জন্মগত। উপন্যাসে সে এই সংগ্রামের বিচিত্র রূপ দেখতে চায়। মানুষ ব্যর্থ হয়, ভেঙে পড়ে, কিন্তু তবু পড়তে পড়তেও সে ভেঙে পড়ার অর্থের ইঙ্গিত রেখে যায়। মানুষ ব্যর্থ হয়, তবু সে তার ব্যর্থতাকে ব্যাখ্যা ক'রে যায় লেখকের সত্যনিষ্ঠাজাত সৃষ্টির ভিতর দিয়ে। পৃথক্ প্রচার দরকার হয় না, প্রচার আপনা থেকেই ফুটে ওঠে সার্থক সৃষ্টিতে, আর্টের নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থেকেও।

আর ঠিক এই কারণেই পাঠক যদি কোনো উপন্যাসে লেখকের কল্পনাশক্তির পরিচয় না পায়, যদি লেখকের সৃষ্টিকে সত্য বলে চিনতে না পারে, কৃত্রিম মনে হয়, যদি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি না মেলাতে পারে, অর্থাৎ লেখক যদি তাকে স্বীকার করতে না পারে, যদি জীবনের ব্যাখ্যা তার কাছে তুচ্ছ হয়, যদি কাহিনীর ঊর্ধ্বে কোনো সত্যের সন্ধান সে না পায়, যদি কাহিনীর মধ্যে কোনো একটা ভাব বা ইঙ্গিত বা [illegible] তার মনকে স্পর্শ না করে, যদি তার কল্পনার বাইরের [illegible] তা তার কাছে উদ্‌ঘাটিত না হয়, যদি মানুষকে সমাজ ও কাল থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে কেবল মাত্র মনস্তত্ত্বের [illegible]কের মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখা হয়, যদি একটা মানুষকে বা একটা সমাজকে বা একটা জাতিকে বর্তমানের মধ্যেই বাস্তুলুপ্ত অবস্থায় দেখানো হয়, যদি পাঠকমনের কোনো দিকের কোনো নতুন গবাক্ষ উন্মুক্ত না হয়, যদি মানুষের [illegible] তার আত্মিক সত্তাকে নাড়া না দেয়, তা হলে সে কাহিনীর শিল্পমূল্য খুব বেশি নেই। তা নানা দিক দিয়ে চমকপ্রদ হতে পারে, কিন্তু তাকে মহৎ সাহিত্য বলা চলবে না।

কথা-সাহিত্যের উপর বর্তমান পাঠকের এই হল চরম দাবী। অর্থাৎ এপিকের বদলে উপন্যাস (বা নাটকের) কাঠামোয় রামায়ণ-মহাভারতের দাবী।

এইখানে ওঠে রুচির প্রশ্ন। কোন্ পাঠকের মর্মে কোন্ [illegible] সাহিত্য-সৃষ্টি এসে আনন্দ জাগাবে তা বলা শক্ত।

শিক্ষার প্রশ্নও জড়িত আছে এর সঙ্গে। চিত্রশিল্প যেমন, সঙ্গীত যেমন। সবারই রুচিভেদ আছে। একের যা ভাল লাগে অন্যের তা লাগে না। যে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত পোলাওয়ের স্বাদ পায়নি, তার কাছে ভাতের ফেন সব চেয়ে স্বাদু। পোলাওয়ের স্বাদ কেমন তা জানবার সুযোগ পায়নি সে। উদর-সিদ্ধি দুইয়েতেই সমান।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সাহিত্যের একটি নিজস্ব মান এখন স্থির হয়ে গেছে। এবং ব্যক্তিগত রুচি যাই হোক, তার দ্বারা সাহিত্যের ভাল-মন্দ বিচার করা চলে না।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, আগের দিনের সাহিত্য-সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত রুচির উপরেই নির্ভরশীল ছিল, এখন আর তা চলে না, গ্রাহ্য হয় না। এই রীতি সব দেশেই ছিল, হয়তো এখনও কিছু কিছু আছে। আগের দিনে বড় লেখক আর এক বড় লেখককে ভুল বুঝে কত উত্তেজনাই না সৃষ্টি করেছেন। আমাদের দেশের কোনো বড় লেখকই আঘাতের হাত থেকে বাঁচেননি। ইংরেজী সাহিত্যে ব্যক্তিগত আক্রমণ হয়েছে আরও বেশি। এমন কি শেক্সপীয়ারও অসভ্য মাতাল বর্বর লেখকরূপে অভিহিত হয়েছেন। সাহিত্যিক গালাগালির সংকলন-গ্রন্থ পাওয়া যায় ইংরেজী সাহিত্যে।

কিন্তু মহৎ সাহিত্যের উপর বর্তমান কালের যে দাবীর কথা বলা হয়েছে, বাঙালী পাঠক হিসাবে বাংলা কথা-সাহিত্যের উপর সে দাবী কত দূর করা চলে? (কাব্যের কথা একেবারেই বাদ দিয়েছি, কারণ পৃথক প্রবন্ধ ভিন্ন তা আলোচনা করা চলে না।)

ইউরোপীয় মহৎ সাহিত্যের যে আদর্শ, সেই আদর্শের বিচারে এ প্রশ্নের উত্তর পাঠককেই দিতে হবে। এপিক ও ছোট গল্পের কথাও বাদ দিলাম। বরঞ্চ নাটকের নাম করা যেতে পারে এই সঙ্গে। এই আদর্শের উপন্যাস ও নাটকে বারোখানা নশ্বর নাম শুনতে চাই। এর পরবর্তী অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর বই [illegible] ডজন নাম লেখা চলতে পারে। তৃতীয় শ্রেণীতে খান পঞ্চাশেক। এ ভিন্ন অধিকাংশ জনপ্রিয় বইয়ের স্থান তৃতীয় শ্রেণীর নিচে।

এইবার জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে আসা যাক। জানার ইচ্ছা, অনুশীলন এবং শিক্ষার সঙ্গে বাড়ে, কিন্তু এমন লোক আছে যে কিছু জানাকে বড়ই ভয় করে। সে শুধু অতীতের বিশ্বাস এবং সংস্কারের মধ্যে ডুবে থাকে, তার সেই জ্ঞান-সীমার বাইরে আর কোনো সত্য আছে এ কথা সে বিশ্বাস করে না। আধুনিক সংস্কার-মুক্ত বিজ্ঞানে তার [illegible] আস্থা নেই। [illegible] দল দার্শনিক আছেন যাঁরা আধু[illegible] [illegible]দের আলো[illegible] বিশ্বের চরম সত্য কি সে সম্পর্কে পূর্ববর্তীদের মত পরিমার্জিত [illegible] করতে এগিয়ে চলেছেন, আর এক দল প্রাচী[illegible] যাঁরা সত্যের বাইরে আর কোনো সত্য আছে বিশ্বাস করেন না। এমন কি থাকা উচিত নয় বলে বিশ্বাস করেন। আর এক দল আছেন, যাঁরা জ্ঞানের পথে, বুদ্ধির পথে চলতে ভয় পান। প্রাচীন জ্ঞান বা আধুনিক জ্ঞান, দুইয়েতেই তাঁদের সমান বিতৃষ্ণা। তাঁরা কেবলমাত্র অন্ধ বিশ্বাসের আশ্রয়ে বাস করতে ভালবাসেন। আরও এক দল আছেন যাঁরা নিজেদের ধ্যানলব্ধ অব্যবহিত সত্য ভিন্ন আর কিছু আছে বলে জানেন না। এই শেষোক্ত দল আপন মনের মধ্যে ডুব দিয়েই সব পেয়ে যান, তাঁদের আর কিছু পাবার দরকার নেই।

অতএব যাঁর যেমন শিক্ষা, রুচি বা প্রবৃত্তি, কিছু জানবার আকাঙ্ক্ষাও তাঁর থাকে। এঁদের সবারই উপযুক্ত বই আছে।

কারও এতটুকুও জানা [illegible] খাটে না, পড়া যাঁদের অভ্যাস তাঁরা আপন [illegible] বই খুঁজে নেন।

এই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। একজনের মতে যেটি গ্রাহ্য, অন্যের মতে সেটি পরিত্যাজ্য। সাধারণ শিক্ষার মান (এবং জীবনযাত্রার মান) উন্নত হলে তবেই কি বই পড়তে প্রবৃত্তি হয় না ভেবে, কি বই পড়া উচিত এ প্রশ্ন মনে জাগে।

বাছাই করার ক্ষেত্র অতি প্রশস্ত। যে দেশে শিক্ষার মান এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত, যারা অনেক জিনিস জেনেছে, তাদের আরও অনেক জানবার অদম্য বাসনা থেকেই হাজার হাজার বিভিন্ন বিষয়ের বই লেখা হয়।

অবশ্য আমাদের দেশে নয়, যদিও এটি আমাদের ইচ্ছাকৃত ত্রুটি নয়। সে কথা পরে আলোচনা করছি।

বাংলা ভাষায় বইয়ের প্রচুর অভাব। জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য উচ্চ মানের বই অতি সামান্যই আছে। বহুমুখী জ্ঞানের পিপাসা তৃপ্ত করবার মতো অবস্থা আমাদের নেই। যে বই পড়ে আধুনিক সমাজে শিক্ষিত বলে পরিচয়

দেওয়া যায় এ রকম বই দু চার বিষয়ে মাত্র আছে, হাজার বিষয়ে নেই। ইচ্ছামতো যে-কোনো বিষয় বেছে নিয়ে সে বিষয়ে উচ্চ জ্ঞান লাভ করার যোগ্য বই নেই। আমাদের নিজস্ব শিল্প, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, দর্শন এবং ইতিহাস বিষয়ে এবং বিজ্ঞানের কোনো একটি বা একাধিক বিষয়ে বই আছে, কিন্তু অন্য দেশের তুলনায় তা কিছুই নয়। অনুবাদ-সাহিত্যও সামান্য আছে, এবং ফরাসী বা রুশ সাহিত্যের যে অনুবাদ আছে তা মূল থেকে নয়, তা অনুবাদের অনুবাদ, অতএব তার কোনো মর্যাদা নেই। মূল থেকে অনুবাদ ক'রে বাংলা সাহিত্যে গৌরব বৃদ্ধি করব, এমন সঙ্কল্প নিয়ে কেউ ফরাসী, রুশ বা জার্মান সাহিত্য পড়েছেন কি না জানি না। গ্রীক সম্পর্কেও ঐ একই কথা।

ইংরেজী ভাষায় এ সব অসুবিধা নেই, যা ইচ্ছা তাই পড়া চলে, অনুবাদ সেখানে সবই মূল থেকে করা হয়, এমন কি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত শিখে সংস্কৃত সব বই অনুবাদ করে নিয়েছেন তাঁদের ভাষায়। অন্য কারও সেকেণ্ড হ্যাণ্ড অনুবাদের উপর নির্ভর করেননি।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য ইংরেজী ভাষায় কিছু পড়তে চাইলে বিশেষ সুবিধা। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাত্র একখানি বইয়ের নাম করছি— সাড়ে তিন টাকায় আগে বিক্রী হত, এখন কত জানি না। মাত্র একখানি বই, নাম— An outline of modern knowledge. যে মূল জ্ঞান থাকলে সমাজে যথেষ্ট শিক্ষিত বলে পরিচিত হওয়া যায়, এই বইখানির চব্বিশটি অধ্যায় পড়লে সেই জ্ঞান লাভ হতে পারে। এর প্রত্যেকটি অধ্যায় এক একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ, মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ১১০১। সবগুলি অধ্যায়ই নিজ নিজ বিষয়ের মূল তত্ত্বকথার আলোচনা, এবং প্রত্যেকটি বিষয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তির লেখা।

জ্ঞানলাভের জন্য ইংরেজীতে প্রসিদ্ধ কয়েকখানি এনসাইক্লো-পীডিয়া আছে, ব্রিটানিকা তার মধ্যে বৃহত্তম। অ্যামেরিকানা, চেম্বার্স এবং অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট অনেক রকম আছে।

আমাদের এনসাইক্লোপীডিয়া নেই। [illegible] হয়েছিল মাত্র। হবার সম্ভাবনা আছে। বিশ্ববিদ্যাসং[illegible] গ্রন্থমালা মিলিয়ে এক শ' খানার উপরে আধুনিক জ্ঞা[illegible] বই ছাপা হয়েছে। এই পর্যায়ে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই ছাপা হওয়ায় বাধা নেই। তা শেষ হলে সমস্ত বই প্রয়োজন মতো সংশোধন ক'রে এক সঙ্গে সাজিয়ে ছাপলেই বাংলায় ছোটখাটো একখানা এনসাইক্লোপীডিয়া হতে পারে। এর সঙ্গে এখনই যুক্ত করার মতো অনেক ভাল প্রবন্ধ যা মাসিক পত্রে ছড়িয়ে আছে তা নেওয়া যেতে পারে এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদে প্রকাশিত সাহিত্যসাধক চরিতমালা যোগ করা যেতে পারে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে বিদেশী সকল সাহিত্য-সাধকের জীবনী ছাপা হওয়া উচিত, তা হলে তা বাংলার পাঠকের পক্ষে যেমন ভাল হবে তেমনি পরিষদের পক্ষেও গৌরবজনক হবে। বিজ্ঞান পরিষদ এর অনুকরণে বিজ্ঞানীদের জীবনী প্রকাশ করতে পারেন। এই তিন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ঘটলে কাজ অনেক সহজ হবে।

আপাতত বাংলায় যে ক'খানা পাঠ্য বই আছে, (সেও অনেক বিভাগে একখানা বইও নেই) তার সংখ্যা কম, এবং কোনো পাঠক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো একটা বিভাগেরও শেষ কথা সম্বলিত বই বাংলায় পাবে না, তাকে ইংরেজী বইয়ের আশ্রয়ে যেতেই হবে। এটি অভিযোগ নয়। এর অনেক কারণ আছে। প্রথমত বাংলা গদ্য ইংরেজীর তুলনায় শিশু। দ্বিতীয়ত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙালীর প্রবেশ ইংরেজী শিক্ষার ফলে, আধুনিক কালে। তৃতীয় কারণ জাতীয় চরিত্র।

বাঙালী চরিত্রে দ্রুত এগিয়ে যাবার গুণের অভাব। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম স্বাদ পেয়ে ইংরেজী সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বাঙালী হঠাৎ আপন স্বভাবধর্মকে সাময়িক ভাবে অতিক্রম করতে পেরে-ছিল। দেড়শ বছর তার আয়ু ছিল। আমরা যে ক'জন বাঙালীকে জাতির গৌরব বলে জানি, তাঁরা সবাই এই সময়ের। জ্ঞানলাভের উগ্র আগ্রহে, কর্মে, জ্ঞান ও শিক্ষা প্রচারে, প্রচলিত অভ্যস্ত সংস্কার ও পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনে তাঁরা ছিলেন খাঁটি ইংরেজধর্মী। তাঁরা যতদূর এগিয়েছিলেন তার পর থেকে আমরা যদি ঠিক সেই পরিমাণ উৎসাহ ও দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারতাম তা হলে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হবার কারণ ছিল। কিন্তু এ গতি থেমে আসছে। ইংরেজ যত দিন স্থায়ী হবার লক্ষণ দেখিয়েছিল তত দিন আমাদেরও এগিয়ে যাবার লক্ষণ ছিল। ইংরেজদের চলে যাবার কিছু আগে থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের কি ইতিহাস? আমরা অগ্রগতি থামিয়ে পিছনে ফিরে বসেছি। নিজেরা নির্বীর্য এবং নিষ্কর্মা হয়ে শুধু বীরপূজা করছি। যাঁদের পূজো করছি, তাঁরা যে কাজ অসমাপ্ত রেখেছেন তাকে এক পা এগিয়ে দিচ্ছি না।

পৃথিবীর যুবশক্তির সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের কোন্ ছবিটি চোখে পড়ে? কেউ কল্পনা করতে পারেন ইংরেজ বা মার্কিন বা ফরাসী বা জার্মান যুবশক্তি সমস্ত অধ্যবসায় এবং অর্থ ব্যয় ক'রে বছরে গোটা দশেক দেবতা পূজোর, গোটা পঁচিশেক গুরুপূজোর আর নেতা-পূজোর শোভাযাত্রা বের ক'রে বছরের অধিকাংশ সময় নষ্ট করছে? এ কল্পনা করা যাবে না। আমরা কিন্তু তাই করছি। উপরন্তু বিয়ের শোভাযাত্রা আছে, রাজনৈতিক শোভাযাত্রা আছে।

আমরা স্বাধীন হবার পর অনেকখানি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছি, এতে আর সন্দেহ নেই। আজকের লেখক দল দু' ভাগে ভাগ হয়ে গেছেন। ক্ষমতাশীল লেখকেরা, যাঁরা বলেন সাহিত্য সকল দলের ঊর্ধ্বে (এবং ঠিক কথাই বলেন) তাঁরা তাঁদের সর্বশক্তি ব্যয় ক'রে তাঁদের সাহিত্যে শুধু এইটি প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে অন্য দলটা খারাপ। এই তাঁদের একমাত্র বাণী। অর্থাৎ নিজেরাই আদর্শভ্রষ্ট হচ্ছেন।

এই সব কারণে আরও অনেক কাল আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আদর্শের পথ খুঁজে বের করতে। জাতীয় চরিত্র স্বভাবতই কার্যবিমুখ হওয়াতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকাংশ বিভাগেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, দর্শন বা গবেষণালব্ধ সত্য বিষয়ক বই বাংলায় আদৌ লেখা হবে কি না সন্দেহ! পাশ্চাত্ত্য দেশে যিনি যে বিষয়ে কর্মী তিনি সেই বিষয়ে বই লেখেন। আমরা তা থেকে অপহরণ ক'রে বই লিখি। এর উপর আর এক বিপদ আসছে। অর্থাৎ হিন্দি আসছে এবং ইংরেজী বিদায় নিচ্ছে। হিন্দি বাংলার চেয়েও দুর্দশাগ্রস্ত। বড় বড় বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক অথবা

[১১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো নয়

ওরে যোগীন, যা তো, গিরিশের বাড়ি যা। আমার জন্যে একটা বাতি চেয়ে নিয়ে আয়। আমার বাতি ফুরিয়ে গেছে। আর শোন—

ঠাকুর পিছু ডাকলেন। আর দেখে আয় সে কেমন আছে।

কে গিরিশ ঘোষ? ওই যে থিয়েটার করে! ওই যে মাতালের সর্দার!

বাতি আনতে তার কাছে? কোথায় দক্ষিণেশ্বর, কোথায় বাগবাজার! কাছে-পিঠে কেউ কি রাখে না মোমবাতি?

কিন্তু উপায় নেই, ঠাকুরের হুকুম।

চলো বাগবাজার। বাড়ি নেই গিরিশ, কোথায় গিয়েছে নেমন্তন্ন খেতে। তবে আর কি, বসে থাকো। ওই যে, ফিরেছে, কিন্তু এ কি চেহারা? টলছে, নেতিয়ে পড়ছে।

'কে হে তুমি? চাই কি?'

'আমাকে ঠাকুর পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'ঠাকুর! আহা, ঠাকুর পাঠিয়ে দিয়েছেন!' ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করল গিরিশ। 'পাঠাবেন না? না পাঠিয়ে কি পারেন? গিরিশের জন্যে যে তাঁর মন পোড়ে।'

'একটা বাতি চেয়েছেন আপনার কাছে—'

'আহা, কি দয়া! একটা বাতির জন্যে এত দূরে পাঠিয়েছেন, আমার কাছে?' দক্ষিণেশ্বরের দিকে চেয়ে গড় করে প্রণাম করল এবার। 'একটা কেন, এক বাণ্ডিল নিয়ে যাও।'

বলে, উঠেই গালাগাল! সে আরেক মূর্তি। তুমি বাতি চাইবার আর জায়গা পাওনি? কেন, তোমার বরানগর-আলমবাজারে বাতি মেলে না! একেবারে আমার বাড়ি ধাওয়া করেছ! তুমি কোথাকার জমিদার, পেয়াদা পাঠিয়েছ সমন দিয়ে! আমি কি তোমার বাস্তুবাড়ির প্রজা, না, তুমি আমার মহাজন?

বলেই খেউড় সুরু করল। মাতালের পাঁচফোড়ন।

বাতি একটা ছুঁড়ে দিল যোগেনের দিকে। নিয়ে যাও। অন্ধকারে আছে, একটু আলো জ্বালানো মন্দ নয়। আলোর অভাব বলেই তো এই দুর্দশা!

আবার গালাগাল।

বাতি নিয়ে ছুট দিল যোগেন। কি বদ্ধ মাতাল রে বাবা! লাফিয়ে পড়ে কামড়ায়নি যে বড়, এই ভাগ্যি।

'কি এক ভ্রেপশু মাতালের কাছেই পাঠিয়েছিলেন—'

'কেন, কি হল?' প্রসন্ন মুখে তাকিয়ে রইলেন ঠাকুর।

'খালি গালাগাল, খালি খিস্তি-খেউড়।'

'কাকে?'

'আর কাকে! আপনাকে।'

এতটুকুও লাগল না ঠাকুরকে। বললেন, 'শুধু গালই দিলে, আর কিছু করলে না?'

'আপনার কথা বলতে প্রথমে প্রণাম করেছিল, উত্তর দিকে মুখ করে কি-সব বলছিল বিড়-বিড় করে, আর মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে গড় করছিল বার-বার—'

'তবে?' উল্লসিত হলেন ঠাকুর। 'তুই শুধু তার মন্দটা দেখলি, ভালোটা দেখলি নে? গালাগাল শুনলি, শুনলি নে তার ভক্তির মন্ত্র? টলে-পড়া দেখলি, দেখলি নে তার নুয়ে-পড়া?'

তাই তো দেখি সর্বক্ষণ। কার কোথায় ত্রুটি, কার কোথায় ন্যূনতা। আমরা ত্বকসর্বস্ব, অন্তঃসারের খবর নিই না। যেমন আমরা লোক তেমনি আমাদের বিচার। আধ-গ্রাস জল কাছে

থাকলে যে দোষদর্শী সে বলে, দেখলে ? জল দিয়ে তো গ্লাসটা ভরতি করে দিলে না ! আর যে গুণ-গ্রাহী সে বলে, আহা কি ভালো, অন্তত আধ-গ্লাস তো দিয়েছে !

কুব্জার মধ্যে কী দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ ? দেখলেন অনবদ্যাঙ্গী গৃহাঙ্গনা।

রাজপথ দিয়ে যাচ্ছেন, বক্রদেহা এক যুবতীর সঙ্গে দেখা। হাতে অঙ্গ-বিলেপের পাত্র। শ্রীকৃষ্ণ জিগগেস করলেন, তোমার নাম কি ? এই বিলেপন কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছ ?

কুব্জা বললে, আমার নাম ত্রিবক্রা, আমি কংসের প্রধানা অঙ্গলেপন-দাসী।

'এ লেপন আমাকে দাও।' কৃষ্ণ হাত বাড়ালেন : 'আমাকে দিলে তোমার শ্রেয়োলাভ হবে।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল কুব্জা। এ লেপন কংসের অতি কামনীয়, কিন্তু এ রসিকশেখর পথিকের মত যোগ্যতর অধিকারী আর কে আছে ? শুধু হাতের পাত্রের নয়, যেন প্রাণপাত্রের সমস্ত চন্দনলেপন দিয়ে দিল পথিককে।

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হল ঐ কুব্জা যুবতীকে সরলাঙ্গী করে দিই। যেহেতু প্রাণের সরলতাটি আমায় দিয়েছে তখন আর তো ওর বাঁকা থাকবার কথা নয়। আমি ওকে ঋজু করে দিই।

কুব্জার দু পায়ের উপর নিজের দু পা রাখলেন শ্রীকৃষ্ণ। দু আঙুল দিয়ে তার চিবুক ধরে তার মুখখানি ঠেলে তুললেন উপরের দিকে। মুকুন্দস্পর্শে গরীয়সী কুব্জা মুহূর্তে উন্নতদর্শনা হয়ে উঠল। শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় আকর্ষণ করে বললে, 'হে বীর, আমার গৃহে চলো। তুমি আমার চিত্ত মথিত করেছ, তোমাকে কিছুক্ষণ আমার অতিথি হতেই হবে।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'হে সুভ্রূ, আমি লোকদুঃখ মোচন করতে এসেছি। সে ব্রত সাঙ্গ হলে আসব তোমার ঘরে। আমি গৃহশূন্য পথিক, আর তোমার ঘর ঘরছাড়াদের আশ্রয়।'

'মা, তাকে টেনে নিও, আমি আর ভাবতে পারি না।' আকুল হয়ে কেঁদে উঠলেন ঠাকুর।

'আমি নিতান্ত পাষণ্ড।' করজোড়ে বলছে গিরিশ, 'কত গালাগাল দিই আপনাকে।'

'বেশ করো। গালাগাল, খারাপ কথা, অনেক বলো তুমি—তা হোক, ও সব বেরিয়ে যাওয়াই ভালো।' অভয়ানন্দ ঠাকুর বললেন উদারস্বরে, 'উপাধিনাশের সময়ই শব্দ হয়। পোড়বার সময় চড়চড় শব্দ করে কাঠ। পুড়ে গেলে আর শব্দ থাকে না।'

'কি উপায় হবে আমার ?'

'তুমি দিন-দিন শুদ্ধ হবে, দিন-দিন উন্নত হবে। লোকে দেখে অবাক মানবে।' বলে মা'র দিকে তাকালেন। 'মা, যে ভালো আছে তাকে ভালো করতে যাওয়ায় বাহাদুরি কি ! মরাকে মেরে কি হবে ? যে খাড়া আছে তাকে মারতে পারো তবে তো তোমার মহিমা !'

নরেন এসে প্রণাম করে বসল। বসল মেঝের উপর, মাদুরে।

'হ্যাঁ রে, ভালো আছিস ? তুই নাকি গিরিশ ঘোষের কাছে প্রায়ই যাস ?'

'আজ্ঞে হাঁ, যাই মাঝে-মাঝে। সব সময় আপনার চিন্তায় মাতোয়ারা। মুখে কেবল আপনার কথা।'

'কিন্তু রশুনের বাটি যত ধোও না কেন, গন্ধ একটু থাকবেই। যেন কাকে-ঠোকরানো আম। দেবতাকেও দেওয়া হয় না, নিজেরও সন্দেহ।' বললেন ঠাকুর, 'ওর থাক আলাদা। যোগও আছে ভোগও আছে। যেমন রাবণের ভাব। নাগকন্যা দেবকন্যাও নেবে, আবার রামকেও লাভ করবে।'

'কিন্তু আগেকার সব সঙ্গ ছেড়েছে গিরিশ।'

কিন্তু সংস্কার যাওয়া কি সোজা কথা ? সেই যে একজায়গায় সন্ন্যাসীরা বসে আছে, একটি স্ত্রীলোক সেখান দিয়ে চলে গেল। সকলেই ঈশ্বরধ্যান করছে, একজন হঠাৎ আড়চোখে দেখে নিলে। কি করবে, তিনটি ছেলে হবার পর সে সন্ন্যাসী হয়েছিল।

সংস্কারের অসীম ক্ষমতা। রাজার ছেলে, পূর্ব-জন্মে জন্মেছিল ধোপার ঘরে। রাজার ছেলে হয়ে যখন খেলা করছে, সমবয়সীদের বলছে, 'ও সব খেলা থাক, আমি উপুড় হয়ে শুই, তোরা আমার পিঠে হুস-হুস করে কাপড় কাচ্।'

'বাবুই গাছে কি আম হয় ?' বললেন ঠাকুর। 'কে জানে, হতেও পারে। তেমন সিদ্ধাই থাকলে বাবুই গাছেও আম ধরে।'

কর্মাগ্নিতে অঙ্গার হীরক হয়। কাম প্রেম হয়। শুষ্ক তরুতে ফুল ধরে। তোমার কৃপার বাতাসটুকু যদি গায়ে লাগে, আমি অশত্থ বৃক্ষ, আমিও চন্দনতরু হয়ে যাব।

দৈব না পুরুষকার? কে না জানে, দুইই দরকার। শুধু একচাকায় কি রথ চলে, না এক দাঁড়ে নৌকো? শুধু পাল তুললেই তো হয় না, লাগসই হাওয়াটি চাই। মাঠে বীজ পুঁতলেই কি হবে? চাই সলিলসিঞ্চন।

কিন্তু এ দৈব কি? একটা নির্বুদ্ধির খামখেয়াল? যারা জড়, অবিবেকী ও ভীরু তারাই দৈব মানে। আমরা পুরুষসিংহ, আমরা পৌরুষ মানি, বিশ্বাস করি প্রযত্নে। আমরা মাটি খুঁড়ে ফসল ফলাই। যুদ্ধে জিতে ছিনিয়ে আনি রাজমুকুট।

সাধ্য কি শুষ্ক পৌরুষে সিদ্ধি পাই। কত শক্তিমান কৃতী লোক প্রাণপণ প্রযত্ন করছে, কত দুর্নিবার নিষ্ঠা, তবু কিছুতে কিছু হচ্ছে না। বিন্দুমাত্র কুলোচ্ছে না পৌরুষে। আবার কত অধম লোক কত অক্লেশে সফলকাম হচ্ছে। এ রহস্যের মানে কি? এর মানে হচ্ছে দৈব। প্রাক্তন বা পূর্বজন্মের কর্মেরি নামই দৈব। তাই দৈব আর কিছুই নয়, পূর্বকৃত পুরুষকার। এক কথায় প্রারব্ধ।

প্রারব্ধ দিয়ে তৈরি হল আমার ইহজন্মের পরিবেশ। ইহজন্মের পুরুষকার দিয়ে খণ্ডন করব সে পরিমণ্ডল। ব্যর্থ করব সে অদৃষ্টের বিধিলিপি।

যেমন বিশ্বামিত্র করেছিল।

চতুরঙ্গিণী সেনা নিয়ে পৃথিবীভ্রমণে বেরিয়েছিল, উপনীত হল বশিষ্ঠের আশ্রমে। সসৈন্য ক্ষত্রিয়-রাজাকে যোগ্য অভ্যর্থনা করতে পারে এমন সামর্থ্য নেই সেই নিঃসম্বল ঋষির—এমনি মনে হল বিশ্বামিত্রের। তবু আতিথ্য নেবার জন্যে বারে-বারে অনুরোধ করতে লাগল বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র রাজি হল, কিন্তু এই বিপুল বাহিনীকে বশিষ্ঠ খাওয়াবে কি? ভাঁড়ে তো মা-ভবানী।

বিচিত্রবর্ণা কামধেনুকে আহ্বান করল বশিষ্ঠ। বললে, শবলা, অতিথি-সংকারের খাদ্য দাও।

কামদায়িনী শবলা ভূরি-ভূরি খাদ্য-সৃষ্টি করল। দেখে তো বিশ্বামিত্রের চক্ষু স্থির, যে করে হোক লাভ করতে হবে এই কামদুঘাকে। বললে, 'রত্নে রাজারই অধিকার। অতএব এই রত্ন আমাকে দান করুন। বিনিময়ে যা কিছু চান ধেনু বা ধন দিচ্ছি আপনাকে।'

অসম্ভব! এই শবলা থেকেই আমার হব্য কব্য, আমার প্রাণযাত্রা। শত কোটি ধেনু বা রাশীভূত রজত শবলার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। কিছুতে রাজি হল না বশিষ্ঠ।

তখন বিশ্বামিত্র সবলে [illegible] নিয়ে চলল শবলাকে। বশিষ্ঠকে উদ্দেশ করে সরোদনে বললে শবলা, 'আপনি কি আমাকে ত্যাগ করলেন?'

আমি কি করব। এই বলোদ্ধত রাজা তোমাকে স্পর্ধাপূর্বক নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে এর অক্ষৌহিণী সেনা। এর তুলনায় আমি কিছুই নয়। আমি নির্বল, নিস্তেজ।

কে বলে? আপনিই অধিক বলবান। ক্ষত্রবলের চেয়ে ব্রহ্মবল শ্রেষ্ঠ।

'অনুমতি করুন,' শবলা বললে দৃপ্তস্বরে, 'আমি সৈন্য সৃষ্টি করি। বিধ্বস্ত করি এই দুর্বৃত্তকে।'

তথাস্তু। মুহূর্তে অগণন সৈন্য-সৃষ্টি করল শবলা। বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্য নির্জিত ও বিনষ্ট হল। শুধু তাই নয়, শতপুত্র মারা পড়ল একে-একে।

এ কী বিপর্যয়! নির্বেগ সমুদ্র, রাহুগ্রস্ত সূর্য ও ভগ্নদন্ত সাপের মত নিষ্প্রভ হল বিশ্বামিত্র। তখনো একটিমাত্র পুত্র বেঁচে আছে, তাকে রাজ্য দিয়ে চলে গেল হিমালয়ে। বসল শিবারাধনায়। কি বর চাও, তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব দেখা দিলেন। দিব্যাস্ত্র দাও, ত্রিজগতে যত অস্ত্র আছে, সব আনো আমার অধিকারে।

মহাদেব বর দিলেন।

আর যায় কোথা! মহাবলে ধাবিত হল বিশ্বামিত্র। অস্ত্রানলে বশিষ্ঠের আশ্রম দগ্ধ করতে লাগল। আশ্রমবাসীরা পালাতে লাগল ঊর্ধ্বশ্বাসে। ভয় পেয়ো না, রৌদ্র যেমন শিশির ধ্বংস করে, তেমনি আমি বিশ্বামিত্রকে শেষ করছি। বলে বশিষ্ঠ তার দণ্ড উত্তোলন করল। তার ব্রহ্মতেজপূর্ণ উদ্দণ্ড দণ্ড। যত অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল বিশ্বামিত্র, ঐন্দ্র আর রৌদ্র, বারুণ আর পাশুপত, সব নিক্ষেপ করল একে-একে। কিছুতেই কিছু হবার নয়। বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ড সমস্ত অস্ত্র নিরাকৃত করল, নির্বাপিত করল সমস্ত কালানল।

ক্ষান্ত হোন, মুনি-ঋষিরা স্তব করতে লাগল বশিষ্ঠকে। বিশ্বামিত্র হতমান হয়েছে, বশীকৃত হয়েছে, স্তব্ধ হয়ে বসেছে অধোমুখে! আপনি আপনার দণ্ড সংবরণ করুন।

বিশ্বামিত্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ক্ষত্রিয়বলকে ধিক, ব্রহ্মতেজই বল। তাই এক ব্রহ্মদণ্ডেই আমার সমস্ত অস্ত্র পরাজিত হল। এই ক্ষত্রিয়ত্ব পরিহার করে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করব তবে আমার নাম।

দুশ্চর তপস্যায় আবার হল বিশ্বামিত্র। চিত্তমল বিশোধিত হল। কাম ক্রোধ লোভ অনেক উপকরণ আসতে লাগল সামনে। বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। ধীরে-ধীরে উপনীত হল ব্রহ্মর্ষি পদবীতে।

দেবতারা অভিনন্দন করে বললে, তীব্র তপস্যা দ্বারা তুমি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছ। এস দীর্ঘ আয়ু গ্রহণ করো।

একেই বলে পুরুষকার। প্রারব্ধনির্দিষ্ট গতি বদলে দিল পৌরুষপ্রাবল্যে। দুস্ত্যজ প্রকৃতিকেও অতিক্রম করলে তপস্যায়।

'তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম করাবে।' বললেন ঠাকুর, 'ভগবান অর্জুনকে বলছেন তুমি ইচ্ছে করলেই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে পারবে না। তোমায় যুদ্ধ করাবে তোমার প্রকৃতিতে। তা তুমি ইচ্ছে করো আর নাই করো। আমি চিন্তা করছি আমি ধ্যান করছি, এও কর্ম। আমার দান-যজ্ঞ এও কর্ম। নামগুণকীর্তনও কর্ম। কিন্তু যাই করো, ফল আকাঙ্ক্ষা করে কোরো না।'

মৃগ না মিলুক তবু ফিরব না মৃগয়া থেকে। মৃগয়ায় যে বেরুতে পেরেছি সেই আমার পরম লাভ।

একশো দশ

দেবেন মজুমদারও নরেনের মত ঠাকুরকে পরীক্ষা করতে চায়। ঘর ফাঁকা দেখে কখন ঠাকুরের বিছানার নিচে ছোট্ট একটি রূপোর দু-আনি রেখে দিয়েছে।

বসতে গিয়ে উঠে পড়লেন ঠাকুর। আবার চেষ্টা করলেন বসতে, আবার উঠে পড়লেন।

'এ কি, এমন হচ্ছে কেন?' জিগগেস করলেন ঠিক দেবেন মজুমদারকেই। 'ছুঁতে পাচ্ছি না কেন বিছানা?'

পরীক্ষকই ধরা পড়ে গেল। পাংশুমুখে স্বীকার করলে অপরাধ।

কিন্তু ঠাকুরের কোনো গ্লানি নেই। হাসিমুখে বললেন, 'আমায় বিড়ে দেখছ নাকি? তা বেশ, বেশ।'

তবু আরো এক পরীক্ষা বুঝি বাকি আছে।

ঠাকুর নিজেই পাড়লেন সেই কথা। বললেন, 'ওগো, মন বড় কেমন করছে। অনেক দিন দেখিনি তাকে।'

কাকে? দেবেন তাকাল কৌতূহলী হয়ে।

ঠাকুর তার নাম করলেন। এ কি, এ যে স্ত্রীলোক। একজন স্ত্রীলোকের প্রতি ঠাকুরের টান। দেবেনের মন কালো হয়ে উঠল।

'ওরে রামনেলো, রসগোল্লা নিয়ে আয়। খিদে পেয়েছে।'

অনেকগুলো নিয়ে এল রামলাল। একটি নিজে খেয়ে বাকিগুলো খাওয়ালেন দেবেনকে। বললেন, 'এ সব সে-ই পাঠিয়েছে। এখানকে বড় ভালোবাসে। বড় ভালো লোক।'

মুখের স্বাদে যেন আর মিষ্টতা নেই এমনি মনে হল দেবেনের। এ কেমনধারা আকর্ষণ।

'ওগো, তাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে।' ব্যস্ত হয়ে ঠাকুর পাইচারি সুরু করেছেন। সহসা ঝুঁকে পড়ে দেবেনের কানের কাছে মুখ এনে বললেন চুপি-চুপি, 'আমাকে একটি টাকা দেবে?'

টাকা? কেন?

'গাড়ি না হলে যেতেও পারি না, আবার গাড়ি করে গেলে তার ছেলে গাড়িভাড়া দিতে মনে বড় কষ্ট করে। তাই তোমার কাছকে চাইছি। তুমি যদি দাও তবে একবার দেখে আসি।'

তার আর কি! দেব না-হয় যখন চাইছেন।

দেবেনের ভঙ্গি দেখে হাসলেন ঠাকুর। বললেন, 'কিন্তু বলো আবার লিবে। কি, আবার লিবে তো?'

তা বেশ মশাই, শোধ যদি দেন তো নেব। টাকা বের করে রামলালের হাতে দিলে। রামলাল কলকাতা যাবার গাড়ি আনতে গেল।

মাষ্টার মশাই ও লাটুর সঙ্গে দেবেনও উঠল গাড়িতে। যাই ব্যাপারটা দেখে আসি স্বচক্ষে।

পথে মন্দির পড়ছে তাকে প্রণাম করছেন ঠাকুর, মসজিদ পড়ছে তাকেও। শুধু তাই নয়, মদের দোকানকেও। কত লোককে এখানেও আনন্দ দিচ্ছেন মহামায়া। মদিরার কথা ভেবে মনে পড়ছে হরিনামের কথা। হরিরসমদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে! যার যাতে নেশা, যার যাতে আনন্দ!

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়েরা। তাদের উদ্দেশেও প্রণাম করছেন ঠাকুর। বলছেন, মা আনন্দময়ী!

দেবেনের পা টিপলেন ঠাকুর। বললেন, 'আমি কারু ভাব নষ্ট করি না।'

যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি।

বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটিই রাখতে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব। তবে যেন এ কথা বোলো না, আমার ভাবই সত্য আর সব ভুয়ো। যে ভাবই হোক, যদি তা আন্তরিক হয় ঠিক পেয়ে যাবে সীমানা।

'বারোয়ারিতে নানা মূর্তি করে, নানান মতের লোকের ভিড়। রাধাকৃষ্ণ, হরপার্বতী, সীতারাম। যারা বৈষ্ণব তারা রাধাকৃষ্ণের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে। যারা শাক্ত তারা হরপার্বতীর কাছে। যারা রামভক্ত তাদের সামনে সীতারাম। কিন্তু যাদের কোনো ঠাকুরের দিকে মন নেই', ঠাকুর হাসলেন: 'তাদের কথা আলাদা। বেশ্যা তার উপপতিকে ঝাঁটাপেটা করছে এমন মূর্তিও করে বারোয়ারিতে। ও সব লোক তাই দেখছে হাঁ করে। দেখছে আর চেঁচাচ্ছে। বন্ধুদের ডাকছে, ওসব কি দেখছিস, আয়, এদিকে আয়।'

গাড়ি এসে পৌঁছুল বাড়িতে। ঠাকুর একা অন্দর-মহলে ঢুকে পড়লেন।

সন্দেহ বুঝি আরো উগ্র হল দেবেনের। মাষ্টার-মশাই তখন গান ধরলেন: আমরা গোরার সঙ্গী হয়েও ভাব বুঝতে নারলুম রে। গোরা বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, ভাব বুঝতে নারলুম রে—

কিছুক্ষণ পরেই ঠাকুর আবার ফিরে এলেন। অসমাপ্ত গানের অবশিষ্টটুকু গাইতে লাগলেন। তবু সন্দেহ কি যায়। কালিমা কি ঘোচে!

ভিতর থেকে চাকর এসে আবার ডেকে নিয়ে গেল ঠাকুরকে। কতক্ষণ পরে আবার এল চাকর। এবার আপনারা আসুন।

ভেতরে গিয়ে কী দেখল দেবেন! দেখল আসনের উপর আলুথালু হয়ে ঠাকুর বসে আছেন, যেন পাঁচ বছরের ভোলানাথ ছেলে আর তাঁর সামনে বসে তাঁকে খাওয়াচ্ছেন এক বৃদ্ধা মহিলা, চোখে জল, মুখভাবে বাৎসল্যের লাবণ্য।

'বাবা, চৈতন্যচরিতামৃতে পড়েছিলুম,' বলছে সেই বৃদ্ধা গৃহিণী, 'চৈতন্যদেবের মা চৈতন্যদেবকে খাইয়ে দিতেন নিজের হাতে। আমার মনে হত, আমি যদি শ্রীচৈতন্যের মা হতুম, এমনি করে খাওয়াতুম তাকে। কি আশ্চর্য, আমার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। তুমি এসে উদয় হলে আমার জীবনে!' বলছে আর কাঁদছে অনর্গল।

কৃষ্ণ মথুরায় গেলে যশোদা এসেছিলেন শ্রীমতীর কাছে। ধ্যানস্থা ছিলেন শ্রীমতী। যশোদাকে বললেন, আমি আদ্যাশক্তি, তুমি আমার কাছে বর নাও। যশোদা বললেন, কি আর বর দেবে! শুধু এইটুকু করো, আমার গোপালকে আমি যেন প্রাণ ভরে সেবা করতে পারি, খাওয়াতে পারি হৃদয়মথিত স্নেহনবনী।

এই তো সেই যশোমতীর মাতৃপ্রতিমা।

কৃষ্ণ বললে, আমাকে অহৈতুকী ভক্তি দাও, অব্যবহিতা ভক্তি। ফলাভিসন্ধিরহিত অবিচ্ছিন্ন ভালোবাসা। কার জন্যে তোমার কাছে তোমার প্রাণ-বুদ্ধি দেহ-মন স্ত্রী-পুত্র এত প্রিয়, কার কৃপায়? যার জন্যে যার কৃপায় এই প্রিয়ত্ববোধ, তার চেয়ে প্রিয়তর আর কে আছে?

এই কি সেই প্রিয়-প্রীণন নয়?

আত্মধিক্কারে ভরে গেল দেবেন। এ কে নয়ন-ভুলানো দেখা দিলেন চোখের সামনে! চোখে যেন আর পলক পড়তে চায় না। খাবার থালা কে দিয়ে গিয়েছে সুমুকে। কিন্তু, না, দাঁড়াও, এই বাৎসল্য-মাধুর্য আস্বাদন করি।

বাগবাজারের এক বড় ঘরের গৃহিণী—কেমন ইচ্ছে হল, যদি একবার যেতে পারতাম দক্ষিণেশ্বর। এত কথা শুনছি যাঁর সম্বন্ধে তাঁকে যদি দেখতে পেতাম চোখ ভরে।

কেন প্রাণ উতলা হয় কে বলবে। ঈশ্বর-পিপাসা তো কোনো হেতুবাদের উপর দাঁড়িয়ে নেই, ক্ষুৎপিপাসার মতই এ বৃত্তি স্বাভাবিকী। ভক্তিতে যত আনন্দ বাড়ে তেমন আর কিছুতে নয়। কেন না ভক্তিতেই আর দেহদুঃখ থাকে না, চিত্ত শান্ত ও অমৎসর হয়, ভোগে অনাসক্তি আসে। যত দুঃখ এই আসক্তি থেকে। আসক্তি চলে গেলেই একটা আশ্চর্য স্থিতিশক্তিতে জীবন দৃঢ় হয়ে ওঠে।

কে একজন আছে চেনা মহিলা, কয়েক বার যাতায়াত করেছে দক্ষিণেশ্বরে, তার শরণাপন্ন হল। বেশ তো, কালই চলো না। নৌকো করে যাব দুজনে।

পরদিন বিকেলে দুজনে এসে উপস্থিত। কিন্তু এ কি, ঠাকুরের ঘরের দরজা বন্ধ। উত্তরের দেয়ালে দুটি ফোকর আছে, তারই ভিতর দিয়ে উঁকি মারল দুজনে। দেখল ঠাকুর শুয়ে আছেন, বিশ্রাম করছেন। এখন যাই কোথা? সারদামণিও নেই, গেছেন বাপের বাড়ি। এ-ওর মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এখন করি কি?

অপেক্ষা করো। স...পাগত হয়েছ, এখন যদি ধৈর্য্য না ধরো, তবে যাত্রা ব্যর্থ হয়ে যাবে। বয়ে যাবে লগ্ন। ক্লেশ-নদী অতিক্রম করে এসেছ, এখন কৃপাজলনিধিকে দেখে যাও।

নবতের দোতলার বারান্দায় গিয়ে বসে রইল দুজনে।

কিছু পরেই ঠাকুর উঠলেন। উত্তরের দরজা খুলতেই চোখ পড়ল মহিলাদের উপর। ওগো, তোরা এখানে আয়, ডেকে উঠলেন সানন্দে।

ঘরে এসে বসল পাশাপাশি। যে মহিলাটি পরিচিত, তক্তপোশ থেকে নেমে তার কাছটিতে এসে বসলেন ঠাকুর। বসতেই সে মহিলাটি লজ্জায় কুঁকড়ে গেল। সরে যাবার জন্যে ত্বরিত ভঙ্গি করলে। ঠাকুর বললেন, 'লজ্জা কি গো! লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। শোনো, তোরাও যা আমিও তাই।'

নিজের দাড়িতে হাত দিলেন: 'তবে এগুলো আছে বলে বুঝি লজ্জা? তাই না?'

কৃষ্ণান্বেষিণীদের আবার লজ্জা কি! শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পদসেবন অর্চন বন্দন দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণা ভক্তি কৃষ্ণকে নিবেদন করো।

অনেক ভগবৎকথা শোনালেন ঠাকুর। সঙ্কোচের আড়ষ্টতা আর থাকল না। হরিপ্রসঙ্গ শেষে সাংসারিক কথাও পাড়লেন। বললেন, 'সপ্তাহে অন্তত একবার করে এসো। প্রথম-প্রথম এখানে আসা-যাওয়াটা বেশি রাখতে হয়। কিন্তু নিত্য অত নৌকো বা গাড়িভাড়া দিতে যাবে কেন? শোনো, আসবার সময় তিন-চারজনে মিলে নৌকো নেবে আর যাবার সময় হেঁটে বরানগর গিয়ে সেখান থেকে শেয়ারে ঘোড়ার গাড়ি।'

[ক্রমশঃ।

আজব দেশ

শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী

কোথায় আছে স্বর্গ নরক—পাশাপাশি সোদর সমান,
দানবেরা দেবতা সাজে, দেবতারা কেউ পাত্তা না পান?
সঞ্জীবনী সুধার জোরে অসুর যতো হয়ে অমর
নিত্যিনায় নানান্ ভাবে অত্যাচারের বাড়ায় বহর;
রোগে ওষুধ পথ্য বিনা দেবতা কোথায় মরে রে?
সে আমাদের আজব দেশ, আমাদেরি এ দেশ রে!

কোন্ দেশেরি মানুষগুলো এমনিতরো বদ্ধ পাগল,
মুখ বুজে যার হজম করে, সব রকমের আবোল-তাবোল?
হাজার হাজার দোকান-ভরা নানান্ রকম দুধের খাবার,
মায়ের কোলে দুধ না পেয়ে কচি শিশুর জীবন কাবার,
খাদ্য ভেজাল, ওষুধ ভেজাল চলতে কোথায় পারে রে?
সে আমাদের আজব দেশ, আমাদেরি এ দেশ রে!

কোথায় আছে এমনি বিধান—হাতে মারার শাস্তি 'মরণ',
কায়দা করে মারলে ভাতে সমাজে তার উচ্চ আসন?
এমন সুযোগ কোথায় আছে—স্বদেশপ্রেমের জুয়াখেলায়
তিনটে টুপি পকেটে যার আগেরে সেই আসর জমায়,
চোরের কোথায় বড়ো গলা, জুয়াচোরের আদর রে?
সে আমাদের আজব দেশ, আমাদেরি এ দেশ রে!

কোন্ দেশেতে ঘরের মেয়ে পেটের দায়ে পথে দাঁড়ায়,
হাতে কিছু জমলে টাকা অকাজ-কুকাজ সবই মানায়?
অট্টালিকায় ভূরি ভোজে কুকুরে পায় জামাই আদর,
মানুষ থাকে অনাহারে পায়ে-চলা পথের উপর,
কথায় কথায় কপাল মানা, ভগবানের দোহাই রে?
সে আমাদের আজব দেশ, আমাদেরি এ দেশ রে!

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

কাব্য ও সাহিত্যসৃষ্টির পথে রবীন্দ্রনাথের জীবন অভিব্যক্তি লাভ করেছিল সত্য, কিন্তু তাঁর জীবনের মূলসূত্র ছিল এক ধ্যানমগ্ন তপস্যা ও কঠোর সাধনার গভীরে নিহিত। রবীন্দ্রনাথ নিজের এই জীবনব্যাপী নিরলস সাধনাকে চিরদিন প্রচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ক্ষণিক বিদ্যুৎ-চমকের মত কখনো কখনো সেই অন্তর্গূঢ় সাধনা প্রকাশ পেয়েছে এবং তার স্পর্শলাভের সৌভাগ্য ঘটেছে অনেকের জীবনে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই মর্মগত সাধনার সঙ্গে তাঁর কাব্য ও সাহিত্যের বাণীকে মিলিয়ে দেখতে পারলে তবেই তাঁর পূর্ণ পরিচয়ের সঙ্কেত পাওয়া সম্ভবপর। তাঁর সাহিত্য এবং তাঁর জীবন উভয়ই আমাদের অবশ্যপাঠ্য। কাব্যের মায়াজালের অন্তরালবর্তী রূপকারকে আমাদের চিনতে হবে শুধু তাঁর রচনাসৃষ্টির আলোকে নয়, তাঁর জীবনালোকের রশ্মিপাতেও।

কাব্যের ভিতরে কবিকে আমরা পেয়েছি বহু বিচিত্র রূপে। দেখেছি সেখানে তাঁর মর্মভেদী হৃদয়বেদনা অস্পৃশ্য অন্ত্যজদের জন্য সম্প্রসারিত, দেখেছি ধর্মের নামে মানুষের নৃশংস রক্তলোলুপতার বিরুদ্ধে তার রুদ্রমূর্তি, অসহায় মূক পশুদের দুঃখে বিগলিত তাঁর করুণার বাণী।

রবীন্দ্রনাথের ভাবজীবনের এই করুণার সঙ্গে তাঁর ব্যবহারিক জীবনের কতটুকু ঐক্যসূত্র ছিল? যে দরদী মনের পরিচয় পাই তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে, দৈনন্দিন জীবনের আচারে ব্যবহারে তার সঙ্গে কতটা মিল ছিল, এ কথা জানতে স্বভাবতই আমাদের আগ্রহ হয়।

পাখী, খরগোশ প্রভৃতি নিরীহ প্রাণিশিকার রবীন্দ্রনাথ সইতে পারতেন না। তাঁর জীবনে এই ধরণের শিকার সম্বন্ধে দুঃসহ অভিজ্ঞতা ঘটে বাল্যকালে। ১৮৭৩ সালে উপনয়নের পর বালক রবীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে হিমালয়ে যাওয়ার পথে প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন। তখন তাঁর বয়স এগারো বছর নয় মাস। শান্তিনিকেতনে মহর্ষির পরিচারক ছিল হরিশ মালী। এই হরিশ মালী বালক রবীন্দ্রনাথকে একদিন তার খরগোশ শিকারের অভিযানে সঙ্গী জুটিয়ে নিল। শান্তিনিকেতন থেকে মাইল দুয়েক দূরে সুরুল গ্রামের পাশে চীপ সাহেবের ভাঙা কুঠিবাড়ী ছিল ঝোপজঙ্গলে ভর্তি। সেখানে ছিল খরগোশ শিকারের প্রশস্ত ক্ষেত্র। হরিশ মালী যখন উৎসাহের সঙ্গে শিকারে প্রবৃত্ত হল, তখন এই নিরীহ প্রাণিবধের মর্মান্তিকতা বালকের মনকে গভীর দুঃখে বিচলিত করে তুলল।

এই কাহিনী রবীন্দ্রনাথের নিজের মুখ থেকেই শোনার সৌভাগ্য একদিন ঘটেছিল। কত দীর্ঘকাল আগেকার ঘটনা, কিন্তু বাল্যকালের এই ক্লেশকর অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে সত্তর বৎসরের রবীন্দ্রনাথকে সেদিন যেভাবে উদ্বেলিত হতে দেখেছিলাম, সে আমাদের পক্ষে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। ঘটনাটিকে লিপিবদ্ধ করে 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করার আগে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলাম। তিনি লেখাটি সংশোধন করে একটি অংশ সম্পূর্ণ নিজের ভাষায় সংযোজন করে দিয়েছিলেন। বালক রবীন্দ্রনাথের অব্যক্ত বেদনাকে সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর উত্তরজীবনে যে ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন, অবশ্যই তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। তাঁর সংযোজনা-অংশটি এইরূপ :—

"ঝোপের মধ্য থেকে হঠাৎ একটি সন্ত্রস্ত খরগোশ যেমনি দৌড়ে বেরিয়ে গেল অমনি হরিশ মালীর অব্যর্থ লক্ষ্যে তার দৌড় বন্ধ হল। ঘন বনের মধ্যে এই ছোট চঞ্চল প্রাণীটির চকিত পলায়নদৃশ্যের এই প্রথম অভিজ্ঞতা যেমন তাঁকে (অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথকে। লেখাটা অন্যের জবানীতে লিখিত, তাই প্রথম পুরুষের প্রয়োগ) বিস্মিত করেছিল তেমনি এক মুহূর্তে তার এই হঠাৎ জীবনের অবসান তাঁকে কঠোর আঘাত দিয়েছিল, কেন না এর নিষ্ঠুরতা তিনি ঘটনার পূর্বে স্পষ্ট করে কল্পনা করতে পারেন নি। তারপরে খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘপথ হরিশ মালী এই খরগোশের মৃতদেহ কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল, বালককে তারই অনুবর্তন করে চলতে হল। এই পথ তাঁর পক্ষে দুঃসহ বেদনার পথ হয়েছিল। এই রক্তপাতের বীভৎসতা থেকে সেদিন যে নিষেধবাণী তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল সে যেন শকুন্তলায় আশ্রমবাসীদের আর্ত অনুনয়েরই মত—ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্ মৃদুনি মৃগশরীরে।"

লেখা সংশোধন করে ঐ সঙ্গে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতেও বলেছিলেন—

"বালককালে চিফ সাহেবের ভাঙা কুঠিতে খরগোশ শিকারের নিদারুণতা চিরকালের মতো আমার মনে মুদ্রিত হয়ে আছে।"

ঐ চিঠিতে আরো লিখেছিলেন—

"আমাদের চরে পাখী মারা সম্বন্ধে আমার নিষেধ ছিল।" এই 'নিষেধ' প্রথম প্রবর্তন করা সম্বন্ধেও একটি কাহিনী আছে।

পুত্র রথীন্দ্রনাথের বয়স যখন দশ বারো বৎসর, তখন একবার তিনি শিলাইদহে ছিলেন কিছু কাল। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সেখানে। তাঁদের বোটের মাঝি একজন ছিল নিপুণ শিকারী। পদ্মাচরের বিলে পাখী শিকারের অভিযানে রথীন্দ্রনাথ প্রায়ই মাঝির সঙ্গ ধরতেন। একদিন মাঝির বন্দুকের গুলীতে এক-জোড়া চখাচখির মধ্যে একটিকে প্রাণ হারাতে হল। তারপর সেই সঙ্গীহারা বিরহী পাখীর অবোধ বিলাপের আর্তনাদ নির্জন চরের চারদিকে এক করুণ আবহাওয়ার সৃষ্টি করল। ক্রৌঞ্চ-মিথুনের বিরহদুঃখে আদিকবির হৃদয় নিংড়ে উৎসারিত হয়েছিল বিশ্বের প্রথম শোকগাথা। বহু যুগ পরে বাংলার কবিকেও সেই দুঃখে উদ্বেলিত করে তুলল। রবীন্দ্রনাথ সেই দিন থেকে তাঁদের চরে পাখী শিকার 'নিষেধ' করে দিলেন।

এই 'নিষেধ' অগ্রাহ্য করে একবার একজন পুলিসের দারোগা পদ্মার চরে হাঁস শিকার করতে গিয়ে বিপদে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বজরা ছিল কাছাকাছি এক জায়গায়। বন্দুকের 'গুড়ুম' 'গুড়ুম' শব্দ শুনেই তিনি বজরার বাইরে বেরিয়ে পাইক

বরকন্দাজদের হুকুম দিলেন অপরাধীকে বজরায় ধরে নিয়ে আসতে। তারা দারোগা সাহেবকে খুঁজে বের করে ছিপে উঠিয়ে নিয়ে এল। রবীন্দ্রনাথের কঠোর মূর্তি দেখে দারোগা ত তটস্থ। তিনি হাত জোড় করে এগিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথের সামনে। লোকটির কুণ্ঠিত কাতর ভাব দেখে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রাগ জল হয়ে গেল। শান্ত-ভাবে দারোগাকে বললেন, দেখ বাপু, এই নিরীহ প্রাণীদের তোমরা উত্যক্ত কোরো না। এ আমি সইতে পারি না।

এই কাহিনীর বিবরণ সংশোধন করে রবীন্দ্রনাথ শেষের দিকে যে অংশ নিজের হাতে যোগ করে দিয়েছিলেন, তার তাৎপর্য্য কম নয়—

> "'যোগাযোগ' উপন্যাসের বিপ্রদাসের জমিদারিতে মধুসূদনের সাহেব বন্ধুদের পাখী হত্যা নিয়ে আলোচনা আছে; সেটা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।"

'রাজর্ষি' উপন্যাস এবং 'বিসর্জন' নাটক রচনার মূল প্রেরণা ছিল জীববলির নৃশংসতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নলব্ধ একটি তীব্র গভীর অনুভূতি, এ কথা সকলেই জানেন।

অসহায় জীবহত্যা যখন ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত হয়, তখন তার নিষ্ঠুরতা সহজে আমাদের মনকে স্পর্শ করে না। এই নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে কিরূপ গভীর বেদনাবোধ ছিল, একবার তা অনুভব করার সুযোগ ঘটেছিল।

খবরের কাগজে সংবাদ বেরল—পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মা নামক এক ব্যক্তি কালীঘাটের কালীমন্দিরে জীববলি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মৃত্যুপণ করে অনশনব্রত গ্রহণ করছেন। এই সংবাদ রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করে তুলল।

কায়, মন ও বাক্যে বিচলিত হওয়ার স্বরূপ যে কি, রবীন্দ্রনাথকে না দেখলে তার ধারণা আমাদের অসম্পূর্ণ থেকে যেত। ১৩৩৯ সালের ৪ঠা আশ্বিন (২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩২) পুণা জেলে মহাত্মাজী যখন অনশনব্রত গ্রহণ করেন, তখনও দেখেছি তাঁর মনের গভীর আলোড়ন। সমস্ত মন জুড়ে তখন তাঁর ঐ এক চিন্তা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে এক সর্বত্যাগী কর্মবীরের স্বপ্ন দেখেছিলেন 'গোরা'তে, 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে, তাঁর কাব্যসাহিত্যের নানা রচনায়। বহু কাল পরে মহাত্মাজী ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা দিলেন যেন রবীন্দ্রনাথের মানসসৃষ্ট কর্মযোগীর জীবন্ত প্রতীকরূপে। কর্মক্ষেত্রে মহাত্মাজী আত্মপ্রকাশ করার আগেই যেন সেই মহামানবের চরিত্র অঙ্কন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। দেশসেবার, মানবপ্রীতির আদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ, সেই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন গান্ধীজী। যা ছিল কবির ধ্যানে সত্য, তাই হয়ে উঠল দেশনেতার জীবনে মূর্ত। রবীন্দ্রনাথকে গান্ধীজী 'গুরুদেব' বলেই সম্বোধন করেছেন। দেশের মুক্তি সাধনায় আদর্শগত ঐক্যবোধ ছিল দুজনের মধ্যে। তাই রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মাজীর মধ্যে ছিল একটা গভীর আধ্যাত্মিক যোগ, পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।

মহাত্মাজী জেলে বসে মৃত্যুপণ করলেন, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। সেই মন্ত্র যে রবীন্দ্রনাথেরই অন্তরের ধ্যানমন্ত্র। মহাত্মাজীর অনশনব্রতের খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্থির থাকা কি সম্ভবপর? তাঁর সমস্ত সত্তা চঞ্চল হয়ে উঠল, বিপ্লব বাধল তাঁর জীবনে। কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনা রইল পড়ে, কবির তখন একমাত্র ধ্যানধারণা—মহাত্মাজীর শেষ ব্রত। সেই ব্রতের আদর্শ ত রবীন্দ্রনাথেরও অন্তরের সুরে বাঁধা। কি ভাবে মহাত্মাজীর ব্রত উদ্‌যাপনে তিনি নিজেও অংশ গ্রহণ করবেন, দিন-রাত অস্থির হয়ে মনে মনে তার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। মহাত্মাজীকে সংকল্প ত্যাগ করতে রবীন্দ্রনাথ কখনো অনুরোধ করেন নি, বরং টেলিগ্রামে তাঁকে জানালেন—"... Our sorrowing hearts will follow your sublime penance with reverence & love." ৪ঠা আশ্বিন সকালে আশ্রমের মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করলেন। আশ্রমবাসী প্রায় সকলেই সেদিন অনশনে ছিলেন। উদ্বেগের সীমা নেই, রবীন্দ্রনাথ কর্তব্যপন্থা স্থির করে উঠতে পারছেন না। আশে-পাশের গ্রামবাসীদের আহ্বান করলেন, মহাত্মাজীর ব্রতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পর পর দুদিন শান্তি-নিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে ভাষণ দিলেন। তাঁর সেই সময়কার অন্তর্বিপ্লবের পরিচয় রয়েছে সেই ভাষণগুলিতে। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় অস্পৃশ্যতা দূর করার সংকল্প আশ্রমবাসীরা গ্রহণ করলেন শুধু কথায় নয়, কাজে। আশ্রমের অন্ত্যজ, অস্পৃশ্যরা একদিন খাবারঘরের পংক্তিভোজনে অন্ন পরিবেশন করল সকলকে, আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণও বাদ পড়লেন না। ছাত্রছাত্রী, কর্মীরা দলে দলে গ্রামে গ্রামে গিয়ে অস্পৃশ্যতা বর্জনের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। আশ্রম জুড়ে সে যেন এক নূতন প্রেরণার বন্যা এল। হরিজনদের সামাজিক সম্মানদানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আশ্রমে গড়ে উঠল 'সংস্কার সমিতি'। রবীন্দ্রনাথ বিলাতের কর্তৃপক্ষের কাছে তার করলেন, দেশবাসীকে অস্পৃশ্যতা বর্জনের জন্য খবরের কাগজে আবেদন জানালেন। তবু কিছুতেই স্থির থাকতে পারছেন না। আশ্রমের আমেরিকান অধ্যাপক 'টাকার' সাহেবকে মহাত্মাজীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তবু তাঁর মনে শান্তি নেই। শেষটা ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি নিজে রওনা হয়ে পড়লেন পুণা অভিমুখে। তারপর কি ভাবে সমস্যার সমাধান ঘটল, কি ভাবে মহাত্মাজী অনশনব্রত ভঙ্গ করলেন আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাশে বসে 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' গানটি গাইলেন, সে সব ঐতিহাসিক ঘটনা কারো অবিদিত নেই।

রামচন্দ্র শর্মার মৃত্যুপণের সংবাদে আর একবার আমরা প্রত্যক্ষ করলাম রবীন্দ্রনাথের মানসিক চাঞ্চল্য। ঐ এক প্রসঙ্গ ভিন্ন তখন আর তাঁর মনে কোন চিন্তার স্থান নেই। নিরীহ পশুর বোবা দুঃখ হৃদয়ে অনুভব করে কবি তাঁর লেখনীমুখে সেই বেদনাকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, সভ্যতাগর্বিত ধর্মান্ধ পশুঘাতক মানুষ যখন দেবতার নাম করে খড়্গ উদ্যত করে, তখন তাকে তিনি ধিক্কার দিতে পারেন। কিন্তু মানুষের সংস্কারপুষ্ট এই কলঙ্কময় প্রথার উচ্ছেদ করা কি কবির সাধ্যায়ত্ত? কবি সেখানে অসহায়। তাই কোন মহাপ্রাণ সাধক এই কলঙ্ক ঘোচাবার ব্রত গ্রহণ করে আত্মোৎসর্গের জন্য কার্যক্ষেত্রে যখন অগ্রসর হয়ে আসেন, তখন তাঁর ব্রত উদ্‌যাপনে প্রেরণা না দিয়ে স্থির থাকা কবির পক্ষে অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পলোকের করুণার অবতার বীর-হৃদয়কে যেন রামচন্দ্র শর্মার ভিতরে আবিষ্কার করেছেন। রামচন্দ্র

শর্মা সম্বন্ধে তখন কেউ বিন্দুমাত্র আস্থার অভাব দেখালে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠে বলেছেন, তোমাদের নিজেদেরই আত্মশ্রদ্ধা নেই, তাই শ্রদ্ধেয়কেও তোমরা অনায়াসে অশ্রদ্ধা করে বস।

যে-আদর্শের জন্ম রামচন্দ্র শর্মা প্রাণ দিতে উদ্যত হয়েছেন, সে ত রবীন্দ্রনাথেরই অন্তরের আদর্শ। একটা ঐতিহাসিক ঘটনার সম্ভাবনায় তাঁর সমস্ত অনুভূতি উদ্বেলিত হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ স্থির করলেন, কলকাতায় 'বিসর্জন' অভিনয়ের ব্যবস্থা করবেন। রামচন্দ্র শর্মার অনশনব্রতের ভূমিকায় 'বিসর্জনে'র মর্মবাণী দেশের অসাড় চিত্তকে জাগিয়ে তুলবে। এই ভাবে দেশের চিত্তকে অনুকূল করে তুলতে পারলে রামচন্দ্র শর্মার ব্রত উদ্‌যাপন হবে সার্থক। তার পর থেকে পুরোদমে চলল অভিনয়ের আয়োজন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অসুস্থ, চিকিৎসক তাঁর পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু কে গ্রাহ্য করে সেই নির্দেশ? শারীরিক দুর্বলতাকে গ্রাহ্য করাই তখন তাঁর মতে দুর্বলতা। আশ্রমবাসী সকলেই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন, কি ভাবে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করা যায়। কিন্তু তোপের মুখে দাঁড়াবে কে? একমাত্র রথীন্দ্রনাথের পক্ষেই তা সম্ভবপর ছিল। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর কাছেও ছিলেন রবীন্দ্রনাথ অসহায়, যেন ছোট-ছেলের মত তাঁর বাধ্য। এঁদের দুজনের চেষ্টাতেই অগত্যা 'বিসর্জন' অভিনয়ের উদ্যোগ ছাড়তে হল রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু তাঁর মন শান্ত হল না, কিছুই করতে না পেরে নিজেকে তিনি কর্তব্যভ্রষ্ট মনে করতে লাগলেন। নিরুপায় কবি অবশেষে রামচন্দ্র শর্মার উদ্দেশে অন্তরের নমস্কার রচনা করলেন কাব্যের ছন্দে—

"প্রাণ-ঘাতকের খড়্গে করিতে ধিক্কার
হে মহাত্মা, প্রাণ দিতে চাও আপনার,
তোমারে জানাই নমস্কার।
হিংসারে ভক্তির বেশে দেবালয়ে আনে,
রক্তাক্ত করিতে পূজা সঙ্কোচ না মানে।
সঁপিয়া পবিত্র প্রাণ, অপবিত্রতার
ক্ষালন করিবে তুমি, সঙ্কল্প তোমার,
তোমারে জানাই নমস্কার।

মাতৃস্তনচ্যুত ভীত পশুর ক্রন্দন
মুখরিত করে মাতৃ-মন্দির-প্রাঙ্গণ।
অবলের হত্যা-অর্ঘ্যে পূজা-উপচার—
এ কলঙ্ক ঘুচাইবে স্বদেশমাতার,
তোমারে জানাই নমস্কার।"

১৫ ভাদ্র, ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

কবিতা ত রচিত হল, কিন্তু তাকে প্রকাশ করা চাই অবিলম্বে। পরবর্তী মাসের 'প্রবাসী' ছাপা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি জরুরি চিঠি পাঠিয়ে ঐ সংখ্যার প্রবাসীতেই শেষের দিকে কোন রকমে কবিতাটি ছাপাবার ব্যবস্থা করতে হল, তবে তিনি কতকটা শান্ত হলেন।

কবির রচিত জয়মাল্য হল তৈরি, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের আসনে বসতে পারলেন না পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মা। রবীন্দ্রনাথের কল্পলোকের বীর তাঁর জীবিত কালে অনাগতই রয়ে গেলেন, ভবিষ্যতে কোন দিন যদি কোন মহাপ্রাণ নিরীহ পশুদের প্রাণ বাঁচাবার জন্ম যথার্থই নিজের প্রাণ বলি দিতে এগিয়ে আসেন, তবে তাঁরই জন্ম সঞ্চিত হয়ে রইল কবির অন্তরের এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ভারতমাতার প্রতি

[শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু'র "To India" কবিতার ভাবানুবাদ]

শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী

অনাদি কালের প্রথম প্রভাত হ'তে,
চির-যৌবনা তুমি গো দীপ্তিময়ি।
ওঠো মা গো ওঠো সন্তরি অমাস্রোতে
গৌরব-কূলে; সকল বিঘ্নে জয়ি।
"যুগ-পরিবেশে" দয়িত বলিয়া মানি,
"স্বৈশ্বর্য্যে" জনম দাও গো রাণি।

দুর্বল জাতি স্মৃত-গৌরব লাজে—
আঁধার কারায় বাঁধা শৃংখল-ভারে।
তারা যে খুঁজিছে তোমারে তাদের মাঝে,
জননি! তাদের নিয়ে চলো নিশাপারে।
জাগো মা গো জাগো সুপ্তিরে তব হানি;
সন্তান দলে দেহ আশ্বাস-বাণী।

নানা সুরে তোমা অনাগত দিনগুলি—
ডাকে প্রাচুর্য্যে ভ'রে নিতে ধন-মান।
সুখ-শয়নের সুপ্তি-অলস ভুলি,
নির্জিত-ভয় জয়িয়া করো ত্রাণ।
জাগিয়া জননি! তন্দ্রা-জড়িমা মাজি;
অতীতের মত বাণীরূপে এসো আজি।

বাঙালী হিন্দুর

[বাঙালী হিন্দুর উপাধির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় বিগত ফাল্গুন, ১৩৬০ সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হওয়ায় উক্ত অসম্পূর্ণ তালিকাটি যাতে সম্পূর্ণ হয় সেজন্য বহু পাঠক-পাঠিকা ও গ্রাহক-গ্রাহিকা আমাদের উদ্যোগী হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে কয়েক জন উদ্যমশীল পাঠক নিজ নিজ সংগৃহীত তালিকা প্রেরণ করেন। এই সংখ্যায় পাঠকগণ-প্রেরিত উপাধিসমূহ বর্ণানুক্রমে প্রকাশ করা হয়েছে। আশা করা যায়, প্রকাশিত তালিকায় বাঙালীর প্রায় সকল উপাধির নামোল্লেখ আছে। যদি কোন উপাধি এ যাবৎ অপ্রকাশিত থাকে, পাঠক-পাঠিকার যদি সেটি দৃষ্টিগোচর হয়, আমাদের জানাতে অনুরোধ করি। যাঁরা সাহায্য করেছেন তালিকার শেষে তাঁদের নাম ও ঠিকানা উল্লিখিত হয়েছে। —স]

অংশ, অক্রূর, অগস্তী, অগ্নিহোত্রী, অঞ্জয়, অর্ণব, অধিকারী, আইচ, আইস, আকুলি, আঙ্গা, আগুয়ান, আগুরী, আচার্য, আতর্থী, আড়ন, আড়ি, আটা, আঢ্য, আদক, আদিত্য, আনক, আমিন, আরিক, আর্গ, আর্যচৌধুরী, আলু, আলুনী, আশ, আসদার, আসামী, আহিন, ইন্দ্র, উকিল, উপাসনী, উপাধ্যায়, ঋষি, এন্দ, ওঝা, ওহদেদার।

কাংস্যবণিক, কচ, কবিরাজ, কড়োই, কয়াদার, কয়াল, কপাট, কপ্টি, কপালী, কর, করণ, করাতি, করালি, করোলীয়া, কর্মকার, কড়িয়া, কলু, কস, কসাইকুলে, কাঁঠাল, কাঁসারী, কাঞ্জিবিল, কাঞ্জিলাল, কাটারি, কাঠালিয়া, কাড়ার, কান, কাননগো, কামলে, কামার, কারফারমা, কারক, কারকুন, কার্ফা, কার্বাল, কাবেরি, কলিসার, কালী, কাসপটি, কাহালি, কিরীটি, কীর্তি, কীর্তনীয়া, কুন্ডর, কুচলান, কুণ্ডু, কুড়, কুম্ভকার, কুমার, কুলভী, কুলু, কুশারি, কেশরী, কেশ, কেন্দ, কৈবর্ত, কৈবর্তদাস, কোইল, কোঙর, কোনর, কোটাল, কোদালি, কোলে, কোলেমান, কোড়া।

খঞ্জ, খটিক, খড়্গ, খরসুন্দর, খাঁ, খাঁড়া, খাগ, খান, খাস্তা, খাম, খামাড়, খামড়ুই, খারা, খাসখিল, খাস্তগীর, খাসনবীশ, খিল, খেটো, খোঁড়ুই।

গঙ্গোপাধ্যায়, গড়গড়ি, গড়াই, গণ, গণপতি, গণ্ড, গন্ধবণিক, গমক, গর্গ, গাইন, গায়েন, গারেন, গিরি, গুঁই গুছাইত, গুড়, গুপ্ত, গুণ, গুণধর, গুল, গুহ, গুহঠাকুরতা, গুহবাক্সা, গুহরায়, গেঁতানি, গৈরিকথী, গোঁ, গোঁড়া, গোপ, গোয়াল, গোয়ালা, গোলদার, গোসেন, গোস্বামী, গোহেন।

ঘটক, ঘড়াই, ঘরামি, ঘাঁটা, ঘাটু, ঘাটমাঝি, ঘাটি, ঘোড়ই, ঘোড়া, ঘোড়ুই, ঘোষ, ঘোষাল।

চং, চংদার, চকদার, চক্রবর্তী, চড়া, চতুর্মুখ, চতুষ্পাঠি, চন্দ, চন্দ্র, চন্দ্রবৈদ্য, চট্টোপাধ্যায়, চট্টরাজ, চর্মকার, চাই, চাদ, চা, চাকলাদার, চাকি, চাকুড়া, চামর, চার, চিত্রকর, চোধার, চৌকিদার, চৌধুরী।

ছমার, ছন্দোগী, ছাগরি, ছোয়াল।

জয়ধর, জাউলিয়া, জাগুলিয়া, জাতী, জানা, জায়দার, জালিয়াদাস, জুগী, জেলে, জোতদার, জোয়ার্দার, জ্যোতি।

ঝম্পটি, ঝাঁ, ঝাট, ঝামড়ী, ঝালো।

টিকাদার, টিকারী, টুঙ্গি, টেপা।

ঠগ, ঠাকুর, ঠাকুরতা, ঠাটারি।

ডিডি।

ঢঙ্গি, ঢাঁই, ঢাক, ঢাকী, ঢালী, ঢুঁ, ঢেঁকি, ঢেঙ্গ, ঢোল।

তপন্দী, তরফদার, তরোয়াল, তহশীলদার, তলাপাত্র, তা, তাম্বুলি, তালুকদার, তালুকদার, তিপরা, ত্রিপাঠি, ত্রিবেদী, তেজ, তেরালি, তেলি, তোষ।

থাকদার, থৈ।

দত্ত, দত্তপাঠক, দত্তী, দন্ত, দত্তচৌধুরী, দত্তমজুমদার, দত্তমুন্সী, দপ্তরী, দফাদার, দরিপা, দর্শন, দলপতি, দলাই, দলুই, দা, দাক্ষিৎ, দাঁ, দাড়িক, দানা, দাড়িয়া, দাম্বারি, দাম, দালাল, দাশ, দাশগুপ্ত, দাস, দাহা, দাক্ষি, দিকপতি, দিগার, দিন্দা, দিনদা, দ্বিবেদী, দীক্ষিত, দীঘাঙ্গী, দুলে, দে, দেউরি, দেও, দেওয়ান, দেব, দেবদাস, দেবনাথ, দেববর্মণ, দে সরকার, দোবে।

ধনু, ধবলদেব, ধর, ধরণী, ধল, ধাঙড়, ধাড়া, ধানী, ধানুয়া, ধারা, ধীমন্ত, ধুত, ঢেঁকি, ধেলাই।

নন্দ, নন্দন, নন্দী, নমঃশূদ্র, নরসুন্দর, নস্কর, নাই, নাইয়া, নাঙ্গলে, নাগ, নাটা, নাথ, নাদ, নান, নাক, নাহ, নাহা, নাহার নিয়োগী।

পই, পড়ে, পড়ুই, পাড়েল, পাণ্ডা, পণ্ডিত, পতি, পতিতুণ্ড, পত্রদাস, পত্রনবীশ, পত্রী, পদধান, পর, পরি, পরিষা, পরিহার, পবিত্র, পলসাই, পঞ্চানন, পশারী, পট্টনায়ক, পাঁজা, পাঁড়ে, পাইক, পাইন, পাক, পাকড়াশী, পাখিরা, পাজা, পাটনি, পাটওয়ারি, পাটিয়াল, পাটিবর, পাঠক, পাড়, পাড়ে, পাণ্ডে, পাড়ুই, পাত্র, পাতিয়া, পাথড়ে, পাদ, পান, পানি, পান্তি, পারিহাল, পাল, পালধৈ, পালধি, পালিত, পায়েক, পাহাড়ী, পিপলাই, পিপ্পলি, পিল, পিরি, পুইস্তা, পুরকাইত, পুরকায়স্থ, পুরোহিত, পুমোর, পুলিশাল, পেদা, পোড়েল, পোদ, পোদ্দার, পোলে, পোহিত, প্রকাইট, প্রধান, প্রহরাজ, প্রামাণিক, প্রামাণি।

ফকির, ফলিয়া, ফণী, ফেরকা, ফোগলা, ফৌজদার।

বই, বকসি, বগলা, বগি, বড়াল, বণিক, বটব্যাল, বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্ধু, বর, বরকন্দাজ, বরাল, বর্মণ, বল, বল্লভ, বশ, বশিষ্ঠ, বসাক,

উপাধি কত ?

বসাক চৌধুরী, বসু, বসু রায়, বাঁকা, বাইন, বাউরি, বাওয়ালী, বাকুণ্ডী, বাকুটি, বাখানি, বাগওয়া, বাগচী, বাগজা, বাগদি, বাগ, বাগড়ী, বাগল, বাঘ, বাঙ্গাল, বাঙ্গালি, বাছর, বাছাড়, বাঠা, বাড়ুয্যে, বাঢ়ৈ, বাপুলি, বাবাজি, বাবু, বাটি, বারিক, বারুড়ী, বালা, বায়েন, বাণ, বাণিয়া, বাস, বাসর, বাহুবলীন্দ্র, বাস্ত্র, বিন, বিদিত, বিন্দু, বিটু, বিবাস্ত, বিশই, বিশী, বিশুই, বিশ্বাস, বিষয়ী, বিষ্ণু, বীড়, বীর, বৃহস্ক্যোমী, বেজ, বেড়া, বেন, বেদিয়া, বেরা, বেরুয়া, বেপারি, বেনে, বেশ, বেরা, বেহারা, বেতাল, বৈদ্য, বৈরাগী, বৈদ্যরাজ, বৈষ্ণব, বোধক, বোয়াল, বোসেন, ব্রহ্ম।

ভকীল, ভক্ত, ভক্তা, ভঞ্জ, ভঞ্জচৌধুরী, ভঞ্জদেব, ভট, ভট্টাচার্য, ভট্টশালী, ভড়, ভদ্র, ভদ্রবর্মণ, ভর, ভরদ্বাজ, ভাঁড়, ভাঁটি, ভাওয়াল, ভাণ্ডারী, ভাদুড়ী, ভায়া, ভারতী, ভারী, ভাস্কর, ভুইঞা, ভুঁইমালি, ভুঁইয়া, ভুবমালি, ভুঁনিয়া, ভূমিপা, ভূষ, ভোজ, ভোল, ভৌমিক।

মজুমদার, মণ্ডল, মতিলাল, মন, মন্দার, মন্দিনী, মল্লিক, মশক, মল্ল, মসালচি, মসিব, ময়রা, মহলনবিশ, মহাজন, মহাপাত্র, মহারাজ, মহিষ, মহিন্ত্যা, মহলানবীশ, মহুরি, মহাতপ, মাইতি, মাঝি, মানি, মাণিকা, মাতব্বর, মাকড়, মাজি, মাঝলে, মাড়, মাতাল, মাজিল্যা, মান্ধাতা, মান্না, মারিক, মাল, মালিক, মালিয়া, মালাকর, মালী, মালুয়া, মালো, মাসাটক, মাসচড়ক, মাহাত, মাহম, মাহিষ্য, মিত্র, মিত্রি, মিত্তা, মিশ্র, মিস্ত্রী, মুকুটমণি, মুখিম, মুকুটি, মুখোপাধ্যায়, মুস্তর, মুত, মুদলি, মুদি, মুন্সী, মুবসু, মুস্তফী, মৃজে, মেছো, মেধ, মেষ, মৈত্র, মোদক, মোল্লা, মোড়ল, মোহান্ত, মৌলিক।

যশ, যাগ, যাচনদার, যাটি।

রক্ষিত, রঞ্জ, রঞ্জা, রণঝাপ, রজক, রবিদাস, রাও, রাজ, রাজগুরু, রাজপণ্ডিত, রাজমিস্ত্রি, রাণা, রাঢ়ী, রাম, রায়, রায়চৌধুরী, রায়জি, রায়ভট্ট, রায় খাস্তনিয়া, রায়বর্মণ, রাহুত, রাউৎ, রাহা, রিত, রুইদাস, রুদ্র, রূপানি, রেজ, রোই।

লাঙ্গল, লাটিয়াল, লালা, লাহা, লাহিড়ী, লু, লেখক লোদ, লৌহ।

শতপথী, শক্তি, শর্মা, শর্মাচার্য, শাঁখারী, শা, শাকলা, শাসমল শাহ, শ্যাম, শিং, শিকারী, শিয়ালী, শী, শীট, শীত, শীল, শীলভদ্র শ্রীধর, শ্রীমাণি, শুঁই, শুকুল, শুক্লবেদী, শূর, শেঠ, শ্বেতা, শৈল, শো ষড়ঙ্গী।

সই, সংপতি, সংপথী, সন্ন্যাসী, সন্নিগ্রাহী, সন্নিবিগ্রহী সভাসুন্দর, সমাজদার, সমাজপতি, সমাদ্দার, সর, সরকার, সরখেল সর্দার, সর্বাধিকারী, সহসরদার, সহায়, স্বর, স্বর্ণকার, স্পশান, সাঁ সাঁত, সাঁতরা, সাঁপুই, সা, সাইন, সাউ, সাউত, সাজোয়ান, সাধক সাধু, সাধুখাঁ, সান্যাল, সাঁফুই, সাবুন, সাম, সামন্ত, সামুই, সাবুই সাহা, সাহানা, সাহা ভৌমিক, সাহু, সাহুই, স্বার, সিং, সিংহ সিকদার, সিমলাই, সিন্দলানি, সিদ্ধান্ত, সুতার, সুকুল, সুনকুল সুর, সুরাই, সূত্রধর, সেন, সেনগুপ্ত, সেনা, সেনাপতি, সোম।

হকার, হর, হলধর, হাইত, হাওলদার, হাজরা, হাজারি হাতি, হানর, হালদার, হালুইদার, হাজি, হাতি, হিমাংশু, হিরণ্য, হীরা, হুংই, হুই, হন, হেম, হেমরোস, হোড়, হোতা।

ক্ষেম, ক্ষৌরকার।

১। সুনীল মজুমদার, ৫৩, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ কলিকাতা। ২। গোপালচন্দ্র বসাক, ১এ, সুধা দত্ত লেন, কলিকাতা। ৩। শ্রীবনবিহারী পাহাড়ী লক্ষ্মীকান্তপুর, ঘাটেশ্বর, ২৪ পরগণা ৪। বিমলকুমার দত্ত, শান্তিনিকেতন ওয়েষ্ট, পশ্চিমবঙ্গ ৫। শ্রীকুমার পাকড়াশী, ৩০, ওঙ্কারমল জেটিয়া রোড, হাওড়া ৬। জহরলাল রায়, ৫৮, বাজে শিবপুর রোড, শিবপুর, হাওড়া ৭। শ্রীসুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, পোঃ ও গ্রাম, জাড়গোড়ী, আন্দুল মৌরী, হাওড়া। ৮। শ্রীবিশ্বেশ্বর বসু, হিন্দুস্থান কনট্রাকস কোঃ লিঃ পোঃ ভাইটারনা বোম্বে ষ্টেট। ৯। শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার ঘো ১২ বি মোহনবাগান লেন কলিকাতা।

উপাধি কাহাকে বলে ?

উপাধি যে কি এবং মনুষ্যজাতি কেনই বা উপাধি ব্যবহার করে? উপাধির অর্থই বা কি? উপাধি অর্থে ধর্মচিন্তা, কুটুম্বব্যাপৃতঃ, বিশেষণং, নামচিহ্নং। আলঙ্কারিক মতে জাতিগুণ ক্রিয়াযদৃচ্ছাস্বরূপঃ। অর্থাৎ মানুষের জাতি ও গুণের পরিচয়ের জন্য এবং ধর্মক্রিয়ায় উপাধির প্রয়োজন হয়। 'ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী'তে লিখিত আছে: উপাধি পরিচয়,— "ধূমবান্ বহ্নেরিত্যাদাবাৰ্দ্রেন্ধনমুপাধিঃ"। অর্থাৎ, ধূমবান্ বহ্নি বলিলে যেমন আর্দ্রকাষ্ঠ ইহার উপাধি।

পশ্চিমবঙ্গে সঙ্গীত নাটক একাডেমী

নয়াদিল্লীর কংগ্রেসী সরকার প্রত্যেক প্রদেশে সঙ্গীত নাটক একাডেমীর শাখা গঠনে উদ্যোগী হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে একটি শাখা গঠনের জন্য একাডেমীর পক্ষ থেকে কে একজন অজ্ঞাতনামা সম্পাদিকা নির্মলা যোশী নামধারিণী সম্প্রতি কলকাতায় আসেন এবং কয়েক ব্যক্তিকে জড়িত ক'রে একটি বোর্ড গঠন করেন। একাডেমীর উদ্দেশ্য হয়তো মহৎ এবং পরিকল্পনাও চমৎকার কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে একাডেমীর উদ্যোগ কতটা কার্যকরী হবে সে-বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট দ্বিধা আছে। নৃত্য, নাটক ও সঙ্গীতকে পুষ্ট করতে কোন সরকার যদি উদ্যোগী হয় তা হ'লে সেই সরকারে এমন ব্যক্তিদের অবস্থিতি প্রয়োজন—যাঁরা এই সকল বিষয়ে সামান্যতম জ্ঞানেরও অধিকারী। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিষয়ে উদ্যোগী হতে দেখে প্রথমে আমরা যথেষ্ট আশ্বস্ত হয়েছিলাম কিন্তু এখন আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি, ডাঃ রায় স্বয়ং পশ্চিম বাঙলার শিল্প ও শিল্পীদের আদেপেষ্টে জানেন না এবং চেনেনও না। মানুষের নাড়ী টিপে, বুকে ষ্টেথিসকোপ বসিয়ে এবং কংগ্রেসের সেবা ক'রে কালাতিপাত করেছেন ডাঃ রায়। এখন শিল্প ও শিল্পীদের সম্পর্কে তাঁকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। বাঙলা ও বাঙালীর শিল্প-প্রকৃতি তিনি যদি সম্যক উপলব্ধি করতে পারতেন, তা হ'লে মন্মথ রায়ের মত বিফল-নাট্যকারের হাতে নাট্য পরিবেশনের ভার অর্পণ কখনই করতেন না। 'মহাভারতী' এবং 'যাত্রা হ'লো শুরু' শুধু কল্যাণীতে নয়, কলকাতার রনজি ষ্টেডিয়ামেও বার বার ব্যর্থ হয়েছে, আশা করি ডাঃ রায়ের চোখে আঙুল দিয়ে তা আর দেখিয়ে দিতে হবে না। সরকারী খেয়াল-খুশী ব্যর্থ হ'লে বেসরকারীদের কিছু বলবার থাকে না, হাসাহাসি করবার অবকাশ থাকে, কিন্তু বেসরকারী ব্যক্তিদের পয়সাকে মূলধন ক'রে সরকার যদি নিরোর মতই দেশে আগুন জ্বালাতে অগ্রণী হন? 'মহাভারতী' ও 'যাত্রা হ'লো শুরু' দেখাতে বদ্ধপরিকর হয়ে মন্মথ রায় দেশে বহু অর্থ জলাঞ্জলি দিয়েছেন বা অন্য কিছু ক'রেছেন। এই অপচেষ্টায় দেশের পয়সা জলে গেছে কিন্তু মন্মথ রায় অগাধ জল থেকে যে মাথা তুলেছেন তা সকলেই লক্ষ্য করেছেন। প্রসঙ্গতঃ আমরা সঙ্গীত-পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী ও শিল্প-নির্দেশকের স্কন্ধে এই অঘটনের কারণ বর্তাতে পারতাম, কিন্তু নাটক-রচয়িতাই যদি ব্যর্থকাম হন তখন আর অন্যের কথা উত্থাপনের মূল্য কি! আমরা মনে করি এত গালভরা নাম ব্যবহার না ক'রে সরকারী বিজ্ঞাপনে নাটকের মানকে নীচে না নামিয়ে সরাসরি প্রহসন আখ্যা দিলে কারও কিছু বলবার থাকতো না। মন্মথ রায় সেই প্রহসনের একমাত্র 'ক্লাউন' হলেও কেউ আপত্তি করতেন না। পঙ্কজ মল্লিকের মত গুণী মিউজিক ডিরেক্টর থাকলে প্রহসন ঠিক উৎরেও যেতো। আর শিল্পের অ, আ, ক, খ যিনি কখনও বুঝেছেন না, সেই সৌরেন সেন শিল্প-নির্দেশ করলেও কেউ খুঁত ধরতে যেতো না। দুঃখের বিষয়, মন্মথ রায়ই আমাদের হাসিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা নাট্য-শিল্পকেও এঁদো পুকুরের ঘোলা জলে ভাসিয়েছেন। যাই হোক, সরকারী সঙ্গীত নাটক একাডেমীর পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রাথমিক বোর্ডে নামের তালিকা দেখে আমরা আবার শঙ্কিত হয়ে উঠেছি এই জন্য যে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বোর্ডের তালিকায় যাঁদের নাম দেখলাম তাঁদের মধ্যে এমন কয়েক জন ঢুকে পড়েছেন যাঁরা সঙ্গীত ও নাটকের ক্ষেত্রে নেহাতই অজ্ঞ এবং অপদার্থ। এই বাবদে ডাঃ রায়ও যে সব প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যেও আছেন বেশ কয়েক জন অপোগণ্ড ও গণ্ডমূর্খ। কেবল মাত্র শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, মণি বর্দ্ধন, প্রহ্লাদ দাস, তারাপদ চক্রবর্ত্তী ও সরযূবালাকে প্রতিনিধিত্ব করতে দেখলে কারও কিছু বলবার থাকতো না, কিন্তু এদের সঙ্গে আরও যে ক'জনের নাম দেখলাম তাঁদের প্রতি দেশবাসীর কোন দিন কোন আস্থাই ছিল না। এই অনাস্থা-ভাজনদের প্রায় সকলেই দেখলাম কংগ্রেস সাহিত্য-সঙ্ঘ নামক মরা প্রতিষ্ঠানের কেউ কর্ণধার, কেউ তহবিলদার! সঙ্গীত নাটক একাডেমী, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকের প্রচার ও প্রসারের জন্য কাজের মত কাজ কিছু করুক আর নাই করুক, প্রচুর অর্থ ব্যয় করবে। এবং বলতে বাধা নেই এই অর্থ ধূলিসাৎ বা আত্মসাৎ করতে এই অনাস্থাভাজন মনোমতদের দল যে কি করবে আর কি করবে না, তা এখন সঠিক বলতে পারছি না। তবে একটি কথা বলতে পারি, নৃত্য, সঙ্গীত, নাটক বা একাডেমীর জন্য কিছুই তারা করবে না; যা করবে তাতে দরিদ্র বঙ্গদেশবাসী কিছুই লাভ করবে না, লাভ করবে শুধু তারাই। এই লাভের

অঙ্কটা শুধু জানতে পাবে না যারা টাকা দিয়ে সরকারকে জুগিয়ে রেখেছে সেই দেশবাসী। প্রসঙ্গত: কলকাতার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার মন্তব্য উদ্ধৃত করবার লোভ সামলাতে পারছি না। মন্তব্যটুকু এই: "শুধু বক্তব্য, এই সরকারী টাকাটা দেশের লোকের অনেক কষ্টের উপার্জ্জন, সেটার যেন অপচয় না হয়। বাঙলার নাট্যালয় অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে রয়েছে। নাট্যকার, শিল্পী ও কর্মীদের বেশীর ভাগই বেকার। তাদের কোন সংস্থান হয় এমন পরিকল্পনা দেশের প্রত্যেকেই মনে-প্রাণে চায়। আর ডা: রায় নিজে জাতীয় নাট্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছেন এটাও কম আশার কথা নয়, কিন্তু যে ভাবে ও যাদের কথায় তিনি চলছেন তাতে আশার লক্ষণ কোথায়?"

টীকা নিষ্প্রয়োজন।

রেকর্ড পরিচয়

এইচ্, এম্ ভি—এ মাসে হিজ্ মাষ্টারস্ ভয়েস্ তিনখানি আধুনিক গানের ও একখানি কীর্ত্তনের রেকর্ড পরিবেশন করিয়াছেন। এন্ ৮২৬০১—রেকর্ডে জগন্ময় মিত্র (সুরসাগর) "আর কত রহি বল" ও "যদি মালা হল আজি" এই দু'খানি আধুনিক গান গাহিয়াছেন। এন্ ৮২৬১০ রেকর্ডে—প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় "মিলন বাসরে আনো" ও "পথ ডাকে ওরে আয়" এই দু'খানি আধুনিক গান সুমিষ্ট কণ্ঠে গাহিয়াছেন। এন্ ৮২৬১১ রেকর্ডটি কীর্ত্তনের—গাহিয়াছেন তুষারকণা ভড়। এন্ ৮২৬১২—রেকর্ডটিতে কুমারী বাণী ঘোষাল—"মাটিতে আজ জীবনের আভাস" ও "মেঘ জমেছে দূরে" এই দু'খানি আধুনিক গান গেয়েছেন।

কলম্বিয়া—জি ই ২৪১২১—রেকর্ডে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়—"ভাঙ্গা তরীর" ও "এই ছায়াতে ঘেরা"—এই দু'খানি আধুনিক গান গেয়েছেন। জি ই ২৪১২২—রেকর্ডটিতে হীরালাল চক্রবর্ত্তী গেয়েছেন দু'খানি আধুনিক—"বৃষ্টি পড়ে" ও "এই শাওন গগনে"। জি ই ২৪১২৩—রেকর্ডে কুমারী ইলা চক্রবর্ত্তী দু'খানি রাগ-প্রধান—"বনে বনে গাহে" ও "আষাঢ় সন্ধ্যা ছায়া ফেলে" গেয়েছেন। জি ই ৩০২১১—"বিল্বমঙ্গল" ছায়াচিত্রের দু'খানি গান গেয়েছেন গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাঙ্গীতিক

বাঙ্গালার স্বনামধন্য গায়ক কবি যদু ভট্টের নাম ভারত প্রসিদ্ধ। এক সময়ে তাঁহার রচিত গান আয়ত্ত করিয়া, আসরে গাওয়া, গায়কদের পক্ষে গৌরবের বিষয় ছিল। যদু ভট্টের রচিত গানে কথা, ভাব, ছন্দ ও সুরের এমন একটা অপূর্ব্ব সমন্বয় আছে, যা সাধারণত: শোনা যায় না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, যদু ভট্টের রচনার মধ্যে এমন একটা বিশেষত্ব ছিল, যাহা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-রচয়িতাদের মধ্যেও বিরল। 'বাহার,' 'তিলককামোদ' 'কানড়া' ছিল তাঁহার প্রিয় রাগ। তাঁহার রচিত 'বাহারে'র গানে বসন্তের রূপকে তিনি মূর্ত্তিমন্ত করে গিয়াছেন। গত ৩রা এপ্রিল রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যদু ভট্ট রচিত 'বাহারে'র বিখ্যাত ধ্রুপদ "আজু বহত বসন্ত পবন' গানটি গাহিয়া অনুষ্ঠান শেষ করেন। সমগ্র ভারতের বেতার-শ্রোতৃমণ্ডলী ঐ গানে মুগ্ধ হইয়াছেন। অতুলনীয় ভাষা, সুর ও ছন্দে পরিপূর্ণ গানটির পরিবেশনে প্রত্যেক প্রদেশের সঙ্গীত-মহলে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। বাঙালীর রচিত হিন্দী গানের কদর আছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। শুধু তাই নয়, তার মর্য্যাদাও সর্ব্বভারতে স্বীকৃত হইল। দিল্লী এবং অন্যান্য প্রদেশের স্থানীয় পত্রিকা এই গানের বিশেষ ভাবে সমালোচনা করিয়াছে। গত ১১ই এপ্রিল 'Sunday Statesman'এর সমালোচনা উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করি:—"Their last item in the National Programme was a Dhrupad & Bahar or the spring song, the composition of which is ascribed to Jadu Bhatt of Bengal. It was a joyful song appropriate to the spring season. Couched in poetic language, it vividly depicted vernal landscapes with the rose and the jasmin and the marigald In full bloom". আগামী সংখ্যায় যদু ভট্টের জীবনী ও 'আজু বহত' গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হইবে। গত ২৪শে এপ্রিল শনিবার ইয়ং এন্টারপ্রাইজারসের পরিচালনায় ভাটপাড়া রাখালরাজ ভবনে ভারতবিখ্যাত শিল্পিসমাবেশে এক সারারাত্রি-ব্যাপী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠান সর্বাঙ্গসুন্দর পরিবেশের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন —গীতশ্রী শ্রীমতী উমা দে; শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র, শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী, মীরা চ্যাটার্জ্জি, ওস্তাদ কেরামত আলী, ওস্তাদ সাগরুদ্দিন, ওস্তাদ আমির আহমেদ, মাষ্টার পান্নু, আমির হোসেন সম্প্রদায়, শ্রীকানাই দত্ত, অনিল দাস, শ্রীশশধর দত্ত এবং শ্রীঅমিয়ভূষণ চ্যাটার্জ্জি প্রভৃতি বিখ্যাত এবং বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দ। কলিকাতার বাহিরে এ জাতীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান ইহার পূর্বে আর হয় নাই। এজন্য ভাটপাড়া ইয়ং এন্টারপ্রাইজারসের সভাবৃন্দ বিশেষ ভাবে ধন্যবাদার্হ। পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় এই জলসার উদ্বোধন করিবার সময় বলেন, "গান অপেক্ষা ভগবৎ সান্নিধ্যের উত্তম সাধন আর কিছু নাই।' এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করিয়া অভিনন্দনবাণী প্রেরণ করেন,—আচার্য্য বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, তানসেন সংগীত-সমাজের সভাপতি শ্রীরাজেন্দ্র সিংহ সিংহী, লালগোলারাজ শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সম্পাদক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রভৃতি বিশিষ্ট সুধিবৃন্দ। দেশবন্ধু ক্লাবের তরফ হইতে শ্রীসমর মুখার্জ্জি এবং ব্যক্তিগত ভাবে শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মাষ্টার পান্নুর তবলাসঙ্গত শুনিয়া প্রীত হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন। বিগত ১২ই বৈশাখ ভবানীপুরের রূপালী সিনেমায় স্বর্গত সঙ্গীত-শিল্পী সুধীরলাল চক্রবর্তীর দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব সম্পন্ন হয়।

এই সভায় মৃত শিল্পীর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আমাদের দেশের মৃত শিল্পীদের প্রতি আত্মবিস্মৃত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন অনেকেই। শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল, নরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ-রায়, সুধীন নিয়োগী, তুলসী লাহিড়ী প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। পরিশিষ্টে সুধীরলালের প্রদত্ত সুরের গান গেয়েছিলেন উৎপলা সেন, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, গীতা সেন, পান্নালাল ভট্টাচার্য্য, গায়ত্রী, নিখিল সেন, শচীন গুপ্ত, সতীনাথ ও মানব মুখোপাধ্যায় এবং শ্যামল মিত্র প্রভৃতি কুড়ি জন শিল্পী।

জাতীয় সঙ্গীত

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীর সকল স্বাধীন দেশেই জাতীয় সঙ্গীত আছে। জাতীয় সঙ্গীতে দেশের গৌরব, রাজ্যবিস্তার ও সাম্রাজ্যরক্ষার বিষয় বর্ণিত আছে। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৫) সময় জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয়। তখন জাতীয় সঙ্গীতের উদ্দেশ্য ছিল, ভারতকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা। জাতীয়তা বোধের আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালার কবিগণ জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন। দেশের সম্মান ও শৌর্য্যবীর্য্য রক্ষার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ঋগ্বেদেও ধ্বনিত হইয়াছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তার অনুবাদ করিয়াছেন :

> "অস্ত্র করি মন্ত্রপূত দুর্গ করি সুদুর্জ্জয়।
> আমি যেথা হই পুরোহিত বিজয় সেথা সুনিশ্চয়।
> উঠুক ধ্বজা বিজয়-রথে সম্মুখে আজ শুভক্ষণ।
> ইন্দ্র আজি চলেন আগে সঙ্গে চলে মরুদ্গণ।
> যাও বীরেরা হও বিজয়ী অমিত হোক্ বাহুর বল।
> উগ্র তেজে দগ্ধ কর, দগ্ধ কর শত্রুদল"।

জাতীয় সঙ্গীতের প্রধান বিষয়বস্তু দেশের বীরত্বকাহিনী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের বর্ণন। এক সময়ে রাজপুত চারণদের গীত সমগ্র জাতিকে দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ করিত।

বাঙ্গলার স্বদেশী গান সমগ্র ভারতে নব প্রেরণা ও নব আশার সঞ্চার করে। শতাব্দীব্যাপী সুপ্তি হইতে জাগাইয়া তোলে দেশকে। আত্মবিস্মৃত জাতির প্রাণে আত্মবোধ উদ্রেক করে। মানুষের দাবী ও মানুষের মান রক্ষার সংকল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত জাতীয় সঙ্গীতে শাসিত ও অত্যাচারিত জাতির যুগপুঞ্জিত ব্যথা ও অবমাননার শেষ শিঙ্গাধ্বনি নিনাদিত হয়। বাঙ্গলার প্রথম স্বদেশী গান কবি রঙ্গলালের "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে", পরে "গাও ভারতের জয় মিলে সবে ভারত-সন্তান" রচিত হয় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্", হেমচন্দ্রের "বাজ রে শিঙ্গা বাজ", রজনীকান্তের "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়", জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "এক সূত্রে বাঁধিয়াছি," দ্বিজেন্দ্রলালের "ধন-ধান্য পুষ্পে ভরা" ও "যে দিন সুনীল জলধি হইতে," অতুলপ্রসাদের "বল বল বল সবে" এবং "উঠ গো ভারতলক্ষ্মী," গোবিন্দচন্দ্রের "কত কাল পরে" গান প্রসিদ্ধ। স্বদেশী সঙ্গীত রচনায় অগ্রগণ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "জনগণ-মন-অধিনায়ক," "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী," "দেশ দেশ নন্দিত করি," "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক," "সার্থক জনম আমার" প্রভৃতি গান জাতির অতুল সম্পদ। এই প্রসঙ্গে কবিগুরু রচিত "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী" গানটি স্বরলিপি সহ প্রকাশিত হইল।

> অয়ি ভুবনমনোমোহিনী,
> অয়ি নির্ম্মলসূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী জনকজননী জননী।
> নীল-সিন্ধুজল-ধৌত-চরণতল, অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
> অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল, শুভ্র তুষার-কিরীটিনী।
> প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে প্রথম সামরব তব তপোবনে,
> প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে জ্ঞানধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী।
> চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন—
> জাহ্নবী-যমুনা বিগলিত-করুণা পুণ্য পীযূষস্তন্যবাহিনী। *

* 'বিশ্ব-ভারতীর' সৌজন্যে প্রকাশিত।

মা পা I { মমা মগা ণদা দা | পা -মপা মা পা I ণদা -া -া -া | -া -া (পা মপা) } I
অ য়ি ভু০ ব০ ন০ ম নো ০ ০ মো হি নী ০ ০ ০ ০ ০ অ য়ি০

-া -া I -দা -ণা -র্সা -া | -দা -ণর্সা -ঋা -া I -দণা -র্সঋা -জ্ঞা -া | -া -া -া -া I
০ ০ মা ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ঋা র্সা ণা দা | পা -মপা মা পা I ণদা -া -া -া | -া -া সা রা I জ্ঞা -া জ্ঞা রা |
ভু ব ন ম নো ০ ০ মো হি নী ০ ০ ০ ০ ০ অ য়ি নি র্ ম ল

জ্ঞা -া জ্ঞা রা I জ্ঞা -রা জ্ঞা মা | জ্ঞা ঋা সা -া I সা র্সণা র্সা র্সঋা | ণর্সা দা
সূ ০ র্য ক রো ০ জ্জ্ব ল ধ র ণী ০ জ ন০ ক জ০ ন০ নী

পা দা I ণা -দা -া -া | দণা -র্সঋা র্সা র্সা I ণা পণা দা দা | পা -মপা মা পা I
জ ন নী ০ ০ ০ ০০ ০০ অ য়ি ভু ব০ ন ম নো ০০ মো হি

ণদা -া -া -া | -া -া -া -া I দা -া দা দা | -া ণা দা ণা I র্সা -া ঋা ণা | র্সা র্সা র্সা র্সা I
নী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ নী ০ ল সি ন্ ধু জ ল ধৌ ০ ত চ র ণ ত ল

দা জ্ঞা রা জ্ঞা | জ্ঞা ঋা ঋা র্সা I না -া র্সা ঋা | র্সা -ণা দা পা I সদা -া দা দা |
অ নি ল বি ক ০ ম্পি ত শ্যা ০ ম ল অ ০ ঞ্চ ল অ ম্ ব র

দা -া দা দা I পদা -ণর্সা র্সা ণা | দপা -ণা দা পা I সা -া সা সা | দা -া ণা র্সা I
চু ০ ম্বি ত ভা০ ০০ ল হি মা০ ০ চ ল শু ০ ভ্র তু ষ ০ র কি

দা -ণা -দা ণা | র্সজ্ঞা -ঋা ঋা র্সা I ণা পণা দা দা | পা -মপা মা পা I ণদা -া -া -া |
রী ০ ০ টি নী০ ০ অ য়ি ভু ব০ ন ম নো ০০ মো হি নী ০ ০ ০

-া -া -া -া I সা সা সা সা | জ্ঞা -া জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞরা জ্ঞা | মা মা মা -পমা I
০ ০ ০ ০ প্র থ ম প্র ভা ০ ত উ দ য় ত০ ব গ গ নে ০০

জ্ঞা জ্ঞা রা জ্ঞা | -া জ্ঞা রা জ্ঞা I রা জ্ঞা মা জ্ঞা | -ঋজ্ঞা ঋা সা -া I ণা সা সা সা |
প্র থ ম সা ০ ম র ব ত ব ত পো ০০ ব নে ০ প্র থ ম প্র

দা -া দা দা I পা পা ণা | দা দা পা -া I জ্ঞা -া মা মা | -া ণা দা পা I জ্ঞা -া মা জ্ঞা |
চা ০ রি ত ত ব ব ন ভ ব নে ০ জ্ঞা ০ ন ধ ০ র্ম ক ত কা ০ ব্য কা

-ঋজ্ঞা ঋা সা -া I { দা দা দা -ণা | দণা -র্সঋা জ্ঞা ঋা I ঋা -র্সা র্সা ণা |
০০ হি নী ০ চি র ক ০ ল্যা০ ০০ ণ ম য়ী ০ তু মি

র্সা -া র্সা -া I সদা -জ্ঞা জ্ঞা রা | জ্ঞা -া ঋা -র্সা I না র্সা ঋা র্সা | র্সা -ণা ণা -দা } I
ধ ০ ন্য ০ দে ০ শ বি দে ০ শে ০ বি ত রি ছ অ ০ ন্ন ০

{ পদা -ণর্সা ণা ণা | দা দা পা -মপা I মা পা পা পা | পমা পা ণদা -া } I সা -া সা দা |
জা০ ০০ হ্ন বী য মু না ০০ বি গ লি ত ক০ রু ণা ০ পু ০ ণ্য পী

-া দা দা -া I দা -ণা র্সা দা | -ণা র্সা জ্ঞা -ঋা I র্সা ণর্সা ণা দা | পা -মপা মা পা I
০ যূ ষ ০ স্ত ০ ন্য বা ০ হি নী ০ ভু ব ন ম নো ০০ মো হি

ণদা -া -া -া | -া -া -া -া II II
নী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

খেয়াল-খাতা

[মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি ঠাকুর সংগৃহীত]

[এ যাবৎ কাল 'অটোগ্রাফ' নামেই এই বিভাগটি প্রকাশিত হয়ে আসছিল, কিন্তু উক্ত নামটি বিদেশী হওয়ায় কয়েক জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ভাষাবিদের সঙ্গে আলোচনান্তে অটোগ্রাফের পরিবর্ত্তে "খেয়াল-খাতা" নামকরণ করা হয়েছে। আশা করি পাঠক-পাঠিকার এই নামে আপত্তি হবে না। বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি ঠাকুরের সংগৃহীত স্বাক্ষর-সমূহের মাত্র অর্দ্ধাংশ প্রকাশ করা হয়েছে। অদ্যাবধি যতগুলি স্বাক্ষর-সংগ্রহ প্রকাশার্থে এসেছে তন্মধ্যে মহারাণী ঠাকুরের সংগ্রহ অধিকতম। এক সংখ্যায় এই সংগ্রহ সম্পূর্ণ প্রকাশের স্থানাভাব হওয়ায় আগামী সংখ্যায় বাকী অর্দ্ধেক প্রকাশ হবে স্থিরীকৃত হয়েছে। প্রসঙ্গত: জানিয়ে রাখি, মাসিক বসুমতীর বহু পাঠক-পাঠিকা ও গ্রাহক-গ্রাহিকা তাঁদের নিজ সংগ্রহ প্রকাশার্থে পাঠাতে চেয়েছেন। "খেয়াল-খাতা" সরাসরি পাঠানোর পূর্ব্বে প্রেরণেচ্ছুগণ পত্রালাপ করুন—এই অনুরোধ ;—স]

আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজো আমায় লিখতে হবে ?
হাত যে আমার কাঁপে,
পূর্ব কথা মনে এনে
জাগায় মনস্তাপে।

—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে।

—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শতং বদ মা লিখ।

—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের জাতীয়-জীবনের নবজাগরণের দিনে যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর অমূল্য দান করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সেই উচ্চ আদর্শ যে তাঁহার বংশধরগণ এখনও পোষণ করিতেছেন এবং এই প্রাসাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার জগতের দৃষ্টির সম্মুখে ধরিতে সংকল্প করিয়াছেন ইহা আমি দেশের গৌরবের কথা মনে করি।

—শ্রীযদুনাথ সরকার

অটোগ্রাফ সংগ্রহের কি উদ্দেশ্য ঠিক বুঝি না। বোধ হয় লেখকের স্বভাব কিছু ধরা পড়ে। তা যদি হয় তবে সে লেখা করকোষ্ঠীর মতই সন্দেহজনক।

—শ্রীরাজশেখর বসু

কারো কোন লাভ নাহি তা'য় মোটে
কালির কালিমা শুধু বেড়ে ওঠে,
শুধু তাই নয়, কলঙ্ক ভয় জাগে
লেখকের মাথায়।

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

হাতের লেখায় মনের লেখায়
দ্বন্দ্ব করে কুহু কেকা
সোজা মনের বোঝা বাড়ায়
সরল হাতের বাঁকা লেখা।

—নজরুল ইসলাম

With all good wishes
Be larrish in your praise and be sparing in your criticism.
Benares

—S. Radhakrishnan

Realise God with yourself.

—M. M. Malaviya.

ন-মীদানম (আমি জানি না)

—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

তোমাদের তরে লিখিয়া দিলাম একটি মাত্র লাইন
"ধরা খেলাঘরে আছো যত দিন মেনো না অশ্রু-আইন।"

—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

তব আরতির পূজা উপচার
সাজায়ে আজি
অঞ্জলি ভরি' এনেছি জননী
কুসুম-রাজি।

—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

(ভারতের প্রবীণতম সাংবাদিক ও সাহিত্যিক)

প্রতিভা ও পৌরুষ এ দুয়ের সমাবেশে মানুষ কতখানি বড় হ'তে পারেন, উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করতে পারেন, এর স্বসঙ্গ দৃষ্টান্ত বর্তমান ভারতের প্রবীণতম সাংবাদিক ও প্রখ্যাত-নামা সাহিত্যিক বাগ্মী স্বনামধন্য শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। সত্যি আশ্চর্য্য লাগে এ মানুষটিকে দেখলে। অশীতি বৎসরে পদার্পণ করতে চলেছেন, এখনও তাঁর মেরুদণ্ড ঋজু ও বলিষ্ঠ, তাঁর উদ্যম ও কর্ম্মশক্তি বিংশবর্ষীয় যুবককেও হার মানিয়ে দেয়। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর কম্বুকণ্ঠ সর্ব্বদাই প্রতিবাদ-ধ্বনি তুলে আসছে। তাঁর চরিত্রে এ দৃঢ়তাব্যঞ্জক রূপের সঙ্গে আর একটা দিক রয়েছে যেখানে তিনি শিশুর মত কোমল ও ক্ষমাশীল। অপর দিকে জ্ঞান অর্জ্জন ও জ্ঞান বিতরণের সাধনা চলে আসছে তাঁর জীবনে বরাবর।

যশোহর জিলার চৌগাছা গ্রামে এক শিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারে শ্রী ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন ১২৮৩ বঙ্গাব্দের ১ই আশ্বিন ষষ্ঠী-পূজার দিনে। মাত্র এক বৎসর যখন তাঁর বয়স হ'য়েছে তখনই তিনি পিতৃহারা হন। পিতামহীর ব্যাকুল যত্নে ও মাতার সস্নেহ তত্ত্বাবধানে তিনি বড় হয়ে উঠতে থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি চলে আসেন কৃষ্ণনগরে আরও অধ্যয়ন করতে। কৃষ্ণনগরের স্কুলে মাইনর পাস করার পর তিনি অল্প দিন তথায় কলেজের স্কুলে পড়ে ভর্ত্তি হ'লেন এসে ক'লকাতার হেয়ার স্কুলে। এ স্কুল থেকেই কৃতিত্বের সঙ্গে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াশুনো আরম্ভ করেন। অপূর্ব্ব মেধাসম্পন্ন ছাত্র হিসেবে তিনি কলেজে অল্প কাল মধ্যেই প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন এবং সসম্মানে বি, এ, ডিগ্রী লাভ করার পর আরম্ভ করেন ইংরেজী সাহিত্যে এম, এ অধ্যয়ন ঐ কলেজেই। সঙ্গে সঙ্গে আইন পড়েন—রিপন কলেজে।

বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদের যে অগাধ পাণ্ডিত্য, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার উপর তাঁর যে অপরিসীম ঝোঁক ও মমত্ব এবং রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে তাঁর যে স্বতন্ত্র ভূমিকা, অল্প বয়সেই তা নানা ভাবে প্রকাশ পায়। পিতা গিরীন্দ্রপ্রসাদ ও পিতামহ তারিণীপ্রসাদের শিক্ষা ও চিন্তাশীলতার প্রভাব তো ছিলই তাঁর উপর, আরও কয়েকটি জিনিষ কাজ করেছে তাঁর ক্ষেত্রে তাঁকে এতখানি বড় করে তোলবার জন্যে। একটা ঘটনা—শ্রীঘোষ তখন সবে মাত্র মাইনর পাস করে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছেন, সারা সহর ম্যালেরিয়ায় ছেয়ে গেল। কৃষ্ণনগরে তাঁর আর থাকা হয়ে উঠলো না। স্বাস্থ্যের সন্ধানে পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি গেলেন দেওঘরে। সে ১৮৮৯ সালের কথা, তখন তাঁর বয়স মাত্র বারো কি তেরো। অপূর্ব্ব সুযোগ মিলে গেল তাঁর সেখানে একটা। বিখ্যাত সাংবাদিক শিশিরকুমার ঘোষ, ঋষিকল্প কবি রাজনারায়ণ বসু ও খৃষ্ট ধর্ম্ম-প্রচারক কুমারী এডাম (Miss Adam)—এঁরা সবাই ছিলেন সে সময়ে দেওঘরে। শ্রীঘোষের নিজের কথায়—"এঁদের তিন জনের প্রভাবে রাজনীতিতে এবং সাহিত্য-চর্চ্চায় ও বিশেষ ইংরেজী অধ্যয়নে আমি আকৃষ্ট হই।"

শ্রীঘোষ তখনও বয়সে তরুণ, তাঁর ভেতর কাব্য-প্রতিভা ও সাহিত্যানুরাগ দেখা দেয়। তাঁর প্রথম কবিতা-পুস্তক "উচ্ছ্বাস" প্রকাশিত হয় ১৩০১ সালে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরই। সংবাদপত্রে লেখার প্রতি তাঁর ঝোঁক যায় আরও অল্প বয়সে, যখন তিনি মাত্র ১২ বছরের বালক। কলেজে পঠদ্দশায় "বিপত্নীক" প্রভৃতি তিন-চারখানি উপন্যাস তিনি রচনা করেন। সে সময় পরলোকগত সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রে তাঁর অনবদ্য লেখনী-প্রসূত বহু ছোট গল্প, প্রবন্ধ, মাইকেল চনা ও কবিতা প্রকাশিত হয়। কিছুদিন 'সাহিত্য' পত্রের কার্য্যালয়ও তাঁর গৃহে অবস্থিত ছিল। এর পর তিনি "আর্য্যাবর্ত্ত" নামে
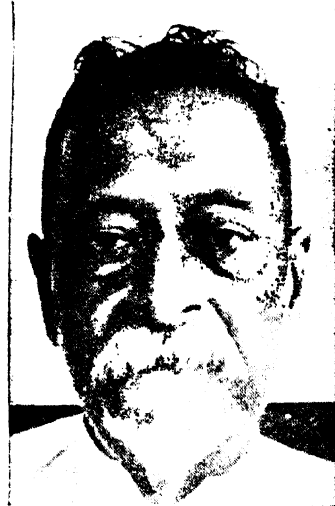
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করে চলেন চার বৎসর কাল। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহে তিনি "সাপ্তাহিক বসুমতী" পত্রে ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর আগ্রহে "বঙ্গবাসী" পত্রে নিয়মিত ভাবে লিখতে আরম্ভ করেন। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হ'বার পূর্ব থেকেই তিনি নিয়মিত লেখক-গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে পড়েন বহু পত্র-পত্রিকায়। তার মধ্যে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর "প্রতিবেশী" ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের "সন্ধ্যা" এবং তৎকালীন বিখ্যাত সংবাদপত্র "যুগান্তরে"র সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

সাংবাদিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঘোষের রাজনৈতিক জীবনও গড়ে উঠতে থাকে খুব অল্প বয়স থেকেই। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হ'লে তিনি তাতে সক্রিয় ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ সময় তিনি "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীতেও যোগদান করেন এবং সেটা শ্রীঅরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পালের একান্ত আগ্রহে। যত দিন পর্যন্ত না উক্ত পত্রখানি সরকারী রোষে পড়ে বন্ধ হ'লো তত দিন পর্যন্ত তিনিই ছিলেন এর অন্যতম প্রধান পরিচালক। এর পরে বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাদর আহ্বানে ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতির আগ্রহে সাপ্তাহিক "বসুমতী"র সম্পাদকীয় গুরু ভার গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরদিনই "দৈনিক বসুমতী" যখন প্রকাশিত হ'লো তখন হরিপদ অধিকারীর নাম সম্পাদক হিসাবে ব্যবহৃত হ'লেও হেমেন্দ্র বাবুই ছিলেন এর প্রকৃত সম্পাদক।

"বসুমতী"তে যোগদানের পরই সাংবাদিক হিসেবে শ্রীঘোষের অপূর্ব প্রতিভা ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে শুধু বাঙ্গালায়ই নয়, সমগ্র ভারতে। এক দিকে সভা-সমিতিতে তাঁর তেজোদৃপ্ত ভাষণ, অপর দিকে সংবাদপত্রের পাতায় দিনের পর দিন তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী তৎকালীন বিদেশী শাসকগোষ্ঠীকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলে। এ ভাবে অপরিসীম দক্ষতার সঙ্গে তিনি দৈনিক বসুমতী ও সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদকের সুকঠিন দায়িত্ব বহন করে চলেন ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সচিত্র 'মাসিক বসুমতী' প্রকাশনার মূলেও ছিল অনেকখানি তাঁরই প্রচেষ্টা ও পরামর্শ। তিনি (শ্রীঘোষ) কিছু কাল এ মাসিকপত্রখানিরও সুযোগ্য সম্পাদক ছিলেন। শ্রীঘোষ কিছু কাল ইংরেজী দৈনিক "এডভান্সের"ও সম্পাদনা করেন অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে। সাংবাদিক হিসেবে শ্রীঘোষ কয়েক বারই বিদেশ সফর করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন চলছে। বৃটিশ সরকার তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন 'ইউরোপের রণাঙ্গন-সমূহ পরিদর্শন করতে।' ইউরোপে গিয়ে তিনি শুধু যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনের মাঝেই নিজেকে আবদ্ধ করে রাখলেন না, সেখানে সংবাদপত্র কতটা কি ভাবে এগিয়ে চলছে তন্ন তন্ন করে দেখে নিলেন এবং বহুল অভিজ্ঞতা নিয়ে স্বদেশে ফিরলেন। তাঁর এ সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দেশের ও সমাজের প্রভূত কল্যাণে এসেছে। এর অব্যবহিত পূর্বেই তিনি গিয়েছিলেন ইরাকে ও বাগদাদে দেশীয় পরিচালিত সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরূপে। এ সাংবাদিক প্রতিনিধিমণ্ডলীর মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র বাঙ্গালী। সচিত্র মাসিক বসুমতীতে তাঁর বিদেশ সফর ও যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার বহু বিবরণ প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

সমাজকল্যাণ শ্রীঘোষ এখনও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং নানা দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে অধ্যাপনা-কার্যে ব্যাপৃত রয়েছেন। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর তাঁকে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য (ফেলো) মনোনীত করা হয়েছে। তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ-এর পাঠ্য-পুস্তক রচনা সংক্রান্ত কমিটিরও অন্যতম সদস্য। বসুমতীর স্বত্বাধিকারী স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বিরাট প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য যে চার জন এক্সিকিউটার বা পরিচালক মনোনীত করে যান, তিনি তাঁদের অন্যতম। ২৪ পরগণা জেলার বোড়াল গ্রামে ঋষি রাজনারায়ণ বসুর যে স্মৃতি-মন্দির গড়ে উঠেছে সে তাঁরই প্রচেষ্টায়। তিনি উক্ত স্মৃতি মন্দির কমিটির সভাপতি।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। ক'লকাতা কর্পোরেশনের তিনি এক সময়ে কাউন্সিলার ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশচন্দ্র লেকচারার ও রামানন্দ লেকচারারের পদও অলংকৃত করেছিলেন ইনি। সংবাদ-পত্র-জগতে তাঁর অবদান নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। কয়েক বৎসর পূর্বে নিখিল ভারত সংবাদপত্র-সম্পাদক সম্মেলনের ক'লকাতা অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে তিনি যে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন সে-ও তাঁর এক অমর কীর্তি।

সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদের অসামান্য দান রয়েছে। বহু উপন্যাস ও প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন এবং গ্রন্থাকারে সে সব প্রকাশিতও হয়েছে।

মাসিক বসুমতীর তিনি একজন নিয়মিত পাঠক, লেখক ও গুণগ্রাহী। তাঁর মতে তাঁরা যখন আরম্ভ করেছিলেন তার পর থেকে মাসিক বসুমতীর কলেবর যাবৎ অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে আকারে, সৌষ্ঠবে এবং বৈচিত্র্যে।

অধ্যাপক অনন্তকুমার তর্কতীর্থ

(ন্যায় ও বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ)

"যে ছেলে বাজার করতে পারে, ন্যায়শাস্ত্র সে-ও পড়তে পারে, যদি তাকে যথাযোগ্য ভাবে শেখানো যায়।" সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীর একটি ঘরে ব'সে ঐ কথাগুলি আমায় বলে যাচ্ছেন রাজধানী ক'লকাতার সংস্কৃত কলেজের ন্যায় ও বেদান্ত-শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীঅনন্তকুমার তর্কতীর্থ।

সম্পাদকের নির্দেশানুযায়ী অনন্তকুমারের জীবনী সংগ্রহের উদ্দেশে অনন্তকুমারের সঙ্গে আমার আলোচনা চলছে। তিনি বলে যাচ্ছেন আর আমি লিখে যাচ্ছি—বিক্রমপুর জেলার ধলছত্র গ্রামে আমি বাড়ী, পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ-পরিবারে হুগলী-উত্তরপাড়ায় প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে জন্ম। ঠাকুরদা—চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, বারা

—তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর। গ্রাম্য হাই স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সুরু হোল, যখন ফোর্থ ক্লাসে পড়া চলছে, সেই সময় হোল উপনয়ন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাবা স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলেন। স্কুলের পড়াশুনো শেষ হোল, কিন্তু অনন্তকুমারের আসল পড়াশুনো এইখান থেকেই সুরু হোল, বাবা তাঁকে ধরালেন সংস্কৃত পড়া, সংস্কৃত অধ্যয়নের সমস্ত প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর স্বর্গগত পিতৃদেবের কাছে, সে কথা আজও সকৃতজ্ঞ চিত্তে অনন্তকুমার স্মরণ করেন। সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্র পড়া তিনি আরম্ভ করলেন কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, ন্যায় তিনি পড়তে সুরু করলেন ব্যাকরণ না পড়েই!

কোন সংসারেই সুখ চিরস্থায়ী নয়, পরমতম সুখের পিছনেই গা ঢাকা দিয়ে থাকে চরমতম দুঃখ, সুযোগ পেলেই সে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনিই অনন্তকুমারদের সুখী সংসারকে দুঃখের পুঞ্জীভূত কালো মেঘ অভিভূত করে তোলে। পণ্ডিতপ্রবর তারকচন্দ্রের কাছে আসে লোকান্তরের আহ্বান। যাত্রী বুঝতে পারে যাবার সময় তার হয়ে এসেছে, দলপতির নির্দেশ পেলেই যাত্রা তাকে করতেই হবে। কিন্তু, হ্যাঁ এর মধ্যে একটা কিন্তু আছে, অনেক আশা, অনেক ভরসা—নাবালক পুত্র, মনের মধ্যে দারুণ বাসনা সে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হোক, পতিব্রতা স্ত্রীকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যেন তাঁর মৃত্যুর পর ছেলের সংস্কৃত পড়া কোন রকমে ব্যাঘাত না পায়। সাধ্বী স্ত্রী উত্তর কালে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর নিকট তাঁর প্রতিজ্ঞা-আশ্বাস।

জগৎপুরের আশ্রমে মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণবিহারী তর্কসিদ্ধান্তের কাছে পড়তে থাকেন পিতৃহীন অনন্তকুমার, কৃষ্ণবিহারীর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি থাকেন, কর্মোপলক্ষে গুরু যেখানে যান শিষ্যও সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। শেষে গুরু এলেন ক'লকাতায়, সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার ভার নিলেন, শিষ্যও সেখানে যোগদান করেন বিদ্যার্থী হিসেবে। গুরুর অধ্যাপনা যথানিয়মে চলতে থাকে, এ দিকে শিষ্যও তাঁর পাঠ্যতালিকা যথাসময়ে শেষ করে ফেলেন। গৌরবময় ছাত্রজীবনে অনন্তকুমার কখনও দ্বিতীয় হননি, চিরকালই তিনি প্রথম। পড়া শেষ হোল, কিন্তু যাত্রা শুরু হোল, যে যাত্রা আজও অপ্রতিহত গতিতে চলছে। অনন্তকুমারের অনন্ত অভিযান আজও অসমাপ্ত। পড়ানো শুরু করলেন ভবানীপুরের গদাধর আশ্রমে, তার পর চলে গেলেন বৈদ্যনাথধাম, বালানন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে বছর নয়েক কাটিয়ে আবার ফিরে এলেন তাঁর শিক্ষাতীর্থেই এবং আজও সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের ক্রোড়েই তিনি সমাসীন। প্রায় বছর দশেক হোল তিনি তাঁর বর্তমান পদের ভারপ্রাপ্ত।

সংস্কৃতের প্রভাব আজ কমে যাচ্ছে কেন, জিজ্ঞাসা করাতে অনন্তকুমার বললেন যে, প্রথমতঃ সংস্কৃতে সামাজিক প্রোৎসাহন নেই, তার পর জাতি এগিয়ে যেতে থাকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার দিকে, ফলে সংস্কৃত দূরে অবহেলিত ভাবে সরে যেতে থাকে। সরকার—হ্যাঁ সরকারও অনেক ভাবে সাহায্য করতে পারেন, যেমন সংস্কৃতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের যে কোন বিভাগে নিয়োগ করে।

অধ্যাপক অনন্তকুমার তর্কতীর্থ

প্রাচীন যুগে সংস্কৃত শিক্ষার পদ্ধতি কি রকম ছিল—উত্তরে অনন্তকুমার একবাক্যে বলে ওঠেন—ভাল—সব দিক দিয়ে ভাল, যেমন ধরুন—তখন একটি নির্দিষ্ট শাস্ত্রে ভারপ্রাপ্ত হলেও অধ্যাপককে শিখতে হোত সকল শাস্ত্র। কিন্তু আজ তিনচার শ' বছর সে ধারা বদলে গেছে, এখন যিনি যা পড়ান তিনি শুধু সেইটুকুরই খোঁজ করেন, এতে করে বহুদর্শিতাটা হারিয়ে যায়, জ্ঞান একটা গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

অনন্তকুমার বলেন, আজকালকার শিক্ষার দৈন্য শুধু বিচারবুদ্ধিহীনতার জন্যে। ভালোমন্দ বিচার করবার ক্ষমতা নেই, ভেবে দেখবার শক্তি নেই, এই শক্তিহীনতার মধ্য দিয়েই এসেছে দীনতা।

প্রায় ঘণ্টাখানেক তাঁর কাছে আমি ছিলুম, দেখতে পেলুম যে এক বিরাট পাণ্ডিত্যের ভিতর লুকিয়ে রয়েছে আর একটি বস্তু—আবরণ, নিজেকে সব কিছু থেকেই লুকিয়ে রাখতে চান অনন্তকুমার।

শিশু-সাহিত্য-সম্রাট শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

অধুনা পূর্ব-পাকিস্তানের ঢাকা শহরের একটি স্কুলের বোর্ডিং হাউস। স্বদেশী-আন্দোলনের যে-যুগে বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার প্রায় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল—বিশেষ করে ছোটদের মহলে তো বটেই, সেই সময়ের কথা।

এক দিন ছেলেদের বোর্ডিং-এ চুরি যাওয়ায় অনুসন্ধান সুরু হ'ল। প্রত্যেক ছেলেকেই তন্ন-তন্ন করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বাক্স-বিছানা তন্ন-তন্ন করে খোঁজা হচ্ছে যদি হদিস পাওয়া যায় চুরি-যাওয়া জিনিসটির। একটি পঞ্চম শ্রেণীর কিশোর কিন্তু

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

কোন মতেই রাজী নয় নিজের জিনিষ-পত্র বাক্স-বিছানা ঘেঁটে দেখাতে। কিশোরটিকে সন্দেহ করে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এগিয়ে এলেন মেস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টিতে বললেন তিনি, 'নিশ্চয় তোমার কাছেই আছে জিনিষটা। তা না হলে সকলেই দেখাচ্ছে নিজের নিজের জিনিষ, আর তুমি রাজী হচ্ছ না কেন দেখাতে?'

কিশোরটির রাগে দুঃখে কথা সরছিলো না। তবু শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'আমি চুরি করিনি—আর তাই দেখাতেও রাজী নই।'

—'বটে'? এগিয়ে এলেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। সহকারীকে আজ্ঞা দিলেন, 'দেখো তো হে ওর বাক্স-বিছানা খুঁজে।'

কিশোরটি প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করলো আর একবার। কিন্তু সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের উন্মত্ত অহংকারে ভেসে গেল সেই ক্ষীণ কণ্ঠের প্রতিবাদ। তার বিছানা-বাক্স-তোরঙ্গ সবই খোঁজা হল তন্ন-তন্ন করে। কিন্তু ঈপ্সিত ফল পাওয়া গেল না। অর্থাৎ যে জিনিষটা চুরি গিয়েছিলো, সেটা পাওয়া গেল না। ব্যর্থ হয়েই ফিরে যাচ্ছিলেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন তিনি। তার পর চিলের মত ছোঁ মেরে হাতে তুলে নিলেন তোরঙ্গের নীচ থেকে একখানি বই—বঙ্কিমের লেখা। বইটি চুরির নয়—তবু নিবিষ্ট ভাবে পরীক্ষা করলেন। কারণ আগেই বলেছি। বঙ্কিমের বই-পড়া নিষেধ ছিল সে-যুগে। আর এই অপরাধেই প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করে তুললেন সেই কচি-কাঁচা কিশোর-মুখ। কিশোরটি কিন্তু তবু স্থির, ধীর, অচঞ্চল। একটা কঠিন প্রতিজ্ঞায় সারা মুখ তার ভাব-গম্ভীর। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের এই দুর্ব্ব্যবহারে বিন্দুমাত্রও দমে যায়নি সে দিনের সেই কিশোর। বঙ্কিমের বই পড়ায় শাস্তি পেল সে, ক্ষুব্ধ হ'ল ছোটদের প্রতি এইরূপ ব্যবহারে। তবু সে বিচলিত হ'ল না।

সে-দিনের সেই কিশোরটি আজকের দিনে শিশু-সাহিত্য-সম্রাট শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার।

সে-দিন থেকেই তার চিন্তা হ'ল এমন একখানাও কি বই হয় না—যা সব ছোটরাই পড়তে পারে বিনা বিপত্তিতে? হয় না কি এমন একখানি বই—যা কেবল ছোটদের জন্যেই, ছোটদের নিজস্ব একখানি বই?

শিশু-সাহিত্যের প্রতি দক্ষিণারঞ্জনের বিশেষ আকর্ষণের প্রধান কারণও এই।

দক্ষিণারঞ্জন সাহিত্য-সাধনা সুরু করলেন—সুরু অনেক দিন আগেই করেছিলেন, এবার থেকে উঠে-পড়ে লাগলেন। বাঙলা দেশে শিশু-সাহিত্যের নির্মল স্রোতঃপ্রবাহের জন্য তিনি সাধনায় ব্রতী হলেন। ছোটদের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা নিয়ে তিনি রচনা করতে লাগলেন কিশোর উপন্যাস, ছোট গল্প, রূপকথা, কবিতা। তাঁর সেই কিশোর-সাধনা যে সফল হয়েছে আজকের দিনে তোমরা সকলেই তা জানো।

শ্রীমতী অশোকা গুপ্তা

[সমাজ-সেবিকা]

ভারতের বঞ্চিত নারী-জাতির ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা এগিয়ে এলেন, দুর্গত ও নিপীড়িত মানুষের সেবায় যাঁরা নিঃস্বার্থ ভাবে বিলিয়ে দিলেন আপনাদের, তাঁদের অন্যতমা অগ্রণী হিসেবে অনায়াসেই নাম করা চলে সমাজহিতব্রতিনী শ্রীমতী অশোকা গুপ্তার। ছেলেবেলা থেকেই সেবার দুর্নিবার সঙ্কল্প নিয়ে তিনি জীবন-পথে এখনও পর্য্যন্ত এগিয়ে চলেছেন অপ্রতিহত গতিতে। বাধা-বিপত্তি প্রতিকূলতা হয়তো সম্মুখে এসেছে অনেক বার কিন্তু কখনই কোন অবস্থাতেই তিনি সঙ্কল্পচ্যুত হন নি—সবল হস্তে ও সুদৃঢ় মনোবল নিয়ে কর্ত্তব্যের হাল ধরে আছেন সর্ব্বদা। সে জন্যেই তাঁর জীবন এত সার্থক, এত সুন্দর এবং এতখানি সম্ভাবনাময়।

যে পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ ক'রে শ্রীমতী গুপ্তা বড় হ'য়ে উঠেন, সকল দিক থেকেই তা চমৎকার। তাঁর পিতা কিরণচন্দ্র সেন ছিলেন পাটনার একজন স্বনামধন্য ব্যবহারজীবী, মাতা শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী নামকরা মহিলা সাহিত্যিক। এঁদের আদিনিবাস হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া গ্রামে। অতি অল্প বয়সে পিতার মৃত্যু হওয়ায় মায়ের সঙ্গে তাঁদের চলে যেতে হয় জয়পুরে। এ পরিবারটি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিদ্যানুরাগের জন্য বহু কাল থেকেই সুপরিচিত। বিশেষ ভাবে তিনি প্রভাবান্বিতা হন তাঁর মায়ের অগ্রগতিমূলক চিন্তাধারায়। তাঁর (শ্রীমতী গুপ্তার) কথায়ই বলতে হয়—আমার জীবনে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করবার যে শক্তি পেয়েছি ও যে প্রেরণা এখনও অব্যাহত ভাবে কাজ করছে, সে প্রধানতঃ আমার মায়ের কাছ থেকেই পাওয়া। ১৩২৮ সালে নারী-জাতির অধিকার সম্পর্কে আমার মায়ের একটি বলিষ্ঠ প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়। সে প্রবন্ধ নিয়ে তখনকার সমাজে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয় সর্বত্র। আমি সে সময়ে বয়সে ছিলুম ছোট কিন্তু স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সকলের আলোচনা শুনে শুনে নারী-জাতির অধিকার সম্পর্কে আমি তখন থেকেই সচেতন হয়ে উঠলুম—মেয়েদের সমাজ-জীবনে সত্যিকারের অবস্থা কি, জানবার জন্য তখন থেকেই নিজের অগোচরেই মন প্রস্তুত হয়ে গেল।

প্রবাসেই শ্রীমতী গুপ্তার শিক্ষা-জীবনের সূত্রপাত। প্রথমে জয়পুরে, তারপর দিল্লীতে তাঁর পড়াশুনো চলে। স্কুলে পড়ার

শেষের দিকে চলে আসেন তিনি ক'লকাতায়। এর পর কলেজ-জীবনও এখানেই কাটলো। কলকাতারই সেণ্ট মার্গারেটস স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। তার পর বেথুন কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে আই, এস, সি ও বি, এস, সি পাস করেন। আই, এস, সিতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে সমর্থ হন।

পশ্চিমবঙ্গের রক্ষণশীল পরিবারের মাঝে থেকেও শিক্ষা ক্ষেত্রে শ্রীমতী গুপ্তার বহু বাধা-বিঘ্ন এড়িয়ে যে এত দূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হল, তার পেছনেও রয়েছে তাঁর মায়ের প্রেরণা ও উৎসাহ। কন্যারা লেখাপড়া শিখে সব বুঝতে শিখুক, এবং স্বাবলম্বী হোক, মাতা জ্যোতির্ম্ময়ীর এ ছিল অন্তরের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ও দাবী। শ্রীমতী গুপ্তা যখন সেণ্ট মার্গারেট মিশনারী স্কুলে পড়ছেন তখনই জনসেবার প্রেরণা আসে তাঁর ভেতর। শিশুকাল থেকেই শ্রীমতী গুপ্তাদের পরিবারে তাঁর মায়ের প্রভাবে তাঁরা কখনও কোনও বিলেতি জিনিস ব্যবহার করেননি। সে ভাবধারা আজও পর্য্যন্ত তাঁর ক্ষেত্রে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তিনি জীবনে ঔষধপত্র ছাড়া কখনও কোনও বিলেতি জিনিস ব্যবহার করেছেন কি না সন্দেহ!

সেবার ক্ষেত্রে শ্রীমতী গুপ্তার জীবন প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়লেন ১৯৪৩ সালের মহামন্বন্তরের দিনে। তখন তাঁর ছেলে-মেয়েরা ছোট ছোট, কিন্তু অসহায় ক্ষুৎপীড়িত মানুষের ক্রন্দনে ঘরে নিশ্চিন্তে বসে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হলো না। সে সময় তিনি স্বামীর সঙ্গে কৃষ্ণনগর থেকে বাঁকুড়ায় গেছেন। কৃষ্ণনগরে দুর্ভিক্ষের যে ছাপ ফুটে উঠছিল বাঁকুড়ায় গিয়ে দেখলেন তার আরও শোচনীয় রূপ! পথে-প্রান্তরে তখন ভেসে বেড়াচ্ছে অনাহারক্লিষ্ট নরনারী ও শিশুদের করুণ আর্ত্তনাদ। মানুষের এ চরম দুর্দ্দিনে সক্রিয় ভাবে কিছু না করলে নয়। নিখিল ভারত মহিলা-সম্মেলনের বাঁকুড়া শাখা পূর্ব্বেই কাজ সুরু করেছিলেন, তিনিও তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ সুরু করে দিলেন। সে সময় অনাথ পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য নারীসম্মিলনীর অর্থে এবং তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় গড়ে ওঠে এক শিশুসদন। যে সদনের শিশুরা এখন শিশুরক্ষা সমিতির চেষ্টায় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। ১৯৪৫ সালে তাঁরা চট্টগ্রামে আসেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনও শেষ হয়ে যায়নি। সেখানেও তাঁর উদ্যোগে সেবার কাজ চললো দুর্গত মানুষের ভেতর। এর অল্প কিছুকাল পরেই ১৯৪৬ সালে অক্টোবর মাসে আরম্ভ হলো নোয়াখালীতে আত্মঘাতী ও নারকীয় দাঙ্গা। মিসেস নেলী সেনগুপ্তাকে সভানেত্রী করে তাঁরা ঠিক করলেন গ্রামে গ্রামে মহিলা-কর্ম্মী পাঠিয়ে অপহৃতা নারীদের যেমন করেই হোক উদ্ধার করতে হবে। ভাগ্যক্রমে ঐ সভার পরদিনই শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীও চট্টগ্রামে এসে পড়লেন। নোয়াখালীর বিধ্বস্ত এলাকায় কাজ করবার জন্য রওনা হবার মুখে।

প্রাথমিক আলোচনা হল যে, কেমন করে সেখানে কর্ম্মী দল নিয়ে পৌঁছানো যায়। স্থির হ'ল, তিনি গিয়ে ব্যবস্থা করে খবর দেবেন। কিন্তু আবহাওয়া তখন এমন বিষাক্ত ছিল যে ইচ্ছামাত্র কাজ হ'লো না। ২৫শে অক্টোবর পর্য্যন্ত গ্রামগুলোর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য দেখে চৌমুহনী পর্য্যন্ত তাঁরা ষ্টেশনে ষ্টেশনে

শ্রীমতী অশোকা গুপ্তা

যেটুকু পারলেন সাহায্য দিয়ে তখনকার মত চট্টগ্রামে ফিরে এলেন। স্থির হলো গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কার্য্যক্রম স্থির করতে হবে।

দুর্গত নর-নারীর সেবার তাগিদে বহু মহিলা কর্ম্মীর সঙ্গে তিনিও চললেন গান্ধীজীর সঙ্গে। গান্ধীজীর সঙ্গে বসে চৌমুহনীর মেয়েদের একটি বৈঠক হ'লো। গান্ধীজী অঞ্চল হিসেবে কর্ম্মীদের কাজ ভাগ করে দিলেন। শ্রীমতী গুপ্তার এলাকা হলো লক্ষ্মীপুর থানা। নভেম্বর থেকে প্রায় ৮ মাস কাল তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে অক্লান্ত ভাবে সেবাকার্য্য চালিয়ে যান। শেষের ছয় মাস নোয়াখালীর হরিজন-প্রধান গ্রাম টুমকরে তিনি শিশুকন্যাসহ বাস করে, ফুলরাণী দাস ও স্নেহরাণী কাঞ্জিলালের সঙ্গে একত্র কাজ করেন। সুচেতা কৃপালনী দিল্লী যাওয়ার পর স্থানীয় বিভিন্ন শিবির পরিচালনার ভারও তাঁর উপর ন্যস্ত হয়।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি স্বামীর সঙ্গে ফিরে এলেন কলকাতায়। এ সময় পাঞ্জাবের দাঙ্গাপীড়িত দুর্গত নর-নারীদের জন্য তাঁর সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হয়। বহু মহিলা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে তিনি তাদের নানা ভাবে শীতবস্ত্র প্রভৃতি সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা করলেন। ১৯৫০ সালে যখন পূর্ব্ববঙ্গ থেকে দলে দলে উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে আসতে থাকেন শ্রীমতী গুপ্তা তখনও তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। তাদের পুনর্ব্বাসন ব্যাপারেও তাঁর প্রচেষ্টা রয়েছে অপরিসীম। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্যা ছিলেন ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্য্যন্ত। তিনি কলিকাতার অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট মহিলা প্রতিষ্ঠান ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পরিকল্পনা বিভাগগুলির সক্রিয় সভ্যা ও সম্পাদিকা। তাঁর স্বামী শ্রীশৈবাল গুপ্ত আই-সি-এস, পত্নীর স্বাধীন মতবাদে ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় কখনও বাধা তো দেনই নি, বরং তাঁর কর্ত্তব্যপালনে সহায় হয়েছেন। কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁর স্বামীর প্রভাবও কম নয়।

(মাসিক বসুমতীর পক্ষ থেকে বিশেষ প্রতিনিধি কর্ত্তৃক সংগৃহীত।)

সার উইলিয়ম জোন্সের পত্রাবলী

(১)

১৭৮৫

চার্লস চ্যাপম্যান এস্কোয়ার

মহানন্দা অতি সুন্দর। সুন্দর-বাদের (সুন্দরবন) কোন কোন নদীর তটদেশ অতি চমৎকার। চমৎকার এক বাঘ তাচ্ছিল্য করে আমাদের দিকে চেয়ে থাকে। তার দু' গজ সামনে দিয়ে আমরা চললাম। তবু রাত্রিকাল। নানা কারণে সঙ্কীর্ণ পথ এড়িয়ে চললাম। কলকাতার যতই কাছে এগুচ্ছি ততই আবহাওয়া বদল হচ্ছে। ভাগলপুরের কথা মনে হয়। আনন্দও হয়, দুঃখও হয়।

দেখছি কলকাতার পরিবর্ত্তন হয়েছে ঢের। মিঃ হেষ্টিংস ও শোরের অভাব বড্ড বোধ হচ্ছে। (ওয়ারেণ হেষ্টিংস ও শোর ১৭৮৫ ফেব্রুয়ারী মাসে ইংলণ্ড যাত্রা করেন)। ভারতে আরও যাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বের আনন্দ ভোগ করেছি, আমার ভয় হতে লাগল, আসচে ঋতুতে তাদের বিরহ বেদনাও আমায় ভোগ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই একটা মস্ত দোষ। এ দেশে যে সুখ আমি আশা করি, এতে সে সুখের কম হানি হয় না।

মহেশ পণ্ডিতকে আপনি কি অনুগ্রহ করে জিজ্ঞেস করবেন, এখনও কি ত্রিহুতের বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের সাহায্য পায়? এখনও কি ঐ বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু আইনের (স্মৃতির) উপাধি দিয়ে থাকে? আমাদের একজন পণ্ডিত মারা গেছেন। যাতে নতুন পণ্ডিত সর্ব্বজন-অনুমোদিত হন, যাতে হিন্দুরা নিঃসংশয় হয় যে, আমরা সর্ব্বোত্তম তথ্য সংগ্রহ করে তাদের আইন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করছি, সে জন্য হিন্দুস্থানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ করে বেনারস এবং, যদি এখনও অস্তিত্ব থাকে, ত্রিহুত বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশের অনুরোধ করব ভাবছি।

(২)

[সার উইলিয়ম জোন্স সুপ্রিম কোর্টের ছুটিতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করবার জন্য কৃষ্ণনগরে বাসা ভাড়া করেন। এখান থেকে ১৭৮৫, ৮ই সেপ্টেম্বর তিনি তাঁর বন্ধু ডাঃ প্যাট্রিক রাসেলকে নিম্ন পত্রখানি লেখেন—]

"দু' মাস অবিরাম ভয়ঙ্কর পরিশ্রম করবার পর এত ক্লান্ত হ'লাম যে বাধ্য হয়ে নৌকো করে তাড়াতাড়ি কলকাতা ছেড়েছি। আমি এখন সুপ্রাচীন নবদ্বীপ বিশ্ববিদ্যালয়ে, যে চমৎকার ভাষা এক কালে সারা ভারতের মাত্র নয়, সদ্বীপা দুই উপদ্বীপেরও মাতৃভাষা ছিল, সেই শ্রেষ্ঠ ভাষার কিছু পাঠ নেব আশা করছি।"

(৩)

[সার উইলিয়ম জোন্স ঘরে কঙ্কালসার হয়ে বেনারস বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে ৭ মাস ঘুরে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করে তাঁর বন্ধু চার্লস চ্যাপম্যানকে নিম্ন পত্রখানি লেখেন—]

সার উইলিয়ম জোন্স বন্ধু চার্লস চ্যাপম্যানকে লেখেন নবদ্বীপ থেকে—

২৮ সেপ্টেম্বর, ১৭৮৫

"এই নিভৃত স্থানে বসে ধীরে অথচ নিশ্চিত ভাবে সংস্কৃত ভাষা শিখছি। আমাদের পণ্ডিতরা হিন্দু আইন সম্বন্ধে যথা খুসী পাঁতি দেন। যখন সহজ ব্যবস্থা জোগাড় করতে পারেন না তখন একটা ন্যায্য বিদায় নিয়ে যথা খুসী পাঁতি দেন। এই সব পণ্ডিতের কৃপায় পড়ে থাকা আমার আর সহ্য হচ্ছে না। মুসলমানদের সত্যপাঠ যা আমরা গ্রহণ করেছি, তা এর সঙ্গে পাঠালাম, আপনি ইচ্ছে করলে তা গ্রহণও করতে পারেন বর্জ্জনও করতে পারেন। মহেশ পণ্ডিত মনে হয় যোগ্য ও সৎলোক। হিন্দুর কি ভাবে সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত, মিথ্যা সাক্ষীর জন্য কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেছেন, এ সব সম্বন্ধে মহেশ পণ্ডিতের মত সংগ্রহ যদি করতে পারেন, অত্যন্ত বাধিত হব। এতে বিচার ব্যবস্থার সুবিধা হবে।"

চট্টগ্রামের কালেক্টারের নিকট বর্ম্মার রাজা তাংবু আর্গুর পত্র

"আমি সমগ্র নরনারীর ও ১০১ দেশের প্রভু, আমার উপাধি রাজছত্রধারী রাজা সুরিয় (সূর্য্য) বংশী। অপূর্ব্ব স্বর্ণ-চন্দ্রাতপযুক্ত সিংহাসনে বসিয়া আমি অনেক রাজাকে আমার প্রতাপের অধীন করিয়াছি। আমার দেশে উৎপন্ন হয় স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি-মাণিক্য। আমার হাতে রণ-আয়ুধ। এই আয়ুধ বজ্রের ন্যায় আমার শত্রুকে দমন করে। আমার সেনানীদের কোন আদেশ নির্দ্দেশ প্রদানের প্রয়োজন হয় না। আমার হস্তী ও অশ্ব সংখ্যাতীত। শাস্ত্র-বিশারদ ১০ জন পণ্ডিত, ১০৪ জন পুরোহিত আমার অধীন। ইঁহাদের জ্ঞানের তুলনা নাই। এই জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে আমি আমার প্রজাদের এমন ন্যায়বিচার করি যে আমার আদেশ বজ্রের ন্যায় অবাধ ও নিষ্পন্দসাধ্য। আমার প্রজারা ধার্ম্মিক ও ন্যায়বান, তাহারা কোন অধর্ম্ম আচরণ করে না, সূর্য্যের ন্যায় আমি জ্ঞানালোকমণ্ডিত হয়ে মানুষের গুপ্ত মতলব আবিষ্কার করতে পারি।

"রাজা নামে অভিহিত হবার যোগ্য যিনি, তিনি হবেন দয়াবান, প্রজার প্রতি ন্যায়পরায়ণ। চোর, ডাকাত ও শান্তির বিঘ্নকারীরা

তাদের অপরাধের জন্য অবশেষে শাস্তি পাইয়াছে। এক্ষণে স্বর্গ-নিপতিত বজ্রের মত আমার মুখের কথায় লোকে ভয় করে। ২ সহস্র নদ ও অগণিত নদীর নিকট আমি মহাসমুদ্র। আমি ৪০ সহস্র গিরিবেষ্টিত সুমেরু পর্ব্বত। ১০১ রাজার উপর আমার কৃতিত্ব। ১০ সহস্র রাজা আমার দরবারে প্রত্যহ উপস্থিত থাকেন।, আমার দেশ পৃথিবীর সকল দেশের সেরা। স্বর্ণ ও অমূল্য হীরক-খচিত আমার স্বর্ণময় প্রাসাদ বিশ্বের সকল দেশকে হার মানাইয়া দেয়। আমার কর্ত্তব্য—প্রধান দেবদূতের কর্ত্তব্যের মত। আমি আরাকানের সকল প্রদেশকে লিখিত আদেশ দিয়াছি—যাহাতে এই পত্র নিরাপদে চট্টগ্রামে পৌঁছে। চট্টগ্রাম পূর্ব্বে রাজা 'শেরি তামাচাকা'র অধীন ছিল। এই রাজা দেশকে কৃষিসমৃদ্ধ ও জনসমৃদ্ধ করেন। তিনি ২৪০০ মন্দির ও ২৪টি সরোবর প্রতিষ্ঠিত করেন।

"ইঁহার রাজ্য-প্রাপ্তির পূর্ব্বে, দেশটি অন্যান্য রাজারা শাসন করেন। এ সকল রাজার উপাধি ছিল ছত্রধারী। সর্ব্বজাতীয় প্রজার ধর্ম্ম পালনের জন্য ইঁহারা বহু পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সময়, রাজা শেরি তামাচাকার রতনপুর, দুতিনদী, আরাকান, দুরাপত্তি, রামপত্তি, ছাগদয়ি, মহাদয়ি, ময়ং দেশগুলিতে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে দেশ কুশাসিত ছিল। রাজা শেরির সময় দেশে ন্যায় ও যোগ্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যুৎ-জ্যোতির ন্যায় রাজার জ্ঞান-বুদ্ধি। তাঁহার শাসনে প্রজারা সুখী হইয়াছিল। সে যুগের সাধুদের সঙ্গে তাঁহার মিত্রতা ছিল। বুদ্দর নামে এমন এক সাধুকে রাজা তাঁহাকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম শিক্ষাদানের জন্য এক জনকে নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিলে সাধু স্বামিনকে নিযুক্ত করিলেন। এই সময় স্বর্গ হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণি-মাণিক্য বর্ষিত হইলে পুরোহিত স্বামিনের তত্ত্বাবধানে সেগুলি ভূপ্রোথিত করা হয়। পুরোহিতের মন্দির স্বর্ণ-রৌপ্যের কারুকার্য্যে ভূষিত ছিল। এখানে লোকে দেবতাদের পূজা দিতে যাইত। মন্দিরের তীর্থযাত্রী ও পরিব্রাজকদের জন্য রাজা বহু ভৃত্য ও ক্রীতদাস নিযুক্ত করেন। রাজা নিজে পঞ্চ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে নিযুক্ত হন, পুরোহিত-ধর্ম্ম নিষিদ্ধ অধর্ম্ম আচরণ হইতে রাজা সর্ব্বদা বিরত হন, হংস, পারাবত, ছাগ, শূকর ও কুক্কুট মাংস বর্জ্জন করেন। সে যুগে চৌর্য্য, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন, মদ্যপান প্রভৃতি দুষ্ট আচরণ কেহ জানিত না। আমিও উপরোক্ত ধর্ম্ম ও আচরণের অনুসরণ করি। কিন্তু আমি যখন আরাকান জয় করি, তাহার পূর্ব্বে মানুষ সর্পের ন্যায় মানুষকে দংশন করিত, শত্রু ও অরাজকতার কবলে তাহারা পড়িয়াছিল। বহু প্রদেশে মানুষ মানুষের মাংস খাইত, এমন দুর্ব্বৃত্ত-বুদ্ধি মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করিল যে, প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

"এই সময় বৌদ্ধ আউতার (অপর নাম শেরি বুট তরুর) নামে এক সাধু আরাকানে আসিয়া গৃহের মানুষ ও মাঠের পশুকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা অনুসারে ৫ হাজার বৎসর দেশ এমন ভাবে শাসিত হইল যে দেশে শান্তি ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইল। আমার আচরণ ও আমার প্রজার শাসন তদনুসারে পরিচালিত। পৃথিবীর বিশেষ কোন স্থানে যেমন মনোমুগ্ধকর সুগন্ধি তৈল উৎপাদিত হয়, সেইরূপ অন্যান্য রাজার অপেক্ষা আমার প্রভাব ও মর্য্যাদা প্রসারিত হইয়াছে। প্রধান পুরোহিত তাফলু রাজা অন্যান্য ধর্ম্মগুরুদের সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে বলিয়াছেন, ১১৪৮ সনের ১৫ই অবুর মাসে (অগ্রহায়ণ?) তুমি দেশে শেরি বুট তরুরের বিধি ও ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত কর। আমি তাহা পালন করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আমি ৬ স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, এবং শেরি তামা চাকার বিধি ও ব্যবস্থা অনুসারে আমি প্রজাদের উদার ন্যায়বুদ্ধিতে শাসন করিতেছি।

আরাকান চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী দেশ। আমার সহিত যদি ইংরেজের বাণিজ্য-সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহা হইলে তৎফলে উত্তম-মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এ জন্য আমি আপনাদের নিকট প্রস্তাব করিয়াছি যে, আপনার দেশের বণিকরা মুক্তা, হস্তিদন্ত, মোম ক্রয়ের জন্য এ দেশে আসুক, পরিবর্ত্তে আমার প্রজাদিগকে চট্টগ্রামের যাহা কিছু পণ্য আছে তাহা ক্রয় করিতে অনুমতি দেওয়া হোক। কিন্তু চট্টগ্রামের মগগণ এতদূর ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান-ভ্রষ্ট হইয়াছে যে, লিপিবদ্ধ বিধিসম্মত ভাবে তাহাদের ভ্রম ও বিচ্যুতির সংশোধন প্রয়োজন। এমন ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন যে, যাহারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহারা যদি ধর্ম্ম ও বিধি-বিচ্যুত হয় তবে অনন্ত কারাশাস্তি ভোগ করিবে এবং যাঁহারা ধর্ম্মপথে চলিবেন তাঁহাদের পরলোকে স্বর্গলাভ হইবে। এতদনুসারে আমি ৩০ জনের তত্ত্বাবধানে ৪ খানি হস্তিদন্ত পাঠাইলাম। এই সকল ব্যক্তি আমার উপরোক্ত প্রস্তাব ও মিত্রতা সম্বন্ধে আপনাদের উত্তর লইয়া আসিবে।"

সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত অপ্রকাশিত পত্রাবলী

[৫]

Post Mark. 7, 10. 22. শান্তিধাম, শনিবার
Brightlands. Ranchi. ৭ই অক্টোবর

কল্যাণীয়েষু,

তোমার সৌম্যমূর্ত্তি দেখিবামাত্র আমিও তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম—মনে হইয়াছিল, তুমি আমাদেরই একজন—যেন তুমি আমার চিরপরিচিত। তোমার বাবার সঙ্গে তোমার মুখের খুব সাদৃশ্য আছে। তাই মনে হচ্ছিল যেন তোমাকে দেখিয়াছি। তোমরা সবাই আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

শুভার্থি

স্বাক্ষর—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

Post Mark. 10.10.22 রাঁচি,
Brightlands. Ranchi. শুক্রবার

কল্যাণীয়েষু,

প্রমথ এখানেই আছেন—তিনি বলিলেন, শীঘ্রই তোমাকে পত্র লিখিবেন। সৌম্য উত্তরবঙ্গে বন্যাক্লিষ্টদের সাহায্যার্থ গিয়াছে শুনিয়া খুসী হইলাম। দেশ ভ্রমণে অনেক শিক্ষালাভ করা যায়—মন উদার হয়। ভ্রমণ শুধু "বাবুয়ানা" নহে। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। শুভার্থি

স্বাক্ষর—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুবোধের পত্র পাইয়াছি—তার পোষ্টকার্ডের পিঠে সুন্দর একটি মন্দিরের ছবি ছিল।

post Mark. 16.4.23.
Brightlands. Ranchi,

রাঁচি,
সোমবার

কল্যাণীয়েষু,

ভাল থাক, সুখে থাক, দীর্ঘজীবী হয়ে আনন্দে সংসার-পথে বিচরণ কর, এই আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ।

Annual যখন বাহির হইবে, সেই সময় আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে—যদি কোন লেখা প্রস্তুত থাকে ত দিব। এখানকার খবর সব ভাল।

শুভার্থি

স্বাক্ষর—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মোরাবাদি, রাঁচি
৮।১১।৩১

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। তোমাদের কাছে থেকে যে দু চারখানি চিঠি পেয়েছি সেগুলি সবই আমার ভাল লেগেছে তার কারণ তোমাদের চিঠি সব সহজভাবে লেখা। অনেকের দেখতে পাই—চিঠি লিখতে বসলেই লিখতে বসেন—অর্থাৎ তার ভিতর কতকটা সাহিত্য পুরে দিতে চান, তাতে অবশ্য তাঁদের চিঠি-গুলো প্রবন্ধের ছোট ভাই হয়ে ওঠে। এ দোষ যে আমার নেই, তা বলতে পারিনে।

লেখার আর্ট সম্বন্ধে আমি যত বক্তৃতা করেছি বাঙ্গলা দেশের কোন লেখকই বোধ হয় ততটা করেন নি। আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের আমার উপর চটবার এও একটা কারণ। কেন না আমার ও সব কথা পড়ে লোকের এ মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে আমি দেশশুদ্ধ লোককে লেখা শেখাতে বসেছি, যেন আর কেউ লিখতে জানেন না। কাজেই তাঁরা বলেন, বীরবলের লেখা "কাপিবুক" স্বরূপে তাঁরা গ্রহণ করতে রাজি নন্ ও লেখার উপর মস্ক করলে তাঁদের হাতের লেখা খারাপ হয়ে যাবে। এ কথাটি ঠিক। একজনের লেখা আর একজন যদি অক্ষরে অক্ষরে নকলও করতে পারেন—তাহলে সে লেখা নকলই হবে, আসল জিনিষ হবে না। আর জাল আদালতে সব সময় ধরা না পড়লে সাহিত্যে ধরা পড়েই পড়ে।

আমি আর্ট জিনিষটের উপর এত ঝোঁক দিই কেন বলছি। শুধু সাহিত্য নয়—সব বিষয়েই আমি আমাদের জাতের অমনো-যোগের পরিচয় নিত্যই পাই—বাঙ্গালীর মনটা একেবারে ঢিলে হয়ে গিয়েছে; কোন বিষয়কেই সে-মন একালে চেপে ধরতে এঁটে ধরতে পারে না। আমি এই ঢিলেমির বিরুদ্ধে সুযোগ পেলেই প্রতিবাদ করি। আমার সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রবন্ধটিতে technique সম্বন্ধে যা লিখেছি সেটি একটু মন দিয়ে পড়ে দেখো, তার থেকেই আমার মনোভাব স্পষ্ট করে জানতে পারবে। গান গাইতে হলে গলা ও মনকে, ছবি আঁকতে হলে হাত ও মনকে যেমন এক করে আনা চাই—লিখতে হলে তেমনি ভাব ও ভাষাকে এক করে আনা চাই। এর জন্তে সাধনা আবশ্যক। হিন্দুমতে গুরু কেবল ভেদ বাৎলে দিতে পারেন, সাধনা সাধককেই করতে হবে। তবে ধর্ম্মের চাইতে সাহিত্যের শিক্ষা দেওয়া ঢের বেশি শক্ত; কেন না, ধর্ম্মগুরু সকলকে নিজের পথে চালাতে চান—কিন্তু সাহিত্য-গুরু যদি ও-রকম কোন লোক থাকেন সকলকে নিজ নিজ পথে চলতে বলেন। তাঁর হাতের গোড়ায় এমন কোনও সাধন-পদ্ধতি নেই যা সকলেই অবলম্বন করে সফল হতে পারে। যারা সাহিত্যের পথে কতকটা অগ্রসর হয়েছে তারা সে পথের নূতন পথিকদের এই পর্য্যন্ত বলতে পারে যে—এ পথ যুগপৎ, সহজ ও কঠিন—এই কথাটি মনে রেখে চলো। এ পথ সহজ কেন না, নিজের স্বভাবই মানুষকে এ পথে নিয়ে যায়, আর এ পথ কঠিন; কেন না, সাহিত্যপন্থীদের পক্ষে নিজের স্বভাবকে ফুটিয়ে তোলা দরকার। যিনি এই ফুটিয়ে তোলার দিকে যতটা মন দেবেন—যতটা যত্ন করবেন, তিনিই প্রমাণ পাবেন যে দিনের পর দিন তাঁর স্বভাবেরও পাঁপড়ির পর পাঁপড়ি খুলে যাচ্ছে।—আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য যে beneath contempt, তার কারণ বাঙ্গালী সাহিত্যিকেরা নিজের স্বভাবের বিশেষত্বের পরিচয় পর্য্যন্ত নেন না, সে স্বভাবকে ফুটিয়ে তোলা ত দূরে থাক্। তাঁরা সকলেই সামাজিক মনোভাব প্রকাশ করতে চান। এঁরা ভুলে যান যে, যা সকলের মত তা কারও মত নয়, আর আজকে যাকে সামাজিক মত বলছ—গত কাল সে একজন মাত্রের মত ছিল। দেখতে পাচ্ছি চিঠিটে ক্রমে বক্তৃতার মত হয়ে উঠছে সুতরাং এইখানেই থামা দরকার।

কিরণশঙ্কর Presidency College-এর History-র Professor হয়েছে শুনে সুখী হলুম। ওর লেখবার সখও আছে, হাতও আছে; ব্যারিষ্টার হয়ে এলে—খুব সম্ভবত: ও সাহিত্যের দিকে পিঠ ফেরাত। এই কাজে যদি লেগে থাকে তাহলে কিরণ সাহিত্যচর্চ্চা করবার সুযোগ ও অবসর দুই পাবে। আমি ব্যারিষ্টারিতে ফেল করেই সাহিত্যে পাস করেছি। ব্যারিষ্টারিতে পাস করতে হলে সাহিত্য ত্যাগ করতে হয়; সুতরাং যার লেখবার ক্ষমতা আছে তাকে আদালতে ঢুকতে দেখলে আমার ভয় হয়—কেন না ও স্থান হচ্ছে মনের যমের বাড়ী।—

আমার ভাইয়ের খবর আমি এখানে আসবার দিন পেয়েছি খবর সব ভাল।—

আমি ১৪ই এখান থেকে বেরিয়ে ১৫ই কলকাতায় পৌছব তার পর আবার সেই আপিস কলেজের ঘানি ঘোরাব। তাতে আমার আপত্তি নেই, দুঃখ শুধু এই যে বুঝতে পারছি নে যে ঐ পরিশ্রম করে যে তেল ভাঙ্গছি তা আমাদের জাতের চরকায় দেওয়া চলবে কিনা। ইতি—

স্বাক্ষর শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

বৈশ্বানর

(সত্য-ঘটনা)

[কাশ্মীরকে বলা হয় ভূ-স্বর্গ। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে হিমালয় পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত ৮৪,৪৭১ বর্গ-মাইল আয়তন-বিশিষ্ট কাশ্মীর রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। সাম্রাজ্যবাদীদের কূট-চক্রান্তে আজ তার আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠলেও তার প্রাকৃতিক শোভা চিরকালের মতই মনোহারিণী আছে। সু-উচ্চ পাহাড়ের কোলে লাস্যময়ী ডালহ্রদের তীরে অবস্থিত কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর সমস্ত দেশের সৌন্দর্যের প্রতীক। দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ লোক আসেন সেখানে বেড়াতে। ডালহ্রদের উপর 'হাউসবোটে' দুই-এক মাস কাটিয়ে সারাজীবন তার সুখ-স্মৃতি বহন করেন। ইদানীং পর্যবেক্ষকের ছদ্মবেশে বিদেশী গুপ্তচরদের আনাগোনা বাড়ছে বলে কাশ্মীর সরকার তাদের সম্পর্কে হুঁসিয়ার হতে বাধ্য হয়েছেন কিন্তু সত্যিকারের পর্যটকদের কাছে এই সৌন্দর্যের দ্বার সদাই উন্মুক্ত। ১৯৪৬ সালে জে, ডি, ওয়েষ্ট-উড নামক জনৈক ইংরাজ-পর্যটক কাশ্মীরে ছিলেন অনেক দিন। নীচের রচনাটি তাঁরই লেখার অনুবাদ।]

'ইলনকা'র কথা যখন বলি তখন মনে হয় যেন সে ছিল একটা প্রতিরূপ—এমন চমৎকার এক জীবনযাত্রার প্রতিরূপ যা আজ স্বপ্নের মত লাগে। ঝিলাম নদীর উর্বরা তীরে বাঁধা অকলঙ্ক দেবদারু কাঠে তৈরী 'ইলনকা' একটা 'হাউসবোট'। তাকে কেন্দ্র করে অনেক ছোট-বড় উৎসাহ-উদ্দীপনা, অনেক উদ্বেগ-বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে।

ঝিলামের 'হাউসবোট'গুলো কুটীরের মত। অগভীর চ্যাপ্টা খোলের উপর তৈরী কোন কোনটা আবার পুরোপুরি কুটীরই হয়ে উঠতে চেয়েছে। তবে ইদানীং যে সব 'হাউসবোট' তৈরী হয় তার খোলগুলো গভীর এবং দুই পাশ মুসলমানী জুতোর মত বাঁকানো। দেখা গেছে যে, কোন একটা প্রাকৃতিক কারণে চ্যাপ্টা খোলের মধ্য ভাগ জলে ভাসতে ভাসতে ক্রমশ উঁচু হয়ে ওঠে এবং কোন অবলম্বন না পেয়ে পাশ দুটো ক্রমশঃ ঝুলতে ঝুলতে এক সময় ভেঙ্গে পড়ে। তাকে বলে মাজা-ভাঙ্গা। গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে নদীর এদিক-ওদিক থেকে এই মাজা-ভাঙ্গার আওয়াজ শোনা যায় কিন্তু তখন সাহায্যের আশা বৃথা। মাজা যদি অগভীর জলে ভাঙ্গে তবেই রক্ষে।

'ইলনকা' খুব পুরোনো 'হাউসবোট' ছিল না। উন্নততর ছাঁদে বেশ মজবুত করে তৈরী তার কাঠামো। খোলটা চ্যাপ্টা নয় এবং তারের কাছি দিয়ে বেশ শক্ত করে বাঁধা।

এক চায়ের পার্টি উপলক্ষে প্রথম আমি সেই বোটে পদার্পণ করি। তার অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য এবং বিস্তৃতি দেখে প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। চওড়া বড় বড় কড়িকাঠ—এত বড় যে লক-গেটে ঢুকবে না। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ, 'ইলনকা' এমন চমৎকার একটা জায়গায় বাঁধা ছিল যে সেখান থেকে কেউ তাকে সরাতে চাইবে না। ধাতুর পাতে মোড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই দেউড়ি। সেখানে টুপি রেখে ভিতরে ঢুকলেই পাবেন ২৫ ফুট লম্বা বৈঠকখানা। জানলা দিয়ে নদী এবং পাড়ের বাগিচা দেখা যায়। পেছনে খাবার ঘর এবং আসবাব-সজ্জিত ভাঁড়ার। আর আছে দু'খানা শোবার ঘর, বাথরুম এবং একটা বারান্দা। তার সামনে রান্নাঘরওয়ালা বোট।

'ইলনকা'র মধ্যে একটা স্থায়িত্বের অনুভূতি ছিল—স্থিতিশীল নিভৃত অনুভূতি। তার সতরঞ্চ আর গালচে এসেছে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে উট, খচ্চর আর ঘোড়ার পিঠে চেপে, আসবাব-পত্র তৈরী হয়েছে পুরোনো সারী আখরোট কাঠের তক্তায়। কাশ্মীরে "মার্কিণ অভিযান" সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "আত্মরক্ষার" খাতিরে আমার স্ত্রী তাড়াতাড়ি 'ইলনকা' দখল করে বসলেন ; কারণ বোঝা গেল যে, মার্কিণ ভদ্রলোকদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সব জিনিষেরই মূল্যে রূপান্তর ঘটছে। ভাড়াটে বোটে জীবনযাত্রার ব্যয় অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেল। এমন কি, আমেরিকানরাও সেটা পছন্দ করেনি যদিও এই মূল্য বৃদ্ধি তাদেরই আমদানী।

কাশ্মীর উপত্যকা নেচে উঠল হাতুড়ীর ঘায়ে। কাশ্মীরীরা সত্যিই কাজের লোক। কোন বাধা-বিপত্তি কেয়ারই করে না ; ঘরে তৈরী পেরেক ঠুকে ঠুকে বে-পরোয়া ভাবে নতুন নতুন বোট নির্মাণ হতে লাগল। রাতারাতি গজালো নয়া নয়া হোটেল। নতুন রূপে দেখা দিতে লাগল পুরাতন সম্পত্তি এবং জলের উপর যা-ই ভাসে তাই বোট নামে চালু হল। 'ইলনকা'র সঙ্গে সে সব বোটের কোন তুলনাই হয় না ; কারণ ইলনকা তৈরী হয়েছে বাছাবাছা মাল মসলায়—পাকা কারিগরের নিপুণ হাতে। গাঁট-গ্রন্থি বিহীন, সারী, কুড়োলকাটা চার ইঞ্চি পুরু দেবদারু তক্তায় তৈরী তার খোল। আগাগোড়া কোথাও কোন অযত্ননির্মিত কাটা-যোড়া নেই। দেওয়ালের খোপগুলো প্রশান্ত গাম্ভীর্যে ঝকঝক করছে। 'ইলনকা' সুদৃঢ় এবং ভারী। এখানে-সেখানে টানা-হ্যাঁচড়া করে নড়িয়ে নিয়ে বেড়াবার জন্য তৈরী হয়নি।

শ্রীনগরে নৌকো বাঁধার ঘাট আছে দু'রকম। 'ক' শ্রেণীর ঘাটগুলোর অবস্থিতি বাঁধ বরাবর। ক্লাব, রেসিডেন্সী, দোকান, পোষ্ট অফিস সবই সেই দিকে। তার সামনেই পীর পঞ্জলের তুষার-মেখলা। 'খ' শ্রেণীর ঘাটগুলো নদীর ওপারে। সেখান থেকে 'ক' শ্রেণীর ঘাটগুলোকে চমৎকার দেখায়। 'ইলনকা' ছিল সেই রকম একটা ঘাটে। তার পেছনে বাগান। 'ইলনকার' জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে সেই পরিবর্তনের যুগে যে দৃশ্য চোখে পড়ত তা ইতিহাসের অতি অস্থিরতা। বিখ্যাত কুখ্যাত সব লোকই তখন কাশ্মীরে পদার্পণ করছেন। ভারতের পণ্ডিত নেহেরু কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। তাঁর বিপরীত মিঃ জিন্না স্বয়ং একবার 'ইলনকার' পদধূলি দিয়ে তার গৌরব বাড়িয়েছিলেন। এমন কি, আই-এন-এর একজন মেজর জেনারেলের মোটর বোটের ঢেউয়েও ঝিলামের জল দুলে উঠল। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের রাষ্ট্রীয় শিকারা (ছোট পানসী) খানা সাদা পোষাকপরা বাছা-বাছা তেজস্বী মাঝির

দাঁড়ের টানে উড়ন্ত মাছের মত ঝিলামের জলে উড়ে বেড়ায়। পরে বিশুদ্ধ বায়ুর আশায় তিন 'বিজ্ঞ' ব্যক্তির এক মন্ত্রি-মিশন এলেন। কিন্তু এত জাঁক-জমক আমাদের পছন্দ হল না। কাশ্মীরে ও-সব দেখতে কেউ যায় নি। আমরা দেখতে চেয়েছিলাম নদীর দৈনন্দিন জীবন। প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মাঝিরা যখন বড় বড় কাঠের ভেলা ভাসিয়ে নিয়ে যেত তখন তাই দেখে আমরা খুশী হতাম, খুশী হতাম ছাত্রদের বাইচ খেলা দেখে।

ইলনকার দৈর্ঘ্য ১১০ ফুট। তীরের বাগানটা দু'শো ফুট লম্বা, ৩০ ফুট চওড়া। যখন নদীর জল নেমে যায় তখন তীরে বসে চা খেতে খেতে নজরে পড়বে বোটের ছাদ পাড়ের সঙ্গে সমান হয়ে গেছে। আবার যখন পাহাড়ে পাহাড়ে বরফ গলতে আরম্ভ করে তখন সকালে উঠে হয়ত নীচে তাকিয়ে দেখবেন যে, গত কাল আপনি যেখানে বসে চা খেয়েছিলেন এবং বুলবুলদের লাফালাফি করতে দেখেছিলেন সেখানে বানের ঘোলাটে জল ঢুকেছে। গত কাল আপনি ছিলেন সমুদ্র সমতল থেকে ৫০০০ ফুট উপরে, আজ ৫০১০ ফুট। বাগানের চিহ্নমাত্র নেই আর বুলবুল সব গিয়ে উঠেছে বড় বড় গাছের শাখায়।

মহম্মদ ইদ্রিস ছিল বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা, সৎ এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসী লোক। বাগানের কাজে বেশ ওস্তাদ। তার বক্তব্য ছিল ফুল ফুটবে যেখানে-সেখানে। ফুল ফোটার কোন স্থান-অস্থান নেই। কাশ্মীরী ফুল কাশ্মীরী ইদ্রিসের মতই সবাইকে খুশী করতে উদ্‌গ্রীব। মহম্মদ ইদ্রিসের হাতে যাবার আগে অতি শোচনীয় অবস্থায় ছিল বাগানটা। না ছিল পরিকল্পনা না ছিল কোন প্রাণ।

ঝোপের মধ্য দিয়ে একটা চওড়া রাস্তা পেছনের দিকে চলে গেছে। সেখানে তিন তলা এক বাড়ীতে থাকতেন এক জমিদার। তিনি সদাই বিষণ্ণ গম্ভীর। তাঁর ঝিলিমিলি কাটা অলিন্দ এসে পড়েছিল রাস্তাটার উপর। তিনি তাঁর মূল্যবান সময়ের অনেকটা নষ্ট করতেন আমাদের গেটের উপর ঝুঁকে আমাদের শক্তির অপচয়ের নিন্দাবাদ করে। তিনি আমাকে বোঝালেন যে আজ পর্যন্ত কেউই ওখানে বাগান বানাতে পারেনি।

তাঁর উপদেশের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার স্ত্রী বিনীত ভাবে বললেন যে, সে জন্য ও জায়গার মাটি দায়ী নয়, দায়ী জমিদার মশাইয়ের হাঁস মুর্গী আর ছাগলের পাল। তা ছাড়া রাত্রে কারা যেন বেড়ার খুঁটিও ভেঙ্গে দিয়ে যায়। জমিদার মশাই স্বীকার করলেন ঘটনার এই দিকটা তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে। তিনি কথা দিলেন যে, এমন ঘটনা আর ঘটতে দেবেন না এবং সত্যিই ঘটতে দেননি।

বেড়ার পাশেই খেয়া-ঘাট। 'ইলনকা'র নাকের উপর দিয়ে খেয়া নৌকো যাতায়াত করত। গোড়ায় আমার স্ত্রী এটা পছন্দ করেন নি কিন্তু তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার পর দেখা গেল সুবিধা অনেক। সামান্য কিছু টাকা অগ্রিম জমা দিয়ে আমাদের চাকর-বাকর বিনা পয়সায় খেয়া পার হতে লাগল। একমাত্র রাঁধুনি নবী বক্স খেয়া পছন্দ করত না। সে ছিল লম্বা শিষ্ট বুদ্ধিমান ব্যক্তি। চোখে সোনার চশমা এবং মাথায় পালের মত ঝুঁটিওয়ালা চমৎকার পাগড়ী। ত্রিপল ঢাকা শিকারার মর্যাদা তাকে উদ্দীপ্ত করত। কিন্তু তা সত্ত্বেও পারঘাটার মাঝিদের সঙ্গে তার যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল।

হঠাৎ একটা বিলাতী চুল্লী পরিস্থিতি ঘোরালো করে তুলল। 'ইলনকা'র কোন পূর্বতন মালিক লণ্ডন থেকে নিয়ে এসেছিলেন চুল্লীটা। এ চুল্লীর একটা উন্মাসিকতা ছিল সন্দেহ নেই। সেটা মালিক এবং ব্যবহারকারী দু'জনকেই কিছুটা ক্ষীত করত। আমি অবশ্য সানন্দে সেটা জলে নিক্ষেপ করতে প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু তা করলে সম্ভবত নবী বক্সকে হারাতে হত। চুল্লীটাকে সে ভালবাসত এবং তার মত ভদ্র এবং কুশলী রাঁধুনি আগে কখনও দেখিনি।

চুল্লীর পাইপটা ছিল আসল গোলমালের উৎস। ছাদের তক্তা ছ্যাঁদা করে পাইপটাকে বাইরে টানা হয়েছিল। ফলে চুল্লীর দরজা যতক্ষণ খোলা থাকত ততক্ষণ বেশ কিন্তু দরজা বন্ধ করে নবী বক্স যদি চুল্লী সম্বন্ধে একদম উদাসীন হয়ে যেত তাহলেই পাইপটা তেতে লাল হয়ে উঠত। আর ছাদের তক্তা ধিকি ধিকি জ্বলতে সুরু করত। নবী বক্স তখন সিদ্দিকীকে ডেকে আগুন নেবাতে বলত আর সিদ্দিকী চায়ের কাপে করে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে নেবাতো সেই আগুন।

এক অপরাহ্নে যাত্রীবোঝাই খেয়া নৌকো মাঝ দরিয়ায় পৌঁছোতেই আমাদের রান্নাঘরের ছাদ দিয়ে ধোঁয়া বেরুতে দেখা গেল। খেয়া নৌকো ছুটে এলো সাহায্য করতে। বাঁধের উপর থেকে ঘটনাটা লক্ষ্য করে আমি ক্লাবের ঘাট থেকে একটা শিকারা ভাড়া করে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি, আগুন নিবে গেছে। লোকেরা সব রান্নাঘরের মধ্যে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে চা কেক খাবার জন্য। সবাই খুব খুশী।

নবী বক্স বলল, এবার আর সিদ্দিকীর চায়ের কাপে কাজ হয়নি। সৌভাগ্য বশতঃ যাত্রীদের মধ্যে একজনের কাছে তেলের ড্রাম ছিল।

ইতিমধ্যে খেয়াঘাটের অপেক্ষমান জনতা অধৈর্য্য হয়ে উঠেছেন। আগুন নেবাতে কত সময় লাগবে জানবার জন্য বার বার তারা দূত পাঠাচ্ছেন কিন্তু দূতরা আর ফেরে না, দলে ভিড়ে যায়।

আর একটা লোক আমাদের খুব উপকার করেছিল। তাকে আগে কখনও দেখিনি। নাম ব্রিম্যান। সম্ভবতঃ সে ডুবুরি। সত্যি তার শক্তি ভোজবাজির মত। হাতে হাতে তার অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়াকলাপের প্রমাণ না পেলে আমরা হয়ত তার কথা গাল-গল্প বলেই মনে করতাম। একবার এক বান্ধবী তাঁর শিকারায় দাঁড়িয়ে আমাদের বৈঠকখানার জানলায় দাঁড়ানো আমার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছিলেন। এমন সময় তাঁর চশমাটা পড়ে গেল জলে। নতুন একটা কিনতে গেলে অনেক দূরে যেতে হবে। সে এক বিড়ম্বনা বিশেষ। রমজান নৌকোর মাথায় বসেছিল। বলল, "কুছ ফিকর নেহি—ভাবনার কোন কারণ নেই মিস্ সাহেব। ওটা পাওয়া যাবে।" ঠিক যেন শিশুকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

নদীর তখন অর্দ্ধপ্লাবন অবস্থা। জল ঘোলা এবং বালুকাময়। রমজান বলল, "ব্রিম্যানকে ডেকে পাঠাচ্ছি। নদীতে কোন দামী জিনিষ পড়লে সে খুঁজে বার করতে পারে।" বন্যার পিঙ্গল জল দেখে রমজানের কথায় কেউ ভরসাও পেল না, আশ্বস্তও হল না। সবাই ভাবছিল, কোন অলৌকিক ঘটনা না ঘটলে ও চশমা আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু সকালে চায়ের টেবলে এসে হাজির হল সেই চশমা। জলের তোড়ে খেয়াঘাটের কাছে অন্য একটা 'হাউসবোটে'র তলায় চলে গিয়েছিল।

কিছু দিন বাদে আবার ডাক পড়ল ব্রিম্যানের। এবার রমজানের সোনার আঙটি গেছে। কিন্তু ব্রিম্যান তার কৃতিত্ব দেখাতে পারল না। রমজান আমাদের বলল যে, ব্রিম্যান নদীর গর্ভ থেকে কাঁটা, চামচ, ছুরি সবই তুলেছে কিন্তু তার আঙটি তুলতে পারল না। এটা খুবই বিস্ময়জনক মনে হয়েছে তার কাছে। মুখ আঁধার করেই কথাটা বলল সে।

সেই বৃদ্ধ ডুবুরি এবং খেয়াঘাটের বৃদ্ধ মাঝি কিছুদিন বাদে মারা গেল।

২

বোটে চাকর ছিল ছ'টা। রমজানের স্থান সবার উপরে। বেয়ারারা তাকে ডাকত 'লণ্ডন রমজান' বলে। কারণ, সে নাকি 'রাজার লোক'। রাজা জর্জ যখন মুকুট পরতে যাচ্ছিলেন তখন স্বচক্ষে রমজান তাকে দেখেছে। সম্মানের দিক দিয়ে তার পরেই স্থান ছিল নবী বক্সের। তার পর বাসন পরিষ্কারক এবং অগ্নিনির্বাপক সিদ্দিকী, ঝাড়ুদার মহম্মদ ইদ্রিস এবং মাঝি করিমা। করিমার কাজ ছিল নৌকোর ভাল-মন্দ এবং নোঙরের দিকে লক্ষ্য রাখা। রাত্রে করিমা এবং সিদ্দিকী ছাড়া আর সকলেই সহরে তাদের বাড়ীতে চলে যেত। ওরা দু' জন শুতো রান্নাঘরওয়ালা বোটে, যাতে রাত্রে বানিহাল গিরিপথের ঝড় ঝাপটা বা ঐ জাতীয় কোন বিপর্যয়ে তারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু এ ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল না।

আর এক ঝঞ্ঝাট ছিল বরফ। রাতে সকলের অলক্ষ্যে যে তুষারস্তূপ জমে উঠত তার চাপে নৌকোর অনেকখানি তলিয়ে যেত। আর জোড়ের ফাঁক দিয়ে জল ঢুকে ঢুকে খোলটাও ভরে থাকত। কিন্তু এর হাত থেকে উদ্ধার পাবার কোন উপায় নেই। ফলে শীতকালটা কাশ্মীরে মোটেই জমে না।

কাঠ ছাড়া অন্য কোন জ্বালানী সেখানে পাওয়া যায় না। গাধার পিঠে এবং বজরায় চেপে বহু দূর থেকে আসে এই দুর্লভ এবং দুর্মূল্য কাঠ। গরীব মানুষের দুর্দশার এক শেষ। আমার স্ত্রী একবার এক মুচিকে প্রশ্ন করেছিলেন : এবার কি রকম শীত পড়বে হে? লোকটা নিস্পৃহ ভাবে বলল : এবারের শীতে আমরা অনেকেই মারা পড়ব। বিদেশী পর্যটকরা এবং স্থায়ী ইউরোপীয় বাসিন্দারা তাই নভেম্বরে সমতল ভূমিতে নেমে যান এবং মে-জুনের আগে আর কাশ্মীরে ফেরেন না। বড়দিনে সেখানে এক ফুট পুরু বরফ। তার পর সাত আট সপ্তাহ হয়ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং রাত্রে অন্তত পাঁচ-ছ'বার উঠে দেখতে হবে নৌকোর পর কি রকম বরফ জমেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে সূর্যের মুখও দেখা যায়। তখন খোলা জানলার সামনে অথবা হাউস বোটের ছাদে বসে চা খান। সেটা অবশ্য নিছক বাহাদুরী কিন্তু প্রিয়জনদের কাছে চিঠি লেখবার সময় অবশ্য উল্লেখযোগ্য।

কাশ্মীরে বহু ইংরাজ স্থায়িভাবে বসবাস করেন। গ্রীষ্মকালে এদের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। তবে খৃষ্টমাস দিবসে ক্লাবের জলসায় তাদের সবাইকে দেখতে পাবেন। এঁরাই বৃটেনের সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে এবং তা রক্ষা করতে সাহায্য করে ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছেন। আজ সাম্রাজ্যের পতন দেখছেন সংশয়াকুল দৃষ্টিতে। এই সব বৃদ্ধ লোকেরা অনেকেই আর দেশে ফিরবেন না। কাশ্মীর থেকে যখন ইউরোপীয়দের সরানো হচ্ছিল তখন এঁরা অপসারিত হতে চাননি।

কিছুদিন বাদে 'ইলনকা'র ছাদটা আমরা নতুন করে বানিয়ে নিলাম। খোল আর জানলার চকোলেট রঙ বদলে সবুজ রঙ লাগালাম আর আসবাব পত্র আনলাম নতুন নতুন। যতই দিন যায় ততই পুরোনো বোটখানাকে আরও ভাল লাগে। একদিন যে ওটা পরিত্যাগ করে চলে যেতে হবে তা ভাবতেই ইচ্ছা করে না। কিন্তু এক রাত্রে আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান নিরাপত্তার চেতনা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত বানিহাল গিরিপথ বেয়ে এক প্রচণ্ড ঝড় এলো মাঝ রাতে। তখন বোটে একমাত্র আমরা ছাড়া আর কেউ নেই।

যখন বানিহালের ঝড় আসবার আশঙ্কা থাকে তখন হ্রদ এবং নদীর যানবাহন তীরে এসে আশ্রয় নেয়। দড়ি কাছি দিয়ে ভাল করে পাড়ের সঙ্গে বাঁধা থাকে। আকাশে উড়ে বেড়ায় মেঘের স্তূপ, সিন্ধুশালকী শাখায় লাফালাফি আর পপ্লারগুলো যেন কুঞ্চিত সমভূমিতে দৌড়ের পাল্লা দেয়।

বৃষ্টির কশাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে ঝড় নামল নদীর উপর দিয়ে। তাড়াতাড়ি উঠে আমরা গায়ে আরও কিছু কাপড় জড়িয়ে নিলাম। এদিকে জলে বাড়ি-খাওয়া নৌকো এমন একটা আর্তনাদ করতে লাগল যেন তক্তাগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। বাইরে ঘোর অন্ধকার। কাজেই আগাগোড়া সমস্ত আলো জ্বালিয়ে দিলাম! দেখলাম, করুণ অসহায় দুটি মানুষ—করিমা ও সিদ্দিকী তছনছ হওয়া ফুলের বাগানে প্রচণ্ড বর্ষার মধ্যে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। সিদ্দিকীর সেই সদাস্মিত মুখে হাসি নেই ; কারণ সেই রাত্রে তাদের কষ্টের আর শেষ নেই। রান্নাঘরওয়ালা বোট পাড় থেকে অনেক দূরে সরে গেছে এবং 'ইলনকা' শক্ত কিছুর সঙ্গে ক্রমাগত ঘা খাচ্ছে।

ভয়ে বিহ্বল হয়ে আমি শুনলাম সব। বোটখানা ধাক্কার পর ধাক্কা খেতে লাগল অথচ কিসে যে ধাক্কা খাচ্ছে কে জানে! এদিকে ঝড় কমার কোন লক্ষণ নেই। সিঁড়ি দেখে বুঝলাম নদীতে জল বাড়ছে। যদি একবার নৌকার দড়ি ছেঁড়ে তাহলে যে কোথায় আমাদের যাত্রা শেষ তা জানি না। সহরে ছ'টা ব্রিজের নীচে মাথা হেঁট করে একেবারে বাঁধের মুখে গিয়ে পড়তে হবে। বাতাস আর জলের স্রোত আমাদের টেনে নিয়ে যাবে। ক্রমবর্দ্ধমান বন্যায় মাথাভারী হাউসবোট বাঁধের মুখে গিয়ে পৌঁছোলে কি দশা হবে ভাবতে মোটেই আনন্দ লাগছিল না।

ভোরে তিনটার কাছাকাছি একটা স্তব্ধতার মধ্যে সমস্ত বাতি নিবে গেল আর আমরা ঝড় মড়মড়ে নৌকোয় ওলট-পালট হতে হতে উদ্বেগাকুল ভাবে প্রত্যুষের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

নদীতে জল বাড়ছে ক্রমাগত। অবশেষে পাহাড়ের চূড়ায় দিনের আলো ঝকঝকিয়ে উঠল। পাহাড়ে উপর থেকে আজানের কম্পিত আওয়াজ ভেসে এল—এ আওয়াজ যেন সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের প্রতি তিরস্কার। 'ইলনকা' আঘাতে আঘাতে বিপর্যস্ত হোক কিন্তু এখনও যে ভেসে আছে এবং তার ভিতরটা এখনও যে

শুকনো আছে সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। গৃহস্থালীর সব জিনিষই তার মধ্যে। চশমা-পরা বাহাদুর নবী বক্স কাদার মধ্যে ছুটোছুটি করে দড়ি-কাছি টেনে কষে বিপদত্রাণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। নদীর জল বেড়েছে পাঁচ ফুট। বাগান ভরে গেছে ভাঙ্গা ডালপালায়। চারি পাশের বেড়া চিৎপটাং।

নৌকোটা কিসে ধাক্কা খাচ্ছিল এতক্ষণে টের পেলাম। নৌকোর ধাক্কায় একখানা খুঁটি পাড়ের সঙ্গে বুক পর্যন্ত গেঁথে গেছে। কিন্তু নৌকোয় কোন ফুটো হয়েছে বলে মনে হল না। তবে যে রকম ধাক্কা খেয়েছে তাতে ভরসা হয় না।

৩

কয়েক রাত্রি পরে ভূতুড়ে ধাক্কা এসে লাগল হাউসবোটে। ধোঁয়াটে সন্ধ্যায় যখন দূরের জিনিষ নজরে পড়ত না, তখনই ঘটত এই ঘটনা। ক্রিকেট বল এসে নৌকোর চালে পড়লে যে রকম ধাক্কা লাগে ঠিক তেমনি ছুটো ধাক্কা। প্রথমে ভেবেছিলাম খেয়া নৌকো থেকে কেউ ঢিল ছুঁড়েছে। রমজান কাছেই ছিল। সে অসন্তুষ্ট চিত্তে স্বীকার করল বটে যে, কোন ছেলে-ছোকরা ঢিল মারলে মারতেও পারে, তবে কাশ্মীরের ছেলে-ছোকরারা হাউসবোটে ঢিল মারে না। বিশেষ করে পাড়া-পড়শীর সঙ্গে আমাদের তো কোন বিবাদ নেই।

সে হতবুদ্ধি এবং অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মনে হল দুর্জ্ঞেয় কোন অনুভূতি পেয়ে বসেছে তাকে। কয়েক দিন বাদেই ঠিক সন্ধ্যার সময় আবার সেই ধাক্কা লাগল এবং আবার আমরা সেই ধাক্কার কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠল ; কারণ, আমাদের চাকর-বাকরের মাথায় যদি একবার ঢুকে যায় যে বোটটাকে ভূতে পেয়েছে তাহলে তারা যে যার কেটে পড়বে। কোন চাকর আর এর ত্রিসীমানা মাড়াবে না।

ভাবলাম, এ সময় ফেরীঘাটের বুড়ো মাঝি বেঁচে থাকলে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কাজে লাগত। কিন্তু বেচারী তো মারা গেছে আর রেখে গেছে যে ভাইপোটাকে সে একেবারে অকর্মার ধাড়ী। সিনেমার নামে পাগল। প্রায়ই দেখতাম বুড়োর ছুই ৮।৯ বছরের নাতি খেয়া বেয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। শাদা শার্ট আর চোঙাওয়ালা টুপি-পরা গোলগাল ছুটি শিশু। তারা অধিকাংশ সময়ই মাঝ দরিয়ায় হাঁসের পেছু পেছু ছুটত। তীরে ক্রুদ্ধ যাত্রী রাগে দাঁত কড়মড় করলে ভারী আমোদ বোধ করত।

মাঝে কিছু দিনের জন্য ভূত আমাদের রেহাই দিল কিন্তু তাদের কথা ভুলতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে আবার তারা ফিরে এল। এবার তাদের উৎপাতটা বেশী। তারা প্রায় এক পক্ষকাল অন্তর অন্তর হানা দিতে লাগল আর আসত ঠিক সন্ধ্যায়।

ভূতুড়ে অভিযান বেশ ভীতিপ্রদ হয়ে উঠল। রমজান সবই জানত কিন্তু সে মুখে চাবি দিয়ে রইল। সে হল 'লণ্ডন' রমজান। সহজে কুসংস্কারে মাতবে না। রাজা জর্জের স্মৃতি নিঃসন্দেহে তাকে সাহস যোগাতো কিন্তু সে বড় হয়ে উঠেছে ভূত প্রেতের লীলাভূমি তিব্বতের প্রবেশদ্বারে এক পিশাচ-দৈত্য-প্রপীড়িত এলাকায় পর্বতের চূড়ায় লামা সন্ন্যাসীদের দেশে ঢোকার এমনি একটি প্রবেশ দ্বারে এক বিশ্রামাগারে রমজান আমাদের সতর্ক করে বলেছিল যে রাত্রে যেন আমরা কেউ বাইরে না বেরোই। তার উপদেশ যে মঙ্গল জনক তা আকাশের তারার মধ্যে মাথা তোলা পর্বতশ্রেণীর দিকে তাকালেই বোঝা যেত।

আমার স্ত্রী কোন উদ্বেগই প্রকাশ করলেন না। তাঁর ধারণা, ব্যাপারটা নিয়ে গল্প-গুজব করে লাভ নেই। সম্ভবত তাঁর ধারণাই ঠিক। কিন্তু একাধিক বার আমি লক্ষ্য করলাম রমজান বিড়বিড়িয়ে বলছে "শয়তান! কাফির।" যেন পুস্ত ভাষায় গাল দিচ্ছে কাউকে। তখন আমাদের মন সম্ভবত নানা রহস্য চেতনায় কিছুটা প্রভাবিত হয়ে ছিল। তার কিছু দিন আগেই নাগাশিকি হিরোশিমা উচ্ছন্নে গেছে। ভীষণ একটা নতুন অমঙ্গলের অসন্তুষ্ট চেতনা আমাদের মধ্যে। আমেরিকা আর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার আকাশে উড়ন্ত চাকী দেখতে পাওয়া গেছে জানি আর 'কাশ্মীর টাইমস' মারফৎ জানলাম পামীরে এটমগ্রাড নামে এক সহর গড়ে উঠেছে। সেখানে কমরেড ষ্ট্যালিন জার্মান অণুবিজ্ঞানীদের আটক করে তাদের দিয়ে উন্নততর আণবিক অস্ত্র বানাচ্ছেন। তার পর লাহোরের "সিভিল এ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেটে" দেখলাম নীচের খবরটা :—

ষ্টকহোম, ২৬শে আগষ্ট—দক্ষিণ সুইডেনের কার্লসক্রোনা নৌ ঘাঁটির নিকটস্থ টার্ণ দ্বীপের অধিবাসীরা এক উজ্জ্বল রহস্যজনক মূর্তির পরিচয় জানবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। তাকে নাকি রাত্রে নির্জন সমুদ্রতীরে ঘুরতে দেখা গেছে। যেখানে যেখানে সে পদার্পণ করছে সেখানে গরু-বাছুর চরতে চায় না, যদিও দ্বীপের সেই অংশ সর্বশ্রেষ্ঠ গো-চারণ ভূমি।

এই সব ঘটনা-পরম্পরায় পরিষ্কার বোঝা গেল যে, চারিদিকে একটা সন্দিগ্ধ ভাব এবং একথাও মনে রাখতে হবে যে কাশ্মীর পামীরের খুব কাছাকাছি।

ঠিক এমনি সময়ই আমাদের উড়ন্ত চাকীর আবির্ভাব হল। আমেরিকার আণবিক তাপ সঞ্চালক উড়ন্ত চাকী, রুশিয়ার পড়শী স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় উজ্জ্বল মূর্তির চাকী আর এখানে এটমগ্রাডের কাছাকাছি কাশ্মীরে উড়ন্ত চাকী। ব্যাপারটা মোটেই ভাল ঠেকল না।

সমাচার নিয়ে এল রমজান। আমার চায়ে চামচ নাড়তে নাড়তে ঐশিক প্রত্যাদেশের স্বরে বলল যে সহর থেকে আসবার সময় আকাশে সে একটা বড় তারাকে উড়তে দেখেছে। ডাল গেটের সামনে যখন সবাই আজানের অপেক্ষায় ছিল সেই সময় তারাটা হঠাৎ সেখানে থেমে যায় এবং চক্রাকারে ঘুরপাক খেয়ে ফেটে পড়ে।

"এ কাশ্মীরী ফৌজের কাজ। ওগুলো রকেট।"—বললাম আমি কিন্তু রমজান বিশ্বাস করে না। রকেট দেখলে সে চিনতে পারে, ওটা রকেট নয়।

কাশ্মীর অবশ্যই একটা অলৌকিক রহস্যময় জায়গা এবং আমাদের মধ্যে অনেকেই আগামী কয়েক সপ্তাহে অনুরূপ ঘটনা দেখতে পায়। সংবাদপত্রে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সুরে কয়েকটি চিঠিপত্রও লেখালেখি হল কিন্তু কেউই প্রমাণ করতে পারল না যে ওটা উড়ন্ত চাকী নয়। অন্তত আমরা মোটেই আশ্বস্ত হতে পারিনি।

বিখ্যাত স্যাংরি-লা গিরিপথটা যে কোথায় তা কেউ জানে না। তিব্বতে আত্মা যখন জরাজীর্ণ দেহত্যাগ করে তখন কেউ বলে না

যে লোকটা মরেছে ; কারণ, তারা জানে যে আসলে সে মরেনি। তারা বলে, লোকটা স্যাংরি-লায় গেছে।

এক মার্চের অপরাহ্ণে হ্রদ থেকে ফেরবার সময় আমার স্ত্রী দেখলেন একটা সন্ত-বানানো চার কামরাওয়ালা বোট বাঁধা রয়েছে ডাল গেটে। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল : "ওই দেখ গো স্যাংরি-লা।"

নামটা বড় করে লেখা আছে বোটের গায়ে। তার মালিক এক তরুণ তাঁর তার সুস্মিতা স্ত্রী। তাঁরা আমাদের বোট দেখবার আমন্ত্রণ জানালো। মনে হয় আমার স্ত্রী কাঁচা দেবদারুর গন্ধে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বোটখানা দেবদারু কাঠে তৈরী। এখানে-সেখানে অসংখ্য গাঁট এবং গ্রন্থি। সারা দেওয়ালে রজন ঘামছে। আসবাবপত্রও তেমন কিছু নেই। কিন্তু তরুণ মাঝি আর তার বউ মহম্মদ ইদ্রিসের মত আমাদের খুশী করতে উৎসুক। আমরা বিভিন্ন সময়ে অনেক বোট দেখেছি কিন্তু স্যাংরি-লার মত এত ত্রুটিপূর্ণ এবং অযৌক্তিক ভাবে আকর্ষণীয় কোন বোট দেখিনি।

ছত্রিশ ঘণ্টা বাদে 'ইলনকা'র মাজা ভাঙল। কয়া দড়ি কাছি তাদের গুপ্ত রহস্য ফাঁস করে দিল—ভূতুড়ে ধাক্কার কারণও বোঝা গেল। সে ছিল নির্বোধের কানে ক্রমাগত বৃথা সতর্কবাণী উচ্চারণের মত। বার বার ধাক্কা দিয়ে বলতে চেয়েছিল যে ঝড়ে নৌকোর কাঠামো আর অক্ষত অনড় নেই।

তারা-ভরা শীতল রাত্রি। বেজেছে প্রায় রাত এগারোটা। ঠিক সেই সময় ঘটল ঘটনাটা। মাজা ভাঙার আগে এমন একটা ঝাঁকুনি লাগল যে মনে হল যেন কোন ভারী জিনিষ হুড়মুড় করে আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ল। 'ইলনকা' লাফিয়ে উঠে কাঁপতে লাগল।

আমার স্ত্রী বললেন, "কোন ভেলাটেলা হবে।"

কিন্তু এময় সময় নদীতে কোন ভেলা চলে না!

সকলেই শুনেছে সেই সংঘর্ষের আওয়াজ। ঘটনা জানবার জন্য দুটি লোক অঙ্গ সঞ্চালন করতে করতে এসে তৎক্ষণাৎ ভাঁড়ারের পাটাতন তুলে ফেলল। খোলের এক দিকে জোড়ের মুখ আলগা হয়ে গেছে এবং সেখান দিয়ে জল ঢুকছে। সেটা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করা গেল। আমরা কিছুটা ভয় পেলেও হতাশ হইনি। সিদ্দিকীকে বললাম সকালে একটা মিস্ত্রী ডেকে আনতে।

সৌভাগ্য বশতঃ রাত্রে আর কিছু হয়নি। ভোরে উঠে জিনিষপত্র বাঁধা-ছাঁদা করে কিছু কিছু পাড়ে নিয়ে তুললাম। মিস্ত্রী এসে পরীক্ষা করে দেখল খোলের মধ্যভাগ। মিস্ত্রী খুব গম্ভীর প্রকৃতির নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তার প্রকাণ্ড পাটলবর্ণ পাগড়ীর নীচে গুরুগম্ভীর মুখটা আজও আমার মনে পড়ে।

উন্মুক্ত খোলের উপর বসে সে চিন্তা করতে লাগল। চোখ দুটো ঘুরে বেড়াতে লাগল দুই পাশের দেওয়ালে। দেওয়ালের খোপের জোড় রাতারাতি আলগা হয়ে গেছে।

"জিনিষপত্র সব বার করে নিন।" শান্ত ভাবে আদেশ করল মিস্ত্রী, "মেঝের পাটাতন পর্যন্ত সরাতে হবে এবং এখনই!"

বিদীর্ণ দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বৃথাই বললাম যে, আমরা আর এক রাত্রি নৌকোয় কাটাতে চেয়েছিলাম।

ক্ষুদ্রকায় পণ্ডিত চমকে উঠল।

"অসম্ভব! এখানে বোটখানাকে ডুবতে দেওয়া যায় না। জল খুব গভীর।" আমার স্ত্রী তাকে বললেন যে, গত রাত্রে আমরা ওর মধ্যেই ঘুমিয়ে ছিলাম। তাতে তার চোখ দুটো বিস্ফারিত হল। অনুমান করা কঠিন নয় যে সে কি বলতে চেয়েছিল। মুখে বলল, "আজ আর পার পেতেন না। আমার লোকেরা এসে এক্ষুনি টেনে নিয়ে যাবে এই বোট।"

সে চলে যেতে একটা ভাড়াটে শিকারায় চেপে আমি আর একটা হাউসবোটের সন্ধানে বেরোলাম। খালের দিকে গিয়ে আবার স্যাংরি-লা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হল। বুঝলাম ভাগ্য আমাদের কোন দিকে টানছে।

মধ্যাহ্নে স্যাংরি-লা এসে দাঁড়ালো 'ইলনকা'র পাশে।

আমাদের জিনিষপত্র দিয়ে সাজানো হল সেটাকে। অপরাহ্ণে 'ইলনকা'কে ধরে ধরে নদীর নীচের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হল।

স্ত্রীকে বললাম, "কাশ্মীর ত্যাগ করার আগে চলো আমরা এখানকার পাখী-টাখী দেখে যাই।"

'ইলনকা'র কাজ শেষ হবার আগেই আমরা ফিরে এলাম। করিমা এবং সিদ্দিকী নৌকোয় করে আমাদের 'ইলনকা' দেখাতে নিয়ে গেল। দেখলাম সেটা বড় একটা শিকলে ঝোলানো। ডকটাকে কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে একটা অববাহিকার দিকে। সেখানে লম্বা লম্বা ডাঁটির মাথায় মোমের মত নরম পদ্মফুল ফুটে আছে। পদ্মবনের উপর লম্বমান 'ইলনকা' নজরে পড়তেই হঠাৎ আমাদের নৌকোর গতি শ্লথ হয়ে গেল। সুন্দর পটভূমিকায় নব রূপায়ণ সমৃদ্ধ সুঠাম ইলনকাকে দেখে মাঝিরা যেন মুগ্ধ এবং মূক হয়ে গেছে।

কাছে গিয়ে তন্ন তন্ন করে দেখলাম বেশ ভালই হয়েছে। ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে ফলাও করে গল্প করলাম। বললাম "এবার নতুন করে জীবন সুরু। কষ্ট যা পেয়েছি তা নিতান্তই মায়া। আর ভয় নেই। এক জায়গায় দুবার বিদ্যুৎ চমকায় না।"

দুই রাত্রি বাদে স্যাংরি-লার ছাদে বসে দেখলাম নদীর নীচ দিকের আকাশ লালে লাল। আমার স্ত্রী বললেন, "আর একটা বাড়ী পুড়লো।"

দুই-এক দিন আগে একটি হোটেল পুড়ে গেছে। এবং নদীর পাড়ে একটা রাজপ্রাসাদেও আগুন লেগেছিল। কিন্তু স্যাংরি-লার ছাদে বসে আমরা একটুও ভাবিনি যে আকাশ-আলো-করা সেই ভীষণ তপ্ত আলোকের আভা 'ইলনকা'র গাত্র থেকেই নির্গত হচ্ছে। সকাল পর্যন্ত সে খবর আমাদের অজ্ঞাত ছিল।

সকালে রমজান একটা আঁটা খাম এনে আমার হাতে দিল, পাঠিয়েছে নৌকোর মিস্ত্রী। দেখলাম রমজান কুয়াশাচ্ছন্ন নদীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখের দৃষ্টি উদাস।

খামটা ছিঁড়ে ফেললাম।

"মহাশয় বড়ই দুঃখের বিষয়। আপনার হাউসবোট ইলনকা গত রাত্রে ভস্মীভূত হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায় নি।"

ব্যস, আর কিছু নেই চিঠিতে। রমজান ফিরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর ভাবে সেলাম করল। তার কুঞ্চিত গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল চোখের জল। বলল: "খোদাবন্দ, আপনার নৌকররা সব কাঁদছে।"

অনুবাদক—সুনীল ঘোষ

বাঙলার গাজন

আনন্দ দে

বাঙলা দেশ উৎসবের দেশ। বাঙলা দেশের সমাজ-মনে উৎসবের উর্বর পলি যুগ-যুগান্ত ধরে জমে উঠেছে। বারো মাসে তার তের পার্বণের সমারোহ! তার বর্ষবোধন হয় উৎসবে, বর্ষবিদায়ও উৎসবে। শিবোৎসব বা চলিত কথায় শিবের গাজন এই বিদায়ের উৎসব। চৈত্র-সংক্রান্তিতে সারা বাংলা দেশে শিবের এই গাজনোৎসব পালিত হয়ে থাকে। শিবের গাজনের ছ'টি অঙ্গ, সন্ন্যাসী নির্বাচন, ক্ষৌরকার্য্য ও সংযম বা 'নিরিমিষ্যি', হবিষ্য (ঘটস্থাপন), মহাহবিষ্য, উপবাস ও উৎসব আর লীলাবতী পূজা এবং শেষে চড়ক। সংস্কৃত গর্জন শব্দ থেকে পাওয়া গাজন শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো শিবের উৎসব। এই শিবের গাজনই বাঙলা দেশের স্থানবিশেষে গম্ভীরা বা গম্ভীরা উৎসব নামে অভিহিত হয়েছে। 'শিবসংহিতা'য় শিবের একটি নাম পাওয়া যায় 'গম্ভীর'। গম্ভীর নামক শিবের বা গম্ভীরের পূজা যেখানে হয় তাকে গম্ভীরা-মণ্ডপ বলা হয়। গম্ভীরা-মণ্ডপে অনুষ্ঠিত শিবপূজা যুগান্তরের সংগে সংগে গম্ভীরা পূজা বা গম্ভীরোৎসব নামে প্রচলিত হয়ে পড়ে। গম্ভীরা-মণ্ডপ মালদহ, রংপুর, দিনাজপুর, বর্দ্ধমান জেলায় বিখ্যাত। এ ছাড়া মেদিনীপুর, বীরভূম, নবদ্বীপ, চব্বিশ পরগণা, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে গম্ভীরা উৎসব বা গাজন বিশেষ পরিচিত এবং সর্বত্রই চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে এই উৎসব পালিত হয়। কিন্তু মালদহের গম্ভীরা আজ সকলের উচ্চে স্থান লাভ করেছে।

গম্ভীরা-উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়—ঘটভরা, ছোট তামাসা, বড় তামাসা, আহারা ও চড়ক পূজা। শ্রদ্ধেয় হরিদাস পালিত মহাশয় উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গের তথ্যবহুল বর্ণনা দিয়েছেন। সচরাচর ছোট তামাসার পূর্বদিনে ঘটভরা বা ঘটস্থাপন করা হয়। এই দিন থেকে গম্ভীরা-গৃহে প্রদীপ জ্বালানো হয়। ঘটভরার দিনে একটা বৈঠক বসে, সর্বসম্মতিক্রমে ঘটভরা স্থিরীকৃত হয় এবং মণ্ডল বা গ্রামের প্রবীণতম ব্যক্তি সর্বশেষে অনুমতি করেন। ছোট তামাসার দিনে কোন রকম উৎসবাদির অনুষ্ঠান নেই, হর-পার্বতীর পূজা শুরু হয়। শিবের নিকট যারা 'মানত' করেছে তারা ভক্ত বা সন্ন্যাসী হয়। বালকেরা হয় বলেই চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে বালা ভক্ত বলে। বড় তামাসার দিনে যথা-প্রচলিত হর-গৌরী পূজা হয়ে থাকে। দুপুরের পর ভক্তগণের শোভাযাত্রা বের হয়। "প্রত্যেক গম্ভীরা হইতে ঢাকসহ ভক্তগণ নৃত্য করিতে করিতে বহির্গত হয়। ভূত, প্রেত, প্রেতিনী, বাজিকর ও বাজিকর-স্ত্রী, কেহ রামাত, কেহ ডুবড়ীওয়ালা, কেহ সাঁওতাল প্রভৃতি যাহার যাহা ইচ্ছা তদ্রূপ বেশভূষণ করিয়া এক গম্ভীরা হইতে গম্ভীরান্তরে গমন করে। ভক্তমধ্যে কেহ কেহ ত্রিশূলাকৃতি ক্ষুদ্র বাণ উভয় বক্ষঃপার্শ্বে বিদ্ধ করিয়া ত্রিশূলাগ্রে তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া প্রজ্বালিত করে; অন্য এক ব্যক্তি তাহাতে ধূপচূর্ণ নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং ভক্ত নৃত্য করিতে করিতে গমন করে।" (আদ্যের গম্ভীরা, পৃঃ ৩১)। এর পরে বালা ভক্তগণ একত্রে শিবনাথ কি মহেশ' (কোথাও বা 'ভোলানাথের চরণে') ধ্বনি দিতে দিতে জলাশয় সমীপে যায়। তার পরের দিনে 'আহারা'য় মশান নাচার পর হর পার্বতীর পূজান্তে হোম এবং ব্রাহ্মণ ও কুমারী-ভোজনাদি হয়ে থাকে। এই দিনে যে গীত হয়ে থাকে তাকে বোলাই বা বোলবাহি বলে, এর সুর স্বতন্ত্র। সবশেষে চড়ক। অঞ্চল-বিশেষে এই মূল ও আদি অনুষ্ঠান-পদ্ধতির সংগে অন্যান্য বিষয় জড়িত হয়ে গেছে। যেমন চব্বিশ পরগণা জেলার বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি গাজনতলার পাশে মাটি দিয়ে প্রকাণ্ড কুমীর তৈরী করা হয় আর তার পূজাও হয়। এবং রমণীরা সন্ধ্যার সময়ে নীলের ঘরে বাতি দেন:

নীলের ঘরে দিয়ে বাতি।
আমার হোক স্বর্গে গতি।

স্থানভেদে এই গম্ভীরোৎসব বিভিন্ন নামেও পরিচিত। গম্ভীরা কোথাও গাজন, আর কোথাও সাহীযাত্রাদি নামে বিদিত। বিশেষতঃ শিবের গাজন, ধর্মের গাজন বাঙলা দেশে ও উড়িষ্যায় ব্যাপ্ত।

জীবজগতে যেমন, দেবজগতেও তেমনি জন্ম-মৃত্যু আছে। অনেক দেবতার স্থান অন্য দেবতা কালান্তরে এসে গ্রহণ করেছেন। হিন্দু দেব-দেবীর ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা এইটে দেখতে পাবো। তেমনি আবার দেবজগতে বর্ণসঙ্কর দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ দেব-দেবীরা মিশ্র রূপ লাভ করেছেন। অনেকের আদিম প্রকৃতি বদলে গেছে, তার ওপরে প্রলেপ পড়েছে পরবর্তী কালের প্রভাব। শান্তোগ্রা দেবী যিনি হয়েছেন, তিনি হয়তো ছিলেন নিতান্ত উগ্রা। এমনিতরো পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক সময়ে দেখা গেছে এক জন বা একের ধর্ম অন্য জনাকে আশ্রয় করে বেঁচে আছে। যেমন ধরা যাক ধর্মঠাকুরের পূজা। অস্পৃশ্য ডোম জাতিভুক্ত লোকেরা যাঁরা 'দেয়াসী' নামে পরিচিত, তাঁরা ধর্মপূজা করেন। এই "ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে গাজন হইয়া থাকে। ইহা মূলত একটি স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান, কাল ক্রমে বাঙলার কোন অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের পূজা ও কোন অঞ্চলে লৌকিক শিবপূজাকে অবলম্বন করিয়া ইহা এখন আত্মরক্ষা করিয়া আছে। গাজন উপলক্ষে কোন কোন গ্রামে যে চড়ক হইয়া থাকে, কেবল মাত্র তাহার সঙ্গেই ধর্মপূজার মৌলিক সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়।" (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৪৮৪)। আবার এই চড়কের কথায় আমরা অন্য একটি বিষয়ে আলোচনা করতে পারি। এই চড়ক অনুষ্ঠানটি আদিম সূর্যপূজা ছাড়া অন্য কিছু নয়। যে দিনটিতে চড়ক অনুষ্ঠিত হয় সূর্য সেই দিন দ্বাদশ রাশির পথে ভ্রমণ শেষ করে নতুন যাত্রা শুরু করেন। সে দিন আবার আগে শিবপূজার দিন বলে ধার্য ছিল না, অন্তত দাক্ষিণাত্যে নেই বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিই: "চড়ক গাছ ও চড়কের চক্র স্পষ্টতই সূর্যের আবর্তন ও চক্রাকারে ভ্রমণ বুঝায়। ইউরোপের কোন কোন জাতি যেমন স্লাব, লিথুনীয়, কেল্ট প্রভৃতির মধ্যে সূর্যপূজারূপেই চড়কের অনুরূপ অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। পশ্চিমবঙ্গের সকল উল্লেখযোগ্য শিবমন্দিরেই এখনও চড়কের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বর্তমান হিন্দুধর্মের প্রভাব বশত কোন কোন স্থলে ধর্মমন্দির শিবমন্দির বলিয়া পরিচিত হইলেও উক্ত চড়কের সংশ্রব হইতেই তাহা যে সবই পূর্বে সূর্যদেবতা বা ধর্মঠাকুরেরই মন্দির ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ধর্মপূজার সঙ্গে এই চড়কের সম্পর্ক হইতেও ধর্মপূজা যে সূর্যপূজা তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।" (বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৫০৪)। আবার গাজনের শাস্ত্রীয় প্রমাণের জন্যে শিবপুরাণের ও ধর্মসংহিতার

কথা তোলা হয়। শিবপুরাণে বিরাট শিবলিঙ্গ মূর্তি বা ধর্ম-সংহিতায় 'বহুযোজনবিস্তীর্ণং লিঙ্গং'-এর কথায় আমরা স্মরণ করতে পারি মিশরদেশীয় শিব অসীরিসের কাহিনী, গ্রীসের বেকস্ দেবের একশ কুড়ি হাত মাপের স্বর্ণময় লিঙ্গমূর্তি। এক সময়ে আমাদের দেশে শৈবধর্মের উত্তাল তরঙ্গ আসে। তখন শিবপূজা প্রচলনের জন্য বিবিধ পুস্তক লেখা হয়। এবং এই সম্বন্ধে যে সব সংহিতা পাওয়া যায় (যেমন, জ্ঞানসংহিতা, বায়বীয়-সংহিতা) সেগুলি খুব প্রাচীন নয় বলেই ধারণা। তবু বলতে হয়, আজকের যে প্রচলিত শিবপূজা তার সুরু সেন রাজগণের সময় থেকেই। তখনও নৃত্য-গীতাদি ও বাদ্যোদ্যম হতো উৎসব-সময়ে। অবশ্য প্রাচীন বৈদিক ও পৌরাণিক শোভাযাত্রা ও উৎসব বর্তমান গাজন ও গম্ভীরাতে রয়েছে বলে অনেকে মত পোষণ করেন।

গাজনের ওপর বৌদ্ধ তান্ত্রিকধর্মের ও হিন্দু তান্ত্রিকতা-বাদের প্রভাব পাওয়া যায়। বর্তমান গাজন বৌদ্ধভাবময় বললে অত্যুক্তি হয় না। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে দেশে ধর্ম সমন্বয়ের সুযোগ ঘটে। শ্রীহর্ষ নিজে শিবপূজা, সূর্যপূজা ও বুদ্ধভক্ত ছিলেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধ-উৎসব তাঁর সময়ে গাজনোৎসবে পরিণত হয়েছিল। তৎকালীন চীনদেশীয় পর্যটকগণ পর্যন্ত বলে গেছেন বৌদ্ধধর্ম পৌত্তলিকতামূলক ধর্মে পরিণত হয়েছিল। অধিকাংশ উৎসব উভয় ধর্মের একই সময়ে অনুষ্ঠিত হতো। এমন কি, মহাযান ধর্মমূলক সম্প্রদায়ের বিবিধ দেব-দেবী পূজা ও উৎসব হিন্দু দেব-দেবীর অনুরূপ ছিল। ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর বৌদ্ধদেরও পূজনীয় হয়ে পড়েছিলেন। তখনকার দিনে অবক্ষয়গামী বৌদ্ধধর্ম হিন্দু উপাসনা পদ্ধতির আড়ালে গিয়ে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচতে চেয়েছে। এবং এই সংমিশ্রণের ভিতর দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মমতও গাজনের ভিতরে প্রবেশ করতে দেরী করেনি। ধর্ম ঠাকুর পূজায় বৌদ্ধ প্রথা আমরা চিনতে পারি। সেই ধর্ম ঠাকুরের সৃষ্টি-প্রকরণ, তাঁর সাকারত্ব লাভ মালদহের গম্ভীরায় পাওয়া যায়। ও দিকে বুদ্ধদেব লোকেশ্বররূপে পরিচিত হলেন যখন তিনি মহাদেবের মতো শ্বেতবর্ণ, চার হাত আর ত্রিনেত্রবিশিষ্ট হলেন। আবার শব-সাধনা জাতীয় তান্ত্রিকতা গাজন-গম্ভীরার মশাল-নৃত্য ও শব-নৃত্যাদির মতোই। প্রাচীন বৌদ্ধগণের মধ্যে শ্মশান-সাধনা ছিল। তা ছাড়া আমরা ত' জানি, জাঙ্গুলীতারা, বজ্রতারা, একজটা প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবীরা হিন্দুদের চণ্ডী, সরস্বতী প্রভৃতির সঙ্গে কতোখানি আত্মীয়তা করে রেখেছেন।

এক দিকে আমরা যেমন দেখি আমাদের দেব-দেবীদের রূপ বদলে গেছে, তাঁরা মিশ্ররূপে বিরাজিতা, অন্য দিকে তাঁদের না আছে পুরোপুরি বৈদিক সত্তা, না আছে পৌরাণিক ভঙ্গী। আবার দেখি, সব সময়ে একটা লৌকিক ধর্মমত বড়ো হয়ে উঠেছে। সমাজের নিচের তলার মানুষ সমাজের ওপর তলার আরাধ্য দেব-দেবীর প্রতিপক্ষ দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছে। গাজন-উৎসব প্রচলিত অর্থে নিম্ন শ্রেণীর ব্যাপার। যদিও উচ্চকোটির মানুষ এই উৎসবকে কিছুটা আমল দেন, আসলে নাগর, ধানুক, চাঁই, রাজবংশী, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়গণের মধ্যেই বেশি পরিলক্ষিত হয়। এমন কি 'গাজুনে বামুন' নীচ বর্ণের বিভিন্ন জাতির পূজারী বলে শ্রেষ্ঠবর্ণজ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন হিসেবে গণ্য হন। কতকটা ধর্মঠাকুরের পূজকদের মত। অবশ্য বর্তমানে সব একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু এটা দেখা গেছে, যাঁরা মাটির খুব কাছাকাছি থাকেন তাঁরা শিবপূজা বা গাজনে অংশ গ্রহণ করেন।

এই গাজনের মধ্যে আমরা বাঙলার কৃষি সংস্কৃতির নিদর্শন পাই। শিব কৃষক-সমাজে উর্বরতার দেবতা; সূর্যের সঙ্গে শিবের পার্থক্য নেই, চড়কের ব্যাপারে সূর্য আসছেন আমাদের আলোচনায়। গাজনের 'আহারা'র দিনে আমরা দেখছি কেউ ধান ছিটিয়ে দেয়, কেউ হল চালায়, কেউ ধানবীজ বপন করে, ধান কাটে। শিবের চাষ বিষয়ক গানও আছে, এবং সে চাষ ধান্যের। এ ছাড়া মাঠ থেকে পাকা ধান উঠলে দেবোদ্দেশে নিবেদন করে গ্রামবাসীদের উৎসব বৈদিক আমল থেকেই চলে আসছে বলে আমরা জানি। শিবের গাজনে দেখি শিব ইন্দ্রালয়ে গিয়ে জমি চাইছেন:

তুমি ভূমি দিলে আমি চষি গিয়া চাষ।
পূর্ণ হয় তবে পার্ব্বতীর অভিলাষ।

আবার বীজধানের জন্যে শিবের চিন্তা হলে,

কাত্যায়নী কন কান্ত কিছু নাই কেন।
কুবেরের বাটী বীজ বাড়ি করে আন। ইত্যাদি।

তাই বলতে চাই, গাজনের মধ্যে কৃষি সংস্কৃতির পলিমাটি লেগে রয়েছে। এবং এই কৃষিকে যাঁরা লালন করেছেন গাজন তাঁদেরই উৎসব, পরবর্তী কালে এতে যতোই কেন নিছক ধর্মের রাঙতা মোড়া হোক না। এবং শিবের মতো সহজলভ্য কৃষি দেবতার কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য বাণবিদ্ধ রক্তাপ্লুত কলেবরে যাওয়ার ব্যাপারটা নিছক তান্ত্রিক প্রভাব বলে ধরে নেওয়া যায়। অবশ্য গাজনে ভক্তগণের বাণ ফোঁড়া বাণোপাখ্যান থেকে গৃহীত বলে পণ্ডিতরা রায় দেন এবং শাস্ত্রীয় বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। চড়ক অর্থে চক্রাসন্নই, বাণবিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা শাক্ত মতের পরিপোষণা করে বলেই বিশ্বাস।

গাজন বা গম্ভীরা যে সমাজের নিচু তলার মানুষদের সামাজিকতার অঙ্গ ছিল এবং দুষ্ট লোক শোধনের হাতিয়ার ছিল সেটা আজকের রূপ দেখলেও বোঝা যায়, যেজন্যে মালদহের গম্ভীরা গান কংগ্রেস সরকার মাঝে বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কারণ, এই গম্ভীরা গানের মধ্যে দেশের কথা বলা হতো। নিচু তলার মানুষের কাছে গাজন তাই শুধু উৎসব নয়। সমাজ-জীবনের স্খলন-পতন, অবিচার-অত্যাচার গাজন গানে প্রকাশিত হতো। সামাজিক অপরাধীদের গম্ভীরা বা শিবালয়ের উদ্দেশে অর্থ বা সম্পত্তি দিতে হতো। এই ভাবে গাজন সমাজচালক হয়ে পড়েছিল। অন্যান্য স্থানের কথা জানি নে, মালদহে এর সমধিক বিকাশ ঘটেছিল এটা সুবিদিত। ধর্ম কেন্দ্র করেই বাংলা সাহিত্যের সুরু। ধর্ম কেন্দ্র করে বাঙলার প্রথম কাব্যসৃষ্টি জনসাধারণের সমতলে নেমে এসেছিল, জনগণের ব্যবহারে লেগেছিল। এই গাজনকে কেন্দ্র করে তাই সাহিত্য তথা কবির বিকাশ ঘটেছে। রামপ্রসাদ, চণ্ডীদাস এই গাজন-গম্ভীরার মাধ্যমে নিজেদের তুলে ধরেছেন বলেই জানা যায়। তাই বলতে পারি, গাজন কতোখানি বেদোক্ত, পুরাণোক্ত বা শাস্ত্রোক্ত সেটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা গাজন বাঙলার সম্পদ, এবং তা কৃষি সভ্যতার স্মৃতিচিহ্নবাহক। বাঙলা দেশের উৎসব-ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কি না সেটা বিচার্য নয়, বিবেচ্য বাঙলার পলিমাটির থেকে জন্মেছে কি না।

শ্রীমতী লিজেল্ রেমঁ

নিবেদিতাও এমনি করে বে'রিয়ে পড়লেন। দু'জনের কাজে সাদৃশ্যটা খুবই প্রকট। মিস ম্যাক-লয়েডকে ১৯০২-এর ২৪শে জুলাই লিখলেন, '...মনটা একটু দমে গিয়েছিল, জানই তো এমন ঘুরে বেড়ানোতে ওঁর যে বিপদের সম্ভাবনা নাই তা নয়। কালকে ওঁকে কাছে পাব জেনে আনন্দ হচ্ছে, কেন না আমার প্রাণভরা শুভাকাঙ্ক্ষা দিয়ে ওঁকে বিদায় দিতে পারব... আপাততঃ তিনি আমাদের অতিথি, বেঘোরে প্রাণ হারানোর অধিকার তাঁর নাই। বুঝে দেখ, তুমি তাঁকে এনেছ, আমাদের জন্যই এনেছ। আবার যদি এ দেশে আসেন (উনি বলছেন আসবেন) সব কিছু জেনে-শুনে স্ব-ইচ্ছাতে আসবেন।'

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

পরিক্রমা

রক্ষণশীল ভারতের বুকে জাতি-বর্ণ ভুলে পারস্পরিক সহযোগিতা আনবার জন্য একটা আন্দোলন বিবেকানন্দ চালিয়েছিলেন। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর বিভিন্ন ভারতীয় সংবাদপত্রে যে-সব শোকসংখ্যা বের হয়েছিল তাতেই সে-আন্দোলনের গুরুত্ব কতখানি তা বোঝা যায়। কাগজে-কাগজে তাঁর ছবি বেরুল, মহোৎসাহে চলল তাঁর জীবনী ও বাণীর বিশ্লেষণ। আবার তিক্ত সমালোচনাও ছিল। কেউ বললেন, স্বামীজি ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক, বুদ্ধ ও শংকরের সন্ন্যাসের আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করে এক নতুন হিন্দুধর্মের বার্তা এনেছেন তিনি। পশ্চিমের দরবারে তিনি ভারতের মুখোজ্জ্বল। কবীরের সঙ্গে কেউ বা তাঁর তুলনা করলেন। কিংবদন্তী আছে, কবীর দেহত্যাগ করবার পর হিন্দু-মুসলমান উভয়েই তাঁর দেহটি দাবী করেছিল, 'স্বামীজিকে নিয়ে হিন্দু-মুসলমানেরা ভবিষ্যতেও ঐ রকম করবে বলে মনে হয়।' (ব্রহ্মবাদিন) স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুর ব্রহ্ম, জরথুস্ত্রপন্থীর অহুর মজদা, বৌদ্ধের বুদ্ধ, ইহুদীর জিহোবা আর খৃষ্টানের পরমপিতাকে সমান মর্যাদা দিয়েছেন, স্বীকার করেছেন সবারই মহিমা। অথচ সকলেই জানতেন যে স্বামীজির মূল উদ্দেশ্য ছিল বেদান্ত দর্শনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা, আর ও-দর্শনকে দৈনন্দিন ব্যবহারে নামিয়ে আনা। নিবেদিতাকে স্বামীজির মানস-কন্যা ধরে নিয়ে তাঁর ভাবী জীবন সম্পর্কেও অনেকে অনেক প্রশ্ন তুলেছিলেন। স্বামীজির জীবনব্রতের উত্তরাধিকার কি তিনি নিবেদিতাকেই দিয়ে গেছেন?

বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের পরই নিবেদিতাকে একটা বিশিষ্ট স্থান দিলেন সবাই। বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করার দু'সপ্তাহের মধ্যেই যশোরে নিবেদিতার ডাক পড়ল। তাঁর গুরু সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে। নিবেদিতা পুরাদস্তুর সন্ন্যাসিনীর মত গেরুয়া প'রে সভায় এলেন, গভীর আবেগে গুরুর কথা বললেন সরল ভাষায়। কিছু ধর্মকথা বলবার জন্য লোকে পীড়াপীড়ি করতেই আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'স্বামীজিই আমার ধর্ম, আমার দেশ-হিতৈষণা সব।' (২৪শে জুলাই ১৯০২-এর চিঠি)। তিন দিন ধরে স্কুলের ছেলে, তাদের অভিভাবক আর জেলার তরুণদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে নিবেদিতা বুঝে নিলেন কি ভাবে তাঁর কাজ আর ওকাকুরার কাজে সমন্বয় ঘটানো যাবে।

এর কয়েক দিন পরে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিশারী করে ওকাকুরা উত্তর-ভারতে ভ্রমণে বেরুলেন। সপ্তাহ কয়েক পরে

ওকাকুরা ও সুরেন্দ্রনাথ চললেন খাঁটী তীর্থযাত্রীর মত। বাংলার সুদূর গ্রামাঞ্চলে ঘুরতে লাগলেন—পথের পাশের সরাই বা মুদির দোকানে রাতের মত আশ্রয় নিয়ে। ওকাকুরা তাও-পন্থী। তাঁর গেরুয়া বসন গ্রামের পথে বেমানান কিছুই নয়। হালকা হয়ে পথ চলেন ওকাকুরা। সঙ্গে কতকগুলো সুতীর কিমোনো, আবহাওয়া অনুযায়ী ওরই একটা বা গোটাকয়েক গায়ে চড়ান, আর যেখানে থামেন সেখানেই ওগুলো কেচে নেন। বিছানা বলতে একখানা মাদুর।

ভারতবর্ষকে ওকাকুরা ভালবাসেন। বুদ্ধের স্মৃতিশেষের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করতে তাঁর এদেশে আসা। মনে ভেবেছিলেন, বুদ্ধগয়ার চার পাশে কতকগুলো বৌদ্ধ উপনিবেশ গড়ে তুলবেন। বৌদ্ধযাত্রীরা সেখানে যে-যার দেশের আচার-নিয়ম বজায় রেখে থাকতে পারবে। কিন্তু ভারতবর্ষের দুঃখ-দৈন্য আর মনঃপীড়ার পরিচয় পেয়ে তাঁর অস্বস্তির আর সীমা রইল না। এশিয়াকে অখণ্ড একটা সত্তা হিসাবে দেখতেন বলে তাঁর বেদনা হল আরও তীব্র।

মিসেস বুল সাড়ম্বরে পার্টি দিয়ে ওকাকুরাকে কলিকাতা সমাজে পরিচিত করে দিয়েছিলেন। সবার মনেই ওকাকুরা বেশ একটা ছাপ ফেলেছিলেন। কালো সিল্কের একটা কিমোনো প'রে ফুলকাটা একখানা পাখা নাড়তে নাড়তে ওকাকুরা বসে থাকেন; মুখখানা কেমন যেন ভারিক্কি ধরণের, দেখে মনের ভাব ধরবার উপায় নাই। শিক্ষা-দীক্ষা বৌদ্ধ ধরণে হওয়ায় কেমন একটা উলটো মোচড় দিয়ে কথা বলেন, যাতে অনেক সময় মনে হয় যেন বিদ্রূপ করছেন। অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর বাঙালীর মেজাজে অনেক সময় সেটা সয় না, বিরোধ বাধে। যখন গুরুগম্ভীর ভাবে কোনও একটা কঠিন সমস্যার বিস্তৃত আলোচনা করেন তখনই ওঁকে সবচেয়ে লঘুস্বভাব মনে হয়। বলতেন, 'ভারতবাসী, তোমরা জেগে ওঠ! দেখ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তির সমকক্ষ করে তোলবার জন্য ত্রিশ বছরেরও কম সময়ে আমাদের দেশকে আমরা কী করেছি। আমাদের অতীত ছিল গৌরবোজ্জ্বল, তার আহ্বানে দেশের ঘুমন্ত আত্মাকে জাগিয়ে তুলেছি আমরা। তোমরাও মাথা তোল।

যে-বিরাট ভবিষ্যৎ তোমাদের সামনে তাকে রূপ দেবার এই সঙ্কেত।'

আশে-পাশে তরুণ হিন্দুরা জমায়েৎ হয়। ওদের দিকে তাকিয়ে কখনও কখনও কাটা-কাটা কথায় সোজাসুজি প্রশ্ন ছোড়েন, 'তারপর, দেশের জন্য তোমরা জনে জনে কি করবে বলে ঠিক করেছ?' দুই চোখে তাঁর উৎসুক জিজ্ঞাসা। এমন সটান জবাব চেয়ে বসে যে, তাকে কি-ই বা বলা যাবে? কথাগুলোতে একটা চাঞ্চল্য জাগে, এমন কি মনে কেমন একটু অস্বস্তিও। স্পষ্ট বোঝা যায় শিল্পী হিসাবে কথা বলছেন না ওকাকুরা, স্বপ্নবিলাসীর মত একটা আদর্শ মেলে ধরছেন না; সব চেয়ে বড় কথা সামুরাই (জাপানী ক্ষত্রিয়) তিনি, তাঁর পিছনে সমগ্র একটা বংশধারার আত্মদানের বীর্য কাজ করছে। ওকাকুরার ভাব-ভঙ্গিতেই এর প্রমাণ মেলে। বলেন, 'ভারতের শৌর্য-বীর্যের হল কি? অশোক আর বিক্রমাদিত্যের মত রাজার নামও দেশটা ভুলে গেছে? একটা জাতির সমস্ত রাজন্য অসম্মানের লাঞ্ছনা বুকে বইছে, মেনে নিচ্ছে বিজেতার হুকুম? জাতীয় মহাসভা এ দেশের লোকের হয়ে আপত্তি তুলতে সাহস করে না? তোমরা কি ভুলে গেছ সমস্ত এশিয়ার সত্তা এক? হিমালয় তো আমাদের তফাৎ করেনি, বরং দুটো বিরাট সভ্যতাকে সংহত হয়ে ওঠবার সুযোগ দিয়েছে—কনফুসিয়ান চীনের বাস্তববাদী সভ্যতা আর বৈদিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সভ্যতাকে। যারা মহাভারত আর উপনিষদের পরমতত্ত্বের অমৃতধারা উৎসুকে আকণ্ঠ পান করেছে সেই সব গাঙ্গেয় দেবব্রতদের হল কি?' সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভ্রমণে বেরিয়ে আগাগোড়া এই সব গরম-গরম কথা ওকাকুরা আউড়িয়ে চলেছেন। যেখানেই এই দুই তীর্থযাত্রী থেমেছেন, সেইখানেই রাজরাজড়া গুণী-জ্ঞানী থেকে গাঁয়ের মেঠো চাষী পর্যন্ত সবাই এ সব শুনেছে।

শ্রান্ত হয়ে কলকাতায় ফিরলেন ওকাকুরা। নিবেদিতা লেখেন; 'কিন্তু সুরেন আর উনি সত্যিকার ভারতবর্ষকে দেখে এসেছেন। কী না করেছেন ওরা? যা-কিছু করার বরং তার চেয়ে বেশীই করেছেন! এইবার আমরা পথ দেখে নিতে পারি।' ১৯০২-এর ৪ঠা সেপ্টেম্বর এ-চিঠি লেখা।

লাহোর, বম্বে, পুণা থেকে নিবেদিতার ডাক আসে। তাড়াতাড়ি রওনা হওয়ার ব্যবস্থা করেন তিনি। যাত্রার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ওকাকুরাকে সাহায্য করতে হয়, ওকাকুরার ভ্রমণ-বিবরণীর সম্পাদনায়। ছ'মাস আগেও লেখাপড়ার ব্যাপারে নিবেদিতা তাঁকে সাহায্য করেছেন। ওঁর 'প্রাচ্যের আদর্শ' (The Ideals of the East) বইখানায় ওঁর বক্তব্যকে মূর্ত করেছেন নিবেদিতা, তাঁর লিপিকুশলতায় ও সম্পাদনায়। বইখানা প্রকাশ করবার জন্য মিসেস বুল আমেরিকায় তার পাণ্ডুলিপি নিয়ে যান। নিবেদিতার উদগ্র আশা এই সংশোধিত আকারে প্রতীচ্যের পাঠকদের কাছে বইটির কদর হবে। জাপানের ইতিহাসের মাধ্যমে ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাও ওতে প্রকাশ পেয়েছে। ভারত যে স্বাধীন হবার জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত হয়েছে, তা-ও। নিবেদিতা লেখেন, 'ভয় হয়, উনি সাধ্যের অতিরিক্ত খাটছেন। এই দীপ্ত আত্মদানের কাছে ছোট-বড়র বিচার নাই। কার জন্য এমন প্রাণপাত করছেন তারও খেয়াল নাই, এমনি আত্মহারা।' এ-চিঠির তারিখ ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯০২।

যাত্রার সব ঠিকঠাক হয়ে যেতেই স্বামী সদানন্দকে নিয়ে নিবেদিতা রওনা দিলেন। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ তখন।

এই ভ্রমণ-পর্বটাকে একটা আশঙ্কার দৃষ্টিতে না দেখে নিবেদিতা পারেননি। এটা তাঁর পক্ষে একটু অস্বাভাবিক। অক্টোবরের গোড়াতে বম্বে থেকে মিস ম্যাকলয়েডকে যে চিঠি লেখেন তা থেকেই তাঁর মনোভাব বোঝা যায়, '...এত আচমকা আমায় এ-কাজে ঠেলে পাঠানো হল যে আমি মোটেই তার জন্য তৈরী ছিলাম না। বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। যখন তোমায় লিখেছিলাম, তখন বাস্তবিকই সাহায্যের দরকার ছিল। কিন্তু জীবনদেবতা আমায় দাবি করে বসলেন। গুরু আমার সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তোমার কাছ থেকে সে-কথাগুলো শুনতে ভাল লাগে, "সারা ভারত ওর নামে মুখর হয়ে উঠবে"...বুকের মধ্যে আমার সেই "মার্গটের দুঃসাহসের" রনণ—তাই নিয়ে এ-যাত্রায় পা বাড়িয়েছি। এই কল্পনাই কি স্বামীজির ছিল? তাই কি এখন পূর্ণ হতে চলেছে? এ-ভাবনায় দিনে-দিনে তাঁর মন কেমন করে তৈরী হয়ে উঠেছিল এখন যেন একটু-একটু করে তার আভাস পাচ্ছি।"

বোম্বাই তাঁকে এই প্রথম অ-বাঙালী জনসাধারণের সংস্পর্শে এনে দিল। এই মহানগরীতে এসেই নিবেদিতা একটা চাপা বিরোধের আভাস পেলেন। পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন ধনী হিন্দুরা ইউরোপের মুখ চেয়ে থাকাতেই অভ্যস্ত, তাদের মধ্যেই এটা বেশী। বিরোধিতার ভাবটা কাটিয়ে দিতে হবে নিবেদিতাকে। তাঁর প্রথম ভাষণের উদ্দেশ্য হল, স্বামীজির সঙ্গে ওদের পরিচয় করানো, জাতীয়তার দিক দিয়ে তাঁর জীবন ও কর্মের তাৎপর্যটা বুঝিয়ে দেওয়া। 'বম্বে যে স্বামীজির পদানত এ কথা এখন বলতে পারি কি? অন্তত: লোকে আমায় তা-ই বলছে'—ভাষণ-শেষে নিবেদিতা বলেন। তাঁর বাণীর সারমর্ম এই: 'স্বামীজির মধ্যে একাধারে লোকোত্তর আধ্যাত্মিকতা আর বিপুল দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি ঘটেছিল। এমন স্বদেশহিতৈষী পৃথিবীতে বড় বেশী জন্মায়নি। দেশের প্রাচীন সংহতি যখন এলিয়ে পড়ছে সেই সময়টিতেই তিনি এলেন। নতুনকে তিনি তো ভয় করতেন না। তিনি যখন এলেন তখন এ দেশের লোক তাদের পুরাতন ঐতিহ্যকে পরিহার করতে চলছে, অথচ তিনি ছিলেন পুরাতনের নৈষ্ঠিক পূজারী। ভারতের নিয়তি তাঁরই মধ্যে সার্থকতা লাভ করেছে।...তাঁর সারাটা জীবন কেটেছে হিন্দুধর্মের একটা সর্বজনীন ভূমির সন্ধানে।

'অভাবিত নানা খুঁটিনাটি আর আপাতবিরোধের মধ্যেও মূলগত একটা ঐক্যের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

'স্বামীজি ব্যর্থতার কথা স্বপ্নেও মনে আনতেন না। দেশবাসীকে কোন্ ভবিষ্যদ্বাণী তিনি দিয়ে গেছেন? তাঁর মত মানুষ বীর্যের মন্ত্রই শুনিয়ে চলেন—আর কিছু নয়। তাঁর মতে দেশের আশা তার নিজের মাঝেই। পরের কাছে কোনও আশা নাই। তাঁর স্বপ্নের ভারত ভাবীকালের গর্ভে। দুঃখ-বেদনার কশাঘাতে যে নব চেতনা আজ উদবুদ্ধ হয়েছে, এক দীর্ঘ বিবর্তনের এ শুধু প্রথম পর্ব।

দেশের অতীত আদর্শ ও পরিবেশ হতে নিজের মাঝেই নিজের জীবনকে ভারত নতুন করে আবিষ্কার করবে—পরের অনুকরণ করে নয়। একটি কথাই বলবার ছিল স্বামীজির, বার বার সমানে একটি বাণীই দিয়ে গেছেন, "উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত! লড়াই করে চল, লক্ষ্যে না পৌঁছন পর্যন্ত থামবে না!" (নিবেদিতার বক্তৃতা হতে)

জনতার হৃদয় জয় করলেন নিবেদিতা। সমাজের নানা সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে কথা বললেন, বহু রঙ্গমঞ্চে ভাষণ দিলেন। তিলক কাগজে-কাগজে ভাষণের দীর্ঘ বিবরণী পাঠাতে লাগলেন। নিবেদিতার মোটামুটি বক্তব্য বিষয় ছিল, 'স্বামী বিবেকানন্দ', 'আধুনিক বিজ্ঞানে হিন্দু মানসের স্থান', 'ভারতের একতা', 'ইংরেজী ভাষা আয়ত্তকরণের সমস্যা', 'ভারতের নারী', 'এশিয়ার ভাবধারা' ইত্যাদি। ছাত্রেরা এসে শুধোয়, 'আমরা কোন্ কাজে লাগব?' 'যে ভাবেই হ'ক ভারতবর্ষের সেবা কর, আমার মত মুক্ত মনের অধিকারী হও!'—এই হয় উত্তর।

১৯০২-এর ১১ই অক্টোবর এক চিঠিতে নিবেদিতা লেখেন, 'যেটুকু সাফল্য পেয়েছি তার মূলে সব চাইতে কৃতিত্ব স্বামী সদানন্দের। প্রথম তো আমায় তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন, দ্বিতীয়তঃ, যেমন ভাবে স্বামীজির পাশে থাকতেন তেমনি ভাবে আমার দেহরক্ষী হয়ে আছেন···বুঝতে পার না যেখানে যাই না কেন, পাশে যদি আমার সহোদরের মত স্বামীজির সাধু শিষ্য একজন থাকেন, কতটা জোর বাড়ে আমার? গুরুর পন্থা কি ছিল তা নিয়ে আমার মনে আর কোন প্রশ্ন ওঠে না।'···যখনই কথা বলতে ওঠেন, থেকে-থেকে নিবেদিতা পাশে-বসা সাধুর দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে নেন। 'মনে হয় কোনও আরণ্যক রাজা আমার বশ মেনে শিকল পরেছেন হাতে-পায়ে। কতখানি ত্যাগস্বীকার যে করছেন তা জানেনও না, এমনি তাঁর উদারতা!' (১১ই নভেম্বর ১৯০২-এর চিঠি)।

ছয় সপ্তাহে নিবেদিতার ভ্রমণ-পর্ব শেষ হল। তার মধ্যে অনেক শহরেই বেশ কিছু দিন করে কাটিয়েছেন। যাঁরা ওঁর গুরুর সমর্থক তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন সর্বত্র। উত্তরে লাহোর পর্যন্ত গিয়েছিলেন, কিন্তু বেশীর ভাগ সময় কাটল গুজরাট, সুরাট, বরোদা আর আমেদাবাদে। ওয়ার্ধা থেকে নাগপুরের পথে আসতে দ্বীপান্তরিত রাজবন্দীদের অনেকগুলো দুঃস্থ পরিবার দেখতে পেলেন নিবেদিতা। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে খোলাখুলি সংগ্রামের কী ভয়াবহ পরিণাম হতে পারে এই প্রথম তা নিজের চোখে দেখলেন। নাগপুরে থাকতেই খবর পেলেন 'ধর্ম-সম্মেলনে'র জন্য তৈরী হতে ওকাকুরা জাপানে ফিরে গেছেন। ১৯০৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সম্মেলন স্থগিত ছিল। জাপানের মহিলা-শাখার পক্ষ থেকে 'প্রাচ্য নারী' সম্বন্ধে ভাষণ দেওয়ার জন্য নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। উনি গেলেন না।

বরোদায় অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয়। বরোদারাজ গাইকোয়াড়ের নির্দেশ মত অরবিন্দ ষ্টেশন থেকে ওঁকে রাজবাড়ীর অতিথিশালায় নিয়ে গেলেন। তখন তাঁর বয়স ত্রিশ। গাইকোয়াড়ের প্রাসাদে অনেক বার যেতে হল নিবেদিতাকে, ভাষণও দিলেন। আশে-পাশের দ্রষ্টব্যও দেখতে গেলেন। কিন্তু বিকালটা হয় রমেশ দত্ত, নয় অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গরম-গরম আলোচনাতেই কাটত। ওখানে রমেশ দত্তের আবার দেখা পেয়ে নিবেদিতা ভারী খুশী।

সে-সময় রাজনীতি ক্ষেত্রে অরবিন্দ ঘোষের বিশিষ্ট কোনও স্থান ছিল না। বরোদা কলেজে প্রফেসারের কর্তব্য পালন আর নিজের পড়াশোনা নিয়েই সময় কাটাচ্ছেন তিনি, অনেকটা অবরোধবেষ্টিত জীবন যেন। ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরেছেন নয় বৎসর। কেম্ব্রিজে যে-উদ্যম নিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে হজম করেছেন, এখন তেমনি উদ্যমেই ভারতীয় সংস্কৃতি আর এশিয়ার ভাবধারা আত্মসাৎ করছিলেন। লোকের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে পারেন, নায়কত্ব করবার মত শক্তি আর গুছিয়ে কাজ করবার মত দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা তাঁর আছে—এ সুনাম তখনই রটে গিয়েছিল।

নিবেদিতা আর অরবিন্দ ঘোষ পরস্পরের অপরিচিত ছিলেন না। অরবিন্দের কাছে নিবেদিতা হলেন 'কালী দি মাদারে'র রচয়িতা; অসংখ্য দেশনেতার হাতে-হাতে ঘুরেছে ঐ নিবন্ধটি। আর নিবেদিতার কাছে অরবিন্দ হলেন ভাবী যুগের দেশনায়ক। চার বছর আগে বম্বের প্রখ্যাত সংবাদপত্র 'ইন্দুপ্রকাশে' ধারাবাহ প্রবন্ধ লিখে একটা সংগ্রামের সূত্রপাত করেছেন তিনিই। বিপ্লবী সমিতি প্রতিষ্ঠা করে তার প্রতিটি সভ্যকে নিজের হাতে নানা বিষয়ে চৌকশ করে তুলছিলেন। দেশের বৈপ্লবিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে একটা সুনিয়ন্ত্রিত কর্মের খাতে বইয়ে দিয়ে এই সমিতি যথাসময়ে জনসমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। ভারতপ্রীতি আর মুক্তিপিপাসায় নিবেদিতা ও অরবিন্দের মাঝে মিল ছিল। তার চেয়েও গভীরতর মিল ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ গ্রহণে এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি দু'জনের ঐকান্তিক শ্রদ্ধায়। অরবিন্দের পরিকল্পনার পরিধি ছিল ব্যাপক এবং দিন দিন তা সক্রিয় হয়ে উঠছিল। বরোদা থেকে বাংলা পর্যন্ত একটা কর্মচক্র বিস্তার করবার জন্য বেছে-বেছে লোক নিচ্ছিলেন দলে। উদ্দেশ্য, মাকড়সার জালের মত এ দল শহরে-শহরে গ্রামে-গ্রামে ছড়িয়ে পড়ুক।

কিন্তু নিবেদিতার ধৈর্য ধরে না। বলেন, 'কলকাতায় তোমাকে দরকার। তোমার স্থান বাংলায়।'

—'এখনও সময় হয়নি। আমি আড়ালে থেকে কাজ করছি। আমার সামনে থেকে প্রকাশ্যে কাজ করবার লোক চাই।'

হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে নিবেদিতা বলেন, 'আমায় ভার দিতে পার, আমি তোমার দলে।' তাঁর আইরিশ-শোণিত শুধু নিবেদিতার নিজস্ব যা-কিছু সব অরবিন্দের কাজে ঢেলে দিলেন তিনি,—অরবিন্দের প্রস্তুত-প্রায় পরিকল্পনায় যেন কাজে লাগতে পারেন।

কলকাতায় ফিরে দেখেন মাদ্রাজ তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রতীক্ষা করছে। তিন হপ্তা বাদে নিবেদিতা মাদ্রাজে চললেন। পথে কয়েক দিনের জন্য শুধু ভুবনেশ্বরে থেমেছিলেন। কিংবদন্তী আছে, ওখানে সাত হাজার মন্দিরে একই মন্ত্র রোজ উচ্চারিত হয়, 'ওঁ নমঃ শিবায়!' শিবের পুরী ওটি। এই ক'টা দিনের ছুটি

আরাম আর নব-আবিষ্কারের আনন্দের ভাগীদার করে জনকয়েক বন্ধু-বান্ধবকে নিবেদিতা সঙ্গে নিয়েছিলেন। উদয়গিরির শিখরে গিয়ে উঠলেন সবাই। গোটা একটা পাহাড় কেটে বানানো হয়েছে মন্দিরের পর মন্দির, তার থামগুলো এক-একখানা আস্ত পাথরের। এই তো ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ ইতিহাস। দক্ষিণের এ সব দেশ গুরু গভীর ভাবে ভালবাসতেন। পায়ে হেঁটে-হেঁটে ঘুরে বেড়ান নিবেদিতা, গ্রামে গৃহস্থের ঘরে গিয়ে ঢোকেন, গরিবের কুঁড়েঘরে যান আর বলেন, 'এইবার আমার ভারতবর্ষের অন্দর-মহলে এসেছি।' অপরিমেয় ভক্তি-বিশ্বাস উছলে পড়ছে এখানে, তারই মাঝে কী নির্মলতা কী শান্তি আর ধ্যান-তন্ময়তায় দিনগুলো কাটে! চার দিকে মন্দিরে-মন্দিরে উঠছে মন্ত্রের গুঞ্জন। যাত্রীদের জড়ো-করা একরাশ নুড়িই হ'ক আর বিচিত্র মূর্তি-কণ্টকিত মন্দিরই হ'ক—সর্বত্রই সমান উৎসাহে পূজা চলছে। সন্ধ্যায় শঙ্খ-করতাল, ঢাক-ঢোলের গম্ভীর রোলে ওঠে ছন্দের স্পন্দন—প্রাণের গভীরে সাড়া জাগে।

মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে কেন্দ্র করে বিবেকানন্দের নিজের বন্ধুরা নিবেদিতার অপেক্ষা করছিলেন। বিচিত্র তাঁদের মনের ভাব! নিবেদিতার চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য আর দুর্নিবার প্রভাবকে কেউ কেউ ভয়ের চোখে দেখছেন, আবার অন্যরা তাঁর নির্ভীকতায় শ্রদ্ধানত। কিন্তু দেহত্যাগের পূর্বে ক'টা মাস স্বামীজির কি ভাবে কেটেছিল, এ নিয়ে প্রশ্ন করার আগ্রহ তাঁদের সকলেরই।

সপ্তাহ কয়েক নিবেদিতা মাদ্রাজে রইলেন। বেশীর ভাগ রামকৃষ্ণ মিশনে আর শহরের বিভিন্ন হলে ভাষণ দিতেন। অত্যন্ত অনায়াসে নিজের চার পাশে একটা নিঃসঙ্গতার পরিমণ্ডল গড়ে তুলতেন নিবেদিতা, যেখানে শুধু তিনি আর তাঁর গুরু। ধ্যান-ধারণা আর কর্মযোগের সমাহার যে সম্ভব, জীবন দিয়ে তা দেখাতেন উনি। তাঁর মুখে তীব্র বৈরাগ্যের বাণীর স্ফুটত দুটি ব্যঞ্জনা: প্রাচীনদের কাছে তা মন্ত্রের মত পবিত্র, তরুণদের কানে তা যেন যুদ্ধের ডাক। উভয় পক্ষই ধন্য ধন্য করত তাঁকে। কোনও সংশয় বা বিতর্কের অবকাশ কোথাও থাকত না।

নিবেদিতা বলতেন, 'হয় স্বীকার করতে হবে অখণ্ড ভারতের অস্তিত্ব আছেই, নয়তো বলতে হবে আমাদের একতা কোন দিন ছিল না বা হবে না। ভারতের অখণ্ডতা নাই, কাউকে এ কথা মুখে আনতে দেবে না! যারা বলে আমরা দুর্বল, আমরা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, হতভাগা সহায়সম্বলহীন পরাধীন আমরা—তাদের দেশহিতৈষণার ভাঁওতায় ভুলো না। যে প্রাণ নবীন, যে প্রাণ দুর্ধর্ষ, প্রকাশের নতুন নতুন পথ সে খুঁজবেই। আমাদের জীবনে সত্য থাকে যদি—নতুন-নতুন সত্য নিত্যই প্রতিভাত হবে আমাদের কাছে। সে-সত্য যেমনই হ'ক না, জোরের সঙ্গে আমরা তা প্রকাশ করব।'

('ভারতের ঐক্য' প্রবন্ধ হতে)

দক্ষিণে সালেম পর্যন্ত গিয়ে নিবেদিতা বিবেকানন্দ-হলের উদ্বোধন করলেন। এ দেশে এই হলটিই সবার প্রথম স্বামীজির নামে উৎসর্গ করা হয়। ওখানে বহু কংগ্রেস-সদস্যের সঙ্গে দেখা হল। তারপর চললেন ত্রিচিনাপল্লীর দিকে। ব্রাহ্মণ্যধর্মী এই দ্রাবিড়ে হানা দিতে এসে নিবেদিতার অন্তর দুলে উঠল।

বন্ধুদের বুঝিয়ে দেন, 'উত্তর-ভারত যদি হয় বুদ্ধি, তো দাক্ষিণাত্য এই 'মহাদেশের হৃদয়। যেন এক বিরাট পাষাণ-প্রতিমা দৃপ্ত-মহিমায় নিবদ্ধ থেকে রহস্যগভীর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে পূর্বাপর তোয়নিধির দিকে। মাদ্রাজ তাঁকে স্বীকার করতেই স্বামীজির মনে হয়েছিল ভারতবর্ষ তাঁর বাণী আপন বলে গ্রহণ করেছে। ঠিক তেমনি দূর অতীতে দক্ষিণ যেদিন উত্তরাপথের বৌদ্ধ আর বৈষ্ণবধর্মকে যাচাই করে নিজের বলে গ্রহণ করল, সেই দিনই ও' দুটি ধর্ম খাঁটী ভারতীয় বস্তুরূপে স্থায়িত্ব লাভ করল।' (স্যার যদুনাথ সরকারের কাছে শোনা)। ভারতমাতার সেবায় দাক্ষিণাত্যের সেই স্বীকৃতি পাওয়ার জন্যই যেন নিবেদিতা এখানে এসেছিলেন।

প্রত্যেকটি নতুন জিনিসেই উদ্দীপনা খুঁজে পান নিবেদিতা। অনবগুণ্ঠিতা দক্ষিণী মেয়েরা পিঠে এলোচুল দুলিয়ে, জড়োয়া গয়নার ঝঙ্কার তুলে পাশ দিয়ে চলে যায় অনায়াস স্বচ্ছন্দে। তাদের দেখে দেখে নিবেদিতার আশ মেটে না। ঝকঝকে গাঢ় রঙের শাড়ী ওদের। পুরুষদের নগ্ন বক্ষে চন্দন অথবা ভস্মের লেপ, কপালে রঙীন তিলক—সগর্বে জাতিধর্মের বৈশিষ্ট্য খ্যাপন করছে সে-সব লাঞ্ছন। জীবন যেন ওখানে সব আড়াল ভেঙে সহস্রধারায় উৎসারিত হয়ে পড়ছে।

চিদম্বরম্ আর ওখানকার মন্দির দেখে নিবেদিতার মনে একটা দোলা লাগল। দেখলেন, মধ্যযুগীয় খৃষ্টান ভজনালয়ের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে হিন্দু-মন্দিরের স্থাপত্যের আশ্চর্য সাদৃশ্য। মন্দিরের গোপুরম্ সাততলা, এক অদ্ভুত নাচের পরিকল্পনা উৎকীর্ণ রয়েছে তাতে। কিরীটে ভূষিত সপার্ষদ দেবদেবীরা, পেট-মোটা ভূত-প্রেত, ভাঁটার মত চোখ রাক্ষস-পিশাচ সবাই তাতে যোগ দিয়েছে। মন্দিরের বাগানে একটা গোটা দিন নিবেদিতা কাটিয়ে দিলেন। বাগানের ভিতরের দিকের দেয়ালে খড়ের ঘরের সারি, তাতে পূজারী ব্রাহ্মণ, সাধু আর যাত্রীরা থাকে। ব্রাহ্মণ বালকেরা শাস্ত্রপাঠ করছে, তালপাতায় লিখছে। খড়ের বড়-বড় ছাউনির নিচে দেবতাকে ভোগ দেওয়ার জন্য ফল-ফুল মিঠাই বিক্রী হচ্ছে। মুণ্ডিত মস্তকে মেয়েরা উচ্চ কণ্ঠে স্তোত্র পড়ছে আর গালবাদ্য করে গলা ছেড়ে হাঁকছে হর! হর! বাতাসে ধূপ, ধূনা, প্রদীপের তেল আর ফুল-পাতার চড়া গন্ধ। নিবেদিতা বন্ধুদের বললেন, 'এইখানে নাগর জীবনকে নিখাত করতে হবে'—মন্দিরের পরিবেশ থেকেই সংসার-জীবন বহির্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। যে-কোনও আন্দোলনের সূচনা করতে হবে এই সব দেবমন্দির হতেই; দীর্ঘযাত্রা-শেষে আবার সে আন্দোলন মিলিয়ে যাবে মায়ের মন্দিরেই।

স্বামী সদানন্দের শরীরটা খারাপ হওয়ায় শেষ দিন ক'টায় আনন্দে ছায়া পড়ল। খৃষ্টমাসের সময়ও ওঁরা মাদ্রাজে ছিলেন। স্বামী সদানন্দ প্রস্তাব করলেন, খৃষ্টমাসের পুণ্য রজনীটি খণ্ডগিরির পাদমূলে গুঞ্জরিত তরুচ্ছায়ায় উদযাপন করা যাক। স্থানীয় পল্লীবাসীরা চন্দন আর ধূপ-ধূনা পোড়াচ্ছে—ওঁরা তাদের সঙ্গে খোলা আকাশের তলে ধুনি জ্বালিয়ে তার চার পাশ ঘিরে বসেন। সদানন্দ আর অমূল্য মহারাজ কম্বল মুড়ি দিয়ে আর্মানী চাষার মত করে সাজলেন। নিবেদিতা পড়ে 'চললেন

যিশুর জন্মকাহিনী। পূব দেশ থেকে গিয়েছিলেন সিদ্ধপুরুষেরা। প্রতিটি কথা সদানন্দ পল্লীবাসীদের অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তাদের একজন মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'যিশুর জয় হক, তিনিই আমাদের শরণ্য! শান্তি নামুক পৃথিবীতে; জয় হ'ক, সেই দিব্যশিশুর।' সুরে সুর মিলিয়ে কৃষ্ণা নিশীথিনী সরলপ্রাণ ভক্ত পূজারীদের বুকে জড়িয়ে ধরে যেন। দেবদূতদের ওরা যে দেখতে পায়, শুনতে পায় তাঁদের বাণী। এমন পবিত্র হৃদয় যাদের তারাই ধন্য।

১৯০৩ সালের জানুয়ারির প্রথমে নিবেদিতা কলকাতায় ফিরে এলেন—জরুরী কাজের তাড়ায়।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

'খোকা' আর 'ক্রিষ্টিন্'

উত্তর-ভারতে ঘোরবার সময় জগদীশ বোসের কথা ভেবে প্রায়ই নিবেদিতা বড় অস্বস্তি ভোগ করতেন। বহু বছর হল ইংল্যাণ্ডে তাঁকে ছেড়ে এসেছেন। মিসেস বুল শুধু মমতাময়ী নন শক্তিময়ীও বটে। তাঁর চেষ্টায় যে নিশ্চিন্ত পরিবেশটি সৃষ্ট হয়েছিল—বোস আছেন তাঁরই আশ্রয়ে। এদিকে নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা নিবেদিতাকে পেয়ে বসেছে,—ভারতের ডাকে তাঁকে সাড়া দিতেই হবে। কিন্তু বোস তাতে ভয়ানক বিরক্ত। 'আমার সাফল্যের চেয়ে ভারতই তোমার বড় হল!' তারপর থেকে নিবেদিতাকে আর চিঠিপত্র দিতেন না।

বোস এবার ভারতে ফেরবার উপক্রম করছেন। মিস্ ম্যাকলয়েডকে নিবেদিতা সেপ্টেম্বরে লিখেছিলেন, 'বুঝতে পারছি সামনের কয়েক মাস বোধ হয় আমার প্রথম কর্তব্য হবে খোকার জন্য একটা কিছু করা।' নিজের কর্মজীবনে জগদীশ বসুকে অনেকখানি জায়গা দিতে তাঁর আপত্তি ছিল না। ওঁর জাহাজের অপেক্ষায় বম্বেতে একদিন বেশী রইলেন, কিন্তু সব বৃথা হল। দুর্যোগের জন্য জাহাজ ঠিক সময়ে পৌঁছল না। নিবেদিতা ভাবলেন নাগপুরেই তাহলে দেখা করবেন। দু'জনার ট্রেনই নাগপুর এসে বেরিয়ে যাবে, সুতরাং ষ্টেশনে মিনিট পনেরোর জন্য দেখা হওয়ার সুযোগ মিলবে।

কিন্তু বোসের মেজাজ চটে ছিল, তিনি নিবেদিতাকে এড়িয়ে গেলেন। ইচ্ছা করে কলকাতায় যাবার এমন ট্রেন ধরলেন যেটা নাগপুর হয়ে যাবে না। আদুরে ছেলের গোপন মনঃকষ্ট বুঝতে পেরে নিবেদিতা কাঁদেন, কেন ওর এ-বিদ্রোহ! '...আমাদের যেন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে,—অদ্ভুত না!...খোকা আমার দেব-স্বভাব, কিন্তু দেশের শ্রেষ্ঠ স্থানে জড়িত, সেখানে আমিই তো ওর গুরু।...জীবন আমার বৃত্তির পরিধিতে আজ ছড়িয়ে পড়েছে, আরও সত্যনিষ্ঠ হয়েছে—তা বলে হৃদয় তো বদলায়নি! সত্যি বলতে মন আমার যা ছিল তা-ই আছে! কিন্তু কোনও ব্যক্তির ছাপ তাতে আর পড়ে না, নাম-রূপের গণ্ডিতে যে মন বাঁধা নাই...'

এই মন নিয়েই নিবেদিতা কলকাতায় বোসের অপেক্ষা করেন। নবেম্বরের এক সকালে বোস দেখা করতে এলেন,—মন তাঁর অসাড় বিরূপ, মেজাজ রূপে আছে। কিন্তু তিনি এড়াতে চাইলেও কী ক্ষমায় ঔদার্যে নিবেদিতা তাঁর প্রতীক্ষায় আছেন বুঝতে পেরে তীব্র অনুশোচনা আরও উদ্দাম হয়ে উঠল তাঁর। কি নিয়ে কথা হল দু'জনের? নিবেদিতার ভারতানুরাগের তাড়নায় বোসের মনে জেগেছিল আত্মসর্বস্ব এক অভিমান, তার ফলে যে-সব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাই নিয়ে। বোসের সবই যেন ছত্রাকার হয়ে গেছে। নিবেদিতা বললেন, 'খোকা, তোমার জন্যে আমি খেটেছি তা সত্যি। তোমার জীবনকে তোমার প্রতিভাকে বাঁচাবার জন্য যা-কিছু প্রয়োজন মনে করে দেখ সবই করেছি। বোধ হয় আমার কর্মক্ষয় করবার জন্যই করেছি। তবে ব্যাপারটা ঠিক শ্রীরামকৃষ্ণের যিশু বা মহম্মদ ভজনার মত বা তাঁর নারীপূজার মত। অনুষ্ঠানটি যথাযথ একবার পালন করেই তিনি ছেড়ে দিতেন। আমিও কর্মক্ষয় হল বুঝে নিয়েছি, ও নিয়ে আর নিজেকে জড়িয়ে রাখতে পারি না। আমায় এগিয়ে যেতে হবে। আমি সন্ন্যাসিনী ছাড়া আর কিছুই তো নই—অতীতকে বর্তমানের সারথি করা আমার চলবে না...'

নিজের অগোচরে হঠাৎ নিবেদিতার নিস্পৃহ ভালবাসার আভাস পেয়ে গেলেন জগদীশ বোস! সে অনাবিল স্নেহ তাঁর মর্ম ভেদ করে যেন মনের সমস্ত বিদ্রোহ খান-খান করে দিল। নিজের কানেই নিজের স্খলিত কণ্ঠের আবেগ-ভরা কথাগুলো বাজতে থাকে। 'আমি...হ্যাঁ, আমিও ভারতের সেবা করতে চাই!' সেদিন আনন্দে ভাস্বর বোস স্নিগ্ধ অন্তর নিয়ে ফিরে এলেন। একটা শুভ্র সুন্দর অনুভবে সব যেন ভরে উঠল। নিবেদিতা যে আদর্শের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, এত দিনে জগদীশ বসু তার স্বরূপ বুঝতে পেরেছেন।' ৭ঠা সেপ্টেম্বর ও ১লা অক্টোবর, ১৯০২-এর চিঠি)

নিবেদিতার দুটি ভ্রমণ-পর্বের মাঝখানটায় দু'জনের অনেক বার দেখা-সাক্ষাৎ হল। কিন্তু ভালবাসার অত্যাচারের এই নতুন হাতেই নিবেদিতা বুঝতে পারলেন এবার তাঁকে নিজের পথ নিজে দেখতে হবে। তার জন্য বন্ধুদের চার দিকে শক্ত দেয়াল গেঁথে তুলতে হবে যাতে সে তার সীমা লঙ্ঘন না করে। পরিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে যাতে কাজ করতে পারেন তার জন্যে নিজের চার পাশে ধ্যান-মৌনের আবেষ্টনটি ক্ষণে-ক্ষণে তাঁকে ঝালাই করে নিতে হবে। ডান হাতটি কি করল বাঁ হাতটির তা খেয়াল করা চলবে না। কিছুদিন পরেই লিখলেন, 'আমার সহকর্মী বলতে পারি না কাউকেই। ওরা সবাই আমার সন্তান। এক বছর আগে আমিও শিশু ছিলাম। এখন আমি মা...একই জীবনের অধ্যায় এ, কোথাও বিচ্ছেদ নাই...অল্পদিন হল একটি শিষ্য করেছি, সে ব্রহ্মচারী হতে এসেছিল। তারা-ভরা আকাশের নিচে বসে জানতে চাইল তার তরুণী স্ত্রী সম্বন্ধে কি তার করা কর্তব্য। আমি সহজ সুরেই বললাম কি কর্তব্য! আমি এখন বুদ্ধ...যে যা চায় তাকে তা যুগিয়ে দেওয়াই আমার ব্রত—স্বামীজি যেমন দিতেন। তিনি আমার সঙ্গে আছেন তা জানি।' ১৯০২ সালের ১লা অক্টোবর ও ১ই নবেম্বরের চিঠি)

বাগবাজারে নিবেদিতার বাড়িটির দেয়ালে মাটির লেপ, জানলায় খড়খড়ি নাই কিন্তু খসখসের পর্দা দেওয়া, রাস্তার উপরে এক চিলতে পোড়ো জমি—নিবেদিতার আশা ছিল ওটা একদিন ফুলবাগান হবে। কাছাকাছি এমন অনেক গুরুজন রয়েছেন যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছেন। এই অনাড়ম্বর পরিবেশটির জন্য ভগবানের কাছে নিবেদিতার কৃতজ্ঞতা উছলে ওঠে। বিলাস

বাহুল্যই যে আত্মার আবরণ। নিবেদিতা চান, তাঁর কাছে যারা আসবে তারা যেন স্বচ্ছন্দ হতে পারে। সবাই যেন বীর্য আর আত্ম-প্রত্যয়ের আশ্বাস পায় এমনি একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করাই এখন তাঁর কর্তব্য।

বেট্ ছিল তাঁর বাপের বাড়ির পুরনো ঝি, ইংল্যাণ্ড থেকে তাকে আনিয়ে নিয়েছেন নিবেদিতা। ওকে নিয়ে এই সরল গৃহস্থালীকে অনায়াস-শান্ত শৃঙ্খলায় এবার সাজিয়ে তুললেন। দেয়ালগুলোকে আর একবার চুণকাম করে কুয়ার চার ধারে গোটা কয়েক 'সুপর্ণী' আর বারমেসে ফুলের চারা লাগিয়ে দিলেন। ভিতরে ঢুকলেই একটা স্বচ্ছন্দ পরিবেশে অন্তর বিশ্রাম পায়, মনে হয় বাইরের জগৎ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। একটা স্নিগ্ধ অনুভব জাগে, রাস্তার ভিড় আর ঠেলাঠেলি, চোখ-ধাঁধানো রোদের ছটা—সবই মুছে যায় মন থেকে। শান-বাঁধানো উঠান পরিষ্কার তকতক করছে, তার এক পাশে গিঁট-বার-করা ডুমুর গাছের ছায়ায় একটি বসবার বেদী। যা-কিছু মনে হতে পারত কর্কশ এমন কি দৃষ্টিকটু, নিপুণ বিন্যাসে তা হয়ে উঠেছে স্নিগ্ধ খুশির আলোয় ঝলমলে।

এ-অঞ্চলের প্রত্যেকটি বাড়ি নিবেদিতার জানা। কিন্তু তিন বছর আগে ওখানে যা-কিছু গড়ে তুলেছিলেন কোথাও তার চিহ্নও নাই। 'সদানন্দ আর বেট্ ছাড়া যাকে আঁকড়ে ধরি সেই ফস্কে যায়। জীবনের প্রথম শিক্ষা হল এই যে কারও ভরসা করা চলবে না। লোকের স্নেহ-পরিচর্যা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে. কিছুর প্রত্যাশা রাখলেই মরণ।' (১৯০২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারীর চিঠি)।

তবু ওঁকে দেখে লোকে খুশী হয়ে ওঠে। কাঙালদের সঙ্গে তিনিও কাঙাল। নিবেদিতা নিজেই লোকের দানের উপর বেঁচে আছেন কিন্তু তাঁরও বাঁধা ভিখারীর দল আছে। প্রথম ছিল তিন জন, প্রত্যেকে সপ্তাহে আট আনা করে পেত। নিবেদিতার খরচের খাতায় নতুন একটা বরাদ্দ যোগ হল, 'আমার ভাইদের বাবদ ছয় টাকা। ওরা আমায় ঈশ্বরবিশ্বাসী হতে শিখিয়েছে…'

প্রত্যেক ভিখারীর নিজস্ব একটা আত্মসমর্পণের ধরণ আছে, নিবেদিতা সেইটি লক্ষ্য করেন। ওদের জন্যই ভারতের পরে নিবেদিতার ভালবাসা দিন দিন পল্লবিত ও মঞ্জরিত হয়ে ওঠে। আচারপরায়ণ রক্ষণশীল ভারতের মর্মের মাঝে প্রবেশ করে যে-সৌন্দর্য্য তিনি আবিষ্কার করলেন, হিন্দুরা নিজে কিন্তু আর তা দেখতে পায় না। ভারতীয়দের নিত্যব্যবহার্য তৈজসপত্রের প্রশংসায় তিনি শতমুখ। স্বভাবের ছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আশ্চর্য গড়ন ওগুলোর। এ দেশের ভজন-গান বিদেশীর কানে বেসুরো, কিন্তু নিবেদিতার অন্তর তাতে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: ও তো শুধু সুর নয়, ও যেন পিতৃপুরুষদের জীবন-ছন্দের অনুরণন। হিন্দুর প্রতিটি ভাবভঙ্গির পিছনে যে-আদর্শের আভাস, সেইটি নিবেদিতা ধরতে পারেন। এই ভারতকেই মন-প্রাণ দিয়ে নিবেদিতা 'ভালবেসেছিলেন,' অথচ এরই জন্যে সবাই তাঁকে বিরুদ্ধপন্থী বলে দোষী করে। তা তিনি বিরুদ্ধপন্থী বই কি! ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে একটা ধূমায়িত বিদ্রোহের ভাব বন্ধুবান্ধবদের মনে চারিয়ে দিতে চাইতেন, সেইখানেই তিনি বিরুদ্ধপন্থী। ভারতানুরাগিণীর সঙ্গে এই বিদ্রোহিণী নিবেদিতার আপাত-বিরোধ। কিন্তু সেজন্য নিবেদিতা মাথা ঘামাতেন না,—হ্যাঁ, অলবৎ তিনি বামপন্থী। ভারতকে ভালবাসলেও তার গতানুগতিকতাকে আঘাত করতে ছাড়েননি তিনি। এ-ব্যাপারে একটা খাঁটি মেয়েলী জিদ ছিল তাঁর, সেই সঙ্গে ভারতের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্যও। তাঁর ঐ সব প্রগতি-বাদের পরিণাম যা-ই হক না কেন তিনি তা বরণ করে নিতে প্রস্তুত।

১৯০২-এর ১৬ই অক্টোবর এক চিঠিতে লিখছেন, 'আমার লক্ষ্য হল ভারতের মঙ্গল। মনে হয়, এখন আমার মমতাও নাই, ধর্মও নাই। পারতাম যদি, প্রত্যেক হিন্দুকে মাংসাশী করে তুলতাম। অর্থ আর কামের তাৎপর্যও বুঝতে পারছি, অথচ এগুলোকে তো অধর্মও বলতে পারি না…নিজেও যেন সমস্ত কৃচ্ছ্রতা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। এখন স্বামীজির ইউরোপীয়ান ধরণে সাজানো তিনখানা ঘর, তাঁর খাওয়া-দাওয়া আর আরও অনেক কিছুর মানে বুঝতে পারি।'

নিবেদিতার আশে-পাশে জীবনের শতমুখ-বৈচিত্র্য দ্রুতবেগে আবর্তিত হয়ে চলে। 'একটি যুবক আমার কাছে এসেছিল। তার একমাত্র স্বপ্ন স্বামীজিকে 'নব্য ভারতের' ধ্রুব-তারা করে তোলা। ছেলেটি স্বামীজির পাগল পূজারী, নিজেও এমন দৃঢ়চেতা চমৎকার মানুষ! জাতে ব্রাহ্মণ, স্বাধীনজীবী। জান না মুম, তিমিরবিদার কী উদার অভ্যুদয়ের সূচনা দেখতে পাচ্ছি! স্বামীজির কাজ আর তাঁর নাম সত্যি সার্থক হয়ে উঠবে এবার। অন্যে যাতে তাঁকে আপন করে নিতে পারে, তারই জন্যে যে ভাই আজ ছেড়ে দিতে হবে তাঁকে। আমার কথা বল যদি, বৃটানিতে যে যমযাতনা ভোগ করেছি তাতে শক্ত হয়ে গেছি এখন। আমার কাছে তিনি তো হারিয়ে যাননি…। (২৬শে নবেম্বর, ১৯০২)

গুরুর আশীর্বাদ যে অহরহ শক্তিসঞ্চার করছে তাঁর মাঝে এটা নিবেদিতা গভীরভাবে অনুভব করতেন। ঐ তাঁর পরিপূর্ণ ভরসা, নিশ্চিত আশ্বাস। সঙ্কটে পড়লেই আঁকড়ে ধরতেন ঐ বিশ্বাসটুকু আর তাঁর সন্ন্যাস-ব্রত। 'যেদিনকার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি মনে ভেসে উঠত…'গুরুর সেই বিরাট জীবন আর অখণ্ড বিজয়-গরিমা ছাড়া, মনে হয় আর সবই তুচ্ছ! মনে পড়ে 'ইনে'র ঘরে পাওয়া সেই অমোঘ আশিষ। অনেক সময় দেখি যেন তোমার হল-ঘরে আগুনের পাশটিতে বসে আছি, বেলা পড়ে আসছে। স্বামীজি কথা কয়েই চলেছেন, বিকাল ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল।' (১১শে নবেম্বর ১৯০২ এর লেখা চিঠি)

কিন্তু ভাবের স্রোতে এতদিন যা ভাসিয়ে এলেও দিনে-দিনে একটা কঠোর অনুশাসনের বাঁধন মেনে নিতেই হয় তাঁকে।

নিজেকে স্থিতু করবার জন্যে একটা কিছু আঁকড়ে ধরা দরকার হয়ে পড়েছে নিবেদিতার। ক্রিশ্চিন গ্রীনস্টিডেলের মাঝে সেইটি তিনি পেয়ে গেলেন। যেমন জগদীশ বোস চিরকাল রইলেন তাঁর আদুরে ছেলে, যে তাঁর অনেকখানি স্নেহের দাবি করে চলেছে সবসময়, ক্রিশ্চিন তেমনি হলেন তাঁর ডান হাত। ক্রিশ্চিন আমেরিকা-বাসী জার্মান পিতা-মাতার সন্তান। জীবনে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের ছিল না। ১৮৯৪ সনে শিকাগোতে স্বামীজির সঙ্গে প্রথম দেখা। এর পর ভারতে আসবার আগে বিধবা মা আর পাঁচটি

বোনের ভরণ-পোষণের জন্ত সাতটি বছর তাঁকে পরের গোলামি করতে হয়েছে। এ দেশে আসার তিন মাস পরেই গুরু দেহত্যাগ করলেন। একটা দারুণ ঘা খেলেন ক্রিষ্টিন্। স্বামীজি তাঁর 'পরে অনেক আশা করেছিলেন,—কেন না ওঁর স্বভাবের সঙ্গে হিন্দু নারীর খুব মিল। একবার লিখেছিলেন, 'তুমি ছাড়া আর সবাইকে নিয়ে আমার ভাবনার শেষ নাই। তোমায় আমি মায়ের কাছে উৎসর্গ করেছি।'

ক্রিষ্টিনের স্বভাবের আরেকটি অসামান্ত সম্পদ তাঁর সহিষ্ণুতা। মায়াবতীতে স্বামীজির অসুখের সময় ওঁর কাজকর্মে এটা নিবেদিতার চোখে পড়েছিল।···'এমন শান্ত ভাবে আর অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে ও তাঁর কাছে বসে থাকে', ১৯০২-এর ২৬শে নবেম্বর নিবেদিতা লিখছেন, 'কোনও সময়ই ও বিরোধ সৃষ্টি করে না, সব সময় ও যেন মিলন-রাখী। আর এত খাঁটি মেয়ে···ঠিক ম্যাকলয়েডের মতই নিষ্ঠা ওর।' তারপর যুমকে একটু চিমটি কেটেই লেখেন, 'ওর স্বভাবটি নরম, লতার মত জড়িয়ে ধরতে পারে, তোমার মত কর্তাত্তি করে না···সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় ওকে, অথচ ওর দৃষ্টিভঙ্গি এত উদার।'

ভিৎ পোক্ত করে কাজ করতে হলে ধারে-কাছে এমন গুণী সহকর্মীরই দরকার। কিন্তু প্রথমটায় ক্রিষ্টিনকে সময় দিতে হবে, কালের প্রলেপে তাঁর শোকের ক্ষত আরাম হওয়া চাই। গুরুর মহাপ্রস্থানের পর নিবেদিতা সঙ্গে-সঙ্গেই কাজের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। ক্রিষ্টিন সাধন-ভজনের জন্ত মায়াবতীতে রইলেন। শেষে নিবেদিতার প্রবল ইচ্ছার আকর্ষণেই তাঁকে পাহাড় থেকে সমতলে নেমে আসতে হল। অমনি এই দুটি মেয়ের মধ্যে এক অটুট সখিত্বের সূচনা হল। স্বভাবে ওঁদের দিন আর রাত্রির মত গরমিল; কিন্তু ক্রিষ্টিন হলেন নিবেদিতার জীবনতরীর নোঙর, গৃহের আতপ্ত আরাম। অন্তরঙ্গ সুহৃদের মত স্থির চিত্তে হাল ধরে বসলেন ক্রিষ্টিন,—আর নিবেদিতা? একটা প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার মত তাঁর দিন হু-হু করে বয়ে চলল, সেই খরস্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল পথের দু'পাশের যা-কিছু। [ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী

সেই বন্ধুকে

আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

বন্ধু আজকে এখানে হিজল-জাফ্রিত সরোবরে
নীল-পদ্মের পাঁপড়ি পরাগ সহসা শপথে লাল,
কুমারী-চোখের কামনা জাগর পতাকার স্বাক্ষরে
জননীর স্নেহ-করুণা-গঙ্গা ঢেউয়ে ঢেউয়ে উত্তাল!
বিধবা-বুকের প্রতিহিংসার বেগবতী নিশ্বাসে
অত্যাচারীর পাড়ায় পাড়ায় জেগেছে ঘূর্ণী-ঝড়,
বাস্তুর শিশু হাসির তুলিতে রক্তের ইতিহাসে
ভাবী পৃথিবীর প্রচ্ছদপট আঁকে অবিনশ্বর!

বন্ধু এখানে জঙ্গী-জীবনে আমিও শরিক হুকুম—
কেন না আজকে আমারো আকাশে ঝড় ওঠে কালবৈশাখীর,
এ ঝড় এনেছে সাত-সাগরের সেতুবন্ধের কঠিন পণ;
পোড়ো প্রান্তরে সব পেয়েছির একতারা বাজে বৈরাগীর!

শস্যলোপাট শূন্যক্ষেতের আল ভেঙে ভেঙে অনেক দূর
চলার পথেই সামনে পেয়েছি মন্বন্তরী মহাশ্মশান,
বধ্যভূমির হাড়ের পাহাড় পেরিয়ে এসেছি ভরদুপুর,
লোহিত সাগরে সভয়ে দেখেছি কী ভয়ঙ্কর বিনাশী বান!

আরো হেঁটে যাই তন্দ্রাবিহীন তেপান্তরের সীমানা শেষ
সম্মুখে দেখি আরেক সাগর উদ্দাম ঢেউয়ে উন্মুখর,
ফেনিল চূড়ায় ফসফরাসের ঢেউ ভেসে চলে দূর-বিদেশ—
তাদের কাছেই পেয়েছি সেদিন সারা পৃথিবীর সব খবর!
আজকে তাইতো পাগলা হাওয়ায় প্রতিধ্বনিত আমার গান,
দুর্বার গতি দিগ্বিজয়ের দামামায় আমি উজ্জীবান!
আজকে সহসা আকাশে আমার ঝড় ওঠে কালবৈশাখীর
পোড়ো প্রান্তরে সব পেয়েছির একতারা বাজে বৈরাগীর!

যদি এ-দিনের বিধুনিত সুরে ঘুম ভেঙে যায়
যদি জীবনের মিল খুঁজে পাও এ ঝড়ো হাওয়ায়,
বন্ধু তাহলে এসো এইবার দু'হাত মিলাই
মিলিত পায়ের পদধ্বনিতে দুনিয়া জাগাই
কড়া চাবুকের চিকণ আঘাতে
চেতনা জাগাই বেঈমানের;
মৃত্যুর বুকে লাথি মেরে তার সামনে দাঁড়াই
দেরী নেই আর, আসন্ন কাল, কদম বাড়াই
সময় হয়েছে রক্তজবার
হৃৎপিণ্ডের রঙে রঙ মেখে
প্রভাতী আলোয়
ফুটতে ফের!

৭

অধ্যাপক ব্রজবল্লভ যে দিন পূর্ব্বাহ্নে অনুকূলচন্দ্রের সহিত পরিচিত হইতে আসিয়াছিলেন, সেই দিনই অপরাহ্নে স্ত্রীকে ও কন্যাকে লইয়া অনুকূলচন্দ্রের গৃহে আসিলেন। অনুকূলচন্দ্র তখন গৃহে ছিলেন না—সাগরিকার শ্বশুরের আহ্বানে—তাঁহার মধুপুর যাত্রার পূর্ব্বে সব ব্যবস্থা করিবার জন্য সমীরচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন।

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, সকালে যে বাবু আসিয়াছিলেন, তিনিই আসিয়াছেন। তরুণকুমার তাঁহাকে আনিতে বলিল; ভাবিল, আবার কি প্রয়োজন?

অল্পক্ষণ মধ্যেই ব্রজবল্লভ স্ত্রী ও কন্যা সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পত্নী অবগুণ্ঠন একটু টানিয়া দিলেন। কন্যা অনবগুণ্ঠিতা। তরুণকুমার বিস্মিতনেত্রে দেখিল—অপরাজিতা, সে দিন কলেজে একটি ছাত্র যাহাকে "অগ্নিশিখা" বলিয়াছিল। ব্রজবল্লভ কন্যাকে বলিলেন, "ইনিই তোমার 'সাম্যবাদের' মধ্যে যে

শ্রীদীপঙ্কর

কাগজ ছিল, তা' পাঠিয়ে দিয়েছেন।" অপরাজিতা নমস্কার করিয়া বলিল, "আমার বড় উপকার হয়েছে। আমি ভুলে কাগজখানা না রেখেই বই ফিরিয়ে দিয়াছিলাম।"

তরুণকুমার তাঁহাদিগকে তাহার ঘরেই বসিতে বলিয়া ভগিনীদিগকে সংবাদ দিবে, কি তাঁহাদিগকে তাহাদিগের নিকট লইয়া যাইবে, ভাবিতেছিল। কিন্তু ভৃত্য তাঁহাদিগকে তরুণের ঘরে আনিয়াই সাগরিকা ও দীপশিখাকে সংবাদ দিতে গিয়াছিল—তাহারা উভয়ে আসিয়া ব্রজবল্লভ বাবুর স্ত্রীকে ও কন্যাকে তাহাদিগের সহিত যাইতে অনুরোধ করিল। তরুণকুমার ব্রজবল্লভ বাবুকে উপবিষ্ট হইতে অনুরোধ করিল।

সাগরিকা ও দীপশিখার সহিত যাইতে যাইতে ব্রজবল্লভ বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "উনি সকালে এসেছিলেন; গিয়ে বললেন, আপনাদের মা নাই; তবে আপনারা এখন বাপের বাড়ী এসেছেন। হয়ত কবে চ'লে যা'বেন ব'লে আজই আমাদের আসতে বললেন।"

সাগরিকা বলিল, "আপনি আমাদের 'আপনি' বলবেন না।"

দীপশিখা অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি পড়েন?"

অপরাজিতা বলিল, "হাঁ।"

তাহার মাতা বলিলেন, "বাড়ীতেই প'ড়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছে—এ বার কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে। তোমার দাদা যে কলেজের ছাত্র সেই কলেজেই পড়ে। ও একখানি বহি কলেজ থেকে পড়তে এনেছিল—তা' থেকে কি কি যে কাগজে লিখে নিয়েছিল সেখানি বহির মধ্যেই ছিল। তোমার দাদা সেই বহিখানি এনেছেন। সকালে ওঁর কাছে শুনে—কাগজখানি পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

সাগরিকা বলিল, "তরুণ বুঝি সেখানি পেয়েছিল?"

অপরাজিতা বলিল, "হাঁ। যদি বইখানির মধ্যে থাকে ব'লে আমি আবার কলেজে সেখানি আনতে গিয়াছিলাম; শুনলাম একজন নিয়ে গেছেন। যা' হ'ক পেয়ে বড় উপকার হ'ল।"

অপরাজিতার মাতা দীপশিখার কন্যাটিকে আদর করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের বুঝি এক জনকে বাবার সংসার দেখতে এসে থাকতে হয়?"

দীপশিখা বলিল, "না। আমাদের এক পিসীমা আছেন—তিনি আবার আমাদের মামীমা; আর বাবা ও পিসামশায় একসঙ্গে ব্যবসা করেন। সেই পিসীমাকেই প্রায়ই আসতে হয়।"

"তিনি কলিকাতাতেই থাকেন?"

"হাঁ।"

সাগরিকা আগন্তুকদ্বয়ের জন্য কিছু ...ষ্টান্ন ও ফল আনিল। অপরাজিতার মাতা—তাহার বিশেষ অনুরোধে একটি মিষ্টান্ন তুলিয়া লইলেন—বলিলেন, "এখন কি খেতে পা..."

সাগরিকা অপরাজিতাকে বলিলেন, "তোমায়—আপনাকে খেতেই হবে।"

মা একবার কন্তার দিকে চাহিলেন—তাহার পরে সাগরিকাকে বলিলেন, "তুই রে! ও এই জন্তই আসতে চাইতেছিল না; বলছিল—লোকের বাড়ী অযাচিত ভাবে গিয়ে তাঁদের বিরক্ত করা, আর খাবারের জন্ত তাঁ'দের বিব্রত করা।"

"আমরা ত মা'র কাছে আর পিসীমা'র কাছে শিক্ষায় এ বিব্রত করা মনে করতে শিখি নাই! কেহ এসে—না খেয়ে গেলে মা 'জলখাবার' পাঠিয়ে দিতেন।"

"এখন কি আর তা' চলে?"

সাগরিকার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অপরাজিতাকে আহার্য্য সম্বন্ধে সুবিচার করিতে হইল বটে, কিন্তু সে যে তাহাতে সন্তুষ্ট হইল, এমন নহে।

তাহার পরে আগন্তুকরা বিদায় লইলেন।

ও দিকে ব্রজবল্লভ বাবুর জন্তও 'জলখাবার' প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি আহার শেষ করিয়া স্ত্রী-কন্তার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং তরুণকুমারের সহিত সাম্যবাদ সম্বন্ধে আলোচনায় রত ছিলেন। সাম্যবাদ সম্বন্ধে তরুণকুমারের মতে তাহার অধ্যয়নের ব্যাপ্তি ও ধারণার সুস্পষ্টতা তাঁহার প্রশংসা আকৃষ্ট করিতেছিল।

স্ত্রী-কন্তা যাইতে চাহেন জানিয়া তিনি বিদায় লইলেন; তরুণকুমারকে বলিলেন, আর এক দিন আসিয়া আলোচনা করিবেন।

তাঁহারা চলিয়া যাইবার পরে তরুণকুমার ভগিনীদিগকে ব্যঙ্গের ভাবে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ—ও-ই ত কলেজের সেই—অগ্নিশিখা!"

দীপশিখা বলিল, "কিন্তু আমরা ত অগ্নিশিখার অগ্নিতাপ বুঝতে পারলাম না!"

"বোধ হয় অগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত—বায়ুপ্রবাহের অপেক্ষা।"

"তুমি কিন্তু সাবধান, দাদা, রাস্তার এ পার হ'তে শিখা তোমাকে স্পর্শ না করে—আগুনের স্পর্শেই দগ্ধ হ'তে হয়।"

পরদিন চিত্রলেখা অনুকূলচন্দ্রের গৃহে আসিয়া সকল কথা শুনিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রীদ্বয়কে বলিলেন, যখন ব্রজবল্লভ বাবুর স্ত্রী আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগেরও এক বার ব্রজবল্লভ বাবুর গৃহে যাওয়া কর্ত্তব্য। শুনিয়া দীপশিখা বলিল, "কিন্তু, পিসীমা, অপরাজিতা ত এখন কলেজে আছে।"

চিত্রলেখা বলিলেন, "বেলা পড়ুক, তা'র পরে যা'ব।"

তিনি তরুণকুমারকে সে কথা বলিলে, তরুণকুমার বলিল, "এ যে একেবারে বিদেশী ব্যাপার হ'চ্ছে, পিসীমা—রিটার্ণ ভিজিট?"

চিত্রলেখা বলিলেন, "তা' কেন বলছ? আমাদের ত চলিত কথাই আছে—'মানুষের কুটুম আসতে যেতে।' তাঁ'রা এসেছিলেন।"

"তা' আপনারা যা'ন।"

"তোমাকে যে সঙ্গে যেতে হ'বে।"

"এই ত রাস্তার ও পারে—আপনারা যেতে পারবেন না?"

"পারব না কেন, বাবা? কিন্তু অধ্যাপক মশায় যখন এসেছিলেন—এক বার নয়, দু' বার তখন তোমাকে বা দাদাকেও যেতে হয়। দাদা ত যেতে নাই—তুমিই আমাদের নিয়ে চল।"

"ভাল, যাবার সময়—তখনও যদি বাবা না ফিরেন—আমাকে বলবেন।"

অপরাহ্ণে চিত্রলেখা, সাগরিকা ও দীপশিখাকে লইয়া তরুণকুমার ব্রজবল্লভ বাবুর গৃহে গেল। সাগরিকা প্রথমে যাইতে ইতস্ততঃ করিয়াছিল। তাহার সঙ্কোচের কারণ চিত্রলেখা অনুমান করিয়াছিলেন—পাছে কেহ তাহাকে তাহার শ্বশুরালয় সম্বন্ধীয় কোন বিব্রতকর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। তিনি বলিয়াছিলেন—"তুই বড় মেয়ে—তুই যা'বি না? যা'বি ত আমার সঙ্গে—ভয় কি?" সে আর কোন কথা বলে নাই।

তাঁহাদিগের আগমন-সংবাদ পাইয়া ব্রজবল্লভ বাবু ও তাঁহার পত্নী আসিয়া তাঁহাদিগকে দ্বিতলে লইয়া যাইলেন। সিঁড়ির উপরেই ব্রজবল্লভ বাবুর বসিবার ঘর—অধ্যাপকের বসিবার ঘর—পুস্তকের আবেষ্টন। সকলে সেই ঘরের সম্মুখে আসিলে অধ্যাপক ডাকিলেন, "অপরাজিতা!"

"এই যে, বাবা"—বলিয়া অপরাজিতা পার্শ্বের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেই পিতা কন্তাকে বলিলেন, "এঁরা সব অনুগ্রহ ক'রে এসেছেন।"

অপরাজিতা সকলকে নমস্কার করিতেছিল। পিতা চিত্রলেখাকে দেখাইয়া কন্তাকে বলিলেন, "ওঁকে প্রণাম কর।"

অপরাজিতা তাঁহাকে নত হইয়া প্রণাম করিবার উদ্যোগ করিলে, চিত্রলেখা তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "হয়েছে।"

তখন অপরাজিতা তাঁহাকে বলিল, "চলুন, পাশের ঘরে বসবেন।" তাহার ব্যবহারে যেমন, কথাতেও তেমনই সঙ্কোচ-কুণ্ঠার অভাব—সরল ও স্বচ্ছন্দভাব চিত্রলেখার বড় ভাল লাগিল। তিনি তাহার অনুসরণ করিলে—সাগরিকা ও দীপশিখাও সঙ্গে গেল। তরুণকুমার কি করিবে, ভাবিতেছিল। ব্রজবল্লভ বাবু তাহাকে বলিলেন, "আমরা এই ঘরেই বসি।" তিনি স্বীয় উপবেশন কক্ষে প্রবেশ করিলেন—তরুণকুমার তাঁহার অনুসরণ করিলে তিনি তাহাকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া বসিতে বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "ঘরটিকে বৈঠকখানা, অধ্যয়নাগার আর গবেষণাগার—তিনেই পরিণত করতে হয়েছে; কারণ, স্থানাভাব। আর সেই জন্ত ঘরটিতে স্থানাভাব অত্যধিক হয়েছে! তবুও অনেক যন্ত্রাদি সাজান সম্ভব হয় নাই।"

তরুণকুমার চারি দিক দেখিয়া বলিল, "একটু বড় বাড়ী নিলেন না কেন?"

ব্রজবল্লভ বাবু বলিলেন, "পাই নি। এক বন্ধুর চেষ্টায় এইটিই কোন রকমে পেয়েছি। অপরাজিতার দুই দাদাই বাহিরে—এক জন পাটনায় ডাক্তারী পড়ে, আর এক জন বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে এঞ্জিনিয়ার হইতেছে! যে পাটনায় তা'কে কলিকাতায় আনবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখন তা'র পরীক্ষার আর এক বৎসর অবশিষ্ট—আনা সম্ভব হয় না। তা'রা এলে বাড়ীতে স্থানের অত্যন্ত অভাব হ'বে। কন্তা অপরাজিতা কলেজে পড়িতেছে, তা'র জন্ত একটি ঘর রাখতে হয়েছে।"

ব্রজবল্লভ বাবু তরুণকুমারের সহিত সাম্যবাদ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তরুণকুমার বুঝিল, তিনি যে বিমল বুদ্ধির অনুশীলন করিয়াছেন, তাহার দ্বারাই তিনি সাম্যবাদের বিচার করিয়াছেন। তাহার মনে হইল, বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধি যখন

অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির
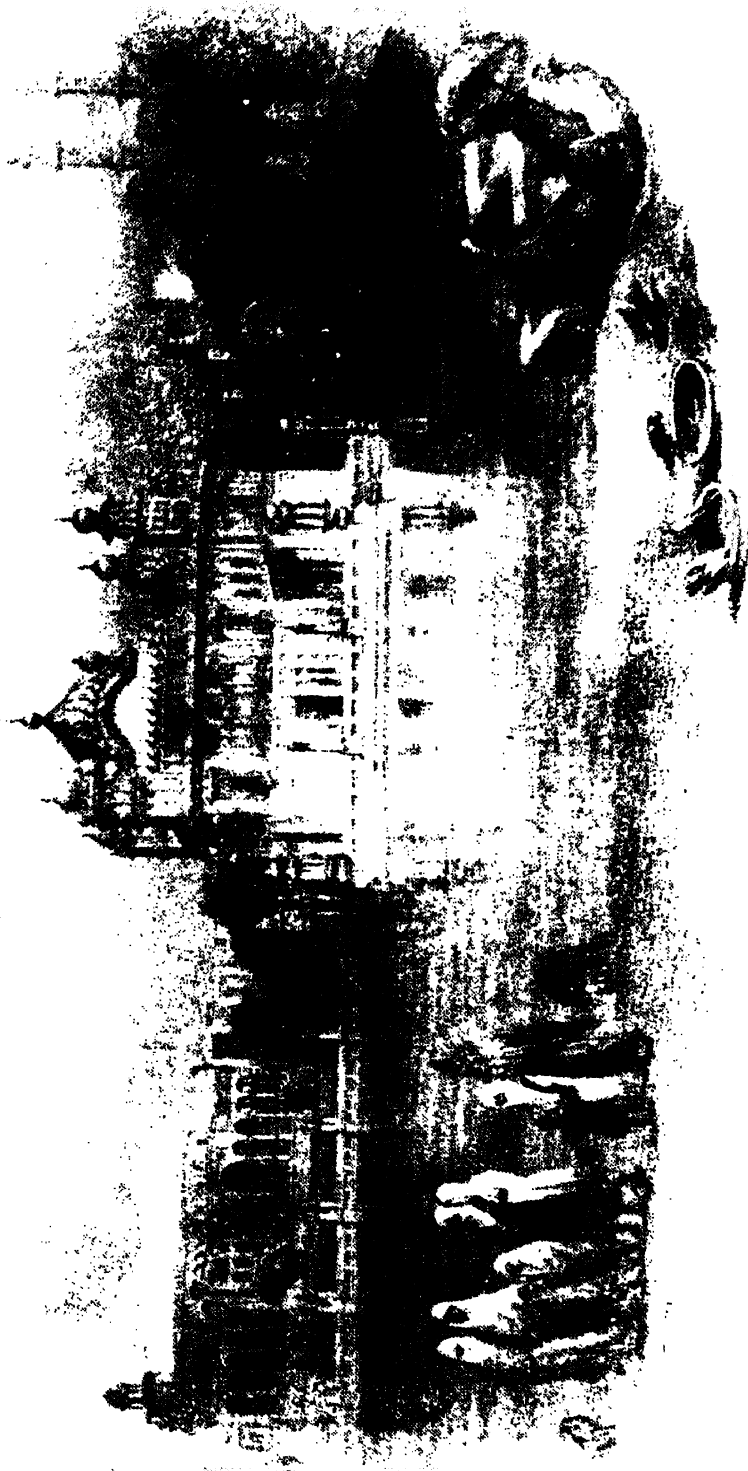
বিজ্ঞানাতিরিক্ত বিষয়ে প্রযুক্ত হয়, তখন তাহাতেও সেই বুদ্ধি আপনার সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিতে পারে।

ও দিকে চিত্রলেখা যখন অপরাজিতার মাতার সহিত আলোচনায় তাঁহাদিগের পরিচয়—আত্মীয়-কুটুম্বদিগের বিষয়—ঘরসংসারের কথা জানিতে লাগিলেন তখন অপরাজিতাই আগন্তুকদিগের জন্য মিষ্টান্ন ও জল আনিল। সে সকল আনিয়া দিয়া সে যখন চতুর্থ পাত্র ও গ্লাস আনিয়া তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি ও ঘরে দিয়ে আসব?"—তখন চিত্রলেখা বলিলেন, "না, মা! আমি ত এ সব খেতে পারব না—তুমি বরং তরুণকে ডেকে দাও, সে এসে খা'বে।" অপরাজিতার মাতা বলিলেন, "সে কি? এ ত অতি সামান্য মিষ্টান্ন।" চিত্রলেখা বলিলেন, "আমি যা' হয় একটা কিছু খা'ব।" তিনি আবার অপরাজিতাকে বলিলেন, "তুমি যাও ত, মা, তরুণকে আসতে বল।"

অপরাজিতা পিতার বসিবার ঘরের দ্বারে যাইয়া তরুণকুমারকে বলিল, "আপনাকে পাশের ঘরে ডাকছেন।"

তরুণকুমার এক বার অপরাজিতার দিকে চাহিল—তাহার পরেই দৃষ্টি নত করিয়া উঠিল। ব্রজবল্লভ বাবুও উঠিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া পার্শ্বস্থ কক্ষে দিয়া আসিলেন।

চিত্রলেখা বলিলেন, "তরুণ, বাবা, আমি খেতে পারব না—আমার খাবারটা তোমাকেই খেতে হ'বে।"

দীপশিখা বলিল, "দাদা, তুমি ভয় পেও না—তোমাকে পিসীমা'র খাবার—তোমার খাবার ছাড়াও খেতে হ'বে না—একটাতেই তোমার নিষ্কৃতি।"

চিত্রলেখা আপনার আসন ত্যাগ করিয়া তাহাতে তরুণকুমারকে বসিতে বলিলেন দেখিয়া ব্রজবল্লভ বাবু তাড়াতাড়ি যাইয়া তাঁহার ঘর হইতে একখানি চেয়ার আনিলেন। তরুণকুমার ব্যস্ত হইয়া বলিল, "এ কি, আপনি চেয়ার আন্‌ছেন!"

ব্রজবল্লভ বাবু বলিলেন, "অতিথি দেবতা।"

তিনি চেয়ার দিয়া চলিয়া যাইলেন।

সেই সময় চিত্রলেখা ঘরের এক পার্শ্বে যে টেবল-হারমোনিয়ামটি ছিল, তাহা দেখাইয়া অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটি নিশ্চয়ই তোমার?"

অপরাজিতা "হাঁ" বলিলে চিত্রলেখা তাহাকে বলিলেন, "আমাদের একটি গান শুনা'বে না?"

অধ্যাপকপত্নী বলিলেন, "উনি এ বাড়ীতে এসে পাড়ার অনেকের সঙ্গে পরিচিত হ'তে গিয়াছেন—জেনেছেন, ঠিক পাশের বাড়ীতে একটি ছেলে মেনিন্‌জাইটিসে ভুগছে; সেই জন্য অপরাজিতাকে গান গাহিতে বা বাজনা বাজা'তে নিষেধ করেছেন।"

শুনিয়া ব্রজবল্লভ বাবুর প্রতি চিত্রলেখার শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইল। তিনি অপরাজিতাকে বলিলেন, "তবে তোমার গান শুনা আজ আমাদের পাওনা রহিল; আর এক দিন পাওনা আদায় করতে আসব। কি বল?"

অধ্যাপকপত্নী বলিলেন, "সে ত ভাগ্যের কথা। বিহারে ওঁর এক বন্ধু অধ্যাপকের স্ত্রী ভাল গান করতে পারেন। তিনিই অপরাজিতাকে গান শিখিয়ে পরীক্ষা দেওয়ান—ও 'গীতশ্রী' উপাধি পেয়েছে।"

"আমার মেজ বৌমা'র সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিব—সে গান বড় ভালবাসে। সেই জন্য তা'র গান আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

ততক্ষণে সকলের আহার শেষ হইয়াছে। চিত্রলেখা অধ্যাপকপত্নীকে বলিলেন, "আজ আমরা বিদায় নিচ্ছি।"

অপরাজিতা টেবলের উপর হইতে আহার্য্য-পাত্রাদি সরাইয়া বাহিরে রাখিয়া আসিল এবং টেবলের উপর যে আচ্ছাদনবস্ত্র দিয়াছিল, তাহা সরাইয়া লইল। আচ্ছাদনবস্ত্রখানি যে তাহার সূচীশিল্পে শোভিত তাহার পরিচয় তাহার নামেই ছিল।

পথে আসিয়াই দীপশিখা চিত্রলেখাকে বলিল, "পিসীমা যে ভাবে ওঁদের পরিচয় জান্‌লেন, তা'তে মনে হয়, যেন পুলিসের সংবাদ সংগ্রহ করা।"

চিত্রলেখা বলিলেন, "এ কি তোদের ব্যবস্থা—সে দিন ওঁরা বাড়ীতে গেলেন; কে, কি, বাড়ী কোথায় [illegible] কোথায়, জ্ঞাতিকুটুম্ব—কিছুই জিজ্ঞাসা করিস নাই?"

"কেন তুমি কি কুটুম্বিতা করবে না কি?

"তা' কি কেহ বলতে পারে? কা'র হাড়ীতে কে চাল দিয়াছে কে জানে?"

সকলে অনুকূলচন্দ্রের গৃহে উপনীত হইলেন। চিত্রলেখা বলিলেন, "লোক ভাল ব'লেই মনে হ'ল। মেয়েটিকে আমার ভাল লাগল—ব্যবহারে এমন একটি নিঃসঙ্কোচ ভাব অথচ আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তা আছে যে তা' সচরাচর দেখা যায় না।"

"দাদা বলেন, কলেজে একে অগ্নিশিখা বলে।"

চিত্রলেখা তরুণকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি, তরুণ?"

তরুণকুমার আলোচনায় যোগ দেয় নাই—যেন কি ভাবিতেছিল; পিসীমা'র কথায় মুখ তুলিয়া অতি সংক্ষেপে ব্যাপারটির বিবরণ দিল। শুনিয়া চিত্রলেখা হাসিয়া বলিলেন, "ছেলেদের ত কাজ নাই, তা-ই ঐ সব করে।"

সাগরিকা বলিল, "পিসীমা, দাদার নাম তা'রা কি দিয়েছে, জানেন?"

সাগ্রহে চিত্রলেখা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?"

সাগরিকা বলিল, "দার্শনিক।"

"কিন্তু তোর শ্বশুরবাড়ীর ব্যাপারে ও যা' করেছে, তা'তে বুঝা যায়—এ কেবল দার্শনিকই নহে—কর্মীও বটে। ভাবেও যেমন কাজও তেমনি করে।"

তরুণকুমার কি ভাবিতেছিল।

৮

কয় দিন পরে সাগরিকা ডাকে একখানি পত্র পাইল। পত্রখানি তাহার দেবর অহিনাথের লিখিত। সে তাহার স্ত্রীর আত্মহত্যার পরে গৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছিল—প্রথমে ব্রহ্মে গিয়াছিল। পত্রখানি তথা হইতে লিখিত। সে লিখিয়াছিল, ব্রহ্ম হইতে সে সিংহলে যাইতেছে—যাইবার দিন তাহাকে পত্র লিখিতেছে—

বৌদিদি,—

আমি চলিয়া আসিবার পূর্ব্বে যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি নাই, সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি। কাজটা অন্যায়

হইয়াছে ; কারণ, তুমি আমাকে ও আমার স্ত্রীকে যে স্নেহ দিয়াছ, তাহা আমি ভুলিতে পারিব না। আজ আমার স্ত্রীর শেষ পত্রখানি পড়িতে পড়িতে সেই বিষয় বার বার মনে হইতেছে। সে লিখিয়াছিল, তোমার ধৈর্য্য, সহগুণ ও স্নেহ তাহাকে মনে করাইয়াছিল, পৃথিবীতে মানুষে দেবীর প্রকৃতি সম্ভব এবং তোমার সান্নিধ্য না থাকিলে সে বহুদিন পূর্ব্বেই আত্মহত্যা করিত। সে লিখিয়াছে, তোমার কাছে থাকিলে সে—তোমার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া—আত্মহত্যা করিতে পারিত না এবং সেই জন্যই পিত্রালয়ে গিয়াছিল।

তাহার পত্রের একটি কথা এই যে, সে আর তাহার স্বামীর উপর শ্রদ্ধা অবিচলিত রাখিতে পারিতেছে না দেখিয়া—ভালবাসায় বেদনায় অস্থির হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সেই কথাই আজ আমার বিশেষ বিবেচনার বিষয় হইয়াছে। আমি—তাহার স্বামী, তাহাকে অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারি নাই—আমি অপরাধী। সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করিতেই হইবে। যাহাতে সে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি, সে জন্য আমি তোমার আশীর্ব্বাদ চাহিতেছি। আমার বিশ্বাস আছে, আমি সে আশীর্ব্বাদ পাইব।

আমি দাদার একখানি পত্র পাইয়াছি। জানিলাম, বাবা ও মা মধুপুরে যাইতেছেন—বোধ হয়, এত দিন গিয়াছেন। অন্য পথ ছিল না। জানিলাম, মহীনাথ, দাদার পরামর্শে, বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়েই গেল। ভালই করিল—আমাদিগের দুই ভ্রাতার মত না হইয়া স্বাবলম্বী হইতে পারিবে। আজ তাহাই প্রয়োজন—কেবল পুরুষেরই নহে, স্ত্রীলোকদিগেরও। দাদা দুঃখ করিয়াছেন—আমরা দুর্ব্বল হইয়াই সংসারে ও জীবনে দুঃখ ডাকিয়া আনিয়াছি। তাহা না হইলে তোমার জা'র মৃত্যুর জন্য আমি হত্যাকারীর অন্তর্দাহ ভোগ করিতাম না ; দাদাকেও লজ্জায় তোমার কাছে মুখ দেখাইতে কুণ্ঠিত হইতে হইত না।

বাবার জন্য আমার দুঃখ হয়। তিনি সত্যই সন্তানদিগকে ভালবাসিতেন। আমিও পিতাকে স্বর্গ ও ধর্ম্ম মনে না করিলেও, তাঁহাকে ভালবাসিতাম। কিন্তু যে দৌর্ব্বল্য আমাদিগের সর্ব্বনাশের কারণ—সে দৌর্ব্বল্য আমরা তাঁহার নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছিলাম। তিনি কখন মা'র অন্যায়ের উপযুক্ত প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই ; পারিলে মা'র অত্যাচার বাড়িয়া যাইতে পারিত না। সে স্থলে বাবা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। আমার ত কথাই নাই।

তুমি কি ভাবিতেছ জানি না, কি করিবে তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। কিন্তু যদি তুমি আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা কর, তবে বলিব, যত দিন আপনার অধিকার সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে না পারিবে এবং দাদাকে কেবল ক্ষমা নহে—শ্রদ্ধা করিতে না পারিবে, তত দিন আপনার প্রাপ্য—সম্মান, সুখ ও শান্তি—ত্যাগ করিও না।

তোমার ভ্রাতার পরিচয় যাহা পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে—তিনি সুস্থ ও সবল দেহে সুস্থ, স্বস্থ ও সবল মনের অনুশীলন করিয়াছেন। তিনি তোমাকে উপযুক্ত উপদেশ দিতে পারিবেন।

আমি সিংহল যাত্রা করিতেছি।

যদি কখন মনকে শান্ত করিতে পারি, তবে হয়ত এক বার ফিরিয়া যাইয়া দেখা করিব।

আমার প্রণাম গ্রহণ করিও। ইতি—

তোমার আশীর্ব্বাদপ্রার্থী
অহিনাথ

পত্রখানি পাঠ করিয়া সাগরিকা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না—তাহার স্মৃতির কক্ষ হইতে কত স্মৃতি আজ বাহির হইয়া আসিতে লাগিল ! প্রথম যৌবনে যে সময় মানুষ কত সুখের স্বপ্ন দেখে—যে ভবিষ্যৎ কল্পনায় রচনা করে, তাহাতে চিরবসন্ত বিরাজিত, তাহাতে কেবল কুসুমের শোভা, মধুপের গুঞ্জন, মলয়ে ফুলের সৌরভ, পাখীর গান—সেই সময়ের স্মৃতি মানুষকে উন্মনা করে। অহিনাথের পত্র পাঠ করিয়া সেই সময়ের কথাই সাগরিকার মনে পড়িতে লাগিল। সেই সময়ে যে ভগিনীরই মত তাহার সঙ্গিনী ছিল, সে তাহারই মত দুঃখে আত্মহত্যা করিয়াছিল, সহ্য করিতে পারে নাই—হয়ত অধিক অভিমানী ছিল। সাগরিকা তাহাকে সত্য সত্যই ভালবাসিত। এই দেবর—এ তাহার ভ্রাতার মতই ছিল। আজ সে কক্ষচ্যুত লক্ষ্যহীন গ্রহের মত অশান্তভাবে দেশে দেশে ঘুরিতেছে—শান্তির সন্ধান করিতেছে। পাইবে কি ? কে বলিতে পারে !

সাগরিকা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

সেই সময় দীপশিখা ঝড়ের মত কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "দিদি !"—তাহার পশ্চাতে চিত্রলেখা।

দীপশিখা সে দিন পিসীমা'র কাছে গিয়াছিল—কখন সে ও চিত্রলেখা আসিয়াছেন, সাগরিকা জানিতে পারে নাই। উভয়ে আসিয়া তরুণের বসিবার ঘরে গিয়াছিলেন—তথা হইতে আসিতেছেন। দীপশিখা বলিল, "দিদি, চল—'অগ্নিশিখা' গান গাচ্ছে, শুনবে ?"

সাগরিকা উঠিল। চিত্রলেখা বলিলেন, "তোর চোখে যে জল ! কা'র পত্র ?"

সাগরিকা আপনার ভাবাবেশ সংযত করিয়া বলিল, "দেবরের।" সে পত্রখানি পিসীমা'র হাতে দিল।

সকলে তরুণের ঘরে গমন করিলেন। চিত্রলেখা পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন।

পথের অপর পারের গৃহে অপরাজিতা গান গাহিতেছিল। কণ্ঠস্বর যেমন মিষ্ট তেমনই উচ্চ। গান সুস্পষ্টরূপেই শুনা যাইতেছিল :—

"স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি,'
রেখ রেখ হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান—
যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে,
অনিলে মলয় সদা বহমান।

নন্দন কাননে কি বা শোভা ছার,
বনরাজিকান্তি অতুল তাহার,
ফলশস্য তা'র সুধার আধার
স্বর্গ হ'তে সে যে মহা মহীয়ান।

এ দেহ তোমার তারি মাটি হ'তে
হয়েছে সৃজিত, পোষিত তাহাতে,
মাটি হয়ে পুনঃ মিশিবে তাহাতে
ভবলীলা যবে হ'বে অবসান।

পিতামহদের অস্থিমজ্জা যত
ধূলিরূপে তাহে রয়েছে মিশিত ;
সেই মাটি হ'তে হইবে উত্থিত
ভাবীকালে তব ভবিষ্য সন্তান।

কংসকারাগারে দেবকীর মত
বক্ষেতে পাষাণ, লৌহ-শৃঙ্খলিত
মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত ;—
পরিচয়ে—তুমি তাঁহারি সন্তান।

প্রকৃত সন্তান জেন সেই জন
নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জ্জন
যে করিবে মা'র দুঃখ বিমোচন,
হ'বে তার মাতৃ-ঋণ প্রতিদান।"

অপরাজিতা যখন গান গাহিতেছিল, তাহার মধ্যে একখানি মোটর রাস্তা দিয়া গেল—গান একটু অস্পষ্ট শুনাইল।

চিত্রলেখা বলিলেন, "যেমন গান, তেমনই গলা! চমৎকার! গানটি যেন্ত বৌমাকে শিখতে হ'বে।"

দীপশিখা জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন ক'রে শিখান হ'বে?"

"অতি সহজে—এক দিন তা'কে নিয়ে ওঁদের বাড়ী যা'ব—আর এক দিন ওঁদের আনব। দু'দিন শুনলেই শিখতে পারবে।"

"তোমার বৌ কি শ্রুতিধর?"

"তা'র মাষ্টার ত বলেন, খুব শীঘ্র শিখতে পারে।"

দীপশিখা তরুণকুমারকে বলিল, "দাদা, এ তোমার বড় অন্যায়—নিজে গান শুনছিলে, দিদিকেও বল নাই।"

তরুণকুমার বলিল, "কে কোথায় গান গায়, সে জন্য কি সভা ডাকতে হবে?" কিন্তু সে কেমন যেন লজ্জানুভব করিল—যেন তাহারই ত্রুটি হইয়াছে।

চিত্রলেখা বলিলেন, "বোধ হয়, আবার গান গাহিবে।"

সেই সময় অপরাজিতা পথের পরপারে গৃহের দিকে চাহিয়া দেখিল, চিত্রলেখা প্রভৃতি বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন—বোধ হয়, তাহার গান শুনিতেছিলেন। সে হার্মোনিয়ম বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—সরিয়া গেল।

তরুণকুমার দীপশিখাকে বলিল, "দেখলে ত, তোমাদের দেখেই গান বন্ধ করল।"

চিত্রলেখার হাতে অহিনাথের পত্র ছিল। তিনি তরুণকুমারকে বলিলেন, "তোর খুব প্রশংসা করেছে।"

তরুণকুমার বলিল, "কে, পিসীমা?"

"সাগরিকার দেবর। এই দেখ।"

তরুণকুমার পত্রখানি পড়িল।

চিত্রলেখা বলিলেন, "আহা, ছেলেটির জন্য দুঃখ হয়।"

তরুণকুমার বলিল, "কিন্তু এ যে গোড়া কেটে আগায় জল। যখন প্রয়োজন ছিল, তখন প্রতীকার ক'রে নি।"

তাহার পরে সে বলিল, "এ জন্য, দিদি, তুমিও দায়ী।"

সাগরিকা বলিল, "আমার অপরাধ?"

"তুমি সহিষ্ণুতার এমন একটা অসম্ভব আদর্শ আনলে যে, তা'তে আকৃষ্ট হয়েও তা' গ্রহণ করতে না পেরে বেচারা আত্মহত্যা করে অব্যাহতি পেল।"

সাগরিকা কোন কথা বলিল না বটে, কিন্তু চিত্রলেখা বলিলেন, "আমাদের কথা—

যে সয়
সে রয়।

সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।"

তাহার পরে চিত্রলেখা সাগরিকাকে অহিনাথের পত্রখানি দিয়া বলিলেন, "কোথায় যা'বে, তা লিখে নাই—পত্রের উত্তর যে তুই দিবি, তা' বোধ হয়, মনে করে নাই।"

সাগরিকা পত্রখানি আবার দেখিল, দেখিয়া বলিল, "না—কিছু লিখা নাই।"

"লোকনাথ হয় ত ঠিকানা জানতে পারবে।"

সাগরিকা আর কিছু বলিল না।

সেই দিন গৃহে ফিরিয়া চিত্রলেখা দীপশিখার শাশুড়ীর এক পত্র পাইলেন, তিনি লিখিয়াছেন, তিনি সুধীরকে লিখিয়াছেন, সে যেন দীপশিখাকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করে—তাহারা যদি প্রয়োজন মনে করে, তবে তিনি তাহার নিকট যাইয়া এক মাস থাকিবেন।

সে রাত্রিতে তিন জন তিন রূপ ভাবনা ভাবিলেন। প্রথম—সাগরিকা। দেবরের পত্রের কথা বার বার তাহার মনে পড়িতে লাগিল ; দেবরের কথায় দেবরপত্নীর স্মৃতি তাহার মনে উদিত হইতে লাগিল। সে তাহার প্রতি একান্ত নির্ভরশীল ছিল ; শাশুড়ীর দুর্ব্যবহারে বেদনা পাইয়া কত দিন তাহাকেই তাহার বেদনা জানাইয়াছে—কত দিন তাহার কথায় সান্ত্বনা পাইয়া বলিয়াছে, "দিদি, তুমি না থাকলে আমি আত্মহত্যা করতাম। আমি কেন তোমার মত সহিষ্ণু হ'তে পারি না, বলতে পার?" তখন সাগরিকা কল্পনাও করিতে পারে নাই, সে এক দিন সত্য সত্যই আত্মহত্যা করিবে ; তরুণের কথা তাহার মনে পড়িল ; সে ভাবিতে লাগিল, সত্যই কি সহিষ্ণু হইয়া সে অপরাধ করিয়াছে—যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা অসত্য—সুতরাং কল্যাণকর নহে। তাহার পর তাহার মনে প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, তাহার এখন কর্তব্য কি? সে মনে করিতে শিখিয়াছে—যাহারা যুগে যুগে অটল ধৈর্য্যের, শ্রমের ও বিশ্বাসের অনুশীলন করে তাহারাই সুখ ও মনীষার অধিকারী হয়। সে বিশ্বাস ত সে ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। তাহার দেবর তাহাকে লিখিয়াছে, যত দিন সে লোকনাথকে কেবল ক্ষমা নহে শ্রদ্ধাও করিতে না পারিবে, ততদিন যেন সে আপনার সম্মান, সুখ ও শান্তি ত্যাগ না করে। কিন্তু সম্মান, সুখ ও শান্তি—এ সকলই কি ভালবাসা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়? ভালবাসা ত ক্ষমার উৎস মুক্ত করিয়া উচ্ছ্বসিত ধারায় প্রেমাস্পদের সব ত্রুটি প্রক্ষালিত করিয়া দেয়—ভালবাসাই ত শ্রদ্ধার ভিত্তি দৃঢ় করে। সে ভ্রাতার

কথায় অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছিল—নানা পুস্তক অধ্যয়ন করিতেছিল ; কিন্তু পরস্পরবিরোধী মতের মধ্যে সে সামঞ্জস্যের সন্ধান করিয়া লইতে পারিতেছিল না। স্বামীর প্রকৃতিগত দৌর্ব্বল্য কি সে তাহার দৃঢ়তার দ্বারা দূর করিতে পারে ? সে এখন কি করিবে ?

দ্বিতীয়—চিত্রলেখা। তিনি অহিনাথের পত্রপাঠে সাগরিকার চক্ষুতে অশ্রু দেখিয়াছিলেন। অবশ্য সে পত্র পাঠ করিয়া সাগরিকার পক্ষে অশ্রুবর্ষণ স্বাভাবিক ; কিন্তু সে অশ্রুর উৎস কি কেবল দেবর-পত্নীর জন্য বেদনায় ও সহানুভূতিতে মুক্ত হইয়াছিল ? তাহার সঙ্গে আর কোন ভাব কি ছিল না ? সাগরিকা যে কোন দিন শ্বশুরালয়ে তাহার প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের উল্লেখও করে নাই, সে কি কেবল তাহার অদৃষ্টবাদে আত্মজনিত সহিষ্ণুতার জন্যই ; না—তাহা স্বামীর প্রতি ভালবাসার ফল ? তাহার দেবরপত্নী যখন তাহার স্বামীর প্রতি আর শ্রদ্ধা অবিচলিত রাখিতে পারিতেছিল না, তখনই আত্মহত্যা করিয়াছিল। সে শ্রদ্ধা কি ভালবাসারই রূপভেদ নহে ? এখন সাগরিকাকে তাঁহারা কি করিতে পরামর্শ দিবেন এবং তাহার সম্বন্ধে তাঁহারা কি করিবেন ? সে বিষয়ে তাঁহাদিগের চিন্তার অবধি ছিল না।

তৃতীয়—তরুণকুমার। তরুণকুমার ভাবিতেছিল, তাহাদিগকে বারান্দায় দেখিয়া যে অপরাজিতা গান শেষ করিয়াছিল, তাহা সে লক্ষ্য করিয়াছিল! তাহাদিগের কৌতূহল কি তবে শিষ্টতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে ? অপরাজিতা কি তাহাদিগের ব্যবহারে বিরক্তি অনুভব করিয়াছিল ? দূর হইতে সে তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিতে পারে নাই। কিন্তু যদি অপরাজিতা তাহাদিগের কার্য্যে বিরক্তি অনুভব করিয়া থাকে ? বিরক্তি অনুভব না করিলে সে সহসা গান বন্ধ করিয়া জানালার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবে কেন ? সেই কথা সে বার বার মনে করিতে লাগিল। দীপশিখা অনুযোগ করিয়াছিল সে গান—মিষ্ট গান শুনিতেছিল, কিন্তু সাগরিকাকেও সে কথা বলে নাই। সে কি তাহার অপরাধ ? অর্থাৎ সে কি আপনি—যাহাকে "ভাবের ঘরে চুরী" বলে তাহাই করিয়াছে অর্থাৎ আপনার কাছেও আপনার মনোভাব গোপন করিয়াছে ? সে আপনার কাছে আপনি কুণ্ঠানুভব করিল—ভাবিল, এ কুণ্ঠার কারণ কি ? সে আপনি সে কুণ্ঠার কারণ বুঝিতে পারিল না ; হয় ত সে যে সন্দেহ অনুভব করিতে লাগিল, তাহা আপনার কাছে আপনি স্বীকার করিতে চাহিল না। ইহার মধ্যে কি মনের কোন অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের বিকাশ—বসন্তে তৃণদলে কুসুমের বিকাশের মত লক্ষিত হইতে পারে ?

৯

চিত্রলেখা পরদিন মধ্যাহ্নের পরেই দুই পুত্রবধূকে লইয়া ভ্রাতার গৃহে আসিলেন—অপরাজিতার পিতার গৃহে যাইবেন।

শুনিয়া তরুণকুমার বলিল, "আপনার যে আর বিলম্ব সহ হয় না, পিসীমা!"

চিত্রলেখা বলিলেন, "কি করি বল, কাল বাড়ী ফিরে বেহানের চিঠি পেলাম, দীপশিখার জন্য ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে ; কবে যে সুধীর তা' নিয়ে আসবেন, বলতে পারি না। শ্বশুর-বাড়ীর ওয়ারেণ্ট—খাড়া ওয়ারেণ্ট, জামিনের সুবিধাও নাই।"

"তা'ই বুঝি ?"

"হাঁ। আর ভেবে দেখলাম, আজ শনিবার—সকাল সকাল কলেজের ছুটী—মেয়েটা বিশ্রাম ক'রে নিতে পারবে। ব... রবিবার—ছুটী ; কাল ওঁদের আনতে বলে আসব। ছুটি পেলেই মেজবৌমা গানটি শিখে নিতে পারবেন।"

তিনি মধ্যমা বধূকে বলিলেন, "কি বল, বৌমা ?"

সাগরিকা বলিল, "তা' পারবে।"

তরুণকুমার বলিল, "পিসীমা, সে দিন ত ওঁরা খাবার আয়োজন করেছিলেন। আজ আপনি আবার আপনার কোম্পানী নিয়ে যাচ্ছেন।"

চিত্রলেখা বলিলেন, "কেন, ওঁরা কি মনে করবেন, আ... খাবারের লোভেই যাচ্ছি ?"

সাগরিকা বলিল, "আমি আজ যা'ব না।"

"চুপ কর! যেমন ভাই তেমনি বোন! আজ ... তরুণকে নেব না, তা' হ'লেই ত এক জন কমল ? আ... প্রথমেই বলব, খাবার দেওয়া চলবে না।"

তাহাকে যাইতে হইবে না শুনিয়া তরুণকুমার যেন স্ব... অনুভব করিল।

অপরাহ্নে চিত্রলেখা মুক্ত বাতায়নপথে দেখিতে পাইলেন অপরাজিতা তাহার ঘরে বসিয়া আছে। তিনি সাগরিকাকে বলিলেন, "চল—যাই।"

ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া সকলে পথের অপর দিকে ব্রজ... বাবুর গৃহে গমন করিলেন। অপরাজিতা, বোধ হয়, তাঁহাদিগের আগমন লক্ষ্য করিয়াছিল এবং তাহার মাতাকে সে স... দিয়াছিল। চিত্রলেখা প্রভৃতি গৃহে প্রবেশ করিতে না করিতে অধ্যাপকপত্নী আসিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া নি... লইয়া যাইলেন। অপরাজিতার ঘরেই স্থান একটু অধিক... সকলকে সেই ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। অপরাজিতাই ... বসিবার ঘর হইতে দুইখানি চেয়ার আনিয়া আসনের অভাব... করিল।

চিত্রলেখা প্রথমেই অপরাজিতাকে বলিলেন, "মা, সে... তোমার গান শুনা হয় নাই। কিন্তু কাল বাড়ী হ'তেই ... গান শুনেছি—একটি মাত্র শুনেছি, কিন্তু শুনেই স্থির ক... আমার বৌমা'কে গানটি শিখিয়ে নিয়ে যা'ব। আজ ... এসেছি।"

অপরাজিতা কোন কথা বলিল না ; চিত্রলেখার প্রশ... সে যে প্রসন্ন হইল, তাহার মুখভাবে তাহারও কোন প... পাওয়া গেল না।

অধ্যাপকপত্নী বলিলেন, "কোন্ গান ?"

চিত্রলেখা বলিলেন, "'স্বদেশের ধূলি'। যেমন গান, তেম... মেয়ের গলা! আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনেছি। কিন্তু অপরাজিতা বোধ হয়, আমাদের উপর রাগ করেছেন।"

"কেন ?"

"আমাদের দেখতে পেয়ে গান বন্ধ করেছিলেন।"

অধ্যাপকপত্নী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা'ই কি অপরাজিতা ?"

অপরাজিতা কিছু বলিল না; কিন্তু তাহার মুখে লজ্জার ভাব ফুটিয়া উঠিল, যেন আকাশে সূর্য্যাস্তের বর্ণ ছড়াইয়া পড়িল।

তাহার পরে চিত্রলেখা বলিলেন, "প্রথমেই একটি কথা ব'লে রাখি—আমাদের কিছু খেতে দিতে পারবেন না।"

অধ্যাপকপত্নী বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"ছেলের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি।"

"সে কি?"

"সে দিন আপনি না খাইয়ে ছাড়েন নাই। তা'তে সে লজ্জা পেয়েছে।"

"কেন?"

"তা' বলতে পারি না। আমরা সে কালের লোক—এ কালের ছেলে-মেয়েদের মনের ভাব বুঝতে পারি না। এই দেখুন না—সে দিন আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে গান শুনছিলাম দেখেই অপরাজিতা গান বন্ধ করলেন; বোধ হয় মনে করলেন, আমরা বড় অশিষ্ট। আবার তরুণকুমার সে দিন আপনাদের খাবার খেয়ে গিয়ে আজ বললেন, আমার পক্ষে আমার 'কোম্পানী' নিয়ে আপনাদের বাড়ীতে আসা অশিষ্টতা হ'বে। বলুন আপনি, আমি কি অপরাধ করেছি?"

"এ ত আপনার অনুগ্রহ যে, আপনি সকলকে নিয়ে এসেছেন।"

"অপরাজিতা হয়ত মনে করছেন, এ অনুগ্রহ নহে—নিগ্রহ। কিন্তু গান তাঁ'কে গাহিতেই হ'বে।"

অপরাজিতা হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে চেষ্টায় যেন আন্তরিকতা ছিল না।

মাতার অনুরোধে অপরাজিতাকে গান গাহিতে হইল।

চিত্রলেখার নির্দ্দেশে তাঁহার বধূমাতা—শোভনা যাইয়া অপরাজিতার পার্শ্বে বসিল—গানটি গাহিতে শিখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

দীপশিখা তাহার পিত্রালয়ের দিকে চাহিয়া দেখিল—তরুণকুমারকে দেখা গেল না; সে ঘরে বসিয়া ছিল, বারান্দায় আইসে নাই। সে কি ঘরের মধ্যে বসিয়া গান শুনিতেছিল না?

অপরাজিতার গান শেষ হইলে শোভনা তাহার নিকট হইতে গানটি লিখিয়া লইল এবং দুই এক স্থানে সুর সম্বন্ধে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইল।

তাহার পরে কিছুক্ষণ আলাপের পরে চিত্রলেখা বিদায় লইলেন এবং বলিলেন, পর দিন অপরাহ্ণে তিনি আসিয়া অধ্যাপক-গৃহিণীকে ও অপরাজিতাকে লইয়া যাইবেন। অপরাজিতা বলিল, রবিবারে তাহার পাঠ ব্যতীত কাজ থাকে—তাহার পিতার ঘরটি ঝাড়িয়া মুছিয়া সাজাইয়া দিতে হয়। শুনিয়া চিত্রলেখা বলিলেন,—"সে আমি শুনব না, মা! জান ত বাঙ্গালী কবি 'বাঙ্গালীর মেয়ের' বর্ণনা করেছেন—'খেয়ে যা'ন, নিয়ে যা'ন, আরো যা'ন চেয়ে।' তেমনই আমি তোমার গান শুনে গেলাম, বৌমা'কে শিখিয়ে নিয়ে গেলাম, আবার তোমাকে যেতে ব'লে যাচ্ছি।"

বিদায় লইবার সময় চিত্রলেখার দৃষ্টি সে গৃহের দাসীর উপর পতিত হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিশু না?"

দাসী বলিল, "হাঁ, মা!"

দাসী শিশুবালা কয় বৎসর পূর্ব্বে একবার কলিকাতায় আসিয়া চিত্রলেখার গৃহে চাকরী করিয়া গিয়াছিল। সে বার কোন রোগে মুর্শিদাবাদ জিলায় রেশম-কীট বা "পলু" মরায় রেশম তন্তুবায়দিগের বিশেষ কার্য্যাভাব ঘটিলে শিশুবালা ও তাহার স্বামী কলিকাতায় চাকরী করিতে আসিয়াছিল—একই পল্লীতে স্বামী ও স্ত্রী চাকরী করিত। কয় মাস পরে তাহারা গৃহে ফিরিয়া যায়। তাহার পরে—শিশুবালার বেশেই অবস্থা-পরিবর্ত্তনের পরিচয়; এখন সে বিধবা; বোধ হয়, আবার অর্থাভাবে চাকরী করিতে আসিয়াছে। গৃহস্থকন্যা ও গৃহস্থবধূর পরিচ্ছন্নপ্রিয়তা এখনও তাহার শুভ্র বেশে দেখা যাইতেছিল।

শিশুবালা বলিল, "হাঁ, মা! কপাল পুড়েছে—তাই আবার আসতে হয়েছে—এ বার একা। আপনকার ঠিকানা মনে ছিল না; নহিলে গিয়ে দেখা ক'রে আসতাম—আপনি মা'র মত স্নেহেই রেখেছিলেন। এই বাবুর এক বন্ধু বহরমপুরে স্কুলে মাষ্টার—আমাদের পাড়ায় থাকেন; তিনিই এখানে চাকরী ক'রে দিয়েছেন—তা' মা, ভাল জায়গায় দিয়াছেন। সামনের বাড়ীর দিদিমণিদের দেখে চেনা-চেনা মনে হয়, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারি নি যে, আপনার ভাইঝি—এখন সব বড় হয়েছে।"

"কাল ত এঁ'রা আমাদের বাড়ীতে যাবেন—সঙ্গে যা'স।"

বধূদিগকে দেখাইয়া শিশুবালা বলিল, "এই বুঝি দুই বৌ?"

"হাঁ।"

"কাল যা'ব, মা!" বলিয়া সে চিত্রলেখাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিমণিদের মা কোথায়?"

চিত্রলেখা বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "সে নাই, শিশু। এই বাড়ী হ'ল: সব আশা, সব আনন্দ ত্যাগ ক'রে সে-ই চলে গেল।" তাঁহার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

শিশুবালা বলিল, "কা'র যে কখন কি হয়! সাজান বাগান রেখে চলে গেছেন! এমন মানুষ কি আর হ'বে? কি স্নেহ! যখন সে বার বাড়ী যাই, আমাকে দশটি টাকা আর আমি তখন যে লাল পাড় শাড়ী পরতাম তা-ই একখানা দিয়ে বলেছিলেন, "পরবে—আমাকে মনে পড়বে।" তাহার পরে সে দীপশিখার দিকে চাহিয়া বলিল, "ছোট দিদিমণির মুখ ঠিক মা'র মুখের মত। দিদিমণিদের ছেলেমেয়ে কি?"

চিত্রলেখা বলিলেন, "ছোটর একটি মেয়ে—চল না, দেখে আসবি।"

শিশুবালা চিত্রলেখার সঙ্গে অনুকূলচন্দ্রের গৃহে গেল—গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, "আহা, এমন বাড়ী, এমন সংসার—যাঁ'র সব তিনিই নাই!"

তাহার পরে শিশুবালা ঘুরিয়া বাড়ী দেখিল, চিত্রলেখাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথায় থাকেন?"

চিত্রলেখা বলিলেন, "সেই পুরান বাড়ী, শিশু! এক দিন যা'স।"

শিশুবালা দীপশিখার কন্যাকে বক্ষে লইয়া আদর করিতে লাগিল। শিশু কোন আপত্তি করিল না।

চিত্রলেখা পরদিন মধ্যাহ্নের পরেই আসিবেন বলিলে সাগরিকা বলিল, "না, পিসীমা, সকালেই আসবেন। সকলে কাল এখানে খা'বেন।"

চিত্রলেখা বলিলেন, "আবার হাঙ্গামা করবি?"

"হাঙ্গামা কি, পিসীমা!"

"তোর যা' ইচ্ছা তা-'ই হ'বে।"

সে দিন চিত্রলেখা স্বগৃহে যাইতে না যাইতেই সাগরিকা পর দিনের সব আয়োজন সম্বন্ধে দীপশিখার সহিত আলোচনা করিয়া সব ব্যবস্থা স্থির করিয়া ফেলিল।

পরদিন সমীরচন্দ্রের পুত্রগণ মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই অনুকূলচন্দ্রের গৃহে আসিল এবং সমীরচন্দ্র ও চিত্রলেখা বধূদিগকে লইয়া তাহাদিগের অনুসরণ করিলেন

সাগরিকা যখন চিত্রলেখাকে বলিল, "পিসীমা, চলুন, কি ব্যবস্থা করেছি, দেখবেন।"—তখন তিনি বলিলেন, "আমি আজ ত নিমন্ত্রণ খেতে এসেছি—ব্যবস্থা দেখব কেন?" তাহার পরে অবশ্য তিনিই সকল বিষয়ে নির্দ্দেশ দিলেন।

অপরাহ্নে চিত্রলেখা দীপশিখাকে সঙ্গে লইয়া ব্রজবল্লভ বাবুর গৃহে যাইয়া অপরাজিতাকে ও তাহার মাতাকে অনুকূলচন্দ্রের গৃহে লইয়া আসিলেন।

চিত্রলেখার মধ্যমা বধূ শোভনা পূর্ব্বদিন শ্রুত গানটি বহু বার অনুচ্চস্বরে গাহিয়া আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আজ অপরাজিতা—চিত্রলেখার অনুরোধে—সেই গানটি আবার গাহিবার পরে, সাগরিকাই শোভনাকে সেটি গাহিতে বলিল। শোভনা গানটি গাহিলে সে বলিল, "আসল আর নকল বুঝা দুষ্কর।"

অনুকূলচন্দ্র ও সমীরচন্দ্র পার্শ্বস্থ কক্ষে ছিলেন। চিত্রলেখা তথায় আসিলে সমীরচন্দ্র বলিলেন, "চমৎকার গলা! আর মেজ বৌমা এক দিনে শিখেছেনও চমৎকার!"

সমীরচন্দ্র তাহার পরে বলিলেন, "আর গান শুনাবে না?"

চিত্রলেখা যাইয়া অপরাজিতাকে সে কথা বলিলে সে সে বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখাইল না বটে, কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে বলিলেন, "এঁরা বলছেন, আর একটা গান গাও।"

অনুরুদ্ধ হইয়া অপরাজিতা আবার হারমোনিয়মের সম্মুখে বসিয়া গান আরম্ভ করিল—"বন্দে মাতরম্!"

সকলে মুগ্ধ হইয়া—তন্ময় হইয়া গান শুনিতে লাগিলেন—অপরাজিতাও যেন তন্ময় হইয়া গান করিল। গান যখন শেষ হইল, তখনও যেন সুর কক্ষ পূর্ণ করিয়া আছে, মনে হইল।

অল্পক্ষণ পরে সমীরচন্দ্র ডাকিলেন, "শোভনা!"

শোভনা শ্বশুরের আহ্বানে পার্শ্বস্থ কক্ষে যাইলে সমীরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "গানটি কি শিখতে পারলে?"

শোভনা বলিল, "না, বাবা!"

"কিন্তু ও গান তোমাকে শিখতেই হবে। তুমি বায়না দিয়ে রাখ, ওঁদের বাড়ীতে গিয়ে শিখে আসবে।"

শোভনা যাইয়া অপরাজিতাকে তাহা বলিল।

চিত্রলেখা বলিলেন, "নিশ্চয়ই পরিশ্রম হয়েছে—নইলে আর একটি গান শুনতে চাইতাম।"

অধ্যাপকপত্নী বলিলেন, "সে ত আর হ'বে না—অপরাজিতা যাঁ'র কাছে গান শিখেছিল, তাঁ'র কথা ছিল—'বন্দে মাতরমে'র পরে আর কোন গান হয় না—তা'তে ও গানের অপমান হয়।"

অনুকূলচন্দ্র সাগরিকাকে ডাকিয়া আগন্তুকদিগের জলযোগের ব্যবস্থা করিতে বলিলে সে বলিল, "ওঁরা কি খাবেন? কাল আমরা ওঁদের বাড়ী খাই নাই।"

"কেন?"

"তরুণ লজ্জা পায়?"

অনুকূলচন্দ্র ও সমীরচন্দ্র হাসিলেন।

সাগরিকা পার্শ্বস্থ কক্ষে যাইয়া যখন অপরাজিতার মাতাকে বলিল, তাহার পিতা জলযোগের ব্যবস্থা করিতে বলিতেছেন, তখন অধ্যাপকপত্নী বলিলেন, "ও কথা ব'ল না, মা! তা' হ'লে অপরাজিতা আর আসতে চাহিবে না।"

চিত্রলেখা বলিলেন, "তবে থা'ক। কাঙ্গালকে যখন শাকের ক্ষেত দেখিয়েছেন, তখন—গানের আকর্ষণে আমিও যা'ব—অপরাজিতাকেও আসতে হ'বে।"

শিশুবালাকে সঙ্গে লইয়া অধ্যাপকপত্নী যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন চিত্রলেখা, সাগরিকা ও দীপশিখা তাঁহাদিগের সঙ্গে তাঁহাদিগের গৃহদ্বার পর্য্যন্ত গমন করিলেন।

তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে সমীরচন্দ্র বলিলেন, "বেশ মেয়েটি।"

চিত্রলেখা বলিলেন, "বৌ করতে ইচ্ছা হচ্ছে?"

"সে ভাবনা আমাদের নহে—একশ' জন সে ভাবনা ভাবছেন।"

সাগরিকা বলিল, "একশ' জন?"

চিত্রলেখা বলিলেন, "বুঝতে পারলি না—আমি একাই একশ'।"

সমীরচন্দ্র বলিলেন, "সে কি অত্যুক্তি?"

"মোটেই না।"

দীপশিখা বলিল, "মেয়েটিকে কলেজের ছেলেরা কি বলে জানেন—অগ্নিশিখা।"

"কে বলল?"

"দাদা।"

"দেখে ত মনে হয় না; তবে খুব সপ্রতিভ।"

চিত্রলেখা বলিলেন, "কেন—'চকচকে হ'লেই হয় না সোনা'।"

"তা' ছাড়া অগ্নি আলো দেয়, তাপ বিকীর্ণ করে—তাপ জীবনের লক্ষণ।"

"কিন্তু আগুন নিয়ে খেলায় বিপদের ভয় আছে।"

"ভয় কোথায় যে নাই, তা' বলা যায় না।"

"তরুণ বুঝি এক বারও এদিকে এল না?"

দীপশিখা বলিল, "কলেজে দাদার নাম—দার্শনিক। দাদা, বোধ হয়, দর্শন নিয়ে ব্যস্ত—শ্রবণের অবসর নাই।"

চিত্রলেখা অনুকূলচন্দ্রকে বলিলেন, "দাদা, এবার ছেলের বিয়ে দিতে হ'বে।"

সমীরচন্দ্র বলিলেন, "সে কথা দাদাকে বলা কেন—কোন কাজেই তুমি কা'রও মতের অপেক্ষা রাখ না—এ বার নূতন ভাব কেন?"

[ক্রমশঃ

শ্রীকালিদাস রায়

বিশালার বিশালাক্ষীগণ
ধূপধূমে কেশ করিয়া সুরভি করে প্রতিদিন বেণীবন্ধন,
বাতায়ন-জালপথে ধূমজাল উঠে গগনে
সেই ধূমজালে পুষ্টি লভিবে, রাখিও মনে।
শিখীদের তুমি বন্ধুজন,
ভবনশিখীরা নৃত্যোপহার তোমারে সঁপিবে কোরো গ্রহণ।
গৃহতলে শোভে নারীচরণের লাক্ষারাগের চিহ্নগুলি,
তাহাদের শোভা হেরিতে বন্ধু যেও না ভুলি'।
পথের শ্রান্তি হরণ করিও ক্ষণেক তরে
কুসুম-সুরভি হর্ম্ম্য 'পরে।

বিশালার পাশে বহিছে তটিনী গন্ধবতী
তার তটে রাজে মন্দির-মাঝে মহাকাল দেব প্রমথপতি।
হরকণ্ঠের দ্যুতি তব দেহে, সেই মন্দিরে যাবে যখন
সেই দ্যুতি হেরি তোমা পানে চাহি রহিবে সাদরে প্রমথগণ।
জলকেলিরতা তরুণীগণের স্নানসুবাসিত শীকরচয়
বহিয়া পবন কুবলয় রজো গন্ধময়
কম্পিত করে পুরোদ্যানের পাদপলতা,
ইহাও তোমার দেখার কথা।
যদি যাও সেথা প্রদোষ ভিন্ন অন্য কালে,
কোরো প্রতীক্ষা যাবৎ তপন অস্ত না যায় চক্রবালে।
তোমারি মন্দ্র সন্ধ্যারতির হবে বিধিমত ঢক্কানাদ,
শ্লাঘ্য তা লভি সার্থক হবে লভিবে দেবের আশীর্বাদ।

দেবদাসীগণ চামর দুলায় লীলাভঙ্গীতে শ্রান্ত হাতে,
সন্ধ্যারতির বাদ্যের সাথে তালে তালে সেথা চরণপাতে।
ঝুনুঝুনু বাজে তায় শিঞ্জন তাদের কটির চন্দ্রহারে।
করাভরণের রত্নের দ্যুতি উজলে চামর দণ্ডটারে।
তাদের অঙ্গে প্রণয়িবিহিত নখরাঘাতের ক্ষতের 'পরে
দু'-চারি বিন্দু বারি যদি তুমি বর্ষণ কর করুণা ভরে,
শৈত্যপরশে ক্ষণেকের তরে ভুলিয়া ব্যথা
জানাবে তাহারা কৃতজ্ঞতা।
মধুপপাঁতির তুল্য তরল নয়নতারার সঞ্চালনে
অপাঙ্গে তারা তোমা নিরখিবে ক্ষণে ক্ষণে।

শেষ হ'য়ে গেলে সন্ধ্যারতি
তাণ্ডব নাচ নাচিবেন যবে সে পশুপতি,
শোভা পাও যদি জবাকুসুমের মতন লোহিত সন্ধ্যারাগে;
মণ্ডলাকারে, তাঁর উন্নত ভুজকাননের অগ্রভাগে,
নৃত্যের সাধ মিটিবে হরের তোমারে রুধিরধারাস্রাবী
স্বশূল-নিহত গজাসুর-দেহচর্ম্ম ভাবি'।
আত্মহারা সে পতির লাগিয়া উমার হৃদয় স্বস্তিহারা!
তাঁর উদ্বেগ দূর হবে মেঘ, তোমারি দ্বারা।
তোমা পানে উমা প্রসন্ন চোখে চাহিয়া রবে
তোমারো অচলা ভক্তি তাহাতে সফলা হবে।

যখন নিশীথে উজ্জয়িনীর রাজপথে দীপ জ্বলে না আর,
তারালোক তুমি রোধিলে ঘনাবে সূচিকাভেদ্য অন্ধকার।
প্রণয়িভবনে অভিসারে চলে অঙ্গনারা
পথখানি খুঁজে পাবে না তারা।
নিকষ পাষাণে হেমরেখা সম তোমার অঙ্গে দামিনীদাম
তাহা সঞ্চারি হইও দিশারী, হয়ো না বাম।
স্বতই তাহারা ত্রস্তচকিতা, বারিধারা আর ঢেল না যেন।
গর্জ্জন করি' নবসঙ্কটে ফেলো না যেন।
বার বার সখা চমকি চমকি নিশীথ নভে
হয়ত তোমার দয়িতা দামিনী ক্লান্ত হবে!

ভবনবলভি বাছিয়া লইবে পারাবতও যেথা রয় না জাগি'
বিশ্রাম কোরো নিশীথে দুজনে পথের শ্রান্তি হরণ লাগি।
আবার চলিও তপন উদিলে বিদূরিত হ'লে অন্ধকার,
সময়াপচয় সঙ্গত নয় লয়ে সুহৃদের কার্য্যভার।
পরকীয়াগৃহে রজনী জাগিয়া প্রণয়ীরা ফিরি স্বগৃহে প্রাতে
খণ্ডিতাদের নয়নসলিল মুছায় হাতে।
তাহাদের প্রতি কৃপায় প্রিয়,
তপনের পথ ছাড়িয়া দিও।
তিনিও চলেন অশ্রু মুছাতে সারা রাত কাঁদে প্রিয়া নলিনী,
তাই কর-রোধে হয়ত বা ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হবেন তিনি।

গম্ভীরা নদী পথে পাও যদি তাহার স্বচ্ছ হৃদয়তলে
প্রবেশ করিবে তোমার স্বভাবসুন্দর রূপ ছায়ার ছলে।
কুমুদধবল চটুল শফরী লীলাবিলসিত সে তটিনীর
দৃষ্টি সরাগ ব্যর্থ কোরো না হয়ে যেন তুমি অযথা ধীর।
বেতসশাখারে পরশ করিয়া গম্ভীরা চলে ক্ষীণ স্রোতে
মনে হয় যেন খসিয়া পড়িয়া তার কটিনীবি বাঁধন হ'তে
সেই শাখা করে ধৃত হয়ে আছে তাহার সুনীল সলিলবাস
তটনিতম্ব আবরিতে নদী করে প্রয়াস।
লম্বিত হয়ে বসন হরিয়া কেমনে হে সখা ছাড়িবে তারে ?
রতিরসজ্ঞ বিবৃতজঘনা রমণীরে কভু ছাড়িতে পারে ?

বর্ষণে তব ক্ষিতিতল হবে উচ্ছ্বসিত,
তার উদ্গত গন্ধে হইবে গিরিসমীরণ বাসমোদিত,
গুরুরবে মন্দ্রিত করি সে বায়ু পিইবে করিনিকর,
স্পর্শে তাহার পাকিয়া উঠিবে উডুম্বর,
এ শীতবায়ুর পরশ পাবে,
মন্দ মন্দ বহিয়া সেবিবে দেবগিরিশিরে যখন যাবে।
হেথা কুমারের চির দিবসের নিবাসভূমি,
কামরূপ ঘন ধরিও হেথায় পুষ্পমেঘের রূপটি তুমি।
ব্যোমগঙ্গার সলিলে সিক্ত করিয়া পুষ্পবৃষ্টি দান।
হেথা স্কন্দের করায়ো স্নান।
সূর্যাতিশায়ী স্বতেজ শম্ভু সম্ভৃত করি' বৈশ্বানরে,
সৃজিলেন এই স্কন্দে একদা ইন্দ্রসেনার রক্ষা তরে।

এই কুমারের ময়ূরটিরে
আদর না করি' হ'তে দেবগিরি যেও না ফিরে।
প্রভাবলয়িত চন্দ্রক যদি স্বতই ইহার খসিয়া পড়ে,
কমল ফেলিয়া উমা তবে তাহা কর্ণে ধরে,
তনয়ের প্রতি স্নেহবশতঃ।
ইহাতেই বুঝ এই শিখীটিরে হৈমবতীর আদর কত।
হরললাটের চন্দ্ররুচি
ইহার নেত্রদুটিকে করেছে শুভ্রশুচি।
গিরিকন্দরে প্রতিধ্বনিত মন্দ্রতালে
নাচাইয়া যেও সেই শিখীটিরে বিদায় কালে।
কুমারে আরাধি চলিবে যবে
সিদ্ধমিথুন তব পথ হতে সরিয়া র'বে।
ভয় যে তাদের,—পাইয়া পরশ জলকণার
পাছে ভিজে যায় বীণার তার।
রন্তিদেবের গোমেধযজ্ঞকীর্তি যেন বা মূর্তিমতী
হয়েছে ধরায় চর্মণ্বতী স্রোতস্বতী।
অবনত হয়ে এই নদীটিরে প্রণাম করি'
যেও পুন নিজ পন্থা ধরি'।

দামোদর-দেহকান্তিচোর হে ঘনবর,
নামিবে যখন নদীর 'পর,
পরশ করিতে তাহার শীতল পুণ্যবারি
তোমারে হেরিবে দলে দলে যত বিষ্ণুভক্ত গগনচারী।
চর্মণ্বতী-বারির প্রবাহ যদিও পীন
অতিদূর হতে মুক্তাগুণের মতন লাগিবে পরিক্ষীণ;
ধরার কণ্ঠে এক লহরীর হারের মতন নদীসলিল,
তার তোমা তারা হেরিবে যেন বা মধ্যমণিটি ইন্দ্রনীল।
তার পর তুমি যাবে দশপুরে যেথা দশপুর-অঙ্গনারা
ভ্রূলতাবিলাসে পরম নিপুণা তোমা পানে চেয়ে রহিবে তারা
নয়নপক্ষ্ম উন্নয়নে তা লভিবে কৃষ্ণসারের ভাতি
দৃষ্টি তাদের কুন্দবৃষ্টি-অনুসারী যেন অলির পাঁতি।
তোমারে হেরিতে কুতূহলিনী তারা তুমি যে তাদের পরম প্রি
স্বকীয় দেহকে করিও তাদের দর্শনীয়।

গ্রীষ্ম

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

আর তো বাঁচি নে প্রাণে, বাপ, বাপ, বাপ,।
বাপ, বাপ, বাপ, এ কি, গুমটের দাপ॥
বিষহীন হোয়ে গেল, বিষধর সাপ।
ভেক তার বুকে মুখে, মারিতেছে লাফ॥
বলিতে মুখের কথা, বুকে লাগে হাঁপ।
বার বার কত আর, জলে দিব ঝাঁপ॥
প্রাণে আর নাহি সয়, তপনের তাপ।
শূন্য হোতে পড়ে যেন, অনলের চাপ॥
বিকল হোতেছে সব, শরীরের কল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

জীবনকাহিনীর কয়েকটি পাতা

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

গত ১৩৬০ সনের ফাল্গুন সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে আমার "জীবনকাহিনীর কয়েকটি পাতা"র এক অধ্যায় সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে যে বিবরণ দিয়েছিলাম তা' ছিল বিজলীর দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কাহিনী। তাতে আমি প্রকাশ করি যে, বিজলীর আদিপর্ব্বের ফাইল আমাদের কারও কাছে নাই। ফাল্গুনের বসুমতীতে এই খবর পেয়ে আমাদের নারায়ণী ও প্রথম বিজলী যুগের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহচর চন্দননগরের শ্রীরামেশ্বর দে তাঁর দুর্ল্লভ সংগ্রহ থেকে আমাকে প্রথম দুই বৎসরের বিজলী দিয়ে গেছেন। আমার জীবন-কথা লিখতে গিয়ে রামেশ্বর এ রকম বহু বার আমাকে তাঁর পুঁথি-সংগ্রহ থেকে উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেছেন; প্রয়োজন মত তাঁরই কাছে আমি একদিন শ্রীঅরবিন্দ-সম্পাদিত ধর্ম্ম ও কর্ম্মযোগীনের ফাইল পেয়েছিলাম।

কাজলঘন কালো মেঘের মেয়ে বিজলীর ইতিহাস সম্পূর্ণ করতে হলে তার আদ্য কথা দিয়ে এ-কাহিনী পূর্ণাঙ্গ করা প্রয়োজন। রামেশ্বরের সংগ্রহ থেকে দেখছি ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা বিজলী প্রকাশিত হয় ৪ঠা অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩২৭ সালে। রেখায় অঙ্কিত ধরিত্রীমণ্ডল, তার মধ্যে ঘন কৃষ্ণবর্ণে ভারতের মানচিত্র। তার গায়ে বিচ্ছুরিত বিদ্যুল্লতার চমকে আঁকাবাঁকা আখরে লেখা "বিজলী" নামটি। এই ছিল আমাদের ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত এই যুগান্তরকারী কাগজের বাহ্য রূপ।

আমার মনে পড়ে, নারায়ণের লেখক ব্যঙ্গরসিক সুগায়ক শ্রীনলিনীকান্ত সরকারকে আমি পত্র দ্বারা আমন্ত্রণ করে আনি এবং তাঁকে বিজলী সম্পাদনের ভার দিই। ১৯২০ সালের ২০শে ডিসেম্বর আমরা আলিপুর বোমার মামলায় প্রথম মুক্তিযোদ্ধার দলটি আন্দামান থেকে বার বৎসর নির্ব্বাসন ভোগ সমাপ্ত করে 'মহারাজা' জাহাজে দেশে ফিরি। এ কাহিনী ফাল্গুনের মাসিক বসুমতীতে চুম্বকে বলেছি, আরও বিশদ করে বলেছিলাম ডি এম লাইব্রেরী প্রকাশিত 'বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী'র পাতায়।

১৯০৩ সালে বাংলার ভাবঘন মাটিতে সশস্ত্র বিপ্লবের নিঃশব্দে বীজ বপন ঘটেছিল ভারতের তখনো প্রায় অজ্ঞাত-কুলশীল মুক্তিঋষি শ্রীঅরবিন্দের দ্বারা। ১৯০৬ সালের গোড়ায় ভারতের প্রথম বিপ্লবী সাপ্তাহিক "যুগান্তর"-এর আত্মপ্রকাশ এবং তার প্রায় ১৬ বৎসর পরে ১৯২১ সালের শেষে আর এক সমাজ-বিপ্লবের সাপ্তাহিক "বিজলী"র চমকপ্রদ আত্মপ্রকাশ! দু'দু'বার এমনি করে বাঙ্গালী দেখিয়েছে একটি গোটা উপমহা-দেশের একাদশ শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতার শৃংখল-মোচন সংগ্রামে কি ভাবে তুচ্ছ লেখনী অসি ও এটম বোমার কাজ করতে পারে। শক্তিরূপা সরস্বতী যে কত বড় যুগবিপর্য্যয়কারিণী শক্তির দেবতা, ভাবুকের হাতের লেখনী যে, তরবারি ও অগ্নি-গোলককেও সংহার-শক্তিতে হার মানায়, তা' দু' দু' বার বীণাপাণির বরপুত্র বাঙালী জাতি হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিয়েছে।

"বিজলী"র প্রথম জন্ম হয় ৪এ মোহনলাল ষ্ট্রীটের দ্বিতলের বাড়ীটিতে। সেখানে তখন এই সব আয়োজনের জন্য আন্দামান ফেরৎ বহু সহকর্ম্মী একত্রিত হয়েছেন। আমি, আমার দিদি সরোজিনী ঘোষ, সস্ত্রীক উপেন, বিভূতি সরকার, বীরেন সেন, বিধুভূষণ দে, এমনই অনেকে। এই ৪এ মোহনলাল ষ্ট্রীটের সামনেই বিজলী কার্য্যালয়ের সংযোগে প্রথম আর্য্য পাবলিশিং হাউসের জন্ম। পরে আমরা পণ্ডিচারী আশ্রমে চলে গেলে এই আর্য্য পাবলিশিং হাউস্ সমস্ত প্রকাশিত পুস্তকাবলীসহ শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অধীন করে দেওয়া হয়।

প্রথম পর্য্যায় "বিজলীর" রূপ ছিল অভিনব। প্রথম পৃষ্ঠায় প্রতিদিন "কাল বৈশাখী" নামে একটি উদ্দীপক লেখা থাকতো। প্রথম সংখ্যায় এই শীর্ষক লেখাটির মাঝে সমসাময়িক আইরীশ হোমরুল, নানা দেশসেবকের কারাদণ্ডের খবর প্রকাশিত হয়; তার সূচনায় ছিল—"জগত ভরে ঝড়ের মাতন উঠেছে। কপালের ত্রিনেত্রে আগুন জ্বেলে ভাঙনের রুদ্র নাচছেন—

"ধিনি ধিনি ধাঁউ   তানাউ তানাউ
তাথেনে তাথেনে থা"

কেউ বলবে যুগ পাল্টে গেল, বুঝি প্রলয় এলো। আমরা বলি প্রলয় কি সৃষ্টির রূপ নয়? শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—

"লোকে বলে য়ুরোপ ধ্বংসের পথে ধাবিত। আমি তাহা মনে করি না। এই যে বিপ্লব, এই যে ওলট-পালট, এ নবসৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা।" য়ুরোপের বিদেশী মেঘ ভারতের আকাশেও হানা দিচ্ছে, এর ফল কি হবে তা' সৃষ্টির ঐ ঠাকুরটিই জানেন।

তার পর ৩ পৃষ্ঠায় "বিজলী"র মাথায় বড় অক্ষরে থাকতো—"যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্"। তার ঠিক নীচে প্রথম সংখ্যায় পাই—

"শূন্য পথে প্রথম প্রয়াণ,
    শূন্যতার গান।
শূন্যের বাজিল শূন্য বুকে,—
দৃষ্টি নাই গতি নাই স্থিতি নাই তার।
তিমিরে তিমির ছিল ঢেকে,
সহসা ভাঙিল অন্ধকার।
আকাশ পরিল ও কি হার?
শূন্য পথে চলে এঁকে বেঁকে?
এস গো বিজলী, তুমি,
অশ্রুসিক্ত কর্ম্মভূমি,
থাক তুমি, রাখ তুমি সুখে।   প্রসাদ

এই প্রাণমনঝরা কবিতাটির পর আমার স্বাক্ষর করা সম্পাদকীয় লেখাটি সবটুকু উদ্ধৃত করার যোগ্য।

"রাধা বেরিয়েছিল কানুকে পেতে। তার পথে ছিল কালো মেঘ, ঝড়, নিশুতি রাত—আর কত দুর্য্যোগ। কিন্তু পথ দেখাচ্ছিল প্রাণঘাতী চিকুমিকে বিজলী, কালো মেঘের বুক চিরে চোখ ধাঁধিয়ে আলোর আগুন দিয়ে পথ দেখিয়ে রাধাকে কানুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল বিজলী।

দেশের প্রেমে আমরাও বেরিয়েছি মুক্তিধন পেতে। এও

প্রেমের পথ—কলঙ্কেরও পথ। এ পথেও কালো কালো বিপদের মেঘে আশার বিজলী হানে। সেই বিজলীর আলোয় আমরা পথ দেখে চলি।

যেখানে কালো মেঘ, সেইখানে দামিনী, যেখানে আঁধার, তারই গায়ে আলো। কালোর গায়ে আলোর বড়ই শোভা, তাতে কালোও মিশকালো দেখায়, আলোও মাধুরীতে প্রাণ কেড়ে নেয়।

বিজলী আকাশের বাজ—মানুষের মরণের ঘর। সেই আগুনের হল্‌কা—সেই মরণই জীবনের পথ দেখায়। প্রেমের পথে মরণই শরণ দেয়। যে বাজ রাজভীরু মানুষের মরণ, তাই হয় সাহসী দেবতার হাতের অস্ত্র।

শক্তির স্বভাব তাই, রাখেও বটে, মারেও বটে। তলোয়ার কাটে, আবার বাঁচায়। যে আগুন লঙ্কাদাহ ঘটায়, সেই আগুন ভাত রাঁধে, সেই আগুন শীতে সুখ দেয়। বিজলী আকাশ থেকে বাজ হানে, মানুষ মারে, আবার কালো রাতে পথ দেখায়, গাড়ী টানে, খবর নেয় দেয়, পাখা ঘোরায়—কি সেবাই না মানুষের করে!

আমাদের এ বিজলী এক দেহে হরিহর, পুরান ভাঙ্গবে, নতুন গড়বে। শিব হয়ে নাচবে, বিষ্ণু হয়ে ক্ষীরসাগরে ভাসবে। এ মরণ-শরণ বিজলী তোমাদের ঝিকিকে ঝিকিকে পথ দেখাবে। মন-বাদল চিরে পরম জ্যোতির জৌলস নিয়ে চমকে যাবে।

বিজলী ঝলকে—
সে রূপ-আলোকে
পুলকে শিহরে "জীবন।"

আঁধারকে ভয় করো না, শক্তির লীলার যুগে আঁধার জমাট বেঁধে আসে—তাই মা আমাদের শক্তিরূপিণী কালী তামসী—তাই সে কালো। আঁধার চারিদিক ঘিরে যত মিশ-কালো হবে, তত জেনো শক্তির দামিনী তার বুকে সাজবে ভাল, আলোর চঞ্চল সাতনরী হার হয়ে দুলবে খাসা। যত তোমার জীবন দুঃখ ব্যথা অপমান দারিদ্র্যের রোগে নাড়ায় ঘিরবে, ততই বুঝবে এ আঁধার কেটে যে আলো আসছে তা' সেই অনুপাতে তত অমল ধবল—ততই আঁধারনাশী।

বিজলী বৈকুণ্ঠের মেয়ে, তোমাদের দুঃখে কালো মেঘের আঙিনায় নাচতে এসেছে। এ যুগ-রাত্রির পর নিশিভোর আসছে, কালবৈশাখীর পর দয়ার—ভাগবতকৃপার তাপহারী বর্ষা আসছে, বিজলী তাই বলতে এসেছে। যুগকৃষ্ণের বাঁশী শুনেছ কি? শুনে থাক, এসো; যুগধর্ম্মের পথে কুলমান ভাসিয়ে অভিসারে এসো, বিজলী আলোর ঝলকে পথ দেখাবে, কৃষ্ণ মিলাবে।

এবার রাসমণ্ডলে সবাই আছে; রুষ, জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইংরাজ, চীন, জাপান, ভারত কেউ বাকি থাকবে না। বিজলী এবার ভারতের বুক চিরে বেরিয়ে দুনিয়ার কালো মেঘে খেলবে, জগৎকে কৃষ্ণপথে ডাকবে, তাই এ কানুর গলার সাতনরী হার এবার দূতী হয়ে এসেছে।

যুগধর্ম্মের বাজ ডেকেছে, গুরু-গুরু-গুরু কড়-কড়-কড় রবে দশ দিক কাঁপিয়ে শিবতাণ্ডব রচেছে। বিজলীর গালভরা হাসি আকাশ-বাচা তন্তু তোমাদের প্রেমের বর্ষায় স্নান করে জুড়াতে ডাক দিয়েছে। জ্বাল জ্বাল এই আঁধারে প্রেমের দীপালী জ্বালো! তোমাদের আলোর মালা ম্লান করে যুগের উষা আসুক।

বিজলী তোমাদের বুকের মাঝে নাচবে, অন্তর-পথ আলোয় ধাঁধিয়ে চিরদিন থাকবে। তাতে জীব শিব হবে, মানুষ দেবতা হবে। বিজলী তোমাদের চোখে হাসবে, সে আগুন চোখে ধরে তোমরা জগৎকে টানবে; তোমাদের বাহুতে বিজলী কালীর ভর আনবে, তাতে তোমরা জগজ্জয়ী হবে। তাই বলি বিজলীকে জীবনের দূতী কর।

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

তার পরে প্রথম সংখ্যায় পাই "নারায়ণের ডিগবাজী।" নারায়ণের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বুক থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য আর পা থেকে শূদ্রের সৃষ্টি হ'লো। এত দিন বামুন ভায়ারা নৈবেদ্যের সন্দেশের মত মাথায় বসে মজাটা লুটছিলেন। * * * কিন্তু কালের গতিকে নারায়ণ এবার প্রকাণ্ড একটা ডিগবাজী খেয়েছেন। শূদ্র আজ সবার মাথায় উঠে পড়েছে—আর তাকে থামায় কে? জগৎজোড়া আজ এই শূদ্রের দাপে সব ওলটপালট হতে বসেছে। * * কত ক্ষাত্র, কত কাইজার আজ শূদ্রশক্তির তরঙ্গাঘাতে কোন্ অতল তলে ভেসে গেল। বামুন ভায়া এখন পুঁথির গাদায় আশ্রয় নিয়েছেন, ক্ষত্রিয় এখন তরবারি ছেড়ে লাঙ্গলের সন্ধানে ঘুরছেন। বৈশ্যের বাণিজ্যের লাভের গুড় আজ শূদ্র-পিপীলিকায় আত্মসাৎ করতে বসেছে। * * * ভারতের শঙ্কাহরণ মৃত্যুতারণ অমিয় মন্ত্রের প্রচার আজ আবশ্যক।

১৯২১ সালের বিজলীর এই সব কথা—এই সব ভবিষ্যদ্বাণী এখনও খাটে; এখনও চলছে চাতুর্বর্ণের ওলটপালট আর ভারতের সেই বিস্মৃত শঙ্কাহরণ মৃত্যুতারণ অমিয় মন্ত্রের সন্ধান। "জগদ্ধাত্রী পূজা" এই প্রথম সংখ্যার অনুপম লেখা। এই সব সোনার আখরে অনুপম ভাবের লেখার পরিচয় দিতে গেলে এক বিরাট গ্রন্থ হয়ে যায় যে! লেখাটির মাঝখান থেকে উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করা কঠিন।

"কৃষ্ণপক্ষের কালো ছায়া জোৎস্নার সেই সুখের ছবিকে মুছে দিল। অমানিশার ঘোর আঁধারে আজ চারি দিক ঢাকা—ভীষণ শ্মশান, ভূত-প্রেতের অট্ট অট্ট হাস, অমাবস্যার ভয়ঙ্কর রাত্রি—এই ভীমকান্ত বীভৎস দৃশ্যমাঝে চামুণ্ডা, মুণ্ডমালিনী বিবসনা, করালবদনা, এলোকেশী শাণিত অসি হাতে মহাকালের বুকে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। আজ কে মায়ের পূজা করবে! আজ জাতির এই বিরাট শবদেহে কে সাধনা করতে বসবে! * * রুধিরে রাঙা করাল অসির শব্দে মায়ের গান জেগে উঠলো, নব মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সাধক গাইলেন—

মা আমাদের দয়াময়ী—মা আমাদের সর্বনাশী;
ভালবাসি আমরা মায়ের বরাভয় আর অট্টহাসি।
পুণ্যপাপের ধার ধারিনে ভয় করিনে দুঃখরাশি;
মা যে মোদের দয়াময়ী, মা যে মোদের সর্ব্বনাশী।
কান্ত কোমল শান্ত যাহা
তোমরা বাঁটি লও গো সবে;
আমরা লব কঠিন কঠোর—
বীভৎস যা' রুদ্র ভবে।

কর্ম্ম মোদের ধর্ম্ম জানি, ধর্ম্ম জানি সংযমেতে,
হৃদয়-শোণিত ঢালতে পারি ষড়রিপুর তর্পণেতে !
ছিন্ন করি কণ্ঠ নিজের প্রস্রবণের উষ্ণধারে
হৃদয় ভরে স্বার্থ-শোণিত পিয়াব মা অধিকারে।
চামুণ্ডার ভীম তাণ্ডবেতে শাক্ত মোরা হর্ষে ভাসি,
মা যে মোদের দয়াময়ী, মা যে মোদের সর্ব্বনাশী !

১৯২১ এর এই "বিজলী" মায়ের যে সর্ব্বনাশী রূপের আবাহন করেছিল তা' তোমরা দেখেছ হিন্দু-মুসলমানের মুক্তি-তাণ্ডবে এই রাজধানীর পথে-ঘাটে। এখনও আরও নিকষ কালো হয়ে আসছে সেই ঘোরা তামসী রাত্রি, এখনও মা বিবসনা মহাকালের বুকে এসে তেমনি দাঁড়িয়ে নাই কি ? "বিজলী" ছিল আঁধারের বুক চিরে চিরে ভবিষ্যৎ দেখাবার চোখ-ধাঁধানো আলো। এখনও এই জগতের মহা দুর্দ্দিনে কালো মেঘের মেয়ে বিজলীর আলোর অঙ্গুলিসঙ্কেত চাই। এখনও মানুষ যে পথভ্রান্ত।

যখন ১৯২১ সালে নভেম্বর মাসে ৪এ মোহনলাল ষ্ট্রীটের জাহাজ-মার্কা বাড়ীতে আকাশের মেয়ে বিজলীর জন্ম হ'লো, তখন এই সমাজ-বিপ্লবের উল্কাটিকে ঘিরে আর্য্য পাবলিশিং হাউস রূপ নিচ্ছে, পণ্ডিচারীতে চলছে শ্রীঅরবিন্দ, মাদাম মীরা ও পল রিশারের সম্পাদনায় "আর্য্য", তার বিজ্ঞাপনে বিজলীর প্রথম সংখ্যায় এই গভীর জীবন দর্শনবাদের কাগজখানির ছিল পরিচয়—

The Arya is a Review of pure philosophy. The object which it has set before itself is twofold—

1. A systematic study of the highest problems of existence.

2. The formation of a vast synthesis of knowledge harmonising the diverse traditions of humanity occidental as well as oriental. Its method will be that of a realism at once rational and transcendental, a realism consisting in the unification of intellectual and scientific disciplines with those of intuitive experience.

"আর্য্য" হইতেছে নিছক অধ্যাত্মদর্শনের পত্রিকা। দুইটি লক্ষ্য সম্মুখে লইয়া আর্য্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

(১) জীবনের উচ্চতম সমস্যাগুলির ধারাবাহিক আলোচনা।

(২) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন ধর্ম্ম-মতবাদের সমন্বয়ে এক বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের সৃষ্টি। ইহার প্রণালী হইবে বাস্তবের যুক্তি ও কার্য্যকরী জীবন এবং তাঁহার অতিপ্রাকৃত অধ্যাত্ম দিকটি; যুক্তিবিচার ও বৈজ্ঞানিক সীমার সহিত বুদ্ধির অতীত প্রজ্ঞাদীপ্ত জ্ঞানের সমন্বয় সাধন।

এই "আর্য্য" পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের গভীর যোগদর্শনের লেখাগুলি আজ পণ্ডিচারী আশ্রম হইতে ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে-দেশে প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকদের মাধ্যমে বিশ্বের চিন্তা ও জ্ঞানভাণ্ডারে অপূর্ব্ব সম্পদ সঞ্চয় করিয়াছে। সে পর্য্যা জ্ঞান এই ভারত তপোভূমি দীপ্ত করিয়া ক্রমে যুরোপ ও আমেরিকায় মানস-লোক উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে। এই ভাবে স্থূল লোকচক্ষুর অগোচরে নূতন এক পৃথিবী জন্ম লইতেছে।

নলিনীকান্ত-সম্পাদিত আদি পর্য্যায়ের বিজলীর দ্বিতীয় ২১শে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'কাল বৈশাখী' স্তম্ভে লেখা ছিল—

প্রেত ভাগ সানুরাগ
লম্ফ-ঝম্ফ ঝাঁকিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল
চৌদ্দ লোক কাঁপিছে।

এই কাল বৈশাখী পুরানোকে ভাঙবে, নূতনকে গড়বে। দক্ষযজ্ঞ নাশ করতে কালভৈরবের সঙ্গে প্রেতদল নেমেছে। ইউরোপ ভরে ভাঙনের গান আর ভারত ভরে রচনার গান। তাই হো হবে, কারণ ভূতে যজ্ঞ ভাঙে আর ভূতনাথ নামে ভোর হয়ে নাচতে নাচতে গড়ে—

যজ্ঞ-গৃহ ভাঙি কেহ
হব্য-কব্য খাইছে।
উৰ্দ্ধহাত বিশ্বনাথ
নাম-গীত গাইছে।

প্রলয় আসে আসুক, তোমরা অমৃতের ছেলেরা কিন্তু ভুলো না—অমৃতের ঋষি অরবিন্দের পথ যে তোমাদের পথ। তিনি লিখেছেন (পণ্ডিচারীর পত্রে)—"আর্য্য জাতির সে উদার বীর যুগে এত হাঁকডাক নাচানাচি ছিল না; কিন্তু তারা যে চেষ্টা আরম্ভ করতো তা' বহু শতাব্দী ধরে টিঁকে যেতো।" যারা নিজের বুকের ঘুমন্ত শিবকে জাগাবে, সেই মানুষই দেশকে তুলবে। কাল বৈশাখী সব পুরানো ভেঙে-চুরে তোমাদের মায়ের নাচবার শ্মশান জাগাবে, সেই রাঙা পায়ের নাচে আবার নূতন সৃষ্টি সাজবে। শোন, কাল বৈশাখীর ঝড়ের মাতন শোন···

তার পর আয়র্লণ্ডের সিনফিনের খবর, রসোপোলিশ লড়াইয়ের খবর, এনভার পাশা ও কামাল পাশার খবর ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যা বিজলী পরিবেশন করেছিল। প্রতি সংখ্যায় এমনই "কাল বৈশাখী" স্তম্ভে থাকতো দুনিয়ার ভাঙা-গড়ার হিসাব ও হদিস। সে যুগের এই সব জাতি-সংগঠক সংবাদপত্র প্রাণহীন পেশাদারী কাগজ ছিল না।

ঐ সংখ্যায় "কাল বৈশাখী"র পাশেই দেখতে পাই পাত্র আবশ্যক বলে একটি বিজ্ঞাপন, সে বিজ্ঞাপনও অভিনব!—

"মেয়েটি বার বৎসরে বিবাহ হইয়া তেরয় পা দিয়া বিধবা হইয়াছে। জাতিতে বৈদ্য। যাহার সহিত বিবাহ হয়, তাহার ছিল দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি, পিতামাতা তাহা গোপন করিয়া রাখেন। মা-বাপের আদরের কন্যা স্বামী কি ধন বুঝিল না, এই বয়সে তার ভরা আনন্দের হাটে আগুন লাগিয়া গেল। কোন সহৃদয় সুশিক্ষিত বৈদ্য যুবক এই কন্যারত্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে ৪।এ মোহনলাল ষ্ট্রীটে, নারায়ণ অফিসে সন্ধান লউন।"

বুঝা গেল আমাদের পরিচালনায় তখনও দেশবন্ধুর "নারায়ণ" চলিতেছে। ২য় সংখ্যা বিজলীতে দুইটি প্রবন্ধ দেখিতে পাই, প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধ—"ষোল আনা খুইয়ে কাণাকড়ি", আর

দ্বিতীয় প্রবন্ধ—"মানুষ মারা কল—ধর্ম্মের শীলমোহর"। কি নিদারুণ বর্শাঘাত সে দিনের বিজলী করতো বস্তা-পচা ধর্ম্ম-পচা হিন্দুর পৃষ্ঠে তার নমুনা একটু দেওয়া যাক—এই "ধর্ম্মের শীলমোহর" থেকে। বিজলী লিখছে—"আমাদের মনে যখন জাত বড় হয়, বর্ণ-গোত্র বড় হয়, নিয়ম-কানুন বড় হয়, তখন ভূতের পূজক হয়ে পড়ি। মানুষ'ক ঠেঙিয়ে বেঁকিয়ে তুবড়ে তাবড়ে জাতে গোত্রে নিয়মে পরিণত করি। ফলে মানুষের দফা গয়া হয়ে যায়, তার জায়গায় জেতো ভূত মানুষের মুখোস পরে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে"।

আন্দামানের জেলে আমার গলার তক্তিতে ছিল ৩১৫৪১ এই নম্বর, জেলখানায় আমি বারীন ঘোষ ছিলাম না, ছিলাম ঐ নম্বর। তারই উল্লেখ করে "বিজলী" লিখছে—"এ রকম মানুষ মেরে নম্বর গড়া যে কেবল ইংরেজের কয়েদখানায় হয়, তা' নয়। ধর্ম্মের কয়েদখানা, সমাজের কয়েদখানা, নীতির কয়েদখানা, যত রাজ্যের কয়েদখানায় ঐ একই নিয়ম। * * আমার বাপ-দাদা কে কবে ব্রহ্মকে জেনেছিলেন তার কুলুজি কুষ্ঠী হারিয়ে গেছে; কিন্তু আমি তারই জোরে আজও পাদোদকের ব্যবসা করি। আর ব্রহ্মজ্ঞ রুহিদাসের বংশধর ঐ বেটা মুচীর মাথায় পা তুলে দিলে আমায় চান করতে হয়।

* * * ভগবান শ্রীচৈতন্যরূপে আচণ্ডালে কোল দিলেন, গোঁসাই বাবাজীরা কিন্তু তখনই তার একটা রবার ষ্ট্যাম্প করে কাছায় লুকিয়ে রাখলো। যেই মহাপ্রভুর তিরোভাব, অমনি হরিনামে ষাঁড় দাগার পালার আবির্ভাব। * * * যদি বল 'তোমরা সব যে নর-নারায়ণ হে'; অমনি আর রক্ষা নাই। যিনি বললেন তাঁর 'চন্নামিত্তির' খেয়ে খেয়ে সব দেবতা হয়ে বসে গেল, আর উঁচু বেদী থেকে নাক সিঁটকে কৃপার চোখে মানুষকে আশীর্ব্বাদ করতে লাগলো। ভক্ত অন্তরঙ্গ সিদ্ধ আধসিদ্ধের হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সেই এক কর্ত্তা এসেই যা পতিত তরিয়ে গেলেন, তার পর কর্ত্তাভজারা সব সুরু করলেন, শীলমোহরী ছাপকাটার রাজ্যি, ভাবের নেড়ানেড়ি, ভেকধারী দেবতার hierarchy। * * * যে ভগবানকে ডাকার এত আয়োজন যোগ যাগ কীর্ত্তন ভজন, সে বেচারা কিন্তু পিঁপড়ের মত সারে সারে ভাঙা চোর; মানুষ গড়েই চলেছে। কারু কথা শোনে না, কোন রবার ষ্ট্যাম্প পেটেণ্ট মার্কা মানে না। ক্রমাগত আপন মনে মাটি কাদা দিয়ে নিজের মাধুরীকে রূপ দেয়। তাই কাদার তালে এমন দেবতা আজ অবধি কোন কুমোরেই গড়েনি। * * * তাকেই বলবো অবতার যে দেখিয়ে দেবে যে জগৎভরা অবতার কিলবিল করছে।"

বিজলীর সব লেখাগুলিই এমনই প্রাণঝাড়া কোন্‌টিকে ফেলে কোন্‌টিকে উদ্ধৃত করি। "সমাজের টোপা পানা" মনে হয় উপেনের লেখা—

"জাতির জীবনের পুকুরটিতে আমরা টোপা পানার মত ভেসে বেড়াচ্ছি। টোপা পানারই মত আমাদের মাটির সঙ্গে যোগ নেই। তাই আমরা হাওয়া লাগলেই ভেসে ভেসে সরে যাই। দেশের জীবনে যে কি সুন্দর কালো জল থৈ থৈ করছে তা দেখতে গেলে আমাদের সরাতে হয়। * * * আমরা টোপা পানার দল যে পুকুরটি ছেয়ে আছি।

ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য আমরা বড় জাত * * * কিন্তু গুণে দেখলে আমরা ১০০ জনের মধ্যে ১৩জন বই তো নয়। শতকরা ১৭জন "চাষা"—পাড়াগাঁয়ে ভূত—শতকরা ৫৬ জনের জল চলে না—অস্পৃশ্য জাতি, তবে সমাজের কাছে নলচে আড়াল দিয়ে তাদের সঙ্গে অবৈধ যৌন সম্বন্ধে "ছুত" দোষ নেই। আমরা টোপা পানার দল দেশ শুদ্ধ লোককে একঘরে করে বসে আছি।

"কোন্ পথের পথিক" লেখায় শ্রীঅরবিন্দকে নিজের দলে টানবার জন্য নরম গরম আর ঈষত্তুষ্ণ দলের মধ্যে তে-কোণা যুদ্ধের মুখরোচক ব্যঙ্গ আছে। ২য় সংখ্যাটির শেষে আছে উপেনের উপভোগ্য "উনপঞ্চাশী"।

—পণ্ডিত ঋষিকেশ ও ক্যাবলার কথোপকথন। হাঁপাতে হাঁপাতে ক্যাবলা এসে তামাক সেবনে রত পণ্ডিত ঋষিকেশকে খবর দিল—যদু পোদ্দারের ভাইপো এমন একটা কল বানিয়েছে * * * এক দিক দিয়ে তুমি তাড়া করে এক পাল গরু সেই কলের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। খানিক পরে দেখবে ও-মুখের নলগুলো দিয়ে বেরুচ্ছে—দুধ, দই, ছানা, ঘি, মাখন, কাঁচাগোল্লা, চটিজুতো আর সিঙের চিরুণি। হুঁকোয় খুব একটা দমকা টান দিয়ে নাক দিয়ে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে পণ্ডিত হৃষিকেশ বললেন—এ আর তুই বেশি কি বললি, ক্যাবলা? * * আমি তো চারিদিকে ঐ রকম কল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছিনে। আচ্ছা এই ধর—যদু-নন্দন কোম্পানীর পেটেণ্ট ব্রহ্মচারিণী তৈরীর কল। একটা বিধবা বা বা সধবা মেয়েকে ধরে তার নাক চুল কেটে গয়নাগুলো কেড়ে নিয়ে ঐ কলের মধ্যে ফেলে দাও—দিন কতক পরে ঐ কল থেকে হয় একটা ত্রিশূলধারিণী ভৈরবী নয় একটা যক্ষাকেশো ব্রহ্মচারিণী বেরিয়ে আসবে। তার পর ধর কল নং ২—পতিব্রতা তৈরীর কল। খুব ছেলেবেলায় একটা কচি কাপড়ে-হেগো মেয়েকে ঘোমটা দিয়ে সাত পুরু মুড়ে ঐ কলের মধ্যে ফেলে দাও, মাঝে মাঝে কেবল এক এক খানা গয়না ছুঁড়ে ঐ কলের মধ্যে ফেলে দিও। দেখবে বছর কতক পরে একটা খাসা নথ-নাকে মিশি-দাঁতে, ঝাঁটা-হাতে সীতা সাবিত্রী তোমার ঘর উজ্জ্বল করে দাঁড়িয়ে আছে।

এ সব না হয় সেকেলে মিস্ত্রীর গড়ন, তা' বলে আজকালের মিস্ত্রীরাও ফেলা যান না। ঐ আমাদের আশু মিস্ত্রী এমনি কল বানিয়েছে যে তার মধ্যে খানকতক সরকারী ছাপমারা বই ভরে দিয়ে একটা গাধা হোক, ঘোড়া হোক, ভেড়া হোক, যা' হোক একটা তার মধ্যে পুরে দাও, বছর কতক না যেতে যেতেই কলের ও-মুখ থেকে একটা M. Sc., B. Sc. বেরিয়ে আসবেই আসবে। এ কি কম ওস্তাদি, বাবা!

তার পর আমাদের টেক্স্‌ট বুক কমিটি। রায় বাহাদুর তৈরী করবার কি কলই না বানিয়েছে। একটা ছোট ছেলেকে ধরে দীনেশ বাবুর রাজারাণীর ছবিওয়ালা বইগুলোর খান কয়েক পাতা দিয়ে তাকে মুড়ে ঐ কলের মধে ফেলে দাও—একেবারে মাথায় সামলা আঁটা একটা রায় বাহাদুর, না হয় রায় সাহেব সেখান থেকে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে আসবে।

আর সব চেয়ে বড় কল হলো তোমার গুজরাটের পেটেণ্ট মনু-কৌড়ি-পায়ের কল। বিনা কড়িতে এই অকূলে কূল পাবার

খবর বলছি

আশরাফ সিদ্দিকী

খবর লিখছি
খবর লিখছি
অনেক খবর ! অনেক রকম আজগুবি আর
ধারকরা
আর মনগড়া
আর আন্‌কোরা
অনেক অনেক অনেক খবর গালভরা !···
খবর লিখছি—
খবরের পাতা শেষ হ'য়ে যায় !
ক্লান্ত নয়ন শ্রান্ত শরীর ভেঙে যেতে চায়
ক্ষুধায় জঠর জ্বলে যেতে চায়—
দশটা-ছটার পাষাণ-কারায়
খবর ! খবর ! খবর লিখছি !
রক্ষপুরীর যক্ষের মত খবর গুণছি !···

হিল্লি-দিল্লী মক্কা-মদিনা লণ্ডন্ থেকে খবর আস্‌ছে
চোখের সমুখে দুনিয়া ভাস্‌ছে
কোন গোলার্দ্ধে কাহারা কাশ্‌ছে হাস্‌ছে
শাস্‌ছে

খবর আস্‌ছে
খবর লিখছি !···
উজির নাজির আমির হাকিম ডিনার খাচ্ছে
হুজুরের কিবা শরীর যাচ্ছে
হলিউডে কোন তারকা নাচ্ছে
খবর আস্‌ছে
খবর লিখছি !

কোথায় কখন কোন্ সে নেতার কথার ধমকে
মাইক্ ফাট্‌লো
আমিরী সফর কেমন কাট্‌লো
কয় শ' নফর কেমন খাট্‌লো
খবর আস্‌ছে
খবর লিখছি !···

খবর খবর অনেক খবর অনেক রকম আজগুবি আর
বাদশাহী
আর গালভরায়
খবরের পাতা শেষ হ'য়ে যায় !

আমার খবর ?···

আমার খবর জমবে কি শুধু পথধূলায়—
আমার খবর মরবে কি শুধু চাপা ব্যথায় ?
আমার খবর পচবে কি শুধু অবহেলায় ?
আমার খবর লেখা হ'বে নাকো আজো ?

পড়ে থাক আজ টেলিপ্রিণ্টার
আজগুবি রয়টার—
ঝুট্ বাত্ নয় ! সত্য খবর আজ ! !
সত্য কথার সহস্র আওয়াজ
সহস্রফণা নাগিনীর মত তুল্‌বে কুচ্ কাওয়াজ

আমার খবর আন্দ।

এমন যন্তোর আর হবে না। একটা ভাল দিনক্ষণ দেখে সমস্ত দিন উপোস করে সন্ধ্যার পর দু'টো বাদামভাজা মুখে দিয়ে "জয় গান্ধী মহারাজকী জয়," বলে বুড়ো জরাজীর্ণ ভারতমাতাকে ধরে ঐ কলের মধ্যে ফেলে দাও—দু'মাস না যেতে যেতেই একেবারে নবীন স্বাধীন ভারত বেরিয়ে আসবে।

সাবাস জোয়ান! এমন না হ'লে কারিগর? বহু যুগ-যুগান্তের বস্তাপচা আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম ও সমাজের এবং মাজাভাঙা পলিটিক্সের পৃষ্ঠের উপর বিজলীর ন্যায় এমন নির্ম্মম কশাঘাত আর কখনও কেউ করেছে বলে ইতিহাসে কোন নজীর নাই। আজকে-মুক্ত ভারতের এই নারী অন্ত্যজ অস্পৃশ্য ও তরুণদের মাঝে যে বিদ্রোহ ও প্রাণের জোয়ার দেখা যায় সে হচ্ছে বিজলীর দান। আজ সেই শ্বেত অশ্বে চড়া কল্কী অবতারের খাপখোলা তলোয়ার নিয়ে যদি বিজলী বা বন্দে মাতরম্ কংগ্রেসী ভারতে আর একবার দেখা দেয় তা' হলে বোধ হয় পৃথিবীর চেহারা ফিরে যাবে। পাশ্চাত্যের সাম্যবাদী লাল ঝাড়ুদারের সম্মার্জনী ওর কাছে হার মেনে যায়। যদি বসুমতীর পাঠকের ধৈর্য্য থাকে তা' হলে বন্ধুবর রামেশ্বরের দান এই "বিজলী"র আদিকাণ্ড থেকে আরও কয়েক সংখ্যার পরিচয় দেবার ইচ্ছা রইল।

ভেরা পানোভা

কেন এসেছে ও! সে কি শুধু দেখতে না বলতে—'আমি বিয়ে করতে চাই না—আমি কাউকে চাই না, আমি চাই শুধু তোমাকে'···কিন্তু একটা কথাও বলা হোলো না, দরজার পাশে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলো, মনে হোলো এখন যদি ফাইনা ওকে চলে যেতে বলে তাহলে সেই মুহূর্তেই বুঝি ও উচ্ছসিত কান্নায় ভেঙে পড়বে···

বোধ হয় ফাইনা বুঝেছিল···

—"ঈস্, আমাকে একেবারে চম্‌কে দিয়েছ তুমি, আমার তন্দ্রার মত এসেছিল···কি জানি বোধ হয় স্বপ্নই দেখছিলাম কিছু···"

কথার সঙ্গে সঙ্গে আরামের ভঙ্গীতে লীলায়িত দেহখানি আরও প্রসারিত করে দেয়—"আলোটা জ্বালো, ঐ টেবিলের উপর রয়েছে—তাক থেকে দেশলাইটা নাও, ও কি, টুপী খোলো শীগ্‌গির···এখনও শিখলে না কিছু···কি যে সব গ্রাম্য ভব্যতা!"

দানিলভ টুপীও খুললো, আলোও জ্বাললো। কিন্তু কি নিদারুণ অসোয়াস্তিতে। ও বেশ বুঝছিলো ফাইনার কাছে ওকে কেমন যেন তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর লাগছে···কিন্তু আশ্চর্য্য, পালাবার কথা তো ভাবতে পারছে না এখনও!

বিছানার উপর বসে ফাইনা ওর অবাধ্য, বিশৃঙ্খল চুলের রাশি বেণীতে বাঁধতে লাগলো। কি ছন্দ ওর আঙুলগুলিতে! কালো দীর্ঘ বেণী নিয়ে নাগিনীর মত জড়িয়ে দিলো নিজেরই বাহুতে—ঝিকমিকে সাদা দাঁতগুলি দিয়ে গোলাপী ঠোঁটের উপর চেপে ধরেছে চিরুণীটা। নিটোল উজ্জ্বল বাহু, লাল নীল ডোরাকাটা মোজার ছোট্ট একটা ফুটো থেকে উঁকি মারছে গোলাপী আঙুল।

—"অমন করে আমার দিকে চেয়ে রয়েছো কেন বল তো? কেন? আমাকে দেখতে বুঝি···আলোটা যে আড়াল পড়ছে, সরে দাঁড়াও···না, না, বসে পড়ো—"

কেমন যেন ঘুম-ঘুম নেশা-জড়ানো স্বর ফাইনার। দানিলভ বসেই পড়ে। ফাইনা একটা শাল মুড়ি দিয়ে জীর্ণ জুতোটায় পা গলিয়ে এগিয়ে আসে, তারপর নিজেও বসে পড়ে একটা চেয়ারে।
—"আমার কিন্তু একটুও অসুখ করেনি"—ফাইনার গলাটা যেন একটু গম্ভীর এবার—"তবে কি জানো ভান্তা, আজই চিঠি পেলাম যে আমার ঠাকুমা মারা গেছে। কিন্তু জানো, জীবনে তিন-চার বারের বেশী ঠাকুমাকে দেখিইনি, তাই একটুও টান ছিল না··· কিন্তু তবু বড্ড খারাপ লাগছে, ভারী চঞ্চল হোয়ে উঠেছে মনটা··· জানি না কেন? আমার নিকট-আত্মীয় বলতে আর কেউ রইলো না—সব অনেক দূর-সম্পর্কের···আর তাদের নিয়ে আমার কোনো প্রয়োজন নেই—কিচ্ছু নেই—তারা সব দোকানদার···জানো ভান্তা, দোকান না থাকলেও কেমন করে দোকানদার হওয়া যায়? ওরা আমাদের এড়িয়ে যায়, ঘৃণা করে কমিউনিষ্ট বলে···হ্যাঁ ঠাকুমাও করতো। তবে···তবে কেন আমি বোকার মত কাঁদছি·ঠাকুমা মরে গেছে বলে···?"—ফাইনা জোর করে হাসতে হাসতে মুছে ফেলে চোখের জলের দাগ।

—"আমার বাবা ভারী চমৎকার লোক ছিলেন। স্কুলে পড়াতেন তিনি। শেষকালে গৃহযুদ্ধের সময় হোয়াইট গার্ডদের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। আজ তিন বছর ধরে আমি একা···কেউ নেই আমার···"

ঝরঝর্ করে ঝরতে লাগলো চোখের জল—কোনো বাধাই মানলো না···কয়েকটি মুহূর্ত—পরক্ষণেই উঠে দাঁড়ালো ফাইনা।

—"নাঃ, বড় দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। এসো একটু চা খাওয়া যাক,···দাঁড়াও ততক্ষণ তোমাকে একটা বই দিচ্ছি, আমাকে দেখার চেয়ে বইটার দিকে দেখো···কেমন?"—একটা মোটা বই দানিলভের সামনে রেখে চলে গেলো ফাইনা।

চুপ করে বসে রইলো দানিলভ, ওর যেন নড়তেও সাহস হচ্ছে না। কিন্তু কই একটুও খারাপ লাগছে না তো? ফাইনার ঘরখানিকে দেখার মধ্যেও এত আনন্দ ছিলো?

এর আগেও তো কত বার এসেছে।···কিন্তু এমন একা তো কখনো আসেনি—আর এতক্ষণ ধরে থাকেওনি তো···তা ছাড়া সবার পিছনেই তো দাঁড়াতো এসে···আজকের মত এমন করে সমস্ত ঘরখানিকে দেখার সুযোগ তো পায়নি।

ছোট্টো ঘর চারটে দেয়ালে বাঁধা। এক কোণে অতি সাধারণ ছোট বিছানা পাতা। পাশেই একটা টেবিল, তার উপর 'বুক শেলফ'। ঘরের আর এক কোণে হাত-মুখ ধোবার বেসিন··· কিছুই নয়, কত সাধারণ, কত তুচ্ছ কয়েকটা জিনিস, কিন্তু দানিলভের চোখে ওই প্রত্যেকটি জিনিষই জেগে উঠলো অমূল্য মর্য্যাদা নিয়ে—এই কয়টা দেয়ালের মাঝেই তো 'সে' থাকে! ঐখানে 'সে' ঘুমায়, ঐ চেয়ারখানিতে বসেই তো 'সে' স্কুলের খাতা দেখে। ঐ বইগুলি! 'তার' পরশধন্য ঐ বইগুলি! প্রতিটি পাতায় আছে 'ওর' হাতের ছোঁয়া, ওর আনত চোখের চাওয়া···! পৃথিবীর সবচেয়ে অমূল্য বস্তুর মত প্রিয় 'তার' এই নিত্য-ব্যবহারের জিনিষগুলি। ঐ যে 'তার' ছাই রঙের শালটা মাটিতে লুটাচ্ছে। গোলাপ ফুল আঁকা বাক্সটা? কি আছে ওটাতে? সুতো? ছুঁচ? ফিতে? কোন্ জিনিষটা? টেবিলে পড়ে আছে আঙুলের [illegible]টা···ফাইনার আঙুলের···আলনা থেকে ঝুলছে সেই গোলাপী ব্লাউসটা—যেটা 'সে' রোজ পরে ···সব—সব কয়টা জিনিষই কি অপূর্ব্ব! কি সুন্দর! ঠিক ফাইনাকে দেখার মত কি কোমল আবেশে ভরা!

হঠাৎ ফাইনার পায়ের শব্দে চকিত হোয়ে দানিলভ বইএর পাতাটা খুললো। খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো বরফের

ধাক্কায় ডুবন্ত টাইটানিকের একখানা ছবি। ফাইনা এগিয়ে এলো চা নিয়ে।

—"কেমন লাগছে?" জানো কেমন করে টাইটানিক ডুবেছিলো—" ফাইনা তার ইতিহাসটা শোনালো, চা খেলো,—ঠাকুরমার জন্মে আবার একটু কাঁদলোও···

আর দানিলভ? সমস্ত সময়টা শুধু ও মন্ত্রমুগ্ধের মত বসেছিলো—সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করেছিলো ফাইনার রূপ, ফাইনার কথা, ফাইনার হাসি-কান্নার মুক্তাধারা···ওর চমক ভাঙলো যখন ফাইনা স্পষ্টভাষায় সোজাসুজি জানালো এবার বাড়ী যাবার সময় হোয়েছে···

রাত্রি যথেষ্ট হোয়েছে। পথের কোথাও নেই এক বিন্দু আলোর আভাস, শুধু কোথায় জলপড়ার ঝির্‌ঝির্ শব্দ শোনা যায়। দানিলভ পিছন ফিরে দেখলো—ফাইনার ঘরের জানলায় দেখা যায় আলোর আভাস। আচ্ছা কি করে ও যখন একা থাকে? দানিলভ ফিরলো, নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো জানলার পাশে—দেখা যাচ্ছে টেবিলের উপর কনুই-এর ভর দিয়ে গালে হাত রেখে গভীর চিন্তায় মগ্ন ফাইনা···কি ভাবছে? ওই উঠে এলো, টেনে দিলে জানলার পর্দা, নিবিয়ে দিলো ঘরের আলো···না, দানিলভের চোখের?

ভালো লাগে, ভারী ভালো লাগে ওকে ভাবতে···আরও ভালো লাগে নির্জ্জন পথে ওর কথা ভাবতে ভাবতে এলোমেলো পথ চলতে।

তারপর থেকে প্রতিদিন আসতে লাগলো দানিলভ। আর ফাইনা? সৌজন্যের ধারও ধারতো না, কতকগুলো বই ঠেলে দিতো ওর দিকে, আর আপন মনে নিজের কাজ করে যেত,—খাতা দেখতো, মোজা সেলাই করতো, বই পড়তো, কখনও বেরিয়েও যেতো···আর দানিলভ···অতন্দ্র প্রহরীর মত বসে থাকতো সারাক্ষণ। কেউ প্রশ্ন করলে সোজা বলতো—'আমার ভালো লাগে তাই'। কিন্তু যদি কেউ প্রশ্ন করতো কোনো দিনও দানিলভের ভাগ্যে ফাইনার টুকটুকে পাতলা ঠোঁটের স্পর্শটুকুও জুটেছে কিনা—সে চিন্তায়ও দানিলভ আতঙ্কিত হোয়ে উঠতো—না, ফাইনার কোমল হাতের পরশটুকুও ওর জোটেনি কোনো দিন।

একদিন দানিলভ পৌঁছিয়ে দেখলো ফাইনা বাড়ী নেই। স্কুলের দেখাশোনা করতো যে বুড়ী, সেই জানালো ওকে ফাইনা 'টীম বাথ' (বাষ্প-স্নান) নিতে গেছে, ফিরবে এখনি। দানিলভ বসে বসে 'নিভা' নামে ছবিওলা একটা পত্রিকার পাতা উল্টাতে লাগলো।

ফাইনা ফিরলো। সদ্যঃস্নাত মুখখানি একরাশ টাট্‌কা ফুলের মত, সারা অঙ্গে গোলাপী আভাস। মাথায় পাগড়ীর মত করে বাঁধা তোয়ালেটা।

—"এই যে এসে গেছো!"—তোয়ালেটা খুলে ফেলে, মাথাটা ঝাঁকিয়ে নেয় ফাইনা, জলসিক্ত গুচ্ছ গুচ্ছ চুলের রাশি কাঁধ ঝাঁপিয়ে পিঠে এসে পড়ে।

—"নাও ধরো; এবার আঁচড়ে দাও দেখি"—লীলায়িত ভঙ্গীতে চিরুণীটা এগিয়ে দিয়ে ফাইনা বলে। মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে আসে দানিলভ, ধীরে ধীরে স্পর্শ করে সেই হিমশীতল, ঢেউয়ের মত চুলের রাশ—আঙুলগুলো জড়িয়ে যায় নরম রেশমের মত চুলের বেড়াজালে—কি মোহজাল ছড়ায় ওর মনে···থর্‌থর্ করে কাঁপতে থাকে আঙুলগুলো।

ওর পিছনে দাঁড়িয়ে দানিলভ, ফাইনা আয়নার সামনে, আয়নার কাচে ভেসে উঠেছে কৌতুকোজ্জ্বল মিষ্টি মুখ একখানি···মুগ্ধ দৃষ্টি দানিলভের···তন্ময়ও বুঝি! হাত থেকে পড়ে যায় চিরুণী···অকস্মাৎ দুই বলিষ্ঠ হাতের বেষ্টনীতে ঘিরে ফেলে ফাইনার সুকোমল দেহখানি—দুই হাতে তুলে ধরে ওর মুখখানি···তারপর তৃষিত হৃদয়ের সব জ্বালা মিটিয়ে ফেলতে চায় ফাইনার রক্তিম অধর পরশে···

ফাইনাও সাড়া দেয়···হ্যাঁ, সাড়া দেয় বৈ কি! কিন্তু পরমুহূর্ত্তে চকিত হয়ে নিজেকে ছিনিয়ে নেয় ওর বাহুবন্ধন থেকে, ঈষৎ রাগত স্বরে বলে,—"একি, একি করছো বল তো?"

দানিলভের মনে নেই সেদিন কেমন করে আবার ও ফিরে এসেছিল, রাস্তায় নামার পর ওর হুঁশ হোলো—টুপীটাও নিতে মনে নেই, বিকারগ্রস্তের মত চলে এসেছে···অনভিজ্ঞ বালক! না, বুদ্ধিহীন, জ্ঞানহীন বালক! আশ্চর্য্য কি কোরে সাহস করলো ও!···কিন্তু তাই যদি হয় তবে কেন···কেন ফাইন ওর দিকে চেয়ে অমন করে হাসলে!···কেন ডাকলে ওকে কেশ প্রসাধনে? নিশ্চয়ই কিছু ছিলো ওর মনে। তবে কেন···কেন ওর চুম্বনে সাড়া দিলে ফাইনা?···হ্যাঁ অনুভব করেছে বৈ কি!···এখনও শিরায় শিরায় সেই মধুর জ্বালাময়ী অনুভূতির স্রোত বইছে যে···কি কোমল স্পর্শ!···ওর রক্তিম অধরের ছোঁয়ায় কি আশ্চর্য্য মধুর ভঙ্গীতে স্পন্দন জাগলো ওই দু'খানি রক্তিমাধরে···কিন্তু সাড়া কি ফাইনা ইচ্ছে করেই দিলে···পরে কৌতুকে পরিহাসে ওকে বিঁধবে বলেই···না, না, হোতে পারে না···কি উজ্জ্বল হোয়ে উঠেছিলো ওর ধূসর চোখের তারা দুটি···ফাইনা ওকে চুম্বন করেছে···হ্যাঁ ওকেই চুম্বন করেছে···

—"কি ব্যাপার তোর বল্ তো? মাতাল হয়েছিস না কি?"—ক্রুদ্ধ স্বরে মা জিজ্ঞাসা করেন।

কোনো কথার উত্তর না দিয়ে ছুটে চলে যায় শোবার ঘরে। জামা-কাপড় খোলার কথাও মনে থাকে না। বিছানার ধারে পা ঝুলিয়ে বসে কনুইয়ে ভর দিয়ে দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে—উঃ জ্বলে যাচ্ছে যেন মাথাটা! জানে না কখন বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু স্বপ্নের ভিতরও ওর চোখের সামনে এক জোড়া ধূসর চোখ···ওর ঠোঁটের উপর ভেঙে পড়তে চায় কোন দুটি উষ্ণ কোমল স্পর্শ।

সকালবেলা স্কুলের একটি ছেলে ওর টুপীটা এনে দিলে। টুপীটা নেবার সময় ওর হাত দুটো এমন কাঁপছিলো যেন ওটা ওর টুপী নয়—ফাইনার লেখা প্রথম চিঠি।

ও যেতে চায় ফাইনার কাছে!···কিন্তু দুর্ব্বার লজ্জা এসে বাধা দেয়···কেমন করে ঢুকবে ঘরে···কি বলবে?···ফাইনা কি হেসে উঠবে···আর ও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে? ছবিগুলো দেখবে? না, না, কোনো কথা না বলে, শুধু ছবি দেখে দেখে ও আজ ক্লান্ত; ও চায় ফাইনার রক্তকমল অধর দুটির অধিকার—ও চায় ফাইনার সান্নিধ্য—ও চায় ফাইনার সবখানি।

আজ সন্ধ্যায় ক্লাবেতেই তাহলে বলবে···অবশ্য যদি সাহসে কুলায়! কিন্তু সেই সন্ধ্যাতেই ক্লাবের উদ্বোধন-উৎসব। দানিলভ পৌঁছালো অনেক পরে, কারণ কি যে বলবে কিছুতেই আর ঠিক করতে পারছিল না···ক্লাবের উৎসব-সজ্জার কোনো কাজ করতেও গেলো না···যুবসঙ্ঘের সব সভ্যরাই উপস্থিত দানিলভ বাদে। ওর শুধু ভয় ফাইনার সামনে···

দানিলভ যখন ঢুকলো, তখন মিটিং সুরু হোয়ে গেছে। গ্রাম-সোবিয়েতের প্রেসিডেন্টের পাশেই ফাইনা মঞ্চের উপর বসে, আর এক পাশে শহুরে পোষাক-পরা এক অচেনা ভদ্রলোক—প্রাদেশিক কার্য্যকরী কমিটী থেকে এখানের উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন। বক্তৃতা ইত্যাদি যথারীতি হোলো, সবার সঙ্গে যন্ত্রচালিতের মত হাততালিও দিলে দানিলভ। কিন্তু সারাক্ষণ ও কিছুই শুনলো না বা দেখলো না—ওর মুগ্ধ দৃষ্টি শুধু চেয়ে রইলো ফাইনার স্বাধীন দৃপ্ত ভঙ্গিমার দিকে, শহর থেকে আসা অচেনা লোকটির সঙ্গে ঝুঁকে গুন্ গুন্ করে কথা বলার দিকে, ওর অপরূপ মাধুর্য্যের দিকে—। বার বার চেষ্টা করলো ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করার, কিন্তু ফাইনা কটাক্ষপাতও করলে না। মিটিং-এর পর বেঞ্চগুলো দেয়ালের দিকে ঠেলে দিয়ে নাচের আসর সুরু হোলো। বেজে উঠলো একর্ডিয়ান, তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে এলো জোড়ে জোড়ে···দানিলভ ফাইনার দিকে অগ্রসর হবার আগেই দেখলে বিদেশীর হাত ধরে এগিয়ে চলেছে সে···।

চুপ করে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রইলো দানিলভ—ওর চোখের সামনে গোলাপী ব্লাউসের রঙীন বর্ণচ্ছটা যেন হাওয়ায় দুলতে লাগলো—ভাসতে লাগলো দোলায় দোলায়—ক্ষুব্ধ, অপমানিত, আক্রোশ-ভরা চোখ দুটো শুধু দেখতে লাগলো—।

শেষ হোয়ে গেলো কি তার সঙ্গে ফাইনার সম্পর্ক? আর কোন উপায় নেই আবার সেই পুরানো সুর ফিরিয়ে আনার···

ঐ তো ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ফাইনা ওই লোকটির হাতে হাত জড়িয়ে। যাবে নাকি পিছন পিছন? না। লজ্জা, গর্ব্ব এসে বাধা দেয়—'যেও না'। দ্বিধা, দ্বিধা। যখন সবলে দ্বিধার হাত এড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো অন্বেষণে—তখন কোথাও নেই ফাইনা! সে চলে গেছে সবার চোখের উপর দিয়ে সেই লোকটির হাত ধরে। প্রচণ্ড রাগে জ্বলে গেলো দানিলভের সর্ব্বশরীর—চোখের সামনে সব কিছু যেন কালো হোয়ে এলো। মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত—তীরের মত ছুটে এগিয়ে চললো দানিলভ। কোথায় ফাইনা? কালো অন্ধকার আর তারার মুচ্‌কি হাসি ছাড়া? থামলো না? এগিয়ে চললো স্কুলের দিকে—হঠাৎ ওর গতি স্তব্ধ হোয়ে গেলো—আলো, আলো জ্বলছে না ফাইনার জানলায়? সমস্ত আক্রোশ যেন জুড়িয়ে গেল নিমেষে,···ঐ তো তার স্বপ্নলোকের আলো, তার ধ্যানের আলো! বুঝি বড় ক্লান্ত, তাই চলে এসেছে নিজের ঘরে। 'আমার হৃদয়ের আনন্দ! আমার প্রিয়া, এলিয়ে দিয়েছে উৎসব-ক্লান্ত দেহভার উত্তপ্ত শয্যায়।'······জানলার কাছে এগিয়ে এলো দানিলভ। ফাইনা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে—কি বিস্মিত ওর দৃষ্টি! আধবোজা ঠোঁট দুটিও যেন চকিত, ভীত···ও কি···সেই অচেনা লোকটি বিছানায় বসে ধূমপান করছে আর কি সব বলছে—ওই তো উঠে এলো, টেনে দিলো জানলার সাদা পর্দা—সেই মুহূর্ত্তে নিবে গেলো ঘরের বাতি··········

নিবে গেলো বুঝি স্বপ্নলোকের আলো।

দানিলভ কাঁদছিলো, শিশুর মত কাঁদছিলো। চোখের জলে ভেসে গেলো ওর মুখ···কিন্তু চোখের সামনে দেখলে গাছ থেকে ঝুলে পড়েছে জমাট তুষারের চাপ। সেটাকে প্রাণপণ শক্তিতে তুলে নিলে, পিছিয়ে গেলো খানিকটা, তারপর সজোরে ছুঁড়ে দিলে জানলা লক্ষ্য করে। কাচ ভাঙার শব্দের সঙ্গে মিশে গেল কাতর চীৎকার············

ফাইনার কণ্ঠস্বর। ছুটে পালালো দানিলভ। সারা পথ ছুটলো আর সারা পথ কাঁদলো। বিদায়···বিদায় আমার প্রথম প্রেম···বিদায় ফাইনা···বিদায় আমার স্বপ্নলোক·········

• • • •

শহরের আগন্তুকটি আর অপেক্ষা করেনি কৈফিয়ৎ দেবার জন্তে—আর যাই হোক লোকটা বোকা নয়—। পরদিন গ্রামময় রাষ্ট্র হোলো ফাইনা উৎসব-শেষে ক্লাব থেকে ফেরা পথে পড়ে গিয়ে আহত হোয়েছে। লাগেনি বিশেষ, তবে গালে বোধ হয় বরাবরের মত ক্ষতচিহ্ন থেকে গেলো। মেয়েদের মন সহানুভূতিতে ভরে গেলো—আহা, অমন রূপ নষ্ট হোলো! ফাইনাকে ভালোবাসতো সবাই।

—"দোহাই তোর ভাল্লা, আর ঘরের কোণে বসে থাকিস্‌নি"—দানিলভের মা অনুযোগ করেন।

দানিলভ চুপ। না, কোথাও তার যাবার জায়গা নেই শেষকালে জঙ্গলে গিয়ে গাছ কাটার কাজে লাগলো। কি অমানুষিক পরিশ্রম সুরু করলে, ওর সব ব্যথা যেন ভুলিয়ে রাখবে কাজ দিয়ে। খাটতে খাটতে ক্লান্তিতে যেন জুড়ে আসে চোখের পাতা!—'কি কাজ-পাগলা ছেলে রে বাবা!' কাঠুরেরা বলতো। একদিন লীগ থেকে খবর এলো জেলা কমিটী এক জনকে পার্টি স্কুলে পাঠাতে বলেছে, আর দানিলভকে নির্ব্বাচন করা হোয়েছে তার জন্তে। দানিলভ জানতো এতে হাত আছে কারও।

তবু যাবার আগে ও ভাবলে একবার ফাইনার সঙ্গে দেখা করে যাবে। হ্যাঁ, জানেই তো সব শেষ হোয়ে গেছে, তবু··· বিদায় নিয়ে যাওয়াতে বাধা কিসের? সন্ধ্যার পর এলো দানিলভ—টেবিলের ধারে বসে ফাইনা তখন খাতা দেখছিলো নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছিলো ওর পায়ের শব্দ, কিন্তু লাফিয়ে উঠলো না, একটু নড়লো, স্থির হোয়ে একমনে দেখতে লাগলো খাতাগুলো। ঘরে এলো দানিলভ······ওর চোখের দিকে সোজা চাইলে ফাইনা, সে দৃষ্টি যেমন শান্ত, তেমনি স্থির আরও এগিয়ে এলো দানিলভ,—হ্যাঁ এইবার স্পষ্ট দেখতে পেলে গালের উপর ক্ষতের দাগ—ঘন গোলাপী ছোটো একটি তারার মত—তার দেওয়া দাগ, কোনো দিন ফাইনা ক্ষমা করবে না···

একটি কথাও ফাইনা কইলে না, একটি প্রশ্নও দানিলভ তুললে না···শুধু একটি মুহূর্ত্ত! তারপর নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো দানিলভ।

পরদিন গ্রাম ছেড়ে চলে গেলো।

সহজ সরল রুচিভরা চাষী-ঘরের ছেলে—সতেজ লতার মতই বেড়ে উঠছিলো দেহের সঙ্গে মনের স্বাস্থ্যের তাল রেখে। তরুণ বয়স—প্রথম ভালোবাসা, আকাঙ্ক্ষায় দুর্বার হবে বৈ কি! সূর্য্যের উষ্ণ উত্তাপে, নারীর কণ্ঠস্বরে, স্বপ্নলোকে মাদকতা আনবে বৈ কি! কিন্তু মনের অটুট স্বাস্থ্যই বাঁচালো ওকে সস্তা মোহের হাত থেকে।

—"বিয়ে আমাকে করতে হবে বৈ কি! নিশ্চয়ই হবে—" মনে মনে ভাবলে দানিলভ—"কিন্তু দুদিন পর। আরও লেখাপড়া শিখি, বড় হই, নিজের পায়ে দাঁড়াই, তবে তো। তারপর যদি 'সে' হঠাৎ মনটা বদলায়—আমাকেই ডাক পাঠায়?"···মনের ভিতর বলে যায়, এই উদ্ভট চিন্তায়, ফাইনার কল্পনায় পাখা মেলে উড়তে থাকে উধাও হোয়ে।

কিন্তু ক্রমেই ক্ষীণতর হোয়ে একদিন শেষ হোয়ে যায় কল্পনার মায়া। নিজেকে জোর কোরে ছিনিয়ে আনতে হয়।

সত্যিই মনে হয় কী বোকাই ও ছিলো প্রথমে—সত্যিই বোকা! দুঃখ পেলো, অনুতাপে জ্বললো, দীর্ঘ প্রতীক্ষায় কাটালো···মাকেও লিখেছিলো স্কুল-শিক্ষয়িত্রীর সব খবর প্রতি চিঠিতে পাঠাতে। এখনও কি সংগঠনের কাজ করছে ফাইনা? বিয়ে করেছে? মা-ও জানাতো সব খবর—মৃত্যুর দিন অবধি জানাতো, দোষ দিতো ছেলেকে, আবার করুণার ধারায়ও সিক্ত করতো অসহায় সন্তানকে। লিখতো ভালোই আছে ফাইনা, প্রাদেশিক কার্য্যকরী কমিটির সভ্যা নির্ব্বাচিত হোয়েছে, সংগঠন করছে, পড়াচ্ছে, না বিয়ে করেনি—ওর উপযুক্ত পাত্র গাঁয়ে কে আছে শুনি? তা ছাড়া সভ্যা নির্ব্বাচিত হোয়ে এখন তো ও সহরে চলে যাচ্ছে—সারা গাঁয়ের তাই দুঃখ। সবাই চাঁদা তুলছে এখন ওর বিদায়োপহারের জন্য। ···দানিলভ চেষ্টা করেছিলো কার্য্যকরী কমিটির কাছে খোঁজ নিতে ফাইনা কোথায়—কিন্তু প্রতি বারই দুরন্ত লজ্জা আর অস্বস্তি এসে বাধা দিতো।

একদিন মায়ের চিঠিতে জানলো ফাইনা গ্রামে এসেছিলো, বক্তৃতা দিলে, ওদের বাড়ীও গিয়েছিলো,—হাঁ। আর জানিয়েছিলো শীগ্‌গিরই ওর বিয়ে···ডাক্তার খোঁজ করেছিলো, শুভেচ্ছাও জানাতে ভোলেনি।

তারপর—তারপর থেকে কঠোর অনুশাসনে ভাঙ্গা বাঁধলো নিজেকে—'তাকে' যে ভুলতে হবেই। কঠিন বৈ কি, কিন্তু অসম্ভব তো নয়—ধীরে ধীরে মন জানলো ফাইনা ওর নয়—ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল ফাইনার চিন্তা, তার চুলের গন্ধ, হাসির ছন্দ, চেনা সুবাস সবটুকু নিঃশেষে মুছে নিয়ে—অলস দিনের মধুর চিন্তা রইলো অনেক কালের চেনা স্বপ্ন হোয়ে।

আর দানিলভ হোলো কর্ত্তব্যে কঠোর—পার্টি স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েট হোয়ে বেরিয়ে সৈন্যবিভাগে কাজের অংশ নিলে—সামনে পড়ে আছে সারা জীবনটা, প্রস্তুতি চাই বৈ কি—দায়িত্ব নেই? প্রয়োজন নেই? তবে···

তবু···হঠাৎ, আচমকা ভেসে ওঠে দুই চোখের তারার মাঝে ফাইনা—দীপ্ত, উজ্জ্বল, স্পষ্ট—না, কোথাও ফাঁক নেই এতটুকু, বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গির প্রতিটি রেখা, হাসির ছোঁয়া লাগা অধরের মৃদু কম্পন, আর···আর সত্তঃস্নাত সিক্ত চুলের অরণ্য সাপের মত লতিয়ে নামানো, ঢেউ-খেলান মাথা থেকে কাঁধ ছাড়িয়ে···'এই ভাঙ্গা, আঁচড়ে দাও তো চুলগুলো'···অতীতের পর্দা ছিঁড়ে মনের তারে তারে বাজিয়ে দিয়ে যায় ঝঙ্কার···। দিন যায়, আজ সে দিনের কিশোর তরুণ পূর্ণবয়স্ক, কর্ম্মী, দিবাস্বপ্নের মদির মুহূর্ত্তের সংখ্যাও বুঝি তাই কমে এসেছে··· ধন্যবাদ, ঈশ্বরকে অজস্র ধন্যবাদ···মোহমুক্তির জন্যে!

* * * *

দু'বছর লালফৌজে কাজের সময় দানিলভ প্রচুর পড়াশোনা কোরে নিলে, বিশেষ কোরে রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে। তারপর যোগ দিলে কমুনিষ্ট পার্টিতে। বাড়ী ফেরার পর জেলা কার্য্যকরী কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যানের আসন পেলো। কিন্তু কাজের প্রতি দুনিবার আকর্ষণ ওকে টেনে আনলো, পার্টির কাজে, স্থানীয় শাসন-পরিষদের কাজে, কৃষিতে, কলেজে—কোথায় নয়?

শুধু ফাইনার কোনো চিহ্ন নেই কোথাও! বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে চলে গেছে—দানিলভের সঙ্গিনীর স্থান পূর্ণ করেছে দুস্যা—স্ত্রী। কিন্তু প্রিয়া?···প্রয়োজন কি? অনেক বেশী প্রয়োজন সমাজে দশের সঙ্গে এক হোয়ে বাঁচা, শ্রদ্ধার সঙ্গে, সম্মানের সঙ্গে। না, আর কোনো ছেলেমানুষী ওকে চ্যুত করবে না ওর আসন থেকে। তাই কর্তব্য, প্রয়োজন, প্রতিষ্ঠার দাম দেবার জন্য ইচ্ছে কোরেই দানিলভ বিয়ে কোরেছে—শুধু মাকে খুশী করতে নয়।

একদিন বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ও দুস্যাকে দেখেছিলো। কূয়োর ধারে দাঁড়িয়ে বালতী কোরে জল তুলছিলো দুস্যা। দানিলভকে দেখে অকারণে রক্তিম হোয়ে উঠলো। দানিলভ অভিবাদন জানালো, কুশল প্রশ্ন করলো। মেয়েটি ওর সমবয়সী, বছর পঁচিশ বয়স হবে—শ্রীময়ী না হলেও স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। সবচেয়ে ভালো লাগলো এক জোড়া নীল চোখের সলাজ খুশীর আলো, মন ছুঁয়ে গেলো সে চাওয়া—"স্ত্রী হিসাবে ভালই লাগবে" দানিলভ ভাবলে।

সন্ধ্যাবেলাই দানিলভ দেখা করলে দুস্যার বাবার সঙ্গে। তারপর—দিন সাতেক বাদে আবার যখন গ্রামে ফিরলো তখন দুস্যাকে আর তার প্রতিদিনের সযত্নসঞ্চিত বেশবাস যাবতীয় সংগ্রহ কোরে সোজা জেলার শহরে চলে এলো—একেবারে রেজেষ্ট্রী অফিসে। সেখান থেকে দুস্যা সোজা এলো দানিলভের ঘরে তার ঘরণী হয়ে। তুলে নিলো যাবতীয় ভার, রান্না করা, ঝাড়া-মোছা, কাপড়-কাচা, রৌদ্রে দেওয়া, সব কিছু—আর দানিলভ রইলো তার জিলা কার্য্যকরী কমিটী আর প্রয়োজনীয় কাজকর্ম্ম নিয়ে—।

এমনি ভাবেই কাটতো ওদের দিন। দানিলভ ওর বক্তৃতা, মিটিং, কাজকর্ম্ম নিয়ে থাকতো, আর দুস্যা থাকতো সংসার নিয়ে। ঘরণী পেলো, গৃহিণী পেলো, কিন্তু প্রিয়াকে পেলো না। যে মধুর মাদকতাময় আকর্ষণ ছিলো ফাইনার, যে মধুর উদ্বেলতায় সমস্ত মন উতলা হোয়ে উঠতো দুস্যার ভিতর দিয়ে সে অনুভূতিকে তো ফিরে পেলো না—জাগেও না তো গৃহকাজরতা প্রিয়া-মিলনের আকাঙ্ক্ষা! অতিথি কি বন্ধুবান্ধব এলে গৃহকর্ত্তার ত্রুটি রাখে না। খাবারের টেবিলে সবার সঙ্গে বসে জোর কোরে

খাওয়ায়, হাসি-গল্পে ভরে দেয় ক্ষণগুলি—তুস্যা। শুধু ওর হাতের কাছে এগিয়ে দেয় এটা-সেটা। দানিলভের ভালো লাগে সব কিছু ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন দেখতে, ও চায় গরম খাবার যত অসময়েই ফিরুক না কেন—তুস্যা প্রাণপণ চেষ্টা করে মন জোগাতে কাজের ভিতর, যতটা আয় তারই ভিতর সচ্ছল, সচ্ছন্দ দিন কাটানোর ভিতর···

দানিলভ বোঝে সচেতনে আর অচেতনেও—বোঝে কি পরিশ্রমই না করতে হয় তুস্যাকে ওর খুশীর মূল্য দিতে—বোঝে নিজের দৈন্য কোথায়···তাই অসহায় ক্রোধ জমা হয় বেচারী তুস্যার উপর—ওই বুঝি সবের মূল!

—"পিঠ যে কুঁজো হোয়ে গেলো কাপড় কেচে, তুমি কি ধোপানী? কেন ওগুলো ধোপার বাড়ী দিতে পারো না"—দানিলভ প্রশ্ন করে।

—"ওরা কেবল নষ্ট করে সব"—তুস্যা বলে ওঠে। মনে মনে আরও বলে,—"হাাঁ, ধোপার বাড়ী! মানে প্রায় ষাট রুবল্-এর ধাক্কা, তাহলে মাইনে পাবার দিন অবধি চালাতে পারব না—তখন যাবো কোথায়?"

প্রথম প্রথম দানিলভ বলতো,—"তুমি কিছুই জানো না, কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে। তোমাকে লেখাপড়া করতেই হবে"—কিন্তু মনে মনে ভাবতো, "কখন করবেই বা, সারাদিনই তো ঘরের হাজারো কাজে ব্যস্ত।" হাাঁ তুস্যাও ঠিক একই কথা ভাবতো—সময় কখন, দিনে-রাতে?

তবু এক এক সময় দানিলভ রেগে উঠতো খাবারের কোনো ত্রুটি হলে, বেশী পুড়ে গেলে কি খারাপ হলে কিম্বা যদি কোথাও ধূলো থাকলো, কিম্বা যদি সার্টের কোনো বোতাম ছেঁড়া দেখলো—তুস্যার সারা জীবনই কাটলো শুধু চারদিকে নজর দিতে দিতে, কোথায় একটু ধূলো জমেছে, কোন্ জামার বোতাম ছিঁড়লো। তা ছাড়াও দাবী ছিলো—ওর স্ত্রীকে সারাক্ষণ পরিচ্ছন্ন ফিটফাট থাকতে হবে। ও সহ্য করতে পারতো না যে রাস্তা দিয়ে ওর স্ত্রী যাবে আলুথালু চুলে, নোংরা হোয়ে। লেখাপড়ার কথা অবশ্য আর বলতো না, কারণ বুঝেছিলো ঘরের কাজই ওর সবচেয়ে প্রিয়।

দানিলভের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে ওর স্ত্রীর সুখী হওয়াই উচিত। যতই হোক কাম্য পুরুষকে যদি পায় তাহলে সে মেয়ে তো সুখী হোতে বাধ্য! ও তো দেখেছে ওর কচিৎ একটু আদরেই কি উচ্ছ্বসিত আনন্দে ভরে ওঠে তুস্যা—তাই তো ওর বিশ্বাস দৃঢ় যে তুস্যা সত্যিই সুখী নারী।

বড় বড় ছুটির দিনগুলোতে—অক্টোবর বিপ্লব কি মে দিবসে—সবাই যায় পার্টিতে। প্রত্যেকটি কল, কারখানা, অফিস, খামার সর্ব্বত্রই চলে উৎসব। সবাই যায় নিজেদের কর্মস্থানের উৎসবে। দানিলভও নিয়ে যায় তুস্যাকে। সকলের চেয়ে ভালো পোষাকটি পরে, চুলে ঢেউ খেলিয়ে, সর্ব্বাঙ্গে ওডিকলোন ছিটিয়ে তুস্যাকে সাজতে হয়। স্ত্রীকে ভিতরে এক জায়গায় বসিয়ে দানিলভ যায় গণ্যমান্য লোকেদের সঙ্গে আলাপ করতে। কখনও দানিলভ ভুলেও জিজ্ঞাসা করেনি স্ত্রীকে যে, তার নিজের এই সব পার্টি ভালো লাগে কি না। সবাই স্ত্রীকে নিয়ে যায়, সেও যাবে বৈ কি। তা ছাড়া ওর স্ত্রীর পোষাকও কারো চেয়ে খাটো নয়, তা ছাড়া সবাই তুস্যার সঙ্গে আলাপ করে একজন বিশিষ্ট লোকের স্ত্রী হিসাবে। তবে? আর কি চাই?

কিন্তু ওর ছেলে—না, তার কথা আলাদা। ওর ছেলে—তার ভিতর তো ওর সবাই মিলে আছে, দানিলভ···তারই তেজ, তারই শক্তি, তারই সমস্ত পৌরুষ মিশে আছে তারই ছেলের ভিতর। তাই তো ছেলেকে দিলে নিজেরই নাম—ইভান। হাাঁ এইখানেই চমৎকার তার স্ত্রী—তাকে উপহার দিতে পেরেছে—ছেলে!

জন্ম দিয়েছে বটে মা, কিন্তু ছেলে যে তারই, সম্পূর্ণভাবে তারই, তারই বংশের ধারাবাহক···যতই হোক, মা কতটুকু, তার অধিকার কতটুকু? শুধু খাওয়ানো, মোছানো ছাড়া? কিন্তু সে যে পিতা, সেই তো সৃষ্টি করে নতুন জীবন, সুগম করে সুন্দর করে সেই জীবনের যাত্রাপথ। সেই পথকে উজ্জ্বল করতে, মহান করতে আদর্শ করতে পিতাই প্রস্তুত আপনার সর্ব্বস্ব দানে—জীবন বিসর্জ্জনে।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—শান্তা বসু।

নববর্ষ

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রচণ্ড নিদাঘ-তাপে ত্যাগ করি' ক্লান্তির নিঃশ্বাস
এল আজি নববর্ষ। আনে নি ক' একটু আশ্বাস
সুস্নিগ্ধ শান্তির। আজি নিখিল বিশ্বের গগন—
'মানুষ-জন্তুর হুঙ্কারে' চতুর্দ্দিক হ'য়েছে মগন।
বিস্মৃত হয়েছে মানব তার শ্রেষ্ঠ সার্থকতা,
বিপুল সংহার তরে নিয়োজিছে চরম ক্রুরতা।

'বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি' ভুলেছে সে অতি অবহেলে,
ব্যাপক হত্যার লীলা অকুণ্ঠে অবাধে তার চলে।
বিশ্ব-মানবের প্রতি তাই মোর এই আবেদন—
মানব কর্ত্তব্যে পুনঃ আজি যেন হয় সচেতন।
লোভ-ক্রোধ-দ্বেষ-হিংসা অন্তরের রিপুচয় ত্যজি'
সার্থক মানব-প্রেমে উদ্বোধিত হয় যেন আজি।

অন্তরের সব গ্লানি আজি যদি করে পরিহার—
সফল হইবে তবে নববর্ষে প্রার্থনা আমার।

স্মরণে

(সত্য ঘটনামূলক)

অজয়েন্দুনারায়ণ রায়

মুনসিফ বাবু

তখন মটর সার্ভিস হয়নি কান্দিতে। ত্রিশ বছর আগেকার কথা। ভদ্রলোক ও বড়লোকরা যেতো শেয়ারের ঘোড়ার গাড়ীতে। পাল্কী কেবল জমিদার ও রাজা-রাণীদের একচেটিয়া ছিল।

মেদিনীপুর থেকে বদলি হ'য়ে লালা দিগম্বর মিত্র জানিয়ে দিলেন, "ভাল ছইওয়ালা গরুর গাড়ী যেন রাখা হয় আমার জন্ম ষ্টেশনে। বিশ মাইল রাস্তা ঘোড়ার গাড়ীতে যেতে পারবো না পা ঝুলিয়ে।"

নাজির বাবু ব্যস্ত হ'য়ে পরামর্শ করতে বসলেন, "যা হোক কাণ্ড বটে বড়লোকদের। এমন ক্যাঠায় মানুষে পড়ে? কোথায় ঈশ্বর, কোথায় গাড়ী! তিনি আসবেন গরুর গাড়ীতে, আমাদেরও চলে না ঘোড়ার গাড়ীতে আসা, কেমন মুস্কিল বল দিকি? এগিয়ে যে আনবো তারও উপায় নেই।"

দেখে বললেন সেরেস্তাদার বাবু, "কেন? আমাদের যোগীকে বললে গাড়ীটাড়ি যোগাড় ক'রে সেই আনতে পারবে। তা ছাড়া সে কথাবার্ত্তা ভাল কইতে পারে। আমাদের যে 'ফেয়ারওয়েল' আছে, যাওয়া ত হবে না।"

কথা মনে লাগলো সকলের। বিদায়ী মুনসিফ বাবুর ফেয়ারওয়েল, সাধারণ ভদ্রলোক বড়লোকরা দেবেন না কেউ। তাঁর সংগে নাকি বিরোধ সকলের। তবুও তিনি নেবেন প্রশংসার মালা আমাদের তরফ হ'তেই।

খবর এসেছে মুনসিফ বাবু নাকি খুবই কড়া। না দেখে তিনি একটা কাগজে সহি করেন না। আমলাদের মুখে খান না।

ভয়ে ব্যস্ত নাজির বাবু বললেন যোগী মণ্ডলকে, "তুমি ত বাবা পুরাতন পিয়ন। ভাল গাড়ী করে হাকিম বাবুকে আন গে। মান-সম্ভ্রম এখন তোমার উপর নির্ভর করছে। বুঝিয়ে বলো ফেয়ারওয়েল জন্য আমরা আসতে পারলাম না। বুঝলে?"

বিজ্ঞের মত বললো মণ্ডল, "আমি যখন যাচ্ছি, তখন কোন অসুবিধা হবে না আপনাদের।"

যোগী নিজের স্বজাতি কেদার মণ্ডলের গাড়ী ঠিক করলো বাগানপাড়া থেকে।

জাতিতে সংগোপ, দরকার হ'লে এক গ্লাস জলও খাওয়াতে পারবে। তা ছাড়া চুরি কেমন ক'রে করতে হয় জানে না।

মণ্ডল গঙ্গার ওপার হ'য়ে কোর্ট-ষ্টেশনে উপস্থিত হ'লো। ট্রেন এলে চীৎকার ক'রে ঘোষণা করলো এধার ওধার দৌড়ে কান্দির হাকিম বাবু। কান্দির হা-কি-ম বা-বু!

"এই যে," ব'লে দাঁড়িয়ে গেলেন লালা মুনসিফ।

"তুমি কে?"

"আমি হুজুরের কোর্টের পিয়ন যোগীন্দ্র মণ্ডল।"

"বাবুরা কেউ আসেন নি?"

"মুনসিফ বাবুর ফেয়ারওয়েল না থাকলে নাজির বাবুই আসতেন।" ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে এসেই ঘোড়ার গাড়ী দেখে বললেন রুক্ষ স্বরে, "আমি গরুর গাড়ী আনতে বলিনি?"

"হুজুরের কথা মত ঠিক হাজির আছে। গঙ্গা পার হ'লেই গরুর গাড়ী পাবেন।"

একটা আলগা ডিঙিতে পার ক'রেই যোগী চেয়ার একখানা ঝেড়ে বসতে দিলো ঘাটোয়াল কালী বাবুর কাছে। বেলা তখন পাঁচটা বাজতে চলেছে। ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন মুনসিফ বাবু, "তোমার গাড়োয়ান কৈ?"

পাশেই ভাত নামাচ্ছিল কেদার মণ্ডল। কালো মোটা-সোটা বেঁটে মানুষ। বললো জোর গলায়, "এই গাড়োয়ান আছে গো! মরে নি!" কলার পাতে ভাত ঢালা রয়েচে দু' সের চালের। দেখে বললেন মুনসিফ বাবু, "তুমি লোকজন ডাকো, না হ'লে বিলম্ব হ'য়ে যাবে যেতে।"

কথা শুনে হেসে উঠল কেদার মণ্ডল, "আমি নিজের মত বেঁধে বেড়ে, গাঁয়ের লোক জুটাতে যাবো। আচ্ছা বগরের কথা হাকিম বাবুর!"

বিস্ফারিত নেত্রে দেখলেন লালা মিত্র অন্নের আয়তন। তুলনা করতে লাগলেন তাঁদের মত ক' জনের আহার। চিন্তা শেষ হবার আগেই দেখেন প্রায় শেষ। এক এক গ্রাসে চলে যায় আধ পো তিন ছটাক। কৌতূহল মেটাবার জন্য প্রশ্ন করলেন লালা মিত্র, "ক' সের চাল রেঁধেছিলে?" কথা উদ্গার তুলে বললো কেদার, "আচ্ছা বগরের কথা বটে হাকিম বাবুর। গরু-গাড়ী নিয়ে মাজনি করতে হ'লে বুঝতে পারতে। ধুমো বেরিয়ে যেতো। কম খ' তখন পরাম পরাম ডাক ধরতো।" চোখ টিপে সাবধান করে দিলো যোগী মণ্ডল। কেদার সোজা স্বচ্ছ, ঢাক চাপ নেই।

"কি বুলবি ছামু ছামু বুল কেনে। হাকিম ত বাঘ লয় জি খেয়ে ফেলবে?" গঙ্গার জলে হাত-মুখ ধুয়ে এসে দাঁড়ালো হাকিম বাবুর সামনে।

"যা খেচো দাও কেনে? দু' এক টান দিই!"

বজ্রাঘাত হ'লো যোগী মণ্ডলের সামনে। খোঁচা মেরে বুঝিয়ে দিতে গিয়ে অপ্রস্তুত মণ্ডলজি।

"কি ফ্যাক্ ফ্যাক্ করিস! আমি কারও মেয়ে বার করিনি সেকিনি যে, হাকিমের ভয়ে জুজু হয়ে থাকবো। ধুমো না খেলে অম্বল শিশিয়ে উঠবে জি?"

কথা বেশী হ'তে দেখে লালা মিত্র ফেলে দিলেন দুটো সিগারেট। যোগীও প্রতিজ্ঞা করলো আর কোন কথা বলবে না কেদারকে।

সন্ধ্যা আগত দেখে বললেন লালা মিত্র, "এবার গাড়ী ঠিক করো।" সেই তালেই বললো কেদার, "গরুটা পাঁজাচে দেখচো না?

বিচারক না বুঝেও অনুমান ক'রলেন গরু এখন এমন অবস্থায় আছে, বলা ঠিক হয়নি আমার।

বুঝিয়ে দিলো যোগী মণ্ডল, "গরুর কিছু হয়নি হুজুর! এখন খেয়ে জাবর কাটছে। লোকটা খুব ভাল হুজুর। চোর চামটি নয়, সেই জন্ম এনেছিলাম—"

হাকিম বাবু তখন পেয়ে বসলেন কেদারকে। তার কথা গিলতে লাগলেম এক এক করে।

"ওঠো গো এবার দলের গাড়ী ছাড়তে লেগেচে।"

কাত হয়ে শুয়ে প্রশ্ন করলেন মিত্র সাহেব, "তুমি বলদ কেননি কেন কেদার?"

হেসে আটখানা কেদার, "রগরের কথা বটে তোমার। পেটে ভাত নাই মুখে পান। কারও চেয়ে চিন্তে ভিক্ষে করে এঁড়ে এনে রসদ চালাচি। পেটের জ্বলনে ম'লাম ছেলে পিলে লিয়ে, বলদ লেবো আমি? হাকিম বাবু! তোমার মাইনে কত গো?"

"কেন? পাঁচশ' টাকা?"

চিন্তিত কেদার প্রশ্ন করলো, "ক' কুড়ি টাকা?"

এতক্ষণ পর হাসি দেখা দিল হাকিম বাবুর। কেদার বলেই চললো, "তোমাদের খুব দুঃখ লয় হাকিম বাবু?"

লালাজী ভেবেই পান না আমাদের কোন্ দুঃখে কাতর করলো পাড়াগ্রামের সরল চাষীটিকে।

"কিসের দুঃখ বল ত কেদার?"

"মাগ ছেলে লিয়ে একঠাই থাকতে পাও না। চরকির মত ঘুরতে হয়। লয়? পেছু লাগলেই পালাতে হয়! লয় গো?"

"সে ত বটেই গো কেদার! তোমাদের দেশের লোক পিছু লাগে নাকি বল ত কেদার?"

চারি দিক পানে চেয়ে বললো কেদার চাপা গলায়, "আমি বুলবো না বাবা। পাঁচ কানাকানি হ'য়ে আমার হাড় থাকবে?"

"তোমাদের দেশের মানুষ কেমন বললে দোষ কি হবে?"

"বড়লোকদের তোমার মত অঙ। আর ইতিনোকের আমার যেমন দেখচো।"

"ও কথা জিজ্ঞেসা করিনি কেদার। তোমাদের বড়লোকরা আমাদের মত হাকিমদের পিছু লাগে কি না?"

"এ' ত তোমার খারাপ কথা গো। শাক দিয়ে ভাত খাবো, বিড়েলের কচকচি কেন বাবা?"

"না কেদার, তোমাকে বলতে হবে। এ কথা বের হবে না সত্য করে বলচি।"

"যখন ছাড়বেই না, শোন! কান্দি থেকে এক শালা হাকিম দাগ না লিয়ে ফেরেনি। দলাদলি কত্তো আমাদের জ্বাশে। এ দলে ঢুকলে ও রাগ করবে। ও দলে ঢুকলে এ রাগ করবে। বাবা এ জ্বাশ বটে। গোবরের ছাঁচ দিয়ে এ দেশের লোককে হাকিম বানিয়ে আনতে হয়। লয়?"

হাকিম বাবু ফিরে গেলেন নিজের কথায়, "কে কে কোন্ কোন্ দল হাকিমদের পিছু লাগে বল দিকি কেদার?"

গোল গোল চোখ নিষ্পলক হ'লো কেদারের। "তুমি বাপু আমাকে সত্যি সত্যি জ্বাশ ছাড়া ক'রবে দেখচি। আমি যদি বুলি আমার বাবা সাতটা। কেন বাবা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে কাজ কী আমার? তোমরা পেট্‌লুন্-পড়া সাহেব, বড়লোকের সংগে এক হ'য়ে যাবা। তখন এই কেদার ব্যাটা পর হবে। কেমন ঠিক কি না?"

"আচ্ছা, না বলিস্, একটা গল্প বল্ শুনি কেদার।"

হেসে কেদার গড়িয়ে পড়ে আর কি, "এ হাকিম খ্যাপা নাকি? আমি মিছে কথা বানিয়ে বুলবো, বই লেখতে পারি নাকি?"

"সত্যি কথাই না হয় বল; তোদের দেশে ভূত আছে কেদার?"

"আপনি খেপেছেন! ভূত আবার কোন্ জ্বাশে নাই। না বুললে মনে ক'রবেন ব্যাটার গরম বেঁধেছে। তবে বুলি শুমুন। আমার দেখা নাই কিন্তু বুলে রাখাচ যা শুনিচি তাই বুলচি, আমাদের কান্দি ঢুকতে ভবাসং পুকুর আছে জানেন ত?"

"আমি এই আসচি, জানবো কি ক'রে তোদের কান্দির কথা?"

"ও তাই ত, ওটা বলে কোম্ ছিল না। তুমি ঘুমিয়ে থাকলে তুলিয়ে দেখাব। একটা একডেলে গাছ আছে, সেখানে অপদেবতা থাকে।"

"কি করে জানলে কেদার?"

"বাঃ! আমার গরু পর্য্যন্ত ফেচকিয়ে যায়। আবার দেখতে হয়। বড় হাকিম পড়ে গিয়ে ঘোড়া থেকে খোঁড়া হ'য়ে গেল। আমরা বুলতাম তাকে খোঁড়া হাকিম। ই' ত সিদিনের কথা।"

"তবে বাবা তোলাস নে।" চোখ বুজে রয়ে গেলেন যেন কত ভীত।

কাছারির কাছে কান্দরের ধারে গাড়ী এসে লাগলো খুব সকালে। অতো সকালে নাজির বাবু সেরেস্তাদার বাবু উপস্থিত আছেন এগিয়ে নেবার জন্য মুনসিফ বাবুকে। অতি উৎসাহী দু'-চার জন ছোকরা উকিলও আছেন সম্মান জানাবার জন্য।

লালা দিগম্বর গাড়ী থেকে নেবেই, কান্দর পার হ'য়ে চললেন নিজের কামরায়।

অনাঘাতে ঘা দিয়ে চীৎকার করে বললো কেদার, "ওগো হাকিম বাবু! একবার পকেটে হাত দাও কেনে? আমার ভাড়া না দিয়ে যর লিচো জি?"

চারি দিক থেকে লে লে করে নিলো কেদারকে। "তুই ব্যাটা, ভাড়ার টাকা যোগীর সঙ্গে বুঝে নিস। আস্ত জানোয়ার, কার সঙ্গে কথা বলছিস জানিস?" ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে বুঝতে পারলে না অপরাধ, "দু'দিন খেটে যা'কে ব'য়ে লিয়ে এলাম তাকে ভাড়া চাইতে পাবো না। এখন যোগের নেঙুরে ত্যাল দিই গা।"

তেরিয়ে হ'য়ে বললো সকলে "জানোয়ার, টাকা বের ক'রে দাও ত? মানুষের মান-খাতির বোঝে না!!"

কেদার ঝাঁপিয়ে উঠে গাড়ী ছেড়ে দিলো, বললো, "আর দক্ষিণে দিতে হবে না বাপ, নিজেই পালাচি। যা হোক হাকিম বটে, একবার যদি পকেটে হাত ভরলো? আচ্ছা, এক মাস জাড় পালায় না। এই বার যোগ্যো গাড়ীর লেগে গেলে হয়!!"
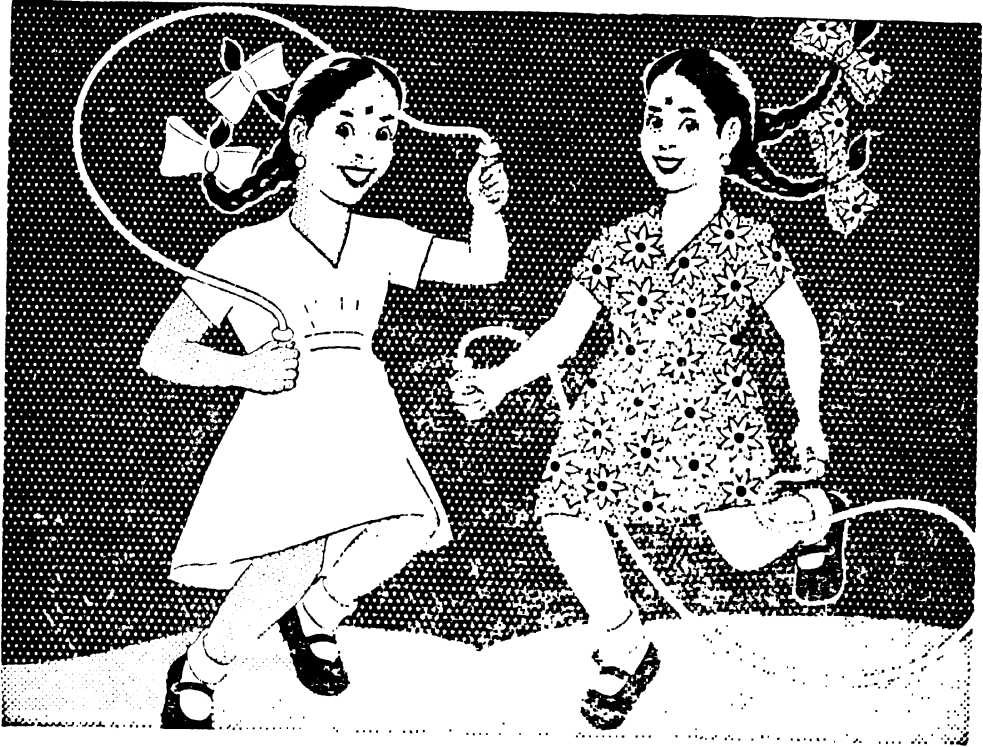
দ্রুত-ফেনিল সানলাইট

না আছড়ে কাচলেও সাদা ও ঝকঝকে ক'রে দেয়

"শিক্ষয়িত্রী বলেন আমি বেশ ফিটফাট থাকি। তার কারণ মা সানলাইট সাবান দিয়ে আমার ফ্রক ধপধপে সাদা ক'রে কেচে দেন। সানলাইটের স্তূপাকার সরের মত ফেনা শীঘ্র ও সহজেই কাপড়-চোপড় থেকে ময়লা বার করে দেয় — আছড়াতেও হয় না।"

"আমার [illegible] মধ্যে আমাকেই সব চেয়ে চমৎকার দেখায়। সানলাইট দিয়ে কাচার জন্য আমার রঙিন ফ্রক কেমন ঝকঝকে থাকে দেখুন। মা বলেন সানলাইট দিয়ে কাচলে কাপড়-চোপড় নষ্ট হয় না আর তা টেঁকেও বেশী দিন। এতে খুব খুশী হবার কথা — নয় কি?"

S. 219-X52 BG

ভারতে প্রস্তুত

সা হি ত্য

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

শীতলপ্রসাদ গুপ্ত—প্রবাসী বাঙালী শিক্ষাব্রতী। প্রধান শিক্ষক, বড়বাকী গভর্ণমেণ্ট স্কুল (কাশী)। ইনি হিন্দী-ভাষায় কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করিতেন। গ্রন্থ—হিন্দী পত্রাবলী (কাশী)।

শীতলপ্রসাদ গুপ্ত—সাংবাদিক ও শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮২৬ খৃ: ২৮এ ফেব্রুয়ারি, কাশী। মৃত্যু—১৮১৬ খৃ: ১৬ই এপ্রিল এলাহাবাদ। পিতা—কালিদাস গুপ্ত (বারাণসীর প্রসিদ্ধ কবিরাজ)। শিক্ষা—বারাণসী কলেজ। কর্ম—শিক্ষকতা, কাশীর কলেজিয়েট স্কুল (১৮৪৫), প্রধান শিক্ষক, মির্জাপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুল। অনুবাদক, এলাহাবাদ হাইকোর্ট। এই সময়ে এলাহাবাদ শাহগঞ্জে স্থায়িভাবে বাস। অবসর গ্রহণ (১৮৮৩)। অবসর সময়ে ইনি কবিতা রচনা ও সাহিত্য-সাধনা করেন। প্রতিষ্ঠাতা—এলাহাবাদ "এংলো বেঙ্গলী স্কুল"। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—সাহস (বাঙলা সাপ্তাহিক, পরে ইংরেজি), 'বৈবাহিক-কুরীতি-নিবারণী সভা', কাশীর 'বাঙ্গালীটোলা হাই স্কুল'। যুগ্ম-সম্পাদক—সাহস (ইংরেজি সাপ্তাহিক), ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান (সাপ্তাহিক)।

শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়—সাংবাদিক ও দেশসেবী। জন্ম—১২৬৩ বঙ্গ ঢাকায়। মৃত্যু—১৩০৪ বঙ্গ লাহোরে। শিক্ষা—ঢাকা, স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। বাল্যকাল হইতেই ইনি সুলেখক বলিয়া পরিচিত। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ (১২৮০) এবং জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ। ইংরেজি ভাষায় প্রভূত জ্ঞানার্জন। ১১২০ বৎসর বয়সে পঞ্জাবের 'ট্রিবিউন' (সাপ্তাহিক) পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৮৪, এলাহাবাদ), আইন ব্যবসায়, মীরাট; পুনরায় ট্রিবিউন পত্রে যোগদান। এই সময় দেশসেবা, সমাজ-উন্নয়ন এবং নানা অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইঁহার অমর লেখনী প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইনি লাহোরবাসী কর্তৃক 'The terror of the Punjab', 'The banner of the people' নামে অভিহিত হইতেন। সম্পাদক—ট্রিবিউন (লাহোর, সাপ্তাহিক, ও পরে সপ্তাহে ৩ বার, ১৮৭৭—৯১), বিহার হেরাল্ড (১৮৮৪)।

শৈলেন্দ্রনাথ সরকার—শিক্ষাব্রতী। প্রধান শিক্ষক, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, সরস্বতী ইনষ্টিটিউসন। শিক্ষক জীবনের অবসরে ইনি নানা গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ—মধুর মিলন, মনোরমা, রমা, সখের জলপান, সুমতি, গৌরাঙ্গলীলা, নাসিরুদ্দিন (না)।

শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মহাভারতীয় উপাখ্যান (১৩৫৫)। সম্পাদক—আধুনিক চিকিৎসা (১৩৩৩-৩৪)।

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার—সাহিত্যিক। জন্ম—বর্ধমান জেলায় বৈদ্য-নপাড়া গ্রামে বৈদ্যবংশে। ইনি বাল্যকাল হইতেই রস-রচনায় সিদ্ধহস্ত। 'বঙ্গদর্শনের' নবপর্যায়ের সহিত (রবীন্দ্রনাথ ও ইঁহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক পুনঃপ্রকাশিত) সংশ্লিষ্ট (১৩০৮)। গ্রন্থ—চিত্রবিচিত্র (১৩০১), ইন্দু। সম্পাদক—সমালোচনী (১৩০৮-১৩১১), বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়, ১৩১৮-২০)।

শোভনা ঘোষ—গ্রন্থকর্ত্রী। স্বামী—প্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ (মৈমনসিংহ, বালীগাঁও নিবাসী)। গ্রন্থ—ছেলেদের চিত্তরঞ্জন।

শোভারাম মুন্সি—গ্রন্থকার। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলার উখুরি গ্রামে। গ্রন্থ—সন্দীপ-বর্ণনা।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—বিদ্যোৎসাহী ও সঙ্গীতজ্ঞ গ্রন্থকার। জন্ম—১২৪৭ বঙ্গ আশ্বিন পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটী। মৃত্যু—১৩২১ বঙ্গ ২২এ জ্যৈষ্ঠ। পিতা—হরকুমার ঠাকুর। শিক্ষা—কলিকাতা হিন্দু কলেজ (১৩২১)। সঙ্গীত (দেশীয় ও ইউরোপীয়), সঙ্গীতজ্ঞ লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র ও অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা। 'সঙ্গীতবিদ্যাসাগর' বা 'ডক্টর অফ মিউজিক' বলিয়া পরিচিত। হিন্দু সঙ্গীতের পুনরুদ্ধারকল্পে বহুল প্রচার ও বহু অর্থব্যয়। প্রতিষ্ঠা—Bengal Music School (১৮৭১), Bengal Academy of Music (১৮৮১)। 'ডক্টর অফ মিউজিক' উপাধি লাভ (ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৭৫, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮১৬)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এফ-আর-এস এবং সি-আই-ই (১৮৮০), 'রাজা' (১৮৮০), 'নাইট' (Knight Bachelor of United Kingdom, ১৮৮৪) উপাধি লাভ। গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইডেন, নেদারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, লাইবেরিয়া, ইজিপ্ট, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ, হইতে বহু সম্মান লাভ। ছাত্রাবস্থা হইতেই সাহিত্য সাধনা। মাত্র চতুর্দশ বর্ষ বয়সে ইঁহার প্রথম গ্রন্থ 'ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত' রচিত হয়। গ্রন্থ—ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত (১৮৫৪), মুক্তাবলী (১৮৫৬), হারমনিয়ম সূত্র (১৮৭৪), ভিক্টোরিয়া গীতিমালা (১৮৭৭), ভারতীয় নাট্যরহস্য (১৮৭৭), জাতীয় সঙ্গীত (১৮৭১), যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা (১৮৭৮), মালবিকাগ্নিমিত্র (অনুবাদ), মণিমালা ১ম (১৮৭১), ২য় (১৮৮১) রসাভিব্যঞ্জক (১৮৮০), যন্ত্রকোষ, (১৮৭৬) গীতপ্রবেশ, সঙ্গীতশাস্ত্রপ্রবেশিকা, A brief History of Tagore Family (১৮৬৪), The Dramatic sentiments of Aryas (১৮৮১), Eight Tunes etc (১৮৮০), The Eight principal Rasas of the Hindus (১৮৮২), A few lyrics of Owen Meridith set to Hindu music (১৮৮৭), Fifty Tunes composed & set to music (১৮৭৮), The five principal Musicians of the Hindus, (১৮৮১), Hindu music from various Authors, ১ম (১৮৭৫), Roma-Kavya(১৮৮০), Short notices of Hindu musical instruments (১৮৭৭), Six principal Ragas (১৮৭৭), Ten principal Avatars of the Hindus etc (১৮৮০), A Vedic Hymn (১৮৭৮), Venisanhar Nataka (ইংরেজি অনুবাদ, ১৮৮০), Brief History of Hindu Music, Musical Scales of the Hindus.

শ্যামধর রায়—গ্রন্থকার। জন্ম—নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরে। গ্রন্থ—কবি রসসাগরের জীবনচরিত।

শ্যামলাল চক্রবর্তী—সাময়িকপত্রসেবী। যুগ্ম-সম্পাদক—জ্ঞান-প্রভা (মাসিক, দ্বিভাষিক পত্র, ১২৮৭)।

শ্যামলাল বসাক—কবি। কাব্যগ্রন্থ—ভারতপরাজয় কাব্য, গীতগোবিন্দের পদ্যানুবাদ (১৮৮৯)।

শ্যামলাল গোস্বামী—বৈষ্ণব পণ্ডিত। সম্পাদক—বৈষ্ণব-সন্দর্ভ (বৃন্দাবন, ১৩১০), সহ-সম্পাদক—বিষ্ণুপ্রিয়া (৪১৬ চৈতন্যাব্দ)।

শ্যামলাল মল্লিক—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৯০ খৃঃ কলিকাতার বিখ্যাত মল্লিক-বংশে। মৃত্যু—১৯২৮ খৃঃ। পিতা—নন্দলাল মল্লিক। গ্রন্থ—চারিধাম ভ্রমণ, কাব্যকুঞ্জ ১ম (১৩০৫), ভাগীরথী-স্তোত্রমালা (১৩০৪), হীরক জুবিলী (১৩০৪)।

শ্যামসুন্দর গোস্বামী—ব্যায়ামাচার্য। জন্ম—শান্তিপুরে। আমেরিকায় শিক্ষান্তে 'ডক্টর অফ ক্যাচারোপ্যাথি' (নিউইয়র্ক) উপাধি লাভ ও কাশী হইতে 'ব্যায়ামবিদ্যাবাচস্পতি' উপাধি-লাভ। স্থাপনা—'গোস্বামী ইনষ্টিটিউট ফর রিসার্চ এণ্ড এডভান্সমেণ্ট অফ ফিজিক্যাল কাল্চার,' 'অল ইণ্ডিয়া ষ্ট্রং মেনস্ এসোসিয়েসন'। গ্রন্থ—Goswami Method of Training & Treatment, Recent Advancement of Physical Culture.

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী—বাগ্মী ও দেশসেবক। জন্ম—১২৭৫ বঙ্গ পাবনা জেলায় ভারেঙ্গ গ্রামে। মৃত্যু—১৩৩৯ বঙ্গ ২২এ ভাদ্র কলিকাতা। প্রবেশিকা (বৃত্তিলাভ), এফ-এ, বি-এ পর্যন্ত অধ্যয়ন। শিক্ষকতা—পাবনা স্কুল, কলিকাতা এংলো বৈদিক স্কুল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যোগদানে নির্বাসিত (১৯০৮-১০)। পুনরায় অন্তরীণ (১৯১৭). আইনভঙ্গ আন্দোলনে কারাবাস (১৯২২)। সংবাদপত্রসেবী—প্রতিবেশী (সাপ্তাহিক) প্রকাশ, People and Prativeshi (ইং ও বাং সাপ্তাহিক) প্রকাশ; সম্পাদকীয় বিভাগে কর্ম—সন্ধ্যা, বন্দে মাতরম্ (১৯০৬), বেঙ্গলী পত্রিকা (১৯১০), সারভেণ্ট (১৯১৭); সম্পাদক—English Basumati, সোনার বাংলা (সাপ্তাহিক, ১৩৩০)।

শ্যামসুন্দর দাস—গ্রন্থকার। কাশীপ্রবাসী। গ্রন্থ—The Hindi Scientific Glossary (কাশী, ১৯০৬), The Nagri Character (কাশী, ১৮৯৬)।

শ্যামসুন্দর সেন—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—সমাচার-সুধাবর্ষণ (দৈনিক, ১৮৫৪, জুন—দ্বিভাষিক বাংলা ও হিন্দী, —ইহাই প্রথম হিন্দী দৈনিক পত্র)।

শ্যামাকুমার ঠাকুর, নবাব—গ্রন্থকার। জন্ম ১৮৮১ খৃঃ কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবংশে। মৃত্যু—১৯২০ খৃঃ। পিতা—মহারাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। পারস্য সরকার কর্তৃক 'নবাব' উপাধিলাভ। পারস্যের ভাইস কন্সাল জেনারেল, বোলিভিয়ার কনসাল জেনারেল এবং ইকোয়েডার, কোষ্টা-রিকা ও ভেনেজুয়েলার কন্সাল। গ্রন্থ—শ্যামাহৃদয়ম্ (সংস্কৃত ও বাংলায়), জার্মানীকাব্যম্ (জার্মানীর ইতিহাস সংস্কৃত কাব্যে)।

শ্যামাঙ্গিনী দে—মহিলা সম্পাদিকা। যুগ্ম সম্পাদিকা—সোহাগিনী (মাসিক, ১২৯২, বৈশাখ)।

শ্যামাচরণ কবিরত্ন—পণ্ডিত। গ্রন্থ—আহ্নিককৃত্যম্, ভাগবত-পুরাণ, বাঙ্গালা চণ্ডী, বিদগ্ধমুখমণ্ডল, রামলীলা, জয়দেব পদ্ধতি, চণ্ডী, সত্যনারায়ণ ও শুভচনীর কথা, বৈদিক ব্যাকরণ, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, কালিকা পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা, কৃষ্ণরাণীর ছড়া, চতুর্বেদী সন্ধ্যাবিধি, ঋজুদর্পণ, ৩ ভাগ, সরল কাদম্বরী। সম্পাদক—হরিভক্তি (মাসিক ১৩০৬-৭), সাহিত্য-সংহিতা (১৩২১-২৩)।

শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—Bengali in Indo-Romanic Small Letter (কলি, ১৯১৮), The International Script (কলি, ১৯১৯)।

শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়—অনুবাদক। অনূদিত গ্রন্থ—নেপোলিয়ন বোনাপার্টির জীবনচরিত (১৮৬৯, পাটনা)।

শ্যামাচরণ দত্ত—নাট্যকার। নাট্যগ্রন্থ—অনুতাপিনী নবকামিনী (১৮৫৬)।

শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—সংবাদ-ভারতবন্ধু (সাপ্তাহিক, ১৮৪১)।

শ্যামাচরণ বসু—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা (মাসিক, ১৮৪৬, জুন—ইহা সত্যসঞ্চারিণী বেদান্ত-সভার মুখপত্র)।

শ্যামাচরণ বসু—শিক্ষাব্রতী ও দেশহিতৈষী। জন্ম—১৮২৭ খৃঃ খুলনা জেলার অন্তর্গত টেংরা-ভবানীপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৮৬৭ খৃঃ লাহোরে। শিক্ষা—বাল্যে গ্রাম্য পাঠশালা, কলিকাতা ডফ সাহেবের স্কুলে। ইনি ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, ফারসী ও আরবী ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কর্ম—পঞ্জাবের মিশনারী ফোরম্যান সাহেবের শিক্ষা-বিস্তারকল্পে সহায়করূপে লাহোরে কর্মগ্রহণ (১৮৪৯)। লাহোরে মিশনারী স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক, পরে সরকারী রাজস্ব বিভাগে, তৎপরে শিক্ষা বিভাগে। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—আঞ্জুমান ই পঞ্জাব, শিক্ষা-সভা (লাহোর)। সম্পাদক—শিক্ষা-সভা। গ্রন্থ—Official Monitol.

শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জীবন ও মরণান্তে জীবন (১৯০৪), ধর্মজীবন ও ভক্তি (১৯০৫)।

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়—কবি। গ্রন্থ—সাধনাগীতি (কবিতা)

শ্যামাচরণ শর্মা সরকার—শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮১৪ খৃঃ ২০এ মার্চ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে পূর্ণিয়াতে। মৃত্যু—১৮৮২ খৃঃ ১৪ই জুলাই। পৈত্রিক নিবাস—নদীয়া জেলার চূর্ণীতীরবর্তী মামজোয়ানি গ্রামে। পিতা—হরনারায়ণ সরকার শিক্ষা—কৃষ্ণনগরে ফার্সী, হিন্দী, ইংরেজি, আরবী। কর্ম—রী[illegible] সাহেবের মুন্সি, সাহেবদিগের গৃহশিক্ষক। কলিকাতা মাদ্রাসা[illegible] বাংলা শিক্ষক (১৮৩৭), মেদিনীপুরে বেলী সাহেবের বাং[illegible] শিক্ষক (১৮৪২), সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি শিক্ষক (১৮৪২) সদর দেওয়ানী আদালতের পেস্কার (১৮৪৮), প্রধান অনুবাদ[illegible] (১৮৫০), সুপ্রীম কোর্টের চীফ ইনটারপ্রিটার (১৮৫৭) অবসর গ্রহণ (১৮৭৩)। ঠাকুর আইন অধ্যাপক (১৮৭২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৮৭৪)। ভারত সভা[illegible] প্রথম সভাপতি (১৮৭৬)। 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি লাভ প্রতিষ্ঠা—নদীয়া জেলায় চূর্ণীতীরবর্তী মামজোয়ানি গ্রা[illegible]

ইংরেজি-বাংলা বিদ্যালয় (১৮৫৮)। ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন (১৮৪৫)। গ্রন্থ—বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১২৫১), ব্যবস্থা-দর্পণ ২ ভাগ (১২৬৬), পাঠসার (১৮৮১), নীতিদর্শন (১৮৮২), Introduction to Bengalee language, ২ খণ্ড (১৮৫০), The Muhamamadan Law, ১ম (১৮৭৩), ২য় (১৮৭৫), Vyavastha Chandrika, ১ম (১৮৭৮)।

শ্যামাচরণ সান্ন্যাল—সাময়িকপত্রসেবী। যুগ্ম-সম্পাদক—সৌদামিনী (দ্বি-সাপ্তাহিক, ১৮৫১, ৩ সেপ্টেম্বর)।

শ্যামাদাস (দে)—প্রাচীন বৈষ্ণব কবি। দুঃখী শ্যামাদাস নামে পরিচিত। জন্ম—১৭শ শতাব্দী মেদিনীপুর জেলার হরিহরপুর গ্রামে। পিতা—শ্রীমুখ। মাতা—ভবানী দেবী। গ্রন্থ—গোবিন্দ মঙ্গল।

শ্যামাদাস মজুমদার—গ্রন্থকার। জন্ম—১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। গ্রন্থ—সরল ভূগোল (১৮৭২)।

শ্যামানন্দ দাস—বৈষ্ণব কবি ও ধর্মপ্রচারক। পৈত্রিক নিবাস—মেদিনীপুর জেলায় ধারেন্দ্রবাহাদুরপুর, পরে দণ্ডেশ্বর গ্রামে। মৃত্যু—১৬৩০ খৃঃ। পিতা—কৃষ্ণ মণ্ডল। মাতা—দুরিকা। উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসিদ্ধ প্রচারক। গ্রন্থ—উপাসনা সারসংগ্রহ, গোবর্দ্ধনোপদেশ, প্রার্থনা, ভাবমালা, অদ্বৈততত্ত্ব, বৃন্দাবনপরিক্রমা।

শ্যামাপদ চক্রবর্তী—কবি। গ্রন্থ—ওমর খৈয়াম (পদ্যানুবাদ)।

শ্যামাপ্রসাদ দত্ত—গ্রন্থকার। নিবাস—চন্দননগর। সম্পাদিত গ্রন্থ—রামদাস সেনের পদাবলী (রাখাল দাস চক্রবর্তী সহ)।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—নেতা, রাজনীতিজ্ঞ ও ব্যবহারজীবী। জন্ম—১৯০১ খৃঃ ৭ই জুলাই কলিকাতা ভবানীপুরে। মৃত্যু—১৯৫৩ খৃঃ ২৩ জুন কাশ্মীরে। পিতা—স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। মাতা—যোগমায়া দেবী। শিক্ষা—প্রবেশিকা (মিত্র ইন্স্টিটিউশন, ১৯১৭), আই-এ (১৯১৯), বি-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৯২১), এম-এ (১৯২৩ প্রথম স্থান বাংলায়), বি-এল, বার-এট্-ল, এল-এল-ডি (অনারারী)। ফেলো, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২৪—২৮), এম-এল-এ (১৯২৩, ১৯৩৭), এম-এল-সি (১৯২৯), ভাইস চ্যান্সেলর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৪—৩৯), বাঙলার অর্থ বিভাগের মন্ত্রী (১৯৪১, পদত্যাগ ১৬ অক্টোবর ১৯৪২, কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও সরবরাহ সচিব (১৯৪৭—৫০)। সভাপতি, হিন্দু মহাসভা মহাবোধি সোসাইটি, বঙ্গভাষা প্রচার সমিতি ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি—জনসঙ্ঘ (১৯৫১—৫৪), এম-পি (১৯৫২)। পরিচালক—ন্যাশানালিষ্ট (দৈনিক পত্র)। রাজনীতিক্ষেত্রে, বাঙলার দুর্ভিক্ষে, কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপারে, উদ্বাস্তু সমস্যায় ইহার কর্মবহুল জীবনের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। গ্রন্থ—পঞ্চাশের মন্বন্তর, রাষ্ট্রসংগ্রামের এক অধ্যায়, পশ্চিম-পরিচয় (সম্পাদিত), A phase of Indian Struggle.

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—শিক্ষাব্রতী ও সমালোচক। জন্ম—১৮৯৪ খৃঃ হাতিয়া গ্রামে (মাতুলালয়ে)। পৈত্রিক নিবাস—বীরভূম জেলার কুশমার গ্রামে। পিতা—মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষা—বি-এ (১৯১০), ঈশান স্কলার, পি-এইচ-ডি (১৯১২)। অধ্যাপক, বিভিন্ন সরকারী কলেজে। রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৬)। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রবন্ধ রচনা। বাঙলা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। গ্রন্থ—বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, বাংলা সাহিত্যের কথা, ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস, Critical theory and practice in the Lyrical Ballad.

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার—স্মার্ত পণ্ডিত। জন্ম—১৮শ শতাব্দী। আদি নিবাস—মালদহ জেলায়। নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপনা ও অধ্যাপনা। গ্রন্থ—দায়ক্রমসংগ্রহ, (কোলব্রুক সাহেব এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেন), দায়ভাগটীকা, সাহিত্যবিচার (ন্যায়গ্রন্থ)।

শ্রীকৃষ্ণ দাস—সাংবাদিক। জন্ম—রাজশাহী জেলায় বোয়ালিয়া গ্রামে। সম্পাদক—জ্ঞানাঙ্কুর (মাসিক, ১২০৯)।

শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। পিতা—গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ। গ্রন্থ—ভাবদীপিকা (ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীর টীকা)।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন—ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। জন্ম—হুগলী জেলার অন্তর্গত সোমড়া গ্রামে। এন্ট্রান্স পর্যন্ত পাঠ। কর্ম—জামালপুর অডিট অফিস। সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন। মুঙ্গেরে ধর্মসভা প্রতিষ্ঠা। চাকুরী ত্যাগ করিয়া ধর্মজীবন যাপন। কাশীতে যোগাশ্রম ও যোগেশ্বরী দেবী প্রতিষ্ঠা। পরবর্তী কালে কৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে বিখ্যাত। টীকাগ্রন্থ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। সম্পাদক—ধর্মপ্রচারক (মাসিক, ১২৮০)।

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র—সাহিত্যিক। জন্ম—খুলনা জেলায়। সম্পাদিত গ্রন্থ—বারণ (কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কৃত নাটক); সম্পাদক—রূপান্তর।

শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম—স্মার্ত পণ্ডিত। জন্ম—১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগে নবদ্বীপে। আদি নিবাস—শান্তিপুরে। কৃষ্ণনগররাজের সভাসদ। স্মৃতিশাস্ত্রে এবং কাব্যশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। গ্রন্থ—কৃষ্ণপদামৃত (কাব্য, ১৭১১), কৃষ্ণপদাঙ্ক দূত (কাব্য, ১৭২৩)।

শ্রীধর আচার্য—দার্শনিক পণ্ডিত। জন্ম—৯১৩ শকাব্দে হুগলী জেলার ভূরিসৃষ্টি (ভুরসুট) গ্রামে। পিতা—বলদেবাচার্য। মাতা—অচ্ছোকা দেবী। দক্ষিণরাঢ় ভূরিসৃষ্টি গ্রামের কায়স্থকুলতিলক পাণ্ডুদাসের উৎসাহে বহু গ্রন্থ রচনা। গ্রন্থ—ন্যায়কন্দলী (বৈশেষিক দর্শনের টীকা); অদ্বয়সিদ্ধি, তত্ত্বপ্রবোধ, তত্ত্বসংবাদিনী সংগ্রহ।

শ্রীধরচন্দ্র বড়ুয়া—অসমীয় ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। সম্পাদক—আসাম তারা (মাসিক, ১৮৮৮—১৮৯০; তীর্থভ্রমণে গমন করায় পত্রিকা বন্ধ হয়)।

শ্রীধর সমাদ্দার—গ্রন্থকার। জন্ম—বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাগধা। পিতা—শশিকান্ত সমাদ্দার। শিক্ষা—বি-এ, হোমিওপ্যাথ। প্রথম জীবনে মিলিটারি অ্যাকাউন্ট্যান্সের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, আইন-অমান্য আন্দোলনে সরকারী কর্মত্যাগ। বিভিন্ন সাময়িকপত্রের লেখক। গ্রন্থ—স্বরাজ লাভ (কথিকা), অদৃষ্ট (উপন্যাস)।

[ক্রমশঃ।

বিস্মিতা

—জে, আর সেনগুপ্ত

মাছধরা

—পরিতোষকুমার মিত্র

বিস্মিতা
—বি, সি, সাহিড়ী

মালদহের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বৃন্দাবনী আম্রবৃক্ষ
—অনিমেষ বসু

আগ্রা ফোর্ট থেকে তাজমহল

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

SNOW”

(TRADE MARK)

“‘হেজলিন’ স্নো” (ট্রেড মার্ক)

প্রচুর নকল ‘স্নো’ বাজারে চলছে। এই জন্য জনসাধারণ যাতে না ঠকেন সেজন্য আমাদের তৈরি “‘HAZELINE’ SNOW” TRADE MARK “‘হেজলিন’ স্নো” ট্রেড মার্ক-এর শিশির ঢাকনার ওপর **অ্যালু ক্যাপসুল** অর্থাৎ রূপালী অ্যালুমিনিয়মের পাতলা পাত জড়ানো থাকে।

কেনার সময় অ্যালুমিনিয়মের পাতলা পাত জড়ানো আছে কিনা দেখে নেবেন।

শিশির উপরের দিকে নীল রঙের এই চিহ্নটিও দেখে নেবেন।

বারোজ ওয়েলকাম
অ্যাণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
পোস্ট বক্স ২৯০, বোম্বাই

“‘HAZELINE’ SNOW” “‘হেজলিন’ স্নো” লণ্ডনের দি ওয়েলকাম ফাউণ্ডেশন লিমিটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্ক এবং ভারতে কেবল বারোজ ওয়েলকাম অ্যাণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড-ই এই কথাটি ব্যবহার করার অধিকার পেয়েছেন। এরা ছাড়া যদি অন্য কেউ এই ট্রেড মার্ক ব্যবহার করেন কিংবা অন্য জিনিস “‘HAZELINE’ SNOW” TRADE MARK “‘হেজলিন’ স্নো” ট্রেড মার্ক নাম দিয়ে উৎপাদন করেন, অথবা ব্যবসা করেন, কিংবা বিক্রি অথবা বিক্রির চেষ্টা করেন তবে তিনি আইনত দণ্ডনীয় হবেন।

কবি মুকুন্দ দাস

(নাটিকা)

ভবেশ দত্ত

পাত্র-পাত্রী

রাজনাথ গুহ-ঠাকুরতা—জমিদার।
মুকুন্দ দাস —চারণ কবি।
রমেশ দাস —ঐ দাদা।
অশ্বিনী দত্ত —স্বদেশী যুগের অন্যতম নেতা।
স্যার সুরেন বাঁড়ুয্যে —রাষ্ট্রগুরু।
ফুলার সাহেব —বরিশালের পুলিশ কমিশনার।
জেলার—
পাহারাওয়ালা—
প্রথম যুবক—
দ্বিতীয় যুবক—
ক্ষীরোদ দাসী —মুকুন্দর মা।
উমা — " স্ত্রী।
রমা — " কন্যা।

প্রথম দৃশ্য।

[স্থান—বেলশ পার্ক বরিশাল। বাংলা দেশ জুড়ে তখন চলছে লবণ আইন অমান্য আন্দোলন ও বিদেশী জিনিষ বর্জ্জন। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে সারা দেশে আলোড়নের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। শহরের গ্রামের দোকানের বিলিতি জিনিষ সমাধি লাভ করছে জ্বলন্ত আগুনে। স্বাধীনতাকামী যুবক দল ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে মরণ-খেলায়। সোনার বাংলা ছারখার হয়ে গেলো বিদেশীর অত্যাচারে। এমন দিনে এলেন স্যার সুরেন বাঁড়ুয্যে]

সুরেন বাঁড়ুয্যে। দেশকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হ'লে আমাদের বিলিতি জিনিষ বর্জ্জন কোরতেই হ'বে। ওরা লুণ্ঠনকারী—আমাদের দেশের সম্পদ আমরা পরের হাতে তুলে দেবো না। বিলিতি জিনিষে ওরা আমাদের দেশটাকে ছেয়ে দিতে চায়। আমরা ভারতবাসী—এ আমরা কিছুতেই বরদাস্ত কোরব না। এ আমাদের দেশ—স্বদেশী জিনিষই আমাদের কাছে শ্রেষ্ঠ। স্বদেশী জিনিষেই আমরা ভরিয়ে তুলবো ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য। এই প্রতিজ্ঞাই আমাদের কোরতে হবে যে বিলিতি জিনিষ আমরা এ দেশ থেকে দূর কোরব। এ কাজে প্রয়োজন হ'লে আমাদের জীবনকে বলি দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হ'বে। আপনারা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে যান, প্রচার করুন, সবাই যেন স্বদেশী জিনিষই ব্যবহার করে। বন্দে মাতরম্।

[সমস্ত পার্কে প্রতিধ্বনি উঠলো—বন্দে মাতরম্। তারপর বক্তৃতামঞ্চে উঠলেন বরিশালের বিশাল মানুষ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার]

অশ্বিনীকুমার। "বিলিতি জিনিষ বর্জ্জন করো" এই আমাদের এখন মূল মন্ত্র। নিজের দেশের লোককে স্বদেশী বেশেই দেখতে চাই। বিলিতি কাপড়-জামা পরে আমরা বাঙালী সাজবো, এর চেয়ে লজ্জার ঘৃণার আর কি হ'তে পারে? আমরা জন্মেছি বাংলার মাটিতে বাঙালী হয়ে। মৃত্যুও যেন কাম্য হয় আমাদের এই বাংলার মাটিতেই। আমার দেশের তাঁতি, তারা খেতে পায় না। তাদের তাঁতে মাকড়শা জাল বুনবে আর আমরা পরবো ম্যানচাষ্টারের কাপড়? কেন আমরা কি মোটা কাপড় পরতে পারি না? তা কি এতই ভারী? যে বিদেশী বোঝা আমাদের মাথার ওপর এত দিন ধরে চেপে বসে আছে সে ভার আমরা সইতে পারছি, বইতে পারছি আর আমার দেশের তৈরী কাপড় তা একটু মোটা বলে আমরা তার ভার সহ্য কোরতে পারি না? যদি আমাদের বাঁচতে হয়, যদি আমাদের দেশের লোককে বাঁচাতে হয়, তা হলে বিলিতি জিনিষ একেবারেই বর্জ্জন কোরতে হবে। দেশের প্রত্যেক লোককেই বুঝিয়ে দিতে হবে যে, দেশের সম্পদই আমার সম্পদ, দেশের খাদ্যই আমার খাদ্য, দেশের সভ্যতাই আমার সভ্যতা, স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার, যে কোন বিনিময়েই আমরা এক দিন না এক দিন লাভ কোরবই।

[এমন সময় সমস্ত পার্কে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হোল। ফুলার সাহেব আসছেন ঘোড়া ছুটিয়ে, তাঁর হাতে চাবুক]

ফুলার সাহেব। As I commissioner I will not tolerate this—clear out at once otherwise I will treat this howling dogs।

[চাবুকের ঘায়ে কত যুবকের পিঠের ছাল উঠে গেলো। চামড়া ছাপিয়ে উঠলো তাজা রক্ত। দু'জন যুবক গেটের সামনে ফুলার সাহেবের ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলো]

ফুলার সাহেব। Leave in at once otherwise......

প্রথম যুবক। না সাহেব ছাড়বো না, কৈফিয়ৎ চাই—চাবুক চালানোর কি অধিকার তোমার আছে?

ফুলার সাহেব। এই Second man, আভি ছোড়।

দ্বিতীয় যুবক। না ছাড়বো না, জবাব দাও, এ অত্যাচারের কি প্রয়োজন ছিল?

ফুলার সাহেব। What nonsense you fool clear out।

[ছুটন্ত ঘোড়ার রাশ চেপে যারা জবাবদিহি কোরছিল তারা পড়ে গেলো চাবুকের ঘায়ে। পুলিশ এসে যাকে পেলো গ্রেপ্তার কোরল। স্যার সুরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হোলেন]

[সমস্ত দেশ জুড়ে যখন চলছে এমনধারা আন্দোলন, এমনি দিনে মুকুন্দ দাস যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন]

ক্ষীরোদ দাসী। মুকুন্দ! ও মুকুন্দ!! তোর ঘুম আর ভাঙবে না, দেশ জুড়ে হাঙ্গামা চলছে আর তোর ঘুম যেন ততই বাড়ছে। ওরে ওঠ, একটু দেখ—

মুকুন্দ দাস। মা, দেশে কি হোল বল্ তো, এত অন্যায় কি ভগবান সইবে?

ক্ষীরোদ দাসী। তাতে তোর কি? গুণ্ডামী আর বাটপাড়ি কোরে যার দিন কাটে তার আবার এত ভাবনা কিসের?

সারা জীবন তোকে নিয়ে জ্বলে মরলাম, ভেবেছিলাম বাবুদের দয়ায় তোকে মানুষ কোরে তুলবো, তোর মতিগতি ফিরবে কিন্তু তা আর হোল না। মানুষ তো হলি না, হলি গুণ্ডাদলের সর্দার।

মুকুন্দ। মা! আমি গুণ্ডাদলের সর্দারই না হয় হোলাম—কিন্তু মা, আমি কি এতই বোকা যে চুপ কোরে শুধু ঘুমোচ্ছি? ঘুমের আমি শেষ কোরে দিলাম—আমি যাচ্ছি।

ক্ষীরোদ। কোথায় রে?

মুকুন্দ। গুরুর কাছে, আজ যে আমি তাঁর কাছে দীক্ষা নেবো।

ক্ষীরোদ। আহা কি ছিরি, দীক্ষা নেবেন! জামা-কাপড়েরই বা কি ছিরি! মাথার চুলে যেন উকুনে বাসা বেঁধেছে। এই চেহারায় যার-তার কাছে যেতে তোর লজ্জা কোরবে না?

মুকুন্দ। গুরুর কাছে যাবো তার আবার লজ্জা কিসের? আমি চললাম। দাদা আসছে ঐ দেখো। কিছু বোল না যেন।

রমেশ। মা, যজ্ঞে কোথায় গেলো?

ক্ষীরোদ। আর যজ্ঞে বলিস নে, ওকে এখন মুকুন্দ বলেই ডাকতে হবে। হ্যাঁ রে, ওর কি আক্কেল বল্ তো? ঐ চেহারা নিয়ে ও নাকি কার কাছে দীক্ষা নিতে গেলো।

রমেশ। দীক্ষা—(হাসিয়া) পাগল! বোললাম, চল দোকানে বসবি। তা নয়, দিন-রাত নিষ্কর্মার মত ঘুরে বেড়াবে। বল তো মা আমাদের কিসের অভাব? দুই ভাই যদি দোকান দেখতাম তাহলে আমাদের সংসারে কিসের অভাব? বাবা সারা জীবন চাকরগিরি কোরে দিন কাটিয়ে গেছে, আর তোমারও যা কষ্ট!

ক্ষীরোদ। (কাঁদিয়া) বাবা রে, সবই কপাল! তোরা আমার বেঁচে থাক—এই আমার সুখ। একটু সরে দাঁড়া বাবা, ঠাকুর আসছেন।

রাজনাথ। কপালের কি দোষ হোল রে রমেশ! যজ্ঞে কোথায় গেলো?

রমেশ। ও না কি কার কাছে দীক্ষা নিতে গেছে।

রাজনাথ। দীক্ষা!

রমেশ। হাঁ ঠাকুর!

রাজনাথ। ওরে বাধা দিস নে। মতি-গতি ওর এবার ফিরবে।

ক্ষীরোদ। আর ফিরছে! চিরকাল যে মুখ্যুই রয়ে গেলো, তার আবার মতি-গতি ফিরবে কি কোরে?

রাজনাথ। কখন যে কার মধ্যে কি প্রতিভা লুকিয়ে থাকে কে বোলতে পারে? আমি বোলছি ও একদিন দেশের সেবায় লাগবে।

ক্ষীরোদ। বাবা ঠাকুর!

রাজনাথ। হ্যাঁ আমি বোলছি। ও একটা জ্বলন্ত আগুনের ফুলকি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সময় দুপুর। মুকুন্দ দাস বসে আছে অশ্বিনী দত্তের গেটের পাশে। একবার যায় আর একবার পিছিয়ে আসে, শেষে সে সোজা ঢুকে গেলো গেটের ভিতরে।]

মুকুন্দ। দেখি গুরুর সংগে দেখা হয় কি না? দত্ত মশায় কি বাড়ী আছেন?

অশ্বিনী। কে? এদিকে এসো।

মুকুন্দ। আমি।

অশ্বিনী। এসো, ভিতরে চলে এসো ভয় কি? থাক, আর প্রণাম কোরতে হবে না। বল কি চাও?

মুকুন্দ। বাবু! আমার বড় অভাব, ভারী দুঃখী মানুষ, যদি পায়ের তলায় একটু ঠাঁই দেন।

অশ্বিনী। কি, পয়সা চাও না খেতে চাও?

মুকুন্দ। পয়সাও চাই নে, খেতেও চাই নে, শুধু আপনার সংগে সংগে থাকতে চাই।

অশ্বিনী। মানে?—

মুকুন্দ। আমি আপনার কাছে কাছে থাকতে চাই, বাড়ীও যাবো না, কিছু কোরবও না। শুধু আপনার সংগে থাকবো।

অশ্বিনী। (একটু চুপ করিয়া) গান গাইতে পারো।

মুকুন্দ। তা পারি, শুনবেন?

অশ্বিনী। না, না, এখন থাক, আগে খাও দাও, বিশ্রাম করো, তার পর গান শুনবো।

মুকুন্দ। তা হোক, আমি এখনই গাই—

ফুলার, আর কি দেখাও ভয়,
দেহ তোমার অধীন বটে
মন তো অধীন নয়।
চাবুক দিয়ে মারবে যত
মরিয়া হোয়ে উঠবো তত
উল্টো লাঠি ধরবো এবার
(আমরা) ভেড়ার বাচ্চা নয়।
অন্যায়ে আর অত্যাচারে
দিয়ে সব ছারেখারে
পরিপাটি দেশের মাটি
কোরলে সব লাটিপাটি
দেখ্, রে এবার ঘটিয়ে দেবো
বিশ্বজোড়া লয়।

অশ্বিনী। এ গান তৈরী কোরলে কে?

মুকুন্দ। কেন বাবু! আমিই বেঁধেছি গান—ঠিক হয়নি বাবু, তাই, নয়? ঠিক কি হয় বাবু, বিদ্যে নেই, বুদ্ধি নেই।

অশ্বিনী। না মুকুন্দ, বেশ হোয়েছে—কিন্তু তোমার এ কি বেশ! তোমার কি কেউ নেই?

মুকুন্দ। আছে বাবু! মা, দাদা, বৌদি সবই আছে।

অশ্বিনী। কোথায় থাকো তোমরা?

মুকুন্দ। আমরা দা'ঠাকুরের বাড়ীতেই থাকি, সেখানেই আমরা মানুষ হোয়েছি।

অশ্বিনী। দা'ঠাকুর কে?

মুকুন্দ। বানারিপাড়ার রাজনাথ গুহ-ঠাকুরতার নাম শোনেননি?

অশ্বিনী। তা আবার শুনবো না কেন, তা কাপড়টা বদলে একখানা ভাল কাপড় পরো।

মুকুন্দ। ভাল কাপড় পরার দিন আসুক, তখন পরবো। পরের অধীনে থেকে যে শালা বাবুগিরি করে, সে বেকুব।

অশ্বিনী। ঠিক বোলেছো! আমাদের দেশের লোক খেতে

পায় না, পরতে পায় না—সবার দুঃখ যদি না-ই ঘুচলো তা হোলে বাবুগিরি কোরে কি লাভ?

মুকুন্দ। হাঁ বাবু, দেশের লোকের দোটানা ঘোচাতে হবে—কত মা বাসন মেজে দিন কাটায় আর তার ছেলে হয়তো দিন-রাত ফুর্ত্তি কোরে বেড়ায়। ধিক্ তাদের জীবনে!

অশ্বিনী। কাঁদছো কেন?

মুকুন্দ। এ বয়সভোর কত অন্যায় কোরেছি, মা আমার কত কষ্ট পেয়েছে, আর আমি—

অশ্বিনী। ও ভেবে আর লাভ নেই। মাকে কষ্ট দেওয়ার মত পাপ নেই। মায়ের দুঃখে যার প্রাণ কাঁদে না, সে অমানুষ। এই দেশও আমাদের মা—এই দেশজননীর কত কষ্ট, পরাধীনতার নিগড়ে মায়ের আমার হাত-পা বাঁধা—মা আমার ছিন্নবস্ত্রা, মায়ের আমার চোখে জল। মুকুন্দ! ও মুকুন্দ!

মুকুন্দ। ছিল ধান গোলাভরা
শ্বেত ইঁদুরে কোরল সারা
দেখ না রে চোখ খুলে
বাবু দেখবি কি আর ম'লে।

অশ্বিনী। চমৎকার! তুমি পারবে মুকুন্দ?

মুকুন্দ। বাবু আমায় কাজ দিন, আমি আর বসে থাকবো না।

অশ্বিনী। হাঁ, তোমায় কাজ দেবো। তোমার উপস্থিত কাজ হোচ্ছে সভায় সভায় গান গেয়ে বেড়ানো, তার পর—

মুকুন্দ। তার পর?

অশ্বিনী। তার পর তোমাকে একটা স্বদেশী যাত্রার দল খুলতে হবে। দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, বাংলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে উল্কার মত ছুটে বেড়াতে হবে স্বদেশী গান গেয়ে গেয়ে।

মুকুন্দ। বেশ বাবু, তাই হবে।

তৃতীয় দৃশ্য

[যুগে যুগে দেশে দেশে যারা বড় হোয়েছে তাদের পিছনে ছিল মহৎ লোকের প্রেরণা। মুকুন্দ দাস মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের প্রেরণায় নতুন মানুষ হোয়ে উঠলো। দাদার অনুরোধ, পত্নীর অভিমান কোন কিছুই তাকে বাধা দিতে পারলো না]

উমা। বল তো তোমার জ্বালায় কি আমি মাথা খুঁড়ে মরবো? দিন-রাত কোথায় কি যে করো তা-ও বুঝি না। না দেখলে সংসার, না দেখলে আমাকে, আমার জীবনটাই যেন ব্যর্থ হোয়ে গেলো।

মুকুন্দ। শোন উমা—সারা জগৎজোড়া যেখানে অশান্তি সেখানে জীবন হয়তো ব্যর্থ হোয়েই থাকে। আমার দেশ-জননী, তারই যে শান্তি নেই। তাকে মুক্ত না কোরতে পারলে কেউ শান্তি পাবে না।

উমা। কি যে বলো, কিছুই বুঝি নে, এত ভাল কথা শিখলে কোথা থেকে? আজ আবার কিছু খেয়ে-টেয়ে আসোনি তো?

মুকুন্দ। যা খেয়েছি তা এ জন্মে পাবো বোলে আশা করিনি। শোন বৌ, আমি বাড়ী থেকে বেরোব। আমার ওপর কাজের ভার পড়েছে।

উমা। তোমার আবার কাজ! কোথাও কোন অফিসে বাবুগিরির কাজ-টাজ জোটালে না কি?

মুকুন্দ। বাবুগিরির মুখে ঝাড়ু। জানো আমি স্বদেশী যাত্রার দল খুলবো, তার পর সেই যাত্রার দল নিয়ে সারা বাংলা দেশ ঘুরে বেড়াবো। দেশের লোকের অন্তরে যাতে স্বদেশী ভাব জাগে সেই কাজ আমাকে করতে হবে।

উমা। দেশে আর লোক পেলো না, তোমাকে এমন ভার দিলে?

মুকুন্দ। লোকের বৌ যে এমন হয় তা আমি আগে জানতাম না। একটা বড়ো কাজে হাত দিচ্ছি কোথায় একটু সাহস দেবে তা না, যাতে পিছিয়ে পড়ি সেই চেষ্টাই কোরছে। এ দিন উমা চিরদিন থাকবে না। শোন একটা গান—

"ও রে যাবার পালা ঘনিয়ে এলো
তল্পী বেঁধে নে এই বেলা।
রক্ত-মাংস সব তো নিলি
আর কেন রে হেলাফেলা।
আমার দেশের তাঁতি মরে
তোদের ঐ ম্যানচেষ্টারে
তাই বলি রে চপি চুপি পড় রে সরে
সাগর-জলে ভাসায়ে ভেলা।
বাংলা দেশে উড়ে এসে
পড়লি ওরে শকুন বেশে
আমার দেশজননীর ত্রিশূল নাচে
আমরা যে তার প্রধান চেলা।

উমা। বাঃ, বেশ তো গান দেখছি, এ গান কে বাঁধলো?

মুকুন্দ। কেন, আমি কি মানুষ নয়?

উমা। নিশ্চয়ই! দেখো আমি বলি কি, এ-সব না কোরে দাদার কথা শোন। দু' ভাই দোকান দেখো, আমাদের সংসার বেশ চলে যাবে—তুমি এই ভাবে ঘুরে বেড়ালে আমাকে কে খাওয়াবে বল তো?

মুকুন্দ। আজ সারা ভারতবর্ষের সব সংসারেই তোমার মত বৌ এমনি কোরে খাওয়ার কথা ভাবে। কিন্তু বল তো আমাদের কিসের অভাব ছিল? সে অভাব সৃষ্টি কোরেছে বিদেশীরা। তাই আমি ঘর থেকে বেরোব। গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ ঘুরে বেড়াবো আমার যাত্রার দল নিয়ে, দেখি দেশ জাগে কি না। দেশের ছেলেরা ফ্যাশান নিয়ে ব্যস্ত। দেশের সেবা দূরে থাক, ঘরে মা-বাপকে খেতে দেয় না। আমার দেশজননীর বুক ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে, আর আমরা দিন দিন ময়ূর সেজে ইংরেজ হবার চেষ্টা কোরছি। এদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে যে এ ভাবে দিন কাটালে দেশের স্বাধীনতা আসবে না। দেশের স্বাধীনতা আনতে গেলে নোতুন ভাবে মন্ত্র নিতে হবে, সে মন্ত্র হবে—বন্দে মাতরম্।

উমা। তোমার চোখে জল কেন, তুমি না পুরুষ মানুষ?

মুকুন্দ। হ্যাঁ ঠিক! কিন্তু এমনি কোরে বাংলার ঘরে ঘরে যে চোখের জল পড়ছে।

[বাইরে শোনা গেলো "কালী মাইকি জয়"।]

মুকুন্দ। ও কি?

উমা। কোথায় বোধ হয় কালীপুজো ছিল, তাই আজ ভাসান দিতে যাচ্ছে।

মুকুন্দ। আমি যাই, ভাসান দেখে আসি।

উমা। সে কি, এমন অসময়ে?

মুকুন্দ। দূর, মাকে দেখতে যাবো তার আবার সময়-অসময় কি?

(বিসর্জ্জনের বাজনা বাজছে)

মুকুন্দ। মা আমায় তুই বোলে দে, কি ভাবে এই দেশ মুক্তি পাবে। তোর মুখের দিকে যে আর আমি চাইতে পারি না—এ তোর কি বেশ মা! রুক্ষ চেহারা, পরনে ছিন্ন বাস। কেন মা, তুই না রাজার দুলালী? এমন ভাবে যদি তুই নিজেকে সাজাস তাহলে আমরা বাঁচবো কি কোরে? আমাদের জাগিয়ে দে—আজ বাংলায় ঘোর দুর্দ্দিন। আজ তুই আয় মা, তোর করাল মূর্ত্তি নিয়ে। হাতের ভয়াল খড়্গ দিয়ে দূর কর বাংলার যত পাপ। ভুলে গেলি মা তোর তাণ্ডব নৃত্য? পায়ের তলে পিষে দে যত অন্যায়, যত অত্যাচার। আজ দেশে সৃষ্টি কর এক নতুন জাতি। তাদের দে এক নতুন প্রাণ, নতুন মন, তাদের কানে কানে শুনিয়ে দে নতুন যাত্রার গান। সপ্ত কোটি কণ্ঠে সারা বিশ্ব কাঁপিয়ে দিক এক নতুন ঝঙ্কার। বোলে দে মা, বাংলা আবার নতুন প্রাণ কি কোরে পাবে—বাঙালী আবার কি কোরে তার লুপ্ত-গৌরব ফিরিয়ে আনবে।

পুরোহিত। তুমি কে?

মুকুন্দ। আমি ঐ ক্ষ্যাপা মায়ের ছেলে। কিন্তু তুমি কে?

পুরোহিত। আমি পুরোহিত। ও কি তুমি কাঁদছো কেন?

মুকুন্দ। কাঁদবো না? দেখেছো আমার মাকে কখনও, দিন-রাত কি পুজো করো তুমি, ভালো কোরে চেয়ে দেখো ত এ কি সেই মা!

পুরোহিত। পাগলা না কি।

মুকুন্দ। মায়ের নামের স্মরণ নিয়ে
চল্ রে ওরে দূর ওপারে
দিন বদলের শানাই বাজে
দিন-রাতই এক করুণ সুরে।
তোরা মায়ের পাগলা ভোলা
সারা দুনিয়ায় দে রে দোলা
(তাদের) পায়ের তলায় দে রে পিষে
মারছে যারা অন্যায়ে আর অত্যাচারে।

চতুর্থ দৃশ্য

[জেলের অভ্যন্তর। 'মাতৃপূজা' অভিনয় করার অপরাধে মুকুন্দ দাসের আড়াই বছর জেল হোল। দেশকে ভালবাসার অপরাধে চারণ কবি মুকুন্দ দাস আজ ঘানি টানছে]

মুকুন্দ দাস। এমনই বিচার আমার সরকারের যে বলদের কাজ মানুষকে দিয়ে করাচ্ছে। দাঁড়া, দিন আসছে, আমাকে দিয়ে
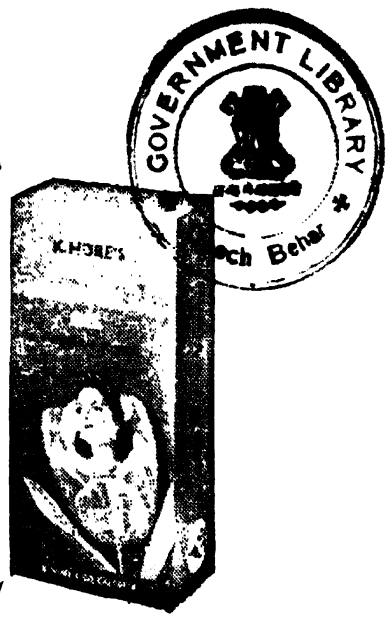
আজ ঘানি টানাচ্ছিস কিন্তু দেশে নতুন যারা আসছে তারা তোদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে। আজব বিচার বাবা! মারলাম না, ধরলাম না, শুধু দুটো গান গেয়েছি আর অমনি ফাটক। ওরে বাবা দুটো গানেই এত, আর যখন কোটি কোটি কণ্ঠে গান গাওয়া হবে সেদিন তো তোমাদের ভিরমি লেগে যাবে।

পাহারাওয়ালা। এই কেঁও ঠ্যারা হ্যায়, চালাও।

মুকুন্দ। আরে বেটা দাঁড়া, একটু জিরিয়ে নি—পাহারাওয়ালা নয় তো, যেন জল্লাদ!

পাহারাওয়ালা। ঠ্যারো, দেখতা হ্যায়।

মুকুন্দ। আর কি দেখাতে চাও?

[সপাং সপাং কোরে বেতের শব্দ হোল]

মুকুন্দ। আঃ, আ। মা, মা, চেয়ে দেখ্‌ছিস? খড়্‌গটা তুলে ধর।

[আবার সপাং সপাং শব্দ হোল]

মুকুন্দ। আঃ, মেরে ফেল। এ অত্যাচারী রাজত্বে আর বাঁচতে চাই নে। ইস্, গায়ের ছালগুলো যে সব উঠে গেছে—বাঃ, আবার রক্তও পড়ছে—পড়ুক শালার রক্ত। এই রক্তের বিনিময়ে যদি আমার দেশজননীর মুক্তি হয় তাহলে পড়ুক আরও রক্ত।

পাহারাওয়ালা। দেখো শালা, স্বদেশী করনেকো কেয়া হাল

মুকুন্দ। জাগো ভারতবাসী রে
...মে ...
... সবে হয়ে একমন
বন্দে মাতরম্।
...রে ভাই মেড়ারে মারিলে ঢুস
সে-ও করে রোষ রে
আমরা এমনই জাতি খাইয়ে পরের লাথি
ধুল ঝেড়ে চলে যাই ভবন
বন্দে মাতরম্।"

পাহারাওয়ালা। এই চুপ্! জেলর সাব।

মুকুন্দ। তোর জেলর সাব আমার কে রে!

জেলার সাহেব। এই কেঁও ঠ্যারা হ্যায়?

মুকুন্দ। দাঁড়িয়ে আছি কেন, দেখছো তোমার পাহারাওয়ালার কাজ!

জেলর সাহেব। Shut up ডাকু (চপেটাঘাত)

মুকুন্দ। উঃ এত অত্যাচার, দেশে কি মানুষ নেই? যারা চীৎকার কোরে বোলতে পারে, তোমরা বিদেয় হও নইলে পুড়িয়ে মারবো, জ্বালিয়ে দেবো তোমাদের অত্যাচারের রাজসিংহাসন।

জেলর সাহেব। চুপ্, রও শুয়ার!

মুকুন্দ। অত্যাচার কোরে কি আমার মুখ বন্ধ কোরতে পারবে?

জেলর সাহেব। দেখো তোমারা এক লেটর আয়া যযসে, তোমারা আওরাৎ মর গিয়া।

মুকুন্দ। যাক সব যাক! শালার এই দুনিয়াই ছিন্ন-ভিন্ন হোয়ে যাচ্ছে, তার আওরাৎ! আওরাৎ, হাঃ হাঃ হাঃ।

পঞ্চম দৃশ্য

[চারণ-কবি জেল থেকে বেরিয়েও শান্ত হোলেন না। ছেলে-মেয়ের হাত ধরেই আবার তিনি যাত্রাভিনয়ে মন দিলেন। তার পর ১৩৪১ সালের বৈশাখে এলেন কোলকাতায়। জেলে অত্যাচারে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। শরীরের কোথায় যেন আস্তে আস্তে ধ্বস নামে। বৈশাখের শেষে গান গাওয়ার সময় তিনি অসুস্থ হোয়ে পড়েন। তার পর এলো ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ। ১৩৪১ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ]

মুকুন্দ। কোলকাতায় এ যাত্রা না এলেই ভালো হোত। বড় ভুল হোয়ে গেছে। তাই না রমা মা!

রমা। বাবা তুমি চুপ করো। ডাক্তার যে বারণ কোরে গেছে কথা বোলতে।

মুকুন্দ। দূর পাগলী! ডাক্তাররা অনেক কিছুই বলে থাকে, মানতে গেলে কি আর আমরা বাঁচি? কথা বোলবে না, ডাক্তারে এমন ওষুধ দিতে পারে যাতে সারা ভারতবর্ষ স্বাধীন হোয়ে যায়।

রমা। বাবা!

মুকুন্দ। হ্যাঁ রে আনন্দময়ী আশ্রম চলবে তো, না বন্ধ করে দিবি। মায়ের আমার বড় দুঃখ।

রমা। মায়ের আবার দুঃখ কি!

মুকুন্দ। বুঝবি না মায়ের দুঃখ কি! তোরা জাগলি না তাই তো মায়ের দুঃখ।

রমা। বাবা, তুমি চুপ করো। দেখছো না কেমন কষ্ট হোচ্ছে।

মুকুন্দ। তা হোক, ওরে আমায় বাধা দিস নে, আর যে সময় নেই—মা আমায় ডাকছেন।

রমা। বাবা! বাবা!

[রাত্রি শেষ হোয়ে আসে। চার পাশে পাখীর কিচির-মিচির শব্দ শোনা যায়। চারণ-কবি হাঁপাতে থাকে]

মুকুন্দ। ওরে জানালাটা একটু খুলে দে, একবার শেষের মত দেখে নি আমার ভারতমাতাকে, কত সাধ ছিল ভারতবর্ষ স্বাধীন দেখে যাবো, কত আশা ছিল কাঙালিনী মাকে আবার নতুন কোরে সাজাবো, সে সাধ আমার পূর্ণ হোল না। বড় ব্যথা নিয়ে আমায় এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হোচ্ছে। তোরা পারবি, মা যেন বোলছেন তোরা সারা ভারতবর্ষের মুক্তি-যজ্ঞে প্রাণ দিবি। তোদের রক্তের ওপর তৈরী হবে স্বাধীনতার বেদী। চোখ যে অন্ধকার হোয়ে আসছে—বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, ব-ন্দে-মা-ত-র-ম্।

রমা। বাবা! বাবা!

(যবনিকা)

দিনে দিনে আরও নির্ম্মল, আরও
লাবণ্যময় ত্বক্
ক্যাডিল্‌যুক্ত রেক্সোনাকে
আপনার জন্যে এই যাদুটি
ক'রতে দিন
রেক্সোনার ক্যাডিল্‌যুক্ত ফেনা আপনার গায়ে আস্তে আস্তে ঘ'ষে নিন ও পরে ধুয়ে ফেলুন। আপনি দেখবেন দিনে দিনে আপনার ত্বক্ আরও কতো মসৃণ, কতো কোমল হচ্ছে—আপনি কতো লাবণ্যময় হ'য়ে উঠছেন।
রেক্সোনা
ক্যাডিল্‌যুক্ত একমাত্র সাবান
★ ত্বক্‌পোষক ও কোমলতাপ্রদ কতকগুলি তৈলের বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম
Rexona
Rexona
RP. 117-50 BG
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত

একটি চাষীর মেয়ে

[পূর্বানুবৃত্তি]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্যার জল সরে গেছে, কাদাও শুকিয়ে গেছে।

কিন্তু জীবনকে যে প্রচণ্ড প্রাণান্তকর আঘাত হেনে গেল বন্যা তার জের তো সহজে মিটবার নয়।

প্রকৃতির সর্বনাশা ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া কত কাল ধরে চলতে চলতে কোথায় গড়াবে, কি রূপ নেবে মানুষের মরার কড়া বাঁচার চেষ্টা আর পট পট করে মরে যাওয়া তাই বা কে জানে!

অনেক শ্রম অনেক জীবন ধ্বংস করা এই মারাত্মক আঘাত সামলে উঠতে না উঠতে আবার যে কি ভয়ঙ্কর আঘাত আসবে না প্রকৃতির অথবা মানবরূপী দানবদের তাই বা কে বলতে পারে!

নদীর ওপারেও দুঃখ-দুর্দশা কিছু নয়। ঢল নামিয়ে না থাকুক, কাল বৈশাখী আর আশ্বিনের ঝড় পাঠিয়ে কি ভাবে প্রকৃতি চাল উড়িয়ে নিয়ে গাছ ভেঙ্গে কুঁড়ে চুরমার করে কি রকম ব্যাপক ভাবে প্রাণ নষ্ট করে আর মানুষকে নিরন্তর মরণের মুখে ঠেলে দেয় এই বয়সেই তার পরিচয় কয়েক বার সে পেয়েছে।

বন্যার বহর দেখে তার মনে হয়েছিল, মহাপ্রলয় না হলেও এটাই বোধ হয় ছোটখাট প্রলয়।

বন্যা বিগত হবার পর তার যেন চমক লেগে ধাঁধা টুটে যায়।

বন্যা নামতে চারিদিকে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। সে যেন দিল শুধু কপাল চাপড়ে কাঁদা। ক্রমে ক্রমে সেই কান্না যেন পরিণত হয়েছে ব্যাপক আর্তনাদে।

শুধুই অসহায় আর্তনাদ নয়, শুধুই অদৃষ্টকে শাপা নয়। গোলোকদেরও তারা শাপে, বন্যা ঠেকাবার জন্য দায়িকদেরও শাপে। সময় বিশেষে, স্থান বিশেষে তাদের এই আর্তনাদই যেন বজ্র গর্জন হয়ে ফেটে পড়ে।

গোলোকের বাড়ীর সামনে একদিন শ' তিনেক লোক জড়ো হয়—মেয়ে-পুরুষ। সবাই তারা গোলোকের প্রজা নয়, তার খাস বা বিলি-করা জমির ক্ষেত-মজুর নয়। অনেকে আবার চাষীও নয়। যাকে বলে আশে-পাশের গাঁয়ের ইতর-ভদ্রের সমাবেশ।

চাষীদের নালিশটাই কিন্তু সব চেয়ে জোরদার হয়। গোলোকের টিকিটিও দেখা যায় না। তার নায়েব হীরালাল প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এসে সমাবেশের ভদ্র অংশের দিকে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, বাবুর জ্বর এয়েছে—বুড়ো মানুষ, বড় কাতর। আপনারা কি বলতে চান আমাকে শুনে যেতে বললেন। যেমন যেমন বলবেন সব বাবুকে জানাব।

: বাবুকে উঠে আসতে বলো। এত লোক কাতর হয়ে মরছে, বাবু একটু জ্বর গায়ে এসে দুটো কথা শুনে যেতে পারবেন না। বাবুকে বলো গে যাও, কোন ভয় নেই, আমরা মারপিট করতে আসিনি। ওনাকে শুধু বলতে এসেছি যে, বন্যা ঠেকানোর ব্যবস্থা এবার করতেই হবে—ওনাকেও উঠে-পড়ে লাগতেই হবে।

তিন বার হীরালাল ভিতরে যায় বাইরে আসে—গোলোককে এই অজুহাতে রেহাই দেবার আবেদন জানায়। তিন বারের বার নদেরচাঁদের বিকট চেহারার বৌ এবং গাঁয়ের প্রায় সেরা সুন্দরী মেয়ে ফুলের মা খ্যানখেনে গলায় গর্জে ওঠে, মিনষেকে আসতে বল। বলছি ভয় নেই, মোরা কিছু করব না—মেয়েছেলের মত লুকিয়ে রয়েছে। বল গে' যা ফুলের মা কথা দিয়েছে দায়িক রইবে। কেউ কাছে এগোলে আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে খাবে।

সবাই চেঁচামেচি করে সমর্থন জানায়। এমন একটা আওয়াজ ওঠে সকলের কণ্ঠ একসঙ্গে সমর্থনে বেজে ওঠায় যে, মনে হয় নদী কেন এমন বন্যা আনবে তারই প্রতিবাদে মহাসমুদ্র এসে গর্জন জুড়েছে।

হীরালাল মূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

ফুলের মা-ই গর্জনটা থামায়।

রেগে আগুন হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে বিকট আওয়াজে সে চেঁচাতে থাকে: চুপ! চুপ! চুপ! চ্যাংড়ামি করতে এয়েছিস নাকি! চুপ!

মিনিট খানেকের মধ্যে সকলে শান্ত হয়ে যায়। শুধু ফিসফাস গুজগাজের মৃদু একটা গুঞ্জরণ থেকে যায়।

ফুলের মা তখন হীরালালকে বলে, কর্তাকে বল গিয়ে, নিজে এসে কথা শুনে যান। শুধু কথা কইতে এয়েছি মোরা, আর কিছু না। ভয় নাই, ভয় নাই, কোন ভয় নাই।

প্রকাণ্ড চ্যাপ্টা মুখে ফুলের মা বিকট হাসি হাসে।

: কথা শুনতে না এলে মোরা মেয়েছেলেরা কিন্তু দল বেঁধে ভেতরে গিয়ে কাঁটাপেটা করব।

খানিক পরে গোলোক আসে।

সকলেই লক্ষ্য করে যে শুধু বাড়ীর গণ্ডা দুই চাকর ঠাকুর পাচক নয়, গণ্ডা তিনেক আশ্রিত আত্মীয়ের সাথে তার পিছনে পিছনে এসেছে গণ্ডা চারেক গুণ্ডা লাঠিয়াল।

গোলোকও সমাবেশের ভদ্র অংশের দিকে এসে গজ দুই ফাঁক রেখে দাঁড়ায়। মোটা কাঠের একটা সেকেলে ভারি চেয়ার তার পিঠপিছু এসেছে চাকরের হাতে কিন্তু ঠিক তার পেছনে পেতে দেওয়া হলেও গোলোক বসে না। দাঁড়িয়ে থেকেই ভদ্র অংশকে প্রশ্ন করে, ব্যাপার কি? ব্যাপার কি?

রিপোর্ট নিতে এসেছিল আমাদের সেই সমরেশ। প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে সাপের বিষ চুষে নিয়ে গোবিন্দকে রেবতীর বাঁচিয়ে দেওয়ার খবরটা যে প্রায় গায়ের জোরেই খবরের কাগজে ছেপে দিয়েছিল।

গোলোকের 'ব্যাপার কি?' 'ব্যাপার কি?' প্রশ্নের জবাব খানিকক্ষণ এলোমেলো ভাবে দেওয়া হলে সে সামনে এগিয়ে গিয়ে সহজ স্পষ্ট ভাষায় বলে, সোজা কথা, আপনাকে এবার বন্যা ঠেকানোর দায় নিতে হবে। খাজনা আপনাকে ঠিক দেবে—এক পয়সা এদিক ওদিক নয়। খাজনা দিয়ে খেটেখুটে চড়া দামের বীজ বুনে ফসল ফলাতে যাবে, বন্যা এসে সব তছনছ করে দেবে। বন্যা ঠেকাবার ব্যবস্থা যদি না করেন, কেউ আর এক পয়সা খাজনা দেবে না। জমি চষবে, ফসল বুনবে, ফসল নিজেদের ঘরে তুলবে।

গোলোক প্রায় পাগলের মত চীৎকার করে ওঠে, বন্যা ঠেকানোর ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করছি না জন্মো থেকে! কেউ কিছু করবে না তো আমি কি করব বল!

বুড়ো গোলোক হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে। সহানুভূতি আদায়ের তার এই বুড়োমি মেয়েলি চেষ্টায় কেউ অবশ্য এতটুকু বিচলিত হয় না।

বরং আরও রেগে যায়।

গিরির বারণ না মেনেই রেবতী এসে এক পাশে মেয়েদের অংশে মিশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু রিপোর্টার কুমারেশের চোখ এড়াবার সাধ্য কি আছে তার? বন্যা ঠেকানো বাঁধের জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গোলোক অন্দরে ফিরে গেলে সমাবেশও ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে যেতে থাকে।

পুলিস ডাকিয়ে তাদের মেরে-ধরে গুলী করে ছত্রখান করার সুযোগ না পেয়ে তাদের সামনে আসতে বাধ্য হয়ে গোলোক যে কেঁদে ফেলেছিল এটা মনে করে শীতল জলের বন্যায় দগ্ধ করা তপ্ত প্রাণটাতে তার কত যে ব্যথায় আপশোষ জাগে।

কুমারেশ নাগাল ধরে গিরি আর রেবতীর। বলে, পিছনে কেন? চুপচাপ কেন? দু'চার কথা বললেই হত। গায়ের জ্বালা প্রকাশ না করলে জগৎ-সংসার কি করে জানবে গায়ে তোমাদের জ্বালা হয়েছে?

গিরি বলে, এ মিন্‌সে কে রে বুড়ী?

রেবতী কুমারেশের দিকে একনজর তাকিয়ে বলে, এ মিনষেই তো সব গণ্ডগোলের গোড়া। কাগজে নামটা ছাপিয়ে দিয়ে মজার কাণ্ড সুরু করে দিলে। হিমসিম খেতে খেতে বানে ভেসে তোর কাছে এসে ঠেকতে হল।

গিরি থেমে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, তাই বল, সেই পপ্পরের কাগজের ছেলেটা? ভাবলাম কি, গোবিন্দ জেলে গেছে, দিন কাটে না, তলে তলে আরেকটার সাথে ভাব জমিয়েছিস্।

: তোর খালি ওই এক ভাবনা মামী! তার কথা কানেও তোলে না গিরি। কুমারেশকে প্রায় আদর করে ডাকার সুরে বলে, আসুন—সাথে সাথে আসুন! অমন ভাবে পিছু নিতে নেই মেয়েছেলের—সাহস করে সাথে ভিড়তে হয়। কারো কিছু ভাবার কারণ থাকে না।

কুমারেশও দাঁড়িয়ে পড়েছিল, এগিয়ে গিরির পাশে এসে কৃতজ্ঞ ভাবে বলে, একটা শিক্ষা দিলেন সত্যি। গাঁয়ের মেয়ে, কাছে ঘেঁষলে ভড়কে যাবেন, ভয় পাবেন ভেবে পিছু নিয়েছিলাম।

গিরি চলতে চলতে মাথা নেড়ে বলে, না, ওটা আপনারা ভুল ভাবেন। গাঁয়ের মেয়ে এটুকু জানে যে সোজাসুজি সামনে এসে যে খোলাখুলি কথা কয় তার কোন বদ মতলব নেই। বদ লোকেরাই ডরায়, পিছু থেকে আড়াল থেকে টোপ ফেলে যাচাই করে সুবিধা হবে না কি।

কুমারেশ খেদের সঙ্গে বলে, আপনাদের সম্পর্কে কত ভুল ধারণাই যে আমরা পুষি!

কুমারেশকে শিক্ষা দিয়ে গিরির যেন গর্ব বেড়েছে। শিক্ষাটা আরও সরল করে মনে প্রাণে গেঁথে দেবার উদ্দেশ্যেই সে যেন বলে, ধরুন না কেন অল্পবয়সী কচি একটা বৌয়ের কথা। ঘাটের পথে একলা চলেছে, কেউ কোথাও নেই। কোন কিছুর হদিস জানতে আপনি গিয়ে নাগাল ধরলেন। উসখুস করলেন, এগোলেন, পেছোলেন, অনেকটা ফারাক রাখলেন, আসল

কথাটা না বলে কেবলি অভয় দিলেন—ভয় পেয়ে বৌটা পড়িমরি করে দৌড় দেবে ঘরের দিকে।

: ধন্যি মামী তুই! মুখ যখন তোর খোলে!

: না না, আপনি বলুন। কি ভাবে নাগাল ধরলে বৌটি ভয় পাবে না।

: কাছে এগিয়ে সামনে যাবেন সোজাসুজি হদিস শুধোবেন—হ্যাঁ মা, রেবতী বলে একটি মেয়ে এয়েছে তার মামা গোবর্দ্ধনের বাড়ী, বাড়ীটা কোন্ দিকে? বৌটি ঘোমটা টেনে পিছু ফিরে দাঁড়াবে আপনার দিকে কিন্তু ছুটে পালাবে না। জড়িয়ে জড়িয়ে জবাব দেবে, হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দেবে কোন দিকে গেলে রেবতীর খোঁজ পাবেন।

রেবতী খিল খিল করে হেসে উঠে মুখে আঁচল চাপা দেয়। কুমারেশও এবার কথা হাল্কা করার জন্য হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে, হঠাৎ জড়িয়ে ধরলে কি করবে?

গিরি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, কামড়ে দেবে, এক খাবলা মাংস খুবলে নেবে, আঙুল ডাবিয়ে চোখ কাণা করে দেবে—

কুমারেশ বলে, ও বাবা!

ঘরে ডেকে এনেছে যোয়ান মানুষটাকে। তারা উপোস দিক, সে কথা আলাদা, ওকে কিছু খেতে দিতেই হবে।

দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসিয়ে যোয়ান মানুষটার সাথে কথা চালিয়ে যাওয়া যায় যত খুসী। আলাপ করতে খরচ কিছুই নেই।

কিন্তু কিছু খেতে তো দিতে হবে মানুষটাকে? কত তেজের সঙ্গে কেমন রসিয়ে রসিয়ে এতক্ষণ কথা বলছিল গিরি—এবার সে যেন নিবে যায়, ঝিমিয়ে যায়, উসখুস করতে থাকে।

রেবতী একটু হেসে বলে, মামী, আমিও তাই ভাবছিলাম—কি দেয়া যায়।

কুমারেশ বলে, অনেক দিন তেল-মুড়ি খাই নি, টোষ্ট সিঙ্গাড়া চা খেতে খেতে অরুচি জন্মে গেছে। এখন ইচ্ছে করছে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে তেল-মুড়ি খেতে!

গিরি অবিশ্বাসের সুরে বলে, তেল-মুড়ি? সত্যি তো? না গরীবের মন যুগিয়ে বানিয়ে বলা হচ্ছে চালাকি করে?

কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে ঝালে মুখ শুষতে শুষতে কুমারেশকে আরাম করে তেল-মুড়ি চিবোতে দেখে গিরির বিশ্বাস হয় যে সত্যি সত্যি তার তেল মুড়ি খাওয়ার সাধ জেগেছিল।

ঝকঝকে করে মাজা গেলাসে গিরি জল দিয়েছে আধ গেলাস—গেলাসে চুমুক দিয়ে জলটা খানিকক্ষণ মুখে রেখে গিলে ফেলে কুমারেশ বলে, বাপ রে, এমন ঝাল তোমাদের লঙ্কা!

গিরি বলে, একটু গুড় দেব? খাবার জল কম দিয়েছি—লাগলে কিন্তু চেয়ে নেবেন। বাবা, খাবার জলের কি কষ্টটাই যাচ্ছে! ছুটো টিউবওয়েল নষ্ট হয়ে পড়ে আছে ছ'বছর। গোলোক বাবু আর সাঁতরাদের ছুটো কুয়ো সম্বল—ধক্কা দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তবে এক কলসী জল মেলে। সব পুকুর ময়লা জলে ভেসে গেছে, অনেকে তাই খাচ্ছে, করবে কি?

আরেক চুমুক জল খেয়ে আবার লঙ্কাটায় কামড় দিয়ে তেল-মুড়ি মুখে তুলে চিবোতে চিবোতে কুমারেশ বলে, একটা সুখবর বলি—গোবিন্দ অনেকটা ভাল আছে। এ যাত্রা বেঁচে যাবে।

রেবতী অস্ফুট একটা শব্দ করে, গিরি বলে, এ কি বলছ গো, বেঁচে যাবে? কি হয়েছে গোবিন্দের?

কুমারেশ বলে, তোমরা বুঝি খবর পাওনি গোবিন্দের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল?

গিরি বলে, কই না? আমরা শুনলাম যে ধরে নিয়ে জেলে পুরেছে।

কুমারেশ বলে, ধরেছে সত্যি, তবে মাথা ফেটে মরতে বসেছিল বলে রেখেছে হাসপাতালে। একদিন গিয়ে দেখা করে এসো না?

রেবতীর মুখের দিকে চেয়ে গিরি বলে, যাবি? চ' আজকেই ছ'জনায় যাই। এনার সাথে যাব, ফিরে আসতে পারব নিজেরাই।

[ক্রমশঃ।

শিক্ষক-সংগ্রামে

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক

গভীর মৌনীর মাঝে,
হঠাৎ খ্যাপা হাওয়ার দোলায় এ কি তোমার কলরোল?
প্রজ্ঞার তিলক-আঁটা ললাটে
দেখেছি নিবিড় চিন্তায়,
দেখেছি লেখনী চালনার ভংগিমায়।
দেখেছি গুরু-গম্ভীর প্রকৃতিতে
বেত্রগাছি হাতে ছাত্রশাসনে,
কিন্তু দেখিনি শাসকের কাছে
শাসনের জানাতে জবুহাত!
দেখেছি নিবিষ্ট ব্ল্যাক-বোর্ডে জ্যামিতিক রেখা-লেখায়,
দেখিনি মুষ্টিবদ্ধ হাতে প্রতিবাদ জানাতে।
পড়াতে শুনেছি অগণন ছাত্রশ্রেণীকে,
শুনিনি সমস্বরে দাবীর জিগির তুলতে।
দেখেছি তত্ত্বকথায় খই ফোটাতে
কিন্তু দেখিনি নিজের সত্য দৈন্যকে নগ্ন করতে।
রেশনের গড়া কড়া কাঁকরের চালে
পরহজমেও যারা কাজে দিয়েছে শক্তি
কর্ম-বিরতি তাদেরই,
শিক্ষাদান নয়, শিবের ধ্যান
শুভ্র রাজভবনের ধুলো-আবিল পথে।
আজ অবাক করেছে তোমার
গভীর মৌনীর মাঝে—
খ্যাপা হাওয়ার হঠাৎ দোলায় কলরোল।

তিনটে দাগ

শ্রীবিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজও রয়েছে আঁকা
পায়ের তিনটে গভীর চিহ্ন ঘরে,
টেবিল চেয়ার এমন রেখেছি
রোজ যেন চোখ পড়ে···
সেদিন তখন নিজেই ইচ্ছে করে,
মেঝের ওপরে
কাঁচা সিমেন্টে চলে চলে দিলে দাগ,
বললে, আমার চিহ্ন রইলো,
মেঝে মুখ বুজে সবটা সইলো,
তুমি কোরো না কো রাগ—
বললে, তোমার অনেক চেষ্টা ছিল
মনে যদি দাগ পড়ে,
মন তো পাওনি, মনে পারলে না,
তাই দাগ দিলে ঘরে—
মনে নয় ঘরে, ঘরে দিয়ে যাই দাগ,
আবার বললে, চোখে ঘন অনুনয়,
আবার ভাবনা আমি যদি করি রাগ,
আমার রাগকে ভীষণ তোমার ভয়···
তুমি চলে গেলে রাত্তিরে,
নটা ছত্রিশে গাড়ী,
সেই যে গিয়েছো আর তো এলে না ফিরে ;
দু একটা চিঠি বেশ দিলে তাড়াতাড়ি,
তারপর চুপচাপ—
পোষ্টমাষ্টার নিজে, চিঠিতে দাও না ছাপ,
একবারও কই ঠিকানা লেখনি ভুলে—
চিঠি ক'টা আছে, মাঝে মাঝে পড়ি খুলে,
বেশ ভালো লাগে ঠেসের বিন্দুবিগুলো,
কেমন সহজে নিজের ভুলের বোঝা
চাপালে আমার ঘাড়ে,
যত ভাবি মনে, বিস্ময় তত বাড়ে।
ও দেশে কি নেই রোজা ?
যেও তার কাছে পয়সা খরচ কোরো,
খুব হাতে-পায়ে ধোরো,
দেখো যদি পারে তোমার মাথার ভূত
কান ধরে নাবিয়ে দিতে,
মন্তরে, সরষে-পোড়ায়, গালাগাল আর ছি ছি ছিতে।

কে জানে কোথায় কোন্ দেশে বসে আছো,
কোন্ ঠিকানায় পাঠাই যে ছাই চিঠি,
ইষ্টিশানের কাছেই থাকি, প্রায়ই রেলের সিটি
গভীর রাতে মনকে পাঠায় দূরে,
যেদিন চোখে ঘুম আসে না, আবোলতাবোল ভেবে,
এমন করে কাঁপবে আকাশ রেলের বাঁশীর সুরে
বুকের তলায় এমন মোচড় দেবে
আগের দিনের নানান কথা যত,
—বাড়বে যত রাত, ছটফটানি বেড়ে উঠবে তত।
এক এক সময় তখন মনে হয়,
অনেক দূরে, অনেক দূরে, পৌঁছে গেছি তোমার কাছে
আমার চিঠি হয়ে—
ডাক বিলোবার যেমন হয় সময়
চিঠির থলের লুকিয়ে থেকে নিজেই হাঁকি 'চিঠি টি আছে'
পোষ্ট অফিসেই তোমার সুমুখেতে
তুমি তখন সিগারেটের শেষটা খেতে খেতে,
চমকে ওঠো আমার গলা পেয়ে···
পুরাণের যে বামন অবতার,
তিনিও কি পোষ্টমাষ্টার ছিলেন ?
কাঁচা মেঝের তিন পা চলে, একেবারে
একটা লোকের ভুবন কিনে নিলেন ?
আজও আছে মেঝের ওপর সেই তিনটে দাগ,
ভয় করো যা আমার মনে অনেক আছে রাগ।
ছ মাস আগে লিখেছিলে, সেই চিঠিটাই শেষ
বদলি হবে প্যাসিফিকের লাইট হাউসেতে,
সমুদ্দুরের মধ্যিখানে সেই তো হবে বেশ,
কারুর সাধ্যি হবে না কো একটু ছোঁয়া পেতে—
প্যাসিফিকের পাহাড়েতে টেলিগ্রাফের বড়ো বাবু,
নতুন করে ঘর পেতেছ খাটিয়ে বুঝি নতুন তাঁবু ?
দিন-রাত গর্জন করে বুঝি প্যাসিফিক
টেলিগ্রাফ কথা বলে টক্‌টক্ টিক্‌টিক্
দিনরাত ছল্‌ছল্, টল্‌মল্ টল্‌মল্
লক্‌লক্ ঝক্‌ঝক্ চক্‌চক্ চিক্‌চিক্
ক্যানারীর দেশ ওটা, ক্যানারীরা উড়ছে,
—একজন বহু দূরে পুড়ছে···
ঘুম ঘুম নীল চোখে থই-থই স্বপ্ন,
আপনি ঘনিয়ে আসে, ভেঙে যায় আপনি,
টেলিগ্রাফ বাবু কই ? জানলার কাছে ঐ,
চোখের চাউনি যেন বহু দূর বহু দূর—
এখানে চাঁদনি রাত, ওখানে কি রোদ্দুর ?
আজও রয়েছে আঁকা,
পায়ের তিনটে গভীর চিহ্ন ঘরে,
সেদিন তখন নিজেই ইচ্ছে করে
কাঁচা সিমেন্টে চলে চলে দিলে দাগ···

১

বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার কর্মটি সব সময়ই এক হুলস্থুল ব্যাপার, তুমুল কাণ্ড। তাতে দু'টো জিনিস সকলেরই চোখে পড়ে; সে দু'টো—ছুটোছুটি আর চেঁচামেচি।

তোমাদের কারো কারো হয়ত ধারণা যে সায়েব-সুবোরা যাবতীয় কাজকর্ম সারা করে যতদূর সম্ভব চুপিসাড়ে আর আমরা চিৎকারে চিৎকারে পাড়ার লোকের প্রাণ অতিষ্ঠ না করে কিছুই করে উঠতে পারিনে। ধারণাটা যে খুব ভুল সে কথা আমি বলবো না। সিনেমায় নিশ্চয়ই দেখেছ, ইংরেজরা, ব্যান্‌কুয়েট (ভোজ) খায় কি রকম কোনো প্রকারের শব্দ না করে। বটলাররা নিঃশব্দে আসছে যাচ্ছে, ছুরিকাঁটার সামান্য একটু ঠুং-ঠাং, কথাবার্তা হচ্ছে মৃদু গুঞ্জরণে, সব-কিছু অতিশয় পরিপাটি, ছিমছাম।

আর আমাদের দাওয়াতে, পাল-পরবের ভোজে, যগ্যির নেমন্তন্নে?

তার বর্ণনা দেবার ক্ষমতা কি আমার আছে? বিশেষ করে এ-সব বিষয়ে আমার গুরু সুকুমার রায় যখন তার অজর অমর বর্ণনা প্ল্যাটিনামাক্ষরে রেখে দিয়ে গিয়েছেন। শোনো:

'এই দিকে এসে তবে লয়ে ভোজভাণ্ড
সমুখে চাহিয়া দেখ কি ভীষণ কাণ্ড!
কেহ কহে 'দৈ আন্' কেহ হাঁকে 'লুচি'
কেহ কাঁদে শূন্য মুখে পাতখানি মুছি।
হোথা দেখি দুই প্রভু পাত্র লয়ে হাতে
হাতাহাতি গুঁতাগুঁতি দ্বন্দরণে মাতে।
কেবা শোনে কার কথা সকলেই কর্তা
অনাহারে কত ধারে হল প্রাণহত্যা।'

বলে কি! ভোজের নেমন্তন্নে অনাহারে প্রাণহত্যা! আলবাৎ! না হলে বাঙালীর নেমন্তন্ন হতে যাবে কেন? পছন্দ না হলে যাও না কাপ্পোতে। খাও না আনো না, আধাসেদ্ধ শুয়ারের মুণ্ডু কিম্বা কিসের যেন ল্যাজ!

সৈয়দ মুজতবা আলী

কিন্তু জাহাজ ছাড়ার সময় সব শেয়ালের এক রা।

আমি ভেনিসে দাঁড়িয়ে ইটালির জাহাজ ছাড়তে দেখেছি—জাহাজে বন্দরে, ডাঙায় জলে উভয় পক্ষের খালাসিরা মাকারনি খেকো খাটি ইটালিয়ান; আমি মার্সেলেসের বন্দরেও ঐ কর্ম দেখেছি—উভয় পক্ষের খালাসিরাই ব্যাঙ-খেকো সরেস ফরাসিস্; আমি ডোভারে দাঁড়িয়ে ঐ প্রক্রিয়াই সাতিশয় মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করেছি—দু পক্ষের বাঁদরগুলোই বীফষ্টিক খেকো খাটাশ-মুখো ইংরেজ। আর গঙ্গায়, গোয়ালন্দে, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জে যে কত-শত বার এই লড়াই দেখেছি তার তো লেখা-জোখা নেই। উভয় পক্ষে আমারই দেশভাই জাতভাই দাড়ি-দোলানো, লুঙ্গি-ঝোলানো সিলট্যা, নোয়াখাল্যা।

বন্দরে বন্দরে তখন যে চিৎকার, অট্টরব ও হুঙ্কারধ্বনি ওঠে সে সর্বত্র একই প্রকারের। একই গন্ধ, একই স্বাদ। চোখ বন্ধ করে বলতে পারবে না, নারাণগঞ্জে দাঁড়িয়ে চাটগাঁইয়া শুনছো, না হামবুর্গে জর্মন শুনছো।

ডেকে রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে প্রথমটায় তোমার মনে এই ধারণা হওয়া বিছুমাত্র বিচিত্র নয় যে, জাহাজ এবং ডাঙার, উভয়ের পক্ষে খালাসিরা একমত হয়ে জাহাজটাকে ডাঙার দড়াদড়ির বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি দিতে চায়। কিন্তু ঐ তো মারাত্মক ভুল করলে, দাদা! আসলে দু' পক্ষের মতলব একটা খণ্ডযুদ্ধ লাগানো। জাহাজ ছাড়ানো বাঁধানো নিছক একটা উপলক্ষ্য মাত্র। যে খালাসি জাহাজের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি তুর্কী ঘোড়ার তেজে ছুটছে, সে যে মাঝে মাঝে ডাঙার খালাসির দিকে মুখ খিঁচিয়ে কি বলছে তার শব্দ সেই ধুন্দুমারের ভিতর শোনা যাচ্ছে না সত্যি কিন্তু একটু কল্পনাশক্তি এবং ঈষৎ খালাসী মনস্তত্ত্ব তোমার রপ্ত থাকলে স্পষ্ট বুঝতে পারবে, তার অতিশয় প্রাঞ্জল বক্তব্য, 'ওরে ও গাড়ুগুর্ম ইষ্টুপিড, দড়িটা যে বাঁ দিক গিঁঠ খেয়ে গিয়েছে, সেটা কি তোর চোখে মাস্তুল গুঁজে দেখিয়ে দিতে হবে। ওরে ও'—(পুনরায় কটু বাক্য)—

এই মধুরসবাণীর জুৎসই সদুত্তর যে ডাঙার কনে পক্ষ চড়াকসে দিতে পারে না, সে কথা আদপেই ভেবো না। অবশ্য তারও গলা শুনতে পাবে না, শুধু দেখতে পাবে অতি রমণীয় মুখভঙ্গি কিম্বা মুখ-বিকৃতি—'তোমরা যা বলো, তা-ই বলো'—

জাহাজের দিকে মুখ তুলে ফ্যাচ করে খানিকটে থুথু ফেলে বললে, 'ওরে মর্কটস্য মর্কট, তোর দিকটা ভালো করে জড়িয়ে নে না। জাহাজের টানে এ-দিকটা তো আপনার থেকেই খুলে যাবে। একটা দড়ির মনের কথা জানিসনে আর এসেছিস জাহাজের কামে। তার চেয়ে দেশে গিয়ে ঠাকুরমার উকুন বাছতে পারিসনে? ওরে ও হামান-দিস্তের থ্যাৎলামুখো'—(পুনরায় কটু বাক্য)—

একটুখানি কল্পনার সাবান হাতে থাকলে ঐ অবস্থায় বিস্তর বাস্তবের বুদ্বুদ ওড়াতে পারবে।

ওদিকে এসব কলরব—মাইকেলের ভাষায় 'রথচক্র-ঘর্ঘর-কোদণ্ড-টঙ্কার' ছাপিয়ে উঠছে ঘন ঘন জাহাজের ভেঁপুর শব্দ—ভোঁ, ভোঁ,—ভোঁ, ভোঁ—

তার অর্থ, যদি সে ছোট জাহাজের প্রতি হয়, 'ওরে ও ছোকরা, সর না। আমি যে এক্ষুণি ওদিকে আসছি দেখতে পাচ্ছিসনে? ধাক্কা লাগলে যে সাড়ে বত্রিশভাজা হয়ে যাবি তখন কি টুকরোগুলো জোড়া লাগাবি গাঁদা পাতার রস দিয়ে?' আর যদি তোমার জাহাজের চেয়ে বড় জাহাজ হয়, তবে তার অর্থ, 'এই যে, দাদা, নমস্কারম্! একটু বাঁ দিকে সরতে আজ্ঞে হয়, আমি তা হলে ডান দিকে সুড়ুৎ করে কেটে পড়তে পারি।' এবং এই ভেঁপু বাজানোর একটা তৃতীয় অর্থও আছে। প্রত্যেক জাহাজের মাঝিমাল্লারা আপন ভেঁপুর শব্দ চেনে। কেউ যদি তখনো বন্দরের কোনো কোণে আনন্দরসে মত্ত হয়েথাকে, তবে ভেঁপুর শব্দ শুনে তৎক্ষণাৎ তার চৈতন্যোদয় হয় এবং জাহাজ ধরার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগায়।

আমি একবার একজন খালাসীকে সাঁতরে এসে জাহাজে উঠতে দেখেছি। তখন তার আর সব খালাসী ভাইয়া যা গালিগালাজ দিয়েছিল তা শুনে আমি কানে আঙুল দিয়ে বাপ বাপ করে সরে পড়েছিলুম। ইংরাজিতে বলে, 'হি ক্যান্ সুয়ার লাইক্ এ সেলার' অর্থাৎ খালাসিরা কটু বাক্য বলাতে এ দুনিয়ায় সব চাইতে ওস্তাদ। ওরা যে ভাষা ব্যবহার করে সেটা বর্জন করতে পারলে দেশ-বিদেশে তুমি মিষ্টভাষীরূপে খ্যাতি অর্জন করতে পারবে।

তোমার যদি ফার্সী পড়নে-ওলা ক্লাস-ফ্রেণ্ড থাকে তবে তাকে জিজ্ঞেস করো, 'ইস্‌কন্দর-ই-রুমীরা পুরসীদ'—অর্থাৎ 'আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল'—দিয়ে যে গল্প আরম্ভ, তার গোটাটা কি? গল্পটা হচ্ছে সিকন্দরশাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল "ভদ্রতা আপনি কার কাছ থেকে শিখেছেন?" উত্তরে তিনি বললেন, "বে-আদবদের কাছ থেকে?" "সে কি প্রকারে সম্ভব?" "তারা যা করে আমি তাই বর্জন করেছি।"

খুব যে একটা দারুণ চালাক গল্প হল তা বলছিনে। তবে জাহাজের খালাসিদের—বিশেষ করে ইংরেজ খালাসিদের—ভাষাটা বর্জন করলেই লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

জাহাজের সিঁড়ি ওঠার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখবে দু'-একটা লোক এক লাফে তিন ধাপ ডিঙোতে ডিঙোতে জাহাজে উঠছে। এরা কি একটু সময় করে আগে-ভাগে আসতে পারে না? আসলে তা নয়। কোনো বেচারীকে কাষ্টম-আপিস (যারা আমদানী-রপ্তানী মালের উপর কড়া নজর রেখে মাশুল তোলে) আটকে রেখেছিল, শেষ মুহূর্তে খালাস পেয়েছে, কেউ বা আধ ঘণ্টা আগে খবর পেয়েছে কোনো যাত্রী এ জাহাজে যাবে না বলে খালি বার্থটা সে পেয়ে গিয়েছে কিম্বা কেউ শহর দেখতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিল, কোনো গতিকে এইমাত্র বন্দর আর জাহাজ খুঁজে পেয়েছে।

'বন্দর বন্দর' বলে জাহাজ বন্দরের বন্ধন থেকে মুক্তি পেল।

অজানা সমুদ্রের বুকে ভেসে যাওয়ার ঔৎসুক্য এক দিকে আছে আবার ডাঙা থেকে ছুটি নেবার সময় মানুষের মন সব সময়ই একটা অব্যক্ত বেদনায় ভরে ওঠে। অপার সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, সীমার শেষের দিগ্বলয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুক্ত মনের যত অগাধ আনন্দই পাও না কেন, ঝঞ্ঝাবাত্যার সঙ্গে দুর্বার সংগ্রাম করে করে ক্ষণে-বাঁচা ক্ষণে-মরার অতুলনীয় যত অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করো না কেন, মাটির কোলে ফিরে আসার মত মধুময় অভিজ্ঞতা অন্য কিছুতেই পাবে না। তাই ভ্রমণকারীদের গুরু, গুরুদেব বহু নদ-নদী সাগর-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার পর বলেছেন,—

'ফিরে চল, ফিরে চল মাটির টানে
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।'

জাহাজ ছাড়তে ছাড়তে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

আমি জাহাজের পিছন দিকে রেলিঙের উপর ভর করে তাকিয়ে রইলুম আলোকমালায় সুসজ্জিত মহানগরীর—পৃথিবীর অন্যতম—বৃহৎ বন্দরের দিকে। সেখানে রাস্তায় রাস্তায়, সমুদ্রের জাহাজে জাহাজে আর জেলেদের ডিঙিতে ডিঙিতে কোথাও বা সারে সারে প্রদীপশ্রেণী আর কোথাও বা এখানে একটা, ওখানে দুটো', সেখানে এক ঝাঁক—যেন মাটির সাত-ভাই-চম্পা।

আমরা দেয়ালি জ্বালি বছরের মাত্র এক শুভদিনে। এখানে সম্বৎসর দেয়ালির উৎসব। এদের প্রতিদিনের প্রতি গোধূলিতে শুভ লগ্ন। আর এদের এ উৎসব আমাদের চেয়ে কত সর্বজনীন! এতে সাড়া দেয় সর্ব ধর্ম সর্ব সম্প্রদায়ের নরনারী—হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খৃষ্টানী!

আমি জানি, বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, কোনো কোনো ছোট্ট পাখীর রঙ যে সবুজ তার কারণ সে যেন গাছের পাতার সঙ্গে নিজের রঙ মিলিয়ে দিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে, যাতে করে শিকরে পাখী তাকে দেখতে পেয়ে ছোঁ মেরে না নিয়ে যেতে পারে। তাই নাকি আমের রঙও কাঁচা বয়সে থাকে সবুজ—যাতে পাখী না দেখতে পায়, এবং পেকে গেলে হয়ে যায় লাল, যাতে করে পাখীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে—যাতে সে যেন ঠুকরে ঠুকরে তাকে গাছ থেকে আলাদা করে দেয়, নিচে পড়ে তার আঁটি যেন নূতন গাছ গজাতে পারে।

বৈজ্ঞানিকদের ব্যাখ্যা ভুল, আমি বলি কি করে, বিজ্ঞানের আমি জানি কতটুকু, বুঝি কতখানি? কিন্তু আমার সরল সৌন্দর্য-তিয়াষী মন এসব জেনে-শুনেও বলে, 'না; পাখী যে সবুজ, সে শুধু তার নিজের সৌন্দর্য আর আমার চোখের আনন্দ বাড়াবার জন্যে। এর ভিতর ছোট হোক, বড় হোক, কোনো স্বার্থ লুকনো নেই। সৌন্দর্য শুধু সুন্দর হওয়ার জন্যই।'

ঠিক তেমনি আমি জানি, পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে প্রতি গোধূলিতে যে আলোর বান জেগে ওঠে, তার মধ্যে স্বার্থ লুকনো আছে। ঐ আলো দিয়ে মানুষ একে অন্যকে দেখতে পায়, বাপ ঐ আলোতে বাড়ি ফেরে, মা তার শিশুকে খুঁজে পায়, সবাই আপন আপন গৃহস্থালীর কাজ করে; কিন্তু তবু, যখনই আমি দূরের থেকে এই আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি, তখনই মনে হয় এগুলো জ্বালানো হয়েছে শুদ্ধমাত্র দেয়ালির উৎসবকে সফল করার জন্য। তার ভিতর যেন আর কোনো স্বার্থ নেই।

অকূল সমুদ্রে পথহারা নাবিক তারার আলোয় ফের পথ খুঁজে পায়। সেই স্বার্থের সত্য উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন,—

'তুমি কত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে
কি উৎসবের লগনে।'

বন্দরের আলোর দিকে তাকিয়ে যদি আমিও ভগবানের উদ্দেশে বলি,—

'মোরা কত আলো জ্বালিয়েছি ঐ চরণে
কি আরতির লগনে।'

তবে কি বড্ড বেশী ভুল বলা হবে?

অনেক দূরে চলে এসেছি। পাড়ের আলো ক্রমেই ম্লান হয়ে এসেছে। তবু এখনো দেখতে পাই হুশ করে একখানা জেলে-ডিঙি আমাদের পাশ দিয়ে উল্টো দিকে চলে গেল। আসলে কিন্তু সে হুশ করে চলে যায়নি। সে ছিল দাঁড়িয়েই, কারণ তার গলুই সমুদ্রের দিকে মুখ করে আছে, আমরা তাকে পেরিয়ে গেলুম মাত্র।

আশ্চর্য, এত রাত অবধি পাড় থেকে এত দূরে তারা মাছ ধরছে। এখন যদি ঝড় উঠে তবে তারা করবে কি? নৌকো যদি ডুবে যায় তবে তারা তো এতখানি জল পাড়ি দিয়ে ডাঙায় পৌঁছতে পারবে না! তবে তারা এ রকম বিপজ্জনক পেশা নিয়ে পড়ে থাকে কেন? লাভের আশায়? নিশ্চয় নয়। সে তত্ত্ব আমি বিলক্ষণ জানি। আমি একবার কয়েক মাসের জন্য মাদ্রাজের সমুদ্র-পাড়ে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে ছিলুম। তারই পাশে ছিল, একেবারে সমুদ্রের গা ঘেঁষে এক জেলেপাড়া। আমি পাকা দু'টি মাস ওদের জীবনযাত্রা-প্রণালী দেখেছি। ওদের দৈন্য দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। আমাদের গরীব চাষারাও এদের তুলনায় বড় লোক, এমন কি, আমাদের আদিবাসীরা, সাঁওতাল ভীলেরাও এদের চেয়ে অনেক বেশী সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করে। তোমাদের ভিতর যারা পুরীর জেলেদের দেখেছ তারাই আমার কথায় সায় দেবে।

তবে কি এরা অন্য কোনো সুযোগ পায় না বলে এই বিপদসঙ্কুল, কঠিন অথচ দুঃখের জীবন নিয়ে পড়ে থাকে? আমার সেই মাদ্রাজী বন্ধু বললে, তা নয়, এরা নাকি খোলা সমুদ্র এত ভালোবাসে যে তাকে ছেড়ে মাঠের কাজে যেতে কিছুতেই রাজী হয় না। ঝড়ের সময় মাছ ধরা প্রায় অসম্ভব বলে তখন উপোষ করে দিন কাটাবে, ক্ষুধায় প্রাণ অতিষ্ঠ হলে, ভুখা কাচ্চাবাচ্চাদের কান্না সহ্য করতে না পারলে সেই ঝড়েই বেরয় মাছ ধরতে আর ডুবে মরে সমুদ্রের অথৈ জলে;—তবু জল ছেড়ে ডাঙার ধান্দায় যেতে রাজি হয় না।

এবং নৌকোর মাঝি-মাল্লা, জাহাজের খালাসীদের বেলাও তাই। এদের জীবন এতখানি অভিশপ্ত নয়, জানি, কিন্তু এরাও ডাঙায় ফিরে যেতে রাজী হয় না। এমন কি, যে চাষা সাত শ পুরুষ ধরে ক্ষেতের কাজ করেছে, সেও যদি দুর্ভিক্ষের সময় দু পয়সা কামাবার জন্য সমুদ্রে যায় তবে কিছু দিন পরই তাকে আর ডাঙার কাজে নিয়ে যাওয়া যায় না। আর পুরনো খালাসীদের তো কথাই নেই। গোঁপদাড়ি পেকে গিয়েছে, সমুদ্রের নোণা জল আর নোণা হাওয়ায় চামড়ার রঙটি ব্রোন্জের মত হয়ে গিয়েছে, আর ক'দিন বাঁচবে তার ঠিক নেই, জাহাজে কেউ চাকরী দিতে চায় না, তবু পড়ে থাকবে খিদিরপুরের এক জঘন্য খিস্তি আড্ডায় আর উদ্‌ভ্রান্ত এ-জাহাজ ও-জাহাজ করে করে বেড়াবে চাকরীর সন্ধানে। ওদিকে বেশ দু' পয়সা জমিয়েছে। ইচ্ছে করলেই দেশের গাঁয়ের তেঁতুল গাছতলায় নাতি-নাতনীর পাখার হাওয়া খেতে খেতে গল্পটল্প বলতে বলতে দু'টি চোখ বুজতে পারে।

সমুদ্রের প্রতি এদের যে একটা কেমন 'নেশা' আছে সেটা সম্বন্ধে তারা একটু লজ্জিত। কেন, তা জানিনে। তুমি যদি বলো, 'তা, চৌধুরীর পো'—চৌধুরীর পো ব'লে সম্বোধন করলে ওরা বড় খুসী হয়—দু'পয়সা তো কামিয়েছো, আর কেন এ-জাহাজে ও-জাহাজে ঝকমারির কাজ করা। তার চেয়ে দেশে গিয়ে আল্লা-রসুলের নাম স্মরণ করো, আখেরের কথা ভাববার সময় কি এখনো আসেনি?'

বড় কাচুমাচু হয়ে বুড়ো বলবে, 'না, ঠাকুর, তা নয়।' দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বলবে 'আর দুটি বচ্ছর কাম করলেই সব সুরাহা হয়ে যাবে। দু' পয়সা না নিয়ে নাতি-নাতনীদের ঘাড়ে চাপতে লজ্জা করে।'

একদম বাজে কথা। বুড়ো জাহাজের কামে ঢোকে যখন তার বয়স আঠারো। আজ সে সত্তর। এই বাহান্ন বৎসর ধরে সে দেশে টাকা পাঠিয়েছে ভালো করে ঘর-বাড়ী বানাবার জন্য, জমি-জমা কেনার জন্য। এখন তার পরিবারের এত স্বচ্ছল অবস্থা যে, ওরা জমিদারকে পর্যন্ত টাকা ধার দেয়। আর বুড়ো বলে কিনা ব্যাটা-ভাইপো নাতি-নাতনী তাকে দু' মুঠো অন্ন খেতে দেবে না!

সমুদ্রের প্রতি কোনো কোনো জাহাজ-কাপ্তেনের এত মায়া যে বুড়ো বয়সে তারা বাড়ি বানায় ঠিক সমুদ্রের পাড়ে, এবং বাড়িটার ঢপও কিম্ভূতকিমাকার! দেখতে আদপেই বাড়ির মত নয়, একদম হুবহু জাহাজের মত—অবশ্য মাটির সঙ্গে যোগ রেখে যতখানি সম্ভব। আর তারই চিলকোঠায়

সাজিয়ে রাখে, কম্পাস, দূরবীণ, ম্যাপ, জাহাজের ষ্টিয়ারিঙ হুইল এবং জাহাজ চালাবার অন্যান্য যাবতীয় সরঞ্জাম। বাড়ির আর কাউকে বুড়ো সেখানে ঢুকতে দেয় না—য়ুনিফর্ম-পরা না থাকলে জাহাজের ও-জায়গায় তো কাউকে যেতে দেওয়া হয় না—এবং সে সেখানে পাইপটা কামড়ে ধরে সমস্ত দিন বিড় বিড় করে 'খালাসীদের' বকাঝকা করে। ঝড়বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। তখন সে একাই একশ'। 'জাহাজ' বাঁচাবার জন্য সে তখন ক্ষেপে গিয়ে 'ব্রিজ'ময় দাবড়ে বেড়ায়, 'টেলিফোনে' চিৎকার করে 'এঞ্জিন-ঘরকে' হুকুম হাঁকে, 'আরো জলদি ; পুরো স্পীডে', কখনো বা বর্ষাতিটা গায়ে চাপিয়ে 'ব্রিজ' খুলে 'ডেকের' তদারকি করে ভিজে কাঁই হয়ে ফের 'ব্রিজে' ঢুকবে। ঝড় না থামা পর্যন্ত তার দম ফেলার ফুরসৎ নেই, ঘুমুতে যাবার তো কথাই ওঠে না। ঝড় থামলে হাঁফ ছেড়ে বলবে, 'ওঃ, কি বাঁচনটাই না বেঁচে গিয়েছি। আমি না থাকলে সব ব্যাটা আজ ডুবে মরতো। আজকালকার ছোঁড়ারা জাহাজ চালাবার কিস্‌সু-টি জানে না।' তার পর টেবিলে বসে আঁকাবাঁকা অক্ষরে 'জাহাজের' ক্রু'দের ধন্যবাদ জানাবে, তারা যে তার হুকুম তামিল করে জাহাজ বাঁচাতে পেরেছে তার জন্য। তার পর ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজ যে কোথায় ছিটকে পড়েছে তার 'বেয়া'রিঙ' নেবে বিস্তর ল্যাটিটুড-লঙিটুড কষে এবং শেষটায় হাঁটু গেড়ে ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরম পরিতৃপ্তি সহকারে হাই তুলতে তুলতে আপন 'কেবিনে' শুতে যাবে।

তিন দিন পরে গুম গুম করে 'জাহাজ' থেকে নেমে সে পাড়ার আড্ডায় যাবে গল্প করতে—'জাহাজ' বন্দরে এসে ভিড়েছে কি না! সেখানে সেই মারাত্মক ঝড়ের একটা ভয়ঙ্কর বর্ণনা দিয়ে শেষটায় পাইপ কামড়াতে কামড়াতে বলবে, 'আর না, এই আমার শেষ সফর। বুড়ো হাড়ে আর জলঝড় সয় না।' সবাই হাঁ হাঁ করে বলবে, 'সে কি, কাপ্তেন, আপনার আর তেমন কি বয়স হল?' কাপ্তেনও 'হেঁ হেঁ' করে মহাখুশী হয়ে 'জাহাজে' ফিরবে।

আমি আরো দুই শ্রেণীর লোককে চিনি যারা কিছুতেই বাসা বাঁধতে চায় না।

দেশ-বিদেশে আমি বিস্তর বেদে দেখেছি। এরা আজ এখানে, কাল ওখানে, পরশু আরো দূরে, অন্য কোথাও। কখন্ কোন্ জায়গায় কোন্ মেলা শুরু হবে, কখন শেষ হবে, সব তাদের জানা। মেলায় মেলায় গিয়ে কেনা-কাটা করবে, নাচ দেখাবে, গান শোনাবে, হাত গুণবে, কিন্তু কোথাও স্থির হয়ে বেশী দিন থাকবে না। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরদাহ, বর্ষার অবিরল বৃষ্টি সব মাথায় করে চলেছে তো চলেছে, কিসের নেশায় কেউ বলতে পারে না। বাচ্চাদের লেখা-পড়া শেখাবার চাড় নেই, তাদের অসুখ-বিসুখ করলে ডাক্তার-বদ্যিরও তোয়াক্কা করে না। যা হবার হোক, বাসা তারা কিছুতেই বাঁধবে না। বাড়ির মায়া কি তারা কখনো জানেনি, কোনো দিন জানবেও না।

ইংলণ্ড দু'শ' বছর ধরে চেষ্টা করে আসছে এদের কোনো জায়গায় পাকাপাকি ভাবে বসিয়ে দিতে। টাকা-পয়সা দিয়েছে, কৃষির যন্ত্রপাতি দিয়েছে, কিন্তু না, না, না, এরা কিছুতেই কোনো জায়গার কেনা-গোলাম হয়ে থাকতে চায় না। ইংলণ্ড যে এখনো তার দেশে প্রাথমিক শিক্ষার হার শতকরা পুরো একশ' করতে পারেনি তার প্রধান কারণ এই বেদেরা। এরা তো আর কোনো জায়গায় বেশী দিন টিকে থাকে না যে এদের বাচ্চারা ইস্কুল যাবে? শেষটায় ইংরেজ এদের জন্য ভ্রাম্যমান পাঠশালা খুলেছে, অর্থাৎ পাঠশালার মাষ্টার শেলেট্-পেন্‌সিল নিয়ে ভবঘুরে হয়ে তাদের পিছন পিছন তাড়া লাগাচ্ছে, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা, তারা যেমন ছিল তেমনি আছে।

খোলা-মেলার সন্তান এরা,—গণ্ডীর ভিতর বদ্ধ হতে চায় না।

কিন্তু এদের সবাইকে হার মানায় কারা জানো?
রবীন্দ্রনাথ যাদের সম্বন্ধে বলেছেন,

'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।'

এই যে আরব-সাগর পাড়ি দিয়ে আদন বন্দরের দিকে যাচ্ছি এরা সেই দেশের লোক। সৃষ্টির আদিম প্রভাত থেকে এরা আরবের এই মরুভূমিতে ঘোরাঘুরি করছে। এরা এদিক-ওদিক যেতে যেতে কখনো ইরাণের সজল উপত্যকার কাছে এসে পৌঁছেচে, কখনো লেবাননের ঘন বনমর্মরধ্বনিও শুনতে পেয়েছে কিন্তু এসব জায়গায় নিশ্চিন্ত মনে বসবাস করার কণামাত্র লোভ এদের কখনো হয়নি। বরঞ্চ মরুভূমির এক মরূদ্যান থেকে আরেক মরূদ্যান যাবার পথে সমস্ত ক্যারাভান (দল) জলের অভাবে মারা গেল—এ বীভৎস সত্য তাদের কাছে অজানা নয়, তবু তারা ঐ পথ ধরেই চলবে, কোনো জায়গায় স্থায়ী বসবাসের প্রস্তাব তাদের মাথায় বজ্রাঘাতের ন্যায়।

জানি, এক কালে আরব দেশ বড় গরীব ছিল, কৃত্রিম উপায়ে জলের ব্যবস্থা করতে পারতো না বলে সেখানে চাষ-আবাদের কোনো প্রশ্নই উঠতো না কিন্তু হালে নজ্দ্-হিজ্জাজের রাজা ইবনে সউদ (১) পেট্রল বিক্রী করে মার্কিণদের কাছ থেকে এত কোটি কোটি ডলার পেয়েছেন যে সে কড়ি কি করে খরচা করবেন তার কোনো উপায়ই খুঁজে পাচ্ছেন না। শেষটায় মেলা যন্ত্রপাতি কিনে তিনি বিস্তর জায়গায় জল সেঁচে সেগুলোকে ক্ষেত-খামারের জন্য তৈরী করে বেদুইনদের বললেন, তারা যেন মরুভূমির প্রাণঘাতী যাযাবরবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে এসব জায়গায় বাড়িঘর বাঁধে।

কার গোয়াল, কে দেয় ধুনো!

---

(১) এঁর ছেলে সম্প্রতি করাচীতে বেড়াতে এসেছিলেন।

সে সব জায়গায় এখন তাল গাছের মত উঁচু আগাছা গজাচ্ছে।

বেদুইন তার উট-খচ্চর, গাধা-ঘোড়া নিয়ে আগেরই মত এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়। উটের লোমের তাঁবুর ভিতর রাত্রিবাস করে। তৃষ্ণায় যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয় তখন তার প্রিয় উটের কণ্ঠ কেটে তারই ভিতরকার জমানো জল খায়। শেষটায় জলের অভাবে গাধা-খচ্চর, বউ-বাচ্চা সহ গুষ্টীশুদ্ধ মারা যায়।

তবু 'পাজমিয়ে' কোথাও নীড় বানাবে না।

এই সব তত্ত্বচিন্তায় মশগুল হয়ে ছিলুম এমন সময় হুশ করে আরেকখানা জেলে-নৌকা পাশ দিয়ে চলে গেল। দেখি, ক্যাম্বিসের ছইয়ের নিচে লোহার উনুন জেলে বুড়ো রান্না চাপিয়েছে। কল্পনা কি না বলতে পারবো না, মনে হল ফোঁড়নের গন্ধ যেন নাকে এসে পৌঁছল। কল্পনা হোক আর যাই হোক্ তত্ত্বচিন্তা লোপ পেয়ে তদ্দণ্ডেই ক্ষুধার উদ্রেক হল।

ওদিকে কবে শেষ ব্যাচের শেষ ডিনার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ, তত্ত্বচিন্তায় মনোবীক্ষণ বিলক্ষণ স্লাঘনীয় প্রচেষ্টা কিন্তু ভক্ষণ-ডিণ্ডিম উপেক্ষা করা সর্বাংশে অর্বাচীনের লক্ষণ।

তবু দেখি, যদি কিছু জোটে, না হলে পেটে কিল মেরে শুয়ে পড়বো আর কি?

দশ পা যেতে না যেতেই দেখি আমার দুই তরুণ বন্ধু পল আর পার্সি 'রামি' খেলছে। আমাকে দেখে এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'গুড ইভনিং স্যর।'

আমি বললুম, 'হ্যালো,' অর্থাৎ 'এই যে।'

তারপর ঈষৎ অভিমানের সুরে বললুম, "আমাকে একলা ফেলে তাস খেলছো যে বড়! জানো, তাস ব্যসন-বিশেষ, তাসে অযথা কালক্ষয় হয়, গুণীরা বলেন—'

ওরা বাধা দিচ্ছে না বলে আমাকেই থামতে হল।

পার্সি বললে, 'যথার্থ বলেছেন, স্যর।'

পল বললে, 'হক্ কথা। কিন্তু স্যর, আমরা তো এতক্ষণ আপনার ডিনার জোগাড় করে কেবিনে গুছিয়ে রাখাতে—'

আমি বললুম, 'সে কি হে?'

পার্সি বললে, 'আজ্ঞে। যখন দেখলুম, আপনি ডিনারের ঘণ্টা শুনেও উঠলেন না, তখনই আমরা ব্যবস্থাটা করে ফেললুম।'

সোনার চাঁদ ছেলেরা। ইচ্ছে হচ্ছিল, দু'জনকে দু'বগলে নিয়ে উল্লাসে নাগা-নৃত্য জুড়ে দি। কিন্তু বয়সে কম হলে হবে কি, ওজনের দিক দিয়ে ওরা আমার চেয়ে ঢের বেশী ভারিক্কি মুরুব্বি। বাসনাটা তাই বিকাশ লাভ করলো না। বললুম, 'তবে চলো, ব্রাদার্স, কেবিনে।'

[ক্রমশঃ।
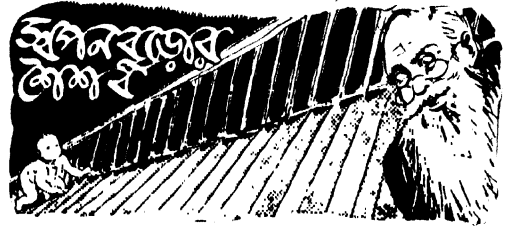
শ্রীঅখিল নিয়োগী

আমার মামী কলকাতার মেয়ে।

আসলে ঢাকায় বাড়ী হলে কি হবে—কলকাতায়ই তিনি মানুষ হয়েছেন। খুব ফর্সা—তাই গ্রাম-দেশে মেম সাহেব বলে তাঁর একটা খ্যাতি ছিল। আমার ছেলেবেলায় এই মামী ছিলেন আমার খেলার সাথী। তাঁর কাছ থেকে প্রচুর গল্প শুনেছি, আদর আর যত্ন পেয়েছি এত যে তার লেখা-জোখা নেই। তখনো ত' তাঁর ছেলে-পুলে কিছু হয়নি। তাই যত স্নেহ-ভালবাসা আর আদর সব আমাদের দুটি ভাইকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। এই মামীর কাছেও আমি অনেক ভূতের গল্প শুনতাম। সন্ধ্যে হলেই তাঁকে আঁকড়ে ধরতাম—নতুন নতুন ভূতের গল্পের জন্যে। মামীর গল্প বলার একটি নিজস্ব ধরণ ছিল। তার ফলে তিনি বেশ রসিয়ে গল্প বলতেন—আর অতি সহজেই সে গল্প জমে যেত। ভূতের গল্প শুনতে যেমন ভয় করত—তেমনি আবার ভালোও লাগত। ঠিক যেন ঝাল-ছোলা অথবা ঝাল-চাটনী খাওয়ার মতো। চোখ দিয়ে জল বেরুবে লঙ্কার ঝাঁজে—তবু জিব বলবে, আরো একটু চেখে দেখি!

ভূতের গল্প এমনি মজার জিনিস!

এই ভূতের গল্প শোনার ব্যাপারে একটি লণ্ঠন কিন্তু পরিবেশ সৃষ্টিতে ভারী সাহায্য করত।

লণ্ঠনটার তেল যখন কমে আসত—সেটা কেবলি দপ্-দপ্ করতে থাকত। তার ফলে বেশ একটা ভুতুড়ে আবহাওয়ার সৃষ্টি হত। তখন ত আর তেল কমার ব্যাপার জানতে পারতাম না। মনে করতাম—ভুতুড়ে কাণ্ডই এই রকম। দপ্-দপ্ করতে করতে লণ্ঠনটা সত্যি এক সময় নিবে যেত!

ঘর একেবারে অন্ধকার!

তখন মামী নাকি সুরে বলতেন—হাঁউ—মাঁউ—কাঁউ—

আর আমি ভয় পেয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরতাম। কিন্তু আবার পরদিন ভুতুড়ে গল্প শোনা চাই।

একটা বিষয় আমি বেশ লক্ষ্য করেছি যে, ছেলেবেলায় ভূতের গল্প প্রচুর শুনেছি বলেই ভূতের ভয়টা আমার কম। আর সেই জন্যেই হয়ত ছোটদের জন্যে রসিয়ে ভুতুড়ে কাণ্ড লিখতে পারি।

ভূতকে জয় করতে না পারলে ভালো ভূতের গল্প লেখা যায় না।

হরি পিশিকে বেশ মনে পড়ে। হরি পিশি মামাবাড়ীর বাসন-মাজার ঝি। ছোট-খাটো মানুষটি। কদম ফুলের মতো কাঁচা-পাকা চুল ছাঁটা। বর্ষাকালে গ্রামের খাল-বিল-পুকুর সব জলে ডুবে যেতো। অনেক বেলা পর্যন্ত বাসন মেজে হরি পিশি ভাত নিয়ে

বাড়ী যেত। হেঁটে যাবার ত' তখন উপায় ছিল না। কেউ ঘাটের নৌকো করে তাকে পৌঁছে দিয়ে আসত। একটা বড় মানকচুর পাতা দিয়ে হরি পিশি তার ভাত ঢেকে নিত! তার পর নৌকোয় করে চলে যেত নিজের বাড়ীতে। এই ছবিটাই মনের মধ্যে আঁকা হয়ে আছে।

হরি পিশি বাড়ী থেকে আসবার মুখে নানা রকম পাকা ফল আমার জন্যে লুকিয়ে নিয়ে আসত। যে দিনের যে ফল সেটা সংগ্রহ করবার একটা চমৎকার যোগ্যতা ছিল হরি পিশির। আমি ছেলেবেলায় হরি পিশিকে নিজের পিশি বলেই মনে করতাম। সে যে আমাদের ঝি এবং বাইরের লোক, সে কথা আদপেই মনে জাগত না।

হরি পিশি খুব কম কথা বলত—কিন্তু তার মনে স্নেহের একটা ফল্গুধারা লুকোনো ছিল—যা' আজকের দিনের ঝি'দের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের সমাজ-জীবনে মনিব আর ঝি-চাকরের সম্পর্কটা এখন একেবারে টাকা-আনা-পাইয়ের মধ্যে চলে গিয়েছে। স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধার ভাবটা একেবারে বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে গেছে!

আর মনে পড়ে—আমাদের ভূইএা মশাইকে। মোটা-সোটা, লম্বা-চওড়া, গোল গোল মানুষটি। ভূইএা মশাই প্রচুর খেতে পারতেন। ইনি মামাবাড়ীর একজন নায়েব ছিলেন। এক জামবাটি-ভর্তি ক্ষীর—পুরো একটা কাঁটাল শুদ্ধ ইনি অবলীলা ক্রমে খেয়ে ফেলতেন! এঁর খাওয়াটা সেই সময় মামাবাড়ীতে একটা গল্পকথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

ভূইএা মশায়ের জ্বর হলেও বিপদের কারণ ছিল। বড় বড় পাথরের বাটি—তার নাম খাদা! সেই এক খাদা ভর্তি দুধ-সাবু দিয়ে তিনি পথ্যি করতেন। ভূইএা মশায়ের জ্বর হলে আমাদের দাদিমাণি গজ-গজ করত—হুঁ! এইবার এক খাদা দুধ সাবুর ব্যবস্থা করো—ভূইএা মশায়ের জ্বর হয়েছে!

ভালো অবস্থাতেই হোক—আর অসুখই করুক—মানুষটির খোরাক কখনো কমত না—এইটিই ছিল দেখবার জিনিস। মানুষটির বেশ কতকগুলো মুদ্রা-দোষ ছিল। একটু ছুঁৎমার্গের ভয় ছিল যেন তার। শুধু তাই নয়—যখন তিনি পথ চলছেন—কেবলি পথের দু'ধারে—থু—থু থু—থ করতে করতে অগ্রসর হতেন! যেন তিনি একাই খাঁটি পবিত্র মানুষ আর জগতের সব-কিছুই অশুচি। সবাইকার কাছ থেকেই তিনি একটু আলাদা থাকবার চেষ্টা করতেন।

মামাবাড়ীতে যে তিনটি তরফ ছিল—সেই তিনটি তরফের কর্তা ছিলেন তিন জন। বড় তরফের কর্তা ছিলেন বড় মামা—মামার জ্যাঠতুতো ভাই—কৃষ্ণনাথ সেন। তিনি নিজে কবিতা ও প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করতেন। তাঁর সাহিত্য-প্রীতি সে কালে সে অঞ্চলে সর্ব্বজনবিদিত ছিল। ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেন মশাই সেই সময় আমাদের পাশের গ্রাম সন্তোষে থাকতেন এবং কবি প্রমথনাথ রায়-চৌধুরীর ছেলের গৃহশিক্ষক ছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি বড় মামার আসরে এসে মজলিস জমাতেন। পরবর্ত্তী কালে বড় মামা 'ভারতবর্ষ, কাগজেও তাঁর বহু রচনা প্রকাশ করেছেন। সন্তোষ গ্রামে একমাত্র রায়-চৌধুরীর পরিবার ছাড়া আর সাহিত্যচর্চ্চার কোন আস্তানা ছিল না। তাই সর্ব্বজনীন জলধর দা' আমাদের গ্রামে এসে প্রতিদিন সন্ধ্যায়—বড় মামার বৈঠকে সাহিত্যের মজ্‌লিস্ জমিয়ে তুলতেন। এইখানে আর একটি রসজ্ঞ লোকের দেখা পাওয়া যেত—তাঁর নাম গাঙ্গুলী মশাই। এই গাঙ্গুলী মশাই বললে গাঁয়ের সবাই তাঁকে চিন্‌তো। সে কালে তিনি ওই অজ পাড়াগাঁয়ে বসেই "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় নানা রকম খবর পাঠাতেন এবং প্রবন্ধও লিখতেন। বস্তুতঃ, ওই অঞ্চলের শিক্ষিত-সমাজে তাঁর একটি পৃথক্ মর্য্যাদা ছিল। কিছু কাল তিনি গ্রামের মাইনর স্কুলে শিক্ষকতাও করেছিলেন। ছোটদের যে তিনি ভালোবাসতেন—তার প্রকাশভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ নতুন টেক্‌নিকে। সে সম্পর্কে মজাদার গল্প পরে বলব।

মামাবাড়ীর ছোট তরফের কর্ত্তা ছিলেন—শ্রীকেদারনাথ সেন, আমাদের ছোট দাদামশাই। আমরা ডাকতাম, ছোট আজামশাই বলে। স্নেহে আর আদরে, শাসনে আর শুভেচ্ছায় একেবারে টুইটম্বুর, প্রাণ-প্রাচুর্য্যে ভর্তি মানুষটি। এঁরই স্নেহচ্ছায়ায় নিজের দাদামশায়ের অভাব জীবনে কখনো বোধ করিনি। আর চিরকাল দেখেছি আমার মাকে তিনি নিজের মেয়েদের চাইতেও ভালবাসতেন। দক্ষিণেশ্বরের মা কালীর যে নাম—আমার মারও সেই নাম। তিনি কখনো পুরো নাম 'ভবতারিণী' উল্লেখ করতেন না,—মাকে 'ভব' বলে ডাকতেন। অতি ছেলেবেলা থেকেই লক্ষ্য করেছি, তাঁর শুভকামনা আর শুভাশিস্ যেন শতধারে মায়ের শিরে বর্ষিত হত। ছোটদের শাসনের ব্যাপারে তিনি যেমন কড়া ছিলেন—তেমনি ছিলেন আদর দিতে পটু। সারা জীবন ধরেই তাঁর কাছ থেকে আদর পেয়ে আসছি। আমার যে কোনো সুনামে তিনি চিরকাল গর্ব্ব অনুভব করেছেন। আজও মনে পড়ে, বড় হয়ে যখন আমার প্রথম রঙীন ছবি মাসিক বসুমতীতে ছাপা হল—তিনি আনন্দের আতিশয্যে সেটা কেটে নিয়ে নিজের শোবার ঘরে বাঁধিয়ে রেখেছিলেন।—যে তাঁর কাছে বেড়াতে যেতো—তাকেই ডেকে দেখাতেন। অনেক সময় আমার নিজেরই লজ্জা করত।

ছোট আজামশাইর তিন বিয়ে। আগের দুই দিদিমাকে আমি দেখিনি। আমি দেখেছি তাঁর তৃতীয়াকে। শুধু দেখিনি—তাঁর স্নেহ পেয়েছি প্রচুর। আমরা তাঁকে ডাকতাম ছোড়দি বলে। অপূর্ব্ব সুন্দরী ছিলেন তিনি। তাই গরীব ঘরের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও এই জমিদারবংশে তাঁর বিয়ে হওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। দেবীমূর্ত্তির মতো এই ছোড়দির কাছে আমাদের আব্দারের অন্ত ছিল না। নানা রকম খাবার তৈরী করতে পারতেন আমাদের এই ছোড়দি। কত যে ডেকে নিয়ে আমাদের খাওয়াতেন—তা' বলে শেষ করা যায় না। রান্নাতেও তাঁর খুব নাম-ডাক ছিল। আমাদের দেশের নানা রকম মাছের তুলনা হয় না—আর সে মাছের স্বাদও ছিল চমৎকার। ছোড়দির হাতে সেই মাছ আরো মুখরোচক হয়ে উঠত।

ছোড়দি আমাদের নিয়ে খুব হৈ-হৈ করতে ভালোবাস্‌তেন। হয়ত আসর খুব জমে উঠেছে—গল্প, হাসি, গান চলেছে পুরোদমে এমন সময় ছোট আজামশাই এসে হাজির। এক কথায় দু কথায় ছোড়দি ছোট আজামশায়ের সঙ্গে মজার মজার কথা বলে ঝগড়া সুরু করে দিতেন। আমরা প্রায়ই ছোড়দির পক্ষ নিতাম—আর 'নারদ' 'নারদ' করে ঝগড়াটাকে ভালো করে

পাকিয়ে তুল্তাম। ছোট আজামশায়ের দ্বিতীয়া স্ত্রীর মেয়ে আমার সমবয়েসী আর খেলার সাথী। তাকে আমি ডাকতাম ছাঁ'মাসি বলে। এই ছাঁ'মাসির সঙ্গে ছেলেবেলায় আমার ভাব ভাব ছিল। বড় মামার তৃতীয় ছেলে ছোক্কনও ছিল আমাদের খেলাধূলার নিত্য সাথী। বড় মামার ছোট মেয়ে মেখিদিও ছিল আমাদের খেলাঘরের সভ্যা। বয়েসে কিছুটা বড় হলেও সে সাজত আমার খেলাঘরের বৌ। আর ছোক্কনের বৌ সাজতো—ছাঁ'মাসি। খেল্তে খেল্তে এক-একদিন এমন ঝগড়া সুরু হয়ে যেত যে নিজেদের হাতে-গড়া খেলাঘর নিজেরাই ভেঙে চুরে তচনচ করে দিতাম! এই ঝগড়ার ব্যাপারে ছাঁ'মাসি আমার পক্ষ নিতো—আর ওরা দুই ভাই-বোন কোমর বেঁধে ঝগড়া সুরু করে দিত।

নতুন নতুন খেলনা পাওয়ার জন্যে আমি সব সময় কল্‌কাতার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মামীর মাকে আগে আমরা চোখে দেখিনি কিন্তু তিনি যে আমাদের আর একটি চমৎকার দিদিমা—সেটা সব সময়ই খেয়াল থাকত। মামী যখন বাপের বাড়ী কল্‌কাতা থেকে আমাদের ওখানে যেতেন—তখন আমাদের দু' ভায়ের জন্যে নানা রকম খেলনা নিয়ে যেতেন। এই জাতীয় খেলনা গাঁয়ের লোকেরা কেউ চোখেও দেখেনি—তাই এটা ছিল আমার ভারী গর্ব্বের বিষয়। যখন খেলার সাথীদের সঙ্গে ঝগড়া হত—কল্‌কাতার এই সব রকমারী খেলনা দেখিয়ে বাজিমাৎ করে ফেল্তাম।

এইবার মামাবাড়ীর মেজ তরফের কথা বলি। মেজ তরফের কর্ত্তা হচ্ছেন মামা। তিনি দেশে খুব কম থাক্‌তেন। আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখেছি—তিনি কল্‌কাতায় থাক্‌তেন। সেখানে কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতির কাছে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পড়তেন। ছুটি-ছাটাতে এবং মাঝে-মাঝে যখন দেশে আস্‌তেন—আমাদের জন্যে অনেক জিনিস নিয়ে আস্‌তেন। তাই মামার দেশে আসাটা আমাদের কাছে ছিল—পাল-পার্ব্বণের মতো।

আসলে মেজ তরফের কর্ত্রী ছিলেন আমার দিদিমা। তিনিই সংসারটাকে আগলে রাখতেন—তা ছাড়া গোটা বাড়ীর এজমালী ব্যবস্থা ত' ছিলই। আমার আর এক বিধবা মাসিমা—প্রায়ই আমাদের সঙ্গে থাক্‌তেন। তিনি আমার আপন মাসিমা নন—কিন্তু আপন মাসিমার চাইতেও বোধ করি বেশী ছিলেন। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের তিনি নিজের বৌদি। খুব অল্প বয়েসে বিধবা হন। এই মাসিমা যেন আমাদেরই আঁকড়ে ধরে পড়ে ছিলেন। এমন কাজের মেয়ে সে কালে আমাদের গাঁয়ে ছিল না বললেও চলে। খুব তাড়াতাড়ি এমন নিপুণ ভাবে তিনি সব কাজ করতেন যে, কেউ সহজে তাঁর ত্রুটি ধরতে পারত না। আমার মামাবাড়ী যদিও গাঁয়ের পশ্চিম পাড়ায় ছিল—তবু বাড়ীটার নাম কিন্তু ছিল পুব বাড়ী। তার একমাত্র কারণ এই বাড়ীর পশ্চিমে একটি বিরাট পুকুর ছিল—এবং তার পরেই যে বাড়ীটি তার নাম ছিল পশ্চিম বাড়ী। পশ্চিমের পুবে বলেই বাড়ীটির নাম হয়েছিল পুব বাড়ী। গোটা গ্রামের লোক তাই পুব বাড়ী বলতে আমার মামাবাড়ীকেই বুঝত।

যে মাসিমার কথা বলছিলাম—তাঁকে নিয়ে আমার ছেলেবেলায় যে মজার ঘটনাটি ঘটেছিল—এখন সেই গল্পটা বলছি।

মাসিমা খুব "কম্মা মেয়ে" ছিলেন আগেই বলেছি। প্রায়ই নানা রকম পিঠে পায়েস করে তিনি আমাদের খাওয়াতেন। এই ব্যাপারে আমার দিদিমার খুব উৎসাহ ছিল—এবং তিনি সুযোগ পেলেই রোজকার বরাদ্দ দুধ ছাড়াও বাড়তি প্রচুর দুধ রাখতেন। মাসিমা ত' এক দিন খুব খেটে-খুটে আমাদের জন্যে 'পান্তুয়া' তৈরী করলেন। সেই পান্তুয়া হল যেমন নরম তেমনি সুস্বাদু। লোভে পড়ে বেশ কয়েকটা গপাগপ খেয়ে ফেললাম। তার ওপর মাসিমা স্নেহের আধিক্যে কেবলি বল্‌তে লাগলেন—আর দুটো খা—আর দুটো খা—

এমন লোভ ছাড়া মুস্কিল! খেতে খেতে মাত্রা গেল ছাড়িয়ে। তার ফলে আমার হল অসুখ। ক'দিন ধরে সব খাওয়া-দাওয়া একেবারে বন্ধ—যাকে বলে উপোস। কিন্তু বাড়ীর লোকে ত' তাই বলে পেটে কীল মেরে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে বসে থাকে নি! তাঁদের সবাইকার দক্ষিণ হস্তের কাজ আগের মতোই রসালো ভাবে চল্‌তে থাক্‌লো। কিন্তু আমি কিছু খেতে চাইলেই চার দিক থেকে রব ওঠে—না-না, কিচ্ছুটি না। তোর যে অসুখ করেছে।

আর কোনো উপায় না দেখে—এইবার আমি ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লাম। সুর করে কান্না সুরু করে দিলাম—"পান্তুয়া খাওয়ালে কেন?" বেশ মনে আছে এই কান্নার সুর কয়েকটা দিন ধরে চলেছিল! এর পরে কোনো একটা ব্যাপার ঘটলেই বাড়ীর লোকে নাকি সুরে আমায় ঠাট্টা করে বলত—"পান্তুয়া খাওয়ালে কেন—?"

আর মাসিমা ক্ষ্যাপাতেন সব চাইতে বেশী।

[ক্রমশঃ।

বিশ্বের বৃহত্তম চিড়িয়াখানা

সুনীল ঘোষ

দক্ষিণ-আফ্রিকার ক্রুগার ন্যাশনাল পার্কটা হচ্ছে বিদেশী দর্শকের কাছে সব চেয়ে আকর্ষণীয় স্থান। বিদেশ থেকে যাঁরা আফ্রিকা মহাদেশে বেড়াতে যান তাঁরা ক্রুগার পার্কে এমন একটা জিনিষ দেখতে পান, বিশ্বের কোথাও যার তুলনা নেই। সারা দুনিয়ায় এত বড় চিড়িয়াখানা আর দ্বিতীয়টি নেই। আফ্রিকায় সভ্যতার আলোক প্রবেশ করবার আগে সেখানকার অবস্থাটা কেমন ছিল, তার একটা আঁচ পাওয়া যায় এই 'চিড়িয়াখানা' দেখলে। তার এই চিড়িয়াখানাটা আমাদের আলীপুরের চিড়িয়াখানার মত খাঁচা আর বেড়া-দেওয়া জন্তু-জানোয়ারের বন্ধ কারাগার নয়।

বহু দিন আগে দক্ষিণ-আফ্রিকার পূর্বাঞ্চল ছিল জীবজন্তুবহুল বিরাট বনাঞ্চল। বন্য জন্তুরা সেখানে স্বাধীন ভাবে ঘর-সংসার করত। তার পর মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পশুরাজ্যের হল সঙ্কোচন। আজ ক্রুগার ন্যাশনাল পার্কটা হচ্ছে সভ্যতা-পরিবেষ্টিত একটি জঙ্গলাকীর্ণ দ্বীপের মত। অতি সমৃদ্ধ এই অঞ্চলটি সারা দুনিয়ার ঈর্ষার বস্তু। অন্যান্য অঞ্চলের মত এই অঞ্চলও প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন এবং দুর্যোগের অধীন। স্বভাবতই বছরের পর বছর ধরে এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশেরও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। অনাবৃষ্টি, অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে এখানকার বহু জীব-জন্তু নির্বংশ হয়ে গেছে। তাই জাতির এই স্বাভাবিক সম্পদকে

রক্ষা করবার জন্ত অনেক কৃত্রিম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। প্রথমত ধরুণ জলের কথা। জঙ্গলের মধ্যে যদি জলাশয় না পায় তাহলে জীবজন্তরা জলের আশায় পার্কের বাইরে অরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করতে বাধ্য হবে। আর একবার অরক্ষিত এলাকায় পদক্ষেপ করলে তারা যে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে সে আশা কম। জীব-জন্তগুলোকে পার্কের মধ্যে নিরাপদে রক্ষা করার জন্ত স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট তাই পার্কের মধ্যেই খানা কেটে কেটে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন, যাতে তাদের বাইরে না আসতে হয়।

ক্রুগার পার্ক লম্বায় ২২০ মাইল আর চওড়ায় প্রায় ৪০ মাইল। মোট এলাকা প্রায় ৮ হাজার বর্গ-মাইল। নদী ছাড়া এই এলাকার কোন স্বাভাবিক সীমারেখা নেই। উত্তরে লেডুবু নদী, দক্ষিণে ক্রোকোডাইল আর সিগেক্ত নদী, পূর্বে (পর্তুগীজ পূর্ব-আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার আন্তর্জাতিক সীমানা) নীচু লেবোম্বো অঞ্চল। পশ্চিমে ঝোপ-ঝাড় কেটে একটা সীমারেখার মত করা হয়েছে। পার্কের ভিতরে ক্রোকোডাইল, সাবি, এলিফ্যাণ্টস্, লেটাবা এবং লেডুবু নদী বয়ে গেছে। এই নদীগুলোয় সারা বছরই জল থাকে। বর্ষার সময় নদীগুলোয় ভরা জোয়ার। বর্ষা সুরু হয় নভেম্বরে এবং শেষ হয় এপ্রিলে। এখানকার আবহাওয়া অন্যান্য উষ্ণদেশের আবহাওয়ারই মত। মৃদু শীত, মাঝে মাঝে কুয়াশা এবং গ্রীষ্মের সময় ক্লান্তিকর গরম। বর্ষার মধ্যে হঠাৎ গরম পড়ে।

কিছু কাল যাবৎ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে সমগ্র পার্কটি আস্তে আস্তে শুকিয়ে আসছে। তার প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে জীব-জন্ত আর তৃণভূমির উপর। গত ১৮ বছর যাবৎ এখানে বারিপাতের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। তার ফলে নদীতে স্রোতের অভাব, ঝরণাগুলো শুকিয়ে আসছে এবং খানা-ডোবাও জলশূন্য। তাই জীব-জন্তরা জলের জন্ত কয়েকটি বিশেষ জলাশয়ে ভীড় করে। ফলে সেই সব জায়গার তৃণভূমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর মাটিতে লেগেছে ক্ষয়। তৃণের অভাবে তৃণাহারী জীবগুলো দুর্বল হয়ে পড়ছে আর মাংসাশী জন্তগুলো সহজেই তাদের শিকার করে খাচ্ছে। প্রকৃত-পক্ষে আজ ক্রুগার পার্কের ২ হাজার বর্গ-মাইল তৃণভূমি জীব-জন্তর ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেছে। গরম কালে তার ধারে-কাছেও কেউ ঘেঁষে না।

এ সবের চেয়েও বড় বিপদ হচ্ছে দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী মালানের বর্বর বর্ণবিদ্বেষ। দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ভারতীয় এবং আফ্রিকানদের তাড়িয়ে তিনি সেই দেশটাকে শ্বেতাঙ্গদের স্বর্গ বানাতে চান। তাই দেশ-বিদেশ থেকে জমি-জমার লোভ দেখিয়ে হাজার হাজার শ্বেতাঙ্গ এনে ভরে ফেলছেন দেশটাকে। এই শ্বেতাঙ্গরা ক্রুগার পার্ককে বেষ্টন করে ঘন বসতি স্থাপন করে ফেলেছে। তারা প্রতি বছর পার্কের অসংখ্য জীবজন্ত ধ্বংস করে। তবে শিকারের আইন কড়া ভাবে প্রয়োগ করে এখন জীব-জন্ত অপহরণ অনেকটা কমানো গেছে।

জলাভাবে তৃণভূমির দুরবস্থা দুষ্ট চক্রের মত কাজ করে। জলাশয় যতই কমে আসবে ততই তার চারি পাশের তৃণ-ভূমি ধ্বংস হবে এবং ততই বন্য জীব-জন্ত হ্রাস পাবে। অনেক সময় দেখা গেছে যে পার্কের মধ্যে জলের অভাব থাকায় সহস্র সহস্র জীব-জন্ত

উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে গাড়ী চলেছে, পথের পাশে একটি মুক্ত পশু—একটি বন্যহরিণ

জলের আশায় পার্কের সীমানা ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে পড়ছে। ১৯৪৭ সালে এমনি ঘটনা ঘটেছিল। হাজার হাজার জানোয়ার দল বেঁধে পার্কের বাইরে বেরিয়ে নিকটস্থ নদীতে জল পান করত। তাদের মুখের গ্রাস আর পায়ের খুরে সেই এলাকার তৃণভূমি সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হয়ে যায়। সহস্র সহস্র জীব-জন্ত শুধু তৃষ্ণা নিবারণের আশায় নিজেদের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে শত্রুপুরীতে প্রবেশ করছে—এ দৃশ্য মর্মান্তিক এবং অবিস্মরণীয়!

এ ছাড়া কচি কচি সুস্বাদু ঘাস খাবার লোভে বসন্ত কাল এবং গ্রীষ্মের প্রথম দিকেও কিছু জীব-জন্ত পার্কের বাইরে চলে আসে। সেই সময় তারা যায় ড্রাকেন্সবার্গের পাহাড়ের পাদদেশে; কারণ সেখানে ঘাস এবং জল দুই-ই পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্য বশত, সেখানকার মানুষ জীব-জন্তর উপর মোটেই সদয় নয়।

এই পার্কের গত ৪০ বছরের ইতিহাস সকলের জানা থাকলেও তার আগেকার কথা কিছুই জানা যায় না। পার্কের প্রাচীন অধিবাসী এবং আবহাওয়া তত্ত্ববিদদের কাছ থেকে জানা যায় যে ১৮৯০ এবং ১৮৯৫ সালের মধ্যে এখানে প্রবল বারিপাত হয়েছিল। তাতে নদীগুলোয় বান ডাকে। সেটা গেছে পার্কের স্বর্ণযুগ। তার পর থেকেই জায়গাটা আস্তে আস্তে শুকিয়ে আসছে।

ব্যাপারটা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়েছে। জল সরবরাহের প্রশ্ন নিয়ে একটা প্রাথমিক তদন্ত-কমিটিও গঠিত হয়েছিল। তাঁদের সুপারিশ অনুযায়ী খানা-ডোবা কেটে বাইরে থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। বাঁধ দিয়ে নদীর জল স্থায়িভাবে বেঁধে রাখবার একটা পরিকল্পনাও করা হয়েছে।

সলোমনের মন্দির নির্মাণ

(প্রাচীন ইস্রাইলের রূপকথা)

ইন্দিরা দেবী

ইহুদীদের রাজা সলোমনের ইচ্ছা হলো তাঁদের দেবতাদের জন্ত একটা ভালো মন্দির তৈরী করবেন। যেই ভাবা সেই কাজ। মন্দির নির্মাণের কাজ সুরু হয়ে গেল।

কিন্তু হলে কি হয়, এলেন পণ্ডিত আর পুরোহিত, তাঁরা বললেন, যে সব পাথর আর লোহা দিয়ে মন্দির তৈরী হবে তা চেরাই করতে বা ভাঙ্গতে যন্ত্র ব্যবহার করলে চলবে না।

রাজা বললে: সে কি! তাহলে মন্দিরের জন্য যে সব লোহা, পাথর লাগবে তা কি করে ভাঙ্গা হবে?

তাঁরা বললেন: হবার উপায় আছে। মন্দিরের জন্য যে সব জিনিসপত্র চেরাই করতে হবে তা এক রকম পোকা দিয়ে করানো যেতে পারবে, তার নাম হলো শামীর।

রাজা বললেন: কিন্তু সে পোকা কোথায় পাওয়া যাবে?

তাঁরা বললেন: পাওয়া যাবে, তবে অনেক পরিশ্রম করতে হবে—তবে সে পোকার এমন ক্ষমতা যে চোখের নিমিষে সব চিরে ভেঙ্গে ফেলতে পারে।

বিস্মিত হয়ে রাজা বললেন: খুব আশ্চর্য্যের ব্যাপার, তা যাই হোক, তাহলে সে পোকা আনার ব্যবস্থা করতে হয়।

তাঁরা বললেন: শামীর আছে এক দৈত্যের কাছে, সেই শামীর সম্পর্কে সব খবর দিতে পারবে।

রাজা বিশদ ভাবে জেনে নিয়ে লোক পাঠালেন সেই দৈত্যের দেশে। সেখানে তারা স্বামি-স্ত্রী বাস করতো। তাদের ধরে বেঁধে নিয়ে আসা হলো; কিন্তু হলে কি হবে, তাদের কাছে কোনও খবরই পাওয়া গেল না। তারা বললে: আমরা শামীরের কোনও খবর জানি না। কোথায় তার সন্ধান পাওয়া যাবে তাও বলতে পারি না। অনেক করে বলা সত্ত্বেও দৈত্যরা যখন কোনও খবরই দিতে পারলে না তখন রাজা বললেন: যে কোনও প্রকারে ওর কাছ থেকে শামীরের সন্ধান করতেই হবে। শামীর না পেলে মন্দির নির্মাণের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই যে ভাবে হোক যেমন করে হোক দৈত্যকে রাজী করাও, শামীরের সন্ধান নাও।

অবশেষে দৈত্যকে খুব শাস্তি দেওয়া আরম্ভ হলো। রাজার আদেশ হয়েছে, যে ভাবে হোক শামীরের সন্ধান করতেই হবে—তাই এই পন্থা গ্রহণ করতে হলো। অকথ্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দৈত্য বললে আমি নিজে কিছু করবো না তবে শামীরের সন্ধান কার কাছে পাওয়া যাবে সেটুকু তোমাদের জানিয়ে দেবো।

রাজা তো খুশী হলেনই, পাত্র-মিত্র সবাই খুশী হয়ে উঠলো। তারপর দৈত্য আর তার স্ত্রী বললে: এখান থেকে বহু বহু ক্রোশ দূরে, রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে যে সব পর্ব্বতশ্রেণী আছে, সেই পাহাড়গুলোর সব শেষ যে বৃহৎ পর্ব্বত, যার নীচে দাঁড়ালে বোঝাও যাবে না যে, পর্ব্বতের চূড়া কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, সেইখানে পাহাড়ে এক দৈত্য থাকে, তার নাম হলো 'আসমেডি'। দৈত্যরাজ 'আসমেডি' কিন্তু প্রতিদিন স্বর্গে আসা-যাওয়া করে। সেখানে সারা দিন নানা পণ্ডিতের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করে, তারপর আবার তার বাড়ী সেই পর্ব্বতের উপরে ফিরে আসে। রোজ যাবার সময় সে নিজের খাবার জলটা নিজে ঠিকমত ব্যবস্থা করে রেখে যায়। তার বিশ্বাস তা না হলে তাকে কেউ যা তা খাইয়ে মেরে ফেলবে। একটা প্রকাণ্ড আর গভীর গর্ত্ত সে খুঁড়েছে—সেটায় নিজে সে জল ভরে রাখে তারপর তেমনি বড়, যাকে বলে বৃহৎ—একটা পাথর দিয়ে সেটা চাপা দেয়। এত বড় পাথর যে কারুর ক্ষমতা হয় না সেটা সরাতে। প্রতিদিন ফিরে এসে ভাল করে পরীক্ষা করে নেয় যে সেই পাথর কেউ সরিয়েছে কি না, ভেঙ্গেছে কি না বা জল কিছু খারাপ করেছে কি না। তারপর সে আর তার ছেলেপুলের জন্য যা দরকার তা নিয়ে গিয়ে আবার সেই বিরাট পাথর চাপা দিয়ে রেখে দেয়।

দৈত্য আর তার স্ত্রীর কথা শুনে রাজা সলোমন বললেন: এ কথা সত্যি কি না, তা আগে দেখতে হবে। তারপর তাঁর সব চেয়ে যে বিশ্বস্ত অনুচর তাকে পাঠালেন সব দেখে শুনে 'আসমেডি'কে ধরে আনার সকল বন্দোবস্ত করতে।

রাজার অনুচরেরা প্রস্তুত হয়ে যাত্রা করলো—সঙ্গে তারা কিছু পানীয় নিলো, যে রঙীন জল খেলেই নেশা ধরে ঝিমঝিমিয়ে আসে সারা শরীর।

অনেক দিন ধরে অনেক কষ্ট করে ওরা পর্ব্বতের উপর গিয়ে পৌঁছল। সেদিন তখনও 'আসমেডি' ফিরে আসেনি। কিছুদূরে একটা প্রকাণ্ড গাছের আড়ালে ওরা লুকিয়ে রইল। যথাসময়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো আর দুম-দুম শব্দে চারি দিক কাঁপিয়ে দৈত্যরাজ 'আসমেডি' এসে উপস্থিত হলো। আগেই সে সেই বিরাট পাথর সরিয়ে জলটা দেখলো, তারপর ঢক্ ঢক্ করে খানিক জল খেয়ে আবার পাথর চাপা দিয়ে তার বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেল।

রাজার অনুচরেরা আড়াল থেকে সব দেখলো। তারপর সে রাতটুকু তারা কোন রকমে কাটিয়ে দিল। পরের দিন সকালে যখন 'আসমেডি' তার নিত্যকর্ম সেরে আবার স্বর্গে পণ্ডিতদের ক্লাসে চলে গেল তখন তারা বেরিয়ে এসে চারি দিক ভাল করে দেখে খুব কষ্ট করে জল-চাপা পাথরের কিছু অংশ সরিয়ে ফেললো। কারুর ক্ষমতা হলো না সেই পাথরটা একেবারে ওঠাতে। তারপর কিছু জল কমিয়ে তাতে সেই নেশা ধরার জলগুলি সব মিশিয়ে দিল। তারপর আবার পাথর চাপা দিয়ে তাদের জায়গায় গিয়ে দৈত্যর অপেক্ষা করতে লাগলো।

সন্ধ্যার সময় দৈত্য এসে জল পরীক্ষা করলো—তারপর জল নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা খেয়ে ফেললে। কিন্তু এ কী হলো! দৈত্য আর যেন বাড়ী যেতে পারছে না। সারা শরীর তার ঝিম্‌ঝিম্ করছে—সে সেখানে বসে পড়লো, আরো কিছুক্ষণ পরে শুয়ে পড়লো। ওরা গাছের আড়াল থেকে সব দেখছিল। এবার সকলে মিলে এসে মোটা লোহার চেন দিয়ে দৈত্যকে বেঁধে ফেললে।

দৈত্য বুঝতে পারলো যে শেকলটায় যাদুমন্ত্র করা ছিল, না হলে তাকে বেঁধে রাখে এমন শিকল আজো প্রস্তুত হয়নি। দৈত্য বেচারা আর কি করবে—দু'চার বার বিরাট ডানা দু'খানায় ঝাপ্টা মারলো। এক ঝাপ্টায় রাজার লোকগুলি ভূমিশয্যা নিলো, কেউ কেউ দূরে ছিটকে পড়লো—তারপর যাদু-শিকলের গুণে আর তার শক্তি রইল না।

দৈত্যকে নিয়ে তারা রাজ্যের দিকে চলতে আরম্ভ করলো। পথে আসতে আসতে ওরা দেখলো খুব বাজনা-বাদ্যি করে বর-কনে যাচ্ছে। সকলেই দেখতে লাগলো বিয়ের বর ও তার সাজ-সরঞ্জাম। দৈত্যও তাকিয়ে দেখলো, তারপর হেসে মুখ ফিরিয়ে নিলে। আবার যেতে যেতে তারা দেখলো একজন লোক একটা মুচিকে জুতো তৈরী করতে দিতে দিতে

বলছে—এমন শক্ত আর মজবুত করে জুতো তৈরী করবে যে সাত বছর আমায় কিছু না করতে হয়—সাত বছর অনায়াসে চলে। দৈত্য সে কথা শুনে মুচকি হাসতে লাগলো। আবার তাদের পথ চলা আরম্ভ হলো—যেতে যেতে তারা আবার দেখলো একজন যাদুকর পথে বসে ম্যাজিক দেখাচ্ছে। ম্যাজিক দেখাতে দেখাতে লোকটা বলছে: আমি মানুষের ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারি—কার অদৃষ্টে কি আছে, কি হবে, এ সব আমি মুহূর্তের মধ্যে বলতে পারি। দৈত্য একবার দাঁড়ালো, তারপর মুখটা খুব বিষণ্ণ করে চলতে লাগলো।

একটু দূরে গিয়ে রাজার প্রধান অনুচর দৈত্যকে বললে: পথে আসতে আসতে যে সব দেখলে তাতে তুমি হাসলেই বা কেন, আবার মুখটা গম্ভীরই বা করলে কেন?

দৈত্য বললে: হাসলাম কেন? ঐ যে বর-কনে নিয়ে ওরা অত ফূর্ত্তি করতে করতে যাচ্ছে—কিন্তু ওরা জানে না যে এক মাসের মধ্যে ঐ বর মারা যাবে। আর যে লোকটা জুতো তৈরী করতে দিচ্ছে সে সাত দিনের মধ্যে মারা যাবে, সাত বছর ছেড়ে সাত মাসও তাকে বাঁচতে হবে না। আর ঐ যাদুকর, যে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে—সব বলে দিতে পারি—সে নিজেই জানে না যেখানে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে—ঠিক তার নীচেই সাত ঘড়া ধনরত্ন আছে। কেউ কিছুই জানে না অথচ কত আনন্দ করছে—মিথ্যেকে সত্যি বলে চালাচ্ছে।

তারপর আবার চলতে চলতে ক্রমশঃ তারা গিয়ে পৌঁছলো রাজ্যের সীমানায়। রাজ্যময় হৈ-চৈ পড়ে গেল, ভয়ঙ্কর বিরাট দৈত্যকে ধরে আনা হয়েছে।

রাজা সলোমন নিজে এসে দেখলেন—বললেন, ওকে আরো জল খাওয়াও—যে জল খাওয়ালে নেশা ধরে সেই জল ওকে আরো খাওয়াও।

দৈত্যকে দু'দিন নেশা ধরিয়ে রেখে দেওয়া হলো। তারপর রাজা বললেন, শামীরের সন্ধান দাও—না হলে আমার মন্দির তৈরী হবে না।

দৈত্য বললে: এই জন্য আমাকে এখানে আনা হলো এত কষ্ট করে—সেখানে গিয়ে সন্ধান করলেই পারতে।

রাজা বললেন: তা হলে তুমি দিতে না, যাই হোক এখন তার সন্ধান বলো।

শামীর এখন সমুদ্র-রাজার কাছে, সেখানে গিয়ে নিয়ে আসা কারুর পক্ষে সম্ভব হবে না। তার চেয়ে ময়না পাখীর মত ঐ যে মরকক্ পাখী আছে ওর বাসায় গিয়ে একটা লোহার ঢাকা চাপা দিয়ে এসো। ঐ ঢাকা খুলতে সে পারবে না তখন ওর বাচ্চাদের জন্য সে গিয়ে শামীরকে আনবে—তখন তোমরা শামীরকে কাজে লাগিও।

দৈত্যর কথা মত রাজা তখনি আদেশ দিলেন। যথাসময়ে মরকক্ পাখী তার বাচ্চাদের দুরবস্থা দেখে শামীরের সন্ধানে গেল, অনেক অনুনয় করে সমুদ্র-রাজার কাছ থেকে শামীরকে নিয়ে এলো।

রাজার লোকেরা আশে-পাশে বসে ছিল, শামীর যেই মাত্র লোহার চাপাটা কেটে দিল অমনি তারা তাকে ধরে নিয়ে রাজার কাছে গেল।

রাজা সলোমনের মন্দির তৈরী হলো আর সারা রাজ্যে আনন্দের বন্যা বইতে লাগলো। রাজার মন্দির-প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল।

যে দৈত্যর জন্যে এ সব হলো—রাজা কিন্তু তাকে আবার তার দেশে পাঠিয়ে দিলেন।

ছড়া

বিমল দত্ত

নূপুর বলে ঝুম ঝুম কাঁকন বলে কি?
ঐ আসচে ঐ আসচে ময়ূরপঙ্খী।
ঢেউ বলে দোল দোল বাতাস বলে কি?
বর আনচে কনে আনচে ময়ূরপঙ্খী।
বরের মাথায় সোলার টোপর কনের চেলি লাল
কে টেনেছে হাল্কার দাঁড় কে তুলেছে পাল।
বরযাত্রির গান গায় কন্যেযাত্রির কাঁদে
বর-ক'নে বসে দেখে মেঘ ঢেকেছে চাঁদে।
রূপোর জরী মেঘের পাড় হাওয়ায় ভাসচে
ময়ূর পেখম তুলে নাও ঘাটে আসচে।
কে দেখেছে সিঁদুর টীপ কে দেখেছে চাঁদ
বাসরঘরে সোনার দীপ ভোমরা ধরার ফাঁদ।
কে শুনেছে পায়ের নূপুর ঝুম-ঝুম-ঝুম
কন্যা-পাতা আল্পনাদের ভাঙবে এবার ঘুম
ঘরের লক্ষ্মী ঘরে ঘর আ'লো করে
লাল পদ্ম আয় আলতা দিবি পায়।
রাত ছম্‌-ছম্‌ আন্ধার দোর বন্ধ চান্দার
কালো রাত বিশ্রী চাঁদের মুখ মিস্‌রি।
রাত ছম্‌-ছন্‌ আন্ধার দোর খুলবে চান্দার দোর খুলবে কে?
ছোট্ট খোকা দোলায় শুয়ে তাকেই ডেকে দে।
আসন পেতে বসুন খেতে উঠচে তেতে কড়া
নুণ-তেল সব তৈরী আছে ভাতের জলটা চড়া।
উনুন থেকে নরম দেখে বেগুন সেঁকে আনিস
এই হ'ল এই, ভরসাও নেই? কত বিদ্যেই জানিস?
আমার ওপর গিন্নিপণা তড়ি-ঘড়ির ঢং দেখো না
ঘোড়ায় চড়ে কে এসেছে বসুক দণ্ড দুই
আমি বরং মাদুর পেতে দাওয়ায় একটু শুই।
হাঁক ডাক ওঠে লোকজন জোটে
পুঁটি মাছ কোটে মেছুনী
ফেলে কারবার গত রোববার
আমি সব্বার পিছু নি।
পড়ে হৈ-চৈ কেউ খোঁজে কৈ
চিংড়িতে দৈ কে খাবে
নিয়ে মাগুর হাঁড়িতে পরের গাড়িতে
কুটুমবাড়ীতে কে যাবে
ভিড়ে হাঁস্‌ফাঁস দোকানের পাস
এসে পড়ে বাস ঠাকুরের।
হৈ-চৈ-তে কথা কইতে
ছেঁড়ে পৈতে ঠাকুরের।

ডি. এচ. লরেন্স

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পল ছেলেটি ঠিক তার মায়ের প্রতিচ্ছবি। তেমনি ছোটখাটো, ছিমছাম চেহারা। মাথার সুন্দর চুলগুলো আগে ছিল লালচে, এখন ক্রমশঃ সেগুলো গভীর পাটল রং ধারণ করছিল। চোখ দুটিতে ধূসরাভা। গায়ের রঙে নেই উজ্জ্বলতা, ভারী শান্তশিষ্ট মনে হয় ওকে দেখলে। চোখ দুটি গভীর আর উজ্জ্বল, যেন চোখ দিয়েই সে জীবনের অর্থ গ্রহণ করছে। নীচের ঠোঁটটি ভারী আর বিষাদমাখা।

বয়সের তুলনায় তাকে বড়ো মনে হ'ত। আশ-পাশের লোকরা কি ভাবছে সব যেন সে বুঝতে পারত, বিশেষ করে তার মায়ের মনের কথা। মায়ের মনে দুঃখ হলে সে অনুভব করতে পারত সে-কথা, তখন থেকে তার নিজের মনেও শান্তি থাকত না। নিজের আত্মাকে সে যেন মায়ের অনুগামী করে রেখেছিল।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পল-এর গায়ের জোর ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। উইলিয়মের সঙ্গ পাওয়া তার ঘটে উঠত না, উইলিয়ম সব দিক দিয়েই তার থেকে অনেক দূরে। কাজেই ছোট ভাইটি অল্প বয়সে একান্ত ভাবেই অ্যানির ন্যাওটো হয়ে উঠল। অ্যানি মেয়ে হলে কি হবে, ছেলেদের খেলাধুলোতেই সে ছিল ওস্তাদ। সারা দিন সে ছুটোছুটি করে বেড়াত। মা তাকে ডাকতেন, 'তড়বড়ানি' বলে। কিন্তু ছোট ভাইটিকে সে খুব ভালবাসত। কাজেই পলও দিদির পেছনে ছুটোছুটি করে বেড়াত, দিদির খেলার সঙ্গী হয়ে। সারা দিন 'বটমস্'-এর সব দস্যি মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অ্যানি দৌড়ত, আর পলও দৌড়ত দিদির পাশে পাশে, দিদির উৎসাহে তারও উৎসাহ, খেলার মধ্যে তার নিজের কোন অংশ তখনও থাকত না। সে এত ঠাণ্ডা ছিল, অনেক সময় লোকের চোখেই সে পড়ত না। কিন্তু অ্যানি তাকে প্রশংসা করে করে আকাশে তুলত। আর অ্যানি যা করতে বলত, পলও মহা উৎসাহে সেই কাজে নেমে পড়ত।

একটা বড়ো পুতুল ছিল অ্যানির, পুতুলটাকে সে যত না ভালবাসত, তার চেয়ে পুতুলটার জন্যে তার গর্ব ছিল বেশী। পুতুলটার নাম রেখেছিল অ্যারাবেলা। একদিন পুতুলটাকে একটা সোফার উপর শুইয়ে এক টুকরো অয়েলক্লথ দিয়ে ঢেকে সে ঘুম পাড়িয়ে রাখল। তার পর আর পুতুলের কথা তার মনে নেই! এদিকে সোফার হাতল থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে পল-এর লাফ দেওয়া অভ্যাস করা চাই। যেমনি সে লাফ দিয়ে পড়েছে সোফার উপর, অমনি ঢাকা-দেওয়া পুতুলটা একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেল। দৌড়ে এল অ্যানি, গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠল, তার পর পুতুলের দশা দেখে, বসে বসে টেনে টেনে কাঁদতে আরম্ভ করল। পল নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বার বার বলতে লাগল, 'কী করে জানব, মা, পুতুলটা ওখানে রয়েছে। কী ক'রে জানব!' যতক্ষণ অ্যানির কান্না না থামল, ততক্ষণ দুঃখে পীড়িত আর নিজের অসহায়ত্বে ম্রিয়মাণ হয়ে পলও সেখানে বসে রইল। আস্তে আস্তে অ্যানির শোকের বেগ কমে এল। ভাইকে সে ক্ষমা করে ফেলেছিল—এখন ওর অবস্থা দেখেই তার কষ্ট হতে লাগল। কিন্তু এ ঘটনার দু'-এক দিন পর অ্যানির বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

—'আয় দিদি', পল এসে বললে, 'আয় আমরা অ্যারাবেলাকে বিসর্জন দিয়ে দি'। চল ওকে পুড়িয়ে ফেলি।'

তার কথা শুনে অ্যানি স্তম্ভিত হয়ে গেল, তবু ছোট কল্পনার দৌড় দেখে তার বেশ মজাও লাগল। দেখা যাক না কি করে ও।

পল একটা বেদীর মত সাজাল ইট দিয়ে, গা থেকে কিছু কিছু কাপড়-চোপড় খুলে নিল, তার পর মোমের পুতুলটার ভাঙা টুকরোগুলোকে গর্তের মধ্যে ফেলে দিল। এবার একটু প্যারাফিন ঢেলে সে দিল আগুন ধরিয়ে। দাউ দাউ করে জায়গাটা জ্বলে উঠল। মোমের পুতুলটা গলে গলে পড়তে লাগল, আগুনের শিখার মধ্যে মিশিয়ে যেতে লাগল, দেখে পলের কি রকম বিজাতীয় আনন্দ। যতক্ষণ না ওই মস্ত বড়ো বিশ্রী পুতুলটা পুড়ে শেষ হয়ে গেল, ততক্ষণ পল চুপ করে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য উপভোগ করতে লাগল। আগুন নিবে গেলে সে ছাইয়ের গাদা থেকে পুতুলটার পোড়া হাত-পা গুলো বের করে এনে একটা পাথর দিয়ে সেগুলোকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলল।

বললে, 'এই বারে মিস অ্যারাবেলার বিসর্জনের পালা শেষ হ'ল। এবার ওর চিহ্নও আর রইল না, কেমন মজা!'

শুনে অ্যানির মন কেমন করে উঠল, যদিও মুখে সে ভাইকে কিছু বলতে পারলে না। পুতুলটার উপর পল-এর এই তীব্র বিদ্বেষের আর কোন কারণ নেই; কেবল সেই যে পুতুলটাকে ভেঙে ফেলেছে, এইটুকুই হয়ত কারণ।...

মায়ের দেখাদেখি সব ছেলেমেয়েরাই ছিল বাপের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে পল। মোরেল অবশ্য আগের মতই লোকাকে শাসাত আর মদ খেত। মাঝে মাঝে সে পারিবারিক জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলত, কখনও বা কয়েক মাস ধরেই চলত এই অশান্তি আর উদ্বেগের পালা। সেদিনের কথা পল ভুলতে পারবে না। সোমবার সন্ধ্যা, ছোটরা সব গির্জেয় বাজনা

শুনে ফিরে এসেছে, ঘরে ঢুকেই পল দেখল মায়ের চোখ ফোলা আর রক্তহীন, বাবা উনুনের কাছে কার্পেটের উপর মাথা নীচু করে, পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে; উইলিয়ম এই মাত্র কাজ সেরে বাড়ি ফিরেছে, সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বাপের দিকে। ছোট ছেলেমেয়েরা ঘরে ঢুকতেই সব চুপচাপ, কিন্তু বড়োরা কেউ চোখ তুলেও চাইল না তাদের দিকে।

উইলিয়মের ঠোঁট দুটি সাদা হয়ে গেছে, হাতের মুঠি দুটি বন্ধ। ছেলেমেয়েরা ঘরে ঢুকে চুপ না করা অবধি সে অপেক্ষা করল, ছোট ছেলেমেয়েদের মতই রাগে আর ঘৃণায় ফুলতে লাগল সে। তারপর বললে, 'ভীরু কোথাকার! আমি ঘরে থাকলে এ কাজ করতে সাহস পেতে তুমি?'

মোরেলের রক্ত মাথায় চলে গিয়েছিল। সে আচমকা ফিরে দাঁড়াল ছেলের দিকে মুখ করে। উইলিয়ম লম্বায় তার বাপের চেয়ে বড়ো, কিন্তু মোরেলের শরীরের গড়ন অনেক শক্ত। রাগে সে প্রায় পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। চীৎকার করে সে বললে, 'পেতাম না? একশো বার পেতাম। খবরদার বলছি, আর বাড়াবাড়ি করিসনি, তা'হলে ঘুষিতে তোর হাড় আর আস্ত রাখব না। যা বলছি তাই শোন।'

মোরেল হাঁটু ভেঙে বসে নিজের হাতের মুঠি তুলে ভয় দেখাল। তাকে তখন মনে হচ্ছিল যেন কোনো কুৎসিত জানোয়ার! উইলিয়াম রাগে বিবর্ণ হয়ে উঠল। মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে, অথচ গলায় জোর এনে সে বললে, 'তাই নাকি। তা'হলে সেই হবে তোমার শেষ ঘুষি!'

মোরেল প্রায় নাচতে নাচতে এদিকে এগিয়ে এলো, নিজের দেহকে বাঁকিয়ে সে ঘুষি তোলবার জন্যে প্রস্তুত হ'ল। উইলিয়মও প্রস্তুত। তার নীল চোখ দুটি ঝকমক করে উঠল, বিদ্রূপের শাণিত হাসির মতো। বাপের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে। আর একটি কথা হলেই, এই দুটি লোকের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে যেত। পল মনে মনে আশা করছিল যেন তাই হয়। সোফার উপর বসে তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে বিবর্ণ মুখে এদিকে চেয়েছিল।

মিসেস মোরেল চড়া গলায় বলে উঠলেন—'থামো। কী সব করছ দু'জনে। এক রাতের পক্ষে এই যা হয়েছে যথেষ্ট।' তার পর স্বামীর দিকে ফিরে বললেন, 'আর, তোমার কী কাণ্ডজ্ঞান নেই! ছেলেমেয়েগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখেছ?'

মোরেল এক-নজরে চাইল সোফাটার দিকে। তার পর বিদ্রূপের সুরে বললে, 'তুমি চেয়ে দেখ ছেলেমেয়ের দিকে। তোমার মত ঝগড়াটে, হাড়জ্বালানীরাই যেন চেয়ে দেখে। ছেলেমেয়েদের কী করেছি আমি, বলো তো। ঠিক তোমারই মতো ওরা হয়ে দাঁড়িয়েছে—তোমার কুশিক্ষা পেয়ে পেয়ে তোমার পথই ওরা ধরেছে।'

উত্তর দেবার প্রবৃত্তি হ'ল না মিসেস মোরেলের। আর কেউই

কথা বললে না। খানিক বাদে মোরেল তার বুটগুলো টেবিলের নীচে ছুঁড়ে ফেলে শুতে চলে গেল।

সে উপরে চলে গেলে উইলিয়ম বললে, 'কেন তুমি আমাকে বাধা দিলে? আজ ওকে আমি দেখিয়ে দিতুম। পারতো নাকি ও আমার সঙ্গে?'

—'আঃ, কী বকিস, ও তোর বাবা না?' মা বললেন জবাবে।

—'বাবা!' উইলিয়ম যেন পুনরাবৃত্তি করল, 'ওকে আমার বাবা বল তুমি।'

—'তবে কি? সে যা, তাই ত' বলতে হবে।'

—'যাক গে, কিন্তু ওর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে দেবে না কেন তুমি? কাজটা একটুও শক্ত হ'ত না আমার পক্ষে।'

—'ছি!' মা ধমকে উঠলেন, 'এখনো ও-রকম করবার মতো কিছু হয়নি।'

—'না হয়নি! চেয়ে দেখ না নিজের দিকে। কেন তুমি বাধা দিলে, নইলে ওর ঘুষিটা ওকেই আমি ফিরিয়ে দিতুম।'

—'না, বাছা, ও আমার সয় না, ও রকম করে তুই বলিসনি।' মা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন।

ছোট ছেলেমেয়েগুলো নিদারুণ মর্ম্মপীড়া নিয়ে ঘুমোতে গেল।

উইলিয়ম তখন সবে কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছে, এমন সময় তাঁরা বাড়ি বদলালেন—বটমস্ থেকে তাঁরা চলে এলেন পাহাড়ের চূড়ার উপর একটা নতুন বাড়িতে। এ বাড়ি থেকে নীচের উপত্যকার সব কিছু চোখে পড়ে। বাড়ির সামনে একটা প্রকাণ্ড বুড়ো অ্যাশ-গাছ। পশ্চিমের বাতাস দূর ডার্বিশায়ার থেকে এসে এই বাড়িগুলোতে জোরে ঘা দিয়ে যায়, সে আঘাতে সামনের গাছগুলো মর্ম্মরিত হয়ে ওঠে। সেই শব্দ শুনতে মোরেল খুব ভালবাসত।

বলত, 'আঃ, কী মিষ্টি শব্দ, শুনলে ঘুম পেয়ে যায়।'

কিন্তু পল, আর্থার, অ্যানি,—ওরা কেউ মোটেই ভালবাসত না ওই শব্দ শুনতে। পল ভাবত, ওটা যেন কোন দৈত্য-দানাবের শব্দ। যে বছর শীতের দিনে তারা এলো এ বাড়িতে, সে বছর সারা শীতকালটাই তাদের বাবার মেজাজ খারাপ হয়ে রইল। ছেলেমেয়েরা ওই বিশাল অন্ধকার উপত্যকার ধারে রাস্তার উপর বসে সন্ধ্যা আটটা অবধি খেলা করত। তার পর তারা যেত শুতে। তাদের মা নীচে বসে সেলাই করতেন। বাড়ির সামনে একটা খোলা জায়গা—ছেলেমেয়েদের মনে জাগত অন্ধকার রাত্রির কথা, বিশাল এই শূন্যতা তাদের অন্তরে ভয় জাগিয়ে দিত। গাছের পাতার শব্দ, পারিবারিক অশান্তির দুঃসহ জ্বালা—সব কিছু জড়িয়ে তাদের এই ভয়। অনেক দিন রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে পল যেন শুনতে পেত, নীচের ঘরে কিসের ভারী শব্দ! তক্ষুনি সে সজাগ হয়ে কান পেতে থাকত। থাকতে থাকতে সে শুনতে পেত তার বাবার কান-ফাটা চীৎকার, প্রায় মাতাল হয়েই সে বাড়ি ফিরত। মা-ও চটে গিয়ে কি যেন জবাব দিতেন, তার উত্তরে টেবিলের উপর বাবার ফটাফট ঘুষি চালাবার শব্দ, লোকটার গলা যতই চড়ত, ততই নাক দিয়ে কেমন অদ্ভুত এক আওয়াজ বেরিয়ে আসত। তার পর সবশুদ্ধ ডুবে যেত অ্যাশ-গাছের তীক্ষ্ণ ধ্বনির নীচে—কত বিচিত্র শব্দই না ভেসে আসত বাতাসের দোলা লেগে ওই বিশাল গাছটি থেকে। ছেলেমেয়েরা নিঃশব্দে কান পেতে শুয়ে থাকত, কখন বাতাসের শব্দ একটু থামবে, বাবা কি করছে আবার তারা শুনতে পাবে। হয়তো সে আবার মায়ের গায়ে হাত তুলবে। ভয়ে তাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত অন্ধকারের মধ্যে। তাদের কম্পমান অন্তরে জাগত তাজা রক্তের অনুভব। দুঃসহ জ্বালায় মুহ্যমান হৃদয় নিয়ে তারা নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকত। ক্রমশঃ বাতাসের বেগ তীব্রতর হয়ে উঠত, বেড়ে উঠত গাছের পাতার সোঁ-সোঁ শব্দ। বীণার সমস্ত তন্ত্রীগুলো যেন ঘা খেয়ে ঝমঝম করে উঠত, তীব্র চীৎকারে ফেটে পড়ত, বঙ্কৃত হয়ে উঠত তীব্র করুণ মূর্চ্ছনায়। তার পর আবার সুগভীর নিস্তব্ধতা, বাইরে, নিচে সর্বত্র ভয়ঙ্কর নীরবতা। কেন? চার দিক হঠাৎ এত নীরব হয়ে গেল কেন? এ স্তব্ধতার অর্থ কী? চার দিকে কি রক্তের ইঙ্গিত? কী করছে, বাবা কী কাণ্ডটাই না জানি করে চলেছে?

ছেলেমেয়ে ক'টি শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে থাকত। অবশেষে অনেকক্ষণ পর তারা শুনতে পেল, বাবা বুটগুলো ছুঁড়ে ফেলে মোজা পায়ে হেঁটে উঠছে উপরে। কান পেতে তবু তারা শুনতে থাকত। শেষ পর্যন্ত বাতাসের শব্দ যদি একটু কমে আসত তবে নীচের তলায় মায়ের কেৎলিতে জলভরার শব্দ শুনতে শুনতে তারা ঘুমিয়ে পড়ত।

সকাল বেলা তাদের মজার সময়—তখন থেকে শুরু হ'ত তাদের খেলা, সন্ধ্যাবেলা তারা নাচত রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টটিকে ঘিরে, চার পাশের অন্ধকারের মধ্যে এইটুকুই আলো। তবু মনের নিভৃতে কী যেন এক আতঙ্ক সঞ্চিত হয়ে থাকত, চোখের সামনে দুলত কী এক অন্ধকার, তাদের জীবনকে সারা ক্ষণ ভারাক্রান্ত করে রাখত।

পল্ তার বাপকে দু'চোখে দেখতে পারত না। ছোট ছেলেদের যেমন থাকে, তারও তেমনি নিজস্ব একটা আন্তরিক প্রার্থনা ছিল। প্রতিদিন রাত্রে সে প্রার্থনা করত, 'বাবার মদ খাওয়া বন্ধ ক'রে দাও ভগবান্!' অনেক দিন সে এমনও বলত, 'ভগবান, বাবা কেন মরে না।' কিন্তু যেদিন সন্ধ্যাবেলা চা খাওয়ার পরও বাবা খনি থেকে বাড়ি ফিরে আসত না, সেদিন প্রার্থনা করে সে বলত, 'ভগবান, বাবা যেন খাদের নীচে প'ড়ে মারা না যায়।'

এই আর একটা নিদারুণ সময়, এই সময়টাতে এ পরিবারে অশান্তির আর সীমা থাকত না। ছেলে-মেয়েরা স্কুল থেকে ফিরে চা খেয়েছে। উনুনের পাশে বড়ো কালো সসপ্যানটা ঠাণ্ডা হচ্ছে, উপরে বসানো ঝোলের পাত্রটা, মোরেলের সন্ধ্যার খাবার তৈরি হচ্ছে। সাধারণতঃ পাঁচটার সময় মোরেলের বাড়ি ফেরার কথা। কিন্তু অনেক দিন কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে দোকানে বসে সে মদ গিলে আসত, মাঝে মাঝে একটানা কয়েক মাস অবধি প্রতিটি দিনই সে এরকম কাণ্ড করত।

শীতের রাত্রে চারি দিকে বিষম ঠাণ্ডা, সন্ধ্যার অন্ধকার তাড়াতাড়িই নেবে আসে। মিসেস মোরেল টেবিলের উপর একটা পেতলের বাতিদান বসিয়ে তাতে মোমবাতি জ্বালিয়ে

বাড়ীতে রাঁধা খাবার খেয়েও বিপদ হ'তে পারে !
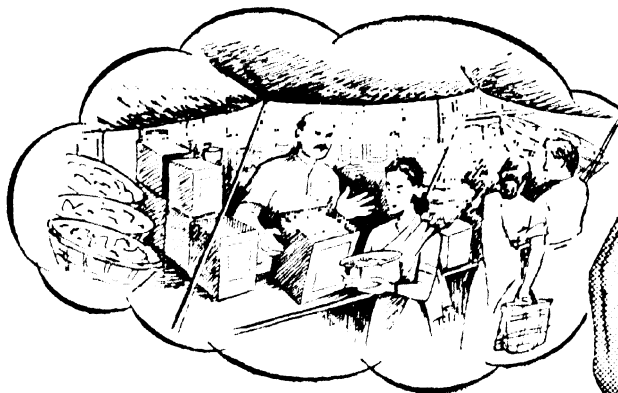
ডাক্তারবাবুর
কথা শুনে আমি ত অবাক ! আমার
দোষেই নাকি ছেলেরা এত ভোগে।

গত ছ মাসের মধ্যে পেটের গোলমালে ছেলেরা দুবার ভুগলো। তার উপর গত মাসে স্বামীও বিছানা নিলেন। বড় বিপদে পড়লাম। জানেনই ত কি রকম দিনকাল পড়েছে, এমনিতেই খরচ কুলানো দায় এর উপর আবার ডাক্তার ও ওষুধপত্রের ধাক্কা এলে বড়ই মুস্কিল।

আশ্চর্য্য ! আমার পরিবারের সকলেই অসুখের ডিপো হয়ে দাঁড়ালো দেখছি ! ডাক্তারবাবুকে গিয়ে এ কথা বলতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন 'রান্নার ব্যাপারে আপনি বেশ সাবধান ত?'

'নিশ্চয়' আমি বললাম।

'রান্নার জন্য স্নেহপদার্থ কেনেন কি ভাবে ?'

'কি করে আবার ? খুচরো কিনি, তাতেই সুবিধা' আমি উত্তর দিলাম।

'ভেবে দেখেছেন কি, খুচরো স্নেহপদার্থে রোগের বীজাণু থাকতে পারে' ডাক্তারবাবু বললেন, 'আর খোলা অবস্থায় থাকে বলে তাতে ভেজাল দেওয়া চলে, ময়লা হাতে ছোঁয়া হতে পারে ও ধুলোবালি ও মাছিময়লা পড়তে পারে। কে জানে, হয়ত এরকম স্নেহপদার্থ খেয়েই আপনার পরিবারের সকলে ভুগছে।'

আগে ভাবতাম যে রান্নার জন্য স্নেহপদার্থ খুচরো কিনলেই পয়সা বাঁচে, সস্তায় হয়। কিন্তু প্রতি মাসে ডাক্তার ও ওষুধের খরচ খতিয়ে দেখে ঠিক করলাম অমন সস্তায় আর কাজ নেই।

সেই দিন থেকেই বায়ুরোধক শীলকরা টিনে ডালডা বনস্পতিই কিনি। ডালডা বনস্পতিতে সব রকম রান্নাই চমৎকার হয়। আর স্বামী ও ছেলেমেয়েরা ডালডা বনস্পতিতে রাঁধা খাবার তৃপ্তির সঙ্গে খায়।

পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সর্ব্বদা আপনার সব রান্না ডালডা বনস্পতি দিয়ে করুন। ডালডা বনস্পতি সর্ব্বদা তাজা ও খাঁটি অবস্থায় পাবেন আর ব্যবহার করে বুঝবেন যে রান্নার ব্যাপারে ডালডার জুড়ি নেই। ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' যুক্ত ডালডা বনস্পতি আপনাদের সুবিধার জন্য ১০, ৫, ২ ও ১ পাউণ্ড টিনে সর্ব্বত্র বিক্রী করা হয়।

কি ক'রে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায়?

বিনামূল্যে খবরের জন্য আজই
লিখুন :
দি ডালডা
এ্যাডভাইসারি সার্ভিস
পোস্ট বক্স ৩৫৩, বোম্বাই ১

আপনার স্বাস্থ্যের জন্য
ডালডা বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন
রাঁধতে ভালো - খরচ কম

HVM. 212-X52 BG

দিতেন, তাতে গ্যাসের খরচটা বাঁচত। ছেলেমেয়েরা তাদের রুটি-মাখন কিম্বা চর্ব্বি-মাখান রুটি খেয়ে বাইরে খেলতে যাবে। কিন্তু মোরেল যদি তখনও বাড়ি ফিরে না আসত, তা'হলে খেলতে যেতেও তাদের কেমন ভয় ভয় করত। মিসেস মোরেলের তখন মনে হ'ত লোকটা হয়ত তার কালিমাখা কাপড়চোপড় নিয়ে খালি পেটেই মদ খেতে বসে গেছে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও বাড়ি আসার নাম নেই, হাত-পা ধুয়ে একটু আরাম করে খাবে, এও তাকে দিয়ে হয় না। মিসেস মোরেল আর সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর এই অশান্তি সঞ্চারিত হ'ত ছেলে-মেয়েদের মনে। এখন আর তাঁর একার দুঃখ নয়; ছেলে-মেয়েরাও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ আর অশান্তি ভোগ করত।

পল তার সঙ্গীদের নিয়ে খেলা করতে যেত। নীচে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে খনির আলোগুলোকে দেখা যেত ছোট ছোট তারকাপুঞ্জের মতো। শেষ পালার কয়েকটি মজুর অন্ধকার-পথে অতি কষ্টে এগিয়ে চলেছে। তাদের পেছনে এলো বাতিওয়ালা। আর কোন মজুরকে আসতে দেখা গেল না। অন্ধকার নেমে এলো সারা উপত্যকাটার উপর। কাজের পালা শেষ হ'ল আজকের মতো। নেমে এলো রাত্রি।

তখন পলের ভারী ভাবনা হ'ত, সে দৌড়ে যেত রান্নাঘরে। তখনও টেবিলের উপর জ্বলছে সেই মোমবাতিটা, উনুনের আগুন বড়ো লাল হয়ে উঠেছে। মিসেস মোরেল একা বসে আছেন। উনুনের পাশে নামানো সসপ্যানটা থেকে ধোঁয়া উঠছে। টেবিলের উপর প্লেটগুলো সাজানো। সমস্ত ঘরে যেন একটা প্রতীক্ষার ভাব, যে লোকটা অদ্ভুত অবস্থায় খনির কালিমাখা জামাকাপড় পরে এই নিবিড় অন্ধকার রাত্রে বাড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে বসে মদ খেয়ে স্ফূর্ত্তি করছে তারই জন্যে এই প্রতীক্ষা!

পল এসে দরজায় দাঁড়াত। জিজ্ঞেস করত, 'বাবা বাড়ি এসেছে মা?'

বৃথা প্রশ্ন। মিসেস মোরেল বিরক্ত হয়ে উত্তর দিতেন, 'দেখতেই পাচ্ছ ত' আসেনি।'

তখন ছেলেটা মার আশ-পাশে ঘোরাফেরা করতে থাকত। তাদের দু'জনার মনে একই ব্যথা, একই জ্বালা। একটু পরে মিসেস মোরেল উঠে গিয়ে আলুগুলো ছাড়াতে বসতেন। বলতেন, 'আলুগুলো বিশ্রী আর নষ্ট, কিন্তু তাতে আমার কী এসে যায়!'

বেশী কথাবার্ত্তা হ'ত না। বাবা বাড়ি আসেনি বলেই যে মা মনে মনে ব্যথা পাচ্ছেন, পল তা বুঝতে পারত আর মায়ের উপর তার এক ধরণের বিরক্তি এসে যেত। বলত, 'কেন তুমি ওরকম কর বলো ত'? সে যদি রাস্তায় মদ খেয়ে আসে, থাক না কেন, তোমার তাতে কি?'

—'আমার কী!' মিসেস মোরেল উত্তেজিত হয়ে জবাব দিতেন, 'আমার কী, তা তুই কি করে বুঝিবি?'

মনে মনে তিনি জানতেন, যে লোক কাজ থেকে বাড়ি ফেরবার পথে দেরি করে আসে, সে খুব অল্পদিনের মধ্যেই তার নিজের আর তার পরিবারের সর্ব্বনাশ ডেকে আনে। এখনো ছেলেমেয়েরা ছোট, মোরেলের আয়ের উপরেই তাদের একান্ত নির্ভর। অবশ্য ভগবানের দয়ায় উইলিয়ম বড় হয়ে উঠেছে এই যা একটু আশার কথা! মোরেল যদি না দিতে পারে, তবে উইলিয়মের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার ঠাঁইটুকু অন্ততঃ তাঁর জুটবে। কিন্তু মনের বিষন্নতা তাতে কাটত না; প্রতীক্ষারত সন্ধ্যাগুলিতে ঘরের আবহাওয়া তেমনি থমথমে আর ভারী হয়ে থাকত।

ঘড়ির কাঁটা টিক টিক করে মুহূর্ত্তগুলোকে গুণে চলত! ছ'টা বেজে যেত, টেবিলের কাপড়টা আগের মতোই পাতা থাকত, খাবার থাকত পড়ে, ঘরের মধ্যে জেগে থাকত আগের মতোই প্রতীক্ষা আর উদ্বেগ। এ আর সহ্য হ'ত না ছেলেটার। বাইরে গিয়ে খেলবার ইচ্ছেও তার হ'ত না। ছুটে যেত সে পাশের বাড়ির মিসেস ইঙ্গার-এর কাছে, গিয়ে গল্প শুনত। মিসেস ইঙ্গার-এর ছেলেমেয়ে ছিল না। তাঁর স্বামী খুব ভালোমানুষ, তবে দোকানে কাজ করেন বলে রাত্রে তাঁর বাড়ি ফিরতে দেরি হ'ত। এই সময়ে পল যখন গিয়ে তাঁর দরজায় দাঁড়াত, তিনি ডাকতেন, 'ভেতরে এসো, পল্।'

বসে বসে দু'জনে খানিকক্ষণ গল্প করতেন, তার পর পল্ হঠাৎ উঠে বলত, 'আচ্ছা, এবার যাই। দেখি গে, মায়ের কোন কাজ করে দিতে হবে কি না। মনের অশান্তি সে তার বন্ধুর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখত, ভাণ করত যেন সে দিব্যি স্ফূর্ত্তিতে আছে। এক-দৌড়ে সে বাড়িতে চলে আসত।

এই সময়টাতে মোরেলও এসে বাড়িতে ঢুকত। চোয়াড়ের মত তার চেহারা, দেখলে ঘেন্না ধরে যায়।

—'চমৎকার সময় বাড়ি ফেরার', মিসেস মোরেল হয়ত বলতেন।

উত্তরে মোরেল গর্জ্জন ক'রে উঠত, 'আমি যখন খুশি বাড়ি ফিরব তাতে তোমার কি?'

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সমস্ত লোক নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হয়ে যেত, সে যে কত বড়ো ভয়ঙ্কর লোক এ ত' আর কারুর অজানা ছিল না। ক্ষুধিত জানোয়ারের মতো খাবারগুলো গিলে, টেবিলের উপর থেকে বাসনগুলো ঠেলে সরিয়ে দিত সে, নিজের হাত দুটি টেবিলে ছড়িয়ে রাখবার জন্যে। এই ভাবেই সে ঘুমিয়ে পড়ত।

এতো খারাপ লাগত পলের। বাপের কাঁচা-পাকা চুলে-ঢাকা ছোট অদ্ভুত মাথাটা তার খালি হাতের উপর, তার মুখ কালি-মাখা আর টকটকে লাল, নাকটা মাংসল, ভ্রূ-জোড়া সরু আর অতি ক্ষীণ। হাতের উপর মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে সে। বীয়ার, ক্লান্তি আর বদমেজাজ—এই তিনের ফল এই গাঢ় ঘুম। যদি হঠাৎ কেউ ঘরে ঢুকত, কিম্বা কোথাও টুক্ করে একটু শব্দ হ'ত, অমনি সে জেগে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠত: 'তোর মাথা গুঁড়ো করে ফেলব, বজ্জাত! ওই খটখট শব্দ থামাবি কিনা বল্!'

কথাটা সাধারণতঃ অ্যানিকে উদ্দেশ করেই বলা হ'ত। তার এই চেঁচানি শুনে, এই অকারণ শাসানো দেখে, বাড়ির লোক আরও বেশী চটে যেত তার উপর, ঘৃণায় তাদের অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে উঠত।

বাড়ির কোন ব্যাপারেই তাকে ডাকা হ'ত না। কেউ তাকে কোন কথা বলত না কখনো। ছেলেমেয়েরা যখন একা একা মায়ের

কাছে থাকত তখন সারা দিনে যা কিছু ঘটনা ঘটেছে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলত মাকে। মায়ের কাছে না বলা পর্য্যন্ত তাদের মনে হ'ত যেন ঘটনাটা এখনো সত্যি সত্যিই ঘটেনি তাদের জীবনে। কিন্তু বাবা বাড়ি আসা মাত্র সব কিছু থেমে যেত। এ বাড়ির সহজ সুন্দর জীবনে সে যেন বিসদৃশ কোন বাধা। মোরেল সব বুঝতে পারত; সে বাড়ি এলেই এখানে কথা বন্ধ হয়ে যায়, জীবনের স্রোত যায় আচম্কা থেমে, তাকে হাত বাড়িয়ে কেউ ডেকে নেয় না। তবু কিছু তার করবার ছিল না; ঘটনাস্রোত এগিয়ে গেছে, তাকে এখন তার বাধা দিতে যাওয়া বৃথা।

সমস্ত প্রাণ দিয়ে সে চাইত যেন ছেলেমেয়েরা তার কাছে আসে, তার সাথে গল্প করে। কিন্তু তারা তা পারত না। মাঝে মাঝে মিসেস মোরেল নিজে থেকেই বলতেন, 'বাবাকে কথাটা বোলো যেন।'

পল একবার ছোটদের কাগজের একটা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেল। বাড়ির সবাই খুব খুশি। মিসেস মোরেল বললেন, 'বাবা বাড়ি এলে তাকে কথাটা বোলো যেন। জানো ত', সে কেমনধারা লোক; এমনিতেই বলে বাড়ির কেউ তাকে কোন কথা জানায় না।'

—'আচ্ছা,' পল বললে। কিন্তু তার মন সায় দিল না। বাবাকে বলার চেয়ে পুরস্কারটা ফিরিয়ে দেওয়া তার বেশী খারাপ লাগত না।

বাবা বাড়ি এলে পল বললে, 'আমি প্রতিযোগিতায় একটা পুরস্কার পেয়েছি, বাবা।'

মোরেল তার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়াল।

—'তাই নাকি, তা' কিসের প্রতিযোগিতা ছিল ওটা?'

—'এমন কিছু নয়, এই—নামকরা মেয়েদের বিষয়ে।'

—'তুমি যে পুরস্কারটা পেলে সেটার দাম কত?'

—'পুরস্কার হ'ল গিয়ে একটা বই।'

—'ও, তা বেশ!'

এইটুকুই কথা। বাপের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালিয়ে যাওয়া এ বাড়ির অন্ত লোকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। সে যেন এ বাড়ির আপন লোক নয়, নিতান্ত আগন্তুক। তার জীবনে সে ঈশ্বরকে স্থান দেয়নি।

শুধু যে সময়টুকু সে বাড়িতে বসে নিজের খুশি মতো কাজকর্ম করত, সেই সময়টুকুর জন্যে পারিবারিক জীবনে প্রবেশের অধিকার সে ফিরে পেত। কোন কোন দিন সন্ধ্যাবেলা সে জুতো সারাতে বসত কিম্বা তার কেৎলি অথবা জলের বোতল মেরামত করত বসে বসে। তখন তাকে সাহায্য করবার লোকের দরকার হ'ত, ছেলে-মেয়েরা খুশি হয়েই এগিয়ে যেত তার কাছে। এই কাজের সময়টুকুর জন্যেই ছেলেমেয়েরা বাপের সঙ্গে এক হয়ে মিলতে পারত, শুধু এই সময়েই বাপের আসল রূপ দেখবার সুযোগ হ'ত তাদের।

নানা রকমের হাতের কাজে সে ছিল নিপুণ কারিগর। মেজাজ ভাল থাকলে সে গান করত। অবশ্য অনেক সময় মাসের পর মাস তার মেজাজ থাকত তিরিক্ষি হয়ে। তার পর আবার খুশি হয়ে উঠত সে। আগুনে তাতানো টকটকে লাল লোহা নিয়ে দৌড়ে ঢুকত সে ভাঁড়ার ঘরে, বলত,—'সরো সরো,—রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াও।'

তার পর হাতুড়ি দিয়ে সেই তপ্ত লোহাটাকে পিটিয়ে সে তাকে ইচ্ছামত রূপ দিত। অথবা এক মুহূর্ত্ত চুপ করে বসে সে ঝালাই করত। তপ্ত লোহা গলে গলে পড়ছে দেখে ছেলেমেয়েদের খুব আনন্দ হ'ত, তারা দেখত গলানো লোহার তালটা যেন নেচে বেড়াচ্ছে। ঘরময় পোড়া গুগগুল আর গরম টিনের গন্ধ। মোরেল চুপচাপ বসে একমনে কাজ করে যাচ্ছে। বুট সারাবার সময় হাতুড়ির তালে তালে গান করা তার চাই-ই। সে যখন তার খনির নীচে পরবার চামড়ার পোষাকটাতে তালি দিতে বসত, তখন তার মন খুশি হয়ে উঠত। এ জিনিসটা ছিল নেহাত ময়লা আর শক্ত, তার স্ত্রীর পক্ষে এটা সারানো কঠিন হ'ত, কাজেই প্রায়ই তাকে এ কাজটা নিজে ক'রে নিতে হ'ত।

কিন্তু ছেলেমেয়েদের কাছে সব চেয়ে মজার সময় ছিল যখন তাদের বাবা পলতে তৈরি করতে বসত। এক বোঝা শুকনো খড় সে নিয়ে আসত তাকের উপর থেকে। হাত দিয়ে ঘষে ঘষে এগুলোকে সোনার সুতোর মতো পরিষ্কার ক'রে তুলত সে। তার পর ছুরি দিয়ে খড়গুলোকে ছ' ইঞ্চি পরিমাণ কেটে নিত, নিচে থাকত একটি ক'রে ছোট গর্ত্ত। টেবিলের উপর বারুদ রাখত সে একরাশ, সাদা টেবিলটার উপর বারুদগুলোকে কালো শস্যকণার মতো দেখাত। সে খড়গুলোকে কেটে কেটে সাজিয়ে রাখত, পল আর অ্যানি ওর মধ্যে বারুদ ভর্ত্তি করত আর মুখ বন্ধ করে দিত। হাত থেকে বারুদের কণাগুলো খড়ের মধ্যে ঝিরঝির করে পড়ছে—দেখতে ভালো লাগত পলের। আস্তে আস্তে সমস্ত চোঙটা ভর্ত্তি হয়ে যেত। তার পর সাবান দিয়ে সে খড়ের মুখটা দিত বন্ধ করে। বলত, 'দেখ বাবা!'

—'ঠিক আছে, বাবা।' মোরেল বলত। দ্বিতীয় ছেলেটিকে সে খুব আদর করত। পল বারুদ-ভর্ত্তি পলতেটিকে তুলে রাখত টিনের মধ্যে। পরদিন সকালে বাবা খনিতে যাবার সময় টিনটিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। সেখানে পলতেটিতে আগুন ধরিয়ে দেবা মাত্র ফেটে যাবে, আর সেই বিস্ফোরণের ফলে কয়লার স্তূপ ভেঙে পড়বে নীচে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ও ধীরেশ ভট্টাচার্য্য

প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

১২৮০ বঙ্গাব্দে মধুসূদন দত্তের মৃত্যু উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র কুল্লুক ভট্ট হইতে রামমোহন রায় পর্য্যন্ত কয় জন স্মরণীয় বাঙ্গালীর নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল।" সে ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বাহুবলে বা সমরকৌশলে স্মরণীয় কোন বাঙ্গালীর উল্লেখ করেন নাই; যাঁহাদিগের মনীষা সাহিত্যে ও দর্শনে আত্মপরিচয় দিয়াছিল কেবল তাঁহাদিগের মধ্যেই কয় জনের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালীর "ভীরু" অপবাদ যে মিথ্যা, বাঙ্গালী যে রণকৌশলেও কৃতিত্ব-পরিচয় দিয়াছেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব নাই। বাঙ্গালার "বার ভূইঞা" বা ভূস্বামীর বিষয় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালী সীতারাম ও প্রতাপাদিত্যকে পরাভূত করা মোগল সম্রাটের বাহিনীর পক্ষে সহজসাধ্য হয় নাই—তাঁহারা বাঙ্গালী সৈনিক লইয়া রণদুর্দ্ধর্ষ সেনাদল গঠিত করিয়াছিলেন। তাহার পরেও যুদ্ধব্যাপারে বাঙ্গালীর প্রতিভা সুযোগ পাইলেই আত্মবিকাশ করিয়াছে—প্রথম বিশ্বযুদ্ধেও তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইংরেজ ইচ্ছা করিয়া বাঙ্গালীকে সেনাদলে প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দী শিখিয়া "পশ্চিমা" সাজিয়া বরোদায় সেনাদলে প্রবেশাধিকার পাইয়া আপনার দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পাদ্রী হিবর লিখিয়াছিলেন:—

"নানা লোকের নিকট আমি শুনিয়াছি, ভারতে বাঙ্গালীরা সর্ব্বাপেক্ষা ভীরু বলিয়া বিবেচিত। এই বিশ্বাসের জন্য এবং তাহারা খর্ব্বাকৃতি বলিয়া বিহার ও উত্তর-ভারত হইতেই সিপাহী গ্রহণ করা হয়। কিন্তু যে ক্ষুদ্র সেনাদল লইয়া ক্লাইব অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ সৈনিকই বাঙ্গালা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। মানুষ অবস্থার ও শিক্ষার ফলে প্রভাবিত হয়—So much are all men the creatures of circumstances and training."

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মধুসূদন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে যে যুদ্ধে বাঙ্গালীর স্মরণীয় কার্য্যের উল্লেখে বিরত ছিলেন, তাহার কারণ—তাহাতে তিনি বাহুবলের তুলনায় জ্ঞানোন্নতিকেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন এবং সেই জন্য বলিয়াছিলেন, "ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল; সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে।"

বাঙ্গালীর বাহুবলের খ্যাতি দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সময়ে ভারতে ব্যাপ্ত ছিল। বাঙ্গালী রাজারা বিহারে, উড়িষ্যায় ও মধ্যপ্রদেশে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী সেনাদল—বাঙ্গালার নৌকায় তরঙ্গসঙ্কুল সাগর লঙ্ঘন করিয়া সিংহল বিজয় করিয়াছিল, যব প্রভৃতি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। সে সব পুরাতন কথা। এ কালে সামরিক প্রতিভার প্রতীক—সুভাষচন্দ্র বসু। মধ্যবর্ত্তী কালে—সিপাহী বিদ্রোহের সময়—এক জন বাঙ্গালী মসীজীবী মুন্সেফ অসিজীবীর প্রতিভার পরিচয় দিয়া ইংরেজের প্রশংসা ও পুরস্কার অর্জ্জন করিয়াছিলেন—"যোদ্ধা মুন্সেফ" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহ দমিত হইবার পরে কোন ইংরেজ লেখক 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে একটি প্রবন্ধে (সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে) বিদ্রোহ-কালে একটি জিলার বিবরণ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটির নাম—"A District during a Rebellion." প্রবন্ধটি [illegible] সম্বার জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য—বিদ্রোহের গতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের জন্য প্রশংসনীয়। প্রবন্ধে ইংরেজ লেখক বাঙ্গালীদিগের ভীরু ও কাপুরুষ অপবাদের উল্লেখ করিয়াও এক জন বাঙ্গালী সরকারী কর্ম্মচারীর সামরিক প্রতিভার ও কার্য্যের উল্লেখ না করিয়া পারেন নাই। লেখক প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী। তিনি বলেন, যখন বিপদ সমুপস্থিত হয়, তখনই লোকের প্রকৃত প্রকৃতি সপ্রকাশ হয় এবং দুর্ব্বল সবলের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়। সেই বিপদের সময় জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার কোন্ কোন্ কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করা যায়, তাহা দেখিতে থাকেন এবং সেই সময় এক জন দাওয়ানী কর্ম্মচারী "বাঙ্গালী বাবু" যে যোগ্যতা ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে "যোদ্ধা মুন্সেফ" নামে অভিহিত করা হয়। তিনি যে কেবল নির্ভীক ভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাই নহে; পরন্তু (শত্রুদিগকে) আক্রমণ করেন, (বিদ্রোহীদিগের) গ্রাম জ্বালাইয়া দেন, অধীনস্থদিগকে ধন্যবাদ দিয়া ইংরেজীতে সরকারী বিবরণ লিখেন এবং শাসন করিবার যে যোগ্যতার ও আবশ্যক কাজ করিবার যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সম্প্রদায়ে (বাঙ্গালীদিগের মধ্যে) অসাধারণ।—

"In one remarkable instance the native civil Judge—a Bengali Baboo by capacity and valour—brought himsellf so conspicuously forward, as to be known as the 'Fighting Moonsiff.' He not only held his own defiantly, but he planned attacks, he burnt villages, he wrote English despatches thanking his subordinates and displayed a capacity for rule and a fertility of resource very remarkable for one of his nation."

ইঁহার প্রতিভার ও দক্ষতার সম্মুখে ঔদ্ধত্য রক্ষা করিতে না পারিয়া এই ইংরেজ লেখক ইঁহার যে প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা "damning with faint praise" ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। সেই জন্য ইংরেজ-পরিচালিত 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্র বাঙ্গালীদিগের সম্বন্ধে লেখকের মত হাস্যোদ্দীপক কুসংস্কারের ফল বলিয়া ঐ উক্তিকে অভিহিত করিয়া বলেন:—

"We are not slow to scold Bengalees when required, but if in India there is a race to whom God has given capacity, real clearness of brain,

it is the Bengalee. Take the most timid, quaking wretch of a Kayust you can find, put him in any district in India with a shadow of authority, and if he does not make Punjabees and Sikh, Marhatta and Hindusthani work themeselves to death for his benefit, and think all the while it is for their own, he is no true Bengalee."

অর্থাৎ—

"যখন প্রয়োজন হয় তখনই আমরা বাঙ্গালীদিগকে তিরস্কার করিতে ত্রুটি করি না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে ভগবান যদি কোন সম্প্রদায়কে দক্ষতা ও বিমল মনীষা দিয়া থাকেন, তবে সে বাঙ্গালীদিগকে। যদি সর্ব্বাপেক্ষা ভীরু, কম্পিত-কলেবর, লক্ষ্মীছাড়া এক জন (বাঙ্গালী) কায়স্থকে বাছিয়া লইয়া কোন জিলায় কোন নামমাত্র ক্ষমতার পদে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তবে সে যদি পঞ্জাবী, শিখ, মহারাষ্ট্রীয় ও হিন্দুস্থানীদিগকে প্রাণপণে পরিশ্রম করাইতে অথচ তাহারা আপনাদিগের জন্যই পরিশ্রম করিতেছে (তাহার জন্য নহে) মনে করাইতে না পারে, তবে সে বাঙ্গালীই নহে!"

এই ইংরেজ লেখক কেন যে বিশেষ ভাবে বাঙ্গালী কায়স্থদিগকেই দক্ষতার জন্য প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কারণ, যদিও বাঙ্গালী কায়স্থরা বহু ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন এবং 'মুতাক্ষরীণ' লেখক সফওরংজঙ্গের সহিত সিরাজদ্দৌলার সংঘর্ষের বিবরণে বলিয়াছেন, শ্যামসুন্দর নামক এক জন কায়স্থ গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন—তথাপি কায়স্থাতিরিক্ত বাঙ্গালীরাও বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন এবং "যোদ্ধা মুন্সেফ" বাঙ্গালী হইলেও কায়স্থ ছিলেন না। 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের ইংরেজ প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু তখনই বাঙ্গালী হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্র তাঁহার পরিচয় দিয়াছিলেন—তিনি উত্তরপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের—প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রথমে উত্তরপাড়ায় ও তাহার পরে হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি এলাহাবাদে (যুক্তপ্রদেশ) মুন্সেফ ছিলেন। তাঁহার বীরত্বের ও যোগ্যতার পরিচয় পাইয়া ইংরেজ সরকার তাঁহাকে বাঙ্গালায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে উন্নীত করিয়াছেন।

সিপাহী বিদ্রোহের তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে প্যারীমোহন কাশীতে কোন আত্মীয়ের নিকট গমন করেন এবং তথায় শিক্ষালাভান্তে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এলাহাবাদের নিকটস্থ মন্‌ঝনপুর নামক স্থানে মুন্সেফ নিযুক্ত হ'ন।

কোন্ সূত্রে কি জন্য প্যারীমোহন উত্তরপাড়া হইতে কাশীতে গিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, বাঙ্গালীকে "ঘরমুখো" অপবাদ দিলেও বাঙ্গালী কখন কারণে ঘর ছাড়িয়া যাইতে ইতস্ততঃ করে নাই। কাশীতে ও বৃন্দাবনে বহু বাঙ্গালী ধর্ম্মস্থানে বাস করিবার জন্য গিয়াছেন—বর্ত্তমান বৃন্দাবন বাঙ্গালীর আবিষ্কার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালী প্রথম ইংরেজী শিক্ষা করায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ইংরেজের নিকট বাঙ্গালীর বিশেষ আদর ছিল। সামরিক রসদ বিভাগ হইতে নানা দপ্তরে যেমন চাকরীতে বহু বাঙ্গালী নানা স্থানে গিয়াছিলেন, তেমনই আবার বহু বাঙ্গালী উকীল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী নানা প্রদেশে ছিলেন। অনেকে কর্ম্মস্থানেই বসবাস করিয়াছিলেন। সেই জন্যই মীরাটে, এলাহাবাদে, লক্ষ্ণৌয়ে, জামালপুরে, কটকে, বালেশ্বরে—নানা স্থানে বহু বাঙ্গালীর বাস। যাঁহারা কার্য্যব্যপদেশে বাঙ্গালার বাহিরে থাকিতেন, তাঁহারা কেবল আত্মীয়-স্বজনকেই নহে—তথায় উপস্থিত বাঙ্গালীমাত্রকেই সাদরে সাহায্য করিতেন।

কাশীতে অধ্যয়নান্তে প্যারীমোহন যখন মুন্সেফী চাকরী পাইয়া মন্‌ঝনপুরে গমন করেন, তখন তিনি যুবক। সেই সময় সিপাহী বিদ্রোহ অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত প্রবল বন্যার মত দেখা দেয়। ইংরেজ ও ভারতীয় উভয় পক্ষেই অত্যাচার ও অনাচার প্রবল হয়। 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন, ইংরেজ সৈনিকরা বিদ্রোহী মনে করিয়া কতকগুলি সহিসকে সঙ্গীণে বিদ্ধ করিয়া মারিয়াছিল, দাড়ী দেখিয়া বিদ্রোহী সন্দেহে লোককে ফাঁসী দিয়াছিল—ইত্যাদি। সুতরাং বলা যায় না—নানা সাহেবই নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

যখন সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দেয়, তখন মন্‌ঝনপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের কয় জন প্রতিপত্তিশালী জমীদার (কৃষক) বিদ্রোহীদিগের জয়ের আশায়ও বটে, লুণ্ঠনের লোভেও বটে কয়খানি গ্রাম জ্বালাইয়া দেয় ও গ্রামবাসীদিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করে। তাহারা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া সমবেত ভাবে যখন ইংরেজ তহশিল আক্রমণ করে, তখন বাঙ্গালী প্যারীমোহন কতিপয় ক্ষতিগ্রস্ত জমীদারকে সরকারের সমর্থক করিয়া—অধীনস্থ লোকদিগকে সমর-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া সেনাদল গঠিত করেন এবং

প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আক্রমণকারীদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করেন। তিনিই সে সময় সেনাপতির কাজ করিয়াছিলেন। তখন 'পাইওনিয়ার' নামক ইংরেজ-পরিচালিত সংবাদপত্রে সেই যুদ্ধের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। একবার প্যারীমোহন সামরিক প্রথায় শিবির সংস্থাপন করিয়া যে যুদ্ধ করেন, তাহাতে বিদ্রোহীদিগের দলপতি ধাথল সিংহ ও তাঁহার দলের কয় জন সর্দার নিহত হ'ন। সেই যুদ্ধে প্যারীমোহন যে বিক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে বিদ্রোহীরা আতঙ্কিত হইয়া আর যমুনা পার হইয়া তাঁহার দলকে আক্রমণ করিতে সাহস করে নাই।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, তখন প্যারীমোহন মাত্র ২২ বৎসরের যুবক এবং সামরিক কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। তাঁহার কার্য্যের পুরস্কারে তৎকালীন বড়লাট কাণপুরে দরবারে তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া খেলাত (পরিচ্ছদ), জমীদারী (জায়গীর) ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করেন। বড়লাট লর্ড ক্যানিং নিজ বিবরণে প্যারীমোহনকে "যোদ্ধা মুন্সেফ" আখ্যা প্রদান করেন— তাঁহার কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। সে সময়ে প্যারীমোহন বাবুর কার্য্যে ও সম্মানে প্রবাসে বাঙ্গালীদিগের সম্মান বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হয় এবং সেই সম্মানের গৌরবচ্ছটা বাঙ্গালী মাত্রকেই উদ্ভাসিত করিয়াছিল। মিষ্টার টমসন তখন এলাহাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি বিভাগীয় কমিশনারকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত হয়—

"প্যারীমোহন বাবু গত নভেম্বর মাসে এই জিলায় মনঝনপুরে মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তদবধি তিনি এই জিলার ঐ অংশ হইতে বিদ্রোহীদিগকে বিতাড়িত করিতে অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন; যদিও সে কাজ তাঁহার নহে, তথাপি তিনি কমিশনারের নিকট প্রস্তাব করেন, তিনি সরকারের সমর্থক জমীদারদিগকে সজ্যবদ্ধ করিবেন, যাহারা সন্দেহে বিচলিত তাহাদিগকে শান্ত করিবেন এবং অসন্তুষ্টদিগের বিরুদ্ধে সরকারী দল গঠিত করিবেন। তিনি সে কাজে এতই সাফল্যলাভ করিয়াছেন যে, তিনি অধিকাংশ গ্রামে সরকারের প্রভুত্ব পুনরায় স্থাপিত করিতে পারিয়াছেন। মাত্র কয়খানি গ্রাম এখনও বিদ্রোহীদিগের হস্তগত আছে। তিনি জয়লাভ করিয়াছেন।"

সে সম্বন্ধে প্যারীমোহনের রিপোর্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনারের নিকট প্রেরণ করেন।

যুবক প্যারীমোহনের সামরিক খ্যাতি তাঁহাকে সেই অঞ্চলে কিরূপ প্রতিপত্তির অধিকারী করিয়াছিল, তাহা তাঁহাকে কার্য্যব্যপদেশে অন্যত্র প্রেরণের প্রস্তাবে স্থানীয় কমিশনার থর্ণহিলের প্রতিবাদে বুঝিতে পারা যায়। থর্ণহিল তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রদেশের ছোটলাটকে লিখিয়াছিলেন :—

"বাবু প্যারীমোহন ব্যক্তিগত সাহস ও দৃঢ়তার জন্য এরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন যে, আমার বিশ্বাস, তাঁহার ভয়েই বিদ্রোহীরা যমুনা নদীর পরপার হইতে (মনঝনপুর অঞ্চলে) আসিতে সাহস করে নাই। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের বিশ্বাস, এ সময় তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিলে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিবে···এ বিষয়ে আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত একমত।"

ইংরেজ স্বভাবত: আপনার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণা পোষণ করিয়া থাকে—বিশেষ বিজিত ভিন্ন জাতির সম্বন্ধে তাহার ধারণা অধিকাংশ স্থলে ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক। তাহার সাম্রাজ্যবাদী কবি কিপলিং বলিয়াছেন, শ্বেতাঙ্গরা যে সকল শ্বেতাতিরিক্ত জাতির উপর প্রভুত্ব করে, তাহারা অর্দ্ধ-শিশু-অর্দ্ধ-শয়তান। ইংরেজদিগের মধ্যে যাঁহাদিগকে আমরা উদার-হৃদয় ও উদার-নীতিক —ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিয়াছি, তাঁহারাও ভারতবাসীকে কখন ইংরেজের সমান মনে করেন নাই—করিতে পারেন নাই। এলফিনষ্টোন এ দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন। যখন বড়লাটের শাসন-পরিষদে এক জন ভারতীয় সদস্য নিয়োগের প্রস্তাব হয়, তখন লর্ড রিপন ইংলণ্ডের মন্ত্রিমণ্ডলে ছিলেন এবং তিনি সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন—ভারতীয়কে সামরিক অবস্থা জানিতে দেওয়া নিরাপদ নহে। শ্বেতাতিরিক্ত জাতির কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই অধীন আইরিশদিগকে স্বায়ত্ত-শাসন প্রদানের প্রস্তাবে লর্ড সলসবেরী উদ্ধত ভাবে বলিয়াছিলেন, দমনের উপর দমন পুঞ্জীভূত করিলে তবে বিজিত আইরিশরা কখন রাজনীতিক অধিকার লাভের উপযোগী হইতে পারিবে।

যাহাদিগের স্বভাব এইরূপ সেই ইংরেজদিগের মধ্যে যাঁহারা সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে এলাহাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট ও বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন, তাঁহারা ভয় করিয়াছিলেন, তরুণ বাঙ্গালী মুন্সেফ প্যারীমোহনকে মনঝনপুর হইতে স্থানান্তরিত করিলে তথায় বিদ্রোহীরা আসিয়া ইংরেজ শাসন বিপন্ন করিবে এবং তিনিই কেবল তাঁহাদিগকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। বাঙ্গালীর ভীরু ও কাপুরুষ অপবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন কেহ অনুভব করিতে পারেন কি? স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ও বিভাগীয় কমিশনার প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী মুন্সেফকে স্থানান্তরিত করিলে ঐ অঞ্চলে বিদ্রোহীদিগকে দমিত রাখা তাঁহাদিগের ক্ষমতায় কুলাইবে না। অথচ প্যারীমোহন বাঙ্গালী যুবক এবং যে কার্য্যে নিযুক্ত তাহা সামরিক নহে।

কিন্তু প্যারীমোহন ইংরেজের চাকরীতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি অসাধারণ যুদ্ধনৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন বটে কিন্তু ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি চাকরী ত্যাগ করিয়া তথায় ওকালতী করিতে থাকেন

তিনি ওকালতীতে সাফল্যলাভ ও অর্থার্জ্জন করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। দেশবাসীর উন্নতি-সাধনে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং তিনি বিশ্বাস করিতেন, শিক্ষাই সেই উন্নতির সুমেরুশিরে উপনীত হইবার সোপান। সেই জন্য যখন এলাহাবাদে কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়, তখন তিনি সে জন্য বাঙ্গালী রামকালী চৌধুরী ও রামেশ্বর চৌধুরীর মতই বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে যুক্তপ্রদেশের তৎকালীন ছোটলাট সার উইলিয়ম মিওর তাঁহার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—কলেজ প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে সাহায্যকারীদিগের মধ্যে লালা গয়াপ্রসাদের এবং বাবু প্যারীমোহনের ও বাবু রামেশ্বর চৌধুরীর নাম আমার নিকট বিশেষ ভাবে উল্লেখিত হইয়াছে।

প্যারীমোহন বাবুর কার্য্যদক্ষতার ও বীরত্বের খ্যাতি তখন যুক্তপ্রদেশে সর্ব্বত্র কিম্বদন্তীর মতই ব্যাপ্ত ও পরিচিত ছিল। সেই জন্য ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন কাশীনরেশ সরকারের অনুমোদন লইয়া প্যারীমোহনকে স্বীয় বিস্তৃত ভূমিসম্পত্তির পরিচালন-ভার দিয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল এলাহাবাদ হাইকোর্টে বাঙ্গালী ব্যবহারাজীবরা বিশেষ আদর লাভ করিয়া গিয়াছেন। প্যারীমোহন তাঁহাদিগের অন্যতম। এই প্রসঙ্গে আমরা আর একদল বাঙ্গালী উকীলের নামোল্লেখ করিব। জনাই গ্রামের যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুতে তেজবাহাদুর সপ্রু বলিয়াছিলেন, তিনি যখন এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবের কাজ আরম্ভ করেন, তখন তথায় ৩ জন প্রধান—সুন্দরলাল, মোতিলাল নেহরু ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী। প্রগাঢ় অধ্যয়ন-ফলে সুন্দরলাল নিজ পক্ষের সমর্থনে নজীর দেখাইয়া জয়ী হইবার যে যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাতে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না; মোতিলাল নেহরু জবাবে বক্তৃতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন; আর যোগেন্দ্রচন্দ্র নজীরে ও বক্তৃতায় সমান দক্ষ ছিলেন এবং সেই জন্য এক জন প্রধান বিচারক বলিতেন, যোগেন্দ্রচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি যাহা বলেন, তাহা বিচারককে এমনই প্রভাবিত করে যে, সঙ্গে সঙ্গে রায় দিলে তাঁহার মতই অভ্রান্ত স্বীকার করিতে হয়। সেই জন্য বিচারক যোগেন্দ্রচন্দ্র কোন মামলায় এক পক্ষে উকীল থাকিলে শুনানীর পরদিন রায় দিতেন।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সবন্ধে বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীদিগের কীর্ত্তির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

"প্যারীমোহন বাবু এতদঞ্চলের অধিবাসিগণের একপ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পর স্থানীয় জনসাধারণ তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ চাঁদা সংগ্রহ করেন এবং ঐ টাকায় প্রতি দ্বিতীয় বৎসর (মিওর) কলেজের পদার্থবিদ্যাধ্যায়ী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে একটি স্বর্ণ পদক দিবার ব্যবস্থা করেন। এলাহাবাদ সিটি রোডের উপর কায়স্থ-পাঠশালার পার্শ্বস্থ বৃহৎ অট্টালিকা এবং উদ্যান বাঙ্গালী 'যোদ্ধা মুন্সেফে'র স্মৃতি বহন করিতেছে।"

প্যারীমোহনের স্বগ্রাম উত্তরপাড়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত আয়োজন করে নাই। ইহার কারণ কি?

প্যারীমোহনের কর্ম্মজীবন' বাঙ্গালার বাহিরে অতিবাহিত হইয়াছিল। সে জীবন কর্ম্মবহুল ছিল। তিনি বিদেশে একাধিক বাঙ্গালীর উন্নতির সহায় ছিলেন।

এলাহাবাদে কলেজ স্থাপনে প্যারীমোহনের প্রচেষ্টার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে "এলাহাবাদ ইনষ্টিটিউট" নামক যে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার এক অধিবেশনে সারদাপ্রসাদ সান্যাল একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিলে নীলকমল মিত্র, প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামেশ্বর চৌধুরী প্রত্যেকে এক হাজার টাকা হিসাবে দানের প্রতিশ্রুতি দেন। কলেজের যে ইতিহাস ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত

হয়, তাহাতে কলেজের জন্য গৃহ-নির্ম্মাণে যাঁহাদিগের অর্থ সংগ্রহ-চেষ্টার উল্লেখ আছে, প্যারীমোহন তাঁহাদিগের অন্যতম। আবশ্যক অর্থ সংগ্রহের জন্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল, প্যারীমোহন তাহার সম্পাদক ছিলেন।

পূর্ব্বে এলাহাবাদ হইতে কেরী নামক একজন ইংরেজের সম্পাদকতায় 'দি নর্থ ওয়েষ্ট লিটারেরী গেজেট' পত্র প্রকাশিত হইত। ভারতীয়গণ 'দি রিফ্লেক্টর' পত্র প্রকাশ করেন। তাহার মূলে প্যারীমোহন ও নীলকমল মিত্র দুই জন বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালী সারদাপ্রসাদ সান্ন্যাল ও রামকালী চৌধুরী এই পত্রের প্রধান লেখক ছিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালীরা এলাহাবাদে যাইয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা হইতে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত যে সকল জনকল্যাণকর কার্য্য করিয়াছিলেন, সে সকলেই প্যারীমোহনের সক্রিয় সাহায্য ছিল এবং সে সকলের জন্য অর্থ ও উদ্যম ব্যয়ে তিনি কখন কার্পণ্য করেন নাই।

তখন উর্দ্দু ভাষাই যুক্তপ্রদেশে আদালতে ব্যবহৃত হইত। বলা বাহুল্য, তাহা মুসলমান শাসনের চিহ্ন। দেশের জনগণের ভাষা হিন্দী। তাহার প্রচলন জন্য যাঁহারা চেষ্টা করেন, প্যারীমোহন তাঁহাদিগের অন্যতম। মুসলমানদিগের প্রতিনিধিরূপে সৈয়দ আহমেদ উর্দ্দুর পক্ষপাতী হইয়া হিন্দী প্রচলনের প্রতিবাদ করেন। সেই বিষয়ে সারদাপ্রসাদের সহিত সৈয়দ আহমেদের যে পত্র ব্যবহার হয় তাহা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া মিওর আলোচনার জন্য সারদাপ্রসাদকে আমন্ত্রণ করিলে তাঁহার সহিত প্যারীমোহন, রামকালী চৌধুরী, নীলকমল মিত্র ও গয়াপ্রসাদও ছোটলাটের নিকট গমন করেন। প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার কেম্পসও সেই আলোচনা-স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাঙ্গালীদিগকে বলেন—"দেখিতেছি, আপনারা বাঙ্গালী, কার্য্যব্যপদেশে যুক্তপ্রদেশে আসিয়াছেন, কাজ শেষ হইলে বাঙ্গালায় ফিরিয়া যাইবেন। আদালতে উর্দ্দু ভাষায় কার্য্য পরিচালিত হইলে আপনাদিগের ক্ষতি কি?" তখন বাঙ্গালীদিগের প্রতিনিধিরূপে রামকালী বাবু বলেন, "মানুষ যে স্থানেই কেন বাস করুক না, সেই স্থানের অধিবাসীদিগের হিতচিন্তায় ও দুর্দ্দশা মোচনে যত্ন করা তাহার কর্ত্তব্য। বাঙালীরা এমন স্বার্থপর নহেন যে, (যুক্তপ্রদেশে হিন্দী ভাষা প্রচলনের মত) কর্ত্তব্য কার্য্যে বিরত হইবেন।"

ইহাতে আর এক জন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীর কার্য্যের বিষয় মনে হয়। যখন ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা সরকার (তখন বিহার বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত) বিহারে শিক্ষাবিস্তারের পন্থা-নিরূপণভার প্রদান করেন, তখন বিহারে ৫টি ভাষা প্রচলিত—হিন্দী, বাঙ্গালা, মাগধী, মৈথিলী ও ব্রজবুলী। এই সকলের মধ্যে বাঙ্গালাই সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্ট। ভূদেব বাবু কিন্তু দেখেন, হিন্দীভাষাভাষীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেই জন্য, শিক্ষাবিস্তারকল্পে, হিন্দীর প্রচলনই কর্ত্তব্য মনে করিয়া তিনি হিন্দী ভাষায় দৈন্য উপেক্ষা করিয়াও তাহাকে শিক্ষার বাহন করেন এবং বাঙ্গালা পুস্তকের অনুকরণে হিন্দীতে পাঠ্যপুস্তক রচনা করাইয়া তাহার অভাব দূর করেন। তাঁহারই চেষ্টায় বিহারে হিন্দী আদালতে ব্যবহার্য্য ভাষারূপে গৃহীত হয়। সে ক্ষেত্রে ভূদেব বাবু যেমন লোকশিক্ষাই বিবেচ্য মনে করিয়াছিলেন, যুক্তপ্রদেশে প্যারীমোহন প্রমুখ বাঙ্গালীরা তেমনই তথায় লোকশিক্ষার বিস্তার সাধন জন্য হিন্দীভাষার প্রচলনচেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদিগের চেষ্টা সফল না হইলেও তাঁহাদিগের প্রচেষ্টার গৌরব তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। তাহা তাঁহাদিগের মনোগত ভাবের পরিচায়ক।

উত্তর কালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারক প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারীমোহনের পরামর্শে ও প্ররোচনায় এলাহাবাদে যাইয়া তথায় কর্ম্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

যুক্তপ্রদেশে হিন্দী ভাষাকে আদালতের ভাষা করিবার জন্য যে আন্দোলন হয়, তাহার আরম্ভে তাহার পুরোভাগে বাঙ্গালীরা ছিলেন। ঐ বিষয় "এলাহাবাদ ইনষ্টিটিউটের" দুইটি সভায় (২৫শে অক্টোবর ও ২১শে নভেম্বর, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে) আলোচিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিনের সভায় প্যারীমোহন সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

যুক্তপ্রদেশে প্যারীমোহনের কর্ম্মবহুল জীবনের অধিক কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি যুক্তপ্রদেশের কল্যাণকর কার্য্যে সর্ব্বদাই অবহিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার যে বাঙ্গালাকে মধুসূদন "শ্যামা জন্মদে" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র যে বাঙ্গালার "সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা" মূর্ত্তি দেখিয়া মা'কে বলিয়াছিলেন—

"বাহুতে তুমি, মা, শক্তি
হৃদয়ে তুমি, মা, ভক্তি—
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে—মন্দিরে"

তিনি কখন সেই বাঙ্গালাকে বিস্মৃত হ'ন নাই। তিনি তাঁহার সকল সম্পত্তি—তাঁহার পত্নীর জীবনান্তে—বাঙ্গালায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রদানের নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন। আজ—যাঁহার সামরিক প্রতিভা তাঁহার আর সকল কার্য্যের গৌরব ম্লান করিয়াছে, সেই কর্ম্মযোগী বাঙ্গালীর কথা স্মরণ করিয়া আমরা গৌরবানুভব করিতেছি।

ছড়া

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন রেখেছে।
বড়োসাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে।
দু'পারে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে।
ওপারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেমেছে।
ঝুমু ঝুমু চুলগাছটি ঝাড়তে লেগেছে।
কে রেখেছে কে রেখেছে দাদা রেখেছে।
আজ দাদার ঢেলা ফেলা, কাল দাদার বে।

দাদা যাবে কোন্‌খান দে, বকুলতা দে।
বকুলফুল কুড়োতে কুড়োতে পেয়ে গেলুম মালা।
রামধনুকে বাদ্দি বাজে সীতেনাথের খেলা।
সীতেনাথ বলে রে ভাই চালকড়াই খাব।
চালকড়াই খেতে খেতে গলা হোলো কাঠ।
হেথা হোথা, জল পাব চিৎপুরের মাঠ।
চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিকচিক করে।
সোনামুখে রোদ লেগে রক্ত ফেটে পড়ে।

—প্রচলিত বাঙ্গলা ছড়া।

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

বিনয় ঘোষ

[অনুবাদ]

হিন্দুস্থানের হিন্দুদের কথা—(২)

সতীদাহ ও সহমরণ

মৃত স্বামীর জলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরতে এত স্ত্রীলোককে দেখেছি যে সহমরণ সম্বন্ধে আমার মনে রীতিমত আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। সতীদাহের বীভৎস দৃশ্য স্বচক্ষে দেখার মতন শক্তিও আর নেই আমার, এমন কি তার বিবরণ দেবারও ইচ্ছা নেই। তবু চেষ্টা করব যতদূর সম্ভব সঠিক বিবরণ দিতে। যা স্বচক্ষে দেখেছি তাই বলব। এই ধরণের ভয়াবহ মর্মান্তিক দৃশ্যের নিখুঁত বিবরণ দেওয়া যে কত কষ্টকর, তা বুঝিয়ে বলতে পারব না। লিখিত বিবরণ পাঠ ক'রে, সহমরণ বা সতীদাহ সম্বন্ধে মনে মনে কোন ধারণা করা সম্ভব নয়। স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

আমেদাবাদ থেকে আগ্রা যাবার সময় অনেক দেশীয় নৃপতির রাজ্য অতিক্রম ক'রে যেতে হয়। পথে একটি বাগানের মধ্যে আমাদের ক্যারাভান যখন বিশ্রামের জন্য থামল, তখন আমরা খবর পেলাম, কাছেই একটি সতীদাহের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে এবং মৃত স্বামীর জলন্ত চিতায় ঝাঁপ দেবার জন্য স্ত্রী প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে। শুনেই তৎক্ষণাৎ আমি সেখানে দৌড়ে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, শুকনো একটি ডোবার তলায় বেশ বড় ক'রে গর্ত কেটে চিতা তৈরী করা হয়েছে। চিতার উপর কাঠ সাজানো। তার উপর মৃত ব্যক্তিকে সটান শুইয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর জীবন্ত স্ত্রীও ব'সে রয়েছেন সেই চিতার উপর। চার-পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পুরোহিত চিতার চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন। পরিপাটি ক'রে পোষাক-পরিচ্ছদ প'রে জন পাঁচেক মধ্যবয়স্কা মহিলা পরস্পর হাত ধরাধরি ক'রে, সেই চিতার চারিদিকে ঘুরে-ফিরে নাচছেন গাইছেন। দর্শকদের ভিড় হয়েছে এবং তাদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা দর্শক দুইই যথেষ্ট সংখ্যায় আছেন।

প্রচুর পরিমাণে তেল-ঘি ঢালা হয়েছিল চিতার উপর। সুতরাং অগ্নি-সংযোগ করতে না করতেই দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠল আগুন। স্ত্রীলোকটির পরণের কাপড়ে আগুন ধ'রে গেল। সুগন্ধ তেল ও চন্দন দিয়ে পূর্ব্বেই তাঁর গায়ে লেপে দেওয়া হয়েছিল। সারা গায়ে আগুন ধরে গেল। আশ্চর্য ব্যাপার! এতটুকু বিচলিত হতে দেখলাম না তাঁকে! কোন বেদনা, যন্ত্রণা, এমন কি সামান্য অস্বস্তির ভাব পর্যন্ত তিনি প্রকাশ করলেন না। স্থির হয়ে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে মুখে বেশ স্পষ্টভাবে "পাঁচ" "দুই" ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন। 'পাঁচের' অর্থ হ'ল, পূর্বজন্মে এরকম পাঁচবার তিনি তাঁর এই স্বামীর সঙ্গে সহমরণ করেছেন। আর দুই জন্মে দু'বার হলেই সাতবার সম্পূর্ণ হয় এবং তাহ'লেই এই মানবজন্ম থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি স্বর্গলোকবাসিনী হ'তে পারেন। সে এক বিচিত্র দৃশ্য! দেখলে মনে হয়, কোন অদৃশ্য শক্তি সেই স্ত্রীলোকটিকে যেন একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে।

কিন্তু এ তো সবে শুরু। করুণ কাহিনীর আরও অনেক বাকি আছে। আমি ভেবেছিলাম, যে পাঁচজন মহিলা চিতার চারিদিকে ঘুরেফিরে নাচছে-গাইছে, তারা কোন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান বা আচার পালন করছে মাত্র। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। চিতার লকলকে আগুন তাদের মধ্যে একজনের কাপড়ে লেগে গেল। আগুন জ্ব'লে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, সেই মহিলাটিও চিতার অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। দ্বিতীয় জনও দেখতে দেখতে তার অনুগমন করল। বাকি তিনজন তখনও সেই রকম হাত ধরাধরি ক'রে নাচছে-গাইছে, কোন চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম না তাদের মধ্যে। কিছুক্ষণ পরে তারাও একে-একে চিতার আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

অতঃপর বুঝলাম, এই একাধিক সহমরণের কারণ কি? ঐ পাঁচজন মহিলা ক্রীতদাসী। গৃহস্বামী যখন অসুস্থ হয়েছিলেন তখন গৃহকর্ত্রী তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতেন এবং বলতেন যে তাঁর মৃত্যু হ'লে তিনিও স্বামীর সহমৃতা হবেন। দাসীরা তাই শুনে স্থির করেছিল যে গৃহস্বামীর মৃত্যুতে যদি গৃহকর্ত্রীও সহমৃতা হন, তাহলে তারাও তাদের জীবন উৎসর্গ করবে।

হিন্দুস্থানের অনেক লোকের সঙ্গে এবিষয়ে আমি আলাপ-আলোচনা করেছি। তাঁরা সকলেই আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে ভালবাসার আধিক্যই সহমরণের অন্যতম কারণ। হিন্দুস্থানের মেয়েরা কোমল-প্রকৃতি ও স্নেহপ্রবণ। সেইজন্য স্বামীর মৃত্যু তাঁরা সহ্য করতে পারেন না এবং নিজেরাও স্বামীর সহমৃতা হন। একথা আমি বিশ্বাস করি না। অনুসন্ধান ক'রে আমি যেটুকু জানতে পেরেছি তাতে আমার অন্যরকম ধারণা হয়েছে। বাল্যকাল থেকে হিন্দুস্থানের মেয়েদের মনে নানারকম কুসংস্কারের বীজ বপন করা হয়। প্রত্যেক মেয়েকে মা শিক্ষা দেন যে স্বামীই হলেন একমাত্র দেবতা এবং মৃত স্বামীর ভস্মাবশেষের সঙ্গে নিজের দেহ মিশিয়ে দেওয়ার চেয়ে জীবনের মহত্তর কর্তব্য আর কিছু হতে পারে না। এইটাই হ'ল সনাতন প্রথা। কোন নারী

এ-প্রথার বিরোধিতা করতে পারে না, করা উচিত নয়, মহাপাপ। আমার ধারণা, পুরুষরাই হ'ল এই সব প্রথা ও সংস্কারের স্রষ্টা। মেয়েদের দাসীর মতন পদানত ক'রে রাখার জন্ত, তাদের সেবা-শুশ্রূষা আদায় করার জন্ত, যাতে তারা কোনদিন কোনকারণে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করতে না পারে সেইজন্ত পুরুষরাই মাথা ঘামিয়ে এই সব প্রথা আবিষ্কার করেছে।

যাই হোক, এরকম আরও দু'-একটা মর্মান্তিক ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। একটি বিখ্যাত ঘটনার কথা বলছি যা আমি স্বচক্ষে দেখিনি অবশ্য, কিন্তু যার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী এবং যা উল্লেখ না করলে সহমরণ-প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমি নিজে স্বচক্ষে যা দেখেছি তাও যদি অন্তদের কাছে বলি তাহ'লে কেউ তা বিশ্বাস করতে চাইবেন না। এরকম ঘটনা এতই অবিশ্বাস্ত যে নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি তা মর্মে মর্মে বুঝতে পারি। তাই শোনা ঘটনা হলেও, আমি সেটা অবিশ্বাস্ত মনে করি না এবং উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। হিন্দুস্থানে সকলের মুখে মুখে কাহিনীটি চালু হয়েছিল এক সময়। প্রত্যেকেই কাহিনীটি সত্য ব'লে বিশ্বাস করেন। হয়ত হিন্দুস্থানের বাইরে ইয়োরোপেও এই কাহিনীর প্রচার হয়েছে এতদিনে।

কাহিনীটি এই। কোন একজন হিন্দু স্ত্রীলোক তার প্রতিবেশী একজন তরুণ মুসলমান দর্জির প্রেমে পড়েছিল। মুসলমান ছেলেটি খুব ভাল সেতার বাজাতে পারত। মেয়েটি নিরুপায় হয়ে তার স্বামীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করল। তার বিশ্বাস ছিল যে মুসলমান ছেলেটি তাকে বিবাহ করতে রাজী হবে। সে তার প্রেমিকের কাছে গিয়ে পতিহত্যার কাহিনী বলল এবং তাকে বিবাহ করার জন্ত অনুরোধ করল। মেয়েটি বলল : এখনই এই স্থান ছেড়ে তাদের চ'লে যাওয়ার দরকার। যেতে দেরী হ'লে তার মৃত্যু ভিন্ন কোন উপায় থাকবে না। স্বামীর শবদাহের সময় তাকেও সহমরণ বরণ করতে হবে। মুসলমান ছেলেটি আসন্ন বিপদের আশঙ্কা দেখে মেয়েটিকে বিবাহ করতে রাজী হ'ল না। মেয়েটি তখন সোজা তার আত্মীয়স্বজনের কাছে চ'লে গিয়ে বলল যে তার স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে সে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছে এবং স্বামীর সহমৃতা হবার সঙ্কল্প করেছে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই তার সঙ্কল্পে খুশী হয়ে বলল যে তার মতন মহীয়সী নারী আর হয় না, পরিবারের গৌরব সে। অবশেষে শবদাহের জন্ত চিতা তৈরী হ'ল এবং তাতে অগ্নিসংযোগ করা হ'ল। মেয়েটি চিতার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে আত্মীয়স্বজনকে আলিঙ্গন ও চুম্বন ক'রে তাদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিতে লাগল। বাজনাদাররাও উপস্থিত ছিল চিতার পাশে এবং তাদের মধ্যে সেই মুসলমান ছেলেটিও ছিল। মেয়েটি একে একে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধীরে ধীরে সেই মুসলমান ছেলেটির কাছে এগিয়ে গিয়ে, হঠাৎ তার গলা ধ'রে হিড়-হিড় ক'রে টানতে টানতে চিতার ধারে নিয়ে এসে, জোরে ধাক্কা দিয়ে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল এবং নিজেও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিল।

সুরাট থেকে পারস্ত যাত্রার সময় আমি আর একজন বিধবা মহিলার পতিভক্তি ও সহমরণ স্বচক্ষে দেখেছি। এই সময় শুধু আমি একা নই, একাধিক ইংরেজ ও ডাচ ভদ্রলোক এবং প্যারিসের মঁশিয়ে শার্দাঁ (chardin) উপস্থিত ছিলেন (১)। এই সতীদাহের বিবরণ নিখুঁতভাবে ভাষায় বর্ণনা করার মতন আমার ক্ষমতা নেই। মহিলার মুখে যে পৈশাচিক সাহস ও স্বচ্ছন্দতা আমি লক্ষ্য করেছি সহমরণের সময়, তা ভাষায় প্রকাশ করা কি সম্ভবপর? কি নির্ভীক, নির্বিকার ভঙ্গী তাঁর! স্থিরভাবে তিনি সকলের সঙ্গে কথা বলছেন, আলাপ করছেন, কোন দুর্ভাবনার ছাপ নেই কোথাও। কি অবিচলিত আত্মবিশ্বাস তাঁর! কোন ভ্রূক্ষেপ নেই কোন কিছুতে। সঙ্কোচ নেই—জড়তা নেই, অস্বস্তি নেই! ব'সে ব'সে নিবিষ্ট মনে তিনি চিতার কাঠখড় ইত্যাদি নেড়েচেড়ে দেখছেন। দেখবার পর, শান্তভাবে চিতার উপর উঠে তিনি মৃত স্বামীর মাথাটি কোলের উপর তুলে নিয়ে বসলেন গম্ভীরভাবে। তারপর একটি জ্বলন্ত মশাল নিয়ে নিজের হাতে ভিতর থেকে চিতায় অগ্নিসংযোগ করলেন, বাইরে থেকে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা আগুন জেলে দিলেন। বর্ণনা করা যায় না সে দৃশ্য! ভাষার জোর নেই আমার। ছবি এঁকেও সেই ভয়াবহ দৃশ্য চোখের সামনে জীবন্ত ক'রে ফুটিয়ে তোলা যায় না। আগাগোড়া সতীদাহের এই দৃশ্যটি এমনভাবে আমার মনে ছাপ রেখে গেছে যে আজও আমার মনে হয় যেন মাত্র কয়েকদিন আগে আমি ঘটনাটি ঘটতে দেখেছি চোখের সামনে। সমস্ত দৃশ্যটি একটি ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতন মনে হয়।

অবশ্য আমি সতীদাহের এমন অনেক ঘটনাও দেখেছি, যেখানে মৃত স্বামীর চিতার সামনে দাঁড়িয়ে বিধবা স্ত্রী ভয়ে শিউরে উঠেছেন এবং আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। তখন আমার মনে হয়েছে যে সতীদাহ থেকে আত্মরক্ষা করার যদি কোন শাস্ত্রীয় বিধান থাকত, তাহ'লে এই হতভাগ্য মহিলাদের মধ্যে অনেকে হয়ত সহমরণ না ক'রে বেঁচে থাকতেন। কিন্তু পুরোহিতরা সেরকম কোন বিধানের কথা কোনদিন বলেননি এবং সহমরণে অনিচ্ছুক, ভীত ও সন্ত্রস্ত বিধবাদের তাঁরা বাধ্য করেছেন মৃত্যু বরণ করতে। অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি, ভীত আতঙ্কিত মহিলাদের জোর ক'রে ঠেলে চিতার মধ্যে ফেলে দিতে। চিতার কাছ থেকে পাঁচ-ছয় পা পিছিয়ে এসেছে ভয়ে, এরকম মহিলাদের জোর ক'রে চিতার মধ্যে ঠেলে ফেলে দিতে দেখেছি। চিতার ভিতর থেকে প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে যাবার জন্ত চেষ্টা করছে এবং বাইরে থেকে বাঁশের খোঁচা দিয়ে জোর ক'রে তাকে চিতার মধ্যে চেপে ধ'রে রাখা হয়েছে, এরকম নিষ্ঠুর দৃশ্যও একাধিক দেখেছি।

---

(১) বিখ্যাত বিদেশী পর্যটক জন শার্দাঁ (John chardin) ১৬৪৩ সালে প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭১৩ সালে লণ্ডনে মারা যান। ১৬৬৫ সালে প্রথমে তিনি বিদেশ যাত্রা করেন—পারস্তে ও ভারতবর্ষে। তিনি ছিলেন জুয়েলার বা জহরৎ-ব্যবসায়ী। ১৬৭০ সালে তিনি প্যারিস ফিরে যান এবং পুনরায় ১৬৭১ সালে পারস্তে ও হিন্দুস্থানে আসেন। ১৬৭৭ সালে উত্তমাশা অন্তরীপের পথে তিনি ইয়োরোপ ফিরে যান। ১৬৬৭ এবং ১৬৭৭ সালে শার্দাঁ সুরাটে ছিলেন। ১৬৬৭ সালে যখন শার্দাঁ সুরাটে ছিলেন তখন বার্নিয়েরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সতীদাহের দৃশ্য বার্নিয়েরের সঙ্গে শার্দাঁ এই সময় একসঙ্গে দেখেছিলেন।

কোন কোন সময় বিধবাদের পালাতেও দেখেছি। শবদাহের সময় চিতার কাছে ডোম-মুদ্দাফরাসদের ভিড় হয়। সতী বয়সে যদি তরুণী হয়, দেখতে সুন্দরী হয়, তাহ'লে অনেক সময় মুদ্দাফরাসরা মতলব ক'রে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। পলাতকা সতীকে তারা লুকিয়ে রাখে। যাদের আত্মীয়স্বজন তেমন নেই, সঙ্গতিহীন ও দরিদ্র, তাদেরই সাধারণত এইভাবে বাঁচানো সম্ভব হয়। কিন্তু এইভাবে যারা পালিয়ে কোনরকমে আত্মরক্ষা করতে পারে এবং নিম্নশ্রেণীর কাছে আশ্রয় পায়, তাদের জীবন শেষ পর্যন্ত দুর্বিষহ হয়ে ওঠে এবং অভিশপ্ত হতভাগিনীর মতন তারা দিন কাটায়। কেউ তাদের শ্রদ্ধা করে না, স্নেহ করে না, ভালবাসে না। সমাজের মধ্যে ভদ্রভাবে তারা আর জীবন কাটাতে পারে না। পতিতা ও কলঙ্কিনীর অপবাদ চিরজীবন তাকে সহ্য করতে হয় মুখ বুজে। সুতরাং তার আশ্রয়দাতা যারা, তারাও তার অসহায় অবস্থার জন্য তার প্রতি দুর্ব্যবহার করে। পলাতকা কোন সতীকে সসম্মানে আশ্রয় দিতে কোন মোগল বা মুসলমানও চায় না, ভয় পায়। সতীর ধর্মদ্রোহিতা তাদের ভয়ের কারণ। তবে অনেক হিন্দু বিধবাকে পর্তুগীজরা সতীদাহের কবল থেকে উদ্ধার করেছে। প্রধানত: বন্দরের কাছাকাছি জায়গাতেই তারা উদ্ধার করেছে বেশী, কারণ, পর্তুগীজদের বাস ছিল বেশী বন্দরের কাছেই। আমার নিজের যা মনে হয়েছে সতীদাহের দৃশ্য দেখতে দেখতে তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না। মনে হয়েছে, যে পুরোহিতশ্রেণী সমাজে এই শাস্ত্রীয় বিধানের প্রবর্তন করেছেন তাঁদের সকলের আগে সমূলে উচ্ছেদ করা উচিত।

লাহোরে একবার একটি সুন্দরী বালিকার সহমরণের দৃশ্য দেখেছিলাম, ভুলতে পারব না কোনদিন। বছর বারোর বেশী বয়স নয় মেয়েটির। চিতার সামনে মেয়েটিকে যখন নিয়ে আসা হ'ল তখন দেখলাম ভয়ে সে আধমরা হয়ে গেছে। সেই মর্মান্তিক দৃশ্য চোখে না দেখলে বর্ণনা ক'রে বোঝানো যায় না। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাউ-হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলো মেয়েটি। কিন্তু সমবেত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবাদি দর্শকদের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। একজন বৃদ্ধা মহিলা মেয়েটির হাত ধরল এবং চার-পাঁচ জন পুরোহিত মিলে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার মৃত স্বামীর চিতার উপর বসিয়ে দিলে। তার হাত পা সব বেঁধে দেওয়া হ'ল, পাছে সে উঠে দৌড়ে পালায়। তারপর চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হ'ল এবং জীবন্ত দ্বাদশী বালিকাটিকে পুড়িয়ে হত্যা করা হ'ল। এরকম কোন ঘটনার সামনে আমার পক্ষে আত্মসংবরণ করা যে কঠিন হ'তে পারে তা বুঝতেই পারছেন। মনে হ'ল, চীৎকার ক'রে প্রতিবাদ করি। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিলাম। কারণ, প্রতিবাদ ক'রে লাভ নেই। আগামেমনন্ (Agamemnon) নিজের কন্যা ইফিজিনিয়াকে (Iphigenia) যখন ডায়ানার কাছে উৎসর্গ করেছিলেন, তখন কবি লুক্রেসিয়াস এই ধর্মের নামে অধর্মাচরণ সম্বন্ধে দুঃখ ক'রে যা বলেছিলেন, সেই কথা আমার মনে পড়ল।

এখনও তো এই বর্বর কুসংস্কার সম্বন্ধে, এই নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে সব কথা বলা হয়নি। হিন্দুস্থানের সর্বত্র যে এই সতীদাহ প্রচলিত প্রথা, তা নয়। কোন কোন অঞ্চলে বিধবা স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় দাহ না ক'রে তাকে টুঁটি টিপে হত্যা করা হয়। দু'-তিন জন মিলে হঠাৎ হতভাগিনীর উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার টুঁটি চেপে ধরে এবং তাকে হত্যা করে। তারপর তার মৃতদেহ মাটি-চাপা দিয়ে পদদলিত করা হয়।

অধিকাংশ হিন্দুরা অবশ্য শবদাহ করে। কেউ কেউ দেখেছি, নদীর ধারে মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে কোন উঁচু জায়গা থেকে জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। গঙ্গানদীর ধারে এরকম মৃতের সৎকার আমি একাধিক দেখেছি। কাক চিল শকুন, কুমীর হাঙরের খাদ্য হয় মৃতদেহ।

কেউ কেউ রুগ্ন ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বে নদীর ধারে বহন ক'রে নিয়ে যায় এবং পা থেকে গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে রাখে। ঠিক মৃত্যুর মুহূর্তে তাকে জলে চুবিয়ে দেওয়া হয় এবং সেইভাবে জলের মধ্যে রেখে, খুব জোরে জোরে হাততালি দিয়ে, চীৎকার ক'রে উঠে, সকলে ফিরে চ'লে যায়। এইভাবে সৎকার করার উদ্দেশ্য কি, একথা আমি জিজ্ঞাসা করেছি। তার উত্তরে শবযাত্রীরা বলেছেন: মৃত্যুর সময় আত্মা যখন দেহ ছেড়ে চ'লে যায় ঠিক সেই মুহূর্তে যদি গঙ্গাজলে তাকে স্নান করানো হয় তাহ'লে কলুষিত আত্মার সমস্ত পাপ ধুয়েমুছে যায় এবং নিষ্কলঙ্ক আত্মার স্বর্গযাত্রা ত্বরান্বিত হয়। জানি না হয় কি না হয়। তবে এ বিশ্বাস শুধু যে অশিক্ষিত সাধারণ লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। রীতিমত শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও আমি এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তর্ক করতে দেখেছি।

সাধুসন্ন্যাসী ফকিরদের কথা

হিন্দুস্থানে সাধু-সন্ন্যাসী, ফকির, দরবেশ ইত্যাদির সংখ্যা ও বৈচিত্র্য এত বেশী যে তা বর্ণনা ক'রে শেষ করা সম্ভব নয়। অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আশ্রমে বাস করেন এবং সেখানে গুরুর আদেশ পালন ক'রে চলেন। আশ্রমে তাঁদের সহজ সরল জীবনযাত্রা, ব্রহ্মচর্য, গুরুভক্তি ইত্যাদি আদর্শ মেনে চলতে হয়। এতরকমের বিচিত্র জীবন এই সব ফকির ও সাধু-সন্ন্যাসী যাপন করেন যে, তার সঠিক বর্ণনা দেওয়া সত্যিই কঠিন। একশ্রেণীর সাধু আছেন তাঁদের "যোগী" বলে। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগের পন্থা যাঁরা জানেন, অথবা যোগশক্তি যাঁদের আছে, তাঁরাই হলেন যোগী। কত যোগী যে হিন্দুস্থানে আছেন তা বলা যায় না। নগ্নদেহে, ভস্ম মেখে তাঁরা ধ্যানস্থ হয়ে ব'সে থাকেন। কখন কোন গাছতলায়, কোন নদনদীর ধারে, আবার কখন বা কোন দেবালয়ের আশেপাশে তাঁদের যোগাসনে ব'সে থাকতে দেখা যায়। মাথায় আজানুলম্বিত কেশ, জট-পাকানো; মুখে দাড়ি। কেউ একটি, কেউ বা দু'টি হাত ঊর্ধ্বে তুলে ব'সে থাকেন। লম্বা লম্বা হাতের নখ—মেপে দেখেছি, প্রায় অর্ধেক আঙুলের সমান লম্বা। হাতগুলি শীর্ণ ও ক্ষুদ্র, অনাহারক্লিষ্ট রোগীর মতন। সাধুরা প্রায় অনাহারেই থাকেন ব'লে তাঁদের দেহ শীর্ণ দেখায়। পেশীগুলি যেন শক্ত হয়ে গেছে মনে হয়, শিরাগুলি যেন পাকিয়ে গেছে। সাধারণ লোক এই শীর্ণকায় সাধুদের দেবতার মতন ভক্তি করে এবং তাঁদের অলৌকিক

ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষ ব'লে মনে করে। দলে দলে তারা সাধুদের কাছে এসে ভিড় করে। যোগাসনে উপবিষ্ট দীর্ঘজটাজুট-শ্মশ্রুশোভিত, লম্বা নখবিশিষ্ট নগ্নদেহ এই যোগীদের দেখলে বাস্তবিকই ভয় করে।

দেশীয় রাজ্যের মধ্যে দেখেছি, নগ্ন সন্ন্যাসীরা দলবদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন (নাগা সন্ন্যাসীদের কথা বলছেন বার্নিয়ের)। ভয়াভয় দৃশ্য। কারও হাত ঊর্দ্ধে প্রসারিত; মাথার জটা বৃত্তাকারে চূড়া ক'রে বাঁধা; হাতে লাঠি, লোহার ডাণ্ডা ও ত্রিশূল; কারও পরণে, কারও কাঁধে বাঘের ছাল। ঠিক এই-ভাবে আমি তাদের দল বেঁধে সারা শহরময় ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। কোন ভয় নেই, সঙ্কোচ নেই। স্ত্রীপুরুষ দর্শক সকলে মিলে তাদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে, ভয়ে বিহ্বল হয়ে নয়, ভক্তিতে গদগদ হয়ে। মহিলারা তাদের দানধ্যান করেন মহাপুরুষ মনে ক'রে। মহাপুরুষ, সাধু-সন্ন্যাসীদের দানধ্যান করলে পুণ্য হয়, স্বর্গবাস হয়—এ বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে।

দিল্লী শহরের মধ্যে এরকম একজন উদ্ধত উলঙ্গ সাধুর আচরণে আমি রীতিমত বিরক্তি বোধ করতাম। সারা শহরের মধ্যে, পথে-ঘাটে সাধুটি উলঙ্গ হয়ে নির্বিকার চিত্তে ঘুরে বেড়াত, কচি খোকার মতন। কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, লজ্জা ভয় নেই। সম্রাট ঔরঙ্গজীবের অনুরোধ ও ধমক দুইই সে উপেক্ষা ক'রে চলত, গ্রাহ্য করত না। বহুবার তাকে কাপড় প'রে ভদ্রবেশে থাকার জন্য অনুরোধও সম্রাট করেছেন, শেষে শাস্তি দেবেন ব'লে ভয়ও দেখিয়েছেন। কিন্তু কিছুই সে গ্রাহ্য করেনি। অবশেষে সম্রাটের আদেশে দিল্লী শহর থেকে স্থানান্তরিত ক'রে, এই ঔদ্ধত্যের জন্য সাধুটির শিরশ্ছেদন করা হয়।

মধ্যে মধ্যে এই ফকির ও সাধু-সন্ন্যাসীরা দল বেঁধে দূরদেশে তীর্থযাত্রা করে। কেবল নগ্নদেহে নয়, বড় বড় লোহার শিকলাদি নিয়ে। হাতির পা-বাঁধা শিকলের মতন মোটা মোটা লোহার শিকল। অনেক সাধুকে দেখেছি, সাত-আট দিন ধ'রে সমানে রাতদিন সোজা হয়ে একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে, আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে। সাত-আট দিন ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য পা ফুলে যায়। কাউকে কাউকে দেখেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাতের উপর ভর দিয়ে, মাথা নীচু ক'রে, পা দু'খানা উপরে তুলে অবস্থান করতে। এরকম আরও নানারকমের দৈহিক কসরতের দৃশ্য দেখেছি, যা এত কষ্টকর যে সাধারণ লোকের পক্ষে অনুকরণ করা সম্ভব নয়। এসব করা হয় একটা অলৌকিক শক্তির নিদর্শনরূপে।

প্রথমে যখন হিন্দুস্থানে যাই আমি, তখন এই সব কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের নিদর্শন দেখে আমার মনে রীতিমত অবজ্ঞার ভাব এসেছিল। একথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই। তা ছাড়া আর কি ভাবা যেতে পারে এসব সম্বন্ধে, আমি জানতাম না। মধ্যে মধ্যে আমার মনে হ'ত এই সাধুরা একদল নৈরাজ্যবাদী ছাড়া আর কিছু নয়। কোন শিক্ষাদীক্ষা নেই, যুক্তি বা বুদ্ধিসম্মত বিচারের ক্ষমতা নেই তাদের। মধ্যে মধ্যে মনে হ'ত, হয়ত তারা সত্যিই সাধু-প্রকৃতির লোক, সরল বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এরকম আচরণ অভ্যাস করছে। কিন্তু সাধুতার বিশেষ কোন চিহ্ন তাদের মধ্যে খুঁজে পাইনি কোনদিন। অনেক সময় মনে হয়েছে হয়ত এরকম একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন অকর্মণ্য, ভ্রাম্যমাণ জীবনের প্রতি তাদের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে বলেই তারা সাধু হয়েছে। আবার একথাও মনে হয়েছে যে সাধু হিসেবে তাদের একটা অহমিকাবোধ আছে এবং সেই বোধ থেকেই তারা এইসব আচরণ ক'রে থাকে। সাধুদের সম্পর্কে এই রকম অনেক কথা আমার মনে হয়েছে।

সাধুরা যে এত কষ্ট সহ্য করেন এবং আত্মনিপীড়ন করেন তার কারণ তাঁরা মনে করেন, পরবর্তী জীবনে তাঁরা রাজা হবেন। অর্থাৎ এমন এক জীবন লাভ করবেন তাঁরা যার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি রাজকীয় জীবনের চেয়ে অনেক বেশী। পরবর্তী জীবনে ইহজীবনের রাজাদের চেয়েও তাঁরা বেশী সুখী হবেন—প্রধানতঃ এই ধরণের বিশ্বাস থেকেই তাঁরা আত্মনিগ্রহ অভ্যাস করেন। অনেক সময় আমি তাঁদের বলেছি, পরজীবনে কি হবে না-হবে তার জন্য ইহজীবনের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে এত দুঃখকষ্ট ভোগ করা, কি কারণে তাঁরা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন? আমি বুঝতে চেয়েছি, বোঝাতে চেয়েছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি, কারণ আমাকে বোঝানো খুব সহজ নয়। আমি বলেছি; অত সহজ যুক্তিতে আমি ঐ সব পরলোকের স্বর্গসুখ বা রাজকীয় সুখের কথা বুঝতে রাজী নই। নির্বুদ্ধি না হ'লে কেউ পরলোকের সুখের ভরসায় ইহলোকে স্বেচ্ছায় এরকম দুঃখকষ্ট ভোগ করে না। [ক্রমশঃ।

পৌরাণিক কাহিনী

বেলা দে

পুরাকালে একদিন দেবরাজ ইন্দ্র শিবলোকে গিয়ে মহা ভয়ঙ্কর এক পুরুষকে দেখতে পেলেন। দেবরাজ তাঁকে মহাদেবের কথা জিজ্ঞেস করলে, সেই পুরুষ কোনো উত্তর দিলেন না। উত্তর না পেয়ে ইন্দ্রের রাগ হলো, তিনি সেই পুরুষকে বজ্র ছুঁড়ে মারলেন। বজ্র তাঁর অনিষ্ট তো করতে পারলই না, অধিকন্তু সেই পুরুষের কপাল থেকে আগুন বার হয়ে তাঁকে দগ্ধ করতে উদ্যত হলো। তখন ইন্দ্রের চৈতন্ত হলো, তিনি বুঝতে পারলেন যে, সেই ভয়ঙ্কর পুরুষই স্বয়ং মহাদেব। অমনি তিনি মাটিতে লুটিয়ে তাঁর স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন। মহাদেব ইন্দ্রকে ক্ষমা করলেন। আর তাঁর কপালের সেই ভীষণ আগুন সমুদ্রের জলে ফেলে দিলেন। সেই আগুন থেকে তৎক্ষণাৎ এক বালক জন্মে কাঁদতে লাগল। সমুদ্র দয়া করে সেই বালককে রক্ষা করলেন। তারপর ব্রহ্মাকে অনুরোধ করলেন—"আপনি দয়া করে এই বালকের নামকরণ করুন।" ব্রহ্মা বালককে কোলে নেবা মাত্র সে তাঁর দাড়ি ধরে এমন টান দিল যে ব্রহ্মার চক্ষু দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তাতেই ব্রহ্মা বালকের নাম রাখলেন 'জলন্ধর'। ব্রহ্মা বালককে অনেক বর দিয়ে বললেন—"মহাদেব ভিন্ন অন্ত কেউ তোমাকে বধ করতে পারবেন না।" এর পর ব্রহ্মা বালককে অসুরদের রাজা করে দিলেন। ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ হয়ে জলন্ধর অসুররাজ্যে রাজত্ব করতে লাগল। কালনেমি অসুরের কন্তা বৃন্দার সঙ্গে তার বিয়ে হলো। ক্রমে জলন্ধর দেবতাদের তাড়িয়ে স্বর্গরাজ্য অধিকার করলে, ইন্দ্র মহাদেবের স্মরণ নিলেন। মহাদেব তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন—"তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি জলন্ধরকে বধ করে দিচ্ছি।" তখন মহাদেবের সঙ্গে জলন্ধরের ঘোরতর যুদ্ধ বেধে গেল। এদিকে জলন্ধরের পত্নী বৃন্দা একমনে বিষ্ণুপূজা করতে লাগল—যাতে যুদ্ধে স্বামীর জয় হয়। বিষ্ণু বৃন্দার পূজায় তুষ্ট হয়ে জলন্ধরকে রক্ষা করতে লাগলেন। মহাদেবের অনেক চেষ্টাতেও জলন্ধরের মৃত্যু হলো না। তখন নিরুপায় দেবতাগণ বিষ্ণুর পূজা করতে লাগলেন। বিষ্ণু তুষ্ট হয়ে দেবতাদের উপকারের জন্ত জলন্ধরের বেশে বৃন্দার সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন—বৃন্দার তপস্তা ভেঙে গেল। সুতরাং বিষ্ণু যুদ্ধকালে আর জলন্ধরের সহায় রইলেন না। এদিকে জলন্ধর মহাদেবের কাছে আস্ফালন করছে: "সব দেবতাকে পরাজিত করেছি এখন তোমাকেও হারাব, তবে ছাড়ব।" মহাদেব বুঝলেন যে, তিনি ভিন্ন ব্রহ্মার বরে জলন্ধর অন্ত সকলের অবধ্য। তখন তিনি হাসতে হাসতে বললেন—"ওহে অসুর! মিথ্যে কেন মরতে চাও, আমার সঙ্গে আর যুদ্ধ করো না।" মহাদেব তখন করলেন কি, পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে সমুদ্রের জলে ভীষণ সুদর্শন চক্র তৈরী করলেন। চক্র তৈরী করে পাছে তার তেজে সমস্ত জগৎ নষ্ট হয়ে যায়, এই ভেবে সেটাকে আর হাতে তুলে নিলেন না—সমুদ্রের জলেই রেখে দিয়ে জলন্ধরকে বললেন—"জলন্ধর! আমি যে চক্র প্রস্তুত করলাম সেটিকে তুমি যদি জল থেকে তুলতে পার, তবেই তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব, নতুবা নয়।" এ কথায় জলন্ধর রাগে অন্ধ হয়ে ভাবল, এই ভীষণ চক্র দিয়াই সে মহাদেবকে বধ করবে। অসুরের দেহে অসাধারণ বল ছিল, তবু চক্রটিকে জল থেকে তুলতে তার বেশ কষ্ট হল। যা হোক, দু'হাতে চক্র উঠিয়ে যেই সে কাঁধের উপর তুলেছে, অমনি সেই মহা ভয়ঙ্কর চক্রের ধারে তার দেহ দু'খণ্ড হয়ে গেল। বিষ্ণু ফাঁকি দিয়েছিলেন বলে মহাদেবের হাতে জলন্ধরের মৃত্যু হলো। তাই বৃন্দা বিষ্ণুকে শাপ দিতে উদ্যত হলো। বিষ্ণু তখন তাকে মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"তুমি তোমার স্বামীর চিতায় দেহত্যাগ করে স্বর্গে চলে যাও। তোমার ভস্ম থেকে যে বৃক্ষ জন্মাবে, আমার ভক্তেরা চিরকাল সেই বৃক্ষের পূজা করবে।" বৃন্দা বিষ্ণুর উপদেশ মত দেহত্যাগ করলে তার ভস্ম থেকে যে বৃক্ষ জন্মালো তার নামই হলো তুলসী।

শ্রীমতী পুষ্প বসু
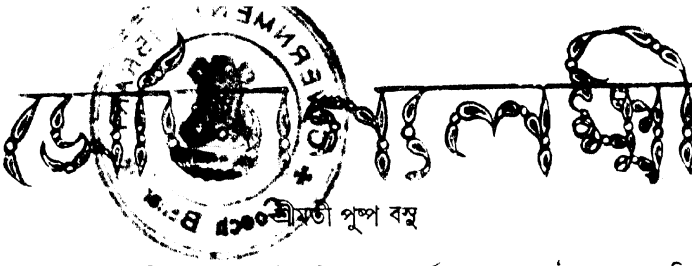
'লক্ষ্মীদেবীর বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, তিনি নানালঙ্কারে শোভিতা, তিনি চিন্তামণির বামভাগে রত্ন-সিংহাসনে বিরাজমানা, এই অনন্ত-রূপিণী মহাদেবী কি অনুষ্ঠান করলে মানবের গৃহে অবস্থান করেন তাই সংক্ষেপে বলি :—

লক্ষ্মী অর্থে শ্রী। মানুষ যত দিন বেঁচে থাকে, অর্থাৎ প্রাণ থাকে তত দিনই তার নামের আগে প্রাণের বিদ্যমানসূচক শ্রী শব্দ প্রয়োগ করা হয়। শ্রী প্রাণেরই নামান্তর। লক্ষ্মীপূজা অর্থে বিশেষ ভাবে প্রাণের পূজাই বুঝতে হবে। যদিও সকল পূজাই প্রাণের পূজা, তবে লক্ষ্মীপূজার বিশেষত্ব এই যে—যাঁরা পার্থিব ধন-ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির প্রবল আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁরা এই লক্ষ্মীমূর্ত্তির পূজা-অর্চনা করে আশানুরূপ ধন-বিত্তাদি লাভ করে থাকেন।

যিনি চৈতন্যময়ী মহতী শক্তি ধান্যরূপে আত্মপ্রকাশ ক'রে জীবের প্রাণরক্ষার হেতু হয়েছেন, তিনিই লক্ষ্মী। সে জন্য ধান্যাদি শস্যকে লক্ষ্মীর প্রতীকরূপে অবলম্বন ক'রে পূজার অনুষ্ঠান হয়। বৈদিক যুগে আর্য্যরা অন্নকে লক্ষ্মীস্বরূপা প্রাণরূপে বর্ণনা করেছেন। বেদে লক্ষ্মীকে হিরণ্যবর্ণা বলা হয়। লক্ষ্মীর ধ্যানেও তাঁকে গৌরবর্ণা ও সুরূপা বলে জানা গিয়েছে। যিনি সর্ব্বদেবময়ী লক্ষ্মীদেবী, ভূস্বরূপা, একমাত্র তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্যতমা। শাস্ত্রে আছে : লক্ষ্মীপূজা না করে অন্য যে কোন দেব-দেবীর পূজা করলে সে সমস্তই বিফল হয়। অল্প হোক, বেশী হোক, যার যেমন ক্ষমতা সে ভক্তিভরে এঁর পূজা করে বহু শুভ ফল লাভ ক'রে থাকে। কথিত আছে : লক্ষ্মীদেবী পূর্ব্বে ভৃগুকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে কোন কারণে দেহ বিসর্জ্জন করেন। তারপর দেবরাজের আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে পুনরায় দেবাসুরগণ কর্ত্তৃক সাগর-মন্থন কালে সমুদ্রগর্ভ হতে সমুৎপন্না হন। জগৎপতি দেবাদিদেব জনার্দ্দন যে সময় অবতাররূপ পরিগ্রহ করেন, লক্ষ্মীদেবীও সেই সময় দেহ ধারণ পূর্ব্বক জনার্দ্দনের সহধর্ম্মিণী হন। লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বদা আমলকী বৃক্ষে, গোময়ে, শঙ্খে, পদ্মে এবং শুভ্র বসনে বিরাজ করেন।

কথিত আছে, কৈলাস পর্ব্বতে একদিন মহাদেব ও পার্ব্বতী রত্নসিংহাসনে বসে নানা কথায় ব্যাপৃত। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ লতাগুল্ম ও নানাবিধ ফলফুলে সেই স্থানটি মনোরম হয়ে উঠেছে। সেখানে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি সকলে হরপার্ব্বতীর নিকটেই অবস্থান করছিলেন। এই সময় কথাপ্রসঙ্গে পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'হে দেব, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী, তুমিই সকলের আশ্রয় এবং তোমার অনুগ্রহে প্রাণীরা দুঃখসাগর থেকে মুক্তি পেয়ে থাকে। আমি আজ তোমার কাছে লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য শুনতে ইচ্ছা করি। আমি জানতে চাই মানুষ কি কাজ করলে মা কমলা তার গৃহে অচলা থাকেন?'

তখন মহাদেব বলতে লাগলেন : 'হে কল্যাণি, তুমি যে বিষয় আজ জানতে চাইলে এতদপেক্ষা সার কথা আর কিছুই নেই। লক্ষ্মীমাহাত্ম্য শুনলে বা শোনালে সর্ব্ব পাপ-তাপ ধ্বংস হয়ে যায়। লক্ষ্মীতত্ত্ব আমার প্রাণস্বরূপ। আমি সানন্দে লক্ষ্মীর রূপ ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করি, শোন :—

'যে গৃহের পরিজনবর্গ সর্ব্বদা সত্যপরায়ণ, নাস্তিকতা যাদের শরীরে আশ্রয় পায় না, এবং যে ঘরে বিষাদের লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না ও কলহ-বিবাদের কোন কারণ ঘটে না, সেই গৃহে কমলা নিরন্তর অবস্থান করেন। যারা দানপরায়ণ, যজ্ঞানুষ্ঠায়ী, তপস্যা ও ধ্যানে নিবিষ্টচেতা এবং যারা ভক্তিভরে জীব-সেবা ক'রে সর্ব্বপ্রাণীতে দয়া ও অনুরাগ প্রদর্শন করে, লক্ষ্মী দেবী কদাচ সে গৃহ পরিত্যাগ করেন না।

'যে গৃহিণী রূপে-গুণে ধর্ম্মশীলা, দেবী কমলা সেই গৃহে চির-বিরাজমানা। যারা সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র সর্ব্বদা পরিহার করে, তারাই লক্ষ্মীদেবীর প্রিয়পাত্রী। যারা ভক্তিভরে লক্ষ্মীদেবীর ধ্যান ও স্তোত্রপাঠ করে, শ্রদ্ধাভরে নিত্য প্রণতি জানায়, তাদের কোন দিন কোন দুঃখ-দারিদ্র্য স্পর্শ করে না। লক্ষ্মীর এই স্তোত্র যে নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা কিম্বা দিনান্তে একবার মাত্র পাঠ করে সে সর্ব্ব পাপ হতে মুক্ত হয়ে যায়।'

লক্ষ্মী-স্তোত্র : 'হে জননি, তুমি ত্রিলোকের জননী, তুমিই জগতের একমাত্র আধার। জয়দাত্রী, তুমিই জানকীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা, আমি অবনত মস্তকে তোমায় নমস্কার করি!

'হে মহাদেবি, তুমি সর্ব্বগুণের সাগরস্বরূপা, তুমিই প্রসন্না হয়ে অষ্টসিদ্ধি প্রদান ক'রে থাক, তোমায় প্রণাম! হে মাতঃ, একমাত্র জ্ঞানদায়িনী জননী গন্ধপুষ্পমাল্যে সদা শোভিতা তোমায় প্রণাম করি।

'দেবি কমলে, তুমি ঘনশ্যাম হরির প্রিয়তমা, একমাত্র দুঃখ-সঙ্কুল সংসার-সাগর থেকে আমাদের পরিত্রাণ করতে পার; তুমি ভিন্ন আমাদের গতি নাই, অতএব তোমায় প্রণাম করি।

'হে কল্যাণকারিণি দেবি! তুমিই একমাত্র ভক্তজনের ভাগীরথী-স্বরূপিণী, তুমিই দুষ্টের দমন এবং শরণাগতকে রক্ষা ক'রে থাক,—তোমায় বার বার নমস্কার!

'হে জননি, তুমি ত্রিভুবনের মঙ্গলবিধান কর, তোমার চরণ-যুগলই যাবতীয় তীর্থ; তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকাল-বিদিতা, তুমিই জীবের ত্রাণকর্ত্রী, দেবগণ বহু আরাধনায় তোমায় প্রাপ্ত হন। তুমি প্রসন্না হলে, সকল শোক-দুঃখ হতে জীব মুক্তি পায়, তুমি ধ্যানের অতীত, তুমি বসুমতী, মন্ত্র-স্বরূপিণী, বরপ্রদা, বাক্‌সিদ্ধিসম্পন্না, তোমায় প্রণাম করি!

'তুমি কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজধামে কাত্যায়নী, দ্বারকাপুরীতে মহামায়ারূপে অধিষ্ঠান করছ, তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও!'

মহাদেবের কথা শেষ হলে সকলে একযোগে লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা ও স্তুতি করেন।

আমাদের দেশে শাস্ত্রকাররা এই শরৎ ঋতুতে বহুবিধ পূজার বিধি-ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান ক'রে গেছেন। আশ্বিন মাসে পূর্ণিমা

তিথিতে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, ললিতা সপ্তমী ব্রত থেকে রাসযাত্রা পর্য্যন্ত অনেক পূজা এই সময় হয়ে থাকে। কার্ত্তিক মাসও শরৎ ঋতুর অন্তর্গত বলা হয়। এই শরৎ ঋতুর প্রথমে শুক্লপক্ষে দুর্গা ও লক্ষ্মীপূজা; তারপর কৃষ্ণপক্ষে কালীপূজা; পুনরায় শুক্লপক্ষে জগদ্ধাত্রীপূজা ও রাসযাত্রা প্রভৃতির বিধান আছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী থেকে এই রাসযাত্রা পর্য্যন্ত নানাবিধ পূজার অনুষ্ঠান এই শরৎ ঋতুতেই হয়ে থাকে।

এই সব প্রত্যেকটি পূজার যে বিশেষ উদ্দেশ্য আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। বিশেষ একটি মাস এবং তিথিতে এই সব পূজানুষ্ঠানের বিশেষ কারণ আছে। ঠিক এই সময়টিতে ক্ষিতিতত্ত্বের প্রকট ভাব বিশেষ ভাবে দেখা যায়, এবং সেই সঙ্গে আমাদের মনও জড়তার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে উঠে। অন্তর-বাহিরে যখন পূর্ণ জড়তা আসে:—তখন ঘন ঘন চৈতন্যসত্তার বিশেষ উদ্বোধের জন্য এই সব পূজার বিধি। এই সকল পূজা ও বিধি-নিয়ম পালন ক'রে মানুষ মঙ্গলের পথে ও সত্যের পথে অগ্রসর হয়।

শরৎকালে শারদীয়া পূজা হয়ে থাকে, এবং সেই জন্যই শরৎলক্ষ্মীকেও এই কোজাগরী পূর্ণিমায় আরাধনা করা হয়।

শরৎ সমাগমে বর্ষাস্ফীত নদ-নদী যেমন শান্ত ও ক্লেদবিহীন হয়ে প্রকৃতির বুকে শ্যামল মাধুর্য্য ভরা একটি আনন্দ বয়ে আনে, তেমনি কোজাগরী পূর্ণিমার অভূতপূর্ব্ব রূপে বিশ্বসংসার প্লাবিত হয়ে যায়—নীল নভোমণ্ডল জ্যোছনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির এই অপরূপ রূপরাশিতে ফুটে উঠে শরৎলক্ষ্মীর অঙ্গদ্যুতি—জগৎ-জননীর অভয় হাসির প্রতিবিম্ব। মা এই দিনে তাঁর সন্তানদের উদ্দেশে জাগৃহি পূজা উচ্চারণ করেন:

নিশীথে বরদা লক্ষ্মী
কো জাগর্ত্তীতি ভাষিণী।

নয়ন-মন নিয়ে রাত্রি জাগরণ ক'রে মার ধ্যান ও আরাধনা করলে—মা তাঁদের বর দান করেন।

এই শুভ দিনে শুভ মুহূর্ত্তে সকলে একত্রিত হয়ে শরৎপূর্ণিমার কৌমুদী-জ্যোতির মধ্যে জগৎ-জননীকে দর্শন ক'রে আমরা ধন্য হই—জাগ্রত হই।

পুরাকালে মিশরের নারী

'অরুন্ধতী'

মিশরের সভ্যতা পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম সভ্যতা। এই সভ্যতা যে কত প্রাচীন তাহা আজও সঠিকরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। মিশরে প্রথম সভ্যতার আলোক ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১০০০০ অব্দে। এই অতি প্রাচীন কাল হইতেই নারীর স্থান সমাজে অতি উচ্চ ছিল। নারী জাতি মায়ের সম্মান সর্ব্বদাই পাইতেন। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সর্ব্ববিষয়ে নারীর বিশিষ্ট স্থান ছিল। নারীকে প্রাচীন মিশরীয়রা যে কত সম্মান করিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহাদের বহু দেবীমূর্ত্তির পরিকল্পনায়—যাহা অদ্যাবধি বহু মন্দিরগাত্রে বা স্তূপে অঙ্কিত দেখা যায়।

ভদ্র-গৃহস্থের মেয়েরা অল্পবিস্তর সকলেই লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন—ইহা খৃষ্টের জন্মের পরের কথা। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল বহুবিধ এবং রাজকুল পরিবারের মেয়েদের এরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত, যাহাতে প্রয়োজনের সময়ে তাঁহারা সহজেই রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে পারিতেন।

স্বামী স্ত্রীকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান দিতেন। স্বামী স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করিলে সমাজ তাঁহাকে শাসন করিত। স্ত্রী তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ইচ্ছামত দান-বিক্রয় করিতে পারিতেন। সামাজিক ব্যাপারে স্ত্রীর স্বামীর ন্যায় পূর্ণ ও সমান অধিকার ছিল। আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও উভয়ের সমান অধিকার ছিল। স্ত্রী না হইলে কোন আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্ম্ম সম্পন্ন হইত না। প্রাচীন স্তূপ প্রভৃতিতে দেখা যায়, স্বামীর সহিত স্ত্রীর প্রতিকৃতিও অঙ্কিত আছে। এ ধারণাও ছিল যে, স্ত্রীর চিত্র সঙ্গে না থাকিলে স্বামীর আত্মার সদ্‌গতি হয় না। স্বামীর মতন স্ত্রীও, স্বামী দুশ্চরিত্র বা অত্যাচারী হইলে তাহাকে সহজেই বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী করিতে পারিতেন।

প্রাচীন মিশরে মা'তৃনামে সন্তানের পরিচয় হইত এবং কন্যারা সম্পত্তি ও অর্থের উত্তরাধিকারিণী হইত। অর্থাৎ মাতৃতন্ত্র সমাজে প্রচলিত ছিল। কন্যার বিবাহের ফলে সম্পত্তি যাহাতে হস্তান্তর না হয় সেই জন্য ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল কিংবা একই বংশের বালক-বালিকার মধ্যে বিবাহ দেওয়া রীতি ছিল। নারী সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইতেন, সেই জন্য বৃদ্ধ পিতা-মাতার ব্যয়ভার কন্যাকেই বহন করিতে হইত। খৃষ্ট-পূর্ব্ব চার হাজার বৎসর হইতে খৃষ্টের আবির্ভাবের পরও প্রায় পাঁচ শত বৎসর মাতৃতন্ত্র প্রথার প্রবর্ত্তন ছিল। তদনুসারে মাতা হইতে কন্যারা সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী হইতেন, কিন্তু এই নিয়ম সত্ত্বেও একটি মাত্র রমণীই মিশরের সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার নাম ছিল হাট্‌সেপো। তিনি অত্যন্ত তেজস্বিনী, সাহসী ও বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। তাঁহার মাতার মৃত্যুর পর বহু বাধা-বিঘ্ন আসিয়াছিল কিন্তু তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দূর করিয়া সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার রাজত্বের পরিধি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহার এক সতীন-পুত্র। হাট্‌সেপোই জগতের প্রথম রাজ্ঞী। তিনিই প্রথমে দেখাইয়া গেলেন যে নারীও রাজ্যশাসন করিতে সক্ষম। ইনি ধর্ম্মজ্ঞা ও মহীয়সী রাজ্ঞী বলিয়া ইতিহাসে বিখ্যাতা।

মিশরের রাজারা সাধারণতঃ ফারোয়া বলিয়া বিখ্যাত। ফারোয়া তাঁহার নিজ ভগিনীকেই বিবাহ করিতেন এবং তিনিই হইতেন প্রধানা মহিষী। এই মহিষীর পুত্রই রাজা হইতেন। রাজা অনেকগুলি বিবাহ করিতেন কিন্তু তাঁহাদের গর্ভজাত কোন সন্তান সিংহাসনের দাবী করিতে পারিত না। রাজার মৃত্যুর পর, পুত্র নাবালক থাকিলে, প্রধানা মহিষী তাহার অভিভাবিকা-স্বরূপে রাজকার্য্য চালাইতেন।

নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে কোনরূপ পর্দ্দাপ্রথা ছিল না। গৃহস্থ বা গরীব ঘরের মেয়েদের সংসারের সমস্ত কাজই করিতে হইত। আবার গরীব মেয়েদের প্রয়োজন হইলে ধানভানা, রুটি তৈয়ারী করা, কাপড় বোনা প্রভৃতি কার্য্য পুরুষের মতনই

করিতে হইত। বাজারে যাইয়া জিনিসপত্র কেনা-বেচা প্রভৃতিও করিতে হইত। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা ভোজসভায় বা কোন উৎসব-কার্য্যে অতিথি-অভ্যাগতদিগকে আদর-অভ্যর্থনা করিয়া সমাদর করিতেন; এমন কি, তাহাদের সহিত একত্রে খানা-পিনা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। উত্তর-মিশরের নারীরা অবরোধ মানিতেন না।

ধর্ম্ম-জগতেও নারীকে উচ্চাসন দেওয়া হইত। মিশরের ইতিহাসে এমন বহু নারীর নাম পাওয়া যায়, যাঁহারা মন্দিরের পুরোহিতের কার্য্য করিতেন এবং ঐ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য তাঁহারা যোগ্যতার সহিত ও যথারীতি করিতেন। আমাদের দেশের মত প্রত্যেক মন্দিরেই সেবাদাসী থাকিত, তাহারা তাহাদের অপরূপ নৃত্য-গীত দ্বারা দেবতার প্রীতি লাভ করিত। নৃত্যকলার প্রচলন সম্ভ্রান্ত ঘরেও ছিল।

তারাবলী

শ্রীমতী কমলা দেবী

আঁধার আকাশ উজল করিয়া
ফুটে আছে কত তারা!
জানি না কোন্‌টি 'বিশাখা', 'চিত্রা'
'রেবতী', 'রোহিণী' কারা।
লক্ষ যোজন দূরে থাকে তবু
ভোলেনি মাটির মায়া,
মানব-জনম-লগনে পড়ে যে
তাদের প্রভাব-ছায়া।
হেথাকার যত হাসিকান্নার
ঢেউগুলি সেথা জাগে কি?
জ্যোতি-পথ বেয়ে তাদের পরশ
আমাদের প্রাণে লাগে কি?
হয়তো বা হবে, আধো রাতে তাই
'স্বাতী'র চোখের জল
শুক্তির বুকে মুক্তারূপেতে
করে বুঝি টলমল!

রবীন্দ্রনাথের 'জন্মদিনে'

মঞ্জু মিত্র

কবিগুরুর শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে কিছু আলোচনা করতে গেলে, তাঁর শেষ বয়সের রচনা 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থখানিই বিশেষ ভাবে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। এ গ্রন্থখানি যেমন রবীন্দ্র-কাব্যজীবনের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছে, তেমনি রবীন্দ্র ভাবধারার তথা রবীন্দ্র দর্শনের একটি মূল তত্ত্বকে প্রকাশ করেছে—সেটিকে বলতে পারি 'রাবীন্দ্রিক জন্মবাদ'। সুতরাং জন্মদিনে কাব্যগ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে 'জন্মবাদ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রতত্ত্বটির ব্যাখ্যা অপরিহার্য্য বলেই মনে হয়।

'জন্ম' কথাটি কবির কাছে একটি বিশেষ অর্থ বহন করে। শারীরিক ভাবে জন্মলাভের কথাই চূড়ান্ত জন্মকথা নয়—মানবিকতার নবতর চেতনায় জন্মলাভের কথাই রবীন্দ্রকাব্যে প্রতিপাদ্য। স্থূল অহংগত জন্মচেতনা থেকে সূক্ষ্ম আনন্দচেতনায় উন্মেষিত হওয়াই রবীন্দ্র মতে নবতর জন্মলাভ। এই জন্ম নানা কারণে মানুষের জীবনে সমায়াত হচ্ছে, মহত্তর জীবনধ্যানের বিস্তৃত ভাবক্ষেত্রে সঞ্চরমান হচ্ছে। 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থে এই ভাবটি খণ্ড খণ্ড কবিতাবলীতে অভিব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং একথা না বললেই নয় যে, জন্মকথাটি রবীন্দ্রনাথের কাছে সাধারণ প্রকৃতিগত জন্মই নয়, পরন্তু ইহজীবনের সম্ভাবনার বিরাটত্বে, চেতনার অভিনবত্বে, এবং দুরন্ত মহিমার বিস্তৃত ক্ষেত্রে নিত্য সচেতনতার আনন্দই এই জন্মের অপর নাম। জীবনের শেষ সীমায় এসে 'জন্মদিনে' গ্রন্থের মধ্যেই কবির এই তত্ত্বের জন্ম নয়, পরন্তু কাব্যজীবন এবং ব্যক্তিজীবনের প্রথম দিন থেকেই এই তত্ত্ব কবির কাছে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মত সহজ হয়ে আছে। সেই জন্যই 'জন্মদিনে' গ্রন্থের আলোচনা করতে গেলে এই জন্মবাদের রাবীন্দ্রিক তত্ত্ব আগেই জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন মানুষের জন্ম একবার মাত্র হয় না; মানুষ স্বভাবতঃ দ্বিজ, পশুর সঙ্গে মানুষের স্থূল এবং মূল পার্থক্য এইখানেই। 'মানুষের ধর্ম', 'সাধনা' প্রভৃতি গ্রন্থে এই কথা নিয়ে বহু আলোচনা কবি করেছেন। যৌবনে আমেরিকায় 'Second birth' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার মধ্যেও এই কথাই প্রকাশ করেছেন যে, biological birthটাই মানুষের প্রকৃত জন্ম নয়, কেন না মানুষ একান্ত ভাবে শারীরিক নয়, চেতনার মধ্য দিয়ে তার আবার অন্যতর জন্ম হয়, তাই মানুষ দ্বিজ। কিন্তু এই দ্বিজত্ব মানুষের স্বভাবতঃই ঘটে, তারপর চেতনার সূক্ষ্মতর বিক্ষেপে, অনুভূতির বিচিত্র অভিনবত্বে জন্ম হচ্ছে তার প্রতি মুহূর্ত্তে; কারণ, মানুষের মনে যে অনন্ত জিজ্ঞাসা। তাই সে যা পেয়েছে তাই নিয়ে সুখী থাকতে পারে না। বিরাটত্বের মহান্ একটা সম্ভাবনার আশায় বুক বেঁধে এগিয়ে চলে অধরাকে ধরবার জন্য; অসম্ভবকে সম্ভব করবার জন্য। কবি 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে বলেছেন "পশু পেয়েছে ঘর, কিন্তু মানুষ পেয়েছে পথ", এই চলার গতির মধ্যে চেতনার প্রাঙ্গণে নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে তার নিত্য নবজন্ম ঘটছে, তাই যিনি শিবমানব তিনি চিরনবীন। কবি বলেছেন, প্রত্যেকটি গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে তিনি নূতন করে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ চেতনার নব নব উন্মেষ এবং অনুভূতির বিকাশের মধ্যে তিনি একই জীবনে জন্ম থেকে জন্মান্তরের পথে এগিয়ে গেছেন। নিতান্ত Phenomenal যে জন্ম তা হ'ল অসম্পূর্ণ; Spiritual re-birthএর মধ্য দিয়ে তা ক্রমশঃ পরিপূর্ণ অখণ্ডের পথে চলে। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস তিনি বাস্তব জীবনেও প্রতিফলিত করেছিলেন—৮৪ বৎসরের দীর্ঘ জীবনের মধ্যে কবি চেতনার দিক থেকে বা অনুভূতির দিক থেকে কোন দিন নিঃশেষিত হয়ে যাননি, স্তব্ধ হয়ে যায়নি তাঁর গতি; চেতনার নব নব আস্বাদন ছিল বলেই শেষ দিন পর্য্যন্ত নব নব সৃষ্টি তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছিল। 'জন্মদিনে' গ্রন্থ কবির সেই জন্মবাদের বৃহত্তর তত্ত্বের প্রকাশ এবং প্রমাণ। এ ছাড়াও 'রোগশয্যায়' 'আরোগ্যে'র পর 'জন্মদিনে' গ্রন্থ কবির কাব্যে

ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। 'রোগশয্যায়' দুঃখ-যন্ত্রণার অভিজ্ঞতায় সেবার মধ্য দিয়ে কবি চেতনার প্রাঙ্গণে এক জন্ম লাভ করেছিলেন—তার পর 'আরোগ্যে' রোগমুক্ত হয়ে যে দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখলেন তা সম্পূর্ণ এক অভিনব! সভ্যরোগমুক্ত কবি-মনের উল্লাসবোধ এবং বিস্ময় কবিচেতনাকে স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছতর করে নবজন্মের পথে আর এক স্তর এগিয়ে দিয়েছে; কিন্তু অশীতিপর বৃদ্ধের এই জন্মগুলির মধ্যেই পূর্ণতা আসেনি—এক একটি জন্মদিনের বিশেষ উৎসবের দিনে কবি যখন জলে স্থলে প্রকৃতির অভিনন্দন লাভ করেন, কবির আদর্শে মহাপুরুষের বিরাটত্ব যেন রূপের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে, সেই দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে আসে, সেই দূরত্বের আহ্বান তিনি শুনতে পান এবং অনুভব করেন—

"বহু জন্মদিনে গাঁথা আমার জীবন
দেখিলাম আপনারে বিচিত্র রূপের সমাবেশে।"

কিন্তু তথাপি এই কবির সম্পূর্ণ প্রকাশ নয়, অপ্রকাশই এর মধ্যে অধিক, যা তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে নিত্য নবজন্মের অগ্রগতির পথে—

"এখনো হয়নি খোলা আমার জীবন আবরণ—
সম্পূর্ণ যে আমি
রয়েছে গোপনে অগোচর।"

'জন্মদিনে কাব্যগ্রন্থে জন্মবাদের মূল কথাটা এই প্রথম দুটি কবিতার মধ্যে ভূমিকা করে নিলেন কবি। সাধনা গ্রন্থে মানবের এই দূরত্বের পূর্ণতর আদর্শ সম্বন্ধে কবি বলেছেন—Man must realise the wholeness of his existance, his place in the infinite; he must know that hard as he may strive, he can never creat his honey within that cells of his live; for the perennial supply of his life-food is outside his walls."

জন্মদিনের বিশেষ ক্ষণকে উপলক্ষ্য করে কবিচেতনা অসীমের এই আদর্শ মানবজীবনের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করেছে, সুতরাং আজকে অসম্পূর্ণ কবিটি উচ্চাকাঙ্ক্ষার পূর্ণতার মধ্যে নূতন করে জন্মগ্রহণ করলেন বৈ কি! এই নবজন্মের অনুভূতি কবিমনে জেগেছে বলেই নিখিলের কাছ থেকে নবীনের অভিনন্দন অনুভব করেছেন এবং অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। কবির দৃষ্টি বস্তুভেদ করে প্রসারিত হয়েছে বস্তুর অতীতে।

"সেদিন আমার জন্মদিন
প্রভাতের প্রণাম লইয়া
উদয়দিগন্ত পানে মেলিলাম আঁখি,

দেখিলাম সন্তস্নাত উষা
আঁকি দিল আলোর চন্দনলেখা
হিমাদ্রির হিমশুভ্র পেলব ললাটে।"

প্রভাত-আলোয় সন্তস্নাত উষা, হিমাদ্রির সুউচ্চতা এবং সুদূর-প্রসারী বিস্তৃতি—এ সবের মধ্যেই যেন এক শুভ্র নবীনের অভিনন্দন কবি অনুভব করলেন এবং হিমাদ্রির হিমশুভ্র পেলব ললাটের উপর যে সূর্য্যালোকের স্বচ্ছ বিকিরণ,—তার মধ্য দিয়ে কবি প্রত্যক্ষ করলেন—বিশ্বের মর্মস্থলের অদৃশ্য অসীমের ধ্রুব উপস্থিতি—

"যে মহাদূরত্ব আছে নিখিল বিশ্বের মর্মস্থানে
তারি আজ দেখিনু প্রতিমা
গিরীন্দ্রের সিংহাসন 'পরে।"

পরিপূর্ণ মানবের যে অখণ্ড আদর্শ, যা কবিকে চঞ্চল করেছে, করেছে সুদূরের পিয়াসী, সেই দূরত্বের অনুভব তাঁর অন্তরে নিবিড় হয়ে এল জন্মদিনের শুভক্ষণকে উপলক্ষ্য করে। কিন্তু সে 'মহাদূরত্বের আদর্শ' রূপটি কি রকম? পূর্ণ প্রকাশের পূর্ব পর্য্যন্ত জ্যোতির্বাষ্পের আচ্ছাদনে নীহারিকা যেমন রহস্যাবৃত তেমনি কবির এই অপ্রকাশিত আদর্শটি—

"আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে—
অলক্ষ্য পথের যাত্রী অজানা তাহার পরিণাম।"

মৃত্যুপথযাত্রী কবি নবজীবনের মধ্য দিয়ে পূর্ণতার সেই অখণ্ড আদর্শ জীবনের আশা করেছেন। সুতরাং 'জন্মদিনে' গ্রন্থে মৃত্যুর পরে নবজন্মের ব্যঞ্জনাও আছে।

এই জীবনে যতটুকু প্রকাশিত হয়েছে, তা যে অসম্পূর্ণ, পূর্ণতার অপেক্ষা করেছে এ কথা কবি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন—এইটিই রবীন্দ্র কবিমানুষের বিপুল আশাবাদ—

"শুধু করি অনুভব
চারি দিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবস রাত্রিরে।"

'সোনার তরী'তেও কবি পূর্ণতর জীবনের এই 'বিরাট আশা' নিয়ে সমুদ্রতীরে বসে আছেন। সেখানেও অব্যক্তের বিরাট প্লাবন কবি-অনুভূতিকে বেষ্টন করেছে—

"তর্ক তারে পরিহাসে
মর্ম তারে সত্য বলি জানে।"

জন্মবাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মতবাদই বিচিত্র অনুভূতির মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে।

জন্মদিনের উপহারের মধ্য দিয়ে পার্থিব রূপজগতের সুন্দরের অভিষেক কবির অস্তিত্বকে মহিমা দান করেছে। 'জন্মবাসরে'র আমন্ত্রণে পাহাড়িয়া ছেলেরা এসে কবিকে পুষ্পমঞ্জরী দিল 'নমস্কার সহ'। নমস্কার কথাটি কবির কাছে কেবলমাত্র নতিস্বীকারই নয়, পরন্তু তার মধ্যে এই অস্তিত্বের মহিমা দানই বড় হয়ে ওঠে।

গ্রহীতা তখন দানের পরিমাণকে ছাড়িয়ে, তার মধ্যে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ বহুতর রূপ আবিষ্কার করতে থাকে। তাই কবি এই ফুলগুলির মধ্যে থেকে ফুলের সৌন্দর্য্যকে অতিক্রম করেও লাভ করলেন মানুষের প্রতি সুন্দরের চিরন্তন নমস্কার, তখন তাঁর মধ্যে মানবজন্মের শ্রেষ্ঠতা তাঁকে দুর্লভ এবং আশ্চর্য্য সম্মানে ভূষিত করল—

"ধরণী লভিয়াছিল কোন ক্ষণে
প্রস্তর-আসনে বসি
বহু যুগ বহ্নিতপ্ত তপস্যার পরে এই বর—
মানুষের জন্মদিনে উৎসর্গ করিবে আশা করি।"

নিখিল বিশ্বের অভিনন্দন কবির প্রাণশক্তির মহিমাকে বিস্তৃত করে দিয়েছে, তাই সৌন্দর্য্য-চেতনার অভিনবত্বের মধ্যে কবির নবজন্ম ঘটেছে।

"সেই বর, মানুষের সুন্দরের সেই নমস্কার
আজি এলো মোর হাতে
আমার জন্মের এই সার্থক স্মরণ।"

এ সুন্দর আর বস্তুসুন্দরে আবদ্ধ নেই, এ সুন্দর যে Abstract Beauty যা চেতনাকে মহিমান্বিত করেছে।

এই ভাবে 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থে,—সৌন্দর্য্যে, আনন্দে, প্রেমে আদর্শে, বিচিত্র অনুভূতির মধ্য দিয়ে জন্মবাসরের মিলনক্ষেত্রে কবি অনুভূতি চেতনার প্রাঙ্গণে নব নব জন্মলাভ করেছে।

নর্ত্তকী

(বুখান)

(Sir Edwin Arnold এর অনুবাদ হইতে)

শ্রীমতী প্রতিমা রায়

আমি শুনেছিনু সঙ্গীতে দ্রুত মূর্ছনাহত সুর
নামিল নৃত্যে নর্ত্তকী যেন চন্দ্রিমা সুমধুর।
দেখিনু কেমনে ফুল্ল-অধরা, অপ্সরা রূপ লাগি
রহিল ঘিরিয়া বিমুগ্ধ শত উৎসুক অনুরাগী।

সহসা দীপ্ত প্রদীপশিখায় খসিল বসনখানি
চিরাগ-বহ্নি প্রসারি শিথিল অঞ্চলে নিল টানি।
লঘু সে চিত্ত থামিল ত্রস্তে, ধ্বনিল কণ্ঠে, "হায়"!
স্তাবক-ভক্ত হতে একজন তখুনি তারে শুধায়,—

"কেন চঞ্চল, প্রেমশতদল? অগ্নি করেছে ছাই
একটি মাত্র পর্ণ তোমার, তাহে ত দুঃখ নাই।
আমি যে হয়েছি দগ্ধ, ভস্ম ফুল, পাতা, তরুমূলে
তোমার নয়ন দীপশিখানলে সে কথা কি গেছ ভুলে?"

"আহা সে শুধু স্বার্থপন্থী" বলে নটী ম্লান হাসি
এমন কভু কহিতে না তুমি যদি থাক ভালবাসি।
কপট যে সেই প্রিয়ার বেদনা আপনার নাহি কয়
মরমী প্রেমিক জানে এ তথ্য, কহিনু সুনিশ্চয়"।

কি লেখা পড়বো ?

[৮ পৃষ্ঠার পর]

সাহিত্যিক হিন্দিভাষীদের মধ্যেও খুব আছে বলে জানি না। সুতরাং সে ভাষাতেও শুধু অনুবাদ পড়তে হবে যদি যথেষ্ট পাওয়া যায়, এবং অনেকগুলি আবার আমাদেরই লেখার অনুবাদ।

আপাততঃ বাংলা ভাষায় যে সব আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই আছে তা পড়া শেষ হলে এখন আমরা সোজা ইংরেজীর আশ্রয়ে যেতে পারছি। সে পথ বন্ধ হলে সম্মুখে অন্ধকার। এই অবস্থা কি আমাদের মেনে নিতেই হবে? মানা অসম্ভব বলে বোধ হয়। পক্ষান্তরে, ইংরেজীর উপর আরও বেশি জোর দিতে হবে। কারণ এই ভাষার সাহায্যেই আমরা বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। আমাদের যা কিছু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা তা সবই ইংরেজী শিক্ষার ফলে। এরই ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যা কিছু উন্নতি। এই উন্নতি অল্প দিনের, তাই হয়তো বাঙালী প্রতিভা উপন্যাসের বা নাটকের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ মহৎ সৃষ্টিতে আজও সফল হতে পারেনি, আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সেই জন্যই বাঙালী মনীষা আজও লেখনীবিমুখ। তবু বাঙালী প্রতিভার কাছে ভবিষ্যতে আশা করবার অনেক কিছু আছে।

প্রতিক্রিয়া যদি অতি প্রবল না হয়, পাশ্চাত্য আদর্শে গড়া ভারতীয় ডেমোক্রেসির দেশ-গঠন আদর্শকে যদি প্রাচ্য ভক্তিরসের আতিশয্যে 'সাবোটাজ' না করি, যদি মহৎকে ঘরে ব'সে, বা পথে পথে, ঢাক পিটিয়ে পূজো করার পরিবর্তে কাজের মধ্য দিয়ে নীরবে অনুসরণ করার প্রবৃত্তি আবার ফিরে পাই, ইংরেজ-চরিত্রের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাকে আদর্শরূপে সম্মুখে ধ'রে রাখতে পারি, তবেই ভবিষ্যতে বাঙালী পাঠক হিসাবে "কি বই পড়ব" প্রশ্নের উত্তরে বাংলা বইয়েরই নাম করতে পারব, নইলে নয়। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরের বাঙালী পাঠক এ প্রশ্নের উত্তর আর একবার দেবার চেষ্টা করবেন, ভবিষ্যৎ যুগ আনন্দের সঙ্গে সেই দিনের অপেক্ষা করবে।

নিখরচায় ভূপর্য্যটন

[৪ পৃষ্ঠার পর]

লরীর উপরই ঘুমোতাম এবং মরু অঞ্চলে রাত্রির শীত যে কি ভীষণ তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতাম। এই ভাবে ১২০ ঘণ্টা ধ'রে পথ অতিক্রমের পর মরুভূমি শেষ হল এবং আমরা জহিদানে পৌঁছলাম। এখানে এসে আমি ক্লান্তিতে একেবারে ভেঙ্গে পড়লাম, তবে ইউরোপ থেকে আসার পথে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম পথ অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছি মনে করে উল্লসিত হলাম। জহিদানে আর একটা আনন্দের ব্যাপার ঘটলো। সেখানকার সামরিক গভর্ণর কর্তৃক প্রদত্ত এক ভোজে আমি সম্মানিত অতিথির আসন লাভ করলাম।

পাটনা থেকে কলকাতা আসার পথে বিলাস সিং নামে এক কনট্রাক্টর আমার সঙ্গী হলেন। কলকাতায় এসে শুনলাম, আমার কথা সকলে আগেই শুনেছেন। এখানে আমি গ্রাণ্ড হোটেলের মিঃ উবেরয়ের অতিথি হবার সৌভাগ্য লাভ করলাম।

অনুবাদক—হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য

[উপন্যাস]

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

সতের

কালো অন্ধকার রাত।

সমুদ্রের কিনারা দিয়ে হেঁটে চলেছি দু'জনে নিরালার দিকে।

ডাইনে অন্ধকারে গর্জমান সমুদ্র যেন কি এক মর্মভাঙা যাতনায় আছাড়ি-পিছাড়ি করছে।

নিরালার সামনে এসে যখন পৌঁছালাম, হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত প্রায় সোয়া এগারটা।—

কিরীটি কিন্তু নিরালার সম্মুখ দিক দিয়ে না প্রবেশ করে পশ্চাতের দিকে এগিয়ে চলল। প্রায় দেড়-মানুষ সমান উঁচু প্রাচীর দড়ির মইয়ের সাহায্যে প্রথমে কিরীটি ও পশ্চাতে আমি টপ্‌কে নিরালার পশ্চাতে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

জমাট অন্ধকারে বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকাটা একটা স্তূপের মত মনে হয়।

নিরালার মধ্যে প্রবেশ করতে চলেছে কিরীটি। কিন্তু কেন, সেটাই ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। কি তার মতলব?

বাগানের চারি দিকে অযত্ন-বর্ধিত জংগল। অন্য কিছুর ভয় না থাক, সাপের ভয়ও ত আছে!

প্রথম দিনের সেই সীতার সতর্ক-বাণী মনে পড়ে। নিরালায় ভয়ানক সাপের উপদ্রব।

শুধু কি তাই? সীতার কুকুর টাইগার? কে জানে সেই ব্যাঘ্রসদৃশ আলসেসীয়ান কুকুরটা ছাড়া আছে কিনা! সীতার মুখখানা যেন কিছুতেই ভুলতে পারি না। কেবলই ঘুরে-ফিরে মনে পড়ে সেই মুখখানা। সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে অন্ধকারে চলেছি কিরীটির পিছু পিছু।

কি কুক্ষণেই যে সমুদ্রের ধারে হাওয়া বদলাতে এসেছিলাম ওর প্ররোচনায় পড়ে!

পৈতৃক প্রাণটা শেষ পর্যন্ত বেঘোরে না হারাতে হয়!

কোন প্রশ্ন যে করবো ওকে তারও কি জো আছে? এখনি হয়ত খিঁচিয়ে উঠবে। নচেৎ বোবা হয়ে থাকবে। হঠাৎ একটা খস্‌-খস্‌ শব্দ কানে এলো।

চকিতে কিরীটি আমাকে ঈষৎ আকর্ষণ করে একটা ঝোপের মধ্যে টেনে বসে পড়ল। আবছা আলো-অন্ধকারে শ্যেন দৃষ্টি মেলে সামনের দিকে তাকিয়ে আছি। কিছুক্ষণ পূর্বে আকাশে এক ফালি চাঁদ জেগেছে। ক্ষীণ অস্পষ্ট সেই চাঁদের আলো আশে-পাশের গাছপালার উপরে প্রতিফলিত হয়ে অদ্ভুত একটা আলো-ছায়ার সৃষ্টি করেছে।

খুব স্পষ্ট না হ'লেও দেখতে কষ্ট হয় না। ঢ্যাংগা মত একটা ছায়া অন্ধকারে নিরালার পশ্চাতের বারান্দায় দেখা গেল। বারান্দা দিয়ে লোকটা পা টিপে টিপে এই দিকেই এগিয়ে আসছে। আরো একটু কাছে এলে দেখলাম, লোকটার দুই হাতে ধরা প্রকাণ্ড একটা কি বস্তু!

কিরীটির দিকে তাকালাম। তার শ্বাস-প্রশ্বাসও যেন পড়ছে না। স্থির অপলক দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে!

কে লোকটা! হাতে ওর ধরাই বা কি?

আরো একটু এগিয়ে আসতেই এবারে বুঝতে আর কষ্ট হলো না লোকটার হাতে ধরা বস্তুটি কি! প্রকাণ্ড একটা ফ্রেমে-বাঁধান ছবি। এবং ছবির সোনালী ফ্রেমে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে চিক্ চিক্ করছে। এবং লোকটাকেও এবারে চিনতে কষ্ট হলো না। এ বাড়ির সেই বোবা-কালা ভুখণা! কিন্তু কোথায় যাচ্ছে ভুখণা ছবিটা নিয়ে?

চাপা স্বরে অতি আস্তে কিরীটিকে সম্বোধন করে বললাম: ভুখণা!

'হাঁ! চুপ!—'

ভুখণা ছবিটা নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল বাগানের মধ্যেই। বাগানের দক্ষিণ কোণে একটা প্রশস্ত ঝাউ গাছ, তার নীচে এসে দাঁড়াল ভুখণা এবং ছবিটা মাটিতে নামিয়ে রাখল।

চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় পরিষ্কার না হলেও আমরা সবই দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ দেখলাম, পাশের ঝোপ থেকে আর একটি ছায়া-মূর্তি বের হয়ে এলো। ছায়ামূর্তির সর্বাঙ্গ একটা কালো কাপড়ে ঢাকা। মুখে বাঁধা একটা কালো রুমাল। সর্বাঙ্গ কালো কাপড়ে আবৃত ছায়ামূর্তি ভুখণাকে চাপা স্বরে কি যেন বললে।

ওদের ব্যবধান আমাদের থেকে প্রায় হাত আষ্টেক হওয়ায় বুঝতে পারলাম না কি কথা বললে।

কিন্তু ও কি! ভুখণা ও ছায়ামূর্তির ঠিক পশ্চাতে গুটি গুটি পা ফেলে তৃতীয় আর একজন এগিয়ে আসছে যে! এসব কি ব্যাপার!

অতি সতর্কতার সঙ্গে পিছন থেকে তৃতীয় আগন্তুক এগিয়ে আসলেও কালো কাপড়ে আবৃত ছায়ামূর্তির অতি সতর্ক শ্রবণেন্দ্রিয়কে ফাঁকি দিতে পারেনি। মুহূর্তে চোখের পলকে কালো কাপড়ে আবৃত ছায়ামূর্তি ঘুরে দাঁড়ায় ও আধো-আলো আধো-অন্ধকারে একটা অগ্নিঝলক ঝলসে উঠে ও সেই সঙ্গে শোনা যায় পিস্তলের আওয়াজ দুড়ুম!—সেই সঙ্গে শোনা গেল একটা অস্ফুট আর্ত চিৎকার!

সমস্ত ব্যাপারটা এত দ্রুত এত আকস্মিক ভাবে ঘটে গেল যে, প্রথমটায় আমরা হতচকিত ও বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম কয়েক মুহূর্তের জন্য।

কেমন করে যে কি ঘটে গেল যেন বুঝতেই পারলাম না।

খেয়াল হতেই দেখি, কিরীটি লাফিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। আমিও ক্ষিপ্র গতিতে তার পশ্চাৎধাবন করলাম।

কিন্তু অকুস্থানে পৌঁছে দেখি, ভুখনা বা সেই কালো কাঁপড়ে আবৃত ছায়ামূর্তির সেখানে চিহ্ন মাত্রও নেই। কেবল কে এক জন সুট-পরিহিত ডান হাত দিয়ে বাম হাতটা চেপে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে যন্ত্রণা-কাতর শব্দ করছে।

উপবিষ্ট লোকটির 'পরে কিরীটির হস্তধৃত টর্চের তীব্র একটা আলোর রশ্মি গিয়ে পড়ল ও সঙ্গে সঙ্গে কিরীটি প্রশ্ন করে: কে!—এ কি! কুমারেশ সরকার!

কুমারেশ সরকার।

আমিও বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালাম।

'কে আপনি?—'যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট কণ্ঠে কুমারেশ সরকার প্রশ্ন করেন কিরীটিকে।

'আমি কিরীটি!—কোথায় গুলী লাগল? দেখি!—' কিরীটি এগিয়ে গেল।

'গুলী করবার আগেই চট্ করে হেলে পড়েছিলাম ডান দিকে। গুলীটা বাঁ হাতের পাতায় লেগেছে। একটুর জন্য শয়তানটাকে ধরতে পারলাম না—উঃ!—'

'দেখি হাতটা—' কিরীটি এগিয়ে গিয়ে কুমারেশ সরকারের গুলীবিদ্ধ আহত রক্তাক্ত বাম হাতটা টর্চের আলোয় পরীক্ষা করতে লাগল। পরীক্ষা করে বললে: না। গুলী pierce করে বেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু woundটার ত এখনি একটা ব্যবস্থা করা দরকার! বুলেট উণ্ড। Neglect করা যায় না। আমার রুমালটা অপরিষ্কার। সুব্রত, তোর কাছে পরিষ্কার রুমাল আছে? কুমারেশ বললেন: দেখুন আমার সার্টের ভিতরের পকেটে কাচা রুমাল আছে বের করুন! কুমারেশের বুক-পকেট হ'তে পরিষ্কার রুমালটা বের করে কিরীটি কুমারেশের আহত হাতটা বেঁধে দিল।

'কিন্তু লোকগুলো যে পালিয়ে গেল!—' কুমারেশ বলেন।

'পালাবে আর কোথায়? নিজের জালে এবারে নিজেই আটকা পড়েছে। অন্ধের সঞ্চিত গুপ্তধনের প্রতি লোভ একবার জন্মালে সে লোভ সংবরণ করা বড় দুঃসাধ্য মিঃ সরকার! তাড়াতাড়িতে প্রাণ ভয়ে সেই বস্তুটিকেই তাদের এখানে ফেলে পালাতে হয়েছে যখন, এ জায়গা ছেড়ে তারা বর্তমানে খুব বেশী দূরে যাবে না! না জেনে আগুনে হাত দিলে হাত পোড়েই। সেটাই আগুনের ধর্ম! সেই পোড়া হাত খুঁজে বের করতে আমাদের আর খুব বেশী বেগ পেতে হবে না। কিন্তু কালো কাপড়ে আবৃত মূর্তিটিকে অন্তত আপনার ত চেনা উচিত ছিল মিঃ সরকার! চিনতেই পারলেন না?—'

'না! ভুখনাকে চিনেছিলাম কিন্তু—'

'যাক্। চলুন, আপনার হাতের ক্ষতস্থানটির সর্বাগ্রে একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।—চলুন দেখি উপরের তলায় শতদল বাবুর ঘরে যদি কোন ঔষধপত্র থাকে!—' বলতে বলতে কিরীটি আমার দিকে তাকিয়ে তার বক্তব্য শেষ করল: সুব্রত! ছবিটা একা নিয়ে যেতে পারবি না?

'কেন পারবো না। চল—'

আগে আগে কিরীটি ও কুমারেশ সরকার ও পশ্চাতে আমি ছবিটা তুলে নিয়ে অগ্রসর হলাম। বারান্দা দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ নজরে পড়লো হিরণ্ময়ী দেবীর ঘরের ভেজান দ্বার-পথের ঈষৎ ফাঁক দিয়ে মৃদু একটা আলোর ইসারা।

'আশ্চর্য! হিরণ্ময়ী দেবীর ঘরে এখনো আলো জ্বলছে!—' বলতে বলতে সর্বাগ্রে কিরীটি ও পশ্চাতে আমরা দু'জনে এগিয়ে গেলাম।

ভেজান দরজার ঈষৎ ফাঁক দিয়ে বারেকের জন্য কিরীটি দৃষ্টিপাত করেই দরজাটা খুলে ফেলল। খোলা দ্বার-পথে কক্ষের অভ্যন্তর আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। এবং থমকে দাঁড়ালাম। নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার মতই ইনভ্যালিড চেয়ারটার উপরে স্থির অচঞ্চল বসে আছেন হিরণ্ময়ী দেবী।

দৃষ্টি তাঁর মাটিতে নিবদ্ধ।

আর সামনেই পায়ের নীচে একরাশ পোড়া কাগজ।

সর্বপ্রথমে কিরীটি ও পশ্চাতে আমি ও কুমারেশ সরকার ছবিটা ঘরের বাইরে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

ঘরের বাতাসে একটা কাগজপোড়া কটু গন্ধ এবং তখনও পাতলা একটা ধোঁয়ার পর্দা ঘরের মধ্যে ভাসছে।

আমরা যে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম তা যেন হিরণ্ময়ী দেবী টেরই পেলেন না। নিজের মধ্যে এমন গভীর ভাবে নিমগ্ন যে, তিন জনের আমাদের কক্ষের মধ্যে প্রবেশের ব্যাপারটা পর্যন্ত তার সমাধিগুস্ত মৌনতাকে এতটুকু নাড়াও দিতে পারলে না।

আরো কাছে আমরা এগিয়ে গেলাম।

তবু আশ্চর্য! হিরণ্ময়ী দেবীর কোন সাড়া-শব্দ নেই।—নিস্তব্ধ নিশ্চুপ!

'হিরণ্ময়ী দেবী—' মৃদু কণ্ঠে কিরীটি ডাকল।

না! তবু সাড়া নেই!

'হিরণ্ময়ী দেবী!—শুনছেন!—' ঈষৎ উচ্চকণ্ঠেই এবারে কিরীটি ডাক দিল।

এবারে চমকে মুখ তুলে তাকালেন হিরণ্ময়ী দেবী।

ঘরের আলোয় হিরণ্ময়ী দেবীর মুখের দিকে তাকালাম: মড়ার মত ফ্যাকাসে রক্তহীন মুখ। আর দুই চোখের দৃষ্টিও যেন ঘষা কাচের মত নিশ্চল প্রাণহীন।

কিরীটি আবার ডাকল, 'হিরণ্ময়ী দেবী!—'

ফ্যাল্‌-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকেন হিরণ্ময়ী দেবী! কোন সাড়া-শব্দই দেন না।

সর্বস্ব হারানোর এক মর্মান্তিক বেদনা যেন হিরণ্ময়ী দেবীর মুখখানিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

সামনের ঐ ভস্মস্তূপের মত যেন তাঁরও সব-কিছু আজ শেষ হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ কথা বললেন হিরণ্ময়ী দেবী: সব পুড়িয়ে ফেলেছি

মিঃ রায়! সীতার শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকুও পুড়িয়ে ফেলেছি। কিন্তু কই? তবু ত তাকে ভুলতে পারছি না? কিছুতেই ত মন থেকে তাকে মুছে ফেলতে পারছি না!

'যে গিয়েছে তার কথা মিথ্যে আর ভেবে কি লাভ বলুন হিরণ্ময়ী দেবী! বাকী জীবনটা এমনি করেই তার স্মৃতি বার বার আপনার মনের মধ্যে এসে উদয় হবেই। ভেবেছেন কি তার চিঠিপত্রগুলো পুড়িয়ে ফেললেই তার স্মৃতির হাত হ'তে আপনি রেহাই পাবেন? তা আপনি পাবেন না। বরং যে রহস্য এত কাল আপনার কাছে অজ্ঞাত ছিল, তার বাক্স ঘেঁটে তার চিঠিপত্রগুলো পড়ে—'

কিরীটির কথা শেষ হলো না। হিরণ্ময়ী দেবী চকিতে কিরীটির মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন: আপনি! আপনি সে সব কথা কেমন করে জানলেন মিঃ রায়!

'আপনি না জানলেও আমি জানতাম হিরণ্ময়ী দেবী! আপনার মেয়ে সীতার মনটা কোথায় পড়ে আছে। আরও একটা কথা আপনি হয়ত জানেন না।—'

'কি?—'

'যে ভালবাসার মধ্যে সীতা নিজেকে অমনি নিঃস্ব করে বিকিয়ে দিয়েছিল সেই ভালবাসাই কাল সাপ হ'য়ে তার বুকে মৃত্যু-ছোবল হেনেছে, অথচ বেচারী সে কথা তার শেষ মুহূর্তেও স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।—'

'কিরীটি বাবু?—' আর্ত চিৎকারের মতই ডাকটা শোনায় হিরণ্ময়ীর কণ্ঠে।

'হাঁ। হিরণ্ময়ী দেবী! একটা দিকই আপনার নজরে পড়েছে। মালাটাই আপনি দেখেছেন কিন্তু সেই মালার মধ্যেই যে ছিল দ্রংষ্টা কীট সেটা আপনার নজরে পড়েনি।—'

'আমি!' আমার যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মিঃ রায়! এ সব আপনি কি বলছেন?—'

'সময় আর ত নেই হিরণ্ময়ী দেবী! এখুনি একবার আমাকে নার্সিং-হোমে যেতে হবে। কুমারেশ বাবুর হাতে গুলী লেগেছে। একটা dressingএর বিশেষ প্রয়োজন!—'

'কুমারেশ!—'

'হাঁ। দেখুন ত একে চিনতে পারছেন কি না!—'

এতক্ষণ কিরীটি কুমারেশ সরকারকে আড়াল করে দাঁড়িয়েই কথাবার্তা চালাচ্ছিল। এবারে সরে দাঁড়াল।

'কে!—'

'চিনতে পারছেন না? বনলতা দেবী ও অধ্যাপক ডাঃ শ্যামাচরণ সরকারের একমাত্র ছেলে কুমারেশ সরকার!—'

'সে কি! তবে যে শুনেছিলাম—'

'কি শুনেছিলেন? তার কোন পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না, তাই না?—'

'হাঁ!—'

'তার জবাব অবিশ্যি উনিই সঠিক দিতে পারবেন। আচ্ছা এবারে আমরা চলি হিরণ্ময়ী দেবী!—'

আমরা দু'জনে কিরীটির পিছু-পিছু দরজার দিকে অগ্রসর হ'তেই কিরীটি হঠাৎ আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে: হাঁ! একটা ছবি আপনার জিম্মায় রেখে যেতে চাই হিরণ্ময়ী দেবী! সুব্রত, ছবিটা ওর কাছেই রেখে যাও। আমার দিকে তাকিয়ে কিরীটি তার বক্তব্য শেষ করল।

'ছবি! কিসের ছবি?—'

আমি ততক্ষণে ঘরের বাইরে গিয়ে ছবিটা এনে হিরণ্ময়ী দেবীর পায়ের সামনে নামিয়ে দিলাম। ছবিটা দেখে হিরণ্ময়ী দেবী সবিস্ময়ে বলে উঠলেন,—'এ কি! এ ছবিটা দাদার ষ্টুডিও-ঘরে ছিল না?'

'হাঁ। আর যত বিভ্রাট এই ছবিটা নিয়েই। এইটা চুরি করবার মতলবেই গত রাত্রে এ বাড়িতে চোরের আবির্ভাব ঘটেছিল।—'

'এই ছবিটা চুরি করতে? কি বলছেন আপনি মিঃ রায়?—'

'হাঁ বললাম ত। নিরালা-রহস্যের মূলে এই ছবিটিই!—'

'তবে! তবে আমার মেয়ে সীতাকে—'

'প্রাণ দিতে হ'লো কেন, তাই না আপনার জিজ্ঞাস্য হিরণ্ময়ী দেবী! একান্ত অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবেই আপনার মেয়ে হত্যাকারীর স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। তাই তাকে প্রাণ দিতে হলো। কিন্তু আমার আর দেরী করা ত চলবে না—ওদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে।—'

'একটা কথা মিঃ রায়—'

'বলুন?—'

'আমার স্বামী—'

'সে কথার জবাব ত আজ সকালেই দিয়ে গিয়েছি হিরণ্ময়ী দেবী!—'

আমরা সকলে অতঃপর নিরালা থেকে বের হয়ে এলাম।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, রাত দু'টো বেজে গিয়েছে।

আঠার

রাস্তায় পৌঁছে কিরীটি হন-হন করে হাঁটতে সুরু করে, আমি আর কুমারেশ বাবু তাকে অনুসরণ করি।

কিরীটির শেষের কথাগুলো সমস্ত সংশয়ের নিরবসান ঘটিয়েছে।

অথচ আশ্চর্য! বার বার ঐ কথাটাই মনে হচ্ছিল এই দিকটা একবারও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি কেন? আগাগোড়া ঘটনাটা একটি বারও ঐ দিক দিয়ে আমি বিশ্লেষণ করে দেখিনি কেন?

'তাড়াতাড়ি একটু পা চালিয়ে আয় সুব্রত! কুমারেশ বাবুর উণ্ডটা dress করাবার ব্যবস্থা করতে হবে।—'

কিরীটি চলতে চলতেই আমাকে একবার তাড়া দিল।

নার্সিং-হোমে পৌঁছে দেখি, সেখানে আবার বেশ সোরগোল পড়ে গিয়েছে। ডাঃ চ্যাটার্জী নিজেই একজন ভৃত্যের সঙ্গে কি যেন কথা বলছিলেন।

আমাদের প্রবেশ করতে দেখে বলে উঠলেন: এই যে মিঃ রায়! আবার শতদল বাবুর lifeএর 'পরে another attempt হয়েছে! ওকেই আপনার কাছে আমি পাঠাচ্ছিলাম।

ডাঃ চ্যাটার্জীর কণ্ঠস্বরে এক-রাশ উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ে।

কিন্তু প্রত্যুত্তরে কিরীটির কণ্ঠস্বরে কোনরূপ উৎকণ্ঠাই প্রকাশ

পল না। অত্যন্ত শান্ত ও নিরুৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করলে: আবার হয়েছিল বুঝি ?

'হাঁ !—'

'এবারেও Poison না বুলেট !—'

'সেই পূর্বের মতই মরফিন হাইড্রোক্লোর—'

'হুঁ। চলুন—দেখা যাক।—'

'এবারেও ঠিক সময় মত ব্যাপারটা জানতে পারায় কোন মতে ভদ্রলোককে বাঁচান গিয়েছে। কিন্তু আর না মশাই! ও ঝঞ্ঝাট আর আমার নার্সিং-হোমে রাখতে সাহস হচ্ছে না মিঃ রায়, আপনারা অন্ত ব্যবস্থা করুন !—'

'ভয় নেই ডক্টর চ্যাটার্জী! হত্যাকারীর এইটাই Last show! খেলা তার ফুরিয়েছে, কিন্তু এবারেও কি কড়া পাকের সন্দেশ নাকি ?—'

'না। এবারে আরো Serious—'

'কি রকম ?—'

'হাঁ। হাসপাতালের দেওয়া দুধ পান করেই অসুস্থ হ'য়ে পড়েন।—'

'হুঁ!—তা দুধটা দিয়ে এসেছিল কে কেবিনে ?—'

'নার্স'ই! সে বললে, রাত দশটায় দুধ নিয়ে এসে শতদল বাবুর কেবিনে ঢুকে দেখে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে ঘরের আলো নিবিয়ে শতদল বাবু ঘুমোচ্ছেন—তাই আর তাঁকে বিরক্ত না করে দুধটা মাথার ধারে মেডিসিন ক্যাবার্ডের 'পরে একটা কাচের প্লেট দিয়ে ঢেকে রেখে কেবিন থেকে বের হ'য়ে আসে।—'

'তারপর ?—' কিরীটি পূর্ববৎ নিরাসক্ত ভাবেই প্রশ্ন করে।

'তারপর রাত যখন দেড়টা, নার্স-বদলীর সময় নতুন ডিউটি নার্স মল্লিকা গুহ শতদল বাবুর কেবিনের সামনে দিয়ে যেতে যেতে একটা অস্পষ্ট গোঙানীর শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করে আলো জ্বেলে দেখে, শতদল শয্যার উপরে পড়ে গোঁ-গোঁ করছে। তাড়াতাড়ি আমাকে খবর দেয়, আমি ছুটে যাই—'

'এখন কেমন আছেন ?—'

'এখন একটু ভাল !—'

'হুঁ!—ভাল কথা ডাঃ চ্যাটার্জী, কুমারেশ বাবুর হাতটা জখম হয়েছে, একটু দেখে ব্যবস্থা যদি করে দেন—'

'নিশ্চয়ই—কিন্তু—'

'সব বলবো আপনাকে। আগে হাতটা পরীক্ষা করে ব্যবস্থা করুন—আমরা ততক্ষণ শতদল বাবুর সঙ্গে একটি বার দেখা করে আসি।—' কথাগুলো বলতে বলতে আরো একটু ডাঃ চ্যাটার্জীর দিকে এগিয়ে গিয়ে নিম্ন কণ্ঠে কিরীটি তাকে যেন কি নির্দেশ দিল, তারপর আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে: চল্ সুব্রত!

* * * *

নির্জীবের মত শতদল বাবু তার নির্দিষ্ট কেবিনের মধ্যে শয্যায় শুয়ে ছিলেন। মাথার সামনে একজন নার্স একটা টুলের 'পরে বসেছিল। আমাদের দু'জনকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে উঠে দাঁড়াল।

কিরীটি চোখের ইংগিতে নার্সকে কক্ষ ত্যাগ করতে বললে।

নিঃশব্দে নার্স কেবিন থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটি অতঃপর শয্যার সামনে এগিয়ে গিয়ে ক্ষণকাল শয্যায় শায়িত নির্জীব শতদলের দিকে তাকিয়ে রইলো।

তারপর এগিয়ে গিয়ে উদ্যানের দিকে খোলা জানালাটার সামনে নিঃশব্দে দাঁড়াল। এবং জানালা-পথে ঝুঁকে কি যেন দেখতে লাগল বাইরে।

এমন সময় হঠাৎ শতদল বাবু চোখ মেলে তাকালেন। এবং ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকলেন: নার্স!

আমি নার্সকে ডাকতে যাচ্ছিলাম কিন্তু কিরীটি চোখের ইংগিতে আমাকে নিষেধ করে শয্যার কাছে এগিয়ে এলো।

'শতদল বাবু !—'

'কে ?—'

'আমি কিরীটি, কেমন আছেন ?—'

'মিঃ রায় এসেছেন, আবার, আবার আমার lifeএ 'পরে attempt নিয়েছিল !—'

'তাই ত শুনলাম।—'

'এবারে দুধের সঙ্গে—'

'হাঁ। বড্ড কাঁচা কাজ করে ফেলেছে !—'

'কাঁচা কাজ,—'

'হাঁ!—আর সেই জন্যই সে আমার চোখে ধরাও পড়ে গিয়েছে।—'

'ধরা পড়েছে !—' শতদল বাবুর কণ্ঠে বিস্ময়।

হাঁ! শতদল বাবু, জানেন একটা কথা, আপনি যে রণধীর চৌধুরীর চিঠিটা আমাকে দিয়েছিলেন তার মর্মার্থ আমি উদ্ধার করতে পেরেছি।—'

'চিঠি !—'

'হাঁ, মনে নেই আপনার? যে চিঠিটা আপনার কাছ থেকে আমি চেয়ে নিয়েছিলাম ?—'

'ও—'

'আর সেই চিঠির মর্মোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে হত্যাকারীও আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।—'

'হত্যাকারী ?—'

'হাঁ—সীতাকে যে হত্যা করেছে।—চিঠিটা শিল্পীর একটা অদ্ভুত খেয়ালই বলতে হবে।

'আর আপনার কথাই ঠিক শতদল বাবু! ঐ চিঠিটা'ই রণধীর চৌধুরীর উইল—'

'আমি ত' আপনাকে সেই দিনই বলেছিলাম কিন্তু দিদিমা মানতে চান নি—'

'ভুল করেছিলেন তিনি—'

আমি আর নিজের কৌতূহলকে দমন করতে পারলাম না। প্রশ্ন করলাম কিরীটিকে: সত্যি তুই চিঠিটার মর্মোদ্ধার করতে পেরেছিস কিরীটি ?

'হাঁ রে! চিঠিটার প্রত্যেকটি লাইনের পাশে পাশে যে সাংকেতিক অংক বসান আছে সেইটাই চিঠিটার মর্মোদ্ধারের সংকেত। এই দেখ পড়।—' বলতে বলতে চিঠিটা পকেট হ'তে বের করে কিরীটি আমার হাতে দিয়ে বললে: মোটামুটি চিঠিটায় বলেছে বটে নিরালা বাড়ি ও তার যাবতীয় সব-

কিছু আমাদের শতদল বাবুই পাবেন। তবে তার মধ্যে আরো একটা নির্দেশ আছে, সেটা হচ্ছে ঐ সাংকেতিক অংকগুলোর মধ্যে। অংক অনুসারে প্রত্যেক লাইনের সমান সংখ্যক কথাগুলো নিলে তার অর্থ এই দাঁড়ায়।

নির্দেশ, আমার মৃত্যুর পর ষ্টুডিওতে প্রপিতামহের ছবির স্বত্ব কুমারেশের হইবে।

'কি বলছেন আপনি মিঃ রায়?—' শতদল বলে ওঠে।

'হাঁ শতদল বাবু! আমার কথা যে মিথ্যা নয় এই চিঠিই তার প্রমাণ দেবে। এবং নিরালা ও তার মধ্যেকার যাবতীয় সম্পত্তি আপনি পেলেও রণধীর চৌধুরীর প্রপিতামহের ছবিটা কুমারেশ সরকারই পাবেন।—'

'কুমারেশ সরকার!—'

'হাঁ। কুমারেশ সরকার। তিনিও আজ এখানে উপস্থিত!—'

'কুমারেশ! কুমারেশকে তাহ'লে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে?—'

'নিশ্চয়ই! ঐ যে—'

ঠিক সেই সময় ডাঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে সঙ্গে কুমারেশ সরকার হাতে ব্যাণ্ডেজ কেবিনের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

'কুমারেশ বাবু! let us hear your story! আপনি কেমন করে হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিলেন আর কোথায়ই বা এত দিন বন্দী হয়েছিলেন কেমন করে?—'

বিস্মিত কুমারেশ সরকার কিরীটির মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন: আপনি! আপনি সে কথা জানলেন কি করে মিঃ রায়?

'অনুমান। অনুমানের 'পরে নির্ভর করেই জেনেছি মিঃ সরকার! এখন ত বুঝতে পারছেন অনুমান আমার ভুল হয়নি! Now let us have the story!—' কিরীটি বললে।

'আশ্চর্য মিঃ রায়, সত্যি আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা এখনো আমার কাছে একটা দুর্বোধ্যের মতই মনে হয়। মনে হয় সবটাই যেন প্রথম হ'তে শেষ পর্যন্ত একটা দুঃস্বপ্ন! তবু বলছি শুনুন—' কুমারেশ সরকার তার কাহিনী সুরু করলেন: 'আপনি হয়ত জানেন না মিঃ রায়, শিল্পী রণধীর চৌধুরীর আমি দৌহিত্র হলেও তাঁর সঙ্গে আমাদের কোন দিন কোন সম্পর্ক ছিল না। আমার মাকে তিনি ত্যজ্য করেছিলেন। আমরাও অর্থাৎ আমার মা-বাবা বা আমি কোন দিন তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবারই চেষ্টা করিনি। সেই দাদুর কাছ হ'তে তাঁর মৃত্যুর মাস খানেক আগে একটা আবোল-তাবোল লেখা চিত্র-বিচিত্র চিঠি পেলাম। আশ্চর্যই হয়েছিলাম। এবং চিঠিটার মাথা-মুণ্ডু কিছু বুঝতে পারিনি বলে সে চিঠিটা ড্রয়ারের মধ্যেই অবহেলায় পড়ে ছিল, তারপর সাত-আট মাস পরে হঠাৎ হরবিলাস দাদুর একখানা চিঠি পেলাম।—'

'হরবিলাস বাবুর চিঠি?—' কিরীটি প্রশ্ন করে।

'হাঁ! চিঠিতে তিনি লেখেন অবিলম্বে কোন বিশেষ জরুরী অথচ গোপনীয় ব্যাপারের জন্য যেন অবিলম্বে চিঠি পাওয়া মাত্রই এখানে এসে তাঁর সঙ্গে নিরালায় সাক্ষাৎ করি। অন্যথায় আমার নাকি সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে। চিঠিতে এ-ও লেখা ছিল, যাবার আগে তাঁকে যেন আমি পত্র দিয়ে জানাই কবে যাচ্ছি!—'

'হুঁ। তারপর?—'

'চিঠি পেয়ে আমি এখানে আসবো কি না ভাবছি এমন সময় রাণুর একখানা চিঠি পাই। সে-ও আমাকে দার্জিলিং থেকে লিখেছে দু'-এক দিনের মধ্যেই তারা এখানে আসছে, তখন স্থির করলাম এখানে আসবো। মনে মনে যে একটা কৌতূহলও হয়নি তা-ও নয়, যা হোক, এখানে এসে পৌঁছালাম রাত্রের ট্রেণে এবং বলাই বাহুল্য, আগে হরবিলাস দাদুকে চিঠিও দিলাম।—' কুমারেশ থামলেন।

'থামলেন কেন? বলুন—শেষ করুন?—' কিরীটি তাগিদ দেয়।

'ষ্টেশনে নেমে বাইরে আসতেই একজন ঢ্যাঙ্গামত লোক এগিয়ে এসে আমাকে প্রশ্ন করল আমার নাম কুমারেশ সরকার কি না এবং আমি কলকাতা হতেই আসছি কি না। জবাবে আমি তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে সে বললে, সে নিরালার হরবিলাস বাবুর লোক। আমাকে সে নিতে এসেছে। একটা ট্যাক্সী ষ্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করছিল। তার মধ্যে তার কথা মত উঠে বসতেই অন্ধকারে ট্যাক্সীর মধ্যে থেকেই কে যেন মাথায় আমার অতর্কিতে প্রচণ্ড আঘাত হানল। সঙ্গে সঙ্গে আমি জ্ঞান হারালাম! জ্ঞান ফিরে আসবার পর দেখি, ছোট একটা ঘরে আমি বন্দী। পরে জেনেছিলাম সেটা নিরালার পিছনে জংগলাকীর্ণ বাগানের মধ্যের আউট হাউস।······'

'একটা কথা মিঃ সরকার! আপনি চেঁচামেচি করে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেননি কেন বন্দী অবস্থায়?—'

'সে-ও এক বিচিত্র ব্যাপার! ঢ্যাঙ্গা লোকটা আমাকে শাসিয়েছিল, তারা নাকি আমার রক্তচাপের রোগী বৃদ্ধ অধ্যাপক বাপকেও নাকি চিঠি দিয়ে আমারই মত এখানে ধরে এনে অন্য একটা ঘরে আটকে রেখেছে। আমি যদি চেঁচামেচি করি বা গোলমাল করি তারা আমার বৃদ্ধ বাপকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেবে। আর যদি চুপচাপ থাকি ত এক মাস বাদে ছেড়ে দেবে। বাবাকে যে আমি কতখানি ভালবাসি ঐ শয়তানরা জানত বোধ হয়। বাধ্য হয়েই তাই আমাকে কতকটা ঐ বন্দি-জীবন মেনে নিতে হয়েছিল। একটি মাত্র জানালা ছিল ঘরের। সেই জানালা-পথে সেই ঢ্যাঙ্গা লোকটা প্রত্যহ এসে আমাকে খাবার দিয়ে যেতো রাত্রে একবার করে। বন্দী অবস্থায় আমার কেবলই ঘুম পেত।—'

'Is it?—'

'হাঁ!—কেবলই ঘুম পেত, উপযুক্ত আহার না পেয়ে এদিকে ক্রমেই দুর্বল হয়েও পড়ছিলাম!—'

'আপনি টেরও পাননি মিঃ সরকার—খাদ্যের সঙ্গে মরফিয়া দিয়ে আপনাকে ঘুম পাড়াতো আর উপযুক্ত পরিমাণ আহার না দিয়ে ক্রমে আপনাকে দুর্বল করে ফেলছিল—' কিরীটি বললে।

'পরে বুঝতে পেরেছিলাম সব।—'

'তারপর?—'

'তারপর যে রাত্রে সীতা মারা যায়—সেই দিন বিকালের দিকে ঐ উদ্যানের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সে এক সময় ঐ out houseএর কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ আমাকে দেখতে পায়।

এবং সীতাই আমাকে উদ্ধার করে ঐ দিন সন্ধ্যার দিকে। এবং আমাকে সে অবিলম্বে এখান থেকে চলে যেতে বলে। কারণ, তার বাপ ব্যাপারটা জানতে পারলে নাকি আমাকে হত্যা করবে, আমিও তার নির্দেশ মত চলে যাই, কিন্তু পথে গিয়ে মনে হয় শতদলকে সব ব্যাপারটা জানান উচিত। সঙ্গে সঙ্গে নিরালায় ফিরে আসি। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে সামনেই সীতার দেখা পাই। সে তখন ছাদ থেকে নীচে নেমে আসছে। সীতা আমাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি বসবার ঘরে টেনে নিয়ে যায়।

সে আমাকে বলে: 'এ কি! আবার আপনি এখানে এসেছেন কেন? একটা সর্বনাশ না করে আপনি ছাড়বেন না দেখছি!—বাবা নীচে আছেন এখন, যদি তার চোখে পড়ে যান—'

'শতদলের সঙ্গে একবার আমি দেখা করতে চাই!—তুমি একবার যেমন করে হোক শতদলকে এই ঘরে ডেকে নিয়ে এসো।—'

'কিন্তু—'

'না! তার সঙ্গে দেখা না করে আমি যাব না!—' আমি বললাম সীতাকে। কিন্তু কথা আমার শেষ হলো না, ঠিক এমনি সময় দরজার ওপাশ থেকে একটা গুলীর আওয়াজ এলো ও সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত চীৎকার করে সীতা মাটিতে পড়ে গেল! আমিও আকস্মিক সেই ব্যাপারে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। এবং ঐ মুহূর্তেই সেখান থেকে পালালাম। পালাই যখন তখন কে যেন সিঁড়ি দিয়ে একটি মহিলা ছাদ থেকে নেমে আসছিল। সে বোধ হয় আমাকে দেখে ফেলেছিল—'

'হাঁ! শরৎ গুহের মেয়ে কবিতা গুহ!—' কিরীটি বললে: কিন্তু সে রাত্রে ভয়ে আপনি যদি অমনি করে হঠাৎ না পালিয়ে যেতেন ত আজ রাত্রে আপনাকে গুলী খেতে হতো না। তবু ভাগ্য বলতে হবে সেই গুলীটা আপনার হাতের উপর দিয়েই গিয়েছে, যাক্! শেষ করুন আপনার কথা!

'নিরালা থেকেও আমি পালালাম। কিন্তু এখান থেকে যেতে পারলাম না। ক'টা দিন আত্মগোপন করে বেড়িয়েছি আর ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছি কি হলো! হঠাৎ সীতাকে কে গুলী করে মারল! এমন সময় হরবিলাস দাদু এ্যারেষ্ট হয়েছেন আজ সকালে শুনতে পেলাম। তখন ঠিক করলাম সীতার মা হিরণ্ময়ীদি'র সঙ্গে দেখা করবো। এবং তাঁকে সব ব্যাপারটা খুলে বলবো। কিন্তু সদর গেট দিয়ে নিরালায় ঢুকতে সাহস হলো না সদরে পুলিশ মোতায়েন দেখে। একটা বাঁশ জোগাড় করে সেই বাঁশের সাহায্যে প্রাচীর টপকে নিরালার পিছনের বাগানে প্রবেশ করলাম। তারপর এগুচ্ছি—'

এই সময় কিরীটি বাধা দিল: দেখলেন ভুখণা ও কালো কাপড়ে সর্বাঙ্গ আবৃত ছায়ামূর্তিকে বাগানের মধ্যে—তাই না!—

'হাঁ, আমার ইচ্ছা ছিল লোকটাকে পিছন থেকে গিয়ে জাপটে ধরবো কিন্তু তার আগেই সে আমার উপস্থিতি টের পেয়ে—'

'গুলী করে! কিন্তু He missed the chance! এবং হত্যাকারী জানত না যে তার আগেই বাগানে প্রবেশ করে একটা ঝোপের মধ্যে অনতিদূরে আমি আর সুব্রত আত্মগোপন করে আছি!—'

ঘোষাল সাহেব এই সময় এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

'ব্যাপার কি কিরীটি বাবু! এত জরুরী তলব কেন?—' ঘোষাল প্রশ্ন করেন।

'এই যে আসুন ঘোষাল সাহেব! আপনার নিরালা ও সীতা-হত্যা-রহস্যের মীমাংসা হয়েছে!—' কিরীটি আহ্বান জানান ঘোষালকে।

'সত্যি!—'

'হাঁ!—'

'কিন্তু ইনি—ইনি কে?—'

'বিখ্যাত Sportsman আমাদের কুমারেশ সরকার।—'

'নমস্কার!—তা উনি—'

'ঘটনাচক্রে উনিই ত যত অনর্থের মূল!—' কিরীটি জবাব দেয়।

'কি বলছেন আপনি মিঃ রায়!—' প্রশ্নটা করলেন শতদল।

'হাঁ! বর্তমান রহস্যের উনিই Neucleus! ওঁকে কেন্দ্র করেই সব কিছু ঘটেছে!—'

'তার মানে!—'

'তার মানেটা আপনার চাইতেও কারো বেশী জানবার কথা নয় শতদল বাবু!—' গম্ভীর কিরীটির কণ্ঠস্বর।

'আমি—'

'হাঁ! আপনি। চমৎকার খেলা খেলেছেন শতদল বাবু কিন্তু বড়ের চালে দু'টো মারাত্মক ভুল করে ফেলেছেন—তাতেই কিস্তি মাৎ হয়ে গিয়েছে!—'

'আপনি—'

'শতদল বাবু! আমি কিরীটি রায়—'

'মিঃ রায়!—' ঘোষাল সাহেব সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকান কিরীটির মুখের দিকে।

'হাঁ মিঃ ঘোষাল—উনি আমাদের শতদল বোসই এই নাটকের প্রধান চরিত্র! সকল রহস্যের মেঘনাদ। সীতা দেবীর হত্যাকারী!—'

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হলো।

উনিশ

নিরালাতেই আমরা সকলে উপস্থিত ছিলাম: আমি, হিরণ্ময়ী দেবী, হরবিলাস, কুমারেশ, রাণু, কবিতা গুহ ও ঘোষাল। এবং ঘোষাল সাহেবের অনুরোধেই কিরীটি নিরালা ও সীতার হত্যা-রহস্য সবিস্তারে বর্ণনা করল পরের দিন। 'খেয়ালী শিল্পী' রণধীর চৌধুরীর নিজের কন্যা বনলতা অধ্যাপক শ্যামাচরণ সরকারকে তাঁর অমতে ভালবেসে অসবর্ণ বিবাহ করায় ত্যাগ করলেও কন্যাকে তিনি কোন দিনই ভুলতে পারেননি। এবং যদিও কন্যার জীবিত কালে কন্যা বনলতার কোন দিন মুখদর্শন করেননি কন্যার মৃত্যুর পর ও নিজের মৃত্যুর পূর্বে বোধ হয় পিতার মনে অনুশোচনা এসেছিল। যার ফলে তাঁর সত্যিকারের যে সম্পদ ছিল কতকগুলো বহু মূল্যবান জুয়েলস যেগুলো তাঁরই হাতে অংকিত প্রপিতামহের অয়েল পেনটিংটার ফ্রেমের মধ্যে কৌশলে ভরে লুকিয়ে রেখেছিলেন সেগুলো তাঁর মৃতা কন্যার একমাত্র পুত্র কুমারেশ বাবুকেই দিয়ে যান উইল করে। অবশ্য শিল্পীর খেয়ালী মন তার, তাই উইলটাকে একটা বিচিত্র চিঠির মত করে রেখে গিয়েছিলেন।

এবং তার একটি কপি নিরালার সিন্দুকে রেখে অন্য একটি কপি ডাকে কুমারেশের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে অবশ্য একটা কথা উঠতে পারে, জুয়েলগুলো কুমারেশ বাবুকেই যদি তাঁর দেবার ইচ্ছা ছিল খোলাখুলি ভাবেই ত একটা চিঠিতে সে কথা কুমারেশ বাবুকে জানিয়ে যেতে পারতেন বা দিয়ে যেতে পারতেন। তবু যে কেন তা না করে অমন একটা কৌতুক করে রেখে গিয়েছিলেন তা তিনিই জানতেন। তবে মনে হয় এ-ও তাঁর খেয়ালী মনের একটা বিচিত্র খেয়াল ভিন্ন কিছু নয়। যা হোক—রণধীর চৌধুরীর মৃত্যুর পর শতদল বাবু এখানে নিরালায় এসে ঐ চিঠির সরল মানে অনুযায়ীই সমস্ত সম্পত্তি নিজের হাতে নেন। চিঠিটার অপ্রকাশ্য সাংকেতিক অর্থটা তিনি প্রথমে ধরতে পারেননি। তারপর হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে যখন সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয় তখন হয়ত—হিরণ্ময়ী দেবীকে শতদল ঐ চিঠিটা দেখায়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী হিরণ্ময়ী দেবী চিঠিটা পড়ে মনে মনে সন্দেহযুক্ত হয়ে ওঠেন। এবং খুব সম্ভবত হয়ত ঐ চিঠিটার কথা ভাবতে ভাবতে কোন এক মুহূর্তে চিঠির সাংকেতিক রহস্যটা তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। এবং তিনি কোন সময়ে হয়ত শতদলকে সে সম্পর্কে কিছু বলেন। এই গেল প্রথম পর্ব বা অধ্যায়। এবারে আসবো আমি রহস্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। শতদল যে মুহূর্তে জানতে পারলে চিঠির আসল রহস্য, মনে মনে সে তার প্ল্যান ঠিক করে নিল। হরবিলাসের নামে বেনামা চিঠি দিয়ে ভূখণার সাহায্যে প্রথমেই কুমারেশ বাবুকে এনে নিরালার বাগানের মধ্যে secluded out houseএ বন্দী করে ধীরে ধীরে মরফিয়ায় addict করে তুলতে লাগল ও সেই সঙ্গে অপর্যাপ্ত আহার দিয়ে দুর্বল করে ফেলতে লাগল। তার ইচ্ছা ছিল হয়ত চট্ করে কুমারেশকে না হত্যা করে ধীরে ধীরে তাকে morphiaর নেশা ধরিয়ে cripple করে ফেলবে এবং পরে হয়ত প্রয়োজন মত সুযোগ বুঝে একেবারে শেষ করে ফেলতেও কষ্ট পেতে হবে না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই তার প্রথম খেলা। দ্বিতীয় খেলা সুরু হলো হরবিলাস ও হিরণ্ময়ী দেবীর উপরে সন্দেহ জাগিয়ে তুলে তাঁদেরও নিজের পথ থেকে সরান। ঘটনাচক্রে এই সময় আমি ও সুব্রত এখানে এলাম। এবং এখানকার স্থানীয় সংবাদপত্রে আমার এখানে আগমনের সংবাদ পেয়ে আমাকেও এই ঘটনার মধ্যে টেনে এনে নিজেকে আরও safe করবার মতলব করলে। আমার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলেও সংবাদপত্রের মারফৎ আমার চেহারা ও আমার পরিচয় শতদলের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। এবং এখানে এসে যে হোটেলে উঠেছি সে-ও শতদলের পূর্বাহ্ণেই জানা ছিল। একটা নাটকীয় কৌতুকের মধ্যে দিয়ে নিজে যেন আচমকা কোন অদৃশ্য আততায়ীর হাতে পিস্তলের গুলীতে আহত হয়েছে এই রকম pose নিয়ে শতদল আমার সামনে এসে আবির্ভূত হয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদের পরিচয় ঘটালো। প্রথমটায় frankly বলতে গেলে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি। পরে যখন তলিয়ে ভাবি, তখনই সর্বপ্রথম আমার মনে সন্দেহ জাগে। শতদলের lifeএর উপরে তিন-চার বার attemp হয়েছে—একবার হোটেলের সামনে গুলী করে, একবার নিরালার পথে পাথর গড়াবার গল্প বলে, একবার শয়নঘরে ছবির তার কেটে, একবার নিজের ঘরে বিভলভার ছুঁড়ে আলোর চিমনি ভেঙ্গে সে আমার কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছে ব্যাপারটা। প্রতিবারই ব্যাপারগুলো আমি প্রথম genuin ভেবেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা ব্যাপার মনের মধ্যে আমার সর্বদাই খচ-খচ করে অদৃশ্য কাঁটার মত বিঁধেছে—Why at all somebody should be after his life? কেন কেউ তাকে হত্যা করতে চাইবে? কি মোটিভ—কি উদ্দেশে এবং ঐ সঙ্গে আরো একটা যুক্তি মনের মধ্যে এসে আমার উদয় হয়েছে হত্যার attempt গুলোর মধ্যে কোথায় যেন একটু ফাঁক আছে। একটা বা দুটো attempt ব্যর্থ হ'তে পারে। কিন্তু বার বার চার বার কেন attempt বিফল হবে? শেষ বারের attemptএর পর যে মুহূর্তে ঐ ধরণের অসামঞ্জস্যটা আমার মনকে আকর্ষণ করল সেই মুহূর্ত হ'তেই মন আমার সজাগ হয়ে উঠেছে। কঠিন বিশ্লেষণে যুক্তি ও নিরঙ্কুশ বিচারে ঘটনাগুলোকে চিন্তা করতে সুরু করলাম এবং চিন্তা করতে গিয়ে একই জায়গায় এসে বার বার থেমে যেতে হলো আমাকে। ব্যাপারটা যুক্তিহীন। এলোমেলো। তারপরই তৃতীয় অধ্যায়ে আমি আসবো: শতদল ও সীতার ব্যাপারে। সীতা ভালবেসেছিল সমস্ত প্রাণ দিয়ে শতদলকে কিন্তু শতদল চাইছিল রাণুকে। এবং রাণু ভালবাসে আবার শতদলকে নয় কুমারেশকে। অর্থ অনর্থ ত ছিলই, সংগে এসে যোগ দিল প্রেমের ব্যাপার। একটা জটিল পরিস্থিতির হলো উদ্ভব। শতদল চায় রাণুকে। রাণু চায় কুমারেশকে, সীতা চায় শতদলকে। আবার শতদল চায় কুমারেশের প্রাপ্য পাওনা থেকে তাকে বঞ্চিত করতে। কুমারেশই হলো এক শতদলের পথের কাঁটা দুই দিকে দিয়ে। একা রামে রক্ষা নেই তাতে সুগ্রীব দোসর। আকাঙ্ক্ষিতা নারী ও আকাঙ্ক্ষিত অর্থ। অতএব কুমারেশকে সরাতে পারলেই দু'দিক পরিষ্কার শতদলের। কাজেই কুমারেশের 'পরেই পড়ল শতদলের যত আক্রোশ। শতদল আটঘাট বেঁধে আসরে অবতীর্ণ হলো। শতদলের বুদ্ধির প্রশংসাই করতাম যদি না বড়ের চালে দু'টো মারাত্মক ভুল করে নিজে মাৎ না হয়ে যেত শেষ পর্যন্ত। এক নম্বর ভুল সে করলে কুমারেশকে হত্যা না করে এনে বন্দী করে রেখে—কারণ, তাতে করে সীতাকে হত্যা করতে হতো না। সীতা কুমারেশের কথা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই তাই হতভাগিনীকে সরাতে হলো ইহজগৎ হতে। আর সেইটাই হলো শতদলের দ্বিতীয় মারাত্মক ভুল—অর্থাৎ সীতাকে হত্যা করা। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত সন্দেহের মীমাংসা হ'য়ে গেল। আমি বুঝলাম সকল রহস্যের মেঘনাদ কে। সীতাকে হত্যা করবার পূর্ব মুহূর্তে নিজের লাল রংয়ের শালটা সীতার গায়ে দিয়ে ব্যাপারটা শতদল এমন করে সাজাতে চেয়েছিল যাতে করে লোকের ধারণা হয় আসলে হত্যাকারী শতদলকেই হত্যা করতে চেয়েছিল কিন্তু আলোয়ানের ব্যাপারে ভুল করে সীতাকে হত্যা করে ফেলেছে। সীতার হত্যাটা একটা pure accident ভিন্ন কিছুই নয়—' বলতে বলতে কিরীটি থামল।

হাতের পাইপটা কখন এক সময় নিবে গিয়েছিল। সেটায় আবার অগ্নিসংযোগ করে কিরীটি তার অসমাপ্ত কাহিনী সুরু করলে।

'এবারে আমি আসবো চতুর্থ অধ্যায়ে। রাণু দেবীর সহাধ্যায়ী কবিতা দেবী! রাণুদের কলকাতার বাসাতেই শতদলের সঙ্গে

কবিতা দেবীর পরিচয় হয়। এবং কবিতা দেবীর মনে সেই পরিচয়টা গাঢ় হয়ে উঠে ভালবাসায় পরিণত হয়। প্রথম Victim সীতা ও দ্বিতীয় Victim হলেন কবিতা দেবী।—'

কবিতা দেবীর দিকে তাকালাম। মাথাটা বুকের পরে ঝুলে পড়েছে তার।

কিরীটি বলে চলে: টের পেলাম আমি ব্যাপারটা একটি প্রবাল পাথর থেকে।

হিরণ্ময়ী দেবী এবার কথা বললেন: সে দিন আপনাকে বলিনি মিঃ রায়! একই ধরণের প্রবাল পাথর দেওয়া দু'টি আংটি ছিল বাবার। একটি দাদা নিয়েছিল অন্যটি আমি নিয়েছিলাম। আমার আংটিটা আমার স্বামীকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলাম—আর দ্বিতীয়টি রণধীর চৌধুরীর মৃত্যুর পর শতদলের হাতে যায়। পরে আমার মনে পড়ে, শতদলের হাতে প্রথম দিন আংটিটা দেখেছিলাম। এবং সেটাই বোধ হয় শতদল কবিতা দেবীকে দেন। কেমন তাই না কবিতা দেবী?—

কবিতা শুধু মৃদু ভাবে ঘাড় নাড়লেন।

'এবং সেই জন্যই পাথরটা কবিতা দেবীর বাইরের ঘরে কুড়িয়ে পাওয়ায় ও পরে কবিতা দেবীর আংটির পাথরটা হারানোর সংবাদে কবিতা দেবী যখন আংটিটা এনে আমাকে দেখালেন চকিতে আমার সব কথা মনে পড়ে গেল ও সেই সঙ্গে সঙ্গে কবিতা দেবী ও শতদলের relationটা চোখের উপরে আমার স্পষ্ট হয়ে উঠলো। বুঝলাম, কবিতা দেবীও শতদলের ফাঁদে পা দিয়ে মজেছেন। ডন জুয়ান শতদল! যাক আবার পূর্বের কথায় ফিরে যাই। সীতাকে হত্যা করবার পরই আমি সাবধান হলাম। শতদলকে আর free রাখতে সাহস হলো না। নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে চোখে চোখে রাখলাম—so that he might not play any more dirty tricks. কিন্তু এবারে কবিতা দেবী হলেন তার সহায়। নার্সিংহোমের ব্যাপারগুলো সব কবিতা দেবীর সাহায্যেই ঘটে। কবিতা দেবীর বাড়িতে সন্দেশ ও ফুল নার্সিংহোমে পাঠাবার জন্য কেউ সংবাদ দেয়নি তাঁকে। A made up story কবিতা দেবীর। শতদলের পরামর্শ মতই কবিতা দেবী যা করবার করেছেন। এদিকে শতদল নার্সিংহোমে বন্দী থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে উঠেছিল, কারণ কুমারেশ একবার যখন ছাড়া পেয়েছে সমস্ত planটাই তার বানচাল হয়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে। সে ভয়ও ছিল, তাই ভুবনার সাহায্যে ফটোটা চুরি করে রাতারাতি এখান হ'তে সরে পড়বার মতলবে ছিল। নার্সিংহোমের জানালা-পথে ধুতি ঝুলিয়ে তার সাহায্যে নেমে গিয়ে নিরালায় যায়। নার্স দুধ নিয়ে যখন তার কেবিনে যায় শতদল আলো নিবিয়ে তখন ঘুমের ভাণ করছে। এবং নার্স চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কেবিন ত্যাগ করে। কিন্তু ধর্মের কল নড়ে উঠলো বাতাসে—ভাগ্যচক্রে সব গেল ভেস্তে—বাধা হয়েই তাকে তাই ছবিটা ফেলে কেবিনে ফিরে আসতে হলো। এবং আবার করতে হলো অভিনয়—তার উপরে আর একবার allempt হয়েছে। কিন্তু তখন বড্ড দেরী হয়ে গিয়েছে। বাঘের থাবায় এসে পড়ে গেছে আগেই।—'

ঘোষাল সাহেব প্রশ্ন করলেন: 'কিন্তু শতদল বাবুই যে সব কিছুর মূলে জানলেন কি করে মিঃ রায় সব-প্রথম?'

'বললাম ত! সীতা নিহত হবার পরই। তার আগে পর্যন্তও সন্দেহটা দৃঢ় হ'তে পারেনি। ভাসা-ভাসা অবস্থাতেই মনের মধ্যে ছিল,—সে রাত্রে সর্বক্ষণই আমার দু'জনার পরে নজর ছিল। একজন সীতা ও অন্য জন শতদল। সীতা ছাদ থেকে নেমে যাওয়ার পরই কিছুক্ষণ বাদে শতদলকে আমি নীচে যেতে দেখেছি। এবং ঠিক তার পশ্চাতেই দেখেছিলাম নীচে যেতে কবিতা দেবীকে। কবিতা দেবীর চিৎকারেই আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, সীতার হত্যার ব্যাপারটা কবিতা দেবী সবটা না জানলেও যে অনেক কিছুই জানেন, সেটা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েই সে রাত্রে বুঝেছিলাম। তখুনি মনে হয় কবিতা দেবী কাউকে shield করছেন deliberately! কিন্তু কাকে, হঠাৎ চকিতে একটা কথা ঐ সঙ্গে মনে হয় কবিতা দেবী শতদলকেই shield করছেন না ত! ভাবতে গিয়ে দেখলাম সেটাই সম্ভব। সেটাই স্বাভাবিক। আর তখন সন্দেহ রইলো না। বুঝলাম এ খেলা শতদলেরই, ইতিমধ্যে রণধীরের চিঠিটার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। তাই শতদলকে দোষী বুঝতে পেরেও strong একটা motive খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কবিতা দেবীর বাড়ি থেকে ফিরবার পথে আংটির পাথর-রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় ব্যাপারটা আর একবার গোড়া থেকে নতুন করে ভাবতে গিয়ে মনে পড়লো চিঠিটার কথা, হোটেলে ফিরেই চিঠিটা নিয়ে বসলাম। ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই সব স্পষ্ট হয়ে গেল, দুয়ে দুয়ে চার অংক মিলে গেল। তখুনি বুঝলাম, গত রাত্রে ছবিটা চুরি করবার চেষ্টা করে যখন হত্যাকারী সফল হয়নি আর একবার সে সম্ভবত ঐ রাত্রেই attempt নেবে, সঙ্গে সঙ্গে নিরালায় গিয়ে হানা দিলাম, এবং অনুমান যে আমার মিথ্যা হয়নি তার প্রমাণও পাওয়া গেল হাতে হাতে।—' কিরীটি তার কথা শেষ করলো।

দিন দুই বাদে ফিরবার পথে ট্রেনের কামরায় কিরীটি বলছিল: হিরণ্ময়ী দেবীর কথাই ঘুরে ফিরে মনে পড়ছে সুব্রত! একমাত্র মেয়ে সীতার মৃত্যুটা সত্যিই বড় মর্মান্তিক হয়েছে তাঁর কাছে, ক্ষুণাক্ষরেও তিনি সন্দেহ করেননি কখনো সীতা শতদলকে ভালবাসে। এবং সেটাই যখন প্রকাশ পেল তাঁর মুখের দিকে যদি তুমি তাকাতে দেখতে কি সর্বস্ব হারানের বেদনাই না তাঁর মুখের 'পরে ফুটে উঠেছিল। একেই বলে মর্মান্তিক বিয়োগান্ত ব্যাপার! যে সম্পত্তির লোভে তিনি নিরালা আঁকড়ে পড়ে ছিলেন সে সম্পত্তিও হস্তগত তাঁর হলোই না। ঐ সঙ্গে হারাতে হলো মর্মান্তিক দুঃখ ও লজ্জার মধ্যে দিয়ে এক মাত্র কন্যাকেও, শতদলও শূন্য হাতে চরম দণ্ডের জন্য অপেক্ষা করছে, হিরণ্ময়ীকেও ফিরে যেতে হলো শূন্য হাতে, সীতাকে শূন্য হাতে বিদায় নিতে হলো। কবিতা ফিরে গেল শূন্য হাতে। রণধীর চৌধুরীর এত সাধের নিরালা তাও পড়ে রইলো শূন্য—কুমারেশ বা রাণু কোন দিনই হয়ত ওখানে পা দেবে না। হিরণ্ময়ী ও হরবিলাস ত দেবেই না!—

কথা শেষ করে কিরীটি পাইপটা মুখে তুলে নিল।

ট্রেণ ছুটে চলেছে কলকাতা অভিমুখে।

শেষ

বাসব ঠাকুর

জমাট বেঁধেছে তখন রাত্রির অন্ধকার। কলকাতা সহর হয়ে এসেছে নিস্তব্ধ।

আমীর আলী এভিনিউতে বাগানওয়ালা বাড়িটার উপর তলায়, দক্ষিণ কোণার একটা ঘরে ব্যারিষ্টার সঞ্জীব রায়ের একমাত্র কন্যা পপি বিছানায় শুয়ে কয়েকটি গল্পের বই নিয়ে নাড়াচাড়া করে শেষ পর্য্যন্ত পড়বার মত মনের অবস্থা নেই দেখে খাটের পাশে টেবিল-ল্যাম্পটা অফ্ করে দেয়। অন্ধকারে চোখ বুজে ভাবতে থাকে বিগত সন্ধ্যার ঘটনাগুলো। ক্লাবের ডান্সে কর্ণেল প্রতীপ সরকার সারা ক্ষণ শুধু ওরই সঙ্গে নেচেছে. নিভা গুপ্তা কি কম চটেছে ওর উপর? আর সেই জন্য বেচারা প্রতীপের উপর এক দল ছেলেরও কি হিংসে! কিন্তু অত বড় একটা অফিসার হলেও প্রতীপ কত লাজুক মেয়েদের কাছে...

হঠাৎ একটা খস্-খস্ আওয়াজ হওয়ায় টেবিল-ল্যাম্পটি জ্বালাতে গিয়ে ও দেখে, ল্যাম্পটা কোথায় সরে গিয়েছে। খোলা জানালা দিয়ে কালো আকাশের তারার আলো যেটুকু ঘরের মধ্যে পৌঁছয় তাতে করে কিছুই ঠিক দেখা যায় না। তবু ওর মনে হয় ঘরের মধ্যে কোন একটি মানুষের নিশ্বাসের শব্দ ও যেন শুনতে পাচ্ছে। আন্দাজে আন্দাজে সুইচবোর্ড অবধি গিয়ে দেয়ালের আলোটা জ্বালতেই হবে এই ভেবে পপি উঠে বসে বিছানার উপর। নিশ্বাসের শব্দটা যেন একেবারে ওর কানের কাছে চলে এসেছে। পাশ ফিরতেই ওর নজরে আসে একটা আবছায়া লোকের মূর্তি! চোর বলে যেই ও চীৎকার করতে যাবে ঠিক সেই সময় একজোড়া বলিষ্ঠ বাহু ওকে জড়িয়ে ধরে, আর ওর ঠোঁটের ওপর দুটো উত্তপ্ত ঠোঁট এসে এমন ভাবে বসে যায় যে আতংকে শিউরে ওঠে ওর সমস্ত শরীর!

ফাল্গুন মাস, দোলের আর দেরী নেই। ফ্যানটা ঘুরছিল তবু ঘরের মধ্যে এত গরম যে পপি শোবার আগে গা থেকে তার নাইট ড্রেসটা খুলে রাখতে বাধ্য হয়েছিল। তা সত্ত্বেও পপি রায়, যার কাছে কর্ণেল সরকারের মতন দুর্দান্ত ছেলেরাও লাজুক বনে যায়, সে তখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। একটা সম্পূর্ণ অজানা লোকের শরীরের সবল মাংসপেশীগুলো ঠেকছে তার নিজের শরীরে। ক্রমশ আতংকের বদলে সে এক নিবিড় পুলকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে থাকে...

ঘরটা তখনও অন্ধকার। গরমে দু'জনেই ওরা একটু ঘেমে উঠেছিল। পপি ক্ষীণ কণ্ঠে অজানা লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলে, "জানো, তোমাকে ভালো করে দেখতে আমার কত ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু এ ঘরে এখন আলো দেখলে বাবা যদি উঠে খবর নিতে আসেন, তাই..."

"সে ভয় নেই, আজ যে অবস্থায় দেখেছি ওনাকে গাড়ি থেকে নামতে, তাতে কাল ১১টার আগে ওঁর যে হুঁস হবে তা বলে তো মনে হয় না। তোমাদের ড্রাইভারটা না ধরলে

উনি তো সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই পারতেন না। সে যাই হ'ক, আলো জ্বালবার দরকার নেই। আর আমি এবার যাই!"

"না, এখনই যেয়ো না, এই তো একটু আগে শুনলে গীর্জের ঘড়িতে মোটে ছুটো বাজলো। কিন্তু কি দুঃসাহসী তুমি? কি করে এলে বল তো আমার ঘরে? বাবা ফিরে এলেই লোহার ফটকটা তো বন্ধ হয়ে যাবার কথা। আর দরোয়ানটারও সমস্ত রাত সজাগ হয়ে শুয়ে থাকবার কথা ঐ ফটকেরই কাছে। ওরা তোমায় বাধা দেয়নি?"

"না, কারণ দোলের বেশী দেরি নেই, তাই তোমাদের বিহারী দরোয়ান আর ড্রাইভারটা দু'জনেই আমাদের সর্দারের সঙ্গে সিদ্ধি খেয়ে প্রায় এখন বেহুঁস হয়ে পড়েছে।"

"তোমাদের সর্দার! তুমি কি তবে?"

"আমি যে কি, তা শুনলে তুমি আর আমাকে এখানে হয়তো এক মুহূর্তও থাকতে দেবে না। চেঁচামেচি করে শেষ কালে একটা যা-তা কাণ্ড বাধিয়ে দেবে, তার চেয়ে এবার আমি যাই, কেমন? কি করে হঠাৎ যে আমার মাথায় এসেছিল এই পাশবিক দুঃসাহস তা জানি না, কিন্তু আজ রাত্রির এই ক'টি ঘণ্টাকে স্মরণ করে বাকি জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে হাসিমুখেই সহ্য করতে পারব বলে মনে হয়।"

"না না, আমি তোমায় যেতে দেবো না। দাও তোমার একটু পরিচয়—বল তোমার জীবনের কাহিনী, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, কিছুই চেঁচামেচি করবো না, তা তুমি যাই হও না কেন। শুধু রাত্রি শেষ না হওয়া পর্যান্ত আমায় ছেড়ে যেও না। আর রোজ রাত্রিতে এমনি করে এসো। এই আমার অনুরোধ।"

"তবে বলি শোনো। অতি অল্প বয়সেই বাপ ও সৎমায়ের অবহেলায় বিরক্ত হয়ে বাড়ী থেকে আমি পালিয়ে যাই। দেশ আমাদের পূর্ববঙ্গে। তারপর কত সহরে ঘুরি, কখনো হোটেলে কাজ করেছি বাসন ধোয়ার, কখনো করেছি কুলীগিরি, কত সময় কেটেছে অনাহারে। কিন্তু তবু আগাছার মতই মজবুত হয়ে ওঠে শরীর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। ক'দিন ধরে তোমাদের বাড়ীর সামনে, নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ, ট্রাম-লাইনে মেরামতের কাজ হচ্ছিল। আমি সেই ট্রাম-লাইন মেরামতের একজন কুলী। রাস্তায় কাজ করতে করতে তোমাকে একদিন মোটর থেকে নামতে দেখে, বুকে আমার জ্বলে উঠে এক দুর্দ্দমনীয় বাসনার আগুন। তাই আজ যখন দেখলুম তোমার বাবার এবং দরোয়ান-ড্রাইভারদের মদ ও সিদ্ধির নেশার চোটে ঐ অবস্থা, তখন হঠাৎ মাথায় এলো এই দুর্ব্বুদ্ধি। দেয়ালের গায়ে-লাগানো ড্রেণের পাইপ বেয়ে উঠে এলুম সোজা তোমার ঘরে। শুনলে তো সব? লজ্জায় ঘৃণায় নিশ্চয় এবার তুমি ডুকরে কেঁদে উঠবে?"

"না না, তা নয় কিন্তু তোমার জীবনের ইতিহাস শুনে সত্যিই কান্না পাচ্ছে যে, এই নাও"—পপি তার গলা থেকে খুলে সোনার হারটা লোকটার মুঠোর মধ্যে দিয়ে বলে, "এটা তোমায় নিতেই হবে। কাল যখন আসবে তখন ঐ ছেঁড়া প্যাণ্টের বদলে দেখি যেন দু'-একটা নতুন জামা-কাপড় কিনে পরেছ।" কথা বলতে বলতে ভোরের হাওয়ায় তন্দ্রায় জড়িয়ে আসছিল ওদের চোখ। তাই পরস্পরের বাহু-বেষ্টিত হয়ে ধীরে ধীরে ওরা ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে পপির যখন ঘুম ভাঙলো ১০টা তখন বেজে গেছে। পপি চোখ মেলে দেখে ঘরের মধ্যে কেউ-ই নেই। তাড়াতাড়ি সে উঠে প'ড়ে ড্রেসিং গাউনটা গায়ের উপর চাপিয়ে নেয়। কাল রাত্রির ঘটনাটা একেবারে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। ঘরের মধ্যে সেই লোকটার কোন কিছুই সে খুঁজে পায় না। সবটাই একটা স্বপ্ন নয়তো? গলার সোনার হার যেটা ও গলা থেকে খুলে কাপড়-জামা কিনবার জন্য লোকটাকে দিয়েছিল সেটা পপির বালিসের পাশে কে যেন যত্ন করে রেখে গেছে। পপি ছুটে বারান্দায় গিয়ে দেখে, সদ্য-মেরামত-করা ট্রাম-লাইনটা চক্ চক্ করছে সকালের রোদ্দুর লেগে। কোথাও কেউ-ই নেই কুলীটুলীরা। পপি খোঁজ নিয়ে জানতে পারে, ভোর পাঁচটায় মেরামতের কাজ সব শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই তাঁবু উঠিয়ে নিয়ে নতুন কাজের সন্ধানে কুলীরা সব কে কোথায় চলে গেছে কে বলতে পারে!····

পাওয়া

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

তোমায় যে চায়, সকল হারায়,
সকল হারায়ে তোমারে সে পায়,—
ব্যথার দেবতা তুমি যে,
আছ অশ্রু-পাথার-কিনারে;
তোমার পরশ-মধু
যে জন চেয়েছে বঁধু,
অশ্রু-সাগরে সে করেছে স্নান,
ভাঙ তুমি তার সব অভিমান,

কাঙাল না হ'লে তোমারে কি পায়?
তুমিও যে কাঁদ তারি বেদনায়!
ভক্তের ভগবান্
নিঃস্বের রাখ মান,
বেদনা জুড়ায়ে দাও,
কোলে তুলে তারে নাও,—
তোমারে যে পায়, সে কি কাঁদে হায়?
সবহারা হ'য়ে, সব ফিরে পায়!

শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জননী রাজকুমারী ভাবেন ক্ষ্যাপা ছেলে বামার কথা। আপন-ভোলা ছেলে তাঁর; সংসারের কোন জ্ঞানই তাঁর নেই; শ্মশানে-মশানে ঘুরে; লোকে কত কি বলে! স্বামীর বন্ধু প্রতিবাসী দুর্গাদাস সরকার নাটোর-রাজ-সরকারের কর্ম্মচারী; তারাপীঠের তত্ত্বাবধান তিনিই করেন। দীনজননী রাণী ভবানী তারা-মায়ের নিত্যপূজা ও ভোগারতির করেছেন বিশেষ ব্যবস্থা; রাজকুমারী দেবীর অনুরোধে ক্ষ্যাপা পেয়েছে তারাপীঠে চাকুরী; কাজ হ'ল, পূজার ফুল তোলা; তার বদলে বামাচরণ মায়ের প্রসাদ পায় আর তার সামান্য কয়েক টাকা মাসোহারা অসহায় সর্বানন্দ-পরিবারের হ'ল বিশেষ সম্বল। কিন্তু তাতেও বাদ সাধলেন বিধাতা; ঈর্ষ্যাকাতর দুষ্ট লোকের অভিযোগে সরকার মশাই হ'লেন দোষী; বামাকে নিয়োগ করায় নাকি তারা-মায়ের সেবার অর্থের অপচয় হচ্ছে! মুর্শিদাবাদ থেকে ছুটে এলেন—এ এলাকার ভারপ্রাপ্ত তদারক মৈত্র মশাই; তিনি বামার মত যোয়ান ছেলেকে দেখে বক্র হাসি হাসলেন; অসহায় বামুনের ছেলে; কাজের বদলে মাইনে দিলে অসহায় পরিবার বেঁচে যায়।

লোভ দেখানো হ'ল মা-গঙ্গার কথা বলে! 'ওরে, বামা, গঙ্গা মাকে দেখতে চাস্? মৈত্র মশাইয়ের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ চলে যা!' মা-গঙ্গা যেন হাতছানি দিয়ে বামাকে ডাকছেন; কুলুকুলু-নাদিনী হরজটা-নিঃস্রাবী গঙ্গা! সন্তান-স্নেহ-বিধুরা বিগলিত-করুণা গঙ্গাকে হর বেঁধে রাখতে পারেন নি; পাগলিনী ধরার বুক করুণা-ধারায় প্লাবিত করে ফলে-ফুলে ধরার সন্তানদের লালনে স্বামি-গৃহ ত্যাগ করেছেন।

মৈত্রের কূট চক্র ব্যর্থ হ'ল। ভাত রাঁধার কাজ কি এই পাগলা বামাকে দিয়ে চলে? সে পড়ে থাকে গঙ্গায়! 'মা, মা' বলে; ডুবের পর ডুব দেয়। সময় যায় কেটে। ভাত পুড়ে যায়, তাতে বামার খেয়াল নেই। এ দিকে বামা দেখে মায়ের স্বপ্ন! জননী রাজকুমারীর শুভ্র মূর্ত্তি তাঁর চোখে ভাসে। তারাপুরের মহাশ্মশান তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে; গঙ্গা মাকে ব'লে,—'আর না মা! আমায় এবার ছেড়ে দে; আমার বড়মা ডাকছে; ছোটমা কাঁদছে!' ডাক বোধ হয় অলক্ষ্যে তাঁর কানে পৌঁছায়। মৈত্র মশাই বিরক্ত না হয়ে মুগ্ধ হ'লেন, ক্ষ্যাপার আপনভোলা ঠাকুরপাগলা ভাব দেখে। বামা গান ধরে:

"কার বা চাকরী কর (রে মন!)
ওরে তুই বা কে, তোর মনিব কে রে,
হলি কার নফর।
মোহাছিবা দিতে হবে, নিকাশ তৈয়ার কর।
ও তোর আমদানীতে শূন্য দেখি,
কর্জ্জ জমা ধর (ওরে মন!)"

* * * *

পট-পরিবর্ত্তন হ'ল; আবার সেই তারাপুর। জননী উঠানে পায়চারী করেন। পাগল ছেলের জন্য তাঁর মন উতলা। 'কোথা সে মুর্শিদাবাদের কাছারি! আমার তারা-পাগলা ছেলে কি তারা-মাকে ছেড়ে থাকতে পারে? কখন খায়, কি করে, কে তাকে খাওয়াবে? পরের চাকরী করতে গিয়েছে। মা, আমি যে ছেলের ভার তোকে দিয়েছি; তুই কেন তাকে পাঠালি মা! আমরা আধ-পেটা খেয়ে থাকব, চাকরীর কাজ নেই; তোর ছেলেকে তুই ফিরিয়ে আন্ মা!'

ঘোরা নিশা। আকাশে আলুলায়িত কুন্তল ছড়িয়ে কে হাসে ওই রমণী! সুপ্ত-শান্ত ধরণীর বুক থেকে হাজারে হাজারে লাখে লাখে ওঠে তৃপ্তির নিশ্বাস। নিশীথিনী মূর্ত্তিতে কার আদি-অন্তহীন বিরাট কোলে শুয়ে আছে ওই লক্ষ-কোটি জীব! সুপ্ত সন্তানের শিয়রে জাগে মা—মহামায়া। বামা পথ-ঘাট-মাঠ ভেঙ্গে চলেছে। মায়ের আর্ত্ত আহ্বান তার কানে পৌঁছেছে: 'বামা, বামা, বামা!' কি এই মায়ার বাঁধন, যে বাঁধনে সারা বিশ্ব বাঁধা পড়েছে! এ কি মোহ? না, না, না, তা' হতে পারে না! মাটির মায়ের মাঝেই মহামায়া লুকিয়ে আছেন, আমার রক্ত-মাংসের দেহধারিণী মা-ই সেই মহামায়ার প্রতীক। ঘরে ঘরে জননীরূপে মহামায়া। তা' না হ'লে সৃষ্টি চলে না। সেই মা আমায় ডাকছে আকুল হয়ে! কানে ভেসে আসে বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দের স্নিগ্ধ ভক্তিশীতল কণ্ঠস্বর—

জ্ঞানেহপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু।
কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা।
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি।
তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া-প্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ।

ওই যে তারা-মায়ের মন্দির! কোন খেয়াল নাই; পর্ণকুটীর-প্রাঙ্গণে মহামায়ার প্রতিমূর্ত্তি বিষাদকাতরা মা যে তার জন্য অপেক্ষা করছেন! এ কি মোহের বাঁধন! এ বাঁধন কি সে ছিঁড়তে পারবে? ছোট ছোট ভাই-বোন্ তার; দাদার মুখ চেয়ে বসে আছে! সহস্র বন্ধন যেন আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে

ধরেছে; ওই বড়মা তারা, মুচকি হাসছেন; আকাশের লক্ষ লক্ষ তারার মধ্যে কার চোখ জ্বল-জ্বল্ করছে? তুলসীতলায় সাঁঝের প্রদীপ জ্বালিয়ে কে দাঁড়িয়ে ওই? দীনা আমার জননী! তুলসীতলার ক্ষুদ্র প্রদীপ আমারই মঙ্গল কামনা করছে, আমারই জীবন-প্রদীপে আলো যোগাচ্ছে; তার এত শক্তি! মনে পড়ে ছোটবেলার কথা, বাবার কথা। পৃথিবীর রোগ-শোক জরা-মৃত্যু কিংবা দুঃখ-কষ্টকে তুচ্ছ করে দাঁড়িয়ে থাকে লালপেড়ে শাড়ীপরা আমাদের মা। মহামায়ার কোল থেকে ছিনিয়ে নিতে চায় তার সন্তানকে। পঞ্চভূতকে দেয় মা রূপ; মহাবায়ু থেকে নিয়ে আসে বায়ু; মহাপ্রাণ এসে মায়ের উদরে সেই পঞ্চভূতের নূতন রূপকে দেয় প্রাণ। তার পর শুভ মুহূর্ত্তে বেজে ওঠে মঙ্গল-শঙ্খ; ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট তুচ্ছ করে আমাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে মা। জ্বল-জ্বল্ করে তাঁর কপালের সিঁদুর। সেই মায়ের সীঁথির সিঁদুর আজ মুছে গিয়েছে; শ্বেতবসনা শিবময়ী আমার মা! এ কি বাঁধনে আমায় বাঁধলি মা? আমার বাঁধন খুলে দে; তুই যে মহামায়া, মায়ারূপে আর আমায় ভোলাস্ নে! রজনীর অন্ধকার ভেদ করে বামার কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়:

"মায়ার বাঁধন খুলে দে মা,
আর যে সইতে পারি নে;
মায়ার মায়ায় বদ্ধ ক'রে
মহামায়ায় ভুলাস নে।
পঞ্চভূতের দেহ-মাঝে
দিবানিশি সকাল-সাঁঝে
ষড়রিপুর আগুন জ্বেলে
আর আমারে পুড়াস নে।"

এই যে সেই চির-পরিচিত গৃহ-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে মায়ারূপিণী মা! 'মা, তুমি এত রাত অবধি এখানে দাঁড়িয়ে! আমি যে বাড়ী ফিরছি, তুমি কি করে জানলে মা?' ভাবে বিভোর বামাচরণ মায়ের চরণে লুটিয়ে পড়ে। স্নিগ্ধ হাস্যে অশ্রুসিক্ত নয়নে রাজকুমারী ছেলের মাথা বুকে চেপে ধরেন; তাঁর হৃদয় কেঁপে কেঁপে শিউরে ওঠে; সুরের লহরী তাঁর মাতৃহৃদয়কে উদ্বেলিত করেছে: 'মায়ার বাঁধন খুলে দে মা, আর যে সইতে পারি নে।' 'এই কচি শিশু! মায়ার বাঁধন তার আবার কিসের? আমারই না সইবার কথা। একা আমি কত করব? তিনি ত হাসিমুখে চলে গেলেন। পুরুষ কি বোঝে নারীর মহাশক্তি? শিশু, পুত্র-কন্যা বা স্বামীর মুখ চেয়ে নারী নিজেকে ভুলে যায়; তারা যে মা!'

• • • •

বামাচরণ তারাপুরে ফিরে এসেছে। আবার তারাপীঠে তার যাতায়াত চলল। কোন দিন বা সেখানে পড়ে থাকে; কৈলাসপতি ব্রজবাসী বাবার পর্ণকুটীরে; ব্রজবাসীর উগ্র মূর্ত্তি, সারা দিন মদে বিভোর! কৌল মোক্ষদানন্দ আর ব্রজবাসীতে চলে সময় সময় গভীর আলোচনা; বামাচরণ মন দিয়ে শোনে; তামাক সেজে দেয়; বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ খুব বড় পণ্ডিত। তিনি বেদপাঠ করেন; নিরক্ষর বামা যেন সব গিলে খায়। যে ব্রজবাসীর ত্রিসীমানা লোকে ভয়ে মাড়ায় না, পিশাচসিদ্ধ বলে যাঁর খ্যাতি বা অখ্যাতি, তাঁরই প্রিয়সহচর হ'ল বামাচরণ। তাঁর উচ্ছিষ্ট খায়; লোকে বলে, সর্ব্বানন্দের ছেলেটা পিশাচ হ'য়ে গেছে! শ্মশানের কুকুরগুলো বামার সহচর; তারা তাঁর ডাক বোঝে; কালু, মালু, ভুলু, পদি, থরহরি, পদি বা শ্বেতফুলি, এই সব নাম বামাচরণ রেখেছে।

এ দিকে আর এক কাণ্ড আরম্ভ হ'ল। গাঁয়ের পথে-ঘাটে, বটতলা, শিমুলতলায় গঙ্গাধর, জটাধর, ধর্ম্মঠাকুর, চণ্ডীমা, প্রভৃতির স্থানে যে সকল গ্রাম্য-দেবতার শিলামূর্ত্তি ছিল, সে সকল অদৃশ্য হ'তে লাগল! লোকে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে এ কি কাণ্ড! কাণ্ড কিন্তু দেখা যায়, দ্বারকার তীরে মহাশ্মশানে বালুর বেদীতে বালুর নৈবিদ্যি সাজিয়ে কে যেন তাঁদের সারবন্দ করে রেখেছে! কেউ স্বপ্নেও ভাবে না যে এটা সম্ভব হতে পারে! এসব ঠাকুরতলা সকলে মান্য করে; সব জাতের লোকেই প্রণতি জানায়; চুরি করা দূরে থাক, ছুঁতেও সাহস করে না। কিন্তু এ রহস্য কেউ ভেদ করতে পারে না। লোকে ভাবে ঘোর কলি এসেছে; পৃথিবী চৌচির হয়ে যাবে; তাই দেবতারা অদৃশ্য হয়েছেন মানুষের পাপে!

এমনি সময় এক দিন আর একটি ঘটনা ঘটে গেল! বৈশাখী খরতাপে মাটি আগুন হয়ে উঠেছে। বামাচরণ চক্রবর্ত্তী-পাড়া দিয়ে চলেছে; সামনে সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দোতলা বাড়িটা যেন হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডাকছে! চেয়ে দেখে দোতলায় দাঁড়িয়ে নধর গঠন ফুটফুটে একটি ছেলে: 'বামা আমায় নিয়ে চল, এখানে জল নেই, আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে; এরা আমায় জলও দেয় না।' স্বপ্নচালিতের মত সেই অজানা ছেলেটির ইঙ্গিতে বারান্দায় ঝোলানো কাপড় বেয়ে বামা ওপরে উঠল; বালকটি তার হাতে

বামদেবের সমাধি-মন্দির—তারাপীঠ মহাশ্মশান

চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর নারায়ণ শিলা দিয়ে বললে "শীগ্‌গির নেমে যা। আমি পরে যাচ্ছি।' বামাচরণ নারায়ণ শিলা নিয়ে শ্মশানের ঘাটে এসে দ্বারকার জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে নারায়ণের তৃষ্ণা দূর করলে। তার পরে সেই বালুর বেদীতে দিলে তাঁকে বসিয়ে।

ইতিমধ্যে চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। শালগ্রাম শিলা চুরি গেছে; চতুর সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী বললেন, 'এ নিশ্চয়ই বামাচরণের কাজ! ছেলেটা পাগল। আমাদের সর্ব্বনাশ করতে লেগেছে!' বহু লোক জড় হয়ে গেল; সকলে তারাপীঠের দিকে ছুটে চলল; দূর থেকে তাদের দেখে বামাচরণ প্রমাদ গণলে। 'ঐ যে সুরেন চক্কোত্তি। সর্ব্বনাশ!' বামাচরণ ছুটে গিয়ে ব্রজবাসীর কুটিরে আশ্রয় নিলে। হৈ-চৈ শুনে ব্রজবাসী বেরিয়ে এসে ব্যাপার জানতে চাইলেন। চক্রবর্ত্তী মশাই ব্যাপারটি খুলে বললেন। বামাচরণও সব স্বীকার করলে, "দোহাই শ্রীগুরু বাবা, আমার কোন দোষ নেই; ওই বদ্ ঠাকুরগুলো, আমায় বলে কি না, নিয়ে চল, এখানে আমরা খেতে পাই নে; আমাদের জল পর্য্যন্ত দেয় না!" ব্রজবাসী গম্ভীর হাসি হাসলেন, 'খবরদার, আর এ রকম অন্যায় কাজ করো না!' যে-যার ঠাকুর নিয়ে বাড়ী ফিরল; বামাচরণ শ্মশানের নিস্তব্ধতা ভেদ করে—তার কণ্ঠে উঠে গান :

"এই দেখ সব মাগীর খেলা।
মাগীর আপ্তভাবে গুপ্তলীলা।
সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ,
ঢেলা দিয়ে ভাঙ্গে ঢেলা,
মাগী সকল বিষয় সমান রাজী,
নারাজ হয় সে কাজের বেলা।"

এ কি রে বাবা! চোরকে বলে চুরি কর, আবার গেরস্তকে বলে, সজাগ থাক। মাগী আবার নিরাকার! আবার কখন হয় সাকার! গুরুবাবা বলেছেন, নিরাকারটাই সাকার হয়ে ধরা দেয় ধরার মানুষকে, নির্গুণ আবার কি রে বাবা! তাই সগুণ হয়ে দয়া-মায়া, ভাবে-ভক্তিতে ভাসিয়ে দেয়। বড় বদ্ ওই সব শাস্ত্রকথা। তারা-মা ব্রহ্মও বটে, আবার দয়াময়ী মা-ও বটে! বড় বদখৎ ও-সব কথা। মা-ই আমার ভাল!

* * * *

কয়েক দিন পর। বামাচরণের মন যেন কি এক চিন্তায় উতলা হয়ে উঠেছে, ছোট ভাই রামচন্দ্র তখন নিতান্ত বালক মাত্র, সাত-আট বছরের বেশী তার বয়স হবে না। ছোট ভাই ও বোনগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে বামাচরণ; চোখে তার অশ্রুধারা! উঠোনের কোণে সেই শিমুলশাখা ফলে-পল্লবে নূতন নূতন রূপ পেয়েছে। তার সঙ্গে জড়িত আছে পিতার স্মৃতি। ওই সেই বেহালা; কে দেয় তাতে সুর? বামাচরণ উদাস-উন্মনা! রাত্রে ঘুম নেই; উঠোনে পায়চারী করে ক্যাপা! এ রকম তিন দিন কাটল; দেবী রাজকুমারী ছেলের অবস্থা দেখে ভয় পান; তাঁর মনে জাগে আতঙ্ক।

রাজকুমারী তারা-মাকে স্মরণ করেন: 'মা আমি যে আমার এ ক্যাপা ছেলেকে তোর হাতে সমর্পণ করেছি মা! সে যে কি চায়, আমি বুঝি না। তাকে শান্ত কর মা! তুই যে সকলের অন্তরের কথা জানিস।' নিশির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ক্যাপা গায়:—

'নেচে নেচে আয় মা শ্যামা,
আমি মা তোর সঙ্গে যাব।
দেখ্‌বো রাঙ্গা পা দুখানি,
বাজবে নূপুর শুনতে পাব।'

'বাবা, রাত অনেক হয়েছে; এবার শুতে আয়; ... যে আর পারি নে।'—বললেন রাজকুমারী।

'মা, তুমি আমায় মুক্তি দাও মা, তুমি যে মা, তোমায় যে আদেশ সইতে হবে।' উত্তর করল বামাচরণ; কণ্ঠে তার ব্যাকুল মিনতি।

'এ সব কি বলছিস্ বাবা, আমার যে কেউ নেই; তোর মুখ চেয়ে সব এত সহ্য করছি; ছোট ছোট ভাই-বোন, এদের কার হাতে দিয়ে যাবি?' বলেন রাজকুমারী, আর্ত-ভয়ার্ত তাঁর কণ্ঠস্বর।

'মা, মা, মা'—বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বামাচরণ মায়ের চরণে লুটিয়ে পড়ে; 'তুমি আমায় মুক্তি দাও মা, তুমি ত আমাকে তারা-মায়ের চরণে সঁপে দিয়েছ; আমি তারা-মায়ের সন্ধানে যাব; আমায় আর বেঁধে রেখো না মা!'

ছেলের মুখ বুকে চেপে ধরে অশ্রুসাগরে ভাসেন রাজকুমারী; ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়; নিশীথিনী শেষ হয়ে আসে প্রায়; ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের স্নিগ্ধ-শীতল বায়ু-প্রবাহ মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করে। জননী ছেলেকে বিদায় দেন। সর্ব্বংসহা ধরণীর বুক যেন ফেটে যায়। রক্ত-মাংসের হাত দুখানি শিথিল হয়ে আসে। মহাকাল প্রকৃতির বুক চিরে যেন হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিয়ে চলে যায়; মহামায়ার মায়ায় মায়ের মায়া ক্ষীণ রেখার মত নিষ্প্রভ হয়ে যায়। কত সীমাবদ্ধ, তুচ্ছ তাঁর শক্তি! মহাশক্তির আকর্ষণে মায়ার শক্তি হয় পরাভূত। মায়ের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বামাচরণের যাত্রা সুরু হয়—সন্ন্যাসের পথে।

তখনও অন্ধকার; গ্রামের পথ-ঘাট ভেঙ্গে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে বামাচরণ; পিছনে তাকাবার আর তার সময় নেই। মায়ার বাঁধন জননীর কৃপায় খুলে গিয়েছে, তার মা সত্যিই তাকে তারা-মায়ের চরণে সঁপে দিয়েছেন। মিথ্যে নয়! এক অনাবিল আনন্দের ঢেউ খেলে মনে। দ্বারকানদী সাঁতরে পার হ'ল বামাচরণ; শ্মশানের ঝোপ-ঝাপে ফেউ, শিয়াল ও শকুনি তখন শান্ত; ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের স্নিগ্ধতার মাঝে ওই অন্ধকারে বিরাট পুরুষ, কে ইনি?—ব্রজবাসী বাবা! বিস্মিত হয় বামাচরণ; ইনি কি অন্তর্যামী?

"গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দেবো গুরুর্গতিঃ।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।"

লুটিয়ে পড়ে বামাচরণ ব্রজবাসীর চরণে; 'তুমি আমায় আশ্রয় দাও; মায়ার বাঁধন কেটে গেছে মায়ের কৃপায়! তুমিই আমার গুরু, তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমিই মহেশ্বর। তুমিই আমার কাছে ব্রহ্মস্বরূপ,—আমায় ত্রাণ কর!'

তান্ত্রিক প্রভায় দীপ্ত ব্রজবাসীর ভৈরব কণ্ঠে নিনাদিত হ'ল, 'তারা, তারা।' 'ওঠ বৎস, তারা-মায়ের নামকীর্ত্তন কর। ভয় কি!' আশ্রম-কুটীরের দিকে এগিয়ে চলেন ব্রজবাসী, তাঁর পিছনে বামাচরণ; আজন্ম ব্রহ্মচারী, বালক-স্বভাব, সহজ-সরল, নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক অষ্টাদশবর্ষীয় তরুণ।
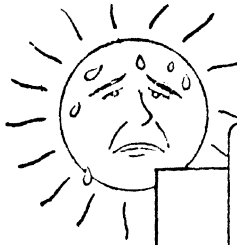
[ক্রমশঃ।

আবার গরম প'ড়লো—
গা বড্ডবেশী চটচটে আর নোংরা বোধ হ'চ্ছে কি ?
ময়লার বীজাণু থেকে প্রতিদিনই আপনার অসুখের সম্ভাবনা আছে।
লাইফবয় মেখে এই সব বীজাণু ধুয়ে ফেলে প্রতিদিন নিজেকে রক্ষা করুন
লাইফবয়ের "রক্ষাকারী ফেনা" আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখে
লাইফবয় সাবান
প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে
LIFEBUOY
SOAP
L. 247-X 52 BG
ভারতে প্রস্তুত
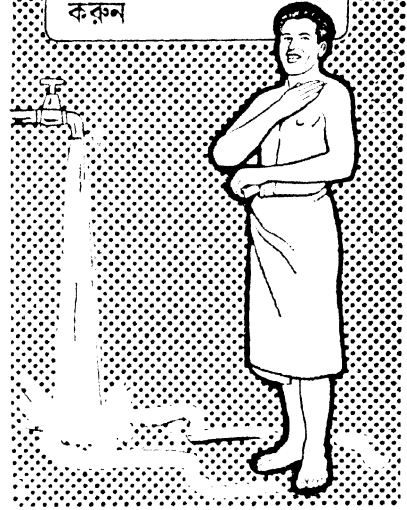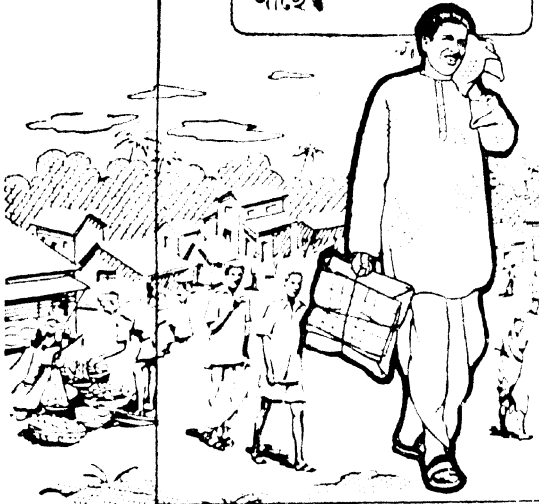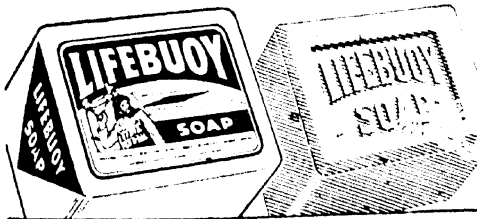
[ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রেতা—এই আলোচনায় আমরা দেশী-বিদেশী সকল ব্যবসায়ীর সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনা করি। সর্ব্বপ্রথম—স্নো, ক্রিম, হেয়ার-অয়েল এবং অন্যান্য সকল প্রকার অঙ্গরাগের উপকরণ প্রস্তুতকারকদের নিকট এই অনুরোধ যে—তাঁহারা যদি তাঁহাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদির নমুনা কিংবা তাহার ফটো এবং বিবরণী আমাদের নিকট পাঠান, আমরা এই সকল দ্রব্যাদির সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের লিখিত সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিব। বলা বাহুল্য, দ্রব্যাদির গুণাগুণ এবং তাহার প্রচার বিষয়ে, যোগ্য হইলে, আমাদের প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে বিস্তারিত হইবে। জামা-কাপড়ের বিষয়েও একই কথা। অন্যান্য পণ্য এবং তাহাদের বাজার ও ক্রেতা সম্পর্কেও আমাদের লক্ষ্য আছে। উপযুক্ত এবং যথোচিত সহযোগিতার অভাব না হইলে আমরা মোটামুটি দেশী এবং বিদেশী সকল পণ্য সম্পর্কেই আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র বিস্তারিত করিব। ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের প্রস্তুত পণ্য সম্পর্কে আমাদের সব কিছু জানাইতে পারেন। আমাদের তরফ হইতে সহযোগিতার কোনো তারতম্য বা অভাব হইবে না।—সম্পাদক মাঃ বসুমতী।]

রাত্রি সাড়ে আটটায় কলকাতা অন্ধকার ?

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য শহরের মধ্যে কলকাতা মহানগরীতে সরকারী আইনানুসারে রাত্রি সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতে দোকান-বাজার সব বন্ধ হ'য়ে যায়। নিয়মানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট কোন এক সময়ে দোকান বন্ধ করা ভালই। এই নিয়ম পৃথিবীর প্রায় সকল বিখ্যাত দেশেই আছে। ডাক্তারখানা, খাবারের দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ প্রভৃতির জন্য শুধু এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। এখানে উল্লেখ করলে হয়তো অন্যায় হবে না, পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেই ঋতুর আনাগোণার সঙ্গে দেশবাসীর জীবনধারার অদল-বদল হ'য়ে থাকে। নিদারুণ শীতকালের নিয়ম দারুণ গ্রীষ্মের সময় প্রয়োগ করা হয় না। আবার গ্রীষ্মে যে রীতির প্রচলন, শীতের সময় তাকে জোর ক'রে চালানো হয় না কখনও। কলকাতা মহানগরীর বা অন্যান্য শহর-মহকুমার দোকান-বাজার প্রভৃতি এই দুর্দ্দান্ত গ্রীষ্মের সময়ে যথারীতি সাড়ে-আটটাতেই বন্ধ হয়ে যায়, যখন শহরবাসীর অনেকেই সবে সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়ে থাকেন এবং সন্ধ্যার হাওয়া খেতে বেরিয়ে অনেকে সওদাও ক'রে থাকেন। দোকান-বাজার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উন্মুক্ত না ক'রে কিঞ্চিৎ বেলায় খুললেও কোন অসুবিধার কারণ থাকে না। রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত দোকান-বাজার খোলা রাখলে এই প্রখর নিদাঘে বরং সুবিধাটাই হয়। এই ব্যবস্থার চালু হ'লে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েরই লাভ।

তা ছাড়া শহরের পথে পথে চুরি জুয়াচুরি, রাহাজানি এবং ডাকাতির ঘন ঘন পুনরাবৃত্তি এই ব্যবস্থায় যথেষ্ট লাঘব হ'তে পারে। রাত্রি সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতে গ্রীষ্মকালেও শহরের পথ অন্ধকারে আবৃত হ'য়ে গেলে চোর-ডাকাতের পোয়াবারো, ক্ষতি শুধু শহরবাসীর এবং ব্যবসায়ীদের। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের এই প্রস্তাবটি বিবেচনা করতে পারেন। পূর্ব্ব নিয়মের যৎসামান্য পরিবর্ত্তনে দোকান-বাজার সাড়ে-আটের পরিবর্তে সাড়ে ন'য়ে বন্ধ করা হোক।
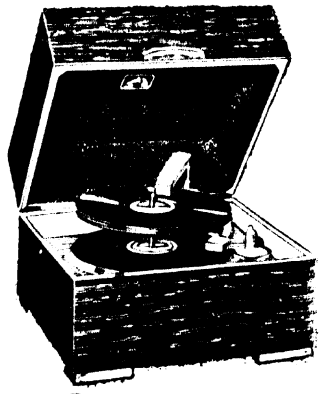
এইচ, এম, ভি অটোমেটিক রেকর্ড-প্লেয়া

বাঙলা দেশে গ্রামোফোনের ব্যবসা

বাঙলা দেশে "ফনোগ্রাফ" নামক যন্ত্রটির প্রচলন খুব বেশী দিন হয়নি। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই গ্রামোফোন বাঙলার ঘরে ঘরে না হ'লেও ধনী সম্প্রদায়ের ড্রইং-রুমে স্থান পেয়েছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে যন্ত্রটির মূল্য যতই হ্রাস পেতে লাগলো ততই তার চাহিদা হয়ে উঠলো অফুরন্ত। সে যুগে বিদেশ থেকে আসতো গ্রামোফোনের যত-কিছু সাজ-সরঞ্জাম, বর্ত্তমানে এই বাঙলা দেশেই তৈরী হচ্ছে বিভিন্ন আকার এবং প্রকারের গ্রামোফোন—যাদের সংখ্যা গণনা করা এক দুরূহ ব্যাপার! সাধারণ ও অখ্যাত ব্যবসায়ীও নিজেদের নামাঙ্কিত গ্রামোফোন তৈরী করছেন এবং বিক্রী করছেন। কাগজে প্রায়ই খ্যাত বা বিখ্যাত গ্রামোফোন ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন দেখা যায়, কিন্তু অখ্যাতদের বিজ্ঞাপন প্রায় দেখাই যায় না। তবুও অখ্যাতদের ব্যবসা স্থানীয় বাজারে ভালই চলে। এবারে আমরা বাঙলা দেশের বিখ্যাত "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" কোম্পানীর তৈয়ারী দু'রকম গ্রামোফোনের সচিত্র বিবরণ প্রকাশ করছি। উক্ত কোম্পানীর নিম্নতম মূল্যের যন্ত্রটিও (মডেল ৮৮) যেমন অপূর্ব্ব তেমনি অটোমেটিক রেকর্ড প্লেয়ার যন্ত্রটিও (মডেল ৫১১৬০) চমৎকার! প্রথমোক্ত যন্ত্রটির মূল্য মাত্র একশো টাকা এবং শেষোক্তটির মূল্য যথাক্রমে দুশো পঁচাত্তর ও তিনশো পঁচাত্তর টাকা। শেষোক্ত যন্ত্রটির দু'ধরণের মডেল আছে। এই যন্ত্রগুলির সুবিধা এই যে, যাদের রেডিও আছে তারা এই যন্ত্রের সাহায্যে রেকর্ড বাজাতে পারেন। এক সঙ্গে দশ থেকে বারোখানি রেকর্ড বাজানো চলবে।

দেশী ইলেকট্রিক পাখা চমৎকার

বাঙলা দেশে কি অসহ্য উত্তাপ! পশ্চিমবঙ্গে যত বেশী শীত না পড়ে তত বেশী গরম অনুভূত হয়। এই জন্তই হয়তো বাঙালীর সভ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে হাওয়া খাওয়ার পাখা। নানা ধরণের পাখা বাঙালী ব্যবহার করেছে। তালপাতার পাখা এখনও আমাদের হাতে হাতে ঘোরে, আমাদের অনেকের ঘরেই আছে টানা-পাখা—অন্ততঃ আমাদের মধ্যে যাঁদের শহরের বাইরে বাস করতে হয়। সরকারের কল্যাণে এখন বিদ্যুৎ সরবরাহ বহু দূরের গ্রামেও সম্ভব হয়েছে, যে জন্ত ইলেকট্রিক পাখার ব্যবহারও দ্রুত গতিতে বেড়েই চলেছে। খসখস টাঙানো ঘরের কড়িকাঠে টানা-পাখা দুলছে—এ দৃশ্য হয়তো আমরা যথাশীঘ্র ভুলেই যাবো। যাই হোক, দেশী ব্যবসায়ীদের মধ্যে দি ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ওয়ার্কশ লিঃ যে সব ধরণের ও গঠনের সস্তা মূল্যের পাখা বাজারে বিক্রয়ার্থ দিয়েছেন সেগুলি বিলাতী অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। এক কালে লোকে জি, ই, সি প্রভৃতির নামেই ভুলে যেতো। এখন দেশী পাখা বিদেশী কোম্পানীর প্রস্তুত বহুমূল্যের পাখাকে সব দিক দিয়ে হার মানিয়েছে। এই সংখ্যায় ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিকের তৈয়ারী বিভিন্ন ধরণের ও মূল্যের পাখার সচিত্র বিবরণ মুদ্রিত হয়েছে।
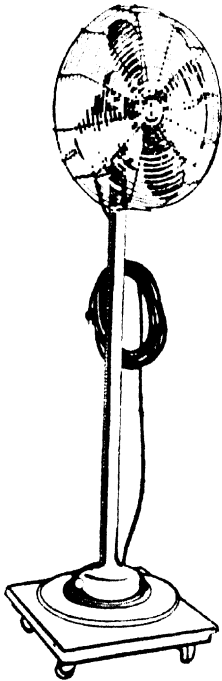
মাত্র এক শত টাকায় পোর্টেবল্ গ্রামোফোন

সিলিং পাখা, মূল্য ১৪৫৲ থেকে ২৪৯৲

পেডেষ্টাল পাখা, মূল্য ১৭০৲ থেকে ১৯০৲

টেবিল পাখা, মূল্য ৯৫৲ থেকে ১২৫৲
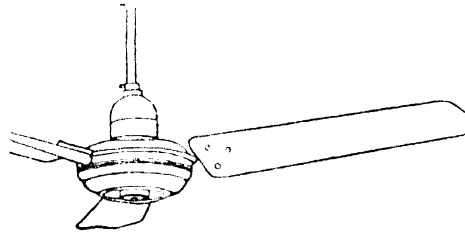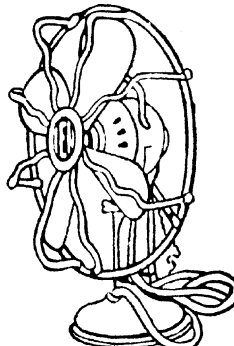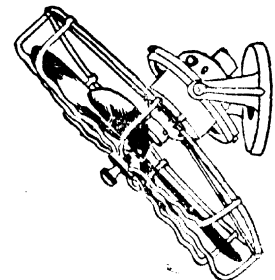
কেবিন পাখা, মূল্য ১০৫৲ থেকে ১২৫৲

দোকান-বাজারকেও বাঁচাতে হবে

কলকাতা শহরের কয়েকটি বিখ্যাত রোড বা স্ট্রীটের দু'ধারে হকারদের সাময়িক দোকান আছে অসংখ্য। আগে এত ছিল না, দেশ ভাগের পরে যত হয়েছে। কলকাতার বহু স্থানে 'হকার্স কর্ণার' পর্য্যন্ত গঠিত হয়েছে। হকারের আধিক্যে কলকাতা উপচে পড়ুক, তাতেও আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু সর্ব্ব দেশেই দোকান এবং হকারদের বিক্রেয় পণ্যের মধ্যে বেশ একটি পার্থক্য থাকে। অর্থাৎ দোকানে যে বস্তু বিক্রী হয় হকার কোন দিন সে বস্তু বিক্রী করে না। আবার হকার যা বিক্রী করে দোকান তার ধারে কিংবা কাছেও ঘেঁষে না। প্রত্যেক দেশেই সরকারের পক্ষ থেকে নির্ব্বাচন ক'রে দেওয়া হয় দোকান এবং হকারদের বিক্রয়ের দ্রব্যাদি।

কলকাতা শহরে বস্ত্র ও পোষাকের দোকান সর্ব্বাধিক। সেই বস্ত্র ও পোষাকের দোকানগুলিকে জোর ক'রে বন্ধ ক'রে বা তুলে দেওয়ার অভিপ্রায়েই কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অসংখ্য হকারদের শুধু মাত্র বস্ত্র ও পোষাক বিক্রয়ের অনুমতি দান ক'রেছেন? এ ক্ষেত্রে কেবল মাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দুষে কোন লাভ নেই, ভারতবর্ষের তাবৎ নামজাদা শহরেই এই একই রীতির প্রচলন হয়েছে। যাই হোক, অন্য প্রদেশে হয়েছে ব'লেই যে কলকাতায় সেই অদ্ভুত নিয়মটির চলন রাখতে হ'বে তার কোন যুক্তিসঙ্গত অর্থ হয় না। বস্ত্র ও পোষাকের দোকানদার শো-কেস সাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে সেলসম্যান পুষে রেখে খরিদ্দারের প্রত্যাশায় হাঁ করে ব'সে থাকবে আর হকারের দল সামান্য মূলধনে স্রেফ গলাবাজীর দ্বারা হাজার হাজার টাকা লুঠতে থাকবে, ভাবতেও আশ্চর্য্য বোধ হয়!

সরকারকেই সিদ্ধান্ত করতে হবে দোকানদার এবং হকারদের বিক্রয়ের পণ্য কি হওয়া সমীচীন। জাতির এক অংশকে বাঁচাতে গিয়ে অন্য এক অংশকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলে চলবে না। সরকারী বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে পরিকল্পনা গঠন করুন। দোকান এবং হকার্স কর্ণার, উভয়কেই রক্ষা করুন।

সাজানো দোকান বা দোকান সাজানো

সে দিন কলকাতার এক স্বর্ণকারের দোকানে আলাপ করছিলাম দোকানের মালিকের সঙ্গে। বৌবাজার স্ট্রীট অঞ্চলের এই দোকানটির সাইন-বোর্ডে সগর্ব্বে ঘোষণা করা হয়েছে "একমাত্র গিনি সোনার আধুনিক ডিজাইনের অলঙ্কার বিক্রেতা" দেখে, কিছু কিনি আর না কিনি মালিকের সঙ্গে পরিচয়ের ইচ্ছাতেই দোকানে ঢুকে প'ড়েছিলাম। আরও যেন কত কি লিখিত ছিল দোকানের এখানে-সেখানে, নানা জায়গায় লেখা ছিল "অলঙ্কারের কল্পতরু," "শিল্পের নিদর্শন", "আপনার পছন্দমত", "অলঙ্কার সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ", "আভিজাত্যপূর্ণ অলঙ্কার", "জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান," "স্বর্ণালঙ্কার আপনার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার সহায়ক" ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। বৌবাজার স্ট্রীটের সারি সারি বিপণিতে জ্বলছে নিওন আলো। শুভ্র আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে সোনা এবং রূপোর শিল্পমাধুর্য্য।

দোকানের মালিক আমার সঙ্গে আলাপ করতে করতে কেবলই দোকানের বাইরে বিপরীত ফুটপাতের কয়েকটি দোকানের প্রতি কটাক্ষপাত করছেন, আমি লক্ষ্য করলাম সাগ্রহে। গয়নাগাঁটির বাজার কেমন জিজ্ঞাসা করতেই বললেন সক্ষোভে,—'যে-দোকানে নিওন আলো আর আয়না সে দোকানে দেখুন কেন কত ভীড়! আমাদের খাঁটি গিনি সোনার কারবার। আমাদের নিওন আলো নেই, আয়না নেই ব'লেই কি খদ্দেরও নেই?'

বললাম,—দোকানের চাকচিক্যই তো আপনাদের কারবারের বিশেষ একটি অঙ্গ।

মালিক বললেন,—তা কি আর বলে দেবেন আপনি? একুশশো টাকার গ্লাস্ আর দু'শো টাকার নিওন আলো—এস্টিমেট নিয়েছি আমি। শেষ পর্য্যন্ত দেখছি মোট তেইশশো টাকা খরচা না করলে—

দি ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ওয়ার্কস লিমিটেডের কারখানায় সারি সারি পাখা, প্রাথমিক নির্ম্মাণ-পর্য্যায়ে

য়ুরোপের রাজধানীগুলিতে শুভেচ্ছা মিশনের সফরে বেরিয়েছে কিশোরী রাজকুমারী প্রিন্সেস্ এ্যান। রাজকুমারীর লণ্ডনের সফর সার্থক হয়েছে। ব্রিটিশ জনসাধারণের অকুণ্ঠিত অভ্যর্থনায় মুখরিত হয়ে উঠেছে চারি দিক। লাবণ্যময়ী রাজকুমারীর মুখের হাসি, মাথায় চুল, চোখের দৃষ্টি, মর্যাদামণ্ডিত অভিজাত-ভঙ্গিমা সকলের অন্তর স্পর্শ করেছে।

কলরব আর ক্লান্তিভরা তিনটি দিন কাটলো লণ্ডনে, তার পর বিমানে আমষ্টারডাম, সেখানে আন্তর্জাতিক ভবনের দ্বারোদঘাটন ও একটি বিরাট সমুদ্রগামী জাহাজের নামকরণ-উৎসব সারতে হ'ল প্রিন্সেস্ এ্যানকে। তার পরদিন পারী, ফ্রান্সের মাটিতে বসে স্বদেশের বাণিজ্যিক উন্নয়নের জন্ত বহুবিধ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হ'ল প্রিন্সেস্ এ্যানকে।

তার পর রোম···
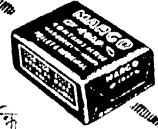
বিরাট সামরিক কুচকাওয়াজ সম্বর্দ্ধনা জানায় রাজকুমারীকে, সংবাদচিত্রের ধারা-বিবরণী দিচ্ছে ঘোষক—"রাজকুমারী এ্যানের দেহে বা মনে এতটুকু ক্লান্তির ছাপ নেই, তাঁর স্বদেশস্থ রাষ্ট্রদূতের ভবনে এক বিশেষ ভোজসভায় রাজকুমারী সহাস্যে অভিনন্দন জানাচ্ছেন সবাইকে।"

অনেক রাতে এ্যামবাসী ভবনে বল-নাচের আসর ভাঙলো! বিছানায় অবসাদ-ক্লিষ্ট ক্লান্ত তনু মেলে দিয়েছে কোমলাঙ্গী এ্যান, ঘুমের স্নেহ-কোমল স্পর্শটুকু পাওয়ার আগে মাথায় ব্রাস ঘস্‌ছে, সামনে দাঁড়িয়ে বর্ষীয়সী কাউণ্টেস্ ভেরেবার্গ। কাউণ্টেস্ প্রিন্সেস্ এ্যানের একান্ত সহচরী ও অভিভাবিকা। এ্যান বলে ওঠে—"এই নাইট গাউনটা বড় বিশ্রী লাগে আমার, পাজামা পরে শুলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে শুনি?"

এই বিস্ময়কর উক্তিতে আহত হ'লেন কাউণ্টেস্।

কাছাকাছি একটা পার্কে নাচ-গানের উৎসব হচ্ছিল। বিছানা ছেড়ে জানলায় এসে দাঁড়ালো এ্যান। সতর্ক প্রহরী কাউণ্টেস্ তাকে জানলার ধার থেকে সরিয়ে এনে বিছানায় শুইয়ে দিল, সেই সঙ্গে ট্রে সাজিয়ে এল দুধ আর বিস্কুট। আবার বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হ'ল রাজকুমারীর কণ্ঠে—

"আমরা যা কিছু করব সবই পুষ্টিকর হওয়া চাই।"

চোখের চশমা-জোড়া ঠিক করে নিয়ে কাউণ্টেস্ আগামী ক্লান্তিকর কার্যসূচী পাঠ করে শোনাতে থাকেন। সকালে এ্যামবাসীর কর্মচারীদের সঙ্গে ব্রেকফাষ্ট সেরে নিয়ে যেতে হবে "পলিনারী অটোমোটিভ ওয়ার্কসে," তার পর কৃষিশালা পরিদর্শন, অতঃপর অনাথ আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন—গেল সোমবারের বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি।

ক্লান্ত এ্যান বলে উঠে—"তারুণ্য ও প্রগতি।"

"এগারোটা পঁয়তাল্লিশে এ্যামবাসীতে ফিরে প্রেস কনফারেন্স।"

নিষ্প্রাণ গলায় রাজকুমারী বলে—"মাধুর্য ও সৌজন্ম।"

তার পর লাঞ্চ সেরে পুলিস গার্ড পরিদর্শন। প্রায় মনে মনেই বলে ওঠে এ্যান—"হাউ ডু ইউ ডু, চার্মড!"

(মূল কাহিনী—আয়ান ম্যাকলিন হান্টার)

এর পর চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ে কিশোরী এ্যান, বলে—"থামো! থামো! আর বলতে হবে না।"

কাউন্টেস্ তৎক্ষণাৎ বলল—"নার্ভ ঠিক নেই, ডাক্তারকে খবর দিই।" কিছুক্ষণ পরে কাউন্টেস্ ডাঃ বনাকোভেনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। ততক্ষণে শান্ত হয়েছে এ্যান্।

রাজকুমারী শান্ত গলায় বলে—"লজ্জা করে ডাঃ বনাকোভেন, হঠাৎ কেমন কান্না এল।"

কাউন্টেস বললেন—"প্রেস্ কনফারেন্সের আগে অন্ততঃ বেশ শান্ত ও সুস্থির থাকা চাই ডাঃ বনাকোভেন।"

এ্যান প্রতিজ্ঞা করে, "আমি শান্ত ও সুস্থির থাকবো, আমি মিষ্টি করে হাসবো, বাণিজ্যিক সম্পর্কের যাতে উন্নতি হয় তার চেষ্টা করবো।"

কিন্তু আবার সেই কান্না, চাপা কান্নায় আকুল হয়েছে এ্যান। আর হাইপোডারমিক গায়ে ফুটিয়ে ডাক্তার বলে ওঠে—"ইওর হাইনেস্ এইবার বেশ সুস্থ হবেন, আমি ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি। নতুন ওষুধ, একেবারে নির্দোষ ওষুধ।"

বিছানায় এ্যানকে শুইয়ে রেখে ডাক্তার বললে: "ওষুধটা কাজে লাগাতে একটু সময় লাগবে, একটু স্থির হয়ে শুয়ে থাকুন।"

"একটু আলো জ্বেলে রাখতে পারি?"

কাউন্টেস্‌কে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ডাক্তার বললেন—"নিশ্চয়ই, এখন কিছুক্ষণ আপনি যা খুশী করতে পারেন।"

'যা খুশী করতে পারেন'! কত দিন আগে সে যা খুশী করেছে, জ্ঞান হওয়ার পর ত' নয়ই। ইতিমধ্যে সেই পার্ক থেকে আবার এক প্রচণ্ড হাস্যরোল শোনা গেল। সেই খোলা জানলায় দাঁড়িয়ে সেদিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইল এ্যান।

'কিছুক্ষণ যা খুশী তাই করতে পারেন!'—ডাক্তার নিজে বলে গেল। সহসা লম্বা চুল বেঁধে ফেলল—অতি দ্রুতভঙ্গীতে সাজসজ্জা করলো এ্যান, দরজার প্রহরীর চোখে ধূলো দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাতায়নপথে নেমে পড়ল রাজকুমারী, তাড়াতাড়ি অন্ধালোকিত সিঁড়ি বেয়ে একেবারে সদরে এসে পৌঁছলো, সেখানে খোরাকখানার ট্রাক দাঁড়িয়েছিল, ড্রাইভার আসার আগেই তাড়াতাড়ি সেই ট্রাকে উঠে পড়ল এ্যান।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ট্রাক এ্যামবাসী ভবনের গেট পার হয়ে বেরিয়ে পড়ল,—পথ চলতে দেখা যায় পথের ধারে কাফেতে প্রেমিক যুগল পরমানন্দে হাসছে। সেই দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে রাজকুমারী। বেশ ঝিমুনি ধরেছে, হঠাৎ পথের বাঁকে বিকট শব্দে ব্রেক কষে ট্রাকটা দাঁড়াতেই চমক ভাঙলো এ্যানের, তাড়াতাড়ি ট্রাক থেকে নেমে পড়ে নিকটস্থ পার্কের পথ ধরে একটা বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়ল—এইটুকু তার মনে আছে।

পার্কের কাছাকাছি এক হোটেলে এক দল আমেরিকান সাংবাদিকের তাস খেলা শেষ হ'ল। জো ব্রাডলী চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। দীর্ঘ তনু, শীর্ণ অঙ্গ, অথচ লোকটির আকর্ষণীয় আকৃতির সামনে সুচেহারাও ম্লান হয়ে যায়,—খেলায় জিতে কয়েকটি লায়ার (ইতালীয় মুদ্রা) পেয়েছিল জো—তাতে তার মুখে হাসি ধরে না।

দাড়িওলা আরভিং র্যাডোভিচ, সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফার, হাই তুলে বলে—"তাড়াতাড়ি উঠতে হবে, কাল আবার হার রয়েল হাইনেসের কাছে যাওয়ার কথা,—অনুগ্রহ করে কয়েকটি ছবির পোজ দেবেন কথা দিয়েছেন।"

জো প্রশ্ন করে—"সকাল সকাল মানে? আমার ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণ হ'ল এগারোটা পঁয়তাল্লিশ—" তার পর সকলের দিকে হাত তুলে বলে, "রাজকুমারী এ্যানের পার্টিতে কাল সকালে আবার দেখা হবে।"

পার্কের ধার দিয়ে চলার সময় জো ব্রাডলীর চোখে পড়ল এক ধারে বেঞ্চে শুয়ে চমৎকার একটি মেয়ে—এত গভীর ঘুম যে, প্রায় গড়িয়ে পড়ে আর কি। তার কাঁধে হাত দিতেই মেয়েটি গুঞ্জনের সুরে বলে ওঠে, "ভারী আনন্দ হ'ল, কেমন আছো সব?"

জো চীৎকার বলে—"এই, উঠে পড়ো।"

মেয়েটি নম্র ভাবে জবাব দেয়,—"না, ধন্যবাদ, আপনি বরং বসুন।"

"উঠে বসো,—শুনছো!"

মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুমজড়িত কণ্ঠে বলে—"ছুটো পনেরো, বাড়ি ফিরে এসে পোষাক বদলাতে হবে।"

"যারা হজম করতে পারে না, তারা মদ টানে কেন?"

স্বপ্নের ঘোরে মেয়েটি বলে—

"If I were dead and buried
and I heard your voice,
beneath the sod of my heart of dust
would still rejoice—"

জানেন কবিতাটা?"

"বাঃ,—বেশ শিক্ষিত দেখছি, পোষাকও বেশ পরিপাটি, এদিকে রাজপথে পড়ে আছো, এখন একটা বিবৃতি দেবে নাকি?" কণ্ঠস্বরে শ্লেষের আভাষ পাওয়া যায়।

অসংলগ্ন ভাবে কয়েকটি কথা বলে মেয়েটি আবার পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করে,—জো তাকে টেনে ধরে দাঁড় করায়। একটা ট্যাক্সি ডেকে বলে, "চলে এসো, ট্যাক্সিটায় উঠে বাড়ি যাও, কাছে টাকা-পয়সা আছে ত?"

"ও-সব বালাই আমার নেই, টাকা আমার কাছে থাকে না।"

"কোথায় থাকে?"

অস্ফুট কণ্ঠে মেয়েটি বলে—"কলিসিউম।" শুনে ব্রাডলী বলল, "ততটা নেশা হয়নি দেখছি!" তখন মেয়েটি বলল—"তুমি ত' বেশ স্মার্ট, মদ আমি খাইনি, তবে আজ আমার ভারী আনন্দ।"

জোর করে মেয়েটিকে ট্যাক্সিতে তুলে ব্রাডলী ড্রাইভারকে নিজের ঠিকানা বলে দেয়। জো'র মনে হ'ল নিজের বাসায় নেমে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে একটু বেশী টাকা দিয়ে মেয়েটিকে তার বাড়ি পৌঁছে দিতে বলবে। কিন্তু জো ব্রাডলীর বাসায় পৌঁছানোর পর ট্যাক্সি-ড্রাইভার মেয়েটিকেও ঠেলে বার করে দেয়,—বলে, "আমার ট্যাক্সিটা ঘুমবোর জায়গা নয়।"

বিরক্ত জো ভাবে কি বিপদ, মেয়েটা নিশ্চয়ই তার সমস্যা নয়। কিন্তু তাকে ঠিক ফেলে দেওয়া যায় না। পথে ফেলে গেলে পুলিসে ধরবে। মেয়েটাকে টেনে তুলতে তুলতে জো আপন মনে বলে—"আমার মাথাটা দেখছি পরীক্ষা করা দরকার।"

ছোট্ট ঘরটি-তে পৌঁছে মেয়েটি প্রশ্ন করে—"এটা বুঝি এলিভেটর?" জো জবাব দেয়—"আমার বাসা।"

একটি চেয়ারে বসে পড়ে মেয়েটি বলে—"খুবই লজ্জা বোধ করছি, তবু না বলেও পারছি না আমার মাথাটা ভীষণ ঘুরছে, আমি এখানে একটু শুতে পারি?"

উৎসাহহীন কণ্ঠে জো বলে—"সেই রকমই ত' মনে হচ্ছে!"

"একটা সিল্ক নাইট-গাউন পাওয়া যাবে,—গায়ে গোলাপ ফুলের বুটি দেওয়া থাকবে!"

আলমারি থেকে একটা ডোরাকাটা পায়জামা বার করে জো ব্রাডলী বলে—"আপাতত তুধের সাধ এই ঘোলে মেটাতে হবে।"

উত্তেজিত কণ্ঠে মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠে—"পায়জামা! পায়জামা!" কথার অর্থ ঠিক না বুঝে জো বলে, "কি করি বলো, বহু কাল নাইট-গাউন পরা ছেড়ে দিয়েছি।"

ব্লাউজ আর স্কার্ট সামলাতে মেয়েটির কুণ্ঠিত ব্রীড়ানম্র ভঙ্গী দেখে জো ব্রাডলী বললে—"আমি বরং বাইরে গিয়ে একটু কফি খেয়ে আসি, তুমি ঐ কাউচে শুয়ে পড়ো।"

মাথা নেড়ে গম্ভীর গলায় মেয়েটি বলে—"বেশ, আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম"—দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে জো ব্রাডলি বললে—"ধন্যবাদ! অশেষ ধন্যবাদ!"

সেই মুহূর্তে এ্যামব্যাসী ভবনে রাজকুমারীর আকস্মিক অন্তর্ধানে বিশেষ উদ্বেগ সঞ্চারিত হয়েছে। রাষ্ট্রদূত গম্ভীর গলায় বললেন—"রাজকুমারী সিংহাসনের সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারিণী। এই সংবাদ একান্ত গোপনীয় রাখতে হবে।"

জো যখন ফিরে এল তখন সেই শ্রান্ত মেয়েটি গভীর ঘুমে মগ্ন। বিছানায় শুয়ে পড়ল ব্রাডলী,—জান্‌লো না সেই মুহূর্তে সমস্ত সংবাদপত্রে এ্যামবাসী থেকে স্পেশাল বুলেটিন পাঠানো হ'ল, "হার হাইনেস প্রিন্সেস এ্যান সহসা অসুস্থ হওয়ায় সব কার্যক্রম বাতিল করা হ'ল···"

পরদিন সকালে এলার্ম ঘড়ি বেজে গেল তবু জো ব্রাডলীর ঘুম ভাঙে না, অবশেষে তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে বলে—"এই রে—প্রিন্সেসের সঙ্গে ইণ্টারভিউ—এগারোটা পঁয়তাল্লিশ!"

এইটুকু শুনে পাশের কাউচ থেকে মেয়েটি চাপা গলায় বলল—"চুপ!" অন্যমনস্ক ভাবে বেরিয়ে যায় ব্রাডলী, মন ভালো নেই, এনই গিয়েথ নিউজ এডিটার হেনেসীকে একটা ইণ্টারভিউ সম্পর্কে মনগড়া কাহিনী শোনাতে হবে।

সংবাদ-প্রতিষ্ঠানে পৌঁছতেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনেসী প্রশ্ন করল—"কি হে একেবারে ইণ্টারভিউ সেরে এলে নাকি?"

জো তাকে আশ্বস্ত করে বলে—"এই তো ফিরছি।" তার পর রঙ ফলিয়ে রাজকুমারীর গুণগান করে। ঠিক কি রঙের গাউন পরেছিলেন মনে নেই।

হেনেসী বলল, "চমৎকার বিবরণ!" তার পর গম্ভীর গলায় বললে—"কিন্তু রাজকুমারী কাল রাত তিনটে থেকে হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার সব কার্যসূচী বাতিল হয়ে গেছে।" রোমের সমস্ত প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানার লাইন দিয়ে তারই সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদপত্রের সেই প্রথম পৃষ্ঠায় জো সবিস্ময়ে একটি মাত্র বস্তু দেখল—সেটি রাজকুমারীর ছবি!—তার ঘরের কাউচে যে মেয়েটি ঘুমে অচেতন—সেই প্রিন্সেস্!

হেনেসী বলে ওঠে—"প্রিনসেস্! বেশ ভালো করে দেখে নাও। আবার কোনো দিন দেখা হবে হয়ত। ভয় নেই তোমার চাকরী যাবে না!, চাকরী যখন যাব তখন আর তোমার কথা বলার সময় থাকবে না।"

জো'র ভঙ্গীতে কেমন একটা চাঞ্চল্য। সে প্রশ্ন করে, "রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রকৃত বিবরণের জন্য কত টাকা পাওয়া যেতে পারে? রোমের বিশেষ প্রতিনিধির সঙ্গে রাজকুমারী এ্যানের গোপন ও অন্তরঙ্গ ইনটারভিউ এবং তার সচিত্র বিবরণ?"

হেনেসী বলল—"যে কোনো সংবাদ-প্রতিষ্ঠান এর জন্য চার-পাঁচশো টাকা দিতে পারে। কিন্তু ব্রাডলী এই উদ্ভট ইনটারভিউ তোমার হবে কোথায়? রাজকুমারী আজ রোগশয্যায়, আগামী কাল এথেন্সে চলে যাবেন।"

জো চলে যাচ্ছিল সেই সময় হেনেসী বলে উঠল—"আমি একটা বাজী ধরছি—আরো পাঁচশ টাকা, এই ইনটারভিউ তুমি আনতে পারবে না।"

জো বলল—"এই বাজী আমি জিতব, আর সেই টাকায় নিউ ইয়র্ক যাওয়ার এক পিঠের ভাড়া হবে।"

রাজকুমারী তখনও ঘুমে অচেতন। জো অতি মৃদু পায়ে বাসায় ফিরে কোমল কণ্ঠে বলল—"ইওর হাইনেস—"

বালিসে মাথাটা নড়ল—রাজকুমারী বলল—"আঃ ডাঃ বনাকোভেন! আমি স্বপ্ন দেখছিলাম রাস্তায় শুয়ে আছি, একজন সুদর্শন যুবা পুরুষ এলেন, বেশ বলিষ্ঠ এবং লম্বা চেহারা, আর লোকটা যে কি"—ঠোঁটের ডগায় হাসি ফুটে উঠল রাজকুমারীর—"চমৎকার!"

এতক্ষণে চোখ মেলে জো'র মুখের দিকে তাকিয়ে রাজকুমারী প্রশ্ন করল—"আমি এখন কোথায় বলতে পারেন?" তার পর এই ঘরটি জো ব্রাডলীর বাসা এই কথা শুনে দৃপ্ত ভঙ্গীতে রাজকুমারী বলে ওঠে—"আমাকে এখানে জোর করে এনেছেন?"

চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে জো ব্রাডলীর—সে বলে ওঠে—"না, ঠিক তার উল্টোটাই ঘটেছে।"

"তাহলে, এইখানে, আপনার সঙ্গে সারা রাত কেটেছে?"

মাথা নেড়ে ব্রাডলী বলল—"ঠিক ঐ কথাগুলি বলা যাবে কি না বলতে পারি না, তবে কতকটা সেই রকম বটে।"

এতক্ষণে রাজকুমারী হাসলেন, মাপা হাসি নয়, রীতিমত আনন্দের হাসি। ব্রাডলীকে অভিবাদন জানালেন রাজকুমারী প্রত্যভিবাদন জানিয়ে জো প্রশ্ন করে, "আপনার নাম কি?"

রাজকুমারী ইতস্ততঃ করে বলে—"আমার নাম এ্যানিয়া। ক'টা বেজেছে এখন?"

একটা বেজে গেছে শুনে রাজকুমারীর মুখের হাসি ম্লান হয়ে গেল, সহসা বলে ওঠে—"আমাকে এখনই যেতে হবে?"

জো বাইরে বেরিয়ে গিয়ে রাডোভিচকে ফোন করে জানালো, বিশেষ জরুরী ব্যাপার, ফটো তুলতে হবে, তাড়াতাড়ি এসো।

আরভিং রাডোভিচ বলল—"আমি বড় ব্যস্ত, এখন যেতে পারবো না।"

জো ক্ষুন্ন মনে ঘরে ফিরে এল। রাজকুমারীর সাজসজ্জা শেষ হয়েছে। রাজকুমারী বললে—"আমি শুধু আপনার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার অপেক্ষায় বসে আছি।"

ব্রাডলী পৌঁছে দিতে চাইল, মেয়েটি ধন্যবাদ জানিয়ে বলল—"আমি খুঁজে নেব'খন।"

মেয়েটি চলে যাওয়ার পর জো বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে দেখছিল, তার পর দৌড়ে নীচে গিয়ে বলল—"পৃথিবীটা অনেক ছোট।"

হেসে মেয়েটি বলল—"ভুলে যাবার চেষ্টা করব। আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারেন?"

গত রজনীর তাসের বাজীতে পাওয়া কিছু টাকা পকেটে ছিল—হাজার লায়ার (ইতালীয় মুদ্রা, ভারতীয় হিসাবে প্রায় সাড়ে সাত টাকা)—জো ব্রাডলী বলল—এই টাকা আধাআধি ভাগ করে নেওয়া যাক।"

কৃতজ্ঞ চিত্তে সেই টাকা গ্রহণ করল রাজকুমারী, তার পর বলল, "টাকাটা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করব।" এই বলে রাজকুমারী পথে নামল।

জো বিদায় জানিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করল না,—কিন্তু মোড়ের মাথায় মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গেই দ্রুত পদক্ষেপে তার পিছু নিল জো ব্রাডলী।

রাজকুমারী টাকাটা নিয়েছিল ট্যাক্সি ধরে এ্যামবাসী ভবনে ফেরার উদ্দেশ্যে। কিন্তু জীবনে সে কখনও একা বাইরে বেরোয়নি। তাই বাজার আর দোকান দেখে তার মাথা গুলিয়ে গেল। একটা চুলকাটার দোকানের সামনে কেশ-প্রসাধনের বিভিন্ন ছবি দেখে লুব্ধ হয়ে ঢুকলো সেখানে। সুদর্শন তরুণ নাপিত মেরিও তার চুলের প্রশংসা করে এবং সেই চুল ছাঁটতে চায় জেনে বিস্মিত ও আতঙ্কিত হয়। কিন্তু চুল ছাঁটা শেষ করে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায় মেরিও, একেবারে মোহিত হ'ল রোমিও। প্রিন্সেসকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলে—"আজ রাতে নাচের আসরে এসো না—টাইবার নদীর ওপর বোটের ওপর—চাঁদের আলো, গান আর নাচ, রীতিমত রোমান্টিক পরিবেশ। তুমি যদি আসো চমৎকার হবে।"

রাজকুমারী ধন্যবাদ জানিয়ে বলে—"না' আমার অন্য কাজ আছে।" মেরিও তবু অনুরোধ জানায়—বলে, "তবু যদি সময় করতে পারো।"

পথের ধারে আইসক্রীম কিনে একটা নির্জন সিঁড়ির ওপর বসে পরমানন্দে খাচ্ছিল রাজকুমারী। এমন সময় জো ব্রাডলী এসে হাজির। রাজকুমারীকে দেখে বিস্ময়ের ভাণ করে বলে—"আপনি যে! না আর কেউ!"

আগ্রহভরে এ্যান প্রশ্ন করে—"কি পছন্দ হয়?"

ওর পাশে বসে পড়ে বলে জো ব্রাডলী—"এই তাহ'লে আপনার জরুরী কাজ?"

মেয়েটি ঠাণ্ডা গলায় বলে—"দেখুন, আমার একটা স্বীকারোক্তি করা প্রয়োজন, আমি কাল রাতে পালিয়ে এসেছি, স্কুল থেকে পালিয়েছি। দু'-এক ঘণ্টার জন্য বেরিয়ে এই বিপদ।" তার পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে পড়ে বলে, "আমাকে এখন উঠতে হয়। একটা বরং ট্যাক্সি ডেকে নিই।"

"দেখুন—এক কাজ করুন, আর একটু সময় হাতে নিয়ে বরং একটু ছুটি নিন, এই ধরুন সারা দিনটা।"

ওর চমৎকার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সত্যি এই ত' সে চেয়েছিল। সে বলে ওঠে—"আমিও ঠিক সারাদিন ধরে যা খুসী করে বেড়াব মনে করছিলুম। পথের ধারে একটা কাফেতে বসা যাক্, কিংবা দোকানের জানলায় তাকিয়ে থাকি। কত মজা,—কত আনন্দ!"

উৎসাহভরে জো বলে, "বেশ ত' দু'জনে মিলেই একটু ফুর্ত্তি করা যাক্।" তার হাত দুটি ধরে জো বলে, "প্রথম ইচ্ছা পূরণ হোক, পথের ধারে কাফেতে বসা যাক্। কাছাকাছির মধ্যেই ত' রয়েছে 'Rocca'।"

কাফেতে পাশাপাশি চেয়ারে বসে জো বলে—"স্কুলের মেয়েরা তোমার এই নূতন ধরণের ছাঁটা চুল দেখে কি বলবে?"

সহসা মেয়েটি বলে ওঠে—"একেবারে মূর্চ্ছা যাবে, আর যদি শোনে আপনার ঘরে সারা রাত কাটিয়েছি, তাহলেই বা কি ভাববে!"

গম্ভীর গলায় জো বলে, "এক কাজ করুন, আমিও কাউকে বলবো না, আপনিও কাউকে সে সব কথা জানাবেন না।"

কিছুক্ষণ পরে হোটেলের ওয়েটারে এসে দাঁড়াতেই জো প্রশ্ন করে—"পানীয় হিসাবে কি নেওয়া হবে?"

মেয়েটি বলল—"স্যাম্পেন! কদাচিৎ ও-জিনিষটা খাই, গেল বারে খেয়েছিলাম একটা সাম্বৎসরিক উৎসবে, বাবার—বাবার চাকুরী পাওয়ার চল্লিশতম উৎসব।

জো হেসে প্রশ্ন করে—"কি কাজ করেন আপনার বাবা?"

—"এই জন-সংযোগ রক্ষার কাজ আর কি, যাকে বলে পাবলিক রিলেশনস্। আপনি কি করেন?"

"এই কেনা-বেচার কাজ আর কি!" এমন সময় দূরে আরভিং আসছে দেখা গেল। তার বান্ধবী ফ্রানচেস্কার সঙ্গে দেখা করতে আসছে। জো তাকে এক রকম জোর করে চেয়ারে বসিয়ে বলে—"এই হ'ল আরভিং রাডোভিচ আর ইনি অ্যানিয়া"—রাজকুমারী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—"অ্যানিয়া স্মিথ।"

উল্লাসভরে কি বলতে যাচ্ছিল রাডোভিচ,—পা দিয়ে আঘাত করে জো তাকে সতর্ক করে। তার পর তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে, "সিগারেট লাইটারটা আছে?" রাডোভিচের সিগারেট

লাইটারের ভেতরই ক্যামেরা আছে। যার ছবি নেওয়া হয় সে কিছুই জানতে পারে না। জো বলে, "মেয়েটি জানে না আমরা কি করি, সুতরাং আমার সংবাদকাহিনী আর তোমার ছবি একেবারে রাজযোটক।"

প্রথমটা প্রতিবাদ জানায় রাডোভিচ কিন্তু পরে যখন ভাবে চমৎকার "স্কুপ" করা যাবে, তখন রাজী হয়।

দু'জনে টেবলে ফিরে এল. জো এ্যানকে একটি সিগারেট উপহার দেয়, রাজকুমারী বলে ওঠে—"জীবনে এই প্রথম ধূমপান।"

রাডোভিচের সিগারেট লাইটার জ্বলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ক্যামেরার ছবি ওঠে।

ইতিমধ্যে সারা রোম নগরীতে অসংখ্য গোয়েন্দা রাজকুমারী এ্যানকে খুঁজতে বেরিয়েছে।

সংযত শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনে রাজকুমারী কখনও এত হাসতে পারেনি, পারেনি এত আনন্দে অংশ গ্রহণ করতে। প্রথমে একটা মোটর-বাইকে প্রমোদ-ভ্রমণে বেরোল, পিছনে রাডোভিচ গোপনে ফটো তুলে চলেছে।

রাজকুমারীকে কিছুক্ষণের জন্য পুলিস কোর্টে যেতে হয়। মোটর-বাইকে আইনমাফিক বসেনি,—জো'র পরিচয়-পত্রে ওরা ছাড়া পেল। বিস্মিত এ্যান প্রশ্ন করে 'নিউজ সার্ভিস' সম্পর্কে, জো জবাব দেয়—"ও যা হয় একটা বললেই ছেড়ে দেয়। বিশেষ প্রেসের নাম করলে ত' কথাই নেই।"

সেই রাতে চন্দ্রালোকিত নৌকাবক্ষে নাচের আসরে এ্যানকে ওরা নিয়ে গেল। মেরিও এইখানেই নিমন্ত্রণ করেছিল। যে রাজকুমারী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে নেচেছে সেই নাচতে থাকে জো'র সঙ্গে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত। পরে মেরিও এসে নাচের আসরে যোগ দেয়, রাজকুমারী সেই নাপিতের সঙ্গে নাচল।

ইতিমধ্যে পুলিসের গুপ্তচরে নদীবক্ষস্থিত সেই ভাসমান হোটেল ভরে গেছে। তারা সাদা পোষাকে এসেছে, কেউ তাদের চিনতে পারেনি।

একজন ডিটেকটিভ রাজকুমারীকে ধরে নিয়ে বলে—"ইওর হাইনেস্, এদিকে এসে নাচুন।"

রাজকুমারী তীব্র প্রতিবাদ জানায়—"ছেড়ে দিন আমাকে, মিঃ ব্রাডলী, মিঃ ব্রাডলী, দেখুন!"

জো দৌড়ে আসে. ডিটেকটিভদের সঙ্গে একটা সংঘর্ষ সুরু হয়, রাজকুমারীও এই হট্টগোলের ভিতর ডিটেকটিভ-দলনে অগ্রণী হয়ে ওঠে। পুলিসকে কাবু করে ওরা বেরিয়ে আসে বাইরে।

তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। জো'র বাসায় এসে পৌঁছল দু'জনে। কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিচ্ছে রাজকুমারী, রেডিওতে লঘু সঙ্গীতের সুর বাজছে। সহসা বিশেষ ঘোষণা শোনা গেল—

"রাজকুমারী এ্যানের রোগশয্যা থেকে আর কোনও নতুন সংবাদ নেই। এতদ্বারা গুজবের সৃষ্টি হয়েছে, হয়ত তাঁর অবস্থা খারাপ। সারা দেশে এই কারণে উদ্বেগের সীমা নেই। রাজকুমারী···"

মুখখানি কাগজের মত শাদা হয়ে গেল রাজকুমারীর। তাড়াতাড়ি রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে বলে—"আমাকে এইবার যেতে হবে।" তার চোখে জল, প্রসারিত বাহু মেলে তাকে ধরতে যায় জো ব্রাডলী, বলে—"অ্যানিয়া, তোমাকে কিছু বলার আছে—"

তার গালে কোমল ঠোঁটের স্পর্শ বুলিয়ে রাজকুমারী বলে—"না, আমাকে এখনই যেতে হবে।"

বাসা থেকে বেরিয়ে গেল, উভয়ের মুখে একটুকু কথা নেই, অসীম নীরবতা। এই স্তব্ধতার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে না-বলা বাণীর গভীর আকুলতা। অবশেষে অতি মৃদু গলায় রাজকুমারী বলে ওঠে—"এখন তোমাকে ছেড়ে যাব, ঐ মোড়ের মাথায় নেমে যাব, তুমি গাড়িতেই থাক, প্রতিজ্ঞা করো আমার দিকে লক্ষ্য করবে না! আমি যেমন তোমাকে ছেড়ে দিলাম, তুমিও আমাকে সেই রকম ছেড়ে দাও।"

ওকে বাহুপাশে বাঁধে জো ব্রাডলী, কয়েকটি নিশ্বাসবিহীন মুহূর্ত। কিছুক্ষণ দু'জনে ভুলে যায় পারিপার্শ্বিক জগতের সংবাদ। তার পর সহসা তার বাহুর বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সজল চক্ষে রাজকুমারী গাড়ি থেকে নেমে যায়···

মোড়ের মাথায় মিলিয়ে যাওয়ার আগে আর একবার পিছন ফিরে চায় রাজকুমারী, মুখে তার দীপ্ত হাসির ঝিলিক, সে মধুর হাসি জো আর দেখেনি। বিদায় [illegible] চাঞ্চল্য—জীবনের অবিস্মরণীয় [illegible]।

গ্রামবাসীকে ফেরার পর [illegible] বলেন: "আপনার কর্তব্যবোধ বড় কম রাজকুমারী।"

মর্যাদামণ্ডিত ভঙ্গিতে গ্রান জবাব দেয়—"বিবেক যদি না থাকত, স্বদেশের এবং জাতির প্রতি আমার দায়িত্ব সম্বন্ধে যদি অবহিত না থাকতাম, তাহ'লে আজ আর ফিরতাম না ইওর একসেলেন্সী।"—তার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "কোনও দিন হয়ত ফিরতাম না।"

উত্তেজিত ভঙ্গিতে সম্পাদক হেনেসী জো'র ঘরে এসে প্রশ্ন করে—"কই হে তোমার সেই চাঞ্চল্যকর সংবাদ-বিবরণ কই?"

শান্ত গলায় জো জবাব দেয়—"কোনও কাহিনীই নেই।"

এই সময় অজস্র ফটো নিয়ে আরভিং ঘরে এল—হেনেসী ছবিগুলি দেখতে চায়, আরভিংও প্রায় দেখাতে যাচ্ছিল; কিন্তু জো ব্রাডলী তার হাত থেকে খামটা নিয়ে বলে, "এ সব একটা নাচের ছবি।"

হেনেসী রেগে চলে যাওয়ার পর বিস্মিত আরভিং বলে, "ব্যাপার কি? আর কেউ কিছু বেশী দেবে নাকি?"

আরভিং রাডোভিচকে খাম ফেরৎ দিয়ে বলল জো ব্রাডলী,—"এই ছবির সঙ্গে কোনও কাহিনীই আর নেই।"

এতক্ষণে বুঝলো ফটোগ্রাফার রাডোভিচ,—সে বলল, "বুঝেছি—কিন্তু রাষ্ট্রদূতের নিমন্ত্রণে যাবে না, রাজকুমারীর প্রেস কনফারেন্সে?"

প্রেস কনফারেন্স, এত কঠিন প্রেস কনফারেন্সে আর জীবনে আসেনি, এ যে রোদন-ভরা কনফারেন্স। গ্রামবাসী

অভ্যর্থনা-গৃহে রোমের সমস্ত বিশিষ্ট সাংবাদিক উপস্থিত। রাজকুমারী এ্যান ধীর-গম্ভীর ভঙ্গিতে প্রবেশ করলে।

"হার রয়্যাল হাইনেস!" সবাই সে দিকে তাকায়।

সব সাংবাদিকের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে মধুর ভাবে হাসলে রাজকুমারী। সিংহাসনে বসার পর চার দিক থেকে প্রশ্নবাণ সুরু হয়। বাণিজ্যিক সম্পর্ক, বিশ্বশান্তির প্রসঙ্গ, এক জন প্রশ্ন করল, "আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?"

জো'র দিকে চোখ রেখে রাজকুমারী বললে, "আমার অসীম শ্রদ্ধা আছে, যেমন শ্রদ্ধা আছে মানবিক মৈত্রীতে!"

এক জন প্রশ্ন করলে, "এত দেশ ভ্রমণ করলেন, কোন দেশ ভালো?"

রাজকুমারী বলল—"সবই ভালো, তবে রোমের স্মৃতি অবিস্মরণীয়। সারা জীবন মনে থাকবে।" প্রশ্নোত্তর শেষ হ'ল, সবাই ক্যামেরা উঁচিয়ে ফটো তোলে। তার পর সাহসিক গলায় রাজকুমারী বলে ওঠে, "আমি এইবার সাংবাদিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ করব।"

মঞ্চ থেকে নেমে রাজকুমারী এক এক সকলের সঙ্গে পরিচিত হ'ল ও করমর্দন করল। আরভিং সেই ফটো-গুলি খামখানি রাজকুমারীকে উপহার দেয়, বলে, "আপনার রোম-ভ্রমণের ছবি!"

ধন্যবাদ দিল রাজকুমারী। সাধারণ সৌজন্যসূচক উক্তি নয়। জো'র সামনে এসে দাঁড়ালো রাজকুমারী। এবার অগ্নি-পরীক্ষা, প্রাণ চায় চক্ষু না চায়, এ কি দুস্তর বাধা! জো বলে—"আমি আমেরিকান নিউজ সার্ভিসের জো ব্রাডলী।"

রাজকুমারী বললে—"বড় আনন্দ হ'ল মিঃ ব্রাডলী!"

অতি কষ্টে কথাগুলি মুখ থেকে বেরিয়ে এল, রাজকুমারীর সংযত ভঙ্গিতে তা ধরা পড়লো না।

অতি ধীরে আবার মঞ্চে ফিরে গেল রাজকুমারী। সারা সভাকক্ষ করতালি-মুখরিত। চমৎকার হেসে রাজকুমারী সেই অভিনন্দন গ্রহণ করল। অশ্রুবাষ্পরুদ্ধ দৃষ্টি আর একবার জো ব্রাডলীর মুখে পড়ল, তার পর এ্যাম্বাসাডারের দিকে তাকিয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করল।

মন্দিরের শেষে তীর্থযাত্রীটির মত নীরবে দাঁড়িয়ে রইল জো ব্রাডলী। রাজকুমারীকে ঠিক এই ভাবে জীবন থেকে কি সে মুছে দিতে পারবে? ভুলতে পারবে বিগত চব্বিশ ঘণ্টার বিরহ-মিলন-কথা?

সজল চোখে সেই শূন্য কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায় জো ব্রাডলী।

পাথরের মূর্তির মত প্রহরীরা তার এই বিহ্বল ভঙ্গি লক্ষ্য করে।

ধীরে ধীরে পথে এসে দাঁড়ালো ব্রাডলী।

অনুবাদক—ভবানী মুখোপাধ্যায়।

চলিষ্ণু

শ্রীভোলানাথ [illegible]

একদিকে নিশিদিন আসিছে তারাই
যারা আসে নাই
দিকে দিকে কণ্ঠস্বর
পদচিহ্ন সেই পথিকের
নব আগন্তুকের।

দিকে দিকে এই সাড়া জাগা
এ রোমাঞ্চ লাগা,
জানি সেই অভিসার, যার
জীর্ণ পৃথিবীর বুকে চলে অভিসার,
যুগের সূচনা হয়ে
শতাব্দীর অঙ্গীকার লয়ে,
জাগায়ে চেতনা নব চিন্তার প্রবাহে;
তার পর একদিন সহসা বিদায়
নতুনেরে ছাড়ি পথ।

এই যাওয়া-আসায় মুখর
সময়-সাগর-বক্ষে শতাব্দীর ঢেউ
অচঞ্চল নহে তারা কেউ—
আসে যায় পত্র সম ভাসি
বৈচিত্র্য-বিলাসী
পৃথিবীর প্রয়োজনে।
তাই,
সেথা আজ যাহা আছে
কাল তাহা নাই।

পথ চেয়ে আগামীর লাগি
নিত্য সে যে রহিয়াছে জাগি;
তাই মৃত্যুর ছোঁয়া
বিষণ্ণ মলিন
পথ প্রান্তে তার চির লীন।
এক ঠাঁই, এক চিন্তা যার
পদে পদে মৃত্যু শুধু তার।

জর্জ-মাইকেল

তেরো

সূর্যালোকিত পথে এসে দাঁড়ালো মোদক্লো। হারিকট কক্তের জন্য চার দিকে তাকায়। বেচারী হারিকট একটা পাথরের বেঞ্চে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তার একটি হাত ফোয়ারার জলে ডুবে আছে।

মোদক তার আকৃতি লক্ষ্য করে। রোদে পুড়ে মুখখানি লাল হয়ে আছে, দেহের রেখাগুলি যেন দিয়াঘিলেপের সঙ্গীতে এইমাত্র দেখে আসা পিকাসোর ছবি। অনেকক্ষণ সেইখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ভূরিভোজের আনন্দ আর যা শুনে এসেছে তার উত্তেজনায় ভরে আছে মন।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সেই ঘুমন্ত মেয়েটিকে ডাকে মোদক—

"তুমিই সেই পাত্র, তোমাতেই আমার সকল ভাবধারা সঞ্চয় করে রাখছি, তারপর নূতন আকার নিয়ে তার চরম প্রকাশ হবে। তুমিই আমার নিয়ামক, প্রকাশের মধ্যে প্রাচীন রীতির কোনও মূল্য যদি থাকে তাহলে আমি শপথ করছি তোমাকে রক্ষা করব, তোমাকে ভালোবাসব, দুর্গম পথে প্রেমের জয়-কেতন উড়িয়ে দেবো, রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই ক্ষোভ নেই, শান্তি চাই না, সান্ত্বনা চাই না, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলব—তুমি আছো, আমি আছি।"

হারিকট এক-গাল হেসে ঘুম ভেঙ্গে উঠলো, চোখে মুখে তার হাসির ছাপ, ওকে টেনে তুললো মোদক, চুম্বনে ভরিয়ে দিল তার গাল, তার পর বাহুর বাঁধনে জড়িয়ে ধরে।

হারিকট বলল—"জানো, এখান থেকে আমি একটুও নড়িনি, ভয় হল হয়ত হারিয়ে যাব, তোমাকে হারাবো সে আমার সইবে না, তবে সেণ্ট পিটারে যেতে হলে কোথায় গাড়ি ধরতে হবে তা আমি জানি, এখন তিনটে, এখনও এক ঘণ্টা সময় আছে।"

চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে মোদকর :

"আর কিছু দেখার প্রয়োজন নেই আমার, সেণ্টপিটার, র‍্যাফায়েল বা সিসটিনে। তবে দেখতেও পারি, এখন আমার সেই দৃষ্টি খুলছে, কোন্ পথে যে যেতে হবে তা আমি জানি। এখন সেই "কিউবস" বন্ধন থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি,—আমি আর্টিষ্ট, আর্টিষ্ট থাকবো, আমার আর আচার্য হয়ে কাজ নেই,—কি প্রয়োজন 'মাষ্টার' হবার? ঐ কথার সঙ্গে ক্রীতদাস কথাটিও আছে, আমার দাসে প্রয়োজন নেই। দাসত্বের কোনো প্রয়োজন নেই আমার কাছে। আমি তোমাকেও ক্রমে ক্রমে মুক্তি দেব, কিন্তু তোমাকে আদর করার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবো না। এসো—"

উভয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলো, যাত্রীরা সব জানলা বন্ধ রেখেছে, "কুকুর আর ইংরাজরাই শুধু রোদ লাগায় গায়ে—" এই রোমক প্রবাদটি তারা মেনে চলে।

ফিরে এসে নদীর ধারে বেড়াবার অনেক সময় পাওয়া যাবে, সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই ধূসর পথ বেশ লাগবে,—কাষ্টেল সান এন্‌জেলো থেকে আইসোলা টাইবারিনা পর্যন্ত বেড়ানো যাবে।

গাড়ি এসে অবশেষে এক নোঙরা গলি-পথে থামলো, পুরাতন কাপড়-জামাওয়ালা, পায়রা-বিক্রেতা প্রভৃতিতে পথ বোঝাই। ওর মোড় ঘুরলো, অদূরে সেণ্ট পিটারের থাম দেখা গেল।

ওরা আশা করেছিল শাদা পাথরের একটা একক চূড়া দেখতে পাবে। সেই বিরাট গির্জার সমস্তটা তার আর চক্রাকার থাম স্বর্ণ গৈরিক রঙের পাথরে তৈরী, এই পাথরেই ছোট-বাড়ী আরো হাজার হাজার রয়েছে, এই সেণ্ট পিটারের। কাছাকাছি অঞ্চলে তাদের ভীড়। ওরা থাম অতিক্রম করে—যেখানটায় পৌছল সেখানে বেকার-বাউণ্ডুলের দল নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তার পর একটা প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালো, তার পর দুটি ফোয়ারা অতিক্রম করলো তার পর সমান্তরাল শ্রেণীবদ্ধ অসংখ্য স্তম্ভের কাছে এসে দাঁড়াল উভয়ে ঘর্মসিক্ত হয়ে উঠল।

মোদক বলল—"কি বিশ্রী!"

হারিকট কক্স বলল—"বড় নোংরা।"

একজন পরিচারক ওদের দা পিয়েতায় নিয়ে গেল। মাইকেলএঞ্জেলোর মর্মর মূর্তিতে তামার ফুল আর মুকুট দেখে মোদক ক্ষেপে গেল। সেণ্ট পিটারের পাষাণময় শবাধারে নিয়ে যাওয়ার জন্য বললো মোদক।

পরিচারক বলল—"এক লিরা (মুদ্রা) পেলে ইলেকট্রিক আলো জেলে দেব আর দু' লিরা পেলে—"

মোদক বলল—"জাহান্নামে যাও।"

"পৃথিবীর পবিত্রতম স্থানে ও-রকম উক্তি অতি গর্হিত।"

হারিকট কক্স বলল—"তোমার ঐ ইলেকট্রিক আলো আর চেয়ে গর্হিত কর্ম নয়।"

চোখ টিপল পরিচারক,—তার পর ওদের দু'জনের হাত ধরে কানোভার ভাস্কর্য নিদর্শন 'বা রিলিফের' (অল্পমাত্র উদ্‌গত ভাস্কর্য) কাছে নিয়ে গেল।

"এই দুটি পরী নয়, ইংরেজ রমণীরা পরীর উরুদেশে হাত বুলায় কারণ—"

মোদক তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—"ভায়া! আমাদের একটু তাড়াতাড়ি সিস্টিনে নিয়ে যাবে?"

"ও, সে ত ভ্যাটিকানে, ঐ ঐখানে, আপনারা ত' আধ ঘণ্টা আসেননি। বাইরে যখন যাবেন তখন চোখে হাত চাপা দেবেন বড় রোদ, চোখ একেবারে অন্ধ হয়ে যাবে। ছোট দোরটা পার হয়ে সারা গির্জা ঘুরে, সাক্রিষ্টি (যে ঘরে গির্জার তৈজসপত্র থাকে) হয়ে তবে যেতে হবে। অনেকটা পথ।"

পথটি বাঁধানো, পাথরের ভিতর থেকে ঘাস গজিয়েছে। দীর্ঘ ও ভবে স্থাপত্যের একটা আকর্ষণ আছে। পথের দু'পাশে কত পরী আছে ওরা গোণে। তাদের পিছনে কি অপরূপ রেখা কি সূক্ষ্ম রঙের সমাবেশ। খিলান ঢালাই, চূড়া, ও তার ওপর স্তম্ভচূড়া যেন পাথরের কেশরাশি, অলিন্দও

সেই স্বর্ণ গৈরিক রঙের পাথরের নীল আকাশের পটভূমিতে অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

আর একটি বাঁধানো পথে এসে ওরা পৌঁছল,—সোজা বটে তবে চড়াই আছে। ওদের বাঁ দিকে একটা পাঁচিলের পাশ থেকে সাইপ্রেস, ঝাউগাছ আর ফণিমনসার ঝোঁপ উঁকি দিচ্ছে। আর অদূরে ছবিঘরের জানলার কাচের সার্সী দেখা যাচ্ছে। ফরাসী মুদ্রায় ওরা প্রবেশ-মূল্য দিয়ে তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে পড়ে, বেশী সময় নেই তাই এক রকম এক দৌড়ে সব দেখে নিতে হবে।

মোদক্লো স্বগতোক্তি করে—"আমাদের সময় নেই, সময়ের জন্য কি এসে-যায়? আমাদের দৃষ্টিশক্তির গভীরতাই আসল, এই যা দেখব তা সারা জীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকবে।"

স্নেহসিক্ত হয়ে হারিকট কত সিঁড়ি বেয়ে ওর পিছন পিছন উঠছে। প্রাঙ্গণ পার হয়ে পাথরের মূর্তিগুলি একে একে অতিক্রম করল, কিন্তু মাঝে মাঝে একটা আবক্ষ মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে হাঁফায় মোদক্লো, বলে—"দেখো! সব পেশীগুলো কেমন এক হয়ে আছে—" তার পর 'লগি' তে এসে পৌঁছল।

'লগি'—না, শুধু অলংকরণ নয়, নাপিতের দোকানে দোকানে যার 'কপি' দেখা যায় সেই জিনিষ নয়। সমগ্র পবিত্র ইতিহাস। একটা আনন্দ-উদ্বেল অভিব্যক্তি। 'সিলিং'গুলি যেন স্ফুলিঙ্গ বিশেষ, একটা অজানা রঙে বিস্ফুরিত।

"চলো—চলো—"

সিস্টিনের দিকে লক্ষ্য করে আঁকা তীরচিহ্ন ধরে ওরা সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে নামে, ওদিকে পর্যটকের দল দর্শনান্তে ওপরে উঠে আসছে। ওপর দিকে তাকিয়ে ওরা অভিভূত হয়ে পড়ে,—রঙের কি অপূর্ব খেলা, গাত্রবর্ণ কি সুন্দর করে আঁকা রয়েছে!

"*Prego, Signor, Chiuse, chiuse.*" দেখুন মশাই, দেখুন, দেখুন!!

"দেখি,—দেখতে দাও—"

"Last Judgment"এর সমগ্র ছবিটি একটি লাল ও সোনালি ভেলভেটে মোড়া, উৎসব উপলক্ষ্যে সেটি টাঙানো হয়েছে। কিন্তু ওপরে দেবতাদের চিরন্তন সম্মেলন,—মাত্র একজন মানুষের আঁকা, দেবদূত, আদম, ইভ, ঈশ্বর অতি-মানবিক ভঙ্গীতে স্থির হয়ে আছেন।

"এই স্বল্প-ক্ষুদ্র আকাশের মধ্য থেকে দেখা যায় র‍্যাফায়েলের শান্ত আকাশ। আমরা কিন্তু র‍্যাফায়েলের ছবির সামনে শান্ত থাকব। মোদক্ল আমাকে টেনে নিও না—সবই কেমন ঝুলে আছে, সিলিং-এর ভেতর থেকে দেবদূতরা ঝুলছে,—গম্বুজের নীচে স্বয়ং ঈশ্বর, তার পর সাধু আর মানুষের দল অথচ একটি ছবিও রীতিগত পদ্ধতিতে আঁকা নয়। সবগুলিই নতুন, বিচিত্র, জীবন্ত, সবাক এবং বিরাট—"

"*Chiuse*"

"না, আমার ভয় করছে, দেখতে পারছি না।"

ইতিমধ্যে ভীড়ের চাপে ওরা আটকে পড়ল, গাইডরা বক্-বক্ করছে, আর সবাই হাঁ করে শুনছে,—পিছু হটতে হ'ল। পুনরায় নীচের তলার করিডোর, ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল, তার পর Stanze, অর্থাৎ 'চেম্বারস্ অব র‍্যাফায়েলে' ঠিক সময়ে গিয়ে পৌঁছল। একটু ইতস্তত: করে হাত-ধরাধরি করে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ছুটে চললো,—রহস্য করে কথা বললো জার্মাণদের মত, আর একটা অসীম উৎসাহ-তরঙ্গ তাদের সারা দেহে আনন্দ-প্লাবন সঞ্চারিত করল।

"*Chiuse*"

ওদের চোখে-মুখে আনন্দের অভিব্যক্তি এতই প্রবল যে গাইড মিনিট খানেক ওদের ছেড়ে রইল। ওদের ঠোঁট নড়ছে, যেন নতুন কি একটা বলতে চায়, ওদের চোখ জলে ভাসছে,—কোনো রহস্যময় আনন্দ-বন্যা এই উচ্ছ্বাসের হেতু নয়, সে চোখে লোভের চিহ্ন, দর্শনের গুরুভোজে পরিতৃপ্ত চোখের উজ্জ্বল আকুলতা।

মোদক্ল হাত দুটি মুঠি করে রেখেছে, হারিকট বুকটা চেপে ধরেছে, যেন এইবার চীৎকার করে কাঁদবে। Heliodours, The Holy Sacrament, The Nine Muses, আর বিশেষত: School of Athens—জ্ঞানী ও দিব্য পুরুষের অপরূপ মুখচ্ছবি ওরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে।

তার পর ওরা ভীতি-জড়িত কণ্ঠে অস্ফুট স্বরে যুগ-যুগান্ত-খ্যাত মন্ত্র উচ্চারণ করে। ভীত-চকিত শিশুর কণ্ঠে প্রথম উচ্চারিত মন্ত্রের মত!

"র‍্যাফায়েলের সব কিছুই পবিত্র—ক্যানভাসের ক্ষুদ্রতম চতুষ্কোণটাও যেন তেমনই চমৎকার কোনো প্রাসাদের পারিপ্রেক্ষিত। শুধু মাত্র সুন্দর আকৃতি অঙ্কনে র‍্যাফায়েল না জানি কি অসীম আনন্দই পেয়েছেন! রেমিনেরও তাই হয়েছিল। কোথা থেকে এই স্বচ্ছতা, এই সৌন্দর্য, জীবনের এই অভিব্যক্তি তিনি পেয়েছিলেন। কি আনন্দময়! যেন একটি মধুর সঙ্গীত, একটি গতিশীল আনন্দ। অথচ একক।

বর্ণ,—ঐশ্বর্য, আনন্দ ও রঙের এক অপূর্ব কল্লোচ্ছাস। এই ছবির সামনে যেন স্থির হয়ে থমকে থাকতে হয়। এইখানে দাঁড়ালে নিজেকে নগ্ন ও দেবতা বলে মনে হয়।

"মাইকেল এঞ্জেলো? দা ভিঞ্চি?"

"মাইকেল এঞ্জেলোর মধ্যে তুমি একটা শক্তির সন্ধান পেয়েছ? মাইকেল এঞ্জেলো নিজেই একটা শক্তি—র‍্যাফায়েল সৌন্দর্য, শ্রী। মাইকেল এঞ্জেলো আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত—আর র‍্যাফায়েল মধুর হেসে তোমাকে মোহিত করেন। তিনি বিশ্বাসী, তবু তিনি স্বয়ং দেবতা, দেবদূত। দা ভিঞ্চি আবার এত বিদগ্ধ যে বিশ্বাসের বাইরে। তোমাকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা আছে। ঠোঁটে তাঁর রহস্যময় হাসি—রহস্য-ভরা গভীর দৃষ্টি তাঁর চোখে। আমরা আর্টে এই রহস্যের হাত থেকে মুক্তির সন্ধানে ফিরছি। দেখছ, র‍্যাফায়েল কত সরল! তাঁকে দেখলেই বিশ্বাস করতে মনে প্রবৃত্তি জাগে। দা ভিঞ্চির মতো র‍্যাফায়েলে স্বর্গের প্রতিশ্রুতি নেই। র‍্যাফায়েল স্বর্লোক স্বয়ং দেখাচ্ছেন, দান করছেন। আর সব রমণীয়। তারা স্বর্গীয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। পেরুজিনো, তার মধ্যে দিব্য জীবনের ইঙ্গিত কই,—সেই চিহ্ন রয়েছে র‍্যাফায়েলে, কারণ র‍্যাফায়েলে, কারণ র‍্যাফায়েল যে পাঁচ যুগের সন্তান। আজকের দিনের পিকাসোর মত র‍্যাফায়েলও বিচিত্র। তিনিই একাধারে

পেরুজিনো, দা ভিঞ্চি, বার্তোলোমো। এক দেহে সব বটে তবু উনি ওঁদেরও ঊর্দ্ধে তুলেছেন, নতুন রূপে রূপায়িত করেছেন, তাঁদের ওপর দেবত্ব আরোপ করেছেন। র‍্যাফায়েল একাই দেবস্বরূপ।"

দরজায় বাইরে এসে পরস্পর মুখের পানে তাকায়,—উভয়েই কাঁদে।

"আবার কবে এই সব দেখব? আবার কবে দেখতে পাবো?"

পুনরায় সেই গোলাকার পিয়াজা অতিক্রম করলো দু'জনে, সেই নোঙরা গলিপথে ঘুরল,—তার পর টাইবার নদীর ধারে এসে মোদিক্লো লাঞ্চের সময় শোনা আলাপ-আলোচনা চারিকটকে শোনায়।

"ওরা যে কি সব বলে যদি শুনতে—কোনো গোষ্ঠী নেই, আছে শুধু প্রতিক্রিয়ার গতি, এমনই প্রচণ্ড তার গতিবেগ যে ক্লাসিসিজমে যদি দু' শতাব্দীর প্রাচীনত্ব থাকে তাহলে রোমান্টিসিজমের কাল পঞ্চাশ বছর আর চিত্র শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতে রিয়ালিজম ও ইম্প্রেসনিজমের কাল মাত্র পনের বছর। এখন দেখবে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে, একই জীবনে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া অতি দ্রুতগতিতে ঘটবে। এই স্ট্রাভিনস্কি বা পিকাসো—একটা কিছু পথ ধরতে হবে নইলে মরণ ভালো। আমার মাথা থেকে কিটস মুছে গেছে, অন্তর থেকেও তাকে বিসর্জন দিয়েছি!

চারিকট রুদ্ধ! মুক্ত মোদিক্লার জয় হোক! সেই অনাগত বিধাতার জয় হোক! সেই অনাগত পুরুষ আমাদের কাছে অপ্রমেয়, অচিন্তনীয়, নইলে আমরাই হয়ত তিনি, এই দেহেই তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে। তোমার কি বিশ্বাস আজ যদি র‍্যাফায়েলের পুনরাবির্ভাব ঘটে তাহলে তিনি তাঁর পুরাতন ধারায় ছবি আঁকবেন? দেখ, রোমের দিকে তাকিয়ে দেখ! র‍্যাফায়েল এখন থাকলে ঐ পথের ওপরকার ঐ ভাড়া গাড়িটাই আঁকতেন, গাড়ীটা ব্রীজের ওপর উঠেছে। তার সঙ্গে আঁকতেন ঐ লাল মূর্তিগুলি আর নদীর লাল জল। এ দিনের রীতি অনুসারে ঐ ছবিতেই তিনি দিব্য প্রেরণা সঞ্চারিত করতেন, ক্যানভাসের ওপর ছবিটা চকচক করতো, সারা ছবিতে থাকতো বিজলীর চমক।"

কা সিটের মতো গোপুচ্ছাকৃতি ছোট এক ফালি বঙ্কিম দ্বীপ টাইবার নদীর ওপর, ওরা সেইখানে গেল—সামনেই ভেস্তার একটি প্রাচীন মন্দির। দীর্ঘ সরু স্তম্ভের ওপর গোলাকার ছাদটি দাঁড়িয়ে আছে।

মন্দিরের সামনে একজন দুটি হাত দিয়ে নানা ভঙ্গী করছিল। লোকটি ডেসপেরো। এই দু'জন তরুণকে দেখে আলাপের উদ্দেশ্যে সে এগিয়ে এল।

"কাল আমার ষ্টুডিওতে আসবেন।"

"আমরা কাল সকালেই ফিরছি,—রোদ থাকতে থাকতে রোমে আর কি দেখে নিতে পারি? কোরাম?"

"না,—আপনার কি ভাববাদী না স্থাপত্য-শিল্পী? এ জন পথচারিণী আমার মনের কথা বলেছিলেন, তিনি বলেছিলেন *dansant* দেখতেই তাঁর ভালো লাগে। ঠিকই বলেছিলেন তিনি। আপনাকে অতীতে চলে যেতে হবে। ধ্বংসস্তূপ দেখে যদি আকুল হ'ন ত' অতীত লোকে চলে যাবেন। আমরা এ দিনের মানুষ।"

এ দিনের মানুষটি নগ্নপদ, দুটি বিভিন্ন কাপড় সেলাই দিয়ে তাঁর ট্রাউজারটি তৈরী হয়েছে। একটি পা কালো রঙের, অপরটি ধূসর। যাই হোক তিনি বলতে থাকেন:

"এই যে ধরুন মোটর গাড়ি,—এই ত' যথার্থ কবিতা—আর্টিষ্ট আর সাধারণ শ্রেণীর গণিকা উভয়েই তা সমান ভাবে উপভোগ করতে পারে। এই ত কবিতা,—সম্পূর্ণ কবিতা,—এ দিনের কবিতা!"

এই বলে ভদ্রলোক কাঁধ নাড়লেন।

"কিন্তু চলুন এই পথ ধরে এমন এক জায়গায় যাওয়া যাক যেখান থেকে রোম দেখা যাবে। আপনার মনে যদি রোমান্টিক ভাব থাকে তাহলে তার পরিতৃপ্তি প্রয়োজন। এই সব হতভাগা পুরাতন জিনিষের দোকানের সামনে দাঁড়াবেন না। ওগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। মিউজিয়মেও আগুন লাগানো উচিত। তার পর পোড়ানো উচিত অভিধান, তবে ত' নতুন শব্দ সৃষ্টি হবে। কারণ এক দিনের ব্যবহৃত কথার এ দিনে আর কোনো মূল্য নেই। পুরাতন মুদ্রার মত,—যার ওপরকার প্রতিমূর্তি যেমন বহুল-প্রচলনে ম্লান হয়ে যায় তেমনি সেই অবস্থা। প্রেম, মাতৃভূমি, মানবতা, সম্মান কথাগুলির এ দিনে আর অর্থ কি? এই সব কথায় নূতন বা পুরাতন কোনো মানে হয় কি—"

"দেখো! যদি আমি ধনী হতাম তাহলে ঐ দিয়ের মাল ছড়া তোমাকে কিনে দিতে পারতাম।"

মোদিক্লো ঐ ক্রিটচরিষ্ট বা ভবিষ্যৎবাদী ভদ্রলোকের কথায় কান না দিয়ে এক ছড়া জরি-মোড়া মালা চারিকটকে দেখালো।

আচ্ছন্ন জনতার মধ্য দিয়ে ওরা চলে, যেন মানবতায় জড়িত আছে এমনই ওদের অস্থির পদক্ষেপ। সূর্যালোক ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে।

দুটি চতুষ্কোণ তোরণ ওপারে উঠেছে, গির্জাটির দিকে আঙুল দেখিয়ে ডেসপেরো বলে ওঠে—

"ঐ দেখুন! ত্রিনিটা ডি মণ্টি—কবি জাহ্নুর্মসিয়োর পাঠকের কাছে পরিচিত। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেন। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠুন, তার পর ভিলা মেডিচির পথ ধরুন, তাহলে ঐ দৈত্যাকৃতি গাড়ির চাইতেও তাড়াতাড়ি পিয়াজা দেল পপোলোয় পৌঁছবেন কিন্তু ঐ সব করার পূর্বে এক গ্লাস কাসটেলি পান করা যাক এমনই তরল মিষ্টি সুরা যে আপনার চৈতন্যকেও মাতাল করে দেবে।"

সূর্যালোক সেই গির্জার সুবর্ণ গৈরিক রঙে আছড়িয়ে পড়ছে আর নীচের তলায় প্রায় সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে ফুলওয়ালীরা এক-ছাতি কেবল খুলছে আর বন্ধ করছে, প্রখর সূর্যকিরণ থেকে ফুলগুলি সযত্নে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

[ক্রমশঃ

অনুবাদক—ভবানী মুখোপাধ্যায়

আমাদের Love-লোকসান

যেমন দেশ তার তেমন রাজা। হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী। এই গবুচন্দ্র মন্ত্রীদের হাতে দেশ শাসনের ভার পড়লে দেশবাসীর অবস্থাটি কি মর্ম্মান্তিক হ'তে পারে, আমাদের সেন্সর বোর্ডের হালচাল দেখলেই তা অনুমান করা যায়। ভারতবর্ষে সাগরপারের যতেক ছবি (তা যতই অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ হোক) বিনা বিচারে ও বিনা বাধায় দেখিয়ে যখন ইংলণ্ড ও আমেরিকার কোটিপতিরা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে দেশে নিয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের দেশের ছবিতে যাতে সামান্যতম ফাঁক না থেকে যায় তার জন্য সেন্সর বোর্ডের সদস্যদের দুশ্চিন্তার সীমা নেই। আমাদের ছবির প্রেম কেবল কয়েকটি অলীক ও অবাস্তব কথোপকথনেই (Dialouge) শেষ হয়। বাঙলা ছবির স্বামী, স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কটা যেন অফিসের রাশভারী ম্যানেজার ও কেরাণীদের সম্পর্করূপেই দেখা যায়। ওদের বেলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুমু খাওয়া, প্রেমালিঙ্গন, জড়াজড়ি, লোফালুফি থাকলেও সেন্সর বোর্ডের সদস্যদের চোখে তা দোষণীয় নয়। আমাদের ছবিতে মাতাল মাতলামি করবে অথচ গেলাস বা বোতলটি হাতে ধারণ করতে পারে না, প্রেমিক প্রেম করবে কিন্তু প্রেম-সম্ভাষণ চলবে না। এমন কি খুনী খুন করলেও খুনের দৃশ্যটি দেখানো চলবে না।

দেশ ও দেশবাসীকে সচ্চরিত্র রাখতে সেন্সর বোর্ড দেশী ছবিগুলির কণ্ঠরোধ ক'রে বিদেশী অশ্লীলতম ছবিটিকে পর্য্যন্ত দেখানোর অনুমতি দিচ্ছে দিনের পর দিন। দেশীকে মেরে বিদেশীকে বাঁচানোর কংগ্রেসী চেষ্টার পেছনে যে কোন ধরণের গান্ধীপন্থী অহিংস মতবাদ থাকতে পারে কেউ বুঝে উঠতেই পারবে না। সেন্সরের এই আত্মঘাতী মতের পরিবর্ত্তন শীঘ্র যে হবে না তা আমরা জানি ভাল ভাবেই। আমাদের হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রীদের কৃপায় দেশের শিল্পের অপমৃত্যু এবং সেই সঙ্গে বিদেশী শিল্পের প্রসার হতে দেখেই বোঝা যায়, সেন্সর বোর্ডের সদস্যদের মতিগতি কি?

ইংরাজ রাজত্বে সেন্সর বোর্ড গঠিত হয়েছিল শুধু মাত্র এই কারণে যে, কোন দেশী ছবিতে যেন মুক্তিকামী জনগণের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের কোন প্রচেষ্টা না থাকে, শুধু এইটুকু লক্ষ্য রাখতে। কংগ্রেসী সরকার সেই ইংরাজ সরকারের 'কার্ব্বন-কপি' বললেও কম বলা হয়। আমাদের জাতীয়তাবাদী কাগজগুলি প্রায়শই আমাদের স্বাধীনতা (বিনা রক্তপাতে) লাভের কথা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করে থাকে। স্বাধীনতাই যখন আমরা লাভ করেছি তখন আর সেই ব্রিটিশ-ছাপ-মারা সেন্সর বোর্ডকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি?

আমরা মনে করি, এতে শুধু বিদেশীর লাভ এবং দেশীর লোকসান এবং পিউরিটান গান্ধীভক্তরাই কি এই প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠতম সহায়ক?

বাঙলা ছবির পরিচালক নেই?

বাঙলা ছায়াছবির মান গত দু'-এক বছরে কেন এতটা নেমে গেছে, তা কি কেউ কোন দিন ভেবে দেখেছেন? বাঙলা ছবির মেয়াদ এক সপ্তাহ হওয়াটা ক্রমাগতই যেন বাঙলা ছবির মজ্জাগত ধারা হতে বসেছেই বা কেন? বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পে কি আছে আর কি নেই তার হিসাব করতে বসে আমরা প্রথমেই যদি বলি বাঙলা ছায়াচিত্রশিল্পের যথার্থ পরিচালকই নেই তা হ'লে হয়তো কথাটি এমন কিছু অন্যায় বলা হবে না। কেন হবে না তাই বলছি। চলচ্চিত্রশিল্প বা চলচ্চিত্র যাঁরা নির্ম্মাণ করেন তাঁদের মধ্যে দু'জনকে প্রধানরূপে ধার্য্য করা যেতে পারে।

(১) প্রযোজক বা Producer.

(২) পরিচালক বা Director.

প্রযোজকদের যোগ্যতা সম্পর্কে অন্তত: বাঙালী জাতির প্র তোলা অনুচিত। বাঙলা ছবির জন্য টাকা ঢেলে এখনও যে কে কেউ প্রযোজনার কাজে লেগে আছেন এইটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নিউ থিয়েটার্সে'র মত প্রভাবশালী ও ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠানও বছরে পর বছর ধ'রে এই প্রযোজনার কাজ ক'রে চলেছেন, যদিও গত ক'বছরে এক 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছাড়া কোন ছবিতেই তেমন টাকা আয় হ'ল না। অন্যান্যদের কথা আর না বলা ভালো। তবুও বলবো, এখনও যে কেউ কেউ বাঙলা ছবি তৈরী করতে ঘর থেকে টাকা বের করছেন সেইটেই পরম বিস্ময়ের বিষয়!

কিন্তু বাঙলা ছবি কেন ছবির মত ছবি হচ্ছে না? কেনই বা বাঙলা ছবি বাইরের বাজার দূরের কথা বাঙলার বাজারে এক সপ্তাহের বেশী দাঁড়াতে পারছে না? আধুনিক বাঙলা ছবি কেন মেরুদণ্ডহীন? তা হ'লে এখানে বলতে হয়, এই ছবি যাঁরা পরিচালনা করছেন চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কতটুকু, জ্ঞানই বা কতটা? যে-কোন ছবিকে দর্শনীয় ও উপভোগ্য ক'রে তুলতে হ'লে পরিচালকের যে সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন আমাদের অধিকাংশ বাঙালী পরিচালকেরই তা নেই। যথাযথ গল্প-নির্ব্বাচন, চিত্র-গ্রহণ, শব্দ-সংযোজন, চিত্রনাট্য রচনা, আবহসঙ্গীত-সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়গুলি যে চলচ্চিত্র নির্ম্মাণের কাজে কতটা উপযোগী, তাও তাঁরা বোঝেন না। আর এই বিষয়ের অজ্ঞানতার দরুণই পরিচালক সারা জীবন ধ'রে ...

ক'রেও একটিও দর্শনীয় ছবি তৈয়ারী করতে পারেন না বা পারছেন না। অধিক কথা বলে কোন লাভ নেই, শুধু এই মাত্র বলতে পারি, অন্যান্য দেশে পরিচালক ছবি পরিচালনার কাজে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে দস্তুরমত শিক্ষালাভ করেন চলচ্চিত্র-শিল্প-শিক্ষালয়ে, আর আমাদের দেশে? বিনা শিক্ষায় শিক্ষকতা করবার প্রবল বাসনা শুধু অশিক্ষিত দেশেই হয়তো সম্ভব হয়। কিন্তু বর্ণপরিচয়, প্রথম, দ্বিতীয় ভাগ বা কথামালা না প'ড়ে কে আর কবে শিক্ষাদানের কাজে কৃতকার্য্য হয়েছে? অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও অপটু পরিচালকদের দলকে বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ষ্টুডিওর চত্বর থেকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করে দেওয়ার সময় সমুপস্থিত। তা না করলে নিকট-ভবিষ্যতে শুধু ষ্টুডিওগুলির দ্বারেই তালা পড়বে না, প্রেক্ষাগৃহের ফটকেও ঘণ্টা ঝুলিয়ে নীলামের ডাক পাড়তে শোনা যাবে।

শোনা যায়, এই সকল পরিচালকদের বাজারদর নাকি ছবি-পিছু পনেরো থেকে পঁচিশ হাজার টাকায় উঠেছে। শুনে হাসি পায় এই ভেবে যে, এদের মূল্য পনেরো পয়সা দূরের কথা, কানাকড়িও নয়।

বাঙলা ছায়াছবির মার্কা-মারা নায়ক

কথায় বলে, ঠেকে মানুষ না শিখলেও দেখে অন্তত শেখে। আমরা ঠেকেও শিখি না, দেখেও শিখি না। বাঙলা ছায়াছবির সুদর্শন নায়কদের কথা ভাবতে ভাবতে কথা ক'টি মনে পড়ে গেল। বাঙলা ছবির নায়কদের লক্ষ্য করছি তারা শুধু নামেই নায়ক। যাত্রা বা অভিনয়ের নায়কও যা, ছায়াছবির নায়কও তাই। তারা কিচ্ছুটি জানে না। জানে শুধু পার্ট মুখস্থ বলে যেতে, মুখে বা চোখে বীর বা করুণ রস ফোটাতে আর নায়িকার কাছাকাছি এগিয়ে নেকিয়ে নেকিয়ে কথা বলতে। ব্যস! কিন্তু যথার্থ নায়ক হ'তে হ'লে শুধু শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মত অভিনয় করা বা অহীন্দ্র চৌধুরীর মত মুখভঙ্গী দেখানোটাই যে শেষ কথা নয়, নায়কদের কে বোঝাবে এই সামান্য কথাটি?

বিদেশী ছবির নায়কদের activity বা সক্রিয়তার সঙ্গে আমাদের নায়কদের ভাবভঙ্গীর কোন তুলনাই চলে না। বিদেশী ছবির নায়করা অভিনয়-শিল্প আয়ত্ত করতে নেমে আরও কত কি কায়দা যে আয়ত্ত করে তার পরিচয় দেওয়ার মত যথেষ্ট স্থান মাসিক বসুমতীতে নেই। যুগের পর যুগ, বছরের পর বছর, মাসের পর মাস, দিনের পর দিন বাঙলা ছবিতে যারা 'নায়ক সেজে নায়কত্ব করছে তাদের একটি বার স্মরণ করতে বলি ষ্টুয়ার্ট গ্র্যাঞ্জার, রীচার্ড বার্টন, ভিক্টর ম্যাচিওর, রবার্ট টেলর, রোনাল্ড কলম্যান, ক্লার্ক গেবল, স্যর অলিভিয়ার লরেন্স প্রভৃতির দক্ষতা কতটা। তাই বলছিলাম, ঠেকে না শিখলেও কেউ কেউ দেখে শিক্ষা করে। বাঙলা ছবির নায়কগণ শুধু কি নারীসুলভ আকৃতিধারী হয়ে এবং দু' চার কলি গান গেয়েই বাজী মাৎ করতে চান?

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

শ্রীমতী কানন দেবী

বৎসরের শেষ দিন—সাক্ষাৎ-আলোচনা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে রওনা হলুম টালীগঞ্জের অনতিদূরে রিজেন্ট গ্রোভে শ্রীমতী কানন দেবীর (ভট্টাচার্য্য) বাসভবনে। সেখানে গিয়ে দেখলুম সহর ও গ্রাম যেন একত্র হয়ে এক অভিনব পরিবেশ সৃষ্টি করে আছে। তার মাঝখানটিতে রয়েছে তাঁর বাসভবন, সত্যিই যেন শিল্পীর আঁকা একখানি অনিন্দ্য ছবি। পূর্ব্বেই টেলিফোনে এ সাক্ষাৎকারের সময় নির্দ্ধারিত ছিল। কাজেই যাওয়া মাত্র আমাকে নিয়ে বসান হ'লো একটি সুসজ্জিত কক্ষে। শিল্পীর রুচি এ কক্ষটির সব কিছুতে পরিস্ফুট দেখতে পেলুম।

অল্প সময়ের মধ্যেই কানন দেবী এসে উপস্থিত হ'লেন নিতান্ত সাদাসিদে পোষাকে। শ্রীমতী ভট্টাচার্য্য (কানন দেবী) বলতে থাকেন,—সর্ব্বপ্রথম আমি নির্ব্বাক্ চিত্র "জয়দেব"-এ আত্মপ্রকাশ করি। সে অনেকদিন ১৯২৬ সালের কথা। এর পর বহু ছবিতে প্রধানতঃ নায়িকার ভূমিকায় আমি অভিনয় করেছি। কোন্ ছবিতে এবং কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করে আমি সব চাইতে তৃপ্তি পেয়েছি বলা কঠিন। তবে এটুকু বলবো আমার 'বর্ত্তমান

রূপসজ্জার বাইরে শ্রীমতী কানন দেবী

ছবি 'নববিধান'-এ অভিনয় করে আমার খুবই ভাল লেগেছে। এ ছবিখানি পরিচালনা করেছেন আমার স্বামী শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য। চলচ্চিত্র শিল্পে আমি যে এলুম—তার মূলে ছিল শিল্পি-মনের দুরন্ত তাগিদ। তা' ছাড়া ছিল জীবিকা নির্ব্বাহের প্রশ্ন। এ লাইনে যোগদানে আমার কখনও ব্যক্তিগত প্রশ্ন বা আপত্তি ছিল না। ছবিতে আত্মপ্রকাশের পর আমার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কোন পরিবর্ত্তন এসেছে কি না—এ প্রশ্নের উত্তরে শুধু এটুকুই বলবো, জীবন সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

এই ভাবে শ্রীমতী কানন-দেবী কিছুক্ষণ বলার পর থামলেন। আমি আবার কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরলুম, তিনি উত্তর দিয়ে চললেন। বললেন—দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী বলতে সাধারণতঃ আমি সাধারণ হিন্দু ঘরের মা ও বধূর কর্ত্তব্য পালন করে থাকি। আমার "হবি" বা খেয়াল ব'লতে সেলাই ও বাগান করা। 'আউটডোর গেমে'র মধ্যে ক্রিকেট ও টেনিস আমার সবচেয়ে ভাল লাগে আর 'ইনডোর গেমে'র ভেতর "ব্রিজ" খেলা। বহু মাসিক ও সাপ্তাহিক আমি পড়ে থাকি, তবে কোন্‌টা আমার সব চাইতে ভাল লাগে সে না বলাই ভাল। মাসিক বসুমতীও আমি পড়ে থাকি। পুঁথি-পুস্তকের মধ্যে প্রাচীন ও বর্ত্তমান বিশিষ্ট লেখকদের গ্রন্থাদি আমার পড়বার অভ্যাস রয়েছে।

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হ'লে কি কি বিশেষ গুণের প্রয়োজন, প্রশ্ন করলুম আমি। শ্রীমতী ভট্টাচার্য্য দৃঢ়তাব্যঞ্জক কণ্ঠে বললেন, চলচ্চিত্র জগতে গুণী শিল্পী হ'তে হ'লে যে কয়টি গুণ না থাকলে নয় সে হচ্ছে চেহারা, অভিনয়কুশলতা, শ্রমশীলতা ও শেখবার আগ্রহ আর সেই সঙ্গে প্রয়োজন গ্রহণক্ষম মনের ও উদ্দেশ্যের সততা। পরিচালক হ'তে হলেও কয়েকটি বিশেষ-গুণ থাকা চাই। যেমন, এ শিল্প সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, বলিষ্ঠ কল্পনাশক্তি, নতুন ভাবে একটা কিছুকে দেখা এবং সে দেখাকে যথাযথ রূপায়িত করবার ক্ষমতা। ভাল ছবি তৈরীর জন্মে চাই প্রথমেই ভাল গল্প বা কাহিনী যার চলচ্চিত্রে সার্থক রূপ দেওয়া সম্ভব। এর সঙ্গে থাকতে হ'বে অভিনয়-দক্ষতা, শিল্পীদের ঐক্যপ্রচেষ্টা, এবং কাহিনীর এমন ভাবে রূপায়ন—যাতে জনসাধারণ সহজেই হ'বে আকৃষ্ট।

আমার পরবর্ত্তী প্রশ্ন, বাংলা ছবির উৎকর্ষসাধন কি প্রকারে সম্ভব বলে আপনি মনে করেন? উত্তর দিলেন শ্রীমতী কানন দেবী অত্যন্ত ধীর ভাবে—বাংলা ছবি আজ মরে যেতে বসেছে। দৈনন্দিন জীবনের রূঢ় বাস্তবকে নিয়ে ছবি এমন ভাবে তৈরী করা প্রয়োজন যা আনন্দ ও জ্ঞান দুই-ই একসঙ্গে যোগাবে। ছবির মান উন্নয়নের জন্ম আর একটি জিনিষ চাই, সে হ'লো ছবির নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সমালোচনা।

অভিজাত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের এ লাইনে যোগদান সম্পর্কে আমার মতামত কি, এ প্রশ্ন যদি জিজ্ঞেস করেন, শ্রীমতী কানন দেবী বলে চলেন, তবে আমি বলবো, বাঙ্গালী, বিশেষ করে অভিজাত পরিবারের ছেলে-মেয়েরা এ শিল্পে যোগদান করুক আমি এর পক্ষপাতী, তবে তাঁরা যখন এ দিকে আসবেন তার আগে তাঁদের মনে যদি কোন ইতস্ততঃ ভাব থেকে থাকে তা ত্যাগ করতে হ'বে। সম্পূর্ণ খোলা মন না হ'লে এ লাইনে এসে কোন লাভ নেই।

আমার অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী ভট্টাচার্য্য বলেন, চলচ্চিত্র-জগতে যোগদান করে আর্থিক দিক থেকে আমি কি পেয়েছি না পেয়েছি সে ব'লতে চাই নে। তবে মনে পড়ছে প্রথম ছবি "জয়দেব-এ" যখন অবতীর্ণ হই তখন মাত্র ২৫৲ টাকা পেয়েছিলুম। সে টাকাও পুরো আমার রইল না, কোথা থেকে কে একজন দালাল এসে ২০৲ টাকা মেরে দিলে। আমার ব'লতে রইল মাত্র পাঁচটি টাকা।

সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান কোথায়, এর উৎকর্ষ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার নিজস্ব মতামত কি—এ প্রশ্নটি আমি যখন তুলে ধরলুম তখন লক্ষ্য করলুম—কানন দেবীর যেন এ-সম্পর্কে বেশ কিছু বলবার আছে। তিনি স্পষ্টই বললেন, চলচ্চিত্র শিল্প সম্প্রতি আমাদের সমাজ-জীবনে একটা উল্লেখযোগ্য স্থান নিয়েছে। এর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত সম্ভাবনাময়, ব্যবসার দিক থেকে এবং শিক্ষার দিক থেকেও। তবে এ দেশের ষ্টুডিয়োগুলো সাজ-সরঞ্জামের ক্ষেত্রে এখনও বিদেশের তুলনায় সম্পূর্ণ নয়। এর উৎকর্ষ-সাধনের জন্ম আরও অনেক সরঞ্জাম অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজন। এ শিল্পের চরম উন্নতির জন্ম সরকারী সাহায্য অবশ্যই পেতে হ'বে। সরকার অগ্রণী হ'লে এ শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর না হয়ে পারে না।

টকির টুকিটাকি

ফিল্মস্ ফাউণ্টেন লিমিটেডের "ঝড়" প্রায় শেষ হয়ে এল। রূপায়ণে আছেন কমল, কানু, নীতিশ, ভানু, কবিতা, প্রীতিধারা প্রভৃতি। "ছোট বউ" চিত্র তুলছেন যুগবাণী চিত্র প্রতিষ্ঠান, শ্রেষ্ঠাংশে আছেন মলিনা ও জহর গাঙ্গুলী। ওয়েষ্টার্ণ ফিল্ম এবার "খুনী" আমদানী কোরবেন সহরে। এই ব্যাপারে আগাগোড়া সাহায্য কোরেছেন সাধনা বোস্, পাহাড়ী সান্যাল, ধীরাজ, নমিতা প্রভৃতি। "কল্পনার সংসার" নিয়ে হিন্দুস্থান ফিল্মস্ খুব ব্যস্ত। সন্ধ্যারাণী, রবীন, বিকাশ, অহীন্দ্র, অনুভা প্রভৃতি শিল্পীরা এই সংসারে জড়িয়ে পড়েছেন। কাহিনীকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরিচালনায় "ডাকিনীর চর" অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। ছবিখানির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন ধীরাজ, বিনয়, নমিতা সিংহ প্রভৃতি। ভাস্কর সিনেটোন "মেজ জামাই" নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। গুরুদাস, গীতশ্রী, সন্তু মতিলাল সাহায্য কোরছেন ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে। এ, কে, ডি প্রোডাকসন্স এবার সহরের চিত্রগৃহগুলিতে নিয়ে আসছেন "আশীর্ব্বাদ"। ছবিখানিতে নেমেছেন সঙ্গীত-পরিচালক রবীন মজুমদার, বনানী, গীতা সিং, বিজন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি। কাহিনীকার শৈলজানন্দের পরিচালনায় "বাংলার নারী"র চিত্ররূপ তুলছেন সিনেফিল্ম প্রোডাকসন্স। ভূমিকায় আছেন ছবি, রবীন, মঞ্জু, তুলসী, অপর্ণা, মহেন্দ্র গুপ্ত ও আরও অনেকে। সুশীল মজুমদারের পরবর্ত্তী ছবি "ভাঙ্গাগড়া"র কাজ বেশ এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন ছবি, রবীন, সন্ধ্যারাণী, ধীরেন, সাবিত্রী, আরতি মজুমদার প্রভৃতি। বাসবদত্তা পিকচার্সে'র এবারকার ছবি বৃন্দাবনের রাধা নয়, "বাণীচকের রাধা"। রূপায়ণে আছেন জহর, মঞ্জু, চন্দ্রাবতী, রবীন ও আরও অনেকে। পৌরাণিক চিত্র "খনা"র চিত্ররূপ তুলছেন বোসার্ট পিকচার্স।
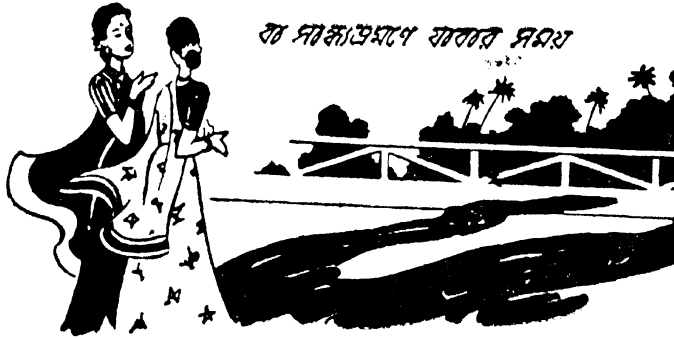
উদয়ভানু

সানাই-মঞ্চে প্রভাতী সুর ধ'রেছিল বাদ্যকার।

তখন হয়তো নক্ষত্র ছিল আকাশে; দিগ্বলয় ছিল তিমিরাচ্ছন্ন; ঘুম-ভাঙা পাখীর ক্ষুধার্ত কণ্ঠ কচিৎ শোনা যায়। মা পতিতপাবনীর মন্দিরের সিংহদ্বারে চূড়োয় আছে সুদৃশ্য ও কারুকার্যময় নহবৎখানা। বরাদ্দ নিয়মে প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় রাগ-রাগিণীর খেলা চলে সেখানে। নিত্য-নূতন সুরে। রাজা বাহাদুরের হুকুমে, গত কালের রাগ আজকে চলবে না কোন মতেই, আজকের রাগিণী আবার আগামী কল্য অচল। এই সানাইয়ের বাদ্যধ্বনি শুনে ঘুম ভাঙবে, ইচ্ছা হয়তো শয্যা ত্যাগ করবেন। বাদ্যযন্ত্রের মিষ্টি আওয়াজ না শুনলে ঘুম ভাঙবে না রাজা বাহাদুরের। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শুধু ভোগ বিলাস, এবং বৈভবে মগ্ন থাকলেই চলবে না। নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। সোনার পালঙ্কে শুয়েও সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা না থাকলেও পরম আলস্য থেকে মুক্ত করতে হয় নিজেকে। ঘুমে ঢুলু-ঢুলু আঁখি মেলতে হয়। কক্ষ-অভ্যন্তরে কি সূর্য্যালোক প্রবেশ করেছে? রাজা বাহাদুর ঘরের ইদিক-সিদিক দেখেন। চোখে ঘুমের জড়িমা, মিথ্যাই বর্ণশোভা দেখলেন কি! চোখের ভুলে এত রঙ দেখলেন! ঘুম-চোখে? লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, বেগুনী রঙের কাচ ঘরের চিত্র-বিচিত্রিত বাতায়নশীর্ষে। রূপ এবং রঙের সংযোগ। বাহির-আকাশে আলো ফুটলেই দেখা যায় ঐ রঙীন ডিজাইন, নচেৎ নয়।

—রাজা কালীশঙ্কর বাহাদুরের জয়!

রাজপ্রাসাদের কোথায় কারা জয়ধ্বনি তোলে! আকাশ-বাতাস কম্পিত হয়ে উঠে উল্লাসে। মুদিত চক্ষু পুনরায় উন্মীলিত করলেন রাজা বাহাদুর। চোখ মেলে তাকালেন। দেখলেন চতুর্দ্দিকে হলুদ বর্ণ। কাঁচা-হলুদ রঙ স্তূপীকৃত হয়ে আছে কি যত্র-তত্র?

রাজঘরের চার দেওয়ালের ব্র্যাকেটে সারি সারি সৈন্য।

সৈন্যদের আশে-পাশে গাছ-গাছড়া। পাহারা দিচ্ছে সৈন্য দল। একেক দেওয়ালের সৈন্য দলকে পরিচালিত করছে এক জন অশ্বারোহী সেনাপতি। বল্লম উঁচিয়ে আছে।

সোনার সৈন্য। রূপার সাজসজ্জা, তরোয়াল।

সোনার গাছে রূপার পাতা। মণি-মাণিক্যের ফুল-ফল। রৌপ্যময় অশ্ব। সোনার সেনাপতি। হোক না নির্জীব, ক্ষতি কি? ভোরের আলো-আঁধারিতে দেওয়ালের ব্র্যাকেটে সসৈন্য সেনাপতিরা যেন মূর্ত্তিমান হয়ে উঠেছে। এখনই বুঝি যুদ্ধারম্ভ করবে। আক্রমণ করবে।

সোনার পালঙ্ক, সোনার কেদারা।

দেওয়াল-গাত্রে জল-সোনার বাহার-বিন্যাস। ঘরের মেঝেয় সোনার তারের গালচে। তাই বোধ করি রাজা বাহাদুরের চোখে শুধু রাশি রাশি হলুদ বর্ণ দেখা দিয়েছে। চক্ষু উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে তাই বিস্মিত হয়েছিলেন প্রথম দৃষ্টিতে। চোখে যে নিদ্রার জড়িমা, দেহে আলস্য।

—জয়, রাজা কালীশঙ্কর বাহাদুরের জয়!

আবার কারা জয়ধ্বনি তোলে! সোল্লাসে? নিদ্রাপ্লুত দুই চক্ষু। জয়ধ্বনির চিৎকারে কালীশঙ্কর যেন প্রকৃতিস্থ হ'লেন। গত রাত্রির নেশার ঘোর কি তবে নেই এখন আর? রাজা বাহাদুর ধীরে ধীরে উঠে বসলেন, বহুমূল্য শয্যা ত্যাগ করলেন এবং দণ্ডায়মান হ'য়ে আড়মোড়া ভাঙলেন। অর্থাৎ জড়তানাশের জন্য অঙ্গবিক্ষেপ করলেন। হাই তুললেন গোটা কয়েক। আসব পান করে'ছিলেন রাজা বাহাদুর। চুয়ানো-মদ বা স্পিরিট। লোকে পান করে, মাত্রা বজায় রাখে। কালীশঙ্কর নিদ্রায় অচেতন হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যতক্ষণ পেরেছিলেন ততক্ষণ পূর্ণপাত্র আসব পান করেছেন। দৈহিক কষ্ট পেয়েছেন; বুকে জ্বালা ধ'রেছে; কপালের দুই তীরে কে যেন হাতুড়ী পিটেছে: লোক চিনতে পারেননি—তবুও রাজা বাহাদুর ক্ষান্ত হননি। পাত্র শেষ হয়ে গেছে, আবার পাত্র পূর্ণ ক'রেছেন কানায় কানায়। কয়েক চুমুকে নিঃশেষ করেছেন প্রতিটি পাত্র। সোনার পাত্র। যতক্ষণ না জ্ঞানহারা হয়ে শয্যায় লুটিয়ে পড়েছেন ততক্ষণ একের পর এক পাত্র শেষ ক'রেছেন। বাধা দেবে এমন ক্ষমতা কারও নেই, নিষেধ করবে এমন সাহসও কারও ছিল না। বুকের ঠিক মধ্যস্থলে অসহ্য একটা ব্যথা ধ'রেছিল, শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, শরীরের

বল হারিয়েছিলেন—তবুও কোন' মতেই পানে বিরত হননি রাজা বাহাদুর। সঙ্গে সঙ্গে চেখেছিলেন মাংস না মাছের গুলী-কাবাব কয়েকটা। আর মেওয়া-ফল। বাদাম, পেস্তা, আখরোট। ছোট এলাচ। জৈত্রী, জিরা, জায়ফল।

ঐ তো প'ড়ে আছে গত রাত্রির উচ্ছিষ্ট পানাহারের সরঞ্জাম।

ভোরের আলো-আঁধারিতে চেকনাই তুলছে পাত্র ক'টা। রঙীন মিনাকরা স্বর্ণময় পাত্রে আর রেকাবী।

—খানসামা! খানসামা!

রাজা বাহাদুর কালীশঙ্কর সরবে ডাক দিয়েছিলেন। রাজমহল গম্ গম্ ক'রে উঠেছিল রাজা বাহাদুরের আহ্বানে।

—ডাকতেছ হুজুর?

কার যেন ভয়ার্ত কণ্ঠ। কক্ষের বাইরে কে কথা বলে এমন ভয়ে ভয়ে! আড়ষ্ট কণ্ঠে সাড়া দেয়।

—হুজুর!

—চান-ঘরে যাবো।

ভয়ার্ত মানুষটি কথা বলে সসঙ্কোচে। প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে। ভয়ে যেন জড়সড় হয়ে আছে। চোখের দৃষ্টিতে তার অনন্যসাধারণ সরলতা। গাত্রবর্ণ ঘনকৃষ্ণ। শুভ্র দন্তপাতি। পরিধানে কালো আদ্দির পাঞ্জাবী, চুড়িদার পায়জামা। আঁটসাঁট বাঁধা। কোমর-বাঁধা। খানসামা কথা বলে রুদ্ধশ্বাসে। বলে,—হুজুর সকল কিছুই প্রস্তুত, হুজুরের যাওয়ার অপিক্ষায় আছে; হুজুরকে কি ধ'রে লিয়ে যাওনের প্রয়োজন আছে?

দূরে, বহুদূরে ব্যাঘ্র-নিনাদ শ্রুত হয়েছিল।

বাঙলার বাঘের হুঙ্কার। বাঘের ডাকে গগন ফেটে যায় যায় বুঝি! রাজা বাহাদুর কিন্তু হাসলেন। একটা হাই তুলতে তুলতে হেসে ফেললেন নিজ মনেই। কর্ণেন্দ্রিয়কে সজাগ করলেন। ব্যাঘ্র-নিনাদ কানে পৌঁছতে তবে যেন কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল হ'লেন রাজা বাহাদুর। ডাকের মত ডাক ডাকছে বটে বাঘটা, পরিতৃপ্তির সঙ্গে কক্ষ ত্যাগ করলেন।

পোষা-কুকুরের মত পিছু পিছু চললো খানসামা। ঈষৎ আনত হয়ে কুর্ণিশ করতে করতে চললো।

—জয়, রাজা কালীশঙ্কর বাহাদুরের জয়!

জয়োল্লাস অস্পষ্ট হয় ক্রমে ক্রমে। রাজা বাহাদুর বিরক্ত হয়ে ওঠেন। বাঘের ডাক চাপা পড়ে যে!

অদূরে রাজপ্রাসাদের সীমানার মধ্যে আছে চিড়িয়াখানা।

সারি সারি শান-বাঁধানো খাঁচা। পাখীর পিঞ্জর। পরিখা-বেষ্টিত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে মুক্ত পশুপক্ষী। চিড়িয়াখানার শোভা বর্দ্ধন করেছে বাঘ, সিংহ, বনমানুষ, নেকড়ে, হায়েনা আর হাতী। পাখী আছে অসংখ্য। আর আছে অজগর। মাংসাশী, ফলাশী, শাকাশী, পতঙ্গাশী, স্তন্যপায়ী ও রোমন্থক জীবের এমন একত্র সমাবেশ সহসা দেখা যায় না। রাজা বাহাদুরের সখের চিড়িয়াখানা। সখের বাগানের পাশে সখের চিড়িয়াখানা?

সুন্দরবন থেকে সদ্য এসেছে অতিবৃহৎ বাঘ।

রাজা বাহাদুরই আনিয়েছেন। তার জন্য পৃথক্ খাঁচার ব্যবস্থা হয়েছে। পশুর আকৃতি এত মোহময় হয়—বাঘটিকে দেখতে দেখতে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে যান রাজা বাহাদুর। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন বাঘের গতিপ্রকৃতি দেখে। হৃষ্টপুষ্ট আকার, সোনার মত গাত্রবর্ণে কালো কালো ডোরা। উজ্জ্বল দুই চোখে প্রখর বন্যদৃষ্টি। এক মুহূর্ত্তের জন্য কি স্থির হয় না! স্বল্পপরিসর খাঁচার মধ্যে সগর্ব্বে পায়চারী করে যায় অবিরাম। মুক্তিলাভের পথ খোঁজে যেন! কোথায় মুক্তি, কোথায়-পথ? কোথায় সেই গহন অরণ্য সুন্দরবন?

মোটা লোহার গরাদে নির্ম্মিত খাঁচার দ্বারমুখে বার বার বৃথাই থাবা মারে বাঘটি। কোন ফল হয় না। ব্যর্থকাম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চনিনাদ করতে থাকে।

এই বাঘের ডাক কানে পৌঁছতে তবেই যেন কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হন রাজা বাহাদুর। গম্ভীর মুখাকৃতিতে পরিতৃপ্তির অল্প হাস্যরেখা ফুটে ওঠে। অসম শক্তির অধিকারী একটি পশুকে পিঞ্জরাবদ্ধ করেছেন রাজা বাহাদুর। ঘুমের জড়তা বুঝি মুছে যায় চোখ থেকে।

—বাইরে লোকজন এসেছে কেউ?

স্নান-ঘর থেকে বেরিয়েই প্রশ্ন করলেন কালীশঙ্কর।

গোঁফের দুই সূক্ষ্ম প্রান্ত দু' হাতে পাকাতে পাকাতে প্রশ্ন করলেন। ভৃত্য, তাঁবেদার, খানসামাদের অনেকেই ততক্ষণে এসে জড় হয়েছে দরদালানে। কা'কে প্রশ্ন করলেন? কে দেবে উত্তর! নীরব মানুষগুলি পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে ভয়ে সিঁটিয়ে।

অবশেষে একজন বৃদ্ধ গোছের খানসামাই জবাব দেয়। বলে,—হুজুর, অনেকেই আইচেন। হুজুরের ইয়ার-বন্ধুদের প্রায় সকলেই আইচেন।

—বোষাল এসেছে?

কাষ্ঠ-পাদুকায় পা গলাতে গলাতে পুনরায় প্রশ্ন করলেন কালীশঙ্কর।

—হাঁ হুজুর। দলবল-সাঙ্গোপাঙ্গ সমেতই আইচেন।

—হালদারের পো আসে নাই?

রাজা বাহাদুর সশব্দ পদক্ষেপে চলতে চলতে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। একজন ভৃত্য হাওয়া-পাখা দোলাতে দোলাতে অনুসরণ করে তাঁকে। গ্রীষ্মের প্রকোপে সাতসকালেই রাজা বাহাদুর ঘামছেন। তাঁর লোমশ বক্ষে ফুটে উঠেছে ঘর্ম্মবিন্দু। হাতে-কাটা সূতার যজ্ঞোপবীত সিক্ত হয়ে গেছে। হাতের ডান বাহুর নবরত্নের কবচ-কুণ্ডল বড় বেশী এঁটে

গেছে যেন। বাম হস্তের তর্জ্জনী সাহায্যে তাবিজটিকে সামান্য নীচে নামিয়ে দিলেন।

খানসামা ভীতিকাতর কণ্ঠে বললে,—তেনাকে হুজুর আসতি দেখি নাই।

—মা জননীকে সংবাদ দেওয়া হোক।

কথা বলতে বলতে কালীশঙ্কর সাজঘরে প্রবেশ করলেন। সাজসজ্জার ঘরে।

পোষাক পরিবর্ত্তন করতে হবে। রাজমহল থেকে যেতে হবে তাঁকে সদরের বৈঠকে। নির্জ্জনতা থেকে জনারণ্যে। বৈঠকখানা এতক্ষণে সত্যই জনাকীর্ণ হয়ে উঠেছে। এসেছে কত কে, চেনা আর অচেনা। তামাক সাজার পালা শুরু হয়ে গেছে। হুঁকোয় কলকে ব'সেছে। অম্বুরী তামাকের সুগন্ধে বারবাড়ী টইটম্বুর।

সাজঘরের চার দেওয়ালে দীর্ঘকায় দর্পণ। দর্পণে সোনালী লতাপাতার চতুষ্কোণ বেষ্টন। রাজা বাহাদুরের প্রতিবিম্ব দেখা যায়—কত অসংখ্য রাজা বাহাদুর!

ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে আছে নিরেট রূপার কেদারা।

যেন একটি সিংহাসন, এমন অপূর্ব্ব কারুকার্য্য! কালীশঙ্কর কেদারায় ব'সে পড়লেন ক্লান্ত ও অবসন্নের মত। চোখে-মুখে জল পড়লো, তবুও আলস্য যেন ঘুচলো না। চোখ যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন।

—হুজুর, রাজমাতা হুজুরের তরে অপিক্ষা করছেন। হুজুর ইচ্ছা করলেই তাঁর চরণ দর্শন—

ভৃত্যের কথা শেষ করতে দিলেন না কালীশঙ্কর।

কেদারা থেকে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লেন ক্ষিপ্রগতিতে। নেহাৎ শিশুর মতই মাতৃদর্শনের প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছেন রাজা বাহাদুর।

—মা জননী কোথায়? আমার মা জননী!

একই কথা বার বার স্বগত করতে করতে কক্ষ ত্যাগ করলেন। কাষ্ঠ-পাদুকার শব্দ ছড়িয়ে প'ড়লো সাদা-কালো চৌকা পাথরের দর-দালানে।

ভৃত্য, তাঁবেদার এবং খানসামার দল হতচকিতের মত দাঁড়িয়ে রইলো, যে যেখানে ছিল। ওদের কারও হাতে হাত-পাখা, কারও হাতে ভিজা গামছা, কারও হাতে হাত-আয়না, চিরুণী। কেউ বা আতরের শিশি, কেউ বা গোলাপ-জলের গোলাপ-পাশ হাতে দাঁড়িয়ে রইলো চিত্রার্পিতের মত। যেন নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ!

রাজা বাহাদুর গেছেন প্রণাম সারতে। এখনই ফিরে আসবেন, তাই আর কারও মুখে কথা ফোটে না। শঙ্কা ও সঙ্কোচে মূক হয়ে যায় হয়তো!

সাদা-কালো চৌকা পাথরের সুবিশাল দর-দালানের শেষ-সীমানায় প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মানা রাজমাতা বিলাস-বাসিনী। মুর্শিদাবাদী রেশমের বস্ত্রাঞ্চল বাতাসে কাঁপছে। রাজমাতার চোখে যেন শূন্যদৃষ্টি। লক্ষ্য ক'রছেন না কিছুই, তবুও নিবদ্ধ দৃষ্টি। বহিরাকাশে সেই দৃষ্টি প্রসারিত।

—মা, মা জননী, তোমার চরণধূলি দেও।

রাজমাতার কাছাকাছি পৌছে কাতর-আহ্বান জানালেন কালীশঙ্কর। কাষ্ঠ-পাদুকা পরিত্যাগ করলেন। ভূলুণ্ঠিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন, বিলাসবাসিনীর পদদ্বয় স্পর্শ করলেন স্বহস্তে। নিজ মস্তকে হাত দিলেন।

—আশীর্ব্বাদ কর মা জননী! তোমার মুখ যেন আমি উজ্জ্বল করতে সক্ষম হই, সেই আশীর্ব্বাদ কর।

রাজা বাহাদুরের কাতর অথচ গম্ভীর কণ্ঠস্বরে দর-দালানের কড়িকাঠের পোষা গোলাপায়রার দল ডানা ঝাপটায়, বক বকম্ করে।

বিলাসবাসিনী কি পাষাণ হয়ে গেছেন!

মুখে তাঁর কথা নেই। নিষ্পলক, শূন্য-দৃষ্টি দুই চোখে। নীরব ওষ্ঠ। এক অশেষ দুঃখের নিঃশব্দ অভিব্যক্তি বিলাসবাসিনীর মুখাবয়বে। কি এক অন্তর্জ্বালায় জ্বলছে যেন তাঁর অন্তর। ধীরে ধীরে একটি হাত পুত্রের মস্তকে স্থাপন করলেন। কোন আশীর্ব্বচনই উচ্চারণ করলেন না। কালীশঙ্করের ভক্তি ও আবেগময় প্রণাম শেষ হ'তেই রাজমাতা ত্যাগ করলেন সুবিশাল দর-দালানের শেষ-সীমানা। চললেন যে দিকে নিজের মহল সে দিক পানে।

সাজঘর আবার হাসতে থাকে যেন।

রাজা বাহাদুর রূপার কেদারায় সমাসীন হ'লেন। মাথার প'রে টানা-পাখা দুলে উঠলো। ঘরে বুঝি ঝড় বইতে লাগলো। হেনা আতরের সুগন্ধ ছড়ালো ঘরে। ভৃত্য, তাঁবেদার ও খানসামার দল কিংকর্ত্তব্য ঠাওরাতে পারে না যেন। কারও হাতে মিহি-কোঁচানো জরিদার বেনারসী জোড়, কারও হাতে খিড়কীদার পাগড়ী, কারও হাতে জরির লপেটা-পাদুকা। চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছে সকলে। সসম্ভ্রমে।

রাজকাজে যাবেন রাজা বাহাদুর। দরবারে বসবেন।

খানসামাদের একজন ভয়ে ভয়ে বললে,—হুজুর, পোষাকটি যে বদল করতে হয়। বেলা অনেক হয়েছে।

গ্রীষ্মাধিক্যে কালীশঙ্কর ঘর্ম্মাক্ত হয়ে পড়েছেন।

কপালে, বক্ষে ও পৃষ্ঠে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিয়েছে। টানা-পাখার স্নিগ্ধ হাওয়ায় দুই চক্ষু নিমীলিত ক'রে আছেন রাজা বাহাদুর। খানসামার ডাক শুনে চোখ মেলে তাকালেন ও উঠে দাঁড়ালেন। নধরকান্তি দেহ কালীশঙ্করের। নড়তে চড়তে যেন কষ্ট অনুভব করেন। বিরক্তি সহকারে বললেন,—দাও, জোড় পরিয়ে দাও।

নেহাৎ শিশুর মতই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন।

খানসামা তড়িৎ গতিতে পোষাক পরিবর্ত্তন ক'রে দেয়। কোমরের কষি এঁটে দেয়। কোঁচা ও কাছা

মুখাকৃতি

ার-যন্ত্রী —কুমারী রেখা সেনগুপ্তা (২য়)

কাশ্মীরে —অবনী মতিলাল

—অজিতকুমার ঘোষ (১ম) কোণারকের মূর্তি

দিল্লী বিড়লা-মন্দিরের একটি মূর্তি —সুধাংশুভূষণ দাশগুপ্ত (৩য়)

বধূ ? —রবীন সরকার

প্রতিবিম্ব —বাচ্চুরাণী মুখোপাধ্যায়

প্রতিবিম্ব —নির্মলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

আলিম্পন —শ্রীমুকুল মুখোপাধ্যায়

জয়রামবাটীর শ্রীশ্রীমার শতবার্ষিকী উৎসবের চারটি চিত্র —অজিত মিশ্র গৃহীত

বিজ্ঞপ্তি

অসংখ্য আলোকচিত্র আমাদের দপ্তরে জমায়েৎ হওয়ার দরুণ বর্তমান সংখ্যা থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার প্রকাশ স্থগিত রাখা হবে। প্রতিযোগিতার পরিবর্তে আমরা জমে-ওঠা আলোকচিত্র কয়েক মাস যাবৎ পর পর প্রকাশ করবো। আশা করি এ ব্যবস্থায় পাঠক-পাঠিকার আপত্তি হবে না। এবং এখন থেকে যত দিন না প্রতিযোগিতা পুনঃপ্রকাশ হচ্ছে সে দিন যে কেউ যে কোন আলোকচিত্রই প্রেরণ করতে পারেন।

আকৃতিসহ শোভাযাত্রা

মন্দির-অভ্যন্তরে শ্রীমার মর্মর মূর্তি

সামলে দেয়। কালীশঙ্কর পুনরায় বসে পড়েন কেদারায়। মাথার অবিন্যস্ত চুল আঁচড়ে টেরী বাগিয়ে দেয় খানসামা। ঢেউ-খেলানো কোঁকড়া চুলের বাঁ পাশে সীঁথি কেটে দিতে হয়। গোঁফ-জোড়াটা আরও একবার নিজেই পাকিয়ে নেন রাজা বাহাদুর। জরির লপেটা-পাদুকা এগিয়ে দেয় কেউ। কেউ গলায় ঝুলিয়ে দেয় মতির মালা। হেনা-আতরের পরশ পড়ে ভ্রূযুগলে।

রাজা বাহাদুর বললেন,—গায়ত্রীটা সেরে নিই আমি। অন্দরে সংবাদ দেওয়া হোক, আমি ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি।

একজন ভৃত্য বললে,—তা আর বলতে হবে না হুজুর! আপনার খাওয়ার ঘরে আপনার প্রাতরাশ প্রস্তুত। আপনি গেলেই দেখতে পাবে।

আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু রাজা বাহাদুরের। সমুখ ঠেলা চোখ।

নিমীলিত চোখ, তবুও শুভ্র কনীনিকা ঈষৎ দেখা যায়। শিবনেত্র যেন!

—ওঁ ভূর্ভুব: স্ব: তৎ সবিতুর্বরেণ্যং—

গায়ত্রীর শুদ্ধমন্ত্র মৃদু গুঞ্জন তোলে সাজঘরে। একবার-দু'বার নয়, অন্তত দশ বার এই মন্ত্র জপ করতে হবে। ইষ্টদেবী, মন্ত্রদেবীকে স্মরণ করতে হবে। মা পতিতপাবনীকেও স্মরতে হবে।

সাজঘরে হেনা-আতরের সুবাস।

এক-রাশি ধূপ জ্বলছে ধূপদানিতে। ঘরে-দোরে ধুনো প'ড়েছে, তাই গুগ্‌গুলের সুগন্ধ নির্য্যাস ভাসছে বাতাসে। রাজা বাহাদুর ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করেন। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে পৈতা জড়িয়ে মন্ত্রসংখ্যার গণনা রাখেন।

ঘর কখন শূন্য হয়ে গেছে। একা শুধু রাজা বাহাদুর আছেন।

ওঁ শব্দধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিচারকের পাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে, যে যে দিকে পেরেছে। সাজঘরে কত অসংখ্য দ্বার, কত গবাক্ষ! গ্রীষ্মের সকালে সাজঘর আলোকিত হয়ে আছে। টানা-পাখা যে কে কোথায় লুকিয়ে ব'সে টানছে চট ক'রে ধরা যায় না। ঘরের মধ্যে তুফান বইছে যেন। তবুও ঘাম ঝরছে রাজার। প্রশস্ত ললাটে স্বেদবিন্দু।

মাতৃদর্শন ক'রলেন; মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন, পদধূলি মাথায় ছোঁয়ালেন।

কিন্তু মার মুখে কথা ফোটাতে পারলেন না কালীশঙ্কর। ফিরে এলেন বিষণ্ণ চিত্তে। রূপার কেদারায় বসতে বোধ করি তার মন চাইলো না। কেদারা ত্যাগ ক'রে কক্ষমধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকেন ইতস্তত:। উন্মুক্ত বাতায়ন। রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন বহুদূরবিস্তৃত প্রাঙ্গণ দেখা যায়। রাজা বাহাদুর সহসা বাতায়নমুখে দাঁড়ালেন। দেখলেন, আকাশে প্রখর সূর্য্যালোক—রূপালী আকাশ। রাজগৃহের মুক্ত প্রান্তরে বিচরণশীল পশু-পক্ষী। হরিণ, খরগোশ আর জেব্রা; ময়ূর, সারস, উটপাখী। সুবৃহৎ বৃক্ষকাণ্ডের সঙ্গে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হস্তিযূথ। হাতীর পদসঞ্চালনে লৌহশৃঙ্খলের ঝণৎকার শোনা যায়। গললগ্ন ঘণ্টা ঢং ঢং শব্দ তোলে। পরিখার জলে অবগাহন না খেলা করছে কয়েকটি জলহস্তী।

রাজা বাহাদুরের সম্প্রসারিত দৃষ্টি ব্যাহত হয়ে ফিরে আসে।

কি দুর্ভেদ্য জঙ্গল সুতানুটীর আনাচে-কানাচে! অজস্র গগনস্পর্শী মহীরুহ! বট, অশ্বত্থ, শিমুল, দেবদারু এবং আম্রবৃক্ষের ঘন সন্নিবেশই বুঝি হাওয়ার গতি রোধ করে। মানুষের দৃষ্টি ব্যাহত ক'রে দেয়। ঐ সীমাহীন সবুজবৃক্ষ-রেখার অপর প্রান্তে কি আছে কে জানে! শুধুই কি অরণ্যগহ্বর? সুতানুটীর উত্তরে দমদম-বরানগর; দক্ষিণে গোবিন্দপুর; পূবে শিয়ালদহ-বৈঠকখানা-উল্টাডিঙ্গি; পশ্চিমে আঁকাবাঁকা অজগরাকৃতি গঙ্গানদী।

মা ফিরেও দেখলেন না। মন খোলসা ক'রে একটা আশীর্ব্বাদ করলেন না। বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করলেন না। শুভ-অশুভের খোঁজও নিলেন না। পাষাণমূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে ছিলেন রাজমাতা। অসহ্য নীরবতা পালন ক'রেছিলেন। প্রচণ্ড এক অভিমানের দুঃখে রাজা বাহাদুরও কেমন যেন মনমরা হয়ে গেলেন। কোন্ উপায়ে রাজমাতার মুখে হাসি ফোটানো যায়? মায়ের মুখে হাসি?

—রাজা বাহাদুর!

—কে?

আচমকা আহ্বান শুনে চমক লাগে কালীশঙ্করের। ঘোর দুশ্চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। গভীর চিন্তার মধ্যে হঠাৎ ডাক শুনেছেন। বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ সুতানুটীর দিকচক্র থেকে চোখ ফেরালেন কালীশঙ্কর। আহ্বানকারীকে দেখেই বললেন,—কে? পুরোহিত মশাই?

—হ্যাঁ রাজা বাহাদুর! মা পতিতপাবনীর চরণোদক আনয়ন করেছি। স্নিগ্ধ কণ্ঠে কথা বলেন ব্রাহ্মণ।

—আসতে আজ্ঞা হোক। দেন চরণোদক দেন, পান ক'রে জ্বালা জুড়াই।

রাজা বাহাদুর কালীশঙ্করের কণ্ঠ কেন কে জানে দুঃখভারাক্রান্ত। কথার শেষে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ঊর্দ্ধমুখ হয়ে হাঁ করলেন। মা পতিতপাবনীর পাদোদকপূর্ণ সোনার কুশি উজাড় করে দিলেন ব্রাহ্মণ অতি সন্তর্পণে। সেই সঙ্গে স্বস্তিবাচন আওড়ালেন। মঙ্গলমন্ত্র বললেন,—রাজা কালীশঙ্কর বাহাদুরের জয় হোক!

—মহাশয়ের পদধূলিও দেন। স্মিতহাস্যে বললেন রাজা বাহাদুর।

পুরোহিতের দুই জানুকাপালিক স্পর্শ করলেন। করজোড়ে নমস্কার জানালেন।

—শুভমস্তু। মঙ্গলমস্তু। বললেন পুরোহিত। হাত তুললেন। বরাভয় মুদ্রা দেখলেন কি কালীশঙ্কর, পুরোহিতের ঊর্দ্ধহস্তে! হয়তো তাই। যেন অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিলেন রাজা বাহাদুর, ঐ যাজককে দেখছিলেন খুঁটিয়ে।

রক্তবর্ণ বস্ত্রপরিহিত দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণের মুণ্ডিতমস্তকে সুদীর্ঘ শিখাগুচ্ছ। বাহু এবং গলদেশে রুদ্রাক্ষের বন্ধনী। ঘনশ্যাম বর্ণে শোভা পায় শুভ্র যজ্ঞোপবীত। বিস্তৃত ললাটে ঘৃতাক্ত সিঁদুররেখা। শিখাপ্রান্তে একটি রক্তজবা দোদুল্যমান। রাজা বাহাদুর দেখে যেন আচ্ছন্ন হয়ে যান। কি ভয়াবহ রূপ ব্রাহ্মণের।

যাজকের মুখে যেন হাসির মৃদু রেখা সদাই লেগে আছে। এই জড়জগতের অতীত কোন্ এক জগতে মন যেন তাঁর নিমগ্ন হয়ে আছে! এই মনুষ্যলোকের মধ্যে নয়, কোথায় কোন্ স্বর্গলোকে ধাবমান পুরোহিতের মনশ্চিন্তা! কার যেন ঐশ্বরিক রূপ ব্রাহ্মণের দৃষ্টিপথে দেখা যায়, অথচ সেই রূপাতীতের সন্ধান বুঝি মিলছে না? গুন্ গুন্ শব্দে অবিরাম মন্ত্র ব'লে চলেছেন যাজক, অস্ফুট উচ্চারণে। আর থেকে থেকে, থেমে থেমে হাসছেন মৃদু মৃদু। ব্রহ্ম-দর্শনানন্দের হাসি হাসছেন কি?

কালীশঙ্করের পলকহীন দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্যও ফেরে না।

সাগ্রহে লক্ষ্য করেন ব্রাহ্মণকে, যেন এক বহির্জগতের মানুষ এই পুরোহিত ব্রাহ্মণ! মা পতিতপাবনীর পূজারী।

—মহাশয়ের রাজকার্য্যে গমন হবে না? ব্রাহ্মণ গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

—অবশ্যই হবে। বললেন কালীশঙ্কর।

পুরোহিত স্থানত্যাগ করেন। কক্ষ থেকে নতমস্তকে বহির্গত হন। দ্বারের শীর্ষে যদি মাথা ছুঁয়ে যায়!

সুগন্ধি ফুল ও চন্দনের মিশ্রিত একটি গন্ধও যেন সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে উবে যায়।

—তারা! তারা!

তারা নাম ডাকতে ডাকতে দর-দালানে অদৃশ্য হন পুরোহিত। বেশ দূর থেকেও ভেসে আসে সেই কণ্ঠধ্বনি। তারা! তারা! তারা—আ—আ!

যাজক ব্রাহ্মণ কেমন যেন আচ্ছন্ন করে দিয়ে গেলেন রাজা বাহাদুরকে।

উত্থানশক্তি বুঝি তাঁর লোপ পেয়ে গেছে। পুরোহিতের মুখে কেন এই রহস্যময় হাসি! অপার্থিব কি এক আনন্দের অনুভূতিতে পুরোহিত যেন বিমুগ্ধ হয়ে আছেন। ব্রাহ্মণের রক্তবর্ণ চক্ষুর্দ্বয়ে কি অপূর্ব্ব ভাবাবেশ! কালীশঙ্কর ভাবছিলেন, সাধনার কোন্ মার্গে পৌঁচেছেন ঐ ঘনকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ!

ব্রাহ্মণের মানসলোচনে নীলা তারামূর্ত্তি বিরাজ করে।

দশমহাবিদ্যার এক মহামায়া। তরুণবল্লরী ও তনুক্ষীণ-পয়োধরা উগ্রতারার অট্টহাস্য শুনছেন কি পুরোহিত? বলিপ্রিয়া, বলিরতা, রক্তপ্রিয়া, রক্তাক্ষী ও রুধিরাসর্ববিভূষিতা মহাদেবপ্রিয়ার উগ্রমূর্ত্তির পূজায় যে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। তারা নাম স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে পলায়নপর হয় যতেক ভূতপ্রেত-পিশাচ-রাক্ষস। তারার পূজা করলে সর্ব্বশাস্ত্রে দক্ষ হওয়া যায়, মোক্ষলাভ হয়।

ব্রাহ্মণ সেই মহামূর্ত্তির কল্পনায় যেন বিভোর হয়ে আছেন।

—রাজা বাহাদুর!

আবার চমকে ওঠেন কালীশঙ্কর। তারা নামের আহ্বান শুনে তিনিও যেন সম্মোহিত হয়েছেন।

—প্রাতরাশ প্রস্তুত, উঠতে আজ্ঞা হোক।

ভৃত্যদের একজন রাজা বাহাদুরের চেতনা ফিরিয়ে আনতে প্রয়াসী হয়। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হাতে হাত কচলায় আর কথা বলে।

—চলো যাই। বললেন রাজা বাহাদুর। অত্যন্ত ধীরে ধীরে ত্যাগ করলেন সাজঘর, অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্তে। ক্ষুধার তাড়না অনুভব করছেন কালীশঙ্কর, কিন্তু আহারে বসতে ইচ্ছা হয় না আদপেই।

জন্মদাত্রী জননী বিলাসবাসিনীর মুখে হাসি নেই।

মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন রাজমাতা, পরম দুঃখে। কোন্ উপায়ে মাতৃমুখে হাসি ফোটানো যায়? কালীশঙ্করের অন্তর দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে। মা অসুখী থাকবেন, আর তিনি কি না হাসতে হাসতে রাজত্ব করবেন! কালীশঙ্কর অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছেন, জামাতা কৃষ্ণরামের কবল থেকে ভগিনী বিন্ধ্যবাসিনীকে উদ্ধার না করলে মা আর ইহজীবনে হাসবেন না। বিন্ধ্যবাসিনীর দুঃখেই হয়তো কোন্ দিন মৃত্যুপথযাত্রী হবেন। কিন্তু উপায় কি? স্বেচ্ছাচারী কৃষ্ণরামের দাবী যে অসামান্য! কৃষ্ণরাম যা চায় তা কি সহজে দেওয়া যায়? কিয়ৎকাল পূর্ব্বে জমিদার কৃষ্ণরাম কয়েকটি সর্ত্তসহ একখানি পত্র প্রেরণ করেছেন। সেই পত্রের প্রতিটি সর্ত্ত যথাযথ পালিত হ'লে তবেই বিন্ধ্যবাসিনীর মুক্তিলাভ সম্ভব। নচেৎ নয়। পত্রটি রাজা বাহাদুর কালীশঙ্করকে লেখা।

কৃষ্ণরামের পত্রের সারমর্ম্ম এই:

"আমাদের মধ্যে যে পূর্ণ-মৈত্রী ও সৌহৃদ্য স্থাপিত আছে তাহাকে বজায় রাখিতে হইলে এবং আমার অন্যতমা সহধর্ম্মিণী বিন্ধ্যবাসিনী দেব্যাকে পিত্রালয়ে গমনের অবাধ অধিকার দিতে হইলে আমাকে অন্ততঃ পঞ্চসহস্র মোহর অগ্রে যৌতুক দিতে হইবেক। আমার অন্যতমা সহধর্ম্মিণী বিন্ধ্যবাসিনীর পরলোকগত পিতার সঞ্চিত ও রক্ষিত হীরা-মুক্তামণি-মাণিক্যের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ আমাকে উপঢৌকন হিসাবে দিতে হইবে। এই সঙ্গে একশতটি অশ্ব ও কুড়িটি হস্তী দিতে হইবে। উপরিউক্ত দ্রব্যাদি যথাযথ প্রেরিত হইলে আমার অন্যতমা সহধর্ম্মিণী বিন্ধ্যবাসিনীর উপর আমার পূর্ণ অধিকার লাঘব করিতে পারি। বিন্ধ্যবাসিনীও যদৃচ্ছা পিত্রালয়ে যাইয়া যত দিন খুসী থাকিতে পারে, তাহাতে আমি আপত্তি করিব না। কারণ, একজন স্ত্রী গতায়ু হইলেও আমার কোনরূপ ক্ষতি নাই। জিন্নেৎ-উল্-বেলাৎ (স্বর্গের

সমতুল্য) বঙ্গভূমিতে বিবাহের জন্য রূপবতী কন্যার অভাব হইবে না।"

পত্রখানি সেদিন হাতে পৌঁছলে কালীশঙ্কর পত্র পাঠ করতে করতে শিউরে উঠেছিলেন। পত্রটি হস্তচ্যুত হয়ে ভূমিতে পতিত হয়েছিল। চোখে অন্ধকার দেখেছিলেন রাজা বাহাদুর। মনে মনে ভেবেছিলেন,—কৃষ্ণরাম কি দুর্দ্দান্ত, কি নিষ্ঠুর, কি নির্লজ্জ!

রাজমাতা বিলাসবাসিনী পত্রমর্ম্ম অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানাবস্থায় ধরাশায়ী হয়ে প'ড়েছিলেন। বহুক্ষণ অতীত হওয়ার পর প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন রাজমাতা। মুখে-চোখে জল দিতে হয়েছিল। মাথায় গোলাপ-জল ঢালতে হয়েছিল। জ্ঞান ফিরে আসতে বলেছিলেন,—কালীশঙ্কর, জামাই কেষ্টরাম যা চায় দিয়ে দাও। আমার মেয়ের জীবন রক্ষা করো। সহোদরার প্রতি তোমার কর্ত্তব্য পালন করো।

মায়ের কথা শুনে চোখে অন্ধকার দেখেছিলেন রাজা বাহাদুর। বলেছিলেন,—আমি সামান্য ভূঁইয়া, আমি কোথা হ'তে পাবো এই বিপুল ধনসম্পদ? আমি কি সর্ব্বস্বান্ত হব?

—তা হ'লে আমার একমাত্তর মেয়েটা অত্যাচারে অত্যাচারে দগ্ধ হোক, মরুক!

রাজমাতা বিলাসবাসিনী আর অন্য কোন বাক্যব্যয় করেননি। সে দিন রাজমহল থেকে কাঁপতে কাঁপতে নিজের মহলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভূমিতে লুটিয়ে প'ড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন। মৃত রাজার অভাব প্রকটরূপে অনুভব করেছিলেন। আহা, তিনি যদি জীবিত থাকতেন।

প্রাতরাশে ব'সে রাজা বাহাদুর যতই ভাবেন ততই যেন তিনি ভাবনার কূলকিনারা হারিয়ে ফেলেন। মায়ের মুখের হাসি দেখতে হ'লে কালীশঙ্করের নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। পঞ্চসহস্র মোহর, হীরামুক্তা-মণি-মাণিক্যের এক-তৃতীয়াংশ, এক শত অশ্ব ও বিংশটি হস্তী—কোথা থেকে দেবেন রাজা বাহাদুর? কেনই বা দেবেন? কোন্ আইনে?

—আনারসের জারক সর্ব্বাগ্রে পান করুন রাজা বাহাদুর!

মধুমিষ্ট নারীকণ্ঠ শুনলেন কালীশঙ্কর। কে কথা বললে এমন স্নিগ্ধ কোমল ধ্বনিতে!

—কে?

শ্বেতপাথরের পাত্রসমূহ থেকে চোখ তুললেন রাজা বাহাদুর।

প্রাতরাশের আহার, তা-ও কতগুলি ভোজনপাত্র! নানা আকারের পাথর-বাটি পাশাপাশি অর্দ্ধবৃত্তাকারে সাজানো। সর্ব্বমধ্যে একটি পাথর-থালি। রাজা বাহাদুরের ডাইনে কৃষ্ণপ্রস্তরের জলকলসী, জলের ঘটি। বাম দিকে মুখপ্রক্ষালনের পাত্র। পেতলের ছিলিমচি।

চোখ তুলে দেখলেন রাজা বাহাদুর।

ভৃত্য, তাঁবেদার, খানসামা কেউ নেই সেখানে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সকলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কালীশঙ্কর সম্মুখদ্বারে দেখলেন রাজমহিষী আবির্ভূতা। রাজা বাহাদুরের প্রধানা মহিষী। মহারাণী।

—কে? উমারাণী?

—হাঁ, রাজা বাহাদুর! সর্ব্বাগ্রে আপনি আনারসের জারকটুকু পান করুন। প্রখর গ্রীষ্ম, জারক পানে আপনি তৃপ্ত হবেন। আমি স্বহস্তে প্রস্তুত করেছি এই পানীয়।

কথা বলতে বলতে রাজমহিষী দ্বার অতিক্রম ক'রে ঘরে প্রবেশ করলেন। দেহের অলঙ্কারের ঝঙ্কার উঠলো ঘরে। কত অলঙ্কার রাজমহিষীর দেহে, কত ঐশ্বর্য্য! তদুপরি কি অনন্যসাধারণ রূপ রাজরাণীর! যেন স্বর্গের অপ্সরী!

রাজা বাহাদুরও ভাবছিলেন কোন্ পাত্রটি সর্ব্বাগ্রে মুখে তুলবেন। কি খাবেন সব আগে? ফল, পানীয়, না মিষ্টান্ন? প্রাতরাশের কত আয়োজন! শুধু আনারসের জারক নয়, আরও এক প্রকার পানীয় ছিল। শ্বেতচন্দন পানীয়। মিছরী, গোলাপজল ও শ্বেতচন্দনচূর্ণের সাহায্যে প্রস্তুত। ফলের রেকাবীতে গ্রীষ্মদিনের নানাবিধ ফল—আম, জাম, জামরুল, তালশাঁস, লিচু, পানিফল, পেঁপে, তরমুজ, আরও কত কি! কত মিষ্টান্ন! মোতিচুর, বালুসাহী, পেরাকী, বাদামের মোহনভোগ।

জারকের পাত্রটি মুখে তুললেন রাজা বাহাদুর।

কি অপূর্ব্ব আস্বাদ! কালীশঙ্করের মুখাকৃতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলেন রাজমহিষী। তিনিও যেন পরিতৃপ্ত হ'লেন। রাজরাণীর তরমুজ-রাঙা ঠোঁটের দুই প্রান্তে পরিতৃপ্তির হাস্যোদ্রেক হয়।

ঘরের কড়িকাঠের টানা-পাখার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ ঘরের নীরবতাকে ভঙ্গ করে দেয়। ঘরে যেন ঝড় বইতে থাকে পাখার হাওয়ায়। কালীশঙ্করের বেনারসী জোড়ের উত্তরীয়-অঞ্চল ওড়াওড়ি করতে থাকে। শুভ্র ও মিহি রেশমের জোড়। উত্তরীয়-অঞ্চলে স্বর্ণসূত্রের বেনারসী কারুকাজ চিকণ তোলে ঘন ঘন!

বেশ ক্ষুধার্ত্ত হয়েছিলেন রাজা বাহাদুর।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে জারকপাত্র শেষ ক'রে পাত্রটি ভূমিতে রেখে দিলেন। তৃপ্তির শ্বাস ফেললেন। ফলের রেকাবী থেকে তুললেন গোলাপজামের কয়েকটি কুচি।

রাজা বাহাদুরের মুখাকৃতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করতে করতে রাজমহিষী মনে মনে ভাবছিলেন, কথাটি পাড়বেন, না পাড়বেন না। কোন' এক অপ্রিয় প্রসঙ্গ বর্ত্তমানে উত্থাপন করা কি উচিত হবে? কিন্তু কখনই বা বলবেন রাজা বাহাদুরকে, সময় কোথায়? দিবা-রাত্রির মধ্যে কতটুকু সময়ের জন্যই বা সাক্ষাৎ হয়! কথা হয় পরস্পরে! রাজরাণীর মুখখানি ম্লান থেকে ক্রমে ম্লানতর হয়। আঁখির কোণে কি অশ্রুর চাকচিক্য দেখা দেয়?

অবশেষে বলেই ফেলেন রাজমহিষী উমারাণী। বলেন,—আমি তো আর চোখে দেখতে পারি না!

—কেন, কি হয়েছে?

প্রশ্ন করলেন রাজা বাহাদুর।

উমারাণী বললেন,—রাজমাতা একাদশীর উপবাস ভাঙতে চাইছেন না। সাতগাঁ থেকে বিন্ধ্যবাসিনীর খোঁজ আনতে লোক পাঠিয়েছেন। সে লোক না ফিরলে জলগ্রহণ করবেন না শপথ ক'রেছেন।

কালীশঙ্কর বললেন,—মা কি লোক পাঠিয়েছেন? সপ্তগ্রামে?

—হাঁ। কা'কে যেন পাঠিয়েছেন। আমি সঠিক কিছুই জানি না। উমারাণীর কাতর কণ্ঠ কথা ব'লে যায়।

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন রাজা বাহাদুর।

রাজমহিষীর প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু মুখে কোন কথা নেই। কালীশঙ্কর নীরব, নির্ব্বাক্।

কি দেখছেন কি? এমন স্থির দৃষ্টিতে! রাজরাণীর সালঙ্কারা রূপ এই কি দেখবার সময়? চুনী-পান্নার অলঙ্কার উমারাণীর উর্দ্ধাঙ্গে। চুড়ি, বালা, তাবিজ। মুক্তার পাঁচনরী কণ্ঠদেশে। সীঁথিতে হীরার সীঁথি। হীরার অঙ্গুরীয়। পায়ে রূপার পদালঙ্কার। ঝুটো পাথরের নক্সাতোলা রূপার পায়জোর। ফিকে সবুজ রেশমের জংলা শাড়ী। বক্ষে ঘন লাল ভেলভেটের খাটো কাঁচুলী।

কিছুই দেখছেন না রাজা বাহাদুর কালীশঙ্কর।

তাঁর চোখে শূন্যদৃষ্টি। কিংকর্ত্তব্য কিছুই ঠাওরাতে পারেন না তিনি। ভেবে ভেবে কোন কূল-কিনারা খুঁজে পান না যেন। বলেন,—কা'কে পাঠিয়েছেন মা? কে গেছে সপ্তগ্রামে?

—আমি সঠিক কিছুই জানি না। পুনরায় বললেন উমারাণী।

কে গেছে সপ্তগ্রামে?

জগমোহন লেঠেল কোমর বেঁধে গেছে।

ততক্ষণে বংশবাটির জনাকীর্ণ পথ অতিক্রম ক'রে সপ্তগ্রামের বাসুদেবপুরে পৌঁছে গেছে জগমোহন। লাটিতে ভর দিয়ে দিয়ে লাফ দিতে দিতে গেছে। কৃষ্ণরামের জমিদারীর চৌহদ্দীতে পৌঁছেছে।

অনতিদূরেই জমিদার কৃষ্ণরামের বৃহৎ আবাস-বাটী। গগনস্পর্শী গাছের অভ্যন্তরে যেন লুকানো।

সু উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত ঘন লাল রঙের ইমারতী গৃহ। বাহির থেকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। জগমোহন দেখলে, গৃহের বৃহৎ মূল ফটকের দু' পাশে দু'জন অশ্বারোহী পাহারাদার। নিশান উড়িয়ে ধ'রে আছে। অশ্বারোহী দ্বয়ের পৃষ্ঠদেশে ঝুলছে দেশী বন্দুক।

জগমোহন বুঝলো, জমিদার-গৃহে প্রবেশ লাভের কোন আশাই নেই। কোন পথও নেই। বৃথা চেষ্টা।

কৃষ্ণরামের গৃহসীমানার কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়িয়ে উপায় নির্দ্ধারণের প্রয়াস পায় জগমোহন। এতটা পথ এসেছে, ক্লান্ত, অবসন্ন ও ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠেছে সে। একটি জটাজুটধারী বটবৃক্ষের ছায়ায় আপাততঃ ব'সে পড়লো জগমোহন। ক্লান্তির মোচন হোক আগে। গায়ের ঘাম শুষ্ক হোক।

গ্রীষ্মদিনের দাবাগ্নি যেন বাতাসে। কি প্রখর উত্তাপ আকাশচারী সূর্য্যের। জগমোহন ঘন ঘন শ্বাস ফেলে। হাঁফায়।

[ক্রমশঃ।

গাঁয়ের মাটির গান

শ্রীশান্তি পাল

আমরা হাঁকাই গরুর গাড়ী ভাই!
আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো—বেঁচে ব আরও
মোদের মরণ নাই।
হেট্—হেট্—হেট্ ডিডি—ডিডি—ডিডি
অর্—রুরু—রুরু—হেই!
নেইকো খামার চাষের জমি,
তাতে মোরা খোড়াই দমি,
ওরে চাকায়-হালে থাকলে বাঁধন
কারে না ডরাই।
আমরা হাঁকাই গরুর গাড়ী ভাই!
বাঁকাচোরা পথের 'পরে,
কেঁৎলে ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর করে,
জোর চাবুক মেরে দামড়া ছোটাই—
ল্যাজ ম'লে ঘোরাই।

হেট্—হেট্—হেট্ ডিডি—ডিডি—ডিডি
অর্—রুরু—রুরু—হেই!
নজর রাখি খোলের কাঠে,
কোথায় কাটে, কোথায় ফাটে,
আবার আড়া-পাকি-বংখিলে রে—
যো'ল-পুটে যাচাই।
আমরা হাঁকাই গরুর গাড়ী ভাই!
যখন যা' পাই যত্নে চাপাই,
দুপুর রোদে বয়ে নে' যাই,
শেষে বলদ-জোড়ার জোত খুলে দে'
কষে' তামুক খাই।
হেট্—হেট্—হেট্ ডিডি—ডিডি—ডিডি
অর্—রুরু—রুরু—হেই!
ধান কলাই গুড় বোঝাই নিয়ে,
হাট-বাজারে নামাই গিয়ে,

সুখে কান-কলিতে কানটি থুয়ে
শুয়েও রাত কাটাই।
আমরা হাঁকাই গরুর গাড়ী ভাই!
ফড়-মাচানে ছই লাগিয়ে,
খড় বিছিয়ে, চ্যাটাই দিয়ে,
কত বউ-ঝি নিয়ে কুটুম-বাড়ী
পৌঁছে দিতে যাই।
হেট্—হেট্—হেট্ ডিডি—ডিডি—ডিডি
অর্—রুরু—রুরু—হেই!
পথের মায়া সাম্‌নে টানে,
গাঁয়ের মায়া ফিরিয়ে আনে,
ঘরের পরের ভার কমাতে
আনন্দে গান গাই।
আমরা হাঁকাই গরুর গাড়ী ভাই!

"সাহিত্য-পরিচয়ের" লক্ষ্য কি ?

"সাহিত্য-পরিচয়" ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং তার প্রমাণ প্রতি মাসেই আমরা পাঠকদের চিঠিপত্রে পাচ্ছি। এই জনপ্রিয়তার কারণ কি? একমাত্র কারণ, আমাদের নিরপেক্ষ, নির্দলীয়, সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী। দলাদলির হীন সংকীর্ণতা যখন বাংলা সাহিত্যকে সম্পূর্ণ গ্রাস করতে বসেছে, আত্মপ্রচার ও অপপ্রচারের প্রবল বন্যায় পাঠকশ্রেণী পর্যন্ত যখন বিভ্রান্ত হবার উপক্রম, তখন নীরবতার ব্রত পালন করা আমরা অন্যায় ব'লে মনে করি। অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে, দু'জনেই সমান অপরাধী। আমাদের লক্ষ্য, 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির' পবিত্র নামে কোন অসত্য ভাষণ, কোন অপপ্রচার আমরা মুখ বুঁজে বরদাস্ত করব না। তার বিকৃত স্বরূপ আমরা নির্মম ভাষায় পাঠকদের চোখের সামনে তুলে ধরব। বিচার পাঠকরাই করবেন, কারণ আমরা বিশ্বাস করি স্বার্থান্বেষী দল ও গোষ্ঠীর প্রতিপত্তি যতই বাড়ুক, ক্রমবর্ধমান সুস্থ, সচেতন ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকগোষ্ঠীর উপর বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল দলীয় চক্রান্ত ও অপপ্রচার কখনই জয়ী হবে না। মিথ্যার জয় হয় না। শক্তিশালী সংবাদপত্র বা সাপ্তাহিক পত্রের জোরে যাঁরা গাধা পিটিয়ে গরু করতে চান এবং গরুর লেজ মুলে ঘোড়ার মতন দৌড় করাতে চান, তাঁদের পাগলামি পাঠকদের বুঝতে দেরী হবে না। তবু যেহেতু প্রচারের যুগে মিথ্যা অপপ্রচারে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে, সেই জন্য আমরা "সাহিত্য-পরিচয়ের" মাধ্যমে পাঠকদের সে-সম্বন্ধে সজাগ ক'রে দেব। সেই সঙ্গে প্রত্যেক সুস্থ ও সার্থক সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে আমরা দলমত নির্বিশেষে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাবো। এই হ'ল 'সাহিত্য-পরিচয়ের' প্রধান লক্ষ্য।

কবিপক্ষ

কবিপক্ষ—পনের দিনব্যাপী উৎসব! এই পোড়া দেশের নেবুতলা, বেলতলা, আমড়াতলা অঞ্চলে যত ক্লাব আর সাংস্কৃতিক সভা-সমিতি আছে, সবাই কোমর বেঁধে কবির জন্ম-জয়ন্তীর উৎসবে মেতেছেন। উৎসবের এই সমারোহ নিশ্চয়ই আনন্দের কারণ, তবে এই উপলক্ষ্যে সবিনয়ে একটা অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের অবতারণা করতে বাধ্য হচ্ছি। অনেকের হয়ত জানা নেই, কবির সমাধিস্থলে আজ গরু চরে,—আগাছা ও তৃণগুল্মে আচ্ছন্ন সেই স্বল্প পরিসর জায়গাটুকু এই ক'দিন একটু পরিষ্কার থাকে, তা'র পর আবার সেই বেদনাদায়ক অবস্থা! কলুষনাশিনী ভাগীরথী অবশ্য আমাদের সকল কলঙ্ক অবসান কল্পে জায়গাটুকু গ্রাস করবার চেষ্টায় আছেন, তা যদি হয়, তাহ'লে আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। অনেক দূরের মানুষের জন্য আমরা অনেক কিছু করেছি এমন কি লাখ লাখ টাকা ব্যয়ে গান্ধী-ঘাট বানিয়েছি। কিন্তু গান্ধীজীর গুরুদেব, সেই কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথের মরদেহ যেখানে ভস্মীভূত হয়েছিল সেখানে ফুলের গাছ ত' দূরের কথা, শ্যামল দূর্বাঘাসও বসাতে পারিনি। জাতির এই কলঙ্কের জন্য যাঁরা দায়ী তাঁরা আজ ঐশ্বর্যের উঁচু পিঁড়িতে। তাঁদের স্পর্শ করে সাধ্য কার? মাঝে সংবাদপত্রে শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয় এবং আরো কেউ কেউ আন্দোলন করেছিলেন বটে কিন্তু কোনো রহস্যময় কারণে তাঁদের কণ্ঠও আজ নীরব। তাই কবিপক্ষে সর্বাগ্রে এই কথা স্মরণ করা কর্তব্য, আমরা কবির জন্ম-জয়ন্তী পালন করছি না, নৃত্য, গীত ও বাদ্য সহকারে বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম। নেবুতলা, বেলতলার দল যদি একটু চেষ্টা করেন তাহ'লে হয়ত একটা ব্যবস্থা হয়—সংবাদপত্রের জয়ঢাক তাঁদের সাহায্য না করলেও দেশের জনসাধারণের অকুণ্ঠিত সহায়তা নিশ্চয়ই তাঁরা লাভ করবেন।

সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি

পাড়ায় একটা অনুষ্ঠান হবে, হয় বাৎসরিক সভা, নয় সর্বজনীন দুর্গোৎসব, নয় সুরকীর কলের উদ্বোধন। সভাপতি চাই, বেশ নামকরা লোক হওয়া চাই, হয় মন্ত্রী, নয় উপমন্ত্রী, সংবাদপত্রের মালিক, নয় সম্পাদক, অন্ততঃ বার্তা-সম্পাদক। দু'-তিন জন যদি পাওয়া যায়, এক জনকে সভাপতি, এক জন প্রধান অতিথি, আর এক জন বিশেষ অতিথি—ব্যস্, তাহলেই সংবাদপত্রে ডবল কলম রিপোর্টের আর ভাবনা থাকে না, একটু বেশী ধরতে পারলে সেই সঙ্গে ফাউ হিসাবে প্রেস ফটোগ্রাফারের তোলা ফটো। সুতরাং বর্মন স্ট্রীট থেকে বাগবাজার, রাইটার্স বিল্ডিং থেকে এণ্ডারসন হাউস ছুটোছুটি করে কাউকে জোগাড় করতে হয়—হতভাগা প্রতিষ্ঠান যদি কাউকে না পায় ছুটবে বাণীসাধক সাহিত্যিকদের দরজায়, নয় অধ্যাপক-পাড়ায়। কিন্তু তাঁদের বক্তৃতা কোথাও ছাপা হবে না, সংবাদটুকুও নয়। এই ত' অবস্থা, তাই কায়দা করে সবই বজায় রাখতে হলে মন্ত্রী বা উপমন্ত্রীকে সভাপতি করো, সাংবাদিককে প্রধান অতিথি আর একজন সাহিত্যিক বা অধ্যাপককে বিশেষ অতিথি, ক্লাবের প্রেসটিজও বাড়বে, সেই সঙ্গে সুলভে প্রচারটাও হবে, আহার ও ঔষধের এমন বিচিত্র ফন্দী যিনি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন ইতিহাসে তাঁর নাম নেই, তাঁকে অজস্র

নমস্কার! কিন্তু এই নোংরামি আর কত কাল চলবে—একটু থমকে দাঁড়াবার সময় আজো কি আসেনি?

চীন দেখে এলাম

মনোজ বসু জনপ্রিয় কথা-সাহিত্যিক। উভয় বঙ্গে তাঁর অশেষ খ্যাতি। এশিয়া ও প্যাসিফিক পীস্ কনফারেন্স উপলক্ষ্যে মনোজ বাবু চীন দেশে ভারতীয় দলের সদস্য হিসাবে গিয়েছিলেন। সাহিত্যিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা তাঁর সেই চীন ভ্রমণের সরস কাহিনী "চীন দেখে এলাম"। 'মাসিক বসুমতী'র পাঠক-পাঠিকার কাছে এই গ্রন্থটির বিশেষ পরিচয়ের প্রয়োজন নেই, কারণ, দীর্ঘ দিন ধারাবাহিক ভাবে এই সুলিখিত কাহিনী 'মাসিক বসুমতী'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হচ্ছে। এই কাহিনীর প্রথম খণ্ড কিছু কাল পূর্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং অল্প কালের ভিতর দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছে। বাংলা রম্য রচনার ক্রমবর্ধমান তালিকায় আর একটি বিশিষ্ট সংযোজন "চীন দেখে এলাম"। মনোজ বাবুর দৃষ্টিভঙ্গী মানবিক এবং সাহিত্যিক, তাই তিনি যা দেখেছেন তার সম্পূর্ণ রেখাচিত্র সংক্ষেপে অতি চমৎকার ভাষায় বর্ণনা করেছেন। মনোজ বাবু সার্থক কথাশিল্পী, কিন্তু অন্যবিধ রচনাতেও যে তাঁর সবিশেষ কৃতিত্ব আছে তার প্রমাণ "চীন দেখে এলাম"। গ্রন্থটির প্রকাশক বেঙ্গল পাব্লিসার্স, দাম তিন টাকা।

কিংবদন্তীর দেশে

সুবোধ ঘোষ কল্লোলোত্তর যুগের একজন বিশিষ্ট লেখক। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর গল্প রচনার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক অভিনব, বাংলা গদ্য তাঁর হাতে অপূর্ব রসসমৃদ্ধ। এই মিতবাক্ শক্তিশালী সাহিত্যিকের নবতম সৃষ্টি "কিংবদন্তীর দেশে" বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় "সুপান্থ" এই ছদ্মনামে প্রকাশিত "কিংবদন্তীর দেশে" রসিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এত দিনে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলেন বিখ্যাত প্রকাশক 'নিউ এজ পাব্লিসার্স।' বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত কিংবদন্তীকে উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে সুবোধ বাবু এই কাহিনীগুলি রচনা করেছেন। অনেক পরিচিত কাহিনী নূতন বেশে পাঠকের কাছে এসেছে, একসঙ্গে এতগুলি কাহিনীর সমাবেশে "কিংবদন্তীর দেশে" মূল্যবান গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি পাবে সন্দেহ নেই। গ্রন্থটির মূল্য পাঁচ টাকা।

কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প

পরশুরামের নূতনতম গ্রন্থ "কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প" সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ১৩৫১-৬০ সালে রচিত একাদশটি রস-রচনা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। পরশুরাম বাংলা দেশের জীবিত সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বোচ্চ শিখরে, সুতরাং তাঁর রচনার গুণাগুণের কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। পরিণত বয়সেও সার্থক শিল্পী পরশুরাম তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কেমন অক্ষুণ্ণ রেখেছেন তার পরিচয় "কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প"। বিশেষতঃ "একগুঁয়ে বার্থা" গল্পটির বিষয়-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করার মত। 'বরনারী বরণ' গল্পটিও বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শ্লেষ রচনা হিসাবে মর্যাদা লাভের অধিকারী। গ্রন্থটির প্রকাশক—এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স—দাম আড়াই টাকা মাত্র।

বাংলা বই ও তার বিজ্ঞাপন

প্রকাশকরা নাকে কাঁদেন বই বিক্রী হয় না, প্রথম ছ' সাতশো এক রকম যায়, তার পর তিন-চার বছর লাগে বাকী চারশো বিক্রী করতে। তার মানেই একটি গ্রন্থের সর্বনাশ। পাঁচ-ছ' বছর পরে সেই গ্রন্থের নূতন সংস্করণ আর তেমন জমে না। প্রকাশকরা কখনও চিন্তা করেন না, কেন বই কাটে না। ক্রেতা অনেক গ্রন্থের সংবাদ পান না।

যে কোনো পত্র-পত্রিকায় বাংলা বইগুলির বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করুন, পাঠকের চোখের সামনে বই তুলে ধরার কোনো প্রচেষ্টা নেই। প্রেস টাইপে একসঙ্গে শতাধিক গ্রন্থের বিজ্ঞাপন, যৌন-জীবনের সঙ্গে মহাভারত একই লাইনে অতি কষ্টে ঘেঁষাঘেঁষি করে জায়গা করে নিয়েছে। প্রকাশক তাঁদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর বিনামূল্যে যাতে দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয় সে দিকে সচেষ্ট কিন্তু সেই মতামত কোনো দিন পুস্তক-ক্রেতার সামনে উপস্থিত করেন না। এই সঙ্গে 'টাইমস্ লিটারারী সাপ্লিমেণ্ট' প্রভৃতি পত্রিকায় ও-দেশের সদ্য-প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করুন। প্রতিটি গ্রন্থ বিশেষ ভাবে ক্রেতার নজরে আনার প্রচেষ্টা সপ্রশংস দৃষ্টিতে আপনাকে দেখতেই হবে। একখানি গ্রন্থ এক মাস গ্রেট বা ইংলিশ এণ্টিকে ছাপলেই প্রকাশকের কর্তব্য শেষ হল। তারপর সেই যে পাইকা বা স্মলপাইকা গাদায় পড়ে গেল তার ভেতর থেকে টেনে ওঠানো দায়। তবু প্রকাশক বলেন, 'বই বিক্রী হয় না'। মনে হয়, বাংলা বই যাতে তাড়াতাড়ি বিক্রী হয় প্রকাশকরা তা কামনা করেন না! অনেক দিন ধরে বিক্রী হলেও নাকি তাঁদের লাভ কিছু কম হয় না। সাময়িক পত্রের সমবেত প্রচেষ্টায় প্রেস টাইপের বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত।

বাংলায় অনুবাদ

বাংলা ভাষায় ইদানীং অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে অনেক, কিন্তু তার পিছনে কোনও পরিকল্পনার পরিচয় নেই এতটুকু। যে যা হাতের কাছে পাচ্ছেন তাই অনুবাদ করছেন। অনুবাদে জাতীয় সাহিত্য নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ হয়, কিন্তু সেই অনুবাদ সার্থক হওয়াটাই এবং গ্রন্থটিও সুনির্বাচিত হওয়া উচিত। অনুবাদকে যাঁরা ইদানীং মর্যাদামণ্ডিত করেছেন তাঁরা কি স্বয়ং গ্রন্থ নির্বাচন করেন, না প্রকাশকের ফরমায়েস অনুসারে অনুবাদ করেন, এই প্রশ্ন মনে জাগে। যে সাহিত্য মহৎ সাহিত্যের সম্মান লাভ করেছে, যা জনপ্রিয় এবং যে গ্রন্থটি অনূদিত হলে বাংলার সাহিত্য-পাঠক উপকৃত হতে পারেন শুধু সেই গ্রন্থই অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

বঙ্গ সংস্কৃতি-সম্মেলন

ফাল্গুন মাসের মাসিক বসুমতীতে আমরা লিখেছিলাম, 'শোনা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি কিছুটা ব্যয়ভার বহন করেছেন' বঙ্গ সংস্কৃতি-সম্মেলনের আনুষঙ্গিক খরচাদি মেটাবার জন্য। সম্প্রতি উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে যুগ্ম-সম্পাদক আমাদের জানিয়েছেন—"সম্মেলন আজ পর্যন্ত একটি আধলাও সরকারের কাছ

থেকে সাহায্য পাননি—" আমরাও আশ্বস্ত হলাম। তাঁরা যে "কোনো হীন সর্তে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট নতি স্বীকার করেননি" এটাও আশার কথা। জনসাধারণের মনে যে সংশয় ছিল মাসিক বসুমতীতে তার উল্লেখ করা হয়েছিল, তাই 'শোনা যাচ্ছে' এবং 'নাকি' কথা দুটি মন্তব্যের মধ্যে ছিল।

সাহিত্য-সংঘের প্রতি আবেদন

বাংলা দেশের সাহিত্য-সংঘের মধ্যে বর্তমানে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য সংঘ দু'টি—(ক) কংগ্রেস সাহিত্য-সংঘ ও (খ) প্রগতি লেখক-সংঘ। উভয়েরই সমালোচনা আমরা করেছি। কংগ্রেস সাহিত্য-সংঘের "কংগ্রেস" কথাটি বিশেষণ হিসেবে অবিলম্বে বর্জনীয় ব'লে আমরা মনে করি। "কংগ্রেস" কথার অর্থ যাঁরা জানেন তাঁরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে 'বিশেষণ'-রূপে তার প্রয়োগ ভাববিরোধী ও ব্যাকরণবিরোধী। সংঘের সভাপতি পণ্ডিত শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এ সম্বন্ধে অবিলম্বে অবহিত হবেন আশা করি। সংঘের নীতি কি এবং তার সাহিত্যিক অবদানই বা কি, আমরা জানতে চাই। "প্রগতি সাহিত্য-সংঘের" তীব্র সমালোচনায় হয়ত কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং কেউ কেউ উল্লসিত হয়ে আড়ালে হাসাহাসি করেছেন। কোন প্রতিক্রিয়াই আমরা সুস্থ ব'লে মনে করি না। কোন বিরূপ মনোভাব নিয়ে আমরা প্রগতি সাহিত্যিকদের সমালোচনা করিনি। আমরা প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি, নিষ্ক্রিয়তা ও অকর্মণ্যতা, বিশৃঙ্খলা ও কাণ্ডজ্ঞানহীনতা প্রগতি সাহিত্য-সংঘকে গ্রাস ক'রে ফেলছে। অথচ বাংলা সাহিত্যের এই ঐতিহাসিক সঙ্কটের সময় তাঁদেরই সব চেয়ে বেশী সক্রিয়, সংঘবদ্ধ ও সজাগ থাকা উচিত ছিল। মার্কিণ প্রচার বিভাগ ক্রমে যে ভাবে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করছে এবং সেই অনুপাতে প্রগতি সাহিত্যিকরা যে ভাবে সংঘগত ও ব্যক্তিগত ভাবে আত্মবিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছেন, তাতে আশঙ্কা হয়, "প্রাচী প্রকাশনের" মতন প্রতিষ্ঠান, "এশিয়া"র মতন পত্রিকা এবং "পরাভূত দেবতা", "পাতালে এক ঋতুর" মতন বই বা সাহিত্যই বাজার ছেয়ে ফেলবে। বাংলা সাহিত্যের এরকম দুর্দিন অনেক দিন দেখা দেয়নি। এক শ্রেণীর কুৎসিত যৌনসাহিত্য ও আধ্যাত্মিক সাহিত্যেও বাজার ক্রমে সরগরম হয়ে উঠছে। পাঠকদের সুস্থ রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী বদলানো হচ্ছে। পাঠকদের রুচি বদলাচ্ছে, এটা মিথ্যা অপপ্রচার। রুচি বদলাবার চেষ্টা করা হচ্ছে, এইটাই সত্য। সঙ্কট যখন এই ভাবে দেখা দিচ্ছে, তখন প্রগতিবাদীরা বেহালা বাজাচ্ছেন।

চট্‌পট্‌ সংস্করণের উদ্‌ভট্ রহস্য

দিন-কাল যা পড়েছে তাতে পৈতৃক প্রাণটুকু বাঁচানোও দায় হয়ে উঠেছে। চা' খাবেন তাতেও চামড়ার টুকরো ভেজাল দেওয়া হ'চ্ছে। দুধ ঘি চাল ডালের কথা বাদই দিলাম। চীনাবাজারের যে অবস্থা, বইয়ের বাজারের প্রায় তাই। ভাল বই কিনে নিশ্চিন্তে পড়বেন, তাতেও ভেজাল। বাজারে বই বেরুল, যথেষ্ট ঢাক পিটিয়েও তেমন বিক্রী হ'ল না। দু-তিন মাসের মধ্যেই খোলস পাল্টে তার 'দ্বিতীয়' সংস্করণ বেরুল। তারপর দেখতে দেখতে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ থেকে একেবারে সপ্তমে উঠে গেল। আপনি নিরীহ পাঠক এবং যথেষ্ট বুদ্ধিমান, কিন্তু তা সত্বেও সেই বইয়ের চট্‌পট্ সংস্করণে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে আপনি বই কিনে ফেললেন বা উপহার দিলেন। ভাবলেন, যে-বইয়ের এত চট্‌পট্ সংস্করণ হচ্ছে, সেই বইয়ে নিশ্চয় কিছু আছে। ভাবা স্বাভাবিক, কারণ চট্‌পট্ সংস্করণের উদ্‌ভট্ রহস্যের কথা আপনি জানেন না। টাইটেল-পৃষ্ঠার ফর্মা ছাপার সময় প্রেসে বলে দিলে যে-কেউ এক-হাজার বই ছাপার সময় যত খুশী সংস্করণের 'লাইন' বসিয়ে ছেপে নিতে পারেন। 'কভার' বা প্রচ্ছদপট ছাপার সময় এক হাজার প্রচ্ছদপট নানা রকম রং পাল্টে ছাপা যায়। এতে যা অতিরিক্ত খরচ হয় তা অতি সামান্য। কিন্তু নতুন নতুন মোড়ক দিয়ে বাজারে মাল ছাড়লে যেমন খরিদ্দারের চোখ ধাঁধিয়ে যায়, তেমনি একখানা বইয়ের খোলস পাল্টে চট্‌পট্ সংস্করণ হচ্ছে দেখলে পাঠকরা হকচকিয়ে যান। তাতে বেশ কিছু বই ধাপ্পা দিয়ে বিক্রী করা যায়। কৌশলটি সাহিত্য ব্যবসায়ে অভিনব এবং সম্প্রতি আমদানি হয়েছে। কার মাথা দিয়ে প্রথম গজিয়েছিল কে জানে। তবে আজ-কাল অনেকেই এই কৌশল ধরেছেন। এটা কি মার্কিণী প্রচার-কৌশলের প্রভাব? পাঠকরা সাবধান হবেন। ভাল ভাল বই সব সময় বেশী ক'রে কিনবেন, কিন্তু নিজে বিচার ক'রে, দেখে-শুনে কিনবেন,—প্রপাগ্যাণ্ডা বা সংস্করণের চোটে বিচলিত হবেন না। মনে রাখবেন, মাছ-তরিতরকারীর বাজারের মতন বইয়ের বাজারেও ভেজাল চলেছে !!

বাংলার সাহিত্যের দারিদ্র্য

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য আমরা গর্ব করি। মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় সাহিত্য সাধনা করেছেন, সেই ভাষা ও সাহিত্য গর্বের বস্তু নিশ্চয়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রধান গৌরব হ'ল বাংলা কাব্য ও কথাসাহিত্য। এমন কি, বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যও তেমন সমৃদ্ধ নয়। ব্রাডলে, ড্রাইডেন, সেণ্টসবেরী, রিচার্ডস প্রভৃতির মতন সমালোচক কোথায় বাংলা সাহিত্যে? রাস্কিন-রোজার ফ্রাই থেকে হার্বার্ট রীড পর্যন্ত শিল্পকলালোচনার যে বিরাট সম্পদ ও ঐতিহ্য ইংরেজী সাহিত্যের আছে, তার চিহ্ন কোথায় বাংলা সাহিত্যে? বাংলা ভাষায় দর্শন ও বিজ্ঞানের বই কোথায়? বৈজ্ঞানিক যুগে আমরা বাস করি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলি, অথচ বাংলা ভাষায় 'বিজ্ঞান' যেন আজও প্রবেশাধিকার পায়নি মনে হয়। এ দিক দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর না থাকলে বাংলা সাহিত্যের ঘাড় হেঁট ক'রে থাকা ছাড়া উপায় থাকত না। বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসের বই কোথায়? সামাজিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, রাষ্ট্রিক ইতিহাস—কোন ইতিহাসই বাংলা ভাষায় তেমন রচিত হয়নি। ইতিহাসের সম্পদ যে-সাহিত্যের নেই, সে-সাহিত্যের দারিদ্র্য শোচনীয়! নৃবিদ্যা, প্রত্নবিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা বইয়ের একান্ত অভাব রয়েছে। বাংলা দেশে এত দেব-দবী, এত রকমের ধর্ম—জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, হিন্দু—, কিন্তু তার ইতিহাস কে রচনা করেছেন বাংলা ভাষায়? দু'-চারখানা বই নিয়ে ঐতিহ্য বা সম্পদ গ'ড়ে ওঠে না। বাঙালী জাতির ইতিহাস কোথায়?

বাঙালী সমাজের? বাঙালীর সংস্কৃতির? বাঙালীর ধর্মকর্মের? বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যেরই বা কি সম্পদ আছে? আধুনিক যুগের কোন্ মনীষীর অমর গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয়েছে? যাঁরা বাংলা ভাষা জানেন, তাঁরা কি আজও ডারুইন, কার্ল মার্কস বা হেগেল পড়তে পারেন? বাংলা ভাষায় সমাজবিজ্ঞানের বই কোথায়? কোথায় অর্থনীতির বই? ক'খানা মৌলিক গবেষণা-গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে? এ-সব বিষয়ে ইংরেজী সাহিত্যের সম্ভারের দিকে চেয়ে বিস্মিত হ'তে হয়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে এ-সব বিষয়ে এমন কি সম্পদ আছে, যার গর্ব করতে পারি আমরা? পৃথিবীর কোন জাতি বা কোন ভাষা কেবল কাব্য, নাট্য ও কথাসাহিত্যের সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে বিশ্বের দরবারে স্থান পেতে পারে না। জাতির শক্তি ও প্রতিভার বিরাটত্বও তাতে প্রকাশ পায় না। বাংলা সাহিত্যের এ দারিদ্র্য যত দিন না ঘুচবে, তত দিন হাজার আস্ফালন সত্ত্বেও বাঙালী জাতি, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যকে আমরা বিশ্বের দরবারে সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব না। কেবল কাব্য, নাটক বা কথাসাহিত্য উপহার দিয়ে, হাজার হাজার কবি ও গাল্পিক তৈরী ক'রে, আমরা আধুনিক যুগের মানুষের চিত্তে শ্রদ্ধার উদ্রেক করতে পারব না। চালাকির দ্বারা যে মহৎ সাহিত্য তৈরী করা যায় না, এ-কথা যেন আমরা ভুলে গেছি। সম্প্রতি প্রকাশিত "সাহিত্যের সালতামামিতে" কাব্য ও কথাসাহিত্য ছাড়া অন্যান্য 'সাহিত্যের' দীনতা দেখলে এ সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যায়।

ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী

"বিশ্বভারতীর" ঘরোয়া দলাদলির গুজব অনেক দিন ধ'রেই আমরা শুনছি। শেষ পর্যন্ত যে তার অবসান হয়েছে এবং ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত হয়েছেন, তাতে প্রত্যেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন। বাংলা দেশের পণ্ডিতদের মধ্যে ডাঃ বাগচী অগ্রগণ্য এবং ভারত-বিদ্যায় তাঁর মূল্যবান অবদানের জন্ম তিনি সারা পৃথিবীর পণ্ডিত-মহলে শ্রদ্ধেয়। দলাদলির প্রবৃত্তি বা ক্ষমতার মোহ চিরদিনই বর্জন ক'রে, নির্জনে ও নীরবে তিনি জ্ঞানসাধনা করেছেন। প্রচারের অন্তরালে থেকে তাঁর জ্ঞানতপস্যার কথা যাঁরা জানেন, তাঁদের শ্রদ্ধার অন্ত নেই তাঁর প্রতি। "বিশ্বভারতী" তাঁর পরিচালনায় ক্রমেই শিক্ষা ও গবেষণার পথে এগিয়ে যাবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। ভারতবিদ্যার গবেষণা যে অনেক সুন্দর ভাবে তিনি পরিচালনা করতে পারবেন, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। ডাঃ বাগচীর প্রতি আমাদের অনুরোধ—বাংলা ভাষায় ভারতবিদ্যার কিছু ভাল গ্রন্থ যেন বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশের তিনি ব্যবস্থা করেন। বৌদ্ধধর্ম ও তন্ত্র সম্বন্ধে কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ বাংলা ভাষায় তিনি নিজেও রচনা করেছেন। এই বিষয়ে তাঁর রচিত আরও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় আমরা প্রত্যাশা করব। সেই সঙ্গে বাংলা দেশে জৈন, বৌদ্ধধর্ম ও তন্ত্রের অনুসন্ধানের কাজে সুযোগ্য ছাত্রদের নিয়োগ ক'রে, তিনি যে অনেক মূল্যবান কাজ করাতে পারবেন, এ বিশ্বাসও আমাদের আছে।

ডাঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত "মনসা-বিজয়" কাব্য

বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির বিখ্যাত "বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা" গ্রন্থমালায় সম্প্রতি বিপ্রদাসের "মনসা-বিজয়" বা "মনসামঙ্গল" কাব্য ডাঃ সুকুমার সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে সাম্প্রতিক মূল্যবান অবদানের মধ্যে ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাকের "রামচরিত" কাব্যের অনুবাদ (যদিও ছাপা খুব খারাপ) এবং এই "মনসা-বিজয়" কাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে বিপ্রদাসের 'মনসা-বিজয়' সব চেয়ে প্রাচীন, এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে রচিত। এত দিন অপ্রকাশিত পুথির পাতায় বিপ্রদাসের কাব্য আবদ্ধ ছিল। ১৯৩৮ সালে এই পুথি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সোসাইটি। দীর্ঘ ষোল বছর লাগল তাঁদের পুথিখানি প্রকাশ করতে। এর কারণ, আমাদের মনে হয়, বাংলা পুথির প্রতি সোসাইটির কর্তৃপক্ষের অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য। অনেক দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান বাংলা পুথি তাঁদের ভাণ্ডারে আছে, যা অনুবাদ ও সম্পাদন ক'রে প্রকাশ করা একান্ত ভাবে বাঞ্ছনীয়। ডাঃ সেনের ভূমিকা, পাঠভেদ, টীকা ইত্যাদির জন্ম বিপ্রদাসের কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য—অনুসন্ধানীর কাছে অনেক বর্ধিত হয়েছে। তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি এ কাজ করার মতন আর কেউ আছেন বলে মনে হয় না। মূল কাব্যটি প্রকাশ ক'রে তার ইংরেজী সার কথা যেমন বইয়ের মধ্যে দেওয়া হয়েছে, তেমনি ডাঃ সেনের মূল্যবান ভূমিকাটি যদি সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় লিখিত হ'ত এবং তার একটি ইংরেজী মর্ম দেওয়া হ'ত, তা হলে সম্পাদনা অনেক বেশী শোভন হ'ত মনে হয়। হয়ত সোসাইটির কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ডাঃ সেন ভূমিকাটি ইংরেজীতে লিখতে বাধ্য হয়েছেন। প্রাচীন বাংলা পুথি ইংরেজী ভূমিকাসহ প্রকাশ করা যেমন হাস্যকর, তেমনি নিন্দনীয়। (গ্রন্থের মূল্য ধার্য হয়েছে ১২৲ টাকা)

সাল-তামামির প্রহসন

সম্প্রতি দুইখানি দৈনিক পত্রে ১৩৬০ সালের বাংলা বই সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। চমক দিয়েছেন যুগান্তর পত্রিকার পৃষ্ঠায় স্বাক্ষরিত প্রবন্ধের রচয়িতা চৌধুরী মহাশয়ের ধারণা, যে কোনো বিষয়ে লেখার অধিকার তাঁর আছে, তাই সর্বত্র যা প্রাণ চায় তাই লেখেন। যুগান্তরের পৃষ্ঠায় তিনি যে ভাবে বর্মন ষ্ট্রীট তথা পাইকপাড়া-নিবাসী সাহিত্যিক দলের অযথা ও অকারণ পিঠ চুলকিয়েছেন, তা দেখে ভোলা ময়রার সেই বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে—

> "কেমন করে বললি জগা—
> জাড়া গোলোক বৃন্দাবন।
> (ওরে বেটা) 'কবি' গাবি পয়সা লবি
> (অত) খোশামদি কি কারণ?"

শ্রীচৌধুরী যেন উপলব্ধি করেন যে, 'গোলামী'র একটা সীমা আছে। তার উল্লিখিত 'গোলামে' যে অসংখ্য ঐতিহাসিক ভ্রান্তি রয়েছে—যা বোঝবার সাধ্য চৌধুরীর নেই-ই, আর বর্মন ষ্ট্রীটের

বেপরোয়া সাহিত্য ব্যাপারীরা ১৩৬১-এর বই হিসাবে গত বছরের গ্রন্থকে যথেচ্ছা ১৩৬০-এর বই,—এবং যে বই মুদ্রাকরের হাতে সেই বই সম্পর্কেও নানাবিধ মন্তব্য করেছেন। শ্রীচৌধুরী যে গ্রন্থ বৈশাখের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়েছে সেই গ্রন্থও পাঠকের প্রশংসা লাভ করেছে এই উক্তি করেছেন।

সাল-তামামি অতি উত্তম বিষয়, কিন্তু এই ধরণের সাহিত্য-জ্ঞানহীন মন্তব্যে সাধারণ পাঠককে প্রতারিত করার একটা সজ্ঞবদ্ধ প্রচেষ্টাই বিশেষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্ভ্রান্ত পত্র-পত্রিকার উচিত সেই প্রতারণা থেকে মুক্ত থাকা। এবং এ কথাও ... উচিত, বর্তমানে এই ধরণের সাল-তামামি প্রকাশ করলে ... পত্রিকায় কোন মন্তব্য অদূর ভবিষ্যতে সাধারণের বিশ্বাস ... করতে পারবে না। এখনই অনেকে বলাবলি করছেন—... আমাদের কানে পৌঁছেছে। চপলাকান্তর প্রতি এ ... আকর্ষণ করিয়ে কোন লাভ নেই, তিনিও আজার ব্যাপারে ... সুসাহিত্যিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় কেন চোখে ... থাকবেন?

১৩৬০ সালের এক শত সেরা বই

[পাঠাগার-কর্তৃপক্ষ ও বাংলা দেশের বিদগ্ধ পাঠক-পাঠিকাদের জন্ম ১৩৬০ সালের এক শত সেরা বই-এর তালিকা কয়েক জন বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতীর সহযোগিতায় এবং মাসিক বসুমতীর অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা-প্রেরিত তালিকা অনুসারে রচনা করা হয়েছে। বৈশাখ ১৩৬০ থেকে চৈত্র ১৩৬০ পর্যন্ত যে এক শত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত ... এই তালিকাটিতে সেই সব গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ... যাঁরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের ও বাংলা ... পুস্তক-প্রকাশকদের আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ...—সম্পাদক, মাসিক বসুমতী।]

বইয়ের নাম	লেখক	প্রকাশক
প্রবন্ধ সাহিত্য ও আলোচনা		
প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান	প্রমথ চৌধুরী	(বিশ্বভারতী)
বলাকা কাব্য পরিক্রমা	ক্ষিতিমোহন সেন	(এ মুখার্জি)
সংগীত ও সংস্কৃতি	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	(শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ)
ধম্মপদ	ভিক্ষু অনোমদর্শী	
গীতাধ্যান	ডাঃ মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারী	
কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য	মোহিতলাল মজুমদার	(কমলা বুক ডিপো)
কবি শ্রীরামকৃষ্ণ	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	(সিগনেট)
পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ	চিত্তরঞ্জন দেব	
নানা নিবন্ধ	সুশীলকুমার দে	(মিত্র ও ঘোষ)
উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য	ত্রিপুরাশঙ্কর সেন	(জেনারেল প্রিণ্টার্স)
রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়	ক্ষুদিরাম দাস	(পুঁথিঘর)
বঙ্গের মহিলা কবি	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	(এ মুখার্জি)
সাহিত্য পাঠকের ডায়েরী (২য়)	হরপ্রসাদ মিত্র	(গুপ্ত প্রকাশনী)
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য	তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	(থ্যাকার স্পিংক)
পুরশ্চরণ	মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য্য	মহারাণী শ্রীসুরুচি ঠাকুর
জীবনী-সাহিত্য ও স্মৃতিকাহিনী		
পরমা প্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	(সিগনেট)
সাধক কবি রামপ্রসাদ	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	(ভট্টাচার্য এ্যাণ্ড সন্স)
মুক্ত পুরুষ প্রসঙ্গ	প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়	(ঐ)
শ্রীশ্রীসারদামণি	স্বামী গম্ভীরানন্দ	(...)
শ্রীমা সারদামণি	শ্যামসরঞ্জন রায়	(কলিকাতা পুস্তকালয়)
লৌহ কবাট	জরাসন্ধ	(বেঙ্গল পাব্লিশার্স)
হারানো অতীত	সরলাবালা সরকার	(ঐ)
জন ও জনতা	জগদানন্দ বাজপেয়ী	(...)
বিপ্লব-তীর্থে	ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়	
পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস	তারকচন্দ্র রায়	(...)
ভ্রমণ		
চীন দেখে এলাম	মনোজ বসু	(বেঙ্গল পাব্লিশার্স)
রাজোয়ারা	দেবেশচন্দ্র দাস	(ঐ)
সপ্তসিন্ধু	হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্য	"
সকালীর চোখে পশ্চিম	শেফালী নন্দী	(...)
বিশাল অক্ষ	নলিনী ভদ্র	"
মায়াবতীর পথে	মহেন্দ্রনাথ দত্ত	"
সুকুমার সাহিত্য		
কলকাত্তা কালচার	বিনয় ঘোষ	(বিহার সাহিত্য ভবন)
কারানগরী	অমল দাশগুপ্ত	(নূতন সাহিত্য)
মাঝারি	বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	(বিহার সাহিত্য ভবন)
বিকল্প	রঞ্জন	(বেঙ্গল পাব্লিশার্স)
দেশে দেশে	বিক্রমাদিত্য	(ঐ)
কবিতা		
অহল্যা	দিনেশ দাস	(সিগনেট)
পদাবলী	সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য	(পূর্বাশা)
নাম রেখেছি কোমল গান্ধার	বিষ্ণু দে	(সিগনেট)
পারাপার	অমিয় চক্রবর্তী	(ঐ)
সন্তরা	বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	(গ্রন্থজগৎ)

বইয়ের নাম	লেখক	প্রকাশক
সংবর্ত	সুধীন্দ্র দত্ত	(সিগনেট)
নূতন কবিতা	অমীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়	(ডি, এম)
ইলা মিত্র	গোলাম কুদ্দুস	(সাধারণ)
অশোকের সময়ের গ্রাম	দুর্গাদাস সরকার	(একক প্রকাশনী)
কয়েকটি সনেট	শুদ্ধসত্ত্ব বসু	(ঐ)
ছায়া	করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়	"

সংকলন ও গ্রন্থাবলী

বইয়ের নাম	লেখক	প্রকাশক
আধুনিক কবিতা সংগ্রহ		(এম, সি, সরকার)
প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা		(নাভানা)
বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা		(নাভানা)
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী		(বসুমতী)
হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী		(ঐ)
প্রবন্ধ সংগ্রহ	প্রমথ চৌধুরী	(বিশ্বভারতী)
বিদেশী প্রবন্ধ-সঙ্কলন	মোহিতলাল মজুমদার	(কমলা বুক ডিপো)
পরিমল গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প		(বিহার সাহিত্য ভবন)
আমার প্রিয় গল্প	তারাশঙ্কর বন্দ্যো	(মিত্র ও ঘোষ)
প্রভাতকুমারের শ্রেষ্ঠ গল্প		(বেঙ্গল পাবলিশার্স)
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের গ্রন্থাবলী		(বসুমতী)
অসমঞ্জের গ্রন্থাবলী		(বসুমতী)

উপন্যাস

বইয়ের নাম	লেখক	প্রকাশক
আরোগ্য-নিকেতন	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	
আকাশ-পাতাল, ১ম খণ্ড	প্রাণতোষ ঘটক	
আকাশ-পাতাল, ২য় খণ্ড	ঐ	(ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড)
একালের কথা	অসীম রায়	(নূতন সাহিত্য)
একতলা	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	(বেঙ্গল পাব্লিশার্স)
তেইশ বছর আগে ও পরে	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	(কলিকাতা পাবলিশার্স)
কন্যা	অন্নদাশঙ্কর রায়	(ডি, এম, লাইব্রেরী)
কান্না-হাসির দোলা	ভবানী মুখোপাধ্যায়	(ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড)
চেনা মহল	নরেন্দ্র মিত্র	(ক্যালকাটা বুক ক্লাব)
যোগ-বিয়োগ	আশাপূর্ণা দেবী	(ঐ)
পঞ্চপর্ব	বনফুল	(ডি, এম, লাইব্রেরী)
মেঘলা আকাশ	রামপদ মুখোপাধ্যায়	(ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড)
ছায়াছবি	অমলা দেবী	(ঐ)
শ্রীমতী কাফে	সমরেশ বসু	(ডি, এম, লাইব্রেরী)
জোটের মহল	অমরেন্দ্র ঘোষ	(ঐ)
এই মর্তভূমি	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	(এম, সি, সরকার)

বইয়ের নাম	লেখক	প্রকাশক
কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	(বেঙ্গল পাব্লিশার্স)
রাজনগর	ননীমাধব চৌধুরী	(জেনারেল প্রিন্টার্স)
রাতভোর	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	(বেঙ্গল পাব্লিশার্স)
মালঙ্গীর কথা	রমেশচন্দ্র সেন	(মিত্র ও ঘোষ)

ছোট গল্প

বইয়ের নাম	লেখক	প্রকাশক
কাঠগোলাপ	নরেন্দ্র মিত্র	(ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড)
ফেরিওয়ালা	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	(ক্যালকাটা পাবলিশার্স)
লাজুক লতা	ঐ	(রীডার্স কর্ণার)
মালাচন্দন	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	(ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড)
মধুরেণ	দক্ষিণারঞ্জন বসু	(বেঙ্গল পাব্লিশার্স)
বিচিত্র লোক	মহাস্থবির	(বেঙ্গল পাব্লিশার্স)
পরিচয়	সন্তোষকুমার দে	(সোয়ান বুক্স্)
আপনি কি হারাইতেছেন	শিবরাম চক্রবর্তী	(এম, সি, সরকার)
শুকসারী	সন্তোষ ঘোষ	(বেঙ্গল পাব্লিশার্স)

অনুবাদ

বইয়ের নাম	লেখক	প্রকাশক
কাশ্মীর ও তিব্বতে	স্বামী অভেদানন্দ	(শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ)
যৌন মনোদর্শন হ্যাভেলক এলিস—ত্রিদিব রায়		(বসুমতী)
অন্ধকার দিন	ফয়েট ভাগনার—ভবানী মুখোপাধ্যায়	(কলিকাতা পাবলিশার্স)
মা ম্যাক্সিম গর্কী—	অশোক গুহ	(নলেজ হোম)
কুট্টনীমতম্	দামোদর গুপ্ত —ত্রিদিবনাথ রায়	(বসুমতী)
মরণের পারে	স্বামী অভেদানন্দ	(শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ)
কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ—জিম করবেট		(সিগনেট)
সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' রাধাগোবিন্দ বসাক		(জেনারেল প্রিন্টার্স)
ডোরিয়াণ গ্রের ছবি	অসকার ওয়াইল্ড —ভবানী মুখোপাধ্যায়	(নব ভারতী)
দর্পিতা	জেন অষ্টেন —শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্ত ভাদুড়ী	(বেঙ্গল পাব্লিশার্স)
প্রণয়-তৃষা	এমিলি জোলা —গিরীন চক্রবর্তী	(হাউস অব বুক্স্)
শাদা-কালো—	এরস্কিনকল্ডওয়েল শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	(বেঙ্গল পাব্লিশার্স)

—আগামী সংখ্যায় ছোট গল্প—

গৃহ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া প্রধান মন্ত্রী-সম্মেলন—

কলম্বো সম্মেলনে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার পাঁচটি দেশের প্রধান মন্ত্রিগণ শেষ পর্য্যন্ত ঐক্যমত হইয়া বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, ইহাই যে এই সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য সাফল্য, এ-কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই সম্মেলন যে এতটুকুও সাফল্য লাভ করিতে পারিবে সে-সম্বন্ধে উহার আহ্বানের সময় হইতেই যথেষ্ট সন্দেহ সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সন্দেহ যে অমূলক ছিল না সম্মেলনের আলোচনা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ঐক্যমত হওয়া যে প্রস্তাবগুলির রচনা-কৌশলের জন্যই শুধু সম্ভব হইয়াছে তাহাও বুঝিতে কষ্ট হয় না। এই রচনা-কৌশলের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট পার্থক্য যেমন সূচিত রহিয়াছে, তেমনি উহার মধ্যে ঐক্যমত হওয়ার আগ্রহও লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐক্যমত হওয়ার আগ্রহের জন্যই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সত্ত্বেও প্রস্তাব-রচনার কৌশল দ্বারা উহার একটা সমাধান করা সম্ভব হইয়াছে। এই সম্মেলনে ঐক্যমত হইয়া প্রস্তাবগুলি গৃহীত না হইলে উহার পরিণাম শুধু দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার পক্ষেই নয়, সমগ্র এশিয়ার পক্ষেও কিরূপ বিপজ্জনক হইতে পারে, সে-কথা ভাবিয়াই প্রস্তাব-রচনার কৌশল দ্বারাই হয়ত মতৈক্য বিধান করা হইয়াছে। ইহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলেও এই মতৈক্যের সার্থকতা অনস্বীকার্য্য।

পাক-মার্কিণ সামরিক চুক্তিই কলম্বো সম্মেলন আহ্বানের প্রয়োজনীয়তার প্রেরণা যোগাইয়াছে। সিংহলের প্রধান মন্ত্রী স্যার জন কোটলেওয়ালাই এই সম্মেলনের জন্য প্রস্তাব করেন। তখনও ইন্দোচীন-সমস্যা যে এত গুরুতর আকার ধারণ করিবে তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই। কিন্তু সম্মেলন আরম্ভ হইবার কিছু দিন পূর্ব্বেই ইন্দোচীনের যুদ্ধ গুরুতর আকার ধারণ করে। ঠিক এই সম্মেলনের প্রাক্কালে সিংহল গবর্ণমেন্ট সিংহলের ভিতর দিয়া ফরাসী সৈন্যকে ইন্দোচীনে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ায় এই সম্মেলনের সাফল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ সৃষ্টি না হইয়া পারে নাই। অবশ্য ফরাসী সৈন্য লইয়া ইন্দোচীনগামী মার্কিণ গ্লোব মাষ্টার বিমানগুলিকে পাকিস্তানে অবতরণ করিবার অনুমতি পাকিস্তান গবর্ণমেন্টও দিয়াছেন। ২৮শে এপ্রিল (১৯৫৪) কলম্বোতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া প্রধান মন্ত্রী-সম্মেলন আরম্ভ হয়। ৩০শে এপ্রিল এই সম্মেলন শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঐ দিনের আলোচনায় শেষে দেখা গেল, কোন বিষয়েই কোন মতৈক্য হওয়া সম্ভব হয় নাই। ইন্দোচীন, ঔপনিবেশিক শাসন এবং সাম্যবাদ সংক্রান্ত প্রস্তাব লইয়াই তীব্র মতভেদ সৃষ্ট হয়। রচনা-কৌশলে মতৈক্যের যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে হইলে মতভেদের প্রকৃত স্বরূপটাও জানা দরকার।

ইন্দোচীন সংক্রান্ত প্রস্তাবের এক অংশে প্রত্যক্ষ ভাবে আলাপ-আলোচনা দ্বারা মীমাংসার কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়ার সুবিধার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, বৃটেন এবং চীনকে হস্তক্ষেপ না করার জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রস্তাবের এই অংশ সম্বন্ধে পাকিস্তান দৃঢ়তার সহিত আপত্তি প্রকাশ করে। নীতিগত দিক হইতে প্রস্তাবের এই অংশ মানিয়া লইতে পাকিস্তান রাজী হইলেও উহাকে প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করিতে অস্বীকৃত হয়। প্রস্তাবের এই অংশ সম্পর্কে সিংহলের আপত্তি পাকিস্তানের মত অত দৃঢ় ছিল না। আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিজম দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক কি না, ইহা লইয়াও প্রবল মতবিরোধ দেখা দেয়। কম্যুনিজম সম্পর্কে সিংহল এবং পাকিস্তান উভয়েরই মত এই যে, উহা একটি জীবন্ত বিপদ। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী সাংবাদিকদের বলিয়াছিলেন যে, এই বিষয়টি সম্পর্কে তিনি দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ঔপনিবেশিক শাসন অপেক্ষা কম্যুনিজম অধিকতর বিপজ্জনক। কারণ, ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থা মরিতে বসিয়াছে, কিন্তু কম্যুনিজম ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। ইন্দোনেশিয়ার অভিমত এই যে, ঔপনিবেশিক শাসন ঐতিহাসিক সত্য, আর কম্যুনিজম একটা আদর্শবাদ মাত্র। ইন্দোনেশিয়া এই অভিমত প্রকাশ করে যে, বিশ্বসংগ্রামে জড়িত না হওয়ার অভিপ্রায়ের সহিত সিংহল ও পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গীর কোন সামঞ্জস্য নাই। এই মতভেদের ফলে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় অবশেষে তাহার অবসান হয় ক্যাণ্ডীতে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া প্রধান মন্ত্রী-সম্মেলনের অধিবেশনে।

ইন্দোচীন সংক্রান্ত প্রস্তাবে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং ইন্দোচীন সমস্যার সমাধানের জন্য প্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট পক্ষদের মধ্যে প্রত্যক্ষ আলোচনার জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে। ফ্রান্স, ইন্দোচীনের তিনটি এসোসিয়েটেড রাষ্ট্র ভিয়েটমীন ব্যতীত মতৈক্যের ভিত্তিতে আমন্ত্রিত অন্যান্য রাষ্ট্রও পক্ষ বলিয়া গণ্য হইবে। আবার

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া নিরোধ করার জন্ম সংশ্লিষ্ট পক্ষদিগকে, বিশেষ করিয়া চীন, বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়াকে প্রয়োজনীয় পন্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই ভাবে প্রস্তাব রচনার কৌশল দ্বারা ইন্দোচীন সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্পর্কে উদ্ভূত অচল অবস্থার অবসান হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ইডেন কলম্বোতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর নিকট এক বাণী প্রেরণ করিয়া জানান যে, ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতির জন্ম জেনেভায় সকলেই যাহাতে একমত হন সেজন্ম বৃটেন চেষ্টা করিবে। সিংহলের প্রধান মন্ত্রীর নিকট এক বাণীতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাঁচটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণের প্রস্তাব সমর্থন করার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। মিঃ ইডেনের এই বাণী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের সাফল্যের পথে কতকটা যে সাহায্য করিয়াছে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে কি? ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান মন্ত্রিগণ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, উহার অস্তিত্ব মানুষের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী এবং বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপজ্জনক। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহারা মরক্কো ও টিউনিশিয়ার স্বাধীনতা দাবী করিয়াছেন। কিন্তু মালয় ও কেনিয়া সম্পর্কে তাঁহাদের নীরবতা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কম্যুনিজম সংক্রান্ত প্রস্তাবে তাঁহারা গণতন্ত্রের প্রতি সুদৃঢ় আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের দেশের যে-কোন ব্যাপারে কি কম্যুনিষ্ট, কি অ-কম্যুনিষ্ট অন্য কাহারও হস্তক্ষেপ দৃঢ়তার সহিত নিরোধ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট চীন সংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কম্যুনিষ্ট চীনকে আসন প্রদান করা হইলে এশিয়ার অবস্থা স্থিতি লাভ করিবে, মন-কষাকষিরও অবসান হইবে এবং বিশ্বসমস্যা এবং বিশেষ করিয়া সুদূর-প্রাচ্যের সমস্যা সমাধানের জন্য বাস্তব অবস্থার দিক হইতে চেষ্টা করা সম্ভব হইবে।

ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া এবং সিংহল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই পাঁচটি দেশের প্রধান মন্ত্রী কলম্বো সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। মালয় যদি স্বাধীন দেশ হইত তবে মালয়ও এই সম্মেলনে যোগদান করিত। ইন্দোচীনে তো রীতিমত যুদ্ধই চলিতেছে এবং উহাই এই সম্মেলনে অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। থাইল্যাণ্ডকে এই সম্মেলনে পাওয়ার আশা করা যে অসম্ভব, সে-কথা বলাই বাহুল্য। ইহা হইতেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কলম্বো সম্মেলনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাঁচটি দেশের প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে যে মতৈক্য হইয়াছে এবং যে ভাবে এই মতৈক্য হইয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই মতৈক্য এত দুর্ব্বল, এত ক্ষণভঙ্গুর যে, উহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভরসা করিবার কিছুই নাই। তথাপি এইটুকু যে মতৈক্য হইয়াছে তাহার বিশেষ সার্থকতা অনস্বীকার্য্য। এশিয়ার ভবিষ্যৎ আজ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এক দিকে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এশিয়ার উপনিবেশগুলি দখলে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, অপর দিকে কম্যুনিজম নিরোধের নাম করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা করিতেছে এশিয়ায় তাহার সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে। এশিয়ারও এক দল কায়েমী স্বার্থবাদী নিজেদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্ম এই সকল সাম্রাজ্যবাদীদিগকে সমর্থন করিতেছে। এই অবস্থায় কলম্বো সম্মেলনে যদি মতৈক্য না হইত তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নীতিই জয়লাভ করিত। কলম্বো সম্মেলনে এই দুর্ব্বল মতৈক্য এশিয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ব্যর্থ করিতে পারিবে, ইহা আশা করা দুরাশা মাত্র। কিন্তু এই মতৈক্য দুর্ব্বল হইলেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এশিয়া-নীতির পথে কিছু-না-কিছু বাধা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে সন্তুষ্ট হইবে না সে-কথা বলাই বাহুল্য। কলম্বো সম্মেলনে তৃতীয় শক্তি বা যুদ্ধ-বর্জ্জিত তৃতীয় অঞ্চল গঠনের কোন কথা আলোচিত হয় নাই। তথাপি এই সম্মেলনের মতৈক্য জেনেভায় কোরিয়া ও ইন্দোচীন সংক্রান্ত আলোচনায় যে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হয়ত এই সম্মেলন হইতে এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনের প্রস্তাবও ভবিষ্যতে দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারিবে। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে মতৈক্য যদি শক্তিশালী হইয়া উঠিতে না পারে, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভরসা করিবার কিছু দেখা যায় না। এই মতৈক্য শক্তিশালী হওয়ার আশা করা কঠিন।

জেনেভা সম্মেলন ও মার্কিণ নীতি—

২৬শে এপ্রিল (১৯৫৪) অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় ১৯টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া জেনেভা সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে।

আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশিত হওয়ার সময় এই সম্মেলনের অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু গভীর সঙ্কটপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে যে এই সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে যেমন সন্দেহ নাই, তেমনি এই সঙ্কট কতক পরিমাণে কাটিয়াছে, ইহা মনে করিলেও ভুল হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে-মনোভাব লইয়া এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিল তাহা যে অনেকখানি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডালেস আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি যাহা বলিবেন, বৃটেন এবং ফ্রান্স 'জী হুজুর' বলিয়া তাহাই মানিয়া লইবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। ওয়াশিংটন পোষ্টের কূটনৈতিক সংবাদদাতা জেনেভা সম্মেলনের বিবরণ দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, "The first week of the conference has seen a major defeat for American deplomacy." অর্থাৎ সম্মেলনের প্রথম সপ্তাহে মার্কিণ কূটনীতির গুরুতর পরাজয় ঘটিয়াছে। বস্তুতঃ জেনেভা সম্মেলনে যে মার্কিণ কূটনীতি প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পর পশ্চিমী রাষ্ট্র-শিবিরে মার্কিণ নেতৃত্ব ইতিপূর্ব্বে এরূপ বাধা আর কখনও পায় নাই। ইন্দোচীনে সামরিক বিজয় ছাড়া আর কোন পন্থাতেই তিনি রাজী হইতে পারেন না, এই মনোভাব লইয়া মিঃ ডালেস জেনেভায় গিয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল, শেষ পর্য্যন্ত মার্কিণ মিত্রশক্তিবর্গকেও তিনি এই মত গ্রহণ করাইতে পারিবেন।

গত ২৯শে মার্চ্চ নিউইয়র্কে ওভারসীজ প্রেসক্লাবে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মিঃ ডালেস বলিয়াছিলেন, "এ কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, চীনের জাতীয়তাবাদী গবর্ণমেন্ট ফরমোসায় অবস্থান করিতেছে এবং লক্ষ লক্ষ স্বাধীন চীনা উহার পতাকাতলে সমবেত হইয়াছে।" অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "স্বাধীন জাতিরা কি ফরমোসায় অবস্থিত স্বাধীন চীনাদের কম্যুনিষ্টদের হাতে ধ্বংস হইতে দিতে পারে?" তাঁহার কাছে ইহা অচিন্তনীয় বলিয়া মনে হইয়াছে। তাঁহার এই উক্তির মধ্যে কম্যুনিষ্ট চীনকে ধ্বংস করিবার ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে। জেনেভা সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উক্ত বক্তৃতায় তিনি বলেন, "Also, we hope that any Indochina discussion will serve to bring the Chinese Communists to see the danger of their apparent design for the conquest of South-east Asia, so that they will cease and desist." অর্থাৎ 'ইন্দোচীন সম্পর্কে আলোচনা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া জয় করিবার উদ্দেশ্যের বিপদ সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট চীনকে সচেতন করিয়া দিবে।' অতঃপর দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় কম্যুনিজমের প্রসার নিরোধ করিবার জন্ত একটি সম্মিলিত রক্ষা-ব্যবস্থা গঠনের এবং সম্মিলিত প্রতিরোধের এই হুমকী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত ইন্দোচীনের যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করা সম্পর্কে চীনকে সতর্ক করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি পঞ্চশক্তি-ঘোষণার প্রস্তাবও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উত্থাপন করে। মিঃ ডালেস এই প্রস্তাব লইয়া লণ্ডনে এবং প্যারীতে যান। বৃটেন এবং ফ্রান্স দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া রক্ষা-ব্যবস্থা গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে বিবেচনা করিতে রাজী হইয়াছে। কিন্তু চীনকে সতর্ক করিয়া দিয়া পঞ্চশক্তি-ঘোষণা এ-পর্য্যন্ত ঘোষিত হয় নাই।

উক্ত ২৯শে মার্চ্চের বক্তৃতায় মিঃ ডালেস আরও বলিয়াছিলেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে স্বাধীন জাতিসমূহ গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হইবে, কাজেই উহাকে ঐক্যবদ্ধ কার্য্য দ্বারা প্রতিরোধ করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন, ইহাতে গুরুতর বিপদ আছে বটে। "But these risks are far less than those that will face us a few years from now, if we dare not be resolute today." অর্থাৎ 'এখন আমরা ঝুঁকি লইতে যদি সাহস না করি তাহা হইলে আমাদের অনেক গুরুতর ঝুঁকির সম্মুখীন হইতে হইবে।' কিন্তু ইন্দোচীনের যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে পূর্ব্বেই মার্কিণ কংগ্রেসের অনুমোদন দরকার। এদিকে ডিয়েন বিয়েন ফু লইয়া সংগ্রাম তীব্রতর হইয়া উঠিতেছিল। ইন্দোচীনকে রক্ষা করিতে প্রত্যক্ষ ভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন। এই অবস্থায় বে-সরকারী ভাবে মার্কিণ কংগ্রেসের মতামত জানিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু দেখা গেল, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একাকী ইন্দোচীনের যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে অধিকাংশ সদস্যই বিরোধী। অর্থাৎ ইন্দোচীনের যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে অন্ততঃ বৃটিশ মন্ত্রিসভা সম্মত না হইলে মার্কিণ কংগ্রেস উহাতে হস্তক্ষেপ করা অনুমোদন করিবে, ইহা ভরসা করিবার কিছুই ছিল না। এই অবস্থায় মিঃ ডালেস লণ্ডনে ও প্যারীতে গিয়াছিলেন। কিন্তু জেনেভা সম্মেলনের পূর্ব্বে ইন্দোচীনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সম্পর্কে বৃটেনের সম্মতি লইয়া তিনি ফিরিতে পারেন নাই।

মিঃ ডালেস জেনেভা যাওয়ার পথে যখন প্যারীতে যান তখন ফরাসী গবর্ণমেন্ট ডিয়েন বিয়েন ফু'র যুদ্ধে 'কেরিয়ার বোর্ণ এয়ার ক্রাফট'-এর সাহায্য চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বৃটেন সহযোগিতা করিতে রাজী না হইলে এই সাহায্য দেওয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বৃটেনের সহযোগিতার সম্মতি পাওয়া যায় নাই। ২৭শে এপ্রিল (১৯৫৪) স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিল কমন্স সভায় ঘোষণা করেন, "British Government is not prepared to give any undertaking about United Kingdom military action in Indochina in advance of the results of Geneva." অর্থাৎ জেনেভা সম্মেলনের ফলাফল জানিবার পূর্ব্বে ইন্দোচীনে সামরিক সাহায্য দেওয়া সম্পর্কে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট রাজী নহেন।

জেনেভা সম্মেলনের আলোচনায় মিঃ ডালেস বৃটেন এবং ফ্রান্সকে তাঁহার অনুগামী করিতে পারে নাই। তাহারা জেনেভা সম্মেলনের ফলাফলের প্রতীক্ষা করিতে চায়। ইহাতে জেনেভায় মার্কিণ কূটনীতির পরাজয় ঘটিয়াছে এ-কথা যদি বলা না-ও যায়, তাহা হইলেও উহার অবাধ গতি যে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মিঃ ডালেস জেনেভা হইতে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্থানে আসিয়াছেন সহকারী রাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ বেডেল স্মিথ। মিঃ ডালেস হতাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন তাহা মনে করিবার

কোন কারণ আছে কি না, তাহা অনুমান করা কঠিন। জেনেভা সম্মেলনে যেমন চলিতেছে তেমনি চলিতেছে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া রক্ষা-ব্যবস্থা গঠনের আয়োজন। গত ৭ই মে (১৯৫৪) ওয়াশিংটন হইতে জেনেভা সম্মেলন সম্পর্কে এক বেতার বক্তৃতায় মি: ডালেস বলিয়াছেন যে, জেনেভাতে যদি এমন কোন যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা হয় যাহাতে ইন্দোচীনে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার কম্যুনিষ্টদের আক্রমণাত্মক কার্য্যকলাপের পথ প্রশস্ত হয়, তবে আমেরিকা খুব উদ্বেগ অনুভব করিবে। এইরূপ অবস্থায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া রক্ষার জন্য সম্মিলিত রক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পাইবে। এই রক্ষা-ব্যবস্থা গঠন সম্পর্কে যে আলোচনা চলিতেছে সে-কথাও তিনি বলিয়াছেন।

জেনেভা সম্মেলনে উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য কোন মীমাংসা হইবে, ইহা ভরসা করা কঠিন। জেনেভা সম্মেলনের ব্যর্থতার পর উত্তর আটলান্টিক ট্রিটি অর্গেনিজেশনের (NATO) অনুরূপ দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ট্রিটি অর্গেনিজেশন (SEATO) গঠনে বৃটেনের আপত্তি হইবে ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইলে এশিয়ায় বৃটিশ উপনিবেশগুলি রক্ষা করার বিশেষ সুবিধা হইবে। এই রক্ষা-ব্যবস্থার যোগদানের জন্য ভারত, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্থান এবং সিংহলকে অনুরোধ করা হইয়াছে। পাকিস্তান ও সিংহল যে যোগদান করিতে রাজী হইবে তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। সমস্যা সৃষ্টি করিবে ভারত। ভারত রাজী হইলে ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়াও সহজেই রাজী হইবে। কাজেই ইহার জন্য ভারতের উপর যে চাপ দেওয়া হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। চাপে পড়িয়া ভারতও যোগদান করিবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই আশা এখনও আছে। তাহা হইলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের শেষ পরিণতি কি হইবে?

ডিয়েন বিয়েন ফু'র পতন—

উত্তর ইন্দোচীনে ফ্রান্সের গুরুত্বপূর্ণ পার্ব্বত্য ঘাঁটি ডিয়েন বিয়েন ফু দুর্গের পতন হইয়াছে। ৫৭ দিন ধরিয়া সংগ্রামের পর ভিয়েটমিনরা এই দুর্গটি দখল করিয়াছে। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদিগকে এই দুর্গের পতন যদি ডানকার্ক এবং তব্রুকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে বিস্মিত হওয়ার কিছুই থাকিতে পারে না। ফরাসী পরিষদে ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ ল্যানিয়েল এই দুর্গটির পতনের সংবাদ ঘোষণা করার পর শোক প্রকাশের জন্য পরিষদের অধিবেশন বন্ধ রাখা হয়। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী অবশ্য জানাইয়াছেন যে, ডিয়েন বিয়েন ফু দুর্গের পতন হইলেও জেনেভা সম্মেলনে ফ্রান্সের মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। জেনেভা সম্মেলনে উহার প্রতিক্রিয়া বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইবে। কিন্তু জেনেভা সম্মেলনে সুবিধা আদায়ের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্যই ভিয়েটমিনরা প্রাণপণে এই দুর্গটি দখলের চেষ্টা করিয়াছিল, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে।

ভিয়েটমিনরা ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে ডিয়েন বিয়েন ফু দখল করে। তখন উহা চারিদিকে ধান্যক্ষেত্র পরিবেষ্টিত কৃষকদের কতিপয় কুটিরের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। উহার এগার মাস পরে ফ্রান্স আবার উহা দখল করিয়া লয় এবং দেড় বৎসরে ইন্দোচীন জয় করিবার জন্য জেনারেল নাভারের পরিকল্পনার অঙ্গস্বরূপ ঐস্থানে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করা হয়। ফ্রান্সের এই পরিকল্পনা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিয়াছিল। বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়া এই দুর্গটিকে পতন হইতে রক্ষা করার আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু উহাতে যুদ্ধ শুধু ইন্দোচীনেই আবদ্ধ থাকিত না, কম্যুনিষ্ট চীনের সহিতও লড়াই বাধিয়া উঠিবার আশঙ্কা দেখা দিত। কিন্তু এরূপ যুদ্ধ চালাইতে হইলে এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীকে লেলাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। উহার জন্য এ পর্য্যন্ত এখনও শুধু প্রস্তুতি চলিতেছে। এই প্রস্তুতি শেষ হওয়া এখনও দূরবর্ত্তী। জেনেভা সম্মেলন ব্যর্থ হইলে এই প্রস্তুতি যে বেশ জোর বাঁধিয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

গত শরৎকালে জেঃ নাভারে দেড় বৎসরে ইন্দোচীন জয়ের পরিকল্পনা লইয়া অভিযান আরম্ভ করেন। ভিয়েটমিনরা শুধু গেরিলা যুদ্ধ না করিয়া প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, ইহাই ছিল উক্ত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। ডিয়েন বিয়েন ফু দুর্গের জন্য যুদ্ধে এই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বটে, জেঃ জিয়াপ কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত ভিয়েটমিন বাহিনী ডিয়েন বিয়েন ফু দুর্গ দখলের জন্য প্রকাশ্য ভাবে সংগ্রাম করিয়াছে বটে, কিন্তু জেঃ নাভারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, বরং তাঁহার পরিকল্পনাই বানচাল হইয়া গিয়াছে।

জেনেভা সম্মেলনে কোরিয়া—

জেনেভা সম্মেলনের দুইটি দিক। একটি দিক কোরিয়া, আর একটি দিক ইন্দোচীন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ২৭শে এপ্রিল (১৯৫৪) কোরিয়া সম্পর্কে সম্মেলন আরম্ভ হয়। কোরিয়ার যে ষোলটি রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে লড়াই করিয়াছে তন্মধ্যে ১৫টি রাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, কম্যুনিষ্ট চীন এবং উত্তর কোরিয়া এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা কোরিয়ায় যুদ্ধ করিলেও জেনেভা সম্মেলনে যোগদান করে নাই। এই দিনের অধিবেশনে দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীই প্রথম বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় পরিষদে উত্তর কোরিয়ার জন্য এক শতটি আসন খালি রাখা হইয়াছে। তিনি উত্তর কোরিয়ায় স্বাধীন ভাবে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া এই এক শতটি আসন পূরণ করার কথা বলেন। উত্তর কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী কোরিয়া-সমস্যা সমাধানের জন্য একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। তাঁহার পরিকল্পনায় উত্তর কোরিয়ার সুপ্রিম পিপলস্ এসেম্বলী এবং দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন দ্বারা কোরিয়ায় অচল অবস্থার অবসানের প্রস্তাব করা হইয়াছে। দেশের নির্ব্বাচন আইন পরীক্ষা করিয়া দেখা, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের উন্নতি সাধন, ছয় মাসের মধ্যে সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারণের ব্যবস্থা করা এবং কোরিয়ার ঘরোয়া রাজনৈতিক ব্যাপারের মীমাংসায় বৈদেশিক হস্তক্ষেপ নিরোধের ব্যবস্থা করা হইবে উভয় আইনসভার যুক্ত অধিবেশনের কার্য্য। কোরিয়া সম্পর্কে দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে মিঃ ডালেস উত্তর কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেন।

দক্ষিণ কোরিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিচালনাধীনে সমগ্র কোরিয়াতে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে দিতে রাজী হইয়াছে বটে, কিন্তু উত্তর কোরিয়া তাহাতে রাজী নয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোরিয়া যুদ্ধের এক পক্ষ। কাজেই তাহার দ্বারা নির্ব্বাচন পরিচালিত হইলে উহাকে স্বাধীন নির্ব্বাচন বলিয়া অভিহিত করা চলে না। উত্তর কোরিয়া প্রস্তাব করিয়াছে নির্ব্বাচন পরিচালনার জন্য একটি সারা কোরিয়া কমিশন গঠন করিতে হইবে। ৩রা মে তারিখে এই প্রস্তাব করা হয়। তাহার এই প্রস্তাবের পর কোরিয়া-সমস্যার আলোচনা সাত জনের একটি কমিটিতে প্রেরিত হয়। এই কমিটিতে আছে বৃহৎ শক্তি-চতুষ্টয়, চীন এবং উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া। এই প্রস্তাবের মূল কথা তিনটি:—(১) সম্মিলিত গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য সমগ্র কোরিয়ায় নির্ব্বাচন হইবে; (২) নির্ব্বাচনের প্রস্তুতি এবং নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি কমিশন গঠন। উভয় কোরিয়ার আইন সভা এই কমিশনের সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন এবং উভয় কোরিয়ার বৃহত্তম গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিরাও এই কমিশনে থাকিবেন; (৩) ছয় মাসের মধ্যে বিদেশী সৈন্যদিগকে কোরিয়া হইতে অপসারিত করিতে হইবে।

আমাদের এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্য্যন্ত জেনেভা সম্মেলনের কোরিয়া অংশের অধিবেশন চলিতেছে বটে, কিন্তু আলোচনার গতি দেখিয়া অত্যধিক আশাবাদীর পক্ষেও উহার সাফল্য সম্বন্ধে আশা পোষণ করা কঠিন।

জেনেভা সম্মেলনে ইন্দোচীন—

জেনেভা সম্মেলনের ইন্দোচীন অংশের অধিবেশন ডিয়েন বিয়েন ফুর্গের পতনের পূর্ব্বে আরম্ভ হওয়া সম্ভব হয় নাই। এই অংশে কোন্ কোন্ রাষ্ট্র যোগদান করিবে তাহা লইয়াও সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল। ভিয়েটমিন এই সম্মেলনে যোগদান করে, ফ্রান্স প্রথমে ইহাতে রাজী হয় নাই। অবশেষে গত ২রা মে (১৯৫৪) রাশিয়া এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গ একমত হন এবং স্থির হয় যে, বৃহৎ রাষ্ট্র-চতুষ্টয়, চীন, ইন্দোচীনের তিনটি এসোসিয়েটেড রাষ্ট্র এবং ভিয়েটমিন এই নয়টি রাষ্ট্র ইন্দোচীন সম্পর্কে শান্তি-আলোচনায় যোগদান করিবে। গত ৮ই মে এই নয়টি রাষ্ট্রের ইন্দোচীন সংক্রান্ত শান্তি-আলোচনা আরম্ভ হয়। এই দিন ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে ফ্রান্স যে প্রস্তাব উপাপন করে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জ্জাতিক শক্তিবর্গ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যুদ্ধবিরতি হওয়ার পূর্ব্বে ভিয়েটমিনদিগকে কাম্বোডিয়া ও লাওস হইতে অপসারণ করিতে হইবে এবং সামরিক অধিনায়ক-নায়কদের দ্বারা নির্দ্ধারিত ভিয়েটনামের নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে ভিয়েটমিন সৈন্যদিগকে অবস্থান করিতে হইবে। ফ্রান্সের এই প্রস্তাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্রান্স যাহা হারাইয়াছে সম্মেলন-টেবিলে বসিয়া তাহাই সে ফিরিয়া পাইতে চায়। ফ্রান্স এই প্রস্তাব উপাপন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কম্যুনিষ্ট পক্ষ হইতে পাথেট লাও (লাওস) এবং খমেরের (কাম্বোডিয়া) গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের এই সম্মেলনে উপস্থিতি দাবী করা হয়। এই দাবীর উত্তরে কাম্বোডিয়ার প্রতিনিধি বলেন, ঐ দুইটি গবর্ণমেণ্ট প্রেত ভূত মাত্র। সম্মেলনে ভূতকে কেন আমন্ত্রণ করা হইবে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। ভিয়েটমিন প্রতিনিধি তাহার উত্তরে বলেন যে, উহারা এমন ভূত যে ইন্দোচীনে ফরাসী সৈন্যকে ধ্বংস করিয়াছে।

ইন্দোচীন সম্পর্কে ফ্রান্সের প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার দুই দিন পর ১০ই মে ভিয়েটমিনের ডেপুটি প্রধান মিঃ ফাম ভ্যান ডং ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতির দাবী করিয়া আট দফাবিশিষ্ট একটি প্রস্তাব উপাপন করেন। আট দফা এই:—(১) ভিয়েটনাম, কাম্বোডিয়া, এবং লাওসের স্বাধীনতা এবং সার্ব্বভৌমিকত্ব স্বীকার করিতে হইবে; (২) ঐ তিনটি রাজ্য হইতে সমস্ত বিদেশী সৈন্য সরাইয়া লইতে হইবে; (৩) এই তিনটি রাজ্যে স্বাধীন ভাবে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে; (৪) এই তিনটি রাজ্যে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য উভয় পক্ষের প্রতিনিধি লইয়া পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হইবে। উহাতে সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি থাকিবে। নির্ব্বাচনে কোনরূপ বৈদেশিক হস্তক্ষেপ থাকিতে পারিবে না; (৫) ফরাসী ইউনিয়নের সহিত সংযুক্ত থাকার প্রশ্নটি এই তিনটি রাষ্ট্র বিবেচনা করিয়া দেখিবে, এই মর্ম্মে একটি ঘোষণা করা হইবে। সমমর্য্যাদার ভিত্তিতে ফরাসী অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ এই তিনটি গবর্ণমেণ্ট

মানিয়া লইতে রাজী; (৬) সহযোগিতাকারীদের প্রতি কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না; (৭) বন্দীবিনিময়; (৮) উল্লিখিত দফাগুলি কার্য্যে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বে যুদ্ধবিরতি হইতে হইবে।

ভিয়েটনামকে বিভক্ত করার কথাও শোনা যাইতেছে। কিন্তু কি বাওদাই গবর্ণমেণ্ট, কি ভিয়েটমিন কেহই দেশবিভাগের পক্ষপাতী নয়। উভয় পক্ষ সম্মত না হইলে দেশবিভাগও বড় সহজ হইবে না। কতগুলি সহর বাদে ভিয়েটনামের অধিকাংশই ভিয়েটমিনদের হাতে। কাজেই উভয় রাজ্যের সীমানা নির্দ্ধারিত হইবে কিরূপে? ফরাসী দৈনিক সংবাদপত্র 'Le Monde'-এর প্রতিনিধি সম্প্রতি ইন্দোচীন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, বিংশতিতম অক্ষরেখাই ইন্দোচীন বিভাগের উৎকৃষ্ট সীমারেখা। কোরিয়া-সমস্যার মত ইন্দোচীন-সমস্যার সমাধানের কোন আশাও দেখা যাইতেছে না। জেনেভা সম্মেলনে যদি ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতির কোন ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব না হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ চলিতেই থাকিবে। জেনেভা সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার পর দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া রক্ষা-ব্যবস্থা গঠনের কাজ হয়ত খুব জোরেই চলিতে থাকিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে ইন্দোচীনের যুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিবে কি না, ইহা অনুমান করা সম্ভব নয়। বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সামরিক সাহায্য ব্যতীত ফ্রান্স ইন্দোচীন রক্ষা করিতে পারিবে না। আবার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করিতে গেলেও তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার আশঙ্কা ঘনীভূত হইয়া উঠিবে। গত ১১ই মে (১৯৫৪) ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ ডালেস বলিয়াছেন যে, ইন্দোচীনকে বাদ দিয়াও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াকে রক্ষা করিতে পারা যাইবে। তাঁহার এই উক্তিতে কোনরূপ ভ্রান্ত ধারণা যাহাতে সৃষ্টি হইতে না পারে সেই জন্য ইহাও তিনি জানাইয়াছেন যে, "ইন্দোচীনকে আমরা হারাইয়াছি, কিম্বা উহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র করিবে না" এইরূপ ধারণা সৃষ্টি করা তাঁহার অভিপ্রায় নয়। জেনেভা সম্মেলনে মিঃ ডালেসের স্থলাভিষিক্ত মিঃ ওয়াল্টার বেডেল স্মিথ গত ১ই জুন বলিয়াছেন, "দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় কম্যুনিজমের প্রসার নিরোধ করিবার জন্য এখানে আমরা আসিয়াছি।" জেনেভার সম্মেলন-টেবিলে বসিয়া কম্যুনিজমের প্রসার নিরোধ করা সম্ভব না হইলে একমাত্র বিকল্প থাকিবে যুদ্ধ।

চীন দেখে এলাম

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু

দু-বেলা কনফারেন্স—সকালের দিকটা একটু আগেভাগে তাই ছুটি মিলেছে। ঘরে ঢুকে দেখি, রকমারি প্যাকেটে টেবিল ভরতি। গরম সোয়েটার, পাজামা, ছাপা সিল্কের স্কার্ফ—ব্যাপার কি হে, কোত্থেকে এলো এত সমস্ত ?

সুইং বলে, শীত পড়ে গেছে বড্ড কি না !

চটে গিয়ে বলি, কি ভেবেছ বলো দিকি ? ঈশ্বরের দেওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোই মাত্র দেশ থেকে নিয়ে এসেছি—শীতের পোশাক দেবে তোমরা, রোদের ছাতা দেবে···না না, এ সমস্ত চলবে না, ফেরত নিয়ে যাও বলছি।

সুইং নিতান্ত নিরীহ ভালমানুষ। আমি কি জানি—যারা দিয়ে গেছে, তাদের ডেকে ফেরত দিন গে—

শুধু কি পোশাক ? খুলতে খুলতে তাজ্জব হয়ে যাই। হৃষ্টপুষ্ট ছবির বই, গ্রামোফোন-রেকর্ড, চন্দনের পাখা, কারুকর্ম করা কৌটো—সে কৌটো খুললে ভিতরে আর এক কৌটো—তার ভিতরে আর একটা—তার ভিতরে—তার ভিতরে···সাতটা এই প্রকার। আরও কত কি বস্তু—মনে পড়ছে না এত দিনের পরে।

একেবারে কিচ্ছু জানো না সুইং, চুপিসাড়ে কারা এসে এত সমস্ত রেখে গেল !

তাহিরা মজহর বক্তৃতা করছেন

মুচকি হেসে মেয়েটা সরে পড়বার ফিকিরে আছে।

পাজামাটা ছোট হয়ে গেল। মাপসই হলে শীতের মধ্যে দিব্যি আরাম পাওয়া যেত। তা কার জিনিস কে-ই বা বদল করে দেয় ! থাকুক গে পড়ে এমনি।

যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে সুইং শুনে নিল, মুখে কিছু বলল না।

ক্ষিতীশের ওদিকটায় ভারি জমজমাট। নতুন দুই ভদ্রলোক

আসুন দাদা, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন মেই লান ফ্যাং। আর ইনি শাও ইয়েই।

ওরে বাবা, মেই এসে পড়েছেন আমাদের ঘরে ! নাম শুনছি এসে অবধি। জাঁদরেল অভিনেতা—ক্লাসিকাল অপেরার রাজা-শাহানশা বিশেষ। সাও ইয়েই ছোকরা মানুষ, নাটক লেখেন ইংরেজি জানেন বলে সঙ্গে এসেছেন, কথাবার্তায় দোভাষীর কাজ করবেন।

তা আমি ঐ দলের বাইরে নই—নাটক লিখি, থিয়েটারে নাটক হয়েছে। একটা নাটক উপহার দিয়ে তাড়াতাড়ি ভাব করে ফেললাম মেইর সঙ্গে। খাতা-কলম নিয়ে আসছি—বসুন।

কলম বাগিয়ে জমিয়ে বসা গেল ওঁদের মধ্যে। আপনাদের অপেরার কথা শুনতে চাই। আপনার মত কে পারবে ? বলুন আমায় দু-চার কথা।

চীনা অপেরা কি আজকের ? অনেক শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছে। লোকজনের মনের সঙ্গে গাঁথা। চল্লিশ বছরের উপর স্টেজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। কুয়োমিনটাং আমলে দেখেছি, আর এই নতুন আমলে দেখছি।

সেকালে যারা নাটক করত, সমাজে ইজ্জত ছিল না তাদের। লোকে মুখ বাঁকাত, বেটা পালা গেয়ে বেড়ায়। পালা শুনতে বিস্তর মানুষ ভেঙে পড়ে—রাজা রাণী বা সেনাপতি সেজে যখন আস্ফালন করছে, তখন মানুষ মাতোয়ারা। ব্যস, ঐ অবধি—আসরের সীমানাটুকুর মধ্যে সমাদর, তার বাইরে নয়। এখন দিন পালটেছে। আপনি সাহিত্যিক—আপনারই প্রায় সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছি আমরা ইদানীং। আপনি লিখে বলেন, আমরা গান গেয়ে অভিনয় করে বলি।

কাজেই দায়িত্ব এসে পড়েছে—বলার কথা নিয়ে ভাবতে হচ্ছে এখন। এবং শুধু কথাগুলোই নয়, বলা হবে কোন কায়দায়। আজকে, দেখতে পাচ্ছেন, যে যার কাজ নিয়ে খেয়ে চলেছে—মুখে না বলুক, দস্তুরমতো পাল্লাপাল্লির ব্যাপার।

হাজার হাজার লোকে আমাদের কথা শোনে—মনে মনে তাই বড্ড ভাবনা, আজে-বাজে কথা শুনিয়ে দেশের উন্নতি পিছিয়ে না দিই।

শুনুন তবে। সেই মান্ধাতার আমলের পালাগানই চলছে আজও। চার-পাঁচটা মাত্র বাদ গেছে। পুরাণো বস্তু নিয়ে বড্ড দেমাক আমাদের। পাঁচ সাত শ' বছর ধরে যা চলে আসছে, বাপ-ঠাকুর্দা যা শুনে গেছেন, কোন হিসাবে তা বাতিল গণ্য হবে? তবে কি বলতে চাও, তাঁরা বোকা—রুচি ও রসবোধ ছিল না তাঁদের? ঐ যে বললাম—এমন গোড়া বামনাই দুনিয়ায় অন্য কোন জাতের যদি দেখতে পান!

পালা ঠিকই আছে, অভিনয়ের ঢং বদলাতে হয়েছে। একালের মানুষকে নয়তো খুশি করা যায় না। যেমন ইয়াং কুই-ফেইয়ের জীবন নিয়ে লেখা নাটক। ঐতিহাসিক ঘটনা—ইয়াং ছিল এক সম্রাটের উপপত্নী। তার আশ্চর্য রূপ আর অহঙ্কারের গল্প চীনের বাচ্চা-বুড়োর মুখে মুখে ফেরে। হুবহু সেই একই নাটক কিন্তু আগেকার অভিনয়ে ফুটে উঠত ইয়াঙের বিলাসলাস্য, আর এখনকার অভিনয়ে রূপসী দুর্ভাগিনীর নিঃসহায় একাকীত্ব। প্রায় একই কথাবার্তা—কিন্তু অভিব্যক্তির রকমফেরে আজকের শ্রোতা রাজ-অন্তঃপুরিকার বন্দীত্ব-বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে। নতুন পালাও অবশ্য বিস্তর লেখা হচ্ছে। পুরাণো ঘটনাই বেশির ভাগ। কিন্তু নতুন অর্থ বিকীরণ করছে সেই সব অতি-প্রাচীন কাহিনী।

●

সুইং ঝড়ের বেগে এসে পড়ল।

গল্প শেষ করুন। পাকিস্তানিদের আপনারা নেমন্তন্ন করেছেন, মনে নেই?

ঠিক বটে! আজকে দ্বিতীয় দফা। সেই যে কথা উঠেছিল, ভারত-পাকিস্তানে গণ্ডগোল করব না, আপোষে ফয়শালা করে নেবো সমস্ত—তারই পাকাপাকি সিদ্ধান্ত হবে আজকে খাওয়ার সময়। যাচ্ছি সুইং, ওঁরা গিয়ে বসতে লাগুন, এক্ষুণি গিয়ে হাজির হবো—

মানুষ কি রকম বদলেছে শুনবেন? একটা পালায় রাজার পাট করে আসছি আমি আজ তিরিশ বছর। লড়াইয়ে হেরে এসে বলছি—"আমি চেষ্টার কসুর করি নি, কিন্তু বিধাতা বিমুখ—রাজ্য আমার ধ্বংস হবেই।" অ্যাক্টো করছি গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে। সেকালে দেখতাম, হলের তাবৎ মানুষ চোখ মুছছে। এখনকার শ্রোতারা হাসে সেই একই কথা—একই ঢঙের বক্তৃতা শুনে। সেকেলে এক নাটকের এক জায়গায় আছে—"মেয়েলোকের ব্যাপার তো! বোলো না, বোলো না, ওতে আবার আর কান দেয় নাকি কেউ?"···কথাগুলো এখন উচ্চারণ করবার জো নেই স্টেজের উপর। গুঞ্জন উঠবে—ঝাঁঝালো প্রতিবাদও কোন কোন ক্ষেত্রে। মেয়েরা নয় শুধু, পুরুষছেলেদেরও অমন কথায় ঘোরতর আপত্তি। একটা পালা ছিল—সেনাপতি তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে মেরে ফেলল মায়ের তুষ্টির জন্য। মা বউকে দেখতে পারত না। মেরে ফেলে তার পর বিষম শোকার্ত হয়েছে সেনাপতি। মাতৃভক্তির চরম পরাকাষ্ঠায় হৈ-হৈ করত সেকালের শ্রোতারা। এখন পালাটা বাতিল—লোকে দু-কানে আঙুল দেয় শোনাতে গেলে। ভাঁড়ামি করে লোক হাসানো হত সেকালের অনেক পালায়; এখনকার মানুষ হাসে না, চটে আগুন হয়। কাগজে চিঠিও বেরোয় এই রকম পালা গাইলে।

রকমারি সাজপোশাকে রঙবেরঙের আলোর মধ্যে চল্লিশটা বছর রাতের পর রাত কেমন বেশ স্বপ্নের ভিতর দিয়ে কাটিয়ে এলাম। স্টেজ বিনে আর কিছু জানিনে। দেশের মানুষ কি বেগে এগিয়ে চলেছে, ওখান থেকেই মালুম হচ্ছে; বাইরে এসে তাকানোর দরকার নেই। নেচেকুঁদে ফুর্তি বাগানোই শুধু নয়, দশজনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটাও সকলের সঙ্গে আমরা কাঁধ পেতে নিয়েছি। মাও-তুচির কথা—পুরাণো বনেদের উপর নতুন ইমারৎ গড়ে তোল। আমাদের নাটুকে ব্যাপারেও ঠিক তাই। সারা চীন জুড়ে অগণ্য অপেরা-দল আছে—১১৫০ অব্দে সবাই এসে পিকিনে জমল। আলাপ-আলোচনা হল—কারা কোন দিকে চলছে, তার নমুনা দেখানো হল কিছু কিছু। মোটামুটি একটা পথ ছকে নেওয়া গেছে সবাই যাতে পাশাপাশি চলতে পারি। আবার শিগগিরই আমরা মিলছি, যেখানে যত অপেরা-দল আছে। কারা কদ্দূর কি করল, তার হিসাবনিকাশ হবে···

শান্তি-সম্মেলনে ভারতীয় দলের কয়েক জন। ভারতের জাতীয় পতাকা। গান্ধি-টুপি মাথায় রবিশঙ্কর মহারাজ। দ্বিতীয় সারির মাঝামাঝি লেখক।

অমিয় মুখুজ্জে একজন সেক্রেটারি—খোদ সেই ব্যক্তি এসে হাজির। সবাই হাত কোলে করে বসে, আর দিব্যি আপনারা গল্প জমিয়ে বসেছেন। আচ্ছা মানুষ!

তাড়া খেয়ে উঠতে হল। ভোজন শুধু নয়, উদ্গীরণ-ক্রিয়াও আছে আমাদের—আমার বক্তৃতা, ক্ষিতীশের গান। কিন্তু গুণীজনদের ছেড়ে যেতে মন চায় না।

আপনারাও আসুন না—খাবেন আমাদের সঙ্গে। খেতে খেতে আরও কথা শুনব।

এমন দরের মানুষ—কিন্তু প্রস্তাবমাত্রেই উঠে দাঁড়ালেন। ব্যাঙ্কুয়েট-হলে ক্ষিতীশ আর আমি দুই মাত্র অতিথিকে মাঝে নিয়ে বসেছি। খাওয়া অন্তে গান হচ্ছে, আবৃত্তি হচ্ছে। মেইকে বলি, না আপনি কিছু ছাড়ুন—

মেই ঘাড় নাড়েন। উঁহু, এখানে কেন? ছিটেফোঁটায় সুবিধে হয় না আমার। আপনাদের জন্য একটা পুরো পালার ব্যবস্থা করছি। আমি তার নায়িকা। পরশু নাগাদ দেখাবো।

নায়িকা মানে বিশ-বাইশ বছরের ফুটফুটে রাজকন্যা। ষাট বছুরে এক বুড়ো তরুণী রাজকন্যা সেজেছেন। বুঝুন। সামনের সিটে আমরা—ষ্টেজের খুব কাছে। বারম্বার নজর হেনেও ধরতে পারছি নে। মেই বোধ হয় ফাঁকি দিলেন শেষ পর্যন্ত? ছাপা প্রোগ্রাম উল্টেপাল্টে দেখছি, রাজকন্যা তিনিই বটে! কিন্তু এই চেহারা মেইর কি করে হতে পারে?

পাশের দোভাষী ছেলেটা হেসে খুন। ঐ তো মজা! মেক-আপ, গলার স্বর এখন এই রকম দেখছেন, আবার সেদিন উনি রাজা সাজবেন, দেখতে পাবেন, বিলকুল ভিন্ন রকম হয়ে গেছে। এমনি না হলে ওঁর নামে তামাম শহর মেতে ওঠে কেন?

পুরুষ মানুষ রাজকন্যা সেজেছে, কিন্তু কন্যার সখীবৃন্দ—গুনতিতে জন ত্রিশেক হবে—তারা সবাই সত্যিকার মেয়ে। সেকালের রেওয়াজ—মেয়ের পার্টেও পুরুষ নামত। ভাল মেয়ে মিলত না, সেই জন্যে বোধ হয়। আমাদের দেশেরই মতন আর কি! এখন দেদার মেয়ে—কত নেবেন?

যাকগে, যাকগে। কোথায় যেন ছিলাম? ব্যাঙ্কুয়েট-হলে ভোজ খাচ্ছি পাকিস্তানি ভায়াদের সঙ্গে। গলা খাঁকারি দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি আসরের মাঝখানে। চতুর্দিকে একবার তাকিয়ে নিই।

আজকে ছাড়ব একখানা বঙ্গভাষায়। সুবোধ বন্দ্যো সেই যে বলেছিলেন, দেখা যাক সেটা কি রকম দাঁড়ায় এই ঘরোয়া সম্মেলনে। ঠিক সামনেই তরুণ বন্ধু মজিবর রহমান—আওয়ামী-লীগের সেক্রেটারি। জেল খেটে এসেছেন ভাষা-আন্দোলনে; বাংলা চাই—বলতে বলতে গুলির মুখে যারা প্রাণ দিয়েছিল, তাদেরই সহযাত্রী। আর রয়েছেন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আতাউর রহমান; দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন, যুগের দাবীর সম্পাদক খোন্দকার ইলিয়াস। বাংলা ভাষার দাবি এঁদের সকলের কণ্ঠে। বাঁ-দিকে দেখতে পাচ্ছি ইউসুফ হাসানকে—আলিগড়ের এম. এ, উর্দুভাষী হয়েও বাংলা ভাষার প্রবল সমর্থক। বাংলায় বলবার এর চেয়ে ভাল ক্ষেত্র কোথায় পাবো আর?

গোড়ায় একটুখানি ভূমিকা করে নিই ইংরেজিতে। মশাইরা অবধান করুন। আমি ভারতীয় বটে, কিন্তু জন্মস্থান পূর্ব পাকিস্তানে। আজকে আমার নিজ ভাষা বাংলায় কিছু বলব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ভাষা। নিখিল-পাকিস্তানের বড় হিস্যাদার যে পূর্ব বাংলা, তারও ভাষা এই।

খুব হাততালি। পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে যাঁরা এসেছেন, উৎসাহ তাঁদেরই উত্তাল। মিঞা ইফতিকারউদ্দীন তো হৈ-হৈ করে উঠলেন উল্লাসে...

সেই রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর মজিবর রহমান এসেছেন আমার ঘরে। এমনি চলত আমাদের—কোন দিন আমি যেতাম ওঁদের আস্তানায়, কোন দিন বা আসতেন ওঁরা কেউ। খাস-বাংলায় অনেক রাত্রি অবধি মনের আনন্দে গল্প-গুজব চলত। বক্তৃতার আসরের ঐ হাততালির কথা উঠল। কি ভায়া, পশ্চিম-পাকিস্তানিদের খুবই তো নিন্দেমন্দ করেন বাংলা ভাষার শত্রু বলে। অমন সম্বর্ধনা কি জন্যে হল তবে?

মজিবর বললেন, ভাষা-আন্দোলনের পর থেকে ভয় করে আমাদের। গুঁতোয় পড়ে বাংলার ঐ খাতির।

আবার বললেন, যে ক'টি এসেছে—এরা লোক ভালো, আমাদের মনের দরদ বোঝে। এদের দেখে সকলের আন্দাজ নেবেন না।

বক্তৃতাটা কেমন হল, বলা হয়নি। তাই কি খেয়াল আছে ছাই, খুব মেতে গিয়েছিলাম এই মাত্র জানি। আমার সাত পুরুষের ভিটা আজকে অন্যরাজ্যে পড়ে গেছে। সীমানা পার হতে হাজারো বায়নাক্কা। কর্তা হয়ে যারা জাঁকিয়ে বসেছে, তারা কোন দেশ থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে—চেহারায় মেলে না, কথায় মেলে না, কথা বোঝে না। মনে দুঃখ হয় না, বলুন? এদেশ ওদেশ হয়ে আলাদা দল করে এসেছি বটে, চীনে আসবার পরে তাবৎ বাঙালি এখন কাঁধ-ধরাধরি করে বেড়াই। পাকিস্তানের এবং ভারতের অপর প্রতিনিধিরা তাজ্জব হয়ে গেছেন আমাদের কাণ্ড দেখে। আমার বাংলা বক্তৃতা বোঝেন ক'জনই বা! কিন্তু সব ক'টি মানুষ আগাগোড়া চুপ হয়ে ছিলেন। অভিভূতও হয়েছেন, মালুম হচ্ছে।

রমেশচন্দ্র এগিয়ে এসে বাহবা দিলেন, ভারি চমৎকার বলেছেন আপনি—

কি বলেছি বলুন দিকি?

আমতা-আমতা করেন তিনি। দেখুন, বাংলা মোটে যে বুঝি নে, এমন নয়। তবে ঝড়ের বেগে ছুটে চললেন—এক বর্ণ তাই ধরতে পারিনি।

শান্তি-সম্মেলনে মোট ছেয়াশিটা বক্তৃতা। রিপোর্ট ও ঘোষণা ইত্যাদিতে আরও গোটা চল্লিশ। একুনে কতগুলো দাঁড়াল, যোগ করে দেখুন। শুনিয়ে দেবো নাকি তার থেকে ভারি গোছের ডজন দুই? আঁতকে উঠবেন না পাঠক-কুল—রসিকতা করলাম—হাইড্রোজেন-বোমা তাক করাও দয়ার কাজ এই তুলনায়। দু-তিনটি বক্তৃতার যৎসামান্য নমুনা ছাড়ব। পুরো বস্তু নয়, এখান থেকে

একটা লাইন, ওখান থেকে ছুটো। এতে আর মুখ বাঁকাবেন না, দোহাই প্রভুগণ!

নারীর অধিকার ও শিশুমঙ্গল সম্পর্কে রিপোর্ট দিলেন তাহিরা মজহর। সর্দার সেকেন্দার হায়াত খাঁর কথা মনে পড়ে—অখণ্ড পাঞ্জাবের যিনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন? তাঁরই মেয়ে উনি। স্বামী মজহর আলী খাঁ পাকিস্তান-টাইমসের সম্পাদক—তিনিও সঙ্গে এসেছেন। অতি সুন্দর চেহারা, কণ্ঠস্বর ও ইংরেজি বাচনভঙ্গিও তেমনি। সাঁইত্রিশটা দেশের পৌণে চার শ' বাছা বাছা মানুষ—সবাই থ হয়ে গেছেন। বক্তৃতার পরে দলে দলে সে কি অভিনন্দনের ঘটা! অধমও সেই সব দলের বাইরে নয়।

"মেয়েদের কথা বলতে উঠেছি আমি—তারা লড়াই করে না, লড়াইয়ে মারা পড়ে অসহায়ের মতো। এখনকার লড়াই শুধু সৈন্য মারে না, নিরীহ মানুষের ঘর-গৃহস্থালী ভাঙে, যুগ যুগ ধরে গড়ে-তোলা মানুষের সমাজ ও সভ্যতা উৎখাত করে দেয়।

মা ছেলেকে বিদায় দিচ্ছেন, কোন দিন আর দেখতে পাবেন না সেই ছেলে—হাস্যোচ্ছলা তরুণীরা নিঃসহায় বিধবা হয়ে দেশ জুড়ে হাহাকার করছে—মনে মনে আন্দাজ করুন তো এমনি ছবিগুলো। কোন অজ্ঞাত সুদূর রণক্ষেত্রে হাজার হাজার মায়ের বাছার উপর সঙ্গিনের ধার পরীক্ষা হচ্ছে, ফিরে যদি আসে কখনো আসবে পঙ্গু বিকলাঙ্গ হয়ে। আমেরিকার কাগজে বেরিয়েছে—এমনি এক ঘটনার কথা বলছি। দক্ষিণ-কোরিয়ার দারুণ শীতে খোলা প্লাটফরমে শত খানেক বাচ্চা আশ্রয় নিয়েছে। বাপ-মা আত্মীয়জন সবাই লড়াইয়ে মরেছে—ধরণীতে আপন বলতে কেউ নেই। আমেরিকান ভদ্রলোক একটিকে গিয়ে ধরলেন, এর পরে কি করবে, ভেবেছ তুমি কিছু?

মরব—আবার কি! গেল শীতে আমার দাদা গেছে, এবারে আমি—

মরার ক্ষণ অবধি কোন গতিকে কাটিয়ে দেওয়া—তা ছাড়া ঐ বাচ্চা ছেলের আর কোন লক্ষ্য নেই জীবনে। এ ছেলে একটি নয়—হাজার, হাজার। প্যারিসে শান্তি-কংগ্রেস হয়েছিল—পাকিস্তানে সাড়া দিয়েছিলাম আমরা মেয়েদের দলই সকলের আগে। পাঞ্জাব উইমেন ডেমোক্রেটিক এসোসিয়েশন। এর কারণ কি জানেন? নিজেদের ভাবনা তত নয়—মায়ের জাত, ছেলেমেয়ের কষ্টে দুঃখে স্থির থাকা অসম্ভব আমাদের পক্ষে। তাই বলছি, লড়াই থামাও বন্ধুরা সকলের মিলিত চেষ্টায়—নইলে তোমার বুকের ছেলে আমার বুকের ছেলে নিঃসহায় নির্বান্ধব পথে দাঁড়িয়ে অমনি বলবে, আমি মরব এবারে শীতকাল এসে পড়লে। ধরণীর সকল আলো-আনন্দ নিঃশেষে নিবে গেছে এক ফোঁটা ঐ বাচ্চা ছেলের চোখের সামনে থেকে।..."

স্বর কাঁপছিল তাহিরা মজহরের। ব্যাকুল বেদনার্ত মাতৃকণ্ঠ, মনে হল, করজোড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে হল-ভরতি তাবৎ মানুষের চোখের সম্মুখ দিয়ে।

আর একজনের দু-এক কথা বলি। আমাদের রবিশঙ্কর মহারাজ। সত্তর বছরের বুড়ামানুষ—অঙ্গে অম্লান খদ্দরের ভূষা, নগ্নপদ, মাথায় গান্ধিটুপি। আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন-ক্ষেত্রে

ভারতের পুণ্যবাণী উদ্গীত হল যেন মহারাজের কণ্ঠে। এই কথা পরে বলেছিলাম অধ্যাপক শুকলার কাছে। মহারাজকে গুজরাটিতে বুঝিয়ে দিতে সলজ্জ হাসি হেসে তিনি আমায় নমস্কার করলেন।

"সম্মেলন তিনটে কারণে অতি পবিত্র আমার কাছে। সম্মেলনের শুরু মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে। সৃষ্টির আদি থেকে যত মানুষ জগতের শান্তি ও সৌহার্দের জন্য কাজ করে গেছেন, মহাত্মার চেয়ে বড় কেউ নেই। দ্বিতীয় কারণ, সুপ্রাচীন চীন-ভূমির উপরে এই অনুষ্ঠান। মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে পর্বতপ্রমাণ দুঃখ ও অত্যাচার সহ্য করছে এই মহাজাতি। তিলেক সঙ্কল্পভ্রষ্ট হয় নি তারা; শ্রমে অবসাদ আসে নি। তিন বছরের মধ্যে অসাধ্য সাধন করে পীড়িত অবমানিত মানুষের সমাজে নতুন অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে। আর তৃতীয় কারণ হল—সম্মেলনের পুণ্য লক্ষ্য, জগতের মধ্যে—বিশেষ করে এশিয়ার দেশে দেশে সকল মানুষের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাবের অচল প্রতিষ্ঠা।

বারম্বার মহাত্মাজীর কথা মনে পড়ছে। শেষ নিশ্বাস অবধি তিনি জগতের শান্তি কামনা করে গেছেন, সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা বা গণ্ডি-ঘেরা স্বদেশপ্রেমের প্রশ্রয় দিতেন না কখনো তিনি। জগতের যা-কিছু ভালো, নিখিল মানবজাতির তা ভোগ্য হবে, কয়েকটি মানুষের কুক্ষিগত হয়ে থাকবে না—এই তিনি চাইতেন। অহিংস পথে ছিল সেই লক্ষ্য সাধনা।

শান্তি আকাশ থেকে পড়বে না—শান্তির জগৎ গড়ে উঠবে সকলের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ হলে। যেখানে জোরজবরদস্তি, সেইখানে বাধা দিতে হবে। অহিংসপথিক আমরা বিশ্বাস করি, মানুষের শান্ত চরিত্রই কেবল শান্তির সহায়ক হতে পারে। তবু যেখানে যে কেউ অন্যায়ের প্রতিরোধ করে—তা সে যে উপায়েই হোক—আমার শ্রদ্ধা স্বতই তার প্রতি উৎসারিত হয়ে ওঠে।

প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ শ্রমের ফল ভোগ করবে। কিন্তু জাগতিক ভোগ-সুখ নিয়ে মাতামাতি করলে কখনো বিশ্ব-শান্তি আসতে পারে না। ত্যাগের মনোভাব চাই। ভোগ-লিপ্সা থেকেই অপরকে বঞ্চনা, সম্পদের আহরণ—এবং শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ের প্রবৃত্তি জাগে।"

[ক্রমশঃ।

—জেনে রাখুন—

মাসিক বসুমতীর জন্য প্রেরিত যে কোন লেখা, চিত্র ও আলোকচিত্রের সঙ্গে যথোপযুক্ত ডাক টিকিট না পাঠালে অমনোনীত লেখা ও ছবি কোন মতেই ফেরত দেওয়া হয় না।

বৈচিত্র্যময়ী —গোপাল ঘোষ অঙ্কিত

● প্রচ্ছদপটের আলোকচিত্রটি শ্রীবিষ্ণুপদ নন্দী গৃহীত।
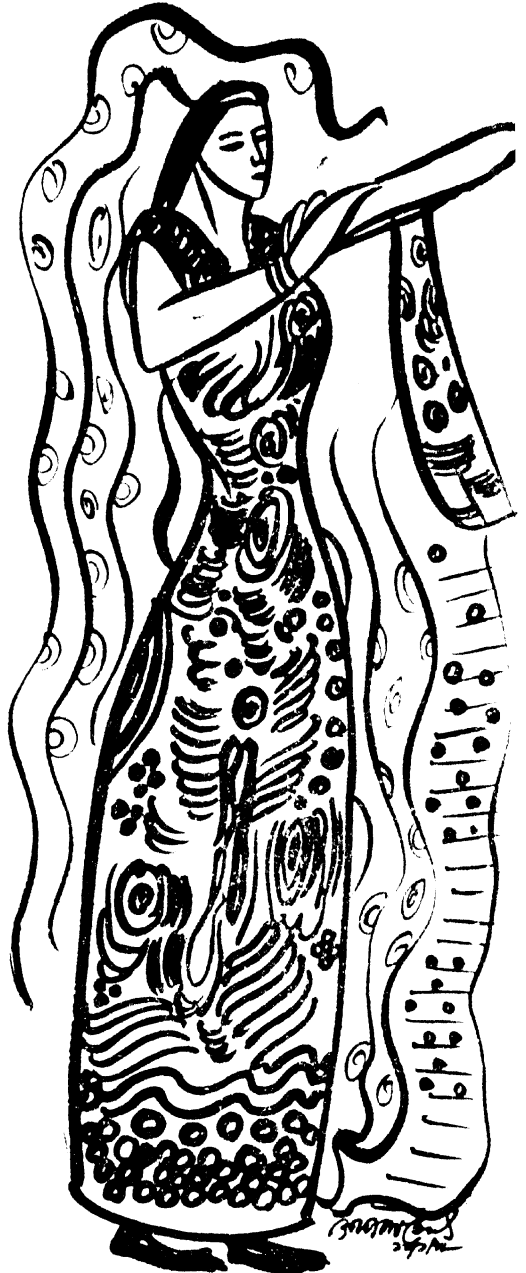
বঙ্গ-বিহার সমস্যা

"বিহারের বাঙ্গালীদের সমস্যা সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের কাছে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ উত্তরে এক পাল্টা প্যাঁচ কসিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন, বিহারে বাঙ্গালীদের এবং বাঙ্গালায় বিহারীদের যে সব অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে ডাঃ রায়ের সঙ্গে আলোচনা করিতে তিনি রাজী আছেন। বিহারে বাঙ্গালীদের অসুবিধার কথা কাহারও অজানা নাই। বাঙ্গালা ভাষার উপর দমন-নীতির রথ চালাইয়া কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট সেখানে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। মানভূমে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সমস্যার গুরুত্ব সম্প্রতি সকলের চোখের সামনে খুবই স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছিল। কেবল এই সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ডাঃ সিংহ যদি রাজী হইতেন, তবে সদিচ্ছার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাইত; কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে বাঙ্গালায় বিহারীদের অসুবিধার কথাও কৌশলে জুড়িয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালায় বিহারীদের অসুবিধা ভোগ করিতে হয়—এ একটা তাজ্জব খবর বটে! এ খবর বাঙ্গালায় অবস্থিত হাজার হাজার বিহারীদেরও জানা আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এ পর্য্যন্ত কেহই এই অভিযোগ করে নাই; কিন্তু তবু এই কল্পিত সমস্যা জুড়িয়া দিয়া বিহারের মুখ্যমন্ত্রী প্রচার করিতে চাহিয়াছেন যে, বাঙ্গালায় বিহারীদের প্রতি এবং বিহারে বাঙ্গালীদের প্রতি ব্যবহারের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই।"

—দৈনিক বসুমতী

যার কথার ঠিক নেই—

"ভারত সরকারের পক্ষ হইতে মন্ত্রিগণ যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেন, তাহা যথাকালে প্রতিপালিত হয় না, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনে বহু বিলম্ব হয়, এই অভিযোগ পাইবার পর লোকসভার অধ্যক্ষ এক কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। কমিটির প্রাথমিক রিপোর্টেই কয়েকটি প্রণিধানযোগ্য তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। জানা যাইতেছে যে ১৯৫২ সালের মে হইতে ১৯৫৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত এক বৎসরে মন্ত্রিগণ মোট এক হাজার তিন শত একানব্বইটি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু ১৯৫৩ সালের মার্চ পর্যন্ত হিসাব-নিকাশে দেখা গিয়াছে, মোট নয় শত চল্লিশটি প্রতিশ্রুতি প্রতিপালিত হইয়াছে এবং চারি শত সাতষট্টিটি প্রতিশ্রুতিই প্রতিপালিত হয় নাই। আরো লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ৮১টি প্রতিশ্রুতি গত দুই বৎসর যাবৎ, ১২৮টি প্রতিশ্রুতি দেড় বৎসর যাবৎ এবং ২৫০টি প্রতিশ্রুতি এক বৎসর যাবৎ অপূর্ণ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া যে সকল প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইয়াছে, সেই সকল প্রতিশ্রুতি পালনেও যথেষ্ট সময় লাগিয়াছে। কমিটি দেখিয়াছেন, ৭৪টি প্রতিশ্রুতি পালনে পুরা এক বৎসরেরও অধিক সময়, ১০৯টি প্রতিশ্রুতি পালনে নয় মাসেরও অধিক সময় এবং ১২১টি প্রতিশ্রুতি পালনে ছয় মাসেরও অধিক সময় অতিবাহিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, যথাকালে না হইয়া বিলম্বে পালিত হওয়ার দরুণ মন্ত্রিগণের প্রতিশ্রুতির মূল্য অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

উচিত নয়

"চাউলের প্রাচুর্য হেতু পশ্চিম-বাঙ্গলার রেশন এলাকায় রেশন প্রত্যাহারের জন্য কিদোয়াই সাহেবকে অনুরোধ জানানো হইয়াছিল। একগাল হাসিয়া তিনি জবাব দেন,—লোকে প্রতি সপ্তাহে রেশনের দোকান হইতে একুশ ছটাক ও বিশেষ দোকান হইতে তিন সের পনের ছটাক চাউল কিনিতে পারে। ইহাই তো কার্যকরী ভাবে রেশন প্রত্যাহার, তবু রেশন তুলিয়া দেওয়ার কথা উঠিতেছে কেন? এই যুক্তিতে একটা ফাঁকি আছে—সে জন্যই রেশন প্রত্যাহারের প্রস্তাব শোনা যায়। এখন বাঁধা দরে মাত্র রেশনের চাউলই পাওয়া যায়। তদতিরিক্ত চাউলের দর শুধু অনিশ্চিত নয়, রেশনে দুই নম্বর চাউলের তুলনায় অনেক চড়া। সেজন্য দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্তের পক্ষে ঐ চাউলটা দরকার মত ক্রয় করা সম্ভব নয়। রেশনে পরিমাণগত বাধা-নিষেধ প্রত্যাহৃত হইয়াছে সত্য; কিন্তু মূল্যের দিক দিয়া পরোক্ষ বাধা বলবৎ হইয়াছে। যাহারা বিশেষ দোকানের চড়া দর দিতে পারে, তাহাদের কোন অসুবিধা নাই,—কিন্তু যাহারা পারে না—রেশনের একুশ ছটাক চাউলই তাহাদের সম্বল। কোন প্রগতিশীল দেশই অর্থবানের জন্য যদিচ্ছা পরিমাণে ও বিত্তহীনের জন্য ন্যূন প্রয়োজন অপেক্ষা কম খাদ্য সরবরাহ করে না। হিতব্রতী রাষ্ট্রের পক্ষে এরূপ নীতি গ্রহণ করা উচিত নয়।" —যুগান্তর।

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চাই

"কলিকাতা মহানগরীতে কলেরার মহামারী অব্যাহত রহিয়াছে। গত সপ্তাহে কলেরার আক্রমণ ও মৃত্যুর হার সামান্য কম ছিল বলিয়া আত্মসন্তুষ্টির কোন কারণ নাই। অথচ পৌরসভার কর্তৃপক্ষ টীকা দিবার ও বস্তি পরিষ্কারের কিছুটা ব্যবস্থা করিয়াই

নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। অপরিশ্রুত জল কলেরা বিস্তারের অন্যতম প্রধান কারণ, কিন্তু পরিশ্রুত জল যথেষ্ট পরিমাণ পাওয়া দুর্ঘট। কলেরা নিবারণের জন্য এই পানীয় জল সরবরাহের মূল সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টা পৌরসভা বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার করিতেছেন না। এই মহানগরীর বহু অঞ্চল মরুভূমি সদৃশ। এক ফোঁটা জলের জন্য মানুষ হাহাকার করে, এক বালতি জলের জন্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। কিন্তু কংগ্রেসী পৌরসভা কর্তৃপক্ষ ও সরকার নির্বিকার! বড় বড় তাঁহাদের পরিকল্পনা, শুনিলে চমক লাগিয়া যায়। ছোট ছোট কাজের কথা ভাবিতে তাঁহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্ক অক্ষম। আমরা বৃহৎ পরিকল্পনার বাগাড়ম্বর বন্ধ করিয়া কর্তৃপক্ষকে ছোটখাটো অথচ এখনই কার্য্যকরী করা সম্ভব এমন সমস্ত কাজে মন দিতে অনুরোধ করিতেছি। কলিকাতার জলাভাবগ্রস্ত এলাকাগুলিতে অবিলম্বে যথেষ্ট পরিমাণে জল সরবরাহ এমনই একটি কাজ। জনসাধারণকেও এই ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলন চালাইতে হইবে, নচেৎ কর্তৃপক্ষের মস্তিষ্কে এই সহজ বিষয়টি প্রবেশ করানো যাইবে না।"

—স্বাধীনতা।

পূর্ব্ববঙ্গ নির্ব্বাচন

"স্বাধীনতার পর এখানে প্রথম নির্ব্বাচনে কংগ্রেস জিতিল, পাকিস্থানে মুসলিম লীগ ধরাশায়ী হইল, ইহার কারণ কি? প্রথম কারণ, পূর্ব্ববঙ্গের বামপন্থী নেতারা বাস্তব সত্য অস্বীকার করেন নাই, লোকের মনের কথা, তাঁহাদের বাস্তব দাবী নিয়া তাঁহারা দাঁড়াইয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার উপর আক্রমণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ও সরকারী চাকুরিতে অবাঙ্গালী প্রাধান্য এই দুইটিই ছিল বাঙ্গালী জনসাধারণের প্রধান অভিযোগ। ইহাকে প্রাদেশিকতা মনে করিয়া তাহারা পিছাইয়া যায় নাই, বাঁচার দাবী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং বামপন্থীরা এই দাবী নিয়া লড়িয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গেও ঠিক এই অবস্থা। এখানেও বাঙ্গালা ভাষা উপেক্ষিত। কর্পোরেশনে বাঙ্গালা ভাষায় কাজ চলিবে, এই চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সফল হয় নাই। বাসের সাইনবোর্ড প্রথমে বাঙ্গালা করিয়া আবার বদলাইয়া ইংরেজি করা হইয়াছে। মানভূমে বাঙ্গালা ভাষার উপর যে অত্যাচার চলিতেছে তাহার তুলনা নাই। আমাদের বামপন্থীরা নীরব। বাঙ্গালীর বাঁচার লড়াই, বাঙ্গালা ভাষার দাবীকে তাঁহারা প্রাদেশিকতা মনে করিয়া নাক সিঁটকাইয়া আসিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গের বামপন্থীরা উহাই গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ, পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণ জাগিয়াছে। যুক্ত ফ্রণ্ট হইয়াছে জনতার চাপে। আমাদের এখানে বামপন্থীরা একত্র মিলিতে পারেন নাই, তাঁহারা পারিয়াছেন। আমাদের জনসাধারণ বামপন্থীদের উপর ঐক্যের জন্য চাপ দেয় নাই, তাঁহারা দিয়াছেন। তাঁহাদের ঐক্য গোড়ায় হইয়াছে, তাই এই বিরাট জয়। আমাদের যেটুকু ঐক্য তাহা পাতায়, তাই পড়ে আর ভাঙ্গে। সেখানে ছাত্রসমাজ জাগিয়াছে, রাজনীতি করিয়াছে, ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের ছাত্রসমাজ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যে কাটজুর বক্তৃতা মন দিয়া শুনিয়া আসিয়াছে। তৃতীয় কারণ, পাকিস্থান বুঝিয়াছে একদলীয় শাসন ডিক্টেটরশিপে পরিণত হয়, উহা জনসাধারণের দুঃখই বাড়ায়, সত্য ও যুক্তির কোন মর্য্যাদা থাকে না। ডিক্টেটর যখন মনে করে যে চিরকাল ভোটে সেই জিতিয়া আসিবে তখনই অত্যাচার চরমে ওঠে। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ দুই জায়গাতেই ইহা হইয়াছে। সেখানে জনসাধারণ এইটি ধরিয়া ফেলিয়াছে এবং প্রথম সুযোগ পাইয়াই লীগ ডিক্টেটরশিপ চূর্ণ করিয়াছে। আমরা ঘরে বসিয়া কংগ্রেসী অত্যাচারের কাহিনীতে সিলিং ফাটাইয়াছি, ভোটের বেলায় সেই জোড়াবলদের পিঠেই কাগজ রাখিয়া আসিয়াছি। বামপন্থী দল এবং জনসাধারণ দুজনে এক সঙ্গে যদি নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন তবে আমাদের এখানেও পূর্ব্ববঙ্গের অঘটন ঘটানো কিছু মাত্র অসম্ভব হইবে না।"

—যুগবাণী।

যন্ত্রের যন্ত্রণা

"এতদঞ্চলে বিড়ি তৈরী করিয়া অনেক লোক জীবিকানির্ব্বাহ করে। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে বিড়ির কারিগর-সংখ্যা দেড় লক্ষ। ইহাদের উপরও যন্ত্রের যন্ত্রণা সুরু হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিছুকাল যাবৎ কলিকাতায় এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের পরিকল্পিত বিড়ি তৈয়ারীর যন্ত্র বাহির হইয়াছে। তাহাতে তিন জন লোকের সাহায্যে ১০০০০ বিড়ি তৈরী করিতে ৮৵ পড়িবে। হাতে কলিকাতায় একজনে ১ দিনে ১০০০ বিড়ি তৈরী করে এবং হাজারে ২।০ টাকা মজুরী পায়। মফঃস্বলে এই হাজার বিড়ি তৈরীর মজুরী ১।০ হইতে ১।৵। একজন বিড়ি-ব্যবসায়ী বলিতেছিলেন যে, লোক কলে তৈরী বিড়ির ধূমপান পছন্দ করে না। তাহা হইলেও ভরসা করা যায় না। আমরা স্বর্গীয় শ্যামাদাস বাচস্পতি কবিরাজ মহাশয়কে রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করার সময় বিশেষ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি যে, যদি ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলের ভাত না খাও, ঔষধে ক্রিয়া করিবে না। তবুও তো সরকার কলের অস্বাস্থ্যকর চাউল খাইতে লোককে বাধ্য করিতেছেন; যন্ত্রের জয় জয়কার! যন্ত্রদানবের হাতে মানুষের নিস্তার নাই!"

—জঙ্গিপুর সংবাদ।

জল নাই

"৪ঠা মে প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম ঘড়া, বালতি হাতে লইয়া এক ফোঁটা জল পাইবার আশায় আসানসোলের নর-নারী ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। সহরে কলের জল বন্ধ। মিউনিসিপ্যালিটি পূর্ব্বে নাকি কোন নোটিশও দেয় নাই। চমৎকার দায়িত্ববোধ! মালসী চেয়ারম্যান হইবার জন্য পরমানন্দে বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ভোট ক্যানভাস করিয়া বেড়াইতেছেন। আর ভাইস চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ কি করিতেছেন তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। এতগুলি লোকের জীবন, স্বাস্থ্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লইয়া যাঁহারা এই ভাবে ঔদাসীন্য দেখাইতে পারেন ও ছেলেখেলা ভাবিতে পারেন, সেই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকার কোন যুক্তি কি তাঁহাদিগের আছে? এক ফোঁটা জলের জন্য যাহাদিগকে উন্মাদের মত ছুটাছুটি করিতে হয়, লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি সেই জনসাধারণের মুখ হইতে কোন সাধুভাষা বাহির হইতে পারে না। মিউনিসিপ্যালিটিকে অভিসম্পাত দিবার মত যথেষ্ট কঠোর ভাষা তাহারা খুঁজিয়া পায় না।"

—বঙ্গবাণী (আসানসোল)

ধর্মঘটের অঘটন ?

"বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হওয়া গেল যে, পুরাতন প্রাথমিক শিক্ষকদের ভিতর এক অসন্তোষের ভাব ধূমায়িত হইতেছে। যে সকল নূতন প্রাথমিক শিক্ষক সরকার নিযুক্ত করিতেছেন তাঁহাদের মাহিনা ম্যাট্রিক, আই-এ বি-এ, এম-এ, যথাক্রমে ৫৫৲ ৭০৲ ৮৫৲ ও ১০০৲ টাকা, অথচ পুরাতন প্রধান শিক্ষকদের মাহিনা মাত্র ৪৭৷৹ ; কিন্তু প্রায়ই ক্ষেত্রে এই প্রধান শিক্ষকগণ ম্যাট্রিক বা আই-এ পাশ আছেন। তাঁহাদের অধীনে এই সব নূতন শিক্ষকদের কাজ করিতে হইতেছে। যেখানে নূতন সহকারী শিক্ষকগণ ৫৫৲, ৭০৲, ৮৫৲, ও ১০০৲ টাকা বেতন পাইবেন, সেখানে পুরাতন প্রধান শিক্ষকগণ পাইবেন মাত্র ৪৭৷৹ আনা। এ প্রথা রোধ না হইলে খুব শীঘ্রই তাঁহারা ধর্ম্মঘটের সম্মুখীন হইবেন বলিয়া জানিতে পারা গেল। এই ধর্ম্মঘটে আবার কি অঘটন ঘটে কে জানে!"

—সীমান্ত (রাণাঘাট)।

অহিংস নীতি জিন্দাবাদ!

"প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে, গ্রামে সরকারী ম্যালেরিয়া নিরোধক কর্মচারীরা ঘরে ঘরে ডি, ডি, টি ছড়াইয়া মশক ধ্বংস করিয়া ম্যালেরিয়া রোগের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতেন কিন্তু তাঁহারা মশকের জন্মস্থান ও আবাসস্থান পচা ডোবা, খানা, নোডরা, আবর্জ্জনা বা মজা পুকুর প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি দেন নাই। তাঁহারা শুধু দেওয়ালে ডি, ডি, টি ছড়ান—যাহাতে দেওয়ালে মশক না জন্মিতে পারে। জীবহত্যা মহাপাপ—তাই হত্যা না করিয়া, আক্রান্ত যাহাতে না হইতে হয় তাহারই মহান উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন! কংগ্রেসী রাজত্বে অহিংস নীতি দ্বারা পরিচালিত না হইলে বিরোধী পক্ষরা যে সমালোচনা করিতে পারে!! অহিংস নীতি জিন্দাবাদ!"

—উদয়ন (মালদহ)।

আসানসোল সহরে ফুটপাথ ও ফেরিওয়ালা সমস্যা

"আসানসোল সহরে ফুটপাথ ও প্রস্রাবাগার সম্বন্ধে আমরা বহু বারই লিখিয়াছি কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার কিছুই কার্য্য অগ্রসর হইতে দেখিতেছি না। পূর্ব্ববর্ত্তী মহকুমা শাসক মহোদয়, বর্ত্তমান মহকুমা শাসক মহোদয়ের সম্মুখে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য এখন শ্রীযুক্ত যেমন তুলিয়া লইয়া শেষ করিবেন বলিয়া আমাদের আশ্বাস দিয়াছিলেন। এবং আমরাও কিছুদিন পূর্ব্বে তাহা পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিয়াছি। কিন্তু যত দিন ফুটপাথ না হইতেছে তত দিন পঞ্চাশ ফুট দিয়া যাহাতে লোকে চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। ফেরিওয়ালারা জীবিকার্জ্জনের চেষ্টায় এরূপ সম্মুখে বসিয়া থাকে যে মধ্যে যাতায়াতের জন্য ৩।৪ ফুটের বেশী পথ থাকে না—ফলে জনতার চলাচলে বড়ই ভীড় বোধ হয়। অবশ্য পুলিশ মধ্যে মধ্যে এই সকল ফেরিওয়ালাদের তাড়াইতে সুরু করিলে এক কৌতুকাবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। যতক্ষণ পুলিশ থাকে ততক্ষণ ফেরিওয়ালারা কাহারও বারান্দায় বা গলিপথে লুকাইয়া থাকে এবং পুলিশ চলিয়া গেলেই পথের পূর্ব্ববৎ অবস্থা হয়। আমাদের পরামর্শ, যত দিন ফুটপাথ বা ফেরিওয়ালাদের উপযুক্ত জায়গা না হইতেছে তত দিন পুলিশ এই ফেরিওয়ালাদের পঞ্চাশ ফুট হইতে একেবারে না তাড়াইয়া বড় নালার ধারে পিছাইয়া বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিক, তাহাতে লোক চলাচলেরও সুবিধা হইবে এবং তাহাদেরও জীবিকার্জ্জনের উপস্থিত ব্যবস্থা থাকিবে। আমরা এ দিকে মহকুমা শাসকের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বন্দে মাতরম্।"

—আসানসোল হিতৈষী।

সেন-র‍্যালে কারখানায় কর্ত্তৃপক্ষের গাফিলতি

"স্থানীয় সেন-র‍্যালে সাইকেল কারখানার শ্রমিক শ্রীপুসদেও সিং কর্মরত অবস্থায় চক্ষুতে ভীষণ আঘাত পান। প্রায় ১১ ঘণ্টা পরে তাঁহাকে আসানসোল হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুটি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। ডাক্তারের এই মন্তব্যে শ্রীসিং তাঁহার বন্ধু শ্রীহংসরাজ ও সেন-র‍্যালে কারখানার শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদকের সহিত এ ব্যাপারে আলাপ করার জন্য দেখা করিতে চান। কিন্তু হাসপাতালের চক্ষু-চিকিৎসক এই সাক্ষাতের অনুমতি দেন না এবং অপমান জনক ব্যবহার করেন। ইহাতে শ্রমিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়। পরে ইউনিয়ন সম্পাদক শ্রীনিরঞ্জন ডিহিদার ও অন্যান্য কর্ম্মিগণ সহ একটি প্রতিনিধি দল ওয়ার্কস্ ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীসিংকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় পাঠাইতে সক্ষম হন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে সেন-র‍্যালে কারখানায় শ্রমিকদের প্রাথমিক চিকিৎসারও কোনরূপ সুবন্দোবস্ত নাই।"

—নূতন পত্রিকা (বর্দ্ধমান)।

শ্যামলেন্দুনারায়ণ রায়কে ধন্যবাদ

"১৯৫২ সালের বনমহোৎসবে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী পৌর-সংঘ পশ্চিমবঙ্গের পৌর-সংঘের পর্য্যায়ে বনমহোৎসবের দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়াছেন। জেলার সংস্থাগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন উদয়চাঁদপুর উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয় এবং ব্যক্তিপর্য্যায়ে মুর্শিদাবাদে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন জেমোর শ্রীশ্যামলেন্দুনারায়ণ রায়। শ্যামলেন্দু বাবু জেমোর কুমার বিজয়েন্দুনারায়ণ রায় এম-এল-এ মহাশয়ের পুত্র। তিনি এ বৎসর ধান্য উৎপাদন প্রতিযোগিতায় আন্দুলিয়া ইউনিয়নের প্রথম পুরস্কারও পাইয়াছেন। আমরা শ্যামলেন্দু বাবুর এই যুগ্ম সাফল্যে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। তিনি যে নিজে ধান্য-চাষ ও বনমহোৎসবে বৃক্ষ রোপণের ব্যাপারে এত অগ্রসর হইয়াছেন তাহা আনন্দের কথা। জেলার অন্যান্য এম-পি, এম-এল-এর পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার আদর্শে অতঃপর অনুপ্রাণিত হইলে ভাল হইবে এবং পুরস্কারও পাওয়া যাইবে।" —মুর্শিদাবাদ সমাচার।

কংগ্রেসী সার্কাস

"বর্দ্ধমান মহারাজার গোলাপবাগের চিড়িয়াখানায় গত শনি ও রবিবার কংগ্রেসী সার্কাস হইয়া গেল। কলিকাতার বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ, পশ্চিম-বাংলার এই প্রাদেশিক কংগ্রেস-সম্মেলনে মাত্র তিন শতাধিক প্রতিনিধি ও মাত্র দুই সহস্র নরনারী যোগদান করিয়াছিল। অজস্র অর্থের শ্রাদ্ধ করিয়া যে কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল, তাহাতে অশ্রদ্ধা ও অনাস্থার সহিতই বর্দ্ধমানের জনগণ বিশেষ ভাবে যোগদান করেন নাই। জনসাধারণের মধ্যে যাহারা যোগদান করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে নাচগান ও হুজুক দেখিবার আগ্রহই ছিল অধিক। বর্দ্ধমানের নাগরিকদের মধ্য হইতেও চিরদিনের প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদিগণ ছাড়া বিশিষ্ট কাহাকেও দেখা যায় নাই। যে কংগ্রেস একদিন জনগণ-মন-অধিনায়করূপে জনসাধারণের আকর্ষণ ও উল্লাসের বস্তু ছিল, যাহার অধিবেশনে যোগদানকে সৌভাগ্য মনে করিয়া কৃষককুল মাইলের পর মাইল তীর্থ দর্শনের ন্যায় অকুণ্ঠিত ভাবে পদব্রজে আগমন করিত, তাহার প্রাদেশিক সম্মেলনের আজি এই দুরবস্থা দেখিয়া অতীত দিনের স্মৃতি মনে করিলে মর্ম্মাহত হইতে হয়। কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে গৃহীত কয়েকটি মামুলি প্রস্তাবের উপর কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ কিছুটা লম্ফঝম্ফ করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে আসর জমাইতে পারেন নাই। কংগ্রেসের প্রাণহীন প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতির উপর জনগণের এতটুকু আস্থা ও বিশ্বাস নাই।" —দামোদর (বর্দ্ধমান)।

পরিবহন প্রসঙ্গ

"ইতিপূর্ব্বে আমরা পরিবহন প্রসঙ্গে সাঁইথিয়া ষ্টেশনের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করিয়া কান্দী-সাঁইথিয়া পথে আন্তঃআঞ্চলিক পরিবহন ব্যবস্থার আশু প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব "আর-টি"-এর সমক্ষে আমাদের "বান্ধবের" মাধ্যমেই উত্থাপন করিয়াছি। "আর-টি-এ"ও নাকি এতদ্বিষয়ে অবহিত হইয়া কথিত রাস্তায় মালবাহী মোটর গমনাগমনের বিধি-ব্যবস্থায় উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু মালবহন হইতেও যে যাত্রীবহনের গুরুত্ব অধিক, তাহা "আর-টি-এ" উপলব্ধি করিতে না পারিলেও সর্ব্বসাধারণের নিকট ইহা অবিসংবাদিত সত্য। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমরা পুনরায় পরিবহন-নিয়ন্ত্রক কথিত প্রতিষ্ঠানের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি, ক্ষিপ্রতার সহিত বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করিয়া "আর টি-এ" জনমঙ্গল বোধের পরিচয় প্রদান করিবেন। যেহেতু বাসের ভাড়া সম্পর্কেও সর্ব্বত্র যাহাতে সমতা রক্ষিত হয় তৎ সম্বন্ধেও পূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি কিন্তু তৎসম্পর্কে নিরপেক্ষ নীতি গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বিষয়টি পুনরায় সুবিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমান সময়ে সাঁইথিয়া হইতে চব্বিশ ঘণ্টায় আপ-ডাউন পঁচিশখানি ট্রেন যাতায়াত করে। ঐ সকল ট্রেনের এতদাঞ্চলিক যাত্রিগণ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে যাতায়াত করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে যে ভাবে বাস-সার্ভিস প্রবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন, নিম্নে আমরা আমাদের ধারণা অনুযায়ী তৎসম্বন্ধীয় একটি টাইম-টেবল প্রদান করিয়া এতদ্বিষয়ে "আর-টি-এ"র মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।" —কান্দী-বান্ধব।

শিক্ষক-সম্মেলন

"অসহযোগ আন্দোলনের সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জ্জনের আহ্বানে বলা হয়, শিক্ষা বিলম্বিত হইতে পারে কিন্তু স্বাধীনতা বিলম্বিত হইতে পারে না।" আজিও ঠিক সেই সুরেই বলা হইতেছে, "শিক্ষা বিলম্বিত হইতে পারে কিন্তু সামাজিক ঐক্য বিলম্বিত হইতে পারে না।" বাঙ্গীটোলায় আলোচনার ধারা হইতে আমরা এইটুকুই বুঝিয়াছি যে শিক্ষা-ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করার দাবী উঠিয়াছে। সরকারী সাহায্য অপরিহার্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের ভাষায় "সরকারের হৃদয় বা মন বলিয়া কিছু নাই—" সুতরাং [illegible] কণ্ঠধারা হইয়া শিক্ষাব্রতীদেরই রাষ্ট্রকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। যাঁহারা ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের পক্ষপাতী তাঁহারা [illegible] করিয়া দেখিবেন কি যে, বাহিরে রাজনৈতিক দলগুলি এই কিশোর মনগুলিকে কি ভাবে ব্যবহার করিতে পারে? দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, যে দলীয় স্বার্থ দৃষ্টি হইতে শিক্ষকরা নিজেদের দূরে রাখিতে পারিতেছেন না, সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রীরা কি ভাবে তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিবে? অধিকন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থা যদি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত হয়, তবে তাহা শাসক দলের প্রতিচ্ছায়া হইতে বাধ্য। সরকারী সাহায্য নিশ্চয়ই প্রয়োজন কিন্তু শিক্ষার স্বায়ত্তশাসন অধিকতর প্রয়োজন।" —সঙ্কল্প (মালদহ)

কাকে ধরলে হয়

"এখন আর পরীক্ষায় ভাল নম্বর, বুদ্ধি ও সততার পরিচয় যোগ্যতার মাপকাঠি নহে। মন্ত্রী, উপমন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের ধরিতে পারিলেই হইল। তাই আজ রাস্তায় শুনি, ম্যাট্রিক পাশ ছেলে ফেল-করা ছেলেকে সান্ত্বনা দেয়—"দুঃখ করছিস কেন ভাই, আমি পাশ করেই বা কি লাভ হলো? ধরবার কেউ নেই যে কোথাও ঢুকতে পারব।" সারাটা দেশে আজ একটি

মাত্র শ্লোগান—"কাকে ধরলে হয়।" চাকরি, মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি, ট্যাক্সির পারমিট, রেশনের দোকান, কনট্রাক্টরি, হাসপাতালে ভর্তি সব কিছু আজ আর যোগ্যতা বা অধিকারের উপর নির্ভর করে না, উপযুক্ত তদ্বির চাই। ঈপ্সিত লাভ করিতে হইলে সকলের আগে খোঁজ নিতে হইবে ঘাঁটিদারটিকে, কোথায় তার বাড়ী, মামাবাড়ী বা শ্বশুরবাড়ী, কোন্ গুরুর শিষ্য, কোন্ ক্লাবের সভ্য, কোথায় ব্রিজ বা টেনিস খেলে, জেলখাটা হইলে কার সঙ্গে কত দিন কোন জেলে ছিল ইত্যাদি। এই সূত্র ধরিয়া সুরু হয় তদ্বিরের প্রতিযোগিতা। যে যত ক্ষমতাবান লোকের কাছে এই সূত্র অবলম্বনে পৌঁছিতে পারিবে তাহারই জিত হইবে। এই অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করিয়া তাহার সুযোগ ডাঃ বিধান রায় সব চেয়ে বেশী গ্রহণ করিতেছেন। "কাকে ধরলে হয়" প্রতিযোগিতায় তিনিই সব চেয়ে ক্ষমতাবান। রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে তাঁহার অপ্রতিহত ক্ষমতার বজ্রমুষ্টি সুদৃঢ় হইয়াছে। রাষ্ট্রে তিনি মুখ্যমন্ত্রী, সব কয়টি বড় এবং পয়সার বিভাগ তাঁহার পকেটে, কংগ্রেসে তিনি শেষ ধমকের অধিকারী, শিক্ষাক্ষেত্রেও তিনিই সর্বোচ্চ প্রভু। সমাজে যে পাপ বিধান রায় ঢুকাইয়া চলিয়াছেন তার ফল একটু দেরীতে আসিবে। যখন আসিবে তখন আর পথ খুঁজিয়া মিলিবে না যদি না, আজও আমরা এই সর্বনাশা শ্লোগানে "কাকে ধরলে হয়" বন্ধ করিতে পারি।

—প্রলাপ (মেদিনীপুর)

জনসাধারণ মানিবে কেন ?

"নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন যে কোন ব্যবস্থাপক সভা বা পরিষদের কংগ্রেসী সভ্য কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান যথা জেলা বোর্ড আদির কর্ম্মকর্ত্তা থাকিতে পারিবেন না। তাহা সত্ত্বেও যে অনেকে আছেন তাহা অনেকেই জানেন—হয়ত তাহা কংগ্রেস-সম্পাদকের গোচরে আসে। ফলে তিনি গত মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে আবার এক ফতোয়া জারি করেন যে, তাঁহার সে নির্দ্দেশ এখনও অনেকে মানেন নাই। তাহা সত্ত্বেও রাজ্য কংগ্রেসগুলি কিছুই করেন নাই। তাহার এই নির্দ্দেশ যেন এখনই মানা হয় বা না মানা হইলে কেন তাহা মানা হইতেছে না তাহা যেন জানান হয়। এই ফতোয়ার পরেও তা কৈ কোন পরিবর্ত্তন আমরা দেখিতে পাই নাই? কারণ দর্শানো হইয়াছে কিনা তাহা জানা যায় নাই অবশ্য। ফতোয়া প্রয়োগকারীদের প্রয়োগ ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে কি? কংগ্রেসী হুমকী যখন কংগ্রেস সভ্য বা কর্ণধারগণরাই মানে না তখন জনসাধারণ মানিবে কেন?"

—বীরভূম বার্ত্তা।

চেয়ে দেখ

"চেয়ে দেখ আজকের সমাজের দিকে। মুষ্টিমেয় মালিক দাঁড়িয়ে রয়েছে সম্পদের পাহাড়ের উপর, আর তার নীচে অগণিত মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছে অভাবের দরিয়ায়। কিন্তু উপরের ঐ ঐশ্বর্যের পাহাড় তো গড়ে উঠেছে নীচেকেই দরিয়া কোরে। যদি একটা

শুকনো পুকুর দেখিয়ে কেউ আমায় প্রশ্ন করে পুকুরটার অত জল গেল কোথা তা হোলে সংগে সংগে উপর দিকে আঙুল দেখিয়ে আমি বলবো সূর্য্যের শোষণের ফলেই সব জল উবে গেছে। ঠিক এই ভাবেই যদি কেউ প্রশ্ন করে যুগ যুগ ধোরে কোটি কোটি মানুষ যে বিরাট উৎপাদন করেছে তা যাচ্ছে কোথায়? সে প্রশ্নের উত্তরেও আমি এই ভাবেই আঙুল দেখিয়ে বলবো ঐ উৎপন্ন ঐশ্বর্য্যের অধিকাংশই জমা হোয়ে আছে ঐ মালিকদের ঘরে, তাদের গুদামে, তাদের ব্যাঙ্কে। কিন্তু ও ঐশ্বর্য তো ওদের নয়। কোটি কোটি চাষী মজুর শিল্পী বৈজ্ঞানিক যুগ যুগ ধোরে যে ঐশ্বর্য গড়েছে, মালিকদের অবৈধ অধিকার থেকে তা বার কোরে আনো, এখনই অভাব দূর হোয়ে যাবে।"—সাধারণতন্ত্রী (শিবপুর, হাওড়া)।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী

"গত ১১৫১ সালে পশ্চিম বঙ্গের বৃহত্তম মিউনিসিপ্যালিটী হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীতে কংগ্রেস-বিরোধী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এই নির্ব্বাচনের ফলাফল প্রকাশ পাওয়ার পর দেশ-বিদেশে এক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কংগ্রেস-বিরোধী ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ ব্লক এই মিউনিসিপ্যালিটী পরিচালনা করেন কংগ্রেস সরকার তাহা সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। বিধান-সভার বর্ত্তমান অধিবেশনে মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিল পাশ করিয়া নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা খর্ব্ব করার এক অপচেষ্টা হয়। কিন্তু আসন্ন রাজ্য পরিষদের নির্ব্বাচনের কথা ভাবিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার পিছাইয়া যান। কিন্তু আকস্মিক ভাবে পশ্চিম বঙ্গ সরকার-হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী বাতিল করিয়া দিয়াছেন। দল হারিয়া গিয়াছে অতএব দলের সরকারের আওতায় তাহা থাকিবে, ইহাই বোধ হয় কংগ্রেসের নীতি।" —নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)।

হিন্দু যে হিন্দু

"হিন্দু যে হিন্দু-সংগঠন, হিন্দু ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন কামনা করেন সে লক্ষণ দিন দিন অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইতেছে। দিকে দিকে নূতন দেবালয় ও ধর্ম্মস্থান গড়িয়া উঠিতেছে। সমষ্টিগত ধর্ম্মালোচনার স্পৃহা প্রবল হইতেছে। এখনও এক শ্রেণীর লোকের মনে ভীতি রহিয়াছে, হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে এখনও কেহ কেহ ভীত হইতেছেন। স্বাধীন জাতির এরূপ ভয় শোভা পায় না। বেদ বলিয়াছেন, "অভী": স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "তোমরা হিন্দু বলিতে লজ্জা পাও কেন? জগতের যাহা কিছু সুন্দর তাহা আমি এই হিন্দুর মধ্যে দেখিতে পাই।" যাঁহারা পররাষ্ট্রের দালাল, যাঁহারা পিতৃপুরুষের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন, ও হিন্দু সমাজ ভাঙ্গিয়া দিতে বদ্ধপরিকর, তাঁহাদের প্রভাব দূর করিয়া হিন্দু সংগঠনের কার্য্যে অগ্রসর হওয়াই এই অধিবেশনের প্রধান উদ্দেশ্য।" —বীরভূম-বাণী।

ধুবড়ীর মেইল পরিবহন

"আজ বেশ কিছুদিন হইল ধুবড়ীর মেইল পরিবহন সমস্যা জনসাধারণের নিকট বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। খামের দাম বর্দ্ধিত করিয়া দুই আনায় পরিণত করা হয়, তখন কেন্দ্রীয় সরকার আশ্বাস দিয়াছিলেন, অতঃপর সম্ভবপর সমস্ত ক্ষেত্রে চিঠিপত্র বাহিত হইবে প্লেন দ্বারা, এবং ইহার ফলে দেশবাসীর পক্ষে সংবাদ আদান-প্রদান হইবে ত্বরান্বিত। এই আশ্বাসের পর কথা অনুযায়ী কাজ চলিতেছিল। কলিকাতাগামী ডাক রূপসী হইতে প্লেনযোগে বাহিত হইত, কিন্তু জেলাবাসী দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে কিছু কাল হইতে কলিকাতায় ডাকপ্লেন-বাহিত না হইয়া ধুবড়ী হইতে ট্রেণে যাইতেছে গৌহাটী পর্য্যন্ত, এবং সেখান হইতে যাইতেছে প্লেনে। ফলে চিঠি-যাতায়াতে একদিন করিয়া দেরী হইতেছে। এদিকে দৈনিক সংবাদপত্রাদি যথাপূর্ব্ব প্লেন-বাহিত হইয়া যাতায়াত করিতেছে। আশা করি, পোষ্টাল কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।"

—বাতায়ন (ধুবড়ী)।

কংগ্রেস কি কমলের মা?

"কংগ্রেসকে 'কমলের মা' বলিয়া বারম্বার তুলনা করিয়া থাকি। ইহা আমাদের অনর্থক অসূয়া নহে। এক শ্রেণীর লোক যেমন দুর্গন্ধযুক্ত পচা মাছ খাইতে ভালবাসে, নাড়িভুঁড়ির চাট্ যেমন রসনা পরিতৃপ্ত করে, কংগ্রেস মানসিকতা তেমনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া জঘন্য চরিত্রের লোকদের মনোনয়ন-পত্র দেয়। রাজনৈতিক ব্যাপারে যাহারা দেশদ্রোহ করিয়াছে, তাদের জেলার মত এ হাত ও হাত ফিরিয়াছে, কংগ্রেস তাহাদেরই কপালে জোড়া বলদের জয়পত্র আঁটিয়া দেয়। এই সম্পর্কে আমাদের মানহানির দায়ে অভিযুক্ত করিলে দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিয়া মনের উষ্মা লাঘব করিতে পারি।"

—আর্য্য (বর্দ্ধমান)।

নন্দনের সপ্তাহব্যাপী উৎসব

ছেলে-মেয়ে, শিশু ও কিশোরদের জন্যে মধ্য-কলিকাতায় এক বিরাট আয়োজন হচ্ছে। 'নন্দন' হচ্ছে শিশু ও কিশোরদের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের পুরোধা ইন্দিরা দেবী। তাঁরই প্রেরণায় ও উৎসাহে বহু কর্মী মিলে আয়োজন করেছে এক মস্ত সম্মেলন ও প্রদর্শনীর, আগামী ৩১শে মে থেকে ৫ই জুন সেন্টপলস্ মি, এম, এস স্কুলে রোজ বিকেল ৫টা থেকে সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত।

শোক-সংবাদ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ডাঃ জে, সি, সিংহ গত ১০ই মে সোমবার এক আকস্মিক মোটর দুর্ঘটনায় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। আমরা ডাঃ সিংহের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কৃষ্ণ ও কুন্তী

— শ্রীইন্দু গুপ্ত অঙ্কিত

প্রথম খণ্ড]

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

[দ্বিতীয় সংখ্যা
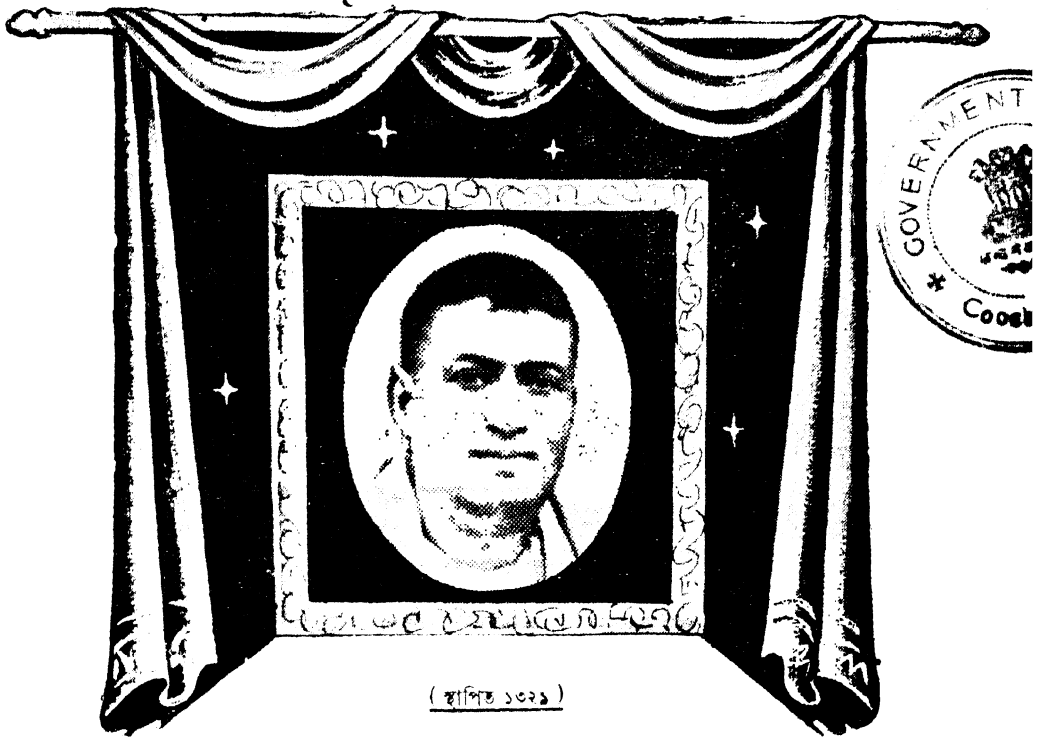
(স্থাপিত ১৩২১)

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০]

[৩৩শ বর্ষ

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। অগ্নিতত্ত্ব সব জায়গায় আছে, তবে কাঠে বেশী। ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজো মানুষে খুঁজবে। তিনিই সব হয়েছেন, তবে মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ হন। যে মানুষ দেখবে ঊর্জিতা ভক্তি-প্রেমভক্তি উথলে পড়ছে, ঈশ্বরের জন্য পাগল, তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা, সেই মানুষে নিশ্চিত জেনো তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। সংসারী লোক দেখলেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতাম।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। কেউ কেউ আমায় জিজ্ঞাসা করে—মশাই আমাদের কি কোন উপায় নাই? আমি বলি, উপায় থাকবে না কেন? তাঁর শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, যাতে অনুকূল হাওয়া বয় যাতে শুভ যোগ ঘটে। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। পঞ্চবটীতে তুলসীকানন করেছিলাম, জপ ধ্যান কোরবো বলে। বাঁকারির বেড়া দেবার জন্য বড় ইচ্ছা হলো। তার পরেই দেখি, জোয়ারে কতকগুলি বাঁকারির আঁটি, খানিকটা দড়ি, ঠিক পঞ্চবটীর সামনে এসে পড়েছে। ঠাকুরবাড়ীর একজন ভারী ছিল। সে নাচতে নাচতে এসে খবর দিলে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। সকলেরই যে বেশী তপস্যা কত্তে হয় তা নয়। আমায় কিন্তু বড় কত্তে হয়েছিল। মাটির ঢিপি মাথায় দিয়ে পড়ে থাকতাম—কাঁদতাম। আমি মা মা বলে এমন কাঁদতাম যে লোক দাঁড়িয়ে যেত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। আমি তিন ত্যাগ করেছিলাম—জমিন, জরু, টাকা। রঘুবীরের নামের জমিও দেশে রেজেষ্ট্রি করতে গিছলাম। আমায় সই করতে বললে। আমি সই করলুম না। আমার জমি বলে তো বোধ নাই। আম এনে দিলে,—তা বাড়ী নিয়ে যাবার যো নাই। সন্ন্যাসীর সঞ্চয় করতে নাই।

ডাঃ ডব্লিউ, এইচ, কেরী

[কত কত যুগ আগে থেকে কলেরা বা ওলাউঠা রোগে বাঙলার গ্রামবাসী ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে তারই সপ্রমাণ ইতিহাস এই রচনাটি। বর্ত্তমানে কলেরা গ্রাম থেকে শহরেও তার হিমহস্ত প্রসারিত করেছে, সুতরাং শহরবাসী পাঠক-পাঠিকাও এ লেখায় অনেক অজানা ঘটনার সন্ধান পাবেন।]

ভারতের বিভিন্ন অংশে আক্ষেপিক কলেরা পূর্ব্বে কবে কবে দেখা দেয়, তার সম্বন্ধে নানা রকমের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। এ সব বিবরণের কোন্‌টা ঠিক, তা নির্ণয় করা শক্ত। কারণ, সাধারণ কলেরা বা মাঝে মাঝে এখানে ওখানে দেখা দেয় এমন কলেরা, কোন কোন ক্ষেত্রে এমন দুষ্ট হয়ে ওঠে যে তার লক্ষণ দেখে তা অন্য রকমের কলেরার সঙ্গে পৃথক্ করা কঠিন হয়ে পড়ে। হয়ত রোগটা কলেরাই নয়, অন্য রোগ। কলকাতায় এক সংবাদপত্রে একজন লেখক এ কথা অনুমোদন করেছেন যে, যশোরে এই ব্যাধির যখন প্রাদুর্ভাব হয় তার এক বছর আগে 'কুরারিয়া' জাতের মধ্যে মহামারী জাতের কলেরা তিনি প্রত্যক্ষ করেন। বেঙ্গল মেডিক্যাল রিপোর্টসে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ১৮১৭ সালের মে মাসে নদীয়া ও ময়মনসিংহ জেলায় কলেরা মহামারী প্রথম দেখা দেয়, জুন মাসে এ অঞ্চলে কলেরার বিক্রম বাড়ে; জুলাই মাসে দূরবর্ত্তী ঢাকা জিলায় গিয়ে পৌঁছে।

১৮১৭ সালের এপ্রিল বা মে মাসের কাছাকাছি সময়ে যশোরে এই ব্যাধি দেখা দিতে থাকে। যশোর, মুর্শিদাবাদ ও রাজসাহীতে সহসা কলেরার প্রকোপ সুরু হলে চরম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ১৮১৮ সালের এশিয়াটিক জার্ণালে এই মহামারীর যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাতে রোগের কারণ নিম্নলিখিত বলা হয়েছে—পচা মাছ ও নতুন চাল এই দুই অহিতকর খাদ্য আহারের সঙ্গে দারুণ গ্রীষ্মের পরে প্রবল বর্ষা ও অতি পরিবর্ত্তনশীল আবহাওয়ার উত্তাপ, যশোরে স্বচ্ছন্দ বায়ু চলাচলের অভাব এবং স্থানটির চারদিকে পোড়ো জঙ্গল ও চাষ-আবাদ। বাঙ্গালার লোকেরা এই নতুন রোগের অর্থসূচক নাম দিয়েছে "ওলাউঠা"।

কলকাতা ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে কলেরার প্রকোপ যখন কতকটা কমে আসে, তখন মহামারী প্রসারিত হয় বিহারে। সেপ্টেম্বর অক্টোবরে দানাপুর, পাটনা এবং উত্তর প্রদেশের অন্য বড় বড় সহরে এর প্রকোপ বাড়তে থাকে। অনেক স্থানে প্রত্যহ প্রায় একশ করে লোক মারা যায়। নভেম্বরে মার্কুইস হেষ্টিংসের বিরাট সৈন্য সিন্ধ (গঙ্গার শাখা) থেকে পূর্ব্বাভিমুখে কুচ করে আসবার পথে মধ্য-ডিভিশন সৈন্য দলে এই ব্যাধি দুর্ভাগ্য ক্রমে প্রবেশ করে। রোগ অত্যন্ত ভীষণ আকার ধারণ করে, নেটিভ ইউরোপীয় বিচার করে না। ১৪ই নভেম্বর ডিভিশনে রোগের আক্রমণ সুরু, প্রায় ১০ দিন ক্যাম্প হাসপাতালে পরিণত। অতর্কিতে ও অস্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হতে থাকে। দশ ভাগের এক ভাগ সৈন্য মারা যায়। প্রত্যহ মৃত ও মুমূর্ষুদের দেহ পথে পথে ছড়িয়ে পড়ে থাকে। যান-বাহন সংগ্রহ অসম্ভব হওয়ায় দেহগুলো অপসারিত করা সম্ভব হয় না। অন্যান্য স্থানের মত এখানেও রোগ কিছুদিন বৃদ্ধি পাবার পর প্রায় দু' হপ্তার মধ্যে কমতে থাকে। সৈন্যদল শুষ্কতর আবহাওয়ার মধ্যে এসে পড়ায় রোগ হ্রাস পায়। রোগ হ্রাসের এই বৈশিষ্ট্য এর পরও দেখা গেছে।

এখানে মন্তব্য করলে মন্দ হবে না যে, রোগের এই প্রাথমিক যুগে এর সংক্রামকতায় সন্দেহও করা হয়েছিল, অস্বীকারও করা হয়েছিল। মধ্য-ডিভিসনের নেটিভ হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জেন মিঃ কোরবিন বেটোয়া-তটস্থিত এরিচ থেকে ২৬শে নভেম্বর, ১৮১৭ তারিখে গবর্ণমেন্টের আদেশে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাতে তিনি বলেন—"আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, রোগ সংক্রামক নয়। রোগীদের শুশ্রূষার জন্য যে সব লোককে আমি নিযুক্ত করেছিলাম তাদের ব্যাধি হয়নি। দিনে-রাতে সব সময় রোগী-ভর্ত্তি হাসপাতালের আবহাওয়ায় প্রশ্বাস গ্রহণ করেও আমার কোন ক্ষতি হয়নি।"

ভারতের মধ্য অঞ্চলের নানা দিকে প্রচার লাভ করবার পর এই রোগ আমাদের পশ্চিম প্রেসিডেন্সীকে বিপন্ন করতে সুরু করে। ১৮১৮ সালের জুন মাসে নাগপুর হয়ে আগষ্টে কলেরা গিয়ে পৌঁছে পুরন্দরপুরে। এখানে জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হলেও কলেরায় মারা যায় ৩ হাজার লোক। সেপ্টেম্বরে কলেরা

পৌঁছে সুরাটে; এমন কি পারস্য উপসাগরের তটবর্ত্তী বেসিনে পর্য্যন্ত। মধ্যভারতে সমান দ্রুত গতিতে এর প্রসার হতে থাকে। একই মাসে এর বিস্তার হয় রাজপুতানায়। এখানে ভয়ঙ্কর ভাবে জনক্ষয় হয়। একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, এখানে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের অধিকাংশ জায়গায় রোগের প্রথম আবির্ভাব কালে কদাচিৎ য়ুরোপীয়রা আক্রান্ত হয়।

আগষ্টে এই ভীষণ মহামারী মাদ্রাজ অঞ্চলে বাড়াবাড়ি সুরু করে দেয়। এলোরা, রাজমহেন্দ্রী ও অন্যান্য স্থানে যথেষ্ট প্রকোপ হলেও উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্বদিকে নিজামরাজ্যকে কিন্তু এ রোগ কিছু মাত্র স্পর্শ করেনি।

১৮১৭, আগষ্ট মাসে রোগের আবির্ভাব কাল থেকে ১৮১৮, জুনে মাদ্রাজ বা বোম্বাই পৌঁছবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাত্র কোম্পানীর এলাকাতেই দেড় লক্ষ নর-নারী কলেরার কবলে পড়ে। মৃত্যু ভয়ে পলায়নের ফলে গ্রামগুলো জনশূন্য হয়ে যায়। মসিয়ে Morcau de Jonnes হিসাব করে বলেছিলেন যে (অবশ্য কোন্ তথ্যের উপর নির্ভর করে বলতে পারি না) হিন্দুস্থানে জন-সংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ লোক কলেরা মহামারীতে আক্রান্ত হয়, আর এই সংখ্যার ৬ ভাগের এক ভাগ লোক মারা যায়।

নবেম্বরে কলেরা মাদ্রাজ ত্যাগ করে (মাদ্রাজে আক্রমণ সুরু অক্টোবরে) ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরী ও কোর মণ্ডল উপকূলের অন্যান্য স্থান আক্রমণ করে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন এসিয়াবাসীরা মনে করে যে কলেরা হ'ল একটা দৈত্য-দানা, সে ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিচরণ করে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে জাভা থেকে পারস্য পর্য্যন্ত, এমন কি চীনেও গ্রামবাসীরাও ডঙ্কা বাজিয়ে কোলাহল করে এই রোগদৈত্য বিতাড়িত করবার চেষ্টা করে থাকে। কলেরার গতির বৈশিষ্ট্য দেখে এই কুসংস্কার এড়ান কঠিন।

পরের বছর (১৮১৯) কলেরার আবির্ভাব ক্ষেত্রের প্রসার হতে দেখে প্রমাণিত হল যে, আবহাওয়া ও তাপের বশবর্ত্তী এ রোগ নয়। কলেরা জানুয়ারীতে পৌঁছল গিয়ে সিংহলে, জুনে পৌঁছল নেপালে, নেপাল থেকে হিমালয় লঙ্ঘন করে প্রবেশ করল তিব্বতে ও তাতার দেশে। বরফ ও লঘু আবহাওয়াকেও কলেরা তুচ্ছ করল। তিব্বত উপত্যকা মনে হ'ল রোগের দুষ্টপ্রভাব বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

এ বছরের শেষ ভাগে গাঙ্গেয় উপদ্বীপ থেকে কলেরা বাইরে চলে গেল। আরাকান, মালাক্কা ও পেনাং শ্মশান করে ফেলল। মলাক্কা ও পেনাংএ লোক মরল অনেক। পেনাংএর জনসংখ্যা নগণ্য হলেও ২৩শে অক্টোবর থেকে থেকে ১৪ই নভেম্বরের মধ্যে এখানে ৮ শতের অধিক লোকের মৃত্যু হয়। যারা মরল তারা প্রধানতঃ চুলিয়া বা কোরমণ্ডল উপকূলের অধিবাসী।

কলেরার সংক্রামকতা সম্বন্ধে যে মত প্রচলিত, সে দিক দিয়ে বিচার করলে মরিশাস দ্বীপে রোগের গতি-প্রকৃতি কিছু গুরুত্বপূর্ণ। ১৮১৯ নভেম্বরে মরিশাসে ব্যাপক কলেরা মহামারী দেখা দেয়। অনুমান করা হয় যে সিংহল থেকে 'ট্রৌপেজ ফ্রিগেট' জাহাজ এই রোগ নিয়ে অক্টোবর মাসে মরিশাসে পৌঁছে।

১৮২০ সালে রোগের প্রতাপ ভয়ঙ্কর ভাবে বিস্তার লাভ করে। সমগ্র ইন্দোচীন দেশগুলোতে এই রোগ প্রসারিত হয়। রোগ প্রকাশে সমগ্র দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়। মহামারীর পর দুর্দ্দশা ও অনাহার! মাত্র ব্যাঙ্কক সহরে কম পক্ষে ৪০ হাজার লোক মারা যায়। কোচিন চীন ও টংকিনের সর্ব্বনাশ কম নয়। নভেম্বরে ম্যানিলাতেও কলেরার ভীষণ প্রকোপ হয়। এই সময় কলেরায় সর্ব্বপ্রথম চীন আক্রমণ করে। সেখানে আমাদের প্রবেশের প্রয়োজন নাই।

কলিকাতায় তথা সমগ্র ভারতে এই ব্যাধি এখন ভীতিপ্রদ হয়ে পড়েছে। সাধারণ লোকের ধারণা যে প্রথমে এ রোগ মার্কুইস অব হেষ্টিংসের সৈন্য দলে ও ১৮১৭ সালে নদীয়া জিলায় দেখা দেয়। কিন্তু পুরাতন লেখকদের লেখা থেকে আমরা পাই যে endemic না হলেও, অনেক পূর্ব্ব থেকেই কলকাতায় যে আকারে এই ব্যাধি দেখা দেয় প্রায় একই প্রকারের ব্যাধি মহামারীরূপে দেখা দিয়ে এসেছে আগে থেকে। লিণ্ড উল্লেখ করেছেন যে ১৭৬২ সালের সর্ব্বব্যাপক ব্যাধিতে "বাঙ্গালা প্রদেশের ৩০ হাজার কালা আদমি ও ৮০০ য়ুরোপীয় মারা যায়।" মন্তব্য করা হয় যে রোগ আক্রমণ করলে—"নিত্য সাদা, আঠা-আঠা, জলবৎ স্বচ্ছ ভেদ, সঙ্গে অবিরাম উদরাময় হয়। ইহা অত্যন্ত মারাত্মক লক্ষণ বলিয়া গণ্য।" কলেরার তখনকার নাম ছিল "Morle de Chien". "অতিপ্রায়শঃ এই ব্যাধি আক্রমণ করে এবং প্রায়শঃ মারাত্মক হয়।" রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল বমনকারক নিদ্রাকারক Harts horn ও জল। কয়েক ঘণ্টায় রোগী মারা যেত।

১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে টমাস ডেলোন "The Indian Mordochi" নামে এক ব্যাধির কথা লিখেন। এই ব্যাধিতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। রোগ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বমন ও উদরাময় দেখা যায়। গোড়ালীর কাছে কব্জীর উপর পায়ে লোহা পুড়িয়ে লাল করে প্রয়োগ করা এবং গোলমরিচ সহ কাঁজি সেবন করা এই চিকিৎসা ফলপ্রদ বলিয়া গণ্য হত।"

মার্কুইস অব হেষ্টিংসের সৈন্য দলে যখন মহামারীরূপে কলেরা আক্রমণ করে, তখন য়ুরোপীয়দের রোগের সঙ্গে আক্ষেপ বা খিল ধরা ও প্রবল পিপাসা দেখা দেয়। কিন্তু ডাক্তাররা এক ফোঁটা জল পান করতে দিতেন না, "কোন কোন রোগী চুরি করে জল খেয়ে শীগ্‌গির সেরে উঠেছিল।" ব্র্যাণ্ডী ও লডেনাম ছাড়া আর একটা চিকিৎসা ছিল। রোগীকে গরমজলে বসিয়ে রাখা হত এবং গরম জলে থাকবার সময় হাত থেকে রক্ত মোক্ষণ করা হ'ত।

সাধারণের কিন্তু ধারণা এই যে, ১৮১৭ সালে কলেরা সরবাস প্রথম দেখা দেয় যশোর জিলায়; কিন্তু ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ভেলোরে সৈন্য দলের মধ্যে এর আক্রমণের কথাও শুনতে পাই। বিভিন্ন রচনা থেকে যে সব অংশ আমরা উপরে উদ্ধার করলাম, তা থেকে মনে হয় যে এর বহুকাল পূর্ব্ব থেকেই কলেরার কথা জানা ছিল, তবে অন্য নামে।

অনুবাদক—শ্রীতারানাথ রায়

পূর্ব্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলন

মনোজ বসু

পাঁচ দিনব্যাপী (২৩শে থেকে ২৭শে এপ্রিল) বিরাট সাহিত্যোৎসব হয়ে গেল ঢাকা শহরে। সকাল দুপুর ও রাত্রি রোজ তিনটে করে অধিবেশন। রাতের অধিবেশন শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক—নাচ গান আবৃত্তি অভিনয় ইত্যাদি। রসধারার প্লাবন বয়ে যেত প্রতি রাত্রে—অত বড় কার্জন-হলের উপরে-নিচে তিলধারণের জায়গা থাকত না। শেষ দিন কবিগান হল—হলের ভিতর নয়, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। দু'টো পূর্ণ নাটক অভিনীত হয়—দুঃখীর ইমান ও কাফের। ছেলেমেয়েরা একত্র অভিনয় করেন। তা ছাড়া কয়েকটা নাটিকা—একটা হল বনফুলের 'কবর'; য়ুনিভার্সিটির একটি মেয়ে চন্দ্রমুখীর ভূমিকায় ভারি সুন্দর অভিনয় করলেন। আর একটা 'বিভাব'—এখানে বহুরূপীর শম্ভু মিত্র যা করে থাকেন। মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গ অভিনীত হল—যেমন সাজ-সজ্জা, তেমনি বাচন-মাধুর্য। ছায়া-নাটিকা করলেন চট্টগ্রামের পাক লোকশিল্পী পরিষদ—ভাষা আন্দোলনের মর্মান্তিক দৃশ্য-গুলো ছায়াছবিতে রূপায়িত হয়েছে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসর, নজরুল সঙ্গীতের আসর। এক দিন হল—'বাংলা ভাষার গান'। এই আসরটা অভিনব; বাংলা ভাষার মহিমা, ভাষা আন্দোলন, আন্দোলনে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের নিয়ে চলল গানের পর গান। 'একুশে ফেব্রুয়ারি—ভুলবো না, ভুলবো না, ভুলতে কি পারি?…' শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে; ঐ মহিমময় দিনে 'বাংলা চাই' বলতে বলতে যাঁরা শেষ নিশ্বাস ফেললেন, তাঁদের রক্তাক্ত ছবি চোখের উপর ভেসে ওঠে। লোক-নৃত্য ও লোক-সঙ্গীতের আসর বসেছিল; এ ছাড়া গীতি-নক্সা ইত্যাদিও ছিল। ঢাকা ও চট্টগ্রামের নানা প্রতিষ্ঠান, সম্ভ্রান্ত মহিলা ও ভদ্রবৃন্দ এবং অনেক ছাত্রছাত্রী এই সব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

সকাল ও দুপুরের অধিবেশনগুলোয় সাহিত্যের নানা দিক দিয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা। কর্মসূচি নিম্নলিখিত রূপ—

২৩শে এপ্রিল

প্রথম অধিবেশন: সকাল ৮॥টা থেকে ১১॥টা। উদ্বোধন: ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। উদ্বোধনী সঙ্গীত: আবদুল লতিফ। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি স্মৃতি-তর্পণ। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ: অধ্যক্ষ আবদুর রহমান খাঁ। সম্মেলনের আবেদন-পত্র পাঠ। অভ্যর্থনা সমিতির যুগ্ম সম্পাদকের রিপোর্ট: আবদুল গনি হাজারী। মূল সভাপতির অভিভাষণ: ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, অনুসন্ধানবিশারদ। চিত্র-প্রদর্শনী, পুস্তক-প্রদর্শনী ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন। দ্বিতীয় অধিবেশন: অপরাহ্ণ ৩টা থেকে ৫টা। ১। কথাসাহিত্য-শাখার সভাপতির ভাষণ: অধ্যাপক আবুল ফজল। প্রবন্ধ পাঠ: (ক) উপন্যাস ও ছোট গল্প: শওকত ওসমান। (খ) নাট্য-সাহিত্য: মুনীর চৌধুরী। (গ) রম্য রচনা: ডাঃ মোহাম্মদ হোসেন। ২। কাব্য-সাহিত্য-শাখার সভাপতির ভাষণ: আবদুল কাদির। প্রবন্ধ পাঠ: (ক) কবির কথা: জসীমউদ্দীন। (খ) আধুনিক কবিতা: আহসান হাবীব। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান: সন্ধ্যা ৭॥টা। সভাপতি: সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক।

ডক্টর শহীদুল্লা সম্মেলনের উদ্বোধন ভাষণ দিচ্ছেন

শকুন্তলা নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য: শকুন্তলা—ছবি হুদা
পরিচালিকা—লায়লা সামাদ

২৪শে এপ্রিল

প্রথম অধিবেশন : সকাল ৮॥টা থেকে ১১॥টা। ১। লোক-সাহিত্য-শাখার সভাপতির ভাষণ : রমেশ শীল। প্রবন্ধ পাঠ : (ক) কাব্য ও গাথা : অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন। (খ) পুঁথি-সাহিত্য : অধ্যাপক আহমদ শরীফ। (গ) লোক-সংগীত : আব্বাস উদ্দীন আহমদ। (ঘ) লোক-সাহিত্য ও ঐতিহ্য : আলাউদ্দিন আল আজাদ। ২। শিশু সাহিত্য-শাখার সভাপতির ভাষণ : বন্দে আলী মিয়া। প্রবন্ধ পাঠ : (ক) গল্প রচনা : হাবীবুর রহমান। (খ) শিশু কাব্য : হোসনে আরা। দ্বিতীয় অধিবেশন : অপরাহ্ণ ৩টা থেকে ৫টা। মনন-সাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ : আবুল কালাম শামসুদ্দীন। প্রবন্ধ পাঠ : (ক) প্রবন্ধ সাহিত্য : অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। (খ) সমালোচনা সাহিত্য : অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান। (গ) সংবাদ-সাহিত্য : মুজিবর রহমান খাঁ। (ঘ) সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান : অধ্যাপক নাজমুল করীম। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সন্ধ্যা ৭॥টা। সভাপতি : মোহাম্মদ বরকতুল্লা।

২৫শে এপ্রিল

প্রথম অধিবেশন : সকাল ৮॥টা থেকে ১২॥টা। ১। ভাষা ও সাহিত্য-শাখার সভাপতির ভাষণ : অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই। প্রবন্ধ পাঠ : (ক) সাহিত্যের ইতিহাস : অধ্যাপক কাজী দীন মুহম্মদ। (খ) রাষ্ট্র ও ভাষা : আবু জাফর শামসুদ্দীন। (গ) পূর্ব-পাকিস্তানে উর্দু সাহিত্য : অধ্যাপক হানিফ ফউক। ২। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির ভাষণ : ডাঃ মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা। প্রবন্ধ পাঠ : (ক) বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও ধর্ম : ডাঃ শচীন্দ্রমোহন মিত্র। (খ) বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ : অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল জব্বার। (গ) বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা : আবদুল্লাহ আল-মুতী। দ্বিতীয় অধিবেশন : অপরাহ্ণ ৩টা থেকে ৬॥টা। ১। চারু ও কারুশিল্প শাখার সভাপতির ভাষণ : জয়নুল আবেদীন। প্রবন্ধ পাঠ : (ক) চিত্রশিল্প : অধ্যাপক শফিকুল হোসেন। (খ) চারু ও কারুশিল্পের ঐতিহ্য : কামরুল হাসান। (গ) ব্যবহারিক শিল্প : কাজী আবুল কাসেম। (ঘ) রঙ্গমঞ্চ : নাজির আহমদ। (ঙ) সঙ্গীত : আবদুল আহাদ। ২। সমসাময়িক ('৪৩—'৫৩) শিল্প ও সাহিত্য-শাখার সভাপতির ভাষণ : ডাঃ কাজী মোতাহার হোসেন। প্রবন্ধ পাঠ : (ক) কবিতা : শামসুর রাহমান। (খ) ছোটগল্প ও উপন্যাস : আনোয়ার রহমান। (গ) সংগীত : কলিম শরাফী। (ঘ) নাট্য-আন্দোলন : বাহাউদ্দীন চৌধুরী। (ঙ) শিশু-সাহিত্য : ফয়েজ আহমেদ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সন্ধ্যা ৭॥টা। সভানেত্রী : বেগম সুফিয়া কামাল।
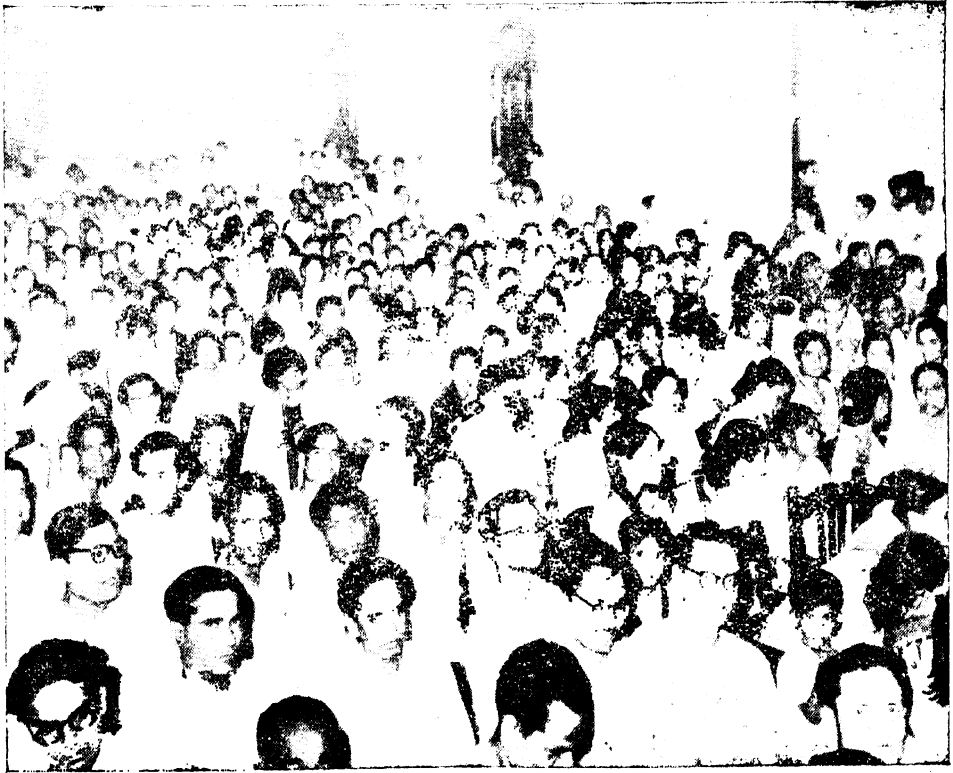
সম্মেলনের দর্শকবৃন্দ

২৬শে এপ্রিল

সকাল ৮॥টা থেকে ১২॥টা। আমাদের সাংস্কৃতিক সমস্যা শাখার সভাপতির ভাষণ : আবুল মনসুর আহমদ। প্রবন্ধ পাঠ : (ক) সাম্প্রতিক সাহিত্যের বাস্তববাদের সমস্যা : মিরাজুল ইসলাম। (খ) সাম্প্রতিক শিল্পের সমস্যা : বিজন চৌধুরী। (গ) পুস্তক প্রকাশনা ও সাময়িক সাহিত্য : মোহাম্মদ কাসেম। (ঘ) সাহিত্য ও মহিলা সমাজ : লায়লা সামাদ। (ঙ) শিল্পী-সাহিত্যিকের উপজীবিকার সমস্যা : আনিসুজ্জামান। বিশেষ প্রবন্ধ : ডাঃ এ. বি. এম. হবীবুল্লা। ২। প্রতিনিধি সম্মেলন : সকাল ১১টা থেকে ১২টা। অপরাহ্ণ ৩টা থেকে ৫টা—রিপোর্ট পাঠ, প্রবন্ধাদি পাঠ ও প্রস্তাব গ্রহণ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সন্ধ্যা ৭॥টা। সভাপতি : অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ।

সাহিত্য-সম্মেলনের অংশরূপে 'চিত্র ও আলোকচিত্র-প্রদর্শনী' এবং 'পুস্তক-প্রদর্শনী' খোলা হয়। জয়নুল আবেদীন, সফিউদ্দীন আহমদ, কামরুল হাসান ও অপর গুণীদের প্রায় এক শ' খানা ছবি নিয়ে চিত্র-প্রদর্শনী। আমানুল হক, সৈয়দ ফজলে হোসেন, শামসুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম প্রভৃতির তোলা পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন জীবন-চিত্র সাজিয়ে অভিনব আলোকচিত্র-প্রদর্শনী। পূর্ব ও পশ্চিম-বাংলায় প্রকাশিত অনেক পত্র-পত্রিকা ও বই নিয়ে পুস্তক-প্রদর্শনী। হাতে-লেখা পুঁথি এবং পুরানো দুষ্প্রাপ্য বইয়েরও কিছু কিছু সংগ্রহ ছিল।

গোড়ায় ঠিক ছিল, অধিবেশন চার দিন চলবে। তাতে কুলিয়ে উঠল না—এক দিন বাড়িয়ে দিতে হল। বক্তৃতার পর বক্তৃতা—বক্তৃতা শুনে আশ মেটে না যেন মানুষের! আমরা পশ্চিম-বঙ্গ থেকে গিয়েছিলাম—শেষ দিনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। বক্তৃতার ভূমিকায় রসিকতা করে বললাম—'কয়েকটা খুন করবার পরে নাকি খুন চেপে যায়! যাকে সামনে পাওয়া যায় তাকেই খুন করতে ইচ্ছে করে। আপনাদেরও হয়েছে প্রায় তাই। চার দিন ধরে বক্তৃতা শুনে শুনে আপনারা এখন মরীয়া। যাকে পাচ্ছেন, তাকেই ধরে মঞ্চে তুলে দিচ্ছেন, লাগাও বক্তৃতা...'

ব্যাপার তাই বটে! এতগুলো বক্তৃতা দিনের পর দিন—সব সময়ে দেখতে পাবেন হল বোঝাই। দূর-দূরান্তর থেকে মেয়েপুরুষ দলে দলে আসছেন বক্তৃতা শুনতে। সাহিত্য-ব্যাপারে এতখানি আগ্রহ ও অনুরাগ কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। পয়লা অধিবেশনটা আমরা ধরতে পারি নি—কাষ্টমসের ছাড় পেতে বড্ড দেরি হল। অধ্যাপক হায়দার চৌধুরী এরোড্রোমে অপেক্ষা করছিলেন। গাড়ি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যখন কার্জন-হলে পৌঁছল, তখন ভলান্টিয়ার এবং কর্মকর্তাদের অল্প কয়েক জন মাত্র আছেন। কিন্তু শোনা গেল সবিস্তারে। যে গান দিয়ে সম্মেলনের শুরু, তার প্রথম লাইন—'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়্যা নিতে চায়—' বেশ বড় গান—নানান রকম সুরের সংমিশ্রণে গাওয়া হয়েছিল। শ্রোতারা আবেগে অধীর হয়ে ছিলেন; চোখ মুছছিলেন সবাই। ফরমাশ করে আমরা গানটা আবার গাওয়ালাম রাত্তের সাংস্কৃতিক আসরে।

প্রাণের বিপুল জোয়ার দেখে এলাম পূর্ব-বাংলায়—ঐ ভাষা-আন্দোলন থেকেই বুঝি তার উৎপত্তি। বিভিন্ন অধিবেশনের মধ্যে কেবলই স্মরণে এসেছে, মাতৃভাষার জন্য যাঁরা আত্মদান করেছেন। আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে বারম্বার ঘোষিত হয়েছে বাংলা ভাষার বিজয়বার্তা। সাহিত্য-সম্মেলন ব্যাপারটাই যেন ভাষা-সংগ্রামের বিজয়োৎসব।

মূল-সভাপতি ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান-বিশারদ। শ্বেতশ্মশ্রু শান্ত সৌম্যদর্শন ব্যক্তি—সাহিত্যকর্মে আকৈশোর নিবেদিতপ্রাণ। তাঁর অভিভাষণেরও ঐ সুর।—

"বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে রক্ষার জন্য আমাদের দেশপ্রেমিক তরুণেরা বুকের রক্ত দিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা গৌরবজনক আর কি হইতে পারে! আমাদের সাহিত্য-সাধনার প্রথম যুগে বাঙ্গালী মুসলমান বাংলাকে এতদূর আপন জ্ঞান করিতে পারে নাই; নানা সংস্কারবশতঃ উর্দু, ফার্সী বা আরবীকেই তাহারা বাংলা অপেক্ষা অধিক মর্য্যাদা দিত। কোন ভাষাকেই আমরা হীন জ্ঞান করি না, সব ভাষাই আমরা শিখিব, কিন্তু মাতৃভাষা আমাদের মুকুটমণি—তাহাকে ফেলিয়া নহে। চারণের বেশে দ্বারে দ্বারে গিয়া প্রথম যুগের সাহিত্যসেবীদেরকে এ কথা বুঝাইতে হইয়াছিল। বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের আজিকার এই আন্তরিক মমত্ববোধ আমাদের শুভ ভবিষ্যতেরই সূচনা করিতেছে। বর্তমানের আলোকে ভবিষ্যৎ যতদূর দেখা যাইতেছে তাহা আমার নিকট অত্যুজ্জ্বল বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

"আমাদের মাতৃভাষার উপর বিভিন্ন দিক হইতে যে সকল আক্রমণ আসিয়াছে, আপনারা তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছেন। ইহাতে আমি বাস্তবিকই গর্ব্বিত।...

"বিগত এক শত বৎসরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যিকদের দানে বাংলা ভাষার আরও সমৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি ঘটিয়াছে। এই সব-কিছুরই আপনারা ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আরও আগাইয়া নিয়া যাওয়ার মহৎ গুরুদায়িত্ব আজ আপনাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। দেশের জাগরণমুখী জনসাধারণ তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিবার জন্য আজ আপনাদের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। দেশের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি যদি আপনাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকে, অতীতের খ্যাত-অখ্যাত সমস্ত সাহিত্য-সাধকের গৌরবে যদি আপনারা নিজদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিতে পারেন এবং দেশের মানুষকে যদি ভালবাসিয়া থাকেন তাহা হইলে ভবিষ্যতের নূতন যুগে আপনাদের সাহিত্য-সাধনার অবিনশ্বর কীর্ত্তিকে কেহই করিতে রোধ পারিবে না।"

আর এক ভাষণে তিনি আবেদন জানালেন, "বঙ্গভূমি নানা কারণে বিভক্ত হয়েছে, কিন্তু আপনারা বাংলা সাহিত্যকে কোন ক্রমে বিভক্ত করবেন না।"

ডক্টর সিদ্দিকীর পাশাপাশি আর এক সাহিত্যতপস্বীকে মনে পড়ে—চট্টগ্রামের আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। কিছু-কাল আগে তাঁর দেহান্ত ঘটেছে। এক দিনের অধিবেশনে সাহিত্যবিশারদের ছোট নাতিটি মূল সভাপতিকে ফুলের মালা, একখানা চিঠি ও কিছু টাকা শিরোপা দিল। চিঠিতে প্রার্থনা ছিল, সাহিত্যবিশারদের অসমাপ্ত কাজ তিনি যেন শেষ করে যান। অশীতিপর সভাপতির চোখে অশ্রু ফুটে উঠল—'কি কঠিন ভার দিলে

তোমরা এই অক্ষম বুড়ো মানুষের উপর। আর কি বয়স আছে আমার, শক্তি আছে?'

ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনও অন্যতম সাহিত্য-নেতা। তার ভাষণেও এই কথা—"বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে রয়েছে ভাষাগত ঐক্য। পুরাতনকে আমরা উপেক্ষা করতে পারব না। আমাদের নব সাধনা রবীন্দ্র-নজরুলের ঐতিহ্যবাহী হবে; আবার নিজস্ব এবং স্বকীয়ত্বকেও আমাদের ভাষায় ও সাহিত্যে পূর্ণভাবে রূপায়িত করব। আমরা ভূঁইফোঁড় কিছু করতে চাইনে···"

জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ আবদুর রহমান খাঁ ছিলেন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি। প্রবীণ ও বিদগ্ধ ব্যক্তি—কিন্তু আলাপে-আচরণে শিশুর মতো সরল। অভিভাষণের মধ্যে ভাষা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন—

"বিংশ শতকের প্রথম ভাগে একবার চেষ্টা হয়েছিল মুসলমানী বাংলা প্রচলনের; কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। আজ আর গ্রামে সে ভাষা নেই; যবান দুরুস্ত হ'য়েছে। এখন যদি কেউ পুঁথির ভাষা ফিরিয়ে আনতে চান, তাঁকে জোর চালাতে হবে; কিন্তু জোর চলে না ভাষার বেলায়। যে ভাষা চলতি আছে তাকেই রাখতে হবে ভিত্তি করে; তার উপরে যদি কিছু আমদানী করতে হয়, তা করতে হবে এমন ভাবে যে বে-মালুম খাপ খেয়ে যায় তার সাথে; তাতে কোন অসুবিধা হবে না, কেউ আপত্তি তুলবে না এর প্রমাণ নজরুলের রচনা।

"এ তো গেল শব্দচয়নের কথা। বিভাগের পরে একটা সমস্যা দাঁড়িয়েছে কি হবে পূর্ব-বাংলার চলতি ভাষা। সব দেশেই বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন চলতি ভাষার প্রচলন আছে। চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, রংপুরের কথাভাষা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিভাগ-পূর্ব-বাংলা দেশে কলকাতা ও তার আশে-পাশের ভাষাই ছিল চলতি ভাষার মান। আমরা কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি। কিন্তু আমার মনে হয় নানা কারণে উভয় দেশের ভাষার মান মোটামুটি একই থাকবে। উভয় দেশের সংযোগস্থল কুষ্টিয়া অঞ্চল। হয়ত এই অঞ্চলের ভাষাই হবে পূর্ববংগের চলতি ভাষা। তাতে পূর্ব-বাংলায় যে সব প্রবাদ-বাক্য বা প্রচার-ভঙ্গী প্রচলিত আছে, আস্তে আস্তে তা স্থান পাবে বই-পুস্তকে-সাহিত্যে।"

ডক্টর শহীদুল্লাহ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তাঁর বক্তৃতা থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করছি—

"১৩৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টে বহু দিনের গোলামীর পর যখন আযাদীর সুপ্রভাত হ'ল, তখন প্রাণে আশা জেগেছিল যে এখন স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে বাংলা সাহিত্য তার সমৃদ্ধির পথ খুঁজে পাবে।···কিন্তু তার পর যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাতে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলুম, স্বাধীনতার নূতন নেশায় আমাদের মতিচ্ছন্ন করে দিয়েছে। আরবী হরফে বাংলা লেখা, বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত আরবী-পারসী শব্দের অবাধ আমদানি, প্রচলিত বাংলা ভাষাকে গঙ্গাতীরের ভাষা ব'লে তার পরিবর্তে পদ্মাতীরের ভাষা প্রচলনের খেয়াল প্রভৃতি বাতুলতা আমাদের এক দল সাহিত্যিককে পেয়ে বসল। তাঁরা এইসব মাতলামিতে এমন মেতে গেলেন, যে প্রকৃত সাহিত্য-সেবা—যাতে দেশের ও দশের মঙ্গল হ'তে পারে, তার পথে আবর্জনাস্তূপ দিয়ে সাহিত্যের উন্নতির পথ কেবল রুদ্ধ ক'রেই খুশিতে ভূষিত হলেন না, বরং খাঁটি সাহিত্যসেবীদিগকে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত ও বিপদগ্রস্ত করতে আদা-জল খেয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। তাতে কতক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা উসকানি দিতে কসুর করলেন না। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গের কবি ও সাহিত্যিকগণের কাব্য ও গ্রন্থ আলোচনা, এমন কি বাঙ্গালী নামটি পর্যন্ত যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ব'লে কেউ কেউ মনে করতে লাগলেন। কেউ বা এতে মিলিত-বঙ্গের ভূতের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আবল-তাবল বকতে শুরু ক'রে দিলেন এবং বেজায় হাত-পা ছুড়তে লাগলেন। করাচীর তাঁবেদার গত লীগ গভর্ণমেণ্ট বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য কিছু করা দূরে থাক, বাঙ্গালী বালকের কচি মাথায় উর্দুর বোঝা চাপিয়ে দিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আরবী হরফে বাংলা ভাষা লেখার এবং উর্দুকে

লেখক প্রদর্শনীর ছবি দেখছেন

'কাফের' নাটকের একটি দৃশ্যে প্রিয় ও জহরৎ আরা
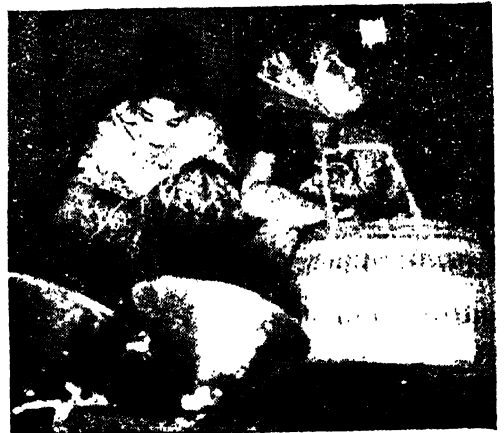
একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অপচেষ্টায় সহযোগিতা করেছেন। এইরূপ বিষাক্ত আবহাওয়ায় ১৯৪৮ সালের পরে আর কোনও সাহিত্য-সম্মেলনের আয়োজন সম্ভবপর হয়নি। আজ জনপ্রিয় পূর্ব-বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এক সর্বদলীয় সাহিত্য-সম্মেলনের আয়োজন করেছি।

"পূর্ববঙ্গবাসীদের উদারতা যে, তারা চার কোটি লোকের ভাষাকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবী না ক'রে বরং উর্দুকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে মানতে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই উদারতায় কৃতজ্ঞ না হয়ে কেউ কেউ এখনো হুঙ্কার দিয়ে বলছেন, যারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করে তারা পাকিস্তানের দুশমন। আজ পূর্ববঙ্গবাসী সমস্বরে বলবে যে এই রকম উর্দু-পুজারীরাই পাকিস্তানের দুশমন। আমরা পাকিস্তানের জানী দোস্ত, তার জন্যে আন্তঃপ্রাদেশিক ঐক্য চাই; সেই ঐক্যের খাতিরে আমরা বাংলার সঙ্গে উর্দুরও দাবী মেনে নিয়েছি। যারা জবরদস্তি ক্রমে সমস্ত পাকিস্তানের ওপর কোন একটি ভাষা চাপিয়ে দিতে চায়, তারাই পাকিস্তানের দুশমন; তারাই পাকিস্তান ধ্বংস করবে।

"সুখের বিষয়, মুসলিম লীগ পার্লিমেণ্টারী পার্টির কিঞ্চিৎ সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে। তাঁরা উর্দু ও বাংলা উভয়কে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। যদিও অন্য কতকগুলি ভাষার বিষয় তাঁরা বিবেচনা করতে স্বীকৃত হয়েছেন, কিন্তু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার আসনে আসীন দেখলেই আমরা চরিতার্থ হব না, যদি না সেই সঙ্গে আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধিকেও না পাই।…

"ভূতপূর্ব লীগ-সরকারের আমলে বাংলা ভাষা ও অক্ষর সম্বন্ধে যে কৃত্রিম সমস্যার সৃষ্টি করা হয়েছিল দুঃখের বিষয় এখনও পর্যন্ত কেউ কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, এই প্রসঙ্গে আমি ১৯৪৮ সালে ঢাকায় সাহিত্য সম্মেলনে যা বলেছিলুম এখানে তা উদ্ধৃত করবার প্রয়োজন মনে করছি—

"মূল আর্য্যভাষার সঙ্গে মিশেছে আদি যুগে কোল, মধ্যযুগে ফারসী ও পারসীর ভিতর দিয়ে কিছু আরবী ও যৎসামান্য তুর্কি, এবং পরবর্তী যুগে পর্তুগীজ আর ইংরেজি। দু-চারটা দ্রাবিড়, মোঙ্গলীয়, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি ভাষার শব্দও বাংলায় আছে। মিশ্র ভাষা বলে আমাদের কিছু লজ্জা নেই। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা চলিত ভাষা ইংরেজির প্রায় দশ আনা শব্দসমষ্টি বিদেশী। পশ্চিম-বাংলার পরিভাষা নির্ম্মাণ সমিতি খাঁটি সংস্কৃত ভাষায় পরিভাষা রচনা করেছেন। পাঠ্য পুস্তকে এইরূপ খাঁটি আর্য্য-ভাষা চলতে পারে, কিন্তু ভাষায় চলে না। আমাদের মনে রাখতে হবে ভাষার ক্ষেত্রে গোঁড়ামি বা ছুঁৎমার্গের কোনও স্থান নেই।

"ঘৃণা ঘৃণাকে জন্ম দেয়। গোঁড়ামি গোঁড়ামিকে জন্ম দেয়। একদল যেমন বাংলাকে সংস্কৃত-ঘেঁষা করতে চেয়েছে, তেমনি আর একদল বাংলাকে আরবী-পারসী-ঘেঁষা করতে উদ্যত হয়েছে। একদল চাচ্ছে খাঁটি বাংলাকে বলি দিতে, আর এক দল চাচ্ছে "জবে" করতে। একদিকে কামারের খাঁড়া, আর একদিকে কসাইয়ের ছুরি।

"নদীর গতিপথ যেমন নির্দ্দেশ করে দেওয়া যায় না, ভাষারও তেমনি। একমাত্র কালই ভাষার গতি নির্দ্দিষ্ট করে। ভাষার রীতি (style) ও গতি কোন নির্দ্দিষ্ট ধরা-বাঁধা নিয়মের অধীন হতে পারে না ফরাসী ভাষায় বলে Le style c'est l'homme—ভাষার রীতি সেটা মানুষ—অর্থাৎ মানুষে মানুষে যেমন তফাৎ, প্রত্যেক লোকের রচনাতেও তেমনি তফাৎ থাকা স্বাভাবিক। এই পার্থক্য নির্ভর করে লেখকের শিক্ষা-দীক্ষা, বংশ এবং পরিবেষ্টনীর উপর। মোট কথা ভাষা হওয়া চাই সহজ, সরল এবং ভাষার রীতি (style) হওয়া চাই স্বতঃস্ফূর্ত্ত, সুন্দর ও মধুর। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত ভাষা ভাব প্রকাশের জন্য, ভাব গোপনের জন্য নয়, আর সাহিত্যের প্রাণ সৌন্দর্য্য, গোঁড়ামি নয়।"

কিছু দিন থেকে বানান ও অক্ষর-সমস্যা দেশে দেখা দিয়েছে। সংস্কারমুক্ত ভাবে এগুলির আলোচনা করা উচিত এবং তার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পরামর্শ-সমিতি গঠন করা আবশ্যক। যাঁরা ধ্বনিতত্ত্বের সংবাদ রাখেন, তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য যে বাংলা বানান অনেকটা অবৈজ্ঞানিক, সুতরাং তার সংস্কার দরকার। কেউ কেউ আরবী হরফে বাংলা লিখতে উপদেশ দিয়েছেন। যদি পূর্ব্ব-বাংলার বাইরে বাংলা দেশ না থাকত আর যদি গোটা বাংলা দেশে মুসলমান ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় না থাকত তবে এই অক্ষরের প্রশ্নটা এত সঙ্গীন হত না। আমাদের বাংলাভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না। আরবী হরফে বাংলা লিখলে বাংলার বিরাট সাহিত্য-ভাণ্ডার থেকে আমাদিগকে বঞ্চিত হতে হবে। অধিকন্তু আরবীতে এতগুলি নূতন অক্ষর ও স্বরচিহ্ন যোগ করতে হবে যে বাংলার বাইরে তা কেউ অনায়াসে পড়তে পারবে না।

বিদেশীর জন্য অক্ষর-জ্ঞানের পূর্ব্বে ভাষাজ্ঞান—এমন অদ্ভুত কল্পনা এ বৈজ্ঞানিক যুগে খাটে না। অক্ষর সম্বন্ধে বিবেচনা করতে হলে ছাপাখানা, টাইপ-রাইটার, শর্টহ্যাণ্ড এবং টেলিগ্রাফের সুবিধা অসুবিধার কথা মনে রাখতে হবে। বিশেষ করে বাংলাকে যখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা হচ্ছে, তখন বাংলা ভাষার রাজনৈতিক সম্ভাবনা ও উপযোগিতার কথা চিন্তা করারও প্রয়োজন রয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিস্তারের জন্য Basic English এর মত এক সোজা বাংলার বিষয় আমাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যদি ৮৫০টি ইংরেজি কথায় সমস্ত প্রয়োজনীয় ভাব প্রকাশ করতে পারা যায়, তবে বাংলায় তা কেন সম্ভব নয়?

পূর্ব্ব-বাংলার জনসংখ্যা গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল, আরব, পারস্য, তুর্কি প্রভৃতি দেশের চেয়ে বেশী। এই সোনার বাংলাকে কেবল জনে নয়, ধনে ধান্যে, জ্ঞানে গুণে, শিল্প-বিজ্ঞানে পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশের সমকক্ষ হতে হবে। তাই কেবল কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিভাগে বাংলাকে উচ্চ আসন নিতে ও দিতে হবে। তার জন্য শিক্ষার মাধ্যম স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আগাগোড়া বাংলা করতে হবে।

আমি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি 'সুরনামার' লেখক নোয়াখালির

ভাষা-আন্দোলনের প্রথম শহীদ, আবু বরকত

সন্দ্বীপ নিবাসী আবদুল হাকিমের একটি কথা আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোককে শুনিয়ে রাখছি :

"যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সবার কিবা রীতি নির্ণয় না জানি॥
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেতে বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগি কেন বিদেশে না যায়॥"

বিস্তর প্রবন্ধ-পাঠ ও বক্তৃতা হল—অধিকাংশই সাহিত্য পদবাচ্য। সঙ্কীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতার নামগন্ধ কোথাও নেই। ভাষা অতিস্বচ্ছ ও স্বতস্ফূর্ত। তাই আমরা বলেছিলাম, ভাষার মধ্যে আরবী-ফারসী অধিক ঢোকানো হবে কিম্বা সংস্কৃত—এর জবাব সাহিত্যশিল্পীরাই দিচ্ছেন। লেখনীর বদলে যাঁরা ডাণ্ডা নিয়ে স্বস্বাস্থির বিচারে নামেন, বিরোধটা তাঁদেরই মধ্যে। সাহিত্যিকের কলমে যে ভাষা বেরুচ্ছে—দুই বাংলার মধ্যে তার কিছুমাত্র তফাৎ নেই।

এই সম্পর্কে একটু ক্ষোভের কথা বলে নিই। আমরা ভারতীয় পাঠক ও-প্রান্তের সেরা লিখিয়েদের সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহশীল—এমন তো মনে হয় না। বাঙালী লেখক-পাঠক অনুদার নন—তা পূর্ব-পশ্চিম যে বাংলার মানুষ হোন না কেন। গলদ হল, পূর্ব-বাংলার ভাল ভাল লেখা পশ্চিম-বাংলার রসিক সমাজে যথোচিত ভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে না। সাহিত্য-বাসরের মধ্যে বারম্বার মনে হয়েছে—এমন সব উপাদেয় সাহিত্যভোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছি আমরা পশ্চিম-বাংলার লোক। উভয় বাংলার গুণী-জ্ঞানীরা ভেবে দেখুন, প্রতিবিধান কি করা যায়।

মেডিকেল কলেজ-ছাত্রাবাসে ঢুকেই বাঁ-দিকে একটুখানি বেড়া দেওয়া জায়গা। বাংলা ভাষার দাবিতে প্রাণ দিয়ে দিয়েছেন, তাঁদেরই কয়েক জনের রক্তে পুণ্যময় এই ভূমি। রক্ত চিহ্ন মাটির উপর আর নেই—আছে পূর্ব-বাংলার ছেলেমেয়ের মনে মনে। ছাত্রাবাসের দেয়ালে বুলেটের চিহ্ন রয়েছে এখনো। ছেলেরা সেই সময় রাতারাতি এক শহীদ-স্তম্ভ গেঁথেছিল। পর দিন মিলিটারি এসে ভেঙে দিয়ে যায়। জায়গাটুকু ঘিরে রেখেছে—এবারে দিনের উজ্জ্বল আলোয় স্তম্ভ গেঁথে তুলবে সেখানে। রক্তদান সার্থক হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখটায় সেই ছেলেদের কবরভূমিতে, শুনতে পেলাম, শেষ-রাত থেকে মেলা জমে যায়; অগণিত নরনারী এসে ফুল আর অশ্রু নিবেদন করে।

আমাদের দলের হয়ে রাধারাণী দেবী বাষ্পাচ্ছন্ন মাতৃকণ্ঠে মোনাজাত করে শহীদ-স্থানে ফুল দিলেন। আদর্শের জন্য যে সন্তানেরা জীবন দিয়েছে, যাদের গৌরবে পরিপূর্ণ মায়ের বুক। তাঁর কথা শুনতে শুনতে সবাই আমরা চোখ মুছেছি।

কত যে সমাদর পেলাম, ভাবতে গিয়ে অবাক হচ্ছি। অভিভূত হয়ে যেতে হয়। ভারী ভারী বিশেষণগুলো কানের মধ্য দিয়ে ঢুকত, আর মাথা নুয়ে আসত নিজেদের অকর্মণ্যতার লজ্জায়। ঢাকায় আট-দশটা সম্বর্ধনা—শেষে ঢাকার বাইরে নারায়ণগঞ্জওয়ালারা এসে হানা দিলেন। সে কি করে হবে—ভিসা আছে ঢাকা শহরটুকুর জন্য—বাইরে পা বাড়িয়ে ফ্যাসাদে পড়ব যে! কিছুতে শুনলেন না তাঁরা। পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পাশপোর্ট-অফিসার, জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট—এবং প্রধানমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক অবধি ধাওয়া করে অনুমতি আদায় করে আনলেন। নারায়ণগঞ্জের সাহিত্যিক এস. ডি. ও. জনাব সানাউল হকের আনুকূল্যে লঞ্চে করে শীতলাক্ষায় ঘোরা গেল। সারা দিনব্যাপী সমারোহ। একটা কথা বলেছিলাম সেদিন সম্বর্ধনা-সভায়—এত সমাদর শুধুমাত্র আমাদের হ'লে সঙ্কোচে গ্রহণ করতে পারতাম না, আমাদের শক্তি বা দৈন্য আপনাদের বিচার্য নয়—আমরা সাহিত্যের সেবা করি, সেই পুণ্যে আমাদের মধ্যবর্তিতায় বাংলা-সাহিত্য ও বাংলা-ভাষার প্রতি আপনাদের অমেয় ভালবাসা পৌঁছে দিলেন।

বিচিত্র পরিবেশ! আমরাও ক্ষেপে গেলাম শেষটা। বেধড়ক বক্তৃতা করে এসেছি। দাঁতের ব্যথায় আমার সমস্ত মুখ ফুলে উঠল, তবু রেহাই নেই। আরও মারাত্মক ব্যাপার—শ'দেড়েক অটোগ্রাফ দিয়েছি, অধিকাংশই কবিতাকারে। বুঝুন! বিস্তর ভাল ভাল কবি জুটেছিলেন, তাঁরা আড়চোখে তাকাতেন। তাঁদের অন্নে ভাগ বসায় বুঝি কোথাকার উটকো এক গদ্যময় মানুষ!

নিমন্ত্রণই বা কত! ভারতীয় ডেপুটি হাই-কমিশনার বিজয়কৃষ্ণ আচার্য, ভারত-দূতাবাসের প্রচারকর্তা রায়চৌধুরি, ভূতপূর্ব মন্ত্রী হবিবুল্লাহ বাহার, নওরোজ কিতাবিস্তানের কর্তৃপক্ষ, অধ্যাপক হায়দার চৌধুরি—রকমারি ভোজ্য খেয়ে এমনি বহুজনকে আনন্দদান করে এসেছি। সর্বশেষ ভোজ খেলাম, নারায়ণগঞ্জে আমাদের এক অচেনা বোন বেগম খুরশিদা মজিবের বাড়ি। কি ভালবাসেন তিনি সাহিত্যকে, দরদ দিয়ে আমাদের কত লেখা পড়েছেন! সামনে এসে আবদার করে হুকুম করে খাওয়ালেন তিনি। সময়ের অভাবে আরও বহু জনের অনুরোধ রাখতে পারিনি। ফেরবার সময় প্লেনে জায়গা পাচ্ছিলাম না; শ্রীযুত আচার্য্য অশেষ অনুগ্রহে তার ব্যবস্থা করে দিলেন।

ক'জনে আমরা ডাক্তার মন্মথ নন্দীর বাড়ি ছিলাম। সে এক কাণ্ড! এক প্রহর রাত থাকতে রোগির ভিড়। সকালে পঞ্চাশ জনের বেশি দেখেন না—সেজন্য সর্বাগ্রে এসে নাম লেখবার চেষ্টা। এত কাজের মধ্যেও প্রতিটি অনুষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত। রোগি দেখতে দেখতে—তারই ভিতর ফাঁক কাটিয়ে আমাদের সঙ্গে গল্প জমাতেন, সম্মেলনের খবরাখবর নিতেন। রাত্রে ঐ ক'দিন রোগি দেখবেন না—নোটিশ টাঙিয়ে সপরিবারে বসতেন গিয়ে সাংস্কৃতিক আসরে। ডাক্তার-গৃহিণী শান্তি দেবীর মনোদুঃখের অবধি ছিল না—ঢাকায় এ-সময়টা মাছ একেবারে অমিল। অতিশয় লজ্জা ও সঙ্কোচের সঙ্গে মাত্র পাঁচ-সাত রকমের মাছ দিতেন প্রতিবেলায় আমাদের খাবার পাতে! আনুষঙ্গিক অন্যান্য পদ তো আছেই।

এই লেখায় প্রকাশিত আলোকচিত্র সমূহ বদরুদ্দিন 'আলি, রফিক ইসলাম, আমানুল হক কর্তৃক গৃহীত।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো এগারো

আহিরিটোলার দিগম্বর ময়রার খাবারের খুব নাম-ডাক। ঠাকুরের জন্যে কিছু কিনে নিলে হয়।

মিহিদানা বাঁধা হচ্ছে। কি হে টাটকা না কি?

'হাতে করে দেখুন না। কত গরম!'

এক সের কিনলে দেবেন মজুমদার। ঘাটে এসে দেখে খেয়ার নৌকো ছাড়ো-ছাড়ো। শুধু একজন যাত্রীর অপেক্ষা। উঠে বসলো এক লাফে।

মিষ্টির ঠোঙা কোলে নিয়ে বসলো সন্তর্পণে। এত ভিড়, ছোঁয়া বাঁচানো দুঃসাধ্য। পাশেই এক চাপদাড়িওয়ালা মুসলমান। ভীষণ গোপ্পে, মুখের আর কামাই নেই। ছুঁয়ে তো দিয়েইছে, কে জানে তার মুখামৃতের ছিটে-ফোঁটাও পড়ছে কি না ঠোঙার উপর।

বিশীর্ণ হয়ে গেল দেবেন। আর ঠাকুরকে দেওয়া চলবে না কিছুতেই। সেবার এক ঝুড়ি জিলিপি নিয়ে এসেছিল রাম দত্ত। পথে একটি ভিখিরি ছেলের সঙ্গে দেখা। তাকে কি ভেবে রাম একখানা জিলিপি দিয়ে দিল। ঠাকুর বললেন, 'সব উচ্ছিষ্ট হয়ে গিয়েছে। দেবতার উদ্দিষ্ট বস্তুর আগ-ভাগ তুলে কাউকে দিলে তা উচ্ছিষ্ট হয়ে যায়।' একখানা জিলিপি নিয়েছিলেন হাতে করে, গুঁড়িয়ে ফেলে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেললেন গঙ্গাজলে।

গরুর গাড়িতে গুড়ের নাগরির মতন গায়ে গা ঠেকিয়ে বসা, তার পর এই মৌলবীর বকর-বকরের আর শেষ নেই। দরকার নেই এ মিষ্টি ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে। রামের জিলিপির অবস্থা হবে। তার চেয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে হাত ধুয়ে হালকা হয়ে যাই। কিন্তু আহা, মিহিদানাগুলো এখনো গরম!

বাঁচোয়া, ঠাকুর ঘরে নেই। দূরের তাকের এক কোণে দেবেন ঠোঙাটা লুকিয়ে রাখল। সহজে কারু নজর পড়বে না। এ জিনিষ ঠাকুরকে দিয়ে কাজ নেই। আরো অনেক আছে এর ভাগীদার।

খাবারের ঠোঙাটা যে ঠাকুরের চোখের আড়াল করতে পেরেছে তাইতেই দেবেন নিশ্চিন্ত।

চটি ফট-ফট করতে-করতে ঠাকুর এসে বসলেন তাঁর ছোট তক্তপোষে। খানিক পরে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'এ কি, খিদে পাচ্ছে কেন?'

কি যেন খুঁজতে লাগলেন ঘরের আনাচে-কানাচে। কি, খাবার? যাই বলি গে, নিয়ে আসুক কিছু জোগাড় করে। উঠে গেল একজন ভক্ত-যুবক। একটু ধৈর্য ধরুন।

অন্তরে বসে কাঁদতে লাগল দেবেন। তোমার নাম করে খাবার আনলাম অথচ তোমাকে দিতে পারলাম না। খাদ্যকে করতে পারলাম না নৈবেদ্য। নিজের রূপকে করতে পারলাম না অরূপের রূপ।

তাক-লাগানো ব্যাপার! ঠিক তাকটি খুঁজে পেয়েছেন ঠাকুর। দেবেনের বুক দুর-দুর করে উঠল। কিন্তু, এ কি, ঠাকুর যে আনন্দে তরলতনু হয়ে উঠলেন। আরে, এই যে, মেঠাই! বাঃ, কে আনলে? এখনো যে হাতে-গরম। বলে, বলা-কওয়া নেই, মুঠো-মুঠো খেতে লাগলেন।

অন্তরের যে কান্না সেই তো তোমার সুধা। আমার অশ্রুক্ষরণই তো তোমার মধুক্ষরণ। তাই মিষ্টত্ব মিহিদানায় নয়, মিষ্টত্ব ব্যাকুলতায়। দিতে এসেও তোমাকে যে দিতে পারলুম না সেই ব্যর্থতার বিষাদে।

হে প্রণতপ্রিয়, হে দয়াসারসিন্ধু, তোমাকে কি দেব, কিবা চাইব, কিবা বলব তোমার কাছে। শুধু জীবন ভরে এই জেনে থাকব আমার নিদ্রাহীন হৃদয়ের ব্যথা কিছুই আর তোমার অজানা নেই।

ব্যথা হরণ করলেন, নিবারণ করলেন সমস্ত

ভয়ভ্রান্তি। শুধু নিজে খেলেন না, সবাইকে প্রসাদ দিতে লাগলেন। খাদ্যকে শুধু নৈবেদ্যে নিয়ে গেলে চলবে না, নৈবেদ্যকে নিয়ে যেতে হবে প্রসাদে।

ভোলা ময়রার দোকানে চমৎকার সর করেছে। ওরে, ঠাকুরের জন্যে একখানা কিনে নিয়ে যাই চল।

মেয়ের দল চলেছে দক্ষিণেশ্বরে। নৌকো করে। একখানা বড় দেখে সর কিনে নিয়েছে। ঠাকুর বড় ভালোবাসেন সর। দেখে কত খুশি হবেন না-জানি!

দক্ষিণেশ্বরে এসে শোনে—কী সর্বনাশ—ঠাকুর কলকাতায় গিয়েছেন। সবাই বসে পড়ল। এত সাধ করে এলুম, দেখা হল না! কোথায় গিয়েছেন কলকাতায়? রামলাল বললে, কম্বুলিটোলায়। মাষ্টার মশায়ের বাড়িতে। কখন ফিরবেন কে জানে!

চল সেখানেই ফিরে যাই। আমি চিনি সে বাড়ি। আমার বাপের বাড়ির লাগোয়া।

কিন্তু যাবি কি করে? বললে আরেক জন। নৌকো তো ছেড়ে দিয়েছিস।

পায়ে হেঁটে যাব।

সরখানি রামলালের হাতে দিয়ে বললে, ঠাকুর এলে দিও। পেটরোগা মানুষ, সবটা তো আর খেতে পারবেন না, একটু যেন খান।

আলমবাজার পার হতে না হতেই, ঠাকুরের কৃপা, ফিরতি গাড়ি জুটে গেল একখানা। চলো শ্যামপুকুর।

বাপের বাড়িও চেনে সে মেয়েটি, কম্বুলিটোলায় মাষ্টারের বাড়ি আর বের করতে পারে না। একবার এ-গলি ঢোকে, ঘুরে-ফিরে আরেক বারও এ-গলি। শেষ পর্যন্ত বাপের বাড়ির সামনেই দাঁড় করালে। একটা চাকর ডেকে নিলে। বাবা, দেখিয়ে দে কম্বুলিটোলা।

জয় শ্রীরামকৃষ্ণ! সামনের ছোট ঘরে তক্তপোষের উপর একলা বসে আছেন। আমরা পর্দার মেয়ে, রাস্তা-ঘাটে বেরোই না কখনো, কিন্তু তোমার জন্যে ছেড়েছি সব লোকলাজ, মানিনি দেয়াল-বেড়া। কার বাড়ি, কে মাষ্টার, কিছুই জানি না। শুধু এইটুকু জানি তুমি যেখানে আছ তাই আমাদের ঘর-দোর। আমাদের তীর্থ-মন্দির।

'তোরা এখানে কেমন করে এলি গো?' ঠাকুর উছলে উঠলেন।

প্রণাম করে বললে যা হয়েছে। বসলে মেঝের উপর। দু' জন বুড়ি, তিন জন অল্পবয়সী। আনন্দে কথা কইতে লাগলেন ঠাকুর। এমন সময় আসবি তো আয় ঠাকুর যাকে 'মোটা বামুন' বলতেন সেই প্রাণকৃষ্ণ মুখুজ্জে এসে উপস্থিত। কি সর্বনাশ, পালাবি কোথায়, পালাবি কি করে? বুড়ি দু' জন জবুথবু হয়ে বসে রইল কোনো রকমে, কিন্তু অল্প-বয়সীদের উপায় কি? উপায় ঠাকুরই জুগিয়ে দিলেন। ঠাকুরেরই তক্তপোষের তলায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলে তিন জন। উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ে রইল। মশার কামড়ে ছিন্নভিন্ন হবার জোগাড় তবু নড়ল না এক তিল।

পুরুষ না নারী এই দেহবুদ্ধি নেই ঠাকুরের। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণের আছে। তাই ঠাকুরকে তাদের লজ্জা নেই, প্রাণকৃষ্ণকে লজ্জা।

সেই সরোবরতীরে বসন রেখে স্নান করছে সুরাঙ্গনারা। সংসার ত্যাগ করে চলেছে যুবক শুক, সেই সরোবরের তীর দিয়ে। তাকে দেখে সর্ব-বিনির্মুক্তা অপ্সরীদের এতটুকু সঙ্কোচ নেই, কেন না যুবক হলেও শুক মায়াহীন, ভগবদ্‌ভাববিভোর। কিন্তু ছেলের পিছনে ছুটছেন ব্যাসদেব, তাকে সংসারে ফিরিয়ে আনতে। হলেনই বা বৃদ্ধ, তিনি মায়াধীন, তাকে দেখামাত্রই স্বর্গসুন্দরীরা ত্বরান্বিত হয়ে গায়ের উপর টেনে নিল আচ্ছাদন।

মন্দ পরিহাস নয়। ব্যাসদেব দাঁড়ালেন। জিগগেস করলেন 'এ তোমাদের কেমন ব্যবহার? আমার যুবক পুত্র শুককে দেখে তোমাদের লজ্জা হল না, আর আমি বুড়ো, আমাকে দেখে তোমাদের লজ্জা?'

কার সঙ্গে কার তুলনা! শুক নিবৃত্তাশয়, উপশান্তাত্মা। দেহবুদ্ধির লেশমাত্র নেই। তাই তাকে দেখে আমাদের লজ্জা করবে কেন? আর বুড়ো হলেও তুমি রূপপিপাসু, সর্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা রমণীদের কটাক্ষগর্ভ নেত্রপাতের ভিখারী, তোমার কাব্যে-গ্রন্থে কত তুমি বর্ণনা করেছ লাবণ্যবিলাস ও বিভ্রমমণ্ডনের কথা। তোমাকে দেখে লজ্জা হবে না তো কাকে দেখে হবে?

প্রাণকৃষ্ণ কি আর শিগগির যায়! ঠায় এক ঘণ্টা ধরে তার নানা নিবন্ধ। ওরে বাপু, এবার সরে পড়। পারি না আর উবুড় হয়ে পড়ে থাকতে। মশার কামড়ে যে গেলুম!

ঘণ্টাখানেক লাগল মোটা বামুনের হাওয়া হতে।

চলে গেলেই বেরিয়ে এল মেয়েরা। তখন ঠাকুরের কি হাসি!

বাড়ির মেয়েরা অচেনা, কি যায় আসে, ঠাকুর যখন সঙ্গে আছেন তখন চরাচরে আর পরাপর নেই। এরাও তাই ঢুকে পড়ল অনায়াসে। ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গেও এরাও খেল-দেল। রাত ন'টা, ঠাকুর ফিরলেন ঘোড়ার গাড়িতে আর এরা পায়ে হেঁটে।

ঠাকুরের ফিরতে প্রায় সাড়ে দশটা। খানিক বাদে রামলালকে ডেকে বললেন, 'ওরে রামনেলো, বড্ড খিদে পেয়েছে।'

'সে কি, খেয়ে আসেননি?'

'খেয়ে এলে কি হয়, আবার খিদে পেতে পারে না? শিগগির কিছু দে। নিদারুণ খিদে।'

সেই সরখানি এনে সামনে ধরল রামলাল। দিব্যি খেয়ে ফেললেন একটু-একটু করে।

পরদিন সকালে আবার এসেছে। সেই মেয়ের দল। তাদের দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন ঠাকুর। 'ওগো রাত্তিরেই তোমার সেই সরখানি সব খেয়ে ফেলেছি। কোনো অসুখ করেনি কিন্তু।'

মেয়েরা সব অবাক। পেটে কিছু সয় না ঠাকুরের, তা ছাড়া রাত্রে দিব্যি খেয়ে এসেছেন মাষ্টারের বাড়ি থেকে, তার পরে আবার এই বন্য ক্ষুধা।

বন্য ক্ষুধা নয় অন্য ক্ষুধা। এ ক্ষুধা অন্তর মধুর জন্যে, ভক্তির আস্বাদনের জন্যে। ক্ষুধা কি বস্তুর, ক্ষুধা ভালোবাসার।

কৃষ্ণের সেই গৃহাশ্রমী ব্রাহ্মণ-বন্ধুর কথা মনে করো। একসঙ্গে পড়েছিল পাঠশালায়, সান্দীপনি গুরুর ঘরে। কিন্তু ভাগ্যদোষে আজ সে ভিখারি। মলিন জীবন যাপন করছে ভার্যার সঙ্গে। একদিন স্ত্রী বললে, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ তোমার সখা, তার কাছে গিয়ে কিছু চাও না।

মন্দ কি। কিছু পাই না পাই অন্তত দেখে আসতে তো পারব। মুখে ভাষা না ফোটে চোখে অন্তত থাকবে তো নীরবতা!

ভিক্ষে করে জুটেছিল কিছু চিড়ের খুদ, তাই ব্রাহ্মণী বেঁধে দিল বস্ত্রখণ্ডে। দ্বারকার দিকে যাত্রা করল ব্রাহ্মণ। পুরপ্রবেশ করতে পারবে কি না তারই বা ঠিক কি। তার পরে অন্তঃপুরে কোন্ সুগোপন কক্ষে তিনি আছেন তাই বা কে বলবে!

আশ্চর্য, কেউ বাধা দিল না। তোরণ পেরিয়ে ক্রমে ক্রমে তিনটি কক্ষা অতিক্রম করল। এই শ্রীশালী গৃহই শ্রীকৃষ্ণের। দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রইল দীনভাবে।

প্রিয়ার পর্যঙ্কে শুয়েছিল কৃষ্ণ। ছুটে কাছে এল ব্রাহ্মণের, দু'বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল নিবিড় করে। বসাল পালঙ্কের উপর। নিজের হাতে ধুয়ে দিল পা দুখানি। সেই পাদোদক মাথায় ধরলে। অর্চনা করল নানা উপকরণে। রুক্মিণী ব্যজন করতে বসল।

এত সব কাণ্ডের পর কৃষ্ণ বললে, ঘর থেকে আমার জন্যে কি এনেছ দাও।

কোথায় আমি চাইব, তা নয়, তুমিই কি না চেয়ে বসলে!

শ্রীকৃষ্ণ বললে, ভাই আমিও ভিখিরি। আমি ভিখিরি ভালোবাসার। ভালোবাসার সঙ্গে যদি অণুমাত্রও কেউ দেয় তাই আমার কাছে অনেক। হোক তা ছোট্ট একটা ফুল নয় তো তুচ্ছ একটা পাতা, কিংবা এক অঞ্জলি জল।

তবু কি এনেছে বলতে সাহস পেল না ব্রাহ্মণ। কি এনেছ দেখি, কৃষ্ণ নিজেই তখন বস্ত্রখণ্ড খুলে ফেললে। এক মুঠো খুদ তুলে নিয়ে মুখে পুরলে। দ্বিতীয় মুষ্টি তুলতে যাচ্ছে, রুক্মিণী হাত চেপে ধরল। বললে, তোমার সন্তোষ দেখাবার জন্যে এক মুষ্টিই যথেষ্ট আবার দ্বিতীয় মুষ্টি কেন?

সেই রাত হরি-ঘরেই বাস করল ব্রাহ্মণ। কি যে তার অভাব কি যে তার চাইবার কিছুই মনে করতে পারল না। প্রত্যূষে ফিরে চলল।

কোথায় আমি দরিদ্র পাপী আর কোথায় শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ! আমি তাঁর বন্ধু, শুধু এটুকু জেনেই তিনি আমাকে আলিঙ্গন করলেন। আমি অধন, ধন পেলে মত্ত হয়ে আর তাঁকে স্মরণ করব না, এই ভেবেই করুণাময় ধন দিলেন না আমাকে।

ঘরের কাছাকাছি এসে ব্রাহ্মণ যেন ইন্দ্রজাল দেখল। এ কি, এ উপবন আর সরোবর এল কোত্থেকে, সেই কুঁড়েঘরের পরিবর্তে এ কি বিচিত্রপুরী! কোথা থেকে এল এত দাসদাসী! আর এই যে চন্দ্র-চন্দনভূষাঙ্গী পুরাঙ্গনা এই কি তার সেই মনোরথ-প্রিয়তমা ব্রাহ্মণী?

চাইলাম না, অথচ এত সব হল কি করে? মেঘ তো না চাইতেই জল দেয়। তেমনি তাঁর যা ইচ্ছে

তা নেন যত ইচ্ছে তত দেন। নইলে আমার পুঁটলি খুলে কেন নিলেন সেই তণ্ডুলকণা, আর কেনই বা দিলেন এত ভোগৈশ্বর্য? পাছে পতন ঘটে তাই তো তিনি ধনবৈভব দেন না ভক্তদের। কিন্তু এ তো আমার প্রাপ্তি নয় এ তোমার প্রীতি। এ তোমার ঐশ্বর্য।

ঠাকুর নবতখানায় খবর পাঠালেন ব্যাঘ্রহুঙ্কারেঃ ভীষণ খিদে পেয়েছে। শিগগির খাবার পাঠাও।

কি বুঝলেন শ্রীমা, এক খাদা সুজির পায়েস করে পাঠালেন। এক জনের চেয়ে অনেক বেশি, একাধিক দিনের আহার। ভক্ত-মেয়ে সেই অন্নপাত্র নিয়ে কাছে এসে এ কি দেখল! ঠাকুর অস্থির পায়ে পাইচারি করছেন। যেন ঠাকুর নয় কে এক অতিকায়-মূর্তি। ঠাকুর ইসারা করলেন খাবার রাখতে। আসনের কাছে খাবার রেখে ভক্ত-মেয়ে দাঁড়িয়ে রইল জোড় করে। কি পর্বতপ্রমাণ ক্ষুধা! ঠাকুর খেতে লাগলেন ভীমগ্রাসে। সেই মেয়ের দিকে চেয়ে জিগগেস করলেন, 'এ কে খাচ্ছে? আমি না আর কেউ?'

'আর কেউ।'

একশো বারো

শ্রীমার কাছে নবতখানায় বসে জপ করছে গোপালের মা। জপ সাঙ্গ করে প্রণাম করে উঠছেন, ঠাকুরের সঙ্গে দেখা। ফিরছেন পঞ্চবটীর ধার থেকে, দেখা হতেই জিগগেস করলেন, 'তুমি এখনো এত জপ করো কেন?'

'জপ করব না?' বিহ্বলের মত তাকিয়ে রইল গোপালের মা। 'আমার কি সব হয়েছে?'

'সব হয়েছে।'

'বলো কি?' যেন ঠাকুর বললেও বিশ্বাস করা যায় না।

'তোমার নিজের জন্যে সব হয়ে গেছে। তবে' নিজের শরীরের প্রতি ইসারা করলেনঃ 'তবে যদি এই শরীরটা ভালো থাকবে বলে করতে চাও তো কোরো।'

তবে তাই হোক। আর নিজের জন্যে নয়। যা করব এবার থেকে সব তোমার, তোমার জন্য।

থলে-মালা গঙ্গায় ফেলে দিল গোপালের মা। হাতেই জপ করতে লাগল। তার পর কি ভেবে আবার একটা মালা নিলে। নিজের জন্যে নয়, গোপালের কল্যাণে মালা ফেরাই।

কিন্তু কই আগের মতন তো গোপাল দর্শন হয় না যখন-তখন। যখন দেখে রামকৃষ্ণমূর্তিই দেখে, কোথায় সেই বালকের বেশ! দু' জানু আর এক হাত মাটিতে আরেক হাতে নবনীভিক্ষা। কোথায় সেই দুটি আহ্লাদবিহ্বল দৃষ্টি!

একদিন এসে কেঁদে পড়ল ঠাকুরের কাছে। 'গোপাল, তুমি আমার এ কি করলে? আমার কি অপরাধ হল, কেন আমি আর তোমাকে আগের সেই গোপালমূর্তিতে দেখি না?'

'সর্বক্ষণ ও রূপ দর্শন করলে বলিতে শরীর থাকে না।'

'আমার শরীর দিয়ে কি হবে?'

না, তুমি বাৎসল্যরতির উদাহরণ, লোকহিতের জন্যে থাকো তুমি সংসারে। সংসারবাসিনীরা বুঝুক শিশুসেবার মধ্যেই ঈশ্বরসেবা।

কার মুখখানি মনে পড়ে গা? সংসারে কাকে বেশি ভালোবাসো? একটি ভক্ত-মেয়েকে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'ছোট একটি ভাই-পোকে।'

'আহা, তবে তাকেই গোপাল ভেবে খাওয়াও-পরাও, সেবা করো। তার মধ্যে গোপালরূপী ভগবানকে দেখ। মানুষ ভেবে করবে কেন? ভগবান ভেবে করবে। যেমন ভাব তেমন লাভ।'

বলরাম বোসের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। রথের সময়। বার-বাড়ির দোতলায় চকমিলান বারান্দায় রথ টানবেন ঠাকুর। কীর্তন করবেন। কিন্তু, কত লোক এসেছে, সে কই?

'ওগো সেই যে কামারহাটির বামুনের মেয়ে। যার কাছে গোপাল হাত পেতে খেতে চায়। সেদিন কি দেখে-শুনে প্রেমে উন্মাদ হয়ে আমার কাছে উপস্থিত। খাওয়াতে-দাওয়াতে একটু ঠাণ্ডা হল। কত থাকতে বললুম কিছুতে থাকলো না। যাবার সময়ও তেমনি উন্মাদ। পায়ের কাপড় মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। হুঁশ নেই। ওগো তাকে একবার আনতে পাঠাও না?'

কামারহাটিতে লোক পাঠালো বলরাম।

সন্ধ্যা হয়-হয় ঠাকুরের ভাবাবেশ হল। মরি মরি বালগোপালের ভাব। হামা দিচ্ছেন দুই জানু

আর এক হাতে। অন্য হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে চেয়ে আছেন ঊর্দ্ধমুখে। মা যশোদা, ননী দে।

স্নেহগলিতা যশোদা শিশুকৃষ্ণকে স্তন্য দিচ্ছেন। হঠাৎ শিশু হাই তুলল। পুত্রের মুখবিবরে যশোদা দেখল স্থাবরজঙ্গম-জ্যোতিষ্ক-সমন্বিত সমগ্র বিশ্ব।

আরেক দিন। বলরাম এসে নালিশ করলে মার কাছে। মা, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে। না মা, খাইনি মাটি। বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখাচ্ছি তবে হাঁ করে। এ কি স্বপ্ন না দেবমায়া? মুখবিবরে আবার সেই বিশ্বরূপ।

হোক মায়া, তবু সেই আমার একমাত্র আশ্রয়। যশোদা ভাবলেন মনে-মনে, এই আমি, এই আমার পতি, এই আমার পুত্র, এই গোপ-গোপী-গোধন সকল আমার এ কুমতি যার মায়াবশে হয়েছে সেই আমার পরমগতি, পরমমতি।

ঠাকুরেরও ভাবাবেশ হয়েছে, গাড়ি এসে দাঁড়াল দরজায়। কে এল? যার ভক্তির জোরে ঠাকুর এমন মূর্তি ধরলেন, সে—সেই গোপালের মা।

'আমি কিন্তু বাপু ভাবে অমন কাঠ হয়ে যাওয়া ভালোবাসি না।' গোপালের মা যেন অনুযোগ দিল। 'আমার গোপাল হাসবে খেলবে বেড়াবে দৌড়ুবে—ও মা, এ যেন একেবারে কাঠ! আমার অমন গোপালে কাজ নেই।' ঠাকুরের পা ঠেলতে লাগল গোপালের মা: 'ও বাবা তুমি অমন হলে কেন।'

এই মাতৃভাব বা সন্তানভাব—সাধনের শেষ কথা বা সহজ কথা। তুমি মা, আমি তোমার ছেলে।

আমি তোমার শরণাগত সন্তান। জীবত্ব বুঝি না, ঈশ্বরত্ব বুঝি না, কাকে বা বলে বন্ধন কাকে বা বলে মুক্তি। জ্ঞান-ভক্তিও বুদ্ধির বাইরে। বুঝি একমাত্র তোমাকে, মাকে। তুমি পূর্ণানন্দ-স্বরূপ মা আর আমি তোমার কোলে সদ্যজাত নগ্ন শিশু। তোমার কোলে যদি উঠতে পারি, তবে ঈশ্বরত্বও তৃণীকৃত।

তিন দিন পরে ঠাকুর ফিরছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের নৌকোতে গোলাপ-মা, গোপালের মা আর একটি-দুটি ভক্ত-বালক। আশ্চর্য, গোপালের মার হাতে একটি পুঁটলি! কি করবে, বলরামের বাড়ির মেয়েরা বেঁধে দিয়েছে। খান দুই কাপড়, রাঁধবার জন্যে কিছু হাতা-খুন্তি।

পুঁটলি দেখে ঠাকুর মহাবিরক্ত। গোপালের মা সরাসরি কিছু বললে না। বললেন গোলাপ মাকে কিন্তু গোপালের মাকে ঠেস দিয়ে। 'যে ত্যাগী সেই ভগবানকে পায়। যে লোকের বাড়িতে খেয়ে-দেয়ে শুধু-হাতে চলে আসে, সেই ভগবানের গায়ে বসতে পারে ঠেস দিয়ে।' বলছেন আর বারে বারে সেই পুঁটলির দিকে কটাক্ষ করছেন।

গোপালের মার মনে হল পুঁটলিটা ফেলে দি গঙ্গাজলে। কিন্তু তাই বা কেন, দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে কাউকে বিলিয়ে দেব না হয়।

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছেই সোজা চলে গেল নবতে। শ্রীমাকে বললে, 'ও বৌমা, গোপাল এ সব জিনিসের পুঁটলি দেখে রাগ করেছে। এখন উপায়? এ সব ভাবছি আর নিয়ে যাব না, এইখানেই বিলিয়ে দি কাউকে।'

সান্ত্বনার প্রলেপ বুলোলেন শ্রীমা। বললেন, 'বলুন গে উনি। তুমি শুনো না। তোমায় দেবার তো কেউ নেই! তা তুমি কি করবে মা, দরকার বলেই তো এনেছ।'

বুক জুড়িয়ে গেল কথা শুনে। তবু মনে যখন উঠেছে, একখানা কাপড় দান করল। আরো কটি এটা-ওটা। ঠাকুরের জন্যে রাঁধল স্বহস্তে। কি জানি, নেবেন কি না।

নেবেন বই কি, হাসিমুখে নেবেন। শ্রীমা ইঙ্গিত করেছেন নবত থেকে। না নিয়ে উপায় কি! গরিব মানুষ, চেয়ে ভিক্ষে করে আনেনি তো! আর যা পেয়েছে তার থেকে দান করে দিয়েছে অপরকে।

নরেনকে ডাকিয়ে এনেছেন ঠাকুর। আর সেই দিনই গোপালের মার আবির্ভাব। এবার রগড় হবে মন্দ নয়। এক জনের হাতে জ্ঞান-অসি আরেক জনের হাতে বিশ্বাসের পাহাড়—কেমন যুদ্ধ হবে না জানি! দুষ্টুমি করে একটা কোঁদল বাধিয়ে দিই দুজনের মধ্যে।

'কেমন তুমি গোপাল দেখ নরেনকে একটু বলো তো বুঝিয়ে।'

দর্শনের কথা কাউকে বলতে নেই এমনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন ঠাকুর। তাই ভয়ে-ভয়ে জিগগেস করল গোপালের মা, 'তাতে কিছু দোষ হবে না তো গোপাল?'

'না, তুমি বলো।'

তুমি বিশ্বাস করো না করো আমি বলি এবার

নির্ভয়ে। আমার ভাবের কথা বলব ভালোবাসার কথা বলব, তাতে আমার লজ্জা কি। চাঁদের আলো যে ছড়িয়ে পড়ছে জলে-স্থলে পাহাড়ে-কাননে সে কি চাঁদের লজ্জা ?

গোপাল আমার কোলে উঠে কাঁধে মাথা রেখে এসেছিল সারা পথ। কামারহাটি থেকে দক্ষিণেশ্বর। তার রাঙা টুকটুকে পা ঝুলছিল বুকের কাছটিতে। এসেই ঢুকে গেল ঠাকুরের শরীরে। আবার বেরিয়ে এল যাবার সময়। শুতে বালিশ না পেয়ে খুঁতখুঁত করেছে সারা রাত। কাঠ কুড়িয়ে আনল রাঁধবার সময় আর খেতে বসে কি দস্যিপনা !

ভাবে বিভোর হয়ে বলতে লাগল অঘোরমণি। তুমি যদি না মানো তো আমি কি করব ! আমি যে দেখছি চোখের সামনে।

এ কি, নরেন কাঁদছে !

বাবা, তোমরা পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, আমি দুঃখী কাঙালী, কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না।' আকুল স্বরে বললে গোপালের মা, 'তোমরা বলো, আমার এ সব তো মিথ্যে নয় ?'

'না মা,' নরেন বললে ভক্তবিশ্বাসীর মতো, 'তুমি যা দেখেছ সব সত্যি।'

ঝগড়াটা তাহলে লাগল না। ঠাকুর হাসতে লাগলেন।

[ক্রমশঃ।

তোমার নামের পাশে

তুষার চট্টোপাধ্যায়

রাতের দুশ্চিন্তা শেষে
আশ্চর্য সকাল পাবো
পাখীদের গানে আর গানে
জীবন সুখের হবে
'সেথা নয় সেথা নয় অন্য কোন খানে।'
আগামীর সেই স্বপ্নে
বার বার যন্ত্রণার
মোড় ঘুরে পার হই দুঃখের সীমানা
আমিও জেনেছি আজ
পথের মিছিলে মেলে
অন্য কোন পথের ঠিকানা।
তাই তো নেমেছি পথে
দু'হাতে আঁধার ঠেলে
জড়াই প্রাণের সাথে
কান্না-হাসি আশা-স্বপ্নে রাঙানো এ মাটি
যারা কাজ করে সব নগরে প্রান্তরে
তাদের মিছিলে পথ,
আমি পথ হাঁটি।
কালের কুটিল স্রোতে
তোমার তরীতে আজ পাল তুলে দিয়ে
এলো-মেলো ঢেউ ভাঙ্গি ;
স্বপ্ন আর সংগ্রামের পটভূমিকায়
অজেয় স্বাক্ষর আঁকি দীনান্তের বাঁকে ;—
তুমি সুখে নিদ্রা যাও,
নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গে
আমি ত রয়েছি জেগে
তোমার নামের পাশে 'পঁচিশে বৈশাখে'।

লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট রাজা রামমোহন রায়ের পত্র

[১৮১৯। ইংরেজ সরকার নবদ্বীপ ও ত্রিহুতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা ত্যাগ করে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের সঙ্কল্প করলেন। রাজা রামমোহন রায় তাতে বাধা দিয়ে ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টের কাছে নীচের চিঠিখানা লিখেছিলেন। ইংরেজ সরকার কিন্তু অবিচলিত রইলেন। ১৮২৪, ২৫শে ফেব্রুয়ারী সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল]

মহামান্য

রাইট অনরেবল লর্ড আমহার্ষ্ট

সপারিষদ গবর্ণর জেনারেল সমীপেষু

মি লর্ড,

কোন সরকারী ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিজেদের মনের কথা ভারতবাসী সচরাচর সরকারের গোচরে আনতে চায় না। অনেক ক্ষেত্রে এই শ্রদ্ধেয় মনোভাব বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ে। ভারতের বর্ত্তমান শাসকরা হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এমন এক জাতকে শাসন করতে এসেছেন, যাদের ভাষা ও সাহিত্য, আচার, প্রকৃতি ও মনোভাবের কথা তাঁদের কাছে প্রায় সম্পূর্ণই নতুন ও অদ্ভুত বলে মনে হবে। দেশের লোক নিজের বাস্তব পরিস্থিতি যতটা ঘনিষ্ঠ ভাবে জানে, ততটা এঁরা সহজে বুঝতে পারেন না। বর্ত্তমান গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সরকার যাতে দেশের কল্যাণকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন, যাতে আমাদের স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-পুষ্ট হয়ে তাঁরা তাঁদের বিঘোষিত দেশের উন্নতি-বিষয়ক কল্যাণ-সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন, তজ্জন্য তথ্য সরবরাহ করা দরকার। তাঁদের এ চেষ্টা ব্যর্থ হবে যদি আমরা ঠিক ঠিক তথ্য তাঁদের সরবরাহ করতে কার্পণ্য করি। এ কার্পণ্যে আমাদের অযথা কর্ত্তব্যহানিই হবে, এতে আমাদের উদাসীনতা সম্বন্ধে শাসকদের অভিযোগ করবার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হবে।

কলকাতায় নতুন সংস্কৃত স্কুলের প্রতিষ্ঠা হবে, এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদের শিক্ষার উন্নতি বিধান করতে চান। তাঁদের এই উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। এই আশীর্ব্বাদের জন্য ভারতবাসী চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে। মানবের কল্যাণকামী প্রত্যেকেরই এই কামনাই থাকা উচিত যে, শিক্ষার এই উন্নতি-বিধান প্রচেষ্টা অতি উন্নত আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হোক। এ হলেই বিভিন্ন কল্যাণ-পথে বিদ্যাস্রোত প্রবাহিত হতে পারবে।

ইংলণ্ড সরকার ভারতে প্রজাদের শিক্ষাদানের জন্য প্রতি বৎসর প্রভূত পরিমাণ অর্থদানের আদেশ করেছেন। গণিত, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, দেহবিজ্ঞান প্রভৃতি প্রয়োজনীয় যে সব বিজ্ঞানের য়ুরোপবাসী চরম উন্নতি বিধান করেছে বলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের চাইতে তারা উন্নত হয়েছে, আমরা এই বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবে সত্যি আশা করেছিলাম, ভারতবাসীদের সেই সব বিজ্ঞানে শিক্ষাদানের জন্য এই টাকায় জ্ঞানী ও গুণী য়ুরোপীয় ভদ্রলোকদের নিযুক্ত করা হবে।

উদীয়মান নব জাতিকে এই ভাবে যে জ্ঞানদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় সেই জ্ঞানের আবির্ভাব-উষার সানন্দ প্রতীক্ষা করে আমাদের অন্তর উল্লাস ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে গেছে। পাশ্চাত্যের অতি উদার ও আলোকপ্রাপ্ত জাতগুলোকে এশিয়ায় বর্ত্তমান য়ুরোপের কলা-বিজ্ঞান বপনের মহৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত করেছেন বলে আমরা ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে রেখেছি।

ভারতে যে বিদ্যাদান পূর্ব্ব থেকেই প্রচলিত, সেই বিদ্যাদানের জন্য হিন্দু পণ্ডিতদের পরিচালনে গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত স্কুল স্থাপন করতে চাচ্ছেন। এই শিক্ষালয় (য়ুরোপে লর্ড বেকনের সময়ের পূর্ব্বে য়ুরোপে যে জাতীয় বিদ্যাদান প্রচলিত ছিল তদনুরূপ) তরুণদের মন ব্যাকরণের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও উচ্চাঙ্গ দর্শন-জ্ঞানে ভারাক্রান্ত করতে পারে। এ বিদ্যা সমাজ বা বিদ্যার্থীদের জীবনে বাস্তবে কোন কাজে লাগবে না। বিশ্লেষণপ্রবণ যে বিদ্যা জানা ছিল দু'হাজার বছর আগে, আর তার পর থেকে যে বিদ্যায় কল্পনাবিলাসী মানুষেরা উৎপন্ন করল নিষ্ফল অন্তঃসারশূন্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, ভারতের সকল অংশে যা আগে থেকেই সাধারণতঃ শিক্ষাদান করা হয়ে আসছে, প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীরা তারই পাঠ পাবেন।

সংস্কৃত ভাষা এত কঠিন যে তাতে জ্ঞানলাভ করতে হলে প্রায় একটা জীবন কেটে যায়। যুগ যুগ ধরে জ্ঞান প্রসারে এ ভাষা যে শোচনীয় ভাবে বাধা দিয়ে এসেছে, তা সবাই জানে। এই ভাষার প্রায় অভেদ্য যবনিকার অন্তরালে যে বিদ্যা লুক্কায়িত তা অধিগত করবার শ্রমের পুরস্কার যথোপযুক্ত ভাবে পাওয়া যায় না। তবু যদি এই ভাষায় যে মূল্যবান তথ্য আছে, মাত্র সেই অংশের জন্যই এই ভাষাকে জিয়িয়ে রাখা প্রয়োজন বলে মনে হয়ে থাকে, নতুন এক সংস্কৃত কলেজ স্থাপন না করেও তা অতি সহজেই অন্য উপায়ে সাধিত হতে পারে। এই সংস্কৃত ভাষা এবং সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য যে সকল শাখার শিক্ষাদান, যা নতুন বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য, তা শিক্ষা দেবার জন্য চিরকাল এবং বর্ত্তমানেও দেশের বিভিন্ন স্থানে

নিযুক্ত আছেন বহু সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক। এই ভাষার অধিকতর উপযুক্ত চর্চ্চাই যদি কাম্য হয়, তাহ'লে বিশিষ্টতম যে সব অধ্যাপক স্বেচ্ছায় বিদ্যাদান করছেন, তাঁদের কিছু বৃত্তির ব্যবস্থা করলে সে উদ্দেশ্য সুসাধিত হত। তাঁদের উদ্যম আরও বেড়ে যেত এ রকমের পুরস্কারে।

এ সব বিবেচনা করে আপনার উচ্চ পদমর্যাদার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে আমি সবিনয়ে বলতে চাই যে, ভারতীয় প্রজাদের উন্নতি বিধানের মানসে ভারতের নেটিভদের শিক্ষাদানের জন্য যখন অর্থের বরাদ্দ করা হয়েছে, তখন বর্ত্তমানের অবলম্বিত পরিকল্পনা অনুসৃত হলে প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। কারণ, জীবনের সব চাইতে মূল্যবান সময়ের এক ডজন বছর মাত্র ব্যাকরণের সূক্ষ্ম মাধুর্য্য অধিগত করবার জন্য যুবকদের প্ররোচিত করলে কোন উন্নতিরই আশা নেই। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির শিক্ষার কথা ধরা যাক। 'খাদ্' ধাতুর অর্থ খাওয়া। 'খাদতি' মানে পুং, স্ত্রী বা ক্লীব সে খায়। এখন প্রশ্ন পুং, স্ত্রী ও ক্লীব সে খায়—এগুলোর সমগ্র অর্থে 'খাদতি'র ব্যবহার সিদ্ধ, না শব্দ-পার্থক্যের ফলে এই অর্থের ব্যতিক্রম হবে। যেমন ইংরেজী ভাষায় 'cat' বলতে আমরা কতটা বুঝি, কতটা "s" এ? বাক্যের এই দুই অংশ দ্বারা কি শব্দটির সমগ্র অর্থ বিচ্ছিন্ন ভাবে বা সমগ্র ভাবে অভিব্যক্ত?

কি ভাবে আত্মা ব্রহ্মে মগ্ন? ভগবৎসত্তার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক কি? বেদান্তের এ জাতীয় গবেষণা থেকেও বড় একটা উন্নতির আশা করা যেতে পারে না। বেদান্ত তরুণদের ধারণা করতে শেখাবে যে, সব দৃশ্য পদার্থ মায়া, এদের বাস্তব কোন অস্তিত্ব নাই, পিতা-ভ্রাতা প্রভৃতিরও বাস্তব অস্তিত্ব নাই, সুতরাং এদের প্রতি বাস্তব আকর্ষণের কোন প্রয়োজন নাই, যত শীগ্‌গির এদের থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সংসার ত্যাগ করা যায় ততই মঙ্গল। সুতরাং বেদান্তবাদে যুবকেরা সমাজের উৎকৃষ্টতর অংশ হয়ে গড়ে উঠতে পারবে না। মীমাংসা শেখাবে বেদান্তের কোন্ কোন্ অংশ আবৃত্তি করলে ছাগঘাতক নিষ্পাপ হয়, অথবা বেদের সূক্তগুলোর বাস্তব প্রকৃতি ও প্রভাব কি প্রভৃতি। এ সব থেকেও বিদ্যার্থীর কোন বাস্তব উপকার হবে না।

ন্যায়শাস্ত্র থেকে ছাত্ররা শিখবে—বিশ্বের পদার্থগুলো কত বাস্তব শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ন্যায় শেখাবে, আত্মার সঙ্গে দেহের আর চোখের সঙ্গে কানের সম্পর্ক প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণা। এ সব শিখবার পর ন্যায়শাস্ত্রের বিদ্যার্থীরা মনের বড় একটা উন্নতি করতে পারবে না।

উপরোক্ত কাল্পনিক বিদ্যায় উৎসাহ দেবার প্রয়োজনীয়তা কত দূর তা যাতে উপলব্ধি করতে পারেন তজ্জন্য লর্ড বেকনের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের য়ুরোপের সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর রচনার পরবর্ত্তী যুগে জ্ঞানের যা উন্নতি হয়েছে তার তুলনা করতে আপনাকে অনুরোধ করি।

বাস্তব জ্ঞান সম্বন্ধে বৃটিশ জাতিকে অজ্ঞ রাখাই যদি উদ্দেশ্য হত, তাহ'লে যে বিদ্যাব্যবস্থা অজ্ঞতা চিরস্থায়ী করবার পক্ষে সর্ব্বোত্তম ছিল বেকনীয় দর্শন, তাকে স্থানচ্যুত করতে দেওয়া হত না। যদি এই দেশকে তমসাচ্ছন্ন রাখাই বৃটিশ বিধান-সভার নীতি হয়ে থাকে, তাহ'লে অবশ্য সংস্কৃত শিক্ষাদান ব্যবস্থা সর্ব্বোত্তম। কিন্তু সরকারের উদ্দেশ্যই যখন দেশীয় জনসাধারণের উন্নতি বিধান, তখন গণিত, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, দেহবিজ্ঞান প্রভৃতি আরও প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে অধিকতর উদার ও উন্নত শিক্ষাপদ্ধতির প্রসার করা তাদের কর্ত্তব্য হবে। য়ুরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েক জন গুণী ও জ্ঞানী ভদ্রলোককে প্রস্তাবিত অর্থ-দ্বারা নিযুক্ত করলে এবং একটি কলেজকে যথোপযুক্ত গ্রন্থ, যন্ত্র ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামে সমৃদ্ধ করলে এ প্রয়োজন সাধিত হবে।

আপনার নিকট এই বিষয় ব্যক্ত করে আমার দেশবাসীর প্রতি এবং এ দেশবাসীর কল্যাণ-কামনায় ও দেশের আলোকপ্রাপ্ত যে নরপতি ও আইনসভা এই সুদূর দেশের প্রতি তাঁদের বদান্য হস্ত প্রসারিত করেছেন, তাঁদেরও প্রতি আমি এক মহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদন করলাম বলে মনে করি। আপনার নিকট আমার এই মনোভাব ব্যক্ত করবার স্বাধীনতা নিয়েছি বলে আশা করি আপনি ক্ষমা করবেন। আই হ্যাভ দি অনার প্রভৃতি

রামমোহন রায়

মণিপুর বিপ্লবীর চিঠি

মণিপুর, ৮ই এপ্রিল, ১৮৯১

ডেপুটী কমিশনর, কোহিমা সমীপে

মহাশয়,

"গত ২৫শে মার্চ্চ টেলিগ্রাফে সকল কথা জানান হয়েছে। ফেব্রুয়ারীর শেষ ভাগে পলিটিক্যাল এজেন্টের যোগে চীফ কমিশনর মণিপুর আসবেন, এ জন্য কুলীর সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। আমরা তা সরবরাহ করেছি। আমরা তাঁর সম্মান রক্ষার জন্য সৈন্য পাঠাবার জন্যও তৈরী ছিলাম, কিন্তু সৈন্য-সাহায্য তিনি নিতে চাননি। মৌথানা পর্য্যন্ত জেনা: থাঙ্গালকে পাঠান হয়। আমার ভ্রাতা, সেনাপতি মণিপুর থেকে ১২ মাইল দূরে শেংমাই পর্য্যন্ত গেছলেন। যুবরাজ মণিপুর থেকে ৪ মাইল দূরে কৈয়ংকাই নদী পর্য্যন্ত গিয়ে চীফ কমিশনরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আমিও রাজবাড়ীর দেউড়ীতে চীফ কমিশনরের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তাঁর সম্মানার্থ রাজবাড়ী থেকে সেলামী তোপধ্বনি করা হয়েছিল। চীফ কমিশনর দরবার করতে চান। আমরা সবাই দরবারে উপস্থিত হই। আমি, যুবরাজ এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ কুমার মন্ত্রিগণসহ রেসিডেন্সীর দ্বারে পৌঁছি। কিন্তু চীফ কমিশনর প্রস্তুত নন বলে আমাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। গবর্ণমেন্টের কি আদেশ হয় জানবার জন্য আমি ব্যগ্র হয়ে পড়ি। অপেক্ষা করেই আছি। যুবরাজ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে পাটে ফিরে যেতে হ'ল। রেসিডেন্সীর মধ্যে প্রবেশ করে বাঙলোর সম্মুখে, পেছনে, চারদিকে দেখলাম সৈন্য সজ্জিত। দেখে সকলেই বিস্মিত হ'ল। মণিপুরীরা শঙ্কিত হয়ে পড়ল। দরবার-ঘরে প্রায় ১ ঘণ্টা অপেক্ষা করে বসে রইলাম। চীফ কমিশনর দেখা দিলেন না। যুবরাজকে আনবার জন্য লোক অথচ পাঠান হয়েছিল, যুবরাজ দরবারে পৌঁছতে পারেননি। বেলা ১২টা থেকে ৩টা পর্য্যন্ত রেসিডেন্সীতে প্রতীক্ষা করে গবর্ণমেন্টের আদেশ অবগত হতে না পেরে পাটে ফিরে এলাম।

২৪শে ভোর বেলা। আমি ঘুমিয়ে। হঠাৎ ইংরেজরা পাট

আক্রমণ করল। বৃটিশ সৈন্যরা শাস্ত্রীদের হত্যা করল। মন্দির নষ্ট করল, বিগ্রহ লুণ্ঠন করল, স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদের নির্বিচারে হত্যা করল, ঘর-বাড়ীতে আগুন দিয়ে, বালক-বালিকাদের চুলে চুলে বেঁধে সে আগুনে ফেলে দিল। মণিপুরী সৈন্যরা অবাধ্য হয়ে উঠল. স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ধর্মরক্ষার জন্য তারা প্রাণপণ যুদ্ধ করল। আমার বহু প্রজা এতে ধ্বংস হ'ল। নিহত হ'ল চীফ কমিশনার, গ্রিমউড প্রভৃতি ইংরেজ সরকারের কর্মচারীরা। তাদের কত সৈন্য যে মরল তার হিসাব করা অসম্ভব হয়ে উঠল। গ্রিমউড সাহেবের মেম নিরাপদেই আছেন। পরদিন প্রাতে তাঁকে আনাবার জন্যে একজন জেনারলকে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু সংবাদ পেলাম তিনি কাছাড় চলে গেছেন।

গত ঘটনার জন্য খুব দুঃখিত। গবর্ণমেণ্টের প্রজা, কর্মচারী, সৈন্য সকলকেই যত্ন করে রাখা হয়েছে। আমি প্রথমে আক্রমণ করি নাই। কেবল চীফ কমিশনরের আদেশে বৃটিশ সৈন্যরা যে বর্ব্বরোচিত ব্যবহার করেছিল, তা থেকে আত্মরক্ষা, স্ত্রী-পুত্র ও ধর্মরক্ষা করবার জন্যে মণিপুরের প্রজারা যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়।"

শ্রীটেকেন্দ্রজিৎ বীরসিংহ।

১৮৫৭ বিপ্লবীর চিঠি

[১৮৫৭, মার্চ। বারাকপুরের ইংরেজ ফৌজ ৪৩তম রেজিমেণ্টের নায়ক মেজর ম্যাথজের কাছে বিপ্লবীরা নীচের বেনামা চিঠি পাঠিয়েছিল]

গোটা ষ্টেশনের বক্তব্য হ'ল এই, ধর্মত্যাগ আমরা করতে পারব না। মান ও ধর্মের জন্য আমাদের কর্ম। আমাদের ধর্মই যদি গেল, তবে হিন্দুর ধর্মও গেল, মুসলমানের ধর্মও গেল। তবে বেঁচে থেকে আর কি করব? তোমরা দেশের প্রভু। কোম্পানীর হুকুম পেয়ে লাট সাহেব সব ফৌজের সেনাপতিকে হুকুম দিয়েছে—দেশের ধর্ম নষ্ট কর। আমরা জানি সে কথা, জানি সরকার সবই কড়ি নিয়ে কিনে ফেলছে। নুণ বিভাগের আমলারা নুণের সাথে হাড় মেশিয়ে দিচ্ছে। ঘৃতের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা ঘির সাথে চর্ব্বি মিশাচ্ছে। সবাই জানে এ কথা। এই ত দুই ব্যাপার। তৃতীয় ব্যাপার এই—চিনির ভার যে সাহেবের উপর, সে হাড় গুঁড়িয়ে, চিনি যা থেকে তৈরী, তার সেরার সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। এ কথা সবাই জানে। চতুর্থ—দেশে রাজা, ঠাকুর, জমিদার, মহাজন ও রায়তদের কাছে ইংলিশ পাউরুটি পাঠিয়ে বড় সাহেবরা হুকুম দিয়েছে, একসাথে বসে খেতে, এ কথাও সবাই জানে ভাল করেই। আর এক কথা, দেশের সর্ব্বত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের, বস্তুতঃ সর্ব্ব শ্রেণীর হিন্দুর স্ত্রীরা বিধবা হলে তাদের আবার বিয়ে দেওয়া হবে। এ কথা সবাই জানে। সুতরাং আমাদের হত্যা করা হচ্ছে বলেই আমরা মনে করছি। তোমরা সবাই যে কোম্পানীর হুকুম মেনে চল, তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু যদি রাজা অথবা আর কেউ অন্যায় কাজ করে, তবে আর অস্তিত্ব থাকে না।

সেপাইরা তোমাদের চাকর। এদের জাত মারবার জন্যে যে কৌন্সুলী বৈঠক করে স্থির করা হয়েছে যে, মাস্কেট দেওয়া হবে, আর দাঁত দিয়ে কাটবার উপযুক্ত চর্ব্বি-মাখানো কাগজে তৈরী কার্ত্তুজ দেওয়া হবে, সে কথা স্বতঃসিদ্ধ। সেনাপতিকে আমরা একথা জানাতে চাই যে, নতুন মাস্কেট আর কার্ত্তুজ আমরা অনুমোদন করি না। সেপাইরা ওগুলো ব্যবহার করতে পারে না। তোমরা দেশের মালেক, আমাদের সব্বাইকে বরখাস্ত কর, আমরা চলে যাব। ব্রিগেডের দেশী অফিসার, সুবাদার, জমাদার, ৭০ রেজিমেণ্টের সুবাদার মেজর সব খৃষ্টান, ৪৩ রেজিমেণ্ট লাইট ইনফ্যান্‌ট্রির জমাদার ঠাকুর মিশির আর এই দু'জন শূয়ারমুখো ছাড়া ব্রিগেডের আর আর দেশী অফিসার, সুবাদার, জমাদার সবাই ভাল।

এই চিঠি যারই হাতে পড়ুক না কেন সে যেন মেজরকে ঠিক ঠিক পড়ে শোনায়। যদি সে হিন্দু হয়ে এ কাজ না করে, সে লক্ষ গোহত্যার পাতকী হবে। যদি সে মুসলমান হয়ে এ কাজ না করে, সে শূয়ারের মাংস খাবে। যদি সে ইউরোপীয় হয়, সে যেন নেটিভ অফিসারদের এ চিঠি পড়ে শোনায়, যদি না শোনায় তবে সে পাপ করবে, তার গীর্জ্জায় যাওয়া হবে নিষ্ফল।

ঠাকুর মিশির জাত হারিয়েছে। ছত্রীরা তাকে আর সম্মান করবে না। ব্রাহ্মণরা তাকে 'নমস্তে'ও করবে না, আশীর্ব্বাদও করবে না। যদি করে, তবে তারাও লক্ষ গোহত্যার পাতকী হবে। সে চামারের ছেলে। যে ব্রাহ্মণ এ কথা শুনবে, সে যেন তাকে খেতে না দেয়, যদি দেয় তবে সে লক্ষ ব্রহ্মহত্যা ও গোহত্যার পাতকী হবে।

মেজর ম্যাথুজকে যেন এই পত্র দেওয়া হয়। যারই হাতে পড়ুক না কেন সে যদি তাকে না দেয়, তবে হিন্দু হয়ে সে লক্ষ গোহত্যার পাতক করবে, মুসলমান হলে শূয়ার খাবে। যদি কোন অফিসারের হাতে পড়ে—তাকে এ চিঠি দিতেই হবে।

সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত অপ্রকাশিত পত্র

কল্যাণীয়েষু, ২রা নভেম্বর, ১৯১৭

কাল তোমার চিঠি পেলুম। তোমরা এখানে কিছু দিনের জন্যে এলে বেশ হত। ইচ্ছে করো ত এখনও আসতে পারো। আমি আরও দু'হপ্তা এখানে আছি। এখন এখানে সময় চমৎকার হয়েছে। আকাশ পরিষ্কার ও সুনীল, বাতাস শুকনো ও ঠাণ্ডা। প্রথম ক'দিন খালি বৃষ্টি পেয়েছিলুম তাতে মেজাজ মোটেই ভাল ছিল না, কাজেই লেখাপড়াও কিছু করা হয়নি।—

এইবার একটি ফরমায়েসি লেখায় হাত দিতে হবে। রবি বাবু মহাশয় আমার ঘাড়ে একটি কাজ চাপিয়েছেন—সেইটি শেষ করে দেখি যদি সময় থাকে ত একটা গল্প লেখবার চেষ্টা করব। প্রবন্ধ বন্ধ না হলে গল্প লেখা অসম্ভব।—

ভাল কথা ধূর্জ্জটির কোনও খবর জানো? এখানে এসে সবুজ দলের প্রায় সকলের কাছ থেকেই চিঠি পেয়েছি এক ধূর্জ্জটি ছাড়া। সম্ভবত Defence force তাকে গ্রাস করেছে। যা হোক, যদি পারো ত তার খোঁজ নিয়ে আমাকে জানিয়ো। আজ এই পর্য্যন্ত, আরও অনেক চিঠি লেখবার আছে। তোমাদের এখানে আসার আশা এখনও ছাড়লুম না। ইতি—

(স্বাক্ষর) শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী
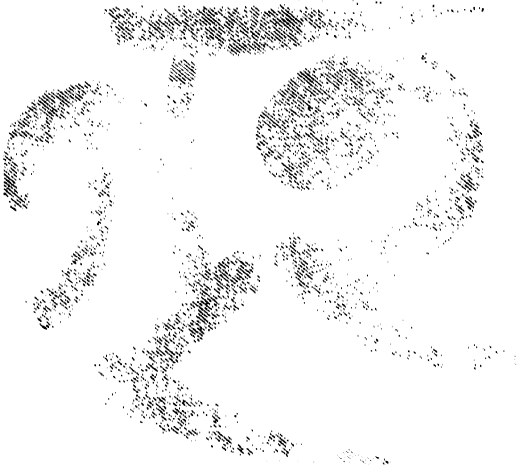
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১

তোমার উকিল আছে?

কোমর থেকে দড়ি আর হাত থেকে হাত-কড়া খুলে নিল কনস্টেবল। খাঁচায় গিয়ে দাঁড়াল মোজাহার। কর-জোড়ে বললে, গরিবগুর্বো লোক, উকিল পাব কোথায়?

চার্জ পড়ে শোনালেন পাবলিক-প্রসিকিউটর। বলো, দোষী না নির্দোষ?

নির্দোষ। আমি বিচার চাই।

একে-একে পাঁচ জনকে ডেকে নিয়ে তৈরি হল জুরি। পি-পি ঘটনার বর্ণনা শুরু করলেন—

তার পর সালিশ বসল।

এর আবার সালিশ কি। সালিশের কী দরকার।

এমনিতেই একটা ছেলের অসুখ করলে মুখ কালো হয়ে যায়। হাতে-রথে বল থাকে না। ছেলের অসুখ করেছে, ডাক্তার-বদ্যি করেও ভালো করতে পারছি না, মনে হয় কত যেন অপরাধ করেছি সংসারের কাছে! তার পর ছেলে যদি মারা পড়ে, তবে কি ছেলের জন্যে কাঁদি? কাঁদি নিজের প্রতি ঘৃণায়। নিজের হেরে-যাওয়ায়। কাউকে মুখ দেখাতে ইচ্ছে করে না।

এ তো আর কিছু নয়, কাটা ঘায়ে নুন বুলোনো। থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেওয়া।

মাওলা বক্স বললে, তুমি বুঝছ না। সালিশ হলেই ওকে গাঁ থেকে তাড়ানো সহজ হবে।

কাকে? আঁতকে উঠেছিল মোজাহার।

আর কাকে! সদরালিকে। সাত দিনের সময় দেব। চলে যাবে দেশ ছেড়ে। তখন থাকতে পাবে শান্তিতে। জঙ্গল কাটবার সময় বাঘের ভয়ে থাকতে হবে না টোঙের উপর।

চল। মোড়ল-মাতব্বরের ফরমান। পঞ্চ ভদ্রের মীমাংসা। সমাজের সম্মানী লোকদের মানতে হয়। সকলের বলেই একলার বল।

বেশ তো, করো না তোমরা সভা। যাকে তাড়াবার তাকে তাড়িয়ে দাও চুনকালি মাখিয়ে। আমাকে ডাকো কেন? আমি তো কোনো অপরাধ করিনি।

বা, তা কি হয়? তোমার নালিশ, আর তুমি থাকবে না দশ-সালিশে? বাদীর অভাবে কি মামলা চলে?

নালিশ তো আমার একলার নয়। নালিশ তো শহরবানুরও।

আহা, সে পর্দার বিবি। সে কেন আসবে? পর্দার বাইরে তাকে নিয়ে যেতে চাইলেই তো সে আর বেপর্দা হয়ে যায়নি।

তার মানে, মোজাহার দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তুমি একা গিয়ে দাঁড়াও। মার-খাওয়া ভিখিরির মত। মুখ কালো করে চেয়ে থাকো। পাঁচ জনের খোঁচা-খোঁচা কৌতূহল মেটাবার জন্যে বলো সব কেচ্ছাকাহিনী। বলো কেমন টোকা মারত বেড়ার গায়ে। কেমন গান ধরত, 'মা আমার দে না বিয়ে সাধের যৈবন ভেসে যায়।' হাট থেকে কেমন কিনে আনত রেশমি চুড়ি, পুঁতির মালা, কখনো বা এক শিশি সুশীল-মালতী—সেদিন তো একেবারে আস্ত-মস্ত শাড়ি একখানা। নকসি-পেড়ে নীলাম্বরী। কত বারণ করেছে মোজাহার, কানেও তোলেনি শহরবানু। বলো সে সব অক্ষমতার কথা। তোমার গরিবানার কথা। বলো তুমি বুড়ো, তুমি অথর্ব, ঘাটের পাড়ের পচা খুঁটি। রঙ্গিলা পালের নাও এবার ছেড়ে দাও স্রোতের টানে।

বললেই হল? বারো বছর ঘর করেছি। চাষী জমি হোক, ঘাসী জমি হোক, নুনে-ভাতে লঙ্কায়-পান্তায় বশ রেখেছি এত দিন। বশ রেখেছি বাহুবলে। বুকজোড়া ভালোবাসায়। তিন-তিনটে ছেলে ধরেছে পেটে। কোব্বাত, জিন্নাত আর বিল্লাত। ছোটটা মোটে ছ বছরের। ছেড়ে গেলেই হল? ঘর তুলেছি ওর জন্যে, মাটি কেটেছি, গাছ লাগিয়েছি। হোলই বা না খড়ের ঘর, বাঁশের বেড়া, তাতেই সাত রাজার ধন এক মাণিকের রাজত্ব। আমার মটুক দিয়ে কি হবে যদি মালা পাই, বিবি দিয়ে কি হবে যদি বউ পাই মনের মত।

কোনো দিন মন্দ-ছন্দ কইনি। উঁচু রা করিনি। হাত তুলিনি। তবু, ওর কী দোষ? অত বিরক্ত করলে কে থাকতে পারে মন মজিয়ে? বারে-বারে আকাশ দেখালে পাখির কী দোষ! জানা বাসার চেয়ে অজানা বিদেশ বুঝি বেশি মনোহর!

নদীর ঘাটের কাছাকাছি গিয়ে ধরা পড়ল। গ্রাম-রক্ষীর দল শহরবানুকে পৌছে দিল ঘরে। ও যে ফের ঘরে ফিরেছে তাইতেই মোজাহারের ফুর্তি। শুধু-পাওয়ার চেয়ে ফিরে-পাওয়ায় বুঝি বেশি ঝাঁজ।

ঘাট মেনেছে শহরবানু। নাকে-কানে খত দিয়েছে।

কসম খেয়ে বলেছে যাবে না আর চৌকাঠ ডিঙিয়ে। এতেই মোজাহারের শান্তি। মোজাহারের দিলাসা।

'তোমরা ওটাকে গাঁয়ের বার করে দিতে পারো না?' শহরবানুও ঝামটা মারল: 'ওই তো যত নষ্টের গোড়া। পরের বাড়ির দোর ধরে বসে থাকে। তুমি কী করতে সোয়ামী হয়েছ! গায়ের রক্ত গরম হয় না তোমার? মেরে তুলো ধুনে দিতে পারো না বে-আক্কেলের?'

সত্যিই তো। প্রতিকার তো স্বামীই করবে। তারই তো দায় স্ত্রীকে কবজায় রাখা। কেউ যদি সেই অধিকারে দাঁত বসায়, আইন তো তাকেই সাজা দেয়, দুর্বল মেয়েটাকে নয়।

তবে তাই হোক। সালিশই হোক। অম্র মণ্ডল আছে, গগন চাপরাশি আছে, আছে হাফেজ কবিরাজ। আলিম মুন্সি। সুরাহা একটা হবেই।

আমার মুখ কালো হয় তো হোক। কিন্তু ওর মুখে যেন রোদ ওঠে।

রায় দিল সালিশ। শহরবানু ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে ঘরের ঘেরাটোপে। মোজাহার নেবে তাকে ধুয়ে-মুছে। আর, সাত দিনের ওয়াদা, সদরালি চলে যাবে গাঁ ছেড়ে, বেপাত্তা হয়ে।

সাত দিন কেন? গর্জে উঠল সদরালি: আজ, এখুনি, এই দণ্ডে চলে যাব। আর, একা যাব না। সঙ্গে নিয়ে যাব শহরবানুকে।

সত্যি-সত্যিই সে ডাক দিল। আর, চাঁদ দেখে জোয়ারের জল যেমন করে তেমনি করে ছুটে এল শহরবানু। এক বস্ত্রে। এলোচুলে। গা ঘেঁষে দাঁড়াল সদরালির।

মুহূর্তে কী হয়ে গেল মোজাহারের কে বলবে। উঠোনে পড়ে ছিল একটা বাঁশের মুগুর, তাই তুলে নিয়ে বসালে এক ঘা। এক ঘা-এর উত্তেজনায় আরো কয়েক ঘা পড়ল পর পর।

লুটিয়ে পড়ল শহরবানু। মাথা ফেটে রক্ত ছুটল ফিনকি দিয়ে। দেখতে-দেখতে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

প্রথম সাক্ষী অম্র মণ্ডল। যারা সালিশে বসেছিল তাদের যে প্রধান। অকু প্রায় তাদের চোখের সামনেই ঘটেছে। তারা সব স্বাধীন সাক্ষী।

বলো কি ঘটেছে। কি দেখেছ নিজের চোখে। উচিত-অনুচিতের কথা নয়, ধর্মাধর্মের কথা নয়, আইন প্রত্যক্ষের কারবারী। সেই প্রত্যক্ষের খবর বলো।

যা ঘটেছে হলফান বলে গেল অম্র মণ্ডল।

হাকিম জিগগেস করলেন মোজাহারকে, 'কি, কিছু জিগগেস করবে?'

একবার বাঁকা চোখে তাকাল মোজাহার। এই সব সত্যি ঘটনা? আর কিছু নয়? কিন্তু কি ভেবে চোখ নামিয়ে বললে, না।

দশ-সালিশের লোকেরা কাঠ-বাক্সে উঠতে লাগল পর-পর।

জেরা নেই, তবু মূল জবানবন্দিতেই হল কিছু গরমিল। কেউ বললে, বাঁশের মুগুর নয়, কাঠের হুড়কো দিয়ে মেরেছে। কেউ বললে, কে যে মেরেছে বলা শক্ত—সদরালি আর মোজাহারে লেগেছিল হুড়দঙ্গল, দু'জনের হাতেই বাঁশের ডাণ্ডা, শহরবানু ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মাঝখানে, কার ডাণ্ডা মাথায় পড়েছে দেখিনি ঠাহর করে। আরেক জন তো স্পষ্টই বললে, সদরালিই হয়তো মেরেছে ব্রহ্মতালুতে।

'জেরা করবে কিছু?'

'কিছু না। কাউকে না।' আওয়াজে এতটুকু উৎসাহ নেই মোজাহারের: 'যে যেমন বলতে চায় বলুক।'

আশ্চর্য, সদরালিও সাক্ষী দেবে?

কেন দেবে না? সত্যি তো সত্যিই। তার কাছে ন্যায় নেই, নীতি নেই। কী ঘটলে ভালো হত তার চেয়ে যা ঘটেছে তাই বেশী দামী।

দিব্যি বলে গেল মুখ ফুটে।

হ্যাঁ, নিয়ে গিয়েছিলাম বের করে। কোনো জোর ছিল না জোচ্চুরি ছিল না, দিনের আলোয় সবার নাকের উপর দিয়ে নিয়ে গেলাম। আইনের চোখে দোষ ধরতে শুধু পুরুষের। মেয়েদের কি আর দোষ হয়? কিন্তু মেয়ে না পা বাড়ালে পথও যে পা বাড়ায় না কিন্তু আটকালো রক্ষী লক্ষ্মীছাড়ারা। পুলিশচালানী কেস হতে পারল না, শহরবানু সাবালিকা আর সে নিজের ইচ্ছেয় বেরিয়েছে—

শ্রান্ত হয়ে কখন বসে পড়েছিল খাঁচার মধ্যে। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল মোজাহার। ইচ্ছে করে বেরিয়েছে? জানা ঘর ছেড়ে অজানা পথ কখনো বড় হয়? পুরোনো পুরুষের চেয়ে নতুন বিদেশী বেশি লোভের? কিছু একটা বলবার জন্যে হুঙ্কার দিয়ে উঠল মোজাহার।

পি-পি বললেন, 'এখন নয়, জেরার সময় জিগগেস করো যা খুশি।'

তাই সালিশ বসাল গাঁয়ের মাথারা। জবানবন্দির জের টানল সদরালি। ফয়সালা হল, শহরবানু ফিরে যাবে তার স্বামীর কাছে। আর আমি সাত দিনের মধ্যে বাস তুলে নেব গাঁ থেকে। দু-কানকাটার আবার ভয় কি। সে যাবে গাঁয়ের মধ্যিখান দিয়ে। সাত দিনের টালমাটাল কেন? এক্ষুনি, এই দণ্ডে, চক্ষের পলক পড়তে-না-পড়তে চলে যাব। কিন্তু খালি হাতে নয়। সঙ্গে করে নিয়ে যাব শহরবানুকে।

শহর! হাঁক দিলাম উঁচু গলায়। চললাম দেশ ছেড়ে। সীমা ছেড়ে। অন্ত ছেড়ে। সঙ্গে যাবে তো চলে এস এই দণ্ডে।

সত্যি-সত্যি চলে এল। সে কি আমি ডেকেছি, না, আর কেউ ডেকেছে? আর কেউ ডেকেছে। যে ডেকেছে তার নাম মরণ।

ঘর থেকে বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গেই ছুটে এল মোজাহার। হাতে বাঁশের মুগুর। এখনো সেই মুগুরে রক্তের দাগ ও

লম্বা কালো চুলের গুছি লেগে আছে। পিছন থেকে শহরবানুর মাথায় বসিয়ে দিল এক ঘা—

মিথ্যে কথা। উকিল লাগাতে পারলে মামলা ঠিক ঘুরিয়ে দিতে পারত। মিথ্যে কথা। সালিশের মীমাংসা মেনে শহরবানু ফের যখন স্বামীর ঘরে গিয়ে ঢুকল সেই থেকেই তুমি ক্ষেপে গিয়েছ। সাত দিনে গাঁ-ছাড়া হওয়ার চেয়ে তা কঠিনতরো অপমান। তাই তুমি প্রতিশোধ নেবার জন্যে শহরের মাথায় লাঠি মারলে। কিংবা, জোর করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে ফের, স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে তিন ছেলের মুখের দিকে চেয়ে সে 'না' করে দিলে। আর অমনি মাথায় তোমার খুন চাপল।

দাঁড়াও, জেরা আছে। জেরায় ইঙ্গিত দেওয়া চলবে। ইঙ্গিত না টিকলেও সেই কারণে আসামী দোষী বনবে না। সবল স্বাধীন সম্পূর্ণ প্রমাণ চাই। সঙ্গত সন্দেহের অতীত যে প্রমাণ।

'কি, জেরা করবে?' পি-পি প্রশ্ন করলেন।

দাঁড়িয়ে ছিল, আস্তে-আস্তে বসে পড়ল মোজাহার। শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। না, জেরা করে কি হবে! জেরা করার আছে কি!

সুরতহাল তদন্ত করেছিল যে ইনস্পেকটর সে এল। লাশ যে সনাক্ত করেছে এল সে কনষ্টেবল। ময়না-তদন্ত করে রিপোর্ট দিয়েছে যে ডাক্তার সেও হলফ নিলে।

তার পর এল, আর কেউ নয়, কোব্বাত। দশ-বারো বছরের সরল শিশু।

ও মা, তুইও সাক্ষী দিবি? বলবি বাপের বিরুদ্ধে?

কার বিরুদ্ধে সেইটে কথা নয়। কথা হচ্ছে সত্যের স্বপক্ষে বলছি। বলছি সমাজের স্বপক্ষে।

কিন্তু ও-ছেলে জানে কি সাক্ষী দেওয়ার? পুলিশ যা শিখিয়ে দেবে তাই বলবে বুঝি? তা কেন? যা ঘটেছে যা দেখেছে তাই ঠিক-ঠিক বলবে। এতটুকু নড়চড় হবে না।

আশ্চর্য, ঠিক-ঠিক বললে কোব্বাত। এতটুকু ভয় পেল না, গলা শুকিয়ে গেল না কাঠ হয়ে। সদরালির সঙ্গে চলে যাবার জন্যে মা বেরিয়ে আসতেই বাঁজান মাথায় দিলে এক মুগুরের বাড়ি। শুধু কি একটা? পর-পর অনেকগুলি—মাথা ফেটে রক্ত বেরুল ফিনিক দিয়ে। মা পড়ে গেল মাটির উপর—

'আমি জেরা করব।' উঠে দাঁড়াল মোজাহার।

পিতার সুপুত্র তুমি, বাপকে জেলে না পাঠালে তোমার সুখ নেই।

গলা-থাখরে জিগগেস করল মোজাহার: 'কেমন আছিস?'

বাপের দিকে চাইল একবার করুণ চোখে। গলা নামিয়ে বললে, 'ভালো আছি।'

'জিন্নাত কেমন আছে?'

'ভালো।'

'আর বিল্লাত? কার কাছে শোয়? কাঁদাকাটি করে নাকি রাত্তিরে?'

হাকিম হুমকে উঠলেন: 'এ সব জেরা চলবে না। ঘটনার সম্বন্ধে কিছু জিগগেস করবার থাকে তো করো।'

মোজাহার ঢোঁক গিলল। বললে, 'কে রান্না করে দেয় তোদের?'

হাকিম ধমক দিলেন কোব্বাতকে: 'উত্তর দিও না।'

'খোরাকি পাস কোথায়? ঘরে কি কিছু ছিল ধান-চাল?'

কোব্বাতের মুখে কথা নেই।

'মাটি দেবার আগে গা থেকে জেওর কখানা খুলে রাখতে পেরেছিলি? ঘরে আছে যে শাড়ি-কাঁচুলি আয়না-কাকই ফিতে-কাঁটা নেয়নি তো চোরে-ডাকাতে? ঘর ছাইবার যে খড় কিনেছিলাম উঠোনে পচছে পড়ে-পড়ে?'

পি-পিও এবার হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। বসে পড়ল মোজাহার।

কোব্বাত নেমে গেল। বসল শত্রুদলের সাক্ষীর এলেকায়। বসল পর হয়ে।

এবার তুমি এস। তোমার জবানবন্দি চাই। সাক্ষ্য-প্রমাণ সব শুনেছ, বলো, তোমার কী বলবার আছে।

মোজাহারের আর কিছুই বলবার নেই। হুজুর, আমি নির্দোষ।

সাফাইসাক্ষী আছে কিছু?

না।

আবার ফিরে গেল খাঁচায়।

সরকারী উকিল সওয়াল শুরু করলেন। এ মামলায় বেশি কিছু বক্তৃতা করবার নেই। প্রথম দেখুন শহরবানু খুন হয়েছে কিনা। আর খুন যদি হয়ে থাকে, মোজাহার করেছে কিনা। দুইই একেবারে প্রমাণ হয়েছে কাঁটায়-কাঁটায়। সাক্ষ্যবাক্য সব একতরফা। এদিক-ওদিক যেটুকু গরমিল হয়েছে, তা খুঁটিনাটি ব্যাপারে। সে সব উপেক্ষার যোগ্য। শাখা-পাতা ছেড়ে দিয়ে দেখুন মূল-কাণ্ড ঠিক আছে কিনা। তা যদি থাকে আপনাদের সিদ্ধান্ত দ্বিধাহীন।

এবার জুরিদের বোঝাতে বসলেন হাকিম। আইনের ব্যাখ্যা, ঘটনার বিশ্লেষণ। গোড়াতেই জেনে রাখুন আপনারাই চূড়ান্ত বিচারক। প্রমাণের ভার সরকার পক্ষের। প্রমাণ কাকে বলে? আপনাদের কাছে যা বিশ্বাস্য আইনেই তা প্রমাণিত; আসামীর পক্ষে উকিল নেই তাই বিশেষ সতর্ক হবেন। কিন্তু সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও যদি বিশ্বাস করেন মোজাহারই মেরেছে তার স্ত্রীকে, তা হলে দোষী বলতে দ্বিরুক্তি করবেন না। এখন দেখুন, অবিশ্বাস করবার কি কোন কারণ আছে? যদি বোঝেন মতলব করে ভেবে-চিন্তে মেরেছে তবে এক রকম শাস্তি, আর যদি বোঝেন ঝোঁকের মাথায় হলেও পরিণামে কি হতে পারে জেনে-শুনে মেরেছে তবে আরেক রকম শাস্তি—

কোর্ট-ঘর লোকে লোকারণ্য।

ঝাড়া দেড় ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা করলেন হাকিম।

জুরিদের কেউ ঘুমুচ্ছে কেউ হাই তুলছে কেউ বা কাগজে হিজিবিজি আঁকছে নয়তো বিলের অঙ্ক কষছে।

জুরিরা বেশি বোঝে। তাদের জন্য ভাবনা নেই। আইনে যা করণীয় তাই করে যাও।

'যান আপনাদের সিদ্ধান্ত এনে দিন আমাকে। যদি পারেন তো একমত হোন।' জুরিদের ছুটি দিলেন হাকিম।

এতক্ষণ হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে ছিল মোক্তাহার, এবার, জুরিরা চলে গেলে ভেঙে পড়ে কাঁদতে বসল।

একবার তাকাল চারদিকে। কাউকে ধরবার-আঁকড়াবার নেই। কোব্বাতের মুখখানিও কোথায় হারিয়ে গেছে।

অনেক প্রতীক্ষার পর এল আবার পঞ্চ জন। পঞ্চ জুরি।

'আপনারা একমত?' জিগগেস করলেন হাকিম।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কি আপনাদের সিদ্ধান্ত?'

'নির্দোষ।'

একটা স্তব্ধতার বজ্র পড়ল ঘরের মধ্যে। পি-পিতে আর হাকিমে একবার চোখ-চাওয়াচাওয়ি হয়ে গেল। যে ইনস্পেকটরের হাতে তদন্তের ভার ছিল সে হাত রাখল কপালে।

রায় দিলেন হাকিম। জুরিদের সঙ্গে একমত হলেন। যাও, জুরিবাবুরা তোমাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করেছেন। তুমি খালাস।

খাঁচা থেকে নেমে এল মোক্তাহার। উন্মুখ দড়ি আর হাতকড়ার ঘের বাঁচিয়ে। কনষ্টেবলরা সসম্মানে পথ ছেড়ে দিল।

কিন্তু কোর্টের সামনে বারান্দায় এসে ফের ভেঙে পড়ল মোক্তাহার। কাঁদতে লাগল শিশুর মত। এক শিশু নয়, তিন-তিন শিশুর কান্না।

ভিড় জমে গেল। কাঁদবার কী হয়েছে! কেউ-কেউ বললে, আসলে যে কি হুকুম হল বুঝতে পারেনি ঠিক মত।

স্বয়ং পি-পি এসে দাঁড়ালেন কাছে। ও কি, কাঁদছ কেন? ন্যায়বিচারে ছাড়া পেয়ে গেছ। আর কোনো ভাবনা নেই। ঘরে চলে যাও এবার।

যেন কোথায় ঘর এমনি উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকাল একবার চার দিকে। পি-পির দু'পা আঁকড়ে ধরে বললে, আপনি তো সব জানেন, কিন্তু বলুন তো আমি কাকে মেরেছি? শহরবানুকে না সদরালিকে?

কাকে মারতে কাকে?

গাঁয়ের মাটির গান

শ্রীশান্তি পাল

বাংলা দেশের আমরা ঘরামী।
বন-বাদাড়ে বসত গড়ি
নই আয়েসী আরামী।
শক্ত ভুঁইয়ে চালাই গাঁতি,
গাবড় খুঁড়ে বসেদ গাঁথি,
গাড্‌দালিতে ধরিয়ে মাটি—
ভরাই খোল-খামি।
ও ভাই, আমরা ঘরামী!
যোগালে যায় যোগান দিয়ে,
চাপ-কেটে দেয় উলুটিয়ে;
খোড়োটি আর পেঁশোটি দে'
তিন ছোপে থামি।
ও ভাই, আমরা ঘরামী।
তীর, মোদম, শাল, তালের কাঁড়ি,
শিবের খুঁটি, সাঁড়ক ভারি,
এক নিমেষে ওঠাই কাঁধে
একটু না থামি।
ও ভাই, আমরা ঘরামী!

ছিটে-বেড়ার, তালের ঘরে,
নাদনা, আড়া, কোণাচ 'পরে,
সাট-ভাটি দে' বসাই পাড়ে—
গোড় বেঁধে নামি।
ও ভাই, আমরা ঘরামী!
তল-গিরিও তলায় ব'সে,
বাক-বাখারি সলায় ঘষে,
ভিজিয়ে খড়ে দেয় রে হাতে—
বাড়ুইয়ে কামী।
ও ভাই, আমরা ঘরামী!
পোড়া-মাটির কে চায় কোঠা,
বেজায় দড় উবীর খোঁটা,
ন্যাপা-পোঁছা মেটে ঘরই
পল্লীতে দামী।
ও ভাই, আমরা ঘরামী!
সুধার সোয়াদ পাই রে গাঁয়ে,
কুঁড়ের কোলে, পোয়াল ছায়ে,
চাই নে মরাই, মা-লক্ষ্মী দিন—
ভক্তি চালের ধামী।
ও ভাই, আমরা ঘরামী!

খেয়াল খাতা

মহারাণী শ্রীমতী সুরীতি ঠাকুর সংগৃহীত

বন্দে মাতরম্

—শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কালীর আঁচড়

দানের মতন নাহি কোন ধন যা'দের জীবন খাতায়
তা'দের লিখন কি বা প্রয়োজন কাগজের সাদা পাতায়
কারো কোন লাভ নাহি তা'য় মোটে
কালির কালিমা শুধু বেড়ে ওঠে,
শুধু তাই নয়, কলঙ্ক ভয় জাগে লেখকের মাথায়।

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

কত জীবনের কত গল্পই ত' লিখলাম, জীবন তবু আমার কাছে হেঁয়ালীই রয়ে গেল। —শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

আলো যদি মুছে যায়, মুছিবে তো কালি
নির্ভয়ে এ মুহূর্তের দীপ তাই জ্বালি।

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

ব'লতে পারো কিসের জোরে
হাতের লেখা রাখবে ধ'রে?— শ্রীনরেন্দ্র দেব

অভিজ্ঞতার ইতিহাসগুলো হচ্ছে বোকামীর ইতিবৃত্ত।

—প্রবোধকুমার সান্যাল

নাই কিছুই
ছায়ায় মিলায়, যাহাই ছুঁই
নাই কিছুই।
কোথায় দুঃখ, নেয় কে দীক্ষা
প্রতীকার নাই, নাই প্রতীক্ষা
শুধুই উন্মাদনা
ক্ষণ-সমুদ্র, তুলিছে রুদ্র
লেলিহ ফেনিল ফণা।—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'দাও, আমাকে দাও,
আমার রাজত্ব, আমার শক্তি, আমার মহিমা,
কেবল দিনের অন্ন নয়।' (D. H. Lawrence)

—বুদ্ধদেব বসু

আমার সব চেয়ে ভাল লাগে, আকাশে তারা, বাতায়নে প্রদীপ আর মাঝখানে তাদের কম্পনে কম্পমান নিশীথ অন্ধকার। —শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

জীবনের পূর্ণহাটে শূন্যহাতে যেয়ো ফিরে—তবু
সুন্দরের অর্ঘ্যভার সামান্যেরে অর্পিয়ো না কভু।

—শ্রীরাধারাণী দেবী

প্রার্থনা

তব চির চরণে দাও শরণাগতি।
আনো ধরিতে বনে ওগো ফুল-সারথি।
আমি চাহি গভীরে তব অকূল স্বনে
বরি' তুফান-তীরে তব তারা-স্বপনে।
তুমি জানো তো প্রিয়, মম প্রাণ-দুরাশা
যাচি শুধু অমিয় তাই বহি পিপাসা।
এসো ছায়া-পাথারে দলি' মায়া-আঁধারে
সহ দুরভিসারে তব দুখ-বরণে।

—দিলীপকুমার

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব নিন্দা তারে যেন তৃণসম দহে।"

—শ্রীসীতা দেবী

ঈশ্বর, স্বদেশ আর বান্ধবের কাছে নিত্য তুমি ভাই,
সত্য থেক মনে-প্রাণে, হয়ো না কপট দোহাই, দোহাই।

—শ্রীসুনির্মল বসু

Wish you all that is best in life.

—Aruna Asaf Ali

বাসা শুধু বাঁধা হয় ভাঙনের মুখে
ভাঙা-গড়া চলে তবু সুখে আর দুখে।

—শ্রীঅসিতকুমার হালদার

"Silence is Golden."—Carlyle.

—শ্রীশান্তা দেবী

'Jai Hind'

In this struggle for our freedom, our duty is to fight on. It is immeterial how many of us shall think is that "I N D I A must live."

—Shah Nawaz Khan
Major-General

সে তার বাজেনি এখনও মোর সেতারে !!!

—রবিশঙ্কর

প্রভু, তোমার চরণতলে
ঠাঁই দিউ মোরে,
ঠাঁই দিউ।

—আলী আকবর খাঁ

—ভ্রম-সংশোধন—

বিগত বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'খেয়াল-খাতা'য় মুদ্রণপ্রমাদ হেতু দুটি বিশেষ ভ্রম থাকিয়া যায়। শ্রীযদুনাথ সরকার লিখিত "আমাদের জাতীয়-জীবনের নবজাগরণের দিনে যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর অমূল্য দান করিয়া গিয়াছিলেন" পঙক্তিতে "যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর" হইবে। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতাটি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া প্রকাশিত হওয়ায় উক্ত কবিতাটি সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত হইল।

চীন দেখে এলাম

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু

ছুটি, ছুটি! তারিখটা ৮ই অক্টোবর। আট-আটটা দিন একটানা কনফারেন্স হল, তাই বুঝি করুণা করে কর্তারা বিকেলটা মাপ করেছেন। রাত ন'টায় সাংস্কৃতিক কমিশন—তাক বুঝে গা-ঢাকা দিলে ওটাও ফাঁক কাটানো যাবে। খানাঘরের ক্রিয়া জবর রকমে সমাধা করে মনের স্ফূর্তিতে লেপ মুড়ি দিয়েছি। ডবল খিল লাগাও ক্ষিতীশ-ভায়া, ছোঁড়াছুঁড়িগুলো দুয়োর ভেঙে ফেললেও চারটের আগে সাড়া দিচ্ছি নে।

হায় রে কপাল! এ বিজ্ঞান-যুগে দুয়োরে খিল দিয়ে শত্রু ঠেকানো যায় না, ঘরের মধ্যে শিয়রের পাশেও শত্রু ওৎ পেতে থাকে। মনোরম আমেজ এসেছে, আর অমনি ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং—। হাত বাড়িয়ে ফোনের মুখ চেপে ধরব, কিন্তু শীতের দুপুরে লেপের তলা থেকে হাত বের করা চাট্টি কথা নয়। লড়াইয়ের তা-বড় তা-বড় যোদ্ধাও হার খেয়ে যান।

তোমার ফোন ক্ষিতীশ, কোন গাইয়ে বন্ধু ডাকছে—

উঁহু, আপনার—

বেশ খানিকটা ঠেলাঠেলি চলল দু'জনে। নাছোড়বান্দা ফোন বেজেই চলেছে। অগত্যা রিসিভার কানে তুলে বেজার মুখে ক্ষিতীশ বলে, বললাম তা কানে নিলেন না। আপনারই।

চালাকি করে স্বপতন্ত্র। ভাঙলে আজ খুনোখুনি হয়ে যেতো। ফোন আমারই বটে! পরাঞ্জপে বলছেন ভারতীয় দূতাবাস থেকে। আজ সন্ধ্যায় সময় আছে আপনার? তাহলে যাই ওখানে।

যান মশায়, আরও দু'দিন এমনি বলেছেন। হা-পিত্যেশ বসে রইলাম, মশায়ের টিকি দর্শন হল না। সামান্য ক'দিন আছি—যদ্দূর পারি দেখে শুনে যাবো, তার মধ্যে দু-দুটো সন্ধ্যের ঘণ্টা দুই নষ্ট করে দিয়েছেন আপনি।

আজকে নির্ঘাৎ। রাত্তির বেলাটা একেবারে ফাঁক করে নিয়েছি। দেদার গল্প—কত শুনবেন? আসছি তাহলে বিস্তু—সাড়ে-ছয় থেকে সাতের মধ্যে।

উঠতেই যখন হল, আর লেপ নয়—ওভারকোট গায়ে চাপানো যাক। ওঠো ক্ষিতীশ, বেরিয়ে পড়ি। আজকে এক কাজ হোক—কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ নয়, যে দিকে দুটো পা নিয়ে যায়—

কিন্তু হবার জো আছে? লনে দেখি ভারী এক দল। সুবোধ বন্দ্যো আছেন—আর অনেকগুলি চীনা বন্ধু।

কোথায়?

চলুন না। হাঙ্গেরির একজিবিসন হচ্ছে। কর্মীদের সাংস্কৃতিক প্রাসাদও (Working Peoples' Palace of Culture) দেখে আসা যাবে অমনি।

চীনা বন্ধু বলেন, দাঁড়ান—গাড়ির কথা বলে আসি।

আজ্ঞে না। বিশ্বাস করুন, পা নামক এক প্রকার অঙ্গ আছে আমাদের। আমরাও কিঞ্চিৎ হাঁটতে পারি। কিন্তু যা গতিক, অব্যবহারে যন্ত্রটাকে বিকল না করে দিয়ে আপনারা ছাড়বেন না।

ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন। ততক্ষণে নেমে পড়েছি, দ্রুত পায়ে যাচ্ছি। চৌরঙ্গির মতো সুপ্রশস্ত পথ। পথের ধারে গাছ-পালা—ছায়ায় ছায়ায় দিব্যি চলেছি। এক সংস্কৃতের পণ্ডিত দলে জুটেছেন। পণ্ডিত বলতে যে রকমটা আন্দাজ করছেন, তা নয় মোটে। ছোকরা-ছোকরা চেহারা—মুখ-ভরা হাসি। অথচ পড়ান তিনি য়ুনিভার্সিটিতে, এবং গীতা-উপনিষদের আধাআধি তাঁর মুখাগ্রে।

পণ্ডিত এক কাণ্ড করে বসলেন। কি লজ্জা, কি লজ্জা! অনেকেই খেয়াল করেনি এই রক্ষা। আমার নজরে পড়ল। ধরণী দ্বিধা হলেন না, নিবিঘ্নে তাই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। সিগারেট খাচ্ছিলেন আমাদের একজন—গল্প করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে সিগারেটের গোড়াটুকু ফেলে দিয়েছেন পথে। পণ্ডিত আমাদের দিকে আড়চোখে চেয়ে সেই মহামূল্য বস্তু নিচু হয়ে তুলে নিলেন। হাতের মুঠোয় নিয়ে চলেছেন—তার পর ডাষ্টবিনের কাছে এসে
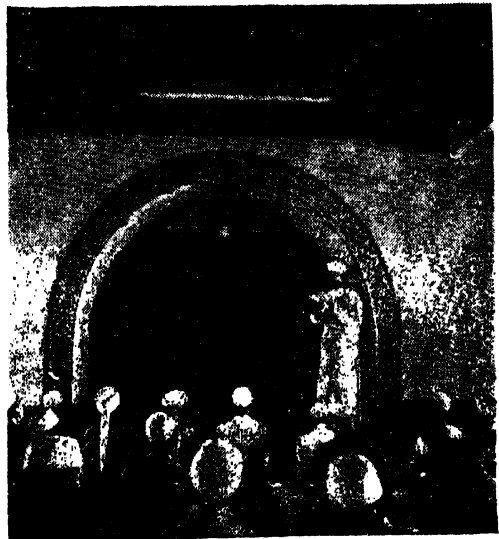
পিকিন মসজিদে ধার্মিক মুসলমানেরা

তার মধ্যে ফেলে দিলেন। পণ্ডিতমানুষ হলে কি হবে—জাতে চীনা! অন্তের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে নিতে তাই বাধল না। কিন্তু এ ভারি বিপদ তো! সর্বজ্ঞ বন্ধুরা বলে থাকেন, ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই নাকি ওদেশে। তা পোড়া-সিগারেটটুকুও পথে ফেলা যায় না—স্বাধীনতা তবে আর রইল কোথায় বলুন?

তিয়েন-আন-মেনের তলা দিয়ে নিষিদ্ধ-শহরে সোজা ঢুকে পড়লাম। সেকাল হলে—ওরে বাবা, চোখ তুলে এদিকে তাকাবারই তাকত হত না কারো! ছায়াচ্ছন্ন বেশ খানিকটা জায়গা। সেটা পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে এক বড় ঘরে এসে পড়লাম। ঘরের ভিতর দিয়ে পথ—ঘরে না ঢুকে আনাচ-কানাচ দিয়ে যে ওদিকে যাবেন, সে উপায় নেই। ঘর ছাড়িয়ে উঠোন—পাথরে বাঁধানো। সারা উঠোন ভরতি দৈত্যদানোর মতো যন্ত্রপাতি। রেল-ইঞ্জিন, ট্রাক্টর, মোটরকার—কোন্ বস্তু যে নেই, বলতে পারব না।

ভারতের মানুষ? আচ্ছা, কি ভাগ্যি, আসুন—আসুন—! তাই দেখলাম, বাইরের ভুবনে বিস্তর ইজ্জত আমাদের। খাতির পেয়ে পেয়ে মাথা প্রায় আকাশ-ছোঁয়ার দাখিল হয়েছিল। ঐ এখন বদভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। দেশে ফিরেও খাড়া মাথা আর নিচু হতে চাচ্ছে না।

উঠোনের দেখাশুনো শেষ হলে সামনের ও ডান দিককার ঘরগুলোয় নিয়ে চলল। কত রকম যন্ত্রপাতি বানিয়েছে রে ঐটুকু দেশ হাঙ্গেরি! হাসতে হাসতে বলে, চাই তোমাদের? তা হলে বলো। চাওয়া না-চাওয়ার মালিক যেন আমরা! হাসি থামিয়ে তার পর বলল, সত্যি, খদ্দের খুঁজছি আমরা। যাদের নেই, তাদের জোগান দিতে পারি।

শুধু ঐ যন্ত্রপাতি? চাষবাস ও ঘরোয়া শিল্পে কত উন্নতি করেছে—থরে থরে তার নমুনা সাজানো। সমস্ত ঘর ঘুরিয়ে তবু ছেড়ে দেবে না। তাই কি হয় মশায়, খেয়ে যান কিছু। খাবার দাবারও খাস হাঙ্গেরির আমদানি—এখানকার একটি জিনিষ নয়।

পাকড়াও করে নিয়ে বসাল একটা ঘরে। রকমারি মদ—ও-বস্তু আমার চলবে না। আচ্ছা, আরও আছে—টিনের মাংস, চকোলেট, কফি—কি বলবেন এবারে শুনি! এটা-ওটা অগত্যা মুখে ফেলে, চিত্রবিচিত্র ভারী এক এক ক্যাটালগ বগলদাবায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

এবারে পশ্চিমে একটু। সাইপ্রেস গাছের ঘনকুঞ্জ—মাঝখানে লাল দেয়ালের ঘর, হলদে টালির ছাউনি। গাছ আর ঘরবাড়ি প্রায় একই বয়সি—পাঁচশো পেরিয়েছে। দক্ষিণের গায়ে ঝিরঝিরে একটু নদী—নদী কেন, খাল বললে মানায় ভালো। সুদূর-পাহাড়ের উদ্দাম মেয়ে নিষিদ্ধ-শহরের অন্দরে এসে নিষ্কম্প নিস্তরঙ্গ ক্ষীণদেহ হয়ে গেছে। আরামে আছে অবশ্য। মার্বেল-পাথরে বাঁধানো দুই তটের শুভ্র শয্যা—মার্বেলের সাতটা সাঁকো কুলবধূর সাদা শাঁখার মতো পর পর যেন হাতে পরানো। সেকালে মস্ত কাজ ছিল ও নদীর—আগুন-নেবানোর যাবতীয় তোড়-জোড় এই বাঁধানো নদীতটে।

বাড়িটা হল পিতৃপুরুষের মন্দির। রাজারা অতীত মুরুব্বিদের পূজা দিতে আসতেন এখানে। রাজারা ফৌত হয়ে গেলে আরশুলা চামচিকের বাসা বাঁধছিল। এখন সেরে-সুরে নতুন ভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে সাংস্কৃতিক প্রাসাদ হয়েছে। নামকরণ মাও-সে-তুঙের—নিজের হাতে নাম লিখে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন ১৯৫০ অব্দে। যারা খেটে খায়, তাদের নিজস্ব জায়গা। দলে দলে এসে জোটে এখানে—পড়াশুনো খেলাধুলো আমোদ-স্ফূর্তি করে।

বাড়িটার কারুকর্ম ও আসবাবপত্রের চেহারা দেখে নয়ন ফেরানো দায়। রাজরাজড়ার বানানো বস্তু—ধরুন, একেবারে খাস এলাকা তাঁদের, রাজার মূল প্রাসাদেরই অংশবিশেষ বলা চলে। যতক্ষণ বেঁচে রয়েছ, থাকো প্রাসাদের ভিতর। মরবার পর একটু সরে এসে এই মন্দিরে জায়গা নাও। মিং আর চিং দু-দুটো রাজ-বংশের যাবতীয় প্রেতাত্মা ছিলেন এখানে; অদৃশ্য বায়বীয় দেহ বলেই কম জায়গায় গুঁতোগুঁতি হতে পারত না। এখন নিশ্চয় নেই আর প্রেতাত্মাবর্গ। গায়ে খেটে-খাওয়া সামান্য লোকেরা দিন-রাত হৈ-হৈ জমাচ্ছে, হেন সংসর্গে থাকতে পারেন রাজন্যেরা?

পূব দিকে খেলার মাঠ; পশ্চিমের মাঠে স্টেজ—থিয়েটার হয় ঐ খোলা জায়গায়। দুটোই নতুন তৈরি। সামনের হলগুলোয় বারো মাসই একজিবিসন চলছে। জিনিষপত্র পালটা-পালটি হয়, পিকিনের জিনিস বাইরে চলে গেল, বাইরের জিনিষ এখানে। তাই মানুষের আনা-গোনা কমে না। পিছনের একটা হলে গান-বাজনা হয়, একটায় নাচ। সকলের পিছনে তাস, দাবা ইত্যাদি আর আড্ডা জমানোর জায়গা। ফুল-লতা-পাতা ও সাইপ্রেসের আলো-আঁধারি উপবনে অহরহ দেখবেন মেয়ে-পুরুষ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, গান গেয়ে গেয়ে উঠছে। খালের উপর ছোট ছোট নৌকো বেয়ে বেড়াচ্ছে; ক্ষণে ক্ষণে বেমালুম হয়ে যাচ্ছে সেগুলো সাত-সাঁকোর তলায়।

ইস্কুল আছে কাছাকাছি কোথাও। ছুটি হয়ে গেছে, বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা বাড়ি ফিরছে। এস গো—একটু আলাপ করি তোমাদের সঙ্গে। কি বুঝল কে জানে—জোরে হেঁটে তারা সরে পড়বার তালে আছে। সামনে গিয়ে হাসতে হাসতে পথ আটকে দাঁড়াই। হাত ধরব, তা পিছলে পিছলে সরে যাচ্ছে। একেবারে শিশু কিনা—ভয় পাচ্ছে হয়তো আমাদের অভিনব পোশাক ও আলাদা ধরনের চেহারা দেখে। অবশেষে একটিকে ধরে একটু আদর করলাম। পোষা-হরিণের মতো মাথা চেপে রইল গায়ে। নতুন চীনের এক ভাবী নাগরিক, দেখ দেখ, আমার গা লেপটে দাঁড়িয়ে আছে।

যাবার সময়টাও, ভেবেছিলাম, পায়ে হেঁটে হেলতে-দুলতে যাওয়া যাবে। কিন্তু হোটেল থেকে এক ভগ্নদূত এসে হাজির হয়েছেন, দন্ত মেলে হাসছেন তিনি। কি করে টের পেলে যে আমরা এখানে? গন্ধ শুঁকে শুঁকে এসেছ?

না এলে ফিরতেন কি করে? বাস নিয়ে এসেছি, দেখা-শুনো হয়ে গিয়ে থাকে তো উঠে পড়ুন এবারে।

দলের সকলে চটে উঠলেন। কক্ষণো না। বিস্তর ঘুরবো আমরা। তোমার বাসে তুমিই চড়ে ফিরে যাও।

উত্তম রূপ ভেবে-চিন্তে আমি ক্রোধ সম্বরণ করে নিই। পরাঞ্জপের সময় হয়ে এলো—ওদের সঙ্গে আমার টহল দেওয়া চলবে না। অত বড় বাসে তবু যা হোক একটি চড়নদার হল—একেবারে শূন্যগর্ভ ফিরতে হল না।

এই সন্ধ্যায় ঘরের মধ্যে একা-একা লাগে। কি করি, কি করি! বোতাম টিপে ওয়েটারকে ডেকে কফির অর্ডার তো দিই সর্বাগ্রে। আঙুর-আপেল-চকোলেটের ছোট টেবিলটা ঘড়-ঘড় করে টেনে নিলাম পাশে। আর তিন-চার দিনের জমে-ওঠা খবরের কাগজ।

দরজায় ঠক-ঠক: আসুন, ভিতরে চলে আসুন—আসা হল তবে সত্যি সত্যি?

কি মুশকিল—পরাঞ্জপে নয়, চক্রেশ জৈন। ব্রজরাজ কিশোর কিছু সওদা করতে দিয়েছিলেন বুঝি মেয়েটার কাছে—একগাদা জিনিষ নিয়ে এসেছে। তড়বড় করে এক নিশ্বাসে বলে, নেই বুঝি তিনি? এগুলো তাঁর খাটের উপর রেখে যাচ্ছি। বলবেন।

আমাকেও তো কেনাকাটা করে দেবে বলেছিলে—

দেবো, দেবো। কথা বলতে পারছি নে এখন। এগুলো রইল। আবার আসব আমি। কেমন?

এই গতিক মেয়েটির। জমিয়ে বসল তো উঠবার নাম নেই। নয় তো ঝড়ের বেগে উড়ে উড়ে বেড়াবে এমনি। কফি এসে পড়েছে ইতিমধ্যে। চুমুকে চুমুকে তা-ও এক সময়ে শেষ হয়ে গেল। সাতটা বেজে যায়, আজকেও তো আসার গতিক দেখিনে। চাই যে আমার ভদ্রলোককে! কুয়োমিনটাং পিঠটান দিল, পাঁচ-তারার নিশান উড়ল এই পিকিন শহরে—সমস্ত তাঁর চোখের উপরে ঘটেছে। সেই সব গল্প শুনতে চাই তাঁর নিজ মুখ থেকে।

যাই হোক, এলেন পরাঞ্জপে শেষ পর্যন্ত। নানান কাজে দেরি হয়ে গেল। কিন্তু এখানে নয়—এ জায়গায় হবে না। আমার বাড়ি চলুন।

খাওয়ার সময় হয়ে গেল যে!

খাওয়াটা আমার সঙ্গে হবে। সে অবশ্য না খেয়ে থাকারই সামিল। এদের এই বিপুল ব্যবস্থার সঙ্গে কি করে পাল্লা দেবো।

রাস্তার উপরে এসেছি দু-জনে। পরাঞ্জপের সাইকেল আছে, সাইকেলে যাবেন উনি। হাত নাড়তে এক রিক্সা এসে দাঁড়াল আমার জন্য। আগেকার মানুষ-টানা রিক্সা এখন বাতিল। মানুষে জানোয়ার হয়ে মানুষ টানবে, সে কি কথা! চীনা ভাষায় কি একটু কথা হল রিক্সাওয়ালা ও পরাঞ্জপের মধ্যে। জিজ্ঞাসা করলাম, কত নেবে?

দু' হাজার ইয়ুয়ান—

অর্থাৎ আমাদের প্রায় সাত আনা?

পরাঞ্জপে হেসে বলেন, কারেন্সির জটিলতা আপনি বেশ আয়ত্ত করে নিয়েছেন দেখছি—

কিন্তু দরাদরি করতে হল—এই যে ওরা দেমাক করে, সব জিনিষের বাঁধা-দর।

রিক্সার বেলা চলে না। কোথায় কোন্ অলিগলিতে কোন্ পথ দিয়ে যেতে হবে, হিসেব করে তার দর বাঁধা চলে না। কিন্তু বেশি চায় না এরা। চেয়েছিল আড়াই হাজার।—পথ ভাল করে বুঝিয়ে দিতে নিজেই আবার দু'-হাজারে নেমে এলো।

এখানকার রিক্সায় মাত্র এক জনের বসবার জায়গা। রিক্সা যাচ্ছে, সাইকেল চেপে পরাঞ্জপে চলেছেন আমার পাশে পাশে।

ডায়েরিতে লেখা আছে দেখছি, স্মরণীয় রাত্রি। তার এই শুরু হয়ে গেল। পরাঞ্জপে না হলে এই রিক্সা চড়ে পিকিনের অচেনা গলিঘুঁজি দিয়ে যাওয়া সম্ভব হত কখনো? আর পাশাপাশি পরাঞ্জপের রকমারি গল্প করে যাওয়া এই রকম?

গলিপথও ঝরঝরে পরিষ্কার। কে যেন একটু আগে ঝাঁট-পাট দিয়ে গেছে। পরিচ্ছন্নতা মানুষের স্বভাব হয়ে গেছে। তিনটে বছর আগেও, কি আর বলব, বিদেশি মানুষ এমনি রিকসা করে যাচ্ছেন—ভিখারির দল পঙ্গপালের মতো ছুটতো পিছু-পিছু। এখন কোনখানে একটা ভিখারি খুঁজে বের করুন দিকি! এই রিকশাওয়ালারাই কি কাণ্ড করত লোকের সঙ্গে? টানা-টানি, মারামারি একরকম বলে গাড়িতে তুলে শেষটা রুক্ষ রকম কথা—বিশেষ করে বাইরের লোক হলে তো কোন রকমে রক্ষে ছিল না।

আজকের চীনে ভিখারি নেই, পতিতা নেই। হাজার হাজার বছরের সামাজিক পাপ নাকি ঘণ্টা পাঁচ-ছয়ের মধ্যে সাফ সাফাই! আরব্য উপন্যাসকে হার মানিয়ে দেয়। কিন্তু আজকে থাক, সে গল্প আর এক দিন।

মুক্তি-সৈন্য ঘিরে ধরেছে পিকিন শহরকে। নানান দলে ভাগ হয়ে তারা আসছে। এসে পড়ল বলে! পাঁচ-সাত-দশ দিন বড় জোর—তার ওদিকে কিছুতে নয়। মানুষে কিন্তু তেমন মাথা ঘামাচ্ছে না—ওদের হল বওয়া ঘাড়, এমন বিস্তর দেখা আছে। এই সেদিন অবধি গোটা চীনের তিন ভাগের এক ভাগ জাপান দখল করে বসে ছিল। পিকিন শহরটাই কতবার হাতফেরতা হয়েছে, বিবেচনা করুন। লড়াইয়ে হেরে গিয়ে জাপানিরা সরে পড়ল; কুয়োমিনটাং প্রভুরা আবার গদিয়ান হলেন। এঁরাই বা কি রামরাজত্বে রেখেছেন গো! কম্যুনিষ্টরা এসেই কি করে দেখা যাক। ঘা খেয়ে খেয়ে এমনি দার্শনিক নির্লিপ্ততা এসেছিল সাধারণের মধ্যে। চিয়াঙের সৈন্য মনোবল হারিয়ে ফেলেছে। লড়াই করে না তারা, লড়াই করবার কারণ খুঁজে পায় না। বাইরে থেকে ভারে ভারে হাতিয়ার ও রসদপত্র আসছে—খবরাখবর নেয়, কবে এসে পৌঁছবে সেগুলো। তার পরে ষোল আনা রণসাজে সজ্জিত হয়ে টুক করে উল্টো দলে ভিড়ে যায়।

চাষী মেয়েরা শীতের ইস্কুলে পড়ছে। (শীতকালে চাষের কাজ হালকা; সেই সময় গ্রামে গ্রামে ইস্কুল বসে)

এদের হাতিয়ার এদেরই দিকে তাক করে তখন। সাধারণে রসিয়ে রসিয়ে এই সমস্ত গল্প করে, ভারি যেন এক মজার ব্যাপার! পথে ঘাটে লোক-চলাচল বেশ আছে—দোকানিরা একটু দেখেশুনে দোকান খোলে, এই যা। আর এক অসুবিধা—বাইরের জিনিষ খুব কম আসছে শহরে। বাজারে তরিতরকারি মিলছে না। কয়লারও বড় টানাটানি।

পরাঞ্জপে যেমন-যেমন বলেছিলেন—তাই লিখছি। আরও আরও একজন ছিলেন—অধ্যাপক উ-সিয়ো-সিনিকা। পরাঞ্জপে তাঁকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন—এক'সঙ্গে খানাপিনা হবে, পরাঞ্জপের বাড়ি আগেভাগে এসে বসে ছিলেন তিনি আমার জন্ত। শান্তিনিকেতনে ছিলেন এক সময়ে—হাস্যমুখ আনন্দময় মূর্তি। এঁর স্ত্রী উত্তম বাংলা জানেন—শান্তিনিকেতনে থাকার সময় নাম পেয়েছিলেন পার্বতী দেবী।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় রেডিওর আহ্বান আসছে, আত্মসমর্পণ করো তোমরা। প্রাচীন মহিমময় পিকিন—বোমা ফেলব না আমরা ওখানে, একটি ইটের টুকরো নষ্ট হতে দেবো না। আপোষে অস্ত্র ফেলে দাও নগররক্ষিদল।

নাগরিকদের অভয় দিচ্ছে, তোমাদের সেবক এই মুক্তিসৈন্যদল। কোন ভয় নেই। কুয়োমিনটাং নিন্দেমন্দ ছড়াচ্ছে—কান দিও না ও-সমস্ত বাজে কথায়—

পালানোর হিড়িক বড়লোকদের মধ্যে। কর্তাদের পেয়ারের মানুষ তারা—জীবন ও টাকাপয়সা নিয়ে সরে পড়তে পারলে হয়। এরোড্রোম শহর থেকে খানিকটা দূরে—দমদম যেমন আমাদের কলকাতা থেকে। বড়-রাস্তায় সেই সময়টা দিনরাত দেখতে পেতেন, মোটরের পর মোটর উর্ধ্বশ্বাসে এরোড্রোম মুখো ছুটেছে। প্লেন হরবখত আসছে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে শোনা গেল, এরোড্রোম থেকে বেশি দূরে আর নেই মুক্তিবাহিনী। সে কি কাণ্ড! যারা তখনো পালাতে পারেনি, তারা একেবারে ক্ষেপে উঠল। প্লেনের এক-একটা সিটের অবিশ্বাস্য রকম দর—বিদেশ কোম্পানিগুলো দু-হাতে টাকা লুঠছে এই মওকায়। বড় বড় ইমারৎ শ্মশানভূমির মতো খাঁ-খাঁ করছে, সৌখিন জিনিষপত্রের ছড়াছড়ি এখানে-সেখানে।...

অধ্যাপক উ হাসতে হাসতে বললেন, আমার ভারি মজা সেই সময়টা। দুষ্প্রাপ্য বই—অনেকগুলোর কেবল নামই শুনেছিলাম, চোখে দেখবার ভাগ্য হয়নি—জলের দরে বিকোচ্ছে। ঘুরে ঘুরে অধ্যাপক বই কিনে বেড়াচ্ছেন। পাঁচ-সাতটা দিনের মধ্যে বিশাল এক লাইব্রেরি। তারই মধ্যে ইদানীং ডুবে থাকেন। ভাগ্যিস গোলমালটা ঘটেছিল, নইলে সারা জীবন চুঁড়েও তো এমন সব বস্তুর নাগাল পেতেন না।

শেষটা শহরের ভিতরে ঐ পিকিন হোটেলেরই কাছাকাছি এক মাঠে প্লেন উঠানামা করতে লাগল। উপায় কি—যা হবার হোক, এরোড্রোম অবধি যাওয়া কোন মতে সাহস করা যায় না। অবস্থা ক্রমশ আরও সঙ্গিন হল—আলো আর কলের জল বন্ধ। কি কষ্ট লোকের! জ্বালানি নেই; কূপের জল তুলে রান্না-খাওয়া; কেরোসিন যৎসামান্য মেলে—সন্ধ্যা হতেই চতুর্দিক অন্ধকার। অথচ পাওয়ার-হাউস কিম্বা ওয়াটার-ওয়ার্কসের ত্রিসীমানায় আসেনি তারা তখনো। গোলমাল বুঝে বড় বাবুরা সরে পড়েছেন, দেখাদেখি শ্রমিকরাও। যন্ত্রপাতিও বিগড়ে দেওয়া হয়েছে কিছু-কিছু, যাতে ওরা এসে অতি সহজে চালু করতে না পারে।

মুক্তিসৈন্য তার পর এসে পড়ল ঐ ঘুঁটিতে। সেই সন্ধ্যায় শহরময় আলো জ্বলে উঠল। পরের দিন সকালে কলের মুখে জল। রেডিও বলছে, আলো-জল পেয়ে কুয়োমিনটাঙের সুবিধা হল। কিন্তু তোমরা যে কষ্ট পাচ্ছ—তোমাদের লোক আমরা। ফয়শালা না হতেই আগে-ভাগে তাই আলো-জল দিয়ে দিচ্ছি।

আর কর্তাদের উদ্দেশ্যে বলছে, রাখতে পারবে না পিকিন; হাতিয়ার ফেলে মিটমাট করো। তিয়েনসিন বন্দরটাও দখল করে নিয়েছে, খবর এসে গেল। পিকিন শহর থেকে সমুদ্রে বেরুবার ঐ পথ। কি হে, এখনো আশা রাখো শহর ঠেকাবার? বাইরে বেরুনো বন্ধ হল—এবারে যে খাঁচার ইঁদুরের মতো মরতে হবে তিল তিল করে।

আর কোন ভরসা নেই—কুয়োমিনটাং সেনাপতি অতএব আত্মসমর্পণ করল। যতই হোক, শাসনকর্মটা বোঝে কুওমিনটাং—এরা এতকাল তো খালি লড়াই করেছে, দুঃখকষ্ট সয়ে ওদের কথা প্রচার করে বেরিয়েছে মানুষজনের মধ্যে। তাই ঠিক হল, আপাতত এক মাস চলবে কুয়োমিনটাং ও কম্যুনিষ্টদের মিলিত শাসন-ব্যবস্থা। কাজকর্ম রপ্ত করে নিয়ে তার পরে পুরোপুরি ভার নেবে। কিন্তু তার আর দরকার হল না। কুয়োমিনটাঙের মানুষগুলোই শেষ অবধি এদের দলে ভিড়ে গেল। দেশ-গঠনে আজকে তারা তিলেক পরিমাণ খাটো নয় কারো চেয়ে। শান্তি-শৃঙ্খলায় দিব্যি কাজকর্ম চলে আসছে সেই থেকে—হাঙ্গামা বা রক্তপাত হয়নি কোন দিন পিকিন শহরের কোথাও। [ক্রমশঃ।

বর্ষার ধুমধাম

নিদাঘের সমুদয়, অধিকার লোটে।
ধমকে চমকে লোক, চপলার চোটে।
চপ্ চপ্ টপ্ টপ্, কলরব উঠে।
কন্ কন্ ঝন্ ঝন্, হুহুঙ্কার ছুটে।
সুমধুর কত সুর, ভেকে গীত গায়।
ঝম্ ঝম্ ঝাম ঝাম, জলদ বাজায়।
কড় কড় মড় মড়, রাগে রাগ বাড়ে।
হড় মড় কড় মড়, টিটকারী ছাড়ে।

ধীরি ধীরি শোভে গিরি, স্বভাবের সাজে।
গুড়ু গুড়ু গুড়ু গুড়ু, নহবৎ বাজে।
খরতর দিনকর, লুকাইল তাপে।
থর থর গর গর, ত্রিভুবন কাঁপে।
হুড় হুড় দুড় দুড়, ঘন ঘন হাঁকে।
ঝর ঝর ফর ফর, সমীরণ ডাকে।
ভন্ ভন্ ফন্ ফন্, মশকের ধ্বনি।
কত রূপ নবরূপ, অপরূপ গণি। —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

মোগল-যুগের ভারত

বিনয় ঘোষ

[অনুবাদ]

হিন্দুস্থানের হিন্দুদের কথা—(৩)

সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্চস্তরের সাধু ব'লে জনসমাজে পরিচিত। একেবারে সিদ্ধ যোগীপুরুষ তাঁরা, ভগবানের সঙ্গে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। সকলের ধারণা, পার্থিব জীবন থেকে তাঁরা একেবারে বিচ্ছিন্ন, সংসারত্যাগী ও গৃহত্যাগী। দূরে কোন অরণ্যমধ্যে নির্জন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন তাঁরা, সাধারণতঃ জনপদের দিকে যান না। কেউ যদি খাবার-দাবার ভক্তিভরে তাঁদের এনে দেন, তাঁরা তা গ্রহণ করেন, আর যদি কেউ না আনেন, তাহ'লে তাঁরা অনাহারেই দিনের পর দিন কাটিয়ে দেন। ভগবান তাঁদের বাঁচিয়ে রাখেন। দীর্ঘকাল অনশন উপবাসে অভ্যস্ত ব'লে তাঁদের বিশেষ কোন কষ্ট হয় না। প্রায়ই দেখা যায়, এই ধর্মাত্মা যোগীপুরুষরা ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন যে এইভাবে তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অক্লেশে থাকতে পারেন, কারণ তাঁদের আত্মা এই সময় একটা অতীন্দ্রিয় আনন্দে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাকে; বাহ্যজ্ঞান তাঁদের লোপ পায়, ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি ব'লে তখন আর কিছু থাকে না। যোগীরা ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করেন। আলোকের মতন জ্যোতির্ময় মূর্তিতে ঈশ্বর তাঁদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হন। তখন তাঁরা এক অলৌকিক আনন্দের শিহরণ অনুভব করেন এবং ইহলোক, সংসার, পৃথিবী সব তাঁদের কাছে তখন অতি তুচ্ছ ও নগণ্য মনে হয়। আমার একজন বিখ্যাত যোগীপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। তিনি বলতেন যে এরকম ধ্যানস্থ হয়ে যতক্ষণ ইচ্ছা তিনি থাকতে পারেন। সাধারণ মানুষ যারা এই যোগীপুরুষদের সান্নিধ্য কামনা করে তারা এই যোগসাধনা ও দেবতাদর্শন ইত্যাদি গভীরভাবে বিশ্বাস করে। আমার মনে হয়, এই ধরনের যোগসাধন ও যোগবলে ঈশ্বরদর্শনাদির অলৌকিক ব্যাপারের মধ্যে কিছুটা সত্য হয়ত নিহিত আছে। নিঃসঙ্গ নির্জন জীবনযাত্রা, দীর্ঘ উপবাস ও আত্মনিগ্রহের ফলে মানুষের কল্পনাশক্তি অনেক উগ্ররূপ ধারণ করে এবং তখন মানুষের পক্ষে নানারকমের অধ্যাসাদি বাস্তব সত্য ব'লে মনে হয়। অবশ ও ক্লান্ত দেহের মধ্যে ঘুমন্ত, মূর্চ্ছিত মন বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখে। সাধু-সন্ন্যাসীরা যেভাবে আত্মনিগ্রহ অভ্যাস করেন, তাতে এরকম কাণ্ডবাণ্ড অসম্ভব ব'লে মনে হয় না। ইন্দ্রিয়গুলিকে তাঁরা ক্রমে নিজেদের আয়ত্তে আনেন এবং তখন ইচ্ছা মতন ধ্যানস্থ হয়ে অলৌকিক স্বপ্ন দর্শন করতে তাঁদের কোন কষ্ট হয় না। সাধুরা বলেন—কোন নির্জন স্থানে গিয়ে একাকী ধ্যানস্থ হতে হবে; প্রথমে উর্দ্ধনেত্র হ'য়ে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে; পূর্ণ উপবাস করতে হবে, জল পর্যন্ত স্পর্শ করা চলবে না; কিছুকাল উর্দ্ধনেত্র হয়ে যোগাসনে ব'সে, চোখ দু'টি ধীরে ধীরে আনত ক'রে নাসিকাগ্রে নিবদ্ধ করতে হবে; নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে কিছুকাল অবস্থান করার পর দেবতা জ্যোতির্ময় আলোকরূপে অবতীর্ণ হবেন যোগীর সামনে।

এই ভাবোন্মত্ততাই হ'ল যোগীদের অলৌকিক রহস্যবাদের মূল কথা। যোগীদের মতন চালচলন সূফীদের মধ্যেও দেখা যায়। আমি এটা রহস্যবাদ বলছি, কারণ সমস্ত ব্যাপারই তাঁদের কাছে গুহ্য ব্যাপার। কিছুই তাঁরা বাইরে প্রকাশ করেন না, করতে চান না। তাঁদের যোগসাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল এই গোপনতা। হয়ত বলবেন, তাহ'লে আমি এত সব কথা কোথা থেকে জানতে পারলাম? একজন পণ্ডিতের সাহায্যেই আমি এই সব কথা জানতে পেরেছি। আমার আগা দানেশমন্দ খাঁ একজন হিন্দু পণ্ডিত বেতন দিয়ে নিযুক্ত করেছিলেন, শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য। পণ্ডিত মশাই আমাদের কাছে কিছুই গোপন করতেন না। সূফীদের সম্বন্ধে দানেশমন্দ খাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল!

আমার নিজের বিশ্বাস—দারিদ্র্য, অনশন ও আত্মনিপীড়ন, এই তিনের প্রভাবে মানুষের পক্ষে এই ধরণের আত্মজ্ঞানহীন অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব হয়। আমাদের দেশের (ইয়োরোপের) ধর্মযাজক ও সাধুপুরুষরা এইদিক দিয়ে যে এশিয়ার বা হিন্দুস্থানের যোগীপুরুষদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তা নয়। বরং এদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল আর্মেনীয়ান, কপ্ট, গ্রীক, জেস্টোরিয়ান, জেকোবিন, ও মেরোনাইটরা। তাদের সঙ্গে তুলনা করলে ইয়োরোপীয় সাধুদের শিক্ষানবীশ ব'লে মনে হয়। অবশ্য একথাও ঠিক যে, অনশন ও উপবাসের কষ্ট শীতপ্রধান ইয়োরোপে অনেক বেশী, হিন্দুস্থানের তুলনায়।

এইবার অন্য আর এক শ্রেণীর ফকিরের কথা বলব, যাঁরা ঠিক যোগীদের মতন নন, অথচ যাঁদের প্রতিপত্তি যোগীদের তুলনায় কোন অংশেই কম নয়। প্রায় সর্বদাই তাঁরা ভ্রাম্যমান জীবন যাপন করেন, চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ান, উদাসীন ভাব দেখান এবং অনেক কিছু গুহ্য ব্যাপার জানেন ব'লে প্রচার করেন। সাধারণ লোক মনে করে যে এই ফকিরবেশী সাধুরা জানেন না এমন কোন জিনিস নেই এবং তাঁদের এমন ঐশ্বরিক শক্তি আছে যে, তাঁরা যে কোন পদার্থকে সোনা তৈরী করতে পারেন। অভ্রজাতী এমন এক পদার্থ তাঁরা তৈরী করেন—যা সামান্য দু'একটা

দানা প্রতিদিন সকালে গলাধঃকরণ করলে যে কোন অসুস্থ লোক সুস্থ হয়ে যায়, দুর্বল শরীরে শক্তিসঞ্চার হয়, যা খাওয়া যায় তাই তৎক্ষণাৎ হজম হয়ে যায়। শুধু তাই নয়। যদি এই শ্রেণীর দু'জন সাধুপুরুষ দৈবক্রমে হঠাৎ কোথাও মিলিত হন, তাহ'লে উভয়ের মধ্যে অলৌকিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে। তখন দু'জনেই এমন সব জাদুবিদ্যার খেল্ দেখাতে থাকেন যে সাধারণ মানুষের বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না। কে কি মনে মনে চিন্তা করছে তা তাঁরা অনর্গল গড়্‌গড় ক'রে ব'লে দেন, পত্রপুষ্পহীন শুকনো গাছের ডালে বিড়্‌বিড়্ ক'রে ফুল ফুটিয়ে দেন, ফল ফলিয়ে দেন এক ঘণ্টার মধ্যে, পনের মিনিটের মধ্যে বুকের ভিতর ডিমে তা দিয়ে বাচ্ছা ফোটান, এবং শুধু বাচ্চা নয়, যে কোন পাখীর বাচ্চা ফোটান, তাকে ঘরের মধ্যে উড়িয়ে দিয়ে তবে ছাড়েন। এরকম আরও অনেক তাজ্জব কাণ্ডকারখানা তাঁরা করেন, জাদুবলে ও মন্ত্রবলে, যার রহস্য কারও পক্ষেই ভেদ করা সম্ভব হয় না।

এই শ্রেণীর ফকিরদের সম্বন্ধে লোকমুখে যা শুনেছি তা সত্য কি মিথ্যা, যাচাই ক'রে দেখার সময় হয়নি। আমার আগা (দানেশমন্দ খাঁ) একবার এরকম এক জন সবজান্তা ফকিরকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি যদি তাঁর মনের কথা সব ঠিক-ঠিক ব'লে দিতে পারেন, তাহ'লে আগা তাঁকে তিনশ' টাকার পুরস্কার দেবেন। আগা বলেছিলেন যে আগে থেকে তিনি একটি কাগজে তাঁর মনের কথা লিখে রেখে দেবেন, যাতে ফকিরের মনে সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না উপস্থিত হয়। এই সময় আমিও ফকিরকে বলেছিলাম যে আমিও তাঁকে পাঁচশ টাকা পুরস্কার দেব যদি আমার মনের কথাও তিনি ব'লে দিতে পারেন। আশ্চর্য! সাধুবাবা তারপর আর আমাদের বাড়ীমুখো হ'লেন না। আর একবার আমার খুব ইচ্ছা হ'ল, এই সাধুবাবারা কি ক'রে ডিমে তা' দিয়ে বাচ্চা ফোটান দেখতে হবে। তাও স্বচক্ষে দেখা কোনদিন সম্ভব হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে আমার এত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কোনদিন সাধুবাবার তাজ্জব কাণ্ড দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। দু'-এক জায়গায় যখনই আমি উপস্থিত হয়েছি এবং দেখেছি যে জনতার মধ্যে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, তখন আমি নানারকম প্রশ্ন ক'রে দেখেছি যে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই হ'ল চালাকি ও ধাপ্পাবাজি, কোন অলৌকিক শক্তির কোন চিহ্ন নেই কোথাও। একবার আমার আগা সাহেবের টাকা চুরি গিয়েছিল এবং সাধুবাবা বাটি চেলে চোর ধরবার কৌশল দেখাচ্ছিলেন। আমি সেই চালাচালির চালাকিটা ফাঁস ক'রে দিয়েছিলাম।

আর একশ্রেণীর ফকির আছে তাঁদের চালচলন অন্যরকম। তাঁরা বাইরে বিশেষ কোন ভড়ং দেখান না, পোশাকপরিচ্ছদের মধ্যেও তেমন কোন জাঁকজমক নেই এবং ভক্তির আতিশয্যও তাঁদের কম। সাধারণতঃ খালি পায়ে তাঁরা চলাফেরা করেন, মাথাতেও কোন পাগড়ি-টাগড়ি পরেন না। একটা লম্বা আজানুলম্বিত আলখাল্লা প'রে, তার উপর ওড়নার মতন একটা সাদা চাদর হাতের তলা দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে, তাঁরা ঘুরে ঘুরে বেড়ান। এমনিতে তাঁরা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকেন, অন্যদের মতন অপরিচ্ছন্ন ন'ন। দু'জন দু'জন ক'রে চলাফেরা করেন, একা নন। চলাফেরার ভঙ্গীও খুব নম্রসম্র। একহাতে কমণ্ডলুর মতন একটি ভিক্ষার পাত্র থাকে। সাধারণতঃ তাঁরা দোকানে দোকানে ঘুরে ভিক্ষা করেন না, অন্যান্য সাধুফকিরদের মতন। ভদ্রলোকের বাড়ীতে যান এবং যাওয়া মাত্রই আপ্যায়িত হন। ভদ্রলোকেরা ও গৃহস্থরা তাঁদের আগমনে কৃতার্থ বোধ করেন, প্রাণ খুলে অতিথিসৎকার করতেও কুণ্ঠিত হন না। হিন্দু গৃহস্থরা মনে করেন, এই সাধুদের আবির্ভাব সাক্ষাৎ দেবতার আবির্ভাবের মতন। যে পরিবারে যখন তাঁরা যান, সেই পরিবারের লোক তখন তাঁদের ভাগ্যবান ব'লে মনে করেন। বাইরে এঁদের আচারব্যবহার চরিত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারকম কাণাঘোঁষা শোনা যায়। পরিবারের সঙ্গে, এমনকি স্ত্রীলোকদের সঙ্গেও তাঁরা এমন অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করেন যে সকলেই তাঁদের সন্দেহের চোখে না দেখে পারেন না। মোগল রাজ্যের মধ্যে এই গুরুসেবা ও সাধুসেবার এই জাতীয় বিচিত্র প্রথা সর্বত্র প্রায় প্রচলিত আছে দেখা যায়। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে যখন দেখি এই সাধুরা নিজেদের কতকটা খৃষ্টান পাদ্রীদের সমগোত্র ব'লে মনে করেন। এঁদের দেখলে আমার মনে নানারকম কৌতূহলের সঞ্চার হ'ত এবং চারিত্রিক দুর্বলতা ও দম্ভ দুইই আমার কাছে বেশ উপভোগ্য মনে হ'ত। মধ্যে মধ্যে তাঁদের ডেকে আমি আলাপ করতাম। দেখতাম তাঁরা বলাবলি করছেন আমার সম্বন্ধে: "এই ফিরিঙ্গী সাহেব আমাদের দেশের অনেক ব্যাপার জানে, কারণ অনেকদিন এখানে আছে। সাহেব জানে যে আমরা হলাম ওদের দেশের পাদ্রীদের * মতন।"

যাই হোক, এই সব সাধু ফকির সম্বন্ধে অনেক কথা বললাম। এখন হিন্দুদের শাস্ত্র সম্বন্ধে দু'চার কথা বলব।

হিন্দুশাস্ত্রের কথা

আমি সংস্কৃত ভাষা জানি না। হিন্দুস্থানে সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা বা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ভাষা। সেই ভাষা সম্বন্ধে আমি একেবারে অজ্ঞ। তবু আমি 'হিন্দুশাস্ত্র' সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি ব'লে যেন বিস্মিত হবেন না। আমার আগা সাহেব, দানেশমন্দ খাঁ, কতকটা আমার অনুরোধে এবং কতকটা তাঁর নিজের কৌতূহল চরিতার্থের জন্য, একজন বিখ্যাত হিন্দু পণ্ডিত নিয়োগ করেছিলেন শাস্ত্র অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে। এরকম সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তখন হিন্দুস্থানে খুব কমই ছিলেন। আগে সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকোর অধীনে এই পণ্ডিত কাজ করতেন।(১) এই পণ্ডিত মশায়ের সাহচর্যে প্রায় তিন বছর কাটিয়েছি এবং তিনিই আমাকে অন্যান্য আরও অনেক পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আগা সাহেবের সঙ্গে হার্ভে

---

* পর্তুগীজ শব্দ "পাদ্রি" প্রথমে রোম্যান পুরোহিতদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হ'ত। পরে হিন্দুস্থানের খৃষ্টান পুরোহিতদের সকলে "পাদ্রি" ব'লে অভিহিত করা হয়।

১। দারা শিকো যখন বারাণসীতে ছিলেন তখন সেখানকার বিখ্যাত সব হিন্দু পণ্ডিতদের সাহায্যে তিনি সংস্কৃত 'উপনিষদ' পার্সী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। সেই পার্সী অনুবাদ থেকে পরে আবার লাতিন ভাষায় উপনিষদ অনুবাদ করা হয়।

(William Harvey) ও পেকেতের (Jean Pecquet) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে, অথবা গ্যাসেণ্ডি (Gassendi) ও দেকর্তের (Descartes) দর্শন সম্বন্ধে, মধ্যে মধ্যে আমার আলোচনা হ'ত।(২) আমি তাঁদের রচনা পার্সী ভাষায় অনুবাদ করতাম আগার জন্য। প্রায় পাঁচ-ছয় বছর খাঁ সাহেবের কাছে থেকে এই অনুবাদের কাজই করতে হয়েছে আমাকে। খাঁ সাহেবের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন নিয়ে আমার রীতিমত তর্ক-বিতর্ক হ'ত। তারই ফাঁকে ফাঁকে আমরা পণ্ডিত মশাইকে ডাকতাম এবং হিন্দুশাস্ত্রের কথা ব্যাখ্যা করতে বলতাম। পণ্ডিত মশাই এমন গম্ভীর হয়ে শাস্ত্রকথা আলোচনা করতেন যে আমাদেরই হাসি পেত অনেক সময়। অথচ শাস্ত্রালোচনার সময় তিনি একটুও হাসতেন না। আমাদের কাছে তাঁর ব্যাখ্যান ও বক্তৃতা প্রায়ই নীরস মনে হ'ত।

হিন্দুদের বিশ্বাস যে স্বয়ং ভগবান তাদের জন্ম চারখানা শাস্ত্রগ্রন্থ আদিতে সৃষ্টি করেছিলেন—তার নাম "বেদ"। বেদ বা জ্ঞান; বেদ অধ্যয়ন করলে সর্ববিদ্যাবিশারদ হওয়া যায়। যা বেদে নাই, তা অন্য কোথাও নাই। প্রথম বেদের নাম 'অথর্ববেদ'; দ্বিতীয় বেদের নাম 'যজুর্বেদ'; তৃতীয় বেদের নাম 'ঋক্‌বেদ'; এবং চতুর্থ বেদের নাম 'সামবেদ'। (৩) বেদে আছে যে মানুষ নানা জাতিতে বিভক্ত হয়ে যাবে, তার মধ্যে প্রধান জাতি হবে চারটি।* প্রথম ও শ্রেষ্ঠ জাতি হ'ল "ব্রাহ্মণ", যাঁরা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন; দ্বিতীয় জাতি হ'ল "ক্ষত্রিয়", যাঁরা যুদ্ধবিগ্রহ করেন; তৃতীয় জাতি হ'ল "বৈশ্য", যাঁরা ব্যবসাবাণিজ্য করেন, এবং সাধারণত: "বেনিয়া" ব'লে পরিচিত; চতুর্থ জাতি হ'ল "শূদ্র", যাঁরা কারিগর, মজুর ও দাস। এই সব জাতির মধ্যে কোন সামাজিক লেনদেনের সম্পর্ক নেই, এক জাতির লোক অন্য জাতিতে বিবাহাদি করতে পারবে না। কোন ব্রাহ্মণ কোন ক্ষত্রিয়কে বিবাহ করতে পারবে না। এই বিধি-নিষেধ অন্যান্য প্রত্যেক জাতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। (৪)

হিন্দুরা কতকটা পাইথাগোরীয়ানদের মতন আত্মার অবিনশ্বরতা, দেহাতীত সত্তায় বিশ্বাস করে। তার জন্য সাধারণত: তারা জীব-জন্তু হত্যা করা বা ভক্ষণ করা পছন্দ করে না। এটা অবশ্য মোটামুটি ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা অন্যান্য জাতির লোকরা জীবজন্তু হত্যা করতে বা ভক্ষণ করতে পারে। তবে তাদের ক্ষেত্রেও গোহত্যা করা পাপ। সর্বশ্রেণীর হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে গরুর প্রতি। প্রায় দেবতার মতন তারা গরুকে ভক্তি করে, তার কারণ তাদের ধারণা, ইহলোক থেকে পরলোক যাত্রার সময় গরুর লেজ ধ'রে বৈতরণী পার হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। যে গরুর লেজ ধ'রে বৈতরণী পার হতে হবে, সে গরুকে পারের কাণ্ডারী ভগবানের মতন ভক্তি না করা অন্যায়। বোধ হয়, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রকাররা রাখাল বালকদের এইভাবে মিশরের নীলনদ পার হ'তে দেখেছিলেন, এক হাতে গরুর লেজ, আর এক হাতে লাঠি নিয়ে। সেই সুদূর অতীতের স্মৃতি তাঁরা এইভাবে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গেছেন। অথবা এমনও হতে পারে যে গরুর উপকারিতার জন্য হিন্দুরা তাকে এই চোখে দেখে। গরুর দুধ-ঘি-মাখন জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে; গরু দিয়ে হালচাষ ক'রে ফসল ফলাতে হয়। অর্থাৎ গরু জীবন দান করে। সুতরাং জীবনীশক্তির উৎস গরু হ'ল ভগবান। এ ছাড়া আরও একটা বিষয় বিবেচনা করা দরকার। উত্তম চারণভূমির খুব অভাব হিন্দুস্থানে। তার জন্য গোমহিষের সংখ্যাবৃদ্ধি করা খুব বেশী সম্ভব নয়। সেইজন্য হয়ত গোহত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে, এমনও হ'তে পারে।(৫) ফ্রান্স, ইংলণ্ড বা অন্যান্য দেশের মতন যদি হিন্দুস্থানেও গোহত্যা করা হ'ত, তাহ'লে দেশের চাষবাসে রীতিমত সঙ্কট দেখা দিত। গ্রীষ্মকালে হিন্দুস্থানের উত্তাপ এত বেশী হয় যে মাঠের গাছপালা সব শুকিয়ে পুড়ে যায় এবং গরুবাছুরের খাদ্য ব'লে কোথাও কিছু থাকে না। প্রায় আট মাসকাল গ্রীষ্ম থাকে এবং এই সময় গরুবাছুর খাদ্যাভাবে মাঠেজঙ্গলে যা খুশী আবর্জনা খেয়ে, শূয়োরের মতন বেঁচে থাকে। গবাদি পশুর অভাবের জন্যই সম্রাট জাহাঙ্গীর একসময় কিছুদিনের জন্য ফরমান জারী ক'রে গোহত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। সম্রাট ঔরঙ্গজীবের সময় হিন্দুরা এই মর্মে আবেদন করেছিল। আবেদনপত্রে তারা জানিয়েছিল যে গত পঞ্চাশ ষাট বছরের মধ্যে দেশের বনজঙ্গলের এত দ্রুত অবনতি হয়েছে যে গরুবাছুর অত্যন্ত দুর্লভ হয়ে গেছে।

হিন্দু শাস্ত্রকাররা গোহত্যা বা মাংসাদিভক্ষণ নিষিদ্ধ করার

২। উইলিয়াম হার্ভে (১৫৭৮—১৬৫৭) ১৬১৬ সালে লণ্ডনের চিকিৎসকমণ্ডলীর কাছে তাঁর রক্তচলাচলের (Blood circulation) যুগান্তকারী তত্ত্বকথা প্রচার করেন।

জাঁ পেকেতও হার্ভের সমসাময়িক একজন বিখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ছিলেন।

এই সময় ফ্রান্সের বিখ্যাত বস্তুবাদী দার্শনিক দেকর্তের আবির্ভাব হয়।

৩। বার্নিয়েরের বেদের ক্রমভাগ ভুল। 'ঋক্‌বেদ' সবচেয়ে প্রাচীন, তারপর যজুর্বেদ, সামবেদ এবং সর্বশেষে অথর্ববেদ রচিত হয়েছে ব'লে এখন পণ্ডিতেরা মনে করেন।

* বার্নিয়ের "tribus" বা "tribe" কথা ব্যবহার করেছেন 'জাতি' অর্থে, "caste" কথা ব্যবহার করেননি। পর্তুগীজ "casta" থেকে "caste" কথা এসেছে এবং জাতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।—অনুবাদক।

৪। বার্নিয়েরের এই জাতি-পরিচয় তাঁর অসাধারণ বোধশক্তির আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পণ্ডিতের সংস্কৃত ব্যাখ্যার পার্সী অনুবাদ থেকে মুখে শুনে, ভারতীয় সমাজের পরিচয় এইভাবে লিপিবদ্ধ ক'রে যাওয়া যে কত কঠিন, তা আজ আমরা ঠিক বুঝতে পারব না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি কথা যেভাবে বার্নিয়ের ভাষান্তরিত করেছেন তা যথাক্রমে এই:—Brahmens, Quetterys, Bescue, Seydra.

৫। গোহত্যা, গোমাংস ভক্ষণ বা শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ সম্বন্ধে বার্নিয়েরের এই চমৎকার ব্যাখ্যা তাঁর অনুসন্ধানী মনের পরিচায়ক। সাধারণ বিদেশীদের মতন তাঁর রচনার মধ্যে কোন তাচ্ছিল্যের ভাব কোথাও প্রকাশ পায়নি। আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিটি আচার-ব্যবহার বুঝতে চেষ্টা করেছেন।

সময় হয়ত ভেবেছিলেন যে এই নিষেধাজ্ঞার ফলে মানুষের উপকার হবে এবং লোকচরিত্রেরও উন্নতি হবে। জীবজন্তুর প্রতি যদি তাদের করুণার উদ্রেক করা যায়, তাহ'লে মানুষের প্রতি মানবতা-বোধও জাগ্রত থাকবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গভীর হবে, মানবিক হবে। তা ছাড়া আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসের ফলে কোন জীবজন্তুকে হত্যা করাকে তারা পিতৃপুরুষ হত্যার সামিল মনে করে। তার চেয়ে ঘোরতর অপরাধ আর কি হ'তে পারে? এমনও হ'তে পারে যে, ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারেরা বুঝেছিলেন যে হিন্দুস্থানের মতন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গোমাংস ভক্ষণ স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক অনিষ্টকর। সেইজন্তও হয়ত তাঁরা গোমাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ বলে জারী করেছিলেন।

বেদের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক হিন্দুর কর্তব্য হ'ল প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনবার পূবদিকে মুখ ক'রে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা। সকালে একবার, দুপুরে একবার, রাত্রে একবার। তিনবার স্নান করাও তার কর্তব্য, অন্ততঃ মধ্যাহ্নভোজনের আগে একবার তো নিশ্চয়ই। স্নান করতে হ'লে বদ্ধ জলে স্নান না ক'রে, স্রোতের জলে অবগাহন করাই শ্রেয়ঃ। এখানেও দেখা যায়, দেশের ভৌগোলিক পরিবেশের প্রতি শাস্ত্রকারদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। শীতপ্রধান দেশের লোকরা সহজেই বুঝতে পারবেন, এই ধরনের শাস্ত্রীয় বিধান যদি তাঁদের উপর প্রয়োগ করা হ'ত, তাহ'লে তাঁদের কি ভয়ানক শোচনীয় অবস্থা হ'ত! অথচ আমি দেখেছি, হিন্দুস্থানের লোক এই শাস্ত্রীয় বিধান বর্ণে বর্ণে পালন করেন, নদনদীর স্রোতের জলে স্নান করেন এবং যেখানে কাছাকাছি কোন নদী নেই, সেখানে কলসী বা অন্ত জলপাত্রে জল নিয়ে মাথায় ঢালেন। মধ্যে মধ্যে আমি তাদের এই শাস্ত্রীয় বিধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতাম এবং বলতাম যে শীতপ্রধান দেশে এ-বিধান মেনে চলা সম্ভব নয়। সুতরাং বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় যে এর মধ্যে ধর্মের ব্যাপার কিছু নেই; এ হ'ল একেবারে নিছক স্বাস্থ্যের বিধান। আমার এই অভিযোগের উত্তরে তারা বলেছে: "আমরা কি কোনদিন বলেছি সাহেব, যে, আমাদের শাস্ত্রের বিধান অন্তান্ত সকল দেশের সকল জাতের লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? তা তো আমরা বলিনি কোনদিন। ভগবান কেবল আমাদের দেশের লোকের জন্তই এই সব শাস্ত্রীয় বিধান রচনা করেছেন, বিধর্মী বিদেশীদের জন্ত নয়। আমরা কোনদিন এমন কথাও বলিনি যে তোমাদের ধর্ম মিথ্যা। তোমাদের ধর্ম তোমাদের সাহেব, আমাদের ধর্ম আমাদের। তোমাদের যা প্রয়োজন ঠিক সেইভাবে তোমাদের ধর্মশাস্ত্র তৈরী হয়েছে। ভগবান ধর্মাচরণের বিভিন্ন পন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন। যে কোন পথ ধ'রে স্বর্গে যাওয়া যায় সাহেব!" এর পর আমার পক্ষে কোন উত্তর দেওয়া মুশ্‌কিল হ'ল। আমি কিছুতেই তাদের বোঝাতে পারলাম না যে আমাদের খৃষ্টানধর্ম পৃথিবীর সকল মানুষের জন্ত এবং হিন্দুদের ধর্ম কেবল হিন্দুস্থানের জন্ত। একথা কিছুতেই তাদের যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাতে পারলাম না।

[ক্রমশঃ।

গল্প লেখার গল্প

আধুনিক কালের কল-কারখানাকে নানা কারণে অনেকেই আজকাল নিন্দে করেন, রবীন্দ্রনাথও করেছেন—তাতে দোষ নেই। বরঞ্চ, ওইটেই হয়েছে ফ্যাশান। এই বহু নিন্দিত বস্তুটার সংস্পর্শে যে মানুষগুলো ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় এসে পড়েছে, তাদের সুখ-দুঃখের কারণগুলোও হয়ে দাঁড়িয়েছে জটিল—জীবন-যাত্রার প্রণালীও গেছে বদ্‌লে, গাঁয়ের চাষাদের সঙ্গে তাদের হুবহু মেলে না। এ নিয়ে আপশোষ করা যেতে পারে, কিন্তু তবু যদি কেউ এদেরই নানা বিচিত্র ঘটনা নিয়ে গল্প লেখে, তা সাহিত্য হবে না কেন? কবিও বলেন না যে হবে না! তাঁর আপত্তি শুধু সাহিত্যের মাত্রা লঙ্ঘনে। কিন্তু এই মাত্রা স্থির হবে কি দিয়ে? কলহ দিয়ে না কটু কথা দিয়ে? কবি বলেছেন—স্থির হবে সাহিত্যের চিরন্তন মূল নীতি দিয়ে। কিন্তু এই 'মূল নীতি' লেখকের বুদ্ধির অভিজ্ঞতা ও স্বকীয় রসোপলব্ধির আদর্শ ছাড়া আর কোথাও আছে কি? চিরন্তনের দোহাই পাড়া যায় শুধু গায়ের জোরে আর কিছুতে নয়। ওটা মরীচিকা।

কবি বলচেন, "উপন্যাস সাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে।" কিন্তু প্রত্যুত্তরে কেউ যদি বলে, "উপন্যাস সাহিত্যের সে দশা নয়, মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েনি, চিন্তার সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে" তাকে নিরস্ত করা যাবে কোন্ নজীর দিয়ে? এবং এরই সঙ্গে আর একটা বুলি আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, তাতে রবীন্দ্রনাথও যোগান দিয়েছেন এই বলে যে, 'যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে, তবে সে গল্পই শুনতে চাইবে, যদি প্রকৃতিস্থ থাকে।' বচনটি স্বীকার করে নিয়েও পাঠকেরা যদি বলে—হাঁ, আমরা প্রকৃতিস্থ আছি, কিন্তু দিন-কাল বদলেছে, এবং বয়েসও বেড়েচে; সুতরাং রাজপুত্র ও ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্পে আর আমাদের মন ভরবে না, তা হলে জবাবটা যে তাদের দুর্বিনীত হবে, এ আমি মনে করিনে। তারা অনায়াসে বলতে পারে, গল্পে চিন্তাশক্তির ছাপ থাকলেই তা' পরিত্যাজ্য হয় না কিম্বা বিশুদ্ধ গল্প লেখার জন্যে লেখকের চিন্তাশক্তি বিসর্জ্জন দেবারও প্রয়োজন নেই।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জলহংস —শান্তিনাথ মুখোপাধ্যায়

জেব্রা
—লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তী

ক্রিসিন্থিমাম
—ক্ষীরোদ রায়

পাঠিকা
—অর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক

—স্নানের পরে পুলিনবিহারী চক্রবর্তী
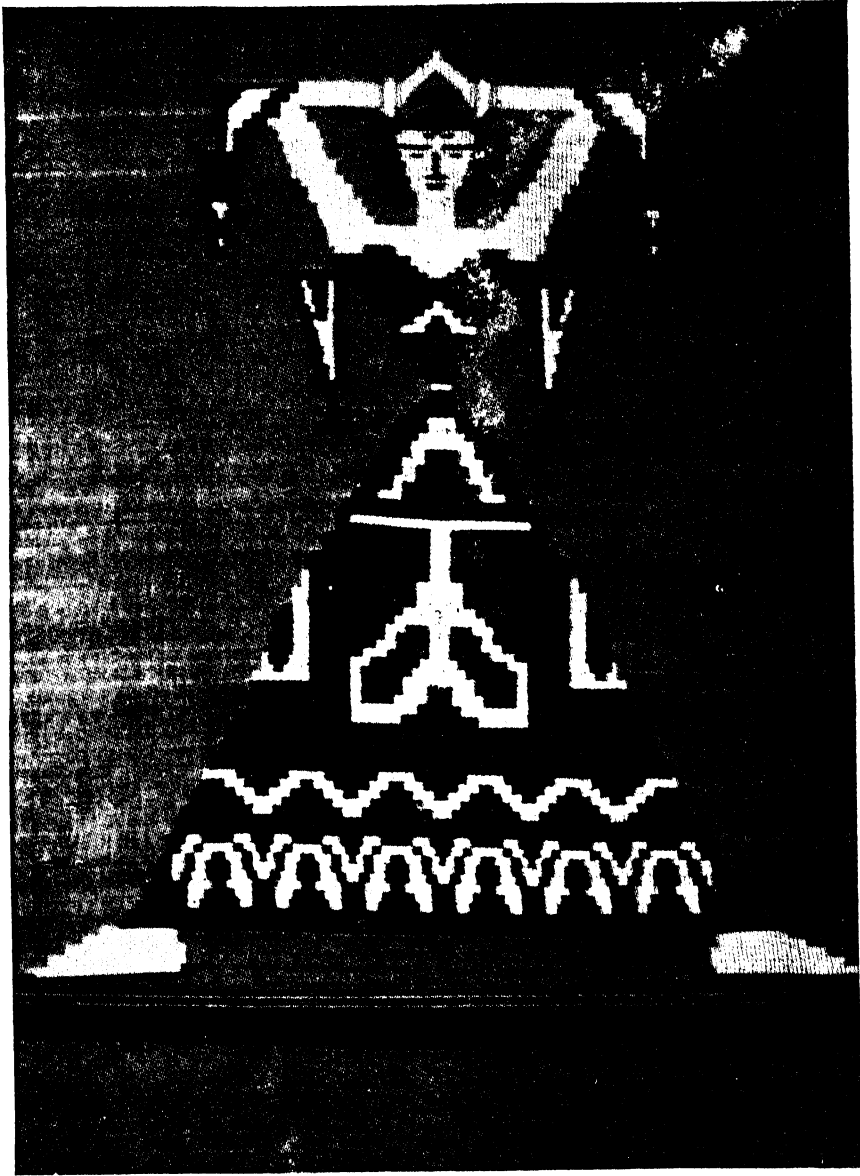
টেক্সটাইল ডিজাইন
শিল্পী—সুভো ঠাকুর

উদয়ভানু

রেশমী ঝালর-দেওয়া লাল-শালুর টানা-পাখার বিরামবিহীন শব্দ। ঘরে যেন ঝড়ের বাতাস বইছে। সন্ধ্যসকালে ঐ পাখা টানার কাজে লেগেছে কোন্ এক চাপরাসী না আরদালী। নতুন উদ্যম ও উৎসাহে ক্ষণিকের তরেও থামছে না। বড় বেশী শব্দ হচ্ছে, টানা-পাখার ক্যাঁচ্-ক্যাঁচ্ শব্দ। কি করবে চাপরাসী, পাখা থামিয়ে দেবে তাই ব'লে? ঘরের জানলা ও দরজার পাতলা পর্দা থেকে থেকে দুলছে হাওয়ার বেগে। রাজাবাহাদুর কালীশঙ্করের বেনারসী জোড়ের উত্তরীয়-অঞ্চলও পতাকার মতই পৎ-পৎ উড়ছে যেন। শুভ্রও মিহি রেশমের জোড়! উত্তরীয়-অঞ্চলে স্বর্ণসূত্রের বেনারসী কারুকাজ চিকণ তুলছে যখন তখন। প্রাতরাশে ব'সেছেন রাজাবাহাদুর, এখন কখনও পাখার গতি মন্দ করা যায়? চাপরাসী সোৎসাহে দড়ি টানে আর ছেড়ে দেয়। ছাড়ে আর টানে। যখন টানে তখন প্রায় শুয়ে পড়ে বুঝি দরদালানে। যখন ছাড়ে তখন মাথাটি তার দুই জানুতে প্রায় স্পর্শ করে। কতটা শক্তির প্রয়োজন হয় টানা-পাখার দড়ি টানতে? শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, ঘাম ঝরতে থাকে। তবুও ক্ষণিকের জন্য থামে না চাপরাসী। মধ্যে মধ্যে হাত বদল করে শুধু। ডান হাতের দড়ি বাম হাতে ধরে।

এটা-সেটা মুখে তোলেন রাজাবাহাদুর।

কখনও ফল, কখনও মিষ্টান্ন। যেটি খেতে ভাল লাগে খান, যেটি খেয়ে অতৃপ্ত হন সেটি মুখে ছুঁইয়ে পুনরায় নামিয়ে রাখেন। শ্বেতচন্দনের পানীয় আস্বাদ করেন কখনও কখনও। বারে বারে অতি সামান্যই পান করেন। পানপাত্রটি যেমন গভীর তেমনই ভারী। পানীয় শেষ হ'তে চায় না যেন। এটা-সেটা খেতে খেতে একেক বার গলা-খাঁকারির শব্দ করেন রাজবাহাদুর। কণ্ঠ সাফ ক'রে নেন। আর মাঝে মাঝে সম্মুখে দণ্ডায়মানা রাজমহিষীর প্রতি দৃষ্টি তোলেন।

রাজাবাহাদুর কালীশঙ্করের প্রধানা মহিষী।

সাবগুণ্ঠনে নম্রমুখী হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তাঁর মুখাকৃতি ঈষৎ গম্ভীর, আঁখির কোণে যেন বিস্ময়ের আবেশ। রাজাবাহাদুর একেক বার সাগ্রহে লক্ষ্য করেন মহিষীর বেশভূষা। বিচিত্র কারুকার্যখচিত পরিচ্ছদ। প্রতি অঙ্গে রত্নাভরণ-পারিপাট্য। সদ্যঃস্নাতা রাণীর পৃষ্ঠে আলুলায়িত ও তৈল-চিকণ কেশের রাশি। প্রায় জানু স্পর্শ ক'রেছে এলো কেশের শেষ।

দরদালানের নূপুর বাজলো হঠাৎ।

নূপুর না ঘুঙুর কে জানে! ঘুন্টি-দেওয়া পায়ের গহনা শব্দ তুললো কক্ষের বাইরে। অতি নিকট থেকে শব্দ কানে পৌঁছে। যেমনকার তেমনি দাঁড়িয়ে থাকেন রাজরাণী। স্তব্ধ গম্ভীর তিনি, যেন চাঞ্চল্যহীন। রাজাবাহাদুর একবার দ্বারপথে দৃষ্টি ফেরালেন। কিন্তু কে কোথায়? কৈ কেউ নেই, তবুও নূপুরের স্পষ্ট ধ্বনি শুনলেন না কালীশঙ্কর?

রাজাবাহাদুর বললেন,—একটি বার দেখো, কে যেন এসেছে ঘরের বাইরে!

ঠিক মূর্তিমতীর মতই দাঁড়িয়েছিলেন রাজমহিষী।

রাজ-আজ্ঞা সহসা কানে পৌঁছতে হতজ্ঞান ফিরে ফেলেন বুঝি। প্রথম কর্ণপাত করতেই রাজাবাহাদুরের উক্তি ঠিক বোধগম্য হয়নি তাঁর। অপ্রস্তুতের লজ্জায় ব্যস্ত হয়ে ফিস-ফিস বললেন,—কে! কে কোথায় এসেছে?

—ঐ যে নূপুরধ্বনি শুনি। কে সেখানে?

শ্বেতচন্দনের পানপাত্র মুখে তুলতে তুলতে বললেন রাজাবাহাদুর। গলা-খাঁকারির শব্দ করলেন। গলা সাফ করে নিলেন।

স্মিতহাসির রেখা ফুটলো রাজমহিষীর অধরোষ্ঠে।

মুক্তার মত দন্তপাতি দৃষ্টিপথে দেখা দিলো। ভেসে-আসা নূপুরের রুনুঝুনু তাঁরও কানে পৌছেছে। তবে তিনি জানেন. ঘরের বাইরে কে এমন ঘুন্টি-দেওয়া পায়ের অলঙ্কার বাজায়। রাজরাণী জানেন, তাই প্রসন্ন হাসির মৃদু আভাস পাওয়া গেল তাঁর ওষ্ঠাধরে।

—কে সেখানে ?

পুনরায় প্রশ্ন করলেন রাজাবাহাদুর। কৌতূহলী কণ্ঠে।

সহাস্যে বললেন রাজমহিষী,—রাজপুত্তুর সেখানে আছে। এখানে আসতে ভীত হয়েছে হয়তো।

কালীশঙ্কর বললেন,—কে ? রাজপুত্র শিবশঙ্কর ?

—হ্যাঁ রাজাবাহাদুর, আমার ছেলে। মুচকি হাসির সঙ্গে আবার কথা বললেন রাজমহিষী। অনিমেষ চক্ষুতে চেয়ে থাকলেন। দেখলেন, দ্বারপথে তাকে দেখতে পান কি না পান।

শিশু পুত্র ঘরে প্রবেশ করতে ভীত হয় শুনে রাজাবাহাদুর মৃদু মৃদু হাসলেন। কোন' কথা বললেন না। শ্বেতচন্দনের পানপাত্রের অবশিষ্টটুকু প্রায় এক চুমুকে পান ক'রে পাত্রটি রাখলেন যথাস্থানে।

—এ কি ! আপনি যে আসন ত্যাগ করছেন ?

রাজাবাহাদুরকে আসন ত্যাগ করতে উদ্যোগী দেখে বললেন মহিষী। টানা-পাখার দুরন্ত হাওয়ায় উড়ে-যাওয়া গুণ্ঠন ঈষৎ টানলেন। হস্তচালনায় হাতের হীরকমণ্ডিত বালা ঘরের আলো-অন্ধকারে জ্বল্-জ্বল্ করলো। গুণ্ঠনের আড়াল থেকে উঁকি দিলো নাকের নথ। নথে একটি দোদুল্যমান লালাভ মুক্তা। নথের নোলক।

—হ্যাঁ তাই। প্রচুর খেয়েছি, আর নয়।

কথা বলতে বলতে সত্যিই 'আসন ত্যাগ ক'রে উঠলেন কালীশঙ্কর। ঘরের বাইরে পদার্পণ করেছেন, তখন রাজরাণী বলেন,—রাজমাতার জন্য কি ব্যবস্থা করলেন ? তিনি যে দ্বাদশীর উপোষ ভাঙ্গতেই নারাজ। গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি তাই বলুন।

দ্বারের বাহিরে পদার্পণ ক'রে রাজমহিষীর বক্তব্য কানে শুনে চলতে চলতে আপন গতিরোধ করলেন রাজাবাহাদুর। চিন্তিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন কতক্ষণ। বললেন,—সহোদর ছোটকুমারের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। অতঃপর জানাবো কি করা কর্ত্তব্য। ভাই কাশীশঙ্কর যেমন বলে তেমন বন্দোবস্ত হবে।

—তবে তাই হোক্।

ফিসফিসিয়ে বললেন রাজমহিষী, সভয়ে, সন্ত্রাসে। মাথার ঘোমটা টানলেন।

দরদালান ধ'রে এগিয়ে যেতে যেতে জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন রাজাবাহাদুর,—কোথায় গেল রাজপুত্র ? কোথায় শিবশঙ্কর ?

কোথায় কে ? কিশোর শিবশঙ্কর রাজার পদধ্বনি শুনেছিল। শোনা মাত্র দৌড়ে পালিয়ে গেছে কোথায় কোন্ ঘরে না দালানে। ইদিক-সিদিক দেখলেন রাজরাণী। কোথাও কেউ নেই। কেমন যেন লজ্জানুভব করছেন উমারাণী। ফিস ফিস সুরে বললেন,—হয়তো ভীত হয়েছে আপনার পদশব্দে। ভয়ে কোথায় দৌড় দিয়েছে।

—বেশ কথা।

মৃদু হাসি হেসে বললেন রাজাবাহাদুর। ঘরের মুখেই ছিল কালীশঙ্করের কাষ্ঠ-পাদুকা। পা চালিয়ে পরেছেন কখন এই ফাঁকেই। পাদুকার বিকট শব্দ দরদালানে মিলিয়ে গেল।

আর কত দূর পিছু পিছু এগোবেন উমারাণী ?

কিছু দূর এগিয়ে ধীরে ধীরে ফিরলেন। কোথায় যাবেন রাজার সঙ্গে সঙ্গে! রাজাবাহাদুর তো এখনই দরবারে যাত্রা করবেন। সমস্ত দিনটির মধ্যে যে আরেকটি বারও সাক্ষাৎ হবে না পরস্পরে। রাত্রেও হবে কি না কে জানে! হয়তো নয়।

রাজাবাহাদুর কালীশঙ্করের দরবারে যাওয়ার সুখাসন রাজমহলের দ্বারে কখন থেকে অপেক্ষা করছে। কি সুদৃশ্য সেই সুখাসন! কত জন তার বাহক!

দ্বাদশ জন কাফ্রী। মিস্ কালো রঙ, আলো ব্যতীত দেখা যায় না অন্ধকারে। দ্বাদশটি কাফ্রী অধীর প্রতীক্ষায় সুখাসন ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে রাজমহলের বড় দরজায়। আর আছে রাজবাহাদুরের দু'জন দেহরক্ষী। সশস্ত্র। কটিদেশে তাদের বাঁকা তরোয়াল।

আর কত দূর রাজাবাহাদুরের সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারেন রাজমহিষী ? সহোদর ভাই, ছোটকুমার কাশীশঙ্করের সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছেন রাজাবাহাদুর। শেষ পর্য্যন্ত এই আলাপ ও পরামর্শের কি পরিণাম হবে কে জানে! উমারাণী নানা কথা চিন্তা করতে করতে বিষণ্ণচিত্তে নিজের মহলের দিকে চললেন। একবার মনে পড়লো রাজপুত্র শিবশঙ্করকে। কোথায় গেল সে, কোথায় লুকালো! রাজমহিষী দেখলেন অদূরে তাঁরই আগমন-প্রতীক্ষায় উন্মুখ দাঁড়িয়ে তাঁরই এক পরিচারিকা। মহিষী তাকে দেখে আশা লাভ করলেন কিঞ্চিৎ। বললেন,—দাসী, তুই যা, রাজপুত্তুরকে খুঁজে আন্। কোথায় যে আছে, আমি তো কিছুই জানি না।

পরিচারিকা বললে,—বড়রাণী, আপনি নিশ্চিন্ত হোন। রাজপুত্তুর আপনার মহলেই ফিরে গেছে।

রাজমহিষীর চিন্তাকুল দৃষ্টি। রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠ।

বললেন,—ভুল দেখলি না তো ? ঠিক জানিস্ ?

পরিচারিকা কথায় জোর দিয়ে বললে,—আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি বড়রাণী! রাজপুত্তুর ফিরে গেছে, এই পথ ধরেই গেছে।

আর এক মুহূর্ত সেখানে তিষ্ঠোলেন না উমারাণী। চললেন, দ্রুত পদে চললেন আপন মহল যে দিকে। পরিচারিকা অনুসরণ করলো রাণীকে। বড় রাণীর কি কমনীয় রূপ, কি উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ! দেখতে দেখতে কত দিন, কত সময়ে বিমুগ্ধ হয়ে গেছে পরিচারিকা।

পদ্ম-পাপড়ির মত দুই নয়ন। ক্ষুদ্র নাসারন্ধ্র! তিন রেখাযুক্ত বিভূসিত কণ্ঠ। কুঞ্চিত কেশকুন্তল। প্রমাণ শরীরে কোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ঐশ্বর্য্য ও পদগর্ব্বে আত্মহারা নয়, মুখে মৃদুহাসির ক্ষীণ রেখা সর্ব্বক্ষণ।

রাজাবাহাদুরের সহোদর, ছোটকুমার, দেবর কালীশঙ্কর কি বলতে কি বলবেন, সেই সকল কথার কল্পিত আলোড়ন বক্ষমধ্যে। কালীশঙ্কর যে ধরণের মানুষ, তাতে ভয় হয় উমারাণীর। বাক্যালাপ, তর্ক বিতর্ক ও বাক্-বিতণ্ডার ধার ধারেন না ছোটকুমার—কথায় কথায় ছোরা ছুরির ব্যবহার করেন—ক্রোধ বৃদ্ধি হ'লে আর কোন উপায় থাকে না। যতক্ষণ ক্রোধ থাকে না ছোটকুমার ততক্ষণই মানুষ। রাজমহিষী ভাবছিলেন,—আহা, রাজাবাহাদুরকে যদি একবার বলবার অবকাশ পেতেন, তবে বলতেন যে, ননদিনী বিন্ধ্যবাসিনীর স্বামী জমিদার কৃষ্ণরামের সঙ্গে যেন আপোষে রফা করেন। ছোটকুমার যেন কোন হিংস্র উপায় অবলম্বন না করেন।

ছেলে কোথায় গেল?

কোথায় গেল শিবশঙ্কর? রাজপুত্র চক্ষের নিমেষে কোন্ অন্তরালে গিয়ে লুকালো? ত্রস্ত পদক্ষেপে নিজের মহলের দিকে যেতে যেতে কত কথাই মনে পড়ে রাজমহিষীর। ছেলেকে চোখের আড়াল করতে পারেন না একটি মুহূর্ত্ত। কার মনে কি আছে কে বলতে পারে? বহুবিস্তৃত এই রাজপ্রাসাদের কোন্ অন্ধকারে কে লুকিয়ে আছে কে জানে! বিষের পাত্র থাকে যদি তার হাতে! অলক্ষ্য থেকে যদি কেউ অস্ত্র নিক্ষেপ করে!

আহা, ছোটকুমার যদি ননদিনী বিন্ধ্যবাসিনীর স্বামী কৃষ্ণরামের সঙ্গে আপোষে মিটমাট করেন তবেই রক্ষা।

কাফ্রীর দল গলদঘর্ম্ম হয়ে উঠেছে।

রাজাবাহাদুরের সুখাসন তবুও এখনও রাজমহলের সীমা ত্যাগ করেনি। এখনও যেতে হবে কত দূরে! রাজমহল থেকে যেতে হবে রাজ-কাছারীতে। যেন এক গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে হবে। এতগুলি কাফ্রী একসঙ্গে সুখাসন বয়ে নিয়ে চলেছে, তবুও ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠেছে প্রত্যেকে। রাজার সুখাসন, যদি দুলে ওঠে! কাঁধ বদল করতে পাবে না কেউ। বদলের জন্য সচেষ্ট হ'লেই রাজগৃহের জল্লাদের লৌহকণ্টকময় কশাঘাত সহ্য করতে হবে। সেই ভয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আছে কাফ্রী দল।

সুখাসন হ'লে কি হয়, যেমন সুদৃঢ় তেমনই গুরুভার।

ক্ষত্রিয় জাতীয় কাষ্ঠে নির্ম্মিত সুখাসন। সোনার পাত আগাপাশতলায়। উঁচু-নীচু কারুশিল্প সর্ব্বত্র। মোগল-মুসলমানী নক্সা সুখাসনের যত্র তত্র। রাজাবাহাদুরের শিরোদেশে মুক্তার-ঝালর ঝোলানো রাজছত্র!

রাজ-কাছারীতে আসছেন স্বয়ং রাজাবাহাদুর।

দেওয়ানজী কখন এসে যাত্রায় যোগ দিয়েছেন, কারও দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু রাজাবাহাদুরের নজর এড়ায় না। কালীশঙ্কর ঠিক চোখ রেখেছেন। দেখেছেন দেওয়ানকে। আজ তার মুখাকৃতি যে কেমন তাও লক্ষ্য করেছেন একাগ্রদৃষ্টিতে।

বেগুনী ভেলভেটের জরিদার তাকিয়া পিষ্ট হ'তে থাকে। রাজাবাহাদুর দেহ হেলিয়েছেন। বললেন,—দেওয়ানজী, বাহকদের গতি রোধ করা হোক্।

সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের অস্ত্রধারী দু'জন দেহরক্ষীর কি এক সঙ্কেত দেখে কাফ্রীর দল থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। রাজাবাহাদুর স্বয়ং যখন হুকুম করেছেন।

—দেওয়ানজী, ছোটকুমারকে এত্তেলা দেন, আমি সাক্ষাতের অভিলাষী। পুনরায় কথা বললেন রাজাবাহাদুর কালীশঙ্কর। গম্ভীর কণ্ঠে।

কথা শুনে দেওয়ান বোধ করি খুসী হন না। মাথার শিরোপা যথাস্থানে বসিয়ে দিতে দিতে দেওয়ান কি যেন বলতে চেয়ে বলতে পারেন না। মুখের আগায় কথা, তবুও মুখ খুলতে পারেন না। সঙ্কোচ বোধ করেন।

রাজাবাহাদুর বললেন,—দেওয়ানজী, আপনি কি আমার প্রস্তাব গ্রহণে অনিচ্ছুক?

শিরোপার অঞ্চলে হাত বুলাতে থাকেন দেওয়ান। বললেন,—রাজাবাহাদুর, আপনার পক্ষে এ কার্য্য সমীচীন হবে না। আপনিই জ্যেষ্ঠ, আপনি সকল সম্মানের অধিকারী, আপনি কেন ওপরপড়া হয়ে সাক্ষাতের প্রার্থনা জানাবেন? কি বা প্রয়োজন?

সুখাসনের গতি কি চিরদিনের মত বন্ধ হয়েছে?

কাফ্রীর দল কৃষ্ণবর্ণ পাষাণ-মূর্ত্তির মত অচঞ্চল দাঁড়িয়ে আছে। কঠোর কষ্টভোগের ম্লান চিহ্ন ওদের মুখাবয়বে। আরও কতক্ষণ বহন করতে হবে এই গুরুভার সুখাসন? আরও কতদূরে যেতে হবে? রাজপুরীর সুবিশাল প্রাঙ্গণের পথ ধ'রে ধীরে ধীরে চলেছিল সুখাসন। অনুজ কালীশঙ্করের মহলের প্রধান দ্বারের সম্মুখে পৌঁছতেই রাজাবাহাদুর সুখাসনের গতি রোধ করতে আদেশ করেছেন।

ছোটকুমার কালীশঙ্করের নাম শুনলেই দেওয়ান কম্পিতবক্ষ হন। তাঁকে দেখলে এতই ভীত হন যে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না কোন মতেই। এই প্রাতঃকালেই ছোটকুমারকে কি ব প্রয়োজন?

রাজাবাহাদুর বললেন,—আমার পরম আরাধ্যা মাতৃদেবী এখনও পর্য্যন্ত নিরম্বু উপোষী আছেন। রাজকুমারী

বিন্ধ্যবাসিনীর জন্য মর্ম্মাহত হয়েছেন। এজন্য কিছু পরামর্শ করণের ইচ্ছা করি।

দেওয়ানজী ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে কাশীশঙ্করের বাসগৃহের আপাদমস্তক লক্ষ্য করেন। যেন এক অপরাধী, কারাগৃহ দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দেওয়ানজী বললেন,—বেশ কথা। খুবই ভাল কথা। তবে এ স্থলে, এই প্রাঙ্গণমধ্যে সকলের চোখের সম্মুখে, আপনি স্বয়ং কিনা রাজাবাহাদুর, আপনার পক্ষে সাক্ষাতের প্রত্যাশায় তীর্থের কাকের ন্যায় অপেক্ষা করা সত্যই লজ্জার ও অনুকম্পার বিষয়। সাক্ষাৎ করতেই যদি হয়, রাজাবাহাদুর আপনি দরবারে ব'সে এত্তেলা পাঠান কেন ছোটকুমারকে।

রাজাবাহাদুর কালীশঙ্কর একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বললেন,—তথাস্তু।

দেওয়ানের আদেশে দেহরক্ষিদ্বয় পুনরায় কি এক সঙ্কেত করতেই সুখাসন সচল হ'ল তৎক্ষণাৎ। কাফ্রীর দল স্বস্তির শ্বাস ফেললো। রাজপুরীর প্রাঙ্গণ-পথ ধ'রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'ল সিপাই, শান্ত্রী ও সুখাসন। রাজছত্রের মুক্তার ঝারা আবার দোদুল্যমান হয়। নতুন সূর্য্যালোকের স্পর্শ পেয়ে সুখাসন দ্যুতি ঠিকরোয়; মোগল মুসলমানী স্বর্ণশিল্পের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করে।

দেওয়ান যেতে যেতে বারে বারে ফিরে ফিরে দেখেন পিছু পানে। ছোটকুমার কাশীশঙ্করের গৃহের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন ভয়-কাতর চোখে। বাহির থেকে গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টি চলে না। গৃহের সুউচ্চ ও বিশাল প্রাচীরে ব্যাহত হয় দৃষ্টি। হাওদা-সমেত হাতীর গমনাগমন চলতে পারে কাশীশঙ্করের গৃহের সিংহদ্বার এমনই বৃহৎ।

উন্মুক্ত লৌহফটক সিংহদ্বারে। তবুও কারও অবাধ গতি সেখানে নেই।

দু'জন সশস্ত্র দেহরক্ষী ফটকের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বিপরীতমুখে যাওয়া-আসা করছে। পাহারা দিচ্ছে, পথ আগলাচ্ছে।'

কোথা থেকে অশ্বের পদধ্বনি ভেসে আসছে, রাজাবাহাদুরের কর্ণেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে। কোথায় কোন পথে দুরন্ত বেগে ছুটেছে কার অশ্ব? একটি দু'টি নয়, একসঙ্গে বেশ কয়েকটি খুরের খটাখট শব্দ পাওয়া যায় যেন। রাজাবাহাদুর দেখলেন ছোটকুমারের সিংহদ্বারের চলমান প্রহরিদ্বয় সহসা প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। ফটকের দু'প্রান্তে যে যার স্থানে দাঁড়িয়ে পড়ে। ইতি-উতি দেখেন রাজাবাহাদুর। কোথায় অশ্ব, কোথায় কে!

এমন সময় কাশীশঙ্করের সিংহদ্বার ভেদ করে তড়িৎ গতিতে বেরিয়ে পড়লো আরোহীসহ অশ্বের সারি। বঙ্কিমগ্রীবা অশ্বসমূহ পূর্ণোদ্যমে ছুটছে—পিছন-পথে ধূলি উড়ছে—উড়ছে অশ্বারোহীদের উষ্ণীষপ্রান্ত। সর্ব্বপ্রথমে চলেছেন ছোটকুমার কাশীশঙ্কর। দুর্নিবার বেগে ঘোড়া ছুটিয়েছেন। অন্যান্য অশ্বারোহী তাঁকে অনুসরণ করছে। কাশীশঙ্করের অশ্বকে ছেড়ে এগিয়ে যাবে এমন সাধ্য বা সাহস কার আছে? অশ্বের সারি রাজপ্রাসাদের প্রধান প্রবেশ-দ্বার অতিক্রম ক'রে সবেগে বেরিয়ে গেল।

রাজাবাহাদুর বললেন,—দেওয়ানজী, অশ্বোপরি কাশীশঙ্করকে দেখছি কি?

—যথার্থই দেখেছেন রাজাবাহাদুর।

দেওয়ানের প্রায় শুষ্ক কণ্ঠ। বিস্ফারিত চোখে শিশুসুলভ ভয়ার্ত্ত চাউনি।

—কোথায় চলেছে সদলবলে? এমন প্রখর সূর্য্যতাপে?

একাগ্র কৌতূহলের সুর কালীশঙ্করের কথায়। আয়ত আঁখিযুগলে ফুটে উঠেছে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। কুঞ্চিত দুই ভ্রূ, যেন দুটি বাঁকা তরোয়াল।

দেওয়ান বললেন,—গড়গোবিন্দপুরে চলেছেন অনুমান হয়।

—গড়গোবিন্দপুরে?

সবিস্ময়ে নিজের মনে নিজেকেই প্রশ্ন করলেন রাজাবাহাদুর। কিন্তু কেন, কি কারণে যে গড়গোবিন্দপুরে চললো ছোটকুমার, অনুধাবন করতে পারলেন না কিছুতেই। সুতানুটী থেকে গড়গোবিন্দপুর, কতটা দীর্ঘ পথ। গড়-গোবিন্দপুরে কাশীশঙ্করের কি প্রয়োজন? কে-ই বা আছে সেখানে! রাজাবাহাদুর যেতে যেতে আকাশ-পাতাল কত কথাই ভাবেন। কিন্তু কোন কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারেন না। দুই ভ্রূ সরল হয় না আর সহজে, বাঁকা তরোয়ালের মতই বক্র হয়ে থাকে।

—গড়গোবিন্দপুরে! কেন সেখানে কে আছে? কোন্ অন্তরঙ্গ?

নিজের মনে নিজেকেই প্রশ্ন করলেন রাজাবাহাদুর। কিন্তু কোন সদুত্তরই খুঁজে পেলেন না।

কাফ্রীর দল তাদের গতি দ্রুত করলো।

গুরুভার সুখাসন আর বুঝি বওয়া যায় না। কাফ্রীদের ঘর্ম্মাক্ত দেহে তাজা সূর্য্যালোক প'ড়েছে। যেন ঘাম-তেল মেখেছে সর্ব্বাঙ্গে। রৌদ্রালোকে চিক চিক করছে ওদের বলিষ্ঠ শরীর। তবুও মুখে কথা নেই, ভাবভঙ্গীতে কোন প্রকাশ নেই। মনে হয়, তবে কি ওরা মূক, বধির?

ভিনদেশের মানুষ। ভাগ্যের ফেরে প'ড়ে ক্রীতদাস হয়েছে। ক্ষুধা আর অভাবের তাড়নায় বিকিয়ে দিয়েছে নিজেদের। দাসত্ব করছে। পাছে কোন দিন চোখে ধূলি দিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় তাই কাফ্রীদের কারও বাহুতে, কারও পৃষ্ঠদেশে লেখা আছে নাম। উর্দ্দু ভাষায় লেখা। যে অজ্ঞাতকুলশীল, যার কোন পরিচয় নেই; যে অনাথ, যার পিতা-মাতার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই, তার পিঠে এঁকে দেওয়া হয়েছে পরিচয়-চিহ্ন হিসাবে সংখ্যার সঙ্কেত।

কালির দাগ, জলে ধুয়ে যায়।

উল্‌কির কালো রেখা, অস্ত্রের সাহায্যে চেঁচে তুলে দেওয়া যায়। তাই জলন্ত লৌহ-সূচী বিদ্ধ করে কাফ্রীদের দেহে ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের আত্মপরিচয়। যত দিন না ঐ দেহ আগুনে দগ্ধ হয়, তত দিন আত্মগোপনের কোন উপায় নেই। পলায়নেরও পথ নেই।

সুখাসনের ভারে ঊর্দ্ধাঙ্গ নত হয়ে গেছে কাফ্রীদের। গতি দ্রুত করেছে ওরা। এই গুরুভার আর বুঝি বওয়া যায় না। কত দূরে রাজকাছারী ?

ঐ তো গাছ-গাছালির ফাঁক থেকে উঁকি মারছে কাছারী-বাড়ী! এখনও অনেকটা পথ। রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণের আঁকা-বাঁকা পথ ধ'রে যেতে হবে আরও কতক্ষণ।

ঘন ও কুঞ্চিত-কেশ কাফ্রীদের মধ্যে একজন হঠাৎ তারস্বরে চীৎকার করলো। রাজাবাহাদুর ছিলেন চিন্তাকুল। গগন-বিদারক শব্দ শুনে কালীশঙ্কর পিছনে দৃষ্টিপাত করলেন। বড় জোর লেগেছে আচম্‌কা। কাফ্রীদের মধ্যে একজন মাত্রাতিরিক্ত ভার বহনে অক্ষম হয়ে কাঁধ বদল করতে সচেষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাস-সর্দ্দার সজোরে চাবুক চালিয়েছে। সব শেষে ছিল যে কাফ্রীটি, তারই পিঠে চাবুকের ঘা পড়েছে। শঙ্কর মাছের লেজের সুদীর্ঘ চাবুক আচমকা লাগতেই চীৎকার ক'রেছে তারস্বরে। কি বিশ্রী আর কর্কশ কণ্ঠধ্বনি! কি গম্ভীর!

একেই আদুড় গা।

নীল বনাতের খাটো জাঙ্গিয়া ছাড়া আর কিছুই নেই পরনে। গলায় কালো সুতোর হারে ঝুলছে তামার চাকৃতি। যার যার আত্মপরিচয় খোদাই আছে ঐ চাকতিতে। যার যা সংখ্যা।

রাজকাছারীর কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়ান বললেন,—হুজুর, তবে এখন দরবারেই গমন হবে তো, না মা পতিত-পাবনীর মন্দির দর্শন করতে যাবেন ?

—উঁহু, দরবারেই যাওয়া হোক্‌।

রাজগৃহের প্রাঙ্গণের ইদিক-সিদিক দেখতে দেখতে বললেন রাজবাহাদুর। দেওয়ানের কথায় কর্ণপাত ক'রেছেন মাত্র, দৃষ্টি তাঁর বিচরণ করছে হেথায়-সেথায়। বহু দূর-বিস্তৃত বৃহৎ প্রাঙ্গণের এক দিকে সারি সারি রাজপ্রাসাদ। এক দিকে চিড়িয়াখানা। এক দিকে মন্দির ও তৎসংলগ্ন ঝিল। এক দিকে রাজকাছারী। গাছ-গাছড়ার ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে আছে কোথাও জেলখানা, কোথাও তোশাখানা, কোথাও মালখানা। আর যেন লুকিয়ে আছে কত সশস্ত্র দ্বাররক্ষী। যত বন্দুকধারী।

রাজকাছারীর দরদালানে সুখাসন নামিয়ে রেখে কাফ্রীর দল রেহাই পায়। দম ফেলে বাঁচে। এখন বহুক্ষণ আর তাদের প্রয়োজন নেই, যতক্ষণ না দরবার শেষ হয়। কেউ ডাকবে না তাদের। এখন একটুকু ছায়া চাই। গাছ-গাছড়ার ঝোপ-ঝাড়ের কালো অন্ধকারে মিলবে শীতলতা, অন্যত্র কোথাও নয়। কাফ্রীর দল নিঃশব্দ পদক্ষেপে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে প্রবেশ করলো। কি অসহ্য সূর্য্যোত্তাপ! মুক্ত আকাশের নীচে কেবল প্রখর রৌদ্র। খরতাপে কি প্রচণ্ড দাহিকা!

রাজ-কাছারীর দরদালানে পদার্পণ করেছেন কি করেননি, অনুগৃহীত ও আশ্রিত জনের প্রতি প্রতি-নমস্কার জানাচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দেওয়ান বললেন,—ঘটনাটি রাজাবাহাদুর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই ?

বিস্ময়াবিষ্ট চোখে তাকালেন রাজাবাহাদুর। সবিস্ময়ে বললেন,—কোন্‌ ঘটনা ?

হে হে শব্দে হাসলেন দেওয়ান। মাথার শিরোপার প্রান্তভাগ ঈষৎ টানাটানি করতে করতে বললেন,—আপনার স্নেহপুষ্ট সহোদরের ব্যবহার লক্ষ্য করলেন না ? স্নেহে আপনি একেবারে অন্ধ হয়ে আছেন, তাই চোখে পড়ে নাই অনুমান করি।

আরও অধিক বিস্ময়ের জড়তায় আচ্ছন্ন হন রাজাবাহাদুর। বলেন,—সহোদরের কি অসৎ আচরণ আপনি দেখেছেন ?

আবার হাসলেন দেওয়ান। কৃত্রিম হাসি।

হাতে হাত কচলাতে লাগলেন। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে রাজাবাহাদুরের কাছাকাছি এগিয়ে গেলেন। কণ্ঠস্বর নত ক'রে বললেন,—ঐ যে আপনার সহোদর, আপনার সমুখ দিয়ে দল-বল সাঙ্গোপাঙ্গ সমেত আপনাকে উপেক্ষা করে টগবগিয়ে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করলো! এ অপমানের প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন। আপনার পক্ষে রাজাবাহাদুর, এরূপ ব্যবহার মেনে নেওয়া অত্যন্ত সম্মানহানিকর। অন্ততঃ আমি তাই মনে করি।

কথা শুনে রাজাবাহাদুর হাসলেন।

ভেবেছিলেন, না জানি দেওয়ান কত কথাই শোনাবে। কথা শুনে সহাস্যে বললেন,—ও, এই কথা ? তজ্জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না। ছোটকুমার সে মানুষ নয়। কালীশঙ্কর আর যাই হোক, আমাকে কদাচ অসম্মান করে না।

দেওয়ানের মুখাকৃতির চকিতে পরিবর্ত্তন হয়।

চোখে-মুখে হতাশা ফুটে ওঠে। মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। চোখের তারা যেন ঠেলে বেরিয়ে পড়তে চায়। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন দেওয়ান।

দরবার-ঘরের দ্বারে পৌঁছে পিছনে দেখলেন রাজাবাহাদুর। দেখলেন কোথায় দেওয়ান।

কিঞ্চিৎ দূরেই ছিলেন দেওয়ান।

রাজাবাহাদুরের চোখে চোখ পড়তেই সভয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলেন। বললেন,—কিছু হুকুম আছে রাজাবাহাদুরের ?

—হাঁ। বললেন কালীশঙ্কর। সহজ সরল কণ্ঠে। বললেন,—সহোদরকে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আপনি

যেন অবিলম্বে খোঁজ লওয়ার ব্যবস্থা করেন, ছোটকুমার কোথায় গেলেন, কখন ফিরবেন। আপনি তখন জানালেন ছোটকুমারের গন্তব্য স্থান না কি গড়গোবিন্দপুর! সত্য কি না সঠিক জ্ঞাত হোন। আমাকেও জানান।

কথার শেষে দরবার-ঘরে প্রবেশ করলেন কালীশঙ্কর।

লাল ভেলভেটের গালচেয় পা দিলেন। এক লহমায় দেখে নেন দরবার-ঘরে কোন্ কোন্ ব্যক্তির অবস্থিতি। কে কে আছে।

কেউ আনত হয়ে প্রণাম জানায় দূর থেকে। কেউ সনমস্কার অভিবাদন জানায়। কেউ আবার সেলাম জানায়, কেউ কুর্নিশ করে। মাথার টুপী খোলে কেউ; কেউ বা পাগড়ী খুলে রাখে। সম্মান-প্রদর্শন করে সকলে। সসম্ভ্রমে।

দরবার-মঞ্চে উঠলেন রাজাবাহাদুর। গদিতে বসলেন।

ঘন লাল ভেলভেটের জরিদার তাকিয়ায় দেহ এলালেন। দু'পাশ থেকে দু'জন নির্ব্বাক্ মানুষ চামর খেলানো আরম্ভ করে। বাতাস খেলায়। কতটা পথ এসেছেন রাজাবাহাদুর এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনে। কালীশঙ্করের কপালে স্বেদবিন্দু। তদুপরি দরবার-ঘরের দেওয়ালের শীর্ষে গবাক্ষ, দ্বার মাত্র একটি। বাতাস নেই বললেই চলে।

ছোটকুমার কালীশঙ্কর কি কারণে গড়গোবিন্দপুরে যাত্রা করলেন, তা যতক্ষণ না জানছেন ততক্ষণ স্থির হবেন না রাজাবাহাদুর। দরবারের কাজে হয়তো ভুল হয়ে যাবে।

—ঘোষাল আসে নাই?

হঠাৎ কথা ধরলেন কালীশঙ্কর। পরিপাটি ক'রে বললেন। হাতের আঙটি জৌলুষ তুললো।

দরবার-ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে সাদা বেলোয়ারী কাচের আধারে বাতি জ্বলছে কত অসংখ্য! মোমবাতি জ্বলছে। কালনার মোম, যে মোমের মূল্য, প্রতি-মণ পঞ্চাশ সিক্কা টাকা!

—আমি হাজির আছি রাজাবাহাদুর।

ঘোষাল কথা বললেন। নিজের বুকে হাত রেখে নিজেকে দেখিয়ে দিলেন। বললেন,—দরকারী কাজ ক'টা আগেভাগে শেষ করেন রাজাবাহাদুর। তারপর কথা হবে।

—ঠিক কথা। বললেন রাজাবাহাদুর।

অপেক্ষমান সেরেস্তাদারের প্রতি চোখ ফেরালেন। পেশকারকে একবার দেখলেন। পেশকার রাজাবাহাদুরকে আদাব জানালে। পেশকারের হাতে কাগজ-পত্র। কাণে কলম।

দরবার-ঘরের এক পাশে নির্দ্দিষ্ট ফরাস। ঢালোয়া সতরঞ্চিতে সারি সারি তাকিয়া। পোদ্দার আর বেনেরা সেখানে এসে ব'সেছে কখন সেই সূর্য্যোদয়ের সময় থেকে। কেউ কেউ ঢুলছে। কেউ ঘুমোচ্ছে।

দরবার-ঘরে চন্দ্রাতপ। লাল রেশমের চাঁদোয়া।

রাজাবাহাদুর ঐ চন্দ্রাতপে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। কালীশঙ্করের মস্তিষ্কে অন্য কোন' চিন্তা নেই। দরবারের কাজে মন বসে না।

—পেশকার, দেওয়ানজীকে সেলাম দাও। রাজাবাহাদুর কথাগুলি বললেন ঐ চন্দ্রাতপে চোখ তুলে। কথার সুরে গাম্ভীর্য্য ফুটিয়ে।

—বহুৎ আচ্ছা হুজুর!

পেশকার বললে আদাব জানিয়ে! মৃদু হাসি হাসতে হাসতে। দরবার-ঘরের দরজার কাছাকাছি গিয়ে প্রহরীদের এক জনকে রাজ-আদেশ ব্যক্ত করলে চুপি চুপি। প্রহরীদের এক জন দেওয়ানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। ছুটলো।

রাজাবাহাদুরকে আনমনা হ'তে দেখেছে ঘোষাল।

দরবারে বসলে কি হবে, ঘোষাল দেখেই বুঝেছে যে রাজা যেন আজ অস্থির হয়ে আছেন। তাঁর মুখাবয়বে চিন্তার কালো ছায়া পড়েছে। তিনি একভাবে অধিকক্ষণ বসতে পর্য্যন্ত পারছেন না।

—রাজাবাহাদুর, বৃথা কালক্ষেপ করেন কেন? জরুরী কাজকর্ম্ম শেষ করেন না কেন?

ঘোষাল কথা বললে কথায় কাকুতি মাখিয়ে।

আকাশ থেকে পড়লেন বুঝি কালীশঙ্কর। এতক্ষণ তিনি যেন ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর সমুখের পৃথিবী। দরবারে বসেছেন বেমালুম ভুলে গেছেন। ঘোষালের কথায় কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হন রাজাবাহাদুর। সুস্থির হয়ে বসেন। চামরের অবিরাম হাওয়ায় খিড়কিদার পাগড়ীর প্রান্তভাগ নাচানাচি করছে। পাগড়ির এক পাশে একটি রত্নময় ধুকধুকি। এক খণ্ড বৃহৎ হীরা, টুকরো চুনী আর মুক্তার বেষ্টনে আবদ্ধ। চামরের হাওয়ায় ধুকধুকির সংলগ্ন সাদা ময়ূরের পালখ কাঁপছে থরো থরো। বেলোয়ারী লণ্ঠনের অসংখ্য বাতির উজ্জ্বল আলোয় জ্যোৎস্নাকাশে নক্ষত্রের মত ধুকধুকিটা যখন তখন জ্বল্-জ্বল্ করছে।

এক পাশে বেণে, ঠাকুর আর পোদ্দারের দল।

অন্য পাশে ভয়ে আড়ষ্ট দেনদারের দল। অভাবের সময় টাকা ধার নিয়েছে। মাথা যেন তাদের বিকিয়ে আছে। দেনার দায়ে ভিটে-মাটি বিকিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। সুদ বাকী রাখলেই সমূহ বিপদ।

কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তাবিষ্ট থেকে কালীশঙ্কর বললেন,—দেনদারদের মধ্যে কে কে হাজির?

—আমরা সকলেই প্রায় আছি রাজাবাহাদুর! তবে কেউ কেউ অনুপস্থিত আছে।

দেনদারদের মধ্য থেকে এক জন কথা বললে উঠে দাঁড়িয়ে।

রাজাবাহাদুর বললেন,—আমার তহবিলদারকে দেখি না কেন? সে কোথায়? আসে নাই কেন এখনও?

—আমি তো আছি রাজাবাহাদুর! হুজুরের কৃপাদৃষ্টি লাভে বঞ্চিত হয়েছি কি?

তহবিলরক্ষক সবিনয়ে কথা বলে।

দরবারের গদীতে বসেছেন রাজাবাহাদুর। কে কখন তাঁর ঠিক সম্মুখে গদীর 'পরে রেখে দিয়ে গেছে তাঁরই ঢাল-তরোয়াল। কালীশঙ্কর তরোয়ালটি নাড়াচাড়া করতে করতে বলেন,—পাওনা টাকা জমা ক'রে নেন মশায়!

দেনদারদের মধ্যে কেমন যেন একটা মৃদু গুঞ্জন হ'তে থাকে। পরস্পরে কথা বলতে থাকে। ফরাস ত্যাগ ক'রে ওঠে কেউ কেউ। রাজাবাহাদুরের পায়ের সন্নিকটে কেউ খুলে রাখে মাথার শিরোপা। কেউ রাখে টাকাভর্ত্তি থলি। শিরোপার খাঁজে খাঁজে আছে টাকার তোড়া।

কালীশঙ্কর বললেন তহবিলদারকে,—পাওনা টাকা উঠায়ে নেন মশায়! দেনদারদের লয়ে যান কাছারীতে। ঠিকঠাক রাখতে ভুল হয় না, নজর রাখবেন। একের ঘরে যেন অন্যের টাকা জমা না করেন।

তহবিলদার বলেন,—এ কথা আমাকে বলতে হবে না রাজাবাহাদুর! চিত্রগুপ্তের ভুল হ'তে পারে, আমার ভুল হয় না। আপনি নিশ্চিন্ত হন।

—দেনদারদের মশায়ের সঙ্গে ল'য়ে যান, কেমন? কালীশঙ্করের কথা কেমন যেন অন্যমনস্কের মত। কথা বলছেন, কিন্তু কথা বলায় মন নেই আজ। এত মানী ও সম্মানী লোকের সমাগম হয়েছে দরবারে, দেখেও যেন দেখছেন না। কালীশঙ্করের ললাটের বক্ররেখাগুলি কোন মতেই সরল হয় না। কাছেই ছিল আতরদান, মেওয়ার রেকাবী, গোলাপপাশ। যত ঢাকাই কাজের সোনার সরঞ্জাম। আতরদান থেকে ভিজে আতরের তুলো তুললেন কালীশঙ্কর। উগ্র মৃগনাভির আঘ্রাণে ক্ষণকালের জন্য দু' চক্ষু নিমীলিত করলেন। কি উগ্র সুগন্ধ! দরবার-ঘর মৃগনাভির জোরালো সুবাসে যেন টইটম্বুর হয়ে আছে। ঘরের কোণে রূপার নক্সাতোলা ধুনা জ্বালাবার পাত্র। ধুমুচিতে শালবৃক্ষের নির্য্যাস পুড়ছে। সর্জ্জরস ও গুগ্‌গুল পুড়ছে। ধুনার ধোঁয়ার শিখা চন্দ্রাতপ স্পর্শ করেছে।

—দেওয়ানজী কেন আসেন না এখনও?

হঠাৎ মিহিকণ্ঠে স্বগত করলেন কালীশঙ্কর। দরবার-ঘরের দ্বারপথে বারে বারে চোখ ফেরান। দেওয়ান আসে কিনা দেখেন। দেখেন, তহবিলরক্ষকের পিছু পিছু দেনদারের পাল বেরিয়ে গেল।

ঘোষাল বললেন,—জহুরীদের সঙ্গে কাজ চুকায়ে লন রাজাবাহাদুর! একে একে কাজ মিটায়ে লন।

কালীশঙ্কর মনের বিরক্তি গোপন ক'রে বললেন,—জহুরীদের আদেশ করেন আমার নিকটে যেন আসে। দূর থেকে কি জহর চেনা যায়?

তিনজন জহুরী ফরাস ছাড়লো। উঠলো।

—রাজাবাহাদুর, বিচারটা শেষ ক'রে লন। এটা ঝামেলার কাজ নয় তেমন। একজন মাত্র আসামীর বিচারের কাজ। হুজুরের একটা হুকুম, হাঁ কিম্বা না যা হয় একটা বলে দেন।

কারারক্ষককে দরবারে দেখে এবং তার কথা শুনে কি যেন ভাবলেন রাজাবাহাদুর। পরিপাটি হয়ে বসতে বসতে বললেন,—আসামী কে? অপরাধ কি?

কারারক্ষক বললে,—আসামীর নাম রহমন। আপনার রাজপ্রাসাদেরই এক খানসামা। অপরাধ গুরুতর।

—আসামী হাজির হোক। বললেন কালীশঙ্কর।

উগ্র মৃগনাভির সতেজ আঘ্রাণের আস্বাদ নেন কথার শেষে।

কারারক্ষক সরবে ডাকলো,—সিপাহীলোক, রহমানকে হাজির!

দরবারকক্ষে কারারক্ষকের উচ্চ রবের প্রতিধ্বনি জাগলো।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জন সিপাই ঠেলা দিতে দিতে এনে উপস্থিত করলে রহমানকে। হস্তপদশৃঙ্খলাবদ্ধ রহমান। তকমা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কোমরবন্ধনী শূন্য।

কালীশঙ্কর সোজা হয়ে বসলেন। মৃগনাভির সুগন্ধি রেখে দিয়ে বললেন,—আসামীর অপরাধ?

কারারক্ষক বললে,—নাচঘর থেকে হুজুর একজোড়া সোনার ফুলদান চুরি। ফটকের সিপাইরা বামালসমেত আসামীকে গিরিফ্‌তার করে।

—চুরি! বললেন রাজাবাহাদুর। সবিস্ময়ে বললেন,—চুরি! নাচঘর থেকে সোনার ফুলদান চুরি!

—হাঁ রাজাবাহাদুর! বললে কারারক্ষক। রহমানকে একটা সজোর ধাক্কা মেরে বললে,—হাঁ হুজুর! কুত্তার বাচ্চা-টাকে কুত্তা লেলিয়ে দিই হুজুর? যা আপনি হুকুম করেন।

ছিটকে পড়ে গিয়েছিল রহমান। হস্তপদশৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়লো দরবারঘরের মেঝেয়। দু'টো সিপাই রহমানের গর্দ্দান ধ'রে হিঁচড়ে তুললো।

রাজাবাহাদুর বললেন,—সাজা এক বছর কয়েদবাস।

কারারক্ষক ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললে,—শাস্তিটা হুজুর কিছুই হ'ল না। কুত্তার বাচ্চার রক্ত দেখবো না হুজুর?

কথার শেষে আবার এক ঠেলা মারলো কারারক্ষক। এবার হাত দিয়ে নয়, কোমরে পা দিয়ে সবলে ঠেললো। আবার ছিটকে পড়লো রহমান। সাত হাত দূরে গিয়ে পড়লো। দরবারঘরের দেওয়ালে ঠুকলো রহমানের মাথা। সশব্দে।

রাজাবাহাদুর বললেন,—আমার বিচারই শেষ কথা।

অগত্যা কারারক্ষক সিপাইদের বললে,—নিকালো শালা শয়তানকো।

সিপাইরা দরবার-ঘরের সাজসজ্জা দেখছিল এতক্ষণ। বিমুগ্ধ হয়ে দেখছিল। কারারক্ষকের কথা শুনে চমকে ওঠে তারা। রহমানকে টেনে তোলে। টানতে টানতে দরবারের বাইরে নিয়ে যায় রহমানকে। কারারক্ষকও অগত্যা দরবার ত্যাগ করে। ফুঁসতে ফুঁসতে বিদায় নেয়। দ্বার অতিক্রমের আগে নামে মাত্র সেলাম ঠোকে।

রাজাবাহাদুর কালীশঙ্কর সহসা দু'চক্ষু বিস্ফারিত ক'রেছেন। আসামীকে দেখছেন কি এমন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে? কি দেখছেন কি? রাজাবাহাদুর দেখছেন দেখে ইয়ার-বন্ধু ও তোষামুদেরাও চোখ বড় করলো তৎক্ষণাৎ। রাজাবাহাদুরের দৃষ্টি অনুসরণ করলো।

রাজাবাহাদুর দেখলেন আসামীর উর্দ্ধাঙ্গ রক্তাক্ত। ঘোর লাল রক্তের একটি ধারা নেমেছে কোথা থেকে।

খানসামা রহমানের মাথা থেকে রক্তপাত হচ্ছে অঝোরে। দেওয়ালের সঙ্গে মাথাটা ঠোকাঠুকি হয়েছে। চিড় খেয়েছে কতটা কে জানে! রক্ত ঝরছে অঝোরে। ঘোর লাল রক্ত।

জহুরী তিন জন নিজ নিজ পণ্য সারি সারি সাজিয়ে ফেলেছিল রাজাবাহাদুরের গদীতে। দরবার শব্দহীন হওয়ায় দেখলেন রাজাবাহাদুর, নীরবে দেখলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন যত রত্নসম্ভার। দেখা শেষ ক'রে তাচ্ছিল্যভরে ও সহাস্যে বললেন,—পাততাড়ি গুটাও।

মন উঠলো না রাজাবাহাদুরের। চোখে পড়লো না তেমন। জহুরীরা যা এনেছে তেমন অনেক দেখেছেন কালীশঙ্কর। এমন একটিও কিছু নেই, যা তিনি এ যাবৎ দেখেননি না। সবই মামুলী।

অগত্যা জহুরী তিন জন যার যার পণ্য গুটিয়ে তুলে একেকটি সেলাম ঠুকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। জহুরী তিন জন বাঙ্গালী নয়। ভিন্ন প্রদেশবাসী।

দরবারের কারও মুখে কোন কথা নেই। সব চুপচাপ।

ঘোষাল নীরবতা ভঙ্গ করলেন। বললেন,—রাজাবাহাদুরকে আজ কেন এমন মনমরা দেখছি? কারণ?

—সকল কারণই সকলের সমক্ষে ব্যক্ত করা যায় না ঘোষাল! রাজাবাহাদুর ঘোষালের কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন। বললেন,—তবে ঘোষাল, তোমার অনুমান মিথ্যা নয়। আমার মন আজ ঠিক নাই। মন চঞ্চল। কথা বলতে বলতে থামলেন কালীশঙ্কর। শ্বাস ফেললেন একটি। দীর্ঘশ্বাস। আবার বললেন,—দেওয়ানজী যে কোথায় যায়! বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে লোকটির কার্য্যক্ষমতাও লুপ্ত হ'তে ব'সেছে।

কথা শেষ হ'তেই রাজাবাহাদুর চক্ষু মুদিত করলেন।

চোখ বন্ধ ক'রে সূক্ষ্ম গোঁফের এক প্রান্ত পাকাতে থাকেন। হাতের হীরকাঙ্গুরীয় ঝলমলিয়ে ওঠে। কণ্ঠের মুক্তামালা আভা ছড়ায়।

ঘোষাল বললে,—দেওয়ানজী পৌঁছলেন, রাজাবাহাদুর কি কিছু আদেশ করবেন?

—দেওয়ানজী!

তৎক্ষণাৎ চোখ মেললেন রাজাবাহাদুর। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—রাজাবাহাদুর।

কালীশঙ্কর ইসারায় ডাকলেন দেওয়ানকে। কাছাকাছি আসতে তবে বললেন,—কি জেনেছেন? ছোটকুমার কখন প্রত্যাগমন করবেন? কেন, গড়গোবিন্দপুরেই বা স্বয়ং তিনি যান কি জন্য?

দেওয়ান রহস্যময় ও নিঃশব্দ হাসির সঙ্গে বললে,—কোম্পানীর সঙ্গে গেছেন সাক্ষাৎ করতে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন কালীশঙ্কর। বললেন,—কোম্পানীর ফ্যাক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছেন? কিন্তু কি প্রয়োজনে গেলেন?

রহস্যময় হাসি দেওয়ানের মুখে। চোখে তির্য্যক্ দৃষ্টি। বললেন,—ছোটকুমারের সরকারে খোঁজ লওয়ার কারণ যে কি তা কেউই স্পষ্টত বলে না। কেবল জানায় হুজুর গেছেন গড়গোবিন্দপুরে। কোম্পানীর সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে। বেলা দ্বিপ্রহর নাগাদ ফিরতে পারেন।

মুখে কোন কথা জোগায় না। ঘোর নীরবতায় মগ্ন হয়ে পড়েন রাজাবাহাদুর। কুঞ্চিত ভ্রূ সরল হয় না।

কালীশঙ্কর নির্ব্বাক্। চন্দ্রাতপে চোখ।

গড়গোবিন্দপুরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাউস আছে। দিল্লীশ্বর মোগল বাদশাহের অনুমতি নাই বা পৌঁছালো! ১৬৯০ খৃষ্টাব্দ। জব চার্ণকের মনোনীত সুতানুটিতেই ডেরা বাঁধতে হবে—তাই ইংরাজের পক্ষ থেকে স্যর জন গোল্ড্সবোরা সুতানুটি পরিদর্শন করতে এসে একটি অট্টালিকা নগদমূল্যে কিনেছেন—আর কিনেছেন কিছু জায়গা-জমি। অট্টালিকায় অফিস বসেছে কোম্পানীর। সওদাগরী অফিস। জমিতে কাদা-মাটির প্রাচীর তোলা হয়েছে। ফ্যাক্টরী বানানো হবে সেখানে। দুর্গ না আরও কি কি যেন তৈয়ারী হবে। কেউ জানে না এখনও। কাকপক্ষীও নয়।

রাজাবাহাদুর বললেন, অত্যন্ত ধীরকণ্ঠে বললেন,—দেওয়ানজী, আপনার অনুমানই যথার্থ। খানসামাদের আদেশ দেন আসবের সরঞ্জাম দিক। দরবার স্থগিত থাক আজ। অপ্রত্যাশিতদের বিদায় করুন।

দেওয়ান কার প্রতি কি ইঙ্গিত করলেন।

সুসজ্জিত চাপরাসীদের হাতে আসবপানের সাজ-সরঞ্জাম।

কালীশঙ্কর চাঞ্চল্যে অস্থির হয়ে পড়েছেন। হস্ত প্রসারিত করলেন বিনা বিলম্বে। চাপরাসী পানপাত্র ধরলো। স্ফটিকের পানপাত্র। ঘন লাল রঙের পানীয়। আসবের পাত্র ধরলেন রাজাবাহাদুর। রূপালী ঝিলিক তুললো স্ফটিকের পানপাত্র। পাত্রের কানায় কানায় পূর্ণ নির্জ্জলা চুয়ানো মদ বা স্পিরিট চলকে চলকে ওঠে।

স্ফটিকের রূপালী পানপাত্র পুনরায় মুখে তুললেন কালীশঙ্কর। পান করলেন নির্জ্জলা চুয়ানো মদ বা স্পিরিট। ইয়ার, বন্ধু ও তোষামুদের দল ব'সে রইলো। তীর্থের কাকের মত। [ক্রমশঃ।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

[ভারত-বিখ্যাত সার্জ্জন]

মানুষের জীবনের সাফল্যের জন্ম প্রথমেই যেটি চাই সে হচ্ছে উত্তম ও অধ্যবসায়। এ দুটি মূলধন থাকলে যত প্রতিকূল অবস্থাই থাকুক মানুষকে পিছিয়ে দিতে পারে না। সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সম্ভব হয়ে ওঠে তার নিশ্চিত উন্নতি ও অগ্রগতি। এর দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার্জ্জন সেবাব্রতী ডাঃ দীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জীবনে। বিক্রমপুরের (ঢাকার) এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ ক'রেন।

ডাঃ চক্রবর্ত্তীর জীবনের প্রথম প্রেরণা লাভ তাঁর পিতার কাছ থেকেই। পিতা স্বর্গত গোলকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ছিলেন সরকারী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বাল্যকালে তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থেকে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৩ সালে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন ঢাকার পোগোস স্কুল থেকে। ঢাকায় বছর খানিক কলেজে অধ্যয়নের পর তিনি গিয়ে ভর্ত্তি হলেন ময়মনসিংহের সিটি কলেজে। এ কলেজ থেকেই তিনি এফ, এ, পাস করেন সম কৃতিত্বের সঙ্গে ১৯০৫ সালে। তার পর তিনি চলে আসেন কলকাতায় জীবনের উন্নতিসাধনের দুর্ব্বার মানস নিয়ে। ভর্ত্তি হলেন কলকাতার মেডিকেল কলেজে। ১৯১০ সালে তিনি এল, এম, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন মর্য্যাদা সহকারে।

১৯১১ সাল থেকে সুরু হ'লো ডাঃ দীনেশচন্দ্রের সাফল্যময় কর্ম্মজীবন। প্রথমেই তিনি চীৎপুরের রেলের হাসপাতালে যোগদান করেন। বেশী দিন তিনি সেখানে থাকলেন না, চলে এলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজে "এনাটমি"র ডেমোনষ্ট্রেটার হিসেবে। এ পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীনই তিনি সার্জ্জারিতে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্ম ইউরোপ যাত্রা করেন এবং এডিনবরা থেকে আড়াই মাসের ভেতরই এফ, আর, সি, এস (F. R. C. S) হন। ভারতীয়দের মধ্যে এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর আগে আর কারো এ মর্য্যাদা লাভের সৌভাগ্য হয়নি। ১৯১৬ সালের প্রথম ভাগে ডাঃ চক্রবর্ত্তী ফিরে এলেন বিলেত থেকে। এবার তিনি হুগলী ইমামবাড়ী হাসপাতালে যোগদান করলেন। সেখান থেকে তিনি এক বছর পর এলেন কলকাতার ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে এনাটমির অধ্যাপক রূপে। ১৯১৮ সালে তিনি ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং এ ভাবে প্রায় ৩ বছর তিনি সামরিক বিভাগে কাজ করে যান। এর ভেতর বছর দুই তিনি কাটান পূর্ব্ব-পারস্যের রণাঙ্গনে শল্য-চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ হিসেবে। যুদ্ধের চাকুরী শেষে দেশে ফিরে তিনি আবার যোগদান করলেন কলকাতার ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলেই। ১৯২৩ সালে তিনি বিত্তায়তনের ক্লিনিকেল সার্জ্জারির অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। এখানে থাকাকালীন তিনি দায়িত্বশীল অধ্যাপক ও কৃতী সার্জ্জন রূপে সুনাম অর্জ্জন করলেন প্রচুর। কিন্তু এখানেই তিনি তাঁর কর্ম্মের পরিধি সীমায়িত করে ফেললেন না। আবার এলেন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুপ্রাচীন মেডিকেল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা-ভবন কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অতিরিক্ত সার্জ্জন হিসেবে। এখানে তাঁর প্রতিভা ও দক্ষতা প্রদর্শনের অপূর্ব্ব সুযোগ ঘটলো। যোগ্যতার মর্য্যাদা স্বরূপ তাঁকে এ কলেজের ক্লিনিকেল সার্জ্জারির অধ্যাপক পদেও নিযুক্ত করা হ'লো। ১৯৪২ সাল পর্যান্ত তিনি এ পদ অলঙ্কৃত করেন এবং এ সময়ের মধ্যে পাঁচ বার তিনি সার্জ্জারির অধ্যাপক রূপে কার্য্য করেন অস্থায়ী ভাবে। ক্রমে তাঁর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ১৯৪৩ সালে ডাঃ চক্রবর্ত্তীর ডাক পড়লো আবার ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালে, তাঁকে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তিনি প্রায় এক বছর এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন প্রভূত যশঃ ও সম্মানের অধিকারী হয়ে। ঐ বছরেরই ৩১শে ডিসেম্বর তিনি চাকুরী-জীবন হতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পরও তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলেন না। ১৯৪৫ সালে স্বাস্থ্যের কারণেই যদিও বিলেত গেলেন, সেখানে সার্জ্জিকেল বিত্তায় কতখানি অগ্রগতি হয়েছে দেখবার জন্ম তাঁর মনে প্রবল ব্যাকুলতা জাগলো। তাই একটু সুযোগ পাওয়া মাত্র তিনি ঐ দেশের বড় বড় হাসপাতালগুলো একটির পর একটি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। প্রচুর অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি যখন স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করলেন, দেশবাসী সে অভিজ্ঞতা-লব্ধ সুফল পাওয়ার সুযোগ পেল

দীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

যথেষ্ট। তাঁর মত কর্ম্মী পুরুষকে বাইরে অবসর জীবন যাপন করতে দেওয়া হ'লো না—আহ্বান এলো, কলকাতার লেক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অধ্যক্ষ ও সুপারিনটেণ্ডেণ্ট পদে তাঁকে অবশ্য চাই। ১৯৪৭ সালের আগষ্ট থেকে ১৯৪৮ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত তিনি এ প্রতিষ্ঠানেই ছিলেন। তাঁর যোগ্যতার মূল্য সরকার সম্যক্ উপলব্ধি করে তাঁকে এর পরও অবসর নিয়ে থাকতে দিলেন না। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর থেকে পাঁচ বছরের জন্যে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সর্ব্বোচ্চ পদে (অধ্যক্ষ ও সুপার) সসম্মানে অধিষ্ঠিত হলেন। অতীব কৃতিত্ব ও কুশলতার সঙ্গে এ দায়িত্ব বহন করে তিনি স্থায়ী ভাবে অবসর গ্রহণ করলেন চাকুরী-জীবন থেকে ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। এ পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তিনি আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি রাষ্ট্রের বিভিন্ন হাসপাতাল ও মেডিকেল বিদ্যায়তন পরিদর্শন করেন। উদ্দেশ্য ছিল সেখান থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এ দেশে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট মেডিকেল শিক্ষার উন্নতিবিধান। কার্য্যতঃ করলেনও তিনি তাই। মেডিকেল শিক্ষাক্ষেত্রে এ সম্পর্কে তাঁর যে অবদান রয়েছে তা সত্যই অতুলনীয়।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী চিকিৎসা-জগতে বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন ক্রমাগত কয়েক বছর। প্রায় ৬ বছর ষ্টেট মেডিকেল ফ্যাকালটির সহ-সভাপতির পদও তিনি অলঙ্কৃত করেন। তিনি নয়াদিল্লীস্থ অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল ইনষ্টিটিউটের উপদেষ্টা কমিটির একজন অগ্রণী সদস্য।

চাকুরী-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করলেও ডাঃ দীনেশচন্দ্র কর্ম্মজীবন থেকে অবসর নিতে পারেননি। কারণ তাঁর কাছে কর্ম্মই জীবন। সমাজ ও দেশের দুর্গত মানুষের সেবায় আজও তিনি অক্লান্ত ভাবে নিযুক্ত। সার্জ্জারী সম্পর্কে তিনি বহু গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ লিখেছেন ও লিখছেন। সেগুলি নিঃসন্দেহে জাতির অমূল্য সম্পদ। তাঁর কাছ থেকে চিকিৎসক সমাজ ও দেশবাসী এখনও অনেক প্রত্যাশা রাখে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়

(পশ্চিম বঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারী)

শ্রীএস, এন, রায়—আই, সি, এস। কিন্তু এটুকুই তাঁর সব পরিচয় নয়। তাঁর ভেতরে এক বিরাট কর্ম্মী মানুষ লুকিয়ে রয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি কর্ম্মকেই তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত বলে গ্রহণ করেছেন। নিজের সম্পর্কে হিসাব-নিকাশের বেলায় তিনি তাই বলছেন—"আমার জীবনধারা ব'লতে গেলে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক এবং রোমাঞ্চকর। যখন যে কাজের আহ্বানই আসুক, অগ্রাহ্য করা আমার কোন কালেই স্বভাবধর্ম্ম নয়। সব কাজকেই আমি সমান বড় বলে মনে করি।"

শ্রীরায়ের জন্ম হয় কলকাতাতেই এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯০২ সালে। তাঁর পূজ্যপাদ পিতা স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন সেকালে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। পিতার সঙ্গে সঙ্গে ছোটবেলায় তাঁকেও নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে হ'তো। শিক্ষাজীবন সুরু কলকাতার হেয়ার স্কুলে। সেখান থেকে ১৯১৯ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ১৯২১ সালে ততোধিক কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি উত্তীর্ণ হলেন আই, এস, সি পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। তার পরই তিনি রওনা হয়ে গেলেন বিলেতে। মনের দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে হবে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এ ডিগ্রী নিয়ে ১৯২৩ সালে তিনি আই, সি, এস-এ উত্তীর্ণ হলেন। তাঁর এই আই, সি, এস হওয়ার মূলে একটা মস্ত বড় কারণ রয়েছে। অমনি হয়তো তিনি আই, সি, এস না হয়ে একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হতেন। কিন্তু কেন সেদিকে যাওয়া হ'লো না তাঁর নিজের কথাতেই বলি—"বিজ্ঞানের প্রতি আমার বরাবরই একটা প্রবল ঝোঁক ছিল। সে জন্যই প্রবেশিকা পরীক্ষার পর আমি বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে আরম্ভ করি। আমার লক্ষ্য ছিল বরাবর আমি একটা কোন গবেষণাগারে বিজ্ঞানের সাধনা করে যাবো। কিন্তু আমার ইচ্ছার উপর আমার পিতৃদেবের ইচ্ছা বড় হয়ে দেখা দিল। আমার কি গুণ লক্ষ্য করে জানি নে তিনি সস্নেহে দাবী জানালেন আমাকে একজন আই, সি, এস হতে হবে।" আই, সি, এস হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করেই শ্রীরায় বৃহত্তর কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করলেন একজন মহকুমা হাকিম হিসাবে। তার পর প্রায় ৬ বৎসর কাল হুগলী ও বর্দ্ধমানের স্থানে স্থানে সেটেলমেণ্ট অফিসার হিসেবে ঘুরে বেড়ান। কিছুকালের জন্য তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে পলিটিক্যাল এজেণ্টের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই পদে ভারতবাসীদের মধ্যে তাঁর পূর্ব্বে আর কেউ স্থান লাভ করেননি। এর পর ক্রমে তিনি তৎকালীন অবিভক্ত বাঙ্গালার অর্থদপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী, যুদ্ধারম্ভের পর ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগে ইমপোর্ট কন্‌ট্রোলার, নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী ও সেক্রেটারী, কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান, কলকাতা কর্পোরেশনের এডমিনিষ্ট্রেটর প্রভৃতি বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে বিভিন্ন সময়ে অধিষ্ঠিত থেকে স্বীয় কর্ম্মশক্তি ও কর্ম্ম-প্রতিভার প্রমাণ দেন।

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

১৯৪৩ সালে বাঙ্গালায় যখন দুর্ভিক্ষ ও হাহাকার চলেছে, বাঙ্গালার গভর্ণর তখন শ্রীরায়কে দিল্লী থেকে স্বরাজ্যে আহ্বান করলেন এবং দায়িত্ব তুলে দিলেন প্রদেশের অসামরিক সরবরাহ

দপ্তরের অর্থ-সংক্রান্ত উপদেষ্টার। তার পর তিনি উক্ত দপ্তরের কমিশনার পদে পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত হন। তাঁর কর্মশক্তির বিশেষ স্ফুরণ আমরা দেখতে পেয়েছি যখন তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের এডমিনিষ্ট্রেটরের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরই অকুণ্ঠ প্রচেষ্টায় কর্পোরেশনের অধীন জমা-জমি ও বাড়ী-ঘরের পুনর্মূল্য নির্দ্ধারণ, নগরীতে জলসরবরাহ বৃদ্ধির জন্ত পলতায় উন্নত ধরণের পরিশোধন-যন্ত্র স্থাপন এবং টালীগঞ্জের ভূ-নিম্নে ময়লা নিষ্কাসনের জরুরী ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজ সুসম্পন্ন হয়। ১৯৫০ সাল থেকে তিনি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারীর দায়িত্ববহুল পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন এবং উভয় বঙ্গের সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলীর মীমাংসার গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাপৃত আছেন।

শ্রীমতী মনোরমা বসু

(বিশিষ্ট মহিলা শিক্ষাব্রতী)

শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার কল্পে এ দেশে এ পর্যন্ত যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন, সংখ্যায় তাঁরা খুব বেশী নন কিন্তু জীবন সংগঠনের এ অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে যাঁদের নিঃস্বার্থ অথচ অমূল্য অবদান রয়েছে, তাঁরা দেশের ও জাতির সর্বকালের শ্রদ্ধেয়। যে পরিবেশের ভেতরে শ্রীমতী বসুর জন্ম হয়, সেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক অপূর্ব্ব যোগাযোগ বলা চলে। পিতা শ্রী পি, কে, বসু ছিলেন একজন স্বনাম-ধন্ত ব্যারিষ্টার। মায়ের দিকে তাঁর মাতামহ ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের নামকরা অধ্যাপক ডাঃ পি, কে, রায়—যিনি শুধু একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বা শিক্ষাগুরুই ছিলেন না, ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। শিক্ষাকেই শ্রীমতী বসু যে জীবনের আদর্শ করে নিয়েছেন তার মূলে এঁদের যথেষ্ট প্রেরণা রয়েছে এ অনস্বীকার্য। তাঁর জীবনের উপর আরও একজন মহামনীষীর প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে—তিনি হচ্ছেন তাঁর (শ্রীমতী বসুর) মায়ের মাতুল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস।

শ্রীমতী বসুর প্রথম পড়াশোনা সেন্ট জেভিয়ার্সের লরেটো কনভেন্টে। ১৯২৩ সালে ঢাকার ইডেন হাই স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন। ঢাকা থেকেই তিনি ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান ও মহিলা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তার পর চলে আসেন তিনি কলকাতায়—ভর্তি হলেন লরেটো কলেজে। সেখান থেকে ১৯২৭ সালে বি, এ, ডিগ্রী লাভ করলেন ইংরেজী অনার্স সহ। ১৯২৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম, এ, উপাধিও লাভ করলেন অর্থনীতি শাস্ত্রে। এম,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমতী বসুর সুরু হ'লো কর্মজীবন। অবশ্য শিক্ষা-জীবনকে তিনি তখনও ছেড়ে দিতে পারলেন না—কর্মজীবনের পাশাপাশি সেটিও চললো যথারীতি। কর্মজীবনের প্রথম অবস্থায় তিনি যোগদান করেন লরেটো কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপিকা হিসেবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর মাতামহ ডাঃ পি, কে, রায়ের সহধর্ম্মিণী-প্রতিষ্ঠিত গোখলে মেমোরিয়েল স্কুলের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই ভাবে ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত কাটলো। ১০৩৯ সালে সরকারী বৃত্তি লাভ করে তিনি রওনা হলেন বিলেতে শিক্ষা সম্পর্কে আরও জ্ঞানার্জ্জনের জন্ত। তাঁর বিলেত যাত্রার এক সপ্তাহ বাদেই ঘোষণা হ'লো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। কেপটাউন ঘুরে ৬ সপ্তাহ জাহাজে কাটিয়ে তিনি গিয়ে পৌছুলেন লণ্ডনে। যুদ্ধাতঙ্কে অনেকেই পথে তাঁদের যাত্রা ভঙ্গ করেছিলেন কিন্তু শ্রীমতী বসু পিছু হটলেন না। শিক্ষা সম্পর্কে নয়া জ্ঞান সঞ্চয়ের অদম্য আগ্রহ তাঁকে ঠেলে দিল সম্মুখের দিকে। লণ্ডনে পৌছেই শ্রীমতী বসু ভর্ত্তি হলেন সেখানকার ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশন-এ। ১৯৪০ সালে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টিচার্স ডিপ্লোমা লাভ করেন। শিক্ষা-জগতের বহুল অভিজ্ঞতা নিয়ে ঐ বৎসরই তিনি ফিরে আসেন স্বদেশে এবং ঢাকার ইডেন ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের ইতিহাস ও অর্থনীতির অধ্যাপিকার কাজে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিতা থাকেন এবং একজন সুদক্ষ শিক্ষাব্রতী হিসেবে তাঁর নাম সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এখানেও শিক্ষার জন্ত তাঁর আজন্ম ব্যাকুল মন শান্ত হয়ে থাকলো না। আবার তিনি চললেন সাগর পারে আরও নোতুন কিছু শিখে আসবেন জেনে আসবেন বলে। এ ভাবে ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি আবার লণ্ডনে কাটান এবং এ সময় মধ্যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ পড়া সমাপ্ত করেন। বিলাত থেকে তিনি সরাসরি চলে যান আমেরিকায় এবং সেখানে গিয়ে তিনি নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ট্রেনিং গ্রহণ করেন। ঐ বছরেই ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি তিনি ফিরে আসেন কলকাতায় এবং ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপিকার কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি যোগদান করেন পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগে স্পেশ্যাল অফিসার রূপে। উক্ত পদ দুটিতেই তিনি অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

শ্রীমতী বসু আজও পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্কল্পিত শিক্ষা-জীবন নিয়েই আছেন। বর্ত্তমানে তিনি পশ্চিম বঙ্গের স্ত্রী-শিক্ষা বিভাগের চীফ ইনস্পেকট্রেস। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর বহু মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও তিনি প্রবন্ধাদি লিখে চলেছেন। অর্থনীতির উপর তাঁর লিখিত প্রবন্ধসমূহ অনবদ্য। জীবনের প্রারম্ভে তাঁর মুখেই নিঃসৃত হয়েছিল—"দেশ ও জাতি গঠনের জন্ত সর্বাগ্রে প্রয়োজন আদর্শবান শিক্ষকের।" তিনি মনে মনে যেটা চেয়েছিলেন, নিজেকে তাতে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করতে পেরেছেন বলেই আজ তাঁর জীবন এতখানি সার্থক ও গরীয়ান।

শ্রীমতী মনোরমা বসু

শ্রীঅশোককুমার সরকার

[আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পরিচালক]

আজকালকার যুগটা হচ্ছে প্রচার-সর্ব্বস্ব কিন্তু এর ভেতরও এমন দু'-এক জন নিঃস্বার্থ কর্ম্মী মানুষ রয়েছেন যাঁরা কোন অবস্থাতেই প্রচারের অপেক্ষা রাখেন না। কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের সুযোগ্য পরিচালক শ্রীঅশোককুমার সরকারকে এ পর্য্যায়ের এক জন বলতে পারি।

কলকাতা মহানগরীরই বুকে ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে শ্রীসরকার জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যবয়সেই পিতা বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক স্বর্গত প্রফুল্লকুমার সরকারের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর উপর পড়ে। সরকার পরিবারটি তৎকালীন বাঙ্গালার একটি রাজনৈতিক নির্য্যাতিত পরিবার। শ্রীঅশোককুমারের মাতা এবং পিতাও এ নির্য্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাননি। এ সকল কারণে পিতা ও মাতা উভয়েরই রাজনৈতিক চেতনার প্রভাব শ্রীসরকারকে আকৃষ্ট করে। সে জন্যে দেখা গেল, স্কুলের পড়া শেষ হতে না হতেই তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। ছাত্র-আন্দোলনে তখন থেকেই তাঁর ছিল অগ্রণী ভূমিকা। ১৯৩২ সালে সবে তিনি আই. এস. সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়েছেন, পুলিশের নির্য্যাতন এলো তাঁর উপরে। তিনি গ্রেপ্তার হলেন এবং ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। পুলিশী অত্যাচারে লাঞ্ছিত হয়েও শ্রীঅশোককুমার স্বীয় লক্ষ্যপথ থেকে বিচ্যুত হলেন না। কারামুক্ত হওয়ার পর আবার চললো তাঁর এক দিকে রাজনীতি-অনুশীলন অপর দিকে জ্ঞানার্জ্জনের সাধনা। রাজনীতির দিকে তাঁর যে এতখানি অনুরাগ এর পশ্চাতে আরও একটি কারণ রয়েছে। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলছেন—"১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সময়ে আমার তরুণ মন বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন সে-কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীসমূহের সর্ব্বাধিনায়ক (জি, ও, সি)। তাঁর অধীনে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে কাজ করবার জন্য একটা দুরন্ত বাসনা জাগলো আমার মনে। আমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'লো এবং এ থেকেই রাজনীতি-ক্ষেত্রে কাজ করার আমি অসীম প্রেরণা পেলুম।"

শ্রীঅশোককুমার সরকার

১৯৩৪ সালে শ্রী সরকার বি, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ থেকে। তার পর ভর্ত্তি হলেন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এস, সি ক্লাসে। এম, এস, সি পড়তে পড়তেই তিনি কলকাতার একটি বিখ্যাত অডিটার্স ফার্ম্ম-এ যোগদান করেন। ১৯৪২ সালে তিনি আর এ (রেজিষ্টার্ড একাউণ্ট) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তিনি অডিট লাইনেই থাকবেন কিন্তু ঘটনাচক্রে তা হ'লো না। পিতা প্রফুল্লকুমার সরকারের পরলোকগমনে তাঁকে চলে আসতে হ'লো আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পরিচালনা-ক্ষেত্রে। স্বর্গত প্রফুল্লকুমার আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের শুধু প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকই ছিলেন না, অন্যতম পরিচালকও ছিলেন। সুতরাং অকস্মাৎ উক্ত সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের গুরু দায়িত্ব শ্রীসরকারের উপর এসে পড়লো। তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হলেন না। সেই থেকে আজ অবধি তিনি নিরলস ভাবে এ কার্য্য সম্পাদনেই ব্যাপৃত আছেন এবং প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে একযোগে এর বহুমুখী উন্নতির জন্য একান্ত ভাবে সচেষ্ট আছেন।

শ্রীসরকার বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বিশেষ করে বাংলা সংবাদপত্রের একজন পরম অনুরাগী। সকল রকম বাংলা পত্র-পত্রিকারই উন্নতি ও বহুল প্রচার হোক এটা তাঁর প্রাণের গভীর আকাঙ্ক্ষা। তাঁর মতে বাংলা ভাষার সংবাদপত্রসমূহের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। নানা ধরণের পুথি-পুস্তক পড়ায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। মাসিক বসুমতী সাময়িক পত্রের তিনি একজন নিয়মিত পাঠক এবং এ পত্রিকা পড়তে তিনি খুবই আনন্দ পান।
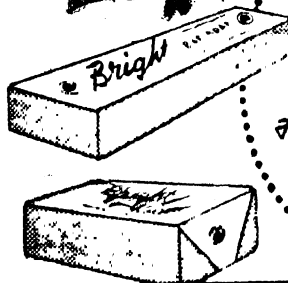
সব রকম
কাপড়
ভালো করে
কাচার
জন্যেই
Bright
Bright
ব্রাইট
বার ও কেক সাবান
কাপড় কাচার শ্রেষ্ঠ সাবান
ডি, এন মিত্র এণ্ড কোং
কলিকাতা-১১

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

স্বস্তিক-রেচিত-করণ

শ্রীভরত। —"স্বস্তিকৌ রেচিতাবিদ্ধৌ বিশ্লিষ্টৌ কটিসংশ্রিতৌ
যত্র তৎ-করণং জ্ঞেয়ং বুধৈঃ স্বস্তিকরেচিতম্।"

(Sl. 67)

অনুবাদ:—প্রথমে "রেচিত" করতে হবে, এবং তার পরে "আবিদ্ধ" বক্র করতে হবে হস্ত দুটিকে। এতেই স্বস্তিক-ভঙ্গীর প্রকাশ পাবে। এবং শেষে, হস্ত দুটিকে বিশ্লিষ্ট করে নিয়ে সংশ্রিত করতে হবে "কটি"তে। জ্ঞানীরা একেই "স্বস্তিক-রেচিত"-করণ বলেন।

* * * *

ভারতনট:—এই 'করণ'টি সহজ নয়। যেহেতু সহজ নয়, সেই হেতু, প্রথমেই আমাদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন "রেচিত", "আবিদ্ধ" এবং "স্বস্তিক" শব্দগুলির অর্থ।
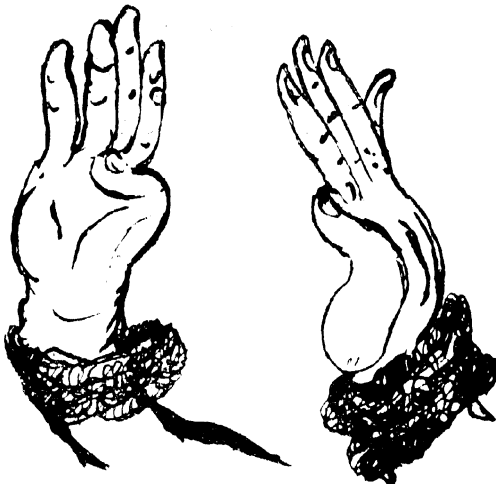
"রেচিত"—এই "রেচিত" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমি (Sl. 18) কিছু বলেছি। আরও বিশদ ভাবে এখানে বলব। যে শ্লোকটি সেখানে তুলেছিলুম, সেটি হচ্ছে,

"রেচিতৌ চাপি বিজ্ঞেয়ৌ হংসপক্ষৌ দ্রুতভ্রমৌ।
প্রসারিতোত্তানতলৌ রেচিতাবিতি সংজ্ঞিতৌ॥"

(ভঃ নাঃ শাঃ ৯, ২০৭)।

এইখানে "হংস-পক্ষ" মুদ্রার কথাটি আমরা পাচ্ছি। "হংসপক্ষ" সম্বন্ধে শ্রীভরত বলেছেন:—

"সমাঃ প্রসারিতাস্তিস্রঃ তথা চোর্দ্ধা কনীয়সী।
অঙ্গুষ্ঠঃ কুঞ্চিতশ্চৈব হংস-পক্ষ ইতি স্মৃতঃ॥
এষ চ নিবাপসলিলে দাতব্যো গণ্ডসংশ্রয়ে চৈব।
কার্যঃ প্রতিগ্রহাচমনভোজনার্থেষু বিপ্রাণাম্।
আলিঙ্গনে মহাস্তম্ভদর্শনে রোমহর্ষণে চৈব।
স্পর্শেঽনুলেপনার্থে যোজ্যঃ সংবাহনে চৈব॥
পুনরেব নারীণাং স্তনান্তরস্থেন বিভ্রমবিশেষাঃ।
কার্য্যা যথাক্রমং স্যাদ্ দুঃখে হনুধারণে চৈব॥

(ভঃ নাঃ শাঃ ৯, ১০৭, ১০৯)

অর্থাৎ:—তর্জ্জনী, মধ্যমা এবং অনামিকা সমভাবে প্রসারিত হয়ে থাকবে। কনিষ্ঠাটি ঐ অঙ্গুলিগুলির ঊর্দ্ধে থাকবে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি কুঞ্চিত হয়ে থাকবে তর্জ্জনীর মূলে।

কখন, এবং কোথায়,—প্রয়োগ করতে হয় এই হংসপক্ষ-হস্ত, তার বিধান নিম্নে গ্রথিত হোলো;—

(১) যাঁরা অনুপ্রাণিত বেদাবী বিপ্র, তাঁরা যখন প্রতিগ্রহ, আচমন এবং ভোজনের জন্য প্রসারিত করেন কর, তখন…

(২) বা, তাঁরা যখন গণ্ডদেশের কাছে, হাতখানিকে নিয়ে এসে দান করেন নিবাপ-সলিল, তখন,—

(৩) আলিঙ্গন, মহাস্তম্ভদর্শন, এবং রোমহর্ষণের অভিনয়ে,

(৪) গা টিপে দিচ্ছি, বা তোমার গায়ে চন্দনাদির অনুলেপন করছি, সেই প্রিয়-জন-স্পর্শের আনন্দিত অভিনয়ে,

হংস-পক্ষ হস্ত
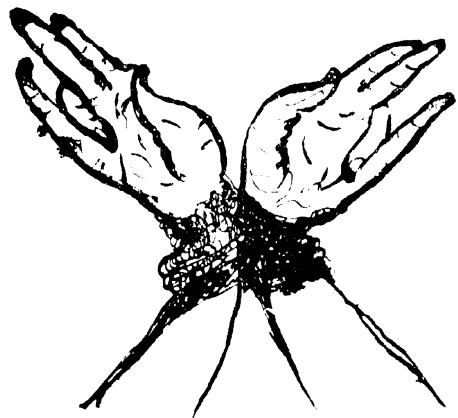
স্বস্তিক হস্ত

(৫) নারীদের স্তনযুগলের মধ্যে করখানিকে রেখে বিশিষ্ট বিভ্রম দেখানোর লীলাভিনয়ে,

(৬) বিষাদের, দুঃখের অনুভাব ফোটাবার জন্যে আঙুল দিয়ে চিবুক ধরার অভিনয়ে।

এখন "আবিদ্ধ"।—

"ভুজাংস-কূর্পরাগ্রৈস্তু কুটিলাবর্ত্তিতৌ করৌ।
পরাঙ্‌মুখতলাবিদ্ধৌ জ্ঞেয়াবাবিদ্ধবক্রকৌ॥"

(ভঃ নাঃ শাঃ ১, ১৯০)

শ্রীভরত লিখেছেন এই শ্লোক। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে, সেই হস্তকর-খানির ইতিহাস। তাতে রয়েছে—সবিলাস কুটিলতা, (বক্রতা)। এর বেশী বোঝার আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা জানি, হাত ঘোরাতে হলে কাঁধের রেখা বাঁকে, কনুইও বাঁকে। সে হাত যে লীলাভরে উল্টো-দিকে ফিরে যায়, তাও আমরা জানি। তাই, বলবার কিছু প্রয়োজন বোধ করছি না।

এবার—স্বস্তিক :—

"তাবেব মণিবন্ধান্তে স্বস্তিকাকৃতি-সংস্থিতৌ।
স্বস্তিকাবিতি বিখ্যাতৌ বিচ্যুতৌ বিপ্রকীর্ণকৌ।"

(ভঃ নাঃ শাঃ ১, ১৮৭)

"স্বস্তিক" সকলেরই বিদিত। কিন্তু স্বস্তিক-মুদ্রার কর-ভঙ্গিটি সকলেই এড়িয়ে যান। তাই, নীচে এঁকে দিলুম সেই মুদ্রাবিভঙ্গ। "ত্রি-পতাক" দিয়ে রচনা করতে হয় এই ভঙ্গি।

(ভঃ নাঃ শাঃ ১, ২০০)।

ব্যাখ্যা তো হোলো। কিন্তু এখন, তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো, "করণটির প্রয়োগের প্রারম্ভে কী কী বিষয় আমাদের বিবেচনা করা প্রয়োজন! কোন্ রসের বিস্তারে এই করণটির হয় প্রয়োজনা?"

মণ্ডল-স্বস্তিক করণ

তার উত্তরে ছোট্ট কথায় বলব,

—"প্র-হর্ষ" বোঝাতে হলেই এই মুদ্রার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। কারুণ্যেরও শান্ত-হর্ষ আছে, বীর-রসেও আছে। শুধু প্রকার-ভেদ। নবরসেই এই মুদ্রার হর্ষিত ক্রিয়া দেখা যায়।

এবার বিলম্ব না করে ঘুঙুরের বোলের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলো এই করণটির নৃত্যরূপ। শিঞ্জনের সঙ্গে তোমার হস্তে আসুক হংস-পক্ষের অনাবিল শুভ্রতা। যেন ডানা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে নাচ। তবুও সর্বদাই একটি কথা মনে রেখো যে, তুমি অভিনয় করছ। অভিনয়ের ক্ষেত্রে যে হর্ষটুকু প্রয়োজনা করা দরকার, সেইটুকু মাত্রই ফোটাও তোমার মুদ্রার মাধ্যমে। না বেশী, না কম।

প্রথমে, "কটকামুখ"-মুদ্রায়, বুকের কাছে রাখো তোমার দু'খানি হাত। তার পরে সে দুটিকে "রেচিত" করতে করতে, দ্রুত-ভ্রমণের মধ্য দিয়ে, রচনা করতে থাকো "হংস-পক্ষ" মুদ্রা। ওতেই ভেসে উঠবে ফেনিল আনন্দ। এবং তার পরেই, রচনা কোরো স্বস্তিক-মুদ্রা। কিছুই এমন কঠিন নয়। কিন্তু অভ্যাস করলেই দেখবে—ফুটে উঠেছে হর্ষের রূপ।

স্বস্তিক-রেচিত করণ

শেষে, একটি মোহন কথা বলি। যখন "স্বস্তিক-রেচিত" করণটির প্রয়োজনা করবে, তখন মনকে একটু চোখ ঠারিয়ে বোলো :—

"মধুকর, তুমি ধন্য, অধরে এসে বোসো।"

"মণ্ডল-স্বস্তিক"-করণ

শ্রীভরত।—"স্বস্তিকৌ তু করৌ কৃত্বা প্রাঙ্‌মুখোর্দ্ধ তলৌ সমৌ।
তথা চ মণ্ডলং স্থানং মণ্ডলস্বস্তিকং তু তৎ॥"

(Sl. 68)

অনুবাদ।—স্বস্তিক-মুদ্রায় বিরচন করো তোমার দুটি কর। করবার পর, সেই কর দুটিকে প্রাঙ্‌মুখ করো। সমভাবে করতল-দুটি যেন উর্দ্ধে মণ্ডলিত হ'তে থাকে। তারপরে, সেই ভঙ্গীতে রচনা কর "মণ্ডল-স্থান"। একেই বলে মণ্ডল-স্বস্তিক-করণ॥

*   *   *   *

ভারতনট:—শ্রীভরত এবারে নৃত্যশাস্ত্রের techincal শব্দগুলি তাঁর সূত্রে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছেন। "স্বস্তিক-মুদ্রা" যে কি, পূর্ব-শ্লোকেই সেটি আমি বিশদ ভাবে বলেছি। পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই।

কিন্তু এই "মণ্ডল-স্বস্তিক" করণে দু-একটি নবীন তত্ত্ব-কথা দেখছি সমাহৃত হয়েছে।

(১) প্রাঙ্‌মুখ-কর।

এবং (২) মণ্ডল-স্থান।

এই দুটিকে যদি বুঝে নিই, তাহলেই আমাদের অনুপ্রবেশ ঘটবে, এই করণটিতে।

প্রাঙ্‌মুখ করের সম্বন্ধে পূর্বেই বলেছি। (See Sl. 64) তাহলে দর্শকদের দিকে কর দুটিকে খটকামুদ্রায় সম্মুখীন করে উর্দ্ধে মণ্ডলিত করতে থাকো তোমার দুটি করতল। এখন তোমাকে রচনা করতে হবে "মণ্ডল-স্থান"।

"মণ্ডলস্থান"।—

"ঐন্দ্রে তু মণ্ডলে পাদৌ চতুস্তালান্তরস্থিতৌ
ত্র্যশ্রৌ পক্ষস্থিতৌ চৈব কটিজানূ সমৌ তথা।
ধনুর্বজ্রানি শস্ত্রাণি মণ্ডলেন প্রযোজয়েৎ।
বাহনং কুঞ্জরাণাং তু স্থূলাক্ষি-নিরূপণম্।

(ভ: না: শা: ১০:৬৫,৬৬)

অর্থাৎ।—"মণ্ডলস্থান" ছয় প্রকার 'স্থানের' মধ্যে অন্যতম।
(see ভ: না: শা: ১০ ৫১)

ইন্দ্রদেব এই মণ্ডল-স্থানের অধিদেবতা।
চতুস্তালান্তরস্থিত হ'তে থাকবে চারী গতিতে দুটি পা।
পার্শ্বাভিমুখী হয়ে থাকবে চরণাঙ্গুলি। (পক্ষস্থিত)।

বাম চরণের মধ্যস্থলে দক্ষিণ চরণের গোড়ালিটি লেগে থাকবার পর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি অগ্রাভিমুখী হয়ে যখন থাকে, তাকে বলে "ত্র্যশ্র";

দুটি পায়ের যখন উল্লিখিত অবস্থান হোলো, এবং তখন যদি কটি এবং জানুকে পায়ের সঞ্চালনের সমান গতিতে রাখো, তাহলেই সম্পূর্ণ হোলো "মণ্ডল-স্থান"।

এই মণ্ডলরচনা করে প্রয়োগ করতে হয় ধনুর্বজ্র শস্ত্র সজ্জ।

কুঞ্জরের উপর থেকে ইন্দ্রদেব যেন বজ্রাদি হানছেন সেই ভাবটি ফুটে ওঠে এই মণ্ডলস্থানের ভঙ্গিতে।

শ্রীনান্দীকেশ্বর (অভি: দ: ২৬৯) নং শ্লোকে বর্ণনা করেছেন "স্বস্তিক মণ্ডল"। নূতনত্ব কিছু নেই। তাই বিরত হলুম তার ব্যাখ্যা থেকে।

তাহ'লে প্রথমে 'স্বস্তিক মুদ্রা'র রচনা হোলো; তারপরে এল 'প্রাঙ্‌মুখ', তারপরে এল 'উর্দ্ধ মণ্ডলে' হাত ঘোরানো। এর সঙ্গে সঙ্গে 'চারটি তালে'র ফাঁকে ফাঁকে, 'মণ্ডল-স্থানে' ঘুরছে পা। সমপাদ থেকে একবার খুলে যাচ্ছে পা, আবার তালান্তে এসে মিশছে। মণ্ডল-স্বস্তিক করণ শেষ।

এই "মণ্ডল-স্বস্তিক" করণটির প্রয়োগ ঘটে "নিকার-বাক্যার্থাভিনয়ে।" (শ্রীঅভিনব গুপ্ত)।

"নিকার" শব্দের অনেক রকমের অর্থ আমরা পাই। যথা—

(1) Piling up or winnowing corn—কাঁড়ি করা বা তুষ ঝাড়া।
(2) Lifting up or tossing—উৎক্ষেপণ বা আন্দোলন।
(3) Humiliation— অবমাননা
(4) Bringing down—মর্য্যাদাহানি
(5) Subduing—পরাভব
(6) নিগ্রহ।

—প্রচ্ছদপট—

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে জনৈক অজ্ঞাতনামা ইংরাজ-শিল্পীর অঙ্কিত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রবেশ-পথ খাইবার-পাশএর চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। চিত্রে স্যর চার্লস নেপিয়ারকে উপজাতি-দস্যুদের পশ্চাদনুসরণ করিতে দেখা যাইতেছে।

১৩২৭ সাল ৪ঠা অগ্রহায়ণ আকাশের বিদ্রোহী মেয়ে যে 'বিজলী' মোহনলাল ষ্ট্রীটের বাড়ীতে জন্ম নেয় তার পরিচয় দিতে বসে বিপদে পড়েছি। কয়েক বৎসর ধরে এই সমাজ-বিপ্লবের বিদ্রোহী কন্যা সংখ্যার পর সংখ্যায় যে মানুষ-পাগল-করা সুর বাজিয়েছিল তার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে গেলে বসুমতীর কাহিনী বিপুলকায় হয়ে বেড়ে চলে। সে অনুপম মানুষ-ক্ষ্যাপানো সৃষ্টি-মজানো লেখার ১ম বৎসরের ৪৮ সংখ্যার বিবরণ শুধু দিতে গেলে কয়েক সংখ্যা বসুমতীর পাতা ভরে যাবে। ৩য় সংখ্যায় 'কাল-বৈশাখী'তে ছিল—

"কাল-বৈশাখীর এমন ঘন-ঘোরা কালো রূপ পশ্চিমের আকাশ আঁধার করে এলো কেন? আয়র্লণ্ড, জার্মাণী, রুষ, পোল, তুর্কী, আরব, আর্মেনিয়া এমনি ঐ অঞ্চলের সারাটা দেশ ভরে মানুষের রক্ত মেখে মানুষ পিশাচ-নৃত্য নাচছে। ঐ তো সেই মায়ের খট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা মানুষের প্রাণের বামনাত্মিকা রূপ। ও রূপে মা তো সেইখানেই আসে যেখানে নিছক শক্তির খেলা—দেবতা যেখানে তিমি বরাহ কূর্মরূপে জনে জনে অবতার। য়ুরোপের করালী ছিন্নমস্তা শক্তি হলেও তোর রক্তাম্বরা ঐশ্বর্য্যের মা, ভারতের মত সারদা-বরদা আনন্দঘনা-নয়। এবার দেখ না কেমন আকাশ ভরে কালো চুলের মেঘে খড়্গের বিজলী চমকিয়ে রক্তাম্বরা নব-রচনার সমাধিতে নাচছে—

> "রণে নাচে কি প্রেমে নাচে
> চেয়ে একবার দেখ না,
> অধীর প্রেমে রুধির পানে
> আপনায় দিতে মগনা!"

এই গানটি আমাদের অন্যতম বিপ্লবগুরু দেবব্রতের রচিত, যিনি বাংলায় প্রথম শিবাজী উৎসবের জন্য উন্মাদনাপূর্ণ সেই গান বেঁধেছিলেন; বড়বাজারে তিলকের শিবাজী উৎসব-সভাকে যাঁর এই গান পাগল করেছিল—

> "কোটী কোটী সুত হুঙ্কারি দাঁড়াল
> উঠিয়া দাঁড়াল জননী!
> রক্তে আঁধারিল রক্তিম সবিতা
> রক্তিম চন্দ্রমা তারা,
> রক্তবর্ণ ডালি রক্তিম অঞ্জলি
> অসুর রক্তময়ী ধরা কিবা শোভিল!
> কোটী কোটী সুত হুঙ্কারি দাঁড়াল!
> বঙ্গ বেহার উৎকল মাদ্রাজ
> রাজপুতানা
> দাক্ষিণাত্য পাঞ্জাব সিন্ধু
> উত্তর পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ!
> কাঁপে সিন্ধুজল কাঁপিল হিমাদ্রী
> কাঁপে নদী কানন ধরিত্রী,
> কাঁপে লক্ষ তারা নৃত্যপদভরে
> অসুরমুণ্ডমালা চণ্ডী সাজাল!
> কোটী কোটী সুত হুঙ্কারি দাঁড়াল॥"

সে অপূর্ব্ব বিপ্লব-বহ্নি-জ্বালানো গানের সব কয়টি কলি এখন আর মনে নাই। তখন আয়র্লণ্ড জুড়ে সিনফিন দলের রুদ্রতালে নাচ আরম্ভ হয়েছে, স্থানে স্থানে পুলিশে বিপ্লবীতে

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

যখন তখন ঝটোপুটি লড়াই চলছে। আয়র্লণ্ড দ্বিখণ্ডিত হবে, হোমরুল আসবে, এ তারই সূচনা। এবারকার 'কাল-বৈশাখী'তে ছিল সিনফিনদের দ্বারা পেথন আপিস লুট, অধ্যাপক জন মলিনের দ্বারা আইরিশ প্রজাতন্ত্রের জন্য অর্থ সংগ্রহের খবর এমনই অনেক কিছু। এ সংখ্যার সম্পাদকীয় লেখার নাম "আধ্যাত্মিক হুক্কাহুয়া।" তাতে ছিল—"পাত্রাধার তৈল কি তৈলাধার পাত্র" অথবা "শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয় 'কচুপোড়া হি ভক্ষণম্'—" এই সব বিচার করতে আমাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধিটা উবে যায়। * * অগ্রহায়ণের নারায়ণে অনন্তানন্দ (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) একটা খাঁটি কথা লিখেছিলেন—"মনটা আমাদের ক্রমাগত খুঁজছে, কোথায় কার পায়ের তলায় পড়ে নাক রগড়াবে * * * আমাদের ধর্ম্মের মধ্যে খড়ম্ পুজো আর কর্ম্মের মধ্যে পাদোদক পান। সংস্কৃত-পড়া পণ্ডিত আর ইংরাজি-পড়া গ্রাজুয়েট—সবারই ঐ এক গতি! তফাতের মধ্যে এই যে এক জন গড়াগড়ি দেন পুবমুখো হয়ে, আর এক জন দেন পশ্চিমমুখো হয়ে।"

এই ৩য় সংখ্যার আর একটি সম্পাদকীয় লেখার শিরোনামা হচ্ছে—"সকলেই শুনিতেছে কারও নাই কান"। লেখাটির কিছু উদ্ধৃত করি, কারণ এসব কথা এখনও কংগ্রেসী রাজ্যেও খাটে।—"যে দেশে রোগে-নাড়ায় দিবানিশি যমে-মানুষে টানা-টানি চলছে, যে দেশে ভাত-কাপড়ের অভাবে 'গোরা ছিনু ভাবিতে ভাবিতে হৈনু কালো,' সে দেশে দশ-পনের বছর ধরে জলের মত টাকা খরচ করে বিদ্যা শেখার এ বিড়ম্বনা কেন? বিলেতের রাজা চার্লসকে প্রজারা ধরে ঠিক কোন্ তারিখে পাঁঠা-জবাই করেছিল সেটা মনে রাখার জন্য দু' সন্ধ্যা গেভিয়ে ছেলে যে কাহিল হয়, তাতে ছেলের আর তার খুকী বৌয়ের ভাত-কাপড়ের সুবিধা হয় কি? * * *

> আগে ভাল ছিল জেলে জাল দড়া বুনে।
> কি কাজ করিল জেলে এঁড়ে গরু কিনে!"

এখন ঐ ইউনিভার্সিটির এঁড়ে গরু খেতাবী বিদ্যা শিখে—

"ঘরে হাঁড়ি ঠন্‌ঠনাস্তি
শীতে শরীর কনকনাস্তি"

এখন তাই বাজারে হাজারে হাজারে এম্‌-এ বি-এ ভিড় করে ইংরাজের দুয়ারে (এ ক্ষেত্রে কংগ্রেসের) আজি হাতে হাভাতেরা গান গাইছে—

"তব গুণগীত বিনা অন্য গীত গাই নে,
অন্য গীত গাই নে
(তবু) চিরকাল খেটে মরি নাহি পাই মাইনে
নাহি পাই মাইনে!
আধা পণে কিনে লবে লিখেছ কি আইনে
লিখেছ কি আইনে?"

এ সংখ্যার ৩য় প্রবন্ধ "জাতে-মারা জাতের স্বদেশী শিক্ষা"—লেখায় বহু মূল্যবান শিক্ষা-বিড়ম্বনার কথা এখনও এই নকল ব্রিটিশ-শাসনের শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে খাটে। এ সংখ্যার শেষ লেখা—"বিজলী বাঁচবে ক'দিন?" এই লেখাটি থেকে উদ্ধৃত করার লোভ সামলানো কঠিন, তাই দু' ছত্র তুলে দিচ্ছি—

"সবাই জিজ্ঞাসা করছেন বিজলী বাঁচবে কত দিন? আমরা বলি, 'যাবচ্চন্দ্র দিবাকর'! বিজলী তো কাগজে শুধু কালির আঁচড় নয়, যে, দু'টো হুমকীতে ঝড়-বাদলে মাটি কামড়ে পড়বে আর মরবে? * * * একবার যখন সে (অগ্নিযুগে) 'শিকল দেবীর পুজার বেদী' ভাঙবার জন্যে ঝড়ের মাতনে পাগল চরামুচর সঙ্গে উনপঞ্চাশী হাওয়ায় ডেকে এসেছিল তখনকার তার সে আকাশ-ফাটা দিক-উজল-করা রূপ কি মরেছে? * * * একখানা মরা কাগজ ত্রিশ বছর বেঁচে থেকে যদি কালি মেখে মেখে নিত্য দু' বেলা বেরোয়, তা' হলেও সে মরারই দাখিল, কারণ সাত শ' আর দেড় শ' এই সাড়ে আট শ' বছরের মড়িঘাটার চিতার ছাই-এর মূল্য কি?

ভাবের শ্রীঅঙ্গ ধরে তোমাদের হৃদয়-আকাশে এবার যুগের বিজলী যদি দু' বছরও হাসতে পায়, তা' হলে এই শব-সাধক মরণজয়ী বাঙালী জাতকে 'বিজলী' অমৃত-ধন দিয়ে যাবে।"

২৫শে অগ্রহায়ণের ৪র্থ সংখ্যা 'বিজলী'তে 'কাল-বৈশাখী'র স্তম্ভে দেখছি দেবব্রতের ঐ গানটির আরও কয়েক কলি রয়েছে। সমাধিবান বিপ্লবী অগ্নিমন্ত্র-দীক্ষিত সাধক দেবব্রতের এই অপরূপ মাতৃরূপের বন্দনা বড় মধুর! এ সংখ্যায় 'কাল-বৈশাখী'তে লিখছে—

"কালীকে যে তোমরা দেশে দেশে জগৎ ভরে চেয়েছিলে। মানুষের দেহ দিয়ে মন দিয়ে ভোগের দেবতাকে ডেকেছি বলেই এই কামনার ঠাকুর লোল রসনা নিয়ে রিপুর নৃত্য নাচছে।

"প্রেমের রীতি ভূমণ্ডলে যা' তাই সে করেছে,
যেমন সাজায়েছ তারে তেমনিই তো সেজেছে!"

মানুষ জাতীয় জীবনে অসুর হয়েছিল, পরের সুখ পায়ে দলে দেশের হিত চেয়েছিল, তাই অসির ঝলকে এই কোপনা অসুরীর আবির্ভাব—

"ত্রিলোকের অসুরভয় দিবানিশি নাশে যে,
অসুরের রণপিপাসা প্রাণভরে মিটায় সে।"

যত দিন আমরা সর্বমুক্তির পূর্ণা মা বরদা আনন্দঘনাকে না চাইব তত দিন এই পাগল মেয়েই নাচবে।"

এ সংখ্যার প্রধান লেখা—"সভ্যতার গুণ্ডামী"।—এ লেখায় আছে—"* * * যারা কর্তাদের ঐ প্রেমের খাঁচা-কলে একবার ঢুকেছে তাদের আর নিস্তার নাই। এই গুণ্ডামীর আবার আছে রকমারী,—একটা বামুণে গুণ্ডামী, একটা বেণের গুণ্ডামী। * * * দক্ষিণ দিক থেকে আর একজন ওস্তাদ গোঁফ চাড়া দিয়ে বলছেন—"আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ তোমার ভয় নেই। যেহেতু আমার পেটে রাক্ষুসে ক্ষিদে, আর তোমার মাংস অতি নরম, সেহেতু আমিই তোমার রক্ষক। আমি তোমার দেউড়িতে ঘাঁটি আগলাবো, আর কেউ না তোমার ঘরে ঢুকতে পারে। আমি তোমার টাকা-কড়ি সব বুঝে পড়ে নিয়ে লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে রাখবো, আর কেউ তা না নিতে পারে। আমি তোমার রাজ্য রক্ষা করবো, তুমি হবে আমার সেপাই; আমি কলকারখানা গড়বো, তুমি হবে আমার মজুর। আমি খাব, তুমি রাঁধবে; আমি গাড়ী চড়বো, তুমি তা' হাঁকাবে। তোমাতে আমাতে একেবারে হরিহরাত্মা।"

লেখাটি অনুপম; এক সভ্য রাষ্ট্রের চরিত-কথা বা স্বরূপ-কথন, মানুষের দ্বারা রাষ্ট্রের নামে যত রকম শাসনতন্ত্র আছে তারই হচ্ছে এটি কুলুজী কুষ্ঠী। এ সংখ্যার দ্বিতীয় সম্পাদকীয় লেখার শিরোনামা—"হাভাতের উপায় কি?" এ লেখাটিরও অমনই এক আঁচড়ে পরিচয় দিই—সেদিনের পরাধীনতার কালের লেখা কেমন এখনকার স্বাধীন বঙ্গেও অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় দেখুন!—"বাঙালী! তুমি যতই বিদ্যে আর সভ্যতা-ভব্যতার বড়াই কর, তুমি যে এখনও এক মুঠো ভাতের কাঙাল! * * * যেখানে হাজার প্রাণ আজ অতৃপ্ত, ক্ষিদে-তেষ্টায় আজ পাগল হয়ে আছে, সেখানেই তোমার দেশ, সেখানেই তোমার স্বদেশ-দেবতা তর্পণের আশ্বাস বুকে করে তোমাদের পথ চেয়ে আছেন। তোমার ক্ষেতে ফসল নাই, মাঠে গরু নাই, তোমার নদী-নালায় জল নাই, তোমার ৪ কোটি ভাই নাঙ্গলা চাষা। * * * বাঙালী তোমার আজ শব-সাধনার দিন—তুমি আজ পল্লী-শ্মশানের স্তূপীভূত হতাদরের উপর বসে বল মা ভৈ মা ভৈ। * * * সহরে কর্মবহুল শাসন-যন্ত্রের চাকাগুলোর অমন নিয়মমাফিক গতি দেখে ভেবো না—তোমার সমস্ত দেশ ঠিক এমনি ভাবে চলছে। সহরে সভ্যতার মধ্যে প্রাণ কই! ও যে শুধু পাটের কল। অবিরাম শুধু দেশের দশের মনের কালি উড়িয়ে চলেছে। আমরা সব রতনকুলীর দল; বসে বসে সব পাটের গাঁটরী বাঁধছি।"

এই সংখ্যায়ই দেখছি আমার লেখা—"বাংলা মায়ের কোলের মেয়ে সুধীরা।" তা'তে দেবব্রত ও তার বোন সুধীরার সম্বন্ধে লিখেছিলাম—"দেবব্রত আলিপুর বোমার মামলায় ধরা পড়ে খালাস পায় (সেসন কোর্টের রায়ে), শেষে সে রামকৃষ্ণ মঠে সন্ন্যাস নিয়ে প্রজ্ঞানন্দ নাম পায়। দেবব্রত বড় উঁচু থাকের সাধক ছিল, অমন করে সাধনে জ্ঞান ও প্রেমকে মিলিয়ে পাওয়া খুব কম লোকের ভাগ্যে ঘটে। আলিপুর ডকে (আসামীর ঝাঁপগড়ার খাঁচায়) আমরা ৪০ জন আসামী বিচারাধীন ছিলাম। তার মধ্যে দেবব্রত

এক অপূর্ব আনন্দের বস্তু ছিল। সেই বক্তরাঙা যুগের গোড়ায়ও অত বড় শক্তিমান কর্মী আর কেউ আমাদের মধ্যে ছিল না। * *

তার বোন সুধীরা সে দিন (ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে) মারা গেছে। সুধীরাও বাংলার জাগা সাধক মেয়ে ও অসাধারণ কর্মী। * * ১৯০৫ সালে ভাই দেবব্রত তার বোনের শিক্ষার ভার স্বামীজীর মানস-কন্যা নিবেদিতার হাতে দেয়। * * * মা ঠাকুরাণীর সঙ্গে সুধীরার প্রথম দেখা ১৯০৭ সালে।

১৯১১ সালে নিবেদিতা এদেশকে কাঁদিয়ে চলে গেলে পর সুধীরা সংসার ছেড়ে মিস ক্রিশ্চিনের সঙ্গে নিবেদিতা স্কুলের ভার নেয়। * * * ১৯১৮ সালে এইখানে শ্রীঅরবিন্দের স্ত্রী মৃণালিনী সুধীরার সঙ্গে এই ব্রহ্মচারিণী সঙ্ঘে যোগ দেয়।"

তার পর এই সংখ্যায় ছিল উপেন্দ্রনাথের লেখা অনবদ্য "উনপঞ্চাশী"। তার শেষের দু'চার ছত্র উদ্ধৃত করলেই বক্তব্যের মূল কথা বোঝা যায়—"পণ্ডিতজী বললেন—"উপায় আর কি? ভগবানের খোলা হাওয়া লোকগুলোর মনে একটু লাগতে দাও। তা'তে আধ্যাত্মিক সর্দি-কাশি হবার কোনই ভয় নেই। আর তোমার পেশাদার ঠাকুরদের বলো একটু আওতা ছেড়ে দাঁড়াতে।" এ সংখ্যায় "ফাগুন লেগেছে বনে বনে" ও "কুলটা হইব কুল না ছাড়িব" বড় মধুর প্রাণ-মাতানো লেখা। শেষের লেখাটিতে ছিল—"বাংলায় অর্দ্ধেক নাকি বাকি অর্দ্ধেককে ছোঁয় না, ছুঁলে তাদের উপরের ক' পুরুষ নরকে যায় তার নিবিধ শাস্ত্রে নাকি কথা আছে। এই নরক-ভীতু জাত নাকি দেশকে তুলবে! * * *

"চোরার মুখেতে ধরম কাহিনী
শুনিয়া পায় যে হাসি।
পাপপুণ্য জ্ঞান তোমার যতেক
জানয়ে বরজবাসী।"

যে দেশে হিন্দু আছে, মোছলমান আছে, বামুন আছে, শুদ্দুর আছে, ধোপা-নাপিত হাড়ি-ডোম-ডোকলা আছে, কিন্তু মানুষ নাই, সে দেশকে বাঁচাবে কে? * * * তুমি মুসলমান থাকবে, আমি হিন্দু থাকবো, সে আমাদের এই আনন্দ-অভিনয়ের নটের পোষাক, প্রাণের ডালি ঐ ফুলে সাজিয়ে এনে আমি তোমার হাটে তুমি আমার হাটে বসেছ। তোমার দানে আমার জীবন ভরে যাক, আমার পিয়ালায় তোমার নয়ন খুলে যাক, তবে তো—

"নব বৃন্দাবনে ঈশ্বর মানু'য
মিলিত হইয়া রব।"

* * * *

"বুকে করে পতি লয়ে আমি থাকি এয়ো হয়ে
যতিনী সতিনী মাগী রাঁড়ী কেন হয় না!"

এই মন্ত্র আউড়ে রাজনীতির শতেক জাত বানিয়ে প্রেমের হাট বসে না।"

৫ম সংখ্যার 'বিজলী'র সম্পাদকীয় লেখার শুধু শিরোনামাগুলি দেখলেই জাতির পিঠে কি নিদারুণ কশাঘাত আসমানী আগুনের কন্যা 'বিজলী' হানছিল তা' বোঝা যায়। প্রথম লেখার নাম "সেই খোল, সেই নলচে" আর দ্বিতীয় লেখার শিরোনামা—"স্বদেশী আতর-মাংস দালালী ব্যবসা"। কংগ্রেসী মুক্ত ভারতে এই কথাগুলিই আগুনের অক্ষরে জাতির অস্থি-পঞ্জরে লেখা হয়ে আছে। তখন ছিল স্বদেশীর নামাবলী আর এখন সর্ব্বপাপবিনাশন আত্মগোপনের ছদ্মবেশ হচ্ছে খদ্দর।—

"ছুচোয় যদি আতর মাখে
তবু কি তার গন্ধ ঢাকে?"

এ সংখ্যায় "গোড়ায় গলদ" আর একটি দামী লেখা, তা' ছাড়া আছে উপেন্দ্রনাথের অনবদ্য 'উনপঞ্চাশী', বাঙালীর সাহেবী ফ্যাসন।

১৬ই অগ্রহায়ণের 'বরিশাল হিতৈষী'তে 'বিজলী'র সম্পর্কে বিরূপ টিপ্পনী ছিল; 'বিজলী'র পক্ষ থেকে এই সংখ্যায় তার উত্তরে ছিল—"টিপ্পনী মাথায় করে নিলাম। বিজলীর জন্য সত্যি কথা বলতে, অরবিন্দ আর গান্ধীর ঘোড়-দৌড়ে এক জনকে জিতিয়ে দিতে তার জন্ম নয়। * * * আমরা খড়ম-পূজক নই, সত্যকে মানি, সত্যের চেয়ে কোন কিছুকে বড় করবো না। 'বরিশাল হিতৈষী' আশীর্ব্বাদ করুন, বিজলীর যদি কাজ ফুরোয়, সে যেন হাসিমুখেই স্বেচ্ছামরণ মরতে পারে। তবে কিনা বিজলীর রগুড়ে ঝাঁটার দু'-এক ঘা সবাইকে খেতে হবে। কারণ সন্ধ্যার মত বিজলীও ঠোঁটকাটা,—গাল খাবার শক্ত চামড়া দাদারা সব কর। ভুলচুক পাও, পাল্টে বাপান্ত করো।"

"গাছে তুলে মই কাড়া বনাম কাজ" এই লেখাটি দিয়ে ৫ম সংখ্যার 'বিজলী' শেষ হয়েছে।

১৯২১ সালে 'বিজলী' অনেক বুক ভরা গঠনের কাজের আশা নিয়ে নেমেছিল, 'মাতৃজাতি সেবক সমিতি'র নারীশিক্ষার আদর্শ তার একটি। সে অপূর্ব জাতিগঠনের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাধন করতে চেষ্টা হয়েছিল সে "মাতৃজাতি সেবক সমিতি" একটি সাধারণ স্কুল রূপে এখনও চলছে। সে আদর্শ কিন্তু রূপ নেয় নাই। (১) ঘরের মত মিঠা, (২) মন্দিরের মত শুদ্ধ, (৩) মায়ের কোলের মত প্রেম-মাখা, (৪) গুরুস্পর্শের মত সহজে প্রাণদায়ী, (৫) কাজের কাজী হবার শিক্ষালয় ছিল মাতৃজাতির আদর্শ। তখন প্রতিষ্ঠানটি ২১ গৌর লাহা ষ্ট্রীটে পোস্তার রাজার আনুকূল্যে ছোট আকারে চলছিল। তার জন্য প্রতি সংখ্যায় যে বিজ্ঞাপন বাহির হতো তা' ৫ম সংখ্যা 'বিজলী' থেকে তুলে দিচ্ছি—

মায়ের ডাক।

মাতৃজাতি সেবক সমিতি মায়ের পেটের অন্নের জন্য, মায়ের ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, মায়ের লজ্জা নিবারণের জন্য ডাক দিচ্ছে। কে ভারতে দীনা দেবীদের সেবার অধিকারী আছ, অর্থ নিয়ে এসে নারীর নারীত্ব রাখো।

শুনে অবাক হবে, যে, পেটের দায়ে মা-বাপ মেয়েকে বেশ্যাবৃত্তির জন্য চামার-পল্লীতে বিক্রী করছে। এ সঙ্কটকালে এদের লজ্জা ঢাকতে লক্ষ লক্ষ টাকা ও নারী সঙ্ঘ চাই।

কি অগ্নিময়ী ভাষায় উদ্দীপনা জাগানো লেখা সেদিনের 'বিজলী' এ জাতির স্নায়ুতে ধমনীতে সঞ্চার করে দিয়ে গিয়েছিল, সংখ্যার পর সংখ্যা থেকে তা' অবিরাম উদ্ধৃত করে বলা যায়। তখনও চলেছিল মুক্তি-সংগ্রাম, তখনও বাংলার তরুণ আশায় দুরাশায় বেঁচে আছে, আজকের মত দীর্ণ ভারতে দীর্ণ বাংলায়

'fissured freedom' পেয়ে ঝটা আজাদীর নেশায় দ্রুতবেগে দুর্নীতির সোপান বেয়ে অতল-গর্ভ খাতে নেমে যাচ্ছে না। ৬ষ্ঠ সংখ্যা 'বিজলীর' 'মন-মরা জাতি' শীর্ষক লেখাটির শেষ কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি বসুমতী পাঠক-পাঠিকার জন্য—"আমাদের সব ধর্ম্মে সমাজে আজ দীঘল-ঘোমটা নারী, মেকী সতীত্ব জাহির করবার জন্যে তিন হাত পরিমাণ মরালিটির ঘোমটা টানা, * * * এবার তাই হেঁকে ডেকে বলবার সময় এসেছে যে, তোরা সব অমৃতের সন্তান, মায়ের খাস তালুকের প্রজা। তোদের পাপ-পুণ্য জীবন-মরণ সবই তার রাঙা পায়ে শরণ পাবার জন্যে। তোরা শুধু এগুবি বৈকুণ্ঠের দেউড়ির হাজার দুয়ার একে একে হাজার বার ঠেলে, শুধু আলো থেকে আলোয় এগিয়ে যাবি। * * * যে হিঁদুর মুনি-ঋষি বলে, 'সোঽহং', যে হিঁদুর গোরা আচণ্ডালে কোল দিয়ে পশু-পাখীটিও তরিয়ে গেল, যে হিঁদুর ব্যাসদেব ছিল জেলের জন্মিত, মহাঋষি কনাদ ছিল বুনো মায়ের পেটের ছেলে, তোরা সব যে সেই হিঁদু।" তার আগের লেখা "প্রাণের কথায়" শ্রীঅরবিন্দের বাণী উদ্ধৃত দেখছি—"Withdraw yourselves, realise your own innerselves and get into the heart of your country and understand what she stands for. Strive for it, work for it unceasingly, strong in your faith in that and all outer things will follow—or you will lose you Souls and your country will never rise." সেদিনের 'বিজলী'র প্রত্যেক লেখাটির মাঝে এই জাতিকে তার অন্তরের মণিকোঠায় ফিরে যাবার উদাত্ত আহ্বান বেজে উঠেছিল। ৬ষ্ঠ সংখ্যার শেষে 'নায়ক' থেকে উদ্ধৃত লেখা দেখছি Slave Mentality ; তা'তে ছিল—"এই যে ন্যাশনাল শিক্ষা বলিয়া কেবল চেল্লাচিল্লি করিতেছ, ও যে কি ও কেমন, তাহা তোমাদের দেশীয় ভাষায় ব্যক্ত করিতে পার কি? ন্যাশনাল শব্দের একটা বাংলা বা হিন্দী প্রতিশব্দ বাহির করিতে পারিয়াছ কি?"

৭ম সংখ্যার 'কাল-বৈশাখী' এই সুরে চলেছে—"আজ দিগন্ত জুড়ে ঝড়-তুফানের তালে তালে মহাকালের বুকে মহাবলির মঙ্গল-নৃত্য আরম্ভ হয়েছে। ভীষণ শ্মশানে—শৃগাল-কুকুর-শবের মধ্যেই দিগম্বরা ঐশ্বর্য্যময়ীর আনন্দ! যেখানে শৃগাল-কুকুরের চিৎকার, কাক-শকুনীর বিকট ধ্বনি সেইখানেই আনন্দময়ী জগজ্জননীর অট্টহাসি! মানব! এ মহাপ্রলয়ে ভয় করো না। এ বিরাট ধ্বংস জগতে নবসৃষ্টির সঙ্কেত-বার্ত্তা।" সকল সংখ্যায়ই ঐ একই ধারা—'কাল-বৈশাখী', প্রাণে আগুন-জ্বালানো সব লেখা, উপেন্দ্রনাথের "উনপঞ্চাশী", জাতির অস্থিমজ্জাগত ক্ষত সব নগ্ন করে দেখানো। সপ্তম সংখ্যার লেখার শিরোনামা হচ্ছে—'স্বাধীনতার ভাংচানি', 'যা হয়েছে যা হচ্ছে আর যা হবে তা জানি রে,' 'ঘরভরা এই আবর্জ্জনা ঘুচাই বল কিসে', 'গোড়া কেটে আগায় জল', 'কংগ্রেসের কথা, কংগ্রেসে মারামারি—ভিতরের গোলামী'। এই সব সেদিনের লেখার শিরোনামাই প্রকাশ করে সেই পচন ও গলদ আজও মুক্ত স্বাধীন ভারতেও চলছে, জাতি এখনও তার অন্তরের মণিকোঠার পথের সন্ধান পায় নাই, বাহিরের ভাঙা হাটেই ঘুরে হয়রান হচ্ছে। সেদিনও ত্রুটিপূর্ণ জাতীয় মহাসভাকে 'বিজলী' ব্যঙ্গভরা কশাঘাত করতো, ৮ম সংখ্যায় দীর্ঘ লেখা 'কঙ্গরসের রঙ্গরস' তার নিদর্শন। এই লেখাটি ছিল নাগপুর কংগ্রেসী বৈঠকের রিপোর্ট—আমাদের পরম সংবাদদাতার পত্র—নিজস্ব সংবাদদাতা নয়। রিপোর্টের দু'চার লাইন উদ্ধৃত করি—"স্বয়ং দাস সাহেব (চিত্তরঞ্জন দাস) দুপুরে রোদে নাগপুরের সেই ধূলো উপভোগ করতে করতে ২।৩ মাইল রাস্তা প্রোসেসনের সঙ্গে চললেন। বাঙালীর বীর রস জেগে উঠলো—সে মরা (মৃতা দেশমাতা) কাঁধে করে গাইতে গাইতে চললো—"বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ।" সে যখন সপ্ত নিনাদে গাইতে লাগল,—"সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গড়িল উপনিবেশ"—তখন অভাগা আমার বুদ্ধিটা কিছুতেই এই মৃত ব্যক্তির (মরা দেশের) সঙ্গে এই লাইনটার সম্বন্ধ আবিষ্কার করতে না পেরে ভেষ্টায় ছটফট করতে লাগল।"

'বিজলী'র পরের সংখ্যাগুলিতে 'কাল-বৈশাখী' ইত্যাদি ছাড়াও "চিঠির ঝাঁপী" আরম্ভ করা হয়েছিল, ১২শ সংখ্যার ঝাঁপীতে আমার পণ্ডিচারী 'আর্য' অফিস থেকে লেখা দীর্ঘ চিঠিতে দেখছি—ভারতীয় চিত্রকলার মুখপত্র রূপম্-এর ৪র্থ সংখ্যায় আবু পর্ব্বতের জৈন মন্দিরগুলির উপমাহীন কারুকার্য্য দেখে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, "This is supremental in art! We not only did work in stones like that but also wrote the Vedas and the Upanishads. Now we only live in hope! In these works you have the soul of India and nothinge else,—not a trace of any other civilisation but her own—it is 'Jeeban Shilpa' indeed!" অর্থাৎ 'এ হচ্ছে শিল্পে অতিমানসের সৃষ্টি! আমরা যে কেবল পাথরে কুঁদে অনন্তের ভাবকে ফুটিয়ে তুলেছিলাম তা' নয়, আমরা বেদ ও উপনিষদও লিখেছি। এখন কেবল আশায় বেঁচে থাকা, যদি কোন দিন মানুষের আবার সে ভাগবতী সৃজন-শক্তি ফেরে! এই সব শিল্পে ছবিতে লেখায় কেবল ভারতের নিছক মনের বিভূতি ধরা পড়েছে, এগুলির ভিতর আর কোন সভ্যতার ধার-করা আভাসও পাবে না, একেই বলে খাঁটি 'জীবন-শিল্প'।' চিঠিখানি পুরাপুরি উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করা কঠিন, ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকের জন্য সে কাজ আজ স্থগিত রইলো। ১২শ সংখ্যার শেষ লেখা—'তোরা ঘরের পানে তাকা।'

এর আগের ১১শ সংখ্যায় ২১শে ডিসেম্বরের টাইমস্ কাগজে মিঃ এডউইন বিভানের লিখিত পত্র থেকে উদ্ধৃত করে লেখা হয়েছে—"মহাত্মা গান্ধী শুধু টলষ্টয়ের শিষ্য নন, সহযোগিতা বর্জ্জনের আদর্শটা টলষ্টয়েরই গড়া। ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে টলষ্টয়ের একখানি চিঠি প্রকাশিত হয়, তাতে তিনি হিন্দুদের বলেছেন——Do not fight against the evil, but on the other hand, take no part in it. Refuse all Co-operation in the Government Administration, in the law courts, in the collection of taxes, and above all, in the army, and no one in the world will be able to subjugate you." প্রাণবান মানুষের কি জীবন্ত ভাষা! এই অসহযোগিতার আদর্শ একদিন মহাত্মা গান্ধীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে গোটা ভারতকে জাগিয়ে তুলেছিল।

জাতিকে সজাগ করবার দিক দিয়ে সে মন্ত্র ব্যর্থ হয় নাই, হয়েছিল বাস্তব ফলের—সদ্য স্বরাজ অর্জ্জনের দিক দিয়ে।

'বিজলী' ১৩শ সংখ্যায় "দেশের জন্য নারীর দান" লেখায় রস ল্যাডনের প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করা হয়—"মার্কিণ আইরিশ কমিশনের নিকট ম্যাকসুইনীর স্ত্রীর সাক্ষ্যদান এক অনুপম দৃশ্য। সে সভায় সবারই চোখে জল, আয়র্লণ্ডের নারীর বেদনায় সবাই চঞ্চল, কেবল সেই বালিকা বধূ মুরিয়েল ম্যাকসুইনীর ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত চোখ দুটিতে জল নাই, মুখখানি শান্ত ও একটু হাসিমাখা, শুধু দেহখানি তেজস্বিতায় ঋজু ও অকম্পিত। তার বিবাহিত জীবনের প্রথম কাহিনী থেকে আরম্ভ করে স্বামীর প্রায়োপবেশনে মৃত্যু অবধি বলতে তিন ঘণ্টা লেগেছিল। মুরিয়েল বলেছিল, 'তোমরা অন্ন-বস্ত্র-টাকা যা' পাঠাও এ দুর্দ্দিনে আইরিশ নারীরা তোমাদের সে শ্রদ্ধার দান নেবে বটে কিন্তু তারা চায় তাদের স্বাধীনতা আগে জগৎ মেনে নিক। আয়র্লণ্ডে আজ স্ত্রী-পুরুষ, সমস্ত জাতি এই এই মুক্তির ব্যথায় একপ্রাণ একাত্মা হয়েছে। মেয়েরা পণ করেছে যে পাষাণ হয়ে দারিদ্র, ক্লেশ ও প্রিয়তম আত্মজনের মৃত্যু-বেদনাও সইবে, তাই আইরিশ মেয়ে আর এখন কাঁদে না। ১৯১৭ সালে ইংরেজের জেলে আমাদের বিয়ে হয় কিন্তু গেলিক ভাষায় আইরিশ পুরোহিত আমাদের মন্ত্র পড়েছিল। তখন দেখে মনে হতো যেন সমস্ত আয়র্লণ্ডই জেলখানায়। * * * খুকী জন্মাবার দু' হপ্তা আগে আমি কর্কে যাই, কারণ তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল যেন আইরিশ মাটিতে আমাদের সন্তানের জন্ম হয়, কারণ ঐ মাটির সেবায় ও কর্ম্মে উৎসর্গিত হবে তার জীবন। তাঁকে আমি খুব কমই পেয়েছি, তিনি দেশের কত বড় লোক, নয় জেলে নয় গ্রেপ্তার হবার আশঙ্কায় গোপন বাসে ঘুরতেন * * * ব্যালিংঘারীতে তিনটি মাস আমরা একত্রে থাকতে পেয়েছি; আর কখনও তাঁর সঙ্গসুখ এ অভাগীর অদৃষ্টে ঘটে নাই। ব্রিক্সটন জেলে তাঁকে রোজ দেখতে পেতাম, কিন্তু রোজ তিল তিল করে মরার সে দেখা বড় নিদারুণ। ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন, 'এখনও যদি তিনি না খান আর তিনি ইহজীবনে বাঁচলেও সুস্থ সবল ছেলেপুলে আমাদের হবে না।' আমি সে কথা তাঁকে বলতে অস্বীকার করি, কারণ আমাদের বিয়ে ছিল আত্মনিবেদন। সে তো সাধারণ বিয়ে নয়। যখন প্রায় মরণের মুখে তখনও তাঁর কি শান্ত হাসিমাখা ভাব। যখন দু' বছরের শাস্তি শোনানো হলো তখন বলেছিলেন, 'কোন ক্ষতি নাই, আমি তো এক মাসে মুক্ত হবো।' তিনি কাউকে ঘৃণা করতেন না, ইংলণ্ডের প্রতি তাঁর রাগ ছিল না, কেবল এ বাসনা ছিল যে আয়র্লণ্ডকে মুক্তি দিয়ে ইংলণ্ড আয়র্লণ্ডের প্রেমের জিনিস হোক। একেই বলে সাধনা, এমনি করে পাগল হয়ে দেশকে ভালবাসাকেই দেশপ্রেম বলে।"

বসুমতীর পাঠক-পাঠিকা! আমাদের দেশেও ম্যাকসুইনী হয়েছিল যতীন দাস এমনই দেশের মুক্তির জন্য প্রায়োপবেশনে জীবন দিয়ে। ১৭ বছরের ছেলে ননীগোপাল দ্বীপান্তরে আন্দামান জেলে চার মাসেরও অধিক কাল প্রায়োপবেশনে ছিল, সে অস্থি-চর্ম্ম-কঙ্কালসার দেশপ্রেম-পাগল বালককে আমি বহু কষ্টে অন্ন-জল গ্রহণ করাই। দেশে ফিরে সে কম্যুনিষ্ট হয়ে যায়, তখন গান্ধীজীর অসহযোগের চাপে বিপ্লববাদ মরে গেছে, তাই প্রাণবন্ত ছেলে ননীগোপাল আশ্রয় নিল সাম্যবাদের লাল ঝাণ্ডার তলে।

১৫শ সংখ্যা 'বিজলী'র লেখাগুলির শিরোনামা শুনুন—"বয়ে যায় পতিতপাবনী তীরে আর ভীষণ শ্মশান", "মানুষের জোয়ার", "উনপঞ্চাশী", চিঠির ঝাঁপীতে পণ্ডিচারী থেকে লেখা পত্র। এই ১৫শ সংখ্যায় 'বিজলী'র কার্য্যাধ্যক্ষ খবর দিয়েছেন—'অকূলে ঝাঁপ' নাম দিয়ে—বিজলী আমরা চার হাজার ছাপতে আরম্ভ করি, নগদ বিক্রীর গ্রাহক নিরাশ হয়ে ফিরে যায় দেখে পাঁচ হাজারে বাড়াই, তার পর ছয় হাজার ছেপেছি, এবার দাঁড়ালো সাত হাজারে।

"দাদারা সব! আমরা নিঃস্ব ভিখারী, 'বিজলী' নিয়ে অকূলে ঝাঁপ দিয়েছি। মূলধন না নিয়ে এত কাগজ ছাপতে বললে ভরা-ডুবি হবে। যারা কাগজ কিনতে সাধ রাখো, বৃহস্পতিবার বেলা বারটা থেকে তিনটার মধ্যে ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাবে, মোহনলাল ষ্ট্রীট আর সরস্বতী লাইব্রেরীতে কাগজ পাবে। তার পর এক কপিও 'বিজলী' থাকে না, কাজেই নিরাশ হতে হবে।"

তখন এই তিনটি প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে সমাজ-বিপ্লবের কাজে নেমেছে। বাজারে কোন পেশাদার কাগজ ১৫ হপ্তায় সাত হাজারে দাঁড়াতে পারে এ দৃশ্য দেখা যায় নাই, আকাশের অগ্নিমুখী মেয়ে 'বিজলী' সেই দিন এই ইন্দ্রজাল কাজে করে দেখিয়েছিল।

সে যুগে সেদিনও তখন ট্রাম ধর্ম্মঘট চলছে। ফিরিঙ্গী ছোকরা ও ফিরিঙ্গী সার্জ্জেণ্ট দিয়ে ট্রাম চালাতে গিয়েও ৬ জন গুলির মুখে জখম ও এক জন প্রাণ দিয়েছে। সেই খবর ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৯২১ সাল) 'বিজলী' দিতে গিয়ে যা লিখেছিল তা' এই ডাণ্ডা-গুলির ওপর দাঁড় করানো কংগ্রেসী রাজ্যেও খাটে। ১৫শ সংখ্যা বিজলী বলছে—"এই সেদিন পাঞ্জাবের ঘা (জালিঅনওয়ালার হত্যাকাণ্ড) শুকোতে না শুকোতে আবার এক ঘায়ের উৎপত্তি, ইংরাজ দেওয়ান, নায়েব, তহসিলদার, দারোগা মায় আরদালী পর্য্যন্ত সবাইকে বলছি, তোমরা রাজার নিমক খেয়ে এ রকম অমঙ্গল সৃষ্টি করো না। রাজ্যটি যদি সুশৃঙ্খলে চালাতে চাও তা' হলে এ ঘুমন্ত সিংহের গায়ে খোঁচা দিও না। দু'-পাঁচ দশ জন ভারতবাসীকে মেরে ফেলে তোমরা এ রক্তবীজের বংশ লোপ করতে পারবে না। বরঞ্চ এ জাতিটার মরণ বলে যে একটা ভয় ছিল, তার নির্ম্মম লীলা চোখের উপর দেখে দেখে সে ভয়টাও কেটে যাবে। * * * আমাদের পরামর্শটা শোন—এ জাতটার মরণ যদি আটপৌরে হয়ে যায় তবে সেটা বড় সুবিধা হবে না। তোমাদের ভালর জন্যে বলি,—ইরাণ দেশের কাজীর মত এটা মনে করো না—

ইমাম সবাই সত্যপ্রিয়
পার্শী মিথ্যাবাদী,
পার্শী ইমামে হইলে বিবাদ
পার্শীই অপরাধী।
পার্শী ঠেকিলে ইমাম গায়
তার মাথাটি বাঁচানো হইবে দায়,
কিন্তু পার্শীর শির কাটিয়া লইলে
হইতে হইবে রাজী!"

তখন আয়র্লণ্ডে ব্ল্যাক এণ্ড ট্যানদের দৌরাত্ম্যে দেশ দু'ভাগ হবার অবস্থা। তখন লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক রাশিয়া সবে উঠছে। ১৬শ সংখ্যা 'বিজলী'তে "রাশিয়া বুঝি এবার মানুষ হ'লো" শীর্ষক লেখাই তার নিদর্শন। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চুকেছে, কাইজারের জগজ্জয়ের স্বপ্ন ভেঙেছে। সেই সব ঘটনার জের কাটার খবর দিতে গিয়ে 'বিজলী'র "কাল-বৈশাখী"তে লেখা হয়েছিল—"শিবকে ছেড়ে সবই ভয়ানক; শিবকে ছেড়ে শক্তি রক্ত-নদীর চামুণ্ডা, তার সাক্ষী য়ুরোপ। এত বড় সভ্যতা,—রাজপাট, ধন-দৌলত শক্তি-সামর্থ্য পেয়েও ওরা দুনিয়া ভরে লুট-তরাজই কেবল করলো, মানুষে মানুষে হিংসার মরণ মরতে শেখালো; জগতে একছত্র শান্তি এলো না। শিবকে ছেড়ে শক্তিসাধনা হয় না। শিব মানে জ্ঞান; সাধনে তা' জাগে। ভারতের শক্তি শিবের শক্তি, এ কথা ভুলো না। ভাবের গোলামী করো না; য়ুরোপকে দেখে বোঝো, শিবের বুকে এ রণরঙ্গিণীকে দাঁড় করাতে হবে, তবে মুণ্ডমালীর হাতে বরাভয় জাগবে; ত্রিনেত্রে প্রেম-মন্দাকিনী বইবে।"

তখন য়ুরোপকে দেখে সবারই Power-Cult শক্তির নেশা জেগেছে, ভারতে বলশেভিকবাদ আসছে। য়ুরোপের শিবহারা শক্তির নেশায় আজ সে সভ্যতা বিশ্বসঙ্কটের মুখে, আজই তার শিবহীন যজ্ঞ ভাঙনের মুখে। ১৬শ সংখ্যা 'বিজলী' আরম্ভ হয়েছিল ঘুম-ভাঙানোর গান দিয়ে—

"জাগলি নাকি, ও শঙ্করী!
এ শঙ্করের হৃদয় 'পরে?
নাচবি নাকি, ভয়ঙ্করী! খে
ভয়ঙ্কর আনন্দভরে?
হাসবি কি মা, সর্ব্বনাশী!
সুপ্তিনাশা মুক্ত হাসি?
হাজার যুগের বাঁধনরাশি
নাশবি উজল কৃপাণ-করে?
এই শবেই আছেন সে শিব জাগি
তাই শব জাগে তোর চরণ লাগি,
তোর আনন্দে শিব বিরাগী
ভক্তিভরা মুক্তি ধরে!
মরণমাঝে শরণময়ী
জীবন দিয়ে জীবনজয়ী
তোর চরণরাগের রক্ত আশে
হানব অসি বুকের 'পরে।
তুই মা মোদের ক্ষ্যাপা মেয়ে,
আপনি ক্ষেপে দিস্ ক্ষেপিয়ে;—
মরণ-সুধায় প্রাণ মাতিয়ে
আগুন দিলি সুখের ঘরে।
আমার আমি মিলিয়ে দে মা,—
পাষাণ আমার গলিয়ে দে মা!
জাগিয়ে দে মা বাঁচিয়ে দে মা
ডুবিয়ে দে মা চিৎ সায়রে।"

১৬শ সংখ্যা থেকে ২০শ সংখ্যা 'বিজলী'তে তাঁত বনাম মিল ও চরকা বনাম বয়নমিল নিয়ে অনেক তত্ত্বকথা আছে। এখন ভারতে মহাত্মাজীর তিরোভাবে সে সমস্যা live issueর তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে, খদ্দর হয়েছে নামমাত্র কংগ্রেসী চাপরাশ, সরকারী উর্দ্দি হয়ে দাঁড়াচ্ছে হ্যাট-কোট-টাই। এখনকার পাঠক-পাঠিকা তাই ঐ "চরকা না তাঁত?"—প্রশ্নের আলোচনায় সুখ পাবেন না। তখন পণ্ডিচারীতে বসে লেখা প্রতি হপ্তায় পণ্ডিচারীর চিঠি মারফৎ অনেক কথাই 'বিজলী'তে প্রকাশ করা হচ্ছে। ১৮শ সংখ্যায় "বাঁধন কাটবে কিসে?"—লেখায় একটা অকাট্য সত্য ছিল যা আজও কংগ্রেসী রাজত্বে খাটে।—"দেখো ভাই, গুরুমশাই বেটা যদি মরে যায় ত হাড়ে বাতাস লাগে।" * * * দ্বিতীয় ক্লাসের ছাত্র উত্তর দেয়—"ওরে! তাও কি কখনও হয়? গুরুমশাই মলে আবার গুরুমশাই হবে, বাবা বেটা মা মরলে আর আমাদের নিস্তার নেই!"

"আমাদের দেশে এক গুরুমশাই মরেছে, আর এক গুরুমশাই এসে পাঠশালা খুলে দিয়েছে। পাঠান মরেছে তো মোগল এসেছে; মোগল মরেছে তো ইংরাজ এসেছে; এই যে একের পর এক গুরুমশাই এসে পাঠশালা খুলে দিচ্ছে আর আমরা পাততাড়ি বগলে মুখে কালি-ঝুলি মেখে গুরুমশায়ের বেত খাচ্ছি আর "আজ্ঞাকারী প্রতিপাল্য" পাঠ লিখে চলেছি, এ দুঃখ কি আমাদের গুরুমশাই মরলেই ঘুচবে?"

"নিজের বাঁধন যদি নিজের হাতে না খোলো তো যে কেউ যখন আসবে সেই যে কোমরের দড়ি ধরে বাঁদর নাচাবে! * * * নিজেকে জানতে হবে, নিজের শক্তি ফুটিয়ে তুলতে হবে। সেই জ্ঞান-শক্তি হারিয়েছি বলেই আমরা আজ বিশ্বের দরবারে কাঙাল, পরের পায়ের ফুটবল।"

আজ দুর্নীতির রাজা কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের স্বদেশী নাগরার তলায় অসহায় ভারত অধোগতির খাত সলিলে ডুবছে, তারও পিছনে আছে জীবনের এই অকাট্য সত্য। সেদিন আমরা ভাবতাম বিদেশী রাজশক্তির উচ্ছেদই পরম কাম্য, বিদেশী সুশাসনের অপেক্ষা স্বদেশী কুশাসনও সহস্র গুণে শ্রেয়। এ কথার পিছনে কিছু সত্য আছে বটে কিন্তু কতটুকু আছে তা' 'বিজলী'র সেদিনের চেয়ে আজই ভাল করে বোঝবার দিন এসে গেছে। আজ আবার পথহারা জাতিকে নূতন করে আলোর অঙ্গুলী-সঙ্কেতে পথ দেখাবার জন্যে আকাশের মেয়ে 'বিজলী'কে তোমাদের চাই।

[ক্রমশঃ।

প্রীতি ও পীরিতি

"কহে চণ্ডিদাস, শুন বিনোদিনী,
সুখ দুখ দুটি ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি,
দুখ যায় তার ঠাঁই।"—চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে

সঙ্গীতের সূত্রে দুই পরিবারে যে ঘনিষ্ঠতার আরম্ভ হইয়াছিল, চিত্রলেখার আগ্রহে তাহা দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছিল। চিত্রলেখা বার বার ভ্রাতার ও স্বামীর সহিত যেমন সাগরিকার ও দীপশিখার সহিতও তেমনই অপরাজিতার সহিত তরুণকুমারের বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রস্তাবে কাহারও অসম্মতি ছিল না। চিত্রলেখা তরুণকুমারের মনোভাব জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—চেষ্টার ফলে তাঁহার মনে হইয়াছিল, তরুণকুমারের আপত্তি হইবে না। ওদিকে তিনি যেমন মনোযোগসহকারে অপরাজিতার ব্যবহার লক্ষ্য করিতেছিলেন, তেমনই দাসী শিশুবালার নিকট হইতে, তাহার সম্বন্ধে যথাসম্ভব সংবাদ সংগ্রহ করিতেছিলেন। শিশুবালা বলিয়াছিল, "মা, মেয়ের যেমন রূপ, তেমনই গুণ; যেমন পড়ায়, তেমনি বাড়ীর সব কাজে—সংসারের কাজে যেমন, পড়াতে তেমনই শ্রান্তি নাই।" মধ্যে অপরাজিতার ভ্রাতারা আসিয়াছিল। তাহাদিগের সহিতও

অপরাজিতা ও পরাজিতা

শ্রীদীপঙ্কর

অনুকূলচন্দ্রের পরিচয় ব্রজবল্লভ বাবু তাহাদিগকে আনিয়া করাইয়া দিয়াছিলেন।

কি একটা কাজের জন্য দীপশিখাকে লইতে আসিতে সুধীরের বিলম্ব হইল। তাহার পরে সে যখন আসিল, তখন তরুণকুমার ব্যঙ্গ করিয়া বলিল,—সত্যসত্যই বাঘ আসিল! চিত্রলেখা এক দিন গানের ব্যবস্থা করিয়া অপরাজিতাকে আনিয়া সুধীরকে দেখাইয়া বলিলেন, তাহার সহিত তরুণকুমারের বিবাহ দেন—ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। সুধীর প্রস্তাবের সমর্থন করিল। সে তরুণকুমারের সহিত সে বিষয় আলোচনা করিলে, তরুণকুমার বলিল, "লাঙ্গুলহীন শৃগালের ব্যবহার?" দুই জনে যে ব্যঙ্গোক্তি হইল, তাহাতে সুধীরের মনে হইল, চিত্রলেখার অনুমানই সত্য—তরুণকুমারের আপত্তি হইবে না—পিতার ও পিসীমা'র ইচ্ছার বিরোধী সে হইত না—তবে এ ক্ষেত্রে আরও কিছু থাকিতে পারে। যদি শীঘ্রই বিবাহ হয়, তবে তিনি দীপশিখাকে এখন স্বামীর সঙ্গে যাইতে দিবেন না মনে করিয়া চিত্রলেখা শিশুবালাকে অধ্যাপক-পত্নীর মনের ভাব জানিতে বলিলেন। আর সুধীর দীপশিখাকে বলিল, সে একবার লোকনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবে—গৃহে যখন আনন্দ, তখন সাগরিকার বিষণ্ণ ভাব বড়ই বেদনাদায়ক হইবে। দীপশিখা সে কথা চিত্রলেখাকে বলিল এবং তিনি তাহা সমীরচন্দ্রকে বলিলে তিনি বলিলেন, "ভালই হ'বে। আমরা কেবলই ভাবছি, কি করা যায়। সুধীর যদি পথ আবিষ্কার করতে পারে, সে ত ভাগ্যের কথা। তবে তুমি একবার সাগরিকার মনের ভাব কি, তা' জান।" সাগরিকার মনের ভাব সম্বন্ধে চিত্রলেখার সন্দেহ ছিল না—সে স্বামীকে শ্রদ্ধা করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু ভালবাসিয়াছে; যদি অশ্রদ্ধার কোন কারণ ঘটিয়া থাকে, তবে কালের ভেষজে যেমন হৃদয়ক্ষত দূর হয়, তেমনই ভালবাসা সে কারণ দূর করিতে পারিবে—হয়ত দূর করিয়াছে। কেবল লোকনাথের ব্যবহার তাঁহার নিকট দুর্ব্বোধ্য হইতেছিল—সে যে কিছুতেই এক দিনও শ্বশুরালয়ে আসিল না—তাহার পক্ষ হইতে সে বিষয়ে আগ্রহের কোন পরিচয়ই পাওয়া গেল না—সে কি কেবল লজ্জা? না—তাহার সঙ্গে অভিমানও ছিল? তিনি মনে করিলেন, সুধীর লোকনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলে কারণ অনুমান করা যাইবে।

কিন্তু শিশুবালা আসিয়া যে সংবাদ দিল, তাহাতে সকলেরই আশার সৌধ যেন ভূমিকম্পে ভাঙ্গিয়া পড়িল—ব্রজবল্লভ বাবু ও তাঁহার পত্নী চিত্রলেখার প্রস্তাব লোভনীয় মনে করিলেও, অপরাজিতা তাহা দৃঢ়তা সহকারে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং সেই জন্য অধ্যাপক-পত্নী শিশুবালাকে বলিয়াছেন, অপরাজিতা এখন পড়িতেই চাহিতেছে—সেই কারণে এখন তাহার বিবাহের কথা উত্থাপন করা হইবে না।

শিশুবালার কথা শুনিয়া চিত্রলেখা অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও স্নেহভাজন বলিয়াই যে তিনি তরুণকুমারকে ভালবাসিতেন তাহা নহে—তাহার গুণ যেমন, তাহার স্বভাব তেমনই এবং সে সকলের সহিত তাহার পিতার আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিলে তাহার সহিত কন্যার বিবাহ যে সকল পিত

মাতাই প্রলোভনীয় মনে করিবেন, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। শিশুবালা বলিয়াছে, ব্রজবল্লভ বাবু ও তাঁহার পত্নীও সেই মত পোষণ করেন। কিন্তু অপরাজিতা এ প্রস্তাবে আপত্তি করিল কেন? তাঁহার মনে হইল, সে সংসার-জ্ঞানে অনভিজ্ঞ—ভুল করিয়াছে। তাহার জন্ম তাঁহার দুঃখ হইল; যেন সে, আপন কল্যাণ আপনি ত্যাগ করিয়াছে। তাঁহার মনে হইল, তাহাকে তাহার ভুল বুঝাইবার কি কোন উপায় করা যায় না? কিন্তু উপায় কোথায়? তিনি শিশুবালাকে নানা প্রশ্ন করিয়া অপরাজিতার আপত্তির কারণ জানিতে চেষ্টা করিলেন। সে মাতার সহিত অপরাজিতার কথার সময় উপস্থিত ছিল এবং যাহা শুনিয়াছিল ও শুনিয়া যাহা বুঝিয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করিল—তরুণকুমারের প্রথম দোষ, সে ধনীর সন্তান—একমাত্র পুত্র, দ্বিতীয় দোষ—সে অতি মৃদু স্বভাব—সর্ব্বদা সঙ্কুচিত, তৃতীয় দোষ—সেরূপ লোক স্বভাবতঃ উন্নতিকর কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারে না। অবশ্য শেষোক্ত দোষ প্রথমোক্ত দোষ দুইটি হইতে অপরাজিতা অনুমান করিয়াছিল।

মাতা যখন কন্যাকে বিবাহ ব্যাপারে তরুণকুমার সম্বন্ধে তাহার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন অপরাজিতা প্রথমেই বলিয়াছিলেন, "ওঁরা যে পেল্লায় বড়মানুষ—দেখ না কত বড় বাড়ী, কত সাজসজ্জা, কত গাড়ী, কত লোক।" তাহাতে অধ্যাপক-পত্নী বলিয়াছিলেন—"সেটা কি বড় অপরাধ?" কন্যা বলিয়াছিলেন, "অপরাধ না হ'লেও আদর পাবার মত নহে।" তাহার পরে—মৃদুতা। অপরাজিতার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, বড় গাছের ছায়ায় যে গাছ জন্মে, সে যেমন দৃঢ় হয় না—তেমনই ধনীর গৃহের একমাত্র পুত্র যখন আবার মৃদু হয়, তখন সে জীবন-সংগ্রামে জয়ের উপযুক্ত হয় না—কাচের বাক্সে মোমের পুতুলের মত তাহার অবস্থা হয়।

শিশুবালা বলিল, "কি জানি, মা—এখনকার লিখাপড়া জানা মেয়েদের ভাব। যেন সেকালের সবই উল্টে গেছে। এমন সম্বন্ধ পসন্দ হ'ল না। শেষে দুঃখ করতে হ'বে।"

চিত্রলেখা বলিলেন, "অমন কথা মুখে উচ্চারণ করতে নাই, ওর ভাগ্যে সুখই যেন থাকে—কা'র হাঁড়ীতে কে চাল দিয়াছে, তা কে বলতে পারে? তুই যেন এ বিষয়ে আর কোন কথা ওঁদের বলিস না। যা' হ'বার তা' হ'বেই।"

"তা-ই করব, মা। তবে এ বিয়ে যদি হ'ত, তবে হরগৌরীর মত মানা'ত। দাদাবাবুর মত ছেলে ত বড় দেখি না—সর্ব্বগুণে গুণবান; আর মেয়েটিও সকল দিকে ভাল—কিন্তু—"

চিত্রলেখা ভাবিলেন, হয়ত অপরাজিতা অনেক উপন্যাস পাঠ করিয়াছে; যে বহু উপন্যাসের সৃষ্ট কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়া দৃষ্টি প্রসারিত করে, সে প্রায়ই ভুল করে। কিন্তু সে বিষয়ে তিনি ভুল করিয়াছিলেন।

সে যাহাই হউক, তিনি সাগরিকাকে ও দীপশিখাকে শিশুবালার কথা বলিলেন এবং দীপশিখা যাহা জানিল, সুধীরের তাহা জানিতে বিলম্ব হইল না। সুধীর দীপশিখাকে বলিল, "তবে এ বার বাক্স গোছাও—পোঁটলা বাঁধ; আর ত থাকবার কোন ছল পা'বে না। দাদার সম্বন্ধে মেয়েটি যা' বলেছে, তা'তে নিশ্চয়ই রাগ করেছ। কিন্তু যা'বার আগে ওদের বাড়ী গিয়ে দেখা ক'রে—গান শুনে বিদায় নিয়ে এস'।" তাহার পরে সে বলিল, "এ দীপশিখা নয়—অগ্নিশিখা—ও নিয়ে খেলা চলে না।"

সেই দিনই সুধীর তরুণকুমারকে বলিল, "তবে আর কি, লাগেজ গুছাই।"

তরুণকুমার বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"তোমার বিবাহ 'শুভস্যশীঘ্রং' হিসাবে পিসীমা দিবেন ব'লে দীপশিখাকে আটকে রাখছিলেন; তা' যখন হ'ল না, তখন আমি আমার লাগেজ গুছাই—তোমার ভগিনী, আর তিনি তাঁর লগেজ গুছান—সন্তান; যাত্রার উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ হ'ল।"

"কি ব্যাপার বল ত?"

"তুমি বুঝি সব জান না? পিসীমা'র ভাইপোটি তাঁ'র 'আমার গরব—আমার আশা'। তাই তিনি মনে করেন, লোক তাঁ'কে জামাই করতে—অনূঢ়ারা তাঁ'কে পতিত্বে বরণ করতে ব্যস্ত হ'বে। তাঁ'র সেই বিশ্বাসের আগুনে ইন্ধন যোগান তাঁ'র দুই ভাইঝি। এখন তিনি বুঝেছেন—আগুন নিয়ে খেলা করতে গেলে হাত পুড়ে যায়।"

"হয়েছে কি?"

"যে ঐ পথের পরপারে তরুণী বাস করেন, গান করেন, কলেজে পড়েন, পিসীমা'র ইচ্ছা ছিল উনি তোমার গলায় মালা দেন। আজ জানা গেল, উনি তা'তে অসম্মত। কারণ কি জান?—প্রথম তোমার প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ আছে—যে অর্থ অর্জ্জন করবার জন্য তাঁ'র পিতা হ'তে তোমার এই ভগিনীপতি পর্য্যাপ্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলেন, তা' অনায়াসে পাওয়া তোমার অপরাধ। তোমার দ্বিতীয় অপরাধ—তুমি নম্র—অর্থাৎ শান্ত—শিষ্ট—তেজবিশিষ্ট। তোমার মত লোকের দ্বারা বিশ্বজয় হয় না—তরুণীর হৃদয় জয় ত পরের কথা। সুতরাং ও বিষয়ে যবনিকাপাত। এখন আমাকে যেতে হ'বে। কেবল তা'র আগে একবার লোকনাথ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে হ'বে।"

"কেন?"

"তাঁ'র অবস্থাটা দেখতে। তাঁ'র পরিবারে ত ভূমিকম্প-ঝড়-বন্যা সবই হয়ে গেল—একটা বিষম ঘটনার ঘটনে—পরিবারটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। তা'র পরে তিনি এখন কি করবেন ও করছেন, দেখতে ইচ্ছা হয়। আর তাঁ'র জীবনের সঙ্গে আবার আর এক জনের জীবন জড়িত হয়ে আছে।"

"সেটা দুর্ভাগ্য।"

"নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্য; কিন্তু অনেক বাঁধন ইচ্ছা করলেই খুলে ফেলে মাটীতে ফেলা যায় না—সামাজিক বন্ধনের কথাই বলছি না, ভালবাসার বন্ধনও থাকে।"

"তোমার কি মনে হয়?"

"মনে কি হয়, তা' ঠিক বুঝতে পারি না বলেই ত বুঝবার চেষ্টা করতে চাই। তুমি ত মনের সুর সপ্তমে চড়িয়ে আছ—সেই জন্য এ বিষয়ে যত আলোচনা, তোমাকে বাদ দিয়ে, শ্বশুর মহাশয়ের আর পিসামহাশয়ের সঙ্গে করি; যেখানে বিব্রতবোধ করি, তোমার ভগিনীর পরামর্শ লই।"

"কি দেখবে?"

"দেখব—লোকটা আপনি কেমন—হাড়ে টক কি না অর্থাৎ তা'র মনের ভাবটা কি।"

সেই সময় মুক্ত বাতায়ন-পথে পথের অপর পার্শ্বস্থ গৃহে দেখা গেল, অপরাজিতা টেবলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কি করিতেছে। সুধীর বলিল, "ঐ দেখ তোমার অগ্নিশিখা।"

তরুণকুমার এক বার সে দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল—যেন আপনাকে বিব্রত মনে করিল।

তাহার ভাব লক্ষ্য করিয়া সুধীর বলিল, "ঐ ত তোমার অপরাধ। নম্রতা, কোমলতা, লজ্জাশীলতা—ও সব এখন অশোভন।"

তরুণকুমার কোন কথা বলিল না—কিন্তু আর দৃষ্টি তুলিয়া পথের পরপারের গৃহে চাহিল না।

সুধীর বলিল, "এখন একবার পিসামশায়ের কাছে যা'ব। তুমি যা'বে?"

তরুণকুমার বলিল, "না।"

"তোমাকে যে সংবাদ দিলাম, তা'র ব্যথায় তোমার মন নিশ্চয়ই টনটন্ করছে। তুমি সেই ব্যথা ভোগ কর—আমি যাই। তোমার ভগিনী দু'টিও বড় কম ব্যথা পা'ন নি—মনে মনে গজরাচ্ছেন; যদি পারতেন, রাস্তা পার হয়ে গিয়ে অগ্নিশিখার সঙ্গে ঝগড়া করতেন।"

সুধীর হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

তরুণকুমার তাহার কথার আলোচনা মনে মনে করিতে লাগিল। কিন্তু সে অপরাজিতার উপর রাগ করিতে পারিল না, তাহার দোষও দেখিতে পাইল না। যে দিন কলেজে ধর্ম্মঘটের সমর্থনে অপরাজিতা বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছিল—তাহার মুখে রক্তাভা, চক্ষুতে উত্তেজনাদৃপ্ত দৃষ্টি—সে দিনের কথা তাহার মনে পড়িল। সে দিন সে তাহাকে কলেজে প্রবেশ-চেষ্টার জন্য তিরস্কার করিয়াছিল—সে যে মোটর যানে গিয়াছিল, তাহাও যেন ব্যঙ্গের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল—তাহাও তাহার মনে পড়িল। তরুণকুমারের মনে হইল অপরাজিতার তাহার সম্বন্ধে উক্তি, তাহার সে দিনের ব্যবহারের ও কথার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য সম্পন্ন। সে জন্য তরুণকুমার মনে মনে অপরাজিতাকে যেন প্রশংসাই করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল, সে দিন অপরাজিতা তাহারই সংবাদপত্রে লিখিত পত্রে তাহারই মত নজিররূপে উপস্থাপিত করিয়াছিল। সে কথা মনে করিয়া তরুণকুমারের মুখে হাসির ভাব ফুটিয়া উঠিল। অপরাজিতা নিশ্চয়ই জানে না—সে পত্র তরুণকুমারই লিখিয়াছিল। তরুণকুমার ভাবিতে লাগিল, সাগরিকা ও দীপশিখা কেন অপরাজিতার কথায় রুষ্ট হইল। মতের দৃঢ়তা কি অপরাধ?

কিন্তু চিন্তার রঙ্গমঞ্চে সেই স্থলেই যবনিকাপাত হইল না। তরুণকুমার ভাবিতে লাগিল—অপরাজিতার ব্যবহারে সে সরল অথচ দৃঢ় অকুণ্ঠ ভাবই লক্ষ্য করিয়াছে। তাহাতে অশিষ্টতার অবকাশ নাই; সে লজ্জাতুরা নহে, কিন্তু তাহার ব্যবহারে গর্ব্বের বা ঔদ্ধত্যের কোন চিহ্ন নাই। সে লক্ষ্য করিয়াছে—তাহার পরিবারস্থাদিগের সহিত ব্যবহারে অপরাজিতা শিষ্টতার পরিচয়ই দিয়াছে—কিন্তু অকারণ কুণ্ঠা বা অশিষ্টতার লেশমাত্র সে ব্যবহার স্পর্শ করে নাই।

সেই সকল কারণে তরুণকুমার অপরাজিতার সম্বন্ধে মনে প্রশংসার ভাবই পোষণ করিয়া আসিয়াছে। আজ সে প্রশংসার কোনরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ সে অনুভব করিতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, অপরাজিতার মনের দৃঢ়তা তাহার সেই প্রশংসা বৰ্দ্ধিত করিতেই পারে।

সে কিছুক্ষণ ভাবিল। কিন্তু বার বার সেই একই কথা তাহার মনে হইতে লাগিল কেন? যেন সে ভাবনায় সে তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। কেন? তাহা ভাবিয়া তরুণকুমারের আপনার মনোভাব সম্বন্ধে কেমন সন্দেহ হইল। সেই সন্দেহের সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে আর একটি ভাবের উদ্ভব হইল—আশঙ্কা।

সেই আশঙ্কা অনুমানের সঙ্গে সঙ্গে তরুণকুমার অস্বস্তি ও চাঞ্চল্য অনুভব করিল। তাহার এই ভাবান্তরের কারণ কি? তবে কি তাহার অজ্ঞাতে তাহার মনে অপরাজিতার সম্বন্ধে প্রশংসা ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া যে ভাব তরুণের হৃদয়ে অজ্ঞাতে আত্মপ্রকাশ করে সেই ভাবে পরিণতি লাভ করিয়াছে?

তরুণকুমার আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হইল। কিন্তু তাহার ভাবনা গেল না।

সে যে পুস্তক পাঠ করিতেছিল, তাহা সম্মুখে ছিল—কিন্তু তাহার অধ্যয়ন অগ্রসর হইল না।

১১

সুধীর দীপশিখাকে লইয়া কর্ম্মস্থানে যাইবে—প্রত্যুষে ট্রেণ। সেই জন্য অমুকূলচন্দ্রের গৃহে সকলে শেষ-রাত্রিতেই শয্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন। দীপশিখার বিদায়ের সব আয়োজন করিবার জন্য চিত্রলেখা সেই গৃহেই ছিলেন।

তরুণকুমার ষ্টেশনে যাইবে। সে প্রস্তুত হইয়া আসিয়া আপনার বসিবার ঘরে বসিয়া ছিল। নগর তখনও প্রায় সুপ্ত—সে নগরের কর্ম্মকোলাহল কখন সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হয় কি না সন্দেহ; কারণ, এক দল লোককে রাত্রিতেও কাজের জন্য বাহির হইতে হয়; তবে যে কোলাহল লোককে পীড়িত করে, তখনও তাহার আরম্ভ হয় নাই। তরুণকুমার ঘরের সম্মুখের দ্বারগুলি মুক্ত করিতে যাইবে, এমন সময় সে শুনিতে পাইল সম্মুখের গৃহ হইতে সঙ্গীত শুনা যাইতেছে—অপরাজিতা গান গাহিতেছে। তাহার মনে হইল, হয়ত সে দ্বারগুলি খুলিলে অপরাজিতা গান বন্ধ করিবে; সেই জন্য সে আর দ্বারগুলি মুক্ত করিল না; শুনিতে লাগিল—

"সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি।
ব্রজ-রমণীগণ-মুকুটমণি।
মোতিম দামিনী কুঞ্জরগামিনী
শ্যাম-নেহারণি-চমকাণী রে।
আভরণধারিণী নব অনুরাগিণী
রস-আবেগিনী তরঙ্গিণী রে।
অঙ্গ-তরঙ্গিণী অধর-সুরঙ্গিণী
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণী রে।
কুঞ্চিতকেশিনী নিরুপমবেশিনী
রস-আবেগিনী ভঙ্গিনী রে।

নব-অনুরাগিণী নিখিল-সোহাগিনী
পঞ্চম রাগিণী-রূপিণী রে।
রাস-বিহারিণী হাস-বিকাশিনী
গোবিন্দদাসচিত-মোহিনী রে॥"

গান শেষ হইল। কিন্তু তাহার মত্ততা যেন দূর হইল না।

হয়ত অপরাজিতা আবার গান গাহিবে—মনে করিয়া তরুণকুমার যখন দ্বার মুক্ত করিবে কি না ভাবিতেছিল, সেই সময় চিত্রলেখা ডাকিলেন, "তরুণ, আয়, বাবা,—চা হয়েছে।"

সে ফিরিল। ঠিক সেই সময় সুধীর ঘরে প্রবেশ করিল—বলিল, "গান শুনলে? এ কি—

'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল বড় প্রাণ।'

কি বল?"

তরুণকুমার বলিল, "আমার না তোমার?"

"যদি স্বীকার কর তোমার—আমি কোন কথা বলব না; কিন্তু যদি বল আমার, তবে তোমার ভগিনীটি সে কথা শুনলে যে ব্যাপার ঘটতে পারে, তা' কি অনুমান করতে পার?"

হাসিতে হাসিতে দুই জন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ততক্ষণে সমীরচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুধীর তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, "লোকনাথ বাবুর সঙ্গে কাল দেখা হয়েছিল। সব কথা পিসীমা'কে বলেছি। আমার মনে হয়, লোকটির দৌর্ব্বল্যই তা'র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ত্রুটি; কিন্তু সেটা তা'র ধাতুগত ব'লেই বোধ হয়। কোন কোন জিনিষ যেমন পাশের জিনিষের রং গ্রহণ করে, তেমনই হয়ত দৃঢ় লোক পাশে পেলে সে দৃঢ় হ'তে পারে। আপনারা বিষয়টি ভেবে দেখবেন।"

সমীরচন্দ্র বলিলেন, "তোমার শ্বশুরেরও কতকটা ঐ মত।" বোধ হয়—'রতনে রতন চিনে'—কারণ, তিনিও কতকটা ঐ জাতীয়।"

তাহার পরে যাত্রার আয়োজন। তরুণকুমার যাত্রীদিগের সঙ্গে গেল। সমীরচন্দ্র সাগরিকাকে বলিলেন, "চল না—আমরাও ঘুরে আসি।"

শুনিয়া চিত্রলেখা বলিলেন, "চল, আমিও যাই—গঙ্গাদর্শন ক'রে আসি।"

সমীরচন্দ্র অনুকূলচন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি আর কেন বল্‌বে 'আমিই শুধু রইনু বাকি?' চল।"

তখন দুইখানি গাড়ীতে সকলেই ষ্টেশনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যখন সকলে গাড়ীতে উঠিতেছেন, তখনও শুনা গেল, অপরাজিতা গান গাহিতেছে। চিত্রলেখা বলিলেন, "কি গলা!"

গাড়ী ষ্টেশনে আসিল। মাল সব নির্দ্দিষ্ট কামরায় উঠিল। তখনও গাড়ী ছাড়িবার প্রায় দশ মিনিট বিলম্ব ছিল। সুধীর ও তরুণকুমার প্ল্যাটফর্ম্মে বেড়াইতেছিল। সুধীর তরুণকুমারকে বলিল, "তোমার যে কয়খানা বহি নিয়ে গেলাম, সেগুলি ডাকে পাঠাব, না—নিয়ে আসব?"

তরুণকুমার বলিল, "শীঘ্র কি আসবে?"

"বোধ হয়; কারণ, পিসীমা ব'লে দিয়াছেন, শ্যালক মহাশয়ের বিবাহে আস্‌তেই হ'বে।"

তরুণকুমার হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কবে?"

"বোধ হয় খুব শীঘ্র। কারণ, পিসীমা প্রতিশোধ নিতে ব্যস্ত হয়েছেন—আর জানই ত কবির কথা—প্রতিহিংসা মিষ্ট, বিশেষ স্ত্রীলোকের কাছে।"

"কা'র উপর প্রতিশোধ?"

"যাঁ'র গান তুমি তন্ময় হয়ে শুনছিলে।"

"কি জন্য?"

"জন্য! গোপীরা যেমন বাঁশী শুনে মুগ্ধ হয়েছিল, পিসীমা তেমনই ওঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং মনপ্রাণ না দিয়ে ভাইপোকে সঁপে দিতে চেয়েছিলেন। উনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন; কাজেই পিসীমা রাগ করেছেন—তাঁ'র ভাইপো—সর্ব্বগুণের আধার। তা'র সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান! তিনি সে অপমানের প্রতিশোধ নিবেনই।"

"কি উপায়ে?"

"ওঁকে দেখিয়ে দিবেন, ভাইপো'র কেমন চমৎকার বৌ আসে এবং শীঘ্রই আন্‌তে পারা যায়।"

সুধীর হাসিতে লাগিল।

তরুণকুমার কিন্তু হাসিল না, বলিল, "কিন্তু আমার ত মনে হয়, এতে অপমানের কোন কারণ নাই।"

সুধীর বলিল, "বল কি?"

"মত প্রত্যেকেরই থাকে এবং সেই মত অনুযায়ী কাজ করা ত নিন্দার নয়—বরং প্রশংসার। বিবাহ সম্বন্ধে সে কথা খুবই বলা যায়।"

"কি সর্ব্বনাশ! তুমি কি ঐ মেয়েটির প্রেমের ফাঁদে পা দিয়াছ না কি? অপমানকে অপমান মনে কর না—বরং সম্মান ভাবছ! লক্ষণ ত ভাল নয়!"

সেই সময় ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। ততক্ষণে উভয়ে তাহাদিগের কামরার নিকটে উপনীত হইয়াছে। সুধীর কামরায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাড়াতাড়ি অনুকূলচন্দ্রকে, চিত্রলেখাকে ও সমীরচন্দ্রকে প্রণাম করিল। ট্রেণ যখন চলিতে আরম্ভ করিবে তখন সে চিত্রলেখাকে বলিল, "পিসীমা, আপনার অরক্ষণীয় ছেলের বিয়ে তাড়াতাড়ি ঠিক ক'রে ফেলুন—পাকা দেখার সাত দিন আগে সংবাদ দিবেন—খাওয়ায় যেন ফাঁক না পড়ি।"

চিত্রলেখা বলিলেন, "তোমরা না থাকলে কি বিয়ে হ'বে, বাবা?"

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

চিত্রলেখা স্বামীর সঙ্গে আপনার গৃহে চলিয়া যাইলেন।

অনুকূলচন্দ্র ও তরুণকুমার গৃহে ফিরিলেন। তখন কলিকাতায় আবার কর্ম্মকোলাহল আরম্ভ হইয়াছে—তবে সহরের পথগুলিতে প্রভাতী মার্জ্জনের পরে আবার দিনের আবর্জ্জনা তত অধিক নাই।

গৃহে প্রবেশকালে তরুণকুমার এক বার পথের পরপারস্থ গৃহের দিকে চাহিল—অপরাজিতার ঘরের বাতায়ন মুক্ত, পথ হইতে তাহাকে দেখা গেল না।

সেদিন বার বার তরুণকুমারের মনে হইতে লাগিল, ষ্টেশনে সুধীর ব্যঙ্গ করিয়া তাহাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহা অমূলক বটে ত—"তুমি কি ঐ মেয়েটির প্রেমের ফাঁদে পা দিয়াছ?" সে কিছুতেই আপনার কাছে সে কথা স্বীকার

করিতে প্রস্তুত নহে। কারণ, অপরাজিতা যে তাহার প্রেমের ফাঁদ তাহার জন্য পাতিতে পারে, তাহা সম্ভব নহে। সে তাহার সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছে, তাহার পর আর সে বিষয়ে কোন কথা থাকিতে পারে না। কারণ, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সেই কথাই সত্য—

"—if she will, she will, you may
depend on it,
And if she won't, she won't, and
there's an end on it"

আর সে স্বয়ং? সে ত এক বারও বিবাহের কথা ভাবে নাই? সে মনের মধ্যে কখন এমন অভাব অনুভব করে নাই যে, সেই জন্য সে বিবাহ করিবার কথা মনে করিবে। বিশেষ বিবাহে অনেক অনিশ্চয়তার উপকরণ লুক্কায়িত থাকে। সে সাগরিকার ব্যাপারে তাহার প্রমাণ পাইয়াছে।

সাগরিকার জন্য তাহার বেদনা ও চিন্তা ছিল। সেই জন্য লোকনাথের সম্বন্ধে সুধীর যাহা বলিয়া গিয়াছে, সে তাহার আলোচনা করিতে লাগিল—লোকনাথ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, তাহাই তাহার কর্ত্তব্যচ্যুতির কারণ—তাহার দৌর্ব্বল্যকে দৃঢ়তা দিবার জন্য যে সাহায্য প্রয়োজন, সাগরিকা তাহা দিতে পারে নাই—কারণ, স্বভাবতঃ এবং শিক্ষা ও সংস্কারহেতু সাগরিকাও দুর্ব্বলচিত্ত—আপনার অধিকার সম্বন্ধে তাহার ধারণা হয়ত আছে, কিন্তু তাহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিবার প্রবৃত্তি তাহার নাই—সে আপনি ত্যাগ ও সহ্য করিতে চাহে—সংঘর্ষ চাহে না। সে সাগরিকাকে সেই কথা বুঝাইবার মত পুস্তক পাঠ করিতে দিবে—তাহার আদর্শের পরিবর্ত্তন সাধনের চেষ্টা করিবে। সে স্বয়ং তাহার প্রবন্ধে তাহাই বলিতে চাহিয়াছে এবং কলেজে ধর্ম্মঘটের সময় অপরাজিতা তাহার একটি রচনার একাংশেরই উল্লেখ করিয়াছিল।

সে দিন সে অপরাজিতাকে যে রূপে দেখিয়াছিল, তাহা তাহার মনে পড়িল—উৎসাহে প্রদীপ্তা—অগ্নিশিখারই মত উজ্জ্বল ও দীপ্ত, মতে দৃঢ়—লৌহদণ্ডের মত, অধিকার সম্বন্ধে কেবল সচেতনই নহে, অধিকার আয়ত্ত করিবার জন্য আগ্রহশীলও বটে। শ্বশুরালয়ে সাগরিকার লাঞ্ছনার পরে সে নারীর যে আদর্শ আদরের বলিয়া মনে করিয়াছিল, সে দিন অপরাজিতাকে যেন সেই আদর্শের প্রতীক বলিয়া মনে করিয়াছিল। সে দিন তাহাকে অপরাজিতার তিরস্কার সে যেমন সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল, পরে তাহার সহিত বিবাহের প্রস্তাবে অপরাজিতার মতও সে তেমনই সঙ্গত বলিয়া মনে করে।—অপরাজিতার মতের দৃঢ়তা তাহার নিকট প্রশংসনীয় বলিয়া মনে হইয়াছে। তাহাতে ভালবাসার—প্রেমের অঙ্কুর থাকিবে কেন? প্রশংসা—তরুণীর সম্বন্ধে তরুণের প্রশংসা যে প্রেমের পূর্ব্বাভাস, তাহা কোন তরুণ প্রথমে বুঝিতে ও স্বীকার করিতে চাহে না।

কেবল তরুণকুমার বুঝিতে পারিতেছিল না—কেন সে সুধীরের ব্যঙ্গ ব্যঙ্গমাত্র বলিয়া উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিতে পারিতেছে না এবং কেনই বা সে বার বার সেই ব্যঙ্গের বিষয় আলোচনা না করিয়া পারিতেছে না এবং সেই প্রসঙ্গে অপরাজিতার চিত্র তাহার সম্মুখে উপনীত হইতেছে। সে কি সেই চিত্রে আকৃষ্ট হইতেছে?

তরুণকুমার তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু সে আপনার কাছে আপনি সুধীরের সন্দেহ ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য অকারণ অধিক আগ্রহ অনুভব করিতে লাগিল। কেন? সুধীর কেন বলিয়াছে—লক্ষণ ত ভাল নহে? কি লক্ষণ?

সুধীরের কথানুসারে দীপশিখা কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্বে চিত্রলেখার সঙ্গে অধ্যাপক গৃহে যাইয়া অপরাজিতা ও তাহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছিল। সে দিন চিত্রলেখার পুত্রবধূ শোভনাও তাঁহাদিগের সঙ্গে ছিল। সঙ্গীতের সূত্রে সে অপরাজিতার প্রতি আকৃষ্টা হইয়াছিল এবং সে দিনও তাহার নিকট হইতে একখানি গানের সুর আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

সে দিন শোভনাই অপরাজিতাকে এক দিন তাহাদিগের গৃহে অর্থাৎ তাহার শ্বশুরালয়ে যাইতে আমন্ত্রণ করিয়াছিল; শিষ্টাচার হিসাবে অধ্যাপক-পত্নীও তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। শোভনা বলিয়া আসিয়াছিল, "যে দিন সুবিধা হ'বে শিশুকে দিয়ে ব'লে পাঠালেই—মামাবাবুর বাড়ীতে দিদির কাছে বলে পাঠালেই—মা সব ব্যবস্থা করবেন।"

অধ্যাপক-পত্নী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার দিদি এখন বাপের বাড়ীতেই থাকবেন?"

দীপশিখা বলিয়াছিল, "হাঁ।"

চিত্রলেখা বলিয়াছিলেন, "ও ভাল ক'রে না সারলে আমি ওকে যেতে দিব না।"

অধ্যাপক-পত্নী বলিয়াছিলেন, "তা' ত বটেই। আবার বাপকেও ত দেখতে হয়। ছেলের বিয়ে না দেওয়া পর্য্যন্ত সংসারের ভার নেবার ত কেউ নাই।"

"হাঁ। সেই জন্যই ভাবছি, যত শীঘ্র পারি তরুণের বিবাহ দিয়ে ফেলি।"

তাহার পরে সুধীর দীপশিখাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহার পুত্রের আর অধ্যাপক-পত্নীর কন্যাকে লইয়া, শোভনার নিমন্ত্রণ রক্ষার সুবিধা হইয়া উঠে নাই। কিন্তু সে কথা শুনিয়া ব্রজবল্লভ বাবু স্ত্রী-কন্যাকে বলিলেন, "এঁরা অতি সদাশয় লোক—অনুগ্রহ ক'রে আমাদের বাড়ীতে আসেন; অত বড় মানুষ, কিন্তু এতটুকু গর্ব্ব নাই—ভদ্রতার আদর্শ বললেও হয়। যখন ব'লে গিয়াছেন, তখন তোমাদের একদিন যাওয়া উচিত।"

অপরাজিতা বলিয়াছিল, "ওঁরা বড় মানুষ বলেই ত ভয় হয়—পরিচয়ের গণ্ডী আর বাড়াতে ইচ্ছা হয় না; তা'র প্রয়োজনই বা কি?"

"তোমার কি ঈশপের উপকথার মাটীর পাত্র আর ধাতু-পাত্রের কথা মনে পড়ছে? কিন্তু সাধারণ ভদ্রতায় ত বিপদের সম্ভাবনা অনায়াসে এড়িয়ে চলা যায়।"

শিশুবালা যে এক দিন তরুণের সহিত অপরাজিতার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল, অপরাজিতার অসম্মতি প্রকাশের পরে ব্রজবল্লভ বাবু তাহা আর মনে রাখেন নাই—ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। কিন্তু অপরাজিতা তাহা ভুলিয়া যায় নাই। সে যে সে দিন সেই প্রস্তাবের কথা শুনিয়া তাহাতে অসম্মতি জানাইয়াছিল, তাহাতে সে

গর্ব্বানুভবই করিয়াছিল—সে স্বমতে দৃঢ়। আর সেই জন্যই সে তরুণকুমারের পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে একটু লজ্জানুভব করিতেছিল। কিন্তু তাহার পরেও চিত্রলেখা, সাগরিকা, দীপশিখা, শোভনা প্রভৃতি তাহাদিগের সহিত যে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তাহার মনে হইয়াছে, তাঁহারা সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তাহাতেই অপরাজিতার লজ্জার কারণও দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

ব্রজবল্লভ বাবুর কথার পরে তাঁহার পত্নী এক দিন, অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, শিশুবালাকে দিয়া সাগরিকার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, তাঁহারা চিত্রলেখার গৃহে যাইবেন। সাগরিকার নিকট সেই সংবাদ পাইয়া চিত্রলেখা বলিলেন, তিনি আসিয়া তাঁহাদিগকে ও সঙ্গে সঙ্গে সাগরিকাকে স্বগৃহে লইয়া যাইবেন। তিনি নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই ভ্রাতার গৃহে আসিয়া অধ্যাপক-পত্নীকে সংবাদ পাঠাইলেন, তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন।

১২

অনুকূলচন্দ্রের গৃহের সহিত সমীরচন্দ্রের গৃহের প্রভেদ সহজেই উপলব্ধ হয়। অনুকূলচন্দ্রের গৃহে এ কালের ভাব যেমন সপ্রকাশ, সমীরচন্দ্রের গৃহে তেমন নহে—কারণ, তাহা যে সময় রচিত সে সময় একান্নবর্ত্তী পরিবার অর্থনৈতিক কারণে—বিশেষ সমাজে সমাজস্থদিগের মনোভাব-পরিবর্ত্তনে ভাঙ্গিয়া যায় নাই এবং যদিও সে গৃহে সমীরচন্দ্র একাই সপরিবারে বাস করেন, তবুও তাহা যে এক সময়ে একান্নবর্ত্তী পরিবারের "দুর্গ" ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তবে তাহা যে ভাবে রচিত ও সজ্জিত, তাহাতে—কতকগুলি পুরাতন রুচির অনুমোদিত গৃহসজ্জা বাদ দিলে একালের প্রভাবই প্রবল বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে মানুষ সামাজের জন্য ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য খর্ব্ব করিত, এখন মানুষ ব্যক্তিকেই অধিক আদর করে, যখন মনে করে "সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল" তখন ত্যাগের মধ্যেও যে ভোগের উপকরণ সঞ্চিত থাকিতে পারে, তাহা মনে করে না—যাহা সহজলভ্য, তাহাই লইতে ভালবাসে।

সমীরচন্দ্র পশুপক্ষী ভালবাসেন—পিঞ্জরে ও দাঁড়ে প্যারো হইতে ম্যাকক পর্য্যন্ত নানা জাতীয় পক্ষী এবং ঘরের পাপোষের উপর নিদ্রিত "টম" ও "টোবী", পিকিনিস হইতে আরম্ভ করিয়া শৃঙ্খলিত "বাদশা" গ্রেট-ডেন কুকুর তাহার পরিচয় প্রদান করে। ঘর-দ্বার পরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক। গৃহসংলগ্ন উদ্যান নাই বটে, কিন্তু অনেক ঘরেই ফুল। ঘরগুলির সজ্জায় একালের চেয়ার, টেবল, সোফা যেমন আছে, তেমনই বাঙ্গালীর সনাতন তক্তপোষ ও তাকিয়া রহিয়াছে—কোন কক্ষে বা মেঝেয় মেদিনীপুরের মাদুর পাতা—কোন খাটে চট্টগ্রামের শীতল-পাটী শয্যা ঢাকার স্থান অধিকার করিয়া আছে।

অপরাজিতাকে কয়টি গান গাহিতে হইল—কেবল শোভনারই নহে, পরন্তু সমীরচন্দ্রেরও সাগ্রহ অনুরোধে। গান তিনি বড় ভালবাসেন। বাল্যকালে তাঁহার সঙ্গীতানুরক্তি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পিতা—তাহাতে পুত্রের পাঠে অমনোযোগ হইবার সম্ভাবনার আশঙ্কায়—পুত্রকে সঙ্গীত-চর্চ্চা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পুত্র পিতার নিষেধ আদেশরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যখন চিত্রলেখাকে বিবাহ করেন, তখনও তাঁহার পিতা জীবিত এবং তাঁহারা একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত; সেই জন্য চিত্রলেখাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার সুবিধা হয় নাই। সেই সঙ্গীতানুরাগ কিন্তু স্ফূর্ত্ত হইবার সুযোগ না পাইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং সেই জন্যই তিনি পুত্র-বধূদ্বয়ের সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রথমা সে ব্যবস্থার আশানুরূপ সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই; কারণ, তাহার সঙ্গীতে স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল না—তাহার কণ্ঠস্বরও সে বিষয়ে অনুকূল ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয়া শোভনার স্বাভাবিক সঙ্গীতানুরাগ শ্বশুরের ব্যবস্থায় স্ফূর্ত্ত হইয়াছিল। চিত্রলেখা শোভনাকে সংসারের কাজ শিক্ষাদানের চেষ্টা করিলে সমীরচন্দ্র বলিতেন, "সংসার ত করবেই; নিজের প্রয়োজনে সংসারের কাজ শিখে নিতেও হ'বে; এখন ওকে সংসারের কাজের চাপ দিও না—সঙ্গীত অভ্যাস করুক।" চিত্রলেখা যদি বলিতেন, "সংসারের কাজ শিখবে না?"—তবে সমীরচন্দ্র উত্তর দিতেন, "এ তোমার বড় অন্যায়—একা সংসারের সব কাজ করতে—এখন পরের মেয়েদের খাটাবার চেষ্টা। বড়-বৌমাকে ত খাটিয়ে মার'ছ; মেজটি না হয়—দু'দিন ছুটি পা'ক।" চিত্রলেখা স্বামীর কথায় হাসিতেন, শোভনাকে বলিতেন, "গান তোমাকে শিখতেই হ'বে, শোভনা; কেন না যাঁ'র খাই তাঁ'র আদেশ। কিন্তু যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না? তুমি, মা, সংসারের কাজও শিখে নিও।" শোভনা হাসিত—শাশুড়ীর কথার যাথার্থ্য সে অনুভব করিত।

সে দিন চিত্রলেখার গৃহে আনন্দে এক ঘণ্টার অধিক কাল কাটাইয়া অধ্যাপক-পত্নী কন্যাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। চিত্রলেখাই তাঁহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিলেন। শিশুবালা সঙ্গে গিয়াছিল—তাহার পুরাতন প্রভুর গৃহে।

অধ্যাপক-পত্নী যখন স্বামীর নিকট চিত্রলেখার অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন শিশুবালা বলিল, "দেও না, মা, দাদাবাবুর সঙ্গে দিদিমণির বিয়ে?—চমৎকার মানা'বে। ওঁরা সবাই ভাল—আমরা দুঃখী মানুষ, আমাদের প্রতি কত দয়া!"

অধ্যাপক-পত্নী বলিলেন, "ওঁরা বড় মানুষ—দেখলাম ত—কি বাড়ী, কি সাজসজ্জা—ওঁরা আমাদের মত গরিবের ঘরে কাজ করবেন কেন?"

"করবেন, মা, করবেন।"

"তুমি কি ক'রে জানলে?"

"মা এক দিন কথায় কথায় বলছিলেন, তা'ই মনে হ'ল।"

অপরাজিতা তথা হইতে চলিয়া গেল।

তাহার ভাব দেখিয়া অধ্যাপক-পত্নী কথাটা উল্টাইয়া লইবার চেষ্টায় বলিলেন, "অপরাজিতা এখন পড়ছে—বিয়ের কথা এখন আমরা আলোচনাই করি না, বিশেষ দুই ছেলেই এখন বিদেশে—সংসার যেন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। এখন ও কথার সময় নয়।"

শিশুবালা বলিল, "তা' হ'বে, মা। কিন্তু ঘর বর দুই-ই ভাল। ওঁদের আপত্তি নাই।"

সেই দিন অপরাজিতা তাহার মাতাকে বলিল, "মা, আমি

তোমাকে বলে দিচ্ছি, আর কোন দিন তুমি আমাকে সামনের বাড়ীতে যেতে ব'ল না।"

মা কন্যাকে জানিতেন, সে কথায় কিছু না বলিয়া স্বামীকে তাহা বলিলেন। ব্রজবল্লভ বাবু কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "অপরাজিতা, তুমি তোমার মা'কে বলেছ, অনুকূল বাবুর বাড়ীতে আর যা'বে না?"

অপরাজিতা বলিল, "হাঁ।"

"তাঁ'দের ত কোন অপরাধ নাই। তাঁ'রা ত কোন প্রস্তাব করেন নি; করলেও তুমি ত জান, তোমার অমতে তোমার বিয়ের কোন কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তুমি বড় হয়েছ, লিখাপড়া শিখছ—তোমার স্বাধীন মত আছে। কালেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে—সে কালের সেই ছোট্ট মেয়ের বিয়ে দেওয়া আর সমাজে চলে না।"

অপরাজিতা কিছু বলিল না।

ব্রজবল্লভ বাবু বলিলেন, "ওঁরা যে অতি ভদ্র তা' তুমিও দেখেছ। ওঁদের সঙ্গে যাওয়া-আসা সামাজিক শিষ্টাচার। যদি ওঁরা কেহ কোন দিন আমাদের বাড়ীতে আসেন, তবে শিষ্টাচার হিসাবে আমাদেরও ওঁদের বাড়ীতে যেতে হ'বে। ঐ পর্য্যন্ত।"

অপরাজিতা পিতার কথা যে যুক্তিসঙ্গত, তাহা অস্বীকার করিতে পারিল না। সুতরাং আর কোন কথা বলিল না।

ব্রজবল্লভ বাবু আবার বলিলেন, "যদি আবার কখন ও বাড়ীতে যা'বার কারণ ঘটে, তবে যেতে অস্বীকার ক'র না। সেটা অকারণ অশিষ্টাচার হ'বে, অপরাজিতা!"

তিনি তাহার পরে বলিলেন, "আমরা ত ওঁদের সঙ্গে অকারণ ঘনিষ্ঠতা করি না—তা' করবার কোন কারণ বা প্রয়োজনও নাই। ঝি কি বলেছে, তা' নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন কারণ নাই।"

তাহার পরে প্রায় সপ্তাহকাল অতিবাহিত হইল। চিত্রলেখা আর অধ্যাপকগৃহে আসিলেন না। সুতরাং অধ্যাপক-গৃহিণীর ও অপরাজিতার অনুকূল বাবুর গৃহে যাইবার কোন কারণ ঘটিল না।

শিশুবালাও আর অপরাজিতার বিবাহের কোন কথা বলিল না—কেন না, দাসী যে, তাহার পক্ষে যাহা অনধিকারচর্চ্চা—সে তাহা করিবে কেন? সুতরাং অপরাজিতারও কিছু মনে করিবার কারণ ঘটিল না।

তাহার পরে পক্ষাধিক কাল গেল—চিত্রলেখা সে সময়ের মধ্যে আর ব্রজবল্লভ বাবুর গৃহে আসিলেন না। শোভনা এক দিন তাঁহাকে সে কথা বলিয়াছিল বটে, কিন্তু যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। বর্ষা-কাল যে তাঁহাদিগের না যাইবার অন্যতম কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই—মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি—আকাশে মেঘ—কালটি যেন আনন্দের পক্ষে অনুকূল নহে। চিত্রলেখা মনে করিয়াছিলেন, অপরাজিতার সহিত তরুণকুমারের বিবাহ দিলে ভাল হয়; কিন্তু তাহা হয় নাই। সেই জন্যও তিনি অধ্যাপক পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতার লৌকিক শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করার কোন প্রয়োজন মনে করেন নাই।

সুধীর দীপশিখাকে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে লোকনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়া যাহা বলিয়া গিয়াছিল, তাহা শুনিয়া অবধি সাগরিকা তাহার বিবাহিত জীবনের বিষয় বিবেচনা করিয়া সুধীরের নিদানই নির্ভুল বলিয়া মনে করিয়াছিল। যে পরিবেষ্টনে লোকনাথ জাত ও লালিত-পালিত হইয়াছিল, তাহা ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিরোধী। যে শক্তি সে অবস্থায়ও মানুষের মনুষ্যত্ববিকাশে সহায় হয় সে শক্তির অভাবই লোকনাথকে ও তাহার ভ্রাতাকে ভুল করাইয়াছে—নহিলে তাহাদিগের অন্য কোন ত্রুটি সে লক্ষ্য করিতে পারে নাই। তাহাদিগের দৌর্ব্বল্যের ফলেই তাহার দেবর-পত্নী আত্মহত্যা করিয়াছিল—তাহার ধৈর্য্যসীমা লঙ্ঘিত হইয়াছিল। লোকনাথ এখন একা। সে কি ভাবিতেছে, তাহার কষ্ট হইতেছে কি না—সে সব কথা সাগরিকার মনে হইতেছিল। সে মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতেছিল। কিন্তু তাহার মনে যে লোকনাথের চিন্তা যখন তখন উদিত হইত, তাহা সে নিবারণ করিতে পারিত না—নিবারণের চেষ্টাও করিত না; কারণ, সে চিন্তা দুঃখের হইলেও সে দুঃখ সুখশূন্য নহে।

সে যে দৃঢ় হয় নাই, তাহা তাহার অপরাধ কি না, সাগরিকা তাহা ভাবিত। সে যদি দৃঢ় হইত, তবে কি ফল ভাল হইত? সে দৃঢ় হইলে হয়ত উমাদাসের সংসার ভাঙ্গিয়া যাইত। তাহা ত ভাঙ্গিয়াছে। সে তাহার "নিমিত্ত" হইলে কি ভাল হইত? লোক হয়ত তাহার নিন্দা করিত। কিন্তু লোক-নিন্দাই কি সব? তরুণকুমার বলে—তাহা তুচ্ছ। সাগরিকা ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিত না। সে আবার ভাবিত, সে যদি দৃঢ় হইত, তাহা হইলে কি সে সত্য সত্যই লোকনাথের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিত? যদি না পারিত? তবে কেবল অশান্তিরই সৃষ্টি হইত। কাহারও কাহারও মত এই যে, সহগুণ ভাল; কিন্তু যাহা তোমাকে সহ্য করিবে না এবং তোমাকে ধ্বংস করিতেই চাহে, তাহা কিরূপে সহ্য করিবে? আবার কেহ কেহ বলেন—প্রেম কেবল তাহার পুষ্টিই চাহে—আর কিছুই নহে; সেই জন্য সুখ দুঃখ সবই তৈলের মত তাহার শিখা উজ্জ্বল করে; প্রেম কখন হতাশ হয় না—কারণ, অযত্নও তাহার পুষ্টির কারণ হইতে পারে।

কোন্ মত সত্য তাহা সাগরিকা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না। কিন্তু তাহার ভাবনার অন্ত ছিল না। তাহার সকল চিন্তা যে তরুণীর প্রেমে রঞ্জিত তাহা সে-ও হয়ত বুঝিতে পারিত না। মানুষ যদি ভুলিতে না পারে, তবুও ক্ষমা করিতে পারে; কারণ ক্ষমা দিব্য।

ভাবনা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্যও সাগরিকা অধ্যয়নে অধিক মনোযোগ দান করিত এবং অধ্যয়নে সে যেরূপ ফললাভ করিত তাহা তরুণকুমারেরও কল্পনাতীত ছিল। সে অধ্যয়ন যে সাগরিকার চিন্তাকে নূতন নূতন ভাবের উপকরণ আনিয়া দিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাবনা যেমনই কেন হউক না, সে কিছুতেই তাহার শেষ পাইত না—কেবলই ভাবিত এবং ভাবনা বাড়িয়াই যাইত।

চিত্রলেখা তরুণকুমারের বিবাহ দিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন —কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ মনের মত পাত্রীর অভাবে ব্যাহত হইতেছিল। পুরাতন প্রথার মধ্যে যেগুলি লুপ্ত হইতেছে, "ঘটক-ঘটকী" প্রথা সে সকলের অন্যতম। পূর্ব্বে ঘটক ছিল—পাত্রপাত্রীর সংবাদকেন্দ্র—তাহাদিগের কুল-পরিচয় প্রভৃতি ঘটকের খাতায় ও স্মৃতিতে থাকিত; "কুল", "ঘর", "পর্য্যায়"—এ সবই ঘটকের নিকট জানিতে হইত। তাহার পরে কতকগুলি "ঘটক"

পাত্রপাত্রীর পরিচয় লইয়া গৃহস্থের নিকট আসিত—দৌত্য করিত। তাহার দেখাদেখি সহরে এক দল স্ত্রীলোক "ঘটকী" হইয়াছিল। তাহারা সাধারণতঃ প্রগল্‌ভা এবং পাত্রপাত্রীর অভিভাবিকাদিগের নিকট তাহাদিগের আদর ও প্রাপ্য ছিল—তরকারী হইতে কাপড় ও পয়সা তাহারা আসিলেই দাবী করিত এবং চিল পড়িলে যেমন কুটা না লইয়া যায় না, তেমনই তাহারা আসিলে কিছু না কিছু সংগ্রহ না করিয়া যাইত না। "দেনা পাওনা" প্রচলিত হইবার পরে তাহারা সে বিষয়ে দালালী করিত—অনেক কথা বলিত এবং "যে কহে বিস্তর, মিছা সে কহে বিস্তর।" "কাল"কে "উজ্জ্বল শ্যাম"—"উজ্জ্বল শ্যামকে" "গৌর" বলিতে তাহাদিগের দ্বিধাবোধ হইত না। তাহাদিগের সংখ্যা কমিয়াছে। চিত্রলেখা তাহাদিগের অভাব অনুভব করিতেন।

সমীরচন্দ্র সময় সময় রঙ্গ করিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "তোমার ভাইপোর বিয়ের নিমন্ত্রণ কবে করছ?" চিত্রলেখা বলিতেন, "আমরা বাজে লোক নিমন্ত্রণ ক'রে ভীড় বাড়াব না—দিনকাল ভাল নহে।" তাহার পরে তিনি বলিতেন, "মনের মত মেয়ের সন্ধানই পাচ্ছি না। কি দুষ্টু মেয়ে তোমাদের ঐ অধ্যাপকের কন্যাটি—ওকে দেখে আর কোন মেয়ে ভাল লাগছে না।"

সমীরচন্দ্র বলিতেন, "তোমার ভাইপোর উপযুক্ত ঐ একটি মেয়েই কি বিধাতা করেছেন?"

তবে সমীরচন্দ্র অপরাজিতার সম্বন্ধে স্ত্রীর সহিত একমত ছিলেন—বলিতেন, "হ'লে বড় ভাল হ'ত। কি যে ওর ধনুর্ভঙ্গ পণ তা'-ও ত বুঝতে পারি না।"

ওদিকে কিন্তু—

"যা'র বিয়ে তা'র মনে নাই,
পাড়াপড়শীর ঘুম নাই!"

অপরাজিতা পিতার কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে, পিতা বলিয়াছেন, তাহার স্বাধীন মত আছে—তিনি সে মতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। বিবাহের কথা সে মনে স্থান দেয় না; "সংসার ধর্ম্ম" ব্যতীত কি স্ত্রীলোকের কোন কাজ নাই? আজ দেশে ও সমাজে কত কাজ দেখা দিয়াছে—সে সকলে নারীর অধিকার কে অস্বীকার করিতে পারে? তাহার সময় সময় মনে হয়—যে লেখকটি "সুব্রত" ছদ্মনামে প্রগতিপন্থী সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রে সংস্কার ও সংসার সম্বন্ধে পত্র ও প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন, তাঁহার সঙ্গে যদি তাহার পরিচয় হয়, তবে সে নিশ্চয়ই অনেক বিষয় শিখিতে পারে। সেই অজ্ঞাত লেখকের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা উৎস হইতে জলের মত উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। একাধিক বার তাহার মনে হইয়াছে, পত্রের সম্পাদককে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লিখে। কিন্তু সে মনে করিয়াছে, যিনি নাম প্রকাশে অসম্মত তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য তাহার অহেতুক কৌতূহল অসঙ্গত; বিশেষ স্ত্রীলোকের নিকট হইতে সেরূপ পত্র পাইলে সম্পাদক কি মনে করিবেন? সে লেখক "সুব্রতের" মত সমর্থন করিয়া একাধিক পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছে—সে সকলের কয়খানি প্রকাশিতও হইয়াছে। তবে সে নাম প্রকাশ করে নাই, সে-ও একটি ছদ্মনামে সেগুলি লিখিয়াছে। তাহার ছদ্মনাম—"কণিকা"।

[ক্রমশঃ।

দুটি অনুবাদ

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

ঘাটতি

হিন্দি মূল

মেরা মুঝ্‌মে কুছ্ নেই
যো কুছ্ হ্যায় সব তেরা,
তেরা তুঝ্‌কো সোঁপ্‌তেঁ
ক্যায়া ঘাট্‌ যায়গা মেরা?

বাঙলা অনুবাদ

আমার ব'লে কিছুই তো নাই
যা আছে সব তোমার প্রভু,
তোমায় যদি তোমার সোঁপি
ক'মে কি যায় আমার কভু?

অভিব্যক্তি

উর্দ্দু মূল

কেঁউ দিলজ্বলো কে লব্‌পে
আহো-ফোঁগা না হো,
মুস্‌কিন্ নেহি কে আগ্ জ্বালে
আউর্ ধোঁয়া না হো!!

বাঙলা অনুবাদ

কেন হা-হুতাশ ধ্বনি হ'বে না বাহির
যে পেয়েছে ব্যথা?
আগুন লাগিবে আর উঠিবে না ধোঁয়া
এ কেমন কথা!!

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

নতুন 'ভারত'

শ্রীমতী লিজেল্ রেমঁ

জাতীয় সংগঠনের প্রধান কর্ম

...ত্র কলকাতায়। নিজে ...জির না থাকলেও ...রবিন্দ ঘোষই ছিলেন ...গোষ্ঠীর নেতা। ১৯০৩ ...নের গোড়া থেকে ...বেদিতারও ঐ দলে ...কটা নির্ধারিত স্থান ছিল। 'ডন সোসাইটি'র ছেলেরা ...খন তৎপর হয়ে উঠেছে, বিপ্লবী ভাবধারা প্রচার করছে ...রাও। তাদের 'পরে নিবেদিতার অসামান্য প্রভাব। তাঁর ...াগবাজারের বাড়িতে 'রবিবাসরীয় প্রাতরাশে'র বৈঠক বসে,—...টি হল তাঁর শক্তিসঞ্চারের উপলক্ষ্য।

এই 'প্রাতরাশ' অনুষ্ঠানটি প্রথম শুরু হয় ১৯০২-এর নবেম্বরে। নিবেদিতা তখন বন্ধুবান্ধবদের কাছে তাঁর উত্তর ভারত ভ্রমণের খুঁটিনাটি বিবরণ দিচ্ছিলেন। ২৬শে নবেম্বরের এক চিঠিতে লিখছেন, 'তুষার এক রকম অবারিতই রাখি, "কোয়েকার ওটস্" আর চাপাটি দেদার খরচ করি...।' এক বছর পরে এই 'প্রাতরাশে'র আসরটি হয়ে উঠল রাজনৈতিক বৈঠক বিশেষ। এ রকম একটা আড্ডা না হলে আর চলছিল না। নিবেদিতা হলেন সে-আড্ডার প্রাণ। ওখানকার বৈঠকে সপ্তাহের বিশেষ-বিশেষ ঘটনা আর কাগজওয়ালাদের নিয়ে আলোচনা চলত। নির্বাসিত বিপ্লবীদের পরিবারবর্গকে দরকার বুঝে সাহায্য করবার আশু ব্যবস্থারও ঠিক হত ওখানে।

বৈঠক বসত দোতলায়, পড়ার ঘরে। ঘরখানা নিরিবিলি —দেয়ালে একটি হাতীর দাঁতের ক্রস্ আর স্বামীজির একখানা ফটো। টেবিল-বোঝাই রকমারি প্রবন্ধ, টীকা টিপ্পনী আর 'সমাচার সংগ্রহে'র টুকরো। তারই মাঝে একটি ফুলদানি আর দুষ্প্রাপ্য একটি বুদ্ধমূর্তি। অভ্যাগতেরা মেঝেতে মাদুরে বসেন। সবাই যে-যাঁর বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে এনেছেন। এই ভাবে আসর জমে ওঠে, সহজে তা ভাঙতে চায় না। বেলার সঙ্গে-সঙ্গে গরম বাড়তে থাকে, ঝাঁ-ঝাঁ রোদে ঘরে ফিরে যাওয়া খুব আরামের নয়। খসখসের পর্দা টেনে দিয়ে মজলিস চলে, সেই সঙ্গে দেদার কফির যোগান। বেশ খানিকটা বেলা পর্যন্ত এমনি ধারা চলতে থাকে।

নিবেদিতার কাছে স্বাগত-সম্ভাষণ পাওয়াটা ক্রমে একটা সুপারিশ-পত্র পাওয়ার সামিল হয়ে উঠল। স্বদেশী দলের গাঁথনি ওতে আরও জমাট হয়। এক দল হয়তো পুনা থেকে এসেছে, তারা দস্তুরমত প্রগতিবাদী। বাঙালীদের স্বভাব হল নিরেট তথ্যের 'পরে সূক্ষ্ম বুদ্ধির কারিগরি করা, ওরা একটু ক্ষুণ্ণ হয় পুনার দলের 'পরে। আবার রামকৃষ্ণ মিশনের গেরুয়াধারী সাধুও আসেন, আসেন র‍্যাটক্লিফের মত উদারপন্থী ইংরেজ সাংবাদিকেরা। র‍্যাটক্লিফকে সবাই ঠাট্টা করে বলতেন 'নিবেদিতার চেলা'। যেখান থেকে যে-ই আসুক না কেন, নবাগতকে সৌজন্যের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। নিবেদিতা নিজে প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। বরোদা আর কলকাতার মধ্যে অনবরত কর্মীদের আনাগোনা চলে। যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বরোদার সামরিক বিভাগে কাজ করতেন, সংগঠনের উনি একজন 'প্রধান' কর্মী। যাঁরা আসতেন—জাতীয় মহাসভার সদস্য, জননেতা, সরকারী চাকুরে, সাহিত্যিক, অধ্যাপক কি সাংবাদিক—যিনি যাই-হন-না-কেন নিবেদিতার ওখানে এলেই সবাই সব ভেদ ভুলে শুধু জাতীয়তাবাদী স্বদেশী হয়ে দাঁড়াতেন। নিবেদিতা 'ন্যাশনালিষ্ট' বলতে যা বুঝতেন, সবাই সেটি মেনে নিতেন। স্বামীজি নিবেদিতাকে শিখিয়েছিলেন, 'সকলের ভাবনায় কোথায় ঐক্য আছে সেইটি বুঝে নিয়ে একেবারে বিভিন্ন চরিত্রের বহু লোককে যদি সঙ্ঘবদ্ধ করা যায়, সে-ই হল খাঁটি নেতৃত্বের নিশানা। চেষ্টা করে এ-কাজ পারা যায় না, নিজের অগোচরে এটা ঘটে যায়।' (মাই মাষ্টার অ্যাজ আই স হিম, পৃঃ ১৪০) কাজের গোড়াপত্তনে এই ছিল নিবেদিতার লক্ষ্য।

এই সব সম্মেলনে একটা অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যের হাওয়া বইত। অতি আধুনিক রাজনৈতিক মতামতও অকপটে আলোচিত হত, তা নিয়ে তিক্ততার সৃষ্টি হত না। নিবেদিতার এই সব বন্ধুদের কি কম ভুগতে হয়েছে! এঁরা এক-এক জন এক-একটি স্বয়ং-প্রধান নির্ভেজাল অভিজাত গোষ্ঠীর লোক, প্রত্যেকেরই একটা বিশেষ বিষয়ে দখল রয়েছে অথচ কারও সঙ্গে কারও সম্বন্ধ নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষায় দেশকে দীক্ষিত করে পশ্চিম এ দেশে প্রচার করেছে ইউরোপীয়ান গণতন্ত্রের দুষ্পাচ্য মতবাদ। ফলে দেশের মনে অস্থিরতা আর অস্বস্তি বেড়ে গেছে। ১৯০৩ সনের ভারতবর্ষ যেন বহ্নুচ্ছ্বাস-উন্মুখ আগ্নেয়গিরি। রামমোহন রায় গিয়েছিলেন ফ্রান্সে, 'এনসাইক্লোপিডিষ্ট'দের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য হয়েছিল—তিনি যে দশম চার্লসের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খানা খেয়েছিলেন লোকের তখন এই সব কথা আলোচনা করতে ভাল লাগত। তেমনি ভাল লাগত কেশব সেনের কীর্তিকলাপ। তাঁর 'নববিধান' প্রচারের চেয়েও বড় কথা হল তিনি শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর একটা নতুন আদর্শ ভারতে এনেছিলেন,—এ দেশের সমাজ-সংস্থানে এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্থান কোথায় সে-বিষয়ে তাঁরা খুবই সচেতন। আর তিলক রাজনীতি ক্ষেত্রে যা প্রচার করছিলেন স্বামীজি ধর্মজগতে দুঃসাহসের সঙ্গে তা-ই ঘোষণা করলেন: 'যা করে ভারত বীর্যশালী হবে সে-ই ধর্মই আমি প্রচার করি...।' কলম্বো থেকে আলমোড়া অবধি

মত ভাষণ স্বামীজি দিয়েছেন, সারা দেশের প্রগতিপন্থী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তাই হল বেদস্বরূপ।

নিবেদিতার 'প্রাতরাশ' অনুষ্ঠানগুলি নতুন ভাবের প্রচার-কেন্দ্র ছাড়া আর কিছুই নয়। অজানিতে বা জেনেশুনে সবারই নজর ছিল অরবিন্দ ঘোষের দিকে। বিপ্লবী আন্দোলন ঠিকমত গড়ে তুলতে হলে আত্মসচেতন ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যমকে রূপ দেওয়া চাই, অরবিন্দ সেই মূর্তিমন্ত উদ্যম। উপযুক্ত লোক ছাড়া তাঁর কাজের পরিকল্পনা কেউ গ্রহণ করতে পারে না বা তার যথার্থ রূপটি সহজে কারও চোখে পড়বার নয়। নিবেদিতা ছাড়া সে-যোগ্যতা আর কার থাকতে পারে? পিতৃ-পিতামহের স্বদেশ-হিতৈষণা আর আত্মত্যাগের আদর্শে তাঁর মন তৈরি যে! তাঁর এই আত্মদানের ব্যাকুলতা আর আয়র্ল্যাণ্ডের প্রতি অপরিসীম ভালবাসাই রূপান্তরিত হয়েছিল ভারত-হিতৈষণায়, তাই যেখানে যেতেন একটা সঞ্জীবনী শক্তি ঠিকরে পড়ত তাঁর অন্তর হতে। নিবেদিতার এক ইংরেজ বন্ধু বলেছিলেন 'ধর্মপ্রাণতার দিক থেকে বিচার করলে সাধুসন্তের মত নিবেদিতা একেবারে ঈশ্বর-প্রেমোন্মত্ত কি না জানি না। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে আর রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে ও যে হিন্দুস্থানকে ভালবেসে বিভোর এটা নিঃসংশয়েই বলা চলে।' (এইচ. ডবলিউ. নেভিনস—সোসিওলজিক্যাল রিভিউ, জুলাই ১৯১৩)

কেউ বলবে না নিবেদিতা ছিলেন শান্ত-শিষ্ট মেয়েটি; বরং তাঁর ধরণটা ছিল দেবাবিষ্ট লোকাচার্যের, সাহস ছিল পুরুষের মত, মেয়েলি ধাঁচের নয়। কোনও দুর্বলতা বা সমালোচনাকে বরদাস্ত করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাঁর মধ্যে এই মুক্তির বীর্য এসেছিল অন্তরের কঠিন তপস্যা হতে। তাঁর তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধিকে ভয় করত অনেকেই. অথচ ও না হলে তাদের চলেও না যে! দেশে যখনই যে-আন্দোলন বাস্তব রূপ নিয়েছে, নিবেদিতার শ্যেন দৃষ্টি নিরপেক্ষ ভাবেই তাঁর মূল্য নিরূপণ করেছে। প্যানপ্যানে ভাবুকতা নিবেদিতার অসহ্য. বন্ধুদের কাউকে ওই রোগে ধরলে ঠাট্টার চোটেই তাকে শুধরে তুলতেন। উনিই তাদের বর্মচর্ম এই তাঁর গর্ব।

'রবিবাসরীয় আসরে' জন কয়েক ছাত্র তাঁর আশে-পাশে ঘুর-ঘুর করত। আশা, কোনও রকমে তাঁর একটু সাহায্য যদি করতে পারে—যদি ওঁর দরকারে কোথাও যেতে হয়, কি কলকাতার রাস্তা-ঘাট চিনিয়ে দিতে হয়, বাংলা থেকে কোনও কিছুর তরজমা করতে হয়। এদের যে নিবেদিতা কী ভালই বাসতেন! গর্বভরে বলতেন, 'ওরাই আমার পুঁজিপাটা, তাই না?' বাপ-মার সামনে যেমন সসম্ভ্রমে চুপ করে থাকে, নিবেদিতার কাছেও ওরা তেমনি চুপচাপ থাকতেই চায়,—যা কথা হচ্ছে শুনে যায় শুধু। কিন্তু নিবেদিতা ওদের সামনে টেনে আনেন, মতামত দিতে বলেন। অভ্যাগতরা বিদায় নিলেই ওরা নিবেদিতাকে ঘিরে ধরে জানতে চায় তাঁর কেমন লাগল। এদের মধ্যে সব চাইতে চটপটে আর বেপরোয়া হলেন বারীন্দ্র ঘোষ। দু' বছর দাদা অরবিন্দের কাছে থেকে বিপ্লবের দীক্ষা নিয়ে এই সবে কলকাতায় এসেছেন। মোটে কুড়ি বছর বয়স, বিবেকানন্দকে দেখেছেন পনের বছর বয়সে।

'আমি কলকাতায় এসেছি রাজনীতি প্রচার করতে, মতলব ছিল স্বাধীনতার মন্ত্র দিয়ে বেড়াব সবার কানে। আমায় রাখতে পারবে না কিছুতেই।'

এমন 'যুদ্ধং দেহি' ভাব দেখেও নিবেদিতা আশ্চর্য হওয়ার কোন লক্ষণ দেখান না। বলেন, 'বেশ তো! উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু নিজেকে তৈরি করেছ? মনে রেখ, তোমার জীবন শুধু তোমার নয়, তুমি জন্মেছ তোমারই মত আর দশ জনের জন্য, এক কথায় সব মানুষের জন্য।'

'নিশ্চয়, কিন্তু তুমি হবে আমাদের "জোয়ান অব আর্ক," পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের, এই শর্ত। তোমায় আমরা চাই। তোমার পিছু-পিছু তাল ঠুকে চলবে আমাদের বাহিনী, কোথায় নিয়ে চলেছ না-ও যদি জানি, তবু সব ঠিক হয়ে যাবে! তুমি হুকুম কর শুধু, তুমি যদি থাক কলকাতায় আর আমি বাংলার পল্লীতে তবু একসঙ্গেই কাজ করব আমরা···'

ওঁর কথায় আবেদনের সুর খানিকটা শাসানির মত শোনায় যেন। ভারত ভ্রমণ কালে হাজারে হাজারে ছেলেদের সঙ্গে নিবেদিতা আলাপ করেছেন, তাদেরই মত বারীন খুঁজছেন সহকর্মী, তাদের নিয়ে একটা সংঘ গড়ে তুলবেন। আর যেন তাঁর তর সইছে না। নিবেদিতা বার বার আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'এখনও যদি কাউকে জোটাতে না পার, আমি তোমার সাহায্য করব। সেই জন্যই তো আমি আছি। নেতারা অনেকেই এখানে আছেন, কিন্তু প্রথম যারা পথ দেখিয়ে দেবে তাদের কাজই কঠিন। মাঝি আর মাল্লারা একজোট হয়ে যদি খাটে পরস্পরের মন বুঝে, ফল ভাল হবেই। ঘাবড়ে যেও না। কাজে লাগ, রাস্তা খুলে যাবে সামনে।'

বাংলায় বারীনের কাজ হল পল্লী-সংগঠন। দূর-দূরান্তের গ্রামে গ্রামে যুব-সমিতি গড়ে তুলতে হবে। সমিতিতে ছেলেরা নানা ছলে একত্র হবে, ড্রিল, গান-বাজনা, পড়াশোনা ইত্যাদি নানান অজুহাতে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হবে দেশ ও সমাজ-সেবা আর রাজনীতির পাঠ নেওয়া। দেশের ব্যাপারে ছেলেদের চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে। তিলকের নায়কত্বায় দাক্ষিণাত্যে এমনি সব যুব-সমিতি ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে। বারীনেরও অনেক সহকর্মী। ঘুপসি মুদি-দোকানে, কি বাড়ীর ছাদে তরুণ ছেলেরা একত্র হয়ে ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডির জীবন-কথা আলোচনা করত, স্বামীজির বক্তৃতা পড়ত, মহাভারতের বীরকাহিনী শুনত। গীতা-ব্যাখ্যাও হত। শিক্ষাদাতাদের উৎসাহ আর দুঃসাহসের চোটে এদের বিপদে পড়তে হত প্রায়ই, তবুও সমিতির সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলল।

এদের একটা দলের কাজকর্মের সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল,—দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর সরলা ঘোষালের দল। ওকাকুরার সঙ্গে ওঁদের সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল বলে ওঁদের কার্যকলাপে নিবেদিতা আগ্রহ পোষণ করতেন। এই বার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন, স্বামীজি যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের নামে সংঘ গড়েছেন উনিও তেমনি স্বামীজির নামে একটা সমিতি স্থাপন করবেন। স্বামীজির জাতীয়তাবাদে যারা দীক্ষা নেবে ভবিষ্যতে, এই সমিতিতে তারা গোষ্ঠীবদ্ধ হবে। জানুয়ারীতে মাদ্রাজে থাকতে এক-দিন এই আশা সফল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।'···মনে হয় নতুন করে যেন স্বামীজির প্রতিটি কথার অর্থ বুঝতে পারছি। সেই সঙ্গে অনুভব করছি, যে দশ হাজার বিবেকানন্দের কথা

স্বামীজি সব সময় বলতেন, সেই হাজারো বিবেকানন্দ আমিই গড়ে তুলতে পারি। তিনি যেমন শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝে রামকৃষ্ণ সংঘ গড়ে গেছেন, আমিও তেমনি তাঁর মনের কথা বুঝেছি, যা তিনি নিজেও হয়তো বুঝতেন না। আমার কাজ হবে এক দল ছেলেকে ছ' মাস কাছে রেখে তার পর ছ' মাসের জন্ম পর্যটনে পাঠিয়ে দেওয়া, আবার ছ' মাসের জন্ম পড়াশোনায় বসিয়ে দেওয়া ইত্যাদি…'(২০শে জানুয়ারী ১১০৩এর চিঠি)

এগুলো করতে হলে চাই কেবল একটা বাড়ি, আর কিছু টাকা। এই নতুন ধরণের মঠে বিশ্বাসী লোক আর সাধু-সন্ন্যাসী, শিক্ষাচার্য কোনটারই অভাব হবে না। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে নিজের পরিকল্পনা পেশ করে নিবেদিতা বললেন, 'যে-শক্তি স্বামীজিকে সৃষ্টি করেছে তারই প্রসাদে টাকা আমার জুটে যাবে।' নিবেদিতা কল্পনায় দেখতেন এই মঠ থেকে দক্ষ জননায়কদের উদ্ভব হচ্ছে। তারা আবার দেশময় 'বিবেকানন্দ সমিতি' আর সক্রিয় 'রাজনীতি পাঠচক্র' গড়ে তুলছে।

এ-পরিকল্পনা বাস্তবে কার্যকরী না হলেও সতীশচন্দ্র মুখার্জির কাজের গোড়াপত্তন হয়েছিল ওই থেকেই। তাঁর 'দি ডন' নামের ছাত্র-সংগঠনটির আকার-প্রকার অনেকটা আবছা ছিল, কাজে-কর্মে একটা ধারাবাহিকতাও ছিল না। নিবেদিতার পরিকল্পনা এই সংগঠনকে একটা দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করল। অনেক বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দকে আমেরিকায় হিন্দু সভ্যতার কথা প্রচার করতে দেখে সেই উৎসাহের উচ্ছ্বাসেই মুখার্জি 'ডন সমিতি' গড়ে তোলেন। তাঁর পরিচালিত মাসিক পত্রিকাটিরও নাম ছিল 'ডন'। তাতে প্রথম-প্রথম শুধু দার্শনিক প্রবন্ধই বেরুত। হঠাৎ তা ছেড়ে মুখার্জি কুটির-শিল্প, লোকাচার, পল্লীজীবন ইত্যাদি সামাজিক বিষয়ে নিবন্ধ লিখতে শুরু করলেন।

সমিতির পরিকল্পনা আর নিয়মাবলীকে আবার ঢেলে সেজে সতীশ মুখার্জি সদস্যদের একটা পুরাদস্তুর রাজনীতির পাঠ দিতে লাগলেন। রাজধানীর দরিদ্র ছাত্রাবাসগুলিতে গাদাগাদি করে যেসব তরুণ থাকত তারা দলে-দলে তাঁর ডাকে সাড়া দিল। কর্মী বাছাই-এর মাপকাঠি ছিল নৈতিক নিষ্ঠা; মুখার্জির মতে ব্রহ্মচর্য অপরিহার্য। এও এক ধরণের সন্ন্যাস—আত্মদানে উন্মুখ তরুণের মনে তপস্যার আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া।

প্রথমে মেট্রোপলিটান কলেজে সপ্তাহে দুটি ভাষণ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। একটা দিতেন পণ্ডিত নীলকণ্ঠ গোস্বামী আর একটা দিতেন মুখার্জি নিজে।—সাধারণ শিক্ষা, আর্থিক উন্নতি এবং নাগরিক জীবন সম্বন্ধে। নামজাদা গুণীদের ভাষণ দেওয়ার জন্ম ডাকা হত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন লোকসঙ্গীত নিয়ে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও তারকনাথ দাস। কলকাতায় এসে রমেশচন্দ্র দত্তও 'জাতীয় জীবনের লক্ষ্য' নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে কতগুলো ভাষণ দিয়েছিলেন।

'ডনে'র শিক্ষানীতির মূলে ছিল 'ভগবদ্গীতা'। গীতার উপরে ভাষণ দিতেন স্বামী সারদানন্দ, নিছক দার্শনিক তত্ত্বের ফাঁকা আলোচনায় ছেলেদের বিভ্রান্ত না করে তাদের বোঝাতেন, 'আদর্শের জন্ম জীবন দেওয়াটা কি ব্যাপার'। নিবেদিতা শুনতে যেতেন। ছেলেরা তাঁকে ঘিরে জানতে চাইত, কেমন লাগল? একদিন বললেন, 'আমি নিজে গীতার থেকে কি পেয়েছি, শুনবে? বিবেক-জ্ঞান! একটা গুটিপোকা আর মানুষকে গীতা সমপর্যায়ে ফেলেনি, কিন্তু দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছে উভয়ের মধ্যে একই সম্ভাবনার বীজ রয়েছে, আর তাই একই আশা লালন করতে উভয়কেই প্রোৎসাহিত করেছে।' এর বেশী কিছু আর বললেন না সেদিন, যদিও গীতার মধ্যে নিবেদিতা দেখতে পেতেন এক অফুরন্ত শক্তির উৎস। 'হাতের কাছে যে-যন্ত্র পেয়েছ তার তুলনা নাই। এখন দৈনন্দিন জীবনে ওকে কাজে লাগাও। এক হাতে গীতা আর এক হাতে তলোয়ার নিয়ে আদর্শকে উপযুক্ত করতে যথার্থ 'ক্ষত্রিয় বীর' করে মাথা তুলবে?' আবার বলেন, 'এই সেদিন এক মহাবীর আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, তাঁর পদাঙ্ক আমরা অনায়াসে অনুসরণ করতে পারি…স্বামীজি এই সেদিনের মানুষ…তাঁর পিছনে আমরা চলতে পারি এখনও…'

'ডন সোসাইটি'র মুরুব্বী হয়ে ছিলেন নিবেদিতা অনেক দিন। 'জাতীয়তাবাদ' নিয়েই বেশী আলোচনা করতেন। বিষয়টা নতুন, তাই তার গোড়ার কথাগুলো একটু ফলাও করেই ব্যাখ্যা করা দরকার। সেজন্ম নিবেদিতাকে অভিব্যক্তিবাদের সাহায্য নিতে হত। দেশের জল-হাওয়া, ভূমিসংস্থানের বৈশিষ্ট্য আর অন্যান্য উপাদান কেমন করে মানুষকে পারিপার্শ্বিকের উপযোগী করে গড়ে তোলে সে সব ছেলেদের বুঝিয়ে দিতেন। আদর্শবাদী দেশপ্রেমিকের চোখে ভারতবর্ষকে দেখতেন নিবেদিতা, এক দৃষ্টিতে দেখতেন তার ধূসর অতীত থেকে গৌরবোজ্জ্বল মহাভবিষ্যৎ পর্যন্ত। এ দেশের ইতিহাসে দর্শন আর ধর্মের সমন্বয়ে যুগশক্তির প্রভাব যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর মধ্যে। যুক্তির তীক্ষ্ণতায় যে-কোনও প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা তাঁর পক্ষে সহজ। রমেশ দত্ত তাঁর বন্ধু, তাঁর উপদেষ্টা। ইংরেজ সরকারের প্রতি তাঁর অবিচল আনুরক্তিকে নিবেদিতা প্রশংসা করতেন। ওদিকে কিন্তু তরুণদের মনে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে দিতেও ছাড়তেন না, বার বার বলতেন: 'সরকারী চাকরীর মোহ ছাড়! গোলামি ছাড়!' মানুষের বাইরেটা বাদ দিয়ে যা দেখে নিবেদিতা মনুষ্যত্বের বিচার করতেন, বেশির ভাগ চেলাদের পক্ষেই তাঁর সেই অন্তর্দৃষ্টির অর্থ বুঝে ওঠা শক্ত। ওঁর প্রতিটি অতর্কিত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় মুখের দিকে ওরা উৎসুক চিত্তে চেয়ে থাকে। সেই সঙ্গে ভয় করে ওঁর প্রশ্নবাণকে, কোন মতেই যা এড়ানো যায় না। তাদের কাছে নিবেদিতা এখন যেন পাত্রী…হাতে তাঁর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মোহর-মারা ছাড়পত্র। একদিন তাঁর এক চেলা* শুধোল, 'স্বাধীনতা আর কত দূরে?' 'তরুণ ভারত স্বাধীনতার জন্ম পাল্লা দিয়ে ছুটতে তৈরি হচ্ছে। অবশ্য দৌড়টা এখনও শুরু হয়নি।'

নিবেদিতার সাদাটে রং আর চেহারায় কিছুটা পরুষ-কঠিন ধাঁচ দেখে ওরা তাঁর নাম দিয়েছিল 'ধবলগিরি'। তাঁর সাদা চামড়া ওদের কাছে যেন একটা অপ্রত্যাশিত ব্যতিক্রম; নীল চোখ দুটিও তাই, কিন্তু তাতে নির্মমতার আভাস মাত্রও ছিল না। দুটোই এক রকম মেনে নিয়েছিল ছেলেরা। নিবেদিতা তো 'মেমসাব' নন, তিনি

---

* বিনয় সরকার। 'ডন সোসাইটির' অনেক তথ্য তাঁর কাছ থেকে পাওয়া।

যে সবার বোন ! সতীশ মুখার্জিকে সবাই গুরুর মত মান্য করত, নিবেদিতা তো তাঁরই স্বগণ। তিনি যা ই হন, তাঁর চেলারা বিন্তু নিবেদিতার কোনও সমালোচনা সইতে পারত না।

শ্রোতাদের মনে নিবেদিতা যে একটা দিব্যোন্মাদনা জাগিয়ে তুলতেন, তার আর সন্দেহ নাই। যদি ওঁর সন্ন্যাসিনীর সাজ না থাকত, হয়তো চেলারা ঈর্ষাবশে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত। কেউ কেউ বলত, 'ঋষিদের কথা ঢের শুনেছি, নিবেদিতা যেন তাঁদেরই এক জন। কালের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছেন, পশ্চিমের প্রাণ আর স্বাতন্ত্র্যের বীর্য নিয়ে ফিরে এসেছেন তাঁর আপন ঘরে। যুগ যুগ ধরে যাদের ভালবাসতেন, তাদেরই সেবা করতে এসেছেন।' নিবেদিতাকে নিয়ে একটা গর্ববোধ ছিল প্রত্যেকেরই।

এদেরই কাছে নিবেদিতা যেন নিজেকে প্রায় উজাড় করে দিয়েছিলেন। এদের চিত্তকে উদার করা, দেশ-বিদেশের সামাজিক ভাবনার মৌলিক ঐক্যকে কি করে বাস্তবে রূপায়িত করা যায় সেই দিকে ওদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করাই তাঁর কাজ। ইউরোপ আর ভারতে সমাজ-চেতনা একই সঙ্গে অগ্রগতির পথে চলেছে, যদিও তাদের ধরণ আলাদা। তিনি চাইতেন, ওরা অনুভব করুক একই মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত সবাই, অথচ প্রত্যেকেই স্বাধীন। নিজেদের ঐতিহ্যকে অস্বীকার না করেও পারিবারিক গণ্ডির সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হক ওদের মন। হিন্দু মায়ের জীবনের লক্ষ্য যে-ত্যাগ, তাকে নিবেদিতা শ্রদ্ধা করতেন ; কিন্তু তিনি চান মায়ের ত্যাগ সন্তানকেও উদ্বুদ্ধ করুক। ছেলেরা আজ কাজের জন্য তৈরি হয়েছে, দেশের জন্য লড়তে প্রস্তুত তারা,—ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষা হক তাদেরও। বলতেন, 'ব্রহ্মচারী ছেলে দরকার, কিন্তু যাদের আদর্শ নৈষ্কর্ম্য তাদের চাই না। আমি চাই তোমরা কর্মী হবে, জীবন-যুদ্ধে মুখ না ফিরিয়ে সব রকম অভিজ্ঞতায় পোক্ত হবে। তোমাদের ব্রহ্মচর্য হবে ক্ষত্রিয়ের ব্রহ্মচর্য। অনুরাগ-বিরাগের দ্বন্দ্ব তোমাদের থাকবে না। এমন মানুষ চাই যারা রূঢ় বাস্তবের সামনে তাল ঠুকে দাঁড়াতে পারে, আত্মবিসর্জনের মাঝেই রুদ্রের দক্ষিণ মুখকে দেখতে পায়। তোমাদের আরাধ্য দেবী ভারতমাতা। মন্দিরের বেদিতে ফুল-পাতা সাজিয়ে আর ধূপধুনা জ্বালিয়ে তাঁকে পাবে না ;—তিনি আছেন দুর্ভিক্ষের হাহাকারে, দারিদ্র্যের তাড়নায়। তোমার আত্মাহুতিতেই তাঁর আবির্ভাব !'

প্রায়ই বলতেন, 'আসল ভারতবর্ষকে যদি চিনতে চাও আকবর আর অশোকের মত স্বপ্ন দেখ। বই পড়ে দেশপ্রেম শেখা যায় না। এ-প্রেম সমগ্র সত্তাকে আবিষ্ট করে রাখে। দেহের অস্থি-মজ্জায় এ-ভালবাসা থাকা চাই,—নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তার অনুভব পাওয়া চাই।'

১৯০৩ সন—এপ্রিলের শেষাশেষি। স্বামী সদানন্দ বাছাই-করা ছ'টি ছেলেকে নিয়ে উত্তর ভারতে রওনা হলেন। নিবেদিতার উল্লাসের সীমা রইল না। এক বছর বাদে আবার একটি অভিযান। দরকার মত টাকা—নিবেদিতাই যোগাড় করে দিলেন, বাপ-মায়ের মত আনালেন। প্রথম দলটিকে পাঠিয়েছিলেন কেদারনাথে, শিবশংকরের পায়ে। পৌরাণিক জৈন, বৌদ্ধ আর দ্রাবিড় ভারতে এমনি আরও মুসাফিরের দল পাঠাবেন, পরিব্রাজক সাধুর মত তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরবে, অথচ মধ্যযুগের সম্প্রদায়ের পারস্পরিক মৈত্রীর ভাবটি তাদের মাঝে থাকবে—এই তাঁর স্বপ্ন।*

এ-সম্পর্কে মিস ম্যাকলয়েডকে লিখলেন, 'সদানন্দের দিল খুলে গেছে। সে আর শুধু সেবক নয়, মস্ত বড় আচার্য এবং নেতা। অথচ যারই কাছ থেকে শেখবার মত কিছু পায় তার কাছেই সেই আগের মত দীন আর অনুগত হয়। ছেলেদের উপরে ওর যে কী অসীম প্রভাব তা বলে বোঝাতে পারব না...' (৪ঠা মে, ১৯০৪)

১৯০৩ সনের মে মাসে মেদিনীপুরের একটা সমিতিতে নিবেদিতা ভাষণ দিতে গিয়েছেন। ছেলেরা তাঁকে স্বাগত জানাল 'হিপ ! হিপ ! হুররে !' ধ্বনি দিয়ে। নিবেদিতা তাদের উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে বললেন, 'বিদেশী জিগির দিয়ে মনোভাব প্রকাশ কর এতই কি দো-আঁশলা হয়ে গেছ তোমরা ? বল আমার সঙ্গে "ওয়াহ্ গুরু কী ফতহ্।" পাঁচ দিনে তের বার ভাষণ দিয়ে ১৯০৩-এরই ২০শে মে'র এক চিঠিতে লিখছেন, '...এ-ধরণের কিছু করতে পারলে খানিকটা কাজ হয় বটে ...তবে আমার কথা ঠিকমত বুঝতে পারা ছেলেদের পক্ষে শক্ত, ওদের মাথায় সব ঢোকে না। সব রকম চেষ্টা করে দেখেছি। কিন্তু এও বুঝেছি, অপরের মুখ দিয়ে যদি কথা বলতে যাই, আমার বক্তব্যের চেহারাটা হয়ে যাবে অন্য রকম। যে প্রচণ্ড প্রাণের দোলা অন্তরে অনুভব করছি, ভেবেছিলাম তা দিয়ে দুনিয়া উল্টে দেব। কিন্তু হায় রে, বাতাসে আমার আকুল কান্না ছড়িয়ে দিয়ে গেলাম, সে-কান্না বাতাসের বুকেই গুমরে উঠল শুধু...' শেষকালে লিখলেন, 'একটা বিরাট কিছু করতে চাই, নিদেন একটা চরম আত্মবিসর্জন...।'

সব কি দেওয়া হয়নি তখনও ?

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

যে বিরাট প্রতিষ্ঠান আজ নিবেদিতা বিদ্যালয় নামে পরিচিত এবং ওই নামের রাস্তার 'পরেই দাঁড়িয়ে আছে, ১৯০৩ সালের এপ্রিল মাসে নিতান্ত মামুলী ভাবে তার দ্বারোদ্ঘাটন হয়। এপ্রিলের প্রথম তপন। একটা লোক হাতুড়ি দিয়ে মস্ত একটা পেরেক ঠুকে কালো রং-করা একখানা নোটিশ দুয়ারের গায়ে আটকে দিল। তাতে লেখা :

ভগিনী-নিবাস

নারী-সমিতি—পাঠশালা—গ্রন্থাগার

১ই এপ্রিলের পর এক চিঠিতে নিবেদিতা লিখছেন...'কিন্তু শক্ত-শক্ত কাজ করবার জন্য আমাদের যে বাহার নামে একটি মুসলমান চাকর আছে, ফলকটায় কিন্তু তার কোনও উল্লেখ নাই। আবার বাহার নিয়ে এসেছে একটা বকরি ! আকারে একটা বাছুরের মত বড় হবে, চিবিয়ে-চিবিয়ে দড়ি ছিঁড়ে ফেলছে অনবরত,...ভয়ে ভয়ে আছি কখন আমাদের ব্রাহ্মণ পাড়া-পড়শীরা আবিষ্কার করে ফেলবে ওটা একটা মুসলমান ছাগল...আমার ঘর-সংসার বাড়ছে, আরও বাড়বে তার শুভ

* ১৯০৩-এর ১৩ই সেপ্টেম্বরের 'দি অ্যাডভোকেট সানডে' দ্রষ্টব্য।

লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। এ আনন্দে যে আমরা তুরীয় ভাব অবলম্বন করে থাকব এমন কথা বলতে পারি না।'

পাড়ার লোকদের কাছে 'ভগিনীরা' বলতে নিবেদিতা, বেট আর ক্রিষ্টিন। তিন বছর আগেই নিবেদিতাকে বাগবাজারের সমাজ নিজেদের এক জন বলে গ্রহণ করেছিল। বেট তার সেলাইয়ের ক্লাসে গোটা কুড়ি মেয়ে যোগাড় করতে পেরেছে। ক্রিষ্টিনও তাঁর সহজ নিষ্ঠা ও তৎপরতা নিয়ে এবার নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন বিদ্যালয়ের কাজে।

জানুয়ারি থেকে নিবেদিতা বিদ্যালয় খোলার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু নিজেকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে না ফেলে একা তাঁর পক্ষে স্কুল চালানো অসম্ভব। তার পর পাড়ায় প্লেগ দেখা দিল। স্বামী সদানন্দকে গড়তে হল সেবা-সমিতি। নিবেদিতার পোষমানা ছোট্ট মেয়ে সেই সন্তোষিণী, তাকে বাগ মানানও শক্ত। এই সব নানান কারণে ফেব্রুয়ারিতে ক্রিষ্টিন মায়াবতী থেকে না আসা পর্যন্ত বিদ্যালয়-উদ্বোধনটা স্থগিত ছিল।

দু'জনের সহযোগিতার সংকল্পটা ঠিক হয়ে যেতেই নিবেদিতা আর ক্রিষ্টিন হিন্দু সমাজের জীবনধারাকে স্বাগত জানালেন, হিন্দুর যত-কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর আজব কল্পনা হুড়মুড় করে ওঁদের বাড়িতে ঢুকে পড়ল। 'ভগিনী-নিবাস'কে ঘিরে বাগবাজারের ঔৎসুক্য কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠল।

মন্দির-চত্বরে তখন যেমন সব যাত্রা হত, মাসে তিন-চার বার বেলুড় মঠের-সন্ন্যাসীদের সাহায্যে নিবেদিতা তেমনি পৌরাণিক কথকতার ব্যবস্থা করতেন। পাড়ার সকলকে তাতে আমন্ত্রণ করা হত। বিকাল বেলা বন্ধ গাড়িতে মেয়েরা আসতেন, উঠানের পাশে সবুজ রঙের চিকের আড়ালে এসে বসতেন। ঘোমটায় সবার মুখ ঢাকা, ওঁদের অস্তিত্ব কেউ জানতেও পারে না। কখনও একটা হাতপাখার আওয়াজ, একটু ফিস্‌ফিসানি, কি চুড়ির টুং টাং মাত্র শোনা যায়। ছোট ছেলে-মেয়েরা বসে উঠানের মাঝখানে। শালুতে মোড়া আর ফুলপাতা দিয়ে সাজানো ছোট্ট একটি মঞ্চ, মস্ত একটা পেট্রল ল্যাম্প জ্বলছে তার উপরে। কথক ঠাকুর সেখানে বসে কথকতা করেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুরাণের গল্প বলে যান অভিনয়ের ভঙ্গিতে। যোগীন-মাও পুরাণ-কথা শোনান, মাঝে মাঝে স্বামী সারদানন্দ চণ্ডীপাঠ করেন।

গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা আসাতে সমস্ত অনুষ্ঠানটি একটা বিশেষ মর্যাদা পেল। নিবেদিতা আর ক্রিষ্টিন তাঁদের কাছেই থাকতেন। এঁরা দুটি বিদেশী মেয়ে হলেও সম্ভ্রান্ত হিন্দু ঘরের মেয়েরা এঁদের এখানে আসতে পেলে খুশীই হতেন। নিবেদিতা দীক্ষিতা ব্রহ্মচারিণী, কাজেই গোঁড়া হিন্দুরও তাঁর কাছে আসতে বাধা নাই, —আর যোগীন-মা থাকায় কারও কোনও রকম বাধো-বাধোও ঠেকত না। তাছাড়া যা-কিছু মেয়েদের নিত্য-পরিচিত, ওখানেও তা-ই তাঁদের চোখে পড়ত,—ও-বাড়ি যেন তাঁদেরই বাড়ির এক অংশ। নিবেদিতা ভাবতেন, 'জীবন-শিল্পের পাঠ নিতে ওরা কি আবার আসবে এখানে, বিশ্বাস করে ওদের ছেলে-মেয়েদের ভার দেবে আমায়?' তখনকার দিনে গোঁড়া হিন্দু পরিবারে মেয়েদের বই পড়া বারণ ছিল, ম্লেচ্ছের সংস্পর্শও এড়িয়ে চলতে হত সব রকমে। হিন্দুর আচারনিষ্ঠা বা ধর্মবোধ এতটুকুও ক্ষুণ্ন না করে মেয়েদের মনে যাতে কিছু খাঁটি জিনিস ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, নিবেদিতাকে তার একটা উপায় খুঁজে বার করতে হবে। ওদের মনে আত্মবিকাশের একটা ইচ্ছা জাগিয়ে তোলাই হল প্রথম কাজ।

কলকাতায় বালিকা বিদ্যালয় খুব কম ছিল তখন। প্রগতিশীল ব্রাহ্মসমাজে দেশীয় মেয়েদের জন্য 'নর্মাল এ্যাণ্ড অ্যাডাল্ট স্কুল' ছিল। ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে কেশব সেন সেইটিকেই বাড়িয়ে 'ভিক্টোরিয়া ইনস্‌টিটিউশনে' পরিণত করলেন। এই বিদ্যালয়ে কাজ করবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন নিবেদিতা। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল নিরক্ষর মায়ের আঁচল-ধরা হিন্দু মেয়েদের শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করা। তবে ক্রিষ্টিন অনেক বার ভিক্টোরিয়ায় কাজ করেছেন।

নিবেদিতার মত একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত আরেকটি বিদ্যালয় ছিল মাতাজী তপস্বিনীর 'মহাকালী পাঠশালা'। বিবেকানন্দ একবার ওটি দেখে এসেছিলেন। আর ছিল গৌরী-মা'র বিদ্যালয়। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ওঁকে দীক্ষা দেন ওঁর ছেলেবেলায়। গৌরী-মা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পায়ে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তার পর বহু দিন ছিলেন হিমালয়ে। তাঁর স্কুলটি গোঁড়া রক্ষণশীল আদর্শে পরিচালিত, অবস্থাও খুব ভাল তখন। গৌরী-মা সারদাদেবীর কাছেই অনেক সময় থাকতেন।

কিন্তু নিবেদিতাকে ধন্য বলি! বাগবাজারের গোঁড়া হিন্দুদের হৃদয় জয় করে তাঁর বিদ্যালয় অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলল। বাপ-মায়ের সম্মতি নিয়েই ওখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত, গোয়ালা—সব জাতের ছাত্রীরা একসঙ্গে পড়তে আসত।

এমনি করে নিবেদিতার ওখানে সব বয়সের হিন্দু মেয়েরা একত্র হলেও তাকে ঠিক বিদ্যালয়ের ক্লাস বলা চলত না। কয়েক সপ্তাহ এই ভাবেই কাটল। তবু যা হক, জমির পাট হয়েছে, এই বার বীজ ছড়ানোর পালা। নিবেদিতাকে কেন্দ্র করে একটি বৃহৎ পরিবার দানা বেঁধে উঠতে লাগল। প্রথম দিকে পাঠ দিতেন ক্রিষ্টিন। হাতে সেলাইয়ের কাজ নিয়ে মেয়েরা রামপ্রসাদ কি চণ্ডীদাসের পদ গান করে। ওরা হাসে, একটা সহজ মাধুরী আছে তার,—যেন সূর্যের আলোয় ফুটে ওঠে চাঁপার কুঁড়ি। যা শেখানো হল তা বেশ মনে রাখে, আবার বাড়ির মেয়েরা জিজ্ঞেস করলে নব-আহরিত জ্ঞানের ভাগ তাদেরও দেয়। দেয়ালের গায়ে ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখে ওদের কল্পনা পাখা মেলে। ওদের বাড়ির আঙিনা হতে শহর, তার পর বাংলা দেশ, তারও পরে ভারতবর্ষ—এদের মধ্যে কি যে সম্পর্ক তা ওদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা আঙুল বুলোয় মধ্যভারতের নিবিড় অরণ্যের কালো বিন্দুগুলোর উপর—ওখানে দেবতারা আছেন; হাত বুলিয়ে দেখে পাঞ্জাবের তপ্ত মরুভূমি—প্রতি সন্ধ্যায় রক্ত-সূর্যের মরণ হয় ওখানে। স্বপ্নের ঘোরে কন্যাকুমারিকার শুভ্র বেলাতট আর পার্বতী-অধিষ্ঠিত হিমগিরির চিরতুষার যেন ওরা দেখে আসে।

সপ্তাহে দু'দিন করে ক্লাস বসত। এত দিনে যা শিখেছে তারই গুমরে বড় মেয়েরা (পনের বছরেরও কম হবে বয়স) যখন পড়তে আর লিখতে চাইল, তখন বিদ্যালয়ের চেহারা ফিরল। 'কিণ্ডার-গার্টেনে' ঢোকবার জন্য কত রকম ফন্দি-ফিকির খাটায় মেয়েরা, এমন

কি রোজ সকালে স্কুলের যে-গাড়িটা বাচ্চা মেয়েদের আনতে যায় ওরা তাতে লুকিয়ে উঠে বসে থাকে। একবার স্কুলে এলে তাদের আর বাড়ি পাঠান যায় না। ক্লাসের সংখ্যা দ্বিগুণ করতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলে গিয়েছিলেন, 'শাসনের চাপে মেয়েরা আজ শিয়ালের মত ভীরু হয়ে গেছে, এমন দিন আসবে যখন তারা সিংহিনীর মত তেজী হয়ে উঠবে।'

১৯০৪ সনের গোড়া হতেই বিদ্যালয়টি এক রকম গুছিয়ে এল। বেলা দুপুর হতে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত স্কুল হয়। সপ্তাহে চার দিন। ক্লাসে মেয়ে ধরে না। গাদাগাদি হয়ে ছাত্রীরা বসে, নিচু ছাতের ঘরে গরমে দম আটকে আসে। কিন্তু সেজন্য নালিশ জানায় না কেউ। নিবেদিতা তাঁর প্রথম রিপোর্টে লিখলেন, 'বলতে গেলে আমার মেয়েরা এত ভাল যে, এমনটি আমি আর দেখিনি। দোষও অবশ্য আছে—যেমন, কিছুতেই ওরা ঠিক সময়ে ক্লাসে আসবে না, তাছাড়া আদেশ পালনে ওরা একেবারেই অভ্যস্ত নয়, শৃঙ্খলা বলে একদম কিছু নাই ওদের মধ্যে। এসব যাতে শুধরে যায় সেই ভাবেই পাঠ দেওয়া হয়। প্রথমে দেখলাম কাঠি সাজাতে দিয়ে একটু কাজ হল,—তার পর একে-একে ড্রিল, নক্সা তৈরি, আঁকা, সেলাই, মাদুর বোনা আর তুলির কাজ। দেখতে-দেখতে ওরা বাধ্য আর নিয়মানুগ হয়ে উঠল। প্রথম দিকটায় কোন কিছু খেয়াল করে দেখবার অভ্যাস ওদের ছিল না। আমায় কেউ কখনও নতুন একটা পোকা, কি ফুল বা পাখির পালক এনে দেখিয়েছে বলে মনে পড়ে না। আমার বাচ্চা কুকুরটাকে প্রথম পেয়ে চুমু খেলাম যখন, ওটার এত সৌভাগ্য কী করে হল মেয়েরা তা নিয়ে গবেষণা করতে-করতে বাড়ি গেল। সকলেই একমত যে কুকুরটা অনেক পুণ্য করেছিল, তা না হলে এমন হয় না। ছোট শিশুর মনে এ কী অদ্ভুত ধারণা! তাছাড়া যে কোনও ভাব ওরা কী তাড়াতাড়ি যে ধরে ফেলে! ওদের দেশ সম্বন্ধে, ওদের সামর্থ্য সম্বন্ধে······'

ফাঁক পেলেই প্রার্থনা আর 'ভারতবর্ষ' মন্ত্র জপ করতে বলে নিবেদিতা স্কুলে দেশাত্মবোধ আর বীরপূজার ভাব প্রবর্তন করলেন। এসব আলোচনা মেয়েদের চুপ করে একমনে শুনতে হত। ওরা শান্ত হলে নিবেদিতা বাঙালী, মারাঠি কি রাজপুত বীরাঙ্গনাদের গল্প করেন। এঁরা সবাই সহোদরা, এঁদের বেলায় প্রাদেশিকতা কি জাতিভেদের প্রশ্ন ওঠে না। এঁদের উত্তরাধিকারিণীরা এক দিন দেশে সৌভ্রাত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে উত্তরাপথের গুরু নানক আর দক্ষিণাপথের রামানন্দের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করবে। মেয়েরা মুগ্ধ হয়ে শোনে। তার পর ভারতবর্ষের পূজা-বেদিতে আত্মগরিমার নৈবেদ্য সাজিয়ে ঘরে ফিরে যায়।

নিবেদিতাকে যদি প্রশ্ন করা হত, 'তোমার উদ্দেশ্য কি?' তিনি জবাব দিতেন, 'বিদ্যালয়ে যে-শিক্ষা ওরা পাবে তা যেন ওদের সারা জীবনের পাথেয় হয়।' কথাটা সত্যি। ১৯০৪-৫ সনের স্বদেশী মেলাতে মেয়েরা তাঁতীদের জন্য নমুনা হিসাবে রেশমের কাজ পাঠিয়েছিল, জাতীয় পতাকায় ছুঁচের কাজ করে দিয়েছিল, ছাঁচের জন্য কেটে দিয়েছিল ফুলের নকশা। বাঁশের টেকো তৈরি করে চুলের মত সরু সুতো কেটেছিল, আচার, মোরব্বা, নানা রকম খাবার তৈরি করে পাঠিয়েছিল। 'অথচ এসব কাজই কেবল খেলা যেন। এর সঙ্গে সামান্য কিছু লেখাপড়া, অঙ্ক আর ইতিহাস।

'ছাত্রীরা কোন্ ভাষায় কথা কইতে পারে?' জিজ্ঞাসা করা হয় নিবেদিতাকে।

'বাংলায়। তিন বছর পরে সংস্কৃত শিখবে আর চার বছর পরে সামান্য ইংরেজী।'

'কি বই পড়া হয়?'

'রামায়ণ আর মহাভারত।'

'তোমাদের ধর্ম কি?'

'আমরা সারদাদেবীর অনুগত। জগজ্জননীর পায়ে প্রাণ সঁপেছি···'

নিবেদিতা কদাচিৎ কোনও ক্লাস নিতেন। তাঁকে দেখাও যেত খুব কম কিন্তু তাঁর অদৃশ্য সত্তা সারা বাড়িতে যেন থমথম করত। কোনও ভাষণ দিতে যখন বাইরে যেতেন, স্কুল তখন ঝিমিয়ে পড়ত, কেননা যা কিছু নতুন উদ্ভাবন সবই তো নিবেদিতার। তবুও, নিবেদিতার অভাব পুরিয়ে নিতেন 'ক্রিষ্টিন'। সারা জীবনের ধকলে আর দায়িত্বের বোঝা বয়ে বয়ে তাঁর চরিত্র হয়ে উঠেছিল কড়াপানের ইস্পাতের মত। যে-কোনও কাজের ভার দিয়ে তাঁর উপরে অনায়াসে নির্ভর করা যায়। ক্রিষ্টিনের কাজ দেখতে দেখতে নিবেদিতা ভাবতেন, 'ওকে দেখবার আগে জানতাম না কী অসহিষ্ণু আমি, অকারণ উত্তেজনায় আমার জীবন কতখানি অফলা। পড়াশোনা, কাজকর্ম আর দেখা-সাক্ষাতেই সমস্তটা সময় ওর কেটে যায়। ওর জীবনে আড়ম্বর নাই, ব্যস্ততা নাই, নাই কোনও জটিলতা। সরল প্রাণ যাদের, তাদের সঙ্গে এত সরল ওর ব্যবহার! ক্রিষ্টিন যেন নারীত্বের মূর্ত আদর্শ···'*

আর্থিক দিক দিয়ে বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভরসা 'বৃটেন ও আমেরিকার নিবেদিতা-সাহায্য-সমিতি।' নিবেদিতার ভাষণে যে-টাকা সংগ্রহ হয়েছে তাই এ সমিতির তহবিল। কিন্তু বিদ্যালয়ের উন্নতি করতে হলে ঐ টাকাই যথেষ্ট নয়। বিদ্যালয়টি চালু করতে গিয়ে তহবিলের মোটা অংশ নিবেদিতা ফুঁকে দিয়েছিলেন, অথচ তখনও স্কুলের বলতে গেলে আদিপর্বই চলছে। আমেরিকান বান্ধবীদের মারফতে যখন কিছু উপরি টাকা আসে, তখন একটা নতুন ক্লাস খোলা হয়। টাকার টান পড়ে যখন, পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়, ছাত্রীরা সরে পড়ে। কিন্তু টাকার ব্যবস্থা হলেই সঙ্গে সঙ্গে আবার তারা এসে জোটে—গুরুর 'পরে শিষ্যের যেমন টান তেমনি প্রাণের টান ওদের।

মহা উৎসাহে পরোপকার করতে চান এমন অনেকেই আছেন, কিন্তু নিবেদিতা ঠিক করেছিলেন বাইরের লোকের দান নেবেন না। তাঁরা হয়তো তাঁদের মতবাদ চালাতে চাইবেন স্কুলের 'পরে। তিনি কিছুতেই তা হতে দেবেন না। নিজের দায় নিজেই বইবেন এই তাঁর দৃঢ় নিশ্চয়। কয়েকটা মিশনারী স্কুল ছিল বিদেশীদের, তাদের

---

* ২৫শে নবেম্বর ১৯০৩ এবং ১০ই ফেব্রুয়ারি, ৬ই নবেম্বর ১৯০৪-এর চিঠি

সমালোচনার আশংকা আছে। কোনও রকম প্রশ্ন করলে নিবেদিতা একটু স্নেহের সঙ্গে তাদের জবাব দিতেন, 'আমরা একটা স্বরাট বিজ্ঞানগর গড়ে তুলছি।' ওঁকে অহঙ্কারী বলে দুষত সবাই, উনি গ্রাহ্যও করতেন না।

কিন্তু ১৯০৪-এর নবেম্বরে নানা রকম সমস্যা এসে এমন করে ঘিরে ধরল যে নিবেদিতা মিস ম্যাকলয়েডের সঙ্গে পরামর্শ করতে বাধ্য হলেন। স্কুল কি বন্ধ করে দিতে হবে? ক্রিষ্টিনের মধ্যবর্তিতায় রামকৃষ্ণ সংঘের সঙ্গে বিদ্যালয়টির সজীব একটা যোগ বজায় রয়েছে বটে, কিন্তু স্কুলের হর্তাকর্তা ছিলেন নিবেদিতা নিজে, আর কাউকে সে-দায় দেননি। ক্রমাগত লেখা আর ভাষণ দিয়ে যা রোজগার করতেন, সেই টাকায় স্কুলটিকে পুষতেনও নিবেদিতাই। প্রায় সারাটা দিনই তাঁর নিজের ঘরে লেখাপড়ার কাজ নিয়ে কাটত। শুধু একটা বাচ্চা ঝিকে ঘরে থাকতে দিতেন,—সে একটিও কথা কইত না; কেবল ওঁর চা-টি এনে দিয়ে ঘরের কোণে বসে মালা টপকাত। বেচারী লেখাপড়া জানে না, বাড়ির আর কোনও কাজে হাত দিতে পারে না, পারে এক জপ করতে। নিবেদিতা ঘাড় নেড়ে বলেন, 'বেশ বেশ, ঠাকুরকে ডাক্! আমার কাজ যেমন খবরের কাগজে প্রবন্ধ লেখা ওটা তেমনি তোর কাজ। যে যার সাধ্যমত মায়ের সেবা করি আমরা।'

১৯০৪ সনের মাঝামাঝি দুটি ঘটনাতে স্কুলের শ্রীবৃদ্ধির সূচনা হল। প্রথমত, পাশের বাড়িটাও স্কুলের জন্ম নেওয়া হল; তার পর এল রবীন্দ্রনাথের একটা প্রস্তাব। তাঁর বিরাট পৈত্রিক বাড়িখানা একটা 'নর্ম্যাল স্কুল' প্রতিষ্ঠার জন্ম নিবেদিতাকে তিনি দিতে চাইলেন। স্বামীজির কথাগুলো নিবেদিতার কানে বাজত, 'সাহস চাই মার্গট! সুযোগ হাতে এলে ছেড় না। কেবল বুকে বল রেখ, আমি তোমায় সব-কিছু যুগিয়ে দেব—'* কিন্তু তবু নিবেদিতা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। রবি ঠাকুরের পরিকল্পনা তখনকার মত নিবেদিতার বিদ্যালয়ে তাঁর নিজস্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে পর্যবসিত হল, নতুন রূপ ধরল না। পরে শান্তিনিকেতনে তাঁর স্বপ্ন সার্থক হয়।

তাঁর কাছে যাঁরা শিক্ষকতার পাঠ নিতে আসতেন নিবেদিতা তাঁদের সমাজ-বিজ্ঞানের একটা পাঠ্যসূচী নির্ধারিত করে দিতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে—এই সূচীটি তৈরি করা হত। পরিকল্পনাটা নতুন ধরণের সন্দেহ নাই, তবে তার প্রেরণার উৎস ছিল এ দেশের প্রাচীন সাধন-শাস্ত্র। 'উপনিষদ বেদান্ত গীতা এরাই আমাদের শিক্ষাদাতা। আমাদের নিজের ভাবনাকে ছাপিয়ে পরদেশী ভাবনাকে আমল দিও না। আমাদের ধর্মবোধ আর আচার-ব্যবহারের মাঝে ভেজাল ঢুকিও না। জনসাধারণকে অনায়াসে সুনিশ্চিত মুক্তির পথে নিয়ে যেতে হলে তাদের সুপরিচিত আদর্শ আর অভ্যস্ত আচারের সাহায্য নিতে হবে। আর লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তাদের অধ্যাত্মপ্রগতি হয় অবিচ্ছিন্ন ধারায়, অভিজ্ঞতার বনিয়াদে যেন কোনও বড় রকমের ফাটল না থাকে…' এই জন্যই নিবেদিতা কিণ্ডারগার্টেনের উপরে এত জোর দিতেন। মেয়েরা সেখানে অসঙ্কোচে তাদের মরমী চিত্তের জীবন্ত ভাবনাকে রূপ দেয়, তাদের মৃন্ময় আধারে মা-ই যে নিজেকে ফুটিয়ে তুলছেন সেইটি ধরতে পেরে খুশী হয়ে ওঠে। নিবেদিতা বলতেন, 'এই জন্যই শিশুদের কল্পলোকের ভিত্তি হওয়া উচিৎ রামায়ণ-মহাভারত, কারণ দেশের পুরাণেতিহাসের সুতোতেই আমাদের আশার মালা গাঁথতে হবে। পেট থেকে পড়েই কেউ মহাপ্রাণ হয় না, বলিষ্ঠ চিন্তার প্রেরণাতেই এক-একটা প্রাণ মহান হয়ে ওঠে। সব মানুষেরই মনের গভীরে একটা আত্মদানের আকাঙ্ক্ষা আছে। মানুষের আর কোনও আকাঙ্ক্ষাই এত প্রচণ্ড নয়। শিক্ষায় সেই আকাঙ্ক্ষাকে চেতিয়ে তুলতে হবে। তবেই ভারতে জাতীয় সত্তার উন্মেষ ঘটবে।'

স্কুলের ছোট-বড় সব মেয়ের কাছেই নিবেদিতা যেন একটা রহস্য। তাঁকে দেবীর মত পুজো করলেও ভয়ও করত সবাই, কারণ রাগলে পরে নিবেদিতা একেবারে আগুন হয়ে উঠতেন। ক্রিষ্টিনের স্বভাব ঢের বেশী ধীর-স্থির, তাঁকে বোঝাও সহজ,—কিন্তু নিবেদিতার মত মাতিয়ে তুলতে পারতেন না তিনি। নিবেদিতার কণ্ঠে যেন মধু ছিল, তাইতে সবার মন কেড়ে নিত। চোখের স্বচ্ছ-স্নিগ্ধ দ্যুতি দেখে মেয়েরা বলাবলি করে, 'নিবেদিতা যেন মা সরস্বতী,—স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন আমাদের মাঝে। সরস্বতীর মতই ধব্‌ধবে রং, তেমনি নির্মল দুটি চোখের চাউনি!'

এই সাদৃশ্যটা মনে আসে বলে সরস্বতী পুজো যেন আরও জমজমাট ওদের কাছে। মাঘের শুক্লা পঞ্চমীতে পুজো। নিবেদিতা খালি পায়ে বেরিয়ে পড়েন বাড়ি-বাড়ি সবাইকে নিমন্ত্রণ করতে। ভোগ রাঁধবার জন্ম বামুন আসে। রকমারি মিষ্টির সঙ্গে আরও নানা রকম রান্না হয়, ভোগ নিবেদনের পর প্রসাদ বিতরণ হবে। পাড়ার গরীব বিধবাদের উপর সেদিন কাজের ভার, তারা ছাদে এসে জড়ো হয়। বছরে এই একটি দিন নিবেদিতা সাদা রেশমের শাড়ি পরেন। বিভূতি-লিপ্ত ললাট, দুই ভুরুর মাঝখানে রক্তচন্দনের একটি টিপ, হাতে একটি ঘট নিয়ে গঙ্গাজল আনবার জন্ম বাইরে আসতেই মিলিত কণ্ঠে আনন্দধ্বনি ওঠে। নিবেদিতা যেন বিদ্যালয়ের অধিষ্ঠাত্রী সাক্ষাৎ সরস্বতী।

পুজোর মণ্ডপ বাঁধা হয়েছে। ফুলে-ছাওয়া বেদির 'পরে শরের কলম, পেনসিল আর বইয়ের গাদা, আর মরালবাহিনী বীণাপাণি সরস্বতীর একটি প্রতিকৃতি। সামনে পুষ্পপাত্র আর নৈবেদ্য সাজানো, পূজানুষ্ঠান করলেন নিবেদিতা নিজে। যোগীন-মা মন্ত্র বলে দিলেন, দেখিয়ে দিলেন কি কি করতে হবে।

মেয়েরা ধ্বনি দিয়ে ওঠে—'সরস্বতী মাঈ কী জয়!'

'জয়!' নিবেদিতা বললেন, 'সবই পুজোর মন্ত্র।'

খানিক রাত হতে বাইরের সবাই যখন চলে গেল, মেয়েরা তখন বাজি পোড়াতে আরম্ভ করল, জ্বালাল মাটির প্রদীপ। চার দিক নিঃসাড় না হওয়া পর্যন্ত নিবেদিতা বসে রইলেন পুজো-মণ্ডপে।

পরদিন ফুল আর মালার বোঝার সঙ্গে সরস্বতীর ছবিটি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে আসা হল। স্কুলে নতুন উৎসাহে আবার লেখাপড়া শুরু হয়েছে। মা সরস্বতী সবাইকে আশীর্বাদ করে গেছেন।

[ক্রমশঃ

অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী

* ৪ঠা জুলাই ১৯০৪-এর চিঠি

সা হি ত্য

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

শ্রীধর স্বামী—টীকাকার। জন্ম—১৪শ (আনু) শতাব্দীতে গুর্জ্জর দেশে বলভী নগরে। পরমানন্দ পুরীর নিকট দীক্ষা লাভ। গ্রন্থ—ভাবার্থদীপিকা (শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা), মহিম্নস্তবের টীকা, গীতার টীকা, বিষ্ণুপুরাণের টীকা, ব্রজবিহার কাব্য।

শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি—মীমাংসাকার। জন্ম—১৫শ শতাব্দী নবদ্বীপে। পিতা—শ্রীকরণাচার্য। গ্রন্থ—দায়তত্ত্বার্ণব, কৃত্যতত্ত্বার্ণব, উদ্বাহতত্ত্বার্ণব।

শ্রীনাথ চন্দ, পণ্ডিত—সাময়িকপত্রসেবী। নিবাস—মৈমনসিংহ। কর্ম—জেলা স্কুলের পণ্ডিত। সম্পাদক—বাঙ্গালী (মাসিক, মৈমনসিংহ, ১৮৭৪), সঞ্জীবনী (সাপ্তাহিক, ১৮৭৮), সেবক (মাসিক, ১৩০১)।

শ্রীনাথচন্দ্র শিরোমণি—সংস্কৃত পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৫৫ খৃঃ মেদিনীপুর জেলায়। মৃত্যু—১৯০৮ খৃঃ মেদিনীপুরে ধান্দা গ্রামে। পিতা—রামশঙ্কর বিদ্যারত্ন। গ্রন্থ—হিন্দুক্রিয়া-কল্পদ্রুম, চতুর্বেদীয় সন্ধ্যাতত্ত্ব, শীতলার্চন চন্দ্রিকা ও শীতলা মাতার ইতিকথা (১৩০৮ বঙ্গ)।

শ্রীনাথচরণ মাসান্ত—শিক্ষাবিদ্ ও সাময়িকপত্রসেবী। জন্ম—মেদিনীপুর জেলায়। শিক্ষা—হুগলী নর্মাল স্কুল। কর্ম—শিক্ষকতা, বাসুদেবপুর, ঘাটাল, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্কুলে। বাসুদেবপুর হরিসভাধ্যক্ষ। গ্রন্থ—পঞ্চপরিচয় (১২৭৯, পৌষ)। সম্পাদক—ঘাটাল পত্রিকা।

শ্রীনাথ চৌধুরী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আমি তো উন্মাদিনী (১৮৭৪)।

শ্রীনাথ দত্ত—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—ব্যবসায়ী (মাসিক, ১২৮৩)।

শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সর্পাঘাত চিকিৎসা-প্রণালী (১৮৭৩), A brief sketch of life of Pundit Prananath Saraswati (কলি, ১৮৯৪)। সম্পাদক—সত্যজ্ঞান-সঞ্চারিণী পত্রিকা (মাসিক, ১৮৫৬, মে)।

শ্রীনাথ বালিয়া—পল্লীকবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। গীতিকাব্য—কৃষ্ণ ও লীলা, শান্তি।

শ্রীনাথ রায়—সাময়িকপত্রসেবী। যুগ্ম সম্পাদক—সংবাদ-ভাস্কর (সাপ্তাহিক, ১৮৩৯, মার্চ)।

শ্রীনাথ সিংহরায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—হিন্দু-রঞ্জিকা (মাসিক, ১৮৬৫, ডিসেম্বর, বোয়ালিয়া ধর্মসভার মুখপত্র)।

শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—[illegible] ([illegible])।

শ্রীপতিমোহন ঘোষ—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—অভিসার, স্বয়ম্বরা, বিজয়িনী।

শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—জ্ঞান-দর্শন (মাসিক, ১৮৫১, মে)।

শ্রীপতি রায়—আইনজ্ঞ। গ্রন্থ—Customs and Customery Laws in British India (কলি, ১৯১১)।

শ্রীরাম শাস্ত্রী—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। গ্রন্থ—তত্ত্ববোধ, লক্ষ্মীচরিত্র, চাণক্য শ্লোক, রহস্যলহরী, ২ খণ্ড, মোহমুদ্গার, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, এতদ্ব্যতীত পাঠ্যপুস্তক।

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বঙ্গেশ্বর (১৩০২)।

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রতিমা, শিবাচার্য ঠাকুর (কাব্য, ১৩১৪)।

শ্রীশচন্দ্র নন্দী, মহারাজা—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৯৭ খৃঃ কাশিমবাজার রাজবংশে। মৃত্যু—১৯৫২ খৃঃ ২রা ফেব্রুয়ারী। পিতা—মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। শিক্ষা—এম-এ। বাংলা সরকারের মন্ত্রী (১৯৩৬—১৯৪১), কলিকাতার শেরিফ (১৯৫১)। সঙ্গীত ও সাহিত্যানুরাগী। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। গ্রন্থ—মনোপ্যাথী (নাট্য রূপান্তরিত), Bengal rivers and our economic welfare, Bengal river's problem, Food and its remedy.

শ্রীশচন্দ্র বসু—সরকারী কর্মচারী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৬১খৃঃ ২রা মার্চ পঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে। পিতা—শ্যামাচরণ বসু (পঞ্জাব)। শিক্ষা—প্রবেশিকা (কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৭৬), বি-এ (১৮৮১); সেণ্ট্রাল ট্রেনিং কলেজ (পঞ্জাব, ১৮৮৩); আরবী ভাষা শিক্ষা। আইন পরীক্ষা (১৮৮৬, এলাহাবাদ)। কর্ম—শিক্ষক, লাহোর গভর্ণমেণ্ট স্কুল, প্রধান শিক্ষক, মডেল স্কুল, আইন ব্যবসায় (মীরাট), মুন্সেফ, আইন ব্যবসায় (এলাহাবাদ, ১৮৮৯), আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ ও মুন্সেফী গ্রহণ (গাজীপুর), বারাণসী, (১৮৯৬), এলাহাবাদ (১৯০৯)। কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষা। ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ (বারাণসী, ১৯১০); 'বিদ্যার্ণব' ও 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ। প্রতিষ্ঠাতা—The Indian Girls Free High School (এলাহাবাদ, ১৮৮৮), পাণিনি কার্যালয় ও হিন্দু সাহিত্য প্রচারালয় (ভ্রাতা মেজর বামনদাস বসু সহ)। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—Association for the encouragement of Female Education in the Northwest & Oudh, বারাণসী হিন্দু কলেজ। গ্রন্থ—অনুবাদ (ইংরেজী)—The Brihadaranyak Upanishad (১৯১৬), The Yoga Sastra (এলাহাবাদ, SBE, ১৯১৫), The Daily Practice of the Hindus (ঐ, ১৯১৮), Studies in the Vedanta Sutras (১৯১৯), Yagyavalkya Smriti (১৯১৮), The Astadhyayi Panini (১৮৯২-৯৯), The Siddhanta Kaumudi (১৯০২-৭), Easy Introduction to Yoga Philosophy (১৯১৪), Folk Tales of Hindusthan, Three Truths of Theosophy, The Daily Practice of the Hindus, Shiva Sanhita.

শ্রীশচন্দ্র বসু—গ্রন্থকার। নিবাস—চন্দননগর। গ্রন্থ—লীলা, প্রতাপ ও সংসার।

শ্রীশচন্দ্র বসু—আইনজীবী। জন্ম—চন্দননগর। বার-এট্-ল। গ্রন্থ—বুদ্ধ, নলদময়ন্তী, মালতীমাধব, পুণ্ডরীক, সন্দিগ্ধা, The story of Nurjahan, The reminiscense. যুগ্ম-সম্পাদক—Amateur workshop.

শ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—শ্রীহট্ট। শিক্ষা—বি-এ। 'তত্ত্বরত্ন', 'বিদ্যাভূষণ', 'বেদান্তভূষণ,' 'ভাগবতরত্ন' উপাধি লাভ। অধ্যাপক ও অস্থায়ী অধ্যক্ষ, শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজ। গ্রন্থ—ধ্যানযোগ, বাসন্তী গীতা, Heart-beats, প্রভৃতি (কবিতা)

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার—সাহিত্যিক। জন্ম—বর্ধমান জেলায় বৈদ্যনপাড়া গ্রামে বৈদ্যবংশে। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। ইঁহার অনুজ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। গ্রন্থ—কৃতজ্ঞতা (১৩০২), ফুলজানি (১৩০১), বিশ্বনাথ, শক্তিকানন (১২৯৩)। সম্পাদক—বঙ্গদর্শন (১৩০০)।

শ্রীশচন্দ্র রায়, মহারাজ—বিদ্যোৎসাহী। জন্ম—১৮১১ খৃঃ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের রাজবংশে। মৃত্যু—১৮৫৬ খৃঃ। ইনি রাজা গিরিশচন্দ্র রায়ের দত্তক পুত্র। ২২ বৎসর বয়সে (১৮৪১) রাজাসন প্রাপ্ত হন। 'মহারাজ বাহাদুর' উপাধি লাভ (১৮৪৮)। গ্রন্থ—সাধন-সঙ্গীত।

শ্রীশচন্দ্র রায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—সেবক (১৩২৩-২৪)।

শ্রীশচন্দ্র শর্মা ভট্ট—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ইলা (ঐতি উপ, ১২৯৬), প্রমীলা (১২৯৬)।

শ্রীশচন্দ্র সেনগুপ্ত—সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৬৭ খৃঃ (আনু) হুগলী জেলার সোমড়াবাজার নামক গ্রামে। মৃত্যু—১৯৪৭ খৃঃ। বিভিন্ন সাময়িকপত্রের নিয়মিত লেখক। গ্রন্থ—গ্রহমুক্তি (নাটক)।

শ্রীশচন্দ্র সর্বাধিকারী—সংবাদপত্রসেবী। জন্ম—১৮৪৪ খৃঃ। মৃত্যু—১৯১২ খৃঃ ১২ই জুলাই। ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত। 'রায়বাহাদুর' উপাধি লাভ (১৯১২)। পরিচালক—'নেশান' পত্র (নগেন্দ্রনাথ ঘোষের মৃত্যুর পর)। সম্পাদক—হিন্দু পেট্রিয়ট (দৈনিক)।

শ্রীশচন্দ্র সুর—নাট্যকার। নিবাস—চন্দননগর। বি-এ, বি-এল। গ্রন্থ—মোগলপাঠান, বরের বাবা, জাগরণ, কলির স্বর্গজয়।

শ্রীহর্ষ—কবি। মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তন্মধ্যে ইনি অন্যতম। বিক্রমপুরের রাজধানী রামপালে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। আবির্ভাব—(আনু) ১০০০ খৃঃ। পিতা—শ্রীহীর। মাতা—মামল্ল দেবী। বঙ্গের 'মুখোপাধ্যায়' উপাধিধারী কুলীন ব্রাহ্মণগণের পূর্বপুরুষ। গ্রন্থ—নৈষধচরিত (কাব্য), গৌড়োর্বীশকুলপ্রশস্তি, অর্ণববর্ণনকাব্য, নবসাহসাঙ্ক-চরিত, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য।

ষষ্ঠীদাস সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—হরিণী উপন্যাস (১২৯১)।

ষষ্ঠীবর সেন—স্বভাবকবি। জন্ম—১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ববঙ্গের ঝিনারদি (দীনার দ্বীপ)। জগদানন্দ নামে কোন ধনীর আশ্রয়ে থাকিয়া গ্রন্থ রচনা। কাব্যগ্রন্থ—মহাভারত, রামায়ণ, পদ্মপুরাণ।

ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১৩০০ বঙ্গ অগ্রহায়ণ ফরিদপুর জেলার ছয়গাঁও গ্রামে। শিক্ষা—আই-এ (ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল), বি-এ (জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা)। কর্ম—সরকারী আবগারী বিভাগে। অবসর গ্রহণ (১৩৫১)। পাঠ্যাবস্থা হইতেই সাহিত্য রচনা। বি-এ পাঠ কালে জগন্নাথ কলেজের ম্যাগাজিনের সম্পাদক। 'দশের পূজা' নামক বারোয়ারী উপন্যাসের অন্যতম লেখক। 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—ইতিহাসের কথা, অঞ্জলি, মেওয়া।

ষোড়শীচরণ মিত্র—সাময়িকপত্রসেবী। জন্ম—হুগলী জেলার অন্তর্গত পানিসেহোলা গ্রামে। পিতা—ঈশানচন্দ্র মিত্র। মাতা—কৃষ্ণকামিনী। কর্ম—আইন ব্যবসায়, পাটনা হাইকোর্ট। সম্পাদক—হিন্দুদর্পণ (পাক্ষিক, কলি, ১২৮১)।

ষোড়শীবালা দাসী—মহিলা কবি। কাব্যগ্রন্থ—পুষ্পপুঞ্জ (১২৯১)।

সংসারচন্দ্র সেন—প্রবাসী শিক্ষাব্রতী ও রাজকর্মচারী। জন্ম—১৮৪৬ খৃঃ ১৩ই এপ্রিল আগ্রায়। মৃত্যু—১৯০৬ খৃঃ জয়পুরে। পৈতৃক নিবাস—কলিকাতার উপকণ্ঠে নাটাগোড় গ্রামে। পিতা—নীলাম্বর সেন। শিক্ষা—প্রবেশিকা (কলিকাতা সেন্ট জন স্কুল, ১৮৬৪), এফ-এ (আগ্রা কলেজ), আইনঅধ্যয়ন। কর্ম—জয়পুর রাজসরকারে। শিক্ষকতা, মহারাজা কলেজ (জয়পুর), অধ্যাপক (ঐ), রাজমুদ্রালয়ের অধ্যক্ষ (জয়পুর)। জয়পুর মহারাজা মাধো সিং-এর গৃহশিক্ষক ও প্রাইভেট সেক্রেটারী (১৮৮০-১৯০২), প্রধান মন্ত্রী (১৯০১)। ইংলণ্ডে গমন (১৯০২)। সম্পাদক—জয়পুর সরকারী গেজেট। গ্রন্থ—জয়পুর রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী (ইংরেজী)।

সখারাম গণেশ দেউস্কর—পুরাতত্ত্ববিদ্। জন্ম—১৮৬৯ খৃঃ পৌষ বৈদ্যনাথধামে মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ-বংশে। মৃত্যু—১৯১২ খৃঃ ২৩এ নভেম্বর বৈদ্যনাথধামে। পিতা—সদাশিব গণেশ দেউস্কর। বাল্যকাল হইতেই বাঙলায় অবস্থান ও বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলন এবং বঙ্গভাষার লেখক। বাঙলায় 'শিবাজী' উৎসবের প্রবর্তক। শিক্ষা—প্রবেশিকা (বৈদ্যনাথ ইংরেজি স্কুল, ১৮৯০)। কর্ম—শিক্ষকতা, বৈদ্যনাথ ইংরেজি স্কুল (১৮৯৩), কলিকাতায় হিতবাদী পত্রিকার প্রথমে প্রুফরীডার, পরে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান। গ্রন্থ—মহামতি রাণাডে, আনন্দীবাঈ, দেশের কথা (বাংলা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত), বাজীরাও, তিলকের মোকদ্দমা, এটা কোন্ যুগ, ঝাঁসির রাজকুমার। সম্পাদক—হিতবাদী (১৯০৫)।

সচ্চিদানন্দ সরস্বতী—সাধক। ইনি নানা ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ—সাধনপ্রদীপ, গুরুপ্রদীপ, গীতাপ্রদীপ, সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তত্ত্বরহস্য, পূজা-প্রদীপ, সন্ধ্যারহস্য, কাশীধাম, জ্ঞানপ্রদীপ, গদাধর।

সজনীকান্ত দাস—কবি, সাহিত্যিক ও সমালোচক। জন্ম—১৯০০ খৃঃ ২৫এ আগষ্ট বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বেতালবন গ্রামে (মাতুলালয়ে)। পৈতৃক নিবাস—বীরভূম জেলার রাইপুর গ্রামে। পিতা—হরেন্দ্রলাল দাস (পার্টিশন ডেপুটি-কলেক্টর)। মাতা—তুঙ্গলতা। শিক্ষা—রাইপুরের বিদ্যালয়, দীন পণ্ডিতের পাঠশালা (মালদহ), মালদহ জেলা স্কুল, পাবনা জেলা স্কুল; প্রবেশিকা (দিনাজপুর জেলা স্কুল, ১৯১৮), আই-এসসি (বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান মিশনারী কলেজ, ১৯২০),

বি-এস্‌সি (স্কটিশ চার্চ কলেজ, ১৯২২), বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে (মাত্র দেড় মাস), এম-এস্‌সি—'ফিজিক্স' হইতে সম্পূর্ণ কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই—(সায়ান্স কলেজে)। কর্ম—প্রবাসী কার্যালয় (১৯২৪—১৯৩১), বিশ্বভারতী (অবৈতনিক), কার্যাধ্যক্ষ, মেট্রোপলিট্যান প্রিন্টিং এ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ (১৯৩২)। স্থাপনা—রঞ্জন প্রকাশালয় (১৯২৮), শনিরঞ্জন প্রেস (১৯৩১), শনিবারের চিঠি প্রকাশ। পরিচালনা—বিজলী, যুগবাণী, চিত্ররেখা। বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী। সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা 'ভাবকুমার প্রধান' ছদ্মনামে 'আবাহন' শনিবারের চিঠিতে ও স্বনামে 'স্বপ্নজাগরণ' প্রবাসীতে (১৩৩১, অগ্রহায়ণ)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট—গ্রন্থাধ্যক্ষ (১৩৪৪—৪৬), পত্রিকাধ্যক্ষ (১৩৪৬—৪৭), সম্পাদক (১৩৫২-৫৫), সহ সভাপতি (১৩৫৬—৫৭) ও সভাপতি (১৩৫৯) রূপে পরিষদের সেবা করিয়া আসিতেছেন। স্বদেশী সঙ্গীত রচনা ও 'অভ্যুদয়' গীতিনাট্যের অধিকাংশ সঙ্গীত রচনায় খ্যাতি অর্জন করেন। গ্রন্থ—অজয় (উপ, ১৩৩৬), পথ চলতে ঘাসের ফুল (গীতিকাব্য, ১৩৩৬), বঙ্গরণভূমে (১৩৩১), মনোদর্পণ (ব্যঙ্গকবিতা, ১৩৩১), মধু ও হুল (১৩৩৮), অঙ্গুষ্ঠ (ব্যঙ্গকবিতা, ১৩৩৯), রাজহংস (কাব্য, ১৩৪২), আলো-আঁধারি (ঐ, ১৩৪৩), কলিকাল (হাসির গল্প, ১৩৪৭), কেড্‌স ও স্যাণ্ডাল (কবিতা, ১৩৪৭), উইলিয়ম কেরী (১৩৪৯), পঁচিশে বৈশাখ (কাব্য, ১৩৪৯), মানস সরোবর (ঐ, ১৩৪৯), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ, ১৩৪৯), বাংলার কবিগান (১৩৫১), মৃত্যুদূত (১৩৫১), রাজমোহনের স্ত্রী (বঙ্কিমচন্দ্রের Rajmohan's Wife হইতে অনূদিত)। আকাশ বাসর (গ, ১৩৫১), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১৩৫৩), পথের সন্ধান (সন্দর্ভ, ১৩৫৩), সম্পাদিত গ্রন্থ—কাশীরাম দাসের মহাভারত (১৩৩৪), রজত-জয়ন্তী: ভারত সাম্রাজ্যের পঁচিশ বৎসর (১৯৩৫), বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী (অন্যতম সম্পাদক, ১৩৪৪), কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ (১৩৪৬), কথোপকথন (১৩৪৯); [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ]—বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, ১-৯ খণ্ড (১৩৪৫-৪৮), আলালের ঘরের দুলাল (১৩৪৭), রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১-২ খণ্ড (১৩৪৭-৪৮), মধুসূদন গ্রন্থাবলী, ১-২ খণ্ড (১৩৪৭-৪৮), ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১-২ খণ্ড (১৩৪৯-৫০), বাংলার কবি ও কাব্য গ্রন্থমালা (১৩৪৯-৫১), দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী, ১-২ খণ্ড (১৩৫০-১৩৫১), পালামৌ (১৩৫১), রামমোহন গ্রন্থাবলী, ১-২ খণ্ড (১৩৫১-৫২) শকুন্তলা (১৩৫২), দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী (১৩৫৩), হুতোম প্যাঁচার নক্সা ও অন্যান্য সমাজচিত্র (১৩৫৫), সীতার বনবাস (১৩৫৫), রামেন্দ্র রচনাবলী ১-৪ খণ্ড (১৩৫৬-৫৭), সারদামঙ্গল (১৩৫৬), মহিলা (১৩৫৭), শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী (১৩৫৭), হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী (১৩৬১)। সহ-সম্পাদক—শনিবারের চিঠি (সাপ্তাহিক, ১৩৩১, ২৮শে অগ্রহায়ণ), সম্পাদক—শনিবারের চিঠি (১৩৩৫, আশ্বিন), বঙ্গশ্রী (১৩৩৯-১৩৪১), অলকা (১৩৪৫-৪৭)।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৩৪ খৃঃ বৈশাখ ২৪-পরগনার অন্তর্গত কাঁঠালপাড়ায়। মৃত্যু—১৮৮৯ খৃঃ বৈশাখ। ছদ্মনাম—প্রমথনাথ বসু। পিতা—যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। শিক্ষা—মেদিনীপুর স্কুল, হুগলী কলেজ। কর্ম—অ্যাসেসরি, ডেপুটি স্পেশাল সব রেজিষ্ট্রার, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। গ্রন্থ—যাত্রাসমালোচনা (১৮৭৫), রামেশ্বরের অদৃষ্ট (উপ, ১২৮৩), কণ্ঠমালা (উপ, ১৮৭৭), সংস্কার (প্র, ১৮৮১), বাল্যবিবাহ (প্র, ১৮৮২), জাল প্রতাপ (১৮৮৩), মাধবীলতা (উপ, ১২৯১), দামিনী (উপ), পালামৌ (ভ্রঃ), জয়চাঁদের চিঠি, Bengal Rayets. সম্পাদক—ভ্রমর (মাসিক), বঙ্গদর্শন (মাসিক, ১২৮৭-৮৯)।

সতীনাথ ভাদুড়ী—শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান ও কারাবরণ। গ্রন্থ—সত্যি ভ্রমণ কাহিনী, ঢোঁড়াই চরিত মানস, ২ খণ্ড, জাগরী (রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত)।

সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কোণের বউ (১২৯৬)।

সতীশচন্দ্র ঘটক—কবি। জন্ম—১৮৮৫ খৃঃ ৪ঠা মে। মৃত্যু—১৯৩২ খৃঃ ১৬ই জুন ভবানীপুরে। শিক্ষা—এম-এ, বি-এল। আইন ব্যবসায়ী। ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যঙ্গরসাত্মক কবি হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। গ্রন্থ—রঙ্গ ও ব্যঙ্গ, পরীর বে, সতীর তেজ, ঝলক, লালিকাগুচ্ছ, নাটিকাগুচ্ছ, (৫ খানি), হাটেহাঁড়ি, অগ্নিশিখা, পদধূলি, শিবপূজা।

সতীশচন্দ্র ঘোষ—গ্রন্থকার। জন্ম—চট্টগ্রামের রাঙামাটি গ্রামে। গ্রন্থ—চাক্‌মা জাতি, সংযুক্ত।

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী—সাহিত্যসেবী। জন্ম—১২৮৬ বঙ্গ ১৬ই ভাদ্র মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইলের অন্তর্গত নবগ্রামে। মৃত্যু—১৩২১ বঙ্গ ২০এ পৌষ। ছদ্মনাম—ভবঘুরে। ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রাহক। সম্পাদক—চতুর্মুখ (ব্যঙ্গাত্মক পত্র, মৈমনসিংহ)।

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলার ধলা গ্রামে। গ্রন্থ—ভারতপথিক সহায়।

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ললনাসুহৃদ, রায় পরিবার, শান্তিনীতি।

সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—নাট্যকার। নাট্যগ্রন্থ—চণ্ডীরাম, জাহানারা, নূতন বাবু, অন্নপূর্ণা, শ্রীরাধা ধর্মপথ।

সতীশচন্দ্র দত্ত—কবি। কাব্যগ্রন্থ—চিন্তালহরী বা পদ্যময়ী (১২৯৪)।

সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত—গান্ধীবাদী জনসেবক। জন্ম—১৮৮২ খৃঃ। ডি-এস্‌-সি (কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়)। কর্ম—বেঙ্গল কেমিক্যালের পরিদর্শক। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ও কারাবরণ। খাদি প্রতিষ্ঠান স্থাপন। হরিজন আন্দোলনের অন্যতম নেতা। কুটিরশিল্পের প্রতিষ্ঠা। গ্রন্থ—গান্ধীজীর আত্মকথা, ২ ভাগ (১৩১৮), দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ, বারদৌলী সত্যাগ্রহ, হিন্দু স্বরাজ্য, স্বাস্থ্যরক্ষা, জীবনব্রত বা গান্ধীবাদ, গান্ধীভাষ্য, অনাসক্তি যোগ (অনুবাদ, ১৩৩৭), ভারতের সাম্যবাদ (১৩৩৭)। সম্পাদক—রাষ্ট্রবাণী (সাপ্তাহিক)।

সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রাজারাণী (১২৯৮)।

সতীশচন্দ্র বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পল্লীগ্রাম (১২৯৯)।

সতীশচন্দ্র বসু—প্রবাসী সাহিত্যসেবী। আগ্রা নিবাসী। হিন্দী, উর্দু ভাষায় অভিজ্ঞ এবং উভয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা। গ্রন্থ—উর্দু ভাষায়—অঙ্গুষত্রী, বসন্তবাহার (না), কামিনী (উপ), সলিমা বেগম (উপ), চন্দ্র পদ্ম; হিন্দী ভাষায়—ম্যঁয় তুম হাঁ রাহী হুঁ, সাধ্বী সুরেন্দ্র (না), জ্ঞাতত্ত্বম্ (ধ), হডি ওঁ কি সনাক্ত (চিকিৎসা), সওয়াল জবাব কেমিষ্ট্রী বা ক্লীতুল কিমীয়া (রসায়ন গ্রন্থ)।

সতীশচন্দ্র বাগচী—আইনজ্ঞ। অধ্যক্ষ, কলিকাতা ল কলেজ। গ্রন্থ—ফরাসী গল্প।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮৭০ খৃঃ জুলাই নবদ্বীপে। মৃত্যু—১৯২০ খৃঃ। পিতা—পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। পালি, তিব্বতীয় ও জার্মান ভাষায় সুপণ্ডিত। শিক্ষা—এম-এ, 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি লাভ (নবদ্বীপ, বিদগ্ধজননী সভা), পি-এইচ-ডি; মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ। কর্ম—তিব্বতীয় অনুবাদক, বাঙলা সরকার (১৮৯৭), অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ (১৯০০), প্রেসিডেন্সী কলেজ (১৯০২), অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ (১৯১১)। গ্রন্থ—আত্মতত্ত্বপ্রকাশ, পালি ব্যাকরণ, বুদ্ধদেব, ভবভূতি, Nyaya-sutras & Gotama (SBE), History of Mediaeval School of Indian logic. সম্পাদক—সাহিত্যপরিষদ্ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক, ১৩১৯—২২)।

সতীশচন্দ্র মাইতি—শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। জন্ম—মেদিনীপুরের সুতাহাটা থানার অন্তর্গত দোরো আকুবপুর গ্রামে। কর্ম—প্রধান শিক্ষক, দেউলপোতা মধ্য বঙ্গ বিদ্যালয়। গ্রন্থ—ব্যবস্থা-পঞ্চবিংশতি, প্রত্যুত্তর-লিপি।

সতীশচন্দ্র মিত্র—ঐতিহাসিক। জন্ম—খুলনা জেলা। মৃত্যু—১৩৩৮ বঙ্গ ৭ই জ্যৈষ্ঠ দৌলতপুরে। শিক্ষা—বি-এ। কর্ম—অধ্যাপক, দৌলতপুর কলেজ। 'কবিরঞ্জন' উপাধি লাভ। বাল্যকাল হইতেই ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধানে অনুরাগী। গ্রন্থ—উচ্ছ্বাস, ধম্মপদ (পদ্যানুবাদ), প্রতাপসিংহ, যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২ ভাগ (১৩২১), হরিদাস ঠাকুর, সপ্তগোস্বামী, শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ।

সতীশচন্দ্র মিত্র—নট ও নাট্যকার। জন্ম—মেদিনীপুর জেলার কপাশটিকরী গ্রামে। পিতা—রামসদয় মিত্র (উকীল)। মাতা-নিস্তারিণী দেবী। ইনি 'ভাকু বাবু' নামে সুপরিচিত। পরে মেদিনীপুর বিবিগঞ্জে বাস করেন। বাল্যকাল হইতেই অভিনয়। মেদিনীপুরে পেশাদারী থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। গ্রন্থ—বোনেদি বেহায়া (নাটক, ১৩০৯), গুপ্তদোল (প্রহসন, ১৩১০)।

সতীশচন্দ্র মিত্র—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। গ্রন্থ—শতদল।

সতীশচন্দ্র রায়—শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৭৩ বঙ্গ ১লা কার্ত্তিক পাবনা সাহাজাদপুরে জমীদার বংশে। মৃত্যু—১৩৩৮ বঙ্গ ৫ই জ্যৈষ্ঠ নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় ধামগড়ে। শিক্ষা—এম-এ (কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ)। কর্ম—অধ্যাপক, ঢাকা জগন্নাথ কলেজ। হিন্দী সাহিত্যে গভীর জ্ঞান। বহু সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। সহ সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। বহু বৈষ্ণব পদাবলী সংকলন করেন। গ্রন্থ—পদকল্পতরু, ৪ ভাগ (সংকলন, ১৩২২—৩৪), কালিদাসের মেঘদূত (পদ্যানুবাদ), জয়দেবের গীতগোবিন্দ (ঐ), কানুদেবের রসমঞ্জরী (ঐ), অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী; সম্পাদিত গ্রন্থ—হরিবংশ।

সতীশচন্দ্র রায়—অর্থশাস্ত্রবিদ্। শিক্ষা—এম-এ। গ্রন্থ—Agricultural Indebtedness in India, Permanent settlement in Bengal, Economic causes of famines in India. Land revenue administration in India.

সতীশচন্দ্র রায়—শিক্ষাব্রতী। অধ্যাপক, কটন কলেজ, গৌহাটী। গ্রন্থ—গুরুদক্ষিণা, সাবিত্রী।

সতীশচন্দ্র রায়—কবি। গ্রন্থ—বাসনাঞ্জলি (১৩০৭)।

সতীশচন্দ্র লাহিড়ী—গ্রন্থকার। শিক্ষা—বি-এ। গ্রন্থ—স্বাস্থ্য ও শতায়ু, রোগীর প্রতি উপদেশ।

সত্যকিঙ্কর বিশ্বাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দেশবন্ধুর কথা (১৩৫২)।

সত্যকৃষ্ণ রায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—চিকিৎসক ও সমালোচক (১৩০১-৩)।

সত্যগোপাল রায় বর্মণ—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—ক্ষত্রিয়বান্ধব (১৩৩৫)।

সত্যচরণ চক্রবর্তী—সাহিত্যিক। নিবাস—কোন্নগর, হুগলী। গ্রন্থ—বঙ্গবধূ, সোনার শিকল, কনে বৌ, প্রেমের হাট, মিলন-প্রহেলিকা, গৌরী, রাণী দুর্গাবতী, চিত্রে সতী সাধ্বী, সোরাব রোস্তম, সিন্ধবাদ, হাতেমতাই, দ্রৌপদী, সতীরাণী, দাতা কর্ণ, বামনের দেশ, দৈত্যপুরী, ঠাকুরমার ঝোলা, মজার গল্প, গল্পকথা, ডাইনির বাঁশী, ভক্তির ডোর, সোনার চাঁদ, হর-পার্বতী। সম্পাদক—খোকাখুকু (১৩৩০)।

সত্যচরণ মিত্র—কবি। গ্রন্থ—মধুর চুম্বন (১৮৮৪), অবলাবালা, আকাশগঙ্গা, বড় বউ, সহমরণ।

সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। আইন ব্যবসায়ী। পিতা—সর্দার উমাচরণ মুখোপাধ্যায় (ঢোলপুর রাজ্য, রাজপুতনা)। মাতা—গিরীন্দ্রনন্দিনী দেবী (গ্রন্থকর্ত্রী)। গ্রন্থ—সাময়িক ভারতের ইতিবৃত্ত।

সত্যচরণ শাস্ত্রী—জীবনী-লেখক। জন্ম—১৮৬৬ খৃঃ ১২ এপ্রিল দক্ষিণেশ্বরে; শিক্ষা—কাশী, 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ। বোম্বাই গমন, হিন্দী, মারাঠি, রুশ ভাষায় সুপণ্ডিত। রুশদেশের গুপ্তচর বলিয়া গ্রেপ্তার ও পরে মুক্তিলাভ। ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য মহারাষ্ট্র, শ্যাম, যাভা, বলীদ্বীপ প্রভৃতি পর্যটন। গ্রন্থ—ছত্রপতি শিবাজী, ভারতে অলিকসুন্দর, প্রতাপাদিত্য, আলিবর্দি খাঁ, জালিয়াৎ ক্লাইভ

সত্যচরণ সেন—আয়ুর্বেদবিদ। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক। সম্পাদক—আয়ুর্বিজ্ঞান (১৩৩৩-৩৪), আয়ুর্বিজ্ঞান-সম্মিলনী (১৩৩৮-৩৯)

সত্যনাথ বরা—অসমীয় সাময়িকপত্রসেবী। শিক্ষা—বি-এ বি-এল। সম্পাদক—জোনাকী (১৯০২, নবপর্যায়)।

সত্যব্রত সামশ্রমী—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। জন্ম—১৮৪৬ খৃঃ পাটনা। মৃত্যু—১৯১১ খৃঃ কলিকাতা। বাংলায় প্রথম বেদ অনুবাদক। বাংলা ভাষায় বেদবিদ্যার প্রথম প্রচারক ও সুলেখক। বঙ্গদেশে পণ্ডিতগণের বিচারে জয়লাভ করেন এবং কিছুদিন কাশ্মীর মহারাজা রণবীর সিংহের সভাপণ্ডিত, অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থ—বৈদিক নিরুক্ত, উষা, প্রত্নকম্রনন্দিনী। সম্পাদিত গ্রন্থ—সামবেদ। [ক্রমশঃ

আভা চট্টোপাধ্যায়

শুক্লার জীবনে এই নিয়ে তিন বার বিপর্য্যয় হোলো—সে অনেক ভেবে দেখলো তার পক্ষে সরোজকে নিয়ে আর সংসার করা একান্ত করেই চল্‌বে না—কাজেই সে শেষ বারের মতন সরোজকে ত্যাগ করে চলে যাবে এই সিদ্ধান্তই করলো। পরদিন সে সকল দুঃখের কথা জানিয়ে তার পিতা ঘনশ্যাম বাবুকে তাকে অনতিবিলম্বে নিয়ে যাবার জন্য তাগিদ দিয়ে চিঠি দিলো। চিঠি ছাড়বার পর বার বার তার এই কথাটাই মনে হোলো যে, সে সত্যিই সরোজকে একলা ফেলে কি চলে যেতে পারবে চিরদিনের জন্য? কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হোলো—উপায়ই বা কি? সে তো অনেক সহ্য করেছে এই সুদীর্ঘ তিন বছরে—বিয়ে হওয়া পর্য্যন্ত—কিন্তু এর শেষ কোথায়—আর তা কেমন করেই বা সে সহ্য করবে! তার কেবলই মনে দুলতে লাগলো সরোজকে ছেড়ে যাবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা ও তার সকল অপরাধ সহ্য করে ক্ষমা করে আঁকড়ে থাকবার অনতিক্রম্য বাধা। আলনায় সরোজের কাপড়-জামা গোছাতে গোছাতে তার মনটা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো। তার মনে হোলো সে চলে গেলে এই আত্মভোলা লোকটার কি দশা হবে—কোনো কাজেই তো তার যত্ন ও চেষ্টা নেই—বিশেষ ভাবে সংসারের—ওকালতি করবার জন্য যেটুকু প্রয়োজন শুধু সেইটুকুই সে জানে—আর জানে কেমন করে নেশা করতে হয় ও সে-নেশার জোরে তাকে সংসারের সব কিছুই ভুলিয়ে দেয়—এমন কি শুক্লাকে পর্য্যন্ত। তখন তার মনে থাকে না সে তার প্রতি কত অন্যায়, কত অত্যাচার করছে—আর শুক্লা তা নীরবে দিনের পর দিন অকুণ্ঠ চিত্তে সহ্য করে যাচ্ছে।

বিয়ে করার পর মাত্র কিছু দিন শুক্লা সরোজকে সংযত ও ভদ্র দেখেছিলো, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে দেখল যে, সে সকল ভদ্রতাকে ডিঙ্গিয়ে গিয়েছে। কিষণ চাকর যে কত দিনের পুরানো ও ছেলেবেলা থেকে থেকে সরোজের কাছে আছে সেও ইদানীং বিরক্ত হয়ে পড়েছিলো—সরোজের শুক্লার প্রতি ব্যবহার—কত দিন সে প্রতিবাদ করতে গিয়ে মার পর্য্যন্ত খেয়েছে—তবুও সে সরোজকে সত্যিই ভালবাসে—শ্রদ্ধা করে, তাই সকল অপমান সহ্য করে সেও আজ এখানে পড়ে আছে।

শুক্লা আরো কয়েক বার সরোজকে ছেড়ে যাবার সংকল্প করেছিলো—তার অভদ্র ব্যবহারে ও অত্যাচারে চিঠির কাগজ ও কলম নিয়ে বাবাকে চিঠিও লিখেছিলো কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বার বারই তার মনের গভীর অন্ধকারের আসনে যিনি বসে আছেন তাঁরই নির্দ্দেশে সে চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছিলো। কিন্তু এবার আর সে কিছুতেই তার মনকে বোঝাতে পারলে না, শেষ পর্য্যন্ত সেই আসনের অধিরাজকেও হার মানতে হোলো। সত্যিই, সহ্যেরও একটা সীমা আছে—এবার তার সহ্যের বাঁধ একেবারে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। ব্যাপারটা ঘটেছিলো ছোট কারণে কিন্তু সংসারে অনেক সময়ে খুব ছোটোখাটো জিনিষ নিয়েও প্রলয়-কাণ্ড হয়—এবারও হোলো তাই। বিকেলে কলেজ থেকে ছোট দেওর পুলক এসে আবদার করে তার বৌদিকে নিয়ে New Empire এ জলসা দেখতে যাবে বায়না ধরলো—শুক্লাও ছেলেবেলা থেকে গান-বাজনা অনেক শিখেছে—ঘনশ্যাম বাবুও নিজেও একজন বিত্তশালী ব্যক্তি—মেয়েকে যথাযোগ্য শিক্ষা ও গান-বাজনাও শিখিয়েছিলেন—আর এই সরোজই তার গান শুনে এত উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলো যে, সে শেষ পর্য্যন্ত শুক্লাকে বিবাহ না করে ছাড়েনি। পুলককে অভয় দিয়ে সে পরিপাটী করে চুল বাঁধলো—গা ধুয়ে সেজেগুজে সরোজের আশায় বসে রইলো। এমনি সময়ে সরোজ রোজই আসে কিন্তু কেন জানি না সেদিন অনেক দেরী করে অপেক্ষা করেও যখন শুক্লা সরোজের আসা দেখলো না—পুলকও ভীষণ তাড়া দিচ্ছে যাবার জন্য—তখন কিষণকে সব কথা বলে সরোজের চা-জলখাবার সব ঠিক করে রেখে সে ট্যাক্সি ডেকে নাচ দেখতে চলে গেলো। যথাসময়ে ফিরে দেখলে সরোজ বসে মদ খাচ্ছে—সঙ্গে রয়েছে ওর বন্ধু অনুপম। সরোজ সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসে শুক্লাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা না করে অত্যন্ত অকথ্য ইতর ভাষায় কতকগুলো কথা বললে যা শুনে শুক্লার সমস্ত শরীরের মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগলো। সে কোনো কথা না বলে উপরে চলে গেলো—তার নিজের ঘরে। সমস্ত রাত তার এতটুকু ঘুম হোলো না—সরোজের সেই ইতর কথাগুলি তার সমস্ত দেহ-মনে জ্বালা ধরিয়ে দিলে। ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলো শুক্লা—যখন ঘুম ভাঙলো তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে—লজ্জিত হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি সে বাথরুমে চলে গেলো। সরোজ মোটেই তার গত সন্ধ্যার ব্যবহারে অনুতপ্ত হয়নি—আজ তাই সে স্থির করলো—সে চলে যাবেই যাবে এবং চিরদিনের জন্য যাবে। সে সব চেয়ে বেশী ব্যথা পেয়েছিলো অনুপমের সামনে তাকে এই ভাবে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করাতে। সে গালাগালির মাঝে অনেক প্রচ্ছন্ন ইতর ইঙ্গিত ছিলো যা সম্পূর্ণ অসত্য ও অত্যন্ত অভদ্র। শুক্লা নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলে

না—সে যাবেই যাবে—তাই সরোজ কোর্টে যেতে সে তার বাবাকে চিঠি লিখে ডাকে না ছাড়া পর্য্যন্ত কিছুতেই স্থির হতে পারছিলো না। আর সে দুর্ব্বল হবে না—সে যাবেই যাবে। আর সে এই বর্ব্বরটার কাছে এক মুহূর্ত্তও থাকবে না। কী তার অপরাধ? সে সব সহ্য করতে পারে—কিন্তু এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত সে কোনোমতেই বরদাস্ত করতে পারবে না।

২

ঘনশ্যাম ঘোষাল মহাশয় দ্বারভাঙ্গার একজন বিশিষ্ট নাগরিক। তিনি মহারাজার একজন পদস্থ কর্ম্মচারী এবং মহারাজার বিশেষ সম্মানিত বন্ধু। তিনি নিজে একজন সুরসিক বিদ্বান ও সঙ্গীতজ্ঞ বলে সকলেরই প্রিয়পাত্র। শুক্লা তাঁরই একমাত্র মেয়ে। শুক্লার যখন দশ বছর বয়স সেই সময় তার মাতাঠাকুরাণী লোকান্তর গমন করেন, কাজেই শুক্লা ঘনশ্যামের নয়নের মণি। সে আজ দশ বছর হয়ে গেলো। শুক্লা Inter পাশ করে Philosophyতে Honours নিয়ে B. A পড়ছে। গান-বাজনাতেও তার ভীষণ ঝোঁক—ঘনশ্যাম তাকে শৈশবে নিজেই তালিম দিয়ে বেশ এগিয়ে দিয়েছিলেন, তার পর ওস্তাদ রেখে সে গান ও সেতার বাজাতে শেখে। ক্রমে ক্রমে তার গানের অপূর্ব্ব মায়াজাল সকলকে মুগ্ধ করল। কলেজে বা সহরে এমন কোনো আসর বা উৎসবই হোতো না যেখানে তার ডাক না পড়তো—বিশেষ করে গান-বাজনার আসরে। শুক্লার সত্যিকারের সুন্দরী বলেও একটা খ্যাতি ছিল—আর খ্যাতি ছিল তার অমায়িক ও অপূর্ব্ব ব্যবহারের। মহারাজার এক জটিল মকর্দ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে ঘনশ্যামকে পাটনা যেতে হয়েছিলো—কাজেই শুক্লারও তাঁর সঙ্গে না গিয়ে উপায় ছিল না। পাটনার বড় বড় কৌসলী ছাড়া কলকাতা থেকেও ২।১ জন বড় কৌঁসুলী আনতে হয়েছিলো—তাঁদেরই এক জনের সঙ্গে সরোজ এসেছিলো মহারাজার তরফে মামলার ব্যাপারে। কৌঁসুলী সাহেব উঠলেন সাহেবী হোটেলে কিন্তু সরোজকে ঘোষাল মশাই নিজের গৃহেই থাকতে বললেন কারণ তাহলে মামলার ব্যাপারে অনেক সময়ে তাকে সব বোঝানোর সুবিধা হবে। কাজেই সরোজের সুখ-সুবিধার খাওয়া-দাওয়ার ভার পড়লো শুক্লার উপর। সরোজ ওকালতি পাশ করে ২।১ বছর ব্রিফ নিয়ে হাইকোর্টে যাতায়াত সবে সুরু করেছে—সামান্য দক্ষিণাতেই সে কৌঁসুলী সাহেবের সঙ্গে পাটনা যেতে রাজী হোলো—মামলা অনেক দিন চলবে এই আশায়। শুক্লা যথাসাধ্য সরোজকে দেখাশোনা করতে লাগলো—ঘনশ্যাম খুবই খুশী হলেন মেয়ের অতিথিসেবায়। মামলার জটিল আলাপ-আলোচনার মাঝে অবসর সময়ে তারা নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতো—শুক্লার অদ্ভুত রকম সকল খবর জানা দেখে সরোজ আশ্চর্য্য হয়ে যেতো। ভাবতো কেমন করে মেয়েটি বিশ্বের এত খবর জানলে যা সেও জানে না। কিন্তু সে পরমাশ্চর্য্য হোলো শুক্লা আর এক নূতন বিদ্যায় পারদর্শিনী জেনে। পাটনায় কি একটা বড় উৎসবে একটা বড় রকমের সঙ্গীতের আসর হয়েছিলো—কাজেই শুক্লার সেখানে ডাক পড়লো
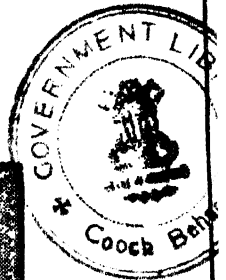
আর কলকাতা থেকেও এলেন অনেক নামজাদা সঙ্গীতজ্ঞ। সেই আসরে শুক্লার অপূর্ব্ব গান শুনে কলকাতার সুরসাগর পঙ্কজ মল্লিক উঠে এসে যখন অনেক কথার পর এ কথাও বললেন যে, একদিন তার ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই উজ্জ্বল হবে, যখন তাকে সমস্ত জনতার সামনে তিনি অভিনন্দন জানালেন তখন শুক্লা তার জীবনে সেইটাই শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে জানলো। সে সর্ব্বান্তঃকরণে এই আশীর্বাণী তার অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করলো। সরোজ জানতো না শুক্লা এত ভাল গান জানে—বিশেষ করে রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও কীর্ত্তন। সে সেই মুহূর্ত্ত থেকে শুক্লাকে যেন অন্য চোখে দেখতে লাগলো এবং সেই মুহূর্ত্ত থেকেই তার জীবনে সব চেয়ে দুর্ব্বলতা এসে বাসা বাঁধলো। তখন থেকে সে রোজই শুক্লাকে রাত্রে সকল কাজকর্ম্মের পর একখানি করে গান শোনাবার জন্য জেবাজেদি করতো—শুক্লাও সে অনুরোধ সরোজের রাখতো হাসিমুখে। ঘনশ্যামও এতে খুব খুসী হতেন গানের চর্চ্চাটা যেন মেয়ের থাকে এই আশায়। সরোজ নিজে যদিও গান গাইতে পারতো না—কিন্তু সে গানের একজন সমঝদার ছিল—বিশেষ করে কীর্ত্তন গান শোনা তার জীবনের একটা মস্ত লোভের জিনিষ ছিল।

মামলা ক্রমেই পেকে উঠলো—সরোজেরও পাটনার বাস দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠলো—আর সেই সঙ্গে যা সনাতন সত্য তাই হোলো। সরোজ ও শুক্লার মাঝে প্রচ্ছন্ন ভালোবাসার অঙ্কুর জন্মালো। ক্রমে তা দিন দিন বেশ বড় হয়ে উঠলো। সেদিনটা ছিল পূর্ণিমা। ঘনশ্যাম কি এক কাজে বেরিয়েছিলেন—সন্ধ্যার পর ছাদের উপর সরোজ ও শুক্লা ভরা জ্যোৎস্নায় বসে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছিলো—তারই অন্তরালে এক সময় সরোজ এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে শুক্লাকে তার মনের গোপন কথাটি প্রকাশ করলো—সে তাকে জীবন-সঙ্গিনী করে পেতে চায়। শুক্লারও দুর্ব্বলতা অনেক দিন থেকে মনের মাঝে জমাট বেঁধেছিলো—কিন্তু সে বড় চাপা—কোনো জিনিষটাই তার ভাবে বা ব্যবহারে প্রকাশ পেতো না। কিন্তু সে খুবই সপ্রতিভ ছিল যেটা সরোজ সব চেয়ে পছন্দ করতো। শুক্লা সরোজকে 'হ্যাঁ—না' কিছুই বললো না—শুধু চুপ করে রইলো। ঘনশ্যামকে সে নিজেই সরোজের প্রস্তাবটা পরদিন বলে নিজের ইচ্ছাটাও প্রকাশ করলো। ঘনশ্যাম চিরদিনই মেয়েকে ভদ্র ভাবে স্বাধীনতা দিয়ে এসেছেন—মেয়ে বড় হয়েছে—লেখাপড়া শিখেছে, তা ছাড়া তিনি নিজেও এ সম্বন্ধে খুবই উদারচেতা মানুষ। কয়েক দিনের মধ্যেই সরোজের সঙ্গে শুক্লার পাটনাতেই বিবাহ হয়ে গেলো। কেউই বিশেষ জানলো না—সরোজের এমন কেউ কলকাতায় ছিল না যাকে না বললে চলে না। সে বহু দিন পিতৃমাতৃহীন। সরোজও ব্রাহ্মণ—ঘনশ্যামও ব্রাহ্মণ, কাজেই বিবাহে বাধা কোথায়? মামলার পর সরোজ কলকাতায় শুক্লাকে নিয়ে এলো। মহারাজার মামলায় সে কৌসলী সাহেবকে যা সাহায্য করেছিলো তারই বিনিময়ে তিনি তাকে সব মামলাতেই জুনিয়র রাখতে আরম্ভ করলেন—সরোজ বেশ মোটা টাকা রোজগার করতে লাগলো—এবং সেই সঙ্গে যা বেশীর ভাগ হয়ে থাকে সে অসৎ সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করলো ও আরো অনেক কিছু। শুক্লা প্রথম প্রথম কিছুই বুঝতে পারেনি—পরে সে সবই বুঝলো, তার পর যা চিরদিন সকলের ভাগ্যে ঘটে তাই ঘটতে সুরু হোলো।

প্রথমে অভদ্র ব্যবহার—লাঞ্ছনা—পরে মারধোর পর্য্যন্ত। সেদিন সে আর সহ্য করতে পারলো না, তাই বড় দুঃখেই সে ঘনশ্যামকে চোখের জলের সঙ্গে এই চিঠি লিখলো—

পূজনীয় বাবা,

আমি আর সহ্য করতে পারছি না। ইতিপূর্ব্বে আপনাকে সামান্য কিছু ওঁর সম্বন্ধে জানিয়েছি, কিন্তু এখন জানাচ্ছি যে আমি আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকতে পারবো না—আমি কৃতসঙ্কল্প হয়েছি এবার। আমি ৩।৪ দিনের মধ্যেই দ্বারভাঙ্গা যাচ্ছি। সাক্ষাতে সব কথা বোলবো। প্রণাম নেবেন।

আপনার দুঃখিনী মেয়ে
শুক্লা।

পুঃ—আমি জানি এতে আপনি কত মর্ম্মান্তিক আঘাত পাবেন, কিন্তু আর কোনো উপায় নেই যে বাবা!

৪।৫ দিন এই মর্ম্মান্তিক দুঃখ নিয়ে শুক্লা ঘনশ্যাম বাবুর আশায় বসে রইলো—না এলো কোনো চিঠি, না এলেন তার বাবা। কাজেই সে দ্বিধা না করে একদিন সরোজের সমস্ত বন্দোবস্ত করে রেখে দিয়ে কিষণকে নিয়ে ষ্টেশনে পৌঁছে দিতে বলে সত্যিই চলে গেলো। কিষণ অনেক অনুনয়-বিনয় করে বৌদিদিকে বাবু আসা পর্য্যন্ত থাকবার অনুরোধ জানালো কিন্তু সবই বৃথা হোলো। মন আজ তার একান্ত বিদ্রোহী হয়েছে—তাকে ঠেকিয়ে রাখবার সাধ্য কারো নেই।

৩

সরোজ কোর্ট থেকে ফিরে দেখলো শুক্লা নেই। সে যে সত্যিই রাগ করে চলে যাবে এ ধারণা সে কোনো দিনই করেনি। এমন তো রাগারাগি প্রায়ই হয়—যদিও সে ভালো করেই জানে যে রাগ শুক্লা কোনো দিনই করেনি—তার সকল অপরাধই সে নীরবে সহ্য করেছে। তবুও এমনটা যে ঘটবে সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। কিষণকে জিজ্ঞাসা করে জানলো তার বৌদিদি—২।৫৫ মিনিটের ট্রেণে চলে গেছে এবং এ কথাও বলতে ভুললো না কিষণ যে, শুক্লা না খেয়েই চলে গেছে আর সরোজেরও সকল বন্দোবস্ত করে রেখেই সে গেছে, কোনো অসুবিধাই তার হবে না। সরোজ কোর্টে যাবার সময় মুহূর্ত্তের জন্যেও বুঝতে পারেনি যে এত বড় একটা বিপর্য্যয় ঘটতে পারে। সে কোনো কথা আর না বলে উপরে শোবার ঘরে চলে গেলো। দেখলে প্রতিদিনের মতন সবই পরিপাটি করে সাজানো রয়েছে—আলনায় তার কাপড়-জামা সবই যেমন অন্য দিন থাকে আজও তাই রয়েছে। খানা-কামরার টেবিলে ট্রেতে চায়ের বাটীতে এক চামচ চিনি যা সে খায় ও বিলাতি দুধের টিন, চামচ, কভার সবই রয়েছে যেমন রোজ থাকে। বোধ হোলো যেন শুক্লা নিজের ঘরে গেছে বা বাথরুমে গেছে এমনিই কিছু। সরোজ নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখলো, তার চোখ ফেটে জল এলো। সে কিছুতেই তা থামাতে পারলো না। তার অন্তরের মাঝ থেকে কে যেন শুধু বলতে লাগলো—সবই আছে সে আজ নেই। সে কোর্টের পোষাক ছেড়ে আরাম-চৌকীটায় বসে একট

একটা করে অনেকগুলো সিগারেট খেয়ে ফেললে। কিষণ জল গরম করে কেটলিতে দিয়ে ট্রে সামনে টিপয়ের উপর রেখে নীচে গেলো। সরোজ প্রথমে অভিমান করে ভাবলো চা খাবে না কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবলো শুক্লা কত যত্ন করে আদর করে তার জন্য সব রেখে গেছে, না খেলে তাকে অপমান করা হবে—ভাবলো সে রাগ করে গিয়েছে, রাগ পড়লেই চলে আসবে, বাবা নিশ্চয়ই কালই পৌঁছে দিয়ে যাবেন। এক পেয়ালা চা খেয়ে চেয়ারে শুয়ে বাঁ হাতটা তার দুটি চোখের উপর ফেলে দিয়ে সে আজ তার সকল অপরাধের কথাই বার বার করে ভাবতে লাগলো। চোখের জলের বন্যা বইয়ে সে অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগলো—সত্যিই তো, সে কত অন্যায় কত অসদ্ব্যবহারই না শুক্লার প্রতি করেছে! মনে পড়লো সেই পাটনার চাঁদিনী রাতের কথা, আরো কত কি! দেখতে দেখতে সন্ধ্যা উত্তরে গেলো, কিষণ ঘরে আলো জ্বালাতে এলো। সরোজ বারণ করলে। খানিক পরে অনুপম যথাসময়ে দৈনন্দিন হাজিরা দিতে এসে কিষণের মুখে সকল খবর পেয়ে উপরে সরোজের ঘরে যখন এলো তখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে। অনুপম বহু দিন বহু বার সরোজের শুক্লার প্রতি এই অভদ্র আচরণ সম্বন্ধে তাকে তিরস্কার করেছে—বিশেষ করে সে এই ভদ্র মেয়েটিকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখে আসছে—কেমন চমৎকার সপ্রতিভ মিষ্টি ভদ্র ব্যবহার মেয়েটির। সে কত দিন সরোজকে শুক্লার গুণের কথা পঞ্চমুখে বলেছে—আজ এই ব্যাপারে সে সত্যিই খুবই মর্মাহত হোলো—কিন্তু শুক্লা যে সত্যিই সরোজকে ছেড়ে চলে যাবে এ ধারণা সেও কোনো দিন করেনি। সে এ বিশ্ব-সংসারেরই এক জন, তার অভিজ্ঞতা ছিলো না যে যে-মেয়ে প্রতিবাদ করে না, ঝগড়া করে না, নীরবে সকল দুঃখ, সকল অপমান শুধু সহ্য করতে জানে—তারা যখন বিক্ষিপ্ত হয় তখন স্বয়ং বিধাতাপুরুষও তাদের নিরস্ত করতে পারেন না। সংসারে এমনিই হয়—এমনিই চিরদিন হয়ে আসছে। অনেকক্ষণ বসে থেকেও যখন সরোজ উঠলো না—তখন সে আস্তে আস্তে চলে গেলো। কিষণকে বলে গেলো যে সরোজের কোনো অসুবিধা না হয় ইত্যাদি।

পরদিন সরোজ যথাসময় কোর্টে গেলো। নিজেই জামা পরলো—টেবিল থেকে বুরুশ-চিরুণী নিজে নিয়ে মাথা আঁচড়ালে—শুক্লা থাকলে তার অফিস যাবার সময় তার হাতের কাছে সবই এগিয়ে দেয়—সিগারেট কেস্, কলম, রুমাল, ডাইরি, মনিব্যাগ, সবই—কোনো কিছুরই ত্রুটি কোনো দিন হয়নি। আজ তাকে যখন সেই সব নিজের হাতে করতে হোলো তখনই বুঝলো, সে কি জিনিস আজ হারিয়েছে। না না, হারাবে কেন, শুক্লা হয়তো আজ, নয়তো কাল নিশ্চয়ই আসবে। মন তার এমনই করে সান্ত্বনা দিতে লাগলো, কেবলই মনে হোলো—"সবই আছে সে আজ নেই"। ঘর থেকে বেরুবার সময় সে শুক্লার মাথার বালিসে তার সমস্ত মুখখানা দিয়ে অফুরন্ত চুমু খেয়ে তার চুলের গন্ধ পাবার জন্য নাক ঘসতে লাগল ও ছোট ছেলের মতন কান্না সামলাতে পারলো না। কিষণ ঘরের দরজা থেকে সবই দেখেছিলো—সে বেচারাও এই দেখে গামছা দিয়ে বার বার চোখ মুছলো।

অনুপম সন্ধ্যায় এলো। শুক্লা আজও আসেনি শুনে আর দেরী না করে পরদিনই সরোজকে দ্বারভাঙ্গা গিয়ে তাকে আনবার জন্য বার বার অনুরোধ করলো। কিন্তু সরোজ কেবলই বললো যে ২।৪ দিন বাদে আসবেই আসবে, রাগটা থামুক না। এখন গেলে হয়তো আরো রাগ বেড়ে যাবে ইত্যাদি।

ক্রমে দশ—পনের—কুড়ি দিন গেলো—না এলো শুক্লা, না এলো একখানা চিঠি তার কাছ থেকে বা ঘনশ্যামের কাছ থেকে। তার অভিমান হোলো, কেন, এতো কি রাগ যে আজও তুমি এলে না—আচ্ছা দেখি কত দিন বাপের বাড়ী থাকতে পারো, আমি পুরুষ মানুষ। নিজেকে এমনি করে অভিমানের জালে জড়িয়ে জড়িয়ে সে নিরস্ত হোলো। ঠিক করলো সে কিছুতেই দ্বারভাঙ্গা যাবে না। অনুপম অনেক বুঝিয়েও তার মত করতে পারলে না। কিন্তু বিপদ আরও হোলো সরোজের, সে নেশার মাত্রা দিলো বাড়িয়ে, শুক্লাকে ভুলবার জন্য। সে ক্রমশই দেখলে তাতে তার শরীর ভেঙ্গে পড়ছে—কাজ করবার শক্তি কমে আসছে—আর যাকে ভোলবার জন্য তার এই উদ্যম তাও হোচ্ছে না। শুক্লা আরও যেন গভীর ভাবে মনের মধ্যে চেপে বসছে—ক্রমে শরীর এত খারাপ হোলো যে তাকে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হোলো। তিনি অবিলম্বে নেশা বন্ধ করতে বললেন—নচেৎ বেশী দিন বাঁচবে না। অনুপমের চেষ্টায় সরোজ নেশা বন্ধ করলো, ক্রমে ক্রমে কাজে মন দিলো—ধীরে ধীরে সুস্থও হয়ে উঠলো দেহে ও মনে। শুক্লাও যেন অলক্ষে তাকে বলতে লাগলো নিরন্তর, "আমি তোমারই কাছে যে সব সময়েই রয়েছি—তবে কেন আমাকে ভোলবার জন্য তোমার এ অধঃপতন?" সরোজ যেন দিন দিন নূতন মানুষ হয়ে উঠলো—কিন্তু তার দুর্জয় অভিমান তাকে দ্বারভাঙ্গা যেতে দিলো না।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত।

বন্দনা

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন
যাঁ সবার চরণ কৃপা শুভের কারণ
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে
তাঁহার চরণ ধুঞা মুক্তি করি পানে।
শ্রোতার পদরেণু করো মস্তকে ভূষণ
তোমরা এ অমৃত পী'লে, সফল হৈল শ্রম।

—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী।

একতান

সোমেন্দ্রনাথ রায়

উদ্যোগী পুরুষ লক্ষ্মীলাভ করেন, আর চঞ্চলা লক্ষ্মী সর্বদা পরিহার করে থাকেন অলস মানুষের সঙ্গ। এ কথা খুব বিশ্বাস করি; এবং এও জানি আমার চেনা-জানা সকলেই চিরকাল আমাকে হেয় জ্ঞান করে এসেছেন আমার জন্মগত আলস্যের জন্য। তবু যখন ভাল গান কোথাও শুনি, যখন সুরের রহস্যময় পথ বেয়ে উদাস হয়ে যায় মন দিশে-না-পাওয়া অবুঝ ব্যথায়, তখনই মনে পড়ে যায় আলস্যের মত এই পরম দোষটি না থাকলে হিরণ্ময় চৌধুরীর সম্পূর্ণ ইতিহাস আমার অজানা থেকে যেত। কণ্ঠসঙ্গীতের আশ্চর্য যাদুতে দুশ্চরিত্র পাষণ্ড যে সদানন্দ সন্ন্যাসীতে রূপান্তরিত হতে পারে, তাও কখনো বিশ্বাস করতাম না।

শিবসাগরে গিয়েছিলাম এবার শীতের ছুটিতে; সেখানেই হঠাৎ দীর্ঘ আট বছর পরে দেখা হয়ে গেল ডাক্তার হিরণ্ময় চৌধুরীর সঙ্গে। এক সময়ে তার নাম আমার পরিচিত মহলে মুখে মুখে ফিরত। দুর্দান্ত প্রকৃতি আর অকুণ্ঠ লাম্পট্য সে সময়ে তাকে প্রায় বিখ্যাত করে তুলেছিল। তার পর হঠাৎ ডাক্তার দেবব্রত মিত্রের সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে বাণী মিত্রের সঙ্গে তার নাটকীয় অন্তর্ধান নিয়ে খুবই হৈ-চৈ হয়েছিল মুখে মুখে এবং কিছুটা খবরের কাগজে। তবু মানুষের স্মৃতি চিরকাল কোন কিছু ধরে রাখতে পারে না। আমরাও তাই হিরণ্ময় চৌধুরী বা বাণীকে ভুলে গিয়েছিলাম ধীরে ধীরে। ওদের সম্পর্কে যে স্মৃতিটুকু ছিল, কেউ তা স্মরণ করিয়ে দিলে তিক্ত হয়ে উঠত আবহাওয়া, মানুষের প্রতি অবিশ্বাস আর অশ্রদ্ধায় অস্বস্তিকর হয়ে উঠত আলোচনা।

বিলাসপুর থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে শিবসাগর, তিন দিক পাহাড়ে ঘেরা বিশাল হ্রদ। এক ধারে শিব-মন্দির, শিব-চতুর্দশীতে মস্ত মেলা হয় সেখানে। জায়গাটির নৈসর্গিক সুষমা, আর হ্রদের জলের আশ্চর্য গুণের কথা শুনেছিলাম আগে। কিন্তু একটি মাস বিলাসপুরে থাকা সত্ত্বেও আলস্যের জন্য গড়িমসি করে ছুটি প্রায় কাবার করে এক সন্ধ্যায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম ওখানে।

বড় ভাল লেগেছিল সেই শীতের রাতটি। পাতলা কুয়াসার চাদরে ঢাকা চারিদিক; শুক্লা অষ্টমীর অপ্রচুর আলোয় দূরের পাহাড়গুলি অপরিস্ফুট দৈত্য-প্রহরীর মত আগলে রেখেছে হ্রদ আর মন্দিরটিকে। খানিক দূরে ডাকবাংলোয় রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। তার দরওয়ানের মুখে শুনলাম, এক বাঙালী দম্পতি মন্দিরের সেবাইৎ। মন্দিরের লাগোয়া একখানি ঘরে বাস করেন তাঁরা। বেশ ভালো চিকিৎসক এই পুজারী ঠাকুর, যুদ্ধ-ফেরৎ মিলিটারি ডাক্তার। এ দেশের বহু লোক প্রাণ পেয়েছে ওঁর চিকিৎসায়।

বড় আনন্দ হল কথাটি শুনে। বাঙলা দেশের থেকে এত দূরে এই লোকালয়-বিচ্ছিন্ন নির্বান্ধব জায়গায় কোন্ বাঙালী বাস করেন, যাঁকে এ দেশের মানুষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে প্রত্যহ, এ কথা শুনে বাঙালী বলে নিজেকে গৌরব বোধ করলাম যেন।

পুজারী ভদ্রলোকের স্ত্রীকে এরা 'মাতাজী' সম্বোধন করে। দরওয়ান বলল, "খুব ভাল গান করতে পারেন মাতাজী। ওঁর মুখের ভজন গান বনের পশু-পাখী পর্যন্ত স্থির হয়ে শোনে।"

অবশ্য এই পুজারী অথবা মাতাজীর কথায় বেশী মনোযোগ দিতে পারিনি তখন। আমার চারিপাশের শীত-নিথর সুপ্ত প্রকৃতির গাম্ভীর্য মনকে এত আবিষ্ট করে রেখেছিল যে, নিজের অস্তিত্বটাই যেন ভুলে গিয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। অপরূপ সুষমাময়ী রাত্রি হ্রদের বুকে প্রতিবিম্বিত চাঁদের পদ্মাসনে বসে আছেন শুভ্র অভিনিবেশে। তিন দিকের পর্বত সেই অচল শান্তির প্রহরায় ঋজু ভঙ্গীতে অপেক্ষমান। চলমান বিশ্ব-সংসার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া একটি নিঃসীম মুহূর্ত শুধু আমার চেতনাকে অধিকার করে ছিল সারাক্ষণ। কোন্ পরম শান্তির লোভে লড়াই-ফেরৎ ডাক্তার যে সমাজ-সংসার ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন এখানে, তা আর আমাকে যুক্তি দিয়ে বুঝতে হল না।

বসে ছিলাম অনেকক্ষণ। দরওয়ান এক সময়ে বলল, "চলুন বাবুজি, আর বেশী রাত করবেন না; ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়বে এবার।" শীতবস্ত্র যা এনেছিলাম সঙ্গে, তা যথেষ্ট নয়, সেটা টের পাচ্ছিলাম প্রতি মুহূর্তে। কিন্তু আলসেমি করে বসে রইলাম সেই অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ।

দরওয়ানের কাজ ছিল, অপেক্ষা করতে পারল না সে। চাঁদের আলোয় ঘড়িতে দেখলাম ন'টা বাজে প্রায়। উঠবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি মনে মনে, এমনই সময়ে কানে এল তানপুরার সুমিষ্ট ঝঙ্কার। উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে কানে এল নারীকণ্ঠের আলাপ, বিলম্বিত লয়ের তান। শুনতে শুনতে চেনা গলার স্মৃতি তোলপাড় করে তুলল মন। বিস্ময়ে উত্তেজনায় কখন উঠে দাঁড়িয়েছিলাম খেয়াল নেই, সম্বিৎ ফিরে পেলাম মন্দিরের কাছে এসে।

মন্দিরের পাশের ঘরটিতে প্রদীপ জ্বলছিল এক কোণে। তারই আলোয় চোখে পড়ল, মেঝেয় বসে তানপুরার তারে আঙুল চালাতে চালাতে গান করে যাচ্ছেন একজন মধ্যবয়সী মহিলা। পাশেই চোখ বন্ধ করে উপাসনার ভঙ্গীতে বসে আছেন সম্ভবতঃ সেই পুজারী, দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ, পরনে গেরুয়া কাপড় আর উত্তরীয়।

এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম যে, যে কোন মুহূর্তে ওঁদের চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। তাতে করে এই শান্ত-মধুর পরিবেশ এক নিমেষে নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু প্রচণ্ড পাহাড়ী শীতের মধ্যেও যেমন অলসতার জন্য উঠে যেতে পারিনি হ্রদের কূল থেকে, এখনও তেমনি সরে যাওয়ার তাগিদ পেলাম না মন থেকে।

আজ ভাবি, আমার সেই সময়ের সেইটুকু আলস্য আমাকে কত বড় অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে সমৃদ্ধ করেছে। হিরণ্ময় চৌধুরীর নবজন্মের ইতিহাস তা না হলে শোনার সুযোগ ঘটতো না কোন জন্মেই। কতক্ষণ সেখানে এক ভাবে দাঁড়িয়েছিলাম মনে নেই। মাথার ওপরে ছিল চাঁদ। আকাশের এক প্রান্তে গুটি কয়েক উজ্জ্বল তারায় মণ্ডিত কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলী কেমন একটা অশরীরি ভয়ের অনুভূতি জাগিয়ে তুলছিল মনে। হঠাৎ এক সময়ে থেমে গেল গান। অস্ফুট কয়েকটা কথা শোনা গেল ঘরে। বাইরে এসে দাঁড়ালেন পুজারী ঠাকুর। গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "কৌন হো?"

নারীকণ্ঠের সঙ্গীতের আলাপে যে সংশয় জাগছিল মনে, পুজারীর কণ্ঠস্বরে সম্পূর্ণ নিরসন হয়ে গেল সেটা। বিস্ময়ে উক্তি বেরিয়ে এল আমার কণ্ঠ থেকে, "হিরণ্ময়!"

আমার চেয়ে অনেক বেশী বিস্মিত হল হিরণ্ময়। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, "কে, সমীর?" হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল সে আমাকে ঘরের ভিতরে। বলল, "তুমি এখানে, এত রাত্রে?"

বাইরের ঠাণ্ডার থেকে ভেতরে এসে অনেকখানি আরাম পেলাম যেন। তাকিয়ে দেখলাম বাণীর দিকে। সেই পরিচিত ভঙ্গীতে কোলের ওপরে তানপুরা নিয়ে বসে আছে, তেমনই শান্ত-সমাহিত মুখশ্রী। অন্য কোন সময়ে, অন্য কোন পরিবেশে ওদের দু'জনকে একত্র দেখলে কি হত বলা যায় না। হয়ত মুখ ঘুরিয়ে আপন লজ্জা আর বিরক্তি গোপন করতে সরে যেতাম নিজে। কিম্বা হয়ত ওদের বিরুদ্ধে এত কাল ধরে যে ক্ষোভ পুষে রেখেছিলাম মনে, তার শোধ নিতাম সাধ মিটিয়ে কড়া কথা বলে। কিন্তু সেদিন রাত্রে ওদের দু'জনকে দেখে প্রথমেই আমার মনে হল, ওদের উভয়ের সম্পর্ক কিংবা উদ্দেশ্য নিয়ে মনে যদি কোন সংশয় আসে, তবে তা হবে আমারই ক্ষুদ্রতার পরিচয়। বললাম, "ভাগ্যের যোগাযোগ ছাড়া একে আর কি বলি বল? আজ সন্ধ্যায় এসেছি এখানে বিলাসপুর থেকে। শুনলাম, মন্দিরের পুজারী এক বাঙালী ভদ্রলোক, লড়াই-ফেরৎ চিকিৎসক। আর তাঁর স্ত্রী, মাতাজীর ভজন গান বনের পশু-পাখী পর্য্যন্ত স্থির হয়ে শোনে। কিন্তু এতগুলো চেনার সূত্র পেয়েও স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, তোমরাই সেই পুজারী ঠাকুর আর মাতাজী।"

পুরোনো দিনের মত সহজ রসিকতা করল চৌধুরী, "আগে জানতে পারলে সরে যেতে বোধ হয়?"

হেসে বললাম, "লজ্জা দিও না ভাই! সত্যিই তোমাদের সম্পর্কে ভালো ধারণা ছিল না কারো। আর তা না থাকাই স্বাভাবিক নয় কি? কিন্তু এখন যদি বলি, আমার অশেষ সৌভাগ্য আজ এমন করে তোমাদের দেখা পেলাম, তবে একটুও মিথ্যে বলব না।"

হাসল হিরণ্ময়। বলল, "তোমার এই ধারণা পরিবর্ত্তনের হেতু?"

বললাম, "হেতুটা কি, বুঝতে পারছ না? চারিত্রিক অবনতিকে যদি সত্যি সত্যিই ঘৃণা করি, উন্নতিকে তবে শ্রদ্ধা করি নিশ্চয়ই। তুমি যা ছিলে, আর আজ যেখানে উঠেছ, এ দুয়ের প্রভেদ তুলনা দিয়ে বোঝাব, এমন ক্ষমতা আমার নেই।"

অন্যমনস্ক হয়ে রইল হিরণ্ময় কিছুক্ষণ। তার পর সচকিত হয়ে বলে উঠল, "এক বাটি দুধ নিয়ে এস বাণী গরম করে। ঠাণ্ডায় কাঁপছে সমীর।"

সত্যি কাঁপছিলাম আমি। গরম দুধ খেয়ে আরাম বোধ করলাম অনেকখানি। হাত-ঘড়িতে দেখলাম দশটা বেজে গেছে। বললাম, "তোমাদের আজ আর বিরক্ত করব না। কাল সকালেই আমার ফিরে যাওয়ার কথা বিলাসপুরে। কিন্তু তোমাদের ইতিহাস না শুনে তো এক পা নড়তে পারব না এখান থেকে।"

আপন মনে হাসছিল হিরণ্ময়। বলল, "ডাকবাংলোয় উঠেছ? আজ রাতে ঘুম হবে তো?"

বললাম, "না হলেও দুঃখিত হব না। কোন প্রত্যাশা না নিয়েই জেগে কাটিয়েছি কত রাত!"

বাণী বলল, "কাল দুপুরে তুমি এখানে খাবে সমীরদা। নিরামিষ খেতে পারবে তো?"

বললাম, "সে কাল দেখা যাবে। ডাকবাংলোতেই বা আমার জন্যে মাছ-মাংস কে রাঁধতে যাচ্ছে?"

সত্যি, সে রাত ঘুমোতে পারিনি একটুও। হিরণ্ময় চৌধুরীর সঙ্গে আমার আলাপ সেই স্কুলের দিন থেকে। উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে ডাক্তারী পাশ করে কমিশন পেয়ে যুদ্ধে চলে গেল সে, তখনই মাত্র কয়েক বছরের জন্যে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল উভয়ের। কিন্তু পঁয়তাল্লিশ সালে যে হিরণ্ময় চৌধুরী ফিরে এল যুদ্ধ থেকে, তাকে চিনে ওঠা সত্যিই আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। শার্ক স্কিনের জ্যাকেট গায়ে, পরনে আমেরিকান খাকী প্যান্ট। প্রকাশ্যেই প্যান্টের হিপ-পকেট থেকে চ্যাপ্টা শিশি বার করে গলায় ঢেলে দেয় উগ্র হুইস্কি। শুনলাম ওদের ইউনিটের প্রত্যেকটি নার্স, ডব্লু-এ-সি-আই ভলান্টিয়ার, এমন কি ঝাড়ুদারণী-মেথরাণীরা পর্য্যন্ত ভয় করত ক্যাপ্টেন চৌধুরীকে। লাম্পট্যের খ্যাতি তাকে বহু ক্লাব-রেস্তোরাঁয় আলোচনার বিষয়-বস্তু করে তুলেছে। ওর সঙ্গে সে সময়ে যখনই দেখা হয়েছে, লজ্জা পেয়েছি নিজে। চেষ্টা করেছি বিদ্রূপ করে, সমালোচনা করে ওকে ফেরাতে। হেসে উড়িয়ে দিত সে। যেন লম্পট যে নয়, সে বুঝি পুরুষই নয়।

যত দূর মনে পড়ে, সেটা উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের ডিসেম্বর মাস। সকালে বাড়িতে বসে চায়ের কাপ আর খবরের কাগজে তলিয়ে গেছি, হঠাৎ এসে দাঁড়াল হিরণ্ময়। বলল, "লেক হসপিটালের ডক্টর মিত্তিরের সঙ্গে তোমার খুব জানাশুনো আছে, না?"

খবরের কাগজ সরিয়ে রেখে বললাম, "আছে। কেন বলত?"

"কেন আবার, চিকিৎসা করাব।"

ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম ওর দিকে। যৌনরোগের

বিশেষজ্ঞ, বিলেতী ডিগ্রিধারী ডক্টর মিত্র আমার বাবার বন্ধু। ওঁদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বহু কালের। আমি অনুরোধ করলে উনি হিরণ্ময়ের চিকিৎসা ভাল ভাবেই করবেন। কিন্তু ওঁর মত স্পেশালিষ্টকে দেখাতে হচ্ছে, এমন মারাত্মক ব্যাধিতে ধরেছে হিরণ্ময়কে? এত দিন পর্য্যন্ত ওর চাপল্য, পল্টনী ব্যবহার, হাসি তামাসার মধ্যে দিয়েই মেনে নিয়েছি। কিন্তু ওর অধঃপতন যে এত দূর হয়েছে, তা ওর যুদ্ধের সময়ের ইতিহাস কিছু কিছু শুনেও বিশ্বাস হয়নি। বললাম, "এমন করে জীবনটাকে নিয়ে ছেলেখেলা করতে একটুও বাধল না?"

হেসে উড়িয়ে দিল সে আমার কথা। বলল, "চপল জীবনটা চিরকাল চপলতা করতে করতেই যায় বন্ধু!"

রাগ করে বললাম, "তবে আবার চিকিৎসার প্রয়োজন কেন? চপলতার মাশুল জোগাতে হবে না?"

একটু ভেবে হিরণ্ময় বলল, "সেটা কি জোগাচ্ছি না ভাব? শরীর, মন আর টাকার কম শ্রাদ্ধ হয়নি। কিন্তু ওসব কথা থাক্। কবে ওঁর কাছে আমাকে নিয়ে যাচ্ছ বল?"

নিস্পৃহ গলায় জবাব দিলাম, "যেদিন যেতে চাও।"

সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্ময় বলল, "তাহলে আজই যাওয়া যাক্ চল। সন্ধ্যে সাতটায় তোমার এখানে আসব, অসুবিধে হবে না তো?"

কোন রকমে জবাব দিলাম, "না।"

সেদিনও এমনি এক শীতের সন্ধ্যায় এমনি তন্ময় হয়ে গান শুনেছিলাম বাণীর। গেট পেরিয়ে লনে ঢুকতে যাচ্ছি, কানে এল সুরের ঝঙ্কার। দোতলার ঘরে বসে গান গাইছিল বাণী। ছেলেবেলা থেকেই ভারি মিষ্টি ওর গলা। তবু সেদিন যেন বেশী ভাল লাগছিল ওর মুখে ভজন গান। লন পেরিয়ে হিরণ্ময়কে নিয়ে ড্রইংরুমে ঢুকতে যাব, বাধা দিল হিরণ্ময়। বলল, "একটুখানি দাঁড়াও।"

ফিরে দেখি পালটে গেছে ওর মুখের চেহারা। অদ্ভুত বিহ্বল চাহনি। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল বুঝি ওর সর্বশরীর। বললাম "কি হল হিরণ্ময়?"

স্পষ্ট দেখলাম কথা বলার চেষ্টায় থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল ওর ঠোঁট দুটো। তাড়াতাড়ি হাত ধরে ঘরে টেনে এনে বসিয়ে দিলাম সোফায়। বললাম, "জল খাবে হিরণ্ময়?"

মাথা নাড়তেই চাকরকে ডেকে জল আনতে পাঠালাম। ভেতরে গিয়ে কি সে বলেছিল জানি না, দেখি, হাতে জলের গ্লাস নিয়ে স্বয়ং বাণী এসে হাজির। বলল, "কি হয়েছে সমীরদা?"

বললাম, "আমার এই বন্ধুটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কাকাবাবু কোথায়?"

"বাবা এই মাত্র ফিরেছেন, বিশ্রাম করছেন একটু, কি হয়েছে ওঁর?"

হেসে বললাম, "তোমার গান শুনে মূর্চ্ছা গিয়েছিল প্রায়। হাত-পা কাঁপছিল ঠক্ ঠক্ করে, সাদা হয়ে গিয়েছিল মুখ-চোখ।"

"যাঃ, ফাজলামী হচ্ছে" বলে চলে যাচ্ছিল বাণী ঘর ছেড়ে। হঠাৎ হিরণ্ময় ডাকল, "দাঁড়ান!"

ঘুরে দাঁড়াল বাণী আরক্ত মুখে। হিরণ্ময় বলল, "আপনিই গান করছিলেন?"

সদা সপ্রতিভ বাণী লজ্জায় মাথা নিচু করে বলল, "হ্যাঁ।"

"আর একদিন ওই গান শোনাবেন আমাকে? আর একটি বার মাত্র।"—হাঁফাতে হাঁফাতে বলল হিরণ্ময়।—"সারা জীবন আমি কৃতজ্ঞ থাকব, চিরকাল মনে রাখব আপনার দয়া।"

আজও আমার কানে বাজে হিরণ্ময়ের সেই আকুল আবেদন। কি যে হল আমার! বললাম, "আচ্ছা, আচ্ছা, অত করে বলতে হবে না। একদিন ওকে ভাল করে গান শুনিয়ে দিও বাণী! তোমার গানের এত বড় ভক্ত আর পাবে না।"

কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে বাণী বলল, "ওঁকে নিয়ে শনিবার সন্ধ্যে বেলা এস সমীরদা! বাবাকে ডেকে দেব কি?"

হেসে বললাম, "দেবে বইকি। তাঁর কাছেই এসেছে ও। তোমার গান শোনাটা উপরিপাওনা।"

কাকাবাবু এলে হিরণ্ময়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে ভেতরে চলে গেলাম আমি। বাণীর সঙ্গে দেখা করে বললাম, "আমার এই বন্ধুটি কে জান? হিরণ্ময় চৌধুরীর নাম শুনেছ তো?"

বিস্মিত হয়ে বাণী বলল, "তোমার সেই যুদ্ধ-ফেরৎ ডাক্তার বন্ধু?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

কঠিন হয়ে গেল বাণীর মুখ। বলল, "ওই লোকটাকে জেনে শুনে গান শোনাতে বললে আমাকে?"

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, "তোমার গান শুনে এমন নার্ভাস হয়ে পড়ল যে—"

আমাকে থামিয়ে দিয়ে বাণী বলল, "অত্যাচার করে করে নার্ভের তো আর বাকি রাখেনি কিছু!"

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বললাম, "যাক্ গে, এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না।"

শক্ত মুখে বাণী বলল, "না। কথা যখন দিয়েছি, তখন গান শোনাব নিশ্চয়ই। কিন্তু সামনে আসব না আর। ড্রইংরুমে থাকবে তোমরা, লাইব্রেরীতে বসে গান করব আমি। এটুকু ম্যানেজ করে নিতে পারবে না?"

বললাম, "খুব পারব। এ আর এমন শক্ত কি?"

পরের শনিবার হিরণ্ময়কে নিয়ে কাকাবাবুর ওখানে যেতে যেতে শুনলাম, ইতিমধ্যে আরও বার দুই দেখাশুনো এবং কথাবার্তা হয়েছে ওর বাণীর সঙ্গে। ড্রইংরুমে ওকে বসিয়ে বাণীকে খবর দিয়ে বললাম, "তুমি তো ওর সঙ্গে আরও বার দুই কথাবার্তা বলেছ। সামনে এসে গান শোনাতে আপত্তি আছে আর?"

একবার আমার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাণী উত্তর দিল, "না, আপত্তি নেই। তোমরা লাইব্রেরীতে গিয়ে বস। আমি একটু পরেই যাচ্ছি।"

কি পাগলামীতে যে পেয়েছিল সেদিন বাণীকে, জানি না। বরাবর দেখে এসেছি, পোষাক-আশাকের পারিপাট্য পছন্দ করে না সে। মাতৃহারা একমাত্র মেয়েকে কাকাবাবু অনেক সময়েই ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে তৃপ্তি পেতে চেয়েছেন। তাতে শুধু বিব্রত আর বিরক্ত হয়েছে সে। কিন্তু চাকরের হাতে খাবারের ট্রে দিয়ে খানিক পরে যখন সে ঘরে এসে ঢুকল, অবাক হয়ে গেলাম

ওর সমস্ত বেশ-বিন্যাসে। ফিকে সবুজ রঙের সিল্কের সাড়ি পরনে, পরিপাটি করে চুল বাঁধা, সমস্ত অঙ্গে সযত্ন প্রসাধনের ছাপ। হিরণ্ময়ের সামনে অকস্মাৎ ওর এই সাজের ঘটা দেখে মনে মনে যথেষ্ট বিস্মিত হলেও মুখের ভাবে সেটুকু লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করলাম প্রাণপণে। হিরণ্ময় চিরকালই কথাবার্তায় পটু। সহজ কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে সুরু হল বাণীর গান।

ভাল করে সেদিন গান শোনা হয়নি আমার; মনটা ঠিক ছিল না। অন্যমনস্ক হয়ে চিন্তা করছিলাম বাণীর ব্যবহারের এই অসঙ্গতির কথা। হঠাৎ গান থামিয়ে ছুটে গেল বাণী হিরণ্ময়ের কৌচের দিকে। চমকে তাকিয়ে দেখি, মুখ বিকৃত করে মাথা এক পাশে হেলিয়ে শুয়ে পড়েছে হিরণ্ময়। হাত দুটো শক্ত করে মুঠো করা। ছুটে ভেতর থেকে জল এনে ঝাপ্টা দিতে লাগল বাণী ওর মুখে-চোখে!

একটু পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠল হিরণ্ময়। অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে রুমাল দিয়ে মাথা-মুখ মুছে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে থাকল সে। ওর কাঁধে হাত দিয়ে বলে উঠল বাণী, "উঠবেন না এখন, সুস্থ হয়ে নিন একটু, তার পর উঠবেন।" শীতের রাতে ফ্যান খুলে দিল সে।

এর পরের দিন আমাকে হঠাৎ চলে যেতে হল সুদূর মধ্যপ্রদেশে প্রায় এক মাসের জন্য। কাজেই সে সময়টুকুর জন্য ওদের কোন খবরাখবর রাখা আর সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। ফিরে এসে ইডেন গার্ডেনে ক্রিকেট খেলা দেখতে গেছি, দেখা হয়ে গেল বন্ধু অনিমেষের সঙ্গে। একথা সেকথার পর অনিমেষ বলল, "হিরণ্ময় আজকাল লেক হসপিটালের ডাক্তার দেবব্রত মিত্তিরের মেয়ে বাণীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে খুব। তুমি তো ছিলে না, কানাঘুষোয় যা শোনা যাচ্ছে, তাতে ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে বলে সন্দেহ হয়। বাণী মেয়েটাকে তো বেশ ভাল বলে জানতাম।"

শুধু বিস্মিত নয়, অত্যন্ত আঘাত পেলাম অনিমেষের কথায়। ক্রিকেট খেলা দেখার ইচ্ছে আর রইল না, চলে এলাম সেই দুপুরে কাকাবাবুর বাড়ি। বাণীকে ডেকে বললাম, "হিরণ্ময়ের সঙ্গে তোমার নাম জড়িয়ে চারদিকে কত কথা উঠেছে জান?"

এক নিমেষে বিবর্ণ হয়ে গেল বাণীর মুখ। বলল, "কি করে জানব বল? আমাকে ডেকে কেউ বলেনি এ পর্যন্ত।"

বললাম, "তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু হিরণ্ময়ের দুর্নাম তো তোমার অজানা নেই। ওর সঙ্গে তোমার বেশী মেলামেশাটা লোকে সহজ ভাবে নেবে না, এটা বোঝো না?"

কঠিন হয়ে গেল বাণীর দৃষ্টি। বলল, "লোকে কি ভাবে নেবে না নেবে, তাই ভেবে নিজের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, এমন কথা কখনো ভাবিওনি, ভাববোও না কোন দিন। আর কিছু বলার আছে তোমার?"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম বাণীর কথায়। বললাম, "এর পরে আর কি কথা থাকতে পারে, বল? তোমার বয়েস হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, যা ভাল বুঝবে তাই করবে। কিন্তু তোমার বাবার কাছে জেনে নিও, হিরণ্ময় চৌধুরীর অসুখটি কি, এবং আদৌ তা ভাল হবে কি না। আর ও রোগ যে কি রকম সংক্রামক, তা তোমাকে বোধ হয় বলে দিতে হবে না।"

গম্ভীর হয়ে রইল বাণী খানিকক্ষণ। তার পর বলল, "তুমি কি বসবে এখন? আমাকে একটু ওপরে যেতে হচ্ছে।"

ওর ইঙ্গিত গায়ে না মেখে বললাম, "একটি মাস বাইরে থেকে ঘুরে এসে মাত্র কাল কলকাতায় এসেছি। লোকের মুখে নানান্ কথা শুনে সাবধান করে দিতে এসেছিলাম তোমাকে। দেখছি তার কোন প্রয়োজন নেই। আচ্ছা, চলি এবার। অনর্থক বোধ হয় বিরক্ত করে গেলাম তোমাকে।"

বাণীর সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা। হিরণ্ময়ের সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল, আমিই কথা বলিনি। তবে ওদের কথা এত কানে আসত যে কান পাতা দায় হয়ে উঠেছিল আমার। একদিন শুনলাম, মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে হিরণ্ময়। বিশ্বাস করলাম না কথাটা। আর একদিন শুনলাম, কোন্ এক সন্ন্যাসীর কাছে যাতায়াত করছে নাকি ওরা দু'জনে। তার পর একদিন শুনলাম, পালিয়েছে ওরা দু'জনে কলকাতা ছেড়ে।

এই নিয়ে কিছু দিন যথারীতি ছি-ছি, হৈ-চৈ, কানাঘুষো হবার পর ভুলে গিয়েছিলাম আমরা হিরণ্ময় আর বাণীকে। এত দিন পরে দেখা হয়ে গেল ওদের সঙ্গে শিবসাগরে।

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না, পায়চারি করতে থাকলাম ডাকবাংলোর ঘেরা বারান্দায়। ঘুম এসেছিল ভোরের দিকে, ভেঙে গেল দরওয়ানের ডাকাডাকিতে। বাইরে এসে দেখি, অপেক্ষা করছে চৌধুরী। ওই প্রচণ্ড পাহাড়ী ঠাণ্ডাতেও স্নান সেরে নিয়েছে এই ভোরে। বলল, "মুখ ধুয়ে এস শীগ্‌গির। চায়ের জল চাপিয়েছে বাণী।"

কোন রকমে মুখ ধোওয়ার অভিনয় করে চলে গেলাম মন্দিরে। ওদের ঘরের পেছনেই ছোট্ট মত রান্নাঘর। তার পর নেমে গেছে শক্ত পাথুরে জমি। কাঠের উনুনে ঘটি চাপিয়ে বসে ছিল বাণী; এক রাশ ভিজে চুল পিঠে ছড়ান, কপালে সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে উজ্জ্বল সিঁদুরের রেখা। আমার মুগ্ধ দৃষ্টি অনুসরণ করে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে দিল সে মাথায়। হাসল একটু লাজুক মেয়ের মত।

চা খেতে খেতে আলাপ হল হিরণ্ময়ের সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কলকাতা ফিরে যাবার ইচ্ছে আছে, না সারা জীবন এখানেই কাটিয়ে দেবে ঠিক করেছ?"

কেমন একটা রহস্যময় হাসি খেলে গেল হিরণ্ময়ের ঠোঁটে। বলল, "ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণ করে দিয়েছি সব কিছু। কখন অন্তরের মধ্যে তাঁর কি নির্দ্দেশ পাই, কি করে বলব? তবে এখানের সরল গরীব মানুষগুলি বড় ভাল। আর এই শিবসাগরের শান্ত পরিবেশ ছেড়ে কোথাও যাবার ইচ্ছে হয় না।"

বাণীকে প্রশ্ন করলাম, "তোমার বাবার খবর কিছু জান?"

ছল ছল করে উঠল ওর চোখ দুটি। বলল, "কাগজে পড়েছি, মারা গেছেন তিনি গত বছরে। টাকাকড়ি সব দিয়ে গেছেন সেবাসদনের ট্রাষ্টীদের হাতে।"

বললাম, "দুঃখ পাওনি তাঁর মৃত্যুতে?"

উত্তর দিল, "বাবা ছাড়া সংসারে আপন বলতে তো কেউ ছিল না। তাঁর কাছে যে স্নেহ পেয়েছি, সবার ভাগ্যে তা জোটে না।"

"তবে তাঁকে এত বড় দুঃখ দিলে কি করে?"

হিরণ্ময়ের মুখের রহস্যময় হাসির আভাস দেখলাম বাণীর ঠোঁটে। বলল, "অন্তরের দেবতার নির্দ্দেশ অমান্য করবার ক্ষমতা ছিল না। তাই সব ছেড়ে চলে আসতে হল এত দূরে।"

ওদের কথার গভীর তত্ত্ব বোঝার মত ক্ষমতা ছিল না। শুধু ওদের মনের অক্ষুন্ন শান্তির চেহারাটা উপলব্ধি করতে পারলাম স্পষ্ট ভাবে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রোদে পিঠ দিয়ে ওদের ইতিহাস শোনার জন্যে প্রস্তুত হলাম। ইতস্ততঃ করছিল হিরণ্ময়। বাণী বলল, "সমীরদাই আমাদের জীবনে পরিবর্ত্তনের সূচনা করে দিয়েছিল একদিন। আমাদের সব কথা শোনার অধিকার ওরই সব চেয়ে বেশী।"

শান্ত হাসি হেসে হিরণ্ময় বলল, "নিজের মনকে মেলে ধরলেই যদি বোঝাতে পারা যেত, তা হলে আর অসুবিধে কি ছিল বল?"

বাণী উত্তর দিল, "তোমার বলার কথা, বলে যাও। সমীরদা যদি অবিশ্বাস করে, তোমার কি যায় আসে বল?"

ধীরে ধীরে সুরু করল হিরণ্ময়। "যুদ্ধে গেলে একটা অনুভূতি সবার মনকেই আচ্ছন্ন করে রাখে, তা হল এই জীবনটার এমন অকারণ অপচয়। বিশেষ করে মেডিক্যাল ইউনিটে থাকলে মৃত্যু আর যন্ত্রণার দৃশ্য দেখতে দেখতে স্বভাবতঃই তোমার মনে হবে, শুধু যে কোন মুহূর্তে অভাবিত মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে বলেই কি আমাদের জীবনধারণ? এত সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজ, সংসারের বন্ধন, এ সবই যেন একেবারে নিরর্থক! মনের প্রসার বন্ধ যেখানে, সেই বীভৎস সঙ্কীর্ণ পরিবেশে দেহের দাবীটা প্রচণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। যে কোন মুহূর্তে যখন মরে যেতে হবে, চলে যেতে হবে রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণের অনুভূতির বাইরে সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়, তখন যতটুকু পাওয়া যায়, জোর করে উপভোগ করে নেওয়াই উচিৎ।

"কিন্তু উপভোগের লালসার পিছল পথে দুরারোগ্য ব্যাধিও যে পিছুটানের মত চলে আসে, তা উত্তেজনার মুহূর্তে মনে থাকে না কারো, এ তো এক ধরণের মানসিক বিকার, কাজেই সুস্থ স্বাভাবিক চিন্তা করার অবকাশ থাকে না মোটেই। যখন রোগের উপসর্গ দেখা দিল মূর্তিমান বিভীষিকার মত, তখনই ফিরে পেলাম চেতনা। কিন্তু তত দিনে কদভ্যাস নেশায় পরিণত হয়েছে, তার থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেও তাই ছাড়তে পারলাম না অসংযম। মনে মনে বেশ বুঝতে পারছিলাম, যুদ্ধের সময়ে যে মৃত্যুকে ভাগ্যবলে ঠেকাতে পেরেছিলাম, সে ফিরে এসেছে দ্বিগুণ বীভৎসরূপে আমারই প্রবৃত্তির তাড়নায়। তখন আপ্রাণ চেষ্টা সুরু করলাম রোগমুক্ত হওয়ার। চিকিৎসার দিক থেকে শেষ চেষ্টা হিসেবে বাণীর বাবার কাছে যাওয়ার কথা ভাবলাম তখন।

"মনে আছে ওখানে যাওয়ার প্রস্তাব নিয়ে এমনি এক শীতের সকালে তোমার কাছে গিয়েছিলাম? তোমাদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে কি খেয়ালে হঠাৎ চলে গেলাম কালিঘাটের মন্দিরে। নিরুপায় হলে খুব শক্ত চরিত্রের মানুষই দুর্বল হয়ে পড়ে, তা আমার চরিত্রের দৃঢ়তা বলে তো কিছুই ছিল না। মন্দিরের কাছে এক সাধু বসেছিলেন বাঘছাল বিছিয়ে। আমার মুখের চিন্তার ছাপ তাঁর চোখে পড়েছিল নিশ্চয়ই। হঠাৎ আমাকে ডেকে বললেন, 'প্রসন্ন পবিত্র মনে মাকে দর্শন করে এসে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যেও বাবা! তোমার মনের অশান্তি দূর করার উপায় বলে দেব।'

"অন্য সময়ে তাঁর সে কথায় কান দিতাম কি না বলা যায় না; কিন্তু আমার মনের সেই ব্যাকুল অবস্থায় ওঁর সে কথাটুকু যেন অনেক আশ্বাস এনে দিল। যথাসম্ভব পবিত্র মনে ঠাকুর দর্শন করে এসে বসলাম সেই সাধুর কাছে। আমাকে কোন প্রশ্ন না করেই উনি বললেন, আমার সব অন্যায়, অপরাধ, যদি মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারি, তবে তার প্রতিকার হওয়াও সম্ভব। বাইরের গ্লানি থেকে মুক্ত করার জন্যে আছেন চিকিৎসক। দেহের রোগ সারাবার জন্যে তাঁর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন আছে বই কি। তেমনি মনের কলুষতার থেকে মুক্তি দিতে পারেন একমাত্র সদ্গুরু। মনের মালিন্য না ঘুচলে দেহের রোগও তো ঘুচবে না। নিজের অন্তরকে নির্মল করার সাধনায় যদি নিযুক্ত হই, তবেই মাত্র চিকিৎসায় ফল হওয়া সম্ভব।

"কথাগুলো বুকে এমন করে গিয়ে বাজল যে, নিজের সব দুষ্কৃতি স্বীকার করতে বাধ্য হলাম তাঁর কাছে। উনি বললেন, এ রোগ তো বড় ভীষণ। তবে সুচিকিৎসকের পরামর্শ মত চললে নীরোগ হওয়া অসম্ভব নয়। সঙ্গে সঙ্গে এ কথা যেন মনে রাখি, এ পৃথিবীতে মানুষের ক্ষমতা বা ইচ্ছা-অনিচ্ছাই চরম নয়। এর নিয়ন্তা আছেন এক জন। সেই লোকাতীত পরম পুরুষ চির আনন্দময় সত্তার স্বরূপ। তাঁকে মন-প্রাণ দিয়ে ডাকতে পারলে দেখবে সব রোগ ভাল হয়ে গেছে। শুধু সে ডাক হওয়া চাই ঐকান্তিক।

"ঠিক সেদিনই সন্ধ্যায় শুনলাম বাণীর গান। শুনতে শুনতে মনে হল, আকাশ যেন ভরে গেছে আলোয়। সুরের ধারা বেয়ে ঈশ্বরের জ্যোতির্ময় সত্তা যেন আমার দেহে প্রবেশ করল। সেই বিপুল আনন্দ সহ্য করতে পারি এমন ক্ষমতা ছিল না। মনে হল, সাধু যে ঈশ্বরকে ডাকার কথা বললেন, সেই ঐকান্তিক ডাক যেন প্রাণের ভিতর থেকে উৎসারিত হয়ে সুরে সুরে আরতি করছে, বন্দনা করছে আনন্দময় সত্তার। সেদিন ভাল করে শোনা হয়নি, তাই আকুল ভাবে প্রার্থনা করেছিলাম বাণীর কাছে আর একদিন শোনার জন্য। দ্বিতীয় দিনে, সেই শনিবারে তোমার সঙ্গে গিয়ে আমার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়েছিল। ওর গান শুনতে শুনতে মনে হল, জীবন-মৃত্যু, দেহ-মন, স্থান-কাল, এসব যেন কিছু নয়। এক মহা আলোকতীর্থের দিকে চলেছে প্রাণ গানের স্রোতে ভেসে। মনে হল, সঙ্গীতের ইসারায় এমন এক জগতের সন্ধান পেয়েছি, যেখানে রোগ-শোক আনন্দ-বেদনা কিছু নেই। শুধু অনন্তকে উপলব্ধি করার গভীর আনন্দে ছেয়ে গেছে সমস্ত প্রাণ।"

চুপ করে যেন সেই অভিজ্ঞতা রোমন্থন করতে থাকল হিরণ্ময়। বাণী বলল, "সেদিন আমি কি রকম সাজগোজ করে গিয়েছিলাম তোমাদের কাছে, মনে আছে?"

বললাম, "আছে বই কি।"

একটু হেসে বাণী বলল, "কেন করেছিলাম জান? তার আগে

দু' বার ও এসেছিল বাবার কাছে। প্রথম দিনে দেখি, বারান্দায় বসে আছে একা, মুখে গভীর চিন্তার ছাপ। তুমি তো জানই, দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির পুরুষদের প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ সহজাত। কাজেই ওকে ভাল করে দেখবার লোভে নিজে গিয়ে কথা বললাম। এমন ভাবে ও আমার দিকে তাকাল, যেন চিনতেই পারল না আমাকে। মনে হল, নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলবার জন্যেই বুঝি ওর সেই অভিনয়, নিজের ওপরে যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল আমার। তাই কোন ভয় না করে, যেন কোন সন্দেহ করিনি এমন ভাবে কথা বলতে লাগলাম ওর সঙ্গে। কিন্তু তখন বিশেষ কথা বলার ইচ্ছেই ছিল না ওর। হঠাৎ এক সময়ে প্রশ্ন করল, 'আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন?'

"তার পরের দিনও এসেছিল ও বাবার কাছে। সেদিন চিনতে পারল সহজেই। নমস্কার করল আমাকে হাত তুলে। কিন্তু তার বেশী আর একটুও এগিয়ে এল না আলাপ করতে।

"খুব আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলাম ওর ব্যবহারে। সত্যিই কি তবে আমার গান শুনে ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা জেগেছে ওর মনে? খানিকটা গর্ববোধ যে করিনি তখন, তা নয়। তবু একবার ভাবলাম, সবই যদি ওর মিথ্যে অভিনয় হয়? সেইটুকু যাচাই করে দেখবার জন্যেই শনিবার দিন বিশেষ সাজ-পোষাক পরে বেরুলাম সামনে। পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি চিনতে অসুবিধে হবার কথা নয়। দেখি কতক্ষণ মুখোস পরে থাকে ও।

"গান শুনে চেতনা হারিয়ে ফেলতে পারে, এমন আশঙ্কা করিনি আমি। সেদিনের পর আমার মধ্যেও কেমন একটা পরিবর্ত্তন এল। বেশ বুঝতে পারলাম, সাধারণ স্বাভাবিক জীবন-ধারণের বাইরে ঈশ্বর বা ঐ জাতীয় কিছু একটা রহস্য নিশ্চয়ই আছে। না হলে শুধু গান শুনে কোন দুর্দ্দান্ত লম্পট এমন করে আত্মহারা হয়ে যেতে পারে না। এরই দিন তিনেক পরে সান্ধ্য বেলায় ওর সঙ্গে দেখা হতে জিজ্ঞাসা করলাম এর কারণ। ভাবতে পারিনি, অকপটে সব কিছু খুলে বলতে পারে আমাকে। আমার কাছে কিছু চায়নি ও, আর একবার গান শোনার ইচ্ছেও প্রকাশ করেনি। কিন্তু মনে মনে বুঝতে পারছিলাম অনেকখানি নির্ভর করে আমার ওপরে। তখন থেকে কেবলই মনে হত, আমিও যেন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি এ পৃথিবীতে। এ জীবনের রহস্য খুঁজে পেতে হবে আমাকে। আর একা একা তা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।"

বাণী থামল এবার, ভাবতে থাকল বোধ হয় সেই পুরোনো দিনগুলোর কথা। হিরণ্ময়কে প্রশ্ন করলাম, "তার পর?"

বলল, "তার পর কিছু দিন ঠিক মোহগ্রস্তের মত কেটেছে। কোন কাজে উৎসাহ নেই, মাথায় কেবল এক চিন্তা। কোন সদ্গুরুর আশ্রয় চাই, যিনি সাধন-পথের সন্ধান দেবেন। কালিঘাটের সেই সাধুর আর দেখা পাইনি। শুনলাম, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে এক সাধু এসেছেন হিমালয় থেকে। বাণীকে সে কথা বলতেই, ও

আমার সঙ্গে যেতে চাইল। একদিন ভোর বেলায় গেলাম দু'জনে কিঙ্কর বাবার কাছে।"

বাণী বলে উঠল, "কিঙ্কর বাবার চোখ দুটি যদি দেখতে সমীরদা! কি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি! কিছু বলতে হল না ওঁকে, আমাদের মুখ দেখেই বুঝে নিলেন সব। উনিও বললেন, 'আসল রোগ মনে। মনের মালিন্য মুক্ত হলেই দেহের রোগ জল-না-পাওয়া গাছের মত নষ্ট হয়ে যাবে।' তার পর থেকে প্রত্যহ আমরা যেতাম ওঁর কাছে। এক মাস পরে ওকে দীক্ষা দিলেন তিনি।"

প্রশ্ন করলাম, "কিন্তু তোমরা পালিয়ে গেলে কেন?"

হিরণ্ময় বলল, "উপায় ছিল না ভাই। প্রত্যহ আমার সঙ্গে যাওয়া-আসা নিয়ে কম কথা ওঠেনি আমাদের পরিচিত মহলে। আমার দুর্নাম তো কম ছিল না। বাণীর বাবা যথেষ্ট স্নেহ করতেন ওকে। কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত একজন লম্পটের সঙ্গে ওর এত মাথামাখি প্রশ্রয় দিতে রাজি ছিলেন না একটুও। তিনি যতখানি পেরেছেন, বাধা তো দিয়েছেনই, আমিও কম বাধা দিইনি ভাই! বাণী যেন তখন মরীয়া হয়ে উঠেছিল। তাই তো ভাবি, ওর আন্তরিকতার টানেই না সত্যিকারের মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছি আমি!"

বাণী বলল, "গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর ডাকে রাধাই পাগল হয়েছিল। ব্রজের কোন পুরুষ তো হয়নি। চারদিক থেকে যত বাধা আসতে লাগল, আমিও তত বেশী করে ওকে আঁকড়ে থাকতে চাইলাম। বুঝলাম, আমাকে ফেলে কোথাও যাবার ক্ষমতা নেই ওর। তবু যখন দীক্ষা নেবার পর ও চলে যেতে চাইল হিমালয়ে, বুকটা আমার কেঁপে উঠল। মনে হল, ও চলে গেলে আমার বেঁচে থাকাই যে নিরর্থক হয়ে যাবে। কিঙ্কর বাবার পায়ে গিয়ে পড়লাম। বললাম সব কথা মুখ ফুটে। উনি মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'বেটি, তোমরাই মহাশক্তি, আবার তোমরাই মহামায়া। দেহের আকর্ষণ মুক্ত হয়ে পরস্পরের মানসলোকের সাথী হতে যদি পার, তবে কেন আপত্তি হবে আমার? কিন্তু যে পরম ভূমার স্বাদ পেয়েছ এ জীবনে দৈবের কৃপায়, তুচ্ছ দেহের আকর্ষণে যেন সে স্বর্গচ্যুত হতে না হয়, এই আশীর্ব্বাদ করি।' উনি তার পর বিয়ে দিলেন আমাদের দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে। বললেন, 'রামকৃষ্ণ আর সারদামণির আদর্শ তোমাদের সামনে রইল, আমি দেখিয়ে দিলাম সাধনার পথ। এখন ঈশ্বরের নাম নিয়ে এগিয়ে যাও; অন্তরের নির্দ্দেশ অনুযায়ী পথ চলবে, তাহলে কখনও পদস্খলন হবে না'।"

হিরণ্ময় বলল, "কিন্তু সমাজ তো আমাদের সে বিয়ে স্বীকার করে নেবে না, বাণীর বাবা তো নয়ই। বাণীর কাছে সব শুনে ডেকে পাঠালেন আমাকে। অপরাধবোধ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল মন থেকে। কাজেই ওঁর রাগ, ভর্ৎসনা, ভয় দেখানো, কিছুতেই আর কোমল হল না মনটা। বাণীকে আটকে রাখলেন উনি। ওকে বলে এলাম, 'ঈশ্বরের পায়ে যখন সমর্পণ করে দিয়েছি নিজেদের, তখন যেখানেই থাকি না কেন, উভয়ে পরস্পরের কাছেই আছি, মনে কোরো।'

"চলে এলাম তার পরে বাড়িতে। নিশ্চিন্ত মনে রাত্রে শুয়েছিলাম, মেঝেয় কম্বলের আসন পেতে। প্রত্যুষের আগেই ঘুম ভেঙে উঠে দেখি বাণী এসে উপস্থিত। হাতে ওর বাপের বাড়ির স্মৃতি, একমাত্র ওই তানপুরাটা।

"বলল, ওর বাবা পুলিশে খবর দিয়েছেন আমাকে এ্যারেষ্ট করবার জন্ম। আইন-আদালতের জটিলতায় যেতে রাজি নয় ও। তার চেয়ে এখনি দু'জনে কোথাও চলে যাওয়া মঙ্গল। কলকাতায় মনও টিঁকবে না আর।

"আমাকে আর কিছু ভাবতে দিল না বাণী। হাতের কাছে যা কিছু পেল, একটা ছোট সুটকেশে বোঝাই করে ট্যাক্সি ডেকে সোজা হাওড়া ষ্টেশনে এসে নাগপুর প্যাসেঞ্জারে চেপে বসল। ওই গাড়িটাই ছাড়ছিল তখন। কিন্তু নাগপুর পর্য্যন্ত যাওয়া কপালে ছিল না। টিকেট করে গাড়িতে উঠিনি। চেকার এসে চাইতে বাণীর সঞ্চয় খুলে দেখা গেল, জরিমানা দিয়ে বিলাসপুর পর্য্যন্ত যাওয়া চলে। বিলাসপুরে কয়েক দিন থেকে সুযোগ পেয়ে চলে এলাম এখানে। এ মন্দিরের যে পূজারী ছিলেন, উঠলাম এসে তাঁরই আশ্রয়ে। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে নিজের হাতেই তুলে নিয়েছি ঠাকুরসেবার ভার।"

কথা বলতে বলতে বেলা পড়ে এসেছিল। বাস ছাড়ার সময়টা জানা থাকলেও খেয়াল হল সেটা ছেড়ে চলে যাবার পর। অপ্রস্তুত হয়ে বলে উঠলাম, "দেখেছ, কথায় কথায় এমন দেরী করিয়ে দিলে যে বাসটা পাওয়া হল না। এখন কি করে আজ বিলাসপুর পৌঁছুই বল দেখি?"

অপ্রস্তুত হয়ে হিরণ্ময় বলল, "ছি, ছি, একেবারে খেয়াল ছিল না ভাই! কত দিন পরে পরিচিত মানুষ দেখলাম, তার কি ঠিক আছে? আত্মহারা হয়ে গেছি একেবারে।"

বাণী হেসে বলল, "সমীরদাকে চিনি না আবার? আজন্ম কুঁড়ে মানুষ। কখনো সময় মত কোথাও যেতে পেরেছে এ পর্য্যন্ত? নিজের দোষে গাড়ি ফেল করে এখন আপশোষ করে কি হবে? ভালই হল, আর একটা দিন বেশী পাওয়া গেল তোমাকে।"

মাথা নিচু করে স্বীকার করে নিলাম আমার সেই চারিত্রিক কলঙ্ক। মনে মনে কিন্তু হাজার বার সাধুবাদ দিলাম ভাগ্যকে। এই মহাশান্তির পটভূমিকায় হিরণ্ময় আর বাণীর জীবনের দিক—পরিবর্তনের যে ইতিহাস শোনার সৌভাগ্য হল আমার, তার জন্তেও অন্ততঃ ক্ষমা করতে পারি আমার স্বভাবের এই ছেলেবেলার অপরাধ—আলস্যকে।

গান

"হলো আমার সব বলনা। ও মা কাজের জ্ঞান থাকে না। মাছের কাঁটা গলায়ে বেধে, ভাবলাম আর ত মাছ খাব না; আবার বুক রাঙা কই পাতে পড়লে, কাঁটার কথায় মন মানে না। পাকা কলার ধাতে সয় না, ভাবলাম আর কলার কয়বো না। আবার নিমন্ত্রণ পেলে ভাবি, আজ খাই খেয়ে আর খাব না। দিবানিশি এমনি করে, ঘটিছে কতই ঘটনা, নাই সুযোগ পেলে ছাড়াছাড়ি, প্রসন্নের এ কি লাঞ্ছনা।"—পণ্ডিত ৺প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি
পুষ্পগন্ধে সুরভিত
ক্যাস্টর অয়েল
বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

ঝড়ের পাখি

শ্রীকরুণাময় বসু

একটু কুণ্ঠিত মুখে সুচিত্রা বললে, থাক্ শ্যামল, পুরানো দিনের কথা আর কেন?

আবার হাসলাম। বললাম, চেয়ারে বসলে কি মানুষ এত শীগ্‌গির বদলে যায়? এই তো মাত্র ছ' মাস পাশ করেছি, এখনো কলেজের গন্ধ যায়নি। বুঝলে সুচিত্রা, এখনো চাঁদ উঠলে আকাশের দিকে চেয়ে থাকি। বাড়ীর পিছনে ঘন বন আছে, সেখান থেকে কনক চাঁপার ফুল এখনো তুলে আনি সন্ধ্যে বেলা। হাসছ যে বড়ো, ভারী মিষ্টি গন্ধ কনক চাঁপা ফুলের।

থাক্ থাক্ শ্যামল, এটা অফিস।

আচ্ছা দাও ফাইল, সই করে দেই।

অডিট-একাউণ্টস সার্বিস পাশ করে সবে একটা বড়ো সরকারী অফিসের ছোট সাহেব হয়ে বসেছি। ছায়াশীতল কক্ষ, দরজায় বিচিত্র পর্দা। বড়ো সেক্রেটেরিয়েট টেবিলে ফাইল স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে। একটার পর একটা সই করে যাই। কাজ এখনো বুঝিনি, শুধু চোখ বুজে সই। দরকার মনে করলে সুপারিটেণ্ডেণ্ট অথবা কেরাণীকে তলব করি। তারা এসে বুঝিয়ে দিয়ে যায়, বই খুলে আইন দেখিয়ে দেয়। খস্ খস্ করে এস এন বটব্যাল সই করতে ভারী আমোদ লাগে যেন। সাদা মসৃণ কাগজে নামের অক্ষর ক'টা ছবির মতো মনে হয়।

ফাইলের উপর থেকে মুখ তুললাম। তাকিয়ে আচমকা চেঁচিয়ে বললাম, এ্যাঁ তুমি?

টেবিলের উপর সুচিত্রা একটা ফাইল রাখলে। তার পর আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলে।

ভারী আশ্চর্য লাগছে। তুমি এই অফিসে চাকরী করতে এসেছ। কবে ঢুকলে?

একটু থেমে, বোধ হয় ভেবে নিলে সুচিত্রা, বললে, প্রায় বছর দেড়েক হ'বে।

বললাম, তুমি জানতে আমি এই অফিসে আসব?

হাসলে সে। আগেকার মতো টোল খেল নিটোল দুটি গালে। শুক্তির মতো ঘাম ফুটে উঠেছে মসৃণ কপালে। বললে, জানতাম বৈ কি!

এত দিন দেখা করতে আসোনি যে।

একটু থেমে বললে, ভেবেছিলাম একদিন না একদিন দেখা হ'বে।

আমি হেসে ফেললাম। তবু ভালো সেই দিন এত কাল পরে অভ্যুদিত হ'ল। জ্যোতির্ময় নবনীল দিন, কি বলো সুচিত্রা?

দিন যায়।

আপিসের মোহ ধীরে ধীরে ইন্দ্রজাল বিস্তার করে। আমি উপরওয়ালা, সুচিত্রা আমার কতো নিচে। কথাবার্তায় কেমন একটা সংকোচ এসে গেছে; আঁটসাঁট সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা। তবু মাঝে মাঝে উড়ে আসে রঙীন প্রজাপতির মতো এক-একটা অলস-মদির মুহূর্ত। টুকরো টুকরো কথায় রামধনু রঙের আভা ভেঙে ভেঙে বিচিত্র মায়া-আল্পনা আঁকে।

একদিন সুচিত্রাকে ডেকে পাঠালাম কি একটা কাজে।

কাজকর্ম কেমন চলছে, আইন-কানুন শিখেছ ত'?

আমার মুখের দিকে চেয়ে সুচিত্রা কি ভাবল। এক মুহূর্ত থেমে বললে, শিখবার চেষ্টা করছি। যাঁরা সিনিয়র কেরাণী তাঁরাও বলেন, দশ বছরের আগে সব কিছু আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

উৎসাহ থাকলে তার আগেও শেখা যায়। লেগে থাকাটাই আসল কথা। কর্তব্যনিষ্ঠা আফিস-জীবনে একটা মস্ত বড়ো কোয়ালিফিকেশন।

আচ্ছা আমি এখন যাই, সুচিত্রা বললে। দু'-একটি চূর্ণ অলক উড়ে এসে গালে পড়েছে তার। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় কানের দুল ঝকমক করে উঠল। কতো দিন আগেকার স্মৃতি হঠাৎ ঝিকমিকিয়ে ওঠে। সেই সব স্মৃতি কি ভুলবার?

যাই, যাই—তোমার সেই আগেকার অভ্যাস এখনও যায়নি দেখছি! বস না ওই চেয়ারে!

এর আগে তাকে কোন দিন বসতে বলিনি। আশি টাকা মাইনের কেরাণী, তাকে বসতে বলা কেমন লজ্জাকর মনে হয়েছিল, যদি কেউ দেখে, কী ভাববে সে?

না, না, বেশ আছি। কি বলবে বলো?

হঠাৎ কি মনে করে বিচিত্র নেকটাই ধরে একট নাড়া দিয়ে

বললাম, এই পোষাকে কেমন লাগছে বলতো? একটু দূরের মনে হয়, কি বলো?

হেসে ফেলল সুচিত্রা। বললে, যখন তুমি কলেজে মটকার পাঞ্জাবী, সোনালি পাড়ের শান্তিপুরী ধুতি আর কাজকরা স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে আসতে তখন তোমাকে রাজপুত্তুর বলে মনে হ'ত। এখন মনে হয় কতো দূরের তুমি, বিদেশী, অচেনা!

কেন, ভয় করে বুঝি?

হাঁা, ভয় করে, খুব বেশী শ্রদ্ধাও হয় না। জানি ভারতবর্ষের শাসন ব্যাপারের ইতিহাসে একদিন এই পোষাক আইন করে উপরওয়ালাদের পরানো হয়েছিল। এখন শুনতে পাই সে আইন নেই। তবু সেই অভিজাত সংস্কার এখনো রক্তে মেশানো আছে। তোমার দোষ নেই শ্যামল!

ঠিক বলেছ সুচিত্রা, এক-এক দিন মনে হয় এই পোষাক টেনে ছিঁড়ে দূর করে ফেলে দেই। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে এই নেকটাই পরলে। কে যেন গলা টিপে ধরে এই কড়া পালিশ করা কলার গলায় দিলে। সব বুঝি কিন্তু উপায় নেই, উপায় নেই!

অতো উতলা হয়ো না শ্যামল, সব ঠিক হয়ে যাবে। এখনো পুরানো জীবন হাতছানি দিয়ে ডাকে তাই তুমি স্বপ্ন দেখ রামধনু রঙের। এ স্বপ্ন একদিন বিবর্ণ ধূসর হয়ে যাবে। তখন দেখবে ফাইল, স্তূপীকৃত ফাইল। কী করে অপরকে পিছনে ফেলে পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় ওঠা যায় সেই আর্টের সাধনা তখন সত্যিকার সাধনা বলে মনে হ'বে। আচ্ছা, আমি আজ যাই।

না, আজ তুমি যেও না, আর একটু থাকো। সত্যি বলছি সুচিত্রা, এ জীবন আমার অসহ্য ঠেকছে। এই পার্টিসন-করা ঘর আমার কাছে খাঁচা বলে মনে হয়; আমি কি চিরকাল বন্দী থাকব এই খাঁচায়? আমি জানি আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আমাকে দেখলে হয়তো ভয়ে দূর থেকে নমস্কার করে পালিয়ে যায়। আমি এখানে চেঁচিয়ে কথা বলতে পারি নে, জোরে হাসতে পারি নে, মন খুলে কারুর সঙ্গে গল্প করতে পারি নে; সর্বদাই মনে হয় আমি যেন মুখোস পরে আছি, ভয় দেখাচ্ছি সবাইকে। ইচ্ছে করে এই মুখোস টেনে ছিঁড়ে ফেলে এই চেয়ার-টেবিল ভেঙে চুরমার করে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাই।

ছি ছি ছি, কী বলছ শ্যামল? উত্তেজিত হয়ো না, এটা অফিস। তোমার পায়ে পড়ি, চুপ করো শ্যামল!

তোমার কথায় কেন চুপ করবো? কে, কে তুমি আমার?

আমি তোমার সুচিত্রা। না, না আমি তোমার চিত্রা, চিত্রা।

স্মৃতির এলোমেলো পাতা উল্টে যাই। দেখি চাঁপা রঙের মেঘ আকাশের এক কোণে, অলস-মেদুর অপরাহ্ন, রজনীগন্ধার কুঁড়ির নিশ্বাস এলোমেলো পূব হাওয়ায় আচমকা ভেসে আসে।

মনে পড়ে এক আহত পাখির মতো সুচিত্রা আমার বুকের কাছে এসে পড়েছিল; কী সংকোচ-ভরা ভীরু চাউনি ছিল তার সেদিন! কলেজের গেট থেকে বেরিয়ে আসছি আমি, পিছন দিক থেকে মেয়েলি গলার স্বর শুনতে পেলাম। একটু শুনুন! পিছনে তাকিয়ে দেখি সুচিত্রা প্রায় কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ফোর্থ ইয়ারের মেয়ে, অঙ্ক সেকসনে পড়ে, মুখ চিনি। শ্যামল, একহারা মেয়ে, বড়ো বড়ো দুটি চোখ কৌতুকে, সরলতায় লাবণ্যদীপ্ত। শাড়ী আধময়লা, বোধ হয় স্বচ্ছল ঘরের মেয়ে নয়, তবু সুচিত্রাকে দেখে সেদিন মন হঠাৎ খুসি হয়ে উঠেছিল।

কী বলুন ত'?

প্রফেসার আচার্যর লেকচারের নোটটা আমি টুকতে পারিনি। শুনলাম গোটা নোটটা আপনার কাছে আছে। গোটা কতক দরকারী পয়েণ্ট আমাকে লিখে দেবেন আপনার নোট দেখে?

আচ্ছা দেব। আপনি কি ট্রামেই যাবেন, যাবেন ত' চলুন একসঙ্গে যাই। কোথায় যাবেন?

না, ধন্যবাদ! আমি হেঁটে যাই, বাড়ী বেশী দূর নয়। আচ্ছা, কাল দয়া করে আনবেন।

আমার মুখের উপর তার দুটি কোমল চোখের দৃষ্টি একবার বুলিয়ে নিয়ে চোখ নিচু করে ধীরে ধীরে গেট থেকে বেরিয়ে গেল। ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়ায় কলেজের বাগান থেকে সেঁউতি ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল। কী মিষ্টি মৃদু গন্ধ তার!

সুচিত্রার যাওয়া-আসা কথাবার্তা সমস্তই যেন নিঃশব্দতার প্রতিধ্বনি। জোরে চলতে পারে না, চেঁচিয়ে কথা কইতে পারে না। জোরে কথা বলতে গেলে উত্তেজনার মাঝে কেমন ঝিমিয়ে পড়ে, কান দুটো অকারণে লাল হয়ে ওঠে।

তবু হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম সুচিত্রার গানের গলা অসাধারণ। আর সে গান আধুনিক গান নয়, দস্তুরমতো ক্লাসিকাল সঙ্গীত।

এ গান শিখলে কোথা থেকে? উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি আমি।

আমাদের বাড়ীর সকলেই কিছু-না-কিছু সঙ্গীত-চর্চা করেন।

ভারী আশ্চর্য লাগছে; এ তো গান নয় যেন সুরের ফুলঝুরি চমকে উঠছে। মানুষের মনে নেশা লাগায় এই সুরের ইন্দ্রজালে।

থামুন, আর রসিকতা করতে হবে না। সুচিত্রা হাসিমুখে বললে।

আমাকে বিশ্বাস করো সুচিত্রা আমি এমন গান অল্পই শুনেছি। তুমি খাঁটি আর্টিষ্ট।

লজ্জিত হয়ে সুচিত্রা ঘাড় নিচু করল।

জানি না কখন সুচিত্রা আমার নির্জন অন্তরে এসে পৌঁছুল নিঃশব্দ চরণে। কোন দিন যা পারিনি একদিন তার ডান হাতখানা গালের উপর রেখে বলেছিলাম: সুচিত্রা, তুমি চলে গেলে আমার সব কিছুই হারিয়ে যাবে। আমি আর আমাকে ফিরে পাব না। আমার ভাণ্ডার ভিখারীর ঝুলির চেয়েও শূন্য হয়ে যাবে তোমাকে হারালে।

গঙ্গার ধারের এক বাগানে বসে আছি আমি আর সুচিত্রা। সন্ধ্যার চাঁদের আলো ঝকঝক করে উঠল নদীর জলে,—মনে হ'ল যেন কোন অশ্রুমতী বিরহিণী চোখ তুলে চাঁদের দিকে চেয়ে কার স্বপ্ন দেখছে। দূরের সুপুরী, নারকেল বনের মধ্য দিয়ে একটা আচমকা বাতাসের ঝলক ঘুরতে ঘুরতে এই দিকে এল আবার দূরে মিলিয়ে গেল হু হু করে। একটা আশ্চর্য রূপকথার রাত মনে হচ্ছে আমার, একটা বহু দূরের বেদনা মনে গুমরে উঠছে যেন।

চলো, উঠি সুচিত্রা!

গায়ে হাত দিয়ে সুচিত্রা বললে, না আর একটু বস!

আমি চমকে উঠলাম। কেন, কেন সুচিত্রা?

হঠাৎ দেখি সুচিত্রা দুই হাতে সজোরে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।

কাঁদ কাঁদ গলায় বললে : শ্যামল আমি বড়ো দুঃখী, আমার বড়ো ভয় হয়। শ্যামল, শ্যামল, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। কথা দাও তুমি আমাকে ফেলে কোথাও যাবে না, কথা দাও, কথা দাও।

থর্ থর্ করে কেঁপে উঠেছে সুচিত্রার সমস্ত শরীর। আমি সেদিন ঝড়ের পাখিকে বুকে তুলে নিয়েছিলাম; দিয়েছিলাম অনন্ত আশ্বাস। সে বুঝি সেদিন স্বপ্ন দেখেছিল শ্যামল ধরণীতে সোনালি দিন-রাত্রির। সে কি দেখেছিল পাখির নীড়ের স্বপ্ন, বন থেকে কুড়িয়ে-আনা খড়-কুটো দিয়ে বাসা বাঁধার স্বপ্ন-মোহ ?

আজ হারানো দিনের সব কথাই মনে আসছে এই ফাইল সই করবার আগে। কলেজে সুচিত্রা আর আমাকে কেন্দ্র করে আলোচনার ঝড় উঠেছিল। আমি দৃঢ় মুষ্টিতে সুচিত্রার ডান হাত ধরে সেই ঘূর্ণী বায়ু থেকে তাকে বাঁচিয়েছিলাম। সে জলভরা দুটি চক্ষু আমার মুখের উপর রেখে বললে, কে, কে তুমি আমার? আমার জন্ম এ কলঙ্ক কেন তুমি মাথা পেতে নিলে ?

কে তুমি আমার, এ প্রশ্নের উত্তর আজ নয়, আর একদিন দেব। শুধু এই কথাটাই আজ বলে রাখি, তোমার দেওয়া সমস্ত ভার তা যতো বড়ো বোঝা হয়ে উঠুক না কেন আমি হাসিমুখে বইবো, এই সত্য আজ করে গেলাম। তুমি আমার দুঃখের ধন সুচিত্রা! ভালোবাসায় দুঃখ আছে, তাইতো সে অমৃত হয়ে ওঠে।

জানালার বিচিত্র পর্দার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক রৌদ্র এসে ঘরে লুটিয়ে পড়েছে ; রামধনু রঙ গুঁড়িয়ে আছে সেই রৌদ্রের আলোয়।

সেই দিক চেয়ে বেল টিপলাম। চাপরাশি আসতে বললাম, মিস্ ব্যানার্জিকে বোলাও।

আবার ঝুঁকে পড়লাম ফাইলের দিকে। সুচিত্রার কাজে গুরুতর ত্রুটি দেখা গিয়েছে। তাকে ডিপার্টমেণ্টাল শাস্তি দেওয়া দরকার, দুটো ইন্‌ক্রিমেণ্ট স্থগিত রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। কাগজপত্র একেবারে নিখুঁত, কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই, শুধু আমার সইয়ের অপেক্ষা। আমার কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে।

শব্দ হ'তে চোখ তুললাম। সুচিত্রা হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

একটু কাশলাম, একটু উসখুস করে বললাম, বস ওই চেয়ারে।

না, না, বেশ আছি, কী বলবে বলো ?

কেমন করছ কাজ আজকাল ? ঠিক সুবিধা হচ্ছে না, কেমন কি না ? হাসবার চেষ্টা করলাম।

সুচিত্রা কি মনে করে অল্প একটু হাসলে। দুই গালে টোল পড়ল আগেকার মতো। দীর্ঘ চোখের পাতায় মদিরতার আমেজ, দুটি বঙ্কিম ভ্রূ-লতা ভ্রমরের মতো চঞ্চল। কানের দুল অকারণে ঝকমক করে উঠল।

হ্যাঁ শ্যামল, কাজে সত্যিই ভুল হয়েছে, সেজন্য দুঃখিত।

কিন্তু ভুলের শাস্তি তোমাকে পেতেই হ'বে সুচিত্রা! আমি মরীয়া হয়ে বললাম।

সে হাসলে আবার। তুমি আমাকে শাস্তি দেবে শ্যামল এ আমি সইতে পারব না। তুমি আমাকে শাস্তি দিও না।

ভুলে যাচ্ছ সুচিত্রা এটা অফিস। তুমি আমি কে ? তোমাকে শাস্তি পেতেই হ'বে।

আমি যদি সেই শাস্তি না নেই তোমার কি সাধ্য আছে শ্যামল তুমি আমাকে শাস্তি নিতে বাধ্য করবে ?

ভুলে যাচ্ছ সুচিত্রা তুমি কেরাণী, আমি তোমার উপরওয়ালা। তুমি আমার অনেক নিচে। আমি তোমাকে শাস্তি দেব এবং সে শাস্তি নিতে তুমি বাধ্য।

না না, আমি তোমার নিচে নাই। এই তো তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছি শ্যামল! আমি তোমার দেওয়া শাস্তি কিছুতেই নেব না।

সে একখানা কাগজ ছুঁড়ে ফেলল আমার টেবিলের উপর। বলল, এই আমার রেজিগনেশন লেটার, মঞ্জুর করা না করা তোমার ইচ্ছা। আমি আর চাকরী করব না। এখন তো তুমি আর আমার উপরওয়ালা নও।

তুমি কি চাকরী ছেড়ে দেবে সুচিত্রা, সরকারী চাকরী, কতো বড়ো নির্ভর-স্থল। খেয়ালের বশে যা খুসী করে বসো না। মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখ।

ভেবে দেখেছি। ক'দিন থেকেই ভাবছি। চুঁচড়োর এক পাড়াগাঁ'র স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিল কাগজে। দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম, কমিটি মঞ্জুর করেছেন। আগামী সোমবার স্কুলে জয়েন করব। মাইনে সামান্য।

আমার গলার স্বর কেঁপে উঠল, তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে সুচিত্রা ?

হ্যাঁ শ্যামল, তোমাকে ছেড়ে যাব। এ যে আমার কতো বড়ো দুঃখ সে তুমি বুঝবে না। তবু তোমাকে ছেড়ে যেতে হ'বে। শ্যামল, শ্যামল, এখানে তুমি আমার কাছে কতো নিচু হয়ে ছিলে; তুমি ছিলে অত্যন্ত সাধারণ মানুষ, একেবারে কাদামাটির তৈরি। মুখোস পরে মানুষকে ভয় দেখাতে, মানুষ ভয়ে কাঁপত। কিন্তু সে মূর্তি তো আমি চাইনি ; তুমি যে আমার সাত রাজার ধন শ্যামল, আমার চোখের দিকে চেয়ে দেখ, কিছু কি দেখতে পাও ? কিছু স্বপ্ন, কিছু রঙ। আমি তোমাকে ভালো-বাসি, তাই তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। সেই পাড়াগাঁ, অবারিত নীল আকাশ ; শ্যাম বনান্ত-রেখার ওপারে ছলছল নদীর করুণ আভাস। মাথার উপর হাঁসের সারি, মেঘে মেঘে ঝিকিক দেওয়া সোনা রোদ, সেইখানে তুমি পরিপূর্ণ হয়ে দেখা দেবে শ্যামল আমার মনে দেবতার মতো। সেই তো আমার চিরকালের স্বপ্ন। আমাকে ছেড়ে দাও শ্যামল, আমি যাই।

নিচু হয়ে সুচিত্রা আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে, তার পর আমার মুখের দিকে একবার তাকালে, চোখের পল্লবের নিচে মুক্তোর মতো অশ্রুর বড়ো বড়ো ফোঁটা লেগে আছে। হঠাৎ দেখি ঝর্‌ঝর্ করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে সুচিত্রার দু' গাল বেয়ে। দু' হাত দিয়ে মুখ ঢাকলে সে, তার পর আঁচল দিয়ে চোখ মুছলে। মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুচিত্রা।

শূন্য পাথরের ঘর, বিকালের রোদ এসে পড়েছে নিস্তেজ পাণ্ডুবর্ণ রেখায়। মনে মনে বললাম : একদিন ঝড়ের পাখিকে বুকে করে তুলে নিয়েছিলাম, সেই পাখিকে আবার ঝড়ের হাওয়ায় দিলাম উড়িয়ে মেঘের ওপারে। একদিন তাকে অনন্ত আশ্বাস দিয়েছিলাম, কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রাখতে পারলাম না। আমি তাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সেই আমাকে চরম শাস্তি দিয়ে গেল।

শস্যশ্যামলা বাঙলা

—সুভো ঠাকুর অঙ্কিত
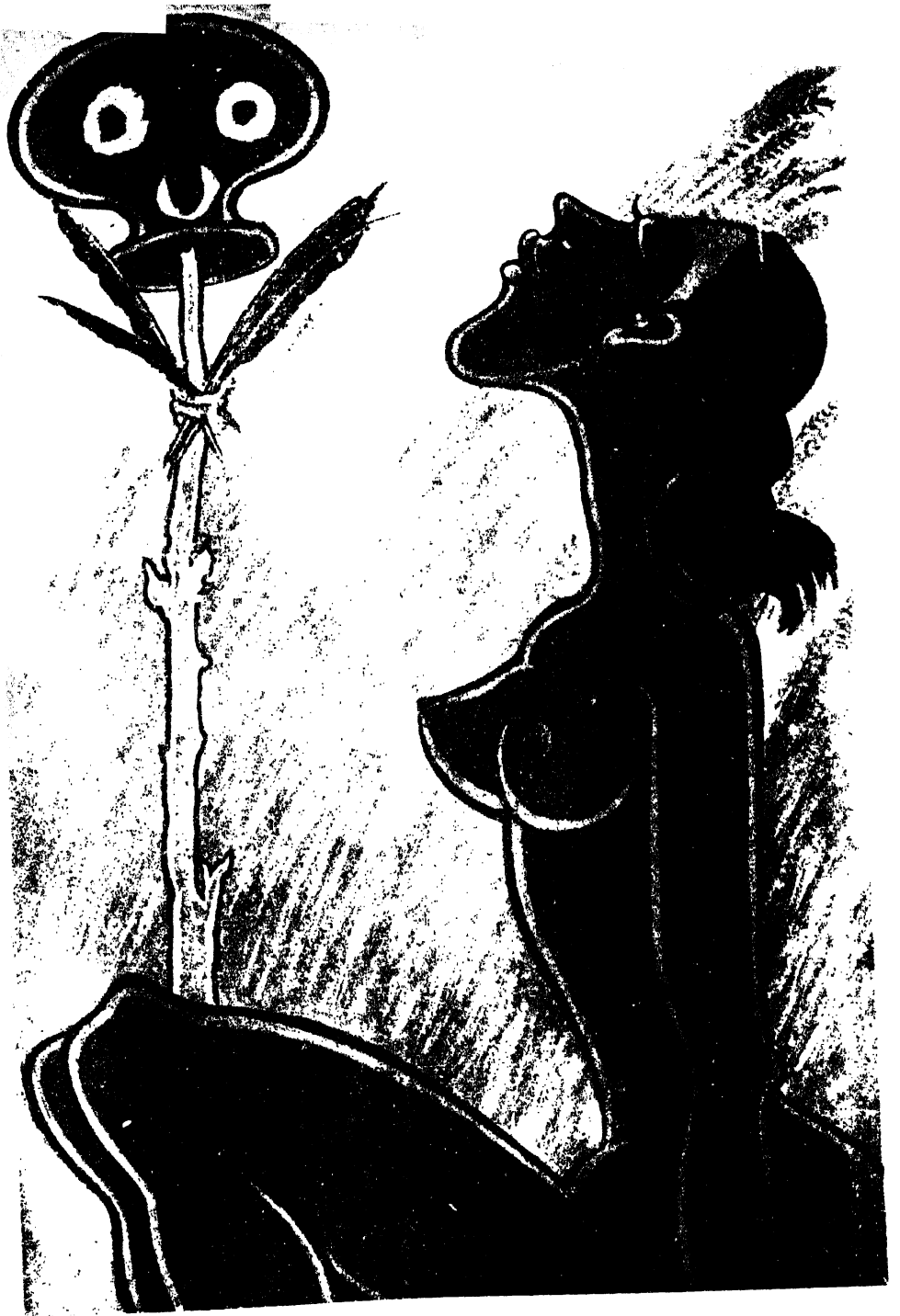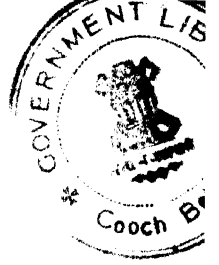
(পূর্ব্বমেঘ)

শ্রীকালিদাস রায়

শ্রীরাম-চরণরেণুতে ধন্য রামগিরিতট তীর্থসম,
যেথা জানকীর পুণ্য সিনানে জলধারাগুলি পাবনতম,
ছায়াচ্ছন্ন তাহারি অঙ্কে বৎসর কাল যাপিছে একা
তরুণ যক্ষ লঙ্ঘন করি নিজ নিয়োগের শাসন-রেখা
        দয়িতা-বিরহ-পীড়িত মনে,
কুবেরের শাপে মহিমা হারায়ে নির্ব্বাসনে।

আট মাস গত, বিরহ নিয়ত সহিয়া তার
        নাইক জীবনে স্বস্তি আর,
ব্যথায় মলিন দেহ কৃশ ক্ষীণ অস্থিসার ;
কনকবলয় খসি খসি পড়ে দু' বাহু বাহি'।
আসিল আষাঢ়, প্রথম বাসরে দেখিল চাহি'
উৎখাত-কেলি-মত্ত বিশাল করীর মত
গিরি-নিতম্ব বেড়ি অম্বুদ সমুন্নত।

চিত্তেও তার উদিল মেঘ
কোন মতে সেই রাজকিঙ্কর সংযত করি বাষ্পবেগ,
চাহিয়া চাহিয়া রাগোদ্দীপক মেঘের পানে,
লাগিল ভাবিতে কত কী যে চিতে কেই বা জানে !
মেঘদরশন কার না চিত্ত উদাস করে ?
মিলনলগ্ন-সুখস্বপ্নেরও চিত্ত বাড়ায় ভাবান্তরে,
বাহুপাশে যার কণ্ঠলগ্ন থাকার কথা,
দূরে রহিলে সে, বিরহী যে পাবে দারুণ ব্যথা
        তাহাতে কি আর বিচিত্রতা !

ঘনায়ে আসিছে শ্রাবণ মাস,
প্রিয়ার জীবনে সে বিরহী মনে হতাশ্বাস,
নিজের কুশল বার্ত্তা প্রেরণে প্রার্থী হইল মেঘেরই কাছে
দশমী দশায় তাই পেয়ে যদি সে প্রিয়া বাঁচে।
সদ্যঃস্ফুট কুটজ কুসুমে রচিয়া অর্ঘ্য ভরিয়া পাণি
সাদরে মধুর বচনে শুনাল নবজলধরে স্বাগতবাণী !

কোথা এই মেঘ—জ্যোতি, ধূম আর সলিল বায়ুর মিলনে গড়া !
সবলেন্দ্রিয় দূতের হস্তে কোথায় বার্ত্তা প্রেরণ করা !

অচেতন মেঘ কারো বার্ত্তা কি বহিতে পারে ?
যক্ষ বিরহবিধুর বক্ষে ঠাঁই দিল না'ক সে চিন্তারে।
        কামবিবশের স্বভাবই এই,
জড়-চেতনের ভেদবোধ তার আদৌ নেই।

        কহিল যক্ষ দু' হাত তুলে,
পুষ্কর আর আবর্ত্তকের ভুবনবিদিত মহৎকুলে
        জন্ম তোমার যাইনি ভুলে।
ইন্দ্রের তুমি প্রধান পুরুষ, পেয়েছ প্রকৃতি পালন ভারও
যখন যেরূপ বাসনা সে রূপই ধরিতে পারো।
হায় বিধিবশে প্রিয়া মোর পাশে আজিকে নাই,
তোমার সকাশে প্রার্থী তাই।
মহানুভবের কাছে প্রার্থনা ব্যর্থ হলেও কাম্য তবু,
সার্থক যদি অধমের কাছে তবু স্পৃহনীয় নয় তা কভু।

কুবেরের ক্রোধে প্রিয়াবিচ্ছেদে আর্ত্ত আমি,
সন্তাপহর তুমি জলধর তোমারি সকাশে শরণকামী,
বহিরুদ্যানবাসী ঈশানের ভালচন্দ্রের চন্দ্রিকায়
হর্ম্যনিকর আরো মনোহর সুধাধবলিত সে অলকায়
যক্ষরাজের সেই পুরী পানে যাত্রা কর,
করিয়া করুণা মম দয়িতার বার্ত্তা ধর।

দয়িত যাদের প্রবাসে রয়
হেরি নীল নভ হেরি তব নব অভ্যুদয়
বিশ্বাস বশে আশা-আশ্বাসে আত্মহারা
দুই চোখ হতে অলকগুচ্ছ তুলে ধরি চেয়ে রহিবে তারা
উজল দিঠিতে তোমার পানে,
তুমি যে ত্বরিতে প্রবাসী দয়িতে স্ববাসে ফিরাও কে বা না জানে ?

গগনে তোমার উদয় হ'লে
কোন্ পরবাসী বিরহবিধুরা জায়ারে ভোলে ?
আমার মতন পরাধীন জন কে বলো আছে,
যে তব উদয়ে বিদেশে বিরহে কষ্টে বাঁচে।

চালায়ে তোমারে অতি ধীরে ধীরে অনুকূল বায়ু বহিছে সাথে
বাম দিকে তব মত্ত চাতক কূজনে মাতে।
বলাকার পাঁতি মালিকা রচিবে তুমি হবে তায় সেব্যমান,
তোমারি আড়ালে লভিবে সেকালে তাদের বধূরা গর্ভাধান।
দেখিবে তোমারে রসোৎসবে,
অমনি কতই শুভের সূচনা যাত্রায় তব দেখিবে নভে।

পতিব্রতা সে, আমিই কেবল তাহার পতি
হয়ে আনমনা দিবস গণনা করিছে সতী।
দেরি না করিলে দেখিবে তোমার ভ্রাতৃজায়াটি জীবিতা আছে,
দয়িত বিহনে কোনরূপে প্রাণে যদিও বাঁচে।
আশায় আশায় বিরহিণী প্রাণে বাঁচিয়া থাকে,
বৃন্ত যেমন পতনপ্রবণ লুলিত কুসুমে ধরিয়া রাখে,
কুসুমকোমল অতিক্ষীণ নারী-হৃদয়খানি
বিরহে বাঁচায় আশাও তেমনি মরণ হইতে রাখিয়া টানি।

মন্দ্রে তোমার ভূমি ভেদি জাগে ভূকন্দলী,
শস্যে শ্যামলা হয় মরুসম কৃষিস্থলী।
শ্রুতিতর্পণ সেই গর্জ্জন শুনিয়া কানে,
মরালেরা যাবে সুদূর মানসসরসী পানে।
মৃণালখণ্ড পাথেয় লইয়া চঞ্চুপুটে
কৈলাসধাম অবধি তোমার সঙ্গী হইবে শৈলকূটে।

বহুদিনকার বিরহ-জ্বালার উষ্মারে দিয়া বাষ্পাকৃতি,
তোমার স্পর্শে যে প্রতিবর্ষে জানায় প্রীতি
মেখলা যাহার ভুবনবন্দ্য রামচন্দ্রের চরণপাতে
চির পবিত্র, কর কোলাকুলি সেই সমুচ্চ গিরির সাথে,
তুমি এ গিরির চির পুরাতন বন্ধু হও,
যাত্রার আগে তাহার সকাশে বিদায় লও।

ওগো পয়োধর, আগে বলি শোনো কোন্ পথে তব হবে প্রয়াণ,
তারপর মোর সন্দেশামৃত কর্ণের পুটে করিও পান।
ক্লান্ত হইলে বিশ্রাম কোরো শৈলশিরে,
হীনবল যদি মনে হয় তবে চলিও ধীরে,
গিরিনির্ঝরে লঘু বারি তবে করিও পান;
মাঝে মাঝে ভার লঘু করে নিও করি প্রান্তরে বৃষ্টিদান।

বেতসকুঞ্জে শ্যামসুন্দর নিম্নভূমি,
দেখিতে দেখিতে উত্তরমুখে করিও জলদ যাত্রা তুমি।
সরল-মুগ্ধ সিদ্ধবধূরা স্নিগ্ধ-চকিত নয়নে চা'বে
তোমাপানে পথে, তুমি সথে তায় নবোৎসাহের পাথেয় পাবে।
তোমা হেরি তারা ভাবিবে আকাশে অকস্মাৎ
গিরির শৃঙ্গ উড়ায়ে ধায় কি ঝঞ্ঝাবাত?

দিঙ নাগগণ স্থূল কর্কশ শুণ্ডে পরশ করিতে এলে,
দ্রুত চলে যেও এড়ায়ে তাদের পিছুতে ফেলে।
যেন নানাবিধ বরণের মণি রতনছটায় রচিত তনু
সমুখে তব ইন্দ্রধনু
বল্মীকশির হ'তে উদিতেছে দেখিতে পাবে।

তব শিরে তার পরশ লাভে
তব শ্যামতনু হবে যেন শিখিপুচ্ছধারী,
গোপবেশধর বিষ্ণুর মত হৃদয়হারী।

অথলা সরলা কৃষিপল্লীর অঙ্গনারা
নটীর মতন ভুরুর নাচন জানে না তারা।
তারা জানে সখে কৃষির সুফল তোমারি দান,
স্নিগ্ধ সরল মুগ্ধ নয়নে তব রূপ তারা করিবে পান।
হলকর্ষণ যে মালভূমিতে করিয়া গিয়াছে কৃষকগণ
হবে তাহা হতে মধুর গন্ধ নিঃসরণ,
জলবর্ষণ করিতে করিতে সেই গন্ধের লভিয়া ঘ্রাণ
পশ্চিমে স'রে ধীরে ধীরে পরে উত্তর দিকে কোরো প্রয়াণ।

দাবানল যবে জ্বলিয়া উঠিল আম্রকূটের সানুটি ঘিরি
তুমি নিবাইলে ধারাবর্ষণে সে কথা এখনো ভুলেনি গিরি।
করিতে তোমার দীর্ঘপথের শ্রমহরণ
শিখরে তার সে রচিয়া রেখেছে শীর্ষাসন।
একবারও যদি লভে উপকার উপকারী জনে করিতে সেবা
হয় না বিমুখ উপকৃত নীচ অধমও যে বা।
গিরি ত উচ্চ, তার সাথে তব বান্ধবতা
তুমিও নহ ত তুচ্ছ অতিথি তোমাকে আদর করারই কথা।

রয় তারে ঘেরি পক্ব রসালে পাণ্ডুবর্ণ আম্রবন।
তৈলসিক্ত বেণীর মতন কৃষ্ণ-চিকণ তব বরণ।
তুমি তার 'পরে করিলে বিরাজ দৃশ্য হইবে রম্যতম,
পাণ্ডুবরণ স্তনের উপরে শোভিবে কৃষ্ণ চুচুক সম,
স্বর্গ হইতে অমর-মিথুন হেরিবে যবে
সেই ধরাধরে ধরা-পয়োধর বলিয়া তাদের প্রতীতি হবে।

বনচরবধূ প্রিয়সংগম যেথায় লভে,
আম্রকূটের সেই নিকুঞ্জে ক্ষণ কাল তোমা রহিতে হবে।
কিছু বারি সেথা ঢালিলে তোমার হবে না ক্ষতি,
হয়ে লঘুভার ক্ষিপ্রগতি
দেখিবে বন্ধু দ্রুত উড়ে গিয়ে বিন্ধ্যাচলে
উপলে ব্যথিতা শীর্ণা রেবারে ঐ গিরিটির চরণতলে,
মিশিতে রেবায় বহু নির্ঝর গিরিদেহ বাহি পড়িছে গলি
গজের অঙ্গে যেন বিরচিত তিলকপত্র চিত্রাবলী।
জম্বুকুঞ্জে প্রতিহত রেবা দেখিবে মন্দ মন্দ বয়
বন্য গজের মদধারাপাতে সলিল যাহার গন্ধময়।
পথে ঢালি জল হবে হীনবল বলিতেছি করি এ অনুমান
বলাধান তরে ঐ বারিধারা করিও পান।

অন্তরে যদি বিরাজে সার
প্রবল বায়ুর সবল শাসনে চালিত হইতে হবে না আর।
অন্তঃসারশূন্য জনেরে পুছিবে কে বা?
গৌরব লভে, রিক্ত যে নয়, অন্তরে রয় পূর্ণ যে বা।
নবধারাপাতে সারা পথ হবে মৃগকদম্বে সূচ্যমান°।
নবজলসেকে সুরভি মাটির গন্ধ তাহারা করিবে ঘ্রাণ।

হেরিবে নীপের আধবিকসিত হরিতকপিশ কেশরাবলী
ভুঞ্জিবে তারা অনূপদেশের প্রথমোদগত ভূকন্দলী।

জানি সখে মোর প্রিয়ার কাছে
বার্ত্তা বহিতে বাসনা তোমার প্রবলই আছে।
তবু মনে মোর শঙ্কা হয়,
কুটজ সুরভি গিরিকূটে কূটে হবে কিছু তব কালক্ষয়।
স্বচ্ছবিশদ জলভরা চোখে হেরিবে তোমাকে ময়ূরগুলি
স্বাগত জানাবে কেকার ভাষণে নৃত্য করিবে পুচ্ছ তুলি'।
তোমারো উচিত তাদেরে একটু আদর করা,
বিলম্ব হবে একটু যদিও, যথাসম্ভব করিও ত্বরা।
কেমন করিয়া কৌশলে জল-কণিকা চাতক করে গ্রহণ
দেখিবে যখন, গণিবে যখন বলাকার পাঁতি সিদ্ধগণ
তব গর্জ্জন সিদ্ধবধূর চিত্তে জাগাবে সহসা ভীতি,
আঁকড়ি ধরিবে প্রিয়তমে যত সিদ্ধ জানাবে শ্রদ্ধা-প্রীতি।

দশার্ণ দেশে যাইয়া দেখিবে ভরা সেই দেশ জামের গাছে,
তার ডালে বামে পাকা পাকা জামে ভরিয়া আছে।
উদ্যান সেথা ছায়ায় শীতল ফুলে ভরে গেছে কেয়ার বেড়া।
হেথা কয় দিন বিশ্রাম করে মানসযাত্রী রাজহাঁসেরা।
গ্রাম্য পাখীরা লোকালয়ে যারা গৃহে গৃহে নিতি আহার পায়
দেখিবে তাহারা কলরব করি পথতরুশাখে বাঁধে কুলায়।

রাজধানী তার বিদিশা যাহার দিকে দিকে যশোঘোষণা বটে,
সেথা গিয়া তব বিলাসলালসা তৃপ্ত হওয়ার কথাই বটে।
বহিছে সেথায় চটুলনেত্রা বেত্রবতী
চলতরঙ্গে তার ভ্রূভঙ্গী-শাসন যদিও তোমার প্রতি
তার মুখসুধা সলিলের জলে পিইবে তুমি
মধুর মন্দ্র চুম্বন রূপে ধ্বনিত করিবে পুলিনভূমি।

বিশ্রাম তরে ঠাঁই যদি চাও নীচৈঃ শৈল কাম্য জানি।
তব সমাগমে বিকচ কদমে শিহরিবে তার অঙ্গখানি।
বহু গুহাগৃহ বিরাজিছে এই শৈলাবাসে
গণিকার সাথে নাগরেরা রাতে হেলায় আসে।
বিলাসিনীদের তনু-পরিমল গুহা হতে হয়ে বহির্গত,
প্রচারিছে হেথা পৌরগণের যৌবন কত মদোদ্ধত!
সেথা বনচরী নদীর কূলে
উদ্যানগুলি দেখিবে মোদিত আধবিকসিত যূথিকা ফুলে,
পুরবালাকুল দলে দলে ফুল চয়ন করে
তপনের তাপে তাদের কপাল কপোল বাহিয়া ঘর্ম্ম ঝরে,
ঘর্ম্মমোচন ঘর্ষণে কানে উৎপলগুলি ঢুলিয়া পড়ে।
নব জলকণা করি বর্ষণ যূথিকাগুলিরে সজীব ক'রো
ছায়াদানে পুরকুমারীগণেরও শ্রান্তি হ'রো।

হেরিতে তোমারে তারা ক্ষণ তরে আনন করিবে সমুন্নত
ক্ষণপরিচয়ে তোমারে বরিবে চিরপরিচিত সখার মত।
উত্তর দিকে যাত্রা তোমার কিছু ঘুরপথ হইবে বটে
একটি নগরী কেমনে না হেরি আগানো ঘটে!

বিমুখ হয়ো না উজ্জয়িনীর সৌধচূড়ার আমন্ত্রণে,
সৌধবাসিনী পৌরকামিনী সৌদামিনীর বিস্ফুরণে
চমকিয়া উঠি চা'বে তোমাপানে স্ফুরিত চকিত লোললোচনে।
সেই নয়নের অপাঙ্গ লীলা সম্ভোগ ক'রো হে কুতূহলী,
বঞ্চিত হবে সে লীলানন্দে তাহা না ভুঞ্জি যাইলে চলি।

বিন্ধ্যদুহিতা নির্বিন্ধ্যারে পথে পাবে তারে কোরো না হেলা,
দেখিবে তাহার তরঙ্গদোলে হংসের পাঁতি করিছে খেলা।
কূজনে তাদের রণিত মেখলা রচিত তাহার কটিটি বেড়ি
শিলায় শিলায় স্খলিত লীলায় চলে সে ছলকি তোমারে হেরি।
সলিলাবর্ত্তে তোমা বার বার দেখায় নাভি
কেন এই ছলা দেখিও ভাবি।
একটু নামিয়া করিও তাহার যৌবনলীলা রসাস্বাদ,
হাবভাবই হয় প্রিয়তম পাশে নারীর প্রথম প্রণয়বাদ।
বেণীর মতন ক্ষীণধারা বহি দেখিবে আজ সে তটিনী চলে।
তীরে তরুশাখা হইতে স্খলিত জীর্ণ পলিত পর্ণদলে
পাণ্ডুবরণ ধরেছে ও তনু বিন্ধ্যজার।
তব ভাগ্যেরই দেয় পরিচয় তোমারি বিরহে এ দশা তার,
ক্ষীণতা দীনতা করিয়া দূর
কোরো হে সুভগ, পীনতাসাধন ঐ তনুর।

তারপরে পাবে অবন্তী দেশ—সেথায় পশি,
শুনিতে পাইবে গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়নকথা কহিছে বসি'।
সেই দেশে পাবে উজ্জয়িনীরে আগেই বলেছি যাহার কথা,
বিশালা তাহার সার্থক নাম হেরিবে তাহার শ্রীবিশালতা।
স্বর্গতদের ক্ষীণ হয়ে এলে পুণ্যরাশি
পুণ্যাবশেষ লয়ে তারা ত্বরা ধরায় আসি
স্বর্গখণ্ড গড়েছে হেথায় তা দিয়ে যেন,
সম্ভব কভু হয় কি মর্ত্ত্যে নতুবা দিব্য নগরী হেন?

সিপ্রার তীরে এ রাজধানী
পটু-মদকল সারস কূজন দূর হ'তে প্রাতে বহিয়া আনি'
সিপ্রার বায়ু স্ফুট কমলের গন্ধ হরি'
তাপিত অঙ্গ শীতল করি'
হরণ করিছে বৈশালীদের নৈশ গ্লানি,
কান্ত যেমন ঘুচায় ক্লান্তি কান্তারে কহি কাকুতিবাণী,
ভুলায় জড়তা বুলায়ে পাণি।

বিশালার বিশালাক্ষীগণ
ধূপধূমে কেশ করিয়া সুরভি করে প্রতিদিন বেণীবয়ন,
বাতায়নজালে পথে ধূমজাল উঠে গগনে,
সেই ধূমজালে পুষ্টি লভিবে রাখিও মনে।

শিখীদের তুমি বন্ধুজন,
ভবনশিখীরা নৃত্যোপহার তোমারে সঁপিবে কোরো গ্রহণ।
গৃহতলে শোভে নারীচরণের লাক্ষারাগের চিহ্নগুলি,
তাহাদের শোভা হেরিতে বন্ধু যেও না ভুলি'।
পথের ক্লান্তি হরণ করিও ক্ষণেক তরে,
কুসুমসুরভি হর্ম্ম্য 'পরে। [ক্রমশঃ।

বাগদাদ বিজয়

(সত্য ঘটনা)

ক্যাপ্টেন ইন্দ্র দত্ত

[দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দাপটে প্রথম মহাযুদ্ধের কথা অনেকেই বিস্মৃত হতে বসেছেন। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, সেই যুদ্ধে বাঙালীরা প্রথম সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করে মধ্য প্রাচ্যে ইংরাজের হয়ে লড়াই করতে গিয়েছিল। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলও সেই লড়াইয়ে হাবিলদারের কাজ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে সেই যুদ্ধে মধ্য প্রাচ্যকে জার্মানীর হাত থেকে রক্ষা করেছিল ভারতীয় সৈন্যরাই। এই প্রবন্ধের লেখক ক্যাপ্টেন ইন্দ্র দত্ত সেই সময় সপ্তম ভারতীয় ডিভিসনে সাব অল্টার্ণ ছিলেন। উক্ত ভারতীয় ডিভিসনের উপর বাগদাদ বিজয়ের ভার পড়েছিল এবং তারা সে কাজ সম্পন্ন করে। এটি তারই স্মৃতিকাহিনী।]

পৈত্রিক বাড়ীটা শেষ পর্যন্ত দেনার দায়েই বিক্রী হয়ে গেল। মনটা খুবই খারাপ। ভাড়াটে বাসায় উঠে যাবার জন্ম জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা করা হচ্ছিল। হঠাৎ শোবার ঘরের একটা পুরোনো টিনের বাক্স ঘেঁটে আমার স্ত্রী একখানা অতি পুরোনো ভাঁজ-করা কাগজ এনে আমার হাতে দিলেন। খুলে দেখি, কাগজের লেখাগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেছে। অনেক কষ্ট করে বুঝতে হল যে ওটা এক কালে মানচিত্র ছিল। এক কোণায় লাল কালিতে লেখা রয়েছে 'টাইগ্রিস' এবং "শাওয়া খাঁ"। সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে গেল। মনে পড়ল প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমরা যখন মধ্য প্রাচ্যে লড়াই করতে গিয়েছিলাম সেই সময় ওটা পেয়েছিলাম ফৌজী দপ্তরের কাছ থেকে এবং শেষ বার ওটার দিকে তাকিয়েছি পঁয়ত্রিশ বছর আগে মেসোপোটামিয়ায়।

ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত জিনিষপত্রের মধ্যে বসে রোমাঞ্চকর অতীতের স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। মানচিত্রটা বিশ বর্গ-মাইল একটা ভূখণ্ডের। ওটা তৈরী করতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছিল, কারণ ঐ কুড়ি মাইল এলাকার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তথ্য মানচিত্রে সন্নিবেশ করতে হয়েছে। জায়গাটা বাগদাদের ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিমে। জন-প্রাণী বলতে কিছু নেই। খালি ধুলো, ধুলো আর ধুলো। "শাওয়া খাঁ" নামটা দেখে ব্যাপারটা আরও ভাল করে আমার মনে পড়ছে, কারণ খলিফাদের সেই নগর দখলের ঠিক আগের দিন মানচিত্রটা আমি ব্যবহার করেছিলাম।

১৯১৭ সাল। আমার বয়স তখন খুবই কম। সপ্তম ভারতীয় ডিভিসনে কাজ করতাম। এই ডিভিসনটিকে পন্টুন ব্রিজে চাপিয়ে টাইগ্রিস নদীর পূর্ব তীর থেকে পশ্চিম তীরে আনা হয়েছে। নদী পেরিয়ে আমরা ঊষর মরুর মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি আর ভাবছি কখন শত্রুরা অতর্কিত এসে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ক্রমাগত এগিয়ে চলেছি আমরা। গোলা-গুলীর আওয়াজ হচ্ছে। ধুলোয় দিশেহারা অন্ধকার। আমরা রেজিমেণ্টাল অফিসাররা পরিস্থিতি সম্পর্কে মোটেই অবহিত নই। খালি মার্চ করি, থামি, শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বিস্তৃত হই, আবার মার্চ করি, আবার থামি। অনন্ত কাল ধরে যেন আমাদের এই উদ্দেশ্য-বিহীন যাত্রা চলতে থাকবে। জীবনে যেন শুধু ধুলো, কাদা, পিপাসা আর আকাশে শকুনির পরিক্রমা ছাড়া আর কিছু নেই।

আমি একটা মেসিন গান কোম্পানীতে সাব অল্টার্ণ ছিলাম। ইউনিটের যান-বাহন অফিসার অসুস্থ হয়ে আমারায় চলে যাওয়ায় তাঁর জায়গায় আমাকে কাজ করতে হচ্ছিল। আমাদের প্রথম দলে ছিল ১২০টা খচ্চর আর কয়েকটি খচ্চর-টানা গাড়ী। এই গাড়ী দেখতে অনেকটা কর্পোরেশনের ময়লা-টানা ঘোড়ার গাড়ীর মত তবে এগুলো কাঠে তৈরী আর আমাদের গাড়ীগুলো ছিল ইস্পাতে। এক-একটা গাড়ী টানতে দুটি করে খচ্চরের প্রয়োজন হ'তো। যন্ত্রচালিত যান-বাহন বলতে সমগ্র ডিভিসনে মোট ৫৬ খানা মোটর গাড়ী ছিল কি না সন্দেহ।

এই যান-বাহন বিভাগটি ছিল শিখ, ভূপালী, গুর্খা এবং পাঞ্জাবীদের হাতে।

সে দিন বেলা তখন আড়াইটার সময়, আমি একগাদা গুলী-বারুদের বাক্সের উপর বসে আছি। ধুলোয় ধুলোয় এত অন্ধকার যে চারি দিকে কিছু নজরেই পড়তে চায় না। আমাদের কমাণ্ডিং অফিসার এসে বললেন যে, আমাদের ডিভিসনটি আপাততঃ আর এগোবে না, কয়েক ঘণ্টার জন্ম ওখানেই অবস্থান করবে। সমস্ত সৈনিক এবং ঘোড়া-গাধাগুলো অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়েছিল। আমার উপর ঘোড়া-গাধাগুলোকে জল খাওয়ানোর এবং ডিভিসনের জলের পাত্রগুলো জলে ভরে রাখার ভার পড়ল। মানচিত্রে দেখলাম, ওখান থেকে টাইগ্রিস নদীর সর্বনিম্ন দূরত্ব পাঁচ মাইল, কিন্তু টাইগ্রিস নদীর যে ঘাটে গিয়ে আমাদের জল আনতে হবে সেটার অপর পার তুর্কীদের দখলে আছে কি না, তা কেউ বলতে পারে না। বরং সেই দিক থেকে গুলী-গোলার আওয়াজ আসছিল বলে আমাদের মনে একটা সন্দেহই দানা বাঁধল।

যাইহোক, জল আনতে যাবার আগে আমি রাস্তাটাকে ভাল করে চিহ্নিত করে গেলাম। বাতাসে যদি ধুলোর আস্তরণ আরও পুরু হয় তাহলে ফেরার সময় পথ হারিয়ে সোজাসুজি কোন তুর্কী-ঘাঁটিতে গিয়ে হাজির হবার পুরো আশংকা রয়েছে। আর যদি তা-ও না হয় তাহলে আরব দস্যুদের হাতে পড়তে কতক্ষণ ?

আমরা নদীর দিকে যাত্রা করলাম—মূল সেনাদল থেকে ছিটকে-পড়া একটা ক্যারাভাঁ। পায়ে হেঁটে যেতে কষ্ট হবে বলে সঙ্গীদের বললাম, তারা ঘোড়ার পিঠে চড়ুক। প্রত্যেকে একটা করে ঘোড়ায় চেপে দুটো করে খচ্চর টেনে নিয়ে গেল। বড় বড় জলের পাত্র ছাড়াও আমরা কিছু ক্যানভাস ব্যাগও সঙ্গে নিয়েছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধুলোয় প্রায় দিশেহারা হবার অবস্থা। একে শরীর গরম, তার উপর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, এবং গায়ে চটচটে ঘাম। কিন্তু

এত দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও মনটা বেশ উৎফুল্ল ; কারণ, মনে হচ্ছিল বাগদাদ দখল করতে আর আমাদের বেশী দেরী নেই ।

অবশেষে টাইগ্রিসে পৌঁছোলাম। নদীর পার থেকে যে কেউ আমাদের উপর গুলী-গোলা ছুঁড়ল না সে আমাদের পরম সৌভাগ্য! পাড় থেকে নদী খাড়া নেমে গেছে ১০ ফুট। সুদূর উত্তরের বরফ-গলা জলের প্রচণ্ড ঘূর্ণীস্রোত বয়ে চলেছে নদীর উপর দিয়ে। খচ্চরগুলো তৃষ্ণা নিবারণের জন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল! আমরা ক্যানভাসের বালতিগুলো দড়িতে পাশাপাশি বেঁধে জল ভরে তাদের সামনে রাখলাম। কিন্তু তাতেও তাদের সামলানো যায় না। দুটো খচ্চর তো দড়িটড়ি ছিঁড়ে জলে গিয়ে ঝাঁপিয়েই পড়ল। জল খাওয়াতে এবং জল ভরতে সময় লাগল অনেক। যখন ফেরবার উদ্যোগ করছি তখন দেখলাম ধূলোর ধোঁয়ায় ৬৭ শত গজের বেশী দৃষ্টি চলে না। কম্পাস নিয়ে পথ নির্দ্ধারণ করে যাত্রা সুরু হল। তৃষ্ণার্ত জীব তৃষ্ণার জল পেয়ে সকলেই একটা স্বর্গীয় তৃপ্তিতে উদ্দীপ্ত। আবহাওয়া অতি বিচিত্র! কখনও আকাশে-বাতাসে ধূলোর পুরু আস্তরণ পড়ছে, আবার কখনও বা পাতলা হয়ে যাচ্ছে।

প্রায় কুড়ি মিনিট চলবার পর অনুভব করলাম, আমাদের বাঁ পাশে যেন একটা কালো প্রতিবন্ধক গড়ে উঠছে। যে দেশে ধূলো এবং গরমে লোকের দৃষ্টিশক্তি বিভ্রান্ত হয়, সেই দেশেই এমন দুর্বোধ্য ঘটনা সম্ভব। মনে হল যেন ঘোড়ার উপর নিশ্চল হয়ে বসে থাকা এক দল আরব ঘোড়সওয়ারের দিকে তাকিয়ে আছি। সংখ্যায় তারা সম্ভবত দু'শো এবং দাঁড়িয়ে আছে প্রায় দু'শো গজ দূরে।

মধ্য প্রাচ্য লড়াইয়ের আগাগোড়াই আমাদের অনেক উপজাতির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। তারা যেন আমাদের পাশে পাশে থাকে এবং সুযোগ পেলেই অতর্কিত আক্রমণে কিছু ক্ষতি করে চলে যায়। যদি জখমী লোকদের বিনা পাহারায় রাখা হয় তাহলে সেই সব উপজাতিরা তাদের খতম করে। আমাদের মধ্যে কোন খৃষ্টানের মৃত্যু হলে তার কবরে 'ক্রস' দেবার উপায় নেই। তাহলেই উপজাতিরা শবগুলো কবর খুঁড়ে বার করবে এবং নানা রকম ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ চালাবে। এটা বন্ধ করবার জন্ত পরে মৃতদেহের সঙ্গে এমন করে হাতবোমা রেখে আসা হত যে, কবর খুঁড়তে গেলেই বিস্ফোরণ হবে।

এই নিশ্চল ঘোড়সওয়ারদের দেখে আমি ভেবেই পেলাম না কি করা যায়। আমার সঙ্গীরা সকলেই রাইফেল-সজ্জিত সেপাই হলে কোন সমস্যাই ছিল না। এতক্ষণ আরবরা ধূলোয় মিলিয়ে যেত। তারা দু'জনে এক জন না হলে কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না। কিন্তু আমার সঙ্গীদের মধ্যে রাইফেল ছিল মুষ্টিমেয় লোকের হাতে। অন্তদের হাতে ছিল তরোয়াল। সেগুলো নিতান্তই লোক-দেখানো অস্ত্র, কোন কাজের নয়। আরবদের হাতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র এবং ধারালো বর্শাফলক। বুঝতে দেরী হল না যে, আরবরা আজ আর ছেড়ে কথা কইবে না। তাদের আক্রমণের পদ্ধতি আমাদের জানা আছে। প্রথমে এক ঝাঁক গুলীবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ঝাঁপিয়ে এসে পড়বে। ধূলোর আস্তরণ আমাদের শত্রু হলেও বর্তমান ক্ষেত্রে বন্ধুর কাজই করল। আরবরা আমাদের কতটুকু দেখতে পাচ্ছে এবং সেই দেখা থেকে কি বুঝছে তার উপরই নির্ভর করছে সব কিছু। যদি ওরা আমাদের প্রকৃত অবস্থা টের পেয়ে যায় তাহলে আমাদের কাউকে আর ইউনিটে ফিরতে হবে না। তবে যদি তাদের মনে আমাদের শক্তি এবং সংখ্যা সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা যায় তাহলে পার পেলেও পেতে পারি। আমি যেন জুয়াড়ীর মত সেই ব্যাপারটার উপর বাজী ধরলাম। ওরা যে-কোন মুহূর্তেই আমাদের প্রকৃত অবস্থা টের পেতে পারে। কাজেই আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে নিজেদের শক্তির বাহুল্য প্রদর্শন করা।

সঙ্গীদের বললাম : তোমরা তরোয়াল উঁচিয়ে চক্রাকারে সার বেঁধে চলো।

তারা আমার আদেশ পালন করল। আমরা ধীরে ধীরে আরবদের দিকে এগোতে লাগলাম। কিন্তু তারাও নড়ে না। সে এক ভয়াবহ মুহূর্ত! আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ওরা যদি লেজ তুলে না পালায় তাহলে আমাদের সমস্ত ধাপ্পাবাজী ধরা পড়বে। কিন্তু ধূলোর আঁধিয়ার আমাদের বাঁচিয়ে দিল। আমরা তাদের এক শ' দেড় শ' গজের মধ্যে পৌঁছোতেই তারা চক্ষের পলকে দল বেঁধে পলায়ন করল। তারা নিশ্চয়ই ভেবেছিল আমাদের দলে লোক অনেক এবং শক্তিও প্রচণ্ড।

ইউনিটে ফিরে আসতেই সংবাদ পেলাম আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার যাত্রা সুরু হবে। পাচকরা আমাদের আনা জলে কড়া চা বানাতে লেগে গেল আর আমাদের সঙ্গীরা চাপাটি, ভাজি বানাতে সুরু করল। সন্ধ্যায় আমরা আমাদের ব্রিগেডে গিয়ে যোগ দিলাম।

তুর্কীরা গুলী-গোলা চালাচ্ছিল বেপরোয়া ভাবে—তোপের পর তোপ ! এই ভাবে গোলা খরচ করা আসলে তাদের পশ্চাদপসরণেরই পূর্ব লক্ষণ। ওরা নিজেদের গুলী-বারুদের হাত থেকে মুক্তি চায়। হয়ত কালই আমরা বাগদাদে পৌঁছে যেতে পারি। গত এক বৎসর অনেক পরিশ্রম, অনেক রক্ত ব্যয় করেও আমরা কুতের অবরোধ ভাঙতে পারিনি। সেখানকার ব্যর্থতার পর আজ বাগদাদ পৌঁছোবার চিন্তা আকাশ-কুসুমের মত লাগল।

ব্রিগেড এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন ইউনিটের মাঝে মাঝে ফাঁক রয়েছে। সকলেই ক্লান্তি ভুলে আগামী কালের গল্পে মসগুল। বাগদাদ সহরটা কি রকম হবে তা নিয়ে অন্ধ এক সাব অন্টার্ণের সঙ্গে আমার তর্কাতর্কি চলছিল। "আরব্য রজনী"র বসুমতী সংস্করণে প্রকাশিত ছবিগুলো স্মৃতিপটে ভেসে উঠছিল। আমার বন্ধু একটু নীরস কাটখোট্টা গোছের লোক। তিনি বললেন যে, বাগদাদ যতই মনোহারিণী হোক এক বোতল মদের জন্ম তিনি সেটা ছেড়ে দিতে রাজি আছেন।

সেই প্রথম আমরা রাত্রে মার্চ করছি। কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারলাম ওখানে পথ হারানো ছাড়া আরও অনেক বিপত্তি জমা আছে আমাদের জন্ম। গভীর রাত্রে এক প্রচণ্ড ধূলি-ঝঞ্ঝা ব্রিগেডের মুখটাকে তছনছ করে দিল। এত অন্ধকার যে পাশের লোকটিকে পর্যন্ত নজরে পড়ে না। সমস্ত লোকজন, ঘোড়া, গাধা, সব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। যারা পেছনে ছিল তারা তখনও এগিয়ে আসছে কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই দম-বন্ধ-করা কালো আঁধার আচ্ছন্ন করল তাদেরও। ফলটা যা হল, যুদ্ধ-বিগ্রহে সচরাচর তেমন দেখা যায় না। ব্রিগেডের প্রত্যেকটি লোক চোখ-মুখ-নাক বুজে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সে এক মহা বিপর্যয় ! আমি ঘোড়া থেকে নেমে লাগাম হাতে নিয়ে মুখ বুজে শুয়ে পড়লাম মাটিতে। চোখ খুললে আর রক্ষা নেই। আমার গা-ঘেঁষাঘেঁষি করি আরও যাঁরা মাটিতে পড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন একজন কর্ণেল, একজন হাবিলদার এবং একটা খচ্চর। কয়েক মুহূর্তের জন্ম অবস্থাটা এমন হয়েছিল যেন আমরা এক দল মৌমাছি গাদাগাদি করে পড়ে আছি।

ঝড়ের পর সবাই উঠে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে আরম্ভ করল। সেই সময় হাবিলদার গুরবচন সিং কিছু মটরভাজা এবং এক মগ চা এনে দিল আমাকে। জানি না কি ভাবে সে এমন অসম্ভব কাজ করেছিল। তার সেই কর্তব্যপরায়ণতা আজও আমার মনে আছে।

যাই হোক, আবার আমরা যে যার যায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লাম। ইতিমধ্যে খবর এল যে আমরা আরও ঘণ্টা দুই ওখানে বিশ্রাম নিতে পারি। কাজেই খচ্চরের পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে ওখানেই গা এলিয়ে দিলাম। হঠাৎ আমাদের উপর আদেশ এলো সেকেণ্ড ব্ল্যাকওয়াচের নেতৃত্বে আমাদের ২১ নং ব্রিগেডকে এগিয়ে যেতে হবে। ব্ল্যাকওয়াচের কর্ণেল ছিলেন এ-জি-ওয়াউচোপ এবং এ্যাডজুটান্ট ছিলেন নীল রিচি।

আবার আমাদের যাত্রা সুরু হল। ভোরের দিকে চোখে নানা রকমের ধাঁধা লাগতে সুরু করল। এই একবার দিগন্তটাকে কাছাকাছি একটা পাঁচিলের মত লাগে, এই মনে হয় এক দল আরব প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত তুলেছিল আবার হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এমনি ধরণের আরও কত কি! শরীর ভাল থাকলে এ সব জিনিষ উপভোগ করা যায় কিন্তু আমরা সকলেই নিদ্রাহীন এবং ক্লান্ত। কাজেই কোন প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যই ভাল লাগছিল না। হঠাৎ আমার নজরে পড়ল পারস্য সীমান্তের পুস্ত-ই-কু পাহাড়ের চূড়ায় সূর্যের প্রথম রশ্মি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির পট-পরিবর্তন হচ্ছে। পথে কয়েকটা ছোট ছোট পাহাড় পড়েছিল। তাতে আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত হয়নি।

কিছু দূর অগ্রসর হবার পর কমাণ্ডিং অফিসার এসে আমাকে আট ফুট উঁচু একটা বাঁধ দেখিয়ে বললেন, ওই বাঁধের উপর দিয়ে খচ্চরের গাড়ীগুলো টেনে নিয়ে যেতে হবে। বাঁধটাকে দূর থেকে খুব সরু বলেই মনে হল। তাড়াতাড়ি খচ্চরের গাড়ীগুলোর মাপ নিয়ে আমি গেলাম বাঁধের উপর। দেখলাম গাড়ীগুলো কোন-ক্রমে বাঁধের উপর দিয়ে যেতে পারবে কিন্তু কথা হচ্ছে গাড়ী ওখানে তুলব কি করে? বাঁধের পাড় নেমে গেছে ৩৫ ডিগ্রি খাড়া। কোদাল শাবল নিয়ে লাগলে সমতল ভূমি থেকে বাঁধের উপর পর্যন্ত একটু ঢালু পথ তৈরী করতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে কিন্তু আমার সঙ্গে লোক বেশী ছিল না, আর সময়ও খুব সংক্ষেপ। কাজেই আবার একটা ঝুঁকি নিতে হল। দুটো খচ্চরকে বাঁধে তুলে লম্বা-লম্বা দড়ির সাহায্যে বাঁধের নীচের গাড়ীর সঙ্গে তাদের বেঁধে দিলাম ছুটিয়ে। সে পরীক্ষায় সফল হতেই কমাণ্ডিং অফিসার বললেন 'সাবাস!' কিন্তু শেষ গাড়ীটা তুলতে গিয়ে গেল উল্টে এবং সহিস বেচারী পড়ল তার নীচে। পড়েই চিৎকার, সাহেব মারা গেছি। সত্যিই কিন্তু সে মরেনি। সুস্থ শরীরে হয়ত আজও বেঁচে আছে।

ধূলোর অন্ধকারে আমরা অনেকেই টের পাইনি যে ইতিমধ্যে সমতল ভূমি থেকে অনেকখানি উপরে উঠেছি—নদীর পাড় থেকে অন্তত ৮০ ফুট উঁচু।

ধূলোর পাতলা আস্তরণ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল। আমাদের নীচে টাইগ্রিস প্রত্যুষের আলোয় ঝকমক করছে। আমাদের বাঁ দিকে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ভগ্নস্তূপের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে রাণী জুবেদার স্মৃতিস্তম্ভ। নদীর দুই পাড়ে সবুজ এবং শীতল খেজুর গাছের সারি পাথরের মত স্থির দাঁড়িয়ে আছে। তার পেছনেই কয়েকটি গৃহ যেন আলোয় ভাসছে; আরও পেছনে দৃষ্টি প্রসারিত করতেই দুর্গ-অধ্যুষিত বাগদাদ সহর নজরে পড়ল। সহরের উত্তর দিকে খাজিমান মসজিদের ময়ূরপঙ্খী চূড়া গর্বভরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা তাকিয়েই রইলাম। মাসের পর মাস নিষ্ফল ব্যর্থতার পর অবশেষে আমরা হারুণ-অল-রসিদের দেশে এসে পৌঁছেছি জীবন্ত অবস্থায়। যতই আমরা সহরের কাছাকাছি যাবো ততই ওর সৌন্দর্য মিলিয়ে যাবে জানি কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে এই ভেবে খুশী হলাম যে শেষ পর্যন্ত বাগদাদ আমাদের দখলে এসেছে। ভারতীয় হিসাবে সেই যুদ্ধে আমাদের কোন স্বার্থ ছিল না। সে জয় প্রকৃত পক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই জয়। তবু পেশাদার সৈনিক হিসাবে যুদ্ধজয়ের আনন্দটুকু আমিও অনুভব করেছিলাম।
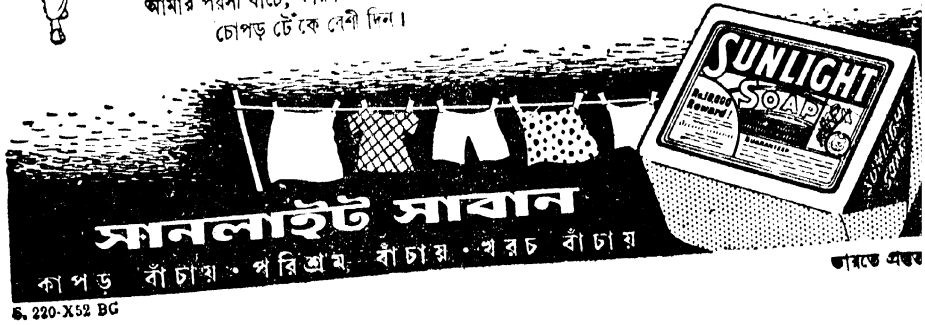
কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

মাধুর্য্য ব্রজের লীলা, ঐশ্বর্য্যের লীলা মথুরায়,
চক্রিলীলা কুরুক্ষেত্রে, লীলা শেষ দূর দ্বারকায়।

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-লীলা ব্রজমণ্ডলে—বৃন্দাবন সেই ব্রজমণ্ডলের কেন্দ্র। পুরাণ-প্রসিদ্ধ বৃন্দাবনের কথায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"এই বৃন্দাবন কাব্যজগতে অতুল্য সৃষ্টি। হরিৎ-পুষ্প-শোভিত-পুলিনশালিনী কলনাদিনী কালিন্দী-কূলে কোকিল-ময়ূর-ধ্বনিত কুঞ্জবন-পরিপূর্ণা, গোপবালকগণের শৃঙ্গবেণুর মধুররবে শব্দময়ী, অসংখ্যকুসুমামোদসুবাসিতা, নানাভরণ-শোভিতা বিশালায়ত-লোচনা ব্রজসুন্দরীগণ-সমালঙ্কৃতা বৃন্দাবনস্থলী স্মৃতিমাত্রে হৃদয় উৎফুল্ল হয়।"

পৌরাণিক কালের পরে চৈতন্যদেবের প্ররোচনায় তাঁহার ভক্তদিগের দ্বারা বৃন্দাবন পুনরাবিষ্কৃত হয়। সেই ভক্তগণ বাঙ্গালী—পার্থিব ঐশ্বর্য্য যশ মান সব ত্যাগ করিয়া পারলৌকিক ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য—অনিত্য বর্জ্জন করিয়া নিত্যের সন্ধানে বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগেরও পরে ভারতবর্ষ এক বিদেশীর শাসনের পরে অন্য বিদেশীর শাসনাধীন হইলে—ইংরেজের শিক্ষা ও সভ্যতা দেশব্যাপ্ত হইলে বৃন্দাবন যাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, যাঁহারা সংসারসুখের মধ্যে মনে করিয়াছিলেন—

"কবে বৃন্দাবনের প্রতি কুলি কুলি
কাঁদিয়া বেড়াব স্কন্ধে লয়ে ঝুলি;
কণ্ঠ ভরে পিব, করপুটে তুলি,
অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম যমুনার"

"লালা বাবু" নামে সমধিক পরিচিত কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ তাঁহাদিগের অন্যতম।

শতবর্ষাধিক কাল তাঁহার নাম বৃন্দাবনে—সমগ্র ব্রজমণ্ডলে ও তাহার সীমার বাহিরে শ্রদ্ধাসহকারে উচ্চারিত হইয়াছে এবং এখনও বৃন্দাবনে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির বহু তীর্থযাত্রীর দ্বারা দেবদর্শনের স্থান বলিয়া বিবেচিত। "লালা বাবুর" জীবনেতিহাস ত্যাগপুণ্যপূত।

কৃষ্ণচন্দ্র যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (১১৮২ বঙ্গাব্দ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ) সে পরিবার বহুদিন হইতে ধনী বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ঐ বংশীয়গণ কেহ বা ডাহাপাড়ার "বঙ্গাধিকারী"র অধীনে রাজস্ব বিভাগে চাকরী করিয়া কেহ বা মুর্শিদাবাদে ব্যবসা করিয়া অর্জ্জিত ও সঞ্চিত অর্থ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের শেষ দশায়ও মুর্শিদাবাদ রেশমী ও সূতী কাপড়ের জন্য কিরূপ প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা পর্য্যটক বাণিয়ারের বিবরণে জানিতে পারা যায়। ভ্যালেনশিয়া ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের নিকটে জঙ্গীপুরে দেখিয়াছিলেন, তথায় ইংরেজ বণিকের কুঠীতে রেশম প্রস্তুতের কাজে প্রায় তিন হাজার লোক নিযুক্ত ছিল। বহুবঙ্গে রেশমের জন্য প্রতিষ্ঠিত কুঠী নষ্ট হইয়া যাইবার পরে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা জঙ্গীপুরে রেশমকুঠী স্থাপিত করিয়াছিল। সিংহ পরিবার অর্থ অর্জন ও সম্পত্তি ক্রয় করিয়া সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিলেও সিংহ বংশের প্রসিদ্ধির কারণ—দাওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। তিনি ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ওয়ারেন হেষ্টিংসের দাওয়ান ছিলেন। তখন দেশে ভাঙ্গাগড়ার যুগ—কোন জমীদারের পতন, কাহারও অভ্যুদয়। হেষ্টিংস কার্য্যসিদ্ধির জন্য অন্যায় আচরণ করিতে দ্বিধানুভব করিতেন না। তিনি অযোধ্যার বেগমদিগের সম্বন্ধে যে ব্যবহার করিয়াছিলেন—যেরূপে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া শেরিডেন বলিয়াছিলেন, তিনি রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তাহা করেন নাই—হীন লোভ পরিতৃপ্তির জন্য তাহা করিয়াছিলেন—রাষ্ট্রের প্রয়োজন সেই হীন লোভের ছদ্মবেশ ব্যতীত আর কিছুই নহে—

"Tear off the mask, and you see coarse vulgar avarice, you see peculation lurking under the gaudy disguise,and adding the guilt of libelling public honour to its own private fraud."

এই হীন লোভ পরিতৃপ্তির কার্য্যে যাঁহারা হেষ্টিংসের সহকর্মী ছিলেন—হেষ্টিংসের দ্বারা প্রযুক্ত হইয়াছিলেন—গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহাদিগের অন্যতম। বাগ্মিবর বার্ক তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন—

গঙ্গাগোবিন্দের নামে সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসীরা ভয়ে বিবর্ণ হয়। ভারতে যে সকল ভারতীয় ইংরেজের আনুগত্য করিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে দুর্ব্বৃত্ততায়, দুর্দ্দান্ততায়, নির্ভীকতায় ও শাঠ্যে আর কেহই গঙ্গাগোবিন্দের সমকক্ষ নহে।

এই অবস্থায় গঙ্গাগোবিন্দ কত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, বলা যায় না। তিনি মাতৃশ্রাদ্ধে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া আপনার সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়া লোককে চমকিত করেন এবং তাঁহার গৃহদেবতা রাধাবল্লভের সেবাদির জন্য প্রতিদিন ৫ শত টাকা ব্যয়িত হইত। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সরকারের চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গঙ্গাগোবিন্দ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে লোকান্তরিত হ'ন। তাঁহার সম্বন্ধে বাঙ্গালা "কবি গান"—

"মহিষের শিং হরিণের শিং, তা'রে কি বলি শিং?
শিংএর মধ্যে শ্রেষ্ঠ—দাওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং।"

তাঁহাকে তুষ্ট না রাখিলে উপায় নাই বুঝিয়া কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র পুত্র শিবচন্দ্রকে দেওয়ানজীর নিকট যাইতে বলিলে শিবচন্দ্র যখন তাহাতে অস্বীকৃত হ'ন, তখন কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দকে লিখিয়াছিলেন—

"পুত্র অবাধ্য দরবার অসাধ্য
ভরসা কেবল গঙ্গাগোবিন্দ।"

কৃষ্ণচন্দ্র সেই গঙ্গাগোবিন্দের একমাত্র পুত্র প্রাণকৃষ্ণের পুত্র। কৃষ্ণচন্দ্রের অন্নপ্রাশনে পিতামহ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে স্বর্ণপত্রে ক্ষোদিত লিপি পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

গঙ্গাগোবিন্দের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ পৈত্রিক সম্পত্তি ব্যতীত পিতৃব্য রাধাকান্তের বিপুল অর্থ ও সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি এমনই কৃপণ ছিলেন যে, একমাত্র পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের ভৃত্যকে যে বস্ত্র ব্যবহারার্থ দিয়াছিলেন, তাহাতে কোনরূপে লজ্জানিবারণ হয়। পুত্র সে জন্ম পিতার প্রধান কর্ম্মচারীর দ্বারা অনুযোগ উত্থাপন করিলে প্রাণকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—পুত্রের ত উপার্জ্জন করিবার বয়স হইয়াছে, সে স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া ভৃত্যকে উৎকৃষ্ট বস্ত্র দিলেই পারে।

তখন কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স ১৭ বৎসর। পিতার কথায় মর্ম্মাহত হইয়া তিনি পত্নীর কয়খানি অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন এবং তাহা হইতে ভৃত্যকে একখানি ভাল কাপড় কিনিয়া দিয়া অবশিষ্ট অর্থ লইয়া ভাগ্যান্বেষণে বর্দ্ধমানে গমন করিয়া তথায় সেরেস্তাদারের চাকরী লাভ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র পিতামহের বিষয়বুদ্ধির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন এবং আরবী, পারসী ও সংস্কৃত কয়টি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের অধিকাংশ মুখস্থ করিয়াছিলেন ও দুর্ব্বোধ্য অংশগুলির ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। যোগ্যতার পুরস্কারে তিনি উড়িষ্যায় জমাবন্দী করিবার ভার লইয়া তথায় গমন করেন এবং কার্য্যকালে তথায় বহু সম্পত্তির অধিকারী হ'ন।

১২১৫ বঙ্গাব্দে পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণচন্দ্র উড়িষ্যা হইতে বাসগ্রাম কাঁদীতে আসেন—পিতা তখন অন্তিম শয়নে।

পিতার মৃত্যুর পরে কৃষ্ণচন্দ্র কখন কাঁদীতে, কখন কলিকাতায় থাকিতেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কার্য্য ব্যপদেশে কলিকাতায় বাসকালে প্রথমে বর্ত্তমান বিডন স্কোয়ারের নিকটে গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া পরে—"গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল" মনে করিয়া বেলুড়ে যাইয়া বাস করেন। তাঁহার পরে সিংহ-পরিবার কলিকাতার উপকণ্ঠে—উত্তর দিকে পাইকপাড়ায় বাস করিতে থাকেন। কৃষ্ণচন্দ্র শাস্ত্রালোচনার জন্য সময় সময় কলিকাতায় আসিতেন। তখন সর্ব্ববিধ বিষয়কর্ম্মের মধ্যে তিনি অনেক সময় পূজার্চ্চনায় ব্যয় করিতেন। কি কারণে তাঁহার মনে ধর্ম্মকর্ম্মে আগ্রহ প্রথম জন্মিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তবে প্রচলিত কথা—সম্পত্তি পরিদর্শনে যাইয়া তিনি এক দিন দিবাবসান কালে কোন রজকিনীকে বলিতে শুনিয়াছিলেন—"বেলা গেল—বাসনায় আগুন দিতে হ'বে।" তখন রজকরা কদলীর শুষ্ক পত্রাদি দগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বস্ত্রের ময়লা দূর করিত—সেই পত্রাদিকে "বাসনা" বলা হয়। শুনিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের মনে হয়—আয়ু ত শেষ হইয়া আসিতেছে, এখনও বাসনামুক্ত হইতে পারিলাম না? কনওয়ে বলিয়াছেন—"who knows what chance word from some Fakir set Buddha thinking, and led to the foundation of Buddhism?"—কে জানে কোন্ সন্ন্যাসীর কোন্ কথায় বুদ্ধ চিন্তা করিতে থাকেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়?

কেহ কেহ বলেন, এক জন ব্রাহ্মণের আত্মহত্যা কৃষ্ণচন্দ্রের বৃন্দাবন গমনের প্রত্যক্ষ কারণ। ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহার কর্ম্মচারী কর্তৃক দেবত্র জমিতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র অনুযোগের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া বিচারের জন্য দিন স্থির করিয়া দেন। ঐ দিন কিন্তু অভিযোগকারী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পা'ন না এবং হতাশ হইয়া উদ্বন্ধনে
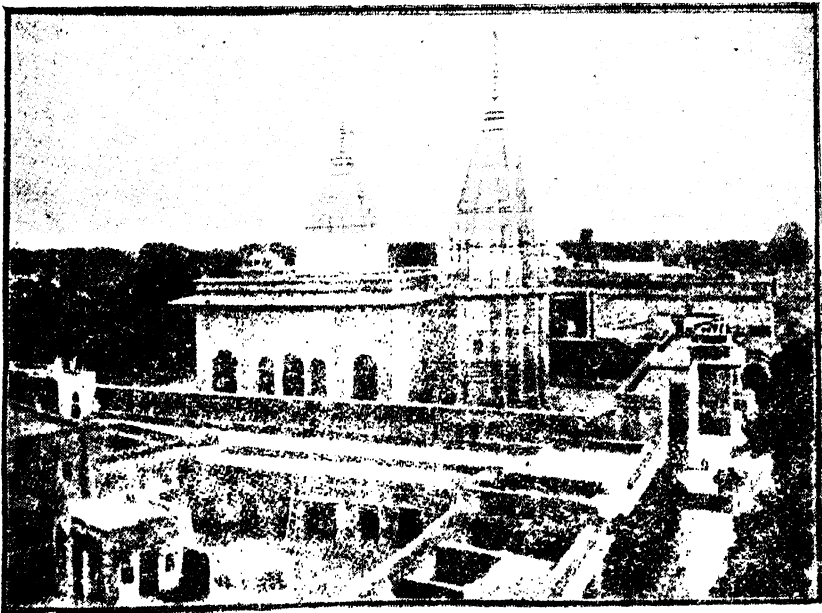
বৃন্দাবনে লালা বাবুর মন্দির

প্রাণত্যাগ করেন। মানুষ পার্থিব সম্পদের জন্য কি করিতে পারে ভাবিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বিচলিত হ'ন, এবং স্থির করেন, সংসার ত্যাগ করিয়া পুণ্যভূমি বৃন্দাবনে যাইবেন।

ঐ সঙ্কল্পানুসারে কৃষ্ণচন্দ্র ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। যাত্রার পূর্ব্বে তিনি সম্পত্তি পরিচালনের ও একমাত্র পুত্র বালক শ্রীনারায়ণের শিক্ষার সব ব্যবস্থা করিয়া গমন করেন। পরিপূর্ণ ভোগের মধ্যে তিনি যখন ত্যাগে আকৃষ্ট হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই—গৃহে ফিরিয়া আসিবেন না, এমন সঙ্কল্প করিয়াও গমন করেন নাই। কারণ, এক বার বৈষয়িক ব্যাপার জটিল হইয়া উঠিলে তিনি বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবশ্যক ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন—পত্নী কাত্যায়নীকে বিষয়কর্ম্মে সাহায্য করিবার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগও করিয়াছিলেন।

তিনি বৃন্দাবনে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, দেশের সেই প্রায় অরাজক অবস্থায় তথায় দেবমন্দিরগুলিতে অব্যবস্থা প্রবল হইয়াছে। সেই জন্য স্বয়ং একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বার বৃন্দাবন গমনকালে তিনি ২৫ লক্ষ টাকা লইয়া গিয়াছিলেন।

তিনি যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন এক রাত্রিতে এক দল দস্যু তাঁহার গৃহ আক্রমণ করে। প্রভুভক্ত ভৃত্য অসীম সাহসে নিজ বিপদ অবজ্ঞা করিয়া প্রভুকে রক্ষা করিয়াছিল।

১২২৭ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার ঈপ্সিত দুইটি কার্য্য আরম্ভ করেন—

(১) মন্দির নির্ম্মাণ।

(২) সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন।

মন্দির যাহাতে তাঁহার মনোমত ও সম্ভ্রমের উপযুক্ত হয়, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। পুলিনবিহারী দত্ত তাঁহার "বৃন্দাবন-কথা" পুস্তকে লিখিয়াছেন, "যমুনা-পুলিন-পার্শ্বে, চারিদিকে প্রাচীর-বেষ্টিত লালা বাবুর কুঞ্জ। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দুইটা দ্বার।...মন্দির, গৃহ, স্তম্ভ, প্রাচীরাদি সমস্তই ভরতপুর হইতে আনীত ঈষৎ পীতাভ পাষাণে বিরচিত; কেবল শিখর দুইটি শ্বেত-প্রস্তরে গঠিত। এ দুইটি দেখিতে বারাণসীর মন্দিরগুলির শিখরের ন্যায়—একটি শিখরের গায়ে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখর সংলগ্ন আছে। চারিদিকে নানাবিধ কারুকার্য্য করা; তাহাতে নৃসিংহ, বামন, বরাহ প্রভৃতি অবতারগুলির মূর্ত্তিও সুনিপুণ ভাবে ক্ষোদিত।...পূর্ব্ব দিকের ফটকে অধিকতর কারুকার্য্য করা।... নাটমন্দিরের সম্মুখে পুষ্পোদ্যান।"

শুনা যায়, লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছিলেন, বৃন্দাবনে "শেঠের মন্দির" —দুর্গের মত, "ব্রহ্মচারীর মন্দির"—রেলষ্টেশনের মত, "শাহজীর মন্দির"—রাজপ্রাসাদবৎ, "লালা বাবুর মন্দির"—প্রকৃত মন্দিরের মত। অবশ্য গোবিন্দজীর যে বিরাট মন্দিরের ঊর্দ্ধাংশ ঔরঙ্গজেবের নির্দ্দেশে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় তাহা যেমন বিরাটত্বে, "যুগলকিশোরের" মন্দির তেমনই স্থাপত্য-সৌন্দর্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরে বিগ্রহ—কৃষ্ণচন্দ্রমা—দ্বিভুজমুরলীধর বালক-মূর্ত্তি। বোধ হয়, এত বড় কৃষ্ণমূর্ত্তি বৃন্দাবনে আর নাই।

কৃষ্ণচন্দ্র বৃন্দাবনে ও সমগ্র যুক্তপ্রদেশে "লালা বাবু" নামেই সমধিক পরিচিত। ঐ অঞ্চলে কায়স্থকে "লালা" বলা হয়। বৃন্দাবনে ও সমগ্র যুক্তপ্রদেশে "লালা বাবু" বলিতে কৃষ্ণচন্দ্র সিংহকেই বুঝাইত।

"লালা বাবুর" চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ত্যাগের সহিত বিষয়বুদ্ধির অপূর্ব্ব সমন্বয়, ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মের অভিন্নতার যে আদর্শ হিন্দুর নিকট সমাদৃত সেই আদর্শের বিকাশ। ধর্ম্ম যে কার্য্যমূলক তাহাই তাঁহার মত ছিল। তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সেই মত আমরা তাঁহাতে প্রকট দেখিতে পাই—"অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে।" গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইলেও যত দিন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, তত দিন এই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। সে জন্য তাঁহাকে সময় সময় কেহ কেহ ভুল বুঝিয়াছিলেন। তিনি পিতামহের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন—হিসাব বিভাগের কার্য্যে তিনি, অনুশীলন বলে, যে দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার জন্যই ইংরেজ সরকার তাঁহাকে বর্দ্ধমানের চাকরী হইতে উড়িষ্যার জরীপ-জমাবন্দী কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উড়িষ্যায় তিনি স্বকীয় চেষ্টায় প্রভূত সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনবাসকালেও তাঁহার সেই কার্য্যে ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি কেবল যে উপযুক্ত ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়া, আবশ্যক প্রস্তর—উপকরণ হিসাবে—সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত শিল্পী দিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাই নহে—যুক্ত-প্রদেশে বহু ভূসম্পত্তিও ক্রয় করিয়া—তাহার আয়ে উপযুক্ত দেবসেবার ও দরিদ্র-নারায়ণের সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সকল কার্য্যে তাঁহার বিষয়বুদ্ধির ও কর্ম্মপ্রিয়তার পরিচয় সপ্রকাশ।

তিনি যখন রাজপুতানার বিভিন্ন স্থানে মন্দির নির্ম্মাণের জন্য প্রস্তর সংগ্রহে গিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার সহিত কয় জন নৃপতির পরিচয় হয় এবং সেই পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।

নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যবহার জন্য প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র কেবল বৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্রমার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াই নিরস্ত হ'ন নাই; পরন্তু রাধাকুণ্ডের চতুর্দ্দিক বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন।

রাজপুতানার কয় জন সামন্ত নৃপতির সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা একাধিক বার কৃষ্ণচন্দ্রের বিপদের কারণ হইয়াছে। তখন ইংরেজ সরকার দেশে প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পরিচিত এক রাজার সহিত ইংরেজ যে চুক্তি করিতেছিলেন, তাহার খসড়া মঞ্জুর করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর দিতে রাজা বিলম্ব করিতেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে বিদ্বিষ্ট কোন কোন লোক ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি চার্লস মেটকাফকে বলেন, "লালা বাবুর" প্ররোচনায় রাজা চুক্তিতে স্বাক্ষর দানে ইতস্ততঃ ও বিলম্ব করিতেছেন। সেই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মেটকাফ কৃষ্ণচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিয়া দিল্লীতে পাঠাইবার জন্য মথুরার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পরওয়ানা পাঠান। "লালা বাবুকে" গ্রেপ্তার করিয়া দিল্লীতে লইয়া যাওয়া লইয়া মথুরার ও বৃন্দাবনের লোক ব্যথিত ও চঞ্চল হইয়া উঠিল—সকলে সঙ্কল্প করিল, তাহারা "লালা বাবুর" সঙ্গে দিল্লীতে যাইয়া দেখিবে, তাঁহার কি হয়। তাহারা "লালা বাবুর" জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইল। সর্ব্বশ্রেণীর প্রায় দশ হাজার লোক "লালা বাবুর" সহগামী হয়—পথে জনতা বর্দ্ধিত

হয় এবং যখন সকলে দিল্লীতে উপনীত হয়, তখন জনতার সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। দিল্লী তখন মোগল সম্রাটদিগের রাজধানীর গৌরবে বঞ্চিত হইতেছিল—তাহার অধিবাসী সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছিল। তখনও দিল্লী দুর্গে বাদশাহ বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রভাব ছিল না—প্রতাপ শুদ্ধান্তেই নিবদ্ধ ছিল। বহু লোকসমাগম দেখিয়া মেটকাফ চিন্তিত ও শঙ্কিত হইলেন—পাছে উত্তেজিত জনতা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া অনাচার করে। তিনি স্থির করিলেন, তিনি "লালা বাবুর" সম্বন্ধে অভিযোগের অনুসন্ধান করিয়া যদি তিনি অপরাধী প্রমাণ প্রাপ্ত হয়েন, তবে তাঁহাকে দণ্ডদানের ব্যবস্থা করিবেন,—নহিলে নহে। শান্তিপুরের দেবীপ্রসাদ রায় নামক একজন বাঙ্গালী তখন মেটকাফের সেরেস্তায় মুন্সী ছিলেন। মেটকাফ তাঁহাকেই প্রাথমিক অনুসন্ধানের ভার দেন। দেবীপ্রসাদ অনুসন্ধানান্তে যখন মেটকাফকে জানাইলেন, "লালা বাবু" ধর্ম্মকর্ম্মে আগ্রহশীল—বিশেষ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ এ দেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে ইংরেজের বিরোধিতা করা সম্ভব নহে, তখন মেটকাফ আপনার ভুল বুঝিয়া তাঁহাকে মুক্তি দেন। তিনি ঐ রাজার দেওয়ান কি না জিজ্ঞাসায় "লালা বাবু" উত্তর দিয়াছিলেন—"আমি বহুদিন মানুষের চাকরী করিয়াছি এখন ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।" পরদিন মেটকাফ কৃষ্ণচন্দ্রকে হৃতগৌরব—নামশেষ সম্রাটের দরবারে লইয়া যাইয়া—ইংরেজদিগের বন্ধুর বংশধর বলিয়া সম্রাটের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। শুনা যায়, তিনি ইংরেজের বন্ধুর বংশধর শুনিয়া ইংরেজের হস্তে পুতুল বাদশাহ তাঁহাকে উপাধি দিয়া সম্মানিত ও ইংরেজকে তুষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন এবং "লালা বাবু" সবিনয়ে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

সে যাহাই হউক, সসম্মানে মুক্তি পাইয়া "লালা বাবু" বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বৃন্দাবনের অধিবাসীরা সোল্লাসে "লালা বাবুকি জয়"—ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করে।

তাঁহার ভাগ্যে দ্বিতীয় বিপদ ভরতপুরের মহারাজার অপ্রীতি লাভ হেতু ঘটিয়াছিল। মহারাজা কোন কারণে "লালা বাবুর" উপর রুষ্ট হইয়া ঘোষণা করেন—কেহ তাঁহাকে হত্যা করিলে পুরস্কার পাইবে। কয় জন দুর্বৃত্ত পুরস্কারলোভে—"লালা বাবুকে" না পাইয়া অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া তাহার ছিন্ন মুণ্ড রাজার নিকট লইয়া গিয়াছিল। এই সময় "লালা বাবুকে" কিছু দিন আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

মন্দির নির্ম্মাণ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়া তাহার অনুশীলন করিয়াছিলেন, বলা যায়। বিষম বিষয়ী গঙ্গাগোবিন্দ ইংরেজের চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া যখন জীবনের অবশিষ্ট কাল নবদ্বীপে যাপন করিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি নবদ্বীপেও মন্দির নির্ম্মাণ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। গঙ্গার ভাঙ্গনে সেই মন্দির নদীগর্ভে অন্তর্হিত হইয়াছে। যখন মন্দির নদীগর্ভে বিলীন হইবার উপক্রম হয়, তখন সিংহ-পরিবারের কুলবধূরা ব্যস্ত হইয়া বিগ্রহগুলি কাঁদীতে আনাইয়া রক্ষা করেন। তথায় রাধাবল্লভের মন্দির-সংলগ্ন গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে ঐ সকল বিগ্রহ রক্ষা করা ও তাঁহাদিগের ভোগাদির ব্যবস্থা করা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ছিল। সেই অভিপ্রায় অবগত হইয়া তখন যে ইংরেজ সিংহ-পরিবারের সম্পত্তির কার্য্য-পরিচালক ছিলেন সেই হারভী ব্যয় করিতে অসম্মত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হাস্যোদ্দীপক —"যেতনা ঠাকুর হ্যায়, সব এক গিজ্জামে ভর দেও—আউর এক বাওয়ার্চি সবকো খানা পাকায়েগা"—সব বিগ্রহ এক গৃহে রক্ষিত হউক—আর সকলের এক ভোগই হইবে। বৃন্দাবনও জনবহুল মনে করিয়া "লালা বাবু" যখন ভগবচ্চিন্তার সুবিধার জন্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্যলীলাকেন্দ্র গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলেন, তখন তিনি তথায় এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে রণজীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী কাত্যায়নী যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন "লালা বাবু" তাঁহাকে বাঙ্গালায় ফিরিয়া যাইয়া গঙ্গাতীরবর্তী কোন স্থানে গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে গোপাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

"লালা বাবু" বৃন্দাবনে মন্দিরের সঙ্গে একটি অন্নসত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি দেবকার্য্যের জন্য যে সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার আয় হইতে প্রতিদিন দেবসেবার জন্য এক শত টাকা ব্যয়িত হইবে ও এক শত লোক খাইতে পাইবে—ইহাই তাঁহার নির্দ্দেশ ছিল। যে কোন ব্যক্তি অতিথি হইয়া একাদিক্রমে পক্ষ কাল অতিথিসৎকার সম্ভোগ করিতে পারিবে, কেবল তাঁহার পরিবারস্থ কেহ এক দিনের অধিক তাহা পাইতে পারিবে না—নির্দ্দেশ ছিল।

"লালা বাবুর" কুঞ্জে কৃষ্ণচন্দ্রমার ভোগাদির ব্যবস্থা রাজোচিত ছিল এবং তাহা ধনীর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু যিনি বিগ্রহের ও দরিদ্রনারায়ণের ও তীর্থযাত্রীর জন্য বিপুল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং দিনের পর দিন কঠোর সংযমের ও ত্যাগের দ্বারা মোক্ষলাভের বিঘ্নকঙ্করকণ্টকিত পথে সাগ্রহে অগ্রসর হইতেছিলেন। বৃন্দাবনে মন্দির নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বৈরাগ্য-ভাব প্রবল হইতেছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার চরিত্রে ত্যাগের ও বিষয়বুদ্ধির সমন্বয়বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার পিতামহ যেমন ঘোর বিষয়ী ছিলেন—তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে এক জন তেমনই সন্ন্যাসী হইয়া নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছিলেন।

মন্দির-সংলগ্ন সামান্য জমী লইয়া "লালা বাবুর" সহিত মথুরার প্রসিদ্ধ ধনী শেঠ (শ্রেষ্ঠী) দিগের মোকর্দ্দমা চলিতেছিল। উভয় পক্ষই ধনী—উভয় পক্ষই জিদের বশবর্ত্তী। মোকর্দ্দমায় বহু অর্থ ব্যয়িত হইতেছিল।

যখন "লালা বাবু" দক্ষ বিষয়ী লোকের মত মোকর্দ্দমায় আপনার প্রাপ্য পাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন তিনি গৃহবাস ত্যাগ করিয়া তরুতলে বাস করিয়া ভগবচ্চিন্তা করিতেছিলেন এবং "মাধুকরী" অর্থাৎ সামান্য আহার্য্য ভিক্ষা করিয়া জীবন-ধারণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তখন 'ভক্তমাল' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক কৃষ্ণদাস বাবাজী বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। "লালা বাবু" তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন, আকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁহার বাবাজীর প্রতি আকৃষ্ট হইবার কারণ এইরূপ কথিত আছে—সন্ন্যাসী হইবার প্রস্তুতিরূপে "লালা বাবু" তখন হঠযোগ অভ্যাস করিতেছিলেন। যে স্থানে তিনি যোগ অভ্যাস করিতেন, তাহারই নিকট দিয়া বাবাজী প্রতিদিন প্রাতঃকালে পুষ্করিণীতে যাইতেন। এক দিন তিনি "লালা বাবুর" যোগসাধনা দেখিয়া মৃদুহাস্য করিলে তাহা লক্ষ্য করিয়া "লালা বাবু" কারণ জানিতে উৎসুক হইয়া বাবাজীর শিষ্যদিগকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। শিষ্যদিগের জিজ্ঞাসায় বাবাজী বলিলেন, যাহারা শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে চাহে কঠোর যৌগিক প্রক্রিয়া তাহাদিগের প্রয়োজন; কিন্তু যাহারা যোগী হইয়া মুক্তি কামনা করেন, তাঁহাদিগের পথ স্বতন্ত্র। শুনিয়া "লালা বাবু" তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যে সময় বাবাজীর শিষ্যগণ গুরুর নিকট বসিয়া উপদেশ লইতেছিলেন, তখন "লালা বাবু" তাঁহাদিগের সহিত উপবিষ্ট হইলেন। বাবাজী শিষ্যবর্গের সহিত [illegible] করিলেন, কিন্তু "লালা বাবুর" সহিত বাক্যালাপও করিলেন না। পরদিনও ঐরূপ ঘটিলে "লালা বাবু" তাঁহার অবজ্ঞার কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিলেন না। তাহাতে বাবাজী বলিলেন, "তুমি ধনী—তোমাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। যাহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়া আমার নিকট আইসে—আমার কাজ তাহাদিগকে লইয়া, তাহাদিগের জন্য।" বাবাজীর কথা হৃদ্‌গত করিয়া "লালা বাবু" সর্ব্বত্যাগী হইয়া "মাধুকরী" অবলম্বন করেন। তাহার পরে তিনি বাবাজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিলে বাবাজী বলিলেন, "তোমার দীক্ষা গ্রহণের সময় হয় নাই। তুমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছ বটে, কিন্তু যে স্থানে 'মাধুকরী' কর তথায় সকলেই তোমাকে জানে—অনেকে তোমার নিকট উপকৃত—তোমার প্রজা; তাহারা ত সাগ্রহে তোমাকে আহার্য্য দিবেই।" এই কথার যাথার্থ্য অনুভব করিয়া "লালা বাবু" যে স্থানে তিনি অপরিচিত সেই স্থানেই "মাধুকরী" করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছু দিন এই অবস্থায় দিনাতিপাত করিয়া তিনি আবার বাবাজীর নিকট দীক্ষার্থী হইলে বাবাজী বলিলেন, "বৎস, তোমার দীক্ষালাভের এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে।" বাবাজীর কথায় ব্যথিত হইয়া "লালা বাবু" আপনার ক্রটির সন্ধানে মনোযোগী হইলেন। আপনার কার্য্য বিচার করিয়া তিনি আপনার দৌর্ব্বল্যের সন্ধান পাইয়া অপরাধ বুঝিতে পারিলেন—তিনি ভিক্ষার্থ অন্যত্র যাইলেও কোন দিন শেঠদিগের দ্বারে গমন করেন নাই—তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার মোকর্দ্দমা চলিতেছিল। তখন তিনি দৌর্ব্বল্য জয় করিবেন স্থির করিয়া পরদিন শেঠের কুঞ্জে ভিক্ষার্থ গমন করিলেন। ঘটনাক্রমে শেঠদিগের কর্ত্তা সেদিন কুঞ্জে ছিলেন। তিনি ভিখারী "লালা বাবুকে" দেখিয়া দ্রুতপদে আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনবদ্ধ ও অশ্রুসিক্ত করিয়া বলিলেন, "আজ মোকর্দ্দমায় আপনার জয় হইল—আমি আজ পরাজিত।" শেঠজী "লালা বাবুকে" কুঞ্জে "প্রসাদ" পাইতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু "মাধুকরী" ব্রত ভঙ্গ হইবে বলিয়া "লালা বাবু" সবিনয়ে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন।

মোকর্দ্দমার অবসান হইল।

কৃষ্ণদাস বাবাজী "লালা বাবুকে" দীক্ষা দিয়া শিষ্য করিলেন।

গঙ্গাগোবিন্দের ক্রটির প্রায়শ্চিত্ত তাঁহার পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র ত্যাগের দ্বারা করিলেন।

দীক্ষালাভের পরে "লালা বাবু" সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিলেন। শুনা যায়, তাহার পরে তিনি মৌনব্রতাবলম্বী হইয়া অধ্যাত্মচিন্তায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

এই অবস্থায় ১৮২২ খৃষ্টাব্দে—মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনান্ত হয়। গোয়ালিয়রের মহারাণী তীর্থদর্শন ব্যপদেশে ব্রজমণ্ডলে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে, তৎকাল প্রচলিত প্রথানুসারে, বহু লোক—সৈনিক প্রভৃতি ছিল। তিনি যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, "লালা বাবু" তাহার নিকটে রাজপথে যাইতেছেন শুনিয়া মহারাণী সাধুদর্শনে পুণ্যলাভের আশায় তাঁহাকে প্রণাম করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইলে, বিনয়বশে "লালা বাবু" ব্যস্ত হইয়া স্থান ত্যাগ করিতে থাকেন। সেই সময় গোয়ালিয়রের অশ্বারোহী রক্ষীদিগের এক জনের অশ্ব চঞ্চল হয় এবং তাহার পদাঘাতে "লালা বাবু" ভূপতিত হয়েন।

তখনই তাঁহাকে তাঁহার গুরুর কুটীরে লইয়া যাওয়া হয় এবং গুরুর অঙ্কে মস্তক রক্ষা করিয়া তিনি বৃন্দাবনের রজে শয়ন করিয়া শেষ শ্বাস ত্যাগ করেন। ব্রজের ধূলি ভক্তগণ পবিত্র জ্ঞান করেন এবং তাহাতে শয়ন করিয়া দেহত্যাগ তাঁহাদিগের কাম্য। "লালা বাবুর" তাহাই হইয়াছিল।

ভোগের সকল উপকরণে পরিবেষ্টিত "লালা বাবু"—ভোগ ত্যাগ করিয়া মোক্ষলাভে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব ও বিষয়বুদ্ধি উভয়ই অসাধারণ ছিল এবং ধর্ম্মভাবই জয়লাভ করে। সাধনায় সিদ্ধির যে দৃষ্টান্ত "লালা বাবু" দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিবে।

ভেরা পানোভা

মস্কোর একটি খবরের কাগজে একদিন একটা মস্ত প্রবন্ধ দেখা গেল—তলায় সই করেছেন সৈন্য বিভাগের ডাক্তার সুপ্রাগভ। প্রবন্ধটিতে 'হসপিটাল ট্রেনে'র চিকিৎসা বিভাগের কর্ম্মীদের বিবরণ লেখা—অত্যন্ত কৌশলে তাদের কর্ম্মকুশলতার প্রশংসা—কোনো নাম উল্লেখ না করে অবশ্য।

প্রবন্ধটা নিয়ে ট্রেনের মধ্যে বেশ একটা আলোচনার ঝড় বয়ে গেল। সুপ্রাগভ আনন্দের উত্তেজনায় আধো-লজ্জিত আধো-উচ্ছ্বসিত হোয়ে ঘুরতে লাগলো চার দিকে। ডাক্তার বেলভ প্রবন্ধটি পড়ে নিয়ে দানিলভকে জিজ্ঞাসা করলেন—

—"ইভান, প্রবন্ধটা পড়ে তোমার কি মনে হয় বল তো?"

—"মন্দ কি? আমাদের অভিজ্ঞতাটা প্রকাশ করাই তো উচিত।"

—"কিন্তু দোহাই ইভান, বলতে পারো কেন ও সমানে লিখেছে 'আমরা,' 'আমরা,' 'আমরা?' আমরা বলার অর্থ কি? সুপ্রাগভের সঙ্গে আমার কোনো দিনই 'বনিবনা' নেই—বিশেষ করে কাজকর্ম্মের ব্যাপারে তুমিই তো সব—অথচ বুঝলে কি না, তোমার নামটার কোথাও উল্লেখই নেই—"

—"আহা, তাতে কি হোয়েছে?"

—"মানে? ও ইচ্ছে করেই উল্লেখ করেনি, এটা বোঝো না বলতে চাও?" মুখ বিকৃত করে বলেন ডাক্তার।

"না, সত্যিই বুঝি না—"

কিন্তু বোঝে! শুধু বোঝে নয়, নিশ্চিত জানে সুপ্রাগভ ইচ্ছে করেই করেছে। কিন্তু জোর করে ভাণ করতে চায় নিজের কাছেও, তাতে কি-ই বা এসে গেল। চুলোয় যাক্, নাম কেনার জন্যে তো কাজ করছে না ও। কিন্তু তা' সত্ত্বেও একটা চাপা রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলে ওঠে—কত বিনিদ্র রাতই কেটেছে এই সব ভাবতে, ব্যবস্থা করতে, তার জন্যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে—অথচ একটি অক্ষরও নেই তার সম্বন্ধে? যারাই প্রবন্ধটা পড়ছে সবাই কৃতিত্বটুকু দিচ্ছে শুধু ডাক্তারদের!

জুলিয়া ডিমিট্রিয়েভনা কিন্তু মুগ্ধ প্রবন্ধটি পড়ে। চমৎকার লেখা হোয়েছে—কি সুচিন্তিত মন্তব্য সব! কি কৌশলেই বলা হোয়েছে বিশেষ ভাবে ডিস্পেন্সারীর কথাটা! সুপ্রাগভই প্রথম পুরুষ বোধ হয়—যে জুলিয়ার সঙ্গ কামনা করতো। অবশ্য প্রথমটা দানিলভ সুপ্রাগভকে আমলই দিত না, ফাইনার উজ্জ্বল ভঙ্গীতে ও নিজেই ভয় পেত, অন্য মেয়েরা ওর গল্প শুনে সে সময়টা হাসতো বটে, তার পরেই কিন্তু আর চেয়েও দেখতো না। এক জুলিয়ার কাছেই ও নিজের উপর আস্থা ফিরে পেতো—লক্ষ্য করতো জুলিয়া সব সময়ই ওর সঙ্গে কোমল সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করে। প্রথমটা দু'জনার মধ্যে এমনি করেই বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো, কিন্তু সুপ্রাগভের মা মারা যেতেই একটা নতুন চিন্তা ওর মনে রূপ নিলে—জুলিয়াকে বিয়ে করলে কেমন হয়? বিয়ে?···শুনতেও ভারী ভালো লাগে, কেমন নেশার মত, না?···তা ছাড়া বাড়ীতে একজন মেয়ে থাকলে খাওয়া-পরা নিয়ে ভাবতে হয় না, সুন্দর গোছানো ফিটফাট ঘরদোর, মোজা আর টাই খুঁজে বেড়াতে হয় না', আর রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে খেতেও হয় না—সত্যি এটা ডাক্তার মানুষের পক্ষে সম্মানজনক নয়। মনে পড়লো নিজের ফ্লাটটার কথা, রঙ-করা বাক্স, জাগ, গোলাপী রঙের ভেনিসের গ্লাস, রামধনু রঙের ঝিলিক লাগানো···যাই বলো প্রত্যেক পুরুষেরই বিয়ে করা উচিত।

কিন্তু সত্যিই কি? অবশ্য বুড়ো বয়স অবধি কুমারী থাকার পর জুলিয়ারও উচিত চিরকৃতজ্ঞ থাকা, তা ছাড়া শ্রদ্ধা করা ওকে বিয়ে করার জন্য···কিন্তু সুপ্রাগভের অবচেতন মন যেন বলে যেই জুলিয়া ওর স্ত্রী হবে সেই মুহূর্ত্ত থেকেই স্বামীর উপর এমন দাবী করবে যা ওর পক্ষে মেটানো কঠিন।

আশ্চর্য্য! এই দাম্ভিকা, কঠিন প্রকৃতির মহিলা, যাকে ট্রেনশুদ্ধ সবাই সমীহ করে চলে সে কি না সুপ্রাগভকে এতটা গুরুত্ব দেয়,···শুধু তাই? বেশ বোঝা যায় জুলিয়া ওর সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসে, ওর সঙ্গ কামনা করে। সুপ্রাগভের জীবনে এই প্রথম কোনো স্থিরপ্রকৃতি নারীর—কৃপাদৃষ্টি নয় বিমুগ্ধ দৃষ্টি লাভ। জুলিয়ার সঙ্গে যে কোনো বিষয়েই কথা বলতে পারে—কি অদ্ভুত মনোযোগ দিয়েই না শোনে ও! নিজের প্রতি দশ গুণ শ্রদ্ধা বেড়ে যায় সুপ্রাগভের—সেই সঙ্গে জুলিয়ার প্রতিও। এত দিনে সত্যিকারের সমঝদার সঙ্গিনী মিললো। সব গল্পই সুপ্রাগভ করতো, কেমন করে ডাক্তারীতে ধীরে ধীরে উপার্জ্জন বাড়লো, কেমন করে একটি সাজানো বাসা তৈরী করলে,···তা ছাড়া ওর মৃতা মায়ের কথা—ভগবান বিচার করবেন, কিন্তু মা ছেলের স্বাচ্ছন্দের দিকে কোনো দিনই দৃষ্টি দেননি—শুধু নিজের আরাম খুঁজেছেন আর ছেলের পরিশ্রমের টাকাগুলো দিয়ে তাসের জুয়ায় মেতেছেন। আর ও একা কাটিয়েছে, চিরকালই একা···কি দুর্ব্বিষহ সেই নিঃসঙ্গতা!

—"অবশ্য আমি আশা করি"—একদিন বললে সুপ্রাগভ—"আমার এই নিঃসঙ্গ জীবন চিরকালই থাকবে না। শীগ্‌গিরই এর শেষ হবে—"

জুলিয়ার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠলো এই খাপছাড়া কথায়। আবার একদিন কি খেয়াল হোলো সুপ্রাগভের নিজের ছোট্টো বাসাটির বিবরণ দিতে বসলো খুঁটিয়ে, এমন কি ছবি এঁকে তার প্ল্যান অবধি বোঝাতে লাগলো—আর সারা সময়টা কম্পিত বক্ষে জুলিয়া ভাবতে লাগলো—কে জানে হয়তো আমারই অদৃষ্টে আছে ঐ বাসাটির অধীশ্বরী হওয়া!

জুলিয়া নিজের এই অনুভূতি সবার কাছ থেকেই গোপন রেখেছিলো ফাইনার কাছে ছাড়া। ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ানো সহজ নয়, বিশেষ করে এই সব রোম্যান্টিক ব্যাপারে। অবশ্য ওর দিকে

নজর না দেওয়াতে সুপ্রাগভের ওপর ওর একটু রাগ ছিলো, অন্য মেয়ে হলে ফাইনা তাকে দাঁড়াতেই দিত না, ওর পক্ষে কিন্তু জুলিয়ার বেলায় ঠিক হোলো উল্টো। ওদের দু'জনার ভালবাসাকে অঙ্কুরিত হবার সুযোগ দিয়ে নিজেই তার পথ করে দিলে—এমন কি সুপ্রাগভ এলেই কোনো না কোনো ছুতায় কামরা থেকে বেরিয়ে যেতো, যাতে জুলিয়া আর সুপ্রাগভের কথার মধ্যে তৃতীয় প্রাণীর বিরক্তিকর উপস্থিতি না ঘটে। অবশ্য কামরার দরজাটা খোলাই থাকতো। আর ওরা দু'জনেই রীতিমত সচেতন থাকতো সে বিষয়ে।

—"জীবনে দু' বার ভালবেসেছিলাম"—সুপ্রাগভ শোনায় ওর গত কাহিনী—"কিন্তু ভালোবেসে কোনো দিনই সুখী হতে পারিনি—"

সুপ্রাগভের মুখে কাহিনীগুলো বেশ ভালো শোনাতো—বলার চেয়ে সুপ্রাগভের চরিত্রটি ফুটে উঠতো মহৎ, ব্যথাতুর—জুলিয়া ঠিক যেমনটি পছন্দ করতো. তাই মুগ্ধ হৃদয়ে নিশ্বাস রুদ্ধ করে শুনতো। জীবনে এই প্রথম জুলিয়ার মনে জাগলো ঈর্ষার অনুভূতি। সুপ্রাগভের বিগত দিনের দুটি নারীর প্রতি গোপন ঈর্ষা। কই প্রফেসর স্তুনারেভস্কির সম্বন্ধে তো ঈর্ষা জাগেনি—সে তো ছিলো কল্পনা কিন্তু সুপ্রাগভ—ওকে ঘিরে আনন্দ-বেদনায় গড়া আশা বার বার মনে উঁকি মেরে যায় যে।

* * * *

ট্রেনেতে নতুন নতুন লোক এলো।

দানিলভ চাইছিলো একটি ছুতোর। অনেক কাজ করাবার আছে। নিত্য-নতুন প্ল্যান ওর মাথায়। যে স্ট্রেচারগুলো মেরামত করতে পারবে, ব্যায়ামের জিনিষগুলো তৈরী করতে পারবে—তা ছাড়া একটা বাসন-রাখা আলমারী চাই, প্রত্যেক বিছানার সঙ্গে একটা করে তাকওয়ালা টেবিল করে দিলে কেমন হয়? ইচ্ছে মত সরানো যাবে, অথচ আহতেরা নিজেদের বই, সিগারেট, খুঁটিনাটি সব কিছু রাখতেও পারবে। বাঙ্কের মাঝে মাঝে বসার টুল করে দিলে আরও ভালো—কিন্তু ভগবানের দয়ায় একটা ছুতোর পেলে হয়। ইভানোভো ষ্টেশনে ভগবানের দয়াটা এলো সাশা খুড়োর মধ্য দিয়ে। রেলওয়েতেই কাজ করতো ও। লুগাতে ছিলো ওর বাড়ী—সেখানে থাকতো ওর বিধবা বোন, দুটো মেয়ে আর একটা ভাইঝি। জার্মানরা দিকে যখন আসে তখনই সাশা খুড়ো তার বাড়ীর মেয়েদের নিয়ে একটা ট্রেনে চলে আসতে চেষ্টা করে। সে ট্রেনটার ও-ই ছিলো কনডাক্টার। কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও প্রথম গাড়ী যেটাতে ও ছিলো সেটাতে ওদের তুলতে পারেনি। সবার পিছনের গাড়ীতে ওরই একটা বন্ধুর জিম্মায় ওদের তুলে দেয়। ভাগ্যের বিড়ম্বনা···পথে জার্মানদের বোমার ঘায়ে শেষ গাড়ী দুখানিই নিশ্চিহ্ন হোলো—একটা প্রাণও বাঁচলো না···মৃতের স্তূপ সরাতে গিয়ে দেখেছিলো ওদের মৃতদেহ···উঃ, কি নিদারুণ দৃশ্য! নিজেও অসুস্থ হোয়ে পড়লো—এত দিন প্রায় ১৮ মাস এই ইভানোভোর একটি মানসিক চিকিৎসা-কেন্দ্রে থাকার পর সবে ছাড়া পেয়েছিলো। এমনি সময় পড়লো দানিলভের দৃষ্টিতে।

সাশা খুড়ো নিজের যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে বসলো ট্রেনের বিশেষ একটি কামরাতে—জটিল, সংক্রামক রোগীদের জন্যে বিশেষ ভাবে পৃথক্ করে রাখা কামরাটা। কিন্তু ট্রেনটা এখন তো খালিই চলছিলো···তাই আপন মনে কাজের সুবিধাও হোলো। ওর মধ্যে এমন একটা প্রাণচঞ্চল স্ফূর্তির ভাব আর এমন সুন্দর সূক্ষ্ম বোধ ছিলো যে, দানিলভের মনটা প্রথমেই আকর্ষণ করলো। সাশা খুড়োর গানের গলাটি ছিলো চমৎকার—যেমন গম্ভীর মধুর তেমনি সূক্ষ্ম কারুকাজও খেলতো পর্দায় পর্দায়। গীটারটি হাতে গান ধরলেই মুখে ফুটে উঠতো আত্মপ্রসাদের সস্মিত হাসি। গাইতো পুরানো দিনের গান—'মস্কোর অগ্নিশিখা', 'ওলেগ যুদ্ধে গেল' এই সব গান। দানিলভ শুনে ওকে ডেকে বললে,—"আহতদের জন্যেও তোমাকে গাইতে হবে সাশা খুড়ো—"

—"বটেই তো, গাইব বৈ কি! ওই সৈন্যছেলের দল তো ষ্টেশনে আমার গান শুনে কি খুসীই হোতো—বড় অফিসাররাও বাদ যেতো না। একবার তো একজন লেফটানান্ট জেনারেল আমায় ঐ 'মস্কোর অগ্নিশিখা' গানটা শুনে এককৌটা সিগারেট উপহার দিয়ে দিলে—"

তার পর থেকে চিকিৎসার কাজ শেষ হোলে যখন খাবার সময় হোতো, তখন গোঁফ-জোড়াটিতে তা' দিয়ে গীটারটি হাতে সাশা

খুড়োকে দেখা যেতো কামরায় কামরায়···ভালোবাসতো সবাই ওকে···কেন যে বলা কঠিন···কিন্তু সত্যিই প্রত্যেকেই ওকে খুব পছন্দ করতো। কামরার মাঝখানে একটি টুল পেতে বসে যখন ও গীটার বাজিয়ে সুরু করতো—'যে রাখী আমার হৃদয়ে তুমি বেঁধেছো কে সেই বন্ধন ছিন্ন করবে কাল···" কিম্বা 'কুয়াশার ভিতরও দেখা যায় ওই জ্বলন্ত অগ্নিশিখা···।' বিষণ্ণ ভঙ্গীতে গাইতো সে, চুপ করে শুনতো সবাই। কিন্তু যেই ও-পাশের কামরাতে যাবার জন্যে উঠতো—সবাই চিৎকার সুরু করতো,—"ও খুড়ো, আরও গান শোনাও! এই, ওকে যেতে দিও না, আরও গাইতে বলো!"

দানিলভ কমসোমলদের (কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্য) ডেকে বললে, —"আচ্ছা, তোমরা একটা ছোটোখাটো গ্রুপ তৈরী করবে কবে বলো তো? এই আহতদের একটু আনন্দ দিতে, খুসী রাখতে নাচ-গান-বাজনার মধ্য দিয়ে?" ওদের সংগঠক নার্স স্মিনোর্ভাকেই লক্ষ্য করে বলে—"কত বার বলেছি আমি। এটা তো তোমাদেরই কাজ, অল্প বয়স তোমাদের অথচ দেখো তো এই বুড়ো সাশাকে, একাই কত আমোদ দিচ্ছে ওদের!"

শেষ অবধি একটা দল তৈরী হোলো। আহতদের চেয়ে ট্রেনের কর্মীদেরই বোধ হয় বেশী প্রয়োজন ছিলো এটার। তাই দেখা গেলো সবাই নাচ-গানে যোগ দিতে চায়। নিঝভেট্স্কি, ফাইনা এমন কি সুখোয়দভ অবধি—অবশ্য ও সুন্দর 'বেলালাইকা' (রাশিয়ার বাদ্যযন্ত্র) বাজাতো। দানিলভ কিছু বাজনা কিনলে, মেয়েরা সাশা আর সুখোয়দভের কাছে শিখতে লাগলো।

* * * *

লালফৌজ জার্ম্মানদের স্তালিনগ্রাদ থেকে হটিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তখন সোভিয়েট মাটি থেকেই ওদের তাড়াতে ব্যস্ত। তার মানে সে সময়টা যুদ্ধও যেমন প্রবল, 'হসপিটাল ট্রেনে'র কাজও তেমনি অত্যধিক। একটার পর একটা গ্রাম থেকে শত্রুসৈন্য হটিয়ে গ্রামগুলোকে মুক্ত করা হচ্ছিল। আর এত দিনের নির্য্যাতিত, অত্যাচারিত, মনুষ্যত্বের চরম অধঃপতনে লাঞ্ছিত মানুষের দুর্দ্দশা প্রকাশ পেল—গৃহহীন, খাদ্যহীন, অনাথের দল ছড়িয়ে পড়লো অগণিত সংখ্যায়—সে যে কি মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য, কল্পনা করা যায় না। এমনি একটা ছোট্ট গ্রাম্যষ্টেশনে ট্রেনটা থেমেছিলো। কিছু নেই কোথাও শুধু কয়েকটা অগ্নিদগ্ধ চিমনী ছাড়া—এখানে ভাস্কা এসে হাজির হোলো 'হসপিটাল-ট্রেনে'। অপরিসীম দুঃখ-ক্লান্তির ছাপ-লাগানো রোগা মত একটি মেয়ে—বিষণ্ণ ধূসর চোখ, মুখের দু' পাশ থেকে নামছে সিল্কের মত নরম চুলের দুটি বেণী। বস্ত্রাসিন মেয়েটিকে নিয়ে এসেছিল।

—"তোমার বয়স কত বলো তো"—দানিলভ জিজ্ঞাসা করলে।

—"সতেরো" ভাস্কা উত্তর দিলে।

—"কোন্ গ্রাম থেকে আসছো? গ্রামটা ধ্বংস হোয়ে গেছে?"

—"পেত্রেইয়েভা গ্রাম। কিন্তু কোনো চিহ্নই নেই তার। ওরা একেবারে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে"—ভাস্কা চাপা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বললে। কথার ফাঁকে ওর উজ্জ্বল চোখ দুটো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলো দানিলভ আর জুলিয়াকে। হাঁফাতে হাঁফাতে এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলছিলো ভাস্কা।

—"তোমার কাগজপত্রগুলো আছে তো?"

—"হ্যাঁ"—ব্লাউসের ভিতর থেকে এক তাড়া কাগজ বের করলে ভাস্কা। চোখের জলে কালির লেখাগুলো ঝাপসা হোয়ে গেছে কাগজে লেখা আছে ১৯৪১ সালে ভাস্কা বুরেক্সো উক্রেনের সাগাইদার স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হোয়েছে।

—"কই, এ তো পরিচয়-পত্র নয়"—দানিলভ জানালে। ভাস্কা অবাক—"তবে কি?"

—"আচ্ছা, উক্রেন থেকে কি করে এখানে এলে বলো তো?"

—"এমনিই চলে এলাম। জার্ম্মানদের হাত থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিলাম আমরা। শেষ অবধি ওরা তো এখানেও এসে গেলো"—

—"এখানে তোমার কোনো আত্মীয়-স্বজন আছে না কি?" জুলিয়া এবার প্রশ্ন করে।

—"হ্যাঁ, আমার ঠাকুমা থাকে কাছেই লিখোরেভাতে ছয় কিলোমিটার দূর এখান থেকে—"

—"তাহলে তুমি ঠাকুমাকে ফেলে এলে কেন?"

—"ঠাকুমা ওর চেনাশোনা লোকেদের সঙ্গে থাকে আমার ভালো লাগে না থাকতে। তাছাড়া ওদের ঘর-বাড়ী তো পুড়ে গেছে। ওরা এখন একটি ঝুপসী কুঠুরী করে থাকে।"

—"তোমার মা, বাবা···?"

—"মা তো নেই। আর বাবা?···জানি না বাবা এখন কোথায়? যুদ্ধে যাবার পর থেকে কোনো খবর পাইনি।"

ভাস্কা সহজ ভাবেই জানায় কথাগুলো, শুধু ওর ভ্রূ দুটো কেমন বিষণ্ণ ভঙ্গীতে কুঁচকে ওঠে।

দানিলভ বলে—"তোমাকে আমরা সঙ্গে নেবো এক সর্ত্তে—একটুও মিথ্যে কথা বলবে না। ১৭ বছরের তুমি নও—"

—"হ্যাঁ সত্যি, সত্যিই—আমি দিব্যি গেলে বলছি সতেরো বছর বয়স আমার—"

—"বটে! তাহলে জার্ম্মানদের কাছে কত বয়স বলেছিলে যে ওরা তোমাকে জার্ম্মানীতে সঙ্গে নিয়ে গেলো না?"—দানিলভ শত্রু-অধিকৃত এলাকার নিয়মগুলোর খোঁজ রাখতো, তাই এই প্রশ্ন করলো।

—"ওদের কাছে বলেছিলাম তেরো বছর—।" শুনে জুলিয়া আর দানিলভ একসঙ্গে হেসে ওঠে—"হ্যাঁ, এটাই অনেকটা সত্যি মনে হচ্ছে। তোমার নামটা কি বল তো?"

—"ভাস্কা।"

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনী! "ওঃ হো! জয় ভগবান! গাড়ীটা ছাড়লো তাহলে!"—ভাস্কা মনে মনে বললে।

একগাদা নীল কম্বল টেবিলে রাখা ছিলো। সুখোয়দভ সেগুলো গোণা শেষ করলো—'উনিশটা'···বলার সঙ্গে সঙ্গে এক বার ভাস্কার দিকে তাকালো। ও ইতিমধ্যে ঠিক করে নিয়েছে এইবার দু'-চারটে কথা সুরু করা উচিত। সোজাসুজি তাই ভাস্কা প্রশ্ন করলে—"ও কাকা, আপনি ওগুলো নিয়ে কি করছেন?"—ওর স্বরে নেই এতটুকু সঙ্কোচের জড়িমা—শিশুর মত অবাধ সরল ভঙ্গি। সেই দিকে চেয়ে সুখোয়দভ ভাবলে এই ছোট্টো বাচ্ছা মেয়েটা এখানে কোন কাজ করতে এলো, মুখে বললে—"এমনি গুছিয়ে তুলছি—"

—"কেন ?"

—"ফোটাতে দেবো বলে।"

—"ও মা ! ফোটাতে কেন ?"

—"জীবাণুগুলো নষ্ট হবে তাহলে।"

—"মরে যাবে একেবারে ?"

—"হ্যাঁ, প্রত্যেকটা জীবাণু মরবে।"

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটলো। আবার ভাস্কা বলে উঠলো—"কাকা, আমাকে এখানে বসিয়ে রেখেছে কেন ?"

—"তোমার পালা আসুক, মিনিট কুড়ি পরে ওভারলগুলো বার করবো, তার পর তুমি যাবে—" বলতে বলতে সুখোময়দত্ত ভাবলে—'ভারী সপ্রতিভ উজ্জ্বল তো মেয়েটা ! দেখতে তো এককোঁটা একটা ফড়িং-এর মত, কিন্তু সব বিষয়ে উৎসুক,—সব কিছু জানা চাই—'

—"কোথায় নিয়ে যাবে আমায় ?"

—"কোথায় ?—ও: ওই বীজাণু-প্রতিষেধক ঘরে"—সুখোময়দত্ত সবুজ জিনিষটাতে কি সব আটকাতে আর খুলতে লাগলো—"কত ডিগ্রী কাকা ?"

—"একশো চার।"

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার সুরু—"কাকা !"।

"কি বলো ?"

—"আমি যদি না যেতে চাই ?"

—"যেতে চাও কি না চাও তা'তে কিছুই এসে-যায় না। আমাদের সবাইকে ওর ভিতর ঘরে আসতেই হবে। ডাক্তার থেকে কয়লা-যোগানদারকে অবধি—"
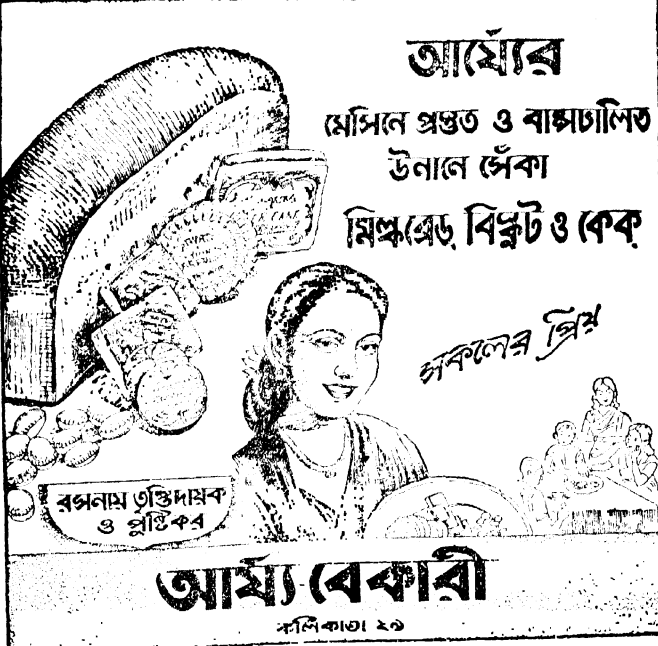
—"তা' বটে।" ভাস্কা ঘাড় নাড়ে—"সবাই যদি গিয়ে থাকে, তাহলে আর আমি মরে যাব না ওখানে—" মেয়েটার জন্যে দুঃখ হয় সুখোময়দত্তের। বলে—"কিছু ভয় নেই তোমার—"

—"না, কাকা, আমি একটুও ভয় পাইনি—"

একটা পুরানো ওভারল ভাস্কাকে দেওয়া হোলো, বেল্টটা ছেঁড়া—আর মাথায় বাঁধতে মিললো এক টুকরো মসলিন। মস্ত বড় ঝলঝলে ওভারল—ভাস্কা তাই একটা কাঁচি নিয়ে তলাটা কেটে সেলাই করে ফেললে, হাত আর গলাও একটু মুড়ে নিলে। ফাইনার মত করে মাথায় মসলিনের টুকরোটা বাঁধবার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু জুলিয়া বললে,—"না, না, ভালো করে মাথাটা ঢাকো—"

সত্যিই নার্স হবার তুলনায় ভারী ছোট্টো মেয়ে। ওকে সাশা খুড়োর কাছে দেওয়া হোলো তাই কাজকর্ম শিখতে। ডিসপেন্সারী গাড়ীটাই সব চেয়ে ভালোও লাগলো ওর। দেওয়ালগুলো কি ঝক্‌ঝকে সাদা, ঠিক সেই উক্রেনে ওর ফেলে-আসা চির-পরিচিত ঘরখানির দেওয়ালের মত—জার্মানরা সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে—যাক্ গে, এখানে সবই কি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ! ভাস্কা আগুনের চিমনীর ধারটিতে বসতে ভালোবাসতো—এ ঘরটাও পরিষ্কার আর গরম। অথচ এখন বাইরে তেমনি ভিজে-ভিজে কন্‌কনে ঠাণ্ডা। নিজের কাজ শেষ করে ভাস্কা মাঝে মাঝে জানলার ধারে দাঁড়াতো, অপেক্ষা

করতো কখন 'ওয়াশ-রুমে'র (ড্রেস করা, ক্ষতস্থান ধোবার ঘর) দরজা খুলবে,—দেখা যাবে সেই শুভ্র স্বর্গ, পামগাছের টবে সাজানো—আয়না, দেয়াল থেকে অপারেশন-ঘরের দরজা অবধি—ঝকঝক করছে। আহতরা অপেক্ষা করছে নরম সাদা ডিভানের উপর বসে বসে নিজেদের পালার—পাশে রেডিও বাজছে মৃদু স্বরে। সব জিনিষই সুন্দর করে সাজানো-গোছানো, সব কিছুই কি আরামের, কি চমৎকার···কত তফাৎ সেই দিনগুলোর সঙ্গে যখন ভাস্কাকে জার্মানদের অধিকৃত জায়গাগুলোতে কাটাতে হোয়েছিলো। উঃ, কি বীভৎস···নিষ্ঠুর দিন! আহতেরা নরম নীল ড্রেসিং-গাউন পরে চুপচাপ বসে থাকে এখানে,—গোলমাল করা দূরে থাক সিগারেটও খায় না—আপন মনে ম্যাগাজিনগুলোর পাতা উল্টোয়।

* * * * *

দানিলভ এখন আর কমিশার নয়—সে এখন রাজনৈতিক বিষয়-সংক্রান্ত ডেপুটী চীফ, আর ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত। সুপ্রাগভ সিনিয়র লেফটানান্ট আর ডাঃ বেলভ মেজর। অনেকগুলি মেয়েও পেয়েছে এই রকম সম্মান-চিহ্ন তারকা-বিশিষ্ট। ভাস্কা দেখতো আর মনে মনে ভাবতো : আমিও অমন তারকা পাবো, আমিও জুলিয়ার মতো অপারেশন-সিষ্টার হবো। কি করে সব কাজ করতে হয় তা-ও সমস্ত শিখবো। অবশ্য ইচ্ছে করলে আমিও একটা ডাক্তারও হোতে পারি, তা' নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। জুলিয়া লক্ষ্য করলো যে, ভাস্কা সব সময়ই 'ওয়াশ-রুমে'র কাছে ঘোরাঘুরি করে। মনে ভাবে, 'মেয়েটার চোখ দুটো ভারী উজ্জ্বল, ভারী তীক্ষ্ণ'। একদিন চুল্লী-ঘরে ঢুকে দেখে ভাস্কা ষ্টোভের পাশটিতে হাঁটু গেড়ে বসে একটা পুরোনো টিন আগুনের উপর ধরে আছে।

—"এই, তোমার হাত পুড়ে যাবে, ভাস্কা," জুলিয়ার স্বর আশ্চর্য্য কোমল—"কি ফোটাচ্ছো ওটাতে?"

—"সাশা খুড়োর কাজ করবার জন্যে গঁদ তৈরী করছি—"

—"সাবধানে করো, নইলে পুড়ে যাবে—"

—"না, না, আমি লক্ষ্য রাখছি—"

ষ্টোভের আগুনের আলো এসে পড়েছে মেয়েটার মুখে—রক্তিম আভায় মুখখানা কি স্বচ্ছ গোলাপের মত দেখাচ্ছে—চুলের উপর কেঁপে কেঁপে উঠছে সোনালী রেখা আগুনের উজ্জ্বল শিখায়।······ 'কতটুকু মেয়েটা' জুলিয়ার বুকের ভিতরটা অজানা অনুভূতিতে উদ্বেল হোয়ে ওঠে.···'একেবারে শিশুর মত যেন'···একটু দ্বিধা একটু অস্বস্তিভরে এগিয়ে এসে অপূর্ব্ব মমতায় সরিয়ে দেয় ভাস্কার কপালের উপর ঝুঁকে-পড়া চুলগুলো···পরক্ষণেই যেন এই আদরটুকুর লজ্জা ঢাকতে বলে ওঠে,—"মুখের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে নিও। আচ্ছা, তুমি আহতদের ক্ষতস্থান বাঁধা হোয়ে গেলে জামা-কাপড় পরিয়ে দিতে পারবে?"

—"হ্যাঁ"—ভাস্কার এতে আপত্তি থাকতে পারে?

—"খুব সাবধানে কাজ করতে হবে কিন্তু, যাতে ওদের একটুও না লাগে, আর খুব তাড়াতাড়িও, অন্যেরাও তো আছে—"

—"হ্যাঁ, আমি খুব তাড়াতাড়ি পারবো।"

তার'পর ভাস্কা ঢুকতে পেলো ওর এতদিনকার বাঞ্ছিত, এতদিনকার কল্পিত স্বর্গপুরীতে,—ডিসপেন্সারী-কামরার ভিতর। জুলিয়া একটা গোল আয়নার মত ঝকঝকে ধাতু-নির্ম্মিত বাক্সের উপর ধীরে ধীরে হাত রেখে বললে,—"এটা হোলো বাক্স। এই যে বাক্সটা দেখছো, এর ভিতর আমি পরিশোধিত যন্ত্রপাতি রাখি। আমরা এখানেই বীজাণু-নাশক যন্ত্র দিয়ে সব কিছু পরিশোধন করি—"

"বীজাণু-নাশক যন্ত্র দিয়ে পরিশোধন"—ভাস্কা এক নিশ্বাসে পুনরাবৃত্তি করে। ওর চোখ দুটো আঠার মত আটকে থাকে জুলিয়ার কর্ম্মচঞ্চল আঙুলগুলির দিকে।

—"আচ্ছা, আমি যা বললাম একবার বলো তো?" প্রশ্ন করে এবার জুলিয়া।

—"এটা হোলো বাক্স"—ভাস্কা তৎক্ষণাৎ জুলিয়ার মত ঝকঝকে বাক্সটার উপর হাত রেখে সুরু করে।

—"না, না, ওটা ছুঁয়ো না, শোনো, নেহাৎ দরকার না হোলে কোনো জিনিষেই হাত দিও না। হাতে করেই সব চেয়ে বেশী বীজাণু ছড়ায়, সব চেয়ে সংক্রামক রোগের বৃদ্ধি হয়—"

'কিন্তু তুমি নিজে সবেতেই তো হাত দিচ্ছ,' বিদ্যুতের মত চিন্তাটা ভাস্কার মনে খেলে গেলো, অবশ্য তার জন্যে ওর মনে একটুও লাগলো না, বরং একটা কথা মনে গেঁথে নিলে—'সংক্রামক'।

—"বেশ, খুব ভালো হোয়েছে, এবার যেতে পারো"—কাজের শেষে জুলিয়া প্রশংসা জানায়।

—"আশ্চর্য্য বুদ্ধিমতী মেয়েটা"—দানিলভকেও বলে জুলিয়া।

—"সত্যি না কি?"—দানিলভের স্বরে বিস্ময়। সার্জ্জারী সম্বন্ধে দানিলভের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। কি জটিল, সূক্ষ্ম অথচ কি ভীষণ দায়িত্বপূর্ণ কাজ! সেখানে ঐ বাচ্চা মেয়েটা কোন্ কাজে লাগে?

—"তোমার হঠাৎ একটি ছাত্রীর শখ আবার হোলো কেন?" সুপ্রাগভ জিজ্ঞাসা করে, "বিশেষ করে ও তো একটা শিশু—"

—"না, না, ওর ভারী আগ্রহ আছে। আমার বিশ্বাস, ওকে ভালো করে শেখালে খুব উন্নতি করবে—"

—"কিন্তু ভাবছো না তোমার সময় কখন?"—সুপ্রাগভের তবু প্রশ্ন।

—"ছোটোদের শেখানোটাও আমাদের কর্ত্তব্য"—জুলিয়ার স্বরে এবার ফোটে ওর নিজস্ব দৃঢ়তার সুর।

একদিন ভাস্কার হাত থেকে একটা সিরিঞ্জ হঠাৎ পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল।

মুহূর্ত্তে জ্বলে উঠলো জুলিয়ার চোখ, তখনি সরিয়ে দিলে ভাস্কাকে ঘর থেকে।

কে জানে হয়তো মেয়েটা আর আসবে না, জুলিয়া অন্যমনস্কের মত ভাবে। কিন্তু পরদিন সার্জ্জারীর দরজায় আবার সেই মুখটা উঁকি মারে প্রতিদিনের মত—এসেছে কাজ শিখতে, কোথাও যেন ঘটেনি কিছুই—

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—শান্তা বসু

ময়লার বীজাণু থেকে প্রতিদিনই আপনার অসুখের সম্ভাবনা আছে
লাইফবয় মেখে এই সব বীজাণু ধুয়ে ফেলে প্রতিদিন নিজেকে রক্ষা করুন
লাইফবয়ের "রক্ষা-কারী ফেনা" আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখে
লাইফবয় সাবান
প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY SOAP
ভারতে প্রস্তুত
L. 248-X52 BG
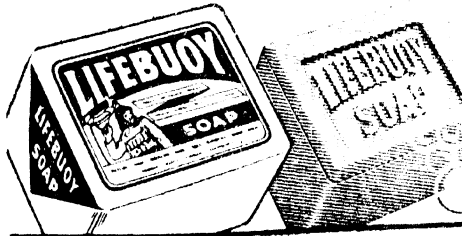
(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ডি. এচ. লরেন্স

আর্থার এখন অবধি তার বাপের খুব ভক্ত ছিল। সে গিয়ে মোরেলের চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে দাঁড়াত, বলত, 'খনির নীচেকার গল্প বলো, বাবা!'

এ গল্প মোরেল নিজেও ভালবাসত। গোড়াতেই সে বলত, 'জানিস, একটা ছোট্ট ঘোড়া আছে সেখানে, ওকে আমরা ডাকি 'ট্যাফি' বলে। আর কি সাঙ্ঘাতিক চালাক ঘোড়া সেটা!'

মোরেল দরদ দিয়ে গল্প বলতে পারত। এমন ভাবে সে বলত যেন ঘোড়াটার চালাকীর কথা শ্রোতাদের মনে দাগ কেটে বসে।

'আর ঘোড়াটার রঙ হ'লো পাটল, দেখতে খুব বেশী বড়ো নয়। খট্-খট্ আওয়াজ ক'রে পা ফেলে সে খাদের নীচে আসে, এসেই হাঁচতে থাকে। তুমি হয়ত জিজ্ঞেস করলে, কী রে, অত হাঁচছিস কেন? নস্যি নিয়েছিস্ নাকি? ও আবার হাঁচে। তার পর গলাটা বাড়িয়ে তার মাথাটা এনে রাখে তোমার মাথার উপর। তুমি বল, কী চাই, ট্যাফি?'

—'হ্যাঁ বাবা, কী চায় ও?' আর্থারও সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ক'রে উঠত।

—'কি চায়? বুঝলিনি বোকা, ও চায় একটু bacca.'

অনেকক্ষণ অবধি ওই ট্যাফির গল্পই চলতে থাকত, সবাই ভালবাসত ওই গল্পটা শুনতে। কোন কোন দিন চলত নতুন কোন গল্প।

—'জানো, কী হয়েছে আজ? দুপুর বেলা খাওয়ার ছুটির সময় কোটটা তুলে পরতে গেছি, অমনি আমার হাতের উপর দিয়ে দৌড়ে চলে গেল—কী বল তো—একটা ইঁদুর রে, ইঁদুর! আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, আরে, আরে! ঠেসে ধরলুম ব্যাটার লেজ।'

—'মেরে ফেললে নাকি ওটাকে?'

—'মারব না? হাড় জ্বালিয়ে তুললে ব্যাটারা। ইঁদুরের একেবারে রাজত্ব হয়েছে জায়গাটাতে।'

—'ওখানে কী খেয়ে বেঁচে থাকে ওরা?'

—'কেন, ওই ঘোড়াগুলোর খাবার ঘাস-খড় থেকে যা মাটিতে পড়ে, তাই ওরা খুঁটে খুঁটে খায়। একেবারে জ্বালিয়ে তুলেছে।—পকেটে গিয়ে ঢুকবে, পকেটে যদি খাবার থাকে তো খেয়ে ফেলবে, তা তোমার কোট তুমি যেখানেই রাখ না কেন! ওঃ, এই ছোট কুট্‌কুটে শয়তানগুলোর জ্বালায় আর পারা গেল না!'

এই সুখের সন্ধ্যা আর ক'দিন? শুধু যে ক'দিন মোরেল বাড়িতে বসে টুকিটাকি কাজ করত, সেই কয়েক দিনই এ বাড়ির সুখ আর শান্তি। এমন দিনে মোরেল শুয়ে পড়ত খুব শীগগির; অনেক দিন ছেলে-মেয়েরা শোবার আগেই সে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

বাবা বিছানায় শুয়ে পড়বার পর ছেলে-মেয়েরা যেন একটু সোয়াস্তি বোধ করত। তারা শুয়ে শুয়ে আরো খানিকক্ষণ চাপা-গলায় কথাবার্ত্তা বলত। মাঝে মাঝে চমকে উঠে তারা দেখত ছাদের গায়ে কিসের ছায়া পড়ছে—রাত ন'টার পালায় যে সব মজুর খনিতে কাজ করতে যেত, তাদের হাতের বাতি থেকে এসে পড়ত এই ছায়া। লোকগুলোর কথা শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে তাদের মনে হ'ত যেন ওরা পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে গেছে নীচের অন্ধকার উপত্যকায়। এক-এক সময় কী মনে ক'রে তারা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াত, দেখত তিনটে কি চারটে বাতি ছোট হতে হতে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে—অন্ধকার মাঠের উপর দিয়ে দুলতে দুলতে চলেছে বাতিগুলো। খুশি হয়ে আবার তারা দৌড়ে ফিরে আসত বিছানায়, জড়োসড়ো হয়ে আরামে শুয়ে থাকত।

পল্ ছেলেটির স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল না—মাঝে মাঝে তার চাপা সর্দ্দি হ'ত। অন্য ছেলে-মেয়েরা দিব্যি সুস্থ-সমর্থ। এই কারণেও পল্-এর দিকে মায়ের মনোভাব একটু অন্য ধরণের হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদিন দুপুর বেলা খাওয়ার সময় বাড়িতে এসে তার শরীর খারাপ বোধ হতে লাগল। কিন্তু এ বাড়িতে অসুখ-বিসুখ নিয়ে উতলা হবার রীতি ছিল না।

মা বেশ চড়া সুরেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কী? তোর আবার কি হ'ল?'—'

'কিছু না,' পল্ বললে। কিন্তু খেতে বসে সেদিন সে কিছুই খেতে পারলে না।

—'খাবার না খেলে তুমি স্কুলেও যেতে পারবে না।' মা বললেন।

—'কেন?' পল জিজ্ঞেস করল।

—'ওই যা বললুম।'

কাজেই খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে পল শুয়ে রইল গরম ছিটের কুশনওয়ালা সোফাটার উপর, সব ছেলে-মেয়েরাই এই সোফাটাতে শুতে ভালবাসত। তার পর আস্তে তার কেমন আচ্ছন্ন ভাব হ'ল। বিকেল বেলা মিসেস মোরেল কাপড়-জামা ইস্ত্রী করছিলেন। হঠাৎ তাঁর কানে গেল, ছেলের গলায় থেকে থেকে কেমন শব্দ হচ্ছে। অমনি তাঁর মনে জাগল সেই পুরোনো ভীতি—পল-এর দিকে চেয়ে আগেও তাঁর মন যেমন ভারী হয়ে উঠত, আজও তেমনি হয়ে উঠল। ও যে বেঁচে থাকবে এ আশা তিনি কোন দিনই করেননি। তবু তার কচি দেহে জীবনীশক্তির জোর ছিল।

সে মরে গেলেও হয়তো তিনি একটু সোয়াস্তি পেতেন—এ ছেলেকে ভালবাসতে গেলেও তাঁর মনে কেমন ব্যথা জাগত।

পল তার আচ্ছন্ন অবস্থায় শুয়ে শুয়ে শুনছিল ইস্ত্রীর ক্ষীণ শব্দ: কোথায় যেন ধুপ্ ধুপ্ করে শব্দ হচ্ছিল। একবার জেগে উঠে সে চোখ খুলে দেখল, মা উনুনের কাছে কার্পেটের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, ইস্ত্রী করার যন্ত্রটা নিজের গালের কাছে নিয়ে যেন কান দিয়ে শুনছেন কতটা গরম। তাঁর স্থির মুখচ্ছবি, দুঃখে, আশাভঙ্গে, আত্মবিলোপের সাধনায় দৃঢ়সম্বদ্ধ মুখ, ছোট্ট একটু নাক আর নীল, চপল, মধু-মাখা চোখ—পাশ থেকে দেখতে দেখতে গভীর প্রেমে পল-এর হৃদয় যেন ভরে গেল। মায়ের এই শান্ত রূপটি তার ভাল লাগে—তাঁর মনের সাহস আর প্রাণের প্রাচুর্য্য ফুটে বেরিয়ে আসে এই সময়টাতে, তবু দেখে মনে হয় যেন তিনি বঞ্চিতা, যেন তাঁর যা পাবার তা তিনি পাননি। মা যে তাঁর জীবনের সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারেননি, এটুকু বুঝে নিতে তার দেরি হয় না, মায়ের জন্মে স্নেহে, বেদনায় তার হৃদয় অভিভূত হয়ে পড়ে। তাঁকে একটু সুখ দিতে, একটু তাঁর ক্ষতিপূরণ করতেও অক্ষম সে; নিজের এই অক্ষমতার জন্মে তার দুঃখ হতে থাকে। তবু মনে সঙ্কল্প আরও তার দৃঢ় হয়ে ওঠে, মনে মনে ধৈর্য্য ধারণ ক'রে থাকে সে। এই তার ছোটবেলার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

ইস্ত্রী করার যন্ত্রটার উপর থুতু ফেললেন মা, তার গোলাকার কণাটুকু যন্ত্রটার কালো, মসৃণ বুকের উপর নেচে উঠল যেন। তার পর উবু হয়ে বসে তিনি মেঝের কার্পেটটার উপর জোরে জোরে ইস্ত্রীর যন্ত্রটা ঘষতে লাগলেন। উনুনের লাল আভায় মাকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। পল শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগল, মায়ের এই হাঁটু গেড়ে বসা, মাথাটি এক পাশে হেলিয়ে রেখে কাজ করে যাওয়া, এ দেখতে তার ভাল লাগত। তাঁর চলা-ফেরার মধ্যে ছিল লঘু চাপল্য—তাঁর দিকে চোখ মেলে চেয়ে থাকাও আনন্দের। মা যা করতেন, মা যে ভাবে চলাফেরা করতেন, তার সবই যেন নিখুঁত মনে হ'ত ছেলে-মেয়েদের কাছে। গরম কাপড়ের গন্ধে ঘরের বাতাস উষ্ণ আর ভারী হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পরে গির্জ্জার যাজক এলেন, এসে ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে গল্প ক'রে গেলেন।

পল-এর বুকে সর্দ্দি বসেছিল, কয়েক দিন তাকে ভুগতে হ'ল। পল এতে কিছু মনে করল না। যা হবার তা হবেই, জোর ক'রে বাধা দিতে গিয়ে লাভ কি: সন্ধ্যার দিকে তার ভাল লাগত—আটটার পর যখন ঘরের বাতি নিবিয়ে দেওয়া হ'ত, তখন উনুনের শিখাগুলোর নাচের সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে আর ছাদে শুরু হয়ে যেত বিরাট কালো কালো ছায়ার নাচ। দেখে দেখে পল-এর মনে হ'ত যেন ঘরময় মানুষে মানুষে একটা বিশাল যুদ্ধ বেধে গেছে, অথচ যুদ্ধটা চলেছে একান্ত নিঃশব্দে।

পল-এর বাপ যখন শুতে আসত, তখন সে একবার স্ত্রীর ঘরেও দেখে যেত। বাড়ির কারু অসুখ হলে, মোরেল খুব যত্ন নিত তার, কিন্তু পল-এর ভাল লাগত না তাকে, বাপ কাছে এলে তার গা জ্বালা করত।

মোরেল এসে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করত, 'ঘুমিয়েছিস রে?'

—"না, মা আসছে ত?"

—'এই ত' তার কাপড় ভাঁজ করা হয়ে গেল বলে। কিছু চাই তোমার?" মোরেল ছেলেকে 'তুই' বলত খুব কম।

—'চাই না ত' কিছু।—মার আসতে আর কত দেরি?'

—'এই ত', এলো বলে।'

উনুনের কাছে দাঁড়িয়ে বাপ এক মুহূর্ত্ত ইতস্তত: করল। ছেলে তাকে চায় না, এ বুঝতে দেরি হ'ল না তার। পরে সিঁড়ির গোড়া থেকে স্ত্রীকে ডেকে বলল, 'ছেলেটা তোমাকে ডেকে ডেকে সারা হ'ল। আর কত দেরি?'

'কাজকর্ম্ম সেরে নেবে ত', না কী। ওকে ঘুমিয়ে পড়তে বলো।'

মোরেল আবার ফিরে এলো পল-এর কাছে। আদর করে বলল, 'মা বললে, তুমি ঘুমোও।'

'না না,' পল জোরে বলে উঠল, 'মা আসুক আগে।'

মায়ের সঙ্গে শুয়ে ঘুমোতে পল-এর ভাল লাগত। যাকে ভালবাসি তার সঙ্গে শুয়ে ঘুমানোর মধ্যেই ঘুমের পরম পরিতৃপ্তি মেলে—তা স্বাস্থ্যসমাচারে এ অভ্যাসকে যতই নিন্দে করুক না কেন। এ ঘুমের মধ্যে আছে জীবনের উষ্ণতা, আত্মার শান্তি আর নির্ভরতা, প্রিয়জনের স্পর্শের সুকোমল মাধুর্য্য—ঘুমকে যা ক'রে তোলে একান্ত গাঢ়, দেহ আর মনের সমস্ত গ্লানি দেয় ধুয়ে। পল তার মায়ের বুক ঘেঁষে শুয়ে ঘুমোত, ক্রমশ: সে সেরে উঠল। মায়ের এমনিতে খুব কম ঘুম হ'ত, কিন্তু শেষের দিকে এমন প্রগাঢ় ঘুম নেমে আসত তাঁর চোখে যে, ক্রমশঃ তাঁর মনের দুর্ব্বলতা কেটে যেতে লাগল, আবার ফিরে এলো জীবনের উপর একান্ত বিশ্বাস।

অসুখ সেরে যাওয়ার পর পল বিছানায় বসে বসে দেখত মাঠে ঘোড়াগুলো দানা খাচ্ছে, বরফের উপর উড়ে উড়ে পড়ছে তাদের ভুক্ত কণাগুলো। খনির মজুররা দল বেঁধে বাড়ি ফিরছে—শাদা মাঠের উপর দিয়ে তাদের কালি-মাখা মূর্ত্তি সার বেঁধে চলেছে। তার পর রাত এলো—শাদা বরফের মধ্যে থেকেই যেন বেরিয়ে এলো খানিকটা গাঢ় অন্ধকারের ধূম।

রোগমুক্ত চোখে সব কিছুই মনে হয় আশ্চর্য্য সুন্দর। বরফের কণাগুলো উড়ে এসে পড়ে জানালার কাচে, সেখানে এক মুহূর্ত্তের জন্ম বসে আবার উড়ে যায়, এক ফোঁটা জল ঝরে পড়ে জানালার কাচ বেয়ে। বাড়ির বাইরে দিয়ে শাদা শাদা বরফ উড়ে বেড়াচ্ছে, ঠিক যেন এক ঝাঁক শাদা পায়রা দূরে, উপত্যকার দূর প্রান্তে, কালো রেলের গাড়ি শাদা বরফ ঢাকা মাঠের উপর দিয়ে যেন সন্দেহের চোখ মেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে।···

বাড়ির অবস্থা ভাল নয়, তাই ছেলে-মেয়েরা যদি কোন দিক দিয়ে একটু সহায়তা করতে পারে তা হ'লে খুশি হয়েই তারা তা করত। গরমের দিনে সকাল বেলা অ্যানি, পল আর আর্থার বেরিয়ে পড়ত শাক-সব্জীর খোঁজে। ভিজে ঘাসের মধ্যে তারা খুঁজে বেড়াত; হঠাৎ ফুড়ুৎ করে ঝোপ থেকে উড়ে যেত পাখী, শাদা রঙের এই বিচিত্র পাখীগুলো ঝোপের মধ্যে মাথা গুঁজে বসে থাকত। আধ পাউণ্ড পরিমাণ সব্জী পেলেই তারা মহা খুশি। খুঁজে পাবার আনন্দ, প্রকৃতির হাত থেকে হাত বাড়িয়ে দান

নেবার আনন্দ, আর বাড়ির লোককে কিছু মূল্যবান জিনিস দিয়ে সাহায্য করবার আনন্দ—সব কিছু জড়িয়ে তাদের এই উৎফুল্ল ভাব।

সব চেয়ে দামী জিনিস যা তারা সংগ্রহ করত সে হচ্ছে কালো কালো 'বেরি' ফল। এ তারা খুঁজতে যেত যখন শস্য কাটা হয়ে গেছে; এখন ঐ শস্যের ভুষি দিয়ে পিঠে তৈরি হবে। মিসেস মোরেল প্রতি শনিবারেই পিঠে তৈরি করেন, তার জন্যে ফল কেনা তাঁর চাই-ই। আর কালো 'বেরি' ফল তিনি নিজেও ভালবাসেন। কাজেই এদিকে যত ঝোপ, জঙ্গল আর খানা-খন্দ আছে, পল আর আর্থার প্রত্যেক সপ্তাহের শেষের দিকে সেগুলো তন্ন তন্ন ক'রে দেখত। যে পর্য্যন্ত একটাও ফল মিলত, সে পর্য্যন্ত তাদের খোঁজার আর বিরাম ছিল না। এদিককার গ্রামগুলো খনি অঞ্চল, কাজেই এদিকে চট্‌ ক'রে ফল মেলা ভার ছিল। তবু পল আশে-পাশে, দূরে খুঁজতে আর বাকি রাখত না। মাঠে ঝোপে ঘুরতে সে ভালবাসত। শুধু তাই নয়,—মায়ের কাছে খালি হাতে ফিরে যাবে এ তার প্রাণে সইত না। মা আশা ক'রে বসে আছেন, তাঁকে নিরাশ করার চেয়ে সে বরঞ্চ মরে যেতে পারত।

যখন তারা অনেক বেলায় বাড়ি ফিরে আসত, তখন পরিশ্রমে আর ক্ষুধায় তারা অবসন্ন। তাদের তখন দেখে মা বলতেন, 'তোরা কি রে—এত বেলা অবধি কোথায় ছিলি?'

—'কি করব', পল জবাব দিত, 'এদিকে ত' একটাও পেলুম না, যেতে হ'ল সেই ওদিককার পাহাড়ে। কিন্তু একটি বার চেয়ে দেখ মা—'

মা ঝুড়িটার ভিতর চেয়ে বললেন, 'বাঃ, চমৎকার ফলগুলো ত'!'

—'আর দু' পাউণ্ডের বেশী হবে—হবে না, মা?'

মা ঝুড়িটা পরখ ক'রে দেখলেন, সন্দেহ হ'লেও তাঁকে বলতে হ'ল, 'হ্যাঁ, খুব হবে।'

তখন পল তাঁকে উপহার দিল একটা ছোট পল্লব। রোজই সে এ রকম একটা পল্লব এনে তাঁকে দিত, সব চেয়ে সেরা যে পল্লবটা তার চোখে পড়ত, সেইটে সে মায়ের জন্যে নিয়ে আসত।

—'চমৎকার', মা বললেন। তাঁর কথাবলার ভঙ্গীতে সেই আশ্চর্য্য কোমলতা, মেয়েরা তাদের প্রেমিকের কাছ থেকে উপহার পেলে যে সুরে কথা বলে।

সারা দিন, মাইলের পর মাইল হেঁটে ছেলে চলে যেত, পাছে তাকে স্বীকার করতে হয় নিজের পরাজয়, পাছে তাকে বাড়ি ফিরতে হয় শূন্য হাতে। যত দিন পল ছোট ছিল, তত দিন মা তার এই মনের কথা বুঝতে পারেননি। তাঁর অন্তরের নারীত্ব অপেক্ষা ক'রে থাকত, যত দিন না ছেলেরা বড় হয়ে ওঠে। উইলিয়মকে নিয়েই তাঁর বেশীর ভাগ সময় কাটত।

কিন্তু উইলিয়ম নটিংহাম-এ চলে যাবার পর পলই হ'ল মায়ের সঙ্গী। উইলিয়ম এখন খুব কমই বাড়ি থাকতে পারত। পল নিজের অজ্ঞাতসারেই বড়ো ভাইকে ঈর্ষা করত, আর উইলিয়মও পল-এর উপর পোষণ করত ঈর্ষা। কিন্তু এমনিতে দু'জনের মধ্যে খুবই ভাব ছিল।

পল-এর সঙ্গে মিসেস্‌ মোরেল-এর এই অন্তরঙ্গতার মধ্যে ছিল সৌকুমার্য্য, ছিল সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির খেলা। উইলিয়ম-এর দিকে তাঁর আবেগ ছিল আরো প্রখর, আরও তীব্র।

শুক্রবার বিকালে পল টাকা আনতে যেত। পাঁচটা খনির সমস্ত মজুরদের মাইনে দেওয়া হ'ত শুক্রবারে। কিন্তু টাকাটা হাতে হাতে দেওয়া হ'ত না। প্রত্যেক খাদের সর্দ্দারের হাতে তার দলের সব মজুরের মাইনে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ত। সে আবার টাকাটা ভাগ ক'রে দিত, হয় তার নিজের বাড়িতে বসে, কিম্বা কোন দোকানে। শুক্রবার দিন আগে স্কুলের ছুটি হয়ে যেত, কাজেই ছেলেরা গিয়ে টাকাটা নিয়ে আসতে পারত। উইলিয়ম, অ্যানি, পল—এরা সবাই গিয়ে মাইনের টাকা এনেছে, অবশ্য যত দিন না তারা নিজেরাই কোথায়ও কাজ নিয়েছে। পল বাড়ি থেকে বেরুত সাড়ে তিনটেয়, তার পকেটে থাকত ছোট্ট একটা কাপড়ের ব্যাগ। রাস্তায় গিয়ে দেখা যেত পথ বেয়ে ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ি, সবাই সার বেঁধে চলেছে অফিসের দিকে।

দেখতে ভারী সুন্দর ছিল অফিসগুলো। নতুন লাল ইট দিয়ে তৈরি বাড়ি প্রায় প্রাসাদের মতো। গ্রীনহিল লেন-এর মাথায় নিজস্ব সুরক্ষিত উদ্যানের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করবার জন্যে নির্দ্দিষ্ট ছিল একটা বিশাল হল-ঘর, কালো ইট দিয়ে বাঁধানো একটা লম্বা, আসবাবপত্রহীন ঘর। দেয়ালের গা ঘেঁষে বসবার আসনগুলো সারা ঘরটাকে বেষ্টন ক'রে চলে গেছে। খনির মজুররা তাদের কয়লা-মাখা জামা-কাপড় নিয়ে ওখানেই বসে থাকত। তারা সাধারণতঃ বেলা থাকতেই এসে পড়ত। মেয়েরা আর ছোট ছেলে-মেয়েরা সাধারণতঃ লাল শান-বাঁধানো রাস্তাটার উপর পায়চারি করতে থাকত। পল গিয়ে ঘাসের ধারে, বড়ো বড়ো ঝোপের মধ্যে খুঁজে বেড়াত—ওখানেই ফুটে থাকত ছোট ছোট প্যানজি আর ফরগেট-মি-নট্‌ ফুল। মহা কোলাহল হ'ত জায়গাতে। মেয়েদের মাথায় থাকত তাদের রবিবারের গির্জ্জেয় যাওয়ার টুপি। কুমারী মেয়েরা জোরে জোরে কথা বলত নিজেদের মধ্যে। ছোট কুকুরগুলো আশে-পাশে দৌড়তে থাকত। চার পাশের সবুজ ঝোপ-ঝাড়গুলো থাকত নিঃসাড় হয়ে।

হঠাৎ ভিতর থেকে ডাক আসত—'স্পিনি পার্ক, স্পিনি পার্ক।'

স্পিনি পার্কের সমস্ত মজুররা দল বেঁধে গিয়ে ঢুকত ঘরটার মধ্যে। যখন টাকা দেবার সময় হ'ত তখন পলও গিয়ে দাঁড়াত ভিড়ের মধ্যে। টাকা দেবার ঘরটা অত্যন্ত ছোট—তার অর্দ্ধেকটা আবার কাউণ্টার দিয়ে ঘেরা। কাউণ্টারের পিছনে দুটি লোক দাঁড়িয়ে থাকত—তাদের এক জন মিঃ ব্রেইথওয়েইট, অন্য জন তার কেরাণী, নাম উইনটারবটম। মিঃ ব্রেইথওয়েইট দেখতে বিশালকায়, তাঁর চেহারায় রুক্ষ শাসনের ভাব, তাঁর শাদা দাড়ি আকারে ক্ষীণ। সাধারণতঃ তাঁর গলায় বাঁধা থাকত একটা প্রকাণ্ড রেশমের গলাবন্ধ, আর খুব গরমের দিনে পর্য্যন্ত তাঁর চুল্লীতে বিরাট এক আগুন জ্বালানো থাকত। জানালার কবাট থাকত সর্ব্বদা বন্ধ। শীতকালে যারা বাইরে থেকে এসে ঘরে ঢুকত, বাইরের তাজা বাতাস খাবার পর, এ ঘরের বন্ধ বাতাসে ঢুকে তাদের গলা খুশখুশ করত। উইন্টারবটম লোকটি দেখতে ছোটখাট, বপু বিরাট, এবং মাথায় একটি প্রকাণ্ড টাক। তার কথাবার্ত্তায় বুদ্ধিশুদ্ধির লেশমাত্রও থাকত না,

আর তার মনিব মুরুব্বির সুরে খনির মজুরদের নানা রকমের উপদেশ দিয়ে বাধিত করতেন। কয়লার কালিতে কালো কাপড়-চোপড় নিয়ে মজুররা ভিড় করে গিয়ে দাঁড়াত। এমন লোকও থাকত যারা বাড়িতে গিয়ে পোষাক বদলে এসেছে। ভিড়ের মধ্যে মেয়েলোক, একটি-দুটি শিশু, এমন কি এক-আধটি কুকুরেরও অভাব হ'ত না। পল বেচারি ছেলেমানুষ, কাজেই সবার পেছনে মজুরদের পায়ের চাপের মধ্যে গিয়ে তাকে দাঁড়াতে হ'ত, আর পেছন থেকে আগুনের তাপ এসে লাগত তার গায়ে। কোন্ নামের পর কোন্ নাম ডাকা হবে সে জানত—খাদের নম্বর অনুসারে ডাকা হ'ত নাম।

মিঃ ব্রেইথওয়েইট-এর বাজখাঁই গলার আওয়াজ শোনা যেত, 'হলিডে!' অমনি মিসেস হলিডে নীরবে এগিয়ে যেতেন। টাকা নেওয়া হয়ে গেলে তিনি এক পাশে সরে আসতেন।

—'বাওয়ার! জন বাওয়ার!'

একটি ছেলে কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াত। মিঃ ব্রেইথওয়েইট-এর বপু যেমন বিশাল, মেজাজ তেমনি উগ্র। খানিকক্ষণ চশমার ভিতর দিয়ে কটমট ক'রে তাকিয়ে তিনি আবার ডাকতেন, 'জন্ বাওয়ার!'

ছেলেটি বলত, 'এই তো আমি!'

মিঃ উইন্টারবটম কাউন্টারের ও-পাশ থেকে ভালো করে দেখে নিতেন ছেলেটিকে। বলতেন, 'সে কী হে, তোমার নাকটা ত' আগে এ রকম ছিল না!'

উপস্থিত লোকজন তাঁর কথা শুনে হেসে উঠত, ছেলেটির বাবার নামও জন বাওয়ার, তাকে মনে পড়ত সবার।

তখন মিঃ ব্রেইথওয়েইট বিচারপতির মতো গলায় গাম্ভীর্য্য এনে বলতেন, 'তোমার বাবা এলো না কেন?'

—'তাঁর অসুখ করেছে,' ক্ষীণ স্বরে ছেলেটি উত্তর দিত।

মাননীয় কোষাধ্যক্ষ মহোদয় তখন গম্ভীর ভাবে বলতেন, 'তাকে ব'লো সে যেন ওই মদের নেশাটা ছাড়ে।'

কে এক জন পেছন থেকে বলত ঠাট্টা ক'রে, 'হ্যাঁ, আর ও কথা বলতে গেলে সে যদি তোমার গায়ে পা তোলে তা হ'লেও কিছু মনে করো না বাছা!'

সব লোক হেসে উঠত। বিশালকায় কোষাধ্যক্ষ মশায় তখন গম্ভীর ভাবে কাগজ উলটে ডাকতেন, 'ফ্রেড, পিলকিংটন!' যেন অন্য কোন দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই।

মিঃ ব্রেইথওয়েইট-এর অনেক টাকার অংশ ছিল এই ব্যবসাটাতে। পল জানত আর এক জনের পরেই তার পালা, তখন থেকেই তার বুক কাঁপতে সুরু করত। সবাই তাকে ঠেলে ঠেলে উনুনের কাছে নিয়ে এসে ফেলেছে। তার পায়ের পেছন দিকটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। এই দারুণ ভিড় ঠেলে সে যে এগিয়ে যাবে এমন আশাও তার ছিল না।

এমন সময় সেই বাজখাঁই গলা ডেকে উঠত, 'ওয়াল্টার মোরেল!' পেছন থেকে সরু গলায় পল বলত, 'এই যে এখানে', কিন্তু সে শব্দ গিয়ে অত দূর পৌঁছত না।

—'মোরেল, ওয়াল্টার মোরেল!' আবার ডাক আসত, কোষাধ্যক্ষ মশায় হিসাবের পাতাটা প্রায় উলটে ফেলবার উপক্রম করতেন।

পল সেখানে দাঁড়িয়ে অস্বস্তি বোধ করতে থাকত, অথচ চিৎকার ক'রে যে বলবে সে ক্ষমতাও তার তখন থাকত না। লোকের পেছনে সে চাপা পড়ে থাকত, সেই বিপদ থেকে উইন্টারবটমই উদ্ধার করত তাকে।

—'এই ত' ওখানে। কই গো মোরেলের ছেলে কোথায়?' লালমুখো মোটা টাকওয়ালা মানুষটি তার গোটা গোটা চোখ মেলে চার দিকে চাইতে থাকত। আগুনের চিমনিটার দিকে নজর দিত সে। তখন অন্য সবাই চাইত পেছন ফিরে, সেখানে ছেলেটিকে আবিষ্কার করত সবাই।

দেখে উইন্টারবটম বলত, 'এই ত' সে।'

পল এগিয়ে যেত কাউন্টারের কাছে।

—'সতেরো পাউণ্ড, এগারো শিলিং, পাঁচ পেন্স' গুণে দিয়ে মিঃ ব্রেইথওয়েইট বলতেন, 'ডাকলে জোরে সাড়া দাও না কেন হে?'

হিসাবের কাগজটার উপর রূপোর শিলিং-এর পাঁচ পাউণ্ড ব্যাগটা তিনি ধুপ ক'রে রাখতেন, তার পর হাতের একটা অতি সুন্দর ভঙ্গী ক'রে রূপোর পাশে দশ পাউণ্ডের সোনার মুদ্রা ফেলে দিতেন। সোনাগুলো কাগজটার উপর ছড়িয়ে পড়ত উজ্জ্বল তরঙ্গের মতো। কোষাধ্যক্ষ মশায়ের টাকা গোণা হয়ে গেলে ছেলেটি সব টাকা-পয়সা নিয়ে যেত উইন্টারবটম-এর কাছে। তার ওখানে বাড়িভাড়া আর যন্ত্রপাতির দাম দিতে হ'ত। এখানেও তার দুর্দশার অন্ত ছিল না।

—'ষোল শিলিং ছ' পেন্স', উইন্টারবটম হিসাব মিলিয়ে বলত।

গুণবার মতো মনের অবস্থা তখন আর পল-এর থাকত না। তাড়াতাড়ি কিছু রূপোর মুদ্রা আর একটা সোনার আধ-পাউণ্ড সে ঠেলে দিত।

—'কত দিয়েছ হে? দেখো ত'?' উইন্টারবটম বলত। ছেলেটা হাঁ ক'রে চেয়ে থাকত। কত দিয়েছে তার সে কী জানে।

'কি গো, মুখে সাড়া-শব্দ নেই কেন?'

পল ঠোঁট কামড়ে আরও কিছু রূপোর মুদ্রা এগিয়ে দিত তার

দিকে। উইণ্টারবটম রেগে গিয়ে বলত, 'বোর্ড-স্কুলে তোমাদের কি গুণতেও শেখায় না?'

একজন মজুর বলে উঠল, 'বীজগণিত আর ফরাসী ভাষা ছাড়া ওখানে আর কিছু শেখায় না।'

আর এক জন পোঁ ধরল, 'আরও শেখায় গো—বেলেল্লামি আর বখামো।'

পল-এর পেছনে আর এক জন অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছিল। টাকাটা তুলে যখন সে ব্যাগে রাখল, তখন তার হাত কাঁপছে। এ জায়গায় এলে তাকে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হ'ত।

বাইরে গিয়ে যখন সে দাঁড়াল, যখন ম্যান্সফিল্ড রোড ধরে হাঁটা শুরু করল, তখন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সে। পার্কের দেয়ালে লতাগুলো ঘন সবুজ। ওধারে ফলের বাগানে একটা আপেল গাছের নীচে মোরগগুলো ঠোঁট দিয়ে খুঁটে খুঁটে বেড়াচ্ছে। মোরগগুলোর মধ্যে কতক সোনালী, কতক শাদা। মজুররা দল বেঁধে বাড়ি ফিরে চলেছে। পল দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তার মনের অস্বস্তি তখন কেটে গেছে। মজুরদের অনেককেই সে জানে, কিন্তু তখন এই কালি-মাখা অবস্থায় কাউকেই সে চিনতে পারলে না। আবার তার মনটা খুঁৎ-খুঁৎ করতে লাগল।

'নিউ ইন' ব'লে বাড়িটার কাছে যখন সে এলো, তখনও তার বাপ ফেরেনি। বাড়ির মালিক মিসেস হোয়ার্মবি তাকে চিনতেন। পল-এর ঠাকুর-মা অর্থাৎ মোরেলের মায়ের বন্ধু ছিলেন তিনি।

—'তোর বাপ ত' আসেনি এখনো। তা বোস্, বোস্।' মিসেস হোয়ার্মবি এমন অদ্ভুত ভাবে কথা বলেন। বয়স্ক মানুষের সঙ্গে কথা বলে বলেই তাঁর অভ্যেস হয়ে গেছে, তাই ছোটদের সঙ্গে কথা বলবার সময় তিনি যেন নাক সিঁটকে অনেক উঁচু থেকে কথা বলেন।

পল দোকানের বেঞ্চির এক ধার ঘেঁষে বসল। কয়েকটি মজুর এক কোণে বসে টাকার হিসাব মেলাচ্ছিল। আরও কয়েকটি এসে ঢুকল। সবাই তার দিকে চেয়ে চেয়ে যায়, কেউ কিছু বলে না। অবশেষে মোরেল এসে উপস্থিত হ'ল, কয়লা-মাখা হলেও তার চাল-চলনে বেশ চট্‌পটে ভাব।

ছেলেকে দেখে, আদর ক'রে সে বলল, 'এই যে! আমার টাকাটা গিয়ে নিয়ে এসেছ ত'—একটু জল-টল খাবে কিছু?'

বাড়ির সব ছেলে-মেয়েদের মত পলও ছিল মদ খাওয়ার বিপক্ষে। এ বিষয়ে তারা ছিল অত্যন্ত গোঁড়া। এই মদের দোকানে সবার সামনে বসে লেমনেড খেতেও তার প্রাণ বেরিয়ে যেত, জোর ক'রে দাঁত তুলে নিলেও বোধ হয় তার অত কষ্ট হ'ত না।

মদের দোকানের কর্ত্রী তার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। ছেলেটিকে দেখে তার দয়া হচ্ছিল। আবার তার আন্তরিক ভালমানুষী দেখে তার গায়ে জ্বালা ধরছিল। রাগে ফুলতে-ফুলতে পল বাড়ি গেল। যখন সে বাড়ি ঢুকল তখন তার মুখে কোন কথা নেই। তাদের বাড়িতে সাধারণত: শুক্রবারে রুটি তৈরি হ'ত। সেদিন গরম পিঠে ছিল, তার মা পিঠেটা তার দিকে এগিয়ে দিলেন। হঠাৎ পলের ভীষণ রাগ হ'ল।

—'আমি আর কোন দিন অফিসে যাব না।' রাগে তার চোখ ঝক্‌মক্ করে উঠল।

মা অবাক হয়ে বললেন, 'কেন কী হয়েছে?' ছেলের এই আচমকা রাগ দেখে তাঁর ভারী মজা লেগেছিল।

—'না, সত্যিই আর আমি কোন দিন যাব না'—পল জোর দিয়ে বললে।

—'বেশ ত,' তা হ'লে তোমার বাবাকে বলো।'

পল যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিঠেটা চিবুতে লাগল। বললে, 'না, আমি আর কোন দিন যাব না টাকা আনতে। মা বললেন, 'বেশ ত', তা হ'লে পাশের বাড়ির কোন ছেলেকে পাঠাব। ছ' পেনিটা পেলে তারা খুশিই হবে!'

এই ছ' পেনিটুকুই ছিল পলের একমাত্র আয়। অবশ্য এর বেশীর ভাগই খরচ হয়ে যেত জন্মদিনের উপহার কিনতে। তবু, হাজার হ'লেও একটা আয় ত'! পলের কাছে এর মূল্য সামান্য ছিল না। কিন্তু আজ সে বলে উঠল, 'নিক্ গে তারা। আমি চাই নে'—

মা বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে। এর জন্যে আমার উপর এত তম্বি কেন?'

পল বললে, 'লোকগুলোকে আমি দু' চক্ষে দেখতে পারি না। একেবারে সব বাজে লোক—ওদের কাছে আমি আর যাচ্ছি না। এক জন ত' কথা বলতেই জানে না, আর এক জন যা বলে সব ভুল।'

এবার মিসেস মোরেল হাসলেন। বললেন, 'ও, সেই জন্যেই বুঝি তুমি যেতে চাও না?'

পল বললে, 'ওরা কেন সব সময় আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে? আমি ভিড় ঠেলে যেতে পারি না।'

মা বললেন, 'বা রে, তুমি ওদের বল না কেন?'

—'তা ছাড়া, উইণ্টারবটম বলে, বোর্ড স্কুলে কিছু শেখানো হয় না।'

মিসেস মোরেল বললেন, 'তা ঠিক, তাকে ওরা কিছুই শেখায়নি—না আদব-কায়দা, না বুদ্ধিশুদ্ধি। যেটুকু বুদ্ধি নিয়ে সে জন্মেছিল তার বেশী আর কিছু তার পেটে পড়েনি।'

এই বলে মা ছেলেকে সান্ত্বনা দিলেন যে, এত অল্পেতেই রাগ হয়ে যাওয়া যেমন হাস্যকর, তেমনি তাঁর কাছে বেদনাদায়কও বটে। ছেলের চোখে রাগের ভাব দেখলে তাঁর নিজের মনও যেন উগ্র হয়ে উঠত—যেন তাঁর ঘুমন্ত আত্মা অবাক হয়ে এক মুহূর্তের জন্য মাথা তুলে দাঁড়াত।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'চেকটা কত টাকার ছিল?'

ছেলে বললে, 'সতেরো পাউণ্ড এগারো শিলিং পাঁচ পেন্স। তার থেকে বাদ গেল ষোল শিলিং ছ' পেন্স। এ সপ্তাহে বাবা অনেক রোজগার করেছে।'

ছেলের হিসাব থেকে মা জানতে পারতেন—স্বামী সপ্তাহে কত রোজগার করেছে। সে যদি তাকে কম টাকা এনে দিত তা' হলে তিনি ধরে ফেলতে পারতেন। মোরেল নিজে তাঁকে কিছুই বলতো না।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—
শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য্য

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

নয়া দিল্লীর রাইসিনাতে লিলিকে কে না চেনে? দিল্লীর সুন্দরী রমণীরা ত তাকে রীতিমত হিংসে করেই চলেন।

কোনো প্যালেস বা প্লেসের আভিজাত্যের বালাই নেই। সাদা-মাটা পার্লিং স্কোয়ারের ডান দিকের কোণের বাড়ীটাতেই লিলিরা থাকে। কত দিন থেকে রয়েছে ঠিক জানি না—কুড়ি বছর ত বটেই; কেন না, কুড়ি বছর আগে আমি যখন দিল্লীতে আসি লিলিকে তখন থেকে ফ্রক পরে ছুটোছুটি করে পাড়াটা মাথায় তুলে নাচতে দেখি। তখন থেকেই লিলির সৌন্দর্য্য-খ্যাতি। সভা-সমিতিতে বিশিষ্ট সভাপতিকে মালা পরাবার জন্য সেদিন থেকেই শিশু লিলির ডাক।

দেখতে দেখতে সেই শিশু হল যৌবন-চঞ্চল সরম-রক্তরাগে প্রস্ফুটিত পুষ্প-স্তবক। কিসের ছোঁয়াতে যৌবনের উত্তাল তরঙ্গ নেচে চলেছে ওর দেহের কানায় কানায়!

আমার ঘরের জানালা দিয়ে তাকে বহু বার দেখেছি। এই জানালার ফাঁক দিয়েই সে বহু বার উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখেছে আমি বাড়ীতে আছি কি না। বহুদিন ওর জ্বালাতনে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে কানটি ধরে সজনে গাছের তলায় বিছানো খাটিয়াতে বসিয়ে হাতে ইতিহাস-ভূগোলের বই গছিয়ে চেঁচিয়ে বলেছি, পড়্ বসে। দজ্জাল কোথাকার! পাড়ায় টেঁকা যায় না চেঁচামেচিতে। উঠবি ত এক্ষুণি বাসে করে তোর ঘোষাল দিদিমণির কাছে ছেড়ে দিয়ে আসব।

বাসের কথায় ওর লোভ হয়। কিন্তু ঘোষাল দিদিমণির কথা শুনলে ওর বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। ঝুম্ করে বসে পড়ে। ঘোষাল দিদিমণি আড়াইশো লাইন টাস্ক দিয়ে বসিয়ে রেখেছিলেন একদিন। কাঁদো-কাঁদো সুরে লিলি বলে, ছেড়ে দাও মণিদা, আর কখ্খনো—তার পরই চুপি চুপি বলত, টপি খাবে মণিদা? কাঠি-লজেন্স?

বললাম, পেলি কোথায়?

—সুবুদার বাক্স থেকে এনেছি। এক দম টেরই পায়নি। খাবে?

সরকারী টিরিওটাইপ বাড়ী। কুড়ি বছরে একটুখানি বদলায়নি। আজ সেই জানালার ফাঁক দিয়েই দেখছি, বসে বসে লিলি রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অন্নমাসির পুরো নাম কেউ জানে না। অন্নপূর্ণাই হবে। নিঃসন্তান বলে পাড়াটাকে নিজের মাতৃত্বের মমতাতে ঢেকে রেখেছেন। অসুখে-বিসুখে ত আছেনই, তা ছাড়াও এ পাড়ায় যে ক'টি প্রজাপতির কৃপাদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়েছে সব ক'টাতেই অন্নমাসির বেশ হাত ছিল। ক'দিন ধরে ধুয়ো ধরেছেন, একশো পাঁচ নম্বরের সুবীরের একটা বিয়ে দিতে হবে। নিজেই গরজ করে করোলবাগে মেয়ে দেখে এসেছেন। এখন সুবীর একবার দেখে এলেই হয়। সুবীরের বাবা এ বিষয়ে ভারিক্কি লোক। বেশী গা দেন না। পাকা কাজের সময়ে তাঁকে দিয়ে একবার দেনা-পাওনার নিষ্পত্তির সেটল্‌মেণ্ট করে নিলেই হবে।

সুবীরের মা—পাড়ার ফুলমাসি—অন্নমাসির সাথে 'সই' পাতিয়েছেন। অন্নমাসির প্রস্তাবে তিনি পুরোপুরি ডিটো মেরে যান।

অন্নমাসির তাড়াতেই সুবীরের বন্ধুরা—জয়ন্ত, বিনয়, অলক মাষ্টার—এসে হাজির।

সুবীরকে এক রকম জোর-জবরদস্তি ভাবেই তৈরী করে মেয়ে দেখতে করোলবাগের দিকে যাত্রা করিয়ে দেন।

টাঙ্গায় যেতে যেতে সুবীর বার বার আপত্তি জানায়, কি হচ্ছে এটা মাষ্টারদা'? তোমাদের বলছি বিয়ে-টিয়ে আমার দ্বারা হবে না, তবুও তোমাদের যত সব ইয়ে···

মাষ্টার বলেন, ওহে অত তড়পাচ্ছো কেন? মেয়ে দেখতে বলেছেন অন্নমাসি, মেয়ে দেখতে চলেছি। তার পাশ-ফেল ত আমাদের হাতে। এখনও বলে ফেল সুবীর তোমার দিলটা কোথাও বাঁধা পড়ে আছে কি না? গিঁট পড়ে গেলে হাজারো বার মাথা খুঁড়লেও আর অদল-বদলের জো-টি নেই ভায়া!

বিনয় মাষ্টারের সুরে সুর মিলিয়ে বলে, ওহে সুবীর, লজ্জায় মরছিস কেন? জানিস একবার ফেঁসে গেলে আর নিস্তার নেই? সঁপে যদি দিয়েই থাকিস কাউকে মন তাতে মহাভারতখানা আর এমন কিছু অশুদ্ধ হয়ে যায়নি। আমি ত ও-রকম কত বার ফেঁসেছি।

জয়ন্ত একটু সাধু টাইপের গোবেচারা ভাল মানুষ। বার দুয়েক সন্ন্যাসী হবার চেষ্টা করেছিল। নেহাত হরিদ্বারে ধরা পড়ায় আবার এ মায়ার জীবনে ফেঁসে গেছে। জওয়ান যুবক দল আবার কোনো কাণ্ড না বাধিয়ে ফেলে তাই মাষ্টারের সাথে সাথে অন্নমাসি জয়ন্তকেও জুড়ে দিয়েছেন। এই মায়াময় এ্যড্‌ভেঞ্চারে ডেলিগেশনে সে ডেপুটি লীডার।

খুব গম্ভীর ভাবে জয়ন্ত সুবীরকে বলল, ভাই, অন্তে প্রাণ সমর্পিত থাকে ত অচিরাৎ প্রকাশই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

সকলেই হো-হো করে হেসে ফেলে।

মনে হল সুবীর যেন একটু হকচকিয়ে গেছে। সে মাষ্টারের কানে কানে কি বলল।

মাষ্টার বললেন, ও এই কথা? তা ভায়া, এতক্ষণ এটা লুকিয়ে রাখতে হয়? তা যাক। দেখা যাবে ওখানে গিয়ে। পাশ-ফেল ত তোমার আমার হাতে।

করোলবাগ নয়া দিল্লীর বালীগঞ্জ। গুরুদ্বারা রোডের খুব কাছেই ওয়েষ্টার্ণ একস্‌টেনসন্‌ এরিয়াতে হলদে রঙের তেতলা বাড়ীটার সামনে টাঙ্গা গিয়ে দাঁড়াতেই বিশেষ অভ্যর্থনার সাথে গৃহকর্তা তাঁদের ঘরের ভিতরে নিয়ে গেলেন।

চারখানি বপুতেই ফরাসখানা ভরে গেল। পাশে ফুলদানিতে কতকগুলো রঙ-বেরঙের ফুল। বুদ্ধের একটা মূর্তির সামনে সুগন্ধি ধূপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরের আবহাওয়াটা খুবই মনোরম। জয়ন্তটা আবার সমাধিস্থ না হয়ে পড়ে!

পর্দার আড়াল থেকে এক প্রৌঢ়া ধরণের ভদ্রমহিলা সুসজ্জিতা কনের হাত ধরে এনে সামনে বিছানো অন্য ফরাসখানার উপর বসিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। গৃহকর্তা অত্যন্ত সমীহ হয়ে যতখানি সম্ভব মোলায়েম সুরে বললেন, এঁরা যা প্রশ্ন করেন ঠিক ঠিক তার জবাব দিবি মা! সুবীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আমার একমাত্র কন্যা শেফালী। আমি আর বিশেষ শিক্ষা দিতে পারলাম কোথায়? আপনারাই একে গড়ে-পিটে নিজেদের মন-মতন করে নেবেন।

শেফালী মাথা নীচু করে হাত তুলে নমস্কার জানাল।

মাষ্টার প্রশ্ন করলেন, কদ্দূর পড়াশুনো করেছেন?

—বি· এ. পড়ছি ইন্দ্রপ্রস্থে।

পড়ার বই-টই ছাড়া অন্য কিছু পড়েন?

—সামান্য।

—যেমন?

—রবীন্দ্রনাথ, মপাসাঁ, রোমা রোলাঁ।

—রবি ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' পড়েছেন?

—পড়েছি। বুঝিনি।

—গান গাইতে জানেন?

—সামান্য।

শোনাল, "যে ছিল আমার স্বপনচারিণী"।

—বেশ! রান্না-বান্না করতে জানেন?

—তা একটু-আধটু জানি বই কি!

—পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ক'টা জিনিষ রাঁধতে পারেন?

—তা হাতে টোটাল সময় বুঝে—এক থেকে দশ। সময় হাতে না থাকলে ভাত, ভাতের সাথে আলু-ভাতে, কুমড়ো-ভাতে, এমনি করে গোটা দশেক। সময় হাতে থাকলে মাংস চড়িয়ে বসে থাকবো। ব্রেড ঘরে থাকলে টোষ্ট অমলেট। তবে আমার প্রশ্নটা হল, রান্নাটা হবে ক'জনার জন্য?

বিনয় জিজ্ঞাসা করে বসে, খেলাধূলো করেন?

অলক মাষ্টার বিনীত ভাবে বলেন, কিছু মনে করবেন না, আমাদের সুবীর, জানেন তো, দিল্লী ষ্টেটকে ফুটবলে রিপ্রেসেন্ট করে?

—না, না, তাতে কি হয়েছে? আমরা খেলাধূলো করি বই কি। ইন্‌ডোরের কথা বলছেন, না আউটডোর?

—ধরুন আউটডোর?

—বাস্কেট বল?

—বলুন তো বাস্কেট বল কতক্ষণ খেলা হয়?

মেয়েটা এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে। তার পর ঠোঁটটা উল্টে জবাব দেয়, হবে চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট।

গম্ভীর ভাবে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করে, অরবিন্দের লাইফ ডিভাইন পড়েছেন? কিংবা রাধাকৃষ্ণণের ডাইনামিক স্পিরিচুয়ালিসম্‌?

শেফালী তিন হাত পিছনে সরে বসে। তার সমস্ত জবাবের সাথে যে একটা তাচ্ছিল্যের সুর লাগানো ছিল এটা ওর নিজেরও কান এড়ায়নি। ওর দোষ কি? গত চার বছরে কত বার ওকে এ রকম প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে। কাউকেই ভেজাতে পারেনি। বিয়ের বাজারেও আজ-কাল ইনফ্লুয়েন্স চাই —সাথে সাথে থলে-ভর্তি করকরে কারেন্সি নোট। 'লহ লহ জীবনবল্লভ' বললেই আলিঙ্গনপাশে কেউ তাকে বেঁধে নেয় না। কেন? শেফালী জানে না। নারী হয়ে জন্মেছে এই কি তার অপরাধ? এরা তো শুধু ডাইনামিক স্পিরিচুয়ালিসম্‌এর উপর দিয়েই রেহাই দিল। সে যাত্রা লক্ষ্ণৌ থেকে যারা এসেছিল তারা তো রেগুলার মিলিটারী মার্চের খেল দেখিয়ে গেছে—হাঁটুন ত সাত পা সামনের দিকে, ন' পা পিছন দিকে? হাত দু'খানা বার করুন তো? মুখখানা আর একটু উঁচু করুন—চোখে কোন খুঁত নেই তো? কিছু মনে করবেন না। আজ-কাল ফটোতে সকলে এত বেশী রিটাচ করে দেয়, ওতে আসল রূপ চাপা পড়ে যায়।

শেফালী সুন্দরী। সৌন্দর্য নিয়ে বক্রোক্তি তার ধাতে সয় না। ঠোঁটের গোড়ায় এসে পড়ে, তা মশাই, ইন্দ্রপুরী থেকে একটা ডানা-কাটা উর্বশী ধরে নিলেই পারেন। বেচারা আমাদের নিয়ে কেন বৃথা এত টানা-হেঁচড়া? বলতে যায়, পারে না। আটকে আসে, শত হলেও বাঙ্গালী মেয়ে ত! বার বার ঠিক করে এই বারই শেষ। ও-সব পরীক্ষা দেওয়া তার দ্বারা আর হবে না, কিন্তু বার বারই বৃদ্ধ পিতার, মা-মণির স্নেহ-ভেজানো মিষ্টি কথায় ভুলে যায়। তাছাড়াও একটা গোপন আকাঙ্ক্ষা যে তার নেই সেটা কে বলতে পারে? বুকভরা আশা নিয়ে কোন্‌ রমণী না বাসা বাঁধার স্বপ্ন দেখে?

দুই

অলক মাষ্টার সুবীরকে বলল, "ওহে, কাজটা কি ভালো হল? বুড়োকে আশা দিয়ে বৃথা বসিয়ে রাখা কি ঠিক হবে? তবে ভায়া লাভ-লোকসানের হিসেবে কাঁটা কোন্‌ দিকে ঘুরলো বুঝছি না। মেয়েটি কিন্তু নেহাত হটেনটট নয়।"

বিনয় বলে ওঠে, "তা যাই বল মাষ্টারদা, মেয়েটার কথার ছিরি যেন কেমন কেমন। কথাগুলো সব যেন কাটা-কাটা।"

জয়ন্ত বলে, "আজকালকার মেয়ে যদি ডাইনামিক স্পিরিচুয়ালিস্‌ম্ না জানে তো—"

মাষ্টার টঙ্ হয়েই ছিল। ঝেড়ে দিল কষে, "দেখ্ জয়ন্ত, ও-সব কপচানো বুলি যেখানে-সেখানে আউড়ে বিপদ আনিস না। নেহাত ভদ্রলোক তাই এ যাত্রা বাঁচোয়া। বিয়ের কনে দেখতে গেছিলি, না তোর পাণ্ডিত্যের একজিবিশন খুলতে? মোট কথা, মেয়ে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। তবে এই হাঁদা-গঙ্গারাম সুবীরটা যে ডুবে ডুবে জল খায় কেমন করে জানবো? নেহাত কোথায় কেঁসে গেছে তাই এ যাত্রা দড়কচ্চা মেরে এ মেয়ে রিজেক্ট করছি। বাঙ্গালী-ঘরের বউ তোমার ডাইনামিক স্পিরিচুয়ালিস্‌ম্ ধুয়ে জল খাবে?"

অন্নমাসি দরজায় হাঁ করে দাঁড়িয়েছিলেন। কালীমন্দিরে পুজো-প্যাণ্ডেলে দেখা অবধিই শেফালীকে তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। ভারী মিষ্টি মুখ। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভেবেছিলেন মনোরঞ্জন যদি আজ বেঁচে থাকতো কি সুন্দর মানাতো ওর সাথে! বছর পঁচিশেক পূর্বের শিশু পুত্রের মৃত্যুশোকে প্রৌঢ়ার চোখে জল আসে। মনোরঞ্জন নেই। সুবু তো আছে—সইএর ছেলেতে আর নিজের ছেলেতে কি তফাৎ? সুবুর সাথে মন্দ মানাবে না। দু'জন লম্বায় সমান সমানই হবে। তা হোক। অত সব দেখলে চলে না। সুবুটা দিন দিন যা মোটা হয়ে যাচ্ছে! একটু লম্বাটে হতে পারে না? তাহলে ত দেখতে-শুনতে আরও মানাতো ভালো। অন্নমাসি মনে মনে প্রার্থনা করেন, ঠাকুর, কত ইচ্ছেই ত অপূর্ণ রাখলে, এই ইচ্ছেটা পায়ে ঠেলো না। সুবুর বয়স শত্রু মনুর বয়স ত একই। হোক না সে সইএর ছেলে।

প্রার্থনা করতে করতে হঠাৎ জিবে ছোট্ট কামড় লাগল। অন্নমাসি মনে মনে বলেন, ও কিছু না। সুবুর মন না গলে পারে না। কি সুন্দর কৃষ্ণকলির মতন চোখ দুটো—আহা মেয়েটা বেঁচে থাকুক। সকাল বেলা ঠাকুরের ছবি স্মরণ করার আগেই যে ছবি মনে ভেসে উঠেছিল সেটা শুধু সুবু-শেফালীর যুগল-মূর্তি। তাতে দোষ কি? সবৎসা গাভী, পূর্ণ কলসী আর যুগল-মূর্তি এ ত সর্বদাই ভাল যাত্রা। তবুও মন থেকে খটকা যায় না। বলা যায় না কিছুই। আজ-কালকার ছোকরাগুলোর মন যেন কেমন কেমন হয়ে গেছে। উদাসী পাগলের মতন কেবল উড়ে উড়ে বেড়াতে চায়। বাসা বাঁধতে তারা কেন যেন ভয় পায়। কর্তাদের সময়ে কিন্তু অমনটি ছিল না। সুবুর বয়সে কর্তা অন্নমাসির কাছে পুরো ভাবে পুরোনো হয়ে গিয়েছিলেন। সে সব চিন্তা করতে বসলে আজও মাসির রাঙা ঠোঁট আরও রক্তাভ হয়ে ওঠে।

সুন্দরমাসি এসে বলেন, তুমি যে দেখছি দিদি একেবারে কোমর বেঁধে লেগে পড়েছো! এই রোদে দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছো! মুখখানা এক বার আয়নায় গিয়ে দেখো না!

অন্নমাসি লজ্জা পান। মুখের রক্তিমার কারণ রোদ নয়—এ কথাটা 'সই'কে বলার সাধ হয়। চেপে যান।

সুবুর মা সুন্দরমাসি অন্নর দিকে প্রীতিভরা চোখ ফেলে পলকে ভিতরে চলে যান। মনে তাঁর গর্ব হয়। হবে না কেন? এমন সই ক'জনার জোটে? তাছাড়া এমন ছেলে? ইংরেজ লাটসাহেব সে দিন তাঁর ছেলের সাথে হাত মিলিয়েছিল। ছবিখানা ড্রইং-রুমে টাঙ্গানো আছে। ইচ্ছে করে সইএর পাশে দু'দণ্ড দাঁড়ান। পারেন না—হাতে কাজ—মাষ্টার, জয়ন্ত, বিনয় এখানে খাওয়া-দাওয়া করবে। তাদের জন্ত এক ফিরিস্তি তৈরী করতে হবে ত!

"কেমন? পছন্দ হল? বলেইছিলাম। তা তোরা কিছু বেয়াড়া ধরণের প্রশ্ন করিসনি ত? সব ক'টার জবাব দিয়েছিল? রান্নার কথা জিজ্ঞেস করেছিলি? সেলাইর কথা? কবিতা শুনিয়েছে?"—অন্নমাসি হাঁপাতে থাকেন।

মাষ্টার জয়ন্তর কানে কানে জপেন, ওহে ডেপুটি লীডার, শক্তিশেল বাণ হানো। আমার কম্মো নয়। যা বলার, তুমিই সেরে ফেল।

মাষ্টারের অন্যমনস্ক ভাব সুন্দরমাসির চোখ এড়ায়নি। তিনি বললেন, "হাঁ রে অলক, তোদের সাথে কথা-কাটাকাটি হয়নি ত? অমন গুমড়োমুখো হয়ে বসে আছিস যে?"

"—ও মেয়ের সাথে সুবুর বিয়ে হবে না।" জয়ন্ত আকাশ থেকে বাজ ফেলল।

অন্নমাসি ব্যাপারখানা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না। এটা যে কখনও সম্ভব তা তিনি এখনও ঠাওর করতে পারছেন না।

সুন্দরমাসি জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন রে?"

"—মেয়ে বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে। ঠোঁট উলটে জবাব দেয়। তাছাড়া, তাছাড়া···" বিনয় আর কথা খুঁজে পায় না!

জয়ন্ত বলে, "মেয়েটার আধ্যাত্মিক দর্শনও কিছু—"

মাষ্টারের রাগভরা চোখের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত থেমে যায়।

আধ্যাত্মিক দর্শন কথাটা সুন্দরমাসির ভাল ভাবে জানা নেই। পুজো সম্বন্ধেই কিছু একটা হবে এ রকম ধারণা নিয়েই বললেন, "তা বাবা পুজো-টুজো না মানলে ত চলবে না এ বাড়ীতে। আমার ঘরের লক্ষ্মীপুজো কে চালাবে? তা ঠিকই করেছো। বেধর্ম্মি অলক্ষ্মী ঘরে এনে কে নরক ভোগ করবে?"

অলক্ষ্মী কথাতে অন্নমাসির বুকে ধড়াস করে যেন একটা পাথর গিয়ে বাজল।

কারুর দিকে কোন ভ্রূকুটি না ছুঁড়ে একটি কথা না বলে তিনি ঘরের ভিতর চলে গেলেন।

হায় স্নেহশীলা অন্নমাসি! তুমি কেমন করে জানবে যে, সমস্ত দুনিয়াতেই আজ এই ছায়াবাজির ছলনা চলছে? সব-কিছু সাজিয়ে প্রত্যাখ্যান কি শুধু তোমার কালীমন্দিরের হঠাৎ-দেখা মেয়েরই কপালে? এই ছলনা নিয়েই ত আজ সমস্ত সংসারটা চলছে। দেখোনি কি তোমারই পাড়ায় জেনে-শুনেও উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক দল কেমন ভাবে উঁচু মাইনের চাকরীর দরখাস্ত পেশ করে বসে থাকে? তারা কি জানে না যে, চেয়ারে আসল লোকের চাদর কত আগে থেকেই বাঁধা হয়ে গেছে? দরখাস্ত পেশ করে হাঁ করে বসে থাকে সে ত বরখাস্ত পাবারই জন্ত। তবুও তাদের লোকসান নেই—আশায় আশায় তাদের যে দিন ক'টা কাটে তাই বা কি কম লাভ? আশার আলো নিবে গেলে এত বড় জীবনটাকে টেনে

হেঁচড়ে চালাবে কেমন করে? এই প্রত্যাখ্যানের বেদনাই ত স্বপ্ন-সচ্ছল আশার মাশুল!

তিন

মাষ্টার সুবীরকে আঁকড়ে ধরেন, "ভায়া, ভাঁওতায় ভুলছি না। চটপট এখন বলে ফেল দিকিনি তোমার মনখানা কোথায় বাঁধা দিয়ে বসে আছো?" সত্যি বলছি ভাই, অন্নমাসির সামনে এখন আমি আসতে লজ্জা পাই।

বিনয় বলল, "মাষ্টারদা, যদি অভয় দাও ত বলি! আমার মনে হয়, সুবীর ওদের পাশের বাড়ীর লিলিকেই ভালবাসে।"

মাষ্টার গম্ভীর ভাবে বললেন, "প্রমাণ?"

"—বল কি মাষ্টারদা এ সব জিনিষের প্রমাণ লাগে? এ কি তোমার বাইনোমিয়াল থিওরেম যে শেষমেশ একটা কিউ ই ডি টেনে-হিঁচড়ে দাঁড় করাতেই হবে? তুমি ওদের চোখের খেলা দেখোনি কখনও? দেখো না কেমন জড়সড়ো হয়ে বসেছে? এই সুবু অত ঘামছিস কেন?"

অনেক কাঠ-খড় পোড়াবার পর চোখ-মুখ পাকা টমেটোর মতন লাল করে সুবীর বলল, "লিলি ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করব না।"

মাষ্টার বললেন, "তা লিলি যদি রাজী না হয়?"

সুবীর টমেটোর উপর এক পোঁচ আলতা চড়িয়ে বলল, "আছে। তুমি জিজ্ঞেস করেছো?"

"—না, তবে জানি সে রাজী।"

"—কেমন করে জানলে?"

প্রশ্ন-জিজ্ঞাসায় মাষ্টার একেবারে ঠোঁটকাটা। ভবেশ বলল, "আহা মাষ্টারদা, বলছে যখন তখন ওর কথাটা মেনেই নাও না।"

মাষ্টার দুষ্টু মি-ভরা চোখে ঘাড় নেড়ে নেড়ে আবৃত্তি করেন, তাই ত হে—

"দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির-বিন্দু।"

সব শুনে অন্নমাসির উৎসাহ যেন কেমন ভাবে কর্পূর হয়ে উবে গেল। অন্নমাসি বলেন, "তা কি হয়? ওরে মাষ্টার, ওরা কি রাজী হবে?"

"—তুমি চেষ্টা করলেই হবে। ঘরও তো পাল্টা ঘর। এত দিন তো খেয়ালই হয়নি কারুর!"

আসল কথাটা বেশী দিন চাপা রইল না। ছেলের বিয়ে দিয়ে হরপ্রসাদ তাকে বিলেত পাঠাবেন। উপরি টাকাটা মেয়ে স্বপ্নলের বিয়ের জন্য থাকবে গচ্ছিত। এত বড় খেলোয়াড়! এত পাশ দেওয়া! এত ভাল কাজ করে সরকারী দপ্তরে! তাকে তিনি বাজারে কমপ্লিমেন্টারি হিসেবে ছাড়তে নারাজ।

লিলির বিধবা বোন মিলি নয়া দিল্লীর আদর্শ মেয়ে। এই ছোট্ট বয়সে, দেশ থেকে হাজার মাইল দূরে পর পর দু-দু'টো ধাক্কা সামলে সমস্ত সংসারটার ঝক্কি নিজের ঘাড়ে নিয়েছে। লিলিকে কলেজে পড়িয়েছে। দু'জনে এখন এক সাথে স্কুলে পড়াতে যায়। সংসার চালাতে হবে ত!

মিলি ছাড়া দিল্লীর দুর্গ্গো পুজোর আয়োজন হয় না। মহাষ্টমীর দিন নিজে থেকে সব আয়োজন করে মণ্ডপ ছেড়ে দূরে গিয়ে বসে। লাইন দিয়ে উপোস-করা মেয়েরা আসে অঞ্জলি দিতে। মা'রা জানায় ছেলে-মেয়ে স্বামীর কল্যাণ-প্রার্থনা। কুমারীরা চায় শিবের মতন বর। মিলিও একদিন চেয়েছিল। সে পেয়েছিল। কিন্তু রাখতে পারল না। তারায় তারায় সে গেছে মিলে। স্বামী এবং পিতার মৃত্যু হয় একই বছর।

পাড়ার মেয়ে নন্দিতা বলে, ও মিলি, দূরে বসলি কেন ভাই? মণ্ডপে বস্ এসে।

মিলি বলে, না ভাই, ঠিক আছে। জানিস না তুই, বিধবাদের ও সময়ে এখানে বসতে নেই।

ভীড়ের ভিতর ছোট বোন লিলিকে খোঁজে। কোথায় গেল লিলি? উঃ, কত বড় হয়েছে, ছেলেমানুষী গেল না! দেখো দিকিনি! অঞ্জলি দেবে না? শিবের মতন বর প্রার্থনার এ সুবর্ণ সুযোগ হারাবে সে?

লিলিকে সে সুখী করবেই।

মিলি গিয়ে অন্নমাসির পা জড়িয়ে ধরে—মাসি, তুমি ত শুধু ওদেরই নও। আমাদেরও। সুবুর মতন লিলিকেও ত তুমি ভালবাস। ইচ্ছে করলে তুমি সব ঠিক করে দিতে পারো।

অন্নমাসি নিস্তব্ধ।

টাকা চাই টাকা! একটি নয়। একশো নয়। এক হাজার নয়—গুণে গুণে দশ হাজার টাকা! ফেলো কারেন্সি নোট—নাও ছেলে। শিক্ষিত বাঙ্গালী ছেলে আলু-পটলের মতন বাজারের সাধারণ কমোডিটি। এর দরটা নীলামেই ঠিক হয়।

অন্নমাসি চাপ দিতে পারেন না। কা'কে চাপ দেবেন? মিলির টাকা নেই। সুবীরের বাপ হরপ্রসাদের কথা নড়ানো তার কর্ম নয়।

বেপরোয়া মিলি হরপ্রসাদের পা জড়িয়ে বললে, "কাকামণি, তুমি ত বাবার বন্ধু। লিলির বিয়ে ত তোমারও কাজ। আমরা দু' বোনে সংসার চালিয়ে যা বাঁচিয়েছি তা থেকে দু' হাজার নগদ দেবো। তুমি বাকীটা মাপ করে দাও কাকামণি!"

হরপ্রসাদ আকাশ থেকে পড়েন। "বলিস কি মিলি? লিলি ত আমার ঝুলনের মতন। ওকে ত আমি বউ ভাবে ভাবতেই পারি না। তোর কি মাথা ঠিক আছে?"

মিলির মাথায় রোখ চাপে। সে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে—টাকা চাই টাকা। ধার। মাত্র দশ হাজার।

এই রাজধানীতে কে বসে আছে অসহায়া বিধবা মেয়ের জন্ত দশ সহস্র মুদ্রা নিয়ে?

লিলির গর্ব যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। তার অমন মন-মাতানো সৌন্দর্য, তার যৌবন! এর কোন মূল্যই নেই।

দিদির অত ছুটোছুটি তার ভাল লাগে না। ভালবাসায় বিনিময়ে ভালবাসা সে পেয়েছে। সুবীর নিজেই এ প্রস্তাব পেড়েছে জেনে পুলকে তার শিহরণ জেগেছে। কিন্তু সেই প্রেম, সেই অকপট ভালবাসার মাঝখানে যে দশ হাজার কারেন্সি নোটের হিমালয় পাহাড় এসে দাঁড়িয়েছে তার কি করবে? সুবীর লাজুক। লিলির মাঝে মাঝে ভয় হয়—সুবীর ভীরুও বোধ হয়। ভীরুকে সে ঘৃণা করে।

লিলি চেঁচিয়ে ওঠে, "তুই কি আমায় ঘরে টিঁকতে দিবি না দিদি? দিন-রাত কেবল ঐ এক কথা! টাকা নিয়ে যারা বিয়ে করে তাদের পায়ে তেল মাখাস কেন? তারা কি মেয়ে বিয়ে করে? তারা চায় টাকা। মেয়েটা তাদের কাছে নেহাত ফাউ। তুই কি চাস আমি আত্মহত্যা করে মরি?"

মিলির ভয় হয়। সেদিন বাইশ বছরের একটি বাঙ্গালী মেয়ে নিউ দিল্লী টাউন হলের সামনের মানমন্দির থেকে লাফ দিয়ে পড়ে মরেছে।

চার

সানাই বাজিয়ে সুবু বউ ঘরে নিয়ে এসেছে। আমাকেও ডেকেছিল। আমি যাইনি। আমার এই জানালা দিয়ে বিয়ের শোভাযাত্রাটা দেখেছি। ট্যাক্সি এসেছে। হাজাক লণ্ঠন এসেছে। বড় বড় গাড়ী এসেছে। মিলি ও-পাড়ায় নন্দিতার বাড়ীতে গেছে। লিলি বেরোয়নি কোথাও। একবার মনে হল ওদের জানালা দিয়ে কে যেন উঁকি মারল!

বাজারে সুবীরের ভাল দামই উঠেছে। দিল্লীর ছেলে। হাজার হোক দিল্লীর একটা মোহও আছে। সেখানকার ছেলের ত বটেই। পনেরো হাজার টাকায় সুবু কলকাতায় নিজেকে বিক্রী করেছে। সাথে একটা বউ পেয়েছে ফাউ হিসেবে।

এই জানালাটা দিয়ে কুড়িটা বছর ধরে কত কি দেখলাম। সামনের নিম গাছটা ছোট ছিল, বড় হয়েছে। কৃষ্ণচূড়ার চারাগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। পলাশ গাছগুলো স্কোয়ারটা আড়াল করে ছায়া দিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার সজনে গাছটা বুড়ো হয়ে মরে গেছে। তার জায়গা দখল করেছে তারই নবঘনশ্যাম অঙ্কুর। লিলি ছোট্ট শিশু ছিল। বড় হয়েছে। সবই কত বড় হয়ে গেছে! বাড়ে নি শুধু একটা জিনিষ। সে কি মানুষের মন? আমার ধারণা যেন ভ্রান্ত হয়। আমার কল্পনা যেন মিথ্যা হয়। সেই বিরাট অলীককে আমি সাদরে যেন মাথা নত করে গ্রহণ করি।

জানালাটা দিয়ে আকাশ দেখা যায়। সেই গগন, যেখানে আমার চিত্তাকে ছেড়ে দিয়ে বেদন-মগন ক্ষণে আমি খুশীতে ভরপুর হয়ে থাকি। লিলির ভাসা ভাসা আবৃত্তি হাওয়ায় ভেসে আসে, "হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা?"

বসে বসে সেই জানালা দিয়েই দেখছি লিলি রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সুবীর এই মাত্র সামনে দিয়ে চলে গেল। সাথে তার নববধূ!

তুলি ও রঙ

জর্জ-মাইকেল

পিয়াজা দি স্পানায় ওরা বসল, ইতালীয় ভদ্রলোক হারিকটকে কিছু ফুল কিনে উপহার দিলেন। মোদক একটা 'ফিয়াসকো' আনতে হুকুম করে, তার পর আরো দুটি। মধুর চাইতেও মধুর এই সুরা।

"কাণের ভেতর যতক্ষণ না ভ্রমরগুঞ্জন শোনা যায় ততক্ষণ এই মদ পান করা চলে।" দেস্‌পেরো আরো দু' বোতলের হুকুম দেয়।

মদ্যপান শেষ হ'ল, দেস্‌পেরো চলে গেল, তখন ওরা দু'জন শূন্যমনে পিয়াজা ত্যাগ করে গির্জার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে।

সম্মোহনের কাজ সুরু হয়েছে।

দুটি তোরণে সূর্যালোক ঠিকরে আসছে না,—সুনীল আকাশের পটভূমিতে রবিরশ্মির গোলাপী আভায—গির্জার গায়ে যেন রক্ত-মাংসের ছাপ এনে দিয়েছে, আনন্দ-উজ্জ্বল, প্রাণরসে উচ্ছল।

প্রথম ধাপে পৌঁছেই দেখা গেল, সুবর্ণ-গৈরিক রঙের দুটি সিঁড়ি সুরু হয়েছে—ডান দিকে মুক্তোখচিত এক পাম গাছ আর বাঁ দিকে কিছু করবী। ইউক্যালিপটাস গাছে এক ঝাঁক পাখির ঐক্যতান সুরু হয়েছে। এই সময় কোথা থেকে একটা গম্ভীর সুর বাদ্যযন্ত্রে ধ্বনিত হয়ে উঠল। কোথা থেকে যে শব্দটা আসছে ওরা তখনও ধরতে পারছে না! সেই কনে-দেখা আলোর ভিতর আরো ওপরে উঠে ওরা তোরণ-চূড়া দেখতে থাকে।

অলিন্দ, বাতায়ন, আর উন্মুক্ত অংশ সব জড়িয়ে এমন একটা স্থাপত্য-সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে যে স্বপ্ন-তাড়িতের মতো মোদকরা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। র‍্যাফায়েলের শিল্পকীর্তি দেখে যে-আনন্দে মন ভরে উঠেছিল এ আনন্দ তাকে ছাপিয়ে উঠেছে। ওপরে—আরো ওপরে গোলাপী গোধূলি···স্বর্গরাজ্যের সুষমামণ্ডিত গোধূলি···

মোদক বলে ওঠে—"কোথাও যদি স্বর্গ থাকে সে এইখানে, হমিনস্তু, হমিনস্তু, হমিনস্তু—"

সেই গম্ভীর সঙ্গীত মুখর ইউক্যালিপটাস্ কুঞ্জে মিশিয়ে রয়েছে, বাতাসের স্নেহস্পর্শ। ওরা ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে উঠে তোরণের পাদদেশে পৌঁছল। দেস্‌পেরো আগেই বলেছিলেন এইখানে চড়াই বেয়ে একটা রাস্তা উঠেছে। চমৎকার সব রঙীন ঘেরাটোপ-জড়ানো ঘোড়া-টানা গাড়ি চলাচল করছে; হাল্‌কা রঙের পোষাক পরে লাস্যময়ী ইতালীয় ললনারা চলেছে, মাথায় বড় বড় ছাতা, ওদের দিকে ফিরে তারা হাস্‌ছেন, বিনিময়ে ওরাও হাস্য বিতরণ করছে। ডান দিকে ভিলা মেডিচির পাঁচিল। ফোয়ারা আর কুলুঙ্গিতে কণ্টকিত। চিরহরিৎ ইউ গাছে চারি দিক ঢাকা।

নীচে, বাম দিকে রাস্তা ঘেঁষে পাঁচীল যেখানে সুরু হয়েছে, তার পাশেই শ্যামলিমায়-ঘেরা রোম নগরী। গোধূলির কি ঔজ্জ্বল্য,—সহস্রশীর্ষ সূর্য অশেষ গরিমার সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত,—প্রাক্-রেনেসাঁ কালের সায়েনীয় চিত্রের সোনালি পটভূমির মত এক অখণ্ড আকাশপট! আর সব কিছুই,—পথ, গাড়ি, বাড়ি, গাছপালা সেই সূর্যস্নানে এক অপূর্ব সোনালি শ্রী মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

পিনচিও গার্ডেনে পৌঁছানোর জন্ত ওরা একটু পা চালিয়ে চলে,—প্রাচীরের প্রতি মোড়েই একটি ফোয়ারা, সেখানে আকাশ প্রতিবিম্বিত, কিংবা দু'-এক দল প্রেমিক-প্রেমিকা বসে আছে। একটি ইউ গাছের তলায় তিন জন চক্ষুহীন সুরকার বসে আছে দেখা গেল। এরাই সেই গম্ভীর সুরের ঐক্যতান বাদন সুরু করেছিল, লঘু অথচ গভীর, ছন্দোময় এবং করুণ সুরের মাধুরী হৃদয় স্পর্শ করে। এক জন চেলো-বেহালাবাদক, আর এক জনের হাতে ফ্লুট বাঁশী, আর এক ব্যক্তি কণ্ঠ-সঙ্গীতের বেপারী।

হাতে তেমন অর্থ না থাকলেও মোদক ওদের হাতে কয়েকটি মুদ্রা ফেলে দেয়। বাম দিকে, বোরঘিজ বাগান, চমৎকার রোমক থাম, আর লতা-গুল্মের কুঞ্জছায়ায় প্রিয়দর্শন কয়েক জন বসে চা পান করছেন—রোমের গোধূলির পটভূমিতে যেন কয়েকটি ছায়া-মূর্তি। হারিকট রুজ এবং মোদকরা ওপরে উঠতে সমগ্র নগরী, পাম আর সাইপ্রেস্, ঝাউগাছ সব যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সেন্ট পীটার আর তার আলোকসজ্জা, চতুষ্কোণ মিনার আর গোল গম্বুজ সব কেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

সোনার সীমারেখা পার হয়ে আকাশ তখনও নীল, আর পরীদের গোলাপী গালের মত হাল্‌কা মেঘের দল এই পবিত্র পরিবেশে ভেসে বেড়াচ্ছে।

পাম জাতীয় গাছের নীচে কিংবা ভিলা বোরঘিজের কুঞ্জবনে অজস্র নর-নারীর ভীড়। মোদকরা আর হারিকটরুজ কিছুই লক্ষ্য করছে না,—শুধু এই অপূর্ব গোধূলির কথা ভাবছে, অনেকগুলি চমৎকার গাড়ি রমণীয় রমণীদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তারই ভিতর দিয়ে ওরা দু'জনে চলা-ফেরা করছে, লক্ষ্য করলে ওরা দেখতে পেত রঙীন ছাতার আড়াল থেকে মহিলারা ওদের প্রতি সুমধুর হাস্য বিতরণ করছে, এর কারণ ওদের দু'জনকে দরিদ্র এবং সাহসী বলে
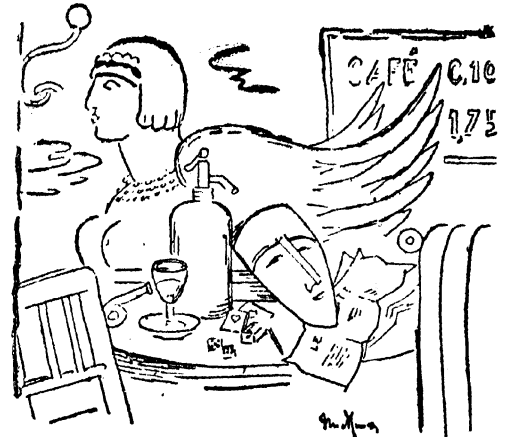
—মদিগলিয়ানি অঙ্কিত

মনে হচ্ছে, সমগ্র ইতালী দরিদ্র জনের প্রতি করুণা ও সহানুভূতিতে ভরপুর।

দৃঢ়তা সত্ত্বেও এই মধুর অথচ তীক্ষ্ণ কটাক্ষ মোদক্কর অন্তর স্পর্শ করে, সে বলে ওঠে—

"দেখো এই সব রোমান মেয়েরা এ দিকে এত গম্ভীর, কিন্তু মনে হয় যেন মাথায় ওদের মুকুট আর চোখে আছে ভালোবাসার মাদকতা।"

আর একটি চমৎকার স্ত্রীলোক দেখা গেল, মুখে গর্ব-দীপ্ত ভঙ্গী, চোখে বিদ্যুৎ—মোদক্কর চোখে ভালো লাগল,—তৎক্ষণাৎ হারিকট রুজের দিকে তাকিয়ে দেখল মোদক্ক—আনন্দময়ী হারিকট, রেঁনোয়ার ছবির মত অপূর্ব আর রক্তিম!

ওকে টেনে নিয়ে চলে মোদক্ক।

ওপরে পাঁচীলের ধারে তখনও কিছু লোক রয়েছে, এরা সব পর্যটকের দল, শহরের তরুণ দলও কিছু আছে—তাদের মনোহারিণী প্রেয়সীর দলও সঙ্গে আছে, হাওয়ায় স্কার্ট উড়ছে বেলুনের মত,—সরু পা গুলি দেখা যাচ্ছে।—ওদের মাথার চুল উড়ছে, শাঁখের মত গ্রীবা, হাতগুলি নগ্ন—আর পোষাকের রঙ শাদা, গোলাপী আর ঈষৎ রক্তিম।

সকলেই সবিস্ময়ে নিসর্গ-শোভা দেখছে। পিয়াজ্জা ডেল পপোলো পার হয়ে যে ছায়া এতক্ষণে নীল হয়ে এসেছে, সেই হ'ল রোম—তোরণ, মিনার আর গম্বুজ—রোম পার হয়ে পবিত্র পর্বতমালা—আর ওপরে গোধূলির ধূসর আকাশ। পাহাড়ের গায়ে মনতে মারিও তার নিজস্ব রঙে রঞ্জিত। বহু যুগের পুরানো এই ছাপ—পাইন গাছের কালো ছাতা যেন মাথায়। সূর্য সেই দিকেই ডুবছেন,—তখনও প্রকাণ্ড সুবর্ণ-গোলকের মত দ্যুতিমান, আর পিছনে রয়েছে সারা আকাশ ছড়িয়ে উজ্জ্বল সোনালি আলো—সে আলোয় রোমের নগর, গ্রাম, গম্বুজ আর বাগান আলোকিত।

"দেখো, দেখো—একটাও বেমানান কিছু নেই, ছোটোখাটো ডিটেল সব ঠিকই রয়েছে, কারখানার চিম্‌নীও নেই কোথাও,—শুধু শ্যামলিমা—আর লাল লাল ছাদ, যেন একটি পাত্রে গির্জা, গম্বুজ, ঘণ্টা, পাখি সব সাজানো,—আকাশের উদ্দেশ্যে যেন ধূপ-ধুনার আরতি সুরু হয়েছে। এমনই অপরূপ এই সৌন্দর্য যে, দেখো ঐ ট্যুরিষ্টরাও বিস্ময়ে নির্বাক্ হয়ে আছে। কেউ কথাটি বলছে না।"

শহরকে বিশ্লেষণ করার বাসনা কারো নেই, কোনো পরিচিত পথচিহ্নকে এত দূর থেকে খুঁজে বার করার আগ্রহ নেই, সবাই বিস্ময়কর গোধূলির এই ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

হারিকট রুজ শুধু বলে ওঠে—

"আমরা এইখানে এসেছি, শুধু আমরা দু'জন,—ঐ অন্ধকার পার হয়ে এসেছি এই সোনালি আকাশের নীচে, রোমে। ঐ সাইপ্রেস গাছ,—এদিকে ফোয়ারা মাথার ওপর এই আকাশ—আর—আর আমরা,—"

ওরা অপরিচ্ছন্ন,—বেশ-বাসে এতটুকু চাকচিক্য নেই, বিশেষ করে এই অপরূপ পটভূমিতে ওদের নোংরা দেখাচ্ছে। ভাঁজ-খাওয়া পোষাক আর স্বেদাপ্লুত দেহ হারিকট-রুজের আকৃতিকে অনেকখানি মলিন করে দিয়েছে।

ট্রেণের কালি-ঝুলি-মাখা জামা মোদক্কর গায়ে সেঁটে বসেছে।

সাইপ্রেস, ঝাউগাছের পত্রপুঞ্জের ভেতর ওরা দু'জনে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে আছে, যেন দুটি আগাছা একত্র গজিয়ে উঠেছে।

এই বিস্ময়কর শহরের বৈচিত্র্য, সোনালি দিগন্তের সুবর্ণ-সমারোহ, কল্পনার পক্ষিরাজে মনকে নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেছে, হারিকটের পেশীগুলি শক্ত হয়ে উঠেছে। সে বলে ওঠে:

"আমরা পুরস্কার পেয়ে গেছি, কষ্ট পেয়েছি, খুবই কষ্ট পেয়েছি, আরো হয়ত পাব কিন্তু সে সব কষ্টের বিনিময়ে পুরস্কারও পেলাম বড় কম নয়।"

মোদক্কর ঘর্মসিক্ত সার্টটি সে বড় বড় কালো আঙুল দিয়ে টেনে ধরে। মোদক্কও উত্তেজনায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বলে—"ঐ দেখ!"

ছত্রাকৃতি পাইন গাছের পিছনের সোনালি রঙ যেন অকস্মাৎ আগুনের শিখার মত ফেটে পড়েছে, লাল রঙের সঙ্গে চলেছে সংঘাত,—তার পর প্রতি সন্ধ্যার মত সেই সর্বব্যাপী লাল রঙ সমস্ত গ্রাস করল।

সারা নগরী বেগুনী রঙের ধূলায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল,—সেই সুবর্ণ-গৈরিক পথ থেকে প্রাচীরগাত্র সবই সেই রঙে ভরে গেল।

দুধে-আলতা রঙের আহত বক্ষের মত আকাশ যেন বেপথুমতী।

চারিদিকে একটা অখণ্ড শান্তিময় পরিবেশ নেমে এল।

একটা পাখির ডাক পর্যন্ত শোনা যায় না। স্নেহস্পর্শের মত লাইলাক গুচ্ছ সমান্তরাল হয়ে পড়ছে, সেণ্ট পীটারের গম্বুজের আলোয় শুধু শাদা রঙের রেশ পাওয়া যাচ্ছে।

একটা ঢ'কের আওয়াজ শোনা গেল। সমগ্র অঞ্চল থেকে লোকজন ছায়ামূর্তির মত সরে গেল এক নিমেষেই। সাইপ্রেস, ঝাউগাছের আড়ালে মোদক্ক আর হারিকট এক রকম একাই দাঁড়িয়ে রইল। ওরা তখনও আকাশের গায়ে যে ক্ষীণতম সোনালি আলোর আভাষ লেগে আছে তা লক্ষ্য করছে।

"চলে যাও।"

সশস্ত্র চৌকিদার চেঁচিয়ে ওঠে—"এখন গেট বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে।"

ওরা কয়েক ফিট নীচে নামল, পাথর-বাঁধানো সিঁড়ির আর এক ধাপে পৌঁছে আর একটি সাইপ্রেসকুঞ্জের আড়ালে লুকিয়ে রইল। ঐ খানেই রাতটা কাটিয়ে দেবে। স্বপ্নপুরীর মত একটা তোরণ উঠেছে ওপরকার পাঁচীলের দিকে। প্রচুর গাছপালায় চারি দিক ঢাকা, মিনার্ভা-মূর্তি রাতের অন্ধকারে আরো কালো হয়ে এসেছে,—ফোয়ারার আওয়াজ আরো জোরালো শোনাচ্ছে, আকাশটা যেন পাহাড় আর পাইন গাছের মাথায় ভেঙে পড়ছে।

চৌকিদার ওদের কাছ ঘেঁষে চলে গেল, হারিকট রুজ আর মোদক্কো একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল একটা ম্যাগনোলিয়া ঝাড়ের পিছনে।—ম্যাগনোলিয়া ফুলের গন্ধ মাথা ঘুরিয়ে দেয়। চাঁদ উঠলো। ওরা ভেতরে রয়ে গেল, গেট বন্ধ হ'ল। ওদের ডান দিকে ফোয়ারার ওপর একটা সাটার বা ছাগদেব

(অর্ধছাগাকৃতি অর্ধমানবাকৃতি মূর্তি) গরুর সিং-এর ভিতর দিয়ে জল ছড়িয়ে দিচ্ছেন। নীচে রোম নগরীর গুঞ্জন-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সাইপ্রেস-কুঞ্জ ভেলভেট-সদৃশ হয়ে এল, আকাশ যেন আরো কাঁপছে। দূরে একটা ঘড়িতে প্রহর শেষের ধ্বনি বাজছে, এক-একটি আওয়াজ যেন অশুভের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জয়ধ্বনি। ম্যাগনোলিয়ার গন্ধ যেন ওদের মাতাল করে তুলেছে—ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে, এক অপরিসীম আনন্দে উভয়ের অন্তর পরিপূর্ণ, ওদের মাথা ঘুরছে।—ওদের জীবনের যত বেদনা, শুধু ওদের কেন, সকল মানুষের মনের পুঞ্জীভূত বেদনাই যেন আজ বিগলিত হয়ে গেছে। এক অনৈসর্গিক আনন্দ ওদের পেয়ে বসেছে,—এ কি স্বপ্ন না সত্য,—কল্পনা না বাস্তব, কিছুই যেন আর বুঝতে পারে না। অনন্ত করুণার মত ওদের মাথার ওপর গাছের পাতার ফাঁকে চাঁদের আলো ঝরে পড়ছে। পরস্পরের বাহুলগ্ন হয়ে উভয়ে ঘুমিয়ে পড়লো—বুক উত্তেজনায় কাঁপছে, দুলে উঠছে, ফুলছে। একটা তাজা সুগন্ধ ক্রমশঃ ওদের আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

ভোর বেলা ঘুম ভাঙতেই হারিকট রুজ এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখলো। ওর সামনে নগ্ন দেবমূর্তির মত মোদক্লো দাঁড়িয়ে, সেই প্রত্যূষে ফোয়ারার জলে ব্রোঞ্জের ছাগদেবের সঙ্গে সে-ও স্নান সেরে নিয়েছে, তার সারা গা দিয়ে জল ঝরছে। তার পর রোমের সেই প্রদোষান্ধকারে প্রভাত-পাখীর প্রথম কলরবের মধ্যে দুই বাহু দিয়ে সে হারিকটকে গ্রহণ করল,—দূরে তখন প্রভাতী ঘণ্টা বাজছে।

"আমার জীবনের যা কিছু রমণীয়, আজ এই প্রভাতের বিমল আনন্দ—আমার শিল্পিসত্তার মুক্তি ও মানুষ হিসাবে আমার যে আনন্দ সে আজ তোমাকেই আমি দান করলাম। আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে সেই অনাগত বিধাতাকেই রূপ দিতে হবে যার জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করে আছি। আর কখনও কি এ দিন আমরা পাব? পাবে তুমি? এই আনন্দময় প্রভাত, নীচে মাটি আর ওপরে ঐ আকাশ, আর আমরা—"

আত্মসমর্পণ করলো আর্ত হারিকট রুজ—নিছক ক্লেদাক্ত দেহ-সম্ভোগ কামনায় নয়, আগামী দিনের দেবতার জন্ম হবে। এ যে তারই আয়োজন—

হারিকট রুজ বলে ওঠে—

"র‍্যাফায়েলের নামে, যীশুর নামে আর মোদক্ল তোমারই জন্য, তোমার এই অযোগ্য সহচরীকে এই মহাজনমের লগ্নে সেই মহামানবের জননীত্বে অভিষিক্ত করো।"

চৌদ্দ

"না, একটাও কথা নয়। কোনো কথা এখন নয়, বুঝলে বরো?" ষ্টেশনে পৌঁছেই মোদক্ল চেঁচিয়ে ওঠে, আগে থেকেই সে পোলিশ বন্ধু ৎবরৌসকীর মুখ দেখে বুঝেছে অনেক কথা তার মনে জমে আছে।

পরস্পরকে ফেরার পথে অতি অন্তরতম মনে হয়েছে, আর প্রায় এক রকম চোখ বুজিয়েই সারা পথ কাটিয়েছে দু'জনে। শোচনীয় অদৃষ্ট হঠাৎ ভাগ্যক্রমে যে সুযোগ এনে দিয়েছিল তার ফলেই তারা রোমের ঐশ্বর্য আর আনন্দ-উজ্জ্বল মাধুরী প্রাণভরে দেখতে পেয়েছে, যা পেয়েছে সেইটুকু আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। ট্রেণ যতই প্যারীর কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে ওরা ততই নার্ভাস হয়ে পড়েছে—যেন প্রতিটি ক্ষয়িষ্ণু মুহূর্ত ওদের এই বিরাট স্বপ্ন একটু-একটু করে গ্রাস করছে।

সাঁঝের সময় টেবলের ওপর কয়েকখানি ছবি মেলে ধরে মোদক্ল। ৎবরৌসকী পরিবারের জন্য এগুলি সে সংগ্রহ করে এনেছে। সে শুধু বলে:

"জানো, আমরা ঐখানে গিছলাম, আর এইখানেও—" বিকার-গ্রস্তের মত তার চোখ জ্বলছে।

বিনা বাক্যব্যয়ে ভদ্র পোল ৎবরৌসকী সব শুনে যাচ্ছে। আর যখন কাউণ্ট সান মার্টিনোর কাছে দিয়াঘিলেপের বাণী পৌঁছে দিয়ে মোদক্ল ফিরে এল, তখনও সে বলল না—কাউণ্টের প্যারী ত্যাগ করে যেতে এখন এক সপ্তাহ বাকী, কারণ দিন পেছিয়ে দিয়েছেন তিনি। বেচারীরা হয়ত আরো ক'দিন রোমে থাকতে পারত।

হারিকট রুজ আর মোদক্ল লুক্সেমবার্গে গিয়েছিল, সেখানে পাঁচীলের রেলিং-এ হাত রেখে চোখ বুজিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দু'জন। আশা করেছিল একটা পাখী হয়ত ডেকে উঠবে, ফোয়ারার জল-ঝরার আওয়াজ পাওয়া যাবে—

হারিকট রুজ অস্ফুট কণ্ঠে বলে—"ঐ ত পিয়াজা ডেল পপোলো—আর পিরামিড। সামনে বাগান আর তিন পাল্লা দরজা, আকাশের গায়ে লেগে আছে সেণ্ট এঞ্জেলো,—ছড়িয়ে আছে তার পাখা। সেণ্ট পীটরের মুকুটটা বড় সাদাসিধে, আর টাইবার—না,—না, সরে যেও না, দেখতে পাবো দেখে ফেলবে। ওপরে আকাশ, র‍্যাফায়েলের মত নীল আর শাদা, মাইকেল এঞ্জেলোর মত সোনা-মাখা, আর সেই ছাতার মত পাইন গাছের সার—"

"থামো, আর বোলো না—"

লজ্জানত মুখে হারিকট বলে—

"এই সেই আমাদের ছোট্ট ফোয়ারা, আর ম্যাগনোলিয়া গাছের পাশে সেই সাইপ্রেস-ঝোপ।"

"না—না, আর বোলো না কিছু—"

মোদক্ল তার উত্তপ্ত গাল হারিকটের শীতল গালে লাগিয়ে চোখ বুজিয়ে থাকে, অন্ধের মত হারিকট ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুক।

যতক্ষণ না হারিকট ওকে ৎবরোর বাড়ির সামনে এনে হাজির করল ততক্ষণ চোখ বুজিয়ে রইল মোদক্ল। সেই ফটোগ্রাফগুলি বাঁধানো এবং দেয়ালে টাঙানো হয়েছে, তারই সামনে এসে ওরা দাঁড়িয়েছে, কেবল রোম—কিংবা সেণ্ট পীটর, বা ভিলা বোরঘিজ।

এতক্ষণে একটু চাঙ্গা হয়ে ওঠে মোদক্ল।

"এখন জীবনে ফিরে আসা যাক, হাসিমুখেই ফিরে চলো, সুদূর থেকে স্বপ্নের চাইতেও মধুরতম বস্তু সংগ্রহ করে এনেছি—সে আমার মুক্তি।"

যার অনুভূতি এত সূক্ষ্ম, রসবোধ এত গভীর সেই নির্বাচিত ব্যক্তিটির চোখের উপর মনোহর আকৃতি ভেসে যায়। স্পষ্ট,

পরিষ্কার ও চমৎকার রেখা। সহচরীর দিকে তাকিয়ে আবার পূর্বস্মৃতি মনে পড়ে—

"বরো,—লা রোতন্দে দু'-এক পাত্র হবে নাকি?"

সানন্দে বরো বলে ওঠে—"আমাকে খাওয়াতে বলছ? কোথা থেকে যে তা সম্ভব হবে সে প্রশ্ন ত' করছ না? জানতেও চাও না—"

"পরে বন্ধু, পরে শোনা যাবে। এমন কথা শোনাবো যে আঁতকে উঠবে, হারিকট রুজও চমকে উঠবে।"

"আমি?"

"চলে এসো।"

সকলে উঠে পড়ে।

মাদাম ৎবরোৎসকী একটা চমৎকার সবুজ পোষাক পরেছেন, এই পোষাকটি ওরা আগে দেখেনি। মাদাম এম্পায়ারী ঢঙ-এ চুলগুলি কুঁকড়ে নিয়েছেন, আর গায়ের রঙে এমনই মাদকতা যে মাদামকে মনোরমা জোসেফাইন বলে চালানো সহজ।

কাফেতে এসে ওরা পৌঁছল। কাফের উজ্জ্বল আলো, আর উত্তেজনাময় উদ্দামতায় মোদক পুলকিত হয়ে ওঠে।

চিরদিনই কোনো দিকে কোনো 'চরিত্র' না লক্ষ্য করেই কাফের ভেতর কাটিয়েছে মোদক, এখন কিন্তু সাল-জড়ানো মার্কিণ মহিলা, প্রাইজ পাওয়া মুষ্টিযোদ্ধাদের প্রতি যে ইংরেজ রমণীটির দুর্বলতা বেশী, কিংবা বছরে দু-এক দিনের জন্য প্যারীতে আসেন শুধু এই লা রোতন্দে দু'-এক দিন কাটানোর জন্য যে সুইডিস্ ভদ্রলোক, তাদের সবাইকে অভিবাদন জানায় মোদক। সুইডিস্ ভদ্রলোক ষ্টেশন থেকে সোজা চলে আসেন লা রোতন্দে আর লা রোতন্দ থেকে সোজা ষ্টেশন, এমনই বরাবর। সেই দিনেমার রমণী, রোমান্স-পটীয়সী। একটি বছর এই লা রোতন্দে পয়সা ছড়িয়ে গেছেন। যে সব মডেলের সঙ্গে কেউ কথা বলে না তাদের চমক দিয়েছে, মাথায় রূপার চিরুণী আর প্রবালের ইয়ারীং প্রায় প্রতিদিনই তিনি বদ্‌লাতেন। তার পর একদিন দেশে ফিরলেন। সেখানে দরবারে একজন পদস্থ ব্যক্তিকে তিনি বিবাহ করেছিলেন, মহিলাটি অভিজাত সম্প্রদায়ের। কিন্তু তিন মাস পরেই ভদ্রমহিলা আবার এই লা রোতন্দে পালিয়ে এসেছিলেন। এবার আর হাতে এক কড়িও ছিল না, অতিশয় দুঃস্থ অবস্থা, তবু কিছুতেই ফিরে গেলেন না। ওঁর শ্বশুর ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলেন, কিন্তু ভদ্রলোক নিজেই 'লা ভেরোল দ্য পারনাশ' বা দ্য পারনাশীয় বসন্ত রোগের কবলে পড়লেন। এখন তিনি ঐ এক কোণে শুয়ে থাকেন, জনৈকা ইতালীয় পেশাদার গায়িকা তাঁর খরচ চালায়। এই আজব পানশালার আর সব অতিথিদের মধ্যে আছেন একজন ইংরাজ ক্লাউন, দু'তিন জন ধর্মযাজক, এক দল স্প্যানিয়ার্ড, আর পৃথিবীর সকল দেশের অসংখ্য নারী প্রতিনিধি, হরেক রকম তাদের মনোভাব, তবে তারা খুসীতেই আছে, কারণ সব জড়িয়ে এক বিচিত্র বিরাট পরিবার গড়ে উঠেছে। এখান থেকে বাইরে গেলে সব কিছু বিস্বাদ আর অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন মনে হয়।

মোদক, ৎবরোৎসকীরা আর হারিকট রুজ আর্টিষ্টদের টেবলে পৌঁছল,—সেখানে কিসলিঙ বক্তৃতা ফেঁদেছে। ওর মা বেশ ভালোই আছেন, আর সে ফেরার পথে বার্লিনে খুব ফুর্তি করে এসেছে। জমিয়ে গল্প বলছে কিসলিঙ, তার প্রকাণ্ড নাক, পুরু ঠোঁট, বড় বড় কাণ, কপাল সব টক্‌টকে লাল হয়ে উঠেছে।

"বার্লিন! বাবা! সহজেই সেখানে একটা নরক গড়ে তোলা যায়। আঃ! আঁতোয়েন, আমাকে একটা পাকা কইনাগ (মদ) দাও ভাই! সব কাণ্ড বল্‌তে গেলে আমার ও না হলে চলবে না। প্রথমে এইটুকু শোনো! পৌঁছেই ত' একটা হোটেল ঠিক করা গেল। ঘরের জন্য দরাদরি করলাম। জিনিষপত্র রেখে বেড়াতে বেরোলাম। পথে ডিনার সারলাম, তার পর ক্লান্ত হয়ে হোটেলে ফিরতে গিয়ে দেখি হোটলের নাম ভুলে গেছি, এমন কি রাস্তার নামটাও। হেসে মনে মনে বল্‌লাম—এখন কোনো পথচলা বিলাসিনীর সঙ্গ নেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

'বার্লিনে ও-সব প্রচুর পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় অবশ্য। যাই হোক, টিয়ারগার্টেনের কাছে ত' একটা দেখা গেল। মেয়েটির ঢঙ-ঢাঙ আর সকলের চেয়ে ভালো, বেশ লম্বা, পরনে কালো পোষাক, হাতের কব্জি সরু। আমার দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে। পকেট থেকে হাত না বার করে আমিও তাকিয়ে থাকি। কথা বলি—দর জানতে চাইলাম।

'এক ডলার।'

"বেশ! এক ডলারই দেব।'

"ওখানে এসব ব্যাপার ডলারের হিসাবেই চলে। ওয়ারশ'র বেশ্যাপল্লীতেও এই রীতি। ও—লা! চমৎকার মেয়ে সব। মনে হবে যেন একেবারে রাইও থেকে সোজা এসেছে। সাড়ে তিন ফ্রাঁ দিলে কোকেন ইত্যাদি সহ কি চমৎকারই না কাটানো যায়, ওরা সঙ্গে আবার কফিও দেয়। চমৎকার! যাক এখন বার্লিনের কথা বলা যাক্। আমি ত' মেয়েটার সঙ্গে গেলাম। সাদাসিধে ঠাণ্ডা ধরণের ঘর। যাই হোক, আমি ত' তাকে নিরাবরণ করলাম—কি অভিজাত গড়ন! সহসা চমকে উঠলাম—পোলিস ভাষায় গাল দিলাম।

"সে বলল···'আপনি বুঝি পোল?'

"হ্যাঁ···আর তুমি বুঝি পুরুষ?"

"তার পর কথা বলে চলি, আমি হলাম শিল্পী, সুতরাং সব কিছুই সহজ চিত্তে গ্রহণ করা উচিত। তার পর সেই মেয়ে বা পুরুষ আমাকে একটা কাফেতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালো। বেশ তাই হোক্।

"একটা বাড়িতে এলাম, জানলাগুলো বন্ধ। একটা উঠান পার হয়ে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠি। ধোঁয়া, আলো, জাজ ব্যাণ্ড—আর ভেতরে একটা লম্বা ঘর, দেখি যুগলে যুগলে সেখানে হয় নাচছে বা মদ টান্‌ছে।

"আমার সঙ্গী বলে ওঠে—'হ্যালো, টি টি, লু লু, টো টো, লো লো—এই বলে আমাকে পরিচিত করার সময় আবার চুমাও খেল। আমি আর কি করি, মুখটা মুছে নিই, আর চেয়ে দেখি। দেখি, এই সব শীর্ণদেহা রমণীবৃন্দ যাঁরা নাচছেন, সকলের অঙ্গে কালো পোষাক, ফ্রাউ ফন্ পম্পাডোরের দল—সবাই আমার সঙ্গীর সমগোত্রীয়, অর্থাৎ সবাই পুরুষ। এদের নাম সোনিয়া। আমি চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের দুটি স্থূলাঙ্গ জার্মাণের কাছ ঘেঁষে বসলাম,

এরা হ'ল জাত বীয়ার টা নিয়ে, বীয়ার টান্‌ছে আর রাশিয়ান ভঙ্গীতে পরস্পর মুখ-চুম্বন করছে। সাম্‌নে, পেছনে, আশে-পাশে সর্বত্র এই কাণ্ড। আমার সামনে এক পাত্র বীয়ার রেখে গেল, আর একটা দেশলাই। তার দাম একেবারে আকাশ ফাটানো। সবাইকার সামনেই দেখি দেশলাই বাক্স, তাই বিনা বাক্যব্যয়ে দাম দিয়ে দেশলাই বাক্স খুলে দেখি তাতে কাঠি নেই, আছে চমৎকার সুগন্ধি পাউডার। বহুত আচ্ছা! তাই পকেটে রাখলাম। আমি ট্যাঙ্গো নৃত্যের তালে লোনিয়াকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে বল্‌লাম। এই ভাবে সব ক'টি নাইট ক্লাব ঘুরলাম। লি বেরুথ কাফে—একেবারে আধুনিক ঢঙের। থিয়েটার আর্টিষ্ট, সালিয়াপিনের ছেলে এখানে গান করে। মোটা গলা—তা ছাড়া দেখা গেল বার্লিনের দু'জন বিদগ্ধ ব্যক্তি, ফ্রানেজ মল্লিসাস্‌, আসটা নিলসেন। সঙ্গে একটি গ্রে-হাউণ্ড কুকুর, পকেটে চেন-বাঁধা ঘড়ি।

"পাঁচ মিনিট ট্যাক্সিতে কাটল—তার পর ব্লাউ-ভোগেল, নীলপাখীর আড্ডা। ছোট টেবল—কালো দেওয়াল, কালো মেঝে, বীভৎস আকৃতির বামনরা কালো কাচের গ্লাস নিয়ে এল, কোনো সার্কাসের দল থেকে এদের সংগ্রহ করা হয়েছে। সেখানে অগম্যাগমনের নমুনা হিসাবে এদের দেখানো হ'ত। তারাও নানা রকম গল্প বলে, সত্য-মিথ্যা যা খুসী বলে।

"এইখানেই পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা। ওরা সবে তখন রোমানিশস্‌ কাফে থেকে ফিরছে। সব পুরানো মঁ পারনশীয় পাপীর দল। যুদ্ধের আগে এরা সব ডোমে এসে আড্ডা জমাত। রুডল্‌ফ, লেডী ম্যাটিসে ষ্টুডিয়োর সেই ওস্তাদ, কবি আইসেনলোর, ইভাঁর সঙ্গে তার কাণ্ড মনে আছে, মেয়েটা ত' উন্মাদাশ্রমে মারা গেল শেষ পর্যন্ত। ইতালীয় ভাস্কর ডি ফিওরি, পরে উরটেমবের্গ বৈমানিক দলে নাম লিখিয়েছিল। আঁদ্রিভা আর্চিপেঙ্কো, গণৎকার আয়তাভাল,—একেবারে নরক গুল্‌জার।

"সবাই ত' আমাকে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

"ও কিস্‌লিঙ! ন' নম্বর বাড়ির চৌকীদারণী কেমন আছে? আর পথের ধারের মুদীটার বউ? আচ্ছা ওয়েটার আঁদ্রে কেমন আছে, তার কাছে এখনও একশো ফ্রাঁ ধার রয়েছে আমার।—আর ডোম? ডোমের কথাই যখন উঠল—এক কাপ কফি-ক্রীমের দাম কত এখন? আবার কি প্যারী দেখতে পাবো? ঐ কোণটা যে আমাদের কাছে কি ছিল ভাই। যদিও সামনের ঐ বেয়াড়া ডাক্তারখানাটা ছিল তবু,—"Caligari"র লেখক ক্রোলোর সঙ্গে দেখা হয়? শুনেছি নাকি ডষ্টয়ভস্কির 'ইডিয়ট' বইটির ভাবানুবাদ করছে..."

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ—ভবানী মুখোপাধ্যায়

বারীন্দ্রনাথ দাশ

অজানা আর অচেনা অনেক মেয়েরই গল্প শুনেছেন অনেকের কাছ থেকে। আজ শুনুন আপনার একটি চেনা মেয়ের গল্প।

কাজের ভিড়ে ঠাসাঠাসি সারা দিনের শেষে আজ এই সন্ধ্যেবেলা একটু সকাল করেই ঘুমের আমেজ নেমেছে আপনার চোখে। কিন্তু ওধারে রান্না শেষ হয়নি এখনো। নিরুপায় বোধ করলেন আপনি। রুটিন-বাঁধা সংসারের পাঁচীল ডিঙিয়ে ছুটে পালাতে চাইলো আপনার মন, সেই কম বয়েসের সবুজ দিনগুলোর খোলা মাঠে, হারিয়ে যেতে চাইলো হারানো স্মৃতিগুলোর বন-বাদাড়ে। খোলা জানালা দিয়ে অলস চোখের চাউনী ভাসিয়ে দিলেন বাইরের আধো-আবছায়া অন্ধকারে, ভাবলেন একটুখানি—কি যেন ছিলো সেই চেনা মেয়েটির নাম······?

ধরে নিন বাঙলা দেশের আর পাঁচ-দশটা সোহাগী মেয়ের মতো তার নাম ছিলো রাণী। থাকতো আপনার বাড়ীর দু'তলার ফ্ল্যাটে, পড়তো আপনার ছোটো বোনের সঙ্গে আর গল্পের বই নিতে আসতো আপনার কাছে। আর জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতো, যখন আপনার বাড়ীর সামনের পথ দিয়ে খুব স্মার্ট হয়ে হেঁটে যেতো নতুন কলেজে ভর্তি হওয়া ভিন পাড়ার ছেলেরা।

তাকে আপনি চিনতেন সেই ছেলেবেলা থেকে, যখন সে আর আপনার বোন হাতের উপর হাত চিমটি কেটে ধরে উপর-নীচে দোলাতে দোলাতে ছড়া কাটতো: ইকড়ি মিকড়ি চামচিকে···, যার পরের লাইনগুলো আপনার আজ আর মনে নেই। সেই ফ্রক-পরা আর মাথার দু'পাশে ছোটো দুটো বিনুনীর ডগায় লাল সাটিনের বো্ও বাঁধা মেয়েটি যখন গানের মাষ্টারের সামনে বসে অত্যন্ত সরু রিনরিনে গলায় সা রে-গা মা-পা-ধা-নি-সা করে গলা সাধতে সুরু করলো কোনো এক অতি সুদূর শ্বশুরবাড়ীর প্রত্যাশায়, আপনার তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা সামনে।

তার পর কখন আপনি ম্যাট্রিক পাশ করে গেলেন, আই-এ পাশ করলেন, বি-এ পাশ করলেন, হয়তো বা এম-এটিও, আপনার খেয়াল নেই। কিছুদিন বাড়ী বসে রইলেন চুপচাপ একটি ভালো কাজ পাওয়ার প্রত্যাশায়; তখন একদিন টক করে মনে হোলো, তাইতো, বড়ো ভালো ছেলের মতো পড়াশুনোই করেছেন এই ক'টা বছর, আশে-পাশে ভালো করে তাকিয়ে দেখেননি, জীবনের কতোখানি কলেজ স্ট্রীটের জনতার মতো ভ্রমজমিয়ে চলে গেছে আপনার পাশ কাটিয়ে, তাও খেয়াল নেই। সেই মধুর আক্ষেপের মধ্যে একদিন হঠাৎ লক্ষ্য করলেন—আরে? কতো বড়ো হয়ে গেছে ওই বাচ্চা মেয়েটি, যার নাম রাণী। চমৎকার রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইছে সে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেবেলা, আর গাইছে খেয়াল, ঠুংরী, ভজন।

"রাণী বেশ গান গাইতে শিখেছে তো!" আপনি একদিন বললেন আপনার বোনকে।

আপনার বোন ময়দা ঠাসতে ঠাসতে বলল, "ও মা, জানো না বুঝি, ও কতো মেডেল আর কাপ পেয়েছে গান গেয়ে! কম্পিটিশানে ফার্ষ্ট হয়েছে কতো বার। রেডিওতে গান গাইছে আজকাল। দু'খানা গানের রেকর্ডও করেছে। তুমি কোনো খবরই রাখো না বুঝি?"

আপনি নিজের অজ্ঞতার সাফাই গাইতে গিয়ে যা বললেন, তার সার মর্ম হোলো—এ সব তুচ্ছ বিষয়ের খবর রাখবার অবকাশ আপনার কোথায়? সকাল বেলা পড়াশুনো, দুপুরে কলেজ, সন্ধ্যেবেলা বন্ধুর বাড়ী আড্ডা, এ সব করে কোনো দিন রাত ন'টা সাড়ে ন'টার আগে বাড়ী ফেরেননি, কলেজের দু'চারটি চেনা মেয়ের খোঁজ-খবর রেখে কূল-কিনারা পাননি, রাণীর ঠাঁই কোথায় আপনার মনের ঢেউ-টলমলো দরিয়ায়? এর মধ্যে আর সেই প্যাকাটি মেয়ে রাণীর খবর কে রাখে? আর এমন কি মস্তো বড়ো গাইয়ে সে, যে কোথায় গান গেয়ে সে প্রাইজ পাচ্ছে আর এনকোর পাচ্ছে আর হাততালি পাচ্ছে আর প্রোগ্রাম পাচ্ছে রেডিওতে সে সব খবর রাখতে হবে আপনাকে?

বন্ধুর প্রতি এই তাচ্ছিল্য আপনার মেজাজী বোনটির সহ্য হোলো না। "এমন কি মস্তো বড়ো গাইয়ে? আচ্ছা, দাঁড়াও, বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমায়," বলে দুম-দাম করে নীচে নেমে গেল সে, আর একটু পরেই ফিরে এলো রাণীকে সঙ্গে নিয়ে।

সে দিন আপনি প্রথম রাণীর সামনা-সামনি বসে ওর গান শুনলেন। এপ্রিল সন্ধ্যার আকাশে তখন শুক্লা চতুর্থীর এক ফালি চাঁদ উঠেছে সামনের বাড়ীর ছাদের ওপারে। পর পর তিনটি গান গাইলো রাণী—ধানী, বসন্ত আর জয়জয়ন্তী। আর আপনি বসে ভাবলেন, সেদিনকার সেই ছোট্টো মেয়ে রাণী! যার চুলের দু'পাশের ছোট্টো দুটো বিনুনীতে থাকতো দুটো লাল সাটিনের বো্‌ও, আজ এ রকম ভালো গান গাইছে সে? একটু হাসির ঢেউ খেলে গেল আপনার ঠোঁটের কোণে। রাণী চোখ মেলে দেখলো সেই হাসিটি। কি ভাবলো কে জানে! নামিয়ে নিলো তার চোখ দুটি।

আপনার বোন চা আনতে গেল আপনাদের জন্তে, ভালোমানুষ ভায়েদের দুষ্টু বোনেদের মতো, রাণীর কাছে আপনাকে একলা রেখে।

রাণী কোনো কথা বলল না। আপনিও কোনো কথা বললেন না। একটু অসোয়াস্তি বোধ করলেন আপনি।

জিজ্ঞেস করলেন, "আমার কাছে গল্পের বই নিতে আসো না কেন?"

জিজ্ঞেস করেই লজ্জা পেলেন মনে মনে। রাণীর মতো মেয়ের কাছে বসে আপনার মতো একটি স্মার্ট ছেলে এ রকম বোকার মতো প্রশ্ন করছে? কী আশ্চর্য!

রাণী বলল, "আপনি তো বাড়ী থাকেন না বড়ো একটা। আমি এসে মামীমাকে বলে আপনার আলমারী খুলে বই নিয়ে যাই মাঝে মাঝে।"

"বেশ বেশ!" আপনি খুশি হয়ে বললেন, তার পর ভেবেই পেলেন না, এতে এতো খুশি হওয়ার কি আছে।

তার পর কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ। আপনি অসোয়াস্তি বোধ করলেন, মেয়েদের সঙ্গে আপনি যে ...
কলেজে প্রচুর মেয়ে-বন্ধু ছিলো ...
বা সহপাঠিনী কেউ ...
না আপনা...
বুঝক

রাণী চুপচাপ শুনে গেল, নিলো বই দু'খানি।

আপনার কথার খেই হারিয়ে গেল আবার। আর কি বলবেন ভেবে পেলেন না। রাগ হোলো আপনার বোনের উপর। পোড়ারমুখী মেয়েটা এখনো চা আনছে না কেন? বলতে তো একটা কিছু হবেই। চুপচাপ বসে থাকা ভালো দেখায় না।

বললেন, "বই দুটো পড়া হয়ে গেলে আবার ফিরিয়ে দিও।"

বলে আপশোষ করতে লাগলেন মনে মনে, এ রকম বোকার মতো কথা তো আপনার মুখ থেকে বেরোয়নি আর কোনো দিন। বই দুটো ও ফিরিয়ে দেবে না তো কি নিজের আলমারীতে তুলে রেখে দেবে, আপনি যা করে থাকেন বন্ধুদের কাছ থেকে বই চেয়ে নিয়ে এসে?

রাণী একটু গম্ভীর মেয়ে, তার চোখে মুখেও এবার হাসি ঝিলমিল্ করে উঠলো।

দুরু-দুরু করে উঠলো আপনার বুক।

রাণী মুখ টিপে হেসে বলল, "আপনার হাতে হাতেই ফিরিয়ে দেবো কি?"

জীবনে প্রথম আপনার মুখ রাঙা হয়ে উঠলো।

চা নিয়ে আপনার বোন যখন ফিরে এলো তখন রাণী আর একটি গান ধরেছে হিন্দোল রাগে।

* * * *

সে দিন থেকে একটি নতুন অভ্যেস এলো আপনার জীবনে। বই কেনার অভ্যেস। এ্যাদ্দিন কিনে পড়েননি কোনো বই। আপনার বইগুলো বেশীর ভাগই আপনা...
পড়তে চেয়ে এ...
মলাটে আর ...
আপনার
থেকে গ...

স্কুলের পড়া মুখস্থ করতে লাগলো আপনার ছোটো ভাইঝিটি। আগের মতোই ব্রিজের আড্ডা বসতে লাগলো সামনের বাড়ীর মেসে, পাশের বাড়ী থেকে ভেসে আসতে লাগলো স্বামি-স্ত্রীর কোমল কলহ। সকাল বেলা কলেজের বাসে চেপে কলেজ করে গেল এ-বাড়ী ও-বাড়ীর মেয়েরা। আগেরই মতো রাণীর যা-কিছু গল্পসল্প করা আপনার বোনের সঙ্গেই, অন্য ঘরে বসে, আপনার চোখের আড়ালে, আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে খুব বেশী অবহিত না হয়ে। আগেরই মতো প্রত্যেক দিন সন্ধ্যে বেলা রাণীর গান, আর ওর মাষ্টারের তবলা-সঙ্গত। শুধু দু'-এক দিন পর পর আপনার বোনের সঙ্গে গল্প করে নীচে নেমে যাওয়ার আগে একবার আপনার ঘরে এসে আলমারীটি খুলে বই পেড়ে নিয়ে চলে যাওয়া। আপনার সঙ্গে কোনো কথা নয়। নেহাত যদি আপনি জিজ্ঞেস করলেন, কি রাণী, কি খবর তোমার, তখন শুধু একটুখানি হেসে একটি ছোটো উত্তর, "ভালো।" ব্যস্, আর কিছু নয়।

এক দিন সন্ধ্যেবেলা দেখলেন রাণী বেরুচ্ছে আর এক জনের সঙ্গে। ছেলেটিকে আপনি চেনেন, সে ওর বৌদির ভাই। আপনি তখন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন। ওরা নামছে, ওরা সরে দাঁড়িয়ে আপনাকে পথ ছেড়ে দিলো। আপনি চিরদিনকার মতো দাদাসুলভ গাম্ভীর্যে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় চললে এত সেজেগুজে?"

রাণী একটু হেসে বলল, "সিনেমায়।"

আপনি উঠে এলেন। জামা-কাপড় ছেড়ে ইজিচেয়ারটি টেনে নিয়ে বসলেন বাইরের বারান্দায়। আকাশে তখন কি ফুটফুটে জ্যোৎস্না! নীচের ফ্ল্যাট স্তব্ধ। কেউ নেই তানপুরো পেড়ে গান ...সামনের বাড়ীর মেসে ব্রিজের আসর সরগরম। হঠাৎ ...না। রাণী সিনেমায় ...সঙ্গে? আমি ...র হাসলেন ...আক্ষেপ ...সিনেমায়

আপনার মনে পড়লো বোনের সঙ্গে রাণীর দেখা হবেই। আপনার প্রসঙ্গও উঠতে পারে। উত্তর দিলেন, "সিনেমায়।"

তার পরদিন বইয়ের দোকান থেকে আগে অর্ডার দেওয়া যে বইটি আপনার কাছে এলো, তাতে আর নাম লিখলেন না। ফাঁকই পড়ে রইলো প্রথম পাতাটি।

রাত্তিরে বাড়ী ফিরতে বোন বলল, "আলমারীটা চাবি বন্ধ করে গেলে কেন? রাণী আজ বই নিতে এসেছিলো। আলমারী থেকে বই নিতে না পেরে টেবিলের ওপর থেকে ওই নতুন বইটি নিয়ে গেছে।"

তার পরদিন বাড়ী ফিরলেন অনেক রাত্তিরে। খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে ঢুকে দেখলেন সেই নতুন বইটি পড়ে আছে আপনার টেবিলে। রাণী পড়ে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।

আপনি আনমনে বইটি তুলে নিলেন। ওল্টালেন রঙিন ঝকঝকে মলাটখানি। হঠাৎ দেখলেন, এ কি, বইয়ের প্রথম পাতাটি আর ফাঁকা নেই। পাতা জুড়ে আপনার নাম, চার বার পাঁচ বার লেখা। রাণীই লিখে দিয়েছে আপনার নাম।

হঠাৎ বুঝতে-না-পারা খুশির বন্যা এলো আপনার মনে। বইটি রেখে দিয়ে আপনি চুপচাপ গিয়ে দাঁড়ালেন অন্ধকার বারান্দায়। দক্ষিণের হাওয়া তখন এ বাড়ী ও বাড়ীর ছাদে ছাদে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অস্ফুট শানাই বাজছে দূরে কোন্ এক বাড়ীর রেডিওতে। বেল ঠুনঠুনিয়ে অলস রিক্শ হেঁটে গেল বাড়ীর সামনের পথ দিয়ে। দূরে মন্থর হয়ে এলো ডিপোয় ফিরে যাওয়া ট্রামের চক্রনির্ঘোষ। নিঝুম হয়ে এলো আশে-পাশের বাড়ীগুলো। একটার পর একটা আলো নিবে গেল এ জানালার পর সে জানালায়। স্তিমিত হয়ে এলো রাস্তার নীল গ্যাসের আলো।

আর আপনার কানে ভেসে এলো একটি নরম গানের সুর। নীচের বারান্দায় গুনগুনিয়ে দরবারী কানাড়ার আলাপ ধরেছে রাণী নামে সেই মেয়েটি।

আকাশে মেঘের মিছিল বয়ে গেল চাঁদের পাশ কাটিয়ে, ...দের কলেজ-ছুটি-হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের জনতার মতো। ...ঢং ঢং করে বারোটা বাজলো। তার পর ...আপনার খেয়াল নেই কখন ...বাড়ীর স্বামি-স্ত্রীর ...র অস্ফুট

শুধু একবার চোখ তুলে তাকানো, আর রাণীর মুখে চিরদিনকার সেই স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য।

কিন্তু সন্ধ্যের পর নীচের ঘর থেকে ভেসে-আসা গানের সুরে সুরে যেন ভেসে আসতো আপনার চোখের চাউনীতে জানানো প্রত্যেকটি মৌন প্রশ্নের সুরেলা উত্তর। গানের ভাষায়, সুরের গমকে, তানে আর বিস্তারে মনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি অনুভূতির বিচিত্র প্রকাশ অনুরাগের মুখর মাধুর্য নিয়ে। আপনার মনে আর ওর মনে কোথায় যেন সুর মেলানো। এই মিলটুকু অনুভব করেই মন ভরে উঠতো আপনার, মন ভরে উঠতো রাণীরও। দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে দেখাশোনায় আর কোনো কথা বলার প্রয়োজন মনে হোতো না।

তার পর একদিন বৃষ্টি-ঝমঝমানো দুপুর বেলা আপনার মনে হোলো আপনার ঘরখানি শুধু আপনাকে নিয়ে বড্ডো নিরালা, বড্ডো ফাঁকা, বড়ো নিঃসঙ্গ।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা রাণী আপনার ঘরে বই নিতে ঢুকতেই আপনি আস্তে আস্তে ডাকলেন, "রাণী!"

এ নাম ধরে এমনি ভাবে ডাকা রাণী শোনেনি আগে কোনো দিন। সে ফিরে দাঁড়ালো। আপনি নিজের বুকের স্পন্দনে যেন অনুভব করলেন ওর বুকের দ্রুত ওঠা-নামা।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বাবাকে বলবো?"

রাণী উত্তর দিলো খুব মৃদু গলায়। বলল, "বোলো।"

আপনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মত আছে?"

রাণী বলল, "হ্যাঁ।"

বেরুনোর মুখে সে ফিরে দাঁড়ালো একটুখানি। জিজ্ঞেস করলো, "কবে বলবে?"

আপনি বললেন, "কালই বলবো। সন্ধ্যেবেলা।"

রাণী চলে গেল।

আপনার চোখে ঘুম এলো না সে রাত্তিরে। বাইরে ঝোড়ো হাওয়া। আকাশে ঘন ঘন বিজলী। সারা রাত ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি। ঘরের ভিতর আপনি জেগে।

মনে হোলো যেন নীচের ফ্ল্যাটে রাণীও জেগে আছে।

মেঘলা ছিলো তার পরের দিনটিও। সারা দুপুর আপনি বসে প্ল্যান করলেন কি করে কথাটি তোলা যায় রাণীর বাবার কাছে। রাণীর বাবার সঙ্গে আপনাদের বেশ সদ্ভাব আছে। আপনারা বহুদিনকার প্রতিবেশী। আপনার হাফ-প্যাণ্ট-পরা দিনগুলি থেকেই তিনি আপনাকে দেখে আসছেন। উনি বেশ পছন্দ করেন আপনাকে। কিন্তু কি জানি, বিয়ের প্রস্তাব উনি কি ভাবে নেন, আপনি ভাবলেন। আপনি তখনো কাজকর্ম কিছু পাননি, বেকার বসে আছেন বাড়ীতে। বিয়ের বাজারে আপনার এমন কিছু দর নেই।

তবে রাণীর বাবা লোকটি বেশ ভদ্র। বেশ সহানুভূতিশীল। খুব ভালোবাসেন মেয়েকে। মেয়ে যদি আপনাকে বিয়ে করে সুখী হয় তিনি আপত্তি না-ও করতে পারেন। সেটুকুই আপনার ভরসা। কিন্তু কথাটি পাড়বেন কি ভাবে? ভাবতে ভাবতে মাথা ধরে গেল আপনার। অফিস থেকে ফিরে এসে ভদ্রলোক হাত-মুখ ধুয়ে জল-টল খেয়ে বাইরের ঘরে বসে গড়গড়া টানেন। মানুষের মেজাজ সব চেয়ে ভালো থাকে সে সময়। ভাবলেন, কথাটি পাড়বার জন্যে সে সময়ই সব চেয়ে প্রশস্ত। সন্ধ্যের পর রাস্তা দিয়ে সোরগোল করে যখন চলে যাবে খেলার শেষে বাড়ীমুখো ছেলেরা আর নীচের ফ্ল্যাট থেকে ভেসে আসবে গড়গড়ার মৃদু আওয়াজ, আপনি নীচে নেমে যাবেন আস্তে আস্তে। ঢুকে পড়বেন ঘরের ভিতর। তিনি আপনাকে দেখে খুশি হবেন। চা আসবে আপনার জন্যে। এ কথা সে কথার পর রাণীর গানের প্রসঙ্গ তুলবেন আপনি। বাপের মুখে মেয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনবেন। নিজে তিন ডবল প্রশংসা করবেন। তার পর কথায় কথায় জানতে চাইবেন তিনি ওর বিয়ে-থা দেওয়ার চেষ্টা করছেন কি না।

"ভালো ছেলে পাচ্ছি কোথায়?" তিনি বলবেন অন্য সব মেয়ের বাপদের মতো। "খুঁজে-টুজে একটা দাও না হে," তিনি বলবেন আপনাকে।

আপনি একটু অনাসক্ত ভাবে বলবেন, "আমি অবশ্যি একটি ছেলেকে জানি, যাকে রাণীরও নিশ্চয় খুব পছন্দ হবে।"

"কে সে? কে সে? কে সে?" জিজ্ঞেস করবেন রাণীর ভালোমানুষ বাবা।

আপনি বলবেন, "ছেলেটিকে আপনি হয়তো চেনেন। ওর বাবার নাম হোলো—" বলে একটু থেমে যে নামটি আপনি বলবেন সেটি আপনারই বাবার নাম। তার পর এসপার ওসপার যা' হয় হবে।

সন্ধেবেলা বড়ো মেঘলা সেদিন, আসন্ন বৃষ্টির প্রত্যাশায় থমথমে হয়ে আছে। দমকা হাওয়া নাড়া দিয়ে যাচ্ছে দরজা আর জানালাগুলো। নীচের ফ্ল্যাটে দেশমল্লারে গান ধরলো রাণী নামে সেই মেয়েটি।

আপনি শুনলেন চুপচাপ বসে। গানের স্নিগ্ধ ছোঁয়ায় আপনার মন থেকে মুছে গেল সমস্ত আশঙ্কাময় কুণ্ঠা। গান শেষ হতে আপনি আস্তে আস্তে নেমে এলেন রাণীদের ফ্ল্যাটে।

বাইরের দরজাটা খোলা। ঘরে ঢুকলেন আপনি। ঢুকে দেখলেন, রাণীর বাবা নেই সে ঘরে, গড়গড়াটি পড়ে আছে কৌচের পাশে। উনি বোধ হয় উঠে গেছেন কোথাও।—কিন্তু পাশের চেয়ারে বসে আছে আরেক জন। সে অচেনা নয় আপনার। স্কুলে পড়তো আপনার দু'-এক ক্লাস উপরে। একজন বিখ্যাত এটর্ণীর ছেলে। এখন ব্যারিষ্টারি করে হাইকোর্টে। বেশ পশার জমিয়েছে এরই মধ্যে।

"তুমি এখানে?" আপনি জিজ্ঞেস করলেন।

"আমিও তোমায় সে কথাই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম," সে বলল।

ওর কাছে আপনি জানলেন ব্যাপারটা। সে এসেছিলো কাছাকাছি কা'দের বাড়ীতে। সেখানে বসে শুনেছে রাণীর গান। শুনেই স্থির করেছে এ মেয়ে কানা হোক, খোঁড়া হোক, কুৎসিত হোক, যাই হোক, একে বিয়ে করবেই। মন স্থির করে সোজা উঠে এসেছে এ বাড়ীতে, মেয়ের বাপের সঙ্গে কথা বলতে।

"দেখা হয়েছে ওর বাপের সঙ্গে?" আপনি জিজ্ঞেস করলেন।

"না। ঢুকে দেখি কেউ নেই। একটি ছোকরা চাকরকে দেখে এই মাত্র খবর পাঠালাম," সে বলল।

আপনি চুপচাপ ভেবে নিলেন দু'-একটি কথা। এর পাশে আপনার সম্ভাবনা কতোখানি? এটর্ণীর ছেলে, নিজে ব্যারিষ্টার, তার ভবিষ্যৎ জানতে জ্যোতিষীর দরকার হয় না।

আর আপনি? আপনি একটি অতি সাধারণ ছেলে আর পাঁচ-দশটা বাঙালী ছেলের মতো, সবে পাশ করে বেরিয়েছেন, আপনার ভবিষ্যৎ ভৃগু মুনিও লিখে রেখে গেছেন কি না সন্দেহ!

বাইরের ঝড়ের মতো ঝড় উঠলো আপনার মনে। মুখে আপনি কি বলে চললেন, আপনার হুঁশ নেই, কিন্তু মনে মনে ভাবছেন অন্য কথা।

এমন সময় বেরিয়ে এলেন রাণীর বাবা। ব্যারিষ্টার ছেলেটি মুখ খুলবার আগেই আপনি আলাপ করিয়ে দিলেন। বললেন, এ আমার বন্ধু। অমুকের ছেলে। হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার।

রাণীর বাবা বেশ জমিয়ে লোক। গল্প জুড়ে দিলেন আপনাদের সঙ্গে। চা এলো আপনাদের জন্যে।

আপনি আপনার বন্ধুকে কোনো কথা বলবারই অবকাশ দিলেন না। নিজেই কথা বলে চললেন অনর্গল। আস্তে আস্তে রাণীর সঙ্গীত-চর্চার প্রসঙ্গ তুললেন। বাপের মুখে মেয়ের উচ্ছসিত প্রশংসা শুনলেন। নিজে তার তিন ডবল প্রশংসা করলেন। তার পর কথায় কথায় জানতে চাইলেন তিনি ওর বিয়ে-থা দেওয়ার চেষ্টা করছেন কি না।

"ভালো ছেলে পাচ্ছি কোথায়?" তিনি বললেন অন্য সব মেয়ের বাপদের মতো। "খুঁজে-টুজে একটি দাও না হে," তিনি বললেন আপনাকে।

আপনার মনে ঝড় তখন উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

আপনি একটু অনাসক্ত ভাবে বললেন, "আমি অবশ্যি একটি ছেলেকে জানি, যাকে রাণীরও নিশ্চয়ই খুব পছন্দ হবে।"

"কে সে? কে সে? কে সে!" জিজ্ঞেস করলেন রাণীর ভালোমানুষ বাবা।

আপনার মনের ঝড় তখন উন্মাদ হয়ে হৃদয়ের শেকড় উপড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে।

তার পর ঝড় থেমে গেল হঠাৎ। যে বিপুল সমস্যায় বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিলো আপনার মন, তার একটি সমাধান এসে গেল ঝড়ের শেষের স্নিগ্ধ হিমেল প্রশান্ত স্তব্ধতার মতো।

আপনি আস্তে আস্তে বললেন, "ছেলেটিকে আপনি জানেন, বেশ ভালো ছেলে, ওর বাবার নাম হোলো—" বলে একটু থেমে যে নামটি আপনি বললেন সেটি আপনার ব্যারিষ্টার বন্ধুটির এটর্ণী বাবার নাম।

* * * *

সেদিন রাত্তিরে খুব সকাল সকাল শুয়ে পড়লেন আপনি, ঘুমুতে যাওয়ার আগে একবার শুধু ভাবলেন, "যাক্ রাণী তো সুখী হবে। ও রকম ভালো সম্বন্ধ ওর বাবা কোনো দিন কল্পনাও করতে পারেননি," ভালোবাসার পাত্রীর জন্যে নিজের থেকে এত বড়ো একটি ত্যাগ স্বীকার করে খুব আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন আপনি, নিজের কথা কিছুতেই ভাবলেন না। বাইরে তখন তুফান বইছে। ভীষণ বৃষ্টি, চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়লেন আপনি। এক বারও ভেবে দেখলেন না নীচের ফ্ল্যাটে রাণী জেগে আছে না ঘুমিয়ে আছে।

তার পরদিন একটা না একটা কাজ নিয়ে মেতে রইলেন সারা দিন, ঘর সাফ করা, বই-পত্তর গুছোনো—এ-সব কিছু। একটুও অবসর দিলেন না নিজের মনকে কোনো কিছু ভাববার, কিন্তু সন্ধ্যের পর আপনার বোনের সঙ্গে গল্প করে চলে যাওয়ার আগে রাণী যখন আপনার কাছে আর বই নিতে এলো না, সোজা নেমে চলে গেল, আপনার আর কাজে মন বসলো না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন বারান্দায়। কেটে গেল অনেকক্ষণ, চাঁদ উঠলো শ্রাবণের মেঘের ফাঁকে ফাঁকে। দূরের বস্তী থেকে ভেসে এলো পশ্চিমা মজুরদের সমবেত কণ্ঠের গান। আপনার ভালো লাগলো না কিছুই, কিসের যেন অভাব মনে হোলো। নীচের ফ্ল্যাট স্তব্ধ। তানপুরো নিয়ে কেউ গান গাইছে না সেখানে।

আপনি আর দাঁড়াতে পারলেন না। সোজা নীচে নেমে গেলেন, গিয়ে দেখেন পাটির উপর তানপুরোটি রেখে রাণী চুপচাপ বসে আছে।

সে চোখ তুলে তাকালো আপনার দিকে।

"আজ গান গাইছো না যে?" আপনি জিজ্ঞেস করলেন।

সে উত্তর দিলো না।

আপনি আস্তে আস্তে বললেন, "তুমি আমার উপর রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি! আমি তোমায় সুখী করতে চাই বলেই এ রকম করলাম।"

রাণী এবারও কোনো উত্তর দিলো না।

আপনি উঠে চলে এলেন, নিজের ঘরে এসে পায়চারী করতে লাগলেন অস্থির হয়ে। মনে হোলো যেন আপনার সত্যিই ভুল হয়ে গেছে। ঝোঁকের মাথায় আপনার উচিত হয়নি ব্যারিষ্টার ছেলেটির জন্যে বিয়ের কথা তোলা রাণীর বাবার কাছে।

"কেন এ রকম ভুল করলাম," ভাবলেন বার বার।

এক দিন কেটে গেল, দু'দিন কেটে গেল, তিন দিন কেটে গেল। চার দিনের দিন রাণী এলো আপনার কাছে। এসে বলল, "বাবা বিয়ের কথা পাকাপাকি করে ফেলেছেন। তুমি কি চাও আমি গলায় দড়ি দিই?"

আপনি বললেন, "আমি কি করবো বলো?"

"সে আমি জানি না," রাণী বলল, "যা' হোক একটা কিছু করো। আমি ওই ছেলেটিকে বিয়ে করতে পারবো না, সে ব্যারিষ্টারই হোক আর জজই হোক।"

আপনি ভাবলেন অনেকক্ষণ, তার পর বললেন, "কিন্তু করবার আর কি আছে, এখন তোমার বাবাকে গিয়ে বললে উনি কি শুনবেন?"

রাণী চুপ করে বসে রইলো অনেকক্ষণ। তার পর আস্তে আস্তে বলল, "চলো, আমরা কোথাও পালিয়ে যাই।"

আপনার মনের দিগন্তে হুড়মুড়িয়ে মেঘ ডাকলো। এ কি বলছে রাণী!

কিন্তু রাণীকে যদি বিয়ে করতেই হয় এ ছাড়া আর কি করবার আছে? আর কোনো উপায় তো হবে না! ব্যারিষ্টার ছেলেটির সঙ্গে বিয়েটা ভাঙতে রাজি হবেন না রাণীর বাবা।

প্ল্যান ঠিক হয়ে গেল। তার পরদিনের গাড়ীতে সোজা

বাবে। আপনি গিয়ে অপেক্ষা করবেন হাওড়া ষ্টেশনে। কলেজ থেকে রাণী আর বাড়ী ফিরবে না। সোজা গিয়ে আপনার সঙ্গে মিলিত হবে হাওড়া ষ্টেশনে।

তার পরদিন আপনি ষ্টেশনে রাণীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন চারটে থেকে। সাড়ে চারটে বাজলো, পাঁচটা বাজলো—রাণীর দেখা নেই। ছ'টা বাজলো, সাতটা বাজলো—রাণীর দেখা নেই।

আটটা যখন বাজলো আপনি ভাবলেন, আর অপেক্ষা করা বৃথা। কোথাও কোনো গোলমাল হয়ে গেছে। বাড়ী ফিরে এলেন আস্তে আস্তে।

এসে প্রথমেই রাণীর খোঁজ করলেন ওদের ফ্ল্যাটে। ওর বাবা হাসিমুখে বললেন, "ওরা সবাই উপরে বসে গল্প করছে।"

উপরে বসে গল্প করছে? আপনি অবাক!

জিজ্ঞেস করলেন, "রাণী কলেজ থেকে ফিরেছে?"

প্রশ্ন শুনে রাণীর বাবা অবাক। "হ্যাঁ,—আজ তো সকাল করেই ফিরেছে। ফিরেছে সেই ছুটোর সময়। কেন?"

কোনো উত্তর না দিয়ে আপনি উঠে এলেন উপরে। এসে দেখেন বাইরের ঘরে বসে আছেন আপনার মা, বাবা, বোন, রাণী আর রাণীদের বাড়ীর মেয়েরা এবং আর দু'জন অচেনা ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা।

রাণী বেশ হাসিমুখে গল্প করছে সবার সঙ্গে। আপনার বাড়ী ফিরে আসাটা ভ্রূক্ষেপই করলো না।

আপনি চলে এলেন আপনার ঘরে।

একটু পরে আপনার বোন এসে ঢুকলো।

"দাদা, তোমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেল," সে বলল।

"মানে?" আপনি জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ," সে হাসিমুখে বলল, "সেই যে তুমি বলতে বিয়ে যদি করতে হয় তো এমন এক রাজকন্যাকে আর সঙ্গে অর্ধেক রাজত্ব আসে! যদি পুরো রাজত্ব আর অর্ধেক রাজকন্যা হয় আরও ভালো, এ কিন্তু পুরো রাজকন্যা এবং পুরো রাজত্ব, মেয়ের বাপের অগাধ পয়সা, বিষয়-সম্পত্তি। মেয়েটি তাঁর একমাত্র সন্তান। সব তুমিই পাবে।"

আপনি চুপ করে রইলেন। তার পর বললেন, "রাণীকে পাঠিয়ে দে তো।"

"দিচ্ছি," বলল আপনার বোন, "ওকে তোমার খাইয়ে দেওয়া উচিত। সেই তো তোমার বিয়ের ঠিক করে দিয়েছে। মেয়েটি কলেজে পড়ে ওর সঙ্গে।"

শুনে আপনি ধপ্ করে বসে পড়লেন চেয়ারে।

জিজ্ঞেস করলেন, "আজ সে হঠাৎ বিয়ের ঠিক করতে গেল কেন?"

"হঠাৎ হতে যাবে কেন," বলল আপনার বোন, "রাণী ওদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে আজ তিন-চার দিন ধরে।"

আপনি স্তম্ভিত!

রাণী এলো, কথা বলতে গিয়ে কথা এলো না আপনার মুখে। অভিমানে গলায় সব কথা আটকে গেল।

রাণী হেসে চুপ করে বসে রইলো একটু। তার পর বলল, "তুমি আমার উপর রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি। আমি তোমায় সুখী করতে চাই বলেই এ রকম করলাম।"

আপনার মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। মনে পড়লো ঠিক এ কথাই আপনিও সে দিন বলেছিলেন রাণীকে।

রাণী বলল, "যাকে ভালবাসি তাকে কি করে সুখী করতে হয় জানতুম না। সেটা তুমিই শিখিয়ে দিয়েছো। তোমার এ উপকার আমি জীবনে ভুলবো না।"

"আমায় ঠাট্টা করছো রাণী?" আপনি বললেন।

রাণী উত্তর দিলো না।

আপনি বললেন, "এতে কি আমি সুখী হবো? তোমার কাছ থেকে এ রকম আঘাত পাবো আমি কোনো দিন ভাবতে পারিনি।"

বিদ্যুতের শিখা ঝলসে উঠলো রাণীর চোখে। ঠোঁটের উপর ফুটে উঠলো একটুখানি বাঁকা হাসি। বলল, "আমার বেলায় এ কথা তোমার মনে পড়ে নি?"

আর দাঁড়ালো না সে।

চলে গেল।

আপনি বসে রইলেন চুপ করে।

তার পর একদিন শানাই বাজিয়ে রাণীর বিয়ে হয়ে গেল সেই ব্যারিষ্টার ছেলেটির সঙ্গে। আপনারও বিয়ে হয়ে গেল অন্য মেয়েটির সঙ্গে। বিয়ে করে আপনি অসুখী হননি, হয়তো সুখী হয়েছে রাণীও। কিন্তু আজও যখন কোনো মেয়ের তৈরী গলায় শুনতে পান খেয়াল কিম্বা ঠুংরী, আপনার মনে পড়ে যায় সে দিনের সন্ধ্যাগুলো। আজ এই ঝিমঝিমে সন্ধ্যায় ঘুমে ভারী হয়ে আসা মন নিয়ে রেডিওর পাশে বসে শুনছেন একজন কারও গান, একটু পরে হয়তো শুনবেন অন্য কারও গান। হয়তো বা শুনবেন বহু দূরে কোথায় কা'দের বাড়ীতে একটি মেয়ে গান শিখছে তার ওস্তাদের কাছে। মেয়েলি গলায়, সুরেলা গলায় দরদ-ঢালা গান আপনাকে মনে পড়িয়ে দেবে অনেক পুরোনো কথা, মনে পড়িয়ে দেবে আপনার ফেলে-আসা দিনগুলোর একটি হারানো রূপকথা, যার প্রথম লাইনটি হোলো—"এক যে ছিলো রাণী···."

সৈয়দ মুজতবা আলি

২

'গড্ডলিকা প্রবাহ' অর্থাৎ ভিড়ের সঙ্গে মানুষ গা ভাসিয়ে দেয় কেন? তাতে সুবিধে এই;—আর পাঁচ জনের যা গতি, তোমারও তাই হবে। এবং যেহেতু সংসারের আর পাঁচ জন হেসে-খেলে বেঁচে আছে, অতএব তুমিও দিব্য তাদেরই মত সুখে-দুঃখে বেঁচে থাকবে।

আর যদি গড্ডলিকায় না মিশে একলা পথে চলো তবে যেমন হঠাৎ গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে যেতে পারো ঠিক তেমনি মোড় ফিরতেই হঠাৎ হয়ত দেখতে পাবে, ব্যাঘ্রাচার্য্য-বৃহল্লাঙ্গুল থাবা পেতে সামনে বসে ন্যাজ আছড়াচ্ছেন!

গুপ্তধনটা একা পেয়েছিলে বলে সেটা যেমন তোমার একারই, ঠিক তেমনি বাঘের মোকাবেলা করতে হবে তোমাকে একাই।

তাই বেশীর ভাগ লোক সর্বনাশা ক্ষতির ভয়ে অত্যধিক লাভের লোভ না করে গড্ডলিকার সঙ্গে মিশে যায়।

জাহাজেও তাই। তুমি যদি আর পাঁচ জনের সঙ্গে ঘুম থেকে জাগো তবে সেই ভিড়ে তুমি ঝটপট তোমার 'বেড-টী'র কাপটি পাবে না। আর যদি খুব সকাল সকাল কিম্বা আর সকলের চেয়ে দেরীতে ওঠো তবে চা'টি পেয়ে যাবে তন্মুহূর্তে'ই, কিন্তু আবার কোনো দিন দেখবে, তখনো আগুন জ্বালা হয়নি বলে চায়ের অনেক দেরী কিম্বা এত দেরীতে উঠেছো যে 'বেড-টী'র পাট উঠে গিয়ে তখন 'ব্রেকফাষ্ট' আরম্ভ হয়ে গিয়েছে বলে তোমার 'বেড-টী-টি' নয় মাঠে, নয় দরিয়ায় মারা গিয়েছে।

ইংরিজিতে একেই বলে, 'নো রিস্ক্, নো গেম,' অর্থাৎ একটুখানি ঝুঁকি যদি নিতে রাজী না হও তবে লাভও হবে না। লটারি জিততে হলে অন্তত একটা টিকিট কেনার রিস্ক্ নিতে হয়।

সেদিন ঝুঁকিটা নিয়ে সুবিধে হল না। চা'টা মিস্ করে বিরস উদরে আর নিরস বদনে ডেকে এসে বসলুম।

এক মিনিটের ভিতর পল আর পার্সির উদয়।

পল ফিস্-ফিস্ করে কানে কানে বললো, 'নূতন সব 'বাড়ি'দের—অর্থাৎ 'চিড়িয়াদের' দেখেছেন, স্যর?'

এরা সব নবাগত যাত্রী। বলম্বোয় জাহাজ ধরেছে। বেচারীরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, ডেক-চেয়ার পাতবার ভালো জায়গার সন্ধানে। কিন্তু পাবে কোথায়? আমরা যে আগে-ভাগেই সব ভালো জায়গা দখল করে আসন জমিয়ে বসে আছি।

এ তো দুনিয়ার সর্বত্র হামেশাই হচ্ছে। মিটিঙে, ফুটবলের মাঠে সর্বদাই আগে গিয়ে ভালো জায়গা দখল করার চেষ্টা সবাই করে থাকে। এমন কি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসি ঠিক দরজাটির কাছে। মা রান্নাঘর থেকে খাবার নিয়ে বেরিয়েই সক্কলের পয়লা দেবে আমাকে।

ভালো জায়গায় বসতে পারাতে দু'টো সুখ। একটা ভালো জায়গা পেয়েছে বলে এবং দ্বিতীয়টা তার চেয়েও বড়। বেশ আরাম করে বসে চিনে-বাদাম খেতে খেতে অলস নিরাসক্ত ভাবে তাকিয়ে দেখতে, অন্যেরা ফ্যা ফ্যা করে কি রকম ভালো জায়গার সন্ধানে ঘুরে মরছে। পরিচিত এবং অপ্রিয় লোক হলে তো কথাই নেই। 'এই যে, ভড় মশাই জায়গা পাচ্ছেন না বুঝি?' বলে ফিক্ করে একটুখানি নোংরা রকমের হাসি হেসে নেবে। তার পর বিনামূল্যে একটুখানি সদুপদেশ বিতরণ করে 'কেন, ঐ দিকে তো মেলা জায়গা রয়েছে,' বলে হাত-খানা মাথার উপর তুলে চতুর্দিকে ঘুরিয়ে দেবে। তার থেকে কেউই বুঝতে পারবে না, কোন্ দিকে জায়গা খালি। লোকটা দৃষ্টি দিয়ে বিষবাণ নিক্ষেপ করে গজরাতে গজরাতে তোমার দৃষ্টির আড়াল হবে।

আঃ! এ সংসারে ভগবান আমাদের জন্যে কত আনন্দই না রেখেছেন! কে বলে সংসার মায়াময় অনিত্য? সে বোধ হয় ফুটবলের মাঠে কখনো ভালো সীট পায়নি।

আমি পল-পার্সিকে জিজ্ঞেস করলুম, 'অদ্যকার প্রোগ্রাম কি?'

পল বললে, 'প্রথমত, জিমন্যাস্টিক হলে গমন।'

'সেখানকার কর্ম-তালিকা কি?'

'একটুখানি রোইং করবো।'

'রোইং? সেখানে কি নৌকো, বৈঠে, জল আছে?'

'সব আছে, শুধু জল নেই।'

'?'

'বৈঠেগুলোর সঙ্গে এমন ভাবে স্প্রিং লাগানো আছে যে জল থাকলে বৈঠাকে যতখানি বাধা দিত স্প্রিং ঠিক ততখানি দেয়। কাজেই শুকনোয় বসে বৈঠে চালানোর প্র্যাকটিস আর পরিশ্রম দুই-ই হয়।'

আমি বললুম, 'উঁহু। আমার মন সাড়া দিচ্ছে না। আমাদের দেশে আমরা বৈঠে মারি দু' হাত দিয়ে তুলে ধরে। তোমার কায়দাটা রপ্ত করে আমার কোনো লাভ হবে না।'

পল বললে, 'তাহলে প্যারালেল কর, ডাম্বেল কিছু একটা?'

'উঁহু।'

পার্সি বললে, 'তাহলে পলে আমাতে বক্সিং লড়বো। আপনি রেফারি হবেন।'

'আমি তো ওর তত্ত্ব কিছুই জানি নে।'

'আমরা শিখিয়ে দেব।'

'উঁহু।'

পল তখন ধীরে ধীরে বললে, 'আসলে আপনি কোনো রকম নড়াচড়া করতে চান না। একসেরসাইসের কথা না হয় রইল কিন্তু আর সবাই তো সকাল-বিকেল জাহাজটাকে কয়েক বার প্রদক্ষিণ দেয় শরীরটাকে ঠিক রাখবার জন্য। আপনি তো তাও করেন না। কেন, বলুন তো?'

আমি বললুম, 'আরেক দিন হবে। উপস্থিত অদ্যকার অন্য কর্মসূচী কি?'

পার্সি বললে, 'আজ এগারোটায় লাউঞ্জে চেম্বার ম্যুজিক। তাই না হয় শোনা যাবে।'

পল আপত্তি জানালে। বললে, 'যে লোকটা বেহালা বাজায় তার বাজনা শুনে মনে হয়, দুটো হুলো বেরালে মারামারি লাগিয়েছে।'

পার্সি বললে, 'ঐ তো পলের দোষ। বড্ড পিটপিটে। আরে বাপু, যাচ্ছিস তো সস্তা ফরাসী 'মেসাজেরি মারিতিম্' জাহাজে আর আশা করেছিস, ক্রাইজলার এসে তোর কেবিনের জানলার কাছে চাঁদের আলোতে বেহালা দিয়ে সেরেনেড বাজাবে!'

আমি বললুম, 'আমাদের দেশে এক বুড়ি কিনে আনল এক পয়সার তেল। পরে দেখে তাতে একটা মরা মাছি। দোকানীকে ফেরৎ দিতে গিয়ে বললে, 'তেলে মরা মাছি।' দোকানী বললে, 'এক পয়সার তেলে কি তুমি একটা মরা হাতী আশা করেছিলে?'

পার্সি বললে, 'এইবার আপনাকে বাগে পেয়েছি, স্যর! আপনি যে গল্পটি বললেন তার যে বিলিতি মুদ্রণটি আমি জানি সে এর চেয়ে সরেস।'

আমি চোখ বন্ধ করে বললুম, 'কীর্তন করো।'

পার্সি বললে, 'এই আমাদের পলেরই মত এক পিটপিটে মেমসায়েব গিয়েছেন মোজা কিনতে। কোনো মোজাই তাঁর পছন্দ হয় না। শেষটায় সব চেয়ে সস্তার, এক শিলিঙে তিনি এক জোড়া মোজা কিনলেন। দোকানী যখন মোজা প্যাক করছে তখন তার চোখে পড়ল মোজাতে অতি ছোট্ট একটি ল্যাডার।—

আমি শুধোলুম, 'ল্যাডার মানে কি? ল্যাডার মানে তো মই।'

'আজ্ঞে, মোজার একগাছা টানার সুতো যদি ছিঁড়ে যায় তবে ঐ জায়গার শুধু পড়েনগুলো একটার উপর একটা এমন ভাবে থাকে যেন মনে হয় সিঁড়ি কিম্বা মই। তাই ওটাকে তখন ল্যাডার বলা হয়।'

আমি বললুম, 'থ্যাঙক্যু; শেখা হল। তার পর কি হল?'

'মেম বললেন, 'ও মোজা আমি নেব না, ওতে একটা ল্যাডার রয়েছে।' দোকানী বললে, 'এক শিলিঙের মোজাতে কি আপনি একটা মার্বেল ষ্টেয়ারকেস আশা করেছিলেন, ম্যাডাম?'

আমি বললুম, 'সাবাস, তোমার বলা গল্পটি আমার গার্হস্থ্য সংস্করণের রাজসংস্করণ বলা যেতে পারে। তদুপরি তোমরা তো রাজার জাত।'

পার্সি বললে, 'ও কথাটা না-ই বা তুললেন, স্যর!'

আমি আবার চোখ বন্ধ করে বললুম, 'জাহাজের দুর্বিষহ গতানুগতিক জীবনকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করবার জন্য কোম্পানি অন্য অন্য কি ব্যবস্থা করছেন?'

পার্সি বললে, 'সঙ্গীতে যখন পলের আপত্তি তখন আমি ভাবছি ঐ সময়টায় আমি সলুনে চুল কাটাতে যাবো।'

আমি হন্তদন্ত হয়ে বললুম, 'অমন কর্মটি গলা কেটে ফেললেও করতে যেয়ো না, পার্সি! তোমার চুল কেটে দেবে নিশ্চয়ই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমার 'হজামৎ'ও করে দেবে।'

'কথাটা বুঝতে পারলুম না, স্যর!'

আমি বললুম, 'ওটা একটা উর্দু কথার আড়। এর অর্থ, তোমার চুল নিশ্চয়ই কেটে দেবে ভালো করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথাটিও মুড়িয়ে দেবে।'

পার্সি আরো সাত হাত জলে। শুধোলে, 'চুল যদি ভালো করে কাটে তবে মাথা মুড়োবে কি করে?'

আমি বললুম, 'তোমার চুল কাটবে শব্দার্থে, কিন্তু মাথা মুড়োবে বক্রার্থে, অর্থাৎ মেটাফরিকেলি। মোদ্দা কথা, তোমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করবে। জাহাজে চুল কাটানোর দর্শনী পঞ্চ মুদ্রা।'

পল বললেন, 'সে কি স্যর? চীন দেশে তো পাঁচ টাকায় কুড়ি বার চুল কাটানো যায়।'

আমি বললুম, 'ভারতবর্ষেও তাই। এমন কি বিশ্ব-ফ্যাশানের রাজধানী প্যারিসেও চুল কাটাতে পাঁচ টাকা লাগে না। ব্যাপারটা হয়েছে কি, জাহাজের ফার্স্ট ক্লাশে যাচ্ছেন পয়সাওলা বড়ো কেরা। তাঁরা পাঁচ টাকার কমে চুল কাটান না। কাজেই রেট বেঁধে দেওয়া হয়েছে পাঁচ টাকা। আমাদের কথা বাদ দাও, এখন যদি কোনো ডেক-প্যাসেঞ্জারও চুল কাটাতে যায় তবে তাকেও দিতে হবে পাঁচ টাকা।'

'তা হলে উপায়? একমাথা চুল নিয়ে লণ্ডনে নামলে, পিসিমা কি ভাববেন? তার উপর পিসিমাকে দেখবো জীবনে এই প্রথম, পিসিমার কথা উঠলে বাবা মা যে ভাবে সমীহ করে কথা বলেন তার থেকে মনে হয় তিনি খুব সোজা মহিলা নন। তা হলে পাঁচটা টাকা দরিয়ার জলে ভেসে গেল আর কি, একদম শব্দার্থে।'

আমি বললুম, 'আদপেই না। জিবুটি বন্দরে চুল কাটাবে। বিবেচনা করি, সেখানে চুল কাটাতে এক শিলিঙেরও কম লাগবে।'

পল বললে, 'আমরা যখন বন্দরে রোঁদ লাগাবো তখন পার্সিটা একটা ঘিঞ্জি সলুনে বসে চুল কাটাবে। তা হলে তার উপযুক্ত শিক্ষা হয়।'

পার্সি আমার দিকে করুণ নয়নে তাকালো।

আমি বললুম, 'তা কেন? বন্দর দেখার পর তোমাতে আমাতে যখন কাফেতে বসে কফি খাবো তখন পার্সি চুল কাটাবে। চাই কি, হয়ত সলুনের বারান্দায় বসেই কফি খেতে খেতে পার্সিকে আমাদের মহামূল্যবান সঙ্গসুখ দেব, অমূল্য উপদেশ বিতরণ করবো।'

পার্সি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বাও করে বললে, 'এ যাত্রায় আপনার সঙ্গে পরিচয় না হলে, স্যর, আমাদের যে কি হত—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'কিছুই হত না। আমার সঙ্গে বজর বজর না করে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে, পাঁচ রকমের ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে আলাপচারি হত। অনেক দেখতে, অনেক শুনতে।'

দু' জনাই সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়ল।

আমি আরব সাগরের আবহাওয়া সম্বন্ধে একখানা বিরাট কেতাব নিয়ে পড়তে লেগে গেলুম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅখিল নিয়োগী

আমার প্রথম চুরি করার কথা মনে হলে এখনো হাসি চেপে রাখা মুস্কিল হয়ে ওঠে। সেই কাহিনীই এখন বলব—

কে যে বুদ্ধি দিয়েছিল ঠিক মনে নেই। কিন্তু প্ল্যানটা যে অভিনব সে কথা আজও ভুলতে পারিনি।

মাছের একটা পট্‌কা কোনো একটা কৌটোর মধ্যে জল দিয়ে জিইয়ে রাখতে হবে। আর তার ভেতর রেখে দিতে হবে একটি আনি। তাহ'লেই না কি পট্‌কার পেট থেকে বেরুবে একটি মাছ।

একটি ছোট পট্‌কা জোগাড় করা শক্ত নয়। কেন না—মাছেরই দেশ। পুকুরের মাছ—বাজারের মাছ—প্রত্যহ বাড়ীতে প্রচুর মাছ এসে থাকে। ওই রকম কাণ্ড করলে নাকি সেই পট্‌কার ভেতর থেকে একটি মাছ বেরুবে এবং সেটিকে জ্যান্ত অবস্থায় পুকুরে ছেড়ে দেওয়া যাবে।

হরি পিসিকে খোসামোদ করে একটি ছোট মাছের পট্‌কা জোগাড় করা গেল। একটি জার্ম্মাণ সিলভারের কৌটোও ছিল আমার ধনভাণ্ডারে। এইবার বিপদ ঘনীভূত হল—একটি আনি সংগ্রহ করার ব্যাপার নিয়ে।

এ বাড়ীতে ছোটদের হাতে পয়সা তুলে দেওয়া ছিল একেবারে বারণ। একটি আনি এখন কোথায় পাওয়া যায়? একটি গজমতির মালা জয় করে আনতে বললে না হয় স্বপ্নরাজ্য থেকে আহরণ করা যেত। কিন্তু আনি আমার কাছে সত্যি মহার্ঘ আর দুষ্প্রাপ্য।

এখানে-ওখানে-সেখানে পয়সা ছড়িয়ে পড়ে থাকে না যে, চট্‌ করে তুলে নেবো। হয়ত দিদিমার মালাজপের থলির মধ্যে মিলতে পারে। কিন্তু সেটা ছোঁয়া একেবারে বারণ। সত্যি, এমন বিপদেও মানুষে পড়ে! টাকা নয়, মোহর নয়—মাত্র একটি আনি! আর তারই অভাবে পট্‌কা থেকে মাছ বেরুবে না, এই বা কেমন কথা?

দিদিমার কাছে খাবার জিনিস চাইলেই পাওয়া যাবে—কিন্তু পয়সা নয়। বাজার সরকার কুইনা মামার কাছে চাইলে তেড়ে মারতে আসবে। মার কাছে কিম্বা মামীর কাছে চাওয়ার ত' সাহসই নেই! সঙ্গে সঙ্গে হাজার প্রশ্নের বান এসে আমায় কাবু করে ফেলবে।

কি করে পাওয়া যায় তবে সাত রাজার ধন এই বহুমূল্য মণিটি?

হঠাৎ দুষ্টু বুদ্ধি জাগল মাথায়। বড় তরফে—বড় মামার বালিশের তলায় খুচরো পয়সা থাকে দেখেছি। সেইখান থেকে একটি আনি নিলে ক্ষতি কি? কেউ জানতেও পারবে না।

সেই ঘরেরই কাঠের মেঝেয় দোতলায় আমাদের 'খেলাঘর' সে মাঝে মাঝে। বর-বৌ আর ঘর-কন্নায় খেলা হয় সেই দোতলায় গোপনে। মেনীদি আমার বৌ সাজে—তাদের ওখানে হামেশা ত' যেতেই হয়।

মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, খেলতে গিয়ে একটি আনি বড় মামার বালিশের তলা থেকে নিয়ে আসতে হবে।

তার পরেই কে যেন কানে-কানে ফিস্-ফিস্ করে বললে, অ্যাঁ! চুরি করবি? আবার দুষ্ট বুদ্ধিও আর এক জন সঙ্গে সঙ্গে জুগিয়ে দিলে, আরে বোকা! এতে আর দোষ কি? পরের বাড়ী থেকে ত' আর চুরি করছিস্ নে! এ ত নিজের মামার বাড়ী। না হয় আনিটা পরে রেখে গেলেই হবে! তাই বলে মাছের ছানা বেরুবে না পটকা থেকে?

শেষ কালে দারুণ কৌতূহলেরই জয় হল। যখন দেখলাম ঘরে কেউ কোথায়ও নেই—টুক্ করে বালিশটা তুলে নিয়ে একটা আনি পকেটে পুরে পালিয়ে এলাম।

কিন্তু কোথায় মাছের ছানা—? এক দিন যায়—দু' দিন যায়—তিন দিন যায়—শেষ কালে দেখা গেল পটকাটাই ফেটে গেছে! সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত প্ল্যানও মাটি!

আনিটা অবশ্য যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তাই বলে চুরির অপরাধটা ত' আর কাটেনি?

ছেলেবেলাকার আর একটি অপরাধ গোপন করার কথা মনে পড়ছে।

আমাদের পুবদ্বারী ঘরের দক্ষিণ দিকের ছোট্ট কুঠুরীতে একটি আল্না ছিল। খুব পল্‌কা আল্না—হালকা কাঠ দিয়ে একটু সৌখীন ভাবে তৈরী। সেই আল্নায় থাকতো আমাদের জামা-কাপড়, মামীর সাড়ী, ব্লাউজ সব সাজানো।

সেদিন কি একটা তাড়াহুড়োর ব্যাপারে জলদি করে জামা পরে বোধ করি খেলাধুলার ব্যাপারে ছুটতে হবে। আমার জামাটা ঝোলানো আছে আলনার সব চাইতে উঁচু ডাণ্ডার সঙ্গে। একবার হাত উঁচু করে যখন ওটাকে হাতানো গেল না—তখন খুব তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করবার জন্য আল্নার একটি ডাণ্ডার ওপর পা দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই মটাৎ করে গেল সেটা ভেঙে।

কাজটা যে খুব গোলমেলে হল সে কথা তখুনি বুঝতে পারলাম। কিন্তু তখন আর গালে হাত দিয়ে বসে ভাববার সময় নেই। এক্ষুণি খেলার দলে গিয়ে হাজির না হলে হয়ত যোগ দিতেই পারবো না! তাই তাড়াতাড়ি করলাম কি, একটা দড়ি দিয়ে ভাঙা ডাণ্ডাটা বেঁধে ফেললাম, তার পর কতকগুলো জামা-কাপড় দিয়ে দুর্ঘটনার যায়গাটা ঢেকে রেখে চুপি চুপি পালিয়ে এলাম খেলায় মাঠে।

দিন দুয়েকের মধ্যে অপরাধটা আর ধরা পড়ল না।

হঠাৎ কে যে গোয়েন্দাগিরি করে এই সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে বসল সে কথা আজ মনে নেই। তবে কে এই কাণ্ডটি করেছে তাই নিয়ে তোলপাড় সুরু হয়ে গেল গোটা বাড়ীতে। সত্যি কথা বলতে কি, আসল কথা জান্‌বার জন্যে আরো তীক্ষ্ণবুদ্ধি ডিটেক্‌টিভের প্রয়োজন।

লোকের পকেট কাটার কাজে নতুন যার শিক্ষানবিশী সুরু হয়েছে, গলির মোড়ে পাহারাওলার লাল পাগড়ীটা দেখলেই তার যেমন মুখখানি আপনা থেকেই শুকিয়ে ওঠে আর গলা কাঠ হয়ে জল-তেষ্টা পায়—আমার অবস্থা অনেকটা ঠিক সেই রকমই হল। পালিয়ে বেড়াবার চেষ্টা করি সব সময়। মোট কথা আমি নিজেই আমার হাব-ভাব দিয়ে ধরা দিলাম যে,—এ নাটের গুরু আমি ছাড়া আর কেউ নয়।

বেশ কিছু উত্তম-মধ্যম যে লাভ হয়েছিল সেটা মনে আছে। তবে মনে মনে বিচার করে আগে থাকতেই ধরে নিয়েছিলাম যে, এটা আমার প্রাপ্যই ছিল। যাই হোক—একটা সমস্যার একেবারে সমাধান হয়ে গেল—আর পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে না। যখন-তখন কারো কথা শুনে চমকে উঠতে হবে না। খেলতে গিয়েও বারে বারে ভাঙা আলনা আর দড়িটা গলার রজ্জু হয়ে উঠবে না!

পাওনা-গণ্ডা একেবারে চুকে গেল, এইবার একেবারে নিশ্চিন্দি।

এই ঘটনার সঙ্গে আর একটি ঘটনা মনের কোণে উঁকি মারে। সে দিন মনে করেছিলাম—শাস্তিটা আমার প্রাপ্য নয়—মিছিমিছি আমার ওপর সেটা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

যে বয়েসের গল্প বলছি—তখন মামী ছিল আমার সব চাইতে বড়ো বন্ধু। গল্প শোনাতে মামী, খেলার সাথী মামী, পড়ার বইয়ে সুন্দর মলাট লাগিয়ে নাম লিখে দিতে মামী, এমন কি কৌতুকে, উল্লাসে, উৎসবে আনন্দে সাজিয়ে দিতে মামী ছাড়া আর কারুর কাজ আমার পছন্দ হত না। কাজেই মামীর কথা ছিল আমার কাছে বেদবাক্য।

সেই মামী আমায় একদিন ডেকে বললেন, এই পোষ্টকার্ডটা নিয়ে যা—কাউকে দেখাবি নে—একেবারে সোজা পোষ্টাপিসে ফেলে দিবি।

এই জাতীয় মজাদার কাজে আমার চিরদিনের আনন্দ। শুধোলাম, ও! কলকাতায় দিদিমাকে লিখেছেন বুঝি?

মামী শুধু মুচকি হেসে মাথা নাড়লেন, কোনো জবাব দিলেন না।

পোষ্টকার্ডের দিকে চেয়ে দেখলাম—ক্ষুদি ক্ষুদি অক্ষরে অনেক কিছু লেখা আছে। মনে করলাম খুব জরুরী চিঠি বুঝি—। এক ছুটে একেবারে পোষ্টাপিসে গিয়ে হাজির হবো—এই ছিল আমার মতলব।

ঠিক দৌড় দেবার মুখে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন মামা।

বললেন, কোথায় যাচ্ছিস্ রে? পোষ্টাপিসে বুঝি? চিঠিখানা দেখি—

আমি পোষ্টকার্ডখানা মামার হাতে তুলে দেবো কি না একটু ইতস্ততঃ করছি—মামী ইসারা করে হাসতে হাসতে জানালেন, না। ততক্ষণে মামা আমার হাত থেকে চিঠি নিয়ে পড়তে সুরু করে দিয়েছেন।

আমার মনে হল, মামী আমাকে যে কাজের ভার দিয়েছেন—আমি বুঝি তার অযোগ্য হয়ে গেলাম। হয়ত চিঠিতে এমন দরকারী কথা লেখা আছে তা আর কেউ জানলে মামীর ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে! ছেলেমানুষী বুদ্ধি আর কাকে বলে!

আমি হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ছোঁ মেরে মামার হাত থেকে পোষ্টকার্ডখানা কেড়ে নিলাম।

মামার কাছে কোনো দিন মার খাইনি—শুধু আদরই পেয়েছি। কিন্তু সে দিন হঠাৎ তিনি রেগে গিয়ে আমার কান পাকড়ে ধরে বললেন, এক ঠেঙে হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্।

তাঁর আদেশ অমান্য করবার শিক্ষা আমরা পাইনি। ঠিক সেই রকম ভাবে এক পায়ে দাঁড়িয়ে রইলাম—কোনো প্রতিবাদ করলাম না, শুধু দারুণ অভিমানে চোখ দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

মামাকে মামী বললেন, তুমি ত আচ্ছা মানুষ! আমি ওকে বারণ করেছি আমার চিঠি কাউকে না দেখাতে। ও আমার কথা রেখেছে। ওকে মিছিমিছি শাস্তি দিলে চল্‌বে কেন?

আমি কিন্তু রাগে অনেকক্ষণ ওই ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মামীর অনুরোধেও পা নামাতে রাজি হইনি।

সে দিন কিশোর মনে এই প্রশ্নই জেগেছিল—কোনো দোষ করিনি, তবু কেন শাস্তি পাবো?

পরে অবশ্য মামী আমায় আদর করে কাছে টেনে নিলেন। কিন্তু এই ঘটনাটার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে এবং বহু কাল ধরে এই সাজা আমার মনে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল।

ছেলেবেলায় আমরা দু'ভাই খুব পালা করে ম্যালেরিয়ায় ভুগতাম। জ্বর যখন আস্‌ত একেবারে হু-হু শব্দে কাঁপুনীর সপ্তম স্বর্গে পৌছে দিত। কাঁথার ওপর কাঁথা চাপিয়ে দেওয়া হত শরীরের ওপর। কিন্তু তাতেও শীত মানে না। হিমালয়ের শিখরে কিম্বা এস্কিমোদের দেশে চলে গেছি কি না কে জানে? তার পর চাপানো হত লেপ আর কম্বল। সারাটা দেহ তবু ভূমিকম্পের মতো কাঁপতে থাকৃত!

ছেলেবেলায় গল্প শুন্‌তাম, 'ভালুকে জ্বর' না কি ঠিক এই রকম। হু-হু শব্দে আসে, জ্বরে কোঁ-কোঁ করে কাঁপতে থাকে ভালুক, আবার কখন যে সেই দারুণ জ্বর পালিয়ে যায় ভালুক তার হদিশ পায় না!

আমাদেরও অনেকটা সেই অবস্থা! দিব্যি ভালো আছি, রদ্দুরে রদ্দুরে ঘুরে ফল-পাকড় খাচ্ছি, খেলাধুলা করে বেড়াচ্ছি নিজের ইচ্ছে মত, আর দিদিমার ভাণ্ডার থেকে পিঠে-পায়েস খাওয়াও বাদ যাচ্ছে না—হঠাৎ কোত্থেকে এসে হাজির হল—ভালুকে জ্বর—আর সব-কিছু একেবারে এক দিনে বন্ধ।

এই রকম ভালুকে জ্বর মাসের মধ্যে বেশ কয়েক পালা হয়ে যেতো। শীতটা যখন হু-হু করে সারা দেহ কাঁপিয়ে আস্‌ত তখন বেশ ভালই লাগত। কিন্তু তার পরেই জ্বর যখন নাম্‌তে থাকৃত—শরীরটা যে কী খারাপ হত—তা বল্‌বার নয়। মুখ হত বিস্বাদ। সারা দেহকে কে যেন হামানদিস্তে দিয়ে ভেঙে-চুরে-গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। প্রথম দিকে থাকৃত যেমন প্রচুর জলতেষ্টা—শেষ কালে জল আর মুখে দেওয়া যেত না। আর সমস্ত দেহে-মেনে যেন কী খাই কী খাই ভাব!

একেবারে যেন বকরাক্ষসের ক্ষিদে!

যা পাবো—দু'হাতে সব মুখে পুরে দেবো এমনি অবস্থা। যেদিন অন্নপথ্য করবো—তার আগের দিন রাত্তিরে ঘুম আর কিছুতেই আসে না। কখন ভোর হবে, কখন মার হাতের রান্না মাছের ঝোল ভাত খাবো, শুধু সেই চিন্তা।

রাত হবে তখন তিনটে। বাড়ী শুদ্ধু লোক ঘুমুচ্ছে। আমিও ঘুমুচ্ছি শুয়ে মার পাশে। হঠাৎ কা-কা শব্দ শুনে মনে হল ভোর হয়ে গেল! তাড়াতাড়ি মাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিলাম, ভোর হয়ে গেল যে, আর কত ঘুমুবে? ওঠো না! আমি যে আজ ভাত খাবো!

আমার আচমকা ধাক্কা খেয়ে মা ধড়মড় করে উঠে বসল। তার পর একবার দরজা খুলে বাইরে ঘুরে এসে বললে, দূর বোকা! এখন যে শেষ রাত্তির রে! জ্যোৎস্না দেখে কাক অমন ডাকে।

লজ্জা পেয়ে পাশ ফিরে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সকাল থেকে আমার তাগিদে বাড়ী শুদ্ধ লোক অস্থির। খুব পুরোনো চালের নরম ভাত না হলে কিন্তু আমি খাবো না। কিন্তু দিদিমা আর মা যে আগে থেকেই পুরোনো সরু চালের ব্যবস্থা করে রেখেছে তা ত আমি জানি না!

তাই ওরা আমার কথায় কোন উত্তর দেয় না—শুধু মুখ টিপে টিপে হাস্‌তে থাকে।

জ্বরের পর প্রথম যেদিন ভাত খাবো সেদিন মার দুর্গতি আর ছুটোছুটির অন্ত থাকে না।

আমার রান্না করে, আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে ঠাণ্ডা করে—ডুব দিয়ে নিয়ে আবার হবিষ্য ঘরে ঢুকতে হবে।

বছরের সব দিন ঠাকুরের রান্না চলবে কিন্তু জ্বরের পর যে প্রথম অন্নপথ্য করা সেটি মার হাতের রান্না না হলে চলবে না।

এই দিন মাকে বাড়তি খাটুনি সহ্য করতেই হবে।

রান্নাঘরের বারান্দায় চলেছে মার রান্না, আর আমি পুব-দ্বারী ঘরের উত্তর দিকের দরজার চৌকাঠে বসে প্রহর গুণছি।

খানিকক্ষণ হয়ত চুপচাপ বসে রইলাম, তার পর প্রশ্ন করলাম।

—আচ্ছা মা, পটল সেদ্ধ দিয়েছ ত?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ!

—শিং মাছের ঝোল কিন্তু আজ কোরো না—

—তবে?

—ধনে পাতুরী করো, বেশ লাগবে খেতে।

—আচ্ছা, আচ্ছা—

এই রকম কাটা কাটা কথা চলে খানিকক্ষণ।

—মাছ পাওয়া গেছে ত?

—পাগাড়ে যখন গেছে—তখন কি আর মাছ না নিয়ে ফিরবে?

পাগাড়ের কথা মনে পড়ে।

সবাই ওকে ডাকে—'পাগাইড়্যা' বলে।

খাল-বিল-নদী-নালা-পগারে কেবলি মাছ মেরে বেড়ায় বলেই ওর পাগাড়ে নাম হয়েছে কি না বলা শক্ত।

তবে মামী বেশ মজার কথা বলেন। ওর না কি মৎস্য রাশি। মাছ সংগ্রহ করতে গিয়ে পাগাড়ে কখনো বিফল-মনোরথ হয়নি। ও যেখানে বঁড়শী ফেলে বস্‌বে—মাছেদের নাকি সেখানে না এসে উপায় নেই! মাছেরা পাগাড়ের হাতে মরতে এত ভালোবাসে—সত্যি ভারী মজার ব্যাপার!

সারা গ্রাম টই-টম্বুর জলে ভর্তি—মাছেদের টিকিটি দেখবার যো নেই—কেউ মাছ সংগ্রহ করতে পারছে না—পাগাড়েকে খবর দাও, ও ঠিক জুটিয়ে আনবে'খন।

মামী নাক কুঁচকে বলেন, নিরিমিষ আমি খেতে পারি নে।

একটু আঁসুটে গন্ধ না হলে কি ভাত খাওয়া যায়? খবর দাও পাগাড়েকে, ও ঠিক জোগাড় করে নিয়ে আসবে।

এতটুকু বাড়িয়ে বলেননি তিনি। পাগাড়ে ঠিক হাসতে হাসতে একটি মাছ নিয়ে এসে হাজির হল। বেঁটে খাটো কালো-কোলো মানুষটি। ছোট ছোট চুল। কিন্তু মুখে হাসি লেগেই আছে।

আর এক জন ছিল, তার নাম যোলই।

মৎস্য-মেধ যজ্ঞ করতে সেও কম যায় না।

যে বাড়ীতে যোলই কাজ করে সে বাড়ীর গেরস্তরা নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করে। এমনি ঘরের কাজ ত' হবেই, তা ছাড়া যখন-তখন জুটবে মাছ।

সেই জন্য গেরস্ত বাড়ীতে যোলইকে নিয়ে লোফালুফি চলে।

জ্বরের পর অন্নপথ্য করার গল্প থেকে একেবারে রসনা-সিক্তকর মৎস্য-কাহিনীতে এসে পড়েছি।

আমি যে সময়ের কথা বলছি—তখন আমাদের গাঁয়ে এই ছড়াটাই সব সময় আনাগোনা করতো অনেক ছেলের মনে—

"লিখিব, পড়িব মরিব দুখে—
মৎস্য মারিব, খাইব সুখে।"

আজ আমার ছেলেবেলাকার আর এক বন্ধু ঘুপুর কথাও জাগছে মনে—ঘুপু একটা ছোট বঁড়শী নিয়ে—নানা পুকুর আর ডোবার ধারে ঘাপটি মেরে চুপচাপ বসে থাকত। বড় বড় কৈ মাছ গেঁথে তুলতে ঘুপুর হাত ছিল একেবারে সব্যসাচীর মতো। ওর শীকার-কাহিনী ছিল সর্বজনবিদিত। বড় হয়ে ঘুপু একজন নামকরা লাঠি-খেলোয়াড় হয়েছিল। শরীরচর্চ্চা করে নিজের স্বাস্থ্যের একেবারে নতুন রূপ দিয়েছিল। কিন্তু ছেলেবয়েসের ঘুপুকে দেখে সে কথা বোঝবার যো ছিল না।

শুভার্থী আর কল্যাণকামীরা ওর কাণ্ডকারখানা দেখে বলত, —ওরে ছোঁড়া, তুই যে রকম আদাড়ে-বাদাড়ে আর জলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াস্—কোন্ দিন শুনবো সাপে তোকে কেটে রেখেছে!

ঘুপু কোনো প্রতিবাদ করত না—শুধু খিল্ খিল্ করে হাসত! সেই লিক্‌লিকে কালো ভয়লেশহীন ছেলেটা যে বড় হয়ে আবার লাঠি ও তলোয়ারের খেলায় সারা বাংলায় নাম করবে সে কথা সে দিন কে ভেবে রেখেছিল? স্বদেশী করে দীর্ঘকাল কারাবরণও করেছিল সে। অকালমৃত্যু ঘুপুর কর্ম্মমুখর জীবনে ইতি টেনে দিয়েছে।

জীবনে প্রথম যে উপহার পেয়েছিলাম—সে কথা আমার মনের অদেখা খাতায় আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

মামাবাড়ীতে খুব আদুরে ছিলাম বলে বেশী বয়েসে আমার লেখাপড়া সুরু হয়।

একবার মামা কলকাতা থেকে দেশে এসে মত প্রকাশ করলেন যে আর আমার আল্‌গা-আল্‌গা ভাবে আদর কাড়লে চল্‌বে না। এইবার থেকে লেখাপড়ার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

তিনি নিজেই গিয়ে গ্রামের মাইনর বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দিলেন। ইস্কুলটির নাম সাকরাইল গ্র্যান্ট-ইন্-এইড এম-ই স্কুল। তীর্থবাসী পণ্ডিত হচ্ছেন এই বিদ্যালয়ের প্রাণ। অন্যান্য সব শিক্ষকদের ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিয়ে-থুয়ে যে ক'টা টাকা অবশিষ্ট থাকে তাই হাসিমুখে গ্রহণ করেন; কিন্তু খাতায় সই করতে হয় বেশী অঙ্কের পরিমাণ। আমারই এক আত্মীয়-বাড়ী থাকা-খাওয়ার বদলে ছেলে-মেয়েদের পড়ান। তিনি ভিন দেশের মানুষ কিন্তু ইস্কুলটা যেন তাঁর প্রাণ। শুনতে পাই আমাদের গাঁয়ের তিন পুরুষ তাঁর কাছে লেখাপড়া করেছে। তাই এই গ্রামে তীর্থবাসী পণ্ডিতের সম্মান সব চাইতে বেশী।

এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়ার আগে আমি রজনী পণ্ডিত মশায়ের কাছে কিছু দিন পড়েছিলাম এবং আমার অক্ষর-পরিচয় হয় সর্ব্বপ্রথম তাঁর কাছেই।

কিন্তু তীর্থবাসী পণ্ডিতের খ্যাতি আর সম্মান ছিল সর্ব্বজন-বিদিত। গ্রামের যে কোনো বাড়ীতে উৎসব কিম্বা নেমন্তন্ন থাকুক—তীর্থবাসী পণ্ডিত সেখানে আমন্ত্রিত হবেনই। সারাটা গ্রামের লোক তাঁকে একেবারে আলাদা চোখে দেখত।

বড় হয়ে আমরা তাঁর ছাত্রের দল যখন "তীর্থবাসী জয়ন্তী" উৎসব করেছিলাম এবং তাঁর হাতে ১০১৲ টাকা তুলে দিয়েছিলাম নিজেরা চাঁদা করে, সেদিন তাঁর মুখে যে তৃপ্তি ও সাফল্যের হাসি দেখেছি তা কোনো দিনের তরেও ভুলতে পারবো না।

কত বার দেখেছি, পণ্ডিত মশায়ের ছেলে এসে সাধাসাধি করে গেছে দেশে ফিরে যাবার জন্যে—; বুড়ো বয়েসে যখন তিনি নিজে হাতে রান্না করে দিনের পর দিন ভাতে-ভাত খেয়েছেন আর কচ্ছপের কামড় দিয়ে মুমূর্ষু বিদ্যালয়কে কোনো রকমে জিইয়ে রেখেছেন—সেই সব কাহিনী কোনো ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে না। তীর্থবাসী পণ্ডিতের সেই আজীবন তপস্যা আর সাধনা আজ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

যাক্—আমি আমার ভর্ত্তি হবার যে কাহিনী বলছিলাম। আমি যখন ভর্ত্তি হলাম—তখন এই বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার হচ্ছেন গাঙ্গুলী মশাই। তাঁর পরিচয় আগেই দিয়েছি।

মামা ভর্ত্তি করে দিয়েই আবার সঙ্গে করে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। বললেন, আজ রাত্তিরেই বই কিনে দেবেন। টাঙ্গাইল শহর আমাদের গ্রাম থেকে মাত্র দেড় মাইল দূর। কাজে-অকাজে হামেশা সেখানে লোক-যাতায়াত করে। সেই টাঙ্গাইল থেকে বই নিয়ে আসবে কুইনা মামা।

সারাটা বিকেল ছট্‌ফট্ করে কাটল। কখন নতুন বই আসবে, কখন সে বইয়ের ছবি দেখবো, মামী তাতে মলাট লাগিয়ে নাম লিখে দেবেন। কেবলি ঘর-বার করতে লাগলাম।

সেই বিকেল বেলাটা আর খেলাধূলায় মন বস্‌ল না। বাড়ীর সবাইকে জিজ্ঞেস করে ব্যতিব্যস্ত করে তুললাম—কখন কুইনা মামা সওদা করে ফিরে আসবে!

ক্রমে সন্ধ্যা উৎরে গেল—তবু কুইনা মামার দেখা নেই। তাই ত! ভারী রাগ হল কুইনা মামার ওপর। আজ কি যত রাজ্যের জিনিস্ কিনে আনছে না কি? কেন, শুধু বইটা নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরা যায় না?

আরো রাত বাড়লো—কিন্তু কোথায় কুইনা মামা?

আমার চোখ ঘুমে ঢুলে এলো—তবু মুখে প্রশ্ন, আমার বই কি এখনো এলো না?

মামী বললেন, তুই যদি ঘুমিয়ে পড়িস ত' তোর শিয়রে বই রেখে দেবো'খন। সকাল বেলা চোখ মেলেই দেখতে পাবি—নতুন ঝকঝকে বই। এখন খেয়ে নে!

কিন্তু বই হাতে না পেয়ে খেতে আমি রাজি নই। সে রাত্তিরে কিচ্ছুটি খেলাম না—ঘুমে চোখের পাতা বুজে এলো। ঘুমপাড়ানি মাসি-পিশি যে কখন তাতে এসে ভর করেছে জানতেও পারিনি।

রাত্তিরেও বইয়ের স্বপ্ন দেখেছিলাম কি না ঠিক মনে নেই। কিন্তু খুব সকালে গেল ঘুম ভেঙে।

শিয়রে তাকিয়ে দেখি সত্যি ত!

ইস্কুলে যে বই পড়তে হবে—তাই রয়েছে ঠিক বালিশের পাশে! কুইনা মামা তাহলে অনেক রাত্তিরে ফিরেছিল আর মামীও তাঁর কথা ভোলেননি। ঠিক আমার শিয়রে রেখে দিয়েছেন বইটি। কিন্তু তখনো আমার কাছে আসল বিস্ময় লুকোনো ছিল। সেই "নীতি-সুধা" না কি বইটা টেনে নিতেই তার তলা থেকে উঁকি দিলে আর একখানি বই!

অবাক কাণ্ড!

এ বইয়ের কথা ত' মামা আগে বলেননি!

ওপরে চমৎকার ছবি—লেখা রয়েছে "হাসিখুসী"। আলিবাবার চোখের সামনে যে দিন চিচিং ফাঁক হয়ে গিয়েছিল—আর রাশি রাশি মণি-মুক্তো, হীরে-জহরৎ বেরিয়ে পড়েছিল সেদিন সেও বোধ হয় এতটা আশ্চর্য্য হয়নি যতটা আমি হয়েছিলাম সেদিন সকাল বেলা—পাঠ্য-পুস্তকের তলায় এই "হাসিখুসী" আবিষ্কার করে।

এমন মজার বইও আছে পৃথিবীতে?

সারা দিন ধরে নতুন বইয়ের মজার গন্ধ শুঁকতে লাগলাম, পাতার পর পাতা উল্টে ছবি দেখতে লাগলাম আর নাওয়া-খাওয়া ভুলে ক্রমাগত ছড়া আওড়াতে লাগলাম—

"অজগর আসছে তেড়ে
আমটি আমি খাবো পেড়ে"

সত্যিকারের আমের চাইতে ছবির আম আর তার ছড়া যে এত মিষ্টি হয় সে কথা কি এর আগে জানা ছিল?

এই হল আমার জীবনে প্রথম ও সেরা উপহার। আমার বড় মামার ছেলে ছোক্কন—একেবারে আমার সমবয়েসী। ওর কথা আগেই বলেছি। হয়ত আমার চাইতে দু'-এক মাসের ছোটই হবে।

সেই ছোক্কন কিনলে এক ছাতা। বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যে ছাতা কেনা হল বটে—কিন্তু এই ছত্রলাভ হওয়ায় তার বিপদ বাড়ল বৈ কমল না।

ছাতাটা খুলে মেঝের ওপর রেখে দেবে ছোক্কন—কিন্তু ছাতার যে কয়টা শিক মাটি ছুঁয়ে থাকবে তাদের কি করে বাঁচানো যায়—এই হল তার এক মহা সমস্যা।

অতি সাবধানী ছোক্কন ভেবে ভেবে আকুল। কিছুতেই কিছু ঠিক করতে পারে না। তবে কি অমন নতুন ছাতার শিকগুলি মৃত্তিকা-স্পর্শে অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে?

ধ্যানীর সাধনা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সে স্থির করলে যে, যে শিকগুলি মাটি ছুঁয়ে আছে তাদের তলায় এক টুকরো করে কাগজ দিয়ে রাখতে হবে এবং এই ভাবেই ছাতা অকালে বিলোপের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

আমাদের সরকার বাহাদুর ভারতের প্রাচীন মন্দির আর মূর্ত্তিগুলি রক্ষার জন্যে আইন প্রণয়ন করেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ছোক্কনের নতুন ছত্র রক্ষার জন্যে এ রকম কোনো কিছুরই ব্যবস্থা ছিল না।

সেটা কি ছেলেবেলায় তার কম দুঃখের কথা ছিল?

ছোক্কনের একটি গোপন তহবিল ছিল। পুজো-পার্ব্বণে তখন ছেলেদের হাতে পরবী দেওয়া হত। কখনো দু'-আনা, কখনো বা একটি সিকি। আমরা এই সব পার্ব্বণী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেহিসাবীর মতো খরচ করে ফেলতাম। সেকালে এক রকম তক্তা-বিস্কুট পাওয়া যেত—তার ওপর চিনি ছড়ানো থাকত। ছোটদের কাছে এইটিই ছিল রাজসিক ভোজ। এ ছাড়া চানাচুরওয়ালার সঙ্গেও সব ছেলের মিতালী ছি[illegible]। ছোক্কন কিন্তু তার পরবীর একটি পয়সা বিরাট সাম্রাজ্যের বিনিময়েও দিতে রাজি ছিল না। কাজেই তার পয়সা-কড়ি দিব্যি ছানা-পোনা নিয়ে গোকুলে বাড়তে থাকত।

এই গোপন ধন-ভাণ্ডার সে বিশেষ কৌশলের সঙ্গে রক্ষা করত। কোনো তোষকের তলায়, ঘাটের কোনো ভাঙা সিঁড়ির কোঁকরে, কোনো গাছের কোটরে সে সযত্নে তার থলিকে লুকিয়ে রাখত। শুধু তাই নয়—সে বারে বারে গিয়ে যখন-তখন খুলে দেখত ভাণ্ডার অক্ষুণ্ণ আছে কি না। তার পর একদিন যখন থলিটি কোনো কৌশলী চোরের দ্বারা অপহৃত হত—তখন জানা যেত—ছোক্কনের গোপন তহবিলে কত টাকা জমেছিল।

টেরী-বাগানো নিয়েও ছোক্কনের কৃচ্ছ্রসাধনের অন্ত ছিল না! আমাদের ছেলেবেলায় এই কাজটি একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। কাজেই যেটা মানা—সেইটের ওপরেই সমস্ত ঝোঁক গিয়ে পড়ে।

আমরা সবাই গোপনে এই কাজটি সম্পাদন করতাম।

ছোক্কন যে ভাবে টেরী বাগাতে চায়—তার চুল সে নির্দ্দেশ মানতে আদপেই রাজি নয়। ফলে চিরুণীর সঙ্গে চুলের রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ সুরু হয়ে যেত।

বাগ মানে না যে চুল, তাকে কি করে শায়েস্তা করতে হয়—সে মন্ত্র আমাদের জানা ছিল না।

আমি ত' শেষ পর্য্যন্ত একদিন রেগে গিয়ে পাকাপাকি টেরীর রাস্তা করবার জন্যে কাঁচি দিয়ে দিব্যি লম্বালম্বি চুল ছেঁটে ফেললাম। আমার টেরীর সেই অবস্থা দেখে খেলার সাথীদের মধ্যে যে হাসা-হাসির ধুম পড়ে গিয়েছিল—সে কথা আজও ভুলতে পারিনি! ওরা আমার নাম দিয়েছিল—'লক্ষ্মণ ঠাকুর'।

যে ছেলেটিকে গ্রাম শুদ্ধ সবাই রসিকতা করে 'গোয়ালন্দ' বলে ডাকত—তার আসল নাম ছিল—'প্রমদানন্দ'। প্রমদা গ্রাম-সম্পর্কে আমার ভাগনে হয়। তার বাবার নাম বিমলানন্দ দাশ-গুপ্ত। খুলনা শহরে তিনি খুব নামকরা উকিল। এই 'গোয়ালন্দের' মাথায় অতি ছেলেবেলা থেকেই নানা রকম বুদ্ধি খেলত।

ওদের বাড়ীর নাম দক্ষিণ-বাড়ী। মামাবাড়ীর ঠিক দক্ষিণে বলেই বোধ করি এই নাম হয়েছিল। গোয়ালন্দ ছেলেবেলায় ছোট বঁড়শী দিয়ে মাছ মারতেও খুব ওস্তাদ ছিল।

হঠাৎ সে একদিন আমাদের নেমন্তন্ন করে বসল—ওদের বাড়ীতে নাকি থিয়েটার হবে।

থিয়েটার করবে 'গোয়ালন্দ'? এর চাইতে মজার কথা আর কী হতে পারে?

কিন্তু একটা ভয় জাগল মনে। ও থিয়েটারের আয়োজন করেছে—কিন্তু ওর বাবা কিছু বলবেন না?

পরে জানা গেল—ওর বাবাও না কি চমৎকার থিয়েটার করতে পারেন এবং খুলনা শহরে তিনিই না কি থিয়েটারের পাণ্ডা।

বিকেল বেলা ত' আমরা দল-বল নিয়ে হাজির হলাম—থিয়েটার দেখতে।

হ্যাঁ, বাহাদুরী দিতে হয় বটে গোয়ালন্দকে।

ভাই-বোনরা মিলেই সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন করেছে।

আঠা দিয়ে সাদা কাগজ জুড়ে সীন তৈরী করেছে—আর তার ওপর সুন্দর দৃশ্য পর্য্যন্ত এঁকে ফেলেছে নিজের হাতে। নানা রঙের সাড়ী ঝলিয়ে দিয়েছে উইংস্ করে। তখনকার দিনে আমরা এই সব দৃশ্য দেখে একেবারে মোহিত হয়ে গেলাম সবাই।

সেদিন কি গান হল, কি নাচ হল—আর কোন্ নাটক অভিনীত হল—কিছুই মনে নেই। কিন্তু সব কিছু জড়িয়ে উৎসবের যে ছবিটা মনে ছাপ দিয়ে দিলে তার দাম বড়ো কম নয়।

অভিনয় শেষ হয়ে যাবার পরও বহুক্ষণ গোয়ালন্দের আশে-পাশে ঘুর্ ঘুর্ করে বেড়িয়েছিলাম। এমন যে গুণী লোক—তার সঙ্গ কখনো ছাড়তে আছে?

[ক্রমশঃ।

রাজপুত্র ও রাপুঞ্জেলের কাহিনী

(জার্মাণীর রূপকথা)

ইন্দিরা দেবী

রাজকুমার শিকার করতে বেরিয়েছেন। সঙ্গে সাজ-সরঞ্জাম লোক-লস্কর কোন-কিছুরই অভাব নেই। ঘন নিবিড় বন। সারি সারি গাছের ঝোপে যেন সবুজের মেলা। আকাশের নীল আর বনের সবুজ এক হয়ে মিশে গিয়েছে। খানিক দূর গিয়ে রাজকুমার তার সঙ্গীদের অপেক্ষা করতে বলে একা এগিয়ে গেলেন সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে। কারু বারণ শুনলেন না। এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন রাজকুমার। শিকারে উৎসাহ যেন তাঁর চলে গিয়েছে। রাজপ্রাসাদ আর লোকালয়ের কোলাহল থেকে দূরে প্রকৃতির এই রাজ্যে এসে তাঁর চোখে ভেসে উঠলো নূতন জগতের ছবি। ভারী ভালো লাগলো তাঁর এই বনের সবুজ সমারোহ! খানিকটা ঘুরে-ফিরে কিছু দূরে দেখতে পেলেন একটা উঁচু গম্বুজ। এই গভীর বনে গম্বুজ দেখে তাঁর ভারী আশ্চর্য্য লাগলো। এগিয়ে গেলেন রাজকুমার। ফাটল-ধরা গম্বুজ; ফাটলের ফাঁকে ফাঁকে জমে উঠেছে ঘাস আর শ্যাওলা। কত দিন জন-মানবহীন হয়ে পড়ে রয়েছে কে জানে? হঠাৎ তাঁর চোখ পড়লো গম্বুজের ওপর দিকের একটা জানালায়। গাছের আড়াল থেকে যখন রাজকুমার গম্বুজটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন তখন দেখতে পেলেন এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে লাঠিতে ভর করে এক থুরথুরে বুড়ী। কাছে এলে দেখতে পেলেন কী বীভৎস তার মুখের চেহারা! রাজকুমারের মনে হলো এ ডাইনী ছাড়া আর কেউ নয়। বুড়ী ততক্ষণে জানালার নীচে চলে এসেছে। ওপর দিকে তাকিয়ে বুড়ী চেঁচিয়ে ডাকলো—"রাপুঞ্জেল! রাপুঞ্জেল! তোমার চুলের সিঁড়িটা নামিয়ে দাও ত!"

কী খনখনে গলার আওয়াজ!

রাজপুত্র অবাক হয়ে দেখলেন ফুটফুটে, অপূর্ব্ব সুন্দরী একটি মেয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। গাছে-ঢাকা বনের অন্ধকার ভেদ করে যেন এক ঝলক আলো বেরিয়ে এলো জানালার ধারে। মেয়েটির মাথা-ভর্ত্তি একরাশি সোনালি চুল। সেই সোনালি চুলের গোছা মেয়েটি ছড়িয়ে দিল জানালা দিয়ে। হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চুলের শেষ প্রান্ত এসে ঠেকালো মাটিতে। আর সেই চুলের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ডাইনী বুড়ী।

রাজপুত্র অবাক-বিস্ময়ে দেখছিলেন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনি দেখলেন বুড়ী আবার সেই চুলের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো। এই সুযোগ। মুহূর্ত্ত মাত্র দেরী না করে রাজপুত্র জানালার নীচে গিয়ে দাঁড়ালেন। তার পর ওপর দিকে তাকিয়ে ডাকলেন "রাপুঞ্জেল! রাপুঞ্জেল! তোমার চুলের গোছা নামিয়ে দাও দেখি।"

সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক আলো। সোনালি চুলের গোছা জানালা দিয়ে গম্বুজের গা বেয়ে নেমে এলো নীচে। তর্-তর্ করে উঠে এলেন রাজপুত্র। মেয়েটি ত তাঁকে দেখে অবাক! এই জন-মানবহীন গভীর বনে এমনি মানুষের দেখা পাবে এ আশা সে ছেড়েই দিয়েছিলো। ভালো করে মনে পড়ে না সেই কবে যখন ছোট্টটি ছিল তখন এই ডাইনী তাকে মা-বাবার কাছ থেকে চুরি করে নিয়ে আসে। কতো কান্নাকাটি করেছে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক তার মা-বাবার কাছে; কিন্তু তার কোন কথাই বুড়ী শোনেনি। সেই থেকে আরম্ভ হয়েছে তার এই দীর্ঘ দিনের নির্ব্বাসন।

রাজপুত্রকে দেখে ভারী খুশী হলো মেয়েটি। দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্ত্তা হলো। সব শুনে রাজপুত্র তাকে উদ্ধার করবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন। খানিক বাদে মেয়েটির কাছে বিদায় নিয়ে তারই চুলের গোছা বেয়ে রাজকুমার নেমে এলেন। বলে গেলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নরম সিল্কের সুতোর একটা মই যোগাড় করে আসবেন তাকে উদ্ধার করতে।

রাজপুত্র চলে যাবার পর মেয়েটির মন ভারী খারাপ লাগলো কিছুক্ষণ। তার পর আবার খুসীও হলো এই ভেবে যে, তার দুঃখের দিনের অবসান হতে চলেছে। কিছুক্ষণ পরেই সেই ডাইনী বুড়ী এসে হাজির। আবার চুলের গোছা বেয়ে সে ওপরে উঠে এলো। মেয়েটির মন তখন আসন্ন মুক্তির আনন্দে মসগুল হয়ে আছে। অসাবধানে হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বার হয়ে গেল—"আচ্ছা, চুলের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে আসতে তোমার অত সময় লাগে কেন বল দেখি? রাজকুমার ত তর্-তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলেন!"

বুড়ী ত তার কথা শুনে খিঁচিয়ে উঠলো। তা' হলে একজন রাজপুত্তুরের যাতায়াত চলছে? রাগে, ক্ষোভে বুড়ী জ্বলে উঠলো। তাড়াতাড়ি দেরাজ থেকে কাঁচি বার করে মুঠো মুঠো করে কেটে দিল রাপুঞ্জেলের চুলের গোছা। নরম তুলতুলে রেশমের মতো সোনালি চুলের রাশি ছড়িয়ে পড়লো মেঝেতে; কিছু ভেসে গেল বাইরের হাওয়ায়। এতেও ডাইনীর

রাগ গেল না। রাপুঞ্জেলকে ধরে জানালা গলিয়ে ফেলে দিল নীচে। তার পর হিড়-হিড় করে টানতে টানতে তাকে নিয়ে গেল কিছু দূরে একটা ঝোপের মাঝে। সেখানে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখলো তাকে।

সন্ধ্যার খানিকটা আগে সিল্কের সুতোয় তৈরী মই জোগাড় করে রাজপুত্র ফিরে এলেন। গম্বুজের তলায় এসে উপর দিকে তাকিয়ে তিনি ডাকলেন রাপুঞ্জেলের নাম ধরে। এক গোছা সোনালি চুল নেমে এলো আর তাইতে ভর করে উঠে এলেন রাজপুত্র। কিন্তু ঘরে ঢুকে কোথায়ও দেখতে পেলেন না রাপুঞ্জেলকে। তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেই বিশ্রী, বীভৎস চেহারার ডাইনী। রাপুঞ্জেলের কেটে-নেওয়া চুল থেকে গোছা তৈরী করে তাই নামিয়ে দিয়েছিল সে জানলা দিয়ে। এবার হাতের কাছে রাজপুত্রকে পেয়ে বুড়ী তাকে ধাক্কা দিয়ে জানলা গলিয়ে ফেলে দিল নীচে—কাঁটাঝোপে বেচারী রাজপুত্রের শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। কাঁটার খায়ে তার চোখ দুটি থেকে অজস্র ধারায় রক্ত ঝরতে লাগলো। তবু রাজপুত্র এগিয়ে চললেন রাপুঞ্জেলের সন্ধানে। তাঁর মনে হলো তাকে কাছাকাছি কোথায়ও খুঁজে পাবেন তিনি। অসহ্য যন্ত্রণা শরীরে—কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত দেহ তবু এগিয়ে চলেছেন রাজপুত্র।

খানিক দূর গিয়ে তার কাণে ভেসে এলো মিষ্টি গানের সুর। দুঃখে ভেঙে পড়ছে সুর, তবু কি মিষ্টি! দুঃখের গান যে অত অভিভূত করতে পারে, রাজপুত্রের আগে তা জানা ছিল না। অধীর আগ্রহে টলতে-টলতে এগিয়ে গেলেন গান লক্ষ্য করে। দেখা পেলেন রাপুঞ্জেলের। তাড়াতাড়ি তার বাঁধন কেটে দিলেন রাজপুত্র। রাপুঞ্জেল কান্নায় ভেঙে পড়লো। তার চোখের জল রাজপুত্রের চোখে দু' ফোঁটা গড়িয়ে পড়ামাত্র এক মুহূর্তে রাজপুত্রের চোখের ক্ষত মিলিয়ে গেল। তিনি ফিরে পেলেন তাঁর দৃষ্টি। তার পর হাত-ধরাধরি করে দু'জনে রওনা হলেন বনের বাইরে। ডাইনী গম্বুজের ওপর থেকে দেখতে পেয়ে রাগে গর-গর করতে লাগলো, কিন্তু কি-ই বা আর করবে? নামবার ত কোন উপায় নেই তার। রাগে দুঃখে ফেটে পড়লো সে। মাত্রাটা কিছু বেশীই হয়ে পড়েছিল। অতো রাগ সামলাতে না পেরে গম্বুজের ঐ ঘরের মধ্যেই মরে পড়ে রইলো ডাইনী। রাজপুত্র আর রাপুঞ্জেল মনের সুখে হাত ধরাধরি করে বনের বাইরে চলে এলেন যেখানে রাজপুত্রের লোকজনেরা অপেক্ষা করছিল। তারপর সবাই মিলে মহা আনন্দে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। রাজা রাণী ত রাপুঞ্জেলকে দেখে খুব খুশী। তাঁকে তাঁরা আর ছাড়তে চাইলেন না। রাজার পুত্রবধূ হয়ে রাজবাড়ীতে রাপুঞ্জেল থেকে গেল।

খামখেয়ালী ছড়া

অজিতকৃষ্ণ বসু

টাকুমারী তেল

মাথায় পরে গান্ধী-টুপি গন্ধমাদন গরাই
রেলগাড়ীতে টাকের ওষুধ বেচেন ক'রে বড়াই :
"চবুকা-মার্কা টাকুমারী তেল, টাকের মহা বৈরী,
আপন ঘরে যত্ন করে আপনি করি তৈরী।
স্বপ্নে-পাওয়া গোপন ওষুধ মিশিয়ে তেলের সঙ্গে
টাক-রোগীদের টাক সারাতে ছড়াই সারা বঙ্গে।
টেকো মাথায় চুল গজাতে নেই কোনো এর জুড়ী।
তরুণ কিম্বা তরুণী, আর বুড়ো কিম্বা বুড়ী,
টাক অথবা টাকের আভাস যারই মাথায় আছে
টাকের দাওয়াই টাকুমারী তেল পাবেন আমার কাছে।
জলের দামে বিক্রী করি—এক টাকা এক শিশি ;
আগাগোড়াই খাঁটি, এবং একেবারে দিশি।
হাতে হাতেই প্রমাণ পাবেন সন্দ করেন যাঁরা।"
এই না বোলে ঝোঁকের মাথায় দিলেন মাথা-নাড়া।
পড়লো খসে গান্ধী-টুপি, সকলে সেই ফাঁকে
দেখেন তাঁহার মাথা ভরা আগাগোড়াই টাকে।
হেসে উঠে বলেন সবাই "সব ব্যাটাই সমান।
কেমন তোমার টাকের ওষুধ, তোমার টাকেই প্রমাণ।"
গরাই তখন বলেন মাথায় টুপীটি ফের রাখি'
"আমার এ তেল নিজের মাথায় কখখনো কি মাখি?
কখখনো না। ময়রা কি খায় আপন হাতের মিঠে?
কোথাও ঘোড়া কখনো কি চড়ে নিজের পিঠে?
বদ্যি কি খায় নিজের পাচন? কখখনো নয় জানি।
আমার এ তেল পরের তরেই বেচতে শুধু আনি।
আপনি আমি তরি না তো, পরকে শুধু তরাই।"
এই বলে দুই গোঁফে তা দেন গন্ধমাদন গরাই।

চৌকিদার

চৌকি তোমার থামাও রে ভাই চৌকিদার!
নিঝুম রাতে ঘুমে যখন নাক ডাকে
ধমকে কেন চমকে তোলো হাঁক-ডাকে?
সইতে পারা দায় হলো যে এ চিৎকার।

আকাশ জুড়ে জোছনা জাগে, সেই সাথে
একলা ঘুরে গোপন রাগে এই রাতে
ভাবছ নাকি "ঘুমিয়ে যারা
আমার সাথে জাগুক তারা,
একাই আমি জাগবো কেন রাস্তাতে?"

চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে ঘুম তাড়াও,
প্রাণপণে যে হট্টগোলের ধূম বাড়াও।
যতই চেঁচাও জোর তুমি
ততই যে ঘুম-চোর তুমি,
ঘুমের দফা করলে রফা, দুখের কথা কই কাকে?
দোহাই তোমার, দাও গো রেহাই,
ভাঙিও না ঘুম হাঁক-ডাকে।

অক্ষয় তৃতীয়া

পুষ্প দেবী

আজ অক্ষয় তৃতীয়া। কেউ কি জানে এই দিনটির আশায় সারা বছর কি ব্যাকুল আগ্রহে আমি চেয়ে থাকি? আশ্চর্য্য শাস্ত্রকারদের আইন! এই একটি দিন ছাড়া আর কোন দিন না কি মেয়ের অধিকার নেই বাপ-মাকে এক ফোঁটা জল দিতে। বুক তার ফেটে গেলেও নয়। আর ছেলেদের মনে ইচ্ছে থাক বা না থাক, বৌদের যতই না মনে বিরক্তি আসুক, তবু তাদের অধিকার না কি সর্ব্বক্ষণই!

কাল তো মনের অস্থিরতায় সারা রাত জেগেই কাটালুম। সারা জীবনের কত কথাই না ভীড় করে মনে আসছে! দীর্ঘ ৪০ বছরের কত না স্মৃতি! বাবা, আমার সেই বাবা, পূজোর আসনে বসে ভগবানকে ডাকতে গিয়ে নারায়ণের মুখ আড়াল করে ফুটে উঠেছে যাঁর মুখ। সন্তানের হাসিতে দেখেছি যাঁর হাসির ছায়া। আমার সেই সমস্ত জীবনের আনন্দের প্রতীক, সমস্ত ভালোবাসার আধার, ভক্তি-শ্রদ্ধার মূর্ত্ত দেবতা, শিক্ষায় গুরু, মমতায় মায়ের অধিক, সেই অনুপম অতুলন আমার বাবাকে আজ না কি আমি যা-খুশী দিতে পারি। শাস্ত্রের কোন বাধা আজ নেই।

পূজোয় বসে মনের তৃপ্তি হারিয়ে গেল। কোন কিছুই যেন মনোমত হচ্ছে না। মা গো', এমন বিশ্রী শুক্‌নো ফুলের মালা কি দিতে ইচ্ছে করে বাবার ছবিতে? সরকারের যদি কিছু এক ফোঁটাও বুদ্ধি থাকে! আস্ত আকাট মুখ্যু। ভেবেছে, সস্তার জিনিষ এনে মাকে আজ কি খুসীই না করলুম! ও মা, আমের ছিরি দেখো! অর্দ্ধেক গলগলে, অর্দ্ধেকটা দড়কচা-মারা। বলতে গেলে এখন গজগজানির সীমা থাকবে না। আম যে এখনও বেশী ওঠেনি সে কি আমি জানি না? বছরে একটা দিন, রোজ তো নয়? যদি টাকায় একটা আমই কেনা যেত কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত তাতে? যাক্‌গে এ সব কথা, ও-সব মানুষকে বোঝানও দায়। টাকা-পয়সার হিসেব করে করে মানুষটার আর কিছু আছে কি? এত বকুনির পরও যে দাঁত বের করে সস্তায় আনা এক বিঘৎ গামছাটা দেখিয়ে আস্ফালন করছে, তাকে কি আরও বলার কিছু আছে? সে তো নিজেই বলছে, দিতে হয় তাই দোয়া, যাকে বলে নেম কম্ম—এ কি তিনি পরে চান করবেন, না গা মুছবেন? এ শুধু পুরুতদের আদায়ের ফন্দি ছাড়া কিছুই তো নয়। তাছাড়া—হঠাৎ সরকার থেমে যায়, জানি না আমার মুখে কিছু পরিবর্ত্তন হয়ত দেখে থাকবে। তাড়াতাড়ি সুর পালটে বলে, এ-সব হল পুণ্যির কাজ, পুণ্যির জন্য যতটুকু বিধি দিতেই হবে; নইলে মরা মানুষ—তাকে থামিয়ে সেখান থেকে চলে যাই।

কেন যে মিছিমিছি ওর দোষ দিচ্ছি! মেয়ের তত্ত্বর কাপড়, দু' গজ ব্লাউজের ছিটের বেলা তো দিব্যি দোকানে-মার্কেটে যেতে পারি! আর আজ যত আবদ্ধ যত নির্ভরতা এল এই বচ্ছরকার একটা দিনের জন্যে? কেন যে নিজে গিয়ে ফলগুলি কিনিনি সেজন্যে মনে যেন কষ্টের সীমা-পরিসীমা থাকে না। নিজের দোষ কার ঘাড়ে চাপাবো? অত যে-বেল ভালোবাসতেন বাবা, একটা বেলও আনেনি, না লিচু না তালশাঁস, কিচ্ছু না?

ও মা! পুরুত মশাই এসে গেছেন যে? তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে গুছিয়ে দিই। বাবার ছবিতে একটা মালা অবধি নেই—ও শুকনো মালা কলসীতেই ভালো, ছবিতে আর দিয়ে কাজ নেই। সারা বছর বসে না ভেবে যদি একটু করিৎকর্ম্মা হতুম, আজ এ কষ্ট পেতে হত না। হঠাৎ বাবার ছবির দিকে নজর পড়ে। মুখে সেই প্রশান্ত হাসি, যেন তেমনি আগের মত বলছেন, "এত অকারণ তুমি ব্যস্ত হও কেন? এই তো বেশ!"

সারা জীবন কখনো কোন জিনিষই তাঁকে দিয়ে তৃপ্তি পাইনি। যাই-ই দিতুম মনে হত, মা গো, এ একটুও ভালো হল না, এই কি বাবাকে দেবার মত জিনিষ? মনে পড়ছে বহু কাল আগেকার কথা। একবার গিয়ে দেখেছিলুম ছোট একটা

আয়নায় বাবার পোষাক পরার বড় অসুবিধে—এ তো আর আজকালকার দিন নয়? গেঞ্জির ওপর একটা বুক-কাট বা হাউই সার্ট পরে সর্ব্বত্র যাওয়া যায়। তখন সার্ট, ওয়েষ্ট-কোট টাই—নানান্ খানা হাঙ্গামা—তাই পরের বার যখন বাবার কাছে যাই একখানা বড় আরসী কিনে নিয়ে গেছলুম ট্রাঙ্কের তলায় করে। তখনকার কালে শ্বশুরবাড়ী থেকে যাবার সময় বাবা-মার জন্যে জিনিষ নেওয়া ছিল ভীষণ নিন্দের—কাজেই ষ্টেশনে যাবার পথে কেনা অত্যন্ত সস্তার জিনিষ। বাড়ীর আশে-পাশের আসবারপত্রের মধ্যে সত্যিই সেটা বেখাপ্পা লাগছিলো। তবু বাবার কি আনন্দ তাতে? বারে বারে মাকে বলছেন, "এমন মেয়ে কি কারুর হয়?" সেই আরসীটা আজও তেমনি আছে। আশ্চর্য্য, দুনিয়ায় একটা ক্ষণভঙ্গুর কাচের জিনিষও যত্ন করে রাখলে তিন পুরুষ থাকে, থাকে না শুধু মানুষের অমূল্য প্রাণটুকু। কোন জিনিষই কি ছাই তাঁকে দেবার উপায় ছিল? আজ মনে পড়ছে যখন কাপড়ের কণ্টোল হয় সে কি বিশ্রি মোটা মোটা ধুতি সব—আর তেমনি কি বহরে ছোট! বাবার মত লম্বা মানুষের জন্যে ভাবনা আরও বেশী। সে বার কত হাঙ্গাম করে ডবল দাম দিয়ে ৪৮ ইঞ্চি বহরের ধুতি আনিয়ে বাবাকে ডাহা মিথ্যে কথা বলে দিলুম যে, আমাদের কণ্টোলের দোকানে মস্ত বড় বহরের ধুতি দিচ্ছে, বাবা যদি বদলে নেন ভালো হয়। এত পাতলা বড় বহরের কাপড় লোকজনদের টেঁকবে কি? ও মা, বাবা সেই কাপড় কি না অনায়াসে রাম বাবুর ছেলেকে দিয়ে তার মোটা ধুতি-জোড়া আমায় এনে দিলেন। সত্যি, বলো দেখি, তাঁর জন্য কিছু করা কি সোজা? বেঁচে থাকতে তো কখনো কিছু দেবার উপায়ই ছিল না—তার পরে পড়লুম শাস্ত্রকারদের হাতে। সব-কিছুতেই মেয়েদের অধিকার নেই—বাধা তার পদে পদে। আর একদিনের কথাও মনে পড়ে। তখন বয়েস আমার কতই বা হবে? ষোল সতের হোক? প্রথম বুনতে শিখে মহা আনন্দে বাবার একটা সোয়েটার বুনে দিয়েছিলুম খুব মিহি কাঁটায় সরু উলে। ও মা, একদিন দেখি বাবার চাকর রামভজন দিব্যি সেই সোয়েটার পরে হাজির। মনে প্রচুর অভিমান হল। শুনলুম, বাবার সঙ্গে কোথায় না কি সে মফঃস্বলে গিয়েছিলো, সেখানে তার খুব কম্প দিয়ে ম্যালেরিয়া জ্বর হয়, তখন বাবা নিজের গায়ের সোয়েটারটা খুলে তাকে দিয়েছিলেন পরতে, কাজেই জামাটা তারই অদৃষ্টে নাচছিল। বাবার সেই মান্ধাতার আমলের সোয়েটারই পরা চললো। একবার এ বিষয়ে কি বলতে গিয়েছিলুম, বাবা হেসে বলেছিলেন, তোমরা কোন জিনিষ পুরোপুরি দিতে পার না তো? তাই এত সহজে কষ্ট পাও। কেন যে অকারণ তুমি ব্যস্ত হও, এই তো বেশ চলছে আমার!

ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি, বাবার মুখের সেই প্রশান্ত হাসি আজও তেমনি অম্লান, এক বিন্দুও তা ক্ষুণ্ণ হয়নি। অত কঠিন যন্ত্রণার মধ্যেও ঠিক এমনি হেসেই বলতেন, "কেন এত ব্যস্ত হচ্ছ তুমি, ওতে তো কিছু লাভ নেই—এমনি করেই আস্তে আস্তে সেরে উঠবো।" পাছে আমরা মনে কষ্ট পাই একবার মৃত্যুর কথা মুখেও আনেননি। অমন সহ্য হয় কি কারুর? না অমন ভালোবাসতে পারবে আর কেউ?

তার পর মনে পড়ে বাবার চতুর্থী পুজার দিনের কথা। সত্যি কথা বলতে কি, খাটখানা আমার একদম পছন্দ হয়নি। উনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। লোক-জনকে দিয়ে কেনানো ছাড়া উপায়ই বা কি? বারে বারে মনটা খুঁতখুঁত করছিল। মা গো, অত বড় লম্বা-চওড়া মানুষটাকে কি এইটুকু খাটে ধরে? আশ্চর্য্য কাণ্ড! এত ছোট খাটই বা পেলো কোথায়? আপন মনে গজ্ গজ্ করছিলুম। খুড়তুতো ভায়ের কানে কথাটা গেলো। সে বললো, "কেন দিদি, বেশ তো খাট! এ তো প্রমাণ সাইজ। ছোট কি করে হবে?" কে জানে বাপু আমার তো কেবলই মনে হচ্ছে বাবাকে কক্ষনো এ খাটে ধরতো না। অদ্ভুত কাণ্ড! এখনও ভাবলে গা শিউরে ওঠে। সারা দিনের অত খাটুনির পরও শুয়ে ঘুমুতে পারলুম না। বুকের মধ্যে কি যে একটা বেদনা মুচড়ে মুচড়ে ওঠে, মনে হয় বুকটা বুঝি বা গুঁড়িয়ে শেষ হয়ে যাবে! মাটিতে কম্বলে ছোট ভাইটি শুয়ে—পাশে বসে সেই শুকনো মুখখানার দিকে চেয়ে থাকি। তার অশৌচ এখনও শেষ হয়নি। আমার আর কোন বাধা-বন্ধ নেই, আমি যে মেয়ে, আমি যে পরগোত্র। ভায়ের রুক্ষ চুল, শুকনো মুখ, আহা মুখখানিতে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে! চেয়ে দেখতে গেলে চোখ জলে ভরে ওঠে। কিচ্ছু দেখতে পাই না। আঁচলে চোখ মুছে আবার চাই বাবার শূন্য হসপিটাল বেড-খাটের দিকে—ও মা এ কি? এ যে দিব্যি ফুল দিয়ে সাজানো চতুর্থীর খাটখানা, তাতে শুয়ে মজা মজা মুখ করে বাবা হাসছেন যেন ঠিক আগের মতই। বলছেন, "কেন যে অকারণ তুমি ব্যস্ত হও? এ ত বেশ!"

ও মা! পুরুত মশাই যে বসে আছেন, ছিঃ ছিঃ! কি আশ্চর্য্য মানুষ আমি! দিব্যি আকাশ-পাতাল ভাবছি আর মানুষটাকে আটকে রেখেছি!

পুজো আরম্ভ হল। আঃ! কি সুন্দর আমাদের মন্ত্রগুলি, বুকের ভেতর অবধি যেন জুড়িয়ে যায়! হ্যাঁ এইটেই ঠিক কথা "হরি! আমার মত পাপীও আর কেউ নেই আর তোমার মত ত্রাণকর্ত্তাও আর কেউ নেই, ওই তোমারি চরণে আমার সব সমর্পণ করে দিলুম—সকল বিনাশ থেকে তুমি এদের রক্ষা করো।" আবার শুনি এই মাটির কলসী আর এই সামান্য ক'টি জিনিষ না কি উৎসর্গ হচ্ছে বাবার অক্ষয় স্বর্গবাস কামনা করে। মা গো! বলতেও লজ্জা করে এই যে আমার পুজো এতে আমার নিছক মন ভোলান ছাড়া। আর কিছু আছে না কি? তাঁর সারা জীবনের অত যে সেবা, অত যে দান-ধ্যান অত যে কাজ কিছুই বুঝি তাঁকে অক্ষয় স্বর্গে পৌছে দিতে পারেনি? আমার এই মাটির কলসী সরাটুকুর জন্যে আটকে ছিল? কি যে বলবো? হাসিও পায়-দুঃখও হয়!

আবার মন্ত্র বলি। আঃ, কি সুন্দর কথা গো! "হে ধর্ম্ম-ঘট, এই জলপূর্ণ হয়ে যেমন শীতল হয়েছ আমার এই শোকদগ্ধ হৃদয়কে তেমনি শীতল করো।" প্রণাম করতে গিয়ে সব যেন গুলিয়ে যায়। মনে হয়, যাক্, শেষ হয়ে গেল সারা বছরের জন্য বাবার জন্য যা কিছু করার। আর শত চেষ্টা করলেও তাঁর জন্য করার কিছুই নেই আমার। অথচ তিনি সারা জীবন

ধরে কত যে আমার করেছেন তার তো সীমা-পরিসীমা নেই। জানি না আর কেউ আছে কি না অত করার মত। পূজোর শেষে মনটা অকারণ বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। মনে হয় সবই যেন বৃথাই গেল, কিছুই হল না। আবার বাবার ছবির দিকে চাই। মুখে সেই অনাবিল প্রশান্ত স্নিগ্ধ হাসি। চোখ দিয়ে স্নেহ-মমতার ঝরণা বইছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি যেন বলবেন, "কেন যে আমার জন্ম অকারণ তুমি ব্যস্ত হও?" কিম্বা "হ্যাঁ রে, বাবা কি কারুর হয় না?"—

দেখছো, এ ধারে বামুন ভাত নিয়ে বসে আছে। আঃ! কেন যে এদের এসব মনিব-ভক্তির ঘটা! মানুষ সকালে ক ঘণ্টা উপোস করেছে বলে কি সাত গুণ খেয়ে পুষুতে হবে? এই ত এক গ্লাস ডাবের জল খেলুম। এখনও গলায় গলায় হয়ে রয়েছে। তার চেয়ে দয়া করে আমার ভাত ঢেকে তোমরা খেয়ে-দেয়ে আমায় উদ্ধার কর দেখি! আমি বরং বারান্দায় বসে মাথাটা একটু ছাড়িয়ে নিই খোলা হাওয়ায়, বড্ড ধরেছে মাথাটা।

ও মা! আহা বাছা রে! কত দিন যে খায়নি কে জানে? কি কঙ্কালসার শিশু দুটি? কি কাড়াকাড়ি করে ডাষ্টবীন থেকে তুলে কি খাচ্ছে? ও, ওই বুঝি ওর মা? মায়ের অবস্থাও তেমনি। অ বিন্দি! যা দেখি ওদের ডেকে নিয়ে আয়। ওদের বাটিতে ঢেলে দে দেখি ওই ভাত-মাছের রাশ। ওদেরও আনন্দ, আমারও মুক্তি। আহা, কি অবর্ণনীয় আনন্দে ভরে গেল ভিখারিণীর মুখ! যাকে কবির ভাষায় বলে বাক্যহারা। কি তৃপ্তি ভরেই যে শিশু দুটি খেলো, সে যেন বলার নয়! মনে হল, সার্থক হল আমার আজকের দিন। পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে ভরে উঠলো বুক। সামনের আকাশে অস্তগামী সূর্য্যের প্রদীপ্ত আলো ছড়িয়ে পড়েছে ধূসর দিগন্তে। সেই দিকে চেয়ে মনে হল, ওরই সঙ্গে যেন মিশিয়ে আছে আমার বাবার মধুর মুখের তৃপ্তি-ভরা হাসি। বুঝলুম, আমার এ পূজাটুকু তাঁর আশীর্ব্বাদ পেয়েছে। মনে পড়ে গেল, ছোটবেলায় তাঁরই কাছে শেখা কবিতা—"ক্ষুধিতেরে অন্নদান সেবা তোমরা লইবে বল কে বা?"

ছেলেদের খাদ্য

"অরুন্ধতী"

শিশু ও বালক-বালিকারা প্রত্যেক জাতির ভবিষ্যৎ আশা-স্বরূপ। ছেলেরা বড় হয়ে যদি স্বাস্থ্যবান ও নীরোগ হয় তা'হলে সেই সঙ্গে জাতির উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্ম ছেলেদের খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ, খাদ্য ও স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। কিন্তু আমরা ছেলেদের খাদ্য সম্বন্ধে হয় উদাসীন, নয় ত অজ্ঞ। কোন খাবার, কি পরিমাণে ছেলের শরীরের পুষ্টির জন্ম দরকার, কি ভাবে সেই খাদ্য প্রস্তুত হয় ও গঠনোন্মুখ শরীরের উপর কার্য্য করে, সে বিষয়ে আমরা চিন্তাই করি না; তার ফলে আমরা বাঙ্গালীরা দিন দিন দুর্ব্বল হয়ে পড়ছি। আমাদের স্বাস্থ্য নেই, বল নেই, আমরা সব হারিয়ে বসেছি। জীবন-যুদ্ধে বাঙ্গালী ছেলেরা সমস্ত ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়ছে। এই শারীরিক দুর্ব্বলতার কারণ—প্রথমতঃ, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, দ্বিতীয়তঃ, আহার যা' মেলে তা' যথেষ্ট নয়, তৃতীয়তঃ নানা রকম কুখাদ্য আহার।

বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, বাঙ্গালীর খাদ্যে শ্বেতসারের অংশ খুব বেশী, নাইট্রোজেনের ভাগ এত কম যে শরীরের পুষ্টি সাধন করাতে পারে না। শ্বেতসার, প্রোটিন্, শর্করা, স্নেহ ও লবণ জাতীয় পদার্থ আমাদের খাদ্যের ভেতর থাকে; এদের মধ্যে প্রোটিনে শুধু নাইট্রোজেন থাকে। খাদ্যের মধ্যে শুধু দুধ, মাংস, ডিম ও মাছে প্রোটেন থাকে। টাকায় এক সের দুধ কিনতে ক'জন লোকই বা পারেন? ডিম অনেকে খান না। মাংস কেনার সঙ্গতি অনেকের নেই। মাছের দাম আজ-কাল মাংসের চাইতে বেশী। কাজেই নাইট্রোজেন আমাদের খাদ্যে নেই বললেই হয়।

পঁচিশ বছর পর্য্যন্ত দেহের গঠন-কার্য্য ও পুষ্টি হয়। তা'ছাড়া আমরা দৈনিক যে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করি, সে জন্ম দেহের ক্ষয় হয়। এই ক্ষয়ের পূরণ হওয়া আবশ্যক। দেহের পুষ্টি ও ক্ষয় পূরণ হয় প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাদ্যে। তিন রকম খাদ্য ছেলেদের পক্ষে দরকার, যেমন (ক) প্রোটিন জাতীয়—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল ইত্যাদি, (খ) স্নেহ জাতীয়—ঘি, তেল, মাখন, চর্ব্বি ইত্যাদি, (গ) শাক জাতীয়—শাক-সব্জী, ফল, ভাত, গম, চিনি। এই তিন রকম খাদ্যই অল্প-বিস্তর গ্রহণ করা উচিত। শৈশবে ঘি, দুধ, মাখন, যৌবনে মাছ, মাংস, ডাল ইত্যাদি খাওয়া উচিত। যত দিন দাঁত না উঠে তত দিন মাতৃস্তন্যই শিশুর প্রকৃতি-দত্ত আদর্শ খাদ্য। যদি মায়ের স্বাস্থ্য ভাল না হয় তা'হলে মায়ের দুধ না খাওয়ানই ভাল, কারণ, তাতে শিশুর চিরদিনের জন্ম স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়। পরিবর্ত্তে শিশুকে খাঁটি গরুর দুধ জল মিশিয়ে খাওয়ান ভাল। প্রথম ছ' বছর শিশুকে দৈনিক এক সের দুধ দিতে পারলে শরীর নিশ্চয়ই ভাল হয় কিন্তু দেশে দুধের দুর্ভিক্ষ—এক সের ত' দূরের কথা, অধিকাংশ শিশুরই এক ছটাক দুধ জোটে না। দুধের মধ্যে পাঁচটি সারবান পদার্থ আছে, যেমন—(১) ছানা জাতীয়, (২) মাখন জাতীয়, (৩) শর্করা জাতীয়, (৪) লবণ জাতীয়, (৫) জলীয়। এই পাঁচটি পদার্থই শরীর পোষণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। শৈশবে দুধের অভাবেই অধিকাংশ ছেলেরাই রুগ্ন ও শীর্ণ হয়।

দেশের অবস্থা ভাল নয়—দুধ, মাছ, মাংস প্রভৃতি দুর্ম্মূল্য, সুতরাং পরিবর্ত্তে ডাল প্রধান খাদ্য ধরতে হবে। ডাল, মাছ ও মাংসের অভাব অনেকটা পূরণ করে। মুসুর ডালই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এতে শতকরা ২৫ ভাগ ছানা আছে। মুগের ডাল, অড়হর ডাল, ছোলার ডালও উপকারী, সারবান ও সস্তা। প্রত্যেক দিন সময়ের ফল তা' যত সামান্যই হোক্ না কেন, ছেলেদের দেওয়া দরকার। দু'আনা দিয়ে ছেলেদের খেলার মার্ব্বেলের মতন ছোট একটি রসগোল্লা জলখাবার খেতে না দিয়ে, যদি দু'পয়সার মুড়ি ও ৪ পয়সার একটি শশা বা নারকোল জলখাবার খেতে দেওয়া হয় তা'হলে ছেলের শরীরের পক্ষেও ভাল হয় এবং পয়সার দিক থেকেও সুসার হয়। ছোটবেলায় মাংস যত কম দেওয়া যায় ততই ভাল। মাছ শরীরের পুষ্টি করে। ডিমের কুসুম মাঝে মাঝে দেওয়া ভাল।

শাক-সব্জী শিশু এবং বালক উভয়েরই নিত্য খাওয়া দরকার। তরকারীতে যে লাবণিক পদার্থ আছে, তাতে রক্ত পরিষ্কার করে,

দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টির সাহায্য করে। ফলে একই উপকার হয়। রাঙ্গা আলুতে খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন) খুব বেশী, সে জন্য বিশেষ উপকারী। কড়াই শুঁটি, বরবটি, সিম প্রভৃতি খাদ্যেও ভিটামিন খুব বেশী এবং ডালের মতই উপকারী। তরকারী খোসাশুদ্ধ রান্না করা উচিত, কারণ, তাহ'লে তরকারীর যা সারাংশ বা ভিটামিন তা' নষ্ট হয় না কিংবা তরকারী সিদ্ধ করে তার পর খোসা বাদ দেওয়া উচিত। তরী-তরকারী কোষ্ঠবদ্ধতাও নিবারণ করে।

ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। ছেলেদের ঢেঁকী-ভাঙ্গা চাল বা আতপ চাল খাওয়ানোর অভ্যাস করান ভাল। কলের ছাঁটা সাদা ধবধবে চালের আমরা পক্ষপাতী কিন্তু ঐ চালের অধিকাংশ ভিটামিন্ ছাঁটাইয়ের সময় নষ্ট হয়ে যায় এবং শ্বেতসার ছাড়া সারবান পদার্থ বিশেষ কিছু থাকে না। ভাতের ফেন ফেলে দিই, তাতেও ভাতের অনেক সারাংশ বেরিয়ে যায়। ফেনশুদ্ধ ভাত খাওয়ানোর অভ্যাস করালে ছেলেদের শরীরের পুষ্টি বেশী হয়। তাতে একটু খাঁটি ঘি বা মাখন রোজ খাওয়া খুব ভাল। ভাত অপেক্ষা রুটি দ্বিগুণ সারবান। ময়দায় নাইট্রোজেন আছে ১০ ভাগ, ভাতে আছে ৫ ভাগ। নাইট্রোজেন শরীর বৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজন। ছেলেদের রাত্রে রুটি খাওয়ানোর অভ্যাস করান ভাল। জাঁতা-ভাঙ্গা আটা শরীরের পক্ষেও উপকারী, খেতেও সুস্বাদু।

মাছ পুষ্টিকর খাদ্য। আমাদের একটা কথায় আছে: 'মাছ খেলে বুদ্ধি বাড়ে।' বেশী পাকা মাছ বা বড় গলদা-চিংড়ী মাছ হজমের ব্যাঘাত ঘটায়; কাজেই ছেলেদের না খাওয়ানোই ভাল। পচা মাছ বিষের মত। মাংস সুপাচ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য কিন্তু বেশী ঘি, তেল, মশলা দিয়ে রান্না করলে গুরুপাক হয়। আমাদের দেশে গরম বেশী। সে জন্য ছোট ছেলে-মেয়েদের মাংস যত কম দেওয়া হয় ততই ভাল। যৌবন কালে যখন পরিপাক-শক্তি বাড়ে তখন মাংস খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, তবে বেশী খেলে শরীরে 'ইউরিক্ এ্যাসিড' জন্মায় এবং নানা রোগের সৃষ্টি করে। তা' ছাড়া টোমেন্ নামক এক রকম তীব্র বিষ দূষিত মাংসে জন্মায়। এইরূপ মাংস খাওয়া বিপদজনক। ডিমও সারবান খাদ্য। ডিমে ছানা আছে ১৪ ভাগ আর মাখনে আছে ১৮ ভাগ। বেশী সিদ্ধ ডিম হজম হয় ৩ ঘণ্টায় এবং অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম ১।• ঘণ্টায় হজম হয়।

ঘি ও তৈল এই দুটি আমাদের অত্যন্ত আবশ্যক খাদ্য-সামগ্রী।

স্বাস্থ্য ভাল রাখতে ঘি'র মতন জিনিষ আর কিছু নেই, তবে খাঁটি হওয়া চাই। আজ-কাল খাঁটি ঘি দুর্লভ। যত রকম 'হারাম' পদার্থের চর্বি ঘিয়ে ভেজাল দেওয়া হয়। ঘি'র অভাব ঘানির তেল দিয়ে পূরণ করা যায়। তেলেও ভেজালের অভাব নেই, তবে সাপ বা শুয়ারের চর্বি থাকে না। এই দুটি জিনিষে ভেজাল আমাদের স্বাস্থ্যহানির কারণ।

দোকানের বা রেস্তরাঁর তৈরী খাবার কোন ক্রমেই ছেলেদের খেতে দেওয়া উচিত নয়। ঐ খাবার বিষের মতন অনিষ্টকারী। মুড়ি খই, চিঁড়া প্রভৃতি অতি সুন্দর জলখাবার। মুড়ি আমাদের দেশী বিস্কুট। মুড়িতে শ্বেতসার আংশিক ভাবে ডেক্স্ট্রিনে পরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। ছোলাসিদ্ধ, মুগের ডাল বা ছোলা ভিজানো, চীনাবাদাম, কড়াই শুঁটি ইত্যাদি জলখাবার হিসাবে পুষ্টিকর ও মুখরোচক। যাঁদের অর্থ আছে, তাঁরা ছেলেদের আখরোট, বাদাম, কিসমিস, পেস্তা, মনক্কা, খোবানি, খেজুর দিতে পারেন।

শরীর সুস্থ ও নীরোগ রাখতে হ'লে, আহার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম ছেলেদের জানা দরকার। আহার মাত্রই হবে পরিমিত। এমন পরিমিত ভাবে খেতে হবে যাতে খাওয়ার শেষে বায়ু চলাচলের জন্য পেটের এক কোণ (ভাগ) খালি থাকে, তা'হলে সহজে হজম হয় ও কোন অসুখ করে না। তাড়াতাড়ি খাওয়া উচিত নয়, আস্তে আস্তে ভাল করে চিবিয়ে খাওয়া উচিত। দাঁতকে তার কাজ করতে দেওয়া চাই—খাদ্য-কণা যত সূক্ষ্ম হবে তত শীঘ্র হজম হবে ও শরীরের পুষ্টি বেশী হবে। তাড়াতাড়ি খেলে হজম হয় না ও অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি রোগে স্বাস্থ্য-হানি হয়। প্রতিদিন একই সময়ে আহার করা বিধেয়। বলা বাহুল্য, সকল খাদ্যই তাজা ও সুপক্ক হওয়া চাই।

কথিকা

শ্রীমতী সুধীরা বসু

রেল লাইনের ধার ঘেঁসে শহরের যে প্রান্তটা শেষ হয়েছে, সেখানটায় গিয়ে দাঁড়ালে চোখে পড়ে শুধু এবড়ো-খেবড়ো খোয়া-ওঠা লাইনের ধারের মাটি, না আছে ঘাস, না আছে কোন গাছ-পালা। চারি দিকে ভাঙা লোহা-লক্কড়, টিন ছড়ানো, কি যেন একটা রেলের কারখানা আছে পাশে, দেখা যায় তার ছাদের টিনের শেড, আর ধোঁয়ায় কালো দুটো চিম্‌নী, তার থেকে অনবরত বেরুচ্ছে কালো ধোঁয়া, পড়ন্ত বেলার ধূসর আকাশে মিশে গিয়ে যেন আকাশ ও চারি পাশ আরও ম্লান করে দিচ্ছে। এরই পাশে সারি সারি টিনের বা খোলার ছাদওলা কুলি-বস্তি, যেমন ময়লা তেমনি নোংরা।

এইখানটা দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালাম। ও কি? ওই ভাঙা জানলাটার ধারে? এই শ্রীহীন রুক্ষ পরিবেশে কে এই সৌন্দর্য্যস্রষ্টা? একটা নীচু ছাদওলা মাটির ঘরের কালো দেওয়ালের ধারে ছোট একটা জানলা, আর ওপরে বসানো রয়েছে ছোট্ট একটা টিনে পোঁতা সতেজ, সবুজ সুন্দর একটি নাম-না-জানা ফুলের গাছ, তার সর্বাঙ্গে ছোট ছোট লাল ফুলের অঙ্গসজ্জা সাজিয়ে সবুজ পাতাগুলি নেড়ে বেলাশেষের মৃদু-মন্দ হাওয়ায় দুলছে। সে যেন আপন পরিপূর্ণতায় আপনি খুসী, দরকার নেই তার দেখবার কোথায় কি মলিনতা, শ্রীহীনতা।

আমি যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালাম, মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলাম এই গাছটার দিকে, হঠাৎ আমার মনে হল এই গাছটা আমার বড় চেনা; ঠিক এই গাছটা নয়, কি যেন, কার সঙ্গে এর যেন খুব সাদৃশ্য বড় মিল আছে। মনে পড়েছে, এবার মনে পড়েছে, ইরা—হ্যাঁ সেই হাসিখুসী ছেলেবেলে প্রাণরসে ভরা সুশ্রী মেয়েটি। অনেক দিন হয়ে গেল তাকে দেখিনি, কত দিন হবে মনে মনে হিসাব করি ও চেয়ে দেখি সেই গাছটার দিকে। শেষবার যখন তাকে দেখি তখন দেখেছিলাম তাকে বধূরূপে, ঠিক এই গাছটার মত—লাল শাড়ী-পরা, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারের দ্যুতি, নিজের ভরা প্রাণের আনন্দে নিজেই মশগুল, শুধু চোখে-মুখে মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে তার ছায়া। ঠিক এই গাছটার মত শ্রীহীন পরিবেশ, চারি দিকে অবাঞ্ছনীয় আত্মীয়া অনাত্মীয়ার ভীড়, সেটা ছিল ইরার শ্বশুরবাড়ী ও সেদিন ছিল বৌভাত। চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম এই সব আত্মীয়া ও অনাত্মীয়াদের নানা রকম প্রতিকূল ও অনুকূল মন্তব্য। মাঝে মাঝে তার চোখের দৃষ্টি ক্লান্তিতে বুজে আসছিল, মুখ হয়ে উঠছিল করুণ; কিন্তু পরক্ষণেই সে আপনার প্রাণরসে আপনিই হয়ে উঠছিল চঞ্চল ও খুসী, যেন তার নিজেকে নিজেই দেখা ছাড়া চারি দিকের আর কিছু দেখবার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু তা বললে তো হয় না, বাস্তবকে ঠেলে ফেলা যায় না, তার রূঢ় আঘাতে ভেঙে যায় স্বপ্নের কল্পনা-বিলাস। ইরারও তাই হয়েছিল। সে যে আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বড় হয়েছে, সেখানে কোন নীচতা হীনতার স্থান ছিল না। তার মনের ও দৃষ্টির চারি দিকে ছিল শুধু তার পিতামহর ও পিতার জ্ঞান ও বিদ্যার অর্জ্জনে নিমগ্ন ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তি, সুন্দর সুস্থ মনের পরিচয় ও যা-কিছু সত্য ও সুন্দর তারই আরাধনা।

ইরা ছিল তার পিতার একমাত্র সন্তান, পিতামহের নয়নের মণি, আনন্দের খনি। আপনার মনে সে হেসে-খেলে বেড়াত। ফিরে চেয়েও দেখত না যে সংসারে বাস করতে গেলে প্রয়োজন হয় সব কিছুরই, শুধু সরল মন নিয়ে সহজ ভাবে নিলেই চলে না, তাতে পেতে হয় আঘাত। সংসারে শুধু আনন্দময়ই নয়, নিরানন্দও ঠিক সমান ভাবে তার পাশে স্থান নিয়েছে, সংসারে বিচরণ করছে কত রকম মানুষ তাদের ভিন্ন ভিন্ন মন ও রুচি নিয়ে। আর আছে হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা যা মানুষকে করে দেয় অমানুষ, সংসারকে করে তোলে পঙ্কিল, বিষাক্ত।

ইরার বিয়ের পরে সে এসে পড়ল একেবারে ঠিক তাদের সংসারের বিপরীত সংসারে, এমন কি মানুষগুলো পর্য্যন্ত। অন্যরা সবাই তো আর তার দেবতুল্য পিতামহ নয়! তাই যখন ইরাকে সুপাত্রে দান করে তাঁরা হলেন নিশ্চিন্ত তখনই ঘনিয়ে উঠল তার অদৃষ্টে কালো মেঘের ছায়া, যা ইরা নিজেও বুঝতে পারেনি।

সুপাত্র? হ্যাঁ সুপাত্র বই কি! সম্পদে, স্বাস্থ্যে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে সুপাত্র বই কি! তা ছাড়া আর কি চাই কন্যাদান করতে গেলে? নাই বা থাকল তার মানসিক বল, নাই বা থাকল কোন অনুভূতি, ভীরু দুর্ব্বল মন নিয়ে পাঁচ জনের মতামত মেনে

পুতুলের গাড়ী —ছায়া শেঠ (৩য়)

যান-বাহন

(প্রতিযোগিতার বিষয়)

'পাল্কী চলে, পাল্কী চলে গগন তলে'— —অজিত মিশ্র (২য়)

জলযান ?

—অভয়কুমার দাস

পশ্চিমবঙ্গের সরকারী বাস

—সুধীরকুমার সাহা
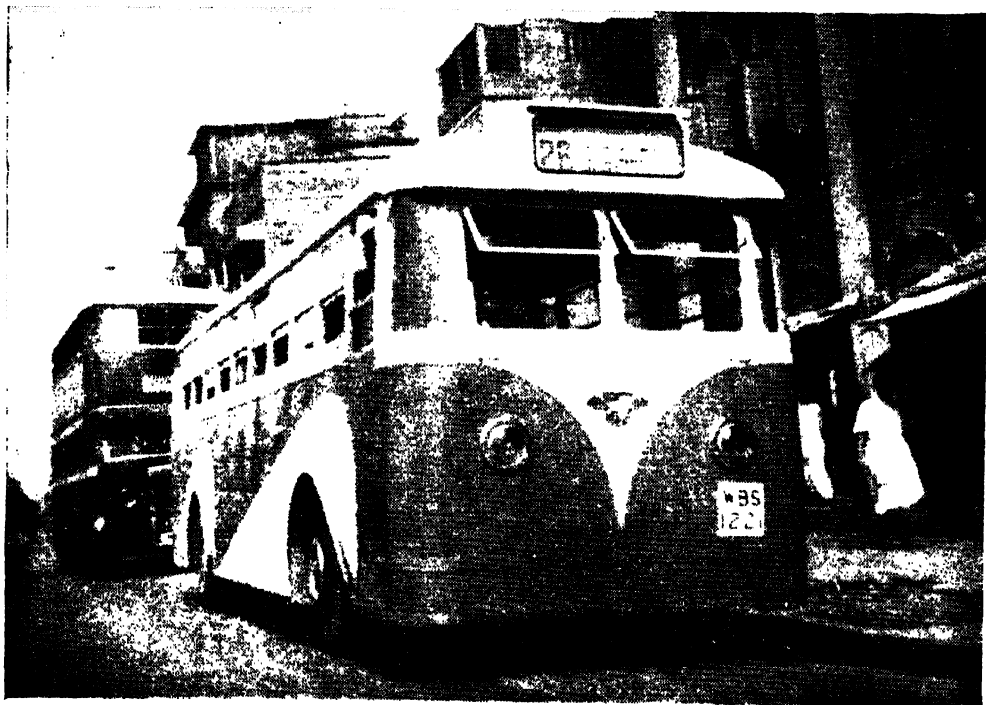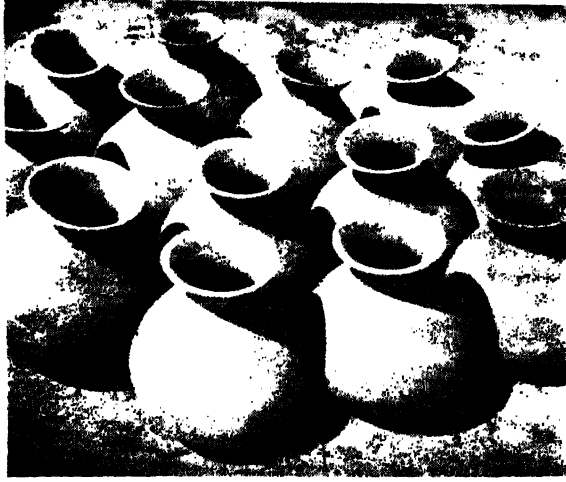
কাঁখের কলসী ? —শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

যাত্রাবন্ধু অজিতকুমার ঘোষ (১ম)
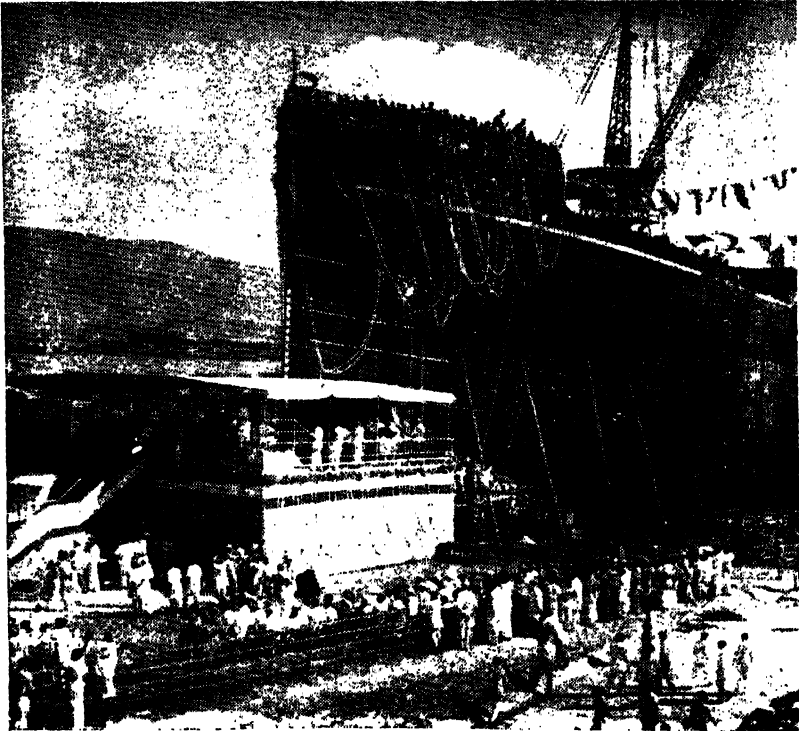
গোধূলি —অমর বিশ্বাস

কাকে চাই ?
—জে, আর, চাটার্জ্জী

বিজ্ঞপ্তি

আগামী আষাঢ় সংখ্যা থেকে কয়েক মাস যাবৎ আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা প্রকাশ করা হবে না। মাসিক বসুমতীর দপ্তরে প্রচুর পরিমাণে আলোকচিত্র জমে ওঠায় এবং সেগুলি যাতে ক্রমে প্রকাশ করা হয় তজ্জন্য এই ব্যবস্থাবলম্বনে আমরা বাধ্য হয়েছি। 'প্রতিযোগিতার' প্রকাশ স্থগিত থাকলেও আমাদের পাঠক-পাঠিকার নিকট থেকে চিত্র গ্রহণের কোন বাধা থাকিবে না। যে কেউ যে কোন বিষয়ের ছবিই যথারীতি পাঠাতে পারেন।

চলাতেই তার সার্থকতা। তাই ইরা যেখানে আঘাত পেয়ে বিমর্ষ মুখে থাকত, তার স্বামী কিন্তু বুঝতেই পারত না যে কি এমন ব্যাপার, যার জন্ত এতটা কাতর হতে হবে? এ তো অতি স্বাভাবিক, পাঁচ জনকে নিয়ে বাস করতে গেলেই সেখানে আসবে নানা রকম বাধা-বিপত্তি। এ নিয়ে সে মাথা ঘামাতেও ব্যস্ত নয় এবং ইরার জন্তও নেই তার কোন সহানুভূতি।

এরই মধ্য দিয়ে কাটছিল ইরার দিন, কেউ নেই তার সঙ্গী-সাথী। বিবাহের পূর্ব্বেও তো ছিল না কিন্তু তখন তো এমন নিঃসঙ্গ লাগত না, মন তো এত বিষাদে ভরে যেত না! তখন বই ছিল তার সঙ্গী, আর সাথী ছিলেন বৃদ্ধ পিতামহ, তাঁর সঙ্গে খেলা করে, পড়ে ও নানা রকম আব্দার করে তার দিনগুলি কোথা দিয়ে কেটে যেত! এখানে এরা পছন্দ করে না বেশী লেখাপড়া করা, এখানে আলোচনা হয় না কোন ভালো কথার। রাত-দিন শুধু শোনে শ্লেষ ও ব্যঙ্গ এবং পরের নিন্দা আর সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত চলে শুধু রান্না ও খাওয়ার তদারক, এ ছাড়া আর কিছু যেন এরা কেউ জানে না। মানুষে কি করে এত সঙ্কীর্ণমনা হতে পারে ইরা ভেবে পায় না। ছোট ননদ দুটো পর্য্যন্ত হাতে তুলে নেয় না একটা বই, গায় না এক লাইন গান, বসে না পুতুল নিয়ে খেলা করতে, খালি বড়দের সঙ্গে সমান ভাবে মুখ ফুলিয়ে সংসারের খুঁটিনাটি কাজে ঘুরে বেড়ায়, যা তাদের না করলেও চলে, আর মাঝে মাঝে মুখ বেঁকিয়ে ইরাকে করে বিদ্রূপ। হাঁপিয়ে ওঠে ইরার মন, আর পারে না সে এই বন্দিদশা সহ্য করতে।

যখন ইরা এসেছিল নববধূরূপে এই বাড়ীতে, সঙ্গে করে এনেছিল সরল মন, সে মনের দৃষ্টিতে সে কুটিলতাকে দেখত সরলতা, অসুন্দরকে দেখত সুন্দর। সবাইকে এবং সংসারকে সে অতি সহজ ভাবে নেবার জন্ত প্রস্তুত ছিল, সবার ওপরে হৃদয়ের স্নেহ-ভালবাসা নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এ কি হল? এরা তো তা চায় না! অন্ত বধূরা কেমন সহজে সংসারে নিজেদের মানিয়ে নিল; সকলের সঙ্গে অন্তরে তাদের মিল না থাকলেও তারা মিলে-মিশে ভাব, ঝগড়া, হিংসা পরস্পরে করে বেশ কাটিয়ে দিচ্ছে দিনগুলি? ইরাই শুধু পারল না? সে হল পরাজিতা। পরে আমি তার এই কাহিনী শুনেছিলাম। অনেক দিন তাকে আর দেখিনি। আজ ওই গাছটার দিকে চেয়ে বড় ইচ্ছা হচ্ছে তাকে দেখবার।

গেলাম সেদিন সকালবেলা ইরার শ্বশুরবাড়ীতে, তাকে দেখতে। কিন্তু পৌঁছে পেলাম না কারুর অভ্যর্থনা, নিয়ে গেল না কেউ আমাকে ইরার কাছে। নীচের দালানে তখন আত্মীয়ারা মিলে কুটনো কোটা ও রান্না করার ফাঁকে ফাঁকে অনর্গল ভাবে নানা রকম কথা বলে যাচ্ছেন, পরনিন্দাও চলছে। বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দু-একবার ইরার নামও কানে এল। উৎকর্ণ হয়ে শুনলাম, ইরার ননদ বলছেন, "কত আর তোমাকে বলতে হবে সব কাজ, সবই কি আমাদের শেখাতে হবে, জান না ঝোলের আলু কি এমনি ডুমো ডুমো করে কোটে, এখানে কি তোমার বাপের বাড়ীর আব্দার পেয়েছ।"

শুনতে পেলাম ইরার মৃদু কণ্ঠস্বর, "এর আগে তো এ সব কখনও করিনি, এর আগে মা তো আমাকে কিছু করতে দিতেন না, নিজেই সব করতেন, তুমি একবার দেখিয়ে দিলে আর কখনও ভুল হবে না।"

বুঝলাম, ইরা তার শাশুড়ীর কথা বলছে। শুনেছি, তিনি কয়েক মাস আগে ইহলোক ত্যাগ করে গিয়েছেন। একবার চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকালাম, প্রখর রৌদ্রে ধরণী দগ্ধ হচ্ছে, মাথাটা রৌদ্রের তাপে ঘুরে উঠল, আর দ্বিধা না করে পর্দ্দা সরিয়ে ঢুকে পড়লাম অন্দরে। তখন ইরার এক খুড়শাশুড়ী তার ননদের কথার জের টেনে মুখ বিকৃত করে বলছেন, "উনি তো কচি খুকী কিছুই জানে না দেখা যাবে এর পর"।

অকস্মাৎ আমার প্রবেশে তাঁর মুখের কথা মুখেই থেকে গেল, চকিতে সকলে নিজেদের সামলে নিলেন ও মুখ ঘুরিয়ে নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, কেউ বা গিয়ে ঢুকলেন রান্নাঘরে, কেউ বা ভাঁড়ারে। ইরা এক পাশে অশ্রুভেজা চোখে কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, আমাকে দেখে তার চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। ধীরে ধীরে, অতি ধীরে এগিয়ে এসে সে আমার হাত দুটি মুহূর্ত্তের জন্তে চেপে ধরল, তারপরে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল তার তিন তলার ঘরের দিকে।

ঘরে ঢুকে দেখলাম, এত প্রতিকূল অবস্থাতেও ইরা তার ঘরটিকে সাজিয়ে রেখেছে সুন্দর ভাবে, দেওয়ালে তার হাতে আঁকা ছবি, আলমারীতে সযত্নে সাজান ঝকঝকে বই, টেবিলে তার নিজের হাতের নক্সাকাটা সেলাইকরা ঢাকা, যাতে তার পূর্ব্বেকার শিল্পিমনের পরিচয় দিচ্ছে। পরিষ্কার শীতল পাথরের মেঝেতে বসে পড়লাম, ইরাকেও টেনে নিয়ে পাশে বসালাম। আস্তে আস্তে শুনলাম তার কাছে পূর্ব্ববর্ণিত সব কাহিনীটি। আরও শুনলাম ইরাকে এরা পছন্দ করে না, এরা চায়, ইরা আনুক অর্থ তার পিতার কাছ থেকে, যার জন্তে তাকে এ-বাড়ীতে আনা হয়েছে। বিনিময়ে ইরাকে এরা কিছুই দেবে না, কারণ তার পিতার যখন অর্থের অভাব নেই তখন ইরার আর কিসের অভাব?

অভিমানিনী ইরা বলে না পিতাকে কিছু, জানায় না তার অভিযোগ, তাঁরা দুঃখ পাবেন বলে চায় না এর প্রতিকার। মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সে কি করবে বিদ্রোহ! না তাতে কোন লাভ নেই, এরা বুঝতেই পারে না যে মানুষের একটা মন বলে জিনিষ আছে। ঝগড়া করবে সে? কিন্তু তাতেই বা লাভ কি, সে তো এদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। তার শরীর ক্ষীণতর হয়ে আসছে, আর কত দিন তাকে এ ভাবে কাটাতে হবে?

বেলা বেড়ে যাচ্ছে দেখে উঠে দাঁড়ালাম ফিরবার জন্ত, ইরার মামাশাশুড়ী এক কাপ চা নিয়ে হন্-হন্ করে ঘরে ঢুকে ঠক্ করে পেয়ালাটা মেঝেয় নামিয়ে রেখে বিরক্ত মুখে যেমন ভাবে এসেছিলেন তেমনি ভাবে বেরিয়ে গেলেন। পিপাসায় আকণ্ঠ শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তবু ইচ্ছা হল না সে চা স্পর্শ করতে। ইরার কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় নেমে একবার চোখ তুলে দেখলাম, ইরার তিন তলার জানলার দিকে, দেখলাম ইরা স্নান মুখে দাঁড়িয়ে আছে আমার দিকে চেয়ে। ফেরবার সময়ে কেন জানি না সেই বস্তিটার ভেতর দিয়েই এলাম, দেখলাম সেই গাছটা জানলার ধারেই বসান আছে কিন্তু পাতাগুলি রৌদ্রের তাপে ঝলসে মুড়ে গিয়েছে, গাছটা যেন একটু শুকনো, একটু ম্লান। তার ক'দিন

আগের ফোটা লাল ফুলগুলি কতক শুকিয়ে ঝরে পড়েছে, কতক ঝরবার জন্ত উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

এর পর কিছু দিন প্রায় মাস দুই আমি এখানে ছিলাম না, গিয়েছিলাম আমাদের শৈলাবাসে এই প্রচণ্ড গরমটা কাটিয়ে আসতে। ফিরেই সেদিন বিকেলে আমার মনটা উন্মুখ হয়ে উঠল একবার সেই গাছটাকে দেখে আসবার জন্তে। কেন জানি না, এই গাছটা আমাকে কি একটা মায়ায় যেন বেঁধে ফেলেছে! আমার যেন মনে হয় এই গাছটার সঙ্গে ইরার জীবন কি যেন একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে গিয়েছে। গেলাম সেই ঘরটার কাছে,—এ কি! গাছটা তো জানলার ওপরে নেই, কোথা গেল! একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি, ঘরটার পিছন দিকে একটা ময়লা কাপড়-পরা লোক উবু হয়ে বসে, গাছটার তলার মাটি খুঁড়ছে ও জল ঢালছে, গাছটা নেতিয়ে পড়েছে কিন্তু তখনও কতকগুলো শুক্‌নো ও বিবর্ণ পাতা তার ডালে ডালে লেগে রয়েছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল, ভাবলাম এ আমার মনের বিকার; তবুও মনটা অস্বস্তিতে ভরে গেল। একটু বেশ ব্যাকুল ভাবেই পরদিন যাত্রা করলাম ইরার শ্বশুরবাড়ীর উদ্দেশে। সেখানে পৌঁছে দেখলাম, আজও তেমনি সব মুখের ভাব, বরং আরও যেন ভারী। ইতস্তত: করে জিজ্ঞাসা করলাম ইরার ননদকে ইরার কথা। সে তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিল, "যান ওপরে, তার অসুখ করেছে।" মনে হল ইরার অসুখ হওয়াটাও যেন এদের কাছে একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। ওপরে গিয়ে ইরার ঘরে ঢুকে আমি চম্‌কে উঠলাম, দু'মাসে এ কি পরিবর্ত্তন! সেই সুন্দর দেহ আজ শীর্ণ হতে শীর্ণতর হয়ে বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েছে; বিছানায় পাতা সাদা চাদরটার সঙ্গে তার গায়ের শুভ্র বর্ণ মিশে এক হয়ে গিয়েছে। সে চোখ বুজে শুয়ে আছে। আমি তার কপালে হাত রাখতেই সে চোখ খুলে আমার দিকে চেয়ে একটু হাসল। দু'-একটা কথাও সে বলল, কিন্তু দেখলাম তাতে তার কষ্টই হচ্ছে, হাঁপিয়ে পড়ছে। একজন নার্স তার মাথায় হাওয়া করছে। উঠে বাইরে এসে ইঙ্গিতে নার্সকে ডাকলাম, জিজ্ঞাসা করলাম অসুখের কথা। নার্স বলল—মন গুমরে থেকে অযত্নে ও উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে ভিতরে যে ক্ষয় হয়েছিল এখন তা আর সারবার নয়, দিন দিন সে মৃত্যু-পথে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু কারুকেই ইরা এ কথা জানায় নি। পরে যখন রোগ বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে চলল তখন ইরার পিতা জানতে পারলেন এবং তাকে সারিয়ে তুলবার জন্ত অজস্র অর্থ ব্যয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন। কিন্তু দেরী হয়ে গিয়েছে, আর সারবার কোন উপায়ই নেই, এখন সে মৃত্যুর জন্ত অপেক্ষা করছে। নার্সের কাছে আরো শুনলাম যে ইরার পিতাই তাহাকে কন্যার সেবার জন্ত নিযুক্ত করেছেন, ইরার প্রতিদিনের আহার্য্যও তিনিই পাঠিয়ে দেন। ইরার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা দিনে একবার, সে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করা ছাড়া আর কিছু করবার প্রয়োজন বোধ করেন না। তার স্বামী সকালে একবার অফিসে যাবার আগে ও ফিরে একবার সন্ধ্যাবেলা সে কেমন আছে জানবার জন্ত তার ঘরে আসেন, একটুখানি হয়ত বসেনও কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারেন না; চারি দিকে গুরুজনরা রয়েছেন, দায়িত্ব তো তাঁদের, তিনি কি করে রুগ্না স্ত্রীর ঘরে বেশীক্ষণ কাটাবেন! সব শুনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। উঃ! মানুষ এমনও হয়! এই কি শিক্ষিত মনের পরিচয়? ইরার কাছে গিয়ে তাকে আবার দেখতে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরিয়ে এলাম সেই বাড়ীটা থেকে।

কয়েক দিন পরে খবর পেলাম ইরা মারা গিয়েছে। এবার গেলাম তাকে শেষ দেখা দেখতে। ফুলে-ঢাকা ক্ষীণ সুন্দর দেহ, সেই বিয়ের লাল শাড়ী পরা, চন্দনে ও অলঙ্কারে সে নববধূর মতই ঘর আলো করে খাটের ওপর শুয়ে আছে। মুখে তার একটু হাসি যেন লেগে রয়েছে। মুক্তি পেয়েছে। অভিমানিনী ইরা অভিমান ভরা মন নিয়ে সে চলে গেল তুচ্ছ করে এই সংসার। দরকার নেই তার দেখবার পিছনে কে পড়ে রইল কাঁদবার জন্ত, বিলাপ করবার জন্ত। তার চারি দিকে যেন ছড়িয়ে আছে শুচিতা, এবাড়ীর লোকদের তা স্পর্শ করবারও যেন অধিকার নেই। চারি দিকের ক্রন্দন ও বিলাপধ্বনির মধ্য দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। কখন যে চলতে চলতে অন্যমনস্ক ভাবে নিজের অজান্তেই সেই ঘরটার ধারে গিয়ে পড়েছি বুঝতেই পারি নি। হুঁস হল হঠাৎ রাস্তার ওপর পড়ে থাকা সেই গাছটাকে মাড়িয়ে ফেলতে গিয়ে। বিস্ফারিত চক্ষে দেখলাম গাছটা মরে গিয়েছে ও টিন থেকে উপড়ে তাকে রাস্তার ধারে ফেলে দেওয়া হয়েছে, এখনও তার ডালে লেগে রয়েছে গোটাকয়েক বিবর্ণ পাতা কিন্তু মূলটা গিয়েছে একেবারে শুকিয়ে। সেই দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে চোখের জল আর বাধা মানল না।

—বাঙালী হিন্দুর উপাধি কত?—

বাঙালী হিন্দুর উপাধি যে কত অসংখ্য তাহা আমাদের ধারণাতীত ছিল। মাসিক বসুমতীর বিগত দুই সংখ্যায় বাঙালী হিন্দুর উপাধির তালিকা প্রকাশ করিয়াও দেখা যাইতেছে, এখনও বহু উপাধি অপ্রকাশিত আছে। প্রসঙ্গত জানাই, মাসিক বসুমতীর বহু গুণগ্রাহী পাঠক-পাঠিকা দুই সংখ্যায় প্রকাশিত তালিকায় আরও অনেক উপাধি সংযোজন করিবার জন্ত তালিকা প্রেরণ করিয়াছেন। সেইগুলি পুনরায় আগামী সংখ্যায় বর্ণানুক্রমিক ভাবে প্রকাশিত হইবে। সঙ্গে প্রেরকদিগের নাম ও ঠিকানা।

শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘোরা অমানিশা! আজ বামাচরণের দীক্ষার দিন; যথা-রীতি সে প্রস্তুত হয়েছে। ত্রয়োদশীতে তার বেদজ্ঞ বাবা মোক্ষদানন্দ বেদপাঠ শোনানো শেষ করলেন; চতুর্দশীতে মুষ্টিভিক্ষা ক'রে তারামায়ের ভোগ দিয়েছে বামাচরণ। অমাবস্যার অন্ধকার গাঢ় হতে লাগল; ব্রজবাসী তাকে বশিষ্ঠের সেই চিহ্নিত আসনে বসিয়ে দিলেন। ব্রজবাসী ও মোক্ষদানন্দ ফিরে এসে মন্দিরে অপেক্ষা করতে লাগলেন; অমার তমসা ভেদ ক'রে আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল, বিরাট এক জ্যোতিঃপুঞ্জের কণাগুলি রহস্যময় বীজমন্ত্ররূপে দেখা দিল আকাশ-মণ্ডলে। ক্ষ্যাপা ছুটে এসে ব্রজবাসীকে এই অলৌকিক রহস্যের কথা বললে। গুরু আবার তাকে বসিয়ে দিলেন সেই আসনে। কানে দিলেন সেই রহস্যময় বীজমন্ত্র!

বামাচরণ ধ্যানস্থ হ'ল; নিশ্চল নিস্পন্দ তার দেহ। সে এক পরমলোকে পরমানন্দের অনুভূতিতে ডুবে রইল! ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে ব্রজবাসীর রুদ্র-গম্ভীর ধ্বনিতে তার ধ্যান ভাঙ্গল,—জয় তারা, জয় তারা!

দীক্ষিত বামাচরণ সেই হইতে সাধক বামা ক্ষেপারূপে পরিচিত হ'লেন; প্রায়ই শিমূলতলায় থাকেন ধ্যানস্থ বা সমাধিমগ্ন; মোক্ষদানন্দ ও কৈলাসপতি বাবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। তাঁরা কাশী যাত্রার আয়োজন করলেন; বামা কিন্তু বেঁকে বসলেন; 'আমি সঙ্গে যাব; একবার আমার অন্নপূর্ণা মাকে দেখব।' মোক্ষদানন্দ হেসে বলেন,—'তোর তারা-মাকে কে দেখবে রে ক্ষ্যাপা! তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারবি?' 'খুব পারব, বাবা! বেটী কি আর এখানে থাকবে; আমার সঙ্গে সঙ্গে চলবে।'

পরদিন তিন জনেই কাশী রওয়ানা হ'লেন; যাবার আগে কৌলের পদে অভিষিক্ত হ'লেন বামা ক্ষ্যাপা। নাটোরের রাজকর্ম্মচারীদের বুঝিয়ে দিলেন মোক্ষদানন্দ। তাঁর যাত্রা অনিশ্চিতের পথে, কিন্তু বামা তখন অষ্টাদশবর্ষীয় কিশোর মাত্র। ট্রেণ, ষ্টেশন, রেলের গার্ড এবং ষ্টেশনের ভীড় ক্ষ্যাপার কাছে সবই আজব ব্যাপার! বিশ্বকর্ম্মার অবতার ওই ইংরেজ-সাহেবগুলো; যাঁরা এমন করে ট্রেণ বানিয়েছে বা ট্রেণ চালায়। তাঁদের সাজপোষাক দেখে বিস্মিত হয় ক্ষ্যাপা। কত সুন্দর শ্যামলিমায় ভরা পথ-ঘাট-মাঠ; বিহারের পার্ব্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে চলেছে রেলগাড়ী: ওই যে পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিলম্বিত বিন্ধ্যপর্ব্বতমালা। এই বিন্ধ্যই গুরু অগস্ত্যের পায়ে মাথা মুইয়ে আজও রয়েছে; অগস্ত্য কোথায়! কত কি প্রশ্ন করে ক্ষ্যাপা। তাঁর ভাবসমাধি দেখে মুগ্ধ হয় যাত্রী দল; তিন জন সন্ন্যাসী—লোকে কৌতূহলের বশে আশে-পাশে জড় হয়; ক্ষ্যাপা বিন্ধ্যকে প্রণাম করে। মনে পড়ে চিত্রকূট। ভরত-মিলনের দৃশ্যপট মনে পড়ে। মনে পড়ে রামায়ণী কথা। শৈশবে বাবার মধুর কণ্ঠের ধ্বনি কানে বেজে উঠে। জটাজুটধারী দুই রাজকুমারের মিলন,—ভরত আর রাম। ভরতের সঙ্গে অযোধ্যানগরী ভেঙ্গে এসেছে; সঙ্গে সেই বশিষ্ঠদেব। তিনিই না কি তারা-মায়ের বড় চেলা। তারাপীঠের তিনিই ত প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছেন। ব্যাকুল হয়ে পড়েন বামা ক্ষ্যাপা। 'গুরুবাবা, আমায় তারাপীঠে ফিরিয়ে নিয়ে চল। আমি আর কাশী যাব না।'

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে।
কালী-পাদ-পদ্ম সুধা ত্যজি
কূপে পড়ে আপন খাবে।
ভবজরা পাপরোগ, নীলাচলে নানা ভোগ,
ওরে ভবে কাশী সর্ব্বনাশী
ত্রিবেণীস্নানে রোগ বাড়াবে।

ক্ষ্যাপার সে প্রাণ-মাতানো সুরে চলন্ত রেলগাড়ীর শব্দও যেন বিলীন হয়ে মধুর হয়ে উঠে; ভাবে গদ-গদ পাগলের দু'নয়নে অশ্রুধারা! মোক্ষদানন্দ ও কৈলাসপতি কোন রকমে বামাকে বুঝান; ওরে বাবা, এবার আমরা তারাপীঠেই ফিরে যাব! কিন্তু জানিস ত ইংরেজের গাড়ী; মোড় ফিরতে যা দেরী। কাশী হ'য়ে তারপর তার মোড় ফিরবে। মাঝখানে আমাদের কাশী দেখা হয়ে যাবে।'

অন্নপূর্ণার ক্ষেত্র এই সেই বারাণসী! বামাচরণের কিছুই ভাল লাগে না এ লোকারণ্যে কি থাকা যায়! মা-কে যেন বেঁধে রেখেছে: সোণায় মোড়া, গয়না-পরা, সানবাঁধানো ঘাটে ত মা আমার নেই! হৈ-হৈ করে কাশী-বিশ্বনাথের জয়ধ্বনি করে কিন্তু ক্ষ্যাপার মন যায় বিগড়ে। কোথায় এক আশ্রমে তাঁকে ফেলে রেখে—তাঁর সঙ্গে দু'জনে নিয়েছেন বিদায়: আমরা পাঁচ-সাত দিন পর ফিরে আসছি ক্ষ্যাপা, তুই ভাবিস্‌নে।'

ক্ষ্যাপার পেটে নাই অন্ন! দিন-রাত ঘুমিয়ে কাটায়! একদিন রাত্রে ক্ষিধের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে অন্নপূর্ণাকে দেয় গালাগাল! 'ছিঃ ছি; বেটি লজ্জা নেই তোর! আমি ক্ষিধের জ্বালায় মরি; আমার তারা-মা তোর চেয়ে অনেক ভাল; এ কি জায়গা রে বাবা! সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত! এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত কেউ দিলে না; বদ এই কাশী। কে ব'লে তোকে অন্নপূর্ণা! অন্নের

নামগন্ধ এখানে নেই! সব ত দেখি ভুড়িওয়ালারা লোটা লোটা জল ঢালছে পাথরের মাথায়! ছিঃ, ছিঃ, কি ঝকমারি করেছি এখানে এসে!'

ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত্ত বামা ক্ষ্যাপা ঘুমিয়ে পড়েন; কি অসহ্য যন্ত্রণা! স্বপ্নে দেখেন তাঁর তারা-মাকে; কে এক বুড়ী এ'সে ডাকে "ওরে ছোঁড়া, ওঠ, মায়ের পেসাদ খা'।" হকচকিয়ে উঠে বামাচরণ; বুড়ী অদৃশ্য হয়ে যায়; পাশে দেখেন, এক ঝুড়ি খাবার! প্যাড়া, পুরি আর তরকারী; তার সঙ্গে মাটীর গেলাসে জল। ক্ষ্যাপা গোগ্রাসে গিলতে থাকে। আবার মাঝে মাঝে হেসে উঠে; বেটী শুনতে পেয়েছে! 'যাই বল না কেন বাপু, তোমার কাশী কিন্তু বড় বদ।' পরিতৃপ্ত হয়ে ক্ষ্যাপা আবার ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু এখানে খোলা মাঠ নেই; মলমূত্র ত্যাগের যে পৃথক ব্যবস্থা থাকতে পারে সে জ্ঞান ক্ষ্যাপার নেই। সকালে উঠে যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে। আশ্রমের লোক হয় বিরক্ত! পাগল মনে করে ক্ষ্যাপাকে দেয় তাড়িয়ে।

এবার ক্ষ্যাপা আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। ছুটে চলে, ষ্টেশনের দিকে। তারাপীঠে ফিরে যাবে। ষ্টেশনে এসে টিকিট চাইতেই সাহেব ষ্টেশন মাষ্টার টাকা চাইলে। কিন্তু টাকা কোথায়! কৌপীন খুলে ক্ষ্যাপা উলঙ্গ হয়ে ঝেড়ে দেখায়—পয়সা নেই। সাহেব ডাকে—পুলিশ—পুলিশ! পুলিশের নাম শুনে ক্ষ্যাপা দিল ছুট! জ্ঞানগম্যি নেই; কোথায় চলেছে তার ঠিক নেই,—কিছু দূর ছুটে, আবার ফিরে দেখে! এ রকম করে কত দূর যে এসেছেন তার ঠিক নেই! ভাগ্যক্রমে এক মাল-বোঝাই গোরুর গাড়ী পড়ল সম্মুখে। সেটা বীরভূমের সিউড়ি থেকে এসেছে! সেই গাড়ীতে আশ্রয় পেয়ে বামাচরণ ফিরে এল সিউড়ি।

সেখান থেকে তারাপীঠে অনেক কষ্টে পৌছল। কাশী স্বপ্নের মত অদৃশ্য হয়ে গেল, তার চোখের সামনে থেকে! এ যেন এক স্বপ্ন দেখা! এক দিন ভোরে সকলে দেখে বামা ক্ষ্যাপা তার শিমুল-তলার আসনে ধ্যানমগ্ন—শিব যেন স্বয়ং বসে আছেন; মাথায় জটাভার, গলায় রুদ্রাক্ষ, বাহুতে রুদ্রাক্ষ-বলয়; কপালে সিঁদুর জল-জল করছে! সকলে স্তম্ভিত হ'ল! কোথায় কাশী আর কোথায় তারাপীঠ!

* * * *

নাটোরের রাণী স্বপ্ন দেখছেন: 'তারা-মা আলুলায়িত-কুন্তলা, চোখে দর-দর ধারা, পৃষ্ঠদেশ আঘাতচিহ্নে রক্তাক্ত; দেবী তারাপীঠ ত্যাগ করছেন।' আঁতকে উঠেন রাণী মা! 'এ কি মা, তুমি কোথা যাবে?' দেবী বলেন, "তোর লোকেরা আমার ছেলেকে মেরেছে, তাঁকে চার দিন খেতে দেয়নি; উঃ, কী যন্ত্রণা!"

আর একটি দৃশ্য; তারামন্দির সজ্জিত মায়ের ভোগ-ব্যঞ্জনে; বামা ক্ষ্যাপা উদ্দাম নৃত্যে বিভোর; "খা বেটী খা, এটা কি তোর কাশী?" নৃত্য যায় থেমে, পাগলের অট্টহাসিতে মুখর হ'য়ে উঠে চারি দিক। ভোগ হয় উচ্ছিষ্ট: ক্ষ্যাপা পূজার আসনে বসে খেতে সুরু করে দেয়! এ কি কাণ্ড! পুরোহিত অবাক; তাঁর চীৎকারে লোকজন জড় হয়; ক্ষ্যাপার পিঠে দু-তিন ঘা দিয়ে তাঁকে ঠেলে বের করে দেয় মন্দির থেকে। পাষাণী তারা-মূর্ত্তি কেঁপে উঠে!

দিব্যজ্যোতিতে নভোমণ্ডল আলোকিত করে নেমে এসেছে এক শ্যামাঙ্গী কুমারী; বামার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে; বামা হাসছে আবার কাঁদছে: 'যা বেটী, তোর আদর কি আমি বুঝিনে! আমায় খেতে বলে মার খাওয়ালি; এমনি বদ তোর স্বভাব; কাশী[illegible] শোধটা নিলি বুঝি?'—রাণী-মা সন্ত্রস্তা হয়ে উঠেন; এ কি স্বপ্ন! স্বপ্নঘোরে রাণী বলে উঠেন, "ক্ষমা কর মা, কি করলে তার প্রায়শ্চি[illegible] হয়, বলে দে।"

শ্যামাঙ্গী কুমারী উত্তর দিলে, "মায়ের আগে সন্তান খাবে, এ [illegible] চিরন্তন রীতি! অভুক্ত ছেলেকে রেখে কি মায়ের অন্ন রুচে[illegible] আমার আগে হ'বে ক্ষ্যাপার ভোগ, বুঝলি?" দিব্যজ্যোতিঃ কোথা[illegible] মিলিয়ে যায়; রাণীর নিদ্রাভঙ্গ হয়। রাণী-মা তখনও ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন: "ক্ষমা কর মা, ক্ষমা কর! তারা, এ নাটোর রাজবংশ যে তোর আশ্রিত মা, তাঁদের ক্ষমা কর!" রাণীর আকুল স্বর অন্ত সকলের ঘুম ভেঙ্গে দিল; স্বয়ং রাজা এসে হাজির হ'লেন[illegible] ব্যাপার কি? তখনও সেই কক্ষ এক দিব্যভাবে ভরপুর! রাণী স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সাশ্রুনয়নে বললেন।

রাজবাড়ীতে সকলে উপবাসী; তারাপীঠে ক্ষ্যাপার ভোগ না হ'লে রাজপুরী অভিশপ্ত হ'বে। ছুটে চলেছেন প্রধান দুই প্রতিনিধি তারাপীঠে। নূতন ক'রে তারাপীঠে ভোগারতি বা পূজার্চ্চনার ব্যবস্থা হবে। তাঁরাও উপবাসী; ক্ষ্যাপার কুটীরে গিয়ে তাঁর অনুনয়-বিনয় করলেন; "রাণীমাকে ক্ষমা করুন: আপনি অন্নগ্রহণ না করলে রাজবাড়ীতে কেউ অন্নগ্রহণ করবেন না।" ক্ষ্যাপা হাসেন, এ কি আমার ভক্ত রাণীমা উপোস করছেন? যে মেরেছে আমায়? মায়ের ছেলে মার খেয়েছে; মায়ের ছেলে[illegible] কাছে: মায়ের প্রসাদ নিয়ে ভায়ে ভায়ে কাড়াকাড়ি মারা মারি? তা এ রকম ত হয়েই থাকে। ব্যাটাদের মাতৃভক্তি বেশী কি না?"

মন্দিরের ভার পড়ল ক্ষ্যাপার উপর। নূতন পুরোহিত নিযুক্ত হলেন; ক্ষ্যাপার পরিচর্য্যার হ'ল ব্যবস্থা। দেবীর ভোগের আগে হ'বে ক্ষ্যাপার ভোগ। শিমুলতলায় তাঁর আসনের কাছে নিত্য আসে পরিপাটী ভোগ—অন্নব্যঞ্জন: কায়েমী ব্যবস্থা। ক্ষ্যাপার নশ্বর দেহের তিরোভাব ঘটলেও এ ব্যবস্থা বন্ধ হয় নাই। তারা-মায়ের ক্ষ্যাপা ছেলে বামাচরণ। দিন-রাত জয় তারা, জয় তারা নিনাদে শ্মশান ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করেন। দলে দলে লোক আসে তাঁকে দেখতে! কিন্তু কখন কি ভাবে থাকেন বুঝা যায় না! প্রায়ই তাঁর মেজাজ থাকে উগ্র! তারা-মায়ের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে গালি পাড়েন—অশ্রাব্য ভাষায়। শিশুর মত আবার কখনও বা অভিমান করে মন্দিরে দেন গড়াগড়ি।

রাণীমায়ের ইচ্ছা ক্ষ্যাপা নিজে আজ পুজো করেন। বিরাট আয়োজন; কত লোক এসেছে পুজো দেখতে; ফলমূল, অন্নব্যঞ্জন, সন্দেশ, দধি ও পায়েসের বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে: ভারে ভারে এসেছে ফুল—জবা ও পদ্ম। শিমুলতলার আসন থেকে নূতন পুরোহিত ক্ষ্যাপার হাত ধরে নিয়ে এলেন মন্দিরে। ভারি আনন্দ ক্ষ্যাপার! আসনে বসেই বললেন, 'তুই ত পাষাণী, তুই আবার খাবি কি? আচ্ছা খেয়ে নে; আমার কিন্তু ক্ষিদে পেয়েছে।' নিজেই খেতে লাগলেন ক্ষ্যাপা; সবাই অবাক হয়ে দেখতে লাগল; এ কি পূজা!

HAZELINE
SNOW

বারোজ ওয়েলকাম
অ্যাণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
পোস্ট বক্স ২৯০, বোম্বাই

এবার কালী তোমায় খাব।
খাব খাব গো দীন-দয়াময়ি
তারা, গণ্ডযোগে জন্ম আমার।
গণ্ডযোগে জনমিলে
সে হয় যে মা-খেকো ছেলে
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দুইটার একটা করে যাব।

এবার হ'বে পাঁঠা বলি। ঘাতকের মাথায় দুটি ফুল ছুঁড়ে দিয়ে ক্ষ্যাপা মন্ত্র বলেন, 'ওঁ ঘাতক কাকায় ফট্।' খড়গে "ওঁ খাঁড়ায় ফট্।" পাঁঠায়—ওঁ পাঁঠায় ফট্; যা' যা' বেটা উদ্ধার পেয়ে গেলি! পূজারি-পুরোহিত সকলে হাসে, এ কি পূজার রীতি! কিন্তু কেউ কিছু বলতে সাহস করে না; রাণীমার আদেশ, পাশে দাঁড়িয়ে রাজ সরকারের দুই জন বিশিষ্ট প্রতিনিধি। বাস্, বলি হয়ে গেল! এইবার পূজা, নৈবেদ্য হ'লো উৎসর্গ—'নে নে, মা, এবার হয়েছে ত?' দাঁড়িয়ে আছেন ক্ষ্যাপা; চোখে তার জলধারা! মুঠো মুঠো ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছেন দেবীর গায়ে। কি আশ্চর্য্য! মালার আকারে ফুলের গোছা মায়ের পাষাণী-মূর্ত্তিকে শোভিত করছে! পুলক-ভারাক্রান্তা দেবী আজ যেন মহা-পুলকিত!

সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥
সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

ভোগ-ক্ষুধায় আচ্ছন্ন আতুর মানবের দেহ-মন; এ ক্ষুধার আগে নিবৃত্তি চাই; কামাদি-রিপু আসল মানুষকে ঢেকে রাখে; তাঁদের দিতে হয় বলি, তা না হলে মায়ের পূজার অধিকার পাবে কোথায়? বলি যারাই হয় আসল মানুষের প্রকাশ। অন্তরস্থিত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ তাতে প্রকাশিত হন; জ্যোতি মহাজ্যোতিতে মিলে যাবার সুযোগ পায়। মায়ের ছেলে মায়ের কোলে যাবার অধিকারী হয়। পাষাণী মাটির মূর্ত্তিতেও বাস্তব কোন প্রাণ নাই; যাঁর অন্তরের শক্তি ও জ্যোতি জেগেছে, সে নিজের জ্যোতি বা শক্তি তাতে আরোপ করে বিশ্বশক্তিকে সেই প্রতীকের মধ্য দিয়েই করে তুলে প্রাণবন্ত; দেবী সর্ব্বভূতা; জড় কিংবা চেতন-অচেতন প্রত্যেক পদার্থের মধ্যেই শক্তি বিরাজিতা। তার উপলব্ধি করবে কে? হৃদ-কমলে যাঁর শক্তি জেগেছে, তাঁর কাছে ত সমগ্র জগৎ প্রাণময়, শক্তিময়, দেবীময়; সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম বিরাজমান। দেবীর আবার ভোগারতি কি? বিশ্বজুড়ে যিনি মুখ-ব্যাদান করে তোমার-আমার পশুপক্ষীর মধ্য দিয়ে পানভোজন করছেন, এই পানভোজন এক মুহূর্ত্ত বন্ধ হ'লে বিশ্ব অচল হয়ে যায়; লীলাময়ীর লীলা হয় বন্ধ। সূর্য্য-চন্দ্র-বাতাস সব জুড়েই তিনি, বিশ্বের পরিপুষ্টি তাঁর লীলা! মানুষ নিতান্ত অবুঝ; তা' বুঝতে পারে না, মাটির ঠাকুর গড়ে! কেন গড়ে? পৃথিবীর বুকে চোখ খুলেই দেখে এই বিচিত্র সংসার! চোখের সামনে দেখে স্নেহ-মমতার আধার মা, বাবা, ভাই-বোন, তারপরে আপন বন্ধু ও বান্ধব। রক্ত-মাংসের শরীর এঁদের। এঁদের মধ্য দিয়ে যে অনুভূতির স্নেহভালবাসা, প্রেমপ্রীতির আস্বাদ পায়, তার থেকে মন যায় ছুটে উৰ্দ্ধলোকে, আসল উৎসের সন্ধানে। বিশ্বজোড়া সাকার কিংবা নিরাকারকে সে ধরতে পারে না, বা বুঝতে পারে না। মায়ের স্নেহস্পর্শের অনুভূতি কিংবা প্রিয়ার প্রেমস্পর্শের অনুভূতি তাঁর দেহ-মনে; তাই যায় নিরাকারকে সাকার-রূপে ধরতে, আলিঙ্গনে বদ্ধ হ'তে, প্রেমপ্রীতিতে তাঁর বুকে নিজেকে মিশে যেতে। সে চায় স্পর্শ, আলিঙ্গন বা জড়াজড়ি ভাব, দূরে থাকতে চায় না! মায়েরই রক্তমাংসের অংশ এই দেহ: মাতা আর পিতা সন্তানের কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা; তার থেকেই দেবতার সঙ্গে আত্মীয়তা।

সাধক বামা ক্ষ্যাপার এই ভাব, এই শিক্ষা! সারাদিন তিনি ভাবে বিভোর! মাঝে মাঝে লোকজন জড় হয় চার পাশে। 'বাবা, দয়া কর, সাধু-সন্ন্যাসীর দেশ এই ভারতবর্ষ। সাধারণের বিশ্বাস এঁদের দয়ার রোগ সেরে যায়; দৈন্য দূর হয়। সংসারী মানুষ আর কিছু চায় না; "আমার রোগ দূর কর; আমায় টাকা দাও, আমায় গাড়ী দাও, বাড়ী দাও, মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, খোকনের চাকুরী দাও।' ঘরে ঘরে এই কলরব; সকাল-সন্ধ্যা শঙ্খধ্বনির মাঝে শোনা যায় এই বিশ্বজোড়া করুণ আর্ত্তনাদ বা আকুতি! ক্ষ্যাপা হাসে, গালি পাড়ে—ব্যাটা, আমি কি ডাক্তারবদ্যি নাকি? 'মায়ের কাছে যা', ছুঁড়ে মারেন মড়ার হাড়, উলঙ্গ হয়ে ধেই ধেই নাচেন;

"পাগল বাবা পাগলী আমার মা,
আমি তাঁদের পাগলা ছেলে
আমার মায়ের নাম শ্যামা।"

[ক্রমশঃ।

—জেনে রাখুন—

মাসিক বসুমতীর জন্য প্রেরিত যে কোন লেখা, চিত্র ও আলোকচিত্রের সঙ্গে যথোপযুক্ত ডাক টিকিট না পাঠালে অমনোনীত লেখা ও ছবি কোন মতেই ফেরত দেওয়া হয় না।

যেখানেই তাঁরা মিলিত হন…
কেশ প্রসঙ্গে তাঁরা ক্যালকেমিকোর মধুর সুগন্ধি কেশতৈল ক্যাষ্টরলএর কথা আলোচনা করেন। নারী-সৌন্দর্য্যের যে দুর্ণিবার আকর্ষণ, তার অনেকখানি পুষ্পমাল্যের মত জড়িয়ে থাকে তাঁদের চাঁচর চিকুরে।
ক্যাষ্টরল ব্যবহারে কেশশ্রী অপরূপ উৎকর্ষ লাভ করে; কারণ ইহা বিশুদ্ধ ও পরিশ্রুত ক্যাষ্টর অয়েল হইতে প্রস্তুত। ইহার সুবাস চিত্তকে প্রসন্ন করে।
৫ ও ১০ আউন্স শিশিতে পাওয়া যায়।
CASTROL
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

পণ্ডিতবর অহোবল প্রণীত

সঙ্গীত-পারিজাত

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

ভারতীয় সঙ্গীত-বিজ্ঞান দুটি পদ্ধতিতে বিভক্ত : দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত কর্ণাটি পদ্ধতি ও উত্তর-ভারতের হিন্দুস্থানী পদ্ধতি। হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সঙ্গীত-রসিকদের পক্ষে পণ্ডিতবর অহোবল বিরচিত সঙ্গীত-পারিজাত একটি প্রয়োজনীয় সঙ্গীতশাস্ত্র, যদিও, গ্রন্থের মধ্যে অনেক কর্ণাটি রাগেরও আলোচনা আছে।

সঙ্গীত-পারিজাত গ্রন্থটি যে ঠিক কবে লেখা হয়েছিল সে সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ আছে। অহোবল নিজে এ সম্বন্ধে নীরব। ফলে, অনেক জ্ঞানী-গুণী অনুমান করেন, পারিজাত লেখা হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর অপরার্দ্ধে ; কারণ, পারিজাতের অনেক কিছু বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে চতুর্দ্দশ শতকে রচিত (লোচন পণ্ডিত কৃত) রাগ-তরঙ্গিণী ও ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে বিরচিত (সোমনাথ কৃত) রাগ-বিবোধ-এর বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য আছে। তা ছাড়া Oriental Collection (Vol I) নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার Sir W. Ousley বলেছেন : ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে জনৈক বাসুদেব-এর পুত্র পণ্ডিত দীননাথ কর্ত্তৃক সঙ্গীত-পারিজাত ফার্সী ভাষায় অনুবাদিত হয়েছিল। এই অনুবাদ-গ্রন্থের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে কেউ কেউ অনুমান করেন : এই অনুবাদ-কার্য্য সংঘটিত হয়েছিল হিন্দুস্থানের অন্যতম সঙ্গীতজ্ঞ সম্রাট মহম্মদ শাহর প্রয়োজনে বা নির্দ্দেশে ; কারণ, ফার্সী ভাষায় অনুবাদিত যে সঙ্গীত-পারিজাতটি আজও রামপুর নবাবের রাজকীয় গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষিত রয়েছে, তাতে সম্রাট মহম্মদ শাহর খোদ গ্রন্থাধ্যক্ষের শীল-মোহর অঙ্কিত আছে। এই অনুবাদ-গ্রন্থখানি স্বর্গত ভাতখণ্ডেজী নিজে দেখেছিলেন ; কিন্তু মহম্মদ শাহর নির্দ্দেশ সম্বন্ধে তিনি কোথাও কিছু বলে যাননি। বলা বাহুল্য, মহম্মদ শাহ সিংহাসন গ্রহণ করেছিলেন ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে এবং পারিজাত ফার্সী ভাষায় অনুবাদিত হয়েছিল ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে। অনুরূপ—গ্রন্থকার অহোবলও যে কোথাকার লোক ছিলেন, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সঙ্গীত-রত্নাকর-প্রণেতা শার্ঙ্গদেব (১২১০-৪৭ খৃঃ) প্রমুখ সে যুগের অনেক সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ গ্রন্থারম্ভে নিজেদের বংশ-পরিচয়, আদি নিবাস প্রভৃতি উল্লেখ করে গিয়েছেন ; কিন্তু অহোবল এ সম্বন্ধেও নীরব। পারিজাত পাঠ করে এইটুকু শুধু জানতে পারা যায় যে, কৃষ্ণপণ্ডিত-তনয় পণ্ডিতবর অহোবল এই গ্রন্থের রচয়িতা। তাই, কেউ অনুমান করেন, তিনি উত্তর-ভারতেরই অধিবাসী ছিলেন ; কারণ, পারিজাতের বিষয়-বস্তু হিন্দুস্থানী পদ্ধতিরই অন্তর্গত। আবার কেউ মনে করেন, সদ্রাগচন্দ্রোদয়-প্রণেতা পুণ্ডরীক বিঠ্ঠল কর্ণাটকীয় (১৫৯৯) মতো অহোবলও আসলে ছিলেন দক্ষিণ-ভারতের লোক ; একাধারে কর্ণাটি, ও হিন্দুস্থানী উভয় পদ্ধতি সম্বন্ধেই অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর ; কিন্তু গ্রন্থ লিখে গিয়েছেন, বিশেষ ভাবে উত্তর-ভারতের সঙ্গীত-রসিকদের সুবিধার জন্যই।

সঙ্গীত-পারিজাত কবে ও কোথায় সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল বলা মুস্কিল। আমার গুরুদেব শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (গৌরীপুর) মহাশয় বলেন : তাঁর এক সহযোগীর নিকট বঙ্গীয় দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত একখানি অসম্পূর্ণ পারিজাত ছিল। এই অসম্পূর্ণ পুস্তকটির কোন টাইটেল্-পেজ ছিল না। অর্থাৎ বইটা কে, কবে, কোথায় প্রকাশ করেছিলেন তা জানবার কোন উপায় ছিল না ; এবং সহযোগী সেটা কিনেছিলেন কোলকাতার ফুটপাথের হকারের কাছ থেকে। এ ছাড়াও, শুনেছি, বিগত ১৮১৯ শকাব্দে পুণা থেকে একখানি পারিজাত প্রকাশিত হয়েছিল। এর পর ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভালচন্দ্র সীতারাম সুকথনকর এম-এ কর্ত্তৃক নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে একখানি পারিজাত মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদ সহ প্রকাশিত হয়। তার পর গত ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে, হাথরস্-এর সঙ্গীত-কার্য্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ হিন্দি অনুবাদ সহ একখানি পারিজাত প্রকাশ করেন। ভাষ্যকারের নাম সঙ্গীত-কলা-কোবিদ পণ্ডিত কালিন্দর জী। কিন্তু বাঙলা ভাষাভাষীদের সুবিধার জন্য আজ পর্য্যন্ত পারিজাতের কোন বঙ্গানুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

পূর্ব্বেই বলেছি, পারিজাত হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সঙ্গীত-রসিকদের পক্ষে একটি অতি-প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। কিন্তু সে তুলনায় গ্রন্থোক্ত বিষয়-বস্তু নিয়ে কোনরূপ আলাপ-আলোচনা হয় না। হয়তো দু'-এক জন পণ্ডিত গ্রন্থখানির খবর রাখেন বা গ্রন্থোক্ত বিষয়-বস্তু নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করেন ; কিন্তু পারিজাত সম্বন্ধে প্রবন্ধাকারে কোন কিছু লেখার উৎসাহ বাঙ্গালী সঙ্গীত-রসিকদের

মধ্যে নেই বললেই হয়। হয়তো এই ঔদাসীন্যের অন্য কোন গুরুতর কারণও আছে; কিন্তু, আমাদের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের অন্যতম ধারক ও বাহক সঙ্গীত-পারিজাত গ্রন্থটি সম্বন্ধে বাঙালী সঙ্গীত-রসিকদের ধ্যান ধারণা যে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, এ কথা ধ্রুব সত্য! শুনেছি, বহু কাল পূর্ব্বে, জ্যোতিষ-তন্ত্রাদি শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রণেতা স্বর্গত রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, অরুণোদয় নামক একটি মাসিক পত্রিকায় পারিজাতের কয়েকটি মাত্র সূত্র ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করেছিলেন; তার পর আমার গুরুদেব শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়, বিগত ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে, সঙ্গীত-বিজ্ঞান পত্রিকায় পারিজাতের সম্পূর্ণ অংশ ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন; বর্ত্তমানে আমাদের প্রতি আদেশ হয়েছে গুরুদেবের—আর একবার চেষ্টা করবার জন্য। পারিজাত-পাঠক লক্ষ্য করবেন, অহোবল তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী "সঙ্গীত-রত্নাকর" প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রাদির অভিমত প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করেও, বিকৃত স্বর, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, অলঙ্কার, মেল ও রাগ-পরিচিতি সম্বন্ধে এমন কিছু অভিনব ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন, যার স্বরূপ জানা প্রগতিবাদী সঙ্গীত-রসিকদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই অভিনবত্ব সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানেই আলোচনা করবো।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমার পূর্ব্বে যাঁরা পারিজাত অনুবাদ করেছেন, তাঁদের কেউই পারিজাতের সব চাইতে প্রয়োজনীয় তথ্যটি উল্লেখ করেননি! অর্থাৎ পারিজাতের শুদ্ধ ঠাট্ কী এবং কিসের ওপর ভিত্তি করে পারিজাত-বর্ণিত রাগগুলির স্বরূপ জানা সম্ভবপর,—সে সম্বন্ধে ভাষ্যকারগণ কেউই কিছু বলে যাননি। আমাদের শুদ্ধ ঠাট্ বেলাবল। সুতরাং এই বেলাবল ঠাট্‌কে পারিজাতেরও শুদ্ধ ঠাট কল্পনা করা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব নয়! এমন কি, এই সম্ভাব্য ভ্রান্তির কবল থেকে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও যে নিস্তার পাননি তার প্রমাণ হাথরাস-এর সঙ্গীত-কার্য্যালয় থেকে প্রকাশিত পারিজাতের হিন্দি অনুবাদখানি। বলা বাহুল্য, পারিজাত উত্তর-ভারতীয় পদ্ধতির সঙ্গীত-গ্রন্থ হ'লেও এর শুদ্ধ ঠাট্ বেলাবল নয় কাফি। অর্থাৎ সপ্তকের গান্ধার ও নিষাদ কোমল। পূর্ব্বেই বলেছি, অহোবল-এর ওপর রাগ-তরঙ্গিণী ও রাগ-বিরোধ গ্রন্থ দুখানির প্রভাব অসামান্য। রাগ-বিরোধ মূলতঃ কর্ণাটি সঙ্গীত-গ্রন্থ হ'লেও, রাগ-তরঙ্গিণীর বিষয়-বস্তু হিন্দুস্থানী এবং এরও শুদ্ধ ঠাট্ বেলাবল নয়—কাফি। এই ঠাট-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে স্বর্গত পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীর অভিমত বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। অতঃপর—গুরুদেব শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের আদেশে, ও বন্ধুবর ডাক্তার বিমল রায় এম-বি মহাশয়ের পরামর্শে সঙ্গীত-পারিজাত গ্রন্থটি অনুবাদ করতে চেষ্টা করছি:

ছন্দোময়ং গরুত্মন্তমারূঢ়ং সত্যয়া সহ।
স্তূয়মানং দিবৌকোভিঃ পারিজাতহরিং ভজে॥ ১

যিনি গরুড়ারোহী ও (গায়ত্রী-আদি সপ্তছন্দ স্বরূপ) সত্যভামার সঙ্গে ছন্দোময়; দেবকুল কর্ত্তৃক যিনি নিয়ত পূজিত; পারিজাত-হরণকারী সেই শ্রীহরিকে আমিও ভজনা করছি।

অর্থাৎ শ্রীহরি যেমন স্বর্গের পারিজাত মর্ত্ত্যে এনেছিলেন

বৈতানিকের রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুষ্ঠান

মানুষের কল্যাণের জন্য, তেমনি, সাধারণ সঙ্গীত-রসিকদের অবগতির জন্য, অহোবলও গ্রন্থাকারে পরিবেশন করছেন সেই সঙ্গীত-কলা-বিজ্ঞান, যা এত দিন দুর্লভ ছিল স্বর্গের পারিজাতের মতোই। (অর্থাৎ, যার ধ্যান-ধারণা এত দিন গণ্ডীবদ্ধ ছিল কয়েক জন ঘরোয়ানা ওস্তাদের মধ্যে।)

সঙ্গীত-পারিজাতোঽয়ং সর্ব্বকামপ্রদো নৃণাম্।
অহোবলেন বিদুষা ক্রিয়তে সর্ব্বসিদ্ধয়ে ॥২

জনসাধারণকে সর্ব্বসিদ্ধি (ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ) লাভের পন্থা নির্দ্দেশ করবার জন্যই পণ্ডিতবর অহোবল এই সর্ব্বকল্যাণপ্রদ সঙ্গীত-পারিজাত রচনা করছেন।

সঙ্গীতং বৈদিকৈর্বাক্যৈর্বোধিতং ব্রাহ্মণাঃ সদা।
কুর্ব্বৈহিকং তথা মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি হ্যবাধিতাঃ ॥৩

(বহুবিধ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত) বৈদিক শাস্ত্রে এই সঙ্গীত (সাধনা) সম্বন্ধে অনেক কিছু বিধি-নির্দ্দেশ আছে বলেই, ব্রাহ্মণগণ এই বেদ-বর্ণিত (ঐতিহ্যপূর্ণ) সঙ্গীত অনুশীলন করে অচিরেই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লাভ করে থাকেন।

অগ্নিহোত্রং যথা কার্য্যং গানং কার্য্যং তথৈব হি।
বেদোক্তত্বাৎ স্মৃতিপ্রোক্ত কর্ত্তব্যত্বান্ মনীষিভিঃ ॥৪

শ্রুতি-স্মৃতির নির্দ্দেশ অনুযায়ী (ব্রাহ্মণগণ) যেমন নিত্য অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তেমনি, (সঙ্গীত-রসিক) মনীষিদেরও কর্ত্তব্য নিয়মিত ভাবে সঙ্গীত অনুশীলন করা; কারণ, সঙ্গীতও শ্রুতি-স্মৃতির বিধানে নিত্যকৃত্য।

সঙ্গীত কথাটার যথার্থ অর্থ নাচ-গান-বাজনা; কিন্তু পারিজাত-কার এখানে নিরঙ্কুশ কণ্ঠসঙ্গীতের কথাই বলেছেন।—শ্রুতি অর্থেও আমরা এখানে সঙ্গীতের শ্রুতির কথা বলিনি; বেদ-এর অপর নাম শ্রুতি।

বিষ্ণুনামানি পুণ্যানি সুস্বরৈরঞ্চিতানি চেৎ।
ভবন্তি সামতুল্যানি কীর্ত্তিতানি মনীষিভিঃ ॥৫

(সর্ব্বদ্রষ্টা ঋষিতুল্য) মনীষিগণ বলে গেছেন: সুস্বরে, (সুমার্জ্জিত কণ্ঠে যথোচিত ভাবে) পবিত্র বিষ্ণুনাম-গান গীত হ'লে, সে গান সামগানের মতোই (সুপবিত্র ও ফলপ্রসূ) হয়।

সাঙ্গীতিক

সঙ্গীত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালীর মন চির-রসিক। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর এমনি এক চর্চ্চা-কেন্দ্র-রূপে "মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতি-মন্দিরের" উত্তর কলিকাতার ৬৫।১ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে জ্যৈষ্ঠের ১৫ই তারিখে কলিকাতার মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীহেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ, শ্রীরাসবিহারী প্রভৃতি বক্তাগণ মন্মথ মল্লিক ও পাথুরিয়াঘাটা মল্লিক-পরিবারের সংগীতপ্রীতির কথা উল্লেখ করেন। শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এই উপলক্ষে একটি সংগীতাসরেরও আয়োজন করা হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ওস্তাদ মৈনুদ্দিন ডাগর ও আমিনুদ্দিন ডাগর ভ্রাতৃদ্বয় প্রথমে সুরদাসী মল্লারে আলাপ ও সাদরা এবং পরে আড়ানা রাগে ধ্রুপদ গান করেন। শ্রীরাজীবলোচন দে সুন্দর পাখোয়াজ সংগত করেন। ডাগর ভ্রাতৃদ্বয় শেষে দেশ রাগে আলাপ ও ধামার এবং মালকোশ রাগে আলাপ ধ্রুপদ সংগীত পরিবেশন করিয়া সেদিনের অনুষ্ঠান শেষ করেন। শেষে পাখোয়াজ সংগতে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ পাল। ডাগর বন্ধুর আলাপ আবার নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মেলনের স্মৃতি জাগিয়ে দেয়। উত্তর কলকাতা সাহিত্য ও সংগীত-আসরের উপযোগী হল স্থাপনের জন্য শ্রীবৃন্দাবন মল্লিক আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

গত ২৫শে এপ্রিল সকালে রূপালী চিত্রগৃহে পরলোকগত সংগীত-শিল্পী সুধীরলাল চক্রবর্তীর দ্বিতীয় স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় সুধীরলালের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। সুধীরলালের সুর-সংযোজিত বহু গান বিভিন্ন শিল্পীদের দ্বারা গীত হয়।

বাগবাজার হাই স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে সংগীত প্রতিযোগিতাতে শ্রীপঙ্কজ মল্লিক একটি সারগর্ভ ভাষণ দেন।

নতুন রেকর্ড

এইচ, এম, ভি,—রবীন্দ্র-জন্মোৎসব কালে হিজ মাষ্টারস্ ভয়েসের প্রখ্যাত শিল্পীদের দ্বারা গীত নতুন ৫ খানি রেকর্ড পরিবেশন রবীন্দ্র-সঙ্গীতানুরাগীদের প্রচুর উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে। এন ৮২৬১৩ রেকর্ডে জগন্ময় মিত্র: গীত 'স্বপ্নে আমার মনে হ'ল" ও "দেখা না দেখায় মেশা"; এন ৮২৬১৪ রেকর্ডে দেবব্রত বিশ্বাস: গীত "ঐ আসন তলে" ও "আকাশ জুড়ে শুনিনু"; এন ৮২৬১৫ রেকর্ডে সন্তোষ সেনগুপ্ত: গীত "চিনিলে না আমারে" ও "গোধূলি লগনে মেঘে"; এন ৮২৬১৬ রেকর্ডে সুচিত্রা মিত্র: গীত "অরূপ বীণা রূপের আড়ালে" ও "বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ"; এন ৮২৬১৭ রেকর্ডে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়: গীত "আমার না বলা বাণী" ও "আরও আঘাত সহিবে" এই গানগুলি আমাদের প্রভূত আনন্দ দিয়াছে।

কলম্বিয়া—এ মাসে কলম্বিয়া কোম্পানীও সুবিখ্যাত শিল্পী দ্বারা পরিবেশিত ৪ খানি রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড ও অন্যান্য তিনখানি রেকর্ড প্রকাশিত করেছেন। জি-ই, ২৪১২৪ রেকর্ডে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়: গীত "মনে রবে কি না রবে" ও "এ পথে আমি যে"; জি-ই, ২৪১২৫ রেকর্ডে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র: গীত "জগতে আনন্দে যজ্ঞে" ও "এ ভারতের রাখ নিত্য প্রভু"; জি-ই, ২৪১২৬ রেকর্ডে গীতা সেন: গীত "সে আমার গোপন কথা" ও "ঝড়ে উড়ে যায় গো"; জি-ই, ২৪১২৭ রেকর্ডে কুমারী পূরবী চট্টোপাধ্যায়: গীত "মোর বীণা ওঠে কোন সুরে" ও "সখি প্রতিদিন হায়"; রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি সুগীত হইয়াছে।

জি-ই, ২৫৮২২ রেকর্ডটি যন্ত্র সঙ্গীতের, ম্যাণ্ডোলীন ও বাঁশী বাজাইয়াছেন অনিল ভট্টাচার্য ও বলাই দাস। জি-ই ৩০২১৯ রেকর্ডটিতে "শুভ যাত্রা" কথাচিত্রের দু'খানি গান "আজ মনে হয়" ও "জোনাক পোকা জ্বালে দীপ" গেয়েছেন গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। জি-ই ৩০২১৮ রেকর্ডটিতে "বিল্বমঙ্গল" কথাচিত্রের দু'খানি গান গেয়েছেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেনা কাটা ● কেনা কাটা

ভেজাল প্রসাধন দ্রব্যে বাজার পরিপূর্ণ

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এনফোর্স ব্র্যাঞ্চের ভারপ্রাপ্ত শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক উদ্যম ও উদ্যোগে ভেজাল দ্রব্যের কারবারীদের অনেকেই ধরা পড়ায় সাধারণের খুশী হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। অধুনা পশ্চিম-বাঙলায় ভেজাল দ্রব্য বিক্রয় করা যেন একটা নির্দ্দিষ্ট রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য দেশে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দিলে যে কোন লোকের 'ক্যাপিটাল পানিশমেণ্ট' হয়ে থাকে। পশ্চিম-বাঙলার খাদ্য ও অখাদ্যের কোন তফাৎ নেই। ঔষধ ও বিষের কোন পার্থক্য নেই। অন্যান্য দ্রব্যের কথা না হয় আপাতত বাদ দেওয়া হচ্ছে। সব চেয়ে হাস্যকর এই, এখানে সব চেয়ে বেশী ভেজাল থাকে প্রসাধন দ্রব্যে, যথা—স্নো, পাউডার, ক্রীম, সুগন্ধি তৈল ও এসেন্সে। কি দুঃখের কথা বলুন তো? আপনি পুরাপুরি দাম দিলেন, অথচ আসল বস্তুটি কিনতে পেলেন না। পণ্ডস্, হেজলিন স্নো, কেটির পাউডার, ভ্যাসেলিন হেয়ার ক্রীম, বুর্জ্জোয়ার তেল বা পম্পিয়া সেণ্ট কিনতে গিয়ে আপনি কোন মতেই ধরতে পারবেন না যে, আপনি আসলের মূল্য দিয়ে নকল দ্রব্য ঘরে আনলেন। শহরে এবং গ্রামে কোথাও এই রীতির ব্যতিক্রম নেই। এই ভেজালের ব্যবসায় আমরা কারও নাম করতে চাই না, কিন্তু অবাঙালী ব্যবসায়ীরা এই জাল-ব্যবসা আজ একচেটিয়া করেছে। বছরের মধ্যে বেশ কয়েক বার শিশির আকারের পরিবর্ত্তন এবং ক্যাপের ছাপ বদল ক'রেও আসলের ব্যবসায়ীরা কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছেন না। এদিকে আপনার গৃহের মহিলাদের মুখে কেন যে বিশ্রী দাগ দেখা দিচ্ছে, তার কারণ

নেহাতই সাধারণ ছাতা—মূল্য তিন টাকা দশ আনা থেকে শুরু করে আট ন' টাকা অবধি।

গলফ ছাতা—খেলার মাঠে ব্যবহার হয় এর। দাম তেরো টাকা থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা।

আপনিও জানেন না। সত্যেন্দ্রনাথ যদি এ দিকটায় সামান্য দৃষ্টি দেন, তা হ'লে আমরা তাঁর কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবো।

ভেজাল প্রসাধন দ্রব্যের বিক্রী কিসে বন্ধ হয়

এই ভেজাল প্রসাধন দ্রব্য আমরা দিনের পর দিন কিনতে বাধ্য হচ্ছি, এ জন্য শুধু মাত্র পুলিশের সাহায্য ভিক্ষা করলে খুব বেশী ফল হবে না, যদি না প্রসাধন ব্যবসায়ীরা এখনও সজাগ হন। পুলিশ না হয় বহু চেষ্টায় দু'-চারটি জাল-দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের ধর-পাকড় করতে পারে, কিন্তু ব্যবসায়ীদেরও এ বিষয়ে যথেষ্ট করণীয় আছে—অন্ততঃ আমরা তাই মনে করি। অধিক লাভের আশায় যাকে-তাকে যে কোন দ্রব্য বিক্রী করতে দেওয়ার নীতিটি পরিবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন। যে-কোন প্রথম শ্রেণীর দোকান এবং ফুটপাতের ষ্টল, উভয়কেই যদি বিক্রীর মাল সরবরাহ করা হয় তা হ'লে এই ভেজালের ব্যবস্থা চালু হবেই। কমলালয় ষ্টোর্স, ফ্র্যাঙ্ক রস্, বেঙ্গল ষ্টোর্সে গেলে যে সকল দ্রব্য কিনতে পাওয়া যায়, সে সকল দ্রব্য যদি রাস্তায় ঢেলে বিক্রী করা হয় তা হ'লে আর কার কি বলবার থাকতে পারে? পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশে যে-কোন ভাল দ্রব্য যে-কেউ বিক্রী করতে পারে না। এ জন্য থাকে প্রতি পাড়ায় নির্দ্দিষ্ট এজেন্ট বা বিক্রেতা। আমাদের সে রীতির কোন বালাই নেই। সুসজ্জিত প্রথম শ্রেণীর দোকানেও যা পাওয়া যায়, যে কোন হাট বা বাজারেও সে সকল দ্রব্য কিনতে পাবেন। আর এই জন্যই আমাদের হাট এবং বাজারে ভেজাল প্রসাধনের এত ছড়াছড়ি। ভেজাল প্রসাধন বিক্রীর ব্যবসা বন্ধ করতে হ'লে দুটি বিষয় অবিলম্বে প্রবর্ত্তন করা উচিত।

মেয়েদের ওয়াটার-প্রুফ—মূল্য সাড়ে আঠারো টাকা।

(১) যে কোন দ্রব্য বিক্রীর জন্য পাড়ায় পাড়ায় নির্দ্দিষ্ট এজেন্ট রাখতে হবে।

(২) যে কোন দ্রব্যের খালি পাত্র আসল ব্যবসায়ীদের কিনতে হবে, যৎসামান্য মূল্যে।
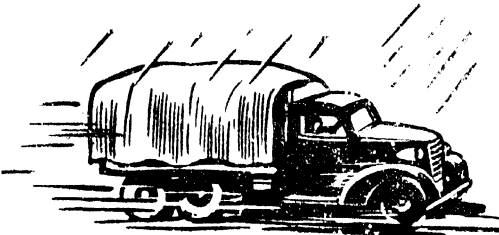
ওয়াটারপ্রুফ ক্যানভাস—তিন টাকা থেকে সাড়ে বারো টাকা।

এই রীতি দুটির প্রবর্ত্তন না হ'লে শুধু পুলিশ কিছুই করতে পারবে না। প্রসাধন ব্যবসায়িগণ আমাদের বক্তব্য গ্রহণ করলে নিশ্চয়ই লাভবান হবেন।

পোষাকের দোকানে মহিলা-কাটার চাই

কলকাতা এবং তার আশে-পাশের অঞ্চলে বহু পোষাকের দোকান আছে, যেখানে পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের দেহের মাপ নিয়ে পোষাক তৈরী করা হয়ে থাকে। আমার হিসাব নিয়ে দেখেছি, এই সকল পোষাকের দোকানে পুরুষ এবং শিশুদের দেহের মাপ নিয়ে জামা তৈরী হয় অধিকতম। মহিলাদের পোষাক তৈরী হয় মহিলাদের দেওয়া কোন পুরানো জামার মাপ থেকে। এর কারণ কি বলতে পারেন? কারণটা নেহাৎই নগণ্য। এই সকল দোকানে মেয়েদের দেহের মাপ নেওয়ার রীতিটি অত্যন্তই হাস্যকর। পুরুষ দর্জ্জি বা কাটারগণ মাপের ফিতা হাতে যখন মেয়েদের দেহ মাপামাপি করতে অগ্রসর হন তখন বহু মহিলা এই মাপ দেওয়ার ব্যাপারে বিব্রত থেকে সলজ্জায় একটি পুরানো জামা এগিয়ে দেয় মাপের জন্য। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশে কিন্তু এই ব্যবস্থা বহু কাল আগে বাতিল হয়ে গেছে। পোষাকের দোকানে মেয়েদের মাপ নেওয়ার জন্য মেয়ে-কাটার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ভদ্র ব্যবস্থার ফলে মেয়েরা লজ্জা, ঘৃণা এবং ভয়ের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বেঁচেছে। পুরানো জামা মাপের জন্য আর
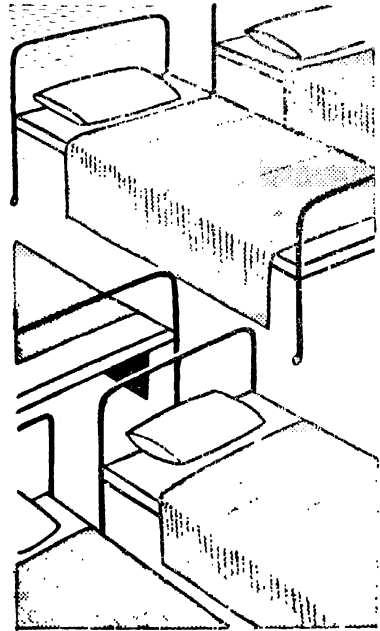
হসপিটাল শিটিঙ্স—দু' টাকা চোদ্দ আনা থেকে সাড়ে তিন টাকা।

পাঠাতেই হচ্ছে না। আমাদের দেশীয় পোষাকের দোকানেও এই রীতির প্রচলন হওয়া উচিত অবিলম্বে। ছোটখাটো দোকানের পক্ষে হয়তো এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া অচিরে সম্ভব নয়, কিন্তু বৃহৎ পোষাকের দোকানগুলি যে অচিরাৎ এই রীতি প্রবর্ত্তিত করতে পারেন, তাতে আমাদের কোন সন্দেহই নেই। দেশের ভদ্রমহিলাগণ যেমন এই ব্যবস্থায় উপকৃত হবেন তেমনি কিছু সংখ্যক বেকার-মহিলাকেও কাজে লাগানো যাবে মেয়ে-কাটারের কাজে। পোষাক ব্যবসায়ীরা আমাদের এই আবেদনে কর্ণপাত করলে আমরা সত্যিই খুশী হব।

গয়নার বিজ্ঞাপন ও ক্যাটালগ পরিচ্ছন্ন নয়

কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে মণিকার, স্বর্ণকার এবং জুয়েলারীর দোকান যত অধিক সংখ্যায় আছে তত আর অন্য কোন কিছুর নেই। প্রায় প্রতি পাড়ায় আছে একাধিক স্বর্ণকারের প্রতিষ্ঠান। এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বিজ্ঞাপনগুলি যেমন দৃষ্টিকটু এবং আকর্ষণহীন তেমনি এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত সচিত্র 'ক্যাটালগ' বা তালিকাও তথৈবচ। আপনি যে কোন ধরণের অলঙ্কার নির্মাণ করাতে গেলেই দোকানদারগণ আপনার হাতে তুলে দেবেন সেই মান্ধাতার আমলের সচিত্র ক্যাটালগ—যাতে আছে অত্যন্ত অপটু শিল্পীর হাতে-আঁকা ডিজাইন। দোকানদারের সপ্তদশ পুরুষ আগের মালিকরা যে সকল ডিজাইন চালু করেছিলেন এখনও সেই সব নক্সাই প্রচলিত করতে চান তাঁদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরা। অলঙ্কার প্রস্তুতের শিল্পটি চতুঃষষ্টি কলার অন্যতম প্রধান আর্ট। এই শিল্পটিতে এখনও, এই বিংশ শতাব্দীতেও যে এতটা গোঁড়ামি থাকতে পারে, ভাবলেও বিস্মিত হ'তে হয়। অলঙ্কারের বিজ্ঞাপনে অপটু শিল্পীর আঁকা একটি টিকালো-মুখ নারীর সর্ব্বাঙ্গে গয়না পরিয়ে দেখানো হয় দোকানে কত রকমের গয়না তৈরী হয় তাদেরই সচিত্র নমুনা। ক্যাটালগে থাকে তৃতীয় শ্রেণীর ডিজাইনের কিম্ভুতকিমাকার আর্ট। ঠাকুমা-দিদিমাদের আমলে ভারী ওজনের গয়না পরার ফ্যাশন চালু ছিল ব'লে নাতনীদেরও যে সেই ফ্যাশন বজায় রাখতে হবে তার কোন অর্থ হয়? তদুপরি ঠাকুমা ও দিদিমাদের দেহের গঠন ছিল তখন ভিন্ন ধরণের এবং সোনার দামও ছিল বর্ত্তমানের তুলনায় যৎসামান্য। সুতরাং এখনকার ছিমছাম চেহারায় অতীতের ভারী ওজনের গয়না পরালে যে একেবারেই বেমানান হবে সে কথা আর লিখে জানাবার প্রয়োজনই নেই। স্বর্ণকার, মণিকার ও জুয়েলারগণকে আমরা প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হিসাবেই ধার্য্য করি। চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে অলঙ্কার-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি যে কতটা সূক্ষ্মতম কলাজ্ঞানের পরিচায়ক তা আমরা বাঙলার অলঙ্কারের মধ্যে দেখতে পেয়েছি এবং সেই জন্যই বলছি, প্রথম শ্রেণীর শিল্পে তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পরুচির সমন্বয় হ'তে দেওয়া অ'দপেই উচিত নয়।

দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞাপনের মূল্য হ্রাস করতে হবে

যে-কোন দেশের যে-কোন ব্যবসাকে লাভজনক করতে হ'লে যে-কোন উপায়ে সেই ব্যবসার বিজ্ঞাপন বা প্রচারের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। সাধারণতঃ যে-কোন ব্যবসায়ী অতি সহজে বৃহত্তম প্রচারের আশায় দৈনিক সংবাদপত্রের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে থাকেন। বাঙালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে অধিকাংশই যে বিজ্ঞাপন-বিমুখ, এ কথাটি আর লুকানোর কোন মানে হয় না। অধিকাংশ বাঙালী ব্যবসায়ী ব্যবসা করতে নেমে আর সকল কিছু করতে রাজী থাকেন, শুধু রাজী থাকেন না প্রচারের তদ্বিরে। আবার এই ব্যবসায়ীদের দু'-চার জন যদিও বা রাজী থাকেন, তাঁরা সভয়ে পিছিয়ে যান আমাদের দেশের দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞাপনের মূল্য শুনে। আমাদের প্রথম শ্রেণীর যা দু'-চারখানি দৈনিক কাগজ আছে, তাদের বিজ্ঞাপনের মূল্য এতই অধিকতম যে বিজ্ঞাপনের কথা চিন্তা করতে পর্য্যন্ত ভয় পান বাঙালী ব্যবসায়ী। যাই হোক, যুদ্ধের পূর্ব্বে বাঙলা দেশের বাঙালী পরিচালিত দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞাপনের হার এতটা বেশী ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চড়-চড় করে বেড়ে উঠলো বিজ্ঞাপনের 'রেট'। প্রতি ইঞ্চি-পিছু পাঁচ থেকে পঁচিশ টাকায় উঠলো। এই চড়া মূল্যে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিজ্ঞাপন দেওয়া ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠলো। আমাদের প্রথম শ্রেণীর দৈনিক পত্রিকাগুলিকে জেদের বশে বিজ্ঞাপন-শূন্য ক'রে বাজারে না দিয়ে যদি বাজারের দর অনুযায়ী বিজ্ঞাপনের দরটাও ধ'রে বেঁধে অন্ততঃ কিছুটা কমানো যায়, তাতে বাঙালীর ব্যবসা যথেষ্ট প্রসারিত হবে। কাগজগুলিও লাভবান হবে।

জলে-কাদায়

বর্ষা এসে গেল। এবারে আর অসহ্য একশো দশ ডিগ্রী গরমে জামার বোতাম খুলে দিয়ে জানলায় খসখস লাগিয়ে জলের ঝারি দিতে হবে না। কিন্তু ট্রাম, বাস ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়ে এসে সওয়া দশটার সময় বন্ধ হয়ে যাবে। জল জমে[illegible]বে রাস্তায়। পল্লীগ্রামে, এমন কি কলকাতায়ও জায়গায় জায়গায় জমে যাবে প্যাচপেচে কাদা। টিপটাপ করে বৃষ্টি পড়বে সারা দিন ধরে। অফিসে লেট হওয়ার জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে কেরাণী বাবুদের। ভিস্তীওয়ালার কাজ শেষ হল। কিন্তু অফিস, বাজার, দোকান সব-কিছুই বজায় রাখতে হবে আপনাকে। আর সেই জন্যই সময় অসময়ের বন্ধু হিসাবে আপনার চাই ছাতা আর না হয় ওয়াটার-প্রুফ। কিন্তু ছাতা তো চাই! দোকানেও না হয় গেলেন। কিন্তু কি ছাতা কিনবেন? বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা যা দুরন্ত, তাই জাপানী কি দিশী-শিক না কিনে বিলিতী শিক কেনাই আপনার ইচ্ছে। এমন ছাতাও না হয় আবার যে বাড়ীতে বৃষ্টিতে ভিজে এসে দেখলেন যে শুধু জলে নয়, কালীতেও ভিজে গেছেন আপনি। দেখতে হবে ছাতার কাপড়টি ভাল হওয়া চাই। রঙ পাকা হবে। কিন্তু এমন সব জিনিষ যে আমাদের বাঙলা দেশেও তৈরী হয় তা কি আপনি জানেন? বর্ত্তমানে বহু দেশী প্রতিষ্ঠান ছাতার ব্যবসায় আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হলেও, প্রচার-কৌশলে সাধারণতঃই ছাতা বললেই যেন মনে পড়ে মহেন্দ্র দত্তর ছাতা। ছাতারও আবার কত বাহার! বাগানে বসবার ছাতা, জরীপের ছাতা, গলফ খেলার জন্য ছাতা, ছেলেদের মেয়েদের রকমারী ছাতা। চার টাকা থেকে চল্লিশ টাকা। আরও বেশী। ওয়াটার প্রুফও নানা রকম। বেঙ্গল 'ওয়াটার-প্রুফ ওয়ার্কস' এ বিষয়ে বাংলা দেশে অগ্রণী। শুধু ওয়াটার-প্রুফ নয় এঁদের রয়েছে গামবুট, হটওয়াটার ব্যাগ, মাথায় চড়াবার ক্যাপ, হসপিটাল শিটিংস, আরও অনেক কিছু।

সঙ্গে প্রকাশিত ছাতা ও ওয়াটারপ্রুফের চিত্র ও উল্লিখিত মূল্য যথাক্রমে মহেন্দ্র দত্ত ও বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কসের।

সাহিত্য পরিচয়

বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকার অপমৃত্যু

ব্যাঙের ছাতার মত নানাবিধ আকারে নানা নামে বছরের সব সময়েই কিছু না কিছু সাময়িক পত্রিকার আকস্মিক আবির্ভাব সকলেই লক্ষ্য করেন নিশ্চয়ই, কখনও যদি কোনো একটি পত্রিকা ভালো লাগে পরের মাসে ষ্টলে গিয়ে দাঁড়ালে শুনবেন, "এখনও বেরোয়নি স্যার!" তার পরের মাসেও সেই একই কথা, অবশেষে বুঝবেন যে পত্রিকাটির অকালমৃত্যু ঘটেছে। প্রথমতঃ জানা দরকার, সাময়িক পত্রিকা কেন প্রকাশিত হয় এবং কেনই বা ওঠে। সাধারণতঃ চার শ্রেণীর উৎসাহী কর্মী এই কর্মে ব্রতী হ'ন,—(১) সাহিত্যপ্রীতিযুক্ত স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী দল, (২) বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠী পরিচালিত পত্রিকা (৩) ব্যবসা হিসাবে সাহিত্য পত্র বার করে চটপট বড়লোক হওয়া (৪) যৌন বা সিনেমা বিষয়ক পত্রিকা বার করে লাভবান হওয়া। প্রথমেই যাঁদের নাম করলাম তাঁদের সাহিত্যিক নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় অসীম, উত্তরকালে সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁদেরই কেউ আসন পাবেন, সুতরাং তাঁদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে প্রশংসাই করতে হয়, একমাত্র সাহিত্যসেবাই তাঁদের লক্ষ্য। দ্বিতীয়, যাঁরা মতবাদ প্রচারে দলগত সাহিত্য-পত্র প্রকাশ করেন তাঁদেরও গ্রাহক-পাঠক সীমাবদ্ধ, দলে ভাঙন ধরলে কাগজ উঠে যায়। তৃতীয় দল ও চতুর্থ দলে আকৃতিগত পার্থক্য থাকলেও এই উভয় পক্ষের মনোভঙ্গী একই প্রকার, এঁরা যদি পাঁচ-ছটি সংখ্যা বার করে দেখেন যে ঘরের কড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে অথচ পকেটে কিছু আসছে না, অথচ প্রেস, ব্লক, দপ্তরী, কাগজ সব জিনিষের দাম বাকী পড়েছে (লেখকের কথা বাদ দিই, বিনামূল্যে সেটা যোগাড়ের কায়দা সবাই জানে) তখন রাতারাতি গণেশ ওল্টায়। ফলে আজ যদি নূতন কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাতে আনন্দ আর মনে জাগে না, সবাই সর্বাগ্রে প্রশ্ন করেন—কবে উঠবে?

এদিকে লাভবান হয় কারা? (১) যে অসাহিত্যিক ব্যক্তিটিকে প্রভাবশালী মনে করে সম্পাদক করা হয়েছিল তিনি, (২) ষ্টলের হিন্দুস্থানী হকাররা। কারণ প্রথমোক্ত ব্যক্তি 'হ য ব র ল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, এই খাতিরে প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রের ছাপাখানায় সহজেই চাকরী পান আর হিন্দুস্থানী হকাররা ছ' মাস অন্তর গুদামে সঞ্চিত পুরাতন পত্রিকা ওজন দরে বিক্রী করে দেশে বাস সার্ভিস খোলার পারমিট সংগ্রহ করে। তাই যাঁরা নতুন পত্র-পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হ'ন তাঁদের কাছে আমাদের অনুরোধ, পত্রিকার স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে তাঁরা যেন এ কাজে ব্রতী না হ'ন। আজকের দিনে একক প্রচেষ্টায় সাময়িক পত্র প্রকাশ করে প্রবল প্রতিযোগীদের সঙ্গে দাঁড়ানো অসম্ভব। 'কল্লোল' 'কালি-কলম' প্রভৃতি পত্রিকা যাঁরা পরিচালনা করেছেন তাঁদের মত উৎসাহী ও উদ্যোগী সাহিত্যিক আজ আর পাওয়া যায় না কেন? নূতন সাময়িক পত্রিকা পরিচালকরা সঙ্ঘবদ্ধ হলেই সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি ও শক্তিশালী পত্রিকা প্রকাশে সমর্থ হবেন।

বাংলা কবিতার বই

বাংলা দেশের সাহিত্যের বাজারের খবর যাঁরা রাখেন তাঁরাই জানেন যে বাংলা দেশে শুধু নভেল ছাড়া আর কোনো বই তেমন কাটে না; অন্ততঃ প্রকাশকরা প্রসন্নমুখে তা প্রকাশ করতে রাজী নন। এমন কি গল্পগ্রন্থও কেউ সহজে ছাপতে চান না, যখন ছাপেন তখন নেহাৎ দায়ে পড়েই ছাপেন। কবিতার বই ত' একেবারে হরিজন। শুধু ছবিওলা 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব', 'ওমর খৈয়াম' ইত্যাদি বিয়ের উপহার হিসাবে চলে। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁরও কবিতা তেমন বিক্রী হ'ত না। কিন্তু সাম্প্রতিক অবস্থা দেখে মনে হয় হাওয়া বদলাচ্ছে—রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, করুণানিধান, কালিদাস রায়, নজরুল ইসলাম প্রভৃতির কাব্যগ্রন্থে আজ পাঠকের যেমন আগ্রহ তেমনই আগ্রহ দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের কবিদের কাব্য সম্পর্কে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, আরো হবে। আধুনিক কবিতা সংগ্রহের একটি সুন্দর সংকলন-গ্রন্থও বেশ সমাদর লাভ করেছে শোনা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে খ্যাতনামা ও নবীন কবিদের সুমুদ্রিত কাব্যগ্রন্থ এখন কবিতা-রসিকদের হাতে হাতে ফিরছে, এ অতি সুলক্ষণ! কবিতার বইএর চাহিদা বাড়ুক, আপনারাও আরো কবিতা পড়ুন।

গল্প ও উপন্যাসের উপজীব্য

বাংলা সাহিত্যের গর্বের বস্তু তার ছোট গল্প আর উপন্যাস। ইদানীং কিন্তু যে সব গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে সেই দিকে পাঠক ও সাহিত্য-রসিকদের দৃষ্টি সবিনয়ে আকর্ষণ করছি। গল্প ও উপন্যাস এক বস্তু নয়, এ-কথা আজ সবাই জানেন, এখন প্রশ্ন—উপন্যাসের বা গল্পের কি উপজীব্য হবে? বিষয়বস্তুর সঙ্গে লেখকের যদি পরিচয় না থাকে তাহ'লে তাঁর কাহিনীতে মুন্সীয়ানা থাকলেও থাকবে না প্রাণ। উঁচুতলার সমাজকে পটভূমি করে লিখতে গিয়ে লেখক ড্রয়িংরুমে ড্রেসিং-টেবল আনেন—আর নিচুতলার সমাজ লিখতে গিয়ে রামুয়া আর তার প্রেয়সী

স্বামীর মুখ দিয়ে এমন কথা বলাবেন, যে কথা মনুমেণ্টের পাদদেশেই ভালো শোভা পায়। শুধু তাই নয়, শেষ পর্যন্ত গল্প হয়ে পড়ে রম্য রচনা (যার আর কোনো নাম দেওয়া যায় না তারই নাম রম্য রচনা)। যে জীবনে সার্কাস দেখেনি সে লেখে সার্কাস নিয়ে উপন্যাস, যে কয়লায় খনি দেখেনি সে লেখে খাদের গল্প। আজ তাই গল্প-উপন্যাসের অবাস্তব বিষয়বস্তু পাঠকচিত্তে তেমন সাড়া জাগায় না। যে সব কাহিনীর ভিতর বাস্তবতার স্পর্শ নেই, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যার উপজীব্য নয় সেই কাহিনী স্বভাবতই ভোলো হয়ে পড়ে। আজ তাই শুধু আঙ্গিক আর রূপকল্পের দিকে মনোযোগ দিলেই সার্থক সাহিত্য হবে না, মহৎ সাহিত্য রচনা করতে চাই প্রতিভার সঙ্গে অধ্যবসায়। যাঁরা সাহিত্য-সাধনায় নতুন করে নামছেন তাঁদের প্রতি আমাদের নিবেদন তাঁরা মৃতকল্প বঙ্গসাহিত্যকে সঞ্জীবিত করে তুলুন।

মাসিক বসুমতীর মন্তব্যের আলোচনায় সভানুষ্ঠান

কলিকাতার সাম্যবাদী দৈনিক পত্রিকায় কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের সভার কার্যসূচী হিসাবে বিজ্ঞাপিত হয়েছে—"মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত মন্তব্যের সম্পর্কে আলোচনা"—। উক্ত সভায় কি আলোচনা হল তার রিপোর্ট আর নজরে পড়েনি। যদি এই সভা মাসিক বসুমতীর মন্তব্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তাহ'লে আমরা আনন্দিত হব। মাসিক বসুমতী সহযোগিতার মনোবৃত্তি নিয়েই প্রগতি সাহিত্যিকদের আত্মাবলুপ্তি সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করেছে। আজ দেশে গোয়েওয়ালা আর দীপক চৌধুরীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে, সেই তরঙ্গ প্রতিরোধ করতে পারেন যাঁরা প্রকৃত প্রগতিবাদী। শুধু মাত্র রঙীন চশমায় চোখ বন্ধ রাখলে প্রগতি সাহিত্যিক হওয়া যায় না, প্রগতি সাহিত্যিক ও হস্তিদন্ত-মিনারে অধিষ্ঠিত কল্পনাবিলাসী সাহিত্যিকের মধ্যে পার্থক্য আছে, এটা দেশবাসীকে বোঝানোর দায়িত্ব প্রগতি সাহিত্যিকেরই। মাসিক বসুমতী সেই জাতীয় কর্তব্যটুকু পালন করেছে মাত্র।

কলকাতার পথ-ঘাট

কলকাতার পথ-ঘাট গলির পিছনে আছে এক অপূর্ব রহস্যময় কাহিনী, এই যন্ত্রনগরী একদিন যাদুনগরীর মতই গড়ে উঠেছিল, এবং আজ থেকে 'মাত্র শতাধিক বছরের এই কৌতূহলময় ইতিহাস প্রায় লুপ্ত হওয়ার সামিল হয়েছিল। দৈনিক বসুমতীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'কলকাতার পথ-ঘাট' বিষয়ক সরস ঐতিহাসিক আলোচনা অবিলম্বে প্রকাশ করছেন মেসার্স ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিসিং কোং। অনেক দুষ্প্রাপ্য তথ্য ও মূল্যবান দলিল এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অস্বীকৃত

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চিতাভস্ম এখনও হয়ত তেমন শীতল হয়নি, এই সাধক জ্ঞানতপস্বী আজীবন সাধনায় বাংলা দেশের সাহিত্য ও সমসাময়িক বহু ইতিহাস আবিষ্কার করেছেন এবং তার জন্য তাঁর পরিশ্রম ও ক্লেশের পরিচয় দেশবাসী নিশ্চয়ই পেয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ তাঁর সেই গবেষণার ফল দেশবাসী গোগ্রাসে গ্রহণ করলেও, তাঁর নামোল্লেখ কোথাও দেখি না। বিশেষতঃ কলকাতায় দুখানি বিশিষ্ট দৈনিকপত্রে ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণা দিনের পর দিন যে ভাবে মৌলিক গবেষণা হিসাবে চালানো হচ্ছে তা অতিশয় নিন্দনীয় রীতি। আগে দেশে সাংবাদিক-শালীনতা বলে একটা কথা প্রচলিত ছিল, সেই কথাটির বোধ হয় অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে।

পড়ার যোগ্য বই আর শ্রেণী-বিভক্ত বিজ্ঞাপন

সেলাই শিক্ষা, গীটার শিক্ষা, মোটা হইবার উপায়, পত্র যোগে ব্যায়াম শিক্ষা ও যোগাভ্যাস প্রভৃতি গ্রন্থের শ্রেণী-বিভক্ত বিজ্ঞাপন হওয়া সম্ভব কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে এক শ্রেণীর বিজ্ঞাপন-রীতি

—ফটো : শম্ভু সাহা

মহাজাতি সদনে কবি-সংবর্ধনা। নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য-সম্মেলন ১৩৬০ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ রূপে নির্বাচিত করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত 'সংবর্ত'। এতদুপলক্ষ্যে রবীন্দ্রজন্মোৎসবের অঙ্গ হিসেবে গত ১লা জ্যৈষ্ঠ সুধীন্দ্রনাথের বিশেষ সংবর্ধনার আয়োজন হয়েছিল মহাজাতি সদনে। উপরে কবিকে মাল্যচন্দন দানের দৃশ্য।

প্রচলিত হয়েছে যার উদ্দেশ্য সৎসাহিত্যের শ্রেণী-বিভক্ত বিজ্ঞাপন দেওয়া। আমাদের মনে হয়, এতদ্দারা গ্রন্থের শুধু অমর্য্যাদা করা হয় না, গ্রন্থকারেরও অমর্য্যাদা ঘটে। লেখক ও প্রকাশকদের এই বিষয়ে একটু অবহিত হওয়ার সময় এসেছে।

পুরাতন বইয়ের নতুন আকার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় বহু মূল্যবান পুরাতন বই নতুন আকারে প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যের অশেষ উপকার সাধন করেছেন। রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা', প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল', বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর 'সারদামঙ্গল', রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রভৃতি বইগুলি নামকরা। একমাত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ব্যতীত সিগনেট প্রেস এবং ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানীও এই ধরণের কিছু কাজ করেছেন। ওরিয়েণ্ট ছেপেছেন রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত এবং সিগনেট ছেপেছেন শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনী। আমরা অন্যান্য প্রকাশকদের এই ধরণের পুরাতন অথচ মূল্যবান কিছু গ্রন্থ প্রকাশ করতে অনুরোধ করি।

ভারতীয় কপিরাইট এ্যাক্টের পরিবর্ত্তন

সময় সময়ে দায়ে প'ড়ে কিম্বা অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থপ্রাপ্তির আশায় অনেক লেখককেই গ্রন্থের লেখকস্বত্ব বিক্রয় করতে হয়, কিন্তু পরে তাঁরা আপশোষ করেন। অনেক প্রকাশক আছেন, যাঁরা লেখকের এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে, তাঁকে সামান্য কিছু দিয়ে, দেয় অর্থের বহু গুণ উপার্জ্জন করেছেন—চিরতরে আত্মসাৎ করেছেন দরিদ্র লেখকের বহু পরিশ্রমের ফল। এই ভাবে বহু খ্যাতনামা লেখকও তাঁদের বহু গ্রন্থের সর্ব্বস্বত্ব হারিয়ে, পরবর্ত্তী সংস্করণের আয় থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। অবশ্য অধুনা এমন অনেক প্রকাশকও আছেন, যাঁরা সংস্করণ ব্যতীত গ্রন্থের সর্ব্বস্বত্ব গ্রহণ করতে নারাজ।

সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্ট দেশের সাহিত্যিকদের মুখ চেয়ে এই কপিরাইট এ্যাক্ট পরিবর্ত্তন করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। এবং বিশ্বস্তসূত্রে আমরা অবগত হয়েছি যে, এই এ্যাক্টের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিশেষ দু'টি বিষয় সম্ভবতঃ এই ভাবে পরিবর্ত্তিত হবে। যথা—কোন গ্রন্থকার গ্রন্থের সর্ব্বস্বত্ব বিক্রয় করার পর ৭ বৎসরের মধ্যে যদি সেই মূল্য (অর্থাৎ যে মূল্যে তিনি উক্ত গ্রন্থ প্রকাশকের নিকট বিক্রয় করেছিলেন) প্রকাশককে প্রত্যর্পণ করেন, তা'হলে প্রকাশক তাঁকে যে কোন সময়ে উক্ত গ্রন্থের স্বত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য থাকবেন। দ্বিতীয়—গ্রন্থকারের মৃত্যুর পরবর্ত্তী ৫০ বছর পর্য্যন্ত তাঁর নিজস্ব গ্রন্থের যে স্বত্ব বজায় থাকে, তা কমিয়ে ৩০ বছরে আনা হবে। অর্থাৎ কোন মৃত লেখকের রচনা ৫০ বছরের পরিবর্ত্তে ৩০ বছরের পরই যে কোন লোক প্রকাশ করতে পারবেন, এতে তাঁর ওয়ারিশ বা অন্য কারুরই কোন স্বত্ব থাকবে না।

বিলেতে গ্রন্থের ফিল্মরাইট নিয়ে চাঞ্চল্য

বিলেতের প্রকাশক ও গ্রন্থকার মহলে সম্প্রতি গ্রন্থের ফিল্ম রাইট নিয়ে বেশ এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণতঃ লেখকরা যে সকল গ্রন্থের এডিসন রাইট দিয়ে থাকেন, সেই সকল গ্রন্থের ফিল্ম ড্রামা বা অনুবাদ প্রভৃতির স্বত্ব গ্রন্থকারের নিজেরই হাতে থাকে, এবং সে সম্বন্ধে প্রকাশকের কোন প্রাপ্য বা করণীয় থাকে না। সর্ব্বস্বত্ব বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও, বিশেষ ভাবে যদি ঐ সকল বিষয়গুলির উল্লেখ না থাকে, তা'হলেও প্রকাশকের পক্ষে বংশ-পরম্পরায় গ্রন্থখানির মুদ্রণ ও বিক্রয় ব্যতীত অন্য কোন কিছু করার উপায় নেই। এই সকল ব্যাপার নিয়েই বিলেতের প্রকাশক মহলের টনক নড়েছে; তাঁরা বলেছেন যে, উপস্থিত তাঁদের প্রকাশিত যে সকল বইয়ের ফিল্ম হবে, এবং সেই সকল বইয়ের জন্য লেখক ফিল্ম কোম্পানীর কাছ থেকে যে অর্থ পাবেন, তার শতকরা ১০ ভাগ দিতে হবে তাঁদের। তাঁরা আরও বলছেন, আমরা প্রভূত অর্থ ব্যয় ক'রে বই ছেপে, বিজ্ঞাপন দিয়ে বইখানিকে জনসাধারণের কাছে আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য ক'রে তুলতে যে সাহায্য করি, তার জন্য ফিল্ম থেকে আমাদেরও কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লেখকরা কেউ-ই এতে রাজী হচ্ছেন না; তাঁরা এটিকে মামার বাড়ির আবদারের মত মনে করেই যত এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন, প্রকাশকরা নাকি ততই গুরুত্ব দিচ্ছেন বিষয়টির উপর। তবে সমস্ত ব্যাপারটিই লেখালেখির ভিতর দিয়ে ডেমোক্রেটিক ওয়েতে চলেছে।

মাসিক বসুমতীর ধারাবাহিক রচনা

আমরা পূর্ব্বেও উল্লেখ করেছি, মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত উপন্যাস বা অন্যান্য ধারাবাহিক রচনার ওপর পাঠক বা প্রকাশকের অসীম আগ্রহ। ইতিপূর্ব্বে যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত', অচিন্ত্যকুমারের 'পরম পুরুষ', রঞ্জনের 'শীতে উপেক্ষিতা', গজেন্দ্র মিত্রের 'রাত্রির তপস্যা,' প্রতিভা বসুর 'মনের ময়ূর', প্রাণতোষ ঘটকের "আকাশ-পাতাল", ও অমরেন্দ্র ঘোষের 'জোটের মহল' প্রভৃতি রচনাবলীর সম্পর্কে আমরা এই আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। প্রায় প্রতিদিনিই পত্র বা টেলিফোন যোগে যে সব রচনা বর্ত্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে সেই বিষয়ে অনেকে খোঁজ-খবর জানতে চান, তাঁদের অবগতির জন্য আমরা জানাচ্ছি যে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত রচনাবলীর ইতিমধ্যেই প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে। নিম্নে রচনাবলী ও প্রকাশকের নাম দেওয়া হল—ভুয়া ভুঁইয়া (বেঙ্গল পাব্লিসার্স), ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিসিং), পরাজিতা ও অপরাজিতা (ঐ), তখন আমি জেলে (ঐ), সন্স এ্যাণ্ড লাভার্স (রীডার্স কর্ণার), তুলি ও রঙ (মেসার্স এম, সি, সরকার), চাষীর মেয়ে (বেঙ্গল পাব্লিসার্স), দেশান্তরী (ঐ) দর্পিতা (ঐ), চীন দেখে এলাম (ঐ), দুই নগরের গল্প (ক্লাসিক প্রেস)।

মাসিক বসুমতীর সুনির্ব্বাচিত ধারাবাহিক রচনার জনপ্রিয়তার এই পরিচয়। এই ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমরাও সর্ব্বদাই সচেষ্ট।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

বাংলায় বিপ্লববাদ

১৩৩০ সালে, যত দূর স্মরণ আছে হলদে রঙের কাগজের মলাটে সজ্জিত হয়ে শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহের 'বাংলায় বিপ্লববাদে'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন গ্রন্থটির আয়তন অনেক ক্ষীণ ছিল। পরাধীন দেশে বিপ্লবের ইতিহাস রচনা করা সহজসাধ্য ছিল না, তবু অপরিসীম নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সহকারে নলিনী বাবু সেই গুরুত্ব কর্ম সম্পন্ন করেছিলেন। আজ চব্বিশ বছর পরে সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থের পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হল। নানাবিধ বাধা-বিপত্তির জন্য একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব না হলেও নলিনী বাবু বহু অপ্রকাশিত তথ্য সমাবেশে এই বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করেছেন। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের মূল কথা স্বার্থহীন আত্মত্যাগ, পিছন পানে না তাকিয়ে একলা চলার সাধনায় বাংলার ত্যাগব্রতী বিপ্লবীরা ফাঁসিকাঠে হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছেন,—পুলিশের গুলীতে বুক পেতে দিয়েছেন। দেশপ্রেম ও স্বদেশের স্বাধীনতা কামনা ছাড়া আর কোনো উচ্চাভিলাষ তাঁদের ছিল না। আজ স্বাধীন ভারতে তাঁদের ক'জনকে আমরা স্মরণে রেখেছি? বাংলার বিপ্লবীদের নিঃশেষে আত্মদানের কাহিনী রচনা করে নলিনী বাবু একটা মহৎ কর্তব্য সম্পন্ন করলেন, তার জন্য তিনি অভিনন্দিত হবার যোগ্য, আর ধন্যবাদার্হ এই গ্রন্থের উদ্যোগী প্রকাশক এ, মুখার্জি এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড। গ্রন্থটির মূল্য ছয় টাকা মাত্র।

শাস্ত্র-সংশয় নিরসন

ধর্মতত্ত্ব অতি জটিল বিষয়, সাধারণে সহজে অনেক কথা বুঝতে পারে না। মনে অনেক সময় অনেক সংশয় জাগে, তার সম্যক্ মীমাংসাও হয় না। মহাত্মা শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের ঢাকাস্থ আশ্রমের ভজন-কুটিরে সাতটি অমূল্য উপদেশ লিখিত ছিল, তার মধ্যে মূলতঃ পঞ্চম বাণী—"শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর" —ভিত্তি করেই তাঁর উপযুক্ত শিষ্য শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনাথ মজুমদার এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। শাস্ত্রবাক্য বিশ্লেষণের অভাবেই সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য হয়—লেখক অসামান্য কৃতিত্ব সহকারে সেই কঠিন বস্তুকে সরল ও সহজ ভাবে পরিবেশন করেছেন। পরলোক, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান, জাতিভেদ, বিধবা-বিবাহ শ্রীশ্রীরাসলীলা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে তাঁর আলোচনা অত্যন্ত সুলিখিত এবং বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। গ্রন্থটির সমগ্র আয় শ্রীসোনার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সেবায় ব্যয়িত হইবে। কয়েকটি সুন্দর চিত্র সম্বলিত এই বিরাট গ্রন্থের দাম মাত্র চার টাকা। প্রাপ্তিস্থান ১০১।১১এ হাজরা রোড, কলিকাতা (২৬)।

ঝিলম নদীর তীরে

কাশ্মীরে পাকিস্থানী হানাদারের আক্রমণের পটভূমিকায় কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী করে 'ঝিলম নদীর তীরে' উপন্যাসটি রচনা করেছেন কুশলী সাহিত্যিক 'যাযাবর'। তথ্যের সঙ্গে কাহিনী মেশাতে তাঁর তুলনা নেই—সুতরাং 'ঝিলম নদীর তীরে' একখানি ছেলে-বুড়ো সকলেরই মনোরঞ্জক কাহিনী হয়েছে। বইটি প্রকাশ করেছেন নিউ এজ পাবলিসার্স লিমিটেড।

অবিশ্বাস্য

সৈয়দ মুজতবা আলী বাংলা সাহিত্যের হাটে যাদুমাখা লেখনী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর লেখনীর ইন্দ্রজাল-স্পর্শে সব কিছুই সোনা হয়ে যায়। 'অবিশ্বাস্য' তাঁর সর্বাধুনিক রচনা। চা-বাগানের পটভূমিতে রচিত রহস্যকাহিনী। প্রকাশক বেঙ্গল পাব্লিসার্স বিজ্ঞাপন দিয়েছেন ২৬।৫।৫৪ তারিখে বেরিয়ে ২৬৫৩ তারিখেই প্রথম এগারোশো বই নিঃশেষিত। তাজ্জব কাণ্ড! বাংলা সাহিত্যের পাঠক ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছেন, এ অতি আশার কথা! বইটির দাম—তিন টাকা।

স্বনির্বাচিত গল্প

নানা কারণে শ্রেষ্ঠ গল্প, সেরা গল্প প্রভৃতির চাইতে স্বনির্বাচিত গল্পগ্রন্থের মর্যাদা বিভিন্ন। জনপ্রিয় লেখক স্বয়ং তাঁর গল্প নির্বাচন করে যখন সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেন তখন তা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সম্প্রতি মেসার্স ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিসিং কোম্পানী এই জাতীয় সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁরা ঘোষণা করেছেন যে, ক্রমে ক্রমে তাঁরা প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, মহাস্থবির, শিবরাম চক্রবর্তী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের স্বনির্বাচিত গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করবেন। এই সিরিজের প্রথম গ্রন্থ প্রবোধকুমার সান্যালের স্বনির্বাচিত গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি মনোরম, তার উপর লেখকের হস্তাক্ষরে মুদ্রিত ভূমিকা বিশেষ আকর্ষণীয়। প্রতি খণ্ডের দাম চার টাকা মাত্র।

বাংলা সাহিত্যে নজরুল

১১ই জ্যৈষ্ঠ, নজরুল ইসলামের জন্মদিন উভয় বঙ্গে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হ'ল। বিদ্রোহী কবির কণ্ঠ আজ নীরব। কিন্তু বাণীসাধক নজরুলের রচনা আজো তেমনই আবেগ-উদ্দাম—প্রাণরসে-ভরপুর। এই শুভদিনে ক্যালকাটা বুক ক্লাব আজাহার-উদ্দীন খান রচিত, "বাংলা সাহিত্যে নজরুল" নামে কবির সম্পূর্ণ জীবন-কথা, সাহিত্য-কীর্তির সমালোচনা ও বহু তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থটিতে কবির কয়েকটি নতুন ছবিও আছে। এক হিসাবে কবির সম্পর্কে এই সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হ'ল। গ্রন্থটির দাম সাড়ে তিন টাকা।

সংবর্ত

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রোত্তর কালের কবিদের মধ্যে অসাধারণ শক্তির অধিকারী। আঙ্গিক ও বিন্যাসে তাঁর নৈপুণ্য পাঠক সাধারণের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। 'সংবর্ত' এই খ্যাতনামা কবির নবতম সাহিত্য-কীর্তি। অপূর্ব মননশীলতা ও সতর্ক কারুকর্ম তাঁর কবিতার প্রধান সম্পদ। নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য-সম্মেলনের নির্বাচনে 'সংবর্ত' ১৩৬০ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বিবেচিত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থের প্রকাশক—সিগনেট প্রেস, দাম দু টাকা।

প্রখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক ও নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী সাহিত্যিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের পত্নী শ্রীমতী ডোরা রাসেল সম্প্রতি কম্যুনিষ্ট পার্টির অজয় ঘোষ মহাশয়ের সহিত কয়েক দিন বাংলার বিভিন্ন স্থানে সফর করেছেন। বিশ্ব গণতান্ত্রিক নারী-সঙ্ঘের প্রতিনিধি হিসাবে শ্রীমতী ডোরা রাসেল নিখিল ভারত নারী-সম্মেলনের সভায় যোগদানের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের বিখ্যাত বই "ম্যারেজ এ্যাণ্ড মর্‍্যালস"র বঙ্গানুবাদ ছাপা হচ্ছে। দেশবন্ধু-তনয়া শ্রীমতী অপর্ণা রায় রচিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অন্তরঙ্গ জীবন-কথা 'মানুষ চিত্তরঞ্জন' শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। ফরাসী মেয়ে সোনিয়া ফোর্ণিয়ার সতের বছর বয়স। সম্প্রতি তার দ্বিতীয় উপন্যাস "দো ইনকুয়্যেয়ে ত্ত সিওল" প্রকাশিত হয়েছে। মেয়েটি গ্রামে বাপ-মার সঙ্গে থাকে ও খামারে কাজ করে। মেয়েটি ভার্জিলের মূল রচনা পড়তে ভালোবাসে। মাতৃভাষা ছাড়া ইংরাজী, স্প্যানিস্, ইতালীয় ও জার্মাণ ভাষাও জানে। সম্প্রতি চিদম্বরমে ভারতীয় লেখকদের এক সম্মেলন হয়ে গেছে। সভার উদ্বোধন করেন প্রধান মন্ত্রী, প্রধান বক্তা ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন সি, পি, রামস্বামী আয়ার। সকলেই লেখক বটে তবে মাতৃভাষায় কেউ এক লাইনও রচনা করেননি। বাংলা দেশের হয়ে গিয়েছিলেন শুধু কবি নরেন্দ্র দেব। পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ভূমিকম্পের পূর্বেই যে বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই সংখ্যায় তার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হল।

১৩৬০ সালের উল্লেখযোগ্য শিশু-সাহিত্য

[১৩৬০ সালের এক শত সেরা বাংলা বইএর তালিকা বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার পর, আমাদের বহু পৃষ্ঠপোষক ও পাঠক-পাঠিকা কিশোরদের জন্য প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের একটি তালিকা প্রকাশের জন্য অনুরোধ করায় ১৩৬০ সালের কিশোর সাহিত্যের কয়েকজন কৃতী লেখক ও কিশোরদের মাসিক পত্রের সম্পাদক কর্তৃক নির্বাচিত উল্লেখযোগ্য কিশোর সাহিত্যের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।]

উপন্যাস

পুস্তকের নাম	গ্রন্থকার	প্রকাশক
শশী শ্যামলের সাঁকো	স্বপনবুড়ো	সত্যব্রত লাইব্রেরী
কুমারিকা সিরিজ	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	দেব সাহিত্য কুটীর
ভুতুড়ে	পুষ্প বসু	এম, সি, সরকার

(রূপকথা)

পুস্তকের নাম	গ্রন্থকার	প্রকাশক
বাঙলার রূপকথা	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	রূপায়নী বুক শপ
রাশিয়া থেকে (রূপকথা)	অরুণকুমার ঘোষ	
রাশিয়ার রূপকথা	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	রূপায়নী বুক শপ

(জীবনী)

পুস্তকের নাম	গ্রন্থকার	প্রকাশক
যাঁদের লেখা তোমরা পড়ো	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	ওরিয়েণ্ট বুক কোং
প্রিয়দর্শী অশোক	ধীরেন্দ্রলাল ধর	"

(গল্প)

পুস্তকের নাম	গ্রন্থকার	প্রকাশক
আমার ভালুক-শীকার	শিবরাম চক্রবর্ত্তী	অভ্যুদয়
স্বপনবুড়োর গল্প-সঞ্চয়ন	স্বপনবুড়ো	ওরিয়েণ্ট বুক কোং
কাল্টু গুল্টু	মৌমাছি	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
জন্মদিনের উপহার	শিবরাম চক্রবর্ত্তী	দেব সাহিত্য কুটীর
নিখরচায় জলযোগ	শিবরাম চক্রবর্ত্তী	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড
হানাবাড়ী	সুকুমার দে সরকার	দেব সাহিত্য কুটীর
ছোটদের পদ্মপুরাণ	সুনির্মল বসু	দেব সাহিত্য কুটীর
পদী পিশির বর্মী বাক্স	লীলা মজুমদার	সিগনেট প্রেস
দুধভাত	ইন্দিরা দেবী	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড

পুস্তকের নাম	গ্রন্থকার	প্রকাশক
এলোমেলো	বুদ্ধদেব বসু	ক্যালকাটা বুক ক্লাব
নাবিক রাজপুত্র ও রাজকন্যা	সঞ্জয় ভট্টাচার্য	পূর্বাশা

(ছড়া ও কবিতা)

পুস্তকের নাম	গ্রন্থকার	প্রকাশক
স্বপনবুড়োর ছড়া	স্বপনবুড়ো	প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

(অনুবাদ, বিজ্ঞান ও বিবিধ)

পুস্তকের নাম	গ্রন্থকার	প্রকাশক
গলিভার ট্রাভেলস	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টো	দেব সাহিত্য
আঙ্কল টমস্ কেবিন	"	"
কো ভেডিস	"	"
সম্রাট সলোমনের গুপ্তধন	নির্মল চৌধুরী	ঘোষ ব্রাদার্স
বিজ্ঞান বিচিত্রা	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীদাস মজুমদার সম্পাদিত	ঈগল পাব্লিশার্স
হিমালয় অভিযান ও শেরপা তেনজিং	সুবোধ ঘোষ প্রভৃতি	ক্যালকাটা বুক ক্লাব
উড়ো জাহাজের কথা	ধীরেন্দ্রলাল ধর	ওরিয়েণ্ট
ছোটদের মঙ্গলকাব্য	ধীরেন্দ্রলাল ধর	ওরিয়েণ্ট
তৈরী করা কঠিন নয়	ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী	"
মজার খেলা ক্রিকেট	বিনয় মুখোপাধ্যায়	নিউ এজ
সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায়	বিশু মুখোপাধ্যায়	কমলা পাবলিশিং
এ্যাডভেঞ্চার অফ মার্কোপোলো	"	দেব সাহিত্য কুটীর
ওল্ড কিউরিয়োসিটি শপ	"	মিত্র ঘোষ

LTS. 415-X52 BG

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

পূর্ব্ব-পাকিস্তানের আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব

সম্মিলিত ফ্রন্টের মন্ত্রিসভাকে অপসারিত করিয়া পূর্ব্ব-পাকিস্তানে গবর্ণরের শাসন প্রবর্ত্তনের ঘটনাটি যে আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গত ৩০শে মে (১৯৫৪) পাকিস্তানের গবর্ণর জেনারেল মিঃ গোলাম মহম্মদ মিঃ ফজলুল হকের প্রধান মন্ত্রিত্বে গঠিত মন্ত্রিসভাকে অপসারিত করিয়া পূর্ব্ব-পাকিস্তানে গবর্ণরের শাসন প্রবর্ত্তন করেন। চৌধুরী খালেকুজ্জমানের স্থানে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় দেশরক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জ্জা পূর্ব্ব-পাকিস্তানের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জ্জা নবাব মীরজাফরের নবম বংশধর। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ নবাব নিজাম সৈয়দ আলী খান ফরিদুন ঝা তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ। হক মন্ত্রিসভার অপসারণ এবং পূর্ব্ব-পাকিস্তানে গবর্ণরের শাসন চাপাইয়া দেওয়া কোন অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক ঘটনা ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। গত ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব্ববঙ্গে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হয় তাহাতে সম্মিলিত ফ্রন্টের নিকট মুসলিম লীগের বিপুল পরাজয়ই শুধু হয় নাই, পূর্ব্ব-পাকিস্তানে রাজনৈতিক দল হিসাবে মুসলিম লীগের অস্তিত্বই বিপন্ন হইয়া পড়ে। গত ৩রা এপ্রিল (১৯৫৪) হক মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন। ১ মাস ২৭ দিন পরেই এই মন্ত্রিসভাকে অপসারিত করিয়া পূর্ব্ব-পাকিস্তানে গবর্ণরের শাসন প্রবর্ত্তন করা হইল।

পূর্ব্ব-পাকিস্তানে গবর্ণরের শাসন উপলক্ষে গত ৩০শে মে (১৯৫৪) সন্ধ্যায় পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী পাকিস্তানবাসীদের উদ্দেশ্যে যে বেতার-বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি হক সাহেবকে পাকিস্তানের দেশদ্রোহী, এমন কি পূর্ব্ব-পাকিস্তানের প্রতিও বিশ্বাসঘাতক এবং পাকিস্তানের প্রতি মূলতঃ আনুগত্যহীন বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি শ্লেষ করিয়া ইহাও বলেন যে, এগার বৎসর রাজনৈতিক নির্ব্বাসন ভোগ করিয়াও হক সাহেব শোধরান নাই। মিঃ জিন্না যে হক সাহেবকে 'মুসলিম জাতির অভিশাপ স্বরূপ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, এ কথাও তিনি উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, হক সাহেবই ১৯৪০ সালে সর্ব্বপ্রথম পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর সেদিন পর্য্যন্তও প্রায় সাত বৎসর ধরিয়া তিনি পূর্ব্ববঙ্গের এডভোকেট জেনারেল ছিলেন। খাজা নাজিমুদ্দিনকে পাক প্রধান মন্ত্রীর আসন হইতে অপসারিত করার পর হক সাহেবকে প্রাদেশিক গবর্ণরের পদ দেওয়ারও প্রস্তাব করা হইয়াছিল। সুতরাং হক সাহেব দেশদ্রোহী হইলেন কবে এবং কিরূপে তাহা অনেকের কাছেই দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হইতে পারে। নির্ব্বাচনের সময় সম্মিলিত ফ্রন্ট যে-সকল দাবী নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন তন্মধ্যে বাংলা ভাষার উপযুক্ত মর্য্যাদা এবং পূর্ব্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসন অন্যতম। সম্মিলিত ফ্রন্টের নেতারা পাক-মার্কিণ সামরিক চুক্তিরও বিরোধী। বিলাতের ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকা ১৩ই মে (১৯৫৪) তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, বাংলার নির্ব্বাচনের পর হইতে পাকিস্তানে গোলমাল বাড়িয়া চলিয়াছে। উক্ত পত্রিকা আরও মন্তব্য করেন যে, যদি বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট (পাকিস্তানের) বিপদাপন্ন হয় তাহা হইলে মধ্য-প্রাচীতে নূতন মার্কিণ নীতিও বিপদাপন্ন হইবে। উক্ত পত্রিকার এই মন্তব্য যে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ, পরবর্ত্তী ঘটনাবলী হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

হক মন্ত্রিসভা গঠনের মুখেই চট্টগ্রামে এক দাঙ্গা হয়। মে মাসের প্রথম ভাগে হক সাহেব কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় যে-সকল উক্তি তিনি করেন, সেগুলির উল্লেখ করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। পরে এই উক্তিগুলি কাজে লাগানো হইয়াছে। ১৫ই মে ঢাকার আদমজী পাটকলে এক ভীষণ দাঙ্গা হয়। পাক প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী উহাকে কম্যুনিষ্টদের কাজ বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু হক সাহেব বলেন, উহা বাঙ্গালী ও অ-বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা। ১৯ই মে করাচীতে পাক-মার্কিণ দেশরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২২শে মে হক সাহেব করাচীতে পৌছেন। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট তিনি যে বিবৃতি দেন তাহা লইয়া আলী-হক বৈঠকেও আলোচনা হয়। উক্ত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, হক সাহেব পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীনতা চান। হক সাহেব তাহা অস্বীকার করিলে উক্ত সংবাদদাতাকে বৈঠকে হাজির করা হয়। তিনি বলেন যে, তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার এক বিন্দুও মিথ্যা নয়। হক সাহেব এক বিবৃতিতে বলেন, মার্কিণ সংবাদদাতার প্রত্যেকটি শব্দ ভিত্তিহীন ও অসত্য। তাঁহার বিবৃতিকে ইচ্ছা করিয়াই বিকৃত করা হইয়াছে। মার্কিণ সংবাদদাতার হক সাহেবের সহিত সাক্ষাৎকারের

বিবরণকে ভিত্তি করিয়া টাইমস অব করাচী হক সাহেবকে অপসারণ করিয়া পূর্ববঙ্গে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠায় দাবী করেন। ইহার কয়েক দিন পরেই হক মন্ত্রিসভাকে অপসারিত করিয়া পূর্ববঙ্গে জঙ্গী গবর্ণরের শাসন কায়েম করা হয়।

মার্কিণ ও বৃটিশ পত্রিকার এবং মস্কো রেডিওর মন্তব্য হইতে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের ঘটনার আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব অনুমান করা কঠিন হয় না। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা ১লা জুন (১৯৫৪) তারিখের সংখ্যায় দেশ বিভাগের ফলসৃষ্ট হইতে সৃষ্ট geographical monstrosity-কে পাকিস্তানে গণ্ডগোলের আংশিক কারণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু সম্মিলিত ফ্রণ্টের হক সাহেব ও মিঃ সুরাওয়ার্দ্দীর কম্যুনিষ্টদের সহিত সহযোগিতা করার চেষ্টাকেও আর একটি কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত পত্রিকা কেন্দ্রীয় পাক গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, হক সাহেব পূর্ব্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা চাওয়ায় পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও শক্তিরক্ষার জন্ম প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে ঐ পথ গ্রহণ করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। ৩১শে মে মস্কো বেতারে মন্তব্য করা হইয়াছে, "পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সাফল্যে ভীত হইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণ-পক্ষপাতী মহল উক্ত দেশের উপর চাপ বৃদ্ধি করিয়াছেন।" মস্কো বেতারে আরও বলা হইয়াছে যে, পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল মহল পূর্ব্ব-পাকিস্তান সরকারের নির্য্যাতনে প্রকাশ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। বিলাতী পত্রিকা ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান বলিয়াছেন যে, দেশ বিভাগের পর সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট দূর না হওয়া পর্য্যন্ত পাকিস্তান আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে জোরালো ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

জেনেভা সম্মেলনের ভবিষ্যৎ—

আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় পর্য্যন্ত প্রায় দেড় মাস হইতে চলিল জেনেভা সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে কি কোরিয়া সমস্যা কি ইন্দোচীন সমস্যা কোন সমস্যারই সমাধানের পথে একটুকুও অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই। জেনেভা সম্মেলনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করিবার চেষ্টা না করিয়াই ইহা বলিতে পারা যায় যে, আলোচনার গতি গোড়াতে যেখানে ছিল সেইখানেই ঘুরপাক খাইতেছে, একটুকুও অগ্রসর হয় নাই। এই সম্মেলন আর কত দিন চলিবে, তাহাও অনুমান করা কঠিন। কোরিয়া ও ইন্দোচীনের বর্ত্তমান অবস্থাই উভয় পক্ষ বজায় রাখিতে চাহেন, এমন কথাও স্বীকার করা কঠিন। অখণ্ড কোরিয়া ডাঃ সীংম্যান রীর শাসনাধীনে মার্কিণ প্রভাবের আওতায় থাকে, ইহাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রেত, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। অখণ্ড কোরিয়া কম্যুনিষ্টদের প্রভাবাধীন থাকুক, ইহাই রাশিয়া ও চীন চাহিবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিজমের প্রসার নিরোধ করিতে চায়। সমগ্র কোরিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আওতার বাহিরে চলিয়া যাওয়ার মধ্যে কম্যুনিজমের প্রসারই মার্কিণ রাষ্ট্রনায়কগণ দেখিতে পাইবেন। ইন্দোচীনের ব্যাপারেও এই একই সমস্যা রহিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চায় যুদ্ধবিরতির পর এমন ভাবে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে যাহাতে সমগ্র ভিয়েটনাম বাওদাইয়ের অধীনে থাকে। তাহা না হইলেই কম্যুনিজমের প্রসার বাড়িয়া যাইবে। জেনেভা সম্মেলনের ফলাফল না দেখিয়া বৃটেন ইন্দোচীনের ব্যাপারে ফ্রান্সকে সামরিক সাহায্য দিতে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া রক্ষা-চুক্তি সম্পাদন করিতে রাজী নয়, এ কথা সত্য। কিন্তু ইতিমধ্যেই গত ৩রা জুন (১৯৫৪) ওয়াশিংটনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড এই পঞ্চ শক্তির সামরিক ষ্টাফের গোপন আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার রক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনাই উহার উদ্দেশ্য। জেনেভা সম্মেলন ব্যর্থ হইলে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ভিত্তিই এই আলোচনা-বৈঠকে রচিত হইবে। জেনেভা সম্মেলন ব্যর্থ হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার মিত্রবর্গ সহ অবিলম্বেই যাহাতে ইন্দোচীনের যুদ্ধে নামিয়া পড়িতে পারে, তাহার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখাই এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ইহা মনে করিলে ভুল হইবে কি?

অখণ্ড কোরিয়া গঠনের পথে—

ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠনের জন্ম উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রস্তাবের পর এ সম্পর্কে গোপন আলোচনার জন্ম বৃহৎ রাষ্ট্র চতুষ্টয়, চীন, উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়াকে লইয়া একটি এডহক কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির বৈঠকেও অখণ্ড কোরিয়া গঠনের উভয় পক্ষের সম্মত কোন পথের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অতঃপর ১৩ই মে (১৯৫৪) সুদূর প্রাচ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ইডেন অখণ্ড কোরিয়া গঠনের জন্ম এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তিনি বলেন যে, উত্তর কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী জেনারেল

নাম্‌ইল যে-প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে একটি স্বাধীন ও গণতন্ত্রী নিখিল কোরিয়া গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। জেঃ নাম্‌ইলের প্রস্তাব মাসিক বসুমতীর বৈশাখ সংখ্যায় আমরা উল্লেখ করিয়াছি। মিঃ ইডেন বলেন, পরিকল্পনা নিম্ন-লিখিত পাঁচটি মূল নীতির ভিত্তির উপর রচিত হওয়া আবশ্যক:— (১) একটি নিখিল কোরিয়া গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য নির্ব্বাচন হইবে. (২) উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণের সংখ্যার ভিত্তিতে জনগণেরই ইচ্ছা প্রতিফলিত হওয়ার উপযোগী করিয়া নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে হইবে, (৩) খাঁটি স্বাধীন অবস্থায় যত শীঘ্র সম্ভব নির্ব্বাচন হইবে এবং উহা অনুষ্ঠিত হইবে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং গোপন ব্যালটে, (৪) আন্তর্জ্জাতিক পরিচালনাধীনে এই নির্ব্বাচন হইবে (মিঃ ইডেনের অভিমত এই যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিচালনায় এই নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত), (৫) কোরিয়া সমস্যা সমাধানের জন্য যে পরিকল্পনাই রচিত হউক না কেন তাহাতে বিদেশী সৈন্য অপসারণের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

মিঃ ইডেনের প্রস্তাব অবশ্য কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা নহে। উহাতে কি কি ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠনের পরিকল্পনা রচিত হওয়া উচিত তাহারই কথা তিনি বলিয়াছেন মাত্র। কিন্তু ইতিমধ্যে সিউলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, সমগ্র কোরিয়ায় সাধারণ নির্ব্বাচন হওয়ার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নহে। মিঃ ইডেনের প্রস্তাবের পর কোরিয়া সমস্যার আলোচনায় প্রায় সপ্তাহ কাল ধরিয়া ভাটা পড়ে। অতঃপর ২২শে মে ১১টি রাষ্ট্রের কোরিয়া সম্মেলনে চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই ছয় দফার এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ঐ দিন দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীও ১৪ দফা বিশিষ্ট এক প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ-এর প্রস্তাবের গুরুত্ব যেমন উপেক্ষার বিষয় নয়, তেমনি এই প্রস্তাবে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ বিস্মিত না হইয়াও পারেন নাই। তিনি প্রস্তাব করেন যে, কোরিয়া যুদ্ধে যে-সকল রাষ্ট্র যোগদান করেন নাই তাঁহাদের মধ্য হইতে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র লইয়া কোরিয়ার নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি নিরপেক্ষ কমিশন গঠন করিতে হইবে। তাঁহার এই প্রস্তাবে আলোচনার নূতন ভিত্তি রচিত হইলেও মূল বাধা অপসারিত হয় নাই। নিরপেক্ষ রাষ্ট্র কাহারা ইহা লইয়া গভীর মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। নিখিল কোরিয়া কমিশনের সংগঠন ও ভূমিকা লইয়া তো মতভেদ আছেই। অ-কমুনিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ পোল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নহেন। রাশিয়ার পক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হয় যে, ভারত, পাকিস্তান, পোল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে লইয়া নিরপেক্ষ সুপারভাইসারী কমিশন গঠন করা হউক। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। অতঃপর ৫ই জুন (১৯৫৪) রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ মলটভ কোরিয়া সমস্যা সমাধানের জন্য পাঁচ দফার এক প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবের মূল কথা এই যে, ঐক্যবদ্ধ, স্বাধীন ও গণতন্ত্রী জাতি গঠনের জন্য সমগ্র কোরিয়ায় স্বাধীন ভাবে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। নির্ব্বাচনের আয়োজন এবং পরিচালনা করিবার জন্য উভয় পক্ষের প্রতিনিধি-লইয়া একটি নিখিল কোরিয়া সংস্থা গঠন করিতে হইবে। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত বিদেশী সৈন্য সরাইয়া লইতে হইবে। নির্ব্বাচন সুপারভাইজ করিবার জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক কমিশন গঠন করিতে হইবে। সুদূর প্রাচ্যে শান্তিরক্ষায় যে-সকল রাষ্ট্রের সমধিক আগ্রহ তাহাদিগকে কোরিয়ার ঐক্য সম্পাদন এবং শান্তিপূর্ণ পথে উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। কোরিয়ার নির্ব্বাচন পরিদর্শনের জন্য সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়া লইয়া একটি নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের জন্য মিঃ চৌ এন লাইয়ের প্রস্তাব মঃ মলটভ সমর্থন করেন। তাঁহার প্রস্তাব পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ মানিয়া লইবেন ইহা আশা করা সম্ভব নয়। শুধু নিরপেক্ষ কমিশন গঠনই নয়, নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে কোরিয়া হইতে বিদেশী সৈন্যের অপসারণও দুর্লঙ্ঘ্য বাধা।

ইন্দোচীন সমস্যা—

জেনেভা সম্মেলনের ইন্দোচীনের দিকেও বিশেষ কিছু অগ্রগতি হয় নাই। ভিয়েটমীনের পক্ষ হইতে ১০ই মে যে-প্রস্তাব করা হয় ভিয়েটনামের প্রতিনিধি ১২ই মে তারিখে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ৭ দফার এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁহার প্রস্তাবের মূল কথা বাওদাই গবর্ণমেণ্টকেই ভিয়েটনামের সার্ব্বভৌম গবর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিচালনায়। অতঃপর ১৪ই মে তারিখে মঃ মলটভ এক নূতন পরিকল্পনা উত্থাপন করেন। তাঁহার এই প্রস্তাব ভিয়েটমীন প্রস্তাবের পরিপূরক হিসাবে উপস্থিত করা হয়। ভিয়েট প্রস্তাবে বলা হয় যে, বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ব্যতীত উভয় পক্ষের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত যুক্ত কমিশন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার কার্য্য পরিদর্শন করিবেন। মঃ মলটভ তাহার পরিবর্ত্তে প্রস্তাব করেন যে, একটি নিরপেক্ষ কমিশন যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্য্যে পরিণত করার ব্যাপার পরিদর্শন করিবেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ভিয়েটমীন প্রস্তাবে যুদ্ধবিরতিকে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপর নির্ভরশীল করা হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিত্রয় মনে করেন যে, ইন্দোচীনে রাজনৈতিক মীমাংসা একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে। তাঁহারা যুদ্ধবিরতির দিকেই বেশী জোর দেন। অতঃপর ইন্দোচীনে শান্তি-প্রতিষ্ঠার আলোচনা চারিটি গোপন অধিবেশনেও বিশেষ কিছু অগ্রসর হয় নাই। কার্য্য-পদ্ধতি লইয়াই দর-কষাকষি চলিতে থাকে। অবশেষে ২১শে মে তারিখের অধিবেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া সম্ভব হয়। ইন্দোনেশিয়ায় শান্তিপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে-সাতটি নীতি লইয়া বিতর্ক চলিতেছিল তন্মধ্যে যুদ্ধবিরতি একটি। ২৫শে মে মিঃ ইডেন প্রস্তাব করেন যে, যুদ্ধবিরতি এবং সৈন্যবাহিনীর আঞ্চলিক অবস্থান সম্পর্কে আলোচনার জন্য উভয় পক্ষের সমরনায়কদিগকে জেনেভায় আনয়ন করা হউক। ভিয়েটমীন প্রস্তাব করে যে, ভিয়েটনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়ায় একসঙ্গে যুদ্ধ-বিরতি হওয়া আবশ্যক। লাওস ও কাম্বোডিয়া এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলে, যুদ্ধবিরতির পূর্ব্বে ভিয়েটমীন সৈন্যদিগকে লাওস ও কাম্বোডিয়া হইতে সরাইয়া লইতে হইবে। ২৯শে মে তারিখের অধিবেশনে যুদ্ধবিরতি আলোচনার জন্য উভয় পক্ষের

হাইকমাণ্ডকে জেনেভায় আহ্বান করার জন্ত মিঃ ইডেনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। হাইকমাণ্ডদের আলোচনায় তিনটি মূল নীতি সম্বন্ধেও সম্মেলনের সদস্তগণ একমত হন। ইন্দোচীনের শান্তি-আলোচনার অগ্রগতির পথে উহা যে এক বৃহৎ পাদক্ষেপ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইন্দোচীনে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্ত আলোচনার গুরুতর সঙ্কট এখনও সম্মুখে রহিয়াছে।

২রা জুন (১৯৫৪) হইতে ইন্দোচীন-সংক্রান্ত আলোচনা দুইটি পরস্পর সমান্তরাল ধারায় চলিতে আরম্ভ করে। ফরাসী এবং ভিয়েটমীন বাহিনীর অফিসারগণ যুদ্ধবিরতির সীমারেখা নির্দ্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করেন। রাজনীতিকগণের আলোচনা যুদ্ধবিরতি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে চলিতে থাকে। কিন্তু সমাধানের কোন আশা আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধবিরতির জন্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার প্রধান বিষয় হইল কি ভাবে যুদ্ধবিরতির কার্য পরিদর্শন করা হইবে. কোন্ কোন্ রাষ্ট্র লইয়া এই পরিদর্শনের জন্ত কমিশন গঠিত হইবে এবং কি কি রাজনৈতিক রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা করা হইবে। যুদ্ধবিরতি পরিদর্শনের জন্ত কাহাদিগকে লইয়া কমিশন গঠন করা হইবে, এই প্রশ্ন ইন্দোচীন আলোচনায় গুরুতর সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে। রাশিয়ার পক্ষ হইতে ভারত, পাকিস্তান, পোল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার নাম প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নয়। পশ্চিমী শক্তিবর্গের পক্ষ হইতে কলম্বো সম্মেলনের শক্তিবর্গকে লইয়া নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পক্ষ এই প্রস্তাবে রাজী নহেন। মঃ মলটভ নাকি বলিয়াছেন যে, কলম্বো সম্মেলনের তিনটি, কম্যুনিষ্ট একটি এবং কম্যুনিষ্ট-বিরোধী একটি রাষ্ট্র লইয়া কমিশন গঠনের বিষয় তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। এই আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দিয়াছে যে, কোন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র নিরপেক্ষ হইতে পারে কি না। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা স্বীকার করেন না যে, কোন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র নিরপেক্ষ হইতে পারে। চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই বলিয়াছেন, কোন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র যদি নিরপেক্ষ না হইতে পারে, তাহা হইলে কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রও নিরপেক্ষ হইতে পারে না। এই অবস্থায় নিরপেক্ষ রাষ্ট্র পাওয়া যাইবে কোথায়?

নিরপেক্ষ কমিশন গঠন লইয়া যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশিত হওয়ার সময় পর্য্যন্ত উহার অবসান হইবে কি না, তাহা বলা কঠিন। গত ১০ই জুন (১৯৫৪) ইন্দোচীন সম্মেলনের সপ্তম প্রকাশ্য অধিবেশনে কলম্বো শক্তিবর্গকে লইয়া যুদ্ধবিরতি পর্য্যবেক্ষক কমিশন গঠনের প্রস্তাব জোরের সহিত সমর্থন করিয়া বলা হয় যে, এত দিন আলোচনার পর হয় মতবিরোধ দূর করিতে হইবে, না হয় ব্যর্থতা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইন্দোচীন-আলোচনা ব্যর্থ হওয়া কোন্ পক্ষের ঈপ্সিত তাহাও কি ভাবিবার বিষয় নহে? আলোচনা চলিতে থাকার সময়েই ইন্দোচীনে যুদ্ধ আবার প্রবল হইয়া উঠিয়াছে সত্য। কিন্তু ক্ষমতা থাকিলে ফ্রান্সও কম করিত না। ফ্রান্সের সামরিক শক্তির অভাব বলিয়াই শান্তি-আলোচনা চলিতে থাকার সময়ই মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ফ্রান্স সামরিক সাহায্যের জন্ত নূতন করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আবেদন করে। তদনুযায়ী উভয় পক্ষের মধ্যে এক আলোচনাও হয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বৃটেনকে এই আলোচনার কথা জানিতে দেওয়া হয় নাই। মিঃ ইডেন সংবাদপত্রে এই আলোচনার কথা জানিতে পারেন। তিনটি সর্ত্তে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোচীনের যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে রাজী আছে। প্রথমতঃ যুদ্ধ পরিচালনের আংশিক ভার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ভিয়েটনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়াকে স্বাধীনতা দিতে হইবে। তৃতীয়তঃ উক্ত অঞ্চলে বৃটেন সহ যাহাদের স্বার্থ আছে তাহাদের সহিত একসঙ্গে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে নামিবে। শান্তি-আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোচীনের যুদ্ধে হস্তক্ষেপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া রক্ষা-ব্যবস্থা গঠনের আয়োজন চলিতেছে। ১০ই জুন সাপ্তাহিক রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বলিয়াছেন যে, বাহির হইতে হস্তক্ষেপের ফলে ভিয়েটমীনবিরোধী সংগ্রামে ফরাসীদের সুবিধা হইবে। উল্লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিলে ইন্দোচীন দ্বিতীয় কোরিয়ায় পরিণত হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।

১১ই জুন, ১৯৫৪

সাম্প্রতিক বাংলা ছবির হিসাব-নিকাশ

গত কয়েক মাসে যে ক'খানি বাঙলা ছবি দেখানো হয়েছে সেগুলির মধ্যে অধিকাংশ ছবি, যেমনই হোক না কেন, দর্শকদের আকৃষ্ট করতে পারেনি কোন মতেই। এই সব প্রদর্শিত ছবির মধ্যে উৎরে গেছে 'নববিধান,' 'প্রফুল্ল' এবং 'টুলী'। 'চাপাডাঙ্গার বৌ', 'মহিলা মহল,' 'কল্যাণী,' 'বাংলার নারী,' 'সাদা কালো' প্রভৃতি চিত্রসমূহ সগৌরবে মুক্তিলাভ করলেও ছবির খরচের টাকা তুলতে আদপেই পারলো কি না জানি না। কিছুকাল আগে কোন এক রহস্যময় কারণে 'মা ও ছেলে' ছবিটি দীর্ঘকাল যাবৎ চলেছিল বলেই কি বাঙালী চিত্রপরিচালকগণ সহসা এই ধরণের মাতৃজাতি ও মেয়েলী নামের প্রতি ঝুঁকে পড়লেন? আর তার ফলেই কি জন্মলাভ করলো না 'চাপাডাঙ্গার বৌ', 'মহিলা মহল,' 'বাঙলার নারী' আর 'কল্যাণী'র মত মেয়েলী ছবি? সম্প্রতি বাঙালী চিত্রব্যবসায়ীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন কেবল মাত্র মহিলা দর্শকদের প্রলুব্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন এবং গ্রহণ করছেন এমন ছবি যাতে মেয়েলী সেণ্টিমেণ্ট অধিক মাত্রায় প্রাধান্য লাভ করছে। আমরা স্বীকার করছি, বাঙলা ছবির দর্শকদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই অধিকতম। এই কারণেই কি আমাদের পরিচালকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে সহসা এই মহিলা-প্রীতি?

কিন্তু দুঃখের বিষয়, উপরিউক্ত চিত্রসমূহ বাঙলার মেয়েদের তৃপ্তিদান করতে সক্ষম হয়নি। তবে কি বুঝতে হবে যে, বাঙলার মেয়েরা অতি শীঘ্র ধ'রে ফেলেছেন বাঙলা ছবির কেরামতি? কোন এক বিশেষ দর্শক সম্প্রদায়ের জন্য কোন দিন কোন বিজ্ঞ পরিচালকই ছবি তৈয়ারী করেন না। কারণ ঐ বিশেষ সম্প্রদায় মুখ ফেরালে তখন আর অন্য কোন উপায়ে ছবি চালানো সম্ভব হয় না। তদুপরি মেয়েরা যদি মুখ ফেরান তা হ'লে তো কোন কথাই ওঠে না। যাই হোক, আমরা আশা করি, আমাদের পরিচালকদের নিশ্চয়ই জ্ঞানোদয় হবে এবং তাঁরা সেণ্টিমেণ্টের দোহাই পেড়ে মেয়েদের আকর্ষণের চেষ্টা থেকে বিরত হবেন। বাঙলার মেয়েদের সম্পর্কে এত সস্তা ধারণাও আর পোষণ করবেন না। সাম্প্রতিক প্রদর্শিত বাঙলা ছায়াছবির মধ্যে যেগুলি কৃতকার্য্য হয়েছে তন্মধ্যে 'না,' 'নববিধান', 'প্রফুল্ল' ও 'টুলী'র নামোল্লেখ করা যায়। ছায়াছবির গল্প যদি ঘটনাবহুল না হয় এবং ছবির পেছনে যদি একটি সম্পূর্ণ গল্প না থাকে তা হ'লে সে ছবি কখনও এক হপ্তার বেশী চলতে পারে না। আবার গল্পটি এমন গল্প হওয়া চাই, যেটিকে স্বাভাবিক গল্প হিসাবে ধার্য্য করা যেতে পারে। 'নববিধান', 'না', 'প্রফুল্ল' ছবি তিনটি গল্প হিসাবে বাঙলায় বিখ্যাত। অভিনয় যে কেউ যেমনই করুক না কেন, গল্প তিনটি বাঙলা সাহিত্যের বিখ্যাত গল্প হওয়ার দরুণ ছবিগুলির প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত কোথাও অবাস্তবতার ছায়া নেই। 'নববিধান' ও 'প্রফুল্ল' বাঙালী সমাজের প্রতিচ্ছায়া, 'না' বাঙলার অতিপরিচিত রহস্যরোমাঞ্চ।

বেশ কিছুকাল যাবৎ বাঙলা ছবির গল্প অবাস্তব হওয়ার দরুণ বাঙলা ছবি যেন জমেও জমছিল না। দুর্ব্বল ও অস্বাভাবিক গল্পের ছবি কখনও কোন দেশেই জমে না। আমাদের দেশেও জমলো না তাই 'কল্যাণী,' 'মহিলা মহল,' 'বাঙলার নারী' ও 'চাপাডাঙ্গার বৌ'এর মত দুর্ব্বল কাহিনী। এই যে এতগুলি ছবি এত পয়সা ব্যয় ক'রেও জমলো না—তাতে চিত্রব্যবসায়ীদের লোকসান হ'লেও পরিচালকদের নিশ্চয়ই জ্ঞানলাভ হয়েছে। এবং আশা করা যায় এই জ্ঞান লাভ হওয়ায় ভবিষ্যতে কোন পরিচালকই অস্বাভাবিক গল্পের সাহায্য গ্রহণ করবেন না। পশ্চিম বাঙলার ষ্টুডিওগুলির অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হ'য়ে উঠছে। কলকাতা তথা পশ্চিম বাঙলার অধিকাংশ প্রেক্ষাগৃহেই কেবলই হিন্দী ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে। এই দুঃসময়েও পরিচালকের দল যদি এক্সপেরিমেণ্টের বশবর্ত্তী হয়ে একের পর এক ব্যর্থ ছবি তৈয়ারীর কাজে লেগে থাকেন, তা হ'লে আর কি বলবার থাকতে পারে?

প্রদর্শিত ও কৃতকার্য্য ছবিগুলির মধ্যে 'টুলী' ছবিটি সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছেই বা কেন? বাঙালী দর্শক নিশ্চয়ই এখনও ভুলে যাননি তারাশঙ্করের 'কবি' এবং মনে হয় বহু বাঙালী দর্শকই দেখেছেন 'বৈজু বাওয়ারা' চিত্রটি। 'টুলী' চিত্রখানি কি এই দুখানি ছবির 'পাঞ্চ' নয়? বাঙলা দেশ ও বাঙালী সঙ্গীত-রসপিপাসু হওয়ার জন্যই 'টুলী' ছবিটি সমাদৃত হয়েছে। টুলীর কাহিনী এমন একটা কিছু বিশেষত্বপূর্ণ নয়, তবুও চিত্রনির্ম্মাতাগণ বিশেষ আকর্ষণের অবকাশ রেখেছেন। কয়েকজন কুশলী অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সঙ্গে রেখেছেন নবাগতা কয়েক জনকে। কাহিনী দুর্ব্বল হ'লে কি হবে, বেশ কয়েকজন বিখ্যাত গায়ক-গায়িকাকে রাখা হয়েছে আড়াল থেকে গান গাওয়ার প্রয়োজনে। যাঁরা সামনাসামনি অভিনয় করেন তাঁদের নামে এত কাল ছবি উৎরে যেতো, এখন দেখা যাচ্ছে আড়ালে থেকে যাঁরা গীতাভিনয় করেন তাঁদের নামঘোষণায় ছবি উৎরোচ্ছে। যে-কোন কারণেই জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করুক, 'টুলী'র নির্ম্মাতাগণ ছবিকে দর্শনীয় করতে যে যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছেন তা অতি সহজেই বোঝা যায়।

ব্যবসা করতে নেমে পুরাপুরি ব্যবসা করাই ভাল। ব্যবসায় নেমে যে-ব্যবসায়ী ক্রমাগতই প্রোডাকশন করতে বদ্ধপরিকর হন,

তাঁকেই অদূর ভবিষ্যতে একদা ব্যবসা থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়—আমাদের ব্যবসায়ী ও স্পেকুলেটিভ চিত্রনির্মাতারা নিশ্চয়ই এই কথাটি অস্বীকার করবেন না। ছবি অতি উচ্চ দরের হোক, সকল সময়ে এমন আশা করা বৃথা। কিন্তু ছবি যদি সকল সময়েই লোকসান খাওয়ায় তাতে সম্পূর্ণ নিরাশ হওয়া ব্যতীত উপায়ন্তর থাকে না। এই নিরাশার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় অধুনা বাঙলা ছবির 'প্রোডিউসার' মেলা ভার হয়ে দাঁড়িয়েছে, এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এবং এজন্য আমরা দায়ী করবো স্রেফ পরিচালকদের, অন্য কাকেও নয়।

টকির টুকিটাকি

অসময়ে এবার এ আর প্রোডাকসন্স সহরের চিত্রগৃহগুলিকে "দীপাশিখা"র আলোকে আলোকিত কোরবেন। মঞ্জু, অনুভা, বিকাশ, জহর, ভানু, সাবিত্রী এঁরাই জানেন এই শিখার ইতিহাস। "বিজ্ঞান ও বিধাতা"র সম্ভবতঃ যুদ্ধের দিন কাছে এসে পড়েছে। ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে রীতিমত কসরৎ দেখাচ্ছেন ছবি, জহর, রবীন বীরেন, রেণুকা প্রভৃতি। "কালচক্র" এবার ঘোরাচ্ছেন রঙ্গদীপা। অনুপম ঘটক সুরের মোহিনী মায়ায় চক্রকে আচ্ছন্ন করার চেষ্টায় আছেন আর প্রাণশক্তি দিয়েছেন কমল, অপর্ণা, ইলা সেন ও আরও অনেক শিল্পীরা। "ঘূর্ণি হাওয়া"র মুখে ঘূরপাক খাচ্ছেন জহর, রেণুকা, নীতিশ, বেচু প্রভৃতি। সুধা ফিল্মস্ শীঘ্রই সহরে এনে হাজির কোরবেন এই পাগল-করা হাওয়াকে। "পরিণাম"ও তুলে রাখছেন অঞ্জনা চিত্র প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য কোরছেন বিকাশ, দীপ্তি রায়, শম্ভু মিত্র, ধীরাজ, নমিতা সিংহ প্রভৃতি শিল্পীরা। "প্রজাপতি অফিস" শীঘ্রই খোলা হবে সহরের বিভিন্ন চিত্রগৃহে। যাত্রিক ইউনিটের পরিচালনায় পি, এ পিকচার্স এই জনগণমঙ্গলকারী অফিসটি খুলবেন। তুলসী চক্রবর্ত্তী, অপর্ণা, শান্তি ভট্টাচার্য এঁরাই হ'লেন কর্ণধার। "মা লক্ষ্মী" এবার সহরে এলেন ব'লে; বরণ কোরে আনছেন সুধা ফিল্ম ডিসট্রিবিউটার্স আর সহরের নামকরা শিল্পীরা নাকি সাহায্য কোরছেন এই ডিসট্রি-বিউটার্সদের। মহেন্দ্র গুপ্ত এবার পরিচালনা কোরছেন "অমর-প্রেম"। প্রেম-সঙ্গীতে সুর দিচ্ছেন দক্ষিণামোহন ঠাকুর, আর সেই প্রেমের জালে জড়িয়ে প'ড়েছেন সন্ধ্যারাণী, অভি ভট্টাচার্য্য, কমল, ধীরাজ, প্রণতি এমন কি মহেন্দ্র গুপ্ত নিজেও। পুরোহিত নবচিত্র ভারতী লিমিটেড "গৃহপ্রবেশ" করবার শুভ লগ্ন দেখছেন পাঁজী নিয়ে। ভিত থেকে সুরু কোরে শেষ অবধি উদ্যোগী র'য়েছেন

তুলসী লাহিড়ী। ইমারতী গাঁথনীর খানিকটা অংশের জন্ত দায়ী সলিল চৌধুরী। অগ্রদূতের "অগ্নিপরীক্ষা" হবে এবার সহরে। সাক্ষী থাকবেন শিল্পীদের মধ্যে চন্দ্রাবতী, সুচিত্রা, উত্তমকুমার, কমল, জহর, শিখারাণী, সুপ্রভা মুখার্জ্জী প্রভৃতি। "অমর তৃষা" নিয়ে এইচ, বি, প্রোডাকসন্স শীঘ্রই সহরে এসে হাজির হবেন। সমবেদনায় অংশ গ্রহণ কোরেছেন রবীন মজুমদার, জীবেন বসু, অবনী মজুমদার, সন্তোষ সিংহ, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। "বারবেলা"র আর দেরী নাই ; মুভী পিক্‌চার্স ইতিমধ্যেই স্যুটিং প্রায় শেষ কোরে ফেলেছেন। রূপায়নে আছেন জহর, যমুনা, সুদীপ্তা, ভানু, নৃপতি, শ্যাম লাহা প্রভৃতি।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

শ্রীমতী মণিকা গুহঠাকুরতা

ঠিক পেশা হিসেবে নয় প্রাণের একটা মস্ত বড় তাগিদ থেকে যাঁরা চলচ্চিত্র শিল্পকে গ্রহণ করেছেন শ্রীমতী মণিকা গুহঠাকুরতা (গাঙ্গুলী) তাঁদের অগ্রণী, অনায়াসেই ব'লতে পারি। বাঙ্গালার একটি অভিজাত পরিবারে তাঁর জন্মগ্রহণের সুযোগ ঘটে এবং বিবাহও হয় বাঙ্গালারই একটি অভিজাত পরিবারে। চলচ্চিত্রের প্রতি তাঁর দুর্ব্বার অনুরাগ, সে নিশ্চয়ই একটা জানবার ব্যাপার। এ শিল্প সম্পর্কে পেশাদার শিল্পীদের ন্যায় তাঁর মতামতও অত্যন্ত মূল্যবান না হয়ে পারে না।

শ্রীমতী মণিকা গুহঠাকুরতা

শ্রীমতী গুহঠাকুরতার মতামতের গুরুত্ব মনে আসা মাত্র যোগাযোগ স্থাপন করলুম আমি তাঁর স্বামী ইষ্টার্ণ রেলওয়ের পাবলিক রিলেশনস্ অফিসার শ্রীপি, গুহঠাকুরতার সঙ্গে। সময় ঠিক করে এর ভেতর একদিন চলে গেলুম তাঁদের গৃহে লেক টেম্পল ষ্ট্রীটে। শ্রীমতী গুহঠাকুরতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বেশী কিছু বিলম্ব হ'লো না। বাঙ্গালার গৃহস্থ পরিবারের আদর্শ বধূর একটি নিখুঁত চিত্র নিয়ে হাজির হলেন তিনি তাঁদের ড্রইংরুমে আমাকে যেখানে সাদরে বসান হয়েছে। আমি কি শুনতে চাইছি ব'লতেই—তিনি সাগ্রহে জবাব দেবার জন্ত প্রস্তুত হ'লেন। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হ'লো চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমাদের আলোচনা—আমি প্রশ্ন করছি আর তিনি দিচ্ছেন উত্তর।

"১৯৩১ সালে আমি সর্ব্বপ্রথম "পদ্মফুল" ছবিতে চলচ্চিত্র শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করি।" এ ছোট্ট কথাটি বলে শ্রীমতী মণিকা তাঁর বক্তব্যের সূচনা করলেন। তার পর তাঁর বলা চললো—"চলচ্চিত্র জগতের প্রতি যে আমার আকর্ষণ তার মূলে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এ ব'লতে হলে আমার ছোটবেলাকার জীবনে ফিরে যেতে হয়। সে এক অপূর্ব্ব রোমাঞ্চ! আমার পিতার (শ্রীধীরেন গাঙ্গুলী, যিনি ভারতীয় ছায়াচিত্রের একজন বিখ্যাত ও প্রবীণতম পরিচালক এবং "ডি, জি" নামে সুপরিচিত) সঙ্গে মেট্রোতে গেলুম। মেট্রোর পর্দ্দায় একটি ছোট্ট মেয়ের অভিনয়-চাতুর্য্য দেখে আমি এতই মুগ্ধ হলুম যে বলবার নয়। পিতা আমার মনের খবর টের পেয়েই কি না জানি নে জিজ্ঞেস করে বসলেন—ওর মতন অভিনয় ক'রতে পারবি? ঠিক সে মুহূর্ত্তেই কেমন করে প্রেরণা এলো আমার মনে, আমাকে যেমন করেই হোক কুশলী চলচ্চিত্র শিল্পী হতে হবে।"

এ কথা বলেই শ্রীমতী গুহঠাকুরতা একটু থামলেন। তার পর প্রশ্ন ক'রতেই আবার উত্তর এলো—"কোন্ ছবিতে এবং কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করে আমি সব চাইতে তৃপ্তি পেয়েছি, ঠিক ঠিক ওজন করে তা বলা কঠিন। তবে এটুকু ব'লবো অথবা ব'লতেই হবে "দাবী" ছবিতে মিনুর চরিত্রে অভিনয় করে আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি। পিতার কাছে প্রথম প্রেরণা পেয়ে যেদিন চলচ্চিত্রে যোগদান করলুম সেদিনের আনন্দ কতখানি হয়েছিল, সে না বললেও চলে। আজও মনে পড়ছে "পথ ভুলে" ছবিতে মেট্রোর পর্দার সেই ছোট্ট মেয়েটির মত আমিও যখন অভিনয়ের সুযোগ পেলুম তখন আমার জীবনও একটা নোতুনের সন্ধান পেল বলে গর্ব্বে ও আনন্দে প্রাণ ভরপুর হয়ে উঠল।"

জিজ্ঞেস করলুম আমি—সাধারণত: আপনার দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী কি? বিনা দ্বিধায় শ্রীমতী মণিকা উত্তর করলেন, "নিজের গৃহখানি আমার বড় প্রিয়। এটি সুবিন্যস্ত রয়েছে কি না তার দেখাশোনা করা নি:সন্দেহে আমার প্রথম কর্ম্মসূচী। সে সঙ্গে রয়েছে ছেলে-মেয়েদের তত্ত্বাবধান, শ্বশ্রুমাতার পরিচর্য্যা, সেলাই, পড়াশুনো ইত্যাদি। সন্ধ্যে বেলা বেড়ানও আমার একটা নিয়মিত কাজের মধ্যে। সবাইকে

নিয়ে ফাঁকে ফাঁকে আমোদ-আহ্লাদ, হৈ-হুল্লোড় করতে আমার ভাল লাগে। চলচ্চিত্র শিল্পের দিকে ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও আমার পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে কোন পরিবর্ত্তনই ঘটেনি। বিবাহিত জীবনের আগেও যেমনটি ছিল এখনও ঠিক তেমনি কাটছে। আর একটি কাজ যেটি আমি করে থাকি এবং করতে বিশেষ আনন্দ পাই সে হচ্ছে ছেলে-মেয়েদের পড়ানো-শেখানো। দিনের শেষে তাদের আবৃত্তি, গান সত্যিই আমার ভাল লাগে।"

"বিশেষ কোন "হবি"র কথা যদি জিজ্ঞেস করেন, তবে আমি এইমাত্র ব'লবো," শ্রীমতী গুহঠাকুরতা বলে চলেন, "আমি বরাবরই আঁকতে ভালবাসি। সেলাই, গান এ সবের চর্চ্চাও আমার অত্যন্ত ভাল লাগে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গান আমার প্রাণের জিনিষ। স্কুলে যখন পড়তুম তখন খেলাধূলো প্রায় সব ক'টাই আমার ভাল লাগতো কিন্তু এখন আমার সে সবের দিকে ঝোঁক কমেছে। আজকাল "সুইমিং" বা সাঁতার কাটা আমার একরূপ একটা "হবি"। গৃহস্থ ঘরের বধূ হিসেবে যেটুকু সম্ভব খেলাধূলো সেটুকুই আমার আছে। ক্রিকেট খেলা দেখতে এখনও আমি খুব ভালবাসি। আর একটি জিনিষ আমার চমৎকার লাগে। সে হচ্ছে বিদেশ ভ্রমণ। এতে আমার কখনও শ্রান্তি বা ক্লান্তিবোধ নেই। উন্মুক্ত প্রান্তরে ভ্রমণও আমার প্রিয়—এটি আমি প্রত্যহই করে থাকি।"

শ্রীমতী মনিকা বলে চলেন—"পুঁথি-পুস্তক পড়া-শোনায় আমার সর্ব্বদাই একটা রুচি রয়েছে। ধর্ম্মকাহিনী যেমন পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী, শেলী, কীট্‌স প্রভৃতি ইংরেজ কবিদের কবিতা, বাংলা ভাল উপন্যাস আর সর্ব্বোপরি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী—সাধারণতঃ এ সকলই আমি গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়ে থাকি। সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যে "মাসিক বসুমতী" আমার যথেষ্ট ভাল লাগে। স্কুল-কলেজে পড়বার সময়ে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা লিখতুম। আজকাল আর সে সব লেখা হয়ে ওঠে না। পোষাক-পরিচ্ছদের কথা ব'লতে পারি—রুচিসম্মত বেশ সাদাসিধে ধরণের পোষাকই আমি পছন্দ করি। জমকাল শাড়ী ও অলঙ্কারাদির প্রাচুর্য্য আমি কোন দিনই ভালবাসি না।"

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে কি কি বিশেষ গুণের প্রয়োজন? এ সম্পর্কে আপনার নিজস্ব মতামতই বা কি? এ প্রশ্নটি আমি তুলে ধরলুম আলোচনার মাঝখানে শ্রীমতী মনিকা দেবীর কাছে। অপেশাদার শিল্পী হয়েও শিল্পগত প্রাণ থাকায় তিনি আমার এ প্রশ্নটি শোনা মাত্র সোৎসাহে উত্তর দিয়ে চললেন—"চলচ্চিত্রে যোগদানের জন্য প্রথমেই যেটি প্রয়োজন সে হচ্ছে গল্প ও চরিত্র সম্পর্কে নিখুঁত জ্ঞান। সেই সঙ্গে অপরিহার্য্য গুণ হিসেবে ধৈর্য্য, সুকণ্ঠ, অভিনয়-কুশলতা, রূপসজ্জা ও ক্যামেরার টেকনিক সম্পর্কেও বেশ কিছুটা জ্ঞানের প্রয়োজন।"

তার পর আমার প্রশ্ন হ'লো—ভাল ছবি তৈরীর জন্য কি কি উপাদান অবশ্য চাই? শ্রীমতী গুহঠাকুরতা অনুরূপ উৎসাহ নিয়ে এ প্রশ্নটির উত্তরে বললেন, "আমার মনে হয় ছবির আসল ভিত্তিই হচ্ছে গল্প। শুধু গল্প বললেই হ'লো না, চাই বলিষ্ঠ গল্প। আর সেই সঙ্গে চাই *সুদক্ষ* পরিচালক ও কুশলী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নিবিড় যোগাযোগ। আমার এও মনে হয় ভাল ছবি সৃষ্টি করতে হলে বেশ কিছুটা সময় নিয়ে করা দরকার। পর্দ্দার উপযোগী করে তাকে তৈরী করবার জন্য প্রত্যেকের তাগিদ থাকতে হবে। এ জন্য শিক্ষিত রুচিসম্পন্ন লোকদের এ লাইনে যোগদানের গুরুত্ব রয়েছে অপরিসীম। অভিজাত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের চলচ্চিত্রে যোগদানে আমার আপত্তি তো নেইই পরন্তু আমি মনে করি উপযুক্ত দক্ষতা নিয়ে এঁরা যদি এ শিল্পে যোগ দেন, তবেই এর প্রত্যাশিত উন্নতি সম্ভব হবে।"

আমাদের প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা প্রায় এক ঘণ্টার উপর হয়ে গেছে। আমি আর বেশী কিছু জিজ্ঞেস না করে শুধু এটুকুই জানতে চাইলুম, সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান কোথায়? এর উৎকর্ষ সাধন ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার নিজস্ব মতামত কি? খুব অল্পের ভেতর শ্রীমতী মণিকা গুহঠাকুরতা তাঁর মনের কথা জানিয়ে দিলেন—"সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সমাজ ও জাতির কল্যাণের জন্য এর প্রয়োজন অবশ্যই স্বীকার্য্য। এর মারফত শিক্ষাদানের অপূর্ব্ব সুযোগ রয়েছে, অবশ্য শিক্ষামূলক ছবি যদি সত্যিকারের তৈরী হয়।" তিনি জোর দিয়ে বললেন—"চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ আমাদের হাতেই। আমার বিশ্বাস এ দেশে এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।"

সাময়িক প্রসঙ্গ

মিউনিসিপ্যালিটি

"একে একে দশটি মিউনিসিপ্যালিটি ভাঙ্গিয়া দিয়া গভর্ণমেণ্ট নিজ কর্তৃত্বাধীনে গ্রহণ করিলেন। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর এবং গভীর চিন্তার বিষয়। এক দিকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী পঞ্চায়েৎ-প্রথা সম্প্রসারণের সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছেন, আর এক দিকে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান মিউনিসিপ্যালিটি-গুলি একে একে ভাঙ্গিয়া দিয়া সরকারী এড্‌মিনিষ্ট্রেটার বসাইতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় যে মিউনিসিপ্যাল বিল উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাতেও মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের উপর সরকারী কর্তৃত্ব দৃঢ়তর করিবারই আয়োজন হইয়াছে। পঞ্চায়েৎ গঠিত হইলে প্রধানতঃ অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকদের দ্বারাই উহা পরিচালিত হইবে। পঞ্চায়েতের উপর কেবল যে স্থানীয় সাধারণ ব্যাপার প্রদত্ত হইবে তাহা নহে, তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাও দেওয়া হইবে। অথচ মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনভার গ্রহণ করেন শিক্ষিত সমাজ এবং মিউনিসিপ্যালিটির হাতে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোন ক্ষমতা নাই। কংগ্রেস পার্টি অশিক্ষিত লোককে যে ক্ষমতা দিতে চাহিতেছেন, শিক্ষিত লোকের হাতে তাহা দেওয়া নিরাপদ মনে করিতেছেন না। ইহাতে এ কথা সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যাইতেছে যে, হয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মূলে কোথাও এমন প্রচণ্ড গলদ রহিয়াছে, যাহা শিক্ষার আলোক পাইয়াও দূর হইতেছে না, অথবা আমাদের দেশে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইতেছে। আমরা মনে করি, প্রথম কারণটি সত্য এবং বিশেষ ভাবে বিচার্য। কলিকাতা কর্পোরেশনের শুক্রবারের সভায় ইউ-সি-সি দলের পক্ষ হইতে কয়েকজন কাউন্সিলার মিউনিসি-প্যালিটি সুপারসেশন সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। উহাতে মিউনিসিপ্যালিটির ব্যর্থতার এবং তাহার প্রতিকারের যে পাঁচটি কারণ ও উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল, তাহা সমগ্র জাতির পক্ষে প্রণিধানযোগ্য।" —দৈনিক বসুমতী।

পূর্ব্ববঙ্গ ঠাণ্ডা!

"বর্ত্তমান যুগের শাসনযন্ত্র সামরিক শাসনযন্ত্র নহে, পুলিশী শাসনযন্ত্রও নহে। দেশের সর্বসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিশিল্প, বাণিজ্য, আর্থিক সমুন্নতি বিধানই শাসনকার্য পরিচালনার প্রধানতম দায়িত্ব। এই দায়িত্ব কতটা কিভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে—মাত্র তাহারই মানদণ্ডে বিচার হইবে শাসনের সাফল্য। পূর্ববঙ্গকে 'ঠাণ্ডা' করিবার জন্য জঙ্গী ব্যবস্থা অনুসৃত হইতেছে কেন? পূর্ববঙ্গের অপরাধ পূর্ববঙ্গবাসী কেন্দ্রের আদরের মুসলিম লীগকে নির্বাচিত না করিয়া যুক্তফ্রণ্টকে নির্বাচিত করিয়াছিল। আর অপরাধ পূর্ববঙ্গের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ পূর্ববঙ্গের জন্য অটনমী চাহিয়াছিলেন। ইহাকে পাকিস্থানের প্রতি 'দুশমনী' আখ্যা দিলেই সমস্যার সমাধান হইবার নহে। বলপ্রয়োগে পূর্ববঙ্গের দাবী নস্যাৎ করা চলে—জনমত স্তব্ধ করিয়া দেওয়া চলে। কিন্তু তাহাতেই পূর্ববঙ্গের সত্যকার দাবী মিথ্যা হইবে না। খান আবদুল গফফর খান বলেন—বলপ্রয়োগের দ্বারা জনগণের অন্তরে ঘৃণার ভাবই সঞ্চারিত হইবে—সমস্যার সমাধান হইবে না। মালিক ফিরোজ খান নুন পূর্ববঙ্গে অনুসৃত দমননীতির সম্পর্কে নিন্দাসূচক কোন কথা না বলিলেও পূর্ববঙ্গের প্রকৃত সমস্যা যে কোথায় তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের জনপ্রতিনিধিদের সত্যকার দাবী পূরণ করা যে কেন্দ্রের কর্তব্য—কেন্দ্রকে যে তাহা আজ না হউক কাল পালন করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার বক্তব্যের মর্ম। সামরিক শক্তির স্পর্দ্ধায় একটা প্রদেশের জনমত স্তব্ধ করিয়া জনমতকে শান্ত ও ঠাণ্ডা করা না হয় গেল, কিন্তু তাহাদের অন্তরের বেদনা গুমরিয়া গুমরিয়া সঞ্চিত হইতেই থাকিবে—তাহা উপেক্ষা করা কোন রাষ্ট্রশক্তির পক্ষেই নিরাপদ নহে।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

ইস্কান্দারী শাসন

"পূর্ববঙ্গের জঙ্গী লাট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা ঘন ঘন বিবৃতি দিয়া বুঝাইতেছেন যে, তিনি কমিউনিষ্টদিগকে এবং দুই বাংলার ঐক্যকামীদের শায়েস্তা করিবেন। সাংবাদিকদের নিকট তিনি বলিয়াছেন যে, সাম্যবাদ পাকিস্থানে এক নম্বর শত্রু, মোল্লাতন্ত্র দুই নম্বর শত্রু, তিন নম্বর বোধ হয় দুই বাংলার ঐক্যকামী 'এবং চার নম্বর ইউনাইটেড ফ্রণ্ট বা সংযুক্ত দল। মন্ত্রিসভা বাতিল করা হইয়াছে, সংযুক্ত দলের সভা পণ্ড করা হইয়াছে, বিভিন্ন জেলায় ৭৩৪ জনকে গ্রেপ্তার ও আটক করিয়া কমিউনিষ্টদের চালুনি ছাঁকা, মোল্লাদের মুখ বন্ধ এবং ঐক্য-কামীদের শায়েস্তা করা হইতেছে। এজন্য ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞায় জনসাধারণের সভাসমিতি বন্ধ রাখা হইয়াছে, গুলীবর্ষণে নরহত্যা করা হইতেছে এবং অযথা অত্যধিক সামরিক দাপটে সকলকে একসঙ্গে সন্ত্রস্ত রাখা হইতেছে। সেন্সার মারফতে সংবাদপত্রের সংবাদ চাপা দেওয়া হইতেছে, রেডিও, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও চিঠিপত্র সম্পর্কে কড়া নজর রাখা

অলঙ্কারে শিল্প সৃষ্টি
......আধুনিকতার পরিচয়।
এই বৈশিষ্ট্যই প্রত্যেক নারীর
একান্ত কাম্য। আমাদের
প্রতিটি অলঙ্কার
শিল্প সৃষ্টির বৈচিত্র্যে
সমৃদ্ধ।
এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স
১৬৭/সি, ১৬৭/সি/১
বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
(আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও
বহুবাজার ষ্ট্রীট জংসন)
ফোন• ৩৪-১৭৬১•গ্রাম• ব্রিলিয়াণ্টস
ব্রাঞ্চ-হিন্দুস্থান মার্ট, বালীগঞ্জ
১৫৯।১বি রাসবিহারী এভেনিউ•পি. কে. ৪৪৬৬
প্রখ্যাত অলঙ্কার নির্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী

হইতেছে। সকলকে একসঙ্গে শত্রু মনে করিয়া একসঙ্গে সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া এই যে সর্বপ্রকার দমন ও মারণাস্ত্র প্রয়োগ করা হইতেছে, পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ কি কখনও ইহা ভুলিতে পারিবে বা দুষ্কৃতকারীদের কখনও মার্জনা করিবে? ক্রিয়া মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে, সুক্রিয়া হইলে তাহার ফল ভালো হয়, কুক্রিয়া কুকীর্তিকেই স্মরণীয় করিয়া রাখে। পূর্ববঙ্গে ইস্লামী শাসন যে দ্বিতীয় কীর্তিতেই অবিস্মরণীয় হইয়া রহিবে সে সম্পর্কে কি কাহারো সন্দেহ আছে?" —যুগান্তর।

ম্যালেরিয়া সপ্তাহ

"সর্ব্বত্র এবং বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের বিভিন্ন দল এবং সংগঠনেরও কর্ত্তব্য, পল্লীতে পল্লীতে জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি গঠন করিয়া অন্যান্য মহামারী সমেত ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর বিরুদ্ধে অভিযানে আত্মনিয়োগ করা। বিশেষতঃ যে সকল এলাকায় ম্যালেরিয়া-বিনাশক দলগুলি কাজ করিতেছে সেখানে উহাদের সহিত সহযোগিতা করা, যেখানে এই সকল দলের কাজ আরম্ভ হইতেছে না, সেখানে অবিলম্বে তাহা আরম্ভ করিবার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানো খুবই জরুরী।"

—স্বাধীনতা (কলিকাতা)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ডীনের স্বেচ্ছাচার

"ডাঃ সুবোধ মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল ফ্যাকাল্টির ডীন হইয়া যে সব কাজ আরম্ভ করিয়াছেন তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত হইতেছে না, ইহা আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছি। ডীন মহাশয় কোন নিয়মকানুন মানিতে চান না, সভায় খুসীমত উপস্থিত হন, দেরীতে আসিয়া আবার গোড়া হইতে কাজ আরম্ভ করান, যাকে খুসী পরীক্ষক নিয়োগ করেন ইত্যাদি অভিযোগ তাঁহার সম্বন্ধে হইতেছে। ফিজিওলজির পরীক্ষক নিয়োগে যাহা তিনি করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত আপত্তিজনক বলিয়া আমরা মনে করিয়াছি। ডাঃ ব্যানার্জি এম-বি-বি-এস, এম-এস-সি, ডি-এস-সি ছিলেন পরীক্ষক। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ঐ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। অধ্যাপক সেন এম-এস-সি তাঁহার সহকারী। ডাঃ সুবোধ মিত্র ডাঃ ব্যানার্জ্জির নাম পরীক্ষক-তালিকা হইতে কাটিয়া তৎস্থলে সেনের নাম বসাইয়া দেন। প্রধান অধ্যাপকের নাম কাটিয়া তৎস্থলে তাঁহারই সহকারীর নাম যিনি বসাইয়াছেন এবং যিনি এই ভাবে পরীক্ষক পদ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারও পক্ষে কাজটা উচিত হয় নাই। সেন ডাঃ সুবোধ মিত্রকে ডীন নির্ব্বাচনে ভোট দিয়াছিলেন, এই দৃষ্টিকটু পরীক্ষক-পরিবর্ত্তনের ইহাই কারণ, এই ধারণাই সকলের মনে জন্মিয়াছে। ব্যাপারটা ভাইস-চ্যান্সেলারের কানেও গিয়াছে। তিনি জানাইয়াছেন এ বৎসর আর কিছু করা সম্ভব নয়। দান এবং গ্রহণে যে অন্যায় এই দুই জন করিয়াছেন তাহার সংশোধনে তাঁহাদেরই অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল।" —যুগবাণী (কলিকাতা)।

মেদিনীপুর বিভাগের অপপ্রচেষ্টা

"ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বার বার দুই বার এই প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং দেশের শত্রু, মুষ্টিমেয় ব্যক্তি এই সম্পর্কে বৃথা আন্দোলনের প্রচেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু সেদিন মেদিনীপুরের মুকুটহীন রাজা বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন জীবিত। তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব, ক্ষুরধার যুক্তিজাল এবং অদম্য ও অনমনীয় দৃঢ়তা সকল প্রকার অপপ্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিয়াছিল। আজ সেই নরশ্রেষ্ঠ, সেই অনন্যসাধারণ সেনানী নাই—কিন্তু বীরেন্দ্রনাথের মেদিনীপুর আজও নিষ্প্রাণ, নিস্পন্দ অথবা নির্জীব নহে। বাতাসে এই অপপ্রচেষ্টার কথা শুনিবা মাত্র মেদিনীপুরের অন্তরাত্মা নড়িয়া উঠিয়াছে দলমত নির্বিশেষে। ৪০ লক্ষ মেদিনীপুরবাসীর সমবেত প্রতিষ্ঠান "মেদিনীপুর সম্মিলনী" তাঁহাদের ৮ম বার্ষিক সাধারণ সভায় সময়োচিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন কংগ্রেসী এম, এল, এ শ্রীযুত কৌস্তভ কান্তিকরণ, সমর্থন করিয়াছেন সমবেত সকলেই এবং প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে সর্ব্ববাদিসম্মত ভাবে। যাঁহারা যে কোন অছিলায় মেদিনীপুর বিভাগের স্বপ্নও দেখেন তাঁহারা আশা করি সময় মত সংযত হইবেন। নচেৎ তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে পরাধীন ভারতে মেদিনীপুরের যে ঐতিহ্য আছে স্বাধীন ভারতেও তাহার সেই ঐতিহ্য দেশের ডাকে কখনও ম্লান হইবে না।"

—মেদিনীপুর পত্রিকা।

নারী সম্মেলন

"হিন্দু সমাজকে ধ্বংস করিবার জন্য নেহেরু সরকার বদ্ধপরিকর হিন্দু কোড আইনে পরিণত করিয়া যত শীঘ্র এই সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় তাহার জন্য পার্লামেণ্টের কম্যুনিষ্ট ও কংগ্রেস সদস্যদের অনেকেই বদ্ধপরিকর। আর বাহিরে নারী-সংস্থা ও মহিলা-সংসদ এই সমাজকে ভাঙ্গিবার জন্য জেহাদ সুরু করিয়াছে। হিন্দু সমাজকে এই প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে দৃঢ় ভাবে দাঁড়াইতে হইবে। এই পথে না হইবে জাতীয় জীবনের উন্নতি, না হইবে নারীর মুক্তি। ইহা শুধু কদাচার ও ব্যভিচার বৃদ্ধি করিবে। বিবাহে পণপ্রথা এই মেয়েরা তুলিতে চায় কিন্তু পিতার সম্পত্তির অংশ দাবী করে। পুত্রের জন্য সম্পত্তি রাখিয়া কন্যাকে তাহার বিনিময়ে যৌতুক দেওয়ার ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত। যাহারা পণপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, তাহারা পিতার সম্পত্তি দাবী করে কোন্ যুক্তিতে? ভারতে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যাই ত বেশী, সুতরাং কন্যার সম্পত্তির অংশ দাবী সমগ্র নারী সমাজের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। সারদা আইন হইয়াছে সমাজ তবু মানে না। বিধবা বিবাহ আইন আছে তাহাও সমাজ গ্রহণ করে না। আজও বিশেষ বিবাহ আইনকে হিন্দু সমাজ অরুচির অভিব্যক্তি বলিয়াই মনে করে, সুতরাং এ দাবী না করাই ভাল। বাহিরে দিবারাত্রি বিক্ষোভ, ষ্ট্রাইক, লকআউট চলিতেছে, ঘরে যেটুকু শান্তি আছে তাহা নষ্ট করিয়া লাভ কয় জনের হইবে? হিন্দু নারীর সম্মুখে বিরাট প্রলোভন। ব্যাপক অগ্নি-পরীক্ষায় তাহাকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, ভারতীয় নারীর মর্য্যাদা ও গৌরব রক্ষা করিতে হইবে।" —বীরভূম-বাণী।

ভেজালে ভেজাল

"কলিকাতা ও বোম্বাই সব স্থানেই খাদ্যে, ঔষধে, পথ্যে এবং পানীয়ে ভেজাল ধরার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা

কর্পোরেশনের দুর্নীতি দমন বিভাগ ও এনফোর্সমেন্ট বিভাগের পুলিশ নানা স্থানে হানা দিয়া ভেজাল মিশানো খাবার, ঔষধ, বার্লি, প্রভৃতি আটক করিয়া গুদামে তালা বন্ধ ও মালিকের মধ্যে কতকগুলি মহাত্মাকে গ্রেপ্তারও করিয়াছে। এ বিষয়ে সুবিধার জন্য কর্পোরেশনের মেয়র মহোদয় আরও অধিক ক্ষমতা পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আমরা কিন্তু ভয় করি powerকে আর পাওয়ার অর্থাৎ এই ব্যাপারে দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী লোকের দাঁও মারিয়া কিছু মোটা অর্থ পাওয়ার সুযোগকে। আজকাল অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্মান বজায় রাখিয়া তাহাদের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করা হয় না। যখন বিচারের আগে আসামীকে হাতে হাতকড়ি কোমরে দড়ি দিয়া চালান দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, তখন ৪ জন অবাঙ্গালীকে ধরা হইয়াছে বলিয়া তাহাদের নাম গোপন রাখার রেওয়াজ উঠিয়াছে। এই খাতির করা দেখিলেও ভয় হয়। বিষ খাওয়াইয়া মারিবার বা ভেজাল ঔষধ দিয়া রোগী হত্যার দায়ে ফেলিয়া "নিয়ারেষ্ট লাইট পোষ্টে" ফাঁসী দেওয়া হইতেছে ইহা দেখার জন্য লোক এখন খুব উৎসুক।"

—জঙ্গীপুর সংবাদ।

দ্রব্যমূল্য

"নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য, বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থায় আসে নাই। বাঙ্গালা দেশের প্রধান খাদ্যদ্রব্য চাউল। আমাদের এই জেলায় এবং পশ্চিম বঙ্গের বহু জেলায় চাউলের দর সাধারণ মানুষের ক্রয়শক্তির মধ্যে নাই। ইহার জন্য সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থায় মাগগী ভাতার জের এখনও পূর্ণোদমে চলিয়াছে। দ্রব্যাদির যে মূল্য তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া যাহাতে চলা যায় তজ্জন্যই এই মাগগী ভাতার প্রবর্ত্তন এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায় আমাদের দেশে বৃটিশরাজ এই মাগগী ভাতার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছে। অবস্থাগতিকে এই মাগগী ভাতা আমাদের দেশে চাকুরী-জীবনে অটুট হইয়া আছে। না হইয়া উপায় নাই, কারণ দ্রব্যাদির মূল্য বিশেষ করিয়া খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থার ধারে-কাছেও আসিতে পারিতেছে না। মূল্য যুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থায় আসা বর্ত্তমান ব্যবস্থায় সম্ভবপরও নহে। অনেকে বলেন যে দেশের প্রধান খাদ্য-শস্যের মূল্য যুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থায় আসিলে দেশের সর্ব্বনাশ অর্থাৎ একটা অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় দেখা দিবে। ধান্যের মূল্য কমিলে দেশের কৃষককুল ধ্বংস হইয়া যাইবে। আমরা এই মত সমর্থন করি না। যাঁহারা কৃষি-ব্যবস্থার খোঁজ রাখেন তাঁহারা জানেন যে খাদ্য-শস্যের চড়া বাজারের সুযোগ আমাদের দেশের শতকরা ৮০ জন কৃষক পায় না ও পাইতে পারে না।" —ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি

"যেদিন স্বাধীনতা-সংগ্রামে ক্লান্ত ক্ষমতালোভী কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ, বিনা রক্তপাতে অহিংস স্বাধীনতা লাভের মোহে বাংলা মায়ের অঙ্গচ্ছেদে সম্মতি দান করিলেন, সেদিনই ভারতের স্বাধীনতা হয়তো লাভ হইয়াছে, কিন্তু বাঙালী জাতির উপর যে একটা নির্ম্মম শেল বর্ষণ করা হইল তাহাও অনস্বীকার্য্য। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাংলার বৃহত্তর অংশ পাকিস্থান হইয়া গেল। বাঙালী মুসলমান, আপনাকে প্রথমে মুসলমান, পরে বাঙালী বলিয়া ভাবিতে শিখিল। পূর্ব্ববঙ্গের অভাগা বাঙালী হিন্দু, শুধু ধর্ম্মের জন্যই পাকিস্থানের নিকট অবাঞ্ছিত নাগরিক বা শত্রু বলিয়া বিবেচিত হইল। তাহার পর পূর্ব্ব-পাকিস্থানের বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়, তাহাদের প্রতিবেশী বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধনে কি করিতে শিখিল বা করিল, সে কথা ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পাতায় কোন্ অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে তাহা জানি না। কিন্তু তবুও বাঙালী জাতির একটা ম্রিয়মান বৈশিষ্ট্যের স্রোত শুধু মাত্র ভাষার মাধ্যমে এই যুযুৎসু র‍্যাডক্লিপ-বিভক্ত ধর্ম্মান্ধ প্রতিবেশী বাঙালী জাতির ধমনীতে অতি গুপ্ত ভাবে প্রবাহিত হইতেছিল। আজ বর্ত্তমান পূর্ব্ব-পাকিস্থানের নাটকীয় রূপান্তরের মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু বাঙালীর সেই অবিনশ্বর জীবনী-শক্তিরই পরিচয় পাই। রবীন্দ্র, শরৎ, নজরুলের বঙ্গভাষা রাষ্ট্রভাষা না হইলেও বাঙালীর কোন ক্ষতি নাই, কারণ বঙ্গভাষা আজ বিশ্বের দরবারে একটা জীবন্ত প্রাণবন্ত ভাষা। উদ্বাস্তু-কল্যাণে কবন্ধ পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক, সামাজিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দাবীর ফল যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহা একমাত্র জগদীশ্বরই জানেন। খণ্ডিত বঙ্গের শাসন-পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতির উন্নতি বিধানের জন্য বৈদেশিক সাহায্য বা নানাবিধ বিভ্রান্তিকর বা উদ্ভট পরিকল্পনারও সৃষ্টি হইতেছে। জমিদারী ও জোতদার উচ্ছেদ করিয়া মধ্যবিত্ত সমাজকে পঙ্গু করিবার চেষ্টা হইতেছে। বাংলার বেকার দিন দিন বৃদ্ধির দিকে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বাঙালী নাকি অবাঞ্ছিত জাতি। অথচ একদিন এই জাতির গৌরবেই সারা ভারত গৌরবান্বিত ছিল। কিন্তু যাঁহারা মনে করেন আঘাতের পর আঘাত হানিলেই এই জাতির ধ্বংস সাধন হইবে তাঁহারা হয় এ জাতির ইতিহাস পড়েন নাই বা এ জাতির বৈশিষ্ট্যের কথা আদৌ চিন্তা করেন নাই। ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ষ্টীম রোলারে সব প্রদেশকে এক Level-ভুক্ত করা সম্ভব হইলেও এই কিম্ভূতকিমাকার দুর্গত, অসহায়, রক্তবীজের বংশটাকে এক পর্য্যায়ে ফেলা সম্ভব হইবে না। বাঘের সঙ্গে যাহারা যুদ্ধ করে তাহারা দুর্ব্বল বলিয়া প্রতিভাত হইলেও অসীম জীবনী-শক্তির ধারক ও বাহক।" —রাঢ়দীপিকা (রামপুরহাট)।

মূক-বধিরদের বাঁচাও

"সমগ্র পশ্চিম বাঙ্গলায় প্রায় বিশ হাজার মূক-বধির আছে অথচ ইহাদের শিক্ষার জন্য সারা পশ্চিম বাঙ্গলায় মাত্র তিনটি বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয় তিনটিতে ২৭৫ জন মূক-বধির শিক্ষা পাইতেছে। সংখ্যা দেখিয়া হতাশ হইবার কথা; কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, বিদ্যালয় ভবনে স্থানাভাব বশতঃ কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় আর কোন নূতন ছাত্র ভর্ত্তি করিতে পারিতেছেন না। এই পরিস্থিতিতে যদি সরকার বহরমপুর ও সিউড়ির বিদ্যালয় দুইটির সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে প্রতি বৎসর এই দুইটি বিদ্যালয় হইতে অন্ততঃ আরও ৫০টি করিয়া মূক-বধির ছাত্র শিক্ষা পাইয়া মানুষ হইতে পারে। প্রসঙ্গতঃ মুর্শিদাবাদ জেলা শাসক মহোদয় বহরমপুর মূক-বধির বিদ্যালয়টির বিষয়ে বিশেষ উৎসাহশীল। এই আগ্রহে তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ের

উন্নতির জন্ত অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন ও যাহার ফলে সরকারও এই বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। বহরমপুর অরফ্যানেজের সংলগ্ন জমিতে এই বিদ্যালয় ও আবাসিক ভবন নির্ম্মাণের পরিকল্পনাও প্রায় দুই বৎসর হইতে হইয়া আছে। কিন্তু তাহার বেশী অগ্রসর আজও হয় নাই কেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। কাজেই আমরা সহৃদয় জেলা শাসক মহোদয়কে এইরূপ একটি মঙ্গলজনক কার্য্য যাহাতে অতি শীঘ্র সম্পূর্ণ হয় তাহার জন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছি।"

—মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।

ভূমিহীনকে ভূমি দাও

"গোয়ালপাড়া জেলার মাত্র লক্ষ্মীপুর ও দক্ষিণ শালমারা থানায় নদীভঙ্গ বা অন্তান্ত প্রাকৃতিক কারণে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা অন্যূন দশ হাজার। ইহাদের মধ্যে কেহ একেবারেই নিঃস্ব, কেহ ৪।৫ বিঘা ভূমির মালিক আর অতি অল্পসংখ্যক লোক ২০।২১ বিঘা ভূমির মালিক হইবে। এই দুই থানায়ই আবার লক্ষ্মীপুর কোর্ট অব ওয়ার্ডস এষ্টেটের অধীনে অন্ততঃ পক্ষে ২০,০০০ বিঘা ভূমি রিজার্ভ নামে পতিত হইয়া আছে। সুশৃঙ্খল ভাবে যদি আন্তরিকতা লইয়া সরকার এই পতিত ভূমি অংশতঃ হইলেও নিঃস্ব বা স্বল্পভূম্যধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করিতেন, তাহা হইলে একটা বিরাট সমস্যার সমাধান হইতে পারিত। তাহা না হওয়ায় এক দিকে জমিদারী কর্তৃপক্ষ ও কর্ম্মচারী নানারূপে গরীব কৃষকদিগকে শোষণ করিতেছে, ঘুষ দিতে অক্ষমেরা ভূমি পাইতেছে না, এবং অন্তে ভূমি পাইলে চঞ্চল হইয়া যাইয়া জমিতে বসিয়া পড়িতে চাহিতেছে আর জমিদারী কর্তৃপক্ষ পুলিশের সহযোগিতায় আবার তাহাদিগকে অত্যাচারের মুখে ফেলিতেছে। জেলার কর্তৃপক্ষ এখনও নিশ্চিন্ত, মন্ত্রীরাও নীরবে বসিয়া আছেন। সাম্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকতার বিরোধ জীয়াইয়া রাখিয়া বা পুলিশের সাহায্যে ক্ষুধিত জনতার দাবীকে বেশী দিন দাবাইয়া রাখা চলে না। সময় থাকিতে সরকার সাবধান হউন।"—বাতায়ন (ধুবড়ী, আসাম)।

বসুমতী সংস্কৃতি সঙ্ঘের নববর্ষ উৎসব

গত ১১ই বৈশাখ বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে বসুমতী সংস্কৃতি সঙ্ঘের নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনে সভাপতি শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও সঙ্ঘের সহ-সভাপতি শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক কর্ম্মীদের অদম্য উৎসাহ ও সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ সার্থকতা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। কণ্ঠ-সঙ্গীত, হাস্যকৌতুক, গীতিনাট্য ও নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ হয়। কণ্ঠসঙ্গীতে শ্রীদ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোরাচাঁদ ঘোষাল, শ্রীপরেশ দেব, শ্রীসত্যগোপাল দেব, শ্রীসৌমেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীপৃথ্বীশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকার্ত্তিক দাস, শ্রীনিত্যধন চক্রবর্ত্তী, হাস্যকৌতুকে শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীজহর রায়, নৃত্যানুষ্ঠানে নৃত্যবিদ্ শ্রীনীরেন্দ্রনাথ সেনের সুযোগ্যা ছাত্রী রেবা দাস ও সন্ধ্যা চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি আরও অনেক শিল্পী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। সঙ্ঘের কোষাধ্যক্ষ শ্রীনির্ব্বাণীতোষ ঘটক ও সম্পাদক শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকী

বসুমতী সংস্কৃতি সঙ্ঘের উদ্যোগে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে বসুমতীর স্বত্বাধিকারী কর্ম্মযোগী সতীশচন্দ্রের দশম মৃত্যুবার্ষিকী বসুমতী-সম্পাদক শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের পৌরোহিত্যে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। সতীশচন্দ্রের একমাত্র পুত্র স্বর্গত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা কুমারী উৎপলা সভাপতিকে

মাল্যভূষিত করেন। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর স্বর্গগত কর্ম্মবীরের কর্ম্মকুশলতা, সাহিত্য-প্রচারে অনবদ্য অবদান ও তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ, এবং বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের অন্যান্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মীগণ এই সভায় পরলোকগত সতীশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। এই সভায় বসুমতীর বহু পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা ও পাঠক উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থলে সতীশচন্দ্রের একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করিয়া রাখা হয়।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মিলন

—অরবিন্দ দত্ত অঙ্কিত

প্রকৃতি ও যন্ত্র

—সুভো ঠাকুর অঙ্কিত

প্রথম খণ্ড] সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত [তৃতীয় সংখ্যা

(স্থাপিত ১৩২৯)

কথামৃত

আষাঢ়, ১৩৭১ [৩৩শ বর্ষ
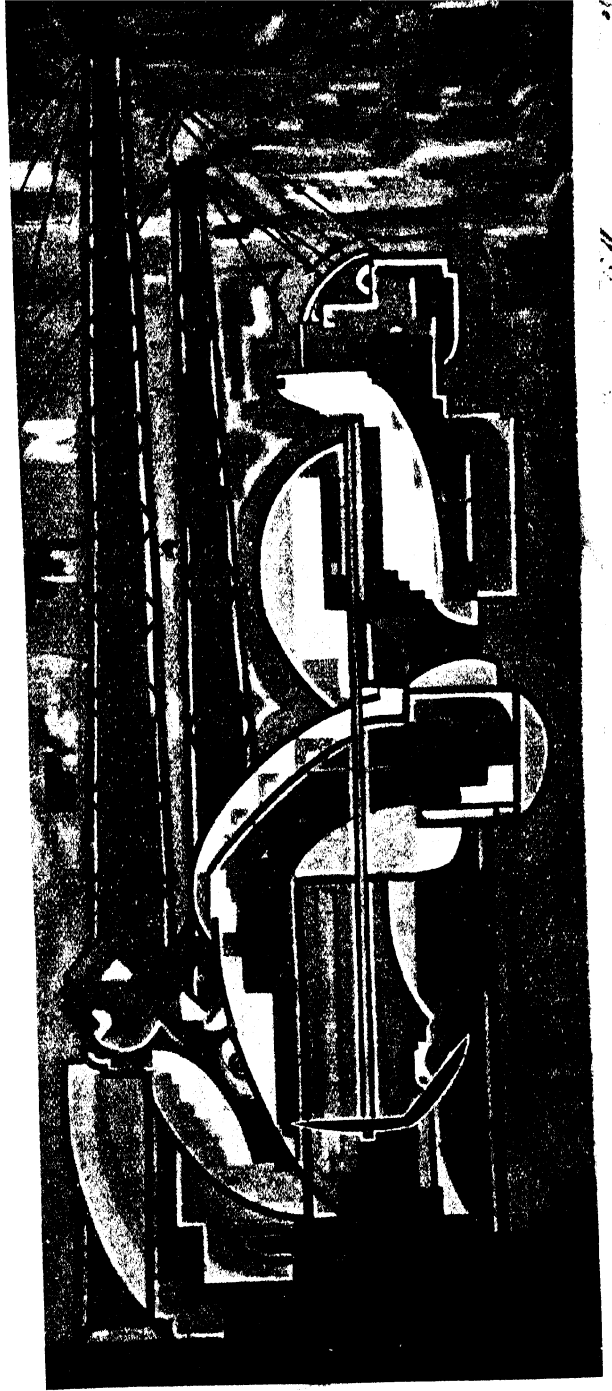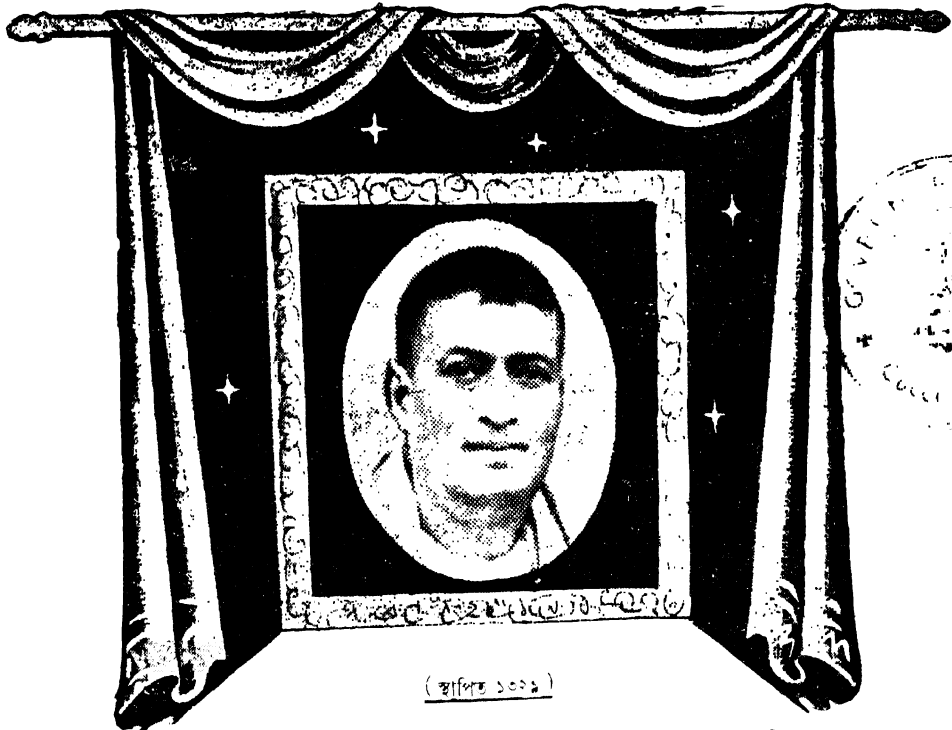
তোতাপুরী। তুমি বেদান্ত সাধনা করবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কথা আমি জানি না।

তোতাপুরী। তুমি সাধনা করবে কি না তুমি জান না, তবে কে জানে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার মা জানেন। মাকে জিজ্ঞাসা করে তোমাকে বলতে পারি।

(মা শব্দে তোতা বুঝলেন গর্ভধারিণী।)

তোতাপুরী। আচ্ছা, তোমার মাকে জিজ্ঞাসা কর গে। কিন্তু বেশী দেরী না হয়, আমি শীঘ্রই চলে যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ শ্রীভবতারিণীর মন্দির-অভিমুখে গমন করলেন। তোতার নয়ন তাঁকে অনুসরণ করে। সত্যই কি তবে মার কাছে যায় ? কিন্তু যেদিকে মন্দির সেদিকে কেন ? তোতা ধীরে ধীরে পঞ্চবটীমূলে আসন পাতেন এবং ধুনি জ্বালেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অনতিপরে এসে জানালেন যে মাতৃ-আদেশ পাওয়া গেছে।

তোতাপুরী। বেশ হয়েছে, আগামী শুভদিনেই তোমাকে দীক্ষা দিব।

ভৈরবী-ব্রাহ্মণী। বাবা, এই সব বৈদান্তিক সাধুদের শুষ্ক ভাব, তুমি ওদের সঙ্গে অত করে মিশ' না, তোমার প্রেম-ভক্তির ভাব নষ্ট হয়ে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তিত হ'লেন নিজ-জননী চন্দ্রাদেবী সম্বন্ধে। তাঁর শোকজীর্ণ হৃদয় ; একমাত্র অবলম্বন শ্রীরামকৃষ্ণকে দণ্ডী বেশে দেখে মাতা নিদারুণ ব্যথা পাবেন। তোতা শ্রীরামকৃষ্ণকে যথারীতি সন্ন্যাস বেশ ধারণের কথা বলায়—

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি গোপনে ঐ সকল আচার পালন করা চলে, তা হলে করতে পারি। প্রকাশ্য ভাবে ঐ সকল ধারণ করে মার মনে ব্যথা দিতে পারব না। প্রকাশ্য ভাবে করা কি বিশেষ আবশ্যক ?

তোতাপুরী। কুছ্ জরুরৎ নেই। আমি তোমায় গোপনেই দীক্ষা দিব।

অতঃপর সেই শুভদিন। পঞ্চবটী-সন্নিকটে সাধন-কুটীরে শিষ্য সহ তোতা হোমাদিপূত অনুষ্ঠানসমূহ সম্পন্ন করে ব্রহ্মজ্ঞান-পিপাসু সাধককে স্থিরচিত্তে ও নির্বিকল্প মনে আত্মধ্যানে ডুবে থাকতে উপদেশ দেন। কিন্তু বারে বারে সেই শ্রীশ্রীজগদম্বার চিন্ময়ী মূর্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মন কিছুতেই নির্বিকল্প হ'ল না, আমি পারলাম না।

তোতাপুরী। (ভীষণ উত্তেজিত হয়ে) কেঁও! হোগা নেই ? কথার শেষে কুটির অভ্যন্তর থেকে এক টুকরো ভাঙা কাচ এনে কাচের সূচলো অগ্রভাগ শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রূ-সন্ধিস্থলে সজোরে বিঁধে দিলেন এবং বললেন, ইঁহা মন ধরো।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'তখন জ্ঞানকে অসি কল্পনা করে সেই মূর্তি দুখানা করে কেটে ফেললাম।'

বাঙালী হিন্দুর

[বাঙালী হিন্দুর উপাধির দুটি অসম্পূর্ণ তালিকা দুই সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে পাঠক-পাঠিকা অবশ্যই পাঠ করেছেন। কিন্তু উক্ত দুই তালিকাতেও বাঙালী হিন্দুর উপাধি সম্পূর্ণ হয়নি, যেজন্য বসুমতীর বহু শুভানুধ্যায়ী পাঠক-পাঠিকা তালিকাটি সম্পূর্ণকরণের জন্য আরও অসংখ্য উপাধির নাম পাঠিয়েছেন। বর্ত্তমান সংখ্যায় আমাদের উপাধির তৃতীয় তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যাতেই তালিকার শেষ হবে কি না জানি না। ধারণা হয়, প্রত্যেক বাঙালী হিন্দুর উপাধি মাসিক বসুমতীতে একে একে প্রকাশিত হয়েছে। যদি কোন উপাধি অপ্রকাশিত থাকে আমাদের জানাতে অনুরোধ করি। তালিকার শেষে তালিকা প্রস্তুতের সাহায্যকারীদের নাম-ঠিকানা মুদ্রিত হয়েছে।—স]

অক্রুর, অগ্রদানী, অজা, অট্ট, অধর্ষ, অধিকার, অধৈর্য, অপমন, অবধূত, অরোরা, অর্জুন, অলঙ্কার।

আঁই, আঁকুড়ে, আইকট, আইচ বর্ম্মণ, আইন, আউলিয়া, আওন, আয়ন্, আয়ন দত্ত, আচার্য চৌধুরী, আগড়, আগার, আঢ্য রায়, আড়ু, আতর, আস্তার, আস্তাড়ী, আদা, আগু, আবিদকারি, আমানি, আমুলি আয়কত্ত, আয়ান, আরুষ, আরোবু, আরোস্থি, আশক, আস, আহির, আচার, আদিগিরি।

ইন্দু

ঈশর, ঈশান, ঈশোর

উঁজ, উপলা, উপাধ্যায়, উল্লুক

ঋতু, ঋত্বিক

এস্, এল

ওর, ওস্তাগর

কড়ুয়া, কড়াদিগর, কড়াই, কড়ার, কড়ুরী, কথক, কনুই, কন্দলী, কবন্ধ, কবি, কবিরাজ, কয়রাল, কয়োদী, কর-গুপ্ত, করঞ্জ, করঞ্জাই, করঞ্জাম, কর-চৌধুরী, করণ, কর-শর্মা, কর-মহাপাত্র, কর রায়, কর্ণানি, কল, কলা, কলামুড়ী, কলি, কলিয়া, কল্যা, কল্যে, কাঁজি, কাঁড়ার, কাঁড়াল, কাইরি, কাইতি, কাউর, কাওড়ী, কাওরা, কাকে, কাকুতি, কাঙার, কাজলী, কাজী, কাজ্জি, কাঞ্চন, কাঞ্চি, কাঠা, কাঠাম, কাঠুরিয়া, কাণ্ডার, কাণ্ডারী, কানুনগো, কাপড়ী, কাপাসিয়া, কাবড়ি, কাবাসী, কাবেরী, কামট, কামিলা, কায়পুত্র, কারক, কারকুন, কারপুন, কারা, কাত্তিক, কার্থি, কালিন্দি, কাশ্যপ, কাশ্যাপি, কাহার, কায়স্থ, কিশোরী, কিস্কু, কুঁতি, কুঁইতি, কুইরী, কুইলা, কুইল্যা, কুড়মী, কুণ্ড, কুণ্ডা, কুণ্ডু চৌধুরী, কুণ্ডু রায়, কুড়ার, কুনুই, কুমীর, কুরী, কুর্মি, কুল, কুলীন, কুলুপী, কুশারী, কুস, কেঁদালী কেওট, কেওড়া, কেঠো, কেবি, কেরালা, কেরী, কৈবল্য, কোঁচ, কোঙা, কোঙার, কোটাল, কোণার, কোদাল, কোয়ারী, কোমর, কোলে, কোলাই, কোহলি, কৌচ, কান্তগিরি, কাপ, কাপুড়িয়া, কারণ, কুঁকরি, ক্যামিল্যা।

খন্দকার, খয়রা, খর, খরুই, খাঙ্গি, খাঁ চ্যাটার্জি, খাওয়াস, খাজাঞ্চী, খাজাঞ্জী, খাটুয়া, খাটেরয়ারী, খাড়াইট, খাদার, খানসামা, খান্না, খামখাট, খামারী, খামরুই, খামারু, খালা, খাশী, খাসখেল, খিলা, খিড়কী, খুঁটিয়া, খুঁটে, খুটিয়া, খুটে, খুখু, খেড়ে, খেটেন, খোটন, খোড়, খোড়েল, খোদ্দার, খোয়ানা, খোশলা, খস্তাইত, খান চক্রবর্ত্তী খুরপাক, খাড়া।

গঁতাইত, গজ, গজেন্দ্র মহাপাত্র, গঙ্গাবাসী, গজদ্দার, গণেশ গড়িয়া, গণ্ডক, গণ্ডার, গরাই, গরাণি, গল, গলাই, গলুই, গাঁতাইৎ, গাঁতিদার, গাদি, গাড়া, গাড়ী, গাড়ী মজুমদার, গাঙ্গুলী, গাবুর, গাক, গুঁইয়া, গুঁই চৌধুরী, গুঁড়ি, গুছা, গুজ্যা, গুটি, গুড়িয়া, গুড়ে, গুণরাজ, গুপ্ত, গুপ্তভায়া, গুমট্যা, গুলি, গুহ, গুহ নিয়োগী, গুহ বর্দ্ধণ, গুহ রায় গুহ সরকার, গেঁড়ি, গেলগাই, গোঁ, গোড়ে, গোন্দল, গোণ্ডানী, গোনা, গোরক্ষী, গোল, গোলন্দাজ, গোলুই, গৌতম, গুপ্তরায়, গোমস্তা।

ঘড়া, ঘণ্টেশ্বরী, ঘর, ঘাঁটি, ঘাকুড়, ঘাটিয়া, ঘাটুয়া, ঘাটোয়াল, ঘুকু, ঘুঘু, ঘেঁরিয়া, ঘেড়ালী, ঘেসেরা, ঘেসেট, ঘোষ চৌধুরী, ঘোষ দস্তিদার, ঘোষ বর্ম্মা, ঘোষ মজুমদার, ঘোষ মৌলিক, ঘোষ যাদব, ঘোষ রায়, ঘোষ হাজরা, ঘোরালি, ঘোরেল, ঘোরুই।

চক্র, চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, চখণ্ডী, চাচুড়া, চট্টখণ্ডী, চট্টরাজ, চড়চড়ি, চড়ুই, চণ্ডাল, চণ্ড, চণ্ডী, চতুর্বেদী, চন্দ, চন্দর, চন্দুক, চম্পাটি, চরম, চরিত, চল, চাঁড়াল, চাউলা, চাউলি, চাউলিয়া, চাউলে, চাউল্যা, চাক, চাকলা, চাকলানবীশ, চাকড়া, চাঠাতি, চাপ, চাপড়াশী, চাবরী, চার্বাক, চালতা, চালাদার, চ্যাটার্জি, চাংড়ি, চিতি, চিনি, চিনে, চিন্নি, চৌনা, চুনিয়া, চুন্নরী, চুয়াল, চুড়ামণ, চৈনী, চেল, চেল-বাচিল, চেং, চেংড়ি, চোবে, চোদ্দার, চৌলি, চৌরশী, চৌরাশী, চাউনরে, চালিহা।

ছত্রপতি, ছত্রী, ছন্দা, ছাটলে, ছাটুই, ছাতক, ছাতাওয়ালা, ছান, ছাতাপরা, ছুতার, ছুড়িদার।

জজ, জদ্দার, জমাদার, জয়, জবা, জলকর, জাল, জালান জালুয়া, জাম্বু, জিং, জুতি, জেঠী, জেটি, জোন, জোলা, জোয়াদ্দার জেল।

ঝরিয়া, ঝাঁপ, ঝাড়ুদার, ঝুমকি, ঝুলকি।

টকাল, টস, টাঁট, টাকী, টাট, ট্যাংরা, টিনডেল, টীটা, টুং, টোলা টেগোর, টাপনি।

ঠ্যাটা, ঠিকাদার, ঠোকদার।

ডগর, ডাকাতি, ডাকুয়া, ডাঙানী, ডাষ, ডাং, ডিঙ্গাল, ডিঙ্গা, ডিহিদার, ডুগার, ডোগরা, ডোন, ডোল।

ঢাক, ঢালা, ঢ্যাড়, ঢ্যাঁপ, ঢ্যাপ্সা, ঢুক, ঢুল, ঢুলি।

উপাধি কত?
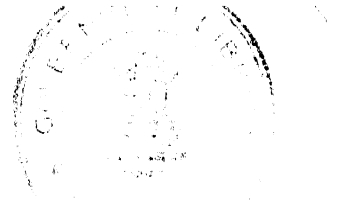
তক্ষক, তক্তা, তন্তুবায়, তন্ত্র, তপাদার, তরাত, তরুয়া, তলুই, তাতি, তা, তাপানী, তাফিলদার, তাড়া, তাড়েকা, তান্ত্রিক, তাসদি, তারণ, তারুই, তামলি, তাস, তিওড়, তিয়াড়ী, ত্রিদিব, তুঙ্গ, তুং, তওয়ারী, তৈ, তোপদার, তোলা।

থানদার, থানাদার, থাম।

দক্ষি, দক্ষিণা, দণ্ডপাঠ, দত্ত গুপ্ত, দত্ত বণিক, দত্ত রায়, দত্ত শর্মা, দত্ত হাজরা, দয়াল, দরজা, দরবেশ, দরজি, দল, দস্তগীর, দাড়িয়ালী, দানিয়াড়ী, দাড়ি, দান, দাভাই, দামদে, দামা, দাস, দাশ চৌধুরী, দাস ঘোষ, দাস ঠাকুর, দাস বণিক, দাস কানুনগো, দাস চক্রবর্তী, দাশ শর্মা, দাস দেওয়ান, দাস বর্মণ, দাস মহাপাত্র, দাস মজুমদার, দাস রায়, দাস হাজরা, দাসড়ী, দাস্ত, দ্বারী, দিগ্‌পতি, দণ্ডপৎ, দস্তিদার, দাগ্‌চী, দিঘল, দিয়াপতি, দিস্তা, দিন্ডু, দিয়ালী, দিশমুখ, দ্বিজ, দীঘাল, দুয়া, দুয়ারী, দুর্লভ, দৃত, দেড়ে, দেউড়ি, দেউতি, দেউটি, দেওয়ানজী, দে-অর্ণব, দেহাবিয়া, দে-চৌধুরী, দে-দাস, দে-দেবভূতি, দে-বিশ্বাস, দে-ভৌমিক, দে-মোদক, দে-রায়কত, দে-সমাদ্দার, দেবগুপ্ত, দেবভৌমিক, দেবরায়, দেবরায় মহাশয়, দেব শর্মা, দেবাশী, দেশমুখ, দেশালী, দেহালদার, দেহেরী, দৈ, দৈত্যারি, দৈয়াশী, দোয়ারী, দৈবজ্ঞ, দেয়ালী, দেবসরকার।

ধঁক, ধনী, ধপধবে, ধমরাজ, ধবলাদেব, ধলে, ধস্ত, ধাউরিয়া, ধাওয়া, ধাড়ি, ধানী, ধাম, ধামালি, ধারা, ধীবর, ধুধুরিয়া, ধুনী, ধুরন্ধর, ধুল, ধোঁ, ধোঁয়া, ধর চৌধুরী, ধন্বন্তরী, ধুমাদ।

নট, নবলগোল, নস্কর, নাইয়া, নাগর, নাগ চৌধুরী, নাগেশ্বর, নাড়ু, নাথক, নাথনাথ, নাথ চৌধুরী, নাথ পুরকায়স্থ, নাথ বাগ্‌চী, নাথ ভট্টাচার্য, নাথ ভৌমিক, নাথ মহাজন, নাথ মজুমদার, নাথ লস্কর, নাদক, নানক, নাপিত, নামহাতা, নামাতা, নাবিক, নাগা, নাবিট, নায়ক, নায়ক শর্মা, নায়েক, নাহা রায়, ন্যাজ, ন্যাড়, নেউল, নেগেল, নেড়, নাচিকেতা, নন্দিমজুমদার, নামশর্মা।

পইত্য, পক্ষি, পচালী, পঞ্চ, পঞ্চাধ্যায়ী, পঞ্চায়েত, পট্টরাজ, পড়িং, পড়িয়া, পড়ুয়া, পড়্যা, পড়ালী, পণ্ডা, পত্তিনায়ক, পাম, পামরাজ, পয়াল, পরাগ, পরামাণিক, পরামান্য, পরীক্ষা, পর্বত, পলমল, পবন, পল্ল্যে, পাঁজি, পাঁরুই, পালি, পার্থ, পাড়াল, পাট্‌রা, পাটরাঙা, পাটলা, পাটি, পাঠা, পাণ্ডা, পাণ্ডে, পাতর, পাতিল, পাত্র, পাথর, পানিগ্রাহী, পাফড়ে, পারাল, পারিয়া, পারুক, পালই, পালুই, পাল চৌধুরী, পালাম, পালদেব, পিতুড়ী, পুত্রি, পুতলি, পুতাতুণ্ডা, পুরণরায়, পেঁকো, পৈত, পৈতী, পৈতন্ডী, পোঁছালী, পোঁড়া, পোটুলি, পোবি, পোলো, পেলান, প্রচণ্ড, প্রজাপতি, প্রতিহার, প্রমাদ, প্রসাদ, প্রহরি, প্রামাণ্য, পাণ্ডব, পাকড়ে, পাগল।

ফদিকার, ফাঁড়িয়া, ফুস্কি, ফুস্তী।

বংশী, বক্তি, বঙ্গবাস, বড়ুয়া, বণিক দত্ত, বণিক মজুমদার, বণিক্য, বণু, বয়া, বরাট, বর্ধণ, বর্মণ রায়, বর্মা, বনমুন্সী, বল্লম, বসন্ত, বসুবর্তী, বলীকাচক, বঙ্গবাসী, বস্তনীয়া, বসু নিয়োগী, বসু মজুমদার, বসু মল্লিক, বাঁক, বাঁকুড়া, বাঁটুল, বাঁড়ুরী, বাঁশ, বাইতি, বাউল, বাক, বাকলা, বাকশে, বাকুই, বাকুলি, বাগতি, বাগালে, বাঘা, বাচারী, বাছাল, বাজপেয়ী, বাজাল, বাজালী, বাজু, বাড়েরী, বাড়ী, বাবু, বাটাং, বাদক, বাদিয়া, বারাই, বারি, বারুজীবী, বাল্মিকী, বাশুলি, বাসর, বাস্তব, বাস্তু, বাহন, বেতাল, বিচালি, বিচিলি, বিজলী, বিধা, বিনা, বিবাড়, বিবাগী, বিশ্ববসু, বিশ্রী, বোছা, বোস ঘোষ, বুড়ুই, বেওয়া, বেজি, বৈদ্য, বেলেল, বেস্কারি, বৈতানিক, বৈদব, বৈলা, বৈশ, বৈরাগী, বৈরাগ্য, ব্যাস, ব্রহ্মা, ব্যবর্তা, ব্যবস্থা, বাসানি, বলাধিকারী, বসুচৌধুরী, বালমজুমদার, বালিয়া, ব্রহ্মচারী, বাগুই, বাগুলি।

ভকত, ভদ্র, ভট্টক, ভটক, ভটশীল, ভবন, ভরাডুবো, ভরালী, ভর্মা, ভল্ল, ভদে, ভাঙ্গী, ভালুক, ভিক্ষু, ভীম, ভীষণ, ভীষ্টাল, ভুঁই, ভুইচাল, ভুক্ত, ভুবিঙ্গা, ভূত, ভূতি, ভূপ, ভূমিক, ভূমিকা, ভূমিজ, ভূষণ, ভেউলি, ভোঁগ, ভোঁড়, ভোস।

মঘ, মঙ্গল, মঠ, মণ্ডলেশ্বর, মন্থনী, মধু, মণি, মন্ত্রণী, ময়রা, ময়ূর, মর্ম্ম, মর্দন, মর্দনা, মল্ল বর্মণ, মশা, মশাট, মহল, মশেল, মহাজনী, মহাদেব, মহাদানী, মহান্তি, মহিভ, মহুর, মহাবাণী, মহেশ, মাকড়, মহাবীর, মাকাল, মাগাল, মাটি, মাটিয়া, মাতা, মাতালী, মাদানী, মান, মানদার, মানা, মাণিক, মার্ভি, মালগ, মালহা, মালা, মাল্লোদাস, মাসচটক, মাসান্তি, মাহাতী, মাহালি, মাহারা, মাহান্তি, মাহিন্দার, মাহিলী, মিঠাই, মিল, মিরবহর, মিত্র মজুমদার, মিন্দার, মীর, মৃধা, মুক্তি, মুখলে, মুখটি, মুখশুদ্ধি, মুখার্জি, মুচকন্দ, মুচ্ছুদ্দি, মুড়ি, মুনিয়ান, মুহুরি মুটুক, মুটে, মুর্ম, মুশাহর, মুক্তা, মুহুরি, মৃল্যো, মেইকাল, মেউর, মেঘুর, মেট্যা, মেণ্ডু, মেটিয়া, মেড়া, মেদ্দা, মেথর, মেহরত্রী, মৈনান, মৈত্রী, মৈত্রেয়, মোড়ায়েদ, মোক্তার, মোত্তী, মোদ, মোহন, মোদক নাগ, মহলদার, মাহিত, মিত্রমুস্তফী, মুলাই, মাওই, মেদেশি, মেঘমালা।

যাজ্ঞিক, যাদব, যাজি, যাজ, যাশু, যোগী, যোশী।

রং, রংদার, রক্ষিত, রক্ষিত চৌধুরী, রক্ষিত রায়, রঞ্জিত, রজক দাস, রত্ন, রথ, রস্তান, রমণ্যা দাস, রাই, রাইকর, রাইল, রাউত, রাজক, রাজবংশী, রাজা, রাজেন, রাজোয়াড়, রাণ, রাণু, রাম, রাম শর্মা, রায়কত, রায় গোস্বামী, রায় গুপ্ত, রায় নস্কর, রায় বসুনীয়, রায় মণ্ডল, রায় মহাশয়, রায় শর্মা, রায় সরকার, রায় সিংহ, রাহা মহাশয়, রিশী, রুইয়া, রুখ, রুদ্র শর্মা, রুজ, রেজা, রোজ্যা, রোহিং, রাউতরায়, রাউন, রায়সরদার, রায়গুপ্ত, রায়দস্তিদার।

লস্কর, লাই, লাখোয়াল, লাটুয়া, লাড়ু, লামা, লাল, লালবেগী,

লাহিড়ী চৌধুরী, লারেন্স, লাহার, ল্যাজ, লুই, লেই, লেট, লেদারী, লেবু, লোধ, লোহার, লুটান্দা, লেড়।

শঙ্কট, শঙ্কর, শঙ্খ, শর, শর্মা রায়, শর্মণ সরকার, শর্মা সরকার, শল্য, শাক্তি, শান, শানদান, শানজী, শাণ্ডিল্য, শান্ত, শাবুদ, শাল, শালুই, শাসমণ্ডল, শাহ, শাহ বনিক, শাহ বণিক শঙ্খনিধি, শ্যামরায়, শ্যামল, শিকদার, শিকলী, শিবদাস, শিলক, শিয়ালি, শীলা, শুয়ালি, শ্রেষ্ঠী, শুক্লবৈদ্য, শুক্লদাস, শেঠ, শের, শৃঙ্গারী, শৈব, শরী, শর্মাভট্ট।

ষণ্ড, ষাঁড়।

সওয়ার, সচদেব, সকুর, সঙ্গ, সজ্জাক, সড়েস, সত্রবিশারদ, সনবিল্ল, সনাতনী, সদাশ্রয়ী, সন্তান, সমশ্রণী, সমন্ধ, সমাজদার, সমুদ্র, সন্ন্যাসী, সয়া, সর্ক, সর্গর, সাঁই, সাঁকরেল, সাঁজোয়াল, সাঁতরা, সাইদেব, সন্দেশ, সাইনী, সাউটে, সাকুই, সাগর, সাতে, সাথী, সান্ত, সাধ্য, সাণ্ডেল, সাদুর্যা, সান্কি, সানা, সানাই, সান্না, সান্দকী, সাপুই, সামরাই, সামধ্যায়ী, সামন্দেশ, সামান্ত, সারেঙ্গী, সারেস, সালুই, সাবোমা, সার্বভৌম, সাহাই, সাহস রায়, সাহা রায়, সাহা বণিক, স্থানপতি, স্যাকরা, সিংটোল, সিংহ ঠাকুর, সিংহ বাবু, সিংহ রায়, সিংহ রায় চৌধুরী, সিংহ সরকার, সিংহী, সিন্হা, সিট, সিন্ধা, সিনা, সিদ্ধেশ্বর, স্থির, সু, সা, সুদর্শন, সুনন্দ, সুমণ্ডল, সুররায় সুরাল, সুকুল, সুশীল, সুপকার, সুবী, সেন চৌধুরী, সেন বর্মণ, সেন রায়, সেন শর্মা, সেনী, সেহানবীশ, সেক্সান, সেহারা, সৈনিক, সোঁ, সোঁদার, সোম চৌধুরী, সৌমণ্ডল, স্বর্ণকর, সেরেস্তাদার, সোনা, সানি, সামন্ত, স্বামী, সেতুয়া, সাল।

হড়, হড় চৌধুরী, হরকরা, হর চৌধুরী, হরবাগ, হবি, হর্ষ, হলদার, হস্তা, হাঁড়ি, হাঁদাল, হাঁস, হাঁসদা, হাউই, হাউনি, হাকিম, হাজরা, হাজরা চৌধুরী, হাজারিকা, হাটি, হাটুই, হাটুয়া, হাড়ি, হাবড়, হাবির, হার, হালি, হালুইকর, হালুয়াই, হাসি, হুঁতাইৎ, হুই, হুই মজুমদার, হুজুমদার, হুহাইত, হুড়ক, হুতুং, হৈস, হেলেন, হেলে, হেলাকাটা, হেবরম, হেশ, হোকার, হোজ, হোদাল, হোম, হোম রায়, হংস, হানিস, হালদা।

(১) শ্রীনিমাইচন্দ্র কর, ওল্ড ভাজিমণ্ডী, কামতি। (২) শ্রীঅরবিন্দ ঘোষাল, এম-এ, এল-এল-বি, ৩৪ মধুসূদন বিশ্বাস লেন, হাওড়া। (৩) শ্রীরসিকচন্দ্র মল্ল, পোঃ সিন্দ্রী, মানভূম। (৪) শ্রীনলিনীভূষণ ঘোষ, ৪৮।২৭এ সাউথ সিঁথি রোড, কলিকাতা-২। (৫) শ্রীখগেন্দ্রনাথ সামন্ত, বাণেশ্বরপুর, পোঃ গুজারপুর, হাওড়া। (৬) শ্রীফকিরচন্দ্র মণ্ডল, কামারমুড়ী, পোঃ গোদাপিয়াসাল, মেদিনীপুর। (৭) শ্রীকালীকৃষ্ণ হাজরা, বড়বড়িয়া, মেদিনীপুর। (৮) শ্রীনীরেন্দ্রনাথ কানুনগো, এগ্রা, মেদিনীপুর। (৯) চতুর্ভুজ, কুঁতিবাড়ী, ৪৪৬ সার্কুলার রোড, হাওড়া। (১০) শ্রীপ্রসাদচন্দ্র রায়, ২১ নস্করপাড়া বাই লেন, সাঁতরাগাছি, হাওড়া। (১১) শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, এম-এ, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ। (১২) শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সিংহ, চুরালি, পূর্ণিয়া। (১৩) শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, ৪১।১০সি হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২১। (১৪) অভিরাম মৈত্র, বি-এ, শেওড়াফুলি, হুগলী। (১৫) শ্রীসরোজেন্দু সরকার, গেলারী, পালামৌ। (১৬) কুমারী মায়ারাণী পাল, গোকুলপুর, মেদিনীপুর। (১৭) শ্রীবিজয় সেন, ১৫৬ গণ্ডক রোড, জামসেদপুর। (১৮) শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আগড়পাড়া, ইলিয়াস রোড। (১৯) মিত্রা নাগ, অম্বিকাপটি, শিলচর, আসাম। (২০) শ্রীমৃণালকান্তি দেব, (২১) শ্রীসুহাসকুমার সান্যাল, (২২) শ্রীসুবীরকুমার সান্যাল, ১৫৫বি আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৩। (২৩) শ্রীঅনিলবরণ মণ্ডল, শ্রীধরকাটি, ২৪-পরগনা। (২৪) শ্রীপ্রবোধকুমার দত্তগুপ্ত, অ্যাসিঃ সার্জেন, ইষ্টার্ণ রেলওয়ে, মুঙ্গের। (২৫) শ্রীমনীন্দ্রনাথ মিত্র, বড়বিল, কেওনঝড়, উড়িষ্যা। (২৬) শ্রীবৈদ্যনাথ মৈত্র, পাট্রাতু, হাজারিবাগ। (২৭) শ্রীকেশবচন্দ্র দাশ, জোড়পাকড়ী, জলপাইগুড়ি। (২৮) শ্রীঅমূল্যকুমার দাস, পোঃ রূপহি, নগাঁও, আসাম। (২৯) শ্রীশিবনারায়ণ ঘোষ, পোঃ কোর্ট ষ্টার, হাওড়া। (৩০) আরতিবাণী দাঁ, (৩১) পদ্মরাণী দাঁ, (৩২) অভয়ারাণী দাঁ, ৪২ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। (৩৩) শ্রীমতী তৃপ্তি মজুমদার, কুচবিহার। (৩৪) শ্রীসুধীরচন্দ্র আদিত্যচৌধুরী, ১১এ আনন্দ পালিত রোড, কলিকাতা-১৪। (৩৫) শীলা ভট্টাচার্য, ১ নবকুমার নন্দী বাই লেন, হাওড়া। (৩৬) শ্রীমৃণালকান্তি চক্রবর্ত্তী, ৮২।২এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (৩৭) শ্রীরাধাবিনোদ সুবাল, ব্রাউন হোষ্টেল, বাঁকুড়া কলেজ, বাঁকুড়া। (৩৮) শ্রীসুশীলকুমার সামন্ত, চাইবাসা। (৩৯) শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ, ধাদকিডি, জামসেদপুর। (৪০) শ্রীঅম্বিকাচরণ নায়ক শর্মা, গঙ্গাজলঘাটি, বাঁকুড়া। (৪১) শ্রীশ্যামাপদ রায়, ক্ষীরগ্রাম, বর্দ্ধমান। (৪২) শ্রীজ্যোতির্ময় মৈত্র, ২৭১ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু, কলিকাতা-৬। (৪৩) ডাঃ পঙ্কজবিহারী ভট্টাচার্য, ১০৫।৩ উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা-৪। (৪৪) শ্রীঅরুণকুমার সরকার, রেলওয়ে কোয়ার্টার, ১০২।৬ই গার্ডেন রীচ, কলিকাতা-২৩। (৪৫) শ্রীনকুলচন্দ্র ভৌমিক, ৪।১ ছাতুবাবু লেন, কলিকাতা-১৪। (৪৬) শ্রীকুমুদ হালদার, শিলিগুড়ি। (৪৭) শ্রীপার্থসারথি রায়, কালার্চাঁদ লাইব্রেরী, চিল্কিগড়, মেদিনীপুর। (৪৮) শ্রীসরোজকুমার দাস, পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর। (৪৯) শ্রীউমাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, হাটখোলা, চন্দননগর। (৫০) শ্রীভাস্করভূষণ ঘোষ, ৫১ ধাদকিডি, জামসেদপুর। (৫১) শ্রীরঞ্জিত রায়, ৭৪ কালীঘাট রোড, কলিকাতা-২৬। (৫২) শ্রীগোপাল প্রতিহার, জিগাছা, সাঁতরাগাছি, হাওড়া। (৫৩) শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ডাক্তারস্ লজ, দেওঘর। (৫৪) শ্রীবিনয়কুমার বাগচী, ৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। (৫৫) শ্রীঅরুণকুমার দাশগুপ্ত, শিয়ালদহ হাউস, ১৩৫ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪। (৫৬) শ্রীকান্তিকুমার মৈত্র, বড়জুলি চা-বাগান, দরং, আসাম। (৫৭) শ্রীবিন্দুপ্রকাশ পাল, কৃষ্ণনগর, কাঁথি, মেদিনীপুর। (৫৮) শ্রীমহাবীর নন্দী, বেঙ্গল লজ, গান্ধীনগর, ধানবাদ। (৫৯) শ্রীযতীন্দ্রনাথ বেরা, বি-এস, আরামবাগ, হুগলী। (৬০) শ্রীআর্যকুমার দাশ, পোঃ ও গ্রাম—কল্যাণচক, মেদিনীপুর। (৬১) শ্রীনীরদকান্তি ঘোষ, সিদ্ধিনাথ চ্যাটার্জি রোড, বেহালা। (৬২) শ্রীমুকুললাল কর্মকার, ৩।২৪ ফতেপুর ফার্ষ্ট লেন, গার্ডেন রীচ, কলিকাতা-২৪। (৬৩) শ্রীঅরুণকুমার রায়, ৮ চিন্তামণি দে রোড, হাওড়া। (৬৪) শ্রীস্মৃতিময় দে, শ্রীরামকৃষ্ণ কলোনী, কাঁচড়াপাড়া। (৬৫) শ্রীশক্তিরঞ্জন সানকি, পোঃ ও গ্রাম, কোটরা, হাওড়া। (৬৬) শ্রীতরুণকুমার মৈত্র, ৫৮।১।জি রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। (৬৭) শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, ইণ্টারপ্রেটার, হাইকোর্ট। (৬৮) শ্রীপ্রফুল্ল

চু-এন-লাই

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

এই সেই মহাভারত—ইহার পবিত্র পথধূলি,—
প্রধান মন্ত্রী শিরে লও তব তুলি'।
বক্ষে তোমার জাগুক হে মহাপ্রাণ,
কপিলবাস্তু, লুম্বিনী উদ্যান,
সেই সারনাথ, তক্ষশিলা ও
বৌদ্ধ-বিহারগুলি।

২

নালন্দার সে ধ্বংসস্তূপে কর হে অর্ঘ্য দান,
নিরঞ্জনার পূত নীর কর পান,
তুমি ভ্রমিতেছ, সঙ্গে তোমার চলে—
ভিক্ষু, শ্রমণ, লামাগণ দলে দলে,
ফিরিছে সঙ্গে হোয়েন্থ সাঙ
এবং ফা-হিয়ান।

৩

বিশাল বিরাট প্রাচীন জাতির হে যোগ্য প্রতিনিধি
তোমাকে শক্তিসামর্থ্য দেন বিধি।
এ সৌহার্দ্য ভারতে এবং চীনে
যুগ যুগ ধরে বাড়িয়াছে দিনে দিনে,
জগতের ইহা চিরকর প্রিয়
হীন অরাতির ভীতি।

৪

ও তো সামরিক ও তো সাময়িক সখের সৌখ্য মহে
বিশ্বশান্তি মৈত্রীর কথা কহে।
পুনঃ জয়রব উঠুক অহিংসার,
মারণাস্ত্রের থামুক আবিষ্কার,
বসুধায় যেন শান্তি তৃপ্তি
পুণ্যের হাওয়া বহে।

৫

কুটিলতা-ভরা যাক কূটনীতি, দুর্নীতি হোক দূর
জড়ীভূত হোক দম্ভী দর্পী ক্রুর।
বিশুদ্ধ হোক সব মানবের মন,
শুচি ও সুদৃঢ় সব প্রীতিবন্ধন,
বিশ্বনাথের বিশ্বে জাগুক
এক প্রাণ, এক সুর।

৬

শিব শুভ হোক, তব আগমন যাত্রার জয় জয়
যেন তব স্মৃতি হয়ে রয় অক্ষয়।
শঙ্খধ্বনি পুষ্পবৃষ্টি করি',
হে সুধী তোমাকে ভারত লয়েছে বরি
অমিতাভ সাথে হউক তোমার
ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

দেবনাথ, বি-এস-সি, বি-টি, রাসমণীর কাছারী, নবদ্বীপ। (৬৯) শ্রীসত্যবন্ধু ভট্টাচার্য্য, ১৬৮।২।১ লিন্টন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৪। (৭০) শ্রীঅশোকরঞ্জন আয়ন, জি, আই, ১৫।১ হীরাকুন্দ, সম্বলপুর, উড়িষ্যা। (৭১) শ্রীবিভূতিভূষণ রায়, এ।১১৭ বি বাঘা যতীন পল্লী, কলিকাতা-৩২। (৭২) শ্রীনিরঞ্জন দত্ত রায়, ১৫।৩।১ সুভাষ নগর রোড, কলিকাতা-২৮। (৭৩) লিপি রায়, তমলুক রাজবাটি, তমলুক, মেদিনীপুর। (৭৪) শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্য, ৬০ডি ইছাপুর রোড, কদমতলা, হাওড়া। (৭৫) শ্রীভূধরচন্দ্র নায়ক, সুবদী পোঃ, মেদিনীপুর। (৭৬) শ্রীগোপালনন্দন বসু, ৩৬।৬ কাশীনাথ দত্ত রোড, কাশীপুর। (৭৭) রেণু ঘোষ, ১২বি মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪। (৭৮) শ্রীঅনিলকুমার কুণ্ডু, ৩৬ তালপুকুর রোড, বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা-১০। (৭৯) শ্রীপ্রদ্যোত চৌধুরী, গঙ্গাজলঘাটি, বাঁকুড়া। (৮০) শ্রীরামপ্রসাদ মৃধা, গ্রাম—ভগবানপুর, পোঃ শ্যামপুর, হাওড়া। (৮১) শ্রীবিশ্বনাথ মন্ত্রী, গ্রাম ও পোঃ ঠাকুরনগর, ২৪-পরগণা। (৮২) কুমারী অন্নপূর্ণা ঘোষ, (৮৩) শ্রীকুমুদাচার্য, মল্লিকপুর, সাঁইথিয়া, বীরভূম (৮৪) শ্রীলীনা সরকার, ১৫এ ইন্দ্র রায় রোড, কলিকাতা-২৫ (৮৫) শ্রীঅরূপ মুখোপাধ্যায়, নীলকুঠি, পুরুলিয়া। (৮৬) শ্রীঅমূল্যকুমার দাস, কপাটি, নগাঁও, আসাম। (৮৭) শ্রীমৈনাকপানি কুশারী ৭, নবাব লেন, কলিকাতা-৭। (৮৮) শ্রীরাজেশ্বর সিংহরায়, পলাশী পোঃ কালানদী, হুগলী। (৮৯) শ্রীবিমলদাস শীল, ১৩ কালীপ্রসাদ ব্যানার্জি লেন, ব্যাটরা, হাওড়া। (৯০) তিলককুমার চক্রবর্ত্তী পোঃ ও গ্রাম সোনাতলা, হাওড়া। (৯১) শ্রীচঞ্চলকুমার পটনায়ক ৬৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (৯২) শ্রীমৃত্যুঞ্জয় সুরাই, শীতলবাড়ি, পানিহাটি, ২৪-পরগণা। (৯৩) শ্রীজয়দেবকুমার মিত্র, আলিগঞ্জ, মেদিনীপুর। (৯৪) শ্রীকেশবচন্দ্র দাশ, পোঃ জোড়পাকড়ী জলপাইগুড়ী, (৯৫) শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, ১২বি মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো তেরো

অধর সেনের বাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে বঙ্কিমের দেখা।

'তুমি ডিপুটি।' কথায়-কথায় বললেন একদিন অধরকে। তার শোভাবাজার বেনেটোলার বাড়ির উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। 'কিন্তু জেনো এ পদও ঈশ্বরের দয়ায় হয়েছে। তাঁকে ভুলো না।' আবার একদিন দক্ষিণেশ্বরে, শিবের সিঁড়িতে বসে। 'দেখ, তুমি এত বিদ্বান আবার ডেপুটি। তবু তুমি খাঁদি-ফাঁদির বশ। আমার কথা শোনো। এগিয়ে পড়ো। চন্দনকাঠের পরেও আরো ভালো জিনিষ আছে। রূপোর খনি, সোনার খনি—তার পর হীরে-মানিক! শুধু এগিয়ে পড়ো—'

বয়স আটাশ-উনত্রিশ। বৃত্তি পেয়েছে এনট্রান্সে অষ্টম হয়ে। এফ-এতে চতুর্থ। কবিতার বই লিখেছে দুখানা, 'মেনকা' আর 'ললিতাসুন্দরী।' চব্বিশ বছর বয়সে প্রথম ডিপটি হয়েই চট্টগ্রাম। সেখান থেকে বদলি হয়ে যশোর। যশোর থেকে সম্প্রতি কলকাতা। আর কলকাতায় পৌঁছেই সটান দক্ষিণেশ্বর।

তিনশো টাকা মাইনে। কলকাতা মিউনিসি-প্যালিটির ভাইসচেয়ারম্যান হবার জন্যে দরখাস্ত করেছে। বড়-বড় লোকদের করছে অনেক ধরাধরি। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এবার তুমি যদি বলো একটু তোমার কালীকে।

অধরকে মনে করেন পরমাত্মীয়। মুখে বলেনও তাই অকপটে। তাই একটু সাধলেন কালীকে। বললেন, 'মা, অনেক তোমার কাছে আনাগোনা করছে। যদি হয় তো হোক না।' বলেই ছি-ছি করে উঠলেন: 'মা, কি হীনবুদ্ধি! জ্ঞান-ভক্তি না চেয়ে চাচ্ছে কিনা টাকা-পয়সা!'

ধিক্কার দিয়ে উঠলেন অধরকে, 'কেন হীনবুদ্ধি লোকগুলোর কাছে অত আনাগোনা করলে? কী হল? সাতকাণ্ড রামায়ণ, সীতা কার ভার্য্যে। আর বোলো না ঐ মল্লিকের কথা। আমার মাহেশ যাবার কথায় চলতি নৌকো বন্দোবস্ত করেছিল, আর বাড়িতে গেলেই হৃদুকে বলত, হৃদু, গাড়ি রেখেছ?'

অধর হাসল। বললে, 'সংসার করতে গেলে এ সব না করলে চলে কই? আপনি তো বারণ করেননি!'

কি অবস্থাই গেছে! 'এই অবস্থার পর,' ঠাকুর বললেন, 'আমাকে মাইনে সই করাতে ডেকেছিল খাজাঞ্চি। যেমন ডাকে সবাইকে, অন্যান্য কর্মচারীকে। আমি বললাম, তা আমি পারবোনি। তোমার ইচ্ছে হয় আর কারুকে দিয়ে দাও।'

সংসারে থাকো কিন্তু ঈশ্বর-রস-সরসীতে স্নান করো। কিন্তু যদি একবার যাও তলিয়ে আর উঠো না।

'এই অবস্থা যেই হল, রকম-সকম দেখে মাকে বললাম, মা, এইখানেই মোড় ফিরিয়ে দে। সুধামুখীর রান্না, আর না আর না—খেয়ে পায় কান্না!'

সবাই হেসে উঠল। সংসারসুধামুখীকে সবাই চেনে। বচনে অমৃত, ব্যঞ্জনে বিষ। আপাতরম্য কিন্তু পর্যন্তপরিতাপী। যাকে বলে দেখসিঁদুরে। রূপসুন্দর কিন্তু অসার।

'যার কর্ম করছ তারই করো।' বললেন আবার অধর সেনকে: 'লোকে পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা মাইনে পায় না, তুমি তিনশো টাকা পাচ্ছ। ডিপুটি কি কম গা? ওদেশে দেখেছিলাম আমি ডিপুটি। নাম ঈশ্বর ঘোষাল। ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। মাথায় তাজ—সব হাড়ে কাঁপে। বাঘে-গরুতে জল খায় এক ঘাটে। শোনো। যার কর্ম করছ তারই করো। এক জনের চাকরি করলেই মন খারাপ হয়ে যায়, আবার পাঁচ জনের!'

আমিও এক জনের চাকরি করছি। এক জনের দাসত্ব। সে মুনিব সে উপরওয়ালার নাম ঈশ্বর।

'শোনো!' আবার বলছেন ঠাকুর: 'আলো

জ্বাললে বাহুলে পোকার অভাব হয় না। তাঁকে লাভ করতে চাইলে তিনিই সব জোগাড় করে দেন, কোনো অভাব রাখেন না। তিনি হৃদয়মধ্যে এলে সেবা করবার অনেক লোক এসে জোটে। তবে আপনি হাকিম, কি বলব। যা ভালো বোঝ তাই কোরো। আমি মূর্খ—'

আর সবাইকে লক্ষ্য করে হাসিমুখে বললে অধর, 'উনি আমাকে একজামিন করছেন।'

যেমন দেশে বাড়ি, কলকাতায় গিয়ে কর্ম করে, তেমনি সংসারকর্মভূমিতে কাজ করে যাও। আর ঈশ্বরের নাম করো। ঈশ্বরই কীর্তনীয় কথনীয় গণনীয় মননীয়। বর্ণনীয়, বন্দনীয়। ঈশ্বরই সর্বার্থনাম-চিন্তামণি। শুধু তাঁর নামসাধন করে যাও। পরমামৃতায়মান নামকীর্তন। "বিদ্যাবধূজীবনং।" চিদ্বৃত্তি বিদ্যারূপ যে বধূ তার জীবনই শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্তন। নামসাধনে নিশ্চলা স্থিতিই নিষ্ঠা।

'তাঁর নামবীজের খুব শক্তি।' বললেন আবার অধরকে। 'নাশ করে অবিদ্যা। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।'

কণ্ঠপীঠে মঙ্গলস্বরূপ কৃষ্ণনাম প্রতিষ্ঠিত করো। "স্ফুটং রট।" শব্দ করে উচ্চারণ করো। সঙ্কেতে অর্থাৎ পুত্রাদির নামকরণে, পরিহাসে, স্তোভে বা নিরর্থক বাক্যে বা নৃত্যগীতে, বা অবহেলাক্রমে যে ভাবেই হোক নাম করলেই হল। ভুলেও যদি অগ্নিকণা গায়ে এসে পড়ে দগ্ধ করবেই। তেমনি হরিনাম যদি এক বার উড়ে এসে মনে পড়ে পুড়ে যাবে সর্বপাপ। আসলে হরিনামও বহ্নিময়। দাহ আছে, আবার এমন মজা, মধুও আছে। যাকে বলে 'তপ্ত ইক্ষু চর্বণ।' রাখাও যায় না ফেলাও যায় না।

"এই প্রেমের আস্বাদন
তপ্ত ইক্ষু চর্বণ—
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন॥"

কিন্তু শুধু নাম করলে কি হবে? অনুরাগ চাই। নামের মধ্যে চাই সেই হৃদয়ের সুর। সেই স্পর্শ-আতুর পথিক হওয়ার ব্যাকুলতা। শুধু নাম করে যাচ্ছি অথচ বিলাস-লালসে মন রয়েছে অলস হয়ে, তাতে কী হবে?

'হাতীকে নাইয়ে দিলে কি হবে, আবার ধুলো-কাদা মেখে যে-কে-সেই। তবে হাতীশালায় ঢোকবার আগে যদি কেউ ধুলো ঝেড়ে স্নান করিয়ে দেয়, তাহলে আর ভয় নেই, গা তখন থাকবে ঠিক পরিষ্কার।'

সেই যে এক পাপী গিয়েছিল গঙ্গাস্নানে। গঙ্গাস্নানে পাপ যায় শুনেছে, ব্যস, মনের সুখে ডুব দিচ্ছে জলে নেমে। কিন্তু জানে না পাপগুলো নদীর পাড়ে গাছের উপর গিয়ে বসেছে। যেই স্নান সেরে ফিরছে অমনি পুরোনো পাপগুলো গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল লোকটার ঘাড়ের উপর। স্নান করে দু পা আসতে-না-আসতেই একটু-আধটু হালকা হতে-না-হতেই আবার সেই গুরুভার। সেই জগদ্দল পাষাণের শ্বাসরোধ।

'তাই বলি নাম করো। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করো, হে ঈশ্বর, তোমার উপর যেন ভালোবাসা আসে। আর কিছু না। টাকা নয় মান নয় দেহের সুখ নয়, শুধু ভালোবাসা। এমন কখনো হতে পারে আমি তোমাকে ভালোবাসি আর তুমি আমাকে বাসো না?'

চণ্ডীর গান হয়ে গেল অধরের বাড়িতে। বলরামকে নেমন্তন্ন করতে ভুল হয়ে গিয়েছে। বলরামের বড় অভিমান, যাকে-তাকে বলে বেড়াচ্ছে। নালিশের মধ্যে রাগ তত নয় যত দুঃখ। চণ্ডীর গান দিল অধর, আমাদের বললে না। তা বলবে কেন, আমরা হলুম আজে-বাজে, হেজি-পেঁজি—

কথা কানে উঠল অধরের। ছুটে তক্ষুনি বলরামের বাড়ি গেল। যুক্ত করে অপরাধ স্বীকার করলে। মাপ করুন। ভুল হয়ে গিয়েছিল—

সেই কথাই হচ্ছিল ঠাকুরের সঙ্গে।

বলরাম বললে, 'আমি জানতে পেরেছি যে অধরের দোষ নয়। দোষ রাখালের। রাখালের উপর ভার ছিল।'

'রাখালের দোষ ধোরো না।' মমতামাখানো মুখে বললেন ঠাকুর, 'গলা টিপলে ওর দুধ বেরোয়—'

'বলেন কি মশাই!' ঝাঁজিয়ে উঠল বলরাম: 'চণ্ডীর গান হল, আর ও নেমন্তন্ন করতে বেরিয়ে—'

'আসলে অধরই জানত না। অধরেরই খেয়াল ছিল না।' ঠাকুর শান্তিজল ঢেলে দিলেন। 'দেখ না সেদিন যদু মল্লিকের বাড়ি গিয়েছিল আমার সঙ্গে। দেখল সিংহবাহিনী। চলে আসবার সময় জিগগেস করলুম, সিংহবাহিনীর কাছে প্রণামী দিলে

না? ও, দিতে হয় নাকি—সঙ্কুচিত হয়ে গেল—তা মশাই আমি তো জানি না, আমার তো খেয়াল নেই!' ঠাকুর থামলেন। বলরামকে বিশেষ উদ্দেশ করে বললেন, 'তা তোমাকে যদি না বলেই থাকে, তাতে দোষ কি? যেখানে হরিনাম সেখানে না বললেও যাওয়া যায়। নিমন্ত্রণের দরকার হয় না।'

নিমন্ত্রণ করি কাকে? অভিমানীকে। স্পর্ধিত-বর্ধিতকে। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করলেও ত্রুটি ধরে। কিন্তু বিশ্বময় এত যে পত্র লিখে রেখেছেন ঈশ্বর, এ কি নিমন্ত্রণ? এ সরোদন আহ্বান। আয় আয়।

তুমি যাবে না ভেবেছ? যেতে পারো না সে আলাদা কথা। তোমার দেহের প্রতিটি রক্তকণা যাই-যাই করে উঠেছে।

গাছ কি নিমন্ত্রণ করে? তবু গাছের ছায়ায় গিয়ে বসি, পত্রমর্মরে হরিনাম শুনি। নদী কি নিমন্ত্রণ করে? তবু তার তীরে গিয়ে বসি, জলগুঞ্জনে হরিনাম শুনি। আকাশ কি নিমন্ত্রণ করে? তবু তার অন্ধকারের নিচে গিয়ে দাঁড়াই। তারায়-তারায় শুনি দীপ্ত হরিনাম।

গৃহস্থের ঘরে হরিনাম হচ্ছে। পথচারী পথিক এসে দাঁড়াল বাড়ির আঙিনায়। কে আপনি? আমি রবাহূত। আমাকে গৃহস্বামী ডাকেনি, আমাকে হরিনাম ডেকে এনেছে।

যেখানেই হরিকথা সেখানেই আত্মীয়তা। যেখানেই হরিনাম সেখানেই সুখধাম।

নামসদৃশ জ্ঞান নেই, নামসদৃশ ব্রত নেই, নাম-সদৃশ ফল নেই, নামসদৃশ শান্তি নেই, নামসদৃশ আশ্রয় নেই। হে রসসারজ্ঞা রসনা, মধুরপ্রিয়া, যদি মধুস্বাদই করতে চাও নিরন্তর, নামপীযূষ পান করো।

'প্রথমে একটু খাটনি!' বললেন আবার অধরকে। 'তার পরেই পেনসান।'

প্রথমে অভ্যাস তারপরেই অনুরাগ। প্রথমে দাগা বুলোনো পরে টেনে লেখা। প্রথমে দাঁড় টানা পরে তামাক খাওয়া। প্রথমে ছুটোছুটি পরে মার কোলে ঘুম।

অনেক দিন পর এসেছেন অধরের বাড়িতে। কোন ঠিক ছিল না হঠাৎ এসে পড়েছেন। ঠাকুরের পায়ের কাছে বসল এসে অধর। বললে, 'কত দিন আসেননি। আমি আজ খুব ডেকেছিলাম আপনাকে। চোখ দিয়ে জল পড়েছিল—'

'বলো কি গো—' মুখমণ্ডল প্রসন্ন হয়ে উঠল। তাই তো এসেছি। ব্যাকুল হয়ে কাঁদলেই তো চলে আসি পথ চিনে। বিনা-রেখার পথ ধরে যেমন বাতাস চলে আসে ফুলগন্ধের সংবাদ পেয়ে।

শুধু তুমি আমার জন্যে নয় আমিও তোমার জন্যে ব্যাকুল হই। কাঁদি। ঘুরে বেড়াই।

অনেক দিন পর অধর এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। 'কি গো এত দিন আসোনি কেন?' ঠাকুরের কণ্ঠে যেন বেদনার কুয়াসা।

'অনেক কাজে পড়ে গিয়েছিলাম। নানান মিটিং, ইস্কুল, অফিস—'

'কচ্ছপের মতন থাকো। কচ্ছপ নিজে জলে চরে বেড়ায় কিন্তু মন রয়েছে আড়াতে। যেখানে তার ডিম রয়েছে সেখানে।'

'অনেক দিন আমাদের বাড়িতে আসেননি।' করজোড় করলেন অধর। বললে, 'সেই যে গিয়েছিলেন বৈঠকখানা ঘর সুগন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন—এখন সব অন্ধকার।'

ভাবসাগর উথলে উঠল ঠাকুরের। ভাবসাগর মানে প্রেমসাগর। দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাত দিয়ে অধর আর মাষ্টারের মাথা ছুঁলেন, ছুঁলেন বক্ষদেশ। বললেন, 'আমি তোমাদের নারায়ণ দেখছি। তোমরাই আমার আপনার লোক।'

শুধু তাই নয়, যেদিন অধরের জিভ ছুঁলেন ঠাকুর। জিভে কি লিখে দিলেন। সেই কি দীক্ষা হয়ে গেল অজানতে? মুখে বললেন, 'তুমি যে নাম করেছিলে তাই ধ্যান কোরো।'

নামসদৃশ ধ্যান নেই।

সেই অধর সেনের বাড়িতে বঙ্কিম এসেছে। এসেছে ঠাকুরকে দেখতে। ঠাকুরের মতই যার মন্ত্র বন্দে মাতরম্।

"এই কি মা? হ্যাঁ, এই মা। চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্তরত্নভূষিতা এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ দশ দিক—দশ দিকে প্রসারিত। তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত—পদাশ্রিত বীরজন—কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্তি এখন দেখিব না, আজি দেখিব না, কাল দেখিব না, কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু এক দিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণ-প্রহারিণী শত্রুমর্দিনী

বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ—এই স্বুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা—”

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

কেশো চৌদ্দ

‘মশায়, ইনিই বঙ্কিম বাবু।’ অধর সেন পরিচয় করিয়ে দিল। ‘ভারি পণ্ডিত, অনেক বই-টই লিখেছেন। দেখতে এসেছেন আপনাকে।’

ঠাকুরের চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট বঙ্কিম। তাকালেন এক বার চোখ তুলে। সহাস্যে বললেন, ‘বঙ্কিম! তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!’

‘আর মশায়, জুতোর চোটে। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।’

তা কেন? আমি তোমাকে চিনেছি। ও কথা বোলো না। তুমি কৃষ্ণপ্রেমে বঙ্কিম। তুমি কৃষ্ণের ভক্ত। কৃষ্ণের ব্যাখ্যাতা। কৃষ্ণরসবিবেত্তা।

‘না গো, প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন।’ বলে পুরুষ-প্রকৃতির অভেদতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন মধুর করে: ‘শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ শ্রীমতী শক্তি। যুগলমূর্তির মানে কি? মানে হচ্ছে, পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ। একটি বললেই আরেকটি। যেমন অগ্নি আর দাহিকা। অগ্নি ছাড়া দাহিকা নেই দাহিকা ছাড়া অগ্নি নেই। তাই যুগলমূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীমতীর দিকে, শ্রীমতীর দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের দিকে। বিদ্যুতের মত গৌরবর্ণ শ্রীমতীর, তাই নীলাম্বর পরেছেন, আর অঙ্গ সাজিয়েছেন নীলকান্ত মণি দিয়ে। আর শ্রীমতীর পায়ে নূপুর দেখে নূপুর পরেছেন শ্রীকৃষ্ণ।’

তন্মোহিতের মত শুনছে দুই ডিপুটি। বঙ্কিম আর অধর। নিজেদের মধ্যে ইংরিজিতে কি বলাবলি করছে!

‘কি গো, আপনারা ইংরিজিতে কি কথাবার্তা করছ?’

‘এই কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যার কথা আলোচনা করছিলাম।’ বললে অধর।

‘সেই যে নাপতের গল্প করলে! শোনো তবে। এক নাপিত কামাচ্ছে এক ভদ্রলোককে। কামাতে-কামাতে কোথায় লাগিয়ে দিয়েছে, আর ভদ্রলোকটি অমনি বলে উঠেছে ড্যাম্। ড্যাম-এর মানে জানে না নাপিত। ক্ষুর-টুর ফেলে রেখে, শীতকাল, তবু জামার আস্তিন গুটোলো নাপিত, বললে, ড্যাম-এর মানে কি বলো। ভদ্রলোক বললে, আরে, তুই কামা না। ওর মানে এমন কিছু নয়, তবে লক্ষ্মী বাবা একটু সাবধানে কামাস! নাপিত সে ছাড়বার নয়। বললে চোখ পাকিয়ে, ড্যাম মানে যদি ভালো হয় তবে আমি ড্যাম, আমার বাপ ড্যাম, আমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। আর ড্যাম মানে যদি খারাপ হয় তবে তুমি ড্যাম, তোমার বাপ ড্যাম, তোমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। শুধু ড্যাম নয়, ড্যাম ড্যাম ড্যাম ড্যা ড্যাম ড্যাম।’

কি মহানন্দ শিশুর মত বললেন সরল গল্পটা। আর বলবার এমন অপূর্ব কৌশল, দুই সহকর্মী হেসে উঠল উচ্চরোলে।

‘আচ্ছা মশাই, এমন সুন্দর আপনার কথা, আপনি প্রচার করেন না কেন?’ প্রশ্ন করল বঙ্কিম।

প্রচার? মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বক্তৃতা করব? না, খোল ঝুলিয়ে বেরুব শোভাযাত্রায়? না কি ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখব আত্মজীবনী?

‘প্রচার! ওগুলো অভিমানের কথা। যিনি চন্দ্রসূর্য সৃষ্টি করে এই জগৎ প্রকাশ করেছেন, তাঁর প্রচার তিনিই করবেন। মানুষ ক্ষুদ্র জীব, তার মধ্যে কি সে প্রচার করে!’

‘তবে তিনি যদি সাক্ষাৎকার হয়ে আদেশ দেন তাহলেই প্রচার সম্ভব। সে আদেশ সে চাপরাশ কজন পেয়েছে? নইলে, আদেশ হয়নি, তুমি বকে যাচ্ছ। যতক্ষণ বলছ লোকে বলবে আহা ইনি বেশ বলছেন। তুমিও থামলে, তারপর ভেঙে যাবে সভা, কোথাও কিছু নেই। আর বলবেই বা কদিন? ঐ দুদিন। দুদিনই লোক শুনবে তারপর ভুলে যাবে। ঐ একটা হুজুক আর কি।’

ঈশ্বরের প্রচার ঈশ্বর করবেন, তুমি নিজে প্রকাশিত হও। দেখ না তিনি নিজে কেমন প্রকাশিত হয়েছেন চতুর্দিকে, সূর্যে চন্দ্রে তৃণাঙ্কিত ধরিত্রীতে, তারাঙ্কিত নিশীথিনীতে। তুমিও তেমনি প্রকাশিত হও। সমস্ত কিশলয়ে যে প্রার্থনা সেই প্রার্থনা তোমারও মধ্যে বিকশিত করো। তুমি যে মহৎ তুমি যে বৃহৎ তার প্রমাণ দাও জীবনে। অপরিমাণ রূপে বাঁচো। নিখিলের প্রতি প্রেমে নিখিলের প্রতি করুণায় প্রসারিত হও।

কার শক্তিতে তুমি প্রচার করবে? তিনি যদি না দুধের নিচে আগুনের জ্বাল দেন তবে তা কি করে ফুলবে?

'যতক্ষণ দুধের নিচে আগুনের জ্বাল রয়েছে ততক্ষণ দুধটা ফোঁস করে ফুলে ওঠে। জ্বাল টেনে নাও, দুধও যেমন তেমনি। আচ্ছা আপনি তো খুব পণ্ডিত, কত বই লিখেছ,' বঙ্কিমকে সবিশেষ লক্ষ্য করলেন ঠাকুর। 'আপনি কি বলো, কিছু কি সঙ্গে যাবে? পরকাল তো আছে?'

কথাটা উড়িয়ে দিল বঙ্কিম। 'পরকাল? সে আবার কি?'

'যতক্ষণ না জ্ঞান হয় ঈশ্বরলাভ হয় ততক্ষণ ফিরে আসতেই হবে সংসারে, নিস্তার নেই। জ্ঞানলাভ হলে ঈশ্বরদর্শন হলে তবে মুক্তি। সিদ্ধ ধান পুঁতলে আর গাছ হয় না। জ্ঞানাগ্নিতে কেউ যদি সিদ্ধ হয় তাকে নিয়ে আর খেলা হয় না সৃষ্টির।'

বঙ্কিম বললে, 'তা মশাই আগাছাতেও তো গাছের কোনো কাজ হয় না।'

'জ্ঞানী তা বলে আগাছা নয়। যে ঈশ্বরদর্শন করেছে, সে অমৃত-ফল্ লাভ করেছে, আপনার লাউ-কুমড়ো ফল নয়। তার আর পুনর্জন্ম হয় না। কেশব সেনকেও বলেছিলাম ঐ কথা। কেশব জিগগেস করলে, মশাই, পরকাল কি আছে? আমি না-এদিক না-ওদিক বললাম। বললাম, কুমোররা হাঁড়ি শুকোতে দেয়, তার ভেতর পাকা হাঁড়িও আছে কাঁচা হাঁড়িও আছে। কখনো গরুটরু এলে হাঁড়ি মাড়িয়ে যায়। পাকা হাঁড়ি ভেঙে গেলে কুমোর সেগুলো ফেলে দেয়, কিন্তু কাঁচা হাঁড়ি ভেঙে গেলে সেগুলো ঘরে আনে, ঘরে এনে জল দিয়ে মেখে আবার চাকে দিয়ে নতুন হাঁড়ি করে, ছাড়ে না। তাই কেশবকে বললুম, যতক্ষণ কাঁচা থাকবে ছাড়বে না কুমোর। যতক্ষণ পাকা না হবে, জ্ঞান লাভ না হবে, ঈশ্বরদর্শন না হবে, আবার চাকে দেবে। পাক দিয়ে ঘুরিয়ে মারবে।'

একাগ্রগামিনী নদীর মত চলেছি। বক্রতায়-ঋজুতায়, উচ্চাবচ পথ ভেঙে-ভেঙে, নানা দেশের বিচিত্র ঘটনা ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে। কিন্তু আমি শরবৎ তন্ময়। আমার লক্ষ্য হচ্ছে সেই জলনিধি, সেই অপার-অগাধ সেই সুদূর-সুন্দর। আমি তো নিশ্চিন্ত হতে চাই না, উদ্বিগ্ন হতে চাই। আমি তো বিশ্রামের নই আমি প্রাণবেগ-প্রাবল্যের। আমি তো সুখী হতে আসিনি বড় হতে এসেছি, বেগবিস্তীর্ণ হতে এসেছি। তাই আমি চলব, আমি থামব না। আমি যে অনন্তের সন্ধানী, সেই তো আমার অন্তহীন আনন্দ।

'আচ্ছা, আপনি কি বলো, মানুষের কর্তব্য কি?'

'আজ্ঞে তা যদি বলেন,' বঙ্কিম বললে পরিহাস করে, 'আহার নিদ্রা আর মৈথুন।'

'এঃ। তুমি বড় ছ্যাঁচড়া।' ঠাকুরের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ঝরে পড়ল। 'যা রাতদিন করো তাই তোমার মুখে বেরুচ্ছে। লোকে যা খায় তার ঢেঁকুর ওঠে। মুলো খেলে মুলোর ঢেঁকুর ওঠে। ডাব খেলে ডাবের ঢেঁকুর ওঠে। কামকাঞ্চনের মধ্যে রয়েছ তাই ঐ কথাই বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। কেবল বিষয়চিন্তা করলে পাটোয়ারি স্বভাব হয়, কপট হয় মানুষ। আর ঈশ্বর-চিন্তা করলে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হলে ও কথা কেউ বলবে না।'

এক সাধুর কাছে এক রাজা এসেছে। সাধুকে প্রণাম করে রাজা বললে, আপনি পরম ত্যাগী। কে বললে? সাধু হাসতে হাসতে বললে, রাজা আপনিই যথার্থ ত্যাগী। আমি? রাজা তো বাক্যহীন। তা ছাড়া আবার কি! যে সব চেয়ে দামী জিনিস প্রিয় জিনিস ত্যাগ করে সেই তো বড় ত্যাগী। বললে সাধু, আমি তো কতগুলো তুচ্ছ জিনিস ত্যাগ করেছি, কামকাঞ্চন ভোগৈশ্বর্য্য। কিন্তু সব চেয়ে যা প্রিয় সব চেয়ে যা মূল্যবান সেই পরমাত্মাকে আপনি ত্যাগ করেছেন, আর তা কত অনায়াসে। তাই, সন্দেহ কি, আপনিই বড় ত্যাগী। বলুন, তাই নয়?

'শুধু পাণ্ডিত্য হলে কি হবে? যদি ঈশ্বরচিন্তা না থাকে? যদি বিবেকবৈরাগ্য না থাকে? চিল-শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে কিন্তু নজর ভাগাড়ের দিকে। অনেক শাস্ত্র-পুঁথি পড়েছে পণ্ডিত। শোলোক ঝাড়তে পারে অফুরন্ত কিন্তু মেয়েমানুষে আসক্ত, টাকা মান সারবস্তু মনে করেছে সে আবার পণ্ডিত কি? ঈশ্বরে মন না থাকলে আবার পণ্ডিত কি?'

পাণ্ডিত্যে আছে কি? শুধু শুষ্কতা, শুধু দাহ। যেখানে রাজত্ব করার কথা সেখানে এসে দাসত্ব করা। শুধু প্রেমহীন প্রাণহীন মাংসপিণ্ড। ঈশ্বর স্বয়ং যেখানে নত হয়ে এসেছেন আমার কাছে সেখানে কিসের আমার স্পর্ধা, কিসের ঔদ্ধত্য? পরম প্রাপ্তিটিই তো প্রণতিতে।

'কেউ-কেউ মনে করে এরা পাগল, এরা বেহেড়ে,

কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে। আর আমরা কেমন স্যায়না, কেমন সুখভোগ করছি। কাকও মনে করে আমি বড় স্যায়না, কিন্তু আসলে কি খায়, কেবল উড়ুর-মুড়ুর করে। আবার দেখ এই হাঁস, দুধে-জলে মিশিয়ে দাও, জল ত্যাগ করে দুধ খাবে।'

সুখভোগ? যা বিষ হয়, তাই তো সংক্ষেপে বিষয়। তার মধ্যে আছে সুখের প্রতিশ্রুতি? সুখ যখন সত্যিই চাও বড়ো সুখটাই নাও না কেন, সেই আরো-র সুখ, সুখের চেয়ে অধিকতর যে সুখ। যা পেয়েছি কুড়িয়েছি ও জমিয়েছি তার চেয়েও যা আরো, যা পাইনি হারিয়েছি ও ফেলে দিয়েছি তার চেয়েও। সুখের বাজি জিতিয়ে দেবে বলে কত ঘোড়াই ধরলাম জীবনের ঘোড়দৌড়ের মাঠে। বিদ্যা আর যশ, পুত্র আর বিত্ত। কেউই পারল না বাজি মারতে, প্রত্যেকেই মার খেল! এবার ধরব এক কালো ঘোড়া, ডার্ক-হর্স। মনের গোপনে গভীর গুঞ্জনে এসে গেছে নতুন খবর! এবার নির্ঘাৎ বাজি মাৎ।

সে তীরবেগ তুরঙ্গমের নামই ঈশ্বর।

'আরো দেখ এই হাঁসের গতি।' বললেন আবার ঠাকুর: 'এক দিকে সোজা চলে যাবে। তেমনি শুদ্ধভক্তের গতিও কেবল ঈশ্বরের দিকে। তার কাছে বিষয়রস তেতো মনে হয়, হরিপাদপদ্মের সুধা বই আর কিছু ভালো লাগে না।' বিশেষ করে তাকালেন আবার বঙ্কিমের দিকে, কোমল স্বরে বললেন, 'আপনি যেন কিছু মনে কোরো না।'

সরল সপ্রতিভের মত বঙ্কিম বললে, 'আজ্ঞে মিষ্টি শুনতে আসিনি।'

কিন্তু বঙ্কিম জানে তার অন্তরের মধ্যে এর চেয়ে আর মিষ্টি নেই। শক্তিশালী ওষুধের নাম জানি না, খেতে খুব ঝাঁজালো, কিন্তু মধুরের মত কাজ করে আত্মগুণে, আরোগ্য এনে দেয়। তেমনি অর্থ জানি না মন্ত্রের উচ্চারণও হয়তো ঠিক হয় না, কিন্তু আত্মগুণে কাজ করে, এনে দেয় নৈরুজ্য। তেমনি তিরস্কারের মধ্য দিয়েই আসুক সেই নামের পুরস্কার।

ভক্ত ঈশ্বরের কাছে বিষয় চাইলেও ঈশ্বর তাকে তাঁর পাদপল্লবই উপহার দেন।

হে প্রভু, তোমাকে ত্যাগ করে স্বর্গ চাই না। ধ্রুবলোক চাই না! সার্বভৌম রসাধিপত্যও চাই না। চাই না যোগসিদ্ধি। চাই না অপুনর্ভব। ক্ষুধার্ত শিশু বা অজাতপক্ষ বিহঙ্গ যেমন তার মা'র জন্যে উৎকণ্ঠিত, বিরহিণী স্ত্রী যেমন প্রবাসগত পতির জন্যে উৎকণ্ঠিত, হে মনোহর-অরবিন্দনেত্র, তোমাকে দেখবার জন্যে আমিও তেমনি উৎকণ্ঠিত হয়েছি।

[ক্রমশঃ।

গাঁয়ের মাটির গান

শ্রীশান্তি পাল

আমরা তাঁতী ফুলিয়ে ছাতি
উঠব এবার মাতি।
সাগর ছেঁচে আনব মাণিক
ও ভাই পুইবে দুখের রাতি।
যন্ত্র-দানোর ধার না ধার,
চরকা-টেকো চালিয়ে আবার,
কাটব ঘরে মিহিন সূতো
ও ভাই সেই দে তুলোর বাতি।

গাবো মাপের পুরণী পেতে,
সলার ঠেলি আসতে-যেতে,
হরেক রকম ধুতি-শাড়ি
ও ভাই টাস—জমিনে গাঁথি।
নিত্যুই মাকু চলবে তাঁতে,
মেড়ায় ঠেকে বাধবে হাতে,
প'ড়েন দিয়ে সানায় টেনে
ও ভাই বুনব বারো-হাতী।

কোথা রে তোর ভড়ি-কাঠি,
নকসা তুলে সাজাও পাটি,
ফসকে যেন যায় না খুলে
ও ভাই গাঁটীর বাঁধন পাতি।
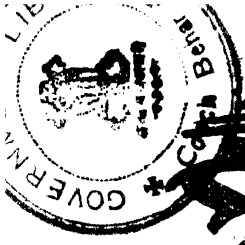
লেডী অবলা বসুর অপ্রকাশিত পত্র

[জননায়ক স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পালের কন্যা শ্রীশোভনা দেবীকে লিখিত এই পত্রগুলি থেকে বাংলার নারী-সমাজের অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্ম্মিণী লেডী অবলা বসুর সুচিন্তিত সংগঠন প্রচেষ্টার আভাস পাওয়া যায়, ভারতীয় নারীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে কি করে আপনি আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে জাতকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, এই পত্রগুলিতে তার আন্তরিক ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়েছে। বাংলার এই মহীয়সী মহিলার নীরব সাধনার সুলিখিত কোন বিবরণ পূর্ব্বে কখন প্রকাশিত হয় নাই।]

13th Jan/30
Rajgir Dak Banglow
Patna District.

কল্যাণীয়াসু,

স্নেহের শোভনা, তোমাকে স্কুলে দিয়ে আমাকে চলে আসতে হোল, তুমি হয়ত প্রথমে হাবুডুবু খাবে, প্রথমটা নিজেকে adjust করিতে একটু কষ্ট হবে, সেজন্যই আমার খারাপ লাগছে যে আমি ওখানে নাই। যদিও তুমি পাকা লোক নিজেকে সহজে পেছুতে দেবে না তবুও প্রথম একটু গোল লাগবে জানি। এখন তোমাকে Boardingএর কথা না ভেবে Montessoriর কথা ভাবাতে চাই, কি করে সেটা class করবে? এক set material এনে সেগুলি বানাবার order একজন মিস্ত্রীকে দিবে। Materialটা তোমাকেই জোগাড় করিতে হবে, miss Sakerকে বলে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেই বোধ হয় ভাল হয়। আমার বোধ হয় প্রভাষ বাবু যিনি স্কুলের কায করেন তিনিই Duplicate করাতে পারবেন। তুমি আপনার মতন ভেবে কায করিবে; কেবল ভবিষ্যত মেয়েদের কথা ভাবিবে, আমরা চাই দেশ-প্রীতি রেখে এবং দেশসেবার জন্যই মেয়েদের Efficient করা—আমাদের mottoe দেখেছ "শ্রদ্ধয়া তপসা সেবয়া"—সেই অনুসারে মেয়েদের মানুষ করিতে পারি। সেই Distinctive Stamp দিতে চেষ্টা করিতে হইবে। আজকালকার মেয়েরা যে শ্রদ্ধার ভাব ছেড়ে একেবারে wild হয়ে যা তা করিতেছে সেটা ভাল লাগে না।

এখন তোমাকে যে ঘর দিয়াছে, সেটা তোমার ঘর হবে না, Feb মাসে আমরা ঠিক বন্দোবস্ত করবো। তোমার সঙ্গে আরও অনেক কথা আছে, আমি ২১শে সকালে কলিকাতা পৌঁছিব, তখন দেখা করিয়া কথা বলিব।

এখানে নালন্দা একটা দেখবার মতন জিনিস। তুমি কি দেখেছ? দেখা হলে সব বলব।

শুঃ অবলা বসু

17th Sept/30
La Colline
Territet.

স্নেহের শোভনা,

তোমার চিঠিখানা অনেক বার পড়িয়াছি এবং তুমি যে মেয়েদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছ তাহার জন্য আনন্দ পাইতেছি। দেশে করিবার অনেক কাজ আছে, দুঃখের বিষয় শিক্ষিতা মেয়েদের দৃষ্টি তাহার দিকে নাই। আমাদের গরীব দেশে বিদেশীয় শাসনে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে Voluntary work ছাড়া সম্ভব নয়, কিন্তু ক'জনের তাহার দিকে দৃষ্টি বল? ছাত্রসঙ্ঘ, ছাত্রীসঙ্ঘ কোনটাতেই constructive programme নাই। সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিতে ছাত্রছাত্রীরা কত করিতে পারে, দেশময় শিক্ষাবিস্তার করিতে পারে। কোথায়ও তাদের এমন কোন Programme নাই। Picketting প্রভৃতি কায ক্ষণিকের, তাতে একটা উত্তেজনাও আছে তাতে কেহ কেহ যোগ দিয়াছেন বটে কিন্তু তাহাতেও সত্যাগ্রহীদের মত প্রেরণা নাই। আমি বলছি না যে ছেলেমেয়েরা কিছু সহ্য করছে না, দেশ ছাড়িবার আগেই ত চামেলীর* কাছ থেকে কাঁথিতে অত্যাচারের কথা শুনিয়া এসেছি তারপর কাগজও পড়িয়াছি! আমাদের দেশের ছেলেমেয়ে যে এতটা সহ্য করিতে প্রস্তুত সেটা একটা দেশের মস্ত লাভ বটে, এখন সেটা জনসাধারণের মধ্যে দিতে হবে এবং সেজন্য শিক্ষা চাই—কেবল ঘৃণাতে কোন কাজ হয় না। যাক্, স্কুলের কথা বলিতে গিয়ে অনেক কথা হোল, যা বলিতে চাহিয়াছিলাম যে আমাদের হাতে অতগুলি মেয়ে আছে, তাদের যদি আমরা তৈরী করে দিতে পারি তবে কতটা কায হয়! মেয়েদের কোন দোষ নাই, তাদের স্বার্থপর বিলাসী হতে শিক্ষা দিয়াছি তাই তাহারা বড় হয়ে loyal হতে শেখে নাই, অশিক্ষিত বোনের কথা মনে করে না। কেবল জানে, পরীক্ষা পাস করিতে ও fashion করিতে। হৃদয়ের কোন শিক্ষাই দেই না। Miss Saker games introduce করে একটা fair playর

* পরলোকগতা দেশকর্ম্মী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী।

idea দিয়াছেন, এখন মেয়েরা প্রফুল্ল ভাবে হারিতে শিখিয়াছে। কিন্তু তিনি একাকী কত পারেন? শিক্ষয়িত্রীদের সকলের সহায়তা না পেলে কখনও মেয়েদের চরিত্র গঠন করা যায় না। শিক্ষয়িত্রীদের নিজের ক্লাশ পড়ান পর্য্যন্তই দায় তারপর আর কোন ideal নেই। এসব বিষয়ে গিয়া তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

Montessori classএ আমরা হাতের কাজ Introduce করিতে পারি কি? তাহা হলে আমি যাবার পর বাগানের পূব দিকের রান্নাঘরের কাছের কোণাটাতে যদি ছেলেমেয়েরা বাড়ীঘর তৈয়ার করে ও তাতে রং দেয় ও সাজায় ত কেমন হয়? অবিশ্যি বড় মেয়েরা অর্থাৎ ওর মধ্যে যারা বড়—একটা জলপ্রপাত ও তাতে কল ঘুরছে এক কোণে, তাও করতে পারে অর্থাৎ হাতেকলমে একটা জিনিষ গড়িয়া তোলা কি ওদের পক্ষে too much হয়? চারু লিখেছে ওরা বেশ স্বদেশী গান শিখেছে। ওদের কি গরজ শেখান হয়? আমার দেশে গিয়ে এই classটার জন্য ছাত্রছাত্রী খুঁজতে হবে। আরও ৫০টা না হলে স্কুলে রাখতে পারবো না। অথচ স্কুল অর্থাৎ montessori class আমি কিছুতে ছাড়বো না; এতদিন পর আমার মনোমত শিক্ষা হচ্ছে। আগে স্কুলে গিয়ে Infant classগুলি দেখলে কান্না পেত। তুমিও ত নিজে এসে দেখেছ। এখন তোমার শরীর নিয়েই ভয়। তুমি ত কখন নিজের জন্য কিছু কর না বরং বিধবা হবার পর থেকে শরীরের প্রতি নানা রকম অত্যাচার করিয়াছ, অত বড় একটা অসুখ হয়ে গেল তারপর যেমন যত্ন হওয়া উচিত তা করনি।

আমি কলিকাতা গিয়ে Dr. Sen Guptaর সঙ্গে দেখা করিয়া তোমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিব। আমরা ১৬ই খুব সম্ভবত, কলিকাতা পৌছিব। এখান থেকে এই শেষ চিঠি, এর পরের মেলে ত আমরাই রওনা হব। তোমার জন্য New Era একখানা পাঠাচ্ছি পড়ে রেখে দিও। যদি miss Vakil চায় তবে দিতে পার কিন্তু তোমার কাছে রাখিয়া দিও; কারণ, তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করিবার আছে। তোমার বড় ছেলে করুণা কি কোনও চাকরী পেয়েছে? এ সময়ে কায পাওয়া ত খুব কষ্টসাধ্য।

তোমার কথা সর্ব্বদাই ভাবি এবং ইচ্ছা হয় তোমার সঙ্গে একত্র হয়ে কত কাজ করি কিন্তু তোমাকে যদি না পেলাম তোমার শরীরের জন্য সাবধানে রাখিতে হবে, যাতে শরীর সামলিয়ে কায কর তাহা দেখিতে হবে।

আজ তবে আসি। পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

শুভার্থিনী অবলা বসু

Giridih 3rd Jan 1931

E. I. R

স্নেহের শোভনা! এই সঙ্গে কয়খানা চিঠি পাঠাই তাহা যথাস্থানে পাঠাইয়া দিও।

স্কুলের প্রাইজের জন্য ছোটরা কিছু ত করিবে? সুখলতার বই যদি চারু কিনিয়া দেয় তাহা থেকে কোন Drill অথবা তোমার নিজের কিছু idea থাকিলে সেটা দিলে ভাল হয় একটা দেশী জিনিষ থাকা চাই। পরিমলকেও জিজ্ঞাসা করিতে পার সে কিছু জানে কি না। পূর্ণিমাকে বলিও যে পরিমলকে তার ওখানে থাকিতে দিতে ওর কাছে লিখেছি তখন নামটা মনে ছিল না তাই নাম লিখি নাই। পরিমল, রমা এরা দুটো class নেবে, আর তুমি ও লীলা আছ। তারা আসিবে কি না জানি না কারণ এখন আমি ২০৲ বেশী দিতে পারিব না, তারপর মায়া (সোম) এলে রাখিতে পারিব কি না জানি না সেজন্যই আপাততঃ ৩ মাসের জন্য বলেছিলাম। পরে সম্ভব হলে ২৫৲ দিয়ে রাখতে পারি কিন্তু ৩ মাসের বেশী তাকে কথা দিতে পারি না।

আমাদের সম্মুখে বড় সঙ্কট, সে বিষয় চিঠিতে কি লিখিব। তোমরা—তুমি, Miss Saker, পূর্ণিমা এবং দরকার হলে Miss Senকে নিয়ে ভবিষ্যতে দরকার হলে কি করিলে Situation meet করা যায় তাহার কর্ম্মপদ্ধতি আগে থেকে ঠিক করিয়া রাখিও, যেন taken by surp rise না হও। জানই ত আমরা হরতাল করতে পারি না। স্কুলে মেয়েরা তকলিতে সুতা কেটে, weaving এবং ছোট ছোট মেয়েরা ছবি দেখিয়া মূর্ত্তি গঠন করা ইত্যাদি দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশের অনেক উপায় আছে। আসল কথা কষ্ট করা যেমন আমরা আত্মীয়দের মৃত্যুতে করি, সেরূপ করিলেই যথেষ্ট, অন্যান্য অনেক বিষয়েও সাবধান হইয়া চলিতে হইবে।

ছোটদের ছবি দেখিয়া মূর্ত্তি গড়িতে দিতে পার, বড়দের জীবনী সম্বন্ধে লেখা বা বক্তৃতা করা মন্দ না। অথচ আমরা কাহাকেও কিছু Suggest করিব না, মেয়েরা যা যা চায় তারাই করিবে তোমাদেরও Tactfully চলতে হবে।

শুভার্থিনী অবলা বসু

আচার্য্যের তিরোধানের পর লিখিত

6th march, 38

স্নেহের শোভনা, তোমার চিঠিখানা পেয়ে সুখী হইলাম। আমার এই ব্যথা লোককে জানিয়ে উত্যক্ত করা আমার স্বভাব না—বাহিরে যত শান্ত দেখ, ভিতরে বড়ই অশান্তিতে কাটিতেছে। তোমাকে তোমার স্বামী একটা কর্ত্তব্যের বোঝা চাপিয়া গিয়াছিলেন বলে গিয়েছিলেন তোমাকে কি করে জীবন কাটাতে। আমাকে যে কিছুই না বলে চলে গেলেন, একেবারে আকস্মিক—মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না, যদি কিছু বলে যেতেন, আবার দেখা হবে তাই আমি বেদবাক্য বলে নিতাম। আমি যে সম্পূর্ণ তাঁর উপর নির্ভর করিতাম আমার নিজের ত কিছুই ছিল না। এখন তাই প্রাণটা অশান্ত, তাই কিছুতেই মনটা ঠিক করিতে পারিতেছি না। একবার ভাবি কোথায় যাব, এখানেই ত উনি আছেন, ওঁকে ফেলে কোথায় যাব, এত শীঘ্র ওঁকে ফেলে বাহিরে যাব? এই আমার ভালবাসা? এই আমার সেবা? যে একটু কষ্ট সহ্য করিতে পারি না? কে ওঁকে দেখবে? এখানে মনে হয় কাছে আছেন দূরে গেলে যদি হারাইয়া ফেলি? আবার প্রাণ অস্থির হয়, বাহিরে গেলে হয়ত প্রাণের ভিতর পাইব—ভগবানকে পাইলে হয়ত প্রাণ ঠাণ্ডা হবে। তাই ভগবানকে অন্বেষণ করিবার জন্য বেরিয়ে যাবই ঠিক করেছি। কোথা গেলে পাব তা জানি না। তুমি লিখেছ কাশীর অলিগলিতে ঘুরেও শান্তি পাওনি, খুব সম্ভব আমিও শান্তি পাব না, কিন্তু খুঁজতে হবেই আমাকে। তারপর যদি শান্তি পাই। সঙ্গে সরযূকে নিচ্ছি না ওকে নিয়ে কি করবো, আমি ত বেড়াতে যাচ্ছি না! আগে মনে হলে তোমাকে সঙ্গে নিতাম! আমি দুজন

বর্ষীয়সী আত্মীয়কে নেব ঠিক করেছি, তাঁরা সঙ্গেও থাকবেন আর কুম্ভমেলাতে তাঁদের আনন্দও হবে। তোমাকে নিলে যেমন প্রাণের যোগ হোত তা অবিশ্যি হবে না। সরযূকে রাখিবার প্রস্তাব যখন করি তখন অমিয়া আমাকে তোমার কথা বলিয়াছিলেন, তুমি ছেলেপিলে ঘর সংসার ফেলে কি করে আমার কাছে থাকিবে তাই ভেবে কিছু বলি নাই, আর তুমিও ত কিছু বল নাই। তা ছাড়া তোমার দুটী মেয়ে আছে তাদের উপর তোমার কর্ত্তব্য আছে সে জন্যও এটা কানেই নেই নাই। নতুবা তুমি সঙ্গে থাকিলে আমার কোন চিন্তাই থাকিত না। আমি একলা বেশ থাকিতে পারি কিন্তু আত্মীয় স্বজনরা তাহা দেবেন না, অথচ তাঁরা কেউ যে নিজেদের সংসার ফেলে আমার এখানে এসে আমার পাহারা দেন সেটাও সহ্য হয় না। ভগবান যখন আমাকে একা করে দিয়েছেন তখন কেন একা থাকব না? প্রথম মাসটা সবাই পালা করে এসে রয়েছেন, কিন্তু চিরকাল ত কেহ পারে না, আর তখন আমি কাউকে কিছু বলি নাই, এখন কেন দেব? সরযূকে আমি নিজের জন্য ত রাখি নাই, নিজের জন্য হলে একজন আয়া রাখিলে বেশী উপকার হইত। সরযূ ছেলেমানুষ, তাকে দিয়ে আমার সেবা কি হতে পারে? আর খুব আপনার লোক না হলে কি সেবা নেওয়া যায়? সরযূকে রেখেছিলাম যে মানুষ করে দিব—"বাণীভবনের" কায হবে তাই। মেয়েটি খুব ভাল, তার বিরুদ্ধে বলার কিছু নাই কিন্তু যা লিখেছ ছেলে মানুষ তার অনুভূতি কোথায়? তাকে কাছে রেখে আমার সুখ নেই, তবে আমার সঙ্গে কোন Interference করে না, সে নিজের মনে আছে, পড়াশুনা করে, নিজেই চেয়ে চিন্তে খায়, আমাকে তার জন্য ভাবতে হয় না।

তুমি এলেই আমার সঙ্গে দেখা করিও। মঙ্গলবার দিন Miss Ornsholt লক্ষ্ণৌ কাজ নিয়ে চলে যাচ্ছেন, তুমি এসে ২।৩ দিন আমার সঙ্গে থাকতে পার? কথাবার্ত্তা বলা যাবে। আমাদের বাড়ীর কাছে বাড়ী নিলে ত যখন তখন তোমাকে ডেকে পাঠাতে পারি। যাক্ তুমি বুধবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করো। আমাদের কবে যাওয়া হবে এখনও ঠিক হয় নাই—বাড়ীর জন্য দেরাদুন লিখেছি এখনও উত্তর আসেনি।

আমার শরীর এত সুস্থ ও সবল যে আমার কপালে দীর্ঘজীবন আছে, তাই ভাবছি কি নিয়ে থাকব?

এক একবার মনে হয় সভ্যতার সব আবরণ দূরে ফেলে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি, সংসারে আবদ্ধ জীব আমরা, বাহিরের জিনিষ নিয়া আছি। কোন দিন ত ভাবি নাই, এখন শূন্য হৃদয়ে তাঁকে খুঁজছি। ভগবানের যদি দয়া হয়। শুভার্থিনী অবলা বসু।

Minerva Hotel Mussorie U. P.
7th May 1938.

স্নেহের শোভনা,

আমি ২৮শে এপ্রিল মুশুরী আসি, তার আগেই তোমার চিঠি পাই। এখানে এসে তোমার চিঠি পাবার আগে অনেক বার তোমার কথা ভেবেছি, মনে হচ্ছিল তোমাকে ওখানে তোমার অনিচ্ছায় জোর করে পাঠিয়ে হয়ত অন্যায় করেছি, এখন তোমার চিঠি পেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছি যে তোমার কাজে মন লেগে গিয়েছে। এখন ভয় হচ্ছে পাছে ওঁরা তোমাকে ছাড়তে না চান ও বেশী টাকা দিয়ে রাখেন। তবে আমাদের মধ্যে লোক না পেলেও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক কর্মী পাবেন, সুতরাং আশা করি তোমাকে থাকিতে হবে না। এতদিনে ত ওঁরা খুঁজিয়া নেবার সুযোগ পাবেন।

এ সব মেয়েদের ইংরাজী শিখিবার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক, কারণ ইংরাজী জানা থাকিলে অনেক কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা, বিশেষ আজকাল আয়ার বদলে ছোটদের জন্য Nurse রাখার খুব একটা প্রয়োজন দেখা যায় ইঙ্গবঙ্গ ঘরে। সেটা যে বড় সুবিধার কাজ তাহা আমি মনে করি না, তবুও জান ত লোকে অত ভাবে না।

গোলমালে হরিদ্বারের মেলার সময় যাইয়া আত্মার তৃপ্তি পাই নাই, তবে একটা জ্ঞান হইল যে আমাদের আপামর সাধারণের মধ্যে বিদেশী ভাব কোনও দিন প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং আমাদের শিক্ষাদীক্ষা সমুদায় দেশীয় ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া করিতে হইবে। আমাদের নিজ দেশের শাস্ত্র ও চিন্তার ধারা ছাড়িয়া দিলে দেশের মঙ্গল নাই। ইহা যে কেবল ব্রাহ্মদের মধ্যে তাহা না, আমাদের এত বড় দর্শনশাস্ত্র, ভক্তিশাস্ত্র, এত বড় বড় মুনি ঋষিদের জ্ঞানলব্ধ রত্ন থাকতেই হিন্দু সমাজের কি অবনতি—দেখিয়া দুঃখ হয়। আমরা যে বিধবাশ্রম করিয়াছি, আমাদের কুশিক্ষা অথবা কু দৃষ্টান্ত জানি না, মেয়েরা এত শীঘ্র সহরের ধরণ শিখিতেছে দেখিয়া দুঃখ হয়। দেখা হইলে অনেক কথা বলিবার আছে।

আমার নিজের মনটা এখনও স্থির করিতে পারি নাই, তবে নির্জ্জনে থাকিয়া ঈশ্বরের কৃপা অনুভব করিতে পারিতেছি এবং বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে যে প্রাণ ভরিয়া একান্তে তাঁকে ডাকিলে তিনি দেখা দেন। সংসারের যে trapping এ অভ্যস্ত হইয়াছি তাহা ছাড়িয়া একেবারে নির্জ্জনে যাইতে ইচ্ছা হয় কিন্তু সঙ্গী দেখিতেছি না। এখানে যদিও অনেক উপকার পাইতেছি তবু যেসব Luxuryতে অভ্যস্ত সব ছাড়িতে ইচ্ছা হয় পারিব কিনা জানি না। তোমাকে যদি মাস কয়েকের জন্য পাইতাম, অথবা আমার মত সংসার নাই এমন কোন সঙ্গী পাইতাম! বৌঠানকে দু'মাস রাখিলাম, বেশী দিন রাখিতে ভাল লাগে না। Selfish মনে হয়। তাঁরও ত মাতৃহীন নাতনী ৩টি আছে, তাদের প্রতিও কর্ত্তব্য আছে, সুতরাং তাঁকে কি করে রাখি। তোমারও দুটি মেয়ে আছে তাদের ফেলেও বা কি করে আমার সঙ্গে ঘোর? আমি ৩১শে এখান থেকে ফিরবো, রাস্তায় একবার কাশী যাব। দেখি কোনও বন্দোবস্ত করিতে পারি কি না।

কোন বিশেষ কারণে সরযূকে রাখিব না স্থির করিয়াছি, তাহার মত সুখপ্রিয় অলস লোক দিয়ে কাজ হবে না।

বড় আশা করেছিলাম যে "বাণী ভবনের" জন্য একটি কর্ম্মী তৈয়ার করিব তাহা হোল না।

দমদমার সেই বাড়ী বোধ হয় হবে না, ওঁরা অন্য বাড়ী খুঁজছেন, মায়া লিখেছে।

তোমার চিঠি পেলে আনন্দ হয়, সর্ব্বদা মন খুলে সব লিখিও। এ মাসটা শীতও নাই, গ্রীষ্মও নাই বেশ temperate এখন। হাঁটিবার সময় বিকালে ঘাম হয় কিন্তু রাত্রে শাল গায়ে দিতে হয়।

আমি ভাল আছি।

শুভার্থিনী অবলা বসু।

ভুয়া-ভুঁইয়া

উদয়ভানু

স্ফটিকের পাত্রের সরঞ্জামে নাকি ফ্রান্সের শিল্পনৈপুণ্য। কোন্ এক ফরাসী সওদাগরের পণ্যসম্ভার দেখে রাজাবাহাদুর ক্ষান্ত থাকতে সক্ষম না হওয়ায়, অত্যন্ত উচ্চমূল্য সত্ত্বেও ক্রয় করেছিলেন-ক্রাইষ্টালের পেগ্-গ্লাশ, ডিকেণ্টার। একটি পুরা সেটই পেয়েছিলেন কালীশঙ্কর; কমপক্ষে অন্ততঃ দশ জন একত্রে ও একাসনে ব'সে যাতে পান করতে পারেন। জলশুভ্র স্ফটিকের পাত্রের সুবিধা এই যে, পানীয়ের রঙ ও পরিমাণ দৃষ্টিগোচর হয়—চোখে দেখা যায় স্পষ্ট। রঙ দেখে নাকি চক্ষুর তৃপ্তি হয়; পরিমাণের হ্রস্ব-দীর্ঘতায় নির্ভর করে আনন্দানুভূতির বিকাশ। স্ফটিক এবং ধাতব পাত্রে তফাৎ অনেক। পাত্র যতক্ষণ পূর্ণ থাকে ততক্ষণই সুখ, পাত্র যতই শূন্য হয় ততই নিরানন্দ! রাজাবাহাদুর কালীশঙ্কর পাত্রসমূহের যা মূল্য দিয়েছিলেন, তা নাকি মূল্যই নয়। জলের দর। -ফ্রান্সের কোম্পানী ডেশ্ ইণ্ডিশের জনৈক অনুমোদিত এজেণ্ট মসিঁয়ে ডি' আলভায়েলার সঙ্গে রাজাবাহাদুরের দহরম-মহরম আছে। ফরাসী কোম্পানীর অজ্ঞাতে, কোম্পানীর যৎপরোনাস্তি ক্ষতিসাধন ক'রেও ডি' আলভায়েলা কত কি মহার্ঘ বস্তুই না দিয়েছে, যৎসামান্য মূল্যে। মোকাম ফ্রান্স থেকে একেক জাহাজে রাজাবাহাদুরের জন্য আমদানী হয়েছে ডি' আলভায়েলার মাধ্যমে। এসেছে পানপাত্র, চাইমিং ক্লক্, ঘড়ি, ঘড়ির চেন, দিক্-নির্ণয়যন্ত্র ও আরও কত দুর্মূল্য ফরাসী মণিকারি—ব্যাঙ্গেল্, ব্রেসলেট্, ইয়ার্ রিং, আর্মলেট্, নোজ্-পিন।

—রাজাবাহাদুর!

কার কাতর আহ্বান শুনে পাত্র থেকে চোখ তুললেন কালীশঙ্কর। গতরাত্রির নেশার জের উত্তীর্ণ হ'তে না হ'তে পুনরায় পানারম্ভ করলেন! এখনও যে দুই চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ হয়ে আছে। কথায় জড়তার প্রকাশ!

—রাজাবাহাদুর!

কে যেন বিনম্র ও কাতরকণ্ঠে ডাকলো। কালীশঙ্কর চক্ষু বিস্ফারিত করলেন। পাত্র থেকে চোখ তুললেন।

—আমি রাজাবাহাদুর! আমি আপনার মহাফেজখানার একজন মুহুরী। নাম চন্দ্রনাথ মুন্শী। হুজুরের সমীপে কিঞ্চি নিবেদন ছিল।

—কি বক্তব্য তাই বলেন।

কালীশঙ্কর কথা শেষ করে পাত্র মুখে তোলেন।

মুন্শীর মুখাগ্রে কথা, তথাপি সে নির্ব্বাক্। কি যেন বলতে চায় সে। কিন্তু সহজে বাক্যস্ফূর্তি হয় না—আমতা আমতা করে মুন্শী,—সাহসে কুলায় না হয়তো। তবুও অতি কষ্টে, জড়িতকণ্ঠে বললে,—রাজাবাহাদুর, অপরাধ যদি হয় মার্জ্জনা করবেন। হুজুর, আপনি স্বয়ং যে নিয়ম-কানুন সৃষ্টি করেছেন, সেই নিয়ম রক্ষা করা হবে না।

কালীশঙ্কর এক চুমুক পানের সঙ্গে সঙ্গে মুখাকৃতি বিকৃত করলেন।

পানীয়ের আস্বাদ তিক্ত না কষায় কে জানে! রাজাবাহাদুরের মুখবিম্বে অতৃপ্তির আভাষ পাওয়া যায়। তবুও কি সুখে যে পান করছেন কে বলবে!

—কে কি নিয়ম ভঙ্গ করেছে? রাজাবাহাদুর প্রশ্ন করলেন একাগ্র দৃষ্টিতে। ব্যগ্রকণ্ঠে।

মুন্শী সসঙ্কোচে বললে,—হুজুরের নিকট নিবেদন করি, দরবার-ঘরে পানের মজলিস্ নাই বা বসলো। হুজুর, আপনার দরবার-ঘরের লাগোয়া আরও বহু প্রকোষ্ঠ আছে, মজলিস-ঘর আছে, আসর আছে। দরবার-ঘরের সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে অনুরোধ জানাই।

—ভাল কথা। বললেন রাজাবাহাদুর।—হক্ কথা বলেছো মুন্শী। সিপাই খানসামাকে কও, আমি এখনই মজলিস-ঘরে যেতে চাই। দরবার-কক্ষ ত্যাগ করতে চাই। মুন্শী, তুমি কিছু অন্যায় বল' নাই।

রাজাবাহাদুর সম্মত হয়েছেন দেখে মুন্সী যেন বুকে বল সঞ্চয় করে। খুশীর মৃদু হাস্যরেখা দেখা যায় ওষ্ঠাধরে। বিগলিত হয়ে পড়ে সে যেন। সাহসে ভর দিয়ে বলে,—হুজুর, আপনার সমুখে কেউই কিছু বলে না। হুজুরের অসাক্ষাতে নিন্দা রটনা করে। কথা চালাচালি করে। হুজুরের কার্য্যের সমালোচনা চালায়। আমি হুজুরের নিমক খাই, হুজুরের কাজকর্ম্মের বিরূপ আলোচনা আদপেই সহ্য করতে পারি না।

রাজাবাহাদুর স্ফটিকের শূন্য পাত্র নামিয়ে রাখতে রাখতে গদী ত্যাগ করলেন। দেওয়ানজী কাছেই দণ্ডায়মান ছিলেন। কালীশঙ্কর এক অঙ্গুলি সঙ্কেতে ডাকলেন দেওয়ানকে। কাছাকাছি পৌঁছতেই বললেন,—দেওয়ানজী, আমি মজলিস-ঘরে গিয়ে অবস্থান করবো। আপনি আমার সাঙ্গোপাঙ্গদের তথায় আসতে অনুরোধ জানান। আর ঐ চন্দ্রনাথ মুন্সীকে একখান মোহর বক্শিশ দেন। সে আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। মুন্সীর কথার যথেষ্ট মূল্য আছে।

দেওয়ানজী সসম্ভ্রমে বললেন,—তথাস্তু হুজুর! যো হুকুম। কিন্তুক, রাজাবাহাদুর, আপনাকে যে বিব্রত দেখছি! কি কারণ? আপত্তি যদি না থাকে আমি কি শুনতে পাই?

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকেন কালীশঙ্কর।

দরবার-ঘরের চন্দ্রাতপে চোখ তুললেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তাকুল থেকে বললেন,—বড় কষ্টে আছি দেওয়ানজী! আমার সহোদর, ছোটকুমার কাশীশঙ্কর কি আমাকে ত্যাগ করতে চান? কিছুই বুঝি না। আমার পক্ষ থেকে কিছু হয়তো ত্রুটি হয়েছে। একমাত্র ঈশ্বর জানেন। দেওয়ানজী, কাশীশঙ্কর যদি আমাকে সত্যই ত্যাগ করে?

—এই সকল কথা কেন যে হুজুরের মনে উদিত হয়েছে, আমি কিছুই অনুমান করতে পারি না। দেওয়ানজীও কথা বলেন চিন্তাগ্রস্ত হয়ে। বলেন,—হুজুর কি তার কোন আভাষ পেয়েছেন?

আবার কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তায় আকুল হয়ে পড়লেন কালীশঙ্কর। বললেন,—তবে কাশীশঙ্কর গড় গোবিন্দপুরে কেন যায়? কোন্ প্রলোভনে? কার আকর্ষণে? কথা বলতে বলতে ক্ষণিকের জন্য কথা বলায় বিরত হয়ে পুনরায় বললেন,—দেওয়ানজী, মনে বড় কষ্ট পাই। কাশীশঙ্করের জন্য আমার আহারে সুখ নাই, নিদ্রায় সুখ নাই। সে যে কি চায় যদি স্পষ্টাস্পষ্টি বলে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করতে পারি।

—ছোটকুমারের মাথাটির হুজুর কিছু ঠিকঠাক নাই। কখন যে কি করেন, কখন যে কা'কে কি বলেন কিছুই ঠাওর করা যায় না। তাঁর নাম শুনলে ভয় হয়, তাঁকে দেখলে হৃদকম্প উপস্থিত হয়। দেওয়ানজী বলতে থাকেন,—হুজুর, শুনছি, ছোটকুমার নাকি ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসায়-সূত্রে আবদ্ধ হ'তে চান। কি কি মাল সরবরাহ করবেন, তারই চুক্তি করতে গেছেন শুনতে পাই কানাঘুষায়।

বাঁকা তরোয়ালের মতই ভ্রু' দুটি বক্র হয়ে উঠলো রাজাবাহাদুরের। আকাশ থেকে পড়লেন যেন তিনি। একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন,—ইহা কি সত্য?

—হ্যাঁ রাজাবাহাদুর! আমি যা বলছি তা মিথ্যা নয়। মিথ্যাকথনে আমার কোনই লাভ নাই। আমি যা শুনেছি আপনার নিকট তাই ব্যক্ত করেছি।

কালীশঙ্কর গমনোদ্যত হয়ে বললেন,—ঈশ্বরের যেমন ইচ্ছা তেমনই হোক। আমি মজলিসে চলেছি দেওয়ানজী! সহোদর কাশীশঙ্করের প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাকে জ্ঞাত করা হয়।

আফসোস ও হতাশার মুখভঙ্গী করলেন দেওয়ান।

সব হারানোর দুঃখ পেয়েছেন যেন, চোখে এমনই করুণ নিরাশা। বললেন,—হুজুরের সেই এক কথা! যে আপনাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে বদ্ধপরিকর, তার জন্য কেন যে এত চিন্তা-ভাবনা! হুজুর, আপনাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিই আপনার ঔরসজাত পুত্র আছে। কুমারবাহাদুর অবশেষে যেন বঞ্চিত না হন!

কোথায় রাজাবাহাদুর! কোথায় কালীশঙ্কর!

তিনি বোধ করি এতক্ষণে মজলিস-ঘরে পদার্পণ করেছেন। দেওয়ানের বক্তব্যে কর্ণপাতও করলেন না। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দরবার-কক্ষ ত্যাগ করলেন। মজলিস-ঘরের দিকে চললেন।

রাজাবাহাদুর কালীশঙ্করের গাত্রোত্থানের সঙ্গে সঙ্গে উপবিষ্ট সমবেত ইয়ার-বন্ধু ও তোষামোদকারীদের মধ্যে ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়। ক্ষীণ আলোড়নের সৃষ্টি হয় যেন। কেউ কেউ ফরাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। মজলিস-ঘরের দ্বারপথের প্রতি তাকিয়ে থাকে সতৃষ্ণ নয়নে।

দেওয়ান বললেন,—রাজাবাহাদুর মজলিস-ঘরে আছেন। সেখানেই এখন অবস্থান করবেন। মহাশয়গণের মধ্যে যদি কেউ হুজুরের সন্দর্শনে যাওয়ার অভিলাষী হন, যেতে পারেন।

হতচকিতের মত ঘোষাল বললেন,—দেওয়ানজী, আপনাদের রাজাবাহাদুরকে আজ যেন কেমন চঞ্চল দেখছি। ব্যাপারটি কি তাই বলেন তো?

ইদিক-সিদিক দেখলেন দেওয়ান।

শিরোপার অঞ্চল-প্রান্ত পাকাতে থাকেন। কণ্ঠস্বর নত ক'রে বললেন,—রাজমাতা নাকি তাঁর একমাত্র কন্যার অদর্শনে স্নানাহার পরিত্যাগ করেছেন। ওদিকে সহোদর ভাই, আমাদের ছোটকুমার কাশীশঙ্কর, ফিরিঙ্গী কোম্পানীর সঙ্গে মোলাকাত করতে গেছেন গড় গোবিন্দপুরে। এই সকল নানা কারণে রাজাবাহাদুর যেন কিছুতেই স্থির থাকতে পারছেন না। কথা বলতে বলতে খানিক থেমে পুনরায় বললেন,—শুনতে পাচ্ছি, রাজমাতা নাকি একাদশীর উপবাস ভঙ্গ করতেই অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনীর জন্য তিনি নাকি মর্ম্মাহত হয়ে আছেন। তা
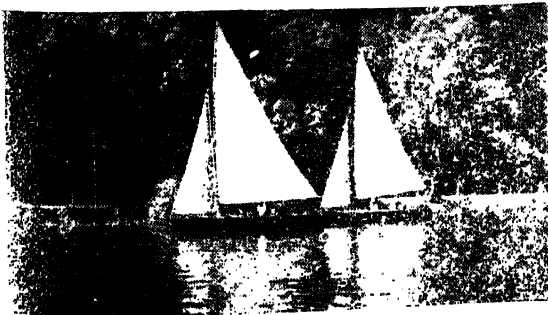
স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি-মন্দিরে স্বামীজীর পবিত্র চিতাভস্ম
—শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পেছন থেকে
—মদন দত্ত
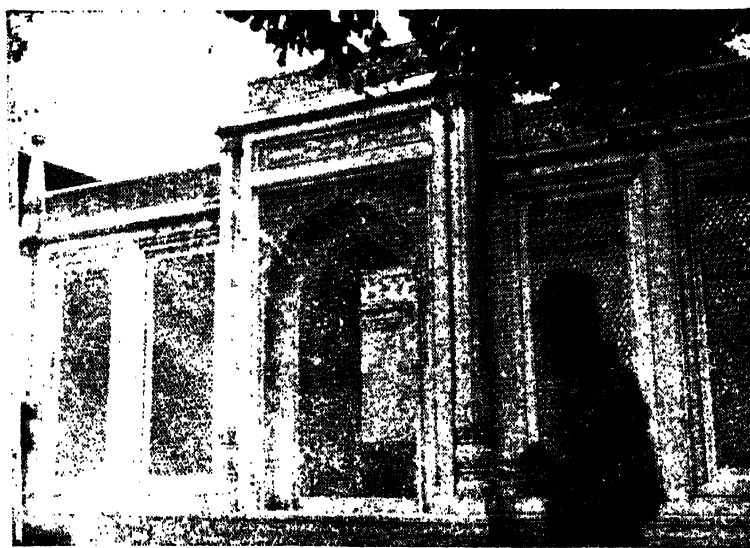
দিল্লী, মতি মসজিদের প্রবেশ-দ্বার
—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়গণ, আপনারা আর কি করতে পারেন, রাজাবাহাদুরকে যৎকিঞ্চিৎ প্রসন্ন রাখতে সচেষ্ট হোন। হুজুর তো দেখলাম আজ প্রাতঃকাল থেকেই মদিরার পাত্র হাতে তুলেছেন। আজ যে কি হবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন!

ঘোষাল বললেন,—আমরা না হয় আপনার হুজুরকে খুশী রাখছি, কিন্তু রাজমাতা যদি উপোস ভঙ্গ না করেন?

কয়েক মুহূর্ত্ত ভেবে-চিন্তে দেওয়ান বলেন,—আমি তো কিছুই ভাবতে পারছি না। রাজমাতা যে ধরণের তেজস্বী নারী, কি জানি কি হয়!

রাজমাতা বিলাসবাসিনী তখন তাঁর খাসমহলে।

পূজা-পর্ব্ব শেষ ক'রে আপন ঘরে ফিরে গেছেন। গ্রীষ্মের প্রকোপ, তাই ঘরের সকল বাতায়নই রুদ্ধ। হাওয়ায় যে অগ্নির উত্তাপ বইছে। কি প্রচণ্ড সূর্য্যালোক! রৌদ্রেরই বা কি উগ্রতা!

রাজমাতার ঘরের দ্বার শুধু উন্মুক্ত। কক্ষমধ্যস্থ দেওয়ালে তৈলালোক জ্বলছে। বিনা অনুমতিতে সে-ঘরে প্রবেশ করে কেউ, এমন সাহস কারও নেই। এই প্রায়-রুদ্ধ ও প্রায়-অন্ধকার ঘরে একা একা কি করছেন বিলাসবাসিনী? তৈলালোক যেন নিস্তেজ, ক্ষীণপ্রভ। কক্ষমধ্যে আলো আছে কিনা ভ্রম হয়। সুবিশাল ঘর, অসংখ্য বাতায়ন যার, তেমন ঘরে সামান্য ঐ তৈলালোক কতটুকু আলোক দান করবে? কিন্তু, রাজমাতা বিলাসবাসিনী ফাঁকা ঘরে একলা ব'সে কি কাজে যে মগ্ন আছেন! ঘরে যেন কি এক গুঞ্জন। তবে কি কোন' দেবমন্ত্র পাঠ করছেন বিলাসবাসিনী? জপ করছেন?

ঘরের বাহিরে, দ্বারের বাহিরে কে যেন অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। সেদিকে দৃষ্টিই নেই রাজমাতার। এত একাগ্রচিত্তে যে কি মন্ত্র বলছেন, তা একমাত্র মন্ত্রের অধীশ্বরই হয়তো জানেন!

—মা!

কে সাড়া দেবে! শুনছে কে! বিলাসবাসিনীর কান নেই কারও ডাকে। ফুরসৎ নেই, কে ডাকলো কি ডাকলো না তাই শুনবেন। জপের মন্ত্র বলছেন, এখন কখনও কেউ ডাকে! তাও চেষ্টার ত্রুটি হবে না। রাজবাড়ীতে এতগুলি নর-নারী, রাজমাতা কিনা শুধু মাত্র খেয়াল এবং অভিমানের বশে নিরম্বু উপবাসী থাকবেন?

দ্বারের বাহিরে দরদালানের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ব'সেছিল ব্রজবালা। সর্ব্বহারার মত গভীর নিরাশা দাসীর চোখে-মুখে। চোখের দৃষ্টি স্থির, শূন্যে নিবদ্ধ। ভগ্নহৃদয়।

—মা! রাণীমা!

আবার কে ডাকে কুঠরীর বাহির থেকে? বিলাসবাসিনী একটিবার চোখ ফেরালেন, দ্বারপানে তাকালেন আয়ত আঁখি তুলে। কুঠরীর তৈলালোকের স্বল্প আলোয় রাজমাতার চোখ দু'টি যেন রাত্রির দূরাকাশের নক্ষত্রবিন্দুর মত জল-জল করে। রাজমাতা দেখলেন, কিন্তু সাড়া দিলেন না, চোখ তুলে তাকালেন মাত্র।

ঘরের বাহিরে, দ্বারমুখে ছিলেন রাজরাণী। রাজা-বাহাদুর কালীশঙ্করের প্রধানা মহিষী। রাজগৃহের জ্যেষ্ঠবধূরাণী। পুনরায় ডাকলেন উমারাণী,—রাজমাতা, ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিন। আমার কিছু কথা আছে।

কোন্ গুরুতর কাজে মগ্ন ছিলেন বিলাসবাসিনী?

দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে বেশ মনঃসংযোগ সহকারে দেখলেন। অনেকক্ষণ ধ'রে দেখতে দেখতে বললেন,—প্রয়োজন থাকে, অন্য কোন' এক সময়ে বলা যায়। এখন আমি ব্যস্ত আছি।

দ্বারমুখ থেকে কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ করলেন রাজমহিষী।

আজ্ঞা বা আদেশের জন্য অপেক্ষা করলেন না আর, শব্দহীন পদক্ষেপে ভেতরে গেলেন। বললেন,—রাণীমা, রাজগৃহের শান্তিরক্ষা আর তো রক্ষা করা যায় না!

—কেন? আমি কার শান্তির বিঘ্ন হয়েছি?

বিলাসবাসিনীর বাষ্পরুদ্ধ কথা। কোথায় গেল রাজমাতার সেই তেজোদীপ্ত কণ্ঠ!

কথায় কথায় রাজমহিষী কুঠরীর মধ্যস্থলে পৌঁছে গেছেন।

দুঃখ-কাতর কথার সুর রাজরাণীর। বললেন,—এ আপনি কি করেন? বিন্ধ্যবাসিনীর শৈশবের পোষাক আর খেলার পুতুল পেড়ে ছড়িয়ে এ আপনি কি করছেন?

মন্ত্রের গুঞ্জন আর নেই। বিলাসবাসিনীর সুবৃহৎ আঁখি দু'টি অশ্রুসজল। অক্ষিপ্রান্তে জলের বিন্দু টলমল করছে। তবে কি রাজমাতা এতক্ষণ মন্ত্র না ব'লে ক্রন্দনে রত ছিলেন?

বিলাসবাসিনী এক মনে কি সকল কথা বলছিলেন। মৃদু কান্নার সুরে কথা বলতে বলতে নিজ মনেই তোলাপাড়া করছিলেন এক রাশি পোষাক। কখন কাঠের সিন্দুকটি খুলে ফেলেছেন রাজমাতা! কত পৌঁটলা পুঁটলি ছড়িয়েছেন। দেরাজ থেকে নামিয়েছেন কতগুলি পুতুল। হস্তি-দন্ত ও কাচের পুতুল, মাটির পুতুল। বিন্ধ্যবাসিনীর শৈশবের নিত্যসঙ্গী, তার খেলাঘরের যত খেলনা-পত্র।

বিলাসবাসিনী ক্রন্দনের বেগ সামলে বললেন,—পোকা ধ'রেছে যে বিন্দুর পোষাকগুলোর! বিন্দুর খেলার পুতুলের গায়ে যে ধুলো জমেছে!

রাজমহিষীর চোখের কোণেও অশ্রুর চাকচিক্য। প্রায়-রুদ্ধ কুঠরীতে লেশমাত্র বাতাস নেই। মাথার গুণ্ঠন মোচন করলেন উমারাণী, অসহ্য নিদাঘে। ক্লান্তকণ্ঠে বললেন,—রাজগৃহে কি আর অন্য কেউ নেই? ঐ তো ব্রজবালা আছে দালানে, তাকে আদেশ করলে সে তো—

বস্ত্রাঞ্চলে চোখ-মুখ মুছলেন বিলাসবাসিনী। বললেন,—নাঃ, অন্য কেউ করে তা আমি চাই না।

রাজমহিষী মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন,—আমার অনুরোধ

রক্ষা করুন। উপবাস ভঙ্গ করুন, নয় তো রাজগৃহে আর শান্তি থাকে না।

কথায় কর্ণপাত করেন না রাজমাতা। দর-দর অশ্রুপাতের সঙ্গে এটা-সেটা তোলাপাড়া করেন। খেলনার পুতুলকে বক্ষে চেপে ধরেন সযত্নে। পুতুলগুলি যেন জীবন্ত এমনই তাঁর আদর-যত্নের আন্তরিকতা। অসাবধানে হস্তচ্যুত হ'লে যদি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় বিন্ধ্যবাসিনীর শৈশবসঙ্গী!

রাজরাণী ধৈর্য্যসহকারে পুনরায় বললেন,—আপনার মেয়ে কুলীনকন্যা। ভুলে যান কেন কুলীনের ঘরেই তার বিয়ে হয়েছে? কৌলীন্যের জ্বালা থেকে কোন' মেয়ের কি মুক্তি আছে? আপনি তো সকল কিছুই জানেন, আমি আর কি বলবো!

কুলীনকন্যার কৌলীন্যের জ্বালা!

শূন্যদৃষ্টিতে আঁখি তুললেন বিলাসবাসিনী। কথাগুলি যেন তাঁর বোধগম্য হয় না। পাষাণের মতই তিনি যেন স্থির ও অচঞ্চল হয়ে গেলেন। কি এমন কথা বললেন রাজমহিষী! কি শোনালেন! বিলাসবাসিনীর মুখাকৃতিতে আতঙ্কের আভাস এবং দৃষ্টিতে বুঝি বা ভয়ার্ত্তভাবের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অশ্রুপতনও বোধ করি রোধ হয়ে যায়। মন্ত্রমুগ্ধের মত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন।

কুলীনকন্যার কৌলীন্যের দুঃসহ জ্বালা কি তবে অনুভব করেছেন রাজমাতা বিলাসবাসিনী? ভূমিপাল বল্লালসেনের কুলবিধি, না, দেবীবরের কৃত মেলী-কুলীন-কন্যার জন্য সেই নিদারুণ ব্যবস্থার সঙ্গে রাজমাতার পরিচয় আছে? কি নির্দ্দয় আর নিষ্ঠুর কুলাচার্য্য দেবীবর! কি কঠিন সেই দেবীবরের ব্যবস্থা!

মেল-প্রচলনের অব্যবহিত পরে সর্ব্বদ্বারী বিবাহ রহিত হওয়ায় ক্রমেই বঙ্গদেশে ঘোর পাত্রাভাব হয়। প্রকৃতি এবং পালটীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকায় ক্রমে ক্রমে ঘর পাওয়াও দায় হ'ল। একেই বাঙলা দেশে কি কারণে কে জানে চিরদিন পুত্রাপেক্ষা কন্যাসন্তানই সাধারণতঃ অধিক জন্মে। এই ক্ষতস্থানে আবার লবণের ছিটা দিলেন অদূরদর্শী দেবীবর। নিয়ম রচনা করলেন তিনি; বঙ্গের ব্রাহ্মণকন্যাদের সর্ব্বনাশ করলেন কঠোর নিয়মের প্রবর্ত্তনে।

স্বেচ্ছাচারী দেবীবর নিয়ম করলেন, মেলী-কুলীন-কন্যাগণ অর্পিত হবে একমাত্র করণীয় কুলীন-পাত্রে। যদি তাদের আজীবন বিবাহ না-ও হয় তথাপি শ্রোত্রিয় বা বংশজের সঙ্গে বিবাহ হবে না। সর্ব্বনাশা দেবীবর আবার মনুর দোহাই পাড়লেন। মনু নাকি লিপিবদ্ধ করেছেন,

"কামমরণাৎ তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেৎ তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥' (৯।৮৮)

রাজমাতা বিলাসবাসিনী যেন শিউরে শিউরে ওঠেন।

শূন্যদৃষ্টিতে আঁখি মেলে থাকতে থাকতে চক্ষুর্দ্বয় বন্ধ করলেন। শ্রোত্রিয় অথবা বংশজের ঘরে যদি কন্যাদান করতেন, তা হ'লে বিন্ধ্যবাসিনীর স্বামী জমিদার কৃষ্ণরামের এত দাপট সহ্য করতে হ'তো না। কৃষ্ণরামের এত দাবী-দাওয়াই বা কে পালন করতো! আহা, এর চেয়ে বিন্ধ্যবাসিনী যদি 'ঠেকা-মেয়ে' হয়েও থাকতো, রাজমাতার মনে কত কথাই উদিত হয়। জমিদার কৃষ্ণরামের মৃত্যু হ'লেও বিন্দুর জীবনটা রক্ষা পায় এখন। কিন্তু দুরাচারীর কি মরণ আছে!

—বৌরাণী, তুমি আর ব'লো না আমাকে। কথা বলতে বলতে চোখ মেললেন রাজমাতা। বললেন,—আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব গেছে। কৌলীন্যের মুখে ছাই পড়ুক!

যেন ক্রন্দনের সুরেই সহসা কথা বললেন বিলাসবাসিনী।

সত্যই তাঁর মুখাবয়বে তিক্ততা ও বিরক্তির বিকাশ লক্ষ্য করা গেল। বুকের পুতুল নামিয়ে রাখলেন ভূমিতে।

রাজমহিষী বললেন,—কুলীনকন্যার কপালের দুঃখ কে ঘোচাবে? আপনিই বা অধৈর্য্য হন কেন? আমি আজ রাজাবাহাদুরের কাছে তো বিষয়টি উত্থাপন করেছি।

এক পাষাণমূর্ত্তি যেন চেতনাময় হয় ক্ষণিকের মধ্যে। মৃতদেহে যেন জ্ঞানসঞ্চার হয়! বিলাসবাসিনী ব্যস্ত হয়ে বললেন,—কাশীশঙ্কর কি বলে? সে কি তবে কেষ্টরামের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে?

ঈষৎ লজ্জানত হন বধূরাণী। মিহি কণ্ঠে রাজমহিষী বলেন,—তিনি ছোটকুমারের পরামর্শ মতই কাজ করতে চান, এই কথা আমাকে জানালেন।

বিলাসবাসিনীর মুখে ক্ষীণ হাস্যরেখা ফুটলো। ক্ষণপ্রকাশ খুশীর হাসি। বললেন,—ঈশ্বরের ইচ্ছায় ছোটকুমার যদি এখন রাজী হয় তবেই। কাশীশঙ্কর কি সহজে সম্মত হতে চাইবে, সে যে ধরণের মানুষ! বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি কাশীশঙ্কর দেবে? মনে হয় না। কথার শেষে একটি তপ্তশ্বাস ফেললেন। বললেন,—তা'ও বৌরাণী, তুমি একটা সুখের কথা শোনালে।

রাজমহিষী উমারাণীর মুক্তার মত দন্তশোভা। তরমুজ-লাল অধরোষ্ঠ। প্রসন্ন হাসি হাসলেন তিনি। বললেন,—তবে আর চিন্তার কি কারণ? আপনি উপবাস ভঙ্গ করুন। আমি ব্রাহ্মণীদের আদেশ করি, আপনার জলাসনের ব্যবস্থা করুক।

রাজমাতা বলেন,—বেশ তাই হোক। দুই ভাই যদি একমত হয় আর আমার চিন্তার কি আছে! কিন্তুক বৌরাণী, সাতগাঁ থেকে জগমোহন লেঠেল এখনও কেন ফেরে না বল'তো?

বিলাসবাসিনীর মৌখিক সম্মতি লাভ করেছেন রাজমহিষী। একাদশীর নির্জ্জলা উপোস ভাঙতে সায় দিয়েছেন রাজমাতা, তাই উমারাণীর হাসির মাত্রা ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হ'তে থাকে। মুক্তার মত দাঁতের শোভা প্রস্ফুটিত হয় লাল ঠোঁটের ফাঁকে। উমারাণী উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন,—কতটা

পথ যাবে, কতটা পথ আসবে, যাওয়া-আসায় কত সময় নেবে, তার ঠিক কি! খোঁজ-খবর পেতেও বিলম্ব হ'তে পারে। আপনি এত শীঘ্র অধৈর্য্য হন কেন? আমি যাই, পাচক-ব্রাহ্মণীদের বলে পাঠাই।

আকাশের পরী যেন ডানা মেলে উড়ে গেল!

শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে বিদ্যুৎ বেগে চলে গেলেন রাজ-মহিষী। গায়ের অলঙ্কারের ঝনঝন ধ্বনি কোথায় মিলিয়ে যায় নিমেষের মধ্যে। উমারাণীর দ্রুত পদক্ষেপের শব্দ আর শোনা যায় না। এক অসাধ্য সাধন করেছেন রাজরাণী, সেই আনন্দেই আত্মহারা হয়ে গেছেন।

শূন্য ঘরে বিন্ধ্যবাসিনী মাত্র একা।

ঊর্দ্ধমুখী হয়ে রাজমাতা বললেন,—পতিতপাবনী, মুখ তুলে চাও মা! তুই ভাই যেন একমত হয়। আমার বিন্দুর জীবনটা যেন রক্ষা হয়। সাতগাঁ থেকে জগমোহন যেন ভালয় ভালয় ফিরে আসে।

একটি জটাজুটধারী বটবৃক্ষের ছায়ায় বসেছিল পথক্লান্ত জগমোহন।

বংশবাটি থেকে সপ্তগ্রামের বাসুদেবপুরে পৌঁছতে দস্তুরমত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সর্প ও শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলাকীর্ণ পথে দস্যু, তস্কর ও ডাকাতের ভয় ছিল পদে পদে। নেহাৎ একটি বৃহৎ বাঁশ ছিল জগমোহনের হাতে, তাই রক্ষা পেয়েছে। সেই বংশদণ্ডেই শরীরের ভর চাপিয়ে লম্ফ দিতে দিতে পথ চলেছিল ভীষণ দ্রুতবেগে। বাঁশের এক প্রান্ত ছিল মৃত্তিকায়, অন্য প্রান্ত জগমোহনের হস্তে। এই বংশদণ্ড বিস্তার করতে করতে তড়িৎবেগে ছুটেছিল। রাজমাতা স্বয়ং আদেশ করেছিলেন, তাই জগমোহন বরিব মরিয়া হয়েই পথ অতিক্রম করেছে। কালঘাম ছুটে গেছে তার।

জগমোহন বুঝেছিল, অধিকক্ষণ বটবৃক্ষের ছায়ায় অবস্থান করলে যদি কারও সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পড়ে তার প্রতি! জমিদার কৃষ্ণরামের বসতবাটী অদূরেই। জমিদার-গৃহের লোকজন সদাক্ষণই গমনাগমন করবে। যদি কারও দৃষ্টি পড়ে! যদি কেউ দেখে! আর কেউ যদি দেখতে পেয়ে কোন প্রশ্ন করে, তখন?

দূরে জমিদার কৃষ্ণরামের লাল ইমারতের চতুর্দ্দিকে সু-উচ্চ প্রাচীর। বাহির থেকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল মাত্র দেখা যায়, গৃহ-শীর্ষে গৈরিক বর্ণের একটি ত্রিকোণ পতাকা উড়ছে। আর দেখা যায়, চতুষ্কোণ গৃহের চতুঃশীর্ষে সোনার কলস চারটি।

আর অধিকক্ষণ থাকলে যদি কারও সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পড়ে সেই ভয়ে জগমোহন ক্ষণেক ভীত হয়। অতঃপর ভালমন্দ চিন্তা করে ধীরে ধীরে ও অতি সন্তর্পণে ঐ জটাজুটধারী বটবৃক্ষের উচ্চতম শাখায় আরোহণের জন্য সচেষ্ট হয়। যদি দৃষ্টিপথে পড়ে জমিদার-গৃহের অভ্যন্তর! এক শাখা থেকে অন্য শাখায় পদার্পণ করে। পত্রবহুল গাছের শাখায় ও শাখার কোটরে ছিল কত অসংখ্য রাত্রিচর পশু-পক্ষী! তক্ষক, পেচক ও বাদুড়ের পাল শাখায় শাখায় বসেছিল অনাগত রাত্রির প্রতীক্ষায়।

শেষে বৃক্ষচূড়ায় যখন পৌঁছেছে তখন চোখে পড়লো কৃষ্ণরামের গৃহাভ্যন্তর। কিন্তু কোথায় কে! কোথায় জমিদার কৃষ্ণরাম, কোথায় রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী। জমিদার-বাড়ীর কর্ম্মচারী, পাইক, সিপাই ও ভৃত্যেরা ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করছে। কৃষ্ণরামের গৃহের আঙিনার এক প্রান্তে সারি সারি অশ্ব। কয়েকটি হস্তী। কয়েক জন নিম্নপদস্থ ঐ পশুদের পরিচর্য্যায় রত।

উদ্দেশ্য সাধন হয় না।

যাদের দেখার অছিলায় জগমোহন এত কষ্ট করলো, কোথায় তারা! কোথায় জমিদার কৃষ্ণরাম, কোথায় তস্য পত্নী রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী! অনন্যোপায় হয়ে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে জগমোহন বৃক্ষশীর্ষ থেকে নীচে নামতে থাকে। কয়েকটি লাল পিপীলিকা অজ্ঞাতে কখন দংশন করেছে—শরীরের যত্র-তত্র জ্বালা ধরেছে! খেয়ালই নেই জগমোহনের। নীচে নামে আর ইতি-উতি দেখতে থাকে সে। যতদূর দেখা যায় শুধু গাছ আর গাছ। একটি মানুষও চোখে পড়ে না। দূরে, বহুদূরে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে বেশ কয়েকটি গৃহস্থের বাস্তু। জনমানবহীন ও পরিত্যক্ত গৃহসমূহ প্রাচীন ভগ্নাবশেষ ব্যতীত আর কিছুই নয়। মড়ক, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে হয়তো গৃহবাসিগণ নিশ্চিহ্ন। মারীজ্বরের প্রাদুর্ভাবে সপ্তগ্রাম যেন খাঁ খাঁ করছে। মনুষ্যালয়ে শৃগাল ও কুকুরের বাসস্থান হয়েছে। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের স্থানে স্থানে মনুষ্যকঙ্কাল ও নরকপালের স্তূপ! জগমোহন লাঠিয়াল হ'লে কি হয়, সে-ও কিঞ্চিৎ সন্ত্রস্ত হয় স্তূপীকৃত নরকপাল সহসা দেখে। মড়ক, মহামারী বা দুর্ভিক্ষের দান হয়তো! রোগ এবং খাদ্যাভাবের শোচনীয় পরিণাম বঙ্গদেশবাসীর।

বৃক্ষশীর্ষ থেকে বেশ কিঞ্চিৎ নীচে নামতেই জগমোহন অনড় অটল হয়ে গেল। জগমোহন দেখলো, জমিদার কৃষ্ণরামের গৃহের ফটক থেকে কারা যেন নিষ্ক্রান্ত হয়। এক দল মানুষ। একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করে জগমোহন। ফটকের মুখ থেকে মানুষগুলি যে এই পথেই আসে। মানুষগুলিকে দেখে মনে হয়, নিতান্তই সাধারণ মানুষ। গ্রামবাসী!

আর কালবিলম্ব করে না জগমোহন। তরতরিয়ে নীচে নামতে থাকে। ক্ষিপ্রগতিতে। রুদ্ধশ্বাসে!

বৃহৎ শরীরও। জটাজুটধারী বৃদ্ধ বটবৃক্ষ। বহুদূরবিস্তৃত শাখা-প্রশাখা। জগমোহনের এত দ্রুত অবতরণেও বৃক্ষটির কোন অঙ্গ সঞ্চালন নেই!

ঐ মানুষের দল নিকটতম হ'লে জগমোহন ব্যগ্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে। মানুষগুলির বেশভূষা একান্তই নগণ্য।

ধূলিমলিন গ্রাম্য আকৃতি। অনুমান, দলে সাত আট জন আছে। কিন্তু মানুষগুলিকে দেখে মনে হয়, যেন বিক্ষুব্ধ। পরস্পরে বাক্‌বিতণ্ডা করছে। প্রতিহিংসার দৃষ্টিতে দেখছে, পেছনে ফেলে-আসা কৃষ্ণরামের আবাসগৃহ।

এমন সুবর্ণ সুযোগ হেলায় কে নষ্ট করে! বৃক্ষমূলে ঠেকানো বংশদণ্ড হাতে নেয় জগমোহন। ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। বলে,—মশায়গণ, শুনছেন?

—কে?

একসঙ্গে কয়েক জন মানুষ উত্তর দেয়। ফিরে দাঁড়ায়।

মানুষগুলির ভাবভঙ্গী দেখে এবং বাক্যবিনিময়ের ভাষা শুনে জগমোহন আন্দাজে বুঝেছিল, তারা যেন কেমন ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। প্রতিবাদের কণ্ঠে পরস্পরে যেন কথা বলছে।

—আমি একজনা পথিক। বললো জগমোহন।

কোন্ পথে যেতে চাও? পথের কোন' গোল হয়েছে কি?

—না মশায়গণ, সে সকল কিছুই নয়। বললে জগমোহন, বিনম্র সুরে।

—তবে কি চাও?

ফিরতি প্রশ্ন আসে। দলের একজন মাতব্বর মত লোক কথা বলে। অন্যান্যরা কৌতূহলী চোখে চেয়ে থাকে। নিষ্পলক দৃষ্টিতে।

জগমোহন বললে,—মশায়গণ, আমি বহু দূর থেকে আসছি। সেই সুতানুটী থেকে। এই প্রাচীর-ঘেরা ইমারত কি জমিদার কৃষ্ণরামের?

—হাঁ।

একসঙ্গে, অনেকেই একই উত্তর দেয়।

জগমোহন মনুষ্য দলটির নিকটে এগোয়। ইদিক সিদিক লক্ষ্য করতে করতে নিম্নকণ্ঠে বলে,—আমি আসছি কৃষ্ণরামের শ্বশুরকুল থেকে। তাঁদেরই একজন ভূমিদানের প্রজা। আমাদের রাজকুমারীর খোঁজ লওনের নিমিত্তে এসেছি। মশায়গণ, আপনারাই বা কে?

মানুষগুলি পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চোখ ফেরায়। জগমোহনের পরিচয় জেনে মাতব্বর মত লোকটি বললে,—তোমাদের রাজকুমারী তো এখানে নাই!

—তবে কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো জগমোহন। ব্যাকুল কণ্ঠে।

লোকটি ক্ষীণ হাসলো। সকাতর হাসি। বললে,—তোমাদের রাজকুমারীকে তো নেয় না কৃষ্ণরাম জমিদার? তেনা তো গড়মান্দারণে আছেন। জমিদার কৃষ্ণরামের জমিদারীর চৌহদ্দীতে কোন এক ভাঙা পোড়োবাড়ীতে রেখেছে তেনাকে। শুনতে পাই তোমাদের রাজকুমারীকে তো এক রকম ত্যাগই করেছে। শালার জমিদার!

মুখাগ্রে যেন কথা আসে না জগমোহনের। লোকটি মিথ্যা বলছে না তো! শোনা মাত্র কেমন যেন অন্য মানুষে পরিণত হয়ে গেল জগমোহন। কপালের ঘাম মুছলো দুই হাতের তালুতে। কি দুর্বিসহ সূর্যোত্তাপ! হাওয়া লেশ মাত্র নেই।

—মশায়গণ, আপনাদের পরিচয় কি? ... বললে জগমোহন। হতাশ সুরে।

ইতিমধ্যে দলস্থ একজন অকস্মাৎ ... চীৎকার করে,—আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে! আমার জাত-কুল-মান আর নেই।

জগমোহন রীতিমত বলশালী। তবুও চমকে ওঠে এই অপ্রত্যাশিত ও সুতীব্র কণ্ঠস্বর শুনে।

মাতব্বর গোছের লোকটিই কথা বলে। মিনতি ... বলে,—দত্তমশাই আপনি উতলা হন কেন? লোক... ডর নাই আপনার, আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাবেন? ... মেয়েটার বে দেওয়া যে দায় হবে! কথা বলতে ... জগমোহনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। বলে,—আমাদের পরিচয়? আমরা পাশের গ্রামের বাসিন্দা। ঐ দত্তমশাইয়ের একমাত্র বিধবা মেয়েকে গত রাত্রে ঘর থেকে পাইক পাঠিয়ে ধরে এনে জমিদার কৃষ্ণরাম আটকে রেখেছে। খবরটি কৃষ্ণরামের শ্বশুরকুলকে জানিও। কি লজ্জার কথা! তিন দিন অতীত না হ'লে খালাস দেবে না!

হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে জগমোহন।

শুনে কানে আঙুল দিতে ইচ্ছা হয়। বলে,—হাঁ, শুনেছি মানুষটি না কি নীচ! তবে তো মশায়দের ঘোর বিপদ?

পৃথিবী কত বিশাল!

সমগ্র দুনিয়ায় এত দেশ ছিল, আর কোথাও ঠাঁই মেলেনি! রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী আছেন গড় মান্দারণে! কৃষ্ণরামের জমিদারীর চৌহদ্দীতে,—এক পরিত্যক্ত ভগ্নগৃহে নির্ব্বাসন-বাস করছেন রাজকুমারী? কৃষ্ণরাম কি নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন! গড় মান্দারণ, সে যে অনেক দূরের পথ! জগমোহন লাঠিয়ালের সকল আকাঙ্ক্ষা চকিতে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। নৌকা এবং পদব্রজে এতটা পথ জগমোহন বৃথাই অতিক্রম করলো! পণ্ডশ্রম করলো! সপ্তগ্রাম যদিও বা অতি কষ্টে পৌঁছালো, রাজকুমারীর দর্শন পাওয়া গেল না? রাজকুমারীর শুভাশুভ কিছুই জানা গেল না? জগমোহন বুঝি চোখে অন্ধকার দেখে হতাশার আবেগে। এখন কি কর্ত্তব্য? সুতানুটীতে প্রত্যাবর্ত্তন ব্যতীত আর কি কর্ত্তব্য?

বিক্ষুব্ধ মানুষগুলি কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়। পথের বাঁকে তাল, খেজুরের সারি। কুল গাছের বন। মানুষগুলি দৃষ্টির আড়ালে চ'লে গেলেও তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। জগমোহন অবিচলিতের মত দাঁড়িয়ে থাকে। রাজমাতাকে সে মুখ দেখাবে কোন্ লজ্জায়? পরম অস্বস্তির শ্বাস ফেলালো জগমোহন। ইদিক-সিদিক দেখলো আশাহত দৃষ্টিতে। কেউ কোথাও নেই, কেবলমাত্র উচ্চ-নীচ সবুজ বৃক্ষরাজি—যেন স্বেচ্ছায়, যার যেথা খুশী মাথা তুলেছে—বহু বিচিত্র

বৃক্ষপত্রসমূহ ধূলায় ধূলায় ম্লান হয়ে আছে। আসল রঙ সহজে দেখা যায় না। বর্ষার জল বিনা এ মলিনতা হয়তো মোচন হবে না।

যন্ত্রচালিতের মতই অগ্রসর হ'তে থাকে জগমোহন।

অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে এগোয়। বংশবাটির গঙ্গার তীর যেদিকে, সেদিকের পথ ধ'রে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। একবার আকাশে চোখ তোলে জগমোহন। বেলা এখন কত, তাই দেখে হয়তো। শুভ্র সমুজ্জ্বল আকাশে কি তীব্র সূর্য্যালোক!

বিলাসবাসিনীকে মুখ দেখাবে কি সাহসে! পথে যেতে যেতে জগমোহন পিছন দিকে দেখে। জমিদার কৃষ্ণরামের বসতবাটী পিছনে। লাল ইমারত—উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত যেন এক দুর্গপুরী!

সপ্তগ্রাম থেকে গড় মান্দারণ প্রায় পঁচিশ ক্রোশের পথ। আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত, আমোদর নদের তীরদেশে গড় মান্দারণ অবস্থিত। বিন্ধ্যবাসিনী আছেন সেখানেই—এই দুঃসংবাদ জ্ঞাত হ'লে রাজমাতা যেমন আদেশ করেন তেমনই করা যাবে। আপাততঃ অন্য কোন উপায় খুঁজে মেলে না।

হাতের বংশদণ্ড বিস্তার করলো জগমোহন।

এক প্রান্ত তার হাতে, অন্য প্রান্ত মৃত্তিকায়। লাফ দিতে দিতে চললো লাঠিয়াল। জঙ্গলাকীর্ণ পথে দস্যু ও তস্করের ভয়—শ্বাপদের ভয়। গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হ'ল। বিদ্যুৎবেগে একেক লম্ফ দেয় জগমোহন। ক্ষণিকের মধ্যে কতটা পথ অতিক্রান্ত হয়। আর এক মুহূর্ত্ত বৃথা কালক্ষেপ নয়। রাজমাতা যে অধীর প্রতীক্ষায় দিন গুনছেন সুতানুটীতে। দুর্ব্বার-গতিতে চললো জগমোহন। সশব্দ পদক্ষেপে।

গাছে গাছে পাখীর বাসায় পক্ষি-শাবক সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে লাঠিয়ালের পদশব্দে। বন্যবরাহ এবং শৃগালের পাল ছুট দেয়, গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করে ভয়ে ভয়ে।

মায়ের মন! রাজমাতা বিলাসবাসিনী ক্ষণেকের জন্যও স্থির হন না। অধিকক্ষণ কোন কিছুতে মন বসে না। একাদশীর উপবাস ভঙ্গ করতে বসেও থেকে থেকে অস্থিরচিত্ত হন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা বিলুপ্ত হয়েছে। নিয়ম রক্ষা করতে হয়, তাই বুঝি আহারে বসেছিলেন। রাজমাতার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে আছে। অবিরাম কান্নার প্রতিফল ফুটেছে চোখে।

তল্লাটে এখন যেন কোন শূদ্রজাতি না আসে। দ্বারে দ্বারে পাহারা বসেছে।

রন্ধনশালার সংলগ্ন একটি কক্ষে রাজমাতা আহারে বসেছেন। দুগ্ধ, ফল আর মিষ্টান্নের ভিন্ন ভিন্ন পাত্র তাঁর সমুখে। রাজগৃহের অন্দরমহলে এখন সাড়াশব্দ নেই—শান্ত ও গম্ভীর আবহাওয়া। পাকশালায় নিযুক্ত ব্রাহ্মণকন্যাগণের মধ্যে ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়। পালিত আত্মীয়াদের কেউ কেউ বিলাসবাসিনীর পরিচর্য্যায় রত। কেউ হাত-পাখা দোলায়। কেউ ছিলিমচি এগিয়ে দেয়। কেউ পানীয় গঙ্গাজল পরিবেশন করে।

—মেজরাণী, তোমার ছোট বোনকে দেখি না কেন? ছোটরাণী কোথায়?

কথায় কথায় প্রশ্ন করলেন রাজমাতা বিলাসবাসিনী কা'কে যেন খুঁজলেন দৃষ্টিচালনায়। দেখতে না য়েছে আহারের পাত্রে চোখ ফেরালেন। রকর্তা।

Heinrich

রাজমাতার আসনের অদূরে, পৃথক্ এক ত নীরবে বসেছিলেন এবং সকল কিছু পর্য্যবেক্ষণ রথ তখন তাঁর মুখে এতক্ষণে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়। তিনি অ বিদেশীদের নন, রাজাবাহাদুর কালীশঙ্করের দ্বিতীয়া পত্নী বলেন যে দেবী। তিনি সলাজকণ্ঠে বললেন,—ছোটরাণী সর্ব্বজ অর্থাৎ ধর্ম্মকর্ম্মে বড় বেশী আগ্রহ। ঘরে সে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি স্থাপন করেছে। এখনও রাধাকৃষ্ণের পূজাতেই হয়তো ব্যস্ত আছে।

সর্ব্বমঙ্গলা ও সর্ব্বজয়া। মেজরাণী ও ছোটরাণী। রাজাবাহাদুর কালীশঙ্করের আরও দুই সহধর্ম্মিণী। ধর্ম্মপত্নী। একই গৃহের দুই সহোদরা কুলীনকন্যা।

রাজমাতা আনন্দাতিশয্যে মৃদু হাসলেন। পরিতৃপ্তির হাসি। বললেন,—বেশ ভাল কথা। ঈশ্বর সর্ব্বজয়াকে সুখী করুন। কথা বলতে বলতে কিয়ৎক্ষণ বিরত থেকে বললেন,—জানো মেজরাণী, আমরা ঘোর শাক্ত। আমাদের নাটমন্দিরে এ জন্য শক্তির প্রতিষ্ঠা। মা পতিতপাবনী আছেন নাটমন্দিরে। পূজা-পার্ব্বণে মায়ের মন্দিরে তাই মোষবলি হয়।

মেজরাণী সর্ব্বমঙ্গলার মুখে কোন কথা নেই। স্বভাবতঃই তিনি স্বল্পভাষী।

তিনি কোন কথা বলেন না। শ্বশ্রূমাতার কথা শোনেন। আর মেঘনীল রঙের ঢাকাই শাড়ীর অঞ্চল-প্রান্ত আঙুলে জড়াতে থাকেন। মেজরাণীর কাজল-কালো চোখে গভীর দৃষ্টি রাশি রাশি কুঞ্চিত এলোকেশে যেন আকাশের বিস্তার শুভ্র দেহবর্ণে স্বর্ণ-আভা। দেহের কুত্রাপি অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য নেই। হাতের মণিবন্ধে শুধু মাত্র জড়োয়া কঙ্কণ লোহা এবং শাঁখা। কণ্ঠের এক সারি মুক্তাহার বক্ষমঃ স্পর্শ করেছে। সর্ব্বমঙ্গলার অধরোষ্ঠ তাম্বুলরাগে রঞ্জিত পান এবং তাম্বুলের প্রতি তাঁর নাকি সবিশেষ আসক্তি মেজরাণী পানচর্ব্বণে ক্ষণেক বিরত হয়ে বললেন,—ননদি বিন্ধ্যবাসিনীর জন্য কি কোন পাকা ব্যবস্থা হ'ল?

নিশ্চিন্তার পরিতৃপ্ত হাসির উদ্রেক হয় বিলাসবাসিনী মুখে। তিনি বলেন,—বড়রাণী আজ বলেছে কালীশঙ্করকে রাজা নাকি আজই পরামর্শ করবে আমার কাশীর সঙ্গে। দে যাক্ কি হয়। জগমোহন লেঠেলটা এলে তো বুঝি? সে তো ফেরে না!

চুপচাপ থাকেন সর্ব্বমঙ্গলা।

মুখের মধ্যে পাণ, চর্ব্বিতচর্ব্বণ থামে না। ঈষৎ-চঞ্চল ওষ্ঠ! ঢাকাই শাড়ীর আঁচল আঙুলে জড়াতে থাকেন আনতদৃষ্টিতে।

রাজমাতা ফলের হাত ধৌত করেন। ছিলিমচিতে জল দেয় এক ব্রাহ্মণকন্যা। বিলাসবাসিনী বললেন,—মা পতিতপাবনীর দয়ায় এখন দুই ভাই একমত হয় তবেই না!

অন্য কথা নেই মেজরাণীর। হাঁ, না কিছুই বলেন না।

—চর্ব্বণও বন্ধ হয় না। মুখের চঞ্চলতায় নাকচাবির এ-চিক করে। হাত-পাখার ঘন ঘন হাওয়ায় মাসুমেঘনীল ঢাকাই শাড়ীর প্রান্ত উড়তে থাকে।

শুনে জং কুন্তল দুলতে থাকে। যদিও সর্ব্বমঙ্গলা নীরব।

হয়ে বিলাসবাসিনী মিষ্টান্নের পাত্র টেনে নিলেন। বললেন, . . মনেই বললেন,—দুই ভাই তো এক জাতের নয়! সেই তো আমার দুঃখু।

এক কাণ দিয়ে কথা প্রবেশ করে। অন্য কাণ দিয়ে বেরিয়ে যায়। মেজরাণী শোনেন কি শোনেন না। তাঁর মুখের চাঞ্চল্যে নাকচাবির হীরা চিক-চিক করে। এখনও কতক্ষণ এই এক ভাবে বসে থাকতে হবে কে জানে? যতক্ষণ না রাজমাতার আহার শেষ হয়। কতক্ষণ ধ'রে কত খুঁটিয়ে খুঁটিয়েই না খান বিলাসবাসিনী!

—দুই ভাই তো এক জাতের না?

রাজমাতার এই ক'টি কথা কিন্তু কাণে নিয়েছেন মেজরাণী। তিনিও মনে মনে চিন্তিত হয়েছেন দুই ভাইয়ের প্রকৃতির বিভিন্নতার কথা শুনে।

দুই ভাই, দুই প্রকৃতির।

কালীশঙ্কর ও কাশীশঙ্কর যেন দুই পৃথিবীর মানুষ। আকৃতির সামঞ্জস্য ব্যতীত আর কোন সমতা নেই।

তা না হ'লে রাজাবাহাদুর কালীশঙ্কর, দরবারের লাগোয়া মজলিস-ঘরে এই দিন-দুপুরেই পার্ষদসহ পানক্রিয়ায় আত্মমগ্ন আর ছোটকুমার কাশীশঙ্কর কি না অশ্বপৃষ্ঠে গড় গোবিন্দপুরের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন! ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসায়-সূত্রে আবদ্ধ হতে গেছেন।

সুতানুটী থেকে গড় গোবিন্দপুর।

আঁকাবাঁকা, বন্ধুর ও দুর্গম পথ। গড়খাত ও পরিখা যেখানে-সেখানে। উঁচু-নীচু, কর্দ্দমাক্ত, পিচ্ছিল কালীঘাটের পথ ধ'রে সদলবলে অশ্ব ছুটিয়েছিলেন কাশীশঙ্কর। অশ্বের দুরন্ত বেগে উষ্ণীষধারী ছোট কুমারের দেহের সম্মুখভাগ ঝুঁকে পড়েছিল।

গড় গোবিন্দপুরের গঙ্গাতীরে তখন সে কি উত্তেজনা! ঘাটের খালাসীদের চীৎকার। মাঝি-মাল্লাদের হামলা।

ইংরাজ কোম্পানীর হাউসের কাছাকাছি কাদামাটির প্রাচীর উঠছে। আত্মরক্ষা না নিরাপত্তার মাড্-ওয়াল্ উঠছে? বর্ষার আগেই কাজ শেষ করতে হবে। কুলি আর মজুরের ঠিকা লোকের অভাবে যত সব, দেশী চোর, জুয়াচোর, দাঙ্গাবাজ আর খুনী আসামী কাজে লেগেছে। এক দল কাদার ঝুড়ি বয়ে আনে গঙ্গাতীর থেকে। গঙ্গামাটি আনে আর ঢেলে দেয় মাটির স্তূপে। এক দল প্রাচীর গড়ে।

একেক দলে ত্রিশ জন আসামী। বিলকুল কালা আদমী। কলকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুরের ভাবী ইংরাজ জমিদার, অর্থাৎ ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষের গ্রেফতারী আসামী। যত সব চোর, জুয়াচোর, দাঙ্গাবাজ আর খুনী আসামী। একেক দলে ত্রিশ জন। ত্রিশ জনের একেক পা একই লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ। প্রতি ত্রিশ জনের জন্য একেক জন বন্দুকধারী দেশী ফৌজ।

ঘাটের মাঝি-মাল্লা ও খালাসী আর কোম্পানীর আসামীদের উত্তেজনা ও আর্ত্তনাদে কাক-চিল বসতে পায় না কোথাও। কত অসংখ্য মাস্তুল দেখা যায় ভাগীরথীবক্ষে। হরেক রকম সদাগরী নৌকার ভীড়ে গঙ্গার জল দেখা যায় না। খালাসী আর আসামীদের চীৎকারে কান পাতা দায়।

কোম্পানীর হাউসের সন্নিকটে পৌঁছে অশ্বের গতি সংযত করেছেন কাশীশঙ্কর। সজাগ কর্ণে মানুষের কণ্ঠরোল শুনছেন। মাঝি-মাল্লা ও খালাসীদের কি উচ্চ কণ্ঠস্বর! কালো আসামীগুলোর মুখে অশ্রাব্য ভাষা। ইংরাজকে গাল পাড়ছে কালো রং নেটিভ প্রজারা!

[ক্রমশঃ।

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

বিনয় ঘোষ

[অনুবাদ]

হিন্দুস্থানের হিন্দুদের কথা (৪)

বেদের শিক্ষা হ'ল—ভগবান এই পৃথিবী সৃষ্টি করবেন সঙ্কল্প করলেন, কিন্তু প্রথমে তিনজন-অবতার সৃষ্টি করলেন তার জন্য। এক জন ব্রহ্মা, যিনি সর্বভূতে বিরাজমান; এক জন বিষ্ণু এবং এক জন মহাদেব। ব্রহ্মাকে দিলেন তিনি সৃষ্টির দায়িত্ব, বিষ্ণুকে দিলেন পালনের দায়িত্ব এবং মহাদেবকে দিলেন সংহারের দায়িত্ব। ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা এবং মহাদেব ধ্বংসের দেবতা। ভগবানের আদেশে ব্রহ্মাই চতুর্বেদ সৃষ্টি করলেন এবং নিজেও সেইজন্য চতুর্মুখ হলেন।

ইয়োরোপীয় পাদ্রী সাহেবদের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। তাঁরা বলেন যে এই ত্রয়ীর কল্পনা হিন্দুধর্মের একটি অন্যতম বিশেষত্ব। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় রহস্যাবৃত, কিন্তু তা নয়। তিন জন যদিও স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট, তাহলেও তাঁরা আসলে এক ও অভিন্ন। এই বিষয়ে হিন্দু পণ্ডিতদের সঙ্গেও আলোচনা ক'রে দেখেছি, তাঁরা এমন ভাষায় ব্যাখ্যা করেন যে তা থেকে তাঁদের পরিষ্কার মতামত কি তা জানা যায় না। (১)

(১) মুইর তাঁর 'Original Sanskrit Texts'-এর মধ্যে এ-সম্বন্ধে যা উদ্ধৃত করেছেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য মনে হয়:

"I shall declare to thee that form composed of Hari and Hara (Vishnu and Mahadeva) combined, which is without beginning, middle or end, imperishable, undecaying. He who is Vishnu is Rudra: he who is Rudra is Pitamaha (Brahma); the substance is one, the gods are three: Rudra, Vishnu, and Pitamaha."—Muir's "Original Sanskrit Texts"—vol IV, p. 237.

মোগল-যুগের ভারত

তাঁরা বলেন যে তিন জন একই ভগবানের অংশবিশেষ এবং তাঁরা দেবতা। কিন্তু "দেবতা" বলতে তাঁরা ঠিক কি বোঝেন তা বলা যায় না। অন্যান্য পণ্ডিত যাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেছি তাঁরাও ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে বলেন যে তিন জনই একই দেবতা, কেবল তিন রূপে কল্পনা করা হয়েছে মাত্র। এক জন সৃষ্টিকর্তা, এক জন ত্রাণকর্তা, এক জন সংহারকর্তা।

আমার সঙ্গে রেভারেণ্ড রোয়া বা রথের (Father Heinrich Roth) পরিচয় ছিল। জার্মান জেসুইট ফাদার রথ তখন আগ্রায় ছিলেন। সংস্কৃতভাষায় তাঁর মতন পণ্ডিত বিদেশীদের মধ্যে তখন কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি বলেন যে এক দেবতার তিন রূপের কল্পনা নয় শুধু, দ্বিতীয় জনের অর্থাৎ বিষ্ণুর আবার দশাবতার রূপ আছে। এই দশাবতার রূপ সম্বন্ধে যেটুকু তিনি হিন্দু পণ্ডিতদের কাছ থেকে এবং অন্যান্য পাদ্রীদের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন, তা আমাকে বললেন। পৃথিবীতে এক একবার সঙ্কট দেখা দিয়েছে, ধ্বংসের মুখে এগিয়ে গেছে পৃথিবী। যতবার এরকম যুগসঙ্কট দেখা দিয়েছে, ততবার বিষ্ণু বিভিন্ন অবতারের রূপ ধ'রে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং মানুষকে সঙ্কট থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এরকম ন'বার সঙ্কট দেখা দিয়েছে, এবং ন'বার বিষ্ণু নয় অবতারের রূপে আবির্ভূত হয়েছেন মানুষের মুক্তির জন্য। (২) বিষ্ণুর অষ্টম অবতার-রূপে আবির্ভাবের কাহিনীটি সবচেয়ে রোমাঞ্চকর (কৃষ্ণাবতার)। পৃথিবীতে দৈত্যদানবের প্রতিপত্তি যখন খুব বেড়ে গেল, তখন এক কুমারীর গর্ভে মানবাকারে বিষ্ণু অবতাররূপে জন্ম নিলেন। দেবদূতরা তাঁর আবির্ভাবে উৎফুল্ল হয়ে নৃত্যোৎসব করল। সারা রাত ধ'রে আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হ'ল অনর্গল। কাহিনীর সঙ্গে খৃষ্টানদের পৌরাণিক কাহিনীর যেন বেশ সাদৃশ্য আছে মনে হয়। যাই হোক, কাহিনীটা বলি। অবতার-রূপে ভূমিষ্ঠ হয়ে, দানবের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন বিষ্ণু। দানবের বিশাল মূর্তিকে আকাশের সূর্যকে আচ্ছাদন ক'রে ফেলল। অন্ধকার হয়ে গেল পৃথিবী। বিষ্ণুর অবতার তাকে বধ করলেন। ভূপৃষ্ঠে আছাড় খেয়ে

(২) বার্নিয়েরের 'অবতার' সম্বন্ধে আলোচনা প'ড়ে পাঠকরা হয়ত কৌতুক বোধ করবেন। কিন্তু একজন বিদেশী বিভাষী পর্যটকের পক্ষে এত গভীর ভাবে হিন্দুধর্মের মর্মকথা উপলব্ধি করার চেষ্টার মধ্যে যে আন্তরিকতার পরিচয় আছে, তা সত্যই অতুলনীয়। অনেক বিষয়ে বার্নিয়েরের স্পষ্ট ধারণা হলেও, তিনি যে হাস্যকর বিপরীত ধারণা করেছিলেন, তা নয়। তাঁর ধারণার অনেকটাই সত্য। ঠিক যে তিনি বুঝতে পারছেন না, এ-সম্বন্ধে সচেতন হয়েই তিনি লিখেছেন। 'অবতার' রূপ সম্বন্ধে বার্নিয়ের যা বলতে চেয়েছেন, তাঁর চমৎকার ব্যাখ্যা 'গীতা'য় করা হয়েছে। যেমন—

> যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

পড়ল যখন দানব, তখন কেঁপে উঠলো সারা পৃথিবী। মাটি ফুঁড়ে রসাতলে নরকে প্রবেশ করল দৈত্য। অবতার আবার উর্ধ্বে স্বর্গে চ'লে গেলেন। হিন্দুরা বলেন, বিষ্ণুর দশম অবতার মুসলমান যবনদের হাত থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। একথা শাস্ত্রে লেখা নেই অবশ্য, এমনি প্রচলিত কিংবদন্তী।

হিন্দুরা বলেন যে, তৃতীয় দেবতা মহাদেবেরও পৃথিবীতে আবির্ভাবের কাহিনী আছে। কাহিনীটি এই: এক রাজার এক কন্যা ছিল। কন্যা যখন বিবাহযোগ্যা হ'ল, তখন রাজা একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে কি রকম পতি সে বরণ করতে চায়। কন্যা উত্তর দিল যে দেবতা ছাড়া অন্য কাউকে সে পতিরূপে বরণ করবে না। কন্যার এই উত্তর শুনে মহাদেব অগ্নিরূপে আবির্ভূত হলেন এবং রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী হলেন। রাজা তাঁর কন্যাকে মহাদেবের প্রস্তাবের কথা বললেন এবং কন্যাও সম্মতি জানাল বিনা দ্বিধায়। মহাদেব অগ্নিরূপেই রাজসভায় উপস্থিত হলেন এবং যখন দেখলেন যে সভাসদরা বিবাহের বিরোধিতা করছেন তখন তিনি তাঁদের দাড়িতে প্রথম আগুন ধরিয়ে দিলেন। তারপর তাঁদের দগ্ধ ক'রে ভস্ম করলেন। রাজকন্যার সঙ্গে মহাদেবের বিবাহ হ'ল। (৩) বিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে হিন্দুরা বলেন যে প্রথমে বিষ্ণু সিংহরূপ ধারণ করে-ছিলেন। দ্বিতীয় রূপ বরাহের, তৃতীয় কূর্মের, চতুর্থ নাগের, পঞ্চম হ্রস্বকায় বামনের, ষষ্ঠ নরসিংহের, সপ্তম ড্রাগনের, অষ্টম কৃষ্ণের, নবম হনুমানের, এবং দশম বীর অশ্বারোহীর। (৪)

যেভাবেও রথ যে বেদজ্ঞ পণ্ডিত এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা যে সত্য, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। তাঁরই কাছ থেকে শোনা পুরাণ কাহিনী আমি এখানে বর্ণনা করেছি। এ বিষয়ে অনেক বেশী লিখে ফেলেছি আমি, এবং হিন্দুদের দেবদেবী বা দেবমূর্তি যা তাদের দেবালয়ে দেখেছি, তা স্কেচ ক'রে নিয়েছি। শুধু তাই নয়, তাদের দেবভাষা যে সংস্কৃত-ভাষা, তাও আমি নকশা ক'রে নিয়েছি। ফাদার কার্কারের (Father Kirker) "China Illustrata" গ্রন্থে এ-সব লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। (৫) এখানে তার পুনরাবৃত্তি আর করব না। ফাদার রথ যখন রোমে ছিলেন তখন কার্কার তাঁর কাছ থেকে অনেক মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। আমার মনে হয়, ঐ বইখানি যদি একবার আপনি পড়েন তাহ'লে অনেক কথা জানতে পারেন। "অবতার" সম্বন্ধে একটি কথা এখানে ব'লে শেষ করি। ফাদার রথ যেভাবে "অবতার" কথার প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা করেছিলেন, তা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। একদল পণ্ডিত "অবতার" কথার এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন: দেবতারা বিভিন্ন অবতারের রূপ ধ'রে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হ'ন এবং নানারকম দৈবশক্তি ও কার্যকলাপের পরিচয় দিয়ে বিদায় নেন। অন্যান্য পণ্ডিতেরা বলেন: পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব ও বীর যাঁরা তাঁদের মৃত্যুর পর আত্মা অন্য কোন দেহের ভিতরে আশ্রয় নেয়। তখন সেই দেহ এক ঐশ্বরিক রূপ ধারণ করে সেই আত্মার সংস্পর্শে। মহামানবদের আত্মা এই ভাবে যখন ভিন্ন দেহান্তর্গত হয়, তখনই সে দেবতার রূপ ধারণ করে। আত্মার সঙ্গে দেবতার যে একটা সম্পর্ক আছে, একথা হিন্দুরা যে ভাবেই হোক, স্বীকার করেন। মানবাত্মা দেবতারই অংশবিশেষ, এই হ'ল হিন্দুদের ধারণা।

কোন কোন পণ্ডিত অবতারবাদের আরও সূক্ষ্ম জটিল ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা বলেন যে দেবতার বিভিন্ন অবতারের কল্পনা তাঁর বিভিন্ন গুণাগুণ প্রকাশের কৌশল মাত্র। অবতার কথার এছাড়া কোন শব্দগত আভিধানিক অর্থ নেই। আধ্যাত্মিক অর্থে অবতার কথার তাৎপর্য বুঝতে হবে। খুব বিচক্ষণ পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে অবতারের কল্পনার মতন আজগুবি কল্পনা আর হয় না। শাস্ত্রকাররা এই সব আজগুবি কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন, সাধারণ লোককে ধর্মের আওতার মধ্যে ধ'রে রাখবার জন্য। তাঁরা বলেন যে মানুষের আত্মা যদি দেবতার অংশবিশেষ হয়, তাহ'লে অবতারের সমস্ত কল্পনা অর্থহীন হয়ে যায় এবং ব্যাপারটা এই দাঁড়ায় যেন আমরাই আমাদের পূজার্চনার জন্য নানারকম ধর্মশাস্ত্র রচনা করেছি, দেবদেবীর কল্পনা করেছি। তা হয় না। অবাস্তব কথা ও যুক্তি অর্থহীন।

পাদ্রী কার্কার ও রথের কাছে হিন্দুধর্মের এই বিবরণের জন্য যেমন আমি বিশেষ ভাবে ঋণী, তেমনি মঁশিয়ে লর্ড ও আব্রাহাম রোজারের কাছেও আমার ঋণ কম নয়। (৬) এই পাদ্রী

(৩) গিরিরাজ হিমালয়-দুহিতা উমার সঙ্গে মহাদেবের শুভ-মিলনের উপভোগ্য বর্ণনা করেছেন বার্নিয়ের।

(৪) বার্নিয়ের অনেক চেষ্টা ক'রে বিষ্ণুর দশাবতার রূপ সম্বন্ধে যা নিজে বুঝেছেন, তাই বর্ণনা করেছেন এখানে। বর্ণনাটি উপভোগ্য হলেও, যথার্থ নয়। কিন্তু তাহ'লেও তিনি যে অনেকটা নির্ভুল বর্ণনা দিয়েছেন তাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। বিষ্ণুর 'দশাবতার' রূপের এই সংস্কৃত শ্লোকটির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত:

মৎস্যঃ কূর্মো বরাহশ্চ নরসিংহোহথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কীতি তে দশ॥

—অর্থাৎ মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, রাম (পরশুরাম), রাম (দাশরথি রাম), রাম (বলরাম), বুদ্ধ ও কল্কি—এই হ'ল বিষ্ণুর দশাবতার।

(৫) ফাদার কার্কারের "China Illustrata" গ্রন্থ আমস্টার্ডামে ১৬৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের মধ্যে সংস্কৃত অক্ষরের পুরো পাঁচ পৃষ্ঠা তাম্রখোদাই প্রতিলিপি ছাপা হয়। ইয়োরোপে সংস্কৃত অক্ষর প্রথম মুদ্রিত হরফে এই গ্রন্থেই ছাপা হয়। তার আগে আর কোন গ্রন্থে মুদ্রিত হরফে সংস্কৃত ভাষা রূপায়িত হয়নি। হবার কথাও নয়, কারণ ১৬৬৭ সালে মুদ্রণের সামান্য প্রচলন হয়েছিল মাত্র। আমাদের দেশে তখনও মুদ্রণ ও মুদ্রিত হরফে বই ছাপা আরম্ভ হয়নি। সুতরাং "China Illustrate" গ্রন্থের এই পাঁচ পৃষ্ঠা সংস্কৃত মুদ্রিত হরফের তাম্রখোদাই প্রতিলিপি হ'ল, সারা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম প্রকাশিত সংস্কৃত 'মুদ্রিত হরফের নমুনা। পাদ্রী কার্কার উর্জবুর্গ "Wurtzburg" বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষার "Riental Languages" অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। বিদেশী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে ফাদার কার্কার আদিযুগের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত।

(৬) সুরাটের চ্যাপলেন ছিলেন হেনরী লর্ড (Henri Lord)। তিনি এসব বিষয়ে কয়েকখানি বইও লিখেছিলেন। তার মধ্যে

পণ্ডিতদের মূল্যবান গ্রন্থাদি থেকে হিন্দুস্থানের হিন্দুদের সম্পর্কে অনেক মূল্যবান উপকরণ আমি সংগ্রহ করেছি, কিন্তু তাঁরা যতটা পরিশ্রম ক'রে ও ধৈর্য ধ'রে সেগুলির সুবিন্যস্ত বিবরণ দিয়েছেন, আমার পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব হবে না। এখানে তাঁদের সেই বিবরণ থেকে আমি যতটা সম্ভব হিন্দুদের বিদ্যা ও বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলব।

সংস্কৃতচর্চা ও কাশীধামের কথা

গঙ্গানদীর তীরে কাশী। যেমন তার প্রাকৃতিক অবস্থান, তেমনি মনোরম পরিবেশ! এই কাশী বা বারাণসীই হ'ল হিন্দুদের সংস্কৃত বিদ্যা ও শাস্ত্রচর্চার প্রধান কেন্দ্র। "It is the Athens of India, whither ressrt the Brahmans and other devotes ; who are the only persons who apply thin minds to study," এই বারাণসীই হ'ল ভারতবর্ষের এথেন্স। এই বারাণসীতে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ভক্তদের সমাগম হয়। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সমাগমতীর্থ। ব্রাহ্মণরাই মনপ্রাণ দিয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শহরের মধ্যে আমরা কলেজ বা স্কুল বলতে যা বুঝি আজকাল, তা নেই। যেমন বিশ্ববিদ্যালয় থাকে, তার অধীন স্কুল-কলেজ থাকে, তেমন কিছু নেই বারাণসীতে। বিদ্যালয় যা আছে তা প্রাচীন যুগের বিদ্যালয়ের মতন। গুরুমশাই ও শিক্ষকরা শহরের বিভিন্ন স্থানে বা শহরের বাইরে থাকেন, এবং প্রধানতঃ বণিকরাই থাকেন শহরের মধ্যে। গুরু মহাশয়ের কাছে ছাত্ররা থেকে বিদ্যাভ্যাস করে। সব গুরুমশায়ের ছাত্রসংখ্যা সমান নয়। কারও ছাত্রসংখ্যা মাত্র চার জন, কারও পাঁচ ছয় জন, আবার কারও বারো কি পনের জন। তার বেশী ছাত্র কারও নেই। ছাত্ররা সাধারণতঃ দশ বছর থেকে বারো বছর পর্যন্ত গুরুর কাছে থাকে এবং সেই সময় গুরুমশাই তাদের ধীরে ধীরে নানা শাস্ত্রে শিক্ষাদান করেন। ধীরে সুস্থে শিক্ষা দেন, তার কারণ সাধারণতঃ দেখা যায় গুরুমশাইরা খুব যে পরিশ্রমী ও কর্মতৎপর, তা নন। ধীরে সুস্থে, মন্থর গতিতে তাঁরা সব কাজকর্ম করেন। এর কারণ বোধ হয় তাঁদের বিশেষ খাদ্য এবং গ্রীষ্মের প্রাবল্য। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের উত্তাপের মধ্যে, ঐ ধরণের খাদ্য খেয়ে, খুব বেশী কাজকর্ম করা যায় ব'লে মনে হয় না। ছাত্রদের মধ্যে কোন পরীক্ষালব্ধ সম্মান বা কৃতিত্বের জন্য কোন প্রতিযোগিতা বা রেষারেষি ব'লে কিছু নেই, যেমন আমাদের দেশের ছাত্রদের মধ্যে আছে। শিক্ষার্থীরা সেই জন্য গুরুমশাইয়ের কাছে থেকে শান্ত সংযত ভাবে বিদ্যাভ্যাস করতে পারে এবং অধ্যয়ন ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হয় না। স্থানীয় ধনিক ও বণিকরাই সাধারণতঃ তাদের ভোজ্যদ্রব্যাদি পাঠিয়ে দেন এবং তারা পিঁপড়ের মতন খুব সাদাসিধে খাদ্য পেলেই খুশী হয়।

প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হয় সংস্কৃত ভাষা। এই সংস্কৃত ভাষা নাকি এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা ছাড়া অন্য কেউ ভাল জানেন না এবং হিন্দুস্থানের লোক যে ভাষায় বাক্যালাপ করে তার সঙ্গে এই ভাষার কোন সম্পর্ক আছে ব'লে মনে হয় না। এই সংস্কৃত ভাষার অক্ষরই প্রথম পাদ্রী কাকার মুদ্রিতরূপে প্রকাশ করেন, পাদ্রী রথের সাহায্যে। "সংস্কৃত" কথার অর্থ হ'ল যা অমার্জিত বা রূঢ় নয়, অর্থাৎ যা পরিমার্জিত ও পরিশুদ্ধ, এ রকম একটি ভাষা। হিন্দুদের বিশ্বাস, ভগবান ব্রহ্মা প্রথমে চতুর্বেদ সৃষ্টি করেন যে-ভাষায়, সেই ভাষা হ'ল সংস্কৃত ভাষা। সেই জন্য সংস্কৃত ভাষা হিন্দুরা দেবভাষা ও বিশুদ্ধ পবিত্র ভাষা ব'লে মনে করেন। তাঁদের ধারণা, ব্রহ্মার মতনই এই সংস্কৃত ভাষা অনাদি ও অনন্ত। ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে এরকম আজগুবি কথায় অবশ্য বিশ্বাস করা যায় না। সংস্কৃত ভাষা যে প্রাচীন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, সংস্কৃত ভাষায় রচিত হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থাদির মধ্যে রীতিমত প্রাচীন গ্রন্থও অনেক আছে। দর্শনশাস্ত্র, আয়ুর্বেদশাস্ত্র এবং অন্যান্য আরও অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছে। কাশীতে এই সব সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের বিশাল একটি পাঠাগার দেখেছি।

শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত ভাষায় কিছুটা পারদর্শী হবার পর তারা 'পুরাণ' পাঠ করে। সংস্কৃত ব্যাকরণে বেশ খানিকটা দখল না থাকলে 'পুরাণ' পাঠ করা বা অর্থ বোঝা সম্ভব নয়। বেদের সারকথা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা ক'রে পুরাণের মধ্যে বলা হয়েছে।* বেদ বিরাট গ্রন্থ, অন্ততঃ আমি যে বেদ কাশীতে দেখেছি তা যদি সত্যিই বেদ হয়, তাহ'লে তার বিরাটত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। 'বেদ' এত দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ গ্রন্থ যে আমার আগা দানেশমন্দ খাঁ অনেক চেষ্টা ক'রেও এক কপিও সংগ্রহ করতে পারেননি। হিন্দুরা অত্যন্ত সাবধানে বেদ বা অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ লুকিয়ে রেখে দেয়, কারণ তাদের ধারণা, মুসলমানরা জানতে পারলে সব পুড়িয়ে নষ্ট ক'রে ফেলবে।

পুরাণ পাঠ শেষ হবার পর শিক্ষার্থীরা দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করে। দর্শনশাস্ত্র খুব তাড়াতাড়ি আয়ত্তে আনা রীতিমত কঠিন। তার উপর স্বভাবশৈথিল্যও শিক্ষার অগ্রগতির পথে অন্যতম অন্তরায়। ইয়োরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বা শিক্ষক অধ্যাপকরা যে রকম তৎপর, হিন্দুস্থানের টোলের গুরুমশাই বা ছাত্ররা তা নন। তার কারণ আগেই বলেছি। সর্বক্ষেত্রে এখানকার জীবনযাত্রার গতিটাই মন্থর।

হিন্দুস্থানে যে সব খ্যাতনামা দার্শনিকের আবির্ভাব হয়েছে তাঁদের মধ্যে ছয় জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ছ'জন

উল্লেখযোগ্য হ'ল : (ক) A Display of two forraigne sects in the East Indies ; (খ) A Discoverie of the sect of the Banians, (গ) The Religion of the Persees (Imprinted at London for Francis Constable, and are to be sold at his Shoppe in Panle's Churchyard, at the signe of the Crane, 1630)।

আব্রাহাম রোজার (Abraham Rozer) পুলিকাটের প্রথম ডাচ চ্যাপলেন ছিলেন (১৬৩১-১৬৪১ খৃঃ অঃ)। ভারতের আদি ডাচ উপনিবেশের গির্জার প্রথম চ্যাপলেন রোজারও ধর্মবিষয়ে বই লিখেছিলেন। ১৬৪৯ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বই প্রকাশিত হয়।

* পুরাণের সঙ্গে বেদের এই সম্পর্কের ব্যাখ্যা ঠিক নয়।
—অনুবাদক

দার্শনিকের অনুগামীদের নিয়ে ছয়টি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে হিন্দুদের মধ্যে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতরা মনে করেন, তাঁদের অনুসৃত দর্শনই অভ্রান্ত এবং একমাত্র সত্য দর্শন, বেদই তার উৎস। (৭) এছাড়া আরও একটি সপ্তম ধর্মসম্প্রদায় আছে, তাঁদের 'বৌদ্ধ' (বার্নিয়েরের ভাষায়—'Baute') বলা হয়। বৌদ্ধরা নাকি আবার দ্বাদশটি শাখা-উপশাখায় বিভক্ত। যাই হোক, এখন আর বৌদ্ধদের তেমন প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই, হিন্দুস্থানে সংখ্যাও তেমন বেশী নয়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকরা ভয়ানক ঘৃণা ও উপেক্ষা করে এবং তাদের নাস্তিক ও ধর্মজ্ঞানহীন বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। বৌদ্ধরা এখন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক বিচিত্র জীবন যাপন করে। (৮)

প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্রেই মূল বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে এবং এক-একজন শাস্ত্রকার এক-এক ভাবে করেছেন। কারও পদ্ধতি ও রীতির সঙ্গে অন্য আরও কোন সম্পর্ক নেই। কেউ বলেন, প্রত্যেক বস্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ দিয়ে গঠিত। এই সব সূক্ষ্ম পদার্থ অবিভাজ্য, নীরেট ব'লে নয়, কণার মতন ক্ষুদ্রতম ব'লে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক তত্ত্বকথার অবতারণা করেছেন শাস্ত্রকার, যা শুনলে ডিমক্রিটাস (Democritus) ও এপিকিউরিয়াসের (*Epicurus*) কথা মনে হয়। কিন্তু মতামতগুলি এমন শিথিল অসংলগ্ন ভঙ্গীতে ব্যক্ত করা হয়েছে, যে সব কথা, সব যুক্তিতর্কই নিতান্তই ভাসা-ভাসা মনে হয়, কোন অর্থ কিছু বোধগম্য হয় না। বিশেষ। আর পণ্ডিতরা এমন সংস্কারগ্রস্ত ও অজ্ঞ এসব বিষয়ে যে এই দুর্বোধ্যতার জন্য কাঁরা দায়ী—শাস্ত্রকাররা, না তাঁদের ভাষ্যকার এই পণ্ডিতরা—তা সঠিক বলা যায় না।

কোন দার্শনিক বলেন—উপাদান ও রূপ, এই নিয়েই জগৎ। এর বেশী কিছু তাঁদের বক্তব্য বোঝা যায় না এবং কোন পণ্ডিতই ব্যাখ্যা ক'রে বুঝতে চান না। উপাদানটা কি বস্তু এবং রূপই বা কি, তা তাঁরা কখনও বুঝিয়ে বলবেন না। আমার মনে হয়, ভাষ্যকার পণ্ডিতরা এ সব কথার তাৎপর্য নিজেরা কিছু জানেন না বা বোঝেন না। যদি জানতেন বা বুঝতেন, তাহ'লে আমাদের দেশের দার্শনিকদের মতন সেটা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করতেন। উপাদান থেকেই রূপের জন্ম—একথা বোঝাবার জন্য তাঁরা কুম্ভকারের মৃৎপাত্রের দৃষ্টান্ত দেন। অর্থাৎ কুম্ভকার যেমন কাদামাটি থেকে মাটির পাত্রকে নানা ভাবে রূপ দেয়, তেমনি বিশ্বের বাস্তব উপাদান থেকে নানা রূপ সৃষ্টি করেন ভগবান।

কেউ বলেন যে শূন্য থেকে সবকিছুর উৎপত্তি এবং একটি মৌলিক উপাদান দিয়ে সবকিছু গঠিত। কিন্তু শূন্যবাদ বা উপাদানের রূপান্তর সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা তাঁরা করতে পারেন না। যে-ব্যাখ্যা তাঁরা করেন, তা কারও বোধগম্য হয় ব'লে মনে হয় না।

কেউ বলেন, আলোক ও অন্ধকারই আসল, কিন্তু আসল তত্ত্বের ব্যাখ্যা তাঁরা যে ভাবে করেন তা সত্যিই হাস্যকর। এমন যুক্তিতর্কের সাহায্যে তাঁরা তাঁদের প্রতিপাদ্য বোঝাতে চেষ্টা করেন এবং এমন লম্বা বক্তৃতা দেবেন যে তার ভিতর থেকে কোন সারবস্তু কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অনেকে আবার সাধনা, তপস্যা, আত্মনিগ্রহ, উপবাস ইত্যাদির উপর এমন গুরুত্ব আরোপ করেন যে মনে হয় যেন ঐগুলিই একমাত্র সত্য। একটা দীর্ঘ তালিকা তাঁরা আওড়ে যাবেন। এই তালিকা থেকেই বোঝা যায় যে কোন বিচক্ষণ শাস্ত্রকার এসব কথা কোন শাস্ত্রগ্রন্থে ব'লে যাননি। এত তুচ্ছ সব ব্যাপার নিয়ে প্রাচীন পণ্ডিতরা কোন কালে মাথা ঘামাতেন ব'লে মনে হয় না।

অনেকে আবার এমন কথাও বলেন যে সবই দৈব বা অদৃষ্টের মাত্র। এ ছাড়া আর কোন জীবনদর্শনে তাঁরা বিশ্বাসী নন। তাঁরাও এমন সব কথা বলবেন যা শুনলেই বোঝা যায় যে কোন শাস্ত্রকার কোনকালে তা বলেননি।

এই সব দার্শনিক মতামত সম্বন্ধে পণ্ডিতরা বিশ্বাস করেন যে এগুলি সনাতন। এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। শূন্য থেকে সবকিছুর সৃষ্টি বা উৎপত্তি হয়েছে, একথা প্রাচীন দার্শনিকদের মনে জাগেনি, হিন্দু দার্শনিকদের মনেও না। একজন হিন্দু দার্শনিক নাকি এ-সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন। (৯) [ক্রমশঃ।

---

(৭) বার্নিয়ের এখানে হিন্দুদের "ষড়্‌দর্শনের" কথা বলছেন। এই ষড়্‌দর্শন হ'ল: সাংখ্য ও যোগদর্শন, বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শন, এবং বেদান্ত ও মীমাংসাদর্শন। কপিল সাংখ্যের, পতঞ্জলি যোগদর্শনের, কণাদ বৈশেষিকের, গৌতম ন্যায়দর্শনের এবং বাদরায়ণ বেদান্ত বা উত্তর-মীমাংসার, জৈমিনির মীমাংসা বা পূর্ব-মীমাংসার প্রতিষ্ঠাতা ব'লে কথিত।

(৮) ভারতের বৌদ্ধদের সম্বন্ধে বার্নিয়েরের এই মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় সমাজে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা কি অবস্থায় পৌঁছেছিলেন, বার্নিয়েরের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৯) বার্নিয়ের এখানে পূর্বোক্ত ষড়্‌দর্শনের ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন সংক্ষেপে। কিন্তু সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, ন্যায়, বেদান্ত ও মীমাংসা দর্শন যে এত সহজে ও সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যায় না, তা বলাই বাহুল্য। তবু সপ্তদশ শতাব্দীতে একজন বিদেশী পর্যটকের পক্ষে হিন্দু দর্শনের নানাদিক সম্বন্ধে এতখানি কৌতূহলী হয়ে তার মূল তত্ত্বকথা জানার চেষ্টা করা কম প্রশংসনীয় নয়। এর মধ্যে বার্নিয়েরের অদম্য আগ্রহ ও জাগ্রত অনুসন্ধানী মনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা শ্রদ্ধার যোগ্য। ষড়্‌দর্শনের ব্যাখ্যা তাঁর অনেকটাই হাস্যকর ব'লে গণ্য হলেও, তিনি তাঁর নিজস্ব বুদ্ধি ও দৃষ্টি দিয়ে তার প্রত্যেকটি প্রতিপাদ্য বুঝতে চেষ্টা করেছেন।

বিজ্ঞপ্তি

মাসিক বসুমতীর বিশেষ প্রতিনিধি শ্রীরমেন্দ্র গোস্বামীর শারীরিক অসুস্থতা হেতু বিশেষ প্রতিনিধি লিখিত "চার জন" এবং "চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত" এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল না।

প্রচার করতে হ'বে। প্রাচীর-চিত্র অঙ্কন ক'রে, গল্প-উপন্যাস রচনা ক'রে, সিনেমা মারফৎ প্রচার করতে হ'বে, ঘুষ সমাজে কি বিপর্যয় ঘটাতে পারে!

(ঝ) যাঁরা ঘুষের অপরাধে অপরাধী হ'য়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'বেন, তাঁদের কারাবাস কালীন আত্মোন্নতির জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

(ঞ) ঘুষের দায়ে অপরাধী ব্যক্তিদের সমভাবে বিচার করতে হ'বে। তাতে উচ্চপদস্থ বা নিম্নপদস্থ কর্মচারী হিসাবে বিভেদ করলে চলবে না।

উপরে ঘুষ নিবারণের যে কয়টি উপায়ের কথা বলা হ'ল, তা ঘুষ নিবারণের সামান্য প্রচেষ্টা মাত্র। যে পর্যন্ত মানুষের নিজের দেশের প্রতি মমত্ববোধ না জাগবে, সে পর্যন্ত এর প্রতিকার হওয়া কঠিন। লোভ একটা ভীষণ ব্যাধি। প্রত্যেকেই চায় সে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করে আর দশ জন থেকে ভাল ভাবে বাঁচবে, অন্যের উপর টেক্কা দেবে। এই লোভ যখন বেড়ে যায় তখনই সে অসদুপায়ে অর্থোপার্জনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আবার যখন দেখে ঘুষ নিয়েও ধরা পড়ছে না, তখন তার লোভ উত্তরোত্তর বেড়েই যায়। তারা তখন আশে-পাশের লোকেরও দৃষ্টান্তস্থল হয়। আর লোভ দেখিয়ে কাজ উদ্ধারের জন্যে সমাজে টাকার কুমীররা ত টাকার থলে হাতে নিয়ে বসেই আছে। সুতরাং মানুষের নৈতিক আদর্শ যখন এ ভাবে গঠিত হ'বে যে টাকার লোভ তাকে আদর্শচ্যুত করতে পারবে না, তখনই ঘুষ নেওয়া বন্ধ হ'বে এবং সমাজে শান্তি আসবে। বর্তমান মানুষদের মধ্যে এই আদর্শ কতটা প্রচার করা সম্ভব হ'বে জানি না, তবে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যদি এখন থেকে সাবধান না হন, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনও অন্ধকার হ'বে সন্দেহ নেই।

দক্ষিণেশ্বরী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মা গো, অনেক কান্না কেঁদেছি জননি,
অনেক ব্যথার অশ্রু ঝরেছে বুকে ;
প্রভাত বেলায় তোর নাম ধরে
ডেকেছি অনেক বার ;
সারা দিনমান পথে পথে ঘুরে
সন্ধ্যায় ফিরে তোর মন্দিরে দেবি,
ভাবনা সাধনা বেদনা আমার
আরতির ধূপে জ্বালায়ে মা গো,
তবুও পাইনি দেখা ;
বাহির-বিশ্বে খুঁজেছি তোমারে
অন্তরলোকে তাই ত দাওনি ধরা।
স্বপ্নে তোমারে দেখেছি অনিন্দিতা,
দেবদুর্লভ নয়নে তোমার অমরাবতীর আলো,
প্রশান্ত তব আননে দীপ্ত সাধনাসিদ্ধ জ্যোতি।
তোমারে হেরিনু হে মহাতপস্বিনি,
মহা তাপসের সাধনভূমিতে
সঙ্গিনী একাকিনী ;
জনমান্তর গন্ধপুষ্প-চন্দনে বিকশিত,
আভূমি-প্রণত বাহু চৈতন্যহারা,
কালো কেশে তব আলোর জোনাকি জ্বলে ;
ধীরে ধীরে ওঠে কণ্ঠে তোমার
বেদমন্ত্রের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনি,
দেবতার পাশে দেবীমাহাত্ম্য
দণ্ডে দণ্ডে ঋদ্ধির পথে চলে।
দেবি, তুমি এলে স্বপন-সম্ভাবিতা
কত না যুগের পুণ্যপ্রবাহে শুদ্ধি-স্নান করি,'
পট্টবস্ত্র মালাচন্দনে সুশোভিতা বধূটির
অন্তরে ছিল বৈরাগ্যের মহিমা অপার্থিব।
শুভদৃষ্টিতে কুটিল দৃষ্টি কঠোর তপস্যার,
অপ্রবুদ্ধ সীমিত জ্ঞানের পরিধি সরিয়া গেল—;
সম্মুখে দেখিলে বরবরাঙ্গে কোটি শশিতারা জ্বলে,
নিভৃত মনের মণিকুটিমে রত্নপ্রদীপশিখা
বরণ করিল নব বধূটিরে অগ্নিশুদ্ধি দিয়া।
জীবন তোমার ধন্য হইল সে মহামিলন-মাঝে ;
বিবাহ-মন্ত্র পড়িতে পড়িতে তোমার কর্ণপাতে
মন্ত্র দিলেন পরম-শরণ বরবেশে মহাগুরু ;
মহাগুরু সেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।
শুধাই জননি, কোন্ সে মন্ত্র
শ্রবণ-রন্ধ্রে তব,
মধুরসে করিল তৃপ্ত
শত জনমের অমৃতের সাধ যত,
শিরায় শিরায় প্রবাহিত হোল
কত না যুগের জাগ্রত প্রাণধারা,
ভেসে এল সাথে অনাদি কালের
মহা ওঁকারধ্বনি,
প্রতিধ্বনিতে শব্দিত চরাচর।
সীমা নাই যার,
শেষ নাই যার
দিগ্‌দিগন্তে যে নাম উচ্চারিত—
সেই সে মাতৃনাম
বেদবেদাঙ্গ উপনিষদের বাঙ্ময় বিভূতিরে
ম্লান করে দিল স্বরূপে প্রকাশ হয়ে।
কোথা বরবধূ পতিপত্নীর মর্তের সংসার
দৈনন্দিন সুখদুঃখের বিরাম বিলাস আশা,
বিরহ-মিলন ভোগসম্ভোগ তুচ্ছ মৃত্তিকার
মান-অভিমান লাভ-অলাভের
হিসাব তুচ্ছতর ?
প্রেম এল সেথা, ঠাকুরের প্রেম

সে প্রেমে জগৎ মজে,
অতলান্তিক সে প্রেমে তোমার
সাধনার অভিষেক ;
সে প্রেম আকাশে দিগন্তহীন
কোমল-কান্ত প্রাণ,
অদৃশ্য বায়ু সেই প্রেমে প্রবাহিত ;
কুসুমগন্ধে সেই প্রেম জাগে
মধু মধু মধু—সে প্রেমে মধুরতর।
সে প্রেমে শ্যামল বৃহদারণ্য
বুকে ঢেকে রাখে অস্থির ঝটিকারে,
সে প্রেমে গভীর মহা সাগরের জল,
চন্দ্রসূর্য্য তারার দীপ্তি
সেই সে প্রেমের জ্যোতিতে স্বপ্রকাশ।
আত্মার সাথে আত্মার পরিচয়
গভীর হইল সে প্রেমের অনুরাগে,
বিচ্ছেদহীন সে প্রেমে নিবাস
চিদানন্দের বিরতি বিহীন গতি।
প্রেমের ঠাকুর ব্যথার ঠাকুর
শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম—
মাটির পৃথিবী সে নামে ধন্য হোল ;
কত সাধকের সাধনায় পূত স্বর্ণ-বঙ্গভূমে
প্রথম আলোক হেরিলেন তিনি
কণ্ঠে তাঁহার কুটিল প্রথম স্বর,
প্রথম মাটির স্পর্শ লভিয়া প্রথম চেতনা তাঁর।
সেই চেতনার ভবিষ্যতের পথে
ওগো মা জননি, তোমার উদয় হোল ;
স্বর্ণসূত্রে বাঁধা পড়ে গেল, বিচিত্র অভিনব
দুইটি জীবন—একটি মৃণালে যেন দুটি শতদল,
একটি তখন মেলিতেছে দল
আরেকটি পাশে ফুটি ফুটি করিতেছে।
তোমারে শুধাই জননি আমার
বল বল একবার,
ভবতারিণীরে প্রণাম করিতে মন্দির-দ্বারে আসি
পূজার অর্ঘ্য সাজায়ে থালায় যখন দাঁড়াতে তুমি
তুমি কি প্রথম নয়ন ভরিয়া দেখ নাই সেই রূপ ?
যে রূপে প্রকট নবঘনশ্যাম হরি
কোমল-নয়ন নয়নাভিরাম রামে,
তুমি কি দাও নি তোমার পূজার
প্রথম অর্ঘ্যরাশি ?
ভবতারিণীর রাজীব চরণে
প্রণাম করিতে যেয়ে
তুমি কি প্রথম করনি প্রণাম
অলক্ষ্যে আপনার
অধম-তারণ পরম-শরণ সেই দেবতার পায়ে ?
তোমার পূজার প্রথম পুষ্পটিরে
প্রতি প্রভাতের প্রথম আলোকপাতে
দাও নি কি তুমি নত মস্তকে
মায়ের পূজারী সেই সে ব্রাহ্মণেরে ?
গুরুর মন্ত্রে জাগিলে জননি,
নয়নে তোমার দীপ্ত জ্ঞানাঞ্জন,
মহীয়সী নারী ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী ;
তুমি দেবি, তুমি পতিতপাবনী মাতা,
দেশে দেশে কত ব্যথাতুর সন্তান
তোমার পুণ্যস্নেহের আশিসে
সহজে পেয়েছে মুক্তির সন্ধান।
শুদ্ধা ভক্তি উপচার নিয়ে
যে আসিল দেবি, তারে দিলে আশ্রয়
মালিন্য তার ধুয়ে-মুছে দিলে তুমি ;
কল্যাণময়ী বরাভয় করে
যে প্রসাদ তুমি বিলাইলে জনে জনে,
তাহারই পুণ্যে গঙ্গার দুই তীরে
বিশ্বের পানে দু'বাহু মেলিয়া
দুইটি তীর্থ ডাকিতেছে জনে জনে।
ঠাকুরের সাথে ঠাকুরাণী মার আত্মিক বন্ধন
মহাকাব্যের ছন্দে ছন্দে উঠিতেছে রণরণি
সর্গে সর্গে স্বর্গ রচনা
মাটি হতে সোনা পুণ্য পরশে ফলে।
পৃথিবীতে নাই হেন অপূর্ব কথা
কে দেখেছে হেন নরদেহে দেবতারে ?
নারীদেহে কেহ কখনও দেখেনি
মহাশক্তির অংশ এ মহাদেবী,
কে শুনেছে হেন মাতৃ সাধনা
পত্নীতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা শ্যামা মা'র
জগদম্বার মূর্ত্তিতে ধ্যান
পূজার আসনে বসাইয়া পত্নীরে ?
ষোড়শোপচারে সে পূজার মাঝে
মহাতন্ত্রের যে নব উদ্বোধন,
কে জানে তাহার মর্ম্মের কথা,
কোথা আছে হেন তপস্যা লোকাতীত ?
বিশুদ্ধতম জ্যোতির আধারে
নির্ম্মলতম চৈতন্যের বাণী—
তুমি মা সারদা, জড়দেহে চিন্ময়ী ;
রসস্বরূপিণি—আনন্দময়ি মা গো,
উৎসর্গের স্বর্গ তোমার হাতে ;
একাধারে উভে স্থিতিগতিময়
অনন্ত দেশে অনন্ত কালজয়ী।
লহ লহ মোর প্রাণের প্রণতি
লহ হৃদয়ের সকল আকিঞ্চন,
মর্ম ছিঁড়িয়া দিতে চাই দেবি,
মর জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য মা গো—
সব লও তুমি, শুধু দাও মোরে
তৃষিত জীবনে অমৃতের আস্বাদ।

ভারতীয় মুসলমান

শ্রীশিশিরকুমার কর

কায়েদ-ই-আজম শ্রীজিন্নার আব্দার এবং ইংরাজরাজের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রশ্রয়ের ফলে ভারতবর্ষকে "মুসলমান-প্রধান" এবং "অ-মুসলমান-প্রধান" অঞ্চল হিসাবে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক ভাগের নাম রয়ে গেছে "ভারতবর্ষ", অন্য ভাগের নাম হ'য়েছে "পাকিস্থান" অর্থাৎ পবিত্র ভূমি। পাশ্চাত্য জাতির, বিশেষতঃ ইংরাজের রাজনীতির মূল সূত্র হচ্ছে—Devide and Rule—শাসিতগণের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে দিয়ে সেই উপলক্ষে তাদের শাসন কর। যেখানে সেটা সম্ভব হয় না সেখানে Devide and Rule অর্থাৎ শাসিতগণকে দুই ভাগে ভাগ করে ছেড়ে দাও; তার পর তা'রা নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করুক। তখন পিঠে ভাগ করতে যেয়ে বানরের ভাগে যতটুকু যা আসে তাই-ই লাভ। আয়ারল্যাণ্ড থেকে এই খেলা আরম্ভ হ'য়েছে; তার পর জার্মাণী, কোরিয়া, আরব-ইস্রাইল, ভারতবর্ষ জুড়ে এই খেলাই চলেছে। এখন কাশ্মীর এবং ইন্দো-চায়নায় এই খেলার তোড়জোড় চলছে।

শ্রীজিন্নার দাবীর মূল তথ্য অথবা যুক্তি হিসাবে দেখান হ'য়েছে যে, হিন্দু এবং মুসলমান হচ্ছে দুই বিভিন্ন জাতি। তাদের শুধু ধর্ম নয়, আচার-ব্যবহার, কৃষ্টি ইত্যাদি সবই তাদের স্বতন্ত্র। কাজেই, দুই ভিন্ন জাতি হিসাবে তাদের কৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের পৃথক আবাসস্থলের "Home-land"এর প্রয়োজন। ইংরাজ ও তাদের সুদূরপ্রসারী জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে এই অপ্রাকৃত দুই জাতিতত্ত্বকে মেনে নিয়ে ভারতবর্ষকে তিন ভাগে ভাগ করে পাকিস্থানের সৃষ্টি করে দিয়ে ১৯০ বছর পরে ভারতের সিংহাসন থেকে নেমে গেলেন।

জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে ইংরাজ জাতির ভেবে দেখা সম্ভব হ'ল না যে, ভারতবর্ষের মুসলমান জনসাধারণের শতকরা একাশি ও আরব-পারস্য থেকে সোজা ভারতবর্ষের দিকে পাড়ি জমায় নাই। এই দেশেই তা'রা জন্মেছে, এদেশের জল-হাওয়ায় তা'রা বেড়ে উঠেছে হিন্দু জনসাধারণের আশে-পাশে এবং একই পরিবেশের মধ্যে। এই হিন্দু সমাজের এক ক্ষুদ্রতম অংশ সামাজিক অসমতা ও অসহিষ্ণুতার ফলে, বহু ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করে মুসলমান সমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। কাহারও স্থির মস্তিষ্কে ভেবে দেখার অবসর হল না যে, হঠাৎ কোন্ যাদুদণ্ডের স্পর্শে আজ তারা দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়ে গেল! যারা ৭০০ বছর পাশাপাশি বাস করেও আজ হঠাৎ তাদের এক দেশে বাস করাও অসম্ভব হয়ে পড়ল? এ সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত মজার ঘটনা ঘটেছিল দিল্লীতে ইংরাজের আমলে। প্যাটেল (বড়) তখন এসেম্বলীর প্রেসিডেন্ট। শ্রীজিন্না বক্তৃতা দিতে দিতে গভীর আবেগের সঙ্গে যেই বললেন—Our great, great great grand father…অমনি শ্রীযুক্ত প্যাটেল বলে উঠলেন—They were all Hindus. অমনি সমস্ত এসেম্বলী হাসির হল্লায় ভেঙ্গে পড়ল।

যাই হোক, দেশ ত' "হিন্দুপ্রধান" এবং "মুসলমান-প্রধান" এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে হিন্দুস্থান এবং পাকিস্থানের সৃষ্টি হল। তাহা সত্ত্বেও অত্যল্প সংখ্যক হিন্দু দেশের মাটি আঁকড়ে পাকিস্থানেই রয়ে গেল। সেই তুলনায় হিন্দুস্থানে যে মুসলমান রয়ে গেল তার সংখ্যা বহুশত গুণ বেশী অর্থাৎ চারি কোটি তিরিশ লক্ষ। এখনও এই খণ্ডিত ভারতবর্ষের অর্থাৎ অপাকিস্থানের প্রতি আট জন অধিবাসীর মধ্যে এক জন মুসলমান। অপপ্রচারের ফলে বহু মুসলমান এদেশ থেকে চলে যাওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষের জন-সংখ্যার এই অবস্থা। এখনও ভারতবর্ষের মুসলমানের সংখ্যা আফগানিস্থানের মুসলমান অধিবাসী-সংখ্যার চার গুণ, ইরাণের মুসলমান অধিবাসী-সংখ্যার তিন গুণ, শুনে অনেকে হয়ত আশ্চর্যান্বিত হবেন যে বর্ত্তমান খণ্ডিত ভারতের মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা তুরস্ক, সিরিয়া, মিসর, জর্ডন, আরব ও পারস্য এই ছয়টি মুসলমানরাষ্ট্রের সম্মিলিত মুসলমান অধিবাসীর চেয়েও অনেক বেশী।

মুসলমান জনসংখ্যার হিসাবে পৃথিবীর মধ্যে ইন্দোনেশিয়াই প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। এই রাষ্ট্রের মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা হচ্ছে সাত কোটি সত্তর লক্ষ। পাকিস্থানের মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা হচ্ছে ছয় কোটি ষাট লক্ষ। এই হিসাবে পাকিস্থান পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। ভারতের বহু মুসলমান পাকিস্থানে চলে যাওয়া সত্ত্বেও মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা হিসাবে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে আছে।

প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার ফলেই অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মেছে যে, ভারতবর্ষ হিন্দুদেরই দেশ, মুসলমানদের নয়। এই ভ্রান্ত ধারণার জন্যই পাশ্চাত্য দেশের বহু লোক মুসলমান-প্রধান প্রদেশ বলে কাশ্মীরের পাকিস্থান-ভুক্তির প্রস্তাব সহানুভূতির সঙ্গে সমীচীন বলে মনে করে থাকেন।

প্রথম থেকেই মুষ্টিমেয় কয়েক জন জাতীয়তাবাদী মুসলমান ব্যতীত সকলেই পাকিস্থান পাওয়ার আশাতে প্রথম থেকেই শ্রীজিন্নাকে আন্তরিক এবং কার্য্যকরী সমর্থন দিয়ে চলেছিলেন। ১৯৪৬ সালের নির্ব্বাচনে মুসলীম লীগ এই জাতিতত্ত্ব এবং পাকিস্থান পাওয়ার দাবী নিয়ে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হয়ে যে বিপুল ভোটাধিক্য লাভ করেছিলেন তা' থেকেই নিঃসন্দেহ ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সমগ্র ভারতের সমস্ত মুসলমানেরই এই একই দাবী। প্রথম থেকে এই দুই জাতি-তত্ত্বকেই তারা তাদের দাবীর ভিত্তিপ্রস্তররূপে ব্যবহার করেছিল। তাদের মতে Mustims are a nation according to any definition of a nation and they must have their home land, their Territory and their state, এই state-ই হচ্ছে পাকিস্থান। এই সময়ে অবশ্য পাকিস্থান-প্রার্থীদের কোন ধারণাই ছিল না যে, পাকিস্থান পেলে তাদের সুখ-সুবিধা কতটা বাড়বে, অথবা সেই পরিবর্ত্তিত অবস্থার মধ্যে কোন নূতন অসুবিধা এবং সমস্যা দেখা দেবে কি না। যাই হোক, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে দেশ যখন খণ্ডিত হ'ল তখন যে সমস্ত মুসলমান পাকিস্থানের এলেকায় পড়লেন তাঁরা ত' স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে ধন্য হলেন, এবং নবলব্ধ স্বাধীনতার আনুসঙ্গিক দায়িত্ব নিয়ে তাঁরা তখন কর্ম্মব্যস্ত। কিন্তু যাঁদের বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি, কাজ-কারবার হিন্দুস্থানের এলেকায় রইল তাঁদের হল দুকূল হারার অবস্থা; হিন্দিতে যাকে বলে "না ঘরকা, না ঘাটকা"। তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুসলমান পাকিস্থানের মরীচিকায় বিভ্রান্ত হয়ে, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে নিঃস্ব

অবস্থায় পাকিস্থানের পথের ধূলার উপর দাঁড়িয়ে পরের দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে বাধ্য হ'লেন। তাঁদের মধ্যে কতক—যাঁরা শাসনযন্ত্রের কর্ণধারগণকে প্রভাবান্বিত করতে সমর্থ হলেন, তাঁরা সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে হলেও অন্ততঃ একটা আশ্রয় লাভ করলেন। যাঁরা তা' পারলেন না, তাঁরা নিঃসম্বল অবস্থায় পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুসলমান আবার ভারতে ফিরে এলেন।

পক্ষান্তরে, পূর্ব্বোক্ত সাড়ে চারি কোটি মুসলমান—যাঁরা এক দিন পাকিস্থানের আশায় হিংসা এবং ঘৃণার বীজ বপন করে চলেছিলেন, পাকিস্থানের মরীচিকায় মুগ্ধ হয়ে নিকটতম প্রতিবাসীকে শত্রু করে তুলেছিলেন, স্বদেশকে দূরতম বিদেশে পরিণত করে তুলেছিলেন, স্বীয় অন্তর্নিহিত হীনতাবোধ (Inferiority Complex) এবং মানসিক অসোয়াস্তি বোধ নিয়ে সেই পরিবেশের মধ্যেই মাথা গুঁজে পড়ে থাকতে হল। এর জন্য তাঁদের প্রাক্তন কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে ছাড়া আর কাউকে দায়ী করে মনকে প্রবোধ দেওয়ার সুযোগ থেকেও তাঁরা বঞ্চিত হয়ে রইলেন। বুমেরাং-এর মত তাদেরই নিক্ষিপ্ত অস্ত্র তাদের মাথাতেই আঘাত হান্‌ল।

ভারতের অধিবাসিগণ ভারতীয় মুসলমানগণের এই মানসিক দুর্ব্বলতার এবং নৈতিক পরাজয়ের কোন সুযোগই গ্রহণ করল না। পাকিস্থান সবিয়তের বিধান অনুযায়ী শাসনতন্ত্র রচনা দ্বারা পাকিস্থানের সমস্ত অমুসলমান নাগরিককে দেশের রাজনীতিতে একটা নিকৃষ্টতর মর্য্যাদায় চিরদিনের মত আবদ্ধ করে রাখবার চেষ্টা করলেও ভারতবর্ষ জাতি-ধর্ম্ম-ভাষা নিরপেক্ষ এবং সমস্ত ভারতবাসীকে সমান অধিকার দিয়ে নিজেদের শাসনতন্ত্র রচনা করল। সেই সংবিধানে জনগণের যে মৌলিক অধিকার নির্দ্ধারিত হল সমস্ত পৃথিবীর সংবিধানের ইতিহাসে তাহা অপূর্ব! ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"আমি শুধু সেই ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী হতে পারি, যেখানে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসী সমান অধিকার ভোগ করবে, সমান দায়িত্ব বহন করবে।"

১৯৪৮ সালে বম্বে কর্পোরেশনের অভ্যর্থনা-সভায় মানপত্রের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে ভারতের লৌহ-মানব সর্দার প্যাটেল বলেছিলেন—"যখন আমরা শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করছি তখন আমাদের শাসন করতেই হবে। যখন আমরা জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীর প্রতিনিধি হিসাবে সেটা করতে না পারব তখন আমরা আজ যেখানে আছি সেখানে থাকবার কোন অধিকারই আমাদের থাকবে না।" ফলে ভারতীয় মুসলমানগণের অন্তর্নিহিত হীনতাবোধ চিরদিনের মত কেটে গেল। ফলে তাদের কলঙ্কময় অতীত সত্ত্বেও ভারতীয় নাগরিকের সম্মানজনক পূর্ণ অধিকার নিয়ে মাথা উঁচু করে চলতে সমর্থ হ'ল। ভারতবর্ষ তার সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকারের ধারাটা শুধু সংবিধানের পাতায় আবদ্ধ করে রাখল না। কার্য্যতঃ সেটা দেখিয়েছে ভারতীয় মুসলমানগণকে আইন, শাসন এমন কি দেশরক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করে।

গত সাধারণ নির্ব্বাচনে ২৭ জন মুসলমান নির্ব্বাচিত হয়েছেন রাষ্ট্রীয় পরিষদে এবং লোকসভায় নির্ব্বাচিত হয়েছেন ২৩ জন। সমস্ত প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে নির্ব্বাচিত হয়েছেন ১৬৯ জন। এঁরা সকলেই নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন যৌথ নির্ব্বাচন প্রথায় এবং অধিক সংখ্যক হিন্দু-ভোটে। এ থেকে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় নেতাগণ ত' দূরের কথা, দেশের জনসাধারণও সাম্প্রদায়িকতার বিষে খুব বেশী কলঙ্কিত হন নাই। পাকিস্থানে যে পরিকল্পনা অনুযায়ী বিরাট হিন্দু উৎসাদন চলেছিল তাহা সত্ত্বেও যে ভারতীয় জনগণ তাহাদের অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে সেটা কম প্রশংসার কথা নয়!

ভারতীয় সংবিধান কেবলমাত্র হিন্দুদের দ্বারা রচিত হয় নাই। অন্ততঃ ৪৫ জন মুসলমান উহাতে কার্য্যকরী ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যে সাত জন লোক সম্মিলিত ভাবে এই সংবিধানকে ভাষাদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন মুসলীম লীগের একজন বিশিষ্ট সদস্য সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লা। ইহা ছাড়াও কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলীতে, আইন এবং বিচার বিভাগে, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদে, বিদেশে ভারতীয় রাজদূতগণের দায়িত্বপূর্ণ পদে, এমন কি দেশরক্ষা বিভাগের সর্ব্বত্র উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলমানগণ স্থান লাভ করেছেন।

রাজপ্রমুখগণের মধ্যে হায়দ্রাবাদের নিজাম, প্রাদেশিক গভর্ণরগণের মধ্যে শ্রীফজল আলি, শ্রীআসফ আলি প্রভৃতি মুসলমানগণ উপযুক্ত মর্য্যাদার সঙ্গেই গৃহীত হয়েছিলেন। প্রথমাবধি দিল্লীর চিফ কমিশনার হয়ে আছেন শ্রীখুর্সেদ আহম্মদ খান।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও শ্রী রফি আহম্মদ কিদোয়াই; সহকারী মন্ত্রিগণের মধ্যে শ্রী সাহ নওয়াজ খান ও শ্রী আবিদ আলি এবং পার্লিয়ামেণ্টারি সেক্রেটারীগণের মধ্যে আছেন শ্রী হুমায়ুন কবির। প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে পশ্চিমবাংলায় আছেন ডাঃ আর আমেদ, উত্তর প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে আছেন সৈয়দ আলি জাহির। এমনি প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে দুই-এক জন করে মুসলমান মন্ত্রী আছেন।

কেন্দ্রীয় সার্ভিস্ কমিশনের সদস্যগণের মধ্যে আছেন শ্রীএ, এ, এ, ফৈজী।

বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতগণের মধ্যে জাপানে আছেন ডাঃ এম, এ, রৌফ, সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোতে আছেন শ্রীএম, এ, হুসেন, শ্রীফৈজী আছেন মিশরে, সুইজারল্যাণ্ডে মৃত্যু পর্য্যন্ত ছিলেন শ্রীআসফ আলি, জেড্ডাতে আছেন শ্রীএম, কে, কিদোয়াই, আর্জেণ্টিনাতে আছেন নবাব আলি ইয়ার জং বাহাদুর, ফিলিপাইনে আছেন শ্রীএম, আর, এ, বেগ প্রভৃতি।

বিচারপতিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বিচারালয় সুপ্রীম কোর্টে আছেন শ্রীগোলাম হুসেন; বম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিরূপে আছেন শ্রীমহম্মদ আলী চাগলা; পাটনা হাইকোর্টে আছেন শ্রীখলিল আহম্মদ; মাদ্রাজ হাইকোর্টে আছেন শ্রীবসির আহম্মদ সইদ; ডাঃ মহম্মদ ওয়ালীউল্লা, শ্রীমুবারক হুসেন কিদোয়াই, শ্রীমুস্তাক আহম্মদ এবং শ্রীনাসিরউল্লা বেগ আছেন এলাহাবাদ হাইকোর্টে।

দেশরক্ষা বিভাগে যে সমস্ত মুসলমান আছেন তাঁদের নাম উল্লেখ করতে হলে সর্ব্বাগ্রে সসম্মানে স্মরণ করতে হয় ব্রিগেডিয়ার ওসমানকে,—যিনি কাশ্মীর রণক্ষেত্রে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জিন্নার দুই জাতিমূলক মতবাদকে মিথ্যা প্রমাণ করে গেছেন।

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

আবার আমার জীবন কাহিনীর কয়েকটি পাতা—ছিন্ন-ভিন্ন হারানো কুড়িয়ে পাওয়া পাতার সূত্র ধরে আবার আরম্ভ হলো অসমাপ্ত কথা। 'বিজলী'—মেঘের বিদ্যুল্লতা কন্যা আগুনে। আখরে জীবন-বেদ লিখে লিখে জাতির জীবন গুছিয়ে দিতে এসেছিল, সে কাজ যে অতি সামান্যই গুছানো হয়েছে, তা' আজ নিদারুণ ও বীভৎস আকারে ধরা পড়েছে যখন বিদেশী রাজশক্তি বিদায় নিয়েছে। যে রাজনৈতিক ইংরাজ-বর্জ্জিত মুক্তির জন্য চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরে অমন জীবন-পণ সংগ্রাম, সে পলিটিকাল স্বরাজ আকাশের চাঁদের মত হাতে নেমে এসে যে তা' এতখানি নৈরাশ্যজনক ও অপদার্থ হতে পারে তা' সেই অগ্নিযুগের প্রাণ-মাতানো উন্মাদনার মাঝে আমাদের কেউ বোঝাতে চাইলে আমরা কি তখন তাঁর কথায় কর্ণপাত করতাম? তাই বলছি আজকার স্বপ্ন-স্বপ্ন হতে জাগা বাঙালীকে আর সে কথা কষ্ট করে বোঝাতে হবে না। রাজনৈতিক অঙ্গহীন কবন্ধ মুক্তির মাশুল দিতে গিয়ে সর্ব্বহারা উদ্বাস্তু বাঙালী—কেন্দ্রের কৃপা হতে বঞ্চিত উপেক্ষিত ভারতের মুক্তিদাতা বাঙালী সে কথা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছে।

গত জ্যৈষ্ঠের মাসিক বসুমতীতে বিজলীর ২০শে সংখ্যা অবধি পরিচয় দিয়েছিলাম। ২১ সংখ্যার তারিখ হচ্ছে ২৬শে চৈত্র, শুক্রবার, ১৩২৭ সাল। প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শিরোনামা—"এ যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে?" লেখাটির থেকে উদ্ধৃতির মাধ্যমে তার কিছু পরিচয় দিই—"যে জাত হাজার বছর ঘুমিয়েছে এই মনে করে যে, তার চারি দিকে একটা নিরেট নিরাপত্তা ঘিরে আছে, আজ সেই জাত জেগে দেখছে কালের স্রোতে সে ভেসে এসেছে এমন একটা জায়গায়—যেখানে আরাম আছে কিন্তু সেই আরামের সঙ্গে নেই আত্মসম্মান, নেই আত্মগৌরব, নেই আত্মসম্পদ,—আজ তাই সে বুঝলো, যে, আরামই মানুষের সবার চাইতে বড় কথা নয়, আজ তাই তার সংগ্রাম। এ সংগ্রামের দু'টি কথা—ভাঙা এবং গড়া * * * তাই আজ আমরা দেশকে এই কথাটাই বলতে চাই, যে, ভাঙবার জন্যে বাইরের হৈ-চৈ উত্তেজনা উদ্দীপনাই যথেষ্ট কিন্তু গড়বার জন্যে চাই স্থিতধী আত্মার সহজ সত্য। * * * এক চোখ আমাদের পলিটিক্সে (রাজনীতিতে) থাক কিন্তু আর একটি চোখ যেন আমাদের নিজেদের দিকে সদাসর্ব্বদা রাখা থাকে।

"এই চোখটির যে কাজ সেই কাজকে যদি তুচ্ছ করি, তবে যে দিন চোখ ফুটবে সে দিন স্পষ্ট দেখতে পাব যে অমঙ্গলের সুরু হয়েছে ঐখান থেকেই। আর সে অমঙ্গল হবে এমন একটা অমঙ্গল যা আমাদের চার পাশের অবস্থার বা পারিপার্শ্বিকের বিরোধ থেকে কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না।

"প্রাণ জিনিসটা প্রেমের মতই অন্ধ। প্রাণ কেবল চলতেই পারে। কিন্তু এই চলাকে সুনিয়মিত করতে হলে চাই তার পিছনে সত্যদৃষ্টি—জ্ঞানময় পুরুষ। প্রাণের গতি আত্মার সত্যকেই সার্থক করে তুলতে পারে। নইলে তার চাঞ্চল্য কেবলই চাঞ্চল্য হয়েই আপনাকে ফুরিয়ে শেষ করে দেবে। যা' পড়ে থাকবে তা' কেবল জাতীয় আত্মার একটা দুরন্ত অবসাদের ভার!"
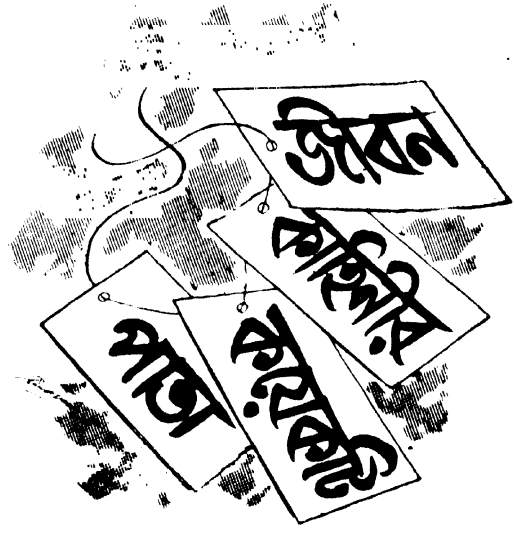
তখনও বৃটিশ রাজত্ব কায়েম আছে। অথচ সে দিনের 'বিজলী'র কথাগুলি জাতির স্বাধীনতা লাভের পরে এমন মর্ম্মান্তিক দৈব-বাণীর মত করুণ সত্য হয়ে দাঁড়াবে তা' আমরাও বুঝি নাই। আমাদের কলমের ডগায় যুগদেবতা ভর করে কথা কইছিলেন। কবন্ধ ভারতের ও বঙ্গের মুক্তির দিনে কংগ্রেসী সরকারের কি ব্যর্থতার সুস্পষ্ট চিত্র এই লেখা ফুটিয়ে তুলেছিল!

২১ সংখ্যার দ্বিতীয় সম্পাদকীয় লেখাটির শিরোনামা হচ্ছে—"প্রেমের চেয়ে বড় কি?" লেখাটি গীতায় শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনকে সেই যুদ্ধে প্ররোচনা দান নিয়ে আরম্ভ—"কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় অর্জ্জুন যখন দেখলেন যে, রাজ্য পাবার জন্য তাঁকে নিজের জ্ঞাতিদের সর্ব্বনাশ করতে হবে, যে দ্রোণগুরুর তিনি আদরের শিষ্য তাঁর বুকের উপর বাণ মারতে হবে, যে পিতামহ ভীষ্মের কোলে পিঠে চড়ে তিনি মানুষ হয়েছেন, নির্ম্মম হয়ে তাঁকে ধরাশায়ী করতে হবে, তখন তাঁর প্রাণটা হা হা করে বলে উঠলো—'কাজ নেই এ ছাই ভস্ম রাজ্য-সম্পদে, কাজ নেই লোকের বুকের উপর দিয়ে চলে গিয়ে সিংহাসনে চড়ে। * * * প্রেমের চেয়ে বড় কে, যে, তার খাতিরে লড়াই করতে যাবো?'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের এই খেদোক্তির উত্তরে তাকে ত্রিগুণাতীত হতে উপদেশ দিয়ে বললেন, "দয়া, মমতা, প্রেম—এগুলো মানুষের শেষ কথা নয়। তার চেয়ে বড় কথা স্বধর্ম্ম।"

"* * * কথাগুলো অতি পুরাতন। শ্রীকৃষ্ণ বলে গিয়েছিলেন সেই দ্বাপর যুগে। কিন্তু আমাদের দেশের মাটি, জল আর হাওয়ার গুণে কৃষ্ণের বাল্যলীলা আর কৈশোরলীলা ছাড়া আর কোন ভাব এ দেশে ফুটলো না। কৃষ্ণকে নাড়ুগোপাল করে রেখে আমরাও এক একটি নাড়ুগোপাল হয়ে বসে আছি। ভক্তি নেই, জ্ঞান নেই—শুধু ছেঁড়া থলি ঝেড়ে ঝেড়ে প্রেম বিলিয়ে বেড়াচ্ছি।

"মানুষের প্রেম চাই না, চাই ভগবানের আনন্দ যা' বজ্রের মত নির্ম্মম ভাবে মারে, আবার মায়ের মত নিজের বুকের অমৃতধারা দিয়ে বাঁচায়। * * ঐ স্বরূপের আনন্দ যেখানে দ্বৈত আর অদ্বৈত

মিশে গেছে, যেখানে এক বহুকে ধরে আছে, যেখানে রুদ্র আর কল্যাণ একাকার।"

প্রতি সংখ্যার সব লেখাগুলির পরিচয় দিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে। ২১ সংখ্যা 'বিজলী'তে এই দুইটি লেখা ছাড়া মুখরোচক 'উনপঞ্চাশী' ছিল, 'বাংলার তরুণ' বলে একটি লেখা ছিল, 'কাজের কথা—নতুন কাজের নতুন মানুষ,' 'নতুন কাজের নতুন নেতা' শীর্ষক দুটি প্যারা ছিল।

২২শ সংখ্যা 'বিজলী'তে 'কালবৈশাখী'তে বড় মনোহারী ছিল 'বিজলী'র স্বরূপ-বর্ণনা—"এবার বিজলীর দিন এলো। এই বৈশাখেই কালো মেঘের শ্যাম অঙ্গে লহরে লহরে আগুনের অজগর খেলছে। জগতের কুণ্ডলিকা আত্মশক্তি এমন আলোর ঝলকে জাগলো কেন? বিজলীর ১ম সংখ্যায়ই বলেছি, এ বিজলী বৈকুণ্ঠের মেয়ে, কালো তামসী দুখ-বাদলের বুকে এ মরণ-শরণ আলোর আঙ্গুল পথহারা বিশ্ব-মানবকে জীবন-কানুর কুঞ্জপথে অভিসারে নিয়ে যাবে। এই কানুর গলার সাত-নরী হারই—কালীর হাতের এই লক্‌লকে খড়্গই জ্ঞান-অসি, একে জীবনপথের দূতী করে তোমরা সবাই বেরিয়ে পড়।" এ সংখ্যার প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধ—"সন্তানের মাতৃদর্শন"। তখন ১৯২১ সাল, সবে এক বৎসর আমরা দ্বীপান্তর থেকে বুকভরা আশা নিয়ে দেশে ফিরেছি। "না হইতে মা গো বোধন তোমার ভাঙিল রাক্ষস মঙ্গলঘট"—মাতৃরূপ দর্শনের অতৃপ্ত ক্ষুধা তখনও মিটে নাই, তখনও এই দীর্ণ স্বাধীনতা **fissured freedom** আসিতেও ২৬ বৎসর বাকি। তাই 'বিজলী'র লেখায় মাতৃহারা সন্তানের ব্যথা বাজিয়া ধ্বনিত হইতেছে—"মাতৃহারা বাঙালী মায়ের রূপ দেখো। মা হারা হয়ে এ দেশ শ্রীহীন ছন্নছাড়া হয়েছে, তাই বাংলার মাটিতে আর সন্তান দল জন্মায় না। কবে কোন কালে দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণ দিয়েছিল, বাঙালীর শিব সেই শব বুকে তুলে কাঁধে করে এত শতাব্দী এত ভূলোক দ্যুলোক ঘুরলো, তবু সে সতীর মরা দেহে প্রাণ এলো না। শিব একদিন কৈলাসে বসে সতীবিরহে অঝর-ঝরে কাঁদছিলেন, নারদের বীণার জ্ঞানদায়ী ঝঙ্কারে হঠাৎ তাঁর এ বুদ্ধিবিভ্রম দূর হয়ে গেল। তিনি দেখলেন সতী মরে না, এই জীবনমরণের টালমাটাল সাগররূপা সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ময়ী শক্তি মরে না। যেখানে শিব সেই খানেই সতী, যেখানে ভালমন্দ পাপপুণ্য জয়পরাজয় জীবনমরণ সেইখানে মায়ের শিবা অশিবারূপ। এ দেশমাতাও চিরন্তনী, শ্যামা সজলজলদবসনা গঙ্গাযমুনামেখলা এ বরদা মাও মরে না।

"* * * প্রেমের বীণা ফেলে দিয়ে জ্ঞান-পিপাসু নারদ তখন জ্ঞানরূপী মহাদেবের কাছে বলে উঠলেন—"দেখাও দেব, আমায় মা দেখাও।" * * * শিব তখন দৃষ্টির মায়া-আবরণ—নারদের চোখের ঠুলি খুলে দেন আর অমনি নারদ দেখে শত শত দ্যুলোক ভূলোক গোলোক ধরণী শিবের শরীরে গঙ্গার জোয়ারের মত প্রবেশ করছে। এইরূপ প্রলয়-তরঙ্গ গিরিনদী গাছপালা সহর নগর সব শিব-অঙ্গে মিশে গেল, গিয়ে সামনে এক মায়াকাশের সৃষ্টি হ'লো। সেই অখণ্ড নীল মণ্ডলে দশধা বিভক্ত আগুনের রাশিচক্রে নারদ তখন দেখলো দশ মহাবিদ্যার রূপ। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, বগলা, ছিন্নমস্তা, মাতঙ্গী, ভৈরবী, কমলা। মা আমার বরাভয়করা নৃমুণ্ডধরা খড়্গবিনাসিনী কালী; সেই মা-ই দেখ আবার বাঘছাল পরে জটায় ফণী ধরে রক্তবরণা তারা। ভয়ঙ্করী সেই মা আবার জ্যোতির শ্রীঅঙ্গে প্রেমের ছবি ষোড়শী আর পীনপয়োধরা চিরযৌবনা ভুবনেশ্বরী। যে মা তোমার রক্তমাখা অঙ্গে ভৈরবী হয়ে রত্নকিরীট মাথায় দাঁড়াতে পারে, যে মা শাঁখের বালা পরে দু'হাতে বীণা ধরে শ্যামাঙ্গী সাজে মাতঙ্গীরূপে জগৎ মন ভুলায়, সেই মা দেখো আবার—

অতিবৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন।
কাকধ্বজ রথারূঢ়া ধূমের বরণ॥
বিস্তারবদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা।
এক হস্ত কম্পমান আর হস্তে কুলা॥

এই তো বর্ত্তমান বাংলার ক্ষুধাতুরা নগ্না গলিতযৌবনা ধূমাবতী রূপ! সর্ব্বনাশী মা আমার দীনতার লীলায় মেতেছে, তার পর ছিন্নমস্তা হয়ে আপন মাথা কেটে সেই মাথা স্বহস্তে ধরে আপন কণ্ঠনিঃসৃত ত্রিধারা রুধিরধারা মা আপনি পান করছে। শান্ত হৌক, ভীমা হৌক, আপনাকে নিয়েই তার কঠোর-কোমল, ভীষণ-মোহন দুই রকমই খেলা। আপন ঐশ্বর্য্য হরণ করে মা ধূমাবতী, আপন মুণ্ড ছিঁড়ে মা রক্তপানাতুরা ছিন্নমস্তা, আবার সমস্ত বিশ্বের অকল্যাণ পান করে ফেলে সেই মা-ই দেখো শেষে মরণলীলার অন্তে মহালক্ষ্মী হয়ে বসবেন। তখন সে রাজরাজেশ্বরীর ঐশ্বর্য্যের আর অন্ত থাকবে না—

সুবর্ণবরণোত্তম কটিতে পিঙ্কন ক্ষৌম
স্বর্ণঘটে বারি করি শিরে নীর ঢালিছে।
পদ্মাসনা করে পদ্ম সতী সর্ব্ব সুগসদ্ম
দয়াতে ডুবায়ে ভব জীব দুঃখ হরিছে॥

দেখতে দেখতে তখন শিবের শরীর হতে দ্যুলোক ভূলোক গিরি নদী বন কান্তার মিলানো স্বপ্নের মত পুনরুদিত হবে, মায়ের ভীমা কান্তা মোহিনী সুভগা ঐ দশটি রূপ একত্রে মিলে গিয়ে একই বিগ্রহে গৌরীরূপ ধারণ করবে। * * * জ্ঞান বিনা শক্তি নাই, বঙ্গদেশ জ্ঞানহারা হয়ে শিব-শক্তি দুই-ই হারিয়েছে। তাই বলি জ্ঞান পেয়ে ত্রিনেত্র খুলে, ওগো সন্তানসেনা, তোমরা একবার মাকে দেখো। এই মা-হারা দেশ এমন ভুবনমোহিনী মায়ের অভয় কোল পাক।"

এই ২রা বৈশাখ, ১৩২৮ সালের বিজলী থেকে দীর্ঘ "সন্তানের মাতৃদর্শন" লেখাটি উদ্ধৃত করার অর্থ আছে। ভারত ও দীর্ণ বঙ্গভূমির আবার ঘোর দুর্দ্দিন আসছে, হয়তো ছিন্নমস্তার প্রসাদে চারি দিকে ভারত ও বিশ্ব জুড়ে শবের পাহাড় লেগে যাবে। বঙ্গের সন্তান দল, প্রস্তুত হও; ভীমা মাকে সাধনায় মৃত্যুপণ কর্ম্মে প্রসন্ন করে ঐ ঐশ্বর্য্যময়ী গৌরী মহালক্ষ্মী রূপ তোমাদেরই পরিগ্রহ করাতে হবে। আজ থেকে ৩১ বছর আগে এই ভাবী দুর্দ্দিন স্মরণ করে 'বিজলী'—অগ্নি-লতিকা 'বিজলী' এই পূর্ণ মাতৃরূপ দেখিয়েছিল।

এই ২২শ সংখ্যা 'বিজলী'র ২য় সম্পাদকীয় লেখা—"জাতীয় শিক্ষা কি?" এর পর আছে উপেন্দ্রনাথের লেখা হাস্য-রসাত্মক বড় মুখরোচক উনপঞ্চাশী, দৈর্ঘ্যের আশঙ্কায় এই অম্লমধুর 'উনপঞ্চাশী' বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দিতে পারলাম না। চতুর্থ লেখা হচ্ছে—"ডুবে কি হইব পার?" তখন মিশরের জাতীয় নেতা জগলুল পাশা দেশে ফিরে লর্ড মিলনারের রিপোর্ট নিয়ে আন্দোলন করছেন। ১৯২০ সালের ২১শে জুলাই মিশরের তরফ

থেকে যে ৭ দফা সন্ধির খসড়া মিলনারের কাছে পাঠান হয়, তার ৭ দফা মিশরের পূর্ণ স্বাধীনতার স্বীকৃতির বিবরণ দিয়ে 'বিজলী'র এই লেখা শেষ করা হয়েছিল নিম্নলিখিত ভাষায়—"এই তো হলো খসড়ার মোট কথা। আমরা বলি ভারত মিশর আইরিশ সবাইকে স্বাধীন হতে দাও। তা' হলে এসব রাজ্য তোমাদের মিত্রশক্তি হয়ে থাকবে। মুখে মধু আর মনে বিষ কত দিন চলে ?"

প্রাণে কেবল দিন-রাত এই গানই উঠতে থাকে—

তোমারে ভজিয়া নায়ে কড়ি দিয়া
ডুবে কি হইব পার ?

'বিজলী'র এই ২২শ সংখ্যার শেষে আমার স্বাক্ষরিত এই চিঠি তখন পলাতক নিরুদ্দেশ শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে ছাপা হয়,—

শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি

ভাই অমর,

কয়েক বছর ধরে তুমি আত্মগোপন করে আছ। শুধু তুমি বলে নও, আরও আমাদের কয়েক জন ভাই তোমার মত আঁধার গহ্বরে লুকিয়ে আছে। তোমাদের মুক্তির জন্য আমরা গভর্ণমেণ্টের কাছে অনেক লেখালেখি করেছি। তার ফলে গভর্ণমেণ্ট অতুলকে মুক্তি দিয়েছে। অতুল প্রথমতঃ চন্দননগরে মতিদা'র কাছে গিয়ে দেখা করে ও সেইখানেই তার মুক্তির সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়। তোমার সম্বন্ধেও গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সব কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে। তুমি এখন এলেই মুক্তি পাবে। অতুল Servant Standard Bearer প্রভৃতিতে বিজ্ঞাপন দিয়ে তোমায় ডেকেছে। জানি না—তুমি কোথায় আছ। যেখানেই থাক না কেন, যতদূর সম্ভব শীঘ্র পার তুমি চন্দননগরে মতিদা'র বাড়ীতে এস। মতিদা'র কাছেই তোমার মুক্তি সম্বন্ধে সকল কথা শুনতে পাবে।

তুমি আসতে দেরী করো না। তোমাকে দেখবার জন্য আমরা উদগ্রীব হয়ে আছি। যত দিন তুমি না এসো, তত দিন এই চিঠিখানা বিজলীতে তোমার উদ্দেশ্যে ছাপানো হবে।

দেখছি অমরদা'র উদ্দেশ্যে এই চিঠি ২৬শ সংখ্যা অবধি 'বিজলী'তে প্রকাশ করে চলা হয়। তার পরই খুব সম্ভব বার্তা পেয়ে অমরেন্দ্রনাথ ফিরে আসেন। আন্দামান থেকে ফেরবার পরই শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহায্যে তখনকার গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডশে প্রাচ্যকলা প্রতিষ্ঠানে আমার সঙ্গে দেখা করেন ও বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। পরে পররাষ্ট্র দপ্তরে লর্ড জেটল্যাণ্ড হয়ে সেক্রেটারী অব ষ্টেট থাকার কালেও আমাদের এই গভীর বন্ধুত্ব বজায় ছিল। তাঁর সাহায্যেই আমি নিরুদ্দেশ বিপ্লবীদের জন্য ও পরবর্ত্তী কালে সুভাষচন্দ্রের মুক্তির জন্য অনেক কাজ করেছিলাম। সুভাষচন্দ্রের মুক্তি আমার চেষ্টাতেই হয়। ইংলণ্ডে তাৎকালীন ইণ্ডিয়া হাউসের নথিপত্র ঘাঁটলে এ সব দলিল পাওয়া বিচিত্র নয়।

বিজলীর ২২শ সংখ্যার শেষ লেখাও উপেন্দ্রনাথের অনবদ্য লেখনী-প্রসূত—"স্বদেশী স্বরাজ।" উপেনের মর্ম্মান্তিক রসিকতা উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করা কঠিন। একটু উদ্ধৃত করি "স্বদেশী স্বরাজ" থেকে—"তোমরা হয়তো জিজ্ঞাসা করবে, ও আবার কি ? গন্ধের খুড়োর মত একটা কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে যে ? স্বরাজ আবার স্বদেশী বিদেশী হয় নাকি ?" আমি বলি, 'হয়, দাদা, হয়। আর শুধু হয় নয়, ডিউক অব কনট থেকে আরম্ভ করে বড় বড় বাবু ভায়ারা পর্য্যন্ত যাঁরা মনগড়া স্বরাজের নমুনা বাতলেছেন, তাঁদের সব নমুনাগুলোর মধ্যে আমি একটা বিদেশী বোটকা গন্ধ পেয়েছি। তোমরা যদি না পেয়ে থাক, তা' হলে আমি বলবো যে তোমাদের নাকের জাত গেছে। উপাধ্যায় মশাই (ব্রহ্মবান্ধব) সরবার সময় তাঁর খাঁটি স্বদেশী নাকটি আমায় বখসিস করে গিছলেন ; সুতরাং সে নাক যে ঠিক গন্ধটি ধরতে পারছে না এ কথা আমি বিনয়ের খাতিরেও স্বীকার করতে রাজী নই।

"খাঁটি সত্যি কথা হচ্ছে এই, দেড় শ' বছর ধরে বিদেশী ধুলো কাদা আমাদের মনের ওপর এত জমা হয়েছে যে, আমাদের নিজেদের সত্যিকার রূপটা আমরা এক রকম ভুলেই গেছি। কাজে কাজেই স্বরাজের নাম করে যত মাল আমদানী করছি, তা একটু নাড়লে চাড়লেই made in Europe ছাপটা বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। স্বাধীনতা ধরবার একটা নাকি কল আছে, যার নাম ডিমোক্রেসী, আর সেই কলের মধ্যে কোন দেশের লোকগুলোকে ফেলতে পারলেই সেই দেশটা রাতারাতি স্বাধীন হয়ে উঠবে। * * *

"অথচ ফরাসী বিপ্লব থেকে আরম্ভ করে আজ অবধি যদি কোন জিনিসের ব্যর্থতা প্রমাণ হয়ে থাকে ত এই ফাঁদ পেতে স্বাধীনতা ধরবার চেষ্টার। সেকালে বিদ্যাসুন্দরের মালিনী মাসী বলেছিল, "আকাশে পাতিয়া ফাঁদ ধরে দিতে পারি চাঁদ"। * * * কিন্তু ফাঁদ পেতে স্বাধীনতা ধরতে বললে মালিনী মাসীকেও হার মানতে হতো। দেখ না একবার তামাসা। ইয়ুরোপের বড় বড় পণ্ডিতেরা মাথা ঘামিয়ে ঠিক করলেন যে, সবাইকে যদি ভোট দেবার ক্ষমতা দেওয়া যায় তা' হলে সবাই সমান হয়ে যাবে আর দুঃখ কষ্ট একেবারে মুছে যাবে। Vox Populii, Vox Dei, প্রভৃতি গালভরা কথাগুলো বড় বড় হরফে ছেপে লোকের চোখের সামনে জ্বল জ্বল করতে লাগলো। কিন্তু পোড়া দুঃখ ঘুচলো না। দেখা গেল যে সবাইকে ভোট দেওয়া সত্ত্বেও জন কত ওস্তাদ অপরের মাথায় চাঁটি মেরে বেশ দু' পয়সা গুছিয়ে নিয়েছে। আর টাকার জোরে যা খুসী তাই করে বেড়াচ্ছে। যাদের টাকা আছে তারাই স্বাধীন, আর বাকি সবাই তাদের গোলাম। পার্লামেণ্ট ফার্লামেণ্ট যা' কিছু বল সব ঐ টাকার থলির ভেতর। তখন আবার হৈচৈ পড়ে গেল টাকার যাতে সমান সমান ভাগ বাটোয়ারা হয় তার ব্যবস্থা কর। এই চেষ্টার ফলে জন্মেছে সমাজতন্ত্র (Socialism)। কিন্তু সমাজতন্ত্র যেখানে প্রবল সেখানে আইন কানুনের চাপে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাটা একেবারে মারা যাবার দাখিল। স্বাধীনতা বাঁচাতে গেলে সাম্য থাকে না, আর সাম্য বাঁচাতে গেলে স্বাধীনতা মারা যায়। এই এখন ইউরোপের সমস্যা। রুশিয়ার কম্যুনিষ্টরা বলছে, সবাইকে গায়ে গতরে সমান খাটাও, আর সমান ভাবে খেতে পরতে দাও তা' হলেই সব সমান হয়ে যাবে। মানুষ যদি খাবার আর খাটবার একটা যন্ত্র হতো তা' হলে এ ব্যবস্থা চলতে পারতো। কিন্তু পেট আর হাত পা ছাড়া মানুষ তো আরও কিছু। সেটুকুর ব্যবস্থা কি হবে ?

"* * * রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি—সব নীতিই হবে

আত্মনীতি ; আমার নিজেকে মানুষের জীবনে প্রকাশ করবার ভঙ্গী। তার গোড়ার কথা সাম্যও নয়, অহঙ্কারের স্বাধীনতাও নয়—গোড়ার কথা হচ্ছে স্বদেশ আত্মার গুরুত্ব। সে গুরুত্বকে পেতে গেলে বাইরের শত প্রলোভন ছেড়ে অন্তরের দিকে মুখ ফেরাতে হবে, Compromise (রফার) কথা ভুলে যেতে হবে, লর্ড রিডিং কি দিল্লীকা লাড্ডু নিয়ে আসছে তার আলোচনা ছাড়তে হবে।"

২১শ সংখ্যা 'বিজলী' থেকে দেখছি কাজের কথা বলে এক নূতন Feature আরম্ভ করা হয়েছে। এবারকার কাজের কথার বিষয় হচ্ছে 'কর্ম্মী গঠন'। সেটি উদ্‌ধৃত করা কর্ত্তব্য, কারণ দেশের কাজ-পাগল তরুণরা অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে লক্ষ্য ও আদর্শ না স্থির করে যা' হোক একটা মামুলী—স্কুল গড়া, লাইব্রেরী ফাঁদার কাজে নেমে পড়েন। বিজলী'র ২২শ সংখ্যা সে সম্বন্ধে লিখছে—

"যারা চট করে একটা যা' হোক কাজে নেমে পড়ে তারা জানে না কি ধরতে যাচ্ছে ; সমস্ত কাজটার হয়তো একটা সামান্য ছোট ফলকে লক্ষ্য করে চলে। আদর্শ নেই, কাজ হচ্ছে ; কি হচ্ছে জানি নে, একটা কিছু তো হচ্ছে। এই রকম উড়ো উড়ো ভাব নিয়ে অধিকাংশ ছেলে কাজে নামে, এ রকম কাণার মত হাতড়ানোয় সুফল ফলে না তার আর আশ্চর্য্য কি ? দেশের সম্বন্ধে জ্ঞান চাই, কাজ করবার হাজার রাস্তা কল কৌশল শেখা চাই, অনেক আগুনে পিটিয়ে সানানো লোহাতেই তলোয়ার হয়। জ্ঞান-বল বড় বল, তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "ভারতের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ চিন্তা শক্তির হ্রাস, জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার।"

"* * * ১৫ দিন বা ১ মাস বক্তৃতা দিয়ে কর্ম্মী গড়া যায় না। * * * ভেতরের মানুষটাকে জাগাতে পারলে হাত পা নাক চোকের কাজ সার্থক হয়। প্রত্যেক কর্ম্মীর মধ্যে দশভূজা দশপ্রহরণধারিণী শক্তি আছে, জ্ঞান শক্তি আনন্দ জাগলে সে মানুষ অসাধ্য সাধন করবে।"

এরূপ "কাজের কথা"র দু'টি করে প্যারা প্রতি সংখ্যা 'বিজলী'তে ২১ সংখ্যা থেকে দেওয়া হচ্ছিল। ২২শ সংখ্যায় ২য় প্যারা ছিল "অহঙ্কারের ডাকাতি"। তার বক্তব্য হচ্ছে—

"যারা কাজ করবে তাদের আগে বোঝা চাই মুক্তি বা স্বাধীনতা কাকে বলে। আমার গরীব দেশবাসীর ঘাড়ে বিদেশী চাপলে চলবে না, আমি স্বদেশী তার ঘাড়ে চাপবো, তাতেই তার সুখ। এ ধারণা নিয়ে গরীব দুঃখীর দুঃখমোচন হবে না, গরীবের টাকা নিয়ে আমি যদি মটর চড়ি, চপ কাটলেট খাই, তা' হলে আমিই দুঃখীর রক্তশোষক। এক জাতির দেশ যেমন আর এক জাতি লুটে খাওয়া পাপ, এক জনের ধন আর এক জনের লুটে খাওয়া তেমনি পাপ। তোমার তেতলা বাড়ীর পাশে আর একজন গরীবের ভাঙা কুঁড়ে ঘর রয়েছে, এ পাপ কার ? তুমি কেন লুচি খাও, ও কেন ছাতু খায় ? তোমার পেট আমারই মত আট খানা রুটিতে ভরে, অথচ তোমার ব্যাঙ্কে দশ লাখ টাকা, আর পাঁচ লাখ ব্যবসায়ে খাটছে। লক্ষ লোকের অন্ন একত্র করে তবে তো তোমার এ টাকা হয়েছে ? যে রাজ্যে সবাই সুখী, সবাই প্রচুর খায় পরে, সেই রাজ্যে মানুষ মুক্ত, সে ধর্ম্মরাজ্য আসে কি করে ? * * * যার মন মুক্ত, তার বাহির মুক্ত ; যে বুঝেছে বিশ্ব চরাচরময় আমি, এত দেহ আমারই অঙ্গ, সেই কেবল একগুণ ধন নিয়ে সহস্রগুণ ফিরিয়ে দেয়। বাকি সব অহঙ্কারের মানুষ অল্পবিস্তর ডাকাত।"

কাজের জাতিগঠনমূলক সুস্পষ্ট ছক ও আদর্শ না থাকায় সহরে ও গ্রামে গ্রামে সর্ব্বত্র বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যপাগল তরুণ দলের বহু শ্রম ও অর্থ অনর্থক উদ্দেশ্যহীন যা' তা' কাজে অপচয় হয়, এ অপচয় দেশেরই ক্ষতি।

১৩২৮ সালের ১ই বৈশাখ প্রকাশিত হয় 'বিজলী' ২৩শ সংখ্যা। সে সংখ্যায় 'কালবৈশাখী'র ভাব ও ভাষা বড় সুন্দর —"কালী এই লীলাময়ী জগৎ শক্তি, এই লীলাতেই সেই নিরঞ্জনের প্রকাশ। অনন্তের অফুরন্ত মাধুরী প্রকাশ করবে বলেই কালী অনিত্যা—অর্থাৎ এই আছে এই নাই। রোজ ভেঙে ভেঙে নিতুই নব নব রূপে সেই পরম সত্যকে দেখিয়ে দেওয়াই তার কাজ, তাই মরে মরে সে অফুরন্ত জীবনগঙ্গা ; নিত্য নূতন নাম রূপ তার মাঝে উদয় হচ্ছে, এমন মরণ-সাধা মেয়ে বলেই কালী মরণকে জয় করেছে। ভেঙে ভেঙে ফুরিয়ে ফুরিয়ে যাকে ফুটতে হবে—মধুর থেকে মধুরতর হয়ে বিগ্রহ ধরতে হবে মরণ তো তার হাতের পাঁচ। তাই কালী ছিন্নমস্তা,—আপন মাথা আপনি কাটে, আপন রুধির আপনি খায়। তোমরা মায়ের ছেলে সে নিত মরণ-সোহাগীর লীলার সহচর হবে ?"

এ সংখ্যার সম্পাদকীয় লেখার শিরোনামা হচ্ছে সৎসঙ্গের ঠাকুরের গানের এক কলি—

"দুখ দানবের অত্যাচারে
ডাকছে জীব ত্রাহি ত্রাহি..
চিহ্ন সে যে মোর প্রকটের
সন্দেহ তায় বিন্দু নাহি।"

বোধ হয় এই সময়েই পাবনায় গিয়ে অনুকূল ঠাকুরের আস্তানায় আমি ও দিদি থাকি। তখন আন্দামান ফেরৎ আমার নূতন কর্ম্ম যোগসাধনার সাথী ও নেয়ে খোঁজার চলছে পালা। অরুণাচলের দয়ানন্দ ঠাকুরের সঙ্গেও আমার এই সময় যোগাযোগ ঘটে।

১ম সম্পাদকীয় লেখার কিছু উদ্‌ধৃত করি—"যার দুঃখ বোধ জাগে নি সে জাতি তিল তিল করে পক্ষাঘাতের অসাড় মরণ মরছে বলতে হবে। তম অজ্ঞান বা অসাড়তাই পাপ। কোন জাতি মরে না—যদি সে একবার কোন উপায়ে বুঝতে পারে, যে, জাতি হিসাবে সে কত বড় দীন কত বড় দুঃখে দুঃখী। * * * তাই বলি সে দিন রক্তযুগের রাঙা উষার বাঙালীর অসাড়তার মরণ ফুরিয়ে বেদনার মরণ আরম্ভ হয়েছে। তাই সে দিন থেকে আর ভয় নাই।

"* * * কালো যমুনার কূলে আঁধার ঘন ঘোর রজনীতে না কুঞ্জের বাঁশী বাজে ? ওগো তুচ্ছ রঙ তামাসার হাসির সম্পদ তোমরা একবার দুঃখের কালো মাণিককে চিনতে শেখো রঙের আলতা পরে সুখদুঃখের পারের কুঞ্জে অভিসারে যেতে শেখো।

* * * বিজলীর চেতনাদায়ী স্পর্শে * * * আত্মভোলা জাতির স্মৃতি হঠাৎ ফিরে তাকে বুঝিয়ে দেয় "আমি নে প্রলয়ের মাঝে পরম শরণ মহাজ্ঞান উদয় হয়—

'প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্।'

লেখাটির আগাগোড়ায় এমনি সব ভাবের মন মাতানো কথা ভরপুর। এ সংখ্যার ২য় সম্পাদকীয়ের শিরোনামা—"ভাঙা ও গড়া—হরিহর বিগ্রহ"। এ লেখায়ও ছিল অনেক গভীর দামী জাতিগঠনের কথা—"ভাঙার সাধক একদিন আমরাও ছিলাম। তখন ভেবেছিলাম ব্রিটিশ রাজকে ভাঙতে পারলেই স্বরাজের পাকা ফলটি টুপ করে এসে আমাদের গোঁফের 'গোড়ায় মনে রস ঢালতে থাকবে। এই প্রত্যক্ষ সত্য ব্যাপারটি সেদিন আমাদের মনে পড়ে নি, যে, যে পাখী সাতশ' বছর খাঁচায় পোরা ছিল অনন্ত গগনে আবার উধাও হয়ে উড়বার পক্ষে খাঁচাটাই তার কেবল বাধা নয়,—তার চাইতে বড় বাধা তার নষ্ট ধর্ম্ম—কেন না আত্মবশ হবার ধর্ম্ম যত জন্মস্বত্বই (birth right) হোক না কেন, অনভ্যাসের ফলে তাও পরধর্ম্ম হয়ে ওঠে—তাই খাঁচার দরজা খোলা পেলে পাখীর মন আর উড়ু উড়ু করে না, মুক্তির ভয়ে তার ছোট্ট বুকটি দুরু দুরু করে ওঠে।

"* * * বলছিলাম যে, আমরাও এক দিন ভাঙার সাধক ছিলাম। এই প্রাক্তন কর্ম্মের সুফল হয়েছে এই, যে, আজ আমরা কেবল ভাঙার নেশাকে কাটিয়ে উঠেছি। * * * মানুষকে যা চিরন্তন করে তোলে—চিরন্তন করে রাখে সেটা উত্তেজনা উদ্দীপনার লেশ নয়,—সেটা হচ্ছে আমার সত্যের অমৃত রস। * * * বড় মন আমরা সেই দিন প্রত্যক্ষ করতে পারব যে দিন সমগ্র সমাজ আপনার অন্তরে চিকিৎসা করতে লেগে যাবে—সমগ্র সমাজ যে দিন এই কথা বলার শক্তি পাবে—আমাদের যা কিছু তা' আমরা নিজ হাতে গড়ে তুলবো। ভাঙার মধ্যে কেবল রুদ্রই আছে কিন্তু গড়ার মধ্যে আছে ব্রহ্মা ও রুদ্রের মিলিত হরিহর রূপ। অসত্য অনেক কিন্তু সত্য যে এক।"

জাতির ও দেশের অন্তরের মণিকোঠার দিকে ডাক সে দিন 'বিজলী'র পাতায় পাতায় অপূর্ব্ব মন-প্রাণ-জাগানো সুরে বাজতো। এ সংখ্যার ৩য় লেখারও শিরোনামা দেখুন—"অধীর প্রেমে রুধির পানে আপনায় দিতে মগনা!" লেখাটির মর্ম্মকথা-পরিচিতি উদ্‌ধৃত করি—"আমাদের এ সোনার দেশ যে দিন থেকে মা-হারা হয়েছে, সেই দিন থেকে অধঃপাতে গেছে। এক দিন ভারতের ঘটে ঘটে নারায়ণ জাগতো, তখন এ দেশে পুরুষ ছিল আর তার জীবনের উযুক্ত সঙ্গিনী নারীও ছিল। তখন ঘরে ঘরে মায়ের জীবন্ত আনন্দময়ী আত্মাশক্তি প্রতিমা ঘরের লক্ষ্মী হয়ে বিরাজ করতো, তাই তাদের কোলে যুগে যুগে নর-নারায়ণ জন্মেছে; জ্ঞানে পুণ্যে শক্তিময়ী মায়ের স্তনের দুধ খেয়ে বীর জন্মেছে; মাতৃতীর্থ সতীপীঠ সে ভারতের আঙিনায় আঙিনায় রাম, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, প্রতাপ, নিমাই নিত্য খেলা করে গেছে।

"তখনও এ মাটিতে মায়ের জলজ্যান্ত আবির্ভাবের ভর ছিল, তখনো দুর্গা চণ্ডী কালী ভবানীর এ সিন্ধু হিমাচল ঘেরা মন্দিরে মেয়ে অবলা ললিতকোমলা হয়নি; জ্ঞানের মেয়ে, শক্তির মেয়ে, আনন্দের মেয়ে তখনো শুধু পুরুষের কামের পুতুল পিঞ্জরের পাখী হয়নি। * * * এ দেশে তাই ঘটেছে বলেই আজ আমরা মা-হারা, তাই আজ এ দেশ একলাষেঁড়ে পুরুষের মত নপুংসকের দেশ। আমরা জাতীয় শিক্ষা বলে মাঠে ঘাটে চিৎকার করে বেড়াই, সহরে সহরে রাজপথ জুড়ে জীবনের দীপালী উৎসব জমকে তুলি, কিন্তু ঘর যে আমাদের আঁধার। আগে তোমরা মায়েদের জ্ঞান দাও, শক্তি দাও, আনন্দ দাও; মা যার বজ্রের মত শক্ত, মা যার কর্ম্মে দশভুজা, রণে চামুণ্ডা, জ্ঞানে শিবের অঙ্কলক্ষ্মী, তার সন্তান যে দেবসেনাপতি না হয়ে পারে না। এ মায়ের দেশে মাকে অজ্ঞানে রেখে, নারীর জীবন বাঁধনের অষ্টপাশে ঘিরে, শক্তির দেহ অলঙ্কারে সাজিয়ে, কামের কামিনী করে দেশে জীবনের জোয়ার আনতে পারবে না। * * * তোমরা দু'জনে এক-দেহ এক-প্রাণ—এক মধুময় সত্যের সোনার সুতোয় মুক্তার লহরে তোমরা নর আর নারী, লক্ষ্মী আর নারায়ণ, হর গৌরী। দেশের মরণ-ভোলানো জীবনের বান দু'য়ের বুকেই ডাকুক, জ্ঞানের ত্রিকালদর্শী নয়ন দু'য়ের ললাটেই খুলুক, কালীর অমঙ্গলনাশা অগ্নিময় খড়্গ তোমাদের চারি ভুজে জগজ্জয়ে নাচুক।

"ওগো! আপনভোলা মানুষ! তোমরা একবার আপনাকে চিনতে শেখো—কি করে এই বিন্দুর বুকে অনন্ত জ্ঞান শক্তির সিন্ধু নাম রূপে দুলছে—কি করে এই মস্ত জগচ্ছবি অনন্তেরই চিদ্বিলাস। চিরনীরব চিরশান্ত পরিপূর্ণ তোমারই বুকে তোমারই কালী—

রণে নাচে কি প্রেমে নাচে
　　চেয়ে একবার দেখ না,
অধীর প্রেমে রুধির পানে
　　আপনায় দিতে মগনা!
(সে যে) ত্রিলোকেরই অসুরভয়
　　দিবানিশি নাশে যে,
অসুরের রণ-পিপাসা
　　প্রাণভরে মিটায় সে,
একই কালে দশ ভাবে
　　পুরায় দশের কামনা।

এ সংখ্যায় জঙ্গীপুরের দাদাঠাকুরের রঙ্গরসিকতার কবিতায়—"তামালী আবক্তি" উদ্‌ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে হোলো। তবু প্রথম আট কলি দিলেই এই উপাদেয় পরমান্নের আংশিক স্বাদ পাওয়া যাবে—

চৌকী নিশ্চিন্তপুর—ইনসাফি আদালত

"বাদী ম্যালেরিয়া সিংহবর্ম্মা,
　　পিতা এনোফেলি মশা,
জাতি ব্যাধিক্ষেত্র, নিবাস সর্ব্বত্র
　　মানবক্ষয় ব্যবসা।
বিবাদী কাঙাল অভাগাদির
　　মা বাপ নাহিক কেহ,
জাতি—দীনদাস, পেশা উপবাস,
　　নিবাস—দুর্ব্বল দেহ।"

এই ২৩শ সংখ্যা বিজলী শেষ হয়েছে দু'টি কাজের কথা প্যারা দিয়ে। এ দু'টি সম্পূর্ণ উদ্‌ধৃত করা উচিত মনে করি, কারণ এ দেশের দগ্ধ অদৃষ্টে আরও বহু কাল এ কথাগুলি কাজে লাগবে।

কাজের কথা

কাজ কা'কে বলে?

"কাজ তো চাই, কিন্তু কাজের আগে চাই কাজের কাজী মানুষ। প্রতি গ্রামে স্কুল চাই, লাইব্রেরী চাই, বৈদ্য চাই, ধানের গোলা চাই,

গোচারণের ঘাসে সবুজ মাঠ চাই, কুটিরে কুটিরে উটজ শিল্প চাই, ঋণ দেবার ব্যাঙ্ক চাই, মন্দিরে মন্দিরে জাগা দেবতা সাধু-সন্ত চাই। এত যে চাই তা' তুমি আমি করে দিলে হবে না, কারণ কার এত টাকা আছে যে লাখ লাখ গাঁয়ে এমন শ্রীপীঠ রচনা করতে পারে? তাই আগে চাই শক্তিধর মানুষ, জনে জনে দশভুজা,—যাঁরা গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে গ্রামবাসীর আপনজন হয়ে মরা গাঙে জীবন আনবে, গৃহভেদ দূর করবে, গ্রামবাসীকে ভাইএর দুঃখের দরদী করবে। এ কাজ বাবু ভেইয়ার—এম্ এ বি এ পড়া তেড়িকাটা চশমাধারীর নয়, এ কাজের কাজী হবে চাষা— সে হবে সেই গ্রামের গ্রামবাসীদেরই এক জন। সে সেখানে স্বরাজ-সঙ্ঘ করে নিজের আড্ডা গড়বে না, দু' বিঘা ভুঁই ছাড়া নিজের বলে কিছুই রাখবে না। গ্রামবাসীদেরই সে শেখাবে কি করে এক জোটে কাজ করলে উসর ভুঁইয়ে সোনা ফলে, কি করে পরের দরদের দরদী হলে আপন ঘরও গড়ে ওঠে। এই কাজের কাজীরা এমন মানুষ হওয়া চাই যার পায়ে সবার মাথা আপনিই নুয়ে পড়ে।"

কাজের কথার ২য় প্যারাটিতেও এই কাজের কাজীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে—"প্রত্যেক গাঁয়ে গাঁয়ে একটি করে জাগা মানুষ নিজে জেগে পরকে জাগাবে, নিজে বেঁচে মরা বাঁচাবে, নিজে পরম আশ্রয় পেয়ে গ্রামবাসীর আশ্রয় হয়ে দাঁড়াবে। প্রতি আঙিনা তার হবে ঘর, প্রতি রোগশয্যা তার হবে তীর্থ, প্রতি শক্তিহীন জ্ঞানহীন অর্থহীন তার হবে কোলের শিশু। যে ধর্ম্ম চায় সে যেন তার কাছে এসে দেবতা পায়, যে জ্ঞান চায় সে যেন তার এসে অফুরন্ত জ্ঞান নিতে পারে, যে রোগ বিপদ দুঃখ হতে ত্রাণ চায় সে যেন শরণ পায়, যে তার প্রতি বিমুখ হয়ে ফিরে যায়, সেও যেন তার কাছে প্রেমে হেরে যায়।"

এই সব লক্ষণ কার মধ্যে জাগে? তারই মধ্যে যে পরম পরশমণি ছুঁয়ে সোনা হয়ে গেছে, মানুষ আকারে থেকেও সে গণ্ডী পেরিয়ে দেবতার পৈঠায় উঠে গেছে। রাষ্ট্রের চাকায় এমন জনক ঋষির যদি হাত পড়ে তা' হলে সে সম্রাট অশোকের মত হয়তো বিধান ও আচরণের ফলে একটা দেশজোড়া জাগা মনুষ্যত্বের বসন্ত শ্যামলিমা আনতে পারে। ভারতের লাখ লাখ গ্রামের জন্য জগদ্দুর্ল্লভ অতগুলি নরদেবতা পাওয়া যাবে কোথায়? দেশব্যাপী আমূল সংস্কারের জন্য চাই জগাই-মাধাই-তারণ মহাপ্রেমের গৌরাঙ্গ, মানুষ স্পর্শমণি।

[ক্রমশঃ।

ভারতবর্ষে চার্লস ডিকেন্সের দুই পুত্র?

চার্লস ডিকেন্সএর নাম মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার নিশ্চয়ই অজানা নয়। বিখ্যাত ইংরাজ-লেখক ডিকেন্সের টেল অব্ টু সিটিজ, পিকুইক পেপার প্রভৃতি গ্রন্থ পৃথিবীবিখ্যাত। চার্লস ডিকেন্সের পুত্রদের মধ্যে দুই ছেলে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ডিকেন্সের মধ্যম পুত্রের কলকাতায় মৃত্যু হয়। ভবানীপুরের মিলিটারী হাসপাতালের কবরখানায় আছে তাঁর সমাধি। এই দ্বিতীয় পুত্রের নাম লেফ্‌টেন্যাণ্ট ওয়ালটার ল্যাণ্ডর ডিকেন্স। মিস এ্যাঞ্জেলা (পরে ব্যারনেস্) বারডেটকাউটশের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে ওয়ালটার ল্যাণ্ডর ২৬ বেঙ্গল লাইট ইনফ্যানট্রিতে ক্যাডেট নিযুক্ত হন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের এক শীতের দিনে কলকাতায় এসে পৌছান। কিন্তু তিনি এখানে এসে দেখলেন যে মিঞা মীর ২৬ বেঙ্গল ইনফ্যানট্রিকে বাতিল করে দিয়েছেন এবং ল্যাণ্ডরের নামও সৈন্যদের নামের তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে। তখন ৪২ হাইল্যাণ্ডার্সে ল্যাণ্ডর চাকুরী নেন। ওয়ালটার স্যাভেজ ল্যাণ্ডরের পালিত পুত্র ছিলেন ল্যাণ্ডর ডিকেন্স। ইং ১৮৬৩ অব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে, অসুস্থ অবস্থায় ছুটি নিয়ে ইংলণ্ড যাত্রা করবেন ল্যাণ্ডর, এমন সময় মাত্র তেইশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল কলকাতায়।

ডিকেন্সের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র চার্লস বালওয়ের লিটন ডিকেন্স ছিলেন সিমলার গুডউড হোটেলের মালিক। শোনা যায়, লেখকের এই কনিষ্ঠ পুত্র কৌতূহল বশতঃ তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের দেখাতেন একটি আঙটি, যেটি কবি লর্ড টেনিশন উপহার দিয়েছিলেন ডিকেন্সকে। এই আঙটিতে ইংরাজীতে লেখা ছিল,—"এ্যালফ্রেড টেনিশন টু চার্লস্ ডিকেন্স, ১৮৫৪।"

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু

পকৌড়ি এলো প্লেটে প্লেটে। আর ব্যাসমে-ভাজা আলুর টুকরো। হাতে-গরম—এক ফুরোচ্ছে, আবার এনে এনে দিচ্ছে। কত দিন পরে স্বদেশি বস্তু জিভে পড়ল! এদের খাদ্য খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গিয়েছে। এনে দিচ্ছে—আর সঙ্গে সঙ্গে প্লেট খালি। পাচকটি জাতে চীনা—কিন্তু ভেজেছে ঠিক আমাদের ঘরের মেয়েদের মতন। পরাঞ্জপে হাতে ধরে শিখিয়েছেন। লোকটা পরিবেশন করছে, এঁটো বাসন সরিয়ে নিচ্ছে—পরনে কিন্তু সদ্য পাট-ভাঙা ধবধবে পোশাক, হাতে ঘড়ি!

তেলে-ভাজার সঙ্গে সঙ্গে গল্প জমে উঠেছে আবার। ঐ আসে—ঐ আসে—সেই আমলের সব গল্প। আসছে মুক্তিসৈন্য—দেরি নেই, এসে পড়ল বলে—এসে গেছে অত্যন্ত কাছাকাছি, পিকিনের দশ-বারো মাইলের ভিতর।

কয়লার ভারি কষ্ট—সোনা হেন দুর্লভ হয়ে উঠেছে। খাবার এক বেলা না হলেও পেটে কিল মেরে পড়ে থাকা যায়, কিন্তু হাড়-কাঁপানো শীতে আগুন বিহনে প্রাণ টেঁকে না। কুয়োমিনটাং হুড়দাড় পালাচ্ছে 'চাচা আপনা বাঁচা' এই মহানীতি অনুসরণ করে। যাবার মুখে তা বলে বজ্জাতি ভোলেনি। জুত পেলেই রেল-লাইন ভাঙছে, খনি ভরাট করে দিয়ে যাচ্ছে কাদামাটি ও আবর্জনায়। খনিগুলো আগে তো সাফসাফাই করো, কয়লা তুলো তারপরে; রেললাইন ঠিকঠাক করে তবে কয়লা-চালানের কথা। কয়লার কড়া রেশন—অল্পস্বল্প যা মজুত থাকে, তাতেই চালিয়ে নিতে হবে সকলের।

নানান রকম রটনা—কম্যুনিষ্টরা এ করছে, তা করছে। যারা বলছেন, প্রত্যক্ষদর্শী নন যদিচ, তবু প্রায় সে নিজ চোখে দেখার সামিল। মাসতুত ভাইয়ের সাক্ষাৎ পিসশ্বশুর—তিনি তো আর মিথ্যা বলবার মানুষ নন। এমনি সব চলছে মুখে মুখে।

তা হলেও—লোকে যে খুব বেশি গা করছে, তা নয়। এক সাবান-কারখানা। কারখানার বড়-দরজায় খিল এঁটে দিয়ে ভিতরে অল্পস্বল্প কাজ চলছে। সৈন্যদের গতিক ভাল করে না বোঝা অবধি মানুষজন বড়-একটা পথে বেরুচ্ছে না।

দরজা বন্ধ তো দেয়াল টপকে দু-জন সৈন্য কারখানার উঠোনে লাফিয়ে পড়ল। ফটক খুলে দিল তারা। সর্বনাশ করেছে—মার-কাট লাগায় বুঝি বাইরের দলবল জুটিয়ে এনে! অত দূর করল না—লোভ অধিক-কিছু নয়। টব ভরতি কয়লা ছিল উঠানে—দু-জনে ধরাধরি করে কয়লার টব বের করে নিয়ে গেল। যাকগে, যাকগে—কি আর হবে! নতুন জায়গার এই মাঘা শীতে ধর্মাধর্ম জ্ঞান থাকে? তবু যা হোক, কয়লার উপর দিয়ে গেল। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে কারখানার লোকে দরজায় হুড়কো তুলে দিল আবার।

সন্ধ্যাবেলা এই ব্যাপার—পরের দিন ভোর না হতে আবার দরজা ঝাঁকাচ্ছে। ফাঁড়া কাটবে এত সহজে? কাল দু-জনে দেখে শুনে গেছে, পুরো দল এসেছে আজকে। লোকগুলো নিঃশব্দ—মড়ার মতো হয়ে আছে। ঝাঁকানি বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ—দুয়োর ভেঙে ফেলবে নাকি? কার্নিশ বেয়ে উঠে একজনে বাইরে উঁকি দিল। আরে সর্বনাশ—সৈন্যদের প্রভুস্থানীয় একজন দোরগোড়ায়। সামান্য ফৌজ এসেছিল কাল, তাই চাট্টি কয়লার উপর দিয়ে গেছে। খোদ ফৌজদার মশায়ের শুভাগমনে আজ কারখানার ধুলোবালি অবধি কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। কপালে যাই থাক, রাস্তার উপর দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না তো বিজয়ী প্রভুকে! দন্তে কিঞ্চিৎ হাসির ছটা বিকীরণ করে আনন্দ-আহ্বান জানাতে হয়, আসতে আজ্ঞা হোক—কি ভাগ্যি আজকে আমাদের!

দরজা খুলে কিন্তু তাজ্জব। কালকের সে দু'টিও আছে পিছনে—কয়লার টব পুনশ্চ বহন করে নিয়ে এসেছে। ফৌজদার বললেন, লজ্জার অবধি নেই—নিজে আমি তাই মাপ চাইতে এসেছি। কয়লা ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। বিচার হবে এদের—কি শাস্তি হল, যথাসময়ে আপনারা জানতে পাবেন।

আর ঐ যে বলছিলাম, তিয়েনমিন বন্দর দখলে এসে গেছে—সেই জায়গারই এক ব্যাপার। সৈন্যদের উপর কড়া হুকুম—জিনিষপত্র কিনে সঙ্গে সঙ্গে ন্যায্য দাম দেবে। যে সব বাড়িতে থাকবে, নির্গোলে তার ভাড়া চুকিয়ে দেবে। জনগণের ভাল করতে এসেছি—এইটে মালুম হয় যেন সব সময়।

জনকয়েক এক বাড়িতে এসে উঠল—হোটেল ছিল আগে সেখানে। তার পরে যে দিন বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, কম্যাণ্ডার বাড়িওয়ালাকে ডাকলেন। দেখে নিন মশায়, আপনার জিনিষ-পত্তোর সমস্ত ঠিকঠাক আছে কিনা।

ফর্দ হাতে মালিক জিনিষপত্র মিলিয়ে নিচ্ছে। সব ঠিক আছে—একটা মগ শুধু কম পড়ছে। আবার গুণে দেখে, তাই বটে!

যাক গে, কতই বা দাম!

কিন্তু শুনবে না কম্যাণ্ডার। সৈন্যদের লাইনবন্দি দাঁড় করিয়ে হ্যাভারস্যাক তল্লাসি হচ্ছে। সেই মগ পাওয়া গেল এক জনের কাছে। কোন কথা নয়—বন্দুক তুলে দুম করে সোজা তাকে গুলি করা হল!

এমনিতরো ব্যাপার। মানুষের মনোহরণ করছে এমনি গোড়া

থেকেই। ভারি চালাক—কি বলেন? আমাদের প্রভুরাও এবম্বিধ চালাকি করুন, এই কামনা করি। সৈন্যরা ওখানে উপরওয়ালা নয়—জনসেবক। গটমট মার্চ করে পৌছল ধরুন এক গ্রামে। পৌছেই পোশাক-আশাক খুলে ফেলে দশ জনের এক জন। সকালবেলা হয়তো দেখছেন, জলকাদার মধ্যে চাষাভুষোর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ধান কাটছে। কিম্বা কোদাল মেরে রাস্তা বাঁধছে মজুরদের দলে। শখের ব্যাপার নয়—গাঁয়ে যতক্ষণ আছ, করতেই হবে গাঁয়ের কাজকর্ম। এই হল বিধি। গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে—আবার ঐ টুপি-পোশাক না পরা অবধি আলাদা করে ধরবার জো নেই।

একটা প্রশ্ন মনের ভিতর আনাগোনা করছে। এক বৌদ্ধ মন্দিরে সেদিন দেখলাম, ভারা বেঁধে মিস্ত্রিরা কাজে লেগেছে। (হ্যাংচাউয়ে পরে দেখলাম, আরও এলাহি ব্যাপার—টাকার শ্রাদ্ধ। আগাগোড়া মেরামত তো আছেই—তার উপরে প্রায়-বিলুপ্ত ফ্রেস্কো-গুলোয় নতুন করে দাগা বুলোচ্ছে) কি কাণ্ড মশায়? নানান দিকে এত জরুরি কাজ আপনাদের—তার মধ্যে এই শখ আসছে কিসে?

অধ্যাপক বললেন, জরুরি এটাও—

বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। কম্যুনিষ্ট দেশ—ধর্মের সঙ্গে লড়াই তো ওদের। মন্দির-মসজিদ-গির্জা ভেঙে ভূমি চৌরস করে ফেলছে, এই তো শুনে আসছি বরাবর।

কর্তারা কম্যুনিষ্ট তো বটেই, শাসন-ব্যবস্থার নাম কিন্তু নতুন-গণতন্ত্র। কাগজপত্র পুরোপুরি মেনে নিচ্ছে না, দেশটা কম্যুনিষ্ট। সে যাই হোক—ভাল ভাল লড়নেওয়ালা রয়েছে প্রতিপক্ষ রূপে, কোন দুঃখে তবে নিরীহ নির্বিরোধ ধর্মধ্বজীদের সঙ্গে লড়াই করতে যাবে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ধর্মের সম্বন্ধে মতিগতি ওদের ঐ প্রকার। সে রাত্রে বিস্তর ধর্মালোচনা হল—ধর্মের তত্ত্ব নয়, তথ্য। বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক পার হয়ে গেল—বিজ্ঞানের গুঁতো খেয়ে খেয়ে ধর্ম কি জোরদার আছে এখন? ধুঁকছে। মরার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া শক্তির অপব্যয়। এই এক মোক্ষম নীতি মশায় জেনে রাখুন, ধর্ম ও ধার্মিকদের সোয়াস্তিতে থাকতে দিতে হয়। ধর্ম নিয়ে পায়তারা কষতে গেলে হরেক সমস্যা অহেতুক মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সত্যিই অনেক কাজ আমাদের এখন—ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কই?

চীনা জাতটা চিরকালই অধিক পরিমাণে ঐহিক। ধর্ম নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি করেনি কখনো। আজকের দিনেও নানান ধর্ম রয়েছে পাশাপাশি। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নামটাই শুধু। কনফুসিয়ানরা গুণতিতে সকলের চেয়ে বেশি। বৌদ্ধও বিস্তর আছেন। আছেন [illegible]—সংসম্প্র উদাসীন সম্প্রদায়-এঁরা। মুসলমানরা সংখ্যায় কম—কিন্তু ধর্মনিষ্ঠা ওঁদেরই সকলের বেশি; মসজিদে নমাজ পড়েন, নীতিনিয়ম মানেন। তাঁরা সংঘবদ্ধও বটে—এক এক অঞ্চল নিয়ে বসতি। উত্তর-পূর্ব দিকে এক একটা জায়গার মানুষ আগাগোড়া মুসলমান। কিন্তু নাম শুনে মালুম পাবেন না—খাঁটি চীনা নাম, আরবি-পারসির নামগন্ধ নেই। চেহারা এবং পোশাকেও পুরো চৈনিক। সভাশোভনের সময়টা সাদা টুপি পরেন, এইমাত্র দেখেছি। আর নাম করতে হয় রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের—তাঁরাও ধর্ম-কর্ম করে থাকেন।

মজা হল একদিন। সেটা এইখানে বলে রাখি। ডাক্তার ফরিদিকে জানেন—লক্ষ্ণৌয়ের সেই যে জাঁদরেল ডাক্তার। সম্মেলনে আমার ডানদিকে যিনি বসতেন গো—নিচু গলায় গল্পগুজব হত আমাদের। একদিন ধরে ফেললাম, আপনি পিকিন-মসজিদে গিয়েছিলেন ডাক্তার সাহেব—

ডাক্তার অবাক হয়ে যান। কে বলল?

আপনি, পাকিস্তানের ওঁরা, এদেশ-ওদেশের আরও অনেকে, এবং এখানকার মোল্লা-মৌলবিরা একসঙ্গে নমাজ পড়ে এসেছেন। কাগজে ফলাও করে দিয়েছে।

বটে? কোন কাগজে বেরিয়েছে বলুন তো? দেবেন মশায় কাগজখানা আমাকে, যত্ন করে দেশে নিয়ে যাবো। বাড়িতে কেউ মানতে চায় না, আমি নমাজ পড়তে পারি—পড়ে থাকি কখনো-সখনো। কাগজ মেলে অবিশ্বাসীদের মুখের উপর ধরব···

চীনা কর্তারা বলেন, যার যেমন ইচ্ছে ধর্ম-কর্ম করুক; ইচ্ছে না হল তো করবে না। নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার—ষ্টেটের কোন মাথাব্যথা নেই এ সম্বন্ধে। ধর্ম এ যুগে কোন জাতকে বাঁচিয়ে রাখবে না—ধর্মোন্মাদনা স্বাভাবিক ভাবেই মারা পড়বে, এই ওরা সার বুঝে নিয়েছে। মুসলমান দু-চার জনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, হাসিখুশি দেখলাম তাঁদের। মসজিদ গড়বার কথা সরকারকে জানালে এক কথায় জমি পেয়ে যাই। কোন রকম অসুবিধা নেই মশায়, আরামে আছি। শুধু মুসলমান বলে নয়—চার্চের পাদরিও হাত পেতে কখনো নিরাশ হয়ে ফেরেন নি। মন্দির-প্যাগোডা যে ঝকঝকে করে তুলছে—ওসব হল ওদের প্রাচীন পুরুষদের কীর্তি, অতি-বড় গর্বের ধন। সে বস্তু কিছুতে নষ্ট হতে দেবে না। দিন পেয়েছে যখন, মন্দিরের উঠোনের টালিখানা অবধি অবিকল সেকালের মতো করে বসাবে।

খাওয়া-দাওয়া চুকল। দেশি পদও ছিল কয়েকটা—পুরি, আলুর দম ইত্যাদি। খেয়ে দেয়ে আবার জমিয়ে বসেছি।

শিক্ষার অবস্থা কি এদেশে? ছেলেপুলে ইস্কুলে পাঠাতে হবে, আইন করা হয়েছে এ রকম?

উঁহু, আইন-টাইন নেই। গোটা দুনিয়া জুড়ে যত মানুষ, তার সিকি ধরুন এই একটা দেশে। যেটের বাচ্চা কতগুলি এই থেকে অতএব আন্দাজ করে নিন। আইন করে সবসুদ্ধ এনে জোটালে তো হবে না—তার জন্য চাই বাড়ি, বইপত্তোর, পণ্ডিত-মাষ্টার। বাচ্চা পড়াতে পারেন—এমনি পাকা মাষ্টারেরই বেশি অকুলান। লেখাপড়াটা আগে ভদ্রলোকের একচেটিয়া ছিল—চাষাভুষো মুটেমজুর কিম্বা মেয়েলোকদের জন্য ও-বস্তু নয়। ইস্কুলের দায়ঝক্কি কুলানো সাধ্যের বাইরে ছিল তাদের। এই সেদিন অবধি শতকরা আশি জনের উপর তাই নাম সই করতে পারত না।

কিন্তু তিন বছরে এখন যা গতিক দাঁড়িয়েছে, শিক্ষা বাবদে আইনের বাঁধাবাঁধি কোনোদিন আর দরকার হবে না। ছেলেপুলেদের আপোষে বাপ-মায়েরা ইস্কুলে নিয়ে দিচ্ছে। কেন দেবে না বলুন! একপয়সা মাইনে লাগবে না। বই-খাতা-কলমও দিয়ে দেয় ইস্কুল থেকে। গার্জেন গরিবানা জানিয়ে যদি দরখাস্ত করে, খাওয়ার ব্যবস্থাও মুফতে হয়ে যায়। এর পরে কোন্ আহম্মক তবে ছেলেপুলে ঘরে আটকে রাখবে? এক সংসারে ধরুন বিস্তর কাচ্চাবাচ্চা, ইস্কুলে দিলে নিখরচায় ঝামেলা এড়ানো যাবে—

অন্তত এই বাবদেও বাপ-মায়েরা ও-গুলোকে টুঁটি ধরে দিয়ে আসবেন ইস্কুলে। আরও আছে। অবস্থা আজকে এমন হয়ে উঠেছে, ছেলে-মেয়ে পাঠশালায় না পাঠালে বাপ-মা নিচু হয়ে যান দশ জনের চোখে। দেখ, দেখ, অমুকের ছেলে বাড়ি বসে বসে বখামি করে। যেন বিষম এক সামাজিক পাপ!

আর ছেলেপুলেই বা বলি কেন, বুড়োদের মধ্যেও ঠিক এই ব্যাপার। বই পড়া শিখতে হবে, হাতের লেখা লিখতে হবে। ইস্কুলের জন্য ঘরবাড়ি মিলল না তো শুরু করে দাও বাড়ির রোয়াকের উপর, কি মন্দিরের চাতালে কিম্বা গাছতলায়। সকাল-সন্ধ্যা-তুপুরে সময় না হল তো রাত তুপুরে। শহরে গাঁয়ে ঘুরতে ঘুরতে এমনি কত অধ্যবসায় আমাদের চোখে পড়েছে! চীনা-লিপি রপ্ত করা—সে যে কি কাণ্ড, আপনারা জানেন। ওখানকার ভাষাতাত্ত্বিকেরা আদা-জল খেয়ে লেগেছেন, সহজ রাস্তা বের করবার জন্মে। তাঁদের কাজ তাঁরা করুনগে— এদিকে কিন্তু দেখতে পাবেন, গাছের ডালে পিচবোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছে, তাতে সেই অক্ষরটা—যার মানে হল 'গাছ'। গরুর পিঠে ঐ রকম 'গরু'-অক্ষর সেঁটে দিয়েছে। পুকুরের ধারে সাইনবোর্ড তুলেছে—তাতে লেখা 'পুকুর'-অক্ষর। দেখে দেখেই কত অক্ষর জেনে ফেলছে এমন। আহা, কত সর্বনাশ হয়ে গেছে এই লেখাপড়া না জানার দরুন। খানিকটা লেখার নিচে সরল মনে টিপসই দিয়েছে—তারপর টের পেলো ক্ষেতখামার সমস্ত বিক্রি করেছে মহাজনকে। মেয়ের ফ্যাক্টরিতে চাকরি হবে—আনন্দে মা দরখাস্তের উপর টিপসই দিল। তারপর জানা গেল, টিপসইর জোরে মেয়েকে নিয়ে তুলেছে পতিতাবাসে।

বারো বছর বয়সে প্রাইমারি পেরিয়ে ছেলেমেয়েরা ঢুকবে জুনিয়ার মিডল ইস্কুলে। তারপরে সিনিয়ার মিডল ইস্কুলে। বই মুখস্থ নয়। খেতে পরতে পারবে, দেশব্যাপ্ত পরিগঠনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে সর্বশক্তিতে—সেই সমস্ত তালিম দেওয়া শুরু হয় ঐ তখন থেকেই। বৃত্তির কাজে উৎসাহ দেয় বেশি। বিস্তর কর্মী চাই, ছেলেমেয়েরা সেই দিকে ধেয়ে যাও। আঠারো বছর অবধি এদিককার পড়াশুনোর পর য়্যুনিভার্সিটি। তার পরেও আছে—দুরূহ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণা। এসব অতি-মেধাবীদের জন্য, সংখ্যায় তারা কম। সাধারণ মেধার ছেলেমেয়েরাও উচ্চ বিদ্যার্জনে প্রাণপাত করবে, এটা ওরা চায় না। উপর দিককার ছাত্রের এদিক-ওদিক খরচপত্র আছে বটে, কিন্তু একটু এলেম দেখাতে পারলেই স্কলারশিপ। কোন একটা স্কলারশিপ জুটিয়ে নিয়ে নিজের খরচ-খরচা চালানো শুধু নয়, উপরি তু-চার পয়সা বাড়িতেও পাঠাতে পারো।

তাই বেরুমলের একটা কথা মনে পড়ছে। আমাদের স্বদেশীয় বেরুমল—মরিশন স্ট্রীটের সেই সিল্কের ব্যাপারি। ব্যাপার-বাণিজ্য সে-কালের মতো জুত নেই, ভদ্রলোক সেই জন্য নতুন গবর্ণমেন্টের উপর খাপ্পা। মুখ ফুটে তেমন-কিছু না বললেও—দেশোয়ালি মানুষ তো— ভাবে ভঙ্গিতে মালুম পাই। একদিন তোড়ের মুখে উষ্মা ও বেদনা ভরে বলে ফেললেন—আরে মশায়, চিয়াং কাইশেকের সাধ্যি আছে আর এখানে ঘাঁটি গাড়বার? বিষম চালাক এরা—একেবারে গোড়া ধরে বন্দোবস্ত। যত পড়ুয়া ছেলে-মেয়ে দেখতে পান, সবাই পাগল নতুন সরকারের জন্য—সবাই ওদের ভাবের ভাবুক। বাচ্চা বয়স থেকে গড়ে-পিটে তুলছে। তোয়াজ কত ছেলে-মেয়েদের—ডাইনে বাঁয়ে স্কলারশিপ ছড়ানো, দয়া করে তুলে নিলেই হল। পড়া শেষ হতে না হতেই কাজ অমনি মুকিয়ে আছে। এখন তো এই দেখছেন—আর এই সব ছেলেমেয়ে যখন মুরুব্বি হয়ে উঠবে, সেই ভাবী আমলের আন্দাজটা নিন দেখি। তাই তো বলি, তামাম তুনিয়া জোটপাট করে চিয়াংকে যদি আবার গদিতে বসিয়ে দেয়, একটা বেলাও সে টিকতে পারবে না।

চীনের দক্ষিণ ভাগটা সকলের পরে এসে মিশেছে। সে অঞ্চলে যদিই বা তু-পাঁচ জন থাকে, আর কোথাও বেকারের নাম-গন্ধ নেই। বরঞ্চ লোকের জন্যই মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি। দেশ গড়ে তোলবার জন্য হাজার দিকে হাজার রকমের কাজ—পোক্ত লোকের অভাবে রামা-শ্যামাকে দিয়ে চালানো হচ্ছে। কাজ-জানা লোক লাখে লাখে গড়ে তোলবার দরকার এখন।

(পরাঞ্জপের বাড়ি ছেড়ে মাঝে একটু এখানকার কথা বলে নিই। এই সেদিন চীন থেকে এক সাংস্কৃতিক দল এসেছিলেন। আমাদের পশ্চিম-বাংলার এক কর্তাব্যক্তি ডেলিগেশনের দলপতিকে শুধালেন, কি আশ্চর্য—এত শিক্ষা ছড়াচ্ছেন, বেকার বাড়ছে না তবু আপনাদের দেশে? আমরা যে মরে গেলাম—যত উৎপাতের মূলে কাজ-না-পাওয়া বেকার ছোকরাগুলো। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, শিক্ষা আমরা এলোমেলো ছড়াই নে, রীতিমতো তার হিসাব আছে। কি রকম শিক্ষায় শিক্ষিত কত জন কারিগর লাগবে, সব কারখানা তার ফিরিস্তি দিয়েছে; জানা আছে, কত ডাক্তার, কত মাষ্টার, কি ধরনের কত কেরানি চাই। আগামী চার-পাঁচ বছর দেশের কোনখানে কোন গুণের কি রকম কর্মী কত সংখ্যায় লাগবে, সমস্ত ছকে ফেলা হয়েছে মোটামুটি। শিক্ষালয়গুলো সেই হিসাবে ছাত্র নেয়। তাই একটা বিষয়ে পাশ করে দশ-বিশ হাজার বেকার বসে রইল, আর একটা বিষয়ে মোটে গুণীলোক পাওয়া যাচ্ছে না— এমনটা হতে পারে না। কথাগুলো আমি ডেলিগেশন-দলপতির শ্রীমুখ থেকেই শুনে লিখছি। কর্তাব্যক্তির নামটা দিলাম না।)

গল্পের পর গল্প। হাতে ঘড়ি-বাঁধা, কিন্তু ফুরসৎ কোথা সেদিকে তাকিয়ে দেখবার? অধ্যাপক তারপর হঠাৎ এক সময় উঠে দাঁড়ালেন, আর নয়—ওঠা যাক এবার।

সর্বনাশ, বারোটা বেজে গেছে যে! পরাঞ্জপে তাঁর লোকটাকে কি বলে দিলেন। অনতিপরে রিক্সা এসে পড়ল। আমায় বললেন, আপনার হোটেলে নিয়ে পৌঁছে দেবে। সমস্ত বাতলে দেওয়া আছে, কিচ্ছু আপনাকে বলতে হবে না।

যেন চীনা ভাষায় ওস্তাদ ব্যক্তি আমি, মনে করলেই গড়গড় করে পথঘাট বুঝিয়ে দিতে পারব। নমস্কার করে রিক্সায় উঠে বসলাম।

রাত্রির এই কয়েকটা ঘণ্টা আমার মনের উপর দাগ কেটে রয়েছে। সে কি জ্যোৎস্না—জ্যোৎস্নায় ফিনকি ফুটছে! আঁকাবাঁকা অতি সঙ্কীর্ণ পথে নিয়ে চলেছে। আমাদের মোটরগাড়ি বড়—নিতান্ত-পক্ষে মেজো রাস্তাগুলোয় বিচরণ করে। পরাঞ্জপের উদ্যোগ না হলে পিকিনের এই গলিঘুঁজি অঞ্চল কখনো দেখা হত না। জায়গায় জায়গায় এমন সরু যে রিক্সার পাশে একটা মানুষের যাবার পথও থাকে না।

নিষুপ্ত শহর। কদাচিৎ একটা-তুটো মানুষ অতিক্রম করে

যাচ্ছে আমাকে। তারপরে দেখি, একটা রোয়াক মতো জায়গায় জন পাঁচ-সাত মণ্ডামর্ক মানুষ গুলতানি করছে। রাত দুপুরে কলকাতা শহরেও দেখতে পাবেন অমন। হঠাৎ তারা চুপচাপ হয়ে যায়। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বিদেশি মানুষ একা একা রিক্সা চেপে চলেছে, কৌতূহলে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

ছোটবেলা লুকিয়ে চুরিয়ে ডিটেকটিক বই পড়তাম (আপনারাও পড়েছেন কি না, যথাধর্ম বলুন। গোপন করবেন না, সত্যসন্ধ পাঠক)—যত লোমহর্ষক খুন-ডাকাতি-রাহাজানি—চীনে বোম্বেটেরাই করছে বেশির ভাগ। অভিভাবকের চটিজুতা ফটফট করে ওঠে—ডাকাত-বোম্বেটেরা সঙ্গে সঙ্গে অমনি জ্যামিতির তলায়। প্রবল কণ্ঠে চেঁচাচ্ছি, ত্রিভুজের দুইটি বাহু পরস্পর সমান হইলে··· চটিজুতা অতএব নিঃসংশয় হয়েছেন, ছেলেটা অতিশয় সাচ্চা। ফটফট আওয়াজে খুশি জ্ঞাপন করে চটি ক্রমশ দূরবর্তী হয়ে চললেন দাবার আড্ডায়। জ্যামিতির ঢাকা ফেলে বোম্বেটের দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আবার। সে স্মৃতি আজও ঝিকমিক করছে। কি সব সাংঘাতিক গল্প রে! নিজে এখন গল্প লিখতে লিখতে লজ্জায় মরি। কারা পড়ে আমাদের এই সব ঘরব্যাভারি জোলো কাহিনী—কেন পড়ে তা-ও জানি না।

চীনের মানুষ সেই তখন জেনেছিলাম। যেমন নৃশংস তেমনি বেপরোয়া; ন্যায়-অন্যায় ধর্মাধর্ম মানে না। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেয়াড়া জায়গা তবে চীন; বইয়ের মধ্যে ছবিও থাকত ঐ সমস্ত বোম্বেটের। মাথায় সুদীর্ঘ টিকি—মেয়েদের বিনুনির মতো। কিন্তু চীনা মাটির উপর এই যে এতদিন বিচরণ করছি, সেই চেহারার একটি চোখে পড়ল না! মুসড়ে যাচ্ছি—ছোট্টবেলার সেই সব ছবি একেবারে ভুয়ো? জাত ধরে বদলে গিয়েছে—তা বলে একটা-দুটো নমুনাও কি থাকতে নেই এত বড় দেশের ভিতর?

দু'ধারের প্রাচীন রহস্যময় বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি। কোন এক চোরকুঠুরির দুয়োর খুলে হঠাৎ ধরুন বেরিয়ে এলো—হাতে ছোরা, মাথায় টিকি, আমার সেকালের বইয়ের কোন এক বোম্বেটে। অপরিচিত দেশে নিশিরাত্রে নিঃসহায় চলেছি—পকেটে কোন না দশ-বিশ লাখ রয়েছে—ছোরাটা সে আমার বুকের উপর এনে ধরল। তারই বা গরজ কি—রিক্সা থামিয়ে সামনে এসে শুধু হাত বাড়ালেই হল। অসহায় ভাবে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকব। চেঁচিয়ে সাহায্য চাইব, সে উপায় নেই—কেউ আমার কথা বুঝবে না।

কিন্তু কিছুই ঘটল না। গলি ছাড়িয়ে নির্বিঘ্নে বড় রাস্তায় এসে পড়লাম। বোম্বেটেবর্গের গুঁড়োটুকুও, দেখছি আর পড়ে নেই। বড় রাস্তাও প্রায় জনশূন্য। একটা ট্রাম জোরে হাঁকিয়ে ডিপোয় ফিরছে। তাতে দু-চার জন মাত্র চড়ন্দার।

হোটেলের সামনে নিয়ে এসেছে—নামতে যাবো, ইসারায় নিষেধ করে। রিক্সা ভাল করে ফুটপাথের গায়ে লাগিয়ে তবে নামতে দিল। ভাড়া মিটিয়ে দেবো—রাত দুপুরে বয়ে নিয়ে এসেছে, কিছু বেশিই ধরে দেওয়া যাক—তিন হাজার?

কথায় তো বুঝবে না, তিনটে আঙুল দেখাই। রিক্সাওয়ালা ঘাড় নাড়ে। মানুষটার লোভ কম নয় তবে তো—চার? থাকগে, পুরোপুরি পাঁচ হাজারই দেবো না হয়।

পাঁচটা আঙুল দেখিয়েও রাজি করা যায় না, তখন সন্দেহ হয় আমার কথা বুঝতে পারছে না হয়তো কিছুই। মনিব্যাগ খুলে পাঁচ হাজারের নোট তখন সামনে মেলে ধরি। কি হে?

রিক্সাওয়ালা তড়াক করে তার সিটে লাফিয়ে বসল। একটা সেলাম ঠুকে সাঁ-সাঁ করে চালিয়ে দিল গাড়ি। এক ইয়ুয়ানও নিল না। পিকিন-হোটেলের সামনে বড় রাস্তার উপর সেই ভুবনপ্লাবী জ্যোৎস্নার মধ্যে হতভম্ব হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। রাগ করে চলে গেল বোধ হয়—আচ্ছা মানুষ তো!

সকালবেলা পরাঞ্জপেকে ফোনে ধরলাম। কি কাণ্ড মশায়, ভাড়া না নিয়ে সরে পড়ল!

পরাঞ্জপে বললেন, আমার লোক ভাড়া দিয়ে দিয়েছিল লোকটাকে ডেকে আনবার সময়। একবার ভাড়া নিয়েছে, আবার আপনার কাছ থেকে নিতে যাবে কেন?

অজানা এক রিক্সাওয়ালা—পথ থেকে ডেকে এনেছে। পরাঞ্জপের লোকও কোন দিন হয়তো পাবে না আর তাকে, বিদেশি মানুষ আমি তো নয়ই। আমার চোখের আড়ালে ভাড়া দিয়েছে কি না দিয়েছে—নিশুতরাত্রে কোন দিকে কেউ নেই—আমি নগদ পাঁচ হাজার মেলে ধরলাম, তা গরিব মানুষটা চোখ তুলে তাকাল না একবার সেদিকে। সামান্য সাধারণ লোকগুলোও এখনি যুধিষ্ঠির হয়ে গেছে, আর আপনারা কিনা মুখ সিঁটকে বলছেন—নতুন-চীনে ধর্মকর্ম নেই!

[ক্রমশঃ

রাত নিঃঝুম

শ্রীসুশান্তকুমার ঘোষ

রাত হ'ল নিঃঝুম,
চোখে কেন নেই ঘুম—
ঘুম-পরী কেন আজ আসে না!
আকাশের আঙিনায়,
তারাদের মাঝে হায়—
এক-ফালি চাঁদ কি হাসে না!
বোবা রাত যে কথা কয়,
চুপি চুপি ইসারায়—
কত কথা সে যে আর থামে না!
তাই বুঝি ঘুম চোখে নামে না?

বাতাস কি চুপিসাড়ে,
দাঁড়ায় কি এসে দ্বারে—
রাত-জাগা প্রাণীগুলো কি করছে!
দেখে এসে কোনখানে,
বলে কি সে কানে কানে—
'দেখলাম কালো ছায়া নড়ছে!'
বাতাসের কথা শুনে,
ভাবনা কি জাল বোনে—
নয়নে কি কারো ছবি ভাসে না?
ঘুম-পরী কেন আজ আসে না!

রবীন্দ্রনাথ ও দক্ষিণ-ভারতের সাহিত্য

কে, এম, পাণিক্কর

এ কথা জোর দিয়ে বলা বাহুল্য যে, অনেক আপাত-বৈষম্য সত্ত্বেও হিন্দু-ভারতে একটা সাংস্কৃতিক ঐক্য আছে। সেই ঐক্য প্রাদেশিকতার সীমা ও জাতিগত আচার-আচরণের বিভেদকে অতিক্রম করে গেছে। যখন যোগাযোগ রক্ষা আজকের মতো সহজ ছিল না এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে মেলা-মেশা দুরূহ ছিল সেই মধ্য যুগের ভারতের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলনগুলির সুদূরপ্রসারী প্রভাবকে অদ্ভুত অর্থগর্ভ বলে স্বীকার করা হয়েছে। এমন কি, তামিল ভাষাভাষীদের শৈবসিদ্ধান্ত সুদূর কাশ্মীরের ওপরও প্রভাব রেখেছে। শঙ্করের দার্শনিক ভাবনারাশি সারা ভারতের চিন্তা ও ধর্মীয় জীবন আলোড়িত করেছিল। রামানুজের থেকে জন্মলাভ করে বৈষ্ণব-মতবাদ চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এমন একটি সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক প্রকাশ ঘটিয়েছিল যা ভারতবর্ষে আর খুব কমই দেখা গেছে। আমাদের আজকের দিনে জাতীয় জীবনে জটিলতার জন্যে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনগুলিতে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে ভারতীয় চিন্তাধারায় এই যে পারস্পরিক যোগাযোগ, এইটেকে ঠিক মতো উপলব্ধি করা হয়নি। শুধু এ কথাও নিশ্চিত যে, রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী দয়ানন্দ প্রভৃতির মতো সংস্কারক ও মনীষীদের ক্রিয়াকাণ্ড শুধু তাঁদের স্ব স্ব কর্মক্ষেত্র বা প্রদেশের চিন্তাধারা ও জীবন পরিবর্তিত করেনি, গোটা হিন্দু-ভারতেরও করেছে। মাদ্রাজ প্রদেশের প্রগতি ব্রাহ্মধর্মের থেকে তার অনুপ্রেরণা পাওয়ার কথা স্বীকার করে।

যদি আজও সেই ঐক্য ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে এখনও জীবন্ত থেকে থাকে, তাহলে সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে তা আরও বেশি জীবন্ত হয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা সংস্কৃতের ঐতিহ্যেই পুষ্ট, তা সে মূলত প্রাকৃত হোক আর দ্রাবিড়ীই হোক। ফল হয়েছে এই যে, এই সকল সাহিত্যের মানবিকতা মূলত একই। এই সকল সাহিত্যে প্রতিফলিত চিন্তার ভঙ্গি, জীবন সম্বন্ধে সাধারণ প্রতিন্যাস এবং কৃষ্টি কিন্তু কোনো ক্রমেই পৃথক্ নয়। সেই সমস্তের পরিণতিতে আজকের আধুনিক প্রভাব যে রূপ দিচ্ছে তা-ও কিন্তু একই। আসলে তারা হলো একটি জীবন্ত সভ্যতার অনেকগুলি স্বর মাত্র। তা হতে কোন একটি সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক আন্দোলন অনতুভবনীয় রূপে অন্যান্যগুলির পরিণতিতে প্রভাব বিস্তার করে, প্রেরণা জাগায়। এই ঘটনা পরিষ্কার হয়ে গেলো যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবিরূপে দেখা দিলেন, অবশ্য এটা আগেই গোচরীভূত হতো, হতে পারেনি আধুনিক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক তন্ময়তার জন্যে।

রবীন্দ্রনাথ যে কেবল উত্তর-ভারতের সাহিত্যেরই নিজস্ব হয়ে পড়বেন বা অঙ্গীভূত হবেন, এটা সম্ভবত অপ্রতিরোধ্য। তবু, বিদ্যাপতি, কবীর, মীরাবাঈ, তুলসীদাস, নানক কেবলমাত্র মৈথিলী হিন্দী বা পাঞ্জাবী ভাষারই কবি হয়ে থাকেননি, তাঁরা সারা ভারতবর্ষেরই। সেই হিসেবে যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় মানবতাবাদের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাতা, সেই কারণে তিনি কেবল বাংলারই কবিশ্রেষ্ঠ নন, সেই-সঙ্গে হিন্দী ও অন্যান্য উত্তর-ভারতের ভাষা সমূহেরও বটেন। তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব কিন্তু কবীর ও অন্যান্যদের মতো বিন্ধ্যপর্বতমালা পর্যন্ত এসে থেমে যায়নি। আজ যদি কোন মালয়ালমভাষী বা তামিলীকে জিজ্ঞাসা করা হয় তাঁদের নিজ নিজ ভাষায় প্রধান সাহিত্যিক শক্তি কে কে, তাঁদের উত্তর নিশ্চয়ই হবে, রবীন্দ্রনাথ। তামিলী অঞ্চলের বা মালাবারের জনসাধারণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখার আত্যন্তিক ব্যাপকতার জন্যেই কিন্তু কেবল নয়। নিঃসন্দেহে এ কথা সত্য, তাঁর লেখা সমস্ত শ্রেণীর কাছে প্রিয়। এই লোকপ্রিয়তাই কিন্তু দক্ষিণাপথের শিল্পসৃষ্টিতে তাঁর অসামান্য প্রভাব এনে দেয়নি। যে নতুন জীবন-চেতনার তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন, যে নতুন শক্তির তিনি উদ্গাতা, যে নয়া মানবতাবাদের পুরোধা তিনি ভারতবর্ষে—সেগুলিই এনে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন একটা সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক শক্তি, যে শক্তি দক্ষিণাপথের সাহিত্যগুলোর কাছে শক্ত আবরণে ঢাকা ঐতিহ্যের জগদ্দল পাথরের কবল থেকে মুক্ত এক নতুন জীবনের সম্ভাবনা দেখিয়েছে।

দক্ষিণাপথের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের এই প্রভাবের অদ্ভুত নিদর্শন হলো মালয়ালম্ ভাষার বিখ্যাত কবি ভাল্লাথলের সাহিত্যে। ভাল্লাথল অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি, এবং সংস্কৃত সাহিত্যের খ্যাতনামা পণ্ডিত। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন সনাতন ঐতিহ্যের অন্ধ ভক্ত। কবিতা যা লিখেছিলেন তা যেন শব্দ নিয়ে কেরামতি। মাঘের 'শিশুপাল বধ'-এর অনুসরণে একখানা মহাকাব্য লিখেছিলেন তিনি, বাল্মীকি রামায়ণের আগাগোড়া অনুবাদ করেছিলেন এবং শিল্পে অবাস্তবতার সাধনায় নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। যাদের জন্যে তিনি লিখতেন সেই জনসাধারণের জীবনের বুদ্ধির বা হৃদয়ের কোনো দিকের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির কোন সম্বন্ধ ছিলো না। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নতুন আলোক তাঁকেও স্পর্শ করলো। পরিবর্তন তাঁর মধ্যে এলো ধীরে ধীরে, কিন্তু পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে ভাল্লাথল এমনই হয়ে উঠলেন যা মালাবারের আর কোন কবিই হননি। তিনি হয়ে উঠলেন বৌদ্ধিক ও শৈল্পিক আন্দোলনের একজন নেতা, সে আন্দোলন শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি, সঙ্গীত, শিল্প, নৃত্যকলার ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছিল। যে জীবন তাঁর চার দিকে উদ্বেলিত হয়ে আছে সেই নতুন জীবনে তিনি উদ্বুদ্ধ হতে লাগলেন, এবং প্রকৃতই তিনি ভারতীয় চিন্তার শ্রীবৃদ্ধির জন্যে গঠিত প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গে মিশে গেলেন। কিন্তু তাঁর প্রধান আকর্ষণ সব সময়ে ছিল শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রের পুনর্বিকাশের দিকে। ভাল্লাথলের মধ্যে যে আন্দোলনের জন্ম সেই আন্দোলন এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে যে, তা মালাবারের বৌদ্ধিক রেনেসাঁর প্রতিনিধিত্ব করে বললে ঠিক বলা হয়।

ভাল্লাথলের কবিতার অবশ্য মৌল পরিবর্তন ঘটেছে। এখন আর তিনি অত্যন্ত জটিল আঙ্গিকের সাহায্যে বোধবর্জিত উৎকল্পনার ব্যাখ্যায় তৃপ্তি পান না, কিংবা তৃপ্তি পান না সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রবিদদের প্রদর্শিত সুকঠোর আইন-কানুনের অনুসরণে। তার পরিবর্তে তিনি সুরু করলেন অনির্বচনীয় ভাবে আর অনুভূতির সঙ্গে বাণীরূপ দিতে তাঁর দেশবাসীর জীবনের, তাদের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার আর তাদের শৈল্পিক আবেগের। কিন্তু এ শুধু তাঁর নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কনিষ্ঠ সাহিত্যিকগোষ্ঠী তাঁকে তাঁদের নেতা বলে বরণ করলেন; তাঁরা ত' ইতিমধ্যেই তখনকার অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকদের অনমনীয় অবাস্তব প্রাচীন রীতির বিরুদ্ধে

লড়াই সুরু করেছেন। ফলে হলো, আজ মালয়ালম্‌ সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের অদৃশ্য হস্তের দ্বারা এবং যে শক্তি তিনি সঞ্চালিত করে দিয়েছিলেন তার দ্বারা চালিত হচ্ছে।

আরও লক্ষ্যণীয় যে, এই যে আন্দোলন যার জন্য দক্ষিণাপথ রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করে নিয়েছে সে আন্দোলন শুধু সাহিত্য-ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নেই। মালাবারের রেনেসাঁ সম্ভবত ভালো ভাবে বোঝা যাবে সেখানকার নাটক ও নৃত্যকলার অভূতপূর্ব পুনর্বিকাশের আলোচনায়। এদিকেও ভাল্লাথল নেতা ও প্রধান প্রবক্তা। যখন তাঁর চেতনায় এলো শিল্পকলার পরম্পর-সম্বন্ধতার কথা, আর ব্যাখ্যার জন্যে তাদের পরস্পরের নির্ভরতার কথা, তখন একটা জিনিষ স্বচ্ছ হয়ে গেলো তাঁর কাছে; যদি মালাবারকে নিজের সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে হয় তবে শিল্পকলার যে সব ঐতিহ্য দ্রুত বিনষ্ট হচ্ছে সেগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। নিজে তিনি নাট্যকার ও অভিনেতা। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন কেরালা কলামণ্ডলমের। এই প্রতিষ্ঠানের চেষ্টা হলো কেরালার শিল্পকলা পুনরুজ্জীবিত করা, এবং কেরালার সৃষ্টিশীল প্রাণনায় নতুন ও আধুনিক নির্দেশ দেওয়া। বিশিষ্ট সমৃদ্ধ ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্য ও নাট্য-কলা কথাকলির পর্যায়ে ইতিমধ্যে এই প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। এক কালে কথাকলি ছিল কেরালার জাতীয় শিল্প। কিন্তু আমাদের কলেজগুলোতে নৈরাত্মাশিক্ষার ফলে যে রুচিবিকৃতি ঘটেছে তার জন্যে কথাকলি জীবিকা বা শিল্প উভয় হিসাবেই দ্রুত নিশ্চিহ্ন হতে চলেছিল। ভাল্লাথল শুধু যে তাকে একেবারে বিস্মৃতির কবল থেকে উদ্ধার করেছেন তাই নয়, লোকপ্রিয়তায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি কেরালা কলামণ্ডলমের পৃষ্ঠপোষকতায় কথাকলি শিল্পীদের জন্যে শিক্ষণ বিভাগ খুললেন এবং শিক্ষিত বনেদী ঘরের যুবকদের সংগ্রহ করলেন কথাকলিকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে। আমরা আগ্রহের সংগে উল্লেখ করতে পারি, কথাকলির এই শ্রীবৃদ্ধিতে রবীন্দ্রনাথ এতখানি বিমুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর একটি শিক্ষার্থীকে ভাল্লাথলের অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে পাঠিয়েছিলেন।

দক্ষিণ-ভারতের সাহিত্যে 'টেগোর স্কুল'-এর জনপ্রিয়তা কোনো-ক্রমেই একটা ক্ষণস্থায়ী রীতি-রেওয়াজ নয়। এ কথা সত্য, এই আন্দোলনের তাগিদে অনেক কিছুই সৃষ্টি হয়েছে যার সংগে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সৌসাদৃশ্য নেই। তা সত্ত্বেও আসলে সেগুলো রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব-জাত শক্তির থেকে জন্মলাভ করেছে এবং কম-বেশি সেগুলো সেই একই প্রেরণা ও আলোকের প্রতিফলন, যে প্রেরণা ও আলোক আধুনিক ভারতবর্ষের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর কাছেই প্রথম উদ্ঘাটিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, তাঁর আবেদনের বিশ্বজনীনতায়, তাঁর বাণীতে, সে-বাণী জাতি, বর্ণ, ধর্ম, বিভেদের গণ্ডী পেরিয়ে সকলের কাছে পৌঁছেছে। কিন্তু আমাদের কাছে তিনি মুখ্যত ভারতের কবি, সঙ্গীতের প্রত্যাদিষ্ট গায়ক; তিনি সাহিত্যে আমাদের নতুন পথ দেখিয়েছেন, জীবন ও চিন্তার নতুন দৃশ্যপট উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তাঁর প্রেরণা থেকেই দক্ষিণাপথের সাহিত্য-গুলোর স্ফূর্তি, তাঁরই প্রভাবে সেগুলি বিচিত্রবর্ণ হয়েছে, সুন্দর সমৃদ্ধ হয়েছে। আবার তিনি ভারতবর্ষের বৌদ্ধিক জীবনকে একসূত্রে গাঁথলেন যেমন গেঁথেছিলেন শঙ্কর ও রামানুজ, চৈতন্য এবং অতীত দিনের অন্যান্য সত্যদ্রষ্টারা, একই পরিমাণে হয়ত নয়, তবু একই ভাবে।

অনুবাদ : আনন্দ দে

সৈনিকদের জন্য খাকির পোষাকের ব্যবহার—ভারতবর্ষে প্রথম

খাকি কাপড়ের পোষাকের সঙ্গে বাঙালী অপরিচিত নয়। ইংরাজ রাজত্বের সময়ের পুলিশ ও মিলিটারীর ছিল খাকির পোষাক। এখনও ভারতীয় ফৌজের অঙ্গ থেকে খাকির পোষাক নামেনি। এই যে এই পুলিশ ও সৈন্যদের জন্য খাকির ব্যবহার—এটি প্রথম কবে প্রচলিত হয় পৃথিবীতে? কে প্রচলন করেন? পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও এই খাকি কাপড়ের পোষাক পুলিশ বা সৈন্যদের জন্য ব্যবহৃত হওয়ার বহু পূর্বে সিপাই বিদ্রোহের সময় ভারতবর্ষে প্রথম প্রচলিত হয়। সিপাই বিদ্রোহ দমনের জন্য নিযুক্ত কমাণ্ডিং অফিসার কর্ণেল ক্যাম্পবেল খাকির পোষাকের ব্যবহার সর্বপ্রথম করেন। তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন :

"I had a suit per man of the white clothing dyed at Sealkote immediately after I arrived there from Lucknow, and we marched out of that place to join the Punjab Movable Column in it. My reason at the time for adopting it was the ulterior view of the diminishing the Indian Kit on account of the difficulty of getting the white trousers and jackets washed quickly. Moreover I thought it would be good colour for service."

অর্থাৎ "লক্ষ্ণৌ থেকে শিয়ালকোটে পৌঁছবার পরেই আমি সাদা পোষাক খাকি রংএ ছাপিয়ে নিলাম এবং তার পর আমরা "পাঞ্জাব মুভেবল কলম"এ যোগ দিতে গেলাম। সাদা পোষাক তাড়াতাড়ি সাফ করার অসুবিধার জন্যই আমি এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম। তা ছাড়া আমি মনে করেছিলাম যে, সৈন্যদের পক্ষে এই রং খুব ভালই হবে।"

বিপ্লবী নেতা বিপিনদা'র জীবনের কয়েকটি পাতা

অমর মুখোপাধ্যায়

বিপ্লবী নায়ক বিপিন গাঙ্গুলীর বিরাট কর্মজীবন ঘটনাবহুল অধ্যায়ে পূর্ণ। রোমাঞ্চ লাগবার মত সে ইতিহাস। বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের জ্বলন্ত ইতিকথা ছিলেন আমাদের দেশবরেণ্য নেতা বিপিনদা।' ভিসুবিয়াসের মত দেশের মুক্তির জন্য যে ক'জন ভারতীয় যুবক ফেটে পড়েছিলেন তাঁদের এক জন বিপিনদা'। তাঁর জীবনকথা তাই দেশের মানুষের কাছে রূপকথার মত লাগে।

তরুণ বিপ্লবীদের মনঃসংযম শিক্ষা দিচ্ছেন শ্রীঅরবিন্দ—সেদিনের শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। দেওয়ালের মাঝখানে একটি চক্ষু আঁকা হয়েছে। সেই চক্ষুর দিকে তাকিয়ে থাকবার নির্দেশ এল। প্রতিবাদ হল সঙ্গে সঙ্গে—আমি এ বিশ্বাস করি না। প্রশ্ন হ'ল—কিসে বিশ্বাস কর? বলিষ্ঠ জবাব—আমি বিপ্লবে বিশ্বাসী। অরবিন্দ বাবু এগিয়ে এলেন। এক সুদর্শন তরুণের মাথায় হাত দিয়ে বললেন—আমিও তাই চাই। তোমাকে এ সব ক্রিয়া পালন করতে হবে না। তোমার জন্য অন্য কাজ আছে। তরুণ বিপ্লবী বিপিন গাঙ্গুলীর মনের আগুন সেদিন বিদ্যুতের মত অরবিন্দ বাবুর মনকে স্পর্শ করল।

বিপিনদা'র—বিপ্লবের উজ্জ্বল বহ্নিশিখার—সে দিনের শপথ পালন করবার পথে কত বাধা! সেই দুর্গম পথে চলায় কত বিপদের বেড়াজাল ছড়ান! গা-ঢাকা দিয়ে সকলের আড়ালে থাকা নয়—কৌশলে সকলের মাঝখানে থেকে কাজ ক'রে যেতে হবে। বিপিনদা'কে তাই ঘুরতে হ'ল দেশে দেশান্তরে ছদ্মবেশে, আপন পরিচয় গোপন ক'রে। বিপ্লবীর নামের মোহ থাকে না। আদর্শ পালনে সন্ন্যাসীর ব্রত নিয়ে ত্যাগের পথে তাকে চলতে হয়, 'একলা চল' গান গেয়ে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একবার কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আপনার 'সব্যসাচী'টি কে? শরৎচন্দ্র হেসে বললেন—'সব্যসাচী'র রূপ দিয়েছি তিন জনকে অবলম্বন করে—বিপিন মামা আর তাঁর গাঁজার থলি, মানবেন্দ্র রায় ও তাঁর বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানীর চেষ্টা, আর রাসবিহারী বসু। দেশবন্ধু প্রশ্ন করলেন—গাঁজার থলিটি কি? শরৎ বাবু বলতে থাকেন—টেগার্ড সাহেব একবার বিপিন মামার পিছু নিয়েছেন। বিপিন মামার দৃষ্টি কিন্তু তিনি এড়াতে পারেননি। সঙ্গে দু'টি গুলী-ভরা পিস্তল নিয়ে চলছিলেন বিপিন মামা। তিনি সুবিধামত পিস্তল দু'টি তাঁর এক অনুচর মারফৎ পাচার করে দিয়ে কোমরে দু'টি থলি ঝুলিয়ে রাখলেন—সেই থলি-ভর্তি গাঁজা! সুযোগমত টেগার্ড সাহেব পিস্তল উঁচিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। টেগার্ডকে এ ভাবে নাজেহাল হতে পূর্বে দেখা যায়নি। দেহ-পরীক্ষার শেষে বিপিন মামা টেগার্ডকে হেসে বললেন—'সাহেব! এই জন্যে এতক্ষণ তুমি আমার পিছনে ঘুরছ। আমি নেশা-ভাং করি। জানতুম—ইংরেজ জাতটা বুদ্ধিমান কিন্তু তুমি আমার ধারণা বদলে দিলে।' চিত্তরঞ্জন সোল্লাসে হেসে উঠলেন।

বড়বাজারে একবার এক পাঞ্জাবী ব্যবসাদারের সঙ্গে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক উর্দ্ধতন কর্মচারী দেখা করতে এলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। শেষে পুলিশ-অফিসারটি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন—না, যা ভাবা গিয়েছিল তা নয়। সেই দিন সন্ধ্যায় ভদ্রলোক যখন বাসায় ফিরলেন, দেখলেন—দরজায় খড়ি দিয়ে লেখা,—'কি দাদা, চিনতে পারলেন না ত'? এবারে ঘুঘু উধাও হ'ল।' ঐ পাঞ্জাবী ব্যবসাদারটি আর কেউ নয়—বিপিনদা'।

বর্মা মুল্লুকের এক জঙ্গলাকীর্ণ পথ। পথিক বিপিনদা' পথ হারিয়ে ফেলেছেন। সন্ধ্যা সমাগত। এক জায়গায় এসে বিপিনদা' থমকে দাঁড়ালেন। অল্প কিছু দূরে এক ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে। কতকগুলি জংলী মানুষ মাঝখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে আগুন জেলেছে। ঠিক সেই আগুনের ওপরেই একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা গায়ের চামড়া-ছাড়ান মানুষ। তারা সেই আগুন ঘিরে নৃত্য করছে আর দুর্বোধ্য ভাষায় গান ধরেছে। এই পাশবিক উৎসব দেখার দুঃসাহস বিপিনদা' দমন করতে পারলেন না। তাদের দৃষ্টি পড়ল বিপিনদা'র দিকে। নূতন শীকার, কয়েক জন ধাওয়া করল। গর্জন ক'রে উঠল বিপিনদা'র পিস্তল। দু'জন লুটিয়ে পড়ল। বিপিনদা' ক্ষিপ্রগতিতে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। বেশ কিছু দূর ছুটে আসার পর একটি গাছের ওপর উঠে পড়লেন। রাত্রি কেটে গেল। সূর্য্য ওঠায় সঙ্গে সঙ্গেই হাঁটা সুরু হ'ল। কিছু দূর অতিক্রম করে বিপিনদা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল এক সাহেবের। তিনি হাতির পিঠে শীকারে বেরিয়েছেন। চমকে উঠলেন বিপিনদা'কে দেখে—এই জঙ্গলে মানুষ! বিপিনদা' পরিচয় দিলেন যে তিনি পরিব্রাজক—পথ ঠিক করতে পারছেন না। সাহেব তাঁর তাঁবুতে অতিথি সেবা করলেন এবং তাঁকে লোকালয়ের নিশানা বলে দিলেন।

একবার বিপিনদা' তখন বন্দী। গোরা সৈন্যের তত্ত্বাবধানে রেঙ্গুনের জেল থেকে ভারতবর্ষে আসছেন। পথে বাধল বিভ্রাট। প্রাতঃকালীন খোরাকীটি তখনও আসেনি। সৈন্যদলের কর্তাকে বিপিনদা' দু'বার জানালেন। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। একই জবাব শুনতে হয় বার বার—পরের জংশন ষ্টেশনে 'ব্রেকফাষ্ট' হবে। বেলা বাড়তে থাকে। ইতিমধ্যে সেই কর্তা সাহেবের জন্য টোষ্ট এবং আনুষঙ্গিক খাদ্যবস্তুটি এসে হাজির। বিপিনদা' ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে গাল ভারী হয়ে উঠল। দু'চারটি ঘুসিও এসে পড়ল। বলিষ্ঠ পুরুষ বিপিনদা'র হজম হয়ে গেল। কর্তা সাহেবের খাঁটি ইংরেজী মন মোটেই চঞ্চল হ'ল না। হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলেন—'মিঃ গাঙ্গুলী, এটা তুমি কি কি করলে? আর একটু অপেক্ষা করতে পারলে না?' বিপিনদা'ও হেসে জবাব দিলেন—'বার বার খোসামোদ করা আমাদের ধাতে নেই। ভদ্রতা করলে তুমি তার যোগ্য ব্যবহারই পাবে।'

কত গল্পই বিপিনদা'র জীবনকে ঘিরে আছে! কতটুকুই বা তার জানি! বিপিনদা'কে দেখেছি—তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছি। কথার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর জীবন-কথা যেটুকু জেনেছি—সেই সম্বল। তিনি বলতেন—'পুরাতন দিনের কাহিনী জেনে তোমাদের কি লাভ হবে? বর্তমানের যা কর্তব্য তাই কর।' কিন্তু দেশের ইতিহাস যাকে ধ'রে রাখল তার আড়ালে থাকার উপায় নেই। তাই বিপিনদা' আজ দেশের বিপিনদা'—ভারতবর্ষের চলার পথে চিরকালের ধ্রুব তারা।

মেডিক্যাল কলেজ যখন ছিল না

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত কলিকাতা সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয় নাই। ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন বাঙ্গলার দ্বৈত-শাসনের অবসান ঘটাইয়া কলিকাতা নগরীকে বাঙ্গলার তথা বৃটিশ-ভারতের রাজধানী করিলেন, তখন হইতেই কলিকাতা নগরীর উন্নতি হইতে থাকে। কলিকাতা নগরীর এই দ্রুত উন্নতির ফলে বাঙ্গলার সমাজ-ব্যবস্থার ও অর্থ নৈতিক বনিয়াদে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটে। এ সম্পর্কে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন "বঙ্গদূত" পত্রিকার একটি সারগর্ভ প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিলেই এই দ্রুত উন্নতির পরিচয় দেওয়া যায়। "বঙ্গদূত" লিখিয়াছিলেন যে, "এই দেশের পূর্ব্বাপেক্ষা যে এক্ষণে অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, ইহার কারণ এই যে পূর্ব্বাপেক্ষা জমির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, দ্বিতীয়ত, এদেশে অবাধে বাণিজ্য ব্যবসায় চলিতেছে, বিশেষতঃ অনেক যোরোপীয় মহাশয়েরদিগের সমাগম হইয়াছে···পূর্ব্ব ত্রিশ বৎসর যে সকল ভূমি পনেরো টাকা মূল্যে ক্রীতা হইয়াছিল এক্ষণে তিন শত টাকা পর্য্যন্ত তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এমতে ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধি দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের পদবৃদ্ধি হইয়াছে"···তাহার পর অর্থের চলাচল অধিক হওয়াতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়া যে "ব্যাখ্যাতিরিক্ত অসংখ্যোপকার হইতে আরম্ভ হয়" "বঙ্গদূত" তাহারও কিছু বর্ণনা দিয়াছেন।

এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক জীবনে কিছু কিছু অভাবও দেখা দিতে আরম্ভ করে। ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবি সম্প্রদায় কলিকাতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বাঙ্গলার নানা স্থান হইতে যে পরিমাণে এখানে স্থায়ী বসবাসের জন্য আসিতে লাগিলেন তাহার তুলনায় নগর-জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্য শ্রেণীর বাসিন্দার তেমন আগমন ঘটে নাই। উদাহরণস্বরূপ চিকিৎসক শ্রেণীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাঙ্গলার বর্দ্ধিষ্ণু শহরগুলিতে সে সময়ে যেরূপ চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী বৈদ্যক পাওয়া যাইত, উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে কলিকাতায় তত্তুল্য বৈদ্যক তো ছিলই না, কোনও রূপে অভাব মিটিতে পারে এরূপ বৈদ্যকেরও অভাব ছিল। "সমাচারদর্পণ" এই অভাবের কথা সেকালেই লিখিয়াছিলেন। "দর্পণে" প্রকাশ, "কোনও বৈদ্যক রোগ নিরূপণ করিলেক কিন্তু ঔষধির ব্যবস্থা করিতে পারেন না, কেহ বা ঔষধি করিতে জানে কিন্তু নাড়ীজ্ঞান নাই, কাহারো বা শাস্ত্রজ্ঞান নাই কেবল পৈতেবৈদ্য, কাহারো শাস্ত্র কিছু জানা আছে, ধনাভাবে ঔষধি করিতে পারে না, ইহাতে কি প্রকার করিয়া লোকে বাঁচিতে পারে ?"

এরূপ অব্যবস্থার হাত হইতে বাঁচিবার আশায় এ শহরের ধনীরা ইংরেজ চিকিৎসকের দ্বারস্থ হইতে আরম্ভ করেন। রামমোহন রায় অসুস্থ হইয়া পড়িলে এম· ডি উপাধিধারী ডাক্তার হালিডের দ্বারা চিকিৎসিত হন ও তদীয় প্রিয় শিষ্য ব্রজমোহন মজুমদার অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলে ব্রজমোহনের অনুরোধে তাঁহার চিকিৎসার্থ রামমোহন একজন সুবিজ্ঞ ইংরেজ চিকিৎসককে প্রেরণ করেন।

কিন্তু ধনী ব্যতীত সাধারণ গৃহস্থের ইংরেজ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হওয়া ব্যয়-বাহুল্যের জন্য প্রায় অসাধ্য ছিল। সুচিকিৎসার এই নিদারুণ অভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণ লাঘবের উদ্দেশ্যে রামমোহন রায় এক পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনারও পূর্ব্বে দেওয়ান রামকমল সেন ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে "ইংলণ্ডীয় কোনও বিজ্ঞ বৈদ্যকের সহকারিতা অবলম্বন করিয়া ইংরেজি হইতে বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর যে সমস্ত ঔষধ ব্যবহৃত হয়," তাহার নাম, উৎপত্তি, গুণ ও অধিকার সর্ব্বসাধারণের জন্য "ঔষধসার সংগ্রহ" নামে এক পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তকের ভূমিকায় রামকমল বলেন যে, "ইদানীং ইংরেজের রাজ্যোন্নতি হইয়াছে, ইউরোপীয় চিকিৎসকের ব্যবসায়ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও ব্যাপক হইতেছে, আর হিন্দুর বৈদ্যক শাস্ত্রের অনুশীলনের অপ্রাচুর্য্য প্রযুক্ত এতদ্দেশীয় অনেক বিশিষ্ট লোক ইংরেজি ঔষধ ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ইংরেজি জানেন না তাঁহারা যাহাতে তত্তদৌষধের তত্ত্বজ্ঞ হইবার কিছু সুবিধা পান সেই জন্য ঔষধসারসংগ্রহ তিনি প্রকাশ করিলেন।"

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন "সমাচারদর্পণ" পত্রিকায় এই পুস্তকের সম্পর্কে একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে জানা যায় যে, "ঐ পুস্তকের মধ্যে ছাপ্পান্ন প্রকার ঔষধের বিবরণ ও তাহা খাইবার ক্রমসকল লিপিবদ্ধ আছে এবং কোন পীড়ায় কোন ঔষধ সেবন করা উপযুক্ত তাহাও লিখিত আছে। ইউরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গলা ভাষায় কেহ তর্জ্জমা করেন নাই ; এখন এই পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আমাদের ভরোসা হইয়াছে যে ক্রমে তাবৎ ইউরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ হইতে পারিবে এবং যদি এই ভরোসা সফল হয় তবে এতদ্দেশীয় লোকেরদের যথেষ্ট উপকার হইবে।"

ইহার পর ১৮২১ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে রবার্ট ডাগলাস নামক একজন চিকিৎসক "এতদ্দেশীয় ভাষায় ইংরেজি বৈদ্যক সম্পর্কে পুস্তকের অপ্রাচুর্য্য জনিত লোকে যে বাধ্য হইয়া অশাস্ত্র চিকিৎসা করিয়া থাকে এবং একযোগে অন্য ঔষধি প্রয়োগ করায়" তাহা দূর করিবার জন্য বাঙ্গলায় এক তর্জ্জমা-পুস্তক বাহির করিয়া "কোন দ্রব্যেতে কোন ঔষধি প্রস্তুত হয় এবং কোন ঔষধিতে কোন ব্যাধি নাশ করে" তাহার বর্ণনা প্রদান করেন।

এই সমস্ত প্রচেষ্টা দ্বারাও অভাব যথেষ্ট পরিমাণে দূর হইতেছে না দেখিয়া, অল্প ব্যয় ও অল্প চেষ্টায় ইহা অপেক্ষা ফলপ্রদ উপায় বাহির করিবার জন্য রামমোহন চিন্তিত হন। এই চিন্তার ফলে যে উপায় সহজেই ফলপ্রসূ হইতে পারে তাহা উদ্ভাবন করিয়া তিনি "সম্বাদ কৌমুদী"তে (১৮২১ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর) লিখিলেন যে, এদেশের বৈদ্যকগণ যদি তাঁহাদের বংশধরদের বৈদ্যশাস্ত্র পাঠ সমাপ্তান্তে ইংরেজ চিকিৎসকের অধীনে কিছু কাল রাখিয়া তাঁহাদের চিকিৎসা-প্রণালী লক্ষ্য করিবার সুযোগ করিয়া দেন, তাহা হইলে সাধারণের খুব উপকার সম্ভাবনা। "কৌমুদী"র ফাইল পাওয়া যায় না কিন্তু প্রথম কয়েক সংখ্যার প্রবন্ধের সার মর্ম্ম "ক্যালকাটা জার্ণালে" দেওয়া থাকায় উহার ফাইল হইতে "কৌমুদী" সংক্রান্ত অনেক তথ্যই জানা যায়। জার্ণালে রামমোহনের উক্ত প্রবন্ধের যে সারাংশ বাহির হইয়াছিল তাহা এই—

"Were the Hindoo physicians to instru

their children in the knowledge of their own medical shaster first, and then place them as practitioners under the superintendence of European physicians, it would prove infinitely advantageous to the natives of this country. In the first place, by a person being acquainted with the English and Bengalee mode of treating diseases he wou'd be enabled to judge which was best, and could with great certainty discover the exact nature of diseases, and administer proper medicines or recommend proper regimen : secondly, by going to all places and attending to the poor as well as rich families and persons of every age and sex, he could render services to all : thirdly, he could without the least difficulty go to such places as were inaccessible to European Doctors : and lastly this kind of medical knowledge and mode of treatment by passing from hand to hand would be at length spread over the whole country."

রামমোহনই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ইউরোপীয় শিক্ষাদান-প্রণালী প্রবর্ত্তনের জন্য ভারত সরকারের নিকট যে সুযুক্তিপূর্ণ আর্জি করিয়াছিলেন, তাহার যৌক্তিকতা অনুধাবন করিয়া গ্রহণ করিতে ভারত সরকারের দশ বৎসর লাগিয়াছিল এবং সৌভাগ্যক্রমে লর্ড মেকলের ন্যায় একজন সুবিজ্ঞ ও হৃদয়বান ব্যক্তি তখন শিক্ষা সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত সচিব ছিলেন বলিয়াই উহা সম্ভব হইয়াছিল। চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে রামমোহন কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত এই সহজ ব্যবস্থাটিও গ্রহণ করিতে সরকার সরাসরি পারেন নাই। এই প্রস্তাবের মূল লক্ষ্যকে অনুসরণ করিয়া এদেশে "বৈদ্যক শ্রেণী" বলিয়া খ্যাত সংস্কৃত কলেজে একটি নূতন বিভাগ খুলিতে ভারত সরকারের আর পাঁচ বৎসর লাগে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মাত্র সাতটি ছাত্র লইয়া এই "বৈদ্যক শ্রেণী" খোলা হয়।

এই শ্রেণীতে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা-প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য খুদিরাম বিশারদ নামক একজন অভিজ্ঞ বৈদ্যকে মাসিক ষাট টাকা বেতনে অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা, পাশ্চাত্য শারীর বিজ্ঞান প্রভৃতি শিখাইবার জন্য ডাক্তার করবিন, গ্রাণ্ট প্রভৃতি বিজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপনা করিতে থাকেন।

প্রথম ছাত্রদলের অন্যতম ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়নে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি শরীরসংস্থান বিদ্যা (Anatomy) উত্তমরূপে অধিগত করিবার মানসে ধর্ম্মগত সংস্কার উপেক্ষা করিয়া শবব্যবচ্ছেদ করিতে সম্মত হন। শবদেহ স্পর্শ করা জাতিনাশের কারণ জানিয়াও সমাজভয়কে অগ্রাহ্য করিয়া জ্ঞান আহরণের স্পৃহাতে তিনি যে সৎসাহস প্রদর্শন করেন, তাহার ফলেই ভারতবাসীর পক্ষে উত্তমরূপে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালী আয়ত্ত করা সহজ হয়। যেদিন তিনি সর্ব্বপ্রথম ব্যবচ্ছেদাগারে সর্ব্বপ্রথম ব্যবচ্ছেদ আরম্ভ করেন, সেই দিন সেই সাহসিক কার্য্যকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য ভারত সরকার তোপধ্বনির ব্যবস্থা করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি হলে মধুসূদনের একটি বৃহৎ আলেখ্য মধুসূদনের সাহসিকতার মর্য্যাদাস্বরূপ বিলম্বিত আছে। মধুসূদন সকল বিষয়েই ছাত্রদের মধ্যে সর্ব্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। প্রায় সাড়ে তিন বৎসর অধ্যাপনার পর যখন অসুস্থতার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও খুদিরাম বিশারদকে কর্ম্ম হইতে ১৮৩০ খৃঃ এপ্রেল মাসে অবসর গ্রহণ করিতে হয়, তখন তাঁহার স্থানে ছাত্রাবস্থা সম্পূর্ণ শেষ হইবার পূর্ব্বেই সরকার মধুসূদনকে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। সে সময়ে তাঁহা অপেক্ষা যোগ্যতর লোক কেহ না থাকিলেও ধর্ম্মীয় সংস্কারে আঘাতকারী এক ব্যক্তির নিয়োগে ধর্ম্মধ্বজী ধর্ম্মসভাপন্থীদের ঘোরতর আপত্তি দেখা যায়। রক্ষণশীল দলের অন্যতম নায়ক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "সমাচারচন্দ্রিকা"য় ঘোরতর আন্দোলন তুলেন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ মে তারিখে "সমাচারচন্দ্রিকা"য় ভবানীচরণ লেখেন যে, "কলেজ কর্ম্মকর্ত্তা মহাশয়গণ একটি ছাত্রকে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিয়া সমাধ্যায়িদিগকে কহেন ঐ ছাত্রের নিকট অধ্যয়ন করা ভাল; জিজ্ঞাসা করি সে ব্যক্তি তাহাদিগকে কি পড়াইবেক কেন না অধ্যাপক ও ছাত্রের উভয়েরই সমান বিদ্যা কাজে কাজেই ইংরেজীতে নির্ভর করিতে হইবে।"

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মধুসূদনের চিকিৎসা-শাস্ত্রে তখন অদ্ভুত

পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত

দখল বর্ত্তাইয়াছিল। কমিটি অব পাব্লিক এডুকেশনের নিকট খুদিরাম বিশারদের স্থলে মধুসূদনের নাম সুপারিশ করিবার কালে কলেজের সেক্রেটারি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রেল তারিখে লেখেন যে—

"under the circumstances, the secretary would recommend that Madhusudan Gupta, the head student of the class, a zealous and intelligent young man who has always had the charge of the class in the absence of his principal, and who is in every respect highly qualified for the situation, be nominated medical pundit in the room of Khoodiram."

"চন্দ্রিকা"য় বিরূপ মন্তব্য যে অসূয়াপরবশের ফলে হইয়াছিল, তাহা মনে করিবার কারণ আছে। এই নিয়োগের মাত্র মাসখানেক পূর্ব্বে ২৬শে মার্চ্চ তারিখে "বৈদ্যক শ্রেণী"র ছাত্রদের ইংরেজি বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিবার আবেদন জানাইয়া লেখা হইয়াছিল যে, "সংস্কৃত কলেজে যে সমস্ত বৈদ্য ছাত্র আছে তাহারদিগকে বিলক্ষণরূপে ইংরেজী বিদ্যায় পারগ করুন, তাহাতে দেশের উপকার আছে। যেহেতু উভয় শাস্ত্র জানিয়া বিলক্ষণরূপে চিকিৎসা করিতে পারিবেক।" কিন্তু মধুসূদনের নিয়োগের পর হইতে ভবানীচরণ উল্টা সুর ধরেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট "চন্দ্রিকা"য় ইউরোপীয় মতে চিকিৎসা যে জাতিনাশক ও ধর্ম্মহানিকর এবং সে জন্য অবিধেয় এই মত প্রকাশ করা হইল। "চন্দ্রিকা" স্পষ্ট লিখিলেন যে, "চিকিৎসা বিষয়ে বিভ্রাটে ধন, জাতি, ধর্ম্ম ও প্রাণ নষ্ট হইতে পারে অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের কাল হয়; ইহার পর আর কি কষ্ট আছে? কেন না আমারদিগের শাস্ত্রে এমত নিষেধ আছে যে অন্য জাতীয়ের ঔষধ কদাচ সেবন করিবেক না; যদ্যপি কেহ করে আর সেই রোগমুক্ত হইতে না পারে অর্থাৎ তাহাতে মৃত্যু হয় তবে তাহার অপমৃত্যু অবশ্য স্বীকার্য্য এবং যে দ্রব্য আহার করা হিন্দুর নিষেধ আছে তাহা অন্য জাতীয়ের ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে নিষিদ্ধ দ্রব্য আহার করা দ্বারা ধর্ম্মহানি হয় ইত্যাদি অনেক দোষ দর্শান যায়।"

এদিকে ছাত্রদিগের সম্মান একজন ছাত্রকে অধ্যাপক পদে নিয়োজিত করাতে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে বলিয়া সনাতন-পন্থী দল ছাত্রদের উস্কাইতে থাকেন কিন্তু ছাত্র-বিক্ষোভ অধিক দিন চলে না।

মধুসূদন যোগ্যতার সহিত অধ্যাপনা করিতে থাকেন। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার কাজে এত সন্তুষ্ট ছিলেন যে, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হওয়ার ফলে যখন সংস্কৃত কলেজের "বৈদ্যক শ্রেণী" উঠিয়া গেল তখন মধুসূদনকে মেডিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার যোগ্যতাকে পুরস্কৃত করেন। মধুসূদন ছাত্রাবস্থাতেই শারীর-সংস্থান বিদ্যার প্রসিদ্ধ পুস্তক "Hooper's Anatomist Vade Mecum" সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক লাভ করেন। তিনি পরে বাঙ্গালা ভাষায় লণ্ডন ফার্ম্মাকোপিয়া ও এন্যাটোমী অর্থাৎ শারীরবিদ্যা, ১ম ভাগ নামক গ্রন্থদ্বয় প্রকাশ করেন।

ছাত্রদের চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিতে হইলে যে হাসপাতাল প্রয়োজন, কেন না তাহা ভিন্ন হাতে-কলমে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইতে যে পারে না, উহা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কর্ত্তৃপক্ষ অনুভব করেন এবং সেই অভাব দূর করিবার উদ্দেশে সংস্কৃত কলেজের নিকটেই একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া হাসপাতাল স্থাপন করিলেন। "সম্বাদকৌমুদী" হইতে "সমাচারদর্পণে"র এক সংবাদে প্রকাশ যে, "শুনিতেছি যে হি[ন্দু] কালেজের অধ্যক্ষেরা ঐ পাঠশালার সন্নিধানে একটি চিকিৎসাল[য়] স্থাপন করিবেন এমত চেষ্টা পাইতেছেন। ইহাতে যে ব্যা[য়] হইবেক তাহার কতক শিক্ষা বিষয়ে সরকার দত্ত ধন হইতে সংপ্রতি লওয়া যাইবেক, ইংরেজি ঔষধ কোম্পানীর ঔষধাগা[র] হইতে দিবেন, আর আর ঔষধ প্রস্তুত হইবেক। প[র] এতন্নগরস্থ ধনী দাতা দয়ালু লোকেরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চাঁ[দা] স্বরূপ দিবেন। * * * * পাঠশালার বৈদ্য ছাত্রেরা বি[জ্ঞ] ডাক্তারদিগের সহিত ঐক্য হইয়া চিকিৎসা করিবেন।"

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে সংস্কৃত কলেজ সংলগ্ন ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট বাটীতে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়।

সেদিন তুমিও এসো

অতন্দ্র ভট্টাচার্য

তুমি তো গানের পাখী, গান গেয়ে তোমাকে জাগালে
তোমার গানের কুঞ্জে নিত্য আঁকো রংয়ের আলপনা
তুমি তো আলোর সুরে খুশি হয়ে তোমাকে ছড়ালে
তোমাকে আমার দেশে ডেকে নেবো কী করে বলো না?

এ দেশে আলোক নেই, রং নেই এখানে আকাশে
এখানে পাবে না তুমি নীলে নীলে বিপুল বিস্তার—
এখানে তো সুর নেই বসন্তের সুরভি নিঃশ্বাসে
এখানে কোথায় বলো রেখে যাবে হৃদয় তোমার?

তবুও তোমায় বলি, শোন আজ মৃত্যুঞ্জয় পাখী
এ' বুকে যদিও আজ কেঁদে ফিরে শোকার্ত্ত সময়—
এ' বুকেই আজ ছাখো সংগ্রামের রক্তোজ্জ্বল রাখী
এখানে শপথ নিয়ে জেগে আছি উদ্দীপ্ত হৃদয়।

স্বপ্নের মশাল জেলে দৃপ্তবাহু ঊর্দ্ধে তুলে আজ
হাজার হাজার প্রাণ ছড়িয়েছি দূর বহুদূর…
রাত্রির আঁধার-বুকে ছুড়ে দিই অগ্নিগর্ভ বাজ
তুলে দিই বজ্রজ্বালা, আর এক যন্ত্রণার সুর।

শীতের উদ্ধত বাহু, যৌবনের অগ্নিজ্বালা গানে
যেদিন সরিয়ে দেবো সবুজের সমারোহ থেকে
আবার জাগবো যেদিন অন্য সুরে অন্য কোন প্রাণে
সেদিন তুমিও এসো পথে পথে ইন্দ্রধনু এঁকে।

পথে পথে খুশি রেখে, সুর তুলে আলোর ভুবনে
আমার বসন্ত-দিনে, হে অমর, এসো তুমি ফিরে—
তোমার মধুর গান মুগ্ধ হয়ে শুনবো দু'জনে
তোমার সুরের শান্তি ভরে থাক আমাদের ঘিরে।

বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ

শ্রীকামিনীকুমার রায়

সম্প্রতি আমাদের কেন্দ্রীয় আইন-সভা দুইটিতে একটি বিশেষ বিবাহ বিল উত্থাপিত হইয়াছে। উহাতে Divorce বা বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত কয়েকটি ধারা সংযোজিত করায় সমাজের উচ্চস্তরের রক্ষণশীল দল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহাদের মতে হিন্দুর বিবাহ সামাজিক চুক্তি (Social contract) নহে, ইহা ধর্ম্মানুষ্ঠান; সুতরাং বিবাহবন্ধন ছিন্ন করা আর ধর্মচ্যুত হওয়া একই কথা। ইঁহারা বলেন, বিবাহ দ্বারা স্বামি-স্ত্রী একাঙ্গীভূত হয়, হিন্দু স্বামি-স্ত্রীর বন্ধন ইহ-পরকালের, ইহা কখনো ছিন্ন হইবার নহে। ইঁহাদের এইরূপ মতের সমর্থনে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র-পুরাণে অনেক উক্তি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্বামী কর্তৃক পত্নীত্যাগ, এবং পত্নী কর্তৃক স্বামীত্যাগের অর্থাৎ বিবাহ-বিচ্ছেদের কথাও যে না আছে, তাহা নহে। আর্য্যঋষিরা ছিলেন জীবনধর্ম্মী, জীবনযাত্রা যাহাতে সুখের হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহারা বিবাহপ্রথা প্রবর্তন ও বিবাহ-বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যে মনুসংহিতার আমরা অধিক দোহাই দিই, তাহাতে শুধু স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ বা মিলনের কথাই কীর্ত্তিত হয় নাই, তাহাদের বিপ্রয়োগ বা বিচ্ছেদের কথাও বলা হইয়াছে। স্ত্রী-পুংধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মনু প্রথমেই বলিয়াছেন—

> পুরুষস্য স্ত্রিয়াশ্চৈব ধর্ম্যে বর্ত্মনি তিষ্ঠতোঃ।
> সংযোগে বিপ্রয়োগে চ ধর্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্॥
>
> (মনু ৯।১)

যাঁহারা আমাদের শাস্ত্রকে প্রগতির পরিপন্থী বলিয়া গালি দেন, অথবা যাঁহারা Divorce বা বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যাপারটিকে পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীদের নূতন আমদানী বলিয়া রোষ প্রকাশ করেন, তাঁহারা উভয়েই একদেশদর্শী। সেকালে আমাদের নারীরা পতি অবর্ত্তমানে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে এবং এক পতি জীবিত থাকিতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারিত; পতিদেরও অবস্থা-বিশেষে পত্নীত্যাগ করিবার অধিকার ছিল; এজন্য রাজদ্বারে প্রকাশ্য বিচারালয়ে যাইয়া ধর্ণা দিতে হইত না; প্রয়োজনের তাগিদে শাস্ত্রের নির্দ্দেশে সহজেই অভীষ্ট লাভ হইত।

বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত এবং আইনসিদ্ধ। বৈদিক যুগে ইহা বহু প্রচলিত ছিল। মনুতে, রামায়ণে, মহাভারতে, নারদ-স্মৃত্যাদিতে, বৌদ্ধজাতকে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। পণ্ডিত-কুলাগ্রগণ্য পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিয়া দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, 'বিধবার অসহ্য বৈধব্য-যন্ত্রণার প্রতিকার কল্পে তিনি নিজের সকল শক্তি, সকল জ্ঞান প্রয়োগ করিয়াছিলেন।' দেশের সমস্ত রক্ষণশীল দলের সুতীব্র প্রতিবাদ এবং বিরোধিতার মুখেও তিনি পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সহিত এক বালবিধবার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন,—

'বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম, জন্মে ইহার অপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই; এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নই;···আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।'

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এইরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপনের পর, ভারতের আর এক মহামনীষী স্যার আশুতোষ স্বীয় বিধবা কন্যাকে পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়া যথার্থ শাস্ত্রের নির্দ্দেশ পালন করিয়া ও মানবিকতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা জ্ঞানবান এবং হৃদয়বান হইয়াও এবং ঐরূপ মহৎ দৃষ্টান্ত সম্মুখে থাকিতেও পুনর্ভূকে তেমন সম্মানের চক্ষে দেখি না; তখন আমাদের পূর্বপুরুষগণ 'গেল ধর্ম্ম, গেল মান' বলিয়া যেরূপ আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন, এখনো তাঁহাদের উত্তরসাধকগণ 'বিবাহ বিল' লইয়া আপনাদিগকে তেমনি বিপন্ন মনে করিতেছেন। কিন্তু আমরা বলি, এজন্য ভীত হইবার কোনও কারণ নাই। শাস্ত্র আমাদিগকে বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহের অধিকার বহুপূর্বেই দিয়া রাখিয়াছেন; মহৎ দৃষ্টান্তেরও আমরা বহুবার সম্মুখীন হইয়াছি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা যেমন যত্রতত্র, যখন তখন সে-অধিকার প্রয়োগ করি নাই বা করি না, আইন-বলে সে-ই অধিকারই আবার নূতন করিয়া পাইলেও, তাহা বহুপ্রচলিত হইবার বিন্দুমাত্রও আশঙ্কা নাই। সাধারণ লোকের চিত্তের উপর আইনের অপেক্ষা শাস্ত্রের, শাস্ত্রের অপেক্ষা দেশাচারের প্রভাব প্রবল। সুতরাং আইনের বলে একটা গোটা সমাজ বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহের নেশায় পাগল হইয়া উঠিবে, এইরূপ চিন্তা করা কল্পনা-বিলাস ছাড়া আর কিছুই নহে।

হিন্দুর বিবাহ-বন্ধন যে একেবারে ত্রিকালের, শাশ্বত-সনাতন,—কোন অবস্থাতেই উহা ছিন্ন করা যায় না, শাস্ত্র তো তাহা বলেন নাই। বিধবা-বিবাহের ন্যায় অবস্থা-বিশেষে বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং পত্যন্তর গ্রহণ ও পত্নীত্যাগেরও তো শাস্ত্র স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন! সব কি আমরা চালিয়া মুছিয়া নিজেদের মনোমত করিয়া সাজাইতে পারিয়াছি? পারি নাই। তাই আজও আমাদের শাস্ত্র-সংহিতায় বহু পরিবর্তন এবং পরিবর্জ্জনের পরও নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলির ন্যায় এমন অনেক শ্লোক রহিয়া গিয়াছে এবং আর্য্য-ঋষিগণ যে বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

> নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
> পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে। ৯৭
> অষ্টৌ বর্ষাণ্যুদীক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিম্।
> অপ্রসূতা তু চত্বারি পরতোঽন্যং সমাশ্রয়েৎ। ৯৮
> ক্ষত্রিয়া ষট্ সমাস্তিষ্ঠেদপ্রসূতা সমাত্রয়ম্।
> বৈশ্যা প্রসূতা চত্বারি দ্বে বর্ষে ত্বিতরা বসেৎ। ৯৯
> ন শূদ্রায়াঃ স্মৃতঃ কাল এষ প্রোষিতযোষিতাম্।
> জীবতি শ্রূয়মাণে তু স্যাদেষ দ্বিগুণো বিধিঃ। ১০০
>
> (নারদস্মৃতি)

নারদস্মৃতির উদ্ধৃত ৯৭ শ্লোকটি পরাশর-সংহিতায়ও আছে 'পতি যদি নিরুদ্দিষ্ট, মৃত, ক্লীব বা পতিত হয়, অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ

করে, তাহা হইলে এই পাঁচটি আপদে নারী অন্ত পতি গ্রহণ করিতে পারে।' বশিষ্ঠস্মৃতি এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও অনুরূপ ভাবের অনেক উক্তি আছে। স্বামীর মৃত্যু, সন্ন্যাস, ক্লীবত্ব বা পাতিত্য অনুমানের অপেক্ষা রাখে না, এইগুলি অনতিবিলম্বেই সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট স্বামী আবার যে কোনও মুহূর্তে ফিরিয়াও আসিতে পারে; কিন্তু তজ্জন্ত স্ত্রী তো জীবনধর্মকে বিসর্জন দিয়া আবহমান কাল অপেক্ষা করিতে পারে না! তাই এরূপ ক্ষেত্রে অপেক্ষার একটা সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে। 'স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হইলে, সন্তানবতী ব্রাহ্মণী স্ত্রী আট বৎসর অপেক্ষা করিবে, সন্তানহীনা হইলে চারি বৎসর এবং অনুরূপ অবস্থায় প্রসূতা-ক্ষত্রিয়া ছয় বৎসর ও অপ্রসূতা তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে। প্রসূতা-বৈশ্যার পক্ষে চারি বৎসর ও অপ্রসূতার পক্ষে দুই বৎসর অপেক্ষা করাই যথেষ্ট। স্বামী জীবিত আছে সঠিক সংবাদ পাওয়া গেলে, পূর্ব্বোক্ত সময়ের দ্বিগুণ সময় অপেক্ষা করা যাইতে পারে। শূদ্রার পক্ষে এইরূপ নির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। মনুর বর্তমান সংস্করণেও এইরূপ অপেক্ষার কথা বলা হইয়াছে:—

প্রোষিতো ধর্মকার্যার্থং প্রতীক্ষ্যোঽষ্টৌ নরঃ সমাঃ।
বিদ্যার্থং ষড়্‌যশোঽর্থং বা কামার্থং ত্রীংস্তু বৎসরান্‌॥
(মনু ৯।৭৬)

'স্বামী ধর্মকার্য্যের জন্য বিদেশে গমন করিলে স্ত্রী তাহার জন্য আট বৎসর, বিদ্যার জন্য গমন করিলে ছয় বৎসর এবং যশ, অর্থ বা কাম্যবস্তু লাভের জন্য গমন করিলে তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে। কিন্তু এইরূপ অপেক্ষার পর কি করিতে হইবে, বর্তমান মনুতে তদ্বিষয়ে কোনও নির্দেশ না থাকায়, আমাদের গোঁড়া রক্ষণশীল দল নারীকে সর্ব্বাধিক বার বৎসর অপেক্ষা করিয়া বৈধব্য গ্রহণ করিতেই পীড়াপীড়ি করেন এবং উচ্চশ্রেণীর হিন্দুসমাজে বর্তমানে ইহাই দেশাচার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু নারদস্মৃতির পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির সঙ্গে মনুর এই ৯৭৬ শ্লোকটি মিলাইয়া পড়িলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দীর্ঘ অপেক্ষার পর পত্যন্তর গ্রহণই মনুরও উপদেশ ছিল। বিশেষতঃ বিধবা এবং স্বামী-পরিত্যক্তার পুনর্বিবাহ সম্পর্কে মনুর ৯।১৭৫, ৯।১৭৬ এবং ৯।১৯১ শ্লোকগুলিতেও সমর্থন পাওয়া যায়। অনেকে * অনুমান করেন 'নষ্টে মৃতে…' শ্লোকটি মনুসংহিতার প্রথম সংস্করণে ছিল, পরবর্তী সংস্করণে তাহা যে কারণেই হউক পরিত্যক্ত এবং উহাতে কালোপযোগী অনেক নূতন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

সেকালে অবস্থা-বিশেষে স্ত্রী যেরূপ পতিত্যাগ বা বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিত, স্বামীরও তদ্রূপ পত্নীত্যাগ বা বিবাহ নাকচের অধিকার ছিল। যথারীতি বিবাহ হইলেও, যে কন্যা বিগর্হিতা, ব্যাধিগ্রস্তা, দুশ্চরিত্রা তাহাকে ত্যাগ করিবার এবং যে বিবাহ ছলনা দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার শাস্ত্রে স্পষ্ট নির্দেশ আছে (মনু ৯।৭২, ৯।৭৩)। ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে স্ত্রীও পবিত্র হয় এবং স্বামীরও দোষ স্পর্শ করে না (মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব)। আমাদের শাস্ত্রসংহিতায়, প্রাচীন সংস্কৃত-গ্রন্থে মানবধর্ম বিষয়ক সকল কথাই আছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ, পত্যন্তর গ্রহণ, পত্নীত্যাগ প্রভৃতি কথা ও ঘটনা ভারতের মাটিতে নূতন নহে। প্রাচীন কালে আমাদের সমাজের উচ্চস্তরে নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইলে এইগুলি যথাশাস্ত্র আচরিত হইত, পরবর্তী কালে কাল প্রভাবে প্রথমে নিন্দিত হইতে থাকে এবং শেষে নিষিদ্ধ হইয়া যায়। সম্প্রতি আইন-সভা দুইটিতে বিবাহ সংক্রান্ত সেই সকল বিষয়েরই যুগোপযোগী একটা নূতন রূপ দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে। এই অবসরে আমরা যদি একবার আমাদেরই হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের দিকে এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ আদিবাসী-সমাজের দিকে লক্ষ্য করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, শাস্ত্রবচন না জানিয়াও তাহারা নিজেদের জ্ঞান, বিশ্বাস ও প্রয়োজন মতো ব্যবস্থাদি করিয়া জীবনযাত্রা কত সহজ করিয়া লইয়াছে! আরও দেখিতে পাইব যে, আর্য্যঋষিগণ তাঁহাদের চারি দিকের এই বিরাট মানব-গোষ্ঠীর বাস্তব দৃষ্টিকে একেবারে অগ্রাহ্য করেন নাই, অনেক ব্যাপারে হয়তো তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া শাশ্বত জীবনধর্মের সৌধ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর জন্য উপরে যে অপেক্ষার কথা বলা হইল, উড়িষ্যার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কিছুকাল পূর্বেও প্রায় ঐরূপ প্রথাই বিদ্যমান ছিল। যদি কোনও পুরুষ দূরদেশে যাইয়া দীর্ঘকাল তাহার স্ত্রীর কোনও খোঁজখবর না লইত, তাহা হইলে সেই স্ত্রী দুই বৎসর কি তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিত। সাধারণতঃ নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাই এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পতিরূপে মনোনীত হইত। এই বিবাহ বিধবা-বিবাহ বা 'সাঙ্গা' বিবাহের মতোই অনাড়ম্বরে শুধু দুই গাছা বালা পরাইয়া এবং স্বজাতির কয়েক জনকে ভোজ দিয়া নিষ্পন্ন হইত।

প্রাচীন ব্যাবিলোন এবং এসিরিয়া দেশেও স্বামী ঘরে জীবিকার সংস্থান না রাখিয়া দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকিলে, স্ত্রী পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিত। এরূপ স্থলে পূর্ব্ব স্বামী ফিরিয়া আসিয়া পত্নীকে আবার নিজ গৃহে লইয়া যাইতে পারিত; দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসজাত সন্তান তাহার নিকটই থাকিয়া যাইত। কিন্তু জীবিকার সংস্থান থাকা সত্ত্বেও অন্য পতি গ্রহণ করিলে, সেই স্ত্রীকে জলে ডোবাইয়া মারা হইত। কাজেই শাস্তিটিও কম ছিল না।

লোটা নাগাদের মধ্যে কোনও পুরুষ যখন বাড়ী হইতে কিছু কালের জন্য অন্যত্র চলিয়া যায়, তখন সে কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের তাহার পত্নীর পতিত্ব করিতে বলিয়া যায়। বিধবা তাহার স্বামীর ভ্রাতাদের সম্পত্তি মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।

মহাভারতে দেবর-বিবাহের কথা আছে—'পত্যভাবে যথৈব স্ত্রী দেবরং কুরুতে পতিম্।' আদিবাসী বা Aboriginal Tribesদের কথা ছাড়িয়াই দিই, শত শত বৎসর ধরিয়া হিন্দু ধর্মের ছায়াতলে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর যে বৃহৎ মানব-গোষ্ঠী প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাদের অধিকাংশের মধ্যেই বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং বিধবার দেবর-বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল। দেবরকে বিবাহ না করিয়া স্বামীর পরিবারের বাহিরে অপর কাহাকেও বিবাহ করিলে বিধবাকে অনেক সুখ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইত। পশ্চিমবঙ্গের ভূমিজ, বিন্দ, চামার, ধোবি, কাউর, মাহিলী, মালপাহাড়িয়া, মুনিয়া, পান, পাসি, তুরী, কাহার, চৈন, খরিয়া

---

* মনুসংহিতায় বিবাহ,—অমলকুমার রায়।

ডোম প্রভৃতির মধ্যে বিধবার দেবর বিবাহের প্রথা আজও কোথাও কোথাও দেখা যায়। আবার যাহারা অধিক হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা, যেমন বাগদি, বেলদার, কোচ প্রভৃতি বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং বিধবা-বিবাহ বরদাস্ত করিলেও দেবর-বিবাহকে স্বীকার করে না।

গত ১৯৫১ সালের সেন্সাসে পশ্চিমবঙ্গের মোট হিন্দু জনসংখ্যা ১১৪৮২৭০৬ জনের মধ্যে ৪৬১৬২০৫ জন অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ scheduled castes রূপে রেকর্ডভুক্ত হইয়াছে। আদিবাসী বা scheduled tribes রূপেও ১১৬৫৩৩৭ জন আপনাদের পরিচয় দিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশের মধ্যেই বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং বিধবার ও স্বামি-পরিত্যক্তার পুনর্বিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রভাবে পোদ, পাটনী, নমশূদ্র, শুঁড়ি, তিয়র প্রভৃতি কয়েকটি জাতির মধ্যে এই সকল প্রথা বর্ত্তমানে একরূপ উঠিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু বাগদী, বাউরী, বেলদার, ভূমিজ, দোসাদ, হাড়ি, ডোম, কোচ, কাউর প্রভৃতি অনেক জাতিই এখনো তাহাদের পূর্ব্ব প্রথা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। রাজবংশীদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে অঞ্চল-বিশেষে তাহা উঠিয়া গিয়াছে, অঞ্চল-বিশেষে আছে। লেপচা, মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওরাওঁ প্রভৃতির মধ্যে এখনো যাহারা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রভাবে পড়ে নাই বা হিন্দুপ্রধান অঞ্চল হইতে একটু দূরে রহিয়াছে, তাহারা এখনো নিজেদের জ্ঞান, বিশ্বাস মতো ঐ সকল প্রথা নিঃসঙ্কোচে মানিয়া চলিতেছে।

মানভূমের 'ভূমিজ' সম্প্রদায় বহু দিন হইতেই হিন্দু আচার-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। অনেকে ইহাদিগকে মুণ্ডাদেরই একটি শাখা বলিয়া অনুমান করেন। ইহাদের মধ্যে স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে। এরূপ স্থলে আত্মীয়-স্বজন একত্র হইয়া অভিযোগ শুনে এবং বিচারে যদি স্ত্রী দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে স্বামী পত্নীর হাত হইতে বিবাহ-বন্ধনের প্রতীক চিহ্ন লোহার চুড়ি (নোয়া) খুলিয়া লয় এবং একটি শালপাতায় জল ঢালিয়া উহা দুই ভাগে ছিঁড়িয়া ফেলে; ইহাকে বলে 'পাত পানি চিড়া।' এইরূপ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়াই বিবাহ-বিচ্ছেদ সিদ্ধ হয় এবং পরিত্যক্তা পত্নীর ভরণপোষণের দায় হইতে স্বামী মুক্তিলাভ করে। কিন্তু পত্নীর দায় হইতে মুক্ত হইলেও সালিসী বিচারে যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা তাহাকে সহজে নিষ্কৃতি দেয় না; স্বামীকে মাথামুণ্ডন করিয়া পবিত্র হইতে হয় এবং সকলকে তাহার ভোজ দিতে হয়। ইহাদের সমাজে নারীর কিন্তু এইরূপ বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার নাই; স্বামীর ঔদাসীন্য এবং নির্য্যাতন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে পত্নীর অন্য লোকের সহিত পলাইয়া যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

পরিত্যক্তা পত্নীরা এবং বিধবারা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে। বিধবা সাধারণতঃ মৃত স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদরকে কিংবা অন্য কোনও সম্পর্কিত ভ্রাতাকে (cousin) বিবাহ করে। বাহিরের কাহাকেও বিবাহ করিলে মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে এবং তাহার সন্তানাদির উপর তাহার কোনও অধিকার থাকে না। বিধবার পুনর্বিবাহে পাত্রের (bridegroom) পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি-স্পৃষ্ট সিন্দুর অপর একজন বিধবা পাত্রীর (bride) কপালে মাখাইয়া দেয়। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসজাত সন্তানের বিবাহ লইয়া প্রায়ই নানা সামাজিক গণ্ডগোল উপস্থিত হয়; ইহা হিন্দু-ধর্ম্মেরই অধিক চাপের ফল সন্দেহ নাই; এজন্য ইহাদের সমাজ হইতে 'সাঙ্গা' বিবাহ ক্রমে লোপ পাইতেছে।

পশ্চিম-বাংলার বাউরীদের মধ্যেও বিধবা-বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত আছে। বিধবারা পূর্ব্বে মৃত স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদরকেই বিবাহ করিত। বর্ত্তমানে দেবর-বিবাহের প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্বামী পত্নীর হস্ত হইতে 'নোয়া' খুলিয়া লয় এবং পরামানিক ও গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সম্মুখে পত্নীত্যাগের কথা ঘোষণা করে। স্বামী ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হইলে, অথবা পত্নীর উপর নির্য্যাতন করিলে কিংবা তাহার ভরণপোষণ না করিলে, পত্নীও স্বামী ত্যাগ করিতে পারে।

সিংহলে এক সময়ে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ থাকা না থাকা স্বামি-স্ত্রীর সুখ-সুবিধার উপর নির্ভর করিত। যদি তাহাদের মনের মিলন না হইত, যে কোন সময়ে পৃথক্ হইয়া যাইতে পারিত। এমতাবস্থায় পুত্র পিতার সঙ্গে এবং কন্যা মাতার সঙ্গে থাকিত। মনের মিলন হইবে কিনা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক পুরুষ নারীর প্রায়ই তিন-চারটি করিয়া trial marriage হইত; পুরুষ এক স্ত্রীতেই অনুরক্ত থাকিত, কিন্তু এক নারীর প্রায়ই দুই স্বামী দেখা যাইত। পূর্ণিয়ার রাজবংশীদের মধ্যেও বিবাহ সাপেক্ষে বা বিবাহ পাকা হইবার পূর্ব্বে দুইটি পুরুষ-নারীকে অনেক সময় একত্র দীর্ঘকাল স্বামি-স্ত্রী রূপে বসবাস করিতে দেখা যায়।

লেপচাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ এবং divorce বা পত্যন্তর গ্রহণ এবং পত্নীত্যাগের প্রথা প্রচলিত আছে। বিধবার পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে তেমন কোন বাধা-নিষেধ নাই; তবু সাধারণতঃ দেশাচার মতে মৃত স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গেই এইরূপ বিবাহ সংঘটিত হইয়া থাকে। বিধবা যদি স্বামীর ভ্রাতা ভিন্ন বাহিরের কোনও লোককে পতিত্বে বরণ করে, তাহা হইলে সেই ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের ঔরসজাত সন্তানদের নিজের কাছে রাখিয়া দিতে এবং বিবাহের সময় যে কন্যাপণ দেওয়া হইয়াছিল তাহা দাবী করিতে পারে। লামার (পুরোহিত) ঘোষণা-ক্রমেই বিবাহ সিদ্ধ হয়, বিশেষ কোনও অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না।

স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে যদি বনিবনা না হয়, তাহা হইলে তাহারা বিবাহ-বন্ধন ছেদ করিতে পারে। কিন্তু প্রায়ই সমাজের কেহ মধ্যস্থ হইয়া তাহাদের বিরোধ মিটাইতে চেষ্টা করে; যদি নিতান্তই অকৃতকার্য্য হয়, যে লামার পৌরোহিত্যে তাহাদের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার ঘোষণা ক্রমেই বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়। স্ত্রী পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে, পূর্ব্ব স্বামীর নিকট হইতে সে যৎ-কিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণও লাভ করে। কিন্তু স্ত্রীর যদি ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে বিবাহ-বিচ্ছেদের অগ্রাধিকার স্বামীর থাকে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে স্বামীর কোনও ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন উঠে না, বরং বিবাহ কালে স্ত্রীকে যে সকল অলঙ্কার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সে ফেরৎ পায়।

উত্তরবঙ্গের কোচ সম্প্রদায়ের অনেকেই এখন আপনাদিগকে রাজবংশী বা ভঙ্গক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহাদের উদ্ভবের ইতিহাস যাহাই থাকুক না কেন, দীর্ঘকাল তাহারা হিন্দুধর্মের ছায়াতলেই বসবাস করিতেছে। রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে রাজবংশীদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ বর্ত্তমানে অপ্রচলিত হইলেও, দার্জ্জিলিং তেরাই অঞ্চলে উহাদেরই বংশধরদের মধ্যে এই অনুষ্ঠান বিরল নহে। বিধবা যদি পরিবারের অভিভাবিকা হয়, তাহা হইলে সে আনুষ্ঠানিক ভাবে পুনর্বিবাহের মধ্যে না যাইয়াও বৈবাহিক বাধা-নিষেধের গণ্ডীর বাহির হইতে কোনও ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া আনিয়া তাহার সহিত স্বামি-স্ত্রীরূপে বাস করিতে পারে। বিধবা-বিবাহকে রাজবংশীরা ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া থাকে। যে বিধবা-বিবাহ করে এবং সম্পত্তির লোভে তাহার বাড়ীতে যাইয়া থাকে, তাহাকে 'ডাঙ্গুয়া' নামে অভিহিত করা হয়। বিধবা তাহার খেয়ালখুসি মতো ইহাকে তাহার বাড়ী হইতে বাহির করিয়াও দিতে পারে। ডাঙ্গুয়াদের প্রতি লোকে এত ঘৃণার ভাব পোষণ করে যে, কথিত হয়, যদি গোয়ালে কোন গরু মরে এবং কোনও ডাঙ্গুয়া তাহা স্পর্শ করে, তাহা হইলে শকুনে পর্য্যন্ত সেই মৃত গরুর মাংস ভক্ষণ করে না। কিন্তু উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা বিধবা-বিবাহকে আমল না দিলেও, বিবাহ-বিচ্ছেদকে তাহারা স্বীকার করে। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সম্মুখে (সেখানে পুরোহিত এবং নাপিতও উপস্থিত থাকে) স্বামী কেন বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে যাইতেছে তাহা সে বিবৃত করে; স্ত্রীর কিছু বলিবার থাকিলে সেও উত্তর দেয়। প্রায়ই দেখা যায়, পঞ্চায়েত স্ত্রীর বিরুদ্ধে রায় দেয় এবং স্বামী নাপিত দ্বারা তাহার চুল ছাঁটাইয়া তাহাকে পরিবার হইতে বাহির করিয়া দেয়।

নেপালের নেওয়ারদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার পত্নীর। স্বামী অপছন্দ হইলে বা তাহার সহিত বনিবনা না হইলে, পত্নী অনায়াসেই পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে। এজন্য বিশেষ কোনও ঝঞ্ঝাট পোয়াইতে হয় না, স্বামীর বালিশের তলায় মাত্র দুইটি সুপারি রাখিয়া দিলেই তাহাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ সূচিত হয় এবং পত্নী পত্যন্তর গ্রহণের অধিকারী হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর পত্নী যদি স্বজাতির অথবা উচ্চশ্রেণীর কাহাকেও বিবাহ করে, তাহা হইলে ইচ্ছানুযায়ী সে আবার প্রথম স্বামীর নিকট ফিরিয়া আসিতে এবং তাহার ঘর-সংসারের ভার লইতে পারে। বিবাহ-বিচ্ছেদের এই প্রথা দার্জ্জিলিংএর নেওয়ারদের মধ্যে ক্রমে লোপ পাইতেছে।

পূর্ণিয়ার সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ এক সময়ে অতি সহজ ব্যাপার ছিল। যদি কোনও স্ত্রীর স্বামী অপছন্দ হইত, তাহা হইলে সে গ্রামের হাটের দিকে চলিয়া যাইত এবং সেখান হইতে পূর্ব্বেই যাহার সঙ্গে হৃগুতা জন্মিয়াছিল, এইরূপ এক ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করিত। উহার গায়ে কতক মুড়কি ছড়াইয়া দিলেই বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং পত্যন্তর গ্রহণ আইনতঃ সিদ্ধ হইত।

সাঁওতালদের সমাজে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে যে কেহ বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে। সাধারণতঃ স্বামী যদি পত্নীর সম্মতি না লইয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করে, তাহা হইলে প্রথমা পত্নীর পক্ষে বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ উপস্থিত হয়। উপযুক্ত কারণ না থাকা সত্ত্বেও পত্নী যদি বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য ব্যগ্র হয়, তাহা হইলে তাহার পিতাকে কন্যাপণ ফেরত দিতে এবং কন্যার উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য তাহাকে অর্থদণ্ড (fine) বহন করিতে হয়। পক্ষান্তরে স্বামী যদি বিনা কারণে অথবা সামান্য কারণে পত্নীত্যাগ করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে কন্যাপণ ফেরত দেওয়া হয় না; অধিকন্তু তাহার নিকট হইতে জরিমানা আদায় করা হয় এবং পরিত্যক্তা পত্নীও প্রথা মত তাহার প্রাপ্য পাইয়া থাকে। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সম্মুখে স্বামী তিনটি শালপাতা দ্বিখণ্ডিত করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে এবং জলপূর্ণ একটি পিতলের কলস উল্টাইয়া দেয়। এইরূপেই সাঁওতালদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর নারী ইচ্ছা করিলে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে। বিধবা-বিবাহও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। বিধবা সাধারণতঃ স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেই পতিত্বে বরণ করিয়া থাকে। এই দুই শ্রেণীর বিবাহই 'সাঙ্গা' নামে অভিহিত হয়। পাত্রী তাহার কতিপয় বান্ধব-বান্ধবী লইয়া মনোনীত পাত্রের বাড়ী যায়। পাত্র তখন সাধারণ কুমারী বিবাহের ন্যায় পত্নীর কপালে সিন্দূর না মাখাইয়া বাম হাতে একটি ডিঙ্ ফুলে সিন্দূর মাখায় এবং সেই হাতেই উহা তাহার (সাঙ্গা-পত্নীর) চুলে গুঁজিয়া দেয়। এইরূপ আচরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সাঁওতালরা 'সাঙ্গা-বিবাহে' পত্নীকে কুমারী-বিবাহের সম্মান দেয় না। মুণ্ডাদের মধ্যেও বিধবা-বিবাহে পত্নীর কপালে বাম হাতে সিন্দূরদানের প্রথা আছে। বিধবাকে পত্নীরূপে গ্রহণের ক্ষেত্রে মানভূমের কুর্মীরা তাহার প্রতি আরও অবমাননাকর ব্যবহার করিয়া থাকে; এইরূপ বিবাহে পতি তাহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা পত্নীর (বিধবার) কপালে সিন্দূর পরায়,—সাঁওতাল বা মুণ্ডাদের ন্যায় বাম হাতের সম্মানও তাহাকে দেয় না।

দক্ষিণ-আফ্রিকার দক্ষিণতম অংশে 'হটেনটট্' নামে একটা জাতি ছিল, বর্ত্তমানে তাহারা অপর বহুজাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। মাতা-পিতাই তাহাদের মধ্যে বর-কন্যা স্থির করিয়া দিত, কিন্তু কন্যার সেখানে একটু স্বাধীনতাও ছিল। যদি বর তাহার পছন্দ না হইত, তাহা হইলে বিবাহের রাত্রে একত্র থাকা সত্ত্বেও কন্যা যদি ছলে-কৌশলে বরের কবল হইতে নিজকে মুক্ত রাখিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইত। ইহাদের মধ্যেও বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু তজ্জন্য বিধবাকে প্রত্যেকবার বিবাহে তাহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলির এক-একটি গিঁট কাটিয়া ফেলিতে হইত।

বিশেষ বিবাহ-বিলের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই প্রবন্ধে দেশ-বিদেশের বহুজাতির বিবাহ-বিচ্ছেদ ও বিধবা-বিবাহ প্রথার আলোচনা করিলাম। বারান্তরে আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।*

---

* এই প্রবন্ধটির অনেক স্থলে আমি অমলকুমার রায় প্রণীত 'মনুসংহিতায় বিবাহ' এবং শ্রীঅশোক মিত্র সম্পাদিত 'The Tribes and Castes of West Bengal' এবং অপর বহু দেশী-বিদেশী পুস্তক হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছি।

ক র্ম্ম খা লি

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৪৬ সালে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার কিছু কালের মধ্যেই। নিষ্প্রদীপের যুগ পেরিয়ে শহরের মানুষ আবার রাত্রির অন্ধকারে পথে-ঘাটে সবেমাত্র আলোর মুখ দেখতে সুরু করেছে। ঠিক এমনি সময়ে খবরের কাগজে একটা কর্মখালির নোটিশ বেরুলো ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রীর কাজের জন্যে আবেদন-পত্র চেয়ে। আবেদন-পত্র আহ্বান করা হলো বক্স নম্বরে।

যুদ্ধের ছাঁটাই বেকারের সংখ্যা তখন অজস্র। চাকুরী চাই, চাকুরী চাই রব সর্বত্র। 'ছাঁটাই করা চলবে না' আওয়াজ মিছিলে মিছিলে যতই উঠুক না কেন, কারখানায় কারখানায় চলেছে ছাঁটাইয়ের হিড়িক। এমনি অবস্থায় কর্মখালির প্রত্যেকটি বিজ্ঞাপনই বেকার কর্মপ্রার্থীদের সামনে আশার আলেয়া সৃষ্টি করে। আলেয়া বলছি এ জন্যে যে, এ কালে প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপন প্রচারিত হবার আগেই কর্মখালির বিজ্ঞাপিত শূন্য স্থান পূর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে। শুধু রীতিরক্ষার জন্যেই বিজ্ঞাপন। কিন্তু এ তথ্য সর্বজনবিদিত হলেও মন যে মানে না! তাই কর্মখালির কোন বিজ্ঞাপনের সঙ্গে নিজের যোগ্যতার আংশিক মিল খুঁজে পেলেও কোন বেকারই একটা দরখাস্ত ছেড়ে দিতে কসুর করে না। এমন কি আট আনা বা এক টাকার ডাকটিকিট সহ আবেদন করতে বলা হলেও নয়।

ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রির কাজের বিজ্ঞাপনেও তাই সাড়া পাওয়া গেল প্রচুর। চাকুরীও পাকা, মাইনেটাও ভাল। কাজেই ভাল সাড়া তো স্বাভাবিক ভাবেই পাবার কথা। মিউনিসিপ্যালিটির কাজকে আধা-সরকারী কাজও বলা যেতে পারে। বড় মিউনিসিপ্যালিটি হলে তো কথাই নেই। অনেক সময় সরকারী কাজের চাইতেও এক-একটা মিউনিসিপ্যালিটির চাকুরীতে বেশী সুযোগ-সুবিধা। তাই অসংখ্য দরখাস্ত পড়লো ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রীর বিজ্ঞাপন কাগজে কাগজে প্রচারিত হবার ফলে।

নন্দ সেন তো খুব খুশি। কিন্তু চিন্তাও বড় কম নয়। এর মধ্যে কত লোককে তিনি এপয়েন্টমেন্ট দেবেন এবং কাদের দেবেন না এই তাঁর ভাবনা। হঠাৎ তাঁর মনে হলো যে, যে সব দরখাস্তের সঙ্গে নামকরা লোকের সুপারিশ রয়েছে তাদের ডাকা ঠিক হবে না। আর বেশী লেখাপড়া জানা লোকদেরও নয়। কারণ তাতে রিস্কটা বড্ড বেশী হয়ে যাবে। সে ভাবেই তিনি সমস্ত দরখাস্ত বাছাই করে নিলেন এবং মোট একশ' জনকে চাকুরী দেওয়া হবে ঠিক হলো।

ফেব্রুয়ারী মাস। বিশ তারিখে মনোনীত একশ' লোকের ঠিকানায় ঠিক ঠিক চিঠি চলে গেল। চব্বিশ তারিখের মধ্যে আড়াই শ' করে টাকা সিকিউরিটি রেখে কাজে যোগ দিতে হবে। হোক না আড়াই শ' টাকা জমা দিতে, চাকুরীটা তো পাকা। কাজেই এদের সকলেরই মনে অসীম আনন্দ। যার যে ভাবে সম্ভব জমার টাকাটা সবাই সংগ্রহ করে ফেলে দু'-এক দিনের মধ্যেই। কেউ কেউ বাপ বা শ্বশুরের কাছ থেকে নিয়ে, আবার অনেকে ধার করে নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে নন্দ সেনের বাড়িতে গিয়ে একের পর এক উঠতে থাকে।

হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ির মতই বাড়ি বটে! একেবারে সাহেবি আদব-কায়দা। নতুন চাকুরেদের মধ্যে কথাবার্তাও হয় এই নিয়ে। বাড়িটা মিউনিসিপ্যালিটির ভাড়া নেওয়া বাড়ি হতে পারে। বাড়িতেই ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের অফিস। সে তো ভালই, সব দিক থেকেই ভাল।

একেবারে পাক্কা সাহেব নন্দ সেন। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় বেলা দশটা বাজতেই সেন সাহেব তাঁর আফিসে এসে বসেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ডাক সুরু হয় আমন্ত্রিত চাকুরীপ্রার্থীদের এপয়েন্টমেন্ট লেটার নেবার জন্যে। ঠিক তিন মিনিট পর পর এক-এক জনের ডাক পড়ে! সামনে-বসা সেনের এ্যাসিষ্ট্যান্টের কাছে এক-এক জন আড়াই শ' করে টাকা জমা দিয়ে রসিদ নেয় আর সেন সাহেব নিজ হাতে তাদের নিয়োগপত্র দিয়ে বলে দেন যে, সে দিন থেকেই তাদের চাকুরী পাকা এবং মাইনেও তারা পাবে সেদিন থেকেই। আর বেলা ৩টার পর এ্যাসিষ্ট্যান্ট দাশগুপ্ত সকলকে কাজ বুঝিয়ে দেবে এ কথাও বলে দেওয়া হয় তাদের।

নিয়োগপত্র বিলির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। জন তিন-চার আর বাকি। বছর বিশ-একুশের এক যুবকের ডাক পড়েছে সাহেবের ঘরে। যুবকের চোখে-মুখে দুশ্চিন্তা—কেমন একটা নৈরাশ্যের ছায়া যেন তাকে ঘিরে রয়েছে। সাহেবের ঘরে ঢুকেই যুবকটি অত্যন্ত করুণ ভাবে জানায় তার অক্ষমতা—এই অল্প সময়ের মধ্যে সিকিউরিটির পুরো আড়াই শ' টাকা সংগ্রহ করতে না পারার কথা।

সাহেব সহানুভূতি জানান ছেলেটির কথা শুনে। কিন্তু এ কথাও তাকে বলে দেন যে, এক জনের বেলায় তো আর নিয়মের ব্যতিক্রম করা চলে না। তা'হলে যে আর সবাইর কাছে তাঁকে অপরাধী হতে হবে। তবে কাজ পেয়েও ছেলেটি একেবারে নিরাশ হয়ে যাবে তাই বা কেমন কথা। তাই সেন সাহেব এই ভরসা দেন তাকে যে, বাকি দেড়শ' টাকা না হয় তাঁর পকেট থেকেই ধার হিসেবে দেওয়া যেতে পারে। ধীরে ধীরে টাকাটা তাঁকে শোধ করে দিলেই চলবে। খুশিতে রাঙা হয়ে ওঠে তরুণ চাকুরীপ্রার্থীর মুখখানা। তাতেই রাজী হয়ে সেন সাহেবের হাত থেকে নিয়োগপত্র নিয়ে এবং তাঁকে প্রণাম জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই তাকে ঘিরে ধরে আর সকলে। সে জমার টাকা পুরোপুরি জোগাড় করে আনতে পারেনি এ কথাটা অনেকেই এরই মধ্যে জেনে ফেলেছিল কি না, তাই তাদের ধারণা হয়েছিল যে, এ ছেলেটির কাজ কিছুতেই হতে পারে না। কিন্তু তারা যখন সব কথা শুনলো তার কাছ থেকে, সবাই অবাক হয়ে গেল সেন সাহেবের সহৃদয়তায়। তারা ধন্যবাদ জানাতে লাগলো তাদের নিজ নিজ অদৃষ্টকে এমন লোকের অধীনে চাকুরী হয়েছে বলে।

দেখতে দেখতে বেলা তিনটে বেজে যায়। নিয়োগপত্র বিলির কাজও প্রায় নির্দিষ্ট সময়েই শেষ হয়ে আসে। বড় হল-ঘরটায় আফিস করা হয়েছে নতুন চাকুরেদের। তারা সবাই সেখানেই বসেছে। এ চাকুরীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। মনিব যতই ভাল হোক না কেন, ভাল কাজ দেখাতে না পারলে যে জীবনে উন্নতি সম্ভব হতে পারে না সে কথা তাদের

মধ্যেই একজন অভিজ্ঞ ও বয়স্ক ব্যক্তি সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর এক তরুণ আবার বলে ওঠে, "যে যাই বলুন, আমাদের ভাল-মন্দ বিবেচনা করার জন্তে, নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্তে নিজেদের একটা ইউনিয়ন থাকা দরকার। প্রভু ভাল বলেই যে আমাদের স্বার্থে কখনো ঘা লাগতে পারবে না, এমন মনে করা ঠিক নয়। আর সব কিছুই তো সেন সাহেবের ওপর নির্ভর করবে না। মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ যেমন নিয়ম বেঁধে দেবেন তেমন ভাবেই তো তাঁকে চলতে হবে। কাজেই আমাদের ভাল-মন্দ দেখার ভার কতকটা আমাদেরই নিতে হবে। অন্ত লোক আমাদের ভাল করে দেবে, তেমন আশা না করাই উচিত। তা' ছাড়া আজকের দিনে একতা ছাড়া এগুনো সম্ভবও নয়।"

এ কথাগুলো সবারই খুব মনে লাগে। এ নিয়ে একটা আলোচনার আবহাওয়াও তৈরী হয়ে যায় যেন। একটা ইউনিয়ন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা আর এক জন বলতে স্থরু করেছে ঠিক এমনি সময় হল-ঘরে সেন সাহেবের এ্যাসিষ্ট্যান্ট এসে ঢুকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সব আলোচনাও স্তব্ধ হয়ে যায়। এ্যাসিষ্ট্যান্ট একটা টাইপ-করা তালিকা এনে পেশ করে নতুন কর্মচারীদের সামনে। শহরের বিভিন্ন রাস্তার বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাদি সব ঠিক আছে কি না তার তদারক করার জন্তে তিন জনের এক-একটি দল তৈরী করে দিয়েছেন সেন সাহেব। কে কোন্ দলে পড়েছে এবং কোন্ দলের কাজ পড়েছে কোন্ এলাকায় তা' টুকে নিতে হবে সকলকে। কয়েক জনকে কাজ দেওয়া হয়েছে আফিসে। বাকি সকলকেই আফিসে হাজিরা দিয়ে আউটডোর ডিউটিতে বেরুতে হবে।

সবাই যে যার কাজ বুঝে নিয়ে বিদায় নেয় সেদিনের মত। পরদিন থেকে রীতিমত কাজ সুরু হয়ে যায়। ছুটির আগে সেন সাহেব নিজে সকলের কাছ থেকে কাজের হিসেব বুঝে নেন। কাজের প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় মালমশলা কর্মচারীদের হাতে দিতে সাহেব যেমন কোন রকম কার্পণ্য করেন না, তেমনি আবার প্রত্যেকের কাছ থেকে কড়ায় গণ্ডায় সব বুঝে না নিয়েও কাউকে তিনি ছাড়েন না।

তিন-চার দিনের মধ্যেই শহরের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার সুস্পষ্ট উন্নতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরই মধ্যে শহরবাসীরা বলাবলি সুরু করে দেয় যে, আলোর সমস্যা তো মিটলো, এখন যদি মিউনিসিপ্যালিটি শহরের পরিচ্ছন্নতার দিকে এবং রাস্তার উন্নতির দিকে একটু বিশেষ নজর দেয় তা'হলেই শহরের রূপ পাল্টে যেতে পারে।

পয়লা মার্চ। মাইনের তারিখ। এক-এক জন করে ডেকে ডেকে সেন সাহেবের সামনে বসেই তাঁর এ্যাসিষ্ট্যান্ট চার দিনের মাইনে পনের টাকা দশ আনা করে প্রত্যেককে বুঝিয়ে দেয়। সবাই সই করে টাকা নিয়ে খুশি মনে যার যার কাজে চলে যায়। সত্যিই তো, খুশি হবার কথা। মাত্র চার দিন কাজ করার পরই কড়ায় গণ্ডায় মাইনে বুঝে পাওয়া, মন তো আনন্দে উদ্দাম হয়ে উঠবেই।

হঠাৎ কি একটা জরুরী ব্যাপারে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের যেতে হবে কলকাতায়। সারা অফিস জুড়ে হৈ-চৈ। অথচ মাত্র তিন-চার দিনের ব্যাপার। কলকাতা থেকে পরের রোববারই সাহেব এবার একেবারে সপরিবারে ফিরে আসবেন, এ একদম পাকা কথা। দাশগুপ্তকেও তাই বলা হয়েছে, বাড়ির ঠাকুর-চাকরকেও সেই ভাবেই তৈরী থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আগের দিন বিকেলে সেন সাহেবের জন্তে দাশগুপ্ত একটা রিটার্ন এয়ার প্যাসেজ বুক করে এসেছে ১৫৲ টাকায়। বিমানে ঢাকা থেকে কলকাতা রিটার্ন টিকিটে ৫৲ টাকা কম পড়ে। এ বাজারে পাঁচটা টাকাই বা কোথা থেকে আসে, সাহেব এ কথা গুরুগম্ভীর ভাবে বলেছিলেন তাঁর সহকারীকে। সে কথাও আগের দিনই রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে অফিসময়।

পরদিন সকাল বেলা ব্রেকফাষ্ট সেরেই সেন সাহেব বিমানে কলকাতা রওনা হয়ে যান। বিমান-ঘাঁটিতেও তিনি ভুল করেন না এ্যাসিষ্ট্যান্টকে সব ফাইলপত্র ঠিক করে রাখার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে।

সেন-সাহেব না থাকলেও পুরাদমেই তাঁর আফিস চলছে। রোববার সাহেব সপরিবারে ফিরবেন কলকাতা থেকে, তার জন্তেও কি কম তোড়জোড়! সকাল সাড়ে সাতটায় প্লেন আসবে। আধ ঘণ্টা আগে থেকেই দাশগুপ্ত বেচারা বিমান-ঘাঁটিতে গিয়ে হাজির। একটা ট্যাক্সিকেও সে বলে রেখেছে যাতে কোন অসুবিধায় পড়তে না হয় তার সাহেবকে।

কিন্তু সাহেব কোথায়? প্লেন যথাসময়েই এলো। যাত্রীরা একে একে নেমে যে যার গন্তব্যস্থলে চলেও গেল। সাহেবের কোন হদিসই নেই। এ কেমন কথা!—বিস্মিত হয়ে ভাবে এ্যাসিষ্ট্যান্ট। হয়তো কোন অসুখ-বিসুখ হয়ে থাকবে। দু'-এক দিনের মধ্যেই যাই হোক একটা চিঠি পাওয়া যাবে নিশ্চয়। এই রকম ভাবতে ভাবতে দাশগুপ্তও চলে যায় বিমান-ঘাঁটি ছেড়ে। সাহেবের বাড়িতে গিয়ে খবরটা জানিয়ে যেতেও ভুল করে না সে। ততক্ষণে চাকর মঙ্গুয়া বড় হাতে বাজার করে নিয়ে এসেছে। সাহেবই রোববারের বাজারের জন্তে দশটা টাকা পৃথক করে দিয়ে গিয়েছিলেন তার হাতে। কিন্তু এ যে দেখছি সবই মাটি হলো! সকাল বেলার খাবারের আয়োজনটাও বৃথা! তার ভোগে অবশ্য লাগলো খানিকটা। তবু সাহেব না আসায় নিরাশ হয়েই আপন মনে বাড়ি ফিরে যেতে হয় তাকে।

দিনের পর দিন কাটে। আফিসও চলেছে সেন সাহেবের। কিন্তু মাস শেষ হতে চললো, সাহেবের যে কোন খোঁজ-খবরই নেই! তবে কি কোন দুর্ঘটনা ঘটলো, না আর কিছু?

আফিসের লোকদের মনে একটু একটু সন্দেহও দেখা দিয়েছে ইতিমধ্যে। তবু তারা বিনা দ্বিধায় কাজ করেই চলেছে, যদিও সে কাজ ক্রমশই যেন প্রাণহীন হয়ে পড়ছে।

সন্দেহ আরও গভীর হয়ে উঠছে। সেন সাহেবের এ্যাসিস্ট্যান্ট দাশগুপ্তও অত্যন্ত বিচলিত। পরদিনই তো আবার মাসপয়লা। কর্মচারীদের মাইনের তাগিদ সামলাবে কি করে? মিউনিসিপ্যালিটি থেকেও তো এ পর্যন্ত কোন খোঁজখবর এলো না! এ সব কথা ভাবতে ভাবতে সব কিছুই কেমন যেন ধোঁয়াটে মনে হতে লাগলো তার।

এমন সময় হঠাৎ দু'জন অপরিচিত ভদ্রলোক এসে উপস্থিত

সেন সাহেবের অফিসে। তাঁরা জানালেন যে, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে তাঁরা এসেছেন একটা বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্যে।

আফিসের কর্মচারীরা সেন সাহেবের ঘর দেখিয়ে দেয় ভদ্রলোকদের। মিউনিসিপ্যালিটির লোক এসেছেন, এ কথা শুনে সবারই যেন প্রাণে জল আসে। যাক্, বাঁচা গেল! দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সবাই।

এদিকে ভদ্রলোক দু'জন হঠাৎ সাহেবের ঘরে ঢুকতেই হকচকিয়ে ওঠে দাশগুপ্ত।

: কাকে চাই?

: আমরা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে আসছি। কয়েকটি বিষয় জানবার আছে আমাদের। কাকে জিজ্ঞেস করবো বলুন তো?

: কি আপনাদের জিজ্ঞাস্য তা' না জানলে তো ঠিক বলতে পারছি না যে, আমি আপনাদের কথার উত্তর দিতে পারব কি না।

: এ আফিসের কর্তা কে? তাঁর সঙ্গেই আমরা একটু কথা বলতে চাই।

: তিনি তো বাইরে গেছেন কয়েক দিনের জন্যে। কবে ফিরবেন তাও আমাদের কারুর জানা নেই।

: আচ্ছা, আপনাকেই তা'হলে জিজ্ঞেস করি। কিছু দিন ধরে শহরের সব রাস্তার আলোগুলোর পাওয়ার হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় এবং বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় মিউনিসিপ্যাল আফিসে পর পর অনেকগুলো চিঠি আসে এ কাজের জন্যে প্রশংসা জানিয়ে। অথচ রাস্তার আলো বা বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মিউনিসিপ্যালিটি ইদানীং এমন কিছু করেনি যার ফলে এ ধরণের প্রশংসা তারা পেতে পারে। তাই বিষয়টির তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে আমাদের ওপর এবং খোঁজ-খবর করে জানা গেল যে, এই আফিস থেকেই নাকি মাসাধিক কাল ধরে শহরের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে অনেক কিছু করা হচ্ছে। কি ব্যাপার বলুন তো!

: হ্যাঁ, আমাদের এ আফিস থেকেই তো এ কাজ করা হচ্ছে। কেন, আপনারা মিউনিসিপ্যালিটির লোক এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না? আমাকে তো সাহেব বলেছিলেন যে, শহরের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ভার তাঁর ওপরে। আর দশটা ফার্মের মত মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গেও তাঁর নাকি একটা কন্ট্রাক্ট রয়েছে।

: এ কি কথা বলছেন, মশাই? এ যে একেবারে অবাক করলেন দেখছি!

: কেন বলুন তো?

: কেন আবার কি, মিউনিসিপ্যালিটির নিজের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট থাকতে তার কি দরকার হতে পারে বাইরের কোন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কণ্ট্রাক্টে আসার? আর দরকার বোধ করলে কি এত বড় মিউনিসিপ্যালিটি দু'-চার জন নতুন ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করে নিতে পারে না? আচ্ছা, আপনি এখানে কি করেন এবং কত দিন ধরে এখানে কাজ করছেন?

: আমি সেন সাহেবের পার্সন্যাল এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট! অন্তত খাতা-পত্রে তো আমার তাই ডেজিগনেশ্যান, আর আফিসের সবাইও তাই জানে। তবে চাকুরী আমার এখানে মাত্র এক মাস ছ'দিনের।

: তাই নাকি? এ কোম্পানীর বয়স কত বলতে পারেন?

: আমার ধারণা, আমিই এখানকার সব চেয়ে পুরানো কর্মচারী। কলকাতায় নাকি এ কোম্পানীর হেড আফিস। ছোট ভাইকে কলকাতা আফিসের পুরো চার্জ বুঝিয়ে দেবার জন্যেই তিনি কলকাতা যাচ্ছেন, আমাদের তো সেন সাহেব এ কথাই বলে গেলেন। যাবার সময় তিনি আরো বলেছেন যে, কলকাতা আফিসের জন্যে এখন আর ওঁর কোন ভাবনাই নেই; ঢাকা আফিসটা ভাল করে অর্গানাইজ করাই এখন বড় কাজ, তাই এবার একেবারে পরিবার-পরিজন নিয়ে আসবেন ঢাকায়।

: আচ্ছা মশাই, এই এক মাস ছ'দিনের চাকুরীতে সেন সাহেবকে কি রকম লোক বলে মনে হয়েছে আপনার?

: সত্যি কথা বলতে কি, এর আগে আমি আরো দু'তিনটে দেশী ফার্মে কাজ করেছি, কিন্তু কোন অফিস-বসকেই এমন ঘড়ি ধরে এবং এমন নিখুঁত ভাবে কাজ করতে দেখিনি। আর এই অল্প সময়ের মধ্যে ভদ্রলোকের সহৃদয়তার পরিচয়ও তো যথেষ্টই পেয়েছি। যে ক'টা দিন ওঁর সামনে বসে কাজ করেছি তার মধ্যেই লক্ষ্য করেছি ওঁর কর্মব্যস্ততা। বাস্তবিকই খুব ঘন ঘন টেলিফোন এসেছে ওঁর কাছে—কখনো মিউনিসিপ্যালিটি থেকে, কখনো কখনো বা ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন বড় বড় ফার্ম থেকে। অবিশ্যি কোথা থেকে কোন্ টেলিফোন এসেছে সাহেব যা বলেছেন আমি তাই বিশ্বাস করেছি। অবিশ্বাস করার কোন কারণও তো কখনো ঘটেনি। তাছাড়া, সাহেব কলকাতা চলে যাবার পরেও মাঝে মাঝে ফোন এসেছে, আমিই সে সব ফোন ধরেছি। প্রশ্ন করে যে উত্তর পেয়েছি তাতেও কখনও কোন রকম সন্দেহ হয়নি। 'কে বলছেন?' এ প্রশ্নের উত্তরে কেউ জানিয়েছেন, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে, কেউ বা মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে, নয়তো বা নারায়ণগঞ্জের রেলী ব্রাদার্স কোম্পানী থেকে, সেন সাহেবকে চাই। সাহেব কলকাতা গেছেন এ কথা শোনার পরে আর কারো সঙ্গেই বেশি কথা হয়নি।

: কিন্তু মশাই, সব ব্যাপারটাই যে সাজানো আর ভুয়ো তা কি এখনো আপনাদের মনে হচ্ছে না? এ কথাটা জেনে রাখুন মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে আপনাদের সেন সাহেবের কোন সম্পর্কই নেই। আর এও আমি বলতে পারি যে, যারা আপনাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম করে ফোন করতো তারা সেন সাহেবের ভাড়াটে ছাড়া আর কিছুই নয়।

: সে কি বলছেন মশাই? তাহলে যে আমাদের সর্বনাশ!—এই বলে সেন সাহেবের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কর্মচারীদের কয়েক জনকে ডেকে আনেন সাহেবের আফিস-ঘরে। সমস্ত কথা শুনে তারাও হতবাক হয়ে যায়, ভীষণ উত্তেজনা দেখা দেয় তাদের মধ্যে। মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধি দল তাদের একটু শান্ত হতে বলে বাড়িওয়ালাকে সেখানে ডেকে আনবার ব্যবস্থা করেন।

কাছেই বাড়িওয়ালার বাড়ি। বেশ নামকরা লোক অনেকগুলো ব্যবসায়ের মালিক। তার ওপর আট-দশখানা 'বাড়ি থেকেও ভদ্রলোকের প্রচুর আয়। কিন্তু বিত্তাস্থান নিতান্তই দুর্ব হওয়ায় বেচারা সবাইকেই খুব সমীহ করে চলেন। বিশেষ করে সরকারী আফিস-কাছারীর লোক দেখলে তো কথাই নেই! যে

জানে, কে আবার কোন্ দিক দিয়ে ফ্যাসাদে ফেলে দেয়, এই ভয়। বাড়ির দরজায় মিউনিসিপ্যালিটির তকমা-আঁটা পিয়নের উপস্থিতি লক্ষ্য করেই বাইরের বিশ্রাম-ঘর থেকে একেবারে ছুটে আসেন দাস মশাই।

: নমস্কার হুজুর! মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার খগেন বাবু আর ধীরেশ বাবু সেন সাহেবের আফিস-ঘরে অপেক্ষা করছেন। আপনাকে এখুনি একটু যেতে হবে সেখানে।

দু'জন কমিশনার তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন! দাস মশাই ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওঠেন এ কথা শুনে। তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে কোন রকমে একটা জামা গায়ে চড়িয়ে দাস বেরিয়ে আসেন এবং পিয়নের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই সেন সাহেবের আফিসে গিয়ে উপস্থিত হন।

: এই যে দাস মশাই, খুব জাঁদরেল ভাড়াটে যোগাড় করেছিলেন দেখছি। ক' মাসের ভাড়া বাকি, তাই আগে বলুন দেখি শুনি!

: সে আবার কি কথা বলছেন স্যার! কিছুই তো বুঝতে পারছি না।—দাস হকচকিয়ে ওঠেন কমিশনারদের কথা শুনে।

: বুঝতে পারছেন না? আপনার ভাড়াটে সেন সাহেব তো উধাও। ভাড়া-টাড়া কিছু পেয়েছেন তাঁর কাছ থেকে?

: হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভদ্রলোক তো দু' মাসের ছ'শ' টাকা ভাড়া আগাম দিয়েই বাড়িতে ঢুকেছেন। তা' আপনারা যাই বলুন না কেন, সেন সাহেব সত্যি সত্যি খাঁটি ভদ্রলোক। এই তো সেদিন পরিবার নিয়ে আসার জন্যে কলকাতা গেলেন। যাবার সময় দেখা করে যেতে ভুল করেননি। শুধু তাই নয়, কলকাতা থেকে আমাদের কিছু নিয়ে আসার দরকার আছে কি না তা' পর্যন্ত বার বার জিজ্ঞেস করে গেছেন। বলুন তো, কোন ভাড়াটে করে এ রকম?

: না, কখখনো না। তবে ব্যাপার কি জানেন দাস মশাই, আপনি যতই ভীমনাগের সন্দেশ বা বাগবাজারের রসগোল্লার অর্ডার দিন না কেন সেন সাহেব কোন দিনই সে সব নিয়ে আপনার কাছে আর ফিরে আসবেন না।

: না আসলেও আমার কোন ক্ষতি নেই তাতে। এ মাস অবধি তাঁর ভাড়া তো পরিষ্কারই আছে। দু'দিন দেখে নতুন ভাড়াটে বসিয়ে দেবো।

: সেন ভারি আশ্চর্য লোক তো দেখছি তা' হলে!—একজন কমিশনার বিস্ময় প্রকাশ করলেন এই বলে।

: আচ্ছা মশাই, এ ঘরে ও ঘরে বারান্দায় এত যে সব ফার্নিচার দেখছি, এ সব এলো কোত্থেকে?—সেন সাহেবের এ্যাসিষ্ট্যান্টকে জিজ্ঞেস করেন আর এক কমিশনার।

: এ সবও তো ভাড়ারই ব্যাপার। মাসিক ভাড়া আড়াই শ' টাকা করে। দু' মাসের ভাড়া এর জন্যেও আগাম দেওয়া আছে, এই দেখুন।—এই বলে দাশগুপ্ত হিসেবপত্রের একখানা বড় খাতা খুলে ধরে ঐ কমিশনারের সামনে।

: বেশ দিলদরিয়া লোকই তো দেখছি আপনাদের সেন সাহেব। হাজার দেড়হাজার টাকার রিস্ক নেওয়া সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে তো খুব সহজ ব্যাপার নয়। খুব শাঁসালো ফ্যামিলিরই ছেলে হবে সেন।

: সবই বুদ্ধির খেলা স্যার! দেড়হাজার খরচ করে যদি দশহাজার টাকা হাতে আসবে বুঝতে পারা যায় তা' হলে দেড় হাজারের রিস্ক নেবে সে আর বেশি কি? এই দেড়হাজার টাকাও সেন হয়ত দেড় শ' টাকা রিস্ক নিয়েই রোজগার করেছে। এই ধরুন না আমারই কথা। গরীবের ছেলে বৌ-এর গয়না বিক্রী করে পাঁচ শ' টাকায় ব্যবসা আরম্ভ করেছিলাম, আর আজ তো দশখানা বাড়ির মালিক এই ঢাকা শহরে।—কথায় কথায় কমিশনারদের কাছে নিজের কৃতিত্বের বড়াই করতে গিয়ে কালোবাজারে প্রচুর অর্থলাভের কথা স্বীকার করতে একটুও বাধে না সোজা মানুষ বাড়িওয়ালা দাস মশাইয়ের।

: কিন্তু তা' নয় হলো। হাজার দেড়েক টাকা খরচ করে সেনের কি লাভ হলো, তাই তো বুঝে উঠতে পারছি না আমরা।

: কেন স্যার, মোট একশ' দু'জন কর্মচারীকে নিয়োগপত্র দেবার সময় সেন সাহেব আড়াই শ' টাকা করে সিকিউরিটি নিয়েছেন প্রত্যেকের কাছ থেকে। শুধু মাত্র এক জনের কাছ থেকে পেয়েছেন একশ' টাকা। অবশ্য প্রথম মাসের শেষ কয় দিনের জন্যে কর্মচারীদের মাইনে এবং অন্যান্য খরচ বাবদ হাজার দুই টাকা হয়তো খরচ হয়ে থাকবে আর বাকি বাইশ-তেইশ হাজার টাকাই তো নেট লাভ!—এ্যাসিষ্ট্যান্টের হিসেব শুনে আঁৎকে উঠেন সবাই একসঙ্গে।

এর পর আর আলোচনা নিরর্থক। সবাই তাই উঠে পড়ে চেয়ার ছেড়ে। সেদিনই খবরটা ছড়িয়ে পড়ে শহরের চারদিকে। পুলিশকেও স্তম্ভিত করে এই অভিনব বিরাট প্রতারণা। মিউনিসিপ্যালিটি এবং প্রতারিত কর্মচারীদের তরফ থেকে থানায় যে ডায়েরী করা হয়েছে তাকে ভিত্তি করে সারা দেশময় খোঁজাখুঁজি সুরু হয়ে যায় নন্দ সেনের। কিন্তু সবই নিষ্ফল।

তার পর কয়েক মাসের মধ্যেই সুরু হয়ে গেল সাম্প্রদায়িক খুনোখুনির তাণ্ডব। হলো দেশবিভাগ। এর পরেও নন্দ সেনের নিশ্চিন্ত না হবার কি কারণ থাকতে পারে? দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে ইতিমধ্যে তার আরো কত অস্থায়ী কোম্পানী চালু হয়েছে কে জানে? এত দিনে এদেশে বেনামীতে একজন গণ্যমান্য নেতা হয়ে বসাও নন্দ সেনের পক্ষে খুব বেশী কিছুই নয়।

তোমাদের কথায় তোমরা

"The thieves at home must hang : but he that puts
Into his over-gorged and bloated purse
The wealth of Indian provinces, escapes."

—William Cowper.

শ্রীমতী লিজেল্ রেমঁ

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

কর্ম্মযোগ

'আপনার কাজটা কি?'—জিজ্ঞাসা করলে নিবেদিতা জবাব দিতেন, 'আমি শিক্ষয়িত্রী, আমার নিজের একটি বিদ্যালয় আছে।' কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আবার অরবিন্দ ঘোষ স্থাপিত সমিতির একজন সদস্যও। বাংলায় তখন এখানে-ওখানে ছোট-ছোট বিপ্লবী দল গজিয়ে উঠেছে, একটার সঙ্গে আর একটার যোগ নাই। এদের সংঘবদ্ধ করে সুনিয়ন্ত্রিত একটা সংস্থা গড়ে তোলবার জন্য বাংলার বিপ্লবী নেতা ব্যারিষ্টার পি. মিত্রকে নিয়ে অরবিন্দ পাঁচজন সদস্যের একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। নিবেদিতা আর পি. মিত্র ছাড়া সদস্যদের মধ্যে ছিলেন যতীন বাঁড়ুয্যে, সি. আর. দাশ ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তরুণ ব্যারিষ্টার সুরেন্দ্রনাথ হালদার নিবেদিতা এবং চারজন সদস্যের মাঝে ছিলেন সেতুস্বরূপ।* ১৯০৫ সালে অরবিন্দ বাংলায় বসবাস করতে আসেন। তার আগে পর্যন্ত সমিতির ভাগ্যে অনেক বিপর্যয় গেছে। বিভিন্ন দলের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে না পেরে কখনও বা সমিতি ছত্রখান হয়েছে। তবুও এক সময় এই সমিতিই হাজারে-হাজারে ছেলেকে দলে টেনেছে আর জাতীয় স্বাধীনতার পুরোধা হিসেবে এক দল লোককে জ্বলন্ত উৎসাহে উদ্দীপিত করেছে।

সমিতির কাজকর্ম চলত একেবারে গোপনে-গোপনে। কদ্দূরব্যাপী মত একটা আন্দোলন—কত দূর তার প্রসার আজ তার সঠিক হিসাব পাওয়া শক্ত। প্রত্যেক সদস্যের এক-একটি নিজস্ব মণ্ডল ছিল, তার সব দায়িত্ব তাঁর একার,—কিন্তু তার বাইরে আর কারও কাজের খবর তিনি জানতে পেতেন না। এতে বিশ্বাসঘাতকতা কি ধরা পড়বার ভয় ছিল কম।

নিবেদিতার কাজ প্রধানত প্রকাশ্য আন্দোলন আর প্রেসের সঙ্গেই জড়িত ছিল। মিস ম্যাকলয়েডকে লেখা অজস্র চিঠি থেকে এ বিষয়ের খুঁটিনাটিতে নিখুঁত খবর মেলে। কাজে নেমে আশা-আকাঙ্ক্ষার কত যে তরঙ্গে দুলতে হয়েছে তাঁকে! বোঝাই যায়, দমননীতি প্রয়োগে সরকারের বেশী বিলম্ব হয়নি এবং তার ফলে নিবেদিতার প্রত্যেকটি কাজ সমস্যা-সঙ্কুল হয়ে উঠেছে।

১৯০৩এর জানুআরিতে মহা সমারোহে দিল্লীর দরবার অনুষ্ঠিত হল। খবরের কাগজে অনেকেই প্রগল্‌ভ ভাষায় ভারতীয় রাজা-মহারাজাদের জাঁক-জমক আর বিলাস-ব্যসনের বিবরণ জাহির করলেন। নিবেদিতা কিন্তু লিখলেন, 'গত দরবারের পর এই পঁচিশ বছরে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক দক্ষশিক্ষা সঞ্চয় করেছে অনেকখানি···শতাব্দীর আর-এক পাদে কত দূর সে এগিয়ে যাবে?' বাংলা সংবাদপত্রে এই প্রথম কঠোর সমালোচনার ভাষায় জনমত প্রকাশ পেল এবং তার ফলে সঙ্গে-সঙ্গেই ছাপাখানা-সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা জারি হল। ব্যাপার ক্রমেই ঘোরাল হয়ে উঠতে লাগল।

আরেকটা কাণ্ড হল যার গুরুত্ব সকলে প্রথমটায় বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু বোঝা মাত্রই সারা বাংলা প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। লর্ড কার্জনের অনুমোদিত 'ইউনিভার্সিটি বিলে' বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ছেলেদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করবার কথা বলা হল। আগুন জ্বলল তাতেই। জাতীয়তাবাদীরা এটাকে দেখলেন সরকারের কূটনৈতিক চাল হিসাবে। শিক্ষিত শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত রোষে ইংরেজ সরকার ফ্যাসাদে পড়েছেন, তাই তাদের গলা টিপে মারবার এই মতলব। কথাটা মিথ্যা নয়। একেই বলে মরণ-বাণ।

দু'-এক পুরুষ ধরে সারা ভারতের মধ্যে বাংলাই বরং সবচেয়ে প্রগতিশীল হয়ে উঠেছিল। দেশের জমিদার-গোষ্ঠী সন্তান-সন্ততিদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য সব রকম ত্যাগ স্বীকার করছেন, তাঁদের সঙ্গে ইংরেজী-শিক্ষিত সংস্কৃতিবান ধনী সম্প্রদায়ের অচ্ছেদ্য যোগাযোগ। দেশের সর্বত্র ছোট-ছোট বেসরকারী বিদ্যালয় মাকড়সার জালের মত ছড়িয়ে পড়েছে। সেগুলোর ছাত্রসংখ্যা নগণ্য নয় এবং সে সব ছাত্র উচ্চ শিক্ষা পাওয়ার জন্য উৎসুক। বোম্বাইয়ের পার্শীদের সঙ্গে বাঙালীরাই প্রথম তাদের ছেলেদের বিলাতে পাঠিয়েছে, তারা সেখান থেকে ব্যারিষ্টার, চিকিৎসক কি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হয়ে ফিরে এসেছে।

বাঙালীর স্বভাবে আছে গবেষণাশীলতা। বুদ্ধির অনুশীলন করতে তারা ভালবাসে, সেই সঙ্গে ধাতটি তাদের কল্পনা-প্রবণ। বড়লাটের দমননীতি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলোচ্ছেদ করবার উপক্রম করল। শিক্ষা-সঙ্কোচের নীতিকে জরুরী পন্থা হিসাবে গ্রহণের সরকারী ব্যাখ্যা দেওয়া হল এই:

'পুঁথিগত বিদ্যা শিখে ছেলেরা ভারতের কৃষি ও শিল্প-ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারবে না।' সপ্তাহ কয়েক পরে কলকাতায় লর্ড কার্জন যে বক্তৃতা দিলেন তাতেও সরকারী নীতির সমর্থন করা হল। এই বক্তৃতায় ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্রের শিথিলতার প্রতি কার্জন কটাক্ষ করলেন। এ অপমানে বাঙালী রাগে আগুন হয়ে উঠল।

প্রতিক্রিয়াও হল সাংঘাতিক। নিবেদিতা সরাসরি বড়লাটকে আক্রমণ করে পাল্টা জবাব দিলেন। লর্ড কার্জনকে অপদস্থ করবার

---

* এই বইয়ের ফরাসী সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার সময় ১৯৪৬এর ১৩ই সেপ্টেম্বর শ্রীঅরবিন্দ এক চিঠি দেন। তা থেকেই এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

মত মাল-মশলা যুগিয়ে দিলেন ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোকে। কূট-নীতির মর্মোদ্ভেদ করা নিবেদিতার কাছে ছেলেখেলার মতই সহজ; ঐতিহাসিক জ্ঞান আর নিবন্ধ-রচনার নৈপুণ্য এবার তিনি ভারতের প্রয়োজনে নিয়োগ করলেন। '···ভারতের 'পরে অনেক অবিচার হচ্ছে। তার মধ্যে সবচেয়ে মনে জ্বালা ধরে এইতে যে, ভারতের ভারত হওয়ার অধিকার ওরা কেড়ে নিয়েছে, নিজের জন্য নিজে ভাবতে পায় না এ-দেশ, কিছু জানবার অধিকারও তার নাই। আমার এই নালিশই সবার বাড়া। এ দেশের অন্ন চাই, সুবিচার চাই, আরও কত কিছু চাই; এসব দাবির কথা ভাবতে গেলেও মন আগুন হয়ে ওঠে, কিন্তু ঐ এক বেদনায় আর সব দুঃখ ছোট হয়ে যায়······' (২৮শে জানুআরি ১৯০৩এর চিঠি)

গোলযোগ থামল না। শোনা গেল, বাংলাকে দু' টুকরো করে দুটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গড়বার প্রস্তাব এনেছেন বড়লাট,—শাসন-ব্যবস্থার সুবিধা হবে এই অজুহাতে। প্রস্তাবটা আপাতদৃষ্টিতে ন্যায্য মনে হলেও এতে শহর আর গ্রামের যোগাযোগ ভীষণ ভাবে ক্ষুণ্ণ হবে। দেশের রাজধানীকে কি সারা দেশ থেকে পৃথক করা চলে? একই দেশের মাঝে মনগড়া ব্যবধান তৈরি করলেই হল!

চারদিকেই বিক্ষোভ দেখা দিল। বাংলার শিক্ষিত সমাজ প্রতিবাদ জানাল। বার বার বহিরাক্রমণের ফলে বাংলায় নানা জাতির সংমিশ্রণ ঘটলেও বাঙালী নিজেদের 'এক' বলে দাবি করল। বিদেশী সরকার সবার শত্রু হয়ে যেন দেশের সকলের মনে একটা সৌহার্দ এনে দিল। কলকাতায় এবং সারা প্রদেশে প্রতিবাদ-সভার আয়োজন হল। এই যে শুরু হল, বহু বছর ধরে এ-লড়াই চলল, আর দিন-দিন তার জোর বাড়তেই লাগল।

এ-বিক্ষোভের খবর বিদ্যুৎগতিতে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল। খাল-বিলের নক্শা-কাটা বাংলা দেশ, বিশাল তার ব-দ্বীপ, তাল-নারকেলে-ঘেরা ছোট-ছোট গ্রাম উত্তরে হিমালয়ের উৎসঙ্গে গিয়ে মিশেছে, পাহাড়ের ধাপে-ধাপেও ফলছে ধান,—এই 'গঙ্গা-হৃদি বঙ্গভূমি'র দূর-দূরান্তের নিভৃত পল্লীতেও সাড়া পড়ে গেল। মন্দিরের শাঁখের ফুঁয়ে গর্জে উঠল বিপ্লবের সুর, পূজার্থীরা পূজারীর কাছে পেল বিদ্রোহের দীক্ষা, অধ্যাপক অগ্নি-মন্ত্র দিলেন ছাত্রের কানে। একপ্রাণ বাঙালী শতকোটি কণ্ঠে একই প্রতিবাদ জানাল, আবাহন করল মহাশক্তির—কালী কি দুর্গা তিনি, তাতে কি আসে যায়! অন্যান্য প্রদেশেও আগুন লাগল। সহস্র-কণ্ঠ-মুখরিত প্রতিধ্বনির মত এই প্রথম দেশের আকাশে-বাতাসে বেজে উঠল—'বন্দে-মাতরম্!' সে-মন্ত্রে ভারতবর্ষের অখণ্ডতার উদাত্ত ঘোষণা।

মিস ম্যাকলয়েডের পাল্লায় পড়ে নিবেদিতা ভাবছিলেন মার্চের মাঝামাঝি ওকাকুরা-পরিচালিত সম্মেলনে যোগ দিতে টোকিও যাবেন কি না; কিন্তু এদিকে কলকাতার কাজ অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠল। তাঁর জায়গায় জাপানে যাক অন্যেরা। নিবেদিতা তখন অনেকগুলো পত্র-পত্রিকার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন ওগুলোতে। দেশের লোককে চেতিয়ে তোলবার এই হল সহজ পথ। লেখার পারিশ্রমিক পেতেন সাধারণ হারেই, আর যা পেতেন তার সবটাই হয় স্বদেশী আন্দোলনে নয়তো নিজের স্কুলের পিছনে ঢালতেন। কলকাতার দেশী খবরের কাগজগুলোর সঙ্গে তাঁর কতখানি সহযোগিতা ছিল আজ তা ঠিক করে বলা অসম্ভব। কেন না তাঁর প্রবন্ধগুলো বন্ধু-বান্ধবদের নামে বা বেনামিতেই ছাপা হত, সম্পাদকদের এ-বিষয়ে তাঁর অনুমতি দেওয়া ছিল। অনেকগুলো প্রবন্ধের নীচে নাম-সই থাকত 'ভজ্র ইগোটা।'* নিবেদিতার প্রবন্ধগুলোয় প্রাণ আছে, আছে স্বতঃ-উৎসারিত আবেগ। ভেবে-চিন্তে বাঁধি গৎ-এ লেখা প্রবন্ধের চেয়ে সেগুলো অনেক সরস। লেখার ধরন দেখলেই কোন্‌টা নিবেদিতার রচনা তা বেশ বোঝা যায়। বেশির ভাগ প্রবন্ধই সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে লেখা—বক্তব্যের ঝাঁঝাল সুর আর আক্রমণের নিপুণ কায়দা থেকে সহজেই তাঁর লেখা চেনা যায়।

ভাষণের চেয়ে কালি-কলমের মারফতেই নিবেদিতার সঙ্গে বেশির ভাগ লোকের যোগাযোগ ঘটত। নিবেদিতা সাধারণ্যে ভাষণ দেওয়া এক রকম ছেড়েই দিলেন। ভাষণ দিতে গেলে বিবাদাস্পদ বিষয়ের অবতারণা অপরিহার্য, আর শ্রোতারা সব সময় তাঁর কথা ধরতে পারত না। তাই ভাষণ ছেড়ে নিবেদিতা কলম ধরলেন, কেন না তাতে নিজেকে প্রকাশ করবার সব রকম সুযোগ মেলে, স্বাতন্ত্র্যও থাকে অক্ষুণ্ণ। তাঁরই জন্যে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' এক কালে পুলিশের নজরে পড়েছিল, নিবেদিতার বন্ধু সম্পাদক মিঃ র‍্যাটক্লিফকে কিছু হাঙ্গামা পোয়াতেও হয়েছিল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক মতিলাল ঘোষ বাগবাজারে এসেছিলেন নিবেদিতাকে দেখতে। কংগ্রেসে তিনি একজন সদস্য, অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতেন। অমৃতবাজার নিবেদিতার স্বচ্ছন্দ মতামত প্রকাশের বাহন হল—বিশেষ করে সুরাট কংগ্রেসের পর থেকে। মতিলাল আর নিবেদিতার মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হল, দু'জন দু'জনকে বিশ্বাসও করতেন অকপটে। মতিলাল ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। নিবেদিতাকে তিনি তাঁর মতে আনবার চেষ্টা করতেন যখন, দু'জনের কথাবার্তা তখন শানানো হয়ে উঠত। মতিলাল ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রীচৈতন্যের কথা বলে চলতেন, নিবেদিতা আনমনে তাঁর রুদ্রাক্ষের মালা ফেরাতেন। তিনি খাঁটি শৈবযোগিনী, মতিলালকে আক্রমণ করতেন বেদান্তের অস্ত্র নিয়ে। দু'জনের মধ্যে ভাই-বোনের মত একটি নিবিড় সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল, প্রতি বৎসর ভাইফোঁটা উৎসবে সেটি স্ফুট হত।

লণ্ডনের 'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ষ্টেড ছিলেন নিবেদিতার বন্ধু। তাঁর পরামর্শমত একখানা 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ' বার করবার সাধ ছিল নিবেদিতার। 'ন্যাশনালিটি' কথাটার তাৎপর্য আর অর্থব্যাপ্তি কতখানি সেইটা ভারতকে জানিয়ে দেওয়াই এখন আসল কাজ। জাতীয়তার বিরাট চেতনা ভারতকে আচ্ছন্ন করে রাখুক অহর্নিশ। এই বোধে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে যাবে, একে অন্যকে দেখবে গভীর শ্রদ্ধার চোখে। ইতিহাসের অর্থ নতুন

---

* ১৯০৪ সনে লেখা কয়েকটা প্রবন্ধের শিরোনাম এই: 'দি ভেনস্ অব কলি: চৌফস্,' 'সাম্ মেজারস্ অব এডুকেশনাল রিফর্ম,' 'দি নেটিভ ষ্টেটস্', 'দি মহামেডান এ্যাণ্ড বৃটিশ রুল', 'পলিটিক্স ইন স্কুল এ্যাণ্ড কলেজ', 'তিলক কেস—অ্যান আপীল টু দি হাইকোর্ট', 'দি ভাইসরয় অ্যাণ্ড দি 'পার্টিশন কোশ্চেন।' স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ডের তিব্বত অভিযান নিবেদিতার মনে বেশ একটু আগুন জাগিয়েছিল। এ নিয়ে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন অনেকগুলো।

আলোয় পরিস্ফুট হবে, ধর্মজগতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবনাকে ভারত আত্মসাৎ করবে, ঘটবে সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়—এখন এটিই আসল। 'ভারতের জাতীয়তা' কি ভারতবাসীর তা উপলব্ধি করা চাই।' (১৪ই এপ্রিল, ১৯০৩এর চিঠি)

এ-পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তোলবার জন্যই জাপানে যাওয়ার মতলব নিবেদিতা ছেড়ে দিলেন। মিঃ ষ্টেডের আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই কারণেই। ষ্টেড নিবেদিতাকে বলেছিলেন লণ্ডনে 'ভারতীয় সংবাদদাতা' হতে। দুরতিক্রম্য বাধা সামনে নিয়ে যে-সংগ্রামে নিবেদিতা ঝাঁপিয়ে পড়লেন, চরমে তাতে হার হবে এ যেন তিনি ধরেই নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিটি প্রয়াসের ফলে অভাবনীয় কতগুলো ঘটনা-পরম্পরা সৃষ্টি হত, আর তাতে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হত প্রাণে। ১৯০৩ সনের ২৩শে এপ্রিলের চিঠিতে মিসেস লেগেট ও সেণ্ট ডোবাকে লিখেছিলেন, 'আমাদের কাজ হল দেশে একটা ভাব চারিয়ে দেওয়া। সে-ভাব স্বামী বিবেকানন্দের। কিন্তু ছাপাখানার রুদ্ধ হাওয়ায় লোকের ভিড়ের বদ্ধ পরিবেশে যে-ভাব জন্ম নিচ্ছে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচবার জন্য শৈলাবাসের স্নিগ্ধ বিরাম হয়তো তার ভাগ্যে নাই। এমনি কত বিড়ম্বনা! পৃথিবীর ইতিহাসের 'পরে নজর বুলিয়ে দেখি, কোনও আদর্শই অবিকৃত আকারে জনতার হাতে কেউ তুলে দিতে পারেনি। কাজেই কপালে আছে দিন-রাত লড়াই করে যাওয়া। তার ফলে সিদ্ধি যদি আসে তো বুঝতে হবে সেই সিদ্ধিই হয়তো ভাগ্যের চরম মার। এমনও হতে পারে, সুনিশ্চিত পরাজয়েই সাধনার শেষ!'

সেবার গ্রীষ্মকালে একটু ফুরসৎ মিলবে আশা হয়েছিল কাজে কিন্তু একটা পট-পরিবর্তন হল মাত্র। প্রেসের দৌরাত্ম্যে কলকাতা ছেড়ে দার্জিলিং গিয়ে নিবেদিতা দেখেন তাঁর পুরানো রাজনৈতিক বন্ধুরা সব সেখানে,—এ ওর বাসায় যাওয়া-আসা করেন, কিংবা দেওদার-তলায় আসর জমান। স্কুল বন্ধ করে নিবেদিতা বাড়ির সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। ক্রিষ্টিন বাংলা শেখা নিয়ে গলদ্-ঘর্ম হচ্ছেন। ইদানিং কাজের চাপে নিবেদিতা জগদীশ বোসকে তেমন আমল দিতে পারতেন না; বোস এবার তাঁর বেশ খানিকটা সময় দখল করে নিতে চান, ওদিকে মিসেস বুল খবর দিয়েছেন কয়েক মাসের মধ্যেই জাপান থেকে এ দেশে পৌঁছবেন।

নিবেদিতা চেয়েছিলেন তাঁর 'দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' বইখানার শেষ পরিমার্জন করে ওটার কাজ সেরে ফেলতে। আশা ছিল বইখানা থেকে স্কুলের জন্য মোটা টাকা উশুল করবেন। নোট-বইয়ে লিখলেন, 'সেপ্টেম্বরের সাতই বেলা ৪টায় বইটা শেষ হল। গুরুকে উৎসর্গ করেছি ওটা। ও-বইয়ে আমি যা বলেছি বেঁচে থাকলে সেসব সম্ভবত তিনিই বলতেন।' প্যাট্রিক গেডেসের ভূগোল-বিজ্ঞানের সূত্র ধরে গড়া এর কাঠামো; রমেশ দত্তের সহযোগিতায় শুরু। কিন্তু নদীর উৎসমুখের মত নিবেদিতার সমস্ত প্রেরণার প্রভব একটিই। 'এ-বই সংক্ষেপে এশিয়ার চরিত-কথা, তার মন্ত্রবাণী আর যুক্তিসূত্র দুই-ই এতে আছে।' যে আধ্যাত্ম একতার ভাবনা সমগ্র এশিয়াকে আচ্ছন্ন করে আছে এ-বইয়ে নিবেদিতা তাকেই রূপ দিয়েছেন। পশ্চিম তার ব্যঞ্জনা বহুকাল ভুলে গিয়েছে। 'গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের নিবিড়তাই এশিয়ার প্রাণস্পন্দের একটা মূল ছন্দ! একটা গোটা জাতি হয়তো একটি মানুষের শিষ্যত্ব স্বীকার করেছে, তারা তাঁর স্বগণ। আহারে-বিহারে চালে-চলনে এমন কি কিছুটা কথাবার্তাতেও তাঁর জীবনকেই আদর্শ বলে মেনে নিতে তারা চেষ্টা করে। এই সব কারণেই ধর্ম প্রাচ্য-সমাজে অমন অসামান্য গুরুত্ব পেয়েছে।' (ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ, পৃঃ ২২৫)

গোখ্লে তখনও দার্জিলিঙে। সেপ্টেম্বর মাসে খবর এল উত্তর-ভারতের মুসলমান অঞ্চলগুলি থেকে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন কালে নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ জানান হচ্ছে। এত দিনে বুঝি হিন্দু মুসলমানের সুচিরাকাঙ্ক্ষিত সহযোগিতার সৃষ্টি হল। নিবেদিতার রাশি-রাশি চিঠিপত্র থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় এতে তাঁর কৃতিত্ব কতখানি। গুরুর সমন্বয়-মন্ত্র তাঁর অজপা, তাই হিন্দু-মুসলিম উভয় দলেই তাঁর সঞ্চরণ ছিল স্বচ্ছন্দ। ক্রিষ্টমাসের পরই নিবেদিতা রওনা হলেন। কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হয়েছে, উৎসাহে সবাই অধীর। নিবেদিতা গোখ্লের পক্ষ নিয়ে জোরের সঙ্গে সমর্থন করলেন তাঁকে। গোখ্লেকে লিখেছিলেন, 'সেদিন বড়লাটকে পুরুষের মত যে-কথা শুনিয়েছ তার জন্য তোমায় অভিনন্দন জানাই। পরিষদে যতই আমরা প্যানপেনে মানুষ পাঠাচ্ছি, ততই তোমার শক্তি-সামর্থের উপর বেশী করে নির্ভর করতে হচ্ছে। এখনও অনেক বোঝবার শক্তি রাখ তুমি এ যে আমার কতখানি আশ্বাস! ঝাণ্ডা যতক্ষণ তোমার হাতে রয়েছে, কোন মতেই তা' যেন নুয়ে না পড়ে!' (১৯০৩ সনের ২২শে ডিসেম্বরের চিঠি) আবার ১৯০৪এর ৯ই এপ্রিল লেখেন, '…তোমার মতে আজ পরস্পরের মুখে এই একটি প্রশ্নই মানায়, "প্রহরী, দেখ দেখি রাত কত আর?" আর আমি মনে করি, ভোর যে হবেই সব সময় এইটি স্মরণ রাখলেই আমাদের জোর বাড়বে। যাক্, দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি না…'

কন্কনে ঠাণ্ডা পড়েছে। সপ্তাহ কয়েক পরে জানুআরির শেষা-শেষি নিবেদিতা আর একবার মুসলিম শ্রোতৃবর্গের কাছে ভাষণ দেওয়ার জন্য বাঁকিপুর চললেন। সঙ্গে স্বামী সদানন্দ। নিবেদিতা বল্লেন, 'এবার আমি মায়ের চাপরাশ পেয়েছি, তাঁরই আমি বার্তাবহ।' গোপালের মা আর স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিশেষ করে আশীর্বাদ পাঠিয়ে-ছিলেন সেবার। 'সারা ভারত চষে ফেলব আমি—মর্মের গভীর হতে গভীরে, আরও গভীরে নিখাত হবে আমার লাঙলের ফলা। কেমন হবে আমার বহিঃপ্রকাশ—সে কি নেপথ্যোচ্চারিত নিঃশব্দ দৈববাণীর মত, না নগরে-নগরে ছড়িয়ে পড়া দৃপ্তবীর্য ক্ষত্রবীরের রণহুঙ্কারের মত—তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। কিন্তু বিধাতার বরে আর আমার এই সবল দক্ষিণ বাহুর আশ্বাসে এ-জোর আমি পেয়েছি যে, প্রতীচ্যবাসীর মত ছিনিমিনিতে আমার প্রাণশক্তি আমি খোয়াব না। আমি জানি…ভারতই আমার সাধনা আর সিদ্ধি দুইই…আর কারও কথা বলতে পারি না।' (১৯০৩ ২৫শে আগষ্টের চিঠি)

বার বার বিপুল জনতার সংস্পর্শে এসে নিবেদিতা নিত্য-নূতন প্রেরণা পান। যে-ঐক্যের বাণী তিনি প্রচার করতেন, অন্তরে সেই অখণ্ড এককে অনুভব করেছিলেন বলেই অন্যের হৃদয়ে সে অনুভূতি সঞ্চারিত করতে পারতেন। একদিন খুব ভোরে একটা ছোট ষ্টেশনে ট্রেণ ধরতে যাচ্ছেন, এক দল মুসলমান এক ঝুড়ি কমলালেবু উপহার নিয়ে এল, সঙ্গে ভুর্জপত্রে লেখা একটি প্রীতি-সম্ভাষণ।

নিবেদিতা যেন বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্যের

প্রাণ-প্রতিমা। তারই সার্থক পরিণাম রূপে দেশে এই একতার সূচনা দেখা দিল। 'কাজ গুরুতর হলেও কৃতকাম হতেই হবে'—নিবেদিতার এ-সঙ্কল্পও ছিল অটুট। নিবেদিতা ছিলেন দুঃসাহসী শিল্পী, তাঁর নৈপুণ্যও কল্পনাতীত। জানতেন পত্রকলা (mosaic) রচনায় একটি রঙিন পাথর যদি বাদ পড়ে তো সেই খুঁতটুকু নজরে পড়ে সবার আগে। তাছাড়া নিবেদিতার কাছে ভারতবর্ষ জ্যোতির্ময়ী সাবিত্রী ছাড়া আর কিছু তো নয়।

১৯০৪এ নিবেদিতা সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এক নিষ্ঠুর সংগ্রামে। আমেরিকা থেকে ফেরবার পর দুটি কথা স্বামীজির ইষ্টমন্ত্র হয়ে উঠেছিল, 'কর্মযোগ আর অখণ্ড ভারত।' এ দুটো কথা প্রায়ই তাঁর মুখে শোনা যেত। প্রথম প্রথম নিবেদিতা কথা দুটি নিজের মনোমত আর সময়োপযোগী করে ব্যাখ্যা করতেন, তার পর সেবারকার বোধগয়ার অভিজ্ঞতা হয়ে উঠল তাঁর প্রেরণার উৎস। (অষ্টত্রিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) দুটিই নিবেদিতার গুরুভক্তির উচ্ছ্বাস,—স্বামী বিবেকানন্দের নিষ্ঠাপূত স্মৃতি-পূজা।

দীক্ষা-বার্ষিকীতে লিখেছিলেন, '···ছ' বছর আগে আমায় নিবেদিতা নাম দেওয়া হয়েছিল···তাঁর সেবায় নাম যেন সার্থক হয়··· তাছাড়া গুরু বলে রেখেছেন বিয়াল্লিশ থেকে উনচল্লিশের মধ্যে আমি মরব। এখন আমার ছত্রিশ। কাজেই ধরে রেখেছি একটা পালা আমি পুরোপুরি দেখে যাব। মনে হয় ১৯১২ সনে মরব। কিন্তু যুম, এই কয় বছরে ভারতের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে কি ? স্বামীজির কাজে এতটুকুও যে লেগেছি এ দেখবার সৌভাগ্য কি আমার হবে ?··· তাঁর দায় মাথায় নিয়ে পৃথিবীতে রয়েছি আমি, তাই তাঁর বিরাট প্রাণ মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ হয়ে চলে গেল, এটুকু যদি অনুভব করতে পারি—সেই আমার নিত্যকালের স্বর্গসুখ। মুক্তির জন্য 'থোড়াই কেয়ার' করি। তিনি আমার পতিতপাবন প্রেমের ঠাকুর—এ ভাবে তাঁকে আমি চাই না। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কি ছিল সে কথা মনে পড়ে না। আমি কেবল চাই তাঁর দায় মাথায় তুলে নিতে, আর তাঁকে ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগের অবসর দিতে। ওঃ, যাঁর সম্বন্ধে এমন করে কেউ স্বপ্ন দেখে আর এ-ও জানে সে স্বপ্ন মিথ্যা নয়···সে মানুষ কী ?' (১৯০৪ সনে ১৭ই মার্চে লেখা চিঠি)

২৬শে ফেব্রুআরি ১৯০৪ সন। কলকাতা টাউন হলে নিবেদিতা সেদিন বারশ' শ্রোতার সামনে ভাষণ দিলেন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে—যে হিন্দুধর্ম মাটির দুলাল চাষা-ভূষোর অন্তরের জিনিস। বললেন, 'গত পঞ্চাশ বছরে সমাজ-সংস্কারের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে এক দল মানুষ দেবাবিষ্টের মত দেখা দিয়েছে, এটা হল প্রথম পর্ব। তার পর, আদর্শ-রাষ্ট্রের স্বপ্নে পাগল হয়ে সেই দিকে ছুটেছে মানুষ। তৃতীয়ত, ধর্মজগতে নতুন করে সাড়া এসেছে নানান ভাবে। ভারতের মূল সমস্যা অবশ্য আধ্যাত্মিক ; কিন্তু 'ন্যাশনালিটি' কথাটার বিপুল ব্যঞ্জনা হৃদয়ঙ্গম করলে তবেই সিদ্ধি আসবে এ-সত্যটা ধরতে না পারলে কোনও সমস্যারই সমাধান হবে না। যে সব আচার-বিচারে মানুষে-মানুষে ভেদ ঘটে, ধর্ম তার মধ্যে নাই। আজ সবার আগে চাই সংঘশক্তি। সেই ধর্মই ধর্ম যাতে জাতির প্রাণশক্তি জেগে ওঠে।' মেয়েদের ডাক দিলেন নিবেদিতা। শুনিয়ে দিলেন, দেশের প্রত্যেকটি পুরুষের সবচেয়ে বড় কর্তব্য বাড়ির মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া। নারীজাগরণেই ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে বিদ্যুৎ-সঞ্চার হবে, জাগবে নতুন উষা, তার আভাস এরই মধ্যে দেখা দিয়েছে। (১৯০৪ সনের ২৭শে ফেব্রুআরি ষ্টেটস্‌ম্যান দ্রষ্টব্য)

মার্চে নিবেদিতা কাশী আর তার শহরতলিতে ভাষণ দিলেন। মুহূর্তের বিশ্রাম নাই তাঁর, কেবল চলা আর চলা। বরোদার গাইকোয়াড় তাঁকে আমন্ত্রণ করলেন নৈনিতালে ; প্রথম সাক্ষাতের পর থেকেই গাইকোয়াড়ের সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। কাঠগোদামে দেখা স্বামী সদানন্দের সঙ্গে—ডন সোসাইটি'র এক দল ছেলে নিয়ে পাহাড়ে চলেছেন। শ্রান্তি আসে, মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যান, তবু নিবেদিতা থামতে পারেন না। আগষ্টে দুটি দিন ছুটি পেয়েছিলেন, গঙ্গার বুকে সে দিন দুটি কাটল মুক্তির আনন্দে। দক্ষিণেশ্বর থেকে একটু দূরে নৌকা বাঁধলেন নিবেদিতা। গঙ্গার কলতান কত রহস্য বলে গেল কানে-কানে। রাণী রাসমণির বাগান দেখে পুরানো দিনের কত উজ্জ্বল স্মৃতি ভেসে উঠল মনের পটে, যার কথা কেউ জানে না।*

'মা মা ! বজ্রযোগিনীর শক্তি আমায় দাও, ভাষায় দাও পরাবাণীর মন্ত্রবীর্য, কণ্ঠে জাগুক মন্ত্র-নির্ঘোষ······'

মিস ম্যাকলয়েডকে লেখেন, "আমার জন্য মায়ের কাছে এ সব চাও। এখনও যে গুরুর বহু কাজ আমায় করতে হবে।'

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী।

* ১৯০৪ সনের ৪ঠা আগষ্টের চিঠি হতে।

ধূমপান

ভাল না মন্দ?

বারিদবরণ ঘোষ ও অনুতোষ চট্টোপাধ্যায়
(ছাত্র : আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ)

ব্রিটেন ও অ্যামেরিকায় কিছু দিন থেকে অতিরিক্ত ধূমপানের ফলাফল নির্ণয় করার জন্য বেশ সাড়া পড়েছে। বলা বাহুল্য যে, ধূমপানের সহজলভ্য উপাদান সিগারেট সম্পর্কেই এই গবেষণা। ধূমপানের কুফল কিছু আছে কিনা এবং যদি কিছু থাকে তবে সেগুলো শরীরের পক্ষে কি কি কারণে হানিকর ও কতটা হানিকর, এই সম্পর্কে আমাদের দেশে এখনও বিশেষ কোনো পর্যালোচনা হয়নি। অনুসন্ধানের প্রথম এবং প্রধানতম অন্তরায় আমাদের দেশে ধূমপানের প্রকরণ হিসেবে প্রচলিত বিবিধ বস্তু। এই সব বিভিন্ন প্রকরণ ব্যবহারের ফলাফল আলাদা ভাবে নির্দ্ধারণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। আর তা ছাড়া আমাদের দেশে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা এত প্রচুর যে, ধূমপান সম্পর্কে অচিরেই কোনো গবেষণা বা অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়।

পাশ্চাত্ত্যে ধূমপানের জনপ্রিয় উপকরণ হচ্ছে সিগারেট। আমাদের দেশেও ধূমপায়ীদের একটি বিরাট অংশ সিগারেটই খান। এই কথা বিবেচনা করে পাশ্চাত্ত্যের অনুসন্ধানকারীরা সিগারেট খাওয়ার ফলে যে সব বিভিন্ন রোগাবস্থার উৎপত্তি হয় বলে সন্দেহ করেছেন, সেই সম্পর্কে যাঁরা সিগারেট খান, তাঁদের কিছুটা অবহিত হওয়া দরকার। প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, ধূমপানের নেশা দৈনন্দিন জীবনের জন্য এমন কিছু একটা অপরিহার্য সখ বা নেশা নয়। তবু যাঁরা সিগারেট খেতে অভ্যস্ত, তাঁরা কেউ খান সখ করে, আর কেউ বা বেশ নেশা করে। সখ করে যাঁরা মাঝে মাঝে সিগারেট খেয়ে থাকেন তাঁদের সিগারেট খাওয়া সম্পর্কে বিশেষ আসক্তি নেই, নিরাসক্তিও নেই। কিন্তু যাঁরা নেশা হিসেবে সিগারেট খাওয়া সুরু করেছেন, তাঁদের পক্ষে সিগারেট একান্তই অপরিহার্য।

সুতরাং নেশা হিসেবে যাঁরা সিগারেট অনেক দিন থেকে খাচ্ছেন তাঁদের মত লোকদের নিয়েই পাশ্চাত্ত্যের অনুসন্ধানকারী বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকেরা যে সব কুফল ঘটার ইংগিত দিয়েছেন সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো। তবে নেশার মাত্রার ওপর এ ক্ষেত্রে গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। নেশা আছে অথচ গোটা দিনে এমন কিছু বেশী সিগারেট খান না এমন লোক বিরল নয়, আবার নেশার মাত্রার কথা শুনিয়ে তাক্ লাগাতে ওস্তাদ এমন লোকের কথা তো প্রায়ই শোনা যায়। সিগারেট খাওয়ায় শরীরের ওপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মূলে সিগারেটের 'কোয়ালিটি' অনেকটা নির্ভর করে এ কথা কেউ অস্বীকার করেন না। আবার বাজারে প্রচলিত সিগারেটের 'ব্রেণ্ড'এর পার্থক্য অনেক ধূমপায়ীদের প্রভাবান্বিত করে। সিগারেট খাওয়ার কুফল নিয়ে পাশ্চাত্ত্যে যে সমস্যার কথা উঠেছে, এ সব কথাগুলো পর্যালোচনা করলে, আমরা আলোচ্য সমস্যা থেকে ক্রমশঃই দূরে সরে যাব। মোটের ওপর অতিরিক্ত সিগারেট খাওয়ার নেশা যে খারাপ এ কথা সবাই বলেন, তা সে উৎকৃষ্ট সিগারেট অথবা নিকৃষ্ট ধরণের সিগারেট যাই হোক না কেন।

অতিরিক্ত সিগারেট খাওয়ার মারাত্মক কুফল হচ্ছে ক্যান্সারের সম্ভাবনা। বিজ্ঞানীরা মনে করেন ক্যান্সার ধূমপানের সুদূরপ্রসারী অন্যতম কুফল। ক্যান্সার ও ধূমপানের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যের পর্যালোচনার ফলাফল নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু এই সম্পর্কে আরও কিছু বলার আগে অতিরিক্ত সিগারেট সেবনে অন্যান্য যে সব আধি-ব্যাধি হতে পারে, সেগুলো আগে বলা দরকার। দেখা গেছে যাঁরা অতিরিক্ত ধূমপান করেন তাঁদের ঠোঁট ও জিব সব সময়েই তাপ ও ঘর্ষণের প্রভাবে খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ভবিষ্যৎ ক্যান্সারের আবির্ভাবের জন্য অপরোক্ষ ভাবে খানিকটা সাহায্য করে থাকে। এ ছাড়া খাদ্যনালীর ওপরের অংশে প্রদাহ, খুশ্‌খুশে কাশি বা ফ্যারিনজাইটিসএর আশংকা সব সময়েই আছে। ফ্যারিনজাইটিস অতিরিক্ত ধূমপায়ীদের প্রায় সকলের থাকে। অম্লাধিক্য রোগে যাঁরা ভোগেন, তাঁদের যদি ধূমপানের অভ্যাস থাকে, তবে তাঁদের অধিকতর অম্লক্ষরণে ধূমপান আরও বেশী সাহায্য করে। এবং এই কারণেই ধূমপায়ীদের মধ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্রে সুপরিচিত পেপটিক আলসার (পাকাশয় বা খাদ্যনালীর ডিওডিনাম অংশের ক্ষত) রোগটির উৎপত্তি ঘটায়। এই রোগটি সংঘটনে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিভিন্ন মতামত থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত ধূমপান অন্যতম কারণ বলে স্বীকৃত হয়েছে। পেপটিক আলসার ছাড়া আর একটি সাংঘাতিক রোগ যে অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে শরীরকে কাবু করে, সেটি হচ্ছে বার্জার রোগ। এই রোগে রক্তবাহী শিরার ক্ষতিতে শরীরের যে অংশে রক্তচলাচল ব্যাহত হয়, পচনক্রিয়ার সাহায্যে সেই অংশটি দেহের মূল অংশ থেকে বিচ্যুত হয়। সাধারণতঃ পায়ের আঙ্গুলে কিংবা হাতের আঙ্গুলে এই রোগটির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বার্জার রোগটি যে অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে হতে পারে, এটা একটা অনুমান ও পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে স্বীকৃত হয়েছে। বার্জারগ্রস্ত রোগীদের অধিকাংশেরই অতিরিক্ত ধূমপানের নেশা থাকে। এ ছাড়া কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন অ্যালার্জি বা অতি-সচেতনতার অবস্থা এই ধূমপানেরই অন্য একটি কুফল। সিগারেটে তামাকপাতার নিকোটিন নামে রাসায়নিক বস্তুটি ধূমপানের সময় শরীরে ও মনে উত্তেজনার ভাব বাড়ালেও, পরে খানিকটা অবসাদ আনে। অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে উপরিলিখিত রোগগুলির উৎপত্তি হতে পারে; কিন্তু একমাত্র সিগারেট-সেবনেই এর উৎপত্তি হয় না কারণ এই রোগ সম্পর্কে অন্যান্য আরও কারণ আছে। ঠিক এই জন্য অনেকে মনে করেন না যে, অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে নিউমোনিয়া, হাঁপানী, যক্ষ্মা বা করোনারী থ্রমবোসিস হতে পারে। এই সব রোগের সম্ভাবনা অতিরিক্ত সিগারেট খেলে হয়, এ সম্বন্ধে সবাই নিশ্চিন্ত নন। কিন্তু

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা যে-রোগটির সম্ভাবনা মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে পারেননি, সেটি হচ্ছে ক্যান্সার। ক্যান্সারের মত সাংঘাতিক রোগ অতি প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রয়োগে সেরে যায়। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সার হয়েছে কিনা নির্ণয় করা সব ক্ষেত্রেই চিকিৎসকদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ ক্যান্সারের আদি অবস্থায় উপসর্গ বলতে কিছুই থাকে না। আর তা ছাড়া ক্যান্সারের উৎপত্তি এত বিভিন্ন কারণ থেকে হতে পারে যে, বিজ্ঞানীরা কিছু দিন থেকে সন্দেহ করছেন যে জিবের ও ফুসফুসের ক্যান্সার হওয়ার মূলে হয়ত অতিরিক্ত ধূমপান দায়ী।

গত তিন বছর বৃটেনে ধূমপান সম্পর্কে যে অনুসন্ধান করা হয়েছে তার কার্যপদ্ধতি অনেকটা লণ্ডনের শিল্পাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। অনুসন্ধানকারীরা দেখেছেন যে যাঁরা শিল্পাঞ্চলে থাকেন, যাঁদের বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে চৌষট্টির মধ্যে এবং যাঁরা অতিরিক্ত ধূমপান করেন, তাঁদেরই ফুসফুসের ক্যান্সার সবচেয়ে সহজে হয়। বৃটেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মিঃ আয়ান ম্যাকলিয়ড এই তথ্যটি সম্প্রতি পেশ করেছেন ক্যান্সার ও রেডিয়াম চিকিৎসা কমিটীর মতামতের ওপর ভিত্তি করে। ব্রিটিশ অনুসন্ধানকারীদের সভাপতি স্যার আর্নেষ্ট রক কার্লিং-এর মতও উপরিলিখিত মন্তব্যের অনুরূপ। কিন্তু অ্যামেরিকার সিগারেট-ব্যবসায়ীরা এই মন্তব্যকে সহজে নিতে পারেননি। তাঁরা জোর গলায় বলছেন যে, ক্যান্সারের জন্য ধূমপান মোটেই দায়ী নয়। এমন কি এই সম্পর্কে আরও গবেষণা চালাবার জন্যে তাঁরা বিশেষ অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমেরিকান ব্যবসায়ীদের এই মনোভাবের পরেও বৃটেনের গবেষণাকারীগণ মনে করেন যে, গত চল্লিশ বছরে যে হারে ক্যান্সার রোগের বৃদ্ধি পেয়েছে, এর মূলে ধূমপান নিশ্চয়ই অনেকটা দায়ী। পরিসংখ্যানের তথ্য থেকে জানা গেছে যে, এক বছরে ক্যান্সারে আক্রান্ত চোদ্দ হাজার রোগীর মধ্যে ধূমপায়ী নন এমন রোগী মাত্র দু'হাজারের মত। সুতরাং তাঁদের এ আশংকা একেবারে অমূলক নয়। এই চল্লিশ বছরে বৃটেনে ধূমপায়ীদের সংখ্যা তো অনেক বেড়েছেই, উপরন্তু অনেকে অল্প বয়স থেকে ধূমপানে অভ্যস্ত হয়েছেন। তবে এত সন্দেহের নিরসন একটি তথ্যের ওপরেই সম্ভব—এ পর্যন্ত কোনো গবেষণাকারী সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে এমন কোনো বস্তু আবিষ্কার করতে পারেননি যার দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রমাণ করা যায় যে, ক্যান্সার সত্যিই ধূমপানের ফলে হতে পারে। সুতরাং যাঁরা ধূমপান করেন তাঁদের অনেককেই এই তথ্যটি সান্ত্বনা দেবে। তাই সবশেষে বলা ভাল যে, ক্যান্সার রোগটি রোজ পঞ্চাশটির বেশী সিগারেট খেলে হতে পারে। আমাদের দেশে এত বেশী সিগারেটপায়ী নিশ্চয়ই খুব কম আছেন।

সিগারেটের ধোঁয়া অতিরিক্ত গলাধঃকরণে যাতে বিশেষ ক্ষতি না হয় তার জন্য ইদানীং 'ফিলটার টিপ' সিগারেটের প্রচলন কিছুটা বেড়েছে। এতে ধোঁয়ায় মেশানো নিকোটিন সিগারেটের মধ্যে অনেকটা আটক পড়ে। অবশ্য যাঁরা পাইপ ব্যবহার করেন, তাঁদের নিকোটিন নিয়ে বিশেষ অসুবিধা সহ্য করতে হয় না। ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হতে হলে যত সিগারেট খাওয়া দরকার, আমাদের দেশে তত সিগারেট সাধারণতঃ অনেকেই খান না। এটা খুবই ভাল কথা। তবু বৃটেনে এ সম্বন্ধে সবাই নিশ্চিন্ত নন বলে সেখানে আরও ব্যাপকতর গবেষণা করার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। পরস্পরবিরোধী মতামতের দোটানায় পড়ে মাত্র গত মাসে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এই বলে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন যে, অতিরিক্ত ধূমপান ক্যান্সারের একমাত্র কারণ বলে ধরে নেওয়া সম্ভব নয়। এখন ধূমপানের সংগে ক্যান্সারের সম্ভাবনা মূলতঃ মোট কত তামাক ব্যবহৃত হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করছে।

এ তো গেল ধূমপানের কুফল সম্বন্ধে মোটামুটি অভিমত। কিন্তু যাঁরা ধূমপানে অভ্যস্ত তাঁরা সিগারেট ভাল লাগার জন্যে কোনো সঙ্গত কারণ দেখাতে পারেন না। তাঁরা বলেন ভাল লাগে বলেই সিগারেট খান, এর পেছনে কোনো কারণ থাকুক আর নাই থাকুক। তবে ধূমপানের মনস্তাত্ত্বিক মূল্য কিছু আছে বই কি! আসলে ধূমপান করলে মেজাজটা বেশ ভাল থাকে। এই মনে হচ্ছে কিছু ভাল লাগছে না, কিছু করবার নেই, নিশ্চিন্ত মনে একটি সিগারেট ধরিয়ে ফেলুন, দেখবেন মেজাজটা বেশ ফুরফুরে হয়ে গেল। হয়ত কোনো কাজে মন সন্নিবেশিত করতে পারছেন না ঠিক মত, একটি সিগারেট এই ক্ষেত্রে মনকে অনেকটা কেন্দ্রীভূত করবে। সুতরাং যাঁরা সিগারেট খান, তাঁরা আপাততঃ মিনিট দশেকের জন্য ধূমপান করে আরাম বোধ করুন, কোনো ভয়-ভাবনার দরকার নেই। এদিকে পাশ্চাত্ত্যে গবেষণা চলতে থাকুক যত দিন না ধূমপানের নিশ্চিত কুফল জানা না যাচ্ছে।

বিজ্ঞাপন দিন, আরও বিজ্ঞাপন দিন

আশীষ বসু

[বাঙলা দেশের প্রচার-শিল্প আজ পৃথিবীতে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। ষ্টুডিও পাবলিকেশনস্ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশক) কর্তৃক প্রতি বছরে প্রকাশিত প্রতি বছরের শ্রেষ্ঠতম প্রচার-শিল্পের সচিত্র সংগ্রহে বাঙলা তথা ভারতবর্ষের বিশিষ্টতম প্রচারের নিদর্শন পর্য্যন্ত সসম্মানে প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। বাঙলা দেশের প্রচার-শিল্পের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই শিল্পের পুরাবৃত্ত পড়তে পড়তে বালখিল্যের দল হাসাহাসি করলেও প্রথম প্রচার-শিল্প হিসাবে সেগুলি আদপেই নগণ্য নয়। এই রচনায় বিজ্ঞাপনের পুরাবৃত্ত আলোচিত হয়েছে তথ্য সমেত।—স]

মনে করুন, আপনার কোন বান্ধবীর বিয়ে। অবশ্যই আপনাকে কিছু উপহার হাতে করে নিয়ে যেতে হবে। অনেক ভেবে চিন্তে আপনি ঠিক করলেন কোন একটা দামী ফাউন্টেন-পেন দিলে সব দিক থেকেই বেশ ভাল হয়। সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনে পড়লো দু'টি বিশ্ববিখ্যাত কলমের নাম। পার্কার আর শেফার্স। কী দেবেন আপনি? পার্কার গোল্ডক্যাপ না শেফার্স লাইফটাইম? দোকানেও গেলেন। পাশাপাশি দু' সেট কলম সাজিয়ে রেখে দেখালেনও। তবু বুঝতে পারছেন না। শেষ পর্য্যন্ত আর বেশী সাত-পাঁচ না ভেবে একটি গোল্ডক্যাপই কিনে ফেললেন আপনি। সঙ্গে সঙ্গে শীকার হয়ে গেলেন আপনি ওয়ালটার টমসন্ নামক বিখ্যাত বিজ্ঞাপন এজেন্টের। বিজ্ঞাপনের যুদ্ধে আপনার ক্ষেত্রে অন্ততঃ হেরে গেল ডি. জে. কীমার্, শেফার্স কলম কোম্পানীর এজেন্ট। কিন্তু ব্যাপারটা কি এতই সোজা? আপনার পার্কার কলম কেনার পেছনে সবটুকু কৃতিত্বই কি ওয়ালটার টমসনের, শেফার্স না কেনার পিছনে কি সবটুকু দায়িত্বই ডি. জে. কীমারের? মোটেই না। বিজ্ঞাপন এতো সহজ বস্তু নয়। সেলস প্রমোসনের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ দিনের বিসার্চ, মার্কেট ষ্টাডি, এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট কপি লেখার কৃতিত্ব, মিডিয়া, আইডিয়া, ডিসপ্লে এবং সবচেয়ে বোধ হয় বেশী জিনিসের প্রয়োজন আর্ট ওয়ার্ক। উন্নততর ড্রইং, ফোটোগ্রাফী, অরিজিন্যালিটি ভাল বিজ্ঞাপনের জন্য অবশ্য প্রয়োজন। ধীরে ধীরে সে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো। এখন শুনুন কিছু পুরোনো বিজ্ঞাপনের কথা।

ইতিহাস

বিজ্ঞাপন-স্পৃহা মানুষের সহজাত। মানুষ জামা-কাপড় পরে, অলঙ্কার গড়ায়, কথা বলে, ছবি আঁকে, লেখে, গান গায়, সব কিছুর মূলেই রয়েছে বিজ্ঞাপন। কিন্তু যে-বিজ্ঞাপনের কথা আজ বলতে বসেছি সে-বিজ্ঞাপনের একমাত্র উদ্দেশ্য সেলস প্রমোসন্। বিজ্ঞাপন কতখানি কাজ করেছে কোন কোম্পানীর ষ্ট্যাটিসটিক্স দেখলেই তার সবচেয়ে বড় পরিচয় পাওয়া যাবে। সে যাই হোক, বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রাচীন কায়দাগুলি সত্যি ভারী মজার। সেকালে বেশীর ভাগই ছিল মেলা, যেখান থেকে বিজ্ঞাপিত হোত আপনার দ্রব্যের গুণাগুণ। এ সম্পর্কে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা লিখছেন, 'In England during the 3rd Century, Stourbridge Fair attracted traders from abroad as well as from all parts of England, and it may be conjectured the crying of wares before the booths on the banks of the Stour was the first form of advertisement which had any marked effect on English Commerce.

এ তো গেল অনেক অনেক দিন আগের কথা। জন গুটেনবার্গ তখনো টাইপ আবিষ্কার করেননি। ষ্ট্যানহোপ আবিষ্কার করেননি লোহার মুদ্রাযন্ত্র। বিজ্ঞাপনের আসল যে মিডিয়াম সেই সংবাদপত্রই তখনো আসেনি। সংবাদপত্রে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন প্রথম যা বেরিয়েছিল তা হোল ১৬৪৭ সালের এপ্রিল মাসে বইয়ের বিজ্ঞাপন Every Daie Journal এর ত্রয়োদশ সংখ্যায়। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ—

A book applauded by the clergy of England called, 'The divine right of Church Government', collected by Sundry Ministers with a brief reply to certain queries againest the ministry of England. Printed and Published by Joseph Hanscot and George Calvert.

এ তো গেল দৈনিক কাগজের বিজ্ঞাপনের কথা। সাপ্তাহিক কাগজে প্রথম যে ইংরাজী বিজ্ঞাপন ছাপা হয় তাও পুস্তক-সংক্রান্ত। Mercurius Elencticus নামক সাপ্তাহিকে ১৬৪৮ সালের ২৩া অক্টোবর ৪৫তম সংখ্যায় যে বিজ্ঞাপনটি বেরোয় তা এইরূপ,—

The reader is desired to persue a sermon entitled, 'A looking-glasse for Levellers.' preached at St. Peters. Paules wharf on sunday sept 24th 1648 by Paul knell Mr. of Arts.

এ যাবৎ আমরা দেখছি বিজ্ঞাপন যা প্রথম দিকে প্রকাশিত হোত তা অধিকাংশই পুস্তক-সংক্রান্ত। পুস্তক ভিন্ন অন্য দ্রব্যাদির বিজ্ঞাপন হিসাবে প্রথম যে বিজ্ঞাপন পাচ্ছি তা হোল চায়ের বিজ্ঞাপন। উপরোক্ত সাপ্তাহিকটিতেই ৪৩৫তম সংখ্যায় ১৬৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এ বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়—

That excellent and by all physitians approved China drink, called by them Tcha, by other

nations Tay, alias Tee, is sold at the sultaneso head, a cophee house in sweetings rents, by the Royal Exchange, London.

তারপর ক্রমশঃ বিজ্ঞাপনে ছেয়ে গেছে পৃথিবী। বেলুন, হোর্ডিং, স্কাই সাইন্‌স, ফ্ল্যাস-লাইটস্, পোষ্টার, প্ল্যাকার্ড, এ্যাডভার্টাইজিং ভ্যান আর শো-কার্ডে ছেয়ে গেছে দেশ। ১৮৪০ সালে ইংল্যাণ্ডের পেনী পোষ্টেজ ও ১৮৫৫ সালের হাফ-পেনী পোষ্টেজ সিষ্টেম্ বিজ্ঞাপনের জন্য সার্কুলার-প্রথাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। আমেরিকার ত্ব' সেণ্ট ব্যয়ের সাধারণ ডাক এ কাজে অনেকখানি সাহায্য করেছে।

কিন্তু এ গেল বিদেশের কথা। দেশী বিজ্ঞাপনের কথা কিছু বলা যাক এবার।

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পন' যা শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রকাশিত হোত, তার ২৭শে জুন, ১৮১৮ সালের (১৪ই আষাঢ়, ১২২৫) সংখ্যায় দেখছি লবণ বিক্রয়ের জন্য কোম্পানীর বিজ্ঞাপন :

লবণ বিক্রয়

১৭ই জুলাই তারিখ কোম্পানীর লবণের
দপ্তরখানাতে বার লক্ষ মন লবণ নিলামে
বিক্রয় হবেক যাবৎ শেষ না হয় তাবৎ
দিন নিলাম থাকিবেক বিরাশী সিক্কা
ওজনে এক ২ লাঠ এক হাজার মন করিয়া
বিক্রয় হবেক বায়না এক টাকা লাগিবেক।

এ অনেকটা নীলামের নোটিশ। ঠিক বিজ্ঞাপন নয়। প্রায় এই রকমই আর একটি কোম্পানীর কাগজ বিক্রয়ের নোটিশ প্রায়ই থাকতো 'সমাচার দর্পনে'।

কোম্পানীর কাগজ

১লা জুলাই বুধবার শন ১৮১৮ শাল।
কোম্পানীর শতকরা ছয়টাকার শুদের
কাগজ খরিদ করিতে হইলে শতকরা
ছয়টাকা ডিষকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে
হইলে শতকরা ছয়টাকা আট আনা·
ডিষকৌণ্ট। (শনিবার। ৪ঠা জুলাই সন ১৮১৮।)

অন্য একটি,

কোম্পানীর ইস্তাহার।—

৮ জুলাইতে সাড়ে দশ ঘণ্টার সময়
কোম্পানীর রপ্তগুদামে পুরানো কিল্লাতে
দুইশতমণ জায়ফল পহেলারকম ও
জৈত্রী একশতমণ পহেলারকম বিক্রয়
হইবেক।

২৫শে জুলাই ১৮১৮ সালে চমৎকার একটি বইয়ের বিজ্ঞাপন পাচ্ছি :

শ্রীপিতাম্বর শর্ম্মণঃ।

এতদ্দেশীয় অনেক ২ বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অপাঠ হেতু পত্রাদি লিখন কালীন শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচন করিয়া লিখিতে অক্ষম এ কারণ এ অকিঞ্চণ ভগবান অমরসিংহকৃত অভিধান অকারাদি ক্রমে অর্থাৎ ইংরেজী ডেক্সিয়ান নারীর ন্যায় ভাষায় বিবরিয়া দন্ত্য ওষ্ঠাবকারের প্রভেদ করিয়া মেদিনী বভসাদি নানা অভিধানের অনেক অর্থ দিয়া নানার্থ স্বরূপ ৪১২ পৃষ্ঠ এক গ্রন্থ কেতাব করিয়া উত্তম অক্ষরে ছাপাইয়াছে তাহার চারিশত বিক্রয় হইয়াছে শেষ একশত আছে ছয় তঙ্কা মূল্যে যাহার লইবার বাঞ্ছা হয় তবে কোং কলিকাতার শ্রীযুত দেওয়াণ রামমোহন রায় মহাশয়ের সোসায়িটী অর্থাৎ আত্মীয় সভাতে চেষ্টা করিলে পাইবেন নিবেদনমিতি।

৮ই আগষ্ট, ১৮১৮ সালে একটি মজার চাকুরীখালির বিজ্ঞাপন পেয়েছি :

কালেজের ইস্তাহার

আগামি শনিবার ১৫ আগস্ত কলিকাতার কলেজের ইস্তাহাম হইবেক যাহারা এই ইস্তাহামের পর কলেজ হইতে বাহির হইবে তাহারা সেই সময়ের ধারানুসারে পারসী ও বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে পরস্পর বিচার করিবে। এবং সে সময়ে কোম্পানীর চাকরেরা ও তাবং পণ্ডিত ও মৌলবি প্রভৃতি সকলে শ্রীশ্রীযুতের নিকটে একত্র হইবে ঐ বিচারে যে ব্যক্তি ভালরূপে জানা যাইবে তাহারা উপযুক্ত সময়ে উত্তম কর্ম্ম পাইবে।

'সমাচার দর্পন' ইত্যাদি প্রথম আমলের বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপনের রেট কিরকম ছিল তা' জানতে নিশ্চয় আপনার খুবই ভাল লাগবে :

সমাচার দেওয়া যাইতেছে।

যদি কোন ব্যক্তি এই 'সমাচার দর্পনে' কোন ইস্তাহার ছাপাইতে চাহেন তবে শুক্রবারের পূর্বে পাঠাইলে শনিবারে সমাচার দর্পনে ছাপান যাইবে এবং তাহার মূল্য এক পংক্তি চারি আনার হিসাবে হইবেক।

তৎকালীন ইংরাজী কাগজ যা এ দেশ থেকে প্রকাশিত হোত তার রেটও ছিল এমনি এবং তাতে বিজ্ঞাপনেরও এমন কিছু বাহাদুরী ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে 'ফেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র বিজ্ঞাপনের রেট দেখা যাক :

Advertisement Rates :—

		Rs.	As.
First three insertions, per line	..	0	4
Repetitions above three times, ditto	..	0	3
Ditto above 6 times, ditto	..	0	2
Column, first insertion	..	30	0
Ditto, Second ditto	..	15	0
Ditto, Third and oftener ditto	..	10	0

'ফেণ্ড অফ ইণ্ডিয়ার' Vol II No 60তে একটি নীলাম-নোটিশ দিচ্ছেন চন্দননগরের এক ইংরাজ কুঠিয়াল :

Native Shikare, Dealers in objects of Natural History and others are informed that any curious Birds, Feathers, Aigrettes or any fancy articles of similar description, suitable for Ladies dress will be liberally valued and

paid for in cash by Mr Philbert Perrot, at Chandernagore.

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার' পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটি অদ্ভুত বিজ্ঞাপন চোখে পড়লো :

TO PARENTS AND GUARDIANS

Mr and Mrs Mack intend to Visit England early in the ensuing cold season, and will be happy to take charge of a few children, who will receive every attention during the Voyage and be conducted to their friends in any part of England or Scotland

বইয়ের বিজ্ঞাপন রয়েছে প্রায় সব সংখ্যাতেই। খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় বইয়ের বিজ্ঞাপনে আজও যেমন ফোর লাইন পাইকা থেকে বর্জ্জাইস সব ক'টি টাইপের অসদ্ব্যবহার হয় সেকালেও তাই হোত।

Just Published from the Serampore Press
The
History of India
From
Remote antiquity to the Accession of the
Mogul dynasty
compiled for the use of schools
BY
JOHN. C. MARSHMAN.
Price Eighteen Annas.

মাসিক বসুমতীর পাতা উল্টে দেখুন বইয়ের বিজ্ঞাপনের সে চাল এখনো ফেরেনি। আজও সেই টাইপের রকমারী বাহার আছে কিন্তু অভিনবত্ব নেই কোথাও। মার্শম্যানের ইতিহাস আর মাসিক বসুমতীর ১৩৬১ সালের যে কোন মাসে প্রকাশিত কোন বিখ্যাত পুস্তকালয়ের বিজ্ঞাপনের মধ্যে বিশেষ কিছু তফাৎ আপনি প্রায়ই করতে পারবেন না।

বিজ্ঞাপন এক অদ্ভুত নেশা। আপনি জিনিষ কিনবেন না। তবু আপনাকে জিনিষ কেনাতে হবে। তার জন্যে বিজ্ঞাপনওয়ালারা ছেয়ে ফেলেছেন সংবাদপত্র, বাড়ীর দেওয়াল, সিনেমার পর্দা, নীল আকাশ, খালীগাড়ীর মাথা, আরও কত কি! কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা, মৃত্যুতে যে জীবনের পরিসমাপ্তি সেই মৃতের স্থান কবরখানাতেও বিজ্ঞাপন দিতে মানুষের আটকায়নি Surrey এর Godalming Churchyard এ জনৈক ভদ্রব্যক্তির কবরের উপরে একটি টেবলেট পুঁতে দিয়ে গিয়েছে :

Sacred
To the memory of
Nathaniel Godbold Esq
Inventor and Proprietor
of that Excellent medicine
The Vegetable Balsam
For the Cure of Consumptions and Asthmas
He departed this life
The 17th day of Decr 1799.
Aged 69 yrs.

চিন্তান্বিতা —শীতাংশু ভট্টাচার্য্য অঙ্কিত

ভেরা পানোভা

দশম অধ্যায়

একটি বছর গত হোলো।

ডাক্তার বেলভ তাঁর ডায়েরীতে লিখলেন—"কি আশ্চর্য্যের বিষয়! আমাকে সম্মান-চিহ্ন দিয়ে অলঙ্কৃত করা হোলো অথচ 'দ'কে নয়!—অথচ আমি এই কয় বছরে কিছুই কৃতিত্ব দেখাইনি শুধু সাধারণ একটি ডাক্তারের কর্ত্তব্য করা ছাড়া—তাও সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক আর ত্রুটি তো পদে পদে (মনে আছে 'ল'এর শোচনীয় মৃত্যু)। অত্যন্ত বিশ্রী লাগছে। আমি 'দ'কে বলেছি, যা' ন্যায্য তা' ঘটাবার জন্যে আমি সব কিছু করতে রাজী। অথচ ও আমাকে সমানেই বোঝাতে চায় যে, আমি এই সম্মানের যোগ্য। অদ্ভুত বুদ্ধিমান, বিবেচক লোকটা। লক্ষ্য করছি ও যেন দিন দিন রোগা হোয়ে যাচ্ছে। সারাক্ষণ কি পরিশ্রমই না করে—সমস্ত ব্যবস্থা করা, প্রত্যেকটি কর্ম্মীকে উৎসাহ দেওয়া, কাজে প্রেরণা জাগানো—সত্যি ওর এই উদ্যম দেখে নিজের আলস্যের জন্যে আমার নিজেরই লজ্জা হয়। 'স' কিন্তু বেশ মোটা হয়েছে। একটু ভুঁড়িও দেখা দিয়েছে ওর। একটু দমে গেছে ওর উল্লেখ হয়নি বলে। অবশ্য আমার যেটুকু সম্মান প্রাপ্য ওরও ততটুকুই প্রাপ্য। ও আমাকে বলেছিলো—'জানলে ডাক্তার, আমার প্রবন্ধটার জন্যেই আমরা এত শীগগির সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।' তা' সত্যি, তাকে মনে করিয়ে দিলাম সৈন্য বিভাগীয় চিকিৎসক সম্মেলনে ওর বক্তৃতাটা খুব সময়োপযোগী হয়েছিলো, তারও একটা ফল আছে তো? বক্তৃতা শুনে কর্ণেল ডাবাঙ্কভ, কেন্দ্রের প্রধান যিনি, এসে আমাদের সঙ্গে করমর্দ্দন করলেন। তাছাড়া আমাদের সংগঠনের এত যে উন্নতি হোয়েছে তার সমস্ত রিপোর্ট ওঁকে দিতে বললেন, সেইগুলি উনি মস্কো নিয়ে গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রধান চিকিৎসা বিভাগে দেবেন। কিন্তু সারাক্ষণ আমি কিছুতেই লক্ষ্য না করে পারিনি 'স'এর বক্তৃতা কি প্রবন্ধের কোথাও 'দ'এর উল্লেখ না করে 'আমরা', 'আমরা' বলে চালানো। আমি একবার বলেওছিলাম, কিন্তু ও উত্তর দিলে যে, 'এক জনের কাজ মানেই সমস্ত সংগঠনের কাজ। যেখানে আমরা যৌথ ভাবে কাজ করি, সেখানে এক জনের বিষয় নাম দিয়ে উল্লেখ করা মোটেই ঠিক হবে না'···আমি 'স'এর এই ভুল শোধরাবার চেষ্টা করেছিলাম, সম্মেলনে বলতে চেয়েছিলাম যে কার প্রেরণায়, কার অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাদের এই উন্নতি সম্ভব হোলো। কিন্তু লেখার চেয়ে আমার বলা শতগুণে খারাপ। কিন্তু তবু আমি 'দ'এর সম্বন্ধে রিপোর্ট একটা লিখে কর্ণেলকে দিয়েছিলাম। কারণ 'স'এর এই ইচ্ছে করে 'দ'কে ছেঁটে ফেলাটা কোনো মতেই আমি বরদাস্ত করতে পারছিলাম না।"

ডায়েরী লেখার মোটা খাতাটা প্রায় ভরে এসেছিলো—ডায়েরী লেখার নেশাটা ডাক্তারের আবার বেড়েছিলো। সাশা খুড়োর মত ডাক্তারও সারাক্ষণ কোনো না কোনো কিছু করতে ভালোবাসতেন। না হলেই ভিতরের কি একটা অদম্য অনুভূতি, একখানি অস্পষ্ট ছবিও জাগতো মাঝে মাঝে—সেখানি ছেলের। কিন্তু আজ অবধি কোনো চিঠি কোনো খবরই তার মেলেনি—কে জানে সে আছে না হত হোয়েছে? অনেকের কথামত ডাক্তার কিছু খোঁজ-খবরও নেবার চেষ্টাও করেছেন কিন্তু কোনো খবরই আসেনি।

ডাক্তারের ডায়েরী আবার ভরে উঠে—"উক্রেনের শত্রু-কবল থেকে মুক্ত এলাকার মধ্য দিয়ে আমাদের ট্রেনটা চলেছে। জার্মানদের হটিয়ে দেওয়া হোয়েছে, বোমার ভয় নেই বললেই চলে। কিন্তু এখনও আমাদের চোখে অভ্যস্ত হোয়ে উঠেনি পরিত্যক্ত, ভস্মীভূত গ্রামগুলির উপর নিষ্ঠুর বর্ব্বর অত্যাচারের অমানুষিক বীভৎসতা। ···আমি অবশ্য বলতে চাই না যে, এত মৃত্যু দেখে আমার শোক সহনীয় হোয়ে উঠেছে, কিম্বা আমি একটু সান্ত্বনা পাচ্ছি··· ষ্টেশনগুলো তো একেবারে ধ্বংসস্তূপ। কল, পাম্প কিছুই অবশিষ্ট নেই। তাই আমরাই বালতি করে কাছাকাছি কূয়ো, নদী থেকে জল এনে ভরছি ট্রেনের ভিতরের চৌবাচ্চা, জলের জায়গা ইত্যাদি। সবাই মিলেই জল তুলে আনছে—সবচেয়ে বড় পদস্থ কর্ম্মচারী থেকে সাধারণ কর্ম্মীরা অবধি। সত্যি, অবাক হোয়ে যাই আমাদের এই সহকর্ম্মী লোকগুলির অসীম উৎসাহ, ধৈর্য্য, কৌশল আর ক্ষমতা দেখে। ওদের দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই···ওদের দেখে হিংসে করি···ওদের দেখে ওদেরই মত হোতে চেষ্টা করি বার বার···"

* * * *

'হসপিটাল ট্রেন' খালিই যাচ্ছিল। 'কে' ষ্টেশনে এসে দিন পাঁচেকের জন্য থামলো। অনেক কিছু খুঁটিনাটি সারাতে হবে।

—"আমি ক'দিনের জন্যে একবার লেনিনগ্রাদ ঘুরে আসতে চাই"—ডাক্তার বললেন দানিলভকে।

—"কেন? তাতে কি হবে?" দানিলভ প্রশ্ন করে।

ডাক্তার মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। চুপ করে রইলেন এক মুহূর্ত, শেষে বললেন,—"মনে হচ্ছে যখন, একবার ঘুরেই আসি, তা'তে এখানে কাজের ক্ষতি হবে না তো?"

—"না' তা' হবে না। ইচ্ছে হচ্ছে যখন আপনি ঘুরে আসুন।"

দানিলভ একটা মালগাড়ীতে একটা ভালো জায়গার ব্যবস্থা করে দিলে ডাক্তারের জন্যে। গাড়ীটা নিরাশ্রয়দের নিয়ে লেনিনগ্রাদেই যাচ্ছিল। মালগাড়ীর প্রধান কনডাক্টরকে নীচু গলায় কিছু বলেও দিলে। সে তার বিছানাটি ডাক্তারের ব্যবহারের জন্যে এনে দিলে। ওয়াগনটা বেশ গরম, তাছাড়া একটা ষ্টোভও জ্বলছিলো। ডাক্তার টিনে-করা শূয়োরের মাংস নিয়েছিলেন সঙ্গে, সবাইকে দিলেন তাই থেকে। কিন্তু অন্যের বিছানাটা ব্যবহার করতে কিছুতেই মন উঠছিলো না। শেষে সবাই মিলে বাধ্য করলো। প্রধান কনডাক্টরের কথা থেকে বেশ বোঝা গেল যে, 'হসপিটাল ট্রেনের' কথা রেলওয়ে বিভাগে সবাই জানে। ও বললে, "কাগজে আপনাদের

সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ বেরিয়েছিল তাতে আপনাদের ট্রেনকে আদর্শ উদাহরণ বলা হোয়েছে···সর্ব্বদাই নিখুঁত পরিচ্ছন্ন, ট্রেনের বাইরেটা অবধি নিয়মিত ধোয়া-মোছায় নতুনের মত, কাচগুলো ঝক্‌ঝকে।

কিছুতেই ঘুম এলো না—হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও। নিজের অক্ষমতাটা এদের কথায় যেন আরও বেশী খোঁচালো। চেষ্টা করলেন একখানা উপন্যাস পড়তে···কিন্তু ভালোবাসার চিরন্তন দ্বন্দ্ব নিয়ে কাহিনী আজকের দিনে ভালো লাগবার কথা নয়···শেষে কন্‌ডাক্টর ওঁকে এক খণ্ড 'প্রাভদা' পত্রিকা এনে দিলো—সেদিনেরই কাগজটা। ডাক্তার একটি অক্ষরও বাদ না দিয়ে পড়ে চললেন, এমন কি সিনেমা, থিয়েটারের বিজ্ঞাপন শুদ্ধ। মস্কোর বলশয় থিয়েটারে হচ্ছে 'ইভান সুজানিন', আর্ট থিয়েটারে 'জার ফিয়োডর'···সবই হচ্ছে···একই ভাবে চলেছে প্রাত্যহিক জীবনধারা···ডাক্তার কেবল ভুলতে চাইলেন যে, তিনি চলেছেন—লেনিনগ্রাদ। এগিয়ে আসছে ক্রমেই লেনিনগ্রাদ ···কিন্তু কি আছে সেখানে আর?···কি দেখতে চলেছেন? কিছু না—সব কল্পনা···কল্পনার হাত থেকে আজও তাঁর মুক্তি হয়নি। লক্ষ বার কল্পনা করেছেন ডাক্তার—কল্পনায় এসেছেন লেনিনগ্রাদে। স্বপ্ন? হ্যাঁ, স্বপ্নেও এসেছেন, দেখেছেন···তাঁর সোনেচ্‌কা আর লায়লা···জীবন্ত, প্রাণচঞ্চলা। তেমনি অটুট রয়েছে বাড়ীটা,···হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে মা আর মেয়ে স্বাগত জানাতে তাঁকে······নাঃ, বৃদ্ধ হোয়ে পড়েছেন আলেকজাণ্ডার ইভানোভিচ, গুলিয়ে ফেলেন তাই সব। আবার স্বপ্ন দেখেছিলেন ঘর-বাড়ী কিছুই নেই, শুধু ভস্মস্তূপ—তার পাশে দাঁড়িয়ে সোনেচ্‌কা আর লায়লা তাঁকে বলছে বাড়ীর এই শেষ চিহ্ন ভস্মস্তূপে···

লেনিনগ্রাদে পৌঁছে ডাক্তার বাড়ী যাবেন পায়ে হেঁটে। পথে সেই মসজিদটা পড়বে। হ্যাঁ, ডাক্তার পায়ে হেঁটেই যাবেন। দূর থেকেই তো চোখে পড়বে বাড়ীর ধ্বংসস্তূপ। অন্য দিক থেকে দেখা যাবে ইগরকে। সামরিক পরিচ্ছদ-পরা, এগিয়ে আসবে একটু ঝুঁকে, অসম ভাবে পা ফেলে···না, না এখন নিশ্চয়ই সেনাদলে থেকে ওর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে—দৃঢ় পায়ে মাথা সোজা করে এগিয়ে আসবে··· আরও কাছে—আরও, আরও কাছে···'বাবা'—দুই বলিষ্ঠ বাহুতে ছেলে জড়িয়ে ধরবে ওঁকে—"বাবা তুমি! তোমার সামরিক পোষাকে যে তোমাকে চেনা যাচ্ছে না বাবা!"···দু'জনের চোখই অশ্রু-ভারাক্রান্ত হোয়ে উঠবে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে। কিম্বা হয়তো···অমন ব্যগ্র আলিঙ্গনে বাঁধতে আসবে না ইগর, হয়তো ওর চোখেও আসবে জল···"এই যে বাবা"—নীরস উক্তির সঙ্গে শুধু হাতটা বাড়িয়ে দেবে! ডাক্তার ভাবতে ভাবতে উদ্‌গত অশ্রু দমন করেন···গলার কাছে কি যেন ঠেলে উঠছে। হ্যাঁ, দু'জনে হয়তো পাশাপাশি দাঁড়াবেন সেই ধ্বংসস্তূপের পাশে—রাত্রি গভীর হোতে থাকবে। হয়তো ইগর বলবে, 'চলো এবার ফেরা যাক্।' দু'জনে উঠবেন কোনো প্রতিবেশীর বাড়ী রাতটা কাটাতে। হয়তো বৃদ্ধা পলিনা আলেক্সিয়েভ্‌না, সেই যাকে লিভারের অসুখে চিকিৎসা করেছিলেন সে দরজা খুলে অবাক হোয়ে চেঁচিয়ে উঠবে—"কি আশ্চর্য্য তুমি? আরে, কিছুক্ষণ আগে ইগরও তো এসেছে এখানে—ইগর, ও ইগর, শীগগির এসো এদিকে!"···না, না, তা কি করে হবে? ইগর তো তাঁরই সঙ্গে যাবে, দু'জন ইগর তো হোতে পারে না। কেমন যেন গুলিয়ে যায় চিন্তাধারা, এলোমেলো হোয়ে যায়। পলিনাও তো অবরোধের সময় না খেতে পেয়ে মারা গেছে। সুতরাং এ কল্পনা আজ শুধু সম্ভব অ[...] বাস্তবে নয়···

শেষকালে এক সময় ডাক্তার সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম যখন ভাঙ্গলো, তখন দেখলেন ট্রেনটা থেমে আছে। কন্‌ডাক্টর ভিতরে এসে জানালো, 'লেনিনগ্রাদ'।

* * * *

'কে' ষ্টেশনে ট্রেনটা পুরো পাঁচ দিনের জন্যে থেমে থাকবে—একঘেয়েমির হাত এড়াবার জন্যে দানিলভ কিছু কর্ম্মীকে বাইরে ঘুরে আসবার অনুমতি দিলে।

সেই দিনই 'হসপিটাল ট্রেনে'র উপর আরও একটি প্রবন্ধ খবরের কাগজে বেরোলো। দানিলভ পড়ে দেখলে সেই একই উচ্ছ্বাস আর সেই বিশেষ কয়েক জনকে বার বার উল্লেখ করা আর অন্যদের সম্বন্ধে একটি লাইনও নয়। মনে মনে হাসলো দানিলভ। প্রথম বারে প্রবন্ধটা এত ভালো করে পড়েনি—দ্বিতীয় বার পড়তে গিয়ে দেখলে আরও মজার আরও অদ্ভুত সব কথা লেখা আছে। 'ট্রেনে'র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ছিল না তা'তে যতটা ছিলো ডাক্তার সুপ্রাগভের নিজের সম্বন্ধে। ডাঃ সুপ্রাগভ এই বলেছেন, ডাঃ সুপ্রাগভ তাই করেছেন···ডাঃ সুপ্রাগভ দেখিয়েছেন···সুপ্রাগভ আর সুপ্রাগভ—সর্ব্বত্রই সুপ্রাগভ দেখাচ্ছে, শোনাচ্ছে, প্রেরণা দিচ্ছে··· উঃ, কি আশ্চর্য্য ধূর্ত শয়তান লোকটা! দানিলভ সোফায় লম্বা হোয়ে শুয়ে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলো। হাসির শব্দে জুলিয়া ঘরে ঢুকলো:

—"এ কি ব্যাপার? এত হাসছো যে?"

দানিলভ ওর হাতে কাগজটা তুলে দিলে।

—"এ তো পড়েছি আমি। এতে হাসির কি আছে? আমি তো কিছু দেখিনি এমন কিছু"—প্রবন্ধটা জুলিয়ার ভালো লেগেছে। লাগবারই কথা! সুপ্রাগভের নাম বার বার উল্লেখ করা হোয়েছে যে—গোপন তৃপ্তিতে জুলিয়ার মনটা ভরে ওঠে।

* * * *

লেনিনগ্রাদে পৌঁছলেও রাত্রি তখন গভীর। কন্‌ডাক্টর ডাঃ বেলভকে রাতটা ট্রেনেই কাটাতে অনুরোধ জানায়। ডাঃ বেলভ রাজী হন—নিঃশব্দে উঠে গিয়ে একটা বেঞ্চের ওপর চুপ করে বসে থাকেন। কন্‌ডাক্টর ষ্টোভটা ধরিয়ে চা তৈরী করে, ডাক্তারকেও দেয় এক পেয়ালা। একটা ছেলে হাতে দাবা খেলার বাক্স নিয়ে অনেকক্ষণ থেকে কন্‌ডাক্টরের পিছনে ঘুরছিলো আর খেলতে ডাকছিলো। প্রথমটা রাজী না হোলেও শেষ অবধি দু'জনে মিলে খানিকক্ষণ খেলবার পর ঘুমিয়ে পড়লো। সারা রাত কাটলো এমনি করে চুপ করে বসে—ভোর বেলা ওদের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ীর পথে চললেন ডাক্তার। নেভস্কি থেকে লিতেইনিতে বেঁকে পাষ্টেল ষ্ট্রীট ধরে চললেন, মিখেইলভ প্রাসাদ পার হোয়ে, মারসোভা, সুভোরভ মেমোরিয়াল, কেরভ ব্রিজ ছাড়িয়ে পেত্রো-গাদাস্কি, কত দিনের চেনা পথ—তাঁর দিবাস্বপ্নে কত বারই না এ পথে এসেছেন কল্পনার রথে! কিন্তু এখন দু'ধারের কোনো কিছুই ওঁর চোখে পড়ছিলো না—সেই মসজিদটাও পার হোয়ে গেলেন লক্ষ্য না করেই। বেলা বাড়তে লাগলো, বাড়ীর সামনে যখন এলেন তখন বেশ আলো। এই তো বাড়ী···ঠিক যেমনটি ছিলো কোথাও তো এতটুকু বদলায়নি! ওঃ-হো, মনে পড়ছে বটে,

শুনেছিলেন প্লাইউড দিয়ে এমন ভাবে ক্যামোফ্লেজ করা হোয়েছে যে, বাইরে থেকে ধ্বংসস্তূপের মর্মান্তিক দৃশ্য চোখেও পড়বে না। প্লাইউড-এর উপর এই বাড়ীটা এমন ভাবে রঙ দিয়ে আঁকা হোয়েছে যে, মনে হয় আসল। কিন্তু সত্যিই বাড়ীর কোনো চিহ্নই নেই সেখানে। ডাক্তার ভিতরে ঢুকতে পারলেন না। মাঝ-রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন ভালো করে বাড়ীটা দেখতে···কিন্তু হঠাৎ মনে হোলো যেন সমস্ত শরীর অবশ হোয়ে আসছে···এখুনি যেন অজ্ঞান হোয়ে পড়বেন। সেই ভাবটা কাটলে দেখতে পেলেন একটি কুলি মেয়ে বাড়ীর সামনে বসে আছে। মেয়েটি বলছে—"বড় হোয়ে কি চমৎকারই না হোয়েছে ছেলেটা! আহা বেঁচে থাকুক দীর্ঘজীবি হোয়ে!"

মেয়েটি ওঁকে চেনে মনে হোলো। কিন্তু ডাক্তার চিনতে পারলেন না।—"মনে নেই ইগরের সেই 'ধোয়া-মোছা' মাসীর বোন আমি"—মেয়েটি বলেই চললো। ডাক্তারের মনে পড়লো বটে 'ধোয়া-মোছা' মাসীকে, কিন্তু বোনটিকে দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না। মেয়েটি বললে, মাসখানেক আগে ইগর এসেছিলো। সেও ঠিক এইখানেই বসেছিলো। ওই মেয়েটিকে ইগর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলো মায়ের আর বোনের কথা—কেমন করে তারা প্রাণ হারালো···নাঃ, চোখের জল একটি ফোঁটাও সে ফেলেনি, নিজের কথাও কিছুই বলেনি, শুধু প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গিয়েছিলো। হ্যাঁ, বাপের ঠিকানা জানতে চেয়েছিল কিন্তু ও-তো জানে না, তাই বলতে পারেনি। তাই একটা চিরকুট রেখে গেছে যদি বাবা কখনও আসে তবে দেবার জন্যে।

—"কোথায় সেই চিরকুট?"—এতক্ষণে ডাক্তার ক্ষীণ স্বরে প্রশ্ন করেন।

কিন্তু 'ধোয়া-মোছা' মাসী তো কাজে গেছে, তার কাছেই আছে সেটা। তবে তার তো রাতের ডিউটি, এক্ষুণিই ফিরবে। ফিরলো বটে সে কিন্তু তক্ষুণি নয়, সমস্ত সময়টা ডাক্তারের মনে হোলো যেন একশোটা বছর পেরিয়ে গেলো তার একটু আসার দেরীতে। কত বুড়ো হোয়ে গেছে সেই 'ধোয়া-মোছা' মাসী, তবু এখনও কাজ করছে। তার মেয়ে লিডা, সেও কাজ করে। তার বিয়ে হোয়ে গেছে, শীগগিরই ছেলেও হবে···উঃ, সেই চিরকুটটা! সেটা বের করতে যেন আরও এক যুগ কাটলো—লিডা পড়তে নিয়ে কোথায় রেখে গেছে। যাই হোক, শেষে বেরোলো সেটা, ডাক্তারের হাতে এনে দিলে মেয়েটি।

ছোট্টো চিরকুট—"বাবা, কোথায় তুমি? তুমি কি আজও বেঁচে আছো? তুমি থাকো, তুমি আমাকে ফেলে যেও না বাবা!" ডাক্তার পড়লেন তার পরই লেখা ছেলের ঠিকানা, পোষ্ট অফিস, সৈন্য বিভাগের ঠিকানা···আজও আছে তাঁর ছেলে! এই তো তার ঠিকানা···তার স্বাক্ষর···বেঁচে আছি ইগর! আমরা দু'জনেই বেঁচে আছি! আমাদের কাজ শেষ করে আবার আমরা মিলবো, কেমন? বেঁচে আছি রে খোকা, আজও বেঁচে আছি!

একাদশ অধ্যায়

এই সময়টা 'হসপিটাল ট্রেনে'র সবাই কিছু না কিছু কাজ শিখে নিচ্ছিল। জুলিয়া অপারেশনের যন্ত্রপাতির ব্যবহার আর জটিল ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেখাচ্ছিল অন্য সিষ্টারদের। ডাক্তাররা নার্সদের কয়েকটা বিষয় ক্লাস নিচ্ছিলেন। মিষ্টার ফাইনা একটা হাসপাতালের সঙ্গে মাসখানেক যুক্ত হোয়ে বিশেষ ভাবে 'ফিজিওথেরাপি' আয়ত্ত করে নিলে। স্বিরোগী রোগীদের জন্য বিশেষ ধরণের ব্যায়াম-শিক্ষার সমস্ত ধারাটা শিখে নিলে। ফিমা, এত দিন ছিলো রন্ধনশালার পরিচারিকা—তাকেও একটা রন্ধন-শিক্ষাগারে পাঠানো হয়। সেখান থেকে সে বেশ ভালো মানপত্র নিয়ে এলো—রন্ধন-বিদ্যায় পারদর্শী হোয়ে ভালোই হোলো, এর আগের জনের রান্না আহত সৈন্যদের একটুও মুখে রুচতো না।

—"লেনা দিন দিন যেন গম্ভীর হোয়ে যাচ্ছে"—জুলিয়া একদিন বললে।

লেনা নিজের মনেই হাসে—কখনোই না, ও ঠিক আগের মতই আছে। আহত সৈন্যদের ওর মত করে কেউ দেখা শোনা করতে পারে না—বিশেষ করে যারই একটু মেজাজের উত্তাপ বা গোলযোগ দেখা যায় তাকেই পাঠানো হয় লেনার তত্ত্বাবধানে—লেনা পারে তাদের শান্ত করতে। নার্সেরা জিজ্ঞাসা করে ওকে, "কি যাদুতে ওদের অমন করে শান্ত কর ভাই?" লেনা হাসে, বলে,—"জানি না তো।"

লেনাও জুনিয়ার সার্জেন্টের পদে উন্নীত হোয়েছে। বুকের উপর সম্মান-চিহ্নগুলি ঝুলিয়ে যখন বেড়ায় তখন খুসীতে ঝলমল করে ওর মুখ—ঠিক এমনি করেই আগের দিনে খেলার পদকগুলি ঝুলিয়ে বেড়াতো।

—"লেনোচ্‌কা, তুমি কিন্তু দিন দিন কেমন যেন বুড়িয়ে যাচ্ছো"—মোটা আইয়া বিষণ্ণ ভাবে বলে।

লেনা ওর ছোটো আয়নাটার সামনে চেয়ে থাকে। সত্যিই কি চোখের পাশে গোল গোল রেখা পড়েছে কিসের? রঙটাও কেমন যেন ফ্যাকাশে হোয়ে গেছে—হবে না? ট্রেনের বদ্ধ হাওয়া, তাছাড়া নিয়মিত ব্যায়ামের অভাব—ছোটোবেলা থেকেই যে ওর প্রতিদিনের অভ্যাস ব্যায়াম করা। যাক গে, ঠিক আছে, ওসব ঠিক হোয়ে যাবে—আবার খেলাধুলা নিয়ে মেতে উঠবে, স্কুলের মত মিষ্টি ছেলে-মেয়ের দল ওকে ঘিরে থাকবে—তাদের শেখাবে, প্রতিযোগিতায় আবার পাবে কত পদক আর···আর পাবে আবার ওর দান্যাকে···আবার ওদের ভালোবাসার জোয়ারে মুছে যাবে সব···

কিন্তু আজও তো কোনো চিঠি নেই!

লেনার হঠাৎ মনে হোলো দান্যা বুঝি আর বেঁচে নেই। কেন এমন মনে হোলো? সেদিনটা ছিলো ম্লান হতাশায় কালো তাই কি? তিন-চার দিন ধরে অবিরাম ধারায় বৃষ্টি···বর্ষণক্লান্ত প্রকৃতির মুখেও নেমেছে আষাঢ়ের মেঘভার···ক্ষুব্ধ হবে না মন? দিনের বেলায়ই প্রতি কামরাতে আলো জ্বালিয়ে কাজ চলছে—প্রত্যেকের মনেই নেমেছে বাদল-দিনের অন্ধকার···এমনি সময় বজ্রপাতের মতই একটি চিঠি এলো নাস্তার হাতে···মারা গেছে ওর ভাবী স্বামী! ঠিক সেই সময়ই যখন নাস্তা প্রস্তুত হচ্ছিল একবারটি গিয়ে দেখা করে আসতে! ছেলেটির কমরেডরা নাস্তাকে জানিয়েছে তার মৃত্যুর বিবরণ। অশ্রুমুখী নাস্তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে চকিতে লেনার মনে জেগে উঠলো একটি কথা···মনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি যেন আর্তনাদ করে উঠলো বিদ্যুতের কশাঘাতে—যদি দান্যারও মৃত্যু হোয়ে থাকে?···না, না, এ আশঙ্কা ক্ষণস্থায়ী···ক্ষণপ্রভার মতই

ক্ষণস্থায়ী···মৃত্যুর জয়পতাকা কোনো দিনই উড়বে না ওদের মিলন-সম্ভাবনাকে এমনি করে হারিয়ে। মিলবে, আবার ওরা মিলবে এই নিদারুণ যুদ্ধের শেষে। প্রতিদিন আয়নায় নিজের মুখখানি বার বার দেখেও বুঝি আশ মেটে না লেনার···কিন্তু সভয়ে লক্ষ্য করলে একদিন, সত্যিই তো চোরের মত লুকিয়ে বার্দ্ধক্য নামছে ওর জীবনে! কোথায় হারালো ওর ললিত লাবণ্য-লতা···কোথায় সেই দীপ্ত, উজ্জ্বল চাহনি···এখনি?···মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে···? না-না-না···ওর সমগ্র অন্তরাত্মা তারস্বরে আর্তনাদ করে ওঠে···ক্ষুব্ধ রোষে প্রতিবাদ জানায় ওর মন!

—"আমি বুঝেছি এর কারণ! এখানের এই জীবনে আমার সুখ নেই তাই···প্রতিদিন সুখের কামনাকে আমি প্রতিহত করি, দূরে সরিয়ে দিই···অনেক, অনেক দূরে···মন থেকেও দিই নির্ব্বাসন, তাই এমন হোলো। না, কিছুতেই চলবে না—উঃ! কোথায় কমরেডরা, এসো সবাই মিলে যত শীগগির পারি শেষ করে দিই ওই ঘৃণ্য ফ্যাশিস্তদের···কমরেড, আর সময় নেই, আমাদের সমস্ত সুখ শুকিয়ে যাবার আগে শেষ করতেই হবে এদের···কেন? কেন আমার প্রেমে কেউ পড়ছে না? পড়তেই হবে কাউকে···অন্যের ভালোবাসার বারি সিঞ্চনে ফুটিয়ে রাখবো আমার ছন্দ মধুর লাবণ্য-লতার ফুলগুলি···। শুধু, শুধু দাঙ্গার···যে কেউ···যে কেউ ভালোবাসুক, কিছু এসে যায় না আমার···শুধু ভালবাসুক। আচ্ছা নিঝভোৎস্কি কেমন হয়? রুগ্ন বেচারী···দূর, তাতে আমার কি আসে যায় রুগ্ন কি সুস্থতে? ও শুধু আমার প্রেমে পড়ুক, তাহলেই হবে।"

উদ্দাম হয়ে ওঠে লেনার সঙ্কল্প। নিঝভোৎস্কির সামনে বার বার হানা দিতে লাগলো কলহাস্যময়ী লেনা কখনও অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখে বঙ্কিম মাধুর্য্যে অপরূপ হোয়ে, কখনও এক ঝলক দখিণ হাওয়ার মত শুধু নিঝভোৎস্কির মনটা মাতাল করে দিতে। লেনা কথা বলত অন্যের সঙ্গে, কখনও ওকে ডাকতো না···ও শুধু তন্ময় হোয়ে চেয়ে থাকতো লেনার দিকে···ওর সমস্ত মনটা হোয়ে গেল এলোমেলো, ম্লান মুখ হোলো বিষণ্ণতর, ফ্যাকাশে কপালে জাগলো চিন্তার রেখা,···আর নিশ্চিন্ত, প্রতিক্রিয়াহীন অনুতাপ মনে লেনা শুধু ভাবলে,···"ঠিক, ঠিক হোচ্ছে, কিন্তু আরও দ্রুত···দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসো এই প্রেমের মরীচিকায়।" দ্রুত···দ্রুততর গতিতেই এলো বেচারী। লেনার কামরাগুলির ভিতর দিয়ে বিনা কাজে সর্ব্বদাই ওর যাওয়া-আসা করাই তার প্রমাণ দিলে। আর লেনা?···চোখ তুলে কোনো দিন চোখেও দেখলে না শুধু মনে মনে বললে, "তোমার এই ব্যাকুলতাটুকু দেখাই আমার প্রয়োজন, আর কিছু নয়।"

* * * * *

'সাদান' লাইন' ধরে ট্রেনটা ছুটে চলেছে খালি অবস্থায়।

—"এই জায়গাটাই হোলো আমাদের দেশ"—জানলায় দাঁড়িয়ে দেখতে দেখাতে ভাস্কা বলে লেনাকে।

শীতের প্রথম দিক। পেঁজা-পেঁজা তুলোর মত বরফে ঢাকা পড়ে গেছে উক্রেণের মাটী। ঢাকা পড়ে গেছে ধ্বংসস্তূপগুলো—জার্মানদের বর্ব্বর অত্যাচারের চিহ্নগুলো। বুড়ীদের মত বুকের কাছে হাত দুটো জড়ো করে ভাস্কা দাঁড়িয়েছিলো :

—"এই এক মিনিটের মধ্যে দেখা যাবে সারি সারি তিনটে ওক গাছ, অবিশ্যি তার আগেই আসছে সাগাইদক্ ষ্টেশনটা। ষ্টেশনটার চিহ্ন না থাকলেও জায়গাটা আমি ঠিক চিনতে পারবো—আমি ওখানের স্কুলেই যেতাম যে···তার পর ইয়ারেস্কীর কাছেই পড়বে আমাদের যৌথ খামারটা···"

কে এক জন ডাকাতে লেনা চলে গেলো। ভাস্কা একাই দাঁড়িয়ে রইলো জানলাতে। ওই চলে গেল তিনটে ওক গাছ। জানলা থেকে ভাস্কা সরে এলো, পরমুহূর্ত্তেই ওভারকোট আর শালটা জড়িয়ে ছুটলো দরজার দিকে। ও ভেবেছিলো ট্রেনটা সাগাইদকে থামবে—কিন্তু না তো, ছুটেই চললো যে! ওই তো তুষার-ঢাকা ছোটো ছোটো ঘরগুলো—এক কালে ঐখানে ষ্টেশন ছিলো, তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। পরের ষ্টেশনই তো ইয়ারেস্কি। সেখানে নিশ্চয়ই থামবে ট্রেনটা··· ও নিজের কানে শুনেছে ক্রাভ্‌ট্সভ বলছে প্রটাসভকে যে, "ইয়ারেস্কিতেই আমরা জিনিষগুলো কিনবো'।" আহা—তুষার আর তুষার, গ্রামের সব চিহ্নই ঢেকে গিয়েছে তুষার পড়ে। না তো···ঐ তো সেই ছোট্টো পপলারের চারাটা! ও মা, এই তিন বছরে কত বড় গাছ হোয়ে গেছে! ঈস্, সব, স—ব ওর কত দিনের চেনা-জানা, চিরকালের আপন জায়গা···আর ভাবে না ভাস্কা, উত্তেজনার মাথায় বরফের মত ঠাণ্ডা হাণ্ডেলটা ধরে শেষ পাদানীতে নেমে দাঁড়াল।

ভাস্কা হারিয়ে গেছে তক্ষুণি জানা গেল। সুখোয়দভ দেখেছিল সাগাইদক্ থেকে পাঁচ কিলোমিটার এসেই কে যেন ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়েছে। তখুনি প্রত্যেকের উপস্থিতি ডাকা হোলো—ভাস্কা অনুপস্থিত।

—"আমাকে বলছিল বটে যে ওদের গ্রাম এখানেই"—লেনা বললে।

—"ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের নেবার ফল এবার ফললো তো" —দানিলভ বিরক্ত হোয়ে বললে।

ইয়ারেস্কিতে এসে ট্রেনটা প্রায় ঘণ্টা দুই থামলো। দানিলভ ইচ্ছে করেই দেরী করছিলো, ভাস্কা ফিরে আসবে এই আশায়। ওর মনে হোয়েছিল যে, "মেয়েটা নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।" দু' ঘণ্টা শেষ হবার একটু আগে সত্যিই ফিরে এলো—সারা গায়ে আপেল আর বরফের গন্ধ।

—"কি, বাড়ী গিয়েছিলে?"—দানিলভ জিজ্ঞাসা করলে।

—"হ্যাঁ, বাড়ী গিয়েছিলাম" খুসীতে উপ্‌ছে পড়ছে মেয়েটা। দানিলভ ওর মুখের দিকে চেয়ে আর বকতে পারলে না। বরং বললে,—"সব ভালো খবর তো?"

—"হ্যাঁ—সবাই ভালো আছে, বেঁচে আছে"—শালটা খুলতে খুলতে অনর্গল বকে চলে ভাস্কা। থামে না—ওরা ঝুপ্‌সী ঘর বেঁধে থাকছে এখন, খুব খারাপ নয় কিন্তু···আমাকে কতকগুলো আপেল দিলে। বাবার কাছ থেকে চিঠি এসেছে, আমাকে ভালোবাসা জানিয়েছে, এখন মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে আছে······

* * * *

কি নিষ্ঠুর আনন্দে লেনা উপভোগ করতো নিঝভেট্‌স্কীর এই যন্ত্রণা! এই-ই তো চেয়েছিলো ও। এখন শান্ত মনে নিশ্চিন্তে ও করে যেতে পারবে আপন কর্ত্তব্য।

হঠাৎ খেয়াল বশে একদিন ট্রেনের লাইব্রেরী থেকে আনা লারমনটভের কবিতার বইটা নিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে সুরু করে :

—"ওরা ভালবেসেছে—কি নিবিড় সেই ভালোবাসা—তবু মৃত্যু এলো—মৃত্যুর পারে নূতন জন্মে মিললো আবার—কিন্তু হায়, আর পরস্পরকে ওরা চিনলো না"—

লেনা মৃদু হেসে ভাবে অর্থাৎ ওরা কেউ-ই সত্যিকারের ভালোবাসেনি।

কাঠের পার্টিশনের ওধারে শোনা যায় সুখোয়দভ, কস্তাসিন, প্রটাসভ বসে বসে সুখ-দুঃখের গল্প করছে। আর আছে নিঝভেট্‌স্কি, তার হলদে বিবর্ণ মুখ, কোটরে-বসা চোখ আর রোগের যন্ত্রণা নিয়ে। প্রটাসভ বলে, এই গেঁটে বাত, শির-বার-করা আঙ্গুল, জীর্ণ শরীর নিয়ে ওর আর বাঁচার নাকি মানে হয় না। সুখোদয়েভের প্রতিবাদ শোনা যায়,—"কেন নয় শুনি? ও সব সত্ত্বেও তুমি বেশ বাঁচতে পারবে। ভদ্‌কার বদলে আয়োডিন খাও, দেখো একশ বছর বহাল তবিয়তে বাঁচবে—"

কিন্তু লেনার কানে এ-সব যায় না। ও ততক্ষণ কবিতার বইটার উপর দিয়ে ভাগ্যফল পরীক্ষা করছে। পাতা খুলে চোখ বন্ধ করে যে কোনো লাইনে আঙ্গুল রেখে দেখছে, কি লেখা উঠলো তার বরাতে—প্রথম বার উঠলো দুটি ভিন্ন ভিন্ন লাইন—

"মিছে জাগে কুতূহল স্বপ্নবিভোরা, স্বপ্নলোকেই থাকো"

"তাই কি তোমায় দেখছি হেথায়—সে তো নয়, সে তো নয়—"

"দূর, কি বাজে লাইন! কোনো মিল নেই"—লেনা আপন মনে বলে ওঠে।

লেনার মন যা চায় তার সঙ্গে অনেক তফাৎ—নয় কি?

* * * *

'বি' ষ্টেশনে এসে ট্রেনটা আর একবার থামলো। লেনা নেমে এলো প্লাটফর্মে।

এই ষ্টেশনটাও ধ্বংস হোয়ে গেছে। ছাদ, জানলাবিহীন কোঠাগুলো কঙ্কালের মত শ্রীহীন হোয়ে দাঁড়িয়ে। চারদিকেই কেমন একটা ছন্নছাড়া বিষণ্ণ হাহাকারের ভাব···লেনা মস্ত কোটটার দুই পকেটে হাত ভরে বেড়াচ্ছিলো, ওর টুপীটা মাথার পিছন দিকে ঠেলা।

সৈন্যবোঝাই একটা ট্রেন এসে থামলো—লাফিয়ে পড়লো সৈন্যেরা প্লাটফর্মের উপর। "এই বাচ্চু, আমাদের সঙ্গে আসছো?" পাশ দিয়ে যেতে-যেতে একটি বিরাট লম্বা-চওড়া সৈন্য লেনার দিকে চেয়ে সস্নেহে প্রশ্ন করে। লেনা হাসিমুখে চায়, সৈন্যটিও হাসতে হাসতে চলে যায়···

"ও কি! দাজা!!!···" সামরিক পোষাক-ঢাকা দেহ, কিন্তু অনেক দূর থেকেও লেনার এতটুকু চিনতে দেরী হয় না। কেমন করে?···কখনও তো লেনা দেখেনি সামরিক পোষাক-পরা মস্ত কোটে ঢাকা দাস্যাকে, সেই ধরণের টুপী-পরা—মুখটা কালো হোয়ে গেছে, কর্কশও, চলার ভঙ্গীটাও হোয়ে গেছে আর পাঁচজন সৈন্যের মত··· কিন্তু যাই হোক না কেন, যে মুহূর্ত্তে লেনার চোখ পড়েছে সেই

মুহূর্ত্তেই ও চিনেছে। কিন্তু দান্যা বুঝি শুনতে পেলে না ওর ডাক —"দান্যা—দানিয়া—" অপূর্ব হাসিতে ভরে উঠেছে লেনার মুখ। ফিরলো দান্যা, এগিয়ে এলো···দু' হাত বাড়িয়ে দিলে লেনা···হাত দুটি ধরে মৃদু চাপ দিলো দান্যা। কেমন যেন সঙ্কোচে বাধা পেলো ওর ব্যগ্র-ব্যাকুল ওষ্ঠাধর···কিন্তু না, এ কি সম্ভব? ওর কাছে এ অপরিচয়ের লজ্জা কেন?···চার ধারে এত জন-সমাবেশেই কি এ সঙ্কোচ?··· না, না, না, জীবনের পরম মুহূর্ত্তটিকে এমন সঙ্কোচে হারাবে না, হারাতে পারবে না···দুই হাতে দান্যার মুখটা নামিয়ে এনে এঁকে দিলে তাতে গভীর চুম্বন-রেখা···

—"তুমি এখানে?" স্বামী প্রশ্ন করে।

—"হ্যাঁ"—ক্ষীণ স্বরে বলে লেনা। পুলকে আনন্দে রুদ্ধ হোয়ে আসে ওর কথা—"তুমি আছো দান্যা? তুমি বেঁচে আছো!!"···

—"হ্যাঁ বেঁচে আছি। এখানে হঠাৎ এই ভাবে তোমাকে দেখতে পাওয়া ভাগ্য ছাড়া কি বলবো—কত অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গাই তো ঘুরলাম, কত দেশ—কত গ্রাম···আরে, তুমি সার্জেণ্ট হোয়েছো দেখছি···বেশ, বেশ—"দান্যা দেখে লেনার সম্মান-চিহ্নগুলো।

—"হ্যাঁ, ঐ যে আমার ট্রেন—" লেনা দেখায়।

—"তাই নাকি? আমরা এখন 'ওয়ারশ' যাচ্ছি। ওটা আবার দখল করে নিতে। তার পর···কেমন আছো বলো? রোগা হোয়ে গেছো মনে হচ্ছে···"

—"দানিয়া,"—লেনা মিনতি করে—"আমি কথা বলবো না। আমায় শুধু তোমাকে দেখতে দাও···তোমার কথা শুনতে দাও··· চাও আমার দিকে। দানিয়া, কেন তুমি আমাকে চিঠি লিখলে না—?"

—"লিখিনি?" দান্যা বলে,—"লিখেছি তো, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি পাওনি—" থেমে যায় ও। লেনার মুখের দিকে চায়, কিন্তু একটা সুস্পষ্ট দুশ্চিন্তার রেখা ওর মুখে ফুটে ওঠে—কি রকম অদ্ভুত ভাবে আমাদের দেখা হোলো, না লেনোচ্‌কা···?"

—"দানিয়া, আমার দানিয়া! তুমি আজও বেঁচে আছো"—লেনা ওর গালে হাত বুলোয়। দানিলভ ধীরে ধীরে সরিয়ে দেয় হাতখানা, বলে,—"থাক্ লেনোচ কা—"

লেনার চোখে বুঝি কিছুই পড়ে না। এত দিনের অন্ধকারের পর আজ ওর মন আলোর জোয়ারে বুঝি অন্ধ!

—"কি যে ভালো লাগছে! এই দানিয়া···বলো তো কেন হাসছি?···ও মা ও কি···দেখো, দেখো, ওরা সবাই চলে যাচ্ছে। তোমাদের বুঝি সময় হোয়ে এলো?"

—"হ্যাঁ, এখন যেতে হবে"—কেমন যেন জড়িয়ে গেল ওর কথা। লেনার পাশে পাশে চলতে লাগলো ট্রেনের দিকে—"ইস্, একটু গরম জল নেবার সময় হোলো না। স্টোভ থাকলে কি হবে···"এলোমেলো কথা অস্পষ্ট ভাবে বলতে বলতে দান্যা এগোয়।

—"জানো দানিয়া, এক্ষুণি তোমাকে একটা চিঠি পোষ্ট করলাম" —বিহ্বল লেনা প্রিয়-মিলনে বিভোর। কোনো দিকে ওর দৃষ্টি নেই দান্যার মুখের দিকে ছাড়া। আপন মনেই বলে চলে— "তোমার হাতে হাতে যদি দিতে পারতাম কি ভালোই না হোতো! আচ্ছা, তুমি আমার চিঠি পাও?"

—"না—মানে হ্যাঁ, পাই বই কি। তবে কি জানো এখন আমার নিজের ঠিকানারই কিছু ঠিক নেই যে—" ওরা দু'জনে এসে গাড়ীর সামনে দাঁড়ালো। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দু'জন অফিসার সিগারেট খেতে খেতে চাইলেন ওদের দিকে।

—"আমি ভালোবাসি তোমায়, দানিয়া···প্রিয়তম আমার···" লেনা গভীর আলিঙ্গনে বাঁধে দান্যাকে,···বিদায়ের শেষ চুম্বনটি দিতে দিতে।

—"লেনা!"—গম্ভীর স্বর দান্যার—"আমি তোমায় ঠকাতে চাই না"—লেনার কনুই দুটো ধরে অপরাধীর ভঙ্গীতে বার বার তাতে চাপ দিতে দিতে বলে চলে দান্যা···"আমায় ক্ষমা কর লেনা! হঠাৎ ঘটে গেল আর কি···মানে···তুমি তো জানো···"

নির্ব্বাক বিস্ময়ে লেনা চেয়ে থাকে। কি বলতে চাইছে ওর দান্যা—ওর স্বামী?

—"ব্যাপারটা ঘটলো"—মৃদুস্বরে বলে দান্যা—"কে জানে নিয়তি···আমার ভাগ্য···"

অপ্রস্তুতের মত হাসে দান্যা—"একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হোলো। না, না, তুমি রাগ কোরো না লেনোচ্‌কা···এই সব ঘটনা অনেক সময় আমাদের অনিচ্ছাতেও ঘটে যায়, তুমি জানো···। যুদ্ধ···যুদ্ধ··· কাউকে ভাঙ্গে আর কাউকে জোড়ে···হ্যাঁ, তুমি নিশ্চয়ই ওসবই নেবে, ঘরখানা আর যা-কিছু জিনিষপত্র আছে সবই তোমার রইলো—" ভ্রূ কুঁচকে দ্রুত ভঙ্গিতে কথা শেষ করে দান্যা।

কি জিনিষপত্র? ঘরখানা লেনার রইলো মানে কি? তবে কি দান্যা ভাবছে যুদ্ধক্ষেত্রে যদি ওর মৃত্যু হয়?···

—"আমাকে ক্ষমা কর লেনা"—চোখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলে দান্যা।

ধীরে ধীরে কুয়াশা সরে যায় মনের উপর থেকে—ধীরে ধীরে সমস্ত অর্থ স্বচ্ছ হোয়ে ওঠে লেনার কাছে···কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ এমন অবশ হোয়ে আসে কেন?

দ্বিধা, অস্বস্তিতে জড়ানো স্বরে দান্যা বলে চলে—"আমি কত সময় ভেবেছি—কেন, এমনই না হোলো কেন? আমি জানি না—হয়ত আমরা পরস্পরকে বড় আকস্মিক বড় তাড়াতাড়ি করেই পেয়েছিলাম। হঠাৎ জ্বরের উত্তাপের মত। তাই এখন কাছাকাছি না থাকাতে সে অনুভূতিও মিলিয়ে গেছে—"

—"না, আমার মন থেকে মিলিয়ে যায়নি"—কথা ভেসে আসে লেনার ছাইএর মত ফ্যাকাশে হোয়ে যাওয়া বিবর্ণ মুখ থেকে।

কথাটা শুনতে পেল না দান্যা কিন্তু বুঝলো তার অর্থ লেনার চোখের ভাষায়, বলার ভঙ্গীতে।

—"হ্যাঁ, তুমি পেরেছো রাখতে···"

পিছন ফিরে চলে গেলো লেনা। মস্ত ভারী কোটটার দুই পকেটে হাত ভরে ফিরে চললো লেনা—কি ক্লান্ত, মন্থর, বিষণ্ণ গতি—এই কি ছিলো লেনার চলার ভঙ্গী? সমস্ত মন ওর মূর্চ্ছাতুর···ভালোবাসা··· লেনার দেহদীপে ভালোবাসার আলো জ্বলেছিলো—জ্বালিয়েছিলো লেনাকে মধুরদ্যুতি করে···জাগিয়েছিলো লেনাকে রূপে, রসে, গানে, ছন্দে অপরূপ করে···আজ সেই ভালোবাসা বিরাট পাষাণ-ভারের মত সমস্ত বক্ষ জুড়ে···মুক্তি নেই···কোথাও মুক্তি নেই, নেই এতটুকু আলো···এই বিরাট বোঝা বহন করে পার হোতে হবে কত দীর্ঘ পথ—কে জানে! [ক্রমশঃ।

জয়রামবাটীতে তিন দিন

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়

সারা বছর ধরে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর শতবার্ষিকী উৎসবের কর্মসূচী রামকৃষ্ণ মিশন গ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে ৮ই এপ্রিলটি বিশেষ শুভ দিন হিসাবে জয়রামবাটীতে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে মায়ের মর্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠা উৎসবটিই ছিল সম্ভবতঃ বিশেষ আকর্ষণীয়। সঙ্গে ছিল কামারপুকুরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরে ৭ই, ৮ই ও ৯ই এপ্রিলব্যাপী সুদীর্ঘ কর্মসূচী। শতবার্ষিকী কমিটির অন্যতম সদস্যরূপে এবং কার্যাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায়, এই উৎসবে যোগদানের ইচ্ছা থাকলেও সন্দেহ ছিল যে, বিধান সভার অধিবেশন হয়তো তখনও চলবে এবং আমার যাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু শ্রীমার কৃপায় ঠিক ৬ই এপ্রিল বৈকালেই বিধান সভার গত অধিবেশনের সমাপ্তি হল। সেই রাত্রেই কলকাতা থেকে ভক্ত নরনারীর যাত্রার জন্য যে স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা হয়েছিল সেই ট্রেনে অগণ্য যাত্রীর সঙ্গে রাত্রি ১০টায় সস্ত্রীক আমিও নিজেকে মিশিয়ে নিলাম। ভোর পাঁচটায় স্পেশাল ট্রেন এসে থামলো বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুরে প্রাতে বহু যাত্রী-সমাগমের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন ও জেলার কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায় বহু বাসের ব্যবস্থা ছিল। ১॥০ টাকা ভাড়ায় এই ৩০ মাইল পথে সকলেই টিকিট সংগ্রহে ব্যস্ত। মিশন কর্তৃপক্ষ, স্বেচ্ছাসেবক ও জেলা কর্তৃপক্ষের সুবন্দোবস্তে কারও কোন অসুবিধা অন্ততঃ যানবাহনের জন্য হয়নি। জেলা শাসক শ্রীআয়েঙ্গার নিজে ষ্টেশনে উপস্থিত থেকে সমস্ত পরিদর্শন করছিলেন। আমাদের জন্য একটি জীপ পূর্ব থেকেই মিশন কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করেছিলেন।

আমরা বেলা ৮॥০টা নাগাদ জয়রামবাটীতে পৌঁছলাম। কোয়ালপাড়া গ্রাম থেকে জয়রামবাটী ৩ মাইল পথ। উৎসবের জন্য সদর রাস্তা থেকে মন্দির পর্য্যন্ত প্রায় সওয়া মাইল মাটী চষে গাড়ী যাবার উপযুক্ত প্রশস্ত ১০০ ফুট চওড়া রাস্তা নির্ম্মাণ করা হয়েছে গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় তাদের স্বেচ্ছা-প্রদত্ত জমিগুলির উপর দিয়ে। তার দুই পাশে নানাবিধ দোকান মেলায় আগত যাত্রীদের খাদ্য-সরবরাহের জন্য আহার্য্য, বস্ত্র, স্থানীয় কুটির-শিল্প ও অন্যান্য দ্রব্য-সম্ভারে পূর্ণ। দোকানের সারি শেষ হলে এক পাশে স্ত্রীভক্তগণের জন্য অস্থায়ী খড়ের চালের শিবির এবং অপর দিকে পুরুষদের শিবির। প্রায় ৪ হাজার যাত্রীর তিন দিন বিশ্রামের জন্য শিবিরগুলি মিশন কর্তৃপক্ষ নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। এ ছাড়া জয়রামবাটী গ্রামের অধিবাসীরা প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ পর্ণকুটিরে বহু আগন্তুকের আবাসের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। এমন কি, গ্রামবাসীরা নিজেরা দাওয়ায় বা গোয়ালঘরে থেকে শয়নকক্ষ ও অন্যান্য কক্ষ অতিথিগণের জন্য ছেড়ে দেন। শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতায় যে স্ত্রীভক্ত সম্মেলন হয়েছিল তার বহু প্রতিনিধি—ভারতের, এমন কি ভারতের বাহিরের—মহিলারা ঐ সব পর্ণকুটিরে আশ্রয় নিয়ে স্বহস্তে পুষ্করিণীতে বা নলকূপে বস্ত্র সম্মার্জ্জন করছেন দেখলাম। দোকানের সারি ছাড়িয়ে এক পার্শ্বে অনুসন্ধান অফিস, স্বেচ্ছাসেবক অফিস এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অফিস। অপর পাশে নানাবিধ শিবির ;—যথা রন্ধনশালা, ভোজনালয়, প্রদর্শনী, যাত্রাভিনয়ের স্থান, এম্বুল্যান্স। পানীয় জলের সুবন্দোবস্তের জন্য চতুর্দ্দিকে বহু নলকূপ খনন করা হয় এবং ব্যবহার্য্য জলের জন্য দূরবর্ত্তী আমোদর নদ থেকে বৈদ্যুতিক পাম্প ও পাইপের সাহায্যে স্থানে স্থানে জলের চৌবাচ্চা নির্ম্মাণ করা হয়। অস্থায়ী যন্ত্রপাতি দ্বারা সমস্ত এলাকায় ও মন্দির-সংলগ্ন স্থানগুলিতে বৈদ্যুতিক আলোর রাত্রে উৎসব-পল্লীকে আলোকিত ও আনন্দমুখর করে তুলেছিলো।

জয়রামবাটীতে প্রথম দিনের সকালে সকল যাত্রীই মধ্যে যে সমস্ত স্থান বা কুটীরের সঙ্গে শ্রীমার স্মৃতি বিজড়িত, ব্যস্ত। কেউ বসে আছেন ধ্যানস্তিমিত নেত্রে শ্রীমার নিজ যেখানে শেষ জীবনের একাধিক বৎসর তিনি কাটিয়েছেন। বসে আছেন তারই অনতিদূরে বাড়ুয্যে ঘাটের দিকে আর কুটীরে যেখানে এককালীন ছয় মাস শ্রীমা বাস করেছিলেন। দেখছে সেই দাওয়া, যেখানে আমজাদকে পরিবেশন করে নিজের হাতে তার পরিত্যক্ত এঁটো পরিষ্কার করেছিলেন কেউ গেছেন দলে দলে দেখতে সেই কুটীর-কক্ষ, যেখানে সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিলো। কেউ শুনছেন জীবদ্দশায় সেবা করবার অধিকার পেয়েছিলেন যিনি সেই স্থানীয় শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষের মুখ থেকে মার জীবনের সংসারের নানা কার্য্যের মধ্যে মার সংসারী মাতৃরূপী দেবীর নিষ্কাম সাধনার কত শত খুঁটিনাটি কথা। দলে দলে ভক্তরা চলেছেন সিংহবাহিনীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও সেই দেবীমূর্ত্তি যিনি কাছে জাগরিতা হয়েছিলেন। ঐ গ্রামেরই শ্রীমার সেবকগণের উত্তরাধিকারিগণ এখনও নিষ্ঠার সঙ্গে চালাচ্ছেন। এই সমস্ত সকাল যেন জয়রামবাটীর গ্রামের জনপথ, প্রতি পর্ণকুটীর, বৃক্ষলতা, পুষ্করিণী ও তৎসংলগ্ন ধূলিকণা পবিত্র পুণ্যস্মৃতি-জড়িত-ধারণায় শ্রীমার জাগ্রত অনুভবে মাতোয়ারা। সকলেই যেন সর্বত্র মাতৃদর্শন শ্রীমার অস্তিত্ব অনুভব করছেন এই ভাবে বিভোর।

সন্ধ্যার পূর্বেই বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত, শ্বেত মর্ম্মর-নির্ম্মিত মন্দির-বেদীতে রাজ-রাজেশ্বরী-বেশে আবির্ভূতা হলেন ভক্তগণ ও দর্শকগণ মুগ্ধদৃষ্টিতে ভক্তিবিনম্র চিত্তে দর্শন দেবীমূর্ত্তি, যাঁকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁরই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন— "যে মা মন্দিরে, তুমি আমার সেই আনন্দময়ী মা।" সেই মায়ের মর্ম্মর দেবীমূর্ত্তি শতবর্ষ পরে শ্রীমার জন্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত অনেক ভক্তই চাইলেন মার আশীর্ব্বাদ। স্বেচ্ছাসেবকগণের অপ্রশস্ত নাটমন্দিরে বহু দর্শনার্থী যাত্রীর ভীড় হওয়ায় কেউই বেশীক্ষণ দর্শন করতে পারেননি। সকলকেই দর্শন ও প্রণাম অল্পকাল মধ্যেই সরে যেতে হয়েছিল। ৭ই এপ্রিল জয়রামবাটীর সমস্তদিনব্যাপী অনুষ্ঠান-কর্মসূচীর মধ্যে ছিল প্রাতঃকাল রুদ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান। মন্দিরের নিকটেই এক বিস্তীর্ণ যজ্ঞবেদী মণ্ডপ নির্ম্মিত হয়েছিল। তাতে শ্রীমার পূজা ইত্যাদির বৈদিক নিয়মানুসারে বিরাট হোম ও রুদ্রযজ্ঞের আয়োজন হয়েছিল। স্বামিজীগণের সঙ্গে সেই সর্বদিনব্যাপী রুদ্রযজ্ঞে ছিলেন বারাণসী হতে আনীত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ। ভক্তগণ সম্মুখের চন্দ্রাতপতলে ভক্তি সহকারে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে

যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অপরাহ্নে সেই রুদ্রযজ্ঞ সমাপ্তির পর ব্রাহ্মণগণ ও স্বামিজীগণ মন্দিরে শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিয়মানুসারে অধিবাস-পূজার ব্যবস্থায় রত ছিলেন এবং দলে দলে ভক্ত নরনারী সেই নাটমন্দিরে শ্রীমার মর্মর-মূর্ত্তি দর্শন করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্ম্মিণী দেবী-মানবী শ্রীমাকে শতবর্ষ পরে বাংলার এই নিভৃত পল্লীতে দেবীরূপে নিজ জন্মস্থানে প্রতিষ্ঠিতা দেখতে সকলেই সবিশেষ উৎসুক। জাতিনির্ব্বিশেষে, শ্রেণীনির্ব্বিশেষে দলে দলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই চলেছেন পল্লীমায়ের নিভৃত অঞ্চলে দেবীরূপে মাতৃশক্তির পুনরভ্যুদয়ের মূর্ত্তি দর্শনে। একটি বার দর্শনে পুলকিত-চিত্ত সকলেই যেন কৃতকৃতার্থ ও সফলজন্ম মনে করছেন। বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত এই পল্লীপ্রান্তে এই সুন্দর পরিবেশের মধ্যে সন্ধ্যার আগমনে জয়রামবাটী আরও উৎসব-মুখরিত হয়ে উঠেছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আকর্ষণীয় ছিল কৃষ্ণনগরের চিত্রকর দ্বারা নির্ম্মিত নানাবিধ মৃন্ময়-মূর্ত্তির দ্বারা সজ্জিত শ্রীমার জীবন-লীলার প্রদর্শনী। শ্রীমার গর্ভধারিণী শ্যামা-সুন্দরীর আলৌকিক নারী দর্শন থেকে ঠাকুরের শ্রীমাকে জগজ্জননী জ্ঞানে ষোড়শী-পূজার মূর্ত্তি সত্যিই উপভোগ্য হয়েছিল। রাত্রে যাত্রাভিনয় স্থানীয় অঞ্চলের অধিবাসিগণকে দলে দলে আকৃষ্ট করেছিল।

দ্বিতীয় দিবস ৮ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ১০১টি তোপধ্বনি পল্লী-অঞ্চলকে সচকিত করে শতবর্ষ জয়ন্তী-উৎসব ঘোষণা করলো। দলে দলে পল্লী-অঞ্চলের সকল গ্রাম্যপথ দিয়ে পল্লীবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পিপীলিকা-শ্রেণীর মত সারি দিয়ে, প্রশস্ত রাজপথে সুদূর বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, আরামবাগ ও অন্যান্য স্থান থেকে দলে দলে বাসে, গো-শকটে তীর্থযাত্রীর ন্যায় মন্দিরাভিমুখে আসতে লাগল। সকলেরই প্রথম গন্তব্যস্থান শ্রীমার মন্দির। সমস্ত দিন এই অঞ্চলে মাঠে-ঘাটে ঘুরে মধ্যাহ্নে প্রসাদ গ্রহণ, সন্ধ্যায় আরাত্রিক দর্শন ও রাত্রে আলোকচিত্র সহযোগে ঠাকুরের ও শ্রীমার জীবনকাহিনী শ্রবণ ও দর্শন, যাত্রাভিনয় শ্রবণ ও অবশেষে বাজী পোড়ানো দেখে রাত্রে কেউ গৃহে ফিরলেন, কেউ বা বৃক্ষতলে আশ্রয় নিলেন। প্রাতে শ্রীশ্রীমার ও শ্রীশ্রীঠাকুরের পটমূর্ত্তি নিয়ে যে বিরাট সংকীর্ত্তনের শোভাযাত্রা বের হয়েছিল তাতেই বোঝা গেল যে, এ-দিনটি পল্লীতে এনেছে কি বিরাট প্রাণের স্পন্দন!

তৃতীয় দিন প্রাতঃকাল থেকেই জনতা শিথিল হতে আরম্ভ হল। ভক্তগণ সেদিন সকলেই প্রাতে কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে যাবার জন্য উৎসুক, কারণ সেদিনই কামারপুকুরে এই শতবার্ষিকী জয়ন্তী-উৎসবের বিশেষ পূজা ও প্রসাদের ব্যবস্থা হয়েছিল। আমরাও সেই দিনই প্রাতে কামারপুকুরে যাত্রা করলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যেই গাড়ীতে করে কামারপুকুর পৌঁছান গেল। বহু ভক্ত এই তিন মাইল পথ পদব্রজেই এলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত যাঁরা তাঁরা নিশ্চয়ই অপূর্ব্ব প্রেরণা ও আনন্দ উপলব্ধি করবেন কামারপুকুরের সকল স্থানে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অলৌকিক জীবনের স্মৃতি-বিজড়িত বহু পুণ্যস্থান সঞ্চার করে প্রাণে পুলক জাগায়, মনে শান্তি ও স্বস্তির আবহাওয়া। সেই ভূতির খালের কাছে বটবৃক্ষ, সেই হালদারপুকুর, সেই পর্ণকুটীরের শয্যাগৃহ ও সেই রঘুনাথজীর বিগ্রহ ও নবনির্ম্মিত মন্দির, সেই পাঠশালা যেখানে তাঁর প্রথম বিদ্যাভ্যাস, সেই লাহাবাবুদের বাটীর ভগ্নাবশেষ, সেই ধাত্রী ধনী কামারণীর গৃহ ও নবনির্ম্মিত স্মৃতি-মন্দির, যে স্থানে ঢেঁকিশালে যুগাবতারের জন্ম সেই সমস্ত এবং তদুপরি শান্ত-স্নিগ্ধ চারুকলায় নির্ম্মিত নূতন মন্দির কামারপুকুরকে পরিণত করেছে বিংশ শতাব্দীর এক তীর্থস্থানে। প্রায় দু' ঘণ্টা মন্দিরে পূজায় ও ধ্যানে এবং মন্দির-সন্নিবিষ্ট গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় পরিভ্রমণ করে আমরা কোয়ালপাড়ায় ফিরলাম এবং বিষ্ণুপুরের পথে বাঁকুড়ায় যাত্রা করলাম।

আমার বিশ্বাস, হুগলী ও বাঁকুড়া জেলার সংযোগস্থলে এই কামারপুকুর ও জয়রামবাটীর মন্দিরদ্বয় ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল আগত ভবিষ্যতে শুধু বাংলার বা ভারতের নয়, সারা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় কল্যাণকামী শ্রদ্ধাবান নরনারীকে পবিত্র তীর্থস্থানরূপে আকর্ষণ করবে। রামকৃষ্ণ মিশন কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁদের বহুমুখী সেবাব্রতের অঙ্গস্বরূপ তাঁরা এই সমস্ত অঞ্চলের পারিপার্শ্বিক এলাকাগুলিকে গড়ে তুলুন স্বাধীন ভারতের আদর্শ পল্লীরূপে। কোন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে জানি না, নবলব্ধ স্বাধীনতার পর যেখানে ভারতের রাষ্ট্র ও জনসাধারণ তার শত শতাব্দীর উপেক্ষিতা পল্লীগুলির পুনরুজ্জীবনে কৃতসংকল্প, সেই মুহূর্ত্তে যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা শতবর্ষ পরে দেশবাসীর তাঁদের প্রতি অর্পিত দেব-দেবীর সমস্ত মাহাত্ম্য, শ্রদ্ধা ও ভক্তি গ্রহণ করে বাংলার পল্লীর এই নিভৃত অঞ্চলে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হলেন।

কবি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তার কোনো দুঃখ নেই—সে তো সব সুখেরও অতীত
তার চক্ষে আলো জ্বলে সে আলোর বর্ণ নেই কোনো
তার বুকে এত ঘুম—ছুঁয়ে দেখি সে তো নয় মৃত
যন্ত্রণার আভা দিয়ে তার মুখ মাধুর্যে সাজানো।

তার কোনো দুঃখ নেই, সুখ নেই, শুধু এ জীবনে
দুরাশ্চর্য তপস্যায় গেঁথে যায় মুহূর্তের মালা
দিনের উজ্জ্বল ফুল অন্তরের অন্তহীন বনে
রেখে যায় গন্ধে স্পর্শে অসহিষ্ণু যৌবনের জ্বালা।

শ্রাবণ মাসের মধ্যভাগে একদিন মধ্যাহ্নের পরে সমীরচন্দ্র ও চিত্রলেখা অনুকূলচন্দ্রের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বর্ষার জন্য চিত্রলেখা তিন দিন তথায় আসিতে পারেন নাই, সেই জন্যও বটে আর দীপশিখা পিসীমা'কে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার বিষয় আলোচনা করিবার জন্যও বটে তাঁহারা আসিয়াছিলেন। দীপশিখা লিখিয়াছিল, সুধীর জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তাঁহারা কি লোকনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাগরিকার ভবিষ্যৎ কাজ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন? লোকনাথের সহিত সাক্ষাতের পর হইতে সুধীরের বিশ্বাস হইয়াছে, দুর্ব্বল লোকনাথকে আর অধিক দিন সে যে ভাবে আছে সে ভাবে থাকিতে দেওয়া সঙ্গত নহে; যে স্বভাবতঃ দুর্ব্বল তাহার সেই দৌর্ব্বল্যের সুযোগ লইয়া দুষ্ট লোক তাহাকে কুপথে লইতেও পারে—তাহার সম্বন্ধে সতর্ক হওয়াই প্রয়োজন। সেই সম্বন্ধে চিত্রলেখা সাগরিকার সহিত ও সমীরচন্দ্র অনুকূলচন্দ্রের ও তরুণকুমারের সহিত আলোচনা করিতে আসিয়াছিলেন।

চিত্রলেখা যখন সাগরিকাকে দেখিয়া আসিয়া তরুণকুমারের

অপরাজিতা ও পরাজিতা

শ্রীদীপঙ্কর

বসিবার ঘরে তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে আসিলেন, তখন সমীরচন্দ্রও তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন, "দ্বারে ব্রজবল্লভ বাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি কলেজ হ'তে আসছিলেন। তিনি বললেন, তাঁ'র যে ছেলে কাশীতে পড়ে সে সতীর্থদের সঙ্গে লাহোরে গিয়াছিল—সেখানে সে শুনে এসেছে, ১৬ই আগষ্ট মসলেম লীগ যে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণা করেছে—সে দিন কলিকাতায় তা'রা একটা হাঙ্গামা বাধাবার ব্যবস্থা করছে।"

চিত্রলেখা কতকটা শঙ্কিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হাঙ্গামা গো?"

"তা' তিনিও জানেন না, আমিও জানি না।"

"তবে?"

"কাক কাণ নিয়ে গেল শুনে কাণের সন্ধানে কাকের অনুসরণ করা যায় না।"

অনুকূলচন্দ্রও তথায় আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "কিন্তু যা'রা লীগের পাণ্ডা তা'দের অসাধ্য কাজ নাই।"

সমীরচন্দ্র বলিলেন, "ষণ্ডামী, গুণ্ডামী, ভণ্ডামী—এ সব তা'দের একচেটিয়া।"

"ভণ্ডামী আর গুণ্ডামী কি এক সঙ্গে থাকে?"

"ওদের সবই সম্ভব।"

চিত্রলেখা বলিলেন, "তা' হ'লে কি হ'বে?"

সমীরচন্দ্র বলিলেন, "কি আর হ'বে? খানিকটা চেঁচাবে—এই পর্য্যন্ত।"

"ব্রজবল্লভ বাবু কি বললেন?"

"তিনি খুব চিন্তিত হয়েছেন। শিক্ষকরা নিরীহ জীব—বো[illegible] ভয়ও পেয়েছেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, কি করা যায়?"

"তুমি কি বললে?"

"আমি বললাম, ভয় পা'বার কোন কারণ নাই।"

তাহার পরে সমীরচন্দ্র তরুণকুমারকে বলিলেন, "তোর পিসী[illegible] পুত্রদায় উপস্থিত—ওঁকে নিষ্কৃতি দেবার ব্যবস্থা কর।"

তরুণকুমার কোন কথা বলিল না।

সমীরচন্দ্র বলিলেন, "তোর পিসীর হয়েছে ঠক বাছতে গাঁ [illegible]—কোন মেয়েই পছন্দ হচ্ছে না—ঐ সামনের বাড়ীর মেয়েটি [illegible] সে এখন বিয়ে করবে না। এ সমস্যার সমাধান কি ক'রে করা [illegible] বল ত? আমি বলি—একটা কমিশন বসান হ'ক। তুই [illegible] এক জন মেম্বার হ'বি।"

চিত্রলেখা বলিলেন, "কি যে মানুষ—ছেলের সঙ্গেও ঠাট্টা?"

সমীরচন্দ্র বলিলেন, "ওর বয়স কবে ষোল বছর হয়ে গেছে—এখন ও মিত্র।"

সমীরচন্দ্র ও অনুকূলচন্দ্র অনুকূলচন্দ্রের বসিবার ঘরে গমন করিলেন। চিত্রলেখা সাগরিকার নিকটে গমন করিলেন।

ভৃত্য তরুণকুমারকে একখানি পত্র আনিয়া দিয়া বলিল—যে পত্রখানি আনিয়াছে, সে জিজ্ঞাসা করিতেছে, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিবে কি? "দেখি"—বলিয়া তরুণকুমার পত্রের খাম খুলিয়া পত্রখানি পড়িল—তাহার পরে ভৃত্যকে বলিল, "তা'কে [illegible]

বল ; উত্তর আমি পাঠিয়ে দিব।" পত্রখানি—তরুণকুমার সাধারণতঃ যে মাসিক পত্রে তাহার সমাজ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ "ব্রুরত" ছদ্মনামে লিখিত সেই পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন। তিনি তাহার সঙ্গে একটি প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়াছিলেন—তাহাতে তাহার শেষ প্রকাশিত প্রবন্ধের আলোচনা ছিল ; আলোচনা সম্বন্ধে সে কোন কথা বলিতে চাহে কি না, সম্পাদক তাহাই জানিতে চাহিয়াছিলেন।

প্রবন্ধটিতে তরুণকুমারের মতের সমর্থনই ছিল ; সমর্থনে কয় জন প্রসিদ্ধ লেখকের মত উদ্ধৃত ও সে সকলের বিশ্লেষণ ও আলোচনা প্রতিপাদ্য বিষয় বিশদ করিয়াছিল। হাতের লিখা পরিষ্কার ও সুন্দর। কৌতূহলবশে তরুণকুমার প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠায় লেখকের নাম দেখিল। ছদ্মনাম "কণিকা"—তাহার নিম্নে রীতি অনুসারে লেখকের নাম ও ঠিকানা। দেখিয়া তরুণকুমার বিস্মিত হইল—লেখিকা আর কেহই নহে—পথের পরপার্শ্বস্থ গৃহের ব্রজবল্লভ বাবুর কন্যা অপরাজিতা—যাহাকে কলেজের কোন ছেলে অগ্নিশিখা নাম দিয়াছে।

তরুণকুমার প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া প্রবন্ধের মত সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য একখানি স্বতন্ত্র কাগজে সংক্ষেপে লিখিয়া—প্রবন্ধ ও তাহার বক্তব্য সম্পাদকের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল।

তাহার মনে যে আনন্দ অনুভূত হইতেছিল, তাহা সে স্বীয় মতের সমর্থনের জন্য বলিয়া মনে করিল—অন্য কোন কারণে, সে সমর্থন অপরাজিতা করিয়াছে বলিয়া নহে। অর্থাৎ সমর্থক কে তাহাতে সমর্থনে তাহার আনন্দের তারতম্য হইতে পারে না। সে যে কেন সে সম্বন্ধে আপনাকে নিঃসন্দেহ করিতে ব্যস্ত হইয়াছিল, তাহা সে বিবেচনা করিল না। অনেক বিষয় মানুষ ইচ্ছা করিয়াই বিবেচনায় বিরত থাকে—কারণ, বিবেচনা করিতে ভয় সে ভয় পায়, নহে ত বিবেচনায় সে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে তাহা তাহার মনোমত নহে।

গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে চিত্রলেখা সাগরিকাকে বলিলেন, "এ বার যে দিন আসব, শোভনাকে আনব ; সে বলছিল, একবার অপরাজিতার সঙ্গে দেখা করবে—একটা গানের যে সুর কোন্ কাগজে বেরিয়েছে, তা' তা'র মনের মত হচ্ছে না—সেই কথার আলোচনা করবে।"

সাগরিকা বলিল, "অপরাজিতা কি তবে মাষ্টার হ'ল ?"

"যে গলা আর যে সুরবোধ, তা'তে তা হ'তে পারে।"

চিত্রলেখা সাগরিকার সহিত যে সকল আলোচনা করিয়াছিলেন, সে তাহার অভিপ্রায় বুঝিবার জন্য। সে সম্বন্ধে তিনি যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, তাহাই সত্য। সাগরিকা বলিয়াছিল—"পিসীমা, বাবা আপনি পিসামশাই আপনারা যা' ভাল মনে করবেন, তা'ই কি আমার ভাল নহে ? আমি ত তা' ছাড়া কিছু মনেও করতে পারি না।" চিত্রলেখা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সমীর ব'লেও গেছে, লিখেছে—লোকনাথ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল—তা'র যে ত্রুটি তা' ইচ্ছাকৃত অপরাধ নহে—সে আপনার ধাতুগত দৌর্ব্বল্য কাটিয়ে উঠতে পারে না। তোরও কি তা'-ই মনে হয় ?" সাগরিকা উত্তর দিয়াছিল, "সে কথা আমি বিশ্বাস করি। সংসারে এক জন যদি অতিপ্রবল হয়, তবে আর সকলের পক্ষে হয় তা'র প্রাবল্য সহ্য করতে হয়, নহিলে সংসার অশান্তির নরক হয়। আর নহে ত বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হয়। ছেলেমেয়েরা বাপমা'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'তে দ্বিধা অনুভব করে। আমার জা' বিদ্রোহী হয়েছিল—কিন্তু আপনাকেই তা'র বলি দিয়েছিল।" চিত্রলেখা বলিয়াছিলেন "কি ভাগ্য যে, তুই তা' করিস নাই।" সাগরিকা বলিয়াছিল, "ভাগ্য নয়, পিসীমা—আপনাদের শিক্ষা।"

তাহার পরে চিত্রলেখা বলিয়াছিলেন, তরুণকুমার কিন্তু লোকনাথকে ক্ষমা করিতে পারিতেছে না। সাগরিকা মনে করিয়াছিল, সে ত ভালবাসা জানে না ; কিন্তু পিসীমা'কে বলিয়াছিল, সে সংসার অধ্যয়নের মধ্য দিয়া দেখে। আলোক তাহার কাছে উপনীত হয় সন্দেহ নাই—কিন্তু সে অধ্যয়নসঞ্জাত কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়া—প্রকৃত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া নহে।

তাহার পরে চিত্রলেখা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুই আমাকে বল, তুই লোকনাথকে ক্ষমা করতে পারবি কি ?"

সে প্রশ্নের কোন উত্তর সাগরিকা দেয় নাই—কেবল হাসিয়াছিল। সে হাসির অর্থ চিত্রলেখার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। ক্ষমা করাই যে ভালবাসার ধর্ম ; যে স্থানে ভালবাসা নাই, সেই স্থানেই ক্ষমা অভিমানের, বেদনার—সব চিহ্ন প্রক্ষালিত করিতে পারে না।

বাস্তবিক যে লজ্জায় লোকনাথ তাহার কাছে মুখ দেখাইতে পারিতেছিল না, তাহার মর্য্যাদা সাগরিকা হয়ত অতিরঞ্জিত ভাবেই দেখিতেছিল।

চিত্রলেখা বলিয়াছিলেন, "বাস—তরুণকে আমি বুঝাব। সে আমাদের কথার অবাধ্য হ'বে না জানি ; কিন্তু সে যা'তে বিচার ক'রে আমাদের মত গ্রহণ করে, তা'-ই করতে হ'বে—নহিলে পরিবর্জিত মনোভাব স্থায়ী হয় না—দোষে টিকে না।"

সেই দিন যখন সমীরচন্দ্র চিত্রলেখাকে লইয়া স্বগৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন এক দল লোক পাকিস্তানের সবুজ পতাকা উড়াইয়া শোভাযাত্রা করিতেছিল—মধ্যে মধ্যে ধ্বনি করিতেছিল—"লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।" অধিকাংশই লুঙ্গীপরা—মদ্যপানমত্ত। সমীরচন্দ্রের মোটর দেখিয়া দূর হইতে কয় জন চীৎকার করিয়া উঠিল—"একবার রোকো।" যানচালক কি উত্তর দিতে যাইতেছিল ; সমীরচন্দ্র জনতার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে কোন কথা না বলিয়া পার্শ্বস্থ গলির মধ্যে যান লইতে বলিলেন। শোভাযাত্রার পুরোভাগে যে কয় জন ছিল, তাহারা বলিল, "কাফের ! মারকে লেঙ্গে পাকিস্তান।" কয় জন পার্শ্বস্থ দোকানে কয়টি জিনিস ফেলিয়া দিয়া অট্টহাস্য করিল।

দীর্ঘ শোভাযাত্রা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ভাবে চলিয়া গেল। তাহাদিগের পশ্চাতে কয় জন পাহারাওয়ালা। সমীরচন্দ্র তাহাদিগের মধ্যে এক জনকে ডাকিয়া বলিলেন, তাহারাও শোভাযাত্রায় আপত্তি করিতেছে না কেন ? সে বলিল, আপত্তি ! এই সব বিড়ীওয়ালা, গুণ্ডা, কশাই—যাহা ইচ্ছা করিলেও যাহাতে কেহ ইহাদিগকে কোনরূপ বাধা দিতে না পারে—তাহাদিগকে তাহাই দেখিবার জন্য নির্দ্দেশ দান করা হইয়াছে।

শুনিয়া সমীরচন্দ্র স্তম্ভিত হইলেন ; চিত্রলেখাকে বলিলেন, "ব্রজবল্লভ বাবুকে অভয় দিয়ে এলাম বটে, কিন্তু এ ত দেখছি অবস্থা ভাল নহে।"

ততক্ষণে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

চিত্রলেখা শঙ্কিত ভাবে বলিলেন, "কি হ'বে ?"

সমীরচন্দ্র বলিলেন, "তা'ই ভাবছি। সাবধান হ'তে হ'বে।"

সে দিন ১২ই আগষ্ট। ১৬ই আগষ্ট মসলেম লীগের বিঘোষিত "প্রত্যক্ষ দিবস"—উদ্দেশ্য পকিস্তান লাভ। সে দিন ব্যবস্থা পরিষদে হিন্দু সদস্যরা ১৬ই আগষ্ট সরকারের পক্ষ হইতে ছুটী ঘোষণার প্রতিবাদ করিয়া সভাগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার পরে এই শোভাযাত্রা। ইহাই কলিকাতায় "প্রত্যক্ষ দিবসে"র প্রস্তুতি।

গৃহে ফিরিয়া সমীরচন্দ্র কর্ত্তব্য কি তাহা ভাবিয়া প্রথমেই স্থির করিলেন, দক্ষিণ কলিকাতায় তাঁহার এক বন্ধুর যে কারখানায় তাঁহার অংশ আছে, তথা হইতে দুই জন নেপালী প্রহরী আনিয়া এক জনকে নিজ গৃহে ও অপর জনকে অনুকূলচন্দ্রের গৃহে রাখিবেন। প্রহরীরা পূর্ব্বে সেনাদলে ছিল এবং তাহাদিগের বন্দুক ব্যবহারের অধিকার আছে—কারখানার পক্ষ হইতে তাহাদিগকে বন্দুক দেওয়া হইয়াছে। তিনি বুঝিলেন, তখন কারখানা বন্ধ হইয়া গিয়াছে; সেই জন্য কারখানার কর্ত্তা—তাঁহার বন্ধুকে সে বিষয়ে তাঁহার বাড়ীতে টেলিফোন করিতে যাইয়া ভাবিলেন, টেলিফোনে সে কথা বলা হয়ত নিরাপদ নহে; সন্ধ্যার পরে তিনি বন্ধুগৃহে যাইবেন।

সমীরচন্দ্র যখন তাঁহার বন্ধুগৃহে যাইয়া প্রহরীর ব্যবস্থা করিতেছিলেন সেই সময় বন্ধুর দ্বারবান আসিয়া বলিল—সে পার্ক সার্কাস অঞ্চলে বস্তীতে ভাড়া আদায় করিতে গিয়াছিল। সে বস্তীতে মুসলমানের বাস। তাহারা ভাড়া ত দেয়ই নাই, অধিকন্তু বলিয়া দিয়াছে, ভাড়া দিবে না এবং পুনরায় ভাড়া আদায় করিতে যাইলে দ্বারবানকে আর প্রাণ লইয়া বাড়ীতে ফিরিতে হইবে না। সে বলিল, বস্তীতে বাহির হইতে বহু অবাঙ্গালী মুসলমান আসিয়া সমবেত হইয়াছে; তাহারা অস্ত্র লইয়া আস্ফালন করিতেছে— "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান! মারকে লেঙ্গে পাকিস্তান।" তাহাদিগের আকৃতি দেখিলে—ব্যবহার বিবেচনা করিলে ভয় হয়।

শুনিয়া সমীরচন্দ্র বন্ধুকে বলিলেন, "যা' ভেবেছিলাম, তা'ই; একটা হাঙ্গামা না বাধিয়ে এরা ছাড়বে না। কনষ্টেবলের কথায় তা' বুঝেছি। এখন আত্মরক্ষার উপায় করতে হ'বে।"

বন্ধু বলিলেন, "কি নিয়ে আত্মরক্ষা করা যা'বে ?"

"পাড়ায় পাড়ায় দল গড়তে হ'বে। বাঙ্গালীর ছেলে ভীরু নহে। তা'র প্রমাণ ত অনেক পেয়েছ। তবে তাদের নায়ক হ'বার লোকের অভাব। তা'দের ভুলাবার চেষ্টা হয়েছে যে, অহিংসা ও নির্ব্বৈরই শ্রেষ্ঠ। অহিংসা ও নির্ব্বৈর যত বড়ই কেন হ'ক না, সে গৃহীর জন্য নহে। গৃহীর ধর্ম্ম স্বামী বিবেকানন্দের মতে—কেহ গালে এক চড় মারলে দশ চড় ফিরিয়ে দিতে হ'বে। যা'রা ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছে, তা'রা স্বামী বিবেকানন্দের আর বঙ্কিমচন্দ্রের মন্ত্রে দীক্ষিত ছিল।"

"ও সব কথা বলতে ভাল, শুনতেও ভাল; কিন্তু কাজের সময় দুষ্কর ব্যাপার।"

"সে বিষয় কাল আলোচনা করব।"

পরদিনই সমীরচন্দ্র নিজ বাসপল্লীতে লোককে সতর্ক করিয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, যদি প্রয়োজন হয়, সকলে যেন তাঁহার গৃহে সম্মিলিত হয়েন—তথায় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে।

তাহার পরে তিনি অনুকূলচন্দ্রের গৃহে যাইয়া প্রথমেই ব্রজ[illegible] বাবুকে ডাকাইয়া অবস্থা বুঝাইয়া বলিলেন, যদি প্রয়োজন হয়, তাঁহারা যেন অনুকূলচন্দ্রের গৃহে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহার পরে তিনি পল্লীর অন্যান্য লোককেও অবস্থা বুঝাইয়া তরুণদিগকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন।

বিপদ যে হইতে পারে, বৃদ্ধরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—তাঁহারা শান্তিতেই অভ্যস্ত। কিন্তু তরুণরা উৎসাহ-সহকারে দলবদ্ধ হইয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল।

উভয় পল্লীতেই কাহারও কাহারও বন্দুক ছিল। সেগুলি ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখাও হইল। বিপদের সম্ভাবনা হইলে কিরূপ সঙ্কেত করা হইবে—কিরূপ আলোক জ্বালিয়া দেওয়া হইবে, তাহারও ব্যবস্থা করা হইল।

সমীরচন্দ্র নিজ গৃহে এক জন বন্দুকধারী গুর্খা প্রহরী ও দুই জন গুর্খা দ্বারবান এবং অনুকূলচন্দ্রের গৃহে এক জন বন্দুকধারী গুর্খা প্রহরী ও দুই জন গুর্খা দ্বারবান রাখিলেন।

১৩ই আগষ্ট কাটিয়া গেল।

১৪

সমীরচন্দ্র যাহা লক্ষ্য করিলেন এবং যাহা মনে করিলেন কলিকাতার শতকরা ৯০ জন লোক তাহা লক্ষ্যও করিল না—তাহা মনেও করিল না। তাহারা তাহাদিগের দৈনন্দিন কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। সহরে একটা স্তব্ধভাব—বহু নূতন লোকের আগমন—মসলেম লীগের অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রা—এ সকল তাহারা আসন্ন বিপদের পূর্ব্বাভাস বলিয়া কল্পনাও করিতে পারিল না। কিন্তু কেহ কেহ তাহা বুঝিলেন; বুঝিয়া শঙ্কিত হইলেন; কিন্তু কি করিবেন, বুঝিতে পারিলেন না।

"প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" কি, সে বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট ধারণা অনেকেরই ছিল না; মসলেম লীগও তাহা অর্থাৎ তাঁহাদিগের কার্য্যপদ্ধতি ব্যক্ত করিলেন না। কেবল কোন কোন মুসলমান নেতা বলিলেন তাঁহারা হিংসা ও অহিংসা উভয়ে প্রভেদ স্বীকার করেন না। ১৬ই আগষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকিবে, ঘোষণা করা হইয়াছিল; পরে ঘোষিত হইল, সেই দিন গড়ের মাঠে মুসলমানদিগের সভা হইবে—তাহাতে পাকিস্তানের দাবী ঘোষণা করা হইবে। ১৫ই আগষ্ট পুলিস প্রত্যেক বন্দুকের হিন্দু অধিকারীকে সেই দিনই বন্দুক লইয়া লালবাজারে পুলিসের প্রধান কেন্দ্রে বন্দুক পরীক্ষার্থ যাইতে নির্দ্দেশ দিল—নির্দ্দেশ মৌখিক, লিখিত নহে। তাঁহার পল্লীতে ও অনুকূলচন্দ্রের পল্লীতে সমীরচন্দ্র বলিলেন, উদ্দেশ্য ভাল নহে—আদেশ যখন লিখিত নহে, তখন তাহা পালন করিয়া আত্মরক্ষার উপায়ে বঞ্চিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই—বন্দুকগুলি হয়ত, পরীক্ষার নামে পুলিস রাখিয়া দিবে। তিনি বলিলেন, পরদিন ছুটি—নির্দ্দেশ অমান্য করিলে সে দিন কাহাকেও পুলিস মামলা-সোপর্দ্দ করিতে পারিবে না; পরে যাহা হয়—হইবে।

১৬ই আগষ্ট প্রাতেই সহরে শোভাযাত্রা বাহির হইল—তাহাদিগের ধ্বনি "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান!" স্থানে স্থানে হিন্দুর দোকান

বলপূর্ব্বক বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টায় সজ্ঘর্ষ হইল। বাজার সে দিন বন্ধ থাকিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পুলিস বিশৃঙ্খলা নিবারণের চেষ্টা করিল না—সহরের প্রায় সকল অংশ পুলিস-শূন্য করিয়া পুলিসের লোকদিগকে গড়ের মাঠে লইয়া যাওয়া হইল—বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য নহে, তাহাতে কেহ যাহাতে বাধা দিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে।

সকাল হইতেই লরীতে মুসলমানদিগকে কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত কলকারখানাসমূহ হইতে কলিকাতায় আনা হইতে লাগিল, তাহাদিগের আহারের জন্য লঙ্গরখানা বা বিনামূল্যে খাদ্যদানের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—বোধ হয় মদ্যও যোগান হইয়াছিল। হাঙ্গামার পরে পেট্রলের দোকানে প্রধান সচিবের স্বাক্ষরিত পেট্রল দিবার ছাড় পাওয়া গিয়াছিল।

গড়ের মাঠে সভা হইল। সেই সভা কলিকাতায় মুসলেম লীগের হিন্দুদিগকে আক্রমণের সঙ্কেত। বিশৃঙ্খল মুসলমান জনতা গড়ের মাঠ হইতে লুণ্ঠন ও হত্যার জন্য চারি দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল—প্রথমেই বন্দুকের দোকানের দ্বার ভাঙ্গিয়া বন্দুক ও টোটা প্রভৃতি সংগ্রহ করিল; লাঠি, ডাণ্ডা, বর্শা, ছোরা, এ সকল পূর্ব্বেই সংগৃহীত হইয়াছিল। রাত্রির অন্ধকার ব্যাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সহরে গুণ্ডারাজের অত্যাচার আরম্ভ হইল।

নিরস্ত্র, অসহায়, অপ্রস্তুত অসঙ্ঘবদ্ধ হিন্দুরা কলিকাতায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত আক্রমণে বিব্রত হইয়া পড়িল। সহরে প্রহার, লুণ্ঠন, হত্যা অবাধে চলিতে লাগিল—মানুষের মধ্যে যে পশু থাকে সে প্রবল হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল—তাহাকে বাধাদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। লোক কি করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

যে অত্যাচার ও অনাচার গড়ের মাঠের সভাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইল, তাহা কলিকাতার দক্ষিণ ও উত্তর উভয় অংশেই ব্যাপ্তিলাভ করিতে লাগিল—তাহাই স্থির ছিল। পথে পথে উচ্ছৃঙ্খল মুসলমান জনতা শোভাযাত্রা করিয়া লুণ্ঠন ও হত্যায় প্রবৃত্ত হইল। যেমন ব্যাঘ্র এক বার রক্তের স্বাদ পাইলে উগ্র হয়, তেমনই তাহাদিগের লুণ্ঠনের ও হত্যার আগ্রহ লুণ্ঠিত দ্রব্যলাভের ও রক্তপাত দর্শনের ফলে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এইরূপ আক্রমণের জন্য অপ্রস্তুত হিন্দুরা প্রথম আঘাতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল—প্রথম দিন অনেক স্থলেই তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিল না—সে জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিল না—প্রতিশোধ লওয়া ত পরের কথা! তবে সমীরচন্দ্রের চেষ্টায় তাঁহার বাস-পল্লীতে ও অনুকূলচন্দ্রের বাস-পল্লীতে লোক সতর্ক হইয়াছিল। তাঁহার বাসপল্লীতে তরুণরা "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" আরম্ভ-সংবাদ পাইয়াই পথের দুই প্রান্তে রক্ষার ব্যবস্থা করিল। যে পল্লীতে অনুকূলচন্দ্রের গৃহ অবস্থিত তাহাতে একটি পুরাতন শিবমন্দির ছিল। সে পল্লীতে তাহাই মুসলমানদিগের আক্রমণের লক্ষ্য হইল। মুসলমান জনতা যখন "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" ধ্বনি করিতে করিতে সেই পথে প্রবেশ করিল, তখন প্রায় সকল গৃহের দ্বার রুদ্ধ হইল—পূর্ব্বব্যবস্থানুসারে কোন কোন গৃহের লোক অনুকূলচন্দ্রের গৃহে আসিয়া আশ্রয় লইলেন—অনেকেই কিন্তু পাছে গৃহ লুণ্ঠিত হয় সেই ভয়ে আপনাদিগের গৃহত্যাগ না করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিবার চেষ্টা করিলেন।

পল্লীর তরুণ দল প্রস্তুত হইয়া আসিবার পূর্ব্বেই আক্রমণকারীরা পথে অনেক দূর অগ্রসর হইল—কয়টি গৃহের দ্বার বলে ভাঙ্গিয়া ফেলিল—লুণ্ঠন আরম্ভ হইল—নারীর অবমাননাও হইতে লাগিল। সেই দুষ্কৃতকারী জনতা যখন অনুকূলচন্দ্রের গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল—তখন ব্রজবল্লভ বাবু, তাঁহার পত্নী, অপরাজিতা ও শিশুবালা সভয়ে গৃহ হইতে পথ পার হইয়া দ্রুতপদে অনুকূলচন্দ্রের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন। নারীদিগকে দেখিয়া জনতা তাঁহাদিগকে আক্রমণের চেষ্টা করিল—শিশুবালা ভয়ে ফিরিয়া যাইয়া গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিল। ব্রজবল্লভ বাবু ও তাঁহার পত্নী অনুকূলচন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করিলেন—কিন্তু অপরাজিতা প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই জনতার কতকগুলি লোক তাহাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। অবস্থা বুঝিতে তরুণকুমারের বিলম্ব হইল না। সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া ছুটিয়া যাইয়া চক্ষুর নিমিষে অপরাজিতাকে তাহার সবল বাহুতে তুলিয়া লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

কিন্তু সম্মুখ হইতে শিকার পলাইলে নেকড়ে বাঘ যেমন উগ্র হয় আক্রমণকারীরা তেমনই হইল। অপরাজিতাকে বাহুতে লইয়া তরুণকুমার নিজ গৃহের দ্বার অতিক্রম করিয়া যখন গৃহে প্রবেশ করিবে, তখন একখানি ছুরিকা তাহার বাম বাহুমূলে বিদ্ধ হইল। আক্রমণকারী ছুরিকা টানিয়া লইয়া পুনরায় আঘাত করিবার পূর্ব্বেই লৌহদ্বার রুদ্ধ হইল—সঙ্গে সঙ্গে রক্ষী নেপালীর বন্দুক হইতে গুলী ছুটিল। ক্রুদ্ধ জনতা স্তম্ভিত হইল বটে, কিন্তু নিবৃত্ত হইল না।

তাহারা লৌহবৃতি অতিক্রম করিয়া গৃহ আক্রমণের চেষ্টা করিল। তরুণকুমারের ব্যবস্থায় বৃতিতে তার জড়াইয়া তাহাতে বিদ্যুতের সঞ্চার-ব্যবস্থা করা ছিল—যে বৃতিতে হাত দিল সে-ই তড়িতস্পর্শে পিছাইয়া আসিল। ততক্ষণে পল্লীর তরুণরাও সমবেত ভাবে অগ্রসর হইল—নেপালী রক্ষীর বন্দুক হইতেও আবার গুলী ছুটিতে লাগিল।

জনতা পলায়নপর হইল এবং গুর্খা প্রহরীরা কুক্‌রী আস্ফালন করিয়া তাহাদিগের দিকে অগ্রসর হইল।

জনতার কতকাংশ ব্রজবল্লভ বাবুর ও অন্য কয়টি বাড়ীর রুদ্ধ দ্বারে পেট্রল দিয়া অগ্নিযোগ করিয়াছিল—সেগুলির অগ্নির আলোক সমগ্র স্থানটিতে ব্যাপ্ত হইতেছিল। পল্লীর তরুণরা কেহ কেহ সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে ব্যস্ত হইল।

তরুণকুমার আপনার গৃহে প্রবেশ করিয়া অপরাজিতাকে নামাইয়া দিয়া আপনি ফিরিয়া দ্বারের দিকে যাইবার সময় অবসাদ অনুভব করিল এবং বসিয়া পড়িল। তখন সে ক্ষতমুখে রক্তপাতে অবসন্ন হইয়াছে। তাহার সংজ্ঞালোপ হইল। তাহার অবস্থা অপরাজিতা লক্ষ্য করিল এবং শঙ্কিত ভাবে পার্শ্বে দণ্ডায়মান অনুকূলচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার কোথায় পাওয়া যা'বে?"

অনুকূলচন্দ্র পুত্রের অবস্থা দেখিলেন। তিনি বিপদে হতবুদ্ধি না হইয়া, পুত্রকে হাসপাতালে লইয়া যাইবার আয়োজন করিলেন—যানচালককে অবিলম্বে গাড়ী বাহির করিতে বলিলেন।

সে দিন সাগরিকা চিত্রলেখার গৃহে গিয়াছিল—সন্ধ্যার পরে তাহার ফিরিবার কথা। কাজেই গৃহে ভৃত্যরাই ছিল। তিনি তাহাদিগকে সাবধান থাকিতে বলিয়া যাত্রার আয়োজন করিলেন। ততক্ষণে, তরুণকুমার শুইয়া পড়িয়াছে—অপরাজিতা তথায় বসিয়া তাহার মস্তক অঙ্কে তুলিয়া লইয়াছে।

যখন ধরাধরি করিয়া কয় জন তরুণকুমারকে গাড়ীতে তুলিল, তখন আহূত না হইলেও অপরাজিতা অনুকূলচন্দ্রের সঙ্গে যাবেন উঠিয়া বসিল। তখনও তরুণকুমারের ক্ষতমুখে রক্ত বাহির হইতেছে—সে রক্তে অনুকূলচন্দ্রের ও অপরাজিতার পরিধেয় রঞ্জিত হইয়া গেল।

অনুকূলচন্দ্র সমীরচন্দ্রকে টেলিফোনে ঘটনা জানাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—সাড়া পাওয়া যায় নাই।

অনুকূলচন্দ্রের যান যখন যথাসম্ভব দ্রুত অগ্রসর হইয়া মেডিকেল কলেজের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল, তখন তথায় কেবল আহতগণ আনীত হইতেছে—বহু আহত তখনও নীত হয় নাই।

তরুণকুমারকে রোগীর শয্যায় শয়ন করাইয়া ডাক্তার তাহার অবস্থা পরীক্ষা করিলেন—ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া রক্তপাত বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়া সহকারীকে একটি "ইন্‌জেকশন" আনিতে বলিলেন। অনুকূলচন্দ্র ও অপরাজিতা শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। "ইন্‌জেকশন" শেষ করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "রক্তপাতে দুর্ব্বল হইয়াছে—দেহে রক্ত দিতে পারিলে ভাল হয়। কে দিতে পারে?"

একই সময়ে অনুকূলচন্দ্র ও অপরাজিতা বলিলেন, "আমি।"

ডাক্তার উভয়ের দিকে চাহিলেন—উভয়েই সুস্থ ও সবল, কিন্তু অনুকূলচন্দ্র প্রৌঢ়—অপরাজিতা তরুণী। তিনি অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি রক্ত দিতে পারিবেন?"

"হাঁ"—বলিয়া অপরাজিতা রোগীর শয্যার আরও নিকটে আসি[য়া] দাঁড়াইল।

ডাক্তার ও তাঁহার সহকারী যথাসম্ভব দ্রুত সব ব্যবস্থা ক[রিয়া] অপরাজিতার দেহ হইতে তরুণকুমারের দেহে আবশ্যক পরিমাণ র[ক্ত] দিলেন। ততক্ষণে তরুণকুমারের ক্ষত হইতে রক্তপাত বন্ধ হইয়াছে।

তখন হাসপাতালে আহতদিগের সংখ্যা অনেক হইয়াছে—চারি দিকে কলরব। মনে হইতেছিল, হাসপাতালে স্থানা[ভাব] অনিবার্য্য। কর্তৃপক্ষ কি কর্তব্য তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। [যে] ডাক্তার তরুণকুমারের চিকিৎসা করিতেছিলেন—তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া যাইলেন; যাইবার পূর্ব্বে অনুকূলচন্দ্রকে বলিয়া যাইলেন, এ[খন] আর কিছু করিবার দরকার নাই; রোগী ঘুমাইবে। তবে রক্ত দি[তে] যে বিলম্ব হয় নাই, তাহাতে মনে হয়, কোন বিপদ ঘটিবে না।

তিনি শুশ্রূষাকারিণীকে আবশ্যক উপদেশ দিলেন। তিনি অপরাজিতা রক্তদানের পরে তাহার বসিবার জন্য চেয়ার আনাইয়া দিয়াছিলেন—যাইবার সময় ভৃত্যকে ডাকিয়া অনুকূলচন্দ্রের জন্য একখানি চেয়ার দিতে বলিয়া গেলেন।

কিন্তু আনীত আহতের সংখ্যা দ্রুত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এক জন কর্ম্মচারী আসিয়া অনুকূলচন্দ্র ও অপরাজিতাকে বলি[লেন] তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে হইবে—আরও আহতদের জন্য ব্যব[স্থা] করিতে হইবে। অনুকূলচন্দ্র পুত্রের জন্য একটি স্বতন্ত্র ঘর ল[ইতে] চাহিলেন—কর্ম্মচারী বলিলেন, তাহা হইতে পারে না। অনুকূলচ[ন্দ্র] বলিলেন, তিনি নির্দ্দিষ্ট টাকা দিবেন। কর্ম্মচারী নিম্নস্বরে বলিলেন, যে কয়টি ঘর শূন্য আছে, সে কয়টি শূন্য রাখিবার জন্য নির্দ্দেশ আছে—যদি কোন প্রয়োজন হয়, প্রধান সচিব সেগুলিতে আহত লইতে বলিলেন—হয়ত তাঁহার লোক আহত হইবে। তবুও অনুকূলচন্দ্র স্থান ত্যা[গ] করিলেন না। কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টা পরে তাঁহাকে বলা হই[ল] তাঁহাদিগকে যাইতেই হইবে।

ততক্ষণে সমীরচন্দ্র আসিয়াছেন। তিনি যখন টেলিফোনে অনুকূলচন্দ্রকে জানাইবার চেষ্টা করেন, অবস্থা যেরূপ তাহাতে সাগরিকাকে সে দিন আর পাঠাইবেন না, তখন টেলিফোনে সা[ড়া] পাওয়া গেল না। তাঁহার সন্দেহ হইল—এ কি? তাহার প[র] যখন তিনি জনরব শুনিলেন, কোন্ কোন্ পল্লী আক্রান্ত হইয়াছে—তখন তাঁহার সন্দেহ আশঙ্কায় পরিণত হইল। সকল বিপদ-সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করিয়া তিনি দ্রুত যান চালাইয়া অনুকূলচন্দ্রের গৃহে গমন করিলেন—পথে দুই স্থানে তাঁহার যান আক্রমণের চেষ্টা হইল।

তিনি যখন অনুকূলচন্দ্রের গৃহে উপনীত হইয়া ব্রজবল্লভ বাবু[র] নিকট ঘটনার বিবরণ শুনিলেন ও তরুণকুমার যে স্থানে শুই[য়া] পড়িয়াছিল, তথায় শ্বেত মর্ম্মরের উপর রক্তের চিহ্ন দেখিলেন, তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া হাসপাতালে চলিলেন।

পথে বহু বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি যখন হাসপাতালে উপনীত হইলেন, তখন হাসপাতাল-প্রাঙ্গণ গাড়ীতে এ[বং] হাসপাতাল আহতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে—আর কেবলই গা[ড়ী] আহত লইয়া আসিতেছে। বহু কষ্টে—অর্থব্যয় করিয়া তিনি তরুণকুমারের সন্ধান পাইলেন। এক জন কেরাণী তাঁহাকে তাহা[র] শয্যার সন্ধান দিয়া তথায় আনিলেন।

তখন অনুকূলচন্দ্র বাধ্য হইয়া অপরাজিতাকে লইয়া হাসপাতা[লে]

যোগের আয়োজন করিতেছিলেন। সমীরচন্দ্র সব শুনিলেন; বলিলেন, যখন উপায় নাই, তখন যাইতেই হইবে।

তিন জন একই যানে হাসপাতাল-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিলেন—অপর যান সঙ্গে আসিতে বলিলেন। ততক্ষণে সহরের অবস্থা আরও ভয়াবহ হইয়াছে—পথগুলি পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার লীলাক্ষেত্র হইয়াছে। কোন কোন স্থানে পথিপার্শ্বে গৃহ জ্বলিতেছে। কোথাও কোথাও পথের উপরে শব পতিত। কোথাও কোথাও লোক আক্রান্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। কোন কোন গৃহ হইতে নারীকণ্ঠে চীৎকার-রব শ্রুত হইতেছে। মানুষের মধ্যে যে পিশাচ থাকে, সে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—সভ্যতার স্ফটিকস্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া অর্দ্ধসিংহ-অর্দ্ধনরাকার বর্ব্বরতা—নৃসিংহমূর্ত্তিরূপে দেখা দিয়াছে। পথে পুলিস নাই। কিন্তু স্থানে স্থানে সংঘর্ষে তাঁহারা বুঝিলেন, অধিকাংশ পল্লীতে লোক অপ্রত্যাশিত ও অতর্কিত আক্রমণজনিত স্তম্ভিত ভাব ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার্থ সমবেত ভাবে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। সমীরচন্দ্র তাহা সুলক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

বহু বাধা অতিক্রম করিয়া যান দুইখানি আসিয়া অনুকূলচন্দ্রের গৃহদ্বারে উপনীত হইল। সকলে অবতরণ করিলেন।

অনুকূলচন্দ্র সমীরচন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি বাড়ী যাও—সকলে ব্যস্ত হইয়া আছে।"

১৫

পল্লীর তরুণরা ব্রজবল্লভ বাবুর গৃহের দ্বারের অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার পরেও যখন সে দ্বার মুক্ত হয় নাই, তখন অনন্যোপায় হইয়া তাহারা দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। শিশুবালা কোনরূপে গৃহমধ্যে ফিরিয়া যাইয়া দ্বার বন্ধ করিয়াই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। তরুণরা তাহাকে সেই অবস্থায় অনুকূলচন্দ্রের গৃহে আনিয়া সেবার ব্যবস্থা করিলে কিছুক্ষণ পরে তাহার জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছিল।

তরুণগণ আসিবার পরে—আক্রমণকারীরা পলায়ন করিলে অনেকেই যে যাহার গৃহে ফিরিয়া গিয়াছিলেন—জীবনের মায়া যত প্রবলই কেন হউক না, গৃহস্থের পক্ষে সম্পত্তির মায়া অল্প প্রবল নহে। ব্রজবল্লভ বাবু ও তাঁহার পত্নী কন্যার প্রত্যাবর্ত্তন-প্রতীক্ষায় অনুকূলচন্দ্রের গৃহেই ছিলেন। অনুকূলচন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া সব শুনিয়া বলিলেন, তিনি পথে যে অবস্থা দেখিয়াছেন, তাহাতে পুনরায় আক্রমণের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত নহে; সুতরাং ব্রজবল্লভ বাবুর পক্ষে ভগ্নদ্বার গৃহে ফিরিয়া যাওয়া সুবিবেচনার কাজ হইবে না। ব্রজবল্লভ বাবু সেই পরামর্শই গ্রহণ করিলেন।

অনুকূলচন্দ্র অধ্যাপক-পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তিনি যেন—যাঁহারা সে গৃহে রহিলেন, তাঁহাদিগের সব ব্যবস্থা করিতে ভৃত্যদিগকে আবশ্যক উপদেশ দেন—বাড়ীতে ত আর কেহই নাই। তিনি অপরাজিতার পরিধেয়ে রক্তচিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছিলেন; তাহাকে বলিলেন, "মা, তুমি স্নান ক'রে ফেল। ঝিকে বল স্নানের ঘর দেখিয়ে দেবে; সাগরিকার কাপড় এনে দেবে।"

অধ্যাপক-পত্নী শিশুবালাকে—তাঁহার গৃহ হইতে অপরাজিতার বস্ত্রাদি আনিয়া দিতে নির্দ্দেশ দিলেন।

স্নান শেষ করিয়া অপরাজিতা আপনাকে শ্রান্ত বোধ করিতে লাগিল—দেহেও বটে, মনেও বটে। রক্ত দিয়া সে কিছু দুর্ব্বল হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মানসিক শ্রান্তির তুলনায় দৈহিক শ্রান্তি উপেক্ষণীয়। তাহার গৃহে তাহার বসিবার ঘরের সম্মুখে পথের পরপারে যে ঘরে তরুণকুমার বসিয়া থাকে, অনুকূলচন্দ্র তাহাকে সেই ঘরে আনিয়া বলিয়া যাইলেন, "খাবার প্রস্তুত হ'তে, বিলম্ব হ'বে। ততক্ষণ তুমি কোন বহি বা কাগজ পড়।"

সেই বিপদের মধ্যেও অনুকূলচন্দ্র অতিথি-সৎকারের আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন। হয়ত তাহা দারুণ দুশ্চিন্তা হইতে কতকটা অব্যাহতি লাভের জন্যও বটে।

সেই ঘরে অপরাজিতা একখানি চেয়ারে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটিয়া গেল, সে সব কি সত্য?—না দুঃস্বপ্ন? অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঘটনার কি বাহুল্য! যেন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু বিশ্বাস না করিয়াও উপায় নাই।

পথে পল্লীর তরুণদল দলবদ্ধ হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে—অপরিচিত ব্যক্তি দেখিতে পাইলেই শত্রু মনে করিয়া "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিতেছে। একাধিক বার আক্রমণকারীরা আসিয়া পলাইয়া গেল।

অপরাজিতা উঠিয়া বারান্দায় গেল। পথে আলো জ্বালিবার লোকরা আলো জ্বালিতে আইসে নাই বটে, কিন্তু পল্লীর তরুণরা আলোগুলি জ্বালিয়া দিয়াছিল। অপরাজিতা দেখিতে পাইল, সম্মুখে তাহাদিগের গৃহের দ্বার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—গৃহ অন্ধকার। কেবল তাহার বসিবার ঘরে আলো জ্বলিতেছে—বোধ হয়, তাহার বস্ত্রাদি লইয়া আসিবার সময় শিশুবালা আলোক নির্ব্বাপিত করে নাই।

অপরাজিতার মনে হইতে লাগিল, ঐ কক্ষে বসিয়া সে কত বার তরুণকুমারকে দেখিতে পাইয়াছে এবং তাহাকে দুর্ব্বল মনে করিয়া শ্রদ্ধার অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে। সে যে কেবল ভুলই করে নাই, পরন্তু অপরাধও করিয়াছে, আজ সে অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাহা বুঝিয়াছে। সে অন্যায় করিয়াছে। কত সাহস থাকিলে—বিপন্নের প্রতি কত দয়ায় মানুষ আপনার জীবন তুচ্ছ করিয়া বিপন্নের উদ্ধার সাধন করিতে যাইতে পারে তাহা ভাবিয়া আজ অপরাজিতা বিস্মিতা হইতেছিল—তাহার মন শ্রদ্ধায় নত হইতেছিল। উন্মত্ত জনতা যখন তাহাকে ধরিতে উদ্যত তখন—অজগরের মুখ হইতে মানুষকে ছিনাইয়া আনিবার মত—যে ভাবে তরুণকুমার তাহাকে তাহার সবল বাহুতে তুলিয়া লইয়া নিরাপদ স্থানে আনিয়াছিল, তাহা কল্পনারও অতীত। সে যেন তখনও তাহার সবল বাহুর সেই স্পর্শ অনুভব করিতেছিল। সে তরুণকুমারের কে যে তাহার জন্য তরুণকুমার বিপদ তুচ্ছ করিয়াছে—বিপন্ন হইয়াছে?

অসীম প্রশংসায় ও শ্রদ্ধায় যখন তাহার মন পূর্ণ তখনই তাহাতে আশঙ্কা-চাঞ্চল্য দেখা দিল—সে যে অবস্থায় তরুণকুমারকে হাসপাতালে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাতে সে যে আরোগ্য লাভ করিবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? যদি সে আরোগ্য লাভ না করে, তবে কি তাহার জন্য অপরাজিতাই দায়ী হইবে না? সে কি কখন আপনাকে ক্ষমা করিতে পারিবে?

অপরাজিতার বক্ষের মধ্যে যেন ক্রন্দনবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

অপরাজিতা বারান্দা হইতে কক্ষে ফিরিয়া আসিল। তরুণকুমারের টেবলের উপর একখানি বাঁধান খাতা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহার উপর লিখা—"প্রবন্ধ, লেখক তরুণকুমার দত্ত।" অকারণ কৌতূহলবশে অপরাজিতা খাতাখানির মলাট উল্টাইল। প্রথম প্রবন্ধটি দেখিয়াই সে চমকিয়া উঠিল। কলেজে ধর্ম্মঘটের দিন সে যে প্রবন্ধ ভিত্তি করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিল—সেই প্রবন্ধ। তাহার পরে সে যত পাতা উল্টাইতে লাগিল, ততই দেখিতে লাগিল—সে যে সকল প্রবন্ধ হইতে সমাজ ও সমাজে নারীর অধিকার সম্বন্ধে মত গঠিত করিয়াছে, সেই সব—তরুণকুমারের রচনা! ইংরেজীতে তরুণের নামের বানান—বিপরীত দিক হইতে পড়িলে যাহা হয়, তাহাই তরুণকুমার ছদ্মনামরূপে গ্রহণ করিয়াছে।

অপরাজিতা ভাবিল, সে কাহার সম্বন্ধে মনে অশ্রদ্ধা পোষণ করিয়াছে! তাহার চক্ষুতে অশ্রু দেখা দিল।

তরুণকুমারের—হাসপাতালে শয্যায় শায়িত সংজ্ঞাহীন তরুণকুমারের মুখ সে কেবলই মনে করিতে লাগিল। সে মুখে কি স্নিগ্ধ ভাব—তাহাতে বেদনার চিহ্নমাত্র নাই।

অপরাজিতা যত ভাবিতে লাগিল, ততই আপনার ভুলের জন্য আপনাকে অপরাধী মনে করিতে লাগিল—মাতার নিকট সে তরুণকুমারের সম্বন্ধে যে অশ্রদ্ধাব্যঞ্জক মত প্রকাশ করিয়াছিল, তাহার জন্য লজ্জানুভব করিতে লাগিল। মা কি মনে করিয়াছেন? যখন সে সেই মত প্রকাশ করিয়াছিল, তখন শিশুবালা তথায় ছিল। সে হয়ত চিত্রলেখার মতানুসারেই তাহার মাতার নিকট প্রস্তাব করিয়াছিল। যদি তাহাই হয়? আর—সে যে মত প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা শিশুবালা চিত্রলেখাকে জানাইয়া দেয় নাই ত? আর—আর—তাহা কোনরূপে তরুণকুমার জানিতে পারে নাই ত? মুখের কথা এক বার বাহির হইলে—নিক্ষিপ্ত তীরেরই মত তাহা আর ফিরাইয়া লওয়া যায় না। এখন সে কি করিবে—কি করিতে পারে? ভুল সংশোধন করা যায়—অপরাধ ক্ষমা ব্যতীত প্রক্ষালিত হয় না। সে কি ক্ষমা পাইবার উপযুক্ত?

সে এখন কি করিবে, সেই চিন্তাই অপরাজিতাকে পীড়িত করিতে লাগিল। সে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

অপরাজিতার মাতা আসিয়া তাহাকে ডাকিলেন—আহার প্রস্তুত। আহার করিতে অপরাজিতার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তাহার যে ক্রন্দন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, পাছে তাহার কণ্ঠস্বরে তাহার মাতা তাহা বুঝিতে পারেন—সেই ভয়ে সে কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তাহার মাতা বলিলেন, "চল। এই বিপদের মধ্যেও অনুকূল বাবু নিজে সকলের আহারের আয়োজন করিয়েছেন, না খেলে তিনি দুঃখিত হ'বেন।"

কোন কথা না বলিয়া অপরাজিতা মাতার অনুসরণ করিল।

যাঁহারা সে গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইতে সাহস করেন নাই, তাঁহাদিগের সকলেরই জন্য আহারের আয়োজন হইয়াছিল। তবে তরুণকুমারের মাতার মৃত্যুর পর হইতে বাড়ীর ঝি-চাকররাই—চিত্রলেখার উপদেশে ও নির্দ্দেশে—কাজ করিয়া শিক্ষিত হইয়াছিল। তাহারা অনুকূলচন্দ্রের আজ্ঞা লইয়া সব আয়োজন করিয়াছিল।

সকলকে আহারে বসাইয়া অনুকূলচন্দ্র বলিলেন, "আমি শোবার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। দেখুন, এ গৃহিণীশূন্য গৃহ—অনেক ত্রুটি হ'বে; অপরাধ নিবেন না।"

ব্রজবল্লভ বাবু বলিলেন, "অপরাধ আমরাই করছি। আজ আপনার উৎকণ্ঠা আমরা অনুমান করতে পারি। তবুও যে আমরা আপনাকে বিরক্ত করছি, সেই অত্যাচারের জন্য আমরা অপরাধী; আর আপনি যে সে অত্যাচার সহ করছেন, তা'তে আপনার মনুষ্যত্বই প্রকাশ পায়।"

অনুকূলচন্দ্র বলিলেন, "মানুষ যদি মানুষের বিপদে আপদে সেবা না করবে, তবে সে মানুষ কেন?"

"কিন্তু আপনার বিপদ যে কি, তা' আমরা বুঝি।"

"আশীর্ব্বাদ করুন, তরুণ সেরে উঠুক। তা'র কাজে আমার, আমার বংশের গৌরব হয়েছে—" বলিতে বলিতে পুত্রের অবস্থা স্মরণ করিয়া অনুকূলচন্দ্রের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

আহারের পরে অনেকেই স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন; কারণ পল্লীর তরুণরা তখন পল্লীরক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। যাঁহারা রহিলেন, ব্রজবল্লভ বাবু, তাঁহার পত্নী ও অপরাজিতা তাঁহাদিগের কয় জন। ব্রজবল্লভ বাবুর গৃহদ্বার ভগ্ন বলিয়া অনুকূলচন্দ্রই তাঁহাকে সে গৃহে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

অপরাজিতা আহারের পরে তরুণকুমারের ঘরেই ফিরিয়া আসিয়াছিল—ঘরে যে কৌচ ছিল, তাহাতে বসিয়াছিল। বিপদের উৎকণ্ঠার পরে অবসাদ অনুভব করিতে করিতে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। যাহারা সুস্থ—তাহাদিগের এমনই হয়।

ব্রজবল্লভ বাবুর সঙ্গে অনুকূলচন্দ্র অপরাজিতাকে শয়নজন্য যাইতে বলিতে আসিয়া যখন দেখিলেন—সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—যেন দিনান্তে প্রস্ফুটিত পদ্মফুল মুদিতপ্রায়দলে শোভা পাইতেছে, তখন তিনি মৃদুস্বরে ব্রজবল্লভ বাবুকে বলিলেন, "আহা—একে উৎকণ্ঠা, তা'তে আবার রক্ত দিয়াছে—শ্রান্ত ও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। ঐ স্থানেই ঘুমাক—আর ডেকে কাজ নাই।" তাঁহার নির্দ্দেশে ভৃত্য কৌচের উপর—নিদ্রিতা অপরাজিতার পার্শ্বে উপাধান রাখিয়া গেল।

অনুকূলচন্দ্র ঘরের আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া দিলেন—ভিতরের বারান্দায় আলো জ্বালা থাকিল।

অপরাজিতা ঘুমাইতে লাগিল।

আগন্তুকদিগের আহারের পরে তাঁহাদিগের শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া অনুকূলচন্দ্র যখন নিজ কক্ষে গমন করিলেন, তখন ভৃত্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—তাঁহার আহার্য্য দিবে কি? তিনি বলিলেন, "না; তোমরা সব খেয়ে শুয়ে পড়—বড় পরিশ্রম করেছ।"

ভৃত্য চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরে একটি গ্লাসে সরবৎ আনিয়া প্রভুকে বলিল, "এইটুকু খেয়ে ফেলুন, বাবা!"

অনুকূলচন্দ্র তাহাই করিলেন।

সে গৃহে দাসদাসী সকলেই উৎকণ্ঠিত—তাহারা আপনাদিগকে প্রভুর ব্যবহারগুণে তাঁহার পরিবারভুক্ত বলিয়াই বিবেচনা করিত—প্রভুর বিপদ তাহারা আপনাদিগের বিপদ মনে করিত।

সে রাত্রিতে অনুকূলচন্দ্র ঘুমাইতে পারিলেন না। দুশ্চিন্তার

তিনি যেন বৃশ্চিকদংশন-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। কি হইবে কে বলিতে পারে? তাঁহার মনে সাহস উদিত হইতে না হইতে আশঙ্কার অন্ধকার তাহা নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতেছিল। তিনি বিপত্নীক,—তাঁহার দুই কন্যা ও এক পুত্র; কন্যাদ্বয়ের বিবাহ দিবার পরে তাঁহার সমগ্র স্নেহ ও মনোযোগ পুত্র তরুণকুমারেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। পুত্রের জন্য তিনি গর্ব্বিত। সেই পুত্র আজ জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে! তিনি যে আজ তাহার শয্যাপার্শ্বে থাকিতে পারিলেন না—তাহার সংবাদও লইতে পারিতেছেন না, এই দুঃখ তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল। সে অবস্থায় নয়নে নিদ্রার স্পর্শানুভব হয় না—হইতে পারে না। আহত—রক্তপাতে দুর্ব্বল—সংজ্ঞাশূন্য পুত্রের মুখচ্ছবি কেবলই তাঁহার সম্মুখে ভাসিতেছিল।

পথে মধ্যে মধ্যে দূরে "আল্লা হো আকবর" এবং নিকটে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি শ্রুত হইতেছিল—দূরে মুসলমানদিগের আক্রমণ-চেষ্টার পরিচয় পাইয়া পল্লীর তরুণগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পল্লীরক্ষার আয়োজন করিতেছিল।

এক বার সেই ধ্বনিতে অপরাজিতার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে বার ধ্বনি উচ্চ—মুসলমান দল পল্লীর পথে অগ্রসর হইয়াছিল; তাহাদিগকে যে তরুণকুমার যখন আহত হয় তখন পলাইতে হইয়াছিল এবং প্রহরীর গুলীতে ও নেপালী রক্ষীদিগের আক্রমণে তাহাদিগের কয় জন আহত হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহারা দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিল। পল্লীর তরুণরা যেন যুদ্ধের আগ্রহে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল—তাহারা অগ্রসর হইল—সঙ্গে সঙ্গে অনুকূলচন্দ্রের গৃহের প্রহরীর বন্দুকের গর্জ্জন শুনা গেল। মুসলমানরা পলায়নপর হইল।

অপরাজিতা দেখিল, ঘড়ীতে তখন ২টা বাজিয়াছে। সে যে সেই স্থানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সে লজ্জিতা হইল।

সে দেখিল, কে তাহার পার্শ্বে উপাধান রাখিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, অনুকূল বাবু। বিষম বিপদের সময়েও তাঁহার স্থির ভাব ও অতিথি-সৎকারের আগ্রহ যে মানুষে সম্ভব তাহা অপরাজিতা পূর্ব্বে ধারণা করিতেও পারে নাই। তরুণকুমার উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র!

সে দেখিল, উপাধানের পার্শ্বে একখানি কাগজে জড়ান কি রহিয়াছে। সে ঘরের আলো জ্বালিয়া সেই কাগজমোড়া জিনিস দেখিল। তাহারই কাপড়, সেমিজ, জামা—রক্তে রঞ্জিত। অনুকূলচন্দ্রই বলিয়া দিয়াছিলেন, কাপড় প্রভৃতি যেন কাচা না হয়—হয়ত পুলিস সাক্ষ্য হিসাবে চাহিবে। সে সেগুলি স্নানের ঘরে ভাঁজ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। হয়ত তাহার মাতাই সেগুলি কাগজে মুড়িয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন।

অপরাজিতা ভাবিতে লাগিল—তাহার বস্ত্রে এই যে রক্ত—ইহা বীরের রক্ত—পূজার রক্তচন্দনের মত পবিত্র। সে যখন মনে করিল, এ রক্ত তাহার রক্ষার জন্য ব্যয়িত হইয়াছে, তখন সে সে জন্য যে গর্ব্বানুভব করিল—তাহা বেদনায় প্লাবিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। সে মনে করিল—তাহার জন্য এই রক্তপাত—সে ইহার কত অযোগ্য। সে যে তরুণকুমারের জন্য রক্তদান করিয়াছিল, সে কথা সে যেন ভুলিয়া গেল—তাহার সে কাজ অতি তুচ্ছ—ত্যাগ নামের অযোগ্য।

সে শয়ন করিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। ঘুম আসিল না।

সে উঠিয়া বসিল—তরুণকুমারের টেবল হইতে যে খাতায় সে তাহার সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি আঁটিয়া রাখিয়াছিল, সেইখানি লইয়া পাঠ করিতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে সে যেন তন্ময় হইয়া গেল—আর তাহার মনে হইতে লাগিল, সে এই মানুষের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়াছে!

১৬

আশঙ্কা-দুঃসহ দীর্ঘযামা রাত্রি শেষ হইল। প্রভাত হইতে না হইতে সমীরচন্দ্র অনুকূলচন্দ্রের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, সহরে অবস্থার কোন উন্নতি লক্ষিত হয় না। তাঁহাদিগের পল্লীতেও কয় বার আক্রমণ-চেষ্টা হইয়াছে—কয় জন নিহতও হইয়াছে। চিত্রলেখা ও সাগরিকার নিকট তিনি ঘটনা গোপন করা সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই বটে, কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব ব্যক্ত করেন নাই। তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া আসিবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন; কিন্তু কিছু দূর আসিয়া গাড়ী ফিরাইয়া তাঁহাদিগকে গৃহে রাখিয়া আসিয়াছেন—আনিতে সাহস হয় নাই।

রজবল্লভ বাবু তাঁহাদিগের নিকট—স্বগৃহে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি চাহিলেন; বলিলেন, "আপনাদের এই বিপদের সময় অত্যন্ত বিরক্ত করেছি—ক্ষমা করবেন।"

অনুকূলচন্দ্র বলিলেন, "ও কথা বলবেন না। যদি যেতে চা'ন যা'ন; কিন্তু যে অবস্থা দেখছি, তা'তে বাড়ীর দ্বার যে সারাবার লোক পাবেন, এমন মনে হয় না। কাজেই অন্ততঃ রাত্রিতে এই বাড়ীতে আসবেন—কোন সঙ্কোচ বোধ করবেন না।"

অপ্রত্যাশিত ভাবে অপরাজিতা বলিল, "কিন্তু আমাকে ত হাসপাতালে যেতেই হ'বে।"

সমীরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?'

"ডাক্তার কাল বলেছিলেন, আজও হয়ত রক্ত দেওয়া প্রয়োজন হ'বে।"

সমীরচন্দ্র চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "তাই ত। কিন্তু নিয়ে যেতে আমার ভরসা হচ্ছে না।"

অপরাজিতা বলিল, "আপনারা ত যাচ্ছেন।"

"আমরা কি না যেয়ে পারি? তোমাকে হয়ত বিপদে ফেলব।"

রজবল্লভ বাবু বলিলেন, "উনি যা' বলছেন, তা'তে—"

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই অপরাজিতা বলিল, "বাবা, যে বিপদ হয়েছে, সে ত আমারই জন্য।"

অনুকূলচন্দ্র বলিলেন, "তুমি তা' মনে ক'র না। তরুণকুমার মানুষের কর্ত্তব্য করেছে—ব্যক্তিবিশেষের জন্য নহে।"

"তা' হ'লেও অপরাধ আমার।"

অনুকূলচন্দ্র ও সমীরচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন।

অপরাজিতা কাতর ভাবে বলিল, "আমাকে নিয়ে চলুন। আমি যা'ব। যদি রক্ত দিতে হয়।"

সমীরচন্দ্র বলিলেন, "তবে চল। গাড়ীতে তুমি আমাদের দু'জনের মাঝখানে একটু পিছিয়ে ব'স—যেন সহজে তোমাকে দেখতে পাওয়া না যায়।'

যাইবার সময় গৃহের প্রবেশপথে শ্বেত মর্ম্মরের উপর খানিকটা স্থান ব্যাপিয়া রক্তের চিহ্ন—তরুণকুমারের রক্ত শুকাইয়া একটু বিবর্ণ হইয়াছে। অপরাজিতা থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু সেই রক্তরঞ্জিত প্রস্তরের উপর পতিত হইল।

সমীরচন্দ্রের নির্দ্দেশে বন্দুক লইয়া প্রহরী গাড়ীতে চালকের

পার্শ্বে বসিল—গাড়ীর মধ্যে তিন জন—দুই পার্শ্বে সমীরচন্দ্র ও অনুকূলচন্দ্র, মধ্যে অপরাজিতা।

পথে দুই বার গাড়ী আক্রমণের চেষ্টা হইল—কিন্তু জনতা প্রহরীকে বন্দুক তুলিতে দেখিয়া সরিয়া গেল। সমীরচন্দ্র পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই—হয়ত বা অবনতি ঘটিয়াছে।

হাসপাতালে যাইয়া তিন জন যান হইতে অবতরণ করিয়া দ্রুত তরুণকুমারের শয্যার দিকে গমন করিলেন। হাসপাতাল আহতে পূর্ণ—আর কোন স্থান নাই। পথে ডাক্তারকে পাইয়া তাঁহারা তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন। ডাক্তার বলিলেন, "আশ্চর্য্য স্বাস্থ্য! অত রক্তপাতেও অবসন্ন হ'ন নাই। তবে কাল বড় সময়ে রক্ত দেওয়া হয়েছিল—তা'র কাজও হয়েছে বিস্ময়কর। শেষ রাত্রিতেই জ্ঞান হয়েছিল।"

সকলে যাইয়া দেখিলেন, তরুণকুমার ঘুমাইতেছে। ডাক্তার বলিলেন, "এখন জাগান হ'বে না। গোলমালে আর রাস্তার চীৎকারে ঘুমা'তে পারেন নাই। তখন সৈনিকরা এসে রাস্তায় চীৎকার বন্ধ করেছে—যে রোগের যে ঔষধ। দেখছেন না, সুস্থ হয়ে ঘুমাচ্ছেন? এটা অত্যন্ত সুলক্ষণ।"

তাহার পরে ডাক্তার বলিলেন, "আপনারা বারান্দায় অপেক্ষা করুন। অবশ্য বারান্দায়ও স্থানাভাব। আমি ঘুরে আসছি; যদি ততক্ষণে ঘুম ভাঙ্গে। নহিলে এ বেলা আর দেখা হ'বে না।"

প্রায় পনের মিনিট পরে ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "খুব ঘুমাচ্ছেন আপনারা বাড়ী যা'ন—কড়া হুকুম, ভীড় করা হ'বে না।"

অগত্যা সকলে অনিচ্ছায় যাইবার উদ্যোগ করিলেন।

অপরাজিতা ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ রক্ত দিতে হ'বে না?"

ডাক্তার বলিলেন, "না। কাল খুব প্রয়োজনের সময় রক্ত দিতে পারা গেছে। আজ আর দিতে হ'বে না। যদি প্রয়োজন বুঝি, কাল দেওয়া হ'বে।"

অপরাজিতা যেন একটু হতাশ হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কাল কখন আসতে হ'বে?"

"সকালেই আসবেন।"

অনুকূলচন্দ্র ও সমীরচন্দ্র অপরাজিতাকে লইয়া প্রাঙ্গণে আসিলেন। গাড়ীর পর গাড়ী আহতদিগকে লইয়া আসিতেছে। কি দৃশ্য!

সমীরচন্দ্রের গাড়ী প্রথমে তাঁহার গৃহেই গেল। অনুকূলচন্দ্র অবতরণ করিয়া অপরাজিতাকে বলিলেন, "আমি একটু পরেই বাড়ী যা'ব—তোমাকেও নিয়ে যা'ব। তুমি এক বার নাম।"

গাড়ীর শব্দ পাইয়া চিত্রলেখা ও সাগরিকা ব্যস্ত হইয়া দ্বারে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া সমীরচন্দ্র বলিলেন, "ভাল আছে।"

সকলে সমীরচন্দ্রের বসিবার ঘরে গমন করিলেন। সমীরচন্দ্রের পুত্ররা ও বধূরাও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পূর্ব্বরাত্রিতে সমীরচন্দ্র সমগ্র ব্যাপার ও তরুণকুমারের আঘাতের গুরুত্ব ব্যক্ত করেন নাই; আজ করিলেন। তিনি যখন বলিলেন, "ডাক্তার বলেছেন, বড় প্রয়োজনের সময় অপরাজিতার রক্ত দেওয়ায় বিস্ময়কর উপকার হয়েছে"—তখন চিত্রলেখা উঠিয়া অপরাজিতাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "মা, আমার! তোমার ঋণ আমরা কখন শোধ করতে পারব না।" অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তাঁহার মুখে আর কথা বাহির হইল না।

অপরাজিতাও ভাঙ্গিয়া পড়িত। কিন্তু আপনার ভাবাবেগ সংযত করিয়া লইয়া বলিল, "ও কথা কেন বলছেন?"

সাগরিকা বলিল, "আপনি যা করেছেন—"

তাহার কথা শেষ না হইতেই অপরাজিতা বলিল, "তিনি যে আমার জন্যই বিপদ বরণ করেছেন, দিদি!" তাহার মনে যে ভাব উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা যেন তাহার সংযমের বাধা চূর্ণ করিতে চাহিতেছিল।

চিত্রলেখা উঠিয়া অপরাজিতার জন্য খাবার আনিতে গমন করিলেন।

সমীরচন্দ্র তাঁহার মধ্যম পুত্রবধূকে বলিলেন, "শোভনা, শুনলে ত তোমার মাষ্টারের কথা?"

চিত্রলেখা ফিরিয়া আসিলেন; তাঁহার প্রথমা বধূ অপরাজিতার জন্য কিছু ফল ও মিষ্টান্ন লইয়া আসিলেন—চিত্রলেখা স্বয়ং একখানি ছোট টেবল আনিয়া অপরাজিতার সম্মুখে রাখিলে বধূ তাহাতে—আহার্য্যের পাত্র রাখিয়া—জল আনিতে গমন করিলেন।

অপরাজিতা খাইতে দ্বিধা করিলে চিত্রলেখা বলিলেন, "সে হবে না, মা! তোমাকে সবল রাখতেই হ'বে—যদি কাল আবার রক্ত দিতে হয়।"

অপরাজিতা মনে করিল, সত্যই কি তাহার প্রয়োজন অধিক?

সাগরিকাও জিদ করায় অপরাজিতা আহার করিতে বাধ্য হইল।

ব্রজবল্লভ বাবু স্বগৃহে গিয়াছেন শুনিয়া চিত্রলেখা ভ্রাতাকে বলিলেন, "দাদা, ওঁদের যেতে দিলে কেন? ভাঙ্গা-দুয়ার বাড়ী—হাঙ্গামা ত সমান চলছে। অপরাজিতাকে তুমি বাড়ীতেই রেখে দিও—যেতে দিও না।"

সমীরচন্দ্র বলিলেন, "সেই ব্যবস্থাই ভাল।"

অনুকূলচন্দ্রের গৃহে আসিয়া অপরাজিতা যখন স্বগৃহে যাইতে চাহিল, তখন অনুকূলচন্দ্র বলিলেন, "তা' হ'বে না। চিত্রলেখার কথাই ঠিক। আমি তোমার মা'কে আর বাবাকে নিয়ে আসছি। তুমি এ বাড়ী নিজের বাড়ী মনে কর।"

অনুকূলচন্দ্র স্বয়ং ব্রজবল্লভ বাবুর গৃহে যাইয়া বলিয়া আসিলেন, তিনি যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে সহরের অবস্থা শান্ত বা নিরাপদ মনে করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং ব্রজবল্লভ বাবু যেন ভগ্নদ্বার গৃহে রাত্রিতে না থাকেন। তিনি যে অপরাজিতাকে তাঁহার গৃহেই থাকিতে বলিয়াছেন, তাহাও বলিয়া তিনি বলিলেন, পল্লীর আর যাঁহারা আপনাদিগকে নিরাপদ মনে না করিবেন, তাঁহাদিগকেও তিনি তাঁহার গৃহে থাকিতে বলিবেন।

সে রাত্রিতে পল্লীর কয়টি গৃহের মহিলারা অনুকূল বাবুর আহ্বানে তাঁহার গৃহে আসিলেন।

অপরাজিতা সমস্ত দিন সঙ্গিহীন অবস্থায় সেই গৃহে থাকিয়া তরুণকুমারের ঘরে তাহার পুস্তকাদি দেখিল। তরুণকুমারের অভ্যাস ছিল, সে স্বয়ং তাহার টেবল ঝাড়িত—পুস্তকাদি গুছাইয়া রাখিত। দুই দিনে টেবলে ধূলি সঞ্চিত হইয়াছিল। অন্য কোন কাজের অভাবে অপরাজিতা টেবল ঝাড়িবে কি না—ঝাড়িলে তাহা সঙ্গত হইবে কি না মনে করিতে লাগিল। শেষে সে ভাবিল, সে ত সব জিনিষ ঝাড়িয়া মুছিয়া—যথাস্থানে রাখিয়া দিবে, তাহাতে দোষ কি? তাহাতে তরুণকুমারের বিরক্ত হইবার কি কারণ থাকিতে পারে? ঝাড়ন

কোথায় ? কক্ষের একটি আলমারীর উপরে একটি পালকের ঝাড়ন ছিল। অপরাজিতা সেইটি পাড়িয়া লইল—তাহার দ্বারা ধূলা ঝাড়িয়া কাগজচাপা, কলম, ঘড়ী সব আঁচলে মুছিয়া যেটি যে স্থানে ছিল সেটি সেই স্থানে রাখিয়া দিল।

রাত্রিতে সকলের আহারের পরে অনুকূলচন্দ্র অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাল যে ঘরে ছিলে, তাতে ভাল ঘুম হয়েছিল ?"

অপরাজিতা "হাঁ" বলিলে তিনি তাহার জন্য সেই ঘরেই কোচের উপর উপাধান দিবার জন্য ভৃত্যকে নির্দেশ দিলেন।

অপরাজিতা সেই ঘরেই রাত্রি যাপন করিল।

"কড়িতে বাঘের দুধ মিলে।" সে কথা সমীরচন্দ্র জানিলেন। পর দিন হাসপাতালে যাইবার জন্য চিত্রলেখা জিদ করিবেন জানিয়া তিনি তাঁহাদিগের জন্য একটি সামরিক রক্ষীদল আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সেই রক্ষীদলে সুরক্ষিত হইয়া সমীরচন্দ্র পর দিন পূর্ব্বাহ্নে চিত্রলেখা ও সাগরিকাকে লইয়া যানে অনুকূলচন্দ্রের গৃহে উপনীত হইলেন। গৃহে প্রবেশ করিতে চিত্রলেখা রক্তচিহ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কি ?" যখন তিনি শুনিলেন, সে রক্ত তরুণকুমারের তখন আতঙ্কিত হইলেন। সমীরচন্দ্র বলিলেন, "ও মুছে ফেল—অনুসন্ধান কে করবে ? যা'রা এই কাণ্ড ঘটাচ্ছে, তা'রা ?"

একখানি গাড়ীতে চিত্রলেখা, সাগরিকা ও সমীরচন্দ্র—আর একখানিতে অনুকূলচন্দ্র ও অপরাজিতা হাসপাতালের দিকে যাত্রা করিলেন; রক্ষীরা একখানি বড় "জিপ" গাড়ীতে সঙ্গে চলিল।

পথে যে দৃশ্য নয়নগোচর হইল, তাহাতে চিত্রলেখা ও সাগরিকা শিহরিয়া উঠিলেন। পথের উপর নিহতদিগের শব—কলিকাতার পথে শবের মাংস আহারের জন্য কুকুর ও শকুন পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছে। এক স্থানে দেখা গেল, কতকগুলি লোক এক ব্যক্তিকে—এক সম্প্রদায়ের লোক আর এক সম্প্রদায়ের এক জনকে—লাঠির আঘাতে হত্যা করিতেছে! চিত্রলেখা শিহরিয়া স্বামীকে বলিলেন, "বারণ কর।" সমীরচন্দ্র আঘাতকারীদিগকে বলিলেন, "কি করছ!" তাহারা তখন প্রতিহিংসায় মত্ত; বলিল, "দেখছেন না—ও কি ? যদি দেখতে না পারেন, চলে যা'ন।" চিত্রলেখা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন—মানুষ কোন্ স্তরে অবনত হইয়াছে!

গাড়ী দুইখানি হাসপাতালের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল।

তরুণকুমারের স্বাস্থ্য আশ্চর্য্যই বটে। সকলে তাহার শয্যাপার্শ্বে যাইয়া দেখিলেন, সে জাগিয়া আছে। সকলকে দেখিয়া সে হাসিল; চিত্রলেখাকে বলিল, "পিসীমা নিশ্চয়ই খুব ভেবেছেন আর কেঁদেছেন ?"

সে অপরাজিতাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল; বলিল, "আজ ডাক্তার বাবু বলছিলেন, বাবা আর যিনি পরশু রাত্রিতে রক্ত দিয়েছিলেন তিনি এসেছিলেন—তখন আমি কুম্ভকর্ণের মত ঘুমুচ্ছিলাম। দিদি, তুমি এসেছিলে ?"

সাগরিকা বলিলেন, "না—সহরের অবস্থা দেখে আমাদের পথ হ'তে ফিরতে হয়েছিল। পরশু রাত্রিতে বাবার সঙ্গে অপরাজিতাও এসেছিলেন—কালও উনিই সাহস ক'রে এসেছিলেন।"

অপরাজিতার মুখ লজ্জায় রক্তাভা ধারণ করিল। সে দৃষ্টি নত করিল।

তরুণকুমার কি ভাবিতেছিল।

সমীরচন্দ্র ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে বাড়ী নিয়ে যেতে দিবেন ?"

ডাক্তার বলিলেন, "আমাদের মনে হয়—এক সপ্তাহ নড়াচাড়া না করালেই ভাল হয়।"

"কিন্তু তা' হ'লে—একটি স্বতন্ত্র ঘরের ব্যবস্থা ক'রে দিন।"

সমীরচন্দ্রের কৌশলে সেই ব্যবস্থাই হইল এবং সকলে গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে তরুণকুমারকে তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে রাখিয়া তবে গমন করিলেন। তরুণকুমার নগরের অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। চিত্রলেখা যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া সে বলিল, "এমন ব্যাপার! আমার দেখা হ'ল না!"

চিত্রলেখা বলিলেন, "ও আর দেখে কাজ নাই।"

যখন সকলের ফিরিবার কথা হইল, তখন অপরাজিতা একটু দ্বিধার পরে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল, "আর রক্ত দিতে হ'বে না ?"

ডাক্তার বলিলেন, "না। আর রক্ত দিতে হ'বে না।" শুনিয়া আর সকলে আনন্দিত হইলেন। কিন্তু অপরাজিতা যেন একটু হতাশ হইল।

গৃহে ফিরিবার পথে চিত্রলেখা স্বামীকে বলিলেন, "চমৎকার মেয়ে—রূপে গুণে সমান।"

সমীরচন্দ্র বলিলেন, "কিন্তু 'রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী' হ'লেও তোমাদের পক্ষে ত ঈশপের উপকথার সেই 'দ্রাক্ষাফল টক'।"

সাগরিকা বলিল, "পিসীমা, বাড়ীতে অতিথিরা আছেন—আমি আজ বাড়ী যাই।"

চিত্রলেখা ভাবিয়া বলিলেন, "তা'ও বটে। চল আমিও ঘুরে আসি।"

বিপদপূর্ণ পথে—উগ্র ব্যক্তিদিগের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির মধ্যে রক্ষীদলে সুরক্ষিত গাড়ী দুইখানি—আসিয়া অনুকূলচন্দ্রের গৃহদ্বারে দাঁড়াইল।

সকলে অবতরণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। সাগরিকা ভৃত্য ও দাসীদিগকে বলিল, সে বাড়ীতেই থাকিবে।

ব্রজবল্লভ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী স্বগৃহে চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহদ্বার সংস্কারের কোন উপায় করিতে পারেন নাই। সকলকে আসিতে দেখিয়া শিশুবালা ব্রজবল্লভ বাবুর গৃহ হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু কেমন আছেন ?"

চিত্রলেখা বলিলেন, "ভগবানের দয়ায় ভাল হয়েছে।"

"কবে আসবেন ?"

"ডাক্তাররা বলছেন, আরও সাত দিন হাসপাতালে থাকাই ভাল।"

অপরাজিতা চিত্রলেখাকে বলিল, "তা' হ'লে আমি বাড়ী যাই।"

সাগরিকা বলিল, "তা' হ'বে না। আমি কি একা থাকব ?"

অপরাজিতা চিত্রলেখাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে সাগরিকা বলিল, "কেন যেতে ব্যস্ত হচ্ছেন ? আপনার কি অসুবিধা হচ্ছে, বলুন ?"

অপরাজিতা হাসিয়া বলিল, "সব চেয়ে বড় অসুবিধা আপনি।"

"কেন ?"

অপরাজিতা চিত্রলেখাকে বলিল, "পিসীমা, আপনিই বলুন, দিদি যদি অত 'আপনি' 'আপনি' করেন, তবে কি থাকা যায় ?"

চিত্রলেখা অপরাজিতাকে আদর করিয়া বলিলেন, "তুমি থাক, আমি মেয়েকে ব'কে দেব।" [ক্রমশঃ ।

একটি অবিস্মরণীয় রাত্রি

অমরেন্দ্র ঘোষ

রাস্তার তেমাথাটা সন্ধ্যাবেলা এমনি গমগম করে প্রত্যহ। ফুলওয়ালা, ফেরীওয়ালা, ভিখারী অতিষ্ঠ করে তোলে একটু দাঁড়ালে। চলমান পথিকদের মাঝে মাঝে চমকে থামতে হয়,—থেঁৎলে যায়নি তো কোনো জুতো-পালিশ ছোকরার হাতটা! এক এক সময় মোটরের হর্ন, পেট্রোলের গন্ধ অসহ্য হয়ে ওঠে। কখন কখনও কারুর স্নায়ুতন্ত্রীকে পীড়া দেয় কর্মক্লান্ত মানুষের এ প্রবাহ!

কিন্তু এর ভিতরই দু-একটি তন্বী এদিক ওদিক করে। কোনো গানের ইস্কুলের ছাত্রী একটি তানপুরা হাতে পাশ কাটিয়ে যায়। যেন অসম্ভব কষ্টে বহন করছে সম্ভ্রম। চকিতে কেউ লজ্জারুণ হয়ে ওঠে। কেউ বা হেড মিস্ট্রেস, শান্ত-গম্ভীর পদক্ষেপ। কারুর বা তৃষিত দৃষ্টি।

ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়িয়ে অমিয় রোজ এখানে এসে দাঁড়ায়। সিগারেটের পর সিগারেট চলে। আফিস-ফেরৎ যাবে কোন্ চুলোয়! সন্ধ্যেবেলায়ই আর ফ্ল্যাটে ঢুকে বসে থাকতে ভাল লাগে না। দেশেও কেউ নেই যে চিঠি লিখবে। একটা অন্তত ছোট ভাই-বোন থাকলেও উপদেশ বর্ষণ করা যেত। দায়িত্বের চাপে আনন্দ পেত খানিক।

সিনেমা?

আর কত দেখা যায়!

ব্যাড্‌মিন্টন, ক্লাব, স্ক্যাশ?

তা-ও কি বাকি রেখেছে? একেবারে হয়রাণ হয়ে গেছে সে। এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করতে চায় একটু। শুধু বিশ্রাম বললে ভুল করা হবে। মস্তিষ্কের অমানুষিক পরিশ্রমের পর, যেমন মানুষ চায় নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে একটু বুঁদ হয়ে থাকতে। ঘুম নয়, তন্দ্রা নয়—এ যেন এক অদ্ভুত অনুভূতি! দারিদ্র্য নয়, বিলাসই বলব।

কিন্তু এখানে কেন?

সে উত্তর অমিয় নিজেই জানে না।

কিসের অভাব অমিয়র?

চাকরীর? সে তো নামকরা এক কা... কেরাণী। মাইনে যা পায় এবং অন্য ... একান্ত খুশি হয়ে যা তার পকেটে ... দেয় তা মোটেই তুচ্ছের নয়। ... হলে একটি অতি-আধুনিক মেয়েরও ... ডগা থেকে ঠোঁটের কানিশ পর্যন্ত রঙ চা... বেশ কিছুটা জমান যেত।

বিনয় প্রায়ই বলে, তুই আর ... করিস নে, এক জায়গায় কথা দে। ... তো স্নুনন্দাকে চিঠি লিখে দি আজই! ... যে দেখা হয়েছিল গিরিডিতে। ... করে পাহাড়ী রাস্তা, নিশ্চয় এখনো ... জোটেনি। মাইরি কি চমৎকার প্রয়া... দেখেছিলাম সন্ধ্যেবেলা···। তারপর ... দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে খানিক দৈহিক উদ্বেগ প্রকাশ করে। কি করব আমার হাত-পা বাঁধা, নইলে···।

অমিয় কোনো জবাব দেয় না। একটু একটু হাসে।

ভাবছিস চাকরীটা এখনো পারমেনেণ্ট হয়নি? ওরে ... জীবনটাই যে টেম্পোরারী, যৌবনটা আরো। তুই যে ... রয়েছিস?

অমিয়র সারা মুখে একটা খুশির রক্তাভা ছড়িয়ে পড়ে। ... ফুটে কিছু উত্তর দিতে পারে না।

আমরা সংসারী হলাম কি করে? তোরই তো 'কলিগ'! ... নোটিশ হবে আমরা কি বাদ যাব? তবু দেখিস উপোস ক... না। ব্রাদার, ভয় নেই, ঝুলে পড়। যৌবনটা কিন্তু আরো···

দূর, দূর, তুই চুপ কর এখন!

তোর বাপ নেই, মা নেই। অভিভাবক বলতে ... —বললেই চুপ করব? আজকাল না কি মাঝে মাঝে ... যাস্? দেখ, দেখ, স্নুনন্দা দেবীর মতই যেন একখানা ... এদিকে এগিয়ে আসছে। ডাকব না কি?

বাবু মালা চাই?

কার গলায় পরাবে ও? বিবি মিলছে না। সাহেব ... গোলাম না হয় আমিই হলাম, বিবি একটি আজ পর্যন্তও জুটল না ... সন্ধান দিতে পার, নইলে মানে মানে সরে পড়ো বাপ ধন!

ফুলওয়ালার মুখ চুণ হয়ে যায়। তবু সে বলে, সত্যি নেবেন না? দেখুন কেমন চমৎকার গন্ধ—শীতের রজনীগন্ধা, এখন পর্যন্ত ... বৌনি হয়নি। আপনাদের মত বাবুরা যদি···কাল পাঁচ টাকা ... নষ্ট হয়েছে।

আর লাখ টাকার জীবনটাই যে খাবি খাচ্ছে! কেউ বৌনি ক... না ভাই, কেউ বৌনি করলে না! ওর অবশ্যি একটু দোষ ... টেম্পোরারীর ভয়ে নিজেই এগুলেন না। বড্ড লাজুক লতা। তোমার মত নয় হে!

বিনয়, থাম, থাম! একটা অপরিচিত ফুলওয়ালাকেও তুই রেহাই দিবি নে? এক ছড়া মালার দাম কত হে?

ছ' আনা।

দাও, দিয়ে সরে পড়ো—নইলে আরও নাস্তানাবুদ হবে।

ফুলওয়ালা চলে যায়।

সত্যই সুনন্দার প্রফাইলখানা এগিয়ে আসছিল। কিন্তু কোথায় যেন মিলিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

সুন্দর নয়, কিন্তু অনেকটা তার মতই দেখতে। তেমনি যেন নাক চোখ। তেমনি যেন গায়ের গড়ন। শুধু মুখের ও চোখের অভিব্যক্তি আর একটু গাঢ়। বয়সটাও যেন বেড়েছে। তবু উজ্জ্বল আলোকে, সিল্কের শাড়ীর বেষ্টনে ক্ষণিকের মাদকতা সৃষ্টি করেছিল।

অমিয় ভাবে, মানুষের এ প্রবাহ একটু বাদেই কমে যাবে। নিবে যাবে দোকান-পসারের বাতি। শুধু জ্বালা কমবে না তার হৃদয়ের। অবাক্ত এ অনুভূতি তাকে দহন করছে তিলে তিলে।

ব্রাদার, তিলোত্তমা পাবে না—এখনও সময় আছে, চিঠি লিখে দি একখানা। এই নে, আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ভেবে দেখ। দেশলাইর কাঠি একটা জ্বালিয়ে বিনয় এগিয়ে যায়। তুই মদ ধরেছিস? তা হলে বুঝি আর কিছুই বাকি নেই?

একটা আছে।

তার জন্যই বুঝি রোজ দাঁড়িয়ে থাকিস তেমাথায়? ছিঃ ছিঃ, এত দূর অধঃপাতে গেছিস! আমি চললাম।

অমিয়র সিগারেটটা জ্বলে না। কিন্তু ফুটপাতের ময়লা এক টুকরা কাগজ ঠিকই পুড়ে যায়।

সুনন্দার সংগে ওদের দেখা হয়েছিল একটা ছোট্ট পাহাড়ী পথের বাঁকে। বিনয় ও অমিয় চড়াই ভেঙে উপরে উঠছিল। সুনন্দা তার সংগিনীদের নিয়ে নামছিল নীচের দিকে। প্রথম শোনা গেল হাসি—পাথরে পাথরে ঠিকরে এগিয়ে এল শব্দতরংগ। ঝংকার অনুরণিত হল পাহাড়ী লতাগুল্ম শাল-পিয়ালে। তার পর যেন দেবকন্যাদের আবির্ভাব!

ক্যামেরাটা ঠিক করে নে অমিয়! হাঁদার মত আমার দিকে চেয়ে রয়েছিস যে? ভিউ ফাইণ্ডারে চোখ দে!

একটা শব্দ হয়—ক্লিক্।

দ্যাটস রাইট!

ওরা চোখ তুলে দেখে যে শিকার ক'টির মুখে রুমাল চাপা!

বিনয় এগিয়ে এসে বলে, একেবারে বোকা বানিয়ে দিলে রে! চল, ফিরে যাই! এবার হামলা করব রয়াল বেঙ্গল টাইগারের মত আচম্বিতে। তুই পারবি নে, আমাকে দে!

দরকার হবে না।

বললেই হল! ট্রাই ট্রাই ট্রাই এগেন। তোকে নিয়ে যে কি মুস্কিলে পড়েছি!

এক্সপোজার করেক্ট হয়েছে।

তাই না কি? বুঝিয়ে বলতে হয় ব্রাদার! ঠিক, ঠিক হবে। জয় হিন্দ! ইনক্লাব জিন্দাবাদ! তা হলে আর চড়াই ভেঙে কসরৎ করে কাজ নেই। এদের মধ্যেই একটিকে বাগিয়ে ফেলতে হবে। কোন্‌টিকে পছন্দ হয় তোমার?

আমি তো কারুকেই ভাল করে দেখিনি।

এই মাটি করেছে!

সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে ওঠে পাহাড়ী রাজ্যে। ওরা ফিরে আসে। তাড়াতাড়ি হেঁটে এসেও কাউকে দেখে না। সুনন্দাদের দলটি ভিন্ন একটা সোজা পথ ধরে নেমে এসেছে। ওরা এ পথটা চেনে না। বিনয় অমিয়কে নিয়ে ছুটোছুটি করে আসে।

হাসি শোনা যায় অদূরে। তার পর মোটরের শব্দ। হেড লাইট পথের দু' ধারের গাছপালা দীর্ঘ ছায়া ফেলে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে থাকে।

বিনয় বলে, সেম্ সেম্—পালিয়ে গেল শেষটায়! তুই, মানে ইউ, ডোন্ট মাইণ্ড, আমি ঝাঁক শুদ্ধ ধরে দেব রাজহাঁসী—আজই, এই নৈশ পরিবেশে! রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চারে! ব্রাদার, একটা ফোটোগ্রাফিক অ্যাডভান্স কর।

পারবি তো?

নিশ্চয়।

তবে এই নে।

ওরা দুজনে একটা মোটর ভাড়া করে। পথে কোনো কথা হয় না—যেন দম বন্ধ করে সময় কাটায়। বাংলোতে ফিরে এসে ড্রাইভারকে ভাড়া চুকিয়ে দেয় অমিয়।

বড় বকশিস্ সাহেব!

অমিয় আবার পকেটে হাত দেয়। বিনয় ওর হাত চেপে ধরে। আজ নয় খাঁইজি, কাল সকালে এস—ডবল পাবে। আজ শিকার ভগ গয়া।

কি যে তোর পাগলামো! ও ভাবলে কি বল তো?

যা-ই ভাবুক, তোর তার জন্য মাথা ঘামাতে হবে না। তুই গিয়ে বয়টাকে ডেকে চা তৈরী করতে বল। বাথরুম থেকে আমি এলাম বলে।

প্রায় আধ ঘণ্টা হয়ে যায়, বিনয়ের দেখা নেই। অমিয় ধড়াচূড়া ছেড়ে পুরো বাবোয়া হয়ে বসেছে। চা এল—একটু ইতস্ততঃ করে চা-ও খেল সে। তার পেট জ্বলে যাচ্ছিল। একটা মাসিক পত্রিকার উলটে পালটে দেখল খানিক। এবার রীতিমত চিন্তা হল অমিয়র। কোনো অ্যাকসিডেন্ট হল না কি? বাথরুমের এমন অনেক গল্প শুনেছে অমিয়। তবে ভরসার মধ্যে বিনয়টার হার্ট ট্রাবল নেই।

কি রে, এতক্ষণ ধরে কি করছিস?

একটা লাল আলো নিবিয়ে দিয়ে বিনয় বেরিয়ে এল। এর নাম বুঝি করেক্ট এক্সপোজার—সব ভোঁ ভাঁ ভোঁ ভাঁ। তুই একটা আস্ত গাধা।

কই দেখি। অমিয় সুইচ টিপে ধরে। কেন, ঐ যে একখানা মুখ দেখা যাচ্ছে প্লেটে!

মাইরি! আর দেখিস নে, আর দেখিস নে। নিবিয়ে ফেল আলো—ফর হেভেন্স সেক নিবিয়ে ফেল।

অমিয় সুইচটা অফ করে দিয়ে মন্তব্য করে, তুই হচ্ছিস এক নম্বর আনাড়ী। ওয়াশিংয়ের খেলায় সব শেষ করে দিয়েছ না কি কে জানে!

এর বিরুদ্ধে রীতিমত একটা থিসিস্ লেখা যেতে পারে। তুমি

যে একটি বাদে আর কটিকে ফোকাসের ভিতর আনতে পারনি তার কি কোনও প্রমাণ আছে? তাহলে বন্ধু তুমিই বল না কে আনাড়ী?

সাধারণত অমিয় উঁচু পর্দায় গলা তুলে খুব কমই প্রতিবাদ করে। সে বলে, অফ কোর্স নট! আমি লোয়ার কোর্ট, আপার কোর্ট, দরকার হলে হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়তে রাজী—তেমন সট যদি নিতে পেরে থাকি, সেইটাই তো আমার কৃতিত্ব।

বিনয় বলে, ব্রেভো! হাতে হাত মিলাও বন্ধু! দেখছি আমারই হারা উচিত। কবুল করছি ভোর নাগাদ অন্তত একটি রাজহংসী ধরে দেবই দেব।

ঠিক ভোর বেলাই বিনয় পারে না তার প্রতিশ্রুতি পালন করতে। অপেক্ষা করতে হয় সূর্যালোকের জন্য। সে ছাড়াও তোড়জোড় রয়েছে যথেষ্ট। এই কিছুক্ষণ ড্রাইভার এসেছে। মোটরটার কালো রঙ চকচক করে উঠল প্রথমতম সূর্যের দীপ্তিতে।

এই নে অমিয়! ঠিক প্রিণ্ট উঠল না। বড্ড হেজি হয়ে গেছে। আসলে নেগেটিভ্টারই দোষ।

দেখি দেখি—কিন্তু অস্পষ্ট বলেই কি অত সুন্দর দেখাচ্ছে?

অমিয়র চোখেমুখে মনে রঙ লাগে। সে মসগুল হয়ে থাকে। বিনয় ফটোখানা নিয়ে বেরিয়ে যায় মোটর হাকিয়ে।

ফেরে ছুটোর পর।

এত সময় অমিয় কি করে যে কাটিয়েছে! জীবনে এমন নাটকীয় সংঘাত সে কখনো অনুভব করেনি। অথচ কিছুই নয়, অস্পষ্ট একটা কাচের কালো প্লেট, তারই সংযোজনায় ঝাপসা একটা ছবি।

কিন্তু মুখর করেছে কেন হৃদিদিগন্ত?

অমিয় এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, সংবাদ কি?

ভাল নাম সুনন্দা মিত্র। এখানের এক ইস্কুলের হেড মিষ্ট্রেস। বয়স বছর বাইশ তেইশ।

এত খবর তুই কি করে নিয়ে এলি? মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড তুই যে কি একটা চিজ! ভেড়ার শিঙে ঠেকিয়ে দিলেও ঠিক কেটে বেরিয়ে যাবি।

কিন্তু পারলাম কোথায়? ওরা ভোরের এক্সপ্রেসে না কি বেড়াতে গেছে। কবে ফেরে তা কেউ বলতে পারল না। এই নাম ধাম ঠিকানা। হয়ত ছুটি ফুরালে ফিরবে।

ও—! অমিয় আর কিছু বলে না।

মাসের পর মাস গত হয়ে যায়। পকেটের ছবিখানা কোথায় কি ভাবে পড়ে থাকে তার হদিশ অমিয় রাখতে পারে না। কিন্তু বুকের ছবিটা কিছুতেই যেন মিলিয়ে যেতে চায় না।

তা-ও ক্রমে ক্রমে আবছা হয়ে আসে রেসের মাঠে, ক্ল্যাসের আড্ডায়, নয়তো রঙিন মদের সফেন উর্মিস্তবকে।

বিনয় এইমাত্র চলে গেছে। সংগে সংগেই প্রশ্ন হল,—এই ঠিকানাটা বলে দিতে পারেন—?…

অমিয় সুনন্দার প্রফাইলখানাই যেন দেখতে পায় তার সুমুখে। ভ্রান্তি নয় ত? নেশা নয় ত? সে ভাল করে চোখের পলক ফেলে কয়েক বার।

আমি রাস্তাটা ঠিক খুঁজে পাচ্ছি নে। অনেক দিন বাদে এ অঞ্চলে আসছি, সব যেন পালটে গেছে।

হ্যাঁ তা বটে, চেনাই দায়।

মেয়েটি এক টুকরা কাগজ অমিয়র হাতে দেয়।

আসুন আমার সংগে।

কত দূর যেতে হবে?

বেশী দূর নয়।

আপনার তো অসুবিধা হবে না?

না, না, কিছু অসুবিধা নেই।

অমিয়র পিছু পিছু মেয়েটি এগিয়ে চলে। ছটো বড় রাস্তা পার হয়ে অমিয় একটা ছোট রাস্তার মোড় ঘোরে। অপেক্ষাকৃত অন্ধকার এ পথটা। নির্জনও বটে। মেয়েটি একটু যেন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে, তবু এগিয়ে চলে অমিয়র সংগে। গোটা চারেক বড় বাড়ী ছাড়িয়ে একটা কয়লার আড়ত।

আর কত দূর? অনেকখানি তো এলাম।

অমিয় হাসে। একটু চেয়ে দেখে মেয়েটির অপাংগে।

নিজের দুর্বলতায় মেয়েটি যেন লজ্জিত হয়। সে দ্রুততর করে দেয় তার চলার গতি। কিছু দূর এগিয়ে আসতে না আসতে আবার সে পিছিয়ে পড়ে।

আপনি দেখছি পরিশ্রান্ত। একটা রিক্সা ডেকে দেব না কি?

বলেন কি, এখনো রিক্সা ডাকতে হবে? মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ে মাঝপথে। ক্ষণিকের জন্য তার মনে একটা কেমন যেন সন্দেহ জাগ্রত হয়।

দূর বলে রিক্সা ভাড়া করতে চাইছি নে, দেখছি যে আপনার কষ্ট হচ্ছে।

হক—আর কত দূর বলুন তো?

ঐ যে, ঐ মোড়টা ছাড়িয়ে আর ক কদম হাটলে। শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে গলিটা উঠেছে দক্ষিণমুখী।

রাস্তায় লোকচলাচল পাতলা হয়ে গেছে। শীতের রাত্রি— দশটা তো বটেই। মেয়েটি চার দিকে তাকিয়ে একটু যেন দূরত্ব বজায় রেখে চলে।

অমিয় সমস্ত বুঝতে পেরেও কিছু বলে না। সে হেঁটে চলে অনেকটা নিস্পৃহচিত্ত পরোপকারীর মত। কিন্তু সহস্র প্রশ্নে উদ্বেল হয়ে ওঠে তার অন্তর। এ মেয়েটি কে? কেন এসেছিল এখানে? সুনন্দার সংগে ওর কি কোনও সম্পর্ক থাকা সম্ভব? অমিয় বিস্মৃতির অতল থেকে পুরান ঝাঁপিটা খুলে একটা ছবি বার করে। বার বার চেয়ে দেখে সংগিনীর দিকে। পর্যাপ্ত আলোর অভাবে মিলাতে পারে না ছটি মুখ। একটি বহু দূরে অপসৃয়মান কিন্তু অপরটি তো তারই সংগে হেঁটে চলেছে—রক্ত মাংসে উত্তাপে জীবন্ত।

এই যে গলিটা ছাড়িয়ে যাচ্ছিলাম, কত নম্বর বলুন তো?

পঁচিশ। মেয়েটি বলে, ধন্যবাদ আপনাকে। এতটুকু পথের জন্য রিক্সা ভাড়া করতে চাইছিলেন? ছজনে আসতাম কি করে? আপনি যে কি উপকার করলেন—ধন্যবাদ! মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে একটা বাড়ীর নম্বর দেখে কড়া নাড়া আরম্ভ করে।

এক্ষুণি অদৃশ্য হয়ে যাবে। তবু অমিয় কুয়াশার ভিতর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। একটা সিগারেট ধরায়। সে শুনতে পায়—

সুলতাদি, 'সুলতাদি' !

কে গা ?

অম্বিকা চক্রোবর্ত্তীর স্ত্রী সুলতাদি'কে খুঁজছি।

কে অম্বিকে চক্রোবর্ত্তী ? সে তো এখানে থাকে না। নম্বর ভুল হয়েছে বাছা—অন্য বাড়ী দেখ। সুলতা নামে তো কারুর নাম শুনিনি আজ পর্যন্ত।

এইটে পঁচিশ নম্বর নয় ?

হাঁ গো হাঁ—তোমার নম্বর পঁয়ত্রিশও তো হতে পারে। তবে বাঁণা তোর বরের নাম কি—অম্বিকে চক্রোবর্ত্তী নাকি ?

আ মরণ আর কি ? প্রিতি মাসে ভাড়ার রসিদ দাও কার নামে ?

মেয়েটি ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে। অমিয় অদূরে দাঁড়িয়ে।

এখন আমি কি করি বলুন তো ? ভাগ্যে আপনার সংগে দেখা হল !

অমিয় যেন এইটেই চায়—এমনি একটা অসহায় অবস্থা। চলুন, চিন্তা করবেন না। যা হক একটা ব্যবস্থা হবেই।

খানিকটা হেঁটে একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায়। মেয়েটির মুখ থেকে কোনো প্রশ্ন বার হয়ে আসার পূর্বেই সে দেখে যে নরম গদির ভিতর তলিয়ে গেছে।

কিছু সময়ের জন্য মেয়েটি দিশা হারিয়ে ফেলে—অন্তত অমিয় তা ভাবে। অপরিচিত একটি নারীদেহ বার বার তার স্নায়ুচেতনাকে উত্তেজিত করছে। শীতের ভিতরও সে যেন ঘর্মাক্ত হয়ে উঠছে। একটা উত্তাপ অনুভব করে নাকে মুখে কপালে।

ট্যাক্সিতে উঠে শুধু একটা নির্দেশ দিয়েছে সোজা চালাতে—কিন্তু কোন্ পথে ?

ভীরু কণ্ঠে মেয়েটি প্রশ্ন করে, কোথায় চলেছেন ?

তুমি যেখানে যাবে।

আমি, আমি শেয়ালদা ষ্টেশনে, কিন্তু ট্যাক্সি ভাড়া অত টাকা কোথায় পাব ? রাতটা না হয় ওখানে থেকে কাল চাকরীতে ইনটার-ভিউ দেব। আমার সংগে মাত্র পাঁচ সিকে আছে।

ট্যাক্সিচালক একটু থেমে পথ জিজ্ঞাসা করে নেয়। অমিয় যে পথ দেখায় তা শিয়ালদার পথ নয়।

ও, চাকরীর খোঁজে এসেছিলে ! থাক কোথায় ?

ঘুঘুডাঙ্গা ষ্টেশন থেকে মাইলটাক দূরে। আজ ইনটারভিউর কথা ছিল, কিন্তু হয়নি। কাল হবে বলেছে।

পাঁচ সিকেয় এতক্ষণ তোমার চলবে কি করে ? ভাতের কথা না হয় ছেড়ে দিচ্ছি, দু বার একটু চা জলখাবার খেতেই তো ও ফুরিয়ে যাবে।

না—তা যাবে না। তারপর সে নিম্ন কণ্ঠে বলে, আমাদের কি অত খরচা করা পোষায় ?

পুষিয়ে নিতে হবে—খাচ করতে হবে, নইলে ইনটারভিউতে সুফল হবে না।

কেন, কেন ?

শরীরে না কুলালে কে ইনটারভিউ দেবে ? আর কলকাতার সহরে কি পয়সার অভাব একটু কুড়িয়ে নিতে জানলে ?

কলকাতা থেকে তো বেশী দূরে থাকি নে—আপনি কি ঠাট্টা করছেন ?

কেন, এ কথা কি নতুন শুনছ ?

অনেক শুনেছি, কিন্তু জীবনে প্রমাণ পাইনি।

চলো, আজ পাবে।

আবারও ঠাট্টা করছেন ? কিন্তু আর কত দূর শিয়ালদা ?

ঐ তো।

মোটরের হেড লাইট নেবে, কিন্তু জ্বলে ওঠে ফ্ল্যাটবাড়ীর লাইট। একখানা কোঠার দামী আসবাব ঝকমক করে ওঠে। একটা বিলেতি কুকুর অভিনন্দন জানায় ঘেউ ঘেউ করে।

এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন ?

তুমি যেখানে যেতে চাচ্ছ—শিয়ালদা। ফার্ষ্ট ক্লাস কমপার্টমেণ্ট, নইলে শীতে কষ্ট পাবে।

মেয়েটি যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। প্রতিবাদ কিম্বা প্রতিরোধ করবার পূর্বেই ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

আমি চীৎকার করব।

কোনও কাজ হবে না—সে সময় উত্তরে গেছে।

মেয়েটি হেসে বলে, তবে প্রথম চায়ের ব্যবস্থাটা করতে বলুন।

অমিয় বিস্মিত হয়ে যায়। এখনও কি তার নেশা রয়েছে ?

অমিয় চায়ের হুকুম করে নিজের বেশবাস বদলাতে যায়। আচমকা মেয়েটির পরিবর্তন তার কানে বড্ড আনস্থরা ঠেকেছে। গজল গাইতে গাইতে আকস্মিক যেন রাগপ্রধান সংগীতে উত্তরণ। তবে কি মেয়েটির সবই কৃত্রিমতা, সমস্তই মেকি ?

সেও কি অভিনব উপায়ে শিকার সন্ধান করে বেড়াচ্ছিল। এই শীতার্ত সহরে ?

এখন আর নেশা নেই অমিয়র। তবু তার নেশা লেগেছে মেয়েটিকে দেখে। ওর চারিত্রিক নিষ্ঠা আজ আর বড় নয়, প্রাধান্য অর্জন করেছে নারীত্ব—যে স্বপ্নের থেকে অমিয় চিরবঞ্চিত।

পায়জামার ওপর একটা গেঞ্জি ও র‍্যাপার চড়িয়ে অমিয় তাড়াতাড়ি ফেরে।

আমার ঘরে শাড়ী নেই, ধুতিতে চলবে ?

কেন চলবে না ? গরীবের মেয়ে সব অভ্যাস আছে।

অমিয় আলো জ্বালিয়ে বাথরুম দেখিয়ে দেয়। কথার বেলা তো মনে হয় বিড়লা কিম্বা টাটার ভগিনী।

একটু বাদেই মেয়েটি ঘরে এসে বলে, আমি কারুর বাসি কাপড় পরতে ভালবাসি 'নে। যদি ধোপাবাড়ীর কাপড় না থাকে—

থাকবে না কেন, আছে, আছে—এই রাসকেল কি দিয়েছিস ?

বয়টা ছুটে যায়।

কিছুক্ষণ পরেই মেয়েটি একখানা ফিনফিনে ধুতি পরে সোফায় এসে বসে। আলোর ঝলকে সায়ার লেসটা পর্যন্ত চকচক করে ওঠে।

এই র‍্যাপারখানা নাও, আমি না হয় আর একখানা এনে গায় দিচ্ছি। অমিয় নিজেই জড়িয়ে দেয় চাদরখানা। ও কি, অমন করলে যে ?

বড্ড শীত, গায়ে যেন কাঁটা দিচ্ছে।

এবার তো খোপখাওয়ান নয় বলে আপত্তি তুললে না ?

পশমী কাপড় সব সময়ই শুদ্ধ।

দেখছি শাস্ত্রজ্ঞানও আছে টনটনে। এমন আইবুড়ো বিধবা আমার নজরে পড়ল এই প্রথম।

আপনি অনুগ্রহ করে একটা রাতের জন্য আশ্রয় দিয়েছেন, যা খুশি বলতে পারেন।

চোখের পাতা দুটি যেন সজল হয়ে ওঠে মেয়েটির।

অমিয়র পিত্ত জ্বলে যায়। এত ন্যাকামীও জানে মেয়েরা!

চা আসে। অমিয় আপ্যায়ন করে, চা খান!

আপনি ?

এই তো খাচ্ছি!

অমিয় চা খাবে কি, মেয়েটির পাতলা দুখানা ঠোঁটের দিকে চেয়ে থাকে আড়চোখে। পেয়ালার প্রতিটি চুমুক সে যেন চুমুক দিয়ে নেবে। এক্ষুণি সামান্য একটু প্রসাধনে কেমন অনবদ্য দেখাচ্ছে মুখশ্রী! সে ভুলে যায় একটু পূর্বের সব বাকবিতণ্ডা।

কিন্তু কি আশ্চর্য, মেয়েটি ধীরে ধীরে কোন অপূর্ব ভংগি না করে ঢক-ঢক করে খেয়ে ফেলল গরম চা-টুকু।

এমন সময় নৈশ আহার্য পরিবেশন করে গেল বয়টা। মেয়েটি কোনও অনুরোধের অবকাশ না দিয়ে খেতে লাগল গোগ্রাসে।

অমিয় নীরবে চেয়ে আছে—সময় কেটে যাচ্ছে নীরবে। আজ দেয়ালের ঘড়িটাও কেন যেন বন্ধ!

পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করে আরও দুখানা পরটা ও ব্যঞ্জন দিয়ে গেল বয়টা। অবশেষে আরও খানিকটা মিষ্টি সামগ্রী।

হাত-মুখ ধুয়ে মেয়েটি বলল, ওকি, আপনার দেখি এখনও চা-টাই খাওয়া হয়নি!

তাই না কি! এঁ্যা, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। অমিয় পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে খাবারের থালাটা টেনে নেয়। ঐটুকু খাবার খেতে তার যে কতক্ষণ গত হয় সে বুঝতে পারে না। সে ভাল করে খেতেই পারে না।

এক সময় সে স্বপ্নোত্থিতের মত বলে ওঠে, তুমি যে কথা বলছ না, রাগ করলে নাকি ?

মেয়েটি নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বলে, না। এমন আতিথ্য পেয়েও রাগ করব ?

আচ্ছা, তোমার সংগে যে তুমি তুমি বলে কথা বলছি, তার জন্য তো কিছু মনে করোনি ? তুমি একটি অপরিচিত ভদ্রমহিলা।

লাস্যজড়িত কণ্ঠে মেয়েটি হেসে ওঠে।

এতক্ষণ আলাপ, তোমার নামটি তো বললে না ?

ভদ্রমহোদয়ের জিজ্ঞাসা করার সৌজন্যও তো দেখলাম না!

সে ত্রুটি অবশ্যি আমি স্বীকার করে নিতে বাধ্য।

তা নয়, আমার সংগে দেখা হওয়া অবধি আপনি কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক।

না, না, না—বাধা হয়ে ওঠে অমিয়। এ তোমার একেবারে ভুল কনক্লুসন। সে একটু সরে বসে। তার পিছনের একটি ছোট টেবিলে উজ্জ্বল আলো পড়ে। কতগুলি সাজান জিনিস ঝিকমিকিয়ে ওঠে।

এখন শুনুন, আমার নাম রেবা মিত্র।

কি বললে ? সোজা হয়ে উঠে বসে অমিয়।

রেবা—!

তা আমি শুনতে চাই নে। তোমরা কি—

এ ফটোখানা আপনি কোথায় পেলেন ? এ যে দিদির ছবি।

গিরিডিতে পরিচয় হয়েছিল প্রায় বছর তিনেক আগে।

শুধু পরিচয় নয়, ঘনিষ্ঠতা ছিল নিশ্চয় ?

হাঁ তা বলতে পার। তবে—এ ছবিটা এখানে কে কোত্থেকে রে ?

বয় জবাব দেয় যে একটা পুরান স্যুটকেশে ছিল—আজ সে ফ্রেমে এঁটে ওখানে রেখেছে। সে হতবুদ্ধি হয়ে থাকে।

রেবা উচ্চস্বরে বলে, না, না, নিশ্চয় ঘনিষ্ঠতা ছিল—নইলে তার কেউ কি কোন অপরিচিতের ফটো তুলে ঘরে বাঁধিয়ে রাখে? আপনি অন্য কথা বললে বিশ্বাস করব কেন ?

আমি তো অস্বীকার করছি নে। তুমিই তো কিছু বিশ্বাস করতে চাইছ না।

তবে আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এখন দিদি কোথায় ?

কেন, গিরিডিতে!

সব জেনে শুনেও আপনি আবার ঠাট্টা করছেন ? উঃ!

আমি তো কিছুই জানি নে রেবা!

অনেক চেষ্টার পর দিদি গিরিডিতে চাকরী পেয়েছিল। কর্তৃপক্ষ কিছু দিনের মধ্যেই নোটিশ দিলে সাবৃপ্লাস বলে। দিদি কলকাতা ফিরে এসে রক্তবমি করল, কিন্তু লাভ হল না। মনের দুঃখে সে ডুব দিল। বাবা বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন, আমার পড়া হল না!···

আবেগকম্পিত কণ্ঠে অমিয় বলে, ঘরে ঘরে এই তো ইতিহাস, তুমি দুঃখ কর না রেবা!

তবু মেয়েটির দু' চোখ বেয়ে বড় বড় দু' বিন্দু অশ্রু ফটোখানার ওপর ঝরে পড়ে।

আজ তুমি বড় পরিশ্রান্ত, এখন ঘুমাও, কাল সব বলব ও শুনব। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে অমিয় দ্রুতপদে অদৃশ্য হওয়ার পূর্বে রেবার চোখ দুটো মুছিয়ে দিয়ে যায়।

শিল্পীর ঘর

—শ্রীসূর্য্য রায় অঙ্কিত

"'HAZELINE' SNOW"

(TRADE MARK)

"'হেজলিন' স্নো" (ট্রেড মার্ক)

প্রচুর নকল 'স্নো' বাজারে চলছে। এই জন্য জনসাধারণ যাতে না ঠকেন সেজন্য আমাদের তৈরি "'HAZELINE' SNOW" TRADE MARK "'হেজলিন' স্নো" ট্রেড মার্ক-এর শিশির ঢাকনার ওপর **অ্যালু ক্যাপসুল** অর্থাৎ রূপালী অ্যালুমিনিয়মের পাতলা পাত জড়ানো থাকে।

কেনার সময় অ্যালুমিনিয়মের পাতলা পাত জড়ানো আছে কিনা দেখে নেবেন।

শিশির উপরের দিকে নীল রঙের এই চিহ্নটিও দেখে নেবেন।

বারোজ ওয়েলকাম

অ্যাণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

পোস্ট বক্স ২৯০, বোম্বাই

"'HAZELINE' SNOW" "'হেজলিন' স্নো" লণ্ডনের দি ওয়েলকাম ফাউণ্ডেশন লিমিটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্ক এবং ভারতে কেবল বারোজ ওয়েলকাম অ্যাণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড-ই এই কথাটি ব্যবহার করার অধিকার পেয়েছেন। এরা ছাড়া যদি অন্য কেউ এই ট্রেড মার্ক ব্যবহার করেন কিংবা অন্য জিনিস "'HAZELINE' SNOW" TRADE MARK "'হেজলিন' স্নো" ট্রেড মার্ক নাম দিয়ে উৎপাদন করেন, অথবা ব্যবসা করেন, কিংবা বিক্রি অথবা বিক্রির চেষ্টা করেন তবে তিনি আইনত দণ্ডনীয় হবেন।

(দ্বিতীয়ার্দ্ধ)

শ্রীকালিদাস রায়

তার পরে গিয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে ছায়ারূপে কোরো অবতরণ,
কুরুক্ষেত্র যেও পরে যেথা ক্ষত্রকুলের হ'লো নিধন।
রাজন্যগণ-আননে যেথায় পার্থ হানিল নিশিত শর,
কমল-কাননে তুমি যাহা কর ধারাবরিষণে হে ঘনবর!
সরস্বতীর তীরে উত্তরিবে অতঃপর
স্বজনবৃন্দে প্রীতির জন্য সমরবিমুখ শ্রীহলধর
রেবতীনয়নবিম্বিত 'হালা' প্রিয় পেয়, তারে গণিয়া হেয়
যাহার সলিলই মানিল শ্রেয়ঃ।
সেই জল পানে হউক তোমার অন্তরাত্মা শুদ্ধ শুচি
বাহিরের রূপ কালোই থাকিবে, অন্তরে হবে শুভ্ররুচি।

তার পরে তুমি যাবে কনখলে যারে লোকে সতীতীর্থ বলে,
জাহ্নবী যেথা হিমাচল হ'তে অবতরিছেন অবনীতলে,
সোপানে সোপানে হেরিবে সেখানে হে কুতূহলী,
দগ্ধ সগরতনয়গণের স্বর্গারোহণ সোপানাবলী।
যেথা গৌরীর ভ্রূকুটিভঙ্গী ফেনরাশি ছলে উড়ায়ে হেসে
ভালেন্দুবীচি হস্তে আঁকড়ি গঙ্গা ধরিছে হরের কেশে।
অর্দ্ধদেহেরে বর্দ্ধিত করি গগনে ঐরাবতের মত
স্ফটিকবিশদ গাঙ্গেয় নীর পানে যবে তুমি হইবে রত,
স্বচ্ছ সলিলে সঞ্চরমান তোমার দেহের অসিত ছায়া
গঙ্গাযমুনা-সংগম-রূপে সৃজিবে মায়া।
আরো উত্তরে তুষারগৌর হিমাচল-সানু পাইবে তুমি,
সুরতটিনীর জন্মভূমি।
হেথাকার শিলাসমুচ্চয়
কস্তূরীমৃগ-নাভি-ঘর্ষণে গন্ধময়,
সেই সানু করি অতিক্রম—
শিখরে তাহার আসীন হইবে হরিতে যখন পথিশ্রম
তোমারে হেরিয়া তখন সবার হইবে ক্ষণিক মতিভ্রম,
শিবের ধবল বৃষভ করেছে উৎখাত কেলি গিরির গায়
বুঝি বা তাহার বপ্রপঙ্ক শৃঙ্গে ভায়।
প্রবল পবনে দেবদারুবনে শাখায় শাখা বিঘৃষ্ট হ'লে,
সেথা দাবানল উঠিবে জ্ব'লে।

বাতাসে উড়িয়া উল্কা তার
দগ্ধ করিবে চমরীমৃগের পুচ্ছ চারু উচ্ছভার।
সেই দাবানল নিবাতে করিও ধারাসহস্রে বৃষ্টিদান,
সার্থক হয় সাধুর অর্থ করিয়া আর্ত্তজনের ত্রাণ।
শরভ মৃগেরা লম্ফঝম্প করিয়া ঘুরে
পথ ছাড়ি দিয়া তাহাদের তুমি রাখিও দূরে।
তোমারেও যদি লঙ্ঘিতে যায় রোষভরে তারা অবজ্ঞাতে,
তাড়ায়ো তাদেরে তুমুল করকা-বৃষ্টিপাতে।
দম্ভের ভরে ব্যর্থ প্রয়াস করে যে হেন
বিড়ম্বিত সে হবে না কেন?
হেথা শিলাতলে হরের স্পষ্ট চরণচিহ্ন পাইবে খুঁজে
সিদ্ধযোগীরা নানা উপচারে তাহাই পূজে।
ভক্তিনম্র হৃদয়ে নমিয়া কোরো তুমি তাহা প্রদক্ষিণ,
দর্শনে তাহা শ্রদ্ধাবানের দেহ-মন হয় কলুষহীন।
হ'লে দেহান্ত, যে জন এখানে ভক্তিনত
শিবানুচরের পদ লভে চিরদিনের মত।
বায়ুবশে হেথা কীচকরন্ধ্রে বাজে অবিরত বংশীতান,
কিন্নরীগণ গায় অনুখন ত্রিপুর-বিপুর বিজয় গান।
কম্পনে যদি মন্দ্রিত হও তাই হবে তায় মুরজরব,
পূর্ণাঙ্গতা লভিবে তাহাতে শিবসঙ্গীত-মহোৎসব।

হিমশৈলের বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি তুমি অতিক্রমি'
পার্ব্বত পথে খানিক ভ্রমি'
কিছু দূরে পাবে হংসদ্বার যাহার নাম
পরশুরামের কীর্ত্তিমার্গ পুণ্যধাম।
রন্ধ্রের পথে তব রূপ হবে মধ্যবক্র দীর্ঘায়ত
বলির দমনে উদ্যত শ্যাম ত্রিবিক্রমের পদের মত।

আরো উত্তরে যাইতে হবে,
পথ হবে শেষ, কৈলাসগিরি পাইবে তবে।

প্রস্থসন্ধি বিভক্ত যার দশমুণ্ডের দ্বিদশ হাতে
ত্রিদশবধূর দর্পণ যাহা এ বসুধাতে।
গগন ভেদিয়া উত্থিত তার কুমুদধবল তুঙ্গশির
রাশীভূত যেন প্রতিদিনকার অট্টহাস্য ধূর্জ্জটির।

সেই যে সদ্যঃকর্ত্তিত করিদন্তের মত ধবলগিরি,
সানুদেশ তার রহিলে ঘিরি
তোমার স্নিগ্ধ দলিতাঞ্জন সম প্রভায়
অপরূপ রূপ ধরিবে ভূধরবরের কায়
মনে হয় যেন শ্রীবলরামের অংসে সুনীল উত্তরীয়
হবে তব শোভা অপলক চোখে দর্শনীয়।

ভুজগবলয় ত্যজি গৌরীর ধরিয়া হাত
পাদচারে যদি সে ক্রীড়াশৈলে বিহার করেন প্রমথনাথ,
গৌরীর সাথে মণিতটে যদি উঠিতে চান,
পুরোভাগে গিয়া আরোহণে তবে হয়ো সোপান
দেহভঙ্গীরে করি অনুকূল নতোন্নত,
অন্তর্গূঢ় সলিলে করিয়া স্তম্ভিত।

সুরযুবতীরা তোমারে পাইয়া কঙ্কণমণিশলাকে ঘায়
বিঁধিলে তোমারে ধারাযন্ত্রের সৃষ্টি হইবে তোমার গায়।

নিদাঘতপ্ত তাদের অঙ্গ জুড়াবে তোমার সলিল-ধারা
সহজে ছাড়িতে চাবে না তারা।
লীলাচঞ্চলা তাহারা যুবতী বৈ ত নয়
শ্রবণপরুষ গুরুগর্জ্জনে তাহাদের তুমি দেখায়ো ভয়।

স্বর্ণকমলপ্রসূ মানসের বারি পিবে যবে ঐরাবত
তুমি তার মুখে রবে যেন ক্ষণছাদনবৎ
তাহারে করিও আরাম দান,
অংশুক সম কল্পতরুর কিসলয়গুলি কম্পমান
করিও পবনে, এইরূপ নানা লীলাভঙ্গীতে সকৌতুক
লভিও ভূধরবিহার সুখ।

প্রণয়িনী যেথা রয় প্রণয়ীর অঙ্ক জুড়ি'
হে কামচারিন দেখিবে সেখানে সে গিরিঅঙ্কে অলকাপুরী।
দেখিবে শিথিল বাস সম তার অঙ্গে গঙ্গা পড়িছে গ'লে,
কঠিন নয়ক' চেনা সে পুরীরে অলকা ব'লে।
দেখিবে উচ্চ সপ্ততলের গৃহগুলি সেথা বিরাজ করে,
বরষায় যবে বৃষ্টি ঝরে,
দেখিবে শোভিত জলকণাবাহী অভ্রনিকরে অলকা মম
মুক্তাগ্রথিত অলকগুচ্ছে [illegible] কামিনী সম।

(পূর্ব্বমেঘ সমাপ্ত)

আভা চট্টোপাধ্যায়

৪
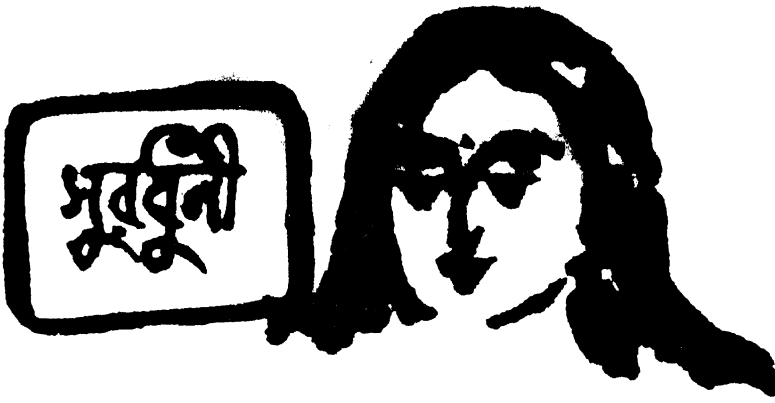
শুক্লা যখন একটি দ্বারভাঙ্গা এসে পৌছোল—তখন বাড়ীতে শুধু তেওয়ারী ঠাকুর ও বাসোয়ার মা দাই ছিল। ঘনশ্যাম দশ বার দিন পূর্ব্বে মকর্দ্দমার কাজে পাটনায় গিয়েছিলেন। শুক্লা দেখলো যে, তার চিঠি বাবার টেবিলের উপর রয়েছে। তেওয়ারী ঠাকুর ও বাসোয়ার মা প্রথমে একটু আশ্চর্য্য যে হয়নি তা নয়—কিন্তু দিদিমণি তো এর আগে এমনি কত বার এসেছেন—কাজেই তারা শুধু জামাইবাবুর কুশল জিজ্ঞাসা করে তাদের কাজে মন দিল। শুক্লাও যেন তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো—কিন্তু বিধাতা পুরুষ বোধ করি অলক্ষ্যে হাসলেন—বললেন, সত্যিই কি তুমি তৃপ্তি পাবে? সত্যিই শুক্লা তৃপ্তি পেলো না—ঘনশ্যামের আসতে আরও তিন চার দিন দেরী হোলো—এক দিন তার যে কেমন করে কাটলো তা শুধু অন্তর্য্যামীই জানেন। শত-কোটি দুঃখ-ব্যথা পেয়েও সে সরোজের কাছে দীর্ঘকাল কাটিয়েছে—কিন্তু এ ক'দিনেই সময় যেন তার কাছে যুগ-যুগান্ত বলে মনে হতে লাগলো—বসে দাঁড়িয়ে শুয়ে সে যেন এতটুকু স্বস্তিও বোধ করলো না। একবার নয়, বার বার সে ভাবলো—ঘনশ্যাম আসবার আগেই সে চলে যাক কলকাতায় সরোজের কাছে। কিন্তু বার বারই তার মনের মাঝে সরোজের সেই শেষ কথাগুলি তাকে বিদ্রোহী করে তুললো—তাকে কঠিন করে তুললো। সে যাবে না—সে যাবে না।

ঘনশ্যাম এসে মেয়েকে একা দেখে আশ্চর্য্য হলেন—কিন্তু তার মুখে সব কথা শুনে কিছুটা গম্ভীর হয়ে গেলেন—কোনো কথাই বললেন না। বৃদ্ধ তাঁর মেয়ের স্বভাব ভালো করেই জানেন। কথা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই। কয়েক দিন পরে শুক্লা তার বাবাকে বলল যে, সে এমন ভাবে এখানে থাকতে চায় না—নিজে একটা স্বাধীন বৃত্তি নিতে চায়, তাতে মনও ভাল থাকবে—অর্থোপার্জ্জনও হবে। ঘনশ্যাম নিজে বিত্তশালী—অর্থের চিন্তা তাঁকে কোনো দিনই করতে হয়নি—কাজেই মেয়ের এই কথাটার প্রতিবাদে তিনি বললেন, "তোমার সব কথাটাই আমি মেনে নিচ্ছি—কিন্তু অর্থের প্রয়োজন তো তোমার নেই?"

প্রত্যুত্তরে শুক্লা বলল, "বাবা, অর্থের প্রয়োজন সবারই আছে—আপনি আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন—গান-বাজনা শিখিয়েছেন—সৎপাত্র দেখে বিয়ে দিয়েছেন—আমার ভাগ্যদোষে আমাকে স্বামীর ঘর ছেড়ে আসতে হয়েছে—আপনারও বয়েস হয়েছে—আজও আমি কেন আপনাকে বিব্রত করবো?"

বৃদ্ধ এবার সত্যি বিচলিত হয়ে বললেন, "বিব্রত! এ কথা তুমি শুক্লা কেমন করে বললে? তুমি ছাড়া এ সংসারে আমার কেউই কি আছে—অবশ্য আমার গোবিন্দজী আছেন—তাঁর জন্ম খানিকটা কর্তব্য আছে—ইচ্ছে আছে—একটি ভালো মন্দির করে তাঁর সেবার একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করবো—সে ভারও তোমাকে নিতে হবে শুক্লা। আমি কি এত দিন বাঁচবো যে দেখে যাবো সেই মন্দিরে তুমি গোবিন্দজীর সামনে কীর্ত্তন গাইছ—গাইছ ভজন?" বলতে বলতে বৃদ্ধের দুই চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো। শুক্লা বুঝলো—বাবা তার কথায় আঘাত পেয়েছেন। সে কথাটার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"বাবা! আপনি নিশ্চয়ই তত দিন বাঁচবেন—এত দিনের আমার এত গানের সাধনা তো পূর্ণ হবে না যদি না সেই দিনটি আপনি দেখে যেতে পারেন—কিন্তু বাবা, তার দেরী আছে—আমি বলছিলাম কি যে, আমি কিছু দিনের জন্ম কলকাতায় মাসীমার বাড়ী যাই, তার পর এখানে এসে গোবিন্দজীর মন্দির ও সেবার বন্দোবস্ত সব করা যাবে—আমারও সময় কাটাবার একটা খুব ভালো রকম পরিবেশের সৃষ্টি হবে—নয় কি বাবা? আপনি অমত করবেন না—আমি দু'-এক দিনের মধ্যেই যেতে চাই—বলুন, আপনার আদেশ পেলাম?"

ঘনশ্যাম সাদাসিধা মানুষ—কিন্তু সংসারের অভিজ্ঞতা তার যথেষ্ট হয়েছে। মহারাজার জমিদারী কাজ ছাড়া এই মেয়েটি ও গোবিন্দজীই তার জীবনের অবলম্বন। নিত্যপুজার আয়োজন শুক্লাই করতো—তার বিয়ের পর তেওয়ারী ঠাকুরই করে—কিন্তু পুজা তিনি নিজেই করেন। শুক্লা থাকতে কেমন পরিপাটী করে ফুল দিয়ে সে গোবিন্দজীকে সাজিয়ে নিজেও প্রতি সন্ধ্যায় তার খোঁপায় নিজের হাতে-গাঁথা মালা জড়াতো। এটি ছিল তার নিত্যকার কাজ। তার পর সে গাইতো কীর্ত্তন—"এক পদ-পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত, কণ্টকে জর জর ভেল"

বৃদ্ধ ঘনশ্যাম স্তিমিত চোখে ধূপ-ধূনার আবেষ্টনীর মাঝে গোবিন্দজীর সামনে বসে এই কীর্ত্তন শুনতেন। এটা ছিল তাঁর প্রতিদিনের কাজ। ঘনশ্যাম মেয়ের কথায় অমত করতে পারলেন না—মনের গোপন কোণে একবার হয়তো দেখতে পেলেন—শুক্লা মাসীর বাড়ী না গিয়ে জামাইবাড়ীই গিয়েছে।

সুকুমারী দেবী কলিকাতার বালিগঞ্জ প্লেসে থেকে ভিক্টোরিয়াতে শিক্ষকতা করেন। তিনিও বিদুষী ও আধুনিক। শুক্লাকে দেখে

প্রথমে তিনি খুবই আশ্চর্য্য হলেন—আশ্চর্য্য হলেন তার ট্যাক্সী থেকে হোল্ড্‌অল ও সুটকেশ নামানো দেখে—শুক্লা বহু বার সরোজের বাড়ী থেকে তাঁর কাছে এসেছে—কিন্তু এ কি ব্যাপার! দিনটা ছিল রবিবার—সুকুমারী বসে চিঠিপত্র লিখছিলেন—একখানি ছোট চৌকীর উপর একখানি কার্পেট পাতা, তাতেই লেখার সাজ-সরঞ্জাম ও কয়েকখানা বই ছড়ানো।

দুপুরে আহারাদি সেরে মাসী-বোনঝিতে পাশাপাশি শুয়ে সুকুমারী শুক্লার সকল কথাই শুনলেন। সরোজ একদিন ইতিমধ্যে ছল করে এসেছিল তাঁর কাছে বেড়াতে আসার নাম করে শুক্লা এসেছে কি না জানতে। তিনি কিছুই তখন বুঝতে পারেন নি যে, এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেছে। সুকুমারীকে শুক্লা যখন জানালো যে সে কিছু একটা করতে চায়—তখন শেষ পর্য্যন্ত সুকুমারী স্থির করলেন একটা গানের স্কুল করবে শুক্লা ও সে সেখানে গান শেখাবে।

সুকুমারী বললেন—"আজ কাল এ অঞ্চলে মেয়েদের গান শেখার একটা ভীষণ বান ডেকেছে—তুই তাই কর্—আমারও অনেক মেয়ে আছে জানা-শুনো, তোর স্কুলে ভর্ত্তি করে দেবো'খন।

কথা শুনে শুক্লা তাঁকে পাটনায় পঙ্কজ মল্লিকের প্রশংসার কথা বললে—একদিন তাঁর কাছে দু'জনে গিয়ে অনুরোধ জানাবে এই সঙ্গীত-বিত্থালয়ের উদ্বোধন তাঁকেই করতে হবে। তাঁরই আশীর্ব্বাদ নিয়ে শুক্লা তার নূতন জীবনের রাস্তা দেখে নেবে। কি নাম হবে—এই নিয়ে মাসী-বোনঝিতে অনেক চিন্তার পর স্থির হোলো—নাম দেওয়া হবে 'সুরধুনী'। শুক্লা এ কথাও মাসীকে জানালো যে, সে এখন 'বাসন্তী' ছদ্মনামেই থাকবে—কি জানি যদি সরোজ জানতে পারে শুক্লার নাম শুনে।

যা কথা, তাই কাজ—সুকুমারী উপস্থিত তাঁর বাড়ীর নীচের বড় ঘরখানি স্কুলের জন্য ছেড়ে দিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো—"সুরধুনীর কথা—সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী বাসন্তী দেবীর পরিচালনায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত, কীর্ত্তন ও ভজন-গান শেখানো হবে" ইত্যাদি।

সুকুমারীর একান্ত চেষ্টায় জন কয়েক ছাত্রীও ভর্ত্তি হোলো—এবার 'সুরধুনী'র প্রবেশ-দ্বার উন্মুক্ত করা দরকার এবং বেশ একটু ঘটা করেই করতে হবে এই ইচ্ছা শুক্লার। কিন্তু সে একা পঙ্কজ বাবুর কাছে যেতে সাহস পেলো না—মাসীকে নিয়ে সে সত্যই একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর আশীর্ব্বাদ নিয়ে এলো—তিনিই সভাপতি হবেন এই অনুমতি নিয়ে। শুক্লাকে দেখে তিনি সহজেই চিনতে পারলেন ও তাঁর সাহায্য চিরদিন পাবে এ আশাটুকুও সে পেলো। গত তিন বছরের তার বিবাহিত জীবনের কোনো কথাই শিল্পীকে সে বললো না। বলবার প্রয়োজনই বা কি?

বেশ জন কয়েক মেয়ে নিয়ে 'সুরধুনী'র কাজ আরম্ভ হোলো। কীর্ত্তন-গান এমনটি আর কোথাও শেখানো হয় না, এই প্রশংসা সারা কলকাতায় শীঘ্রই ছড়িয়ে পড়লো। শুক্লা একদিন সুকুমারীকে বলল "মাসী, আরও দু'খানি ঘর না হলে চলে না—মেয়ে তো ক্রমেই বেড়ে চলেছে।"

সুকুমারী নিজের জন্য দোতলায় দু'খানি ঘর রেখে বাকী ঘরই সব 'সুরধুনী'র জন্য ছেড়ে দিলেন। তাঁরও যেন ক্রমে ক্রমে গানের নেশা পেয়ে বসলো ও অনেক সময়ে তিনিও মেয়েদের গান শেখাতে লাগলেন। সুকুমারী খুব ভালো রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতে পারতেন—শুক্লা সে ভারটা তাঁকেই দিল। মাসী-বোনঝিতে 'সুরধুনী' বেশ জমিয়ে তুললেন সাধারণের নিকট।

প্রায় এক বছর কেটে গেছে, শুক্লা দ্বারভাঙ্গা থেকে এসেছে—ঘনশ্যাম বাবু ইতিমধ্যে দু'-এক বার কলকাতায় ঘুরে গেছেন ও 'সুরধুনী'র উন্নতিতে যেন খুসীই হয়েছেন। কিন্তু তাঁর শরীর ইদানীং ভালো যাচ্ছিল না—তিনি প্রাচীন হয়েছেন—শুক্লা কাছে নেই—তেমন সেবা-যত্নও পাচ্ছেন না—এ অভিযোগও কথা প্রসঙ্গে জানাতে ভোলেননি। তবুও তিনি খুসীই হয়েছেন যে, মেয়েটা যা হোক্ সরোজের ব্যবহার ভুলে আছে। এটাই ছিল তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা—যদিও মনের মাঝে ও জিনিষটা তাঁকে খুবই ব্যথা অনেক সময় দিত—কিন্তু তাঁর মন সর্ব্বদাই এই আশা করত যে, শীঘ্রই মেয়ে-জামাই আবার মিলিত হবে। মহারাজার কাজ-কর্ম্মও আজ-কাল শরীরের জন্ম বেশী করতে পারেন না—বেশীর ভাগ সময়ই গোবিন্দজীকে নিয়ে তাঁর সময় কাটে—রেওয়ারী ও বাসোয়ার মার সেবা-যত্নে দিন কেটে যায়। যেদিন শরীর বেশ খারাপ লাগতো—সেদিন পাড়ার মিশিরজীকে ডাকিয়ে পূজাটা সেরে নিতেন—কিন্তু তাতে তাঁর মন ভরতো না—যেন কোথায় ত্রুটি থেকে যাচ্ছে—বুঝি গোবিন্দজী খুসী হচ্ছেন না। কিন্তু নিরুপায় ঘনশ্যামের দিন এমনি করেই কাটতে লাগলো।

৫

অনুপম বেলিয়াঘাটা উদ্বাস্তু-কলোনীতে বেশ ভাল চাকরী করে। উদ্বাস্তু মেয়েদের কুটীর-শিল্পের যাবতীয় কাজ তারই তত্ত্বাবধানে হয়। সরকারের কাছে তার কাজের বেশ সুখ্যাতিও আছে—কারণ, সে সত্যিই বড় দরদী কর্ম্মী। নিজেও কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে বেশ খ্যাতি অর্জ্জন করেছে ও মেয়েরাও তার ব্যবহারে সকলেই খুব সন্তুষ্ট। সরোজকে মাঝে মাঝে সে অবসর সময়ে এখানে আনতো উদ্বাস্তুদের কাজ কেমন করে চলছে তা দেখাতে। ক্রমে ক্রমে সরোজেরও মনের মাঝে এই অসহায় মেয়েদের কেমন করে সাহায্য করা যায়—সেই চিন্তাই চেপে বসলো।

একদিন সন্ধ্যায় অনুপমকে সে বলল, "আচ্ছা অনুপম, তুমি তো অনেক সময় আমাকে বল যে অনেক মেয়েরা স্থানাভাবে এখানে কাজ শেখবার সুযোগ-সুবিধা পায় না—তা আমার এত বড় বাড়ী—কে-ই বা আছে—নীচের তলাটায় এই রকম একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে কেমন হয় ভাই?"

অনুপম বলল, "খুবই যে ভালো হয় তাতে সন্দেহ কি সরোজ—কিন্তু ভাই, সবই পয়সার খেলা—গোড়ায় তো বেশ কিছু খরচ আছে ভাই! সে পয়সা কে দেবে?"

প্রত্যুত্তরে সরোজ বলল, "ধর, কুড়ি জন মেয়েকে নিয়ে এ কাজ সুরু করলে কি রকম খরচ পড়বে তুমি আমাকে যত শীঘ্র সম্ভব জানাও—যদি সম্ভব হয় আমার পক্ষে, আমি ভাই নিশ্চয়ই সাহায্য করবো। আমারও সময়টা কাটে এই সব দেখাশুনা নিয়ে, জান তো শুক্লা গিয়ে পর্য্যন্ত আমি কী করে দিন কাটাই?"

অনুপম ভাল ভাবেই জানতো—শুক্লা গিয়ে পর্য্যন্ত সরোজ কি করে দিন কাটাচ্ছে। দুই বন্ধুতে কত সন্ধ্যা শুক্লার এই অভিমান করে চলে যাওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে কাটিয়েছে! অনুপমের শত অনুরোধেও সরোজ তাকে ফিরিয়ে আনতে দ্বারভাঙ্গা যেতে চায়নি। শেষ পর্য্যন্ত অনুপম হাল ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু দিন দিন সরোজ যে মনে মনে খুবই দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে এটা সে বেশ লক্ষ্য করছিল। কিষণের কাছে এ কথাও শুনেছে সে অনেক দিন যে, সরোজ অনেক রাত পর্য্যন্ত বারান্দায় পায়চারী করে একাকী—রাত্রে দু'-তিন বার উঠে সে আবার পায়চারী করে—আবার গিয়ে বিছানায় শোয়। কেন যে এবং কার জন্য সে এমনটি করে, অনুপমের তা বুঝতে বাকী ছিল না—কিন্তু কোনো দিন সে এ কথা সরোজকে বলেনি, পাছে সে আরো ব্যথা পায়। কাজেই সরোজের মনটা যদি এই সংকাজে খানিকটা শান্তি পায়, সে তো ভালোই। অনুপম খুব পরিশ্রম করে এই পরিকল্পনার সম্ভাব্য ব্যয় সম্বন্ধে একটা হিসাব সরোজকে দিল। বেশ মোটা খরচই গোড়ায় প্রয়োজন—সরোজকে সে বিষয়েও সে বুঝিয়ে দিলে। অত টাকা সরোজের পক্ষে প্রথমেই খরচ করা সম্ভব নয়—তবে এ কাজ সে আরম্ভ করবেই—তাই অনুপমের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রথমে জনা দশেক দুঃস্থা মেয়েকে নিয়ে সে নিজের বাড়ীতেই কাজ সুরু করে দিলে। এ কাজের জন্য যে সব জিনিষের প্রয়োজন তা সবই অনুপমকে দিয়ে আনালে। এ কাজের জন্য দু' জন শিক্ষয়িত্রীও অনুপম ঠিক করে দিলো। সরোজের কোর্টের কাজে আর মন বসে না—সব সময়েই সে চিন্তা করতে লাগলো কেমন করে এ প্রতিষ্ঠানকে আরও বড় করা যায়। কেমন করে এই অসহায় মেয়েগুলির সংখ্যা আরও বাড়ানো যায়। কেমন করে তাদের দ্বারা তাদেরই জীবিকার্জ্জনের উপায় হতে পারে। আজ-কাল সে প্রায়ই সকাল সকাল কোর্ট থেকে ফেরে—একটু বিশ্রাম করেই এই কাজের মধ্যে নিজেকে পরিপূর্ণ করে সমর্পণ করে। অনুপম সন্ধ্যার সময়ে এসে দেখাশুনো করে, প্রয়োজনীয় সব পরামর্শ ও উপদেশ দেয় শিক্ষয়িত্রীদের ও সরোজকেও। সরোজও যেন মনে করে সে-ও এক জন এদেরই মতন অসহায় উদ্বাস্তু। সে মনে করে, আমারও বাস্তু থেকেও তো আমি উদ্বাস্তু। তার মনটা যেন সময় সময় পাগল হয়ে যায়—কেমন করে সে এতগুলি মেয়েকে আবার তাদের বাস্তুতে ফিরিয়ে আনতে পারে—কেমন করে সে নিজেও তার নিজের বাস্তু ফিরে পায়—এমনি কত কি! কিন্তু টাকার প্রয়োজন, অনেক টাকা আরও চাই। অনুপমের সঙ্গে সে এ সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ করলো—তার নিজের গচ্ছিত টাকা সে সবই ক্রমে ক্রমে এতে খরচ করতে লাগলো। শেষ পর্য্যন্ত দুই বন্ধুতে স্থির করলো—সাধারণের সাহায্য-ভিক্ষা চাই—কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? সরোজ লোকের কাছে গিয়ে হাত পেতে ভিক্ষা নেবে না—সে এ কাজ পারবে না—পারবে না—তবে উপায় কি?

অনুপম একদিন এসে বলল—সরোজ, কাগজে এই প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করে সাধারণের সাহায্য চেয়ে দেখা যাক—কি রকম ফল পাওয়া যায়।

সরোজ বলল, প্রস্তাবটা তোমার অবশ্য ভালো—কিন্তু ভাই, তুমি তো দেশের অবস্থা জানো—ব্যঙ্গ করে লোকে বলবে—বন্ধু সবাই আমরা উদ্বাস্তু। ক'জন লোকই বা তেমন হৃদয়বান যে, আমাদের এ প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করবে? হয়তো বলবে—পয়সা রোজগারের অভিনব ফন্দী হে! এমনি কত কি!

যা হোক, শেষ পর্য্যন্ত অনুপমের কথাই রইলো—সরোজ কাগজে সত্যই বিজ্ঞাপন দিল—নিজের নাম ও ঠিকানা দিয়ে। সাহায্য যেন এই ঠিকানায় পাঠানো হয়। নিজে হাইকোর্টের উকিল—এটুকুও সে বিজ্ঞাপনে দিতে ভুলল না। উদ্বাস্তুদের জন্য সাহায্য, এতে অপমান কোথায়? সত্যিই তো সে জুয়াচোর নয়—সে তো নিজের জন্য এক কপর্দ্দকও চাইছে না?

৬

সকালে সুকুমারী চা খেয়ে 'সুরধুনী'র হিসাব দেখছিলেন—"মাসী, মাসী, দেখ কি মজার খবর আজ কাগজে বেরিয়েছে"—উচ্ছ্বসিত হাসিতে সমস্ত ঘরখানা মুখরিত করে শুক্লা প্রবেশ করল।

"কি হয়েছে পোড়ারমুখী—অত হাসছিস্ কেন," সুকুমারী জিজ্ঞাসা করলেন। শুক্লার হাসির ছটা যেন বেড়েই চলেছে—সুকুমারীর হাতে 'যুগবাণী' কাগজখানা দিয়ে 'সরোজ উদ্বাস্তু-সদনে'র বিজ্ঞাপন দেখালো। সরোজের ঠিকানা বিজ্ঞাপনের নীচেই ছিল—বুঝতে তাদের বাকী রইলো না যে, এ উদ্বাস্তু-সদনের প্রভুটি কে? শুক্লা হেসে বলল—"মাসী, আমরা কিন্তু নিশ্চয়ই এতে সাহায্য করবো—কি বল তুমি?"

সুকুমারী সমস্ত বিজ্ঞাপনটা ও সম্পাদকের মন্তব্য পড়ে বললেন—"জামাই ওকালতী ছেড়ে শেষে অসহায়া নারীদের সেবায় মন দিলে না কি রে শুক্লা? তুইও তো উদ্বাস্তু অসহায়া—তুইও না হয় গিয়ে সদনের সভ্যা হ। অনেক হাসি-কৌতুকের পর শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হোলো যে, বাসন্তী দেবী পরিচালিত 'সুরধুনী' এ বিষয়ে যথাসম্ভব সাহায্য করতে প্রস্তুত; এমনি একটা প্রস্তাব করে সরোজকে পাঠানো হোক্। সরোজ জানে না যে শুক্লা কলকাতায় আছে, সে দ্বারভাঙ্গায় আছে এই সে জানে। সুকুমারী লাবণ্যর নাম দিয়ে প্রস্তাবটা পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। লাবণ্য 'সুরধুনী'র একজন বয়স্কা ছাত্রী এবং শুক্লা ও সুকুমারী দুই জনের খুবই প্রিয়। তারই নামে সরোজের কাছে চিঠি গেল—"আপনার 'সরোজ উদ্বাস্তু-সদনে'র সাহায্যকল্পে আমরা বাসন্তী দেবী পরিচালিত 'সুরধুনী'র ছাত্রীরা একদিন কোন ভাল জায়গায় জলসা করিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছি—আপনি এ বিষয়ে আপনার মতামত জানাইলে বাধিত হইব।"

কলকাতার সকলেই 'সুরধুনী'র নাম জানেন। সরোজ ও অনুপম এই চিঠি পেয়ে খুবই আনন্দিত হোলো। উত্তরে সরোজ জানালো যে, স্থান, কাল ও সময় স্থির করে যত শীঘ্র সম্ভব লাবণ্য দেবীকে সে জানাবে।

* * * *

আশুতোষ কলেজে 'সুরধুনী'র গানের আসর বসলো। দিনটা ছিল রবিবার সন্ধ্যা—কাজেই সহরের বহু গণ্যমান্য গুণী ভদ্রলোক ও মহিলারা এসেছিলেন। সরোজ ও অনুপমের ঐকান্তিক চেষ্টায় মোটা টাকার টিকিট বিক্রী হয়েছে—কারণ, 'সুরধুনী'র খ্যাতি চতুর্দ্দিকে এবং উদ্দেশ্যও সাধু। শুক্লা ও সুকুমারী ইচ্ছে করেই সরোজ

বা অনুপমের সঙ্গে দেখা করেনি—সব কাজই লাবণ্যকে দিয়ে করিয়েছে। তবে এটা ঠিক ছিল, সব শেষে শুক্লার গান হয়ে আসরের শেষ হবে। তখনই শুধু সরোজ জানাবে এ সাহায্যের উদ্যোক্তা কে। মাসী-বোনঝির মধ্যে এই নিয়ে খুব হাসাহাসি হোতো। শুধু লাবণ্য কিছুটা জানতো—সবটা নয়। এ প্রচ্ছন্ন কৌতুকের কি যে কারণ, সে লাবণ্যর জিজ্ঞাসা করবার সাহসও ছিল না।

যথাসময়ে গান সুরু হোলো—কীর্ত্তন, ভজন ও আধুনিক সবই হোলো, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বালাইও ছিল না। শুক্লা ছিল ষ্টেজের পাশে।' সেখান থেকেই নির্দেশ দিচ্ছিল—এবারে শেষ গান গাইবেন বাসন্তী নিজে—ধীরে ধীরে মঞ্চের উপর এসে দাঁড়াল—পরনে একখানি লাল টুকটুকে চওড়া পাড়ের গরদের শাড়ী—খোঁপায় মোড়া করে বেলফুলের মালা—এটা ছিল তার চিরদিনের প্রসাধনের অঙ্গ। দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার জানিয়ে শুক্লা গান গাইতে বসল—গাইলো রবীন্দ্রনাথের—সরোজের সব চেয়ে প্রিয় গান—

"ভরা থাক স্মৃতি-সুধায় বিরহের পাত্রখানি
মিলনের উৎসবে তা' ফিরায়ে দিও আনি"

শুধু সুরে-তালে নয়, বাক্যের বিশুদ্ধতায়, উচ্চারণের স্পষ্টতায় ও প্রকাশভঙ্গীর মধুরতার এ সন্ধ্যায় সমবেত শ্রোতাদের মনের মাঝে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি হোলো তা অভাবিত। কিন্তু পরমাশ্চর্য হোলো সরোজ ও অনুপম।

৭

অনেক রাতে আসর ভাঙ্গলে, অনুপম সরোজকে বলল—"সরোজ, আজই তুমি শুক্লার কাছে ক্ষমা চাও ভাই—অনেক অন্যায় করেছ, তার উপযুক্ত শাস্তি শুক্লা আজ তোমাকে দিয়েছে, আর অভিমান কোরো না ভাই!"

সরোজ শুধু বলল—"নিশ্চয়ই।" মেয়েদের সব পাঠিয়ে দিয়ে শুক্লা ও সুকুমারী ট্যাক্সী ডাকালে। সরোজ শুক্লার কাছে গিয়ে তার দুটি হাত ধরে শুধু বলল, "আমাকে তুমি ক্ষমা কর রাণী—এসো তুমি ও মাসীমা আমার গাড়ীতে।" সুকুমারী কোনো কথা না বলে শুক্লাকে সরোজের গাড়ীতে তুলে দিয়ে অনুপমকে নিয়ে ট্যাক্সীতে চলে গেলেন—শুধু যাবার সময় বলে গেলেন—"কাল সকালে তোদের বাড়ী আসবো।"

*　　*　　*　　*

পরদিন সকালে শুক্লা সরোজের 'উদ্বাস্তু-সদন' সমস্ত ঘুরে ঘুরে দেখলো—দেখে সত্যিই বড় আনন্দ পেল সে। দু'জনে চা খেতে খেতে কত কথাই হোলো। স্থির হোলো, 'সুরধুনী'কে সরোজের বাড়ীতেই আনা হবে—ওটাও একটা উদ্বাস্তু-সদনের অঙ্গ-বিশেষ হবে—উদ্বাস্তু মেয়েদের গান শেখানো এখানেই হবে।

'সরোজ, মাসীমা এসেছেন'—সঙ্গে সঙ্গে সুকুমারীকে নিয়ে অনুপম ঘরে ঢুকলো। তাঁরা দু'জনে একসঙ্গেই আজ সকালে সরোজের বাড়ী আসবেন ঠিক করেছিলেন। সরোজ তাড়াতাড়ি উঠে সুকুমারীকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করে বসিয়ে বলল—"মাসীমা, আপনি ও শুক্লা এই উদ্বাস্তু-সদনের সমস্ত দায়িত্ব নিন্—তুলে আনুন আপনাদের 'সুরধুনী'কে এই সদনে—সে-ও এর একটা বিশেষ অঙ্গ হোক।"

সুকুমারীকে নিয়ে শুক্লা ও সরোজ সমস্ত উদ্বাস্তু-সদনটি ঘুরে ঘুরে দেখালে। অনুপম সুকুমারীকে পৌঁছে দিয়েই সরে পড়েছে নিজের চাকরী বজায় রাখতে। সুকুমারী ও শুক্লা সত্যিই বড় আনন্দ পেল এই সুন্দর প্রতিষ্ঠানটি দেখে ও আসছে কালই 'সুরধুনী'কে এখানে আনা হবে স্থির হোলো।

পরদিন সুকুমারীর বাড়ীর বাইরে 'সুরধুনী'র নূতন ঠিকানা দরজায় কাগজে সেঁটে দিয়ে সুকুমারী নিজের ঘর-দোর সব বন্ধ করে সরোজের বাড়ী উপস্থিত হলে এলেন। কিষণ কয়েক দিন ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিল, ফিরে এসে শুক্লাকে দেখে তার আনন্দ আর রাখবার জায়গা নেই। কেবলই সুবিধা পেলেই শুক্লাকে বলছে—"বউ দিদি! আপনি না এলে বাবু পাগল হয়ে যেতেন।" শুক্লা হেসে বললো—"তুই তো ছিলি—কেন আমাকে দ্বারভাঙ্গা থেকে নিয়ে আসতে যাস নি? যেমন মনিব তেমনি তার বাহন!"

সহযাত্রী

অসীম সোম

যন্ত্রের যৌতুকে দৃপ্ত সরীসৃপের গতিবিস্তার
স্তব্ধতাকে দীর্ণ করে। অতিকায় দৈত্যের চীৎকার—
হুইসিলের শব্দে যেন। ট্রেনের স্পন্দনের সাথে
পেণ্ডুলামের গতি চলে তোমার আমার ধমনীতে।
অনির্দেশ মননের ফাঁকে বিক্ষিপ্ত বাসনা জাগে,
ডাক কার আসে—সাড়া আজ কে দেবে গো আগে?

মাটিতে আকাশে ঐকতান:
তন্দ্রনার চেতনায় অলক্ষ্যে লেগেছে এক টান।
বাতাসে কথার স্বর, বজ্র বাজায় শাঁখ বার বার,
বৃষ্টি আনে অবিরাম উলুধ্বনি তার,
বিদ্যুতের অগ্নি সাক্ষী; মনে মনে বেঁধে রাখি রাখী:
সীমানার সিগন্যাল কত দূর—কতটুকু পথ আর বাকী।

মৃদংগ-গম্ভীর ঘনঘটায়, সুস্নাত দিবসে পুনরায়—
তুমি আছ সহযাত্রী। অজানা জীবনপথে পঞ্চশর কুসুম ছড়ায়।

সা হি ত্য

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

সত্যরঞ্জন রায়—শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। জন্ম—পাবনা জেলায় ভারেঙ্গা। শিক্ষা—এম-এ। অধ্যাপক, মুঙ্গের কলেজ, অধ্যক্ষ, মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন। গ্রন্থ—রাজা দেবীদাস, অবগুণ্ঠিতা, চক্ষুদান, বর্ণাশ্রম ধর্ম ও বৈশ্যজাতি, বেণীরায়, স্নেহের ঋণ।

সত্যেন্দ্রকুমার বসু—গ্রন্থকার। শিক্ষা—বি-এ। গ্রন্থ—প্রজাপতি, প্রতারক, পরাজয়, বৌদিদি, মহাযুদ্ধের ইতিহাস, ৭ খণ্ড, বৈষ্ণবী।

সত্যেন্দ্রকুমার বসু—সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। জন্ম—১২৯৫ বঙ্গ, খুলনা জেলার মৌভোগ গ্রামে বিশিষ্ট বৈষ্ণব-বংশে। মৃত্যু—১৩৫৯ বঙ্গ ৪ঠা আষাঢ়। শিক্ষা—এম-এ, বি-এল। সম্পাদক—মাসিক বসুমতী (১৩৩১), হিতবাদী (সাপ্তাহিক)।

সত্যেন্দ্রনাথ জানা—কবি ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৩১৫ বঙ্গ ১৬ ভাদ্র মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরে। পিতা—জগবন্ধু জানা। মাতা—কুসুমকুমারী। শিক্ষা—শান্তিনিকেতন। বি-এল (১৯৩২) পরীক্ষায় রিপন ল কলেজ হইতে ১ম স্থান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ম স্থান অধিকার। কর্ম—আইন ব্যবসায়, তমলুক শহরে। তমলুক সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক, বিভিন্ন সাময়িকপত্রের লেখক। 'কাব্যরথী' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—সাগরিকা (কাব্য ১৩৪৯), রবি-তর্পণ (সঙ্গীত ও কবিতা, ১৩৫১), পনেরো আগষ্ট (নাটক, ১৩৫৭, অপ্র), বহ্নিপাষাণ (কাব্য), মরশুমী ফুল, রূপ ও খেয়াল, কবিতার জন্ম।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৪২ খৃঃ ১লা জুন কলিকাতা জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরবাড়ীতে। মৃত্যু—১৯২৩ খৃঃ ৯ই জানুয়ারী কলিকাতা। পিতা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাতা—সারদা দেবী। শিক্ষা—ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী, হিন্দু কলেজ, সেণ্ট পলস স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ, সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা (১৮৬২ খৃঃ ২৩শে মার্চ)। সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় (১৮৬৩ খৃঃ) ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম সিবিলিয়ন হইয়া ১৮৬৪ খৃঃ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। কর্ম—প্রথমে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট, আমেদাবাদ (১৮৬৫), ৩৩ বৎসর রাজকার্য করিয়া অবসর গ্রহণ (১৮৯৭)। বিখ্যাত গান 'মিলে সবে ভারত সন্তান' রচনা হিন্দুমেলা উৎসবে (১২৭৪)। সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (১৩০৭-৮, ১৩১০-১১) আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য (১৯০৬)। বহু ব্রহ্ম-সঙ্গীত রচনা। গ্রন্থ—স্ত্রী-স্বাধীনতা (পুস্তিকা), সুশীলা বীরসিংহ নাটক (১৮৬৮), বোম্বাই চিত্র (১৮৮৯), মেঘদূত (পদ্যানুবাদ, ১২৯৮), বৌদ্ধধর্ম (১৩০৮), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (পদ্যানুবাদ, ১৩১১), নবরত্নমালা (১৩১৪), ভারতীয় ইংরাজ (১৩১৪), আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস (১৯১৫), Raja Rammohan Roy (১৮৮৭), Autobiographical Notes & Reminiscences (১৮৯৭), The Autobiography of Maharshi Debendra Nath Tagore. সম্পাদক—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৫৯-৬২, ১৯০৯-১৯১০, ১৯১৫-২৩)।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—ছন্দোবিদ্ কবি। জন্ম—১২৮৮ বঙ্গ ৩০শে মাঘ কলিকাতার সন্নিকটে নিমতা গ্রামে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৩২৯ বঙ্গ ১০ই আষাঢ় কলিকাতায়। পিতা—রজনীনাথ দত্ত। মাতা—মহামায়া দেবী। পিতামহ—প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্ত। ইনি নানা ভাষায় অভিজ্ঞ, নানাবিধ ছন্দ-রচনায় ও উদ্ভাবনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি। বিভিন্ন ভাষা হইতে বহু কবিতা বাঙলায় অনুবাদ করিয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। ভাষা ও ছন্দের সৃষ্টিই ইঁহার কবিপ্রতিভার সর্বাধিক মৌলিক কীর্তি। প্রথম কবিতা 'সবিতা' হিতৈষী সাপ্তাহিক পত্রে (১৯০০)। প্রথম কবিতা পুস্তক 'সন্ধিক্ষণ' মুদ্রিত (১৯০৫)। গ্রন্থ—সন্ধিক্ষণ (১৩১১), বেণু ও বীণা (কাব্য, ১৩১৩), হোমশিখা (১৩১৪), তীর্থসলিল (১৩১৫), তীর্থরেণু (১৩১৫), ফুলের ফসল (১৩১৮), জন্মদুঃখী (উপ), কুহু ও কেকা (কা ১৩১৯), রঙ্গমল্লী (নাট্যকাব্য, ১৩১৯), তুলির লিখন (কা ১৩২১), মাণমঞ্জুষা (ঐ, ১৩২২), অভ্র-আবীর (১৩২২), হসন্তিকা (১৩২৩), চীনের ধূপ, বেলাশেষের গান (১৩৩০), বিদায় আরতি (ঐ), ডঙ্কানিশান (উপ, ১৩৩০), ধূপের ধোঁয়ায় (নাটিকা, ১০৩৬)।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—সাংবাদিক। জন্ম—১২৯৯ বঙ্গ ফাল্গুন মৈমনসিংহ জেলায় টাঙ্গাইল মহকুমায়। বাল্যকালে ১৯০৭ খৃঃ রাজনৈতিক কারণে স্কুল হইতে বহিষ্কৃত এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান। কর্ম—কুচবিহারে নায়েবী, মহারাজার দেহরক্ষী, কলিকাতায় ব্যবসায়, পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অভিনয়, হিন্দুস্থান ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে চাকুরী। রামকৃষ্ণ মঠে কিছুকাল বাস। যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি। Globe News Agencyর প্রধান সম্পাদক। গ্রন্থ—জওহরলালের আত্মজীবনী (অনুবাদ), সমাজ ও সাহিত্য, ষ্টালিন। সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা (১৯২২-১৯৪০), স্বরাজ (দৈনিক), সত্যযুগ (দৈনিক)। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক—অরণি (সাপ্তাহিক)।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু—বৈজ্ঞানিক। জন্ম—১৩০১ কলিকাতা। পৈতৃক নিবাস—২৪-পরগনার কাঁচড়াপাড়ার কাছাকাছি। শিক্ষা—প্রবেশিকা (হিন্দু স্কুল, ১৯০৯), এফ-এ (প্রেসিডেন্সি কলেজ, প্রথম স্থান), বি-এ (ঐ ১৯১৩, প্রথম স্থান), এম-এ (ঐ.১৯১৫, ১ম)। পদার্থবিদ্যা ও গণিতবিদ্যায় পারদর্শী। কর্ম—অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ফ্রান্স গমন (১৯২৪), সিলভাঁ লেভীর সহিত সাক্ষাৎ (১৯২৪), মাদাম কুরীর সহিত সাক্ষাৎ, পরে জর্মাণীতে আইনষ্টাইনের সহিত সাক্ষাৎ। এই সময় 'প্ল্যাঙ্কস ল অ্যাণ্ড দি লাইট কোয়াণ্টাম হাইপথেসিস' নামে তাঁহার প্রবন্ধটি আইনষ্টাইনের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়ায় আইনষ্টাইন কর্তৃক অভিনন্দিত। ইঁহার বৈজ্ঞানিক দান 'বসু আইনষ্টাইন ষ্টাটিসটিক্স'। কয়েকটি বৈদেশিক ভাষায় সুপণ্ডিত। ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক

প্রবন্ধ রচনা। অধ্যাপক, কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজ (১৯৪৫)। সভাপতি, ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের (১৯৪৪) সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ভারতের ন্যাশান্যাল ইনষ্টিটিউট (১৯৪৮-৫০)। ইহার পর তাঁহার পদার্থ বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার লইয়া বিদেশে নানা স্থানে গমন (১৯৫৩)। গ্রন্থ—Warmegleichgewicht im Stralungsfeld nei Answesenhict von Materie (Heat equlibrium in Radiation field in presence of matter), Zeitschift fur Physik (১৯২৪), Plancks gesezund Lichtquantan hypothese (Plank's law & the light quantum hypothesis), Les identites de divergence dano la nuvelle theorie unitaric, Comptes rendus des seances de l'Academic des Scienes (১৯৫৩), The Affino connection in Einstein's New Unitary Field Theory, Annals of Mathematics.

সত্যেন্দ্রনাথ সেন—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮৮৩ খৃঃ ২৭এ নভেম্বর ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খান্দারপাড়া। পিতা—গঙ্গাচরণ সেন (আইন-ব্যবসায়ী, খুলনা)। পিতৃব্য—মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন। শিক্ষা—প্রবেশিকা (খুলনা জেলা স্কুল, ১৯০১), এফ-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৯০৩), বি-এ (ঐ, ১৯০৫), এম-এ (১৯০৬)। 'বিদ্যাবাগীশ' উপাধিলাভ, ডি, সি, লাহা বৃত্তি ও 'প্রসন্ন সর্বাধিকারী স্বর্ণপদক' লাভ। কর্ম—অধ্যাপক (সংস্কৃত), দৌলতপুর কলেজ, খুলনা (১৯০৭), সিটি কলেজ, কলিকাতা (১৯০৮)। সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য। গুরুকুল (হরিদ্বার) সরস্বতী সম্মেলনের সভাপতি (১৯১২), এম-এল-এ (১৯৩১)। সম্পাদিত গ্রন্থ—(মূল ও টীকাসহ) রঘুবংশ (৫ সর্গ), কুমার-সম্ভব (২ সর্গ), শিশুপাল-বধ (২ সর্গ), কিরাতার্জুনীয় (১ সর্গ), মনুসংহিতা (৪ সর্গ)।

সদানন্দ ঠাকুর—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। গ্রন্থ—বিবেকবন্ধু, ব্রজপ্রাপ্তি রসতত্ত্ব।

সদানন্দ মুন্সী—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে মৈমনসিংহ জেলার উস্তি গ্রামে। গ্রন্থ—দারাশোকো।

সদাশিব মজুমদার—কবি। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলায় উস্তি গ্রামে। গ্রন্থ—আদিপুরাণ, মনসামঙ্গল, কুমারসম্ভব (অনুবাদ)।

সন্তোষকুমার দত্ত—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—লাল-পতাকা, রক্তের গোলাম, সন্ধ্যাতারা। সম্পাদক—বামাতোষিণী পত্রিকা (১৩১৪-১৩২৯)।

সন্তোষকুমার দে—গ্রন্থকার। জন্ম—১৩২৩ বঙ্গ ৬ই বৈশাখ খুলনা জেলার মূলঘর গ্রামে। গ্রন্থ—উপজীবিকা হিসাবে বিজ্ঞাপন (প্রচারশিল্প গ্রন্থ), ষ্ট্রাইক (গ), পাণ্ডুলিপি (উপ), আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র (জী), ১৩৫০ সাল (না), স্বাস্থ্যধর্মসঙ্গীত (গীত), বেলুন (রস-রচনা)। সম্পাদক—গায়ত্রী (পত্রিকা), সহ-সম্পাদক—স্বাস্থ্যসমাচার পত্রিকা।

সন্তোষকুমার পাল—গ্রন্থকার। জন্ম—১৩০০ বঙ্গ মেদিনীপুরের কাঁথিতে। মৃত্যু—১৩৪১ বঙ্গ। পিতা—আশুতোষ পাল। শিক্ষা—বি-এ (১৯১৩), বি-এল (১৯১৬)। কর্ম—আইন-ব্যবসায়, কলিকাতা হাইকোর্ট। গ্রন্থ—বীণা (১৩৩৭)।

সন্তোষকুমার ভড়—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। এম-এ। গ্রন্থ—On the zero of non-defferentiable functions of Darboux's type, On some remarkable points on the 'Graph' of Dinis not-differentiable functions.

সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়—কবি ও সাংবাদিক। জন্ম—১৩০০ বঙ্গ কলিকাতায়। পালি ভাষায় অভিজ্ঞ। সম্পাদক—বাঁশরী (১৩২২), আনন্দবাজার পত্রিকা।

সন্তোষকুমার শেঠ—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। 'সাহিত্যরত্ন' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—মহাজনী হিসাব ও লিখন শিক্ষা প্রণালী (১৯১২), মোকামে বাণিজ্য তত্ত্ব, ২ খণ্ড, প্রাথমিক ব্যবসা শিক্ষা, বিজ্ঞাপন তত্ত্ব ও ক্যানভাসিং, মহাজন সখা (১৯১১), বঙ্গে চালতত্ত্ব, অর্থোপার্জনের সহজ উপায় (১৯১২), Book-keeping in Bengali, Sett's guide to commercial places, Trader's friend.

সন্তোষকুমারী গুপ্তা—মহিলা সাহিত্যিকা। সম্পাদিকা—শ্রমিক (১৩৩১-৩২)।

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—শান্তি-নিকেতন (১৩২৮—২৯)।

সন্তোষবিহারী বসু—সাময়িকপত্রসেবী। যুগ্ম সম্পাদক—ভূমিলক্ষ্মী (ত্রৈমাসিক, ১৩৩১-৩৩)।

সন্তোষকুমার লাহিড়ী—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৯৩ খৃঃ কলিকাতায়। পিতা—শরৎকুমার লাহিড়ী। পিতামহ—রামতনু লাহিড়ী। শিক্ষা—হিন্দু স্কুল, বিদ্যাসাগর কলেজ। বহু গ্রন্থের লেখক। সম্পাদিত গ্রন্থ—অন্নদামঙ্গল, মাইকেলের কাব্য গ্রন্থাবলী, Police handbook, Primer of criminology & case diary, Police powers, Law of Transport, Criminal science & detection of crime, Constable manual, Excise handbook, Elements of medical jurisprudence, Criminal.clauses etc.

সমাধিপ্রকাশ আরণ্য—সমাজ-সেবক। পূর্ব নাম—নরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রধান শিক্ষক, বালিয়াকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়। গ্রন্থ—বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্মশিক্ষা, শ্রীশ্রীজগবন্ধু দর্শন, বুদ্ধচরিতের আভাষ, শুদ্ধা মাধুরী, পল্লীবোধন, বিদ্যাশিক্ষা ও সাধনা, পুরুষ ও আত্মা, জাতিকথা (১৩৪০), পরশমণি (১৩৪১)।

সরযূবালা দত্ত—মহিলা সাহিত্যিক। সম্পাদিকা—ভারত মহিলা (১৩১২-২৪)

সরস্বালা দাশগুপ্তা—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—ত্রিবেণী-সঙ্গমে, দেবোত্তর বিশ্বনাট্য, বসন্ত-প্রয়াণ।

সরযূবালা বসু—মহিলা ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—মনোরমা, প্রতিষ্ঠা, পরিত্যক্তা, প্রায়শ্চিত্ত, শ্রেয়সী, মিলন, শুকতারা, আহুতি, গ্রহের ফাঁদ, রেখা, প্রবাল।

সরসীলাল সরকার—চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৭৯ (?) বঙ্গ। মৃত্যু—১৩৫১ বঙ্গ ১০ই পৌষ। পিতা—কিশোরীলাল সরকার। শিক্ষা—এফ-এ (বৃত্তিলাভ), এম-এ (১৮৯৪), এল-এম-এস (মেডিক্যাল কলেজ, ১৮৯৮)। ইলিয়ট পুরস্কার লাভ (কলিঃ

বিশ্ববিদ্যালয়)। কর্ম—সরকারী সহ-সার্জন, সার্জন (১৮৯৯-১৯৩০)। গ্রন্থ—মনের কথা, রবীন্দ্রনাথের রাখী পরিকল্পনা, পল্লী-সংগঠন (১৯২৬), প্রবাহ (কবিতা)।

সরসীবালা দাসী—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—নিবেদিতা।

সরসীবালা বসু—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—পুষ্পহার।

সরলাবালা সরকার—মহিলা কবি ও গ্রন্থকর্ত্রী। জন্ম—১২৮২ বঙ্গ ২৫শে অগ্রহায়ণ। পিতা—কিশোরীলাল সরকার। স্বামী—শরচ্চন্দ্র সরকার (রায় বাহাদুর মহিমচন্দ্র সরকারের পুত্র)। ভ্রাতা—ডাঃ সরসীলাল সরকার। বৈধব্য (১৩০৫)। বাল্যকাল হইতেই কাব্যানুরাগিণী। প্রথম রচনা 'লজ্জাবতী' কবিতা (ভারতী ও বালক, ১২৯৭)। বহু সাময়িকপত্রে ছোট গল্প ও কবিতা প্রকাশ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মান লাভ। গ্রন্থ—প্রবাহ (শোককাব্য, ১৩১১), চিত্রপট (গল্প, ১৯১৭), নিবেদিতা (জীবনী, ১৩১৯), কুমুদনাথ (জী, ১৩৪৪)।

সরলা দেবী চৌধুরাণী—মহিলা কবি ও সাহিত্যিকা। জন্ম—১৮৭২ খৃঃ ৯ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা। মৃত্যু—১৯৪৫ খৃঃ ১৮ই অগষ্ট। পিতা—জানকীনাথ ঘোষাল। মাতা—স্বর্ণকুমারী দেবী (রবীন্দ্রনাথের ভগিনী)। স্বামী—লাহোর-নিবাসী পণ্ডিত রামভজ দত্তচৌধুরী। শিক্ষা—প্রবেশিকা (১৮৮৬), বি-এ (বেথুন কলেজ, ১৮৯০)। বৈধব্য (১৯২৩)। শৈশব হইতেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ। প্রথম রচনা—দুর্ভিক্ষ (বালক, ১২৯২, জ্যৈষ্ঠ)। 'ভারতী' পত্রিকায় বহু গল্প, কবিতা ও স্বরলিপি রচনা। বিখ্যাত পিয়ানোবাদিনী। ইনি প্রাচীন ভারতের বীরত্বের আদর্শে 'বীরাষ্টমী'র প্রচলন করেন। স্বদেশী আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া দীর্ঘকাল দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। গ্রন্থ—শতগান (স্বরলিপিসহ, ১৩০৭), বাঙ্গালীর পিতৃধন (১৯০৩), ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল (১৯১১), নববর্ষের স্বপ্ন (গ, ১৩২৫), কালীপূজায় বলিদান ও বর্তমানে তাহার উপযোগিতা (১৯২৮), শ্রীগুরু বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মানুষ্ঠিত শিবরাত্রি পূজা (১৯৪১), বেদবাণী, ১১ খণ্ড (বিজয়কৃষ্ণের উপদেশাবলী, ১৯৪৭-৫০)। যুগ্ম-সম্পাদিকা—ভারতী (মাসিক, ১৩০২-১৩০৪); সম্পাদিকা—ভারতী (১৩০৬-১৩১৪, ১৩৩১-১৩৩৩)।

সরোজকুমার আচার্য—গ্রন্থকার। জন্ম ১৯০৬ খৃঃ ৭ই জুন নদীয়া জেলায় কুষ্টিয়ায়। শিক্ষা—এম-এ। ছাত্রাবস্থা হইতেই জাতীয় আন্দোলনে জড়িত, কারাবাস ৭ বৎসর। গ্রন্থ—এশিয়ার রক্তবিপ্লব, মার্ক্সীয় দর্শন, যুক্তিবিজ্ঞান।

সরোজকুমার বসু—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—খুলনা জেলায়। কর্ম—অধ্যাপক, রাঁচি কলেজ। গ্রন্থ—রবীন্দ্র-সাহিত্যে হাস্যরস।

সরোজকুমার রায় চৌধুরী—সাময়িকপত্রসেবী। গ্রন্থ—মনের গহনে, দেহ-যমুনা, শৃঙ্খল, বসন্তরজনী, পান্থনিবাস, ঘরের ঠিকানা, মধুচক্র, আকাশ ও মৃত্তিকা, ময়ূরাক্ষী, [illegible]। সম্পাদক—নবশক্তি (সাপ্তাহিক ১৩৩৮-৩৯)।

সরোজকুমারী দেবী—মহিলা কবি। জন্ম—১৮৭৫ খৃঃ ৪ঠা নভেম্বর। মৃত্যু—১৯২৬ খৃঃ। পিতা মথুরানাথ গুপ্ত (বিচার বিভাগ)। ভ্রাতা—সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। স্বামী—কলুটোলা-নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ সেন (সম্বলপুরের উকিল)। বিবাহের (১৮৮৬) পর নিজ চেষ্টায় সাহিত্যসেবা। গ্রন্থ—হাসি ও অশ্রু (কাব্য, ১৩০১), অশোকা (কাব্য, ১৩০৮), কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প (১৩১২), শতদল (কা, ১৯১০), অদৃষ্ট-লিপি (গ, ১৯১৫), ফুলদানি (গ, ১৯১৫)।

সরোজকুমারী দেবী—লেখিকা। গ্রন্থ—দ্বন্দ্ব, মেঘমুক্তি।

সরোজনাথ ঘোষ—সাহিত্যিক। জন্ম ১২৮১ বঙ্গ (?)। মৃত্যু—১৩৫১ বঙ্গ ২৮শে বৈশাখ চেতলায়। কর্ম—সম্পাদকীয় বিভাগে, বসুমতী। সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী, মাসিক বসুমতী; যুগ্ম সম্পাদক—পল্লীবাণী (১৩২৯)। গ্রন্থ—শতগল্প গ্রন্থাবলী মস্তকের মূল্য, জাল সম্রাট, বিসমার্ক, জার্মাণীর গুপ্তচর, বিদ্রোহী শাসক, যুবরাজ, যমুনাবাঈ।

সরোজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের প্রকৃতি।

সরোজনলিনী দত্ত—মহিলা সাহিত্যিক। গ্রন্থ—জাপানে বঙ্গনারী।

সরোজবাসিনী দেবী—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—বনবালা (উপ, ১২৯৯)।

সরোজিনী চৌধুরী—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—সুরের বীণ (কুমিল্লা, ১৩৪১)।

সরোজিনী দেবী—মহিলা কবি। গ্রন্থ—সুধাময়ী (কাব্য, ১৩০১)।

সরোজিনী নাইডু—কবি, বিদুষী ও রাজনীতিজ্ঞ। জন্ম—১৮৭৯ খৃঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারি হায়দরাবাদে। মৃত্যু—১৯৪৯ খৃঃ ২রা মার্চ—লক্ষ্ণৌ। পিতা—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। আদি নিবাস—ঢাকা-বিক্রমপুর। বিবাহ—হায়দরাবাদে ১৮৯৮ খৃঃ। স্বামী—ডাঃ গোবিন্দরাজলু নাইডু। শিক্ষা—হায়দরাবাদে, বিলাতে কিংস কলেজে (১৬ বৎসর বয়সে), গার্টন কলেজে। ফেলো—লণ্ডন সোসাইটী অব লিটারেচার, ডি-লিট (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। বাল্যকাল হইতেই অদ্ভুত কবি-প্রতিভা। ইংরেজী কবিতা রচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশ হইতে সম্বর্ধিত। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান। জাতীয় মহাসভার সভানেত্রী (১৯২৫), ভারত স্বাধীন হইবার পর প্রথম মহিলা প্রদেশপালিকা, উত্তর প্রদেশ (১৯৪৭)। গ্রন্থ—The Golden Threshold (লণ্ডন, ১৯০৫), The Bird of Time (লণ্ডন, ১৯১২), The Broken Wing (লণ্ডন, ১৯১৭)।

সর্বানন্দ—অসমীয়া কবি। জন্ম—১৮৭০ খৃঃ ফেব্রুয়ারি। মৃত্যু—১৯০৮ খৃঃ ১৬ই এপ্রিল। শিক্ষা—প্রবেশিকা, এফ-এ (চট্টগ্রাম কলেজ)। কর্ম—দারোগা; শিক্ষক, মহামুনি মধ্য-ইংরেজি স্কুল, পরে মোক্তারি। গ্রন্থ—শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত, জগজ্জ্যোতিঃ। সম্পাদক—বৌদ্ধপত্রিকা।*

[ক্রমশঃ।

---

* মৃত এবং জীবিত লেখক-লেখিকাদের মধ্যে যাঁহাদের নাম ভ্রমবশতঃ অথবা যথাসময়ে সংগৃহীত না হওয়ায় অনুল্লিখিত হইয়াছে, উহা সংগৃহীত হইলে সাহিত্য-সেবক-মঞ্জুষার পরিশিষ্ট-অংশে 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হইবে। এই বিষয়ে লেখককে সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের সুবিধার্থে লেখকের ঠিকানা দেওয়া হইল—১২বি, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪।

সৈয়দ মুজতবা আলি

৩

আরবের তুলনায় বাঙালী যে অতিশয় নিরীহ সে বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয় কিন্তু আরব সাগর, সাগর হয়েও বঙ্গোপসাগরের উপসাগরের চেয়ে অনেক বেশী শান্ত এবং ঠাণ্ডা। মাদ্রাজ থেকে কলম্ব পর্যন্ত অধিকাংশ যাত্রী সী-সিকনেসে বেশ কাবু হয়ে থাকার পর এখানে তাঁরা বেশ চাঙা হয়ে উঠেছেন। উত্তর-পূব দিকে মৃদু-মন্দ মৌসুমী হাওয়া বইছে তখনো—এই হাওয়ায় পাল তুলে দিয়েই ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকা থেকে ভারতে পৌছতে পেরেছিলেন কিন্তু এই সময়ে ঐ হাওয়া ভারতের দিকে বয় সে আবিষ্কার গামার নয়। আরবরা এ হাওয়ার গতিবিধি সম্বন্ধে বিলক্ষণ ওকিব-হাল ছিল এবং বিশেষ ঋতুতে (মৌসুম) এ হাওয়া বয় বলে এর নাম দিয়েছিল মৌসুমী হাওয়া। ইংরিজি শব্দ 'মনস্যুন' এই মৌসুম শব্দ থেকে এসেছে। কিন্তু মৌসুমী হাওয়ার খানিকটে সন্ধান পাওয়ার পরও গামা একা সাহস করে আরব সাগর পাড়ি দিতে পারেননি। আফ্রিকা থেকে এক জন আরবকে জোর করে জাহাজের 'পাইলট' রূপে সঙ্গে এনেছিলেন।

রোমানরাও নিশ্চয়ই এ হাওয়ার খবর কিছুটা রাখতো। না হলে আরবদের বহু পূর্বে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করলো কি করে? এখনো দক্ষিণ-ভারতের বহু জায়গায় মাটির তলা থেকে রোমান মুদ্রা বেরোয়।

তারও পূর্বে পূর্বে গ্রীক, ফনেশিয়ানরা এ হাওয়ার খবর কতখানি রাখতো আমার বিদ্যে অত দূর পৌঁছয়নি। তোমরা যদি কেতাব-পত্র ঘেঁটে আমাকে খবরটা জানাও তবে বড় খুশী হই।

এই হাওয়াটাকেই টারচা কেটে কেটে আমাদের জাহাজ এগোচ্ছে। এ হাওয়া যতক্ষন মোলায়েম ভাবে চলেন ততক্ষণ কোনো ভাবনা নাই; জাহাজ অল্প-স্বল্প দোলে বটে তবু উল্টো দিক থেকে বইছে বলে গরমে বেগুন-পোড়া হতে হয় না। কিন্তু ইনি রুদ্রমূর্তি ধরলেই জাহাজময় পরিত্রাহি চিৎকার উঠবে। এবং বছরের এ সময়টায় তিনি যে মাসে অন্তত দু-তিন বার জাহাজগুলোকে লণ্ডভণ্ড করে দেবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে যান সে সুখবরটা আবহাওয়ার বইখানাতে একাধিক বার উল্লেখ করা হয়েছে।

আবহাওয়ার বিজ্ঞান ঝড় ওঠবার পূর্বাভাস খানিকটা দিতে পারে বটে কিন্তু আরব সাগরের মাঝখানে যে ঝড় উঠল সে যে তার পর কোন দিকে ধাওয়া করবে সে সম্বন্ধে আগে ভাগে কোনো-কিছু বলে দেওয়া প্রায় অসম্ভব।

তাই সে ঝড় যদি পূব দিকে ধাওয়া করে তবে ভারতের বিপদ; বোম্বাই, কারবার, ত্রিবান্দ্রম্ (শ্রীঅনন্তপুর, টি্রভাণ্ডরম্) অঞ্চল লণ্ডভণ্ড করে দেবে। যদি উত্তর দিকে যায় তবে পারশ্যান গাল্ফ্‌ এবং আরব-উপকূলের বিপদ আর যদি পশ্চিম পানে আক্রমণ করে তবে আদন বন্দর এবং আফ্রিকার সোমালিদেশের প্রাণ যায় যায়।

এক বার নাকি এই রকম একটা ঝড়ের পর সোমালিদের ওবোক শহরে মাত্র একখানা বাড়ি খাড়া ছিল! যে ঝড়ে শহরের সব বাড়ি পড়ে যায়, তার সঙ্গে যদি মাঝ দরিয়ায় আমাদের জাহাজের মোলাকাৎ হয় তবে অবস্থাটা কি রকম হবে খানিকটে অনুমান করা যায়।

তবে আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, এ রকম ঝড়ের সঙ্গে মানুষের এক বারের বেশী দেখা হয় না। প্রথম ধাক্কাতেই পাতাল-প্রাপ্তি!

'পাতাল-প্রাপ্তি' কথাটা কি ঠিক হল? কোথায় যেন পড়েছি, জাহাজ ডুবে গেলে পাতাল অবধি নাকি পৌঁছয় না। খানিকটে নাবার পর ভারি জল ছিন্ন করে জাহাজ নাকি আর তলার দিকে যেতে পারে না। তখন সে ত্রিশঙ্কুর মত ঐখানেই ভাসতে থাকে।

ভাবতে কি রকম অদ্ভুত লাগে! সমুদ্রের এক বিশেষ স্তরে তা'হলে যত সব জাহাজ ডোবে তারা যত দিন না জরাজীর্ণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় তত দিন শুধু ঘোরাফেরাই করবে!

জলে যা, হাওয়াতেও বোধ করি তাই। বেলুন টেলুন জোরদার করে ছাড়তে পারলে বোধ হয় উড়তে উড়তে তারা এক বিশেষ স্তরে পৌছলে সে ঐখানেই ঝুলতে থাকবে—না পারবে নিচের দিকে নামতে, না যেতে পারবে উপরের দিকে। তারই অবস্থা কল্পনা করে বোধ হয় মুনি-ঋষিরা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ-মর্ত্যের মাঝখানে ঝুলে থাকার কথা কল্পনা করেছিলেন।

আমাকে অবশ্য কখনো কোনো জায়গায় ঝুলে থাকতে হবে না। দ্বিপ্রহরে এবং সন্ধ্যায় যা গুরুভোজন করে থাকি তার ফলে জলে ডুবলে পাথরবাটির মত তরতর করে একদম নাক বরাবর পাতালে পৌঁছে যাব। আহারাদির পর আমার যা ওজন হয় সে গুরুভার সমুদ্রের যে-কোনো নোণা জলকে অনায়াসে ছিন্ন করতে পারে। আমার ভাবনা শুধু আমার মুণ্ডুটাকে নিয়ে। মগজ সেটাতে এক রত্তিও নেই বলে সেটা এমনি ফাঁপা যে, কখন যে ধড়টি ছেড়ে

চুশ করে চন্দ্র-সূর্যের পানে তাওয়া করবে তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। হাজারো লোকের ভিড়ের মধ্যে যদি আমাকে সনাক্ত করতে চাও তবে শুধু লক্ষ্য করো কোন্ লোকটা দু'হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে নড়া-চড়া করছে।

অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলুম আমার সখা এবং সতীর্থ—একই তীর্থে যখন যাচ্ছি তখন 'সতীর্থ' বলাতে কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়—শ্রীমান্ পল কোথা থেকে একটা টেলিস্কোপ জোগাড় করে একদৃষ্টে দক্ষিণ পানে তাকিয়ে আছে। ভাবলুম, ঐ দিক দিয়ে বোধ হয় কোনো জাহাজ যাচ্ছে আর সে তার নামটা পড়ার চেষ্টা করছে।

আমাকে দাঁড়াতে দেখে কাছে এসে বললে, "ঐ দূরে যেন ল্যাণ্ড দেখা যাচ্ছে।'

আমি বললুম, 'ল্যাণ্ড নয়, আইল্যাণ্ড। ওটা বোধ হয় মালদ্বীপপুঞ্জের কোনো একটা হবে।'

পল বললে, 'কই, ওগুলোর নাম তো কখনো শুনিনি!'

আমি বললুম, 'শুনবে কি করে? এই জাহাজে যে এত লোক,—এঁদের সব্বাইকে জিজ্ঞেস করো ওঁদের কেউ মালদ্বীপ গিয়েছেন কি না?'

অন্দুরই বা কেন? শুধু জিজ্ঞেস করো, মালদ্বীপবাসী কারো সঙ্গে কখনো ওঁদের দেখা হয়েছে কি না? তাই মালদ্বীপ নিয়ে এ বিশ্বভুবনে কারো কোনো কৌতূহল নেই।'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'শুনেছি, মালদ্বীপের লোকেরা খুব ধর্মভীরু হয়। এক মালদ্বীপবাসীর তাই ইচ্ছা হয়, তার ছেলেকে মুসলিম শাস্ত্র শেখাবার। মালদ্বীপে তার কোনো ব্যবস্থা নেই বলে তিনি ছেলেকে কাইরোর আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান;—ঐটেই ইসলামি শাস্ত্র শেখার জন্য পৃথিবীর সব চেয়ে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। ছেলেটির সঙ্গে আমার আলাপ হয় ঐখানে। বহুবার দেখা হয়েছিল বলে সে আমাকে তার দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলেছিল, তবে সে অনেক কাল হয়ে গিয়েছে বলে আজ আর বিশেষ কিছু মনে নেই।

'ওখানে না কি সবশুদ্ধ হাজার দুই ছোট ছোট দ্বীপ আছে এবং তার অনেকগুলোতেই খাবার জল নেই বলে কোনো প্রকারের বসতি নেই। মালদ্বীপের ছেলেটি আমায় বলেছিল, 'আপনি যদি এ রকম দশ-বিশটা দ্বীপ নিয়ে বলেন, "এগুলো আপনার, আপনি এদের রাজা তা হলে আমরা তাতে কণামাত্র আপত্তি জানাবো না। অন্যগুলোতেও বিশেষ কিছু ফলে না, সব চেয়ে বড় দ্বীপটার দৈর্ঘ্য না কি মাত্র দু'মাইল। মালদ্বীপের সুলতান সেখানে থাকেন এবং তাঁর নাকি ছোট্ট একখানা মোটর গাড়ি আছে। তবে যেখানে সব চেয়ে লম্বা রাস্তার দৈর্ঘ্য মাত্র দু'মাইল সেখানে ওটা চালিয়ে তিনি কি সুখ পান তা তিনিই বলতে পারবেন।"

মালদ্বীপে আছে প্রচুর নারকল গাছ আর দ্বীপের চতুর্দিকে জাত-বেজাতের মাছ কিলবিল করছে। মাছের শুঁটকি আর নারকোলে নৌকো ভর্তি করে পাল তুলে দিয়ে তারা রওয়ানা হয় সিংহলের দিকে মৌসুমী হাওয়া বইতে আরম্ভ করলেই। হাওয়া তখন মালদ্বীপ থেকে সিংহলের দিকে বয়। সমস্ত বর্ষাকালটা সিংহলে ঐ সব বিক্রী করে এবং বদলে চাল ডাল কাপড় কেরসিন তেল কেনে। কেনা-কাটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তাদের নাকি সেখানে বহুদিন কাটাতে হয়, কারণ উল্টো হাওয়া বইতে আরম্ভ করবে শীতের শুরুতে। তার আগে তো ফেরার উপায় নেই।'

পাসি বললে, 'কেন স্যর, [illegible] না। [illegible] তো হাওয়ার [illegible] দিয়েই [illegible]।'

আমি বললুম, '[illegible] চলে [illegible], হাওয়ার [illegible] কেউ [illegible]। মালদ্বীপে কোনো কলের জাহাজ যায় না, [illegible] না বলে। তাই আজ পর্যন্ত কোনো টুরিস্ট মালদ্বীপ যায়নি।"

'তাই মালদ্বীপের [illegible] আমায় বলেছিল, 'আমাদের ভাষাতে 'অতিথি' শব্দটার কোনো প্রতিশব্দ নেই। তার কারণ বহুশত বৎসর ধরে আমাদের দেশে ভিনদিশী লোক আসেনি। আমরা এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যা অল্পস্বল্প যাওয়া-আসা করি তা এতই কাচাকাছির ব্যাপার যে কাউকে অন্যের বাড়িতে রাত্রিযাপন করতে হয় না।' তার পর আমায় বলেছিল, 'আপনার নেমন্তন্ন রইল মালদ্বীপ ভ্রমণের কিন্তু আমি জানি, আপনি কখনো আসবেন না। যদিস্যাৎ এসে যান তাই আগের থেকেই বলে রাখছি, আপনাকে এর বাড়ি ওর বাড়ি করে করে অন্তত বছর তিনেক সেখানে কাটাতে হবে। খাবেন দাবেন, নারকোল গাছের তলাতে চাঁদের আলোয় গাওনা-বাজনা শুনবেন, বাস্, আর কি চাই!'

'যখন শুনেছিলুম তখন যে যাবার লোভ হয়নি এ-কথা বলবো না। ঝাড়া তিনটি বচ্ছর (এবং মালদ্বীপের ছেলেটি আশা দিয়েছিল যে সেখানে যাহা তিন তাহা তিরানব্বুই) কিচ্ছুটি করতে হবে না, এবং শুধু তিন বৎসর না, বাকি জীবনটাই কিছু করতে হবে না এ-কথাটা ভাবলেই যেন চিত্তবনের উপর দিয়ে মর্মর গান তুলে মন্দমিঠে মলয় বাতাস বয়ে যায়। এগজামিনের ভাবনা, কেষ্টার কাছে দু'টাকার দেনা, সব কিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এক মুহূর্তেই মুক্তি। অহো,!

> 'কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ
> দিবা-রাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ—
> সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
> তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ॥'

এ-সব আত্মচিন্তার সব কিছুই যে পল-পাসিকে প্রকাশ করে বলেছিলুম তা নয়, তবে একটা কথা মনে আছে, ওরা যখন উৎসাহিত হয়ে মালদ্বীপে বাকি জীবনটা কাটাবে বলে আমাকে সে খবরটা দিলে তখন আমি বলেছিলুম,—

'বাকি জীবন কেন, তিনটি মাসও সেখানে কাটাতে পারবে না। তার কারণ যেখানে কোনো কাজ করার নেই, সেখানে কাজ না-করাটাই হয়ে দাঁড়ায় কাজের কাজ। এবং সে ভয়াবহ কাজ। কারণ, অন্য যে-কোনো কাজই নাও না কেন, যেমন মনে করো এগজামিন্—তারও শেষ আছে, বি-এ, এম-এ, পি-এইচ্-ডি,—তার পর আর কোনো পরীক্ষা নেই। কিম্বা মনে করো উঁচু পাহাড়ে চড়া। পাঁচ হাজার, দশ হাজার, ত্রিশ হাজার ফুট, যাই হোক না কেন, তারও একটা সীমা আছে। কিন্তু 'কাজ নেই'—এ হ'ল একটা জিনিস যা নেই, কাজেই তার আরম্ভও নেই শেষও নেই। যে জিনিসের শেষ নেই সে জিনিস [illegible] পর্যন্ত সইতে পারে না।

'[illegible] অন্য দিক দিয়ে ব্যাপারটাকে দেখ [illegible]।

'আমাদের কবি [illegible] বলেছেন, [illegible] ঘর। ঘরের আসল জিনিস—দি ইমপর্টেন্ট, [illegible] তার ফাঁকাটা, আমরা তাতে আসবাবপত্র রাখি, [illegible], সেখানে রৌদ্রবৃষ্টি থেকে শরীরটা বাঁচাই। ঘরের দেয়ালগুলো কিন্তু এসব কাজে লাগছে না। অর্থাৎ ইমপর্টেন্ট হ'ল ফাঁকাটা, নিরেট দেয়ালটা নয়। তাই বলে দেয়ালটা বাদ দিলে চলবে না। দেয়ালহীন ফাঁকা হল ময়দানের ফাঁকা, সেখানে আশ্রয় জোটে না।

'তাই গুরুদেব বলেছেন, মানুষের জীবনের অবসরটা হচ্ছে ঘরের ফাঁকাটার মত, সেই দেয় আমাদের আশ্রয় কিন্তু কিছুটা কাজের দেয়াল দিয়ে সেই ফাঁকা অবসরটাকে যদি ঘিরে না রাখো তবে তার থেকে কোনো সুবিধে ওঠাতে পারবে না। কিন্তু কাজ করবে যতদূর সম্ভব কম। কারণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছো, ঘরের মধ্যে ফাঁকাটা দেয়ালের তুলনায় পরিমাণে অনেক বেশী।'

তার পর আমি বললুম, 'কিন্তু, হে লাতৃদ্বয়, আমার গুরুদেব এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন ভারি সুন্দর ভাষায় আর সুমিষ্ট ব্যঞ্জনায়, কিছুটা উঁহার স্বরচিত হাস্যকৌতুক মিশিয়ে দিয়ে। আমি তার অনুকরণ করবো কি করে?

'কিন্তু মূল সিদ্ধান্ত এই,—মালদ্বীপের একটানা কর্মহীনতার ফাঁকাটা অসহ্য হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তার চতুর্দিকে সামান্যতম কাজের দেয়াল নেই বলে।'

একটানা এতখানি কথা বলার দরুণ ক্লান্ত হয়ে ডেক-চেয়ারে গা এলিয়ে দিলুম।

তখন লক্ষ্য করলুম, পল ঘন-ঘন ঘাড় চুলকোচ্ছে। তার পর হঠাৎ ডান হাতটা মুঠো করে মাথায় দুম্ করে গুত্তা মেরে বললে, 'পেয়েছি, পেয়েছি, এই বারে পেয়েছি।'

কি পেয়েছে সেইটে আমি শুধোবার পূর্বেই পাসি বললে, 'ঐ হচ্ছে পলের ধরণ। কোনো একটা কথা স্মরণে আনবার চেষ্টা করার সময় সে ঘন-ঘন ঘাড় চুলকোয়। মনে এসে যাওয়া মাত্রই ঠাস করে মাথায় মারবে এক ঘুশি। ক্লাসেও ও তাই করে। আমরা তাই নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে থাকি। এই বারে শুনুন, ও কি বলে।'

পল বললে, 'কোনো নূতন কথা নয়, স্যর! তবে আপনার গুরুর তুলনাতে মনে পড়ে গেল আমাদের গুরু 'কন্‌ফুৎস'র (আমার মনে বড় আনন্দ হ'ল যে ইংরেজ ছেলেটি কন্-ফু-ৎস'কে 'আমাদের গুরু' বলে সম্মান জানালো—ভারতবর্ষের ইংরেজ ছেলে-বুড়ো বুদ্ধকে কখনো 'আমাদের গুরু' বলেনি) বিষয়ে অন্য এক তুলনা। যদি অনুমতি দেন—'

আমি বললুম, 'কী জ্বালা! তোমার এই চীনা লৌকিকতা—ভদ্রতা আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললে। কন্-ফু-ৎস'র তত্ত্বচিন্তা শুনতে চায় না কোন মর্কট? জানো,

ঋষি কন্-ফু-ৎস আমাদের মহাপুরুষ গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক ? ঐ সময়েই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ইরানে জরথুস্ত্র, গ্রীসে সেক্রোতেস-প্লাতো-আরিস্তোতেলেস, প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের ভিতরে—তা থাক গে, তোমার কথা বলো।'

পল বললে, 'সরি, সরি। কন্-ফু-স বলেছেন, 'একটি পেয়ালার আসল (ইমপরটেণ্ট) জিনিস কি ? তার ফাঁকা জায়গাটা, না তার পর্সেলেনের ভাগটা ? ফাঁকা জায়গাটাতেই আমরা রাখি জল, শরবৎ, চা। কিন্তু পর্সেলেন না থাকলে ফাঁকাটা আদপেই কোনো উপকার করতে পারে না। অতএব কাজের পর্সেলেন দিয়ে অকাজের ফাঁকাটা ঘিরে রাখতে হয়। এবং শুধু তাই নয়, পর্সেলেন যত পাতলা হয়, পেয়ালার কদর ততই বেশী। অর্থাৎ কাজ করবে যতদূর সম্ভব সামান্যতম।'

তার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে কাও-টাও করে, অর্থাৎ চীনা পদ্ধতিতে আমাকে হাটু আর মাথা নিচু করে অভিবাদন জানিয়ে বললে,—

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ফের তোমার চীনে সৌজন্য ?'

বললে, 'সরি সরি। কিন্তু, আর ঐ মালদ্বীপের কথা ওঠাতে আর আপনি আপনার গুরুদেবের কথা বলাতে আমার কাছে কন্-ফু-ৎসের অর্থচিন্তা আজ সরল হয়ে গেল। ওঁর এ বাণী বহু বার শুনেছি, অনেক বার পড়েছি কিন্তু আজ এই প্রথম—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'চোপ্।'

[ক্রমশঃ।

এমনটিও ঘটে

(ইংলণ্ডের রূপকথা)

ইন্দিরা দেবী

অনেক কাল আগের কথা। পশ্চিম দেশের এক রাজা, ছোট্ট দেশ। কিন্তু দেশ ছোট হলে কি হবে ? বড় বড় দেশের মত সেখানেও রাজা রয়েছেন। আর রাজা থাকলে পাত্র-মিত্র লোক-জন সৈন্য-সামন্ত এ-সব তো থাকবেই। রাজা-রাণী বেশ সুখেই রাজত্ব করছিলেন, প্রজারাও শান্তিতে ছিল। রাজার ছ' ছেলে। লেখা-পড়ায় যুদ্ধবিদ্যায় তারা রীতিমত নিপুণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু রাজা-রাণীর কপালে সুখ বেশী দিন ছিল না। ছয় ছেলের পর রাজার আর একটি ছেলে হলো। মুস্কিল দেখা দিল এই ছেলেকে নিয়ে ! দেখতে-শুনতে ছেলেটি ভারী সুন্দর, মাথাভর্তি সোনালী চুল, নীল চক্‌চকে চোখ, দাঁত, নাক, মুখ, ঠোঁট, গাল, গলা সবই সুন্দর, কেবল পা দু'টো অসম্ভব রকমের ছোট। সে রাজ্যে নিয়ম ছিল অদ্ভুত। পা ছোট হওয়া খুব লজ্জার আর দুর্ভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করা হতো। যার পা যত বড়, রাজ্যে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-মর্যাদা তত বেশী—এই ছিল সেখানকার নিয়ম। রাজা-রাণী আর রাজকুমারদের বেশ বড় বড় লম্বা লম্বা পা ছিল। কিন্তু বুড়ো বয়সের এই ছেলেটা অলক্ষণে হয়ে জন্মালো। কী করা যায় ? রাজা-রাণীর ভাবনার অন্ত নেই। শেষকালে অনেক পরামর্শ করে ছেলেটাকে রাজবাড়ী থেকে বিদেয় করে দেওয়া হলো। রাণী চোখের জল মুছলেন, কিন্তু প্রতিবাদ করার তাঁর সাহস ছিল না।

রাজধানীর কিছু দূরে বনের ধারে থাকতো মেষ-পালকেরা। তাদের এক জন রাজার ছেলেকে আশ্রয় দিলো। সকাল বেলা উঠে ভেড়ার পাল নিয়ে সে বনের দিকে চলে যেতো। সমস্ত দিন ধরে ভেড়ার পাল এধার-ওধার চরে বেড়াতো। সন্ধ্যার কিছু আগে রাজার ছেলে ভেড়াগুলোকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে আসতো। এমনি করে তার দিন কাটছিল। বেচারীর মনে এতোটুকু সুখ নেই। বাড়ীর কথা, মা-বাবার কথা, ভাইদের কথা মনে হলেই তার কান্না পেতো। এখানকার সঙ্গীরাও তার সঙ্গে মিশতে চাইতো না। পা ছোট বলে সবাই তাকে ঘৃণা করতো। একলা বনের ধারে বসে বসে রাজকুমার তার অদৃষ্টের কথা ভাবতো আর দুঃখ পেতো। একদিন বিকেল বেলা ভেড়ার পাল ছেড়ে দিয়ে রাজকুমার বসে রয়েছে। এমন সময় দেখতে পেলো একটা ছোট্ট পাখীকে প্রকাণ্ড একটা বাজপাখী তাড়া করে নিয়ে আসছে। বাজ-পাখী প্রায় ধরে ফেলবে এমন সময় ছোট পাখীটা হুমড়ি খেয়ে নীচে রাজপুত্র যেখানে বসেছিল তার কাছে মাটির ওপর ঢিপ করে পড়ে গেল। তাকে দেখতে পেয়ে রাজপুত্র তার মাথার লম্বা টুপিটা দিয়ে ছোট পাখীটাকে ঢেকে দিলে। বাজপাখীটা খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর শীকার হাতছাড়া হয়ে গেল দেখে মন খারাপ করে উড়ে চলে গেল।

বাজপাখী চলে যাওয়ার পর রাজপুত্র টুপিটা সরিয়ে নিলো।

কিন্তু কোথায় সে পাখী? তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এক হাত-লম্বা, শাদা চুল-দাড়িওয়ালা, সবুজ পোষাক-পরা একটা ক্ষুদে বামন। রাজপুত্রকে দেখেই বামন দু'হাত তুলে তাকে আশীর্বাদ করলো তার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে। বামন বললে, রাজপুত্রের যদি কোন প্রয়োজনে লাগতে পারে তবে সে ধন্য হবে। এই বলেই বামন তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল। রাজপুত্র তাকে থামিয়ে দিলে। বামনের কাছে রাজপুত্র তার দুঃখের কথা খুলে বললো। সব শুনে বামনের ভারী দুঃখ হলো। খানিক ভেবে সে রাজপুত্রকে বললে—'সন্ধ্যে হয়ে আসচে। ভেড়াগুলো নিয়ে তুমি বাড়ী চলে যাও। রাত্তিরে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন আমি তোমার বাড়ীতে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবো। তোমাকে নিয়ে যাবো আমাদের দেশে। দেখবে সেখানে কতো মজা! আমরা পা দেখে মানুষের বিচার করি না সেখানে।'

রাজকুমার তার কথা শুনে আশ্বস্ত হলো। বাড়ী ফিরে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে সে শুয়ে পড়লো তার ঘরে। খানিক বাদে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন সেই বামন এসে হাজির। হাত ধরে রাজপুত্রকে নিয়ে সে চললো বনের দিকে। আকাশে ততক্ষণে চাঁদ উঠেছে। চার দিক জ্যোৎস্নায় ঢেকে গিয়েছে। ঝির্‌ঝির্ বাতাস বইছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে আলো-আঁধার-ঢাকা পথ দিয়ে খানিক দূর গিয়ে হাজির হলো তারা পাহাড়ের কোলে এক ঝরণার ধারে। চার দিকে অজস্র ফুলের গাছ। কতো রকমারী রং-এর ফুল সেখানে ফুটে রয়েছে! গালিচার মত নরম সবুজ ঘাস। আকাশের বুক থেকে ঝরে পড়ছে কি মিষ্টি চাঁদের আলো! ভালো করে তাকিয়ে রাজপুত্র দেখতে পেলো গাছের তলায় অনেকগুলো ছোট ছোট টেবিল পাতা রয়েছে—তাতে খাবার-ভর্ত্তি ডিস আর সরবতের গ্লাস। বামন তাকে একটা টেবিলে বসিয়ে দিয়ে সরবত খেতে বললো। কী মিষ্টি সে সরবত! বামন বললে, 'এই ঝরণার জল থেকে এই সরবত তৈরী হয়েছে। এ জলের অনেক গুণ।'

সরবত খাওয়ার পর রাজপুত্রের ক্লান্তি এক মুহূর্তে দূর হয়ে গেলো। চার দিকে তখন ঝক্‌ঝকে সবুজ পোষাক-পরা পরীদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নাচ আরম্ভ হয়েছে। সুন্দর বাজনার সঙ্গে তালে তালে তাদের নাচ দেখে রাজপুত্রের খুব ভালো লাগলো। একটু পরে এক দল ছেলে-মেয়ে তাকে ঘিরে নাচের আসরে নিয়ে গেলো। সবাইর সঙ্গে সেও নাচে মেতে উঠলো। সারা রাত ধরে নাচ-গান, খেলাধুলো চললো। তার পর পূবের আকাশ যখন ফর্সা হয়ে আসছে তখন বামন রাজপুত্রের হাত ধরে তাকে বনের বাইরে এনে তার বাড়ী পৌঁছে দিলো। সারা রাত নাচ-গান হৈ-হল্লা চলেছে, কিন্তু কী আশ্চর্য! রাজপুত্রের এতোটুকু ক্লান্তি মনে হচ্ছে না। এই ভাবে প্রতি রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন বামন এসে রাজপুত্রকে বনে পরীদের আস্তানায় নিয়ে যায়। সারা রাত হৈ-হুল্লোড় আর নাচ-গান করে সকাল হওয়ার আগেই রাজপুত্র ফিরে আসে। তার চেহারার আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে। মনে এখন আর তার কোনো দুঃখ নেই। সমস্ত দিন সে বসে থাকে রাত্রির অপেক্ষায়।

এক দিন নাচ-গানের পালা শেষ হওয়ার পর রাজপুত্র বাড়ী ফিরে আসছে। বামন আজ আর তাকে এগিয়ে দিতে আসেনি। খানিক দূর যাওয়ার পর বনের রাস্তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় রাজপুত্র দেখতে পেলো দু'জন লোক তার আগে আগে চলেছে। তারা নিজেদের মধ্যে যে সব কথা-বার্ত্তা বলছিল, রাজপুত্রের কানে তা ভেসে আসছিল। তারা ভিন্‌রাজ্যের লোক। তাদের রাজকন্যাকে নিয়ে ভারী বিপদে পড়া গেছে। তার পা দুটো ক্রমশঃ ভারী আর বড় হয়ে পড়ছে। এত বড় পা নিয়ে রাজকন্যার নাচের আসরে যোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই রাজার আদেশ—সমস্ত দেশ খুঁজে এমন কারু সন্ধান নিতে হবে, যে রাজকন্যার বেড়ে-যাওয়া পা দু'টোকে ছোট করে দিতে পারে। রাজপুত্র তাদের কথা শুনে কিন্তু কিছুই বললে না। পরদিন কাউকে কিছু না বলে রাজপুত্র সেই রাজার রাজ্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। অনেকখানি পথ হেঁটে এক দিন সে তার গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছুল। রাজার সঙ্গে দেখা করে সে বললে, যদি রাজা তাকে অনুমতি দেন ত' তাঁর মেয়েকে সে দিন কতকের জন্য সঙ্গে করে নিয়ে যাবে আর তার পা দু'টোকে ছোট করে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

মেয়ের পা সম্বন্ধে রাজা এতো নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন যে, বিদেশী তরুণের কথায় তিনি রাজী হলেন। সঙ্গে লোক-জন দিয়ে রাজকন্যাকে তিনি তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। রাজপুত্র রাজকন্যা আর তার দল-বলকে নিয়ে সোজা চলে এলেন পরীদের আস্তানায়—সেখানে ঝরণার ধারে রোজ রাত্তিরে তাদের নাচের আসর বসতো। রাজপুত্রের কথা মতো রাজকন্যা জুতো-মোজা খুলে তার পা দুখানি ঝরণার জলে নামিয়ে দিলো। কী আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে তার পা দুখানি ছোট হয়ে গেলো। ঐ বিদ্‌ঘুটে বড় বড় পা দু'টোর জায়গায় ছোট্ট সুন্দর দুখানি পা দেখে রাজকন্যা ভারী খুসী হলো। তার পর রাজপুত্র রাজকন্যা আর তার দলবলকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন তার দেশে। রাজা-রাণী ত মেয়েকে পেয়ে মহাখুসী। তাঁরা আরও খুসী হলেন যখন দেখলেন যে তাদের মেয়ে ফুট্‌ফুটে ছোট্ট দুখানা পা ফেলে হেঁটে বেড়াচ্ছে। রাজা-রাণী ভিন্‌দেশী এই ছেলেটিকে তাদের বাড়ীতেই রেখে দিলেন। তাকে আর ফিরে যেতে দিলেন না। কিছু দিন পর রাজকন্যার সঙ্গে ছেলেটির খুব ভাব হলো। রাজা-রাণীর ইচ্ছামত রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেওয়া হলো। দু'জনে মহাসুখে রাজবাড়ীতে ঘর-কন্না করতে লাগলো। কেবল রাজা-রাণীর মত নিয়ে দিন কয়েকের জন্য তারা দু'জনে পরীদের আস্তানায় বেড়াতে এলো। সেই ঝরণার জলের দিকে তাকিয়ে রাজকন্যার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠছিল আর বামনের দেখা পেয়ে রাজপুত্রের দু' চোখ চক্‌চক্ করে উঠলো আনন্দে আর কৃতজ্ঞতায়।

ছাত্রনেতা সুভাষচন্দ্র

শ্রীসুলতা কর

১৯১৬ খৃষ্টাব্দ, জানুয়ারী মাস। প্রেসিডেন্সী কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর এক দল ছাত্র জটলা পাকিয়ে কি'যেন মন্ত্রণা করছে। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে তারা। রাগে অনেকের মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কয়েক মিনিট এই ভাবে কাটবার পর বাইরের দরজা খুলে ভিতরে এসে তাদের সামনে দাঁড়াল এক সুদর্শন তরুণ। মুখে ভাবে সরলতা আর তেজস্বিতা ফুটে উঠেছে। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র দলের নেতা সুভাষচন্দ্র। সুভাষকে দেখেই ছাত্রদের

কথা বন্ধ হোয়ে গেল। সবাই তার দিকে ফিরে তাকাল। কয়েক জন ছাত্র বেঞ্চ থেকে লাফিয়ে উঠে বলল—"সুভাষ, আজ আবার এক কাণ্ড হয়েছে। কি করা যায় বল দেখি?"

"কি ব্যাপার বল শুনি, আমি ত কিছু জানি না।" সুভাষচন্দ্র তাদের মাঝখানে এসে বসলেন।

"অধ্যাপক ওটেন সাহেব আজ আবার আমাদের এক বন্ধুকে মেরেছেন। প্রথম বার্ষিকের ছাত্র সে। কোন দোষ ছিল না ছেলেটির। মিথ্যে একটা ছুতা নিয়ে সাহেব তাকে মেরেছেন।"

সুভাষ অবাক হয়ে বললেন—"সে কি! এখনও এক মাস হয় নি, ওটেন সাহেবকে সমস্ত ছাত্রদের কাছে ক্ষমা চাইতে হয়েছে আর আজ আবার তিনি এমন ব্যবহার করতে সাহস পেলেন? মনে আছে ত তোমাদের সে ঘটনা?"

সামনের ছাত্রটি বলল—"সে কথা আর মনে থাকবে না? ওটেন সাহেবের ঘরের সামনের বারান্দায় আমরা কয় জন একটু জোরে হেঁটেছি, আর অমনি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাত ধরে টানতে টানতে আমাদের ধাক্কা দিলেন। তারপর সুভাষ, তোমার কথা মত আমরা এমন ধর্মঘট করলাম যে কলেজ বন্ধ হবার জোগাড়। ওটেন সাহেব ক্ষমা চাইলেন তবে ধর্মঘট ভাঙলাম।"

সুভাষ বললেন—"কিন্তু সে বারের ধর্মঘটের ব্যাপারে আমরাও খানিকটা হেরে গেছলাম। এই কলেজের অধ্যক্ষ ইংলণ্ডের খাস সাহেব। তিনি ছাত্রদের কয়েক জনকে জরিমানা করলেন। আমরা সে জরিমানা দিতে বাধ্য হলাম। এবারেও যদি ধর্মঘট করি তাহলে ঠিক গত বারের মতই ফল হবে। অধ্যক্ষ যখন সাহেব তখন ধর্মঘট করে কি সুবিচার পাবে আশা কর?"

ছাত্রেরা বলল—"সে ত পাব না বেশ বুঝছি। কিন্তু কি করে প্রতিকার করা যায় আমরা ত ভেবে পাচ্ছি না। তুমি আমাদের নেতা, তুমিই প্রস্তাব কর ভাই!"

সুভাষ উঠে দাঁড়ালেন, দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—"দেখ সাহেবেরা কথায় ভোলে না, ভোলে কাজে। আমরা কয়েক জন সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ওটেনকে প্রহার করে বুঝিয়ে দেব যে ভারতের ছাত্রের গায়ে হাত তুললে সে তা ফিরিয়ে দিতে জানে। তারা পরাধীন হলেও কাপুরুষ নয়। কি বল বন্ধুরা, রাজী আছ? এর ফল কি হবে বুঝতেই পারছ। আমাদের অনেককে হয়ত কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, অনেককে হয়ত জরিমানা দিতে হবে। কিন্তু তবু আমরা যে মানুষ, আমাদের যে আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, জাতীয়তাবোধ আছে, তা বোঝাবার এই একটিমাত্র পথই খোলা আছে। এখন বল তোমরা এ প্রস্তাবে রাজী আছ কি না?"

উৎসাহ-চঞ্চল তরুণদের মুখে প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ফুটে উঠল। তারা সমস্বরে বলে উঠল—"রাজী সুভাষ, সবাই রাজী।"

পরের দিন সকাল। ওটেন সাহেব সগর্বে ক্লাশ-ঘরের দিকে চলেছেন। হঠাৎ কয়েক জন ছাত্র নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে ওটেন সাহেবের চার পাশ ঘিরে দাঁড়াল। সামনে তরুণ নেতা সুভাষ। মুহূর্ত্তের মধ্যে কে বা কারা সাহেবকে সজোরে আঘাত করল। সাহেব মাটীতে গড়িয়ে পড়লেন, চোখে অন্ধকার দেখলেন, চীৎকার করে উঠলেন। নিঃশব্দে ছাত্রের দল সরে গেল।

কলেজের চাপরাশীরা বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল। সাহেবকে গড়াগড়ি দিতে আর যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখে তারা চীৎকার করে উঠল। কলেজের অধ্যক্ষ জেমস্ সাহেব ছুটে এলেন। অধ্যাপকেরা ছুটে এলেন। ভীড় জমে গেল। শুধু ছাত্রেরা এল না। কলেজে ছুটী ঘোষণা করা হয়ে গেল।

সে যুগে এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা কখনও ঘটেনি। সে দিন সন্ধ্যায় কলিকাতার সব খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে এই ঘটনার বিবরণ ছাপা হল।

কয় দিন কাটল। ওটেন সাহেব সেরে উঠলেন। অধ্যক্ষ জেমস্ সাহেব সভা ডেকেছেন। সভাতে ওটেন সাহেব আর সব অধ্যাপকেরা উপস্থিত রয়েছেন। অধ্যক্ষ এক এক করে ছাত্রদের ডাকছেন আর জিজ্ঞাসা করছেন—"সেদিন কে ওটেন সাহেবকে মেরেছে তার নাম বল। কে তোমাদের নেতা তার নাম বল। যদি না বল ত কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।"

দলে দলে ছাত্র এসে উত্তর দিয়ে চলে গেল। প্রত্যেকের মুখে এক কথা—"কে মেরেছে জানি না। নেতা কেউ নেই।" অধ্যক্ষের ভয় দেখান, অধ্যাপকদের অনুনয় সব ব্যর্থ হল। কে মেরেছে বোঝা গেল না। ছাত্রনেতার নাম জানা গেল না।

অধ্যক্ষও ভাবতে লাগলেন—আমার এমন রাজভক্ত কলেজে এ রকম দৃঢ় ছাত্রসঙ্ঘ কে গড়ে তুলতে পারে? এ সাধ্য একমাত্র সুভাষচন্দ্রেরই আছে। তিনি সুভাষকে ডেকে পাঠালেন। সুভাষচন্দ্র অধ্যক্ষের সামনে এসে দাঁড়ালেন। অধ্যক্ষ প্রশ্ন করলেন—"তুমি নিশ্চয়ই জান যে ছাত্রেরা পিছন থেকে লুকিয়ে ওটেন সাহেবকে বার বার মেরেছে। তাঁকে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিয়েছে। তাঁকে একেবারে মৃতপ্রায় করেছে। এ কাজ কে করেছে? এদের নেতা কে? আশা করি তুমি ভীরু নও, সত্য কথা বলবার সাহস আছে।"

জেমস্ সাহেবের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে তরুণ বীর সুভাষ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—"সত্য কথা বলতে একটুও ভয় পাব না। ওটেন সাহেব এ দেশের ছাত্রদের মানুষ বলে ভাবেন না। অকারণে তিনি একজন ছাত্রকে মেরেছেন। তাই ছাত্রেরা যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছে। কিন্তু আপনার সব কথা সত্য নয়। ছাত্রেরা ওটেন সাহেবকে পিছন থেকে মারেনি। সিঁড়ি থেকে ফেলে দেয়নি, কিংবা বার বার মারেনি। তারা সামনে দাঁড়িয়ে মাত্র একবার মেরেছে, শুধু এই কথা বুঝিয়ে দেবার জন্য যে ভারতের ছাত্রেরা পরাধীন হলেও মানুষ, তাদের আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, তারা সাদা চামড়া দেখে ভয় পায় না। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম, সব ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছি।"

সুভাষের কথা শুনে জেমস্ সাহেব রাগে জ্বলে উঠলেন। চীৎকার করে বললেন—"বোস, তোমার মত বেয়াড়া ছেলে আর কলেজে নাই। তোমাকে আমি সাস্‌পেণ্ড করলাম।"

সুভাষচন্দ্র অভিবাদন করে বললেন—"ধন্যবাদ!"

তার পর তিনি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। বাইরে ছাত্রের দল জয়ধ্বনি দিতে দিতে তাঁর সঙ্গে রাজপথে বেরিয়ে এল।

এর পর কয়েক বছর পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্র কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে পেলেন না।
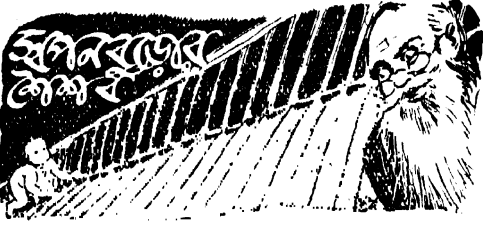
শ্রীঅখিল নিয়োগী

দাদার ধারণা ছিল—আমার পিঠটা হচ্ছে বেওয়ারিশ মাল। যখন-তখন এসে তব্‌লা বাজিয়ে যাওয়া চলে। আর দাদা যখন বয়েসে আমার চাইতে তিন-চার বছরের বড় তখন জন্মগত সে অধিকার ত' আছেই।

কখন আমার পিঠে ভাদ্রের তাল এসে পড়ে সে জন্য বাড়ী শুদ্ধ লোক সব সময় তটস্থ থাকত।

এই সব গুরুতর ব্যাপারে আমার সান্ত্বনার যায়গা ছিল মামীর কোল।

পরিস্থিতি জটিল ও ঘোরালো হয়ে উঠলেই আমি সটান সেইখানে পালিয়ে যেতাম।

কিন্তু তাই বলে সব সময় যে নিষ্কৃতি পেতাম তা নয়। এই তাল-পড়া কিম্বা তবলা-বাজানো ভবিষ্যতের জন্যে শিকেয় তোলা থাকত—এবং শুভ-মুহূর্তে যথাস্থানে এসে পৌঁছুতে তার কিছুমাত্র ভুল হত না!

দাদা ইস্কুলের পড়া যা পড়ত···আমি চুপচাপ বসে মনোযোগ দিয়ে শুন্‌তাম। তার পর যা-কিছু শুনতাম অনর্গল বলে যেতাম—ঠিক-বেঠিক সুর মিলিয়ে।

এই সময়টা দাদা [illegible] খুব মুখস্থ করছিল। আমি কয়েকটা দিন বেশ কান পেতে শুনলাম। তার পর একদিন মামীকে বললাম, এ ত' খুব সোজা—জিজ্ঞেস করলে আমিও বলে দিতে পারি।

মামী খুব কৌতুক বোধ করলেন, বললেন, আচ্ছা, বল ত স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গ—কেমন শিখেছিস?

শুধু প্রশ্ন করার অপেক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে চাবি-দেয়া কলের গানের মতো অনর্গল বলে যেতে লাগলাম—গাছ-গাছুনি, মাছ-মাছুনি, ঘর-ঘরণী, পথ-পথনী—

আরো অনেক কিছু হয়ত শোনাতে পারতাম—কিন্তু হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, মামী হেসে গড়িয়ে পড়েছেন, কাউকে ডেকে যে কৌতুকের ভাগ দেবেন—তাঁর সে ক্ষমতাও নেই।

ব্যাপার দেখে ভারী দমে গেলাম। আমার এই কৃতিত্বে এত হাসির ব্যাপার কি আছে, কিছুই বুঝতে পারলাম না!

কানুকে ভোলা আমার পক্ষে সহজ নয়।

কানু, মামার ছেলে।

আমার জীবনে কানুই হচ্ছে প্রথম শিশু—যাকে প্রাণ ভরে আদর করতে আর ধমক দিয়ে কাঁদাতে পারতাম।

সত্যি কথা বল্‌তে কি, কানুকে আমি একটা খেলনা বলেই মনে করতাম।

প্রথম জীবনে মামীর সন্তান হয়ে বাঁচত না। কয়েকটি শিশুর অকালমৃত্যুর পর মামীর কোলে এলো কানু।

এই কানু আমাদের কাছে হল সাত রাজার ধন মাণিক। তখন কানু ছাড়া আর যেন কিছু ভাবতে পারতাম না—

মনে হত, কানু রোজ কেন আরো বড় হয় না? তাহলে ত' ওর হাত ধরে উঠোনে ছুটোছুটি করতে পারতাম, দু'জনে দূর্ব্বো আর কাঁটালপাতা জোগাড় করে নিয়ে এসে ছাগলকে খাওয়াতে পারতাম, কিম্বা ওর হাতে শ্লেট-পেন্সিল গুঁজে দিয়ে ইস্কুলে নিয়ে যেতে পারতাম।

এজন্যে আমার জিজ্ঞাসার অন্ত ছিল না।

যখন ইস্কুলে থাক্‌তাম—কেবলি মনে হত, কখন বাড়ী ফিরে যাবো—কানুকে দেখতে পাবো—তার সঙ্গে হাসবো আর হাততালি দেবো।

মামী উত্তর দিতেন, বড় হবে বৈ কি! বড় হয়ে ত' তোর সঙ্গেই খেলাধূলা করবে। ছুটোছুটি করবে, দুষ্টুমী করবে—

দাদী মাসি কিম্বা হরি পিশি একদিন বলেছিল ঝাল খেলে নাকি তাড়াতাড়ি বড় হয়।

একদিন ওকে একটা লঙ্কা খাওয়াবার ইচ্ছে ছিল—কিন্তু পাছে মারধোর খেতে হয় তাই সাহস পাইনি।

একদিন শোনা গেল—কানুর মুখে ভাত হবে। অন্নপ্রাশন। কি মজা! ও নাকি প্রথম ভাত খাবে—মিষ্টি পায়েস খাবে, রসগোল্লা খাবে—আরো কি সব খাবে। ওর জন্যে সোনার গয়না তৈরী হবে—স্যাক্‌রা-বাড়ীতে ফরমাস গেল। মুখে ভাতের দিন অনেক নাকি লোক খাবে। পুকুরে জাল ফেলা হবে—মাছ উঠবে অনেক।

আনন্দে আর উল্লাসে আমার চোখে ঘুম নেই!

অনেক পরামর্শ করে ফর্দ্দ তৈরী হচ্ছে—কা'কে কা'কে নেমন্তন্ন করা হবে। কল্‌কাতা থেকে মামীর ভাই পাঁচু মামা আস্‌বেন। তিনিই নাকি কানুর মুখে ভাত দেবেন। পাঁচু মামা মামীর ভাই মামাকেই মুখে ভাত তুলে দিতে হয়।

নানা রকম গল্পে বাড়ী একেবারে সরগরম।

আর ক'টা দিন কাটাতে পারলে সারা বাড়ীতে পুলকের বন্যা বয়ে যাবে এই কথা ভেবে আমি কেবলই ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলাম একবার এ-ঘর—আর একবার ও-ঘর।

মনে হল—আমার যদি খুব গায়ে জোর থাক্‌ত তবে দিনগুলোকে ঠেলে একেবারে হটিয়ে দিতাম পেছনে।

তার পর একেবারে আনন্দের হাট।

—'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো'

কিন্তু মৃত্যু যে গোপনে পা টিপে-টিপে এগিয়ে এসেছে সে কথা আমরা কেউ ভাবতেও পারিনি!

কুষ্ঠি, ঠিকুজী, দিন-ক্ষণ কত কি বিচার করেই না অন্নপ্রাশনে শুভদিন ধার্য্য করা হয়েছিল।

কোনো পণ্ডিতে কি সত্যি করে গণনা করতে পারে না?

সেই নির্দ্ধারিত শুভদিনের আগেই মৃত্যু তার থাবা মেলে সকলকার মাঝখান থেকেই মামীর কোল খালি করে কানুকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

জীবনে এই মৃত্যুকে প্রথম সামনা-সামনি দেখলাম।

সে বয়সে আর কতটুকুই বা বুঝতে পেরেছিলাম!

কিন্তু সেদিনকার সেই কিশোরের মনে যে আঘাত লেগেছিল তাতে সাময়িক ভাবে তার ঠোঁটে কে যেন বোবা-কাঠি ছুঁইয়ে দিলে!

কানুর সেই ফুল-তোলা কাঁথা—যার ওপর শুয়ে সে হাত-পা নেড়ে খেলা করত, সেই ঝিনুক-বাটি যাতে করে সে দুধ খেতো, ছোট্ট বালিশ, যার ওপর মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে থাকত—সব যেন কাঁকর হয়ে চোখে বিঁধতে লাগলো।

ভাল করে খেতে পারি নে, রাত্তিরে ঘুমুতে পারি নে, কেবলি চম্‌কে চম্‌কে উঠি।

আমার মনে হত নিশীথ রাতে কানু যেন হামাগুড়ি দিয়ে এসে আমার কানের কাছে খিলখিল করে হেসে উঠছে!

আমি চম্‌কে চম্‌কে উঠি। বাড়ী-শুদ্ধ লোক তখন আমার সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়ল। গাঁয়ের কা'কে ডেকে যেন ঝাড়ফুঁক করা হল। সেকালের নিয়ম অনুযায়ী 'বাড়ী-বন্ধন'ও করা হয়েছিল। কানুর আত্মা নাকি বাড়ী ছেড়ে যায়নি!

আমার মনে এই ভয়-ভয় ভাবটা বহু কাল ছিল। সেই থেকে মামাবাড়ীতে অন্নপ্রাশন উৎসব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সেকালে আমাদের গাঁয়ে কুমারীপুজো আর কুমারী ভোজন করানোর প্রথা ছিল। দিদিমা প্রতি বছর কুমারীপুজো করতেন।

একবারের ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। আমার এক সহপাঠী বন্ধু ছিল, তার নাম টোনা ঠাকুর। সেই টোনা ঠাকুরের দিদিকে দিদিমা কুমারী হিসেবে নেমন্তন্ন করেছিলেন।

ব্রাহ্মণকন্যাকে বসিয়ে তাকে দেবতার মতো পুজো করতে হয়। কুমারী মেয়ে ত' মা ভগবতীর অংশ—সেই মনোভাব থেকেই বোধ করি কুমারীপুজোর প্রচলন হয়েছে।

একটা জ্যান্ত মানুষকে বসে কেউ পুজো করছে—এটা দেখতে আমার ভারী মজা লাগছিল!

আমি ভাবছিলাম—পুজোর পর মেয়েটাকে কাঁধে করে নিয়ে খালে কিম্বা পুকুরের জলে বিসর্জ্জন দিতে হবে নাকি? যেমন নাকি অন্যান্য প্রতিমার বেলা হয়ে থাকে?

মেয়েটার পায়ে আলতা পরিয়ে তাকে আবির দিয়ে প্রণাম করা হল—পূজোর পর। তার পর থালা থালা সব খাবার সাজিয়ে দেয়া হল ওর খাবার জন্যে।

ঐটুকু মেয়ে আবার কতটুকু খাবার খাবে? পরে সব ছেলে-মেয়েদের হাতে হাতে ভাগ করে দেয়া হল।

যে থালায় মেয়েটি খেয়েছিল—তার থেকে অনেকগুলি ভালো মিষ্টি আর সাবু-মাখা তুলে নিয়ে দিদিমা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, নে—খা!

খুব ছেলেবেলা থেকেই আমি কারো পাতের জিনিস খেতে পারি না। মেয়েটির পাতের খাবার হাতে দেয়ায় আমার গা ঘিন্-ঘিন্ করতে লাগলো। কী দুষ্টু সরস্বতী যে মাথায় চাপলো বলতে পারি নে!

সবগুলি খাবার দিদিমার গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। সবাই একেবারে হা-হা করে উঠল।

দিদিমা আমায় বকাবকি করতে লাগলেন। তার পর গামছাটা কাঁধে ফেলে তিনি আবার পুকুরঘাটে চললেন নাইতে।

যে খাবার এতক্ষণ ছিল প্রসাদ—আমার ছোঁয়ায় তা নাকি উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে—তাই দিদিমাকে স্নান করে 'শুদ্ধ' হতে হবে!

প্রসাদকে অবহেলা করা, আর এই গুরুতর অপরাধের জন্য সেদিন মার কাছ থেকে খুব উত্তম-মধ্যম লাভ হয়েছিল!

আমরা দু' ভাই যখন খুব ঘন ঘন ম্যালেরিয়ায় ভুগতে সুরু করলাম—তখন বাড়ীর তিন কর্ত্তা—ছোট আজামশাই, বড় মামা আর মামা পরামর্শ করে স্থির করলেন—আমাদের স্থান পরিবর্ত্তনের একান্ত প্রয়োজন।

দিগিন্দ্রপ্রসাদ সেন—পাশের সন্তোষ গ্রামের প্রমথ-মন্মথ রায়-চৌধুরীর পাঁচ আনি ষ্টেটে কাজ করেন। তিনি তখন পাবনার অন্তর্গত ম্যাছরা কাছারীর নায়েবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দিগিন্দ্রপ্রসাদের মতো দিলখোলা, পরোপকারী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ মানুষ সে যুগে আমাদের গাঁয়ে খুব কমই ছিলেন। গোটা গ্রামে তিনি কেঠু বাবু নামে পরিচিত ছিলেন। আর সেই হিসেবে তিনি ছিলেন আমাদের কেঠুদা।

এই ম্যাছরা জায়গাটা তখন নাকি খুব স্বাস্থ্যকর ছিল। কাজেই স্থির হল, আমরা দুই ভাই—মার সঙ্গে ম্যাছরা গিয়ে কেঠুদার কাছে বেশ কিছু দিন থাকবো—তাহলেই ম্যালেরিয়া পালাতে পথ পাবে না।

তখনকার দিনে নদীপথে বড় নৌকা করে যাতায়াত করতে হত।

গ্রামের বাইরে এই আমরা প্রথম যাচ্ছি।

কাজেই শিশুমনে কৌতূহলের অন্ত ছিল না। 'ম্যালোয়ারী' ছাড়ুক আর না ছাড়ুক—নতুন জায়গা ত' দেখে নেয়া যাবে।

একটা শুভদিন দেখে নৌকো করে আমরা রওনা হলাম। এ বাড়ীর তিন কর্ত্তার সঙ্গে পরামর্শ করে কেঠু দাদাই সে ব্যবস্থা করেছিলেন।

গ্রামের বেষ্টনীর বাইরে নদীপথে এই নৌকো-ভ্রমণ একসঙ্গে দেহ-মন যেন একেবারে শীতল করে দিল।

দু' চোখে যা দেখি—তাতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি।

নৌকো যখন পাল তুলে দিয়ে চলতে থাকে—এক দিকে প্রকৃতির শ্যাম শোভা, অন্য দিকে তীর দেখা যায় না—এমন নদীর বিস্তার! গাঙচিলেরা দূর আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে—, হাল্কা মেঘ ভাসছে নীল গগনের গায়, নদীর স্রোত আবর্ত্ত রচনা করে কেবলি ছুটে চলেছে কোন্ অসীমের সন্ধানে।

যে দিকটায় তীর খুব কাছাকাছি সেখানেও ছায়াছবির মতো পট পরিবর্ত্তিত হচ্ছে ক্ষণে-ক্ষণে।

কচি কলাগাছের পাতা বাতাসে হেলছে, দুলছে—রাশি-রাশি কাশফুলের বন সাদা হয়ে ছেয়ে আছে নদীর তীর। মাঝে মাঝে কৃষকদের ছোট-ছোট কুটির। চাষার মেয়েরা মাথায় দুধের

কলসী নিয়ে চলেছে হাটের পথে। কৃষকদের ধামায় তাজা তরি-তরকারী একেবারে লকলক্ করছে। এক্ষুনি তুলে আনা হয়েছে সব্জী-ক্ষেত থেকে। কোথায়ও বা নদীর ঘাটে বৌ-ঝিরা স্নান করছে। কেউ বা স্নান করার ফাঁকে ঘোম্‌টা তুলে পাল-তোলা নৌকোটাকে একবার দেখে নিচ্ছে।

দামাল ছেলের দল—জল ছিটিয়ে, দুরন্তপণা করে, সাঁতার কেটে নদীর ঘাট তচ্‌নচ করে তুলেছে। পারের কাছ দিয়ে যে সব নৌকো যাচ্ছে—সাঁতারুদের মধ্যে কেউ কেউ ঢেউয়ের দোলায় ভেসে এসে তার হালটা আঁকড়ে ধরছে! বেশ খানিকটা চলে যাবার পর আবার ছেড়ে দিচ্ছে নৌকোর হাল। ঢেউয়ের দোলায় তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দূরে—দূরে—অনেক দূরে। মোচার খোলার মতো তাদের মাথাটা কখনো ভাস্‌ছে—আবার কখনো ডুবছে।

নৌকোর পাটাতনে বসে মাঝিরা পালা করে তামাক সেজে টান্‌ছে। এক জন চীৎকার করে উঠল—ওই পানকৌড়ি।

কোন্ ছেলে-ভুলোনো-ছড়ায় যেন পানকৌড়ির নাম শুনেছিলাম। কাজেই তাকে দেখবার আগ্রহ আমার কম ছিল না।

উঁকি-ঝুঁকি মেরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম—নৌকোর একটা ধারের দিকে। কিন্তু মা কিছুতেই এগুতে দেবেন না। আমি ত' তখন সাঁতার জানি নে! আর সাঁতার জান্‌লেই বা কী! সেই ঢেউয়ের দোলা-লাগা নদী থেকে উঠে আসা আমার মতো ছোট ছেলের কাজ নয়। দু'বার নাকানি-চুবানি খেলেই নদীর তলায় বরুণ দেবের বাড়ী গিয়ে হাজির হতে হবে।

নদীপথে চলতে গিয়ে মাঝে মাঝে চরের দেখা পাওয়া যায়। এই হঠাৎ-জেগে-ওঠা চরগুলি দেখতে ভারী ভালো লাগে!

কোথায়ও সবুজের আস্তরণ, কোথায়ও শুধু বালি—কোথায়ও বা ওরই মাঝখানে গড়ে উঠেছে একটি ছোট চাষীপল্লী।

এক-একটি চর বেশ দীর্ঘ আর নিরালা।

এখানে মাঝে মাঝে কুমীর নদী থেকে উঠে এসে রোদ পোহায়। মাঝি বললে, অনেক সময় দল বেঁধেও ওরা উঠে আসে—মানুষের আর নৌকোর সাড়া পেলে ঝুপ ঝুপ্ করে জলে নেমে যায়। কচ্ছপের ডিমও মেলে এই সব চরে।

খাঁটি দুধ খাবে? ডাকো না একজন চাষার মেয়েকে। হাঁড়ি থেকে ঢেলে দেবে। এক ফোঁটা জল মেশানো নেই তাতে।

নৌকো করে দল বেঁধে মাছ ধরছে জেলেরা নদীর বুকে। জাল খুলে দিয়েছে অগাধ জলে। এই রকম কত নৌকোর দেখা পেলাম আমরা।

ওদের কাছ থেকে টাটকা তাজা ইলিশ মাছ কিনে—গরম গরম মাছের ঝোল ভাত খেতে ভারী মজা!

সব কিছু ছাপিয়ে সব সময় নদীর কল্-কল্ ছল্-ছল্ শব্দ যেন মনের আর দেহের মালিন্য ধুয়ে-মুছে নির্ম্মল করে দিচ্ছে।

নদীর ওপর নৌকোর মাঝেই যেন আমাদের অসুখ অর্দ্ধেক সেরে গেল,—নতুন একটা বল যেন পেলাম!

[ক্রমশঃ।

খামখেয়ালী ছড়া

অজিতকৃষ্ণ বসু

সবুর

পোনাগুলো ছোট আর পাৎলা
বড় হয়ে হবে রুই কাৎলা,
হয়ে যাবে নারকেল কাঁচা ডাব পাক্‌লে।
মেওয়া নাকি ফলে ভাই সবুরে,
বসে থাকা বড় দায় তবু রে,
জিভ্ থেকে জল ঝরে কাঁচা আম চাখ্‌লে।

ভিরুমিরামের মামা

নিমবাগানের ভীম পালোয়ান ভিরুমিরামের মামা—
তার কাছে হায় কোথায় লাগে গ্যাঙো-গোবর-গামা?
এই তো সেদিন চিড়িয়াখানায় যেতে যেতেই পাঁপড়
দুই হাতীকে শুইয়ে দিলেন দুইটি মেরে চাপড়।
গান শুনে তাঁর তানসেনেরা মান নিয়ে যান ভেগে,
একটু বেসুর শুন্‌লে পরেই বিষম ওঠেন রেগে।
লম্বা পায়ে দম বাড়িয়ে এম্নি ছোটেন বেড়ে
ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ারাও পাল্লাতে যায় হেরে।
হকি, ক্রিকেট, টেনিস, পোলো—সব খেলাতেই বাজী,
হারার ভয়ে তাহার সাথে কেউ লড়ে না রাজী।
সার্কাসেতে তাক্-লাগানো দেখায় যে সব খেলা
দেখান তিনি অনায়াসেই সন্ধ্যে সকাল বেলা।
গণ্ডা বিশেক মণ্ডা পারেন যখন তখন খেতে,
সাঁতার কেটে তাহার সাথে কাহার সাধ্য জেতে?
যখন তখন পদ্য লেখেন, এম্নি পাকা কবি!
দেখ্‌লে সবাই মুগ্ধ হবে তাঁহার আঁকা ছবি।
ডাক্তারী তাঁর কোথায় শেখা, যায় না মোটে বোঝা,
কঠিন কঠিন ব্যামো সারান ওষুধ দিয়ে সোজা।
রান্নাতে তাঁর নেইকো জুড়ি, সবাই সেটা জানে,
মিঠাই বানান এমন মিঠে, ময়রারা হার মানে।
হাজার রকম ম্যাজিক জানেন, দেখান মাঝে মাঝে,
তাঁর তুলনায় সব যাদুকর একেবারেই বাজে।
হাতীর পিঠে মাহুত তিনি, ঘোড়ার পিঠে সোয়ার,
গোঁ যা ধরেন ছাড়েন না কো এম্নি তিনি গোঁয়ার।
সেতার, বীণা, ব্যাঞ্জো, বাঁশী, সারেঙ্গী আর সানাই,
সবেতে তাঁর সমান দখল (চুপ্‌টি করে জানাই)।
ঘুঁষোঘুঁষির বিদ্যে জানেন, যুযুৎসু-তে দড়,
লাঠিখেলার হাজার ফিকির মগজে তাঁর জড়।
এসব ছাড়াও অনেক কিছু আরো জানেন যা তা
লিখ্‌তে গেলে লাগ্‌বে পুরো আড়াইখানা খাতা।
তাই তো মোরা সবাই বলি "ভিরুমিরামের মামা
মানুষ তো নয়, মহামানুষ, হাজার গুণের ধামা।"

[জেমস জোনসের সুদীর্ঘ উপন্যাস "ফ্রম হিয়ার টু ইটারনিটি" ১৩৫৩ সালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বিগত বৎসর এই উপন্যাসটির ১,৫০০,০০০ খণ্ড বিক্রী হয়েছে। জেমস জোনস্ এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, সব কথা সত্য না হলেও এই গ্রন্থের অধিকাংশ তথ্যই প্রকৃত ঘটনা—এবং এই রকম এক ব্যারাকে তিনি স্বয়ং সৈনিক-জীবন কাটিয়েছেন। মার্কিণ সেনা-ব্যারাকের অনেক আভ্যন্তরীণ তথ্য এবং নিদারুণ ব্যথা ও বেদনার কথা এই উপন্যাসের উপজীব্য। উপন্যাসটির প্রথম পাতায় জেমস জোনস রাডিয়ার্ড কিপলিঙের **Barrack Room Ballads**-এর বিখ্যাত কবিতা থেকে উদ্ধৃত করেছেন—

"Damned from here to eternity
God ha' mercy on such as we,
Bah, Yah, Bah!

'ফ্রম্ হিয়ার টু ইটারনিটি' রূপালী পর্দায় সার্থক ছবি। জেমস জোনসের সেই উপন্যাসটির চিত্ররূপের সংক্ষেপিত অংশ বাংলায় অনুবাদ করা হ'ল।]

জুন মাসে রবার্ট লী প্রিউইট ফোর্ট সাফ্‌টারের বিউগিল্ কোর ত্যাগ করল। ওকে কর্তৃপক্ষ পার্ল হারবারের কাছে স্কোফিল্ড ব্যারাকস্-এ বদলী করলেন।

এক দিকে ভালো হল, আবার সেই হাস্যময়, উদ্দাম প্রকৃতির এঞ্জেলো ম্যাগিওর সঙ্গে একই সঙ্গে কাজ করা যাবে। তা ছাড়া ওখানে আর একজন বিউগিল-বাদক ওর ওপরওলা।

মন্দের দিকে ক্যাপ্টেন ডানা হোমস্। রেজিমেণ্টের বক্সিং দলের শিক্ষক হিসাবে হোমস চান একটা শক্তিশালী দল গড়তে। প্রথম দিনেই প্রিউকে বলা হয়েছিল সে যদি বক্সিং দলে যোগ দেয় তাহলে আবার তাকে কর্পোরাল পদে উন্নীত করা হবে।

প্রিউ কিন্তু আর বক্সিং করতে চায় না,—হাওয়াই অঞ্চলে অবশ্য আমি মিডিলওয়েট হিসাবে তার খ্যাতি ছিল—কিন্তু বছর খানেক আগে একটা বিশ্রী দুর্ঘটনা ঘটে, তার ফলে বেচারী ডিক্সী ওয়েলস্ আজ অন্ধ, সেই দিন থেকে প্রিউ তার মুষ্টিযুদ্ধের সরঞ্জাম তুলে রেখেছে, চিরদিনের জন্য আর সে দস্তানা পরবে না।

হোমস্ তবু জেদ করে বলেছিলেন—"এক জন মারা গেলে তুমি হয়ত বলবে যুদ্ধ থামাও। আমাদের প্রোগ্রাম অনুসারেই মানুষের মনোবল সব চেয়ে সহজে বাড়ানো যায়। আমার দলে একজন বিউগিল-বাদক আছে, ঐ চাকরীটা তোমার কেমন লাগে?"

প্রিউ দৃঢ় গলায় বলে—"না,—তার অর্থ যদি বক্সিং লড়া হয়, তাহ'লে বলব আমি লড়াই চাই না।"

কাপ্তেন হোমস্ গর্জন করে বলে ওঠেন—"বেশ, আমরা অবশ্য তোমাকে জোর করে কিছু করাতে চাই না।"

জোর? জবরদস্তি? দৃঢ়চিত্ত মিলট ওয়ার্ডেন আরো স্পষ্ট করেই বলে—"তোমাকে লড়তেই হবে প্রিউইট, কাপ্তেন হোমস চান মেজর হোমস হ'তে। ওঁর ধারণা যদি একটা শক্তিশালী দল গড়তে পারেন তাহ'লেই মেজরত্ব লাভ করবেন। আমার কাজ ওঁকে খুসী রাখা। বুঝলে?"

ওয়ার্ডেন ঠিকই বলেছিল: এর ফলে এখানকার 'ব্যবহারে'র বিরুদ্ধে সোজা হয়ে দাঁড়াতে প্রিউকে অনেক সহ্য করতে হয়েছে।

ময়লা পরিষ্কার, পায়খানা পরিষ্কার, আর গালোভিচ্, ধোম, উইলসন প্রভৃতি নন-কমিসণ্ড অফিসারদের সঙ্গে ঘুরতে হয়েছে। অতিরিক্ত ড্রিল করতে হয়েছে, রাইফেল্স পরিষ্কার করার শাস্তিও গ্রহণ করতে হয়েছে।

তবু কোনো মতে দৃঢ় ভাবে নিজের জেদ বজায় রেখেছিল প্রিউ। সে একদিন বলল: "ওয়ার্ডেন, যদি তুমি মনে করে থাকো এই ভাবে আমাকে যন্ত্রণা দিয়ে বক্সিং দলে ভেড়াতে পারবে, তাহলে তুমি ভুল বুঝেচ। তুমি বা ঐ ডিনামাইট-মার্কা হোমস্ বা তোমাদের এই ব্যবহার আমার সঙ্কল্প টলাতে পারবে না।"

প্রিউ যা বলেছিল তা ঠিক।

মিলট্ ওয়ার্ডেন, আজীবন এই সেনাদলেই কাটিয়েছে, প্রিউইটের মতো এমন জেদী মানুষ সে পছন্দ করে না, আর সবাই যা চাইছে প্রিউ তার বিরোধী এ ওয়ার্ডেনের ভালো লাগে না। ওয়ার্ডেন জানে ছেলেটিকে অবশেষে'দুদিন আগে বা পরে নতি স্বীকার করতেই হবে। শুধু এইটুকু না হলে, এত দিনে সে কাপ্তেন হোমস্কে সুপারিশ করে বেচারী প্রিউ'র যন্ত্রণা কিছু লাঘব করারচেষ্টা করত।

কা রে ণ, কাপ্তেনের স্ত্রী। ওয়ার্ডেনের কাছে সে এক বিস্ময়. নিজের অজ্ঞাতসারে সে ক্রমে কারেণের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। প্রথম দিন সামরিক ছাউনিতে তাকে দেখা অবধি এই অবস্থা হয়েছে। মেয়েটির সম্পর্কে নানাবিধ কলঙ্ককাহিনী জানা সত্ত্বেও ওয়ার্ডেন তাকে ভালো না বেসে পারেনি।

খুব সম্প্রতি ওয়ার্ডেন তার সঙ্গে দিন-ক্ষণ স্থির করে মেলামেশা করতে সুরু করেছে, বিশেষতঃ যে সব দিনগুলিতে কাপ্তেনের অপরা কোনো রমণীর সঙ্গে হনলুলু বারে থাকার কথা।

ক্রমে ওয়ার্ডেন জানতে পারে কি কারণে কাপ্তেন-পত্নী কারেণ এই পথ ধরেছে। কাপ্তেন ডানা হোমস্ ওদের বিয়ের গোড়ার দিক থেকেই ব্যভিচারী। যে রাতে কারেণের শিশু সন্তান জন্ম-গ্রহণ করে সে রাতে অন্য একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে হোমস্ শহরে উচ্ছৃঙ্খল আনন্দে মত্ত। শিশুটি মৃত অবস্থায় জন্মালো, কারণ তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেয় এমন কেউ ছিল না। এই ব্যাপারে তিক্ত ও বিরাক্ত হ'ল তার মন। তাই ভুল পথেই সে চলেছে বছরের পর বছর। তার পর এই হাওয়াই দ্বীপে ওর সঙ্গে ওয়ার্ডেনের দেখা·····

এর পর—

ওয়ার্ডেনের জীবনে কারেণই এখন সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। সৈনিক-জীবনের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ। কাপ্তেন ডানা হোমস্কে এমন ঘৃণা করে যে, আজ-কাল প্রতিদিন প্রভাতী অভিবাদন জানানোর যান্ত্রিক কর্তব্যটুকুও তার ক্লেশকর হয়ে উঠেছে।

না, ও কোনো বিরোধের মধ্যে যাবে না, এমন কি প্রিউইটের মত অমন সোনার চাঁদ ছেলেটির জন্যও নয়। হোমস্কে সে সুখী রাখবে, এবং সন্দেহমুক্ত রাখতে চেষ্টা করবে।

যত দিন যায় প্রিউইটের প্রতি অত্যাচারও বেড়ে চলে, তবু সে বক্সিং লড়বে না কিছুতেই। শুধু প্রিউইটের বন্ধু ম্যাগিও তার দুঃখ একটু বোঝে বলে মনে হয়

ম্যাগিও বলে—"ধরা দিও না ভাই, তোমার মনের ভাব আমি বুঝি, যেন একটা ক্ষুদে বাক্সে তোমাকে চাবী দিয়ে রেখেছে ওরা। আর বাইরে সারা জগত হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে।"

ম্যাগিও একদিন ওকে টেনে নিয়ে গেল শহরের পান-শালায়। সেদিন মাইনের দিন, মাইনে পাওয়ার পর ম্যাগিও ওকে বে-সামরিক পোষাক পরিয়ে 'নিউ কন্গেস' ক্লাবে নিয়ে গেল। এই ক্লাবের সদস্য ম্যাগিও নিজে।

যে-স্ত্রীলোকটি এই ক্লাবের মালিক তার নাম মিসেস্ কিপফার, মহিলাটি রীতিমত ভদ্র এবং দক্ষিণ-আমেরিকা-বাসিনী। প্রিউ চার ডলার দিয়ে ক্লাবের সদস্য হ'ল। সৈনিক আর নাবিকে সারাটি ক্লাব ভর্তি। এক ব্যক্তি একটি পিয়ানোর ওপর শক্তি-পরীক্ষা করছে সজোরে, তার নাম সার্জেণ্ট জুডসন, ওরা তার নামকরণ করেছে ফ্যাট্সো মোটকু। সানদ্রা বলে একটি মেয়েকে টেনে নিয়ে ম্যাগিও নাচতে গেল, প্রিউ রইল একা।

সে দেখল কাউচে একটি মেয়ে একা বসে আছে, কি একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে। আশ-পাশের কলরব যেন তাকে স্পর্শ করছে না। মেয়েটি সুশ্রী, বেশ সুন্দরী বলা চলে। প্রিউ সোজাসুজি তার কাছে গিয়ে বলে—"আপনি কি খুব ব্যস্ত নাকি?"

ওর মুখের দিকে ডাগর চোখ দুটি মেলে মেয়েটি বলে ওঠে, "আমার নাম লো রে ণ।"

ওর পাশে বসে পড়ে কথা বলে যায় প্রিউ।

মেয়েটি স্পষ্ট গলায় বলে,—"আমার তোমাকে ভারী ভালো লেগেছে, এ্যানেট যখন তোমাকে ঘরে নিয়ে এল তখনই আমার চোখে লেগেছে।"

এই কথায় মনের সকল অন্ধকার ঘুচে গেল, প্রিউ আগ্রহ ভরে বলে ওঠে—"আমারও সেই অবস্থা, ঐখানে তোমাকে দেখেই ত' তাই এগিয়ে এলাম।"

ইতিমধ্যে "মোটকু"র সঙ্গে ম্যাগিওর তর্ক বেধেছে অত জোরে পিয়ানো বাজানো নিয়ে। প্রিউ উঠে গিয়ে ঝগড়া মেটানোর চেষ্টা করে—অনেক পরে সানদ্রা আর প্রিউ ম্যাগিওকে এক রকম টেনে সরিয়ে নিয়ে আসে। রাগে গর-গর করে ম্যাগিও, তারপর আবার নাচে যোগ দেয়। প্রিউ ফিরে এসে আবার লোরেণকে সন্ধান করে, সে তখন আর একজন সৈনিকের সঙ্গে বসে আছে।

একটু মুক্ত হ'তেই লোরেণের কাছে এগিয়ে এসে প্রিউ রীতিমত কলহ সুরু করে।

তার এই ঈর্ষা-কাতরতায় বিরক্ত হয় লোরেণ, তবু মনে মনে একটু খুসীও হয়, বলে—"মিসেস্ কিপফার কি আমাদের মুখ দেখে মাইনে দেয়? এই সব ছোকরাদের কাছে মিষ্টি হয়ে থাকাটাই আমাদের কাজ, সেই জন্যেই আমাদের ভাড়া খাটানো হয়।"

প্রিউ তার মুখের পানে উত্তেজিত ভঙ্গীতে তাকিয়ে থাকে, তার পর বলে, "বেশ! আমার অন্যায় হয়েছে।"

লোরেণ বলে—"তার চেয়ে চলো মিসেস কিপফারের স্যুইটে যাওয়া যাক—সেইখানে বসাই ভালো। খুব বিশেষ ধরনের অতিথির জন্য উনি ঘরটা মাঝে মাঝে ছেড়ে দেন।"

মিসেস্ কিপফারের ঘরটি বেশ মনোরম, পরিবেশ চমৎকার। লোরেণের কাছ ঘেঁসে ঘনিষ্ঠ হয়ে কাউচের ওপর বসলো প্রিউ।

কয়েক মিনিট পরে একটা বোতল হাতে এসে ঢুকলো ম্যাগিও। ঠাট্টা করে বললে—"আমি ধরেছি ঠিক,—বোতলটা তোমাদের কাজে লাগবে।" বোঝা গেল এর আগে দু'-চার পাত্র সে টেনেছে, প্রিউর সঙ্গে আর এক গ্লাস টেনেই সে নীচে গেল সানড্রার সঙ্গে আবার নাচতে।

ও চলে যাওয়ার পর লোরেণ বলল তার অতীত জীবনের কাহিনী। তার বাড়ি ওরিগন প্রদেশে। সেখানে একটি ছেলের প্রেমে পড়েছিল কিন্তু সে আরেক জনকে বিয়ে করেছে। হাওয়াই দ্বীপে লোরেণ এসেছে অর্থের সন্ধানে। একদিন টাকা নিয়ে সে দেশে ফিরবে, সকলে চমকে উঠবে ওর ঐশ্বর্য দেখে।

প্রিউ শোনালো তার মনের কথা, ব্যথা ও বেদনা-ভরা দীর্ঘশ্বাসের ইতিহাস। মনের ভার অনেক কমলো—অন্ততঃ এই মুহূর্তে সৈনিক-জীবনের গ্লানিকর নির্মম ব্যবহার সে ভুলে রইলো।

সার্জেণ্ট ওয়ার্ডেনের কাছেও মাইনের দিনটি একটি বিশেষ দিন। জনবহুল কুহায়ো পার্কের এক কোণে হোমস্-পত্নী কারেণকে খুঁজে বার করে সার্জেণ্ট ওয়ার্ডেন। কারেণের সঙ্গে গাড়ি ছিল। ডায়মণ্ড হেডের কাছাকাছি একটা সমুদ্রতীর ওয়ার্ডেনের পরিচিত ছিল, গাড়ি চালিয়ে সেইখানেই গেল দু'জনে, উভয়ে সাঁতার কাটলো একত্রে, তারপর বালির ওপর ওর বাহুলগ্ন হয়ে শুয়ে রইল কারেণ।

মৃদু গলায় কারেণ এক নিশ্বাসে বলে যায়—"এমনটা যে হবে কোনো দিন ভাবিনি। তোমার মত এমন করে কেউ আমাকে কোনো দিন চুমায় আকুল করেনি।"

এই কথাটিতে ওয়ার্ডেন বোঝে কারেণের জীবনে আরো অনেক পুরুষের পদক্ষেপ ঘটেছে। সব কাহিনী যদি সত্য হয় তাহলে কারেণ বহুজনধন্যা।

চিন্তাকুল কণ্ঠে ওয়ার্ডেন বলে—"হয়ত সমুদ্রতীরে এমনই আরো অনেকেই এসেছে।"

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কারেণের মধুর মুখখানি কালো হয়ে গেল, সে শুধু বললো—"যে কথা কোনো দিন কাউকে বলিনি আজ তোমাকে হয়ত তাই বল্‌বো।" তারপর তিক্ত কণ্ঠে আরো বলে—"এ কাহিনী তোমাদের ব্যারাকে গিয়ে খোসগল্প করে আর পাঁচজনকে শুনিয়ো।"

সব কথাই বলল কারেণ। তার দুশ্চরিত্র স্বামীর কাণ্ড। তার মৃতজাত শিশু—আর তার পরবর্তী বন্ধ্যাত্ব!

রাগে ও অনুরাগে ক্ষিপ্ত হয়ে ওয়ার্ডেন তাকে সজোরে জড়িয়ে ধরে। কারেণ কাঁদছে, কিন্তু সমুদ্রগর্জনে তার কান্নার আওয়াজ চাপা পড়ে গেছে।

নীরবে আরো কয়েক সপ্তাহ কাল প্রিউইট সামরিক ব্যারাকের অত্যাচার সইলো। মাঝে মাঝে সে যেন তার বিউগিলের করুণ সুর শুনতে পায়, তার ফলে তার মনে বেদনার সঙ্গে কিছু বিষাদ-মেশানো আনন্দও জাগে।

ইতিমধ্যে কাপ্তেন একেবারে দানব হয়ে উঠেছেন। প্রাইভেট প্রিউইটকে বক্সিং দলে যে কোনো উপায়ে নামানোর জন্য তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প। কর্পোরাল বাকলে প্রিউকে একদিন সতর্ক করে দেয় কাপ্তেন হোমায় আর বক্সিং দলের দু'-একজন সুবিধে পেলে ওকে ঠাণ্ডা করে ছাড়বে, ব্যারাকের বন্দিশালায় পুরে জব্দ করবে। বন্দিশালার কর্তা সেই মোটকু জুড্‌সন! আর অতি বীভৎস তার পৈশাচিক দণ্ড দানের প্রথা।

ওদের বক্সিং দলের থর্ণহিল, হেন্ডারসন, উইলসন আর গালোভিচ্, প্রভৃতি বক্সারবৃন্দ হোমসের হুকুম অনুসারে প্রিউইটের ওপর অত্যাচার বাড়িয়ে তুললো। একদিন গালোভিচের অত্যাচার সহ্যের সীমানা ছাড়িয়ে গেল, প্রিউ সেদিন প্রতিবাদ জানিয়েছিল কিন্তু কাপ্তেন ওকে তার জন্য ক্ষমা চাইতে হুকুম দিলেন। কিছুতেই সে হুকুম যখন প্রিউইট মান্‌লো না তখন কাপ্তেন হোমস্ একজন পথচলতি নন কমিসনড্ অফিসরকে ডেকে হুকুম দিলেন—

"কর্পোরাল পালুসো,—এই লোকটাকে ভারী বুট, হেলমেট, আর পুরো বোঝা দিয়ে বেশ করে মার্চ করাও। তারপর একটা বাইসিকলে চড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে যাতায়াত করাও।"

যে পথে যাওয়ার হুকুম হ'ল সে পথ অতি বন্ধুর এবং চড়াই আছে, রৌদ্রের তেজ অতি প্রখর। সত্তর পাউণ্ড বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়ে সেই পথ ধরে ক্লান্ত প্রিউ শাস্তি ভোগ করে। পালুসো ওকে বিশ্রাম করতে বলে একটা সিগারেট দেয়, এমন সময় কর্ণেল উইলসন জিপে চড়ে সেই পথ ধরে যাচ্ছিলেন, কৌতূহল বশে এই নিদারুণ দণ্ডের কারণটা কি তিনি জানতে চাইলেন।

পালুসো বলল—"অবাধ্যতা, কাপ্তেনের হুকুমে এই দণ্ড হয়েছে।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে কর্ণেল বললেন—"তোমাদের দলের নাম কি?"

"কম্পানী জি, ২১৯ নং স্যার!"

কাপ্তেনের দপ্তরে ফেরার পর হোমস্ আবার এক দফা ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন। পুনরায় দৃঢ় ভাবে সে হুকুম অমান্য করলো প্রিউ। উত্তেজিত কাপ্তেন আবার সেই ভাবেই মার্চ করানোর হুকুম দিলেন। ওয়ার্ডেনকে কোর্ট মার্শেল করার কাগজপত্র তৈরী করতে আদেশ দিলেন। ওয়ার্ডেন বলল, "কিন্তু, প্রিউকে এখনও হয়ত বক্সিং করতে রাজী করানো যাবে।" এই বলে সে তখনকার মত কাপ্তেনকে ক্ষান্ত করলো।

পিকদানি পরিষ্কার, পিতলের জিনিষপত্র প্রভৃতি পালিশ করতে হ'ল প্রিউকে, অত্যাচার বেড়ে চলে,—এখনকার অত্যাচারের তুলনায় আগের অত্যাচার যেন বিশ্রাম। তবু অনমনীয় রইলো প্রিউইট। সার্জেণ্ট মিলট ওয়ার্ডেন প্রিউইটের এই দৃঢ়তা সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতে সুরু করলো।

একদিন চৈনিক বীয়ার দোকানে প্রাইভেট ম্যাজিওলী প্রিউইটকে উপদেশ দিল ইনসপেকটর জেনারেলের কাছে অভিযোগ জানাতে। প্রিউ বললো—"আমি অভিযোগ করতে চাই না ওদের নামে, আর বক্সিং করেও ওদের আনন্দ দেব না।"

সেই দিন সন্ধ্যায় 'মোটকু' জুডসনের সঙ্গে ম্যাগিও'র রীতিমত এক ঝগড়া বেধে গেল। টেবলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মোটকু ম্যাগিও'র বোনের সাঁতারের পোষাক-পরা এক ফটো তুলে নিয়ে একটা জঘন্য উক্তি করে বসলো। ম্যাগিও ওর মাথার উপর একটা চেয়ার ভাঙলো, মোটকু পকেট থেকে ছোরা বার করলো।

নিশ্চিত খুনোখুনী থেকে ওদের বাঁচালেন সার্জেণ্ট ওয়ার্ডেন। ওয়ার্ডেন বোধ করি শয়তানেরও ভয় রাখে না।

সে চেঁচিয়ে বলে ওঠে—"যত সব খুনের দল। আমি তোমাদের একটা ভালো মেয়েমানুষ জুটিয়ে দেব!" অন্ততঃ সাময়িক ভাবে অবস্থা শান্ত হলেও মোটকুর চোখ জ্বলতে লাগল। আর ম্যাগিওর মুখখানি শাদা হয়ে গেছে।

ঝোঁকের মাথায় মোটকুর হাত থেকে খসে-পড়া ছুরিটা তুলে নিয়ে প্রিউ সার্জেণ্ট ওয়ার্ডেনকে অনুসরণ করে ছুরিটা ফেরৎ দেওয়ার জন্য। সার্জেণ্ট কিন্তু ছুরিটা ওর কাছেই রাখতে বলল।

করুণ গলায় ওয়ার্ডেন বলে—"তোমার বড় কষ্ট যাচ্ছে, না খোকা?"

প্রিউ শুধু বলল—"ওরা না হয় মেরেই ফেলতে পারে, খেতে ত' আর পারবে না?"

"একটা সাপ্তাহান্তিক পাশ তোমাকে দেব, নেবে?"

সাপ্তাহান্তিক পাশ! তৎক্ষণাৎ লোরেণের কথা মনে পড়ে যায়।

প্রিউ ভেবেছিল ম্যাগিওর সঙ্গে শহরে যাবে, কিন্তু বাস যখন ছাড়ো ছাড়ো,—তখনও ম্যাগিওর পোষাক পরা হয়নি, সুতরাং প্রিউ একাই হনোলুলু গেল। নিউ কন্‌গ্রেস ক্লাবে ওর কিন্তু দুঃখের কারণ ঘটলো।

শ্রীমতী কিপফার—আগের মতই আনন্দময়ী ও ভদ্র। কিন্তু লোরেণ যেন সহসা পরিবর্তিত হয়েছে। হিকাম ফিল্‌ড্ থেকে অনেক সৈনিক আগে থেকেই এসেছে, তাদের নিয়েই সে ব্যস্ত। লোরেণ বলল ওর কাজই হ'ল পাঁচ জনকে আপ্যায়িত করা। "তুমি কি চাও তোমাকে বাদ্যভাণ্ড সহকারে অভ্যর্থনা জানাতে হবে? আমি এখানে কাজ করি, সেটা জানো ত? তুমি ত' ক' সপ্তাহ এদিকে মাড়াওনি। এখন কি আশা করো—?"

"ম্যাগিও একটু পরেই আসছে, এখন একটু বেরিয়ে পড়া যায় না?"

"বেরোব বললেই কি বেরোন যায়, জানো না, মিসেস কিপফারেরও আইন-কানুন আছে?"

প্রিউর চোখ দুটো জ্বলছে, সে লোরেণকে ভালো করে লক্ষ্য করে বলে: "ছোট ছেলে যেমন ক্রিসমাসের দিকে তাকিয়ে থাকে আমিও তেমনি এই দিনটির জন্য তাকিয়ে আছি। আর কয়েক মাসের মধ্যে হয়ত ছুটি মিলবে না। যাক্ গে, সে কথা ভেবে আর কি হবে, লোরেণের কাজ আছে, লোরেণ ব্যস্ত, তাকে আইন মেনে চলতে হয়।"—

উত্তেজিত হয়ে লোরেণ চীৎকার করে ওঠে—"থামো, থামো! আমাকে তুমি কি হিসাবে লোরেণ বলে ডাকো? আর ডেকো না! আমার নাম, আসল নাম আলমা, আ ল মা বার্ক।" সে ফুঁপিয়ে কাঁদে, আবার বলে, "মিসেস কিপফার একটা ফরাসী সুগন্ধির নাম থেকে ওটা বেছে নিয়ে আমার নামকরণ করেছে, তাঁর ধারণা ওতে বেশ ফরাসী আমেজ আছে।"

কিছুক্ষণ পরে আলমা মিসেস কিপফারকে শরীর অসুস্থ বলে ছুটি নিয়ে ওয়াইকিকি বারে চললো। সেখানে ম্যাগিওর জন্য অপেক্ষা করছিল প্রিউ। আলমা (এখন আর লোরেণ বলা চলে না) সেনা-ব্যারাকে প্রিউর প্রতি অত্যাচারের কথা শুনে সমবেদনায় জ্বলে ওঠে। প্রিউ সৈনিক-জীবনের রহস্যময় কাহিনী বলে চলে।

সে বলে, "মানুষ যদি কিছু ভালোবাসে তাহ'লে সে অনেক কিছু সহ্য করতে পারে। যখন সতের বছর বয়স তখন বাড়ি ছেড়েছি, বাবা-মা দুই তখন নেই। আমার তাই তিন কুলে কেউ নেই। সেনাদলে যদি না থাকতাম তাহ'লে কোনো দিনই হয়ত বিউগিল শিখতাম না। আর্লিংটন কবরখানায় 'আর্মিসটিস ডে'র দিন আমাকে বাজাতে বলে। প্রেসিডেণ্ট সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।"

কয়েক মিনিট পরে ম্যাগিও বদ্ধ মাতাল অবস্থায় এসে হাজির, গায়ে তার সামরিক পোষাক। শোনা গেল ওকে ব্যারাকে আটকে রেখে আর কার বদলীতে ডিউটি দিয়েছিল। সুতরাং বিনা ছুটিতেই এসে পড়েছে।

সে আনন্দভরে চেঁচায়, "ঐ ত',—ওদিকে রয়্যাল হাওয়াইয়ান, ঐখানে সব সিনেমা ষ্টাররা থাকে। আজ ভাই সাঁতার কাটার রাত, চমৎকার রাত!"

বন্ধুর জন্যে প্রিউর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। চিত্রতারকাদের সঙ্গে স্নান ও সাঁতার কাটার জন্য ম্যাগিও যখন ব্যাকুল, অন্ধকার পথে তার সঙ্গে প্রিউকেও যেতে হয়। ব্যাপারটি বুঝে আলমা প্রিউকে তার সঙ্গে যেতে বলেছিল।

ম্যাগিও জামা খুলে ফেলেছে—প্রিউ তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, এমন সময় জিপ গাড়িতে এক জোড়া মিলিটারি পুলিশ সেই পথে এসে পড়ল। কোথায় লুকিয়ে পড়বে, না, ম্যাগিও তাদের সামনে গিয়ে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল। প্রিউ-র আর কিছুই করার রইল না।

ম্যাগিও'র কোর্ট মার্শালের ফলাফল জানার জন্য সমগ্র সেনাদল আগ্রহান্বিত। ওয়ার্ডেন যখন শাস্তির ফলাফল জানালো তখন দেখা গেল সবাই যা আশংকা করেছিল তাই হয়েছে, ছ' মাস সামরিক জেল। কে যে এই বন্দিশালার পরিচালক সবাই জানে, সেই শূয়ারাক্ষ মোটকু জুড্‌সন, তার হাতে আবার ছুরি থাকে।

সার্জেণ্ট ওয়ার্ডেনও চিন্তিত হতেন যদি তার নিজেরও যথেষ্ট ব্যক্তিগত উদ্বেগ না থাকতো। কারেণের সঙ্গে তার নোঙরা এক পানশালায় মেলামেশা ঘটতো। সেখানে অন্ততঃ কাপ্তেন হোমসের পরিচিত কোনো অফিসার থাকবার কথা নয়। কখনো কোনো দল এলে ওরা তাড়াতাড়ি পালাতো পিছনের দোর দিয়ে। ভয় এবং অপমান ওদের নিরন্তর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। তার ফলে অন্তরের ভাবাবেগ অন্তর্হিত হওয়ার উপক্রম।

প্রিউর ভাবনা ম্যাগিওকে নিয়ে, সে তবু অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান। আলমা আর তার বন্ধু জর্জেট ডায়মণ্ড হেডের কাছে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। প্রিউর এই দুঃখের সাহারায় সে এক মরুকানন-বিশেষ, তাই সামরিক বিধির উৎপীড়নের ফলে সে এখনও ভেঙে পড়েনি। এই বাসাটিতে বই আছে, কিছু গ্রামোফোন রেকর্ডও আছে, আর আছে শান্ত নৈঃশব্দ। আলমা একটা অতিরিক্ত চাবী তৈরী করিয়ে ওকে দিয়েছে, যে কোনো সময়ে প্রিউ তাই আসতে পারে, আলমা বাসায় না থাকলেও কোনো বাধা নেই।

প্রিউ এদিকে এই ভাবে শান্তিতে সন্ধ্যা যাপন করছে আর ওদিকে ওয়ার্ডেন আর কারেণের প্রেমলীলা প্রায় চুরমার হতে বসেছে।

একদিন গেটের সামনে গাড়ি থামিয়ে কারেণ বলে—"এই ভাবে আর চলে না—"

ওয়ার্ডেন মাথা নেড়ে বলে, "তোমার স্বামী হয়ত তোমাকে ডিভোর্স করতে পারেন কিন্তু আমাকে কি এখান থেকে বদলী করবেন ?"

কারেণ বলে—"একটা উপায় আছে,—তোমাকে অফিসার হ'তে হবে। কমিশন পেলে তোমার পক্ষে সব সম্ভব হবে। তোমাকে ওরা তখন যুক্তরাষ্ট্রের কোথাও বদলী করবে, আমিও ডানা হোমসের সঙ্গে ডিভোর্স নিয়ে তোমাকে বিয়ে করতে পারব।"

"অফিসর ?" মাথা নাড়ে ওয়ার্ডেন বলে—"আমি নিজে চিরদিন অফিসারদের ঘৃণা করে এসেছি,—তা ছাড়া পরীক্ষাগুলোও কঠিন। তা ছাড়া—"

চটে উঠে কারেণ বলে—"সত্যি কথাটাই বলো না! কোনো দায়িত্ব-ভার নিতে চাও না। হয়ত আমাকে ভালোবাসো না—"

ওয়ার্ডেন ধীর গলায় বলে—"তোমাকে ভালো না বাসলে হয়ত ভালোই করতাম। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে যে যন্ত্রনায় আছি তা কি বলব! আমি যদি অফিসার হই তা' হলে সেনাদলের অতি বেয়াড়া অফিসারই হ'ব।

হয়ত ঋতুটা সে সময় প্রেমিক-প্রেমিকাদের পক্ষে তেমন অনুকূল ছিল না। কারেণ ডানা হোমসের সঙ্গে ডিভোর্স চায়, হোমস রাজী হ'ল না, কারণ তার ফলে তার প্রমোশনের সুযোগ নষ্ট হবার সম্ভাবনা। কিন্তু কারেণ যখন কিছুতেই স্বীকার করলো না তার জীবনের এই নূতন অতিথিটি কে কি তার নাম, তখন ডানা হোমস্ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তার দাম্ভিকতা আহত হ'ল। সে চিন্তিত হয়ে পড়ল।

এদিকে প্রিউ যখন আলমার কাছে থাকে, কাজ থাকে, শান্তিতে, থাকে, সে তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব জানালো। বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো আল্‌মা এই প্রস্তাবে, সে প্রত্যাখ্যান করলো। বল্‌লো —"তুমি কি জানো না নিউ কন্‌গ্রেস ক্লাবের মেয়ে আর আর ফুটপাথের মেয়ের মধ্যে মাত্র ছুটি ধাপের তফাৎ।"

প্রিউ আন্তরিকতার সুর মিশিয়ে বলল—"আমি সামান্য প্রাইভেট মাত্র। এখন কিছু উঁচুতলার হোমরা-চোমরা নই। আমি যদি সার্জেণ্ট হই তাহলে হয়ত আমাকে যুক্তরাষ্ট্রে বদলী করবে—ওখানে কয়েক জায়গায় বিবাহিত সৈনিকের আলাদা ব্যারাক আছে, যেমন "জেফারসন ব্যারাকস্"।

"তোমার এই কাপ্তেন হোমসের কাছে তুমি সার্জেণ্ট হওয়ার আশা রাখো ?"

দাঁতের ওপর দাঁত চেপে প্রিউ বলে উঠে—"বক্সিং লড়লেই আমার প্রমোশন হবে।"

"না, ওদের অত্যাচারে এ ভাবে আত্মসমর্পণ করলে চলবে না। প্রিউ, আজ আমাদের পরস্পরকে অতি প্রয়োজন, কিন্তু আমি সৈনিকের স্ত্রী হ'তে চাই না। আমার এই পরিকল্পনা থেকে কেউ আমাকে হটাতে পারবে না। তবে এক বছর। এক বছর কিছু নয়। এক বছরে আমি অনেক টাকা সঞ্চয় করতে পারবো। দেশে ফিরে আমার আর মার জন্য একটা বাড়ি করবো, একটা 'কন্‌ট্রি ক্লাবে' কাজ নেব, গল্‌ফ্ খেলব। তখন নিশ্চয়ই উপযুক্ত অবস্থার উপযুক্ত মানুষ খুঁজে পাব। তখনই উপযুক্ত স্ত্রী হতে পারব। ঠিক অবস্থায় থাকলেই ত' নিরাপত্তা।"

তিক্ত অথচ সপ্রশংস কণ্ঠে প্রিউ শুকনো গলায় বলে—"বেশ, তবে তাই হোক, তোমার আশা সফল হোক্।"

ওর মুখের দিকে সকরুণ ভঙ্গীতে তাকায় প্রিউ, যেন সে এইবার কেঁদে ফেল্‌বে, সে শুধু বলে—"কিন্তু এ কথাও সত্য বলে জেনো তোমাকেও আমি হারাতে চাই না, তার কারণ আমার নিঃসঙ্গতা। হয়ত ভাবছ আমি মিথ্যা কথা বলছি, তাই না ?"

আলমা উত্তরে বলে "লোকে যখন বলে, আমি নিঃসঙ্গ তখন তার ভিতর মিথ্যার আর কি আছে ?"

বন্দিশালার ভেতর থেকে নানা রকম গুজব বাইরে এসে পৌছয়, যাদের শাস্তির সময় শেষ হয় তারা বাইরে এসে নানা কথা বলে। ওদেরই একজন, প্রাইভেট নেয়ার এসে খবর দিল মোটকু জুড্‌সন ম্যাগিওর ওপর ভারী অত্যাচার করছে, লাথি মারছে, ম্যাগিও তেমনি মোটকুর মুখে থুতু ফেলেছে।

উদ্বেগে আকুল হয়ে প্রিউ বলে—"তোমার কি ধারণা এর ফল ভালো হবে ?"

নেয়ার জবাবে বলে, "হট্টগোল একটা হ'তেও পারে। মোটকু ড'বার ওকে সেলের ভেতর আটকেছে, আর ম্যাগিও বলে ও ঠিক পালাতে পারে। আমাকে ত' বলেছে একদিন লুকিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবে।"

মনে নিদারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রিউ প্রচণ্ড রোদের ভেতর ঘাস ছিঁড়ছিল। এদিকে সর্দারি করছিল সেই গালোভিচ্, সে আরো খাটাতে চায়, এক কাজ বার বার করানোর জন্য চাপ দেয়। শেষ পর্যন্ত ভারী মিলিটারী বুটটা কর্মরত প্রিউ বেচারীর ক্ষতবিক্ষত হাতের ওপর সজোরে চাপিয়ে দিলো গালোভিচ। জ্বলন্ত চোখে প্রিউ উঠে দাঁড়িয়ে বলে—"বেশ, এইবার তোকে ঠাণ্ডা করবো ?"

গালোভিচ সার্ট খুলে ফেলে, সেও একজন পাকা বক্সার, হাতের পেশী তার মাংসল ও সুদৃঢ়। যাকে সে ঘৃণা করে তার মাথা সে সহজেই ফাটাতে পারে। প্রিউ কম যায় না, তার মার বেশ তীব্র এবং তীক্ষ্ণ।

এদিকে গালোভিচ্ও একজন শক্তিশালী যোদ্ধা।

এক জন ভীড়ের ভেতর থেকে বলে ওঠে—"প্রিউ-ওর মুণ্ডুটা থেঁতো করে দিক !"

সার্জেণ্ট দোহম জবাবে বলে—"একবার প্রিউ এক জনের চোখ নষ্ট করে দিয়েছিল, তাই ভয় পায়।"

গালোভিচ্ প্রিউর ঠিক চোখের ওপর একটা আঘাত করল। কপাল বেয়ে রক্ত ঝরছে। ডিকসী ওয়েলসের কথা মনে পড়ে প্রিউর, সে পড়ে যায়,—সঙ্গে সঙ্গে পায়ের ওপর গালোভিচের আঘাত এসে

পড়ে। অতি কষ্টে উঠে পড়ে, প্রিউ ওর পেটে একটি ঘুঁসি বসিয়ে দেয়, লোকটা যন্ত্রণায় কাতরায়। ওপরের বারান্দায় একজন মেজর আর একজন কাপ্তেন দাঁড়িয়ে এই লড়াই দেখছিলেন।

কাপ্তেন হোমসের মুখে খুসীর হাসি,—জনতার ভীড়ে মিশে তিনিও হাততালি দিচ্ছেন। প্রিউর ওপর এই অত্যাচার থামাবার দিকে তাঁর আগ্রহ নেই। প্রিউ পড়ে গেল, গালোভিচ তাকে লাথির পর লাথি মারতে লাগল। উঠে পড়ে সহসা প্রিউর চোখ পরিষ্কার হয়ে গেল, সে কঠিন আঘাত করল ড্যমনের পেট লক্ষ্য করে, তারপর তার মুখের ওপর প্রচণ্ড আঘাত করলো। আবার রক্তপাত। দর্শকগণ চীৎকার করে উঠলো।

গালোভিচ্ যন্ত্রণায় ছটফট করে। প্রিউ আবার তার মুখে আঘাত করলো। গালোভিচ্ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কাপ্তেন ডানা হোমস্ এতক্ষণে চীৎকার করে বলে—"বহুৎ আচ্ছা! এইবার কিন্তু খেল খতম!"

গালোভিচ্ ঘোঁত ঘোঁত করে বলে—"প্রিউইট আমার হুকুম মানতে চাইনি, উলটে লড়াই সুরু করেছে।"

একজন দর্শক বলে উঠে—"প্রিউইটের কোনও দোষ নেই, ও নির্দ্দোষ। গালোভিচই সর্বাগ্রে গণ্ডগোল পাকিয়েছে।"

অবস্থাটা না বুঝে ডানা হোমস্ চার পাশে দেখতে থাকে,—সকলের মুখেই এই একই কথার প্রতিধ্বনি। বিভ্রান্ত হয়ে কাপ্তেন হোমস্ শুধু বলে—"যাক গে, এ সব ভুলে, এখন যে যার কাজে যাও।"

ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই মেজর আর কাপ্তেন তীব্র বিরক্তিতে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন।

যাক গে—'ব্যবহার' যাই হোক, অত্যাচারের কথা ভুলে দলের এক জন হয়ে থাকাই ভালো। তাই সবাই যখন 'choy's হোটেলে বীয়ার টানছে, তখন প্রিউ বিউগিলে "Re-enlistment Blues"-এর সুর বাজালো। সকলেই মহা খুসী। সানন্দে সবাই বীয়ার টানে।

একদিন রাতে হঠাৎ সার্জেণ্ট ওয়ার্ডেনের সঙ্গে প্রিউর দেখা হয়ে গেল,—পথের মাঝে একেবারে বুদ্ধমূর্তির মতো যোগাসনে বসে আছে ওয়ার্ডেন।

ওকে দেখেই হুকুম করে—"হল্ট্! কি হে খোকা! এখানে কি?"

যথেষ্ট বিনয় সহকারে প্রিউ বলল—"একটু মদ্যপান করতে চলেছি।"

আবার হুকুম—"সিট ডাউন,—বসো, আমার কাছেই বোতল আছে।"

প্রিউ বন্ধুর মত ওয়ার্ডেনের পাশে বসে পড়ে আকণ্ঠ পান করে বলে, "ধন্যবাদ!"

"ধন্যবাদ তোমাকেই দেব! যে ভাবে গালোভিচটাকে ঠাণ্ডা করেছ সেদিন, বাহাদুরী আছে তোমার। জীবনটাই আজ জটিল হয়ে উঠেছে, জানো ত'? আচ্ছা একটা ট্রাক এসে যদি আমাদের চাপা দেয় কেমন মজা হয়?"

প্রিউ সবিস্ময়ে বলে—"মজার মধ্যে আমরা মারা যাব, কিন্তু তোমার কি হবে সার্জেণ্ট? আমাদের সেনাদল দেখবে কে?"

এদিকে বৃষ্টি পড়ছে, সেদিকে কারো খেয়াল নেই।

ওয়ার্ডেন প্রিউকে বলে—"এত সব জ্বালায় জড়িয়ে আছি, ভালোবাসার কথাই ধরো,—মেয়েটা আমাকে বলে কি না,—বলে তোমাকে অফিসার হতে হবে। আমি অফিসার হলে কেমন হ'বে?"

প্রিউ বলে—"তুমি একজন ভালো অফিসার হবে।"

Choy হোটেলের সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে। একটা জীপ গাড়ির আলো এসে পথে পড়লো, ঠিক এই সময়েই ব্যারাক থেকে একটা সাইরেণ ধ্বনিত হ'ল। এই সাইরেণের অর্থ বন্দিশালা থেকে কেউ পালিয়েছে।

সহসা সেই প্রকাশ্য রাজপথে ম্যাগিও এসে দাঁড়িয়েছে, জামা-কাপড় মলিন ও ছিন্ন,—জিপের হেডলাইটের আলোয় ম্যাগিওর বেদনা-ক্লিষ্ট অত্যাচার-জর্জরিত আকৃতি দেখা যায়।

প্রিউর দিকে তাকিয়ে সে বলে—"ভাবলুম, তুমি হয়ত Choy-হোটেলে থাকবে,—দেখো, যা বলেছিলাম তাই করেছি, ঠিক পালিয়েছি বাবা, অনেক কায়দা করে পালিয়েছি।"

চিন্তিত প্রিউর নেশা ছুটে গেছে, সে ওকে ধরে বলে—"এজ্জেলে এ কি হয়েছে ভাই তোমার শরীর, এত দাগ কিসের?"

হাঁফাতে হাঁফাতে ম্যাগিও বলে—"মোটকুর অত্যাচার! দশ বার আমাকে ডাণ্ডা দিয়ে মেরেছে।"

ম্যাগিও প্রিউর বাহুতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

ওয়ার্ডেন উঠে এসে দাঁড়িয়ে ম্যাগিওর দেহটা দেখে বলে—"প্রিউ—ওকে শুইয়ে দাও,—ও আর নেই! মারা গেছে।"

অদূরে অন্ধকারে সাইরেণ আর্তনাদ করছে—বন্দী পলাতক, তারই সংকেত।

সেই রাতে একটা বিউগিল সংগ্রহ করে বন্ধুর মৃত্যুতে অতি সকরুণ সুর বাজালো প্রিউ। সেই চন্দ্রালোকিত প্রান্তর যেন এক বুকফাটা কান্নায় ভরে গেল। সমগ্র ব্যারাকের যে যেখানে ছিল বিছানা ছেড়ে উঠে এসে নীরবে সেই সকরুণ বাঁশীর আওয়াজ শুনলো।

সেই রাতেই নিউ কনগ্রেস ক্লাবের দিকে গেল প্রিউ। বাইরের জানলায় দাঁড়িয়ে মোটকুর সেই হাতুড়ি-পেটা পিয়ানোর

স্বর সে শুনলো। তারপর মোটটু জুড়সন বেরিয়ে আসতেই প্রিউ চেঁচিয়ে ওঠে—"হ্যালো মোটকু!"

সেই অন্ধকার-পথে সার্জেণ্ট এগিয়ে এল, একটা বিপদের সম্ভাবনা সে-ও হয়ত ভেবেছে। কলহের সম্ভাবনায় সে কাছে এসে বলে, "কি হে, খুব যে সাহস, কি বলছ?"

"তুমি ম্যাগিওকে খুন করেছ, তোমার এক টুকরো মাংস আমার চাই।" মোটকু তৎক্ষণাৎ ছুরি বার করলো, তৈরী ছিল প্রিউ, সেও ছুরিটা বার করে। এই ছুরিই সেই প্রথম কলহের রাত্রে মোটকুর হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল। ওয়ার্ডেন সেটা ওকেই উপহার দিয়েছিল। প্রিউ সেটা সযত্নে রেখেছিল।

প্রচণ্ড ধস্তাধস্তির মধ্যে মোটকু জুড়সনের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল—সে শুধু বলল—"আমাকে কেন খুন করলে? আমি তোর কি করেছি?"

এর পর আর প্রিউ ব্যারাকে ফিরলো না, সোজা আলমার বাড়ি চলে গেল। ওয়ার্ডেন প্রথমটা প্রিউর এই অনুপস্থিতি গোপনে রেখেছিল। আর আহত প্রিউ জানলো না দিনের পর দিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়—

"সার্জেণ্ট জুড়সনের আততায়ী আজও নিখোঁজ।"

৭ই ডিসেম্বর ১৯৪১

জাপানীরা পার্ল হারবারে বোমা ফেলছে। বেতারে তার ঘোষণা শোনা গেল। আহত দুর্বল প্রিউ এই কথা শুনে আর স্থির থাকতে পারে না। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে, সবাই ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব-নিকাশ করছে, আর জাপানীদের অভিশাপ দিচ্ছে—যুদ্ধের সংবাদ প্রিউইটকে আকুল করে তুললো।

আলমা ব্লাড ব্যাংকে রক্তদান করে ফিরে এল। উত্তেজিত প্রিউ বলে—আমি কোম্পানীতে ফিরে যাব, দু'-এক দিনের ভিতর আবার আসব।

আলমা সবিস্ময়ে বলে, "সে কি? কোম্পানীতে ফিরবে কি, তুমি ত' পালিয়ে আছ, তোমাকে বন্দিশালায় আটক করবে!"

—"আমি যাব, ওরা নিশ্চয়ই আমার ব্যবস্থা করবে।"

আলমা কাঁদে, বলে, "ওরা বুঝবে তুমিই খুনী। শাস্তি হবে।"

—"একবার ত' ফিরি, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আলমা বলে—"না যেও না, আর তোমাকে ফিরে পাব না, আমি জানি আর তোমার দেখা পাব না—"

এক মুহূর্ত্ত ওকে নিবিড় বাহুর বাঁধনে ধরে প্রিউ দোর খুলে বেরিয়ে পড়ে—সে ছুটলো সেনা-ব্যারাকের দিকে। রাতের সেই অন্ধকারে—সেনাদল চেঁচায়—হল্ট! হল্ট!

প্রিউ বলে—"আমি সোলজার।" শুনতে পায় না সৈন্যদল তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেনগান গর্জ্জন করে উঠল।

আহত প্রিউর দেহ ঘিরে সব সৈনিকরা দাঁড়ালো। মিলট ওয়ার্ডেন নতুন কাপ্তেনকে বলল—"এ আমাদের পুরানো সৈনিক, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সৈনিক হিসাবে কিন্তু এর মত নির্ভীক আর সাহসী দেখিনি।"

সেদিন বিউগিল বাজালো ওয়ার্ডেন। সুরজ্ঞান তেমন তাঁর নেই, তবু তিনি মনে মনে জানেন একজন সৎ সৈনিকের উদ্দেশ্যেই আজ বিউগিল বাজালেন। সেই সঙ্গে পড়ল চোখের জল।

অনুবাদক—ভবানী মুখোপাধ্যায়

তিনটি প্রাচীন গ্রীক-কবিতা

হতভাগার পাঁচালি

থিওদোরিদাস (জন্ম : ২৪০ খৃঃ-পূঃ)

আমার জন্যে দাঁড়িও না
এক অখ্যাত নাবিকের কবর এখানে জানবে
জানবে ভরাডুবিতে যেদিন এই হতভাগা তার প্রাণ হারালো
কূল-ঘেঁষা জাহাজেরা পাল খুলে ভুলেও দু'দণ্ড কেউ দাঁড়ায়নি॥

বিভাবরী

সাফো (জন্ম : ৬০০ ? খৃঃ-পূঃ ?)।
(কারো কারো ধারণা এটি একটি লৌকিক ছড়া)

সারা আকাশ খোঁজো :
চাঁদ নেই,
সপ্তর্ষি অস্তমিত।
আসন্ন মধ্য রাত।
সময় ব'য়ে যায়।
সময় যায়, তবু
একাই তো চুপ ক'রে ব'সে আছি।

মাস্টার কুকুর

তিমনিস (খৃঃ-পূঃ দ্বিতীয় শতক)

মাস্টার এক কুকুর
মনে ধ'রেছিলো খুকুর।
ভুলো ব'লে তাকে ডাকতো।
রাত্তিরে কোথা থাকতো ?
খোঁজা হ'লো গলি রাস্তা।
মিললো না তার পাত্তা।

অনুবাদক—পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দিনে দিনে আরও নির্ম্মল, আরও
লাবণ্যময় ত্বক্
Rexona
BLENDED WITH CADYL
Rexona
BLENDED WITH CADYL
ক্যাডিলযুক্ত রেক্সোনাকে
আপনার জন্যে এই যাদুটি
ক'রতে দিন
রেক্সোনার ক্যাডিলযুক্ত ফেনা আপনার
গায়ে আস্তে আস্তে ঘ'ষে নিন ও পরে
ধুয়ে ফেলুন। আপনি দেখবেন
দিনে দিনে আপনার ত্বক্ আরও
কতো মসৃণ, কতো কোমল হচ্ছে—
আপনি কতো লাবণ্যময় হ'য়ে উঠছেন।
রেক্সোনা
ক্যাডিলযুক্ত একমাত্র সাবান
* ত্বক্‌পোষক ও কোমলতাপ্রদ কতকগুলি তৈলের
বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম
RP. 117-50 BG
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত

জয়ন্তী দেবী

টক্-টক্-টক্—দরজায় তিন বার কড়া নাড়লেন নন্দদুলাল বাবু।

টিক্ করে বিজলি বাতি জ্বালবার শব্দ শুনতে পেলেন। দরজাটা খুলে দিল মিনতি, অর্থাৎ নন্দদুলাল বাবুর স্ত্রী। নন্দদুলাল বাবু অন্দরে প্রবেশ করে মিনতির পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকলেন। মিনতি দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিয়ে বারান্দায় এসে ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। ঘুমে তার দু' চোখ জড়িয়ে আসছে।

ততক্ষণে নন্দদুলাল বাবু পোষাক পরিবর্ত্তন করে তোয়ালে নিয়ে স্নান-ঘরে ঢুকেছেন। সমস্ত বাড়ীটা একেবারে নিস্তব্ধ, যেন ঘুমন্ত পুরী। শুধু মাত্র ঘড়ির একঘেয়ে টিক্-টিক্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘড়ির কাঁটাটা শুধু চলেছে অক্লান্ত পদক্ষেপে একটার পর একটা সংখ্যা অতিক্রম করে। কোন কিছুই ভ্রূক্ষেপ নেই। মিনতি ঘড়িটার দিকে চাইল, তার পর স্নান-ঘরের দিকে। শুধু একটানা জল পড়বার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আর তার সঙ্গে স্বামীর অস্পষ্ট গানের সুর। অসীম বিরক্তিতে মিনতির ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। স্নান সমাপন করে তোয়ালে দিয়ে সিক্ত কেশ মুছতে মুছতে নন্দদুলাল বাবু বেরুলেন। তার পর ঘরে ঢুকে প্রসাধন শেষ করে একটা বই হাতে নিয়ে এসে মিনতির পাশেই একটা চেয়ার গ্রহণ করলেন।

'খেতে দিতে পার?' বলে নন্দদুলাল বাবু বইএর পৃষ্ঠা ওলটাতে লাগলেন। স্বামীর হাব-ভাব দেখে মিনতির সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। খেয়ে যেন কৃতার্থ করবে তাকে! দেয়াল-ঘড়িটার দিকে স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল—ক'টা বেজেছে খেয়াল আছে কিছু? ঠিক তখুনি ঘড়িটা যেন মিনতির কথায় সায় দিয়েই বেজে উঠল—টং। ঘড়ির দিকে না চেয়েই নন্দদুলাল বাবু বললেন—'সাড়ে বারটা। তোমার খেতে দেবার ইচ্ছে আছে নাকি বল! নইলে শুতে যাই। বেজায় ঘুম পেয়েছে।'

'লজ্জা করল না বলতে এ কথা?' মিনতি উঠে গিয়ে স্বামীর খাদ্য পরিবেশনে মন দিল। দুজনের খাবার একসঙ্গেই ঢাকা ছিল। মিনতি স্বামীর খাবার গুছিয়ে দিল আসনের কাছে। জলের গ্লাস প্লেট দিয়ে ঢাকা ছিল, সেটা উঠিয়ে নিল।

নন্দদুলাল বাবুর কিন্তু উঠবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি তখন গভীর মনোযোগের সঙ্গে হাতের বইটা পড়ছেন। মিনতি কিছুক্ষণ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে রইল। তার পর ডাকল—'ওগো শুনছো, খেতে এস।' এবারে তার কণ্ঠের উত্তাপটা কিছু কম। নন্দদুলাল বাবু এবারে উঠে এসে আসন গ্রহণ করলেন এবং আহারে মন দিলেন। মিনতিও নিজের থালাটা কাছে টেনে নিল। তার পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁরা দু'জনেই খেয়ে যেতে লাগলেন। যেন তাঁদের মধ্যে কোন পরিচয় নেই, এক দোকানে পাশাপাশি বসে খাচ্ছেন মাত্র।

খানিক বাদে নন্দদুলাল বাবুই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। 'তুমি আগে খেয়ে নিলেই পার। আমার জন্য বসে থাক কেন? রোজ তোমাকে এক কথা বলি, তবু শুনবে না।' মিনতি এ কথার কোন জবাব দেবার প্রয়োজন অনুভব করল না।

নন্দদুলাল বাবু এক টুকরো আলু মুখে দিয়ে বললেন—'জান, এবারে এ পাড়ার পুজোর সব ভার আমার ঘাড়ে পড়ল। আপত্তি করেছিলাম—কিন্তু ওরা ছাড়লে না কিছুতেই।'

'এ রকম গাধা ত আর দুটি নেই কানপুরে···ছাড়বে কেন?'—মিনতি আরও গম্ভীর হয়ে রইল। স্বামীর গৌরবে সে মোটেই খুশী হল না। মিনতির তীব্র শ্লেষটা গায়েই মাখলেন না নন্দদুলাল বাবু। তিনি আপন মনে বলতে লাগলেন—"দেখে নিও এবারে বাঙ্গালী ক্লাবটাকে নতুন করে গড়ব। সবাই বলবে নন্দদুলাল বাবু কাজের লোক বটে, একটা লাইব্রেরী খুলবারও ইচ্ছে আছে—সে কাজও সুরু করে দিয়েছি। এবার পুজোর থিয়েটারের ভারও আমার, আর দেখেই নিও ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়। যে-সে লোক নয় এ শর্ম্মা। এখানকার বাঙ্গালী-সমাজকে দাঁড় করাতেই হবে।' এক চুমুকে দুধের বাটিটা নিঃশেষ করে উঠে পড়লেন তিনি। মিনতি খাওয়া বাসনগুলি গুছোতে গুছোতে বলল—'কাল সকালে উঠে বাজার না করে দিলে কিন্তু রান্না হবে না, বুঝলে?'

নন্দদুলাল বাবুর মনে হল মিনতি বুঝি তার গায়ে এক মুঠো তপ্ত বালু ছড়িয়ে দিল।

'কেন, বাজারটা হাবাকে দিয়ে করিয়ে রাখলেই পার? আমার ভরসা কর কেন? দেখছ আমার মোটেই সময় নেই।'

'হাবাটা ভয়ানক চুরি করে—আর জিনিষ যা আনে তা না বলাই ভাল।'

'বেশ করে, আমার পয়সা চুরি করে তোমার তাতে কি? দেখা হলেই কেবল এক কথা—চাল আর ডাল, যেন আর কোন কথাই নেই সংসারে! দেখছ আমি দশ জনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি, সেটুকু বুঝবে না। মেয়ে মানুষের জাতটাই এমনি স্বার্থপর।' নন্দদুলাল বাবু উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

'অমন করে গাধার মত চেঁচিও না রাত দুপুরে। পাশের ঘরে লোক ঘুমুচ্ছে, খেয়াল আছে কিছু?' ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বার আয়োজন করে মিনতি। নন্দদুলাল বাবু ঘরে গিয়ে স্ত্রীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে থাকেন—'স্বার্থপর' কেবল নিজের গণ্ডীটুকুতেই আবদ্ধ থাকতে চায়। সারা দিন অফিসের খাটুনী, তার পর দশ জনের মঙ্গলের জন্য যে কাজ করি সে কি নিজের স্বার্থের জন্য? আর তোমাকে কি করতে হয়—ঘরে বসে দু' বেলা দুটো রান্না করা। একদিন ভাল বাজার না হলেই মেজাজ সপ্তমে। কে তোমাকে না খেয়ে বসে থাকতে বলে? আমার জীবনের যা-কিছু আদর্শের স্বপ্ন ছিল সব দেখছি তোমার জন্য বিসর্জ্জন দিতে হবে।' বলতে বলতে নন্দদুলাল বাবু আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

'আজকে আর ঘুমোবে না বুঝি? তোমার কথার চোটে বাবলুটা ঠিক জেগে উঠবে দেখছি। খুব হয়েছে, এবারে শুয়ে পড়। কাল থেকে আর কোন কথাই বলব না তোমাকে সংসারের।' শুয়ে শুয়ে মিনতি বলে। নন্দদুলাল বাবু বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েন আর বাক্যব্যয় না করে। সত্যি, রাত্রিও ত কম হয়নি! কিছুক্ষণের মধ্যে নাসিকা-গর্জ্জন শোনা যায় নন্দদুলাল বাবুর।

মিনতির কিন্তু ঘুম আসে না অনেকক্ষণ। স্বামীর সুখনিদ্রা দেখে তার আরও রাগ হয়। কয়েক মাস থেকেই এ রকম চলছে।

সংসারের কোন কিছুরই খেয়াল নেই। সকাল হলেই চা খেয়ে যাবে আড্ডা দিতে। অফিস যাবার কিছু আগে বাসায় এসে কোন রকমে নাকে-মুখে দুটো গুঁজে অফিস। বিকেলে অফিস থেকে ফিরে জল-যোগ করেই দৌড়োবে ক্লাবে, তার পর ফিরবে রাত্রি এগারোটা-বারোটা করে। শুধু খাওয়া আর রাত্রে শোবার সঙ্গেই যেন বাসার সাথে সম্বন্ধ! সকাল বেলাটায় ছেলেটাকে একটু পড়া দেখিয়ে দিলে কি দোষ হয়? ছেলেটা রোজ স্কুলে ধমক খাচ্ছে। চাকর দিয়ে বাজার করালে কত আর ভাল জিনিস পাওয়া যাবে? সে একা কত দিক সামলাবে? কিন্তু এ কথা সে বোঝাবে কাকে? কিছু বলতে গেলেই ঝগড়া হবে। মেজাজ এতটুকু খারাপ হলেই নন্দদুলাল বাবু এমন জোরে চীৎকার করেন যে, শেষে মিনতির নিজেরই লজ্জা করতে থাকে। নীচের ফ্ল্যাটেই এক বাঙ্গালী-পরিবার থাকে—এখানকার কথা শুনতে পায় নিশ্চয়। ভাবতে ভাবতে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে মিনতি। ঘুম ভাঙ্গে স্বামীর তর্জনে।

'ছ'টা বাজে, এখন পর্যন্ত এক কাপ চা পাবার আশা নেই। কাগজওয়ালাটাও হয়েছে তেমনি, বেলা হল তবু বাবুর পাত্তা নেই।'

মিনতি তাড়াতাড়ি করে উঠে পড়ে বিছানা থেকে। ইলেকট্রিক ষ্টোভে চায়ের জল চাপিয়ে দেয়। সত্যি বেলা হয়ে গেছে।

'কই, তোমার ছেলে উঠেছে? এত বেলা করে উঠলেই হয়েছে তোমার ছেলের পড়াশোনা! রোজ বল, ছেলেকে পড়া দেখিয়ে দিই না—ছেলেকে একটু সকালে ওঠালেই পার, এর পর পড়াব কি অফিস কামাই করে?'

'সকালে উঠেই এত মেজাজ দেখাচ্ছ কেন?' ধূমায়িত চায়ের পেয়ালাটা টেবিলে রাখে মিনতি। 'কে বলেছে তোমাকে ছেলে পড়াতে?' মিনতির মেজাজও নেহাৎ ঠাণ্ডা মনে হয় না।

'এত দেরীতে চা পেলে কার মেজাজ ভাল থাকে বল?' নন্দদুলাল বাবু গরম চায়ে চুমুক দেন। ইতিমধ্যে খবরের কাগজও এসে গেছে। বাবলু এসে বই-খাতা নিয়ে বাবার কাছে পড়তে বসেছে। মিনতি গৃহকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নন্দদুলাল বাবু খবরের কাগজ দেখতে দেখতে বাবলুকে পড়া দেখিয়ে দিচ্ছেন এমনি সময়ে—'নন্দদা' বাসায় আছেন নাকি—?' নীচে থেকে ডাক এল। অমনি নন্দদা আর কোন কথা না বলে ঘরে ঢুকে গায়ে একটা সার্ট চড়িয়ে দুপ্ দাপ্ শব্দে নীচে নেমে যান। মিনতি চুপ করেই দেখল, কিছু বলে যখন লাভ নেই।

বাবলু কিন্তু খুব খুশী হয় বাবা চলে যাওয়াতে। ছ' বছরের ছেলে বাবলু। ওকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে সম্প্রতি। স্কুলে তার মোটেই ভাল লাগে না বন্দী হয়ে থাকতে। বাবার শিক্ষা দেবার পদ্ধতিটাও তার পছন্দ নয় একেবারেই। বাবলুর বন্ধুরা থাকে সব নীচের তলায়। কিন্তু তার বাবা-মা তাকে নীচে যেতে দেখলেই বকবে। ফাঁক পেলেই সে নীচে চলে যায়। বাবা চলে যেতেই একটু পরে সেও নীচে নেমে গেল।

মিনতি রান্না-ঘরে গিয়ে রান্না করবার আয়োজন করতে থাকে। নিঃশ্বাস ফেলবার সময় কোথায় তার? হঠাৎ খেয়াল হয় বাবলুকে ত দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই নীচে গেছে ছেলেটা। বারান্দা থেকে গলা বাড়িয়ে ডাকে মিনতি। বাবলু চলে আসে ভয়ে ভয়ে। তার পর কিছুক্ষণ চলে বাবলুর স্নানপর্ব। বাবলুর স্নান করতে ভাল লাগে না। বাবলুর সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করে হাঁপিয়ে পড়ে মিনতি। শেষ কালে বাবলুকে হার মানতে হয়। ইতিমধ্যে নন্দদুলাল বাবু এসে পড়েন। কোন রকমে স্নান সেরে খেতে বসে যান। মিনতির ডাল তখনও সিদ্ধ হয়নি। গরম ভাতে ঘি ঢালতে ঢালতে মিনতি বলে—'আজ বিকেলে একটু বেরুব, বুঝলে?'

'বেরুতে তোমাকে মানা করেছি নাকি?' এক গ্রাস ভাত মুখে তুলতে তুলতে নন্দদুলাল বাবু জবাব দেন।

'তোমার সঙ্গে আজ মার্কেটে যাব ভেবেছি, বাবলুর জন্য কিছু উল আনতে হবে।'

নন্দদুলাল বাবু জলের গ্লাসে চুমুক দেন। ন'টা বাজতে দেরী নেই।

'কি, কথা বলছ না যে? আজ আর অফিস থেকে ফিরে ক্লাবে যেতে পারবে না, বুঝলে?' আদেশের সুরে বলে মিনতি।

'আজ আমাকে ক্লাবে না গেলেই চলবে না। উল আনতে কাল যাওয়া যাবে।' নন্দদুলাল বাবু খাওয়া শেষ করে উঠে যান। হাত-মুখ ধুয়ে অফিসে যাবার জন্য তৈরী হয়ে নেন। তাড়াতাড়ি করে নীচে নেমে যান। তার পর সাইকেলে চেপে অদৃশ্য। মিনতির গা জ্বালা করতে থাকে রাগে আর অপমানে। ইচ্ছে করে সংসার ফেলে দিয়ে চলে যায় যে দিকে দু' চোখ যায়। কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠে না তার। বাবলুকে খাইয়ে দিতে হবে। দিতে হবে তাকে পোষাক পরিয়ে বই-খাতা গুছিয়ে। গরম জামা-কাপড়ের বাক্সটা খুলে দেখতে হবে। জামা-কাপড় কাচতে হবে। কাজের কি অন্ত আছে আর? দুপুর বেলায় নীনার মায়ের কাছে গিয়ে ডিজাইনটা শিখে আসতে হবে।

বাবলুকে স্কুলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হয় মিনতি। এখন ধীরে-সুস্থে কাজ করা যাবে। রান্না-ঘরের পাট চুকিয়ে স্নান করে খাওয়াটা সেরে ফেলে তাড়াতাড়ি। গরম জামা-কাপড়গুলি রৌদ্রে মেলে দেয়। ঘরের খুঁটিনাটি কাজ-কর্মগুলি সেরে ফেলে। তার পর অবসর হয় মিনতির। উল-কাঁটা হাতে নিয়ে নীচে যায় নীনার মায়ের কাছে ডিজাইন শিখতে। নীনার মায়ের কাছে সে প্রায়ই যায় দুপুর বেলা। নীনার মা সময় করে উঠতে পারে না উপরে আসবার জন্য। ঘরে ঢুকে মিনতি দেখে নীনার মা তখন কোলের ছেলেটাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছে।

'এই যে এস ভাই, বস। আমি খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে এখুনি আসছি।'

মিনতি একটা চেয়ার গ্রহণ করে। একটু পরেই নীনার মা নেমে আসে খাট থেকে। খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। মিনতির পাশেই একটা চেয়ার টেনে বসে। তার পর চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে মিনতির মুখোমুখি হয়ে বসে। দু'জনের সংবাদের আদান-প্রদান চলতে থাকে সেলাই শেখবার ফাঁকে ফাঁকে।

কেমন চলছে ভাই আজ-কাল? পুজোও এসে গেল। তোমার কর্তা ত খুব খাটছেন। এবারে নাকি এদিকের পুজোতেই বেশী আমোদ হবে। বাবলুর পড়াশুনা চলছে কেমন? বাবলুর খুব অঙ্কে মাথা। নীনার নাচের দিকে ঝোঁক বেশী। সামনের বছর ওকে নাচের স্কুলে ভর্তি করব। ওই সিদ্ধীদের বাড়ীর ছেলেটার মাথায় একেবারে কিছু নেই। রায়দের ছোট বৌ'র বাচ্চা হবে। নরেন

বাবুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। অনেক জিনিষ পাবে। পুজোর বাজার করতে যাচ্ছ কবে? তোমার কানের টবের মত এক জোড়া গড়াব ভেবেছি, ইত্যাদি নানা খবরাখবর চলতে থাকে দু'জনের মধ্যে। তার পর এক সময় নীনার মা বলে—'আজ কাল তোমার কর্ত্তা বুঝি খুব রাত করে ফেরেন? আমি আবার ওই সময়টাতে খোকাকে দুধ খাওয়াতে উঠি কি না।'

মিনতির মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে—'তিনটে যে বাজে। আজ উঠি ভাই।' নীনার মা কিন্তু ছাড়তে চায় না—'এখুনি উঠবে কেন। আর একটু বস না। চা-টা খেয়ে যাও।' মিনতি প্রবল আপত্তি করে—'না—না, একটু পরেই ঝি এসে যাবে। চা আর একদিন খাওয়া যাবে।'

'এই দেখ ভাই, কথায় কথায় ভুলেই গেছি, নীনার মা একটা পোষ্টকার্ড দেয় মিনতির হাতে।

'সকালে পিওনটা ভুল করে আমার ঘরে দিয়ে গেছে—আমিও ভুলে গেছি।'

'তাতে আর কি হয়েছে'—মিনতি চিঠিটা আর উল-কাঁটা হাতে করে উপরে চলে আসে।

চিঠিটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে। মিনতির মা লিখেছেন চিঠি। মিনতির ছোট বোন প্রণতির হঠাৎ বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। চিঠি পেয়েই যেন মিনতি চলে আসে। সময় নেই মোটেই। তাই ত, আর মাত্র চার দিন আছে! হিসেব করে দেখে মিনতি। অনেক দিন থেকেই প্রণতির বিয়ের কথা চলছিল—এবারে হঠাৎ ঠিক হয়ে গেছে। খবরটা সুখবর সন্দেহ নেই। মিনতি নিশ্চয় যাবে। স্বামী অমত করলেও যাবে। ঝি এসে গেছে ইতিমধ্যে। কলতলায় বাসন মাজবার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মিনতির মন চলে গেছে তখন অনেক দূরে তার শৈশবের খেলাঘরে। বাবা—মা—প্রণতি—টুকু আর মিনতি। কি সুখেরই না স্মৃতি! মিনতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কত দিন যায়নি সে কলকাতায়? হাতের আঙ্গুলের হিসেব করে মিনতি। চার বছর হয়ে গেছে যায়নি। এতগুলি বছর সে কি করে কাটাল—ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে। এই স্বার্থপর স্বামীর জন্যই ত? পাছে তার কোন অসুবিধা হয় এই ভেবে। এর বিনিময়ে কি পাচ্ছে সে? অবহেলা—উপেক্ষা—অপমান—কোনটা বাকি আছে তার? এবারে সে যাবে দীর্ঘ দিনের জন্য। মন স্থির করে ফেলে মিনতি। বাবলুর পড়াশুনার কিছু ক্ষতি হবে—সে এমন কিছু নয়। স্বামীর খাবার অসুবিধা হবে—তা হ'ক। তাই বলে সে বাপ-মাকে দেখবে না? সে একাই যাবে। স্বামীকে যাবার জন্য বলবে না। জানা কথা, ক্লাব আর পুজো ফেলে কোথাও যাবে না।

'মা—মা গো'—সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে উপরে আসে বাবলু। এসেই মার গলা জড়িয়ে ধরে। তাই ত, কখন চারটে বেজে গেছে জানতেই পারেনি। বাবলুর দুধ গরম করতে হবে। রৌদ্রে-দেওয়া জামা-কাপড়গুলি উঠিয়ে ফেলে তাড়াতাড়ি। একটু পরেই আসবে বাবলুর বাবা।

'ও বাবলু, তুই হাত-মুখ ধুয়ে নে। একটা মজার কথা বলব', বাবলুর খাবার গুছিয়ে দিতে দিতে বলে মিনতি। হাত-মুখ ধুয়ে বাবলু খেতে বসে। মা যে কি মজার কথা বলবে ভেবে পায় না।

'আজ রাত্রিতে আমরা কলকাতা যাব—তোর দাদুর বাড়ী, জানিস বাবলু? সেখানে তোর একটা মাসী আর মামা আছে। তারা তোকে কত ভালবাসবে।' খুশীতে মিনতি বাবলুকে জড়িয়ে ধরে।

'দাদুকে তোর মনে আছে বাবলু?' বাবলু মহা উৎসাহে ঘাড় দুলিয়ে বলে—বা রে, কেন মনে থাকবে না? সেই ইয়া লম্বা দাড়ি, সেই ত?'

বাবলুর হাব-ভাব দেখে মিনতি হেসে লুটিয়ে পড়ে। 'ধোৎ, তোর কিচ্ছু মনে নেই'—আজ অনেক দিন পরে হাসতে পেরে বাঁচে মিনতি। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে বুঝতে পারে স্বামী আসছে। এক দৌড়ে বাবলু গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ায়—'জান বাবা, আজ আমি আর মা কলকাতায় যাচ্ছি। মাসীর বিয়ে হবে।' বাবাকে সুখবরটা শুনিয়ে স্বস্তি পায় বাবলু।

'বেশ, বেশ, ভাল খবর। তোর মা কোথায় রে?' মিনতি ততক্ষণে চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছে। তোয়ালে আর কাপড় রেখে এসেছে স্নান-ঘরে। হাত-মুখ ধুয়ে একটা চেয়ারে এসে বসলেন নন্দদুলাল বাবু। মিনতি খাবারের প্লেটটা এনে টেবিলে রেখে দিল।

'সত্যি যাচ্ছ নাকি আজই'—এক চামচে হালুয়া মুখে তুলতে তুলতে বললেন নন্দদুলাল বাবু।

চায়ে চিনি দিতে দিতে মুখ না তুলেই মিনতি বলল—'কেন, আপত্তি আছে নাকি তোমার?'

'আপত্তি থাকলেই বা শুনছে কে?' গরম চায়ের পেয়ালাটা হাতে তুলে নেন নন্দদুলাল বাবু। 'চিঠিটা কোথায়? প্রণতির বিয়ে কবে হচ্ছে?'

'এবারে গিয়ে বেশ কিছু দিন থেকে আসব, বুঝলে?'

'নিশ্চয়—নিশ্চয়, অনেক দিন যাওনি বাপের বাড়ী। এবারে গিয়ে অনেক দিন থেকে এস।'

স্বামীর এ ধরণের কথা মোটেই ভাল লাগে না মিনতির। স্বামী আপত্তি করবে, নিজের নানা অসুবিধার কথা বলবে। সেই সুযোগে মিনতি বেশ দু' কথা শুনিয়ে দেবে ভেবেছিল।

'তোমার শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না দেখছি। এবারে বাপের বাড়ী গিয়ে আদর-যত্নে থেকে শরীরটা ভাল করে এস। বাবলুটার পড়ার ক্ষতি হবে অবশ্য, কিন্তু তা আর কি করা যাবে?'

'আমার শরীরের জন্য ত তোমার কত দরদ, সে আমার জানা আছে। আমি ত আজ-কাল তোমার আপদ হয়েছি, গেলেই বাঁচি। তাই আমার যাবার জন্য তোমার এত গরজ। বেশ এবারে যাব আর ফিরব না—তুমি মনের সুখে থেকো।' বলতে বলতে মিনতির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। তার দু' গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

অনেক দিনের সঞ্চিত অভিমানের বাঁধ আজ ভেঙে যায়। মিনতি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। নন্দদুলাল বাবু কি যে করবেন ভেবে পান না। বাবলুটা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মায়ের কাঁদবার মত কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ সে খুঁজে পায় না। কলকাতা যাবে দাদু-দিদার কাছে—বাবাও যেতে বলেছেন, এর মধ্যে কাঁদবার কথাটা কি হল? সে একবার বাবা আর একবার মার দিকে তাকিয়ে কারণ খুঁজতে গিয়ে হতাশ হয়ে পড়ে। নন্দদুলাল বাবুও বেশ মুস্কিলে পড়ে যান মিনতির ব্যবহারে। বাবলুর সামনে মিনতিকে কি করে

শান্ত করবেন ভেবে পান না। মুখের কথায় যে এ শ্রাবণধারা থামবে না, সে ত দেখাই যাচ্ছে। আগে আগে এ রকম ঘটনা ঘটলে তিনি পকেট থেকে রুমাল বের করে স্ত্রীর নাকের জল ও চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছেন। বাবলু এখন বড় হয়েছে, ওর সামনে সেটা কি উচিত হবে? যে দুষ্টু ছেলে, এখুনি হয়ত নীচে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবকে বলে বেড়াবে।

'বাবলু, তুমি নীচে গিয়ে খেলা কর।' ছেলের সামনে অস্বস্তি বোধ করেন নন্দদুলাল বাবু। বাবলুর কিন্তু আজ নীচে যাবার উৎসাহটা কমে গেছে দেখা গেল।

'নীচে গেলে মা বকুনী দেবে।' সে যে মায়ের অবাধ্য মোটেই নয়, তার প্রমাণ দিল হাতে হাতে। নন্দদুলাল বাবুর ভয়ানক রাগ হয় এই অকালপক্ক ছেলেটার ওপর। কিন্তু এখন ধৈর্য্য হারালে চলবে না। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়—অফিস থেকে ফিরবার সময় নীচের তলার বাড়ীটার সামনে ছেলেদের ভীড়, সাপ খেলা হচ্ছে।

'জানিস বাবলু, আজ ফিরবার সময় দেখি কি, মণ্টুদের বাসায় সেই সাপুড়েটা সাপ খেলা দেখাচ্ছে। একটা এই বড় সাপ এমনি করে নাচছে।' নন্দদুলাল বাবু ডান হাতটা উঁচু করে আঙুল দিয়ে সাপের ফণার মুদ্রা করে দেখান। বাবলু অমনি দুপ্‌দাপ শব্দে নীচে নেমে যায়। এতক্ষণে কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন নন্দদুলাল বাবু। মিনতি তখনও আঁচলে মুখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছে। নিরাপদ হয়ে নন্দদুলাল বাবু পকেট থেকে রুমাল বের করে মিনতির কাছে এগিয়ে যান। মিনতি তাঁর রুমাল সমেত হাত ঠেলে দেয়—'যাও, যাও, আর ঢং করতে হবে না। কত যে দরদ আমার জানা আছে।'

'কি হয়েছে তোমার বল ত মিনু? এমন করছ কেন? সত্যি তোমার কষ্ট কি আমি বুঝি না? কিন্তু কি করব বল? পাঁচ জনে মিলে অনুরোধ করলে না শুনেই বা পারি কি করে? আমি কি আমোদ করতে যাই না কি? তুমি এত বুদ্ধিমতী হয়ে এটুকু বোঝ না কেন? চিঠিটা দেখাও ত আমাকে?'

কেঁদে কেঁদে মিনতি শ্রান্ত হয়ে পড়ে। এক সময় তার কান্না থামে। মায়ের চিঠিটা এনে স্বামীর হাতে দেয়। চিঠিটা পড়ে নন্দদুলাল বাবু মন্তব্য করেন—'আজকেই রওনা হবে নাকি? সময় ত নেই মোটেই। তুমি একাই চলে যাও বাবলুকে নিয়ে। তোমার সঙ্গে যেতে পারলে খুবই খুশী হতাম—কিন্তু কি আর করা যাবে? তুমি ত অবুঝ নও? রাত্রি বারটায় একটা গাড়ি আছে, সে গাড়ীতে গেলেই ভাল। আমি তুলে দিয়ে আসব। তুমি এদিকে গুছিয়ে নাও। সত্যি এক ভাবে থাকতে থাকতে তোমার শরীরটা খারাপ হয়ে পড়েছে। স্থান পরিবর্ত্তনটা তোমার পক্ষে ভালই হবে। এর পর তুমি ফিরে এলে আর অফিসের পর বাসা থেকে বেরুব না। লক্ষ্মীটি, তুমি রাগ কর না!'

মিনতির সমস্ত রাগ তখন চোখের জল হয়ে ঝরে পড়ে গেছে। মুখে ফুটে উঠেছে বর্ষার বিষণ্ণ আবহাওয়ার পর শরতের প্রসন্ন হাসি।

'বাবলুটা গেছে কোথায়?' এতক্ষণে মিনতি কথা বলল।

'তাই ত, অনেকক্ষণ হল দেখছি না ছেলেটাকে, ফাঁক পেলেই কেবল নীচে যাবে।'

'তুমিই ত ওকে সাপ খেলা দেখতে নীচে পাঠালে। এখন দোষ দিচ্ছ কেন?' বলল মিনতি।

'নীচে না পাঠিয়ে কি করি বল?' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মিনতির চোখে চোখ রাখলেন নন্দদুলাল বাবু। মিনতির মুখে ফুটে উঠল এক টুকরো সলজ্জ হাসি।

'তাহলে বারটার গাড়ীতেই যাচ্ছি ত?' মিনতি স্বামীর দিকে চাইল।

'সেই ভাল হবে।'

'আমি তাহলে গুছিয়ে নি। আজ রান্না করব খিচুড়ী। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সারতে হবে।'

'আজকে আর রান্নার হাঙ্গামা নাই বা করলে। দোকান থেকে কিছু আনিয়ে নিলেই হবে।'

'না—না তার কি দরকার। তোমার আবার দোকানের খাবার খেলেই শরীর খারাপ হয়। এ ক'দিন দোকানে খেয়ে তোমার আবার অসুখ-বিসুখ না করে, ভেবে আমার চিন্তা হচ্ছে। অথচ না গেলেই বা সেখানে কি ভাববে? মা-বাবা ভারি দুঃখ পাবেন নইলে—।' কথাটা অসমাপ্তই ছেড়ে দেয় মিনতি।

'তুমি কিছু ভেব না সে জন্য। আমি খুব সাবধানে থাকব। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে কয়েকটা দিন বিশ্রাম করে এস। তার পর বল তোমার কি কি লাগবে? একটা ফর্দ্দ লিখে দাও। প্রণতিকে কি দেবে? শাড়ী ত? এখান থেকে নিয়ে যাওয়াই ভাল। সেখানে গিয়ে আর সময় পাবে না। বাবলুর জামা-কাপড় আছে ত?'

মিনতি ঘরে গিয়ে একটা ফর্দ্দ লিখে এনে স্বামীর হাতে দেয়। নন্দদুলাল বাবু ফর্দ্দটা হাতে নিয়ে নীচে নেমে যান।

বাবলুকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যেও—বারান্দা থেকে গলা বাড়িয়ে বলে মিনতি। তার পর গোছাতে বসে।

২

বাজারে গিয়ে ফর্দ্দ মিলিয়ে জিনিষ কেনেন নন্দদুলাল বাবু। স্নো-পাউডার-গন্ধতেল। বাবলুর জন্য বিস্কুট। বাবলু মহা খুশী। এক সময় প্রশ্ন করে—আচ্ছা বাবা, মা তখন কেঁদেছিল কেন?

বিব্রত হয়ে নন্দদুলাল বাবু বলেন—'টফি খাবি বাবলু? এই নে।' দোকান থেকে এক টিন টফি কিনে দেন বাবলুকে। বাবাকে আজ ভারি ভাল লাগে বাবলুর। বাবা মার চেয়ে অনেক ভালবাসে তাকে। আর কোন দিন সে বাবার উপর রাগ করবে না।

সৌখীন শাড়ীর দোকানের দিকে অগ্রসর হন নন্দদুলাল বাবু। দেয়ালে সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে বেশ গুছিয়ে বসেন। দেখতে দেখতে কাপড়ের স্তূপ হয়ে ওঠে সামনে। অনেক বেছে প্রণতির জন্য শাড়ী কেনেন একখানা। বাঃ, ওই শাড়ীখানা বেশ ত? মিনতিকে বেশ মানাবে। মেরুণ রংএর শাড়ী মিনতির ভারি পছন্দ। দাম কত? ষাট? তা হ'ক। পছন্দ যখন হয়েছে তখন কিনেই ফেলবেন। খরচের কথা ভাববেন না। মিনতি নিশ্চয়ই খুশী হবে শাড়ীটা পেয়ে। মুখে বলবে কি দরকার ছিল এতগুলি টাকা নষ্ট করা ইত্যাদি! এ তিনি ভাল ভাবেই জানেন। কিছু ব্লাউজের কাপড়ও নিলেন। তার পর হাত-ঘড়ির দিকে চাইলেন, সাতটা যে বাজে। বাবলু এক মনে টফি খেয়ে চলেছে। এক সময় জিজ্ঞেস করে—'কখন যাব বাবা আমরা?'

'এই ত খাবার সময় হয়ে এল। বাসায় গিয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে, তার পর এক ঘুমে যাবার সময় হয়ে যাবে।'

'আরে, এই যে নন্দদুলাল বাবু!' এমনি সুরে কথাটা বলেন ভদ্রলোক যেন মস্ত কিছু একটা আবিষ্কার করেছেন। সাইকেল থেকে নেমে একেবারে নন্দদুলাল বাবুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ান। নন্দদুলাল বাবু তখন কেনা-কাটা সেরে সবেমাত্র সাইকেলের সীটে বসবার জন্য তৈরী হয়েছেন—বাবলু বসেছে সামনে। পিছনের সীটটা জিনিষ-পত্রে বোঝাই।

'কি ব্যাপার বলুন ত? আজকে ক্লাবে মিটিং আছে ভুলে গেছেন না কি? আপনিই সমস্ত আয়োজন করলেন—আর আপনারই কিনা পাত্তা নেই? আপনার বাসায় গিয়েছিলাম—বৌদি বললেন বাজারে গেছেন। ছুটতে ছুটতে এখানে এসেছি'—ভদ্রলোক কৃতিত্বের হাসি হাসলেন।

'আজ আমাকে বাদ দিন নগেন বাবু!'

'সে কি, আপনাকে বাদ দিলে চলবে কি করে? আজ দীনেশ বাবুর সঙ্গে খুব একচোট হবে।' সহজে ছাড়বার পাত্র নন নগেন বাবু।

'বাসায় জরুরী কাজ আছে।' নেহাৎই অভদ্রের মত সাইকেলে চেপে নন্দদুলাল বাবু নগেন বাবুর দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে যান।

'ও মশাই শুনুন—শুনুন—'নগেন বাবু উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে থাকেন। নন্দদুলাল বাবু দূর থেকে বাঁ হাতখানা উঁচু করে নগেন বাবুকে নিরস্ত হতে ইঙ্গিত করেন।

নগেন বাবু কিছুক্ষণ বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকেন ভীড়ের মধ্যে। এ রহস্যের কোন কূল-কিনারা পান না খুঁজে। পূজোর ব্যাপারে নন্দদুলাল বাবুর উৎসাহটাই সব চেয়ে বেশী। তাঁর পণ, কানপুরের বাঙ্গালী-সমাজকে তিনি আদর্শ করে গড়ে তুলবেন। এ জন্য ভদ্রলোকের মাথা-ব্যথার অবধি নেই। প্রত্যেক বাড়ী গিয়ে চাঁদার জন্য বিব্রত করে তোলেন। সেই মানুষ কিনা আজ ক্লাবের নামে এত উদাসীন!

যেতে যেতে নন্দদুলাল বাবু তখন ভাবছেন মিনতির কথা। মিনতির সঙ্গে আজ-কাল তাঁর ব্যবহার সত্যি বড় খারাপ হচ্ছে। বেচারা একা-একা কি করে সময় কাটায় সে কথা মোটেই ভাবেন না তিনি। এই ত সেদিন কি একটা ভাল সিনেমা এসেছিল—মিনতি দেখবে বলেছিল, কিন্তু তিনি নিয়ে যাননি। মিনতি অবশ্য একা যেতে পারে, তা সে যাবে না। রোজ কত রাত করে বাসায় ফেরেন আর মিনতি না খেয়ে তাঁর জন্য বসে থাকে! কত গভীর ভালবাসা থাকলেই এ রকম হতে পারে! অনেক ভাগ্য মিনতির মত স্ত্রী পেয়েছেন। স্ত্রী-ভাগ্যে পুলকিত হয়ে ওঠেন নন্দদুলাল বাবু। এবার মিনতি ফিরে এলে তার কথা শুনে চলবেন তিনি। এবার থেকে নিয়মিত সঙ্গ দেবেন তাকে। মিনতিহীন বাসা কল্পনা করতেই কেমন যেন শূন্য লাগে সংসারটা। ক্লাবের কোন আকর্ষণই যেন নেই। গভীর আবেগে চোখ দুটো ছল্-ছল্ করে ওঠে নন্দদুলাল বাবুর। মিনতিকে তিনি এত ভালবাসেন এত দিন যেন অজানা ছিল!

'বাবা—মামাবাড়ী গেলে পড়া-শোনা করতে হবে না ত?' বাবলু অনেক ভেবে প্রশ্ন করে।

'না—না, বিয়ে-বাড়ীতে আবার পড়াশোনা কিসের? সেখানে গিয়ে খুব লক্ষ্মী হয়ে থাকবে বাবলু—মাকে জ্বালাতন করবে না মোটেই।' ছেলেকে উপদেশ দেন নন্দদুলাল বাবু। তার পর জিজ্ঞেস করেন:

'হ্যাঁ রে বাবলু—আমার কথা তোর মনে পড়বে সেখানে গিয়ে? বাবলু বাসায় নেই ভাবতেও কেমন যেন লাগে।'

তোমার কথা আমার সব সময় মনে পড়বে। তোমাকে আমি খুব ভালবাসি বাবা!' বাবলুর কাছে তখনও বাবার দেওয়া বিস্কুট আর টফি রয়েছে। মোটেই অকৃতজ্ঞ নয় সে।

'আচ্ছা, এইবার নাম', বাসার কাছে এসে সাইকেল থেকে বাবলুকে নামিয়ে দেন। বাবলু এক দৌড়ে মার কাছে চলে যায়। নন্দদুলাল বাবু সাইকেলে তালা লাগিয়ে—দুই হাতে জিনিষপত্র বোঝাই করে নিয়ে উপরে ওঠেন।

মিনতি তখন বারান্দার রেলিংএ ভর দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছটার মাথার উপরে চাঁদ উঠেছে গোল হয়ে। স্বামি-পুত্রের আগমনে ধ্যান ভঙ্গ হয় মিনতির।

'* * ও কি, তুমি দেখছি এখনি যাবার জন্যে তৈরী হয়ে বসে আছ?' মিনতির পরিপাটি সজ্জাটা চোখে পড়ে নন্দদুলাল বাবুর। মিনতির হাতে একটা কার্ড ছিল সেটা স্বামীর হাতে দিয়ে বলল—'বিকেলের ডাকে এসেছে।'

দেখ কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে আকাশে!' আবেশ-ভরা দৃষ্টিতে সে চাইল স্বামীর দিকে। নন্দদুলাল বাবু চিঠিটা পড়ে ফেরৎ দিলেন মিনতিকে।

'প্রণতির বিয়ের তারিখ পিছিয়ে গেছে। মাস দুই দেরী আছে তাহলে এখন।' নন্দদুলাল বাবু বললেন, 'এত আগে গিয়ে কি করবে? তাই আজ যাওয়া বন্ধ রাখলেম। চল না আজ ঐ পার্কটায় একটু গিয়ে বসি।' মিনতি যেন আদরে গলে পড়ছে।

'আজ যাওয়া হচ্ছে না তাহলে? বেশ! বেশ! পার্কে আরেক দিন যাওয়া যাবে—'বলে নন্দদুলাল বাবু ঘরে ঢুকে আলনা থেকে কোটটা টেনে দিয়ে দ্রুত পায়ে নীচে নেমে গেলেন। বাবলু ডাকল—মা খেতে দাও, ঘুম পেয়েছে। নন্দদুলাল বাবু হাত-ঘড়িটা দেখলেন—আটটা বাজে। মিটিংএ যোগ দেবার এখনও সময় আছে। যেতে যেতে শুনতে পেলেন পেটা-ঘড়িতে বাজছে—টং-টং—টং—আটটা বাজল।

সনেট কবিতার ভূমিকা প্রসঙ্গে

"Reader! Who ever publishes a sonnet with a preface? I hear, or fancy that I hear, you say "none"! Well! I publish. I am an enemy to what man call "custom". But be that as it is, I publish my sonnet with a preface; I have to teach the world something new. Don't get offended. Behold! I have written a sonnet in blank-verse! What a rare experiment!" —মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি
পুষ্পগন্ধে সুরভিত
ক্যাস্টর অয়েল
বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
CKS
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

অক্ষয় চট্টোপাধ্যায়

সে বাঁশীই বাজায়। আর তা অনেক দূর থেকে শোনাও যায়। যেমন আমি শুনেছিলাম ট্রাম হতে নামতে গিয়ে।

বাঁশী কেন রাধা রাধা বলে···এই কথাগুলোই তার বাঁশী নানা ভাবে বলে চলেছিলো। এই পরিচিত গানটি তো কতো বারই শুনেছি, কিন্তু বাঁশীর স্বরে আজ যেন নতুন করে শুনলাম। তখনো তার বাঁশী থামেনি। বাঁশী বাজিয়েই সে জিজ্ঞাসা করে চলেছে—বাঁশী কেন রাধা রাধা বলে?

বাঁশী থামলো। আমারই মতো গুটি চার লোক থেমে পড়েছিলো। তাদের মধ্যে এক অবাঙালীই কোন দর-দস্তুর না করেই কিনে নিয়ে গেলো একটি বাঁশী। কি জানি কি ভাবে অবাঙালী ক্রেতারও মন ছুঁয়ে গেলো—বাঁশী কেন রাধা রাধা বলে।

মুখ তুলে তাকাই। শ্যামবর্ণ ছিপ্‌ছিপে চেহারা। মাথায় এক রাশ চুল। বুকের কাছে পিঠ বেয়ে বাঁধা কাপড়ের থলিতে অগুন্তি বাঁশী।

পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরাতে যাচ্ছিলো, আমিই এগিয়ে গিয়ে হাতে তুলে দিলাম একটা সিগারেট।

অবাক্ হয়ে সে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

: এতোক্ষণ তোমার বাঁশী শুনছিলাম কি না! এটি পুরস্কার।

এবার সে হাসলো। বললো: আপনিও নিশ্চয়ই জাত-গুণীন।

আমি বললাম: আমি তো বাঁশী বাজাতে পারি না ভাই!

: আপনি কিন্তু ভালো বাঁশী বাজানো দাঁড়িয়ে শোনেন। তাই বললুম বাবু জাত-গুণীন।

আমি হাসলাম।

সে বললো: বাবু কি করেন?

: গল্প লিখি।

: বায়োস্কোপের গল্প লেখেন?

: না।

: কিন্তু বাবু বায়োস্কোপের গল্প না লিখলে তো আজ-কাল চলবে না?

: চলেও না তো, হাসলাম আমি।

: এখনো তার মানে রফা হয়নি। এবার সে হাসলো।

: কিসের রফা ভাই?

: ওই আসল বিক্রেয় আর নকল বিক্রেয়।

: তার মানে?

: এই দেখুন না আমি যতো দিন ভালো ভালো রাগ-রাগিণী বাজিয়েছি, একটি খদ্দেরও পাইনি। যে দিন থেকে সিনেমার গান ধরলুম, বেশ খদ্দের পাই!

: কিন্তু তুমি তো এতোক্ষণ অন্য গান বাজাচ্ছিলে?

: হ্যাঁ বাবু!

: তবে?

: ও যে ভালোবাসার গান বাবু—বাঁশী কেন রাধা রাধা বলে।

: কিছু মনে ক'রো না। তুমি বিয়ে করেছো?

: হ্যাঁ বাবু! ভালোবাসা করে বিয়ে করেছি।

হাসলো সে। স্নিগ্ধ হাসি।

আর আমি বুঝলাম কেন সে পয়সার মায়া কাটিয়ে আজও বাজালো সেই ভালোবাসার গান। বাঁশী কেন রাধা রাধা বলে। আর দাঁড়াইনি তার কাছে। কেমন যেন হিংসে হলো তাকে।

চলে আসছিলাম। আমার হাত দুটো ধরে বলে উঠলো: আপনিও সিনেমার গল্প লিখুন বাবু! সব অভাব মিটে যাবে।

: লিখবো। হাত ছাড়িয়ে নিলাম।

আর থামিনি। পথ চলতে মনের কোণে কেবলই ঘুরতে থাকে তার কথা। বাঁশীর স্বর।

স্বর-ভরা বাণী। হঠাৎ হেসে ফেলি।

পার্কের বেঞ্চে পাড়ার ছেলেরা বসেছিলো। তাদেরই এক জন বলে ওঠে: ওরে গরমের দিনেও সাহিত্যিকের হিম লেগেছে। সবাই হো-হো করে হেসে ওঠে।

আমিও হাসি। চোখ চলকে জল গড়িয়ে পড়লো হয়তো। কিন্তু সে জল বলতে পারেনি, বাঁশী কেন রাধা রাধা বলে।

পরের দিনেই আবার দেখা হয়ে গেলো। গেঞ্জি গায়ে লুঙি পরে ব্লেড কিনতে বেরিয়েছি, দেখি সামনের পানের দোকানে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি: কি হে চিনতে পারছো?

: আজ্ঞে··· প্রথমটা হকচকিয়ে যায়।

: আরে, কালকে রাস্তে যাকে জাত-গুণীন বললে?

এবার সে হেসে ওঠে: খুব চিনতে পেরেছি বাবু! জাত-গুণীন দেখলেই চেনা যায়।

: যেমন আমি তোমায় চিনলাম।

হেসেই অস্থির সে। থামিয়ে দিয়ে বললাম: এদিকেই থাকো নাকি?

: ওই তো সামনের মাটি-কোঠা।

: আরে, আমিও তো এই মেসে থাকি!

: তাহলে তো ছাড়তে পারবো না বাবু!

: মানে?

: আমার ঘরে একবার যেতে হবে।

: আর একদিন না হয় যাবো।

: না—না আজই যেতে হবে। জাত-গুণীনের পায়ের ধূলা চাই-ই।

আবার সেই স্নিগ্ধ হাসি। মনে পড়ে গেলো, ভালোবেসে সে বিয়ে করেছে। কি-যেন মনে হলো, বললাম: চলো।

পথ চলতে জেনে নিয়েছিলাম নাম। নাম হরি। বউয়ের নাম পারু। ছেলেপুলে এখনো হয়নি।

: আসুন বাবু, এই আমার ঘর।

চোখ তুলে তাকালাম। মাটির দেওয়াল জুড়ে কতো নকশা-আলপনা। ভারি আশ্চর্য লাগে। জিজ্ঞাসা করি: তোমার বউ এই সব নকশা করেছে?

: না বাবু, আমি নিজেই। জানেন তো বাবু, মেয়েমানুষের মন

সহজে ধরা যায় না। অনেক নক্‌শা কেটে ধরতে হয়। বলেই হরি উচ্চ কণ্ঠে হেসে ওঠে। সংগে সংগে ডেকে ওঠে: পাতু! ওরে পাতু!

: সাত-সকালে এতো হাঁক-ডাক কেন মশাই? সামনে এসে দাঁড়ায় পাতু। আমি দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই। দেখলেই মনে হয় পাথরে-কোঁদা মূর্তি। যেন অজন্তার দেওয়াল হতে নেমে এসেছে। কিন্তু নড়লে-চড়লেই মাটির তাল। তুলতুলে নরম মাটি।

আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পাতু।

: আরে, থামলি কেন পাতু? পেন্নাম কর বাবুকে। জাত-গুণীন।

প্রণাম করে পাতু। এবার চোখে পড়ে, তার সারা দেহ জুড়ে একরাশ গয়না। এতো গয়না হরি পাতুকে দিলো কেমন করে?

: বাবু চা খাবেন? পাতু জিজ্ঞাসা করে।

: হাঁ হাঁ খাবেন। তুই চট্ করে তৈরি করে দে।

ঘরেই উনুন জ্বলছিলো। পাতু হেসে চা তৈরি করতে বসে।

আমি বলে উঠি: একটু বাঁশীই না-হয় শোনাও হরি!

: আজ্ঞে সেটি হবে না।

: কেন?

: ঘরে বাঁশী বাজালে সে ভালোবাসার জন্য বাজানো। সে শুনবে কেবল পাতু। পাতু ফিক করে হেসে চলে গেলো।

আমার উঠে পড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু বসতে হলো। চা খেয়ে গল্প করে ফেরার পথে হরিকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করি: এতো গয়না দিলে কোথা থেকে হরি?

: সে একটু মজা আছে। হরি হাসলো। সেই স্নিগ্ধ হাসি।

: কি মজা আবার?

: ও-সব গয়না বাবু গিলটির গয়না। সোনার গয়না কোথা থেকে পাবো বাবু? মেয়েমানুষের মন তো! কতো নক্‌শা করে করে ধরতে হয়। এবার কিন্তু হরির চোখ দুটো ছল্-ছল্ করে।

তা হয় তো হয়। ভালো করে নিজের জানা নেই। ব্লেড না কিনেই মেসে ফিরে আসি।

তারপর কয়েকটি দিন চলে যায়। কেন জানি না, হরির মাটি-কোঠা এড়িয়েই চলতাম। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় ধরে ফেলে আমাকে। সিনেমার সামনে।

: কোথায় চললেন বাবু?

: মেসে। তুমি এখানে?

: পাতু বায়োস্কোপ দেখতে এসেছে।

: আর তুমি?

: আমি যাইনি। অবশ্য পাতু আমাকে ওকে সংগে নিয়ে নিচে দশ আনার সিটেই দেখতে বলেছিলো।

: তা দেখলে না কেন?

: মিছিমিছি পয়সা খরচ, আমার তো ছ'আনাতেই হয়ে যেতে পারে। তাই ওকে ওপরে মেয়েদের টিকিট কেটে দিলুম।

: তা তুমি দেখলে না?

: লাইনে দাঁড়িয়েছিলুম বাবু, মনে হলো, দূর আমার বায়োস্কোপ দেখে আর কি হবে? তার চাইতে······

: তার চাইতে কি? জিজ্ঞাসা করে উঠি।

: তার চাইতে ছ'গণ্ডা পয়সায় পাতুর এক শিশি আলতা হবে। এই দেখুন না কিনে ফেলেছি। এই আলতাটা ভালো, নয় বাবু?

: খুব ভালো! ভেতরটা আমার কেমন যেন মুচড়ে ওঠে: তা পাতু তো জানতে পারবে তুমি বায়োস্কোপ দেখোনি।

: না—না, আপনি বলে দেবেন না যেন! হরি আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে। আমি হেসে উঠি: আমি বলতে যাবো কেন?

হরি সোয়াস্তি পায়: কি জানেন বাবু, মেয়েরা একটু এই সব সাজতে গুজতে ভালবাসে। এদিকে অবস্থাও নেই। মানিয়ে গুনিয়ে চলতে হয় আর কি! হরির সেই মুখ-ভরা স্নিগ্ধ হাসি।

আমার মনের মধ্যে ঘুরে যায়—এ তো নক্‌শা কেটে মেয়েমানুষের মন ধরা নয়। এ যে আরো কিছু। এ যে সেই—বাঁশী কেন রাধা রাধা বলে!

আর দাঁড়াইনি আমি। দাঁড়াইনি হরির পাশে আমার দাঁড়ানোর যোগ্যতা নেই বলে।

এর পর মেস ছেড়ে নিজেই একদিন পালালাম। হরির যোগ্যতা আমি পাবো কোথায়? তাই আমার মনের নক্‌শায় কোন পাতু জোটেনি। ইচ্ছে করেই সে-পথ দিয়ে চলতাম না, যে পথের মোড়ে হরি বাঁশী বাজিয়ে ফেরি করে।

অনেক দিন চলে যায়। শেষে আর নিজেকে সামলাতে না পেরে উপস্থিত হই সেই রাস্তায়। কিন্তু কই, বাঁশী তো আর বাজে না!

হরি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, অথচ বাঁশী বাজে না। কাছে এগিয়ে যাই। হাত ধরে বলে উঠি: বাঁশী বাজাও ওস্তাদ! তোমার জাত-গুণীন এসেছে। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে সে। কোন সাড়া-শব্দ নেই।

: আরে, কথা বলছো না যে? তোমার হলো কি?

তবু হরি নীরব!

পাশে গেঞ্জি বিক্রী করছিলো একটি ছোক্‌রা! সে এগিয়ে এসে বলে: ও কথা বলতে পারে না তো!

: কথা বলতে পারে না! আমি বিস্মিত।

: হাঁ বাবু, বাঁশী বাজাতেও পারে না?

: বাঁশী বাজাতেও পারে না!

: না বাবু!

: কেন বলো তো?

: এদিকে সরে আসুন, সব বলছি।

তার কথামতো সরে এলাম। শুনলাম সব। মাঝে হরির অসুখ করে। সংসারে পয়সার টান পড়ে। পাতু তার গয়না বড় দোকানে বিক্রী করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। গিলটির গয়না সোনার গয়না বলে সে চালাতে এসেছিলো। তারা পুলিশে দেয়। পুলিশ সব জেনে ছেড়ে দেয় অবশ্য।

কিন্তু এদিকে হরি লজ্জায় কণ্ঠনালিতে খুর চালিয়ে দেয়। মরেনি সে। কেবল কণ্ঠনালিতে একটা ফুটো থেকে গেছে। সেখান দিয়েই সব বাতাস বেরিয়ে যায়। বাঁশী আর বাজে না।

সব শুনে মুখ তুলে তাকাই। হরি নেই! আমায় দেখে লজ্জায় পালিয়েছে। তবু আমি দেখতে পাই, তার চোখ দুটি জলে ভরা। এ-ও কি গিলটি-করা জল? আর শুনতে পাই তার বাঁশী। বাঁশী তার আজও বাজে: বাঁশী কেন রাধা রাধা বলে? সে বাঁশী বাজে তার দীর্ঘশ্বাসে।

শ্রীবারি দেবী

বাড়ীর পিছনে ছিল একটি মুসলমান-বস্তি।

ঐ বস্তি আর আমাদের বাড়ীর মাঝে একটি সু-উচ্চ প্রাচীর সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল, যেন একটা উদ্ধত প্রহরী মাঝে দাঁড়িয়ে থেকে ঐশ্বর্য্য, আভিজাত্য আর অভাব-দৈন্যকে পৃথক্ করে রেখেছে!

এই উভয় জগতের অধিবাসীরা প্রতিবেশী হলেও, পরিচয়ের গণ্ডি পেরিয়ে, পরিবেশ জমাবার আগ্রহ কারুর মনে জাগে না। অজানাকে জানার বাসনা যখন জাগে মানব-মনের অতলে, তখন সে সকল বাধা-নিষেধের গণ্ডিকে উপেক্ষা করে চালায় তার দুঃসাহসিক অভিযান।

আমার মনে একদিন এলো সেই অজানাকে আবিষ্কার করার তাগিদ।

প্রাচীরের ও-পাশের বাসিন্দাদের সম্বন্ধে প্রবল কৌতূহল জাগতো মনে।

কেমন ধারা ওদের জীবনযাত্রা? গৃহ-পরিবেশ বা কি রকম? ওদের সাথে আলাপ করার উপায় মনে মনে অনুসন্ধান করছি।

উপায় হোল। সেই প্রাচীরের ঠিক পাশেই আমাদের বাগানে একটা লোহার ঘোরানো সিঁড়ি ছিল, ঝাড়ুদারের ওঠা-নামার জন্য। বেশ নির্জ্জন জায়গাটি, বাড়ীর কারুর নজরে পড়ে না। নিঃশব্দ দুপুর বেলায় সেই সিঁড়ির ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে, কয়েক দিনের ভেতরই ওদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেললাম।

দুটি মুসলমান-বৌ। আমারই সমবয়সী।

ওরা তো ভারি খুশি! আমার জন্য প্রতিদিন ওরা সাগ্রহে অপেক্ষা করতো ওদের ছোট্ট মাটির উঠোনে, মধ্যাহ্নের ছায়ায় ঘেরা নিমগাছটির তলায়।

কি রান্না হোল? নতুন কি সেলাই শেখা হোল? এই সব মামুলী কথাগুলো যেন তখন বর্ণ-ধ্বনিময় হয়ে উঠতো! ওদের বাপের বাড়ী ছিল এক জনের পূর্ববঙ্গে নোয়াখালীতে, অপর জনের চাটগাঁয়ে।

ওরা আমাকে বলে,—'তোমাকে কি বলে ডাকি ভাই? তুমি আমাদের চাঁদ বিবি। ঐ আসমান থেকে আমাদের সাথে মিতালী কর কি-না?'

—'সেই ভালো। তোমরা তাহলে আমার চকোর বন্ধু।' আমি হেসে জবাব দিই।

আমার চকোর বন্ধুরা মাঝে মাঝে ওদের পিতৃগৃহ থেকে আসা খাটি ঘি, কলার ছড়া, মধু, কাসুন্দি, আরো কত কি আমাকে উপহার দিতো। সে এক অভিনব প্রণালীতে! একটি বাঁশের লগির মাথায় উপহার বেঁধে ওরা তুলে ধরতো আমার দিকে;— আমি খুলে নিয়ে বলি,—'চকোর বন্ধুরা, কাল এটা আমার একবার দরকার লাগবে!'

ওরা ব্যাপার অনুমান করে ব্যস্ত ভাবে বলে,—'না, না, চাঁদ বিবি! তোমাকে কিছু দিতে হবে না! এ-সব যে আমাদের বাপের দেশ থেকে এসেছিল।'

'আমারো ভাই বাপের বাড়ী নামে একটা জায়গা আছে, আর সেখান থেকে মাঝে মাঝে কিছু আসে!'

ওরা হাসতে থাকে—

পরদিন সন্দেশ বা কিছু পুডিং আর চপ, যখন যা যোগাড় হতো, ওদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে মনে হত যেন কোনো রাজ্য জয় করে এলাম।

সে দিন চকোর বন্ধুরা বললো—'জানো চাঁদ বিবি! ঐ বড় টালি-দেওয়া ঘরখানাতে ভারি খুপসুরৎ একটা বিবি এসেছে, সঙ্গে আছে ওর খসম আর একটা ছোট্ট লেড়কি,—আসমানের চাঁদের মত! কিন্তু কারুর সাথে কথা বলে না, বড় দেমাক!'

আমাদের ভাঁড়ার-ঘরের পাশেই প্রাচীর। তার ওদিকে ছোট্ট একটু খোলা জায়গার ওপর টালি-ছাওয়া ঘরখানি, বস্তির চেয়ে একটু পৃথক্ ভাব।

যেন সিনেমা-হলের দশ আনা, ছ' আনা সিটের পার্থক্য।

জানলায় দাঁড়িয়ে উঁকি-ঝুঁকি মেরে নতুন মানুষদের দেখবার চেষ্টা করি। কিন্তু ওদের জানলা প্রায় সারা দিনই বন্ধ থাকে। কখনও সন্ধ্যার সময়, অস্পষ্ট চাঁদের আলোতে দেখেছি খোলা জমিটাতে একখানি খাটিয়া পেতে বসে একজন বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় যুবক। পরনে তার শেরোয়ানী আর চোস্ত। ঝাঁকড়া চুল, লম্বা জুলপি। টকটকে ফর্সা রং, সুরমা-পরা ধারালো চোখ দুটি তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত। উন্নত নাসার সঙ্গে পাতলা দুটি ঠোঁট মুখের সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুলেছে, কোনো সুদক্ষ গ্রীক ভাস্করের নিপুণ হাতের খোদাই-করা একখানি শ্বেত-মর্ম্মর এ্যাপোলোর মূর্ত্তির মত।

কোন্ দেশের লোক, দেখলে বোঝা যায় না, তবে ওর চেহারার মধ্যে মোগল যুগের ছবির, রাজা-বাদশাদের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। ওর পায়ের কাছে খেলা করে একটি পরীর বাচ্চার মত মেয়ে; আধ-আধ কথা বলে উর্দ্দু ভাষায়।

একদিন দুপুর বেলায়, চকোরদের আসরে যোগদান বন্ধ রেখে ভাঁড়ারঘরের জানলাটা খুলে দাঁড়ালাম। সবিস্ময়ে দেখি, টালির ঘরের জানলাটা খোলা। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছে একটি অপরূপ রূপসী মেয়ে। গাঢ় সবুজ রং সিল্কের শালোয়ার ও পাঞ্জাবী পরা; আকাশী রং-এর পাতলা ওড়নার ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে লম্বা বেণী দুলছে পিঠে, তাতে জরির পেঁচ দেওয়া! কানে দুটি পান্নার চৌদানী; সিঁথিতে মুক্তোর সিঁথি। গোলাপী তার গাল দুটো, রক্তিম ঠোঁট দুটি ব্লাকপ্রিন্স গোলাপের পাপড়ীর মত। আর সুরমা-টানা ঐ চোখকেই বুঝি হরিণ-নয়ন বলে! মুগ্ধবিস্ময়ে অপলক দৃষ্টি মেলে চেয়ে ছিলাম ওর দিকে।

হঠাৎ সে চোখ তুলে চাইল আমা'র দিকে। মুখে যেন ফুটে উঠলো একটা ভয়ার্ত্ত ভাব! চকিতা হরিণীর মত দৃষ্টি হেনে সে
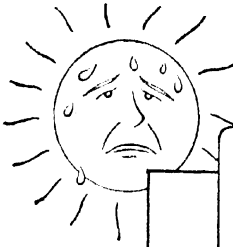
আবার গরম প'ড়লো—
গা বড্ডবেশী চটচটে আর নোংরা বোধ হ'চ্ছে কি?
ময়লার বীজাণু থেকে প্রতিদিনই আপনার অসুখের সম্ভাবনা আছে
লাইফবয় মেখে এই সব বীজাণু ধুয়ে ফেলে প্রতিদিন নিজেকে রক্ষা করুন
লাইফবয়ের "রক্ষাকারী ফেনা" আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখে
লাইফবয় সাবান
প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে
LIFEBUOY SOAP
ভারতে প্রস্তুত
L. 247-X 52 BQ
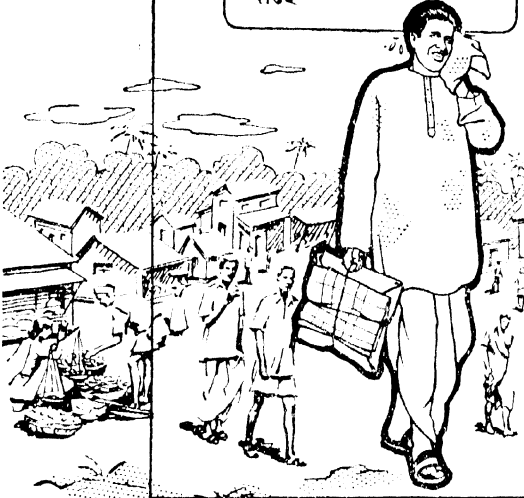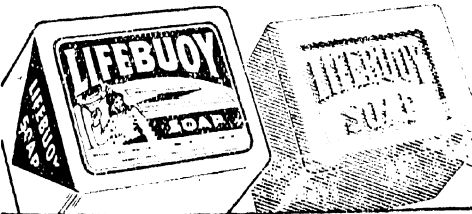
চট্ করে সরে গেল সেখান থেকে,—একখানি মোমে-গড়া হাত বাড়িয়ে বন্ধ করে দিলে জানলাটা।

ভারি অবাক্ লাগলো ; পুরুষ মানুষ নই তো, তবে ওর আমাকে দেখে এত ভীতি-সঙ্কোচের কি কারণ ঘটলো ?

……পরদিন—সিঁড়ির ওপর আমাদের চাঁদ ও চকোরদের দৃষ্টি-মিলন হোল! চকোররা ভারি খুশির সঙ্গে বলে—'জানো চাঁদ বিবি! কাল আমরা গিয়েছিলাম, ঐ ঘরে—ছোট খুকুর জন্যে লাল টিনের বাক্স আর পুতুল, বিবির জন্যে আমসত্ব নিয়ে গিয়েছিলাম। যেন বেহেস্তের হুরি, কোন্ মুলুকের মেয়ে জানি না, কিছু বলতে চায় না! ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে কথা বলে, তবে ওটা ওর নিজের ভাষা নয়, বোঝা যায়। সাজ-পোষাক দেখলে মনে হয় কোন্ আমীর-ওমরাহের হারেমের জেনানা! আমরা শুধোলাম,—কে আছে ভাই তোমার? মুলুক কোথা? ও বলে, মুলুক পাঞ্জাবে ছিল একদিন, এখন সেথায় কেউ নেই। শুধু ওর স্বামী আর মেয়ে আছে আর কোথাও কেউ নেই।' বড় তাজ্জব বনে গেলাম। এ-ও কি হয়? আপন জন কেউ নেই! ভারি গোলমেলে লাগলো ওদের ব্যাপারটা!

আমি হেসে জানাই,—'আমিও এক ঝলক ঝাঁকি দর্শন পেয়েছি ওদের।'

দিন কতক পরে দুপুর বেলায় ভাঁড়ার-ঘরের জানলাটা খুলে দেখি, সেই রূপসী মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে ওদের জানলার ধারে। আজ সে আমাকে দেখে সরে গেল না, বরং একটু হাসলো! ওর মুক্তোর সারির মত দাঁতগুলো রক্তপ্রবাল ঠোঁটের আড়ালে ঝিক্‌মিকিয়ে উঠলো।

আমিও হাসি ওর দিকে চেয়ে। আমার জানলার গরাদ ছিলো না, মাথা ঝুঁকিয়ে ওর সাথে কথা বলবার চেষ্টা করি।

মেয়েটি প্রথম কথা বলে পরিষ্কার ইংরাজি ভাষায়—তোমার নামটি কি ভাই?

আমাকেও জবাব দিতে হয় ইংরাজিতে,—বলি, 'নাম একটা আছে বৈ কি! তবে তোমার পাশের বাড়ীর বৌয়েরা আমাকে ডাকে চাঁদ বিবি বলে, আর আমি ওদের নাম দিয়েছি চকোর বন্ধু!'

মেয়েটি খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে। ভাঙা হিন্দিতে বলে, 'ভারি মজার নামগুলো তো আপনাদের,—'

আমি ওকে বলি,—'তোমার নামটি কি ভাই?'

সে বলে,—'আমাকেও দিন না একটা নতুন নাম। আর আমি কিন্তু আপনাকে চাঁদ বিবি বলেই ডাকবো।'

—'তোমার নাম দিলাম ভায়োলেট। ভায়োলেট ফুলের মতই তুমি মিষ্টি আর সুন্দর।'

ও হেসে বলে, 'লোভ হচ্ছে বুঝি?'

আমি একটু হতাশ ভাব ফুটিয়ে বলি,—'হায় রে! বেল পাক্‌লে কাকের কি?—এই বিজ্ঞানের যুগে, মেয়েদের যদি পুরুষ হবার কোনো ওষুধ আবিষ্কার হয়, তবে কিন্তু জানিয়ে রাখছি তোমাকে আমি চুরি করে নিয়ে পালাবো!'

হঠাৎ যেন ওর মুখখানি বিবর্ণ হয়ে যায়।

চঞ্চল স্বরে বলে,—'না ভাই! সে হবে'না। আমার মিঞা সাহেবকে ছেড়ে আমি বেহেস্তেও যেতে চাই না!'

ওর চোখের কোলে যেন জল চিক্‌মিক্ করে ওঠে।

আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। এ কি? রসিকতাও বোঝে না না কি?

কথা পালটে জিজ্ঞাসা করি—'তোমায় বুঝি উনি খু-উ-ব ভালোবাসেন?'

ওর চোখ দুটোতে খুশির আলো ঝলমলিয়ে ওঠে। মিষ্টি সুরে বলে, 'সে ভালোবাসার তুলনা নেই চাঁদ বিবি! সে প্রেম সাগরের মত গভীর, আকাশের মত অসীম।'

বড় ভালো লাগছিলো ওর কথাগুলো শুনতে। বলি,—'তোমার মেয়েকে দেখাও না ভাই!' সে ডাকলো মেয়েকে। একটি বছর দুয়েকের মেয়ে দৌড়ে এলো, যেন এক ঝলক চাঁদের আলো! ওর মা বলে,—'পরীবানু, সেলাম দাও!' পরীবানু তার ছোট্ট ফুলের মত একখানি হাত তুলে সেলামের ভঙ্গিতে কপালে ঠেকায়। আমিও নমস্কার করি, ওকে খুশি করবার জন্য। দেশ কোথায় আর জানতে চাইলাম না, কারণ আগেই জেনেছি সে কথা ও বলবে না।

এর পর থেকে চকোর বন্ধুদের সঙ্গে ঐ ভাঁড়ারঘরের জানলা দিয়েই গল্প জমাতাম। ওরা আসতো দুপুর বেলায় ভায়োলেটের ঘরে। আমিও যথাসময়ে জানলা খুলে গিয়ে দাঁড়াতাম। তার পর ইংরাজি, হিন্দি, উর্দ্দু, বাংলা সকল ভাষার মিশ্রিত ককটেল ভাষায় চলতো আমাদের আদান-প্রদান। ঐ সময়টায় কাক্কর আদমী ঘরে থাকতো না, অতএব সকলেই মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত খুশির হাওয়ায় উড়ে বেড়াতো নানা সুরের ঝঙ্কার তুলে।

…সেদিন শরতের মেঘমুক্ত আকাশ,—পূর্ণিমার চাঁদের পরশ লেগে নীলার মত জ্বলছিলো। শীতের আমেজ-লাগা উত্তুরে বাতাস সবে আনাগোনা সুরু করেছে। মনের গহন বনে যেন কোন্ উদাসী বাঁশির মরমীয়া সুর-মূর্চ্ছনা ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। যেন শুনতে পাই কোন্ অজানার মৃদু পদধ্বনি!

…রাত্রি প্রায় বারোটা।

অপূর্ব্ব কণ্ঠের গান যেন কোথা থেকে ভেসে আসছে! হাল্কা ঘুমের মাঝে যেন সে গান স্বপ্নলোকের ইন্দ্রজাল রচনা করতে লাগলো। ঘুম ভেঙ্গে যায়—উঠে মৃদু পদক্ষেপে পূবের জানলাটার সামনে দাঁড়ালাম। কিছু দূরে ভায়ালেটের ঘরে জ্বলছে বেগুনী আলো।

ঘরের কিছু অংশ দেখা যায়। ঘরের মেঝেয় উপবিষ্ট মিঞা সাহেব একটি তানপুরায় সুর দিয়ে মিঠে সুরে নিচু গলায় গাইছে গান, গানের সুর লক্ষ্ণৌ ঠুংরী!…

একটা অদম্য কৌতূহলের তীব্র আকর্ষণে গিয়ে দাঁড়াই ভাঁড়ার-ঘরের জানলায়। এবারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওদের ঘরের ভেতরটা। দামী গালচে পাতা, তিন-চারটি রকমারি গড়নের ফুলদানে রয়েছে রক্তবর্ণের গোলাপগুচ্ছ। সামনে একটি বেলোয়ারী কাচের জগ্ ও একটি রৌপ্যাধারে তরল পানীয় তাজা রক্তের মত টলমল করছে। এক পাশে জ্বলছে এক গুচ্ছ মহা সুগন্ধি ধূপ। ভায়োলেটের অঙ্গে সলমা-চুমকির কারুকার্য্য-খচিত গাঢ় নীল রং-এর কাঁচুলী ও পায়জামা, পাতলা আসমানী রং-এর ওড়নার চুমকির ফুলগুলো ঝক্‌মক্ করে জ্বলছিলো এক ঝাঁক জোনাকীর মত।

ভায়োলেট একটি ভেলভেটের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসেছিল; আর তার সামনে বসে গান গাইছিলো মিঞা সাহেব। যেন

মেঘদূতের যক্ষরাজ। একটা দামী আতরের গন্ধ, গোলাপ আর ধূপের গন্ধে মিশ্রিত হয়ে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ছে মস্তা সুগন্ধি ফোয়ারার মত।

ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছি না তো? সন্দেহ হোল। আমি কি কোনো গন্ধর্বরাজের প্রমোদ-কক্ষ দেখছি? না এটা মুসলমান বাদশাদের রংমহাল? অথবা ওমর খৈয়াম আর তার রূপসী প্রিয়ার প্রণয়-কুঞ্জ? ভালো করে চোখ মুছে দেখলাম, না, ঠিকই দেখছি! ঐ তো আমার ভায়োলেট, মেহেদীর ছোপ-লাগা চাঁপা রং-এর হাতখানি দিয়ে সিরাজি ঢেলে পূর্ণ করছে শূন্য পানপাত্রখানি।

গান শেষ হোল, চললো ওদের হাসি-গল্প, প্রণয়-গুঞ্জন। আমি অপূর্ব্ব রসসিক্ত মন নিয়ে ফিরে চললেম শয়নকক্ষে!

পরদিন দুপুরে। সহাস্যে ভায়োলেটকে বলি, 'কাল রাত্রে ভাই চুরি করে তোমাদের একটা গোপনীয় ব্যাপার দেখে ফেলেছি, রাগ না কর তো বলতে পারি।'

ভায়োলেট হেসে ওঠে,—বলে, 'জানি গো জানি—তোমার চোখে মিত্র সাহেবের গানের আমেজ লেগে চোখ দুটি ঢুলছিলো; তখন আমরা দু'জনেই দেখে নিয়েছি তোমাকে। এমন পূর্ণিমা রাতে চাঁদের দর্শন সামনা-সামনি পেয়ে আমরা ধন্য হয়ে গেলাম।'

অপ্রস্তুত হয়ে যাই ওর কথা শুনে। কোথায় ওকে চমকে দেব, না নিজেই বোকা বনে গেলাম চকোরদের সামনে। ভায়োলেট আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে হাসতে হাসতে বলে,—'ও ভাই চাঁদ বিবি! চাঁদমুখ অমন মেঘে ঢাকলো কেন? আমরা তোমার চৌর্য্যবৃত্তিটা পরম কৌতুকে উপভোগ করেছি; কোনো অভিযোগ নেই তার জন্য। দোহাই তোমার, এবারে কথা কও।'

কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বলি,—'তোমার মিত্র সাহেব যে ভালো গান জানেন সে কথা তো আমাদের আসরে পেশ করনি? হিজি-বিজি কত কথা হয় তো রোজ! আমাদের সব খবর তো জেনে নিয়েছো, আর নিজেদের মজাগুলো স্রেফ চেপে গেছ।'

আমার চকোর বন্ধুরা এবারে ভায়োলেটকে ঘিরে ফেললো। কেউ বেণী ধরে টান দেয়, পিঠে কিল বসায়, কেউ বা গাল দুটো টিপে লাল করে দিলে। আমার দিকে চেয়ে ওরা বলে, 'বন্ধুদের গোপন কথার অপবাদের সাজা দিচ্ছি ওকে।'

এবার ভায়োলেট মুখ তুলে বলে—'মাপ কি জিয়ে চাঁদ বিবি। জরিমানা দিচ্ছি।' একটু পরে চকোর বন্ধুরা বাঁশের লগিটা এনে জানলার সামনে তুলে ধরলো। এক টুকরো কাপড়ে বাঁধা কি একটা জিনিষ ছিল, খুলে নিলাম।

ন্যাকড়া খুলে দেখি,—সোনালী কাজ-করা চমৎকার একটি শিশি-ভরা আতর; গন্ধটা তার আগের রাত্রে পেয়েছি। এখনও মনের মধ্যে ভরপুর হয়ে আছে নেশা-লাগানো ওর বনেদি গন্ধটা। আমি ব্যস্ত হয়ে বলি—'এ কি ভাই? অমন দামী জিনিষটা দিলে কেন? এ আমি নিতে পারবো না!'

ভায়োলেট কেমন করুণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। তার পর নিশ্বাস ফেলে বলে—'বন্ধুর উপহার গ্রহণ করতে অত সঙ্কোচ কেন? যখন

আমি তোমাদের কাছে থাকবো না, তখন ওর খুসবাই মনে করিয়ে দেবে তোমার ভায়োলেটকে।'

শিশিটার গায়ে লেখা ছিল 'ভায়োলেট।' অগত্যা নিতেই হোল। বললাম, 'তোমাকে মনে রাখবার জন্য গন্ধের প্রয়োজন ছিল না, তোমাকে যে ভোলা যায় না বিবি সাহেবা!' চকোরদের হাতেও ঐ রকমের শিশি ভায়োলেটের প্রীতি-উপহার।

পরদিন আমিও দিলাম ভায়োলেটকে এক শিশি চেরি সেণ্ট ও দুখানি সিল্কের রুমাল। বললাম—'দু'জনে ব্যবহার করবার সময় তোমাদের চাঁদ বিবিকে মনে কোরো।'

সে দিন ভায়োলেটকে জিজ্ঞাসা করি—'আচ্ছা বন্ধু! তোমরা কোথাও বেড়াতে যাও না?' সে বলে, 'না ভাই! কোথাও যাই না—আমাদের মহব্বত দিয়ে এই মাটির ঘরে আমরা এক নয়া বেহেস্তখানা বানিয়েছি। প্রেম-সিরাজি পিয়ে দিল আমাদের ভরপুর হয়ে আছে। এ বেহেস্তখানা ফেলে এক কদমও কোথাও যেতে দিল্ চায় না চাঁদ বিবি!'

ওর কথাগুলো যেন আমার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের শিহরণ জাগিয়ে দিলো, সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করি পুলক-রোমাঞ্চ। সে মহাভাবকে রূপ দেবার ভাষা খুঁজে পাইনি সেদিন।

* * * *

কয়েক দিন কেটে গেছে!···গভীর রাত্রে কার চাপা কান্নার আওয়াজে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। কে কাঁদে? উঠে জানলার কাছে যাই। মনে হোল ভায়োলেটের ঘর থেকে ভেসে আসছে চাপা কান্নার সুর। কি হোল? মনটা যেন কোন্ অজানা আশঙ্কায় শিউরে ওঠে। ভাঁড়ারঘরের জানলায় গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি···বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে ভায়োলেট। মিঞা সাহেব ঘরে নেই বলে মনে হোল। আমি যে কি করি কিছু স্থির করতে পারলাম না। ওকে ডাকতে সাহস হোল না।

মাথার ওপর দিয়ে একটা পেঁচা চ্যাঁ-চ্যাঁ করে কর্কশ স্বরে ডেকে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল। বিষাদ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। অজানা ভীতি ও অনিদ্রার মাঝে রাত্রি শেষ হোল! ভোরের আবছা আলোয় সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালাম, যদি ভায়োলেটের কান্নার বিবরণ কিছু জানতে পারি।

চকোর বন্ধুরা তখন বারোয়ারী কলতলায় বসে বাসন মাজছিলো, ওদের ডেকে বললাম কাল রাতের কথা। ওরা বলে,—'মিঞা সাহেব কাল ঘরে ফেরেনি, সেজন্য ও সারা রাত কেঁদেছে।'

মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোনো খোঁজ-খবর করা হয়েছে?'

ওরা বলে,—'তার সাথে তো কারুর চেনা-পরিচয় ছিলো না। একবার দুপুরে বাইরে যেতো, সন্ধ্যায় ফিরে এসে ঘরেই থাকতো। কারুর সাথে বাতচিৎ করতো না, তবে নামটা শুনেছি মুকুল মিঞা। কিন্তু কোথায় যায়, কি কাম করে, কারুর তো জানা নেই। কাল রাত্রে ভায়োলেট বিবি বলছিলো যে, সে শেয়ারের বাজারে টাকা লেন্-দেন্ করতো। আজ আমাদের পুরুষ মানুষরা খোঁজ করে দেখবে।'

ওদের চোখে-মুখেও যেন ব্যথার ছোপ লেগেছে। বুক-ভরা ব্যথা নিয়ে ফিরে এলাম। কোনো কাজে মন দিতে পারছি না।··· দুপুরে ভাঁড়ারঘরের জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

ভায়োলেট উদাস শূন্য দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়েছিল জানলার গরাদ ধরে। তার মুখ দেখে চমকে উঠলাম।

অশ্রুসিক্ত, স্ফীত, হরিণ-নয়ন দুটি রক্ত-পলাশ বর্ণ ধারণ করেছে। সর্ব্বহারার বিহ্বল ভাব ছড়িয়ে পড়েছে তার চোখে-মুখে। আমি মৃদু স্বরে ডাকলাম—'ভায়োলেট!' সে মুখ তুলে চাইলো আমার দিকে। কি বিষাদপূর্ণ হৃদয়-ভেদী চাউনি!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'মিঞা সাহেবের কোনোও খবর পেয়েছ ভাই?' সে মাথা নাড়লো,···কি বলতে গেল,···বলতে পারলো না। শুধু থর্ থর্ করে ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠলো, আর দুটি গাল বেয়ে অজস্র ধারায় ঝরে পড়তে লাগলো উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা। আমারও চোখের জল বাধা মানলো না। নিজের হৃদয়াবেগকে গোপন করার জন্য ছুটে চলে গেলাম সেখান থেকে। সন্ধ্যার সময় আবার সিঁড়ির ধারে গিয়ে ডাকলাম চকোর বন্ধুদের। ওরা এলো—ফিস্-ফিস্ করে আমাকে বললো, 'কে একটা লোক খবর দিয়ে গেছে, কয়েকটি কাগজ-পত্রও দিয়ে গেছে। কাল বেলা পাঁচটার সময় একটা মরদ গাড়ী চাপা পড়ে ভীষণ জখম হয়। হাসপাতালে তাকে দেওয়া হয়েছিলো, সে কাল রাত্রেই সেখানে মারা গেছে। আজ সারা দিন লাস ছিলো, কেউ সনাক্ত করতে যায়নি। সন্ধ্যা বেলায় সে লাস জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার পকেটে এই কাগজগুলো পাওয়া যায় আর একটি বড় কোম্পানীর কাছে মাল নেওয়ার একটি রসিদ ছিলো, সেই সূত্র ধরে ওরা সন্ধান নিয়ে জানতে পারে যে এই বস্তিতে সে বাস করতো, এর বেশী কেউ কিছু বলতে পারেনি।'

কাগজগুলো দেখে ভায়োলেট জানতে পারলো তার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, তার জীবনের আলো নিবে গেছে।

ছুটে চলে গেলাম ভাঁড়ারঘরের জানলায়। ঐ যে বসে আছে মূর্ত্তিমতী বিষাদ-প্রতিমা! বেণী-মুক্ত রুক্ষ কোঁকড়ানো চুলগুলো সাপের মত এঁকে-বেঁকে মুখের চার পাশে ও পিঠের ওপর ঝুলছে। পরীবানু কই? তাকে বোধ হয় চকোর বন্ধুরা নিয়ে গেছে খাওয়াবার জন্য। ইচ্ছে করছিলো যাই, ছুটে যাই ওর কাছে। নীড়-ভাঙ্গা, সাথী-হারা, ব্যথাহত কপোতীকে সযত্নে টেনে নিই বুকে। আমার সকল দরদ ও ভালবাসার প্রলেপ মাখিয়ে দিই ওর নিদারুণ শোকানল-দগ্ধ হৃদয়ে।

কিন্তু হায়! অন্তঃপুর-রূপ খাঁচার বন্দী বিহগী আমি, কেমন করে যাব ওর কাছে? চকোর বন্ধুরা মাঝে মাঝে আসছে, ওকে ঘিরে নীরবে বসে থাকছে। কিছু বলবার নেই, করবার নেই। আমিও সেই নীরব শোকের হোমানলে নীরবে দিই সমবেদনার আহুতি।

কি ভয়াবহ নিঃশব্দতা! যেন গৌরী বসেছেন পঞ্চতপা সাধনের যোগাসনে। তাঁর চারি দিকে শোকের অনল জ্বলছে ধূ-ধূ করে। ভাষা আজ স্তব্ধ হয়ে প্রণতি জানায়, ধ্যানগম্ভীর মৌন রূপের পায়ে। চোখের জলে আর নানা দুঃস্বপ্নের মাঝে রাত কেটে গেল।

ভোর বেলায় কিসের গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল, উঠে জানলার ধারে গিয়ে দেখি,—ভায়োলেটের ঘরের সামনে ভীষণ ভীড় জমেছে। সকলের চোখে-মুখে উত্তেজনার ভাব। বুকটা দুরু-দুরু করে উঠলো। ছুটে গেলাম ঘোরানো সিঁড়ির ধারে।

কোথায় চকোর বন্ধুরা? সকলে চলে গেছে ভায়োলেটের ঘরে। খানিকটা পরেই দেখি, অনেকগুলো পুলিশ ও সার্জেন্ট এলো। কাউকে দেখতে পাই না, কি করে খবর পাই?

মিনিট পাঁচেক অধীর প্রতীক্ষার পর দেখা গেল,—চকোর বন্ধুরা চোখ মুছতে মুছতে এই দিকে আসছে। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম ওদের। ওরা কাঁদতে কাঁদতে বললে—'ভায়োলেট বিবি মরে গেছে জহর খেয়ে। কাল রাত্রে যখন ওর মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আমরা ওর পাশে তাকে শুইয়ে দিয়ে এসেছি। বেশী রাত্রে পরীবানুর কান্নায় আমাদের ঘুম ভেঙে যায়···ছুটে যাই। দরজা খোলাই ছিলো, ভেতরে গিয়ে দেখি, ভায়োলেট বিবি, মেঝেয় পড়ে আছে। পাশে একটা কাগজ পড়েছিলো, তাতে কি লিখে গেছে।

দারুণ দুঃসংবাদ সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্তরে কেন পাচ্ছি পরম প্রশান্তির স্নিগ্ধ পরশ?

আঃ! ভায়োলেট মরেছে? কে বললো? মৃত্যুর সিঁড়ি বেয়ে সে ঐ যে উঠে যাচ্ছে প্রেমের অমৃতলোকে, তার প্রিয়-সন্নিধানে।

আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন বড় ডাক্তার এক জন; তাঁর কাছে গেলাম। কাতর অনুনয় জানাই একবার ঘটনাস্থলে যাবার জন্য। আর ভায়োলেটের ফুলের মত দেহটা ময়না তদন্তে যেন ছিন্ন-ভিন্ন না করা হয়; তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে ওঁকে অনুরোধ করি। উনি সেখানে গেলেন···বিশেষ কিছু জানবার ছিলো না। পাশেই চিঠি পড়েছিলো, তাতে সে লিখে গেছে, লক্ষ্ণৌ সহরের একটি ঠিকানা। অনুরোধ এই যে···ওখানে খবর দিলে, ওরা এসে তার মেয়েকে নিয়ে যাবে। আর লিখেছে···স্বামীর সঙ্গে পরলোকে মিলিত হবার জন্য আমি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করলাম। আমার হাতের বড় পান্নার আংটির ভেতর জহর সঞ্চিত করা ছিল।

ডাক্তার বাবুর আর প্রতিবাসীদের চেষ্টায় দেহ ছাড়া পেলো। পুলিশরা রিপোর্ট লিখে নিয়ে চলে গেল।

শবদেহ কবরখানায় নিয়ে যাবার আগে আমাকে দেখাবার জন্য ওরা সকলে পাশের খোলা জমিটাতে একবার নিয়ে এলো। চকোর বন্ধুরা তাকে সাজিয়ে দিয়েছে; জরির কাজ-করা শুভ্র শাটিনের পোষাকে। চাঁদের আলোয় ঝলমল করছিলো ওর পোষাকের সলমা চুমকিগুলো।

পলকহীন স্থির দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখলাম···আমার ভায়োলেটের বর্ণ আর গোলাপী নেই। জহরসুধা পান করে সে আজ সত্যই ভায়োলেট বর্ণ ধারণ করেছে। ওর ঘরে যতগুলো সেণ্ট আর আতর গোলাপ ছিলো, চকোর বন্ধুরা উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে তার সর্বাঙ্গে। মিষ্টি, উগ্র নানা জাতের দামী গন্ধ মিশ্রিত হয়ে একটা মহা সৌরভের ভারে বায়ুমণ্ডল ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। শেষ বিদায় নিয়ে কোন্ অজানা রাজ্যের রূপসী কন্যা চলে গেলেন, এক অখ্যাত কবরখানার মাটির তলায়! ওদিকটায় আর যেতে পারি না। চাঁদ-চকোরের মিলন-আসর ভেঙে গেছে।

কয়েক দিন পরে, অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়িয়েছিলাম ভাঁড়ার-ঘরের জানলায়। মিঞা সাহেবের শূন্য খাটিয়াখানার ওপর ম্লান চাঁদের আলো লুটোপুটি খাচ্ছিলো। হঠাৎ দেখি, একজন দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধ মুসলমান পরীবানুর হাতখানা ধরে এসে বসলেন সেই খাটিয়ায়। মূল্যবান শুভ্র শেরোয়ানী আর চোস্ত পরনে তাঁর। শ্বেত শ্মশ্রুগুচ্ছ আবক্ষ বিলম্বিত। ইহুদিদের মত শুভ্র গাত্রবর্ণ তাঁর। মুখের ভাব ভায়োলেটকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কে এই সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ? তিনি পরীবানুকে কোলে তুলে নিয়ে তার চিবুকটি ধরে ভালো করে দেখলেন তার ফুলের মত মুখখানি। তার পর তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ছোট বালকের মত কাঁদতে লাগলেন। পরীবানুও তাঁকে জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদছিলো।

কি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! অন্তরের অবরুদ্ধ বেদনার বাষ্পে দৃষ্টি আমার ঝাপসা হয়ে এলো। কিছুক্ষণ পরে পরীবানুর হাতখানি ধরে তিনি ধীর পদক্ষেপে চলে গেলেন ভায়োলেটের ঘরে। ভায়োলেটের লেখা লক্ষ্ণৌএর ঠিকানায় পত্র দেওয়া হয়েছিলো; মনে হোল ইনিই বোধ হয় সেই চিঠি পেয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছেন।

পরদিন একবার সিঁড়ির ধারে গেলাম খবরটা জানবার জন্য। চকোর বন্ধুরা বললে, গত কাল একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসেছিলেন লক্ষ্ণৌ থেকে। আমরা ভায়োলেট বিবির সব-কিছু জিনিষ আর পরীবানুকে দিয়ে দিয়েছি তাঁর জিম্মায়। আজ ভোরবেলায় পরীবানুকে নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন ভায়োলেট-বিবির কবরখানায়।

আমাদের আদমীরা গিয়েছিলো সঙ্গে। এক রাশ ফুল নিয়ে গিয়ে তার কবরখানা সাজিয়ে দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অনেক কেঁদেছেন। ফিরে আসবার পর সকালে খাবার জন্যে কত অনুরোধ করলাম, এক বিন্দু জলও মুখে দিলেন না। ভায়োলেট বিবির পোষাক-আষাক জিনিষপত্তর সব আমাদের দিয়ে গেছেন। খালি দামী গয়না ক'খানা নিয়ে গেলেন। আর খান কতক মোহর দিয়ে গেছেন, ভায়োলেটের কবরখানা সাদা পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দেবার জন্য। উনি আবার আসবেন ভায়োলেট বিবির পাথরের মূর্ত্তি খোদাই করিয়ে নিয়ে, নিজে হাতে বসিয়ে যাবেন তার কবরখানায়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সন্ধ্যাবেলায়

রবে না দিন চিরদিন, সুদিন কুদিন, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।
আমার আমার, সব ফক্কিকার, কেবল তোমার, নামটি রবে;
হবে সব লীলা সাঙ্গ, সোনার অঙ্গ, ধূলায় গড়াগড়ি যাবে।
সংসারের মিছে বাজি, ভোজের বাজি, সব কারসাজি ফুরাইবে;
মরি এক পলকে, তিন ঝলকে, সকল আশা মিটে যাবে।

—মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)

সঙ্গীত সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র

"সঙ্গীত কাহাকে বলে? সকলেই জানেন যে, বিশিষ্ট শব্দই সঙ্গীত। কিন্তু স্বর কি? কোন বস্তুতে অপর বস্তুর আঘাত হইলে শব্দ জন্মে এবং আহত পদার্থের পরমাণুমধ্যে কম্পন জন্মে। সেই কম্পনে তাহার চারিপার্শ্বস্থ বায়ুও কম্পিত হয়। যেমন সরোবরমধ্যে জলের উপরি ইষ্টকখণ্ড নিক্ষিপ্ত করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা সমুদ্ভূত হইয়া চারি দিকে মণ্ডলাকারে ধাবিত হয়, সেইরূপ কম্পিত বায়ুর তরঙ্গ চারি দিকে ধাবিত হইতে থাকে। সেই সকল তরঙ্গ কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কর্ণমধ্যে একখানি সূক্ষ্ম চর্ম্ম আছে। ঐ সকল বায়বীয় তরঙ্গপরম্পরা সেই চর্ম্মোপরি প্রহত হয়; পরে তৎসংলগ্ন অস্থি প্রভৃতি দ্বারা শ্রবণস্নায়ুতে নীত হইয়া মস্তিষ্কমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহাতে আমরা শব্দানুভব করি।

অতএব বায়ুর প্রকম্প শব্দজ্ঞানের মুখ্য কারণ। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, যে শব্দে প্রতি সেকেণ্ডে ৪৮,০০০ বার বায়ুর প্রকম্প হয়, তাহা আমরা শুনিতে পাই, তাহার অধিক হইলে শুনিতে পাই না। মস্যুর সাবতি অবধারিত করিয়াছেন যে, প্রতি সেকেণ্ডে ১৪ বারের ন্যূনসংখ্যক প্রকম্প যে শব্দ, সে শব্দ আমরা শুনিতে পাই না। এই প্রকম্পের সমান মাত্রা স্বরের কারণ। দুইটি প্রকম্পের মধ্যে যে সময় গত হয়, তাহা যদি সকল বারে সমান থাকে, তাহা হইলেই স্বর জন্মে। গীতে তাল যেরূপ মাত্রার সমতা মাত্র—শব্দপ্রকম্পে সেইরূপ থাকিলে স্বর জন্মে। যে শব্দে সেই সমতা নাই, তাহা স্বররূপে পরিণত হয় না। সে শব্দ "বেস্থর" অর্থাৎ গণ্ডগোল মাত্র। তালই সঙ্গীতের সার।"

বাঙলা দেশে অর্কেষ্ট্রার প্রথম প্রচলন

"জাতীয় নাট্যশালার সঙ্গে জাতীয় একতান-বাদনও সংঘটিত হওয়া কর্ত্তব্য, মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের এইরূপ প্রস্তাবে এবং সঙ্গীতাচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রভৃতির যত্নে ইংরাজী রীতির অনুকরণে, একতান-বাদন-সম্প্রদায় গঠিত হইল। ইহাই বঙ্গদেশের প্রথম একতান-বাদন-সম্প্রদায়।"

—মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, যোগীন্দ্রনাথ বসু

রেকর্ড পরিচয়

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

সতীনাথ মুখোপাধ্যায় N 82618 "যদি আসে কভু" ও "রাধিকা বিহনে কাঁদে" (আধুনিক): শ্যামল মিত্র N 82619 "মহুল ফুলে জমেছে মৌ" ও "এমন দিন আসতে পারে" (আধুনিক): সনৎ সিংহ N 82620 "অহল্যা কন্যার" ও "বেহুলা বেহুলা বৌ" (আধুনিক): শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ N 82621 "আমার সকল কাঁটা ধন্য করে" ও "তোমার ঝর্ণা তলার" (রবীন্দ্র-সংগীত)।

কলম্বিয়া

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য GE 24728 "কথা দিলাম চেয়ে নেব" ও "চিরদিন তুমি" (আধুনিক): গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় GE 24729 "বল মধুপের সনে" ও "আজ বসন্ত এলো" (আধুনিক): কুমারী গায়ত্রী বসু GE 24730 "মেল নয়ন মেল রে" ও "ঐ মেঘে মেঘে" (আধুনিক): পান্নালাল ভট্টাচার্য GE 24731 "তুই কার উপরে সদয়" ও "শ্যামের বাঁশী আর শ্যামার অসি" (ধর্মমূলক)।

কলকাতা এবং তার আশ-পাশের শহরতলীতে সঙ্গীত-সম্মেলনের অনুষ্ঠান পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমানে সংখ্যায় অনেক বর্দ্ধিত হয়েছে। কিছু কাল পূর্ব্বেও বাঙলা ও বাঙালী যেন গান গাইতে ভুলে গিয়েছিল। বর্ত্তমানে বাঙালীর এই সঙ্গীতপ্রিয়তা কেন যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হচ্ছে তার কারণ দু'-এক কথায় ব্যক্ত করা যায় না। কণ্ঠ এবং যন্ত্রসঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার হওয়ায় অনেকেই হয়তো খুশী হবেন। গত এক মাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাঙ্গীতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে সদারং সঙ্গীত-সংসদের প্রতিষ্ঠা-উৎসবের নামোল্লেখ প্রথমেই করতে হয়। সদারঙের উদ্দেশ্য, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচার এবং দুঃস্থ, গুণী

সঙ্গীত-শিল্পীদের সাধ্যমত সাহায্যদান। এই প্রসঙ্গে এক সাংবাদিক-সম্মেলনে সংসদের স্থায়ী সভাপতি শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সংসদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "সঙ্গীত শিক্ষায় ইচ্ছুক দরিদ্র ছোট ছেলেমেয়েদের বড় ওস্তাদের কাছে শিক্ষালাভের জন্য সাহায্য করার চেষ্টা সংসদের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত।" বিগত ১৩ই জুন সংসদ আশুতোষ কলেজ-হলে প্রথম জলসার অনুষ্ঠান করে। কুমারী অনুরাধা দাশের কথক নাচের সঙ্গে আরম্ভ এবং চিন্ময় লাহিড়ীর গানে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। রাধিকামোহন মৈত্রের স্বরোদ সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ দান করে। সকলের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন ওস্তাদ কেরামৎউল্লা খাঁন। গুণী সঙ্গীতজ্ঞদের সাহায্য-পরিকল্পনানুসারে প্রথম কিস্তীতে সংসদ ৯১ বৎসর বয়স্ক শ্রীপ্রমথ-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১০১৲ টাকা পুরস্কার দান করে। সংসদের কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে আছেন ওস্তাদ দবীর খান; এইচ এস কাওয়াসজী মেটা, জগদীশচন্দ্র দাশগুপ্ত; এস, জে সভাত; কানাইলাল সরকার এবং আরও অনেকে। সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদে আছেন কালিদাস সান্যাল ও প্রভাতপ্রসূন মোদক। এই সংসদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তানসেন সঙ্গীত সমাজের আয়ুষ্কাল ফুরিয়েছে কিনা আমরা বলতে পারি না। বিগত ৫ই আষাঢ় পূর্ণিমা সম্মেলন বাণীমন্দির সাহিত্যসভার উদ্যোগে 'জাতিগঠনে সঙ্গীতের প্রভাব' এই আলোচনার ব্যবস্থা করেন। অংশ গ্রহণ করেন আচার্য্য শ্রীমন্মথনাথ বসু, প্রাণতোষ ঘটক ও সুকোমলকান্তি ঘোষ। সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল, অমর ভট্টাচার্য্য, ধীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও রাজীবলোচন দে। বিগত ১লা আষাঢ় সাহিত্যতীর্থের প্রথম অধিবেশনে বর্ষাসঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী বর্ণা হাজরা, বাণী দাশগুপ্তা, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সবিতা গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। সভাপতি ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। উপস্থিত জনগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রাণতোষ ঘটক। কলকাতার কোন একটি সাপ্তাহিকে শ্রী[illegible]কুমার দাশগুপ্ত 'খ্যাতি-সঙ্গীত' বিষয়ে এক নিবন্ধে বলছেন যে, "খ্যাতি-সঙ্গীত কথাটি অপ্রচলিত হইলেও এক শ্রেণীর গানের নাম হিসাবে ইহার প্রয়োগ সার্থক। বিশেষ উপলক্ষে রচিত কতগুলি গান এক বৃহৎ সঙ্গীত-সংগ্রহে খ্যাতি-সঙ্গীত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই গানের বিষয় কোন স্মরণীয় ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনা; ইংরাজীতে এই জাতীয় গান অকেশনাল সং বলিয়া পরিচিত।" কলকাতা জোড়াসাঁকোর মহর্ষি-ভবনে গীতবিতানের পক্ষ থেকে ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর একাশী বছর পূর্ত্তি উপলক্ষে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ও মনোজ্ঞ হয়। গীতবিতানের ছাত্র-ছাত্রীগণ সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীত পরিবেশন করেন। একটি দীপাধার, চায়ের সরঞ্জাম ও বস্ত্রমণ্ডিত রেখাপত্রগুচ্ছ উপহার লওয়ার পর ইন্দিরা দেবী একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। সভায় ঠাকুর-পরিবারের বহু পুরুষ ও মহিলা, প্রতিমা ঠাকুর, লেডী প্রতিমা মিত্র, অমল হোম, প্রাণতোষ ঘটক, সুকোমলকান্তি ঘোষ এবং আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 'দক্ষিণী'র সঙ্গীত বিভাগ থেকে সাঙ্গীতিক গবেষণার জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকার তিনটি বৃত্তি দেওয়া হবে বলে স্থিরীকৃত হয়েছে। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ লোক ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত এই হবে গবেষণাকার্য্যের বিষয়বস্তু এবং এই সকল গবেষণা দক্ষিণীই পুস্তকাকারে প্রকাশ করবেন।

যদু ভট্ট

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গলার সঙ্গীত-ক্ষেত্রে যাঁরা বরণীয় ও স্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে যদু ভট্ট অন্যতম। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার এক প্রাচীন রাজ্য বিষ্ণুপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাঙ্গলার বাহিরে তিনি যদু ভট্ট নামে খ্যাত ছিলেন কিন্তু তাঁর আসল নাম যদুনাথ ভট্টাচার্য্য। পিতা মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের তিনি একমাত্র সন্তান। তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা সংস্কৃত-পণ্ডিত ছিলেন এবং অধ্যাপনা করতেন। যদুনাথ কিন্তু বংশের ধারার বাহক হলেন না। বীণা-পুস্তকধারিণী বিদ্যাদায়িনীর নিকট তিনি চাইলেন বীণা। তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছিল। পিতার ইচ্ছায় এবং স্বীয় অনিচ্ছায় পড়াশুনা আরম্ভ করলেন কিন্তু সুরের সম্মোহিনী শক্তি তাঁর চিত্তকে হরণ করল। ওস্তাদী সঙ্গীত বা যাত্রার আসরের কোন ভাল গান শুনবা মাত্র তিনি আয়ত্ত করে ফেলতেন এবং সকলকে গেয়ে শুনিয়ে দিতেন। তাঁর কণ্ঠ ছিল মধুর ও ভাবব্যঞ্জক। এমন কেউ ছিল না যে, বালকের সঙ্গীতে মুগ্ধ না হত। পুত্রের সঙ্গীত-প্রতিভা লক্ষ্য করে পিতা মধুসূদন উপযুক্ত গুরুর কাছে তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থায় উদ্যোগী হলেন। সেই সময় পণ্ডিতপ্রবর, আচার্য্যশ্রেষ্ঠ রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বিষ্ণুপুর রাজদরবারে সঙ্গীতাচার্য্য পদে আসীন। তিনি স্ব-গৃহে মেধাবী ও সুকণ্ঠ শিষ্যগণকে বিদ্যাদান করতেন। ঋষিকল্প,

অশীতিপর বৃদ্ধ রামশঙ্করকে গুরুরূপে পেয়ে বালক যদুনাথ নিজেকে ধন্য মনে করলেন। বালকের প্রতিভা ও কণ্ঠে মুগ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য বুঝেছিলেন যে এই বালকের প্রতিভা একদিন সমগ্র ভারতকে বিমুগ্ধ করবে। রামশঙ্কর ছিলেন সুকবি। সংস্কৃত শব্দ-বহুল স্বরচিত বাঙ্গলা গান যখন তিনি শিষ্যদের শোনাতেন, তখন এই বালক শিষ্যের অন্তরে প্রেরণা জাগত যে, একদিন সে-ও এরূপ সঙ্গীত রচনা করবে। গুরুর দীক্ষায় দীক্ষিত হল বালক। কিন্তু যদুনাথের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটল। তাঁর শিক্ষারম্ভের তিন বৎসর পরেই ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৮৭ বৎসর বয়সে রামশঙ্কর পরলোক গমন করলেন। তের বৎসর বয়স্ক বালক যদুনাথ বিচলিত হয়ে উঠলেন, সঙ্গীত-শিক্ষা ব্যাহত হল আদর্শ গুরু হারিয়ে। পিতার আদেশে পুনরায় তাঁকে অধ্যয়নে মনঃসংযোগ করতে হল।

কলকাতা সহর তখন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের একটি রীতিমত কেন্দ্র হতে চলেছে। ভারতের বহু বিখ্যাত ওস্তাদ তখন কলকাতায় গুণগ্রাহী ধনীমহলে আসতে সুরু করেছেন এবং অনেকে স্থায়িভাবে বসবাস করে ফেলেছেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন, সৌরীন্দ্রমোহনের দরবারে অনেক গুণী-জ্ঞানীর সমাগম হত। বেতিয়ার নওলকিশোর ও আনন্দকিশোরের মৃত্যুর পর সেখানকার কত্থক ঘরানা বিখ্যাত ওস্তাদগণ কলকাতার সঙ্গীত-আসর জমিয়ে রেখেছেন। রামশঙ্করের কৃতী শিষ্যগণ কলকাতায় যাওয়া-আসা করতেন। পনের বৎসরের বালক যদুনাথ এই সব খবর শুনলেন এবং একদিন পিতার ইচ্ছা ও আদেশ অবহেলা করে চলে এলেন কলকাতায় একবারে নিঃসম্বল অবস্থায়। সঙ্গীতের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁকে বিদেশের দুঃখ ও দারিদ্র্য সহ্য করবার ক্ষমতা দিল। বিষ্ণুপুর-নিবাসী স্বনামধন্য সঙ্গীতবিদ্, ভারতের প্রথম স্বরলিপি-আবিষ্কারক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তখন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গীতাচার্য্য। ইনি রামশঙ্করের একজন কৃতী শিষ্য। ক্ষেত্রমোহন তাঁর গুরুভাই যদুনাথকে নানা ভাবে সাহায্য ও উৎসাহ দান করেন। এই সময় যদুনাথ কলকাতার তৎকালীন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ স্বর্গত গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে আশ্রয় পেলেন এবং তাঁর কাছে ধ্রুপদ শিক্ষা আরম্ভ করেন। বালক হলেও রামশঙ্করের শিক্ষাধীনে, তিনি সঙ্গীতের সারমর্ম 'সুর ও ভাবকে' হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা অর্জ্জন করেছিলেন। অদ্ভুত প্রতিভাবলে তিনি আয়ত্ত করতে লাগলেন রাগ-রাগিণী ও গান। সহশিক্ষার্থীরা অবাক্ হলেন তাঁর প্রতিভায় ও মধুর কণ্ঠে। যদুনাথ তাঁর শিক্ষা এক যায়গায় নিবদ্ধ রাখলেন না। সঙ্গীত-আসরের তিনি ছিলেন নিয়মিত শ্রোতা। নানা প্রকার রাগ-রাগিণী, বিভিন্ন ঘরানা ও ঢংয়ের গান তিনি শোনা মাত্র অনুকরণ করে নিতেন এবং পরক্ষণেই সেই গান ও রাগ শুনিয়ে শ্রোতাদের আশ্চর্য্যান্বিত করতেন। কেউ বুঝতে পারত না কোথায় এবং কার কাছে তিনি শিখেছেন। আর একটি তাঁর আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল, কোন অজানা বা অপ্রচলিত রাগ কেহ গাইলে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা আয়ত্ত করে সেই রাগের গান রচনা করে শোনাতেন। সে সকল গানের রচনা ও সুর ছিল অতুলনীয়। অল্পবয়স্ক যুবক যদু ভট্টের গান মুখে মুখে প্রচলিত হতে লাগল। যদু ভট্ট কেবল গুরুর শিক্ষারই পুনরাবৃত্তি করলেন না, নানা ঘরানা, নানা ঢংয়ের সামঞ্জস্য করে তিনি এক নিজস্ব ধারা ও গায়েকী প্রচলন করলেন যা' শ্রোতা মাত্রকেই অভিভূত করত এবং যার জন্য তাঁর নাম সেকালেও শুধু বাঙ্গলায় নয়, সুদূর পশ্চিমেও বিখ্যাত হয়েছিল। বাইশ বৎসর বয়সে তিনি সঙ্গীত-শিক্ষা সমাপ্ত করে সাধনায় ও সঙ্গীত-রচনায় মনঃসংযোগ করলেন। তিনি ছিলেন অস্থির প্রকৃতির লোক। শিক্ষাদান কালে নিমেষে তিনি অধৈর্য্য হয়ে পড়তেন। আনন্দ পেতেন তিনি গান গেয়ে এবং শুনিয়ে। দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল, তিনি হবেন সকলের সেরা। অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাঁর এই আদর্শকে সসম্মানে রক্ষা করেছিল। বাঙ্গালী হলেও তাঁর রচিত হিন্দী ধ্রুপদ গান বিখ্যাত হিন্দুস্থানী রচয়িতাদিগকেও ম্লান করেছে। বাঙ্গালী হয়েও তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-কেন্দ্র ও রাজদরবারে তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে জয়টীকা নিয়ে এসেছেন। প্রায় এক বৎসর পরে তিনি স্বদেশে আসেন এবং এই সময় তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। বিষ্ণুপুরে তৎকালীন রাজা ছিলেন গোপাল সিং। রাজকাজ চালাচ্ছেন অপারগ ও স্বার্থান্বেষী অমাত্য, আমলাবর্গ। ধ্বংসোন্মুখ রাজ্যের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাও আত্মসাৎ করছেন। রাজা Religion Portfolio নিয়ে আছেন। সন্ধ্যাহ্নিক ও পূজার্চ্চনা দেশবাসীর অবশ্যকরণীয় কাজ—এটা প্রায় আইন দ্বারা চালু করেছেন। 'গোপাল সিংয়ের বেগার' সারতে সারতে সকলেই অতিষ্ঠ। সন্ধ্যায় তিনি বৈঠকী-সঙ্গীত, যাত্রা, কথকতা, ভাগবত প্রভৃতি নিয়মিত শুনতেন।

এই রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ দান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। গোপাল সিং সেই ধারা রক্ষা করেছেন। শ্রদ্ধা ও সসম্মানে দরবার-সঙ্গীতাচার্য্য পদে আসীন ছিলেন যদু ভট্টের গুরুভ্রাতা অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। গোপাল সিং রাজপদে অভিষিক্ত হবার পর এই প্রথম শুনলেন যদু ভট্ট স্বদেশে এসেছেন। তাঁর সুনামে বিষ্ণুপুরবাসী মাত্রেই গৌরব অনুভব করতেন। যদু ভট্টের সম্মানার্থে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বসন্তকালে এক সঙ্গীত-আসরের আয়োজন হল। দরবার ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরহীন। পুরাতন বিরাট প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ পুরাকীর্ত্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে। বিষ্ণুপুর রাজের সাতমহলা প্রাসাদ এবং রাজবৈভব এখন ত' রূপকথায় দাঁড়িয়েছে। কোন্ সে আদিকালে বিষ্ণুপুর রাজ্যের কীর্ত্তিকলাপ ও ঐশ্বর্য্য ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্যকেও নাকি হার মানিয়েছিল! কিন্তু কালের কালিমা রেখেছে সে স্বর্ণ-যুগের কিছু কিছু নিদর্শন মাত্র।

দরবারী আদব-কায়দা, শালীনতা ছিল বংশ-মর্য্যাদার পরিচায়ক। যদু ভট্ট ছিলেন সে আসরের প্রধান শিল্পী। দরবার-গৃহ, প্রাঙ্গণ, সম্মুখস্থ উদ্যান জনাকীর্ণ। রাজা যদু ভট্টকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন, তিনি গান সুরু করলেন। রাগের পর রাগ, গানের পর গান গেয়ে চললেন তন্ময় হয়ে। শ্রোতারাও তন্ময়। প্রথমে তিনি স্ব-ইচ্ছায় গেয়ে চললেন, তার পর এল ফরমাসের পালা; তাঁর রচনা গান শোনার জন্য আগ্রহ। তখন বসন্তের সুগন্ধ পবন সকলের মনে দোলা দিল। নবফুল-পল্লবিত উদ্যানের দিকে চেয়ে রাজা যদু ভট্টকে অনুরোধ করলেন সেদিনের বসন্তের রূপ ও আনন্দ উৎসব বর্ণনা করে একটি গান রচনা করে শোনাতে, যে গান হবে সকল গানের সেরা। যদু ভট্ট তখন আপন গানে আপনিই বিভোর মাত্র কিছুক্ষণ ভেবে নিয়েই তিনি গাইতে আরম্ভ করলেন—

"আজ বহত সুগন্ধ পবন সুমন্দ মধুর বসন্তমে,
হর মকুর পর যুথ মধুপ মদহর নিরত কর রব কুঞ্জমে"—

গানের পর সভা হয়ে উঠল মুখরিত আনন্দে ও প্রশংসা-ধ্বনিতে—বসন্তের শোভাও যেন শতগুণ বৃদ্ধি পেল। যদু ভট্ট এই প্রথম রাজসম্মান পেলেন—মহারাজ সানন্দে তাঁকে ১০১ স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিলেন। কথায় বলে 'মরা হাতী লাখ টাকা।' উদার-হৃদয় মহারাজ রাজবংশের নিজস্ব তহবিল থেকে ঐ উপহার দিলেন। যদু ভট্ট আজীবন গোপাল সিংহের গুণগ্রাহিতার কথা ভোলেননি। বৎসরে অন্ততঃ একবার বিষ্ণুপুরে এসে তিনি মহারাজকে ও দেশবাসীকে গান শুনিয়ে যেতেন। এই সময় প্রায় এক বৎসর বিষ্ণুপুরে থেকে তিনি পুনরায় কলকাতায় আসেন। সেখানে প্রকৃত পক্ষে তাঁর একাধিপত্য ছিল। ১৮৬৬ সালে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ একদিন কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন। কোথায় গেলেন কেউ জান্‌ল না বা সন্ধান পেল না। প্রায় এক বছর পর তিনি ফিরে আসেন। কথিত আছে, তিনি ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন এবং বিশেষ করে গোয়ালিয়র, আলোয়ার, রামপুর প্রভৃতি ষ্টেটে তাঁর সুনাম প্রতিষ্ঠা করেন। পরের বছর তাঁর বিবাহ হয় কাঁচড়াপাড়ায়। তাঁর কোন সন্তানাদি ছিল না। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যদু ভট্টকে আমন্ত্রণ করলেন তাঁর গান শুনবার জন্য। তিনি ঠাকুরবাড়ীতে গান শুনিয়ে মহর্ষি, তাঁর পুত্রগণ ও সমবেত আত্মীয়-স্বজনকে মুগ্ধ করেন। কয়েক বৎসর পর মহর্ষি তাঁকে গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের পরম ভক্ত ছিলেন। শিক্ষাদানের ধৈর্য্য তাঁর ছিল না কিন্তু তিনি গান শুনিয়ে যেতেন। কবিগুরু ও তাঁর মেজদা' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যদু ভট্টের রচিত খাণ্ডারবাণী ও অন্যান্য ধ্রুপদের সুর ও ছন্দ নিয়ে গান রচনা করলেন। এই সময় যদু ভট্ট কয়েকটি বাঙ্গলা ব্রহ্ম-সঙ্গীত রচনা করেন। এই ভাবে ঠাকুরপরিবারের সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। এই সূত্রে ত্রিপুরারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

১৮৭৬ সালে তিনি মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হন। প্রসিদ্ধ রবাববাদক কাসেম আলি খাঁ তখন ত্রিপুরা দরবারে নিযুক্ত। যদু ভট্ট ত্রিপুরায় এলেন। দরবারে সঙ্গীতের এক বিরাট অনুষ্ঠান হল। আসরে বসে মহারাজের সম্মানার্থে তাঁর বিষয় একটি গান রচনা করে গাইলেন। তিলক-কামোদ রাগে তিনি গাইলেন: "তড়পত চিতবন তুম বিন হো রাজাধিরাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য ত্রিপুরেশ্বর"! তার পর তিনি গাইলেন তাঁর প্রিয় রাগ—স্বরচিত গান। মহারাজ ও সভাসদ্‌গণ একবাক্যে স্বীকার করলেন এ রকম গান কখনও শোনেননি। প্রবীণ ওস্তাদ কাসেম আলিও তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। গানের পর রবাব বাজাতে সুরু করলেন কাসেম আলি। তিনি ঘরানা কয়েকটি রাগ বাজালেন। সুচতুর যদু ভট্ট এক মনে সেগুলি শুনে সেই রাগের গান রচনা করে সভায় গাইলেন। প্রবীণ ওস্তাদ অবাক হলেন তাঁর ক্ষমতায়। মহারাজ, যদু ভট্টের প্রতিভার বিষয় অবগত ছিলেন। তিনিও এ চাতুরী বুঝলেন। সভামধ্যে এক রঙ্গ সৃষ্টি হল। মহারাজ সভায় সর্ব্বজনসমক্ষে যদু ভট্টকে "রঙ্গনাথ" উপাধিতে ভূষিত করেন। এর পূর্ব্বে যদু ভট্ট স্বরচিত গানে ভণিতা দিতেন না। এর পর থেকে তাঁর রচিত সমস্ত গানেই 'রঙ্গনাথ' নাম উল্লেখ আছে। তিনি গেয়েছেন "কৌন রূপ বনে হো রাজাধিরাজ, আজু নৈন নিরখ রঙ্গনাথ গাওয়ে"। ত্রিপুরারাজ, যদু ভট্টকে তাঁর সভা অলঙ্কৃত করতে সানুনয় অনুরোধ করেন। তিনি স্থায়ী ভাবে থাকতে রাজি হন্‌নি কিন্তু প্রায়ই ত্রিপুরা গিয়ে মহারাজকে গান শুনিয়ে আসতেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে তিনি বেশীর ভাগ থাক্‌তেন।

যদু ভট্টের সময়ে আর কোন গায়ক এরূপ সর্ব্বভারতীয় খ্যাতি অর্জ্জন করতে পারেননি। ১৮৮৩ সালের প্রথম দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বিষ্ণুপুরে প্রত্যাগমন করে কয়েক মাস শয্যাশায়ী থেকে ইহলোক ত্যাগ করেন। মাত্র তেতাল্লিশ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন কিন্তু এই অল্প সময়ে তিনি যে কীর্ত্তি রেখে গেছেন, তা' বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয়। তাঁর প্রতিভা-রশ্মি ভারতীয় সঙ্গীতের উপর এক গভীর রেখাপাত করেছে। কাব্যভাব ও সুরভাবের সমন্বয়েই যে গান, তার দৃষ্টান্ত তিনি দেখিয়ে গেছেন। তাঁর রচিত অমূল্য সঙ্গীতগুলি আলোচনা ও প্রচারের সময় এসেছে। বাঙ্গলার সঙ্গীত-সমাজের এ বিষয়ে কর্ত্তব্য রয়েছে। এ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমরা যেন সচেতন থাকি। বাঙ্গলায় সঙ্গীত-ইতিহাসে যদু ভট্টের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

পাঞ্চালীকে অন্যদিন

প্রদ্যুম্ন মিত্র

সে দিনো বিকেল ছিলো মেঘছোঁয়া মেঘনাপারের
আমরা দু'জন আর কাছাকাছি তিরতিরে নদী
ঢেউ ভেঙে খেলা করে এক মন দুকূলে আকুল ;
আর আরও দুটি মন ঢেউ গুণে সারা আজ ফের।
সে ঢেউ স্রোতের বুঝি সময়ের একটু হাসির
আমরা বৃথাই গুণি নদীটির তীরে সারা বেলা
নীরব আঙুলে আঁকি এক ছবি আবছা মুখের
বালির ইজেলে রঙে—সেই রঙ মিলুট স্মৃতির :

সে ছবি সে মুখ আহা আমাদেরি—অনেক অচেনা
কেন না ধুয়েই গেছে সেই মন সেই বেচাকেনা।
সুমনা, সময় যাক, বলো নাকো মেঘনাপারের
পাখির হাসির মতো কোন কথা, আজকে বিকেল
কেন যে মুহূর্ত-গোণা রঙ-মাখা ফের ফাগুনের !
বিমনা আঙুলে খুঁটে ঘাসশীষ মৌনতা অঢেল
হঠাৎ এ দেখা পাক শেষ আলো গোধূলি-হৃদয়
সে কথা এখন থাক, তুমি নেই, কাঁপুক সময় !!

অঙ্গনে ও প্রাঙ্গনে

ব্রহ্মনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীশর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়

চিরন্তন যে মানবতা, তার প্রধান পরিচয় **অমৃতের তৃষ্ণায়।** অমৃত-পিপাসা আর অমৃত সন্ধানের মধ্যেই যুগ-যুগবাহী মানবতার প্রগতি। মানুষ অমৃতের পূজারী। নিত্যকালের মানুষ এই অমৃত সন্ধানেই রত হন। এই অমৃত সন্ধানের দিকটি ব্যক্তিসত্তার বাইরে; **ব্যষ্টিসত্তায় নয়,** নিত্যকালের সমষ্টির মধ্যে তার **অবলুপ্তি।** **ব্যক্তিগত** বৈষয়িকতায় তার পরিমাপ অসম্ভব। বর্তমানকে **অস্বীকার ক'রে** **অনিশ্চিত কালকেই** সেখানে **স্বীকৃতি** দেওয়া হয়। **বর্তমানের স্বার্থকে** পরিত্যাগ ক'রে সেখানে অনিশ্চিত কালের জন্যে নিঃস্বার্থ হ'য়ে কর্মে রত হ'তে হয়। সেখানে ব্যষ্টি-জীবনের চেয়ে আরো বড়ো আরো বিশাল, আরো সীমাতিক্রমী যে প্রাণ, সেই প্রাণের মধ্যে মানুষ লীন হ'তে চায়, হ'তে চায় সর্বজনীন, সর্বকালীন মানব।

কিন্তু ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের নিচে চাপা প'ড়ে যায় এই সর্বজনীন, সর্বকালীন, বিচিত্রবীর্য মানব-হৃদয়। জীবনের মরুভূমিতে ঐশ্বর্য হোল মরীচিকা: বার বার পথ ভুল, দিক ভুল, সব ভুল করায় মানুষের: মানুষ ভুলে যায় অমৃত সন্ধানের কথা। ভুলে যায় যে, ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের বাইরে রয়েছে অনন্ত অসীমতার আনন্দ।

কিন্তু গরল কী অমৃতের পিপাসা মেটাতে পারে? মরীচিকা কী সর্বক্ষণস্থায়ী? নিশ্চয়ই না। কিন্তু আমাদের জীবনটাও অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী; আর সেই ক্ষণস্থায়ী জীবন ব্যেপে যদি মরীচিকা স্থান লাভ করে, তবে অমৃত সন্ধানের আর সময়ই বা পাওয়া যাবে কোথায়? কোন্‌খানে?

সুতরাং দেখা যায়, মৃগতৃষ্ণিকায় পথ ভুল ক'রে মানুষ এমন গোলক-ধাঁধায় এসে আটকা পড়ে, যেখান থেকে বেরুবার পথ খোঁজা, যেখান থেকে রেহাই পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তখন ঐশ্বর্যের আকাশ-ছোঁয়া পাঁচিলের দেহে গিয়ে রুদ্ধ হয় মানুষের চোখের সন্ধানী আলো: অনন্ত আকাশের অমৃত-আলোক পায় না খুঁজে সেই ঐশ্বর্যের প্রাচীর-ঘেরা স্থানে ঢোকার সড়ক। উজ্জ্বল, আশ্চর্য, দিগন্তহীন ব্যাপ্তি যে অমৃত-আলোকের, তার রশ্মিধারা মরে প্রাচীরের পাথরে মাথা কুটে। দীন-হৃদয় ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে কৃতার্থ হয়, ভাবে, আর কিছুই আমার চাই নে।

কিন্তু অন্তরাত্মা কাঁদে, মাথা কুটে হয় মরো-মরো। বলে, যাতে আমি অমর হ'বো না, তা' নিয়ে করবো কী—'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্?'

মানুষ যখন ধনের অধীশ্বর হ'য়ে আত্মগরিমায় অতিরিক্ত উৎফুল্ল, তখন অন্তরাত্মা রুদ্ধ-রোদনে ভেঙে প'ড়ে প্রার্থনা করে:

'অসতো মা সদ্‌গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়!!!'

ঐশ্বর্যের এইটেই হোল সব চেয়ে বড়ো বিড়ম্বনা যে, দীন যা' হৃদয়, ঐশ্বর্যকে সে মনে করে চরম-পরম সার্থকতা।

কিন্তু অমৃত-রসার্ত যাঁরা, তাঁরা জানেন, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং'—এবং তাই অমৃতকেই তাঁরা জানান মুগ্ধচিত্ত প্রণতি।—দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন অমৃত-রসার্ত।

তাই দেখা যায়, যখন দেবেন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবন-তরী ঝড়-তুফানের মধ্যে ডুবু-ডুবু, তখনো সে চ'লেছে অগ্রগতির ঋজু রেখা ধ'রে সামনের দিকে। তাই, জীবন-প্রভাতে তিনি অন্ধ বিভাবরীর সমস্ত অনুপল জেগে কাটিয়েছিলেন; তাই, দুস্তর পারাবারের খেয়ায় তিনি একা দৃঢ় হাতে টেনেছিলেন দাঁড়।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেবেলা কাটিয়েছেন ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যের ভেতরে, কিন্তু তখন থেকেই তিনি ব্রহ্মৈশ্বর্য লাভ ক'রবার জন্যে দীনাতিদীন ভিখিরীর মতন প্রার্থনা ক'রেছিলেন। আবার, যখন আকস্মিক দুর্যোগের বজ্রপাতে পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হ'তে চলেছিল, তখনো তিনি নির্লিপ্ত চিত্তে আত্মৈশ্বর্য লাভ ক'রে

অলঙ্কারে শিল্প সৃষ্টি
...... আধুনিকতার পরিচয়।
এই বৈশিষ্ট্যই প্রত্যেক নারীর
একান্ত কাম্য। আমাদের
প্রতিটি অলঙ্কার
শিল্প সৃষ্টির বৈচিত্র্যে
সমৃদ্ধ।
১৬৭/সি, ১৬৭/সি/১
বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
(আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও
বহুবাজার ষ্ট্রীট জংসন)
ফোন • ৩৪-১৭৬১ • গ্রাম • রিলিয়ান্টস
ব্রাঞ্চ-হিন্দুস্থান মার্ট, বালীগঞ্জ
১৫৯১বি রাসবিহারী এভেনিউ • পি. কে. ৪৪৬৬
প্রখ্যাত অলঙ্কার নির্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী

ব্রহ্মস্বাদসুধায় অদ্ভুত আনন্দে যে-পথ 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া', সে-পথে অকুতোভয়ে পদসঞ্চরণ ক'রেছিলেন। সম্পদ তাঁকে অমৃত লাভে বঞ্চিত ক'রতে পারেনি, বিপদও না। পারিবারিক জীবনের চরম দুর্যোগের মুহূর্তে সাধারণত সবাই দুর্যোগমুক্তির পথ অনুসরণ করে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সেই বিপদের দিনেও পরমেশ্বরের অমৃত-সঞ্চয় থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেননি। সমস্ত বিপদ-বন্যাকে দ্বিধাহীন হৃদয়ে নির্ভয়ে অগ্রাহ্য ক'রে রক্ষা ক'রেছিলেন ধর্মকে, শুধু প্রার্থনা ক'রেছিলেন: 'মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ।'

তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, জানতেন, 'সত্যমেব জায়তে নানৃতম্'। সমস্ত জীবনের মধ্যেই ভূমাকে সপ্রমাণ ক'রবার সাধনা তাই তিনি ক'রেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের মতন সত্যবাদী তিনি নন, তাই তিনি 'ইতি গজ' বলেননি, উন্নত শিরে সমস্ত ঝড়-তুফান, সমস্ত বজ্রপাত উপেক্ষা ক'রেছেন। তাঁর সমস্ত জীবনের মধ্যে এই প্রার্থনাই সর্ববৃহৎ: 'আবিরাবীর্ম এধি'—হে স্বপ্রকাশ, আমার কাছে প্রকাশিত হও,—আমার কাছে প্রকাশিত হ'লে সেই প্রকাশ আমাকে অতিক্রম ক'রে সমস্ত মানবের কাছে সহজে দীপ্যমান হ'য়ে উঠবে। পূষণের জ্যোতির্ময় পাত্রের আবরণ-উন্মোচন স্বর্ণক্ষরা আলোর বিভায় তাই তিনি জ্যোতিষ্মান্ হ'য়ে উঠেছেন আমাদের কাছে, সার্থক হ'য়েছে তাঁর প্রার্থনা: 'আবিরাবীর্ম এধি!'

এই পৃথিবীতে এক দিকে যেমন আছে ভোগাসক্ত জীবনের প্রাচুর্য, অন্য দিকে তেমনি রয়েছে নিরাসক্ত জীবনের অনাবিল আনন্দ। আর ব্রহ্ম হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ:

'আনন্দো ব্রহ্ম, আনন্দাদ্ধ্যেবখল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দ প্রযন্ত্যাভিসংবিশন্তি।'

যিনি আসক্তি নিজের অন্তরের অন্তঃপুর থেকে দূর ক'রতে পেরেছেন, যিনি আপন বীর্যবত্তাকে উপলব্ধি ক'রতে পেরেছেন, তিনিই এই পৃথিবীতে নির্মল আনন্দের অধিকারী। ভোগাসক্তির বিষবাষ্পে তাঁর জীবন হয় বিষময়। শাশ্বত প্রশান্তি তাঁকে শোনায় প্রাণব্রহ্মের অন্তর্বাণী। সম্ভোগকে যিনি প্রশ্রয় দেন না, নিরাসক্ত জীবনে বীর্যকেই তিনি দেন প্রাধান্য। তাই, সত্যকে রক্ষা ক'রতে তিনি একটুও টলেন না, একটুও ক্ষুণ্ণ হন না। ভোগ-লালসার অন্তিম পরিণতি তাঁর জীবনে রূপায়িতও হয় না। তিনি পান নির্মল আনন্দের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতার ইংগিত। তিনি সত্যান্বেষী। সত্যই তাঁর পরম অভীষ্ট। ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর চরম কাম্য। তাই তিনি ঋষি। তিনি ভোগৈশ্বর্যের মোহে নিজেকে বিসর্জ্জন দিতে চান না, ব্রহ্মজ্ঞান লাভই তাঁর পরম লক্ষ্য। ধনসম্পদের স্বর্ণমৃগ তাঁকে ফাঁদে ফেলতে পারে না। সত্যকে তিনি রক্ষা করেন আপ্রাণ। পৌরুষ, বীর্য, শক্তি তাই তাঁরা লাভ করেন অনায়াসে। তাই, সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে বিনাশ ক'রে, সমস্ত গ্লানিমা অপনোদন ক'রে, সমস্ত ভোগের মধ্যে সংযম দান ক'রে এই বীর্য, এই পৌরুষ, এই শক্তি দুঃখের কঠিনতম আঘাতকেও দৌর্বল্যে ভেঙে না প'ড়ে অবলীলাক্রমে করে প্রতিরোধ। এই-ই হোল ঋষিধর্ম। সত্যে-বীর্যে তাই ঋষিধর্ম মহীয়ান্, ব্রহ্মনিষ্ঠায় এই ঋষিধর্ম দীপ্যমান, ত্যাগে-সংযমে এই ঋষিধর্ম দার্ঢ্যমান।

এই ঋষিধর্মে দেবেন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ ভাবে দীপ্তিমান হ'য়েছেন সূর্যের মতন। সত্যের এষণায়, ব্রহ্মের এষণায় তাই তাঁর জীবন হ'য়েছে অনন্য জ্যোতিষ্মান্। সকল ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে তাই তাঁর সোন্নত অবস্থান। তাই তিনি মহর্ষি। তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ। তিনি উজ্জ্বল। অদ্বৈতের সাধনায় তাই তিনি নিত্যজীবনের মধ্যে উৎসর্গীকৃত। সর্বকালীন বিচিত্রবীর্য ব্রহ্মজ্ঞান-তৃষ্ণাতুর মানব-হৃদয়বান্ হয়ে তাই তিনি যুগসীমা অতিক্রম ক'রে নিত্যকালের পরম প্রাণের মধ্যে বিলীন হ'য়েছেন।

আমাদের অধিকার ও শিক্ষা

"অরুন্ধতী"

কিছু কাল যাবৎ আমাদের দেশে নারীর অধিকার ও জাগরণ নিয়ে আন্দোলন সুরু হয়েছে। শিক্ষিতা তরুণীরা বলেন যে, নারীর উপর চিরকালই অত্যাচার করা হয়েছে এবং তাঁরা তাঁদের ন্যায্য অধিকার দাবী করেন। তাঁদের প্রথম দাবী হ'ল, নারীকে তার স্বাধীনতা দিতে হবে, নারীর পুরুষের সঙ্গে সর্ব বিষয়ে সমান অধিকার থাকবে। স্ত্রীলোকের আর্থিক সঙ্গতি না থাকাতেই তাদের পুরুষের দয়ার উপর নির্ভর ক'রে তাদের প্রসন্নতার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, সেজন্য পুরুষদের মতন তাদেরও অর্থকরী কর্ম্ম করার অধিকার থাকা দরকার। পুরুষরা যথেচ্ছা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে কিন্তু নারী যদি ভুল করে তাকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করতে হয়। নারীর পছন্দ মতন বিবাহ করার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত এবং বিবাহ অসুখকর হলেই সেই বিবাহ বিচ্ছেদ করতে দেওয়া উচিত। হিন্দু-সমাজের উপর তাঁদের অভিযোগ অনেক। তাঁরা বলেন, এ সমাজ নারীর সম্মান জানে না; নারীকে চিরদিন অবজ্ঞা করেছে, বিনা শিক্ষায় ঘরের ভিতর পুরে রেখে এবং বাইরের আলো-বাতাস দেখতে না দিয়ে তাদের পঙ্গু করে দিয়েছে; বিধবা-বিবাহ দেওয়া উচিত বলে মনে করে না, মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ দিয়ে তাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়।

নারী জাতির মধ্যে আত্মোন্নতির জন্য যে একটা আগ্রহের স্পন্দন দেখা দিয়েছে, তাতে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হ'তে পারে না। তাঁরা হিন্দু-সমাজের পরিবর্ত্তনের দাবী করেছেন। পরিবর্ত্তন দরকার বই কি! সদা পরিবর্ত্তনশীলতাই হচ্ছে প্রাণধর্ম্ম বা জীবনের সাক্ষ্য, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন বিশেষ চিন্তা ক'রে ও জাতীয় আদর্শ সম্মুখে রেখে করা বিধেয়। যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে পড়ে ও সেই সভ্যতার বাহ্যিক চাকচিক্যে ভুলে আমরা আমাদের এই প্রাচীন সভ্যতার আমূল সংস্কার করতে উদ্যত হই, তাহলে সর্ব্বাগ্রে নারীর ক্ষতিই হবে সব চেয়ে বেশী। তার পর, নারীরা নিজের পায়ে সবে মাত্র ভর দিয়ে দাঁড়াতে চাইছেন, এ সময়ে পরিবর্ত্তন যদি দ্রুত হয় তাহলে তাঁদের আছাড় খেতেই হবে। সমাজবিধি মানুষের উদ্ভাবন, সুতরাং সম্পূর্ণ নয়; মান্ধাতার আমলের বিধি মনুর আমলে বদল হয়েছে, মুসার আমলের বিধি মহম্মদের আমলে বদল করার প্রয়োজন হয়েছে। কালধর্ম্ম অনুযায়ী সমাজবিধি বদলাতে বাধ্য এবং আমাদের দেশে তার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে ও আরো হবে। আমাদের সমাজ অতি প্রাচীন। বহু কাল ধরে বিকাশের একটা নির্দ্দিষ্ট ধারা ধরে এ সমাজ গড়ে উঠেছে, সেই ধারা ছেড়ে দিয়ে

অন্য দেশের অনুকরণে আবার একটা নূতন ধারা ধরতে গেলেই বিপর্য্যয় ঘটবে। ফলে, সমাজের নর-নারীই ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও তাদের চরিত্রবল লোপ পাবে।

শিক্ষিতা নারীরা সমাজের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করেন, সেগুলি অধিকাংশই ভিত্তিহীন, কেন না, তার মূলে কোন সত্য নেই। প্রথম অভিযোগ হ'ল হিন্দুরা নারীর সম্মান জানে না, তারা নারীকে দাসীর মতন করে রাখে। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। হিন্দুরা নারী জাতিকে যে সম্মানের স্থান দিয়েছেন, আজ পর্য্যন্ত কোন সভ্য দেশ তাদের নারী জাতিকে সে সম্মান দেননি বা দিতে পারেননি। হিন্দুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন ভগবতী দুর্গা বা কালী। ভগবানকে নারী-রূপে দেখে তাঁরা নারীকে সম্মানের শ্রেষ্ঠ আসনে স্থাপনা করেছেন, এ পর্য্যন্ত কোন সভ্য জাত যা' করতে পারেনি। ঋষিরা বলেছেন, নারী মাত্রই বিশ্বজননীর প্রতিমূর্ত্তি। শাস্ত্রকারগণ বার বার বলেছেন যে, "নারী জাতিকে তার প্রাপ্য সম্মান না দিলে পুরুষ জীবনে প্রতিষ্ঠা বা কল্যাণ লাভ করতে পারে না।" মনু বলেছেন, "যে গৃহে নারী পূজিতা হইয়া থাকেন অর্থাৎ যথাযোগ্য সম্মান পাইয়া থাকেন, সে গৃহে দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থিতি করেন এবং যে গৃহে বা বংশে নারী নির্য্যাতিতা হন, সেই গৃহ বা বংশের নাশ অবশ্যম্ভাবী।" যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, "কুলবধূর পতি, ভ্রাতা, পিতা, জ্ঞাতিবর্গ, শাশুড়ী, শ্বশুর, দেবর এবং বন্ধুবর্গ সকলেই ভূষণ, বসন এবং অশন প্রদান দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিবেন।" হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে পরিবারের সকল নারীর প্রতি সসম্মান ব্যবহার করার উপদেশ দিয়েছেন। হিন্দুর কাছে নারী মাত্রই মা এবং তাঁদের কাছে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" এর চাইতে উচ্চ সম্মান কোন জাত নারী জাতিকে দিতে পারে বলে মনে হয় না। বাল্য-বিবাহ খুবই দোষের বটে কিন্তু নানা কারণে এই প্রথা সমাজ এক সময়ে অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল। প্রাচীন কালে বাল্য-বিবাহ ছিল না। অবরোধ-প্রথাও ছিল না, বোধ হয় মুসলমান শাসনের সময় এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। বিধবা-বিবাহ ত' এখন আইন-সম্মত কিন্তু হিন্দুনারীর আজীবন সংস্কার, স্বামী তার জন্ম-জন্মান্তরের সাথী, ঐ আইন কার্য্যকরী করতে দিল না। মনে হয় বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন যা' শীঘ্রই প্রবর্ত্তিত হবে, ঐ একই কারণে আমাদের দেশে চালু হবে না। রাষ্ট্রেও আজ নারী স্থান পেয়েছেন।

নারী পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দাবী করছেন কিন্তু প্রকৃতি-দত্ত দৈহিক ও মানসিক বৈষম্যই যে সে অধিকার লাভের প্রবল অন্তরায়, সে কথা ভুললে চলবে কেন? এর বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে, ইউরোপে নারী পুরুষের সঙ্গে সমান কাজ করছে ও সাফল্য লাভ করেছে, তবে এ দেশের নারীরাই বা পারবে না কেন? কথাগুলি খুবই সত্যি, কিন্তু নারীর ঐ ভাবে পুরুষের কার্য্য করার ফলে যে বিষময় ফল দেখা দিয়েছে, সেখানকার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাই দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন। তবে কি হিন্দু নারী চিরকালই ঘরের কোণে বসে শুধু সন্তান পালন করবে, তার কি বাইরের কাজ করার কিছুই নেই? তা কেন? আমরা হিন্দু নারী, হিন্দু নারীর যা চিরন্তন আদর্শ তাই ধরে আমাদের জাগতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্ত কণ্ঠে বলে গিয়েছেন, "হে ভারত! ভুলিও না, তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী।" ঐ আদর্শ অটুট রেখে, তার পর পাশ্চাত্য ভাবধারার যা-কিছু ভাল তা নিলে কোন ক্ষতি হবে না। পরধর্ম্ম বা সভ্যতা যত ভাল হোক্ না কেন, তার অনুকরণে কস হয় ভয়াবহ। আমাদের আদর্শ ভোগে নয় ত্যাগে, এ কথা যেন কোন দিন না ভুলি।

পুরুষ ও স্ত্রী-শক্তি নিয়ে সমাজ। এমন অনেক জিনিষ আছে যা পুরুষে আছে, নারীতে নেই, আবার নারীতে আছে ত' পুরুষে নেই, কাজেই সেই উভয় বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় না করতে পারলে কোন সার্থকতা আসতে পারে না। সকল কাজেই স্ত্রীলোকের সাহায্য ও সমর্থন না পেলে কোন কাজই সুসম্পন্ন হতে পারে না। জনৈক মার্কিণ মনীষী বলেছেন, "সংসার-তরণীতে নর হ'ল হাল, আর নারী তার পাল।" নৌকা ঠিক পথে নিয়ে যেতে হলে, হাল ও পাল দুয়েরই সম ভাবে প্রয়োজন। সংসারের নিয়মও তাই, স্বামি-স্ত্রী দু'জনে যদি একমন ও একপ্রাণ হয়ে কাজ করেন, তাহলেই সংসার আনন্দময় হয়ে ওঠে। স্ত্রী হবেন স্বামীর গৃহের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী, সংশয় কালের মন্ত্রী, নর্ম্মকালের সখী ও বিপদের আশ্রয় এবং ললিতকলায় প্রিয় শিষ্যা। রমণীর সকল ভাবের সকল সম্পর্কের প্রতিমূর্ত্তি হয়ে স্বামীর পাশে এসে স্ত্রী যদি দাঁড়ান, তাহলে এই সংসারই স্বর্গ হয়ে উঠবে।

পল্লীই গৃহস্থাশ্রমের মূল কেন্দ্র। সেই কেন্দ্রই যদি ভ্রষ্ট হয়ে যায়, বিকৃত শিক্ষার ফলে স্বামি-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি যদি শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভালবাসা, সহানুভূতি ও আত্মত্যাগ না থাকে, তাহলে সংঘাত অনিবার্য্য এবং উভয়ের জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে ওঠে। সেই জন্য আমাদের শাস্ত্রকাররা

বলেছেন, "কন্যাকেও বিশেষ যত্ন করে শিক্ষা দিবে।" মেধাদি বলেছেন, "কুমারী কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা দিবে, বিশেষতঃ উহাদিগকে ধর্ম্মনীতিতে আস্থাবতী করিবে। যে কুমারী ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করে সে পিতৃকুল ও পতিকুল, উভয়েরই কল্যাণদায়িনী হইয়া থাকে।" এই জন্য ব্রত-ব্রত, উপবাস, তুলসীতলায় দীপদান, পূজা, জপ, স্তোত্র-পাঠ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ পাঠের ভেতর দিয়ে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার প্রচলন ছিল, যা'তে তাদের সংযম শিক্ষা, শ্রীভগবানে বিশ্বাস এবং নির্ভরতা, ধৈর্য্য, মাধুর্য্য, সেবা, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি সত্ত্বগুণের বিকাশ পায়।

নারীজাগরণের জন্যে চাই শিক্ষা। কারণ, আমাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষার বড় অভাব। কিন্তু সেই শিক্ষা এমন ভাবে নির্দ্ধারিত হওয়া চাই, যা'তে নারী কোন্‌টা কর্ত্তব্য ও কোন্‌টা অকর্ত্তব্য সহজেই বুঝতে পারে। নারী-প্রকৃতি ও পুরুষ-প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে, সে কারণ ছেলেদের শিক্ষা মেয়েদের দেহ ও মনের উপযোগী নয়। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি রক্ষার জন্য নারীকে এমন ভাবে গড়েছেন যে, মা হওয়ার ও সন্তান পালনের গুরুভার তাকে নিতে হবেই। আবার এই গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন বলে তার অন্তরে কতকগুলি বিশেষ গুণও দিয়েছেন। ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ ভালবাসা, মায়া, মমতা, করুণা, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি নারীর সহজাত গুণগুলির যাতে সম্যক্ ভাবে বিকাশ পায়, সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। মেয়েদের ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। ধর্ম্মহীন শিক্ষার ফলে পাশ্চাত্য দেশের গাহস্থ্য-জীবন আজ বিপন্ন; সে জন্য প্রথম থেকেই সাবধান হওয়া প্রয়োজন। সন্তান-পালন ও ধাত্রী-বিদ্যা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আমরা ইউরোপের কাছ থেকে পেয়েছি, সেগুলিও যথাযথ শিক্ষা দেওয়া উচিত। তার সঙ্গে স্বদেশের ও অন্য দেশের যে বিষয়গুলি চর্চ্চা করলে জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ হয়, সে বিষয়গুলিও শিক্ষা দেওয়া ভাল। আবার লেখা-পড়া শিখলেই হবে না, শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্র, রন্ধন বিদ্যা, খাদ্যতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা অধিগত করতে হবে। নারী শুধু শিক্ষিতা হলে হবে না, তাকে শিক্ষাদানের ব্রত গ্রহণ করতে হবে এবং সমাজে ঐ সব জ্ঞান প্রসারিত করে সমাজকে উন্নত, সুস্থ ও সুন্দর করতে হবে। নারী অনন্ত শক্তির আধার, এই ভাবে শিক্ষাপ্রসারের ফলে আবার বাক্, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির ন্যায় শত শত বিদুষী ও মহীয়সী রমণীর উদ্ভব হবে, নারী তার প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার ফিরে পাবে।

"সংস্কার"

শ্রীমতী সুষমা দেবী

সংস্কার শব্দের অর্থ শুদ্ধকরণ। রুচিভেদে ও জ্ঞানের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে, প্রয়োজন অনুসারে নিত্যই সকল বস্তুর সংস্কার হইতেছে। আবহমান কাল ধরিয়া এই সংস্কারের দ্বারা পুরাতনের অবসান ও নূতনের অভ্যুদয় হইতেছে।

ইহা ব্যতীত অন্য যে অর্থে আমরা 'সংস্কার' কথার ব্যবহার করি, তাহা কতকগুলি প্রচলিত প্রথা।

এই প্রথা বা সংস্কার মানব-সমাজের একটি অন্যতম অঙ্গ। পৃথিবীর প্রায় প্রতি জাতিই দৈনন্দিন জীবনে কিছু না কিছু সংস্কারাবদ্ধ। এই সংস্কারের প্রভাব আমাদের সমাজ-জীবনে প্রায় অপরিহার্য্য। জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত জীবন বহুবিধ সংস্কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সংস্কার বা প্রথা এমন কয়েকটি আছে, যাহা মানুষের স্বাস্থ্য ও মানসিক গঠনকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্যই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। সংস্কার হইলেও ইহা মঙ্গলদায়ক। ইহাকে সু-সংস্কার বলা হয়।

আবার এমন কতকগুলি সংস্কার আছে, যাহা দ্বারা মানব-মন সঙ্কীর্ণ হয়। অথবা কতকগুলি বাধা-নিষেধের গণ্ডী টানিয়া জীবনকে বিড়ম্বিত করা হয়। ইহাকে কু-সংস্কার বলা হয়। এখন হিন্দু জাতির সংস্কারের বিষয় সামান্য কিছু আলোচনা করিব।

হিন্দু রক্ষণশীল জাতি। বহু বাধা-নিষেধের দৃঢ় গণ্ডীতে বদ্ধ এই সনাতন ধর্ম্ম। সংস্কারের প্রাচুর্য্য হিন্দু জাতির বৈশিষ্ট্য।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি দিনকে পর্য্যালোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, খুঁটিনাটি কত না সংস্কার! সামান্য, অথচ আমরা এগুলি এখনও উপেক্ষা করিতে পারি না। মঘা-অশ্লেষা, হাঁচি, টিকটিকি, জোড়া-কথা, পেছনে ডাকা ইত্যাদির প্রভাব আমাদের জন্মগত। কিছু দিন পূর্ব্বেও ম্লেচ্ছ-দেশ-প্রত্যাগত ব্যক্তিকে গোবর খাওয়াইয়া শুদ্ধ করা হইত। ক্ষয়-কুষ্ঠরোগীর শব প্রায়শ্চিত্ত না হইলে দাহ হইত না। শত যুক্তি-তর্ক সত্ত্বেও এ সকল সংস্কার আমরা ত্যাগ করিতে পারি না।

এই সকল ছোটখাট সংস্কার ব্যতীত দেখা যায়, আমাদের সমাজের ও ধর্ম্মের কিছু অংশ সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে, যুগ যুগ ধরিয়া শাসন-ব্যবস্থা সুবিধার জন্য, ধর্ম্মরক্ষার জন্য, শাসক সম্প্রদায়গণ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তৎকালীন সুবিধা অনুযায়ী যে সকল আইন প্রবর্ত্তন করেন, তাহাই কালক্রমে সংস্কারে পরিণত হইয়াছে।

অস্পৃশ্যতা আমাদের দেশের একটি প্রধান সংস্কার, এই সংস্কারের প্রভাবে মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণার জন্ম হইয়াছে। অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্য বহু চেষ্টা হইয়াছে এবং আমরা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিচার করিয়া দেখিলে এই প্রথার কোনই যুক্তিসঙ্গত কারণ পাই না। এই সংস্কারের প্রভাবে সমাজের এক স্তরের মানুষ চিরদিন অখ্যাত, অবজ্ঞাত হইয়া পড়িয়া রহিল। কোন দিনই তাহারা সমাজে ও দেশে মনুষ্যত্বের সম্মান ও অধিকার পাইল না। এই অস্পৃশ্যতার মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণশ্রেণী আপন স্বার্থরক্ষার জন্যই এই অস্পৃশ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। এমন একদিন ছিল যখন সমস্ত দেশ ও জাতি ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের আদেশে চলিত। দেশের রাজা ও জনসাধারণ ব্রাহ্মণের বাক্যকে দেবতার আদেশ বলিয়া মানিত। এই সুযোগে আপন প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্রাহ্মণেরা নানা ক্রিয়া-কলাপ, আদেশ-নির্দ্দেশ দ্বারা জনগণের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করান। তাঁহারা নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রস্তাব করেন ব্রাহ্মণই একমাত্র দেবসেবার যোগ্য। অন্য সকল শ্রেণী দেবতার অস্পৃশ্য। এই প্রথাই কাল ক্রমে অস্পৃশ্যতা নামক সংস্কারে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

হিন্দু সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্রেই আর একটি প্রধান সংস্কার-রূপে দেখিতে পাওয়া যায় হিন্দু বিধবাদের। অসহায় ব্রহ্মচারিণী স্বামি-হীনা নারীর করুণ জীবন!

এই বিধবার দৈনন্দিন সংসারযাত্রা বহুবিধ সংস্কারাচ্ছন্ন, শত বাধা-নিষেধের নির্দ্দেশ দিয়া এই জীবন-যাপন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সমাজে বাস করিয়া ইহা অমান্য করিবার শক্তি ও সাধ্য বিধবা নারীর নাই। আমাদের মানসিক গঠন, দেশ, কাল ও সমাজ-ব্যবস্থা অনুযায়ী এই বৈধব্য নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

বৈধব্যের পক্ষে এই সকল সামাজিক অনুশাসন উপযুক্ত ঠিকই, কারণ, ব্রহ্মচারিণীর এই আহার-বিহারে সংযম প্রয়োজন। কিন্তু এই বৈধব্য প্রথারই উপস্থিত আর প্রয়োজন আছে কি না, তাহাই বিবেচ্য।

বৈধব্য প্রথার প্রচলনের কারণ দেখিতে গেলে দেখা যায়, প্রাচীন কালে সমর-ক্ষেত্রে যখন সহস্র সহস্র যোদ্ধা প্রাণ হারাইতেন, তখন তাঁহাদের সাধ্বী স্ত্রীগণ কেহ বা সহমরণে যাইতেন। কেহ বা চিরবৈধব্য বরণ করিতেন। সেই যুগে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা এই জন্যই অধিক ছিল। সেই জন্যই দেখা যায় ব্রাহ্মণের বহু পত্নী, নৃপতির শত শত মহিষী। পুরুষের একাধিক পত্নী গ্রহণ সে-যুগের প্রথা ছিল।

যুবতী কন্যার সুপাত্রে বিবাহ দেওয়া সমাজে একটি প্রধান সমস্যা ছিল, এক্ষেত্রে কুমারী কন্যার বিবাহের পর আর বিধবা রমণীর পুনর্বিবাহ সম্ভব ছিল না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই স্বামি-হারাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত বৈধব্য-শাসনে চলিতে হইত।

যে প্রয়োজনে একদিন বৈধব্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, আজ আর সে প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ও মানসিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বৈধব্যকে মানিয়া লওয়া কষ্টসাধ্য। আজিকার দিনে বিধবা নারীর জীবন-যাপন অত্যন্ত সমস্যাপূর্ণ।

বিধবা-বিবাহ আইনসঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও, হিন্দু জাতি আজও এই আইন সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতে পারে না। এ জাতির নারীর আদর্শ যেখানে সীতা-সাবিত্রী, সেখানে পুনর্বিবাহকে সকল বিধবা আজও পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। আচার-নিষ্ঠায়, সংসারে অনন্ত দুঃখ-দুর্দ্দশা সহ্য করিয়াও বিধবা নারী সংস্কার বশেই বৈধব্য ভোগ করেন। ইহার ফলে বহু ক্ষেত্রে ব্যভিচার ও পতন দেখা দিয়াছে। তবুও আজ বৈধব্য-প্রথার অবসান ঘটা সম্ভব হয় নাই।

একজন সোভিয়েট দেশ-প্রত্যাগত ব্যক্তি লিখিয়াছেন, তাঁহার সহিত ঐ স্থানের এক বিধবা যুবতীর আলাপ হয়। তিনি ঐ রমণীকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি আর কখনও বিবাহ করিবেন না?"

যুবতী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলেন,—"যত দিন আমার স্বামীর স্মৃতি, আমার মনে অম্লান থাকিবে, যত দিন তাঁহার চিন্তায় সময় অতিবাহিত করিতে পারিব, তত দিন বিবাহ করিব না। তাঁহার স্মৃতি লইয়াই জীবন কাটাইবার চেষ্টা করিব। তবে যদি ভবিষ্যতে কোন দিন প্রয়োজন বোধ করি, তবে অবশ্যই বিবাহ করিতে পারি।"

এই উক্তি হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইঁহারা কোনও সংস্কারাচ্ছন্ন নহেন। সংস্কার বশে, সমাজের শাসনে বাধ্য হইয়া সত্যকে গোপন করার চেষ্টা নাই। যাহা সত্য, যাহা স্পষ্ট, জীবনকে সেই স্বাভাবিক পথে চালিত করাই ইহার উদ্দেশ্য।

আমাদের জীবনে ও সমাজে এইরূপ সংস্কার-মুক্ত চিন্তাধারারই প্রয়োজন। সমস্ত ক্ষেত্রে, সকল অবস্থায় সংস্কার ত্যাগ করিয়া প্রকৃত সত্যের সম্মুখীন হইলেই সমাজ ও জাতির মঙ্গল। বর্ত্তমান পৃথিবীর সহিত সমতা রাখিয়া জাতিকে সমস্ত সংস্কার ত্যাগ করা উচিত।

সংস্কার-মুক্ত বলিষ্ঠমনা নর-নারীই আজ সমাজ ও দেশের পক্ষে সর্ব্বাধিক প্রয়োজন।

আমার কবিতা

অম্বালিকা পাল

মাটির দুহিতা তুমিই শ্যামলিমা কবিতা
আমার হৃদয় জুড়ে তোমার আসন পাতা
সবুজের মিতা তুমি বোধি পারমিতা সীতা
চোখে-মুখে ছড়িয়েছ আজকে বিবর্ণতা।

সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দুনিরীক্ষ্য ভাষার বজ্র-বাঁধনে
আবেগ হারিয়ে মত্তমত্তা আমার কবিতার মনে
রক্ত-রূপালী দীপ্ত দীপশিখা জ্বলে অকম্পিত
যদিও, তাহলে আমার কি লাভ আমার কি লাভ বলো ত?

শৃঙ্খলিত বেদনার উদ্বেলিত মৃত্যু-কাঁপনে
যদি উন্মন হই কোন এক অলক্ষ্য ভাবনে
ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে হৃদয়ে বিষণ্ণ ম্লানিমা তার
বিধৃত করো রাগ প্রশান্ত বন-সন্ধ্যার।.

শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ষার ঘনঘটা, উচ্ছ্বসিত উন্মাদ দ্বারকা নদের খরস্রোতে বিদ্যুতের খেলা; প্রকৃতির অট্টহাসি দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করছে; নির্বিকার সাধক বামা ক্ষ্যাপা শ্মশানের কোল বৃক্ষমূলে বসে আছেন; হঠাৎ ওপারের শ্মশানে উচ্চস্বরে ধ্বনিত হ'ল— 'বল হরি, হরিবোল!' সাধক সঙ্গে সঙ্গে আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠলেন, 'মা, আমার মা!' বহু দিন তাঁর দীনা জননীকে ভুলে রয়েছিলেন তিনি; বিশ্বমাতার প্রতীক তাঁর সেই জননী। আবাল্য জড়বুদ্ধি ক্ষ্যাপা ছেলে যে মায়ের কত বেদনার ধন, তা' আজ মর্মে মর্মে বুঝতে পারলেন সেই সর্বত্যাগী ক্ষ্যাপা সন্ন্যাসী। কথা বলতে কথা জড়িয়ে যায়, বাহ্য দৃষ্টিতে লোকের কথা বুঝতে পারেন না বলেই মনে হয়, এমনই জড়বুদ্ধি ছিলেন বাল্য থেকে এই বামা ক্ষ্যাপা। বোবা-কালাকে যেমন ইঙ্গিতে বোঝান হয়, ক্ষ্যাপাকে করুণার চোখে অনেকে তেমনি আকারে-ইঙ্গিতে বুঝতে চেষ্টা করতেন। রাজকুমারী সেই দুর্বহ যাতনা-ভার সয়েছেন ধরিত্রীর মত। জননীর প্রাণহীন শবদেহ বহন ক'রে বর্ষার দুর্যোগপূর্ণ রাত্রিতে শ্মশানে আনা হ'য়েছে; ক্ষ্যাপার অন্তরাত্মা যেন কেঁপে উঠল। যেন দিব্যদৃষ্টিতে তিনি তা' দেখতে পেয়েছেন; কোথায় ভেসে গেল সন্ন্যাসের কঠোর আবরণ! ক্ষ্যাপা আর্তনাদ করতে করতে নদীতে ঝাঁপ দিলেন। ওপার থেকে পাড়া-প্রতিবাসী শ্মশান-বন্ধুরা চীৎকার করে হায় হায় হায় করতে লাগল। ছোট ভাই রামু দাদাকে আর্তস্বরে বারণ করলে—'দাদা ফিরে যাও, এ কাল-স্রোতে কোথায় ভেসে যাবে!'

ক্ষ্যাপা ওপারে পৌঁছে বললেন, 'রামু, মাকে আমার বড়মায়ের ডাঙ্গায় মহাশ্মশানে শুইয়ে দেবো; এখানে নয়!' এই দুর্যোগের মধ্যে যে তা' সম্ভব নয়, পারাপারের নৌকা বা ডিঙ্গিও নেই, এ কথা পাগলকে বোঝায় কে? ছোট ভাই রামু ত কেঁদেই অস্থির। প্রতিবেশী সম্পর্কীয় গুরুজন বার বার নিষেধ করলেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে? মায়ের শবদেহ পিঠে ফেলে ঝাঁপ দিলে বামা ক্ষ্যাপা দ্বারকার জলে। দুর্যোগ থেমে গেল। মহাশ্মশানে চিতাগ্নি জ্বলে উঠল,— চিতাগ্নি প্রদক্ষিণ ক'রে ক্ষ্যাপা আর্তকণ্ঠে গায়:

> 'বিশ্ব জুড়ে মা রয়েছে,
> তবু কেন কাঁদিস রে মন?
> মা ছাড়া কি ছেলে থাকে
> বাঁচে কি রে একটি ক্ষণ?'

ক্ষ্যাপা সাধকের মাতৃশ্রাদ্ধ। ক'দিন আগে ছোট ভাই রামচন্দ্র দাদার কাছে গিয়েছিল; দাদা বলে দিয়েছেন, 'আমার মায়ের কাজ, দশ গাঁয়ে কেউ সেদিন অভুক্ত থাকবে না, তুমি সকলকে নেমন্তন্ন কর; ভোজের ব্যবস্থা আমিই করছি।' সরলচিত্ত রামু তাই করেছে; তাদের বাড়ীর সংলগ্ন মাঠ পরিষ্কার করা হয়েছে, অন্য কোন আয়োজন নেই।

একের পর এক ক'রে লোক আসছে; সাধু, সন্ন্যাসী বা আউলিয়ার ওপর এ দেশের লোকের অগাধ বিশ্বাস। তাঁরা অলৌকিক কাজ করতে পারেন। আট-দশখানা গ্রামের লোক জড় হয়েছে—ক্ষ্যাপার মাতৃশ্রাদ্ধে ভোজ খাবে। দীন-দরিদ্র পরিবারের ছেলে রামু; পাড়া-প্রতিবেশীর সহায়তায় কোন রকমে শ্রাদ্ধ হয়েছে, কিন্তু হাজার হাজার লোকের ভিড় আর হৈ-চৈ শুনে সে ভীত হয়ে গেল; পাড়ার দু'-চার জন মাতব্বর এসে দাঁড়ালেন, কিন্তু তাঁরাই বা করেন কি? লোকে বুঝেও বোঝে না; দ্বিপ্রহর অতীত-প্রায়; লোকে উত্তেজিত হয়ে উঠল!

'ঐ আসছে ক্ষ্যাপা' ব'লে চেঁচিয়ে উঠল সকলে। হাতে এক বাঁশের লাঠি—দিগম্বর, ভুঁড়িতে নিম্নাঙ্গ ঢাকা পড়েছে, মাথায় জটা, আজানুলম্বিত বাহু, মুখে তারা-নাম। সঙ্গে সঙ্গে ভারে ভারে লুচি, মিঠাই, দই, সন্দেশ প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য নিয়ে আসতে লাগল বহু লোক; এঁরা কারা? দূর-দূরান্তের ক্ষ্যাপা-ভক্ত সম্পন্ন ব্যক্তিরা ক্ষ্যাপার মাতৃশ্রাদ্ধের ভোজ পাঠিয়েছেন। প্রচুর ও পর্যাপ্ত সে ডালি; হাজার হাজার লোক তাতে পরিতৃপ্ত হ'তে পারে।

কিন্তু আর এক ফ্যাসাদ বাধল; সেই অগণিত নর-নারী মাঠে ভোজে বসেছে; এমন সময় আকাশে ঘনঘটা দেখা দিল; বিদ্যুৎ চমকাল; বর্ষণোন্মুখ বর্ষা রাক্ষসী-মূর্তিতে আকাশ-বাতাস অন্ধকার করে দিলে। উপস্থিত সকলে প্রমাদ গণল; গ্রামের মাতব্বরেরা 'হায় হায়' করে উঠল; রামু কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, 'দাদা, এখন উপায়?' ক্ষ্যাপা উত্তর দিলেন—'ও মেঘ নয়, আমার মা এসেছেন ভোজ দেখতে; ঐ দেখ, ঐ দেখ'—বলে চিৎকার করে সেই জায়গা মণ্ডলাকারে বেষ্টন ক'রে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে পালালেন; বৃষ্টি নামল; কিন্তু ক্ষ্যাপার সেই গণ্ডীর মধ্যে এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ল না। সকলে পরিতৃপ্ত হ'ল। ক্ষ্যাপার প্রার্থনা প্রকৃতি শুনেছেন, বিস্মিত ও স্তম্ভিত নর-নারী। 'জয় তারা, জয় তারা' শব্দে আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রে তুলল! ক্ষ্যাপা মাতৃদায়মুক্ত হ'লেন!

* * * *

দেশের সর্বত্র ক্ষ্যাপার কথা রটে গেল। রাজা, মহারাজা, জজ কিংবা ম্যাজিষ্ট্রেট আসেন ক্ষ্যাপাকে দেখতে। কি এক

অলৌকিক আকর্ষণ পাগলা ক্ষ্যাপার! বিভোর হ'য়ে থাকেন ভক্তদের দেওয়া মদ্যপানে। 'বাবা' আর 'শালা' এই হ'ল তাঁর মধুর সম্ভাষণ। রাজা বাবা, পুলিশ বাবা, দারোগা বাবা, সাহেব বাবা;—সকলেই বাবা! দূর-দূরান্ত থেকে আসে রোগী, কারো যক্ষ্মা, কারো কুষ্ঠ, কারো বা দুরন্ত হাঁপানি—ক্ষ্যাপা গালাগালি করেন, মড়ার হাড় ছুঁড়ে মারেন, পায়ে ধরলে মারেন লাথি! তাতে মহিমা আরো বেড়ে যায়। সংস্কারান্ধ লোকে ভাবে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল। নদাই হাড়ি কুষ্ঠরোগী; সে করে ক্ষ্যাপা-বাবার পরিচর্য্যা। তার হাতে জল খেতেও বাবার ঘৃণা হয় না; কুকুর-শেয়ালের সঙ্গে যিনি এক পাতে খেতে পারেন, মূত্র-বিষ্ঠায় যাঁর ভেদজ্ঞান নাই, তাঁর আর কুষ্ঠরোগীর প্রতি ঘৃণা থাকার কথা নয়! এমনি ছিল ক্ষ্যাপা বাবার উদার মহান আত্মভোলা ভাব!

রাজা-মহারাজা থেকে দীন-দরিদ্রের ভক্তির দানে শ্মশান-কুটীর ভ'রে উঠত; টাকা-পয়সা, সিকি-আধুলি জড় হ'ত প্রচুর; স্থানীয় ভক্তেরা কিনে আনলেন লোহার সিন্দুক; তাতে তা' জমা হ'তে লাগল; মহামূল্য শাল-আলোয়ান, কাপড়-চোপড়ের মূল্য ঐ শ্মশানে কতটুকু! দিগম্বর ক্ষ্যাপা বিলিয়ে দিতেন সব। পাণ্ডারা তাঁকে ভয়-ভক্তি করতেন প্রচুর। তাঁরাই হ'তেন লাভবান। পাণ্ডা নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ছিলেন ক্ষ্যাপা বাবার খুব অন্তরঙ্গ; কৌল-সাধনার উঁচুদরের সঙ্গীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ক্ষ্যাপা বাবা বেশি লোক-জন পছন্দ করতেন না; আপন খেয়ালে নিরিবিলি থাকতে ভালবাসতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট অমৃত বাবু সাহেব গোছের লোক; ক্ষ্যাপার প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি। হঠাৎ একদিন তিনি তারাপীঠে এসে ক্ষ্যাপা বাবাকে বললেন, 'এখানে বহু লোক-জন আসে, রাস্তা-ঘাট খারাপ, আপনার শুনেছি অনেক টাকা আছে।' ক্ষ্যাপা উত্তর দেন, 'হাঁ বাবা, অনেক আছে; ঐ সিন্দুকে।' দেখা গেল, সিন্দুকের অধিকাংশ টাকাই ক্ষ্যাপার অন্তরঙ্গ ভক্তদের এক জন অভাবে প'ড়ে খরচ করেছেন। সাহেব বললেন, 'টাকা না দিলে সেই ভক্তকে জেল খাটতে হবে।'

পাণ্ডাদিগের মধ্যে মান-অভিমানের উচ্ছ্বাস ব'য়ে গেল; তাঁদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগল; তারা-মায়ের ভোগারতি প্রায় বন্ধ হ'য়ে যায়! ভক্তকে রক্ষা করবার জন্যে ক্ষ্যাপা বাবা সিউড়ি চললেন পাল্কি চড়ে; ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজির হলেন দিগম্বর ভোলানাথ বামা ক্ষ্যাপা। 'সাহেব বাবা, আমার টাকা খরচ করেছে ত তোমার কি? তার অভাব, তাই খরচ করেছে, আমার লোককে ছেড়ে দাও।' অগত্যা সেই আদেশ পালন করতে হ'ল। এমনই আত্মভোলা ছিলেন ক্ষ্যাপা!

* * * *

'আমার চাবিকাঠি কোথা?' হারিয়ে গেছে চাবিকাঠি; হাওড়া ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে লোকের ভিড়ের মধ্যে কোমরে-বাঁধা চাবিকাঠি কখন যে খুলে পড়ে গেছে তার ঠিক নেই। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাদর আহ্বানে তারাপীঠ থেকে ক্ষ্যাপা বাবা এসেছেন কলকাতায়। বামা ক্ষ্যাপার নাম তখন ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সর্ব্বত্র ছড়িয়ে গেছে; সকলেই জানে, অপূর্ব্ব অলৌকিক শক্তি আছে এই পাগল সাধুর; তাঁর ইঙ্গিতে মাটিও সোনা হয়ে যায়; মৃত্যুপথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন এই আপনভোলা শঙ্কর-প্রতিম সন্ন্যাসী। সেই সাধু একটা চাবিকাঠির জন্যে বেঁকে বসলেন, কিছুতেই এক পা' নড়বেন না; 'তাই ত বাবা, আমার চাবিকাঠিটা কোথা গেল? কি হ'বে বাবা!' তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজেও চাবিকাঠি পাওয়া গেল না। ভক্তেরা বললেন, 'যাক্ এ চাবি, আমরা আপনাকে একটা ভাল চাবিকাঠি তৈরী ক'রে দেব।' কিন্তু কে শোনে তাঁদের কথা! মহারাজার কর্ম্মচারীদের আশ্বাস সত্ত্বেও হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে বসে পড়লেন বামা ক্ষ্যাপা; 'দে শালারা, আমার চাবিকাঠি এক্ষুনি দে।' মহারাজা যতীন্দ্রমোহনকে হাওড়া ষ্টেশনে আসতে হ'ল; তিনি চাবিকাঠির জন্য ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেন; ক্ষ্যাপা শান্ত হলেন।

কালীঘাটের কালী দেখবেন ক্ষ্যাপা, তারই জন্যে কলকাতায় এসেছেন; মহারাজা ঠাকুর করেছেন তার ব্যবস্থা। আলোর মালায় বিভূষিতা মহানগরী তাঁকে বিভোর ক'রে তোলে; এ যে মায়ের রাজরাজেশ্বরী বেশ! তাঁর স্নেহাতুরা শ্যামলা পল্লীজননীর কথা মনে পড়ে। রাত্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'আগুন আগুন' ব'লে অট্টহাসি হাসেন; মনে পড়ে বাল্যের কথা; চণ্ডীপুর আর তারাপুরে খড়ের ঘরে কিংবা বিচালির গাদায় প্রায়ই আগুন লাগত; দুষ্ট লোকের দুষমণীতেই হ'ত এ-সব কাণ্ড। কিন্তু যখন পর পর ক'দিন এ রকম ঘটনা ঘটতে লাগল, লোকে ভাবল এ ক্ষ্যাপার কাণ্ড! একদিন রাত্রে এই রকম গৃহদাহের সময়ে ক্ষ্যাপা আনমনে দাঁড়িয়ে আগুনের মধ্যে কার যেন লেলিহান মূর্ত্তি দেখছে তন্ময় হয়ে। পাড়ার লোকে বললে, 'এই যে ক্ষ্যাপা! ঐ বেটাই আগুন দিয়ে মজা দেখছে। দাও ওকে আগুনে ফেলে।' তাদের তাড়ায় ক্ষ্যাপা আগুনের মধ্য দিয়েই ছুটে গেল। তারা ভাবলে, ক্ষ্যাপা বুঝি পুড়ে মরল; এ কি হ'ল! জড়বুদ্ধি ক্ষ্যাপা ছেলেটা তাঁদের জন্যেই আজ জ্যান্ত পুড়ে মরল? 'হায় হায়' করে উঠল তারা; কিন্তু তা' নয়! খুঁজে খুঁজে জানা গেল, ক্ষ্যাপা অক্ষত-শরীরে তারাপীঠ শ্মশানে ব'সে তারা-নাম করছে। স্বপ্নের মত সেই স্মৃতি-ছবি ভেসে উঠল ক্ষ্যাপার চোখের সামনে।

কালীঘাটের ক্ষীণা গঙ্গা,—ক্ষ্যাপা তাতে ডুবের পর ডুব দিচ্ছে, বিরাম নেই! এদিকে কালীবাড়ীতে শশব্যস্ত হ'য়ে মহারাজার লোক-জন ও স্বয়ং মহারাজা অপেক্ষা করছেন। অন্ধ, আতুর, ধনী, গরীব, সাধু ও অসাধু অনেকেই ভিড় জমিয়েছে কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণে আর রাস্তায়, তারাপীঠের সেই ভৈরবকে দেখে জন্ম সার্থক করবে; সিক্ত দেহে বিলম্বিত জটাজুটধারী মহাদেব যেন মত্ত ভাবে ধরিত্রী কাঁপিয়ে চলেছেন; সেই ভীম, ঘোর প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখে নির্ব্বাক্ বিস্মিত জনমণ্ডলী শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে মস্তক নত করলে। মায়ের সামনে দাঁড়ালেন ক্ষ্যাপা। এই ত সেই মহিমময়ী কালী, কপালিনী, দশমহাবিদ্যার আদি, "করালবদনা, ভীষণাকৃতি, আলুলায়িত-কেশা এবং চতুর্ভুজা; তাঁহার গলদেশে মুণ্ডমালা এবং বাম ভাগের অধঃকরে সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড ও উর্দ্ধকরে খড়্গ; দক্ষিণ ভাগের অধোহস্তে অভয় ও উর্দ্ধহস্তে বরমুদ্রা; তিনি গাঢ় মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা ও দিগম্বরী; গলস্থিত মুণ্ডমালা হইতে শোণিতধারা বিগলিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিতেছে; তাঁহার কর্ণে দুইটি শবশিশু অলঙ্কার-রূপে বিরাজমান; ইহাতে দেবীর আকৃতি অতি ভীষণ হইয়াছে; দশনপংক্তি আরও ভীষণ। দেবীর স্তনযুগল স্থূল ও উচ্চ এবং

শবহস্তনির্মিত কাঞ্চী কটিদেশে শোভা পাইতেছে ; তিনি হাস্যবদনা. তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে বিলম্বিত শোণিতধারা মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল করিতেছে ; তাঁহার নাদ অতিশয় গভীর। তিনি নিরন্তর শ্মশানে অবস্থিতি করেন। নেত্রত্রয় নবোদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় সমুজ্জ্বল। দশনপংক্তি উন্নত ও বহির্গত। কেশপাশ দক্ষিণব্যাপী ও আলুলায়িত। শবরূপী শিব তাঁহার পদতলে, তাঁহার চারি দিকে শিবাগণ ভৈরব রব করিতেছে ; মহাকালের সহিত দেবী বিপরীত রত্যাসক্তা ; মুখকমল সুপ্রসন্ন ও হাস্যবিকশিত ;" সর্ব্বকামনা ও সমৃদ্ধিদাত্রী দেবী কালী সাধক বামা ক্ষ্যাপার সম্মুখে।

পাষাণী দেবী যেন বাক্‌মুখরিতা ; পাগল ক্ষ্যাপা আপন মনে দেবীর সঙ্গে কথা বলছেন, 'চল না মা, তোকে আমার তারা-মায়ের কাছে নিয়ে যাই ; এখানে ঐ বদ লোকগুলো ভিড় করে তোকে মেরে ফেলবে।' সাধক ক্ষ্যাপা কালীমূর্ত্তিকে জড়িয়ে ধরে তুলতে চান ; পূজারীরা সানুনয়ে বাধা দিলে। ক্ষ্যাপা উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন, 'থাক্ তোদের পাষাণী কেলো কালী, রাক্ষুসীকে আমি চাই নে ; তার চাইতে আমার তারা-মা ভাল !' বেরিয়ে এলেন বামা ক্ষ্যাপা।

পাথুরিয়াঘাটায় মহারাজা ঠাকুরের প্রাসাদে তিন দিন ছিলেন সাধক বামা ক্ষ্যাপা। একদিন সকালে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি ; কোথা গেলেন, অচেনা পথ-ঘাট, কলকাতার মত জায়গায় কোথা পাওয়া যায় এই ভোলানাথকে ? অনেক খোঁজাখুঁজির পর নিমতলার শ্মশানে বেওয়ারিশ মৃতদেহের স্তূপের ওপর শুয়ে রয়েছেন দেখা গেল। এমনই ছিল তাঁর প্রকৃতি ! শ্যামা-মায়ের এই দামাল ছেলের প্রতি তবু ছিল লোকের প্রবল আকর্ষণ ! মহারাজার অনুরোধে মূলাজোড় কালীবাড়ীতে ক্ষ্যাপা নিজে পূজো করতে স্বীকৃত হলেন। বেশ, পূজোর আসনে বসেই তিনি কোশার সমস্ত জল পান করলেন, নিজের মাথায় আর আশে-পাশে লোকের ওপর ফুল ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এবার কাঁসর-ঘণ্টা বাজাও।' যাঁরা অন্তরঙ্গ তাঁরাই বুঝলেন, এ পূজোর রহস্য। অন্তরবাসিনী মাতৃশক্তিকে উপোসী রেখে বাহ্যপূজা চলে না ; বিশ্বব্যাপী মাতৃমূর্ত্তি নানারূপে বিরাজিতা। মানুষ, পশু, ইট, পাথর—বিশ্বের প্রতি ধূলিকণায় তিনি রয়েছেন ; উপবাসী থাকলে সেই অন্তরবাসিনীকেই কষ্ট দেওয়া হয়। সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান জগতে ভেদাভেদ-জ্ঞানহীন সাধক ছাড়া এ মন্ত্র দান করবে কে ?

সংসার ত্যাগ করতে চাও, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে চাও, কিন্তু সংসার ছেড়ে যাবে কোথা ? কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের প্রকৃত অর্থ কি, তা কেউ বোঝে না। সংসার-স্রোত কি বন্ধ করা বিশ্ব-প্রকৃতির উদ্দেশ্য ? বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, যীশু কেউই সে স্রোত বন্ধ করতে পারেননি। বিশ্ব-প্রকৃতির উদ্দেশ্যই সংসার-জীবন ; নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ ভাবে কামিনী-কাঞ্চনে লোভ না রেখে সংসার-ভোগই সত্যিকারের পথ। কামিনীকে ত্যাগ করতে চাও ? কি ক'রে পারবে ? কামিনী তোমার সম্মুখে নানা রূপে বিরাজিতা,—মাতা, ভগিনী, পত্নী, কন্যা ও সখী। এরা ত পথের কণ্টক নয় ? যে মায়ের অতুল ত্যাগে ও সর্ব্বংসহা বেদনা-সহ্যের জন্য তোমার জন্ম, আজ তুমি-আমি বেঁচে আছি, তাঁকে এক কথায় উড়িয়ে দিতে চাও ? কামিনীর সঙ্গে কামের সম্পর্ক কতখানি, কতটুকু ? মহান্ সংসার-ব্রতে সে-ই তোমার সঙ্গিনী। শিব সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হলেও গৃহিণী সন্তানবতী উমার স্বামী ; তিনিও গৃহস্থ। হর-পার্ব্বতীই গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শ। লোকে এসে তাঁর চেলা হতে যায় ; 'সংসার ভাল লাগে না বাবা, তোমার চরণে আশ্রয় দাও।' 'দূর হ, দূর হ', বলে মড়ার হাড় ছুঁড়ে মারেন ক্ষ্যাপা। 'সংসার ভাল লাগে না, তুই কোথায় আছিস রে বেদো শালা ! গর্ভধারিণী মাকে গিয়ে পূজো কর ; তাতেই মুক্তি পাবি। সব শালা, সংসার পাড়বে ; শিব কি আমার উমা মাকে ছেড়ে দিয়েছে রে শালা ! মদ খাবি, আর মজা মারবি, তাই না ; বিষ্ঠা খেতে পারবি, মরার মাংস খেতে পারবি ? তাহ'লে আয় !' ভয়ার্ত্ত লোক ফিরে যায়। তারই মধ্যে তারানাথ নামে এক ভদ্র যুবক তাঁর কৃপালাভ করেন ; তারানাথ পরে ক্ষেপাজী তারানাথ বা তারা ক্ষ্যাপা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তারানাথ মাঝে মাঝে তারাপীঠে আসতেন ; তাঁকে দেখলে ক্ষ্যাপার আর আনন্দের সীমা থাকত না।

দেবতার সঙ্গে নিজে একাত্ম না হ'লে দেবপূজার কোন সার্থকতা থাকে না ; সাধক ও দেবতার মিলনই হ'ল পূজা। আত্মা আর পরমাত্মার সংযোগই হ'ল যোগ। ধ্যান-জপে মানুষ আরাধ্যতে তন্ময় হ'তে পারে। সংসারী লোকের পক্ষে আত্ম-স্বজন ও পরিবেশের মধ্যে আরাধ্যকে দেখে সংসার-ধর্ম্ম পালন ক'রে যেতে হবে ; এটাই ছিল ক্ষ্যাপার মূল কথা। মুক্তি পাওয়া যায় না ; নির্ব্বাণ-মুক্তি শুধু কথার কথা। বিশ্বশক্তির মধ্যে যে কোনরূপে বিলীন হয়ে তাঁর লীলার সহায়তা করতে হবে। বামা ক্ষ্যাপার গালাগাল ও উপদেশের মধ্যে ফুটে উঠত এ সব কথা। অন্তরঙ্গ ভক্ত ছাড়া কেউ এ কথা জানে না।

'মায়াই ত যত নষ্টের মূল' ব'লে ওঠে এক পণ্ডিত ভক্ত। উত্তেজিত হয়ে উঠেন ক্ষ্যাপা, 'ওরে বেদো শালা, মায়া ত্যাগ করবি কি ! মায়াই ত মা। যার মায়া নাই, সে ত রাক্ষস, মায়া না থাকলে জগৎই থাকে না ! মায়া থাকলেই মহামায়ার কাজ ভাল হবে ; যেদিন মায়াকে মা জ্ঞান করতে পারবি, সেদিন তোর জন্ম সার্থক হবে। তুই কি বলতে চাস্ তোর মায়ের স্নেহমায়া কি মিথ্যে ? ছেলের রোগ-দুঃখে কেঁদে ভেসে যাচ্ছে তোর দুঃখিনী মা ; সে কি মিথ্যে হ'য়ে গেল ; না, না, না, তোর মা-ও মিথ্যে নয়, বউও মিথ্যে নয়, সকলই সত্য ; মহামায়ার লীলা তা'হলে বন্ধ হয়ে যেতো। ওদের মধ্য দিয়েই মহামায়া তোকে আমাকে আর বিশ্বচরাচরকে ধরে রয়েছেন।' 'আমরা পাপী-তাপী কত অকাজ-কুকাজ করি, আমরা কি তা' বুঝতে পারি, বাবা ?' বলে ওঠে ভক্ত। 'কিসের পাপ রে বাবা, পাপকে পাপ মনে করে তা' করিস কেন ? তোকে বেঁচে থাকতে হ'লে যা করার প্রয়োজন মহামায়াই তা' করাচ্ছেন ; তুই করবার কে ? মাকে সর্ব্বত্র দেখ, পাপ তোকে স্পর্শ করবে না। কামিনী-কাঞ্চন ভোগের জন্যই সংসার ; আমার মা-ই কামিনী।'

[ক্রমশঃ।

খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরীতে
মধুসূদনের আবক্ষ মর্মর-মূর্তি

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ
—শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

ব্যাণ্ডেল চার্চ
—অলক দে

কাশীর গঙ্গাতীরে
—তুলসী সেনগুপ্ত

বেকার মেয়ে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ডি. এচ. লরেন্স

শুক্রবার রাত্রিটা ছিল রুটি সেঁকার আর বাজার করার রাত্রি। বাড়ির নিয়ম ছিল যে, পল বাড়িতে থেকে রুটি সেঁকবে। বাড়িতে বসে বসে ছবি আঁকতে কিম্বা পড়তে পলের খুব ভাল লাগত। বিশেষ ক'রে ছবি আঁকার দিকে তার খুব ঝোঁক ছিল। অ্যানি শুক্রবার রাত্রে রোজই বাইরে বেড়িয়ে বেড়াত। আর্থার তার নিজের মনে খেলা করত। কাজেই পলকে একা একাই বাড়ি থাকতে হ'ত।

মিসেস মোরেল বাজার করতে ভালবাসতেন। পাহাড়ের উপর ছোট বাজারটি। চার দিক থেকে চারটি রাস্তা এসে এখানে মিলেছে। চৌমাথার উপর অনেকগুলো সাজানো দোকান। আশ-পাশের গ্রাম থেকে ঠেলাগাড়ি করে সব জিনিসপত্র আসত। বাজারের ভেতরে মেয়েদের ভিড়। আর রাস্তাগুলোতে পুরুষের ভিড়। যে দিকে চোখ যায় সর্ব্বত্রই মানুষ। যে মেয়েলোকটি লেস্ বিক্রি করত তার সঙ্গে মিসেস্ মোরেল প্রায় রোজই ঝগড়া করতেন। যে পুরুষটি ফল বিক্রি করত সে বোকা হলেও তার দিকে মিসেস মোরেলের খুব টান ছিল। কিন্তু তার স্ত্রীকে তিনি দেখতে পারতেন না। মাছওয়ালার সঙ্গে তিনি হেসে হেসে কথা বলতেন। যে লোকটা বাসনপত্র বিক্রি করত তার কাছে পারতপক্ষে তিনি যেতেন না। আর গেলেও খুব গম্ভীর হয়ে ভদ্রভাবে কথা বলতেন। একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঐ ছোট ডিসটির দাম কত হবে?' লোকটা বললে, 'আপনি যদি নেন তবে সাত পেন্স'—

—'ধন্যবাদ!'

মিসেস মোরেল ডিসটা নামিয়ে রেখে চলে গেলেন, কিন্তু ডিসটা না নিয়ে যেতেও তাঁর ইচ্ছে করছিল না। মেঝের উপর যেখানে জিনিসপত্রগুলো ছড়ানো ছিল, সেদিক দিয়ে আবার তিনি হেঁটে গেলেন—একবার আড়-চোখে চাইলেন ডিসটার দিকে, কিন্তু ভাণ করলেন যেন তিনি অন্য দিকে চেয়ে আছেন।

মিসেস মোরেল দেখতে খুব ছোটখাট ছিলেন। তাঁর পরনে কালো পোষাক আর একটা টুপি। টুপিটা তিন বছরের পুরোন। অ্যানি এটা নিয়ে প্রায়ই খুঁত-খুঁত করত। মাকে বলত, 'মা, এই পুরোন টুপিটা তুমি এইবার ছাড়।' মা রাগ ক'রে উত্তর দিতেন, 'তাহ'লে কি পরবো?—তাছাড়া এটা ত' বেশ ভালই রয়েছে।' প্রথমে টুপিটাতে বেশ ফুল ছিল, কিন্তু এখন শুধু একটা কাল লেস্ দিয়ে বাঁধা থাকত। পল বলত, 'ভারী বিশ্রী দেখাচ্ছে মা—এটাকে একটু সারিয়ে নিতে পার না?' মিসেস মোরেল ধমক দিয়ে বলতেন, 'বখামী করিসনি।' ব'লে কোন দিকে দৃকপাত না ক'রে আবার কাল টুপির ফিতেগুলো টেনে গলার নিচে বাঁধতে থাকতেন।•••

আবার তিনি ডিসটার দিকে চাইলেন। এইবার বাসনওয়ালা তাঁকে দেখে ফেলল। হঠাৎ সে চীৎকার করে উঠল—'পাঁচ পেন্স হলে নেবেন কি?' মিসেস মোরেল চমকে উঠলেন, একবার ভাবলেন নেবেন না—আবার কি মনে করে নিচু হয়ে ডিসটা তুলে নিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, নিচ্ছি।'

—'ওঃ, আজ আমার কি সৌভাগ্য! অবশ্য আপনাকে কিছু দিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা, আপনি হয়ত নিয়ে গিয়ে সেটাতে থুথু ফেলবেন।'

মিসেস মোরেল মুখ ভার করে পাঁচ পেন্স দিলেন তাকে। বললেন 'তুমি আমাকে দিচ্ছ কেমন ত' বুঝলুম না। পাঁচ পেন্সে যদি দেবার ইচ্ছে তোমার না থাকত, তা'হলে কি আর দিতে তুমি?' বাসনওয়ালা বিরক্ত হয়ে বলল, 'আর বলবেন না—এই এলোমেলো বাজারের মধ্যে কি আর কাউকে কিছু দিয়ে দেবার ভাগ্যি হয়?'

—'তা ঠিক', মিসেস মোরেল বললেন, 'সময় কখনো খারাপ হয় কখনো ভাল।' বাসনওয়ালার উপর তাঁর আর তখন রাগ ছিল না। আজ থেকে তাঁদের মৈত্রী। এবার বাসনগুলো ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখবার সাহস হ'ল তাঁর, কাজেই মনে মনে খুশি হয়ে উঠলেন তিনি।

পল বাড়িতে বসে অপেক্ষা করছিল মায়ের জন্য। মায়ের বাড়ি আসার সময়টিকে সে ভালবাসে। মায়ের এমন সুন্দর রূপ আর কখনো দেখা যায় না—শ্রান্ত অথচ বিজয়ের গর্ব্বে উৎফুল্ল, হাতে জিনিসপত্রের ভারী বোঝা অথচ অন্তরে সার্থকতার উল্লাস। ঢুকবার সময় মায়ের দ্রুত লঘু পদক্ষেপ তার কানে গেল, ছবি থেকে মুখ তুলে সে চাইল এদিকে।

দরজা থেকে তার দিকে চেয়ে মা হাসলেন, হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, 'ওঃ!'

পল তার আঁকবার তুলি ফেলে লাফিয়ে উঠল, চীৎকার করে বলল, 'ও কী মা, তুমি যে বোঝার চাপে মারা যাবে!'

মা দীর্ঘনিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, 'সত্যি রে! মুখপোড়া মেয়েটা কোথায়—সে বলেছিল বাজারে যাবে। ওঃ, এত বোঝা কি আমার আনার সাধ্যি!'

মা তাঁর দড়ির ব্যাগ আর জিনিসপত্রগুলো টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। উনুনের কাছে গিয়ে তিনি বললেন, 'সব রুটি হয়ে গেছে ত'?'

—'না মা, শেষ রুটিটা সেঁকা হচ্ছে এবার। তোমাকে দেখতে হবে না, আমার মনে আছে।'

উনুনের মুখটা বন্ধ ক'রে দিয়ে মা এসে বললেন, 'ওই বাসনওলাটার কথা যে বলেছিলাম—ওকে যত খারাপ ভেবেছিলাম তত খারাপ নয় কিন্তু।'

'তাই নাকি ?'

মায়ের দিকেই কান ছিল ছেলের। মা তাঁর মাথার কালো ঢাকনাটা খুলে ফেললেন।

'হ্যাঁ। আমার মনে হয় লোকটা খুব বেশী টাকা-পয়সা রোজগার করতে পারে না। আজ-কাল অবশ্য সবাই বলে ও-কথা। যাক গে, আমার মনে হয়, সেই জন্যেই ওর মেজাজ খারাপ থাকে।'

—'হ্যাঁ মা, ও রকম হলে আমার মেজাজও খারাপ থাকত।' পল বলল।

'তা হলেই দেখ্, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আজ এই জিনিসটা সে দিলে—কত দাম নিয়েছে বল্ দেখি ?' ছেঁড়া কাগজের বাণ্ডিল থেকে ডিসটাকে বার ক'রে মা খুশি হয়ে সেটাকে দেখতে লাগলেন।

পল বলল, 'দেখি মা, কেমন।'

দু'জনে তাঁরা ডিসটার দিকে চেয়ে গর্ব্বে আর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

পল বলল, 'কেমন সুন্দর ফুল-আঁকা ডিসটাতে, দেখতে চমৎকার !'

—'হ্যাঁ, তুমি যে চা ভেজাবার বাসনটা আমাকে এনে দিয়েছিলে, সেইটার কথা আমার মনে পড়ে গেল।'

'সেটার দাম ত' এক শিলিং তিন পেন্স।' পল বললে।

'আর এটা পাঁচ পেন্স।'

'এ বড্ড কম দাম, মা !'

'তবে বলছি কি,—প্রায় বিনা দামেই নিয়ে এসেছি মনে হচ্ছে ! অবশ্য আমার অনেক খরচ হয়ে গিয়েছিল, এর বেশী দিয়ে কেনবার আমার সাধ্যও ছিল না। তাছাড়া ও যদি পাঁচ পেন্সে দিতে না পারত, তা'হলে কি আর দিত ?'

'তা ঠিক।' পল বললে, 'তা'হলে কি আর ও দিত ?' দু'জনে দু'জনকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। বাসনওয়ালাকে ঠকানো হয়েছে এই ভেবে দু'জনেই কুণ্ঠিত।

পল বলল, 'ডিসটাতে আমরা ফল সেদ্ধ রাখতে পারব।'

—'কিম্বা কাষ্টার্ড (ডিম আর দুধ দিয়ে তৈরি), না হলে ফলের আচার।' মা যোগ করলেন।

—'অথবা লেটুস শাক আর মূলো।'

'যাক, রুটিটার কথা ভুলে যাসনি যেন।' মা তাড়া দিয়ে উঠলেন। তাঁর কণ্ঠ আনন্দে উচ্ছল।

পল উনুনের মুখটা খুলে রুটিটা টিপে দেখলে। বললে, 'হয়ে গেছে, মা !' রুটিটা মায়ের কাছে নিয়ে এল সে। মাও পরীক্ষা করে দেখলেন। বললেন, 'ঠিকই হয়েছে।' তারপর বাজারের ব্যাগটা খুলতে খুলতে বললেন, 'আমি বড্ড উড়নচণ্ডী হয়ে গেছি রে, কী যে উপায় হবে আমার ! আমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।'

পল ব্যস্ত হয়ে লাফিয়ে গেল মায়ের কাছে, মা আবার কিসে খরচ করলেন দেখবার জন্য। মা আর এক দফা খবরের কাগজ খুলে দেখালেন,—কতকগুলো প্যান্জী আর লাল ডেইজী ফুলের চারা। বললেন, 'এর দাম—চার পেন্স।'

—'কী সস্তা !' পল চীৎকার করে উঠল।

—'সস্তা ত,' কিন্তু এ হপ্তায় এত খরচ হয়ে গেল, এমন বেশী খরচ হলে কুলোয় না।'

—'কিন্তু দেখতে কী সুন্দর !' পল আবার উচ্ছসিত হয়ে উঠল। তার আনন্দের এই ছোঁয়াচ মাকেও লাগল, তিনিও বলে উঠলেন, 'সত্যি, ভারী সুন্দর ! দেখ, এই হলদে ফুলটার দিকে চেয়ে দেখ—সুন্দর, ঠিক যেন বুড়ো মানুষের মুখের মত।'

'ঠিক মা, ঠিক।' পল বলল ফুলটা শুঁকতে শুঁকতে: 'আর গন্ধও কিন্তু চমৎকার। কিন্তু একটু যেন ময়লা ফুলটা।'

বলতে বলতে পল দৌড়ে গেল ভাঁড়ারঘরে, একটা ভেজা ফ্লানেল এনে ফুলটাকে আস্তে আস্তে ধুয়ে দিতে লাগল।

'এবার দেখ মা, ভেজা ফুলটাকে দেখ।'

'দেখেছি রে।' খুশিতে উদ্বেল হয়ে মা বললেন।

স্কারগিল ষ্ট্রীটের ছেলে-মেয়েরা নিজেদের একটু স্বতন্ত্র, একটু উঁচুদরের লোক বলে মনে করত। যে পাড়ায় মোরেলরা থাকত, সে পাড়ায় ছেলে-মেয়ের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। কাজেই যে ক'টি ছেলে-মেয়ে ছিল তাদের মধ্যে ছিল গভীর মিল। ছেলে আর মেয়ে সবাই মিলে খেলা করত। ছেলেদের হুড়োহুড়ি ধস্তাধস্তির মধ্যে মেয়েরা যোগ দিত, আবার ছেলেরাও এসে জুটত মেয়েদের নাচের খেলায়, মেয়েদের দলে, আর তাদের নানা রকম কল্পনা-বিলাসে।

শীতের সন্ধ্যায় যদি খুব বেশী ভিজে বাতাস না ছড়াত তা'হলে বাইরে বেরিয়ে খেলা করতে পল, অ্যানি, আর্থার, এরা সবাই খুব ভালবাসত। খনির সব লোক বাড়িতে ফিরে আসা অবধি তারা ঘরে থাকত। তারপর রাত্রি হ'ত গভীর অন্ধকার। রাস্তাগুলো হয়ে উঠত জনশূন্য। তখন তারা গলায় বুকে আলোয়ান জড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে যেত। ওভারকোট পরবার রেওয়াজ ছিল না খনি-মজুরদের মধ্যে। পথ-ঘাট নিবিড় অন্ধকার, দূরে রাত্রির সমস্ত অন্ধকার যেন নিচু হয়ে একটা গর্ত্তের মত রচনা করেছে। শুধু যেখানে মিনটন-এর খনিগুলো, সেখানে ছোট এক সারি আলো আর উলটো দিকে অনেক দূরে দেখা যায় সেলবী'র আলোগুলো। দূরের ছোট ছোট আলোগুলোর জন্যে অন্ধকারটাকে মনে হয় যেন আরও বেশীদূর ছড়িয়ে গেছে। মেঠো রাস্তার ও-মাথায় একটি শুধু বাতির পোষ্ট। ছেলে-মেয়ে ক'টি ভয়ে ভয়ে চাইত সেদিকে। যদি সেই ছোট্ট আলোটুকুর নিচে একটিও লোক না থাকত, তা'হলে বাস্তবিকই ছেলে দুটি বড় নিঃসঙ্গ মনে করত নিজেদের। বাতিটার নিচে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত দিয়ে তারা অন্ধকারের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াত, তাদের চোখ থাকত অন্ধকার-ঢাকা বাড়িগুলোর দিকে, চেয়ে চেয়ে ভারী বিশ্রী লাগত তাদের। হঠাৎ ছোট কোটের নিচে একটি লম্বা ফ্রক এগিয়ে আসত, দৌড়ে আসত লম্বা পা ফেলে একটা মেয়ে।

'কোথায় গো, বিলি কোথায়, এডি কোথায় আর তোমাদের অ্যানিই বা কোথায় ?'

—'জানি না।'

নাই বা এল তারা—এবার তারা নিজেরাই তিন জন। আলোর পোষ্টটাকে ঘিরে তারা খেলতে শুরু করত। ক্রমে ক্রমে অন্য সবাই এসে উপস্থিত হ'ত হাঁক-ডাক করতে করতে। তাদের

খেলা ভয়ঙ্কর রকম জমে উঠত। এদিকে শুধু এই একটি গ্যাসপোষ্ট। এর পেছনে বিরাট অন্ধকারের রহস্য-ঘেরা রাজ্য—যেন সমস্ত রাত্রিটা জুড়ে রেখেছে সেই জায়গাটুকুকে। সামনের দিকে চওড়া একটা অন্ধকার রাস্তা পাহাড়ের বুক বেয়ে চলে গেছে। ক্বচিৎ কোন লোক এই রাস্তা দিয়ে এসে সরু পথ বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মাঠের মধ্যে। দশ-বারো গজ যেতে যেতেই রাত্রির অন্ধকার তাদের গ্রাস করেছে। ছেলে-মেয়েদের খেলা চলতে থাকে সমানে।

এদিকটা একটু দূরে থাকাতে এ পাড়ার সব ছেলে-মেয়ে নিজেদের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হলে তাদের খেলাটাই মাঠে মারা যেত। আর্থারের আবার একটুতেই রাগ, আর বিলি তার চেয়েও বেশী ছিঁচকাঁদুনে। তখন পল দাঁড়াত আর্থারের পক্ষে, তার সঙ্গে যেত অ্যালিস্; আর বিলির পক্ষে যেত এমি আর এডি। তখন এই ছ'জনের মধ্যে চলত মারামারি, পরস্পরকে তারা ভীষণ ভাবে ঘৃণা করত, তারপর ভয়ে ছুটে তারা বাড়ি পালাত।

এক দিনের কথা পল-এর মনে পড়ে। দু'পক্ষের মধ্যে এমনি ভীষণ যুদ্ধ হয়ে যাবার পর পল চেয়ে দেখল আকাশে বড় লাল চাঁদ উঠেছে—ধীরে ধীরে যেন একটা বিশালকায় পাখীর মত পাহাড়ের উপরের ফাঁকা রাস্তাটার মাঝখান দিয়ে সে মাথা ঠেলে উঠছিল। পল-এর তখন মনে পড়ল বাইবেলের কথা, সেই যেখানে লেখা আছে চাঁদটা রক্ত হয়ে যাবে। পরের দিন সে গিয়ে বিলির সঙ্গে যেচে ভাব করল। ভাব করবার পর আবার চার দিকের অন্ধকারের মধ্যে ল্যাম্পপোষ্টটির নিচে তাদের হই-চই, হুটোপাটি, খেলাধূলো নির্বিবাদে চলত। বাইরের ঘর থেকে মিসেস মোরেল শুনতে পেতেন, খেলতে খেলতে ছেলে-মেয়েগুলো ছড়া কাটছে:

'স্পেন দেশের চামড়া দিয়ে তৈরি আমার জুতো,
মোজাগুলো তৈরি হ'ল—রেশম দিয়ে সুতো।
আঙটিপরা আঙুল আমার একটিও বাদ না।
শুনলে অবাক হবে, আমি দুধ দিয়ে ধুই গা।'

রাতের অন্ধকার চার দিকে—তার মধ্যে ওরা খেলায় মত্ত। তাদের ছড়ার একটানা সুর শুনে মনে হয় যেন অন্ধকার রাতের কোন উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণীর গান। তাদের গান শুনে মায়েরও মন চঞ্চল হয়ে উঠত। কেন তা তিনি বুঝে উঠতে পারতেন না। বুঝতে পারতেন শুধু যখন ওরা রাত আটটায় ঘরে ফিরত, তখন ওদের গাল উত্তেজনায় রক্তিম, চোখ চকচক করছে আর ওদের কথাবার্তায় অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য।

স্কারগিল ষ্ট্রীটের বাড়িটা চার দিক খোলা। তাদের খুব ভাল লাগত—বাড়িটার উপর থেকে নিচের দিকে চাইলে পৃথিবীটাকে মনে হ'ত একটা ডিসের মত। গরমের দিনে সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির মেয়েরা মাঠের বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে গল্প করত। পশ্চিম দিকে চেয়ে তারা সূর্য্যাস্তের শোভা দেখত—দেখত ডার্বীসায়ারের পাহাড়গুলো অনেক দূর অবধি টকটকে লাল হয়ে উঠেছে।

গরমের দিন খনিতে কোন দিনই পুরোপুরি কাজ হ'ত না। মিসেস মোরেলের পাশের বাড়িতে থাকতেন মিসেস্ ডেকিন। ঘরের কারপেট রোদে দিতে বাইরে গিয়ে তিনি দেখতেন অনেক লোক পাহাড় বেয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠছে। দেখেই তিনি বুঝতে পারতেন, এরা খনির লোক। মিসেস ডেকিন ছিলেন লম্বা, রোগা, তাঁর মুখে মোটেই শ্রী ছিল না। পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে তিনি অপেক্ষা করতে থাকতেন—খনির মজুররা পাহাড় বেয়ে উঠে আসত, তাঁকে দেখে তাদের মনে জাগত শঙ্কা। তখন বেলা এগারোটা। গ্রীষ্মকালে সকাল বেলা যে পাতলা কুয়াশা কালো পাহাড়ের মত পাহাড়ের উপর ঝুলতে থাকে তা তখনও দূর হয়ে যায়নি। প্রথম মানুষটি বেড়ার কাছে এসে ঠেলা দিয়ে দরজাটা খুলল। মিসেস ডেকিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হে ছুটি হয়ে গেল তোমাদের?'—'হ্যাঁ'—মিসেস ডেকিন বিদ্রূপ করে বললেন, 'সত্যই এ বড় খারাপ, এত সকালে তারা তোমাদের ছেড়ে দেয় কেন?' মজুরটি বললে, 'সত্যি যা বলেছেন!' মিসেস ডেকিন বললেন, 'তোমরাও বাপু পালাতে পারলে বাঁচ।' লোকটি হেঁটে চলে গেল। মিসেস ডেকিন তাঁর উঠানে গিয়ে দেখলেন মিসেস মোরেল ছাই নিয়ে যাচ্ছেন ছাইগাদায় ফেলতে। তিনি চীৎকার করে বললেন, 'শুনেছেন মিসেস মোরেল, মিণ্টনের খনিতে ছুটি হয়ে গেছে। মিসেস মোরেলের মেজাজ খারাপ হ'ল। তিনি বললেন, 'দেখুন ত' কী বিরক্তি!'

'সত্যই বলছি এই মাত্র আমি একটি মজুরকে দেখে এলাম।' মিসেস মোরেল বলে উঠলেন, 'খরচ বাঁচাবার চমৎকার রাস্তা পেয়েছে ওরা।' বিরক্ত হয়ে দু'জনই ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

দূরে খনির মজুররা দল বেঁধে বাড়ি ফিরছিল। একটু আগে তারা কাজে গিয়েছে—এখনো তাদের মুখে ঝুল-কালি লাগেনি। বাড়ি ফিরে যেতে মোরেলের ভাল লাগছিল না। আজকের এ সকাল বেলার রোদ তার খুব ভাল লাগছিল। কাজ করতে গিয়েছিল সে—কাজ না করে ফিরে আসতে হ'ল বলে তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠেছিল।

সে বাড়ি ঢুকছে এমন সময় মিসেস মোরেল তাকে দেখলেন, বললেন, 'এখুনিই ফিরে এলে যে?'

মোরেল গর্জ্জে উঠল, 'ফেরা না ফেরা কি আমার হাতে?'

'—কিন্তু আমার যে দুপুর বেলার রান্না অর্দ্ধেকও হয়নি।'

—'তবে আর কি? আমি যে খাবারটুকু নিয়ে গিছলাম তাই বসে তাই খেতে থাকি।' তার মন ভাল ছিল না। নিজেকে কেমন অকর্ম্মণ্য অপদার্থ বলে মনে হচ্ছিল।

ছেলে-মেয়েরা ইস্কুল থেকে ফিরে দেখল বাবা বাড়িতে বসে খনির ফেরৎ ময়লা আর শুকনো মাখন-রুটি চিবিয়ে খাচ্ছে। দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। আর্থার জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, তার খনির খাবার এখন কেন খাচ্ছে মা? মোরেল ফস্ ক'রে বলে উঠল, 'না খেলে কি আর রক্ষে থাকত? জোর ক'রে খাওয়ানো হ'ত আমাকে।'

মিসেস মোরেল ধমক দিয়ে উঠলেন, 'আহা, কী কথার ছিরি!'

মোরেল বলল, 'তবে কি জিনিসটা ফেলে দেব নাকি? আমি ত' তোমাদের মত অমন উড়নচণ্ডী নই? তোমাদের মত এমন জিনিস নষ্ট করি না আমি। খনির মধ্যে যদি এক টুকরো রুটি পড়ে যায় তা'হলেও ময়লা থেকে তুলে নিয়ে আমি সেটা খাই—তবু ফেলে দিই না।'

পল বলল, 'ইঁদুরগুলো ত' খেয়ে নেবে। নষ্ট হবে কেন ?'

—'এই চমৎকার রুটি-মাখন কি ইঁদুরের জন্যে?' মোরেল জবাব দিল, 'এ ময়লাই হোক আর যাই হোক, এ আমি পেটে খিদে থাকতে নষ্ট হতে দিতে পারি না।'

এবার মিসেস মোরেল কথা বললেন। বললেন, 'ওই রুটি-মাখনটুকু না হয় ইঁদুরেই খেল, তুমি তোমার মদের খরচটা দিয়ে ওই ক্ষতিটা পুরণ ক'রে দিলেই ত' পারো।'

'পারি বৈ কি।' মোরেল অসহিষ্ণু চীৎকার ক'রে উঠল।

সে বার শরৎকালটা তাদের কাটল খুব দুরবস্থায়। উইলিয়ম সবে লণ্ডনে গিয়েছে, সে এখানে থাকতে যা রোজগার করত, তার প্রায় সবই দিত বাড়ির খরচের জন্যে মায়ের হাতে—এবার ওই টাকা ক'টির অভাবে সংসার চালাতে গিয়ে মা বিব্রত হয়ে পড়লেন। লণ্ডনে গিয়েও সে দু'এক বার দশ শিলিং করে পাঠিয়েছে, কিন্তু প্রথমবার যাওয়ার পরই নানা জিনিস কিনতে হ'ল বলে বেশীর ভাগই তার নিজের রাখতে হ'ত। সপ্তাহে একবার নিয়মিত তার চিঠি আসত। মায়ের কাছে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু লিখত—তার লণ্ডনের জীবনের কথা, নতুন বন্ধু-বান্ধবদের কথা, সে একজনকে ইংরেজী শিখিয়ে তার বদলে তার কাছ থেকে শিখছে ফরাসী ভাষা সেই কথা, তাছাড়া লণ্ডন শহরটা তার কেমন লাগছে সব কিছু লিখত সে মাকে। তার চিঠি পেয়ে মায়ের আবার মনে হতে লাগল, যেন সে তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে যায়নি—বাড়িতে থাকতে যেমন ছিল, ঠিক ততখানিই নিকটে সে রয়েছে। মা-ও প্রতি সপ্তাহেই চিঠি লিখতেন ছেলের কাছে—তাঁর চিঠিগুলো সাদাসিধে, কিন্তু তাতে থাকত বুদ্ধিমত্তার ছাপ। সারা দিন বাড়ি-ঘর-দোর সাফ করতে করতে মায়ের শুধু ছেলের কথাই মনে পড়ত। লণ্ডনে গিয়ে সে ভালই করবে। সে যেন তাঁর কাছে আগের কালের সেই বীর যোদ্ধা—তাঁর তুষ্টিসাধনের জন্যেই সে এগিয়ে গেছে জীবনের যুদ্ধে।

[ক্রমশঃ

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ফসল কাটার গান

[শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু'র "Harvest Hymn" কবিতার ভাবানুবাদ]

পুরুষগণ :—

মৃণালিনী-নাথ ঢালো গো প্রভাতে অকৃপণ আলো ভুবন ছেয়ে,
সোনার ফসল ফলে যে দেবতা তোমার সোনার কিরণ পেয়ে।
তোমারি প্রসাদে ভুবন-মাঝারে বীজ-বোনা দেব সফল হয়,
তোমারি প্রসাদে ক্ষেতের শস্য বেড়ে ওঠে জিনি মরণভয়।
স্তবগান গাহি পূজিতে তোমারে আনিয়াছি গাঁথি কুসুম-হার,
এনেছি অর্ঘ্য সোনালি ধান্য—এনেছি সোনার ফলের ভার।
উজল বরণ কোমল কিরণে দিবস-নাথ হে নামিয়া আসি—
লও পূজা লও,—গাহি জয়গান মন্দিরা আর বাজায়ে বাঁশি।

রামধনু-সখা সোনার ফসল লভি যে তোমার প্রসাদ ধরি,—
হে মহাশকতি, অকৃপণ দানে ছেয়েছ' সকল ভুবন ভ'রি।
তব করুণায় সিঞ্চিত হয় কর্ষিত ভূমি সুধার ধারে,
তব করুণায় লভি এ ধরায় চির-ঈপ্সিত শস্যভারে।
কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া হৃদয় তোমারে পূজিতে গাহি হে গান,
এনেছি কুসুম-মালিকা, এনেছি অঞ্জলি ভরি সোনার ধান।
বরষার জলধারায় বহিয়া হে বরুণদেব নামিয়া আসি—
লও পূজা লও,—গাহি জয়গান মন্দিরা আর বাজায়ে বাঁশি।

রমণীগণ :—

সকল জীবের ধাত্রী, জননী বসুন্ধরা গো করুণাময়ী—
লইয়া ধান্য পুষ্পাভরণে সজ্জিতা তুমি এসো গো অয়ি!
তোমারি বক্ষ-ক্ষরিত-সুধায় জননী ক্ষুধার শান্তি হয়,
মহৈশ্বর্য্য-প্রসবিনী সব সম্পদই তব গর্ভে রয়।
এনেছি পূজিতে কুসুমের মালা, এনেছি ভকতি ভরিয়া প্রাণ,
এসেছি জননি অঞ্জলি দিতে বহিয়া তোমারি দয়ার দান।
সকল সুখের উৎস জননী বসুমতী তুমি বস' গো আসি—
লও পূজা লও,—গাহি জয়গান মন্দিরা আর বাজায়ে বাঁশি।

পুরুষ ও রমণীগণ :—

নিখিল জীবের জীবন-দেবতা আছ ব্যাপী ক্ষিতি মরুৎ ব্যোম্,
চির-শাশ্বত হে পরম-পিতা প্রকাশ-অতীত হে মহা "ওম্"।
যে বীজ-বপনে ফলে গো ফসল, যে সোনার ধানে দু'হাত ভ'রি,
যে পরাণ-মাঝে লভি আনন্দ তোমার প্রসাদ গ্রহণ করি;
সেই বীজ, সেই ক্ষেতের ফসল, সেই দেহ, সেই মন ও প্রাণ,
এনেছি দেবতা চরণে তোমার—পূজায় তোমারি করিতে দান।
পরম দয়াল, ভীষণ ভয়াল দুখের তুফান নাশিতে এলে,
হালখানি ধরি এ জীবন-তরী বাঁচায়ো তোমার করুণা ঢেলে।
হে মহাজীবন, করুণাসিন্ধু, হে ব্রহ্ম—তুমি বস গো আসি—
লও পূজা লও,—গাহি জয়গান মন্দিরা আর বাজায়ে বাঁশি!

অনুবাদ—শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী।

আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ

যুদ্ধ-পূর্ব যুগে বাঙালীকে কদাচিৎ দেখা যেত বিদেশীয় পোষাকে। অবশ্য কিছু সংখ্যক চৌরঙ্গী অঞ্চলের বাঙালী বাসিন্দা, দক্ষিণের সোসাইটিওয়ালারা আর ব্যারিষ্টার, উকিল, ডাক্তার থেকে রেলের গার্ড অবধি কার্য্যকালে লংস পরিধান করতেন। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে আপনি কলকাতার যে কোন রাস্তা দিয়েই হাঁটুন না কেন, চায়না টাউন থেকে বেলেঘাটা সে যে স্থানই হোক, কোথাও আপনি পাবেন না পোষাকের মধ্যে কোনও একতা। লুঙ্গী, পায়জামা ঢিলে আর আঁট, ধুতি, কারও কোঁচা দিয়ে পরা, কারও মালকোঁচা দিয়ে, কেউ পেছনে প্রজাপতি বসিয়ে যাত্রাদলের কেষ্ট ঠাকুরের মত কাপড়ের খুঁট কোমর জড়িয়ে ঘুরিয়ে বেঁধেছেন, কেউ আবার অতি সাবধানী ধুতি পরেছেন ফেরতা দিয়ে, প্যান্টেরও কত বাহার—কোনটা আমেরিকান কায়দায় পেটের নীচে নামিয়ে পরা, কোনটা ইংরেজী কায়দায় আঁটসাট। তবু মেয়েদের খানিকটা অন্ততঃ একতা আছে এ বিষয়ে। ড্রেস করে শাড়ীপরা মেয়েই আপনার চোখে পড়বে
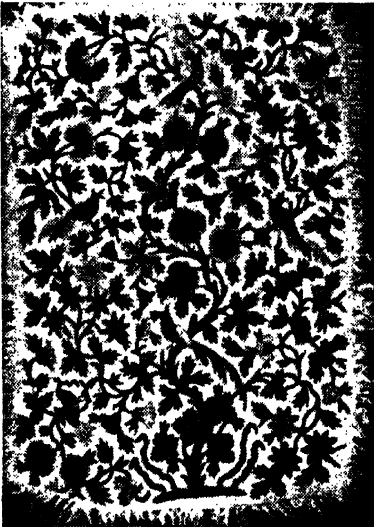
নীম্‌দা সাধারণ)—দাম ২১৲ টাকা থেকে ৬´×৪´)

ক্যালকাটা কেমিক্যালের প্রস্তুত (বাম থেকে ডাইনে) তিলল; লা-ই-জু; ক্যাষ্টরল; কোকোনল; ভৃঙ্গল; সিলট্রেস। এগুলি মাথার তেল, শ্যাম্পু এবং লাইমজ্যুস হেয়ার-ক্রীম ব্যতীত আর কিছুই নয়।

হামেশা কলকাতার পথে-ঘাটে, ক্বচিৎ কখনো কোন বাঙালী মেয়ে শাড়ী পরেন পার্শী ধরণে বা মাড়োয়ারী কি পশ্চিমা মেয়েদের মত দুখানি শাড়ীকে একত্র করে। কিন্তু এদিকে পাঞ্জাবী পোষাক পরার হিড়িক মেয়েদের মধ্যে খুব দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। তবে শালওয়ার পরার মত উপযুক্ত চেহারা বাঙালী মেয়ের প্রায়ই নেই, এটা একটা আশার কথা। সরকার আদেশ দিয়েছেন সাদা-মাটা পোষাক পরে আসতে হবে দপ্তরে। কী পোষাক হবে তার একটা হদিশও দিয়েছেন। এই পোষাক-বিভ্রাটের মধ্যে সমস্ত বাঙালী-সমাজ আজ হাবুডুবু খাচ্ছেন। আমেরিকানদের আছে লন্ডসের সঙ্গে টাই। তাই তাদের জাতীয় পোষাক। ইউরোপীয়ানদের মত জ্যাকেটের সঙ্গে কোট, টাই মেলাবার মত যথেষ্ট অবসর তাদের নেই। উত্তরে ইউরোপবাসী বলবেন, ওদের কালচার নেই। কিন্তু সহজ হওয়ার মধ্যেই আছে কালচারের পরিচয়। সমগ্র বাঙালী জাতির আজ সময় এসেছে বিশেষ করে এই জাতীয় পোষাক সম্বন্ধে ভাববার। দোকানদারগণ এ সম্পর্কে চিন্তা করুন, সরকার বাহাদুর নির্দেশ দিন, উপদেশ দিন দেশের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা!

হোটেলে, রেস্তোরাঁয় কাগজের পাত্র

সকালে, বিকালে, দুপুরে আর রাতে চার বারই কি আর কেউ আপনাকে প্রত্যহ নিমন্ত্রণ করে খাওয়াচ্ছে? সেই গাঁটের পয়সা খরচা করেই আপনাকে সওদা করতে হবে, বাজারে যেতে হবে, যেতে হবে মশলা, তৈজসপত্রের দোকানে, তবেই না? সুতরাং খাদ্যদ্রব্যের কথাও পড়ে যাচ্ছে 'কেনাকাটা' দপ্তরের মধ্যেই। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আমাদের নানা রকম আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে। এ বারে আমাদের বক্তব্য হোটেল ও রেস্তোরাঁয় খাদ্য-পরিবেশনের পাত্রগুলি সম্পর্কে। হোটেল কলকাতায় আছে শতাধিক। বৈঠকখানা বাজারের পাইস হোটেল থেকে চৌরঙ্গীর ফারপো অবধি। রেস্তোরাঁ আছে কয়েক শত। পথে-ঘাটে ছড়িয়ে রয়েছে কত সাঙ্গুভেলী, দিলখুসা, আবার রয়েছে ফ্লিওস, মনিকোও। কিন্তু কলকাতার পথে-ঘাটে ছড়িয়ে রয়েছে হাজার হাজার রোগগ্রস্ত মানুষ, এ কথাও আপনি জানেন। যে কাপটি করে এই মাত্র কোন হোটেল থেকে আপনি খেয়ে এলেন এক কাপ চা কি কফি, জানেন কি কত শত লোক এর আগে খেয়ে গেছে ওই একই কাপে আপনারই মত মুখ লাগিয়ে? যে কাঁটা-চামচেতে আজ আপনি লাঞ্চ সেরে এলেন, এক বারও ভেবে দেখেছেন কি এর আগে কত লোক আপনারই মত লাঞ্চ সেরে গেছে ওতে? খুব কম রেস্তোরাঁতেই খাবার পর কাপ, ডিস বা প্লেট গরম জলে সোডা-সাবান ইত্যাদি দিয়ে ফুটিয়ে সাফ করা হয়। কাঁটা-চামচ ভাল করে পরিষ্কার প্রায়ই হয় না। যক্ষ্মা, সিফিলিস, গণোরিয়া প্রভৃতি রোগ প্রায়ই কাপ-ডিসের মধ্য দিয়ে সংক্রামিত হয়। যে কোনও রেষ্টুরেন্ট থেকে একটি কাপ নিয়ে এসে খুব পাওয়ারফুল মাইক্রোসকোপের তলে ফেলে পরীক্ষা করে দেখুন, আর আপনার বাইরে কোথাও খেতে প্রবৃত্তি হবে না। এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য, অচিরে কলকাতার সমস্ত হোটেল আর রেস্তোরাঁয় কাগজের পাত্র ব্যবহৃত হোক। দামে এ সস্তা এবং রুচিসঙ্গত। সমস্ত আমেরিকা রোগের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশেই বা তা সম্ভব হবে না কেন?

কুটীর-শিল্পকে রক্ষার কথা দিয়ে রক্ষা করা হচ্ছে না সরকার থেকে

কোট টাই আর কলারওয়ালা এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের হোমরা-চোমরা হাজারী দেড়-হাজারী অফিসাররা কুটীর-শিল্পকে রক্ষা করবার আশ্বাস বছর বছর দিয়ে আসছেন আজ সাত বছর ধরে। অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে। কিন্তু কিছু হল কি? সস্তায় মিলে-তৈরী সুতো তাঁতীর ঘরে ঘরে পৌঁছবার কোন বন্দোবস্ত আজও হল না কেন? তাঁতের কাপড় বিক্রীর জন্য মিলওয়ালাদের ট্যাক্স করার অর্থ হল দরিদ্র জনসাধারণের ওপরেই করভার চাপান। না হলে কাপড়ের ওপর এক্সাইজ ডিউটি, সেলস্ ট্যাক্স ইত্যাদি চাপাবার অর্থ কি? কিন্তু তাঁতশিল্পই কি দেশের একমাত্র কুটীর-শিল্প? রেশমশিল্প, বাসন-কোশন, বেতের কাজ, মাটীর কাজ, পাটের তৈরী নানা সামগ্রী, মাদুর, দড়ি ইত্যাদি রক্ষার চেষ্টা সরকারের নেই কেন? এই বিশ্বব্যাপী মন্দার বাজারে বাংলার গ্রাম থেকে সমস্ত কুটীর-শিল্পগুলিকে উচ্ছেদ হতে দিয়ে গ্রামের মানুষগুলিকে সহরে টেনে এনে দারিদ্র্যের বোঝা আরও বাড়িয়ে লাভ কি? গত ৩১শে মার্চ সরকারী অর্থনৈতিক বৎসর শেষ হবার মাত্র কয়েক দিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কুটীর-শিল্পের উন্নতি বাবদ কিছু অর্থসাহায্য করা হয়। কিন্তু এই অসময়োচিত সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই অর্থের সামান্যই মাত্র খরচা করতে পেরেছেন। তাও খরচা করেছেন বেশীর ভাগই প্রচার-দপ্তর থেকে কয়েকখানি পুস্তিকা (অবশ্য কুটীর-শিল্প সংক্রান্ত) বার করে। পথে পথে তাঁতবস্ত্র ক্রয় সপ্তাহের উদ্বোধন উপলক্ষে পোষ্টারে কত সহস্র টাকা ব্যয় হল কে জানে? কিন্তু যাদের জন্য এ কাজ তাদের কপালে ছিটেফোঁটাও পড়লো কি?

বাঙলা দেশে কলকাতার দোকানের প্যাকিং

কলকাতার দোকান, তা কাপড়েরই হোক আর গয়নারই হোক, খাবারেরই হোক আর পুস্তকেরই হোক, কোনও জিনিষ যখন আপনি সেখান থেকে কেনেন, তখন কি দিয়ে বেঁধে দেন সেই জিনিসপত্র আপনার দোকানদার? খবরের কাগজ যা প্রায়ই নোংরা, খাতার ব্যবহৃত পাতা, বড় জোর একটা ঠোঙা যার গায়ে লেখা আছে সেই দোকানের নাম। দোকানের নাম তো লেখা আছে বাইরের
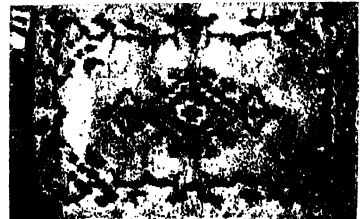
স্কেলিটন (বেনারসী)—দাম ১২০৲ টাকা (৯´×৬)

সাইনবোর্ডেও'। লেখা আছে কত নম্বর আর কি ষ্ট্রীট সেটা, লেখা আছে হয়ত ঘটা করে কিসের দোকান, হয়ত ক্ষুদে অক্ষরে লেখা আছে প্রোপ্রাইটরের নামও। কিন্তু কি হল তাতে! ঠোঙ্গার গায়ে— বাঁশপাতার কাগজে না হয় লেখাই হল দোকানের নাম, কিন্তু দোকানদার ভেবে দেখেছেন কি, কতখানি প্রচার-মূল্য আছে আপনার এই প্যাকিংয়ের? কোন ভদ্রলোক হয়ত আপনার দোকান থেকে জিনিষপত্র কিনে নিয়ে যাচ্ছেন মফঃস্বলে নিজের গ্রামে। পথে বাসে, ট্রামে, ট্রেনে সর্বত্রই সাবধানে কোলের ওপর ভদ্রলোক রেখেছেন আপনার দোকান থেকে কেনা দ্রব্যটি। সঙ্গে সঙ্গে প্রচারিত হয়ে চলেছে আপনার দোকানের নাম প্যাকিংয়ের মারফৎ। তাই আমরা বলছি স্রেফ খবরের কাগজ, বাঁশপাতার কাগজের ঠোঙ্গা ইত্যাদি ব্যবহার না করে, রং-বেরঙের কাগজ ব্যবহার করুন, যা দামে সস্তা। কিছু উন্নততর ড্রইং দিয়ে, ভাল আর্টিষ্টকে দিয়ে লেটারিং করিয়ে নিন আপনার দোকানের নাম। দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টান। তাতে আপনার লাভ বই লোকসান হবে না। খদ্দেররাও সন্তুষ্ট হবেন।

ঘর সাজানো আর সাজানো ঘর

বাংলা দেশে ঘর-সাজানোর রেওয়াজ নতুন নয় কিছু। প্রাচীন কাল থেকেই চিত্রকর বাঙালী গৃহস্থের ঘরের দেওয়ালে এঁকে গেছে কত ছবি। বাংলার কালীঘাট, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের পট আজ রীতিমত গবেষণার বস্তু। কিন্তু চেহারার পরিবর্তন হয়েছে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে। আজকের যুগে আর সেই পুরোনো চিত্রকর নেই। এখন গৃহস্বামীর রুচি হল, বার্ড করবে ফ্লুর, ল্যাজারাম দেবে ফার্নিচার, ফিলিপস দেবে ফ্লুরেসেণ্ট বাতি। সঙ্গে থাকবে সোফা, সেটি আর ঘর-জোড়া থাকবে কার্পেট। দেওয়ালে কালো রিবণ দিয়ে টাঙানো থাকবে দিশী বিদেশী আর্টিষ্টের খানকয় ছবি রেডিওগ্রামের ফ্রেমে বাঁধানো; 'ভেস'এ থাকবে রজনীগন্ধার ঝাড়, দরবারী ধূপ জ্বলবে ধূপদানে শ্বেতপাথরের টেবিলে, পাশে একান্ত অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকবে একখানা ইলাষ্ট্রেটেড উইকলী আর বড় জোর একটি বুদ্ধমূর্ত্তি প্রায়ই মাটী, সাদাপাথর বা ব্রোঞ্জের। কার্পেট, যার আলোক-চিত্র সঙ্গে প্রকাশিত হল তা দিয়েছেন ইষ্টার্ণ কার্পেটস। কার্পেট আমাদের ভারতবর্ষেই বেনারাস, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে তৈরী হয় এবং তা যে কোন অংশেই বিদেশী কার্পেটগুলি থেকে নিকৃষ্ট নয়, এ কথা আপনি জানেন কি? ভারতীয় কার্পেট আভিজাত্যে কোন অংশেই হীন নয় এবং তা ক্রয় করে আপনি রুচিরই পরিচয় দেবেন। ভারতীয় দ্রব্য দামেও কম হবে অথচ জিনিষও খারাপ হবে না। ভারতীয় কার্পেটও বিভিন্ন রকমের রয়েছে। দাম ষাট-সত্তর টাকা থেকে সুরু করে পাঁচ, ছ'শ টাকা অবধি। নানা ষ্টেপলিন্, মডার্ন নানা ভ্যারাইটি, নানা রকম দামও।

বাঙলা দেশের কেশ-প্রসাধন

বাঙলা দেশের গন্ধদ্রব্য পৃথিবী বিখ্যাত। গাছের ফুলের নির্যাস থেকে বাঙালী ইদানীং যে-ধরণের 'এসেন্স' বা তেল প্রস্তুত করছে তাতে আমাদের প্রত্যেকের গর্ব্ববোধ করা উচিত। বাঙালীর প্রসাধন ব্যবসাও দস্তুরমত বিদেশী ব্যবসার সঙ্গে প্রতিযোগিতা বাধিয়েছে। দেশী প্রসাধন ব্যবসায়ীদের মধ্যে বেঙ্গল কেমিক্যাল, টাটা, শর্ম্মা-ব্যানার্জী, সি, কে, সেন, ক্যালকাটা কেমিক্যাল, কোহিনুর রেডিয়ম, কে, ডোড় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান আজকের দিনে কেউ আর অস্বীকার করতে পারবেন না। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় ক্যালকাটা কেমিক্যালের প্রস্তুত কেশ-প্রসাধনের মধ্যে কয়েক ধরণের তেল এবং লাইম-জুশের শিশির চিত্র মুদ্রিত করলাম। ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত দ্রব্যাদির সচিত্র পরিচয় প্রকাশের ইচ্ছা আছে।

মানুষের সকল অঙ্গের মধ্যে মাথার মূল্যই হয়তো সমধিক, যে জন্য প্রত্যেকের পক্ষেই মাথার জন্য পরিচর্য্যা প্রয়োজন। আমরাও সেই প্রয়োজন বোধে কেশ-প্রসাধনের জন্য বিশেষ মাথা ঘামিয়ে কেনা কাটার মধ্যে তাকে স্থান দিয়েছি।

ময়ূরাক্ষী

জগন্নাথ বিশ্বাস

শান্ত হও ময়ূরাক্ষী! ময়ূরের মত দুই চোখ
তৃষ্ণার্ত করুণ তব, আষাঢ়ের নব মেঘলোক
কখন রচিবে স্বপ্ন ঘন হয়ে পাহাড়-চূড়ায়
তার স্বপ্ন দেখে। আজ ধূ-ধূ প্রান্ত বসন উড়ায়
শুকনো বালির ঝড়ে।

আজ এই শীর্ণা রূপ দেখে,
গো-যান চক্রের রেখা, পথচারী চিহ্ন যায় রেখে,
কে বলো কল্পনা করে?—রুদ্ররূপে অতি অকস্মাৎ
বর্ষায় তোমার তীব্র প্রচণ্ড আঘাত।

আজ তুমি আঘাতের অস্ত্রগুলো করো সংবরণ,
যুগান্তের শক্তি তব কাল-অন্তে অমর মরণ
যেচে নিক সাধ করে। রূঢ় রাঢ় বীরভূম-প্রান্তরে
আঘাতের অস্ত্রগুলো ফসলের রূপে আসে ফিরে
শ্যামল সবুজে সেজে। আনো আনো, পাতো দুই হাত;
ময়ূরাক্ষী, শান্তি নাও। স্নেহ-অন্ধ হেনো না আঘাত।

তাঁদের একটি কথা মনে রাখা উচিত যে প্রকৃত উপকারী কেশ তৈল নির্বাচন না করলে ও যথাযথ প্রণালীতে ব্যবহার না করলে উপকার পাওয়া যায় না। স্নানের আগে মিনিট পাঁচেক চুলের ভেতর ঘষে ঘষে তেল মাখা প্রয়োজন এবং স্নানের পর পরিষ্কার করে মাথা মুছে চুল শুকিয়ে ফেলা ও সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করে মাথা ঘষা বিধেয়।

স্নানের সময় ক্যালকেমিকোর মহাভৃঙ্গরাজ তৈল "ভৃঙ্গল" ব্যবহারে মাথা স্নিগ্ধ রাখে, স্নায়ু শান্তি করে, রক্তের চাপ কমায় এবং চুল ঘন ও কৃষ্ণবর্ণ করে। বৈকালিক কেশ প্রসাধনে সুগন্ধি বিশুদ্ধ ক্যাষ্টর অয়েল—"ক্যাষ্টরল" ব্যবহারে কেশগুচ্ছের উন্নতি হয়, কেশমূল দৃঢ় হয় ও মধুর সুগন্ধে মন প্রফুল্ল করে।

এই প্রণালীতে দৈনন্দিন পরিচর্য্যায় দু'টি কেশ তৈল কিছুদিন ব্যবহার করলে উপকারিতা বুঝতে পারবেন। সপ্তাহে একবার করে সুগন্ধি শ্যাম্পু "সিল্‌ট্রেস" দিয়ে মাথা ও চুল পরিষ্কার করা উচিত। ভৃঙ্গল ও ক্যাষ্টরল এর যে কোন একটিতেও সুফল পাওয়া যায়, তবে দুটিই ব্যবহার করলে কেশের উন্নতি দ্রুত ও নিশ্চিত হয়।

ভৃঙ্গল ✿ ক্যাষ্টরল

সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ তৈল ● সুবাসিত ক্যাষ্টর অয়েল

বিস্তৃত প্রণালী জানিতে "কেশপরিচর্য্যা" পুস্তিকার জন্য লিখুন।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, লিঃ কলিকাতা-২৯

H.P.S

জর্জ-মাইকেল

কয়েক দিন পরে মোদক কিস্‌লিঙকে দেখতে গেছে তার ষ্টুডিয়োতে, আসলে সেটি চিলের ছাতের ছোট্ট ঘর, তবে লাল-আড্রিয়ানপোল টাঙানো, যেন প্রাচীন কালের ইতালীয় গির্জা। কিস্‌লিঙ বলল—"ছবিতে আজকাল কি যে হচ্ছে ভাই, সব কথাই তোমাকে আমার বলাই ভালো। প্রথমতঃ প্রতিটি রাস্তার মোড়ে, প্রাচীর-পত্রেও সস্তা কিউবিজম, এমন কি গৃহস্থ বাড়িতেও। পাউরুটির দোকান তামাক রাখার কৌটার মত দেখায়। এর জন্য রাশিয়ানরাই দায়ী, তবু তারা জার্মানদের কাছ থেকে আধুনিকত্বের হাতে-খড়ি নিয়েছে। বের্লিনে দুশো হাজার রাশিয়ান আছে; ওরা সারা য়ুরোপ ঘুরে বেড়িয়েছে, পেট্রোগ্রাড, মস্কৌ, কনষ্টানটিনেপোল, ইতালী পারী, বের্লিন। অধিকাংশ থাকে ডানজিগে। স্বাধীন নগরী—মুক্ত শহর। আর নিঃসন্দেহে ওরা পেট্রোগ্রাড, বিশেষতঃ বুর্জোয়ারা, বের্লিনের পশ্চিম প্রান্তটা একেবারে একচেটে করে নিয়েছে। এমন এক-একটা রাস্তা আছে, যেমন মেৎসষ্ট্রাসে, মনে হবে যে শতকরা একশটাই রাশিয়ান।"

"কিন্তু শিল্পী ?"

"রুশীয় চিত্রশিল্পী ? ওরা একটা পরিপ্রেক্ষিত ধরে সেটা ন্যাতার মত নিঙড়ে ফেলে দেবে, স্যুতিনে যেমন করে। ওরা সংখ্যায় প্রায় একশ' জন, প্রেসকো, রেপিন, কেইসলার থেকে সুরু করে ম্যুনিকের সর্বাধুনিক কিউবিষ্ট পর্যন্ত। তুমিই দেখো,—সমানস্থরখাতে রোমক আর্ট। এর একমাত্র সাফাই এই যে, এরই নাম নাকি ফ্যাসান। আমি পুনি, টুট্‌চেরস্‌কো, ট্যাটগেন, এক্‌সটার, গন্‌টচারোভা ও লারিওনভের কথা বলছি। এ ছাড়া পেনটিং-এর মত আছে আর কি! কিংবা সব আসছে ফ্রান্স থেকে, দু'একটা মারী লরেন্সীয় ছবি যেন হংস মধ্যে বক।"

"কিন্তু জার্মানরা ?"

"আমরা জাতীয়তাবাদী নই,—কেমন হে ? কিন্তু দেখো, স্বকীয় জাতের হাত থেকে নিষ্কৃতিও নেই। আর্টের আবার জাত-গোত্র কি ? নেই তাও খারাপ, অন্ততঃ ছবি-বিক্রেতাদের পক্ষে ত' বটে। কিন্তু চিত্রশিল্পীদের—সব রকম ইস্তাহার, যত তোমার মনস্তত্ত্বমূলক নভেল আছে, তার ভিতর জার্মাণীর ছবি হল সমগ্র জাতীয় জীবনের মানসিক আকৃতির সূচীপত্র। সব দেশের মত ওরা এখন উন্মাদের মত লড়ছে, মরিয়া হয়ে লড়ছে বটে—কিন্তু ভারসাম্য বজায় রাখতে পারছে না। কোকোসকা কিংবা ওদের একস্‌প্রেসনিষ্ট দলের (অভিব্যক্তিবাদী) সবাইকে দেখো, সকলে যেন উগ্র খামখেয়ালী—যাক গে এখন। তুমি বোল্লাণ্ডারের নাম শুনেছ, যে দানবটা অতিকায় দানবীয় ছবি আঁকে, তার ছবি যাদুঘরে রাখার উপযুক্ত, সামুদ্রিক ঝিনুকের ঢঙে দ্বীপদের মত অতিকায় সব আকৃতি, বিরাট স্তনাগ্রচূড়া তার গায়ে নীল শিরা, কালো আঙুরের মত গা বেয়ে কি ব্যাঙের ছাতা গজাচ্ছে ?" আবার চীৎকার করে বলে, "সংসারে এই অতিকায়ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নেই"—লোকটার মানসিক অবস্থা এমনই হয়ে উঠেছে যে যাকে বিয়ে করেছে সে মেয়েটির তিনটি স্তন, মুখটা কিসে যে খেয়ে গেছে জানি না—আবার বলে কি জানো—"বিপরীত সুরের দিক দিয়ে কি বিচিত্র মূর্তি !"—এখন বোঝো ভাই।

"তবে, ওরা বেশীর ভাগ ঘোরতর ভাবে জার্মাণ-বিদ্বেষী,—ওদের আসল ঝোঁক হল নিয়মসঙ্গত পদ্ধতি থেকে সরে আসা। 'মারণে'র প্রথম সংঘর্ষে এই বিধিসঙ্গত পদ্ধতি দেউলিয়া হয়ে গেছে,—কিন্তু জাতীয় প্রতিভা ত' টিঁকে আছে, তাই তারা বিধিসঙ্গত প্রথায় নিয়মমাফিক পথ থেকে সরে আসছে। আর তার ফল ! কোকোস্‌কা'র আঁকা একটা 'একস্‌প্রেসনিষ্ট' (অভিব্যক্তিমূলক) ক্যান্‌ভাসের দিকে তাকিয়ে দেখ। একেবারে স্বেচ্ছাকৃতি তালহীনতা, অতিরঞ্জন, জার্মাণ একগুঁয়েমির চূড়ান্ত প্রকাশ। এক কোণে বোনারের আঁকা দু'পয়সা দামের ছবি, আর এক পাশে এক ফ্রাঁ দামের ভান গগ, ওদিকে সীজানের এক বেয়াড়া নকল, এদিকে সেগোনজাকের ঢঙে-একটা ধ্যাবড়া রঙের ছবি,—তার ওপর লীজারের রীতিতে আঁকা অক্ষর চারিদিকে ছড়ানো। তাই ভাই, অতঃপর আগের চেয়ে বেশী করে আমাদের কিউব আঁকড়ে বসে থাকতে হবে। আরো স্পষ্ট করে এবং খাঁটি ভাবে কিউব (চতুষ্কোণ ছবি) আঁকতে হবে। কিউব ছাড়া আর মুক্তি নেই, যা আছে তা যথেচ্ছাচার, অরাজকতা,—একেবারে তপ্ত কটাহ থেকে জ্বলন্ত অনলে,—এই বোমবারায় আমার জীবনে এক বিরাট শিক্ষা হয়েছে ভাই !"

মোদক উঠে দাঁড়ায়, এই প্রথম বার আপনাকে অতি স্বার্থপর মনে হয় তার। নিজের তীর্থদর্শন সম্পর্কে একটি কথাও সে বলে না, এই তীর্থযাত্রায় নরক নয় সে স্বর্গের একাংশ দেখতে পেয়েছে। কিস্‌লিঙের বাসা থেকে বেরিয়ে সে লুক্‌সেনবার্গের দিকে দৌড়ে এক প্রশস্ত ময়দানের বেঞ্চে গিয়ে বসে পড়ে, বিরাট গাছের তলায় বেঞ্চটি পাতা রয়েছে। সামনেই এক বিরাট প্রতি-মূর্তির ভগ্নাবশেষ দাঁড়িয়ে আছে, তার ওপর থেকে ফোয়ারা বেয়ে জল পড়ছে, সেই জলে রোদ লেগে রামধনু রঙ সৃষ্টি হয়েছে, ছোট ছেলের মত মনের আনন্দে সোজা সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে মোদক।

সেই ভগ্নস্তূপ ক্রমে একটা সিসিলিয় বা ক্রীটান মূর্তির আকার নেয়, হারিকট ক্রজের বেণী, আদিম ঢঙ-এ ধীরে ধীরে একটা রূপ গ্রহণ করে—যেন সেই সূর্যালোকে সেই মুখ হাসিতে ভরে উঠেছে, ওর কাছে তাদের আনন্দময় গোপন কথা বলে যায়। সূর্যালোর মূর্তিটিকে সোনার রঙে ঘিরে ফেলে, তার পর চোখ চাইতেই মোদক দেখে একটা ঘন-নীল লোহিত বর্ণের পোষাকে ঢাকা মানটেনা বা কারপাচিওর ছায়ামূর্তি।

"সত্যি,—র‍্যাফায়েল হল মুক্ত কারপাচিও,—কিন্তু জ্যামিতিক ঢঙ হলেও কারপাচিও তাঁর ভার্জিন বা রাজনটীদের সাজিয়েছেন সাড়ম্বর আয়োজনে। আর্ট-ই আনন্দ, আর্টাৎ পরতরং নহি,—আর্ট-ই সম্পদ, রেখার সম্পদ, রঙের সম্পদ, পশ্চাৎপটের সম্পদ সবই সমান। ধূসর সমতল ভূমির কি প্রয়োজন, জয় সোনালি রোমের জয়! বিত্ত-বৈভবহীন আকাশে কি প্রয়োজন ? চাই নীল, উজ্জ্বল, প্রাণোচ্ছল আকাশ ! সম্পদের জয় হোক্‌ !"

হাস্‌লো মোদক! জীবনে কদাচিৎ এই হাসি সে হাস্‌তে পারে। বেঞ্চের গায়ে মাথাটি হেলিয়ে দিয়েছে, বাদাম গাছের আন্দোলিত শাখা যেন ওর চোখে মায়া-কাজল পরিয়ে দেয়,—এই বাদাম গাছের স্বচ্ছ পাতার ফাঁকে সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ সোনালি মেঘ দেখা যায়। দোদুল্যমান বুকের উপর সার্টটি অর্দ্ধেক খোলা, নেশাচ্ছন্নের মত সে এই ছায়াশীতল বাগানের গন্ধ নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে।

ছড়িয়ে বসে মোদক। বিরাট ক্যানভাসের গায়ে স্বর্গ আর সুখের ছবি এঁকে এই ধরণের সরকারী বাগানে সে টিকিট বসাবে। পায়ের আঘাতে পথের কাঁকর মাড়ায় মোদক—সে ইতালীর আনন্দময় ধূলি স্পর্শ করেছে, সে যেন রোমের কোম্পানার সেই মুক্ত মেষপালক, হাওয়ায় ভেসে চলেছে।

পনের

হারিকট রুক্তকে চুম্বনে অভিষিক্ত করে, ল্যাকের টেবিলে বসবার সময় শিল্পী বলে ওঠে—"আচ্ছা এইবার বলো ত ভাই এখন, তবে খবর কি আছে?" হারিকটের মুখ রহস্যময় ভঙ্গিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তার চোখ থেকে সোনালি জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ে, ও মুখ আনন্দচঞ্চল ডানার মত ছড়িয়ে পড়ে।

—"তবে খবর? তাহ'লে শোনো, ও যে সেই নবাগত সেই ছবিওলাটা আজ এসে হাজির—ঐ ভেরেন্দাতে বসেছিল—"

"তার পর সেটাকে তাড়িয়ে দিলে?"

"তোমার আঁকা সব ক'টি ক্যানভাস, স্কেচ, সব ওর চাই—"

"লাথি মেরে নীচে ফেলে দিলে?"

ভদ্র ভাবে হরবোসকা বলে ওঠে—"আমি হাজার ফ্রাঁ চেয়েছিলাম। লোকটা ফিরেই চলে গেল। কিন্তু আবার ফিরে এল।

"এবং তার পর?"

"আমি বললাম বারো'শ ফ্রাঁ দিতে হবে, তার ওপর স্কেচের জন্য আরো দেড়শ' ফ্রাঁ। দিয়ে দিলে সব টাকা। আবার হারিকটের ছবি আঁকা দরকার ঐ পালাটাও চাইছিল, আমি বললাম—দশ হাজার ফ্রাঁ দিলেও নয়।"

"ঠিকই করেছ—"

"শুনলাম নাকি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা তোমার ছবি চান, মহিলাটি ধনী, তাঁর সেলুন ছবিতে ভরে দিয়েছেন। লা প্রিনসেস্ লরেনস্—"

"কি?"

মোদকের মুখ লেখার কুঞ্চনে ভরে গেল—তার বুকে এমন কাঁপন সুরু হল যে, মনে হল যেন তা বেরিয়ে আস্‌তে চায়।

"তার পর স্টুডিওটার মধ্য থেকে দু'চারটে কথা আদায়ের চেষ্টা করলাম।"

"আর কিছু বোলো না ভাই!"

"তবে—"

"আমার ক্যানভাসের কি অবস্থা হবে তা আমি জানতে চাই না, আমাদের কর্তব্য কাজ করে যাওয়া মজুরের মত আর তার বিনিময়ে টাকা পাওয়া। আগের দিনের ফ্রেস্কো চিত্রকর বা যে সব

ভাস্করবৃন্দ, মধ্য-যুগীয় গির্জার জন্য অসংখ্য পরী বা গার্গয়েল (মানুষ বা পশু মুখাকৃতি জলবাহী নল) প্রস্তুত করেছেন পাথর কেটে আমরা তাদের সমগোত্র। অপরে যদি আমাদের হাতের কাজ লাখ লাখ টাকায় বিক্রী করে, ভালোই। ছবি আঁকার সময় যে আনন্দ পেয়েছি, স্বর্ণমুদ্রা পকেটে তোলার আনন্দের চাইতে তা অনেক বেশী।"

কিন্তু অন্য কথা ভাবছে মোদক, সেই অভিজাত মহিলার শুভ্রসূক্ষ্ম তনুর কথা মন থেকে মুছে ফেলতে চায়, তাঁর সেই সিল্কমণ্ডিত পোষাকের কথা মনে পড়ে মোদকের—প্রতিটি ভাঁজে যেন রহস্যঘন রঙের খেলা, পিনটিও-প্রমিনেডের সুন্দরী এবং গম্ভীর রোমক রমণীদের কথা মনে পড়ে।

হারিকটের মুখের দিকে তাকায় মোদক।

সে বলে ওঠে—"কিন্তু হবরো কি বলে শুনে যাও।"

পোলীয় ভদ্রলোক উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে—"হাঁ, হাঁ,—বড় বড় লোক তোমার আঁকা ছবি দেখেছেন, আর তোমার সম্বর্দ্ধনার জন্য একটা ছোট্ট পার্টিরও ব্যবস্থা হয়েছে, তুমি এবং তোমার কমরেডদের 'এ্যাট হোম' দেওয়া হবে। তুমি হবে সেই সম্বর্দ্ধনা-সভার সম্মানিত অতিথি।

প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে মোদক বলে ওঠে—"আমি যাবো না—"

ওকে জীবনে এই সর্বপ্রথম ঠেলা দিয়ে বলে ওঠে হবরৌসকী—"আঁ, চালাকি! সেই পুরানো রোগ, কম্যুনিষ্ট, সন্ন্যাসী, বা ডেগাসের কাহিনীর মত এই এক ছেলেখেলা। ওদের এই সব ভঙ্গিমার পিছনে এই সব প্রাচীন চিত্রশিল্পীরা সাধারণ লাজুক ছেলের মত কাণ্ড করেছেন। ওঁরা জানতেন না সমাজে কি ভাবে চলতে হয়। সুন্দরী রমণীদের সংস্পর্শে ওঁরা ভীত হয়ে পড়তেন, তাই পালিয়ে বাঁচার জন্যই এই সব অভদ্র ব্যবহার। রান্নাঘরে বাস করো, বিয়ে করো আর রাঁধো! তুমি, তুমিও কি জীবনকে মুখোমুখি দেখতে ভয় পাচ্ছো? গেল বছরে চেম্বার অব ডেপুটিজের একজন সদস্যের সঙ্গে যখন তোমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল, ভদ্রলোক চিত্র-প্রদর্শনী দেখে তারিফ করলেন, তুমি ত' তখন স্প্যানিস্ রাষ্ট্রদূতের মত উদ্ধত ব্যবহার করেছিলে মনে নেই? দাঁড়াও, হারিকট রুজ তোমার জন্য কি আনতে যাচ্ছে!"

মাদাম হবরৌসকীর ঘরে ঢুকে হারিকট নিয়ে এল কয়েকটি সুন্দর কাপড়ের সার্ট, এক জোড়া পেটেন্ট লেদারের জুতো, একটা কালো স্যুট, কোটটার সামনের দিকের কাটছাঁট এমনই যে প্রায় ডিনার কোটের মতই দেখায়।

সে এসে বলল—"তোমাকে সাজিয়ে দেব! আজকের এই বিজয়-লগ্নে তোমাকে সুন্দর দেখায় এই চাই, এখন তোমার ছবির বিক্রী সুরু হল, এখন এই সম্মানের জন্য তৈরী থাকতে হবে। তোমার কি ইচ্ছে হয় না আমারও একদিন সুন্দর পোষাক হোক?"

"এই পোষাকগুলো ফেরৎ দিয়ে তোমার জন্য কিছু নিয়ে এসো বরং"···

"সে আর এখন সম্ভব নয়, মোদক! তা ছাড়া এই তোমার ব্যবসা সুরু হল। ওখান থেকে আজই রাতে অনেক ক্যানভাসের অর্ডার পাবে, তখন আমাকে সব কিনে দেবে। কাপড়, ইয়ারিং, আমার চুলের ভেতর থেকে চকচক্ করে উঠবে। আর বৈক্রান্ত মণির এক ছড়া হার, আমার দেহের রঙে আগুন ধরিয়ে দেবে···

ষোলো

প্রিন্সেস লরেন্স চমৎকার রাজকুমারী, আগেই তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অনেক মানুষের যেমন ধর্মের প্রতি টান থাকে তেমনই তাঁর দুর্বলতা আর্টে,—কখনও কোনো কনসার্টে গরহাজির নেই,—আর এতটুকু বিচ্যুতি না ঘটিয়ে সাম্প্রতিক রুচির আধুনিকত্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে জানেন। ওঁর সেলোঁতে অপূর্ব ক্যানভাসের মাধুর্য্য লক্ষ্য করে প্রিন্সেসের বন্ধু-বান্ধবরা, আধুনিক চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছেন, প্রিন্সেসও তাঁদের সেই সুযোগ দানে সানন্দে সম্মতি দিয়েছেন। আমেরিকান নাচের মজলিসে পরিচিত সুদর্শন যুবকের আঁকা ছবিও এই ভাবেই কিনেছেন। এই সব উদ্দাম প্রকৃতির কিউবিষ্ট চিত্রশিল্পীদের ডেকে এক ডিনার পার্টি দেওয়ার কথা ওঁরা উত্থাপন করলেন। প্রিন্সেস মুরাট বা ফ্যাসান-প্রবর্তক পরিচ্ছদকাররা যে ধরণের পার্টি দেয়।

প্রিন্সেস মুখ বেঁকিয়েছিলেন। আধা-অভিজাত এক মহিলার বাড়িতে এক বীভৎস পানোৎসবের কথা মনে পড়ল তাঁর, যেখানে সকল জাতের সম্মেলন। অতিথিরা প্রথমটা ভীত হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিল্পীদের গা ঘেঁষতে লাগল, পশুশালায় পশুদের যে চোখে সবাই দেখে—প্রথমটা প্রায় দমবন্ধ হবার জোগাড় হলেও শেষাশেষি সর্বশক্তিমান গন্ধের প্রভাবে সকলে আকুল হয়ে ওঠে।

এসব রাজকুমারীর পছন্দ নয়। রীতিমত সামাজিক প্রতিবেশে সামাজিক প্রাণীদের মধ্যে বোলসেভিক প্রভাব তিনি পছন্দ করেন না।

তখন প্রস্তাব করা হল, কিউবিষ্ট শিল্পীদের সম্মানে একটি ডিনার পার্টি দেওয়া হোক, এরাই ত' আগামী কাল বিখ্যাত হয়ে উঠবে (লা ফিগারো পত্রিকায় ওদের সম্বন্ধে মাঝে মাঝে কিছু প্রকাশিত হয়েছে), এরাই হবে নেতৃস্থানীয়, এদের যথাযোগ্য গুরুত্বের সঙ্গে সমাদর হওয়া উচিত।

লটারী করে এই শিল্পীর নাম সংগ্রহ করা হোক,—হ্যাটের ভিতর থেকে নাম তোলা, হোক্—কিংবা যে-শিল্পীর ক্যান্‌ভাস রাজকুমারী ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করেছেন তাকেই ডাকা হোক,—তার নামই ত' সর্বপ্রথম উল্লিখিত হয়েছিল।

মঁসিয়ে দ্য বেলানগেস্ এই সব সামাজিক ব্যাপারের সংগঠক, তিনি একজন চমৎকার ব্যক্তিকে জানেন, বেশ সামাজিক মানুষ, লর্ড জ্যাকট, প্যারীর সব আর্টিষ্টের সঙ্গেই তিনি পরিচিত,—প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা তাঁর হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়।

প্রিন্সেস বেলানজেস্ এবং তাঁর দূত লর্ড জ্যাকটের হাতে সব ভার ছেড়ে দিলেন, যেমন ডিনারের ব্যবস্থা লোকে ছেড়ে দেয় সেফের (সূপকারের) হাতে, চ্যারিটি বলের ব্যবস্থা কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থাপকের হাতে। এ সব ব্যবস্থা তারা সহজেই করতে পারে।

লর্ড জ্যাকট মুচকি হেসে লা রোতন্দের দ্বিতীয় শ্রেণীর কিউবিষ্টদের আমন্ত্রণ করে এনেছে। প্রিন্সেস মোদকল্লোর আঁকা যে নূতন ক্যানভাস্ সংগ্রহ করেছেন তাই নিয়ে ব্যস্ত।

গম্ভীর এবং উদ্ধত ভঙ্গীতে শিল্পী এসে তাঁর স্বহস্ত-অঙ্কিত ছবির সুদীর্ঘ সারি অতিক্রম করে গেলেন। লর্ড জ্যাকট বা কাফের আর কয়েক জন বাউণ্ডুলের দিকে নজর পড়লেও মোদক তেমন বিচলিত হয়নি। সে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

যে সম্মান তাকে দেওয়া হয়েছে তার জন্য নয়, যার উপস্থিতির স্বপ্ন সারা সপ্তাহ ধরে মনে মনে দেখছে আজ তারই সান্নিধ্যে উপযুক্ত পরিচ্ছদ ধারণ করে সে আসতে পেরেছে এই তার আনন্দ।

এতক্ষণে দেখা গেল রাজকুমারী তাঁর কাছে আসছেন,—তিনি যতই নিকটতর হচ্ছেন মোদকের মন ততই কল্পলোকে বিচরণ করছে।

"মঁসিয়ে, আজ আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে সত্যই গর্ব বোধ করছি—"

মোদকের হৃদয়ে যেন শাণিত অস্ত্র প্রবেশ করল, তবু সে জানে এ সৌজন্য প্রকাশের যথারীতি মামুলী ব্যবস্থা। কিন্তু কোমলাঙ্গীর পেলব হস্তের স্পর্শ তার সেই বেয়াড়া মুঠির মধ্যে ধরল,—এই স্পর্শের প্রভাবে সারা বাড়িটা কয়েক মুহূর্ত যেন তার চার পাশে নৃত্য করতে থাকে।

মোদক যদি রাজা হ'ত, তাহলে হয়ত এই আগমনই ডিনারের যাত্রার সংকেত হিসাবে গৃহীত হত,—যে মুহূর্তে মোদক এই ভাবে হাতটি নিয়ে চুম্বনে অভিষিক্ত করলো, তখনই প্রিন্সেস মোদকের হাতটি নিজের হাতের ভিতর নিয়ে ডিনার টেবলে চললেন,—সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক অভ্যাগত অতিথি অনুগমন করলো,—মোদক বসল গৃহকর্ত্রীর ডান পাশে।

কত নাম-না-জানা ফুল, পাপড়িগুলি স্বচ্ছ,—চতুর্দিকে ফুলের মালা ছড়ানো চিনেমাটির বাসনগুলি গাত্রচর্মের মতই মনোহর, আর গ্লাসগুলি এতই ভঙ্গুর যে, স্পর্শ করতে ভয় হয়।

প্রথমটা রাজকুমারীর সঙ্গে কয়েকটা বাঁধা-ধরা কথাবার্তা চলল—কিন্তু মোদক তাঁর কণ্ঠের অপূর্ব ব্যঞ্জনা সবিস্ময়ে শুনে যায়। রাজকুমারীর সূক্ষ্ম শরীরের নিঃশ্বাস যেন এই কণ্ঠস্বরে তরঙ্গায়িত। যে ভাবেই বলুন আর গম্ভীর গলায়ই বলুন প্রিন্সেসের সুসমঞ্জস দেহের মতই তা মাধুরীমণ্ডিত।

তার পর মোদককেও কিছু বলতে হয়,—প্রসঙ্গটা যে অবশেষে রোমের কথায় এসে পৌঁছল এতে মোদক মনে খুসী হল। আর কোনো কারণে নয়, এই অপূর্ব প্রাণীটিকে শুখ্‌নো তত্ত্বকথা শোনাতে তার মন সরছিল না, যে বিষয় সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান নেই—সে কথা না শোনানোই উচিত। প্রিন্সেসও রোমে গিয়েছেন, তাঁকে লা কমিটি এবং ব্যালের কথা শোনানো গেল।

এর ভিতর হাবিকট রুজের হাস্যময়ী মুখ মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে,—কিন্তু মোদক তাতে বিচলিত হয় না, প্রিন্সেস মোদকের প্রতিটি কথায় স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করছেন। প্রিন্সেস মাঝে একটা হালকা, গ্লাসের পাত্রে তাঁর ঠোঁট ভিজিয়ে নিলেও মোদক শুধু জল পান করছে।

প্রিন্সেস যখন তার হাত দুটি টেবলে রাখলেন, মোদক সেই ছন্দিত হাত দুটি আর একবার লক্ষ্য করলে, সূক্ষ্মাগ্র আঙুলের কি অপূর্ব পেলবতা,—আঙুলের ডগা তেমন গোলাপি নয়,—কিন্তু নখগুলি যেন প্রবালে গঠিত। মোদকের প্রবাল ভালো লাগে,—তার চড়া সুরের আবেদন আছে। হাতগুলি ওঠানোর আগে হাতে কিঞ্চিৎ ভার পড়াতেই আঙুলগুলি গোলাপি রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠল। রোমে দেখা প্রবালের কথা মনে পড়ে মোদকের।

রাজকুমারীর কাঁধ আর গলার দিকে তাকায় মোদক। এই সর্বপ্রথম রাজকুমারী সম্পর্কে একটি বিষয় তাকে সম্মোহিত করল। এ মাদকতা শুধু চোখের নেশা নয়,—সেই পরিচিত সুগন্ধির সৌরভ, তার মাথায় চুল, গাত্রচর্ম, সিল্কের পোষাক প্রভৃতির মধ্যে কি যে তাকে এত আকর্ষণ করছে তা সে ভেবে পায় না,—কিন্তু তবু ক্ষীণ নিঃশ্বাসে সেই ঘ্রাণ প্রাণভরে গ্রহণ করে তখন কোথায় কি যেন হয়ে গেল,—মনোরম মদিরা যেমন পানপাত্রে তার সৌরভস্পর্শ রেখে যায় এ যেন তাই।

মোদক চোখ বন্ধ করল,—তখন এক বিস্ময়কর সুরসঙ্গতি তার অন্তরের প্রতিটি রন্ধ্র গ্রাস করল,—এক ধরণের সুর যেমন হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করে—এ যেন তাই। মোদক এক জ্যোতির্ময়ী নারীর হাসি লক্ষ্য করল, এ হাসির রঙ সে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি ত'। এক সহস্রদল পদ্ম যেন তার সম্মুখে প্রসারিত, রাজকুমারীর সকল দেহের আকুল আনন্দের সৌরভ যেন তার সারা অঙ্গে মাদকতা এনেছে।

ওঁর কম্পিত বক্ষের দিকে যখন নজর পড়ল মোদকের, তখন সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না এত কোমলতা, এত পেলবতার ভিতরও এতখানি কাঠিন্য লুকানো থাকতে পারে।

ওদের চার চোখের মিলন হতে উভয়েই যেন বিচলিত হয়ে পড়ে।

আজে বাজে কথা বলার চেষ্টা করে উভয়ে, কিন্তু ঘুরে ফিরে প্রতিটি কথাই অর্থব্যঞ্জক হয়ে ওঠে।

"সূর্যালোক হচ্ছে—"

কিন্তু উভয়ে উভয়ের চোখের পানে তাকিয়ে থাকে।

"আপনি ঐ ছোট ছবিটা দেখেছেন—?"

কিন্তু তাঁর কম্পমান ক্ষীণ ঠোঁটের স্পন্দনে দৃষ্টি তার স্থির হয়ে থাকে।

উভয়ে কথা বন্ধ করলো। উভয়ের মধ্যে দ্ব্যর্থ-বোধক বাক্য প্রয়োগ না হওয়াই ভালো। পাশাপাশি দুটি নরনারী বসে আছে এ বিষয়ে ওরা দু'জনেই সচেতন, বিশেষতঃ দু'জনের সমাজ আলাদা, শ্রেণী অসমান। ওদের বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য যা সহায়ক তা কিন্তু উভয়ের মনে এক প্রতিক্রিয়া ঘটালো, এবং উভয়কেই ঘনিষ্ঠতর ক'রে তুললো, ইচ্ছা থাক আর নাই থাক দু'জনের ব্যবধান সরে গেল। অবশেষে একটু সরে বসলো দু'জনেই—কারণ যদি কনুই স্পর্শ ঘটে তাহলে হয়ত বিরাট বিস্ফোরণে দু'জনেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ—ভবানী মুখোপাধ্যায়

প্রথমা

প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলার আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর। কথাসাহিত্যের মত কাব্যসাহিত্যেও তাঁর নেতৃত্ব স্বীকৃত। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর অধুনা বিখ্যাত কবিতা-গ্রন্থ 'প্রথমা'র সম্প্রতি কটি নূতন শোভন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। নূতন আঙ্গিক, কল্পনার বলশালিতা আর দুর্জয় সাহস এই ছিল সে দিনের তরুণ সাহিত্য-পথিকের পাথেয়। বিরোধীর বক্রোক্তি, সমালোচকের ভ্রূভঙ্গী অতিক্রম করেও স্বকীয় মহিমায় আধুনিক কাব্যসাহিত্যের প্রতিষ্ঠায় যাঁরা অগ্রণী ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁদের অন্যতম, তাই তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নূতন সংস্করণ সাহিত্য-পাঠকের কাছে আনন্দ সংবাদ। কবির বত্রিশটি অতি-পরিচিত কবিতা এই কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে—প্রথম সংস্করণে কবিতার সংখ্যা ছিল পঁচিশ। সংযোজিত কবিতাবলীর মধ্যে 'মানে,' 'সংশয়,' 'রাস্তা,' 'পাওনা' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সোনালী কাগজে বিচিত্র প্রচ্ছদ-শোভিত এই মূল্যবান কাব্য-গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিশিং কোং লিঃ, দাম তিন টাকা।

কামিনী-কাঞ্চন

অন্নদাশঙ্কর রায়ের এই সদ্য-প্রকাশিত গল্প-গ্রন্থ বাংলা কথা-সাহিত্যের সুদীর্ঘ তালিকায় এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। যাঁরা তাঁর 'প্রকৃতির পরিহাস', 'মনপবন', 'যৌবন-জ্বালা' প্রভৃতি ছোট গল্পের বইগুলি পাঠ করেছেন, 'কামিনী-কাঞ্চন' তাঁদের অবশ্যপাঠ্য। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের এই গল্পগ্রন্থে তাঁর আটটি সাম্প্রতিক গল্প সংগৃহীত হয়েছে। গল্পগুলির মধ্যে আছে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ,—মনোবিকারের বিচিত্র চিত্র আর মানব-প্রকৃতির প্রতি সুগভীর মমতা। কথাভাষার অপূর্ব নমুনা কামিনী-কাঞ্চন, অতি দুরূহ তথ্যও কেমন সহজে প্রকাশ করা যায়, অন্নদাশঙ্কর তার পথ প্রদর্শন করেছেন। বৈঠকী ধরণে বলে যাওয়া এই গল্পে লেখক অধিকাংশ স্থলে আপনাকে প্রক্ষেপ করেছেন, গল্পের আঙ্গিক হিসাবে তা অতিশয় সার্থক হয়েছে। গ্রন্থটির প্রকাশক, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স্—দাম তিন টাকা।

রোজেনবার্গ-পত্রগুচ্ছ

সোভিয়েট য়ুনিয়নকে গোপনে আণবিক তথ্য সরবরাহ করার অপরাধে প্রায় তিন বছর বিচার চলার পর ১৯৫৩ খৃঃ জুন মাসে রোজেনবার্গ-দম্পতির মৃত্যুদণ্ড হয়। রোজেনবার্গ-দম্পতির জীবন রক্ষার জন্য সারা পৃথিবীতে একটা ব্যাপক আন্দোলন সুরু হয়—কিন্তু জুলিয়াস ও এথেল রোজেনবার্গের—১৯শে জুন তারিখে বৈদ্যুতিক তারে মৃত্যু হয়। বিভিন্ন সেলের নির্জনে বসে পরস্পরের মধ্যে যে পত্রের আদান-প্রদান হয়েছিল, রোজেনবার্গ-পত্রগুচ্ছে সেগুলি সংগৃহীত হয়েছে। রোজেনবার্গদের বিচার পৃথিবীর ইতিহাসে সাকো এবং ভ্যানজেত্তি আর দ্রেফুস কেসের সমতুল্য। এই গ্রন্থে পত্রাবলী রোজেনবার্গরা নিজেরাই নির্বাচন করেছিলেন—তাঁদের দুই সন্তান, রবার্ট আর মাইকেলের সাহায্যার্থে একটি তহবিল গঠন করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। প্রকাশক ক্যালকাটা বুক ক্লাবও লভ্যাংশের দশমাংশ সেই উদ্দেশ্যে ব্যয় করবেন। ইংরাজী গ্রন্থের ভূমিকা সেন্টপলস ক্যাথিড্রেলের চ্যান্সেলার জনকলিনস লিখেছিলেন 'মানবিক সহনশীলতা, সাহস এবং পারিবারিক প্রেমের দলিল এই পত্রাবলী'—বাংলা অনুবাদে অনুবাদক সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই ভূমিকাটুকু অনুবাদ করলে ভালোই করতেন। পত্রানুবাদে তাঁর মত কৃতী কবি অনুবাদকের সুনাম অক্ষুণ্ণ রইল।

নেতাজী-রহস্য সন্ধানে

নেতাজী আজ বাঙালী মাত্রেরই জীবনের সঙ্গে জড়িত,—তাঁর অনুপস্থিতিতে বাংলার সামাজিক আর রাজনৈতিক জীবন আজ বিপর্যস্ত,—তাই সময়ে অসময়ে আমরা ডাকি—'এস সুদর্শনধারী মুরারি'—অবনত ভারত যে তোমার প্রতীক্ষায় আকুল। কিন্তু নেতাজীর রহস্যের কোনও সমাধান হওয়া দূরে থাকুক—তাঁর মৃত্যু ও বিবাহ—এই নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি দেবনাথ দাসও এক প্রেস কন্‌ফারেন্স বসিয়ে অনেক কথা বলেছেন—কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাঁর বক্তব্যের ভেতর অনেক ফাঁক এবং ফাঁকি আছে। 'প্রয়োজনীয় তথ্য পরে প্রকাশ করব,' 'প্রয়োজনীয় নাম পরে প্রকাশ করব'—ইত্যাদি বলে তিনি এক গুরুতর বিষয়ের স্থির মীমাংসা করে ফেলেছেন—এবং অনেকে তাঁর এই উক্তিতে বিভ্রান্ত হয়ে মনে করেছেন—আর কি তাহলে নেতাজী আর বেঁচে নেই? কিন্তু শ্রীদেবনাথ দাসের উপস্থিতিতে জাপ-ক্যাপ্টেন কিয়ানী নেতাজীর উত্তরাধিকারী নির্বাচনের যে প্রস্তাব করেছিলেন দেবনাথ দাস ও মেজর জেনারেল চ্যাটার্জী সে কথা চেপে গেছেন কেন?

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত এই স্বল্পায়তন গ্রন্থটিতে লেখক সৌরেন্দ্রমোহন গোস্বামী বহু দুষ্প্রাপ্য তথ্য একত্র করেছেন এবং দেশবাসীকে আর একবার নূতন করে চিন্তার সুযোগ দান করলেন। এই গ্রন্থটিতে প্রবীণ সাংবাদিক তারানাথ রায় মহাশয়

লিখিত 'সাংবাদিক দৃষ্টিতে নেতাজীর রহস্য জনক অন্তর্দ্ধান' এই প্রবন্ধটি সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থটির মূল্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। লেখক স্বয়ং প্রাচ্যের ও দূরপ্রাচ্যের বহু স্থানে অনুসন্ধান করে যা জেনেছেন তা এই পুস্তিকায় সংযুক্ত করেছেন। এক টাকা মূল্যের এই গ্রন্থটি পাঠ করলে পাঠক নেতাজী জীবিত না মৃত এই প্রশ্নের কিঞ্চিৎ জবাব পাবেন। আমরাও বলি, নেতাজীর মৃত্যু নাই।

উদ্বোধন

জননী সারদা দেবীর জন্মদিনের শতপূর্তির স্মারক গ্রন্থ হিসাবে উদ্বোধনের একটি বিশেষ 'শ্রীমা শতবর্ষ-জয়ন্তী' সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই উপলক্ষে স্বামী শঙ্করানন্দ, স্বামী সাধনানন্দ, ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ, মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, ডাঃ সুধীর দাশ-গুপ্ত, ডাঃ রমা চৌধুরী, আশাপূর্ণা দেবী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ডাঃ নলিনী ব্রহ্ম, অনুরূপা দেবী, কালিদাস রায়, ডাঃ মায়াধর মানসিংহ, ডাঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডাঃ সরোজ দাস, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, লীলা মজুমদার, দেবেশ দাস, ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, রেজাউল করিম প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের বিভিন্ন বিষয়ে বহু মূল্যবান রচনা এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। তা ছাড়া নন্দলাল বসু-প্রমুখ শিল্পীদের দু'খানি ত্রিবর্ণ চিত্রও আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা দেবীর সাধনার ফলে আজ বাংলার সামাজিক জীবন বর্ত্তমান স্তরে পৌঁছেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত পথে শ্রীশ্রীমা উত্তর কালে অসংখ্য ভক্তজনকে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করেছেন। ঠাকুর বলেছেন—'গোলোকে রাধা, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী, মিথিলায় সীতা আর দক্ষিণেশ্বরে সারদা। ও কি যে সে? ও আমার শক্তি! ও সরস্বতী বিদ্যাদায়িনী। সর্বাভয়দায়িনী অন্নপূর্ণা।' এই দিব্যজীবনের অপূর্ব-বিবর্তন শক্তিমান লেখক-লেখিকার রচনায় ফুটে উঠেছে। শ্রীশ্রীসারদামণির কয়েকটি জীবনকথা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, ভক্ত ও অনুসন্ধিৎসু সমাজে এই শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যা বিশেষ আদৃত হইবে সন্দেহ নাই। এই সংখ্যার সম্পাদনা করেছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। ১নং উদ্বোধন লেন কলিকাতা (৩) থেকে প্রকাশিত। এই স্মারক গ্রন্থের দাম আড়াই টাকা (উদ্বোধন গ্রাহকপক্ষে দেড় টাকা) মাত্র।

কর্ণফুলী

রবীন্দ্রনাথ দাশ অপেক্ষাকৃত তরুণ লেখক। ইংরাজী ও বাংলা উভয়বিধ ভাষায় তাঁর কলম সমান জোরালো। তাঁর কয়েকটি গল্প ইতিমধ্যেই বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। 'কর্ণফুলী' তাঁর সর্বাধুনিক উপন্যাস। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুনের পতনের পর কলকাতায় চলে এসেছিলেন লেখক—যুদ্ধের ভয়ঙ্করত্ব তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন আর প্রত্যক্ষ করেছেন জীবনকে। পূর্ব-সীমান্তের সবুজ আর নীলাভ পাহাড় থেকে বেরিয়ে-আসা 'কর্ণফুলী'—আর রাঙা মাটির দেশকে পটভূমি করে এই উপন্যাসটি রচিত। মুসলমান আর হিন্দুতে মেশামেশি এই দেশ, পঞ্চাশের মন্বন্তরে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে,

কিন্তু নিষ্প্রাণ হয়নি। মধ্যবিত্তের ঘরে পয়সা নেই, চাষার ঘরে ধান নেই···যার হাতে পয়সা আছে তার পয়সা বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন, আর যার অর্থাভাব তার দারিদ্র্য আরো বেড়ে যাচ্ছে··· তারই মাঝখানে প্রত্যেক বাড়ীর মেয়েরা ঠিক হাসিদির মতো'—

অপূর্ব সংযম ও কৃতিত্বের সঙ্গে বাংলার ইতিহাসের এক নিদারুণ দুঃস্বপ্নের অধ্যায় রবীন্দ্রনাথ দাশ তাঁর এই নূতন উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন। সাম্প্রতিক কালের একটি সার্থক উপন্যাস এই 'কর্ণফুলী'র প্রকাশক—ক্যালকাটা বুক ক্লাব, দাম তিন টাকা।

অহল্যা

কল্লোলোত্তর যুগে যে-সব কবিরা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বহু জনতার ভীড়ে পথ করে এগিয়ে এসেছেন দীনেশ দাশ তাঁদের একজন। দীনেশ দাশের কবিতা সংকলনের মুখবন্ধে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন—"দীনেশ দাশের কবিতা নিষ্ফল আতিশয্যের অরণ্যে এক একটি বিস্তীর্ণ গভীর হ্রদের মতো।" 'অহল্যা' কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ, এ ছাড়া তাঁর একটি কবিতা-সংকলনও আছে। দীনেশ দাশের এই নবতম কাব্যগ্রন্থে তাঁর মনের বিচিত্র ধ্যান-ধারণার ছন্দোময় প্রকাশ। অহল্যাকে তিনি শিলীভূত রূপ নিয়ে দেখেন নি, দেখেছেন বিশ্ব প্রকৃতির প্রতীক হিসাবে। কবিতাগুলির মধ্যে 'নদী-নারী আলো-আকাশ' ছাড়া আছে সাম্প্রতিক ঘটনা ও মানুষের কাব্য রূপায়ন। কয়েকটি আরবী কবিতার অনুবাদ এই গ্রন্থটিতে সংযোজন না করলেই ভালো হত। ডাঃ নীহার রায়ের ভূমিকা ও শিল্পী গোপাল ঘোষের প্রচ্ছদ-শোভিত এই কাব্যগ্রন্থের প্রকাশক মণিকা দাস, পরিবেশক, সিগনেট প্রেস, দাম দু' টাকা।

তিমিরাভিসার

হরপ্রসাদ মিত্রের ১৯৩৩—১৯৫৩ এই কুড়ি বছরের মধ্যে লিখিত কবিতার স্ব-নির্বাচিত কবিতা-সংকলন 'তিমিরাভিসার'। শক্তিমান কবি হরপ্রসাদ মিত্রের অনেকগুলি স্বনির্বাচিত কবিতা এই স্ব-নির্বাচিত কাব্যগ্রন্থে স্থানলাভ করেছে।

হরপ্রসাদ মিত্র আধুনিক কাব্য-সাহিত্যে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছেন। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে তাঁর এই কবিতাগুলি পাঠকচিত্তকে শুধু স্পর্শ করে না, মনে আলোড়ন জাগায়। দীর্ঘকালের ব্যবধানেও তাঁর পুরাতন কবিতার ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়নি, সরল ও বহু বিচিত্র জীবনের পথে প্রেম ও প্রকৃতি, আকাশ ও মাটির যে অপরূপ রূপ রূপায়িত, হরপ্রসাদ মিত্রের লীলায়িত ছন্দ মাধুরীতে সেই রূপই নিখুঁত ভাবে প্রকাশিত। অনাড়ম্বর অথচ পরিচ্ছন্ন প্রচ্ছদ-শোভিত এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন এম, সি, সরকার এ্যাণ্ড সনস্,—দাম দেড় টাকা মাত্র।

আ মরি বাংলা ভাষা

দিল্লীতে জু-এন-লাই-নেহেরু সাক্ষাৎকার, ওয়াশিংটনে চার্চিল-ইডেন-আইসেনহাওয়ারের গোপন পরামর্শ, আর শুভ ৪ঠা জুলাই তারিখে পাটনায় বঙ্গজননীর কৃতী সন্তান ডাঃ বিধানচন্দ্র আর বিহারাধিপতি ডাঃ শিউকিষেণ সিং-এর সঙ্গে ভাষাগত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এক বৈঠকের ব্যবস্থা হয়েছিল। খালের জল, ইন্দোচীন ইত্যাদির মতো দুটি প্রতিবেশী-প্রদেশের মধ্যে এই ভাষাগত বিরোধও উপেক্ষণীয় সমস্যা নয়, তাই পয়লা তারিখে বাহাত্তর অতিক্রম করেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বি, পি, সি, সির অতুল্য ঘোষ মহাশয় সমভিব্যাহারে ছুটেছিলেন পাটনায়, সেখানে প্রচুর আদর-আপ্যায়ন এবং খানা-পিনার পর যেটুকু সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তা পাঠ করলে জানা যায়, বিহারে আসলে বাংলা ভাষা নিয়ে কোনো সমস্যাই নেই, সমস্যা ডাঃ বিধানচন্দ্রের রাজ্যে, সেখানে হিন্দী ভাষাভাষীরা বড়ই কষ্টে আছে, তারা যথেষ্ট সুবিধা পায় না, তারা সমষ্টি ও ব্যক্তিগত ভাবে শিউকিষেণজীর সকাশে অভিযোগ জানিয়েছে। মানভূমের প্রবীণ নেতা অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অভিযোগটা কিছু নয়, কারণ সে অভিযোগ যথাস্থানে পৌছায়নি হয়ত। পাগলা মেহের আলিও বলেছিল—'সব ঝুটা হ্যায়।'

এ কথাও বলা হয়েছে যে, সেন্সাসের অঙ্ক অনুসারে পশ্চিম-বাংলায় হিন্দীভাষা-ভাষীর সংখ্যা ১,৫০০,০০০ (অবশ্য এই সংখ্যার ভিতর হিন্দী ভাষাজ্ঞ বঙ্গ সন্তানও আছেন এবং বিহারী ছাড়া সারা ভারতের অধিবাসী আছেন), অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬।৭ ভাগ, অথচ বিহারে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা মাত্র ১,৭০,০০০ অর্থাৎ জন সংখ্যার শতকরা ৪·৩ ভাগ। অতএব 'হে বৈদ্য, আগে নিজের রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা কর'—তার পর এসো বিহারে!

ডাঃ শিউকিষেণজীর উক্তি হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন, সাধারণে বিহারে বাংলা ভাষার কোনো সমস্যা নেই জেনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র এবং তাঁর সহচর হৃষ্টচিত্তে স্ব-প্রদেশে ফিরে এসেছেন। ডাঃ শিউকিষেণ সিং বলেছেন—"এ, আই, সি, সির সভায় কয়েকটি প্রমাণহীন অভিযোগই আজকের এই আলোচনার কারণ,—"

এই মন্তব্য লেখার সময় (১৩ই জুলাই ১৯৫৪) সংবাদ পাওয়া গেল ডাঃ শিউকিষেণ সিং কলিকাতায় ডাঃ বিধানচন্দ্রের সঙ্গে এ বিষয় আলোচনা করবেন। উভয়েই অতি পুরাতন বন্ধু ইত্যাদি।

মোট কথা এই যে, দীনা-হীনা বঙ্গজননীর আজ অতি দুঃসময়। পূর্ব-পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন সফল হলেও সেখানকার নেতৃবৃন্দ আজ কারাগারে, পশ্চিম-বাংলার কংগ্রেস-সভাপতি অনেক আস্ফালন করেছিলেন, এখন তিনিও নীরব। "দৈনিক বসুমতী" ২১শে আষাঢ় তারিখে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সমগ্র ব্যাপারের একটি সরকারী প্রেসনোট প্রকাশের অনুরোধ করেছিলেন, সে অনুরোধ অরণ্যে রোদনের মত কারো কাণে পৌছায়নি।

উপস্থিত বাংলা ভাষার ও বিহারস্থ বাঙালীদের দুঃখের কথা ভুলে আসুন আমরা হিন্দীভাষীদের কি ভাবে আরো সুখ-সুবিধা দেওয়া যায় সেই চিন্তা করি। অতিথি সেবা পরম ধর্ম!

মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতিসভা ও স্মৃতিরক্ষা

ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্য বঙ্গের রেনেসাঁ বা নবজন্মের যুগে যে সমস্ত মনীষিবৃন্দ বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছেন, ভাবগঙ্গার ভগীরথ মধুসূদন তাঁদের অন্যতম। বাংলা সাহিত্যকে ইংরেজী সাহিত্যের সমকক্ষ করে গড়ে তুলেছিলেন শ্রীমধুসূদন। কবি-সমালোচক স্বর্গতঃ মোহিতলাল এক জায়গায় বলেছেন—"ইংরাজী সাহিত্যের সহযাত্রী করিয়া বাংলা সাহিত্যকে ভবিষ্যৎ মহাতীর্থ অভিমুখে পথ চিনাইয়া দেওয়ার ভাগবতী প্রেরণা পাইয়াছিলেন যুগাবতার শ্রীমধুসূদন।···বাংলা গদ্যে বঙ্কিম যাহা করিয়াছিলেন বাংলা কাব্যে মধুসূদন তাহা অপেক্ষা অধিক অসাধ্য সা

করিয়াছিলেন।···তিনি একেবারে Virgil Mitton হইতে ভারতচন্দ্র ও কৃত্তিবাসে সেতু যোজনা করিয়াছিলেন।"—বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি, তাই আজ আমরা শ্রীমধুসূদনকে ভুলতে বসেছি—এ যুগের পাঠক-পাঠিকার কাছে নূতন ভাবে মধুসূদনকে পরিচিত করার সময় উপস্থিত। শ্রীমধুসূদনের পুণ্যস্পর্শে খিদিরপুর একদা ধন্য হয়েছিল। মাইকেল, হেম, রঙ্গলালের লীলা নিকেতন খিদিরপুর। সেই খিদিরপুরেই মাইকেলের স্মৃতিরক্ষার এবং স্মৃতিপূজার আয়োজন করছেন "মাইকেল মধুসূদন পাঠাগার"। এই পাঠাগারে মাইকেলের একটি সুন্দর মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিগত ৩০শে জুন তারিখে এই পাঠাগারে তাঁর অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অধ্যাপক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী প্রভৃতি উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রবীণ সাহিত্যসেবী কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় সভাপতি হিসাবে কবির সঙ্গে দেবতার এবং কাব্যের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের তুলনা করে শ্রীমধুসূদনের কাব্য প্রেরণার উৎস সন্ধান প্রসঙ্গে আদি কবি বাল্মীকির কথা উত্থাপন করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে মাসিক-বসুমতী-সম্পাদক মহাকবির বিপ্লবী মনের কারণ বিশ্লেষণ করে বলেন—"মাইকেল নবযুগের স্রষ্টা, তাঁর বিদ্রোহী মনে ডিরেজিও, রিচার্ডসন প্রভৃতির প্রভাব ছিল। রামায়ণ-মহাভারতের প্রতি আগ্রহও পরিণত বয়সে বাইবেল আদর্শস্বরূপ হওয়ায় তাঁর রচনায় প্রেমপিপাসু ও ব্যথা ও বেদনাশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়।" পাঠাগার কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু বক্তৃতা প্রসঙ্গে মাইকেলের স্মৃতিরক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন।

মাইকেলের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তাঁর স্বদেশবাসীর। এই সূত্রে মাইকেলের পৌত্র, আলবার্ট তনয় নোরেল এম, দত্তের প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। পিতামহের স্মৃতিরক্ষায় তাঁর অক্লান্ত উদ্যমের পরিচয় পেয়ে আমরা আনন্দিত হয়েছি। মাইকেলের সাগরদাঁড়ির বাড়ী আজ ধ্বংসপ্রায়, কিন্তু খিদিরপুরের বাড়ীটি আছে (যে বাড়ীটিতে খিদিরপুর প্রেস আছে), এই বাড়ীতে কবির বাল্য ও কৈশোর কেটেছে, দেয়ালগাত্রে নাকি এখনও পেনসিলে লেখা কবিতার চিহ্ন পাওয়া যায়। আর আছে ৬ নং (এখনও ৮ নং) লোয়ার চিৎপুর রোডের বাড়ী। পুলিশ কোর্টের দোভাষীর কাজ পাওয়ার পর এই বাড়ীতে তিনি অনেক দিন ছিলেন, এই বাড়ীতে বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্ম, মেঘনাদবধ কাব্য, শর্মিষ্ঠা নাটক, কৃষ্ণকুমারী নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যও এই গৃহে রচিত। আমাদের দেশে অনেক সাহিত্যসংস্থা আছে, সাংস্কৃতিক দলের ত' সীমা নাই, এই জাতীয় সম্পত্তি সংরক্ষণে সরকার অগ্রণী না হলে এ কাজে তাঁদের এগিয়ে আসাই কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর ভার দিল্লী সরকার নিয়েছেন, কাঁঠালপাড়ার ভার নিয়েছেন বাংলা সরকার, মাইকেল সম্পর্কেও সরকারের একটা কর্তব্য আছে। এই বিষয়ে সরকারের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। জাতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণে তাঁরাও ত' নাচ-গানে লক্ষ টাকা ব্যয় করবেন শোনা যায়। তাই এই বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

রবীন্দ্রনাথের সমাধি

নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলন নামক একটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান নিমতলা মহাশ্মশানে কবির সমাধি রচনা করার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। তের বছর আগে কবিকে এইখানেই দাহ করা হয়। একটি চিঠিতে সম্মেলন-কর্তৃপক্ষ সমাধিস্থলটি কি রকম অযত্নে আছে তার বিস্তৃত বিবরণ দান করেছেন, ভবিষ্যতে উপযুক্ত ব্যবস্থা হলে সম্মেলন-কর্তৃপক্ষ তাঁদের স্মৃতিফলক সরিয়ে নেবেন। আমরা 'কবিপক্ষে'র আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয়ে সম্প্রতি মন্তব্য করেছিলাম, এত দিনে যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান এই ভার গ্রহণ করেছেন এ অতি আশার কথা, তাঁদের উদ্যম সফল হোক এই আমাদের কামনা।

ন্যাশানাল লাইব্রেরীর স্থানান্তর

আবার গুজব শোনা যাচ্ছে যে, বাংলা দেশ থেকে ন্যাশানাল লাইব্রেরী স্থানান্তরে পাঠান হবে। অতীতে বহু বার এই প্রস্তাব হয়েছে, এমন কি ইংরেজ আমলেও এই চেষ্টা কয়েক বার ব্যাহত হয়েছে। এস্প্লানেড ভবন থেকে ঐতিহাসিক বেলভেডিয়ার ভবনে স্থানান্তরিত হওয়ার সময় আর একবার এই প্রসঙ্গ ওঠে এবং বাংলা দেশের সৌভাগ্যে উপস্থিত কিছু সংখ্যক ভি, আই, পি (অর্থাৎ হোমরা চোমরা ব্যক্তি) এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মৌলানা আজাদ সাহেবের চেষ্টায় নাকি সে ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যায়। এখন ন্যাশানাল লাইব্রেরী বেলভেডিয়ারে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আবার সেই অপচেষ্টা সুরু হয়েছে মনে হয়। সাহিত্য-পাঠক, গবেষক এবং শিক্ষাব্রতীদের এই দুরভিসন্ধির মূলে আঘাত করার সময় উপস্থিত। ন্যাশনাল লাইব্রেরী কলিকাতা থেকে স্থানান্তর করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য সকলের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

হস্তলিখিত পত্রিকা

প্রায়ই আমাদের কাছে নানা প্রতিষ্ঠান থেকে শোভন প্রচ্ছদমণ্ডিত ও সুন্দর হস্তলিপিতে সজ্জিত হস্তলিখিত পত্র-পত্রিকা আসে। এই সব পত্রিকার রচনা ও ছবিগুলি অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচায়ক। বাংলা দেশে হস্তলিখিত পত্রিকা ভবিষ্যৎ সাহিত্যিকের সূতিকাগার। স্বয়ং শরৎচন্দ্র পর্যন্ত একদা এই জাতীয় হস্তলিখিত মাসিক সম্পাদনা করেছেন, তাঁর সেই পত্রিকার নাম ছিল 'ছায়া', এবং সেই পত্রিকার লেখকবর্গের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নিরুপমা দেবী, বিভূতি ভট্ট, প্রভৃতি উত্তর কালে যথেষ্ট সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। আমরা এই জাতীয় প্রচেষ্টার অনুরাগী এবং সমর্থক, কিন্তু দুঃখ এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব প্রতিষ্ঠানের পিছনে সুযোগ্য পরিচালকের অভাব থাকে, যথেষ্ট সংগঠন-শক্তিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির নেতৃত্বে যদি এই সব কিশোর ও তরুণ-তরুণীদের উৎসাহ ও উদ্যম যথারীতি নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে একদা তার উপযুক্ত ফল সকলেই ভোগ করতে পারে। আশা করি, হস্তলিখিত পত্র-পত্রিকার উদ্যোক্তারা কথাটা অনুধাবন করবেন।

বর্তমান পরিস্থিতি ও লেখকের দায়িত্ব

পি, ই, এন আন্তর্জাতিক কনগ্রেস আমষ্টারডামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেই সভায় সভাপতি চার্লস মর্গান চমৎকার একটি অভিভাষণ দান করেছেন। জন গলসওয়ার্দি ও এচ, জি, ওয়েলসের পর তিনিই প্রথম ইংরাজ, যিনি এই সভায় সভাপতিত্ব করলেন। চার্লস মর্গান বলেছেন—"A June night and no War!" এই কথাটি আমার মনে বহু বার এসেছে এবং আমি আমার সাহিত্য-কর্মে ব্যবহার করেছি, আবার সেই কথা মনে পড়ছে, আমার পিতা-পিতামহের কাছে যুদ্ধ কথার অর্থ ছিল এক বিরাট দুর্ঘটনা। আমাদের যুগে শান্তি এক দুষ্প্রাপ্য বস্তু। কুড়ি থেকে পঞ্চাশের মধ্যে ত্রিশ বছর মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল, কিন্তু আমি এবং পি, ই, এনের এই সম্মেলনে যাঁরা যোগ দিয়েছেন তাঁদের অনেকের জীবনের এক-তৃতীয়াংশ কেটেছে মহাযুদ্ধে। সেই কারণেই যতটুকু শান্তি পাওয়া যায় ততটুকু নির্ভয়ে এবং পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করাই উচিত। তা ছাড়া বৃথা শান্তির নাম গ্রহণ করার সুযোগ কাউকে দিয়ে তার সন্ত্রাসকর ব্যবহার হ'তে না দেওয়াই উচিত। জীবনের দিন ক্ষয় হচ্ছে কিন্তু সেই কারণে বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত না হই বা আমাদের করধৃত লেখনী যেন কম্পিত না হয়।"

সুদীর্ঘ ভাষণ শেষে মর্গান বিখ্যাত রাশিয়ান মনীষীর উক্তি প্রতিধ্বনিত করে বলেছেন—"শোষিত ও দুর্দশাগ্রস্ত মানবতার কাছে আমাদের অবনত হয়ে শ্রদ্ধা জানাতে হবে।"

চার্লস মর্গানের উক্তির মধ্যে এদিনের সাহিত্যিকদের অনেক অনেক চিন্তার খোরাক বর্তমান,—জীবন ও সাহিত্যকে আজ নূতন দৃষ্টিতে বিচার করার সময় এসেছে।

শ্লীল ও অশ্লীল সাহিত্য

ষ্ট্যানলি ব্যুফ্‌মানের—"দি ফিলাণ্ডারার" নামক উপন্যাসের প্রকাশক মার্টিন সেকার ওয়ারবুর্গ লণ্ডনের সেন্ট্রাল ক্রিমিনাল কোর্টে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। জাষ্টিস ষ্টেবল দীর্ঘ রায় প্রসঙ্গে বলেছেন—"যুগ-যুগান্ত ধরে যৌনতত্ত্ব (Sex) নর-নারীর জীবনে এক কৌতূহলকর বস্তু। এ বিষয়ে দ্বিবিধ মতবাদ বর্তমান উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিরাট,—উভয় পক্ষেই বিভিন্ন মতামত আছে। এক পক্ষের মতে যৌনতত্ত্ব পাপ, সমগ্র ব্যাপারটি ক্লেদাক্ত এই অরুচিকর বিষয়ে যত কম বলা যায় ততই মঙ্গল। অপর পক্ষ বলে, চাপা দেওয়ার নীতি অত্যন্ত ক্ষতিকর, বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টির এই বিষয়টিও একটি অংশ, এ বিষয়ে যতখানি স্পষ্টভাবে কথা বলা যায় ততই ভালো। আমাদের ইংলণ্ডে একটি চোদ্দ বছরের স্কুলের মেয়ের পক্ষে কি উপযোগী এই মানদণ্ডে কি সমসাময়িক সাহিত্যের বিচার হবে? এই আদালতে প্রধান ব্যক্তি নিশ্চয়ই নেই যিনি বলবেন না যে অশ্লীল পুস্তক দমন করা উচিত, কিন্তু স্বাস্থ্যকর সমাজগঠনে আমরা যদি ফৌজদারী আইন বেশী দূর টানি তাহ'লে সমাজে বিদ্রোহ জাগবে এবং আইন পরিবর্তনের দাবী উঠবে। বইটি আমেরিকার বর্তমান জীবনের ঘটনা। অভিযোক্তা উকীল বলেছেন, "এই গ্রন্থ পূতিগন্ধময় জঞ্জাল," সত্যই কি তাই? যৌন কামনার প্রকাশ ও অভিব্যক্তি কি শুধু নোংরা জঞ্জাল মাত্র? এই ধরনের রচনা রুচির দিক থেকে হয়ত ত্রুটিপূর্ণ, কিন্তু তাই বলে কি শুধুই জঞ্জাল?

মাননীয় বিচারপতি আরো অনেক কথা বলেছেন—আমরা এদেশীয় নীতিবাগীশ সমালোচক ও পুলিশ কোর্টের কর্তাদের সম্পূর্ণ রায়টি পাঠ করতে অনুরোধ জানাই। সাহিত্যে কতটুকু শ্লীল ও অশ্লীল তার মাপকাঠি নির্দিষ্ট নেই, যা রুচিকর ও শোভন তাকেই সৎসাহিত্য বলে গ্রহণ করা উচিত।

শব্দকল্পদ্রুম ও বিশ্বকোষ

বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ শব্দকল্পদ্রুম আর বিশ্বকোষ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। বহু উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থের মত এগুলি কালক্রমে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, অথচ ছাত্র, শিক্ষাব্রতী সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের বিশেষ প্রয়োজনীয় এই সব গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রণের কোনো ব্যবস্থাই হচ্ছে না। দেশের বিদ্যোৎসাহী ধনী সম্প্রদায় আজ নিশ্চিন্ত, যাঁদের হাতে এখনও কিছু অর্থ আছে তাঁরা লক্ষ্মীলাভের জন্য কঠোর উপাসনায় ব্যস্ত, উপযুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানও নেই যাঁরা এই ভারটুকু গ্রহণ করতে পারেন, সুতরাং জাতীয় সরকারেরই কর্তব্য এই জাতীয় সম্পদ পুনরুদ্ধার করা। আমরা জাতীয় সরকারের যে সব বে-সরকারি পরামর্শদাতা আছেন তাঁদের কাছেই আমাদের এই আবেদনটুকু পেশ করছি। রাইটার্স বিলডিং-এ প্রধান মন্ত্রী ভবিষ্যতে যখন সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের চা পানে আপ্যায়িত করবেন তখন তাঁরাও কথাটা প্রসঙ্গতঃ উত্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রীকে সচেতন করার চেষ্টা করতে পারেন।

বাংলা ভাষায় ভারতবর্ষের ইতিহাস

বাংলা ভাষায় বাঙালীর ইতিহাস একাধিক রচিত হয়েছে এবং তা বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমগ্র ভারতবর্ষের কোনো উল্লেখযোগ্য ইতিহাস আজো বাংলা ভাষায় রচিত হয়নি। মারহাট্টা যুগ, মোগল যুগ সম্পর্কে ইংরাজী ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত পুস্তক-সংখ্যাও কম নয়, কিন্তু সে সবই ইংরাজী ভাষায় রচিত।

আদর্শ
লিভার
টনিক
QUMARESH

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

গুয়াতেমালা—

মধ্য-আমেরিকার ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গুয়াতেমালায় সম্প্রতি বার দিন-ব্যাপী যে-যুদ্ধ হইয়া গেল, যে-যুদ্ধের ফলে গুয়াতেমালার বামপন্থী গবর্ণমেন্টের পতন হইল তাহাকে চির বিপ্লবের দেশ লাটিন আমেরিকার ঠিক অনুরূপ একটি বিপ্লব বলিয়া স্বীকার করা যায় না। উহা বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক অবস্থারই একটি অঙ্গ-স্বরূপ, মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের কম্যুনিজম নিরোধ প্রচেষ্টার একটি অংশ, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। ১৭শে জুন (১৯৫৪) গুয়াতেমালা আক্রান্ত হয়। ২৭শে জুন রাত্রে প্রেসিডেণ্ট আরবেনজ পদত্যাগ করেন এবং সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়ক কর্ণেল কারলজ এনরিক দিয়াজ প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। কিন্তু ২৯শে জুন তারিখে সেনর জোস লুইস ক্রুজ এবং আরও দুই জনকে লইয়া এক সামরিক শাসকচক্র গঠিত হয়। এই শাসকচক্র ক্ষমতা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই কম্যুনিষ্টদিগকে গ্রেফ্তারের হুকুম দিয়া আক্রমণকারীদের সহিত আপোষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ২রা জুলাই শান্তিচুক্তি হয় এবং পাঁচ জনকে লইয়া একটি শাসকচক্র গঠিত হয়। কর্ণেল এলফেগো মনজন সাময়িক ভাবে রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত হন এবং বিদ্রোহী-বাহিনীর অধিনায়ক কর্ণেল কোঠিলো আরমাস শাসকচক্রের একজন সদস্য হইয়াছেন। গুয়াতেমালার এই যুদ্ধ এবং তাহার পরিণামের যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে হইলে কে গুয়াতেমালাকে আক্রমণ করিয়াছিল, কেন আক্রমণ করিয়াছিল এবং যুদ্ধের ফলে গঠিত নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠনের তাৎপর্য্য কি, তাহা আলোচনা করা আবশ্যক।

গুয়াতেমালা গবর্ণমেণ্ট হণ্ডুরাস এবং নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ করিয়াছিল। এই আক্রমণের জন্য কয়েকটি একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান প্ররোচনা দিয়াছে বলিয়াও অভিযোগ করা হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কোনরূপ তদন্ত না করিয়াই গুয়াতেমালা আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে এবং মার্কিণ রাষ্ট্র দপ্তরের একটি বিবৃতিতে উহাকে গুয়াতেমালা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জনগণের অভ্যুত্থান বলিয়া অভিহিত করা হয়। রয়টারের প্রেরিত সংবাদে আক্রমণকারীদিগকে বলা হইয়াছে, 'কম্যুনিষ্টবিরোধী মুক্তি ফৌজ।' কিন্তু ইহারা কাহারা? কোথা হইতে এবং কিরূপে এই ফৌজ সংগ্রহ করা হইল, কোথায় তাহাদিগকে যুদ্ধশিক্ষা দেওয়া হইল, তাহার অস্ত্র-শস্ত্র এবং ১১ হইতে ১৬খানা বিমান কোথা হইতে পাইল, তাহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আক্রমণকারীদের অধিনায়ক কর্ণেল কাষ্টিলো আরমাস ১৯৫০ সালে গুয়াতেমালায় বিদ্রোহের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া ধৃত ও বন্দী হন। এক বৎসর পরে তিনি জেল হইতে পলায়ন করিয়া গুয়াতেমালার বাহিরে শক্তিসঞ্চয় করিতেছিলেন। কিন্তু ইহাতে গুয়াতেমালার এই যুদ্ধের কারণ এবং স্বরূপ কিছুই বুঝা যায় না। গুয়াতেমালার বামপন্থী গবর্ণমেণ্টের ধ্বংস সাধন করিয়া আক্রমণকারীদের জয়লাভের প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডালেসের উক্তি হইতে। ৩০শে জুন রাত্রে রেডিও-টেলিভিশন বক্তৃতায় আক্রমণকারীদের জয়লাভকে তিনি 'নূতন এবং গৌরবজনক' বিজয় বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। গুয়াতেমালায় যাহা ঘটিয়া গেল তাহা যে লাটিন আমেরিকা সুলভ সামরিক অভ্যুত্থান নহে, তাহা তাঁহার এই বিজয় উল্লাস হইতেও অনুমান করিতে পারা যায়। তিনি আরও বলেন, দশ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত গুয়াতেমালার বিপ্লবে কম্যুনিষ্টদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহারা গুয়াতেমালার সরকারী কর্ম্মচারীদের সহিত সহযোগিতা করিয়া আসিতেছিল। দশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯৪৪ সালে গুয়াতেমালায় যে-বিপ্লব ঘটে তাহার মূলোচ্ছেদ যে এই আক্রমণের ফলে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত গুয়াতেমালা কার্য্যতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একটি উপনিবেশ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ঐ বৎসর সাধারণ নির্ব্বাচনে ডিক্টেটর জেনারেল জর্জ্জ ইউবিকোর পতন হয় এবং গণতান্ত্রিক শক্তি জয়লাভ করে। এই নির্ব্বাচনে জুয়ান জোস আরেভালো গুয়াতেমালার প্রেসিডেণ্ট হন। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া গুয়াতেমালা হইতে নির্ব্বাসিত ছিলেন। এই নির্ব্বাচনের পর হইতে গুয়াতেমালা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে থাকে। আরেভালো গভর্ণমেণ্টের শাসনকালের ছয় বৎসরের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বড় কম হয় নাই, কয়েক বার সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টাও হইয়াছে। ১৯৫০ সালের নির্ব্বাচনে জেকবো আরবেনজ প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক শোষণ হইতে মুক্তির চেষ্টা অব্যাহত ভাবেই চলিতে থাকে। ১৯৫২ সালে কৃষিভূমি সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন প্রবর্ত্তন যেমন জনগণের অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য এক বৃহৎ পাদক্ষেপ তেমনি এই আইনই গুয়াতেমালা আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম প্রধান প্ররোচনা হইয়াছিল। কিন্তু আরবেনজ

গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বামপন্থী নীতি গ্রহণ করা অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না। গুয়াতেমালার অর্দ্ধেক জমির মালিক ২২টি জমিদার এবং অবশিষ্ট জমি ছিল ৩ লক্ষ ১ হাজার ১৩২ জন কৃষকের হাতে। সুতরাং মুষ্টিমেয় ধনী শ্রেণীর তুলনায় জনসাধারণের দারিদ্র্য যে কি ভয়াবহ ছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন নয়। জনগণের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য ভূমির পুনর্ব্বণ্টন ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। কিন্তু গুয়াতেমালায় সর্ব্বাপেক্ষা বড় জমিদার মার্কিণ মূলধনে গঠিত ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানী। এই কোম্পানীই গুয়াতেমালার কলার বাগান সমূহের মালিক। মধ্য-আমেরিকা যত কলা সরবরাহ করে তাহার শতকরা ১৮ ভাগ উৎপন্ন হয় শুধু গুয়াতেমালায়। এইজন্য উহা 'কলা প্রজাতন্ত্র' নামেও খ্যাত। ১৯৫৩ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী গুয়াতেমালা গবর্ণমেণ্ট ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর উপর এই মর্ম্মে নোটিশ জারী করেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলস্থ উক্ত কোম্পানীর ৩ লক্ষ একর জমির মধ্যে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার একর জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে। এই নোটিশ রহিত করিবার জন্য প্রেসিডেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া কোন ফল না পাওয়ায় কোম্পানী সুপ্রীম কোর্টে আপীল রুজু করেন। কিন্তু এই আপীল অগ্রাহ্য হয় এবং ১৯৫৩ সালের ১৫ই নভেম্বর হইতে কোম্পানীর বাজেয়াপ্ত জমির পুনর্ব্বণ্টন আরম্ভ হয়। এ প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, জমি বাজেয়াপ্ত করার জন্য কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৯৫৩ সালের শেষ ভাগে উক্ত কোম্পানীর কারিবিয়ান সাগরের উপকূলস্থ ১ লক্ষ ৭৪ হাজার জমিও বাজেয়াপ্ত করার নোটিশ দেওয়া হয়। এই কোম্পানীটি গুয়াতেমালার তিনটি সামুদ্রিক বন্দরেরও মালিক। এই তিনটি বন্দরের সাহায্যে এই কোম্পানী গুয়াতেমালার সমস্ত বৈদেশিক বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানী ব্যতীত আরও দুইটি বৃহৎ একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গুয়াতেমালায় আছে। একটি 'ইণ্টারনেশাস্থাল রেলওয়েস্ অব সেন্ট্রাল আমেরিকা', আর একটি 'এম্প্রেস ইলেকট্রিকস্ ডি গুয়াতেমালা।' শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি গুয়াতেমালার সমস্ত বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানটি এ্যাংলো-মার্কিণ মালিকানা সত্ত্বে গঠিত। এই রেলওয়েই গুয়াতেমালার একমাত্র রেলওয়ে। আরবেন্জ গবর্ণমেণ্ট শুধু কৃষকদের উন্নতির জন্যই চেষ্টা করিতেছিলেন না, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্যও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মজুরি লইয়া উক্ত রেলওয়ে কোম্পানী এবং শ্রমিকদের মধ্যে অনেক দিন ধরিয়াই বিরোধ চলিতেছিল। এই বিরোধের পরিণামে গুয়াতেমালা গবর্ণমেণ্ট 'ইণ্টারন্যাশন্যাল রেলওয়েস্ অব সেন্ট্রাল আমেরিকার পরিচালন-ভার ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

গুয়াতেমালার জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আরবেন্জ গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত যে সকল কার্য্যপদ্ধতি গ্রহণ করেন তাহাতে গুয়াতেমালায় মার্কিণ স্বার্থ বিপন্ন হওয়ায় মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট উদ্বিগ্ন না হইয়া পারেন নাই। কিন্তু একটা স্বাধীন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সোজাসুজি হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়। মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট গুয়াতেমালা গভর্ণমেণ্টের উপর কম্যুনিষ্টদের প্রভাবের দুঃস্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিলেন। গুয়াতেমালা গবর্ণমেণ্ট রাশিয়ার নিকট হইতে আদেশ গ্রহণ করেন, এই অভিযোগও উপস্থিত করা হইতে লাগিল। অন্য দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার পক্ষে কম্যুনিজমের অভিযোগটা একটা সহজ উপায়ে পরিণত হইয়াছে। একথা অবশ্য সত্য যে, গত মার্চ্চ মাসে (১৯৫৪) কারাকাসে অনুষ্ঠিত আন্তঃ আমেরিকান সম্মেলনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ চেষ্টায় কম্যুনিজম নিরোধের জন্য যে প্রস্তাব গৃহীত হয় গুয়াতেমালা তাহাতে স্বাক্ষর করে নাই। ইহাতেই গুয়াতেমালা গবর্ণমেণ্টের উপর কম্যুনিষ্টদের প্রভাব প্রমাণিত হইয়া যায় না। আরবেন্জ গবর্ণমেণ্ট ছিল তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দলের কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট। জাতীয় পরিষদের ৫৬টি আসনের মধ্যে এই তিনটি রাজনৈতিক দল ৪০টি আসন দখল করিয়াছিল। অবশিষ্ট ১৬টি আসনের মধ্যে কম্যুনিষ্টরা দখল করিয়াছিল মাত্র চারিটি আসন। মন্ত্রীদের মধ্যে কেহই কম্যুনিষ্ট ছিলেন না। ইহাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। প্রকাশ্যে কম্যুনিজমের অভিযোগ তুলিয়া যেভাবে গুয়াতেমালার বিরুদ্ধে আয়োজন করা হইতেছিল, গত ২৯শে জানুয়ারী প্রেসিডেণ্ট আরবেন্জ যে অভিযোগ উপস্থিত করেন তাহা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। তিনি প্রকাশ্যেই এই অভিযোগ করেন যে, কয়েকটি আমেরিকান প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র গুয়াতেমালা আক্রমণের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে। তিনি ডোমিনিকান রিপাবলিক, এল সালভাডর, নিকারাগুয়া এবং ভেনেজুয়েলার নাম স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ করেন। সেই সঙ্গে গুয়াতেমালার উত্তরে অবস্থিত একটি গবর্ণমেণ্টের কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন। উত্তরে অবস্থিত গবর্ণমেণ্ট বলিতে সোজাসুজি মেক্সিকোকেই অবশ্য বুঝায়। কিন্তু উহা দ্বারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকেও বুঝান হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। উক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হয় যে, প্রধান ষড়যন্ত্রকারী দুই জন, একজন

কর্ণেল কাষ্টিগো আরমাস এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি জেনারেন ইয়েডুরাস, ফুয়েণ্টেস। প্রথমোক্তের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় ব্যক্তি ১৯৫০ সালের নির্ব্বাচনে প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজিত হন। গুয়াতেমালার কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন এবং ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানী ষড়যন্ত্রকারীদিগকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিতেছে বলিয়াও উক্ত বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়। এই অভিযোগও করা হয় যে, গুয়াতেমালা আক্রমণের জন্য আক্রমণকারীদিগকে শিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে নিকারাগুয়ায় ট্রেনিং ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

গত ১৫ই মে (১৯৫৪) পোলাণ্ডের একটি বন্দর হইতে এক-জাহাজ সোভিয়েট অস্ত্রশস্ত্র গুয়াতেমালার পুয়েরটো করিয়স বন্দরে পৌঁছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উহাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলিয়া মনে করে। কিন্তু ইহা সকলেরই জানা কথা যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গুয়াতেমালার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করিতে তো অস্বীকার করেই— মার্কিণ মিত্রশক্তিবর্গ যাহাতে গুয়াতেমালার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় না করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করে। এই অবস্থায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় গুয়াতেমালা অন্যত্র অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিতে চেষ্টা করিয়া থাকিলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। সুইজারল্যাণ্ড হইতে যে জাহাজে করিয়া অস্ত্রশস্ত্র গুয়াতেমালায় প্রেরিত হইয়াছিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নির্দ্দেশে হামবুর্গে তাহা আটক করা হয়। ইউরোপের যে সকল রাষ্ট্রের জাহাজী কারবার আছে তাহাদের সকলকেই মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট এই অনুরোধ করেন যে, তাহাদের জাহাজগুলিকে সমুদ্রপথে মার্কিণ যুদ্ধজাহাজকে যেন তল্লাসী করিতে দেওয়া হয়। এই ভাবে গুয়াতেমালায় অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হণ্ডুরাস এবং নিকারাগুয়াকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিতে থাকে। এই ভাবেই চলিয়াছিল গুয়াতেমালা আক্রমণের প্রস্তুতি। গুয়াতেমালায় যাহা ঘটিয়াছে তাহা জনগণের বিদ্রোহ নয়, বাহির হইতে গুয়াতেমালা আক্রমণ। হণ্ডুরাস হইতে স্থলপথে গুয়াতেমালা আক্রান্ত হয়, সমুদ্র হইতে গোলাবর্ষণ করা হয় এবং আকাশ হইতে বর্ষণ করা হয় বোমা। আক্রমণকারীদের মধ্যে নির্ব্বাসিত গুয়াতেমালাবাসী অবশ্যই হয়ত ছিল। কিন্তু অন্য দেশের সৈন্য ছিল কি না, তাহা জানিবার পথ নিরাপত্তা পরিষদই রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। মুষ্টিমেয় নির্ব্বাসিত গুয়াতেমালাবাসী জলপথ, স্থলপথ এবং বিমানপথে আক্রমণ করিবার শক্তি কোথায় পাইল তাহাও কেহই বিবেচনা করিয়া দেখিল না।

আক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য গুয়াতেমালা নিরাপত্তা পরিষদের নিকট আবেদন করিয়াছিল। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে গুয়াতেমালার প্রতিনিধি ডাঃ কাষ্টিলা অরিওলা বলিয়াছিলেন, "Guatemala is being invaded by international forces under the treacherons guise of exile," কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদ গুয়াতেমালার অভিযোগকে তাহার কার্য্যসূচীতেই স্থান দিতে রাজী হয় নাই। গুয়াতেমালার অভিযোগকে কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিবার বিরুদ্ধে পাঁচ ভোট এবং পক্ষে চারি ভোট হইয়াছিল। বৃটেন এবং ফ্রান্স অনুপস্থিত ছিল। বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কুয়োমিণ্টাং চীন, তুরস্ক, ব্রাজিল এবং কলম্বিয়া। রাশিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, ডেনমার্ক এবং লেবানন পক্ষে ভোট দিয়াছিল। গুয়াতেমালার ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ যে-পন্থা গ্রহণ করিয়াছে তাহা কোরিয়ার কথা স্মরণ না করাইয়া দিয়া পারে না। উত্তর-কোরিয়া দক্ষিণ-কোরিয়াকে আক্রমণ করিয়াছে, দক্ষিণ-কোরিয়ার এই অভিযোগ কোনরূপ তদন্ত না করিয়াই নিরাপত্তা পরিষদ বেদবাক্যের মত বিশ্বাস করিয়াছিল। নিরাপত্তা পরিষদের মঞ্জুরীর অপেক্ষা না করিয়াই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-কোরিয়ার পক্ষে যুদ্ধে নামিয়া গিয়াছিল এবং নিরাপত্তা পরিষদ পরে এই কার্য্য অনুমোদন করে। আর গুয়াতেমালার ক্ষেত্রে অভিযোগকেই কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিতে দেওয়া হইল না।

মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র তথা নিরাপত্তা পরিষদের কার্য্যতার ফলে গুয়াতেমালা মুক্ত হওয়ার দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা পাইল না। কিন্তু গুয়াতেমালার গণতান্ত্রিক এবং জনগণের আস্থাভাজন গবর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করা হইলেও লাটিন আমেরিকার সমস্যার সমাধান হয় নাই। লাটিন আমেরিকার প্রত্যেকটি দেশে জনগণের মনে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে। ফ্যাসিষ্ট শাসকশ্রেণী ক্ষমতা ত্যাগ করিতে কিছুতেই রাজী নয়। তাহারা দৃঢ় হস্তে জনগণের অসন্তোষকে দমন করিতেছে। ১৯০০ সাল হইতে এ-পর্য্যন্ত লাটিন আমেরিকার ভিন্ন দেশে একের পর আর অনেক বিপ্লব হইয়াছে, কিন্তু জনগণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই। গুয়াতেমালা এই স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাকেও মুক্ত করা হইল। লাটিন আমেরিকার এই অবস্থার জন্য মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রই যে প্রধানতঃ দায়ী এ-কথা অস্বীকার করা চলে না। মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র লাটিন আমেরিকাকে তাহার পণ্যের বাজার এবং মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে দেখিয়া থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হওয়ায় লাটিন আমেরিকার কুড়িটি দেশ মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নূতন গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। লাটিন আমেরিকার কুড়িটি দেশ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য-সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। তাহারা মার্কিণ তাঁবেদার হিসাবে একযোগে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ভোট দিয়া থাকে। সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্যের উহা একটি প্রধান কারণ। গুয়াতেমালা মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের কবল-মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাকে আবার খোঁয়াড়ে পুরা হইয়াছে। কিন্তু লাটিন আমেরিকার জনগণের অসন্তোষ দমন করা সম্ভব নয়। এশিয়ার জনগণ বহুদিন আগেই জাগিয়াছে। আফ্রিকাতেও জনজাগরণ আরম্ভ হইয়াছে। লাটিন আমেরিকাও পিছনে পড়িয়া থাকিবে না।

জেনেভা-সম্মেলন—

জেনেভা সম্মেলনে কোরিয়া শান্তিচুক্তির আলোচনা ব্যর্থ হইয়া গেল। কেন ব্যর্থ হইল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন নয়। চীনের দিক হইতে প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে কোরিয়া হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারিত করিতে হইবে এবং একটি নিরপেক্ষ জাতি কমিশন নির্ব্বাচন পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। এই নিরপেক্ষ জাতি

কমিশন সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, পোলাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে লইয়া গঠনের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু মার্কিণযুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাবে রাজী হইতে পারে নাই। কেন রাজী হইতে পারে নাই তাহাও বুঝিতে পারা কঠিন নয়। কোরিয়া হইতে বিদেশী সৈন্য যদি অপসারিত হয় এবং নিরপেক্ষ কমিশন যদি নির্বাচন পরিদর্শন করেন, তাহা হইলে নির্বাচনের ফল যেরূপ হওয়া মার্কিণযুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রেত সেরূপ হওয়ায় কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চাহিয়াছিল যে, বিদেশী সৈন্যের উপস্থিতিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পর্য্যবেক্ষণাধীন কোরিয়ায় নির্বাচন হউক। বিদেশী সৈন্য উপস্থিত থাকিলে ভোটারদিগকে ভয় দেখাইয়া সিংম্যানরীর পক্ষে ভোট দিতে বাধ্য করা সম্ভব হইবে। সেই সঙ্গে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকমিশন সার্টিফিকেট দিবে যে, নির্বাচন স্বাধীন ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অবস্থায় কোরিয়ার শান্তিচুক্তির আলোচনা ব্যর্থ হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

ইন্দোচীন

কোরিয়ায় শান্তিচুক্তির আলোচনা ব্যর্থ হইলেও ইন্দোচীন সংক্রান্ত আলোচনা সাফল্য লাভ করার ক্ষীণ সম্ভাবনা এখনও বর্তমান রহিয়াছে। আলোচনা যে ভাঙ্গিয়া যায় নাই, ইহাও বড় কম কথা নয়। লাওস ও কাম্বোডিয়া সম্পর্কে পৃথক ভাবে বিবেচনা করিতে চীন রাজী হওয়ায় পশ্চিমী শক্তিবর্গের একটি দাবী পূরণ হইয়াছে। কিন্তু সম্মুখের বাধা এখনও কম দুর্লঙ্ঘ্য নয়। ইতিমধ্যে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে ইন্দোচীন আলোচনার উপর যাহার প্রভাবের গুরুত্ব অনেক বেশী।

ফ্রান্স গবর্ণমেণ্টের ইন্দোচীন নীতি সম্পর্কে আস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবে প্রধান মন্ত্রী মঃ ল্যানিয়েল ১২ই জুন পরাজিত হইয়া পদত্যাগ করেন। বামপন্থী র‍্যাডিকেল মঃ মেণ্ডেস ফ্রাঁস ১৮ই জুন তারিখে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তিনি এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, হয় এক মাসের মধ্যে তিনি ইন্দোচীনে শান্তি স্থাপন করিবেন, না হয় পদত্যাগ করিবেন। সুতরাং ২০ শে জুলাইয়ের মধ্যে ইন্দোচীনে যদি শান্তি স্থাপন করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। পররাষ্ট্র-দপ্তর তিনি নিজের হাতে রাখিয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, তিনি ইউরোপীয় দেশরক্ষা ব্যবস্থার বিরোধী। মন্ত্রিসভা গঠনের পর ইন্দোচীন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রথম কাজ চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাইয়ের সহিত আলোচনা। বার্ণে ২৩শে জুন তারিখে এই আলোচনা হয় এবং আলোচনার পর ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ মেণ্ডেস ফ্রাঁস বলেন যে, মিঃ চৌ-এন লাইয়ের সহিত আলোচনায় জেনেভা সম্মেলনের অগ্রগতি সম্বন্ধে তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। এই দিকে ইন্দোচীনে যুদ্ধের গতি ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করিতে থাকে। ইন্দোচীনস্থিত ফরাসী হাইকমাণ্ড ১লা জুলাই তারিখে এক ইস্তাহারে জানান যে, লোহিত নদীর ১৬শত বর্গ-মাইল বদ্বীপ হইতে ফরাসী সৈন্যদিগকে অপসারিত করা হইয়াছে। অতঃপর ফুলী ঘাঁটিকেও তাহারা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় পর্য্যন্ত অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে হ্যানয়ও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ফরাসী সৈন্যদের লোহিত নদীর বদ্বীপ হইতে চলিয়া আসায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র খুব অসন্তুষ্ট হইয়াছে। ফরাসীদের দিক হইতে বলা হইয়াছে যে, ল্যানিয়াল গবর্ণমেণ্টের সময়েই লোহিত নদীর বদ্বীপ ত্যাগের সিদ্ধান্ত করা হয়। এইরূপ একটা আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে, ইন্দোচীনকে বিভক্ত করিবার জন্য একটা গোপন চুক্তি করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কিছু অনুমান করিতে চেষ্টা করা বৃথা। কোন পক্ষই ইন্দোচীনকে বিভক্ত করার পক্ষপাতী নহে। কিন্তু যদি যুদ্ধ বিরতি হয় তবে যুদ্ধ বিরতির সীমারেখা কার্য্যতঃ ইন্দোচীনকে বিভক্তই করিবে। যত দিন না রাজনৈতিক মীমাংসা দ্বারা ইন্দোচীনের ঐক্য সাধিত না হইবে তত দিন এই বিভাগ থাকিয়াই যাইবে। অনেকে মনে করেন যে, ষোড়শ অক্ষরেখাই যুদ্ধবিরতির সীমারেখা হইবে। আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বেই হয়ত ২০শে জুলাই অতিক্রান্ত হইবে।
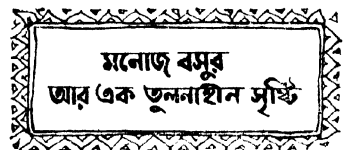
লেডীজ সিট—হাসির ছবি নয়, লোকহাসানো ছবি

হাসির ছবি বাংলা দেশে আজ অবধি একটিও তৈরী হয় নি, আর যাঁদের হাতে আজও বাংলা দেশে ছবি পরিচালনার ভার রয়েছে তাঁদেরই হাতে থাকলে কখনো হবেও না। ভানু বন্দ্যো, নবদ্বীপ হালদার, ফণী রায়কে জড়ো করেই যাঁরা ভাবেন যে হাসির ছবি তৈরী হয়ে গেল, তাঁরা এক একটি মহাপণ্ডিত। 'কাম, কাম, সিট, সিট' কিংবা 'নো সারভেণ্ট লাড' বলেই যদি হাসানো যেত তাহলে আর চার্লি, লরেলকে করে খেতে হত না।

একটা খাঁটী হাসির দৃশ্যের কথা বলছি। জনৈক ভদ্রলোক একটা দেশলাই কাঠি ধরাতে গিয়ে অসতর্ক মুহূর্তে হাত থেকে ফসকে পড়ে গেল কাঠিটি। আরও একটি কাঠি জ্বাললেন ভদ্রলোক না-জ্বলা কাঠিটি খুঁজে বার করতে। শেষ হয়ে গেল সেটা জ্বলে জ্বলে। জ্বাললেন আরও একটা, তা-ও শেষ। তার পর, পর পর কাঠি জ্বেলে চললো সেই হারিয়ে-যাওয়া কাঠিটিকে খোঁজা। দৃশ্যটি একটি বিদেশী ছবিতে দেখা। বলুন তো এবার আপনি হাসবেন কি না? আর একটা, ছুটতে ছুটতে কোনও হোটেলের চার তলায় উঠলেন এক ভদ্রলোক। চাবি দিয়ে খুললেন দরজা। সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে খুলে এল প্যাণ্টের পকেটের খানিকটা। বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা? প্যাণ্টের বোতামে লাগানো ছিল চাবিটা। চাবিটা কলে লাগানো অবস্থাতেই ঠেলেছেন দরজা এবং সঙ্গে সঙ্গে।

এক বিরহী যুবক তার প্রিয়ার বিবাহের দিনে এক এক করে পুড়িয়ে ফেলতে লাগলো দিনের পর দিন লেখা চিঠিগুলি আর সেই আগুন থেকে ধরিয়ে নিল সিগারেট। শুরু হল লেডীজ সিটের গল্প। ল্যাংচা, গর্দী পিসির গলির সব চেয়ে ধনী বাসিন্দা, অভিভাবকহীন, বাড়ীতে ভাড়াটে এনে তুললো, তার সঙ্গে এল একটি মেয়ে অপূর্ব সুন্দরী, রূপলাবণ্যময়ী। কৃষ্ণনাম বন্ধ হল। শুরু হল কলহর নিয়ে ঝগড়া। তার পর···তার পর একদিন চিংড়ীর কাটলেট এ'ওর মুখে দিয়ে দেওয়া। আর কী? হিন্দী ছবির মত নানা ঢংয়ে তোলা মায়া মুখার্জীর সট্। বাথরুমে চান্ করার দৃশ্য বেশ খানিকক্ষণ ধরে ক্লোজ আপে। ধনঞ্জয় ভট্টা। ব্যস, হিট।

বাংলা দেশের ছবির বাজারে অভিনেত্রী আছেন শতাধিক। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সামান্য দু'-একজনেরও গ্ল্যামার নামক অতি-অবশ্য বস্তুটি আছে কি না সন্দেহ। মায়া মুখার্জীর মধ্যে এ জিনিষটি আছে। যখন এই একটি মাত্র বস্তুর গুণেই হিন্দী ছবি বাংলা দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা লুঠে নিয়ে যাচ্ছে তখন বাংলা দেশের চিত্রপরিচালকও দু'-একটি মায়া মুখার্জীর বাথরুমের স্নান করার চিত্র গ্রহণের সুযোগ করবেন না কেন? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সেই পরিচালককে, এই বাংলা দেশেই 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'কালো ছায়া', কি প্রভৃত অর্থ রোজগার করেনি? তবে বাংলার কালচারকে বাঁচিয়ে ছবির মত ছবি তুলে অর্থ রোজগার করতে আপত্তি কোথায়?

ফটোগ্রাফী ও শব্দগ্রহণ মন্দ নয়। অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ কেউ-ই কোন প্রতিভার ছাপ রেখে যেতে পারলেন না, অন্ততঃ এই ছবিটির মারফৎ।

মরণের পরে—উনপঞ্চাশী ছবি

মরণের পরেও কি মানুষের কিছু পড়ে থাকে? মৃত্যুতেই কি এ জীবনের পরিসমাপ্তি? মানুষের এ জিজ্ঞাসা অনন্তকালের। তবু তো সমাজে দু'-একটা জাতিস্মর দেখা যায়, যাঁরা বলতে পারেন বিগত জীবনের কাহিনী। এমনি একটি জাতিস্মরকে নিয়েই 'মরণের পরে'র কাহিনী। বিয়ের দিন টাকার গোলমালে বরপক্ষ বর উঠিয়ে নিয়ে গেল চাঁদনাতলা থেকে। ঘটক একটি ঘাটের মড়া জমিদারকে ধরে নিয়ে এল বর সাজিয়ে। একে কুলীন, তায় জমিদার, সুতরাং পাড়াগাঁয়ে তিনি সোনার চাঁদ ছেলে। বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু শুভদৃষ্টির সময়ই অজ্ঞান হয়ে পড়ল কনে। কেন? শুভদৃষ্টির সময় তার যেন মনে হল এই স্বামীকে সে যেন দেখেছে কোথায়। কিন্তু কোথায়? কিছুতেই মনে করতে পারে না। কর্ণেল চ্যাটার্জী এলেন তার এই অদ্ভুত মানসিক ব্যাধিকে সারাবার জন্য। কিন্তু কর্ণেল চ্যাটার্জীর মেণ্টাল হসপিটালের যুবক ডাক্তারটিকে দেখেই সে আবিষ্কার করলো এই তার ছেলে। এমন সময় এল খুনে গুরুদাস ভিক্ষা করতে। তাকে দেখেই অজ্ঞান অবস্থায়—সব কিছু স্বীকারোক্তি। ইতিমধ্যে ভুজঙ্গ চৌধুরী জমিদার এসে হাজির। শুরু হল একটা ডুয়েল ফাইট। খুন হলেন জমিদার। সেই দৃশ্যেই মিলন হল একটি যুবক ডাক্তারের আর ভুজঙ্গ চৌধুরীর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কন্যা খুকুসোনার। একটি হ-য-ব-র-ল ঘটনা। মাথামুণ্ডু কিছুই নেই। নাগা পাহাড়ে হিন্দী গান, কর্ণেল চ্যাটার্জীর বাড়ী আর জমিদার ভুজঙ্গ চৌধুরীর কলকাতার বাড়ীর তফাৎ নেই, ডাক্তারের চোখে ধোঁকা দেওয়া বাক্সে রক্ত দেখিয়ে, দেশলাইয়ের খোলে আঁকা দোতালা মেণ্টাল হসপিটাল কত অসঙ্গতি!

পাঁচ মিনিটের মধ্যে পর পর চারটি খুন দেখাবার কৃতিত্ব রইল পরিচালক দাশগুপ্ত মহাশয়ের। বাংলা দেশে আজও একটা সত্যিকারের ভালবাসার দৃশ্য দেখলাম না। সেই কপোত-কপোতী, কুঁড়ি ফোটানো, রেলিঙ ধরে পাশাপাশি দাঁড়ানো, ফুলবাগানে লুকোচুরি, এ দিয়ে আর কত দিন চলবে দাশগুপ্ত মশাই?

廣重画

প্রথম খণ্ড] সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত [চতুর্থ সংখ্যা

স্থাপিত ১৩২৯

শ্রাবণ, ১৩৬১ | ৩৩শ বর্ষ
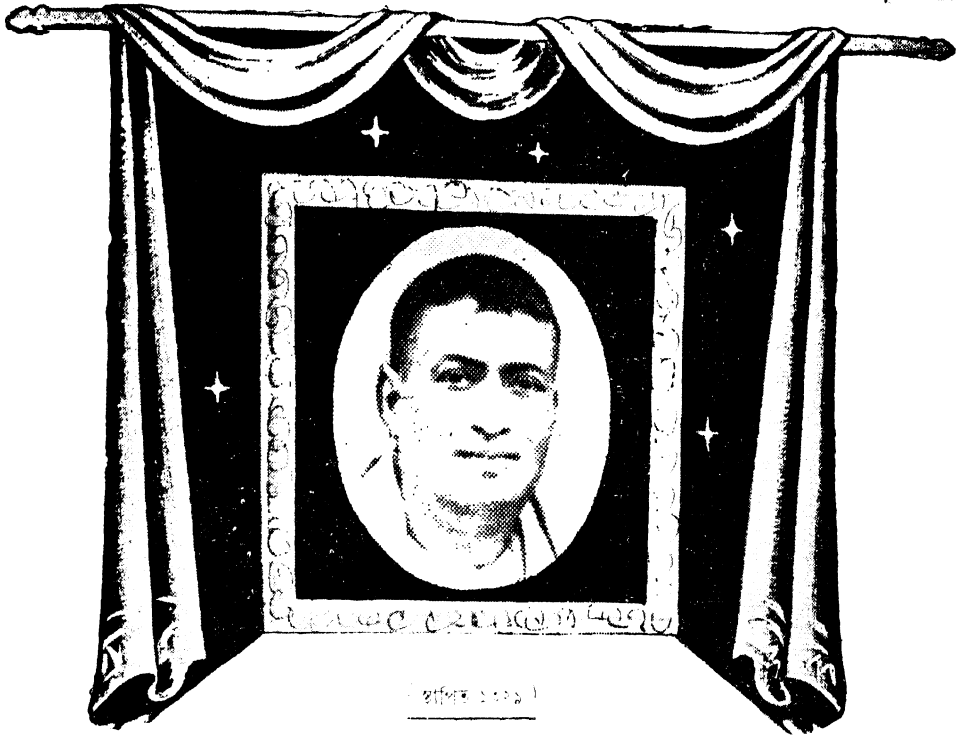
কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। "দ্যাখ্, যেটা সড় সড় ক'রে মাথায় উঠে, সেটা সব সময় এক রকম ভাবে উঠে না। শাস্ত্রে সেটার পাঁচ রকম গতির কথা আছে—যথা, পিপীলিকাগতি,—যেমন পিঁপড়েগুলো খাবার মুখে ক'রে সার দিয়ে সুড় সুড় ক'রে যায়, সেই রকম পা থেকে একটা সুড়-সুড়ানি আরম্ভ হয় ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে থাকে; মাথা পর্য্যন্ত যায়—আর সমাধি হয়! ভেকগতি,—ব্যাঙ্‌গুলো যেমন টুপ্ টুপ্ টুপ্, টুপ্ টুপ টুপ্ ক'রে দু-তিন বার লাফিয়ে একটু থামে, আবার দু-তিন বার লাফিয়ে আবার একটু থামে, সেই রকম করে কি একটা পায়ের দিক্ থেকে মাথায় উঠছে বোঝা যায়; আর যেই মাথায় উঠলো আর সমাধি! সর্পগতি,—সাপগুলো যেমন লম্বা হয়ে বা পুঁটুলি পাকিয়ে চুপ ক'রে পড়ে আছে, আর যেই সামনে খাবার (শিকার) দেখেছে বা ভয় পেয়েছে, অমনি কিল্‌বিল কিল্‌বিল ক'রে এঁকে-বেঁকে ছোটে, সেই রকম ক'রে ওটা কিল্‌বিল ক'রে একেবারে মাথায় গিয়ে উঠে—আর সমাধি! পক্ষিগতি,—পক্ষীগুলো যেমন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে বসবার সময় হুস্ ক'রে উড়ে কখন একটু উঁচুতে উঠে, কখন একটু নীচুতে নাবে, কিন্তু কোথাও বিশ্রাম করে না,—একেবারে যেখানে বসবে মনে করেছে সেইখানে গিয়ে বসে, সেই রকম ক'রে ওটা মাথায় উঠে ও সমাধি হয়! বাঁদরগতি,—হনুমানগুলো যেমন এক গাছ থেকে আর এক গাছে যাবার সময় 'উউপ্' ক'রে এক ডাল থেকে আর এক ডালে গিয়ে পড়লো, এইরূপে দু-তিন লাফে যেখানে মনে করেছে সেখানে উপস্থিত হয়, সেই রকম ক'রে ওটাও দু-তিন লাফে মাথায় গিয়ে উঠে বোঝা যায় ও সমাধি হয়!"

সর্পদংশনের প্রতিকার

শ্রীনারায়ণ ভঞ্জ

বিধাতার সৃষ্টিমধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার মানব পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ সকল প্রাণীর উপর আধিপত্য করিতেছে ; জয় করিয়া বশীভূত করিয়া স্বকার্য্য-সাধনে নিয়োজিত করিতেছে, সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পরাক্রান্ত প্রাণিগণ আজি তাহার ক্রীড়নক, হস্তী-অশ্ব-গো-মহিষাদি বলবান জীবনিচয় তাহার আজ্ঞাবহ, তথাপি এক নগণ্য ক্ষুদ্র প্রাণী—যাহার শৃঙ্গ-নখরাদি আয়ুধ নাই, এমন কি পদ-বিবর্জ্জিত বলিয়া বুকে হাটে—সেই হইয়া রহিয়াছে বিজ্ঞান-বলদৃপ্ত মানবের ভীতিস্থল! তাহার সম্বল কেবল দন্ত, তাহাও আবার অন্তঃসারশূন্য, ভঙ্গুর, তথাপি তাহারই ভয়ে মানব সদা সশঙ্কিত। স্থল-জল-অন্তরীক্ষে তাহার বিভীষিকা। যেহেতু ঐ দন্তে আছে কালকূট বিষ—সদ্যপ্রাণাপহারক।

জীবের জীবন নাশে কী প্রচণ্ড শক্তি এই বিষের! বিশালকায় হস্তীও একটি অতি ক্ষুদ্র সর্পশিশুর দংশনে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিষধর সর্প একবার দংশনে যে বিষ ঢালে, তাহার শতাংশের একাংশ মাত্রই মানবের মৃত্যু সংঘটনে যথেষ্ট। কালান্তক যমসম এই শত্রুর আক্রমণও প্রায় অনতিক্রমণীয়। কেন না, ইহারা লোকালয়-বাসী এবং গোপনচারী। অনেক সময় মানবের বাসগৃহে আসিয়াই ইহারা বাসা বাঁধে এবং অনন্যোপায় গৃহস্থের "বাস্তুদেবতা" হইয়া বসে। দেবতার পূজাও অবশ্য সমারোহে সম্পন্ন হয়, কিন্তু ভক্তের চিরন্তন কাতর প্রার্থনা—"ঠাকুর মুখটি লুকাও, লেজটি দেখাও।"

এই কুটিলগতি ক্রূরস্বভাব মহাভয়ঙ্কর শত্রু হইতে দূরে থাকিবার জন্য, ইহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য এবং ইহার দংশনে নিশ্চিত মৃত্যু হইতে জীবনরক্ষার জন্য মানবের চিন্তা ও চেষ্টার অন্ত নাই। ইহার আবির্ভাব যেমন অভাবনীয়, প্রভাব তেমনই দুর্নিবার। অতি-সতর্কের 'লোহার-বাসরে'ও ইহার যেমন স্বচ্ছন্দ-বিহার, ক্ষিপ্র পলায়নক্ষমও তেমনই ইহার শিকার। রজ্জুসম ক্ষীণদেহধারী এই উরঃচারী জীব যখন সরোষে ফণা বিস্তার করিয়া উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হয়, তখন ভয়চকিত বুদ্ধিহত মানব আত্মরক্ষার উপায় ভুলিয়া যায়। আঘাত হানিবার শক্তি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র দন্তে কণ্টকবেধতুল্য দংশন, কিন্তু কি প্রচণ্ড ইরম্মদজ্বালা—কি সদ্যসংজ্ঞাহারী তীক্ষ্ণ বিষক্রিয়া তাহার! প্রতিকার-নির্ণয়, চিকিৎসা-বিধান দূরে থাক, অনেক সময় বৈদ্য ডাকিবারও তর সহে না। সেই হেতু বোধ করি আদৌ মন্ত্রশক্তিই উহার প্রতিকারোপায় নিরূপিত হইয়াছিল এবং অদ্যাপি নগর-গহন নির্বিশেষে তাহাই অনুসরণীয় পন্থা হইয়া রহিয়াছে। সর্পসঙ্কুল পল্লী-অঞ্চলে তাই এখনও এমন গ্রাম নাই, যথায় উক্তরূপ মন্ত্রবিৎ 'গুণিন্' অন্ততঃ এক জনও না আছেন। এই 'গুণিন্' বলিতে কেবল নিরক্ষর বেদে-সাপুড়িয়া বা মালবৈদ্য নহে—অকস্মাৎ বিপদে আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা এবং লোকহিতার্থ অনেক শিক্ষিত ভদ্রসন্তানও এই ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং স্বার্থলেশশূন্য হইয়া, এমন কি নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া, আহ্বানমাত্র সকল কার্য্য ফেলিয়া দুর্য্যোগনিশায় দুর্গম পথে আপৎ-প্রতিকারে প্রধাবিত হয়েন। ইঁহাদের চেষ্টা যে সর্ব্বত্র সার্থক হয়, তাহা নহে। তথাপি দুঃখের বিষয় যে, বিংশ শতাব্দীর উন্নত চিকিৎসা-বিজ্ঞানও ইহার যথার্থ প্রতিকারোপায় নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এখনও তাই দেশে ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা কলেরা-বসন্ত-গ্রাসমুক্ত সুস্থ-সবল সহস্র সহস্র ব্যক্তির এই "জ্যান্ত যমে"র দংশনে অকস্মাৎ প্রাণান্ত ঘটে।

তবে এ দেশে সর্পদংশনের প্রাবল্যের কারণ যে এদেশীয় লোকের অনবধানতা ও কুসংস্কার, তাহাতে সন্দেহ নাই। গৃহ, প্রাঙ্গণ ও বাস্তুভূমির চতুর্দ্দিক পরিষ্কৃত রাখা, গৃহে ইন্দুরের গর্ত্তাদি দেখিলে তৎক্ষণাৎ বুজাইয়া ফেলা, দেওয়ালে ফাটল ধরিলে লেপিয়া রুদ্ধ করা বা গৃহের মাচায় নির্বিচারে রাশি-রাশি সংগ্রহ-সম্ভার সর্পের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হইয়াছে কি না, তাহার তদারক কার্য্যে অনেকেই উদাসীন। মাঠে-ঘাটে, অরণ্যে-পর্ব্বতে নহে, গৃহমধ্যে সর্পদংশনের সংখ্যা তাই এত অধিক। অন্ধকার রাত্রে জঙ্গলাকীর্ণ পল্লীপথে ভ্রমণ করিতে একটা আলো সঙ্গে লইবার অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা অনেকের মনে স্থান পায় না,—সে আত্মপ্রত্যয়ের কারণ নাকি—"সাপের লেখা"। অর্থাৎ কপালে লেখা না থাকিলে সর্পের সাধ্য কি দংশন করে! আর লেখা যদি থাকে, তবে সহস্র সতর্কতাতেও নিস্তার নাই।

বৎসরের অন্যান্য সময় হইতে বর্ষাকালই সর্পভীতির সমধিক সম্ভাবনাপূর্ণ! শীতের কয়েক মাস সর্পগণ প্রায় গর্ত্তমধ্যেই কাটায়। গর্ত্তই ইহাদের প্রধান আশ্রয়, তদভাবে কখনও কখনও আত্মগোপন করিবার মত স্থান পাইলেই আশ্রয় লইয়া থাকে। বর্ষাকালে মাঠের গর্ত্তসমূহ জলপূর্ণ এবং উন্মুক্ত স্থানের আবর্জ্জনারাশি জলসিক্ত হইয়া বাসের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িলে অসংখ্য সর্প লোকালয়ে আসিয়া আশ্রয় অনুসন্ধান করে এবং প্রথমতঃ বাসগৃহের পশ্চাদ্ভাগে গৃহস্থের চির-উপেক্ষিত ইঁদুর-গর্ত্তেই প্রবিষ্ট হয় কিন্তু অচিরাৎ ভিতরে স্বচ্ছন্দ-বিহারের উপায়ও আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। এইরূপে গৃহমধ্যে নির্ভর-নিদ্রাসুখে সর্পদষ্ট হইয়া কত জনের যে জীবনান্ত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। বলা বাহুল্য যে, সর্প গর্ত্ত খনন করিতে পারে না, এ বিষয়ে উই আর ইঁদুর দুই তাহার সহায়। তাই গৃহস্থের কর্ত্তব্য গৃহে বল্মীক (উইঢিবি) ও ইন্দুর-গর্ত্ত না থাকে তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। বস্তুতঃ, দুই শত্রুই দুর্ণিবার—বার বার প্রতিকার করিয়াও নিষ্কৃতি নাই। সেইজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনই যুক্তিযুক্ত। বল্মীকের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত গভীর ভাবে খনন করিয়া উহাতে তুষ ও ঘুঁটে পূর্ণ করিয়া অগ্নিসংযোগ করিলে এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অন্ততঃ তিন-চারি দিন ঐ ধূমায়িত অগ্নি জাগাইয়া রাখিলে উইয়ের উপদ্রব নিবারিত হয়। আর ইঁদুরগর্ত্তের মুখে মুখে কার্ব্বলিক এ্যাসিড-সিক্ত ন্যাকড়া গুঁজিয়া দিয়া ইষ্টকাদি কঠিন পদার্থ সহযোগে উহার মুখ বন্ধ করিয়া দিলে আর কোনও ভয় থাকে না। যেহেতু কার্ব্বলিক এ্যাসিডের গন্ধে কেবল ইঁদুর নহে—শাপও আর ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারে না। কার্ব্বলিক এ্যাসিডের অভাবে তার্পিণ তৈলেও কতকটা কার্য্য হয়।

অন্ধকারে অথবা নিদ্রিতাবস্থায় সর্প দংশন করিয়া অদৃশ্য হইলে বুঝিবার উপায় থাকে না যে, কোন্ জাতীয় সর্প ; কদাচিৎ নির্বিষ সর্পও হইতে পারে। কিন্তু দংশনমাত্র বিষধর সর্প ধরিয়া লইয়াই

তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান কর্ত্তব্য। অনেক সময় বৃশ্চিক দংশনেও সর্পাঘাত ভ্রম হয়, উহা বরং ভাল, তথাপি বৃশ্চিক দংশন মনে করিয়া সর্পাঘাতে প্রতিকার-বিমুখতা যেন কদাপি না ঘটে। পরীক্ষার উপায় অবশ্য আছে, কিন্তু উহা অব্যাকুলচিত্ত বিজ্ঞজনেরই সাধ্য। প্রথমতঃ দষ্টস্থানে লালা আছে কি না দেখিতে হইবে; যদি সর্পদংশন হয়, তবে দষ্টস্থানের চতুষ্পার্শ্বে সর্পের মুখনিঃসৃত লালা লাগিয়া থাকিবে এবং রক্তপাত হইবে, কিন্তু বৃশ্চিক দংশনে তাহা দৃষ্ট হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, দষ্টস্থানের স্ফীতি ও বর্ণ পরীক্ষা :—সর্পদংশনে ফুলা কম এবং উহার চতুষ্পার্শ্ব নীলবর্ণ, আর বৃশ্চিক দংশনে স্ফীতি অধিক ও রক্তাভাবিশিষ্ট। আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে সর্পদংশনেও বুঝিতে গোল বাধে—ঐ সর্প বিষধর, কি নির্বিষ? এরূপ স্থলে প্রকৃত তথ্য জানিবার উপায় সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে কোনও তিক্ত রসবিশিষ্ট লতা-পত্র চিবাইতে দেওয়া। যদি তিক্ততা তাহার জিহ্বায় অনুভূত হয়, তবে সর্প নির্বিষ; অর্থাৎ তাহার চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন নাই। কিন্তু ঐ তিক্ততা যদি সে না পায়, তবে বুঝিতে হইবে সর্প বিষধর এবং মুহূর্ত্ত মাত্র কালক্ষেপ না করিয়া তাহাকে উপযুক্ত ঔষধ সেবন করাইতে হইবে। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে কদাচ ঘুমাইতে দিবে না, যে কোনও উপায়ে জাগাইয়া রাখিতে হইবে।

সর্প দংশন করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ দষ্টস্থানের তিন বা চারি অঙ্গুলি উপরে রজ্জু দ্বারা উত্তমরূপে কষিয়া "তাগা" বাঁধিলে বিষ আর উপরে উঠিয়া সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। বন্ধনরজ্জু অতি সূক্ষ্ম বা অতি স্থূল হইলে চলিবে না, পদ্মের মৃণালসদৃশ স্থূল হইলেই ভাল হয়। ঐরূপ দড়ি কেহ সঙ্গে লইয়া ফেরেন না, অথচ বন্ধন সত্তই না হইলে উহা নিরর্থক বন্ধন হইবে; সুতরাং তখন পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া পাক দিয়া ঐরূপ দড়ি প্রস্তুত করিয়া লওয়াই সহজ উপায়। প্রথম বাঁধনের উপর (চারি অঙ্গুলি উপরে) আর একটা ঐরূপ বাঁধন দিতে পারিলে বিপদের আশঙ্কা কাটিয়া যায়। চলিত কথায় ইহাকেই "তাগা-বাঁধা" বলে। তবে এই তাগা-বাঁধা, দংশন হস্ত-পদ ব্যতীত দেহের অপর কোন অংশে হইলে সম্ভব হয় না। বিষ কত দূর পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়াছে, গাত্র-রোমের উদ্গমণ-দৃষ্টে তাহা নিরূপণ করা যায়।

রক্তমোক্ষণ সর্পাঘাতের চিকিৎসায় প্রথম করণীয় কার্য্য। তাগা বাঁধিবার পরক্ষণেই দষ্টস্থানে মুখ দিয়া জোরের সহিত চুষিয়া টানিয়া বিষ বাহির করিয়া ফেলিতে পারিলে আর কোন ভয় থাকে না। কিন্তু যিনি মুখ দিয়া চুষিয়া রক্ত বাহির করিবেন, তাঁহার মুখে ক্ষত কিম্বা দাঁতের গোড়া দিয়া রক্তপড়া থাকিলে কদাচ ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না; কারণ মুখের লালার সহিত অল্প মাত্র বিষ পেটে গেলে ক্ষতি নাই, কিন্তু কোনওরূপে রক্তের সহিত মিশিলেই বিপদ! রোগী স্বয়ং যদি ঐখানে মুখ লাগাইতে পারেন, তবে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেই ঐরূপে রক্তমোক্ষণ করিতে পারেন। তাহা না হইলে একটি ছোট কাচের গেলাস বা পিতলের গেলাসের ভিতর কিঞ্চিৎ স্পিরিট ঢালিয়া অগ্নিসংযোগ-মাত্র স্পিরিট জ্বলিয়া উঠিলেই গেলাসটি ক্ষতস্থানের উপর উপুড় করিয়া জোরে চাপিয়া ধরিবে। গেলাস আঁটিয়া গেলে কিছুক্ষণ ঐ ভাবে রাখিয়া উহা টানিয়া ছাড়াইয়া লইবে এবং উহার ভিতর যে রক্ত আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে, তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার উহাতে স্পিরিট জ্বালিয়া পূর্ব্ববৎ দষ্টস্থানে চাপিয়া ধরিবে এবং রক্ত-মোক্ষণ করিবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিবার পর বিশুদ্ধ লাল রক্ত বাহির হইতে দেখিলে, বিষ নির্গত হইয়া গিয়াছে বুঝিয়া নিবৃত্ত হইবে। দষ্টস্থানে ক্ষত যদি অতি ক্ষুদ্র হয় (ছোট সাপের এইরূপ হইয়া থাকে), তবে ছুরি দিয়া ক্রশচিহ্নের মত (ঢ্যারাকাটা) করিয়া চিরিয়া দিয়া রক্তমোক্ষণ করিতে হইবে। যদি স্পিরিট না থাকে, তবে ঐরূপে ক্ষতস্থান চিরিয়া তাহাতে লবণ প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া গরম জল ঢালিতে থাকিবে। ইহা দ্বারা প্রচুর রক্তপাত হইবে এবং তৎসঙ্গে বিষও বাহির হইয়া যাইবে। তৎপরে লোহা পোড়াইয়া ঐ স্থানে ছ্যাঁকা দিবে। জলপাইয়ের তৈল বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক প্রয়োগেও বিশেষ উপকার দর্শে। "বিষমোরা" নামক বকুল-ফলের বীচির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট বস্তুর সাহায্যে ক্ষতমুখ হইতে বিষ-শোষণের কথা অনেকেই অবগত আছেন, কিন্তু উহা সাধারণতঃ গুণিনদিগেরই নিকট থাকে, অন্যের পক্ষে দুর্লভ। মিলিলে, উহার সাহায্যে বিষ-শোষণ কার্য্য সহজে সম্পন্ন হইতে পারে। অনেকে উহাকে "বিষ-পাথর" আখ্যা দিয়া থাকেন, বস্তুতঃ উহা জান্তব-পদার্থ। জলাভূমিতে বিচরণশীল সারস-সদৃশ একজাতীয় পক্ষীর মস্তকের খুলির মধ্যে উহা পাওয়া যায়; চলিত কথায় উহাদিগকে "হাড়গিল্লা" বলে। হাড় উহারা গিলে না, কিন্তু সাপ দেখিবা মাত্র ধরিয়া গিলিয়া ফেলে। তাই মনে হয় উহার নামের সাধু শব্দ হয়ত "অহিগিল" অপভ্রষ্ট হইয়া হাড়গিল্লা দাঁড়াইয়াছে। বিষধর সর্প যাহার খাদ্য, বিষ-প্রতিষেধক পদার্থ তাহার দেহে থাকা অসম্ভব নহে। আর জীবদেহে শরীরাস্থি ব্যতিরেকে ঐরূপ প্রস্তরবৎ স্বতন্ত্র পদার্থ যে থাকিতে পারে, শোলজাতীয় মৎস্যের মস্তকস্থ "পাথর" হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। প্রজ্বালিত দুধের বাটিতে ফেলিয়া দিলে ঐ ক্ষুদ্র পদার্থ যতখানি দুধ শুষিয়া লয়, তাহার সিকি পরিমাণ রক্ত যদি শোষণ করিতে পারে, তবে বিষ তাহার সহিত বাহির হইয়া আসিবে, সন্দেহ কি?

বিষমোরা সম্বন্ধে এত কথা বলিবার প্রয়োজন হইল এই জন্য যে, কিছুদিন পূর্ব্বে একখানি বিখ্যাত সংবাদপত্রে জনৈক লেখক "বিষ-পাথরে"র উপর স্বীয় মিথ্যা-মন্তব্যের বিষোদ্গার করিয়া লোকের মনে যে ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছেন, তাহার নিরসন অবশ্যকর্ত্তব্য। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন লেখক কেবল 'বিষ-পাথর' নহে—প্রাচীন চিকিৎসা-পদ্ধতিরই উপর অযথা আক্রমণ চালাইয়া অতীত-যুগের ভেষজ-শাস্ত্র-প্রবর্ত্তকদিগকে 'বেকুব' বানাইয়া ছাড়িয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত :—"আদিম মানুষের মনস্তত্ত্ব লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আকৃতিতে একই রকম দুটি জিনিষকে তারা একই গুণাবলম্বী ব'লে মনে করত। শিকড়গুলি সাপের মত দেখতে সুতরাং তাদের ধারণা হলো শিকড়গুলি নিশ্চয়ই সর্প-বিষ-প্রতিষেধক।" মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণী প্রতিভা বটে! আর্য্য-সভ্যতার নিন্দায় এমন উৎসাহ কোন ইংরেজও দেখাইতেন কিনা সন্দেহ। মন্ত্রতন্ত্রকে তিনি 'বুজরুগি' মাত্র বলিয়াছেন। অধুনা বিজ্ঞতা-প্রকাশের 'ফ্যাশান' ইহাই, সুতরাং ক্ষোভের কিছুই নাই। তথাপি মন্ত্র-সম্পর্কে এ যুগের বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের অভিমত জানা থাকিলে, অন্ততঃ তিনি মানুষের এই জীবন-মরণ সঙ্কটে ঐরূপ বিজ্ঞতা

প্রকাশে বিরত থাকিতেন। 'ভণ্ডদের' বিন্দুমাত্র বিশ্বাস না করিয়া ডাক্তারের শরণ লইতেই তিনি উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু বাংলার পল্লী-জীবনের কিঞ্চিন্মাত্র অভিজ্ঞতা থাকিলেও বুঝিতেন যে, পাড়াগাঁয়ে ডাক্তার পাওয়া কত দুষ্কর এবং সাধারণতঃ যে দূর ব্যবধানে তাঁহাদের অবস্থিতি, তাহাতে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া সর্পাঘাতের রোগীর চিকিৎসা কতখানি সম্ভব? চিকিৎসকের প্রতি রোগীর আস্থার প্রয়োজনীয়তা পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু উহাতে তাহার মূলোৎপাটনেরই ব্যবস্থা হইয়াছে। বিশেষতঃ 'গাছের শিকড়কে' যাঁহারা হেয় জ্ঞান করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, তাঁহাদের একান্ত নির্ভরস্থল বিলাতী ঔষধ-সমূহের অধিকাংশই ঐ সকল 'শিকড়-বাকড়' হইতে প্রস্তুত হইয়া বিচিত্র শিশিতে চটকদার লেবেলের পরিচয়-পত্র আঁটিয়া আসিয়াই সমাদর লাভ করিতেছে।

মূল প্রসঙ্গ ছাড়িয়া অনেক অবান্তর কথা বলিতে হইল; কিন্তু অকারণে নহে। যেহেতু অতঃপর সর্পদংশনের রোগীকে সেবন করাইবার জন্য যে কয়টি ঔষধের কথা বলা হইবে, তাহার সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—"যস্য দেশস্য যো জন্তুঃ তজ্জং তস্যৌষধং হিতম্"। কেবল তাহাই নহে, অতি অল্পায়াসেই সংগ্রহযোগ্য পল্লীবাসীর সুপরিচিত বৃক্ষলতার তথাকথিত 'শিকড়'ই উহাদের প্রধান উপাদানরূপে নির্দ্দেশিত। সুতরাং 'শিকড়ে' আস্থা-স্থাপন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সর্পসঙ্কুল পল্লীগ্রামেই সর্পাঘাতের সংখ্যাধিক্য; সুতরাং তত্রত্য সাদা ঔষধ কল্পনাই যুক্তিযুক্ত। চরম উপায় মনে না করিলেও, দুর্লভের প্রত্যাশায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া না থাকিয়া আয়ত্তানুসারে উহাদের ভিতর কোনও একটি বা দুইটি ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা আরোগ্যলাভেরই সম্ভাবনা।

১। শ্বেত-আকন্দমূলের ছাল শীতল জলসহ বাঁটিয়া অর্দ্ধ-তোলা মাত্রায় সেবন করিলে সর্পবিষ বিনষ্ট হয়।

২। অপরাজিতার মূলচূর্ণ দুগ্ধের সহিত ঐরূপ মাত্রায় সেবন করিলে সর্পবিষ নষ্ট হইয়া যায়।

৩। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব লবণ ও নবনীত ঘৃত এবং মধুসহ মর্দ্দন করিয়া এক তোলা মাত্রায় সেবন করিলে সর্পদষ্ট ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করে।

৪। মনসা-সীজের আঠা সর্পদষ্ট স্থানে লাগাইয়া দিলে এবং ঐ গাছের ডাল ছেঁচিয়া উহার রস এক ছটাক পান করিলে সর্পবিষ নাশ হয়।

৫। ভূমিলতা বা কেঁচো কলার ভিতর পূরিয়া সেবন করাইলে সর্পদষ্ট রোগী আরোগ্যলাভ করে।

৬। জয়পালের বীজ ভাঙ্গিলে উহার ভিতর যে হরিদ্রাভ কাগজ সদৃশ পাতলা পদার্থ (শস্যাবরক) পাওয়া যায়, তাহা লইয়া মুখের লালার সহিত ঘষিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ ও চক্ষুতে অঞ্জন দিলে সর্পাঘাতে অচেতন রোগীও সত্বর সচেতন এবং সুস্থ হইয়া থাকে।

যাঁহারা ডাক্তারী ঔষধে সমধিক আস্থাবান, তাঁহারা নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবেন :—

ব্র্যাণ্ডি	৩ ড্রাম,
স্পিরিট এ্যামোনি এ্যারোমেটিক	অর্দ্ধ ড্রাম,
লাইকর পটাশিয়াম	অর্দ্ধ ড্রাম,
টিঙ্কার নক্সভমিকা	৫ ফোঁটা,
ভাইনাম্ ইপিকাক	৩ ড্রাম,
উষ্ণ জল	১ আউন্স।

একত্র মিশ্রিত করিয়া বমন না হওয়া পর্য্যন্ত অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। বমন হইয়া গেলে নস্য দ্বারা রোগীকে হাঁচাইবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং তখন ভাইনাম ইপিকাক্ বাদ দিয়া অবশিষ্ট ঔষধগুলি মাত্রানুসারে দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর একবার করিয়া সেবন করাইতে হইবে। রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে তাহাকে আহার করিতে দিবে।

নির্বিষ সর্পের দংশনে (ঢোঁড়া প্রভৃতি) সাধারণতঃ চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না; তবে দষ্টস্থানে উহাদের দাঁত ভাঙ্গিয়া প্রবিষ্ট থাকা প্রযুক্ত জ্বালা অনুভূত হইলে লম্বা চুলের দুই প্রান্ত দুই হাতে ধরিয়া উহার উপর এদিক হইতে ওদিকে এবং ওদিক হইতে এদিকে বারংবার টানিলে ঐ দাঁত উঠিয়া আসিবে। ঐ ক্ষতস্থানে যাহাতে গোময়-সংস্পর্শ না ঘটে, তৎপ্রতি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবে। কেন না, গোবর লাগিলেই উহাতে বিষক্রিয়া আরম্ভ হইবে।

সর্পদষ্ট রোগীর পক্ষে দুগ্ধই উত্তম পথ্য। সুরাপান সর্ব্বত্র নিন্দিত হইলেও এইরূপ আপৎকালে উহা রোগীকে সেবন করাইবার বিধান আর্য্য-চিকিৎসা-শাস্ত্রেও উল্লিখিত হইয়াছে। যেহেতু—

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।"

আমি

অমর ষড়ংগী

ঝিলমিল নদীতট ছুঁয়ে যায় জলে।
মনে হয়, হৃদয়ের গভীর অতলে
তাঁর নাম লেখা আছে। সুরে সব তার
এক ছোঁয়ে বেজে ওঠে কোমল-গান্ধার।

পৃথিবীর পথ হোতে আমার সঞ্চয়
তাঁকে সমর্পণ করি। যেটুকু সময়
কাছে পাই, দিনান্তের সুমধুর বাণী
ডেকে বলে শান্ত স্বরে, তিনি মোর 'আমি'।

অষ্টাদশ শতকের নূরজাহান

সুরুচিবালা রায়

১৭৫০ খৃষ্টাব্দের কথা—

ঘন দুর্য্যোগের ভেতর দিয়েও, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সূর্য্য বাংলার আকাশকে একটু একটু করে রাঙিয়ে তুলছে। সিরাজ উদ্দৌলার পরিত্যক্ত সিংহাসনে কোম্পানীর তাঁবেদার মীরজাফর মাত্র দিন কয়েকের জন্য বসবার সৌভাগ্য পেলেন, কিন্তু স্বাধীনচেতা মহামতি মীরকাশিম স্বদেশের মঙ্গল কামনায়, মীরজাফরকে পরাজিত করে, সে সিংহাসন অধিকার করে নিলেন। কিন্তু আকাশের ঘনঘটা কিছুমাত্র কমলো না। নানা উৎপাতে মীরকাশিম দিবা-রাত্রি জর্জ্জরিত হয়ে রইলেন।

সে সময় একজন জার্ম্মাণ যুবক মীরকাশিমের সৈন্যদলে এসে চাকরি গ্রহণ করলো। তার অদ্ভুত সৈন্যপরিচালনা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তার অপূর্ব্ব বীরত্বে মীরকাশিম সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বহু বার পুরস্কৃত করলেন। কিন্তু, তারই পরে মীরকাশিমের যখন ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটলো, বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিম পরাজিত হলেন, এবং সে যুবক তার সৈন্যদল নিয়ে নূতন প্রভুর সন্ধানে দিল্লী চলে গেল, সেটা তখন ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ।

এই জার্ম্মাণ যুবক, নাম তার ওয়াল্টার রীণ হাড, ওরফে সমরু, মন তার নিয়ত উচ্চ আদর্শের সন্ধানে ঘুরছে। দেশের মাটি ছেড়ে বিদেশে আসা, সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে বহুদূর বিদেশে জীবনের নোঙর ফেলা,—সে ত শুধু জীবিকা অর্জ্জনের জন্যই নয়, মনে তার যে বৃহত্তম কামনা অনুক্ষণ জাগ্রত হয়েছিল, সেটা সমাজ-জীবনের উচ্চতম অংশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বীরোচিত সম্মান লাভ করা।

চঞ্চল মনে রীণ হাড কখনো অযোধ্যার নবাবের সৈন্যাধ্যক্ষের পদে কখনো বা জাঠরাজার অধীনে চাকরি নিয়ে চরকীর মত ঘুরে বেড়াতে লাগলো, এবং হঠাৎ কখন ভারতসম্রাট শাহ আলমের মন্ত্রীদের সুদৃষ্টিতে পড়ে গিয়ে তার স্বপ্ন সফল হবার পথে এগিয়ে চললো।

ভারত সম্রাটের সমর বিভাগে ৬৫ হাজার টাকা বেতন নিয়ে সসৈন্যে কিছু দিন কাজ করার পর, সম্রাট সন্তুষ্ট হয়ে মীরাটের সন্নিকটস্থ সার্দ্ধানা পরগনা ও তৎসহ বহু জমি তাকে জায়গীর স্বরূপ দান করলেন। জায়গীর লাভ করে খাঁটি মোগলের বেশে সমরু আপনাকে রূপান্তরিত করে নিল, বেশে এবং আদব-কায়দায় একজন সম্ভ্রান্ত মোগলরূপেই দিল্লীর উচ্চ মহলে সে পরিচিত হয়ে উঠলো।

মীরাটের কোটানা গ্রামে, এক অতি দরিদ্র পরিবারে একটি কন্যা তখন ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে। কন্যার পিতা লতিফ আলি সেই শিশু কন্যার অতুলনীয় রূপ-গুণ দেখে, মনে মনে নানা রকমের আশার জাল বোনে, ভাবে মেয়েটিকে নিয়ে দিল্লী যেতে পারলে, এবং একবার কোন রকমে আমীর-ওমরাহ মহলে পরিচিত হতে পারলে, চিরদিনের জন্য তার দুঃখের দিনের অবসান ঘটে যাবে। গরীব দুঃখী আশার স্বপ্ন দেখতে পায় বলেই বেঁচে থাকে, দুঃসহ দুঃখেরও একদিন শেষ আছে, এই আশাতেই সম্মুখের পানে সে তাকিয়ে থাকে। লতিফ আলিরও দুঃখের দিনের শেষ হোল, কিন্তু এই পৃথিবীতে নয়, দিল্লীতে যাবার প্রয়োজনও তার রইলো না, খোদার দরবারের ডাকে ইহলোকের সকল কিছুকেই উপেক্ষা করে হঠাৎ সে চলে গেল পরপারে।

সুখের, দুঃখের বা সকল কিছুর ভাবনা বয়ে দিনের রোজগার দিন এনে স্ত্রী-কন্যাকে যে প্রতিপালন করে আসছিলো, সে চলে গেল এমন অকস্মাৎ যে, কন্যাকে নিয়ে মাতা ডুবে গেল অকূল পাথারে। দয়াপরবশ হয়ে বন্ধু-বান্ধবেরা পাঠিয়ে দিল তাদের দিল্লীতে।

দিল্লী, লতিফ আলির সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত দিল্লী! শোকার্ত্ত মাতা এই দিল্লীতে আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যে কোনও রকমে কন্যাকে মানুষ করে তুলতে লাগলো। দরিদ্র হলেও, তাদের ভেতরে এবং ব্যবহারে একটা ঐশ্বর্য্যের ছাপ নিহিত ছিল, দিল্লীর সমাজে সহজেই তারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে ফেলল। ক্রমে ক্রমে আমীর ওমরাহদের সম্ভ্রান্ত সমাজেও পরিচিত হতে তাদের বিলম্ব হোল না। এবং এই কন্যাকে ঘিরে, দিল্লীর সাম্রাজ্যে আবার সেই বেগম নূরজাহানের দিনের ইতিহাস রচিত হবে কি না, এ সম্ভাবনাও অনেকের মনে দেখা দিল।

দিল্লীতে বাদশাহী আমলের তখন জীবন-সন্ধ্যা। সেই গোধূলির স্তিমিত আলোকে, দিল্লীশ্বরের অচেতন অবস্থার সুযোগ নিয়ে, তাঁর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে তখন নানা চক্রান্ত গজ্জে উঠছে, স্বর্ণময়ী ভারতমাতার রূপের জৌলুসে, সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকেও, ইয়োরোপের চোখ ঝলসে ঝলসে উঠছে, কৌশলী ইয়োরোপীয়রা নানা রূপে নানা কাজের ছল করে ভারতের বিভিন্ন রাজদরবারে ঢুকে পড়ছে। বড় বড় সমর-কুশলীরা সৈন্যবিভাগে চাকরী নিয়ে পাশ্চাত্যের যুদ্ধ-কৌশলে সৈন্যদের শিক্ষিত করে তুলছে। বলা বাহুল্য, রীণ হাড বা সমরুও এমনি একটা দলে এদেশে এসে ঢুকেছিল এবং তার অতুলনীয় বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তির দ্বারা তার নাম-ধাম-পরিচয় সব লুপ্ত করে দিয়ে এদেশের রক্ত-মাংসের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

দেশের লোকেরা যখন লতিফ আলির কন্যার সঙ্গে নূরজাহানের তুলনা করে কালের গতি দেখবার আশায় অপেক্ষা করছিলো, খোদ বাদশার প্রাসাদ থেকে সম্ভ্রান্ত আমীর-ওমরাহদের গৃহে গৃহেও যখন তার প্রচুর সমাদর দিন দিন বৃদ্ধিই পাচ্ছিল, তখন সহসা সমস্ত দেশকে সচকিত করে দিয়ে রীণ হাডের সঙ্গেই তার পরিণয় সম্পাদিত হয়ে গেল।

দেশের লোক খানিকটা নিরাশ এবং দুঃখিত হলেও, সহজেই তা' সয়ে নিল। সম্ভ্রান্ত মোগল-সমাজে তখন মোগলবেশী সমরু অসাধারণ প্রতিপত্তি জমিয়ে তুলেছে। বিলাসী, আত্মসুখময়, উচ্ছৃঙ্খল বাদশার প্রাসাদের আমন্ত্রণ যে সহজেই প্রত্যাখ্যান করল, ভোগ-লালসারত বিলাসী মোগল-সমাজ যাকে প্রেমের নিগড়ে বাঁধতে পারল না, সমরুর বলিষ্ঠ হৃদয়ের প্রেম-নিবেদনে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। সমরুর শৌর্য্য-বীর্য্য ও সৌজন্য তাকে সর্ব্বদাই আকর্ষণ করত, তাই বিবাহের প্রস্তাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করা তার সম্ভব হোল না। খাঁটি মুসলমান প্রথানুসারেই তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেল। বিরাট

সার্দ্ধানা পরগণার জায়গীরদারের গৃহে এসে দেশবাসীর কল্পিত নূরজাহান বেগম সমরু নামে খ্যাত হয়ে গেল। বাদশার প্রাসাদের বেগম না হলেও, বেগম সমরু ছোটোখাটো যে রাজ্যটি অধিকার করে বসলো, সেখানেও তার সম্মান বা গৌরব কিছুমাত্র কম হোল না, স্বামীর সহকারিণী হয়ে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের সকল কাজ দেখে এবং বীর স্বামীর কাছে অস্ত্রধারণ শিক্ষা করে একটি বীর সৈনিকের মতই অশ্বারোহী স্বামীর পাশে পাশে তার অশ্ব চালিয়ে চলতো।

কিন্তু, হঠাৎ একদিন এ সুখের দিনের অবসান ঘটলো। সম্রাট শাহ আলমের প্রীতির দান বিপুল ভূসম্পত্তি সার্দ্ধানা পরগণা ও বিধাতার অকৃপণ হস্তের দান ও তার নিজের হাতের গড়ে-তোলা তার নব-পরিণীতা বেগমকে পরিত্যাগ করে আর এক অজানা রাজ্যের উদ্দেশে সমরু পাড়ি দিল, ইহজন্মের সকল উচ্চ আশা বা কামনা রইলো সব পশ্চাতে পড়ে।

দিন কয়েক অভিভূত হয়ে, আচ্ছন্নের মত পড়ে থেকে অবশেষে সৈনিক প্রজাদের আহ্বানে বেগম মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠে দাঁড়ালো। এ দিকে সৈনিকদের প্রার্থনা এবং আগ্রহে, সম্রাট বেগমকেই তার স্বামীর শূন্য স্থানে অভিষিক্ত হওয়ার অনুমতি দিলেন। সার্দ্ধানার শূন্য সিংহাসনে শূন্য মনে বসে বেগম অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলো। সমরুর সঙ্গে যদিও তার মুসলমান প্রথানুসারেই বিয়ে হয়েছিল, তবুও দীর্ঘ দিন স্বামীর সঙ্গে বাস করে বেগম মনে মনে খৃষ্টধর্ম্মে আকৃষ্ট হয়েছিল, স্বামীর মৃত্যুর পর সে খৃষ্টধর্ম্মই গ্রহণ করলো। তাকে বিয়ে করবার আগেই সমরু অন্য একটি মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করেছিল, ইতিহাস-লেখক তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেননি, কেবল সে যে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল, ইতিহাসে তাই শুধু জানা যায়। তার একটি পুত্র ছিল, স্বামীর মৃত্যুর পর সেই ছেলেটিকে সাদরে নিকটে এনে, বেগম তাকে প্রতিপালন করতে লাগলো। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তাকে নিয়েই বেগম রোমান ক্যাথলিক মতে দীক্ষিত হোল।

২

বেগমের জীবন-অধ্যায় তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করলে এই বারের এই নতুন জীবনারম্ভকে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ বলে বর্ণনা করা যায়। সৈন্যবিভাগের উন্নতির জন্য এবং তাদের বিদেশী সমর-সজ্জায় শ্রেষ্ঠ করে তোলবার জন্য বেগম তার সৈন্যদলের অধিনায়ক হিসাবে যে ক'জন বিদেশী সেনাপতিকে স্বীয় দলে গ্রহণ করলো, তাঁদের মধ্যে দু'জন ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জর্জ্জ টমাস নামে একজন আইরিশ এবং লেভা সুলত নামে অতি সুপুরুষ এবং সুশিক্ষিত একজন ফরাসী যুবক।

দিল্লীর আকাশেও তখন ধীরে ধীরে গভীর ঘটা করে কালো মেঘ জমে উঠেছে, আকবর, সাজাহান, ঔরংজেবের পরম প্রিয় বহু ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত ময়ূরসিংহাসনের নিম্নতল ধীরে ধীরে টলে টলে উঠছে, সম্রাটের সকল শক্তি ক্ষুণ্ণ হয়ে আসছে দ্রুতগতিতে, দেশে অসন্তোষের সীমা নেই, ছোট ছোট খণ্ড-রাজ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে অহর্নিশ দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে দুর্ব্বল এবং ক্লান্ত, প্রবল মহারাষ্ট্র শক্তির নূতন সূর্য্য অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আর্য্যাবর্ত্ত এবং দাক্ষিণাত্যের আকাশে উঁকি দিচ্ছে এবং দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধিরূপে মাধোজি-সিন্ধিয়া তখন আর্য্যাবর্ত্তের ভাগ্যবিধাতা। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী বেগম তাই নিজ সৈন্যদলকে প্রবল-পরাক্রান্ত আধুনিক যুদ্ধপ্রণালীতে সুশিক্ষিত করে তোলবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। সৈন্যদলের অধিনায়ক হিসাবে লেভা সুলত ও জর্জ্জ টমাস বেগমের নেতৃত্বে কাজ করতে লাগলেন। কার্য্যসূত্রে অহরহঃ বেগমের সঙ্গে সাক্ষাতে উভয় অধিনায়কই ক্রমে ক্রমে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তে লাগলেন। উভয়েই অধিকতর অনুগ্রহ লাভের আশায় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলেন।

এ দিকে বেগমের মনও যে দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে, সে কথাও উভয়ের অজ্ঞাত ছিল না, গভীর বেদনার সঙ্গে টমাস লক্ষ্য করলেন, বেগমের মন আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে লেভা সুলতের দিকেই বেশি করে। বেদনাহত টমাস ক্ষুণ্ণ মনে বেগমের কাজ ছেড়ে দিয়ে দূরে চলে গেলেন।

উভয়ের প্রতি উভয়ের এই আকর্ষণে খানিকটা রাজনীতিও যে না ছিল, সে কথা বলা যায় না। চতুষ্পার্শ্বের সামন্তরাজ্য-গুলোতে বহির্বিপ্লব এসে যে ভাবে সব ভেঙ্গে-চুরে দিয়ে যাচ্ছিলো, এমন কি খোদ কর্ত্তা বাদশার বাদশাহীরও যে ভিত্তি নড়ে উঠছিলো, অশেষ বুদ্ধিশালিনী বেগমের তা অপরিজ্ঞাত ছিল না। এই বিপদের দিনে তার রাজ্য রক্ষা করতে হলে যে দৃঢ়তা এবং শক্তির প্রয়োজন ছিল, লেভা সুলতের মধ্যে তার পরিচয় পেয়েই বেগম ক্রমশঃ লেভা সুলতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তে লাগলো। পক্ষান্তরে, চতুর লেভা সুলতও সমরুর পরিত্যক্ত ছোট রাজ্যখানির প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন; উভয়েরই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলে বিয়ে করা ছাড়া উপায় ছিল না। উভয়ের এই গোপন আকর্ষণের কথা জানতে পারলেন একমাত্র রেভারেণ্ড গ্রেগোরিও, এবং তাঁরই পরামর্শে এবং সাহায্যে রোমান ক্যাথলিক মতে ওদের বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেল, কিন্তু অত্যন্ত গোপনে।

বেগম বুঝেছিলেন, এই বিয়ের খবরে প্রজারা সন্তুষ্ট হবে না, তাদের মৃত এবং পরমপ্রিয় প্রভুর স্থলে লেভা সুলতকে ওরা সহ্য করবে না, তাই এই বিয়ের খবর গোপনেই রইলো। কিন্তু অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে, লেভা সুলত তাঁর বর্ত্তমান পদমর্য্যাদার গর্ব্বে খানিকটা উদ্ধত হয়ে উঠলেন।

পূর্ব্বস্বামী সমরুর সময় বেগম রাজ্য পরিচালনার কাজে সর্ব্বদাই স্বামীকে সাহায্য করতেন, তাঁর মৃত্যুর পরও বাদশাহের অনুমতি ক্রমে বেগম রাজ্যের গুরুভার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে একাকীই সম্পন্ন করে আসছিলেন কিন্তু এবারে লেভা সুলত স্বামিত্বের অধিকারে বেগমের অনেক রকম বাইরের কাজেই আপত্তি প্রকাশ করতে লাগলেন। ইয়োরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষদের সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় মেলামেশা লেভা সুলত একেবারেই বন্ধ করে দিলেন, সেনানায়ক এবং সৈন্যদের ভিতরে পূর্ব্ব থেকেই সন্দেহের যে গুঞ্জরণ শোনা যাচ্ছিল, এবারে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। বিবাহের খবর একেবারেই অজানা থাকায় লেভা সুলতকে সৈনাধ্যক্ষগণ এবং সৈনিকরা যে সন্দেহের চোখে দেখে আসছিল, ধীরে ধীরে তাই চাপা বহ্নির মত ধূমায়িত হয়ে উঠতে লাগলো এবং এক সময় দাবানলের মত জ্বলে উঠে চার পাশে ছড়িয়ে পড়লো।

ছড়িয়ে পড়লো সর্ব্বত্র।

বেগমের কিছু সৈন্য দিল্লীশ্বরের প্রয়োজনের জন্য দিল্লীতেই রাখা হোত, সমরুর নিজের হাতে শিক্ষিত অপরিমিত বীর্য্যশালী সেই সৈন্যদল লেভা সুলতের অন্যায় সাহস ও রাজপুরীতে তার অনধিকার প্রবেশের কথা জেনে বিষম ক্রুদ্ধ ও হিংস্র হয়ে উঠলো এবং দিল্লী পরিত্যাগ করে তারা সার্দ্ধানার পথে রওনা হোল এই কামনা নিয়ে যে, লেভা সুলত ও বেগমকে বন্দী করে রেখে সমরুর পুত্র জাফরকেই বসাবে সমরুর মসনদে। বিদেশী এবং বিধর্ম্মী হোলেও সমরু খাঁটি মোগলরূপে এমনি করেই তাদের সমাজে মিশে গিয়েছিল যে, সমরু হয়েছিল তাদের একান্তই আপনার জন, সেই সমরুর শক্তি এবং বুদ্ধি দিয়ে গড়া সার্দ্ধানার ছোট্ট রাজ্যখানি লেভা সুলতের খেলার সামগ্রী হবে,—তারা তা ভাবতেও পারে না। কিন্তু বেগমের বুদ্ধি যে অন্য রকম ছিল সে কথা বেগম নিজে ছাড়া এবং আর দু'চার জন বেগমের নিতান্তই অন্তরঙ্গ সহচারিণী ছাড়া আর কেউ জানতেও পারলো না। বেগমের ভবিষ্যৎ জীবনের কার্য্যতালিকাও ঐতিহাসিকদের চোখে এই রকমেরই আলোকপাত করছে। পাপীর দণ্ড দিতে দিল্লীর ক্রুদ্ধ সৈন্যরা এগিয়ে আসছে, সার্দ্ধানায় পৌঁছে গেল এ খবর। পৌঁছুলো অপরাধী দু'জনেরও কানে।

এ রকম যে ঘটতে পারে, বেগমের তা অজানা ছিল না, পূর্ব্বাবধি লেভা সুলতকে একজন্য বেগম সতর্কও করেছিলো বহু বার, কিন্তু একই সঙ্গে একটি রাজ্য এবং রাজনন্দিনীকে আপন করায়ত্তে এনে লেভা সুলতের মাথার ঠিক ছিল না, তাঁর সমস্ত অত্যাচার তাঁরই সর্ব্বনাশকে যে ডেকে আনছে, এ জ্ঞান লেভা সুলতের তখন ছিল না, বিপদ তাই এত সহজেই এসে উপস্থিত হোল।

অনুতাপে জর্জ্জরিত বেগম আপন মনের দিকে তাকিয়ে দেখলো, কি ভুলই হয়ে গেছে, শূন্য মন্দির ভরাতে গিয়ে মন্দির যে তার দেউলে হয়ে পড়েছে! কিন্তু, তবু বাঁচতে হবে, এবং তার একমাত্র উপায় পলায়ন। শুনে রাজী হোলেন লেভা সুলত। বেগম গোপনে গোপনে পলায়নের আয়োজন করতে লাগলো।

তার পর, একদিন এক গভীর অন্ধকার রাত্রিতে গুপ্ত দ্বারপথে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে, কোন্ এক অজানা আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো পাল্কী এবং অশ্বারোহী দু'জন, সঙ্গী তাদের উভয়ের হাতের দুটি শাণিত অস্ত্র এবং বেগমের অতি বিশ্বাসী এবং প্রিয় সহচরী ক'জন। চার পাশের গভীর অন্ধকারে বেগমের মনের ভিতর জ্বলতে লাগলো রাজপ্রাসাদের সেই উজ্জ্বল আলো, বুকের পরতে পরতে বিদ্ধ হতে লাগলো গৃহাভ্যন্তরে সজ্জিত তার এবং সমরুর সেই পরমপ্রিয় বস্ত্র-আভরণরাশি। পশ্চাতে দৃষ্টি ফিরিয়ে বেগম একবার দেখে নিল তার রাজপ্রাসাদ, তার স্মৃতির মন্দির। কার হাত ধরে একদিন এসে এই প্রাসাদে প্রবেশ করেছিল সে? ভোলেনি বেগম তাকে, ভোলেনি অন্তরের মণিকোঠায় যে দীপটি জ্বলেই চলেছে অনুক্ষণ, তারই আলোতে বুকের ভিতর পরিস্ফুট হয়ে উঠছে কোন্ এক মহাবীর্য্যশালী উষ্ণীষধারী অতি সুপুরুষের প্রতিবিম্ব?

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ওরা চলেছে, আরও কোন্ এক মহা অন্ধকারের গহ্বরে! যেতে হবে সত্বরে, ইংরাজের সীমানাধীন সহরে, এই রাত্রির শেষ হবে যেখানে গিয়ে। ফুটে উঠবে নতুন প্রভাত। লেভা সুলত সেই কামনা করে।

অশ্বের গতি বাড়তে লাগলো। কিন্তু দূরে শোনা যেতে লাগলো বহুতর অশ্বের খুরের ধ্বনি। কারা আসছে? বিদ্রোহীরা? লেভা সুলত পশ্চাতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, বেগম, মরতে পারবে? পরম অনুকম্পা ভরে বেগম উত্তর দিল—পারবো, এই অপমানিত জীবন রেখে কি হবে? লেভা সুলত বললে, তবে সময় মত প্রস্তুত থেকো।

অবশেষে এলো সেই সময়, বিদ্রোহীরা চতুষ্পার্শ্ব দিয়ে ঘিরে ধরলো অপরাধীদের; হাতে তাদের কঠিন নিষ্করুণ আগ্নেয়াস্ত্র, আর কটিবন্ধে সজ্জিত তীক্ষ্ণধার অসি।

তার পরের ঘটনা সংক্ষেপেই বলা ভাল, ওদের উদ্যত অসি এগিয়ে আসবার আগেই লেভা সুলত আগ্নেয়াস্ত্রের গুলী বিদ্ধ করে দিলেন নিজের বুকে, তার আগে তাঁর নব-পরিণীতার পানে তাকিয়ে করুণ স্বরে অনুনয় করে বললেন, 'কথা রাখো, এগিয়ে চলছি, তুমিও এসো।'

কিন্তু ভবিতব্যের বিধান তা নয়, বেগম আত্মহত্যার চেষ্টা করলো, কিন্তু সক্ষম হলো না, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলো মাটিতে, বিদ্রোহীরা কাছে এসে তার রক্তাক্ত মূর্চ্ছিত দেহ একটা কামানের নীচে বেঁধে রেখে চলে গেল, সাত দিন এই ভাবে প্রায় অনাহারেই কাটিয়েও প্রাণে বেঁচে রইলো বেগম তার এক বুদ্ধিমতী প্রাচীনা দাসীর চেষ্টায়, এর পর পরে তার মনে পড়লো তারই কাছে প্রত্যাখ্যাত জর্জ্জ টমাসকে।

গোপনে খবর পেয়ে পূর্ব্ব-শত্রুতা ভুলে গিয়ে টমাস সসৈন্যে এসে বেগমকে বিদ্রোহীদের হাত থেকে উদ্ধার করলেন।

৩

মাঝখানের স্বল্প কটি দিন একটা দুঃস্বপ্নের মত বেগমের জাগ্রত জীবনকে যেন মোহাবিষ্ট করে রেখেছিল। নূতন জীবনের প্রারম্ভে জাগ্রত হয়ে বেগম তার স্বাভাবিক জীবন লাভ করে তার স্বামীর পরিত্যক্ত রাজ্যটিকে যেন নূতন করে সমগ্র জীবন দিয়ে আবার গ্রহণ করলো। বিদ্রোহী সৈন্যরা আবার তার বশ্যতা স্বীকার করলো। বেগম মসনদে উপবিষ্ট হোল, এবং পূর্ব্বের মত আবার সৈন্যদের অধিনায়িকারূপে আবার বাদশাহের প্রয়োজনে নানা স্থানে বহু যুদ্ধে সৈন্য পাঠাতে লাগলো। স্বামীর পরিত্যক্ত যত কিছু কাজ সকল কিছু নিষ্ঠার সঙ্গে সমাপ্ত করাই তাঁর একমাত্র ব্রত হয়ে উঠলো।

বাদশাহের দুর্ব্বলতার সুযোগ পেয়ে সমগ্র ভারতব্যাপী তখন অসংখ্য শক্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবং নবোদিত সূর্য্যের মত ঘোর অন্ধকার ভেদে প্রবল প্রতাপ ইংরাজ তখন ভারতের আকাশে দীপ্ত হয়ে উঠছে।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেক এবং লর্ড ওয়েলেসলি সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত এবং দাক্ষিণাত্য থেকে মহারাষ্ট্র শক্তি নির্ম্মূল করে দিলেন এবং প্রকৃত পক্ষে এই যুদ্ধজয়ই বৃটিশের ভারতবিজয় হয়ে গেল। বুদ্ধিমতী বেগম বৃটিশের শক্তি লক্ষ্য করছিলো, এবং অদূর ভবিষ্যতে এই বৃটিশই যে সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে দাঁড়াবে এ কথা বুঝতে তার বিলম্ব হোল না। একে একে বৃটিশ যে ভাবে ভারতের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি গ্রাস করে নিচ্ছে, তাতে সমরুর সার্দ্ধানাও যে

বৃটিশের করায়ত্ত হতে দেরী হবে না, বেগমের তা বুঝে নিতে বিলম্ব হোল না। অন্য যে কেউ এসে বসবে সমরুর আসনে বেগম তা ভাবতেও পারে না।

ভুল একবার হয়েছে, কিন্তু একবার ভুলের জন্য সমরুর এই আসনের উপরেই সর্বনাশের কালো ছায়া সে নিজেই ডেকে এনেছিল, আর তার পুনরাবৃত্তি হবে না, বেগমের চিন্তাধারা এবার এই এক নতুন প্রবাহে বইতে লাগল। দীর্ঘ দিন গভীরভাবে চিন্তা করে অবশেষে সে নিজের মন স্থির করে নিল এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই লর্ড লেকের নিকটে সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠালো।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে সন্ধি হয়ে গেল, বেগমের জীবিত কাল পর্য্যন্ত তাঁর শক্তি এবং অধিকারে বৃটিশ হস্তক্ষেপ করবে না, এবং তাঁর মৃত্যুর পর বৃটিশরাজের অভিভাবকত্বে তাঁরই স্বামীর উত্তরাধিকারী মিঃ ডাইস 'সোম্বার' উপাধি নিয়ে এই মসনদে বসবে।

এই সন্ধিপত্রে লর্ড লেক্ সম্মতি দান করেন। কৃতজ্ঞ বেগম আমরণ বৃটিশের বন্ধুত্ব স্বীকার করেছিলো, এবং ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ভরতপুরের যুদ্ধে ইংরাজের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছিলো। বেগমের সহযোগিতা প্রবল-পরাক্রান্ত এবং চতুর বৃটিশরাজও কাম্যই মনে করেছিল, চতুষ্পার্শ্বের সেই জটিল পরিস্থিতিতেও যে রমণী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মুসলমান, মহারাষ্ট্র ও ইংরাজের সঙ্গে রাজনীতিতে সমান তালে তার অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়ে আসছিলো, বীর ইংরাজ তাকে সম্মান দিতে কার্পণ্য করেনি কোন দিন। ইয়োরোপীয়ান স্বামীর কাছে রাজনীতি এবং রণকুশলতায় দক্ষ বলে সারা জীবন তাই তাকে রক্ষা করে এসেছে।

রাজ্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে এবার বেগম আত্মচিন্তায় মনোনিবেশ করলো। মনে হোল যেন দীর্ঘ দিন কেটে গেছে এই পৃথিবীতে, যাঁকে নিয়ে জীবন সুরু হয়েছিল, তাঁর অভাবে, তাঁরই গচ্ছিত সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে জীবনটা নানা পথে ঘুরে বেড়ালো। এবারে সে সব পরিত্যাগ করবার সময় এসেছে, ওপারের আহ্বান এসে পৌঁছুচ্ছে প্রাণের ভিতর। বেগম পৃথিবীতে আরও কিছু কাজ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো, কেবল মাত্র যুদ্ধ করে। কেবল মাত্র অপরের রক্তপাত করে করে ওপারে যাবার পথ কি সরল হয়েছে?

রাজকোষ মুক্ত করে দিয়ে দেশের কল্যাণের জন্য অকাতরে বেগম অর্থব্যয় করতে লাগলো। তৈরী হতে লাগলো পথ-ঘাট, অসংখ্য আশ্রয়স্থল নির্ম্মিত হোল; অনাথ-কাঙালের, ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মিত হতে লাগলো দেশে-বিদেশে, ধর্ম্মপিপাসুদের জন্য। কলকাতার বিশপকে, রোমের পোপকে, ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপকে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রদান করলো গরীব-দুঃখীর কল্যাণের জন্য ব্যয় করতে। সার্দ্ধানায় তৈরী হোল কত সাহায্য-ভাণ্ডার, কত শিক্ষা-নিকেতন। প্রজারা এবং দেশের চতুষ্পার্শ্বের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী কায়মনোবাক্যে বেগমের মঙ্গল-কামনা করতে লাগলো।

নিজের উপাসনার জন্যে সার্দ্ধানায় অতি চমৎকার একটি উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণ করে বেগম ভগবচ্চিন্তায় এবং পরপারে যাবার ধ্যানে তন্ময় হয়ে রইলো। মনে এক গভীর ব্যাকুলতা—হয়ত সব কাজই শেষ হয়েছে, আর দেরী কত,—আর কত দেরী!

তার পর ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী দেশ-বিদেশের সহস্র সহস্র লোকের মঙ্গল-কামনা সঙ্গে নিয়ে বেগম ভগবানের নাম-ধ্যান করতে করতে স্বর্গে তাঁর প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

মিনতি

দিলীপকুমার পুরকায়স্থ

জীবনের যত বেদনার ফুল
বিছায়েছি তব পায়ের তলে,
চরণ ফেলিয়ো ধীরে ধীরে বঁধু
দেখিয়ো তাদেরে যেয়ো না দ'লে!

আশায় ভাষায় গাঁথিয়াছি মালা
স্বপন-সাধনা আমার যত,
উজাড় করিয়া দিয়েছি ঢালিয়া
সান্ধ্য-সমীরে শিউলীর মত!

প্রদোষ-আঁধারে অতি ধীরে ধীরে
অঙ্গনে তব নামিবে যখন,
ফুলে ফুলে শুধু ছাইবে তোমার
অলক্ত রাঙা কমল-চরণ।

মৃদু জ্যোছনায় উতলা বাতাস
কানে কানে তব গুঞ্জন করি,
মিনতি জানাবে, পায়ের তলায়
দেখো কি ঝরেছে তোমারে স্মরি'!

চমকি উঠিয়া করুণা করিয়া
আয়ত নয়নে আনত শিরে,
বারেক চাহিয়ো সে ফুলে হেরিয়ো
চরণ ফেলিয়ো একটু ধীরে!

খেয়াল খাতা

শ্রীমতী বীণাদেবী সেন সংগৃহীত

My dear young friend,

I thank you for the long you promised. It was good of you to have tanscribed it in Hindi and translated it in English. The words are beautiful.

Yours Sincerely
M. K. Gandhi.

যখন আমি নামশেষ হয়ে যাব, তখনও আমি বেঁচে থাকব বাংলা দেশের কারো কারো মনের কোণে, এই আমার বঙ্গবাণীর নানাঙ্গ সেবার পরম পুরস্কার।

—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

Very best wishes.
—Uday Shankar.

Very pleased with the function.
—R. N. Mookerjee.

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উক্তি—

মা, আমি তোমার আশ্রয় লইয়াছি; আমাকে শিখাও আমি কি করিব ও কি বলিব।

—শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু।

ক্ষণে ক্ষণে হয় ক্ষণিকের মত দেখা
তারি মাঝে থাকে লুকায়ে গোপনে
নিত্যকালের লেখা।

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

The Hindus in East Bengal are in such circumstances that no young man can afford to remain undeveloped in body particularly. Every young man must be developed as a Kshatriya so that he may ever be ready to defend his women folk and his temples of warship without the help of the Govt police.
—B. S. Moonje.

Religion is love and truth.
—Abdul Ghaffar.

তরুণতায় তরুণতার কর জীবন পূর্ণ।

—শ্রীগুরুসদয় দত্ত।

নিজের পুঁজি দেখচ খুঁজি
চক্ষু বুঁজে থেকে
বাহিরে চাহি দেখ না তারে
নাও না কাছে ডেকে।

—শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

সহসা একদা নবীন প্রভাতে
ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে
সেই ভরসায় করি পদতলে
শূন্য হৃদয় দান।

—চন্দ্রাবতী।

World is a stage and we are all its actors.
—Jahar Ganguli.

Trust in God and do the right.
—Pramathesh Barua.

ভেসে যা প্রেম-জোয়ারে রূপ-সায়রে
একবারও তুই ডুবে যা না
পাবি রে অরূপ রতন মনের মতন
মানব জনম আর হবে না।

—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

Serve the motherland faithfully and fearlessly.
—M. M. Malaviji.

Mean, speak and do well.
(The urquhart class motto)
—U. S. Urquhart.

জীবনের পথে যাকে হারাই, মরণের পথে আবার তাকেই আমরা কুড়িয়ে পাই।

—শ্রীচারুবিকাস দত্ত।

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধু পাত্রং
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানাং ঈশ পারং ন যাতি।

—শ্রীসোমেশচন্দ্র বসু।

কিসের শোক করিস ভাই আবার তোরা মানুষ হ।
—শ্রীদিলীপকুমার রায়।

আমার সকল কর্ম্মই যেন দেশের স্বাধীনতা-যজ্ঞেই সমর্পিত হয়, এ জীবনের সার্থকতা দেশমাতৃকার পূজায় নিহিত।

—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সুখে দুখে হাসিমুখে রও
হেসে ধর লাভ আর ক্ষতি
লক্ষ্মীসমা পরিপূর্ণা হও
হও তুমি চির-আয়ুষ্মতী।

—উমা দেবী।

Shall I ask the brave soldier who fights by my side in the cause of our country. If our creeds agree, shall I give up the friend I have valued and tried. If he kneels not before.

The same alter with me?

—M. Kelkar.

সাগর-তীর্থে

(১৩ই শ্রাবণ প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার জন্মভূমি দর্শনে।)

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

করে এলাম বিশাল সাগর-তীর্থ পরিক্রমা,
'বীরসিংহ' গ্রামের রজে দিলাম গড়াগড়ি,
পুণ্যভূমি, পাদস্পর্শ করো আমার ক্ষমা,
সাগর-সুধা নিয়ে এলাম প্রাণের কলস ভরি।

দেখে এলাম তরুশ্রেণী হস্তে-রোপা তাঁর,
সরোবরে আজও তাঁহার সাঁতার-কাটা বারি,
প্রশান্ত সে মূর্ত্তি তাঁহার হেরি বারম্বার,
চরণতলে দিলাম মালা—শতদলের সারি।

দেখে এলাম মৃতের তো নয়,—অমৃত উৎসব,
বিদ্যাসাগর অমর যে তাই পেলাম এসে টের,
এক সাথেতে কণ্ঠে সবার তাঁহার জয়রব,—
পল্লীগ্রামে পুণ্য মিলন পঞ্চ সহস্রের।

শুনে এলাম প্রতি বুকেই সমুদ্রকল্লোল,
বৃদ্ধ বালক নর নারীর আনন্দ-উচ্ছ্বাস,
বৃষ্টি এবং বায়ুতে এক অমৃত-হিল্লোল,
কি এক শুচি উন্মাদনায় পূর্ণ চারি পাশ।

দেখে এলাম তরুণ দলের বিপুল সমাবেশ,
কি শৃঙ্খলা, কি ভদ্রতা, ভক্তি ভালবাসা,
উদ্দীপনায় নাইকো কোথাও অবাধ্যতার লেশ,
নিয়ে এলাম নূতন স্বপন, নূতনতর আশা।

শিক্ষক এবং ছাত্র হেথায় সবাই সমপ্রাণ,
ক্লান্তিবিহীন—মহোৎসবের করছে আয়োজন,
গ্রাম তো নহে—যজ্ঞভূমে করছি অবস্থান,
অহর্নিশি পবিত্রতার পাচ্ছি পরশন।

সংযত সশ্রদ্ধ-চিত্ত হেরি কিশোর দল,
ধন্য তাদের কর্ম্মনিষ্ঠা, পূজ্য-পূজা ব্রত,
শত কাজে হস্ত পদ সতত চঞ্চল,—
নতশিরে আজ্ঞা পালি' ফিরছে অবিরত।

দেখতে পেলাম বঙ্গভূমির সত্যিকারের রূপ,
বাঙালী যে বাঁচবে তাতে সন্দেহ নাই কণা,
মূককে দিল বাচাল করে—রইতে নারি চুপ,
হবে নাকো বিফল এদের নীরব আরাধনা।

দেখে এলাম প্রাণ যে এদের প্রাচুর্য্যেতে ভরা,
বিচ্যুতি দেয় সাক্ষ্য কাজের বিপুলতার শুধু,
দেখে এলাম সম্ভাবনার কান্তিমতী ধরা,
ফিরছি লয়ে সে রাজসূয়ের হোমটিকা ও মধু।

হেথায় স্মৃতি-সভার শোভা শ্রদ্ধা নিবেদনে,
কোলাহলের মাঝে একই পূজার একাগ্রতা,
জুটেছে সব—একটি মহৎ নামের নিমন্ত্রণে,
সবেই তাদের আনন্দ আর সবেই সফলতা।

নাইকো কোনো নৃত্য কি গীত, অভিনয়ের মোহ,
করতে দেশের জনগণে হেথায় আকর্ষণ,
হেরি কেবল ভক্তি-নম্র যাত্রী-সমারোহ,
দুর্গম পথ অতিক্রমি আসছে ক্ষণে ক্ষণ।

অশোভন যে লাগলো বড়ই দুস্তর সেই পথ,
বাঙালীর এ শ্রেষ্ঠ তীর্থ,—বিশ্বতীর্থ হবে,
যে পথ দিয়ে চলবে মোদের জাতির জয়-রথ
অবহেলা তাহার প্রতি করা কি সম্ভবে?

এসেছিলাম স্কন্ধে ঝুলি তীর্থযাত্রী দীন,
কৃতার্থ ও তৃপ্ত হলাম, পূর্ণ মনস্কাম।
আশীষ লভি ফিরছি ঘরে—অন্তরে নবীন,
পূজি' তাঁরে ভক্তিভরে—স্মরি' গুণগ্রাম।

এলাম আমি সাগর-বেলায় প্রণাম আমার রেখে,
সাগর-শীকর-সিক্ত হলো দেহ মনঃ প্রাণ,
জাতির ভবিষ্যতের ছবি সাগর-সুধায় এঁকে,—
নিলাম বুকে—কল্পলোকে করছি অবস্থান।

মহামানব আবার এসো উর্দ্ধে তোলো দেশ,
তোমার মত মানুষ যে আজ সারা ভারত চায়,
বিশুদ্ধ ও উজল কর মলিন পরিবেশ,
তোমার দয়া, তেজস্বিতায় মহাপ্রাণতায়।

ফিরছি লয়ে রৌদ্র এবং মেঘের আলিঙ্গন,
বক্ষে আমার ইন্দ্রধনু—চক্ষে আমার জল,
অনাগতের আবির্ভাব যে হেরছে আমার মন
হয়ে এলাম জাতিস্মর আর বলিষ্ঠ, নির্ম্মল।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর চিঠি

'সঙ্গীত-শতক' পাঠ করিয়া, বিহারিলালের সহিত আলাপ করিবার বাসনা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে জাগে। উভয়ের মধ্যে কিরূপ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল, ১৮ মে ১৮৬৪ তারিখে দ্বিজেন্দ্রনাথকে লিখিত বিহারিলালের নিম্নোদ্ধৃত পত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

১২৭১ সাল। ৬ জ্যৈষ্ঠ
রাত্রি ১০ ঘণ্টার সময়

প্রিয় সখা

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

"প্রযুক্তসংস্কার-বিশেষমাত্মনা
ন মাং পরং সম্প্রতিপত্তুমর্হসি।
যতঃ সতাং * * * সঙ্গতং
মনীষিভিঃ সাপ্তপদীনমুচ্যতে॥"

একি এ নূতন আলো অন্তরে উজলে!
অরুণ কিরণ যেন প্রফুল্ল কমলে।
বহু দিন যে রস করিনি আস্বাদন,
আজি সে মধুর রসে রসিয়াছে মন!
মৈত্রী কিম্বা প্রেমে ইহা ঠিক নাহি পাই;
যারে ভালবাসা বলে বুঝি হবে তাই।
ছেলেবেলা ছেলেখেলা ফুরায়ে গিয়েছে,
মানুষের মনে মন পশিতে শিখেছে;
তা না হোলে একটুও ছাড়াছাড়ি নাই।
আজি কেন পশিতে প্রবৃত্তি নাহি হয়?
ছেঁড়া খোঁড়া ভাবিতেও জন্মে যেন ভয়?
যেন ইহা প্রভাতের পবিত্র কুসুম, (কুসুম)
ছেঁড়ে কোন্ সহৃদয়, অহৃদয় সম?
নির্ম্মল বাতাশে বেস হেলিবে দুলিবে,
মধুর আমোদে আত্মা উথলে উঠিবে।
হায় কেন মন ফের দোলে গো দোলায়!
ঢাকে বা উষার ছটা মেঘের ছায়ায়।
বটে এই মনোহর কুসুম রতন
সৌরভে গৌরবে মোরে করে আকর্ষণ;
কে জানে ইহার নাই কেহ অধিকারি?
কে জানে যে নহে ইহা নিকুঞ্জ আঁধারি?
পাছে আমি নাহি পাই সম্ভোগের পথ,
হই পাছে মাঝ পথে ভগ্নমনোরথ,
অথবা চরমে মম মরমের মাজে
আচম্বিতে চোরা বাণ বেগে এসে বাজে!
কি আছে অদৃষ্টে, তাহা বলা নাহি যায়,
"স্বর্গেতে থাকিতে পাছে ভূতেতে কিলায়?"
দূর হোক্ এ দোলায় কেন দুলি আর,
সন্দেহে প্রণয় সুখ হয় ছারখার্!
উদার অন্তরে দিয়ে হৃদয় ঢালিয়ে
চুপ্ কোরে বসে থাকি নিশ্চিন্ত হইয়ে।
হয়তো আমার মন মজেছে যেমন,
সে তাহার বিন্দুমাত্র করেনি গ্রহণ।
আপনার তেজঃগর্ভ নম্র ব্যাবহার,
কতদূর শক্তি ধরে মন মোহিবার;
সরল মধুর ভাব, খোলা আলাপন,
কতদূর কোরেছে আমারে আকর্ষণ,
হয়তো সে নিজে তাহা জ্ঞাত মাত্র নয়,
চন্দ্রমা জানে না তার কবে কত হয়!
শশি হে চকোর কবে তোমার দেয়ান্,
থেকোনা মেঘের আড়ে, বোধোনা পরাণ।
গায়েপড়া হোলে তার গুমোর থাকে না,
জেনেও আমার মন প্রবোধ মানে না।
মানিনী ভামিনী নই, গুমোর জানিনে,
তা বোলে কি প্রেমপাত্র হইতে পারিনে?
প্রিয় হে আমার মনে অন্য কিছু নাই,
হেরিয়ে তোমায় সুহৃ হৃদয় জুড়াই।

কে জানে ভাই! কি ছেলেমানুষী কোরে বোস্‌লেম্, কিছুই বোলতে পারিনে। কাল্‌কের কথায় বার্ত্তায় আর আজকের লেখায় যদি চাপল্য প্রকাশ হয়ে থাকে, বোধ কর, তা ভাই! বড্ড বেসি অভিমান কোর না। আমার এই পত্রীখানি কাহাকেও দেখিও না।

তোমার অনুরক্ত
শ্রীবেহারিলাল চক্রবর্ত্তী

২

১৯ অক্টোবর ১৮৮১ তারিখে বিহারিলাল 'সারদামঙ্গল' রচনা সম্পর্কে বন্ধু অনাথবন্ধু রায়কে একখানি পত্র লেখেন; পত্রখানি বিহারিলালের গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত 'সারদামঙ্গল' পুস্তকের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

কলিকাতা, ৪ঠা কার্ত্তিক ১২৮৮।

ভ্রাতঃ!

মৈত্রীবিরহ প্রীতিবিরহ, সরস্বতীবিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল সঙ্গীত রচনা করি।

সর্ব্বাদৌ প্রথম সর্গের প্রথম কবিতা হইতে চতুর্থ কবিতা পর্য্যন্ত রচনা করিয়া বাগেশ্রী রাগিণীতে পুনঃপুনঃ গান করিতে লাগিলাম; সময় শুক্লপক্ষের দ্বিপ্রহর রজনী, স্থান উচ্চ ছাদের উপর। গাহিতে গাহিতে সহসা বাল্মীকি মুনির পূর্ব্ববর্ত্তী কাল মনে উদয় হইল, তৎপরে বাল্মীকির কাল, তৎপরে কালিদাসের। এই ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতীমূর্ত্তি রচনানন্তর আমার চির আনন্দময়ী বিষাদিনী সারদা কখন স্পষ্ট কখন অস্পষ্ট কখন বা তিরোহিত ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে এই বিষাদময়ী মূর্ত্তির সহিত বিরহিত-মৈত্রপ্রীতির ম্লান করুণামূর্ত্তি মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

এখন বোধ করি বুঝিতে পারিলেন যে, আমি কোন উদ্দেশ্যেই সারদামঙ্গল লিখি নাই।

মৈত্রী ও প্রীতিবিরহ যথার্থ সরল সহজভাবে বুঝাইতে হইলে আমার সমস্ত জীবন বৃত্তান্ত লেখা আবশ্যক করে, এবং সরস্বতীর সহিত প্রেম, বিরহ ও মিলন বুঝাইতে হইলে অনেকগুলি অসর্ব্ববাদীসম্মত কথা কহিতে হয়, কি করি বলুন, আমাকে কুরুচি ভাবিবেন না। একান্ত শুশ্রূষা বুঝিলে সারদা-প্রেমের অসর্ব্ববাদীসম্মত কথা পত্রান্তরে লিখিব, কেবল জীবন বৃত্তান্ত এখন লিখিতে পারিব না।

অনুরক্ত

শ্রীবিহারিলাল চক্রবর্ত্তী

৩

অনাথবন্ধু রায়কে লিখিত দ্বিতীয় পত্রখানি 'প্রয়াস' পত্রের মে, ১৯০০ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে; পত্রখানি এইরূপ:—

কলিকাতা

৬ই মাঘ, ১২৮৮।

ভাই অনাথ

তুমি কোথায়, তুমি কোথায় এখন! তোমাকে এখন আর দেখিতে পাইতেছি না কেন? আমি কি করিয়াছি? আমি যখন তোমার প্রথম পত্র পাই, তখন আমার শোবার ঘরের সমুখের ছাদের আলসের উপর, টবে, দাড়িম গাছে, একটি দাড়িম ধরিয়াছিল। তোমার দ্বিতীয় পত্র পাইবার সময়, সেটি পুষ্ট হইতে আরম্ভ করে, তৃতীয় পত্র পাওয়ার পর অবধি সে রক্তবর্ণ, ক্রমে আপেলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছিল। আমি প্রতিদিন ঘুম ভাঙিয়া উঠিবামাত্র দাড়িমটি আমার চোখে পড়িত, অমনি তুমি আমার সমুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে; আমোদে আহ্লাদে, পীড়ায়, চিন্তায়, রচনায়, সর্ব্বদাই তুমি সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে—সর্ব্বদাই তোমার হাসি হাসি মুখশশী চেহারায় খুসি ফুটিয়া উঠিত। তোমার মত খোলা প্রাণের মানুষকে পাইয়া আমি অহোরাত্র স্বর্গসুখে ছিলাম। দুই চারিদিন হইল টুকটুকে চুকচুকে দাড়িমটি ঝরিয়া পড়িয়াছে। ছাতটা যেন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। তোমাকেও আর তেমন সর্ব্বদা দেখিতে পাই না। প্রাণ কাতর মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। পত্রপাঠ পত্র লিখিয়া সুস্থ কর। আমি শরীর গতিক ভাল আছি, তুমি সারিয়াছ কি না? তোমার বেহারী।

নগরে বেশ্যাগণের বসতির বিরুদ্ধে পত্র

নগরপ্রান্তে বেশ্যাগণ বসতিকরণ কারণ বঙ্গদেশবাসিগণের ভারতবর্ষীয় লেজিসলেটিব কৌন্সলে আবেদন।

মহামহিম ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়গণ

সমীপেষু।

নিম্ন স্বাক্ষরিত বঙ্গদেশবাসীদিগের সবিনয় নিবেদন এই যে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত করায় বঙ্গদেশবাসিগণের যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত, কারণ দেশের শান্তিরক্ষা ও কুরীতি নিরাকরণ করাই ছত্রধরদিগের উচিত কার্য্য ও তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। এক্ষণে পুলিস কর্ত্তৃক যেরূপ শান্তিরক্ষা হইতেছে বর্ণন বাহুল্য, অতি সুচারুরূপেই হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই, নগরীয় যাবতীয় শান্তিরক্ষার মধ্যে বেশ্যাকুল দ্বারা তাহার অনেক অংশের ত্রুটি হয়, কারণ, বারযোষাকুল সমস্ত রাত্রি মদ্যপান দ্বারা গীতবাদ্যাদির কোলাহলে এত উৎপাত আরম্ভ করে যে ভদ্রলোক মাত্রেই উক্ত পল্লীতে শয়নাগার ত্যাগকরণে বাধ্য হন, চৌর্য্য কার্য্যদ্বারা যে সমস্ত দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয় তাহা কেবল ঐ বারললনাগণের ব্যবহার কারণ। রাত্রিকালে মদ্য বিক্রয় যাহা ভয়ানক শান্তিভঙ্গ তাহা কেবল বারযোষাগণের নিমিত্তে হয়, কলহ, মদ্যপান দ্বারা জীবন সংহার, বাসন দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি ভয়ানক অত্যাচার কেবল এই বারস্ত্রীগণের আলয়েই সম্পাদিত হয়, আরো বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের ইহা স্বভাব সংশোধন বলিলেও বলা যাইতে পারে, কারণ তাহারা কি প্রাতঃকালে কি সায়ংকালে সাবকাশ হইলেই এই কদাচার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, বেশ্যা সংখ্যায় ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে তাহার তাৎপর্য্য কি কেবল তাহাদিগের প্রতি কোন উক্ত নিয়ম অদ্যাবধি প্রচলিত হয় নাই বলিয়াই তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া যথেচ্ছ তাহাই করিতেছে, কেবল যে বেশ্যাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার এত উৎপাত হইতেছে তাহাও নহে, বঙ্গদেশীয় ধনবানগণ স্বীয় স্বীয় বসতবাটীতেও অধিক ভাটালোভী হইয়া ভদ্রপল্লীমধ্যে বেশ্যাগণকে স্থান দান করিয়া অতুল সুখ প্রাপ্ত হইতেছেন যদ্দারা এক ঘর বেশ্যাবৃদ্ধি হইবায় সেই ভদ্রপল্লী একেবারে অভদ্র নিয়মে পরিপূর্ণ হইতেছে অতি নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক ধনবান্ মান্য বংশের প্রাসাদের নিকটেই বেশ্যানিকেতন কেবলই ভয়ানক ব্যবহার প্রদর্শিত হইতেছে। অতএব হে সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা মনোযোগী হইয়া বেশ্যাগণকে নগরের প্রান্তে একত্রে নিবসতির আজ্ঞা করুন, নচেৎ কোন প্রকারেই ভদ্র ধনবানগণ এই বিশাল ধনপূর্ণ ভদ্র নগর বাসের উত্তম স্থল বোধ করিতে পারেন না। যদ্যপি রাজা হইয়া প্রজাদিগের শুভ চীৎকারের সময়ে কালার ন্যায় ব্যবহার করেন তাহা হইলে সেই রাজার রাজত্বের কীর্ত্তি কোন কালেই পতাকা রূপে উড্ডীন হইতে পারে না।

অতি পূর্ব্বে সোণাগাজি নামক স্থান বেশ্যাদিগের বাসস্থল ছিল অদ্যাপিও তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় পূর্ব্ব সময়ে যেরূপ শান্তিরক্ষার নিয়ম ছিল মধ্যে তাহার উল্লেখ না হইবায় একেবারে তাহা মিলিত হইয়া গিয়াছে, অযোধ্যা, কাশী, দিল্লী ইত্যাদি নগরে এবং ইউরোপীয় নানা নগরে এই প্রকার রীতি প্রচলিত আছে তজ্জন্য আমরা বিনীতভাবে এই নিবেদন করি যে দেশীয় স্বাস্থ্য বৃদ্ধি

ও শান্তিকার্য্য উত্তমরূপ নির্ব্বাহ জন্য সভ্যমহোদয়েরা মনোযোগী হইয়া বেশ্যাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র পল্লী নির্দ্দিষ্ট করুন যদ্দ্বারা আমাদের ঈপ্সিত বিষয় সুসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

মহোদয়গণ

আমরা আপনাদিগের নিতান্ত অনুগত ভৃত্য।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

রামমোহন ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদের পত্র

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩এ জুন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায় রুজু করেন এবং উহার শুনানি হয় কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের ইকুইটি-বিভাগে প্রধান বিচারপতি স্যর্ এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্টের সম্মুখে। এই মকদ্দমা সম্বন্ধে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। ডাঃ কার্পেণ্টার লিখিয়া গিয়াছেন যে, রামমোহন জাতি ও ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন, এই কথা প্রমাণ করিয়া তাঁহাকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য এই মকদ্দমা রুজু করা হয়, কিন্তু রামমোহন তাঁহার প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেন।

কিছু দিন পরে গোবিন্দপ্রসাদ মকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিলেন ও পিতৃব্যের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লিখিলেন :—

শ্রীকৃষ্ণ

শরণং

সেবক শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দেব শর্ম্মণঃ প্রণামা পরাঙ্ক নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এ সেবকের মঙ্গল পরং আমি অন্য অন্য লোকের কথা প্রমাণ মহাশয়ের নামে হিস্যা পাইবার প্রার্থনায় সুপরেম কোর্ট একুইটিতে অযথার্থ নালিশ করিয়াছিলাম একণে জানিলাম যে আমার বুঝিবার ভ্রমে এ বিষয়ে প্রবর্ত্ত হইয়া নানা প্রকার ক্লেশ পাইতেছি এবং মহাশয়েরও মনস্তাপ এবং অর্থব্যয় অতএব মহাশয় আমার পিতার তুল্য আমার অপরাধ মর্য্যাদা করিয়া যদি আমাকে নিকট যাইতে অনুমতি করেন তবে আমি নিকট পৌঁছিয়া সকল বিশয় নিবেদন করি।

শ্রীচরণাম্বুজেষু ইতি।—

সন ১২২৬ সাল তা: ১৯ কার্ত্তিক,

পরম পূজনীয়—

শ্রীযুৎ রামমোহন রায় খুড়া মহাশয়,

শ্রীচরণ সরজেষু

পত্র দেনা মো: কলিকাতা।

মকদ্দমার শেষ শুনানির দিন (১০ ডিসেম্বর ১৮১৯) গোবিন্দ-প্রসাদ আদালতে উপস্থিত হইলেন না, এজন্য তাঁহার মকদ্দমা ডিসমিস হইয়া গেল।

টমাস ম্যানিংএর নিকট চার্লস ল্যাম্বের চিঠি

[চার্লস্ ল্যাম্ব বিখ্যাত বৃটিশ লেখক। ম্যানিং তাঁর বন্ধু, ৯ বছর চীনে কাটাচ্ছিলেন। বন্ধু-বান্ধব ও তৎকালীন জীবিত বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আজগুবি ও কাল্পনিক তথ্যপূর্ণ ল্যাম্বের এই পত্রখানি ইংরেজী সাহিত্যের একখানি বিখ্যাত চিঠি।]

ডিসেম্বর ২৫, ১৮১৫

এত দিন আমাদের কাছ থেকে দূরে বসে থাকবার কি মতলব তোমার বল ত ম্যানিং? যে ইংল্যাণ্ড দেখে গেছলে, আশা করো না, তেমনটি ইংল্যাণ্ড আর তুমি দেখতে পাবে।

রাজরাজড়া সব ওলট-পালট। জনতাকে পায়ে দলে ধূলো করে দিয়েছে। পশ্চিম দুনিয়ার রূপ বদলে গেছে বেমালুম। তোমার যে সব বন্ধুর ফোটা যৌবন দেখে গেছলে, তারা সব আজ বুড়ো। আমার (দু'-চার জন যারা তোমার কথা আজও মনে করে, আমি তাদের অন্যতম) সেই সোনালী চুল, মনে আছে বোধ হয় যার কত গর্ব্ব আমি করতাম, আজ তাতে রূপালী রং আর ছাই রং ধরেছে। মেরী স্বর্গে, অনেক দিন হ'ল তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। যে রেশমী গাউন তাঁকে পাঠিয়েছিলে, তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল সেই রেশমী গাউন পরিয়ে তাঁকে যেন সমাধিস্থ করা হয়। মনে হয়ত আছে—সেই কম্বুকণ্ঠ ও বলবান বিকম্যানকে, সে আজ এক দাসীর কাঁধে ভর করে লাঠি ধরে বেড়ায়। মার্টিন বার্ণে খুব বুড়ো হয়েছে। সেদিন এক বৃদ্ধা আমার দোরে এসে কড়া নাড়ল, বললে আমার যে জানা, অনেক কষ্টে বুঝলাম লুইসা, মিসেস টপহামের মেয়ে। মিসেস টপহাম আগে ছিলেন মিসেস মর্টন, মিসেস রেণ্ডলডস, মিসেস কেনি। এঁর পয়লা স্বামী ছিলেন গত শতাব্দীর নাট্যকার হলক্রফট।

সেণ্ট পলের গীর্জা ধ্বংসস্তূপে পরিণত। মনুমেণ্টটা কত উঁচু ছিল মনে আছে? আজ উঁচু তার অর্দ্ধেকও নয়, কালের আক্রমণে তার অনেক অংশকে বিপজ্জনক বলে বাতিল করতে হয়েছে। চেরিং-ক্রশের ঘোড়াটা নেই, কোথায় গেছে কেউ বলতে পারে না। ওখানে বসে ত 'হোচিট'-এ' দিয়ে বানান হবে কি হবে না তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ, আর এই দিকে এই সব হচ্ছে। যেখানে আছ সেখানেই থাক। তোমার যাবার সময় যারা জন্মেনি, দুনিয়া আজ তাদের। Struld-burgএর মত কালের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে আর কি লাভ? এখানে সেখানে দু'-এক জন কদাচিৎ তোমায় হয়ত চিনবে। তোমার মত সবাই বলবে সেকেলে, তোমার ঠাট্টা বিদ্রূপ সব পচা রসিকতা তোমার 'পান' ওরা বলবে বাতিল সেকেলে রস। যে ভাবে অঙ্ক তুমি কষতে, তার জায়গায় নতুন 'মেথড' এর মধ্যে এসে পড়েছে। আমার মনে হয় এদের নতুন 'মেথড' পুরাণ Maclaurinএর ধারা।

বেচারা গডউইন! সেদিন ক্রিপলগেট কবরখানায় তার কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। কবরের উপর মিস···লিখিত দু'-চার ছত্র কবিতা। ভাল মনে হ'লে তোমায় পাঠাব। তুমি ফিরে এলে যাদের আনন্দ, গডউইনও তাদের অন্যতম। তোমায় পেয়ে উন্মত্ত চীৎকার আর কলরবের অভ্যর্থনা সে হয়ত করত না। দার্শনিকের কাছে জ্ঞানই সুখ। সেই জ্ঞান আহরণে আগ্রহান্বিত দার্শনিকের Complacent gratulationএ সে তোমায় অভ্যর্থিত করত। আজ গডউইনের সব থিওরী, সব মত ক্রিপলগেটের মাটীর ১০ ফুট নীচুতে বিশ্রাম করছে।

সবে কোলেরিজের মৃত্যু হয়েছে। অনেক দিন বাঁচলেন। দু'-এক

হপ্তা আগে ওয়ার্ডসওয়ার্থও চোখ বুজেছেন। মৃত্যুর মাত্র দু'দিন আগে এক পুস্তক-বিক্রেতাকে কোলেরিজ লিখেছিলেন যে, ২৪ ভাগে তিনি 'Wanderings of Cain' মহাকাব্য লিখবেন। শোনা যায় তিনি সমালোচনা, দর্শন, অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ৪০ হাজার বই লিখে গেছেন, কিন্তু এর মাত্র দু-একখানির রচনা শেষ হয়েছে। আজ সে সব পাণ্ডুলিপি দিয়ে সম্ভবতঃ মসলা বাঁধা হবে।

তাই দেখ, কালের ব্যস্ত হস্ত কি কাণ্ডটাই করছে। আর তুমি অকারণ ওখানে স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসনে দিন কাটাচ্ছ। এখানে এলে বন্ধুরা খুসী হ'ত, তোমার দেশও হ'ত উপকৃত। কিন্তু ব্যর্থ অভিযোগ। ধ্বংসাবশেষের টুকরোগুলোকে কুড়িয়ে নাও বন্ধু, যত শীগগির পার। ফিরে এস স্বদেশে। চোখ কচলে দেখব তোমায় চিনতে পারি কি না। শীর্ণ সঙ্কুচিত দুই বুড়ো হাতে হাত দিয়ে আমরা পুরোনো সব গল্প করব—সেন্ট মেরীর চার্চ্চের গল্প আর সেই হাজামখানার উল্টো দিকের সেইখানটার কথা, সেখানে তরুণ গণিত ছাত্ররা গিয়ে মিলত। পরে এই আড্ডা জমিয়ে রেখেছিল বেচারী ক্রিপস্। পরে ট্রাম্পিংটন্ স্ট্রীটে একটা দোকান করে ক্রিপস্ সেখানেই থাকে শুনেছি। সম্ভবতঃ শুনেছ, আমি ইণ্ডিয়া হাউসে আর নাই। ব্রিজের উপর ফিস্‌মঙ্গার্স আমস্ হাউসে ছোট্ট একটা কেবিনে আছি। আমার এ কুটীর ছোট, তবু আরামে আছি। এই কেবিনেই তোমায় অভ্যর্থিত করব। তুমি গেঁড়ি ভালবাস, নিজেই ঝিনুক খুলতে। গেঁড়ির সময় এলে তোমার জন্য কিছু জোগাড় করব। গডউইনের পুরানো বন্ধু মার্শাল এখনও বেঁচে। তুমি কেমন মুখ ভেংচাতে, আজও তার কথা বলে।

যত শীগ্‌গির পার ফিরে এস।

সি ল্যাম্বস্।

রেভাঃ লংএর মুক্তির পর রেভাঃ ডাফের পত্র

[নীলদর্পণ মামলার দণ্ডভোগের পর রেভাঃ লং বাংলা ত্যাগ করে মাদ্রাজ গমন করেন। সেখান থেকে বন্ধু রেভাঃ আলেকজাণ্ডার ডাফকে স্মরণ করেন, এ কথা লং-পত্নী জানান। ডাফের এই পত্রে লংএর বিচার সম্বন্ধে বিলেতের অন্যতম জনপ্রিয় সংবাদপত্রের অভিমত উল্লেখ দেখতে পাই।]

প্রিয় মিসেস লং,

কলিকাতা,

আপনার প্রিয় স্বামীর পত্রের জন্য আমার পরম ধন্যবাদ গ্রহণ করিলে বাধিত হইব। আমায় যে তিনি স্মরণ করিয়াছেন ইহাতে তাঁহার সহৃদয়তাই প্রকাশ পাইয়াছে। আপনিও যে কালবিলম্ব না করিয়া পত্রখানি আমাকে পাঠাইয়াছেন, ইহাতে আপনারও সহৃদয়তা প্রকাশিত হইয়াছে। জানিয়া সুখী হইলাম যে তিনি মাদ্রাজের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি এখানে থাকিলে দীর্ঘকাল উত্তেজনা জীয়াইয়া রাখা হইত মাত্র। এখন তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন বিশ্রাম, বিশ্রাম, বিশ্রাম—মনের ও দেহের। অবিলম্বে তাঁহার পাহাড়িয়া অঞ্চলে চলিয়া যাওয়া প্রয়োজন। সেখানে উচ্চ পাহাড়ী হাওয়ায় তিনি সারা দিন বেড়াইবেন আর মূক মহাপ্রকৃতির মহামহিমময় প্রকাশের সহিত মনোবিনিময় করিবেন—অর্থাৎ বিচিত্র ও মহিমান্বিত সৃষ্টির স্রষ্টা পরমেশ্বরের সহিত যোগস্থাপন করিবেন।

এবারের ডাকে লণ্ডনের সংবাদপত্রগুলি পাইলাম। 'টাইমস্' পত্রের পরই প্রভাবশালী 'ডেলী নিউজ' পত্র নীলদর্পণের মামলায় মিঃ লংকে সমর্থন করিয়া নীলকর, জুরী ও জজের নিন্দা করিয়াছেন।

ভবদীয় বশম্বদ—

আলেকজাণ্ডার ডাফ।

হাতীর লড়াই —মনু চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো পনেরো

'কামিনী-কাঞ্চনই সংসার।' বঙ্কিমকে লক্ষ্য করে বললেন আবার ঠাকুর: 'এরই নাম মায়া। দেখতে দেয় না ঈশ্বরকে।'

মাথার উপরে ছাদ থাকলে কি সূর্যকে দেখা যায়? একটু-একটু আলো এলে কি হবে? কামিনী-কাঞ্চনই ছাদ। ছাদ তুলে না ফেললে সূর্যকে দেখবে কি করে? সংসারী লোক যেন ঘরের মধ্যে বন্দী। আবছায়ার বাসিন্দে।

কামিনী-কাঞ্চনই মেঘ। সেও দেখতে দেয় না সূর্যকে। যতক্ষণ মায়ার ঘরে আছ, যতক্ষণ মায়া-মেঘ রয়েছে জ্ঞান-সূর্য কাজ করে না। মায়া-ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াও। জ্ঞান-সূর্যে নাশ হবে অবিদ্যা। বন্ধ ঘরের অন্ধকার।

বন্ধ ঘরের অন্ধকারও যা অহঙ্কারও তাই। দগ্ধ হয়ে যাবে শুকনো তৃণের মত।

'ঘরের মধ্যে আনলে আতস কাঁচে কাগজ পোড়ে না।' বললেন ঠাকুর, 'ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালে রোদটি ঠিক কাঁচে পড়ে, তখন পুড়ে যায় কাগজ। আবার মেঘ চলে এলে কাজ হয় না আতস কাঁচে। মেঘটি সরে গেলে তবে হয়।'

সেই একজন এক কুকুর পুষেছে। দিন-রাত থাকে তাকে নিয়ে। কখনো কোলে করে কখনো বা মুখের পরে মুখ দিয়ে বসে থাকে। অত আদর করতে নেই, একজন এসে শাসিয়ে গেল, পশুর জাত, কোন দিন আদর ভুলে ফট করে কামড়ে দেবে তার ঠিক কি। সত্যিই তো। জোর করে নামিয়ে দিলে কোল থেকে। আর ককখনো কোলে নেব না। কুকুর তা শুনবে কেন? দৌড়ে এসে উঠতে চায় ব্যাকুল হয়ে। নামিয়ে দাও তো আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছুটে পালাও তো সেও ছোটে। তখন উপায় কি? প্রহার করো। কুকুরের মার আড়াই প্রহর। মার ভুলে গিয়ে আবার কোলের জন্যে হা-পিত্যেশ করে। অনেক কাল আদর করে কোলে তুলে নিয়েছ এখন তুমি নিরস্ত হলেও সে ছাড়বে কেন? আসতে চায় আসুক, আবার প্রহার করো। জর্জর করো। নির্জিত করো। আর সে আসবে না। পালিয়ে যাবে।

কামকেও অনেক প্রশ্রয় দিয়েছ। এবার তাকে উচ্ছিন্ন করো।

কি জানিস, তোদের এখন যৌবনের বন্যা এসেছে। তাই পাচ্ছিস না বাঁধ দিতে। বান যখন আসে তখন কি আর বাঁধ-টাঁধ মানে? বাঁধ ভেঙ্গে জল ছুটতে থাকে উত্তাল হয়ে। ধান-খেতের উপর এক বাঁশ-সমান জল দাঁড়িয়ে যায়। কামিনী-কাঞ্চন যদি মন থেকে গেল তবে আর বাকি কি রইল? তখন কেবল ব্রহ্মানন্দ।

কিন্তু তুমি কি কামিনী? তুমি জননী, তুমি জায়া, তুমি তনয়া, তুমি সহোদরা। তোমাকে ত্যাগ করব কি করে?

কামিনীকে ত্যাগ করো দামিনীকে নয়; ভোগিনীকে ত্যাগ করো, যোগিনীকে নয়। অবিদ্যাকে ত্যাগ করো, বিদ্যা-বিনোদিনীকে নয়।

'দু-একটি ছেলে হলে স্ত্রীর সঙ্গে ভাই-ভগ্নীর মত থাকতে হয়, আর তার সঙ্গে কইতে হয় শুধু ঈশ্বরের কথা।' বঙ্কিমকে বললেন আবার ঠাকুর: 'তা হলেই দুজনের মন তাঁর দিকে যাবে আর স্ত্রী ধর্মের সহায় হবে।'

জগতের মা, সেই আদ্যাশক্তিই স্ত্রী হয়ে স্ত্রীরূপ ধরে রয়েছেন। সেই সৃজনী পালনী সংহরণী শক্তিই নেমে এসেছে সংসারে। প্রভাতে গায়ত্রী, অরুণ-রঞ্জিত আকাশে হংসারূঢ়া কুমারী, সৃষ্টি-উন্মুখী কোরক-আকারা। মধ্যাহ্নে শুক্লবর্ণা স্থিতিরূপিণী যুবতী, পদন্যাসবিলাসলক্ষ্মী। সায়াহ্নে কৃষ্ণবর্ণা প্রলয়শংসিনী বৃদ্ধা, ঘোরকুটিল-আননা। এই তো

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়লক্ষণা ব্রহ্মশক্তি! সমস্ত জগতের আধারশক্তি। এই ব্রহ্মময়ী মহাশক্তিকেই তো বসিয়েছি সংসারে।

শক্তিযুক্ত না হতে পারলে শিব করবে কি? শিব তো সামর্থ্যহীন স্পন্দহীন। শক্তিযুক্ত হলেই সে পুরুষার্থসম্পন্ন।

ঋক কখনো সাম ছাড়া আর সাম কখনো ঋক-বিরহিত হয়ে থাকতে পারে না। ঋক স্ত্রী, সাম পুরুষ। ঋক ভূলোক, সাম স্বর্লোক।

বিবাহের মন্ত্রে বর বলছে বধূকে: 'আমি অম, লক্ষ্মী, তুমি লক্ষ্মী। আমি সামবেদ তুমি ঋগ্বেদ। আমি স্বর্গ তুমি ধরিত্রী।'

আসল কথা, সংযম করো। সত্তার কনকপদ্মটিকে উন্মোচিত করো। সংসারের উর্ধ্বেও যে সংসার আছে তার খোঁজ নাও। দেহমঞ্চে ফোটাও এবার ঈশ্বর-রোমাঞ্চের ফুল। আনন্দ পেতে এসেছ সংসারে নাও এই নিত্য-নতুনের আনন্দ। বিন্দু-বিন্দু নয়, থেকে-থেকে থেমে-থেমে নয়—চাই অপরিচ্ছিন্ন সুখ। একটানা বন্যা। সেই একটানা বন্যার নামই ঈশ্বর।

'আর কাঞ্চন?' বললেন আবার ঠাকুর: 'পঞ্চবটীর তলায় গঙ্গার ধারে বসে টাকা মাটি, মাটি টাকা, বলে ফেলে দিয়েছিলুম জলে।'

'বলেন কি! টাকা মাটি?' বঙ্কিম চমকে উঠল: 'মশায়, চারটে পয়সা থাকলে গরিবকে দেওয়া যায়। টাকা যদি মাটি, তা হলে দয়া-পরোপকার হবে না?'

'দয়া! পরোপকার!' স্মিতহাস্যে বললেন ঠাকুর: 'তোমার সাধ্য কি যে তুমি পরোপকার করো। দয়া ঈশ্বরের, মানুষে আবার কী দয়া করবে! দয়ালুর ভিতর যে দয়া দেখ সে তাঁরই দয়া। বাবা-মা'র মধ্যে যে স্নেহ দেখ সব তাঁর স্নেহ।'

পরকে দয়া করবার আগে নিজেকে দয়া করো। ভাণ্ডারে বৈভব থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছ। উড়িয়ে দিচ্ছ ফুরিয়ে ফেলছ নিজেকে। ক্ষয়ে যেতে বয়ে যেতে দিচ্ছ। সর্বাধিকারী হয়েও আছ সর্বহারার মত। নিজেকে কৃপা করো। আত্মকৃপার মত কৃপা নেই। নিজেই নিজের দিকে চেয়ে রয়েছ করুণনেত্রে। নিজের দিকে তাকাও। নিজেকে বাঁচাও। নিজেকে তুলে ধরো।

'ঈশ্বরকে ডাকবার আমার কী দরকার?' অভিমান করে একদিন বলেছিল বিদ্যাসাগর। 'দেখ না চেঙ্গিস খাঁকে। বিস্তর লুটপাট করে রাজ্যের লোককে বন্দী করলে। প্রায় এক লাখ। সেনাপতিরা প্রমাদ গুণল। বললে, মশাই, এদের এখন খাওয়াবে কে? সঙ্গে এদের রাখলেও বিপদ, ছেড়ে দিলেও বিপদ। এই হত্যাকাণ্ডটা তো ঈশ্বর স্বচক্ষে দেখলেন। কই একটু নিবারণ তো করলেন না। তা তিনি থাকেন থাকুন আমার তাতে দরকার কি। আমার তো কোনো উপকার নেই।'

ঠাকুর বললেন, 'ঈশ্বরের কার্য্য কে বোঝে! কেনই বা সৃষ্টি করছেন, কেনই বা সংহার! আমি বলি আমার ও বোঝবার দরকার নেই। বাগানে আম খেতে এসেছি আম খেয়ে যাই। কত গাছ কত ডাল কত পাতা তার হিসেবে আমার কাজ কি। আমি চাই ভক্তি, আমি চাই ভালোবাসা। আমি চাই সুস্বাদুকে আস্বাদ করতে।'

গঙ্গাধর গাঙুলিকে—পরে যিনি অখণ্ডানন্দ—আসন শেখাচ্ছেন ঠাকুর। একেবারে ঝুঁকে বসতে নেই, আবার খুব টান হয়েও বসতে নেই। শেখাতে-শেখাতে এক সময় বলে উঠলেন, 'শোন, তোকে বলে রাখি কানে-কানে, খিদের মুখে বাড়া ভাত পেলে খেয়ে ফেলবি। খিদের মুখে যেমন করেই খা, পেট ভরবে।'

তাই আসলে হচ্ছে আস্বাদ। আসলে হচ্ছে ভালোবাসা।

বঙ্কিমকে আবার বলছেন ঠাকুর, 'সংসারী লোকের টাকার দরকার। সঞ্চয় দরকার। কেন না তার মাগ-ছেলে আছে, খাওয়াতে হবে। সঞ্চয় করবে না কে? কেবল পঞ্ছী অউর দরবেশ। পাখি আর সন্ন্যাসী। তেমনি কামিনীও সন্ন্যাসীর ত্যাজ্য। তার কামিনী গ্রহণ করা মানে থুতু ফেলে সেই থুতু খাওয়া।'

আর তুমি, সংসারী? কামিনী সম্বন্ধে তোমার সংযম, কাঞ্চন সম্বন্ধে তোমার অনাসক্তি। তোমার ত্যাগ নয়, পরিহার নয়, নিষেধ নয়, আরোপ নয়। তোমার শুধু একটু বেঁকিয়ে দেওয়া। কামের থেকে প্রেমে চলে আসা। আত্ম থেকে আত্মায়। বদ্ধ দেয়ালের দেশ থেকে উন্মুক্ত সমুদ্রে।

'আচ্ছা, তুমি কি বলো?' প্রশ্ন করলেন বঙ্কিমকে। 'আগে সায়েন্স না আগে ঈশ্বর?'

'বা, আগে পাঁচটা জানতে হবে বৈ কি। এদিককার জ্ঞান না হলে ঈশ্বর জানব কেমন করে?'

'তোমাদের ঐ এক কথা। আগে ঈশ্বর তার পর সৃষ্টি। আগে যদু মল্লিক তার পর তার ধন-দৌলত। ১-এর পর যদি পঞ্চাশটা শূন্য থাকে অনেক হয়ে যায়। ১-কে মুছে ফেল সব শূন্য। এককে নিয়েই অনেক। এক আগে তার পর অনেক। আগে ঈশ্বর তার পর জীবজগৎ।' অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে দেখলেন বঙ্কিমকে: 'আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও।'

বঙ্কিম হাসল। 'আম পাই কই?'

'তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করো। আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। হয়তো অমৃত সৎসঙ্গ জুটিয়ে দিলেন—'

'কে, গুরু? তাঁর কথা বলবেন না। ভালো আমটি নিজে খেয়ে খারাপ আমটি আমায় দেবেন।'

'তা কেন? যার যা পেটে সয়। সকলে কি পলুয়া-কালিয়া হজম করতে পারে? যে দুর্বল যার পেটের অসুখ তার পথ্য মাছের ঝোল।'

ত্রৈলোক্য সান্যাল গান ধরল। ঠাকুর দাঁড়িয়ে পড়লেন। দাঁড়িয়েই সমাধিস্থ। সবাই ঘিরে ধরল। ভিড় ঠেলে বঙ্কিমও এল এগিয়ে। একদৃষ্টে দেখতে লাগল ঠাকুরকে।

অচ্যুতচিন্তায় কখনো কাঁদছেন, কখনো হাসছেন, কখনো নাচছেন, গান করছেন, অলৌকিক কথা বলছেন, কখনো বা শ্রীহরির লীলাভিনয় করছেন, কখনো বা নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত তূষ্ণী হয়ে আছেন। কৃতকৃতার্থ ভক্তের কথা সেই যে পড়েছিল বঙ্কিম, এ যে তারই প্রতিমূর্তি।

কে এই পুরুষ? নাম টাকা মান বৈভব কিছু চায় না, শুধু প্রেমানন্দ চায়, যে প্রেম ঈশ্বর থেকে উৎসারিত। প্রেমানন্দই ভূমানন্দ। কিছু চাই না অথচ ভালোবাসি—এর নামই ভূমা। উদ্দেশ্য যা উপায়ও তাই। উদ্দেশ্য ভালোবাসা উপায়ও ভালোবাসা। ভালোবেসেই বিশ্বকে আপন করা। সেই বিশ্বানন্দই ব্রহ্মানন্দ।

অনিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে বঙ্কিম। দেখছে ঠাকুরের নৃত্য। কীর্তনকদম্বস্ফূর্তি।

কীর্তনান্তে সকলকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন ঠাকুর। বললেন, 'ভাগবৎ-ভক্ত-ভগবান জ্ঞানী-যোগী সকলের চরণে প্রণাম।'

বিগলিত হল বঙ্কিম। সন্ন্যাসের আসল কি অর্থ তা যেন বুঝল নতুন করে। শুধু স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নয়, এই বিশ্বজগৎ আমার আত্মার বিস্তৃতি, সুতরাং আমারই আপনার লোক। তাই যদি হয় তবে এই অনন্ত আত্মীয়ের রাজ্যে শুধু পরিমিত পরিজন নিয়ে সুখী আছি কি করে? অঙ্গনকে পরিমুক্ত করো, প্রসারিত করো। এই প্রসারণই সন্ন্যাস। সন্ন্যাস সংসারের সঙ্কোচন নয়, সংসারের বিস্তৃতিই সন্ন্যাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বসংসারী, তাই আসল সন্ন্যাসী। সর্বত্যাগী হয়েও তাই সর্বগ্রাহী।

'ভক্তি কেমন করে হয়?' জিগগেস করল বঙ্কিম।

'ব্যাকুলতায়। ছেলে যেমন মার জন্যে দিশেহারা হয়ে কাঁদে সেই ব্যাকুলতায়। উপরে ভাসলে কী হবে? ডুব দাও কান্নাসাগরে, তবেই পান্না উঠবে। গভীর জলের নিচে রত্ন, জলের উপর হাত-পা ছুঁড়লেই তো রত্ন ভেসে উঠবে না। রত্ন যে ভারী, জলে ভাসে না, তলিয়ে গিয়ে মাটির সঙ্গে ঠেকেছে। তাই ডোবো। তলিয়ে যাও।'

'কি করি! পেছনে যে শোলা বাঁধা।'

'কাল-পাশ কেটে যাবে, এ তো মাত্র শোলা! তাঁকে মনন করো, তাঁকে ডাকো, তাঁতে নিমজ্জিত হও। ডুব না দিলে কিছু হবে না। একটা গান শোনো।' বলে গান ধরলেন:

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন,
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেমরত্নধন।

ঘর ছেড়ে মাঠে এসো। ঘরের মধ্যে এক চিল্‌তে আলো ছাদের ফাঁক দিয়ে আসছে। যে ঘরের মধ্যে আছে তার আলো জ্ঞান এটুকু। যার ঘরের বেড়ায় অনেক ছ্যাদা, সে বেশি আলো দেখতে পায়। যে দরজা-জানলা খুলে দিয়েছে সে পায় আরো দেখতে। কিন্তু যে চলে আসতে পেরেছে মাঠে তার আলোয় আলো। আত্মবোধ থেকে চলে এস বিশ্ববোধে।

'কেউ-কেউ ডুব দিতে চায় না। বলে ঈশ্বর-ঈশ্বর করে বাড়াবাড়ি করে শেষকালে কি পাগল হয়ে যাব?' নিবিড় স্নেহে তাকালেন বঙ্কিমের দিকে। 'ঈশ্বর এমন রস যাতে লোকে সুস্থ হয় স্নিগ্ধ হয় সুন্দর হয়। সে অমৃতের সাগরে ডুবলে মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে—'

ঠাকুরকে প্রণাম করল বঙ্কিম। বিদায় নিল।

বললে, 'আমাকে যত আহাম্মক ঠাওরেছেন আমি হয়তো তত নই।'

ঠাকুর হাসলেন। ঠাকুরের কি বুঝতে বাকি আছে কোন উপাদান দিয়ে বঙ্কিম তৈরি! অন্তরগহনে রয়েছে তার ভক্তির উৎস, অন্তঃসলিলা ভক্তির প্রবাহিনী।

আঠারো বছর বেদান্ত রগড়াচ্ছি, তবু, বন্ধু.—বলছিল এক সাধু—দূরে মলের শব্দ শুনতে পেলে মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। সংসার থেকে মন উচ্ছিন্ন করা কি সহজ কথা?

'একটি প্রার্থনা আছে।' বঙ্কিম বললে স্নিগ্ধমুখে, 'অনুগ্রহ করে যদি কুটিরে একবার পায়ের ধূলো দেন—'

'তা বেশ তো। ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

কি ভাবছিল বঙ্কিম, ভাবতে-ভাবতে বেরিয়ে পড়েছে অন্যমনে। যাকে কেউ টানতে পারে না অথচ যে সকলকে টানে তারই আশ্চর্য শক্তির কথাই ভাবছিল হয়তো। পায়ের চাদর ফেলে এসেছে ভুলে। কে একজন কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে তাকে পৌঁছে দিল চাদর। তবু সম্পূর্ণ খেয়াল নেই। দৃষ্টি নেই বেশবাসে।

কদিন পরে গিরিশ আর মাষ্টারকে ডাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'সেই যে বঙ্কিম বলে গেল তার বাড়িতে নিয়ে যাবে একদিন, কই, এল না তো! যাও খোঁজ নিয়ে এস দেখি।'

গিরিশ আর মাষ্টার তখুনি রওনা হল। বঙ্কিম কত কথা বললে ঠাকুরের সম্বন্ধে, দিব্য আনন্দের কথা। যাকে না পেয়ে ও যেখান থেকে ব্যাহত হয়ে বাক্য ও মন যুগপৎ নিবর্তন করে তাই তো আনন্দ-পারাবার। বহু মেধা বা শাস্ত্র দ্বারা লভ্য নন, যাকে বরণ করেন একমাত্র তার দ্বারাই লভ্য। সেই অনির্বচনীয় কথা।

বললে, 'যাব আরেক দিন। ডেকে নিয়ে আসব।'

আর যাওয়া হয়নি বঙ্কিমের। যেতে হয় না, তিনিই আসেন নিজের থেকে। ডাকলে তো আসেনই, না ডাকলেও আসেন।

যেমন এসেছেন অধরের মৃত্যুশয্যার পাশে।

মানিকতলায় ডিষ্টিলারি পরিদর্শন করতে গিয়েছিল অধর। গিয়েছিল ঘোড়ায় চড়ে। ফিরতি-পথে শোভাবাজার ষ্ট্রীটে পড়ে গেল ঘোড়া থেকে। ভেঙে গেল বাঁ হাতের কব্জি। শুধু তাই নয়, ধনুষ্টঙ্কার হয়ে গেল। ঠাকুর যখন এলেন, কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে অধরের। তবু চিনতে দেরী হল না। সমস্ত যন্ত্রণা আনন্দাশ্রুতে বিধৌত হতে লাগল। ঠাকুর কাছে বসে পায়ে হাত বুলুতে লাগলেন। মুখখানি ম্লান, চোখ দুটি করুণকোমল।

অধর চলে গেল অধরায়। মাত্র তখন তিরিশ বছর বয়স। একটা যেন তারা খসে পড়ল। ভবতারিণীর দুয়ার ধরে কাঁদতে বসলেন ঠাকুর। 'মাগো, আমার কেন এত যন্ত্রণা? আমাকে ভক্তি দিয়ে রেখেছিস বলেই তো আমাকে এত সইতে হচ্ছে।'

একশো গোল

প্রভু, কোন মুখে আমি সুখ চাইব তোমার কাছে, কোন লজ্জায়? যতবার দেহধারণ করে এসেছ একবারও সুখ পাওনি। রামরূপে এলে রাজপুত্র হয়ে, চীরবল্কল ধরে চলে গেলে বনবাসে। চন্দ্রের সঙ্গে চিত্রা-নক্ষত্রের মত সীতাও তোমার অনুগামিনী হল। বনে গিয়ে তোমার কত যন্ত্রণা, কত যুদ্ধ। তার পর সীতাকে যদি-বা উদ্ধার করলে, বসাতে পারলে না সংসারের সিংহাসনে। তাকে পাঠাতে হল নির্বাসনে প্রজানুরঞ্জনের তাগিদে। দগ্ধ হলে দুঃসহ মর্মজ্বালায়। সুখ পেলে না। কৃষ্ণরূপে জন্ম নিলে কারাগৃহে। নিজের মায়ের স্তন্য থেকে বঞ্চিত রইলে। রাজার ছেলে হয়ে মানুষ হলে গোপের ঘরে। সারাজীবন ধরেই যুদ্ধ আর দুষ্টদলন করতে হল, সুখ কাকে বলে শান্তি কাকে বলে জানতে পেলে না। শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করলে আপ্রাণ, তবু দায়ী হলে কুরুক্ষেত্রের অশান্তির জন্যে। মাথা পেতে নিলে কত অভিশাপ। চোখের সামনে মরতে দেখলে আত্মীয়বৃন্দকে, শেষে অতর্কিত ব্যাধশরে প্রাণ দিলে। আর এখন রামকৃষ্ণরূপে ভুগছ দুরারোগ্য ব্যাধিতে। কোন লজ্জায় বলব, আমি সুখ চাই, আমাকে সুখ দাও!

ঠাকুরের পা ঘেঁসে বসেছে দুর্গাচরণ। ওগো বসো বসো আমার পা ঘেঁসে। তোমার ঠাণ্ডা শরীর স্পর্শ করে আমার দগ্ধ শরীর শীতল হবে। দুর্গাচরণকে জড়িয়ে ধরলেন ঠাকুর।

বললেন, 'ডাক্তার-কবরেজরা সব হার মেনেছে। তুমি জানো কিছু ঝাড়ফুঁক? কিছু করতে পার উপকার?'

মুহূর্তে একটা উদ্দাম চিন্তা খেলে গেল মনের

মধ্যে। বিদ্যুৎঝলকের মত। মুহূর্তেই সঙ্কল্প দৃঢ়ীভূত হল। বললে, 'পারি। আপনার কৃপায় সব পারি। আপনার কৃপায় রোগ সারাতে পারি আপনার।'

পারো ?

অভিপ্রায় বুঝতে পারলেন ঠাকুর। দুর্গাচরণ নিজের শরীরে ঠাকুরের ব্যাধি টেনে নিতে চাইছে। সহসা তাকে দুই হাতে ঠেলে দিলেন জোর করে। বললেন, 'তা তুমি পারো, জানি, তুমি পারো রোগ সারাতে। কিন্তু সারিয়ে দরকার নেই। সরে যাও সরে যাও এখান থেকে।'

প্রথম যখন দক্ষিণেশ্বরে আসে, আসে সুরেশ দত্তর সঙ্গে। শুধু নাম শুনেছে আর বেরিয়ে পড়েছে। কোথায় দক্ষিণেশ্বর ? তাও জানে না। উত্তরে যাও। উত্তরে গেলেই উত্তর মিলবে। দেখবে সেখানেই বসে আছেন সুদক্ষিণ।

চলেছে পায়ে হেঁটে। চলেছে তো চলেইছে। শেষে একজনকে জিগগেস করলে। দক্ষিণেশ্বর কোথায় বলতে পারেন ? সে কি মশাই ? দক্ষিণেশ্বর যে ছাড়িয়ে এসেছেন।

দুপুর দুটোর সময় মন্দিরে এসে পৌঁছুলেন দুজন। কাউকে চিনি না, কোথায় থাকেন সেই ত্রিদশকুলেশ, কাকে জিগগেস করি ? একজন দাড়িওয়ালা লোকের সঙ্গে দেখা হল হঠাৎ। ইনিই বলতে পারবেন হয়তো।

'হ্যাঁ মশাই, এখানে একজন সাধু থাকেন ?'

দাড়িওলা লোক আর কেউ নয়, প্রতাপ হাজরা। বললে, 'হ্যাঁ, একজন আছেন বটে, কিন্তু আজ তো এখানে নেই।'

নেই ? বসে পড়ল দুজনে। কোথায় গিয়েছেন ?

'চন্দননগরে গিয়েছেন। কবে ফিরবেন কে জানে। তোমরা আরেক দিন এস।'

অবসন্ন পায়ে আবার ফিরে চলো কলকাতা। হৃতসর্বস্বের মতো ফিরে চলো। কিন্তু, ওমা, ঐ দেখ ঘরের মধ্য থেকে দরজার ফাঁক দিয়ে হাতছানি দিয়ে কে ডাকছে। আর কে! ঐ সেই অনন্তাত্মা মহোদধি। অমানীমানন্দ লোকস্বামী। প্রতাপ হাজরাকে উপেক্ষা করে সটান ঢুকল ঠাকুরের ঘরে। ছোট তক্তপোষটির উপর পা ছড়িয়ে বসে আছেন ঠাকুর।

বারো বছর ধরে ঠাকুরের ছায়ায় বাস করছে হাজরা, তবু চিনতে পারল না ঠাকুরকে। শুধু সাধারণ সত্য কথাটুকুও বলতে শিখল না। কি করে শিখবে, কি করে চিনবে তিনি যদি না কৃপা করেন! তাঁর হাতেই ফুট-কম্পাস, চেন-দড়ি, তিনি না ছেড়ে দিলে মাপবে কি দিয়ে ?

হৃদয়ের সঙ্গে সেই একবার কালীঘাটে গিয়েছিলেন ঠাকুর। দেখলেন পূবের পুকুরপাড়ে কচুবনের মধ্যে কালী কুমারীবেশে আর-কতগুলো কুমারীর সঙ্গে ফড়িং-ধরার খেলা করছেন। দেখেই ঠাকুর মা-মা বলে ডেকে উঠলেন আর সমাধিস্থ হলেন। সমাধি-ভঙ্গের পর মন্দিরে এসে দেখলেন যে শাড়ি পরে কুমারীবেশে খেলা করছিলেন কালী ঠিক সেই শাড়ীখানিই মূর্তির পায়ে জড়ানো। ওরে হৃদে, একেই যে তখন দেখলুম ছুটোছুটি করছে—

সব শুনে হৃদয় ক্ষেপে উঠল। বললে, 'তখন বলোনি কেন ? ছুটে গিয়ে ধরে ফেলতুম মাকে।'

'তা কি হয় রে!' ঠাকুর বললেন, 'তিনি যদি কৃপা করে না ধরা দেন কে তাঁকে ধরে! কে তাঁর দর্শন পায়!'

সুরেশ দত্ত প্রণাম করল করজোড়ে। কিন্তু দুর্গাচরণ আরো বেশি যায়। তার উর্মী ভক্তি। প্রসাদের সঙ্গে সে শালপাতার ঠোঙা পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে সে গেল ঠাকুরের পদধূলি নিতে। তুমি হলে জলন্ত আগুন, তোমাকে কি পা ছুঁতে দিতে পারি ? ঠাকুর পা সরিয়ে নিলেন।

বললেন দুর্গাচরণকে, 'সংসারই তোমার পীঠস্থান। সংসারেই থাকবে। থাকবে পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকের মধ্যে ডুবে আছে কিন্তু গায়ে পাঁকের স্পর্শ-লেশ নেই। তেমনি গৃহে থাকো কিন্তু তার ময়লা যেন না লাগে। থাকো জনকের মত। তোমাকে দেখে লোকে শিখুক কাকে বলে গৃহাশ্রমী।'

যে বিষয়ে যযাতি ভোগী সেই বিষয়েই জনক রাজর্ষি। যে অভিমানে দুর্যোধনের সর্বনাশ সেই অভিমানেই ধ্রুবের সত্যলোকে অধিষ্ঠান।

উপদেশ তো শুনলুম, মানব তা অক্ষরে-অক্ষরে, কিন্তু দুটি হাত ভরে যে পদস্পর্শ নিতে দিলে না এ দুঃখ আমি রাখব কোথায় ? অন্তরের নির্জনে বসে কাঁদতে লাগল দুর্গাচরণ। শুনেছি তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু, তুমি শুনবে না আমার এই বেদনার নিবেদন ? আমি আগুন

নই, আমি জল, আমি গলিত-স্খলিত অমল প্রেমাশ্রু। একবারটি স্পর্শ করতে দাও তোমাকে। শীতাংশু সুধা-সমুদ্রের দুটি ঢেউ, তোমার দুটি পাদপদ্ম।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করত দুর্গাচরণ। একদিন দক্ষিণেশ্বরে চলে এসেছে একা-একা। তাকে দেখে ঠাকুর মহা খুশি। উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তুমি ডাক্তারি করো, দেখ দেখি আমার পায়ে কি হয়েছে?'

দুর্গাচরণ বসে পড়ল পায়ের কাছে। তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগল পা দুখানি। স্পর্শ করা বারণ, চোখ দিয়েই পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। বললে কুণ্ঠিতের মত, 'কই, কোথাও তো দেখছি না কিছুই।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'ভালো করে দেখ না কি হয়েছে।'

এতক্ষণে বুঝল দুর্গাচরণ। পা দুখানি চেপে ধরল দু হাতে। মাথা লুটিয়ে দিল পায়ের উপর। অন্তর্যামী শুনেছেন অন্তরের ঈপ্সা। আগুনকে অশ্রু করেছেন।

কিন্তু, প্রভু, আরো প্রার্থনা আছে। ইচ্ছে করে তোমার সেবা করি। বেশ তো, ঠাকুর তাকে নানা ফরমাস খাটাতে লাগলেন। ওরে তামাক সেজে দে, গামছা আর বেটুয়া নিয়ে আয়, গাড়ুতে জল ভর, নিয়ে চল ঝাউতলায়। দুর্গাচরণ এক পায়ে খাড়া। ডাকলেই হল বললেই হল, যেখান থেকে পারি যেমন করে পারি সম্পন্ন করে দেব। তুমি যদি বলো নিয়ে আসব অকালের আমলকী।

একদিন বললেন হাওয়া করতে। পাখাখানি তুলে দিলেন দুর্গাচরণের হাতে। বললেন, আমি একটু ঘুমুই।

জ্যৈষ্ঠ মাস, ফুটি-ফাটা মাঠে কাঠ ফাটা রোদ। সমানে হাওয়া করছে দুর্গাচরণ। হাত ব্যথা করছে তবু ক্ষান্ত হচ্ছে না। পাখা বন্ধ করলেই যদি জেগে ওঠেন। আমার অসামর্থ্যের জন্যে প্রভুর বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে? কখনো না। হাত ভেরে উঠল, তবু ছাড়ছে না পাখা। হাত ছিঁড়ে পড়ছে যন্ত্রণায়, তবু না। ওকি, ঠাকুর যে নিজেই হাত ধরে পাখা বন্ধ করে দিলেন। তবে কি ঠাকুর ঘুমুননি?

দুর্গাচরণ বলে, 'ঠাকুরের ঘুম সাধারণ নিদ্রাবস্থা নয়। তিনি সর্বদাই জেগে রয়েছেন। আর সকলে ঘুমোয় কিন্তু ভগবানের চোখে ঘুম নেই।'

একদিন বললেন তাকে ঠাকুর, 'ডাক্তার উকিল মোক্তার দালাল—এদের ঠিক-ঠিক ধর্মলাভ হওয়া কঠিন। এতটুকু ওষুধে যদি মন পড়ে থাকে তবে আর কি করে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণা হবে?'

এখন তবে উপায়?

উপায় সহজ। দুর্গাচরণ ওষুধের বাক্স আর চিকিৎসার বই ফেলে দিল গঙ্গায়। দ্বিধার কুশাঙ্কুরটিও বিদ্ধ করল না।

দেশে ফিরেছে দুর্গাচরণ। উন্মনা, উদাসীন। বাপ দীনদয়াল অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছেন। বললেন, 'ডাক্তারি যে ছেড়ে দিলি এখন করবি কি?'

'আমি কে করবার! যা হয় ভগবান করবেন।'

'তোর মুণ্ডু করবেন। বুঝতে আর আমার বাকি নেই।' দীনদয়াল বিরক্তিতে ঝাঁজিয়ে উঠলেন। 'এখন ন্যাংটা হয়ে চলবি আর ব্যাঙ ধরে খাবি।'

বাবার যখন তাই ইচ্ছে, তবে তাই হোক। পলকে পরনের কাপড় খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল দুর্গাচরণ। উঠোনের কোণে পড়ে ছিল একটা মরা ব্যাঙ, তাই তুলে এনে মুখে পুরলে। চিবোতে-চিবোতে বললে, 'আপনার দু আদেশই পালন করলাম। এখন কৃপা করে আমার একটি অনুরোধ রাখুন। সংসারের কথা আর ভাববেন না। এখন জপ করুন ইষ্টনাম।'

বাড়ির লাউগাছটির কাছে গরু বাঁধা। দড়িটা ছোট, তাই আকণ্ঠ চেষ্টা করেও গাছের নাগাল পাচ্ছে না গরু। ক্ষুধার্ত দুই চোখে লোলুপ কাতরতা। ও মা, খাবি, খেতে সাধ গিয়েছে? নে, খা, তৃপ্তি করে খা। দড়িটা খুলে দিল দুর্গাচরণ। মুহূর্তে গাছটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

'জিহ্বার সুখেচ্ছা হবে।' এই বলে নিজে মিষ্টি বা নুন খায় না দুর্গাচরণ। কিন্তু পরকে খাওয়ায় সাধ্যমত। সে গরুই হোক আর পাখিই হোক। অতিথিই হোক বা ভিখিরিই হোক। তুমি প্রীত হও, তৃপ্ত হও। ইষ্ট ছাড়া আমার আর কিছু মিষ্ট নেই। অশ্রু ছাড়া আমার আর নেই কিছু লবণাক্ত।

কলকাতার বাসার আদ্ধেকটায় কীর্তিবাস থাকে। চালের ব্যবসা করে। কুঁড়ো জমে থাকে তার আড়তে। তাই দুর্গাচরণ কুড়িয়ে নিয়ে এসে গঙ্গাজল মাখিয়ে খায়। বলে, 'যা হোক কিছু খেয়ে জীবনধারণ করলেই হল, ভালো-মন্দ বিচারের প্রয়োজন কি? শুধু আহার আর তার আস্বাদ নিয়েই থাকব, তবে কখনই বা ডাকব ভগবানকে, আর কখনই বা তাঁর মনন করব? কুঁড়ো খেয়ে দিব্যি হালকা আছি।'

রাসপূর্ণিমা

অন্নদাশঙ্কর রায়

রাসপূর্ণিমা
জ্যোৎস্নাধবল
ধরণী।
কোথা মোর রাধা
কোথা চম্পক-
বরণী।
যমুনাপুলিনে
কদম্ববনে
খেলিতে।
উজল রজনী
পোহাতে সুরত-
কেলিতে।
তুমি সাথে নেই
আমি এ প্রবাসে
উতলা।
ভাবি আর ভাবি
রাসপূর্ণিমা
বিফলা।

[illegible]শে নভেম্বর
১৯৭০

কাউকে হঠাৎ নিন্দা করে ফেলেছে বা কারু উপর রাগ দেখিয়েছে অমনি আত্মপীড়ন সুরু হয়ে গেল। আর নিন্দে করবি? রোষভাষ করবি? রাস্তা থেকে এক টুকরো পাথর কুড়িয়ে এনে ঘা মারতে লাগল কপালে। বল আর অবাধ্য হবি? মানবিনে শৃঙ্খলা? কপাল ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। সে ঘা শুকোতে এক মাস। হবে না? একশো বার হবে। যে যেমন পাজি তার তেমনি শাস্তি হওয়া দরকার।

'অহং-শালাকে ঠেঙিয়ে-ঠেঙিয়ে তার মাথা ভেঙে দিয়েছেন নাগমশাই।' বলছে গিরিশ ঘোষ। বলছে, 'নরেনকে আর নাগমশাইকে বাঁধতে গিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছেন মহামায়া। নরেনকে যত বাঁধেন সে ততই বড় হয়ে যায়, মায়ার দড়ি আর কুলোয় না। শেষে নরেন এত বড় হল যে মায়া হতাশ হয়ে ছেড়ে দিলেন। নাগমশাইকে যত বাঁধেন সে ততই সরু হয়। ক্রমে এত সরু হলেন যে মায়াজালের মধ্য দিয়ে গলে চলে গেলেন পালিয়ে। ধরতে পেলেন না মহামায়া।'

আমি ক্ষুদ্দুর, আমি শুদ্দুর—এই বুলিই নাগমশায়ের মুখে। তোমাদের মুখে ও কিসের কথা? বিষয়প্রসঙ্গ রাখো। রামকৃষ্ণের কথা কও। আর সব কথার ইতি আছে। ঈশ্বরকথার ইতি নেই।

[ক্রমশঃ]

উদয়ভানু

অশ্বপৃষ্ঠ থেকে ধীরে ধীরে অবতরণ করলেন কাশীশঙ্কর। কর্দ্দমাক্ত, পিচ্ছিল, আঁকা-বাঁকা ও উঁচু-নীচু পথ বহু ক্লেশে অতিক্রম করতে হয়েছে দ্রুততম গতিতে। অশ্ব ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে থাকে। শুভ্র ফেনপুঞ্জ অশ্বমুখে। বাহনের গ্রীবাদেশে চাপড় মারেন ছোটকুমার। সজোরে ও সশব্দে। ভূমিতে একেক বার একেক পা ঠুকছে অশ্বটি। কোম্পানীর হাউসের অনতিদূরে এক দেবদারু বৃক্ষের নিম্নস্থ শাখায় বাহনকে বেঁধে দেন কাশীশঙ্কর। ততক্ষণে অনুগামী সহচরের কেউ কেউ এসে উপস্থিত হন। ছোটকুমারের সঙ্গে একত্রে অশ্বচালনায় অন্য কারও জয় হয় না কখনও। যেন পক্ষীরাজের মত দ্রুততম গতিতে অগ্রগামী হয় ঐ অশ্ব। হঠাৎ দেখা দেয়, হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়—বিদ্যুতের মত। কপালের স্বেদবিন্দু উত্তরীয়-অঞ্চলে মুছতে মুছতে কাশীশঙ্কর কোম্পানীর হাউসের উদ্দেশে অগ্রসর হন। সহচরবৃন্দকে বললেন,—ক্ষণকাল তিষ্ঠ। রামনারায়ণের সাক্ষাৎ পাই তো কাজ হয়। নচেৎ আমাদের বৃথাই আগমন।

কথা শোনা যায় কি না যায়, এতই কলরোল। নৌকার মাঝি-মাল্লা, জাহাজের খালাসী, কুশীদ শেঠ, ফ'ড়ে আর ঠিকাদারদের হৈ-হল্লায় কাক-চিল বসতে পায় না কোথাও। শব্দের প্রতিশব্দ ভেসে ওঠে বাতাসে। ধ্বনির প্রতিধ্বনি। সেই সঙ্গে যত সব চোর, জুয়াচোর, দাঙ্গাবাজ ও খুনী আসামীদের এলোপাথাড়ি চীৎকার। কুলী-মজুর পাওয়া যায় না। দেশী মজুর বিদেশীর অধীনে কাজ করতে চায় না। তাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে যত গ্রেফ্‌তারী আসামীদের বন্দুকের ভয় দেখিয়ে কাজে লাগানো হয়েছে। একেক দলে ত্রিশ জন আসামী। সেই ত্রিশ জনের পা একটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ। প্রতি ত্রিশ জনের জন্য একেক বন্দুকধারী দেশী ফৌজ।

কোম্পানীর হাউসের কাছাকাছি বিস্তীর্ণ ভূমির গড়খাতে ও পরিখাসমূহে মাটি পড়ছে চুবড়ী চুবড়ী। বন্ধুর জমিকে সমতল করতে হবে এই বর্ষার আগেই। কাদামাটির প্রাচীর শেষ করতে হবে।

ছোটকুমার কাশীশঙ্কর লক্ষ্য করেন, দিগন্তবিস্তৃত ধূসরতা। ডাইনে বাঁয়ে সমুখে পিছনে যে দিকেই দৃষ্টি যায়, শুধু সীমাহীন মাটি-রঙ। মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রচণ্ড আলোকরশ্মি, অধিক দূর দেখা যায় না একদৃষ্টে। রৌদ্র-ঔজ্জ্বল্যে দৃষ্টি ব্যাহত হয়। তবুও যতটা চোখে পড়ে, শুধু ধূসর, ধূসর, ধূসর।

গড় গোবিন্দপুরের ভূমি কর্দ্দমময়। বিপুলকায়া গঙ্গার জলও কর্দ্দমযুক্ত ঘোলাটে-বর্ণ। তাই আপাতদৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক ধূসরতায় পরিপূর্ণ মনে হয়।

কোম্পানীর হাউস যথার্থ হাউসই নয়। হোম, হাউস, রেসিডেন্স, ভিলা, কটেজ কিছুই নয়। একেবারে মৃন্ময়-কুটির। বলা যায় থ্যাটজ্-কটেজ্। মাটির ঘরে মাটির দেওয়াল, গোলপাতার ছাউনি। কাঁচা বাঁশের কাঠামোয় দাঁড়িয়ে আছে কোন রকমে। চাঁচাড়ির ছোট ছোট জানলা। খসখস-টাটির দরজা।

কত ঝড়ের রাতে ঐ পর্ণকুটিরের কাঠামো ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে ইতিপূর্ব্বে। গঙ্গানদীর বুক থেকে উড়ে-আসা হাওয়ার বেগে তাল রাখতে পারে না পাতার ছাউনি। বাঁশের কাঠামো যুঝতে পারে না দুরন্তগতি বাতাসের সঙ্গে। প্রবল বর্ষণে মাটির দেওয়াল মাটির সঙ্গে মিশে যায় রাতারাতি।

বর্ষার আকাশ কি ভয়ঙ্কর! বাঙলার করাল-কালো গম্ভীর মেঘাচ্ছন্ন আকাশকে দেখে ইংরেজের অন্তরাত্মা যেন ধুকপুক করতে থাকে। স্থলে যুদ্ধ চলে, জলেও ইংরেজ যুদ্ধ চালায়, কিন্তু আকাশের সঙ্গে কে লড়াই করবে কোন্ বলে! প্রকৃতির সঙ্গে?

কাশীশঙ্কর হাসলেন মৃদু মৃদু। ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় উইলিয়ামের নাম স্মরণ করলেন মনে মনে। তৃতীয় উইলিয়ামের দেশবাসীর এ কি দুর্দ্দশা গড় গোবিন্দপুরে! সম্মুখে আসন্ন বর্ষাঋতু, কোম্পানীর মাটির ঘরে মাটির প্রলেপ পড়ছে। পাতার ছাউনি, পাতা বদলানো চালিয়েছে ঘরামি। পুরানো নারকেল-দড়ি বাতিল হয়ে যাচ্ছে।

হাত পেতেছে ইংরাজ। আবার হাসলেন কাশীশঙ্কর। মৃদু মৃদু হাসলেন। সওদাগর ইংরাজ, দেশে চুলো নেই কোন,' মরণের ঠাঁই নেই, এসেছে ভূভারতে। তাও শূন্য হাতে নয়। সরাসরি ভিক্ষাপাত্র নয়। এক নিয়ে এক দিতে এসেছে। রাজার জাত ভিক্ষা মাগে না।

এক দিয়ে এক নেয় না। একের বদলে একশো নেয়। কোটির বদলে লক্ষ দেয়। কাচের বদলে কাঞ্চন নেয়।

কোম্পানীর কুটিরে যদি রামনারায়ণ থাকে তবেই কাজ হবে, নয়তো নয়। ছোটকুমার কুটিরের কাছাকাছি পৌঁছে দেখলেন কুটিরের সীমানায় বন্দুকধারী পাহারা। কুটিরের দাওয়ায় ইংরাজ কর্ম্মচারী। যে যার কাজ করছে। খাতা লিখছে যত সব রাইটার। জমা আর খরচের খাতা। কর্ম্মচারীদের হাতে চিলের পালখের কলম। তালপাতার পাখা। বৈশাখী উত্তাপে হাওয়া খায় আর কলম চালায়। মাটির পাত্রে জল খায় কেউ। কলসী থেকে জল ঢালে আর খায়।

—রামনারায়ণ?

—আছে।

শেঠ রামনারায়ণ ইংরাজ কোম্পানীর বেতনভুক্ দালাল। রামনারায়ণ সাহাকে ইংরাজের পক্ষ থেকে বাণিজ্য-দ্রব্যের সন্ধান রাখতে হয়। কি পাওয়া যায়, আর কি পাওয়া যায় না। সমুদ্রপারে রপ্তানীর জন্য প্রয়োজন যত কিছু দ্রব্যের। যেমন লবণের চাঁই, লাক্ষা, শোরা, হরিতাল, তামাকের পাতা, আফিম, মৌচাকের মোম, সরিষার তেল, যব, সুপারী, চিনি, শুকনো আদা, তামা, শিশা, টিন। বাঙলা দেশের সূতা আর রেশমজাত বস্ত্র চাই। চাই তাফতা, মুগা, তসর, মসলিন, তাঞ্জেব, ডুরিয়া, জামিয়ার, মলমল।

কোম্পানীর কুটিরের অভ্যন্তর থেকে রামনারায়ণ শেঠ বেরিয়ে আসে। কে আবার ডাকলো তাকে! কোন্ মহাজন? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে এধার-সেধার দেখলো। ছোটকুমার কাশীশঙ্করকে অপেক্ষমান দেখে ঈষৎ আনত হয়ে নমস্কার করলো। যুক্ত দুই হাত বুকে ঠেকালো।

—কুমার বাহাদুর, স্বয়ং আপনি কি না এই অধীনের খোঁজ করতে আসবেন, তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না! হুকুম করেন কি করতে হবে।

সহাস্যে কথা বললে রামনারায়ণ শেঠ। মাথার পাগড়ী যথাস্থানে বসায় আর কথা বলে। গঙ্গাতীরের প্রবল বাতাসে কাঁধের লম্বমান চাদর উড়তে থাকে তার। গোঁফের দুই সূক্ষ্মতম প্রান্ত উড়তে থাকে। শেঠের দুই কানে সোনার মাকড়ি। সূর্য্য-আভায় চিক-চিক করছে। রেশমের চিত্র-বিচিত্র বেনিয়ান চেকনাই তুলছে।

কাশীশঙ্কর বললেন,—রামনারায়ণ, তোমাকেই প্রয়োজন।

—বলেন হুজুর বলেন। কি হুকুম তাই বলেন।

রামনারায়ণ কথা বলে আর মাথার পাগড়ী সামলায়। পরনের কাপড় সামলায়। গঙ্গাতীরের দুর্দ্দান্ত হাওয়ায় বড় বেশী ওড়াওড়ি করছে কাপড়চোপড়।

—রামনারাণ, আমি মহাজনের কাজ করতে চাই! ইংরাজ কোম্পানীকে মাল-মসলা বিক্রী করতে চাই, তুমি বিলিব্যবস্থা ক'রে দাও।

ছোটকুমার কথার শেষে হাসলেন, খুশীর ক্ষীণ হাসি। রামনারায়ণের হাত ধরলেন নিজের হাতে। মিনতির ভাব প্রকাশ করলেন মুখে।

রামনারায়ণ বললে,—সে কি কথা হুজুর! আপনি করতে চান মহাজনের কর্ম্ম? কোন্ দুঃখে? আপনি যে রাজার ছেলে হুজুর!

আবার হাসলেন কাশীশঙ্কর। রামনারায়ণ শেঠের কথা শুনে হো-হো শব্দে হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন,—হাঁ রামনারাণ। তুমি যদি আমার সহায় হও, আমিই করবো মহাজনের কাজ। তুমি সহায় হ'লে আমার কোন চিন্তা নাই।

স্বকর্ণে শুনেও যেন বিশ্বাস করতে চায় না রামনারায়ণ শেঠ। তার কপালের রেখাগুলি কুঞ্চিত হয়। সবিস্ময়ে বলে,—সহায় হব কি হুজুর! আপনারা রাজা লোক, আমরা আপনাদের অধীনের গোলাম।

কাশীশঙ্কর হাসি সম্বরণ করলেন। শেঠের দুই স্কন্ধে হাত রেখে বললেন,—না রামনারাণ, তুমি আমাদের গোলাম নও, তুমি আমার হিতকামী বন্ধুজন। তুমি আমাকে পথ দেখাও।

রামনারায়ণও কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। বিস্ময়মিশ্রিত কণ্ঠে বললে,—সত্য কথা হুজুর? মহাজনের কাজ করতে ইচ্ছা করেন?

—হাঁ রামনারাণ! আমি তোমাকে মিথ্যা বলি নাই। মিথ্যা বলা আমার ধর্ম্ম নয়। তোমার অবশ্যই অজানা নাই, আমার পিতা ছিলেন রাজা। পিতার অবর্ত্তমানে আমার অগ্রজ রাজা হয়েছেন, সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। আর আমি?

ছোটকুমারের কথায় অন্তরের সুর। কেমন যেন দুঃখ-ভারাক্রান্ত কণ্ঠ। কথা বলতে বলতে সহসা মধ্যপথে থামলেন তিনি। বিস্ময়ের ঘোর কিছুতেই কাটে না রামনারায়ণের। বিশ্বাসই করতে চায় না যেন। অদূরে প্রবহমান গঙ্গানদীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। বলে,—হুজুর, আপনি আর এই খাঁ খাঁ রোদে কষ্ট পান কেন? আপনি গৃহে ফিরে যান। আমিই যাবো হুজুরের সমীপে, সাক্ষাৎ করবো। যতেক কথা সেখানেই হবে।

—ভাল কথা। বললেন কাশীশঙ্কর। কথার শেষে নিজের কণ্ঠ থেকে কি এক অলঙ্কার খুলে তুলে ধরলেন। বললেন,—রামনারাণ, তোমার পুরস্কার।

হাত পাতলো রামনারারণ শেঠ। কাশীশঙ্কর তার হাতে অর্পণ করলেন একটি বহুমূল্য কণ্ঠাভরণ। লাল মুক্তার মালা এক ছড়া। সহাস্থে গ্রহণ করলো শেঠ। ছোটকুমারকে অভিবাদন জানালো নতমস্তকে।

কাশীশঙ্কর বললেন,—সাক্ষাৎ কবে হবে রামনারাণ?

শেঠ খুশীর হাসি হাসতে হাসতে বললে,—আগামীকল্য প্রাতে।

—তথাস্তু। বললেন ছোটকুমার। অপেক্ষমান সহচরবৃন্দ যেদিকে, সেদিকে চললেন প্রফুল্লচিত্তে।

গড় গোবিন্দপুরের গঙ্গাতীরে তখনও সে কি উত্তেজনা!

নৌকার মাঝি-মাল্লা, জাহাজের খালাসী, ফড়ে আর ঠিকাদারদের সরব চীৎকারে কান পাতা দায়। কাক-চিল বসতে পায় না কোথাও। ভাগীরথীবক্ষে কত হরেক রকমের জলগামী পোত। ইংরাজ কোম্পানীর জাহাজ, শ্লুপ, আর কার্গো। দেশী নৌকা, পানশি, বজরা, গহনা নৌকা। গঙ্গার বুক থেকে আকাশের বুকে উঠেছে কত অসংখ্য মাস্তুল। ইংরাজদের বিখ্যাত জাহাজ 'রয়াল জেমশ এণ্ড মেরী' নোঙর করেছে। জাহাজের সারেঙ কি কারণে কে জানে থেকে থেকে ভেরী বাজিয়ে চলেছে।

তদুপরি জোর কাজ চলেছে গঙ্গাতীরে ইংরাজ কোম্পানীর পক্ষ থেকে। পর্টুগীজ আর ইংরাজ নাবিকদের মধ্যে যারা করিতকর্ম্মা, তাদেরই কাজে লাগানো হয়েছে গড় গোবিন্দপুরের গঙ্গাতীরে রাণা বাঁধার দুঃসাধ্য কাজে। আসন্ন বর্ষার আগে নিশ্চয়ই কাজ শেষ করতে হবে। বর্ষার বর্ষণে ও বিপুলকায়া গঙ্গার একত্র উৎপীড়নে রাণা ভেসে যাওয়া বিচিত্র নয়। তাই পোড়ামাটির ইট আর চুণের সাহায্যে কাজ চলেছে দ্রুততম গতিতে। কাজ করছে গ্রেফ্‌তারী আসামীর দল। তদারক করছে পর্টুগীজ ও ইংরাজ নাবিকগণ। নাবিকদের হাতে চাবুক। কুলী-মজুরদের গাফিলতি দেখলেই চাবুকের সদ্ব্যবহার করছে নাবিকরা।

মধ্যে মধ্যে লোহার শেকলের ঝনন্ ঝনন্ শব্দ পাওয়া যায়। কেউ নোঙর করছে, কেউ নোঙর খুলছে। জাহাজ আর বজরার সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ নোঙরের ঝন ঝন শব্দে সামুদ্রিক শ্বেতপক্ষীরা সন্ত্রাসে উড়ে পালায়। আবার আসে। ঝাঁকে-ঝাঁকে।

দ্রুত যাওয়ার তাড়া নেই কোন।

কাশীশঙ্করের অশ্ব দুলকি চালে চলে। অনুচরগণ অনুসরণ করে ছোটকুমারকে। সহগামী সাঙ্গোপাঙ্গরা কাশীশঙ্করের মুখাকৃতি লক্ষ্য করে দেখেছে। দেখেছে তাঁর হাসি-হাসি মুখ। প্রফুল্ল বদন। সহচরের দল বেশ বুঝেছে যে. এত কষ্টের ছোটাছুটিতে কাজ হয়েছে। তারা লক্ষ্য করে, কাশীশঙ্করের কণ্ঠের লাল মুক্তার মালা কোথায় গেল! হয়তো আনন্দের প্রাবল্যে পুরস্কারস্বরূপ দান করেছেন শেঠ রামনারায়ণকে। ছোটকুমার যেমন ইচ্ছা হয়েছে তেমনই করেছেন। কে কি বলবে তাঁর কাজে! তেমন সাধ্য আছে কার?

ছোটকুমারের পোষমানা বাহন চললো দুলকি চালে। সে-ও কি বুঝেছে মনিবের মনোগত ভাব! কাশীশঙ্করের মত সে-ও কি খুশী হয়েছে! মনুষ্যজাতির মত পশুও হয়তো আনন্দে উৎফুল্ল হয়।

রামনারায়ণ শেঠের মৌখিক সম্মতি পেয়ে হাতে যেন স্বর্গ পেয়েছেন কাশীশঙ্কর। ইদিক সিদিক দেখতে দেখতে অশ্বপৃষ্ঠে চলেছেন খুশীমনে। ছোটকুমার সাগ্রহে দেখছেন, কোম্পানীর কুটিরের আশ-পাশে দূরে কাছে ইংরাজরা আপন আপন বসতি গেড়েছে। ইট-চুণের ঘর তুলেছে, যে যেখানে পেরেছে। নালা, নর্দ্দমা আর পানীয় জলের পুকুর কেটেছে, কুয়ো খুঁড়েছে।

ইংলণ্ডের কোর্টের আদেশ অমান্য ক'রেছেন দরাজমন জব চার্ণক—শহর কলকাতার জন্মদাতা। চার্ণকের নির্দ্দেশেই তাঁর স্বজাতিগণ গৃহ নির্ম্মাণ করেছে যে যেখানে পেয়েছে।

ঐ তো মিষ্টার রশের বাংলো! মিষ্টার আয়ার, জ্যাকশন, গ্রিফিথস্ আর উইলিয়ামসনের ইট-চুণের কোটা! স্যর রবার্ট নাইটিঙ্গেলের আবাস।

অশ্বপৃষ্ঠে ছোটকুমার কাশীশঙ্কর দুলকি চালে চলতে চলতে অনুগামীদের উদ্দেশ্যে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করলেন। বললেন,—ঐটি রশ সাহেবের গৃহ। ঐটি আয়ার সাহেবের, ঐ গৃহটি জ্যাকশন সাহেবের, ঐটিতে উইলিয়ামসন থাকে। আর ঐ অদূরে স্যর রবার্ট নাইটিঙ্গেল বাস করেন।

অনুগামীদের মধ্যে সকলেই যেন একই ধাতুর মানুষ, একই ধাতুতে গড়া। তাঁদের প্রত্যেকেরই মুখাকৃতিতে যেমন কঠোরতা তেমনই গাম্ভীর্য্য। সুবাধ্য ও নির্ব্বোধ সৈনিকের মত পিছনে পিছনে চলেছেন কাশীশঙ্করের অভিন্নহৃদয় সহচরের দল। ছোটকুমারের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তাঁদের প্রত্যেকেই চোখ ফেরান। পরম নির্লিপ্তের দৃষ্টি প্রত্যেকের চোখে।

কাশীশঙ্কর আকাশে দৃক্‌পাত করেন উর্দ্ধদৃষ্টিতে। আকাশে আবার কার গৃহ আছে! অমন ব্যগ্র দৃষ্টিতে কি দেখছেন! কাশীশঙ্কর আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে বললেন,—বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। আমরা সকলেই এখনও অনাহারী। এসো, আমরা দ্রুত অশ্ব ছোটাই। নচেৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সুতানুটিতে পৌছানো সম্ভব হবে না।

কথা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক পাল অশ্ব মুহূর্ত্তমধ্যে একই সঙ্গে তড়িৎগতিতে ছুট দেয়। পিছনের পথ অন্ধকার হয়ে যায় ধুলা-কাদায়।

উঁচু-নীচু, আঁকা-বাঁকা, পিচ্ছিল ও কর্দ্দমাক্ত পথ. রোড টু কালীঘাট। চিৎপুরের মা চিত্তেশ্বরীর সমুখ দিয়ে এসে

সোজা চলে গেছে কালীমাতার দরজায়। কালীঘাটে। সুতানুটি থেকে বাজার কলকাতা বরাবর সোজা গড় গোবিন্দপুর পেরিয়ে কালীঘাটে গেছে বহুবিস্তৃত এই পথ।

পথ চেয়ে বসেছিলেন রাজাবাহাদুর। মজলিস-ঘরের গবাক্ষ থেকে রাজপ্রাসাদের প্রধান প্রবেশ-দ্বারে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন। কালীশঙ্করের হাতে ক্রাইষ্টালের পেগ্-গ্লাশ! টলমল করছে লোহিত-রঙ পানীয়। সমুখে ত্রিধাকৃতি গবাক্ষ। একটি নাতিবৃহৎ উপাধানে দেহ হেলিয়ে নির্নিমেষ নয়নে দেখছিলেন রাজাবাহাদুর। হাতে তাঁর টলটলায়মান পানপাত্র। দু'জন কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস সন্নিকটে, দুটি সুবিশাল তালপাতার বাহারী ও জরিদার পাখা চালনা করছে।

রাজাবাহাদুরের দৃষ্টি ব্যাহত হয় কখনও। কি প্রচণ্ড সূর্য্যালোক! চক্ষুর্দ্বয় ঝলসে ওঠে কখনও। তবুও পথ চেয়ে আছেন তিনি। কে যেন আসবে! ওষ্ঠ থেকে পানপাত্র নামিয়ে রাজাবাহাদুর বললেন,—মল্লার রাগ ধরো। দারুণ গ্রীষ্মে আর পারি না। অন্য সুরে কর্ণেন্দ্রিয় সাড়া দেয় না এখন।

—যো হুকুম রাজাবাহাদুর।

সেলাম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুর বদলালো। এক সুর থেকে অন্য সুর ধ'রলো ওস্তাদজী। রাজাবাহাদুরের নির্দেশ শুনে দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে উঠলো যেন। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটলো ওস্তাদের। সুরবাহারের সুর বদলাতে থাকলো আস্তেসহকারে। তবলচী রূপার হাতুড়ী পিটতে লাগলো ডানে আর বাঁয়া তবলার বুকের কিনারায়। তানপুরার বাদ্যকার নড়ে-চড়ে বসলো। পানদানি থেকে পান পুরলো মুখে।

ঘোষাল বললেন,—রাজাবাহাদুর, রাজগৃহে ফিরে যান। বেলা আর নাই। মহাশয়ের আহারে বিলম্ব হবে অকারণে।

চোখ ফেরালেন কালীশঙ্কর। চোখে তাঁর শূন্য দৃষ্টি। দেখছেন কি দেখছেন না। বললেন—যথার্থই বলছো ঘোষাল! কিন্তু কোন উপায় দেখি না। ছোটকুমার বাহাদুর যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ আমার আহার-নিদ্রা নাই।

ঠোঁট ওলটালেন ঘোষাল। কথা শুনে মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন। কাশীশঙ্করের আগমনের কথায় মনে মনে ভীষণ অখুশী হলেন ও মুখ বিকৃতি করলেন অতৃপ্তিতে।

ওস্তাদের সুরবাহারের সুরঝঙ্কারে মজলিস-ঘর ঝনঝনিয়ে ওঠে যেন ক্ষণকালের মধ্যে। বিলম্বিত তালে সুর ধ'রেছে ওস্তাদ। ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ হাসি মাখিয়ে বাজিয়ে চলেছে। অতি সন্তর্পণে।

রাজাবাহাদুর নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছেন। দেখছেন, সাগ্রহে ও ব্যগ্রদৃষ্টিতে দেখছেন। রাজপ্রাসাদের প্রধান প্রবেশ-পথে রাজাবাহাদুরের চোখ। কে যেন আসবে, তারই প্রতীক্ষায় আছেন।

ঘোষাল বললে,—রাজাবাহাদুর, নির্জলা আসব পানে শরীর অসুস্থ হয়। আপনি এই সঙ্গে কিছু মুখে দেন কেন।

অত্যন্ত ধীরে ধীরে চোখ ফেরালেন কালীশঙ্কর। প্রগাঢ় আলস্যের সঙ্গে ঘোষালের কথাগুলি কানে নিলেন। কাছাকাছি ফরাসের 'পরে ছিল মেওয়ার রেকাবী, ছোট একটি কাংস্য-পাত্রে গোটাফলের স্তূপ। রেকাবীতে, বাদাম, পেস্তা, আখরোট, কাজু, বড় এলাচ, লবঙ্গ। কাংস্যপাত্রে আঙুর, আপেল, ডালিম, কদলী, পিচফল।

এক গুচ্ছ আঙুর হাতে তুললেন রাজাবাহাদুর। ডান হাতের ক্রাইষ্টালের পেগ-গ্লাশ নামিয়ে রাখলেন ফরাসে। একেকটি আঙুর মুখে দিতে থাকেন একেক বারে। কালীশঙ্করের চোখের চাউনিতে যেন শূন্যতা ফুটেছে। মুখভাবে গাম্ভীর্য্য। চক্ষুপ্রান্ত রক্তবর্ণ হয়েছে। নির্জলা আসবের প্রক্রিয়ায় সোজা বসতে পারেন না রাজাবাহাদুর। হৃদ্‌যন্ত্রের গতি কেমন যেন দ্রুততর হয় ক্রমেই। নেশার ঘোরে মন তাঁর আনন্দ আর উল্লাসে পরিপূর্ণ হ'লেও কালীশঙ্কর সোজা বসতে পারেন না। হস্তপদে শিথিলতা যেন!

—ঘোষাল!

উপাধানে এলিয়ে পড়ে বুক চিতিয়ে চিতিয়ে কথা বললেন রাজাবাহাদুর। মজলিস-ঘরের আলো-আঁধারে কালীশঙ্করের খিড়কিদার জরির পাগড়ী আর কণ্ঠহারের মণি-মাণিক্য ঝলমল করে।

ঘোষাল বললেন,—হুকুম করেন রাজাবাহাদুর। বলেন কি বলতে চান।

কথার শেষে মুখে পানপাত্র তোলেন ঘোষাল। পর পর কয়েকটা চুমুক দেন স্ফটিকের পাত্রে।

কত চেষ্টা করছেন কালীশঙ্কর। নেশাধিক্যে নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারেন না। কত চেষ্টা সত্ত্বেও উঠে সোজা বসতে পারেন না। কথাও তেমন স্পষ্ট বলতে পারেন না। কখনও গম্ভীর হয়ে থাকেন। কখনও বা আপন খেয়ালে প্রচণ্ড শব্দে হাসতে থাকেন। অকারণে। রাজাবাহাদুরের ইয়ার-বন্ধু আর তোষামুদের দলও বাদ যায় না। এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হবে? তাঁদেরও দেওয়া হয়েছে পানপাত্র। কানায় কানায় আসবপূর্ণ ডিকেণ্টার। তাঁদের কেউ কেউ এক মনে একের পর এক পাত্র শেষ ক'রে চলেছেন। পানপাত্র হাতে কেউ কেউ ওস্তাদকে ঘিরে ব'সেছেন, সুরবাহারের সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাথা দুলিয়ে চলেছেন এক নাগাড়ে।

ঘোষাল শুধু রাজাবাহাদুরের পাশটিতে আছেন। কালীশঙ্কর কখন কি বলেন, মন্তব্য কাটেন বা ফরমাশ করেন, সেই অপেক্ষায় আছেন ঘোষাল। রাজাবাহাদুরের সঙ্গে সমানে তাল রেখে পান করছেন তিনিও।

জড়িয়ে জড়িয়ে কথা ধরলেন রাজাবাহাদুর। বললেন,—ঘোষাল, গিঞ্জাকে কও বিলম্বিত লয় আর ভাল লাগে না। তবলায় জলদ চলে, তবেই তো!

ওস্তাদ বাম হাতে আবার সেলাম ঠুকলো সহাস্তে। খোদ রাজাবাহাদুরের আজ্ঞা শুনেছে, কৃতার্থ হয়ে গেল যেন। বললে,—হুকুম রাজাবাহাদুর!

রাজার পায়ে যেন ওস্তাদ বিকিয়ে দিয়েছে নিজেকে। মিঞার ভাবভঙ্গীতে আত্মসমর্পণের আবেগ সদা-জাগ্রত। মাস-মাহিনার চাকরী ওস্তাদের। খেয়ালী রাজার কখন কি খেয়াল হয়, কে বলতে পারে? ওস্তাদ জানে আরও অনেক গাইয়ে-বাজিয়ে আছে দেশে। আরও অনেক ওস্তাদ আছে। মিঞা যেন সন্ত্রস্ত হয়ে আছে।

ঘোষাল লোভাতুর চোখে কি যেন দেখে। রাজাবাহাদুরের কণ্ঠে মতির হার। মুক্তার মালা। ঘোষালের ঈষৎ লাল চোখে লোভার্ত্ত চাহনি। মুখে নকল হাসি। ঘোষাল বললেন,—মতির মালায় যা মানিয়েছে রাজাবাহাদুরকে!

ক্ষণিকের জন্য হাসি ফুটলো কালীশঙ্করের মুখে। ক্ষীণ হাসি হাসলেন। জড়িত কণ্ঠে বললেন,—ঘোষাল, মতির মালায় তোমার লোভ আছে?

—বিলক্ষণ আছে রাজাবাহাদুর। বললেন ঘোষাল, গদগদ কণ্ঠে। বললেন,—তবে, আমার কি আর লোভ? সহধর্ম্মিণীকে পরাতে সাধ জাগে যে! আমার গলায় মতির মালা দেখে লোকে যে হাসবে রাজাবাহাদুর! বলবে, বাঁদরের গলায়—

আবার হাসলেন কালীশঙ্কর। শব্দহীন ক্ষীণ হাসি। ঘোষালের কথায় হাসলেন। সূক্ষ্ম দুই ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে নিজের কণ্ঠ থেকে মতির মালা খুলে বললেন,—ঘোষাল, এটি তুমি নাও!

ইতি-উতি দেখলেন ঘোষাল। সাঙ্গোপাঙ্গদের তির্য্যক্ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে করতে একান্তই নির্লজ্জের মত হাত পাতলেন। গ্রহণ করলেন মতির মালা। আঙরাখার অভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখলেন।

অনেক বার হাসলেন রাজাবাহাদুর। ক্ষীণ হাসি হেসে মজলিস-ঘরের দেওয়ালে চোখ ফেরালেন। দেওয়াল-গিরিতে কত অসংখ্য মোমবাতি জ্বলছে। ঘরের প্রবেশমুখে একটি মশাল, দাউ-দাউ জ্বলে।

দেওয়াল-গিরির মোমের আলো অধিকক্ষণ চোখে দেখা যায় না। চোখ ঝলসায়। রাজাবাহাদুরও ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিত করলেন। যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন হলেন। হাতের পানপাত্র কখন নামিয়ে রেখেছেন ফরাসে! মোমবাতির ঐ লেলিহান শিখার মতই রাজাবাহাদুরের হৃৎপিণ্ড যেন দপ্‌দপিয়ে জ্বলছে অবিরাম! নেশার উগ্র-জ্বালায় থেকে থেকে বিকৃত মুখভঙ্গী করেন।

সুরবাহারের সুর থামে না। হাত দু'টো ব্যথিয়ে ওঠে না ওস্তাদের! দ্রুত লয়ে বাজিয়ে চলেছে ওস্তাদ, হুজুরের নির্দ্দেশে। তবলায় জলদ চলেছে। মজলিস-ঘর যেন গম-গম করছে মন্ত্রসঙ্গীতের মল্লার রাগে।

কিন্তু রাজা শুনছেন কৈ? তাঁর কর্ণেন্দ্রিয় এখন সম্পূর্ণ বধির। নেশার উগ্রতায় মুদিতচক্ষু। ভেলভেটের উপাধানে দেহ এলিয়ে দিয়েছেন কালীশঙ্কর। হস্তপদ যেন শিথিল হয়ে গেছে। যেন কি এক অন্তর্জ্বালা বক্ষে ধারণ ক'রে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে আছেন।

—রাজাবাহাদুর!

মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন ঘোষাল। রাজার কানে যেন মন্ত্র পড়লেন। কিন্তু সাড়া মিললো না। রাজাবাহাদুরের এই অবস্থা দেখে দলের দু'জন হঠাৎ অট্টহাসি ধরলো গলা ফাটিয়ে। একজন আরেক জনের অঙ্গে ঢ'লে পড়লো হাসতে হাসতে।

ঘোষাল আবার ডাকলেন,—রাজাবাহাদুর, অসময়ে নিদ্রা যাবেন না।

কে কার কথা শোনে! ঘোষালের মিনতিপূর্ণ কথা কানে পৌঁছয় না কালীশঙ্করের। তিনি যেন ইহলোক ভুলে গেছেন। নেশার উগ্রতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। দু'জন পাঙ্খাবেহারা হরদম পাখা দুলিয়ে চলেছে। তবুও রাজাবাহাদুরের কপালে দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। শরীর যেন তাঁর আড়ষ্ট হয়ে আছে। বিষণ্ণ মুখাকৃতি।

নেশার উগ্রতায় না সুরবাহারের সম্মোহনী সুরে গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়েছেন কালীশঙ্কর! সুরবাহারের তার ছিঁড়ে যাবে নাকি? ওস্তাদের হাত দু'টি এক নজরে দেখা যায় না। এতই দ্রুত বাজায় ওস্তাদ!

মিঞা লক্ষ্ণৌয়ের পশ্চিমা মুসলমান। পঞ্চাশের উর্দ্ধে বয়স—ইতিমধ্যেই তার মেহেদী-মাখানো দাড়ি-গোঁফে পাক ধরেছে। শুধু সুরবাহার নয়, বীণ আর সেতারেও মিঞা সিদ্ধহস্ত। মিঞার নাম মহম্মদ আজিমুল্লা খাঁ।

এক সুর শেষ ক'রে অন্য সুর ধরলো ওস্তাদ। 'মেঘমল্লার' শেষ করে ধরলো 'মিয়া কী মল্লার'। তবলচি রূপার হাতুড়ী ঠুকতে থাকে তবলায়।

মজলিস-ঘর দক্ষিণমুখী। দক্ষিণের উন্মুক্ত গবাক্ষ থেকে আকাশ দেখা যায়। মেঘের লেশমাত্র নেই, শুভ্র রূপালী আকাশ। হাওয়ায় যেন অগ্নিবাণ ছুটছে। আকাশের বুকে চাতক পাখী চক্কর খায়। মল্লার রাগে বর্ষার কোন আভাস মেলে না।

—ঘোষাল মশাই!

—কে? দেওয়ানজী?

ঘোষাল কি এক গুরুতর কাজে লিপ্ত ও ব্যস্ত ছিলেন। ডাক শুনে চমকে উঠলেন ঠিক ধরা-পড়া চোরের মত। নেশাচ্ছন্ন রাজাবাহাদুরের ডান হাতের একটি অঙ্গুরীয় সকলের অজ্ঞাতে খুলছিলেন ঘোষাল। নবরত্নের অঙ্গুরীয়।

দেওয়ানজী বললেন,—ঘোষাল মশাই, রাজাবাহাদুরের মধ্যাহ্ন-আহারের সময় অতিবাহিত হয়ে যায় যে! রাজ-অন্দর থেকে ডাক এসেছে! আহার্য্য প্রস্তুত।

ঘোষাল বললেন,—আমি তো কোন উপায় দেখি না। দেওয়ানজী, আপনিই ডাকেন রাজাবাহাদুরকে।

শিউরে উঠলেন দেওয়ান। নেতিবাচক দেহভঙ্গী করলেন। বললেন,—না না ঘোষাল মশাই! আমি এ কার্য্যে অক্ষম। আমার সাহসে কুলায় না। আপনিই ডাকেন কেন।

ঘোষাল পুনরায় ডাকলেন,—রাজাবাহাদুর!

চক্ষুদ্বয় অর্দ্ধ উন্মীলিত করলেন কালীশঙ্কর। দুই হাতের বজ্রমুষ্টি ধীরে ধীরে শিথিল করলেন।

ঘোষাল বললেন,—রাজাবাহাদুর, গাত্রোত্থান করেন! স্নানাহারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায় যে!

দুই চোখ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করলেন কালীশঙ্কর। স্থিরদৃষ্টিতে কি যেন দেখলেন ঘোষালের মুখাবয়বে। কি যেন লেখা পড়লেন ঘোষালের মুখ পানে চেয়ে। গম্ভীরকণ্ঠে ও ধীরে ধীরে বললেন,—ঘোষাল, তুমি যদি ক্লান্ত হও, বিদায় লও। জননী এখনও উপবাসী। অদ্য দ্বাদশী, তথাপি তিনি মুখে জল দেন নাই। সহোদর ছোটকুমার কালীশঙ্কর যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ আমিও অভুক্ত থাকি তো ক্ষতি কি?

দক্ষিণমুখী মজলিস-ঘরের প্রায় মধ্যস্থলে পশ্চাতের দেউলে লাগা এক তক্তপোষে কিংখাবের গদীর ওপর রাজার নিজের আসন আছে। আসনের পিছনে তাকিয়া, দুই পাশে তাকিয়া। আসনের সম্মুখে একটি হাত-বাক্স, দোয়াত, ও সহী-মোহর। দরবারের সংলগ্ন মজলিস-ঘর—রাজার হাতের কাছে থাকে কাজের জিনিস। মজলিসে বসে যদি প্রয়োজন হয় কোন জরুরী চিঠিতে সই লিখতে!

রাজার নির্দিষ্ট আসন, কিন্তু কালীশঙ্কর আজ আর নিজের আসনে নেই। রাজগৃহের প্রধান প্রবেশ-পথের তোরণ যে দিকে, সে দিকের গবাক্ষ সমুখে রেখে আসনের নীচের চাদর-বিছানো ফরাস-সতরঞ্চিতেই আসন গ্রহণ করেছেন। মজলিস-ঘর না বালাখানা? দরবার আম্ না দরবার খাস্? না সদর-বৈঠকখানা?

ঘোষাল আমতা-আমতা করে। বলে,—রাজাবাহাদুর, তবে আমি বিদায় লই। বেলা আর নাই।

কেমন যেন বিরক্তির ভাব প্রকাশ করলেন কালীশঙ্কর। তাঁর মুখের সর্ব্বত্রে কুঞ্চিত রেখা ফুটলো। দুই হাতের মুষ্টি কঠোর করলেন। নিজের উর্দ্ধাঙ্গ উঠাতে সচেষ্ট হয়ে বললেন,—ঘোষাল, তোমরা সকলেই বিদায় লও। আগামী কল্যের দরবারে আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হবে।

ঘোষাল মতির মালা হাতিয়েছে। ঘোষাল স'রে পড়তে পারলে বেঁচে যায়। ঘোষাল বললেন,—তথাস্তু রাজাবাহাদুর!

কালীশঙ্কর সম্পূর্ণ আসীন হলেন বহু চেষ্টায়। পায়ের ওপর পা চাপিয়ে বসলেন সহজ মানুষের মত। বললেন,—দেওয়ানজী, বাদ্যসঙ্গীত যেন না থামে। ওস্তাদজীকে অনুরোধ করুন সেই মত। আমাকে তামাকু দিতে আদেশ করেন খেদমতগারকে।

বালাখানার এক কোণে জলচৌকী।

জলচৌকীতে সোনা আর রূপায় বাঁধানো সারি সারি কুরসী হুঁকা, পানদান, পিকদান। রাজাবাহাদুরের পৃথক আলবলা। ঢাকাই রূপার কারুকার্য্যখচিত ধূমপানের ফরসি।

তৈরীই ছিল। মুখ থেকে কথা খসানোর সঙ্গে সঙ্গে রূপার গুড়গুড়ি বসিয়ে দিয়ে গেল খেদমতগার। শীর্ষে মণিমুক্তার ঝারি।

গলাখাঁকারির শব্দ হয় কালীশঙ্করের কণ্ঠে। বালাখানার প্রবেশ-পথে দেখেন চোখ ফিরিয়ে। ঘন লাল বিশাল দুই চোখ। সম্পূর্ণ আঁখি মেলেছেন রাজাবাহাদুর, টেরিয়ে টেরিয়ে দেখলেন দেওয়ানজী। মুখের কাছে হীরামুক্তা-বসানো সোনার মুখ-নল। সোনালী তার-জড়ানো সটকা। কালীশঙ্কর দেখলেন, মজলিস-ঘর থেকে কে কে নির্গত হয়। কে থাকে আর কে যায়।

রাজাবাহাদুর বললেন,—দেওয়ানজী, দরবারে কে কে আছেন?

হাতে হাত কচলালেন দেওয়ান। হঠাৎ ডাক শুনে হকচকিয়ে গেলেন। বললেন,—রাজাবাহাদুর, মুনসীখানার আমলারা ব্যতীত অন্য কেহ নাই।

বালাখানার প্রবেশ-পথে মশাল জ্বলছে। সেখানে অপেক্ষমান এক পাল কালো কালো মানুষ। খানসামা, খেদমতগার, মশালচি, আবদর, হুকাবরদার, বেহারা, পেয়াদা।

ওদের কারও কারও দেহে রূপার অলঙ্কার। হাতে রূপার বালা, গলায় হাঁসুলী। মশালের আলোয় চক-চক করছে কত দূর থেকে।

দরবারে মুনসীখানার আমলারা ব্যতীত অন্য কেউ নেই। শুনে যেন নিশ্চিন্ত হন রাজাবাহাদুর। খাতার লেখার কাজ চলছে যখন তখন, আর চিন্তার কি কারণ আছে? রাজাবাহাদুর মুখ-নল মুখে দিলেন।

মুনসীখানার আমলারা কাজ করছে দরবারে। লেখা-পড়ার কাজ। খাতা লেখার কাজ। দরবারে রাজাবাহাদুরের গদীর বাম দিকের মেঝেয় চাটাই পাতা। চাটাইয়ের পরে শতরঞ্চ ও চাদর বিছানো মুনসীখানা। সর্ব্ব-সাধারণের গতিবিধি নেই দরবারে। কত গুপ্ত কাজ হয়, কত গুপ্ত পরামর্শ চলে। তাই প্রধান প্রধান কার্য্যকারক ছাড়া অন্য কেউ নেই।

হুজুরের মুখের আদেশ শুনে বর্ত্তে গিয়েছিল ওস্তাদ। প্রবল উৎসাহে পান-খাওয়া ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি মাখিয়ে সুর ধরেছে সুরবাহারে। মল্লার রাগ।

বাহিরে দুঃসহ আবহাওয়া। উত্তপ্ত দ্বিপ্রহর! মাঠ-ঘাট গাছ-পালা প্রখরতম রৌদ্রে দগ্ধ হয় বুঝি! গবাক্ষ-পথে বহিরাকাশ দেখলেন কালীশঙ্কর। মুখ থেকে তামাকের প্রচুর ধূম নির্গত করতে করতে দেখলেন শুভ্র আকাশ। সুগন্ধি তামাকের গন্ধ বইতে থাকে বালাখানায়।

বাহিরে প্রকৃতি। দেখলেন রাজাবাহাদুর। প্রকৃতির সবুজ শোভা। এই প্রচণ্ড সূর্য্যরশ্মিতেও দগ্ধ হয়ে যায় না।

ঘন জঙ্গলাকীর্ণ সুতানুটির প্রান্তভাগ গবাক্ষ-পথে দৃষ্টিগোচর হয়। কালীশঙ্করের দৃষ্টি থমকে যায় সহসা। কি দেখছেন রাজাবাহাদুর, এমন ব্যগ্র দৃষ্টিতে! মুখ থেকে মুখ-নল নামালেন তিনি। আশার ক্ষীণ হাসি ফুটলো ওষ্ঠপ্রান্তে! রাজা দেখলেন এক দল অশ্বারোহী আসছে। পুরোভাগে কাশীশঙ্কর।

নিশ্চয়ই ছোটকুমার ফিরেছেন। নয়তো হাসি কেন রাজার মুখে। ভয়ে যেন শিউরে শিউরে ওঠেন দেওয়ান। তাঁর পদতলের ভূমি কাঁপতে থাকে যেন।

কালীশঙ্কর বললেন,—দেওয়ানজী, ঐ দেখেন সহোদর সদলে ফিরে আসে। ছোটকুমারকে অবিলম্বে এত্তেলা পাঠান। আমি এখানেই সাক্ষাৎ করতে চাই। জরুরী প্রয়োজন আছে।

হন্‌হনিয়ে দেওয়ানজী বেরিয়ে গেলেন বালাখানা থেকে। হৃদ‌কম্প হয় দেওয়ানের, ছোটকুমার যদি আসেন সদলবলে। দরবার থেকে চিরকুট লিখে পাঠাতে হয় দেওয়ানকে। রাজাবাহাদুরের এত্তেলা পাঠাতে হয় পেয়াদা মারফৎ।

পেয়াদা ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে নিমেষের মধ্যে। বলে,—দেওয়ানজী, ছোট রাজা ইদিকেই যে আসেন দেখতে পাই। দলবল সমেত দরবার অভিমুখেই আসতে দেখেছি।

—অঁা? বিস্ময় প্রকাশ করলেন দেওয়ান। বললেন,—সে কি কথা হে!

—হাঁ দেওয়ানজী! ঐ দেখেন কে আসেন। পেয়াদা অঙ্গুলি সঙ্কেত করলো।

দরবার-কক্ষের দ্বারমুখে কয়েক জন বলিষ্ঠ মানুষের প্রবেশ দেখলেন দেওয়ান, অপলক দৃষ্টিতে। দলের প্রত্যেকের একই ধরণের পোষাক। একই প্রকৃতির মানুষ হয়তো, একই ভাবভঙ্গী, একই আদব-কায়দা। পদক্ষেপেও কি একতা! দলের পুরোধা ছোটকুমার কাশীশঙ্কর। দৃপ্ত ভঙ্গীতে প্রবেশ করেই রাজাবাহাদুরের দরবারী গদী শূন্য দেখে হাঁকলেন,—দেওয়ান, মুন্সী, কড়নায়েব, তোমাদের রাজামশাই গেলেন কোথায়? দেখি না কেন তাঁকে?

ধড়ে প্রাণ আসে দেওয়ানের। উঁচানো তরোয়ালের পরিবর্তে সামান্য দু'-চারটি কথায় দেওয়ান যেন প্রকৃতিস্থ হ'লেন। বললেন,—তেনার কথা বাদ দিন ছোটরাজা। দরবারে বসে তো কাজ চালাতেই পারলেন না। কোথায় ছোটকুমার আর কোথায় ছোটকুমার করছেন। আপনার তরেই কাতর প্রতীক্ষায় আছেন কখন থেকে! হুজুর, আপনার কাছারীতে কয়েক বার ছুটে ছুটে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসেছি। কিন্তু আপনার পাত্তা মেলে নাই। কোথায় গিয়েছিলেন ছোটরাজা? রাজাবাহাদুর তো ভেবে ভেবেই সারা হয়ে গেলেন।

দেওয়ানের কথার কোন জববাবই দেন না কাশীশঙ্কর। বলেন,—কোথায় আপনাদের রাজাবাহাদুর, তাই বলেন।

দেওয়ান ভয়ে ভয়ে বললেন,—হুজুর, তিনি বালাখানাতেই অবস্থান করছেন। ওস্তাদের বাদ্যযন্ত্র শুনছেন।

ওপরে-নীচে মাথা দুলিয়ে বালাখানার দিকে এগিয়ে গেলেন কাশীশঙ্কর। সহচরগণ অপেক্ষায় থাকলেন দরবারকক্ষে।

বালাখানা যেন আলোয় আলো হয়ে আছে। মোমবাতি আর মশালের সোনালী আলোয় দিনের আলো ফুটেছে যেন বালাখানায়। প্রবেশ-পথে দাঁড়িয়ে ছোটকুমার হাঁকলেন,—প্রবেশের অনুমতি হোক।

আসন থেকে উল্লাসে উঠে পড়তে চেষ্টা করলেন রাজাবাহাদুর। কিন্তু পারলেন না। আসবের উগ্র নেশায় তাঁর হস্তপদ আর দেহে যেন জড়তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। গলা খাঁকরে কালীশঙ্করও হাঁকলেন,—সুস্বাগতম্, সুস্বাগতম্। আসতে আজ্ঞা হোক। এসো, এসো ছোটকুমার এসো। আমার সন্নিকটে এসো, কিছু গোপন কথা আছে।

ছোটকুমার বালাখানার দ্বারে দাঁড়িয়ে সহাস্যে ও নত মস্তকে অভিবাদন জানালেন। হাসি-হাসি মুখ কাশীশঙ্করের। এতটা পথ অশ্বারোহণে এসে যদিও তিনি ক্লান্ত। তবুও মুখ হাসি-খুসী। আনন্দে উৎফুল্ল। ছোটকুমার সোজা এগিয়ে আসেন সশব্দ পদধ্বনিতে। হাসতে হাসতে।

কাশীশঙ্করের দেহে সাদা রেশমের জোব্বা। মুগার ধুতি মালকোছা দেওয়া, ইরাণী পায়জামা যেন! কটিদেশে একটি নাতিবৃহৎ তরোয়াল। জরিদার খাপে ভর্তি। হাতীর দাঁতের হাতল উঁকি মারে। কুমারের চলনের সঙ্গে মাথার উষ্ণীষ হেলে-দোলে।

রাজাবাহাদুর উঠে দাঁড়ানোর জন্য কত চেষ্টাই না করেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! ওস্তাদকে উদ্দেশ করে বললেন,—এক্ষণে বিরত হন ওস্তাদজী! ঐ আমার সহোদর আসে। আমাদের পরস্পরে কথা কওনের প্রয়োজন। গুহ্য কথা।

সুরবাহারের তার ছিন্ন হয় যেন আচমকা। ওস্তাদের ক্লান্ত হাত, তবু সেই হাত তুলে সেলাম জানালো ওস্তাদ। কপালে চার আঙুল ঠেকালো।

দাঁড়ানো সুরবাহার আর তানপুরা শুয়ে পড়লো যেন শতরঞ্চি-ফরাসে। তবলা বুঝি ফুটো হয়ে থেমে গেল।

কাশীশঙ্কর বসলেন রাজাসনের সমুখে। রাজাবাহাদুরের পায়ের কাছটিতে। মুখে স্বচ্ছ হাসি। বললেন,—রাজা, তুমিই আজ রাধানগরের প্রকৃত রাজা, তদুপরি তুমি আমার বয়ঃজ্যেষ্ঠ, সহোদর। তুমি আমাকে আশীষ দাও। আমি তোমার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

বর্ষারম্ভের এলোমেলো হাওয়ায় মোমবাতি আর মশালের শিখা লকলকিয়ে ওঠে। জল-অর্ণবের মত জলমধ্যে যেন বালাখানা দোলাদুলি করে। সুগন্ধি তামাকের খোশবায় ভাসতে থাকে বালাখানার কোণে কোণে। গুড়-মিশানো অম্বুরী তাম্রকূট।

কেমন যেন শিশুর মত গুমরে গুমরে উঠলেন রাজা

বাহাদুর। চকিতের মধ্যে তাঁর ঘোর লাল চোখ দুটি সজল হয়। নাসিকামূলে কে যেন সিঁদুরের গুঁড়া ছড়িয়ে দেয়। রাজাবাহাদুর কথা বলেন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে,—কাশীশঙ্কর, এতক্ষণ কোন্ কাজে ব্যস্ত ছিলে তাই শুনি সর্ব্বাগ্রে! আশীষের কিবা প্রয়োজন? আমি তোমাকে এত্তেলা পাঠায়েছি।

রাজাবাহাদুরের এক পদের অঙ্গুলিসমূহ ধীরে ধীরে ধারণ করলেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—তুমি বিমর্ষ হও কেন অনর্থক? তোমার পদধূলি দাও। কথা বলতে বলতে অন্য পদও স্পর্শ করলেন।

কালীশঙ্কর [illegible] বললেন,—সেই প্রাতঃকালে কোথায় যাত্রা করলে তুমি?

নতমস্তক হন ছোটকুমার। সলজ্জায়। সসঙ্কোচে। বললেন,—কোম্পানীর কুঠীতে। গড় গোবিন্দপুরে।

—কি কারণ?

—কারণ সওদাগরী।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলেন রাজাবাহাদুর। রুদ্ধকণ্ঠে বললেন,—রাজার সন্তান তুমি, সদাগর হওয়ার বাসনা কেন? তুমি ও তোমার পরিবার কি অভুক্ত থাকে? তোমাদের যদি কোন দুঃখকষ্ট থাকে, তাও ব্যক্ত কর।

ছোটকুমারের আনত দৃষ্টি। যেন নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে। তিনি বললেন,—আমার বক্তব্য তুমি মন দিয়া শুন।

—কও, তোমার কি বক্তব্য আছে?

কাশীশঙ্কর অল্প হেসে বললেন,—রাজাবাহাদুর, তোমার উত্তরাধিকারিগণ আছে। আমি তাদের বঞ্চিত করবো কোন্ লজ্জায়? হিন্দু বিধিতে জ্যেষ্ঠই সকল কিছুর উত্তরাধিকারী। আর যে কনিষ্ঠ, সে জ্যেষ্ঠের দয়া-দাক্ষিণ্যের পাত্র ছাড়া আর কি?

বক্ষপিঞ্জর মথিত হয় রাজাবাহাদুরের। কনিষ্ঠের কথায়। কথা বলার সুরে। বলেন,—আমার অবস্থা এখন তেমন নয় যে তোমার সকল কথা শুনি। তোমাকে আমি সর্ব্বক্ষণ আশীর্ব্বাদ করি, এ বিষয়ে পরে আমার মতামত শুনিও।

কথা বলতে বলতে কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। বলেন,—তুমি হয়তো অবিদিত আছো, আমাদের মাতৃদেবী এই দ্বাদশীতে এখনও উপবাসে আছেন? জলগ্রহণে অনিচ্ছা তাঁর।

ভ্রূ-যুগলে আকুঞ্চন ফোটে ছোটকুমারের। বলেন,—সহোদরা বিন্ধ্যবাসিনীর জন্য কি?

—হাঁ, তজ্জন্যই। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? জমিদার কেষ্টরামকে পরিতুষ্ট করি কোন্ উপায়ে?

চিবুক স্পর্শ করলেন কাশীশঙ্কর। কি যেন চিন্তা করলেন কুমার। গভীর চিন্তা। অগ্রজের পদদ্বয় ত্যাগ করে ফরাস থেকে উঠে পড়লেন। বললেন,—ভ্রাতঃ, তুমি এই কারণে চিন্তিত না হও। আমি মাতৃদেবীর নিকট এখনই যাই। দেখি কি হয়। কথা বলতে বলতে ক্ষণকাল থামলেন। আবার বললেন,—রাজাবাহাদুর, তুমি এখন নেশায় কাতর আছো? আপাতদৃষ্টিতে তাইতো মনে হয়। কৃষ্ণরামের কথা ধর্ত্তব্যই নয়! সে একটা পাষণ্ড। পশু।

—হাঁ, তাই। তবে নেশা আর নাই। তুমি অবিলম্বে রাজ-অন্দরে মাতৃদেবীর নিকট যাও। তাঁর উপবাস ভঙ্গ করাও। নতুবা আমাদের উভয়কেই মহাপাপের ভাগী হতে হবে। আমার শারীরিক তেমন সামর্থ্য নাই যে, তাঁকে অনুরোধ জানাতে যাই।

অগ্রজের পা-ছোঁয়া হাত দুটি উষ্ণীষের পরে রাখলেন ছোটকুমার। বললেন,—অধিক পানে শরীরটাকে বিনষ্ট করতে চাও?

রাজাবাহাদুর নীরব, নির্ব্বাক্! যেন নিস্পন্দ। কাতর দৃষ্টিতে দেখেন সহোদরের মুখখানি। বাক্যস্ফূর্তি হয় না যেন চেষ্টা সত্ত্বেও। স্তিমিত কণ্ঠে বললেন,—আর কালবিলম্ব নয়, তুমি এখনই যাও ভাই!

কথা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গেই পিছন ফিরলেন ছোটকুমার। সামরিক কায়দায় অর্ডার শুনে পিছু ফিরলেন যেন। ততঃপর চললেন ক্ষিপ্রগতিতে। ভূমি কাঁপিয়ে।

ক্রাইষ্টালের পানপাত্র পুনরায় ওষ্ঠে তুললেন রাজাবাহাদুর। ডিকেণ্টার থেকে পানীয় ঢেলে পেগ-গ্লাশ মুখে তুললেন অতি ধীরে ধীরে। রাধানগরের রাজা, রাজা কাশীশঙ্কর বাহাদুর কি জন্য কে জানে যেন নির্জীব হয়ে পড়েছেন এই সামান্য সময়ের মধ্যেই! বিক্ষিপ্ত মন, চঞ্চল মস্তিষ্ক। কিছু কি ভাল লাগে এখন? গভীর নিরাশায় তাঁর দেহ-মন যেন ভেঙ্গে পড়েছে।

রাজমাতা বিলাসবাসিনী এখনও কি অনাহারী আছেন? নাঃ, আর তাঁর কোন দুঃখই নেই। রাজাবাহাদুরের প্রধানা মহিষী বড়রাণীর মুখে শুনেছেন, ভাইয়ে ভাইয়ে পরামর্শ হবে। সেই কথা শোনা মাত্র রাজমাতার যত ক্ষোভ আর দুঃখ কর্পূরের মত জ্বলেই নিবে গেছে যেন। তিনি উপবাস ভঙ্গ ক'রেছেন। মুখে জল দিয়েছেন। মেজরাণী সর্ব্বমঙ্গলা কাছে ব'সে ব'সে রাজমাতাকে খাইয়েছেন।

আহারান্তে ছেঁচা পানের কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার গোলক মুখে দিয়ে রাজমাতা আপন কক্ষে ফিরে শুয়েছেন নিজ শয্যায়। বিলাসবাসিনীর কেমন যেন অবসন্ন শরীর। উপবাসের অত্যাচারে হয়তো ক্লিষ্ট দেহ। নিজের পালঙ্কে শুয়েছিলেন তিনি। দু'জন দাসী পদসেবায় রত ছিল। আর কাছেই, শিয়রের কাছেই বসেছিলেন কালীশঙ্করের প্রধানা মহিষী। উমারাণী। বড়রাণী।

ছোটকুমারের কণ্ঠ না? কে এমন মা মা শব্দে ডাক দেয়? কারই বা এমন গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর?

—মা, মা গো!

কাশীশঙ্কর যেন বুকের ভিতর থেকে ডাকেন। কথায় এমনই আন্তরিকতা। সন্তানের ডাক। কানে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন, রাজমাতা বিলাসবাসিনী। শরীরে অবসন্নতা, কে বলবে! স্বগত করলেন বিলাসবাসিনী, —কে? আমার কাশীর ডাক না? ছোটকুমারের ডাক না?

দাসীরা দু'জন ঘর ছেড়ে পালায়। লজ্জায় আর ভয়ে। পালে বুঝি বাঘ পড়েছে, এমনই ব্যস্ত ও ত্রস্ত হয়ে ছুট দেয় দাসীরা। রাজমাতার পালঙ্ক থেকে নেমে পড়লেন বড়রাণী। ভূমিতে নেমে দাঁড়ালেন সলজ্জায়।

প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে প্রবেশ করলেন ছোটকুমার। মাথার উষ্ণীষ খুলে ফেললেন এক হেঁচকা টানে। কপালে তাঁর স্বেদবিন্দু। বিলাসবাসিনীর পদদ্বয়ের কাছাকাছি নামিয়ে রাখেন মাথার উষ্ণীষ। বলেন,—মা তুমি এখনও জলগ্রহণ করনি? কোন্ দুঃখে? কেষ্টরামের ব্যবহারে তুমিও চঞ্চলা হও? তবে তো তার জেদ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হবে!

এক গাল হাসলেন বিলাসবাসিনী। কেঁদে কেঁদে ফুলে-ওঠা চোখ তাঁর। থমথমে মুখ। তবুও হাসলেন খুশীমনে। বললেন,—এসো আমার বাছা এসো। আমি তো বহুক্ষণ উপোস ভেঙ্গেছি।

—তবে আমি কি ভুল শুনেছি! সবিস্ময়ে বললেন কাশীশঙ্কর। কথার শেষে জননীর পদ স্পর্শ করলেন। বললেন,—অগ্রজ রাজা কালীশঙ্করই শোনালেন। তিনিই আমাকে ত্বরায় পাঠালেন।

—সে হয়তো জানে না। বড়রাণী উমার মুখে শুনি যে রাজা নাকি তোমার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করবে জামাই কেষ্টরামের দাবীদাওয়া নিয়ে। তাই শুনে আর আমার কোন ক্ষোভ নেই। কোন দুঃখ নেই। আমি এখন নিশ্চিন্ত। বড়রাণীর কথাতেই উপোস ভেঙেছি। কি বল' উমারাণী!

মুক্তার মত শুভ্র দন্তপাতি দেখা যায় প্রধানা মহিষীর। তরমুজ-লাল ঠোঁটের ফাঁক থেকে চোখে পড়ে সারি সারি মুক্তার মত উজ্জ্বল দন্ত।

—তাই নাকি বধূরাণী?

কৌতুক-কণ্ঠে বললেন ছোটকুমার। চোখ ফিরিয়ে দেখলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূকে। উমারাণীর সুসজ্জিত আপাদমস্তক দেখলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

উমারাণী কোন কথা বলেন না। নতমুখী হয়ে থাকেন। হাসির রেখা ফোটে লাল অধরের সীমানায়। কি মিষ্ট সেই মুক্তা-ঝরা হাসি! স্বর্গের দ্যুতি ছড়ায় যেন রাণীর হাসিতে।

লজ্জা না ব্রীড়ায় উমারাণী তৎক্ষণাৎ রাজমাতার কুঠরী ত্যাগ করলেন। আঁচল উড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন হাসিমুখে। মুক্তা ঝরিয়ে গেলেন যেন রাশি রাশি।

[ক্রমশঃ

মানবদরদী জননায়ক

ডাঃ বিধানচন্দ্র

(বিশেষ প্রতিনিধি লিখিত)

[বর্ত্তমান সংখ্যায় 'চার জনের' পরিবর্ত্তে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কর্ম্মময় জীবনের পরিচয় প্রকাশ করা হইয়াছে। আশা করি, বসুমতীর সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন এবং 'চার জনের' স্থলে এক জনের জীবন বিবরণ দেওয়া হ'লো বলিয়া মার্জ্জনা করিবেন। আগামী সংখ্যায় যথারীতি চার জনেরই বিবরণ দেওয়া হবে।—সঃ মাঃ বঃ]

যে-জীবন সর্ব্বদাই এগিয়ে যাবার জন্যে ব্যাকুল এবং মহৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত, সে-জীবনই ধন্য—সে-ই সার্থক ও সুন্দর। আমাদের ভেতর এখনও এমন একজন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানবদরদী পুরুষ রয়েছেন, এ সৌভাগ্যের বিষয়। শ্রদ্ধার সঙ্গে বলবো তিনিই সর্ব্বজন-বরেণ্য নেতা স্বনামধন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। এ যুগের তিনি একটি প্রকাণ্ড বিস্ময়! অপূর্ব্ব প্রতিভার সঙ্গে প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তি ও বিচক্ষণতার এমন সুসংমিশ্রণ বড় দেখা যায় না। তিনি মনে-প্রাণে একজন খাঁটী বাঙ্গালী—বাঙ্গালার মহৎ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির তিনি আজীবন ধারক, বাহক ও পরিপোষক। একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর নাম শুধু বাঙ্গালা ও ভারতের সীমারেখার মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি, সাগরপারের দূর দিগন্তের দেশগুলিতেও ছড়িয়ে আছে। "নিদানে বিধান" এই কথাটি আজ ঘরে ঘরে প্রবাদ বাক্যে পরিণত। স্বাধীন বাঙ্গালা তথা ভারতের সংগঠনে তাঁর বলিষ্ঠ-নেতৃত্ব, অনন্যসাধারণ সৃজনী-শক্তি ও অমূল্য অবদান অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে যাবে—এ অবিসংবাদী সত্য।

১৮৮২ সালের ১লা জুলাই পাটনায় বিজ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ জননায়ক ডাঃ বিধানচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র রায় ছিলেন তৎকালে সেখানকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। ডাঃ রায়ের পৈত্রিক বাসভূমি খুলনা জেলার শ্রীপুর গ্রামে। এটি যেমন একটি ঐতিহাসিক গ্রাম তেমনি সেখানকার এ রায়পরিবারও সম্ভ্রান্ত ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। "যশোরনগর ধাম প্রতাপ-আদিত্য নাম"—বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর মুক্তি-সংগ্রামের মহানায়ক বার ভূইঞার অন্যতম প্রধান মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বংশধরই ডাঃ বিধানচন্দ্র আজিকার পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধার। তাঁর উপর মাতা-পিতার চারিত্রিক প্রভাব শৈশব অবস্থাতেই বিশেষ ভাবে কাজ আরম্ভ করে। উত্তরকালে তিনি যে প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদার সু-উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হ'তে পারলেন তার প্রেরণার বীজ রোপিত হয় এখানেই।

ডাঃ রায়ের পড়াশুনো আরম্ভ হয় পাটনায়—প্রথমে স্কুলে ও তার পর কলেজে। বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদ-ধন্য জীবন প্রতি পরীক্ষাতেই কৃতিত্বের পুরস্কার নিয়ে এগিয়ে চললো। স্কুলে পড়বার সময় সাধারণ ছেলেদের মতই তাঁর চাল-চলন ছিল। খেয়ালের বশে ক্লাস ছেড়েও যে দু'চার বার না পালিয়েছেন এমন নয়। কিন্তু তাই বলে তাঁর অগ্রগতি ও জয়যাত্রা কখনই প্রতিহত হয়নি।

প্রথম থেকেই তাঁর ভেতর অপূর্ব্ব মেধা ও বিচারশক্তির স্ফুরণ দেখা যায়। তাঁর নিজেরও দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে-দিকেই তিনি যান না কেন পিছু হটে আসবেন না। কার্য্যতঃ দেখা যেতে লাগলো ঠিক তাই-ই। পাটনা কলেজে পড়াশুনো শেষ করে যখন কলকাতায় আসেন তখন তাঁর সামনে প্রশ্ন উঠলো মেডিকেল লাইনে পড়বেন কি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বেন। ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্যই অবশ্য তাঁর প্রথম আগ্রহ ছিল। দুই জায়গায়ই ভর্ত্তি হ'বার জন্য তিনি আবেদন করলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, প্রথম অনুমতি-পত্র পেলেন মেডিকেল কলেজ থেকে। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ভর্ত্তি হবার অনুমতি-পত্র কয়েক ঘণ্টা পর তাঁর হাতে এসে পৌঁছায়। তিনি একটুও অপেক্ষা করে থাকলেন না। সামনে যে সুবর্ণ সুযোগ পেলেন সেটিই গ্রহণ করলেন। ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার আগ্রহ তিনি আর মনে স্থান দিলেন না। এ যদি না হ'তো, বিশ্ববাসী হয়তো ডাঃ রায়কে একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর পরিবর্তে শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার-রূপে দেখতে পেত।

মেডিকেল কলেজে ডাঃ বিধানচন্দ্র ছাত্র হিসেবে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে চললেন। অধ্যাপকমণ্ডলী অনেকেই বুঝতে পারলেন এ যুবক অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন, চিকিৎসা-জগতে একদিন শীর্ষস্থান অধিকার করবেন, এ নিঃসন্দেহ। ১৯০৮ সাল—বিধানচন্দ্রের বয়স মাত্র ২৬ বৎসর। এ সময়েই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রি এম, ডি লাভ করলেন। শিক্ষানুরাগী বাঙ্গালা ও ভারতের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি তখনই তাঁর উপর প'ড়লো। ১৯০৬ সালে ডাক্তারীতে কৃতবিদ্য হওয়ার পরই তিনি অবশ্য চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। এম, ডি ডিগ্রিতেও ভূষিত হলেন ইতোমধ্যে কিন্তু তাঁর জ্ঞানপিপাসু মন এতেই তৃপ্ত হ'লো না। চিকিৎসা-শাস্ত্রে সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানলাভের কঠিন ব্যাকুলতা ও দুর্জ্জয় প্রত্যাশা নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন বিলেতে ১৯০৯ সালে। তখন তাঁর হাতে সম্বল ছিল ১২ শত টাকা। এ অর্থ দিয়ে তাঁকে দু'বছর যেমন করেই হোক কাটাতে হবে, তাই তিনি ফ্যাসনদুরস্ত নামকরা কোন হোটেলে আবাস নিলেন না। লণ্ডনের সব চেয়ে সস্তার একটি আবাসস্থল দেখে তিনি স্থান নিলেন। সেখানে খরচা লাগতো সপ্তাহে মাত্র ১৬ শিলিং, এ ভাবে বহু রকমের দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়ে তিনি নিজের মহত্তর সঙ্কল্পকে সফল করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেন। তারপর একদিন তাঁর এ অদম্য সাধনায় চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ ঘটলো—তিনি ক্রমে এল, আর, সি, পি (লণ্ডন), এম, আর, সি, এস (ইংল্যাণ্ড), এম, আর, সি, পি (লণ্ডন), এফ, আর সি, এস (ইংল্যাণ্ড) উপাধিতে ভূষিত হন এবং সুধীসমাজের প্রভূত প্রশংসা অর্জ্জন করেন।

সাফল্যের জয়তিলক পরে ডাঃ বিধানচন্দ্র ফিরে এলেন স্বদেশে ১৯১১ সালে। কিন্তু দারিদ্র্য ও অর্থাভাব তখনও তাঁর পিছু ছাড়েনি। সাগরপার থেকে এসে যখন তিনি দেশের মাটিতে পদার্পণ করলেন তখন তাঁর হাতে মাত্র ক'টি টাকা সম্বল ছিল। কিন্তু এই দুর্গতির মধ্যেও তিনি একদিনের জন্যেও ধৈর্য্য ও আত্মবিশ্বাস হারালেন না। সামান্য অর্থের পুঁজি এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রে অসামান্য জ্ঞান ও অধিকার নিয়ে তিনি চিকিৎসা ব্যবসা সুরু করে দিলেন ক'লকাতা মহানগরীর বুকে। ভাগ্যলক্ষ্মী অল্প দিন মধ্যেই তাঁর প্রতি সুপ্রসন্না হলেন এবং ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে—দেশ হ'তে দেশান্তরে। দীর্ঘ ৪০ বছর এ ভাবে চললো তাঁর দুর্গত মানবসেবার ব্রত। কত হাজার হাজার নর-নারী ও শিশু তাঁর সিদ্ধ হস্তের স্পর্শ পেয়ে যে ব্যাধি-মুক্ত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নাই। অপর দিকে সমসাময়িক কালের এমন কোন মনীষী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নেই, প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে যিনি ডাঃ বিধান-চন্দ্রের পরামর্শ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি বা করছেন না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন থেকে আরম্ভ ক'রে নেতাজী সুভাষচন্দ্র, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, লালা লাজপত রায়, ডাঃ এম, এ, আনসারী প্রমুখ সকলেই কোন না কোন সময়ে চিকিৎসা-শাস্ত্রে "ধন্বন্তরি" ডাঃ বিধানচন্দ্রের দ্বারা চিকিৎসিত হ'য়েছেন। এখন এমন দাঁড়িয়ে গেছে যে, এ যুগে ডাক্তার বা চিকিৎসক বলতে শুধু বাঙ্গালায় নয়, সারা ভারতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কেই বোঝায়।

ডাঃ বিধানচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন একটি বিরাট অধ্যায়। ১৯২৩ সালে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন এবং প্রকাশ্য ভাবে যোগদান করেন রাজনীতিতে। এ বৎসরই বঙ্গীয় আইন সভা নির্ব্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে স্বরাজ্য দলে পূর্ণ সমর্থনে তিনি ভারত-বিখ্যাত নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করে নির্ব্বাচিত হন ২৪ পরগণা জেলার উত্তর মিউনিসিপ্যাল কেন্দ্র থেকে। এর পরেই তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং গান্ধীজীর নির্দ্দেশিত পথে দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। সেই থেকে অদ্যাবধি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে তিনি সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। ১৯২৮ সালে মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ক'লকাতা কংগ্রেসে ডাঃ রায় অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসেবে ৬ মাস কারাবরণ করেন। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন-সভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা স্থির ক'রলে ডাঃ রায় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের প্রথম সম্পাদক হন। প্রাক্-স্বাধীনতার যুগে তিনি কয়েক বছর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দায়িত্বশীল সদস্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এবং

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

বর্ত্তমানেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একজন বিশিষ্ট সদস্য। ডাঃ রায় কিছু কাল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিও ছিলেন।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে ডাঃ রায় গান্ধীপন্থী এবং অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু এ সত্ত্বেও বাঙ্গালার নির্য্যাতিত বিপ্লবীরা তাঁর প্রাণখোলা শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি থেকে কোন দিনই বঞ্চিত হননি। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের দুঃসাহসী সৈনিক দল যখনই তাঁর কাছে সাহায্যের জন্যে তাকিয়েছেন তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে গোপনে তাদের অজস্র অর্থ দান করেছেন। দেশের ও জনগণের সেবা বরাবরই তাঁর দৃষ্টিতে সব চেয়ে বড় জিনিষ এবং এর জন্যে তিনি পার্থিব সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই বিসর্জ্জন দিয়েছেন।

সমাজসেবার ক্ষেত্রেও ডাঃ রায়ের অবদান অসামান্য। আর্ত্তের দুঃখে অভিভূত হ'য়ে তিনিই সর্ব্বপ্রথম অগ্রণী হ'য়ে আরও কয়েকজনের সহায়তায় চিত্তরঞ্জন সেবাসদন ও যাদবপুর যক্ষ্মা-হাসপাতাল (যা বর্ত্তমানে কে, এস, রায় যক্ষ্মা-হাসপাতাল নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠা করেন। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ (বর্ত্তমানে যা আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নামে পরিচিত)—এর মূলেও রয়েছেন ডাঃ বিধানচন্দ্র। দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়ন ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ও প্রচেষ্টার সীমা নাই।

ডাঃ রায়ের শিক্ষানুরাগ তাঁর সাফল্যময় জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য দিক। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর প্রায় দীর্ঘ ৪০ বৎসরের যোগাযোগ। ১৯১৬ সালে তিনি প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। তার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্টস্ বোর্ডের সভাপতি ও সিণ্ডিকেটের সদস্য-পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৪২ সন হ'তে ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত দু' বৎসর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন। ভাইস-চ্যান্সেলার থাকা কালীন তাঁরই পরিকল্পনানুসারে সর্ব্বপ্রথম এই বিশ্ববিদ্যালয়ে "ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্স শিক্ষা ক্লাসের" উদ্বোধন হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে "সোস্যাল ওয়ার্কার্স ট্রেনিং ব্যবস্থা" প্রবর্ত্তিত হয়েছে সে-ও ডাঃ রায়ের প্রচেষ্টার ফল। ১৯৪৪ সালে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর অফ সায়েন্স উপাধিতে ভূষিত করেন। যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি হিসেবেও তিনি জাতি গঠনের ক্ষেত্রে যে অপূর্ব্ব কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, বাঙ্গালার সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

কর্ম্মক্ষেত্রে ডাঃ রায় যে-দিকেই হাত দিয়েছেন সেখানেই গড়ে উঠেছে সাফল্যের অক্ষয় সৌধ। ক'লকাতা মহানগরীর বহুমুখী উন্নতির জন্য তার প্রচেষ্টা ও উদ্যমের কোন কালেই অভাব ঘটেনি। ক'লকাতা কর্পোরেশনের তিনি কয়েক বছর অল্ডারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তার পর আপন যোগ্যতা বলে দু'বার কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হন। চিকিৎসা-জগতেও নানা ভাবে তাঁর অপরিসীম অবদান রয়েছে। ১৯৩৫ সালে তিনি রয়েল সোসাইটি অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন ও হাইজিনের ফেলো হন এবং ১৯৪০ সালে আমেরিকান সোসাইটির বক্ষ চিকিৎসকমণ্ডলীর সদস্য হন। ১৯৪১ সালে ডাঃ রায় বেঙ্গল মেডিকেল ষ্টেট ফ্যাকাল্টির সদস্য হন। তিনি ১৯৩৯ ও ১৯৪৪ সালে দু'বার ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৩ সালে তিনি নিখিল ভারত লাইসেনসিয়েট এসোসিয়েশনের সভাপতি হন ভারত সরকার কর্ত্তৃক গঠিত ভোর কমিটিতে তিনি একজন সদস্য ছিলেন।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশ যখন বিভক্ত হ'লো এবং সমস্যাসঙ্কুল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সৃষ্টি হ'লো তখন বাঙ্গালীর একান্ত প্রিয় নেতা, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ-সিংহ ডাঃ বিধানচন্দ্র চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। কি করে রাজ্যের দুর্গত মানুষের সেবায় নিজেকে ব্যাপৃত করতে পারেন তার জন্য তাঁর প্রাণে জাগলো প্রচণ্ড ব্যাকুলতা। দেশ বিভাগ হ'তে না হ'তেই পূর্ব্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ নর-নারী ও শিশু উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গের দ্বারে আশ্রয়প্রার্থী হ'লো। এর ফলে দেখা দিল এক জটিলতর সমস্যা। রাজ্যের অভ্যন্তরেও সে সময়ে নানা ক্ষেত্রে অশান্তি ও উত্তেজনা চ'লছিল। এ মহাসঙ্কটের মুহূর্ত্তে পশ্চিমবঙ্গের শাসন-ব্যবস্থার যোগ্যতম কর্ণধার হিসেবে দেশবাসী শরণাপন্ন হলেন ডাঃ বিধানচন্দ্রের। রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির আস্থা হারালেন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি পদত্যাগ করেন। ডাঃ রায় তাঁর প্রিয় দেশবাসীর অকুণ্ঠ আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারলেন না—নবগঠিত ছিন্নাঙ্গ বহু সমস্যা-কণ্টকিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শাসন পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের সর্ব্বত্র এক অপূর্ব্ব প্রেরণার সঞ্চার হ'লো।

প্রধান মন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হ'য়েই ডাঃ বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের জরুরী সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য একান্ত ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই—কি সেক্রেটারিয়েটে কি নিজ বাসভবনে বসে এই কর্ম্মযোগী সৃজনী-শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ভেবে চললেন দিন-রাত, কি করে দেশের কল্যাণ-সাধন করা যায়। শুধু ভাবনা নয়, ভাবনার সঙ্গে কাজও চললো অবিরাম গতিতে। দেখতে দেখতে অল্প দিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চেহারা বদলে দিলেন—আশা ও বিশ্বাস জাগলো জাতির প্রাণে অনেকখানি। উদ্বাস্তু-সমস্যা যা উপেক্ষিত হ'য়ে আসছিল ডাঃ রায় সে সমস্যাটিকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে অগ্রাধিকার দিলেন। এ বিরাট সমস্যা সমাধানে ডাঃ রায়ের অবদান অসামান্য। এ পর্য্যন্ত এ ব্যাপারে যা কিছু করা হ'য়েছে ও হচ্ছে তা সমস্তই তাঁর প্রচেষ্টায়। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ও অপরাপর সমস্যা সমাধানের জন্যও তিনি যে সকল সুপরিকল্পিত কাজ করেছেন ও এখনও করছেন এবং এ রাজ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে তাঁর যে অদম্য প্রয়াস, জাতির সম্মুখে এ একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হ'য়ে থাকবে।

ডাঃ বিধানচন্দ্র বর্ত্তমানে ৭৩ বৎসরে পদার্পণ করলেও যুবকের ন্যায়ই অক্লান্তকর্ম্মী। কর্ম্মই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ও আদর্শ। জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিয়ে দেশ ও জাতির হিতার্থে সর্ব্বক্ষণ তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বশীল পদে তিনি আজও পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত, এ বাঙ্গলার সৌভাগ্য! তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙ্গালী যে লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে সমর্থ হবে, এ আশা করার যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁর কতখানি মানবদরদী প্রাণ—কর্ম্মের ভেতর দিয়েই প্রতিনিয়ত তার প্রমাণ ও পরিচয় দিয়ে চলেছেন। তাঁকে পেয়ে বাঙ্গালা ধন্য, ভারতও ধন্য।
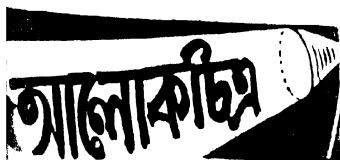
শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে অপেক্ষমান কিশোর-কিশোরী

মহাকাল মন্দির (দার্জ্জিলিং) —কনক সেন

কার্ত্তিকেয় মন্দির (পুণা)
—সত্যেন্দ্রনাথ সাহা

৩ শিল্পাচার্যের শোভাযাত্রা —চঞ্চল মিত্র
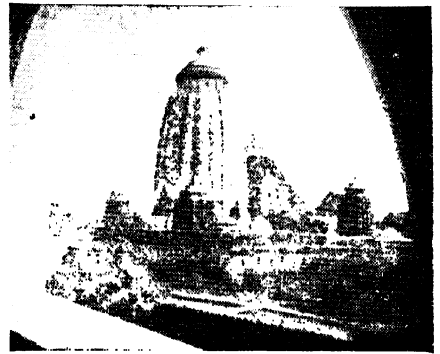
পুরীর মন্দির —সবিতা হালদার

ভুবনেশ্বরের মন্দির
—মণি বাগ

ভারতমুক্তির মন্ত্রণা

নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ডে

ডক্টর অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পি, এইচ, ডি

পদ্মনাভম পিলাই

১৯১৩ অব্দের ডিসেম্বর মাস। আমি জার্ম্মানীর হালে (Halle) বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিকেল ইনষ্টিটিউটে রাসায়নিক গবেষণায় ব্যাপৃত, সেই সময়ে সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী বেয়ার্ণ (Bern) হইতে ট্রাঙ্ক-টেলিফোনে আমার ডাক আসিল, কথা বলিলেন—ভারতীয় উগ্র-জাতীয়তাবাদী সি, পদ্মনাভম পিল্লাই। তিনি সংক্ষেপে সামান্য ভূমিকার পর বলিলেন যে, সম্প্রতি "ফ্রাঙ্কফুর্টের সাইটুং" (Frankfuerter Zeitung) এর আলোচনা পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের "রেইস কনফ্লিক্ট" (Race Conflict) নামক বক্তৃতার যে জার্ম্মেণ অনুবাদ (Rassen Kamf) আমি প্রকাশ করিয়াছি তাহা পাঠ করিয়া তিনি পুলকিত হইয়াছেন। ভারতের এই মনীষীর স্পষ্ট ভাষণ যথাযথ ভাবে অনূদিত করিয়া আমি বস্তুতঃই দেশের কল্যাণ সাধন করিয়াছি। তিনি তজ্জন্য আমাকে অভিনন্দিত করিলেন এবং উক্ত ভাষণটি তাঁহার সম্পাদিত "প্রো-ইণ্ডিয়েন" (Pro-Indian) পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত এবং ফ্রেঞ্চ ও ইটালিয়ান ভাষায়ও তাহা অনুবাদের অধিকার চাহিলেন।

সুইজারল্যাণ্ডের বেয়ার্ণ সহরেই ছিল তাঁহার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র। তিনি "প্রো-ইণ্ডিয়া সোসাইটী" প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজেই ইহার সভাপতি এবং "প্রো-ইণ্ডিয়েন" পত্রিকার সম্পাদক ভাবে ভারত-মাতার মর্ম্মান্তিক অবস্থা ইউরোপে বিজ্ঞাপিত করেন।

সোমালীল্যাণ্ডের মোল্লা সেই সময়ে তাঁহার দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া এংগ্লো-ফ্রেঞ্চ শক্তির দাপট চূর্ণ করার চেষ্টায় আমরণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। এংগ্লো-ফ্রেঞ্চ সংবাদপত্র সমূহে তাঁহাকে "পাগলা মোল্লা" আখ্যা দিয়া তাঁহার কার্য্যাবলীর বিবরণ নিত্য প্রকাশিত হইত। "প্রো-ইণ্ডিয়েন" পত্রে পিলাই প্রকাশ করিলেন :—

"সোমালীল্যাণ্ডের জাতীয়তাবাদী মোল্লা কি উন্মাদ ?" তিনি বিস্তৃত প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিলেন "তাহা হইলে পয়েনকার, এসকুইথ প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়কগণ সকলেই ত উন্মাদ !"

মধ্য-ইউরোপের সকল সমাজতন্ত্রী সংবাদপত্রেই এই প্রবন্ধের উদ্ধৃতি মন্তব্য সহ প্রকাশিত হইল। পিলাই সুইজারল্যাণ্ডে বিভিন্ন সহরের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সমূহে এবং "ইয়ং ম্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েশন" হলে প্রায়শঃ বক্তৃতা দিয়া ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য এবং পরপদানত হওয়ায় তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-পথের বিঘ্ন সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতেন। তিনি এক জন বিপ্লববাদীও ছিলেন, সুতরাং তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলাম। প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণ ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করার অধিকার দিলাম।

প্রকৃত পক্ষে আলোচ্য অনুবাদটি আমার নামে প্রকাশিত হইলেও আমি অনুবাদ করি নাই। অনুবাদক ছিলেন বার্লিনের অন্যতম অধ্যার্থী ধীরেন্দ্রকুমার সরকার (অধ্যাপক বিনয় সরকারের অন্যতম কনিষ্ঠ ভ্রাতা) এবং তাঁহার পরিচিতা জনৈকা জার্ম্মেণ শিক্ষয়িত্রী। তাঁহারা মিলিত ভাবে, প্রবন্ধটি এবং রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা, গল্প ও সঙ্গীত অনুবাদ করিয়াও সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশ করার সুযোগ পাইলেন না। অগত্যা আমার শরণাপন্ন হইলেন।

অপর দিকে নবেম্বরের ১৪ তারিখের প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জার্ম্মেণ পত্রিকা সমূহ অষ্ট্রিয়ান নাট্যকার পিটার-রোজেগার (Peter Rosegar)-কে অবজ্ঞা করিয়া সুদূর প্রাচ্যের অজ্ঞাত অখ্যাত এক রাজপুত্রকে (কোনো কোনো পত্রে রবীন্দ্রনাথকে মহারাজার পুত্র বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছিল) পুরস্কৃত করা যে নিতান্ত অসমীচীন ও অযৌক্তিক হইয়াছে এবং ইহাতে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর ও সাহিত্যসেবিগণের পাকচক্র রহিয়াছে এরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইল। "লুষ্টিগে ব্লাটার" (Lustige Blaetter) নামক ব্যঙ্গপত্রের প্রচ্ছদপটেই একটি চিত্রে দেখা গেল ইংলিশ ও সুয়েডিশ সাহিত্যিকগণ দূরবীণ লইয়া আফ্রিকার জঙ্গলে নোবেল পুরস্কার প্রদান উপযোগী সাহিত্যিক খুঁজিতেছেন এবং অন্যান্য বহু প্রকার বিদ্রূপ !

এই সময়ে আমি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভ্রম নিরসনের জন্য প্রায় ৪ কলমব্যাপী একটি প্রবন্ধ "বার্লিনেয়ার টাগেব্লাট" (Barliner Tageblatt) পত্রিকায় প্রেরণ করিলে সম্পাদক তাঁহাদের "মন্তব্য অক্ষুন্ন রাখিয়া প্রবন্ধে বহু অজ্ঞাত তথ্য রহিয়াছে বলিয়া" ইহা সাগ্রহে প্রকাশ করিলেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া আরও কয়েকটি প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া [illegible]

বিভিন্নমুখী কর্ম্মধারার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম। ইহাতে সুধী-সমাজে পরিচয়, কতকটা খ্যাতি এবং কিছু অর্থলাভও হইল।

দীবেন সরকার এ জন্যই মনে করিলেন আমার মত যশস্বী (!) লেখকের নাম থাকিলে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। সম্ভবতঃ তাঁহার আশা পূর্ণ হইল এবং দক্ষিণা ১০০ মার্ক (তৎকালে ৭৫১) পাইয়া আমি যখন তাহা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলাম তখন তিনি পুনরায় ৫০ মার্ক আমাকে পাঠাইলেন।

রবীন্দ্রনাথ "নিউ ইয়র্কের" রসেষ্টারে (Rochester) "কংগ্রেস অব দি ন্যাশনেল ফেডারেশন অব রেলিজিয়াস লিবারেলস"এর অধিবেশনে ইহা অভিভাষণ ভাবে পাঠ করেন। লোষ্টনের "দি ক্রিশ্চিয়ান রেজিষ্টার" এবং অন্যান্য কতকগুলি দার্শনিক সংবাদপত্রেও ইহা সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

"মডার্ণ রিভিউ"তে ১৯১৩ অব্দের এপ্রিল মাসে (অর্থাৎ নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির ৮ মাস পূর্ব্বেই) প্রকাশিত হইয়াছিল।

টেলিফোনে পিলাইর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার পরদিনই সন্ধ্যাবেলায় এক প্যাকেট "প্রো-ইণ্ডিয়ান" ডাকে আসিয়া পৌছিল। সংখ্যাগুলি বাছাই করা, মাঝে মাঝে রঙীন পেন্সিলে দাগ দেওয়া। একটি দাগ-দেওয়া প্রবন্ধ ছিল—রাশিয়ার জার, দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের হত্যা-কাহিনী। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ—"উদ্ধারকর্ত্তা জার" (Czar Liberator) আখ্যাত সম্রাট যখন অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় এক বিরাট মিলিটারী প্যারেড দর্শন করিয়া সেণ্ট পিটার্সবার্গে (বর্ত্তমানে লেনিনগ্রাড) সহরের থিয়েটার বাঁকের দিকে আসিতে-ছিলেন সেই সময়ে নিকোলাস ডোয়ানভিচ রিসাকভ (Nicholas Doanovitch Rissakov) নামক মুক্তিকামী তরুণ তাঁহার গাড়ীর পার্শ্বে আসিয়া রুমালে-বাঁধা একটি বোমা নিক্ষেপ করিলেন। ইহা আকাশভেদী শব্দে বিস্ফোরিত হইল, দুই জন গার্ড এবং অদূরে দণ্ডায়মান একটি বালক নিহত হইল। জার গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া স্থানটি পরীক্ষা করিতেছিলেন, ৫ মিনিট মধ্যেই জনৈক পোলিশ বিপ্লবী তরুণ আর একটি বোমা নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে জার সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া "উইণ্টার পেলেসে" নীত হইলেন এবং ৪-২৫ মিঃ সময়ে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। পোলিশ বিপ্লবী ছিলেন গ্বিভিনভেৎস্কী (Gvinivetzki)। পিলাই হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উক্ত দুই তরুণের বর্ণনা করিয়া "জার লিবারেটারে"র (Czar Liberator) সিকি শতাব্দী-কালব্যাপী শাসন ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যে ইহারা এই কার্য্য করিয়াছেন তাহা সমর্থন করিয়াছেন।

এরূপই ছিল পিলাইর লেখনী সঞ্চালন। তিনি শ্যামজী কৃষ্ণ বর্ম্মার "ইণ্ডিয়ান সোসিওলোজিষ্ট" পত্রের মত না হইলেও অনেকটা ঐ ধরণের প্রবন্ধই প্রকাশ করিতেন।

উগ্র জাতীয়তাবাদী সিদ্দিক!

ইহার দুই দিন পরেই "গোয়েটিংগেন" (Goettingen) বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ী আর এক উগ্র জাতীয়তাবাদী সিদ্দিক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কেমিকেল ইনষ্টিটিউটে উপনীত হইলেন। তাঁহাকে লইয়া দারুণ শীতের মধ্যেই একটা পার্কের কোণে বসিলাম। তিনি [illegible]বাদ গভর্ণমেণ্ট প্রেরিত ছাত্র, বার্ষিক ৪৫০ পাউণ্ড বৃত্তি পান, ঘনের বিষয় ইতিহাস, সঙ্গে বাধ্যতামূলক দর্শন এবং অতিরিক্ত বিষয় আরবী, পার্শী সাহিত্য, ল্যাবরেটারী ব্যয়ও নাই, আনুসঙ্গিক ব্যয় নামমাত্র। এজন্য নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেন। তাঁহাকে আমরা "তালাৎ বে" আখ্যা দিয়াছিলাম। তালাৎ বে (Talat Bey) ছিলেন নব্য তুরস্কের পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী। তিনি সর্ব্বদাই রাজনৈতিক কার্য্যে বিভিন্ন দেশে পর্য্যটন করিতেন। জার্ম্মেণীতে আমরা কয়েক বার তাঁহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়াছি। সিদ্দিক বলিলেন।—

"শুনুন, একটা শুভ সংবাদ। আমাদের বন্ধু, সমগ্র এশিয়ার বন্ধু, নব্য গণতন্ত্রী চীনের অন্যতম রাষ্ট্রসচিব ডক্টর ইয়েন শীঘ্রই প্যারিস হতে বার্লিনে আসছেন। আমরা এশিয়ার যুবগণের পক্ষ থেকে বার্লিনে তাঁকে এক প্রীতিভোজে সংবর্দ্ধিত করবো, কিন্তু জাপানী ছাত্রগণকে ডাকবো না, তারা আসবেও না।"

তারপর তিনি বলিলেন—"আমাদের কর্ত্তব্য হবে আইরিশ, পোলিশ, নবতুর্কী এবং জাতীয়তাবাদী মিশরীয়গণকে আহ্বান করা, তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাদেরই মত"।

অতঃপর তিনি আরও বলিলেন "আমাদের জোর বরাত থাকলে হয়ত এই সম্মেলনে তালাৎ বে, মুস্তাফা কামাল পাশা, মিশরের জাতীয়তাবাদী ফরিদবেকেও পেতে পারি।"

"আমি আজ রেয়ার্ণ হতেই এলাম। সেখানের আইরিশগণ সানন্দে যোগ দেবেন। পিলাই বললেন, "তাঁরা চার-পাঁচ জন অবশ্য উপস্থিত হবেন। জুরিখ এবং বাসেলেও গিয়েছিলুম, তথাকার বন্ধুগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মতই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সম্মত।"

এবার তিনি বললেন "চলুন, একটা রেষ্টোরেণ্টে যেয়ে সান্ধ্য-ভোজটা সেরে নেই।"

আমি বললাম, "না, চলুন আমার কক্ষে। ডিমের ওমলেট [illegible] খিচুড়ী খাবেন।"

সিদ্দিক সাহ্লাদে বলিলেন, "জিহ্বায় জল সঞ্চার হচ্ছে, চলুন। বার্লিনে ডক্টর চক্রবর্ত্তী এবং ডক্টর দাশগুপ্তের বাটীতে আপনার রাঁধা খেয়েছি, আপনার রাঁধার প্রশংসা তাঁরা উভয়ে, এমন কি ডক্টর মিত্র, ডক্টর হরিশচন্দ্র, দেশাই প্রমুখ সকলেই করেছেন।"

আমার কক্ষে আসিয়া উভয়ে মথিত পনীর সহযোগে কোকো পান করিলাম। অতঃপর গ্যাস-ষ্টোভে খিচুড়ী চাপাইয়া [illegible] বিষয়ের আলোচনায় মগ্ন হইলাম।

সিদ্দিক দৃঢ় প্রকৃতির জাতীয়তাবাদী ছিলেন। মাসিক [illegible] পাঁচ শতাধিক টাকা। তথাপি তিনি কোনো প্রকার [illegible] চলিতেন না। ইউরোপে অধ্যয়ী মুসলমান ছাত্রগণ [illegible] ইউরোপীয়ান মহিলার সঙ্গে বিবাহিত নহেন কিম্বা এক [illegible] বসবাস করেন না এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল, বিরলের অন্তর্গতই ছিলেন সিদ্দিক, এজন্য তিনি জাতীয়তাবাদ প্রচারকারিগণকে সময়ে [illegible] অর্থসাহায্য করিতেও ত্রুটী করিতেন না।

১৯১৪ অব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের কালে আমরা যখন "[illegible] ভারত উদ্ধার" উদ্যোগ আরম্ভ করি সেই সময়ে তিনিও [illegible] যোগদান করেন। পরে হায়দরাবাদ উস্মানিয়া কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া ১৯৪৭এ দেশবিভাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তথায়ই আছেন, এই সংবাদও বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে পাইয়াছিলাম। তার পর আর তাঁহার সংবাদ অবগত নহি।

সিদ্দিক বলিলেন, "সুইজারল্যাণ্ড এক অদ্ভুত দেশ। ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র 'স্যান ম্যারিনো' ব্যতীত এত দীর্ঘকালের গণতান্ত্রিক নিরপেক্ষ দেশ আর নেই। এ জন্যই পিলাই পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে সেখানে গায়ের ঝাল মিটিয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী বিষোদ্গার করতে পারছেন। আমাকে বললেন, খৃষ্টমাসের ছুটিতে এখানে আসুন। অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব নিয়ে একটা সম্মেলনে দেশমাতৃকার বন্ধনমুক্তির জন্য সুচিন্তিত কর্ম্মধারা প্রস্তুত ক'রে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি।"

আমি বলেছি, "বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে মতামত জানাব।"

ক্ষণিক ধূম্রপানের পর বলিলেন, "মন্দ কি, প্যারিসে ম্যাডাম কামার কর্ম্মকেন্দ্র এত সুপরিচিত হয়ে গেছে যে, তার সঙ্গে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে জার্মেনীতে কিছু করা আমাদের পক্ষে [illegible] আমার, [illegible] বিভিন্ন রাজ্য বা ভারত গভর্ণমেন্টের বৃত্তিপ্রাপ্ত [illegible] কঠিন, এমন কি বিপদসঙ্কুলও বটে। জার্মেনী ইংরাজকে খুব ক'রে শক্তি বিস্তারের প্রয়াসী, ওদিকে ফ্রান্স, রুশ, [illegible] ও [illegible] ক্ষমতাধারী সাম্রাজ্যবাদী ত্রয়ী শক্তির সমন্বয় (Triple Entante) জার্মেনীকে পর্যুদস্ত করবার আকাঙ্ক্ষায় নিয়ত [illegible] তোষামোদ করছে, নতুবা আমাদের [illegible] অধিকার [illegible] এত [illegible] কিছুটা [illegible]।"

সহসা তিনি বলিলেন, "যাক, আপাততঃ ডক্টর ইয়েনের সংবর্দ্ধনাটা শেষ হয়ে যাক্‌, দেখি, আমাদের কাঁধে কতটা বোঝা চাপে।"

অতঃপর রাত্রি নটায় হোটেলে সাক্ষাতের কথা [illegible] হইলেন। বাহিরে শীত পড়িয়াছে। [illegible] গায়ে দিয়া বাহির হইলাম।

তিনি হালের সর্ব্বশেষ [illegible] টুলিপে (Tulpe) উঠিয়াছেন। এই হোটেলেই [illegible] এক [illegible] লাড্ডু (Laddu) বাস করেন। তিনি মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। [illegible] তাঁহার বাড়ী, [illegible] মেয়রের জন্য বিখ্যাত। ১৯০৯ অব্দে বোমা নিক্ষেপের পর বিলাতে পার্লিয়ামেণ্টে [illegible] নিশ্চয় হইয়াছে। বোমা সংশ্লিষ্ট ধৃত যুবকগণের সঙ্গে লাড্ডুও জড়িত আছেন মনে করিয়া কিছু কাল পুলিশ তাঁহাকে [illegible] করিয়াছিল। অনেক ইউরোপীয় অধ্যাপকের চেষ্টায় তিনি বিপদমুক্ত হইয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি বার্ষিক ২৫০ পাউণ্ড পাইয়া [illegible] এবং এপিগ্রাফীর সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক হুলৎসের (Hultz) অধীনে ইণ্ডিয়ান এপিগ্রাফীতে গবেষণা করিয়াছেন। তিনি ত্রিবিক্রমের প্রাকৃত ব্যাকরণের ভাষ্য (Prolegomena to Tri-Bikram's Prakrit Grammer) লিখিয়া ডক্টরেটের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তিনি ১৯১৪ অব্দের প্রথম দিকেই "ডক্টর" হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং কাশী কুইন্স কলেজে অধ্যাপনা করার কালে ১৯২৩-২৪এর মধ্যে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

লাড্ডু সেদিনই প্রাতঃকালে তাঁহার বন্ধু—ইন্দোলজীর ছাত্র অধ্যাপক গুণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে লাইপজীগ গিয়াছিলেন। এজন্য সিদ্দিক তাঁহার সাক্ষাৎ পান নাই।

আমরা হোটেলে যাইয়া অবগত হইলাম যে, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজ কক্ষেই আছেন। আমরা উপস্থিত হইলে তিনি প্রীতি-প্রফুল্ল বদনে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন, তার পর বলিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমাদিগকেও নৈশভোজে বসিতে হইবে। কিন্তু সিদ্দিক যখন খিচুড়ীবার্ত্তা দিলেন তখন তিনি খিচুড়ীর শোকে অভিভূত হইলেন। তিনি নিরামিষাশী কিন্তু অবাঙ্গালী নিরামিষ-ভোজীগণের মতই পেঁয়াজ-রসুনে আপত্তি নাই; অধিকন্তু ইউরোপের নিরামিষ ভোজনাগারে ডিম্বের প্রচলন দেখিয়া ডিম্বও দু'চারটি প্রত্যহ উদরস্থ করেন।

আমরা তাঁহার সঙ্গেই নিম্নতলে ভোজনাগারে যাইয়া টেবিলে উপবেশন করিলাম এবং কয়েক প্রকার মিষ্ট দ্রব্য ভোজন ও ছোট ছোট পেয়ালায় কৃষ্ণবর্ণ কাফি পান করিয়া বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করিলাম, ডক্টর ইয়েনের সংবর্দ্ধনা, বেয়ার্ণে সম্মেলন ইত্যাদি।

পরদিন প্রভাতে সিদ্দিক বার্লিনে চলিয়া যাইবেন, তিনি লাড্ডুকে চিন্তিতে বলিলেন, "শুনোন পণ্ডিতজী! আপনি ছাত্র [illegible] বার্লিন যাতায়াতের পাথেয় দিবেন, তিনি থাকবেন ধীরেন সরকারের কাছে, একটি রাতের ব্যাপার ত? আমি বার্লিনে ওঁর আহারের ভার এবং সংবর্দ্ধনা-ভোজের দেয় চাঁদা দিয়ে দিব। আমরা ভারত গভর্ণমেণ্টের বৃত্তিধারী, আর্ট কোর্সের অধ্যায়ী, শিক্ষাব্যয় প্রায় শূন্য। আর ওঁরা রাসায়নিক গবেষণাকারী; ল্যাবোরেটরী খরচ ইত্যাদিতে অনেক পয়সা ব্যয় যায়। আমরা এ সকল ব্যাপারে সাহায্য না করলে, ওঁর চলবে কেন?"

লাড্ডু সহাস্যে বলিলেন,—"ভাগাভাগি কেন বাপু? হয় সবটাই তুমি দাও, নয়ত আমাকেই দিতে দাও।"

আমি বলিলাম "লাড্ডু অনেক সময়েই দিয়ে থাকেন। গত প্যারিস যাত্রা সম্পূর্ণ ওঁর সাহায্যেই হয়েছে।"

সিদ্দিক বলিলেন,—"বেশ, বেশ, না হয় বেয়ার্ণ যাতায়াতের খরচটা আমিই দেব। কেমন?"

বার্লিনে চীন রাষ্ট্রসচিবের সংবর্দ্ধনা-ভোজ

[illegible] দিন পরেই সুরম্য মুদ্রিত পত্র পাইয়া জ্ঞাত হইলাম যে পরবর্ত্তী শনিবার সন্ধ্যা সাতটায় "হোটেল কাইজারীন আগষ্টে ভিক্টোরিয়া"র হলে সংবর্দ্ধনা-ভোজ অনুষ্ঠিত হইবে। সন্ধ্যাবেলায় লাড্ডুও আসিয়া এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে অপরাহ্ণ [illegible] গাড়ীতে আমরা উভয়ে বার্লিন যাত্রা করিলাম এবং বার্লিনে উপনীত হইয়া অগ্রে ধীরেন সরকারের বাটীতে যাইয়া ভোজসভার উদ্যোগ আয়োজনের বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাত হইলাম।

তিনি বলিলেন, চীনা ছাত্রসঙ্ঘ ভোজনের হল, চীন গণতন্ত্রের পতাকাদিতে সাজসজ্জার জন্য ৫০০ মার্ক দিয়াছেন। ভোজের কভার (Cover) চারি মার্ক করা হইয়াছে, তাঁহাদের জন্য ৫০ খানা আসন রিজার্ভ করার জন্যও ৬ মার্ক হিসাবে দিয়াছেন। আমাদের ন্যূনতম দেয় ৫ মার্ক হিসাবে দিলেই চলিতে পারে।

সুইজারল্যাণ্ড হইতে পদ্মনাভম পিলাই জনকয়েক বন্ধুসহ আসিয়া হোটেল কণ্টিনেণ্টালে উঠিয়াছেন। বাংলার পুরাতন অধ্যায়ী ডক্টর পি, সি, মিত্র, ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত বার্লিনে অনুপস্থিত। প্রথমোক্ত মিত্র মহাশয় দেশে, দ্বিতীয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় বুদাপেষ্টে এবং শেষোক্ত দাশগুপ্ত বাসেলে আছেন। শেষ দুই জন দুই ফ্যাক্টরীতে রাসায়নিকের কার্য্যে নিযুক্ত। ধীরেন সরকার, আমি এবং শরৎচন্দ্র দত্ত (কলিকাতার আদেয়ার দত্ত কোং

প্রতিষ্ঠাতা) এই তিন বাঙ্গালী সংবর্দ্ধনা-ভোজে যোগ দিলাম। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হইতে ৩০।৩৫ জন ভারতীয় উপস্থিত হইলেন এবং সানন্দে যোগ দিলেন।

সন্ধ্যাবেলায় উজ্জ্বল আলোকমালা-মণ্ডিত হলে প্রায় ২৫০ জন বিভিন্ন দেশীয় তরুণ ও প্রৌঢ়ের সম্মেলনে গণতন্ত্রী চীনের বার্লিনস্থ প্রথম রাষ্ট্রদূত বিপ্লবী নায়ক বর্ত্তমান গণতন্ত্রের অন্যতম রাষ্ট্রসচিব ডক্টর ইয়েন সহ সভায় উপনীত হইলেন। জাৰ্ম্মেণীর কতিপয় চীনা ভাষাবিদ অধ্যাপক ও ছাত্র এবং চীনবিপ্লবে পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে সাহায্যকারী ব্যক্তিগণ যথা—হামবুর্গ আমেরিকা লাইনের অধ্যক্ষ স্যার আলবার্ট বার্লিন (ইনিই ১৯১৪ অব্দে আমাদের ভারতবন্ধু জাৰ্ম্মেণ সমিতির প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন) চীনাভাষাভিজ্ঞ ডক্টর মুলার (ইনি ১৯১২ অব্দে চীন দেশে জাৰ্ম্মেণ গভর্ণমেণ্ট এবং চীনবিপ্লবের নায়কগণের মধ্যে লিয়াসন অফিসার ছিলেন, পরবর্ত্তী কালে ১৯১৪ অব্দে তাঁহাকে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে আনয়ন করিয়া জাৰ্ম্মেণ গভর্ণমেণ্ট এবং আমাদের মধ্যেও লিয়াসন অফিসার করা হয়) প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তিকেও সম্মেলনে দেখিয়া প্রীত হইলাম।

এক জন চীনা ছাত্র চীনের জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া সভার উদ্বোধন করিলেন। ইহা আমাদের দেশের পদাবলীর মত বা বর্ত্তমান যুগের গণসঙ্গীতের মত মনে হইয়াছিল।

এশিয়ার যুবগণের পক্ষ হইতে আমাদের সহকর্ম্মী সিদ্দিকই জাৰ্ম্মেণ ভাষায় সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ দিয়া সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন।

চীন রাষ্ট্রসচিবের অভিভাষণ

উত্তরে ডক্টর ইয়েন প্রায় ৪৫ মিনিট কাল সুশ্রাব্য জাৰ্ম্মেণ ভাষায় সুস্পষ্ট ভাষণ দিলেন। তিনি চীনবিপ্লবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বার্লিনে চারি-পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করেন এবং পরে আমরা জানিতে পারি যে, জাৰ্ম্মেণ পররাষ্ট্র দপ্তর সংস্পৃষ্ট কোনো একটি ধনিকমণ্ডলীর নিকট হইতে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য পাওয়ার প্রতিশ্রুতি লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৯১১-১২ অব্দের বিপ্লব কালে ডক্টর স্যান ইয়াৎ সেনের অবিস্মরণীয় আত্মোৎসর্গের কাহিনী তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বর্ণনা করিয়া বলেন যে, ভগবান প্রেরিত তাঁহাদের এই গণনায়ক এবং তাঁহার অগণিত সহকর্ম্মিগণের আকাঙ্ক্ষা এই যে, চীনরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সুইজারল্যাণ্ডের আদর্শে সুগঠিত করা। ক্ষুদ্র একটি পার্ব্বত্য-প্রদেশ এই সুইজারল্যাণ্ড, চীন এবং ভারতবর্ষের এক একটি জেলা হইতেও ক্ষুদ্র, মাত্র ১৬০০০ বর্গ-মাইল স্থান লইয়া এই দেশটি, তার লোকসংখ্যা মাত্র চল্লিশ-একচল্লিশ লক্ষ। তার মধ্যে ৩০ লক্ষ লোকের কথ্য ভাষা জাৰ্ম্মেণ আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের ভাষা ফ্রেঞ্চ এবং মাত্র দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের ভাষা ইটালিয়ান, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনটি ভাষাই সমভাবে জাতীয় এবং অফিসিয়েল ভাষারূপে গণ্য হয়। তিন ভাষাতেই ইউনিভার্সিটি চলিতেছে। রাজ্য চিরকালই নিরপেক্ষ। নেপোলিয়নের রক্তচক্ষুতে যেমন দেশ বিপন্ন মনে করে নাই, বিসমার্কের জার্ম্মাণ রাষ্ট্রগঠন কালেও সে সন্ত্রাসিত হয় নাই। তিনটি ভাষাভাষী অঞ্চল কখনও তিন 'দিকে তিন শক্তিশালী রাষ্ট্র, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স এবং ইটালীর সঙ্গে সম্মিলিত হইতেও প্রয়াসী হয় নাই। সম্পূর্ণ ভাবে জাতি, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রগত নিরপেক্ষ এই ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী দেশ বহু দেশের বহু কারণে লাঞ্ছিত উৎপীড়িত জনগণকে সাদরে আশ্রয় দিয়া পৃথিবীতে এমনই অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক ইজ্জতের মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়াছে যে, বিভিন্ন দেশের ধনী-মানী ব্যক্তিগণ কোটি কোটি পাউণ্ড স্বর্ণমুদ্রা এই রাজ্যের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়া রাজ্যের স্বর্ণ-তহবিলকে সুপুষ্ট করিয়া বহু জাতি ও বহু লুণ্ঠনলোলুপ দেশের ঈর্ষানল প্রজ্বালিত করিয়াছে। এ রাজ্য আবহমান কাল হইতে সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্ব ভাবে জাতি সংঘাত, ধর্ম্মসংঘাত বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সমস্যায় বিচলিত হয় নাই বলিয়াই এ সকল সমস্যার উদ্ভবও সুইজারল্যাণ্ডে হয় নাই।

যে কোনো জাতি বা ধর্ম্মের অনুসরণকারিগণ যত নগণ্য তাহাদের সংখ্যা হউক, নিত্য আকাঙ্ক্ষা মত ন্যায় বিচার পাইয়া থাকে। জাতিতে জাতিতে ধর্ম্মে ধর্ম্মে সর্ব্ব প্রকারে যে ঐকতান নিত্য এই ক্ষুদ্র অথচ মহান দেশে ধ্বনিত হইয়া থাকে তাহা বিশ্বের অগণিত জাতি ও গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নরনারীর অনুসরণ হওয়া একান্ত বিধেয়। আমরা একাগ্র চিত্তে কামনা করি ঠিক সেনই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে আমাদের জনসংখ্যা জাতি, শ্রেণী, গোষ্ঠী, বহু ধর্ম্ম, বহু ভাষা মত ও পথের অনুসরণকারী বহু বহু বৈচিত্রপূর্ণ নানাভাষী বিভিন্ন প্রকৃতির কোটি কোটি নরনারীকে। আমরা চাই, ভগবান প্রেরিত আমাদের মহাজাতির মহানায়ক মহামানব স্যান ইয়াৎ সেনকে আদর্শ লইয়া মুক্তির পথে জীবনের পথে আলোকের বর্ত্তিকা লইয়া অগ্রসর হইতে, যেন দেশবাসীর রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্য নৈরাশ্যবাদের অন্ধকার বিদূরিত হয়, যেন জাতি একাত্মবোধে শক্তিশালী হইয়া পশ্চাতের কালিমা, বিপ্লবের রক্তবন্যা সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিয়া ভবিষ্যতের সহস্রাংশুর সহস্র কিরণরশ্মিতে সঞ্জীবিত হইতে পারে।

সুইজারল্যাণ্ডের বহির্গমনের পথ নাই, সমুদ্র-উপকূল নাই, নৌপোত নাই, তথাপি তাহার বহির্ব্বাণিজ্য দিনের পর দিন উন্নতির পথে চলিয়াছে। সর্ব্বশেষে বক্তা বলেন, ক্ষুদ্র সুইজারল্যাণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওয়াচগুলি যেমন পৃথিবীর দিবা-রাত্রি ওয়াচ করিয়া নিয়ামকরূপে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে, শান্তির নিশান পতাকা লইয়াও এই ক্ষুদ্র রাজ্য সমগ্র পৃথিবীর দাম্ভিক রাষ্ট্রনায়কগণের বাহ্বাস্ফোট ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যিশুখৃষ্টের মত সকলকে ডাকিতেছে xome un tome! (আমাতে এস)!

আমরা চাই, এই আদর্শ জাতিকে অনুপ্রাণিত করিতে—নির্ভীক অথচ নির্ব্বিকার, স্বাধিকার রক্ষায় সদা জাগ্রত অথচ স্বাধিকার বিস্তৃতির মোহে পরস্বাপহরণ নহে।

তিনি বলিলেন, পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের মানসে ডক্টর স্যান ইয়াৎ সেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি মিঃ উডরো উইলসন সমীপে এক দীর্ঘ স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন, দেখা যাক, ইহা কি ভাবে গৃহীত হয়।

অতঃপর তিনি ভারতীয়, আইরীশ ও মিশরীয় জাতীয়তাবাদিগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের আশীর্ব্বাদও কামনা করিলেন।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

জুয়ায় আপনি হারবেনই

সুনীলকুমার ধর

জুয়ায় আপনি হারবেনই। কথাটা শুনে আমার অনেক তরুণ বন্ধুদের ভ্রূ কুঁচকে উঠবে জানি, কিংবা হালে জুয়াখেলা আরম্ভ ক'রেই জিততে থাকায় আমার অনেক নতুন জুয়াড়ী বন্ধু ব'লে উঠবেন: ফুঃ, জুয়ায় জেতা মোটেই কঠিন নয়। একটু বুদ্ধি খরচ করলেই জুয়ায় জেতা খুবই সহজ!

আর যাঁরা জুয়ায় ক্রমাগত হেরেই যাচ্ছেন অথচ আশার কুহকে প'ড়ে ছাড়তে পারছেন না, তাঁরা বলবেন: কত লোক ত' জিতছে বাপু, আমাদের ভাগ্য খারাপ, তাই জিততে পারছি না। ভাগ্য একদিন প্রসন্ন হবেই। সুতরাং এত টাকা লোকসান দেওয়ার পর এখন ছাড়ার কথাই ওঠে না।

যে যাই বলুন না কেন, আমার কিন্তু ঐ এক কথা। যে জুয়াই আপনি খেলুন না কেন এবং সে জুয়া যত সাধুতার সঙ্গে পরিচালিত হোক না—শেষ পর্যন্ত আপনার হার হবেই হবে। ভাগ্যের কৃপাদৃষ্টি বা দুর্ভাগ্যের আড়াআড়ির কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আমি জানি, এর পরেও অনেকে অনেক নজির উপস্থিত ক'রে বলবেন: ঐ যে অমুক, ঐ যে তমুক—ঐ যে ও-দেশের ঐ যে সে-দেশের অমুক রাজা হ'য়েছে, অমুক 'মন্টি কার্লো' ফাঁক করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব কথার জবাব প্রবন্ধের শেষের দিকে পাবেন। এখন শুধু বলবো: আপনি ওদের কথায় কান দেবেন না, দেবেন না। মরীচিকার পিছনে দৌড়ে দৌড়ে অকারণ সর্বস্বান্ত হবেন কেন!

জুয়া থেকে নিয়মিত পয়সা উপার্জন ক'রে যারা জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের আমি জুয়াড়ী বলি না। তারা হ'ল পেশাদার। জীবিকার্জনের জন্যই তাদের জুয়াখেলার পেশা। এরা কোন দিনই কোন অবস্থায় বড় লোক হবার আশায় কিংবা জুয়াখেলার জন্যই জুয়া খেলে না। আর জুয়া যখন ব্যবসা তখন অন্য সব ব্যবসায়ের মতই এতে লাভ-লোকসান দুই-ই হতে পারে। সেটা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে হিসাব আর পরিচালনা করবার ক্ষমতার তারতম্যের উপর। পথের ভিখারী যারা হয় তারা পেশাদার নয়, ব্যবসায়ী জুয়াড়ীও নয়! আমার এই সতর্কবাণী এই সাধারণ লোকদের জন্য।

জুয়াখেলার প্রবৃত্তির মূলে হ'ল অনিশ্চিতকে নিজের করায়ত্বের মধ্যে আনবার নেশা এবং মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন: নিজের অসাধারণ (?) বুদ্ধি দিয়ে অপরকে পরাভূত করবার (বিশেষ করে যাকে জীবনের অন্য ক্ষেত্রে কিছুতেই বাগে আনা যায় না) বাসনাই হ'ল জুয়াখেলার (বিশেষ করে পরিচিত গণ্ডির মধ্যে) প্রধান উদ্দেশ্য। যারা সামাজিক জীবনে নিজেকে দশ জনের কাছে কোন রকমে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না অথচ মনে মনে অহমিকা আছে যে, তারা আর দশ জনের কারো চেয়ে কম নয় বরং শ্রেষ্ঠ, তারাই জুয়ার টেবিলে নিজেদের বুদ্ধি-বিচক্ষণতা প্রমাণ করবার জন্য উঠে-পড়ে লাগে।

জুয়াকে ব্যবসা করতে পারলে লাভ নিশ্চয়ই হয়, নইলে সারা পৃথিবীময় জুয়ার ব্যবসা চলছে কি ক'রে? অথচ জুয়ায় আপনি হারবেনই এই জন্য যে, জুয়াকে আপনি কোন দিনই ব্যবসায়ের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবেন না। কিংবা পেশায় পরিণত করতে পারবেন না। আর তা ছাড়া জুয়ায় যদি আপনি (আপনারা প্রত্যেকে যাঁরা খেলেন) জিতবেনই, তা হ'লে জুয়ার ব্যবসা যারা করে তাদের অবস্থা কি হবে? আমার একটা কথা বিশ্বাস করুন, জুয়ার ব্যবসা যারা করে তারা হারে না কখনও।

সাধারণ যে অসংখ্য লোক জুয়া খেলে, তারা জুয়াই খেলে অর্থাৎ অনিশ্চিতকে তারা নিজেদের করায়ত্বে আনতে চায় এবং সেই জন্য তারা কোন জুয়াতেই শেষ পর্যন্ত জিততে পারে না। অনেকে জুয়া খেলে উত্তেজনার খোরাক হিসাবে। উত্তেজনাই তাদের ব্যসন, আত্মবিনোদন। যদিও এ একটা মস্ত বড় অবৈজ্ঞানিক উক্তি তবুও অনেকে উত্তেজনা ছাড়া থাকতে পারে না এবং জুয়ায় উত্তেজনা সহজে প্রাপ্য বলেই জুয়ায় মাতে। সামান্য সংখ্যক লোক যারা জুয়াকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে অথচ যারা জুয়াখেলা পরিচালনায় অংশ নেয় না বা যারা জুয়ার ব্যবসাও করে না, তারা কি ভাবে নিজেদের পরিচালিত করে সে বিষয়েও যথাসময়ে আলোচনা করবো। তবে নিছক আনন্দ আহরণ বা সময় কাটাবার জন্য জুয়া খেলে, এ কথা যারা বলে, তারা হয় নিজেদের মন জানে না—না হয় মিথ্যা কথা বলে।

বর্তমানে আপনি যিনি কেবল জুয়াখেলা আরম্ভ করেছেন (আপনার জুয়াখেলা আরম্ভ করার মূলে যে কারণই থাক না কেন) তাঁকে আমার অনুরোধ যে, যেদিন যে টাকা নিয়ে যে জুয়া খেলতেই যান না কেন সেই টাকাটা হারবার জন্য প্রস্তুত হয়েই যাবেন। আপনি যদি অন্য আশা নিয়ে যান তা হ'লে আপনার আশাভঙ্গ হবেই হবে, এ কথা আমি ব'লে রাখছি। অবশ্য আপনি যে একদিনও জিতবেন না এমন কথা বলি না। তবে আপনি যদি একটা হিসাব রাখেন তা হ'লে দেখবেন, শেষ পর্যন্ত আপনার হারই হ'য়েছে। এখানেও অবশ্য এক আধটা ব্যতিক্রমের কথা ওঠে কিন্তু দশ লাখে একটি ব্যতিক্রমকে কি বাকি ৯৯৯৯৯৯ জনের প্রতিপূরক হিসাবে গণ্য করা হবে?

এই প্রসঙ্গে অনেকে অনেক রকম 'সিষ্টেম'-এর কথা বলেন। সিষ্টেম অনুসরণ করলেই জিতবে এমন কোন স্থির নিশ্চয়তা নেই; তবে সিষ্টেম যারা তৈরী করে এবং চালু করে তারা যে এই সিষ্টেম-এর ব্যবসায় বেশ লাভবান হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সারা পৃথিবীতে না হবে ত' অন্ততঃ কয়েক হাজার এমনি নিশ্চয় জিতিয়ে দেবার 'সিষ্টেম' চালু আছে—কিন্তু এমনি ভাগ্যবিড়ম্বনা যে, এই 'সিষ্টেম' অনুসরণ করে যদি একজনের ভাগ্য প্রসন্ন হয়ে থাকে ত' অন্ততঃ এক লক্ষ লোক পথের ভিখারী হয়েছে! এই সিষ্টেমের পক্ষে একটা কথা বলা চলে যে, Law of average এবং Law of chance হিসাবে করা কোন একটা 'সিষ্টেম' অনুসরণ করে তাদের, যারা কোন 'সিষ্টেম' অনুসরণ করে না তাদের চেয়ে জিতবার আশা কিছু বেশী। কারণ হারের মুখে 'এলোপাথাড়ী' জুয়াড়ী অনেক সময় এমন শিশুসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দেয় যে অন্য সময় [illegible] বুদ্ধিসম্পন্ন কোন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সম্বন্ধে সে [illegible] সম্ভব নয়।

[illegible] ছে আর [illegible] পথে এসে [illegible] বো তা সত্য

এই এলোপাথাড়ী খেলার একটা গল্প বলি।

এক উচ্ছৃঙ্খল ধনী যুবক একদিন অনেক টাকা নিয়ে কিছু উত্তেজনার আনন্দের জন্য এক জুয়ার আড্ডায় গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে একজন বুড়ো জুয়াড়ীর সঙ্গে জুয়া খেলতে আরম্ভ করেন। ভাবটা এই রকম যে, খেলার উত্তেজনাই তাঁর লক্ষ্য, হার-জিতে তাঁর কিছু আসে-যায় না। তাসের জুয়া চলছিল। পর পর অনেক টাকা হেরে গিয়ে ঐ যুবকটি উত্তেজিত হয়ে (হেরে গেলে হীনমন্যতা থেকে উত্তেজনা আসবেই), বুড়োকে বলেন যে নিশ্চয়ই বুড়ো ফেরেপবাজি করে তাঁকে ঠকাচ্ছে। উত্তরে বুড়ো মৃদু হেসে বললে, দেখুন বাবু, আপনি জুয়া খেলতে এসেছেন—হেরে গেছেন, এখন মিছিমিছি আমাকে জোচ্চোর বলছেন! জুয়া আপনার নেশা কিন্তু জুয়া আমার পেশা। আমাকে হারানো খুব সহজ নয়, তবে আপনি অনেক টাকা হেরেছেন এখন আপনি যদি রাজি থাকেন তা হ'লে দশ হাজার টাকা বাজি রাখলে আমি আমার বাঁ চোখটা উপড়ে দেবার বাজি ধরতে রাজি আছি। উত্তেজনায় যুবকটি তখন এমনই কাণ্ডজ্ঞানশূন্য এবং বেপরোয়া হ'য়ে উঠেছেন যে, তাঁর একবারও সন্দেহ হ'ল না টাকার পরিমাণ যতই হোক না কেন, কোন মানুষের পক্ষেই সত্য-সত্যই নিজের চোখ নিজে উপড়ে দেওয়া কেমন করে সম্ভব। অথচ পেশাদার লোকটি যখন অত সহজে বাজি ধরতে রাজি হয়েছে তখন নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যাপার আছেই ; কিন্তু ঐ যুবক সে কথা একবারও না ভেবে ধরে নিলেন যে, এ বাজিতে বুড়ো নিশ্চয়ই হারবে ; যে হেতু, কোন মানুষের পক্ষেই নিজের চোখ উপড়ে দেওয়া সম্ভব নয়, এই ধারণা যুবকের মনে বদ্ধমূল হয়েছে, এবং লোকসান পূরণের (জুয়াড়ী যত বড় ধনীই হোক না কেন, এ লোভ থাকবেই) অন্ধ আশায় বললেন, বেশ রইলো দশ হাজার টাকা বাজি। বুড়ো মৃদু হেসে স্বচ্ছন্দে তার কাচের চোখটা খুলে টেবিলের উপর রাখলে। তারপর মৃদু হেসে বললে, এবার কুড়ি হাজার টাকা বাজি ধরলে আমি আমার ডান চোখটা খুলে দেব। ঐ যুবক তখন ঘাবড়ে গেছেন। তিনি আর এ বাজিতে রাজি হলেন না। অথচ একটু থিতিয়ে ভাববার ক্ষমতা যদি তখন ঐ যুবকের থাকতো এবং তিনি যদি কুড়ি হাজার টাকা বাজি রাখতেন তা হ'লে তিনি নিশ্চয়ই জিততে পারতেন। বৃদ্ধটি আসলে ছিল কানা। কোন অন্ধ লোকের পক্ষে যে জুয়া খেলা সম্ভব নয় এই একান্ত সাধারণ বুদ্ধিও লোপ পেয়েছিল ঐ যুবকটির!

এখন জুয়ায় আপনি কেন হারবেনই এই প্রসঙ্গে প্রথমে আপনাদের বর্তমানে এই শহরে অনেক ক্লাবে খুব চালু এবং একান্ত নির্দোষ ব'লে প্রচলিত একটি জুয়ার বিষয়ে কিছু বলবো। সে হ'ল 'হাউসী' খেলা। 'হাউসী' খেলা কি ধরণের তা যাঁরা জানেন না তাঁদের বুঝাবার জন্য দু-এক কথা বলা দরকার। এই খেলার মূল জিনিষ হল সংখ্যা-দেওয়া কতকগুলো ছাপানো ফর্ম কিনতে হবে। যেমন ১, ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি। হাউসী খেলতে গেলে আপনাকে প্রথমে এই সংখ্যা-দেওয়া ছাপানো ফর্ম কিনতে হবে। সাধারণতঃ এই ফর্মের দাম এক আনা, দু' আনা, চার আনা হয়ে থাকে। এই ছাপানো ফর্ম নিয়ে একটি বাজিতে একসঙ্গে অনেক লোক খেলতে পারেন। মনে করুন, ।শয়ংলজি 'হাউস'-এর (আসলে খেলাটির নাম হ'ল 'হাউস' চলতি জার্মাণ 'উসা') পুরস্কার হল এক হাজার টাকা। 'লাইন' এর দাম ভাষাভাষী কা। ক্লাবে পস্থিত সকলে (মেম্বরদের বন্ধু-বান্ধবী সমেত) জার্মাণী, যখন ফর্ম কিনে নিয়ে বসেছেন, তখন ক্লাবের তরফ থেকে একজন একটি থলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটি করে কাগজ তুলতে আরম্ভ করেন এবং তার পর সেই কাগজে যে সংখ্যাটি লেখা বা ছাপা আছে—সেইটা হেঁকে বলতে থাকেন। মনে করুন প্রথম তোলা কাগজের নম্বরটি হ'ল ৭৭। তিনি হেঁকে বললেন—All the sevens, 77. এখন আপনার কেনা ফর্মে যদি ঐ সংখ্যাটি থাকে, তা হ'লে আপনি ঐ সংখ্যাটি × (চিক্) দিয়ে কাটলেন—আর না থাকলে, যার ফর্মে সেটি আছে তিনি সেইটি কাটলেন। তার পর ঐ ভদ্রলোক এই ভাবে প্রতিবার থলে থেকে একটি কাগজের টুকরো তুলে তাতে ছাপা সংখ্যাটি বলে যেতে আরম্ভ করলেন—যতক্ষণ না উপস্থিত খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে কোন একজন বা একাধিক জন চেঁচিয়ে উঠছেন, 'লাইন' বলে। 'লাইন' হ'ল, থলে থেকে তোলা সংখ্যাগুলির মধ্যে পর পর কয়েকটি সংখ্যা যার ফর্মে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়ে ফর্মের একটি লাইনকে পূরণ করেছে। যেমন ধরুন, থলে থেকে তোলা হয়েছে ৭৭, ৮৩, ৯৯, ২৪, ৮৭, ৫৪, ৩ এবং এমনি আরো কয়েকটি সংখ্যা। এখন ছাপানো ফর্মে লাইন হিসেবে যদি ৮টি বিভিন্ন সংখ্যা থাকে এবং থলে থেকে তোলা সংখ্যাগুলির যে কোন ৮টি সংখ্যা যদি প্রথমে আপনার ফর্মে পাশাপাশি এসে দাঁড়ায় তা হ'লেই আপনার 'লাইন' হ'ল। এবং 'লাইন' হ'লেই লাইনের যে পুরস্কার (২০০) তা আপনার প্রাপ্য হ'ল। বিভিন্ন ক্লাবে বিভিন্ন নিয়ম। কোন ক্লাবে লাইনের জন্য নির্দিষ্ট পুরস্কারের টাকা যাঁদের 'লাইন' হয় তাঁদের প্রত্যেককে ঐ পরিমাণে টাকা দেওয়া হয়। কোন কোন জায়গায় একাধিক খেলোয়াড়ের 'লাইন' হলে পুরস্কারের নির্দিষ্ট টাকা সমান অংশে ভাগ করে দেওয়া হয়। পুরস্কারের টাকাটা অবশ্য 'লাইন' হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দেওয়া হয়। এই ভাবে আপনার কেনা ফর্মের সমস্ত সংখ্যাগুলি যদি থলে থেকে তোলা সংখ্যাগুলির সঙ্গে সব চেয়ে আগে মিলে যায়, তা হ'লে আপনি 'হাউস' পেলেন—অর্থাৎ প্রথম বাজির পুরস্কারের ১০০০ টাকা আপনার প্রাপ্য হল। সাধারণতঃ ফর্মের দাম দু' আনা, চার আনা হওয়ায় বেশীর ভাগ খেলোয়াড়রাই একাধিক ফর্ম কিনে Law of average বা Law of chance এর chance নেন।

এ খেলায় খুব বেশী পয়সা লাগে না এবং এমন কথাও আমি বলি না যে, এখানকার কোন 'হাউসী' খেলায় কোন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোন রকম অসাধু উপায় অবলম্বন করা হয়। তবে আমি শুনেছি, পুলিশের কড়াকড়ির আগে অনেক ক্লাবে মেম্বরদের চাইতে বাইরের খেলোয়াড়-সংখ্যাই বেশী হ'ত—এবং এই শহরে বহু ক্লাবে এই খেলার খুব চলন হয়েছিল। পুলিশ কেন সচেতন হয়েছেন সে খবর অবশ্য আমি জানি না, তবে 'হাউসী' খেলায়ও যে পরিচালকরা ইচ্ছা করলে অসাধু উপায় অবলম্বন করতে পারে এবং কেমন করে পারে তা আপনাদের বলছি। আসলে 'হাউসী' খেলায় চালাকি করবার উপায় ঐ থলের মধ্যেই থাকে। বড় থলির (যার মধ্যে সংখ্যা দেওয়া কাগজের টুকরোগুলো থাকে) মধ্যে ছোট আর একটি থলে (পকেট) থাকে এবং তার মধ্যে সেই সংখ্যাগুলি রাখা থাকে, যে সংখ্যাগুলি কেবল কর্তৃপক্ষের নিজেদের কোন লোকের ফর্মেই আছে।

তার পর কি হবে বা হতে পারে, তা আশা করি আপনারা বুঝতেই পারছেন।

উপস্থিত নরনারীরা যদি চোখের সামনে দেখেন যে তাঁদেরই মধ্যে বসে আছেন এমন একজন লোক 'হাউস' পেলেন, তখন কারো মনেই কোন রকম সন্দেহ জাগে না। তা ছাড়া মাত্র ছ' আনা চার আনায় ৫০০৲, ১০০০৲ বা ২০০০৲ টাকা পাওয়া যায় এবং সামনের লোকটাকে যখন চোখের সামনেই পেতে দেখা গেল, সেই জন্যে কেউ কোন দিন এ নিয়ে মাথাও ঘামায় না। 'হাউসী' যখন কোন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ব্যবসা হিসাবে চালান হয় তখন অবশ্য অনেক সময় লোক-সমাগম বাড়াবার জন্য এবং ব্যবসায়কে জমাও করবার জন্য মাঝে মাঝে দু-চার জন বাইরের লোককেও 'হাউস' পাইয়ে দেওয়া হয় এবং তাইতেই 'হাউসী' জনসাধারণের এতখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এত ভীড় হয়। এবং বোধ হয় খুব ভীড় হওয়ার জন্যই পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

(দুই)

সাধারণতঃ মানুষ জুয়াখেলা প্রথম আরম্ভ করে অবস্থা যখন ভাল থাকে। নিঃস্ব গরীব জুয়াড়ী হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। অবস্থা ভাল থাকা মানে এ নয় যে, প্রত্যেকেই লক্ষপতি। সাধারণ স্বচ্ছল অবস্থা। এই অবস্থায় মানুষ দলে পড়েই হোক কিংবা অবস্থা আরো ভাল করবার লোভেই হোক জুয়াখেলা আরম্ভ করে। অনেক সময় একদিন সখ করে 'ভাইসরয় কাপ' রেস দেখতে গিয়ে যে হাতে খড়ি হয়, শেষ পর্য্যন্ত তা দড়ি হয়ে গলায় ফাঁস না লাগা পর্য্যন্ত থামে না।

আসলে জুয়া হ'ল বিলাসী ধনীদের অন্যতম ব্যসন। এই সেদিন সিংহাসনচ্যুত এক রাজার প্রাসাদের গোপন অন্তঃপুর থেকে নানা রকম জুয়াখেলার যেসব সরঞ্জাম পাওয়া গেছে তার একটা ছোট খাট লিষ্ট আপনারা খবরের কাগজে দেখেছেন। এবং এ দৃষ্টান্ত লক্ষ লক্ষ আছে যে, স্বচ্ছল অবস্থায় অবসর বিনোদনের জন্য এবং 'স্পোর্টস্' হিসাবে জুয়াখেলা আরম্ভ ক'রে শেষ পর্য্যন্ত পথের ভিখারী হয়েছে।

জুয়ার এমনি আকর্ষণ এবং অভিশাপ যে, প্রত্যেক সাধারণ মানুষই জুয়াখেলার পরিণাম জানে এবং এও ঠিক যে, প্রথম জুয়াখেলা আরম্ভ করবার পূর্ব্বে প্রত্যেকের মনেই জুয়ার সম্বন্ধে একটা স্বভাবগত স্বাভাবিক আশঙ্কা এবং অমঙ্গল বোধের ভাব থাকে। তবুও কেন, কি অবস্থায় এবং কেমন করে মানুষের এই স্বাভাবিক মনোভাবের আমূল পরিবর্ত্তন হয় তা বুঝতে গেলে বিশেষ বিশ্লেষণ দরকার। তবে মোটামুটি ভাবে বলা চলে যে, অনিশ্চিতকে করায়ত্ত করবার নেশা এবং সঙ্গে সঙ্গে বিনা আয়াসে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ধনী হবার স্বপ্ন জুয়াখেলার প্রধান এবং সর্ব্বনেশে আকর্ষণ। জুয়া খেলে যে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে মৃত্যু পর্য্যন্ত সুযোগ পেলেই সে জুয়া খেলবে এবং জুয়া খেলে যারা প্রচুর ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করে তারাও সর্ব্বস্বান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জুয়া খেলবেই। ভাগ্যের পরিহাস এবং অভিশাপ এইখানেই। জুয়া থেকে উপার্জ্জন করে ধনী হয়ে জুয়াখেলা ছেড়ে দিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বড় একটা দেখা যায় না।

ব্যক্তিগত জীবনে বা সাংসারিক জীবনে অনেক অসুখী লোক মনের জ্বালা সাময়িক ভাবে ভুলবার অভিপ্রায়ে এবং আশায় এবং প্রতিষেধক হিসাবে জুয়াখেলা আরম্ভ করে, এ কথাও একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় যে, দুধের অভাব ঘোলে মিটাতে এসে ঐ সব লোকের মানসিক অশান্তি এবং অস্বস্তি অনেক বেড়ে গেছে। ব্যক্তিগত জীবনের অশান্তি থেকে পালিয়ে এই উত্তেজনার মধ্যে আশ্রয় নিতে গিয়ে ঐ সব লোকদের ব্যক্তিগত জীবনের অশান্তি যেমন ছিল তেমনি ত থাকেই; উপরন্তু আর একটা উপসর্গ উপস্থিত হয়ে তাদের আরো ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। এই দলে যাঁরা পড়েন, তাঁদের আমি অনুরোধ করবো, ব্যক্তিগত জীবনে যদি কোন অশান্তি এবং অস্বস্তি থাকে তা থেকে এমনি ভাবে পালিয়ে বেড়িয়ে কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে এই অস্বস্তি এবং অশান্তির মূল কারণ নির্ণয় করে প্রতিকার করবার চেষ্টা করুন। হার-জিত নির্ব্বিচারে জুয়ার সাময়িক উত্তেজনার আনন্দের (?) পর যে অবসন্নতা আসে তা বড় মর্ম্মদাহী। তা ছাড়া ক্রমাগত এক উত্তেজনা থেকে আর এক উত্তেজনা এবং তারপর আর এক উত্তেজনা এবং তারপর আর এক উত্তেজনা—এর ফলে যে কোন মানুষের শরীরে একদিন স্নায়ুবিকার দেখা দেবেই এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিরবিকারও ঘটে থাকে। এই রকম উত্তেজিত অবস্থায় মানুষ উত্তেজনার জন্য এমন মরিয়া হয়ে উঠতে পারে যে, তখন তার আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। এবং যে মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয় তার পক্ষে যে-কোন রকম অন্যায় এবং অপরাধ করা একটুও অসম্ভব নয়। এবং সাধারণতঃ তাই ঘটে থাকে।

অনেকে প্রতিযোগিতামূলক খেলা বা অনুষ্ঠানকেও জুয়ার পর্য্যায়ে ফেলতে চান। এটা অবশ্য ঠিক নয়। স্কুলের ছেলেদের দৌড়ের প্রতিযোগিতার সঙ্গে ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতাকে এক পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। সুস্থ প্রতিযোগিতা মানুষের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে, নিজেকে বিকশিত করতে সাহায্য করে কিন্তু যখনই কোন প্রতিযোগিতাকে জুয়ার অবলম্বন বা লক্ষ্য করা হয়, তখনই সব-কিছু অমঙ্গল এবং নোংরামী এসে সেখানে আশ্রয় নেয়। খেলা-ধূলাকে কেন্দ্র করে জুয়া যখন বড় আধিপত্য আরম্ভ করে, তার কি বিষময় ফল হয়, সে সম্বন্ধেও আমরা যথাসময়ে আলোচনা করবো।

এবার আমি "রেস" বা ঘোড়দৌড় সম্বন্ধে দু'-চার কথা বলবো। রেস খেলা কবে কোন্ দেশে কোন্ উপলক্ষে প্রথম আরম্ভ হয় কিংবা জুয়াখেলা কেমন করে মানুষের সমাজে প্রসার বিস্তার করে—সে সব ঐতিহাসিক তত্ত্ব এবং তথ্য এই রচনার শেষের দিকে পাবেন। প্রথমে আমি এমনি কয়েকটি জুয়া নিয়ে আলোচনা করবো যা সাধারণ মানুষের জীবনকে বিড়ম্বিত করে। এ সম্বন্ধে আমি যে সব কথা বলবো তা আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি, চিন্তাধারা এবং অনুশীলন-প্রসূত। সুতরাং আমার বক্তব্য যে সকলের কাছেই গ্রহণীয় ব'লে মনে হবে এমন আশা আমি করি না। কারণ আমি জানি, আমার পূর্ব্বে পৃথিবীর অনেক মনীষী 'রেস' খেলার শোচনীয় পরিণামের কথা যেমন ব'লেছেন এবং দেখিয়েছেন, তেমনি 'রেসিং' যে খুব একটা 'healthy sport' এ সম্বন্ধেও অনেকে অনেক কথা বলেছেন। দুই পক্ষের মতামত কাটাকাটির পটভূমিকায় দেখা যাচ্ছে যে, চিরন্তন এক দল লোক রাতারাতি বড় লোক হওয়ার আশায় রেসের মাঠে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে এসেছে আর এক দল 'রেসে' সাময়িক ভাবে 'রাজা' হয়ে শেষ পর্য্যন্ত পথে এসে ব'সেছে। সুতরাং এক দিক দিয়ে আমি যে কথা বলবো তা সত্য

প্রমাণিত হলেও এবং সে কথা মনে মনে প্রত্যেক 'রেসুড়ে' জানলেও, উপলব্ধি করলেও—সঙ্গে সঙ্গে ঐ যে 'রাজা' হওয়ার সম্ভাবনাটা আছে তার জন্য ঘোড়দৌড়ের মাঠে লোকসমাগম আজও বন্ধ হয়নি। হয়ত হবেও না কোন দিন!

আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, "ঘোড়া-রোগে যাকে একবার ধরে তার আর ভাঙ্গি নেই।" কথাটি মর্মান্তিক সত্য। ঘোড়ারোগে ধরলে কোন মানুষই আর স্বাভাবিক থাকে না। থাকা সম্ভবও নয়। কারণ, এইটাই এই রোগের প্রধান উপসর্গ। ঘোড়ারোগে যাকে ধরে সে নিজেকে ভোলে, সংসার ভোলে, পারিপার্শ্বিক ভোলে। তার ফলে এই হয় যে, তার কাছে সপ্তাহের বিশেষ একটি দিনই সব চেয়ে বড় হয়ে ওঠে এবং কল্পনায় মনে মনে সঙ্কল্প করে ঐ দিনে যদি সে কোন রকমে বাজিমাত করে আনতে পারে তা হলে এত দিনের অবহেলিত অন্য দিকে উপযুক্ত মনোযোগ সে দেবেই এবং অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্যের প্রতি এত দিন যে ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটেছে তার সংস্কার করে নিয়ে এবার থেকে সে তার কর্ত্তব্যগুলি যথাযথ ভাবে পালন করবেই। রেসে আর সে যাবে না। মনে মনে এমনি অনেক রঙীন কল্পনা এবং স্বপ্নের জাল বোনাই হল রেসুড়ে বা প্রত্যেক জুয়াড়ীদের চরিত্রগত। কিন্তু হায়, ঐ বাজিমাত করা জীবনে ঘটে ওঠে না। যদি বা ক্কচিৎ কারো ভাগ্যে (!) এমনি ঘটনা ঘটে—তা শেষ পর্য্যন্ত দুর্ঘটনায় পর্য্যবসিত না হওয়া পর্য্যন্ত রেসে যাওয়া বন্ধ করেছে এমন দৃষ্টান্ত সারা পৃথিবী খুঁজলে খুব কমই পাওয়া যাবে।

জুয়াড়ীদের মত এত কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকও কম দেখা যায়। যে লোক জীবনের অন্য কোন ক্ষেত্রে কোন সংস্কার মানে না, সে কিন্তু জুয়ার ব্যাপারে ভীষণ নিটপিটে। মানুষের চরিত্রে দুটো বিপরীতমুখী ধর্ম্মের এমন সমন্বয় আর কোথাও দেখা যায় না!

সাধারণতঃ ঘোড়দৌড় হোল time এবং space-এর খেলা। বংশধারাও এখানে অনেকখানি। মোট কথা হ'ল, কোন ঘোড়া কত ওজন নিয়ে কতখানি জায়গা কত সময়ে অতিক্রম করতে পারে, বাস্তবতঃ এই অঙ্ক কষার উপর ঘোড়দৌড় দাঁড়িয়ে আছে। তার পর অবশ্য প্রশ্ন হচ্ছে, যে ঘোড়ারা এক সঙ্গে একই পরিমাণ জায়গা অতিক্রম করার প্রতিযোগিতা করবে, তাদের পরস্পরের বাপ-ঠাকুর্দ্দা এবং তস্য বাবা কে ছিল, মা, দিদিমা এবং তস্যা মা কে ছিল, কেমন ছিল—অর্থাৎ তারা কে কতখানি জায়গা কত ওজন নিয়ে কত সময়ে দৌড়েছে। যদি দেখা যায়, ৭টি ঘোড়ার মধ্যে বিশেষ এক জনের বাবা বা ঠাকুর্দ্দা অন্য আর ছ' জনের নিকট-আত্মীয়ের চেয়ে প্রায় সমান বা বেশী ওজন নিয়ে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে ঐ জায়গা অতিক্রম ক'রেছে, তখন সকলেই সেই ঘোড়ার হিসাব নিয়ে মাথা ঘামায়। কিন্তু দেখা যায়, সব সময় ঐ সব হিসাব কোন কাজেই লাগে না। হিসাব করে যদি সব সময় যে ঘোড়া জিতবেই বার করা সম্ভব হোত তা হ'লে রেসে অধিকাংশ লোকই হারতো না। তা হ'লে প্রত্যেক রেসই অঙ্ক কষার ব্যাপার হোত এবং যে কোন বুদ্ধিমান আর গরীব থাকতো না।

সাধারণতঃ যখনই কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তখন সকলেই বলে: শ্রেষ্ঠ জন বা শ্রেষ্ঠ দল জিতুক। ঘোড়দৌড়ের বেলায়ও ঐ একই কথা শোনা যায়; 'Let the best horse win'. এখানে সব চেয়ে ভাল ব'লতে যা বুঝায় তা হ'ল ট্রেনিং-এর দিক থেকে, স্বাস্থ্যের দিক থেকে, বংশধারার দিক থেকে যে শ্রেষ্ঠ সে। বংশধারাটা অবশ্য ঘোড়ার নিজের মধ্যেই থাকে কিন্তু আর দুটো সম্পূর্ণ নির্ভর করে অপরের উপর। তার উপরে আছে পরিচালক বা জকি। ভাল ঘোড়াও যে পরিচালনার দোষে মার খায় তার অনেক প্রমাণ যাঁরা রেসে যান, তাঁরা অনেক বার পেয়েছেন। সুতরাং আপনার বাজি-ধরা ঘোড়া যে জিতবেই তার নিশ্চয়তা কোথায়? রেসের মাঠে যাঁরা গেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, যেই কোন একটা ঘোড়া জেতে তখনই তার সমর্থকরা উল্লাসে দিশেহারা হয়ে মাঠের মধ্যেই লম্ফ-ঝম্প আরম্ভ করে এবং বলতে থাকে: "না এসে যাবে কোথা? আমি সে দিনের 'স্পার্টস' দেখেই বুঝেছি যে এবার নির্ঘাত এ জিতবেই। এ বাব্বাঃ হিসাব করে বার করা।" আর যাদের ঘোড়া জিতলো না (অধিকাংশেরই) তারা জকি এবং ট্রেণারের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে। "শালা এমন তৈরী ঘোড়াটাকে মার খাওয়ালে? ও ব্যাটাকে না বসিয়ে যদি একটা বাঁদর বসান যেত, তা হলেও অন্ততঃ ঠিক 'লেংথে' জিততো। যত সব জোচ্চোরের কাণ্ড মশাই, নৈলে এমন তৈরী ঘোড়াটাকে মার খাওয়ালে!"

তা হ'লে কি বুঝতে হবে যে, ঘোড়দৌড়ের ব্যাপারে pedigree, space এবং time-এর মূল্য নিতান্ত বাজে কথা? এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হয়, না। তবে কেন এমন হয়? তার জবাব হচ্ছে: যে কটি ঘোড়া কোন একটা বিশেষ বাজিতে দৌড়ায় তারা কে কেমন তা আমরা কেবল কাগজপত্রের মারফৎ জানতে পারি। যেমন অমুকের ঠাকুর্দ্দা, দাদামশাই অমুক, তার বাবা মা অমুক অমুক ইত্যাদি এবং খবরের কাগজের রিপোর্টাররা ভোরবেলায় রেসের মাঠে গিয়ে 'স্পার্টসের' যে বিবরণ নিয়ে এসে দেয়, তাই। এই 'স্পার্টস্' দেখে ঘোড়া তৈরী হয়েছে কি না তার খানিকটা আভাস যে পাওয়া যায় না এমন নয়, কিন্তু এই 'স্পার্টস্' দেখেই যদি আমরা আমাদের ঘোড়া বাছাই করি তা বেশীর ভাগ সময় সফল হয় না। না হওয়ার কারণ হচ্ছে যে, কোন্ ঘোড়া ঠিক কতখানি তৈরী তা এ থেকে সঠিক বুঝা সম্ভব নয়। যেমন ধরুন: চতুর্থ শ্রেণীর অশ্বিনী ৬ ফার্লঙের শেষ দু ফার্লং ২৪।০ সেকেণ্ডে এবং মোট দূরত্ব ১ মিঃ ১৪ ১/৫ সেকেণ্ডে অতিক্রম করেছে। এখন আপনি যদি মোট দূরত্বের সময়কে হিসাবে নেন, তা হ'লে এক ফার্লঙের জন্য সময় ধরতে হবে ১২ ১/৬ সেকেণ্ড আর যদি শেষের দু ফার্লঙের সময়কে হিসাবে নেন তা হ'লে সময় ধরতে হবে ১২ ১/৫ ... আর চতুর্থ শ্রেণীর মারুতী ৫ ফার্লঙের শেষ দু ফার্লং ২৪ ১/৫ এবং মোট দূরত্ব ১ মিঃ ১ সেকেণ্ডে অতিক্রম করেছে তা হলে মোট দূরত্বের হিসাবে সে প্রতি ফার্লং অতিক্রম করেছে ১২ ১/৫ সেকেণ্ডে আর শেষের দু ফার্লঙের হিসাবে সে এক ফার্লং অতিক্রম করেছে ১২ ১/১০ সেকেণ্ডে। এখন আপনি যদি শেষ দু ফার্লঙের হিসাব থেকে মারুতীর ৬ ফার্লং অতিক্রম করতে কত সময় নেবে তা হিসাব করেন, তা হলে দাঁড়াবে ১ মিঃ ১২ ৪/৫ সেকেণ্ড আর যদি মোট সময়ের হিসাব থেকে ধরেন তা হ'লে দাঁড়াবে ১ মিঃ ১৩ ১/৫ সেকেণ্ড। সুতরাং বর্ত্তমান হিসাব মত দেখা গেল যে, ৬ ফার্লঙের রেসে অশ্বিনীর চেয়ে মারুতীর জিতবার সম্ভাবনা হিসাব মত অনেক নিশ্চিত এবং আপনিও এই হিসাব কষে নিয়ে মাঠে গিয়ে উপস্থিত হবেন। সেখানে

গিয়ে বা তার আগেই রেসের লিষ্টে দেখেছেন যে অশ্বিনী দৌড়বে ৮ ষ্টোন ৫ পাউণ্ড ওজন নিয়ে এবং মারুতী দৌড়বে ৮ ষ্টোন ৪ পাউণ্ড নিয়ে। সুতরাং আপনি মনে মনে ভাবলেন, আর কি, আজ কেল্লা ফতে! আপনি যে টাকা মাঠে নিয়ে গিয়েছেন তার বেশীর ভাগই লাগালেন মারুতীর উপর। মাঠে গিয়ে দেখলেন, কেবল আপনিই হিসাব করে আসেননি, আরো অনেকেই এসেছেন। কারণ মারুতী 1st fovourite. আপনি ভাবলেন, তা হোক। আমি যখন জানি এ ঘোড়া জিতবেই তখন বোকার মত অন্য ঘোড়ায় টাকা লাগাব কেন? মাঠের এত লোককে আপনার হিসাব-করা ঘোড়ায় টাকা লাগাতে দেখে আপনার বুকে বেশ খানিকটা 'নিশ্চিন্তভাব' এসেছে।

তার পর রেস আরম্ভ হ'ল। এবং যথাসময়ে দেখা গেল অশ্বিনী জিতলো। মাঠশুদ্ধ লোক হৈ-হৈ ক'রে উঠলো। চারি পাশ থেকে নানা রকম গালাগালি, হা-হুতাশ আর আফশোসের ঝড় উঠলো কিন্তু আপনার নিশ্চিত জেতা টাকার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। আপনার পকেট ফাঁক, বুকও ফাঁক। চোখের সামনে ফুটে উঠলো সুন্দর সর্ষের ফুল! তা হ'লে আপনারা কি বলবেন যে, অশ্বিনী জোচ্চুরী করে জিতেছে, না মারুতী'র জকি ইচ্ছা করে মারুতীকে মার খাইয়েছে, না পথ না পাওয়ায় মারুতী মার খেয়েছে? এর যে কোন একটা কারণ ঘটা অসম্ভব নয় কিন্তু রেসের মাঠে যাই ঘটুক না কেন, যতক্ষণ না কর্তৃপক্ষরা এমন কোন একটা কারণ স্পষ্ট করে দেখাবেন, ততক্ষণ 'জোচ্চুরী' বা ইচ্ছা করে মার খাওয়ানো'র কথা বললেই আপনি আইনতঃ দণ্ডনীয় হতে পারেন।

তা হ'লে ব্যাপারটা কি হ'ল? আপনি দেখলেন, মারুতী ঠিক মতই দৌড়েছে অথচ হিসাব মত অন্ততঃ ২ লেংথে না জিতে, মারুতী হারলো কেন?

এর পিছনে আরো অনেক কারণের মধ্যে ছোট্ট অথচ নিশ্চিত একটি কারণ যা আপনার একবারও মনে হয়নি, তা হ'ল অশ্বিনী ও মারুতীর ক্ষ্যাটিসের যে হিসাব দেখে আপনি মারুতী সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছিলেন সেই হিসাবেই মস্ত বড় একটা ফাঁক রয়ে গেছে। হিসাবের সময় আপনি কি একবারও এ কথা ভেবেছিলেন যে, স্ক্যাটিস্ দেবার সময় অশ্বিনী ও মারুতী পরস্পরে কত ওজন নিয়ে স্ক্যাটিস্ দিয়েছিল। কাগজের রিপোর্টার তা জানে না, এমন কি জকিও তা জানে না। জানে একমাত্র ট্রেণার। এবং আমার একটা কথা মনে রাখবেন যে, সাধারণতঃ ঘোড়দৌড়ে একমাত্র ট্রেণারদেরই জিতবার সম্ভাবনা কিছু আছে! কারণ একমাত্র তাদের পক্ষেই Pedigree, space, time ও weight এর একটা গড়পড়তা হিসাব রাখা সম্ভব। কিন্তু একথাও কোন ট্রেণারই জোর করে ব'লতে পারে না যে, অমুক রেসে তার অমুক ঘোড়া জিতবেই। সে বড় জোর বলতে পারে যে, তার ঘোড়া try করা হবে। কারণ, প্রত্যেক ট্রেণারই Pedigree, space, time এবং weight সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল; সুতরাং একজনকে টেক্কা দিয়ে আর একজনের সহজে পার পাওয়া খুব সহজ নয়; বিশেষ করে যদি সত্যই কোন এক বিশেষ ব্যক্তিত্বে বাইরে থেকে অন্য কোন রকম প্রভাব কার্যকরী না হয়। এই প্রভাব বিস্তার সম্বন্ধে পরে আলোচনা করবো। এখন দেখা যাক, আপনি রেস-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল হ'য়েও বড় লোক হ'তে পারছেন না কেন, কি তার বাধা?

বাধাগুলির ব্যাখ্যা করবার আগে আমি আর একবার বলছি, যাবেন না রেসের মাঠে, ভুলেও কোন দিন যাবেন না। তবে যদি নেহাইৎ আমার অনুরোধ না শোনেন, তা হ'লে একটা কথা বলি; নিজের বুদ্ধি এবং বিচার মতই রেস খেলবেন। যদি হারেন, যদি কেন, শেষ পর্যন্ত নিশ্চিতই আপনার হার হবে, এমন কি আপনি সর্বস্বান্ত হবেন তবু আপনার সান্ত্বনা থাকবে যে, নিজের বুদ্ধি মত টাকা নষ্ট করছেন। এবং এর জন্য অন্য আর কারো উপর আক্রোশ বা রাগ হবে না। কারণ, সাধারণতঃ দেখা যায়, অনেকেই "খবর" পায় যে আগামী শনিবার অমুক অমুক রেসে অমুক ঘোড়া জিতবে। একেবারে 'হৈবলের' খবর, ট্রেণারের খবর, জকির খবর! এই খবরই রেসের মাঠে অধিকাংশ লোকের সর্বনাশের কারণ! কিছুদিন আগে এই শহরে এমনি 'খবর' দেওয়ার একটা কৌতুককর ইংরেজী ফিল্ম দেখানো হয়েছিল। এই খবর দেওয়ার ব্যাপারটা খানিকটা আমাদের দেশে অনেক জ্যোতিষির "টিপ" দেওয়ার মত এবং অনেক তথাকথিত 'ব্যুরো'ও এমনি খবর (Sure tips) দেওয়ার ব্যবসায়ে সকল দেশেই বেশ দু' পয়সা উপায় করে। আমাদের এই শহরেও এমন ব্যুরো যে দু-চারটে নেই এমন নয়।

জ্যোতিষীর 'টিপ' দেওয়ার ব্যাপারটা হ'ল, একটি রেসে যতগুলি ঘোড়া দৌড়ায়, প্রত্যেক রেসুড়েকে তার একটি একটি করে নম্বর ব'লে দেন, সুতরাং কারো কারো ঘোড়া ত' জিতবেই—আর যাদের ঘোড়া জিতবে তারাই জ্যোতিষীর হ'য়ে ঢাক্ পিটিয়ে বেড়ায়। অনেকে হয়ত' ব'লবেন, এটা একেবারে বাজে কথা। কিন্তু আমার পরিচিত দুই ভদ্রলোক এক জ্যোতিষী সম্বন্ধে এমনি কথাই ব'লে-ছিলেন। তিনি এই শহরের একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী এবং তিনি জানতেন না যে ঐ দুজন পরস্পরের বন্ধু এবং তাঁর বাড়ীর বাইরে এসেই তাঁকে তাঁরা নানা রকম আত্মীয়সুলভ সম্বোধনে সম্মানিত করেছিলেন।

ব্যুরোগুলি সম্বন্ধেও এই ধরণের মন্তব্য করা একটুকু অসমীচীন হবে না এই কারণে যে, রেসে কোন ঘোড়া জিতবে, এ কথা নিশ্চিত করে বলা কারো পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। মানুষের দুর্বলতা নিয়ে এ পৃথিবীতে যতগুলি ব্যবসায় চালু আছে—এই টিপ-এর ব্যবসা তার একটা।

"যাকে দেখলে আপনা-আপনি মন প্রফুল্ল হয়, সেই ভক্ত। আর যাকে দেখে আপনা-আপনি মন কুন্ঠিত হয়, সে ঈশ্বর-বিমুখ।"
—মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্য।

(উপন্যাস)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

[বাঙলা সাহিত্যের 'কল্লোল' যুগের অন্যতম পথপ্রদর্শক কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ সাহিত্যক্ষেত্র থেকে এক রকম বিদায় গ্রহণ করেছিলেন। বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতিকল্পে লেখক আত্মনিয়োগ করেন। বর্ত্তমানে আবার তিনি সাহিত্যসেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। শৈলজানন্দর থেমে-যাওয়া কলম পুনরায় চালানোর কৃতিত্ব মাসিক বসুমতীর। আমাদের পাঠক-পাঠিকার জন্য মাসিক বসুমতী লেখকের এই সম্পূর্ণ নূতন ধরণের উপন্যাসটি ধারাবাহিক প্রকাশ করছে বর্ত্তমান সংখ্যা থেকে। —স]

১

ব্র্যাঞ্চ লাইনের ছোট্ট রেল-ষ্টেশন।

ট্রেণ থেকে নেমে সোজা পশ্চিম মুখে মাইল-দুই গেলেই দেখা যায়—পায়ের তলার মাটির রং গেছে বদ্‌লে। সমতল সে প্রান্তর আর নেই। চারি দিকে শুধু উঁচু-নীচু ঢেউ-খেলানো ধানের মাঠ। মাঠের মাঝখানে সবুজ গাছপালায় ঘেরা ছোট-ছোট এক-একখানি গ্রাম। আর তারই মাঝখান দিয়ে সাপের মত আঁকাবাঁকা রাঙা-মাটির পথ।

মাটির সে গেরুয়া রংও ক্রমশঃ কালো হয়ে আসে। দূর থেকে দেখা যায়—মাঠের মাঝে যেখানে-সেখানে চিমনির মাথায় কালো ধোঁয়া উঠছে, আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে লোহার তৈরি প্রকাণ্ড হেড্ গিয়ার। খাদের মুখ থেকে ডিপো পর্য্যন্ত ইস্পাতের লাইন পাতা। তারই ওপর দিয়ে যাওয়া-আসা করছে কয়লা-বোঝাই টব-গাড়ী।

দূরে দূরে সাদা চুণকাম-করা সায়েবদের 'বাংলো', বাবুদের 'কোয়াটার' আর নিতান্ত হতশ্রী কতকগুলো ছোট-ছোট বস্তি—কুলি-মজুরদের 'ধাওড়া'। ছোট-ছোট হাট-বাজার, ছোট-ছোট গ্রাম···

কয়লা-কুঠির দেশ!

যে-সময়ের কথা বলছি, তখন এখানে ইংরেজের রাজত্ব।

আগে ছিল দিগন্তবিস্তৃত ধানের ক্ষেত। নদীর দু'পাশে ছিল শাল-তমালের প্রকাণ্ড জঙ্গল। চাষীরা মনের আনন্দে চাষ করতো আর আশ-পাশের গ্রামের লোক গরুর গাড়ী বোঝাই করে' জ্বালানী কাঠ কেটে আনতো জঙ্গল থেকে।

এখন সে নদী গেছে মজে। জঙ্গলের চিহ্নমাত্র নেই। জ্বালানী কাঠের অভাব গেছে ঘুচে।

জমিজমা বেচে কুঠির সায়েবদের কাছ থেকে শুনতে পাই কত লোক কত টাকা পেয়েছে।

সুলতানপুরের মুখুজ্যেদের অবস্থা ছিল খুব খারাপ। এত খারাপ যে, তাদের সেজ-বৌ একদিন প্যারী মোড়লের ক্ষেত থেকে লঙ্কা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। সে-কথা আজ আর কারও মনে নেই। ভুলে গেছে।

ভুলে যাবার কারণ—সুলতানপুরের মুখুজ্যেরা এখন হয়েছে—সুলতানপুরের 'বাবু'। হয়েছে এই কালো কয়লার কল্যাণে।

যে সেজ-বৌ লঙ্কা চুরি করেছিল, সে সেজ-বৌকে আজ-কাল দেখলে আর চেনা যায় না। গায়ে এক-গা গয়না, বাস করে দোতলা দালান-বাড়ীতে, হাওয়া-গাড়ীতে চড়ে হাওয়া খায়, গায়ের রং পর্য্যন্ত ফর্সা হয়ে গেছে।

কিন্তু এখানকার সব-কিছুই যেন ওই কয়লার বাজারের সঙ্গে সমসূত্রে গাঁথা। কয়লার দাম যখন চড়ে, সকলের মুখে হাসি ফোটে। আবার দাম যখন পড়ে, চারি দিক মনে হয় যেন অন্ধকার!

গত তিন বছর ধরে' কি যে হয়েছে কে জানে! কয়লার দাম নামতে নামতে হঠাৎ এমন একটা জায়গায় এসে থেমেছে—কিছুতেই যেন আর উঠতে চায় না!

কেন যে এমন হ'লো, কেউ কিছু বুঝতে পারে না।

নানা লোকে নানান্ কথা বলতে থাকে।

কেউ বলে: সুদূর ম্যান্‌চেষ্টার থেকে জাহাজ-বোঝাই কয়লা আসছে।

আবার কেউ কেউ বলে : ইংরেজের ইচ্ছে নয় যে আমাদের দেশের কয়লার বাজার ভাল চলে, তাই তারা লোকসান দিয়ে বিলিতি কয়লা বেচতে আরম্ভ করেছে।

আজগুবি এমনি-সব গুজব রটিয়ে দিয়ে মানুষ হয়তো-বা একটু সান্ত্বনা লাভ করে, কিন্তু মনে শান্তি পায় না। টাকা-পয়সার অভাব।

দিনে-দিনে এই কয়লা-কুঠির দেশটা কেমন যেন ম্রিয়মান হয়ে এলো। ধীরে-ধীরে ছোট-ছোট কুঠি গেল বন্ধ হয়ে। চিমনিতে ধোঁয়া ওঠে না। লোকজন বেকার।

ইংরেজ-কোম্পানীর কয়েকটি মাত্র কুঠি তখনও চলছে।

চাষীর যে-সব ছেলে চাষ ছেড়ে দিয়ে কয়লাকুঠিতে চাকরি করছিল, এখন তারা বাড়ীতে বসে। চাষ-আবাদের জমিও গেছে, এখন আবার চাকরিটাও গেল।

জামজুড়িতে হাট বসতো প্রতি রবিবার। সে-হাট এখনও বসে, কিন্তু সে শুধু নামে মাত্র।

তিঙ্গুল নদীর ও-পারে চাষাদের গ্রাম একটা এখনও আছে। বাড়ীর পাশে ক্ষেতে-খামারে কিছু তরি-তরকারি এখনও হয়। ঝুড়িভর্ত্তি সেই সব ফসল তারা বেচতে আসে জামজুড়ির হাটে।

বেচতে আসে, কিন্তু কেনবার লোক কোথায়?

দু' পয়সা সের বেগুন আর চার পয়সা সের আলু। সীম, লঙ্কা, পেঁয়াজ, কচুর দাম এক রকম নেই বললেই হয়।

বর্ষার কয়েকটা মাস তিঙ্গুল নদী কানায় কানায় ভরে থাকে। গিরিমাটি-ধোয়া ঘোলাটে জলের ঢল নেমে আসে পশ্চিম থেকে।

বর্ষার পর শরৎ।

পেঁজা তুলোর মত আকাশ-ভরা সাদা সাদা মেঘের সমারোহ। তিঙ্গুলের ঘোলা জল একটু যেন পরিষ্কার বলে মনে হয়। তার পর ধীরে ধীরে কেমন করে কোন্ দিক দিয়ে সব জল যে শুকিয়ে যায়—কেউ তা বুঝতে পারে না।

দেখতে দেখতে শীত এসে পড়ে। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া প্রথম প্রথম মন্দ লাগে না। নদীর ধারে ধারে আঁকাবাঁকা মেঠো পথ ধরে জামজুড়ি থেকে ভাঙা হাটের লোকজন একটু সকাল-সকাল বাড়ী ফিরে আসে। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে পড়ন্ত সূর্য্যের স্তিমিত আলোর ছটায় নদীর শুক্‌নো বালি চিক্‌চিক্ করে ওঠে।

পশ্চিমের আকাশটা লালে লাল! মনে হয় সারা আকাশে কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

পাখীদের নীড়ে ফেরবার সময়।

চাষা-বৌ বলে : এই সস্তাগণ্ডার বাজারে কি করে কি হবে বলতে পারো মোড়ল?

মোড়ল তাকে সান্ত্বনা দেয়। বলে : আর কিছু দিন সবুর কর্! এমন দিন থাকবে না চিরকাল।

চিরকাল যে থাকবে না তা সে জানে। এ-রকম সান্ত্বনার কথা সে অনেক শুনেছে।

কিন্তু কথায় পেট ভরে না। ভাল দিন যখন আসবে, তত দিন হয়তো সে বাঁচবে না।

বলে : গাঁয়ের জমিজমা বেচে দিয়ে তখন যদি কুঠির বাজারে গিয়ে বাস করতাম তাহ'লে বোধ হয় ভাল হ'তো।

অর্থাৎ গ্রামে আছে বলেই তাদের এত কষ্ট। শহর-বাজারে থাকতে পারলে হয়ত সুখে থাকতো—এই তার ধারণা।

শহর-বাজার মানেই জামজুড়ির বাজার।

বাজারের অবস্থা আরও শোচনীয়।

বাজারে ঢুকতেই দেখা যায়, একটা পাঠশালা বসেছে। ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ের চীৎকারে-হট্টগোলে জায়গাটা একেবারে গুলজার হয়ে আছে।

কয়লা-কুঠির যখন বেশ জমজমাট দিন, তখন কোথাকার কোন্ এক মাড়োয়ারী ব্যবসাদার এসেছিল এখানে বায়োস্কোপের খেলা দেখিয়ে পয়সা রোজগার করবার মতলবে। কিন্তু খেলা তাকে আর দেখাতে হয়নি। ঘরখানা তৈরি হবার আগেই বাজার গেল পড়ে। চতুর ব্যবসায়ী পালিয়ে গেল সেই অসমাপ্ত ঘর ফেলে দিয়ে। স্থানীয় এক গরীব ব্রাহ্মণ সেই ভাঙ্গা ঘরের চার কোণে চারটে বাঁশের খুঁটি পুঁতে ছোট্ট একটি খড়ের চালা বেঁধে পাঠশালা খুলেছে।

পাঠশালা না ছাই. লোকটা নিজে বাড়ী-বাড়ী গিয়ে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের ডেকে এনে পড়াবার নামে হাতের সুখে উত্তমরূপে প্রহার করে আর কান ধরে সুর করে নামতা বলায়।

অথচ এই জামজুড়ির বাজারে এক সময় ছিল সবই। জামা, জুতো, ছাতা, চুড়ি, তরি-তরকারি, মাছ-মাংস, ঘি-দুধ—ছিল না কি?

মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে হবে—জামজুড়ির বাজার ছাড়া উপায় নেই। শাড়ী-সেমিজ তো আছেই, এমন-কি তরল আলতার শিশিটি পর্য্যন্ত!

পূজোর সময় জামজুড়ির বাজারে ঢোকে কার সাধ্য!

বাজারে ঢুকবার মুখেই ছিল লালরঙের টালির ছাদ দেওয়া পুলিশ-থানা। তার পাশেই প্রকাণ্ড একটা বুড়ো বটগাছ। গাছের নীচে অসংখ্য গরুর গাড়ী। বহু দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে জিনিসপত্র সওদা করতে আসতো তারা।

টুং-টুং করে গরুর গলার ঘণ্টা বাজছে, ঘুঙুর বাজছে।

ওদিকে সারাসারি দর্জ্জির দোকান। সেলাই-এর কলের ঝক্‌ঝক্ শব্দে বাজারে কান পাতবার উপায় নেই। লোকে লোকে বাজারের পথ যেন ঠাসা!

কিন্তু এ সবই হ'তো বুঝি ওই মাটির তলা থেকে প্রচুর পরিমাণে কয়লা উঠতো বলে। ধরিত্রী তার বুকের তলার গুপ্ত রত্ন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

যেই কয়লার খাদ বন্ধ হওয়া, আর অমনি তার সঙ্গে সঙ্গে সবই বন্ধ।

তবে ও-অঞ্চলে কয়লার বড়-বড় কারবারী যারা, তারা না কি বলে : এ মন্দা বাজার থাকবে না কখনও। আবার উঠবে। এক্ষুণি উঠতে পারে—কোথাও যদি বেশ বড় রকমের একটা লড়াই বেধে যায়!

কিন্তু এই ভারতবর্ষ—বিশেষ করে আমাদের এই বাংলা দেশ—মানুষে মানুষে মারামারি কাটাকাটি পছন্দ করে না। তবু প্রাণের দায়ে এই কয়লা-কুঠির দেশের লোকগুলি তখন মনে-মনে প্রার্থনা করে—বাধুক লড়াই!······

তা না হ'লে যে-জামজুড়ির বাজারে একদিন যাত্রার দলের পোষাক পর্য্যন্ত ভাড়া পাওয়া যেতো, সেখানে আজ-কাল সাজ-পোষাক

দূরের কথা, সামান্য একটা রঙের দোকান—তাও নাকি বন্ধ হয়ে গেছে। দোকান বন্ধ করে দিয়ে দোকানী চলে গেছে কলকাতার কাছাকাছি কোথায় কোন্ পাট-কলের বাজারে পান-বিড়ির দোকান করতে।

সুলতানপুর থেকে হরিমোহন মুখুজ্যের বড় ছেলে কীর্ত্তিবাস সেদিন রং আনতে গিয়েছিল জামজুড়ির বাজারে। ফিরে এল খালি হাতে। রং পাওয়া গেল না। কাপড় রাঙাবার রং।

গ্রামের ছেলেরা ভেবেছিল, যাত্রাগান করবে সরস্বতী পুজোর দিন। থিয়েটারের হাঙ্গামা অনেক। কাঠের প্ল্যাটফর্ম্ম করতে হবে, ষ্টেজ বাঁধতে হবে, সিন্-সিনারি আনতে হবে ভাড়া করে।

তার চেয়ে কাজ নেই অত হাঙ্গামায়। সুলতানপুরের বাবুদের বাড়ী থেকে বড় সামিয়ানা একটা চাইলে পাওয়া যাবে, কিছু সাজ-পোষাক আনাতে পারলেই—বাস্, আর কিছুরই দরকার হবে না, থিয়েটারের এক দিনের খরচে যাত্রা হবে তিন দিন।

কিন্তু সময় এমনি খারাপ যে তাতেও বাধা পড়লো।

চাঁদার টাকা উঠলো এত কম যে সাজ-পোষাকের সামান্য ভাড়া, —তাও দেওয়া যায় না।

বাবুদের বাড়ীর চাঁদা ধরা হয়েছিল দশ টাকা। দশ টাকার জায়গায় তাঁরা পাঠিয়ে দিয়েছেন মাত্র দুটি টাকা। তার পর ছেলে-ছোকরার দল নিজেরা গিয়ে অনেক বলে-কয়ে হাতে-পায়ে ধরে চেঁচামেচি করে অনেক কষ্টে আদায় করে এনেছে আর একটি টাকা।

বাবুদের বাড়ীতেই এই। বাকি সব তো নেহাৎ গরীব। আট আনা পয়সা দিতে হ'লে জিব বেরিয়ে যায়। চাল বেচতে হয় সাত সের।

এত গরীব অবশ্য কেউই ছিল না। সবাই দোহাই পাড়ে কয়লা-কুঠির। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে।

কাজেই রীতিমত সাজ-পোষাক পরে যাত্রাগান করবার ইচ্ছাটা আপাততঃ তাদের দমন করতে হয়েছে। এ বছরের মত শেষ পর্য্যন্ত তারা স্থির করেছে, কাপড়-চোপড় রাঙিয়ে, জাপানী মুক্তোর মালা পরে পাখীর পালক-বসানো হাতের তৈরি কাগজের মুকুট মাথায় দিয়ে কাজ চালিয়ে দেবে। পরে ভগবান যদি কখনও মুখ তুলে চান, আবার যদি কয়লার কুঠিগুলো ভাল চলতে থাকে তো কি যে তারা করবে তা না বলাই ভালো।

অধিকারীদের চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন ছেলেদের যাত্রাগানের রিহার্স্যাল্ চলছে। হঠাৎ সেখানে এসে বসলেন রতন সরকার। এই রতন সরকার একদিন চাকরি করতেন জামজুড়ির ইংরেজ-কুঠিতে। তখন তাঁর প্রতাপ-প্রতিপত্তি ছিল একটা দেখবার মত বস্তু। এখন আর তাঁর সে চাকরিও নেই, সে প্রতাপও নেই। পুরনো দিনের মূল্যবান স্মৃতির মধ্যে এখন আছে মাত্র তাঁর সেই বিরাট এক-জোড়া গোঁফ—পাকিয়ে পাকিয়ে সরু সূচের মত করে কান পর্য্যন্ত টানা, সেই রূপো দিয়ে বাঁধানো লাঠিগাছটি আর হাঁটু পর্য্যন্ত নামানো শীতকালের গরম কোটখানি। রোজ সন্ধ্যায় এক কালে যাঁর এক বোতল হুইস্কি না হ'লে চলতো না, আজ তাঁর আনা দুই-তিনের গাঁজাতেই চলে। চোখ দুটি লাল। সম্ভবতঃ টেনেই এসেছেন। এসেই তিনি একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : কি রে, তোদের সাজ-পোষাকের কি হ'লো?

গ্রামের অন্ধকার পথ। একটা আলো না হ'লে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার ভয়। তাই লণ্ঠন একটি তিনি হাতে ঝুলিয়ে এনে-ছিলেন। তেলটা আর অনর্থক পোড়ে কেন? হাত দিয়ে কলটি ঘুরিয়ে পল্‌তেটা খাটো করে দিলেন। দিয়েই লণ্ঠনটা তিনি পেছন দিকে আড়াল করে' একটু লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিলেন। তিনকড়ি ছিল পাশেই দাঁড়িয়ে। চট্ করে লণ্ঠনটা সে এক রকম ছোঁ মেরে তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিলে। নিয়েই সে প্রথমে কলটা ঘুরিয়ে পল্‌তেটা দিলে পুরোদমে জ্বালিয়ে। তার পর একটা খুঁটির গায়ে পেরেকের ওপর লণ্ঠনটা ঝুলিয়ে রেখে বললে : জ্বলুক না কাকা, আমাদের লণ্ঠন মোটে দুটি। দেখতেই তো পাচ্ছ?

দেখতে অবশ্য সকলেই পাচ্ছিল। মাত্র দুটি লণ্ঠন, তাও আবার অবস্থা কারও ভাল নয়। জীবনীশক্তিহীন বৃদ্ধের মত আষ্টে-পৃষ্ঠে কাগজের পটি-মারা কাচ দেওয়া দুটি লণ্ঠন দু'দিকে দুটি খুঁটির গায়ে ঝুলছে।

রতন সরকার মুখে কিছু বলতে পারলেন না। মুখ ভার করে বসে রইলেন। এক হাত দিয়ে হাতুড়ি ঠুকে আর এক হাত দিয়ে তাঁই তাঁই করে চাটি মেরে তবলা ঠিক করছিল বলরাম। বলরাম পাল। জাতিতে স্যাকরা। তারও গায়ে সেই কুঠির আমলের হাতকাটা খাকি সার্ট। হাতুড়ি-সমেত হাত দুটি একবার কপালে ঠেকিয়ে বললে : পেন্নাম হই দাদাবাবু! আসুন। সাজ-পোষাকের কথা বলছেন? এ বছর আর হ'লো না। দশ টাকা কম পড়লো।

বলেই সে রসিকের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে ইঙ্গিতে কি যেন বুঝিয়ে দিলে। দিয়েই নিজের কাজ করতে লাগলো।

ইঙ্গিতটা বুঝতে রসিকের দেরি হ'লো না। তৎক্ষণাৎ সে বলে বসলো : তা—টাকা দশটা তুমিই দাও না রতন-খুড়ো! খুড়ীমাকে তাহ'লে আমরা সাজ-পোষাক পরেই গাওনাটা শুনিয়ে দিই।

রতন সরকারের চোখ ছিল তাঁর লণ্ঠনের দিকে। কারও গায়ে মাথায় একবার লাগে তো টিপ্ করে সেটা পড়ে যাবে। আর পড়লেই বাস্—ঠুন্‌কো কাচ, ভেঙ্গে যাবে চুরমার হয়ে......

চিন্তায় ব্যাঘাত পড়লো। কি বললি? দশ টাকা আমি দেবো? গান শুনিয়ে তোরা তো আমার সব দুঃখুই ঘুচিয়ে দিবি—তাই দশটা টাকা দিতে হবে—চাঁদা?

—এতক্ষণ পরে একটা কথার মত কথা শোনা গেল। কথাটি বললে রমাই লায়েক।

পাশেই সে বসেছিল একটা খুঁটিতে ঠেস্ দিয়ে। বুড়ো হয়েছে। একটু আফিং খাওয়ার অভ্যেস। তাই সে রোজ একবার এখানে এসে বসে। বিনা খরচে তামাক খাওয়া চলে। আজ তার রাগ হয়েছে। রাগের কারণ—হুঁকোটা অনেকক্ষণ থেকে হাতে-হাতে ঘুরছে, বার-দুতিন হাত বাড়িয়েছে হুঁকোটা নেবার জন্যে, কিন্তু কেউ তা দেয়নি। চট্ করে রতন সরকারের কথাটা তাই যেন সে লুফে নিলে। বললে : বল বাবা রতন, তুমি নইলে হক্ কথাটি কেউ বলতে পারে না। বলি—বয়েসের একটা সম্মান তো আছে! যাত্রার দল করে সেটিও গেল। বাপ-জ্যেঠা গুরুজন কিছু মানামানি নেই, যেখানে যাচ্ছি—দেখছি, এতটুকু-টুকু ছেলেরা সব ঘুরঘুর ঘুরঘুর করে নাচছে আর বলছে—এক-দুই-তিন, এক-দুই-তিন! আর গান যদি শোনো তো কানে আঙুল দিয়ে

হবে। আর—এই ত্যাখো না, এই যে এতক্ষণ ধরে হুঁকোটা টানছিস্, তা' ভুলেও একবার হাত বাড়িয়ে দে ইদিকে! তা নয়, শুধু চাঁদার বেলা—দু' আনায় হবে না খুড়ো, তোমার চাঁদা ধরা হয়েছে এক টাকা। ধরা হয়েছে! ধরা হয়েছে কি রে! এ কি হাকিমের জরিমানা না জমিদারের জুলুম?

লায়েক আপন মনেই বকে যাচ্ছিল, রসিক বললে: তুমি চুপ কর লায়েক, তুমি চেঁচিয়ো না। দে রে দে, লায়েককে হুঁকোটা একবার দে, নইলে পেট ফুলে মরে যাবে।

লায়েক চীৎকার করে উঠলো।—মরে যাবে কি রে! মরার কথা বলতে আছে কাউকে? শোনো রতন, শোনো! চাঁদা নিয়ে তোরা কি করবি তা আমি জানি। নেশা করে ফূর্তি করবি। এই তো?

রসিক বললে: সবাইকে তুমি নিজের মত কেন ভাবো বল তো লায়েক? নেশা আমরা কেউ করি না। সাজ-পোষাক পরে গানবাজনা করবো আমরা—আর কিছু করবো না।

লায়েকের রাগ তখনও কমেনি। হুঁকোটা তখনও তার হাতে আসেনি। তখনও সে ঘন-ঘন তাকাচ্ছে সেই দিকে। বললে: সাজ-পোষাক পরে কি হবে? যতই সাজ পর আর পোষাক পর,—সবাই বলবে সেই বস্‌কে-ছোঁড়া! তোকে ভীম-অর্জুন কেউ বলবে না। কলকাতার বড়-বড় দলের গাওনা হয়—সে এক কথা আলাদা। না কি বল রতন-বাবাজি!

রতন সরকার সে কথা অবশ্য বলতে পারলেন না। তখনও তিনি চাঁদার কথাই ভাবছিলেন। বললেন: সে দিন আর নেই রসিক, কাল সকালে একবার যাবি, দেবো পাঁচ-আটক পয়সা।

একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো রসিক আর বলরাম।

—নেবো না। দশ টাকা না দিন, পাঁচ টাকা আপনাকে দিতেই হবে।

কি যে বলিস্ তোরা! রতন সরকার উঠে দাঁড়ালেন।

—এ কি! উঠলে কেন? গান দু'-একখানা শুনেই যাও।

না, রাত হয়ে গেছে। লণ্ঠনটা হাত বাড়িয়ে পেড়ে নিয়ে ততক্ষণে তিনি চণ্ডীমণ্ডপের নীচে নেমে গিয়ে জুতো পায়ে দিচ্ছেন। বললেন: আলোয় আলোয় আসবে তো এসো লায়েক!

লায়েক তখন সবেমাত্র হুঁকোটা হাতে পেয়েছে।

বহুক্ষণ প্রতীক্ষার পর হুঁকোটা পেয়ে প্রাণপণে পড়্ পড়্ করে টানতে টানতে লায়েক বললে: তুমি যাও বাবাজি, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

রতন সরকারকে দেখিয়ে রসিক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে: ওঁরাও যদি এই কথা বলেন, আমোদ-আহ্লাদ তুলেই দিতে হয়।

লায়েক বললে: না না, তুলবি কেন?

বলেই একবার তাকিয়ে দেখলে, রতন সরকারের হাতের আলো গ্রামের অন্ধকার পথে তখন অনেক দূর চলে গেছে। মুখ থেকে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে: দেবে দেবে, রতন পাঁচ টাকাই দেবে। ব্যাটা চামার—এক নম্বরের কেপ্পণ কিনা, তাই তাড়াতাড়ি পালালো। তোরাই-বা ছাড়বি কেন, দু'চার বার যাওয়া-আসা করবি, জোর করে ধরে বসবি—তাহ'লেই দেবে। যাত্রার দলটা করেছিস যখন এত কষ্ট করে—আমোদ-আহ্লাদ করবি তো 'বেশ ভাল করেই কর।

[ক্রমশঃ।

গাঁয়ের মাটির গান

শ্রীশান্তি পাল

আমরা মালী সাজাই ডালি
ফুলের বেসাত বই,
জুঁই চামেলি বকুল বেলির
গন্ধে পাগল হই।

বন-বাদাড় সাফ সুতোর করি,
বাগ-বাগিচা বাতর গড়ি,
সকাল-সাঁঝে কুপোই জমি,
দুপুরে জিরোই।

খোন্তা, খড়া, দাউলী, শাবল,
কাতান, কাঁচি ভরসা কেবল;
শক্ত খোলা পাস্তা ক'রে
কোদালে কুরোই।

খোল-গোবরে সারাই মাটি,
চৌকো দিয়ে বানাই ভাটি,
কাঁচা ডালে কলম বাঁধি
আগাছা নিড়োই।

ফুলের ফসল ফললে পরে,
তুলে নে' যাই আপন ঘরে;
মোদের গাঁথা গোড়ের মালায়
ভাবুকে ভুলোই।

সুবাস নিয়ে বাঁচি মরি,
কুঁড়ের মাঝে স্বর্গ গড়ি,
মিলিয়ে ভক্ত ভগবানে
পরাণ জুড়োই।

শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অদূরে একজন ভক্তের কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হ'ল—

"আদর করে হৃদে রাখ আমার আদরিণী শ্যামা মাকে।
(ও মন) তুমি দেখ আর আমি দেখি,
আর যেন মন কেউ না দেখে।"

বামাচরণ ভাবে বিভোর হ'লেন ; ছ'চোখ দিয়ে ঝরে অশ্রুধারা ; "শ্যামা মা, কোথা যাচ্ছ, এস মা ! ঐ শ্মশানে ঘুরে কি হবে মা ? তুই এত নিদয়া কেন ? কথা শোন্, বিশ্ব জুড়ে তোর ছেলেরা 'মা, মা' ব'লে কাঁদছে ; তাদের ক্ষিদে মিটিয়ে দে ; আমাকে বড় বিরক্ত করে ! আমি আর পারি নে, মা !" দুই হাতে তালি দিয়ে সাধক ক্ষ্যাপা নাচতে লাগলেন :

"নেচে নেচে আয় মা শ্যামা,
আমি মা তোর সঙ্গে যাব।
দেখব রাঙ্গা পা দু'খানি,
বাজবে নূপুর শুনতে পাব।"

ক্লান্ত সাধক শান্ত হ'লেন বহুক্ষণ পর। সন্ধ্যার ছায়া দূর হ'ল ; নামল অন্ধকার ; ক্ষ্যাপার আসনের চার পাশে শিয়াল-কুকুরের দল নির্ব্বিবাদে শুয়ে পড়ল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ! অন্তরঙ্গ ভক্তদের দু'-চার জন কাছেই বসেছিলেন। বিজয়ার বিসর্জ্জনের বাদ্যভাণ্ডের করুণ আর্ত্তনাদ তখনও আকাশে-বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক ভক্ত শুধালেন, "মাকে বিসর্জ্জন দেয় কেন বাবা ?" ক্ষ্যাপা ঠাকুর উত্তর করলেন, "মায়ের আবার বিসর্জ্জন কি বাবা ! ভক্ত মাকে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে তিন দিন আনন্দ করে ; হৃদাকাশ থেকেই নেমে আসেন মা। ভক্তের হৃদাকাশেই মায়ের স্থান। পূজার শেষে ভক্ত মানস-সরোবরেই মাকে ডুবিয়ে রাখে ; এই হ'ল বিসর্জ্জন। ত্রিভুবন-জোড়া আমার মা ; তাঁকে কি নদী-নালায় ডুবানো যায় ? আবার ভক্তের কাছে তিনি এত ছোট যে ভক্তের হৃদয়-জলে মা আপনিই হাবুডুবু খান।"

"কামই যত নষ্টের গোড়া, এ রিপুকে নষ্ট না করলে ভক্তির উদয় হয় না বাবা ! কামই আমাদের সংসার-মায়ায় জড়িয়ে রাখছে।"—বললেন আর এক ভক্ত।

"তুমি ত বেশ তত্ত্বজ্ঞানী বাবা ! এ রকম জ্ঞানে মাকে পাওয়া যায় না। কামকে মহাদেব নষ্ট করতে পারেননি ; আর তুমি বল কি না সেই কামকে নষ্ট করবে ? কামকে জয় করতে হবে। কামকে কখনও নাশ করা যায় না। কামের নাশ নাই বলেই ব্যাটা মহাদেব রতির সাধনায় তুষ্ট হয়ে মদনকে আবার বাঁচিয়ে দেন। জগতের মঙ্গলের জন্য কামকে বশ করতে হয় ; অতনুর প্রভাবেই কুমার কার্ত্তিকেয়ের জন্ম। এটাও আমার মহামায়া মায়ের লীলা। না হ'লে যে সৃষ্টি রোধ হয়ে যায় ! সবই নিরাকার ব্যোম হ'লে মা আমার কা'কে নিয়ে খেলা করবেন ? ছেলে-পিলে নিয়েই মায়ের সংসার। তা' না হ'লে তাঁকে 'মা' ব'লে ডাকবে কে ?"

"মন্ত্র-তন্ত্রের কি দরকার বাবা ? 'মা' বলে ডাকলেই ত মা সাড়া দেবে ?"—শুধালেন ভক্তটি। "আরে শালা, মন্ত্র-তন্ত্রের গুণ আছে রে শালা ! তোকে পথ দেখাবে কে ? মন্ত্রই হচ্ছে চাবিকাঠি। গুরুই তোকে সেই চাবিকাঠি দেবে। কৌশল চাই, কৌশল চাই ! মনকে বশে রাখার কৌশল জানা চাই।" উত্তর করলেন ক্ষ্যাপা।

"সর্বভূতে ভগবান দর্শন এবং ভগবানের মধ্যে সর্বভূত দর্শনই হচ্ছে সাধনার পরম লক্ষ্য, এ কথা মনে রাখবি। গীতায় বিশ্বরূপে এটাই দেখিয়েছেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। এই জ্ঞানের উদয় হ'লে আপন-পর, কিংবা সুখ-দুঃখের ভেদাভেদ থাকে না, সর্বত্র মা'কে দেখ্‌তে পাবি ; মায়া তখন মহামায়ারূপে দেখা দেবে।"—প্রসন্ন হাসিতে ক্ষ্যাপার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠল।

"সংসারে থেকে ভজন-সাধন করা অতি সহজ ; যুগে যুগে কত ঋষি, কত সন্ন্যাসী, কত অবতার এসেছে ; কেউ সংসার স্রোত বন্ধ করতে পারেনি. আমার মা যে পুরো সংসারী। শিব আর পার্ব্বতী নিয়েই আমাদের ঘর-সংসার। প্রত্যেক পুরুষই শিব এবং প্রত্যেক নারীই পার্ব্বতী ; পুরুষ আর প্রকৃতি নিয়েই সংসারের লীলা। এই জ্ঞান সংসারী নর-নারীর মধ্যে যতই ভেসে উঠবে, ততই এই মাটির সংসারেই নেমে আসবে কৈলাস।"—ক্ষ্যাপা বাবার সহজ-সরল উপদেশে ভক্তেরা আনন্দ পান ; তাঁদের মনে হয় আশার সঞ্চার।

* * *

দিন দিন ভক্তের সংখ্যা বেড়ে যায়। কিন্তু গুরুগিরি স্বীকার করেন না বামা ক্ষ্যাপা। ভক্ত যুবক নলিনীকান্ত সরকারী চাকুরী ছেড়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভের আশায় অনেক জায়গায় ছোটাছুটি করে তারাপীঠে এসে ক্ষ্যাপার শরণ নিলেন ; তাঁরই সহায়তায় জ্ঞানলাভ করে নলিনীকান্ত পরমহংস নিগমানন্দ নামে খ্যাত হ'লেন।

মায়ের মূর্ত্তি বা রূপের কি সীমা আছে ? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই মায়ের মূর্ত্তি ; যে রূপে, যে নামে মাকে চাও, সেই রূপে, সেই নামেই মা সাধককে দেখা দিবেন ; কবিরা যুগে যুগে তাঁর গুণকীর্ত্তন করে গেছেন ; সাধকদের কথা ছেড়ে দাও। তারা না

নয় গাঁজাখোর পাগল। কিন্তু কবির মানসলোকেও তিনি ধরা দেন। তাঁকে দেখবার ব্যাকুলতাই ভক্তি। ভক্তি আর কিছু নয়। পাপও কিছু নয়। পাপ-পুণ্যের সংস্কার থাকলে মুক্তি পাবি না; এটা ভাল, ওটা মন্দ করতে করতেই জীবন যাবে। ওই বেটা মহাকাল মায়ের চরণ জুড়ে রয়েছে; মহাকালকে দলিত করে চলেছে মায়ের লীলা। আমরা মায়ের ছেলে, মায়ের কোলই আমাদের লক্ষ্য; হাত-পা ছুঁড়ে যখনই কাঁদি, তখনই মা কোলে তুলে নেন। মহাকাল মহাদেবের সঙ্গে মায়ের পা নিয়ে ঝগড়া করে কাজ কি বাবা! মায়ের কোলও কেউ দখল করেনি!"—এইরূপ চলে ক্ষ্যাপা বাবার শিক্ষা।

তারাপীঠের মহাশ্মশানে উন্মনা সাধক ঘুরে বেড়ান; মাঝে মাঝে বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে যায়। সুখ-দুঃখের কোন অনুভূতি নাই; হাসেন, কাঁদেন, আর কখন কখন বা কারও সঙ্গে কথা বলেন; নেপথ্যে থেকে কে যেন তাঁর কথার উত্তর দেয়। বালকাল থেকেই লোকে তাঁকে জড়বুদ্ধি ভাবত। লোকে মনে করে ক্ষ্যাপা বেশী কথা বলতে জানে না; মন্ত্র-তন্ত্র-জ্ঞানও তাঁর নেই। আর এক দল মনে করে ক্ষ্যাপা আপন-ভোলা ছদ্মবেশী কোন মহাপুরুষ; মর্ত্যলোকে জন্ম কাটাবার জন্যে নেমে এসেছেন। লোকের ধারণা বা অপবাদের ধার ধারেন না ক্ষ্যাপা। তারানামেই তিনি পাগল, তারা ছাড়া কোন কিছুই জানেন না; তাঁর মতে তারাবিদ্যাই বড় বিদ্যা। তারাই স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী। তাঁর কাছে তারা-মা প্রত্যক্ষ মানুষের মত। ছুটে যান তিনি তারা-মাকে ধরতে; শ্মশানের ঝোপ-ঝাড়ে উঁকিঝুঁকি মেরে কোন কোন দিন ছুটোছুটি করে বেড়ান ক্ষ্যাপা। মা যেন তাঁর সঙ্গে খেলা করতে আসেন!

"টুঁ-টুঁ, দাঁড়া যাচ্ছি, দেখি এবার ধরতে পারি কি না? লুকিয়েছিস্, কোথা লুকোবি, ঠিক তোকে খুঁজে বার করব!" গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন নিস্তব্ধ শ্মশানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে যান ক্ষ্যাপা; তাঁর কানে যেন ভেসে আসে এক মধুর "টুঁ" শব্দ। কেউ যেন সহচরকে আহ্বান করছে; লুকোচুরির সেই আনন্দমুখর আহ্বান—'টুঁ-কি'। পাগল ছেলে ছুটে যান; রহস্যময়ী যেন একবার দেখা দেন; আবার কোথা লুকিয়ে পড়েন, ক্ষ্যাপার চোখে-মুখে হাসির ঝলক; ক্লান্তি আসে। "না, না, না, ধরব না তোকে! এবার আমার পালা, ধর্ দেখি আমাকে? আয়, আয়, কাছে আয়!"

মড়ার মাথাগুলো পায়ে লেগে গড়াচ্ছে; কঙ্কাল-অস্থি পায়ের তলা বিদীর্ণ করছে; রক্ত ঝরছে পা আঁচড়ে গিয়ে; ক্ষ্যাপার ছুটোছুটির অন্ত নেই। ভক্তেরা দূরে দাঁড়িয়ে অবাক-বিস্ময়ে এ পাগলামি লক্ষ্য করেন; আজ-কাল বড় বাড়াবাড়ি চলছে, ক্ষ্যাপা ক্ষান্ত হতে চায় না। কখনও চিৎকার করে উঠেন। দু' তিন দিন নিরম্বু উপবাস চলে; শিব-প্রতিম ভৈরবকায় দেহ-সুঠাম কখনও বা মলিন হয়ে উঠে; কখনও বা ধ্যানমগ্ন ক্ষ্যাপার দেহকান্তি অন্ধকারে যেন দিব্যজ্যোতি ছড়ায়; দলে দলে নর-নারী আসে; প্রার্থনা তাদের অফুরন্ত। ক্ষ্যাপা শোনেন; আর হাসেন। চাওয়ার কি আর অন্ত আছে? সমুদ্রমেখলা এই বিরাট পৃথ্বী, সৌর-মণ্ডলে অসংখ্য তারকা কিসের ইঙ্গিত দেয় মাটির মানুষের মনে? চাঁদের জ্যোৎস্নায় নেমে আসে কার করুণাধারা? তরুণ তপন আকাশচক্র পরিক্রমণ করে ডুবে যায়। মানুষ কি চায়? রহস্যলোক তার চোখের সামনে ভাসে; রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যুর বিভীষিকায় ভীত হয়েও মানুষ এই পৃথিবীকে ভালবাসে! পৃথিবীকে আঁকড়ে থাকতে চায়। এমনি মাটির মায়া! ক্ষ্যাপা সাধক মানুষের এ দুর্ব্বলতা দেখেন। তাদের অফুরন্ত কামনা-বাসনার সাধ মেটাবেন তিনি? তাদের রোগ, শোক ও অভাব-অভিযোগ মেটাবেন তিনি?—তাই বুঝি তিনি মা-ভাই-বোনকে ছেড়ে তারা-মায়ের কোলে আশ্রয় নিয়েছেন? ছোটবেলায় সামান্য অপরাধে যারা নির্য্যাতন করেছে, তারাই আজ সাশ্রুনয়নে তাঁহার করুণার ভিখারী!

বামাচরণ একান্ত মনে কখনও বা গান ধরেন: আষাঢ়ের বারিধারা তাঁর মনে নূতন রস সঞ্চার করেছে; ঝির্-ঝির্ টির্-টির্ ঝরে বারিধারা; ঘন মেঘে চারি দিক অন্ধকারময়, কোলের মানুষ দেখতে পাওয়া যায় না; কুটীরে কোন আলো নাই; এক-এক বার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে; বিদ্যুতের মাঝে কার হাসি দেখতে পান ক্ষ্যাপা?

"জান না রে মন পরম কারণ
শ্যামা কখন মেয়ে নয়!
সে যে মেঘেরি বরণ, করিয়ে ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়।"

ঐ দেখ, বেটি ভিজছে, জলের মধ্যে চুল এলিয়ে নাচছে আর হাসছে; থাম্, বেটি থাম্। তোকে কে চিনতে পারে? এত বহুরূপ যাঁর, তাঁকে কি কেউ সহজে ধরতে পারে? জয় তারা! জয় তারা!—

ক্ষ্যাপার অন্তরঙ্গ ভক্ত দু' এক জন ছিলেন কুটীরে। তাঁর ভাব-বৈচিত্র্য তাঁদের বিহ্বল করে তোলে; রথযাত্রার দিন ক্ষ্যাপা বলেছিলেন 'আমার রথ এসে গেছে বাবা! এবার আমায় যেতে হবে। কিন্তু আমার উল্টো রথ আর হবে না, আমি ছড়িয়ে থাকব ঐ তারাপীঠের ঝোপে-ঝাড়ে, ধূলিকণায়; আবকার জলে আমাকে দেখতে পাবে। আমার মায়ের সঙ্গে আমি মিশে যাব; আর ফিরে আসব না। দেহী জীবের ক্রন্দনে আমি টিকতে পারছি না। ব্যাটাদের যত বুঝাই, ততই আমাকে পেয়ে বসে। এ দেহটা যে কিছুই নয়, এই কথাটা কেউ বুঝে না। কেউ মাকে দেখতে চায় না; চায় কেবল টাকা, চায় রোজগার, চায় আরাম! আমি কি ডাক্তার-বদ্যি যে রোগ ভাল করব? কার ছেলে হয় না, তার ছেলে চাই! কি আবদার! তাই লুকিয়ে থাকব আমার মায়ের মত। বন-বাদাড়, আলো-ছায়া, শ্মশান-মশান, শিয়াল-কুকুর, মাটি-পাথর—সবার মধ্যে মিলিয়ে যাব। ব্যস্, বম্ ফট্! কোন্ শালা আমার নাগাল পায়? আমার মায়ের আপুভারে গুপ্তলীলা! বুঝলে কি না!"

ভক্তের দল কেঁদে ওঠেন। "বাবা, তা হ'লে আমাদের কি গতি হবে?" "যাঁর জীব তিনিই আছেন, আমি কি করব বাবা? তিনিই তোমাদের দেখছেন, তিনিই দেখবেন। তিনি ছাড়া ত কেউ নয়; তুমি আমি সবাই তাঁরই মধ্যে আছি, তাঁরই কোলে লুকিয়ে পড়ব, ঘুমিয়ে পড়ব; মায়ের বুকে মিশে যাব; তাতে দুঃখ কিসের?"

অদূরে অন্ধকার থেকে এক মাতাল সাধু ভাঙ্গাগলায় গান ধরেছে, পাগলা বাবা তার রস উপভোগ করেন; "বাঃ, বাঃ, শালা মাতাল হয়েছে! তবু বুঝি ঠিক আছে; মা-বোল কি ভোলা যায় রে বাবা!" মাতাল গায়:—

"মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি।
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা,
ভুলেছ কি রাজমহিষী।
তারা, কত দিনে কাটিবে আমার,
এ দুরন্ত কালের ফাঁসি।"

* * * *

আষাঢ় শেষ হয়ে শ্রাবণ এসেছে; চার দিকে ঘনঘটা, বীরভূমের রাঙামাটি জলধারায় আরো রাঙা হয়ে উঠেছে; রক্তিমাভ গেরুয়া আঁচল মেলে ধরেছে ধরণী; ভিজে গেছে সে আঁচল; মাঝে মাঝে গৈরিক জলস্রোত আঁকাবাঁকা খালা-নালায় সর্পিল গতিতে চলেছে; শ্মশানে ঝোপঝাড় আরো বেড়ে গেছে; লতিয়ে পড়েছে শূন্য লতা; শিমূল-ঝাওড়ার আগডালে বাসা বেঁধেছে কত অজানা পাখী। কাকেরা জলধারায় ভিজে ভিজে মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে—কা, কা, কা। ক্ষ্যাপা বাবার আদরের কুকুরগুলো কুটীরের এক পাশে ঝিমুচ্ছে। খাওয়া-দাওয়ার প্রতি ক্ষ্যাপা বাবার আর তত লক্ষ্য নাই। শ্রাবণধারা তাঁর মনে কি যেন এক উত্তাল তরঙ্গ তুলেছে। গৈরিক-বসনা শ্যামা তৃণভূমি তাঁর মনে যেন কোন্ এক পূর্বস্মৃতি জাগিয়ে দিয়েছে! "ঐ যে আমার মা, আয়, আয়, আয় মা! আমিও তোর সঙ্গে যাব।" আপন মনে বিড়-বিড় করে কার সঙ্গে তিনি কথা বলেন, তা বোঝা যায় না।

"তোরা শোন্, ঐ শোন্, কি সুন্দর বাজনা! বীণাপাণি নিজে বীণা বাজাচ্ছেন! না, না, না—ঐ যে স্বয়ং মহাদেব 'বম্ বম্' করে শিঙেতে ফুঁক দিচ্ছেন; আকাশ থেকে বীণা হাতে কি সুন্দর এক দিব্যকান্তি সন্ন্যাসী নেমে আসছেন; 'হরি, হরি'—আর কোন বোল তাঁর নাই; কি সুন্দর! কি মধুর! ঐ যে ঋষি নারদ!" ভক্তেরা বিহ্বল হয়ে পড়ে।

শ্রাবণের কাল-রাত্রি; সারা দিন অঝোর ধারা-বর্ষণে সদ্যঃস্নাতা ধরিত্রী; অপরাহ্নে দিব্যদ্যুতিতে ভাস্কর অপরূপ হাসিতে বিদায় নিয়েছেন; ক্ষ্যাপা বাবা সমাধি-ভঙ্গে সেই সময়ে প্রসন্ন মূর্তিতে উপবেশন করেছেন: "বড় সুন্দর এই পৃথিবী। বড় সুন্দর ও আকাশ! মিশে যেতে চাই এরই মধ্যে। আমাকে আর পৃথক করে রাখতে চাই নে। তোমাদের ভয় কিসের বাবা? আকাশে বাতাসে আমার মায়ের সঙ্গে আমি খেলা করব। চাঁদের কিরণে ভেসে আসব তোমাদের কাছে; ভোরের আলোর সঙ্গে আমি তোমাদের ঘরে এসে আলো ছড়িয়ে যাবো। কেমন মজা হবে। তোমরা আমায় ধরতে পারবে না।"

ভক্তেরা সংশয়-দোলায় দুলছে; ক্ষ্যাপা বাবা হয়ত মরলীলা শেষ করবেন; ক' দিন ধরেই তাঁর কথাবার্তায় তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে; শরীরটাও তাঁর ভেঙ্গে পড়েছে। ১৩১৮ সালের ২রা শ্রাবণ; সে দিন বুধবার। বিকাল থেকেই ক্ষ্যাপার মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল; সন্ধ্যায় তাঁর ইঙ্গিতে এক প্রিয় ভক্ত গান ধরলেন:

"ডুব দে রে মন কালী বলে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু' চার ডুবে ধন না পেলে
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন,
শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।......"

গভীর রাত্রি; ক্ষ্যাপা বাবা নিশ্চল, নিস্পন্দ তাঁর দেহ। সমাধি আর ভাঙ্গল না। হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে তিনি যে ডুব দিলেন, আর উঠলেন না। ভক্তবৃন্দ হাহাকার করে উঠল। তারাপীঠের ভৈরব তারাপীঠেই সমাসীন হ'লেন; সে ভৈরব মূর্তি আজও যেন ছায়ামূর্তির ন্যায় মহাশ্মশানে ঘুরে বেড়ায়; শিমূলতলে যে আসনে রজনীর অন্ধকার ভেদ করে ভক্তের মানসচক্ষে ফুটে ওঠে দিব্যজ্যোতিঃ ক্ষ্যাপা বামাচরণের মূর্তি। সেই কালরাত্রিতে শ্মশানভূমিকে লীলাচ্ছলে শিঞ্জিনী-কিঙ্কিণী-ধ্বনিত কার মধুর পদধ্বনি মুখরিত করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে দূরাগত শত শত কণ্ঠে ধ্বনি হয়েছিল—জয় তারা! জয় তারা!

সমাপ্ত

প্যারীর ইফেল টাওয়ারের চূড়োয় কবিগুরু

যাঁরাই প্যারী শহরে গেছেন তাঁরাই দেখেছেন ইফেল টাওয়ার। এই স্তম্ভটি পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থপতিশিল্প অর্থাৎ "The world's third highest structure." যিনি গঠন করেন তাঁর নাম গুস্তাভ ইফেল, ইং ১৮৩২ অব্দে, ফ্রান্সের ডিজনে জন্মেছিলেন। গুস্তাভ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হতেন। গড়িয়ে গড়িয়ে এক দিন গ্রাজুয়েট হলেন প্যারীর সেন্ট্রাল স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে। তিনি নাকি প্রায়ই বলতেন "I have ideas. You will see." ভবিষ্যতে এই স্তম্ভ গুস্তাভ নিজেই তৈরী করেন।

ইফেল টাওয়ারের চূড়োয় উঠে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাঙলা দেশে ফেলে-আসা সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে চিঠি লিখেছিলেন। কবির পত্রগুচ্ছে এই চিঠি ছাপা হয়েছে।

১৭

রোগীদিগের সাধারণ কক্ষ হইতে স্বতন্ত্র একটি কক্ষে স্থান লাভ করিয়া তরুণকুমার চিন্তার অবকাশ পাইল। সাধারণ কক্ষের অপরিচিত ও অসাধারণ পরিবেশ তাহাকে অভিভূত করিতেছিল। বহু চিকিৎসার্থী—খাটের পর খাট,—কেহ বেদনায় বা যন্ত্রণায় কাতরধ্বনি করিতেছে, কাহারও ধ্বনি উচ্চ হইলে শুশ্রূষাকারিণীরা বুঝাইয়া শান্ত করিতেছে বা তিরস্কার করিতেছে. কাহারও প্রাণবিয়োগ হইলে শব সরাইয়া লইবার পূর্ব্বে তাহার শয্যাটি পর্দ্দা আনিয়া অন্যের অগোচর করা হইতেছে; সাক্ষাতের নির্দ্দিষ্ট সময়ে বহু লোক সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে—যদি সহরের অবস্থা স্বাভাবিক হইত, তবে তাহাদিগের সংখ্যা তো অধিক হইত। তাহাদিগের সংখ্যা দেখিয়া তরুণকুমার সহরের অবস্থা অনুমান করিতে পারিত। হাসপাতালে নীত হইবার দুই দিন পরে সে পিতাকে সংবাদপত্র আনিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলেও তাহা বিলি করা দুঃসাধ্য ছিল।

অপরাজিতা ও পরাজিতা

শ্রীদীপঙ্কর

কিন্তু পুত্রের জন্য পিতা প্রতিদিন সংবাদপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। তাহাতে তরুণকুমার "বিরাট হত্যার" যে বিবরণ পাইত, তাহাতে সে বুঝিতে পারিত—অবস্থা শোচনীয়! ঐ অবস্থায় সে যে তাহার দেশবাসীর আর কোন সাহায্য করিতে পারিল না—প্রথম দিনের পরেই বাধ্য হইয়া হাসপাতালে আবদ্ধ রহিল, তাহা তাহার পক্ষে দুঃখের কারণ হইয়াছিল।

প্রথম দিন ও পরের আরও দুই দিন অপরাজিতা তাহার পিতার সহিত হাসপাতালে আসিয়াছিল, জানিয়া তরুণকুমারের চিন্তা নূতন একটি পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অপরাজিতা কেন আসিল? যে অবস্থায় চিত্রলেখা ও সাগরিকা বাড়ী হইতে তাহাকে দেখিতে হাসপাতালে আগমন বিপজ্জনক মনে করিয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন, সেই বিপজ্জনক অবস্থায় অপরাজিতা কেন আসিয়াছে এবং কেনই বা অনুকূলচন্দ্র তাহাকে আনিয়াছেন, জানিবার জন্য তাহার কৌতূহলের সীমা ছিল না। কিন্তু সে কথা সে পিতাকে বা সমীরচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করে নাই—জিজ্ঞাসা করিতে কেমন লজ্জানুভব করিতেছিল। সে যে সেই বিপদ যামিনীতে অপরাজিতাকে নিশ্চয় বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহাতে সে যেমন আত্মপ্রসাদ লাভ করিত—সে যে আর কোন কায করিতে পারিল না, তাহাতে সে তেমনই দুঃখিত হইত। নানা চিন্তার মধ্যে তাহার মনে কেবলই প্রশ্ন উঠিত—অপরাজিতা কেন আসিল? তাহার সম্বন্ধে অপরাজিতার মনোভাব সে গোপন করে নাই। সেই মনোভাব থাকিলেও সে যে তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে, সে, বোধ হয়, তাহাকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতায়। কিন্তু কৃতজ্ঞতার কোন দাবী ত তরুণকুমার করিতে পারে না! সে অপরাজিতাকে রক্ষা করিতে যাইয়া বিপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু সে ত—সে অপরাজিতা বলিয়াই নহে; সে অবস্থায় সে যে কোন ব্যক্তিকে ঐ ভাবেই উদ্ধার করিতে যাইত—সন্দেহ নাই। অপরাজিতার কৃতজ্ঞতার কোন বিশেষ কারণ ছিল না—অথবা কৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে তাহার ধারণা স্বভাবতঃই অতিরঞ্জিত—হয়ত তাহাই নারীর পক্ষে স্বাভাবিক।

চতুর্থ দিন চিত্রলেখা ও সাগরিকা পূর্ব্বদিনেরই মত হাসপাতালে আসিলেন বটে, কিন্তু অপরাজিতা তাঁহাদিগের সঙ্গে আসিল না। আর রক্তদানের প্রয়োজন নাই জানিয়া অপরাজিতা আর হাসপাতালে আসে নাই; সাগরিকা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সে কি হাসপাতালে যাইবে? সে তাহাতে বলিয়াছিল. "না। আর কোন প্রয়োজন নাই।" সে কথা সে যে অনিচ্ছায় বলিয়াছিল, তাহা সাগরিকা বুঝিতে পারে নাই।

সাগরিকার মনে প্রথমে ভ্রাতার বিপদই প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে বিপদ যখন হ্রাস পাইল—তখন তাহার আর এক চিন্তা প্রবল হইল—লোকনাথ কোথায়, কেমন আছে—তাহার কোন বিপদ ঘটে নাই ত? স্বাভাবিক লজ্জা হেতু সে চিন্তার বিষয় সে যতক্ষণ পারিল, কাহাকেও জানিতে দিল না। কিন্তু উৎস হইতে উদ্গত জলে যেমন হ্রদ ছাপাইয়া যায়—সেই চিন্তা তেমনই তাহার মন ছাপাইয়া গেল; আর গোপন রাখা সম্ভব

হইল না। পঞ্চম দিন তরুণকুমারকে দেখিয়া হাসপাতাল হইতে ফিরিবার পরে সে চিত্রলেখাকে বলিল, "পিসীমা, তোমাদের জামাই কোথায়—কেমন আছেন, একবার সন্ধান নিলে হয় না?"

চিত্রলেখা বলিলেন, "তোকে বলতে ভুলে গেছি, আজ সকালে—ক'দিন পরে ডাক বিলি হয়েছে—দীপশিখার পত্র পেয়েছি। তা'তে সে আমাদের সকলের সব সংবাদ জানবার জন্য ব্যস্ততা জানিয়েছে—লোকনাথের কথাও জিজ্ঞাসা করেছে। পত্র পেয়ে আমি তোর পিসামশাইকে সে কথা বললে, তিনি বলেছেন—বড়ই লজ্জার কথা যে, আমরা ক'দিন তরুণকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় লোকনাথের সংবাদ নিতে যেতে পারি নাই; আজই বৈকালে হাসপাতালে আমাদের রেখে তিনি দাদাকে নিয়ে তা'র সন্ধানে যা'বেন। সত্যই লজ্জার কথা—সে হয়ত মনে করছে, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য কায করলাম না।"

সাগরিকা বলিল, "লজ্জার কি কারণ আছে, পিসীমা? ক'দিন যে অবস্থা গেল, তা'তে যা'র মনে করলেও ত যা'বার উপায় ছিল না—নহিলে তাঁ'রা নিশ্চয়ই যেতেন। দীপশিখাকে কি তরুণের কথা সব লিখবেন? দূরে আছে—ভয় পা'বে।"

"দেখি বিবেচনা আর পরামর্শ ক'রে।"

সেদিন সকলে অপরাহ্নের আরম্ভেই হাসপাতালে গমন করিলেন—দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন, তরুণকুমার দ্রুত আরোগ্য লাভ করিতেছে। ডাক্তারও তাহাই বলিলেন।

চিত্রলেখাকে ও সাগরিকাকে হাসপাতালে রাখিয়া সমীরচন্দ্র ও অনুকূলচন্দ্র যখন লোকনাথের সন্ধানে যাত্রা করিবার জন্য হাসপাতালের সোপানশ্রেণীতে অবতরণ করিতেছিলেন, তখন সমীরচন্দ্র বলিলেন, "আমাদের ফিরতে হয় ত দেরী হ'বে—চল, ওদের বাড়ীতে রেখে আমরা যা'ব হ'ব।" তিনি যাইয়া চিত্রলেখাকে ও সাগরিকাকে ডাকিয়া আনিলেন। সকলে যখন হাসপাতালের প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন, তখন এক জন ব্যাকুল ভাবে ডাকিল "বৌদিদি!"

সাগরিকা চাহিয়া দেখিল, তাহার শ্বশুরালয়ের পুরাতন ভৃত্য কুলদীপ। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি সংবাদ, কুলদীপ?"

সে বলিল, "দাদা বাবুকে ডাক্তাররা হাসপাতাল হ'তে নিয়ে যেতে বলছে।"

অনুকূলচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?"

যে দুই জন যুবক কুলদীপের সঙ্গে ছিল, তাহাদিগের এক জন বলিল, "লোকনাথ বাবু হাসপাতালে। আজ ডাক্তাররা বলছেন, মন্ত্রীদের হুকুম, এখন মুসলমান আহতের সংখ্যা বাড়ছে—যত হিন্দু আহতকে সরিয়ে তা'দের জন্য স্থান করা সম্ভব তা করতে হবে। তাই আমরা কোন 'নার্সিং-হোমে' স্থান পাই কি না, দেখতে যাচ্ছি।"

"সে কবে হাসপাতালে এসেছে?"

"১৭ই অপরাহ্ণে। সেই দিন আমাদের পল্লীতে প্রবল আক্রমণ হয়। আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছাত্রীনিবাস। লোকনাথ বাবু পূর্ব্বে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন নাই। সে দিন যখন প্রায় দু'শ লোক ছাত্রীনিবাস আক্রমণ করল—ছাত্রীদের আর্ত্তনাদ উঠল, তখন আমরা কি করব ভাবছি, এমন সময় তিনি ছুটে এলেন। কাছে একটা পার্ক—আমরা তা'র রেলিং খুলে ব্যবহার করবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। তিনি তা'র একখানি নিয়ে অসীম সাহসে ভগ্ন দ্বারপথে—প্রবেশ ক'রে, আক্রমণকারীদের আক্রমণ করলেন। সাহস—রোগেরই মত সংক্রামক। আমরা তাঁর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করলাম। আক্রমণকারীদের তাড়াতে পারলাম বটে, কিন্তু বোধ হয়, তারা দু'টি মেয়েকে বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছিল—আর লোকনাথ বাবুর মাথার চামড়া খানিকটা কেটে গিয়ে ঝুলছিল। আমরা ক'জন তাড়াতাড়ি তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসি। তা'র পরে—"

অধীর ভাবে সাগরিকা জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায়?"

আর সকলে তখন মুগ্ধ হইয়া লোকনাথের কার্য্যের বিবরণ শুনিতেছিলেন। সাগরিকার মনোভাব অন্যরূপ।

সাগরিকার জিজ্ঞাসায় কুলদীপ বলিল, "চলুন, বৌদিদি!"

সব বিস্মৃত হইয়া—লজ্জা ও সঙ্কোচ অনুভব না করিয়া সাগরিকা ভৃত্যের অনুসরণ করিল। আর সকলে তাহার অনুসরণ করিলেন।

শয্যাপার্শ্বে আসিয়া কুলদীপ ডাকিল, "দাদা বাবু, বৌদিদি এসেছেন।"

লোকনাথ চাহিয়া দেখিল—সম্মুখে সাগরিকা। তাহার চক্ষুতে আনন্দের দীপ্তি দেখা গেল। কিন্তু সে বিস্ময়ানুভবও করিল; কারণ সে কুলদীপকে বলিয়া দিয়াছিল, তাহার সংবাদ সে যেন কাহাকেও না দেয়। জীবনের সব ঘটনা বিবেচনা করিয়া সে মনে করিয়াছিল, যদি তাহার ব্যর্থ জীবনের অবসান হয়। তবে তাহাতে কাহারও ইষ্ট বা আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না—তাহার সংবাদ কাহাকেও দিবার প্রয়োজন থাকিতে পারে না।

সাগরিকা যেন পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া ছিল। কি অবস্থায় উভয়ে এত দিন পরে সাক্ষাৎ! কেবল তাহার দৃষ্টি স্বামীর মুখে নিবদ্ধ ছিল। রোগীর শয্যাপার্শ্বে যে আসন ছিল, চিত্রলেখা তাহাতে সাগরিকাকে বসাইয়া দিলেন।

লোকনাথের মুখে স্নিগ্ধ তৃপ্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল।

আহত হিন্দুদিগকে হাসপাতাল হইতে সরাইবার যে নির্দ্দেশের কথা কুলদীপ বলিয়াছিল, জিজ্ঞাসিত হইয়া ডাক্তার তাহাই বলিলেন। ডাক্তার বলিলেন, "আদেশ অত্যন্ত অসঙ্গত। কিন্তু আমরা তা'-ই মানিতে বাধ্য। আর—হাসপাতালে স্থানেরও অত্যন্ত অভাব।"

অনুকূলচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন স্থানান্তরিত করা নিরাপদ হ'বে কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "সাবধানে নিয়ে গেলে কোন ক্ষতি না হ'বার কথা।"

"আপনারা এম্বুলেন্স দিবেন ত?"

"আপনি সে কথা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলুন। বোধ হয়, ব্যবস্থা হ'বে।"

"আচ্ছা আমি যাচ্ছি"—বলিয়া সমীরচন্দ্র যাইতে উদ্যত হইলে চিত্রলেখা অনুকূলচন্দ্রকে বলিলেন, "দাদা, আমাকে তরুণের কাছে নিয়ে চল। তা'কে এ কথা বলব।"

চিত্রলেখার উদ্দেশ্য ছিল—সাগরিকাকে লোকনাথের কাছে রাখিয়া তাঁহারা সরিয়া যাইবেন। তিনি ভ্রাতার সঙ্গে গমন করিলেন—সমীরচন্দ্র এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করিতে যাইলেন।

সাগরিকা বসিয়া রহিল—কোন কথা বলিতে পারিল না। কিন্তু

তাহার দুই চক্ষুতে অশ্রু নিবারণ অসম্ভব হইল—বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু ঝরিতে লাগিল। লোকনাথের পক্ষেও অশ্রু সম্বরণ করা সম্ভব হইল না।

প্রায় পঁচিশ মিনিট পরে—সব ব্যবস্থা করিয়া—সমীরচন্দ্র যখন অনুকূলচন্দ্রকে ও চিত্রলেখাকে লইয়া লোকনাথের কাছে আসিলেন, তখনও সাগরিকা ও লোকনাথ সেই ভাবে রহিয়াছে। তিনি লোকনাথকে বলিলেন, "যা'বার সব ব্যবস্থা হ'ল।"

লোকনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ?"

সমীরচন্দ্র বলিলেন, "অনুকূলের বাড়ীতে।"

"কোন নার্সিং-হোমে কি স্থান পাওয়া গেল না ?"

"যদি শ্বশুরবাড়ী যেতে তোমার কুণ্ঠা বোধ হয়, তবে তোমার পিসীমা'র বাড়ীতে চল।"

"হাসপাতালে কি থাকতে দিবে না ?"

"দিলেই বা কে তোমাকে এখানে রেখে যা'বে ?"

লোকনাথ সাগরিকার দিকে চাহিল—তাহার দৃষ্টিতে অভিমান ছিল না—যদি থাকিয়া থাকে, তবে তাহা অশ্রুতে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল—তাহাতে অনুনয়ই ব্যক্ত হইতেছিল। সে আর কোনরূপ আপত্তি করিল না।

লোকনাথকে লইয়া সকলে গৃহে ফিরিলেন। তথায় উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুকূলচন্দ্র হাসপাতাল হইতেই তাঁহার ডাক্তারকে টেলিফোন করিয়া দিয়াছিলেন। লোকনাথকে যান হইতে নামাইয়া সাগরিকার শয়নকক্ষে লইয়া যাইবার পরে তিনি তাহার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া অভয় দিলেন, স্থানান্তরিত করায় অবস্থার কোন অবনতি ঘটে নাই এবং সঙ্গে সঙ্গে আশ্বাস দিলেন, আঘাত যেমনই কেন হইয়া থাকুক না, লোকনাথ অচিরে সুস্থ হইয়া উঠিবেন—তাঁহার জীবনীশক্তি প্রচুর আছে। তিনি পরদিন আসিয়া আঘাতের স্থানটি পরীক্ষা করিবেন। সমীরচন্দ্র জানাইলেন, তিনি হাসপাতালের বড় ডাক্তারকেও আসিতে বলিয়াছেন।

ডাক্তার বিদায় লইবার পরে চিত্রলেখা স্বামীকে বলিলেন, "তুমি বাড়ী যাও—বৌমাদের ব'ল, আমি আজ আর বাড়ী যা'ব না—তা'রা যেন সব ব্যবস্থা ক'রে নেয়।"

সমীরচন্দ্র বলিলেন, "একটা বিষয় আগে ভাবা হয় নাই—শুশ্রূষাকারিণীর প্রয়োজন হবে কি ?"

চিত্রলেখা একটু ভাবিয়া সাগরিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি মনে হয় ?"

সে বলিল, "কেন ?"

রোগী আনিবার যান দেখিয়া ব্রজবল্লভ বাবুর স্ত্রী অনুকূলচন্দ্রের গৃহে আসিয়াছিলেন—অপরাজিতাও আসিয়াছিল। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন—তরুণকুমার আসিয়াছে। অধ্যাপকপত্নী বলিলেন, "যদি আপত্তি না হয়, রোগীর শুশ্রূষায় আমাদের কিছু করতে দিবেন। অপরাজিতা এ কাযে খুব উৎসাহী।"

চিত্রলেখা অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল, মা ?"

অপরাজিতা বলিল, "বাবা বলেন, সেবা স্ত্রীলোকের ধর্ম এবং সেই জন্য সেবায় স্ত্রীলোকের সহজাত পটুত্ব। তিনি সেই জন্য আমাকে তার অনুশীলন করতে বলেন—রোগীর শুশ্রূষা করবার রীতি সম্বন্ধে পুস্তক দিয়াছেন। তাঁ'র মত সব জিনিস সম্বন্ধে কিছু এবং কিছু জিনিস সম্বন্ধে সব জানাই সংস্কৃতির লক্ষণ।"

অনুকূলচন্দ্র বলিলেন, "অধ্যাপকের উপযুক্ত কথাই বটে।"

তখন স্থির হইল, অবস্থা বুঝিয়া পরদিন যে ব্যবস্থা হয় করা হইবে—সে দিন আর শুশ্রূষাকারিণী আনা হইবে না।

তখনও ব্রজবল্লভ বাবুর গৃহের ভগ্ন দ্বারের সংস্কার করিবার লোক পাওয়া যায় নাই—সুতরাং অধ্যাপকগৃহিণী ও অপরাজিতাকে অনুকূলচন্দ্রের গৃহেই রাত্রি যাপন করিতে হইল।

চিত্রলেখা স্থির করিলেন, রাত্রি দশটার পরে সাগরিকা, অধ্যাপকপত্নী ও তিনি তিন জন প্রত্যেকে দুই ঘণ্টা কাল লোকনাথের নিকটে থাকিবেন। অপরাজিতা বলিল, "আমাকে বুঝি একঘরে করলেন ?"

চিত্রলেখা হাসিয়া বলিলেন, "বেশ ত—প্রত্যেকে দেড় ঘণ্টা ক'রে জাগব। কারও কষ্ট হ'বে না। তোমাকে একঘরে করব ? আমরা ত তোমাকে ঘরে আনি করতেই চেয়েছিলাম—দুষ্ট মেয়ে তুমি—তুমিই ধরা দিলে না।"

অসতর্ক ভাবে কথা বলিয়া চিত্রলেখা ভাবিলেন, হয়ত কাযটা ভাল হইল না। তিনি অপরাজিতার দিকে চাহিলেন। সে দৃষ্টি নত করিয়া ছিল। বোধ হয় কি ভাবিতেছিল।

কথাটা বলা সঙ্গত হইয়াছে কি না সন্দেহ বশে চিত্রলেখা তাহা চাপা দিবার জন্য সাগরিকাকে বলিলেন, "তুমি যাও, হাসপাতালের কাপড় ছেড়ে—গা ধো'য়ে এস।" তাহার পরে তিনি অধ্যাপক-পত্নীকে বলিলেন, "আপনাকে আর এখন কষ্ট করতে হ'বে না। আমি এখানে আছি।"

তিনি অপরাজিতাকে বলিলেন, "তুমি আমার কাছে থাকবে ত ?"

অপরাজিতা সম্মতি জানাইল।

১৮

লোকনাথের কথা শুনিয়া তরুণকুমার যেন স্বস্তি অনুভব করিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে সে যে ধারণা মনে পোষণ করিয়াছিল, তাহা তাহার পক্ষে বেদনার কারণই ছিল। সে ধারণা যে দূর হইয়া গেল, ইহাতে সে স্বস্তিবোধ করিল। কারণ, সাগরিকার জন্য তাহার চিন্তা তাহাকে পীড়িত করিত। সুধীরের কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল—লোকটির দোষ তাহার ধাতুগত দৌর্বল্য। সেই দৌর্বল্যই তাহার সাগরিকার প্রতি তাহার প্রচণ্ড জননীর কুব্যবহার রোধে তাহাকে প্ররোচিত করিতে বাধা দিয়াছিল।

সে রাত্রিতে সুনিদ্রার পরে তরুণকুমার আরও সুস্থ ও সবল বোধ করিতে লাগিল। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে—হাসপাতালের কায শেষ করিয়া যাইবার সময় ডাক্তার যখন তাহার কাছে আসিলেন, তখন সে সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। কাযের চাপ কমিয়া আসিয়াছিল। ডাক্তার তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, বোধ হয় মৃত্যুতাণ্ডবের অবসান হইল। সে কি ভাবে হাসপাতালে নীত হইয়াছিল এবং কিরূপে তাহার জ্ঞান ফিরিল তাহা জানিবার জন্য তরুণকুমার কৌতূহল অনুভব করিলেও সে কথা জানিতে পারে নাই। আজ সে ডাক্তারকে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। ডাক্তার যখন তাহার হাসপাতালে নীত হওয়া—তাহার দেহে রক্তদানের কথা—সব বলিলেন, তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, "রক্ত ত হাসপাতালের সঞ্চিত রক্ত হইতে দেওয়া হয় ?" তখন ডাক্তার বলিলেন, "না। আপনাকে আনিয়াছিলেন,

আপনার পিতা আর আপনার—ভগিনী। রক্তদানের কথা বলিলে তিনিই বলিলেন, তিনি রক্ত দিবেন। তাহাই করা হয়।"

তাহার পর ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরদিন—বোধ হয় তাহারও পরদিন তিনি এসেছিলেন; আর ত আসেন নাই। তিনি কি অসুস্থ হয়েছেন?"

তরুণকুমার কি ভাবিতেছিল; অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "কে?"

ডাক্তার তাহার প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "যিনি রক্ত দিয়াছিলেন, তিনি কি আপনার ভগিনী ন'ন?"

"না।"

"তবে?"

"প্রতিবেশিকন্যা।"

"সে রাত্রিতে তিনি এখানে কেন?"

"তা' ত আমি জানি না।"

তরুণকুমারকে অন্যমনস্ক দেখিয়া ডাক্তার বিদায় লইলেন। যাইবার সময় বলিয়া যাইলেন—"আর দু' দিনেই আপনি বাড়ী যেতে পারবেন। যে কাণ্ড হ'য়ে গেল! এ যেন একটা দারুণ দুঃস্বপ্ন।"

ডাক্তার চলিয়া যাইলেন। তরুণকুমার ভাবিতে লাগিল: অপরাজিতা তাহার জন্য রক্ত দিয়াছে! কেন? সে অনেক ভাবিল—শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া আপনাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিল যে, সে যে অপরাজিতাকে রক্ষা করিতে যাইয়া আহত হইয়াছিল, সেই জন্যই অপরাজিতা তাহার জন্য রক্ত দিয়াছে—কোনরূপ কৃতজ্ঞতার ঋণ রাখে নাই। তাহাই অপরাজিতার চরিত্রের সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন।

কিন্তু কি অবস্থায়—কেন সে সেই ভয়াবহ রাত্রিতে অনুকূলচন্দ্রের সহিত হাসপাতালে আসিয়াছিল? তাহার সাহস যে প্রশংসনীয়, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সে সাহস তাহার সেই কলেজে ধর্ম্মঘটের দিন লক্ষিত "অগ্নিশিখা" রূপের উপযুক্ত। অপরাজিতার সেই দিন দৃষ্ট মূর্ত্তি তরুণকুমারের মনে পড়িল—মুখে কি উদ্দীপনার ভাব—চক্ষুতে কি ঔজ্জ্বল্য!

সে ভাবিতে লাগিল, অপরাজিতা কেন তাহার নিকট আপনাকে ঋণী মনে করিয়াছে? সে যে সেদিন তাহাকে আক্রমণকারীদিগের সম্মুখ হইতে বাহুতে তুলিয়া স্বগৃহে আনিয়াছিল, সে ত বিপন্ন অপরাজিতা বলিয়া নহে; সে অবস্থায় যে কেহ পড়িলে তাহাকে এ ভাবে রক্ষা করিবার চেষ্টা তরুণকুমার কর্ত্তব্য মনে করে।

কয় দিন কাটিল। কয় দিনে চিকিৎসায়, সেবায় ও মনের শান্তিতে লোকনাথ অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিল। ডাক্তাররা বলিলেন, "আর ক্ষতস্থান বাঁধিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই।"

ওদিকে তরুণকুমারও সুস্থ হইয়া উঠিতেছিল—তাহার দেহের ক্ষত মিলাইয়া গিয়াছিল—দৌর্ব্বল্যও দূর হইতেছিল। ডাক্তাররা তাহার গৃহে ফিরিবার অনুমতি দিলেন।

যে দিন তরুণকুমার ফিরিয়া আসিবে সে দিন আর চিত্রলেখা ও সাগরিকা হাসপাতালে গমন করিলেন না, গৃহেই তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন অনুকূলচন্দ্র ও সমীরচন্দ্র তাহাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন, তখন সকলের কি আনন্দ!

সে যে আসিবে তাহা ব্রজবল্লভ বাবুর পরিবারের সকলেই জানিতেন। মুসলমানদিগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" দিন উভয় পরিবারে—অতর্কিত ঘটনায়—যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছিল—সপ্তাহাধিক কালে তাহা নিবিড় প্রীতিপূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। তরুণকুমারের জন্য অপরাজিতার রক্তদান যেমন অনুকূলচন্দ্রের পরিবারের সকলের তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাব জন্মিয়াছিল তেমনই কয় দিন বাধ্য হইয়া, অনুকূলচন্দ্রের গৃহে তাঁহাদিগের অবস্থিতি তাঁহাদিগকে অনুকূলচন্দ্রের পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করিয়াছিল। লোকনাথের সেবা-শুশ্রূষায় অধ্যাপকপত্নীর ও অপরাজিতার অপ্রত্যাশিত অকুণ্ঠ সাহায্য ঘনিষ্ঠতা আরও বর্দ্ধিত করিয়াছিল। অনুকূলচন্দ্র, সমীরচন্দ্র, চিত্রলেখা সকলেই অপরাজিতার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সাগরিকা কেবল যে তাহাকে আর "আপনি" বলিত না, তাহাই নহে—বিপদের সময় নিঃসঙ্কোচে তাহাকে স্বামীর শুশ্রূষায় সাহায্য করিতে বলিত।—চিত্রলেখার বার বার মনে হইয়াছে—"এমন গুণের মেয়ে আর আমি কোথায় পাব?" শুনিয়া সমীরচন্দ্র বলিয়াছেন, "তা' ত দেখছি। কিন্তু, এর যখন তরুণকুমারের সঙ্গে বিবাহে আপত্তি আছে, তখন আর সে জন্য মনে করে লাভ কি?"

শুনিয়া চিত্রলেখা যেন হতাশ ভাবেই বলিয়াছিলেন, "তা' বটে—বয়স হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে—ওদের স্বাধীন মত আছে কিন্তু—" সমীরচন্দ্র তাহাতে বলিয়াছিলেন, "'কিন্তু' কি? তুমি যে দেখছি, কথাটা বলতে 'কিন্তু-কিন্তু' হচ্ছ।" চিত্রলেখা বলিয়াছিলেন, "ক' দিন ঘরের মেয়ের মতই ব্যবহার করেছে।"

তরুণকুমার হাসপাতাল হইতে ফিরিয়াছে জানিয়াই ব্রজবল্লভ বাবু সস্ত্রীক তাহাকে দেখিতে আসিলেন। যাইবার সময় তাঁহারা অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সে কি যাইবে? তাহাতে অপরাজিতা বলিয়াছিল, "না! আমার পড়ায় বড় ব্যাঘাত হ'য়েছে বাড়ীর ভাঙ্গা দরজার সংস্কার হয়েছে—আজ থেকে পড়ায় মন দিতে হ'বে।"

ব্রজবল্লভ বাবুর স্ত্রীকে দেখিয়াই সাগরিকা জিজ্ঞাসা করিল, "অপরাজিতা কোথায়?"

অপরাজিতার মাতা বলিলেন, "সে বলিয়াছে, তাহার পড়ায় বড় ব্যাঘাত হইয়াছে—আজ হইতে সে পাঠে মন দিবে।"

সাগরিকা বলিল, "সে কি কথা? তরুণ আজ ফিরে এল। আজ বাড়ীতে যে আনন্দ তা' সে না থাকলে অপূর্ণ থেকে যা'বে?"

অপরাজিতার অনুপস্থিতি সে গৃহে সকলেই অনুভব করিলেন। সে কথা তরুণকুমারও শুনিল। সে ভাবিল, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ অপরাজিতা হয়ত তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করিয়াই আর সে গৃহে আসে নাই।

তরুণকুমার তাহার বসিবার ঘর পরিচ্ছন্ন—টেবল ধূলিশূন্য দেখিয়া সাগরিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বুঝি আমার ঘর পরিষ্কার রেখেছ?"

সাগরিকা বলিল, "না, তরুণ! প্রথমে তোমার জন্য আমার ও দিকে মনই ছিল না। তা'র পরে তোমার জামাই বাবুকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম—তবু অপরাজিতা কত সাহায্য করেছে।

তোমার ঘর ঝাড়া—নিশ্চয়ই অপরাজিতা করেছে। সে প্রায় দিন রাতই এই ঘরে থাকত।"

তরুণকুমার বিস্মিত ভাবে ভগিনীর দিকে চাহিলে সাগরিকা হাঙ্গামার প্রথম দিন অপরাজিতার হাসপাতালে রক্ত দিয়া আসিবার পরে শ্রান্ত হইয়া সেই ঘরে ঘুমাইয়া পড়িবার যে কথা শুনিয়াছিল, তাহা ও তাহার পরে কয় দিন তাহার বিষয় যাহা দেখিয়াছিল তাহা শুনিয়া বলিল, "তোমার জামাই বাবুকে নিয়ে আসার পরে ক'দিন অনেক সময় সে তাঁ'র শুশ্রূষায় আমাদের সাহায্য করেছে। কি সাহায্যই করেছে!"

তরুণকুমার শুনিল—কোন কথা বলিল না।

সাগরিকা বলিল, "আজ অপরাজিতা আসে নি—কেন আসে নি, জিজ্ঞাসা করায় তা'র মা বললেন, পড়ায় মন দিয়াছে"

সেই সময় চিত্রলেখা ও তাঁহার পুত্রবধূদ্বয় অধ্যাপকপত্নীকে সঙ্গে লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সাগরিকা বলিল, "পিসীমা, অপরাজিতা যে আজ আসবে না, তা ত জানতাম না! সে ক'দিন যা' করেছে, তা'র জন্য তা'কে একবার ধন্যবাদও দিতে পারি নি।"

অধ্যাপকপত্নী বলিলেন, "ধন্যবাদ কি, মা? তোমাদের দয়া কি আমরা ভুলতে পারব?"

তরুণকুমার উঠিয়া যাইয়া অধ্যাপকপত্নীকে প্রণাম করিলে তিনি আশীর্বাদ করিলেন।

চিত্রলেখা সাগরিকাকে বলিলেন, "তুমি যেয়ে অপরাজিতার সঙ্গে দেখা ক'রে এস।"

শোভনা বলিল, "আমার যে দু'খানা গানের কথা তাঁ'র কাছে জানবার আছে।"

চিত্রলেখা বলিলেন, "তবে ত ভালই হ'ল। তুমি ত যাবে। আর—দীপশিখা ত কাল আসবে, সে এলে তোমরা সব এক দিন যা'বে।"

তরুণকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "পিসীমা, দীপশিখা আসছে?"

"হা, বাবা! সে কি ব্যস্তই হয়েছিল? সুধীর তা'কে নিয়ে আসছে—কালই তা'রা এসে পৌঁছবে।"

"আমি তা'দের আনতে ষ্টেশানে যা'ব।"

"না, বাবা, তুমি এখন ক' দিন বেশী নড়াচড়া ক'র না।"

"তা'রা ভাবছে, আমি কতই অসুস্থ—আমাকে ষ্টেশানে দেখলে কত আনন্দ পেত!"

"ডাক্তার বাবু যদি বলেন, তবে না হয় যেও।"

"পিসীমা, আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন যদি বলতাম, 'মা, ক'দিন ছুটি—পিসীমার বাড়ীতে থাকব—তবে মা বলতেন, 'যদি মাষ্টারমশাই বলেন, তবে যেতে পার' তার পরে যখন যা বলেছি, বাবা বলেছেন, যদি ভাল বুঝ কর'। আজ আবার যেন আমি ছোটটি হয়েছি—ডাক্তার বললে তবে যেতে পাব।" তরুণকুমার হাসিতে লাগিল।

চিত্রলেখা বলিলেন, "আমরা যে আসতেই পারি না, তোমরা বড় হয়েছ। এই সেদিন অপরাজিতা বলছিল, তার এ বাড়ীতে থাকবার প্রধান অসুবিধা সাগরিকা তাকে 'আপনি' 'আপনি' ক'রে বিব্রত করে—আমি তখনি বলেছিলাম, খোকনকে ব'কে দেব।"

সকলে হাসিলেন—কেবল তরুণকুমার যেন কি ভাবিতেছিল।

ডাক্তার বাবু আসিয়া সব শুনিয়া বলিলেন, "তরুণকুমার যাইতে যেরূপ আগ্রহশীল হইয়াছে, তাহাতে যাইতে না পাইলে সে দুঃখিত হইবে—সুতরাং তিনি তাহাকে যাইতে অনুমতি দিচ্ছেন—তবে সে যেন বড় গাড়ীতে যায়, ঝাঁকুনি কম হইবে।"

সেই ব্যবস্থাই হইল। পরদিন তরুণকুমার ভগিনীকে ও ভগিনীপতিকে আনিবার জন্য ষ্টেশানে গেল। সে যাহা মনে করিয়াছিল, তাহাই হইল—তাহাকে দেখিয়া দীপশিখা ও সুধীর বিশেষ আনন্দানুভব করিল। সে দীপশিখার কন্যাটিকে লইবার জন্য যখন চেষ্টা করিল তখন শিশু তাহার কাছে যাইতে অস্বীকার করিলে সুধীর বলিল,—"এ নির্বিবাদী—তোমার মত হুড়হাঙ্গামপ্রিয় —ছোরা-খাওয়া লোকের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছে।"

গৃহে আসিয়া দীপশিখা ও সুধীর সব ঘটনার বিবরণ শুনিল। দীপশিখা বলিল, "অপরাজিতা বুঝি এলেন না?"

চিত্রলেখা বলিলেন, "কাল থেকে আর আসেনি—তা'র মা বললেন, বলেছে, পড়ায় বড় ব্যাঘাত হয়েছে—এখন মনোযোগ দিয়ে পড়বে। আমি তা'কে বলেছি, তুই এলে তুই আর শোভনা দু'জনে এক দিন তা'র কাছে যা'বে।"

"এক দিন কেন পিসীমা? আমরা আজই যা'ব। আপনি বৌদিদিদের আনতে পাঠান। আমি স্নান সেরে নিচ্ছি। আর আপনি খাবার ব্যবস্থা করুন, আমরা অপরাজিতাকে ধরে নিয়ে আসব—সব এক সঙ্গে খা'ব।"

"এই ত সবে এলি। এক দিন বিশ্রাম কর।"

"সে হ'বে না, পিসীমা! জান ত শুভস্য শীঘ্রং।"

অগত্যা চিত্রলেখা বধূদ্বয়কে আনিবার জন্য গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন, তাহারা অনুকূলচন্দ্রের গৃহেই খাইবে—দীপশিখার আদেশ।

দীপশিখা যাহা বলিয়াছিল, তাহাই করিল—শোভনাকে লইয়া ব্রজবল্লভ বাবুর গৃহে যাইয়া অপরাজিতার মাতাকে প্রণাম করিয়া বলিল, তাহারা অপরাজিতাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছে—সে তাহাদিগের গৃহে আহার করিবে।

অপরাজিতা পাঠে মন দিবার চেষ্টাই করিতেছিল বটে, কিন্তু মনোনিবেশ করিতে পারিতেছিল না। তাহার কারণ সে আপনি নির্ণয় করিতে পারিতেছিল না। দীপশিখার প্রস্তাবে সে আপত্তি করিল—আর এক দিন সে যাইবে, সে দিন নহে। কারণ, সে কেবল অধ্যয়নের ছিন্নসূত্র যুক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দীপশিখা কিছুতেই তাহার আপত্তি গ্রাহ্য করিতে সম্মত হইল না। শেষে মাতার অনুরোধে অপরাজিতা কিছুক্ষণ বাদে অনুকূলচন্দ্রের গৃহে যাইতে সম্মত হইল। তাহার প্রতিশ্রুতি লইয়া দীপশিখা ও শোভনা ফিরিয়া গেল।

যথাকালে অধ্যাপকপত্নী কন্যাকে অনুকূলচন্দ্রের গৃহে যাইবার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তিনি জানিতেন না, কন্যা—কোন অজ্ঞাত কারণে—সেই স্মরণ করানর প্রতীক্ষাই করিতেছিল। সে বলিয়া গেল, "মা, আমি কিন্তু শীঘ্র চলে আসব।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"আমি যেতে চাই নি—ওঁরা এত জিদ করলেন!"

"ওঁরা যে যত্ন করেন, তা'তে ওঁদের কথা এড়ান যায় না, অপরাজিতা! ওঁদের ঋণ আমরা কখন পরিশোধ করতে পারব না। ওঁরা আমাদের কি বিপদেই রক্ষা করেছেন!"

সে কথা কত সত্য তাহা কন্যার অবিদিত ছিল না। কিন্তু মা জানিতেন না—মা বুঝিতে পারেন নাই, তরুণকুমারের কার্য্যের ও সেই পরিবারের ব্যবহারের সূর্য্যালোক তাহার হৃদয়ের উপেক্ষার তুষারস্তূপ বিগলিত করিয়া দিয়াছিল—বিগলিত তুষার বারিপ্রবাহের বেগ নিয়ন্ত্রিত করা সে দুঃসাধ্য বলিয়াই অনুভব করিতেছিল।

অনুকূলচন্দ্রের গৃহে সে দিন যেন আনন্দের উৎসব! সেই উৎসবের মধ্যে সকলেই অপরাজিতার কার্য্যের—তাহার তরুণকুমারের জন্য রক্তদানের ও লোকনাথের সেবার জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। অপরাজিতা তাহাতে লজ্জানুভব করিতে লাগিল।

অপরাহ্ণে অধ্যাপকপত্নী সেই গৃহে আসিলেন। শোভনার আগ্রহাতিশয্যে অপরাজিতাকে গান গাহিতে হইল। কিন্তু সে বিদায় লইয়া যাইবার জন্যই ব্যস্ত হইয়াছিল। তরুণকুমার কয় বার সেই সম্মিলনে আসিয়াছিল—কোন কথা বলে নাই। একবার সে আসিলে দীপশিখা চিত্রলেখাকে বলিয়াছিল, "পিসীমা, যদি এখন দাদার বিয়ে দাও, তবে আমি থেকে যা'ব, নহিলে তেরাত্তির বাস—কারণ, ছুটী সাত দিন—আজ তা'র দু'দিন হ'ল।" চিত্রলেখা বলিয়াছিলেন, "আমি ত সে জন্য ব্যস্ত; কিন্তু মনের মত পাত্রী পাচ্ছি না।" আর কেহ লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু অপরাজিতার মুখ যে সহসা যেন রক্তশূন্য হইয়া গিয়াছিল, তাহা তাহার মাতার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই।

১৯

যে দিন দীপশিখা ও সুধীর কলিকাতায় আসিল, তাহার পরদিন সুধীর তরুণকুমারের বসিবার ঘরে—যে কৌচে অপরাজিতা হাঙ্গামার দিন রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেই কৌচে বসিয়া কয় দিনের ঘটনার আলোচনা করিতে করিতে বলিল, "তোমার অপরাজিতার কাছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য। কারণ, তুমি তা'কে বিপদ হ'তে রক্ষা করতে গিয়ে আহত হয়েছিলে বটে, কিন্তু তা' না করলে তোমার পক্ষে তা' নিন্দার কথা হ'ত; আর অপরাজিতা সেই বিপন্মুক্ত অবস্থায়—বিপদের মধ্যে হাসপাতালে গিয়ে যে রক্ত দিয়ে এসেছিল, তা' তা'র প্রশংসার কথা—সে তা' না করলে নিন্দার কারণ হ'ত না।"

তরুণকুমার একটু ভাবিল। সে সুধীরের কথার যাথার্থ্য অনুভব করিল, কিন্তু অপরাজিতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে সে লজ্জানুভব করিতে লাগিল এবং সেই জন্যই বলিল, "বাবা, পিসীমা, পিসেমশাই, দিদি—সকলেই ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তা'-ই কি যথেষ্ট নহে?"

"না। তাঁরা তাঁদের কর্ত্তব্য করেছেন। তোমার কর্ত্তব্য পালন বকলমে হয় না। নইলে যেন দাঁড়ায় তুমি তা'কে বিপদে রক্ষা করেছ, সে তোমাকে বাঁচাতে রক্ত দিয়েছে—দেনা-পাওনা চুকে গেছে; কা'রও আর করবার কিছু নাই।"

"তুমি কি বল?

"আমার মনে হয়, তোমার কৃতজ্ঞতা সরল ভাবে জানানই কর্ত্তব্য; নইলে অপরাজিতা মনে করতেও পারে, তা'র কাযের কোন গুরুত্ব আছে, তা' তুমি মনে কর না। যে সময় পিসীমাও সাহস ক'রে তোমাকে দেখতে যেতে পারেন নি, তখনও সে আগ্রহে—স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিপদের মধ্য দিয়ে হাসপাতালে গিয়ে, যদি তোমাকে— তা'র উদ্ধারকর্ত্তাকে বাঁচাবার জন্য আরও রক্ত দিতে হয়। আমি ত এ কথা যত মনে করি, তত তা'র সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা বাড়ে—তত তার প্রশংসা করতে হয়।"

"তা'তে সন্দেহ নাই।"

"তোমার ভগিনীর সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কথা হয়েছে—তিনি আমার মতের সমর্থন করেন। তিনি বলেন, তুমি হাসপাতাল হ'তে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই যে অপরাজিতার এ বাড়ীতে আসা বন্ধ হ'য়েছে, সে কেবল পড়ার আগ্রহে না-ও হ'তে পারে। সে হয়ত মনে করেছে, তুমি তা'র কাজের প্রকৃত মূল্য বুঝতে চাহিলে না।"

তরুণকুমার ভাবিতে লাগিল; কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "হয়ত তোমার অনুমানই সত্য। লোকনাথ বাবুর সম্বন্ধে তোমার মতই সত্য দেখা যাচ্ছে—আমার মতই ভুল; লোকটির ধাতুতে দোষ নাই, বিপদে তা'র প্রমাণ পাওয়া গেল। যে ত্যাগস্বীকার করতে পারে, তা'র অনেক ত্রুটি মার্জ্জনীয়!"

সুধীর অন্য কথার অবতারণা করিলে তরুণকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কৃতজ্ঞতা স্বীকার কি ভাবে করা সঙ্গত বল ত?"

সুধীর বলিল, "কেন—এক দিন আমার সঙ্গে ব্রজবল্লভ বাবুর বাড়ীতে চল! সেখানে গিয়ে অত্যন্ত কাতর ভাবে অপরাজিতাকে বল—তুমি কৃতজ্ঞতার বোঝা আর বহিতে পারছ না, তাই তা তাঁ'র চরণে অর্পণ করতে এসেছ—ইত্যাদি।"

উভয়েই হাসিল।

তাহার পরে তরুণকুমার বলিল, "সে কাযটা বকলমে হয় না?"

সুধীর বলিল, "আমার দ্বারা কায সারতে চাও? কেন? উপায় সহজ। কবির কথা ত জান—

'অনাথা দুঃখীর দুঃখ করিতে সান্ত্বনা
হয়েছে লিপির সৃষ্টি বিধির বাসনা।'

কিন্তু লিপি কি কেবল সেই কাজেরই জন্য? তা' নয়—

'প্রাণ ভ'রে অন্তরের কথা প্রকাশিতে
এমন উপায় আর নাই এ মহীতে।'

সুতরাং তুমি তোমার কৃতজ্ঞতা লিপির অক্ষরে ব্যক্ত কর।"

তরুণকুমার বলিল, "তোমার কথাই ভাল—আমি পত্র লিখব।"

সুধীর লোকনাথের ঘরে গেল এবং তাহার সহিত তাহাদিগের পল্লীর ব্যাপারের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল।

তরুণকুমার কোন কায করিবে স্থির করিলে তাহা সম্পন্ন করিতে বিলম্ব করিত না। সে অপরাজিতাকে পত্র লিখিবে—সুধীরের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়া সেই বিষয় ভাবিতে লাগিল। কি ভাবে পত্র লিখিবে, কি লিখিবে, কিরূপে ভাবপ্রকাশ করা সঙ্গত—এই সকল, যেমন—পত্র ইংরেজীতে লিখিবে কি বাঙ্গালায় লিখিবে তাহাও তাহার চিন্তার বিষয় হইল। ইংরেজীতে পত্র লিখিবার কতকগুলি সুবিধা আছে—তাহার সম্বন্ধে সত্যই বলা যায়, মনের ভাব গোপন করিবার

সম্ভাই ভাষার সৃষ্টি ; তাহাতে আন্তরিকতা গোপন করিয়া কতকগুলি বাঁধা-কথায় শিষ্টাচার রক্ষা করা যায়। বাঙ্গালায় তাহা হয় না।

তরুণকুমার প্রথমে ইংরেজীতেই লিখিতে আরম্ভ করিল। পত্র শেষ করিয়া সে যখন তাহা পাঠ করিল, তখন সে দুই দিকে অসুবিধা বোধ করিল—প্রথম, সম্বোধন ও স্বাক্ষরের পূর্ববিশেষণ লইয়া,—ইংরেজীতে লিখিতে হইলে "প্রিয় মহাশয়া" এইরূপ কিছু লিখিতে হয়, আপনাকে আন্তরিক ভাবে "আপনার" লিখিতে হয়। বাঙ্গালায় "সবিনয় নিবেদন" ও "বিনীত" লিখিলে হয় এবং তাহাই ভাল বোধ হয়। এইরূপ ভাবিয়া সে আবার বাঙ্গালায় পত্র লিখিল—লিখিয়া সুধীরকে ডাকিয়া আনিয়া ইংরেজী ও বাঙ্গালা দুইখানি পত্র তাহাকে দেখাইয়া তাহার বক্তব্য বলিল।

সুধীর ভাবিয়া বলিল, বাঙ্গালায় লেখাই ভাল। তখন তরুণকুমার তাহার বাঙ্গালায় লিখিবার পক্ষে দ্বিতীয় কারণটি ব্যক্ত করিল—পাছে অপরাজিতা মনে করে, সে তাহার বিদ্যা দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে।

বাঙ্গালা পত্র প্রেরণই স্থির হইল এবং সুধীর আবার সেই পত্র পাঠ করিয়া বলিল, "তোমার কৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে আন্তরিকতায় আমার সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু ভাষায় তাহা প্রকাশে যেন আন্তরিকতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। একবার তোমার ভগিনীদের দেখাতে আনি। তাঁরা হয়ত কিছু উন্নতি করতে পারবেন—তাঁদের অসাধ্য কাজ নাই।"

তরুণকুমার তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল, "না—পত্রের ব্যাপারে আর সমিতি বসিয়েও কাজ নাই—সেটিরও প্রয়োজন নাই। তোমার অনুমোদনই যথেষ্ট।"

"বেশ—তাই হ'ক।"

পত্রে তরুণকুমার লিখিয়াছিল, সে জানিয়াছে, সে আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হইলে যখন ডাক্তাররা তাহার দেহে রক্তদানের প্রয়োজন অনুভব করেন, তখন অপরাজিতাই স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়া আপনার দেহ হইতে রক্ত দিয়াছিলেন। সে জন্য এবং বিপদের সময় বিপদ তুচ্ছ করিয়া তাহার জন্য হাসপাতালে গমনে সে অপরাজিতার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাহার পক্ষে ইতঃপূর্বেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা কর্তব্য ছিল ; তাহাতে যে বিলম্ব হইয়াছে সে জন্য সে লজ্জিত এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে।

পত্রখানি পাঠাইবার কথায় সুধীর বলিল, দীপশিখা উহা লইয়া যাইবে। পত্রের প্রতিক্রিয়া কি হয়, তাহা জানা সুধীরের অভিপ্রেত ছিল। তরুণকুমার সে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিল, "তাহাই হউক।"

দীপশিখা সেই দিন অপরাহ্ণেই ব্রজবল্লভ বাবুর গৃহে গেল—অপরাজিতার জন্য পত্রখানি লইয়া গেল।

পত্র পাইয়া অপরাজিতা কিছু বলিল না—কেবল দীপশিখা লক্ষ্য করিল, তাহা পাঠকালে অপরাজিতার মুখ দিনান্ত আকাশের মত একবার রক্তাভ হইয়া তাহার পরে পাণ্ডু বর্ণ হইয়া গেল।

দীপশিখা অপরাজিতাকে বলিতে গিয়াছিল, সে হয়ত আর এক দিন পরেই স্বামীর সঙ্গে কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইবে। কারণ, সে সংবাদ পাইয়া ভ্রাতাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হওয়ায় সুধীর অনেক চেষ্টায় মাত্র এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া তাহাকে কলিকাতায় আনিয়াছে। তবে চিত্রলেখা বলিতেছেন, সে দিন কয়েক থাকিয়া যাউক, তাহার পরে তরুণকুমারই তাহাকে স্বামীর কর্মস্থানে রাখিয়া আসিবে এবং সুধীর সাগরিকাকে ও লোকনাথকেও সেই সময় তথায় যাইয়া কয় দিন থাকিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছে। যদি তাহার স্বামীর সঙ্গেই যাওয়া হয়, তবে আর দেখা হইবে না বলিয়া সে দেখা করিতে আসিয়াছে।

সে অপরাজিতাকে বলিল, সে তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে শুনিয়া তরুণকুমার তাহাকে একখানি পত্র দিতে বলিয়াছে। সে অপরাজিতাকে তরুণকুমারের পত্রখানি দিল। তরুণকুমার তাহাকে পত্র লিখিয়াছে শুনিয়া অপরাজিতা যেন স্তম্ভিত হইল। পত্রখানি দিয়া দীপশিখা বিদায় লইল।

দীপশিখা বিদায় লইলে অপরাজিতা কাগজকাটা লইয়া পত্রের খাম কাটিয়া পত্র বাহির করিয়া পড়িল! পড়িয়া সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল—সে যেন হতাশ হইল। কিন্তু সে কি আশা করিয়াছিল তাহা কি সে আপনার কাছেও স্বীকার করিবে ?

অপরাজিতা পত্রখানি আবার পড়িল। তাহার মনে হইল, পত্রখানি এতই নিয়মানুগ যে তাহাতে স্নেহ-স্নিগ্ধতাও নাই—তাহা নিষ্ঠুরতারই নামান্তর।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া অপরাজিতা পিতামাতাকে পত্রখানি দেখাইতে গেল—তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁহাদিগের উপদেশ লইবে।

ব্রজবল্লভ বাবু বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানে বাহুল্যের স্থান নাই। সেই জন্য তিনি তরুণকুমারের বাহুল্যবর্জ্জিত পত্রখানি পাঠ করিয়া তিনি তাহার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "কি চমৎকার পত্র—বাহুল্য নাই—শিষ্টাচারে পূর্ণ—সংযত ও উদার-ভাবসমন্বিত।"

অপরাজিতা জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কি পত্রের উত্তর দিতে হ'বে ?"

"তা' হবে বই কি ! নইলে যে অভদ্রতা হ'বে।"

পিতার কথা শুনিয়া অপরাজিতা পত্রখানি লইয়া আপনার বসিবার ঘরে গেল। আবার পত্রখানি পড়িল। তাহার পর সে ভাবিতে লাগিল—কি লিখিবে ? কিন্তু তাহাকে পত্রের উত্তর দিতে হইবে। তাহার বুকের মধ্যে যেন বেদনার উৎস হইতে ক্রন্দন উদ্গত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পিতা বলিয়াছেন, পত্রের উত্তর না দিলে অভদ্রতা হইবে। সে দৃঢ় হইয়া উত্তর লিখিতে বসিল।

অপরাজিতা পত্রে লিখিল, সে তরুণকুমারের পত্র পাইয়া লজ্জিত হইয়াছে। তরুণকুমার তাহাকে যে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে তাহাতে তরুণকুমারের নিকট তাহার ঋণ সে জীবনে কখন—এমন কি জীবন দিলেও শোধ করিতে পারিবে না—সামান্য রক্তদান উল্লেখেরও অযোগ্য। তরুণকুমার যেন সে কথা মনেও না করে। তাহারা তরুণকুমারের পরিবারের নিকট যে অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে, তাহাতে তাহারা ধন্য হইয়াছে। তাহার কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধ্য। সে স্বাক্ষরদানের সময় কি ভাবিল—ভাবিয়া লিখিল—পরাজিতা।

পত্র লিখিয়া অপরাজিতা শিশুবালাকে ডাকিয়া পত্রখানি দীপশিখাকে দিয়া আসিতে বলিল।

শিশুবালা বিস্মিতা হইল ; জিজ্ঞাসা করিল, "এই ত ওবাড়ীর ছোট দিদিমণি গেল ; আবার কি দরকার হ'ল ?"

অপরাজিতা বলিল, "একটু দরকার ছিল, শিশু! পত্রখানা দিয়ে এস।"

শিশুবালা পত্র দিতে গেল।

অপরাজিতা ভাবিতে লাগিল—পত্র পাইয়া তরুণকুমার কি মনে করিবে? সে কি তাহার স্বাক্ষর লক্ষ্য করিবে না? তাহা লক্ষ্য করিয়া সে কি তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না? তরুণকুমার তীক্ষ্ণধী—তাহার পক্ষে কি তাহা বুঝিতে পারা দুষ্কর হইবে?

অপরাজিতা কত ভাবিয়া—কত সাহস করিয়া—কিরূপে লজ্জা জয় করিয়া—কত আশা করিয়া যে সেই স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহা সে-ই জানে। কিন্তু সে যাহা ভাবিয়া তাহা করিয়াছে, তাহা কি সফল হইবে?

সে বার বার পথের পরপারে অনুকূলচন্দ্রের গৃহের দিকে চাহিল—বারান্দায় কেহ নাই—ঘরে কেহ আছে কি না বুঝিতে পারিল না।

প্রণয় যখন প্রথম তরুণ-তরুণীর মনে বিকশিত হয়, তখন সে তাহাদিগকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করে—পরস্পরকে পরস্পরের সন্নিকটস্থ করে। সেই জন্যই প্রণয় যেমন তরুণকে নারী-সুলভ লজ্জা দেয়, তেমনই তরুণীকে পুরুষ-সুলভ সাহস প্রদান করে; এক জনকে অপরের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য দিয়া তাহাদিগকে সন্নিকটস্থ করে। তাহার প্রণয় অপরাজিতাকে সাহস দিতেছিল। সেই সাহসের জন্যই সে তরুণকুমারকে লিখিত পত্রে আপনাকে "পরাজিতা" বলিয়া স্বাক্ষর দান করিয়াছিল।

চিত্রলেখার কথায় সে যেমন তরুণকুমারের সম্বন্ধে তাহার অপ্রিয় মন্তব্যের আভাস পাইয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়াছিল, তেমনই তিনি তরুণকুমারের বিবাহের জন্য পাত্রী সন্ধান করিতেছেন জানিয়া বেদনা পাইয়াছিল। চিত্রলেখা যখন তাহাকে বলিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে তাঁহাদিগের ঘরে আটক করিতেই চাহিয়াছিলেন—সে-ই ধরা দেয় নাই—তখন তাহার মন তাহাকে বলিতে প্রণোদিত করিয়াছিল, সে ভুল করিয়াছিল সেজন্য তিনি যেন ভুল না করেন—তাহাকে ক্ষমা করেন। কিন্তু স্বাভাবিক লজ্জা তাহাকে সে কথা বলিতে দেয় নাই। সে আপনাকেই দোষী মনে করিয়াছে। নিশ্চয়ই শিশুবালা তরুণকুমারের সম্বন্ধে তাহার উক্তি চিত্রলেখাকে বলিয়াছিল। কি লজ্জা! চিত্রলেখা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায়, শিশুবালা যে প্রস্তাব আনিয়াছিল, তাহা চিত্রলেখার। তাহার সেই মত জানিয়াও অনুকূলচন্দ্র, চিত্রলেখা, সাগরিকা ও দীপশিখা তাহার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা যেমন তাঁহাদিগের উদারতার পরিচায়ক—তাহার পক্ষে তেমনই লজ্জার কথা। তাঁহাদিগের স্নেহের তুলনা নাই!

কিন্তু তরুণকুমার? তরুণকুমারও কি তাহার মনের কথা শুনিয়াছে? যদি শুনিয়া থাকে, তবে সে কি মনে করিয়াছে? যদি সে তাহা শুনিয়া থাকে, তবে তাহার পরেও যে মহানুভবতার প্রেরণায় সে আপনার জীবন বিপন্ন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছে, তাহা কি অতুলনীয় নহে? প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়া সে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত আক্রমণকারীদিগের সম্মুখ হইতে তরুণকুমার তাহাকে তাহার সবল বাহুতে অনায়াসে তুলিয়া লইয়া বিপদ হইতে নিরাপদ স্থানে আনিয়াছিল এবং সেই জন্য আপনি আহত হইয়াছিল, [illegible] কি সে কখন ভুলিতে পারে? সে সামান্য রক্ত দিয়াছে—তাহার কৃতজ্ঞতার তুলনায় তাহা একান্তই উপেক্ষণীয়; কিন্তু সেই জন্য তরুণকুমার কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছে। অথচ আপনাকে তাহার জন্য দিলেও যে তাহার কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ হয় না!

প্রশংসায় ও দুঃখে অপরাজিতা অভিভূতা হইয়া পড়িল।

এখন সে কি করিবে? সে কি করিতে পারে? তাহার বুকের মধ্যে বেদনা ও চক্ষুতে অশ্রু উথলিয়া উঠিতে লাগিল। [illegible] সেই বেদনা ও সেই অশ্রু গোপন করিবার যত চেষ্টাই করিতে লাগিল, ততই সে চেষ্টা ব্যর্থ হইতে লাগিল। কয় দিন সে অধ্যয়নের চেষ্টা করিয়াছে—অধ্যয়ন করিতে পারে নাই। মনের অবস্থা তাহার প্রতিকূল। সে কি করিবে? ভাবিয়া সে কিছুই [illegible] করিতে পারিতেছিল না। এ ব্যথা সে কিরূপে জুড়াইবে?

সত্যই কি তরুণকুমার তাহার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছে? সাগরিকার, পিসীমা'র ও দীপশিখার ব্যবহারে কি সে অপ্রসন্নতার কোন পরিচয়ই পায় নাই? কেবল কি তরুণকুমারই তাহার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া আছে?

সে যদি অপ্রসন্ন হইয়া থাকে, তবে সে নিশ্চয়ই তাহার স্বাক্ষরের অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিবে না—হয়ত তাহা লক্ষ্য করিবে না। মনে করিয়া অপরাজিতার মনের মধ্যে বেদনা [illegible] পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল—সে বেদনা কি তাহার মন হইতে [illegible] দূর করা সম্ভব হইবে?

২০

সত্যই তরুণকুমার অপরাজিতার স্বাক্ষরের মর্ম্মানুভব করিতে [illegible] নাই। সে যে তাহা লক্ষ্য করে নাই, এমন নহে। কিন্তু তাহাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করিয়া মনে করিয়াছিল, [illegible] দোষে নামের আদ্যক্ষর কাগজে ফুটিয়া উঠে নাই। তাহার [illegible] মনে করিবার কারণ—সে শুনিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে অপরাজিতার মনোভাব বিরূপ। সেই জন্য সে অপরাজিতার সম্বন্ধে [illegible] মনের ভাব মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টাই করিয়াছে ও করিতেছিল। তাহা যে মুছিবার নহে—তাহা সে বুঝে নাই। কিন্তু সে মনে করিয়াছে, অপরাজিতা তাহার সম্বন্ধে নিজ মনোভাব [illegible] পরিবর্ত্তন করিবে? সে আশা করিবার অধিকার তাহার নাই। সে কোন্ গুণে সে অধিকার করিতে পারে?

অপরাজিতা কিন্তু পুরুষের বুদ্ধির নিন্দা করিতেছিল—[illegible] আপনাকে ধিক্কার দিতেছিল। ভুল সে-ই করিয়াছে।

সেই দিন ব্রজবল্লভ বাবু টেলিগ্রাফ পাইলেন—কলিকাতার সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া তাঁহার যে পুত্র বারাণসীতে পড়ে, সে ব্যস্ত হইয়া পাটনায় অন্য পুত্রের কাছে আসিয়াছে—[illegible] কলিকাতায় আসিতেছে।

তাহারা যে ট্রেণে আসিবে, তাহার নম্বর মাত্র টেলিগ্রামে ছিল। ব্রজবল্লভ বাবু সে ট্রেণ আসিবার সময় জানিতে ব্যস্ত হইলেন। তিনি সংবাদপত্র দেখিলেন, একখানিতে কতকগুলি ট্রেণের আগমন-নির্গমনের সময় পাইলেন বটে, কিন্তু ট্রেণের নম্বর পাইলেন না। তিনি ব্যস্ত হইয়া ষ্টেশনে যাইবার উদ্যোগ করিলেন।

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, "অনুকূল বাবুর বাড়ীতে কি রেলের সময় জানার বহি নাই ?"

ব্রজবল্লভ বাবু বলিলেন, "তা' থাকতে পারে।"

"অপরাজিতা চল, আমরা যাই। বাড়ীর ছোট মেয়েটি ত কাল দেখা করতে এসেছিল—হয়ত আসছে কালই স্বামীর সঙ্গে চ'লে যাবে। তা'র সঙ্গে দেখা ক'রে আসাও হ'বে।"

মা মনে করিয়াছিলেন, কন্যা যাইতে চাহিবে না। কিন্তু তিনি দেখিলেন, সে আপত্তি করিল না; বলিল, "তুমি যদি রথ দেখা আর কলা বেচা এক সঙ্গে সারতে চাও ?"

মাতাপুত্রী অনুকূলচন্দ্রের গৃহে গমন করিলেন। দীপশিখাকে দেখিয়া অপরাজিতা অপ্রতিভ ভাবে বলিল, "আপনি কি কালই যাচ্ছেন ?"

দীপশিখা বলিল, "না। পিসীমা ছাড়লেন না।"

"আমরা এক ঢিলে দুই পাখী মারব ব'লে এসেছিলাম। একটি ত উড়ে গেল, এখন দ্বিতীয়টির কথা বলি—আমার দাদারা কাল দার্জিলিং থেকে আসছেন। টেলিগ্রাফ করেছেন, তা'তে ট্রেনের নম্বর দিয়েছেন—আমরা তা' জানতে পারছি না। সেই জন্য যদি আপনাদের বাড়ী টাইম-টেবল থাকে জানতে এসেছি।"

দীপশিখা হাসিয়া বলিল, "আছে। কিন্তু বিনামূল্যে কোন জিনিষ পাওয়া যায় না।"

"দামটা কি ?"

"গান।"

ততক্ষণে অধ্যাপকপত্নী সাগরিকার সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন। লোকনাথ তাঁহাকে দেখিয়া আপনার অফিস-ঘরে চলিয়া গিয়াছিল। অধ্যাপকপত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "জামাই এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন ?"

সাগরিকা বলিল, "আপনাদের আশীর্ব্বাদে সুস্থ হয়েছেন। কেবল দুর্ব্বলতা এখনও যায় নাই।"

"যে আঘাত—সবল হ'তে দিন লাগবে।"

দীপশিখা অপরাজিতাকে লইয়া তথায় আসিয়া বলিল, "দিদি, ইনি এসেছেন, টাইম-টেবল নিতে। আমি বলেছি—গান না গাইলে পাবেন না। ঠিক বলি নি ?"

সাগরিকা হাসিয়া বলিল, "ঠিক বলেছ।"

দুই ভগিনীর আগ্রহে অপরাজিতাকে গাহিতে হইল। কেহ লক্ষ্য করিল না—গাহিতে সে কোন আপত্তি করিল না। সে গাহিল :—

"তুমি এলে না! তুমি এলে না!
তুমি এলে না!
আমার　ব্যথিত ব্যাকুল　হৃদয় আকুল
একবার ধরা দিলে না!
আমি　তব পথ চাহি'　এ জীবন বাহি'
হৃদে বহি শুধু কামনা;
আমার　নয়নে কেবল　নয়নের জল
হৃদয়ে কেবল যাতনা।
ওহে　নিঠুর যদি　নাহি দিবে হৃদি,
কেন এ আশার ছলনা?
আমার　এত সুখ-আশা,　এত ভালবাসা
হ'বে কি কেবলি বেদনা?
আমি　তব প্রেম লাগি'　সকল তেয়াগি,
আপনি ভুলেছি আপনা।
আমি　তোমার লাগিয়া　রেখেছি করিয়া
হৃদয়-আসন রচনা—
ওহে　পরাণ-বল্লভ,　হে চির-দুর্ল্লভ
একবার সেথা এস না—
তবে　ঘুচিবে আমার　সব হাহাকার
পূরিবে আমার সাধনা।"

তরুণকুমার ও সুধীর চিত্রলেখার কাছে গিয়াছিল—সুধীর পরদিন কর্ম্মস্থানে যাইবে। অপরাজিতা যখন কেবল গান আরম্ভ করিয়াছে, তখন তাহারা ফিরিয়া আসিল—চিত্রলেখাও সঙ্গে আসিলেন। গান শুনিবার লোভে সুধীর দ্রুত সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া দ্বিতলে গেল। চিত্রলেখা তাহার অনুসরণ করিলেন। কেহই লক্ষ্য করিলেন না, তরুণকুমার যেন স্তম্ভিত হইয়া সিঁড়ির প্রথম ধাপে দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল আর ভাবিতে লাগিল। অপরাজিতা এ গান কোথায় পাইল? এ গান তাহার এক বন্ধুর রচনা। বন্ধু নববিবাহিত; পত্নীকে লইয়া কালিম্পং-এ বেড়াইতে গিয়াছে; তথায় ঐ গানটি রচনা করিয়া তাহাকে দেখিতে পাঠাইয়াছে। গানটি—বন্ধুর পত্রসহ তরুণকুমার টেবলের উপর রাখিয়াছিল। তাহার পরেই সে আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হয়। সে আসিয়া দেখিয়াছে, গান লিখা কাগজ সে যে স্থানে রাখিয়া গিয়াছিল সেই স্থানেই আছে। সে সাগরিকার কাছে শুনিয়াছে, অপরাজিতা কয় দিন অনেক সময় সেই ঘরে ছিল এবং সে-ই তাহার টেবল ও টেবলের সব জিনিষ ঝাড়িয়া-মুছিয়া রাখিয়াছিল। সে সেই সময় গানটি পড়িয়াছে—হয়ত লিখিয়া লইয়াছে। অপরাজিতাই কি গানটিতে সুর দিয়াছে? কি মধুর সুর! কি মধুর কণ্ঠ! তরুণকুমার মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল—শুনিতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিল।

এদিকে গান শেষ করিয়া অপরাজিতা যখন বলিল, "বাবা নিশ্চয় ব্যস্ত হচ্ছেন"—তখন দীপশিখা বলিল, "দাদার ঘরে টাইম-টেবল আছে। আপনি ত জানেন—আপনি যা'ন; মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি একে শুইয়ে দিয়ে যাচ্ছি।"

সত্যই কয় দিনে অপরাজিতা সে গৃহের সহিত বিশেষ পরিচিত হইয়াছিল। সে টাইম-টেবল আনিতে তরুণকুমারের বসিবার ঘরে গেল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঘর অন্ধকার দেখিয়া সে আলো জ্বালিয়া যখন সেলফে টাইম-টেবল সন্ধান করিতেছিল, তখন তরুণকুমার ঘরের দ্বারে আসিল। পশ্চাৎ হইতে তরুণকুমার বলিল, "দীপশিখা ?"

অপরাজিতা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে তথায় দেখিয়া তরুণকুমার বিস্ময়ে বিব্রত হইল। সে বলিল—"অপরাজিতা!"

অপরাজিতা মুহূর্ত্তমাত্র কি ভাবিল, মুখ তুলিয়া তরুণকুমারের দিকে চাহিয়া—আপনার মানসিক চাঞ্চল্য জয় করিয়া বলিল—"আমি আর অপরাজিতা নহি—আমি পরাজিতা।"

তরুণকুমার কিছু বলিল না।

অপরাজিতার মনে সাহস দেখা দিয়াছিল। সে বলিল, "আপনাদের অনুগ্রহ আমাকে অভিভূত করেছে—আপনার ব্যবহার আমাকে পরাজিত করেছে।"

সে যেন যন্ত্রচালিতের মত সে কথা বলিল।

তরুণকুমার মনে অগাধ তৃপ্তিলাভ করিল বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যবোধে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার সম্বন্ধে যে মত—"

তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া অপরাজিতা বলিল, "তখন 'নুরক্ত' কে তাহা আমি জানতাম না।"

তরুণকুমার এবার হাসিয়া বলিল, "আমি কিন্তু 'কণিকা' কে তা' জানি।"

অপরাজিতা আবার মুখ তুলিয়া তরুণকুমারের দিকে চাহিল—তাহার মুখে আর আশঙ্কার বা উদ্বেগের ভাব নাই।

চারি চক্ষুর দৃষ্টি মিলিত হইল—সে দৃষ্টিতে যেন বিদ্যুৎ চমকাইয়া গেল।

তরুণকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাহি ?"

অপরাজিতা বলিল, "টাইম-টেবল। দাদারা কাল আসবেন,—ট্রেণের সময় জানি না।"

"দিচ্ছি।"—বলিয়া তরুণকুমার অগ্রসর হইল—টাইম-টেবল লইয়া অপরাজিতাকে দিল।

অপরাজিতা বলিল, "ধন্যবাদ।"

তরুণকুমার কি বলিতে যাইতেছিল—এমন সময় দীপশিখা জিজ্ঞাসা করিল, "পেয়েছেন ?"

তরুণকুমার যখন বলিতেছিল 'কণিকা' কে তাহা সে জানিত—সেই সময় দীপশিখা তথায় আসিয়াছিল। তরুণকুমারের কথার অর্থ সে বুঝিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাহার মনে হইয়াছিল—তাহার দাদার ব্যবহারে সে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিল; আর সে লক্ষ্য করিয়াছিল, অপরাজিতার মুখে প্রফুল্ল ভাব।

"পেয়েছি"—বলিয়া অপরাজিতা টাইম-টেবল লইয়া দীপশিখার সঙ্গে চলিয়া গেল।

তরুণকুমার মনে যে ভাব অনুভব করিল তাহা কেবল স্বস্তি নহে, তৃপ্তি নহে—আনন্দ। যখন পার্ব্বত্য প্রদেশে রাত্রি প্রভাত হয়, তখন সূর্য্যের যে আলোক বিকশিত হয়, তাহা কেবল অন্ধকার দূরই করে না—কেবল স্নিগ্ধ নীল জল হ্রদের উপর সৌন্দর্য্যের প্রলেপই দেয় না—পরন্তু পর্ব্বতের উপর অরুণাভা ছড়াইয়াও দেয়।

কন্যাকে দেখিয়া অধ্যাপকপত্নী বলিলেন, "পেয়েছ ?"

অপরাজিতা বলিল, "হাঁ।"

"যা' জানবার দেখে লও—বহিখানা আর নিয়ে যাবার কি প্রয়োজন ?"

"বাবা নিজে দেখতে চাহিবেন।"

চিত্রলেখা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ট্রেণ কখন আসবে, দেখ।"

অপরাজিতা দেখিয়া বলিল, "বেলা ৭টায়।"

"তুমি কি ষ্টেশনে যা'বে ?"

"বাবা, বোধ হয়, যা'বেন—দাদারা ত বাড়ী কোথায় তা জানেন না।"

"তোমার যদি যেতে ইচ্ছা হয়, বল। আমি গাড়ীর ব্যবস্থা করব।"

অপরাজিতা কিছু বলিবার পূর্ব্বে অধ্যাপকপত্নী বলিলেন "আপনারা কি অনুগ্রহ দিয়া শেষ করতে পারছেন না ?"

চিত্রলেখা বলিলেন, "এ আর অনুগ্রহ কি ? দাদারা আসছে—অপরাজিতার তা'দের দেখবার আগ্রহ স্বাভাবিক। ওকে আমরা পর ভাবি না। একখানা গাড়ীতেই হ'বে ? না—দু'খানার ব্যবস্থা করব ?"

অপরাজিতা বলিল, "দু'খানা হ'লে মা-ও যেতে পারেন।"

চিত্রলেখা বলিলেন, "তা'-ই হ'বে।"

মা কন্যাকে বলিলেন, "তবে চল।"

চিত্রলেখা বলিলেন, "আপনি বহি নিয়ে যা'ন। আমি আর একটা গান শুনে অপরাজিতাকে পাঠিয়ে দিব।"

অপরাজিতা কোন আপত্তি করিল না।

তাহার পর—মা চলিয়া যাইলে কন্যা গান করিল :—

বুঝেছি বুঝেছি, সখা, প্রেমনিশা নাই আর ;
প্রেমে নাই মদিরতা,—সে আজ বেদনা-স্বর।
নিশীথের অন্ধকারে
ভালবেসেছিলে যা'রে
এ নব আলোকে তা'রে
ভাল কি লাগিবে আর ?
তবে, সখা, যাও সেথা
প্রেম-সুখ মিলে যথা।
ভুল এ মর্ম্মের ব্যথা
নয়নে নয়ন-ধার।
সুখ অন্বেষণে যদি,
ব্যথা কভু পায় হৃদি,
জেন,—র'বে নিরবধি
তোমা তরে মুক্ত দ্বার—
জেন, র'বে এ হৃদয়
তোমা তরে প্রেমময়,
এ প্রেম হ'বে না ক্ষয়
মরণের (এ) পর পার।

গান শেষ হইলে চিত্রলেখা অপরাজিতাকে বলিলেন, "কাল তোমার দাদারা আসবেন—কাল আসতে বলব না; কিন্তু পরশু তোমাকে একবার আসতে হ'বে। শোভনা আসতে চেয়েছিল—আমি আনি নি; নূতন গান গেয়েছ শুনলে আমার উপর রাগ করবে। তা'কে শিখাতে হ'বে।"

অপরাজিতা বলিল, "তা-ই-হবে।"

—সাগরিকা ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া—অপরাজিতাকে তাহাদিগের গৃহে রাখিয়া আসিল।

দীপশিখা পিসীমাকে বলিল, "দাদার সঙ্গে অপরাজিতার বিয়ের কথাটা আর একবার পাড়লে হয়।"

চিত্রলেখা বলিলেন, "আমার ত খুবই ইচ্ছা। ওর পরে আর কোন মেয়ে আমার পসন্দ হচ্ছে না। কিন্তু অপরাজিতার মনের কথা ত তোমরা জান। তরুণ সে কথা শুনেছে। আবার কথা

পাঠালে হয় ত অপরাজিতা আর এ বাড়ীতে আসবে না—ও ঘরের লোক হয়ে গেছে, কি জানি যদি বিবাদ হয়। আর তরুণও কি ভাববে জানি না।"

দীপশিখা বলিল, "পিসীমা, সে যখনকার কথা, তা'র পরে যে খণ্ডপ্রলয় হয়ে গেছে।"

সাগরিকা বলিল, "তোর জামাইবাবুও তা'-ই বলেন।"

"এ বিষয়ে জামাইবাবুর মতই গ্রাহ্য করতে হয়; কারণ, তিনি নিজেই ভুক্তভোগী।"

চিত্রলেখা বলিলেন, "জামাইকেই ঘটকালী করতে বল না?"

সাগরিকা বলিল, "তবেই হয়েছে! সে কাজ করতে পারত সুধীর; তা' সে ত কালই চলে যাচ্ছে।"

চিত্রলেখা দীপশিখাকে বলিলেন, "তুই-ই তবে ঘটকালীটা কর না।"

দীপশিখা বলিল, "তা' করতে পারি। কিন্তু 'ঘটক বিদায়' কি হ'বে?"

"কি চা'স, বল।"

"আমার মেয়ের খুব ভাল সম্বন্ধ করে দিতে হ'বে।"

"সে ত আমি করেই রেখেছি; সে জন্য ভাবনা নাই।"

"কে, পিসীমা?"

"তোর পিসেমশাই।"

"সে ভাল। সতীন হ'বে বটে, কিন্তু অমন সতীন নিয়ে ঘর করা যায়!"

"আমি আমার অধিকার লিখে ছেড়ে দিব।"

"তবে আদাজল খেয়ে ঘটকালীর কাযেই লেগে যাই।"

পরদিন প্রত্যূষে ব্রজবল্লভ বাবুর জন্য দুইখানি গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া চিত্রলেখা গৃহে যাইবার সময় বলিয়া যাইলেন—তিনি সকালেই আসিবেন; পরদিন সন্ধ্যায় ব্রজবল্লভ বাবুর দুই ছেলেকে আহারের নিমন্ত্রণ করা হইবে।

সেই রাত্রিতে দীপশিখা স্বামীকে বলিল, "তোমাকে হয়ত শীঘ্রই আসতে হ'বে।"

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"দাদার বিয়ে।"

"কোথায়?"

"অপরাজিতার সঙ্গে। আমি ঘটক।"

"তবে সম্ভব; কারণ তুমি অঘটন ঘটাতে পার।"

[ক্রমশঃ।

জননী শ্রীশ্রীসারদা দেবীর উদ্দেশে

ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য

চিরকল্যাণময়ি জগজ্জননি,
স্নেহ দিয়ে অন্তরের পাপ-তাপ-গ্লানি
কোলে টেনে নিলে সবে
শান্তি দিলে তপ্ত বুকে।
তোমার স্নেহের পরশ হ'তে
কেহ নহে দূরে—
পণ্ডিত অথবা মূর্খ, জ্ঞানী গুণী কিবা পাপী তাপী
নারী বা পুরুষ, সাধু বা তস্কর!
আব্রাহ্মণচণ্ডালে উচ্ছলিত স্নেহধারা তব
সমভাবে। পশু-পক্ষী বৃক্ষ-লতাটিও
লভেছে অসীম স্নেহের স্বাদ!
তাই তো জগজ্জননী তুমি!
শ্রীরামকৃষ্ণ-তপস্যার
মূর্ত শক্তিরূপে প্রকাশিত হইলে ধরায়
দিলে নব শিক্ষা কর্মযোগ-দীক্ষা
চিত্তশুদ্ধকরী লোককল্যাণ প্রয়াস মানসে।
সংসারের শত ঝামেলার ঊর্দ্ধে
চিত্তখানি ধরি সাধারণ পুরনারীরূপে
করিলে কতই লীলা তুমি মহামায়া
মায়াধীনা যেন!

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলন যেথায়
সংকীর্ণতা নাহি পেল স্থান,
শুচিস্নাত হ'ল ধরা পবিত্র পরশ লভি।
তোমারে আদর্শ করি
আবার আসিবে কত
সীতা ও সাবিত্রী, গার্গী ও মৈত্রেয়ী;
সমাজে নারীর দেখা যাবে
মহত্ত্বের পূর্ণতার নব নব রূপ,
জ্ঞানের চরম বিকাশ!
মহাশক্তি মা! সমস্ত ঐশ্বর্য ভাতি
অন্তরালে করিলে লুপ্ত,
ক্ষুদ্রবুদ্ধি নর কেমনে বুঝিবে
এ অপূর্ব লীলা?
মাতৃভাব করিতে প্রচার আগমন তব
সকলের সাক্ষাৎ জননী—
চির জনমের—নহে মিথ্যা কথা।
চাঁদের আলোর মত শুচিশুভ্রা
নিবাসনা জননি আমার
বিত্তৈষণা লোকৈষণা নাহি চাহি কিছু
একমাত্র প্রার্থনা তব নির্বাসনা।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

সহদেব চক্রবর্তী—প্রাচীন কবি। জন্ম—১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হুগলী জেলার বালিগড় পরগনাধীন রাধানগর গ্রামে। 'কালু রায়' নামক দেবতার স্বপ্নাদেশ পাইয়া 'ধর্মমঙ্গল' রচনা। গ্রন্থ—ধর্মমঙ্গল (১৭৪০ খৃঃ)।

সাগরকালী ঘোষ—গ্রন্থকার। নিবাস—চন্দননগর। গ্রন্থ—ভেলদিগদিগ বা কপাটি খেলার নিয়মাবলী।

সাগরচন্দ্র কুণ্ডু—গ্রন্থকার। নিবাস—চন্দননগর। গ্রন্থ—জলকষ্টাদির কাহিনী ও বৃষ্টিতত্ত্ব, দুগ্ধ কি বস্তু দেখুন, অগ্নিব্রাহ্মের স্মৃতি ও মহিমা বর্ণনা, সূর্যনারায়ণতত্ত্ব, মাতৃপিতৃ-ভক্তি, অগ্নিব্রাহ্মের তত্ত্ব ও আহুতি প্রকরণ।

সাতকড়ি রায়—কবিগান রচয়িতা। জন্ম—১২০৯ বঙ্গ শান্তিপুরের নিকটস্থ বৈরিগ্রামে ব্রাহ্মণবংশে। মৃত্যু—১২৭২ বঙ্গ। ইনি সাতু রায় নামে পরিচিত। পিতা—পীতাম্বর রায়। শিক্ষা—স্বগ্রামে ও শান্তিপুরে। কর্ম—রাণাঘাটের পালচৌধুরীদিগের পক্ষে বারাসাত মহকুমায় মোক্তারী। গ্রন্থ—কবির গীত।

সাতকড়িপতি রায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—সত্যবাদী (সাপ্তা, ১৩২৯-৩০২১)।

সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—সংসঙ্গ (১৩০১-৫)।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৯৮ খৃঃ নদীয়া জেলার লোকনাথপুরে। শিক্ষা—চুয়াডাঙ্গা, মাজদিয়া, কটক, বহরমপুর ও কলিকাতা, বি-এ (কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়), এম-এ পাঠকালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান (১৯২১)। কর্ম—অধ্যাপক, বিদ্যাপীঠ। হিন্দুস্থান ইনস্যুরেন্স কোং প্রচার-সচিব। গ্রন্থ—পল্লীব্যথা (১৯২১), বক্তুরেখা (রাজেন্দ্রপুর, ১৯২২), আহিতাগ্নি, মনোমুকুর, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র (জী), সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র, খৃষ্টানুসরণ, মডার্ন কবিতা, মধুমালতী, অনুরাধা, অতসী, বন্দনা (স্বদেশী সঙ্গীত সং,) Life Insurance, Advertising and Selling. সম্পাদক—বিজলী, স্বায়ত্তশাসন (পাক্ষিক), উপাসনা (মাসিক ১৩৩১-৩৯), অভ্যুদয়।

সারদাচরণ ঘোষ—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—আরতি (১৩০৮-১৩১৬)।

সারদাচরণ মিত্র—আইনজীবী ও বিদ্যানুরাগী। জন্ম—১৮৪৮ খৃঃ ১৯এ ডিসেম্বর হুগলী জেলার পানিসেওলা গ্রামে। মৃত্যু—১৯১৯ খৃঃ ৪ঠা সেপ্টেম্বর। পিতা—ঈশানচন্দ্র মিত্র। মাতা—ভগবতী দেবী। শিক্ষা—হেয়ার স্কুল (পূর্ব নাম—কলুটোলা বয়েজ স্কুল, ১৮৫৭), প্রবেশিকা (ঐ, ১৮৬৫, ১ম স্থান), এফ-এ (১৮৬৭, ১ম), বি-এ (১৮৭০, ১ম), এম-এ (১৮৭০), পি-আর-এস (১৮৭১), বি-এল (১৮৭২)। কর্ম—অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ (১৮৭০-৭২), আইন-ব্যবসায়, কলিঃ হাইকোর্ট (১৮৭৩), অস্থায়ী হাইকোর্টের জজ (১৯০২-১), স্থায়ী (১৯০৪-১৯০৮); বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৮৮৫), মিউনিসিপ্যাল কমিশনার (১৮৭৭-১৮৮০), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি (১৩০৯-১১, ১৩২০-২২), সভাপতি (১৩১২-১৩১৯), ভারত মহামণ্ডল (বারাণসী) অন্যতম সম্পাদক। অক্ষয়কুমার সরকারের সহিত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের উদ্ধার-চেষ্টায় ব্রতী। নানা সাময়িকপত্রের লেখক। 'কায়স্থ-কারিকা' প্রণয়নের প্রধান উদ্যোগী, টেক্সট বুক কমিটির সভ্য (১৮৮৮-১৯০০), কলিকাতা আর্য্য বিদ্যালয় স্থাপনা (বর্তমান সারদাচরণ এরিয়ান ইন্সটিটিউসন, ১৮৮৪), বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী। বহুবিধ সমাজ-সংস্কার কার্যে ব্রতী। 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' প্রকাশ (১২৯৭)। গ্রন্থ—[illegible] বত্নমালা, বিদ্যাপতির পদাবলী, কায়স্থকারিকা, উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, চাণক্যশ্লোক, পুরন্দর খাঁ, An English Grammer for beginners, Tagore Law Lectures (১৮৯৫), Land Law of Bengal.

সারদাচরণ ধর—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নবীন চন্দ্রকলা।

সারদানাথ দত্ত—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—[illegible] (১৩১৮)।

সারদাপ্রসন্ন দাস—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮৭১ খৃঃ [illegible] জেলায় জেলীর সাদপুর কাজিরহাট গ্রামে। মৃত্যু—১৯২৭ খৃঃ [illegible]। পিতা—মহেশচন্দ্র দাস (ত্রিপুরা স্টেটের উচ্চপদস্থ কর্মচারী)। শিক্ষা—প্রবেশিকা (চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, প্রথম স্থান), [illegible] (প্রেসিডেন্সী কলেজ, প্রথম), বি-এ (ঐ, প্রথম), ঈশান [illegible] লাভ, এম-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ)। কর্ম—অধ্যক্ষ, হুগলী [illegible] অধ্যাপক, (রসিক পণ্ডিত), কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়। 'রায়-বাহাদুর' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—দক্ষিণ-ভারতে তীর্থ-ভ্রমণ, [illegible] শাস্ত্রের পাঠ্য পুস্তক।

সারদাপ্রসাদ চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রাজ্যের [illegible] মহাপ্রস্থান, রজিনী, মোহিনী প্রতিমা বা সরলা, নিরাশ [illegible] পদ্মিনী, সাবিত্রী।

সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—[illegible] কাজের লোক (১৯০৭-১৯২৭)।

সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য—ধর্ম-প্রচারক। পঞ্জাব প্রবাসী। [illegible] ফিরোজপুরে সরকারী চাকুরী (১৮৬০), লাহোরে বদলী (১৮[illegible]) প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য—লাহোর ব্রাহ্মসমাজ (১৮৬২)। [illegible] প্রতিষ্ঠাতা—পঞ্জাবী সৎসভা, কাঙ্গড়ার আঞ্জুমান সভা, '[illegible] আঞ্জুমান' সভা। অতঃপর ব্রাহ্মধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সিমলায় সনাতন ধর্ম-প্রচার। 'সিমলা সনাতন ধর্ম' প্রতিষ্ঠা। [illegible] দয়ানন্দের সম্পর্কে আসিয়া আর্যসমাজের সভাপতি। '[illegible] ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট মিশন' স্থাপনা। গ্রন্থ—অমরনাথ (ভ্রমণ), [illegible] (ভ্রমণ)।

সারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ, বিদ্যাবিনোদ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—উত্তরকাণ্ড পরিক্রম।

সারদারঞ্জন রায়—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১২৬৫ বঙ্গ ১২ই [illegible] মৈমনসিংহ মসুয়া গ্রামে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৩৩২ বঙ্গ ১৫ই কার্তিক দেওঘরে। পিতা—কালীনাথ রায় (শ্যামসুন্দর মুন্সী

নামে পরিচিত)। শিক্ষা—প্রবেশিকা (মৈমনসিংহ জেলা স্কুল), বি-এ (ঢাকা কলেজ), এম-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ)। বাল্যকাল হইতে ক্রিকেট খেলা ও ব্যায়াম-চর্চা। কর্ম—অধ্যাপক, আলিগড় কলেজ, হেতমপুর কলেজ, ঢাকা কলেজ, মেট্রোপলিটান কলেজ; অধ্যক্ষ, মেট্রোপলিটান কলেজ (১৯০৯)। গ্রন্থ—**A Treatise on Geometry**. সম্পাদিত; গ্রন্থ—কিরাতার্জুন (সটীক), শকুন্তলা (ঐ), ভট্টি (ঐ)।

সাহানা দেবী—সঙ্গীতজ্ঞা। অপর নাম সুশীলতা দেবী। পিতা—ডাক্তার কর্ণেল ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (এলাহাবাদ)। স্বামী—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বহু স্বরলিপি রচয়িত্রী। গ্রন্থ—মালিকা।

সিদ্ধমোহন মিত্র—আইনবিদ্। হায়দ্রাবাদ-প্রবাসী। পিতা—জ্ঞানচন্দ্র মিত্র (কোন্নগর-নিবাসী)। কর্ম—ব্যারিষ্টার, হায়দ্রাবাদ হাইকোর্ট, পরে নিজাম ষ্টেটের এডভোকেট-জেনারেল। ইতিহাস, সাহিত্য, মুশলিম সাহিত্য, আরবী ও পারসী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ। গ্রেট-ব্রিটেন রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য। গ্রন্থ—The Position of Women in Indian life (বরোদা-মহারাণী সহযোগে), Anglo-Indian Studies, The Indian Problem, মুশলিম ধর্ম ও সংস্কৃতি (উর্দু)। সম্পাদক—Deccan Post (সংবাদপত্র), Hydrabad Record.

সিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। চুঁচুড়া-নিবাসী। সম্পাদক—জ্যোৎস্নাহার (মাসিক, ১৩০১)।

সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—আর্য্যকাহিনী (সাপ্তাহিক, ১৮৮১)।

সীতা দেবী—মহিলা সাহিত্যিক। জন্ম—১৩০২ বঙ্গ কলিকাতা। পিতা—প্রসিদ্ধ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। স্বামী—সুধীরকুমার চৌধুরী। শিক্ষা—বাল্যে এলাহাবাদে; প্রবেশিকা (বেথুন কলেজ), এফ-এ (ঐ), বি-এ (ঐ, ১৯১৬), শান্তিনিকেতন (৩ বৎসর)। বিবাহের (১৯২৩) পর ব্রহ্মদেশে গমন ও দীর্ঘ ৭ বৎসর অবস্থান। বাল্যকাল হইতেই সাহিত্য-সাধনা। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বিভিন্ন রচনা। বহু গ্রন্থ ইংরেজি ভাষায় অনূদিত। লীলা-পুরস্কার লাভ। গ্রন্থ—সোনার খাঁচা, পথিক বন্ধু, আলোর আড়াল, রজনীগন্ধা, বন্যা, মাতৃঋণ, শোক ও সান্ত্বনা, জন্মসত্ত্ব, পরভৃতিকা, মহামায়া, মাটির বাসা, ঘূর্ণির মাঝখানে, ক্ষণিকের অতিথি, বজ্রমণি, ছায়াবীথি (গ), পুণ্যস্মৃতি (রবীন্দ্রস্মরণে), নীরেট গুরুর কাহিনী (শি), আজবদেশ (ঐ), তিনটি গল্প (ঐ), কথাসপ্তক (ঐ), Garden Creaper, Knight Errant.

সীতানাথ গোস্বামী—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। জন্ম—শান্তিপুরের গোস্বামী (আতাবুনিয়া শাখা) বংশে। ইনি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র। গ্রন্থ—বালক বিজয়কৃষ্ণ।

সীতানাথ ঘোষ—সাময়িকপত্রসেবী। জন্ম—যশোহর। পাষণ্ড পীড়ন (সাপ্তাহিক, ১৮৪৬, ২০ জুন), জগবন্ধু (মাসিক, ১৮৪৬, অক্টোবর), মানসমোহিনী (মাসিক, ১৮৫৪), হিন্দু প্রদর্শক (মাসিক, ১৮৭২)।

সীতানাথ দত্ত, তত্ত্বভূষণ—দার্শনিক পণ্ডিত। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য। গ্রন্থ—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, উপনিষদ, অদ্বৈতবাদ, মৈত্রেয়ী, জ্ঞানাঞ্জন (১৮৭০), Krisna and Gita, Philosophy of Brahmanism or the Creed of Educated Hindus, Vedanta and Modern Thought. সম্পাদক—ব্রহ্মতত্ত্ব (ত্রৈমাসিক, ১৩০৩)।

সীতানাথ দাস মহাপাত্র—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। ভক্তিতীর্থ গোস্বামী নামে পরিচিত। মেদিনীপুর জেলার সাউটীর প্রপন্ন আশ্রমভুক্ত। গ্রন্থ—শ্রীহরিনামামৃত সিন্ধুবিন্দু, শ্রীভাগবত ধর্ম, সদযুক্তি-সোপান (১৩২২), শ্রীসেবাসঙ্কল্প, শ্রীরসতত্ত্ব গীতাবলী (৪২৪ চৈতন্যাব্দ)।

সীতানাথ ন্যায়াচার্য—নৈয়ায়িক পণ্ডিত ও সুকবি। জন্ম—১৮৬৪ খৃঃ ৯ই মার্চ বর্ধমান জেলার অন্তর্বর্তী কাইগ্রাম নামক গ্রামে। মৃত্যু—১৯২৮ খৃঃ ৫ই জুন কাশীধামে। পিতা—নবীনচন্দ্র তর্কালঙ্কার। ন্যায়, বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন, বাংলা ও উর্দু ভাষা শিক্ষা। 'তর্করত্ন' (বিবুধজননী সভা, ১২৯৭), তর্কতীর্থ (গভর্ণমেন্ট), ন্যায়াচার্য শিরোমণি (বঙ্গবিবুধজননী সভা, ১৩০২), 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি (১৯২০) লাভ। স্থাপনা—'মুর্শিদাবাদ মঠ' চতুষ্পাঠী (১৩০২), আরণ্য চতুষ্পাঠী (১৩১৬)। বঙ্গীয় বেদ-সভার সভাপতি (১৯২১)। ইনি প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ—হরিবাসর সঙ্গীত।

সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ—পণ্ডিত ও অনুবাদক। গ্রন্থ—কাতন্ত্রসূত্রম্ (সটীক), কাতন্ত্রগণমালা (সটীক), সন্ধিবৃত্তি, নামপ্রকরণ, দেবনাগর বর্ণ পরিচয়, কৃষ্ণস্তবী, পুরোহিতপ্রদীপ।

সীতানাথ বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কাশীখণ্ড (১৮৭০)।

সীতেশচন্দ্র খাঁ—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—অরুণ (১৩৩৭-৩৮)।

সুকান্ত ভট্টাচার্য—কবি। জন্ম—১৩৩৩ বঙ্গ ৩০এ শ্রাবণ। মৃত্যু—১৩৫৪ বঙ্গ ২৯এ বৈশাখ। বিভিন্ন সাময়িকপত্রের লেখক। অতি অল্প বয়সেই মৃত্যুবরণ। গ্রন্থ—ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস, মিঠেকড়া (শি), অভিযান (নাটিকা)।

সুকুমার হালদার—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৬৪ খৃঃ (?)। মৃত্যু—১৯৪৮ খৃঃ ২১ ফেব্রুয়ারী রাঁচীতে নিজ বাসভবনে। পিতা—রাখালদাস হালদার। কর্ম—ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, রাঁচী এবং তৎপরে ইনি দেওরা ষ্টেটের রাজার অভিভাবক নিযুক্ত হন। অবসর সময়ে ইনি দেশী ও বিদেশীয় ইংরেজি নানা সাময়িকপত্রে প্রবন্ধ রচনা করিতেন। বহু ক্ষেত্রে 'An old Musafir' অথবা 'A Defunct Deputy' ছদ্মনামে রচনা প্রকাশ হইত। প্রথম ইংরেজি পুস্তক। "The Modern Iconoclasties and Missionary Ignorance" ত্রয়োদশ বর্ষে প্রকাশিত হয়। ছোটনাগপুরের যাবতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত ইনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রাঁচীতে ইঁহার সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য হইতে ইনি বহু দ্রব্য বিশ্বভারতী, বিশ্ববিদ্যালয়, ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে দান করেন। গ্রন্থ—**Raja Rammohan Roy and Hinduism, Western Religion & Modern Civilisation, A Mid-Victorian Hindu, The Lure of the Cross, The Cross in the Crucible, Divine Love,**

Bible Examined, The Dead Sea Apple, The War Spirit.

সুকুমার সেন—শিক্ষাবিদ্। শিক্ষা—এম-এ, ডি-লিট (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থ—বাংলা সাহিত্যে গদ্য, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী (১৩৫০), মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী (১৩৫২)।

সুকুমাররঞ্জন দাশ গ্রন্থকার—শিক্ষা—এম-এ, পি-এইচ-ডি, অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর কলেজ। গ্রন্থ—হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা, চিত্তরঞ্জন। সম্পাদক—নারায়ণ (মাসিক)।

সুকোমল বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রেতাত্মার বার্তা, অনাবিষ্কৃত, ইষ্টিশান (কবিতা)।

সুখময় শাস্ত্রী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মহাভারতের সমাজ, মীমাংসা দর্শন, মিতাক্ষরা দায়ভাগ।

সুখরঞ্জন রায়—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮৮৯ খৃঃ জুন। শিক্ষা—এম-এ। কর্ম—অধ্যাপক, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা। গ্রন্থ—আকাশ-প্রদীপ (১৯১৪), মায়াচিত্র (১৯১১), শুক্লা (১৯১০)।

সুখলতা রাও—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—আরো গল্প, গল্পের বই, পড়াশুনা, মজার গল্প।

সুচারু দেবী—মহিলা সাহিত্যিক। ময়ূরভঞ্জের রাণী। সম্পাদক—পরিচারিকা (মাসিক, ১৩০২)।

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার, মৈত্রীসাধনা, Nairatmyayapariprecha, The Trisvabha- vanirdesa of Vasubandhu.

সুধাংশুমোহন বসু—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮৭৮ খৃঃ ২রা জুন। পিতা—দেশনেতা আনন্দমোহন বসু। কর্ম—ব্যারিষ্টার, কলিকাতা হাইকোর্ট, আইন অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২০-২৩)। গ্রন্থ—Bengal Municipal Act (১৯৩৩), The Working Constitution in India (১৯২১—৩৯), Meaning of Dominion Status (১৯৪৪)।

সুধাংশুভূষণ সেনগুপ্ত—আয়ুর্বেদবিদ্। সম্পাদক—আয়ুর্বেদ-বিকাশ (১৩৩০-৩২)।

সুধাংশু হালদার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অভিনব, সম্পুট, একাঙ্কিকা।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—সরণি (১৩২৮-২৯)।

সুধাকৃষ্ণ বাগচি—সাহিত্যিক। গ্রন্থ—সপ্তনকাহিনী, পুণ্যের জয়, স্বদেশ কুসুম, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বাঙ্গালীর সমাজ, কুমার ভীমসিংহ, শিল্পবিজ্ঞান। সম্পাদক—ফাল্গুনী (১৩১৮-২২)।

সুধীন্দ্র চক্রবর্ত্তী শিক্ষাব্রতী। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলায় বাঁধের গ্রামে। অধ্যাপক আনন্দমোহন কলেজ, বোলপুর কলেজ। গ্রন্থ—সাংখ্যকলিকা।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৬৯ খৃঃ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবংশে। মৃত্যু—১৯২৯ খৃঃ ৭ই নভেম্বর। পিতা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষা—বি-এ, বি-এল। কর্ম—আইন ব্যবসায়, কলিকাতা হাইকোর্ট। বিভিন্ন সাময়িকপত্রের লেখক। গ্রন্থ—বঙ্গমঙ্গল, করঙ্ক, চিত্ররেখা, মঞ্জুষা, চিত্রালী, দোলা, বৈতানিক, প্রসঙ্গ, মায়াবন্ধন। সম্পাদক—সাধনা (মাসিক, ১২৯৮-১৩০১)।

সুধীন্দ্র বসু—শিক্ষাব্রতী। শিক্ষা—এম-এ (Illinois) পিএইচ-ডি (Iowa)। কর্ম—লেকচারার, ষ্টেট ইউনিভার্সিটি অব আওয়া, আমেরিকা। গ্রন্থ—Some Aspects of British Rule in India.

সুধীভূষণ ভট্টাচার্য—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৩১৯ বঙ্গ [illegible] যশোহরে (মাতুলালয়ে)। পিতা—মহামহোপাধ্যায় [illegible] তর্কবাগীশ। শিক্ষা—প্রবেশিকা (১৯২৮, কাশী), আই-এ ([illegible] বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০, বি-এ (১৯৩২), এম-এ (ইংরেজী, হিন্দু [illegible] বিদ্যালয়, ১৯৩৬), এম-এ (বাংলা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা[illegible] কর্ম—অধ্যাপক, দৌলতপুর কলেজ (১৯৩৭-৪১), রংপুর [illegible] (১৯৪১-৪৭), ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব বিভাগ (১৯[illegible] বহু গবেষণা-মূলক রচনা নানা সাময়িকপত্রে প্রকাশ। [illegible]— মঙ্গলচণ্ডীর গীত (সম্পাদিত), The Parji Language (অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Dr. T. Burow [illegible] লণ্ডন, ১৯৫৩), Studies in the Parenji Language ১৯৫৪)। সম্পাদক—ছাত্রমহল (কাশী, ১৯[illegible])। সম্পাদক—বঙ্গীয় মহাকোষ (১৩৫১-৫২)।

সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। [illegible] দিগন্ত (অনিলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ), পুতুল আলপনা।

সুধীরকুমার দাশগুপ্ত—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৩০১ বঙ্গ [illegible] জেলার মাহিলাড়া। শিক্ষা—এম-এ, পি-এইচ-ডি। [illegible] রাজনীতিক্ষেত্রে ব্রতী থাকিয়া পরে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ। [illegible] স্কটিশ চার্চ কলেজ। গ্রন্থ—কাব্যালোক।

সুধীরকুমার মিত্র—গ্রন্থকার। জন্ম—১৯১১ খৃঃ [illegible] বাকসা গ্রামে (মাতুলালয়ে)। পৈতৃক নিবাস—হুগলী জেলার [illegible] গ্রাম। পিতা—আশুতোষ মিত্র। মাতা—বাসবালা। [illegible] প্রবেশিকা (স্কটিশ চার্চ কলেজ), বি-এ পর্যন্ত পাঠ। পরিচালিত বুভুক্ষা (পাক্ষিক)। বাল্যকাল হইতে সাহিত্য-সাধনা ও শিশু-[illegible] বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা। 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—[illegible] রাষ্ট্রভাষা, Indias National Language, মহাবিপ্লবী [illegible] নব্য বাঙ্গালা, তীর্থ সপ্তক, আমাদের বাপুজী, মৃত্যুঞ্জয়ী [illegible] আমাদের নেতাজী, যুগাচার্য বিবেকানন্দ, বরণীয় বাঙ্গালী, শ্রীশ্রী[illegible] রাণী রাসমণি, তেজুরের মিত্র বংশ, হুগলীর ইতিহাস।

সুধীরকুমার সেন—সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। জন্ম—[illegible] খৃঃ বরিশাল জেলার ভারুকাঠি-নারায়ণপুর গ্রামে। পিতা—[illegible] সেন। বাল্যকাল হইতেই সাহিত্য-সাধনা। কর্ম—বেশবী, [illegible] বর্তমানে 'যুগান্তর' পত্রিকার সহ-সম্পাদক। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সমরনীতি সংক্রান্ত বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থের লেখক। গ্রন্থ—[illegible] দাবী (নাটক), বর্তমান মহাযুদ্ধ, এ যুদ্ধের সেনা[illegible] চীনের মানুষ, মরণজয়ী বীর, গদর বিপ্লব। সম্পাদক— প্রবুদ্ধ ভারত (বাংলা), নবনূর (সাপ্তাহিক), [illegible] (সাপ্তাহিক)।

[ক্রমশঃ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীমতী লিজেল্ রেমঁ

অন্দরে

গোপালের মা-ই নিবেদিতাকে প্রথম বাগবাজারের সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। ডিসেম্বরে নিবেদিতা এই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে নিজের বাড়িতে আনান। উঠানের ধার ঘেঁসে যে-সব ছোট-ছোট কুঠরি, তারই একটা দখল করলেন বুড়ী।

গোপালের মার তখন জরাজীর্ণ অসহায় অবস্থা, যেন আবার শৈশব ফিরে এসেছে; অথচ দেখবার কেউ নাই জগতে। নিবেদিতা তাঁকে ভালবাসতেন, দেবীর মত ভক্তি করতেন। তার বদলে বৃদ্ধা নিবেদিতাকে দিয়েছিলেন সেই ভাস্বর মাতৃস্নেহ, যার সামনে শ্রীরামকৃষ্ণও একদিন হৃদয় মেলে ধরেছিলেন। গোপালের মায়ের জীবন কঠিন নিষ্ঠায় বাঁধা, আত্মোৎসর্গের জীবন। কুসুম নামে তাঁর এক শিষ্যা ছিল। সেই-ই তাঁর সব কাজ করত, রান্না, গঙ্গাজল আনা, গোবর দিয়ে ঘর নিকানো—সব।

কঠোর জীবনযাত্রা নিবেদিতার। নিষ্ঠুর সমালোচনা সইতে হয়, সবার আক্রমণের যাত্রী তিনি। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছেলেদের ভারতের কাজে সংঘবদ্ধ করতে চান, অদম্য উৎসাহে নিজেকে হাজার টুকরোয় ছড়িয়ে দেন ওদের মাঝে। নির্জন অবসরের বিলাস তাঁর ঘুচে গিয়েছিল এমনি করে। কিন্তু গোপালের মা আবার যেন একটু ফিরিয়ে আনলেন। ভোরবেলা নিবেদিতা তাঁর দোরগোড়ায় গিয়ে বসে থাকেন, কখন বুড়ী ইশারায় ঘরে ঢুকতে বলবেন এই প্রতীক্ষায়। এমনি প্রতিদিন। গোপালের মা হয়তো স্তব পড়ছেন কি জপ করছেন। নিবেদিতাকে দেখলেই তাঁর বলিকুঞ্চিত মুখ খুশির হাসিতে ঝলমলিয়ে ওঠে, চোখ দুটি জ্বল-জ্বল করে। নিবেদিতাকে কাছে টেনে এনে একটুকু জল-মিষ্টি মুখে তুলে দেওয়া চাই-ই রোজ। গোপালের মা'র ঘরে ঠাকুরদের আনাগোনা চলে, কিন্তু তাঁদের কথা বুড়ী মুখেও আনবেন না। কথা কইলেই তাঁরা নাকি ভয় পান।—ঘরের বাতাস ভরে আছে গোপালের বাঁশির সুরে, সে-সুরও যায় থেমে। এ-খবর নিবেদিতার অজানা নয়,—তিনি চুপ করেই থাকেন। যাতে কখন গোপালের মা কষ্ট পান, নিবেদিতা গা-হাত-পা টিপে দেন। মা যেমন রুগ্ন ছেলের যত্ন করে তেমনি যত্ন করেন ওঁকে। জগদীশ্বরী যেন অসহায় দুর্বল সেজে সেবা নিতে এসেছেন, এমনি মনে হয় নিবেদিতার। নিজের মায়ের কোনও সেবাতেই তো লাগেননি, গোপালের মা যেন নিবেদিতার সেই মা-জননী।

১৯০৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর লিখছেন,…'গোপালের মায়ের কাছে থাকলে অন্তরে একটা অদ্ভুত উদ্দীপনা জাগে। সেন্ট এলিজাবেথের কথাগুলো কানে বাজে, "কী এমন আমি যে আমার ঠাকুরের মা আমায় দেখতে আসবেন?" গোপালের মার যে পরমহংস অবস্থা এ আমি বিশ্বাস করি। মনে হয় শুধু এঁকেই পূজা করতে পারি যদি তাহলেই যাদের ভালবাসি তাদের পরে বিধাতার অজস্র আশীর্বাদ ঝরে পড়বে। এর বেশি আর কি বলব!'

নিবেদিতার স্নেহার্দ্র চিত্তে একটি প্রশ্নই বার বার জাগে, নিজেই শুধোন নিজেকে, স্বামীজি আমার কাজে খুশি হয়েছেন কি?…'তাঁর মত আমিও একলা কাজ করতেই আনন্দ পাই। সারা জীবন তিনি মানুষ খুঁজে ফিরেছেন। জানতেন না, যে-আদর্শের জন্য তিনি প্রাণপাত করে গেলেন সে-আদর্শ প্রস্ফুট হয়ে উঠবে তাঁর জীবনের যবনিকা পড়লেই। আজ সে-আদর্শ দেশের সামনে পরিস্ফুট। মানুষ এখন নিজের তাগিদে কাজ করতে আসছে। আর কারও প্রয়োজন নাই। চুম্বকের মত লোহার কণাগুলোকে একমুখী করেছেন তিনি…তাঁর হৃদয় যে কত বড় সে আমার কল্পনাতীত। আজ শুধু এইটুকুই জানতে চাই যে তাঁর ইচ্ছাই আমার জীবনে পূর্ণ হতে চলেছে, তাঁর আশীর্বাদ আর প্রসাদের অমৃত-ধারায় সিঞ্চিত হচ্ছে এ জীবন। অথচ আমার জন্য যে-পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন তার সঙ্গে এখনকার সব-কিছুর কী যে গরমিল! দেখতে গেলে অনেক ব্যাপারে তিনি যেটি করতে আমায় নিষেধ করেছিলেন; আমি ঠিক সেইটিই করেছি…সঙ্কট-সাগরে পাড়ি দিয়ে হাজারো বিপদের ঢেউ কেটে কেটে বন্দরে পৌঁছবার কম্পাস একটিই—সে আমার মর্মবেদনা, অন্তরের জ্বালা…'(১৯০৩ সনের ২৫শে নবেম্বরের চিঠি।)

কথাগুলো যে ক্লান্তিতে বলা তাতে কোনও সন্দেহ নাই। সাধের অতিরিক্ত করেছেন নিবেদিতা। এবার কাঁধের বোঝা নামিয়ে রেখে নিজের মনের মুখোমুখি হলেন। গোত্রহীনা সন্ন্যাসিনী ছাড়া আর কিছু নন তিনি—সেই ভাবেই তাঁর দিন কাটতে লাগল। বিশ্রামের সব আয়োজন দূরে ঠেলে, ব্রত-উপবাস বাদ দিয়ে নিবেদিতা গোপালের মার সঙ্গে বসে ধ্যান করেন। ঝাড়ের কলম থেকে যেমন আলো ঠিকরে পড়ে, নিবেদিতা চেয়েছিলেন ঘরের বাইরেও তাঁর স্বভাব হতে অমনি করে প্রাণশক্তি ঠিকরে প'ড়ে জাগিয়ে তুলুক সবাইকে। এর বেশি আর কিছু তো চাননি। নিজের ঘরে তিনি নিঃসম্বল ভিক্ষুণী মাত্র। ঘরে বসে চেনা গলার আওয়াজ পান। তাঁর হস্তক্ষেপ ছাড়াই সব-কিছু ছন্দে-লয়ে হয়ে যাচ্ছে তো! ক্রিষ্টিন এখন স্কুলের সর্বে-সর্বা। আনন্দ-মধুর শান্ত-সুন্দর যে ভাবলোককে স্বামীজি রূপ দিতে চেয়েছিলেন, ও তাকে মূর্ত করে তুলেছে। ওর ঋণ শোধবার নয়। ঈর্ষা না করে নিবেদিতা ক্রিষ্টিনের শান্ত জীবনযাত্রা দেখে যান। ওকে সুখী

মনে করবেন না করুণা করবেন, ভেবে পান না। উদ্দাম তুফানের মত ছুটে চলেছে নিবেদিতার জীবন, তারই পাশে ক্রিষ্টিনের অথৈ ভালবাসা যেন স্বচ্ছসলিলা। তটিনীর মন্দধারা।'··· স্বভাবটি ওর সুষমায় সুডৌল। ওর অন্তরের তাগিদকে সহজেই ও মেনে নেয়, কারণ, ওর সহজাত বৃত্তিগুলো ন্যায়ের পথেই ঠেলে ওকে, অন্যায় অসত্যের পথে নয়। ওর মত সাক্ষিভাবের তটস্থতা আর কারও মাঝে আমি দেখিনি। ভালবাসাই ওর সব। কিন্তু সে-ভালবাসা নিঃসঙ্গ, একাগ্র, উজাড়-করা ভালবাসা—উত্তাল তরঙ্গমুখর কি সর্বগ্রাসী বুভুক্ষা নয়! ও একই কালে সব চেয়ে ভাগ্যবতী আর সব চেয়ে দুঃখিনী···ওকে চিনতে পেরে চোখের জল ফেলে বলেছি, আমার সারা জীবনটাই ব্যর্থ। আমার চেয়ে আমার গুরুই যে এতে বেশি ব্যথা পাচ্ছেন···আমি জানি, আমি দেবতার ক্রীড়নক, তাঁর ইচ্ছায় এ-জীবনে অনির্বাণ দহনজ্বালা···তাঁর ইচ্ছাই কলায় কলায় গ্রাস করছে এ-জীবনকে···মাধুর্যের সঙ্গে বীর্যের নিত্য দ্বন্দ্ব আমার মাঝে, বুঝে উঠতে পারি না জীবনটা আমার নিজের খেয়ালে আর শৈথিল্যেই পয়মাল করলাম কিনা'···*

ওঁদের স্বভাবের গরমিল নিয়ে ক্রিষ্টিন আর নিবেদিতা দু'জনেই হাসাহাসি করতেন। একদিন নিবেদিতা বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম লেখাপড়া ভাবনা-চিন্তা সব ছেড়ে কোনও মঠের ঝি হব, বাসন ধোব, শাকপাতা তুলব আর সর্বদা ঠাকুরের চিন্তা করব। আবার কখনও ভাবতাম, রাণী হব, সম্রাজ্ঞীর যা-কিছু ক্ষমতা-প্রতিপত্তি আর দুর্ভাবনা সবই বইব অকাতরে।† যে-সত্যনিষ্ঠা থাকলে জীবনের দায় বাড়ে বই কমে না, নিবেদিতার লক্ষ্য ছিল সেই পরম সত্যনিষ্ঠা। সেই নিষ্ঠা নিয়েই নারায়ণ সেবা করবার আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল তাঁর, তাকে বাদ দিয়ে নয়। অন্তরে বড় আদর্শ পালন করা আর জীবনের তুচ্ছ খুঁটিনাটিতেও সে-আদর্শকে অবিচল নিষ্ঠায় তিলে-তিলে ফুটিয়ে তোলা—অগ্নাভিযানের মূল কথা কি এ-ই নয়?

দীর্ঘদিন গ্রামে থাকবার পর ফেব্রুআরিতে সারদা দেবী বাগবাজারে ফিরে এলেন। তাঁকে দেখে নিবেদিতা নিজের মনোভাবের অর্থ খুঁজে পান। স্বামী বিবেকানন্দ দেহরক্ষা করবার পর এ পর্যন্ত দু'জনের দেখা হয়নি। ২৪শে ফেব্রুআরি ১৯০৪ সনের এক চিঠিতে লিখলেন;···'শ্রীমা এখানে এসেছেন, শরীর একেবারে ক্ষয়ে গেছে, এত রোগা আর ছোট্ট আর এমন কালো হয়ে গেছেন—বোধ হয় গ্রামে থেকে ওখানকার কষ্টে। কিন্তু সেই দৃষ্টির স্বচ্ছতা, সেই মহিমা আর মাতৃত্ব আগের মতই আছে। আহা, ওঁকে কত আরামে রাখতে সাধ জাগে! নরম একটি বালিশ, ছোট্ট একটা আলমারী আরও কত কি ওঁর দরকার! এত ভিড় ওঁর চার দিকে! লোকজন সব সময় ঘিরে আছে···'

নিবেদিতার মুখখানি ধরে আদর করেন সারদা দেবী। চিবুকে আঙুল ক'টি বুলিয়ে চুমো খান, নানান প্রশ্ন করেন। কিন্তু বলবার কথা যে অনেক। আর মায়ের কাছে মুখের কথা কিছুই নয়, মনের কথা সব তিনি ধরে ফেলেন, ঠিক আসল জায়গায় হাত দেন। মা ওঁর মনের কথা আঁচ করুন, নিবেদিতা চোখ বুজে চুপ করে ব[illegible] আছেন। দুজনের মধ্যে কোনও আড়াল তো নাই।

দিনে-দিনে মায়ের সঙ্গে খানিকটা সময় কাটানো নিবেদি[illegible] অভ্যাস হয়ে উঠল। সময়ের মাত্রা যত পারেন বাড়িয়ে [illegible] কোনও বাঁধা-ধরা নিয়মও নাই, দিনের যে-কোনও সময়ে হ'ক [illegible] হল। নিজের বন্ধুদের মায়ের কাছে নিয়ে আসেন। কর্মব্য[illegible] সব তরুণদের নানা প্রচার-কাজে পাঠান প্রায়ই তাদের ধরে আনেন, মায়ের আশীর্বাদ চান তাদের জন্য। মায়ের জন্য থালা ভরে ফল-[illegible] আনেন, মা নিয়ে আবার পাঁচ জনকে বিলিয়ে দেন। [illegible] কোনও সময় ঘর-ভরা ভক্তেরা থাকেন, মাকে ঘিরে ধ্যান ক[illegible] সবাই। গভীর শ্রদ্ধায় প্রণামটি করেই নিবেদিতা চলে [illegible] মায়ের মুখে এক টুকরো হাসি! ঐটুকু কুড়িয়েই নিবেদিতার [illegible] ভরে।

একটু বিশেষ অন্তরঙ্গতার সুরে নিবেদিতাকে একদিন মা ব[illegible] 'দেখ মা, কদিন হল তোমায় দেখলুম, তোমার পরনে [illegible] অর্থাৎ আমি তোমায় সন্ন্যাস দিতে প্রস্তুত।' কথা ক'টির [illegible] বুঝতে পেরে দেহে-মনে কেঁপে ওঠেন নিবেদিতা। কান ঝাঁ-ঝাঁ [illegible] দম যেন আটকে আসে, কোন মতে বলেন 'আমি ও চাই [illegible] সারদা দেবীর চোখে-চোখে তাকান—স্নেহের দিব্যদ্যুতি তাঁর দৃষ্টি[illegible]

লুটিয়ে পড়ে তখন প্রণাম করেন নিবেদিতা, মা তাঁর মাথায় [illegible] রেখেছেন, আশীর্বাদ করছেন! আমেরিকায় গুরুর হাত থেকে [illegible] একদিন পেয়েছিলেন মা আজ আনুষ্ঠানিক ভাবে সেই সন্ন্যাস [illegible] চান ওঁকে। গুরু যে-শক্তি সঞ্চার করেছিলেন, নিবেদিতা[illegible] জীবন সেই শক্তিতে বিদ্যুৎগর্ভ হয়ে আছে। তাঁর দায় বইবা[illegible] আর কি এখন নতুন করে গেরুয়া ধরবার কোন প্রয়োজন [illegible] না, আর তার কোনও দরকার নাই। প্রেপদির প্রতী[illegible] ব্রহ্মচারিণীর শুভ্র বাস—এই-ই যথেষ্ট।···'স্বামীজি প্রকাশ্যে [illegible] একটিমাত্র ব্রত দিয়ে গেছেন—সে আমার ব্রহ্মচর্য। আমরণ [illegible] আমায় রক্ষা করতে হবে। অথচ সে-ব্রত অটুট রেখে ক[illegible] লাভের নিশ্চয়তা তো নাই। কারও সঙ্গ না করা, সব ভাব[illegible] ছেড়ে দেওয়া আর মানুষের সঙ্গে আত্মীয়-জ্ঞানে স্নেহ-প্রীতি[illegible] কথা না কওয়া—এই হল মহাজনের পন্থা। এ-নিয়মও মেনে [illegible] পারিনি। কিন্তু এ করেও আমি তাঁরই কাজ করেছি কিনা [illegible] তিনিই শুধু দিতে পারেন। আমি জানি তিনি তা [illegible] জানি, আমি ঠিক করেছি—সবার তাতে মঙ্গলই হবে। কোন[illegible] কোনও দিন আমার বে-আইনী কাজেরও আইন খুঁজে বার ক[illegible] বলতে-বলতে নিবেদিতা কেঁদে ফেলেন। সারদা দেবীরও চোখে [illegible] আসে। এ-নিয়ে আর কখনও কোনও কথা হয়নি। (৮ই [illegible] ১৯০৪এর চিঠি)

গুরুভক্তি! এই গুরুভক্তির রন্ধ্রপথেই নিবেদিতার [illegible] বিপুল আত্মত্যাগের অগ্নিজ্বালা বিসর্পিত হয়েছিল, কর্পূ[illegible] নিঃশেষে পুড়ে গিয়েছিল তাঁর অহন্তা। স্বামীজি বলে দিয়েছিলেন 'সব সময় জপ করবে "শিব! শিব! শিব!" ক্লান্ত হয়ে [illegible] দিলে চলবে না। সব মন্ত্রের সেরা মন্ত্র এ। পথের যত বা[illegible] মন্ত্রের তেজে ছাই হয়ে যাবে।'

এ মন্ত্র জপলেই নিবেদিতার মন চলে যায় অতীতে[illegible]

---

* ১৯০৩ এর চিঠি, ২৫শে নবেম্বর, ৪ঠা এপ্রিল।

† ৩১শে মে ১৯০৩ এর চিঠি।

তীর্থাভিযানে—পুণ্যক্ষেত্র অমরনাথের পথে। সেদিন বোঝেননি কত বড় আত্মত্যাগের পথে চলতে হবে তাঁকে···আজ আবার একা সেই তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন, চলেছে মানস-পরিক্রমা, পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছেন দুর্গম পথে। জানেন দেবদর্শনের পুণ্য বলে কিছু নাই, আছে দেবতার সঙ্গে একাত্মতার অনুভব—'জীব শিব দোঁহে অভেদ মূরতি।' সে-যোগ্যতা কি এবার এসেছে? দেহ আজ শ্রান্তি-জর্জর, পথ বন্ধুর,—নিবেদিতা আপন মনে খতিয়ে দেখেন। দেখেন সন্ধ্যামেঘের রক্তচ্ছটায় পরমগুরুর জ্যোতির্লেখা,—মহামহেশ্বর তিনি, তিনিই মহাকাল, সোম-সূর্য-নাদে তাঁরই প্রকাশ, আবার তিনিই 'সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।' জীবে-জীবে তিনিই রুদ্ররূপে 'খেলা ভাঙার খেলা' খেলে চলেছেন, মৃত্যুর তোরণ-পথে উত্তীর্ণ হচ্ছেন অপাপবিদ্ধ অমৃতের কূলে।

বিশ্বের হৃৎস্পন্দন আপন হৃদয়ে শুনতে পান নিবেদিতা,—পশুপতির পশুযূথকে উচ্চকিত করছে তাঁরই ত্রিশূলফলক, নিবেদিতার অন্তরে তারই বিজলী-ফলক···গুরু বলেছিলেন, 'এখন বুঝতে পারছ না। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে কাজ হবেই, এক দিন এর ফল ফলবেই···'

নিবেদিতা বার বার বলেন, 'ওগো, তীর্থ-পরিক্রমা আমার শেষ হল···আজ বুঝেছি, শিব আছেন আমারই অন্তরে।'

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

বুদ্ধগয়া

নজরবন্দীদের তালিকায় নিবেদিতার নাম উঠেছিল। তাঁকে এ খবর দিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হল। খবরটা গুরুতর, তার পরিণাম অনেক দূর গড়াতে পারে। নিবেদিতার শেষদিকের কাজ-কর্মে বৃটিশ সরকার অসন্তুষ্ট হয়েছিল। যদি তাঁর চলাফেরার স্বাচ্ছন্দ্য বিশেষ রকম ক্ষুণ্ণ না হ'ত তা'হলে নিবেদিতা এ-ব্যাপারে তেমন অস্বস্তি বোধ করতেন না। স্বামী সদানন্দকেও এই ফ্যাসাদে পড়তে হল। নিবেদিতার গতিবিধির 'পরে কতটা নজর রাখা হত সেটা অবশ্য ঠিক করে বলা অসম্ভব।

ইদানীং ভাষণগুলিতে নিবেদিতা সরকারী নীতির বিরুদ্ধ সমালোচনা করতেন। শেষ বার বুদ্ধগয়ায় গিয়ে ওখানকার শ্রমণ-পুরোহিতদের সঙ্গে মিলে-মিশে যা করেছিলেন তা সহজে কারও চোখে পড়বার মত নয়। কিন্তু তাতেই সরকারী মহলের আরও বিরোধিতা করা হয়েছিল। ১৯০৪ সনের ফেব্রুআরিতে মোহান্তের সঙ্গে নিবেদিতা যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করেন, গুপ্ত পুলিস তার নিখুঁত রিপোর্ট পেশ করে।

সে-সময়ে বুদ্ধগয়ায় একটা অসন্তোষের হাওয়া বইছিল। ধর্মশালায় যাত্রীদের পরে যে-অন্যায় করা হয় তা নিয়ে তারা খুঁত-খুঁত করছে। শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসী আর পূজার্থী আগন্তুক সকলেই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। প্রবাদ, হিন্দু পাণ্ডারা স্বয়ং শংকরাচার্যের কাছ থেকে মন্দিরের খবরদারি করবার ভার পেয়েছে। তারা তাদের অধিকার নিয়ে বৌদ্ধ শ্রমণদের সঙ্গে খিটিমিটি বাধিয়েছে। লর্ড কার্জন বুদ্ধগয়াকে দেখলেন ঐতিহাসিক একটা স্থান হিসাবে, আর এই হিন্দু-বৌদ্ধের রেষারেষিটাকে করে তুললেন চার্চের সঙ্গে রাজতন্ত্রের ঠোকাঠুকির সামিল। তবে এক্ষেত্রে চার্চ হল জনসাধারণ, আর রাজা বিদেশী। নিবেদিতা সাধারণের মুখপাত্র হয়ে ব্যাপারটাকে জাতীয় ঐক্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসাবে রূপ দিতে চাইলেন।

আকাশ-বাতাস তখন ঝড়ের সূচনায় থমথমে। রুশ-জাপান যুদ্ধ তুমুল হয়ে উঠেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধদের জোর দাবি এড়ানো তখন প্রায় অসম্ভব। ব্যাপারটা ধর্মসংক্রান্ত হলেও বৈদেশিক প্রভাবের প্রশ্ন কিন্তু কিছুতেই ঠেকানো গেল না। লণ্ডন আর টোকিও সরকারের পাঠানো উপদেষ্টারা যে-যার স্বার্থ বুঝে কাজ করতে লাগলেন, গণ্ডগোল তাতে বেড়েই চলল। বুদ্ধগয়ার ব্যাপারের সঙ্গে সব হিন্দুই নিজেদের জড়িত মনে করতে লাগলেন।

মোহান্তের কাছে নিবেদিতা রাজনীতি আর ধর্মঘটিত প্রশ্ন—দুটোকে প্রথমেই পৃথক করে ধরলেন। জাপানের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও অবস্থাটার অপক্ষপাত বিচার করতে গিয়ে নিবেদিতা বললেন, 'যুদ্ধটা যে আমাদেরই সে-কথা ভারতবর্ষের হাট-বাজারের লোকও জানে···বুদ্ধগয়ার জাপানী যাত্রীনিবাসের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নাই। কিন্তু সিংহলী বৌদ্ধদের মনোভাব যাই-ই হ'ক না কেন, জাপানী বৌদ্ধরা যে খুশি হয়ে এদেশে আসায়, সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে—এর একটা গুরুত্ব আছে।'

'···সুজাতার ভিটেবাড়িটা দেখবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, জায়গাটা আজও আছে। সেখানে গিয়ে সুজাতার জীবনী পড়লাম—নির্বাণলাভের পূর্বক্ষণে সেই প্রভু বুদ্ধকে দিয়েছিল পরমান্ন। কোলে তার শিশু-সন্তান, বুদ্ধদেব সে-শিশুকে আশীর্বাদ করেছিলেন···বুদ্ধগয়ার মন্দির আর বোধিদ্রুম দেখা হলে মোহান্তের অতিথি হলাম। বুদ্ধগয়াই ভবিষ্যতের হৃৎপিণ্ড, রাজনৈতিক দৃষ্টিতে ভারতের প্রসিদ্ধতম স্থান···' (৩রা মার্চ, ১লা ও ৩রা ফেব্রুআরির চিঠি)।

বুদ্ধগয়া সব রকমেই হিন্দু-ভারতের প্রতিনিধি। পুরীর মন্দির এ-অধিকার হারিয়েছে, কারণ তার দুয়ার এক শ্রেণীর হিন্দু-সন্তানের কাছে রুদ্ধ। তাদের অপরাধ, তারা বর্তমান জগতের ভাবধারার সঙ্গে কিছু বেশী মাত্রায় পরিচিত, তারা বিলাত-ফেরত, ম্লেচ্ছ। পুরীর মন্দিরের দরজা তারা পার হতে পারে না। আর বুদ্ধগয়া? সেখানে সবার প্রবেশাধিকার: নোড়াপুজি, চাঁদ-সূর্যের উপাসক পৌত্তলিকই বল আর নিরাকারবাদী-ই বল—সবাই সেখানে যেতে পারে। অনাচার না করলেই হল—নইলে পৌত্তলিক কি অজ্ঞেয়বাদী, নাস্তিক কি ব্রহ্মবাদী এমন কি খৃষ্টান বা মুসলমানও বুদ্ধকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারে। কেউ ফুল-ফল দিয়ে কেউ ধূপ-দীপ কেউ বা নির্বাক মৌনতা দিয়ে—যার যেভাবে খুশি করুক না অর্চনা।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে নিবেদিতা ওখানে এসে উঠলেন। বুদ্ধগয়ার ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল, ভাবভক্তির সূক্ষ্ম প্রশ্নও জড়িয়ে আছে তার সঙ্গে। নিবেদিতা চেয়েছিলেন একটা সমন্বয়ের সূত্র খুঁজে বার করতে। এই পুণ্যতীর্থ হতে বৌদ্ধরা যুগে-যুগে পেয়েছেন প্রেরণা, প্রখ্যাত প্রচারকেরা এইখান থেকেই যাত্রা করেছেন চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল কি তিব্বতে। সেই বুদ্ধগয়া কি ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে থাকবে, ছেয়ে যাবে আফিমফুলে? ভাবতেও অধীর হয়ে ওঠেন নিবেদিতা। একটা জাত ধ্বংস হতে চলেছে, তার মধ্যে এ-অপরাধই যে হবে সবচেয়ে ভয়ানক।

বহির্বিশ্বে বুদ্ধগয়া যে প্রেরণার উৎস, সে শুধু বুদ্ধের নামের গুণে, কিন্তু ভারতবর্ষে বুদ্ধগয়া হিন্দু-ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অহঙ্কার

প্রলয়ে যে 'নির্বাণ' আর আমিত্বের ব্যাপ্তিতে যে 'মোক্ষ'—দুয়ে তফাৎ কি? একই বস্তুর এপিঠ আর ওপিঠ নয়? অদ্বৈতবাদ দুয়েরই মর্মরহস্য।

বিবেকানন্দ এক নজরেই বৌদ্ধ আর বেদান্তীর সাদৃশ্যটা দেখতে পেয়েছিলেন। মোহান্তের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে নিবেদিতা তাঁর সেই সোজা প্রস্তাবটাই আবার তুললেন। বিবেকানন্দ অল্প কথায় মামলা চুকিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, বৌদ্ধ বলেন "যা দেখছ এ সবই মায়া" আর হিন্দু বলেন "কিন্তু এই মায়ার আড়ালেই সত্য"। আসলে দুটোই আপেক্ষিক সত্য,—অতিচেতনায় আরূঢ় না হওয়া পর্যন্ত মানুষ এই ভাবেই জগৎকে বিচার করে।

ভারতের আটটি প্রখ্যাত সংবাদপত্র মারফত বুদ্ধগয়ার ব্যাপার নিয়ে একটা অভিযান চালানোর জন্য নিবেদিতা কলকাতায় ফিরে এলেন। এর পর পক্ষকাল মাদ্রাজ থেকে লক্ষ্ণৌ, ওদিকে বম্বে থেকে কলকাতায় সবার মুখে-মুখে নিবেদিতার নাম ফিরতে লাগল। সুকৌশলে এই বিবাদটাকে তিনি একটা জাতীয় সংগ্রামের পর্যায়ে এনে ফেললেন। বাদী-প্রতিবাদী ওখানে ভারতীয়, ফয়সালাও করবে ভারতীয়রা,—বাইরের কারও সাহায্য ছাড়া তারা নিজেরাই একটা রফা খুঁজে বার করবে। ইষ্টারের সময় নিবেদিতা কলকাতার ক্লাসিক থিয়েটারে এই নিয়ে ভাষণ দিলেন, হিন্দু-বৌদ্ধের পারস্পরিক ঐক্য সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য সবার চোখের সামনে তুলে ধরলেন। সারা দেশ চকিত হয়ে উঠল। তাঁর যুক্তিগুলো জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে প্রয়োগ করবার জন্য হিন্দুরা সাহস ভরে এগিয়ে এল।

নিজের কার্যকলাপের কথা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে জানাতে তিনি সস্নেহে হাসলেন একটু। বেশী কথা বলেন না ব্রহ্মানন্দ। আলাপ-আলোচনার ধার দিয়ে না গিয়ে বললেন, 'বেশ করেছ মা; খুব ভাল কাজ করেছ।' নিবেদিতা আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। একা-একা যে ভাবে নিবেদিতা কাজ করে চলেছেন দেখে সন্ন্যাসীর চমক লাগে। এ-রুদ্রবীর্য কি চিরদিনই সমান থাকবে?

নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে নিবেদিতাকে উৎসাহ দেন ব্রহ্মানন্দ, ওঁর অগ্রাভিযান যেন অব্যাহত হয়। বলেন, 'তোমার সহযাত্রী অনেকেই তোমার মন ভেঙে দিতে চাইবে, বলবে তোমার এ-কাজ শ্রীরামকৃষ্ণ কি বিবেকানন্দের কাজ নয়। তাদের কথায় কান দিও না! সমস্ত জগৎ তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও যা ঠিক বলে বুঝেছ তা ছেড় না…'

নিবেদিতা কথা বলেন তাড়াতাড়ি, আর তারই তোড়ে নিজের বক্তব্যকে ছবির মত ফুটিয়ে তোলেন। ব্রহ্মানন্দ আর ওঁর মধ্যে বোঝা-পড়া হওয়ার পক্ষে এই এক অন্তরায়। কারণ সন্ন্যাসী ইংরেজী ভাল জানতেন না, সব কথা যে বুঝছেন না তা-ও বলতেন না। এদিকে কথার তোড় ক্রমেই বাড়তে থাকে, শেষকালে ব্রহ্মানন্দের ধ্যানে ডুবে যাওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না। প্রথমটা নিবেদিতা ধাক্কা খেয়ে চুপ হয়ে যান, শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসীর তন্ময়তার ছোঁয়া লেগে তিনিও ধীরে-ধীরে অন্তর্মুখ হয়ে পড়েন। হঠাৎ ঘনিয়ে-আসা এক স্তব্ধতায় কথা হারিয়ে যায়। ব্রহ্মানন্দের নীরব আশীর্বাদে প্রীতিরসে গলে পড়ে নিবেদিতার মন।

ব্রহ্মানন্দ প্রস্তাব করলেন, জন ছয়েক ছাত্র নিয়ে নিবেদিতা বুদ্ধগয়ায় একটা বিদ্যালয় পত্তন করুন, সেখানে ইতিহাসের পাঠ দেওয়া হ'ক। ভবিষ্যতে হয়তো ওটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা শাখা হয়ে উঠবে। প্রস্তাবটি চমৎকার! ফলে একটা নতুন পরিকল্পনা অঙ্কুরিত হল; মাস কয়েক পরে তার ফলও ফলল। বুদ্ধগয়া নিবেদিতার কাছে শিল্পানুরাগ ও স্বদেশপ্রীতির তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল। এ-নিয়ে ইংরেজী কাগজওয়ালাদের গালাগালকে তাচ্ছিল্য করেই তিনি উড়িয়ে দিলেন।

ঠিক হল এই উপলক্ষ্যে সবাইকে নিয়ে বিখ্যাত বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষগুলো দেখে আসা হবে। সম্প্রতি যে-সব স্তূপ, উৎকীর্ণ শিলালেখ আর লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলোও খুঁটিয়ে দেখা চাই। বুদ্ধগয়ায় চার দিন থেকে ঐ পথেই সারনাথ-কাশী রাজগৃহ আর নালন্দা ঘুরে আসবে ওঁদের দল। দলে থাকবেন প্রায় কুড়ি জন। ওঁদের কাজ হল সাধারণের আস্থাভাজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে মোটামুটি অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটানো। নিবেদিতা ভ্রমণ আর বনভোজনের পুরোদস্তুর ফর্দ করে ফেললেন। ফেরবার পথে হিন্দু আর মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে আসবেন এ-ও স্থির হল। বন্ধুরাও রাজকায়দায় অতিথি সৎকারের জন্য এখন থেকেই উঠে-পড়ে লেগে গেলেন।

পূজার ছুটিতে পর্যটকেরা বেরিয়ে পড়লেন। ক্রিষ্টিন বসু-দম্পতি রবীন্দ্রনাথ আর ঠাকুর-বাড়ির ছেলেরা ছাড়া এ-দলে ছিলেন [illegible] রাজকুমার, স্যার যদুনাথ সরকার, ইন্দুনাথ নন্দী, প্রফেসর চন্দ্র দে আর র‍্যাটক্লিফেরা। নিবেদিতার বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন না কেবল গোখলে। যে ছাত্র তিনটিকে নিবেদিতা সঙ্গে নেবেন বলে ঠিক করেছিলেন, স্বামী সদানন্দ তাদের দেখাশোনার ভার নিলেন।

এইবার নিবেদিতার স্বভাবের একটা নতুন দিক সবার চোখে পড়ল। স্থাপত্য আর ইতিহাস সম্পর্কে নিবেদিতার একটা সহজ ঝোঁক আছে। সেই সঙ্গে আছে অতীতকে মূর্ত করে তোলবার অনায়াস একটা ক্ষমতা। তথ্যানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতদের পক্ষে তিনি নিপুণ দিশারী। আবার প্রাণের আবেগ মন খুলে তাঁর কাছে প্রকাশ করা চলে, তিনি দরদী। নিবেদিতার বন্ধুরা মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনতেন।

সকাল-সকাল প্রাতরাশের পর্ব চুকিয়ে নিবেদিতা 'লাইট অব এশিয়া' কি নিজের লেখা 'দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' হতে কিছু পড়ে শোনান, টীকা-ভাষ্য করেন তার পরে। আলোচনা হয় ইতিহাস আর 'ন্যাশনালিজম' নিয়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবন সম্বন্ধে। কথা কইতে-কইতে বর্তমানের গণ্ডি ছাড়িয়ে যান নিবেদিতা, এ বিষয়ে তাঁর সহজ পটুত্ব। আবার ভগবান বুদ্ধের প্রসঙ্গ তোলেন নিজেই: শ্রীরামকৃষ্ণকে যাঁরা গুরু বলে স্বীকার করেছেন আর অতীতে সত্ত্বশুদ্ধি ও সত্যলাভের পিপাসায় যাঁরা সে যুগের মহাপুরুষ বুদ্ধদেবকে অনুসরণ করেছেন—এঁদের মধ্যে তো ভাবের কোন ভেদ নাই। যদি কখনও স্বামীজির জীবনী লিখি তো তাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধু হিসাবে চিত্রিত করব, তার শ্রীচৈতন্যের বা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নাম করব কথা-প্রসঙ্গে মাত্র। পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকরা আমার সে-বইয়ের নজিরে যদি সিদ্ধান্ত করে যে রামকৃষ্ণ-শিষ্যরা হিন্দুসমাজ ছেড়ে আরেকটা ধর্মসম্প্রদায় গড়ে

ভুলেছিলেন, তাঁরা বৈষ্ণব নন কি চৈতন্য-ভক্তদের তাঁরা হতমান করেছিলেন—তবে তাঁরা মস্ত ভুল করবেন। যাঁরা বলেন বৌদ্ধ-ধর্ম আমাদের ধর্ম হতে পৃথক তাঁরাও ঠিক সেই ভুল করেন।' (১৫ই জুন ১৯৩৮ সনের যদুনাথ সরকারের চিঠি হতে)।

সন্ধ্যায় ধ্বংসস্তূপের ভাঙা-চোরা সিঁড়িতে বসে ওঁরা জোনাকির ঝিকিমিকি দেখেন। গভীর শান্তি চার দিকে—ওঁদের যেন ধ্যান-স্তব্ধ করে তোলে। নিবেদিতা হয়তো নিজের কোনও অনুভূতির কথা বললেন, রবীন্দ্রনাথ একখানা ভজন গাইলেন। ফাঁকে-ফাঁকে মহৎ হৃদয়ের এই যে ভাব-বিনিময়, এ অন্তরঙ্গতার তুলনা নাই। নিবেদিতা মন্তব্য করেন, 'অতিথি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ অনুপম। সৌজন্যে নিখুঁত তাঁর ব্যবহার, কোনও দাবি বা আবদার তাঁর আসে না। কথাবার্তায় একটা সহজ মর্যাদাবোধ ফোটে, অথচ এমন সরল ভাবে কথা বলেন যে তা অন্তর স্পর্শ করে। গান আর রহস্যালাপ তো সব সময় লেগেই আছে। পরকে খুশি করতে যেমন তৎপর নিজেও তেমনি হাসি-খুশি হয়েই আছেন। দেশের কাজ আর মুক্তির সাধনা—কখনও এটা, কখনও ওটা, এ দুই নেশায় তাঁর সময় কাটে।···সত্যিকারের কবি তিনি। ওঁর গানে প্রাণ ভরে ওঠে আমাদের!'

মোহান্ত তাঁর সাধ্য মত মহাসমাদরে ওঁদের অভ্যর্থনা করলেন। চলে যাওয়ার আগের দিন হঠাৎ কী এক অবসাদ নিবেদিতাকে পেয়ে বসে। মোহান্তের কাছে মনের কথা খুলে বলেন। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তো খুশিমনে সরে পড়ছেন। সঙ্গে যে ছেলেদের এনেছেন আর এই বন্ধুরা—পরের প্রতি সৌজন্য আর প্রেমের শিক্ষাকে কতটুকু আপন করে নিতে পেরেছেন তাঁরা? এই যে চমৎকার ক'টা দিন কাটল এর স্মৃতি কতটুকু ওঁদের মনে থাকবে? সন্ন্যাসীকে নিবেদিতা বলেন, 'স্বামীজি দেশের মাটিতে একটা অবন্ধ্য আধ্যাত্মিকতার বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন সত্যি তবুও প্রত্যেককেই তো বাঁধন টুটিয়ে ফুটতে হবে—বীজ উদ্ভিন্ন হয়ে বিরাট মহীরুহ মাথা তুলবে তো···' সন্ন্যাসী উত্তর করলেন, 'তাঁর মালঞ্চের তরুলতাকে তিনিই দেখবেন! তাঁর কাজ কি আমরা বুঝে উঠতে পারি!' সন্ন্যাসী অঞ্জলি পেতে দেবতার প্রসাদ-ভিক্ষা করেন, ঠোঁটের হাসিতে ফুটে ওঠে আশ্বাস, চোখে জ্বলে বিশ্বাসের দীপ্তি। ভক্তিভরে নিবেদিতা নিচু হয়ে তাঁর পায়ে হাত দেন।

হেঁটে যেতে হলে বুদ্ধগয়া হতে রাজগৃহ পঞ্চাশ মাইল। চাঁদের আলোয় যে-পথ ধরে বুদ্ধ একদিন রাজগৃহে রওনা হয়েছিলেন,—যাত্রীরাও সেই পথ ধরলেন। মেয়েরা আর ছোটর দল চলল হাতিতে। তার পিছনে মশালচীদের নিয়ে ছেলেরা। রাত্রে দু বার করে থামা হত, তার পর ধুনি জ্বেলে অল্প কিছু খাওয়া। এক জন হয়তো সুর করে ভগবান বুদ্ধের একটি উদানগাথা আওড়ান, অন্যেরা সমস্বরে দোহার ধরেন। জঙ্গলের মধ্যে এক ভাঙা দেউলের কাছে একদিন থামলেন সবাই। দেউলের অঙ্গনে যেন ছায়া-শরীরীদের নৃত্য! এ কি বিদ্যাধর-গন্ধর্বেরা দেবসভায় পুরাণ-কাহিনীর অভিনয় করছে, অপ্সরাদের চাপা গলায় উঠেছে করুণ তান! হাসি আর কান্নায় রাতের আকাশ যেন খান-খান হয়ে যায়। ভোরে সবাই দেখেন দেউলের শেওলা-ঢাকা সিঁড়ির ধাপ নেমেছে এক পদ্মপুকুরে। স্নান করে পাথরের ঠাণ্ডা চাতালে হাত-পা ছড়িয়ে সকলে শুয়ে পড়লেন।

এ যাত্রায় নিবেদিতা অপ্রত্যাশিত একটা আনন্দের খোরাক পেয়ে গেলেন। পাথরের বুকে লেখা রয়েছে ভারতের চিরন্তন কাহিনী, আজও তা' প্রাণময়। পুরাতত্ত্বে নিবেদিতার চিরকালই আগ্রহ ছিল, কিন্তু এ যে বৌদ্ধধর্মের অখণ্ড ইতিহাস। তার ক্রমবিকাশের ধারা দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন নিবেদিতা। রাজগৃহে দেখলেন এক কালো পাথরের বুদ্ধমূর্তি—বালির বুকে সমাহিত ছিল শতাব্দী কাল ধরে। দেখে নিবেদিতা আবেগে উচ্ছল হয়ে ওঠেন। ওখানকার চাষীর কুঁড়েতে গিয়ে দেখেন মেয়েদের বাটনাবাটা শিলখানা কোনও পুরাকীর্তি নয় তো! কুয়োগুলোতে উঁকি মেরে-মেরে দেখেন, পাটগুলোতে পোড়া মাটির কাজ করা আছে কি না! গাঁয়ের খোদাইকার কারিগর কুমোর-ছুতোরদের সঙ্গে আলাপ করেন। আহা! দু' হাজার বছর আগে ওরাই তো এমনি সব মূর্তি গড়েছে। 'কী বিচিত্র এ দেশ!' নিবেদিতা বলে ওঠেন, 'শিল্পীরা এখানে নামহীন, নিজেদের শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে একেবারেই সচেতন নয়। জানে না কী নৈপুণ্যে দেবতার প্রতিমা আর প্রতীককে রূপ দিয়েছে ওরা, অফুরন্ত ওদের সৃষ্টির প্রতিভা! ভারতবর্ষ তো ফুরিয়ে যেতে পারে না: তার অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ যে এক সূতায় গাঁথা। এ দেশের শিল্পের আবহমান ধারায় তার সামাজিক আর আধ্যাত্মিক ভাবনারই যে অভিব্যক্তি।' ভারতীয় শিল্প নিয়ে তাঁর প্রথম দফার প্রবন্ধগুলো এই সময়েরই লেখা।

ফিরে এসে ব্রহ্মানন্দকে বললেন, 'শিল্পকলার মাধ্যমে ঐক্য-সাধনার কথা মানুষকে এবার শোনাব। এ দেশের শিল্পও একটা উঁচুদরের অধ্যাত্মসাধনা।' রাজনীতিবিদ্ বন্ধুদের বললেন, 'পাথরের বুকে মহাশক্তিকে দেখে এলাম। যে অদ্বৈত শিবস্বরূপের উপাসক আমরা, তিনি নিত্য এবং সত্য। তিনিই ভারতবর্ষ!'

এ অভিযানের ফল কি হল জানতে চাইলে নিবেদিতা হাসেন, 'সম্যকসম্বুদ্ধ আমাদের প্রাণে আনন্দ ঢেলে দিয়েছেন। দেবতার প্রসাদের সীমা নাই তো—কিন্তু আমরা কি তা ধরতে পারি?'

বুদ্ধগয়ার সমস্যা মিটে গেল। হিন্দুধর্মের প্রাণস্বরূপ ও তীর্থ, মোহান্তের হাতেই ওর ভার থাকবে। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মোহান্ত নিবেদিতাকে পাঠিয়ে দিলেন একটি বজ্র—বৌদ্ধ শূন্যতার প্রতীক। সেই সঙ্গে এল আশীর্বাদ, 'তোমার শূন্যহৃদয়ে উছলে চলুক তাঁরই ইচ্ছার প্রবেগ।'

[ক্রমশঃ।

পাপেতে পৃথিবী পার।
ধর্ম্ম তথা নাই আর॥
অনেকে "মিলের" ছাত্র।
ধর্ম্ম কর্ম্ম কথা মাত্র॥
কপটতা ধর্ম্ম সাজে।

পৃথিবী ঢাকিয়া আছে॥
ধর্ম্ম যদি চাও ভাই।
ধর্ম্ম সাজে কাজ নাই॥
কপটতা পরিহর।
ভাল হও ভাল কর॥

—কাঙ্গাল হরিনাথ (১৮৩৩-৯৬)

(উত্তরমেঘ)

শ্রীকালিদাস রায়

দেখিবে সেথায় তুঙ্গ হর্ম্ম্য-শিখর অভ্র ভেদিয়া রাজে।
দামিনীর মত পুরকামিনীরা বিলাস করিছে তাদের মাঝে।
কক্ষে কক্ষে নানা বরণে চিত্র কত
শোভিছে তোমার ক্রোড়ে ইন্দ্রধনুর মত,
সঙ্গীতে সেথা বাজে মৃদঙ্গ গুরুগম্ভীর মধুরতর—
সে নাদ তোমারি মন্দ্র সম।
হর্ম্ম্যগুলির কুট্টিমতল
তব জল সম করে টলটল
অলকাপুরীর তুঙ্গশিখর প্রাসাদ যত
সর্ব্বতোভাবে তোমারি মত।

যেথায় ললনা লীলাকমলেই বীজন করে
গ্রথিত করিয়া কুন্দকোরক অলকের শোভা সৃজন করে।
লোধ্রপরাগ করি বিলেপন
গণ্ডেরে করে পাণ্ডুবরণ
শ্রবণে শিরীষ নবকুরুবক চূড়ায় ধরে।
তব সমাগম ফুটায় কদম তাই সীমন্তে তাহারা পরে।
ছয়টি ঋতুরই ফুল নিয়ে নিতি ভূষণ গড়ে।

বারো মাস ধরি ফুলমঞ্জরী ফুটি রয় ভরি কুঞ্জবন,
করে দিবারাতি মধুকর-পাঁতি মধুপানে মাতি গুঞ্জরণ।
নিতি শতদল ফুটে পদতলে সরোবরমার
হংসেরা করে রচনা রম্য রশনাভার
ভবনশিখীরা কলাপ বিথারি তুলে সব কালে কেকাধ্বনি,
চন্দ্রিকা হরে তিমির সে পুরে ভাস্বরী করে প্রতিরজনী।

পরমানন্দ বিনা যক্ষের চক্ষে সলিল কভু না ঝরে,
যা কিছু দুঃখ প্রণয়িবক্ষে তা মীনকেতুর কুসুমশরে।
প্রণয়াভিমান রঙ্গকলহ
ছাড়া নাই রসভঙ্গ বিরহ
বিরহ ক্ষণিক, হয় অপগত মানাবসানে
যৌবন ছাড়া অন্য দশারে কেহ না জানে।

বিম্বিত তারাপুঞ্জের মত কুসুমদলে
রচিত খচিত মণিময় সিত হর্ম্ম্যতলে।
সঙ্গে লইয়া স্থিরযৌবনা বরাঙ্গনা
যক্ষেরা করে দিনযাপনা
তোমার মতন গম্ভীর নাদে পুষ্করে ধীরে তুলিয়া তান
কল্পতরুর রতিফলা সুরা করে অতিসুখে তাহারা পান।

সেবিত হইয়া মন্দাকিনীর সলিল শীকর-শীতল বাতে
দেববাঞ্ছিতা কন্যারা সেথা খেলায় মাতে।
মুঠায় মুঠায় হেমবালু ছুড়ি
মণি লয়ে তারা করে লুকোচুরি।
মন্দার তরু মন্দাকিনীর তটের 'পরে
তাহাদের শ্রমসঞ্জাত তাপ ছায়ায় হরে।

প্রিয়তম যদি চটুল হস্তে সালসা ভরে
বিম্বাধরার শিথিল-নীবির ক্ষৌম বসন টানিয়া ধরে,
লজ্জায় হতবুদ্ধি নারী
রাগোন্মত্ত প্রিয়তমে বাধা দিতে না পারি
উদ্ধতশিখ দীপ নিবাইতে চূর্ণমুষ্টি ছুড়িয়া মারে,
ব্যর্থ প্রয়াস, নিত্যোজ্জ্বল মণিদীপ কভু নিবিতে পারে?

চন্দ্রকান্ত মণি শোভে সেথা চন্দ্রাতপের তন্তুজালে।
যদি চন্দ্রেরে কর অনাবৃত হে মেঘ সহসা নিশীথকালে
ছিন্ন করিবে মুক্তবিধুর সিতচন্দ্রিকা মণিতে পড়ি
বারিবিন্দুতে অঙ্গ তাহার উঠিবে ভরি।
প্রিয়তমভুজে দৃঢ়ালিঙ্গন শিথিল হইলে অঙ্গনারা
সে বারিকণায় হবে গ্লানিহারা ক্লান্তিহারা।

যক্ষের গৃহে লক্ষ্মী ত বাঁধা, তারা অক্ষয় ধনাধিকারী
বৈভ্রাজ বনে সঙ্গে লইয়া বিবুধগণের গণিকা নারী
ধনপতিযশোগায়ন-দক্ষ কিন্নরগণে লইয়া সাথে
করি রসালাপ প্রতিদিন তারা আমোদে মাতে।

হেথা কামিনীরা বেপথুশরীরা কোন পথে যায় নিশাভিসারে
অরুণ উদয়ে হয় নাক' দেরি চিনিতে তারে।
অলক হইতে নবমন্দার-পল্লবদল খুলিয়া পড়ে
কর্ণ হইতে কনককমল ত্রস্তগতিতে খসিয়া ঝরে।
ভূষণে খচিত মুক্তাও পথে খসি পড়ে কোন অঙ্গনার
স্তনপরিসর হইতে কারো বা ছিন্ন হার
এই পথে তারা করে অভিসার রেখে যায় নানা চিহ্ন তার।

কুবেরমিত্র শিবের নিত্য নিবাস এখানে, তাই অতনু
বহিতে পারে না সকল সময় মধুপগুণের কুসুমধনু।
চটুলা নারীর ভ্রূবিলাসবশ হাবভাব রস চাতুরীময়
অমোঘ শরেই কামিজনহৃদি বিদ্ধ হয়,
কামের কামনা ইহাতেই হেথা সিদ্ধ হয়।

সম্ভোগচার কল্পপাদপ হ'তে সবই পায় যক্ষবধূ
সুচিত্র বেশ, নেত্রে আবেশসঞ্চারী পেয় মদিরা মধু,
তনুমণ্ডন ভূষা আভরণ কিসলয় সহ কুসুম দল,
লাক্ষার রাগ যাহা দিয়া তারা রাঙায় তাদের চরণতল।

ধনপতিগৃহ হ'তে উত্তরে কিছু দূর তুমি আগায়ে যাবে,
ইন্দ্রায়ুধের তুল্য তোরণ দূর হ'তে সেথা দেখিতে পাবে।
সেই মোর গৃহ লক্ষ্য কর
নন্দনবং প্রিয়ার পালিত দ্বারে মন্দার বৃক্ষ নব।
স্তবকের ভারে শাখাগুলি নত তরুটিরে কোন নিদর্শন
ফুলগুলি তায় হাতে ক'রে যায় করা চয়ন।

সেথা সরোবরে পারে থরে থরে মরকতময়ী সোপানাবলী
বৈদূর্যের মৃণালে সেথায় ফুটে হেমময় কমলকলি।
হংসের পাঁতি খেলিছে তথা
তোমারে দরশি মানসসরসী তাহাদের মনে পড়ার কথা।
পালে না তাহারা জাতির ধারা,
অতি নিকটেই সে সরসী তবু যাইতে লুব্ধ হয় না তারা।

তার তীরে আছে আমাদের ক্রীড়াবিলাসগিরি
রচিত ইন্দ্রনীলে তার চূড়া, কনককদলী রেখেছে ঘিরি।
চপলা চমকে তোমার তনুর প্রান্ত বেড়ি
প্রিয়ার সে ক্রীড়াশৈলের রূপ তোমাতে হেরি।
বড় ব্যথা জাগে মনে পড়ে সেই শৈলটিরে,
আমার প্রিয়ার প্রিয় তা যে সেই সরসীতীরে।
লীলাশৈলে কুরবকে-ঘেরা মাধবীকুঞ্জ জুড়াবে চোখ,
তারি কাছে আছে বকুলবৃক্ষ চলকিসলয় রক্তাশোক।
আমারি মতন অশোক প্রিয়ার বামচরণের পরশ যাচে,
বকুল আকুল মুখমধু মাগে প্রিয়ার কাছে
পুষ্পিত হ'তে তিনেরই সাধ
কত বা সইব ? হায় রে, দৈব সাধিল বাদ।

একটি কনকদণ্ড প্রোথিত দুয়ের মধ্য ভূমিটি ভেদি',
নবীন বেণুর মত শ্যামমণি দিয়া নির্মিত তাহার বেদী।
স্ফটিকফলক শোভে তার পরে, দিবস শেষে
বসিত হেথায় প্রিয়ার পালিত তোমার বন্ধু শিখীটি এসে।
হেমবলয়ের শিঞ্জন সহ তালে তালে তার আমার প্রিয়া
নাচাইত কত আদর দিয়া।
মনে রেখ সখে নিদর্শন,
সহজেই এতে পারিবে চিনিতে মোর ভবন।
উপজিবে যবে গৃহের দ্বারে,
দেখিতে পাইবে শঙ্খপদ্ম অঙ্কিত তার দুইটি ধারে।
আমার বিরহে শ্রী-শোভা সে গেহে অটুট থাকার কথাই নয়,
রবির অস্তে নলিনীর শোভা তার কি রয় ?

আগেই বলেছি কোথা মোর ক্রীড়াশৈলভূমি,
সত্বর তুমি সেথায় নামিতে করিশিশু সম হৈও তুমি।
তার পর তুমি শৈলশিখরে হয়ে আসীন
তোমার প্রখর চপলা প্রভারে করিয়া ক্ষীণ
খদ্যোতিকার দীপালি সম
অন্তঃপুরে পাঠাবে দৃষ্টি যেখানে থাকেন প্রেয়সী মম।

তনু তার কৃশ দশনশিখরী দাড়িম ফলের বীজের মত,
অধরে পক্ক বিম্বের ভাতি, স্তনভারে তনু ঈষৎ নত।
কটিতট ক্ষীণ, নাভি সুগভীর, নয়ন চকিতা হরিণী সম—
বর্ণ তাহার তপ্ত কষিত স্বর্ণোপম।
শ্রোণিভারে তার অলস গতি,
যেন বিধাতার আদ্যসৃষ্টি শুভলক্ষণা এই যুবতী।

মিতভাষিণী সে তাহারে আমার দ্বিতীয় জীবন জানিবে সখা
চখীর মতন একাকিনী সে যে হারায়ে চখা।
বিরহের শরে উদ্বেগ ভরে উৎকণ্ঠায় যাপিছে দিন
শিশির-মথিতা কমলিনী সম তনুশ্রী তার ম্লান মলিন।
নিয়ত রোদনে ফুলিয়াছে আঁখি দুইটি তার,
তপ্তশ্বাসে অধরোষ্ঠের নাহি বুঝি সেই বর্ণ আর।
নাহিক কণ্ঠে স্বর্ণহার।
আলুলিত কেশে মুখখানি তার আধেক ঢাকা,
করতল ভরে কপোল তাহার হেলায়ে রাখা
দেখিবে সে মুখ মলিন নত
ঘন যবনিকা আবরণে যেন চাঁদের মত।
হয়ত দেখিবে পূজায় ব্রতিনী রয়েছে প্রেয়সী, হে প্রিয়তম,
বিরহ তনুর কল্পনা করি নয়ত আঁকিছে চিত্র মম
অথবা দেখিবে শুধাইছে প্রিয়া পিঞ্জরস্থা সারিকাটিকে
"ছিলে তাঁর প্রিয়া তাঁহার কথা কি মনে পড়ে তব
অয়ি রসিকে !"

হয়ত দেখিবে প্রেয়সী মলিন বসন পরি'
বীণাখানি তার অঙ্কে ধরি'

মম নামে রচা গীতিকা গাহিতে প্রয়াস করে,
হয়নাক' গাওয়া, বীণার উপরে অবিরল ধারে অশ্রু ঝরে।
মুছিয়া সিক্ত তন্ত্রীগুলিরে বসনাঞ্চলে বারংবার
বাজাইতে চায়, নিজেরই রচিত মূর্চ্ছনার
মনে কিছু হায় পড়ে না আর।

হয়ত দেখিবে বিরহ-দিনের নিখুঁত হিসাব রাখিতে গিয়া
দেহলীর পরে এত দিন ধরে যেই ফুলগুলি সাজাল প্রিয়া
সেই ফুলগুলি মাটিতে রাখি
গণিয়া দেখিছে বিরহ-দিনের আর কতগুলি রয়েছে বাকী।
কিংবা সে প্রিয়া করে সম্ভোগ করি ইন্দ্রিয়বৃত্তি রোধ
আমার সঙ্গ, বিরহিণীদের ইহাতেই হয় চিত্তবিনোদ।
দিনে নানা কাজে রয়ে ব্যাপৃতা যে বিরহের ব্যথা ভুলিয়া থাকে,
গুরুতর শোকে পীড়িতা নিশীথে হেরিবে তাকে।

মম বারতায় সুখ দিতে তায় কোরো আশ্রয় গভীর রাতে
বাতায়ন তল, ভূতল শয়নে রহিবে যখন অনিদ্রাতে।
প্রাচীমূলে কলামাত্রাবশেষ ইন্দুলেখাটি সে বরবামা,
দেখিবে রয়েছে পার্শ্বশায়িনী আধিক্ষামা।
আমার সঙ্গে রভসরঙ্গে কাটিত যে রাতি নিমেষবৎ
সেই রাতি আজ চলিতে নারাজ, অশ্রুপিচ্ছল তাহার পথ।

বাতায়নজাল সে নিশীথ কালে কৌমুদী পশি পড়ে যখন
তাহার বয়ানে, চায় তার পানে প্রাক্তনী প্রীতি করি স্মরণ।
সহসা চমকি ফিরায় আঁখি
অশ্রুতে ভরা পল্লবপুট রাখে তা ঢাকি'।
দেখিবে তাহারে মেঘলা দিনের দ্বিধাহতা স্থলনলিনী সম
জাগরিতা নয়, সুপ্তাও নয়, কেমন যেন সে প্রেয়সী মম।

ক্লিষ্ট অধর-কিশলয় তার তপ্ত শ্বাসে
বিনা তৈলের সিনানে রুক্ষ স্রস্ত অলক কপোল পাশে।
স্বপ্নেও যদি সম্ভোগ পায় নিদ্রা সে তাই কামনা করে,
জলে ভরা চোখ কেমনে মুদিবে? ফাঁক দিয়া তাই ঝরিয়া পড়ে
জলধারা তার নিদ্রা হরে।
বিরহের দিনে বিনা ফুলহার বাঁধিয়াছে প্রিয়া বেণীটি তার,
শাপ অবসানে নিঃশোক প্রাণে মোচন করিব সে বেণীভার।
রুক্ষ-জটিল স্পর্শকঠিন সেই বেণী পড়ে কপোল'পরে,
প্রিয়া বারে বারে সরাইছে তারে নখরী করে।

দেহ বলহীন দুর্বহ ক্ষীণ ত্যজেছে ভূষণ বেদনা ভরে
শয্যার কোলে লুলিত তনুটি বার বারই তার এলায়ে পড়ে।
হেরি সে দৃশ্য জললব ছলে অশ্রু ঝরিবে তোমার চোখে,
আর্দ্র হৃদয় সহজেই গলে করুণায় পরদুঃখ-শোকে।

গাঢ় অনুরাগে মদগত তার হৃদয়খানি,
প্রথম বিরহে এইরূপই দশা হবেই জানি।
সে সৌভাগ্য করেনি আমায় অমিতভাষী কি অনৃতবাদী
নিজ চোখে সবি দেখিতে পাইবে যা কিছু বলেছি তোমারে সাধি
অপাঙ্গলীলা রুদ্ধ করেছে চোখে লম্বিত অলকভার
সুরাপান জাত ভ্রূবিলাস নাই, অঞ্জন নাই নয়নে তার।
তুমি কাছে গেলে শুভসূচনায় বামনয়নে
স্ফুরণ জাগিবে ঊর্দ্ধপানে।
হবে সে কেমন? মীনক্ষোভে
হয়ে চঞ্চল যেমন অমল নীল-উৎপল তড়াগে শোভে।

[ক্রমশঃ

কলকাতার পুরানো বাড়ী

কলকাতার দালানগুলা যেন দাবানল জ্বলিতেছে। খোলার ঘর তো আগুনের খাপ্‌রা। টীনের ছাদ তাতিয়া তাঁহা তাঁহা করিতেছে। নূতন চূণকাম-করা সাদা দেওয়ালে মধ্যাহ্ন-তপনের তাপ লাগিয়া, গরিব পথিকের চক্ষু কেবল ঝলসিতেছে। যে বাড়ীগুলার হলদে রঙ, সেগুলাতে বরং একটু রক্ষা আছে! তক্তা-চাপা-অসূর্য্যম্পশ্য-নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম-রঙের অনুকরণে যে সকল বাড়ীতে আজকাল একটু হরিতালী গোছ রঙ মাখান হয়, সেইখানেই কতকটা উত্তপ্ত পথিকের মন-প্রাণ-শরীর ঠাণ্ডা হইতে পারে।

বড় সুখের বিষয়, কলিকাতার বাড়ী যতই জরাজীর্ণ হইতেছে, ততই ঐ হরিতাল-রঙে একটু "নিকন পৌছান" করিয়া, তাহার ভাড়া বাড়ান হইতেছে। বাড়ী পড় পড়; বনিয়াদে ঘুণ ধরিয়াছে; ছাদ ফাটিয়াছে, কড়ি ঝুলিয়াছে। ভাবিলাম, মিউনিসিপালিটী হইতে দুচার দিনের মধ্যে উহাকে ভাঙ্গিয়া দিবার আজ্ঞা আসিবে। ওমা! পনের দিন পরে দেখি, কতকগুলা রাজমিস্ত্রি, সেই হরিতালী রঙ, হাঁড়া হাঁড়া গুসিয়া হুহু শব্দে তাহার অষ্টপৃষ্ঠললাটে মাখাইতেছে। দেখিতে দেখিতে, দিব্য ফুটফুটেটি হইল। তখন বাড়ীর কর্ত্তা, প্রচার করিতে লাগিলেন, "আমার ইচ্ছা, (ত্রিশ টাকা ভাড়া ছিল) দশ টাকা বাড়াইয়া চল্লিশ টাকা করি।" গিন্নী বলেন, "তা হবে না; পঞ্চাশ টাকার কম এবার ও-বাড়ী ছাড়া হবে না।" পয়তাল্লিশ-বর্ষ-বয়স্কা বারাঙ্গনা, গোলাপী-রঙে ছোপান পুরান কাপড়ের কাঁচুলি-কসনে, ডবল বিজিটের দাবী করে।

—যোগেশচন্দ্র বসু (১৮৫৪-১৯০৫)

অভিসারিকা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
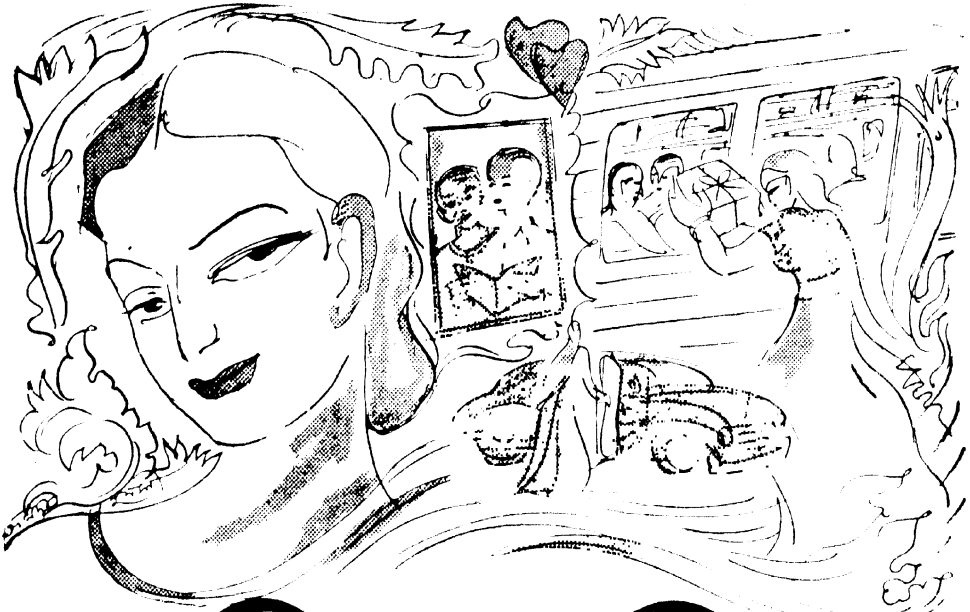
দিল্লীর পথের ধূলোয় অনেক ইতিহাস ছড়ানো।

আর, দিল্লীর বাতাসে অনেক রোমান্স ছড়ানো।

ইতিহাসের রূপ বদলেছে। রোমান্সেরও রং বদলেছে। কোনো শাহেন শা বাদশার রণোন্মত্ত ভ্রূকুটি-গর্জনে আজ আর ইতিহাস রচিত হচ্ছে না। কোনো বাদশাহের সুরাপাত্রের রক্তিম ফেনোচ্ছ্বাসে সুলতান-প্রেয়সীর ঈর্ষা-নিপীড়িত যৌবনবেদনাও বিদ্যুৎ কটাক্ষে ঝকমকিয়ে উঠছে না, অথবা অন্ধকার বিলাসশালার দীপালোকে বিলোল-কটাক্ষ কোনো নর্তকীর মণিভূষণ জ্বলে উঠেও আজ আর রোমান্স বিচ্ছুরিত করছে না। রোমান্স আসছে নতুন দিল্লীর বাতাসের গায়ে গায়ে।

গল্প বলি।

দিল্লীর প্রতি আমার বিশেষ একটা মোহ আছে। সেটা এই নতুন ইতিহাস বা নতুন রোমান্সের জন্য নয়। বরং যে ইতিহাস আর যে রোমান্স এখন মিউজিয়ামে এসে ঠেকেছে, সেগুলোর প্রতিই আমার আকর্ষণ বেশী। বছর-দু'বছর বাদে যখনই এক এক বার আসি এখানে, সেগুলোর একটা নিঃশব্দ আবেদন যেন মনের মধ্যে পৌঁছয়। অনেক বার হয়ে গেল, এখনো কুতুবের তিনশ' উনিশিটা ধাপ গুণে গুণে চূড়ায় গিয়ে উঠতে আমার ভালো লাগে, আউলিয়ার পুকুর ছাড়িয়ে বাদশাজাদী জাহানারার ঘাসের কবরের পাশটিতে খানিকক্ষণ চুপটি করে বসে থাকতে ইচ্ছে করে, লাল কেল্লার মধ্যে ঢুকে দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস, খাস-মহল, রংমহলে ঘুরে ঘুরে যেন আশ মেটে না, দু'শ বার বিঘে প্রমাণ তউজপাসের ধূ-ধূ এবড়ো-খেবড়ো মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে কল্পনা করতে সাধ যায় কেমন ছিল সেই বিশালকায় কাক-চক্ষু পুষ্করিণীর রূপ, হুমায়ুন সমাধিসৌধের ওপরে উঠে সেই জায়গাটা খুঁজে বার করতে ইচ্ছা করে, যেখানে শেষ ভারত-সম্রাট বাহাদুর শাহের পুত্র-পৌত্রেরা প্রাণভয়ে লুকিয়েছিল ভীরু খরগোসের মত, ফকিরের বিশ্বাসঘাতকতায় পরুষ-কঠিন হড্‌সন ক্ষুধিত মার্জারের মত যাদের মুখে করে নিয়ে এসে বুলেটের আঘাতে রাজরক্ত-কলঙ্কিত করে রাখলে দিল্লীর রাজপথ।

নতুন দিল্লী নয়, এই দিল্লীর প্রতি আমার মোহ।

কিন্তু নতুন দিল্লী ছাড়বে কেন।···

তার কিছু দেবার আছে।

তার কিছু নেবার আছে।

এসে পর্যন্ত মনটা কেমন মুষড়ে আছে। এবারে এসেছি পাঁচ-ছ' বছর বাদে অথচ ক'টা দিন কেটে গেল কোথাও বেরুনো হয়নি। একে বরফ-জমানো শীত, তার ওপর আবার অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে রোজই। ওদিকে অতিথি-বৎসল আত্মীয় গৃহস্বামীটি আপিসের কাজের চাপে আর তাঁর গৃহিণীটি বাড়িতে ছেলের অসুখে ব্যতিব্যস্ত আছেন। সঙ্গী এবং সঙ্গিনী হিসেবে তাঁরা লোভনীয়। তাছাড়া, একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে বেড়াবার মত দার্শনিকও আমি নই। রোজই আশায় আশায় কাটে, যদি আকাশের অবস্থা একটু ভালো হয়, যদি আপিস থেকে ফিরে আত্মীয়টি খবর দেন যে দিন তিনেকের ছুটি পেয়ে গেছেন, যদি ছেলের অসুখ কমে···।

বিকেলের দিকে অবশ্য রোজই একটু-আধটু হাঁটতে বেরোই। সেদিন শীতের জড়তা কাটাবার জন্যেই বার কতক যন্তর-মন্তরের ডগায় উঠলুম আর প্রায় দৌড়ে নাবলুম। অতঃপর শ্রমবিনোদনের জন্য চায়ের দোকান খুঁজতে হল। আত্মীয়টি তাঁর পরিচিত এক বাঙ্গালী রেস্তোরাঁয় নিয়ে এলেন। এখান থেকেই আমার গল্পের প্লট সুরু।

নানা বয়সের জনাকতক বাঙ্গালী ভদ্রলোক নিজেদের মধ্যে বেশ জমিয়ে গল্পগুজব করছেন। আমার সঙ্গীটির মুখ চেনা সকলেরই। বোধ হয় সেক্রেটেরিয়েটেরই চাকুরে এঁরাও। একটু তফাতে বসলেও কথাবার্তা কানে আসছে। কোনো নারী-সংশ্লিষ্ট বেপরোয়া মুখরোচক আলোচনা।···সার কথা, কোনো এক সুদর্শনা সোম, বহু অভিজাত দিল্লীবাসীর অন্তস্তলে যিনি খোলাখুলি বিচরণ করে বেড়িয়েছেন, বহু ঈর্ষাকাতর কমলিকার কোমল-বক্ষে যিনি ঝড় তুলেছেন, তুফান বইয়েছেন—সেই অমিতচারিণী সুদর্শনা সোমের মোহিনী জালে এবারে আবদ্ধ হয়েছে বেশ বড় রকমের একটা জাতের মাছ। শিক্ষিত, সম্রান্ত, পদস্থ সরকারী চাকুরে। ঘটনাটা অভাবিত বলেই এমন মর্মগ্রাহী লাগছে বোধ হয়।

সঙ্গীর দিকে চেয়ে দেখি, স্মিত হাস্যে তিনিও দিব্যি রসাস্বাদনে যোগ দিয়েছেন। সুদর্শনা সোমের মত অমন দু'-চারটে মেয়ে সব জায়গাতেই থাকে। কিন্তু আমার কান খাড়া হয়েছে ওঁদের মুখ থেকে সেই বড় মাছের নামটা শুনে। ওই নামের এক জনকে আমিও চিনতুম। এক নামের অমন কত লোক থাকে। আবার এক-একটা নামও থাকে যা অনেক লোকের থাকে না। সেই গোছের নাম একটা।—পার্থ বোস। সংক্ষেপে ডাকতুম পি, বি। যাই হোক, নামটা শোনা মাত্র একটা ছিপছিপে দোহারা তরুণ মূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

সহপাঠী ছিলুম। খুব বেশী দিনের জন্যে নয়। মাত্র বছর কতক। কিন্তু ওর সান্নিধ্যে যে এসেছে তার মধ্যে একটা নিবিড় ছাপ পড়তে বাধ্য। অন্তত আমার পড়েছিল। সাহসী, মেধাবী, খেলাধূলোতেও ভালো ছিল। কিন্তু সব থেকে বড় আকর্ষণের বস্তু হল ওর মনটা। এত বড় আর এত নরম মন বড় একটা দেখিনি। একটা আরশুলা মরতে দেখলেও ধড়ফড় করে উঠত। হস্টেলের ছেলেরা পুরানো আলসে থেকে জংলি পায়রা ধরে এনে মাংস খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে রেস্তোরাঁয় বসে ওর পয়সায় চপ-কাটলেট খেত। মারের চোটে পকেটমারকে রক্তাক্ত অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়তে দেখে পর পর ক' রাত ঘুমোয়নি। কোনো দিন কোনো ভিখিরি ওর কাছে হাত পেতে বিমুখ হয়নি। রাতের পর রাত আমরা হস্টেলের এক ঘরে পাশাপাশি শুয়ে জল্পনা-কল্পনায় ভাবী-জীবনের কত রকম নক্সাই না আঁকতুম! ওর বাবা আজীবন বাংলা দেশের বাইরে কাটিয়েছেন। তারও খুব বেশী দিন এখানে থাকা হল না। প্রথম প্রথম ঘন ঘন পত্র-বিনিময় চলত। ক্রমশ সেটা শিথিল হল। শেষে একেবারে ছেদ পড়ে গেল।···সুদর্শনা-বল্লভ এই পার্থ বোস বোধ করি আর কেউ হবে, কিন্তু তবু মনে মনে একটা কৌতুহল জাগল।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার?

তিনি উৎফুল্ল মুখে জবাব দিলেন, কি আর, প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে···।

—নায়িকাটি কে?

—শুনলেন তো।

—উর্বশী-বিনিন্দিতা?

জবাবে মাথা নাড়লেন তিনি।—না, ও-রকম উর্বশী প্রায় ঘরে ঘরেই আছে। অতঃপর দিল্লীর রূপ সম্বন্ধে একটা ছোটখাট লেকচার করে ফেললেন তিনি। অর্থাৎ, নিছক রূপের দামে এখানে রূপ বিকোয় না। হাব-ভাব, চলন-বলন, সোসাইটি, বাসন-বসন ইত্যাদি সব মিলিয়ে যা দাঁড়ায় এখানকার অ্যারিষ্টোক্র্যাট মহলে সেটাই রূপ। এই ধরণের রূপশ্রীর সাধনায় অনেক সাধারণ মেয়ে এখানে রূপসী বলে চলে যায়।

—আর নায়কটি?

—আমাদের আপিসের ডিরেক্টর।

—বয়েস কত?

—বেশী নয়, কি মতলব, গল্প ফাঁদবেন না কি?

বললাম, তা নয়, এক জন পার্থ বসুর সঙ্গে ইস্কুল-কলেজে একসঙ্গে পড়তাম, সেই কি না···।

সম্ভাবনাটাকে তিনি আমল দিলেন না, ঈষৎ তাচ্ছিল্যে উড়িয়ে দিলেন, না, এ প্রকাণ্ড লোক, বহু দিন বিলেতে কাটিয়েছে—আড়াই হাজার টাকা মাইনে পায়।

তিনি কেরাণী আর আমি কেরাণীর আত্মীয় লেখক। [illegible] বিশ অবস্থা। প্রকাণ্ড লোক অথবা আড়াই হাজার-ওয়ালারা [illegible] এক সময় সাধারণ পাঁচ জনের সঙ্গে মেলামেশা করে থাকে [illegible] প্রতিবাদ আর করলাম না।

সুদর্শনা সোমের সমাচার শোনা গেল। বিধবা। স্বামী [illegible] চাকরী করতেন কি ব্যবসা করতেন সেটা সঠিক ইনি জানেন না, তবে টাকা-কড়ি কিছু রেখে গেছেন বলেই মনে হয়। দু'টি ছেলে আছে। তারা কলকাতায় পড়াশুনা করে। সম্ভবত, কোনো বড় লোক আত্মীয়-টাত্মীয় আছে, নয়ত বোর্ডিং-এ রেখেছে। মিছিমিছি নিজের কাছে রেখে ঝামেলা বাড়ানো কেন, ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসা করলাম, উনি এখানে থাকেন কোথায়?

—কোথাও থাকেন নিশ্চয়, তবে থাকার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই শুনি। আপনার বাড়ি-গাড়ি আর ডিনার-লাঞ্চ খাওয়াবার পয়সা থাকলে আপনার কাছে এসেও থাকতে পারেন ডাকলে। হেসে উঠলেন, বললেন, পার্থ বোস তার লেটেষ্ট···

পরদিন সন্ধ্যায় কনট সার্কাস ধরে হাঁটছি। পাশে [illegible] পার্ক। দিল্লীর রসিক জনেরা এই নাম দিয়েছে। সন্ধ্যার পর থেকেই বহু যুগ্ম-দয়িতের আনাগোনা শুরু হয় এখানে। সকালের দিকে পথের ছেলেরা গাছের তলায় তলায় ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে শ্যেন দৃষ্টিতে ভূমি-তল্লাস করে। অনেক সময়েই তারা আঙটি, হারের লকেট বা কানের দুল কুড়িয়ে পায় না কি।

সঙ্গীটি হঠাৎ আমার বাহু আকর্ষণ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর অঙ্গুলি-সঙ্কেত অনুসরণ করে দেখি, কিছু দূরে মোটর গাড়ি থেকে নেমে একজোড়া ঝকঝকে নারী-পুরুষ পার্কের উদ্দেশে অগ্রসর হচ্ছে। এ আলোয় বিলিতি পোষাক, মোটা ফ্রেমের চশমা এবং

মোটা পাইপের আড়াল থেকে মানুষটিকে সঠিক ভাবে দেখা সম্ভব হল না। আর তার পার্শ্ববর্তিনীর মুখ মোটে দেখাই গেল না, শুধু দূর থেকে, বিশেষ করে পিছন থেকে সাজগোজ-করা মেয়ে মাত্রই যেমন ভালো লাগে তেমনি ভালো লাগল।

—সুদর্শনা সোম আর সেই বড় জাতের মাছ?

আত্মীয়টি মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন, তাই বটে।

বললাম, চলুন না ভিতরে গিয়ে দেখি।

—পাগল, আপিসে কত বার ফাইল নিয়ে যাই, মুখ চেনে। তা' ছাড়া জানেও আপিসে এখন কোন্ টপিক নিয়ে জোর কানাঘুষো চলছে, ভাবের ফলো করছি।

এর পরের বারে কিন্তু আর ফলো করতে হল না। একেবারে মুখোমুখি দেখা কনট্-প্লেস মার্কেটের একটা গেটের সামনে। দিল্লী যাঁরা যাননি, তাঁরা এ যোগাযোগে বিস্মিত হবেন না। অভিজাত মাত্রেই সপ্তাহে অন্ততঃ পাঁচ দিন এখানে না এলে আভিজাত্য মলিন হয়। অতএব এখানে এসেছি যখন দেখা হওয়াটা বিচিত্র নয়।

আমাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে সসঙ্গিনী তিনিও থামলেন; পাশ কাটাতে গিয়ে আবার থমকালেন। মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন ভালো করে। তার পর চেঁচিয়ে উঠলেন।

—আপনি তো···তুমি···মানে···কি আশ্চর্য!···

কিন্তু মুখে সহসা বাক্-নিঃসরণ হল না আমারও। এত কাল বাদে বিলিতি ধোলাইয়ের আড়াই-হাজারী ডিরেক্টর বন্ধুকে দেখে নয়। তাকে আমি এক নজরেই চিনেছি। সেই ছিপছিপে গড়ন গিয়ে দিব্যি পরিপুষ্ট নবরকান্তিটি হয়ে উঠেছে, তবুও। কিন্তু ওপরওয়ালা আমার জন্যে অনেক বড় বিস্ময় সঞ্চিত করে রেখেছিলেন। তার সঙ্গিনী, অর্থাৎ, মহানগরীর বিলাসতরঙ্গিণী সুদর্শনা সোমের পালিশ-করা মুখের ওপর আমার চোখ দু'টো যেন আটকে গেল।—রূপ? না সে জন্যে নয়। আমার আত্মীয়টি মিছে বলেননি, একটু ভালো করে চেষ্টা করলে অমন রূপকে উপেক্ষা করা যায় হয়ত। রূপের জন্যে এ বিস্ময়-সম্মোহন নয়। এই সুদর্শনা সোমকেও আমি চিনি। ভুল হল, সুদর্শনা সোমকে চিনি নে, কিন্তু এই মহিলাকে আমি বেশ ভালো রকম চিনি এবং জানি। অন্তত চিনতুম এবং জানতুম। সে-ও চিনল, আর চিনে বিব্রত হল।

সামলে নিলাম। এত কাল পরের সাক্ষাতে আড়াই-হাজারী পার্থ বোসও উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল, নইলে তার চোখে আমার সেই বিস্ময় বিসদৃশ লাগত। সবল দুই হাতে আমার কাঁধে বিপুল এক ঝাঁকানি দিল সে।

—হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো, হ্যা-ল্-লো! হোয়াট এ সারপ্রাইজ! কবে এসেছ দিল্লীতে? এখানেই থাকো না কি? কোথায় আছ? চিনতে পারছ তো?

সকল প্রশ্নের জবাবে আমি একটু হাসতে চেষ্টা করলাম শুধু। অদূরে আমার আত্মীয়টি দেখি মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন।

গেট থেকে সরে এসে দাঁড়ালুম। আমার হস্তযুগল পার্থ বোসের হাতের মুঠিতে। আবার প্রশ্ন করল, এখানেই থাকো?

—না, দু'চার দিনের জন্য বেড়াতে এসেছি।

—এই শীতে! দাঁড়াও, আগে এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।···মিসেস্ সুদর্শনা সোম, মাই অনারারী গার্ডিয়ান—আর, ইনি আমার ক্লাশ মেট, রুমমেট, অ্যাণ্ড···

সুদর্শনা সোম বিব্রত ভাবটুকু দমন করে সহজ হাসতেই বাধা দিল, তোমাকে আর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না, আমিও এঁকে ভালই চিনি। সোজাসুজি তাকালো আমার দিকে, আপনি চিনেছেন তো?

আমি চিনেছি কি না, সেটা সে প্রথম নজরেই বুঝেছে। আবারও জবাব না দিয়ে শুধু হাসতেই চেষ্টা করলাম। পার্থ বোস, অন্যথায়, পি, বি'র হাতে আবার সজোরে ঝাঁকুনি খেলাম একটা। —হোয়াট এ মেমোরি ম্যান! দৃষ্টি ফেরালো, তুমি ন'শ মাইল দূরে বসে এঁকে চিনলে কি করে?

বাক্যস্ফুরণের বদলে সুদর্শনা সোমও হাসির পথটাই বেছে নিল। পরে হাত বাড়িয়ে পার্থ বোসের কবজি উল্টে সময় দেখল। সঙ্গে সঙ্গে পি, বি'ও চঞ্চল হয়ে উঠল।···গোড্! অনলি টেন মিনিটস লেফট! পকেট থেকে নোট-বই বার করল সে।—আজ ভয়ানক তাড়া আছে আর দাঁড়াতে পারছি না, তোমার ঠিকানা বলো, শ্যাল হান্ট ইউ আউট—!

বললাম। সে লিখেও নিল বটে। তার পর দু'বার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে অদূরে প্রতীক্ষারত ঝকঝকে একটা মোটরে গিয়ে উঠল। সঙ্গিনীও। মোটরে ষ্টার্ট দিয়ে পি, বি হাত নাড়ল একবার। আর, সঙ্গিনী শুধু ফিরে তাকালো।

আমার আত্মীয়টি পায়ে পায়ে কাছে এলেন এতক্ষণে। তাঁর বিমূঢ় ভাব দেখে হাসি পেয়ে গেল। বাড়ি ফিরে শুধু তিনি নন, সমাচার শুনে তাঁর গৃহিণীও আমায় ছেঁকে ধরলেন। কর্তা বললেন, পার্থ বোসকে আপনি চেনেন একথা অবশ্য বলেছিলেন, কিন্তু সুদর্শনা সোমের কথা তো একবারও বলেননি?

গৃহিণী বললেন, তলায় তলায় এত! সব ফাঁক হয়ে গেল তো?

প্রসঙ্গ এড়িয়ে জবাব দিলুম, সুদর্শনা সোম সম্বন্ধে আপনাদের সবারই যেন ভয়ানক আগ্রহ!

গৃহিণী চন্দ্রাগ্রে বলে উঠলেন, হবে না! নেহাৎ আমার ভদ্রলোকটি কেরাণী বলে রক্ষা, ছোটখাট অফিসার হলেও ভয়ে ভয়ে দিন কাটত। স্বামীর দিকে চোখ ফেরালেন, পার্থ বোসের পরে আর ক'জন অফিসার আছে গো? শীগ্গির তোমার নাগাল পাবে না তো?

হেসে উঠলাম।

গৃহস্বামী চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করলেন, ঠিকানা যে লিখে নিল, সত্যিই এসে হাজির হবে না কি এই 'ডি'-মার্কা কোয়ার্টারে?

আশ্বস্ত করলাম তাঁকে, নিশ্চিন্ত থাকুন, যে পার্থ বোসকে জানতুম সে মানুষ বদলেছে—ঠিকানা তার নোট-বইয়েতেই থাকবে। আর আসেই যদি নেহাৎ, তাতেই বা আপনার সঙ্কোচ কিসের?

তাঁর গৃহিণী ফোঁস্ করে বলে উঠলেন, যদি প্রমোশান দিয়ে বসে?

মহিলা সুরসিকা।

কিন্তু আমারই ভুল হয়েছে। পার্থ বোসের বাইরেটা বদলালেও ভেতরটা খুব বদলায়নি বোধ হয়। পরদিনই সকালে আপিসের পথে তার প্রকাণ্ড গাড়িটা এই 'ডি'-মার্কা কোয়ার্টারের দোরেই এসে

হানা দিল। গৃহস্বামী হন্তদন্ত হয়ে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে ভেতরে এনে বসালেন। তাঁর সঙ্গে নতুন করে পরিচয়ও ঘটল আমার মারফং। তার পর পার্থ বোস স্মিতহাস্যে তাকালো আমার দিকে।—হোয়েন ডু আই পিক্ ইউ আপ্, নেক্‌ষ্ট ?

—কোথায় ?

—এনিহয়্যার। কাল শনিবার হাফ ডে, পরশু রবিবার ফুল্ ডে—হাউ লাকি।

বিব্রত মুখে বললাম, তুমি কাজের লোক, এতো সময় নষ্ট করে…

—সময় নষ্ট! সবিস্ময়ে চেয়ে রইল স্বল্পক্ষণ।—তুমি সেই লোকই তো হে! তোমার আত্মীয়রা অসন্তুষ্ট হবেন নইলে আমার বাড়িতেই ধরে নিয়ে যেতাম তোমাকে। আর ক'দিন আছ এখানে ?

—সপ্তাহ খানেক।

—গুড। শনি-রবিবারের প্রোগ্রাম করো, তাছাড়া রোজ ছুটির পরেও মিট্ করা যাবে।

হেসে বললাম, আপত্তি নেই, বিশেষ করে তোমার যখন গাড়ি আছে। এবারে বসে কাটিয়ে দিল্লী আর ভালো লাগছে না। কিন্তু তোমার ওই সব হালফ্যাশানের আধুনিক বেড়ানোও আমার ভালো লাগবে না। আমি ইতিহাসের যুগে বেড়াব, তাতে আপত্তি না থাকে তো গাড়ি নিয়ে এসো।

আগের মত তেমনি প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল পি, বি! বলল, ইয়েস্, ইউ আর জাস্ট্ সেইম্ ম্যান্! ও. কে। আই উইল কাম্। গাড়িতে এসে উঠল। আর এক আপিসেরই যাত্রী যখন, আমার আত্মীয়টিকেও ডেকে নিতে ভুলল না।

তাঁরা চলে যেতেই গৃহস্বামিনী এক-গাল হেসে উদয় হলেন, একেবারে খাঁটি সাহেব দেখি!

বললাম, হবে না কেন, বিলেত-ফেরত, আড়াই-হাজারী মাল।

তিনি মন্তব্য করলেন, একে দেখেই বোধ হয় সুদর্শনা সোম সাহেব-ইস্কুলে ছেলেদের পড়াচ্ছে।

—এ খবরটা আবার কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন ?

—সংগ্রহ করব কেন, তার হাঁড়ির খবর দিল্লীর বাতাসে ভাসে। রোববার এলেই দেখবেন বাইরের ঘরে বসে আপিসের বাবুরা এই নিয়ে গবেষণা করতে করতে নাইতে-খেতে ভুলেছেন। এবারে তো আরো বিষম ব্যাপার, পার্থ বোসের মোটরে আপিসে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা নাকি! কিন্তু লোকটা ভালো মনে হচ্ছে—ওই সর্বনাশীর খপ্পরে গিয়ে পড়ল কি করে!

কথাটা আর শেষ করলেন না।

সুদর্শনা সোমের কথা ইতিমধ্যে অনেক বার ভেবেছি। ভবতোষের বোন হিরণ হঠাৎ সুদর্শনা হয়ে বসল কি করে বুঝছি না। ভবতোষও সহপাঠী ছিল, তবে পার্থ বোসের অনেক পরে। প্রাইভেট টুইশানী করে মা-বোন নিয়ে তখন থেকেই সংসার চালাতে হত তাকে। মেয়েটি দেখতে-শুনতে ভালই ছিল। সহপাঠীদের কেউ কেউ তাই ওর বাড়িতে আনাগোনা করত বোনকে প্রাইভেট ম্যাট্রিক পরীক্ষা-পাশে সাহায্য করতে। এ প্ররোচনা ভবতোষেরই মস্তিষ্কজাত। তার আশা ছিল বোধ হয়, এই থেকে যদি অনুকূল কিছু ঘটে যায়। কিন্তু কিছুই ঘটল না, ম্যাট্রিক পাশও না বা অনুকূল কিছুও না। বোনের ওপর আস্থা ছিল ভবতোষের, সেটা গেল হয়ত। কারণ, হঠাৎ একদিন শোনা গেল, দিল্লী-নিবাসী একজন মাঝবয়সী লোকের সঙ্গে হিরণের বিয়ে ঠিক হয়েছে। কে করে যোগাযোগ ঘটিয়েছিল জানি নে। বিয়ের জন্যে কলেজ থেকে চাঁদা তুলে আমরা অর্থ সংগ্রহ করে দিয়েছি ভবতোষকে। বিয়ের আসরে বসেও মেয়েটার সে কান্না চোখে ভাসছে।

কিন্তু ভোজবাজীর মত এমন দিন বদলালো কি করে! যার হাতে বোনকে সমর্পণ করেছিল ভবতোষ, তার অবস্থাও স্বচ্ছল ছিল না খুব। অথচ তার ছেলেরা আজ কলকাতায় থাকে, সাহেব-ইস্কুলে পড়াশুনা করে, আর তাদের মা এখানে ডিনার-লাঞ্চ খায়, মোটরে চড়ে বেড়ায়। ভাবলুম হবেও বা। যুদ্ধের দৌলতে কত ফকির তো লাল হয়ে গেল। এ-ও সম্ভবত তাই।

শনিবার থেকেই দিল্লীভ্রমণ সুরু হল। পার্থ বোস নিজে এসে তার মোটরে তুলে নিয়ে গেল। একা নয়। সঙ্গে হিরণ বলি কেন, সুদর্শনা সোমের সেই বিব্রত ভাবটুকু [illegible] কেটেছে। কুতুবের পথে আগাগোড়া হাস্য-কৌতুকে [illegible] রাখল আমাদের।

কুতুবের প্রথম পংক্তি উঠে বিশ্রামের জায়গায় [illegible] বসে পড়ল পার্থ বোস। বলল, বাপ! আর এক পা-ও উঠছি না আমি—তোমাদের ইচ্ছে থাকে তো একেবারে স্বর্গে গিয়ে [illegible] যাও।

ইচ্ছে তো আছেই। উপরন্তু তার সঙ্গিনীটিকে একলা পাবার ইচ্ছেও একটু ছিল। সুদর্শনা টিপ্পনী কাটল, এতেই [illegible] পড়লে! আচ্ছা নবীন পুরুষ তো! আমায় লক্ষ্য করে [illegible] আপনারও একই অবস্থা নাকি ?

—না, আমি তো উঠবই।

এবারের সিঁড়ির ধাপগুলো তেমন চওড়া নয়। ক্রমশ [illegible] সরু হয়ে গেছে। পাশাপাশি দু'জন ওঠা যায় না। সুদর্শনা আগে আগে উঠতে লাগল। আমি পিছনে।

ইতিহাসের রোমাঞ্চ আর মনে জাগছে না। পিছন [illegible] বললাম, তুমি তাহলে এখন সুদর্শনা ?

সে ঘুরে দাঁড়াল। আবছা অন্ধকারে তার দাঁতগুলো ঝক্ ঝক্ করে উঠল। হেসে বলল, সুদর্শনা নই ? কি জানি, লেখকরা কল্পনা-জগতের মানুষ, মাটির কাউকেই তারা সুদর্শনা দেখে না বড় একটা।

কে বলবে এই সেই ম্যাট্রিক ফেল-করা মেয়ে [illegible] আবার উঠতে লাগল সে। আমিও। একটু বাদে বললাম, আমি লেখক, এ খবরটা তুমি রাখো দেখছি…

—ও মা, আমরা রাখি বলেই তো রক্ষা, মেয়েরা [illegible] কে আর খবর রাখে আপনাদের ?

কর্ণদ্বয়ে বাক্যমধু বর্ষিত হল। উঠতে লাগলাম। তিন [illegible] ছাড়িয়ে চার তলা ধরে। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার [illegible] খবর কি ?

—খবর রাখি নে।

—তোমার ছেলেরা কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করছে শুনলাম, সেখানে থাকে না ?

—দাদার বাড়ি ছাড়াও কলকাতায় থাকার অনেক জায়গা আছে। দাদার অবস্থা তো জানেন—

—তা' বটে, এ তো আর হিরাণের ছেলে নয়, মিসেস্ সুদর্শনা সোমের ছেলে!

অস্ফুট কণ্ঠে হেসে উঠল সে। পরে তেমনি উঠতে উঠতেই জিজ্ঞাসা করল, ছেলেদের কথা কোথায় শুনলেন?

—দিল্লীতে এসে অবধি তো এবারে সকলের মুখে তোমার কথাই শুনছি।

ওর হাসিটা এবারে আরো করুণ শোনালো। সকলের মুখেই! টেনে বলল, বে—চা—রী।

চার তলায় এসে বিশ্রামের জন্য একটু দাঁড়ালুম। সুদর্শনা রেলিং-এ ঠেস দিয়ে হাঁপাতে লাগল। অল্প অল্প ঘামছেও। রুমালে সন্তর্পণে মুখ মুছতে লাগল।

জিজ্ঞাসা করলাম, বেচারী কেন?

ঈষৎ কৌতুকে সে মুখের দিকে চেয়ে রইল স্বল্পক্ষণ, জবাব দিল, কেন বুঝছেন না? যারা আমার কথায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে এমন, তাদের নাম-ঠিকানা বরং দিয়ে দিন আমায়। হেসে উঠল।

নিজের কানের কাছটাই উষ্ণ ঠেকল। মেয়েটা এক কালে একটু সমীহ করত আমায়। প্রশ্ন করল, আর উঠবেন, না এবারে অধোগতি হবো?

—আমি শেষ পর্যন্ত উঠব একবার।

ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বলল, শেষ পর্যন্ত ওঠাই ভালো, চলুন।—

বিনা বাক্যব্যয়ে এবারে কুতুব-আরোহণ শেষ হল। পার্থ বোস নীচে নেমে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছে। আমাদের দেখে বলল, ওপরে ওঠার প্রতি মানুষের একটা নেশা আছে, না?—

তার সঙ্গিনী বক্র কটাক্ষে একবার তাকালো আমার দিকে। জবাব দিলুম, তা বটে, কিন্তু মেয়েছেলে সঙ্গে থাকলে ওঠা শক্ত।

বন্ধু একটা চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাড়াতাড়ি হেসে উঠল।—ফিলসফাইজিং, এঃ?—

পরদিনটাও সারাক্ষণ ওদের সঙ্গেই ইতিহাস-রাজ্যে ভ্রমণ করেছি। কিন্তু ইতিহাস যে সঙ্গ-বিশেষে এমন দূরে সরে যেতে পারে আগে জানতুম না। বন্ধুটি কুঁড়ের বাদশা। অনেক সময়েই গাড়িতে বসে অপেক্ষা করেছে সে, সঙ্গিনীকে বলেছে, ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনো— আমি যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখেই ঘুরে-ফিরে দেখাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দেখার সে মনটাই আর নেই, থেকে থেকে বিরক্ত হচ্ছি নিজের পরে, কোথাকার কে একটা বাজে মেয়ের পাল্লায় পড়েছে বড়লোক বন্ধু, সে জন্যে আমার অস্বস্তি কেন—?

তার সঙ্গিনী কিন্তু নিরালায় এসে আজ আর হাসিঠাট্টার ধার দিয়েও গেল না। উচ্ছলতাটুকু শুধু বন্ধুর সামনেই স্বতঃস্ফূর্ত হচ্ছিল। আমায় একলা পাওয়া মাত্র কলকাতা, কলকাতার স্বাস্থ্য, কলকাতার খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি নানা বিষয়ে তার ঔৎসুক্য চাড়িয়ে উঠতে লাগল যেন! এবারে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, এখন তো বসন্তের সময় আসছে, করপোরেশানের লোকেরা নিজেরাই এসে সব জায়গায় টিকে দিয়ে যায় তো?

—যায়—।

—সব্বাই জায়গায়?

—খবর দিলে যায়। বিদ্রূপ করে বললাম, তোমার এত ভাবনা কিসের, বড়লোকের ছেলেদের কোনো ব্যবস্থারই অভাব হয় না, না চাইতেই সব ব্যবস্থা হয়ে যায়।

একটু হেসে প্রায় অন্যমনস্কের মত মাথা নাড়ল সে। পরে হঠাৎ কি ভেবে বলল, একটা কাজ করে দেবেন?

—কি—?

—আপনি কলকাতা ফিরছেন কবে?

—শীগ্‌গিরই, কেন?

—একটা প্যাকেট দেব, পৌঁছে দেবেন?

—কোথায় পৌঁছে দেব, ছেলেদের?

—হাঁ।

—আমার যে সময় হওয়া শক্ত!

তার কণ্ঠস্বর এবারে আবেদনের মত শোনালো যেন। বলল, দয়া করে যখন হোক এক সময় পৌঁছে দেবেন, এক-আধটা জামা-টামা আর কি, চিঠি লিখছিলাম পাঠাব। এখন পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি, ছোট ছেলে, তাই আশা করে আছে, দিন না পৌঁছে?

দরদ দেখে গা জ্বলে যায়। শান্ত মুখে বললাম, এমন করে বলছ যখন দেবো। কিন্তু ছেলেদের এখানে নিজের কাছে এনে রাখো না কেন?

—এখানে পড়াশুনোর নানা অসুবিধে।

—এখানে ছেলেরা আর পড়াশুনা করছে না তাহলে, নানা অসুবিধেটা পড়াশুনোর, না তোমার নিজের?

সে হাসতে লাগল। পরে বলল, ওদিকে মোটরে বসে ভাবছে হয়ত কি হল, চলুন শীগ্‌গির—

এর পরে আপিসের দিনেও বিকেলের দিকে বেড়ানোর কামাই হল না। আত্মীয় গৃহস্বামী এবং গৃহস্বামিনী ঠাট্টা করতে লাগলেন, সুদর্শনা সোমের জন্যে শেষে বন্ধুর সঙ্গে না হাতাহাতি হয়ে যায়

আমার। এত বড় এক জন ধনী পদস্থ লোকের দরাজ অন্তঃকরণ দেখে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন বটে। মুগ্ধ আমিও হয়েছি। আর সে জন্যেই তাকে তার সহচরীটির সম্বন্ধে একটু সচেতন করে দেবার কথাটা মনে মনে অনেক বার ভেবেছি। কলকাতা ফেরবার সময় এগিয়ে এলো। শেষ দিনে পার্থ বোসের সামনেই তার সঙ্গিনী ছেলেদের জামার বড় একটা প্যাকেট আমার জিম্মা করে দিলে। একটা আলাদা কাগজে বাড়ির ঠিকানা আর একজন ভদ্রলোকের নাম লেখা। বলল, আপনার একটুও কষ্ট হবে না, বড় রাস্তার ওপর প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইবেন, আর ছেলেদের ডেকে প্যাকেটটা দেবেন—

অপাঙ্গে একবার বন্ধুর দিকে তাকালুম। দেখি, সে নির্বিকার চিত্তে গাড়ি চালাচ্ছে।

যে দিন রওনা হব, সে দিনও সকালে বন্ধু এসে হাজির। আজ একাই। একা ঠিক নয়, সঙ্গে পশ্চিমা ড্রাইভার আছে। বলল, চলো, তোমাকে ষ্টেশানে তুলে দিয়ে আসি।—

ভারী ভালো লাগল। গাড়িতে উঠে প্রশ্ন করলাম, একলা যে, বান্ধবী কোথায় ?

—তিনি সকালে একটা পার্টি এ্যাটেণ্ড করবেন।

—ও! একটু ভেবে বললাম, কিছু না মনে করো তো একটা কথা বলি।—

—নো ফরম্যালিটি প্লীজ, গো অন।···

জিজ্ঞাসা করলাম, বিয়ে করছ না কেন ?

হাসল, বলল, আর বয়েস আছে নাকি ?

ঠাট্টা নয়, এই মেয়েটিকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি, শেষে তোমার অশান্তি বাড়বে আরো।

হেসেই জবাব দিল, মেয়েটির ছেলেবেলা জানো, বর্তমানের বেলাটা কিছু জানো কী ?

—যা দেখলাম আর জানলাম, সে তো ছেলেবেলার থেকেও খারাপ। তা' ছাড়া ওর দু'টি ছেলে আছে। এত উঁচু মন তোমার···ওর ভালোর জন্যেও ওকে বিয়ে করা উচিত।

ষ্টেশানের কাছে একটা ঠেলা গাড়ি রাস্তা আটকে আছে। দু'টো লোক এই শীতেও সেটা ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে গলদঘর্ম হয়ে উঠেছে। পার্থ বোস তাকালো আমার দিকে, দেখেছো ?—

—কি ?—

ওই ঠেলাওলা দু'টোকে। ভালো করে দেখো, পরে বলছি।

কথাটার তাৎপর্য বোঝা গেল না। মোটর ষ্টেশান-প্রাঙ্গণে এসে থামল। টিকিট কেটে মালপত্র নিয়ে একটা ইণ্টার-ক্লাশ কামরায় সবে উঠে বসেছি, পার্থ বোস চোখের ইঙ্গিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করল আবার। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি, সুদর্শনা সোম হন্তদন্ত হয়ে এক-একটা কামরা অনুসন্ধান করতে করতে এগিয়ে আসছে। হাতে তার আর একটা ছোট্ট কাগজের বাক্সর মত কি। কাছে এসে পার্থকে দেখে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। স্পষ্টই বুঝলাম, তাকে এখানে প্রত্যাশা করেনি। পার্থ এক-গাল হেসে প্রশ্ন করল, কি ব্যাপার, মিসেস আলির পার্টিতে যাওনি এখনো ?

সে-ও এবারে তেমনি হাল্কা হেসেই জবাব দিল, এই যাব, একটু দেরী হয়ে গেল।

—একটু! লেইট্ হওয়াটা তোমার একেবারে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে দেখছি।···তাঁরা তোমার অপেক্ষায় বসে আছেন নিশ্চয়—।

তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিল, থাকুক গে—। আমার দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত হাস্যে বলল, আপনার বোঝা আরো একটু বাড়াতে এলাম। এই খাবারের বাক্সটাও পৌঁছে দিতে হবে। ওরা ভাবে, নিজের খাবার কত না ভালো, খেয়ে দেখুক।

নিজের অজ্ঞাতেই হাত বাড়িয়ে বাক্সটা নিলাম। [illegible] এবারে যাই নইলে লেইট্ হবার জন্যে আবার এক পশলা বকুনি সুরু হবে। বন্ধুর উদ্দেশে হাল্কা কটাক্ষপাত করে সে প্রস্থানোদ্যত হল। বন্ধু অনুরাগ-রঞ্জিত হয়ে স্মরণ করিয়ে দিল, বিকেলে ওখানে যাচ্ছি খেয়াল আছে তো? লেইট হলে শাস্তি [illegible] কিন্তু—।

তার দিকে একবার ভ্রূভঙ্গি করে আধুনিকার কায়দায় হাত নেড়ে আমায় বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে একটু ব্যস্ত ভাবেই প্রস্থান করল সে।

পার্থ বোস জানালায় মাথা রেখে অর্ধশয়ান হয়ে বলল, আজ পার্টি-টার্টি কিছু ছিল না দেখছি, ষ্টেশানে তোমাকে মিট্ করবার জন্যে পার্টির কথাটা বলেছে বোধ হয়।

সুযোগ পেয়ে ঠাট্টা করলাম, একটু একটু চিনেছ তাহলে। ঠেলাওলা দু'টোকে দেখিয়ে কি বলছিলে তখন ?

—দেখেছিলে ?

—দেখেছি তো, কিন্তু কি দেখাতে বলছিলে ?

—সুদর্শনার ভালোর জন্যেও সুদর্শনাকে বিয়ে করবার কথা বলছিলে কি না। উঠে সোজা হয়ে বসল সে। আমার দিকে চেয়ে চোখ বেঁকে হাসল একটু। বলল, ওই ঠেলাওলা দু'টোর যা অবস্থা তাতে ওদের ভালো করতে হলে ঠেলা টানা বন্ধ করা উচিত। কিন্তু সত্যি তাই করতে গেলে ওরা মরবে। বরং যত [illegible] চাপাবে ঠেলায় তত তাদের উপকার।

—দু'টো এক হল ?

—হল। আই অ্যাম হার এডভাইসর, সে বি নাইন্থ—বি উইল বি ইন্ ডিফিকাল্টি ইফ গেটি হার নেক্সট। এখন [illegible] ওকে বড় একটা আমল দেয় না কেউ···কলকাতার বড় রাস্তার ওপর যে প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ির ঠিকানায় তুমি ওর ছেলেদের জন্য এই প্যাকেট দু'টো পৌঁছে দিতে যাচ্ছ সেটা একটা অনাথ-আশ্রম। আর কাগজে নাম-লেখা সেই ভদ্রলোকটি সেখানকার অভিভাবক। সেখানে খাওয়া থাকাটাই শুধু ফ্রী, আর কিছু নয়—।

আমি নির্বাক-বিস্ময়ে হতভম্বের মত চেয়ে রইলাম তার দিকে। সে নির্বিকার চিত্তে বসে শিস দিতে লাগল। খানিক বাদে আস্তে আস্তে বললাম, তুমি এত কথা জানো, সে জানে ?

হেসে ক্ষুদ্র জবাব দিল, পাগল নাকি !

চেয়ে আছি। চেয়েই আছি। সময় হল। গার্ডের হুইসল বেজে উঠল। বন্ধু নেমে গেল। কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে প্রসন্ন হাস্যে বিদায় নিল সে। ট্রেণ ছাড়ল। যতক্ষণ দেখা গেল তাকে খুঁজে রইলাম। ট্রেণের গতি বাড়ছে। যেন দিল্লী ছেড়ে যাবার জন্য মহা ব্যস্ত সে।

অনুবাদক— ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সবে তুষার একটু একটু গলতে আরম্ভ হয়েছে। রাস্তায় নবেম্বর মাসের বরফ—ভিজে আর ভারী,—গ্রামের নিস্তব্ধ থেকে একখানি ভারী শ্লে-গাড়ী আসছিল ঢোকে ঢোকে। এর ভিতরে চারটি মেয়ে ব'সেছিল। মেরী, কেট, ইলসি আর কার্ষ্টা—সবে মাত্র তাদের বিয়ে হয়ে গেল চারটি নবনিযুক্ত সৈনিকের সঙ্গে। কালকেই তাদের স্বামীরা ব্যারাকে চলে যাবে। তাদের মাথায় নীল রুমাল বাঁধা—বিয়ের লক্ষণ: চুপটি ক'রে তারা বসেছিল, আর প্রতি ঝাঁকুনিতে তারা নড়ে পরস্পরের গায়ে পড়ছিল। রুবেন গাড়ী চালাচ্ছে—মদ খেয়ে চুরচুরে। রোগা রোগা ঘোড়াগুলিকে নির্দ্দয় ভাবে চাবুক মারছিল। ওদের স্বামীরা পেছনে পেছনে আসছিল—দু'জন ক'রে এক-একখানি শ্লে-গাড়ীতে। তারাও খুব মদ খেয়েছিল—মনের ফূর্ত্তিতে তাই ছেড়ে-গলায় চীৎকার করে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিল। মেয়েগুলি ভারী শান্ত ও চুপ করে ছিল—ওরই মধ্যে কার্ষ্টার বয়স খুব কম, দেখতেও ছোট। তার গোলগাল গোলাপী মুখখানি, হালকা-নীল চোখ দুটি ও ফুলো-ফুলো নাকটি দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন একটি শিশু মেয়ে—কিন্তু তার সারা মুখে একটি চিন্তার রেখা স্পষ্ট দাগ এঁকে দিয়েছিল। ধূসর কুয়াসা—যা' সারা মাঠটিকে ছেয়ে রেখেছে—তারই দিকে ও অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। খুব দূরে বাব্‌লা গাছের ঝোপ আর কাকগুলো এই ধূসরের গায়ে অদ্ভুত কালো কালো রেখা টেনে দিয়েছিল—মাঠের বুকে দেবদারু গাছগুলি যেন ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে। ওরই দিকে ও তাকিয়ে ছিল—বর্ণহীন দৃশ্যপট ওর চোখের সামনে দুলছিল আস্তে আস্তে—যেমন ইষ্টারের সময় মেলায় গিয়ে দোলনায় চাপলে মনে হয়।

ওরা প্রত্যেক শুঁড়ির দোকানের কাছে থামছিল। "ছোট্ট মেয়ে, জমে গেছ নাকি?" এই বলে কার্ষ্টার স্বামী টোম ওকে মদ দিচ্ছিল। কার্ষ্টা একটুখানি মুচকে হেসে বোতলটি নিয়ে টোমের অনুরোধ মেনে নিলে। এ সময় একটু মদ খেলে শরীর বেশ গরম হয়—ভারী আরামও পাওয়া যায়; তা' ছাড়া বেশ সুন্দর সুন্দর কল্পনা এসে জোটে—ভাবতে খুব ভাল লাগে। কার্ষ্টার চোখের সামনে সমস্ত ধোঁয়াটে জগৎ আরও অস্পষ্ট হ'য়ে আসছিল—এমন কি ক্যাবেনের পিঠটিকেও মনে হচ্ছিল আরো দূরের বস্তু। আবার এদিকে সারাদিনের ব্যাপারগুলি অতি পরিষ্কাররূপে তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছিল—সেই খুড়েনের মেলায় যেমন মেরী-গো-রাউণ্ড ঘোরে তেমনি ক'রে—একটার পর একটা। তার বিয়ে হবে—বিয়ে হবে! সেই সকালে রেশমী সেমিজ—কেমন সাদা আর সুন্দর, তাই পরা; সেমিজ তার এত সুন্দর আর ঠাণ্ডা যে, সে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল, বিয়ের টোপরটি তার মাথায় এমনি চেপে বসিয়ে দেওয়া হয় যে তাতে সে ব্যথা পেয়েছিল—হয়ত, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই তার কপালে রক্ত জমে একটি লাল রেখা পড়ে গেছে। তারপর সেই গির্জ্জা—ঠাণ্ডা আর পবিত্র। তার নতুন জুতা পাথরের মেঝেতে কেমন সুন্দর শব্দ করছিল—এমন ভেজা সে মেঝে যেন বরফ, পাছে পড়ে যায় এই ভেবে কার্ষ্টা সতর্ক হয়েছিল।...

তার পর পাদরী-মশাই; কথা বলার সময় জিভ বার ক'রে মুখ চাটেন যেন ভাল কিছু খাচ্ছেন, কিন্তু সত্যি, কী সুন্দরই তিনি বললেন! তিনি মানুষের মরণের কথা, বিশ্বাসী থাকার কথা বললেন—ঈশ্বরের কথায় আস্থা রাখো,—অবিশ্যি ফেলেছিল। সৈনিকের স্ত্রীরা বিয়ের সময় কেঁদেই

ছাড়াও কাঁদাটাই ভাল। সে আর সবার চেয়ে বেশী কেঁদেছিল—এ কথাটা পরে আলোচনার সময় সে নিশ্চয়ই বলতে পারত। তার পর গির্জ্জার মোড়ে মদের দোকানে ওরা সকলে মদ খেয়েছিল—আর স্বামীরা ঝগড়াও করেছিল। মানে কিনা, বিয়ের সময় যা' যা' হওয়া উচিত তার কোনটা বাদ যায়নি।

ক্যাবেনের ঘোড়ার গলায় ঘণ্টাগুলি বাজছিল—কাষ্টার মনে হয় যেন ওগুলো সব বিয়ের বাজনাই বাজাচ্ছে;—ও আবার গোড়া থেকে সমস্ত বিয়ের ব্যাপারটির স্বপ্ন দেখতে লাগলো। অন্য অন্য তিনটি মেয়েও তেমনি সবাই বাইরে তাকিয়েছিল—নিতান্তই অর্থহীন দৃষ্টিতে, যেন তারা কিছুই দেখছে না, কেবল যখন হয়ত একটি খরগোস রাস্তার এপার ওপার হচ্ছিল, তখন তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল 'ঐ দেখ, ঐ দেখ, একটা খরা!'—সঙ্গে সঙ্গে একটু মুচকে হাসি।

গ্রামের সরাইখানায় তারা এসে পৌঁছল। নিমন্ত্রিতগণ সবাই সুন্দর পোষাক পরে দাঁড়িয়েছিল, ওদের দেখেই চীৎকার ক'রে উঠলো। কুঁড়েঘরগুলির কাচের জানলার ভিতর দিয়ে ছেলে-মেয়েদের পাণ্ডুর মুখগুলি উঁকি মারতে দেখা গেল—সবাই ক'নে দেখতে উৎসুক হ'য়ে উঠেছিল। এই সব দেখে কাষ্টার মনে একটি যেন উৎসব-আনন্দের ভাব এল। বিয়ের ক'নে সবার কাছেই অতি কৌতূহলের বস্তু; আর সত্যিই, বিয়ের দিনটি মানুষের জীবনের সব চেয়ে সুখের দিন।

সরাইখানার দোরের কাছে দাঁড়িয়ে কাষ্টা টোমের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো, ওরা দু'জন এক সঙ্গেই ভেতরে প্রবেশ করবে—এই হচ্ছে রীতি। সে বেশ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপারে একটি বৃদ্ধার সঙ্গে কথা কচ্ছিল। এমন কি, গাঁয়ের মোড়ল মশাইও তার সঙ্গে কথা কইলে, আর ছোট ছোট মেয়েগুলি তার টোপরটির দিকে কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে ছিল। কুঁড়েঘরের বাসিন্দা এ্যানলিজের মেয়ে কাষ্টা কখন এমন খাতির ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার কারও কাছ থেকে পায়নি। গরীবের ঘরের ছোট মেয়ে সে—সম্পত্তির মধ্যে ছিল তার মোটে একটি ছাগল, তাই কে-ই যে বা তাকে পোছে? কিন্তু মজা এই, যখন তোমার বিয়ে হবে তখন তুমি দশের মধ্যে একজন। আত্মতৃপ্তিতায় কাষ্টার ছোট্ট কচি মুখখানি যেন আপেলের মত টুকটুকে লাল হয়ে উঠলো।

এরই মধ্যে স্বামীরা গাইতে গাইতে এসে উপস্থিত হোলো। টোম কাষ্টার কাছে গিয়ে তার কোমর জড়িয়ে উঁচু ক'রে তুলে ধরলে। "বড় নয় বেশী, কিন্তু ভারী যেন ময়দার বস্তা"—এই কথা সে বললে। সকলে হেসে উঠলো। কাষ্টা আনন্দে লাল হ'য়ে উঠলো—টোমের কাছে সে নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করতে লাগলো।

সরাইখানার বড় ঘরটিতে নিমন্ত্রিতদের দল সাদা টেবিলের ধারে বসে পড়লো। সকলেই নিস্তব্ধ ও শান্ত হ'য়ে দুধ আর ঝোল খেতে আরম্ভ ক'রে দিলে; কিছুক্ষণের জন্য খালি কোঁৎ-কোঁৎ ক'রে গিলবার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না; তার পর পর্ক এল, পরে মাটন, আবার পর্ক। গরম মাংসের ধোঁয়ায় ঘর যেন বোঝাই হ'য়ে গেল। কাষ্টা আগ্রহভরে খাচ্ছিল—শেষটা সে এত খেয়ে ফেলল যে সে-ও এবারে হাঁফাতে লাগলো—কোনও রকমে তার তলপেটের বেল্টটা আলগা হয়ে গেল। সে মনে মনে বললে, "এই তো বেশ, আচ্ছা তোলো, একই নাম বিয়ে বটে!" টোমের হাতের উপর আস্তে আস্তে টোকা দিতে লাগলো। টোম এখন তো নিজের মত— টোম এখন তার নিজের সম্পত্তি। স্বামী পাওয়া বড়ই ... "কাষ্টা, মদটুকু খেয়ে ফেল"—টোম বললে।

বাইরে অন্ধকার হ'য়ে এল। ঘরে আলো আনা হোলো—মদের বোতলের মধ্যে সরু সরু বাতি বসানো।...একটি ব্যাণ্ড, একটি বেহালা, একটি বাঁশী আর একটা বীণা-যন্ত্র নিয়ে বাজনা সুরু হোলো—পলকা-নাচের বাজনা। 'এইবার নাচের পালা'—গভীর ... সঙ্গে কাষ্টা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। মুহূর্ত্তের জন্যে সে বাইরে ... অন্ধকার—একটা ঠাণ্ডা ভেজা বাতাসের ঝাপটা, ধূসর মেঘের ... আকাশে জমাট হ'য়ে এসেছিল। কাষ্টা ভাবলে, 'কালকে ... পড়বে।'

নিস্তব্ধ গ্রামটিতে ছোট ছোট কুঁড়েগুলো গায় গায় ... হ'য়েছিল। কোনো জানালার ধারে হয়ত একটু আলো মিটমিট করছে,—কোথাও বা একটি ছেলে কাঁদছে, তার মা ঘুমপাড়ানি ... সুরু করেছে—সেই একঘেয়ে টানা-টানা সুর। রাস্তার ... ছোট কদাকার কালোমত কুঁড়েখানি এ্যানলিজের। কাল সব শেষ হ'য়ে যাবে—যেন কখন কিছু হয়নি। কাষ্টাকে আবার কুঁড়েখানিতে ফিরে মায়ের সঙ্গে বাস করতে হবে।—কাষ্টা তার ... জামা দিয়ে চোখ মুছে ফেললে। এখন সে কাঁদবে কেন? ... কাঁদবার জন্যে যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।

কাষ্টা ভেতরে গিয়ে নাচতে লাগলো। মন্দ না ... নাচের সময় ধরে কাষ্টার মনে হ'তে লাগলো, 'সুন্দর! ... এমন সময় আমার জীবনে আর আসবে না।' টোমের ... নাচার সময় তার শক্ত বাহুর উপর ভর দিয়ে কাষ্টা যেন ... মত মনে করছিল। তারপর নাচের পর আরম্ভ হোলো ... সবাই সার দিয়ে দাঁড়ালো—মদ্দারা ঘুষোঘুষি আরম্ভ করলে। ... টোম আক্রান্ত হচ্ছিল, অমনি কাষ্টা চীৎকার ক'রে উঠছিল ... মন গর্ব্বে ফুলে উঠছিল। সব শেষে চীৎকার ক'রে গাইতে গাইতে নবদম্পতিকে সবাই মিলে এ্যানলিজের কুটীরে নিয়ে গেল—... আজ কাষ্টার বাসব-শয্যা।

ছোট্ট ঘরটিতে কাষ্টা একটি বাতি জ্বালাতেই টোম ধুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়লো। মদ খেয়ে চুরচুরে হ'য়ে ছিল, তাই ... ও ঘুমিয়ে পড়লো। কাষ্টা ওর জুতো দুটি খুলে দিলে,—... বালিসটিকে শক্ত ক'রে নিয়ে সে-ও শুয়ে পড়লো।

ক্লান্তিতে তার হাত-পা কামড়াচ্ছিল। চোখ বুজে তার মনে হ'তে লাগলো বিছানাটি যেন নৌকার মত দুলছে। তবু ... ঠিক ঘুম হচ্ছিল না। তন্দ্রা আসার সঙ্গে সঙ্গে সে তার বিয়ের সারা দিনের ঘটনার স্বপ্ন দেখছিল—সেই গির্জ্জা সেই সেমিজ সেই নীল টোপরটি পর্য্যন্ত—তার পর হঠাৎ চম্‌কে উঠে তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগল, না জানি তার কোন সর্ব্বনাশ ঘটবে,—সেটা কি? হাঁ, ঠিক—তার স্বামী চলে যাবে আর আবার তার পুরানো জীবনযাত্রা সুরু হবে—এক ঘেয়ে তেতো—বিবাহ তার হ'য়ে গেছে, ব্যস্, সারা জীবনে তার আর হয়ত কোন আনন্দের ঘটনা ঘটবে না।

বাইরে ভোর হ'য়ে এল—ঘরের জানালার কাচগুলি নীল হ'য়ে

উঠলো। কার্ষ্টা উঠে বসে টোমের দিকে তাকিয়ে রইলো। তখনো সে অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে—তার সুন্দর চুলগুলি এলো হ'য়ে তার কপালে পড়ে আছে; তার মুখখানি লাল টকটক্ করছে আর তার একটু ফাঁক মুখ থেকে নাক ডাকার শব্দ বেরুচ্ছে। কার্ষ্টা আস্তে আস্তে বুকে চাপড় দিলে—যেন ছোট শিশুকে ঘুম পাড়াচ্ছে। এই স্বামীটি তার—একান্ত তার নিজের, বড় আপনার সম্পত্তি। সে আজ তাই পেয়েছে যা' সকল মেয়েই একান্ত ভাবে চায়—একটি মানুষ; আর তার মানুষটি বেশ বড় আর বলবান—জোয়ান। কিন্তু এতে কি লাভ যদি এখনি এই মানুষটিকে ছেড়ে দিতে হয়? মা গো কী লজ্জা! এ-সব বিষয় না ভাবাই বরং ভাল। কার্ষ্টা বিছানা থেকে এসে দুধের ভাঁড়টি তুলে নিল। এবার সে ছাগল দুইতে যাবে।

বাইরে খুব জোরে বাতাস বইছিল—আর বরফ পড়ছিল—ভোরের আলোয় সামনের মাঠটিকে ধোঁয়াটে-নীল দেখাচ্ছিল। আর ঐ দিগন্ত-রেখার কাছে কালো কালো গাছের সারির মধ্যে একটি সাদা উজ্জ্বল জিনিষ দেখা গেল। অভ্যাস-মত কার্ষ্টা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো, হাত দিয়ে তার চোখ ঢাকলো; নাকটিকে মোচড় দিয়ে মুছে সে উঠন্ত দিনের আলোর দিকে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে রইলো। রাস্তার ও-পাশের বাড়ীগুলোর দোরেও ঠিক ওই মত দুধের ভাঁড় হাতে নিয়ে অনেক মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। কার্ষ্টার মতই তারা দু' চোখে হাত দিয়ে ধূসর প্রভাতের দিকে তাকিয়েছিল, যেন তারা সবাই আগন্তুক দিনটির কাছে কিছু প্রত্যাশা করে।

কার্ষ্টার গায়ে কাঁটা দিল। সে ছুটে গোয়ালঘরের দিকে চলে গেল। যেখানে একটি ছাগল, শূয়োর আর মুরগী থাকতো। ওখানের বাতাস বেশ ভারী আর গরম। মুরগীগুলো তাদের দাঁড়ে উঠে পাখনাঝাড়া দিয়ে উঠলো—শূয়োরটি আপন মনে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে লাগলো। কার্ষ্টা ছাগলটির কাছে উবু হ'য়ে বসে দুইতে লাগলো। গরম গরম দুধ তা'র আঙুল বেয়ে পড়ায় তার ভারী আরাম হোলো—একটা কেমন যেন আচ্ছন্ন ভাব তাকে পেয়ে বসলো। সে ছাগলটার গায়ে হেলান দিয়ে কাঁদতে লাগলো—বিয়ের সমস্ত প্রথা মত যে কান্না কেঁদেছিল এ কান্না সে নয়,—অথবা তার স্বামী চলে গেলে আজ যে ভাবে সে কাঁদবে এ কান্না তেমনও নয়; ছোট শিশুর মত শুধু সে কাঁদতে লাগলো। চোখ-মুখ উপচিয়ে তার চোখের জল আপনিই বেরুতে লাগলো—গরম জলে সে যেন মুখখানি ধুয়ে ফেলছে; নিজের জন্যে সে বড় দুঃখ অনুভব করতে লাগলো, কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ সেখানেই সে ঘুমিয়ে পড়ল—স্বপ্নহীন শান্তিময় ঘুম। ছাগলটি নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকলো—কেবল মাঝে মাঝে ফিরে সে মায়ের মত সস্নেহে ঘুমন্ত মেয়েটিকে দেখছিল তার হলদে চোখ দিয়ে।

মায়ের গলা শুনে কার্ষ্টার ঘুম ভেঙে গেল—"ও কপাল! দুইতে দুইতে ঘুমিয়ে পড়েছে। আঁ! বলি, দুধ দুচ্ছিস্ কি জন্যে আজকে?"

"এক জন আছে যে—" আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় কার্ষ্টা উত্তর দিলে।
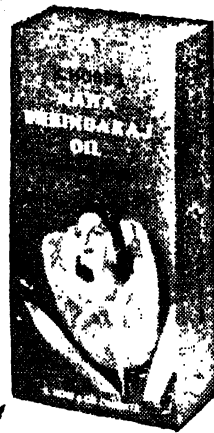
"বেশ, এই কাজটি করতে করতে আবার ঘুমিয়ে পড় গে যা,—" ওর মা বললে। রোজকার মতই বৃদ্ধা কঠিন স্বরে এই কথাগুলি বলেছিল; তবুও কার্ষ্টার মনে হোলো কেমন যেন তার ভেতর একটু মনে মনে হাসা—একটু সম্মানের আমেজ মেশানো ছিল। আর সত্যিই একজন নববিবাহিতা স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলা, আর একটি অবিবাহিতার সঙ্গে আলাদা বৈ কি!

"যা'—শীগ্‌গির যা.' আগুন জ্বালা গে; তোর স্বামী এখুনি চ'লে যাবে।" কার্ষ্টা তাকিয়ে উঠলো। সত্যিই ত! আজ তো আর অন্য সাধারণ দিনের মত নয়; আজকে যে সে সব চেয়ে ভাল কাপড় পরে গাড়ী করে সহরে যেতে পারে; আজকে তাকে সবাই দেখবে, তাকে দয়া দেখাবে। তাতেও একটু আরাম আছে।

সেই সৈনিকগুলিকে সহরে নিয়ে যাবার ভার হচ্ছে গ্রামের মোড়লের উপর—একটা শ্লেজগাড়ী করে। তাদের মা, বাবা, স্ত্রী প্রভৃতি সবাইকেই ষ্টেশনে যেতে হবে ওদের বিদায় দিতে।

প্রাতরাশের সময় মোকদ্দমা সংক্রান্ত দু'চারটে কথা ছাড়া টোম আর কিছুই বলেনি, তার স্ত্রীকে মাত্র কিছু উপদেশ দিল। গ্রামের বাঁ ধারে বনের দিকে কিছু জমি-জমা পিটার রক্ত তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল; আইন অনুসারে এই সম্পত্তি কার্ষ্টারই প্রাপ্য, কেন না, মৃত অধিকারীর সব চেয়ে নিকট-আত্মীয় সেই, পিটার হচ্ছে মাত্র সেই অধিকারীর সতাতো কন্যার স্বামী। এখন কার্ষ্টাকে বিয়ে করার সঙ্গে সেই জমি-জমার অধিকার-স্বত্ব টোমের উপর বর্ত্তেছিল, সুতরাং তার অনুপস্থিতিতে কার্ষ্টা যাতে তার অধিকারত্ব প্রমাণ করতে পারে সে ব্যবস্থা করা টোমের কর্ত্তব্য।

"ছাখ, তুমি জ্যাকোবোসইন উকিলের কাছে যাবে—ইহুদীরা বেশ চতুর আর তা ছাড়া বেশ কম দরে পাওয়া যাবে। দেখো, যেন হেরে যেয়ো না!" কার্ষ্টার মুখের ভাব বেশ কালির মতো হলো। সে তার দায়িত্ব খুব ভালই জানে।

সে বললে,—"ঠিক ব্যবস্থা করব আমি ত বোকা না।"

"তুমি বোকা হলে কি আমি তোমাকে বিয়ে করতুম?" এই বলে টোম কথাবার্ত্তা শেষ করলে।

খুব চীৎকার করতে করতে সৈনিকেরা তাদের শ্লেজে উঠে বসলো। স্ত্রীলোকেরা আর শিশুরা তাদের গাড়ী ঘিরে কাঁদতে লাগলো। আর একখানি গাড়ীতে চারিটি স্ত্রী ওদের সঙ্গে চললো। ভয়ানক বরফ পড়ছিল। বনের ধারে যখন ওরা পৌঁছেছে, মেরী বললে, "বলি, এতে আমাদের কি লাভ হোলো? কাল থেকে যেমন চলছিল সব তেমনই চলতে থাকবে।" "হ্যাঁ, তার আর পরিবর্ত্তন হবে না ভাই"—এই বলে অন্য তিন জনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে।

সদরে গিয়ে আর শোক করার অবসর ওরা পায়নি। চারি দিকে কত কী তারা দেখতে লাগল। তারপর টাউন হলের কাছে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলো যে-পর্য্যন্ত না সৈনিকেরা বাইরে এসেছিল—তারপর সরাইখানায় আহার ও পান করা এবং তারপর ষ্টেশনে গভীর আর্ত্তনাদের ভেতর তাদের বিদায়। টোম কার্ষ্টার পিঠ চাপড়ে বললে, "cheer up,—জান তো আমরা মরতে যাচ্ছি না সেখানে। মাঝে মাঝে টাকাকড়ি পাঠিও, কেন না, অনেক সময় সেখানে খাওয়া জোটে না।"

"আচ্ছা! আচ্ছা!—"

"হ্যাঁ, মোকদ্দমার কথা মনে আছে ত? সেই উকিলটার কাছে যেও?"

"আচ্ছা বেশ!"

"আর দেখ, নিজে খুব চালাক হয়ে চলো, না হলে আমি ফিরে এসে বোকা বনে যাব।"

"আচ্ছা! আচ্ছা!"—তার বেশী আর সে বলতে পারে।

ট্রেণ যখন চলে গিয়েছে, তখন মেয়েরা সব প্লাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে শোক করছে—"ভগবান! ভগবান!"

প্রথমে কার্ষ্টাই থামলো। তাকে যে উকিলের কাছে যেতে হবে।

সুন্দর ছোট একটি গরম ঘরে তাকে অপেক্ষা করতে হোলো। উকিল বেশ ভদ্রলোক—ধৈর্য্য ধরে সমস্ত কথা শুনে ভরসা দিলেন। একটু ঠাট্টা করলেন, কার্ষ্টার চিবুক ধরে নেড়ে দিয়ে বললেন, "আহা, এমন সুন্দর ছোট বউটি অথচ তাকে এত দিন ধরে স্বামী ছাড়া থাকতে হবে? আহা! মোকদ্দমার পক্ষে এ শুভ লক্ষণ [illegible] হবে।"

অন্ধকার হয়ে এসেছে—তখন সেই শ্লেজগাড়ীর সারি বাড়ীর দিকে রওনা হোলো। পাণ্ডুর আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে [illegible] বাষ্পভরা ফলের মত লাল সূর্য্য আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে [illegible] কুঞ্চিত ধূসর সমুদ্রটি সাদা হয়ে উঠেছিল। রেশমের মত [illegible] খস্‌খস্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

দাঁড়িয়ে বেড়িয়ে মদ খেয়ে কেঁদে কেঁদে সৈনিক-বধূরা [illegible] হয়ে পড়েছিল। চুপটি ক'রে তাই তারা বোকার মত [illegible] ক'রে ঐ অস্তগামী সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে ছিল। বনের [illegible] অন্ধকারে ছেয়ে গেল—আর সঙ্গে সঙ্গে কালো নেড়া পাইন [illegible] আগার ওপরে চাঁদ উঠলো—সেই নির্জ্জনে ঐ মেয়ে ক'টি [illegible] ভারী হোলো কোন্ এক না-জানা বেদনায়। আর তারা [illegible] পারলে না—তাই তারা গান ধরলে, যে গানটি তাদের [illegible] মনে এল—তাদের করুণ স্বর বনের প্রতি স্তরে গিয়ে পৌঁছল—

এস প্রিয়তম এস—ওগো বাড়ী ফিরে এস—ত্বরিতে
তুমি থেকো না দূরে সরে—যেয়ো না ক দেরী করিতে—
পথের কাঁটাতে ছিঁড়ে যাবে প্রিয়
বাতাসে উড়ানো তব উত্তরীয়—পথ চলিতে—পথ চলিতে।

এই বিয়ের পর কার কি লাভ হোলো? এ্যান্‌লিজের কুটিরের জীবনযাত্রা আগে যেমন চলেছিল—এখনও তেমনি চলেছে। কার্ষ্টাকে তেমনি ছাগল দুইতে হোতো, বনে কাঠ কুড়োতে এবং বুন্‌তেও হোতো। ডিসেম্বর মাসে যখন তিন্‌টে বাজতেই সন্ধ্যা হোতো তখন সে তার সেই শৈশবের ছোট বিছানাটিতে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়তো। সেই ছয় বছর বয়সের বিছানা—আর নতুন তাকে দেওয়া হয়নি। কী লাভ? সকাল ছটায় যখন [illegible] তখন তার যথেষ্ট ঘুমোনো হয়েছে—তাঁতের কাছে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে বস্‌তো। দিন নেই, রাত নেই—সেই একঘেয়ে নিরানন্দ জীবন: ঠিক যেন তাঁতটির মাকু, একবার এধার, তারপর ওধার এমনি! কার্ষ্টার যে বিয়ে হয়েছে সে কেবল তার খোঁপা বাঁধা থেকে বোঝা যেতো—কেন না কুমারী অবস্থায় তার চুল পিঠের ওপর

পড়ে থাকতো। ছুটির দিনে সরাইখানায় সে নাচতে যায় না—অথবা শনিবারের রাত্রে কোন যুবক তাকে চুরি ক'রে দেখতে আসে না। বালিকা-জীবনের প্রধান অংশ তার শেষ হ'য়ে গেছে, সেই পাড়ার ছেলেদের কথা ভাবা, তাদের জন্যে অপেক্ষা করা, সেই ছেলেদের জন্যে কাঁদা। এমন তার আর এখন কে ছিল যার সঙ্গে দুটো কথা কয়? মেয়েগুলো তাদের যুবকদের সম্বন্ধে কথা বলতো, স্ত্রীরা তাদের ছেলে, স্বামী, ঘরকন্নার কথা বলতো। কিন্তু কাষ্টার যে কোন রকমই ছিল না? সে বড় কাতর ও বিষণ্ণ হয়ে পড়লো। এক-এক দিন রাত্রে সে ঘুমোতে পারত না—কেবল এ-পাশ ও-পাশ করত। তার চার দিকে গভীর নিস্তব্ধতা। ছোট জানলার পরকলা দিয়ে শীতের তারা মিটমিট করত—সে তা'ই দেখতো। আশে-পাশের কুঁড়েঘরের প্রত্যেক শব্দটি তার কানে পৌঁছোতো। বিলির খোকা কেঁদে উঠলো। জেজ বাড়ী ফিরলো—মাতাল হ'য়ে, আঙিনার উপর হোঁচোট খেয়ে পড়ে গেল। তারপর সে বিলিকে মারছে—আর বিলি চীৎকার আর গালাগালি করছে। সব শোনা যাচ্ছে। কাষ্টা নিজেকে বড় একা মনে করতে লাগলো। তার কেন অমন সব নেই? সে যে তার স্বামীকে চায়—তার টোমকে। গাল বেয়ে তার চোখের জল পড়ে—সে বিছানার চাদর চিবোতে থাকে।

কিন্তু মোকর্দ্দমার ব্যবস্থা করতে হবে। ঐ কাজটি নিয়ে সে সম্পূর্ণ ব্যস্ত থাকলো—ওতেই তার সম্মান ও প্রাধান্য। চার ঘণ্টা ধরে পথ হেঁটে সপ্তায় সে একবার সহরে উকীলের বাড়ীতে যেতো। সে রাস্তার প্রতিটি গাছ, প্রতিটি পাথর চিনতো। যদি বেশী শীত না পড়তো তবে সে মোজা বুনতে বুনতে রাস্তা চলতো। প্রত্যেকেই এই ছোট মেয়েটিকে চিনতো। পথের ধারের কাঠুরিয়ারা তাকে চেঁচিয়ে ডেকে বলতো, "ওগো কাষ্টা, বলি-স্বামী ছাড়া হ'য়ে থাকাটা কেমন গা?" কাষ্টা থামতো, তারপর মুখ মুছে বলতো,—"বেশ তো, আর বেশ হবে না কেন শুনি?"

"টোম এখন ছ' বছর সেখানে থাকবে, বুঝলে?"

"থাকুক না কেন—আমার ভারি ব'য়ে গেল।"

এই শুনে ওরা হাসিতে বন কাঁপিয়ে তুলে বলতো, "হাঁ—হাঁ, ও একলা থাকতেই ভালবাসে। আচ্ছা, বলি মোকর্দ্দমার কত দূর কি হোলো?"

"চমৎকার চলছে। তোমার দিকে যদি সত্যিই ন্যায্য দাবী থাকে তবে তোমার ভাবার কারণ কি?"

"ও কথা আর বোলো না।"

সহকারী বনাধ্যক্ষের সঙ্গে প্রায়ই তার দেখা হোতো; বেশ সুন্দর ভদ্র যুবক, কালো কালো গোঁফ, কটা উজ্জ্বল চোখ, সবুজ জামা, রূপার ঘড়ির চেন তার বুকে। প্রত্যেক বারই সে কাষ্টাকে পথে থামিয়ে তার সঙ্গে ঠাট্টা করতো।

"বলি, হ্যাঁ গো সৈনিক-বধূ, কেমন আছ?"

কাষ্টা একটু লাল হ'য়ে উঠতো, তারপর তার দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে বলতো, "কেন, বেশ ভালই অবিশ্যি।"

"আর ওদিকে বউ না নিয়ে টোমেরও বেশ ভালই চলে যাচ্ছে, কেমন?"

"ও! যেখানে সে গেছে সেখানে কত পোল-মেয়ে ইহুদী-মেয়ে আছে?"

"ও:! আর বুঝি তোমার এদিকেও অনেক যুবক আছে?"

"আছেই তো চারি দিকে—"

"মাইরি বলছি, আমি যদি তোমার মত অমন আপেলের মত লাল টুকটুকে যুবতী হোতাম, তা' হলে কিন্তু এক বুড়ো সৈনিকের জন্যে বসে থাকতে আমায় দেখতে না।"

"বলি, বসেই বা আছে কে?" এই বলে কাষ্টা হেসে উঠতো—যেমন করে ঠাট্টা করার সময় কেউ হেসে ওঠে।

"ও, তবে তুমি বসে নাই? বেশ ত আমরা দু'জনে বেশ জোড়াটি হবো। তুমি যেন ছোট্ট চড়াই পাখী আর দেখ আমি কেমন লম্বা!"

"চ-ম-ৎ-কা-র!" এই বলে কাষ্টা চলতে থাকতো, "আসছে বছর এর একটা চুক্তি করা যাবে।" বাস্তবিকই, কাষ্টা জানতো কেমন ক'রে যুবকদের সঙ্গে রসালাপ করতে হয়। একদিন সেই অরণ্যাধ্যক্ষ যুবকটি চুমু খাবার জন্যে ওকে ধ'রে মাটিতে ফেলে দিলে, কিন্তু ও হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে এসেছিল। সারা দিন এই কথাটি ভেবে সে হেসেছিল। বাড়ীতে রাত্রিবেলায় শুয়ে সে দেখতে পেত সেই যুবকটির চোখ দুটো যেন তার সামনে। তারপর যখন সে শুনতে পেত যে ছেলেগুলো মেয়েদের জানালায় টোকা দিচ্ছে তখন সে অস্থির হ'য়ে উঠতো—ঘুমোতে পারত না।

বসন্তকাল এলে সহরে যাওয়া বেশ সহজ হ'য়ে দাঁড়ালো। বাড়ী আসতে সে বেশ সময় পেত—সন্ধ্যার সময়ও আলোয় আলো হ'য়ে থাকে সারা দিক। সে বড় আস্তে আস্তে চলতো, সত্যি বড় অদ্ভুত এই বসন্তের সন্ধ্যাগুলি, মানুষকে বড় আলসে ক'রে ফেলে—এমন আলসে যে মোকদ্দমার কথাও ভুলে যেতে হয়। ভারি মজা ত!

গাছে সব নূতন পাতা গজিয়েছে—যেন ওরা নীল ঘোমটা টেনে নিজেদের ঢেকে আছে। ওরই মাঝে সাদা সাদা চেরী ফুল ফুটেছে—নীল কাঁচুলিতে সাদা ফুটকি যেন, ওদের গন্ধ এক মাইল থেকে পাওয়া যায়। বনের পারে হরিণ চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে; কোন সুদূর পাহাড় বা ক্ষেতের ধার থেকে মেয়েদের গান ভেসে আসছে—এ গান কাষ্টা খুব ভালই জানে। এমন রাত্রে সমস্ত কুমারীবালাই যেন অর্দ্ধোন্মাদ হ'য়ে থাকে—ঘুমোবার চেষ্টা করে কোনও ফল নেই। কাষ্টা তা-ও ভাল রকম জানতো। সে-ও সারা রাত্রি জেগে বসেছিল হাঁটুর ওপর হাত দিয়ে—তারপর গান গেয়েছিল, রাত্রির স্তরে স্তরে ওর গান ভেসে চলেছিল; তারপর সে একটু অপেক্ষা করে,—যদি কেউ তার এতে উত্তর দেয়—যদি কেউ আসে! কেউ কি এসে তার ঠোঁটের উপর নিজের মুখ চেপে ধরবে না? বনের মাঝে চলতে চলতে কাষ্টা এইগুলি ভাবছিল—আর সে কান পেতে রেখেছিল যেন কোন শব্দ শুনতে।

একদিন বনের মাঝে কাষ্টা শুকনো পাতার মচমচানি শুনতে পেল। একটা হরিণ হঠাৎ লাফিয়ে বাইরে এসে ডেকে উঠলো—আবার মচ্ মচ্ শব্দ; সেই বনের কর্ত্তা যুবকটি ওর কাছে এসে দাঁড়ালো।

"ওগো ছোট্ট সৈনিকবধূ"—সে ডাকলে। আকাশের অনেক উঁচুতে চাঁদ উঠেছিল—তার আলোয় যুবকটির চোখ দুটি আর দাঁতগুলি ঝক্ ঝক্ করছিল—আবার পথের উপরে এসেছে সে!

কাষ্টা থামলো—ওর দিকে ফিরে তাকালো, তাকে সহরেই

আবার যেতে হয়েছিল—তা ছাড়া আর কি জন্যে এই বনের পথে আসবে বল ?

"বেশ সুন্দর রাতটি, বেড়ানোর পক্ষে"—

"হাঁ ভারী সুন্দর"—

যুবকটি হাসল—কাষ্টাঁর দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলো। কাষ্টাঁও চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকল। শেষে সে কাষ্টাঁর গলা জড়িয়ে বললে, "তুমি আর আমি, আমি আর তুমি এস।"

"কেন তোমার সঙ্গে আমার কি ?"—কাষ্টাঁ বললে একটু ঠাট্টার স্বরে, কর্কশ ভাবেই সে এই কথাটি বলতে চেয়েছিল যেমন ক'রে ছেলেদের সঙ্গে রসিকতা করতে গিয়ে বলতে হয়, কিন্তু কেমন যেন তার গলা কেঁপে গেল,—ওর গলার স্বর মিষ্টি হয়ে গেছে। তাকে রাস্তা থেকে বনে নিয়ে যেতে সে যুবকটিকে বাধা দিতে পারলে না—ওর কী হয়েছে! তার-পর গাছের তলায় গিয়ে যখন যুবকটি ওর মুখে বুকে আস্তে আস্তে চাপড় দিলে তার সেই ভারী গরম হাত দিয়ে, তখন কাষ্টাঁর মনে হোল এই যুবকটি তাকে নিয়ে যা-তা করলেও তার বাধা দেবার শক্তি নেই।

সকাল হোলো—অনেক আগেই বুনো হাঁস মাঠে গিয়ে ডাকতে সুরু করেছে; কাষ্টাঁ তাড়াতাড়ি গাঁয়ের দিকে চলল।···

এর পর থেকে কাষ্টাঁর সহর থেকে ফিরবার সময় প্রায়ই সেই যুবকটির সঙ্গে দেখা হ'তে লাগলো। ওর মা ওকে ধমকাতো—"এত দেরী ক'রে বাড়ী ফিরিস্ কেন লা ? মোকদ্দমা-মোকদ্দমা"—কাষ্টাঁ বলতো, "বাপ্‌, এ তো তোমার ডিম সেদ্ধ'র ব্যাপার নয় যে এর মত মোকদ্দমা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে!" মেয়েদের রাতের গান, ছেলেদের জানালায় টোকা দেওয়া আর কাষ্টাঁকে বিচলিত করতে পারে না।

ক্ষেত নিড়ানোর সময় কাষ্টাঁ অন্তঃসত্ত্বা হোলো। ব্যাপারটি বড় খারাপ হ'য়ে দাঁড়ায়—এখন সে কী করে? গোয়ালের মধ্যে সে ঢুকলো—কেউ যেন না তাকে দেখতে পায়, সেখানে খুব এক চোট কাঁদলে ঘণ্টা খানেক ধরে; তারপর আস্তে আস্তে কাজ করতে গেল। সেই বনের যুবকটির সঙ্গে তারপর দেখা হলে কাষ্টাঁ খুব রাগ ক'রে তাকে বকলো। কিন্তু তাতেই বা কি হবে ?

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সে কাজ ক'রে যেতে লাগলো। গ্রীষ্মের সমস্ত কঠিন কাজ সে করতে লাগলো, মার সঙ্গে-পিঠে থেকে, আর মোকর্দ্দমার জন্যে সহরে ঘন ঘন যাতায়াত করতে লাগলো। মোকর্দ্দমায় হেরে গেলে তার যে সর্ব্বনাশ হবে; টোম ফিরে এসে তাকে আর তার শিশুকে একবারে ঠেঙিয়ে মেরে ফেলবে। এই পেটের ছেলেটিকে নিয়ে কী করা যায়? তবে এমন তো হয় যে সন্তান জন্মায় আবার মরেও—অ... টোম ত অনেক দিনের ভেতর বাড়ী আস্‌ছে না; এ-সব সত্ত্বেও সে নিজের সন্তানটির ভাবনা না ভেবে থাকতে পারত না। তার একটা দোলা চাই, বিছানার জন্যে চাদর চাই; কেমন ধরণের সে হবে, সেই ছোট্ট শিশুটি গরম আর নরম তুলতুলে, তাকে বুকের ওপরে সে চেপে ধরবে, নিজের হাতে তার কচি মুখে মাইটি পুরে দেবে—আর সে হাত-পা নাড়তে থাকবে। না, না, এ-সব ভাবনা কেন, সে যেন মরে যায় এই যে তার কামনা।

আলু তোলার সময় সে আর চেপে রাখতে পারলে না। আস্তে আস্তে সে নিজের ক্ষেতের ধারে গিয়ে কোমর নীচু করে আলু তুলতো—আর আঁচলে রাখতো সেগুলো। সে শুনতে পেলে বিপ্লি বল্‌ছে পেছনে—"টোম বাড়ী ফিরলেই কাষ্টাঁর কাছ থেকে একটি উপহার পাবে। মা গো, আচ্ছা এতে সে খুসী হবে না ?" অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা হো-হো ক'রে হেসে উঠলো—তাদের হাসির রোল সারা মাঠে ছড়িয়ে পড়লো। কাষ্টাঁ মনে মনে ভাবলে, "এমন যে হবে তা তো জানতাম—আর এখন তাই হচ্ছে।" তার হাঁটু কেঁপে গেল—ছড় ছড় করে সমস্ত আলু তার কোঁচড় থেকে পড়ে গেল। সোজা হয়ে দাঁড়াল সে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে—যেমন ক'রে কোণ-ঠেসা অসহায় জন্তু তার শত্রুর দিকে তাকায় তেমনি ভাবে। তারপর আবার ঝুঁকে পড়ে নিঃশব্দে কাজ ক'রে যেতে লাগলো। তার প্রতি বিদ্রূপের আর অন্ত ছিল না। কাষ্টাঁকে যখন আলু নিয়ে গাড়ীতে বোঝাই করতে যেতে হোলো, মনে হোলো যেন সে আগুনের ভেতর দিয়ে হাঁটছে। বলি ও কাষ্টাঁ, এমন জিনিষটি তৈরী করালে কাকে দিয়ে বল ত? সহরে গিয়ে না কি? হাঁ, সহরে এ-সব জিনিস বেশ সস্তাতেই মেলে বটে। আমরা ভাবছি বুঝি মোকদ্দমা থেকে এই জিনিষটি পেয়েছ, না টোম ডাক-মারফৎ পাঠিয়েছে?" কাষ্টাঁ এর কি উত্তর দেবে? সে চুপ ক'রে থাকে, এমনই খানিকক্ষণ ঠাট্টা ক'রে ওরা আবার সবাই চুপ-করে যায়। মার পর্য্যন্ত বিষ-নজরে সে পড়লো—তার মা সারা দিন তাকে বকতো। তাতে আর কি হবে। "যা হ'বার তা তো হ'য়ে গেছে"—কাষ্টাঁ মনে মনে ভাবে,—"মোটের উপর জীবন বড় কষ্টের! এখন থেকে ও আর এ-সব ব্যাপার নিয়ে মনের কষ্ট ভোগ করবে না।"

শীতের একটি দিনে কাষ্টাঁ কাঠ কুড়োতে গিয়েছিল,—হঠাৎ তার পেটে ব্যথা ধরলো। অন্য স্ত্রীলোকেরা তাকে একখানা শ্লেজে চাপিয়ে চীৎকার করতে করতে বাড়ী টেনে নিয়ে এল। কাষ্টাঁর একটি মেয়ে হোলো। সন্তান তো হোলো কিন্তু তার মরার কোন লক্ষণই দেখা গেল না; বরং বেশ নাদুস্ নুদুস্ গোলগাল মেয়েটি—কটা তার চোখ দুটি। কাষ্টাঁর সন্তান হয়েছে এ ব্যাপারটা গাঁয়ের লোকের গা-সওয়া হ'য়ে গেছে—ও নিয়ে আর তারা ঠাট্টা করে না। এখন কাষ্টাঁর জীবনে মোকর্দ্দমার ব্যাপার ছাড়া আরও কাজ জুটলো। অবশ্য মোকদ্দমা খুবই দরকারী সন্দেহ নেই, কিন্তু শিশুটির তার মাকে প্রয়োজন সারাদিন ধরেই। তাকে দোলাতে হবে, পরিষ্কার ক'রে দিতে হবে, গরম-সন্ধ্যায় তাকে কোলে নিয়ে দোর-গোড়ায় বসে গাইতে হবে—আয়—আয়—আয়!

টোম লিখেছিল,—"প্রিয় কাষ্টাঁ, ব্যাপার সব খারাপ হয়েছে তাই তোমাকে চিঠি লিখছি। আমি পীড়িত হ'য়ে পড়েছি। আমাকে তাই বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আসছে সপ্তাহে আমি বাড়ী ফিরবো। সাবধানে থেকো। ইতি—তোমার স্বামী।"

আগুনের আলোয় অতি কষ্টে কাষ্টাঁ চিঠিখানি পড়লে। "কি লিখেছে?" তার মা জিজ্ঞেস করলে। "কি আর লিখবে!" কাষ্টাঁ উত্তর দিলে। আগুনের ধারে বেঞ্চির ওপর শুয়ে পড়লো—তার যেন শীত-শীত করছে। তার মা আবার জিজ্ঞেস করলে, "ভাল আছে ত?" কাষ্টাঁ কিছুই বল্‌লে না—আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকলো।

"উত্তর দিচ্ছিস্ না কেন লা? বল্‌তেই হবে তোকে।"

"সে ফিরে আসছে"—শুকনো গলায় কার্ষ্টী বললে।

কার্ষ্টী তখন ভাবছে, যদি সে ফিরে এসে খুকিটিকে না মারে। তার মার মনেও এই ভাবনা এসেছিল। সে বললে, "খুকির দোলাটি এমন জায়গায় রাখতে হবে যাতে তার চোখের ওপর না থাকে।" হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা ত করতেই হবে। পাশাপাশি দু'জনে অনেকক্ষণ বসে থাকলো, দু'জনের মুখ থেকে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল; তারা শোবার জন্য উঠলো। বিছানায় গিয়ে তার মা বললে, "মোকর্দ্দমা ঠিক চলছে ত' রে?"

"তা কেন চলবে না শুনি?"

"বেশ, আচ্ছা, তা হলে—'

শনিবার বিকেলে কার্ষ্টী সরাইখানার সামনে দাঁড়িয়েছিল স্লে-গাড়ীর অপেক্ষা ক'রে—যাতে চেপে সেই সদ্য-অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকটি সহর থেকে আসবে। ভয়ানক শীত পড়েছিল। কাচের মত আকাশে সূর্য্য লাল হ'য়ে অস্ত যাচ্ছিল। গ্রামের সমস্ত স্ত্রীলোক সরাইখানার সামনে এসে জুটেছিল। আঁচলে তাদের হাত ঢেকে নাকটি মোচড় দিয়ে মুছে তারা রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল। ঐ যে সৈনিকদের দেখা যাচ্ছে; তারা টুপি উড়িয়ে চীৎকার করতে করতে আসছে।

কার্ষ্টীর সামনে দাঁড়িয়ে টোম বললে—"বাঃ, তুমি তো সেই ছোট মেয়েটিই আছ!—তোমাকে বেশ চমৎকার দেখাচ্ছে তো!" কার্ষ্টী লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো; টোম যে এমন বড় সড় হ'য়ে উঠেছে তা সে ভুলেই গিয়েছিল। লজ্জায় সে কেমন জড়সড় হ'য়ে পড়লো।

মুচকে হেসে কার্ষ্টী বলে,—"কেন দেখাবে না শুনি!" কিন্তু তার চোখে জল এসে পড়লো—সে টোমের জামার হাতা চাপড়াতে লাগল। আবার বলে,—"খাবার তৈরী যে, চল।"

"খাবার—হুঁ হুঁ" টোম বেশ হালকা ভাবেই হেসে উঠলো। "আমাকে ও খাওয়াতে চায় পেট ভ'রে, ও আমাকে বড় রোগা দেখছে বুঝি!" তারপর তারা বাড়ীর দিকে চলে, টোম আগে আগে, কার্ষ্টী তার পিছনে।

কুঁড়েঘরটির ভিতরটা দুটি মোমের বাতিতে আলোকিত ছিল। সাদা কাপড় দিয়ে টেবিলটি ঢাকা, পাইন গাছের ছুঁচের মত পাতায় ঘর বিছানো। মা এ্যান্‌লিজ্ আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে ঝোলের পাত্র নাড়ছিল।

"এই যে মা দেখছি, এখনও বেঁচে আছেন? বুড়ো হাড়গুলো এখনো টিকে আছে যে!"—টোম বললে।

"হাড়গুলো আর কিছু দিন টিকবে বাছা! তোমাকে ফিরতে দেখে বড় ভাল লাগলো।"

টোম টেবিলের ধারে বসতে তাকে মাংস বেড়ে দেওয়া হোলো। আস্তে আস্তে সে খাচ্ছিল—প্রত্যেক গ্রাস বেশ যত্নের সঙ্গে চিবিয়ে চিবিয়ে, তার পর কার্ষ্টীর দিকে তাকিয়ে খাবার মুখেই বললে, "হুজুরের জমিদারণী!" কার্ষ্টী তার সামনেই বসেছিল কোলের উপর হাত রেখে। ভাবছিল, কি মজা, কী সুন্দর এই মানুষটি দেখতে, টোমের মুখখানি এমন পোড়া-পোড়া মনে হচ্ছিল যে, গোঁফজোড়াটি প্রায় সাদা দেখাচ্ছিল কিন্তু ওর কাঁধ, ওর বাহু, ওর গলা দেখবার মত বটে! শক্তিমান্ স্বামী পাওয়া বড় ভাল।

প্রথম ক্ষিদের চোট নিবৃত্তি ক'রে ফেললে। হাতের উল্টো পিঠে গোঁফটি মুছে চেয়ারে হেলান দিলে। বললে, "এইবার মোকর্দ্দমার কথা শুনি!" কার্ষ্টী বলতে আরম্ভ ক'রে বেশ গম্ভীর ভাব ধারণ করলে। সে কী করেছিল আর বলেছিল উকিল কি বলেছিল এই সব সে বলতে লাগল—যেন তার আর শেষ হবে না। জমি-জমাগুলি যে তার দখলে আসবে তা নিশ্চিত। একাগ্রচিত্ত হ'য়ে টোম সব শুনলে। "বহুৎ আচ্ছা। এই ছোট মেয়েটির কতখানি মাথা।" এই শুনে কার্ষ্টী আরও আগ্রহের সঙ্গে বলছিল। হঠাৎ দূরের কোণ থেকে একটি অস্ফুট কান্নার ধ্বনি শোনা গেল। কার্ষ্টী গল্প শেষ না ক'রেই কলের মত উঠে দাঁড়াল, দোলাটির কাছে গেল, নিজের গায়ের জ্যাকেটটি খুলে মেয়েটিকে বুকে তুলে নিয়ে স্তন্য দিতে লাগলো। সে সেখান থেকেই আর একটু জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, তারপর হঠাৎ বলতে বলতে মাঝখানে থামলো। তার মা আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল। কার্ষ্টী ভাবলে, আমি এখন প্রস্তুত। টোম মুখটি বাড়িয়ে আস্তে আস্তে কার্ষ্টীর কাছে আসছিল; যেন কিছু ধ'রে ফেলবে এই ভেবে কার্ষ্টী তখন চট ক'রে মেয়েটিকে দোলায় রেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখ ফ্যাকাসে—নীচের ঠোঁটটি দাঁত দিয়ে কামড়াচ্ছে, গোল গোল চোখ ভয়ার্ত্ত প্রাণীর মত বিস্ফারিত হ'য়ে গেল। তার হাত এত কাঁপছিল যে, সে হাত দিয়ে তার পেট চেপে ধরলে। তারপর অপেক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে রইল এইবার—এইবার, যা হোতোই তা হ'তে চলেছে।

ওটা কি?—টোমের গলা নীচু—যেন কে তার গলা টিপে ধরেছে। কি মনে হয়?

"কোত্থেকে এ শিশুটি এল, এ্যাঁ?"

"এ শিশুটি?—কোথা থেকে আর আসবে শুনি?"—একটু জোর ক'রে এই কথাগুলি সে বলে ফেললে; তারপর চোখে দুই হাত দিয়ে শিশুর মত চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল—যেমন কোনও শিশু দুষ্টামী ক'রে ধরা পড়ে গেলে কাঁদে। "ও, তা' হলে এমনি ধরণের তুমি?"—তার হাতের কব্জি ধরে ঘরের মাঝখানে টেনে আনলে। "স্বামীর সঙ্গে চালাকি খেলেছিস্, হারামজাদী; তোকে আর তোর পেটের ওটাকে আজ মেরেই ফেল্‌বো!"

টোম নির্দ্দয় ভাবে কার্ষ্টীকে মারতে আরম্ভ করলে। আর সে চীৎকার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে নিজেকে বাঁচাতে লাগলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবছিল, "ওঃ, এর হাতের কব্জি যেন লোহা, বাপ রে কি জোর গায়ে! আমাকে মেরেই ফেলবে।" যদিও ভয়ানক মার খাচ্ছিল তবুও সে যেন একটু খুসী না হ'য়ে পারছিল না। এ সবের ভেতরে দিয়েও তার মনে হ'তে লাগল তার একটি স্বামী আছে।

টোম হাঁপিয়ে পড়েছিল। গালি দিয়ে তার স্ত্রীকে এক ধাক্কা দিয়ে দূরে ফেলে দিলে—তার গায় থুতু দিলে, তারপর আবার টেবিলে এসে বসল। যন্ত্রণা অনুভব করতে করতে কার্ষ্টী মেঝের ওপর পাথরের মত পড়ে রইল। আড়-চোখে টোমকে দেখতে লাগলো। আর মারবে নাকি? কিন্তু চুপ ক'রে বসে থেকে তার ওপর মনোযোগী না হওয়ার চেয়ে বরং মার খাওয়া ভাল—কার্ষ্টী ভাবলে। কষ্টের সঙ্গে কার্ষ্টী মাটি থেকে উঠে আগুনের ধারে বেঞ্চের ওপর বসে

পড়ল, আর আহত জায়গায় হাত বুলোতে বুলোতে আস্তে আস্তে কাঁদতে লাগলো।

বাতি পুড়ে পুড়ে ছোট হ'য়ে এসেছিল। শক্ত বরফের কুচি জানলার পরকলার গায় এসে পড়ছিল—খচ-খচ। মাঠের মাঝখানে ঝিঁঝিঁপোকারা আনন্দে গান সুরু ক'রে দিয়েছিল। কাষ্টাঁ তখন ভাবছে, "আচ্ছা, ও আর কী করবে? আজ রাত্রে আবার মারবে নাকি আমায়?" কিছু ব্র্যাণ্ডী পান ক'রে টোম হাই তুললো,—তারপর জুতো খুলতে লাগলো। কাষ্টাঁ তখন উঠে গিয়ে তার পায়ের জুতো খুলে দিল। তারপর টোম কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো—বিছানাটি ক্যাঁচ-কোঁচ ক'রে উঠলো, তার ভারে যেন ভেঙে যাবে। কাষ্টাঁ না হেসে থাকতে পারেনি। বেশ ভারী মানুষটি বটে! বাতি নিবিয়ে দিয়ে সে আগুনের ধারে গিয়ে বসে পড়লো। আগুনের কম্পিত স্তিমিত শিখা ঐ মেয়েটির ছোট দুটি পায়ে লাল আভা ছড়িয়ে দিয়েছিল—আর সে সেখানে স্থির হ'য়ে বসে কত কি ভাবছিল,—তার স্বামীর প্রত্যেক নিঃশ্বাসটি সে শুনছিল।

"তুমি", হঠাৎ এই কথাটি বিছানা হতে আসতে কাষ্টাঁ ভয় পেয়ে চমকে উঠলো। "তুমি ওখানে বসে আছ কেন? বিছানায় আসবে না?"

"না গিয়ে করবো কি?" কর্কশ স্বরে কাষ্টাঁ উত্তর দিলে। কিন্তু বিছানার নিকট যেতেই সে যেন মনের মাঝে কেমন একটা উত্তাপ অনুভব করলে। এখন হ'তে সে-ও অন্যান্য স্ত্রীদের মতই!

দিন কতক এই কুটীরের জীবনযাত্রা বড় অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। তার প্রতি অবিচারের জন্য টোমের রাগ মাঝে মাঝে জ্বলে উঠতো; তারপরই মারের শব্দ ও কান্নার আওয়াজ। সরাইখানায় বসে সে প্রতিজ্ঞা করলে যে তার স্ত্রী আর সন্তানটিকে সে ঠেঙিয়ে মেরে ফেলবে। শিশুটিকে সর্বদাই টোমের কাছ থেকে আড়াল ক'রে রাখতে হোতো। কাষ্টাঁ প্রশান্ত ভাবেই বলতো—"ও সব ঠিক হ'য়েই যাবে। মন্দ মানুষগুলো অমনধারা চিরকাল; এর আর নড়চড় হবে না।"

বাস্তবিক, সময় যত যেতে লাগলো, টোম শিশুটির কথা আর বড় বেশী না কয়ে মোকর্দ্দমার কথাই কইতো বেশী। স্বামি-স্ত্রীতে পরামর্শ চলতো কয়টা গরু, কয়টা শূয়োর তারা পুষতে পারবে ছোট গোলাবাড়ীতে; তা' ছাড়া আর কত কথাই হোতো। টোম শিশুটির কথা ভুলে গেল, আর ওর দিকে নজর দিত না, কিংবা দোলার কাছ দিয়ে যাবার সময় থুথ ফেলত না; না লুকিয়েই কাষ্টাঁ তার মেয়েটিকে স্তন দিতে পারতো।

কাজের বিলি-ব্যবস্থা করার জন্যে সহরে যাওয়া দরকার। টোম মনে করলে—কাষ্টাঁ অবিশ্যি বেশ চালাক-চতুর ছিল, কিন্তু আসল মাথার কাজে মদ্দা মানুষেরই দরকার।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তুমি ও-সবের ব্যবস্থা না করলে আর করবে কে?"—কাষ্টাঁ বললে।

গাড়ী নিয়ে টোম চলে গেল। সন্ধ্যার পরে ফিরলো—মাতাল অবস্থা কিন্তু ভারী ফুর্ত্তির সঙ্গে। মোকর্দ্দমায় জয় হয়েছে।

"এখানে এস গো, ও গিন্নী"—এই বলে সে ঢুকলে, এই দেখ, কি এনেছি তোমার জন্যে।" সে একখানি লাল রুমাল কাষ্টাঁর মাথায় উপর রাখলে। "একটু সুন্দর হওয়ার দরকার তো?"

"হ্যাঁ গো রুমাল? কি জন্যে আনলে গা?" এই বলে কাষ্টাঁ হাসলে।

"ও কেন না"—এই বলে ওদিকে ফিরে টম যেন একটু বিব্রত হ'য়ে পড়লো, তার পর টেবিলের উপর একখানি সাদা রুটি ছুঁড়ে ফেলে দিলে "আর ওটা—ওটা—ঐ ওটা কিনেছি সে ওর—ওর জন্যে—"

"কার জন্যে?"

"ঐ যে—ঐ মুখপুড়ীটার জন্যে।"

কাষ্টাঁ রুটিখানি তুলে নিয়ে বুকে আস্তে আস্তে চেপে ধরলে। ভাবলে, এইবার থেকে বোধ হয় তার জীবনে একটু ভাল সময় আসছে।

নীলগিরির চূড়া

দুর্গাদাস সরকার

দেখেছি আমি দু'চোখে চেয়ে নীলগিরির চূড়া।
হাওয়ায় দোলা নীল আকাশ বুকের কাছে তার,
সেই আকাশ গলায় তার জ্বালে তারার হার—
সাগর-জলে দিনশেষের সূর্য্য হোলে গুঁড়া।
দেখেছি আমি দু'চোখে চেয়ে নীলগিরির চূড়া।
নীলগিরির চূড়ায় মন সকলে রাগে বেঁধে।
সকাল থেকে বিকেল পাখী খাবার খুটে খুটে
চোখের ছায়া গাঢ় হোলেই এখানে আসে ছুটে।
সময় কেউ কাটায় না তো এখানে কেঁদে কেঁদে।
অনেক যুগ পড়েছে ধরা, অনেক ইতিহাসে।
কেউ মরেছে যুদ্ধে, কেউ এনেছে মহামারী!
সুদূর এই দক্ষিণেই প্রতিবাদেই তারি
শান্তি আছে ছড়ানো আজো নীলগিরির ঘাসে।
বলতে পারি: এখানে এলে প্রাণের সাড়া মিলে;
ভালোবাসাও গভীর হতে হয় গভীরতর;
নিজের চেয়ে অপরিচিত জনেরে দেখে বড়ো;
এখানে কোনো বিভেদ নেই ব্রাহ্মণে ও ভীলে।
উত্তরের পুরুষ আর দক্ষিণের নারী—
ঘর বেঁধেছে, বাঁধবো ঘর নীলগিরির বুকে;
তারপরেই ছড়িয়ে হাওয়া শুধু মিলন-সুখে
পূর্ব্ব আর পশ্চিমকে মিলিয়ে দিতে পারি।
নীলগিরির চূড়ায় নেই অবসাদের সাধ।
নীলগিরির মেঘ গিয়েছে দিগ্বিদিকে ছুটে
মলিন মন মলিন মাটি বৃষ্টি দিয়ে ধুতে
সেই বৃষ্টি নীলগিরির ছড়াবে সংবাদ!
নীলগিরির চূড়ায় নেই অবসাদের সাধ!!

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীবারি দেবী

দীর্ঘ এক বছর কেটে গেছে। ভাঁড়ারঘরের জানলাটা প্রথম প্রথম বন্ধই রেখে দিতাম। ওদিকে চাইলেই চোখের সামনে ভেসে উঠতো কয়েকখানি রঙ্গীন ছবি। মিত্র সাহেব আর ভায়োলেটের প্রেমের ছবিগুলো যেন আঁকা রয়েছে অন্তর-পটে। তার উপহার-দেওয়া আতরটি খুললেই, সেই হারানো দিনের স্মৃতিগুলো মনের মাঝে ভিড় জমাতো। ধীরে ধীরে সয়ে গেল সব। আবার জানলা খুলি, তবে দুপুরের আসর আর জমে না।

আমার ছোট মামা ভাগলপুরে থাকতেন। সম্প্রতি মেয়ের বিয়ে দিতে এসেছেন কলকাতায়। ঐ একটি মাত্র মেয়ে সুজাতা। বেশ সুন্দরী মেয়ে, আই-এ পড়ে। আজ তার বিয়ে। নেমন্তন্ন রাখতে গেলাম তাদের গড়িয়াহাটার বাড়ীতে।

বর এসেছে। সুসজ্জিত বাড়ী। চার ধারে আনন্দের হুল্লোড় বয়ে চলেছে। বরকে আনা হোল ছাঁদনাতলায়। কনেকে আনা হচ্ছে। বরণের মাঙ্গলিক দ্রব্য হাতে আমরা সাত পাক প্রদক্ষিণ করলাম। স্ত্রী-আচার চলেছে। কড়ি দিয়ে কেনা, দড়ি দিয়ে বাঁধা শেষ হয়েছে, এবার মাকু হাতে নিয়ে ভ্যা করার পালা। বর কিছুতেই ভ্যা করছে না, সেই জন্যে নারী দলের চলেছে সুমিষ্ট উৎপীড়ন। আমিও এগিয়ে এসেছি সেই অভিপ্রায় নিয়ে। উজ্জ্বল আলোতে বরের মুখ দেখে যেন বিদ্যুতের শক খেয়ে থেমে গেলাম। এ কি? আমি কি ভূত দেখছি না কি! না না! চোখের ভুল নয় তো? সেই মুখ, সেই চোখ, আর ডান দিকের গালে সেই বড় আঁচিলটা ঠিক তেমনিই আছে। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত আমার তখনও চলেছে তড়িৎ-প্রবাহ। চোখের সামনে নিবে গেছে যেন সব আলো! থেমে গেছে উৎসব-কোলাহল। কে কাঁদছে ও?······ভায়োলেট? মুখ দিয়ে আমার অতর্কিতে ঐ নামটি উচ্চারিত হোয়ে গেল। বর চমকে উঠে ফিরে চাইলো আমার পানে। মুহূর্ত্তের মাঝে মুখখানি তার বিবর্ণ হোয়ে গেল। চোখে ফুটে উঠেছে অদ্ভুত একটা আতঙ্কের চিহ্ন! পর মুহূর্ত্তে সে সামলে নিল নিজেকে। মেয়েদের ভেতরেও যেন এসেছে একটা বিশৃঙ্খল ভাব। তারা রসিকতার ছিন্ন সূত্রটি আর খুঁজে পায় না। এমন সময়ে কনেকে নিয়ে আসা হোল। আমি আর দাঁড়ালাম না সেখানে, ওপরে গিয়ে একটা নির্জ্জন ঘর বেছে নিয়ে পাখাটা জোরে চালিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম, নিজেকে প্রকৃতিস্থ করবার জন্য।

সে রাত্রে মামা-মামীমা আমাকে বাড়ী ফিরতে দিলেন না। বাসরে গান গাইতে হবে। প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাসরে যেতে হোল। গানও একটা গাইতে হোল। কিন্তু সে গান হোল কান্নার রূপান্তর। নিজের কাছে নিজেই দারুণ লজ্জা বোধ করি। এ আমি কি করছি? এক জনের সঙ্গে কি আর এক জনের সাদৃশ্য থাকে না? মিত্র সাহেব তো এ জগতে নেই! তাঁর সঙ্গে এঁর চেহারার সাদৃশ্য খুবই থাকলেও, তিনি আর এ এক ব্যক্তি হবে কি করে? যুক্তির জোড়া-তালি দিয়ে মনের কাটা-ছেঁড়াগুলো ঢাকবার চেষ্টা করছি।

তখন নারীবাহিনী বরকে ঘিরেছে গান গাওয়াবার জন্য। একটি মেয়ে নাছোড়বান্দা হোয়ে বলে ও সুদর্শন বাবু, আপনার ভেতর তো গানের ফোয়ারা আছে শুনছি! তার কলটা একবার খুলে দিলে, যদি এতগুলো প্রাণী আনন্দ পায়, তাতে আপনি এত নারাজ হচ্ছেন কেন?

সুদর্শন বাবু এবার মুখ খুললেন।—কি গান শুনবেন? আদেশ করুন।

আমি একবার স্থির দৃষ্টিতে তাঁর পানে চেয়ে দেখলাম। মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল। বললাম—আপনি লক্ষ্ণৌ-ঠুংরী জানেন?

সুদর্শন বাবু তির্য্যক দৃষ্টিতে চাইলেন আমার দিকে। চোখ নয় যেন দুটি সার্চ্চলাইট। তার অনুসন্ধানী আলোক পাত করে তিনি যেন পাঠ করতে চান আমার অন্তস্থল। ঠোঁটের কোণে খেলে গেল তাঁর রহস্যভরা হাসির ঝিলিক। হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে তাতে সুর দিয়ে আরম্ভ করলেন গান, লক্ষ্ণৌ-ঠুংরী।

চোখের সামনে আমার মুছে গেল উৎসব-মুখরিত বাসর-ঘরের বাস্তব দৃশ্যগুলো। মানস-পটে ভেসে উঠলো সেই রাতের ছবিখানি। মিত্র সাহেব তানপুরা নিয়ে গাইছেন লক্ষ্ণৌ-ঠুংরী, পাশে বসে আছে রূপসী ভায়োলেট। সামনে পানপাত্রে রঙিন সুরা টলমল করছে। গোলাপ, আতরের গন্ধে বাতাস ভরপুর। সেই গান! সেই সুর! সেই কণ্ঠ! আমার সকল সন্দেহের অবসান হোল।

সুদর্শন বাবুর গান থেমে গেছে। সকলের মুখে এক বাক্য ধ্বনিত হচ্ছে—চমৎকার! আমি শুধু বিহ্বল ভাবে চেয়েছিলাম গায়কের মুখের পানে। সুদর্শন বাবু মৃদু হেসে আমাকে লক্ষ্য কোরে বললেন—আপনি তো কিছু বললেন না, এই গানখানাই তো শুনতে চেয়েছিলেন? তবে গানের ভাষাটা বড় জটিল, মর্ম্মার্থ যদি বুঝে থাকেন, তাকে দয়া করে সর্ব্বজনীন করবেন না আশা করি! চোখে তাঁর মিনতি-ভরা চাউনি।

মুহূর্ত্তের মাঝে নিজেকে স্থির করে ফেললাম। পরিহাস-ভরা কণ্ঠে বললাম—অপূর্ব্ব গান! মর্ম্মার্থ নিজেই পরিষ্কার বুঝলাম না, অপরকে কি করে বোঝাবো? আপনার গানের দুর্ব্বোধ্য ভাব শুধু আপনার জন্যেই রইলো। আর পারেন তো সুজাতাকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন।

বাকী রাতটা কেটে গেল হাল্কা পরিহাস, হাসি ও গানের মাঝে। নব জামাতার পরিচয় জানলাম—নয়নপুরের জমিদার বিশ্বরূপ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র সুদর্শন চৌধুরীর সাথে সুজাতার আলাপ হয় ভাগলপুরে একটি গানের জলসায়। আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠতায়, পরে বিবাহে পরিণতি লাভ করল। পাত্র-পাত্রীর পিতা-মাতার আপত্তির কোনও কারণ ছিলো না। কারণ সম্পত্তি, রূপ, বিদ্যা উভয় পক্ষেরই ছিলো, স্বঘরও বটে।

মাস খানেক পরে—একখানি রেজিষ্ট্রি-করা চিঠি পেলাম। ভাবি

অবাক লাগল। কার চিঠি? এরকম চিঠি লেখবার মত কে আছে? দুরু-দুরু বক্ষে চিঠিটা খুলে পড়তে সুরু করলাম।

"চাঁদবিবি!

মিঞা সাহেবকে চিনতে ভুল হয়নি আপনার। সেদিন আপনার ধৈর্য্য ও সৌজন্যতার পরিচয় মুগ্ধ করেছে আমাকে। যে গভীর শ্রদ্ধা জেগেছে অন্তরে, সেই শ্রদ্ধা আজ আমার সকল গোপন রহস্য আপনাকে জানাতে বাধ্য করছে।

আমার পিতার নাম কুমার বিশ্বরূপ চৌধুরী। তাঁর দুটি বিবাহ ছিল। বড়মার একটি ছেলে ও আমি ছোটর একমাত্র সন্তান। আমাদের সম্পত্তি ছিল দেবোত্তর; এবং তার এই নিয়ম ছিল যে— বংশের বড় ছেলে হবে দেবতার সেবাইত, অর্থাৎ একমাত্র মালিক। বাকী ছেলেরা একটা মাসোহারা পাবে। সে যেন শৈশব কাল থেকেই দেখে আসছি, আমার দাদা দেবরূপের সম্মান আমার চেয়ে অনেক বেশী। সকলে তাকে সম্বোধন করত 'কুমার-সাহেব' বলে। এর জন্য আমার মনে চাপা অসন্তোষ যেন দিনে দিনে প্রবল ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছিলো। আমার মায়ের সতর্কতা ও সৎ উপদেশের জন্য সেটা সম্ভব হোতো না। তবে আমার দুটি ঈশ্বরদত্ত অমূল্য সম্পত্তি ছিলো। সে হচ্ছে আমার রূপ ও সুরেলা কণ্ঠস্বর, যা আমার দাদার ছিলো না। সেজন্য তার কোনও অসুবিধা বা ক্ষোভ ছিলো না, আর—সে মানুষ হিসেবে খুব ভালো লোক ছিলো। আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতো, কিন্তু শুধু নির্জ্জলা ভালবাসাতেই আমার মন ভরত না। দাদাকে প্রায়ই টাকার জন্য উৎপীড়ন কোরেছি।

আমার সুকণ্ঠ ছিলো বলে একজন বিখ্যাত মুসলমান ওস্তাদকে নিযুক্ত করা হোয়েছিলো আমাকে সঙ্গীত শিক্ষা দেবার জন্য।

আমার যখন কুড়ি বছর বয়স, সবে বি-এ, পাশ করেছি, সেই সময়ে হঠাৎ আমার মা মারা গেলেন। এর পর বাড়ীতে আর আমার কোনও আকর্ষণ না থাকায়, ক্রমশঃ আমার মন বহির্মুখিন হোয়ে পড়তে লাগলো। নিত্য-নতুন স্ফূর্ত্তির উপচার ও উপাদান জোগাড়েরও অভাব ছিলো না। একদিন ওই কারণে বাবা আমাকে যথেষ্ট তিরস্কার করে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, ষ্টেট থেকে তোমাকে আর এক পয়সাও দেওয়া হবে না, যত দিন না তোমার স্বভাব সংশোধন করতে পার। দারুণ লজ্জায়, ঘৃণায় সেদিন রাতের অন্ধকারে দেশ ছেড়ে চলে গেলাম লক্ষ্ণৌয়ে। সেখানে আমার বৃদ্ধ ওস্তাদজীর বাড়ী। তাঁর কাছে গিয়ে বাস করতে লাগলাম। আত্মগোপন করে নাম নিলাম নুরুল মিঞা। মরিস্ কলেজে তখন একজন সঙ্গীতজ্ঞ শিক্ষকের অনুসন্ধান চলছিলো। ওস্তাদজীকে ধরে ঐ কাজটি আমি পেলাম।

বেশ দিন কেটে যাচ্ছিলো—গান শেখাই, স্ফূর্ত্তি করে ঘুরে বেড়াই। বাড়ীর কথা মনেও পড়ে না। সংবাদপত্রগুলোতে মাসের পর মাস নিরুদ্দেশ-পৃষ্ঠায় আমার নাম, পরিচয়, ফিরে এস, ছাপা হতে

লাগলো, অনেক টাকা পুরস্কারও ঘোষণা ছিল যে খবর দেবে তার জন্য।

এক বছর নির্ব্বিঘ্নে কেটে গেল। সেদিন কলেজে এক অপরূপ রূপসী নবাগতাকে দেখে আমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম তার দিকে, সে-ও কয়েক বার চেয়ে দেখল আমাকে। ক্রমে পরিচয় হোল, নাম তার সেলিমা। বিখ্যাত জমিদার ও ব্যবসায়ীর কন্যা। শুনেছি মোগলরাজরক্ত ওদের ধমনীতে বর্ত্তমান। আগে এদের মুখ চন্দ্রসূর্য্যও দেখতে পেতেন না কিন্তু সম্প্রতি বোরখা ও কুসংস্কারগুলোকে বর্জ্জন করে এঁরা বাইরের আলোতে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাবা ও মা কয়েক বার ইউরোপ ঘুরে এসেছেন। ছুটি পুত্র, কন্যা সেলিমা আর ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়াসুদ্দিনও গিয়েছিলো তাঁদের সঙ্গে।

আমাদের পরিচয় ক্রমে প্রগাঢ় প্রেমে পরিবর্ত্তিত হোল। তার কি সম্মোহন শক্তি ছিল জানি না, সে সময়ে তার সাহচর্য্য লাভ করে আমি সমগ্র বিশ্বকে ভুলে গিয়েছিলাম। আমার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হোয়ে তার সান্নিধ্যে একনিষ্ঠ ভক্ত ও প্রেমিকরূপ ধারণ করেছিলো। ক্রমে তার বাড়ীতেও আমার যাতায়াত সুরু হোল। ওর মা-বাবা আমাকে খুব পছন্দ করতেন, তবে ওর খুড়তুতো ভাই গিয়াস আমাকে ভাল চোখে দেখত না। কারণ, সেলিমাকে তারই পাবার কথা ছিলো। ওরা জানতো আমার দেশ বাংলায়, মা-বাবা কেউ নেই। কিন্তু মুসলমান আচার-ব্যবহারে দুরস্ত হোয়ে উঠেছিলাম আমি, হিন্দু বলে সন্দেহ করবার কোন কারণও ছিল না।

আরও এক বছর কেটে গেছে। সেদিন সেলিমা ওর বাবাকে জানালো, সে আমাকে বিয়ে করতে চায়। ওর বাবা হঠাৎ কোনও জবাব দিতে পারলেন না। যতই আলোকপ্রাপ্ত হোন না কেন, একটা বংশ-মর্য্যাদাহীন অখ্যাত যুবককে কন্যাদান করবার মত মনের উদারতা লাভ করতে পারেন নি তিনি। তাঁর স্ত্রী তো একেবারেই মত দিলেন না। গিয়াস্ শ্লেষ-ভরা কটুবাক্যে জর্জ্জরিত করল সেলিমাকে।

অবশেষে অনশন ও চোখের জলের ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা জয়লাভ করল সেলিমা। বিয়ে হোল, তবে সমারোহ-বর্জ্জিত বিয়ে। আমি শ্বশুর-বাড়ীতেই বাস করতে লাগলাম। ওস্তাদের গৃহত্যাগ করে ওম্‌রাহের প্রাসাদে এলাম। বছর খানেক পরে—পরিবানু এলো সেলিমার কোলে।

আমার আলো-ভরা জীবন-আকাশে সহসা এলো বিপর্য্যয়ের মেঘ ঘনিয়ে। সেলিমার মা ও বাবা যথেষ্ট স্নেহ প্রদর্শন করতেন আমাকে। আলাদা মহাল সাজিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের জন্য। ওর ছোট ভাই দুটিও ছিলো খুব ভালো,—কিন্তু গিয়াসুদ্দীন সর্ব্বদাই ঘৃণার চক্ষে দেখতো আমাকে। সুযোগ পেলেই শ্বশুরালয়ে বাস করা ও আমার কুল-শীল সম্বন্ধে বিদ্রূপ-ভরা কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করতে ছাড়তো না।

ক্রমে যেন তার কথাগুলো অসহ্য হয়ে উঠতে লাগলো আমার পক্ষে। আমি সেলিমাকে বলি—চলো আমরা ওস্তাদজীর বাড়ীতে গিয়ে বাস করি। কিন্তু সে তার বাপ-মাকেও একথা বলবার সাহস পায় না, তাঁরা মনে দারুণ আঘাত পাবেন বলে। ওদের যৌথসম্পত্তির অর্দ্ধেক মালিক গিয়াস্; সেজন্য প্রভূত ক্ষমতা প্রবল প্রতাপ ছিলো তার। হঠাৎ একদিন কোনো বিখ্যাত সংবাদপত্রে আবার আমার ফটো সমেত,—নিরুদ্দেশকে উদ্দেশ করে লেখা হোল। —"ফিরে এস, বাবা অসুস্থ।" লিখছেন আমার দাদা। গিয়াসুদ্দীন যে সেই ফটো আমার সাথে মিলিয়ে চেহারার সাদৃশ্য লক্ষ্য করে বাংলায় চর পাঠিয়ে আমার সত্য পরিচয় অনুসন্ধান করতে পারে, এ-রকম সন্দেহ একবারও জাগেনি আমার মনে। কিন্তু যথাসময়ে আমার গোপনীয় তথ্যগুলো সে আবিষ্কার করেছিলো; শুধু বলবার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করছিলো।

সে দিন ভোরবেলায় ওস্তাদজী একটি ছেলেকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি গেলাম···তিনি বললেন,—তোমার বড় বিপদ বাবা। সাবধান হবার কথা বলতে তোমাকে ডেকেছি। গিয়াস্ তোমার সত্য পরিচয় জেনে ফেলেছে। সে আমাকে এসে শাসিয়ে গেছে। বলে গেছে,··· একটা কাফেরের বাচ্ছাকে আমাদের হারেমে পুরে দিয়েছো! শয়তান! তুমি আমাদের রাজবংশের রক্তধারাকে কলঙ্কিত করেছ। এর প্রতিশোধ আমি নেব। ঐ শত্রুটা না এলে আজ সেলিমা আমার হোতো। আমার জীবনের মহা ক্ষতি করেছে যে, তাকে এ দুনিয়া থেকে সরাবার ব্যবস্থা আমি করেছি! আর বুড়ো ঘুঘু! সেই সঙ্গে তোমাকেও···! ওস্তাদজী আমার হাত দুটি ধরে কাতর স্বরে বললেন—বাবা, তুমি আজই এ মুলুক ছেড়ে চলে যাও; ও দুষমনের অসাধ্য কাজ কিছু নেই বাবা, ও সব করতে পারে। আমার জীবনের সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। মৃত্যুকে আমি ডরাই না; কিন্তু তুমি নিরাপদ স্থানে না যাওয়া পর্য্যন্ত আমি বড়ই অশান্তি ভোগ করছি। আমার অপরাধ অতি গুরুতর বলে প্রমাণ হবে তুমি সামনে থাকলে, কারণ আমি তোমাকে মুসলমান বলে পরিচয় দিয়েছি। তুমি এখন কিছু দিনের জন্য অন্যত্র চলে গেলে, গিয়াস্ আর বিশেষ কিছু করবে বলে মনে হয় না। গোলমাল কিছুটা ঠাণ্ডা হলে, আমি সুযোগ বুঝে তোমাকে খবর দেব, তখন তুমি আবার ফিরে এস।

ভারি ভাবনা হোল। ফিরে গিয়ে সেলিমাকে সকল ব্যাপার খুলে বললাম। যুক্তকরে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলাম। সে সজল চোখে বললো,—প্রথমেই আমাকে সব কথা খুলে বলনি কেন? আমি তোমার সঙ্গে অন্যত্র গিয়ে বাস করতাম।

আমি কাতর কণ্ঠে বলি,—পাছে তোমাকে হারাতে হয়—সেজন্য সব-কিছু গোপন করেছিলাম। আজ আমাকে বিদায় দাও, আবার দেখা হবে।

সেলিমার করুণ কান্নায় আমার বুক যেন ভেঙে যেতে লাগলো। সে কাঁদতে কাঁদতে বলে,—আজ বাবা যদি অসুস্থ না হতেন, আর সর্ব্বস্ব গিয়াসের তত্ত্বাবধানে না থাকতো, তবে আমি সব কথা বাবাকে খুলে বলতাম; তিনি নিশ্চয়ই আমাদের ক্ষমা করতেন।

আমি বললাম, কিন্তু গিয়াস্ সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর, ওকে বিশ্বাস নেই।

সে বললে,—কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যে আমি একটা দিনও বাঁচবো না, আমাদেরও নিয়ে চল তোমার সঙ্গে।"

বারংবার তাকে নিষেধ করলাম। কাতর মিনতি জানিয়ে বলি,

ভেসে যায়
দু' পাশে
গরুরা
নামে ঐ

তাই ভেবে ঐ দিশেহারা
শূন্য পথে পাথার 'পরে
অস্তরবির আলোক ঝরে।
উড়িয়ে ধূলি চল্‌ছে ফিরে,
সন্ধ্যা নামে গোধূলির এই স্বপ্ন ঘিরে ॥

খানিক পরেই সওদাগরের ছেলের নাম ধরে কে যেন ডাকলো। কী আশ্চর্য্য মিষ্টি গলা! স্বর লক্ষ্য করে পাশের ঘরে ঢুকে সে দেখতে পেলো পালঙ্কের ওপর থেকে সে সাপ অদৃশ্য হয়েছে। তার জায়গায় বসে রয়েছে অপূর্ব্ব সুন্দরী একটি মেয়ে। মেয়েটির সঙ্গে দু'দিনেই তার ভাব হয়ে গেলো। সোনার পাহাড়-দেশের রাজকন্যা সে। বামনদের শাপে বার বছর সে সাপ হয়ে ছিল। এবার সে মুক্তি পেয়েছে।

তার পর একদিন সওদাগরের ছেলের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হলো। অনেক বছর তারা একসঙ্গে খুব সুখে কাটালো। কিন্তু সওদাগরের ছেলের মাঝে মাঝে তার বাপ-মার কথা, দেশের কথা মনে পড়ে। একদিন রাজকন্যাকে তার মনের ইচ্ছা সে খুলে বললে। রাজকন্যা তাকে মন্ত্রপূত একটি আংটি দিয়ে বললে—"তুমি এটা সঙ্গে করে নিয়ে যাও। এর দিকে তাকিয়ে যা ইচ্ছে করবে সে ইচ্ছাই পূরণ হবে। কিন্তু খবরদার, বাপ-মার কাছে গিয়ে আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো না। তাহলে বিপদ ঘটবে।"

সওদাগর-পুত্র রাজকন্যার কাছে বিদেয় নিয়ে দেশের দিকে রওনা হলো। অনেকখানি পথ ঘুরে আর অনেক দিনে সে নিজের বাড়ীতে হাজির হলো। কিন্তু বাপ-মা তাকে চিনতে পারেন না। তারা ভেবেছিল ছেলে আর বেঁচে নেই। যা হোক, অনেক কষ্টে সে তার পরিচয় প্রমাণ করলো। কিন্তু তার সব কথা সওদাগর বিশ্বাস করতে চাইলো না। রাগে, দুঃখে আংটির দিকে চেয়ে ছেলে বললে, "এক্ষুনি যদি রাজকন্যা এসে হাজির হতো তা'হলে এদের সব কথা বিশ্বাস করাতে পারতুম।" কী আশ্চর্য্য! মনের এই ইচ্ছা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়-দেশের রাজকন্যা সেখানে হাজির। তখন সওদাগর তার সব কথা বিশ্বাস করলো। কিন্তু রাজকন্যা সেই থেকে কি রকম আনমনা হয়ে গিয়েছে। কোন কিছুই তার ভাল লাগে না। একদিন দু'জনে হ্রদের ধারে বেড়াতে বেড়াতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সওদাগর-পুত্র বিশ্রামের জন্য একটু বসেছে। ঝিরঝির করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। দারুণ ক্লান্তিতে তার চোখের পাতা বুজে এলো। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে মনে নেই। ঘুম ভাঙতেই দেখলো রাজকন্যা নেই। সে একা বাড়ী ফিরে এলো। রাজকন্যা বাড়ীতেও ফিরে আসেনি।

পরদিন সওদাগরের ছেলে বাপ-মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে রাজকন্যার জন্য পাহাড়-দেশের খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। পথে যেতে যেতে একদিন দেখতে পেলো বনের ধারে তিনটে দৈত্য কতকগুলো জিনিসের ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। সওদাগরের ছেলেকে দেখতে পেয়ে তাকে ডেকে তারা সালিশী করতে বললো। একজোড়া জুতো, একটা তরোয়াল আর একটা আলখাল্লা—এই ক'টি জিনিষ নিয়ে ঝগড়া। যেমন-তেমন জিনিষ নয়। এদের প্রত্যেকটির আশ্চর্য্য গুণ! জুতো-জোড়া পায়ে দিয়ে যেখানে যেতে চাইবে সেখানেই যাওয়া যাবে। যাকে কাটতে বলবে তরোয়াল মুহূর্তের মধ্যে তাকে কেটে দু' টুকরো করে দেবে। আলখাল্লা গায়ে দিলে কেউ আর তোমায় দেখতে পাবে না। জিনিষগুলো দেখে সওদাগরের ছেলের ভারী লোভ হলো। সে বললে, "ঝগড়া ত তোমরা করছো; কিন্তু জিনিষগুলোর সত্যি সত্যিই কোন গুণ আছে কি না আগে তার পরখ করতে হবে।" বোকা দৈত্যেরা তিনটি জিনিষই তার হাতে তুলে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে আলখাল্লা গায়ে চড়িয়ে সওদাগরের ছেলে অদৃশ্য হয়ে গেলো। পরমুহূর্তে জুতো-জোড়া পায়ে দিয়ে সে যেতে চাইলো হারানো রাজকন্যার রাজ্যে। যেমন বলা, তেমনি কাজ। মুহূর্তের মধ্যেই হাজির হলো সে সেই শ্বেতপাথরে তৈরী রাজপ্রাসাদের ফটকে। সেখানে আজ কী একটা উৎসব চলছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো রাজকন্যার স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে বহু কাল—তাই রাজকন্যার আবার বিয়ে হবে—তারই উৎসব। সওদাগর-পুত্র অদৃশ্য হয়ে বিবাহ-সভায় ঢুকে গেলো। তার পর রাজকন্যার সঙ্গে দেখা করে তার পরিচয় দিলো। তখন রাজকন্যা আর কী করে? বিবাহের আয়োজন বন্ধ করে দেওয়া হলো। অনেক কালের ছাড়াছাড়ি আর ভুল বোঝাবুঝির পর দু'জন আবার সুখে ঘরকন্না করতে লাগলো।

খামখেয়ালী ছড়া

অজিতকৃষ্ণ বসু

হুঁশিয়ার হাল্‌দার

হাসিমুখো হুঁশিয়ার হুতাশন হাল্‌দার
খায় নাকো লুচি যদি ভাজা হয় দালদা'র,
হেসে বলে "খাঁটি ঘিয়ে ভেজে দিয়ো ছোড়দি!
মেকি খেলে শেষটায় হয়ে যাবে সর্দ্দি।"
ভয় পাওয়া দূরে থাক্ গোলমাল দেখেই
মাল নিয়ে সরে পড়ে গোল পিছে রেখেই।
করে না সে হৈ-হৈ, হল্লা বা ছট্‌ফট্
কাজটি হাসিল করে কেটে পড়ে চট্‌পট্॥

গোধূলি

আকাশের কোথায় সুরু কোথায় সারা
পাখীরা তাই ভেবে ঐ দিশেহারা
ভেসে যায় শূন্য পথে পাথার 'পরে
দু' পাশে অস্তরবির আলোক ঝরে।
গরুরা উড়িয়ে ধূলি চলছে ফিরে,
নামে ঐ সন্ধ্যা নামে গোধূলির এই স্বপ্ন ঘিরে॥

ভেরা পানোভা

ডাঃ বেলভ দানিলভকে ডেকে বললেন,—"জানো, ছয় নম্বর গাড়ীতে দু'জন মহিলা-অফিসারকে রাখা হোয়েছে! এক জনের তো উরুতের গোড়া থেকেই পা-টা কেটে বাদ দেওয়া হোয়েছে! দেখলেও কষ্ট হয়, কিন্তু বুঝলে কিনা ক্লীগার-গাড়ীর কামরাগুলোতে আর একটুও জায়গা নেই। বাধ্য হোয়ে ওদের ওই কেঠো গাড়ীতে ওঠাতে হোলো।"

সকাল বেলা ট্রেন পরিদর্শনের সময় মহিলা-অফিসার দুটিকেও দানিলভ যেতে দেখে এলো; কামরার শেষ প্রান্তে তাদের রাখা হোয়েছে—তাছাড়া ডা: বেলভের কথা মত একটা পর্দা দিয়ে আড়ালও করে দেওয়া হোয়েছে। দু'জনেই নিদ্রামগ্না। এক জন বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে, খাটো করে ছাঁটা চুলগুলো শুধু ট্রেনের ঝাঁকুনিতে দুলছে। অপরা প্রায় নাক অবধি চাদরটা ঢাকা দিয়ে ঘুমোচ্ছে—কপালে জেগেছে কয়েকটি রেখা···ধূসর চুলগুলির মধ্যে দু'-একটি কুচ্‌কুচে কালো চুলের আভাস পাওয়া যায়···নিমীলিত পল্লবগুলি ঘন কালো আর বড় বড়···কিন্তু দু'চোখের কোলে কি ক্লান্তির কালিমা আর দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে! ভাস্কা ছিলো এই বিভাগের ভারপ্রাপ্তা নার্স হোয়ে। দানিলভ ভাস্কার কাছে গিয়ে বললে,—"দেখো, তোমার চার্জে এই যে মহিলারা রয়েছেন এঁদের যেন একটুও বিশ্রামের ব্যাঘাত না হয়। ওঁদের ঘুমাতে দিও যতক্ষণ সম্ভব, আর শোনো, বার বার দেখে যেও এসে। সাবধান কিন্তু, মোটে জাগাবে না। তোমাকে তো জানি—ভোরে আলো ফুটতে না ফুটতে তুমি একধার থেকে সবাইকে ঠেলে ঠেলে থার্মোমিটার দিতে সুরু কোরবে···"

ভাস্কা ভীত ভাবে দানিলভের প্রত্যেকটি কথা শুনে নিলে। পরক্ষণেই ছুটলো সিষ্টার স্মির্নোভার কাছে,

—"সিষ্টার শোনো, ক্যাপ্টেন দানিলভ এক্ষুনি এসেছিলেন, ওই মহিলাদের একটুও বিরক্ত করাও বারণ করে গেলেন···"

সিষ্টার ফাইনার কাছে গিয়েও এই একই কথার পুনরুক্তি করল। কিন্তু ফাইনা কি স্মির্নোভা কারোই হাতে এত সময় নেই যে, খামোকা ঘুমন্ত রোগীকে বিরক্ত করতে যাবে—তারা নিজেদের কাজ নিয়েই ব্যস্ত রইলো। এবার আহতের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হওয়াতে কারোরই মুহূর্ত্ত সময় মিলছিলো না নিশ্বাস ফেলবার—তাই ডিনারের সময় খেতে যাবার কথা কারো মাথায়ও এলো না—একা সুপ্রাগভ ছাড়া।

—"আমি শৃঙ্খলা মানতেই চিরকাল অভ্যস্ত"—আপন মনেই বলে সুপ্রাগভ—"খাওয়া-দাওয়া সব-কিছুই ঠিক নিয়মে করে চললে তবেই ভালো ভাবে কাজ করা যায়···"

ওভারল খুলে ফেলে বেশ করে হাত ধুয়ে খাবার টেবিলের সামনে বসতেই যেন মনটা খুসী হোয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে খাবার দেওয়া হোয়ে গেছে—প্লেটের পাশেই তুষার-ধবল ন্যাপকিনগুলিও পাট করা। এমন সময় সোবোল এসে ঢুকলো।

—"আচ্ছা আর সবাইকার হোলো কি? ক্রমাগত খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে—আর কাঁহাতক গরম করি বসে বসে—?"

—"আসবে, আসবে"—বেশী বাক্যব্যয় না করে সুপ্রাগভ প্লেটটা সরিয়েই বলে ওঠে—"এঁ্যা, এ কি ব্যাপার?"

খেতে খেতে হঠাৎ বাধা পড়লো। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কে! প্রবল ভাবে ঘন ঘন ধাক্কার শব্দ। স্মির্নোভা।

—"ডাক্তার"—অস্বাভাবিক উত্তেজনায় গলার স্বরও ওর বিকৃত শোনাচ্ছে—"শীগ্‌গির, শীগ্‌গির চলে এসো ছয় নম্বর গাড়ীতে"—

"—কি হোলো আবার?"—ক্ষুব্ধ স্বর সুপ্রাগভের। বেচারা সবে বড় এক টুকরো মাংস বেশ করে রাই মাখিয়ে চাকা-চাকা পেঁয়াজ সাজিয়ে মুখে তুলতে যাচ্ছে, এমন সময় এই বিভ্রাট!

—"আহত মহিলাটির ব্যথা উঠেছে"—

—"কি বলছো? ব্যথা উঠেছে কি?" সুপ্রাগভের স্বর বিস্মিত।

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা হয়, তেমনিই হোয়েছে আবার কি?"—কর্কশ স্বরে জবাব দেয় স্মির্নোভা।

সুপ্রাগভের মুখের সামনে ধরা কাঁটায় বেঁধা মাংসটা দেখেই ওর মাথায় যেন রক্ত চড়ে গেল। ইচ্ছে হোলো ওর মুখের সামনে থেকে খাবারের প্লেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে। স্মির্নোভার বয়স কম, আর চট করেই উত্তেজিত হোয়ে ওঠে···ওর প্রত্যেকটি মনের ভাব ফুটে ওঠে ওর ধূসর দুই চোখে।

—"ট্রেনের ঝাঁকুনিতেই হঠাৎ ওর ব্যথা উঠেছে—ওই যে, মহিলাটির একটি পা বাদ দেওয়া হোয়েছে।

সুপ্রাগভ মাংসের টুকরোটা মুখে দিয়ে সঙ্গে একটু রুটিও ছিঁড়ে নিয়ে মুখে পুরলো। ওর চোখে জল এসে গিয়েছিলো···হ্যাঁ, রাইএর ঝাঁঝে।

—"কিন্তু ছাখো"—ধীরে-সুস্থে চিবোতে চিবোতে বলে—"খাতায় তো অন্তঃসত্ত্বার কেস লেখা নেই"—

—"জানি না।"

—"মেট্রন কোথায়—ওখানেই?"

—"না, নয় নম্বর গাড়ীতে। সেখানে এক জনের ফিট হোচ্ছে—সবাই সেখানে"—

—"আর অল্‌গা মিখেইলোভনা?"

—"ক্লীগার-গাড়ীতে আহতদের ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে"—

সুপ্রাগভ ক্ষুব্ধ। সর্ব্বদাই এই হয়—যেই কিছু ঘটবে অমনি আর সবাই ব্যস্ত। কিন্তু এসব ব্যাপারে ও কি করবে? নাক, গলা, কান···এসবের চিকিৎসাই ও করে। ধাত্রীর কাজ তো ওর করবার কথা নয়!

—"তা অত ঘাবড়াচ্ছোই বা কেন?" সুপ্রাগভ বলে—"এসব ব্যাপার তোমরা মেয়েরাই তো ভালো জানো।"

আতিথ্য স্বীকার করেন। যে সমস্ত বস্তু বিগ্রহের ভোগে দেওয়া হয় না সে সমস্ত বস্তু ইচ্ছাপূর্বক গৌরমোহনের নিকট যাচ্ঞা করেন। তাঁরা চেয়েছিলেন মাগুর মাছের ঝোল, শাক, বড়ি-পোস্ত এবং মসুর ডাল। বলা বাহুল্য, মাত্র ঠাকুর অনতিবিলম্বে তাঁদের ঐ সব খাদ্য-দ্রব্যাদি সরবরাহ করে তুষ্ট করেন। (শিক্ষিত সহরবাসিগণ হয়ত খাদ্য-সামগ্রীর তালিকা শুনে হাস্য সংবরণ করতে পারবেন না কিন্তু রাঢ় দেশের গ্রামাঞ্চলে ঐ খাদ্যই আজও অমৃতোপমরূপে গণ্য হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, রাঢ়ের গ্রামের অধিকাংশ স্থানেই দেখেছি বিবাহ বা উৎসবাদিতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ কলাইএর ডাল, মাছের টক আর মোটা চালের ভাত দিয়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে তুষ্ট করেন। তাঁরা পোলাও-কালিয়া অপেক্ষা এই খাদ্যই উপাদেয় ভেবে প্রচুর পরিমাণে খেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন।)

ঐ সময় রাজনগরের রাজা আলিনকি খাঁর * রাজ্য ছিল। তিনি মৃগয়া ব্যপদেশে দ্বিপ্রহরে বনমধ্যে অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসার্ত হয়ে পড়েন। পথও বোধ হয় হারিয়ে গিয়েছিলেন। সহসা তিনি মাধবের মন্দির দেখে সেখানে উপস্থিত হন ও গৌরমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। রাজা বললেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ যায়। বাঁচাও!

গৌরমোহন তটস্থ হয়ে উঠলেন; গরীবের ভাঙ্গা কুঁড়ে হতে শীতল পানীয় জল ছাড়া আর কি দেবেন? তাঁকে সন্তুষ্ট করবার মত অর্থ বা সামর্থ্য কি আছে? রাজার কি মনে হল, কে জানে! তিনি বললেন, ভাববার দরকার নেই। শাকান্ন প্রসাদই দাও আমাকে।

—সে কি হুজুর! আপনি রাজা, সামান্য শাকান্ন কি ভাবে গ্রহণ করবেন?

—তোমরা পার, আমি পারব না, হাসালে ব্রাহ্মণ! তুমি হাসালে।

যাই হোক, ইষ্টনাম স্মরণ করতে করতে গৌরমোহন ঠাকুর সবিনয়ে মাধবের ভোগ পদ্মপত্রে নিবেদন করলেন রাজনগরের প্রতাপশালী ভূমধ্যকারী আলিনকি খাঁকে।

অন্নের কণিকাটিও পড়ে থাকে না রাজার পাতে। পরিতৃপ্তির উদ্গার তুলতে তুলতে রাজা বললেন, ব্রাহ্মণ, কি সুখাদ্যই তুমি আজ খাওয়ালে! আহা কি সৌগন্ধ! কি আস্বাদন! খাইনি জীবনে এমন খাদ্য। এত রাজভোগ খেয়েছি কিন্তু কৈ এর সঙ্গে তুলনা হয় না তো! ব্রাহ্মণ! যদি অনুমতি দাও মধ্যে মধ্যে এসে এই অদ্ভুত বস্তু খেয়ে ধন্য হয়ে যাব।

মুসলমান নবাব পৌত্তলিক হিন্দুর মন্দিরে উৎসর্গীকৃত অন্ন গ্রহণ করে কেবল মুখের স্তুতিবাদেই ক্ষান্ত হননি। আনন্দের অভিব্যক্তিস্বরূপ পাঁচ শত বিঘা নিষ্কর লাখেরাজ সম্পত্তি মাধবের নামে দান করেছিলেন।

সেই পাঁচ শত বিঘা সম্পত্তি মাধবের এখন আর নেই। ময়ূরাক্ষী রাক্ষসীর গর্ভে কবলিত হয়েছে অনেকখানি। এখন অবশিষ্ট আছে শতখানেক বিঘার কিছু বেশী। গৌরমোহন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটিও ময়ূরাক্ষী ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। একটু দূরে নূতন মন্দির পরবর্তী-কালে তৈরী হয়। এটিরও ভগ্নদশা। মন্দিরের সন্নিকটে একটি সুবৃহৎ তমালের গাছ আছে। গোলাকারে প্রায় ১২।১৪ কাঠা স্থান জুড়ে মন্দিরটিকে রমা শিল্প-কলা থেকে বিশেষ সৌকর্যসাধন করেছে।

দোল, রাস, রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি উৎসবগুলি গতানুগতিক ভাবে এখনও অনুষ্ঠিত হয়। ৫ সের চালের অন্ন, দুই রকম তরকারী, একটি চাটনী, ডাল ও পায়স ভোগ নিত্য হবার ব্যবস্থা আছে। পূর্বে হত হ্যানচার শাক, কলাইএর ডাল, আঁকাড়া চালের অন্ন ও চাটনী।

নৌরঙ্গী বীরভূমের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র। ৪০।৫০ ঘর লোকের বাস। সিউড়ীর ৭ মাইল পশ্চিমে ময়ূরাক্ষীর অপর তীরে এই গ্রাম অবস্থিত। এ পারে ভাণ্ডীরবন।

গৌরমোহন ঠাকুরের জীবনী সামান্য জানা যায়। এঁর পূর্ব-নিবাস ছিল হুগলী জেলার ভাণ্ডারহাটী নামক গ্রামে। ইনি কি কারণে নৌরঙ্গী গ্রামে আসেন বলা শক্ত। তিরোধানের তারিখ ৩০ এ ভাদ্র, (সন অজ্ঞাত)। পুণ্যাত্মার স্মরণে ঐ দিবসে একটি মহোৎসব আজও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

* ইনি ঠিক রাজত্ব করেন নাই। রাজভ্রাতা ছিলেন। সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজগণের বিপক্ষে লড়াই করে ইনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেন। এঁর মৃত্যুকাল ১৭৬৪ খৃঃ—Statistical Account of Bengal Vol IV—w. w. Hunter.

অঙ্গনে ও প্রাঙ্গণে

অবরোধ-প্রথার উৎপত্তি

অরুন্ধতী

অবরোধ-প্রথা কোন্ সময়ে ও কি ভাবে আমাদের দেশে প্রচলিত হয়েছিল তাহার সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। স্ত্রীলোককে হারেমে বা অন্তঃপুরে অনাত্মীয় পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে দূরে রাখার যে বিধি আজও ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায়, তা আমাদের দেশে প্রাচীন কালে ছিল না। আর্য্যদের মধ্যে নারীর অবরোধ যতখানি শালীনতা ও শ্লীলতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন তাই-ই পালন করার বিধি ছিল। সীতা রামের সঙ্গে বনবাসে গিয়েছিলেন, ভাগ্য-বিড়ম্বনায় পঞ্চপাণ্ডবকে যখন বনে যেতে হয়েছিল দ্রৌপদী তাঁদের সাথী হয়েছিলেন। যদি সে সময় অবরোধ-প্রথা থাকত, তাহলে সমাজ-বিধি লঙ্ঘন করে সীতা ও দ্রৌপদী এমন কাজ করতে পারতেন না। বাক্, মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি পূত-চরিত্রা মহীয়সী নারীদের চরিত্র পাঠে জানা যায় তাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। অরুন্ধতী সর্ব্বদাই সপ্তর্ষিদের সঙ্গে থাকতেন। ব্রাহ্মণকন্যারা কখনই অবরুদ্ধ থাকতেন না। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর উপাখ্যান পাঠে এ কথা সহজেই অনুমান করা যায়। রাজাদের পাটরাণীরাও প্রায়ই রাজার পাশে বসে রাজকার্য্য পরিচালনা দেখতেন। ধর্ম্ম-শাস্ত্রে একটি সুন্দর বিধান আছে—"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।" কিন্তু যদি অবরোধ-প্রথা সমাজে প্রচলিত থাকত, তা'হলে কেমন করে ঐ নিয়ম পালন করা সম্ভব হত? আর দেখাও যায় যে, সে কালে প্রায় সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মে স্ত্রীলোক পুরুষের সঙ্গে যোগ দিতেন।

অবরোধ-প্রথা না থাকলেও স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বিষয়ে ঋষিরা বিরোধী ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "পিতা-মাতা বাল্যকালে, স্বামী যৌবনে ও পুত্রেরা বৃদ্ধাবস্থায় স্ত্রীলোককে রক্ষা করিবে।" তবে স্বামী বা গুরুজনের অনুমতি নিয়ে স্ত্রীলোকের সর্ব্বত্র গতায়াতে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু যে স্ত্রীলোক আপন ইচ্ছামত চলত তাকে লোকে ব্যভিচারিণী বলত। নারদ বলেন, "যদি স্বামীর বংশ নির্ম্মূল হয় তা'হলে স্ত্রীলোক পিতৃকুল আশ্রয় করিবে। পিতৃবংশ নির্ম্মূল হইলে রাজা স্ত্রীলোককে রক্ষা করিবেন।" পৈঠিনসী বলেন, "স্ত্রীলোককে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিবে, দেখিও যেন সঙ্করবর্ণ উৎপন্ন না হয়।" ঋষিরা স্ত্রীজাতিকে অবিশ্বাস করে বা কোন সঙ্কীর্ণ মনোভাব নিয়ে এই সমস্ত নিয়ম করে যাননি। নারী স্বভাবতঃই দুর্ব্বল ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ; সেজন্য সমাজের ও নারীর কল্যাণের জন্যই ঐরূপ বিধি-ব্যবস্থা করেছেন। নারীর প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার দিতে তাঁরা কুণ্ঠিত হননি কিন্তু স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় তাঁরা দেননি। নারীকে তার প্রাপ্য সম্মান ও মর্য্যাদা দেওয়ার আদেশ বার বার তাঁরা করেছেন।

ছ'শ বছর আগে মুসলমানরা প্রথম পর্দা-প্রথা প্রবর্ত্তিত করে। কতকগুলি সামাজিক ত্রুটির নিবারণ করার জন্যই এই প্রথা আরম্ভ হয়। এখন সাধারণ মুসলমানরা এই প্রথাকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলে মনে করে। ঐতিহাসিকেরা বলেন, "চেঙ্গিজ খাঁ যে সব দেশ জয় করেন সেই সব দেশেই পর্দ্দার প্রচলন হয়।" তাঁর অনুচর মঙ্গোল সৈন্যরা মেয়েদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্য্যাতন করত, ফলে মেয়েদের দুর্গতি ও লাঞ্ছনার সীমা-পরিসীমা ছিল না। তাঁদের সম্মান রক্ষার জন্যই মুসলমান-সমাজে পর্দ্দার সৃষ্টি হয়। পর্দ্দা কতকগুলি মুসলমান দেশে আছে, কতকগুলি দেশে নেই। উত্তর-আফ্রিকার আরবদের মধ্যে এ প্রথা দেখা যায় না এবং আফ্রিকার অন্তর্ভাগের নিগ্রোদের মধ্যেও নেই। আরবের যারা অধিবাসী, তারা এ প্রথা মানে না। তুরস্কে আগে কঠোর পর্দ্দা ছিল কিন্তু কামাল পাশা কঠোর হস্তে ঐ প্রথা দমন করেন এবং তাঁর চেষ্টা ও শিক্ষায় তুরস্কের নারীরা আজ সম্পূর্ণ ভাবে পর্দ্দা বর্জ্জন করেছেন। আফগানিস্থান, পারস্য ও মধ্য-এশিয়ায় পূর্ব্বে এই প্রথা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হত, কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ সব দেশের শিক্ষিত সমাজে ঐ নিয়ম অনেকটা শিথিল হয়েছে।

ময়লার বীজাণু থেকে প্রতিদিনই আপনার অসুখের সম্ভাবনা আছে
লাইফবয় মেখে এই সব বীজাণু ধুয়ে ফেলে প্রতিদিন নিজেকে রক্ষা করুন
লাইফবয়ের "রক্ষা-কারী ফেনা" আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখে
লা ই ফ ব য় সা বা ন
প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY SOAP
ভারতে প্রস্তুত
L. 248-X52 BG
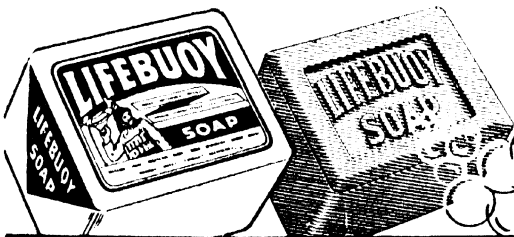
ভারতের সমস্ত মুসলমান এবং যে সমস্ত হিন্দু অন্য প্রভাবে নয়, স্বাভাবিক ভাবেই মুসলমানদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল তারাও এই প্রথা মানে। ইসলাম অবরোধ-প্রথার পৃষ্ঠপোষক; এক কালে মুসলমানরা প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকার করেছিল এবং তাদের অনুকরণে এই প্রথা সারা ভারতে প্রসার হয়েছিল। অনেক ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ নিয়ম মুসলমানেরা যেমন হিন্দুদের কাছ থেকে নিয়েছিল, হিন্দুরাও তেমনি এই প্রথা মুসলমানদের কাছ থেকে নিয়েছিল। অনেকে বলেন যে মুসলমানেরা হিন্দুদের মেয়েদের চুরি করে বিবাহ করত, তাদের ওপর নির্য্যাতন ও অত্যাচার করত, সুতরাং তাদের হাত থেকে মেয়েদের রক্ষার জন্য হিন্দু সমাজে পর্দ্দার সৃষ্টি হয়েছে। তাই যদি হয়, তবে দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাট প্রদেশে অবরোধ-প্রথা নেই কেন? মাদ্রাজ ও গুজরাটে পর্দ্দার প্রচলন হয়নি, তার কারণ ঐ সব স্থানে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের বসবাস খুব কম ছিল। মনে হয় প্রথম মতটি সমীচীন।

এই অবরোধ-প্রথার ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিই শক্তি-হীন হয়ে পড়েছে। নারী ও পুরুষ সমাজের দুটি অঙ্গ। একটি অঙ্গ বাদ দিয়ে আর একটির সাহায্যে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কখনও সম্ভবপর নয়। নারীকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করে রাখার পরিণামে নারী তার দৈহিক ও মানসিক উভয় শক্তিই হারিয়েছে। যেখানে নারীর শক্তি ও কৃতিত্ব কম, সেখানে পুরুষের শক্তিও কম, সমাজেরও কম। নারী ও পুরুষের সমবেত চেষ্টার দ্বারাই সমাজের কল্যাণ হওয়া সম্ভব। চিকিৎসকদের মতে শহরের অবরোধ-প্রথা নারীদের মধ্যে যক্ষ্মাদি রোগ প্রসারণের অন্যতম কারণ। বর্ত্তমান যুগে ভারতে ব্রাহ্মসমাজ, বিশেষতঃ ঐ সমাজের নারীরা উৎপীড়ন ও কুৎসা গ্রাহ্য না করে সর্ব্বপ্রথম অবরোধ-প্রথা দূর করার জন্য আন্দোলন সুরু করেন। তাঁদের চেষ্টা কতকাংশে ফলবতী হয়েছে। পরে শিক্ষিতা হিন্দু রমণীরাও এই আন্দোলনে যোগ দেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবেও এ প্রথা অনেকটা শিথিল হয়েছে। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র নারীর স্বাধীনতা স্বীকার করেছেন কিন্তু অবরোধ-প্রথা না লুপ্ত হলে সমাজ যে তিমিরে আছে সেই তিমিরেই থাকবে।

বিবাহের সময়

আভা দেবী

হিন্দুদের যে দশটি পালনীয় সংস্কার আছে, তার মধ্যে একটি হ'ল বিবাহ। হিন্দুশাস্ত্র মতে বিবাহ অতি পবিত্র বন্ধন। আমাদের দেশে বিবাহ সময় নির্দ্ধারণ করা হয় শুভ মাসে ও শুভ ক্ষণে। ভারতে জ্যোতিষের চর্চ্চা বহু প্রাচীন কাল থেকেই ছিল এবং এ বিষয়ে চরম উন্নতিও হয়েছিল। ব্যাস, বশিষ্ঠাদি মুনিরা এর প্রবর্ত্তক। মুনি-ঋষিদের বহু দর্শন ও পরীক্ষার ফলেই এই শাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়েছে। তাঁরা তাঁদের ভূয়োদর্শনের ফলে জানতে পেরেছিলেন যে, গ্রহ-নক্ষত্রাদির স্থিতি ও গতি অনুসারে মানুষের সুখ-দুঃখাদি নিয়ন্ত্রিত হয়। ভবিষ্যতে যাতে মানুষ দুঃখ-কষ্ট না পায়, সেই জন্যে বিবাহের আগে তাঁরা কোষ্ঠীমিলন এবং শুভ দিন ও ক্ষণ নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা করেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্র বলেন:

"বেশ্যা ভাদ্রপদে ইষে চ মরণং রোগান্বিতা কার্ত্তিকে।
পৌষে প্রেতবতী বিয়োগবহুলা চৈত্রে মদোন্মাদিনী।
অন্যেষ্বেব বিবাহিতা পতিব্রতা নারী সমৃদ্ধা ভবেৎ।"

অর্থাৎ "ভাদ্র মাসে বিবাহ হইলে কন্যা বেশ্যা, আশ্বিন মাসে মৃত্যু, কার্ত্তিক মাসে রোগযুক্তা, পৌষ মাসে আচার-ভ্রষ্টা ও স্বামি-বিয়োগিনী, চৈত্র মাসে বিবাহ হইলে কন্যা মদনোন্মত্তা হয়। তদ্ভিন্ন অন্যান্য মাসে বিবাহ হইলে কন্যা পতিব্রতা ও ঐশ্বর্য্যযুক্তা হয়।" কিন্তু কন্যা যদি অরক্ষণীয়া হয় তা'হলে পৌষ ও চৈত্র মাস বাদ দিয়া আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসেও বিবাহ দেওয়ার বিধি আছে। তবে বশিষ্ঠ বলেন যে, জন্মদিন বাদে জন্মমাসে বিবাহে দোষ নেই। গর্গ বলেন, জন্মমাসের আট দিন বাদ দিয়ে এবং যবন মুনির মতে দশ দিন ছেড়ে বিবাহ দেওয়া যেতে পারে। তিথি, নক্ষত্র ও বার সম্বন্ধেও এইরূপ কতকগুলি বিধি-নিষেধ দেখা যায়। অমাবস্যা, রিষ্টিভদ্রা ও রিক্তা তিথিতে বিবাহ হ'লে শীঘ্র মৃত্যু হয় কিন্তু শনিবারে যদি রিক্তা তিথি হয় তা'হলে কন্যা পতি-পুত্র-বর্দ্ধিনী হয়। রেবতী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, মৃগশিরা, মূলা, অনুরাধা, মঘা, হস্তা ও স্বাতী নক্ষত্রে এবং মিথুন, কন্যা ও তুলা লগ্নে বিবাহ সুপ্রশস্ত। চিত্রা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, অশ্বিনী নক্ষত্রে আপদ বিষয়ে যজুর্ব্বেদীয় বিবাহ প্রশস্ত। আজ-কাল রাত্রে বিবাহ হয় বলে বার সম্বন্ধে কোন নিষেধ নেই। পূর্ব্বে দিনের বেলায় বিবাহ হত, তখন রবি, মঙ্গল ও শনিবারে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।

বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমতী স্নিগ্ধা চক্রবর্ত্তী

আনন্দ সুখময় কিন্তু মনে তার স্থায়িত্ব ক্ষণস্থায়ী, দুঃখের করুণ সুর তার ছাপ রেখে যায় হৃদয়ের মাঝে, বর্ষার মধ্যে আমরা এমনি এক দুঃখের সুর খুঁজে পাই। বর্ষার অক্লান্ত বরিষণ আমাদের মনে এনে দেয় উদাসীনতা, মনে হয় কি যেন নেই, কি যেন হারিয়েছি, কিন্তু সে উদাসীনতা আনে না অবসাদ, এই পাওয়ার না পাওয়ার অপূর্ব্ব সন্ধিক্ষণই কবির চিত্তকে করেছে মুগ্ধ, মনকে দিয়েছে দোলা তাই ত কবি বর্ষাসুন্দরীর কণ্ঠে জয়মাল্য পরিয়ে তাকে করেছেন নিজের সহচরী, তার মধ্যে সন্ধান পেয়েছেন তাঁর মানসী প্রিয়ার, শ্রাবণ-বরিষণ-মুখরিত রাত্রিতে প্রকৃতি রাণী বর্ষাসুন্দরীর রূপ ধরে মিলন-সাজে এগিয়ে এসেছে তাঁর কাছে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে—

"আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে
গোপনে তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।"

সঙ্গে সঙ্গে কবি তাকে এই বলে সম্বর্দ্ধনা করেছেন—

"আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।"

কিন্তু সবার অজ্ঞাতসারে রাত্রির এই ক্ষণিক পাওয়া কবির মন ভরাতে পারেনি, তাই তিনি তাকে আহ্বান করেছেন সর্ব্বসমক্ষে দিনের আলোয়—

"বন্ধু রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন শ্রাবণ-প্রাতে···
···কথা কও মোর হৃদয়ে
হাত রাখো হাতে।"

চঞ্চলা বর্ষার অশান্ত রূপ আর তার অক্লান্ত ছুটোপুটি কবিচিত্তের গভীরতাকেও দোলা দিয়েছে, তাই ত তার শ্যামছায়া মূর্ত্তিটি কবির হৃদয়কে নাচিয়েছে ময়ূরের মত। তার এই দুরন্তপনার ছোঁয়া লেগে কবির হৃদয় হয়েছে চঞ্চল কিশোরে রূপান্তরিত, তিনি তারই মত কলকণ্ঠে বর্ষার সুরে সুর মিলিয়েছেন—

"ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন
লুটেছে এই ঝড়ে

*　　*　　*　　*

অন্তরে আজ কি কলরোল
দ্বারে দ্বারে ভাঙ্গল আগল
হৃদয়-মাঝে জাগল পাগল
আজি ভাদরে।"

শুধু তাই নয়, বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা বর্ষা তার বজ্র-বিদ্যুতের ঝলকানি, তার রুদ্র ভ্রুকুটি, তার গুরুগম্ভীর গর্জন সঙ্গে নিয়ে এসেছিল তার প্রিয়তমের সঙ্গে ছলনার খেলা খেলতে কিন্তু প্রিয়তমের প্রেমের গভীরতাই তার সমস্ত চাতুরীজাল ছিন্ন করে তাকে আরো গভীর ভাবে কাছে টেনে এনে প্রশ্ন করেছে—

রুদ্র বেশে কেমন খেলা, কালো মেঘের ভ্রুকুটি
সন্ধ্যাকাশে বক্ষ যে ঐ বজ্রবাণে যায় টুটি॥

*　　*　　*　　*

মিলন-দিনে হঠাৎ কেন লুকাও তোমার মাধুরী
ভীরুকে ভয় দেখাতে চাও এ কী দারুণ চাতুরী॥

কিন্তু সে ত শুধু অভিসারিকা নয়, সে-যে কবির অন্তরের অন্তরতম ধন, তাই দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে গিয়েও তিনি তাকে ভুলতে পারেন নি—

"ঘন শ্রাবণ মেঘের মত
রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে প্রভু
একটি নমস্কারে"।

আনন্দ ও বেদনার মধ্য দিয়ে সুন্দরী বর্ষা নানা রূপে, নানা ছন্দে, নানা বর্ণে কবির চিত্তকে করেছে পূর্ণ, তাই ত তার বিদায়-বেলায় কবির কণ্ঠ ভরে উঠেছে করুণ সুরে—

"বাদলধারা হল সারা,
বাজে বিদায় সুর
গানের পালা শেষ করে দে
যাবি অনেক দূর"

মাইকেল মধুসূদনের কাব্য-বৈশিষ্ট্য

শ্রীমতী মঞ্জু মিত্র

মাইকেল মধুসূদন প্রতিভাবান কবি—প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই হ'ল অপূর্ব বস্তুনির্মাণ ক্ষমতা, প্রতিভা হ'ল 'প্রকৃতিকৃত নিয়ম-রহিতা'—প্রতিভা 'নবনবোন্মেষশালিনী'—এরই বলে যা শ্রেষ্ঠ 'কবিকৃতি' বা 'কবিসৃষ্ট' তা মৌলিক, দ্বিতীয় রহিত। এই শ্রেষ্ঠ, চরম এবং তীক্ষ্ণধী প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের মত ঊনবিংশ শতাব্দীতে মাইকেলের মধ্যেও তুল্য পরিমাণেই ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথকে আজ 'বিশ্বকবি' বলা হয়েছে, আর মাইকেল হলেন 'মহাকবি'—মহাকাব্যের রচয়িতা বলেই তিনি 'মহাকবি' ন'ন—মহাকাব্য রচনাটা গৌণ—পরন্তু মহৎ-কবি বলেই তিনি 'মহাকবি'। বাঙ্গলার গতানুগতিক সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব ধূমকেতুর মতই—প্রচলিত প্রথা এবং সংস্কারকে তিনি দু'হাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন; শিল্পসৌন্দর্য্য ও ভাবাদর্শে পূর্ণাঙ্গ এবং সম্পূর্ণ অভিনব সাহিত্যের আদর্শ স্থাপনা করে তিনি চলে গেলেন। মাইকেলের জীবনের সকল ঘটনার মধ্যেই আকস্মিকতার সমাবেশ হয়েছে—আকস্মিক ভাবেই মাদ্রাজ থেকে প্রত্যাবর্ত্তন, আকস্মিক ভাবে বাঙ্গলা কাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ, নিতান্ত প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে অকস্মাৎ নাট্যরচনা, বাঙ্গলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ পরীক্ষা এবং প্রবর্ত্তন এবং অল্প কয়েক বৎসর পরে আকস্মিক ভাবেই অন্তর্দ্ধান।

বস্তুত, বাঙ্গলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব যেন সম্পূর্ণ একটা accident, এবং ঊনবিংশ শতকে, আধুনিক সাহিত্যের প্রস্তুতির যুগে এই বলিষ্ঠ জীবনবাদী প্রতিভাকে লাভ করা বাঙ্গলা সাহিত্যের পক্ষে অল্প সৌভাগ্যের কথা নয়। বিধর্মী বলে তাঁকে সেদিন যতই অপাংক্তেয় করা হোক, এ ব্যক্তিত্ব যেন বাঙ্গলার পক্ষে বহু তপস্যালব্ধ ধন।

কিন্তু তথাপি এ কথা মানতেই হবে যে, প্রত্যেক যুগের সাহিত্য-সাধনার পশ্চাতে প্রতিভার মৌলিকতা ও আকস্মিকতা যেমন আছে তেমনি একটা ইতিহাসও বর্ত্তমান আছে—অর্থাৎ একটা বিশিষ্ট পরিপার্শ্ব আছে, বিশিষ্ট জীবনধর্ম বা জীবনের মূল্যবোধ সম্বন্ধে ধারণা (Sense of life's value) আছে—যাকে আধারস্বরূপ করে প্রতিভা বিকশিত হয়। সুতরাং মাইকেল-প্রতিভা বিচার করতে গেলে ঊনবিংশ শতকের কোম্পানীর যুগের তৎকালীন পরিবেশ এবং তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা প্রয়োজন—এই দুই শক্তির সমন্বয়ে তাঁর কবি-প্রতিভার বিকাশ।

মধুসূদন যে যুগে আবির্ভূত হলেন—সেটা একটা যুগসন্ধির কাল—একটা দারুণ ভাঙ্গনের যুগ। এক দিকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতা-সংস্কৃতির নব ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দু কলেজের ইংরেজী-শিক্ষিত নবযুবা ইয়ং বেঙ্গলের দল প্রচলিত সব কিছু সংস্কার এবং হিন্দুধর্মের সনাতন আদর্শকে ভেঙ্গে ফেলে পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার অনুকরণে উচ্ছৃঙ্খল মত্তোন্মত্ত রক্তিম ফেনিল জীবন-তরঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। অপর দিকে বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষিগণ হিন্দুধর্ম এবং সংস্কৃতিকে সবলে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তৎপর হয়েছেন। এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষে বাঙ্গালী-জীবন তখন উদ্‌ভ্রান্ত।

এই সময় মধুসূদন সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে তাঁর এবং তাঁর সমসাময়িক যুগমানবের সকল কিছু অবচেতনার অপ্রকাশিত অথচ প্রকাশোন্মুখ অস্থিরতা (restlessness) প্রতিভার দ্বারা সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবৃত করলেন,—এবং এই সার্থক প্রকাশের জন্য ছন্দে, রীতিতে, প্রকাশভঙ্গীতে যত-কিছু

অভিনবত্বের প্রয়োজন, নিপুণ সংগ্রাহকের মত তিনি পাশ্চাত্ত্য বিভিন্ন সাহিত্যাদর্শ থেকে তা সঞ্চয় করে বাঙ্গলা সাহিত্যকে এক সম্পূর্ণ এবং অপূর্ব পূর্ণতা দান করলেন। মাইকেলের সাহিত্য হ'ল তাঁর প্রতিভা এবং যুগমানসের মণি-কাঞ্চন যোগ —তাই সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি যখন আবির্ভূত হলেন বিদ্রোহী চিত্তের নিদারুণ গতিভঙ্গে সকল কিছু প্রচলিত সংস্কারকে ধ্বংস করলেন, এবং নবসৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিহৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত জয় করলেন। এই জন্যই সমসাময়িক কবিদ্বয় হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র, তাঁরই আদর্শে মহাকাব্য রচনার প্রয়াস পেলেও, এবং হিন্দুধর্মাবলম্বী হলেও, ম্লেচ্ছ বিধর্মী কবি মধুসূদনের মত মানুষের হৃদয়ে চিরন্তন আসন লাভ করতে পারেন নি।

মহাকাব্য মাইকেল রচনা করেছিলেন, মহাকাব্য হেমচন্দ্রও রচনা করেছিলেন এবং ছন্দে-ভাবে হেমচন্দ্র মাইকেলকে প্রচুর পরিমাণে অনুকরণও করেছিলেন, এমন কি, মহাকাব্যের বস্তু-প্রসারের দিক থেকে হেমচন্দ্রের বিষয়-বস্তু নির্বাচন অনেক বেশী উপযোগীও হয়েছিল,—কিন্তু তথাপি মধুসূদনের সাফল্যের কারণ কি?... সাফল্যের কারণ প্রথমতঃ প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব এবং দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান যুগ স্বতঃস্ফূর্ত্ত মহাকাব্যের যুগ নয়। তাই বর্ত্তমান মহাকাব্যের বিরাট বহিরঙ্গ বিন্যাসের পশ্চাতে এমন একটা বিরাট সার্বভৌম ভাবাদর্শ থাকা চাই যা এই খণ্ড-বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে অখণ্ড বিরাট আদর্শে বিধৃত করে একটা কেন্দ্রগত সংহতি দান করবে। মাইকেলের মহাকাব্যের এই কেন্দ্রগত ভাবাদর্শ হ'ল স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে মানবাত্মার জ্যোতির্ময় প্রকাশ—এই ভাবাদর্শই মধুসূদনের সকল ক্ষুদ্র ঘটনাময় মহাকাব্যের বিপুল পরিধিকে কেন্দ্রানুগ করেছে এবং মানবহৃদয়ের কাছে এর আবেদন করেছে চিরন্তন। আমরা যখন 'মেঘনাদবধ কাব্য' পড়ি তখন ভুলে যাই যে, এ একটা Dynastic war,—মানবচরিত্রের অকৃতকার্য্যতাই যেন আমাদের Tragic appeal করে। কিন্তু হেমচন্দ্রের মধ্যে Dynastic war ছাড়া আর কিছুই পাই না। মধুসূদনের রাবণের সঙ্গে আমাদের যে মানবাত্মার Identty ঘটে, তা তার ব্যক্তিগত বা রাজ্যগত সীমাকে ছাড়িয়ে গিয়ে চিরন্তন মানবাত্মার Symbolic সংঘাতে আমাদের চিত্তকে দোলায়িত করে। কিন্তু হেমচন্দ্রের দেবাসুরে যুদ্ধ একটা সামান্য পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক যুদ্ধের অতিরিক্ত কোনও দ্যোতনায় আমাদের চিত্তকে আলোড়িত করে না। ইন্দ্রের সাধনার মধ্যেও বিশেষ একটা ফললাভ ব্যতীত স্থায়ী আত্মগৌরব নেই, সে গৌরব বরং আছে দধীচির আত্মত্যাগের মধ্যে, কিন্তু এই আত্মত্যাগের দ্বারা মহাকাব্যের কেন্দ্রগত ভাবাদর্শ নিয়ন্ত্রিত নয়, পরন্তু তা হ'ল এ কাব্যের সামান্য একটা স্ফুলিঙ্গ-বিশেষ।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, মধুসূদনের স্বল্পপরিসর কাব্য-জীবনের কাব্যসৌধের মধ্যে বিশেষ কোন ধর্মবিশ্বাস বা দার্শনিক মতবাদ নেই। কেবলমাত্র শিল্পসাধনার চরমোৎকর্ষ এবং জীবন-বাদের তীব্রতা তাঁর কাব্যকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রভূত প্রভাবশালী এবং অমর করেছে। হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে তিনি যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তা কোন বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের তাগিদে নয়, কারণ তাঁর সাহিত্য আলোচনা করলেই দেখা যায় যে, প্রচলিত কোন খৃষ্টধর্মাদর্শ বা ধর্মবিশ্বাসের কথা সেখানে বলা নেই। আসলে তিনি ছিলেন পরম নাস্তিক। মাইকেল যদিও ডিরোজিও সাহেবের প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন না, তথাপি তিনি যখন হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন তখন ডিরোজিওর মৃত্যু হলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল অক্ষুণ্ণ।

মাইকেল যখন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন তখন তাঁর কোন ধর্মেই বিশ্বাস ছিল না—তবে সাংসারিক সুখের প্রলোভনে এবং একটা ভ্রান্ত কল্পনার বশে তিনি এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য এই যে ধর্মান্তর গ্রহণ করা, এই তো চরম নাস্তিক্য। মধুসূদনের বিশ্বাস ছিল—দেশের সেরা ইংলণ্ড, জাতির সেরা ইংরেজ এবং কবির সেরা মিল্টন। তাই তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করলে এই গুণগুলো আয়ত্ত করা যাবে না। তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং মিল্টনের আদর্শে কাব্য রচনাও করেছিলেন, কিন্তু মিল্টনের খৃষ্টান Puritan আদর্শকে কোথাও গ্রহণ করেননি বরং গ্রীক-রোমানদের যে জীবনধর্মময় বিলাসের Pagan আদর্শ তার উপরই তিনি জোর দিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিজীবনেও ঐশ্বর্য্যবিলাসের উপর আকর্ষণ ছিল তীব্র, যার জন্য মধুসূদনের কল্পনাশক্তি প্রভূত ঐশ্বর্য্যমহিমান্বিত রাবণকে কেন্দ্র করে ঘুরেছে।

এ কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, মধুসূদনের কাব্যের যদি কোন বিশেষ ধর্ম বা দর্শন থাকে তবে তা মানবধর্ম—মধুসূদন একান্ত ভাবে জীবনবাদের কবি, মানবতার আদর্শেই তাঁর কাব্যের চরিত্র বিচার্য্য। সেই জন্যই তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে দেখি যে, প্রচলিত ঘটনার প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গী গেছে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়ে। যুগ-চেতনার প্রভাবে মানবতার জয়গানে তিনি পঞ্চমুখ। কবির আরেক বৈশিষ্ট্য—একটা শিল্পের পূর্ণাঙ্গ মূর্ত্তি তাঁর চিত্তে সর্বদা উজ্জ্বল ছিল। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রের মধ্যে দেখা যায় যে—তিনি বহু রচনা করেছেন এবং সময় পেলে শিল্প এবং সাহিত্য সম্বন্ধে একটা পূর্ণাঙ্গ চেহারা কিছু সমালোচনার দ্বারা তিনি দিয়ে যাবেন। বাস্তবিক কাব্য-ক্ষেত্রে নূতন নূতন আঙ্গিকের প্রবর্ত্তন ও রূপ-চিত্রণে সুদক্ষ কবি মাইকেলের মত অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন। একটা সামান্য সৌন্দর্য্য বর্ণনা করতে গিয়ে যে উপমামালার সমাবেশ তিনি করেছেন, তাতে কেবল সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই হয়নি পরন্তু তার মধ্যে একটা Epical grandeur সর্বদা প্রস্ফুট হয়েছে। এই শিল্পের নিখুঁৎ গঠনে অসীম দক্ষতা এবং যা কিছু সুন্দর তার প্রতি একটা মোহ তাঁর ছিল বলেই ব্রজাঙ্গনা কাব্যের সৃষ্টি। বৈষ্ণব সাহিত্যের ধর্ম বা দর্শন নয়, পরন্তু অনিন্দ্যসুন্দর শ্রীরাধার রূপটি তাঁকে অভিভূত করেছিল। রাধা-চিত্রের প্রতি সেই রূপমুগ্ধতাই তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য সৃষ্টির মূল কারণ। এই দিক দিয়েই তিনি গ্রীক কবিদের সঙ্গে তুলনীয়। তিনি বলেছিলেন—"আমার রচনার তিন-চতুর্থাংশ গ্রীক—"

মধুসূদন যে কালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন পিছন দিকের বাধা অনেকটাই গেছে ভেঙ্গে, অপর দিকে সম্মুখের প্রাচীরও সম্পূর্ণ সৃষ্ট হয়ে ওঠেনি। এই সংস্কার, মুক্তি বা ভাঙ্গনের কালে তাঁর আবির্ভাব—রাম রাবণ এবং অন্য সকল চরিত্রকে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা, এই সময় জন্মগ্রহণের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। তাঁর চরিত্র-গঠনের মধ্যে যে পাশ্চাত্ত্য উপাদান ছিল তারই প্রভাবে বিদ্রোহী

কবি সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্বাধীন ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য বিবিধ সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের দরুণ বাঙ্গলা সাহিত্যে তিনি এমন একটি বস্তু দান করে গেছেন যা তৎকালে প্রচলিত বাঙ্গলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভিনব—সেটা হল 'কণ্টিনেণ্টালিজম'।

আধুনিকতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মনে পাপ, পুণ্য, নীতি, সতীত্ব, ধর্ম, সংস্কার ইত্যাদি সম্বন্ধে মূল্য নির্দ্ধারণের মানদণ্ড যে পরিবর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছিল তা আগেই দেখা গেছে। মধুসূদন সমাজ-মানসের এই অবচেতনার বিদ্রোহটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে ধরেছিলেন। তাই নিপুণ মনস্তাত্ত্বিকের মত তাঁর কাব্যের মধ্যে 'রামায়ণ' 'মহাভারত' থেকে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি চরিত্র গ্রহণ করলেন—এবং তাদের মুখে অত্যন্ত সুকৌশলে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে আধুনিক পাপ-পুণ্যের সেই মানদণ্ডে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত করে তুললেন। এই দিক দিয়ে তাঁর 'বীরাঙ্গনা' কাব্য আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী কাব্য। শুধু যে ল্যাতিন কবি Ovid এর Heroic Epistle এর অনুকরণে এগুলি পত্র-কবিতার অভিনব form তা নয়, এই Continentalism এর দিকে থেকে বীরাঙ্গনা কাব্যের বৈশিষ্ট্য এবং প্রভাব আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে অত্যন্ত বেশী। রামায়ণ-মহাভারত থেকে ১১টি বিচিত্র প্রকারের নারীচরিত্র এখানে তিনি গ্রহণ করেছেন, তাঁরা তাঁদের স্বামী অথবা প্রিয়তমের কাছে পত্র লিখছেন—এর মধ্য দিয়ে এমনই সব চরিত্র-বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একান্ত মনস্তাত্ত্বিক বেদনা এবং বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত করেছেন কবি যা অতি আধুনিক মনোবিশ্লেষণের কাছেও সম্পূর্ণ অভিনব। এই দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হয়, 'মেঘনাদবধ কাব্য' অপেক্ষাও 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র মূল্য অধিক। কৈকেয়ী এবং জনার মত ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারীর পক্ষে কিরূপ কথা বলা সম্ভব, সতীত্বের চরম আদর্শ দুষ্মন্ত-পরিত্যক্তা শকুন্তলার মুখে কিরূপ উক্তি শোভা পায়, দুষ্মন্তের মধুকরী বৃত্তি তার মনে কি জ্বালার সৃষ্টি করতে পারে, এ সকল অত্যন্ত সূক্ষ্ম কৌশলেই কবি ইঙ্গিত করেছেন। সোমের প্রতি তারার পত্রে কুলত্যাগিনী তারার চরিত্রের আর্ত্তি এবং সূর্পণখার রাক্ষসী-চরিত্রে abnormal psychologyর যে বিশ্লেষণ কবি করেছেন—তা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার পরাকাষ্ঠা।

বাচনভঙ্গীর অভিনবত্বে এখানে কবির অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় মেলে। দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার অভিযোগের পরোক্ষ ভঙ্গী; আবার সোমের প্রতি তারার তীব্র আর্ত্তিপূর্ণ অসামাজিক প্রেমমানসের ইঙ্গিতময় প্রকাশের মধ্যে এই বাচনভঙ্গীর অপূর্বতার পরিচয় পাই।

মধুসূদনের কাব্যের বলিষ্ঠ জীবনবাদের কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কবির ব্যক্তি-জীবনেও দেখি, পাশ্চাত্ত্য আদর্শ থেকে তিনি একটা তীব্র প্রাণচাঞ্চল্য লাভ করেছিলেন, তাই গ্রীক সাহিত্যের এই জীবনবাদ তাঁর চরিত্রের সঙ্গে অত্যন্ত বেশী খাপ খেয়ে গিয়েছিল। তিনি সেই জীবন-স্রোতে অবগাহন করেছেন। কাব্য-ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবিষ্কার এই প্রেরণা থেকে উদ্ভূত।

সুতরাং সকল দিক্ থেকে দেখা যাচ্ছে মধুসূদনের কাব্য-বৈশিষ্ট্য নব্য বাঙ্গলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটা অভিনব আলোড়নের সূত্রপাত করল। কিন্তু এ কথা বলা হয় যে, এক জন এত বড় প্রতিভাশালী কবি পরবর্ত্তী বাঙ্গলা সাহিত্যে খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করতে কেন পারেননি? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণকারী না পাওয়া গেলেও বাঙ্গলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর পরোক্ষ প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। আসলে মহাকাব্য রচনা করাটাই মধুসূদনের মৌলিক কৃতিত্ব নয়; এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংজ্ঞা অনুসারে বিচার করতে গেলে মেঘনাদবধ কাব্য প্রকৃত মহাকাব্যের পর্য্যায়ে পড়ে কি না তা সন্দেহের বিষয়। প্রকৃত পক্ষে মাইকেল তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে শিল্পকৌশলের কয়েকটি যে অভিনব আদর্শ সাহিত্যকে দান করে গেলেন, তারই অনুসরণে গঠিত হয়ে উঠেছে নব্য বাঙ্গলার কাব্যসাহিত্য। বাঙ্গলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন, সনেটের প্রবর্তন—এ সকল ক্ষেত্রে মধুসূদনের কীর্ত্তি অমর। বিবর্তনের সূত্রে রবীন্দ্রকাব্যে যে অমিল ও সমিল অমিত্র ছন্দ এবং সনেটের রূপ আমরা পাই তার পথদ্রষ্টা যে মধুসূদনই, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বাঙ্গলা সাহিত্যে মধুসূদনের সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রভাব হ'ল দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন সাধন। একটা বলিষ্ঠ মানবিকতার মানদণ্ডে জীবনের মূল্য নির্দ্ধারণ করতে আজ আমরা শিখেছি, সেজন্য ঋণী আমরা বহুল পরিমাণে মধুসূদনের কাছে। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'—যা বাঙ্গলা উপন্যাস-জগতে নূতনত্ব এনেছিল—তার বীজ তো মধুপ্রতিভার মধ্যেই নিহিত ছিল। শরৎ-সাহিত্যে যে সমাজ-বিদ্রোহ, প্রচলিত নীতি এবং সতীধর্মের আদর্শের প্রতি যে তীব্র কটাক্ষপাত—এ সকলের মূল অনুসন্ধান করলে আমরা কোন্ উৎসে গিয়ে উপস্থিত হব তা লক্ষ্য করবার বিষয়। সুতরাং বর্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের বিবর্তন ও পরিণতির ক্ষেত্রে মধুপ্রতিভার দান যে অবিস্মরণীয়, সে কথা স্বীকার করতেই হবে। রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভার উপাদানে ভাবাদর্শের দিক থেকে যেমন বিহারীলাল গুরু, তেমনি শিল্প-সৌষ্ঠবের উৎকর্ষের দিক থেকে ও চিন্তাধারার পথিকৃৎ হিসাবে মাইকেল মধুসূদনের প্রভাব বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান কি না এ কথা আজ চিন্তা করে দেখবার বিষয়।

কবি বিদ্যাপতির শিক্ষা

মিথিলার কবি বিদ্যাপতি, হরিমিশ্রের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। হরিমিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র স্বনামখ্যাত নৈয়ায়িক সর্ষপ গ্রাম নিবাসী (দ্বারবঙ্গের ৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী) পক্ষধর মিশ্র বিদ্যাপতির সহপাঠী ছিলেন। নবদ্বীপ নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয় এই পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায় শিক্ষা করিয়া জগতে অতুল খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ডি. এচ. লরেন্স

খ্রীশ্‌মাস-উৎসবের সময় পাঁচ দিনের ছুটিতে উইলিয়ম বাড়ি এল। এমন আয়োজন আর কোন দেশে হয়নি। পল্‌ আর আর্থার বাড়ি সাজাবার জন্যে সারা দিন ফুল আর লতার সন্ধানে ঘুরে বেড়াল চারদিকে। অ্যানি কাগজের শিকল তৈরি করলে পুরোন কায়দায়। খাবার তৈরির ব্যাপারেও এমন অকৃপণ ব্যয় আর কোন দিন দেখা যায়নি। মিসেস মোরেল একটা প্রকাণ্ড কেক তৈরি করলেন। তাঁর মনে আজ রাণীর মতো গর্ব আর আনন্দ। পলকে তিনি শিখিয়ে দিলেন, কী ক'রে বাদামগুলোকে পরিষ্কার করতে হয়। পল খুব সাবধানে একটা একটা ক'রে বাদামের খোসা ছাড়াতে লাগল,—তার স্থির লক্ষ্য রইল যাতে একটাও বাদাম না হারিয়ে যায়। কে একজন বলেছিল ঠাণ্ডা জায়গায় দাঁড়িয়ে নাড়ালে ডিমের কুসুম ভাল করে জমে। পল গিয়ে দাঁড়াল ভাঁড়ারঘরে, সেখানকার উত্তাপ তখন বোধ হয় শূন্য ডিগ্রীরও নীচে, জল জমে সেখানে প্রায় বরফ হয়ে যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত সে ডিমের কুসুমটাকে নাড়াতে লাগল। যখন দেখল ডিমের শাদা অংশটা শক্ত আর বরফের মত শুভ্র হয়ে উঠছে, তখন আনন্দে আর উত্তেজনায় লাফাতে লাফাতে সে গেল মায়ের কাছে। বললে, 'দেখ মা, চেয়ে দেখ। কেমন সুন্দর হয়েছে!'

এক চিমটি উঠিয়ে নিয়ে সে নিজের নাকের উপর রাখল, তারপর নিঃশ্বাস ফেলে সেটাকে উড়িয়ে দিল শূন্যে।

মা বললেন, 'এই শুরু হ'ল। এ তোর নষ্ট করবার জন্যে নাকি?'

বাড়ির সবাই উত্তেজনায় মত্ত। খ্রীশ্‌মাস-পর্ব্বের আগের দিন উইলিয়মের আসার কথা। মিসেস মোরেল তাঁর খাবার ঘর সাজিয়ে গুছিয়ে তুলতে লাগলেন। একটা বড়ো প্লাম-কেক্‌, চালের পিঠে, ফলের রস দিয়ে তৈরি পুলি ইত্যাদিতে দুটো বড়ো প্লেট ঠাসা। আরও রান্না হচ্ছিল তখনো—নতুন নতুন পিঠে আর কেক। সারা বাড়িতে উৎসবের সাজ। রান্নাঘরের ছাদে লতার গুচ্ছ ধীরে ধীরে দুলছে। উনুনের জলন্ত আগুন থেকে শোঁ-শোঁ শব্দ উঠছে। ঘরের বাতাসে পিঠে-পুলির সুগন্ধ। সন্ধ্যা সাতটায় উইলিয়মের আসবার কথা, কিন্তু আজ গাড়ি দেরিতে আসছে। ছেলে-মেয়ে তিনটি ষ্টেশনে গেছে তাকে নিয়ে আসতে। মা বাড়িতে একা। পৌনে সাতটায় মোরেল ফিরে এলো। স্বামি-স্ত্রী কেউ কোন কথা বললে না। মোরেল এসে বসল তার লম্বা চেয়ারটায়—উত্তেজনায় তাকেও আজ কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মিসেস মোরেল চুপচাপ তাঁর পিঠে তৈরির কাজ করে যেতে লাগলেন। বাইরে থেকে তাঁকে দেখাচ্ছিল শান্ত, কিন্তু যে ভাবে ধীরে ধীরে তিনি কাজ করে যাচ্ছিলেন, তাতে তাঁর মনের চাঞ্চল্য অনুভব করা কঠিন ছিল না। ঘড়িটা টিক-টিক করে বেজে চলেছে।

মোরেল আবার জিজ্ঞেস করল, 'ওর গাড়ি ক'টায় পৌছবে যেন বলেছিলে?'

আজ সারাদিনে পাঁচ বার সে এই একই প্রশ্ন করেছে।

মিসেস মোরেল জোর দিয়ে বললেন, 'সাড়ে ছ'টায় গাড়ি এসে পৌছবার কথা।'

—'তা'হলে সাতটা বেজে দশ মিনিটে সে বাড়ি এসে যাবে।'

—'তুমি তাই মনে করে বসে থাক, আজ গাড়ি কয়েক ঘণ্টা দেরি করে আসবে।' মিসেস মোরেলের কথায় কোন দুঃখ নেই, তাঁর যেন কোন কিছু এসে যায় না এতে। তবু মনে মনে আশা ছিল তাঁর, যতই দেরি করে আসবে ভাববেন, ঠিক ততোই তাড়াতাড়ি ছেলে এসে উপস্থিত হবে। মোরেল একবার উঠে সদর দরজা পর্য্যন্ত দেখে এলো। আবার ফিরে এসে বসল সে চেয়ারটাতে।

মিসেস মোরেল বললেন, 'তোমার কি হয়েছে বলো ত'; অমন ছটফট করছ কেন?'

সে কথার জবাব না দিয়ে মোরেল বললে, 'ওর জন্যে কিছু খাবার ঠিক করে রাখো না কেন?'

—'এখনো ঢের সময় রয়েছে।' মিসেস মোরেল বললেন।

—'আমি যত দূর দেখতে পাচ্ছি, মোটেই সময় নেই।' বলে রাগে গরগর করতে করতে চেয়ারে বসেই সে যেন লাফিয়ে উঠল। মিসেস মোরেল টেবিলটাকে পরিষ্কার করতে লাগলেন। কেৎলিটা থেকে জল ফুটবার মৃদু-মধুর শব্দ হচ্ছে। তাঁরা দু'জনে অপেক্ষা করতে লাগলেন, মনে হ'ল এ প্রতীক্ষার যেন আর শেষ নেই।

এদিকে ছেলে-মেয়েরা সব গিয়ে ষ্টেশনের প্লাটফর্মে জড়ো হয়েছে। ষ্টেশন দু' মাইল দূর বাড়ি থেকে। তারা এক ঘণ্টা বসে রইল গাড়ির অপেক্ষায়। একটা গাড়ি এলো—কিন্তু তাতে উইলিয়ম নেই। দূরে লাইনের পাশে লাল, সবুজ আলো জ্বলছে। চারিদিক অন্ধকার আর হাড়ভাঙা ঠাণ্ডা।

বাঁকানো টুপি-পরা একটা লোককে আসতে দেখে পল্‌ বললে অ্যানিকে—'দেখ না ওকে জিজ্ঞেস ক'রে লণ্ডনের গাড়ি এসে গেছে কি না।'

—'সর্ব্বনাশ', অ্যানি জবাব দিল, 'চুপ কর তুই—নইলে ও আমাদের তাড়িয়ে দেবে এখান থেকে।'

কিন্তু লোকটাকে ও-কথা না জানিয়েই বা পল্‌ থাকে কী ক'রে। লণ্ডনের গাড়িতে কারু আসবার কথা—কথাটা শুনতেই কেমন চমক লাগে। কিন্তু কোন লোকের কাছে গিয়ে কথা বলতে তার সাহসে

কুলোয় না—এ লোকটা আবার উঁচু টুপি পরা! ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসতেও তাদের সাহস হ'ল না, পাছে ঘর থেকে তাদের বের করে দেয় কিম্বা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেলে যদি তারা দেখতে না পায় এই ভয়ে। অন্ধকারে বাইরের ঠাণ্ডার মধ্যেই তারা অপেক্ষা করতে লাগল।

—'দেড় ঘণ্টা ত' কেটে গেল, এখনো গাড়ি এলো না।' আর্থার করুণ সুরে বললে।

—'তবে কী', অ্যানি বললে, 'জানিস নে কাল খ্রীশ্‌মাস।'

আবার সব চুপচাপ। উইলিয়ম তা'হলে এলো না। রেলরাস্তার উপর দিয়ে অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে তারা চেয়ে রইল। ওই দিকে লণ্ডন—কত দূরে, মনে হয় সে দূরত্ব অতিক্রম করা যেন কারু সাধ্য নয়। লণ্ডন থেকে কেউ আসবে, এ কেমন অবিশ্বাস্য শোনায়, যেন অভাবনীয় কোন ঘটনা! কথা বলবার মত মনের ভাব তখন আর তাদের ছিল না। বাইরে ঠাণ্ডা, মনের ভিতর নেই সুখ—নীরবে জড়োসড়ো হয়ে তারা প্ল্যাটফর্মের উপর বসে রইল।

দু' ঘণ্টারও বেশী তারা বসে রইল এই ভাবে। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল দূরে অন্ধকারের বুক চিরে একটা ইঞ্জিনের বাতি এদিকে এগিয়ে আসছে। একটা মুটে দৌড়ে গেল। ছেলে-মেয়ে ক'টি লাইন থেকে একটু পেছনে সরে এলো; তাদের বুক তখন উত্তেজনায় কাঁপছে। বিশাল একটা গাড়ি এসে থামল ষ্টেশনে। গাড়ির দুটি মাত্র দরজা খুলল, তার একটি থেকে বেরিয়ে এলো উইলিয়ম। ওরা ছুটে এগিয়ে গেল। ওদের পেয়ে সে ত' খুব খুশি; মালপত্র বুঝিয়ে দিল ওদের কাছে। বললে, এই ছোট্ট ষ্টেশনে শুধু তার জন্যেই এই বিরাট গাড়িটা ধরেছে, নইলে এখানে থামবার কথাও ছিল না।

বাড়িতে বাবা-মার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। সব কিছু ঠিক—টেবিল গোছানো রয়েছে, রান্না-বান্না সারা। মিসেস মোরেল তাঁর সব চেয়ে ভালো পোশাকটা আজ পরলেন, উপরে জড়ালেন একটা কালো চাদর। একটা বই হাতে নিয়ে তিনি পড়ার দিকে মন দিতে চেষ্টা করলেন। প্রতিটি মুহূর্ত্ত তাঁর কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল।

হঠাৎ মোরেল বলে উঠল, 'দেড় ঘণ্টা ত' কেটে গেল।'

—'ছেলে-মেয়েগুলো ওখানে অপেক্ষা করে রয়েছে।' মিসেস মোরেল বললেন।

—'এখনো গাড়ি আসেনি নাকি?'

—'ওই যে বলেছি, খ্রীশমাসের আগের দিন গাড়িগুলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেরি করে আসে।'

দু'জনেরই মন উদ্বেগে আকুল, পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েও তাঁরা বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। বাইরের ঠাণ্ডা এলোমেলো বাতাসে অ্যাশ-গাছটা যেন থেকে থেকে বিলাপ ক'রে উঠছে। লণ্ডন আর এ বাড়ির মধ্যে আজ শুধু অন্ধকারের শূন্যতা। মিসেস মোরেল নিজের মনকে আর স্থির রাখতে পারছিলেন না। ঘড়ির কাঁটার টিক্-টিক্ শব্দে তাঁর মেজাজ আরও বিরক্ত হয়ে উঠছিল। সময় কেটে যাচ্ছে,—ক্রমশঃ অবস্থাটা সত্যিই অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগল।

অবশেষে বাইরে থেকে অনেকগুলো গলার আওয়াজ ভেসে এলো—সদর দরজায় শোনা গেল পায়ের শব্দ। মোরেল লাফিয়ে উঠল—'ওই এসেছে।'

স্থির হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। মা দরজার দিকে ছুটে গেলেন। কারা যেন তাড়াতাড়ি হেঁটে এদিকে আসছে। হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল, আর সামনেই দেখা গেল উইলিয়মকে। হাতের বড়ো ব্যাগটা নাবিয়ে রেখে উইলিয়ম মাকে দু'হাতের মধ্যে জড়িয়ে ধরলে।

—'মা!'

—'সোনা আমার!'

ছেলেকে জড়িয়ে ধরে তিনি বার বার তাকে চুমু খেতে লাগলেন। দু' সেকেণ্ডের বেশী নয়। তার পরই নিজেকে সম্বরণ ক'রে সরে এলেন তিনি। বললেন, 'হাঁ রে, এত দেরি হ'ল কেন?'

—'হাঁ, অনেক দেরি', বাপের দিকে ফিরে উইলিয়ম বললে, 'কেমন আছ, বাবা?'

তারা দু'জনে পরস্পরের হাত ধরল এগিয়ে এসে।

—'ভাল আছি বাবা।' মোরেলের চোখও তখন শুকনো ছিল না। বললে, 'ভেবেছিলুম তুমি আর বুঝি এলে না!'

—'না এসে পারতুম কী?' উইলিয়ম জোর দিয়ে বললে, ব'লে মায়ের দিকে ফিরে দাঁড়াল।

মা হেসে বললেন, 'তোমাকে বেশ ভাল দেখাচ্ছে।' তাঁর মুখে তৃপ্তির হাসি।

—'নিশ্চয়ই,' উইলিয়ম মহা উৎসাহে ব'লে উঠল, 'বাড়ি আসছি যে।'

চমৎকার লম্বা, সোজা, বেপরোয়া ধরণের ছেলে। চারিদিকে চেয়ে সে দেখল ঘরে লতাপাতা সাজানো, উনুনের উপর টিন-ভর্ত্তি পুলি-পিঠে।

এক মুহূর্ত্ত সবাই নীরব। হঠাৎ উইলিয়ম এক লাফে গিয়ে একটা পিঠে তুলে নিলে, তারপর সবটা একেবারে পুরে দিলে মুখের মধ্যে।

মোরেল ব'লে উঠল, 'দেখছ, এমন সুন্দর উনুন কোথাও দেখেছ!'

অনেক জিনিস উইলিয়ম তাদের জন্যে কিনে এনেছিল। তার সব টাকা সে তাদের জন্যেই খরচ করেছে। সারা বাড়িতে আজ যেন উৎসব—উৎসবের প্রাচুর্য্য আজ সব কিছুতেই। মায়ের জন্য সে এনেছে সোনালী বাঁটওয়ালা একটা ছাতা। মা তাঁর মরণকাল পর্য্যন্ত যাতে ছাতাটা থাকে সেই ভাবে তুলে ফেললেন সেটাকে—এটা হারাবার আগে আর সব কিছু হারাতে তিনি রাজী। সবার জন্যেই এসেছে দামী কোন-না-কোন উপহার; তাছাড়া নানা রকমের মিষ্টি, এখানকার লোকেরা সে সব মিষ্টির নামও জানে না। লণ্ডন ছাড়া এ সব জিনিস কি আর মেলে? পল ঘুরে ঘুরে তার বন্ধু-বান্ধবদের সব জিনিস দেখিয়ে আসতে লাগল।

'সত্যিকারের আনারস রে—কুচি কচি ক'রে কেটে রাখে, তারপর দানা বেঁধে যায়—খেতে যা মজা, উঃ!'

এ বাড়ির সবাই আজ আনন্দে বিহ্বল। যত কিছু দুঃখই তাদের থাক না কেন, নিজেদের বাড়ির দিকে আন্তরিক ভালবাসার তাদের অভাব নেই। নিজেদের বাড়ি, এ কথা ভাবতেও কত সুখ। বাড়িতে ভোজ হ'ল, আমোদ-আহ্লাদের ত্রুটি হ'ল না। উইলিয়মকে দেখতে এলো পাড়ার লোক, লণ্ডনে থেকে তার কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে কি না দেখে যেতে এলো। দেখে গিয়ে সবাই বললে, চমৎকার নরম-সরম ছেলেটি।

উইলিয়ম আবার চলে যাবার পর ছেলে-মেয়েগুলি বাড়ির আনাচে-কানাচে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদল। মোরেল মনের দুঃখে শয্যা নিলে, আর মিসেস মোরেলের মনে হতে লাগল যেন কোন বিষাক্ত ওষুধের ক্রিয়ায় তাঁর সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেছে, যেন কোন কিছু উপলব্ধিই তাঁর হচ্ছে না। ছেলেকে প্রাণের সমস্ত আবেগ দিয়ে তিনি ভালবাসতেন।

উইলিয়ম লণ্ডনে যে অফিসে কাজ করত, সেটা ছিল একজন আইনজীবীর। তিনি আর একটা বড়ো জাহাজ-কোম্পানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এবার গরমের ছুটিতে উইলিয়মের মনিব তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, সে জাহাজে করে ভূমধ্যসাগরে বেড়াতে যাবে কি না, গেলে অল্প ভাড়ায় থাকার ব্যবস্থা তিনি ক'রে দেবেন। মিসেস মোরেল তাঁর চিঠিতে লিখলেন, 'গিয়ে দেখে এসো। হয়ত এমন সুযোগ আর কখনো পাবে না। তুমি বাড়িতে এলে আমাদের সবারই আনন্দ, তবে তুমি জাহাজে চড়ে সমুদ্র দেখে বেড়াচ্ছ, এ ভাবতেও আমার কম আনন্দ হবে না।' তবু পনেরো দিনের ছুটিতে উইলিয়ম বাড়িতেই চলে এলো। তার তরুণ মনে বেড়াবার সখ ছিল যথেষ্ট, রৌদ্রোজ্জ্বল দক্ষিণ দেশের কথা সে বার বার অবাক হয়ে ভাবত, তার মতো দরিদ্র অবস্থার লোকের কাছে সেখানকার বিলাস-উচ্ছল জীবন ছিল স্বপ্নের মতো; তবু সব কিছু বাইরের টান উপেক্ষা ক'রে সে ছুটে এলো বাড়ির নিভৃত কোণে। মায়ের মন খুশি হয়ে উঠল, তাঁর জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি কোন দিক দিয়ে যেন বা পূর্ণ হয়ে উঠবে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মোরেল লোকটি ছিল বেপরোয়া, বিপদ-আপদের ভয় যেমন সে খুব কমই করত—তেমনি তার দুর্ঘটনাও ঘটত অনেক বার। যখনই মিসেস মোরেল শুনতেন কোন খালি কয়লার গাড়ি ঘড় ঘড় করে তাঁর সদর দরজার সামনে এসে থামল, তখনই তিনি দৌড়ে যেতেন বাইরের ঘরে। মনে মনে তাঁর আশঙ্কা হতে থাকত—বুঝি খুলে গিয়ে দেখবেন স্বামী গাড়ির উপর বসে আছে,—তার মুখ ময়লা-মাখা—দেহ আঘাতে পঙ্গু—অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছে সে। যদি তাঁর আশঙ্কা সত্যে পরিণত হ'ত তাহ'লে তিনি দৌড়ে যেতেন তাকে উঠিয়ে আনতে।

উইলিয়মের লণ্ডন যাবার পর প্রায় এক বছর অতীত হয়েছে। পলের ইস্কুলের পড়া শেষ হয়েছে, এখনো সে কোন কাজ পায়নি। একদিন মিসেস মোরেল উপরতলায় কাজ করছিলেন। পল রান্নাঘরে বসে ছবি আঁকছিল। সে আজকাল খুব ভাল ছবি আঁকতে শিখেছিল। এমন সময় সদর দরজার কড়া সশব্দে নড়ে উঠল। বিরক্ত হয়ে পল ব্রাসটা নামিয়ে রেখে দরজা খুলতে গেল। ঠিক তখনই তার মা উপর তলার একটা জানালা খুলে নীচের দিকে চাইলেন।

খনির ময়লা-মাখা একটা ছেলে দরজায় দাঁড়িয়েছিল—জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি ওয়াল্টার মোরেলের বাড়ি?'

মিসেস মোরেল বললেন, 'হ্যাঁ—কী দরকার?' ব্যাপারটা তিনি আগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। ছেলেটা বললে, 'আপনার স্বামী ভারী আঘাত পেয়েছেন।' 'সে আমি জানি', মিসেস মোরেল ব'লে উঠলেন, 'সে পাবে না ত' পাবে কে?—এবার আবার কি কাণ্ড করেছে বলো ত'?'

—'ঠিক বলতে পারি না—তাঁর পায়ে কোথায় যেন আঘাত লেগেছে। ওরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে।'

'হায় ভগবান! এমন মানুষ ত' আর আমি জন্মে দেখিনি। ওর জন্যে পাঁচ মিনিটও আমার সোয়াস্তি নেই। হাতের আঙুলটা সবে একটু ভাল হয়েছে, আজ আবার লাগল পায়ে। আচ্ছা, তুমি কি তাকে দেখেছিলে?'

—'দেখেছিলুম খনির নীচে থাকতে যখন ওরা তাঁকে উপরে নিয়ে এলো, তখন তাঁর একটুও জ্ঞান নেই। কিন্তু ডাক্তার যখন দেখতে এলেন তখন তিনি চেঁচামেচি করছিলেন—চার দিকে যত লোক ছিল, সবাইকে গালমন্দ আর শাপশাপান্ত করে বলছিলেন বাড়ি যাবেন, কিছুতেই হাসপাতালে যাবেন না।'—ছেলেটা কিছুতেই ভালো করে গুছিয়ে কথা বলতে পারছিল না।

মিসেস মোরেল বললেন, 'হ্যাঁ, সে ত' বাড়িতেই আসতে চাইবে—তা না হলে সবটা যন্ত্রণা আমাকে দেওয়া হবে কি করে! আচ্ছা, বাছা তুমি যাও। আমার শরীর জ্বলে-পুড়ে গেল আর পারি না!' নীচের তলায় নেবে এলেন তিনি। পল আবার আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করলে।

মিসেস মোরেল বলে চললেন, 'হাসপাতালে নিয়ে গেছে···তা'হলে নিশ্চয়ই অবস্থা খুব ভাল নয়, কিন্তু কী অসাবধান লোক! অন্য কারু এমন দুর্ঘটনা হয় না—। যত কিছু বিপত্তি সব আমার ঘাড়ে এনে ফেলে—। ভেবেছিলুম একটু শান্তির সময় এলো। কিন্তু তা কি আর হবার জো আছে!' তারপর তিনি পলের দিকে ফিরে বললেন, 'জিনিসপত্রগুলো তুলে রাখ, এখন কি আঁকবার সময়? ট্রেনটা বা কখন? আমায় ত' আবার ছুটতে ছুটতে যেতে হবে শহরে—শোবার ঘরটা আর গোছান হ'ল না।'···

পল বলল, 'আমি গুছিয়ে রাখব মা!' মা বললেন, 'দরকার হবে না। আমি আবার সাতটার গাড়িতে ফিরে আসতে পারব। ওর কাছে গেলেই ত' আবোল-তাবোল বকাবে আর ঝঞ্ঝাট বাধাবে। আর যে গাড়িতে করে ওকে নিয়ে যাবে তার ঝাঁকুনিতেই সে বেচারী অস্থির হয়ে উঠবে।···কেন যে ওরা এম্বুলেন্স গাড়িগুলোকে সারায় না—! শুনেছিলুম এখানে একটা হাসপাতাল হবে, জায়গা-জমি সব কেনা হয়েছে, আর এখানে এত বেশী দুর্ঘটনা হয়, একটা হাসপাতাল অনায়াসে চলতে পারে। তা ত' নয়—দশ মাইল দূরে টেনে নিয়ে যাবে একটা ভাঙা গাড়িতে। কত বড় লজ্জার ব্যাপার এটা! আমি জানি সে অনেক কিছু গণ্ডগোল বাধাবে। তার সঙ্গে কে গেছে? খুব সম্ভব বার্কার। বকাবকি করে সে ওর মেজাজ খারাপ করে দেবে। তবু হাজার হলেও বন্ধু ত'? দেখা-শোনা যা করবার ওই করবে। কত দিন না জানি হাসপাতালে পড়ে থাকতে হবে। আর ক্রমেই ত' সে বিরক্ত হয়ে উঠবে। অবশ্য শুধু যদি পায়ে আঘাত লেগে থাকে তবে সেরে উঠতে হয়ত বেশী দিন লাগবে না।'

কথা বলতে বলতে মিসেস মোরেল যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। গায়ের জামাটা তাড়াতাড়ি খুলে রেখে তিনি নীচু হয়ে বসলেন গরম জলের পাইপের নীচে। ঝির্‌-ঝির্‌ করে জল পড়ছে। মিসেস মোরেল অসহিষ্ণু হয়ে হাতলটা ধরে নাড়তে লাগলেন, বললেন, 'এটাকে সমুদ্রের জলে বিসর্জ্জন দিতে হয়।' তাঁর ছোট দেহের

তুলনায় হাতগুলো ছিল বলিষ্ঠ আর সুন্দর। পল জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে কেংলিটা চাপিয়ে দিল উনুনে। দিয়ে, টেবিলটা সাজাতে লাগল। বললে, 'চারটে বেজে কুড়ি মিনিটের আগে কোন গাড়ি নেই। এখনও ঢের সময় আছে। মা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে নিচ্ছিলেন। ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'না না, সময় নেই, সময় কোথায় ?'

পল বললে, 'অনেক সময় আছে মা, এক কাপ চা তুমি অনায়াসেই খেয়ে যেতে পারো ! আর তোমার সঙ্গে ষ্টেশন অবধি যেতে হবে কি ?"

—'কেন, আমার সঙ্গে আসতে হবে কেন ?—তার চেয়ে বল দেখি, ওর জন্যে কি নিয়ে যেতে হবে ? ওর ফরসা জামাটা ? ভাগ্য ভালো, জামাটা পরিষ্কার রয়েছে। একটু হাওয়া দিতে হবে। আর ওর মোজা জোড়া—না মোজার দরকার হবে না। একটা তোয়ালে আর রুমাল। আর কিছু নিতে হবে ?' পল বললে, 'নিতে হবে—চিরুণী, ছুরি, আর কাঁটা-চামচ।' বাবা এর আগেও হাসপাতালে গিয়েছিল, কাজেই পল সব জানত।

নিজের লম্বা বাদামী রঙের চুলের রাশি আঁচড়াতে আঁচড়াতে মিসেস মোরেল বললেন, 'ভগবান জানেন, কী অবস্থায় রয়েছে। পা দুটো নিয়েই চিন্তা। কোমর অবধি সে খুব ভাল ক'রেই ধোয়—কিন্তু কোমরের নীচের অংশটুকুর জন্যে তার কোন যত্ন নেই। তবে হাসপাতালে ও-রকম রোগী একটা কেন, অনেকেই যায়।'

পলের টেবিল সাজানো হয়ে গিয়েছিল। মায়ের জন্যে পাতলা ক'রে দু'শ্লাইস রুটি-মাখন কেটে নিল সে। চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে দিয়ে বললে, 'খেয়ে নাও, মা !'

—'বিরক্ত করিস কেন ?' মা উত্যক্ত হয়ে বললেন।

—'খেয়ে নাও, লক্ষীটি, ঢেলে দিয়েছি যে,' পল মিনতি ক'রে বললে। মা ব'সে পড়ে চুমুক দিলেন চায়ে, নীরবে সামান্য কিছু খেয়ে নিলেন। মনে মনে তাঁর ভাবনার অন্ত নেই।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। এখন আড়াই মাইল হেঁটে যেতে হবে ষ্টেশনে। মোটা দড়ির ব্যাগটার মধ্যে সব কিছু জিনিসপত্র। ঝোপের ফাঁক দিয়ে পল দেখল মা হেঁটে যাচ্ছেন রাস্তা ধরে—ছোট্ট মানুষটি দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছেন—দেখে তার মন কেমন ক'রে উঠল। মায়ের কপালে যেন আর শান্তি নেই, আবার পড়লেন এই নতুন দুঃখ আর ঝঞ্ঝাটের মধ্যে। মনের গভীরে দুশ্চিন্তার বোঝা নিয়ে মা তাড়াতাড়ি হেঁটে যাচ্ছিলেন, তাঁরও মনে পড়ছিল শুধু ছেলের কথা, ছেলের মন নিশ্চয়ই তাঁর উপর পড়ে আছে, তাঁর বেদনার যতটুকু অংশ সে বহন করতে পারে, ততটুকু নিশ্চয়ই করবে। মায়ের মনে হ'ল যেন এই বেদনার মধ্যে ছেলেই তাঁর একান্ত নির্ভর।

হাসপাতালে বসে মা ভাবলেন : এত খারাপ অবস্থা—এ যদি পল শোনে, তা'হলে ওর মন ভেঙে পড়বে। ওর সামনে সাবধানে কথাবার্তা বলতে হবে। আবার বাড়ি ফিরে যাওয়ায় সময় ছেলের কথা তাঁর মনে হ'ল, মনে হ'ল যেন তাঁর দুঃখের বোঝার খানিকটা অংশ সে বহন করতে আসছে।

মা বাড়ি ঢুকতেই পল জিজ্ঞেস করল : 'খুব খারাপ নাকি, মা ?'

—'বেশ খারাপ।'

—'বলো কী ?'

মা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে ব'সে পড়লেন, ব'সে মাথার টুপির বাঁধন-গুলো খুলতে লাগলেন। মায়ের মুখ উপর দিকে ফেরানো, ছোট্ট হাত দুটি পরিশ্রমে রুক্ষ, হাত দিয়ে টুপির ফিতে খুলছেন তিনি, পল মুগ্ধ-চোখে দেখতে লাগল।

—'অবশ্য ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু নার্স বলছিল হাড়গোড় ভীষণ ভাবে ভেঙে গেছে। পায়ের উপর একটা প্রকাণ্ড পাথর এসে পড়েছিল, তাতেই হাড় ভেঙে টুকরোগুলো একেবারে বেরিয়ে পড়েছে।'

—'উঃ, কী সাঙ্ঘাতিক !' ছেলেমেয়ে ক'টি ভয় পেয়ে বললে।

—'আর সে ত' বলছে সে আর বাঁচবে না। অবশ্য ওর মত লোক এ ছাড়া আর কি বলবে ? আমার দিকে চেয়ে বললে, আর আমার রক্ষে নেই। আমি বললুম, যা-তা বলছ কেন ? পা ভাঙলে লোক মরে যায় নাকি ? সে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, যদি বেরুতেও পারি, তবু সারা জন্মের মত কাঠের ঠেলাগাড়িতে চড়ে বেড়াতে হবে। বললুম, বেশ ত,' ভাল হয়ে তুমি যদি কাঠের গাড়িতে চড়ে বাগানে বেড়াতে চাও, ওরা কি আর তোমাকে নিয়ে যাবে না ? নার্সটি সেখানেই ছিল, বললে, অবশ্য ওঁর পক্ষে যদি এটা ভাল বলে মনে করি আমরা। চমৎকার ভাল মানুষ নার্সটি তবে নিয়ম-কানুনের দিক দিয়ে বড্ড কড়া।'

মিসেস মোরেলের টুপি খোলা হয়ে গিয়েছিল। ছেলে-মেয়েরা নিঃশব্দে অপেক্ষা ক'রে রইল।

মা আবার বললেন, 'অবস্থা ত' খারাপই। খারাপ নাই বা হবে কেন ? অমন আঘাত পেয়েছে, এতটা রক্ত বেরিয়ে গেছে শরীর থেকে। [illegible]ার পা-টা ভেঙেছেও ভীষণ ভাবে। খুব সহজে যে সারবে বলে ত' মনে হয় না। তার উপর আবার জ্বর আর মনের যন্ত্রণা। যদি খারাপের দিকে যেতে থাকে তা'হলে কয়েক দিনের মধ্যেই হয়ত সব শেষ। তবে ওর রক্তে ত' কোন দোষ নেই, নতুন মাংসও গজায় আশ্চর্য্য তাড়াতাড়ি, কাজেই খারাপের দিকে যাবার কোন কারণ ত' দেখি না। কিন্তু একটা ঘা আবার রয়েছে—

আশঙ্কা আর উত্তেজনায় তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল। ছেলে-মেয়ে তিনটির বুঝতে দেরি হ'ল না, তাদের বাবার অবস্থা খুবই খারাপ। সারা বাড়িটা জুড়ে কেবল নীরবতা আর আতঙ্ক।

একটু পরে পল বললে, 'যাই বলো, বাবা ত' বরাবরই ভাল হয়ে ওঠে।'

মা বললেন, 'আমিও ত' সেই কথাই বলি ওকে।'

বাড়ির সবারই মুখ গম্ভীর—নীরবে চলা-ফেরা করতে লাগল সকলে।

মা বললেন, 'দেখে মনে হয় ওর আর কিছু বাকী নেই। নার্স বললে, 'ব্যথার চোটে ও-রকম দেখাচ্ছে।'

মায়ের কোট আর টুপি অ্যানি নিয়ে তুলে রাখলে।

—'আমি চলে আসবার সময় কি রকম ভাবে আমার দিকে চেয়ে রইল সে ! বললুম, এবার উঠি আমি, গাড়ির সময় হ'ল, ছেলে-মেয়ে-গুলো একা রয়েছে, ও শুধু চাইলে আমার দিকে। দেখেও কষ্ট লাগে।'

পল তার তুলি নিয়ে আবার ছবি আঁকতে বসল। আর্থার

বাইরে গেল কয়লা আনবার জন্যে। অ্যানি ম্লানমুখে ব'সে রইল। মিসেস মোরেল তাঁর ছোট্ট দোলনা-চেয়ারটায় নিশ্চল হয়ে ব'সে রাজ্যের ভাবনা ভাবতে লাগলেন। এই চেয়ারটা তাঁর স্বামীর হাতের তৈরি। প্রথম ছেলেটির জন্মের আগে তাঁর জন্যে তৈরি ক'রে দিয়েছিল। লোকটার জন্যে তাঁর দুঃখ হতে লাগল। তার শোচনীয় আঘাতের কথা ভেবে তাঁর মন হয়ে উঠল বিষাদাচ্ছন্ন। কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে, যেখানে আজ প্রেমের দুঃসহ জ্বালা অনুভব করবার কথা ছিল, সেখানে এক নিদারুণ শূন্যতা। তাঁর নারী-হৃদয়ের সবটুকু করুণা আজ উদ্বেলিত হয়ে উঠছে, মনে হচ্ছে আজ ওকে সেবা-শুশ্রূষা ক'রে বাঁচিয়ে তুলবার জন্যে তাঁর অদেয় কিছুই নেই, সম্ভব হলে ওর সমস্ত যন্ত্রণা নিজের ওপর তুলে নিতেও তাঁর আপত্তি নেই—তবু হৃদয়ের গভীরে কোথায় যেন লোকটার দিকে, তার সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার দিকে তাঁর একান্ত বিরাগ আর ঔদাসীন্য। মনের সমস্ত কোমল বৃত্তি যখন আজ ওরই দিকে চেয়ে জেগে উঠেছে, তখনও প্রেম এলো না জীবনে, তখনও লোকটাকে ভালবাসতে পারলেন না তিনি···এই তাঁর সব চেয়ে বড় দুঃখ। ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ ধরে এই কথাই ভাবতে লাগলেন পলেদের মা।

হঠাৎ তিনি ব'লে উঠলেন, 'আর দেখ—ষ্টেশনের পথে অর্দ্ধেক রাস্তা গিয়ে দেখি মনের ভুলে পুরোন জুতোযোড়া পরে গিয়েছি—দেখতেও আমার লজ্জা করছিল।' এ জুতোযোড়া মিসেস্ মোরেল বাড়িতে কাজ করবার সময় পরতেন, এগুলো আগে ছিল পল-এর, বাদামী রঙের জুতো, ক্রমাগত ব্যবহারে আঙুলের দিকটা ক্ষয়ে গিয়েছিল।

সকাল বেলা অ্যানি আর আর্থার স্কুলে গেলে পল মায়ের গৃহকর্মে সাহায্য করছিল। মা বললেন, 'বার্কারকে দেখলুম হাসপাতালে। ওর চেহারাও ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে, আহা বেচারী!' আমি জিজ্ঞেস করলুম, রাস্তায় মোরেলকে নিয়ে যেতে ওর খুব অসুবিধে হয়েছিল কি না। সে বললে, আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। বললুম, জানি আমি! ওর আচার-ব্যবহার জানতে কি আর বাকী আছে আমার? তখন সে বললে, না, না, সত্যিই ওর খুব খারাপ অবস্থা গেছে! আমি বললুম, তা ত' দেখতেই পাচ্ছি। সে বললে, গাড়ির ঝাঁকুনিতে আমারই মনে হয় প্রাণ বেরিয়ে যায়। আর ও ত' থেকে থেকেই চীৎকার ক'রে ওঠে। উঃ এমন যন্ত্রণা গেছে—আমাকে একটা রাজত্ব দিলেও আমার আর ওর মধ্যে যেতে ইচ্ছে করবে না। বললুম, আপনি আর কি বলবেন আমাকে? সে বললে, এই ত' মস্ত বিপদ—আর সেরে উঠতেও ত' মনে হচ্ছে লাগবে অনেক দিন। তা ত' বটেই, আমি বললুম। সত্যি, মিঃ বার্কারকে আমার খুব ভাল লাগে। ওর মধ্যে সত্যিকারের পুরুষালি ভাব আছে।

পল কোন কথা না বলে তার কাজ করতে লাগল।

মিসেস মোরেল ব'লে চললেন, 'ওর মতো, মানে, তোমার বাপের মতো লোকের কাছে হাসপাতালে থাকা কি আর সহজ! নিয়ম-কানুন ব'লে কিছু আছে, এ ত' আর সে বুঝতে চাইবে না। আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত পারবে অন্য লোককে ধরতেও দেবে না। সেবার সেই উরুতে আঘাত লাগল, দিনে চার বার ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হয়, তা ও কি আর কাউকে ছুঁতে দেবে—হয় আমি নয় ত' ওর মা! এবারও এই নিয়েই খিটিমিটি করবে নার্সদের সঙ্গে। কী করব, ও হাসপাতালে পড়ে থাকে এ কি আমারই ভাল লাগে? ছেড়ে আসবার সময় এমন মন খারাপ হয়ে গেল! আসবার সময় যখন চুমু দিয়ে চলে এলাম, তখন আমারই কেমন লজ্জা লাগছিল।'

এ যেন তিনি তাঁর চিন্তাগুলোকে কথার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করছেন ছেলের কাছে—ছেলেও যতটা সাধ্য মায়ের চিন্তার মধ্যে প্রবেশ করতে চেষ্টা করল, মায়ের অশান্তির ভাগ গ্রহণ ক'রে একটু শান্তি তাঁকে দিতে চাইল সে। ধীরে ধীরে মনের সব কিছু দুশ্চিন্তা ছেলের সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে নিলেন তিনি, যদিও নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ ব্যাপারটা ঘটল।

মোরেলের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে উঠেছিল। প্রায় সপ্তাহকাল সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। তারপর সেরে উঠতে লাগল সে। তখন বাড়ির লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল, আবার আগের মত স্বচ্ছন্দে চলতে লাগল এ-বাড়ীর জীবন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য্য

গৃহপালিত গণ্ডার

[রসরচনা]

শ্রীঅমিয়চন্দ্র মিত্র

আপনারা সকলেই মাছি-মারা কেরাণীর কথা জানেন, কিন্তু গণ্ডার-সৃষ্টিকারী কর্মচারীটির সংবাদ রাখেন না। তবে শুনুন।

অনেক দিন আগেকার কথা। লালদীঘির মহাকরণে, কৃষি-বিভাগ আপিসে সেদিন হুলুস্থূল বাধিয়া গিয়াছে। জনৈক মাননীয় সরকার-বিরোধী সদস্য কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন, ১লা এপ্রিল কৃষি-বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বিধানসভায় সেইগুলির যথাযথ উত্তর দিতে হইবে। প্রশ্নগুলি এইরূপ :—

১। কৃষি-বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, গৃহপালিত পশু সম্বন্ধে যে Census (আদমসুমার ?) প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে দু'টি গণ্ডারের উল্লেখ আছে ?

২। ঐ গণ্ডার দু'টি কোথায় ও কাহার জিম্মায় আছে ?

৩। ঐ গণ্ডার দু'টি যাহাতে সাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক না হইতে পারে, তজ্জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?

প্রশ্নগুলির উত্তরের জন্য কৃষি-বিভাগের সচিব (Secretary) মহাশয়ের নিকট পাঠান হইয়াছে। প্রশ্নগুলি দেখিয়াই সচিব মহাশয় উৰ্দ্ধ-দৃষ্টি হইলেন। পশ্চিমবঙ্গে গণ্ডার আসিল কিরূপে ? এবং তাহা গৃহপালিত পশুর Census তালিকারই অন্তর্ভুক্ত হইল কেমন করিয়া ? তিনি সহকারী সচিব ও প্রধান কারণিক (Head Assistant)কে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা নথীপত্র সহ উপস্থিত হইলেন।

দেখা গেল, প্রেসিডেন্সী বিভাগ শাসক (Commissioner) মহাশয় যে সঙ্কলিত রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন তাহাতে সেন্সাস তালিকার শেষ স্তম্ভে (Column) ও মন্তব্য-ঘরে দু'টি গণ্ডারের উল্লেখ আছে। কমিশনার সাহেবের আপিস নিকটেই। টেলিফোনে তাহাকে প্রশ্নগুলি জানান হইল ও উত্তর চাহিয়া পাঠান হইল। পরে যথাবিধি চিঠিও পাঠান হইল।

কমিশনার সাহেবের আপিসের নথী হইতে জানা গেল যে, গণ্ডার-কণ্টকিত তালিকা মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে আসিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় মাঝে মাঝে পাকিস্তানী গুণ্ডার আবির্ভাবের খবর পাওয়া যায়—গণ্ডারের কোনও সংবাদ ইতিপূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই। মুর্শিদাবাদের নবাবের হাজারদোয়ারি প্রাসাদে ত কোনও পশুশালা নাই যাহাতে গণ্ডার থাকিতে পারে। তখনি মুর্শিদাবাদের জেলা-শাসকের নিকট বেতার-বার্ত্তা পাঠান হইল, যেন তিনি তিন দিনের মধ্যে ঐ প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর পাঠাইয়া দেন।

বেতার-বার্ত্তা পাইয়া জেলা-শাসকের চক্ষু স্থির ! মুর্শিদাবাদ জেলায় গণ্ডার ! তিনি নূতন আসিয়াছেন ; জ্যেষ্ঠ উপশাসককে (Senior Deputy Magistrate) ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আপিসের কর্ত্তা (Superintendent) ও প্রধান কারণিকও নথীপত্র সহ হাজির হইলেন।

নথী হইতে দেখা গেল যে, জঙ্গীপুরের মহকুমা-শাসক থানাওয়ারী যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন তাহাতে জঙ্গীপুর থানার তালিকার শেষ স্তম্ভে মন্তব্য-ঘরে—"Rhinoceros—2" এইরূপ লেখা আছে। মহকুমা শাসকের নিকট বেতার-বার্ত্তা পাঠান হইল—তিনি যেন দু' দিনের মধ্যে উত্তর পাঠাইয়া দেন। সংকলনকারী কর্মচারীকেও নথীপত্র সহ পাঠাইবার আদেশ দেওয়া হইল।

বেতার-বার্ত্তা পাইয়া মহকুমা-শাসক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। পরে প্রধান কারণিককে তলব করিলেন। কানুনগো বাবু—যিনি এই রিপোর্ট সংকলন করিয়াছেন—তাঁহাকেও ডাকা হইল। তাঁহাকে পাওয়া গেল না—মফঃস্বলে গিয়াছেন।

ইউনিয়ন বোর্ড হইতে প্রেরিত রিপোর্টগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইল। জঙ্গীপুর থানার অনন্তপুর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট বাবুর প্রেরিত রিপোর্টে মঙ্গলপোতা গ্রামের তালিকার শেষ স্তম্ভে মন্তব্য-ঘরে এইরূপ লেখা আছে, "Gandar—2"। কানুনগো বাবু থানাওয়ারী রিপোর্ট সংকলন করিয়াছেন। তিনি জঙ্গীপুর থানার তালিকায় শেষ স্তম্ভে মন্তব্য-ঘরে লিখিয়াছেন—"Rhinoceros—2"। তাহাই জেলা-আপিসে জানান হইয়াছে।

কানুনগো বাবুর বাসায় নথীপত্র পাঠাইয়া আদেশ দেওয়া হইল, তিনি যেন আগামী প্রাতে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিয়া যান। কানুনগো বাবু সন্ধ্যা ছ'টায় মফঃস্বল হইতে ফিরিয়া আসিয়া চিঠি দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। নথী দেখিয়া বুঝিলেন সবই ঠিক আছে। প্রেসিডেন্ট মহাশয় Gandar—2 লিখিয়াছেন, গণ্ডারের ইংরাজী জানেন না। তিনি তাহা শুদ্ধ ইংরাজীতে Rhinoceros—2 লিখিয়াছেন মাত্র। যাহা হউক, এখন ভাল করিয়া তদন্ত করিয়া কাল রিপোর্ট দিবেন।

তিনি তখনই অনন্তপুরের প্রেসিডেন্টের বাড়ী যাত্রা করিলেন। চার মাইল বাইক করিয়া ও ২½ মাইল হাঁটিয়া রাত ন'টায় প্রেসিডেন্ট শ্রীনটবর মণ্ডলের বাড়ী পৌঁছিলেন। এত রাত্রিতে কানুনগো বাবুকে দেখিয়া প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ? এত রাত্রিতে ?"

কানুনগো—গণ্ডার মশায়, গণ্ডারের তাড়ায়। আপনার ইউনিয়নে গণ্ডার কোথায় ?

প্রেসিডেন্ট—গণ্ডার ! সস্তা-গণ্ডার দিন আর কি আছে ?

কানুনগো—আপনার গৃহপালিত পশুর সেনসাস্ তালিকায় দু'টি গণ্ডার লিখিয়াছেন। এই দেখুন রিপোর্ট। গণ্ডার কোথায় ?

প্রেসিডেন্ট—আরে, মশায় গণ্ডার কোথায় ? এ ত রাজহংস। আমার কেরাণী বলিলেন রাজহংসের ইংরাজী gandar, তাহাই লেখা হইয়াছে।

কানুনগো—বানানে যে ভুল করিয়া gardar লিখিয়াছেন।

প্রেসিডেন্ট—পাঁচ টাকার কেরাণীর আবার বানানে ভুল !

কানুনগো—আমি ত মশায় গণ্ডার মনে করিয়া Rhinoceros লিখিয়া রিপোর্ট দিয়াছি। এখন উপায় ?

প্রেসিডেন্ট—আরে তাই না কি ! হাঃ হাঃ হাঃ। আমার কেরাণী তো মাত্র বানানে ভুল করিয়াছে আর আপনি করিয়াছেন আসলে ভুল ! হাঃ হাঃ হাঃ।

কানুনগো—এখন চাকরী যে যায় !

প্রেসিডেন্ট—রাখুন মশায় ! সরকারী চাকরী পাওয়াও শক্ত, যাওয়াও শক্ত। কিছু ভাববেন না। এখানে মঙ্গলপোতায় মা

মঙ্গলচণ্ডী আছেন। জাগ্রত দেবতা! পাঁচ সিকে পূজো দিয়ে যান। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কানুনগো প্রেসিডেণ্ট মহাশয়ের বাটীতে রাত্রিবাস করিয়া পাঁচ সিকে পূজার ব্যবস্থা করিয়া পরদিন ভোরে সদরে ফিরিয়া আসিলেন ও কাঁপিতে কাঁপিতে মহকুমা-হাকিমের নিকট হাজির হইলেন।

হাকিম—গণ্ডারের কি হইল?

কানুনগো—গণ্ডার পাওয়া যায় নাই।

হাকিম—কোথায় গেল?

কানুনগো—গণ্ডার রাজহংস হইবে। প্রেসিডেণ্ট রাজহংসের ইংরাজীতে বানান ভুল করিয়া gandar লিখিয়াছিল—আমি তাহাতে গণ্ডার মনে করিয়া Rhinoceros লিখিয়াছিলাম।

হাকিম—তাহার ত সামান্য বানানে ভুল—আর আপনার কাণ্ডজ্ঞানের ভুল। প্রশ্নের উত্তর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দিয়া আসুন। গবর্ণমেণ্ট হইতে রিপোর্ট চাহিয়াছেন।

কানুনগো—স্যর, আমার চাকরী?

হাকিম—কি হইবে বলা যায় না। তবে আমি নিজে আর কিছু লিখিব না।

কানুনগো বাবু মুখটি চুণ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন ও সেই দিনই নথীপত্র লইয়া জেলা-শাসকের খাস্‌কামরায় হাজির হইলেন।

জেলা-শাসক—আপনার ব্যাপার কি? গণ্ডার কোথা হইতে আমদানী করিলেন?

কানুনগো—গ-গণ্ডার নেই স্যর—লি—লিখিবার ভুল হইয়াছে।

জেলা-শাসক—ভুল! রিপোর্ট গভর্ণমেণ্টে গেছে, প্রকাশিত হয়েছে, এখন বলেন ভুল? আপনারা নিজেদের চাকুরী খাইবেন, আমাকেও টিকিতে দিবেন না।

কানুনগো বাবু সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। জেলা-শাসক সমস্ত শুনিয়া গম্ভীর হইয়া "হুম্" বলিয়া কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া বহিলেন। উপরে বিদ্যুতের পাখা চলিতেছিল। তৎসত্ত্বেও কানুনগো বাবু ঘামিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে জেলা-শাসক বলিলেন, "আপনি উত্তর ও কৈফিয়ৎ রাখিয়া চলিয়া যাইতে পারেন।"

কানুনগো—স্যর আ—আমার চা—চাকরী?

জেলা-শাসক—কি হইবে বলিতে পারি না। তবে যাওয়াই উচিত।

কানুনগো মা মঙ্গলচণ্ডীর নাম স্মরণ করিতে করিতে বিদায় লইলেন।

জেলা-শাসকের আপিস হইতে উত্তরগুলি কৈফিয়ৎ সহ কমিশনারের আপিসে পাঠান হইল। এক প্রস্থ প্রতিলিপি জঙ্গীপুরের মহকুমা-শাসকের নিকট গেল ও তৎসঙ্গে মন্তব্যও পাঠান হইল, যেন এইরূপ আজগুবী রিপোর্ট ভবিষ্যতে পাঠান না হয়।

কমিশনারের আপিস হইতে মহাকরণে রিপোর্ট পাঠান হইল। জেলা-শাসকের নিকট মন্তব্যও পাঠান হইল, যেন ভবিষ্যতে কোনও রিপোর্ট পাঠাইবার সময় সেইগুলি যথাযথ ভাবে পরীক্ষা করা হয়।

রিপোর্ট যথাসময়ে কৃষি-বিভাগে ও তদুর্দ্ধে কৃষিমন্ত্রীর হস্তগত হইল।

১লা এপ্রিল প্রশ্নোত্তর কালে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী উত্তর দিলেন—

১। মাননীয় সদস্য মহাশয়কে জানান হইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে কোনও গণ্ডার নাই। রিপোর্টে যে গণ্ডার আছে তাহা ভ্রমবশতঃ ঘটিয়াছে। দুই ও তিন নং প্রশ্নের উত্তরের কথা উঠে না।

মাননীয় সদস্য—ভ্রমটি কি প্রকৃতির তাহা জানাইবেন কি?

মাননীয় মন্ত্রী—কোনও ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট দুটি রাজহংসের উল্লেখ করিয়া ইংরাজী অনুবাদে ভুল করিয়া Gandar লিখিয়াছিলেন। সংকলনকারী কর্মচারী Gandar শব্দটিকে বাংলায় গণ্ডার ধরিয়া লইয়া ইংরাজী অনুবাদ Rhinoceros লিখায় এই ভ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে।

জনৈক সদস্য—গণ্ডার রাজহংস হইয়া মানস-সরোবরে উড়িয়া গিয়াছে!

সভায় উচ্চ হাস্যরোল।

মাননীয় সদস্য—ঐ অযোগ্য সংকলনকারী কর্মচারী ও যে যে উচ্চপদস্থ কর্মচারী মাধ্যমে এই রিপোর্ট গভর্ণমেণ্টে পৌঁছিয়াছে, মন্ত্রী মহাশয় কি তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থা করিবেন?

অন্য মাননীয় সদস্য—আমরা কি সরকারের অন্য রিপোর্টগুলিও এইরূপ ১লা এপ্রিলের তামাসা বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি?

সভায় উচ্চ হাস্যরোল। সভাপতি—অর্ডার! অর্ডার!

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কোনও উত্তর দেন নাই।

'গানের রাজা' রবীন্দ্রনাথ

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

জীবনের কোন ক্ষেত্রেই আকস্মিকতার স্থান নেই। প্রকৃতির রাজ্যে প্রতিনিয়ত কত পরিবর্তন ঘটে দেখি। কিন্তু হঠাৎ একটা বিরাট পরিবর্তন সেখানেও সাধারণতঃ ঘটে না—বহু দিন ধরে চলে তার পূর্ব-প্রস্তুতি। এ সত্য মানব-সমাজেও চিরন্তন। তাই কোন দেশে যখনই কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তখনই বোঝা যায় সেখানে তাঁর আগমনের নিশ্চয়ই একান্ত প্রয়োজন আছে। কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও এ সত্যের ব্যতিক্রম ঘটেনি। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করলেন, তখন পুরাতন বাংলা ভাষার ভাঙ্গার কাজ হয়েছে শেষ—প্রয়োজন গড়ার কাজের—আর সে প্রয়োজনের জন্য চাই একজন অমোঘ শক্তিসম্পন্ন ভাষার কারিগর।

২৫শে বৈশাখ বাংলার বিশেষ সম্পদ কালবৈশাখী তার ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বহন করে নিয়ে এল বাংলার জন্য এক শুভ সম্পদ—সেই নবাগত সম্পদ কালবৈশাখীরই মত জীর্ণ পুরাতনকে ভেঙ্গে-চুরে এক নবীন অধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা করল বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে। বাংলার কোলে এক শুভলগ্নে জন্ম নিলেন রবীন্দ্রনাথ—নব বাংলা ভাষার স্রষ্টা—ভারতের রবি—বিশ্বের কবি রবীন্দ্রনাথ।···

সাহিত্য-জগতে এমন কোন দিক নেই, যাতে রবীন্দ্রনাথ পদার্পণ করেননি। তাঁর প্রতিভারূপ স্পর্শমণির ছোঁয়া যাতে লেগেছে, কি এক অদৃশ্য শক্তির বলে সেই জিনিষই হয়ে উঠেছে সোনার! তবু সব-কিছু ছাপিয়ে, সব-কিছু ছাড়িয়ে সব চেয়ে সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর গান—সে গানের তুলনা মেলা বড় কঠিন।

কাব্যসৃষ্টির প্রথমাবস্থায় তিনি ছিলেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পূজারী। তাই তাঁর গানের মন্ত্রে তিনি পূজা করেছিলেন প্রকৃতি দেবীকে। এ জগতের সব কিছু তাঁর চিরনবীন চোখের সামনে চিরনূতন, চিরসুন্দর হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাই তিনি গেয়েছেন—

এই তো ভাল লেগেছিল—
আলোর নাচন পাতায় পাতায়
শালের বনে ক্ষ্যাপা হাওয়া
এই তো আমার মনকে মাতায়।
রাঙামাটির রাস্তা বেয়ে
হাটের পথিক চলে ধেয়ে
ছোট মেয়ে ধূলায় বসে খেলার ডালি আপনি সাজায়।
সামনে চেয়ে এই যা দেখি, চোখে আমার বীণা বাজায়॥

চিরকালের বারো মাসের ছয় ঋতু রবীন্দ্রনাথের গানে নতুন করে ভাষা পেল। চৈত্রাবসানে তিনি নববর্ষকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন বৈশাখ মাসকে আহ্বান করে—

এস হে বৈশাখ, এস, এস,
তাপস নিশ্বাস বায়ে
মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক্॥···

এল নিদাঘ—প্রখর-তপন-তাপে ধরাতল তপ্ত হয়ে উঠল। কবিগুরু গাইলেন—

দারুণ অগ্নিবাণে রে, হৃদয়তৃষা হানে রে
রজনী নিদ্রাহীন দীর্ঘ দগ্ধ দিন
আমার নাহি জানে রে।

সে অবিশ্রাম অগ্নিবর্ষণও একদিন শেষ হল। এল বর্ষা—আকাশের জ্বলন্ত চোখ সহসা কালো মেঘের আবরণে ব্যথায় বুঝি ম্লান হয়ে এল। ঐ এল বৃষ্টি—মানুষের মন নৃত্য করে উঠল আনন্দে। সে আনন্দকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে
শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস, কলাপের মত করেছে বিকাশ
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচে রে॥

বর্ষাশেষে কৃষ্ণাবরণ উন্মুক্ত করে ধরাতলে এল শরৎ। সুনির্মল আকাশ, পুষ্পফলভারাক্রান্ত বৃক্ষরাজি—সবাই নির্বাক্-বিস্ময়ে নিজেদের সৌন্দর্য্য অবলোকন করছে অতৃপ্ত নয়নে। কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হল—

এস হে শারদলক্ষ্মী তোমার শুভ্র মেঘের রথে
এস নির্মল-নীল পথে
এস ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল বন-গিরি-পর্ব্বতে
এস মুকুট পরিয়া শ্বেত শতদল কনক-শিশির ঢালা॥

এবার এল হেমন্ত। প্রান্তে নব-শিশির-সিক্ত নতুন ধান নবারুণালোকে ঝলমল করে উঠে। শীতের আসন্ন আগমনে—হিম-ঢাকা পৃথিবী রাতে যেন ধূসর রং ধারণ করে।

হায় হেমন্তলক্ষ্মী তোমার নয়ন কেন ঢাকা
হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা॥

শীত এসে যায় মন্থর গতিতে। হঠাৎ প্রকৃতিকে কেমন যেন রিক্ত নিঃস্ব অসহায় মনে হয়। কবি-গুরু সে শীতের কথাচিত্র অঙ্কিত করলেন—

শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন আমলকীর ঐ ডালে ডালে।
পাতাগুলি শিরশিরিয়ে ঝরিয়ে গেল তালে তালে॥

এবার এল ঋতুরাজ। সৌন্দর্য্যের সাজে নতুন করে সজ্জিত হল প্রকৃতি—সাজসজ্জায়। বসন্তের আগমনে স্থলে-জলে-বনতলে লাগল রঙের প্রলেপ—প্রকৃতিও বুঝি আজ হোলির খেলার আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে। সে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্য রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে পেল ভাষা—উপদেশ দিলেন তিনি কৃত্রিম জীবন-যাপনে অভ্যস্ত মানব-সমাজকে—

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে।

শুধু ঋতু নয়—প্রকৃতির কোন ক্ষুদ্র বস্তুও তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি। ফুল, জল তাঁর দরদী লেখনীর মুখে নব-নব সৌন্দর্য্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে। তাঁর লেখনীর ভাষা পেয়ে—

ফুল বলে, ধন্য আমি মাটির পরে
দেবতা ওগো, তোমার পূজা আমার ঘরে।
জন্ম নিয়েছি ধূলিতে
দয়া করে দাও ভুলিতে
নাই ধূলি মোর অন্তরে॥

বৃষ্টিকে সম্বোধন করে কবিগুরু গেয়ে উঠলেন গান—

হে আকাশ-বিহারী-নীরদবাহন জল
আছিল শৈল-শিখরে শিখরে
তোমার লীলাস্থল।

··· ··· ··· ···

শেষে শ্যামল মাটির প্রেমে
তুমি ভুলে এসেছিলে নেমে
এবে বাঁধা পড়ে গেলে যেথানে ধরার গভীর তিমিরতল ॥

ঐ সজীব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনায় মুগ্ধ হল বিশ্বভুবন—কিন্তু মহাকবি তৃপ্ত হলেন না। এবার এক মহান্ আকর্ষণ তাঁকে আকৃষ্ট করল। সৌন্দর্যের পূজারী হলেন ভগবৎ-প্রেমিক। এবারও তাঁর পূজার মন্ত্র হল গান। গাইলেন রবীন্দ্রনাথ—

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না শুকনো ধূলো যত
কে জানিত আসবে তুমি গো অনাহূতের মত।
পার হয়ে এসেছ মরু
নাই যে সেথায় ছায়াতরু
পথের দুঃখ দিলেম তোমায় গো এমন ভাগ্যহত।

তিনি প্রার্থনা করলেন ভগবানের কাছে—পেতে চাইলেন তাঁকে পথ-প্রদর্শকরূপে।—

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে
পিছিয়ে পড়েছি আমি যাব যে কি করে।
এসেছে নিবিড় নিশি পথরেখা গেছে মিশি
সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে।

কি অপূর্ব! কি সুন্দর!—

আজ আমরা যে কোন পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে উল্লেখ করতে পারি রবীন্দ্রনাথের গান। তাঁর মত এত সুন্দর আর এত সংখ্যক গান বোধ করি আর কোন কবি লেখেননি। তাই তো তিনি 'গানের রাজা'।

২২শে শ্রাবণ, তোমার চোখে জল! কেন? আজ বাংলা দেশের ঘরে ঘরে যে অশ্রুর প্লাবন—তারই সঙ্গে মিলে কেঁদে চলেছ বুঝি তুমি অবিরল ধারায়—অবিশ্রান্ত ভাবে? ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে মিশে তোমার হাহাকার—আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে দিকে দিকে কেঁদে বেড়াচ্ছে—তিনি নেই! তিনি নেই!...না, না! ও কথা বোলো না! "কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের তরে দীর্ঘশ্বাস?" তিনি আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবেন? তাঁর প্রিয় সোনার বাংলা দেশ ছেড়ে, তাঁর প্রিয় ভাই-বোন সন্তান-সন্ততি ছেড়ে—তাঁর সুন্দর ভুবন ছেড়ে তিনি কোথায় যাবেন? তিনি যে অব্যয়, অক্ষয়,—তিনি যে শাশ্বত—তিনি যে অমর! তাঁর মূর্ত্তি, তাঁর কণ্ঠস্বর লুকিয়ে আছে তাঁর রচনার মধ্যে—যুগ যুগ ধরে সে অমনি করেই লুকিয়ে থাকবে।

অনুবর্তন

চিত্ত সিংহ

একটি কুঁড়ি, সকাল হলে দেখে,
রূপ নিয়েছে ফুলে,
ভাবছে সে-ও কোন্ বিধাতার ভুলে,
রঙীন হলো আবীর রঙ মেখে।
দেখছে সে তার, মাথার 'পরে
আলোর লুটোপুটি,
রঙের ছুটোছুটি।
দেখল চেয়ে দূরে—
আকাশ মাটি মিলেছে তার সুরে।

ভাবতে তার অবাক লাগে মনে,
তাই সে ক্ষণে ক্ষণে,
তাকায় আশে-পাশে,
দেখল সে, ভ্রমর ছুটে আসে।
ভয়েতে তার মনটি থরো থরো,
দেহটি তার ছোট্ট জড়োসড়ো,
তবু সে সংগীতে,
ডাকল ইংগিতে।
ভ্রমর এলো, গানের তালে তালে,
সুর ছড়িয়ে প্রাণের ডালে ডালে,
অবাক হাতে টানল কাছে তাঁকে,
গানের ফাঁকে ফাঁকে।

অবশেষে অনেক কথার পরে,
বসল বুকের 'পরে
উজাড় করে নিলো,
যা কিছু তার বুকের মাঝে ছিলো।
কান্না পেল তার,
এবার বুঝি সুরুই হবে,
শেষের অভিসার?

অবশেষে, সূর্য পড়ে ঢলে,
মানুষ ঘরে চলে,
সন্ধ্যা নামে বুঝি,
তাই ভাবে চোখ বুজি,
এবার কি তার হবে,
আলোর পরাভবে?

সন্ধ্যা হবার তখনো ঢের বাকী,
পড়লো মনে, এবার দেবে ফাঁকি
শেষের বেলাটুকু,
হাসির খেলা খেলে,
উদাস অবহেলে।

কিন্তু তখন সাঙ্গ তার বেলা,
শেষ হলো তার খেলা,
পড়ল খসে ঝরে,
তখন গাছের শীষে,
আরেক কুঁড়ির,
ফোটার ঘণ্টা পড়ে।

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

গত আষাঢ় সংখ্যায় মাসিক বসুমতীতে জীবন-মেঘের বিদ্যুল্লতা 'বিজলী'র ২৩শ সংখ্যা অবধি পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ১৩২৮ সালে ১৬ই বৈশাখ শুক্রবারে (ইংরাজি ২৯শে এপ্রিল, ১৯২১) এই অনুপম জীবন-বেদের ২৪শ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সে সংখ্যার 'কালবৈশাখী' এক পরম অনবদ্য লেখা, সেটি উদ্ধৃত করে যুগ-বহ্নিশিখার পরিচয় আরম্ভ হোক।

"শক্তির যে পাগল সে শক্তিকে চেনে না। কালী কেবল খড়্গের নয়, কেবল নরমুণ্ডের রক্তপাতের ঠাকুর নয়। এই জগতে শুভ-অশুভ—শিব-অশিব যত শক্তি খেলছে সবার মূল আদ্যাশক্তিরই নাম কালী। যে এ শক্তিকে দেখেছে সে শিবকেও দেখেছে, কারণ সব শক্তিই তো উঠছে একই পরম-শরণ-শিব থেকে। এ দুনিয়ায় চামুণ্ডার সহচর অনেক জাতি আছে, যারা কালীকে চেনে না, কিন্তু কালীর খাঁড়ার ইঙ্গিতে নাচে। যারা অন্ধ তারাই কালীর দাস, আর যারা জ্ঞানী তারা শিব জ্ঞানে আদ্যাশক্তিকে বুকে ধরে। ভারতে অখণ্ড জ্ঞানে অনন্ত প্রেমে অনন্ত শক্তি খেলুক, তোমরা শিব হয়ে কালীর সাধনা কর। সেদিন পাঞ্জাবে নানকানা সাহেবে যে কাণ্ড হ'লো, আজ ইউরোপের ঘরে ঘরে যে কাণ্ড চলছে, ঐ তো নরঘাতী অশিব কালীর খেলা। ওতে জগতে কি শান্তি আসবে?"

তখনো দ্বিতীয় মহাসমরের প্রলয়-অগ্নি জ্বলতে ১৮ বৎসর বাকি। চারিদিকে তখন চামুণ্ডার ভূত-প্রেত সাজছে।

'কালবৈশাখী'র সংবাদস্তম্ভে 'বিজলী' খবর দিচ্ছে—এদিকে সিনফিনের আগুন রাবণের চিতার মত জ্বলছে। * * * শত্রুর তিন কুল মুক্ত। তাই লয়েড জর্জ সুর ধরেছেন যে সাম্রাজ্যের একতা রক্ষা পেলে তিনি আয়র্লণ্ডের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করতে রাজী আছেন। তাঁর কথা শোনে কে? * * * বলসীদের সম্বন্ধে কত রকম বে-রকমের খবর বার হচ্ছে। এই বলসীরা যায় যায়, আবার তারা তোফা বেঁচে উঠলো। ট্রট্স্কী গুমোর করে বলেছেন, যে, বলসী সৈন্যের সংখ্যা এখন দশ লাখ। * * * বিলেতের মর্ণিং পোষ্ট কাগজে লিখছে যে ট্রট্স্কী সদল বলে আফগানিস্থানের দিকে এসেছে। কি মতলব তা কেউ জানে না।

২৪শ সংখ্যার ১ম সম্পাদকীয় ছিল—শ্রীঅরবিন্দের A preface on National Education অবলম্বনে লেখা—জাতীয় শিক্ষার গৌরচন্দ্রিকা (পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)। শ্রীঅরবিন্দের জাতীয় শিক্ষার মূল কথা কারও অবিদিত নাই।

এবারকার উপেন্দ্রনাথের লিখিত 'ঊনপঞ্চাশী' বড় মর্ম্মস্পর্শী। একটি ছেলে ও পণ্ডিতজীর কথার মধ্য দিয়ে এই 'ঊনপঞ্চাশী'র রস পরিবেশন হয়েছে।

পণ্ডিত। দেশের কথা? তা' শুনতে চাও তো বলতে পারি, কিন্তু বিশ্বাস করবে কি? (বিশ্বাসের স্বীকৃতি পেয়ে)—সেদিন আষাঢ় মাসের সন্ধ্যাবেলা। * * * আমি জানলা খুলে চুপ করে আকাশ পানে চেয়ে আছি, এমন সময় মনে হলো, সমস্ত পৃথিবীটা যেন কাঁপতে আরম্ভ করেছে। চারিদিকে চেয়ে দেখলুম ঘর, দোর, জানালা, বাড়ী কোথায়ও কিছু নেই, সব কোথায় মিলিয়ে গেছে। আমি আছি—কিন্তু কই, আমার শরীরটাকে তো দেখতে পাচ্ছি নে? ভাবলুম বুঝি স্বপ্ন দেখছি—কিন্তু না, দিব্যি টন টন করছে জ্ঞান! মনে হলো শূন্যে কোথায় শোঁ শোঁ করে উড়ে চলেছি। সেই মহাশূন্য জুড়ে কেউ নেই—শুধু আমি আর আমি। * * * আমার মনে হতে লাগলো, একটা কিছু ঘটবে। কতক্ষণ এ রকম ছিলাম জানি না, হঠাৎ একটা কান্নার শব্দ শুনে আমার যেন সমস্ত মনটা কেঁপে উঠলো। এখানে কাঁদে কে? নীচের দিকে চেয়ে দেখলাম—যেন অস্পষ্ট কি একটা দেখা যাচ্ছে। কে ও? * * * মনে হতে লাগলো—কার যেন দেহ, মন সব গলে গিয়ে একটা কান্নার সুর হয়ে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। কে ও কাঁদে।

"তার পর?"

"তার পর সে কান্না চুপ করে গেল। সুমুখে চেয়ে দেখি, মহাশূন্য জুড়ে একটা জ্যোতি ফুটে উঠেছে—আর সেই জ্যোতির মাঝখানে এক দিব্যমূর্ত্তি। আর তাঁর পা থেকে একটা আলোর তরঙ্গ ছুটে গিয়ে পড়েছে পৃথিবীর বক্ষে। সেই আলোতে দেখলাম—যে কাঁদছিল সে কে! দেখলুম একটি মেয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। জীর্ণ-শীর্ণ আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী কঙ্কালসার দেহ, কালো চুলের রাশি কাদায় লুটাচ্ছে আর তার পিঠের উপর একখানা প্রকাণ্ড পাথর চাপানো আর পাথরের ধারে ধারে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। আলোর একটা তরঙ্গ গিয়ে স্নেহাশীর্ব্বাদের মত মেয়েটির মাথার উপর পড়লো। সারা দেহ তার কেঁপে উঠলো। সে আকাশের পানে মাথা তুলে দেখলে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের মুখ করুণায় ভরে গেছে। তিনি বললেন,—"ওঠ।"

মেয়েটি একবার হাতের উপর ভর দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করলো। পাথরের চাপে দেহ তার ফেটে ফেটে রক্তের ধারা ছুটতে লাগলো। মুখ তার চোখের জলে ভেসে গেলো। দিব্যপুরুষের পায়ের দিকে একবার কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে সে আবার পড়ে গেলো।

"সত্যি?"

"সত্যি মিথ্যে জানি নে, যা' দেখলুম তাই বলছি। সত্যি কি মিথ্যে তা'তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ। ১৯০৭এ দেখেছ, ১৯২১এ দেখছো। পাঁচ সাত বছর বেঁচে থাকলে বাকিটাও দেখবে।"

"বাকিটা কি দেখলেন ?"

"যা' দেখলুম তা আফিমখোরেও বাড়া। ভগবান কখনও কাঁদে বলে মনে হয় ? হয় না ? কিন্তু আমি সেই দিন ভগবানকে কাঁদতে দেখেছি। বেশ স্পষ্ট দেখেছি—সেই মেয়েটির জন্যে ভগবানের চক্ষু ফেটে জল পড়লো। তিনি বললেন, "ওঠো—আমি যে তোমাকে চাই"।

"মেয়েটি চুপ করে পড়ে রইলো, বললো—"আমার শক্তি ফুরিয়ে গেছে; তোমার শক্তিতে আমাকে তুলে যাও। আমার দেহ মন প্রাণ যদি বেঁচে ওঠে ত তোমার শক্তিতে বেঁচে উঠুক"।

"ভগবানের মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম হাসিতে মুখ ভরে উঠেছে। হায় রে কাঙাল ভগবান! তুমি এই কথাটি শোনবার জন্যে হাজার বৎসর বসেছিলে? তার পর সেই জ্যোতির তরঙ্গে গা ভাসিয়ে ভগবান নেমে এলেন। মেয়েটির হাত ধরে বললেন—"এইবার ওঠো, তোমার বাঁধন খসে গেছে"

ইংরাজ কবি বলছেন—'Our deepest thoughts are those that tell of saddest thoughts'—আমাদের গভীরতম ভাব তাই যা' করুণতম দুঃখের কথা বলে। খৃশ্চান জগতের দুঃখবাদ—ক্রুশবিদ্ধ যীশুর পাপী-তাপীর ত্রাণে আত্মদান। আমরাও একদিন দুঃখিনী কাঙালিনী ভারতমাতার বন্ধন-দুঃখে কেঁদে কবিমুখে দেশ ভাসিয়েছি। কিন্তু ভারত—মৃত্যুঞ্জয়ী দুঃখজয়ী ভারত বহুরূপে এক সৎ-এর লীলানন্দের কথা বলে, ভীমা রুদ্রা বিশ্বা ষড়ৈশ্বর্যময়ী সবই মায়ের রূপ। ভারতের জীবন-নীতিতে দুঃখবাদের স্থান নাই, ভারতের চক্ষে আনন্দ হইতে জাত, আনন্দে স্থিত, অন্তিমে আনন্দরূপ ব্রহ্মে সমাহিত এ অবিনশ্বর সৃষ্টি ও জীবনে কোথায়ও দুঃখ বা মৃত্যু নাই। এ অখণ্ড অমৃততত্ত্ব ও সচ্চিদানন্দময়ী আদ্যাশক্তির ধারণা পাশ্চাত্যের অনুভূতির বস্তু নহে।

এ সংখ্যায় 'বিজলী'তে এ ছাড়া আরও রসসাহিত্য মারফৎ রাজনীতির পরিবেশন আরও আছে, যথা 'রামও বল রে কাপড়ও তোল রে,' 'দুনিয়াদারী' এবং পাঁচমিশেলী শিরোনামায় সংবাদ পরিবেশন। সে টিপ্পনী সহ সংবাদগুলি হচ্ছে,—ফিলিপাইনে বাঁধন কাটার গান, ঘর ভেদে বারণ নষ্ট, আমড়ার চামড়ার স্বর্ণের শোভা, নতুন ছাতারে কীর্ত্তন, কুজ্জার দূতীগিরি। বিজলীর এই রং-রসের ভাষা ব্রহ্মবান্ধবের সে যুগের সন্ধ্যার দান। এই ২৪ সংখ্যা 'বিজলী'র শেষ দিকে, "কাজের কথা" বলে যথারীতি দুইটি প্যারা আছে। তাতে গঠনের কাজের ছক দেওয়া আছে বলে উদ্ধৃত করছি—

কাজের কথা

চাষীর সঙ্ঘ

প্রত্যেক গাঁয়ে এক দল করে আপনভোলা মানুষ চাষার কল্যাণে ব্যবসা ফেঁদে বসো। আমরা তেমন ধনকুবের চাই না যে কুবের লক্ষ লোককে কুলী করে দেশের টাকা পোঁটলা বাঁধে, আর কখন কখন দান করে নাম কেনে। সেও মানুষকে যে দাসখতে বাঁধছে। তোমরা এক-একটি বড় বড় ব্যবসা ফেঁদে গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি কর, গ্রামের সম্পদ বাড়াও, কিন্তু ক্রমশঃ চাষীদের এক করে সেই ব্যবসার মালিক করে দাও। তারা পরের স্বার্থে নিজের স্বার্থ ডুবিয়ে কাজ করতে শিখুক। সেই ব্যবসার টাকায় স্কুল, লাইব্রেরী, ধর্ম্মগোলা, পথ, ঘাট, গোষ্ঠ, মন্দির, দীঘি, হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক, ছত্র, বাগান, রঙ্গমঞ্চ এমনি সব আনন্দের জিনিষ গড়ুক। তাদের এত বড় হতে হবে, এমন এক জোট হতে হবে যে যেন জমিদারীও ভবিষ্যতে কিনে নিয়ে গ্রামের যৌথ সম্পত্তি করে দিতে পারে। এক একটি গ্রাম হোক এক একটি সঙ্ঘ—প্রেম-পরিবার। তারা উঠবে বসবে চলবে ফিরবে একদেহ একাত্মা হয়ে। কিন্তু এত শক্তি পেলে মানুষ মাতাল হয়ে পড়ে, যার সঙ্গে মতে না মেলে তাকে পিষে ফেলে। তাই ধর্ম্ম চাই, মনটি খুব উঁচু সুরে বাঁধা চাই। গ্রামে গিয়ে তোমরা স্বার্থের ব্যবসা, স্বার্থের কৃষি করো না, সব চাষীর জন্যে কর, চাষীই দেশের জীবন।

কাজের কথা

মন মুক্ত তো জগৎ মুক্ত

এদেশে গাঁয়ে গাঁয়ে মানুষ মনমরা হয়ে আছে; জমিদারের অত্যাচারে মহাজনের তাড়নায়, রাজার আইনের চাপে আর গ্রামস্থ ভদ্রলোকের ঔদাসীন্যে চাষা উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। ঘরে ঘরে পরচর্চ্চা, কলহ, তাস, দাবা, মোকদ্দমা, মামলা ও পাপাচার। কি ভদ্র কি ইতর সবারই মন এত ছোট্ট হয়ে গেছে, যে, নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না, পরের দুঃখে সুখ পায়, ঘরে মা-বোনের মূর্খ অজ্ঞান অবস্থা গা-সওয়া হয়ে গেছে। স্বরাজের ডাকে দু'দিন সাড়া দেয়, সভায় আসে, আবার কিন্তু যা' ছিল তাই হয়ে দাওয়ায় বসে তামাক খায়। এই সব মনমরাদের বুকে বল, চক্ষে আগুন, বাহুতে দশভুজার তেজ, শক্তি ও অন্তরে আনন্দ দিতে হবে। এই সব পাষাণ ভেদ করে দিব্য জীবনের ফুল ফোটাতে হবে, সেই অসাধ্য সাধনের পরশমণি মানুষ চাই। সেই মানুষ যে উপায়ে পার গড়। দেশ যদি আরও পঞ্চাশ বছর স্বাধীন না হয় ক্ষতি নাই, তোমরা মানুষ হও। এইটুকু বোঝ যে জীবন্তের দেশ জীবন্ত, মরার দেশ মরা। মাটিতে কিছু নেই, মানুষ নিয়েই সব। মানুষের বুকে তিল তিল করে স্বরাজ গড়াই পাকা গাঁথনী। সে স্বরাজ হাজার বছর টিঁকে যাবে, কারণ যে জাতির অন্তর মুক্ত তাকে বাঁধবে এমন শক্তি দুনিয়ায় নাই। আমরা মনে জ্ঞানে মুক্তি চাইলেই মুক্তি আসবে।

তার পর ২৩শে বৈশাখ, ১৩২৮ সাল, শুক্রবারে প্রকাশিত 'বিজলী'র ২৫শ সংখ্যা।

কালবৈশাখী

কালীর বাঁ হাতে খড়্গ দেখে ভয় পাও? মুণ্ডমালা দেখে শিউরে ওঠ? ডান দিকে মায়ের চেয়ে দেখো—ঐ মায়েরই হাতে বরাভয় রয়েছে। যার মাথা মায়ের হাতে কাটা যায়

সেই বেঁচে ওঠে। অসুর আর কে?—তুমি আর আমি এবং যারা অহঙ্কারে ঘাড় উঁচু করে মায়ের সৃষ্টিতে অশান্তি এনেছি; অনন্ত মিলনের মাঝখানে বিচ্ছেদের হলাহল এনেছি, মোড়ল সেজে দুনিয়াকে নিজেদের খেয়াল মত ভাঙতে গড়তে চলেছি। নিজের সেই অহঙ্কারী উঁচু মাথা কেটে মায়ের হাতে তুলে দাও; তুমিও বাঁচবে, জগতও শান্ত হবে। নিজের সৃষ্টি মা নিজে পালন করবেন। বরাভয়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

'কালবৈশাখী'র পর এ সংখ্যার প্রথম সম্পাদকীয় লেখার শিরোনামা—"মানসিক ব্যাধি।" লেখায় আছে—

"এই যে আমাদের ভাববার অনিচ্ছা, চিন্তা করতে অলসতা—এই যে আমাদের মানসিক ব্যাধি, এ ব্যাধি থেকে জাতি যত দিন না মুক্ত হচ্ছে, তত দিন সমাজ আপনার জন্যে মুক্তির মোহন মালা গেঁথে তুলতে পারবে না—কি দেহের কি আত্মার। কেন না অজ্ঞানতাই হচ্ছে শৃঙ্খল—আর অজ্ঞানতাকে পরাভব করতে পারে একমাত্র জ্ঞান, আর জ্ঞান জিনিসটা মনোজগতের জিনিস।

সুতরাং কি সমাজে কি সাহিত্যে কি রাজনীতিতে যেখানেই আমাদের এই মনকে ঘুম পাড়ানোর মন্ত্র শুনবো সেখানেই যে একটা অমঙ্গল বাসা বেঁধে আছে—এ কথা যেন আমরা বুঝতে পারি। এত কাল আমাদের সমাজ সনাতন ধর্মের দোহাই দিয়ে আমাদের মন বুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। * * * আজ আবার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বক্তার কথা তুলে ঐ ঘুম পাড়ানোর ব্যবস্থা চলছে আর আমাদের চোখের পাতা আরামে বেশ বুজে আসছে। * * * দেশে তাঁত চলুক—খুব ভাল কথা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লোকের মন বুদ্ধিও যেন চলে।"

লেখাটি আগাগোড়া এই সুরে বাঁধা। প্রতিটি লাইনে আছে ঘুমন্ত তামস অলস জাতির সম্বিতের উপর চাবুক। এ সংখ্যার দ্বিতীয় লেখার শিরোনামায় তার আছে পরিচয়—"চল্লেই চল্লিশবুদ্ধি।" লেখাটির কিছু উদ্ধৃতি প্রয়োজন—"খাঁচার পাখী নীল উদার আকাশকে ভয় করে, খাঁচার মাঝে ছোলাভেজা খেয়ে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে পাখীর সাহস গেছে ভেঙে, মন গেছে কুঁকড়ে, ডানার ওড়বার শক্তি গেছে হারিয়ে। পরদায় ঘেরা অন্তঃপুরের ঘোমটা-ঢাকা মেয়েকে পথে বার করলে তারও দেখবে গা কাঁপে, বুক দুরু দুরু করে, পায়ে পা জড়িয়ে যায়—সে তার সেই পরম শরণ আড়ালটুক পেলে যেন বেঁচে যায়। ত্রিশ বছরের চল্লিশ টাকার কেরাণীকে হাজার টাকার লোভ দেখালেও ব্যবসায়ে নামাতে পারবে না, মাসান্তে ঐ ওজন পাওয়া নগদ চল্লিশ টাকার বাঁধি গৎ তার মাথা খেয়ে দিয়েছে, অনিশ্চিত পথে বেরুবার সাহস আনন্দ বল তার জন্মের মত নষ্ট হয়ে গেছে। বাঁধনে, নিয়মের নাগপাশে, পরের আওতায় মানুষ এমনি করেই ছোট হয়ে যায়। * * * যেখানে জীবন সেইখানেই চাই মুক্তি। বাঁধনে ভগবান জাগে না। মানুষের মাঝে অনন্ত শক্তি, জ্ঞান আর আনন্দ নিয়ে শিব বসে আছে! * * * তোমরা সব বাঁধন খুলে দাও, মনে প্রাণে—সমাজে ধর্মে মুক্ত হও, তখন দেখবে পথ পেয়ে পাষাণস্তম্ভ ফেটে কি ঠাকুর বেরিয়ে আসে।"

এই কথাগুলি তখনকার তামস পরমুখাপেক্ষী ভারতের পক্ষে খাটতো, এখনও খাটে। ভারতের অভিজাত ঘরের নারীর মধ্যে দশ হাজার- করা একটাও এখনও জীবনের পথে ঘাটে সাবলীল মুক্ত গতিতে চলতে শেখে নাই। নগদ মাহিনার চাকুরে বাঙালীর এখনও ঐ দশাই আছে, তাই বাংলার পথে ঘাটে হাটে বাজারে অবাঙালী খাম্‌সা-কুলির মত টাকা পয়সা কুড়োয়, আর দেশের ছেলে পেট চলার জন্য একটা অফিসের কোণে বাঁধা মাহিনার চেয়ার খুঁজে মরে।

তার পরে আরম্ভ হলো—"লাখ কথার কথা"। এ এক রকম ছোট ছোট সার কথার গাঁথা মালা; একটু নমুনা দিলেই বুঝতে কষ্ট হবে না। যথা—"দেহটা হাড় মাসের খাঁচা নয়—শ্রীকৃষ্ণের লীলাধার। * * * ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা নয়—ব্রহ্ম সত্য জগৎ সত্য। মিথ্যা হলে জগৎটা এত দিন টিঁকতো না। * * * মানুষ মানুষ হও—মানুষের বড় করে দেখো। মানুষ দেবতার চেয়ে হীন নয়। দেবতারা সাধ করে মানুষ রূপ ধরে থাকেন। প্রমাণ—"সম্ভবামি যুগে যুগে।" * * * ভারতের মানুষ শ্রীকৃষ্ণ রামচন্দ্র যদি দেবতা না হয়ে মানুষই থেকে যেতেন, তা হলে ভারতের আজ এ দুর্দ্দশা হতো না!"

তার পর আবার সেই উপেনদা'র অনুপম রসাল "উনপঞ্চাশী", এবার পণ্ডিত মশাই স্বরাজের "স্ব" নিয়ে পড়েছেন। গোলদীঘিতে গোপালদা বক্তৃতা শুনে এসেছিল—"আগে আগে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে", সেই চেষ্টায় গিয়ে পিণ্ডির কাছে তাড়া খাওয়ার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করতে পণ্ডিতজী তাঁর মুখরোচক বাণী আরম্ভ করলেন—"ও তো জানা কথা। সবটা বাঙালীর পররাষ্ট্র; সেখানে স্বরাজ ফাঁদবার উপায় নেই। স্বরাজ গড়তে চাও তো চলে যাও একদম গোলদীঘির পাড়ে আর গরীবের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে মোটর চড়ে বেড়াও, নয় ঢুকে পড় বিজলী সম্পাদকের মত অন্তরের মণিকোঠায়। পরের অন্তরে খোঁটা গাড়তে গেলে যখন তাদের আপত্তি, তখন স্বরাজের খোঁটা নিজের অন্তরে গাড়া ছাড়া উপায় কি? কিন্তু এক এক জনের প্রাণে এক এক রকম স্বরাজের ছানাপোনা ডিম পাড়ছে, তার করছো কি?"

"তাতে এত দোষটাই বা কি?"

আরে বাপু, এই অন্তরের স্বরাজ তো একদিন না একদিন ঘোমটা খুলে বাইরে বার হবে? তখন কার স্বরাজ খাঁটি তাই নিয়ে গোলমাল লাগবে না? দেবভূমি ভারতের এই তেত্রিশ কোটি (অপ) দেবতারা সবাই নিজের নিজের অন্তরে যদি এক একটি স্বরাজ গড়ে ফেলেন তখন সেই তেত্রিশ কোটি স্বরাজের ঠোকাঠুকিতে একটি স্বরাজও টিঁকবে কি না সন্দেহ। শেষে খুচরো খুচরো স্বরাজের ঠেলা সামলাবার জন্যে রুশিয়া থেকে স্বরাজ না আমদানী করতে হয়। কে কার কাছে ঘাড় নোয়াবে বল,—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কেউ তো কারু চেয়ে কম নয়। আমরা এক একটি নোড়া নই, এক একটি শালগ্রাম।"

"পণ্ডিতজী, তা গোড়ায় অমন একটু আধটু গলদ হয়েই থাকে। দেশটা যখন নিজেদের হাতে এসে পড়বে, তখন বাকি সবটা ঠিকঠাক গড়ে নেওয়া যাবে।"

পণ্ডিতজী। অর্থাৎ আগে রাজটা গড়ে নেওয়া যাক, তার পর স্ব-টা সঙ্গে জুড়ে দিলেই হবে,—এই না? খুব বুদ্ধিমানের কথা; কিন্তু গড়ে কে? কেউ কলম, কেউ মৃদঙ্গ, কেউ লাঠি আর কেউ তেলের বাটি নিয়ে হাজির হয়েছেন। কার অন্তরে কি রকম রাজটি আছে তা' তো বোঝবার উপায় নেই। সবাই বলছে—"খুঁজি খুঁজি

পারি, যে পায় তারই।" আচ্ছা, দেখ দেখি এই তেত্রিশ কোটি দেবতাদের স্বরাজটা কোন্‌খানে? জমিদার দেবতা ভুঁড়িতে হাত বুলুতে বুলুতে বলছেন তাঁর "স্ব" ঐ লাটের কিস্তিতে; বামুন তার পাঁজরার উপর হাত দিয়ে বলছে, 'আমার "স্ব" পেটের জ্বালায়।' কলওয়ালা বলছে—'বাৎসরিক ডিভিডেণ্ড'; মজুর বলছে—'হপ্তায় সাত সিকায়'; গোপেশ্বর বাবু বলছেন—'স্ব আছে এক কোটি টাকায়।' লাট সিঙ্গী বলছে—'খোলা ভাঁটিতে'; হিন্দু বলছেন—'বর্ণাশ্রমে'; মুসলমান বলছেন—'খেলাফতে'। এতগুলো "স্ব" নিয়ে একটা রাজ গড়া মুস্কিল।

"তা' হলে উপায়?"

পণ্ডিতজী। উপায় নিরুপায়ের উপায়। জানই তো—It is unexpected that always happens. বিশ্বাস না হয় খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন লটকে দাও। বল—হারিয়ে গেছে; আমাদের স্বরাজ গড়বার 'স্ব'টুকু। কেউ বলছেন ওটা এদেশে কখনো ছিল না, বিলেত থেকে আমদানি করতে হবে; কেউ বা বলছেন ভট্চাযি মশাই মাতৃগর্ভে পুরে বর্ণাশ্রমের বাক্সতে বন্ধ করে চাবি হারিয়ে ফেলেছেন। মোট কথা, কোথায় যে জিনিসটা আছে তা' কারও বুদ্ধির ভাণ্ডারে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খুঁজে যে পাবে—চুপি চুপি আমায় জানিও। সারা দেশটাকে তার পায়ে লুটিয়ে দেব।

এই 'উনপঞ্চাশী'র মাধ্যমে সেদিন বিস্মিত উপেন্দ্রনাথের বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। The unexpected has happened—'স্ব'টুকু বাদ দিয়ে রাজটি দেশে শাসক-পক্ষের কৃপায় গড়ে উঠেছে। স্বরাজের হারানো 'স্ব'টুকু নিয়ে এই কচকচি বাদানুবাদ আমাদের আজকের দলীয় পলিটিক্সের এক-একটি পার্টির জন্মপত্রিকা। ভারতের ওপারে হিমাচলের উত্তর থেকে পূর্ব অবধি ছাউনী পড়েছে লালঝুঞ্জুর, তারও পাকেই আছে বোলসা ওরাও বিদেশী "স্ব"। বহু রকম বে-রকমের 'স্ব' নিয়ে বিশ্বমঞ্চে বুঝি লাগে লাগে আজ আণবিক উদ্ভান সংগ্রাম। আজ থেকে ৩৫ বছর আগে লেখা উপেন্দ্রনাথের এই 'উনপঞ্চাশী' বর্তমানের 'স্ব'-হীন মেকী স্বরাজেরই জীবন-বেদ; উদাত্তস্বরে তাপস ব্রাহ্মণ আন্দামানে বসে এই আগন্তুক ঝুটা স্বরাজের আগমনীর পদধ্বনি শুনেছিল এবং দেশে এসে ১৩২৮ সালে 'বিজলী'র অগ্নি-আখরে তাকে ভাষা দিয়ে গিয়েছিল। আমরা আজ সেই তত্ত্বের দুর্নীতিপঙ্কে অবগাহন করে পাপক্ষালন করছি।

তার পর 'ভূমিয়াদারী'র ২য় দফা—এও এক পরম লোভনীয় লেখা, এর কিছু অংশ না উদ্ধৃত করে পারা যায় না। লেখাটির সর্বনাশা গতি ও রূপ দেখুন—

'এক হপ্তা আগে প্রাণধন বলে গিয়েছিল, চলে চলে যাস উঠে যাওয়া রাস্তাটা ছেড়ে নতুন পথে এগুতে হবে। সাতটা দিন ধরে কেবল তার কথাগুলোই আমার মনে কাঁটা বিঁধিয়েছে।

বেশ যাচ্ছিলুম এতদিন। অদৃষ্টের দোহাই মেনে, বোঝা দেহ ও মনটার উপর সংসারের সত্যিমিথ্যে অনেক বোঝা চাপিয়ে নিয়ে চোখঢাকা বলদের মত ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বেশ তো ঘুরছিলাম। আশা যাদুকরী কোন দিন তো আমার ঘুটঘুটে আঁধারভরা মনের কোঠায় রংমশাল জ্বালিয়ে ধরেনি।

প্রাণধন এলো, তার ভাসা-ভাসা দুটো কথা কয়ে গেল—আর তার ফলে এতদিন যা চরম সত্য বলে জানতুম, মনে হলো সেইটেই বুঝি মিথ্যে। * * * সে বলে গেল—"অতটুকু কিছুই নয়—জীবনের অনন্ত সম্ভাবনা"। কত ভাবলুম—কিন্তু বুঝতে কিছুই পারলুম না। তাই সেদিন বিদ-বাগানে তার দেখা পেয়ে চেপে ধরলুম, বললুম—"আজ আর ছাড়ছিনে, স্পষ্ট কথা না শুনে।" * * * আমার হাতের মাঝে গোটাকত ভাজা চীনেবাদাম গুঁজে দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলো—"ব্যাপার কি রে? এত উত্তেজনা কিসের?"

আমি বললুম—"তুমি যে সেদিন বলে গেলে নতুন পথে যাত্রা সুরু করতে হবে; সে পথটা কোথায় কোন দিকে?"

সে। ঠিক জানা নেই তো?

খপ করে তার একখানা হাত চেপে ধরে বললুম—"জানা নেই কি?"

সে। অর্থাৎ অজ্ঞাত।

তার মুখে আবার সেই হাসি—দরদের লেশমাত্র তাতে নেই। ভারী রাগ হলো, চেঁচিয়ে বললুম,—"কেন তবে কথার ঠাটে সেদিন আমায় মাতিয়ে তুলেছিলে?"

সে। হো হো হো! কে বললে তুই মেতেছিস?

আমি। আমার মন।

সে। ভুল, একেবারে ভুল! মেতে যদি উঠতিস তা' হলে কি পাথর পথের নেবার অপেক্ষায় একটু কালও দাঁড়াতে পারতিস্? কি হয়েছে জানিস্? মন বুদ্ধিতে মরচে ধরে ছিল। আর আজ কি হয়েছে? আজ তোর intellect দীপ্ত হয়েছে। তারই আলোয় নিজের চেহারাটা অমন শুকনো, অমন হ্যাংলা দেখে আজ তোর অনুতাপ হয়েছে। মনে হচ্ছে, অতীতের ভুলচুক এক দিনে শুধরে নিয়ে লম্ফ দৌড়ে একেবারে গিয়ে হাজির হবি নন্দন কাননে আর অঞ্জলি ভরে কেবল অমৃতই পান করবি।

আমি। তবে বল সে পথ কোথায়?

সে। কে বাপু তোর জন্য চৌরঙ্গীর তেল-চোয়ানো রাস্তার মত একটা পাকা সড়ক করে রেখেছে যে তুই কল্পনার হাওয়া গাড়ী ছুটিয়ে আরাম করবি?

আ। সেদিন তবে বলেছিলে কেন?

সে। আহাম্মুকি করেছিলুম। তুই যে পথটাকেই কেবল চেয়েছিলি মনটাকে ঠিক না করে, তা তখন তো বুঝতে পারিনি। তবে পথটাই যদি তৈরী থাকবে তা হলে কি আর ভাবনা ছিল? পথ যে আমাদেরই করে নিতে হবে। পাহাড় উড়িয়ে, জংগল পুড়িয়ে, নালা ডোবা ভরিয়ে পায়ে পায়ে পথ গড়ে তুলতে হবে। কোন্ পীর পয়গম্বর তোকে দয়া করে পথ দেখিয়ে দেবেন আর তুই চাল-চিঁড়ে বেঁধে চলতে সুরু করবি ভেবেছিস্? ঠকে যাবি। মুক্তির পথ একটা নয়—অসংখ্য অগণ্য।

আ। পেট চলবে কি করে?

সে। না চলে শিঙে ফুঁকবি? ভড়কাও কেন দাদা, এখনও মরণ পাসওয়া হয়ে যায়নি, শুনেই মুখখানা অমন কাগজের মত সাদা হয়ে গেল?

আমাদের মরা কাগজের সব মরা ভাষা, এ ছিল জীবন্ত প্রাণদায়ী ভাষা। এই অগ্নিবাণীর ধাক্কায় এত দিন বাংলা পথ

চলেছিল, সেই ভাষার দেওয়া বাঁধো ও ধৈর্য্যে ফেটে চার টুকরো হয়েও উদ্বাস্তু বাংলা আজও রসাতলে তলিয়ে যায় নাই।

'পাঁচমিশেলী' 'বিজলী'র সম্পাদকীয় প্যারার নাম ছিল। সেগুলিও মুখরোচক চীনাবাদাম ভাজার মত মধুর। এবারকার 'পাঁচমিশেলী'র শিরোনামা—"খোদায় দেয় তো জোলায় দেয় না, কপাল বুঝি ফাটে, এ কেলেংকারী তোল বাবা, সোনার দাঁড়ে ছোলা ভাজা।" শেষের প্যারাতে খবর দেওয়া হচ্ছে—"প্রয়াগপুর মোকদ্দমার আসামী ফণীভূষণ রায় আন্দামান থেকে লিখছে, এখন আশুতোষ লাহিড়ী, মদনমোহন ভৌমিক ও যতীন্দ্রনাথ নন্দীর সঙ্গে ফণীকে সেটলমেণ্টে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ ছোট খাঁচা থেকে বড় খাঁচায় সরিয়ে রাখা হয়েছে। * * এই গোবেচারীদের মুক্তি দেওয়া হয় না কেন? এত বড় ইংরেজ রাজত্ব ক'টা ছেলে মিলে যদি উল্টেই দেয়, তা' হলে সে রাজ্য না হয় যাক। বালেশ্বরের মোকদ্দমার জ্যোতিষ পাল পাগলা গারদে আজও পচ্চে, সে কি বোমার মিস্ত্রী উল্লাসকরের চেয়েও বড় কালকেতু নাকি?"

তার পর এলো "রাজ্যের কথা," তার শিরোনামা হচ্ছে "পাষাণ গলাবার শক্তি কই?" প্যারাটি সবটুকু পাঠক-পাঠিকার জন্ম তুলে দিই—"সুরেনদা এসে এক ঘণ্টা ধরে দুঃখের কান্না কেঁদে গেলেন, বল্লেন, "দাদা। কে আমার কথা শোনে? গ্রামে যাদব বাবুর দীঘিতে শ্যাওলা ও দল হয়ে দীঘি মাঠ হয়ে এসেছে—ওপরে ছাগল চরতে পারে, তবু বাবুরা তা' সাফ করাবে না। আমরা পয়সা দিয়ে পরিষ্কার করাব তাও করাতে দেবে না। গাঁয়ের করিম চাচার জমিটুকুর ওপর দিয়ে বিশ হাত একটা নালা কেটে দিলেই গাঁয়ের পাড়া বিলটা বাঁচে, তা খেসারৎ দিলেও ঐটুকু জমি দিয়ে উপকার করবে না। গাঁয়ে দুপুর বেলা এক ঘণ্টা মেয়েদের আর রাত্রে এক ঘণ্টা পুরুষদের পড়াবার ব্যবস্থা করলুম, তা কা কস্য পরিবেদনা! বলে কি না, "বাবুদের কি মৎলব আছে।" হারু চক্কোত্তি সারা গাঁটায় সুদে টাকা ধার দিয়েছে। হাটের দিন এসে জেলে বৌ আর তরকারিওয়ালা চাষার কাছে ধমক চমক দিয়ে বিনি পয়সায় সব মাছ তরকারী নিয়ে গেল।" শুনে আমি কিছু বললাম না, সুরেনদা ছল ছল চোখে বসে রইলো। আমার অন্তরাত্মা তখন সুরেনদাকে স্বগত বলছিল, "দাদা! কার নামে নালিশ করছো? এ তো তোমাদেরই শত শত বছরের অবহেলার পাপ এই সব রূপ নিয়েছে। গ্রামবাসীরা তোমার কথা শোনেনি, কিন্তু তুমি কি শোনাতে পেরেছ? সে শক্তি বুকে ধরে তার পরে কি কাজে নেমেছিলে? এ যে পাষাণ গলাবার কাজ ভাই।"

কাজের কথার ২য় প্যারাটির শিরোনামা হচ্ছে—"কি কি গুণের গুণী চাই?" প্যারাটি গোটা তুলে দেওয়া হলো—

"ভারতের মুক্তির দিন এসেছে, তাই লাখে লাখে মুক্তির মানুষ চাই। তাদের প্রেম হবে অপার—যেন ভালবেসেই অতি বড় বিরোধী মানুষকে জয় করে ফেলতে পারে। অহঙ্কার থাকতে কিন্তু প্রেম হয় না, যেখানে অহঙ্কার সেইখানেই স্বার্থবুদ্ধি ছোট মন রাগ লোভ সব বাসা বাঁধে, যে যত আপনাকে ভুলবে সেই পরকে ভালবাসতে পারে। কিন্তু জ্ঞান বিনা প্রেমের কোন শক্তি নাই, যে যত জানে, বোঝে ও ভাবে, যে বিশ্বের সত্তা যত তলিয়ে দেখে তারই শত্রু অহঙ্কার গলে যায়, তারই ভাল মন্দ নির্বিচারে ছোট বড় ইতর ভদ্র নির্বিচারে সবাইকে এক বাঁধনে আপন করে নেবার শক্তি হয়। জ্ঞানে, প্রেমে ও শক্তিতে অদ্ভুত অসাধারণ মানুষ, আপনভোলা ভাগবত শঙ্কররূপী মানুষ, অর্থাৎ কিনা মানুষের আকারে সাক্ষাৎ শিব-বিভূতি অনেক চাই। ইংরাজ তোমাদের শত্রু নয়, তোমাদের শত্রু তোমরাই; তোমাদেরই অন্তরের স্বার্থ অহঙ্কার পাপ দলাদলি হিংসা বাহিরে ইংরাজের রূপ ধরেছে। তোমরা দেশের মরমের মরমিয়া হও, দেখবে শত্রুও পরম সহায় হয়ে যাবে। শক্তের তিন কুল মুক্ত।"

তখন ভারত হতে ইংরাজের বিদায় নেবার ১৯২১ সেই সালে ছাব্বিশ বৎসর বাকি থাকলেও বিদায়ের পালা তাদের আরম্ভ হয়ে গেছে। আসন্ন রাজনৈতিক মুক্তির ধ্বনি ও সুর আকাশে-বাতাসে মানুষের মনে গতিবিধিতে মিশে বাজছে। আকাশ-তড়িতা 'বিজলী' তাই অপূর্ব্ব এক পরমার্থ-ভিত্তিক দিব্য রাজ্যের স্বপ্ন দেখছে। তার ডাকে সেদিন যদি দলে দলে মানুষের আকারে শিব-বিভূতি জাগতো, তা' হলে নেহক রাষ্ট্র আজ অধোগামী হতে পারতো না। আজ এই নেহক রাষ্ট্রের ধারক-বাহক আমলাতন্ত্রের মানুষগুলি যে ধাতুর গড়া, রাষ্ট্রটিরও রূপ হয়েছে তদনুযায়ী। যে শিবের আমরা দোহাই পাড়ি সে শিব বা পরাশক্তি যে বিশ্বের অনন্তমুখী রূপায়নের ঠাকুর, একাধারে গরল ও অমৃত, হিত অহিত, তথাকথিত পাপ ও পুণ্য, করাল ও মধুর সবই। শিবশক্তিকে আবাহন করলে ঐ সবই এসে পড়ে, তোমার চক্ষের উপর দেবাসুর কংলয় হয়ে বিশ্বনৃত্যে নাচতে থাকে। এ অনন্ত রস ও ভাবের ঠাকুরকে বুকে ধরতে পারে সেই যে তারই মত সম ও বিশাল। সমরস না হলে ভালও তোমাকে মোহে ডুবিয়ে কল্যাণের পিশাচ করে তুলবে, মন্দও স্ফটিক-স্তম্ভ ভেদ করে নৃসিংহরূপী হয়ে তোমার নাড়ীভুঁড়ি নখে ঠেলে বার করবে। তাই তখনকার 'বিজলী'র ডাক জীবনের একমুখী মন্ত্র, মানুষ জাগানো আহ্বান। এরও প্রয়োজন ছিল এবং চিরদিনই থাকবে। কাজের ছক ও পরিকল্পনা মানুষ নানা ভাবে ভেঁজে চলেছে, কাজ কিন্তু না ফুরোয়, না গুছিয়ে যায়। গীতার সেই কথা—"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ"—কোন্‌টি যে কর্ম্ম ও কোন্‌টি অকর্ম্ম মহাজ্ঞানীরাও তা' বুঝে উঠতে পারেন না, বিমূঢ় হয়ে থাকেন।

[ক্রমশঃ।

অলঙ্কারে শিল্প সৃষ্টি
……আধুনিকতার পরিচয়।
এই বৈশিষ্ট্যই প্রত্যেক নারীর
একান্ত কাম্য। আমাদের
প্রতিটি অলঙ্কার
শিল্প সৃষ্টির বৈচিত্র্যে
সমৃদ্ধ।
এম,
বি,
সরকার
১৬৭/সি, ১৬৭/সি/১
বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
(আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও
বহুবাজার ষ্ট্রীট জংসন)
ফোন• ৩৪-১৭৬১•গ্রাম• ব্রিলিয়ান্টস
ব্রাঞ্চ-হিন্দুস্থান মার্ট, বালীগঞ্জ
১৫৯।১বি রাসবিহারী এভেনিউ•পি. কে. ৪৪৬৬
প্রখ্যাত অলঙ্কার নির্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু

স্বর্গ-মন্দির (Temple of Heaven) দেখতে গেলাম। মন্দির একটি নয়—বড় ছোট অনেকগুলো। মন্দিরের লাগোয়া বিস্তর কুঠুরি। শহরের দক্ষিণ ধারে হাজার হাজার অতি-বৃদ্ধ সাইপ্রেস গাছ—বিপুলায়তন গৃহগুলি তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। ১৪২০ অব্দে তৈরি—বয়স তা হ'লে, হিসাব করে দেখুন, পাঁচশো ছাড়িয়ে গেছে।

একটা হল শস্য-প্রার্থনার মন্দির। পৌষের শেষাশেষি ওদের নতুন বর্ষ। বছরের পয়লা দিনে রাজা গিয়ে আকাশের কাছে হাত মেলে যাচ্‌ঞা করতেন, ভূরি পরিমাণ ফসল যাতে ফলে। মন্দিরটা তাই আকাশের মতন করে বানানো। ছাতের নিচে নীল রঙের টালি—ঐ যেন হল নীল আকাশ। সেই আকাশ-ছাত দাঁড়িয়ে রয়েছে চৌদিকে ঘোরানো আটাশটা থামের উপর—অষ্টবিংশতি নক্ষত্র আর কি! ঠিক মাঝখানে ড্রাগনমুখো আরো চারটে থাম—চার ঋতু ওরা (চীনে ঋতু হল চারটে—জ্যোতিষিক হিসাবেও তাই)। ওদের ঘিরে লাল রঙের আরো বারোটা থাম—বারো মাস হল ওগুলো।

সূর্য চন্দ্র বাতাস আর বৃষ্টি—ওঁরা হলেন দুনিয়ার চালক, ফসল দেবার কর্তা। পুজো পেতেন ওঁরাই। ডাইনে বাঁয়ে অগুন্তি ঘর। মন্দির ছেড়ে উপরমুখো চলে যান পাথরে-বাঁধা প্রশস্ত চত্বর ধরে। উপরে উঠছেন। আরও উপরে—উঠেই যাচ্ছেন—সত্যি সত্যি স্বর্গলোকে উঠে চললেন, এমনি মনে হবে।

অনেক ঘর সেদিকেও। রাজারা এসে এদিকটায় ঘুরে ঘুরে পূজার আয়োজন দেখতেন। ভোগরান্নার ঘর। বলির জায়গা—পশু বলি দেওয়া হত স্বর্গের প্রীতি-কামনায়। পূজোর হরেক জিনিষপত্র—রূপোর প্রদীপ, নানা রকম রূপোর বাসন, হাজার হাজার বছর আগেকার ঢঙে তৈরি। খাবার পাত্র, সুরাপাত্র, মাংস রাখার পাত্র। ফল রাখার ঝুড়ি—সেই কতকাল আগেকার। কত রকমের বাজনা। গুণী পাঠক, নানান দেশের রকমারি বাজনা নিয়ে তো নাড়াচাড়া করে থাকেন—পাথরের বাজনা দেখেছেন কখনো? আজ্ঞে হাঁ—একখানা পাথর মাত্র। তার এখানে-ওখানে ঘা দিন, আর মিষ্টি আওয়াজ বেরোবে। সেতার-এসরাজ হার খেয়ে যায়। একটা ঘরে নাচের সরঞ্জাম,—হায় রে, পাঁচশ' বছর আগেকার নাচুনে মেয়েগুলো কোথায় লোপ হয়ে গেছে, তাদের অঙ্গের সাজপোষাক আর পায়ের ঘুঙুর রেখে দিয়েছে কাচের বাক্স বোঝাই করে!

গোল বেদি-ঘর। বেদি হল স্বর্গের প্রতীক—তার সামনে রাজা দাঁড়িয়ে পুজো করবেন। অনেকটা উঁচু গোলাকার জায়গা—তিন থাক পর পর। সকলের উঁচু থাকের উপরে বেদি। বেদির উপর দাঁড়িয়ে কিছু বলুন—বলুন না, মজা দেখবেন—চতুর্দিক থেকে শত শত কণ্ঠ আপনার সেই কথা ফিরিয়ে বলবে। এমন মজার প্রতিধ্বনি শোনেন নি আর কখনো।

ডক্টর কিচলু ও পীর মানকি শরীফ কোলাকুলি করছেন

বেশি মজা আর একটা জায়গায়। উঠানের একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আওয়াজ করুন—দূর থেকে একবার প্রতিধ্বনি আসবে। পরের পাথরখানায় গিয়ে করুন দিকি আওয়াজ—প্রতিধ্বনি দু-বার। তার পরের পাথরে—তিন বার। আওয়াজ করে পরখ করে দেখে তবে এই লিখছি।

গোল পাঁচিল আছে বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে। তার একটা প্রান্তে গিয়ে পাঁচিলে মুখ করে ফিসফিসিয়ে বলুন তো কিছু—দূর প্রান্তের অপর জন সব কথা শুনতে পাবেন। টেলিফোনের ব্যাপার

পুরোপুরি। কোন আমলের কথা—ধ্বনিবিজ্ঞানের যাবতীয় কচকচানি সেই তখনই মাথায় ছিল ওদের। আর মাথার থাকার ব্যাপারই শুধু নয়! বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বিহনে এমন সূক্ষ্ম হিসাবের বস্তু কোন্ কায়দায় গড়ে তুলল—তাজ্জব হতে হয় কিনা বলুন!

উনিশ শতকে একবার বাজ পড়ে মন্দিরের অনেকটা ভেঙে যায়। আগাগোড়া মেরামত হয়েছে পুরানো রীতিতে। জ্ঞানী-গুণীরা ঠাউরে ঠাউরে বলেন, আমাদের সাঁচির আদল আছে নাকি মন্দিরের কতকগুলো গেটে। তখন তো ভারি দহরম-মহরম আমাদের সঙ্গে—প্রভু বুদ্ধের নীতিধর্মের সঙ্গে আমাদের শিল্পরীতিও চলে যেতে পারে হিমালয় পার হয়ে উত্তরমুখো। যেতে যেতে এই পিকিনে এসে হাজির হয়েছে। পিকিন ছাড়িয়ে আরও দূরে গিয়েছে শুনলাম।

শান্তি-সম্মেলন দোর্দণ্ড বেগে চলছে ওদিকে। শুধু মাত্র বক্তৃতা নয়—বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে আর যা হচ্ছে, চোখ শুকনো রাখা কঠিন হয়ে ওঠে অনেক সময়। আমেরিকার প্রতিনিধিরা একটা চারাগাছ দিল কোরিয়ানদের। সমুদ্র-পার হতে বয়ে নিয়ে এসেছে। এই চারা নিয়ে পুঁতো তোমাদের দেশের মাটিতে—প্রসন্ন বায়ু ও সূর্যালোকে গাছ বড় হবে, ছায়া শান্তি ও আনন্দ দান করবে। আর দিল তারা ফুল, কাপড় আর কম্বল। ওদের দেশের লোক বোমা ফেলে মানুষ মারছে, ঘরবাড়ি চুরমার করছে—আর সেই রণজর্জরদের কম্বল বিলোচ্ছে এরা। দেশের গবর্নমেণ্ট আর সাধারণ মানুষ এক নয়, তারই বিশ্ববাসীর কাছে এই তত্ত্ব জানান দিয়ে দিল তারা।

ভারত ও পাকিস্তানের যুক্ত-ঘোষণা পড়া হল একদিন। মারামারি-কাটাকাটি করব না ভাই সকল নিজেদের মাঝে; সকল বিরোধের আপোসনিষ্পত্তি করব। লড়াই দুনিয়ার কোথাও হবে না। বিশেষ করে আমাদের হিন্দুস্থান-পাকিস্তান সবে স্বাধীনতার ধ্বজা তুলে ধরেছে—এ অঞ্চলে নৈব নৈব চ। বিস্তর সুহৃদের উদয় হচ্ছে—চোখ টিপে দিলেই টাকাকড়ি আর অস্ত্রসম্ভার নিয়ে পড়বেন—কিন্তু খবরদার খবরদার, খপ্পরে পড়েছ কি বিলকুল খতম। কাশ্মীর এবং অন্যান্য গোলমাল জিইয়ে রেখে তৃতীয় পক্ষের সুবিধা করে নেবে—কিছুতেই আস্কারা দেবো না তাদের।

তাই দু-তরফে ভেবেচিন্তে শান্তি-চুক্তির খসড়া হয়েছে। কো-মো-জো ঘোষণা করলেন, চুক্তিপত্রে সই হচ্ছে এবারে। ঘর ফেটে যায় এমনি হাততালি। একজন ডেপুটি-সেক্রেটারি ঘোষণা পাঠ করলেন। সুগম্ভীর বাজনা। সইয়ের জন্য ডাক হল দু-তরফের প্রতিনিধিদের। সকলের আগে চলেছেন ভারত-দলের নেতা ডক্টর কিচলু ও পাকিস্তান-দলের নেতা পীর মানকি শরিফ পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে। হল সুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে। (তালে তালে দীর্ঘক্ষণ ধরে হাত পড়ত। পাকিস্তানের আতাউর রহমান সাহেব আর আমি বলাবলি করতাম—ছাদ পেটানো। অবিকল তেমনি আওয়াজ) প্লাটফরমের সামনে অবধি একত্র গিয়ে দু-দল দু-দিক দিয়ে উপরে উঠলেন। সই হয়ে যাবার পর কিচলু আর পীর গভীর আলিঙ্গনে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন। এ দিকেও কি মাতামাতি আমাদের দু-দলের মধ্যে! পাকিস্তানের মেয়েরা ফুল ছুড়াচ্ছেন আমাদের দিকে। আমাদের মেয়েরা ওদিকে। এ-তরফ থেকে ও-দলের গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে, ও-তরফ থেকে এই দলে। ডক্টর কিচলু পীরকে উপহার দিলেন গালার কাজ-করা চমৎকার কাশ্মীরি বাক্স আর সিল্কের উপরে পিকিনের গ্রীষ্মপ্রাসাদ-বোনা ছবি। পীর কিচলুর মাথায় পরিয়ে দিলেন জরিদার টুপি (পাঞ্জাব অঞ্চলে ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন ওটা), আর চীনের কারুকর্ম-করা কাঠের বাক্স। এদিকে পাকিস্তানিরা ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছেন ভারতীয়দের মধ্যে। কোলাকুলি প্রচণ্ড আবেগে। পাকা দাড়ি-ওয়ালা সৈয়দ মুত্তালাবি—পাকিস্তানি-পাঞ্জাবের নাম-করা কবি, আমাদের সর্দার পৃথ্বী সিং-এর সুদীর্ঘ কালের বন্ধু। দেখলাম, দু-চোখে জল গড়াচ্ছে বুড়োমানুষটির। দেশ ভাগ হবার সময় একরত্ত ধারণায় আসেনি—আজকে নাড়ি-ছেঁড়া টান মর্মে মর্মে বুঝছে সকলেই।

সম্মেলন চলে সকাল, বিকাল এবং কখনো কখনো রাত্রে। তার উপর কমিশন আছে। কমিশনের মিটিং সারা হতে এক-একদিন রাত্রি দুটো-তিনটে বেজে যায়। ব্যাপারটা তাই ভয়ের হয়ে উঠেছে, জুত পেলেই ডুব দিই। আমি আছি সাংস্কৃতিক লেনদেনের কমিশনে। প্রস্তাব তৈরি হচ্ছে ঐ সম্পর্কে—তাই নিয়ে তর্কাতর্কির অবধি নেই। কমিশনের সভাপতি হলেন ভারতীয়—আলিগড়ের ডক্টর আবদুল আলিম। মনে পড়ছে না? কি বলেন, আপনাদের সঙ্গে অনেকবার মোলাকাত হয়ে গিয়েছে তো! দুপুরে রাতে শীত-সাগরের কনকনে হাওয়া দিয়েছে—ঘরে গিয়ে লেপের তলে ঢুকতে পারলে বাঁচি, প্রস্তাবটাও পাশ হয়ে যায়-যায়—হেনকালে কোত্থেকে এক নতুন ফ্যাচাং রেজিলের ভদ্রলোক। লড়াইবাজ (warmonger) কথাটা খুব চালু—তার দেখাদেখি আমরা ভদ্রলোকের নাম দিয়েছিলাম শান্তিবাজ (peacemonger)।

উৎকর্ণ কোন পাঠক সজ্জন—এই অধম এবারে মঞ্চারোহণ করছেন। দেশ-বিদেশের তা-বড় তা-বড় লোকের বক্তৃতা শুনলেন—গোটা দুনিয়া দু-আগ্রহে চোখে উপর তুলে ধরেন তাঁরা, বলেনও খাসা—বিস্তর জ্ঞানলাভ হয়। আমি সাহিত্যিক ব্যক্তি নিতান্ত সাদা-মাটা কথা বলব, শুঁকে শুঁকে নাক ক্ষয়ে ফেললেও রাজনৈতিক মতলব পাবেন না তার ভিতর।

জবানটা বাংলায় ছাড়ি কি বলেন? বেশির ভাগ লোক নিজ নিজ ভাষা শুনিয়ে দিচ্ছে—আমার কি লজ্জা, আমার ভাষা কম নয় কারো চেয়ে! মতলবটা জানিয়ে দেওয়া হল কর্তাদের। তা বেশ তো, আপত্তির কি আছে? তবে বক্তৃতার একটা ইংরেজি তর্জমা দিতে হবে কয়েকটা দিন আগে। তাই থেকে আরও

সম্মেলনে বক্তৃতার সময় লেখকের এই ছবি তুলেছিল

তিনটে ভাষায় তর্জমা হবে—সে কাজ ওঁরাই করবেন। মূল বাংলা বক্তৃতার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে আরও চারটে ভাষায় সমান তালে ছাড়া হবে—ইংরেজি, চীনা, রুশ ও স্প্যানিশ। আপনারা নয়ন ভরে বক্তার হাত-মুখ নাড়া দেখুন—আর যে ভাষাটা বোঝেন, তাতেই বক্তৃতা শুনে যান যথাস্থানে হেড-ফোনের প্লাগ ঢুকিয়ে। শুনতে না চান, সে কায়দাও বাতলে দিয়েছি—বাজে ফুটোয় প্লাগ ঢুকিয়ে চুপচাপ নিরুপদ্রব বসে থাকুন।

কিন্তু বাংলা বলেই মুসকিল হয়েছে। ভাষাটা ওঁদের মধ্যে কেউ জানে না। তাই বাংলা-জানা এক জনের ডাক পড়ল বুঝে-সমঝে দেবার জন্যে। নইলে হয়তো দেখবেন, বক্তৃতা চুকিয়ে আমি নেমে গেলাম স্প্যানিশওয়ালা ভীমবেগে ছেড়ে যাচ্ছেন তখনো। বাংলানবিশ একজন গিয়ে তালিম দিয়ে দেবেন, মূল বক্তৃতা ধাপে ধাপে কখন কদ্দূর এগুলো। অনুবাদগুলো যথাসম্ভব সেই বেগে ছাড়বে। আমাদের নন্দী গেলেন এই কাজে—ফিরে এসে তাজ্জব বর্ণনা দিলেন। এলাহি কাণ্ড ভাই দস্তরমতো অফিস বসিয়েছে, শ'খানেক লোক খাটছে। বক্তৃতাদি চারটে ভাষায় এক সঙ্গে প্রচার করা, সমস্ত লেখার অনুবাদ করে সঙ্গে সঙ্গে কাগজে পাঠানো ; নিজেদের আলাদা সচিত্র বুলেটিন বের করা, পুরো রিপোর্ট বানিয়ে নানান ভাষায় তর্জমা ও টাইপ করে সকলের হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়া—সমস্ত সমাধা হয়ে যাচ্ছে ঘন্টা কয়েকের মধ্যে। মানুষগুলো নিশ্বাস ফেলার ফুরসৎ পায় না।

বক্তৃতাটা দিয়ে দিই পুরোপুরি? লেখক হওয়ার এই বড় সুবিধে, আপনারা পাল্লার মধ্যে পাচ্ছেন না। না হয় দু-চার লাইন পড়ে ছেড়ে দেবেন—তার বেশি কি করতে পারেন? কিন্তু মুশকিল হয়েছে, অন্যের বক্তৃতা ভেঙে চুরে পরিবেশন করেছি—নিজের বস্তু অটুট নামালে তাঁরা যে মাথার মুগুর ভাঙবেন। খানিকটা তুলে দিচ্ছি, তবে শুনুন—

ভারতের লেখক আমি—এশিয়া ও প্রশান্তসাগরীয় অঞ্চলের সমাগত বন্ধুজনকে সাদর-সম্ভাষণ জানাচ্ছি। সভ্যতার আদি যুগ থেকে ভারতবর্ষ সব মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে এসেছে। ভারতের সৈন্য কখনো পর-সীমান্ত লঙ্ঘন করে নি—শান্তি, প্রীতি ও পরম-আশ্বাসের বার্তা দিকে দিকে পরিকীর্ণ করেছেন ভারতীয় ধর্মাত্মা বিদগ্ধমণ্ডলী। অস্ত্র নিয়ে যারা আক্রমণ করতে এসেছিল, উদার ভারত-সংস্কৃতি গভীর আলিঙ্গনে তাদের অন্তরে গ্রহণ করল। বহু মানবের বিচিত্র সমবায়ে এমনি ভাবে অনেক শতাব্দী ধরে মহিমময় মহা-ভারত পরিগঠিত হয়েছে।
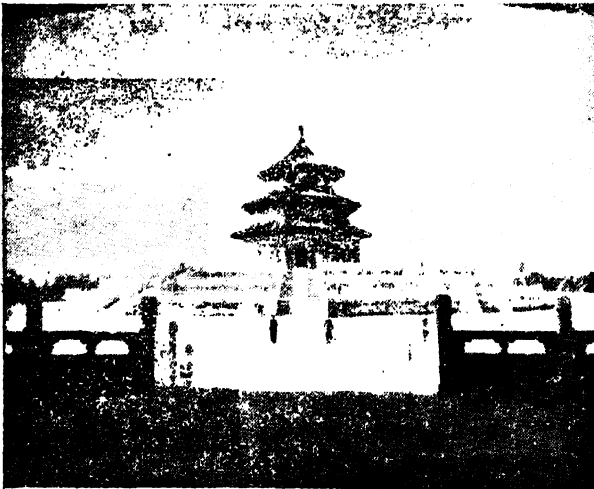
সেকালের সেই শান্তি-দূতদের পদাঙ্ক বেয়ে আমরা আজ সমুদ্র ও পর্বত-পারের পুরানো বন্ধুদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম। বহু দুঃখ ও দুর্যোগ গিয়েছে আমাদের উপর দিয়ে—সেই ঘনান্ধকারে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও অসহায় হয়ে পড়েছিলাম। আজ নূতন প্রভাত। বৃটিশের কবলমুক্ত আমরা এক সর্বমুখী অভিনব ভারত-রচনায় সঙ্কল্পবদ্ধ। নানা দেশের মানবপ্রেমী নরনারীর এই পবিত্র মহাসঙ্গম থেকে অঞ্জলি ভরে আমরা নূতন আশা ও অনুপ্রেরণা নিয়ে ফিরে যাবো।

মারণাস্ত্র মানুষ মারে, কিন্তু মন মারতে পারে না। লক্ষ-কোটি মানুষের মন দোলায়িত করি আমরা লেখক-সম্প্রদায়—অসীম আমাদের শক্তি। সাহিত্য আজ মানুষের অতি-কাছাকাছি—বিশিষ্ট কয়েকজনের বিলাসমাত্র নয়। জন-চিত্তে আনন্দ ও জীবনের প্রতি ভালবাসা জাগাবে আমাদের সাহিত্য, তাদের আত্মসচেতন করবে। সাধারণ মানুষ সংসার পেতে শান্তিতে থাকতে চায়। তারা আনন্দ চায়, পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অংশভাগী হতে চায়। মুষ্টিমেয় চক্রান্ত করে তাদের কামানের মুখে পাঠিয়ে দেয় নিজেদের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য। সমাজ-শত্রুদের চিনিয়ে দিক নূতন কালের সাহিত্য—তারা একক, শক্তিহীন সর্বজনঘৃণ্য হয়ে নিশ্চিহ্ন মিলিয়ে যাক। সকল দেশের মানুষ পরস্পর জানাশোনায় প্রীতিপর গোষ্ঠীতে পরিণত হোক।...

রণজর্জর বসুমতী আকুল আগ্রহে তাকিয়ে আমাদের দিকে। প্রভু বুদ্ধ, অশোক, গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যবাহী আমি ভারতীয় সাহিত্যিক—এশিয়া ও প্রশান্তসাগরীয় জাতিপুঞ্জের সকল লেখকের সঙ্গে সমকণ্ঠে ঘোষণা করছি, আমাদের সুন্দরী শ্যামা ধরিত্রীর রক্তকলঙ্ক বিদূরণ করব—এই আমাদের অমোঘ সংকল্প।

চার-পাঁচটা মাইক এদিকে-ওদিকে। ডাইনের টেবিলে কাচের গ্লাস। ফুলে ফুলে এমন সাজিয়েছে, যেন ফুলবাগানের ভিতর দাঁড়িয়ে বলছি। ব্যবস্থা অতি উত্তম। দপদপিয়ে ফ্লাশ-লাইট জ্বলে উঠছে—ছবি তুলছে। আবার কামানের মতন মোভি-ক্যামেরা উদ্যত মুখের দিকে। আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

স্বর্গ-মন্দির

কারা শুনছে, কিম্বা শোনার ভাণ করে ঘুমুচ্ছে—আলোর জন্যে সামনে তাকিয়ে দেখবার উপায় নেই। তা ছাড়া দেখবোই বা কেমনে—মুখের বক্তৃতা নয়, লেখা জিনিষ পড়ে যাওয়া।

পড়া শেষ করে হাততালির মধ্যে নেমে এলাম। প্রথমে এক মহিলা সেকহ্যাণ্ড করলেন। তাঁর এপাশে-ওপাশের আরো জন চার-পাঁচ। চোখ ধাঁধিয়ে আছে তখনো, কোন দেশের মানুষ ঠাহর করে দেখিনি। মাঝের রাস্তা দিয়ে ফিরে চলেছি নিজের সিটে। খান তিনেক চেয়ারের ওদিক থেকে আনিসিমভ দেখি, উঠে এসে হাত বাড়ালেন। এ সমাদরের মানেটা কি? ভজনদার বস্তু নেই, ঐ তো দেখলেন—(সে বুদ্ধি আছে, বিষ্ণে যাঁর হলো না পড়ে)। —তাই কোন কিছুতে ধরা ছোঁওয়া দিইনি। সাহিত্যিকের সামান্য সাদামাটা কথা, তাই তাঁর মনে ধরল?

গভীর প্রীতিতে সেকহ্যাণ্ড করলেন, পাকিস্তানের মজিবর রহমান। আওয়ামি লীগের সেক্রেটারি—এই তরুণ বন্ধুটিকেও চেনেন আপনারা। যুক্ত ফ্রন্টের তরফ থেকে যে মন্ত্রিসভা গড়া হয়েছিল, তার মধ্যে ছিলেন ইনি। (আতাউর রহমান সাহেবের কথা আগে বলেছি, তিনিও ছিলেন। এই সেদিন ঢাকায় গিয়ে কত আনন্দ করে এলাম ওঁদের সঙ্গে!) মজিবর রহমান বললেন, বড় ভাল বলেছেন দাদা, নতুন কথা।

মজিবর রহমানের বক্তৃতা হল মাঝে আরো বক্তকগুলো হয়ে যাবার পর। ইনিও বললেন বাংলায়। ছেয়াশি জন বক্তার মধ্যে বাংলায় বললেন দুজন। পাকিস্তানের মজিবর রহমান আর ভারতের এই অধম। ভাগ্যি কে মজা হল এই নিয়ে। পল্লীটি বলি। এক ভদ্রলোক গুটিগুটি এসে বসলেন আমার পাশের খালি-চেয়ারে। মার্কিন মুলুকের মানুষ বলে আন্দাজ হয়। চুপি চুপি শুধালেন, মশায়, আপনি বলেছেন—আর ঐ যে উনি বলছেন, দু-জনের একই ভাষা নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বাংলা।

একই রকম অক্ষর?

এক ভাষা, তা দুই অক্ষর হবে কি করে?

বুক চিতিয়ে দেমাক করি, বাংলার নাম জানো না—কে বটে হে তুমি?—টেগোর যে ভাষায় লিখলেন?

কদ্দুর কি বুঝল, মা-সরস্বতী জানেন। আমতা-আমতা করে বলে, সে তো বটেই! কিন্তু উনি এক দেশের মানুষ আপনি অন্য দেশের, অথচ দুটো দেশের ভাষা এক রকম—

বলতে পারলো না, বাংলা যে আন্তর্জাতিক ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেশ-সেদেশের মানুষ ঐ এক ভাষায় কথা বলে, এক রকম অক্ষর জানে, মায়ের মতন দরদ ঐ ভাষার প্রতি। তোমাদের ইংরেজির মতন আর কি!

খুব হাসতে লাগলাম। হাসতে হাসতে স্তব্ধ হয়ে যাই। বাংলা দেশ দু-টুকরো হয়ে গেছে আজকে। তবু একই ভাষা। বাংলাভাষা বেঁধে রেখেছে আমাদের। রাডক্লিফের খড়্‌গ মাটি কেটে ভাগ করে দিয়েছে, ভাষার উপরে তার কোপ পড়ে নি। সাত-সমুদ্র পারের বিদেশি চোখেও এই ঐক্য ধরা পড়ে গেছে।

[ক্রমশঃ।

চোখ

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক

সুমার সক কাজলা রেখার পারে
নীল সায়রের মাঝে,
টিপ্‌ টিপ্‌ কালো চাঁদ আয়নাতে
দেখি চকিত অলকাপুরীর স্বপ্নছায়ে
নেশা-ভরা মিঠে দু চোখ চাউনিতে।
ঢুলু-ঢুলু চোখ ঘুম-ঘুম প্রেমে এলিয়ে দেয়
লেক-কিনারার বেঞ্চিটায়।
ঝিরঝিরে হাওয়ায় চপলা চাউনি
টেনে আনে তার ঠিক পাশে—
চুম্বক লোহ শক্তিতে।

চঞ্চল দুটো নীলা তারার
তর্‌-তর্‌ করে জলসিঁড়ি বেয়ে নেমে যাই
কমলদীঘির গভীর গহনে মন-মধুপ।
টল-টল করে মুক্তার মত দু'চোখে দু'ফোঁটা জল
তখন বাইরের যত কর্মভার নিরুদ্বেগ
শুধু তপ্ত তৃষায় দু'চোখে দু'চোখ চাউনি পাতে।

তার রক্তজবার লালিমা চোখ
অগ্নিবর্ষী ভীষণ বাণ।
হালকা প্রেমে আলগা পেয়ে
চিতানল জ্বালে অগ্নিচোখ;
সেথানে তরুণে দিল জ্বালায়!
নইলে মধুর দু'চোখে দু'চোখ চাউনি পাতা
সুমারেখায় প্রেম তাতায়।

রাণু ভৌমিক

চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা, ওরা উঠতে যেতেই বাধা দিল। একটু হক্‌চকিয়ে গেল পরেশ—পিছনে ছিল সমীর, সে-ও থমকে দাঁড়াল। জায়গাটা ত' বিশেষ সুবিধের নয়, যত তাড়াতাড়ি উপরে উঠে যাওয়া যায় ততই নিশ্চিন্ত।

কিন্তু উঠবে কি করে? সিঁড়ির মুখেই যে ও। দু'হাত দু'দিকে ছড়ানো, ভঙ্গীটাই বাধা দেবার, মুখে শুধু একটা কথা বলছে 'না'।

'কি না?' শুধোলো পরেশ, খুব বিরক্ত ভাবে ভ্রূ বাঁকিয়ে।

কোন কথা বলছে না ও, বার বার শুধু আবৃত্তি করছে একই কথার—না, না, না।

বেশ-ভূষা চেহারা দেখে ত' পাগল মনে হয় না? তবে? অবশ্য, দুনিয়ায় কে পাগল আর কে নয়, তা বিচার করে বের করা কঠিন। অনেক দিন আগে পরেশদের বাড়ীর সামনে দিয়ে প্রায়ই একটা পাগল লাঠি হাতে ঘুরে বেড়াত—আর চীৎকার করে বলতো, 'দুনিয়ায় সব ব্যাটাই পাগল, আমি শুধু ক্ষেপে ঠকেছি।' কথাটা ভারী ভাল লেগেছিল পরেশের, তাই মনে আছে এখনও।

সমীর এতক্ষণ পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার এগিয়ে এল সামনে, ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে সরিয়ে দিয়ে সিঁড়িতে পা দিল। লোকটা আর বাধা দিল না। কি করে দেবে? দুর্ব্বল দেহ ওর, সমীরের একটা ধাক্কা সামলাবার ক্ষমতাও ওর নেই! ধীরে শুধু বললো 'যাচ্ছেন যান, তবে কি না আপনাদেরই মেয়ে…'

—'কি বাজে বকছ? আমাদের কেন হতে যাবে?'

একটু হাসলো ও, বিষণ্ণ হাসি, 'না হয়ত আপনাদের কিছু নয়। তবে কি না জানেন—এই পৃথিবীতে পুরুষ জাতের মধ্যে কেউ-না-কেউ ওর বাপ ত' বটেই। আকাশ থেকে ত' পড়েনি ওরা?'

ততক্ষণ সমীর ও পরেশ উপরে উঠে গেছে। শেষ কথাটা শুধু পরেশেরই কানে পৌছাল—সমীর হয়ত শুনতেই পেল না। সমীর বেশ বস্তুতন্ত্রবাদী—এ সব বাজে সেণ্টিমেণ্টের ধার সে ধারে না। তাই ক্ষণিকের এই ব্যাপারটা তার মনে কোন দাগই কাটেনি।

পরেশের মনে কিন্তু শুধু মাত্র একটা কথাই ঘুরে বেড়াচ্ছে 'আকাশ থেকে ত' পড়েনি?' সকলের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে। বড় টেবিলটা ঘিরে ওরা বসে আছে। শাড়ীর রং আর ব্লাউজের নক্সায় যা তফাৎ তা নইলে সবাই একই রকম চেহারার। কোটরগত চক্ষু, কণ্ঠার উঁচু হাড় আর ক্লান্ত, শুকনো মুখ। এরা কোথা থেকে এল? জোয়ারের ভেসে-আসা ফুল নয়,—শ্মশান-কলিকা। তবু, যেখানেই ফুটুক না কেন, এদের বীজ ত' কেউ-না-কেউ বুনেছে? এ কথা সত্য। তবে?

ছোট কামরাটার মধ্যে বসে সেই একই কথা ভাবছিল সে। তিন হাত লম্বা সরু একটা খাট সমস্ত ঘরটা জুড়ে আছে। কোথাও আর একটুও ফাঁক নেই।

বড় রাস্তার উপরেই এই ঘরটা। তাই এখান থেকে সব শব্দই শোনা যায়—ট্রামের ঘটাং ঘটাং আওয়াজ, রিক্সার টুং টাং, পথচারীর মৃদু অথচ অবিরত পদধ্বনি—তারই সঙ্গে তাল রেখে ঠিক উল্টো সুর গায় এরা। ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলে, নীরবে চলে।

তাকিয়ে দেখল—ঠিক ছায়ার মতই এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটি। পরেশ এখানে নতুন আসেনি, কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আজ হঠাৎ যেন তার মায়া লেগে গেল। মনে হলো, ওর মুখের সমস্ত ক্লান্তির পিছনে আছে শান্ত-সুকুমার একটি মুখশ্রী। সমস্ত লজ্জা, সঙ্কোচ ও লজ্জার পিছনে এক মধুর নারীহৃদয়। আত্মাকে এরা শয়তানের কাছে বিক্রয় করেছে সত্য কিন্তু সেই আত্মা কি সম্পূর্ণ ই বিকৃত? তা ত' নয়। এখনও উদ্ধারের আশা আছে এদের।

আর, যে পুরুষ জাতের কামনায় আহুতি দিয়ে এদের জন্ম হয়েছে আজ তারাই আবার হচ্ছে সেই জাতেরই শয্যাসঙ্গিনী। আশ্চর্য্য! ছেলেদের মনে কি এক বারও দ্বিধা জাগে না? এক বারও মনে হয় না যে মায়ের থেকে আমাদের জীবন, যার বুকের অমৃতে আমরা অমর হয়েছি এ সেই মায়েরই জাত? নারী কি শুধু কামনা-বাসনা-পরিতৃপ্তিকর খেলার পুতুল!…কোন দিন পরেশের

এ কথা মনে হয়নি—কিন্তু আজ তার মনটা যেন কেমন হয়ে গেছে। মেয়েটিকে কাছে ডেকে এনে বসালো সে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হলো জবার কথা। জবা পরেশের একমাত্র মেয়ে। এর মুখটা যেন অনেকটা জবারই মত। তা কখন হয়? পরেশ ভাবলো, মাথাটা দেখছি ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তার চেয়ে ওর সঙ্গে গল্প করা যাক্।

—'তোমার নাম কি?'

—'কণা।'

—'তুমি এ কাজ করে থেকে, কি করে আরম্ভ করলে? কেনই বা করছ?'

মেয়েটি চুপ করে রইলো। পরেশ বুঝলো এতগুলি প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে দিতে পারছে না। তাই ধীরে শুধোলো—'কি করে প্রথম এলে এখানে?'

—'শিয়ালদার কাছে একটা ছোট্ট বাড়ীতে আমরা থাকতাম। আমার মা ঝি'র কাজ করতো—ওতে চলতো না আমাদের। পাশের ঘরের মেয়েটা একদিন বললো, 'চাকরী করবি।' আমি বললাম 'হ্যাঁ।' এসে দেখি এই রকমের চাকরী। কিন্তু, কি করবো? এর চেয়ে ভাল আর পাবই বা কোথায়? আমি ত আর লেখাপড়া জানি নে।'

—'তোমার বাবা নেই?'

—'বাবা!'—দু' ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়লো ওর গাল বেয়ে। কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন মন্দাকিনীর ধারায় তার মুখখানা পবিত্র হয়ে উঠলো—'বাবা থাকলে কি আজ আর এই অবস্থা হয়?'

—'কেন? কি হলো বাবার?'

—'যখন আমরা দেশ থেকে আসি, রাত্রিবেলা একটা ষ্টেশনে ট্রেণ থামলে আমি জল খেতে চাইলাম। কেউ জানতাম না যে ওখানে ট্রেণ এক মিনিট মাত্র থামে। জল আনতে বাবা নেমে গেল, আর উঠতে পারলো না। হারিয়ে গেল কোথায়।'

কণা খুবই আদরের মেয়ে ছিল ওর বাবার। হবেই বা না কেন? একমাত্র সন্তান। শৈশবের কথা বলতে বলতে কণার মুখটা কেমন করুণ হয়ে আসে—কুৎসিত মেয়েটাও কিছুক্ষণের জন্য অপরূপা হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ ওর বাবার কথা বলতে বলতে ও যেন উচ্ছসিত হয়ে ওঠে। খুবই ভালবাসতো কি না কণাকে।

পরেশ চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়। চমকে ওঠে কণা। তার কি কোন অজ্ঞাত অপরাধ হয়েছে? থেমে থেমে বলে, 'এ কি, কি···চলে যাচ্ছেন···'

'তাতে কিছু হয়নি।' পরেশ একটা হাত রাখে ওর পিঠে।

চলে আসে পরেশ। তার পর চলে গেছে বহু দিন। প্রায় দু'বছর। ওদিকে কেন, আর কোন দিকেই যায়নি পরেশ। নিজের স্ত্রীর মাঝেই সমস্ত পৃথিবীর নারীর সৌন্দর্য্য খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছে। পুরাতনের মাঝে নতুনের আবিষ্কার!

সেদিন বাজার থেকে ফেরবার পথে কার সঙ্গে যেন ধাক্কা লাগলো। তাকিয়ে দেখে মুখটা যেন চেনা-চেনা। সে লোকটাও ক্ষমা প্রার্থনা সেরে চলে গেল না। নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। মনে হলো সে-ও চিনেছে, তবে বলতে সাহস করছে না। ততক্ষণ, সমস্ত চিন্তারাজ্য ঘেঁটে পরেশের মনে হয়েছে, সে লোকটা ওখানকার চাকর ছিল।

—'তুমি ওখানে কাজ করতে না?'

—'হ্যাঁ, বাবু।' উজ্জ্বল মুখে উত্তর দেয়।

—'ছেড়ে দিলে কেন?'

—'চলে না আজ-কাল আর, কেউ যায় না। বাজার আক্রা।··· আপনিও ত'···কথাটা শেষ না করেই ছেড়ে দেয় ও।

পরেশ চুপ করে থাকে। সে যায় না সত্য—কিন্তু সে কি আর্থিক অবনতির জন্য? তা ত' নয়। এই দু' বছরে তার অবস্থা কিছু খারাপ হয়নি। বরং স্বাভাবিক ভাবেই মাইনে কিছু বেড়েছে। তবে?

—'আচ্ছা, তোমাদের ওখানে একটা লোক নীচে বসে থাকতো'—লোকটার চেহারার বর্ণনা দেয় পরেশ।

—'হাঁ বাবু! আর লোক এলেই বলতো, 'যাবেন না, যাবেন না।'

—'কেন ও-রকম করতো ও কি পাগল?'

'না, ঠিক তবে কি জানেন? আচ্ছা এই সামনের বাড়ীটা আপনার ত'? আমি যাব সন্ধ্যেবেলা।'

এসেছিল চাকরটা। তার মুখেই শুনলো পরেশ সুশান্ত করের ইতিহাস। ঐ লোকটার নামই সুশান্ত। অল্প দিনের মধ্যেই দালালি করে বেশ কিছু টাকা করেছিল সুশান্ত। কেউ ছিল না ওর। ওখানে ওপরে প্রায়ই আসতো। কিন্তু, কিছুতেই স্পৃহা ছিল না যেন। আসতে হয় তাই আসে—এমনি ভাব।

সেদিন ওর ঘরে গিয়েছিল কণা নামে একটি মেয়ে। আলো নেবান ছিল। কিছুক্ষণ বাদে আলো জ্বালিয়ে চমকে উঠেছিল সুশান্ত। হয়তো এতক্ষণ সে ভাল করে তাকিয়ে দেখেইনি। মেয়েটিকে আলোর সামনে টেনে নিয়ে বার বার খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে দেখল সেই পরিচিত আঁচিল। ওর দৃষ্টিভঙ্গী দেখে ক্রমেই ভয় পেয়ে যাচ্ছিল কণা। দাড়ি-গোঁফে ঢাকা সুশান্তকে চেনা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। হাত ছাড়িয়ে চলে যেতে চাইলো সে। কিন্তু ওর হাত শক্ত করে ধরে সুশান্ত শুধু একবার চেঁচিয়ে উঠলো 'না, না,' তারপর অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তখনই ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো হাসপাতালে। পুরো দু'দিন অজ্ঞান হয়ে ছিল সে। তার পর থেকেই কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে নীচে বসে থাকতো—কথা বিশেষ বলতো না—শুধু কাউকে উপরে যেতে দেখলেই চেঁচিয়ে বলতো —'না, না, না।'

হতাশের আক্ষেপ

এ যন্ত্রণা ছিল ভালো, কেন পুনঃ দেখা হলো,
দেখে বুক বিদারিল, কেন তারে দেখিলাম!

ভাবিতাম আমি দুখে, প্রেয়সী থাকিত সুখে,
সে ভ্রম ঘুচিল, হায়, কেন চখে দেখিলাম!

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদেশী সঙ্গীত-যন্ত্র নিশ্চয়ই চলবে

সুষ্ঠু, সঙ্গীতের প্রয়োজনে যে যন্ত্রের উদ্ভব সেখানে দেশী আর বিদেশী যন্ত্রের মধ্যে সাপ আর নেউলের সম্পর্ক কেন থাকবে, সাধারণে তা' বুঝতে পারে না। আমাদের মনে হয়, ভারতীয় যন্ত্রবাদকদের মধ্যে যাঁরা গুণী তাঁদেরই খেয়াল মাত্র এটা। স্বদেশপ্রীতি সব সময়েই ভাল কিন্তু সঙ্গীতের পরিবেশনে যখন যে যন্ত্রের প্রয়োজন তাল, সুর রাগের সামঞ্জস্য বিধানার্থে শুধু মাত্র বিদেশী বলেই ভারতীয় আসরে তাকে যেন অপাংক্তেয় করা না হয়। তা'তে সঙ্গীতের মান দিনকে দিন হ্রাস পাবে। বেতার থেকে হারমোনিয়াম, গীটার প্রভৃতি যন্ত্র বয়কট করা হয়েছে। হারমোনিয়াম বয়কট অবশ্য করা হয়েছে শান্তিনিকেতনকে অনুসরণ করে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে না হয় নাই বাজলো হারমোনিয়াম, কিন্তু অন্যান্য সঙ্গীতে যেখানে প্রয়োজন সেখানে এ' খেয়াল-খুসীর কারণ কি ?

কলকাতা বেতার-কেন্দ্রে রাত্রে রবীন্দ্র-সঙ্গীত

সারা দিনের নানা কাজ,' নানা পরিশ্রমের শেষে বাড়ীতে ফিরে এসে রাতে বিছানায় আশ্রয় নেবার পরও আপনি যদি না শুনতে পান বেতারের চাবী ঘুরিয়ে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মত কোনও আমেজী কিছু তাহলে পরের বছরও নগদ পনেরোটি টাকা খরচা করে আপনি আপনার বেতার-লাইসেন্সটি পালটাবেন কি ? কলকাতা বেতার-কেন্দ্রকে ধন্যবাদ তারা তা' করেনও। কিন্তু শুধু শ্রাবণ মাসেই যদি, 'তিল ঠাঁই আর নাই রে,—'গানটি পর পর কয়েক রাত ধরে শোনেন তবে তা' একটু শ্রুতিকটু লাগবেই। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের গান বা ঐ জাতীয় আর কিছুও উপভোগ্য হতে পারে। ঐ বিষয়ে বেতার কর্তৃপক্ষকে আমরা ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

বাঙালীর গলায় সুর আছে, বাঙালী সুরের জাল বুনে কত লোকের যে মন ভুলিয়েছে সে কথা নতুন কোরে জানাবার দরকার নেই। বাঙালী সঙ্গীতজ্ঞরা সঙ্গীতের সাধনা কোরেই গেছেন, কোন দিন পুরস্কারের মোহ তাঁদের সাধনাকে ব্যাহত করে নি। বাঙালী সঙ্গীতশিল্পী গুণী। আজ ভারত সরকার গুণী শিল্পীদের গুণের সমাদর দিতে এগিয়ে এসেছেন দেখে দেশবাসী যে তাঁদের এ প্রচেষ্টার জন্যে সাধুবাদ জানাবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাশীর প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১৯৫৪ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করলেন। শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় একজন গুণী শিল্পী—ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুংরী প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ সংগীতে তাঁর অপূর্ব দখল। সমগ্র ভারতে তাঁর বহু ছাত্র আজও ছড়িয়ে আছেন। সংগীত সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রাগের ঘরণার ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতির স্বরলিপি সমেত ও সঙ্গীতের জটিল সমস্যার ওপর লেখা তাঁর একখানা গ্রন্থ আজও অপ্রকাশিত আছে। বইখানা প্রকাশিত হলে সঙ্গীত-জগতের বহু অজানা খবর যে পাওয়া যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সংগীত-রসপিপাসু ভক্তদের কাছে তার একটি আনন্দের খবর—আগামী সেপ্টেম্বরে একটি সংস্কৃতি-মিশন ভারত থেকে রাশিয়া অভিমুখে যাত্রা করছেন। এই দলের ভেতর আছেন বাঙলা তথা ভারতের স্বনামধন্য সেতার-বাদক পণ্ডিত রবিশংকর, বিখ্যাত স্বরোদ-বাদক আলী আকবর খাঁ ও সুখ্যাতনামা উচ্চাঙ্গ সংগীতগায়িকা গীতশ্রী শ্রীমীরা চট্টোপাধ্যায়, বংশীবাদক পান্নালাল ঘোষ প্রভৃতি। এই সংস্কৃতি-মিশন ভারতের মুখ উজ্জ্বল করে স্বদেশে ফিরুন—আমাদের কামনা। আগামী সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ কলকাতায় নিখিল ভারত সদারং সঙ্গীত-সংসদের এক সম্মেলনের তোড়জোড় চলেছে। মিঃ এইচ, এম, কাওয়াদজী মেটা, শ্রী এম, আর মুন-ঝুনওয়ালা, শ্রী জি ডি নন্দ প্রভৃতিকে নিয়ে একটি শক্তিশালী সাব কমিটিও এ কারণে ইতোমধ্যে গঠিত হয়েছে। গীতবিতানের উত্তর-কলিকাতা বিভাগের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব ইতোমধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীটস্থ 'ক্যাসলে' সম্পন্ন হয়। সভায়

সভাপতিত্ব করলেন সঙ্গীতরসিক শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় এবং পুরস্কার বিতরণ করলেন মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি ঠাকুর। আলাউদ্দীন সঙ্গীত-সমাজ কর্তৃক পরিচালিত সঙ্গীত শিক্ষার ক্লাস প্রবর্ত্তন হল। এই উপলক্ষে রাজভবনে এক বিশেষ সঙ্গীত-সভার আয়োজন হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গভর্ণর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী। গত ১১শে জুলাই ইটালীর কৈলাস বালিকা বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রায়ণ সংস্কৃতি বিভাগের ৪র্থ মাসিক অধিবেশনে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ ও ধামারের বৈশিষ্ট্যের ওপর দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং তার সঙ্গে গানে সহায়তা করেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় ও সুকুমার মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি কড়েয়া রোডে নৃত্যভারতীর উদ্যোগে লক্ষ্ণৌ সবণীর নৃত্যশিক্ষক শ্রীরামনারায়ণ মিশ্রের ছাত্রী বেবি রাণী ও বালক শ্রীচিত্রেশকুমার কথক নৃত্য নৃত্যভারতীর ছাত্রী শ্রীমতী কেশোয়া মুসা ভারত নাট্যম নৃত্য পরিবেশন করেন। তবলা সঙ্গত করেন মাষ্টার মুন্নন। নৃত্যানুষ্ঠানের পর শ্রীজ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী বেহাগে আলাপ করেন ও মালকোষে ধ্রুপদ গেয়ে শোনান। পাখোয়াজে সঙ্গত করেন শ্রীকৃষ্ণ পাল।

নতুন রেকর্ড

জুলাই মাসে নিম্নলিখিত বাংলা রেকর্ডগুলি বাহির হইয়াছে:—

'হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস্'—

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়—N 82622 'আমার জীবনে প্রেম অভিশাপ' ও 'কোন্ বঁধুয়া দাবায়' (আধুনিক); শ্রীমতী উৎপলা সেন—N 82623 'রাতের কবিতা' ও 'প্রেম শুধু মোর' (আধুনিক); শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়—N 82624 'তুমি এসে আজ' ও 'প্রদীপ কহিল' (আধুনিক); সুনাম চক্রবর্তী—N 82625 'হারিয়ে গেল দিনগুলি' ও 'যমুনা কিনারে সাজাহানের' (আধুনিক)।

কলম্বিয়া—

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়—GE 24732 'পথ দিয়ে কে যায়' ও 'ওগো নদী আপন বেগে' (রবীন্দ্রসঙ্গীত); দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় GE 24734 'শ্রাবণ ঢল ঢল' ও 'পায়ে চলা পথের কাঁকর' (আধুনিক); শ্রীমতী রাধারাণী—GE 24735 'আমি মলাম মলাম শ্যাম' ও 'কী রূপ হেরিনু' ধর্মমূলক)।

হুন্দুদাদার গীত

দেবপ্রসাদ বসু

বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে "গ্রামীন সাহিত্য" ছড়িয়ে আছে। দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর, সবুজ বনানী। পূবে হাওয়া সোনালী ধানের ক্ষেতে হাত বুলিয়ে যায় ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে। গেঁয়ো কাঁচা মাটির পথ হাতছানি দিয়ে ডাকে অচেনা পথিককে, দূর থেকে দূরান্তরে রাখালের বাঁশি বেজে ওঠে মিঠে সুরে, পথ চলার ক্লান্তি দূর হয় নিমেষে। আঁকা-বাঁকা নদী-নালা নানা পথে গেছে ছবির মত, সমস্ত দেশটা যেন কোন রূপকথার রাজকন্যার দেশ, যেন দুধ-সাগরের পারে এক স্বপ্নরাজ্য! মাঠের চাষী এখানে কাব্যিক, নায়ের মাঝি সেথায় গায়ক। গাঁয়ের ছোট-বড় সবাই দিনের শেষে ক্লান্তি দূর করে পল্লীর সান্ধ্য অনুষ্ঠানে জারি, সারি, আলকাছ, ভাওয়াল, তপ এই সব নানা ধরণের গান গেয়ে। গ্রামীন আবহাওয়ার মাঝে জেগে ওঠে প্রাচীন পল্লীসাহিত্য। সহুরে আভিজাত্যের অন্তরালে পল্লীর পর্ণ-কুটীরের ছায়া-শীতল কোলে আজও কত গায়ক, কত স্বভাবকবি বেঁচে আছেন, কত ঝরে গেছেন। চৈতালি এলোমেলো ঝড়ে ইতিহাস তার কোন খোঁজই রাখেনি। পল্লী-সংস্কৃতি আজ মৃতপ্রায়। উত্তরবঙ্গের রংপুর এক দিন পল্লীসাহিত্যে সমৃদ্ধ ছিল, সেখানকার একজন পল্লীমহিলা-রচিত একটি গীত আপনাদের শোনাচ্ছি, গীতটি "হুন্দুদাদার গীত" নামে পরিচিত। বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে পল্লীবধূরা এই গানটি গেয়ে থাকেন। সাহিত্যের দুটি দিক, বাস্তববাদ ও আদর্শবাদ। বঙ্গকবি জীবনের আদর্শের দিকে সমস্ত প্রতিভা নিয়োজিত করেছিলেন। মানব-জীবনের বাস্তব দিকে একেবারে দৃক্‌পাত করেননি। সংস্কৃত সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শকে উপেক্ষা করবার সাহস তাঁদের ছিল না। রংপুরের গাঁয়ের মহিলা কবি জীবনের ঐ দিকটা উপলব্ধি করেছিলেন। "হুন্দুদাদার গীতে" আমরা এইটিই দেখতে পাই। গীতটি বড় প্রাচীন। প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বে রচিত হয়েছিল। ক্রমাগত অবহেলায় গানটির আজও প্রচলন

আছে। এর ভাষা প্রাকৃত-প্রধান বাঙ্গলা। গানটির আখ্যান ভাগ এই রূপ : "মুন্দু একজন গাঁয়ের ছেলে। চাষীর মেয়ে কেওয়া তার প্রতিবেশী। দু'জনে খুব ভাব। গ্রাম্য সম্বন্ধে কেওয়া মুন্দুকে "দাদা" বলে ডাকত। গাঁয়ের পথে-প্রান্তরে, নদীর ঘাটে তাদের কৈশোরের দিনগুলি কেটে গেল। তার পর এলো যৌবন। মুন্দু বুঝলে সে কেওয়াকে ভালবাসে, তার অজ্ঞানায় মনের কোন গভীর আঙ্গিনায় এই অনুভূতি বাসা বেঁধেছে। কেওয়া মুন্দুকে ছেড়ে থাকতে পারতো না, কেন, তা সে জানে না। সে গাঁয়ের মেয়ে সরল ও স্বচ্ছ, তাই তার মাঝে যে স্বপ্ন কানাকানি করে অতি গোপনে, তা সে যত্ন করে তুলে রেখেছে অন্তরের অন্তস্তলে। কিন্তু গ্রাম্য সমাজে এ ভালবাসা অচল, গ্রামীন লোকাচার এ সব বরদাস্ত করে না, করে একঘরে। তাই একদিন মুন্দুকে ও কেওয়াকে চিরতরে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল।"

বাঁশের তলে কেঁওয়া চন্দন খড়ি (১) করে রে।
ওদিয়া যায় মুন্দু না যে ভাইয়া রে ॥
মুন্দু দাদা ক্যানে (২) হাতের জোকা (৩) নিল রে।
দৌড়ি যায় কেওয়া বড় ভাবির (৪) আগে রে ॥
তোকে বল মুই বড় না ভাবি রে।
মুন্দু দাদা ক্যানে হাতের জোকা নিল রে ॥
তুই কেঁওয়া আজিলি (৫) না পাগিলি রে।
তোর মুন্দু দাদার তোরে জোক কইল রে ॥
দৌড়ি যায় কেঁওয়া জন নি (৬) মা এর আগে রে।
তোকে বল মুই জন নি না মাও রে ॥
মুন্দু দাদা ক্যানে হাতের জোকা নিল রে।
তুইও কেঁওয়া আজিলি না পাগিলি রে ॥
তোর মুন্দু ভাইয়ার তোরে জোক কই না রে।
দৌড়ি যায় কেঁওয়া আস-পরসির (৭) বাড়ী রে।
তোকে বল মুই আসপরসি মাও রে।
মুন্দু দাদা ক্যানে হাতের জোকা নিল রে ॥
তুই কেঁওয়া আজিলি না পাগিলি রে।
তোর মুন্দু ভাইয়া তোকে বিয়াও করিবে রে।
দৌড়ি যায় কেঁওয়া বাড়িক না গিয়া রে।
ন্যায় ন্যায় কেঁওয়া সোনার নও বুড়ি কড়ি।
যায় যায় কেঁওয়া বাদিয়ার (৮) বাড়ী ॥
তোকে বল মুই বাদিয়া না ভাইয়া রে।
ন্যায়েক ভাইয়া তুই সোনার নও বুড়ি কড়ি রে ॥
ন্যায়েক ভাইয়া তুই সোনার নও বুড়ি কড়ি রে।
মোক দেইস ভাইয়া আলাও সাপের বিষ রে ॥
যায় যায় কেঁওয়া পোয়াল না পাড়ায় রে।
তোকে বল মুই গোয়াল'না ভাইয়া রে ॥
মাক দেইস ভাইয়া এক বর্ণি গাইর দুত রে ॥
আইস আইসে কেঁওয়া বাড়িক (৯) না গিয়া রে।
সোন্দার (১০) সোন্দায় কেঁওয়া জোড়া মন্দির ঘরে রে ॥

সেদিন শুক্লা তিথি, উড়ো মেঘ আকাশে চলা-ফেরা করছিল, অশথতলায় রথের মেলা বসেছে, দূর পথচারীর দল ফেরার পথে পাড়ি জমিয়েছে। পারের নৌকো যাত্রী-বোঝাই করে ঢেউএর মুখে ছেড়ে দিয়েছে, মাঝি হাল ধরে গান ধরেছে,

কোন্ দেশেতে যাও রে ভ্রমর
ফুলের মধু খাও,
কোন্ দেশেতে যাও ……

অভিমানী কেঁওয়া কোথাও যায় না, কাউকে মুখ দেখায় না, তার মুন্দু দাদা আর আসে না। গাঁয়ে নানা কথা নানা ভাবে আলোচনা হতে লাগলো, কেঁওয়া মুখ লুকিয়ে কাঁদে। ভাবী কিন্তু সব লক্ষ্য করে অলক্ষ্য থেকে, কিন্তু সান্ত্বনা দেবার ভাষা তার নেই। কেঁওয়া নীরবে ভাবীর সামনে এসে দাঁড়ায়, কথার খেই হারিয়ে ফেলে :

"প্রেম কইর‍্যা কি জ্বালা রে বন্ধু!"

সকলের অলক্ষ্যে সে পালিয়ে গেল দূরে,…দুধের সাথে বিষ মিশিয়ে খেল,…মৃত্যুর ছায়া ক্রমে তাকে গ্রাস করলো, দূরে মন্দিরে তখন সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজছে, শঙ্খের আওয়াজ ঘোষণা করছে নব জীবনের ইঙ্গিত…। মুন্দু কিছুই জানে না, সে এসে ভাবীকে বলে, "কেঁওয়া কোথায়?"

ভাবী ছল-ছল আঁখি দুটি তারিয়ে বলে, "তোর কেঁওয়া জোড় মন্দির ঘরে রে!" মুন্দু ঘরে প্রবেশ করে গায়ে হাত দিয়ে দেখলে—গা বরফের মত ঠাণ্ডা। দূরে ঝাউগাছের পাতা শন্ শন্ করে দুলে উঠলো। এক নিমেষে তার সুখ-স্বপ্ন মিলিয়ে গেল; অবশিষ্ট বিষটুকু মুন্দু পান করলে।

আজও কেঁওয়া-মুন্দুর ভিটেয় প্রতি সন্ধ্যায় গাঁয়ের কুলবধূরা সন্ধ্যা-প্রদীপ দেয়।

---

(১) জ্বালানী কাঠ। (২) কেন। (৩) মাপ। (৪) বৌদি। (৫) অজ্ঞান। (৬) জননী। (৭) প্রতিবেশী। (৮) বেদে। (৯) বাড়ীতে। (১০) প্রবেশ করিল।

গীত

"যদি ডাকার মত পারিতাম ডাক্‌তে।
তবে কি মা, এমন ক'রে, তুমি লুকায়ে থাক্‌তে পারতে ॥
আমি নাম জানি নে, ডাক জানি নে,
আবার পারি না মা, কোন কথা বলতে ;
তোমায়, ডেকে দেখা পাই নে তাইতে, আমার জনম গেল কান্‌তে ॥
দুঃখ পেলে মা, তোমায় ডাকি,
আবার, সুখ পেলে চুপ্ ক'রে থাকি ডাক্‌তে ;
তুমি মনে বসে, মন দেখ মা, আমায় দেখা দাও না তাইতে।"

—কাঙাল হরিনাথ

হয়ে ক্রোশ দুই তফাতে এই নদীরই একটা বাঁকের কাছে আর একটা জঙ্গলের সঙ্গে মিশেছে। সরস্বতীর জাঙ্গাল নামে জঙ্গলটি পরিচিত।

সে দিন নীলের উৎসব। মন্দির-সংলগ্ন বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে মেলা বসে গেছে। বালক-বালিকা ও নিম্নশ্রেণীর নারীদের ভীড়ই বেশী। পল্লীর ভদ্রঘরের মেয়েরাও সারা দিন উপবাসী থেকে সায়াহ্নে মন্দিরে পূজা দিতে এসেছেন।

[উপন্যাস]

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১

গ্রামের নাম হরগৌরীপুর। প্রাচীন কাল থেকেই এর প্রতিষ্ঠা। গ্রামের এক প্রান্তে খরস্রোতা সরস্বতীর তীর ঘেঁসে 'হরগৌরী' শিবের মন্দির—দীর্ঘ শিবলিঙ্গের গৌরীপীঠে হরগৌরীর মূর্তি উৎকীর্ণ এবং এইটিই এ-মন্দিরের বৈচিত্র্য। হরগৌরীর নামেই যে পুরাকালে গ্রামখানি প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। বিস্তীর্ণ গ্রামখানির মধ্যে বিভিন্ন পল্লীসংস্থান এবং পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখে মনে হয়—সহর অঞ্চলে আদর্শ গ্রাম সম্বন্ধে যে-সব গালভরা নাম শোনা যায়, হরগৌরীপুর গ্রামখানি নানা দিক দিয়ে সেই আদর্শতার দাবী রাখে।

কেন এবং কি সূত্রে?···এ প্রশ্নের উত্তরে গ্রাম্য পরিবেশ সম্পর্কে দীর্ঘ বর্ণনার পরিবর্তে আলোচ্য কাহিনীটিই আরম্ভ করছি; এ থেকেই প্রশ্নের উত্তর মিলবে। বিশেষতঃ এ-কাহিনীর সূচনা যখন এই গ্রাম থেকেই।

*　　*　　*　　*

চৈত্র মাসের শেষাশেষি। চড়কোৎসব উপলক্ষে শিবের গাজন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। এ-অঞ্চলের যেখানে যত গাজুনে দল আছে, হরগৌরী-মন্দির-তলায় এসে, তারা নাচের তালে তালে 'হরগৌরীর পায়ে শিব' লাগাবেই—নতুবা তাদের সন্ন্যাস-ব্রত সিদ্ধই হবে না। নীলের উৎসব ও চড়ক পূজার দিন মন্দিরের সামনে বাঁধা বাঁশের মঞ্চ থেকে এরা হরগৌরীর নাম নিয়ে ঝাঁপ খাবে, নাচের নানারূপ কসরৎ দেখাবে, নাচের পর প্রাঙ্গণে লুটিয়ে পড়ে ভক্তি নিবেদন করবে; অবশেষে 'হরগৌরীর পায়ে শিব লাগে—মহাদেব!' ···এই আওয়াজ তুলে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করবে। এই উপলক্ষে মন্দিরতলায় রীতিমত মেলা বসে, বাহিরের লোকজন তো আসেই, পাড়ার ভদ্র-ঘরের মেয়েরাও বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সারা দিন উপবাসের পর সন্ধ্যার সময় নীলের পূজা দিতে আসেন। পূজার পর তবে তাঁরা জলগ্রহণ করবেন।

সরস্বতী নদীর উপকূলে পোস্তা বেঁধে মন্দির-সংলগ্ন আস্তানাটিকে দৃঢ় করা হয়েছে। সেকেলে কাজ, পোস্তা থেকে একখানি পাথরও সরেনি। কত দিন আগে যে পোস্তা গেঁথে তার পর মন্দির তোলা হয়েছে, সে কথা গ্রামের সব চেয়ে বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি সত্য ঘোষালও বলতে পারবেন না। নদীর কিনারাতেই—মন্দির থেকে একটু তফাতে মহাশ্মশান। তার পরই একটা বিশাল বনভূমি—এখান থেকে সুরু

তাঁদের সঙ্গেও বেশীর ভাগ বালিকাদের ভীড়, বালকও আছে—তবে সংখ্যায় কম। পুরোহিত মন্দিরমধ্যে পূজায় বসেছেন। পূজার্থিনীরা স্ব স্ব উপচারাদি তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে সামনের চাতালে এসে গল্প-গুজব করছেন। নীচের প্রাঙ্গণে গাজনের সন্ন্যাসীরা সমবেত হচ্ছে।

পূজা শেষ হতেই নীচের প্রাঙ্গণে নাচের উৎসব জেঁকে ওঠে। সন্ন্যাসীদের ভিতর থেকেই শিব, নন্দী, ভৃঙ্গি, ভূত, প্রেত সেজে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে দেয়। চাতালের এক পার্শ্বে নিম্নশ্রেণীর সধবারা ধূনা পোড়াতে বসে যায় সারি সারি। তাদের প্রত্যেকের মাথার উপর লতা-পাতা দিয়ে পাকানো বিড়ার উপরে এক-একটি আগুনের মালসা বসানো। পুরোহিত ঘুরে-ফিরে প্রত্যেক মালসার উপর চূর্ণ ধূনা নিক্ষেপ করছেন, সঙ্গে সঙ্গে শিখা বিস্তার করে আগুন জ্বলে উঠছে।

এমনি সময় মন্দিরের দিকে একটা নূতন রকমের ঘটনা সকলকে উল্লসিত করল। ভদ্রপল্লীর কিশোরী মেয়েরা এই আনন্দের দিন পল্লীর দুটি শিশুকে নিভৃতে এতক্ষণ ধরে নিপুণ ভাবে হরগৌরী সাজাচ্ছিল—শিশু হরগৌরী। সজ্জা শেষ হতেই তারা চাতালে দণ্ডায়মান মহিলাদের উদ্দেশ করে বলল:

জনৈকা কিশোরী: গাজুনে সন্নেসীদের রঙ্গভঙ্গ এতক্ষণ তো দেখলেন—এখন দেখুন সাক্ষাৎ হরগৌরী।

মেয়েটির কথায় মহিলারা সচকিত হয়ে দেখলেন—একটি উঁচু চৌতারার উপর সুসজ্জিত "শিশুহরগৌরী" পাশাপাশি দণ্ডায়মান।··· চার বছরের একটি প্রিয়দর্শন ছেলেকে শিব এবং দু' বছরের এক সুন্দরী মেয়েকে গৌরী সাজানো হয়েছে।

চাতালে উপস্থিত মহিলারা সোল্লাসে বলে উঠলেন বিভিন্ন কণ্ঠে:

মহিলাগণ: বা! বা!

বাহিরের প্রাঙ্গণ থেকে কতিপয় ছেলে ক্ল্যাপ দিয়ে বলল:

ছেলেরা: হরগৌরীকি জয়!

সন্ন্যাসীরা: হরগৌরীর পায়ে শিব লাগে—মহাদেব!

পুরোহিত: তোমরা বুঝি ওখানে বসে এই কাণ্ড করছিলে?

যে কয়টি কিশোরী এ কাজে ব্যাপৃতা ছিল, তাদের ভিতর থেকে এক জন বলে উঠল:

জনৈকা কিশোরী: ভালো করিনি ভট্‌চাজ মশাই?

জনৈকা মহিলা: দিব্যি মানিয়েছে—যেন সাক্ষাৎ হরগৌরী।

এই সময় অনুপমা নামে প্রৌঢ়বয়স্কা এক মহিলা ভীড়ের ভিতর থেকে এগিয়ে এসে গণ্ডে হাত দিয়ে বলে উঠলেন :

অনুপমা : অ'মা, এ কি রে ! ছেলেটাকে করেছিস্ কি ?

জনৈকা তরুণী : আপনারই ছেলে—অনুপমা পিসি।

অনুপমা : তাই ত দেখছি ! এই বয়েসে আমার ললিতকে শিব সাজিয়ে দিলি তোরা ?

আর এক তরুণী অন্য দিক দিয়ে অনুপমা দেবীর সমবয়স্কা ও পরিচিতা এক প্রৌঢ়া মহিলাকে নিয়ে এগিয়ে এসে বললেন :

২য়া তরুণী : আপনার দেবীকে খুঁজছিলেন সুলোচনা কাকী—দেবী হারায়নি, ঐ দেখুন শিবের পাশে—কে !

সুলোচনা : য়্যাঁ—করেছিস্ কি তোরা ! অমা—সই যে ! দেখছ কাণ্ড ?

অনুপমা : দেখিছি ! আমার ললিত হয়েছে হর, আর তোর দেবী হয়েছে গৌরী।

পুরোহিত : এটা সুলক্ষণ। নীলের দিনে গাজনের বাজনার মধ্যে হরগৌরী মিলন হয়ে গেল।

বাহিরে তখন বহুকণ্ঠে কোলাহল উঠেছে—

—আমরা হরগৌরী দেখব।

—আমাদের দেখান ঠাকুর।

মেয়েদের ভীড় দু'পাশে সরে গেল। চৌতারার উপর পাশাপাশি দণ্ডায়মান শিশু হরগৌরীকে বাহিরের লোকজনেরা দেখল। তারা সমস্বরে বলে উঠল :

—হরগৌরী কী জয় !

চারদিক থেকে বাজনা বেজে উঠল। সন্ন্যাসীরা সমস্বরে নৃত্যের তালে তালে আওয়াজ তুলল :

সন্ন্যাসিগণ : হরগৌরীর পায়ে শিব লাগে—মহাদেব !

২

প্রতি বছরই চৈত্রের শেষে এই ভাবে নীলের উৎসব হয়। উৎসবে মেলা বসে, বহু জনসমাগম হয় এবং মায়েরাও সন্তানের মঙ্গল কামনায় উপবাসী থেকে হরগৌরীর পূজা দিয়ে পুরোহিতের আশীর্বাদ ও দেবতার প্রসাদ নিয়ে যান। কিন্তু এ-বছর পূজার পর দুটি বিশিষ্ট পরিবারের শিশু সন্তানকে হরগৌরী সাজিয়ে চাঞ্চল্য তোলার দৃশ্যটি উভয় শিশুর মায়েদের মনে এমন একটি দাগ দেয় যে, এর পর প্রতি বছরই উৎসবের সময় সেটা যেন নূতন করে চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলে। ফলে, মায়েদের মনের মধ্যে এই সূত্রে একটা আগ্রহও উদ্রিক্ত হয়ে ওঠে যে, এরা দুটিতে বড় হ'লে এমনি করেই ওদের মিলন দেখে সেদিনের খেলাটি সার্থক ও বাস্তব করবেন।

কিন্তু মুখে ব্যক্ত না করলেও সে পরিকল্পনাটি যে তাঁদের মনের গহনে তলিয়ে যায়নি, দীর্ঘ চার বছর পরে একদা সেই দুটি বালক-বালিকার খেলাঘরের খেলার বিচিত্র পরিকল্পনা-সম্পর্কে দুই কর্তার প্রাসঙ্গিক মন্তব্য আর একবার অনুপমা ও সুলোচনা দেবীকে সচকিত ও উল্লসিত করায়—সহজেই সেটি উপলব্ধি হয়। তখন, চার বছর আগে হরগৌরী মন্দিরের সেই মিলনের দৃশ্যটি স্ব স্ব গৃহিণীর মুখে শুনে উভয় কর্তা—পশুপতি হালদার ও বগলাপদ সমদ্দার রীতিমত খুসীই হলেন।

সেই কথাই এখন বলছি।

গ্রামের মধ্যে প্রথমেই ব্রাহ্মণপাড়ায় পাশাপাশি কয়েক ঘর সম্ভ্রান্ত পরিবারের বসবাস। পল্লীগ্রামের বাড়ী—বসতবাড়ীর সঙ্গে খোলা জমি, বাগান, বাড়ীর মধ্যে উঠান, ধানের মরাই, ঢেঁকিশালা। বাহিরে রাস্তার গায়ে সাজার চণ্ডীমণ্ডপ, পিছনে একটা বড়-সড় পুষ্করিণী। সাবেক কর্তাদের আমলের ব্যবস্থা—কাজকর্মে সবাই ব্যবহার করবেন, নেমন্তন্নের সময়ও সকলে মিলে-মিশে সাহায্য করবেন। সকালের দিকে ছেলেমেয়েদের পাঠশালা বসে এই চণ্ডীমণ্ডপে। সন্ধ্যার দিকে পাড়ার গৃহস্বামীরা সমবেত হয়ে গল্পগুজব করেন, কখনো বা তাস-পাশা দাবা-বোড়ে নিয়ে আড্ডা জমান।

চার বছর আগে নীলের উৎসবের দিন যে শিশু দুটিকে হরগৌরী সাজিয়ে আনন্দ উপভোগের একটা নবতম উপাদান রচনা করা হয়েছিল, এখন তারা বালক-বালিকা। ললিত আট বছরে পড়েছে, দেবীর বয়সও পাঁচ উত্তীর্ণ হতে চলেছে। কিন্তু এই বয়সেই খেলাঘর পেতে খেলা-ধূলার ভিতর দিয়ে ঘর-গৃহস্থালী ও পারস্পরিক প্রীতি-ভালোবাসা, দরদ ও মান-অভিমান নিয়ে যে, সব কথাবার্তা বলে বা কাজকর্ম করে, সমবয়সীরা তাতে যেমন উল্লসিত হয়, অভিভাবকরাও তেমনি বিস্মিত হয়ে আলোচনা করেন—এই বয়সে এমন পাকা কথা আর সংসারের কাজকর্ম এরা শিখল কোথা থেকে ?

হরগৌরী-মন্দিরে সেই ঘটনার পর প্রায় চার বছর পরে একদিন বিকালের দিকে দেখা গেল, বছর আষ্টেকের একটি হৃষ্টপুষ্ট প্রিয়দর্শন ছেলে হরগৌরীর মন্দির থেকে কতকগুলি ফুল-বেলপাতা নিয়ে গাঁয়ে সোজা ও পরিচিত পথগুলির উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে।

এই ছেলেটিকেই বছর চারেক আগে হরগৌরী-মন্দিরে শিব

সাজানো হয়েছিল। ছেলেটির গায়ে একটা হাতকাটা জামা, পরনে একটু চওড়া-পাড় ধুতি, খালি পা—জুতা নেই। এর নাম ললিত।

ছেলেটি এর পর রাস্তার ধারে একটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। চারদিকে পাঁচীল দেওয়া একতালা বাড়ী। রাস্তা থেকে নেমে পাঁচীলের পাশ দিয়ে সরু পথ ধরে একটু গেলেই খিড়কীর দরজা। সেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে ডাকল: দেবী—দেবী—

বাড়ীর ভিতর থেকে দেবীর মা সুলোচনা দেবী চেঁচিয়ে বললেন: কে—ললিত বুঝি! দেবী তো নেই বাড়ীতে—খেলতে গেছে।

'ও!' বলেই ছেলেটি আবার ফিরল; আগের পথ ধরে সামনের বাঁকটা ঘুরে সেই ভাবে ছুটতে লাগল। এই বাড়ীর মালিক বগলাপদ সমদ্দার। চালানী কাজের ব্যাপার করেন। সুলোচনা দেবী এঁরই স্ত্রী এবং দুই কন্যা দেবী ও রাণী। দেবীকেই সেবার মন্দিরে গৌরীর সাজে দেখা গিয়েছিল তখন তার বয়স ছিল দেড় কি দুই। রাণী তার কোলের বোন, দেবীর চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট। এই বাঁকটার পরেই সেই সাজার জীর্ণ চণ্ডীমণ্ডপ। তার আশে-পাশে অনেকখানি খোলা জমি, স্থানে স্থানে ফুলগাছ, ঘড়ের গাদা—মরাইয়ের মত বাঁধা। এই জমিতেই পল্লীর ছেলেমেয়েদের খেলা-ধূলা চলে। চণ্ডীমণ্ডপ থেকে কিছু কিছু দেখা যায়।

চণ্ডীমণ্ডপে মাদুর বিছিয়ে তখন গল্প করছিলেন বগলাপদ এবং পশুপতি। উভয়েই সমবয়স্ক—এক এক পরিবারের কর্তা। উভয়েরই বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। বগলাপদর মুখ ক্ষৌরিত, বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহ, প্রকৃতি একটু গম্ভীর। পশুপতি অপেক্ষাকৃত স্থূলাকৃতি, মোহারা চেহারা, সেজন্য নাকের নীচে পরিপুষ্ট গোঁফ-জোড়াটি মুখের গাম্ভীর্যটুকু আরও পরিস্ফুট করেছে এবং মাথার উপরে বিঘতপ্রমাণ স্থূল টিকিটিও দিব্য মানিয়েছে। বগলাপদর গায়ে একটা গেঞ্জি। পশুপতির ও বালাই নেই, আধা-ভিজা একখানা গামছা তাঁর কাঁধে, গল্প করতে করতে মধ্যে মধ্যে গামছা দিয়ে মুখ-চোখ মুছছিলেন।

একই হুঁকায় উভয়ের তাম্রকূট সেবন চলেছে। এ থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে যে, তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা এবং বর্ণগত কোন পার্থক্য নেই। বগলার পদবী সমদ্দার ও পশুপতি হালদার হলেও উভয়েই বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব—এঁদের পূর্ব-উপাধি যাই থাক, পুরুষানুক্রমে পুরাকাল হতে নবাব-দত্ত উপাধি ব্যবহার করে আসছেন।

পশুপতি সোৎসাহে হুঁকায় জোরে একটি টান দিয়ে, হুঁকার মুখটি নিজের হাতে মুছে বগলার হাতে দিতে দিতে বললেন: সেই একটা কথা আছে না—কারো পোষ মাস, কারো বা সর্বনাশ—এই লড়াইটাও তাই। এর দাপটে কেউ করছে—হায় হায়! কেউ বা খোসমেজাজে বলছে—দিন এলো···বাঁচলাম।

হুঁকায় টান দিয়ে তাম্রকূটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বগলাপদ বললেন: ঠিক কথাই বলেছ! এই দেখ না, কলকাতায় যাদের ফার্মে তিসি-তাসা চালান দিয়ে কোন রকমে দিন গুজরাণ করছিলাম, মাঝে তো সে-সব চালান বন্ধ হবার জো হয়েছিল। কিন্তু লড়াই বাধতেই মোড় ঘুরতে থাকে; তার পর দেখ না, এই দুটো বছরেই কি কাণ্ড—চালান তিন গুণ বেড়ে গেছে।

পশুপতি: তাই তো বলছিলুম, তোমারও পোষ মাস হে বগলা ভায়া!

কথার সঙ্গে জোরে হেসে উঠলেন পশুপতি। তাঁর বালক পুত্র ললিত ঠিক এই সময় চণ্ডীমণ্ডপের পাশ কাটিয়ে নিঃশব্দে খেলাঘরের দিকে যাচ্ছিল; হাসির শব্দে চমকে উঠে একবার তাকাল, তারপর আরও দ্রুত চলে গেল।

বগলাপদ ললিতকে লক্ষ্য করে বললেন: এবার খেলাঘরের কর্তা এলেন। ওর জন্য দেবীর কি ব্যগ্রতা—

পশুপতি: তাই ত, খেলাঘর থেকে এখানেই খবর নিতে এলো কত বার—ললিতদা কোথায়?

বগলাপদ: ওদের এই ছেলেখেলা আমার ভারি মিষ্টি লাগে—তাই এখানে বসে গল্প করতে করতে ওদিকেও নজর রাখি। ওই দেখ কাণ্ড—

আগেই বলা হয়েছে, গ্রামের এদিকটায় পাশাপাশি, বা কাছাকাছি তিনটি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পরিবারের বসতি এবং এই অঞ্চলটি ব্রাহ্মণ-পল্লীর অন্তর্ভুক্ত। বাঁকটির মুখেই বগলা সমদ্দারের বসত-বাড়ী; তার পরেই চণ্ডীমণ্ডপের নিকট পশুপতি ও তার পিছনে সত্য ঘোষালের বাসভবন। পল্লী অঞ্চলের বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থদের ঘরবাড়ী যেমন হয়, তেমনি সাদাসাদা ইটের একতলা ঘর কয়েকখানি, তার পর মাটির দেওয়াল দেওয়া ঘরগুলির উপর গোলপাতা বা উলুর ছাউনি। ভাঁড়ার, রান্নাবান্না, খাওয়া-দাওয়ার কাজ এখানে চলে। উঠানে ধানের মরাই, ঢেঁকিশালা প্রভৃতি লক্ষ্মীমন্ত গৃহস্থ-পরিবারের পরিচিতি বহন করে। বাড়ীর পিছনে গোশালা, তার পর খোলা জমি—বেড়া দিয়ে সীমানা বন্দেজ করা। পারস্পরিক প্রতিযোগিতার অভাবে প্রতিবাসীর উপর টেক্কা দিয়ে নিজের ঘরবাড়ীর অকারণ বাহ্যিক সৌষ্ঠব বাড়াবার আগ্রহ নেই কোন পক্ষের।

এখন ললিত চণ্ডীমণ্ডপের পাশ দিয়ে এগিয়ে খোলা মাঠে পড়েই তার চলনের গতি হ্রাস করল। সে এখন অত্যন্ত সন্তর্পণে পা টিপে টিপে দেবীর খেলাঘর লক্ষ্য করে চলতে লাগল নিঃশব্দে। উদ্দেশ্য, হঠাৎ গিয়ে দেবীকে চমকে দেবে। কিন্তু এ-পাশে কতকগুলো বাহারী ক্রোটন গাছের আড়ালে সত্য ঘোষালের ভাগিনেয়ী রাধা দাঁড়িয়েছিল। এ দিকটা তারই এলাকা—নিকটেই তার খেলাঘর। এই মেয়েটিও সাগ্রহে ললিত ছেলেটির প্রতীক্ষা করছিল, কাছ দিয়ে তাকে যেতে দেখেই তাড়াতাড়ি গাছের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে পিছন থেকে খপ্ করে তার কাপড় চেপে ধরে বলল: ওদিকে নয়—এদিকে। এসো।

এ ভাবে হঠাৎ বাধা পেয়ে চমকে উঠে ললিত ছেলেটি বলল: বা-রে! আমি যে দেবীর খেলাঘরে যাচ্ছি—তার সঙ্গেই খেলব।

কচি মুখের একটা মিষ্টি ভঙ্গি করে রাধা বলল: রোজই তো তুমি দেবীর সঙ্গে খেল ললিত দা, একদিন না হয় আমাকে নিয়েই খেললে! এসো—

বিপন্নের মত মুখভঙ্গি করে ললিত বলল: সে ভাই আর একদিন হবে—আজ নয়। দেখছ না—দেবীর খোকার অসুখ করেছে, আমি ঠাকুরের পেরসাদী ফুল আনতে গিয়েছিলুম। দেবী কত ভাবছে—আমি যাই।

কিন্তু রাধা তার কাছার দিকের কাপড়টা এমন শক্ত করে

ধরে ছিল যে, ললিতের সাধ্যই ছিল না—সেটা ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়। তখন সে মিনতির ভঙ্গিতে বলল: লক্ষ্মী ভাই রাধা, আমাকে ছেড়ে দে, বড্ডো দেরী হয়ে গেছে ফুল আনতে—দেবী ভারি রাগ করবে'খন।

রাধাও কঠিন হয়ে এবং কাপড়টা আরো শক্ত করে টেনে বলল: ও রাগ করল তো বড় বয়ে গেছে—তুমি এসো ত। আমি তাকে বলবো।

অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির ছেলে এই ললিত। এই বয়সেই অদ্ভুত ভাবপ্রবণ। কারও মনে ব্যথা দেওয়া বা কারও সঙ্গে কলহ করা তার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। মুখখানা ম্লান করে, ছল ছল চোখ দুটি তুলে সে নীরবেই রাধার পানে তাকাল, কিন্তু তথাপি রাধার করুণা হলো না—বিজয়িনীর মত জয়োল্লাসে সে ললিতকে টেনে নিয়ে হাজির হলো তার খেলাঘরে। সেখানে তার পাতা সংসারটি দেখিয়ে বলল: দেখ দেখি—কেমন সাজিয়েছি ঘরখানি, দেবীর চেয়ে ভালো নয়? বসো তুমি।···ললিতকে বসতে হয়, কিন্তু তার চোখের উপর তখন ভাসতে থাকে—বিপন্না দেবীর ঘরখানা। খোকার অসুখ, দেবীর কি ভাবনা! তাই ত সে গিয়েছিল ঠাকুরের ফুল আনতে। কিন্তু দেবী কি ভাবছে?

সত্যই দেবী তখন তার খেলাঘরে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। কি রকম বে-আক্কেলে কর্তা বল ত! খোকার অসুখ—সে একলাটি তাকে নিয়ে পড়ে আছে, আর কর্তার দেখাই নেই! অমুক একবার···একখানা আস্ত ইটের উপর বসে গালে হাত দিয়ে দেবী ভাবতে থাকে।

এমনি সময় দেবীর ছোট বোন রাণী এসে বলল: অমা, গালে হাত দিয়ে বসে আছিস যে বড়—রান্না-বান্না কখন করবি দিদিভাই?

দেবী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল: দেখ না ভাই কর্তার কাণ্ড, খোকা জ্বরে বেহুঁস হয়ে রয়েছে, ওষুধ আনতে গেছেন তিনি—এখনো ফেরবার নাম নেই। কাছে কেউ না থাকলে উঠি কি করে?

রাণী বিস্ময়ের স্বরে বলল: কে বললে তোর কর্তা ফেরেনি, আমি তো দেখিছি, ছুটতে ছুটতে এসেছে—দাঁড়া তো···

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলেই কাঁধের আঁচলটি কোমরে জড়াতে জড়াতে রাণী তীরের বেগে বেরিয়ে গেল। দেবী মেয়েটির স্বভাব যেমন কোমল, রাণীর ঠিক তার বিপরীত। কেউ কোন দোষ-ত্রুটি করলে রাণীর চোখে পড়লে আর রক্ষা নেই—সে তখনি একটা হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। উচিত কথা শোনাতে কিম্বা ঝগড়া বা মারামারি করতেও এই মেয়েটি পিছপাও নয়।

রাধার খেলাঘরে শান্ত প্রকৃতির ছেলে ললিত তখন খুবই মুশকিলে পড়েছে। তার মন পড়ে রয়েছে দেবীর দিকে, দেবী ছাড়া আর কোন মেয়ে বা ছেলের সঙ্গে সে খেলতে নারাজ, ভালোও লাগে না তার; অথচ রাধা কি না জোর করে তাকে ধরে এনে বসিয়ে রেখেছে কিছুতেই উঠতে দেবে না! উপরন্তু আবদার ধরেছে—যে ফুল-বেলপাতা তার সঙ্গে রয়েছে, রাধার ঠাকুরঘরে সেগুলি কাজে লাগাক—ললিত নিজেই পূজা করুক। কিন্তু ললিত এখন গোঁ ধরেছে—এ কেমন করে হবে? হরগৌরীতলা থেকে সে কত কষ্ট করে প্রসাদী ফুলপাতা এনেছে দেবীর ছেলের জন্য। এ-সব ফুল-পাতা সে কিছুতেই দেবে না; এ ছাড়া প্রসাদী ফুল-পাতায় কি ঠাকুরের পূজা হয়? ললিতের বাবা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ, নিজেই নিত্য ঠাকুরপূজা করেন, ললিত কাছে বসে বসে দেখে; কাজেই পূজার প্রকরণ কিছু কিছু তার জানা আছে।

রাধা ভাবছে, ললিতের এ কথার কি জবাব সে দেবে? এমনি সময় কোমরে আঁচলটি জড়িয়ে মারমুখী হয়ে সেখানে ধেয়ে এলো দেবীর ছোট বোন রাণী। তর্জনী তুলে চোখ দুটো পাকিয়ে মুখখানা বেঁকিয়ে সে ললিতকে উদ্দেশ করে বলল: কি রকম বে-আক্কেলে কর্তা তুমি গা! তোমার গিন্নী ছেলে নিয়ে ঠায় বসে, উঠতে পারছে না, রান্নাঘরে সব পড়ে—আর তুমি এখানে দিব্যি বসে আছ? ওঠ বলছি—

ললিত বেচারী হতচকিত হয়ে আর্ত কণ্ঠে বলে উঠল: এই দ্যাখ না—রাধা আমাকে খালি খালি ধরে রেখেছে।

মুখখানা বিকৃত করে রাণী বলল: আহা গো! কচি খোকা, বলি পা দুটো পঙ্গু হয়েছে না কি যে উঠতে পারছ না? এখনো বসে আছ!

রাধার দিকে অসহায় ভাবে ললিত তাকায়। রাধা এতক্ষণ মনের সমস্ত ক্রোধ চেপে রাণীর এই অন্যায় ও অনধিকারচর্চা কোন রকমে সহ্য করছিল, এখন ফেটে পড়বার মত হয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলল: তোর যে ভারি আস্পর্দ্ধা হয়েছে রে রাণী! আমার ঘর বয়ে তুই ঝগড়া করতে এলি? বলি—ললিতদা কি দেবীর কেনা কর্তা?

রাণীও ততোধিক চড়া গলায় এবং প্রত্যক্ষ যুক্তির সঙ্গে

জবাব দিলো : কেনো কি না—ঐ তো বসে রয়েছে কর্তা, জিজ্ঞেস কর না—ও কোথায় যেতে চায় ?

রাণীর কথার সঙ্গেই ললিত তাড়াতাড়ি উঠে পড়েই বলল : আমি দেবীর কাছে যাব।

রাণীও মুখ নাড়া দিয়ে বলল : যাবে তো যাও না—দাঁড়িয়ে কেন ? ভ্যালা মেনী-মুখো মিন্সে !

আর কথা নেই, কলাপাতায় বাঁধা ফুলের মোড়কটি তুলে নিয়েই দে ছুট ! রাধা প্রথমটা ভড়কে গিয়েছিল, ললিতকে তার আয়ত্ত থেকে এ ভাবে পালাতে দেখে সে-ও তার পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে দু'পা এগুতেই রাণী বাধা দিয়ে বলল : থাক্—ঢের হয়েছে, আর টস দেখিয়ে কাজ নেই।

ফুক্কোমুখী হয়ে রাধা বলল : তুই পোড়ারমুখী এসেই তো সব নষ্ট করে দিলি !···রাধা রাণীকে চেনে, ঝগড়ায় বা গায়ের জোরে তাকে এঁটে ওঠা দায়—তারও পরীক্ষা হয়ে গেছে। কাজেই আর বাড়াবাড়ি না করে নিজের ঘরকন্নার দিকেই তাকে মন নিবিষ্ট করতে হলো—মনের দুঃখ সব চেপে রেখে।

রাণীও ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এসে ললিতকে ধরে ফেলল, তার পর রাণীর সামনে হাজির করে শ্লেষের সুরে বলল : এই তোর কর্তাকে নে—এর পর শক্ত হয়ে শাসন করবি, বুঝলি ?

দেবীর অত শত নেই। কর্তাকে দেখেই যেন বর্তে গেল, সচকিত হয়ে বলল : খোকা জ্বরে আনচান করছে, ওকে ফেলে উঠতে পারছি না—তুমি একটু কাছে ব'স ; আমি ওদিকে দেখি।

ললিত তাড়াতাড়ি বলল : খোকার জন্যেই তো বেরিয়েছিলুম ঠাকুরের প্রসাদী ফুল আনতে—

দেবী : এনেছ ?

ললিত : এই যে—নাও।

কলাপাতায় বাঁধা ফুল-পাতার মোড়কটি দেবীর হাতে দিতেই অমনি তার মুখখানি প্রসন্ন হয়ে উঠল। সে-ও তৎক্ষণাৎ মোড়কটি খুলে ফুল-পাতাগুলি বের করে শয্যাশায়ী কাঠের পুতুলটির সর্বাঙ্গে দৈবী-পরশ দিতে লাগল একান্ত আগ্রহ ও ভক্তি সহকারে।

ওদিকে সন্নিহিত চণ্ডীমণ্ডপে উপবিষ্ট আলাপচারী দুই প্রৌঢ় বন্ধু এই সূত্রে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে একটা মিলন-গ্রন্থিও রচনা করতে থাকেন। কথা-প্রসঙ্গে চার বছর আগের হরগৌরী মন্দিরের ঘটনাটিও তাঁদের স্মৃতিপথে উঠে সঙ্কল্পটি দৃঢ় করে দেয়।

বগলাপদ বলেন : দেখ ভায়া, ছেলে বড় হলে যেন ভুলে যেয়ো না। তাহলে আমার স্ত্রী একবারে ভেঙে পড়বেন !

পশুপতি বলেন : পাগল হয়েছ ! আমাদের যেমন ছাড়াছাড়ি হবে না, ওদের দুটিরও তাই। আমার স্ত্রীর চোখে সেই থেকে মন্দিরের ব্যাপারটি ছবির মত নাকি দিন-রাতই ভাসে !

৩

পূর্বোক্ত ঘটনাটির পর এ-পল্লীর বালক-বালিকা মহলে চাঞ্চল্যের একটা সাড়া পড়ে যায়—রাধা মেয়েটিও তার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য তলে তলে চেষ্টা করতে থাকে। রসরাজ অমৃতলাল বসু বলতেন : ইংরেজদের কাছ থেকে আমাদের স্বরাজ শিখবার কিছুই নেই—আমরা ছেলেবেলা থেকে ছেলেখেলার ভিতর দিয়ে 'স্বরাজ' করে আসছি। ছেলেমেয়ে মানুষ করা, বাঁধা আয়ের মধ্যে সব দিকে দৃষ্টি রেখে মানিয়ে নেওয়া, তার মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি, মামলা-মকর্দ্দমা, লোক-লৌকিকতা রক্ষা—আমরা যে ভাবে চালিয়ে বাহাদুরী নিই—করুক দেখি কোন সিবিলিয়ান ইংরেজ তেমনি নিখুঁত ভাবে ? আর, আমাদের দেখাদেখি, বাচ্চাগুলোও তাদের খেলাঘরে হুবহু আমাদের নিত্যকার কাজের এমনি অনুকরণ করে যে, আড়াল থেকে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে থাকি।

কথাগুলো যে রসরাজ অভিজ্ঞতা সূত্রেই বলেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই এবং এই হরগৌরীপুরের শিশুমহলের খেলার ভিতর দিয়েই তার একটা সুস্পষ্ট আভাসও পাওয়া যায়। সে যাই হোক, এখন আমাদের গল্পে আসা যাক। রাধা মেয়েটি মাতুলালয়ে থাকে, খুব শৈশবে পিতৃহীন হয়ে মায়ের সঙ্গে মাতামহের আশ্রয়ে এসে লালিত-পালিত হচ্ছে। মাতামহ সত্য ঘোষাল গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি, তাঁর অবস্থাও বেশ সচ্ছল, যথেষ্ট জমি-জমা আছে, তার উপর বাড়ী থেকেই জ্যোতিষও করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে বুদ্ধির সঙ্গে মাথাও চালাতে হয়। কাজেই দাদুর সাম্পর্কে থেকে রাধাও মাথা চালাতে শিখেছে। এর পর সে করলে কি, ললিত ছেলেটির নামে মিথ্যা করে লাগিয়ে ভাঙিয়ে পাড়ার ছেলে-মেয়েদের মন এমনি বিষিয়ে দিলে যে, দেখতে দেখতে একটা ভাঙন ধরে গেল। ললিত দেখে, তাকে আর কেউ ডাকে না, মিশতেও চায় না তার সঙ্গে। এমন কি, দেবী-ও একদিন নীরবে তার হাতের বিচ্ছেদসূচক আঙুলটি তুলে দেখিয়ে আড়ি দিয়ে দিল। এ অবস্থায় মান রক্ষার জন্য ললিতকেও তার নিজের সেই নির্দিষ্ট আঙুলটি দেখিয়ে বিপক্ষ ভেবেই দেবীর 'আলটিমেটাম' গ্রহণ করতে হলো।

এর ফলে শিশুমহলে বেশ একটা থমথমে ভাব গাঢ় হয়ে উঠল। খেলা আর জমে না। রাধা ভেবেছিল, এ ভাবে মন-ভাঙানোর ফলে তার খেলাঘরটি দিব্যি জেঁকে উঠবে, কিন্তু দেখা গেল—সে গুড়ে বালি—কেমন একটা ছন্নছাড়া ভাব যেন বিশ্রী করে তুলেছে খেলাঘরের পরিবেশটিকে।

ললিত এখন একঘরে—একা। কিন্তু তার দরদী দৃষ্টি দেবীকে ঘিরে যেন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। নিজের মনে সে ভাবে, তার তো কোন দোষ নেই—তবে কেন দেবীও তাকে ভুল বুঝল ? হরগৌরী-মন্দিরে খুব শিশুকালে তাদের মিলনের কথা সে শুনেছে ; সে-সূত্রে হরগৌরীর উপরে ভক্তিও যথেষ্ট। এখন তার কাজ হয়েছে—ঐ ঠাকুরের কাছেই নালিশ করা, তিনি যাতে দেবীর ভুল ভেঙে দেন। নির্জ্জনে নিবিষ্ট মনে ললিতকে প্রায়ই ঠাকুরের উদ্দেশে আর্ত প্রার্থনা নিবেদন করতে দেখা যায়। সকাতরে সে জানায় : আমি তো কোন দোষ করিনি ঠাকুর, মিছে কথা বলতেও শিখিনি, তবে কেন মিছি-মিছি ওরা আমাকে 'মিথ্যুক' 'দেমাকে' 'মিটমিটে ডান' বলে আড়ি দিয়ে গেল ? আমার কথা ওরা বিশ্বাসই করলে না। কিন্তু তুমি তো সব জানো—তুমি যে অন্তর্যামী ঠাকুর ! তবে কেন চুপ করে আছ ? আমি যে আর একলা একলা থাকতে পারছি না দেবীকে ছেড়ে ? তুমিই আবার আমাদের ভাব করে দাও। মা তো বলেন—তোমাকে মন দিয়ে ডাকলে, মনের কথা শোনালে, সব দুঃখ মোচন করে দাও। তাই তোমাকে ডাকছি ঠাকুর—আমার কথায় তুমি কান দাও।

ঠাকুরের উদ্দেশে প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তার বড় বড় কালো কালো

চোখের তারা দুটি জলে ভরে যায়—তখন জলভরা পদ্মফুলের মত সেই সুন্দর মুখখানিও শোভাময় হয়ে ওঠে।

ওদিকে রাধার উদ্যোগে পাড়ার ছেলেমেয়েরা চড়িভাতির আনন্দে মেতে উঠেছে। নিরানন্দ মনগুলি আবার উল্লাসে ঝলমল করছে। স্থির হয়েছে—সেদিন দুপুরের পর দল বেঁধে তারা সবাই মিলে সরস্বতীর জাঙ্গালে সেঁধুবে, সেইখানেই চড়িভাতি হবে, আর সেই বনের ভিতরে তারা লুকোচুরি খেলবে। রাধা যুক্তি দিয়েছে—ললিতকে বাদ দিয়ে এই চড়িভাতি করলেই, সে যে একঘরে হয়েছে, আমাদের দলের বাইরে—সেটা আরো ভালো করে সকলে জানতে পারবে।

বসন্ত নামে একটি ছেলে এখন এ দলের 'চাঁই' হয়েছে—ছেলেগুলো তার হাত ধরা, এরই ইশারায় তারা ফেরে। ললিতের প্রতি তার বরাবরই বিদ্বেষ, কিছুতেই তার সঙ্গে বনে না। সেই তো ললিতের নাম রেখেছে—'মিটমিটে ডান!' রাধার যুক্তি শুনে বসন্ত ক্ল্যাপ দিয়ে বলে: হুররে! রাধা ভারি দামী কথা বলেছে। সত্যিই এবার বাছাধনের দেমাক ভাঙবে।

ছেলেরা শ্লোগান তোলে: মার দিয়া কেল্লা।

সবাই আনন্দে উৎফুল্ল; কিন্তু দেবীর মুখখানা সর্বদাই যেন বিমর্ষ, ম্রিয়মান। এ প্রস্তাবে বাধ্য হয়ে তাকেও মত দিতে হয় সমস্ত ব্যথা-বেদনা চেপে রেখে। হ্যাঁ, সে-ও আনন্দে মেতে উঠত—যদি তার ললিতদা থাকত তার পাশে। কিন্তু তার তো সম্ভাবনা নেই—সে যে এখন দলছাড়া, একঘরে। আবার, এ ব্যাপারে রাণীর যে যুক্তি নেবে, তারও উপায় নেই—এই আড়াআড়ির আগে থেকেই রাণী পড়েছে জ্বরে—তাই তাকে সে কোন কথাই বলেনি।

যাই হোক, নির্দিষ্ট সেই ছুটির দিনে বাড়ীতে কোন রকমে খাওয়া দাওয়া সেরেই এ-দলটি তোড়জোড় সব সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল চড়িভাতির উদ্দেশ্যে। ললিত তখন বাইরেই সেই চণ্ডীমণ্ডপে একাটি একখানি পড়ার বই হাতে করে বসেছিল। কিন্তু পড়ায় কিছুতেই মন নিবিষ্ট করতে পারছিল না, চার পাশ থেকে খেলুড়েদের কথাগুলো কানে লেগে তাকে চঞ্চল করে তুলছিল; অথচ, এখান থেকে উঠে যেতেও তার মন সায় দিচ্ছিল না। আর একটু পরেই যে ওরা দল বেঁধে যাবে, তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই দেবী থাকবে—তার এখন একান্ত ইচ্ছা, একবার দেবীকে এই সময় দেখবে—সত্যিই কি সে ওদের মতই হাসতে হাসতে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাবে?

আর ভাবা হলো না—পনেরো-ষোলটি ছেলেমেয়ের সেই বড় দলটি চণ্ডীমণ্ডপের কাছে এসে দাঁড়াল। চড়িভাতির সমস্ত উপকরণও এদের সঙ্গে রয়েছে। ললিতকে এ সময় সামনে দেখতে পাবে, কেউ তা ভাবেনি; এখন বসন্তই সর্বাগ্রে তাকে উদ্দেশ করে বলল: এই ছ্যাখ, আমরা দল বেঁধে পিকনিক করতে চলিছি, আমাদের এখানকার খেলাঘর সব খালি রইল, তুই একলাই আগলে থাকিস্ ললতে!

কিন্তু যাকে উদ্দেশ করে এ-ভাবে শ্লেষের আঘাত দিল এই ছেলেটি—সে তখন ও-কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে দলের মধ্যে দেবীকে খুঁজছিল তার আগ্রহাত্মক দৃষ্টি দিয়ে। এতক্ষণে তার বহুপ্রতীক্ষ্য ধৈর্য্য সার্থক হলো। সে দেখল, অত্যন্ত আড়ষ্ট ভাবে বিরস বদনে দেবী রয়েছে তাদের মধ্যে, মুখে নেই হাসি, আর সব ছেলেমেয়েদের মত দেহখানি তার উৎসাহে টলমল করছে না, অমন যে টানা টানা দুটি চোখ—যেন একবারে নিষ্প্রভ এবং তারই দিকে সম্পূর্ণ নিবদ্ধ।

ললিতকে নিরুত্তর দেখে দল থেকে রাধা বলল; আমাদের চড়িভাতিতে দেবী বলেছে কাঁচা লঙ্কার দম রাঁধবে—থেকো ব'সে এখানে, তোমার জন্যেও আনবে।

দেবী ছাড়া দলের সবাই হেসে উঠল: ললিত লক্ষ্য করল—দেবীর মুখখানা যেন কালো হয়ে গেছে রাধার ঐ কথা শুনে। সে তখন কোন উত্তর না দিয়ে ঝাঁ করে উঠে পড়ে বাড়ীর দিকে ছুটলো, তার পর হাতের বইখানা রেখে খালি গায়ে একটা হাত-কাটা জামা চড়িয়ে ফিতে বাঁধা পোষাকী জুতো জোড়াটি পরে তার ছোট ছাতিটি নিয়ে আবার চণ্ডীমণ্ডপে ফিরে এলো।

দলটি তখন কলহাস্যে মধ্যাহ্নের জনহীন পথ মুখর করে চলেছে এবং ললিতকে উদ্দেশ করে তাদের কণ্ঠনিঃসৃত বিদ্রূপ-বাণীর দু'-একটা কণা ইটের টুকরোর মত কানে এসে পড়ায় এরই মধ্যে ললিত স্থির করে ফেলল যে,—সে-ও সরস্বতীর জাঙ্গালে যাবে, তার পর ওদের অলক্ষ্যে ওদেরই সঙ্গে বনভ্রমণ করবে। সেখানে বনভোজন করে ওদের মনে যে আনন্দ হবে, তারও চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ সে উপভোগ করবে একাই বনে বনে ভ্রমণ করে। ললিত আরও বুঝল যে, শ্মশানের পাশ দিয়ে যেতে হবে এই ভয়ে ওরা গ্রামের যে পথ ধরে জাঙ্গালে চলেছে, তাতে অনেকটা ঘুর হবে। সে কিন্তু দলে থাকলে, ওদিকের পথ ধরে আগে হরগৌরীর মন্দিরে ঠাকুরদর্শন করে তার পর শ্মশানের কিনারা দিয়েই জাঙ্গালে ঢুকতো। এখন ওদের এই ভুল নিজেই শুধরে নেবে এই মনে করে ললিত ছাতাটি খুলে মাথায় দিয়ে হরগৌরীর মন্দিরের দিকে ছুট দিল। [ক্রমশঃ।

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

বিনয় ঘোষ

[অনুবাদ]

হিন্দুস্থানের হিন্দুদের কথা—(৫)

হিন্দুদের চিকিৎসাবিদ্যা

শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে হিন্দুদের কয়েকখানি গ্রন্থ আছে; কিন্তু তার অধিকাংশই ঔষধ ও পথ্যের তালিকা ছাড়া কিছু নয়। শারীরবিদ্যার বা তত্ত্বের কোন আলোচনা তার মধ্যে করা হয়নি। এ-সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থখানি পদ্যে লেখা। হিন্দুদের চিকিৎসা-প্রথার সঙ্গে আমাদের প্রথার পার্থক্য অনেক। কয়েকটি মূলনীতির উপর তাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের ভিত্তি গঠিত। নীতিগুলি এই :

(ক) রোগীর অসুখ হ'লে তার পুষ্টির কোন প্রয়োজন নেই;

(খ) অসুখের প্রধান চিকিৎসা হ'ল উপবাস;

(গ) মাংসের কং ইত্যাদি রোগীর পথ্য নয়। অসুস্থ রোগীর এই জাতীয় পথ্য বিষবৎ বর্জনীয়;

(ঘ) বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে রোগীর দেহ থেকে রক্ত নেওয়া উচিত নয়।

এই চিকিৎসা-পদ্ধতি সঙ্গত কি না, এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না, তা বিচক্ষণ চিকিৎসকরা বিবেচনা ক'রে দেখবেন। আমার বক্তব্য হ'ল, এই চিকিৎসা-পদ্ধতি হিন্দুস্থানে বেশ ফলপ্রদ হয়েছে দেখা যায়। শুধু হিন্দুরা নয়, মোগল ও অন্যান্য মুসলমান চিকিৎসকরা এই একই পদ্ধতিতে রোগীর চিকিৎসা করেন। উপবাস করতে হবে অসুখ হ'লে, একথা সকল শ্রেণীর চিকিৎসকরাই স্বীকার করেন। মোগল চিকিৎসকরা হিন্দুদের চেয়ে রোগীর দেহ থেকে রক্ত নিষ্কাশনের পক্ষপাতী বেশী ব'লে মনে হয়। মাথার অসুখ, লিভার বা কিড্‌নীর কোন অসুখের সম্ভাবনা থাকলে তাঁরা রোগীর দেহ থেকে রক্ত বার ক'রে নেন। গোয়া(১) বা প্যারিসের ডাক্তাররা যেভাবে অল্পস্বল্প ক'রে নেন, মোগল চিকিৎসকরা তা করেন না। তাঁরা প্রাচীন চিকিৎসকদের মতন এক-একজন রোগীর দেহ থেকে আঠার থেকে বিশ আউন্স পর্যন্ত রক্ত নিষ্কাশন করেন এবং তার ফলে অনেক সময় রোগী অচৈতন্য হয়ে পড়ে। এইভাবে তাঁরা বলেন যে রোগীর দেহ থেকে বদ্‌রক্ত বার ক'রে দিলে, যে কোন বিষাক্ত রোগই হোক না কেন গোড়াতেই তার মূলে আঘাত করা হয় এবং রোগেরও দ্রুত উপশম হয়।

হিন্দুরা শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে যে একেবারে অজ্ঞ তাতে অবাক হবার কিছু নেই। মানুষের শরীরের ভিতরের গড়ন না দেখলে স্বচক্ষে, শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে কোন ধারণা বা জ্ঞান হওয়াও সম্ভব নয়। হিন্দুরা কোনদিন কোন রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করেন না। তাঁরা দেখেননি কোনদিন, দেহের মধ্যে কি আছে, না আছে। মানুষ তো দূরের কথা, কোন জন্তুজানোয়ারের দেহও এইজন্য তাঁরা কোনদিন কেটেকুটে দেখেননি। মধ্যে মধ্যে আমি যখন কোন ছাগল বা ভেড়ার দেহ চিরে ফেলে আমার মনিব আগাকে দেহের মধ্যে রক্তচলাচলের পদ্ধতির ব্যাখ্যা করতাম, তখন হিন্দুরা ভয়ে ও বিস্ময়ে সেখান থেকে পালিয়ে যেতেন। যাঁরা শরীরের ভিতরে একটি শিরার দিকেও কোনদিন চেয়ে দেখেননি তাঁরা মানুষের দেহে কতগুলি শিরা-উপশিরা আছে তা মুখস্থ ব'লে দিতে পারেন। হিন্দুরা বলেন, মানুষের শরীরে পাঁচ হাজার শিরা-উপশিরা আছে, একটিও বেশী বা কম নেই। যেন প্রত্যেকটি শিরা দেখে দেখে তাঁরা গুণে রেখেছেন মনে হয়।

হিন্দুদের জ্যোতিষবিদ্যা

জ্যোতিষবিদ্যা সম্বন্ধেও হিন্দুদের নিজস্ব গণনাপদ্ধতি আছে এবং সেই গণনানুসারে তাঁরা গ্রহণাদির ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। ইয়োরোপীয় জ্যোতিষীদের মতন তাঁদের গণনা একেবারে নির্ভুল না হলেও, অনেকটা যে নির্ভুল তাতে কোন সন্দেহ নেই। গ্রহণাদি সম্পর্কে তাঁদের যা যুক্তি তার সঙ্গে অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁরা বলেন, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ একই কারণে হয় এবং কোন দানব বা রাক্ষস সূর্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করে ফেলে। এই সময় কতকগুলি নিয়ম না পালন করলে মানুষের অমঙ্গল হ'তে পারে, এই তাঁদের বিশ্বাস। এখানকার জ্যোতিষীদের ধারণা, সূর্য থেকে চন্দ্রের দূরত্ব প্রায় চল্লিশ লক্ষ ক্রোশ। চন্দ্র জ্যোতির্ময়

(১) এই সময় গোয়ার চিকিৎসকরা বিশেষ মর্যাদা পেতেন এবং তার জন্য মাথায় ছাতি ধ'রে তাঁরা চলতে পারতেন। মাথায় ছাতি দিয়ে চলার অধিকার এককালে সকলের ছিল না। বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তিরা সেই অধিকার অর্জন করতেন। গোয়ার ডাক্তারদের সম্বন্ধে জনৈক পর্যটক বলেছেন: "There are in Goa many Heathen phisitions which observe their gravities with hats carried over them for the sunne, like the Portingales, which no other heathens doe, but (onely) Ambassadors, or some rich Marchants:" ("Voyage to the East Indies"—Hakluyt Soc. ed, 1885, Vol 1, P. 230)
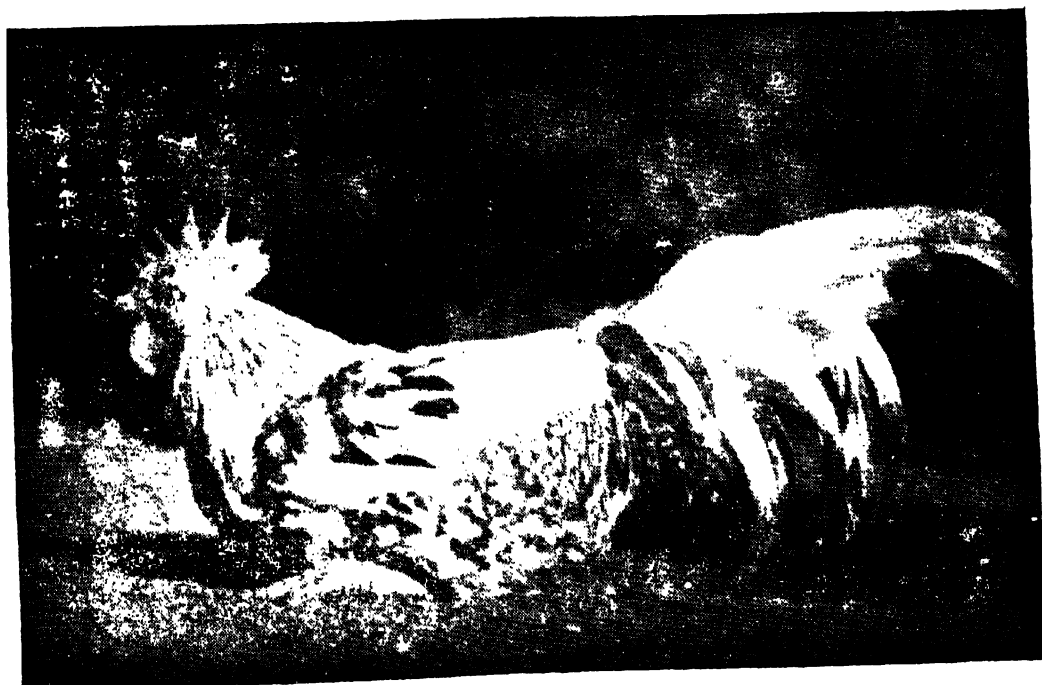
রূপসজ্জার বাইরে স্বাগতা চক্রবর্ত্তী

—অশোককুমার বসু

—কে, ডি, মুখোপাধ্যায়

ডিমে তা

—ধনঞ্জয় নাগ

কলকাতার পথে —প্রদ্যোত দে

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ —এ, চৌধুরী

—প্রণব চট্টোপাধ্যায়

পাঠিকা

নর্তকী অনুরাধা দাস —শ্রীহরি গাঙ্গুলী

—দিলীপকুমার বসু

—জহর ঘোষ

সাঁঝের প্রদীপ

পদার্থ-বিশেষ। চন্দ্র থেকে মানুষের দেহে যে তরল পদার্থ নিঃসৃত হয়ে আসে তাই প্রথম মগজে এসে জমা হয় এবং সেখান থেকে দেহের অন্যান্য অংশে সঞ্চারিত হয়ে সমস্ত শরীরটাকে সক্রিয় ও তেজোদ্দীপ্ত ক'রে রাখে। হিন্দু জ্যোতিষীদের ধারণা হ'ল, সূর্য, চন্দ্র ও অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র দেবতা-বিশেষ। তাদের দৈবশক্তি আছে। সুমেরুর অন্তরালে সূর্যদেব যখন বিশ্রাম গ্রহণ করেন তখন বাইরের জগতে অন্ধকার নামে এবং রাত্রি হয়। এই সুমেরু পর্বত, তাঁরা বলেন, পৃথিবীর ঠিক মধ্যখানে অবস্থিত, দেখতে কতকটা উল্টানো পাঁউরুটির মত এবং তার চূড়া যে কত লক্ষ ক্রোশ দূরে তার হিসেব নেই! সুতরাং তার অন্তরালে সূর্যদেব যখন লুকিয়ে থাকেন, তখন বাইরের পৃথিবীতে আলো প্রবেশ করে না।

হিন্দুদের ভৌগোলিক ধারণা

জ্যোতিষের মতন ভূগোল সম্বন্ধেও হিন্দুদের নানারকমের বিচিত্র ভ্রান্ত ধারণা আছে। তাঁদের মতে পৃথিবীটা গোলাকার নয়, চ্যাপটা ও ত্রিকোণাকার। পৃথিবীতে সাতটি "লোক" আছে এবং প্রত্যেকটি লোক সাগরবেষ্টিত। সাগরও একরকমের নয়, নানারকমের। কোন সাগর দুধের সাগর, কোনটা চিনির, কোনটা ননীর, কোনটা বা সুরার ইত্যাদি। দুগ্ধসাগর, শর্করাসাগর, সুরাসাগর ইত্যাদি বিভিন্ন সাগরবেষ্টিত লোকে এক-এক শ্রেণীর অতিমানুষ ও মানুষের বসবাস আছে। এইভাবে সাগর ও মৃত্তিকার সাতটি স্তর বা বেষ্টনী নিয়ে পৃথিবী গঠিত এবং তার মধ্যস্থলে সুমেরু পর্বত। প্রথম স্তরে, সুমেরু শিখরের কাছে বড় বড় দেবতাদের বাসস্থান; দ্বিতীয় স্তরে ছোট ছোট অসংখ্য দেবতারা বাস করেন। তাঁরা মানুষের চেয়ে অনেক বড়, কিন্তু বড় বড় দেবতাদের মতন শক্তিশালী নন। এইভাবে পর পর ছয়টি স্তরে অনেক রকম দেবতা, উপদেবতা ও অপদেবতাদের বাস আছে। সপ্তম স্তরে মানুষের বাস। এই সপ্তম স্তরই হ'ল মর্ত্যলোক বা মাটির পৃথিবী। তাছাড়া, হিন্দুদের ধারণা, এই পৃথিবীটা অসংখ্য হাতির পিঠের উপর প্রতিষ্ঠিত। হাতিগুলো যখন দোলে তখনই পৃথিবীটাও দোলে, ভূমিকম্প হয়।

হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণদের প্রাচীন শাস্ত্রবিদ্যার যদি এই অবস্থা হয়, তাহ'লে বুঝতে হবে যে এতদিন আমরা তাদের জ্ঞানবিদ্যা সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করেছি। সত্যই এটা ঠিক কিনা, অর্থাৎ প্রাচীন হিন্দুদের জ্ঞানবিদ্যা সম্বন্ধে এরকম ধারণা করা সঙ্গত কিনা, আমি এখনও বলতে পারব না। সুপ্রাচীন কাল থেকে হিন্দুশাস্ত্রকাররা এই সব শাস্ত্রবিদ্যার চর্চা ক'রে আসছেন এবং তাঁদের শাস্ত্রও সংস্কৃতের মতন প্রাচীন ভাষায় রচিত। এতকালের প্রাচীন ঐতিহ্যকে হঠাৎ অপাংক্তেয় বলে বর্জন করাও কঠিন। খুব মুশকিলে পড়তে হয় এইজন্য। যাই হোক, এখন আমি হিন্দুদের দেবদেবীর পূজা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব।

হিন্দু দেবদেবীর কথা

গঙ্গা নদী ধ'রে যেতে যেতে আমি বারাণসীতে পৌঁছলাম। বারাণসী পৌঁছে সেখানকার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত যিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। বারাণসী প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র বলেও হিন্দুদের কাছে প্রসিদ্ধ। যে পণ্ডিতের কথা আমি বলছি তিনি তখনকার আমলে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ব'লে খ্যাত ছিলেন। ফকির বা সাধকের মতন তিনি থাকতেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের এমন খ্যাতি ছিল যে তিনি সেইজন্য সম্রাট সাজাহানের কাছ থেকে বাৎসরিক দু'হাজার টাকার মতন বৃত্তি পেতেন। বেশ বলিষ্ঠ সুপুরুষ চেহারা তাঁর। সাদা সিল্কের কাপড় আর গায়ে লাল সিল্কের চাদর জড়িয়ে থাকতেন তিনি। দিল্লীতে মধ্যে মধ্যে এই পণ্ডিত মশাইকে আমি এই পোষাক প'রে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। রাজদরবারে বাদশাহের সামনেই হোক, বা ওমরাহদের কাছেই হোক, সবসময় তিনি এই পোষাক প'রে হাজির হতেন। পায়ে হেঁটেও যাতায়াত করতেন, মধ্যে মধ্যে পালকিতেও চড়তেন। প্রায় এক বছর ধ'রে এই পণ্ডিত মশাই আমার মনিব দানেশমন্দ খাঁ-র কাছে যাতায়াত করেছিলেন। যাতায়াতের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁকে ধ'রে সম্রাট ঔরঙ্গজীবের কাছ থেকে বৃত্তি আদায় করা। ঔরঙ্গজীব তাঁর বৃত্তি বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন ব'লে তিনি আগাকে ধ'রে বৃত্তি আদায় করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই সময়, যখন তিনি আমার মনিবের কাছে যাতায়াত করতেন, তখন তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তখন মধ্যে মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমি নানাবিষয়ে আলোচনাও করতাম। অনেক বিষয় নিয়ে তর্কও হ'ত তাঁর সঙ্গে। সুতরাং তাঁর সঙ্গে যখন বারাণসীতে আমার দেখা হ'ল, তখন তিনি আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে আরও ছয় জন কাশীর পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ ক'রে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ও আলোচনার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। (২) পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনার এরকম অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়ে আমিও প্রস্তুত হলাম। ঠিক করলাম, হিন্দুদের দেবতা সম্বন্ধে আলোচনা করব। সভা যখন আরম্ভ হ'ল তখন আমি তাঁদের বললাম: "হিন্দুস্থান থেকে আমি এই মূর্তিপূজা সম্বন্ধে ও বহুদেবতার পূজা সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর ধারণা নিয়ে চ'লে যাচ্ছি। যেদেশে আপনাদের মতন এরকম বিচক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা আছেন, সেদেশে এরকম বহুদেবতা ও মূর্তিপূজার এরকম প্রবল প্রচলন হয় কেমন ক'রে, আমি ভাবতে পারি না। আমাকে আপনারা বুঝিয়ে দিন, এই পূজার অর্থ কি?" এই কথার উত্তরে পণ্ডিতেরা বললেন:

"আমাদের দেবালয়ে বহু দেবদেবীর মূর্তি আছে, যেমন ব্রহ্মা, মহাদেব, গণেশ, ভবানী ইত্যাদি (নামগুলি যথাক্রমে বার্নিয়ের

---

(২) ১৬৬৫ সালে আগ্রা থেকে বাংলাদেশে ভ্রমণের সময় বিখ্যাত পর্যটক তাভার্নিয়েরের সঙ্গী ছিলেন ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের। ঐ বছরের ১১ই থেকে ১৩ই ডিসেম্বর তাভার্নিয়ের বারাণসীতে ছিলেন এবং তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে (Travels, vol II, pp. 234—235) লিখে গেছেন: "প্রকাণ্ড একটি মন্দিরের কাছে একটি বিরাট গৃহ আছে কাশীতে। এই গৃহটিতেই রাজা জয়সিংহের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। এই বিদ্যালয়ে সদ্বংশের সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া হয়। রাজকুমারদেরও আমি এই বিদ্যালয়ে পড়তে দেখেছি। তাঁরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কাছে লেখাপড়া শেখেন এবং পুরোহিতদের ভাষা বা দেবভাষা সংস্কৃতও অধ্যয়ন করেন।"

এই ভাবে লিখেছেন—Brahma, Mehadeu, Genich, Gavani)। এঁরাই প্রধান দেবদেবী। এঁরা ছাড়াও আরও অনেক দেবদেবী আছেন যাঁদের হিন্দুরা পুজা করে নানাকারণে। এই সব দেবদেবীর মূর্তি আমরা পুজা করি ঠিক। সাষ্টাঙ্গে আমরা মূর্তির সামনে প্রণাম করি, ফুল, লতাপাতা, নানারকমের চাল, ঘি, তেল খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির নৈবেদ্য সাজিয়ে পুজা দিই, জাঁকজমক সহকারে অনুষ্ঠান করি। সবই ঠিক। কিন্তু একথাও ঠিক যে যখন দেবতার মূর্তিকে আমরা এইভাবে পুজা করি, তখন সত্যই তাঁরা যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু (Bechen) প্রমুখ দেবতা তা মনে করি না। তাঁদেরই প্রতিমূর্তি যে তা সব সময় মনে রাখি। সাক্ষাৎ দেবতা ভাবি না। কেবল সেই সব মূর্তি কোন বিশেষ দেবতার রূপ ব'লে তার সামনে আমরা পুজা করি। মূর্তিকে করি না, দেবতাকেই করি। তবু কেন মূর্তি গ'ড়ে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করি, এ প্রশ্ন করা বাইরের লোকের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। মন্দিরে আমরা মূর্তি গ'ড়ে এইজন্য প্রতিষ্ঠা করি যাতে সাধারণ লোক সামনে কিছু চোখে দেখে, সেই দেবতার ধ্যান ক'রে, তাঁর আরাধনায় মনোনিবেশ করতে পারে। এ ছাড়া মূর্তিপুজার আর কোন কারণ নেই। সামনে একটা প্রত্যক্ষ মূর্তি থাকলে তার উপর মনপ্রাণ নিবদ্ধ ক'রে প্রার্থনা করা অনেক সহজ হয়। তার জন্যই মূর্তির কল্পনা। আসলে মনে মনে সব সময় আমরা দেবতারই পুজা করি এবং তিনি একই দেবতা ও ঈশ্বর, যে-রূপেই বা যে-মূর্তিতেই তাকে কল্পনা করি না কেন।"

কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিতরা আমাকে যা বলেছিলেন তার হুবহু বিবরণ আমি দিলাম। একটি কথাও এর মধ্যে যোগ করিনি বা বাদ দিইনি। তবে আমার সন্দেহ হয় যে আমাকে তাঁরা এইভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়েছিলেন আমি খৃষ্টান ব'লে। তাঁরা যেভাবে বহুদেবতার পুজা ও মূর্তিপুজার ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে তা একদেবতার পুজা ব'লে মনে হয় এবং খৃষ্টীয় ধর্মের সঙ্গে তার যে পার্থক্য আছে তা বোঝা যায় না। অন্যান্য পণ্ডিতদের কাছে এই একই বিষয়ের যেরকম ব্যাখ্যা শুনেছি, তাতে অন্যরকম ধারণা হয় মনে। অর্থাৎ পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা করার পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে দেখা যায়।

হিন্দুদের কালগণনা

দেবদেবী সম্বন্ধে আলোচনার পরে আমি কালগণনা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করলাম। পণ্ডিতেরা এই ব্যাপারে আমাকে সবচেয়ে বেশী তাক্ লাগিয়ে দিলেন। কালগণনার এমন এক বিচিত্র হিসেব দাখিল করলেন তাঁরা যা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। হিন্দু পণ্ডিতেরা এমন কথা বলেন না যে সৃষ্টি অনাদি। সৃষ্টির আদি আছে একথা তাঁরা স্বীকার করেন। কিন্তু তার এমন একটা হিসেব দেন যা আমাদের কাছে অসীম অনন্তকালের মতো মনে হয়। তাঁরা বলেন, সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে কালগণনা করা হয়, এবং তাকে চারটি যুগে ভাগ ক'রে। যুগ বলতে আমরা যা বুঝি, তাঁরা তা বোঝেন না (বার্নিয়েরের "Dgugues"—যুগ)। যুগের হিসেব শতক বা সহস্রকের হিসেবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মোটামুটি এক কোটি বছর ক'রে তাঁরা প্রত্যেকটি যুগের হিসেব করেন। সঠিক কত বছর তা বলতে পারব না। প্রথম যুগের নাম সত্যযুগ (Sate-Dgugue)। সত্যযুগ প্রায় পঁচিশ লক্ষ বছর ছিল শোনা যায়। দ্বিতীয় যুগের নাম ত্রেতাযুগ (Trita-Dgugue)। ত্রেতাযুগের অস্তিত্ব ছিল বারো লক্ষ বছর। তৃতীয় যুগের নাম দ্বাপর যুগ (Duapar-Dgugue)। দ্বাপর যুগ প্রায় আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বছর ছিল। চতুর্থ যুগের নাম কলিযুগ (Kale-Dgugue) কলিযুগ যে কত লক্ষ বছর ধ'রে চলবে তা বলা যায় না। পণ্ডিতেরা বলেন যে প্রথম তিনটি যুগ—সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—শেষ হয়ে গেছে এবং চতুর্থ যুগ, অর্থাৎ কলিযুগেরও অনেকটা কেটে গেছে। কলি যুগের পরে আর কোন নতুন যুগের অভ্যুদয় হবে না। এই চতুর্থ যুগই বর্তমান পৃথিবীর জীবনের শেষ পর্ব। কলিযুগেই সৃষ্টির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কলিযুগের শেষে পৃথিবী আবার তার প্রাথমিক স্তরে ফিরে যাবে, সৃষ্টির আদিকালের অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। যতবার পণ্ডিতদের (Pendets) জিজ্ঞাসা করেছি যে পৃথিবীর বয়স কত, ততবার তাঁরা নানা ভাবে অঙ্ক ক'ষে, হিসেব ক'রে, আমাকে বোঝাবার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ একজনের সঙ্গে অন্যজনের হিসেব কিছুতেই মেলে না। মেলে না যখন তখন তাঁরা যা বলেছেন তা থেকে এইটুকু শুধু বুঝেছি যে পৃথিবীটা এত প্রাচীন যে তার বয়েসের কোন হিসেব নেই। তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। যখন তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছি যে কোথা থেকে তাঁরা এইসব হিসেব পেলেন, তখন তাঁরা কেবল বেদের নাম ক'রে চুপ ক'রে থেকেছেন। "সব বেদে আছে" —এই তাঁদের বক্তব্য। স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁদের জন্য বেদ রচনা ক'রে তার মধ্যে এইসব সারগর্ভ কথা ব'লে গেছেন।

দেবদেবীর প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁদের কাছে জানবার যথেষ্ট চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। কেউ কেউ বলেন, দেবতা তিনরকমের আছেন—ভাল, মন্দ ও উদাসীন। কেউ বলেন, দেবতাদের উপাদান অগ্নি, কেউ বলেন আলোক। আবার কেউ বলেন, দেবতা হলেন ব্যাপক (বার্নিয়েরের "Biapck—ব্যাপক)। ব্যাপক কথার অর্থ আমি সঠিক উপলব্ধি করতে পারিনি। যা 'ব্যাপক,' তা নাকি স্থান ও কালের ঊর্দ্ধে এবং তার ধ্বংস হয় না। আবার এমন অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁরা বলেন যে দেবতারা হলেন পরমেশ্বরের অংশ মাত্র। কেউ বলেন, দেবতারা হলেন একজাতীয় দৈব জীব যাঁরা পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

সুফীদের ধর্ম ও দর্শন

এইবার সুফীদের সম্বন্ধে কিছু ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করব। হিন্দুস্থানে সম্প্রতি এই সুফীদের মতবাদ ও দর্শন নিয়ে খুব একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে বলেন যে হিন্দু পণ্ডিতেরা নাকি সম্রাট সাজাহানের পুত্র দারা শিকো ও সুলতান সুজার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। প্রাচীনকালের দার্শনিকেরা, আপনি জানেন, সৃষ্টির মধ্যে এক সনাতন প্রাণশক্তির সন্ধান করতেন এবং মনে করতেন যে জীব মাত্রই সেই অনাদি অনন্ত প্রাণশক্তির কণা বিশেষ ছাড়া কিছুই নয়। দার্শনিক প্লেটো ও আরিস্ততেল থেকে সকলেই প্রায় নানাভাবে এই অভিমত প্রকাশ ক'রে গেছেন। হিন্দু পণ্ডিতরাও প্রায় এই একই কথা বলেন এবং একই ধরণের মত পোষণ করেন। এই মতবাদই হ'ল সুফীদের

মতবাদ এবং পারস্যের পণ্ডিত ও দার্শনিকরাও নাকি এই মতবাদ সমর্থন করেন। পারস্যের কাব্যে—গুলশান রাজে (৩)—এই মতবাদই চমৎকার ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে।

* * * *

হিন্দুস্থানের হিন্দুদের এই সব বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠান, ধ্যান-ধারণা, ধর্মকর্ম, দেবদেবী, দর্শন-বিজ্ঞান ইত্যাদি দেখে-শুনে এবং এত কষ্ট স্বীকার ক'রে বুঝবার চেষ্টা ক'রে আমার মনে হয়েছে যে পৃথিবীতে এমন কোন আজগুবি বা অবিশ্বাস্য মতামত নেই যা মানুষের কাছে বিশ্বাসের যোগ্য নয়।* [ক্রমশঃ।

(৩) "গুলশান রাজ" কাব্য (Mystic Rose Garden) ১৩১৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়, সুফীদের সম্বন্ধে পনেরটি প্রশ্নের উত্তর হিসেবে।

* এর পর বার্নিয়ের ঔরঙ্গজীবের কাশ্মীর অভিযানের কথা বলেছেন। তার অনুবাদ করার কোন প্রয়োজন এখন আছে ব'লে আমার মনে হয় না। তারপর কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে তিনি বাংলা দেশের সৌন্দর্য্য ও সম্পদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। পরবর্তী সংখ্যায় সেই অংশের (বাংলাদেশ সম্বন্ধে) অনুবাদ প্রকাশ ক'রে বার্নিয়েরের অনুবাদপর্ব শেষ করব।

—অনুবাদক

এখানে নির্জন দ্বীপে

শান্তিকুমার ঘোষ

এখানে নির্জন দ্বীপে পেয়েছি দুজন শুধু জীবনের স্বাদ—
আমার ভাগ্যের সাথে কে নারী জড়ায়ে আছে ছায়ার মতন।
সমুদ্রে জাহাজডুবি, বিশাল জ্বলন্ত ঢেউ, শেষ আর্তনাদ
ভোরের স্বপ্নের মত এখনো আমার মনে আনে শিহরণ।
আকাশ সমুদ্রে হারা, ছিল না দিশারী তারা, নৌকায় ভেসে।
অনেক কুয়াশা চিরে অনেক সাগরে ফিরে শুধুই সংশয়,
একটি সুদীর্ঘ দিন একটি সুদীর্ঘ রাত গেলে অবশেষে—
হঠাৎ ঠেকেছে চোখে সুপারী-পামের সারি তীরের বলয়।

এখনো ঠোঁটে যে তার ঢেউয়ের ছিটার ঘায় লেগে আছে নুণ,
সাপের খোলসবং দুলিছে চুলের জট অজানা হাওয়ায়,
সে যেন উর্মিলা মেয়ে গভীর অতলে চেয়ে রয়েছে করুণ—
যেখানে জলের নীচে নীল দিন শিহরিছে ঘুমের দোলায়।
ওপাল পাথরে গড়া নিখুঁত মুখ-শ্রী তার—নয় পৃথিবীর,
তুসার-চিকণ গালে তারকার মত তিল অপরূপ জ্বলে,
নিটোল বাঁধনে তার নিটোল বুকের ভার-কোমল সে নীড়,
হাজার নাবিক তারে এখনো কামনা করে সমুদ্রের তলে।

দ্বীপময় এ জগতে আদম-ইভের চোখে দেখেছি সুন্দর
সূর্যমুখী দিন গেলে চন্দ্রমল্লী রাত আসে—উৎসবেতে সারা।
প্রান্তরে প্রবাল রোদ, শিখরের শেষ ছায়া, দূর বালুচর,
ভিতরের উপত্যকা উজ্জ্বল রেখেছে একা কোহিনুর তারা।
বনের তোরণ দিয়ে ফিরেছ আমায় নিয়ে সাহসে যখন
অজানা পাখির স্বরে দিয়েছে চকিত করে মৃদু ইসারায়,
পাতার মুকুট গড়ে মাথায় নিয়েছ পরে রাণীর মতন,—
আমিও তোমার দেখে পাখির পালখ গেঁথে পরেছি চূড়ায়।

দেখেছি সোনালি ঢেউ উত্তরোল সমুদ্রের নীল-গলা জলে—
ফেনার আল্পনা এঁকে মায়ার কাহিনী লেখে খেয়ালী জোয়ার,
হাজার সামুদ্র-পাখি ডানায় ডানায় ভেসে কোন্ দিকে চলে—
দেখেছি জলে সে ছায়া অনেক রূপালি ছায়া গেছে সারে সার।
বেলুনের মত চাঁদ প্রহর উঁচুতে থেমে আরো উঠে আসে,
তুলোর মতন মেঘ ছুটেছে জড়াতে তারে সে আকাশময় ;
রাত্রির প্রাকৃত রূপ খোলে দূর-দূরান্তরে বিরাট আভাসে—
তারার উপরে তারা আরেক জগতে হারা আমার হৃদয়।

প্যান্থার-পাইথনে ভরা নিবিড় সেগুন বন : অনেক ভিতরে
সবুজ আঁধারে ঘোরে ভেলভেট বাঘগুলি : চারিদিকে হাড়
হেথাহোথা পড়ে আছে কোন্ সব নাবিকের : পাললিক স্তরে
এখনো ঘুমায় তারা : আধো রাতে অন্ধকারে জাগিবে আবার
জমাতে মায়ার পাশা : এখন গভীর শান্তি অরণ্য-অতলে।
পাতার কুটির থেকে তুমিও উঠিছ কেঁপে ঘুমের ভিতর,
বাইরে আকাশতলে চাঁদিনী কুয়াশা ঝরে পল-অনুপলে—
শাণিত হিমেল হাওয়া, নিথর বনানী শুধু ভয়াল সুন্দর।

যোজন যোজন দূরে পৃথিবী রয়েছে পড়ে সমুদ্রের পার—
কী এক আঁধারে-হারা কী এক বিষাদে-ভরা সে জীবন চলে,
নগরের কোলাহলে সেখানে বধির করে শুধু বার বার,—
বাঁকানো ছুরির গায়ে নীলাভ আলোর মত চোখগুলি জ্বলে!
পশম সবুজ ঘাসে বসেছি তোমার পাশে কী আবেশ ভরে—
মশলা সুরভি হাওয়া তোমার আমার গায়ে লাগে অনুক্ষণ,
পলকবিহীন চোখে চেয়ে আছি ওই মুখে অবাক প্রহরে—
এখানে নির্জন দ্বীপে হয়তো কখন চুপে পেয়ে গেছি মন।

বাণীর বরপুত্র বাণীকুমারের 'ক্রন্দসী' নাটিকা

কলকাতা বেতার-কেন্দ্র থেকে নাটক পরিবেশনের ঐতিহ্য অনেক দিনের। বহু প্রথম শ্রেণীর নাটক যেমন রেডিওতে অভিনীত হয়েছে, তেমনি বহু অভিনেতা ও অভিনেত্রীও অভিনয় করেছেন। আবার নিয়মিত নাটক পরিবেশনের জন্য বেতার-কেন্দ্রে আছেন বেতনভোগী নাট্যকার, অভিনেতা, অভিনেত্রী। এই ব্যবস্থা খুবই ভাল, সে বিষয়ে কোন মতান্তর থাকতে পারে না। একই অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দ্বারা দিনের পর দিন নাটক অভিনয় করানো বেতার-কেন্দ্রের পক্ষে এমন কিছু অসাধ্য সাধন নয়। কিন্তু একই নাট্যকার যদি মাসের পর মাস নানা পটভূমিকায় নাটক রচনা করে যেতে পারেন, তবে সেই নাট্যকার নিশ্চয়ই বাণীর বরপুত্র। কলকাতা বেতার-কেন্দ্রের বাণীর বরপুত্র বাণীকুমার সম্প্রতি স্বরচিত 'ক্রন্দসী' নামে একটি নাটিকা শুনিয়েছেন—যেটি একেবারে না বলিয়া লওয়া হয়েছে ঐতিহাসিক লেখক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি রচনা থেকে। কোন রচনার পাত্র-পাত্রীর নামগুলি বেমালুম বদলালেই যেমন নতুন রচনা করা হয় না, তেমনি রাম-শ্যাম যদু-মধুর নাম বাণীকুমার দিলেও তাদের চিনতে দেরী হয় না। কথামালার কাকও ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করেছিল। কিন্তু ?

ক্যাবলামি আর ছ্যাবলামির ছবি

পাশের বাড়ী, শ্বশুরবাড়ী থেকে লেডীজ সিট, বারবেলা অবধি হাসির ছবি তোলবার অনেক অনেক চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এর একটি ছবিও যে সার্থক হল না কেন, সে সম্পর্কে কোনও চিত্রনির্মাতার আজও অবধি দেখতে পাইনি কোন মাথাব্যথা। এক হপ্তা কি বড় জোর দু' হপ্তা মেয়াদী 'পাত্রী চাই' জাতীয় হাসির ছবি কেন দর্শক নিল না সে কথা ভেবে দেখেছেন কেউ? আসল কথা, হাসির ছবিতে হাসির গল্প নেই, হাসির চরিত্র নেই, হাসির দৃশ্য নেই, নেই এমন কোন 'সিচুয়েশন' যাতে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবে। বাংলা দেশে হাসির ছবির অর্থ হল, ক্যাবলামি আর ছ্যাবলামি। ন্যাকা-ন্যাকা কথা, অদ্ভুত অদ্ভুত সব পরিবেশ, পেট মোটা, রোগা প্যাঁকাটির মাথায় গোল আলু বসানো সব চেহারা, অবান্তর কথাবার্ত্তা (প্রায়ই বা রসোত্তীর্ণ নয়) এই দিয়ে শুরু হয় আমাদের ছবি এবং শেষও হয় হপ্তা না কাবার হতে হতেই চিত্র-প্রযোজককে কাবার করে দিয়ে, প্রায়ই পথে বসিয়ে। হাসির ছবি মানেই নয় এলোমেলো ঘটনা, অদ্ভুত চরিত্র—এই বোধ চিত্র-পরিচালকদের হোক। সাধারণ কোন ছবি তোলার চেয়ে হাসির ছবি তোলা যে অধিক ব্যয়বহুল, পরিশ্রম-সাপেক্ষ এবং তা' তুলতে যে মগজে কিছু থাকা প্রয়োজন একথা এঁরা বুঝবেন কবে? ইদানীং আর একটা হিড়িক উঠেছে সিনেমায় পুরুষকে নারীর রূপে দেখানো। বৌঠাকুরাণীর হাটের ভাঁড়কে এখন সকলেই দেখাচ্ছে।

ছবি দেখতে দেখতে মন্তব্য

এখনো খুব বেশী দিন গত হয়নি, কারও কারও মনে থাকলেও থাকতে পারে, বাংলা দেশের সিনেমা-গৃহে ছবি দেখতে দেখতে দর্শকগণের নানা রসাত্মক মন্তব্যের কথা। ওপরের ব্যালকনী ছিল সেদিন মেয়েদের জন্য রিজার্ভড। মা ষষ্ঠীর 'লেডটেষ্ট' উপহারটিকে সঙ্গে করে নিয়ে সিনেমায় আগতাদের সংখ্যা সেদিনের কথা বাদ দিলাম, আজও খুব বিরল নয়। ক্রন্দনরত শিশুটিকে উপরের ব্যালকনীতে ঠাণ্ডা করার জন্য বিব্রতা মাতাকে নিচের দর্শক-সাধারণের ভেতর থেকে একটি বিশেষ বস্তু মুখে গুঁজে দেবার জন্য আসত মন্তব্য, টীকা টিপ্পনী সমেত, সেকথা আজও অনেকে ভোলেন নি, মনে হয়। 'দুর-শা',—'ধরে জুতিয়ে দিলে', 'রাম রাম পয়সাটাই জলে গেল,' 'আহা মাইরী আর কি!' ইত্যাদি মন্তব্য বাংলা ছবিতে কিছু দর্শকের কাছ থেকে আজও যে শোনা যায় না, এমনটি নয়। অল্পশিক্ষিতা বা প্রায়ই অশিক্ষিতা স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে ঘ্যান-ঘ্যান করে কাহিনীর আদ্যোপান্ত বোঝাবার চেষ্টা করছেন কোনও বিব্রত স্বামী, এ দৃশ্যও আছে। তবে এদের সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। ছবির উৎকর্ষ দিনকে দিন যত কমে যাচ্ছে প্রেক্ষাগৃহও মন্তব্য-মুখর হয়ে উঠছে। ভদ্রভাষায় নানা মন্তব্য তো আছেই, যা প্রায়ই ব্যঙ্গরসাত্মক, অভদ্র ভাষাতেও আছে। এদের সব সময় দোষ দিতে পারি না, গাঁটের পয়সা খরচা করে সবাই ছবি দেখতে গেছে, খারাপ লাগলে বলবেই তারা। চিত্রজগতের লোকদেরও তা' সইতেই হবে।

টকির টুকিটাকি

তন্ত্র-মন্ত্রে যাদের বিশ্বাস আছে "মন্ত্রশক্তি" তাদের খুব ভাল লাগা উচিত। মন্ত্র যদি যাদুমন্ত্রের মত কাজ করে তবেই না "মন্ত্রশক্তি," আর টাকার জোরে ঐ মন্ত্র বজায় রাখলেই হবে শক্তির মন্ত্র। দেখা যাক, চিত্ত বসুর পরিচালনায় কোন্ শক্তি বজায় থাকে। শক্তি পরীক্ষায় কিন্তু নামকরা শিল্পীরাই আছেন, যেমন, জহর, মলিনা, অনুভা, সন্ধ্যারাণী, অসিতবরণ প্রভৃতি। "ভুল" "ভুল" "ভুল"—জনসাধারণেরই "ভুল"। ভেবেছেন বোধ হয় অমর পিকচার্স "ভুল" আর বের কোরবেন না। কিন্তু "ভুল" তাঁদের বেরুবেই এবার। ছবি, মলিনা, কমল মিত্র, সাবিত্রী,

বিকাশ, রবীন, পদ্মা, এঁরাই কিন্তু এই ভুলের জন্য দায়ী হবেন। বালীগঞ্জ লেক (হ্রদ) পার হ'য়েই কিছু দূরে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে শোনা যাচ্ছে, অর্দ্ধেন্দু সেনের পরিচালনায় নূতন "হ্রদ" তৈরী হচ্ছে। সন্ধ্যারাণী, অসিতবরণ, উত্তমকুমার, অজিত, জহর, এঁরাই এই "হ্রদ" তৈরীর ব্যাপারে পুরোপুরি কাজ করছেন। ফুলবাগিচা ছেড়ে "বকুল" এবার সহরের রূপালী পর্দ্দায় ফুটবে ব'লে প্রকাশ। নিউ থিয়েটার্স এই ফুল ফোটানোর অজুহাতে উত্তমকুমার, অরুন্ধতী, বসন্ত চৌধুরী প্রভৃতি নামকরা শিল্পীদের সাহায্য নিয়েছেন। সূর্য্যচন্দ্রের "বলয়গ্রাস" কালেভদ্রে হ'য়ে থাকে। এবার কিন্তু পাহাড়ী, শোভা সেন, জীবেন বোস, সুপ্রভা, সুচিত্রা সেন প্রভৃতি তারকামণ্ডলের "বলয়গ্রাস" দেখা যাবে। প্রয়াগতীর্থের মত চিত্রগৃহগুলিই এবার মহাতীর্থ হবে। দর্শকেরা ভিড় কোরে এসে দাঁড়াবে নিষ্প্রদীপ সেই মহা তীর্থক্ষেত্র প্রেক্ষাগৃহগুলিতে। "থেকেও যাদের নাম নেই" এমন সব অভিনেতারা যে এই ছবিখানিতে নেমেছেন এমন কথা কিন্তু বলা উচিত নয়। বিকাশ, সন্ধ্যা, সমীরকুমার, জয়শ্রী প্রভৃতি শিল্পীরা তো নূতন নন, এঁরাই ছবিখানিতে অভিনয় কোরেছেন। সম্ভবত: সাধারণের চোখে ধূলো দেওয়ার মতলব কোরেছেন এ, আর প্রোডাকসন্স। প্রিয়জনের আকুল আহ্বানে নশ্বর আর অবিনশ্বর আত্মার "মহামিলন" ঘটে। এই রকম "মহামিলন" চিত্র হয়ত এই চিত্রখানির বিষয়বস্তু না-ও হতে পারে। কিন্তু স্ক্রীন শো ইণ্ডিয়ার ঐকান্তিক আহ্বানে "মহামিলন" ক্ষেত্রে স্বগত: শিল্পী মনোরঞ্জনকে এক রাজ্য ছেড়ে আর এক রাজ্যের রূপালী পর্দ্দায় ধরা দিতে হবে। নমিতা, ছায়া, বিপিন প্রভৃতি শিল্পীরা কিন্তু ঐ ভাবে ধরা-ছোঁওয়া দেবার বাইরে আছেন। সুকুমার দাশগুপ্ত তাঁর পূর্ব্বেকার চিত্র পরিচালনার যত সব ত্রুটির ঋণ সম্ভবত: এবার অরোরার পরিবেশনায় "পরিশোধ" কোরবেন। "পরিশোধ"এর ব্যাপারে সাক্ষী থাকবেন কাহিনীকার প্রেমেন্দ্র মিত্র, আর অনুভা, পাহাড়ী, ধীরাজ, জহর, ছবি, মঞ্জু প্রভৃতি শিল্পীরা! এক শতাব্দী পূর্ব্বের "যদু ভট্ট" নামে এক সঙ্গীতজ্ঞের নাটকীয় জীবনের চিত্র তুলছেন সানরাইজ ফিল্ম। ছবিখানিতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত থাকবে ব'লে আশা করা যাচ্ছে। সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন জ্ঞান ঘোষ। ভূমিকায় নেমেছেন বসন্ত চৌধুরী, অনুভা, ছবি, প্রশান্তকুমার, রাণী ব্যানার্জ্জী প্রভৃতি। এইচ, বি, প্রোডাকসন্সের "অমর-তৃষা"র চিন্তা সম্ভবত: এইবার মিটবে। জনসাধারণ চাতকের মত তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে চেয়ে আছে "অমর-তৃষা"র দিকে। রবীন মজুমদার, সাবিত্রী, অবনী মজুমদার, সন্তোষ সিংহ প্রভৃতি শিল্পীরা "অমর তৃষা"য় অমর সুধাপানে অমর হয়ে থাকবেন।

মণি আর মাণিক—একটি স্বল্পবিখ্যাত মিষ্টান্ন-প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনী ছবি

মণি আর মাণিক দু'ভাই। বাপ জেলে, মা কোনও রকমে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জোগাড় করছিলেন যত দিন ছিলেন জীবিত। মায়ের মৃত্যুর পর ছোট ভাইটির হাত ধরে পথে এসে দাঁড়াল মাণিক। জীবন-সংগ্রাম শুরু হল। চাকরের কাজ নিয়েও ছোট ভাইটিকে মানুষ করার সাধনা তার। এ দিকে তার বাপ এক সাকরেদ জোগাড় করে জাল স্বামীজী সেজে সেই বাড়ীতেই এসে হাজির হল যেখানে তারই ছেলে চাকরের কাজ করছে। ইতিমধ্যে ছোটভাইটি মোটর-চাপা পড়ল। মরল না' তবে বোবা হয়ে গেল। অবশ্য কথাও বলল পরে, একেবারে পিতাপুত্রদের মিলন ঘটল যখন তখন। এই কাহিনী। কাহিনী সম্পর্কে এই বলা চলতে পারে যে অভিনবত্ব নেই কোথাও। জহর গাঙ্গুলী মশায় এবার চিত্র-জগত থেকে বিদায় নিন সসম্মানে। দশ বছর আগে যে 'পোজে' কথা বলা তিনি অভ্যাস করেছিলেন আজও তাঁর সে অভ্যাস যায়নি। প্রণতি ঘোষ এই ছবিখানিতে নিজের অক্ষমতারই পরিচয় দিলেন। বড় ভাইয়ের ভূমিকায় মাষ্টার সুখেনের অভিনয় অতিশয়োক্তি হয়েছে। আর একজন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। কি কারণে ইনি এ চিত্রে অংশ গ্রহণ করলেন সেটাই অস্পষ্ট। সাকরেদী করার জন্য একজন ভাঁড় আমদানী করতে হবে এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম আছে কি? আর 'সেন মহাশয়ের দোকানের সাইনবোর্ডটি অতক্ষণ ধরে দেখাবার কোনও প্রয়োজন ছিল কি? 'ভাল সন্দেশ, সেন মহাশয়ের রাতাবী খেয়ে নাও,' সন্দেশ খাওয়াবার জন্য দোকানের নাম করার কি প্রয়োজন? ব্যাপারটি দৃষ্টিকটু। অন্যান্য কোনও ভূমিকাতেই উল্লেখযোগ্য হয়নি কারও অভিনয়। ফটোগ্রাফী ভাল নয়। শব্দগ্রহণ মামুলী।

অমর প্রেম—প্রাচীন উজ্জয়িনী থেকে আধুনিক কলকাতা অবধি এ প্রেমের বিস্তার

আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন, প্রেম অমর। অর্থাৎ এ জন্মে যদি কেউ কাউকে ভালবাসে আর তার ভালবাসা যদি সাঁচ্চা হয় তো হাজার হাজার বছর ধরে বারে বারে তারাই জন্মাবে পৃথিবীর বুকে আর ভালবাসবে পরস্পরকে। নাগভট্ট 'অমর প্রেম' লিখতে লিখতে নেতিয়ে পড়লেন। পুঁথি রইল অসমাপ্ত। বসন্ত উৎসবে গিয়ে যে শ্রেষ্ঠীকন্যাকে ভালবাসলো অভি তা'র কি হবে? আর কি হবে বাড়ীতে ভালবাসা আর একটি প্রিয়ার? কি আর হবে, নাগভট্ট তো মারা গেলেন। কিন্তু নাগভট্ট মারা গেলে কি হবে, প্রফেসার রায় আছেন না কলকাতায়! অতএব ছবিকে টেনে আন প্রাচীন উজ্জয়িনী থেকে একেবারে হাওড়ার পুলে। দিব্য করে বলতে পারি, সামনের আসনে একজন ভদ্রলোক ছবির গল্পকে উজ্জয়িনী থেকে হাওড়ার পুলে আনা হতেই বলে উঠলেন, 'যাঃ শা—।' প্রফেসর রায় আছেন, আছে তাঁরও মেয়ে। জমিদার-পুত্রও আছেন কলকাতায়, ছবিও আঁকেন তিনি। দেখা হল কিন্তু ট্রেনের কামরায়। উজ্জয়িনী থেকে কলকতা অনেক দূর কি না! স্যুটকেশ বদলা-বদলি (এর আগে অন্তত ডজন খানেক ছবিতে দেখা) হল। তার পর ছবি আঁকার গৃহশিক্ষক এবং সুবোধ বাঙ্গালী-কন্যার মত গৃহ হতে পলায়ন গৃহশিক্ষকের সঙ্গে। ধীরাজ বাবু আর তাঁর কাল পোষাক, মদের বোতল, ফিরিঙ্গী মেয়ে,—সিগারেট, সব ঠিক আছে। প্রণতি ঘোষ, মূকবধির মেয়েটি, গগল্‌স চোখে পার্কে, মন্দ লাগল না। সন্ধ্যারাণীর অভিনয়ই যা' একটু ভাল। মহেন্দ্র গুপ্ত কোথায় অভিনয় করছেন, ক্যামেরার সামনে না ষ্টেজে তা' প্রায়ই ভুলে

যাচ্ছিলেন। সেট বাজে! বসন্ত উৎসবের পরিকল্পনাটি মন্দ নয়! ফটোগ্রাফী চলনসই। কাহিনী অদ্ভুত, সামঞ্জস্যহীন।

অন্নপূর্ণার মন্দির—কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের দেখবার এবং দেখাবার মত ছবি

ওই একটি আইডিয়া 'পণপ্রথা' নিয়েই বাংলা দেশে প্রায় সাত-আটখানি ছবি দেখলাম। যেন বাংলার পল্লীগ্রামকে কেন্দ্র করে কোন ছবি তুলতে গেলেই অভাবগ্রস্ত কোন পিতা, একটি ষোড়শী অনূঢ়া কন্যা টাকার অভাবে পাত্রস্থ হতে পারছে না, বয়াটে জমিদারের বদ নজর মেয়েটির ওপর, এ-সব আনতেই হবে। কেন রে বাপু? বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে কি আর কিছু এমন নেই যা থেকে একখানি ছবির মালমশলা পাওয়া যেতে পারে? 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে'র পরিচালককে ধন্যবাদ, তিনি অন্ততঃ ছবির নায়ককে একবারও কলকাতা দেখাননি। শুধুমাত্র একখানি গ্রামকে কেন্দ্র করেই ছবিখানি তোলা হয়েছে। ছবি শেষ হবার দশ মিনিট আগে অবধি সত্যি বলছি ছবিখানি মন্দ লাগছিল না কিন্তু 'সতীর' মৃত্যুর পর পটাপট করে সেই সব এক ধার থেকে চৈতন্যলাভ করতে শুরু করল, অমনি গল্পটির অপমৃত্যু ঘটল। সানাই না বাজালে কি ছবি দর্শকগণ নেবেন না এই ধারণা পরিচালকের? সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের ওই একটি মাত্র কথা, 'ও, গোলমাল যা হয় একটা ঘটতোই' সমস্ত গল্পটির রসভঙ্গ করেছে। 'সতী'র মৃত্যুর দৃশ্যটি অস্পষ্ট এবং গোলমেলে। গেটের কাছে পড়ে-থাকা সতীর মৃতদেহ কেন দেখান হল না? পল্লীগ্রামে এর ওর বাড়ীর মধ্য দিয়ে রাস্তা প্রায়ই থাকে। সেখানকার লোকেরা খুব সকালেই মাঠে যায়। কোনও কৃষককে দিয়ে 'সতী'র মৃতদেহ প্রথম দেখালেই সব দিক দিয়ে ভাল হত। অনেক দিন পর মলিনা দেবীকে ভাল অভিনয় করতে দেখলাম। উত্তমকুমার নামক ভদ্রলোকটিকে কি কারণে চিত্রে নেওয়া হয় বুঝতে পারলাম না। ইনি অভিনয়ের তো কিছুই জানেন না! সুচিত্রা সেনের প্রথম দিককার অভিনয় খুব সংযত হয়েছে। পরে অবশ্য জায়গায় জায়গায় অতিশয়োক্তি হচ্ছিল। রমেশ কাকা, ভট্টাচার্য্য মশাই, লাহিড়ী প্রভৃতি প্রত্যেকেই পুরনো অভিনেতা অথচ এঁদের অভিনয় অত্যন্ত অক্ষম। আউটডোর সুটিং বেশী থাকলে ছবিটা জমতো ভাল। সেটের পরিকল্পনা মন্দ হয়নি। তবে খড়ের ঘরের ইটগুলি যে আঁকা, তা সহজেই চোখে পড়ছিল। ভট্টাচার্য্যের মৃত্যুর দৃশ্যটির পরিকল্পনা ভাল হয়েছে। তবে ওপর থেকে ঝারি দিয়ে জল ফেলা হচ্ছিল বলে সমস্ত স্ক্রীণটা জুড়ে জল পড়ার দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল না। ফটোগ্রাফী মন্দ নয়। শব্দগ্রহণ মোটামুটি।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রীছবি বিশ্বাস

নিষ্ঠার সঙ্গে একটা জিনিষকে আঁকড়িয়ে ধরে রাখলে বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্য যে অনিবার্য্য, তার অন্যতম জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বাঙ্গালার জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রীছবি বিশ্বাস। সেই কোন কালে অভিনয়-জগতে তিনি এসেছেন, আজও পর্য্যন্ত সাধকের মত তিনি ধরে রেখেছেন একেই। তিনি শুধু পর্দ্দাতেই নয়, মঞ্চেও কুশলী অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছেন। এমন একজন সুদক্ষ শিল্পীর বক্তব্য ও মতামত জানবার জন্যে ব্যাকুলতা হওয়া স্বাভাবিক। তাই এবার যখন লিখতে হ'বে তখন তাঁর কাছে যাওয়াই স্থির ক'রলুম। স্থির করা নয় শুধু, যাত্রায়ও বিলম্ব ঘটলো না। পূর্ব্বাহ্ণে যোগাযোগ স্থাপন করে এর ভেতরেই একদিন বেরিয়ে পড়লুম কলকাতার উপকণ্ঠস্থিত নেতাজী সুভাস রোডে (বাঁশদ্রোণী, টালিগঞ্জ) তাঁর বাসভবনের উদ্দেশে।

শিল্পীর বাড়ী—ঢুকতেই চোখে পড়লো চার দিকে সাজান ফুলের বাগান। বাড়ীখানি তেমন বড় না হলেও শিল্পীর রুচিসম্মত বলতেই হ'বে। বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি ছবি বাবু—অত্যন্ত সাদাসিধে পোষাকে দাঁড়িয়ে। আমাকে নিয়ে বসালেন সরাসরি তাঁর বসবার ঘরে। তিনিও একটি আসন নিয়ে বসলেন—সুরু হলো আমাদের আলাপ-আলোচনা। চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত দাবী ক'রে আমি একটির পর একটি প্রশ্ন তুলে ধ'রলুম, তিনি নিঃসঙ্কোচে দিয়ে চললেন উত্তর।

শ্রী বিশ্বাসের প্রথম কথা—১৯৩৫ সালে "অন্নপূর্ণার মন্দির"-এ চিত্রাভিনেতা হিসেবে আমি প্রথম আত্মপ্রকাশ করি। এর পর বহু ছবিতে বিচিত্র ভূমিকায় অভিনয় করবার আমার সুযোগ হয়েছে। তবে কোন্ ছবিতে কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করে আমি সব চাইতে তৃপ্তি পেয়েছি বলা খুব শক্ত। এইমাত্র বলতে পারি, নায়কের ভূমিকায় যতকাল অভিনয় করেছি মন ভরতো না, তাই বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করবার ব্যাকুলতা জাগে। শ্রীদেবকী বসু পরিচালিত "নর্ত্তকী" ছবিতে ৯০ বৎসরের বৃদ্ধ স্বামীজীর ভূমিকায় যেদিন অভিনয় করলুম আমার মন আবেগে অভিভূত হয়েছিল। "শুভদা" চিত্রে হারানের ভূমিকায় অভিনয় করেও আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছে।

ছবি বাবু বলে চললেন—চলচ্চিত্র-জগতে আমি যে এলুম তার মূলে কতকগুলো প্রেরণা কাজ ক'রেছে। আমি যখন ছোট তখনই আমাদের বাড়ীতে ছেলেদের আবৃত্তি ও অভিনয়ের আসর বসতো। সেই থেকে অভিনয়ের দিকে আমার প্রথম ঝোঁক যায়। তার পর বহু বার সৌখীন নাট্যসমাজে অভিনয় করি। সিকদারবাগানে বান্ধব সমাজ নামে সৌখীন যাত্রা অভিনয়ের একটি সংস্থা ছিল। আমি এঁদের পরিচালিত "নিমাই সন্ন্যাস" পালায় অভিনয় করতুম। এ ভাবে এক সময়ে চিত্র-জগতে এসে হাজির হ'লুম। প্রথম অভিনয় পূর্ব্বেই বলেছি—'অন্নপূর্ণার মন্দির' ছবিতে বিশুর ভূমিকায়। এ চিত্র নির্ম্মিত হয় প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী প্রতিষ্ঠিত কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিয়োতে। প্রিয়নাথ বাবুই আমায় এ চিত্রে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন এবং তাঁর উৎসাহে ও প্রেরণায়ই বলতে গেলে আমার এ লাইনে আসা।

সাধারণতঃ আপনার দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী কি এবং আপনার বিশেষ ধরণের কোন "হবি" আছে কি না—জিজ্ঞেস কর'লুম আমি: ছবি বাবু বেশ সহজ মানুষের মত উত্তর দিলেন—সাধারণতঃ আমি খুব ভোর বেলায়ই ঘুম থেকে উঠি। বাগান করা ও চাষবাস করার সখ বরাবরই আমার আছে। সকাল বেলায় ষ্টুডিওর কাজে

৩রা সেপ্টেম্বর হইতে
সমস্ত প্রধান কেন্দ্রে
"বহুৎ দিন হুয়ে"...
সর্বকালের উপযোগী
সুদূর অতীত কালের কাহিনী...
জেমিনীর ছবি

বেরোবার আগে প্রত্যহ দু' ঘণ্টা থেকে আড়াই ঘণ্টা এ কাজগুলোতে আমি ব্যস্ত থাকি। দিনে ঘুমানো আমার সাধারণ কর্মসূচীর অঙ্গ নয়। সব সময়েই কোন না কোন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে আমি চেষ্টা করি। খেলাধূলো সম্পর্কে এই মাত্র বলবো অভিনয়-জগতে যোগদানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলায় বিশেষ আকর্ষণ ছিল। যদিও নামকরা খেলোয়াড় ছিলুম না তবু সব খেলাতেই সক্রিয় ভাবে যোগ দিতুম। পর্দ্দা ও মঞ্চে যোগদানের পর সময় অভাবেই সে ঝোঁক ও আগ্রহ স্তিমিত হ'য়ে এসেছে। একটা "হবি"র কথা বলা হ'লো না। সূচীশিল্পে এক সময়ে আমার বিশেষ "ন্যাক" ছিল। নিজ হাতে আমি বহু জিনিষ তৈরী করেছি, মনে আছে। গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় আমি সর্ব্বস্বান্ত হই এবং সেই সঙ্গে আমার সূচীশিল্পের নিদর্শনগুলোও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এখন অবশ্য মাঝে মাঝে সূচীশিল্পের কাজ করতে ইচ্ছে হয়, করেও হয়তো থাকি একটু-আধটু। কিন্তু হাতে সময় এমনই অপ্রচুর, সাধ মেটান হয় না।

শ্রী বিশ্বাস বলে চল্লেন—দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক বহু পত্র-পত্রিকা আমি নিয়মিত পড়ে থাকি। "মাসিক বসুমতী" কাগজখানির গ্রাহিকা আমার স্ত্রী। আমি এটি পড়তে খুব পছন্দ করি এবং এখনও সময় পেলে পড়তে আনন্দ পাই। সিনেমা-সংক্রান্ত যে ক'টি কাগজ আছে, সেগুলোও মোটামুটি আমি পড়ে থাকি। অপর দিকে পুথি-পুস্তকের বেলায় দেশ-বিদেশের বড় বড় লোকের জীবনী, পৌরাণিক কাহিনী এসব আমার পড়তে ভাল লাগে। আর ভাল লাগে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের গ্রন্থরাজি। সাধারণতঃ উপন্যাস আমি পড়তে চাই নে। তবে জনপ্রিয় উপন্যাস সম্পর্কে খবর পেলেই আমি সেটা পড়বার জন্যে উৎসাহী হই। পোষাক-পরিচ্ছদের বেলায় সাদাসিধে কাপড়-জামাই আমার পছন্দসই। সামান্য ছেঁড়া-কাটা থাকুক, তাতে আপত্তি নেই তবে প্রতিটি পোষাকই পরিষ্কার হওয়া চাই। রকমারি জুতো ব্যবহার করার আমার সখ আছে। পূর্ব্বে বিলিতি পোষাক পরতুম, তবে তখনও ধুতি-পাঞ্জাবী আমার প্রিয় ছিল। এখন এ আরও প্রিয়তর হ'য়েছে, এটুকু না বলে পারবো না।

আমার পরবর্ত্তী প্রশ্ন—চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হ'লে কি কি বিশেষ গুণ অপরিহার্য্য বলে আপনি মনে করেন? ধীরে ধীরে ছবি বাবু উত্তর করলেন, প্রথম অপরিহার্য্য জিনিষ হচ্ছে সুচেহারা, স্বাস্থ্য এবং কণ্ঠ। সেই সঙ্গে আর যেটি অত্যাবশ্যক সে হচ্ছে অভিনয়কুশলতা। এবং সব কিছুর উপরে আমি বলবো প্রয়োজন নিষ্ঠা ও একাগ্রতার, ভাল ছবি তৈরী করতে হ'লে কী প্রয়োজন যদি জিজ্ঞেস করেন, তবে বলবো ছবি নির্ম্মাণের বিভিন্ন বিভাগে একটা সমন্বয় থাকা একান্ত আবশ্যক। পরিচালক যিনি হ'বেন, অভিনয়, সঙ্গীত-রেকর্ডিং, সম্পাদনা, ক্যামেরার জ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ে তার নিখুঁত জ্ঞান থাকতে হ'বে। বাংলা ছবির ক্ষেত্রে আজও যদি কোন দৈন্য থাকে তবে সেটা হচ্ছে এ জ্ঞানের অভাব। পরিচালকের আর যে দুটি-একটি গুণ না হ'লে নয় সে হ'লো গল্পের চরিত্রানুযায়ী শিল্পী নির্ব্বাচন এবং দর্শকমনের সঙ্গে নিবিড় পরিচিতি। এসব দিক মেনে চলা হ'লে বাংলা ছবির উৎকর্ষ অনিবার্য্য,—বাইরের ছবির মান থেকে এ কখনই পিছিয়ে পড়বে না।

চলচ্চিত্রে অভিজাত এবং শিক্ষিত পরিবারের ছেলেমেয়েদের যোগদান সম্পর্কে মতামত জানতে চাইলে শ্রীবিশ্বাস স্পষ্টই বললেন—পূর্ব্বে এক সময় ছিল যখন এদেশে অভিজাত পরিবারের ছেলেমেয়েরা এ লাইনে আসতে চাইতেন না। এ লাইনে সে দিনে যাঁরা আসতেন সাধারণ ভাবে তাঁরা ছিলেন অপাংক্তেয়। কিন্তু আজকে এ প্রগতির যুগে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বদলেছে। অভিজাত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে-কেউ এ লাইনে আসুন সামাজিক প্রতিষ্ঠা তাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। আর আমার এ-ও বিশ্বাস, যখন এ পেশাটাকে অভিজাত ও শিক্ষিতশ্রেণী যত বেশী ব্যাপক ভাবে গ্রহণ ক'রবেন তত দ্রুত এ শিল্প পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে।

এ ভাবে চলচ্চিত্র সম্পর্কে নানা ধরণের আলাপ-আলোচনায় ছবি বাবুর সঙ্গে প্রায় তিন ঘণ্টা কাটালুম। আসবার মুহূর্ত্তে শুধু এটুকু জানতে চাইলুম—ভবিষ্যৎ জীবন আপনি কি ভাবে কাটাতে ইচ্ছে করেন? তিনি অল্প কথায় বললেন—ভবিষ্যৎ কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবু যখন জানবার দাবী করলেন, বলবো—পর্দ্দার ন্যায়ই মঞ্চ-অভিনয় আমার অত্যন্ত প্রিয়। মঞ্চ এবং চিত্রাভিনয়ের উৎকর্ষ সাধনই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ভবিষ্যৎ করণীয় বলতে এ উদ্দেশ্যের কথাই বলতে পারি।

শ্রীছবি বিশ্বাস

অভিধান

অভিধান, অভিধান, রাখিয়াছে মুখ।
কিন্তু এ কি অসম্ভব, নাহি তব মুখ॥
মুখ হোয়ে মুখ নাই, বিমুখ হোয়েছ।
মূক হয়ে একেবারে, নীরব রোয়েছ॥

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ওদিকে স্যাটিনে ঘুমিয়ে পড়েছে, এতে খুসী হয়েছে সেই ছোট্ট মেয়েটি যার তুষারশুভ্র বুকে ও গড়িয়ে পড়েছে, প্রথমটা কিন্তু ওর অতিকায় নরখাদক-মার্কা চোয়াল দেখে অতি ভীত হয়ে পড়েছিল সে। দলটি ক্রমশঃই প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠছে। লর্ড জ্যারুট তার সেই অতিরক্তিম নাক নেড়ে জনৈকা ক্ষুদে কাউন্টেসকে বোঝাচ্ছে।

"এ সবই অবশ্য এক রকম রসিকতা, তবু এই রসিকতাকেও ধন্যবাদ, হয়ত আগামী কাল ও একজন প্রসিদ্ধ মানুষ হয়ে উঠবে। আমি জানি কিসে কী হয়। কারণ, আমিই এ্যাপোলিমেয়ারকে "লা ত্যআনির" লাকের ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়েছিলাম। প্রথমটা ও বিশ্বাস করতে পারেনি। বাস্লার আমাকে সমর্থন করলো। দশ বছর পরে এ্যাপোলিমেয়ার বর্তমানের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সমঝদার।"

মঁসিয়ে দ্য বেলানজেস তখন বলে উঠল—"ক্রিষ্টাল রুমে কি তা'হলে 'টোষ্ট' দেওয়ার আয়োজন করব, রাজকুমারী?"

এই প্রস্তাব গৃহীত হল। সকলেই উঠল।

মোদক মহিলাদের কোমলাঙ্গের রূপ লক্ষ্য করতে থাকে, সিল্কের পোষাক-পরা এই সব রমণীদের দেহলতা র‍্যাফায়েলের আঁকা ছবির চাইতেও অনেক বৈচিত্র্যময়, বর্ণাঢ্য! প্রতিটি রমণীর মাথায় অপরূপ কেশদামের বিচিত্র সম্পদ ফুলের অলঙ্কারে আর পাখির পালকে সজ্জিত। তারা লঘু পায়ে হাল্কা ছন্দে ভেসে বেড়াচ্ছে। মোদক যেন মূর্তিমতী আনন্দ-প্রতিমা দেখছে, যেন প্রাণরসে সঞ্জীবিত অপূর্ব 'মাষ্টারপীস্'। মোদক ভাবে—

"এই মহিলাদের মত শ্রীমতী হত যদি হারিকট রুজ, তাহ'লে, তা'হলে, সেই 'অনাগত-বিধাতা' কি রমণীয় রূপের অধিকারী হ'ত!"

এই সব রূপসীদের সামনে আপনাকে ক্ষুদ্র মনে হয় না তার, বরং সে যেন গর্বে স্ফীত হয়ে উঠেছে। কারণ এই সব রূপবতীদের অধিকারীদের চাইতেও সে শ্রেষ্ঠ সমঝদার। তারপর যখন সর্বপ্রথম প্রিনসেস্ ওর কাছে এসে দাঁড়ালেন, তখন ক্ষীণতম সম্ভাবনা সম্বন্ধে এক বিন্দু কল্পনা না করেই, মোদকের মনে হল উত্তরকালের র‍্যাফায়েলের জননী হওয়ার যোগ্যতা এই রমণীরই আছে। এই পরমা-রমণী নারীকুলে অনন্যা। মোদক রাজকুমারীর গতিছন্দ লক্ষ্য করে। হাল্কা-বাদামী রঙের স্যাবেল-চর্ম (নকুলজাতীয় প্রাণী) তাঁর কাঁধে জড়ানো,—জিনিসটির মূল্য সম্পর্কে কোনো জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও রাজকুমারীর গায়ে ওর প্রতিফলনের কথা চিন্তা করে মোদক। হরিণীর মতো চঞ্চল পদে রাজকুমারী এগিয়ে এলেন। তাঁর শীর্ণ অথচ পেলব গুল্ফের পেশী যেন সুষম ছন্দের প্রকাশ, মাটিতে সে পা যেন বাঁধা তালে পড়ছে। তেমনই তাঁর দেহকাণ্ড! তাঁর দেহে অন্য স্ত্রীলোকের দেহের যেমন কুৎসিত অংশ থাকে তেমন কোনো অংশই নেই।

মঁসিয়ে দ্য বেলানজেস্ উঠে দাঁড়িয়ে এক কৃত্রিম বীরত্বপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন।

মোদক কিছুই শুনলো না, অথচ সবটাই তারই সম্পর্কে।

মোদক শুনলো—দাম্ভিক লোকটা তার সম্বন্ধে বলছে যে, "মোদকের ছবির ভেতর 'খাপছাড়া' কিম্ভূত কাণ্ড থাকা সত্ত্বেও সে আর্ট এবং ফ্রান্সের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। একদিন তাকে সবাই বুঝবে, তার ছবির আদর হবে, যেমন বুগুরোকে মানুষ বিস্মৃত হলেও মোদককে স্মরণে রাখবে—"

জর্জ-মাইকেল

তবু মোদককে খুসী, তাই ওর বলার পালা আসতেই সে সহাস্য-বদনে অথচ গম্ভীর ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালো—

"মহাশয়গণ, আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, আপনারা বিগত দিনের না হলেও বর্তমানের রুচির ধারক ও প্রতিনিধিস্বরূপ। আগামী দিনের সৌন্দর্যের যা মূল সূত্র হবে এবং জন্মের অব্যবহিত পরেই যা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা আপনারা তাকে স্বীকৃতি দিলেন। শিল্পীদের সম্পর্কে আপনাদের মার্জনা-ভিক্ষার প্রয়োজন নেই, তাদের উৎসাহিত করারও তেমন আবশ্যক নেই। কোনও চিত্রশিল্পীর প্রতি স্বীকৃতিদান বা অবহেলা প্রকাশের ফলে আপনাদের কোনও লাভ নেই। আমাদের শিল্পকর্ম যদি আপনারা বুঝতে না পারেন এবং যদি বোঝেন, তার জন্য আপনাদের কোনও স্বীকারোক্তি করার প্রয়োজন নেই। কাউকে কোনও সন্দেহ প্রকাশের সুযোগ দেবেন না! বুগুরো নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধার অধিকারী, এবং আমার মনে হয়, আপনাদের কথায় যতটুকু বুঝলাম, সে শ্রদ্ধা তাঁকে প্রদর্শন করতে আপনাদের আপত্তি নেই। তিনি একজন মহৎ শিল্পী। এই শ্রদ্ধা যা কুৎসিত তার প্রতি নয়। আপনাদের, মহাশয়গণ, আমার বলতে বাধা নেই, আপনারা অতি সহৃদয়, প্রীতিময়, যারা এখনও পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে আপনারা তাদের স্বীকৃতি দানের চেষ্টা করছেন।"

প্রত্যেকের দেহে এক শীতল বায়ুতরঙ্গ প্রবাহিত হল। প্রিনসেস্ আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য গাঢ় সবুজবর্ণের পেয়ালায় স্বর্ণ-পীতাভ উষ্ণ কফি নিয়ে এলেন। তাঁর মুখ ভীষণ লাল হয়ে উঠেছে। বেলানজেস্ অন্যত্র চলে গেছে, সেই সঙ্গে তার দলবল। মেয়েরাও একে একে চলে গেছে।

মোদক তার হাত প্রিনসেসের দিকে প্রসারিত করতে তিনি বললেন···থামুন। ইতস্ততঃ করেন প্রিনসেস—

"দেখুন আপনার কাছে,—আমার নিজের জন্যও বটে, আমার একটা জবাবদিহি করা প্রয়োজন—"

মোদক যেন বুঝতে পারে না, ব্যাপারটা কি! সহসা তার মনে এক বিচিত্র সম্ভাবনার কথা উদয় হয়।

শেষতম অতিথিটিকে সলোঁর দরজায় দাঁড়িয়ে বিদায় দেওয়ার সময় প্রিনসেসের চোখ শিল্পীকে খোঁজে, কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া যায় না।

তাঁর চোখে জল আসে। শিল্পীর অনুপস্থিতি, এই পলায়নে যেন ভেঙে পড়ে প্রিনসেস্। এই নতুন অতিথিকে আজ কি করা হল তিনি ভাবেন,—এখন তাঁর চোখে শিল্পীর মর্যাদা অনেক বেড়ে গেছে, অপরিমেয় শ্রদ্ধা।

কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে প্রিনসেস্ নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

হাওয়া-ভরা সুন্দর প্রশস্ত কক্ষ। মেঝেতে সুন্দর রেশমের কম্বল পাতা, নীল দেয়ালগাত্রে অপ্রত্যক্ষ আলোর প্রতিফলন। আলোগুলি কার্নিসের ভিতর প্রচ্ছন্ন ভাবে সাজানো আছে। আসবাবপত্রের ধূসর রঙ—বিরাট আসবাব চতুর্দিকে সাজানো। রূপালি মোজাইকের কাজ-করা বাথরুম,—জলে-বোঝাই বাথটবের নীল রঙ দেখা যাচ্ছে, তাতে অম্বরের গন্ধ।

দাসী এসে জরদা রঙের টিউনিক খুলে দেয়, তাতে প্রিনসেসের গাত্রচর্মের ঔজ্জ্বল্য যেন আরো বিকীরিত হ'ল।

ঊরু, হাঁটু, কিঞ্চিৎ মাংসল অথচ পেলব। তরঙ্গায়িত বাহুলতার বর্ণ যেন গোলাপের পাপড়ি। সোনার দীপ্তি যেন ইতস্ততঃ বিচরণশীল—যেন তাঁর সুকুমার দেহকান্তির উপরকার সিল্কের সেমিজেও সেই বর্ণচ্ছটা। দাসী এই কুসুম-পেলব তনুর জ্যোতি ধূসর রঙের পাতলা চাদরে ঢেকে যেন নিবিয়ে দেয়.।

—"তুমি এখন যেতে পারো।"

"মাদাম কি এখন বই পড়বেন?"

"হ্যা।"

পড়ার আলো আবার জ্বালানো হল, মাথার ওপর থেকেই, শুধু বই-এর ওপর একটা জরদা রঙের আলো এসে পড়ল।

একাকী, শয্যাপ্রান্তে নীরবে বসে রইলেন প্রিনসেস্, নগ্ন পায়ে মেঝের পাতা রেশমের কম্বলে মৃদু আঘাত করছেন। প্রিনসেস্ চিন্তামগ্ন। তাঁরই বাড়িতে বসে যে মানুষটি জগৎ-সংসারের বাইরে, তাঁকেই যে উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়েছে। মহিলাটির সততা আছে। তাই তাঁর মনে হল তিনিও অবিচার করেছেন। কল্পনানেত্রে তিনি মোদক্লোর আকৃতির স্বপ্ন দেখেন, শীর্ণ দীর্ঘ দেহ অথচ স্মিতানন, মিতবাক্। বেলানজাসের বক্তৃতার প্রত্যুত্তরে একটা সচেতন উন্নত মনোভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। মোদক্লর বাস্তব রূপ যেন প্রিনসেস্ দেখতে পাচ্ছেন। মাথা তুললেন প্রিনসেস্। আম্‌তা-আম্‌তা করে উঠে দাঁড়ালেন রাজকুমারী।

মোদক্লো তাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে, মোদক্লো কিন্তু বোঝেনি··· প্রিনসেস্ সচকিত হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝলেন কেন তাঁর জবাবদিহিতে কান দেননি মোদক্লো। তিনি জানেন এখন অবশ্য অনেক দেরীও হয়ে গেছে···

প্রিনসেসের জীবনে কোনো দিন প্রেমিকের আবির্ভাব ঘটেনি। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সম্ভ্রান্ত রক্ত তাঁর দেহে আধিপত্য করেছে, আর সব নারীর মতই তাঁর শরীরেও অনুরণিত হয়েছে সেই তেজ। কখনও কোনো বিরলতম মুহূর্তে প্রেমিকের স্বপ্ন দেখেছেন প্রিনসেস্, একরকম অতি সঙ্গোপনে—কিন্তু সেই প্রেমিকের উচ্চ বর্ণের এবং পবিত্র রক্তের প্রতিই সতর্ক দৃষ্টি ছিল। অত্যন্ত ভব্য এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরই সেই যোগ্যতা থাকা সম্ভব, কারণ রাজকুমারী প্রাচীনতম অভিজাত-বংশের অন্তর্গত। এমনই ছিল তাঁর জীবন যে কেউ কোনো দিন তাঁর আঙুলের ওপর সতৃষ্ণ ঠোঁটের চুম্বনরেখা আঁকতে সাহস করেনি।

মোদক্লোকে তিনি দেখলেন। জামার কলার খোলা, মাথার চুল যেন আগুনের শিখা, মুখে অপরূপ প্রশান্তি। চোখ দুটি যেন কিসের ঘোষণা।

ওর উপস্থিতি তাঁকে উত্তেজিত না করে একটা অপূর্ব স্বস্তি এনে দিল। অজ্ঞাতসারেই যেন অভ্যাসবশে তার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন রাজকুমারী। সেই ভঙ্গিমা নিষেধের না আবেদনের, সে জ্ঞান তাঁর নেই। মোদক্লও তাঁর দিকে এগিয়ে এল। এখন আর ওরা রাজকুমারী এবং যাযাবর শিল্পী নয়, যেন কোনো সুদূর গুহায়—দুই বিভিন্ন নর-নারীর মিলন ঘটেছে, মনের মিল আছে, আর আছে উপযুক্ত দেহ।

চমৎকার চেহারা মোদক্লর,—ওঁর দিকে সে এগিয়ে আসছে, রাজকুমারীর মতই পেলব ও সুকুমার তার দেহভঙ্গিমা। সহসা রাজকুমারী অনুভব করলেন তাঁর শক্তিমান বাহুর পেষণে নিষ্পেষিত হচ্ছে। তারপর সেই হাত তাঁকে শূন্যে তুলে শুইয়ে দিল, যেন আহত কুমারীর মতো সেই বিরাট কাউচে পড়ে রইলেন রাজকুমারী।

অনুরোধ করা বা সম্মতিদানের জন্য মুখ খোলার চেষ্টা করেন রাজকুমারী—এমনই নিঃশ্বাস ফেলছেন যে ওঁর ক্ষুদ্র অথচ তীক্ষ্ণ স্বর্ণচূড়া যেন বিভক্ত হয়ে পড়ছে।

ভীষণ জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে রাজকুমারীর, তাঁর জলভরা চোখ দুটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত,—তাঁর খোলা বুক চমৎকার পাতলা কাপড়ের মত তরঙ্গায়িত।

ওঁর কাছে ফিরে এসে মোদক্ল ধীরে ধীরে নিষ্প্রাণ ভঙ্গীতে রাজকুমারীর রাত্রিবাস খুলে তাকিয়ে রইল সেই সার্থক সুন্দর নিরাবরণ দেহের দিকে,—তার দুটি চোখ মেলে সারা দেহটি ভালো করে দেখলো,—যেন প্রদর্শনী-কক্ষে র‍্যাফায়েলের ছবি দেখছে। তারপর যখন মোদক্লর গাত্রবাসও খসে পড়ল—আদিমকালের মানুষের মত তার পেশীবহুল নগ্ন দেহে এক স্বর্গীয় সুষমা বিকশিত হয়ে উঠল। রাজকুমারীর পাশে দেহটি মেলে দেয় মোদক্ল, তার পর ঘোষণার ভঙ্গীতে বলে—

"আমি তোমাকে আজ নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করলাম। নূতন সংস্কারে তুমি সংস্কৃত।"

কথাগুলির অর্থ বুঝলো না প্রিনসেস্।

মোদক্লর ভারী ঘন চুলে কোমল হাতটি রেখে প্রিনসেস্ বললেন—"থাকো, যেও না—" এবং মোদক্লর পাশ ঘেঁসে সারা দেহ মেলে দিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন।

[ক্রমশঃ

অনুবাদ—ভবানী মুখোপাধ্যায়

নারী-শিক্ষার প্রথম যুগে

"কেবল আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের লেখা পড়ার পদ্ধি আগে ছিল না, এই জন্তে কিছু দিন কেহ করে নাই। কিন্তু প্রথম ইং ১৮২০ [১৮১৯ ?] শালের জুন মাসে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা এই কলিকাতার নন্দন বাগানে যুবনাইল পাঠশালা নামে এক পাঠশালা করিলেন, তাহাতে আগে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করিয়াছিল না, এই ক্ষণে এই কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটা স্ত্রীপাঠশালা হইয়াছে।—'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক', গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার।

কেনা কাটা ● কেনা কাটা

দোকানের ভোল পালটে দিন

আজকের এই বিশ্বজোড়া মন্দার দিনে বড় বড় ব্যবসাদারেরাই কাবুল হয়ে পড়ছেন। চার দিকে চলেছে কর্মচারীর সংখ্যা কমাবার হিড়িক। জিনিসপত্রের দাম কখনো বাড়ছে একটু, কখন কমে যাচ্ছে হু-হু করে। এরই মধ্যে ব্যবসা করে যাঁদের খেতে হবে তাঁদের খোল-নলচে পালটাবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেই পুরোনো আমলের মত পেছনে গুদাম, সামনে দোকান, বাক্সের পর বাক্স সাজান—এ দিয়ে আর চলছে না। পাড়ার যে কোন দোকানে, সে দোকান পোষাকেরই হোক বা ষ্টেশনারীরই হোক, লোহা-লক্কড়েরই হোক বা মিষ্টান্নেরই হোক, দোকানদারের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে গেলেই আপনি শুনতে পাবেন তিনি বলছেন, 'আরে মশাই, দোকানে কেনা-বেচাই নেই। পিতৃপুরুষের ব্যবসা তাই কোনও ক্রমে চালিয়ে যাচ্ছি, দেখবেন কবে তালা ঝুলছে বাইরে।' কিন্তু কেন এই আক্ষেপ? দোকানে বিক্রিই বা নেই কেন? অথচ বাইরের চালা ফুটপাতে কাপড়-জামার ছিটের মেলা বসে গিয়েছে। লোকের ভীড়ে পথ চলা দায়! এ তফাৎ কেন? আপনি ফুটপাতের চেয়ে দাম নেবেন বেশী, কিন্তু তার জন্য খরিদ্দারের কি বেশী আরামের বন্দোবস্ত করেছেন আপনি? দোকান সাজিয়েছেন ভাল করে? নিয়ন আলো দিয়েছেন বাইরে? বিজ্ঞাপন দেন নিয়মিত? কাউন্টার আছে আপনার? খরিদ্দারদের বসবার জন্য গদী-আঁটা চেয়ারের বন্দোবস্ত আছে আপনার? দোকানে পাখা রেখেছেন আপনি? প্যাকিং-বক্সের ব্যবস্থা আছে? তবে? এ সব যদি না থাকে তো কেন আপনি আশা করবেন বেশী দাম? তাহলে যে যুগ আসছে তাতে সারা জীবন বসে আপনাকে আক্ষেপই করতে হবে যদি না ইতোমধ্যে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি ফেরে, কালের সঙ্গে পা ফেলে চলবার আপনি উপযুক্ত হন।

জর্দ্দা-স্মৃর্তি কি বিষ?

তাম্বূল-রাগে-রঞ্জিত কোন অধরাকে দেখেই ভেবে নেবেন না যে তিনি সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনার্থেই সব সময় এ জিনিসটি ব্যবহার করে থাকেন। এমনও হতে পারে যে মুখের কোন দুর্গন্ধ, দাঁতের বা মাড়ীর কোন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশকে সুগন্ধি তাম্বূলের লাল রঙে ভিজিয়ে আপনার কাছে, হলেও হতে পারে, তাঁর অভিসার। ইউরোপ, আমেরিকার কথা যদি ধরেন তবে শুধু চুম্বন মুহূর্ত্তেই দুর্গন্ধযুক্ত অধর-বিশিষ্টার সঙ্গে চিরকালের মত ডাইভোর্স হয়ে গেছে বহু জনের। সে কথা থাক, আজকের কথা হল জর্দ্দা-স্মৃর্তি আপনি খাবেন কি খাবেন না? খাবেন বই কি, ভাল লাগলেই খাবেন। কিন্তু দোকান থেকে সেই দ্রব্যটি কেনবার আগে আপনি নিঃসন্দেহ তো যে, তার মধ্যে এতটুকুও ভেজাল নেই? আপনি নিঃসন্দেহ নন, এবং সত্যি কথা বলতে কি নিঃসন্দেহ হবার কোন উপায়ও নেই। দোকানদারগণ প্রায়ই জর্দ্দায় নানারূপ
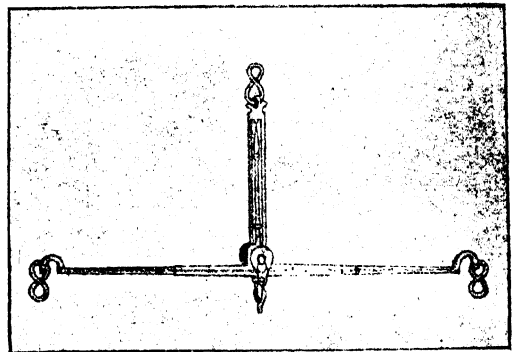
উমাচরণ কর্ম্মকারের প্রস্তুত দাঁড়িপাল্লা—সাধারণ কাজের জন্য।

বাজে নিকৃষ্ট ধরণের তামাক ব্যবহার করে থাকেন এবং সেই বদ গন্ধ ঢাকবার জন্যে ব্যবহার করেন উগ্র ধরণের কোন সেন্ট। বাজে, কমদামী তামাকে নিকোটিনের পরিমাণ থাকে বেশী এবং তা প্রায়ই আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকরও। জর্দা-সুর্তি আপনি খান কিন্তু বাড়ীতে কিনে আনুন মৃগনাভি, কেয়াফুলের রেণু, যষ্টিমধু, তামাকপাতা ইত্যাদি মশলা। নিজে ভাগ অনুযায়ী মেশান। তাতে আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে এবং অধিকতর আরামও উপভোগ করতে পারবেন। বাজারের জর্দা-সুর্তি আর সুগন্ধি মশলা খাওয়া মানে প্রকারান্তরে বিষ খাওয়া। দাঁত, শ্বাস ও যকৃতের রোগে শেষ পরিণাম!

এ্যানালিটিক্যাল ব্যালান্স—রসায়নাগারের কাজে লাগে।

বণিকের মানদণ্ড

কথায় বলে না চুল চেরা হিসেব। কিন্তু সত্যিই কি আর চুল চিরে হিসেব করে দেওয়া সম্ভব না তাই করে কেউ! হিসেব করবার জন্য তাই বন্দোবস্ত হয়েছে কাঁটা আর নিক্তির। মোটামুটি মাপ, এক কাঁচ্চা, দু' কাঁচ্চার তফাৎ, মারাত্মক রকমের কোন ক্ষতি না হয় যাতে তার জন্য রয়েছে কাঁটার বন্দোবস্ত। আর সোনা, রূপো, নানা বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতির জন্য প্রয়োজন সূক্ষ্মতর হিসাব। তাই রয়েছে নিক্তি। কাঁটা আর নিক্তি তৈরীর কাজে উমাচরণ কর্মকার এ্যাণ্ড সন্স বাংলা দেশে অগ্রণী। সঙ্গের ছবিগুলি তাঁদেরই প্রতিষ্ঠানের পণ্য। প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রতিষ্ঠান এবং সুনামের সঙ্গে কাজও করে চলেছেন এঁরা। নানাপ্রকার কেমিক্যাল ব্যালান্স এ্যানালিটিক্যাল ব্যালেন্স থেকে শুরু করে যাবতীয় ওজনের কাঁটা অবধি সবই এঁরা প্রস্তুত করেন। বাটখারা নানা ওজনের এঁরাই প্রস্তুত করেন। বাজারে কম ওজনের বাটখারা রাখার অজুহাতে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী ইতোমধ্যেই ধরা পড়ছেন। তাই জানাচ্ছি, সাধু সাবধান!

বিয়েতে কি উপহার দিই?

চিরকুমার সভা চিরকালই বারে বারে পৃথিবীর সব দেশে গড়েছে আর ভেঙ্গে গেছে। পঞ্চশর অলক্ষ্যে বসে তাঁর তূণ থেকে বেছে বেছে একটি করে শর নিক্ষেপ করেছেন অবিবাহিত যুবক-যুবতীর পানে। তার পর একদিন গোধূলিলগ্নে চাঁদোয়াতলায় শতকণ্ঠ-কলরোলের হাঁকডাকের মধ্যে শানাইয়ের আয়োজনের ফাঁকে ফাঁকে ঘটে গেছে তাদের শুভ বিবাহ। কিন্তু মুস্কিলে পড়েছি আপনি আমি নিমন্ত্রিতের দল। প্রজাপতি আঁকা, বা দু'খানি হাত একত্র করে ফুলের মালা জড়ানো ছবিওয়ালা লাল কার্ড এসেছে বাড়ীতে। নিমন্ত্রণ। কোথাও ভদ্রতা কোথাও সামাজিকতা কোথাও বা আন্তরিকতার ফলে আপনাকে সে নিমন্ত্রণ রাখতেও হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবেও। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এক জায়গায়। পরের পয়সায় লুচি-মণ্ডার ফলার তো মন্দ লাগবার কথা নয়, কিন্তু মন্দ লাগে তখনি যখন একখানি 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' হাতে বিবাহ বাসরে পরম নিশ্চিন্ত মনে প্রবেশ করে পাত্রীর হাতে দিতে গিয়ে দেখলেন, পাশের উপহার রাখবার টেবিলে ইতোমধ্যেই জড়ো হয়েছে আরও ডজন খানেক একই পুস্তক অর্থাৎ আপনার দেওয়া সেই 'পরমপুরুষ'ই। চরম এ সমস্যা! তখন কি করবেন আপনি? সিঁদুর কৌটা, দু'টি কি চারটি রূপোর টাকা, কাস্কেট এ-সব তো তিন পুরুষ আগে থেকেই আপনার আমার ঠাকুমা দিদিমারা উপহার দিয়ে আসছেন। প্রয়োজনীয় জিনিষ হিসাবে দেবেন হিটার, টেবিল-ল্যাম্প? আইডিয়া মন্দ নয়, তবে আপনার বাজেটে তা' আসবে তো? আমাদের বাজেট তো এক্ষেত্রে প্রায়ই পাঁচ টাকার উর্দ্ধে নয়। তাই বলছি বাংলা দেশে আরও বহু ভাল ভাল পুস্তক আছে যা দামে কম অথচ উপহার দিতে গিয়ে আপনাকে ঠকতে হবে না। বিবাহে এই উপহার দেওয়া সম্পর্কে এবার দৃষ্টি আমাদের পাল্টাবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।
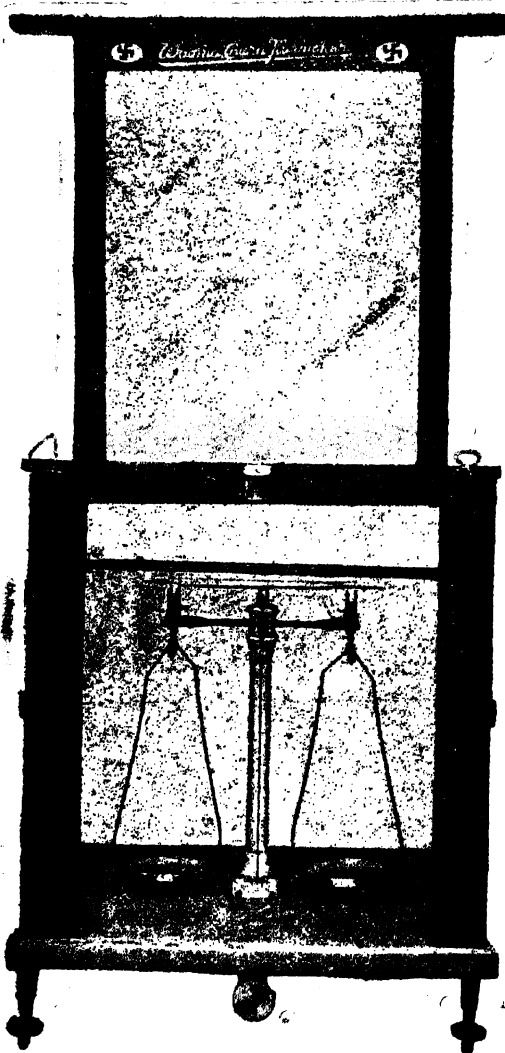
পূজোর বাজার

আর এক সপ্তাহ কি বড় জোর দু' সপ্তাহ পর থেকেই রাস্তা-ঘাটে চলতে ফিরতে গিয়ে পদে পদে আপনি কি দেখতে পাবেন? দোকানদারগণ লালশালুর ওপর সাদা লংক্লথের কাপড় কেটে আর জুড়ে মেশিনে সেলাই করে দোকানের এপার থেকে ওপার অবধি, কখনো কখনো সমস্ত বড় রাস্তার মাথা জুড়ে টাঙিয়েছেন, 'পূজোর বাজারে সস্তায় সব কিছু সওদা করুন এখানেই' বা 'কমপিটিশন সেল' বা ঐ জাতীয় অন্য কোনও কথা। দোকানের ভেতরে ঢুকুন। সেই এক অবস্থা। উনিশশো বিশ সালে দোকানদার লাল সাটিনের জামা, অরগ্যাণ্ডীর ফ্রক, জরিদার শান্তিপুরী ধুতি, শাড়ী, বাঙ্গালোর আর মাইশোর সিল্ক, শিফন, জর্জেট যা আনতেন, সেই একই হাল আজও। পাড়ার পূজোতলায় আপনার ছেলে-মেয়ে যে জামা-কাপড় পরে ঠাকুর দেখতে গেছে আপনার প্রতিবেশীও প্রায়ই সেই জামা-কাপড়ই পাঠিয়েছেন তাঁর সন্তান-সন্ততিকেও। এ কেন হবে? বিশেষত্ব কেন থাকতে পারবে না দুটি ছেলে, দুটি মেয়ের পোষাকে? নতুনত্ব মানেই নয় 'মানে না মানা' শাড়ী কি 'উদয়ের পথে' চুড়ি। নতুনত্ব মানে নতুনত্বই। দ্রব্যগুণে নতুনত্ব, নামগুণে নয়। আরও একটা বিশেষ ভাববার কথা, পূজোর বাজারের জিনিষ প্রায়ই টেঁকসই কম হয়। জমিদার শান্তিপুরী ধুতি কিনলেন কোন মধ্যবিত্ত কেরাণী অনেক কষ্টে পূজোর দিনে ছেলেটির মুখে একটু হাসি দেখবেন বলে, মাসখানেক যেতে না যেতেই ধোপাবাড়ী থেকে ধুতি ফেচে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যেখানে জরি ছিল সেখানে একটি হলদে দাগের আভাস পাওয়া যাচ্ছে মাত্র। দোকানদারগণ নতুনত্ব আনুন, সঙ্গে সঙ্গে আনুন ফিরিয়ে আপনার খরিদ্দারের বিশ্বাসও।

বিজ্ঞাপনের এজেন্টদের বিজ্ঞাপন কৈ?

বাঙলা দেশ থেকে বছরে কোটি কোটি টাকা বাঙলার বাইরে চালান হ'লেও বাঙালী ব্যবসাক্ষেত্রে আর খুব বেশী পিছিয়ে নেই। বাঙালী ব্যবসায়ীদের পণ্যের বিজ্ঞাপনও পত্র-পত্রিকায় দেখা যায় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী। শিল্প হিসাবে এই সব বিজ্ঞাপন প্রথম শ্রেণীর পর্য্যায়ে না পড়লেও, বাঙালী ব্যবসায়ীরা বর্ত্তমানে বেশ বিজ্ঞাপনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, বাঙালী ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন সম্পর্কে নয়, বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন সম্পর্কে। বাঙলা দেশে যে কতগুলি বাঙালী-পরিচালিত বিজ্ঞাপনের ব্যবসা আছে—তা অনেকেই জানেন না। কেন না, শুধু মাত্র বিজ্ঞাপনের ব্যবসা করেই বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ীরা ক্ষান্ত থাকতে চান, নিজেদের বিজ্ঞাপনও যে মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করতে হয় তা যেন এঁরা মানতে চান না আদপেই।

সাধারণতঃ পণ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ীরা তাঁদের ব্যবসার বিজ্ঞাপনের বিষয়ে কোন রকম চিন্তা করবার অবসরই পান না, যে কারণে বিজ্ঞাপন বা প্রচারের জন্য তাঁরা কোন বিজ্ঞাপনের এজেন্টের শরণাপন্ন হন। এজেন্ট নানা পরিকল্পনার সঙ্গে ব্যবসার যথাযথ প্রচারের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ব্যবসায়ীরা এই এজেন্টদের চিনবেন বা জানবেন কোথা থেকে, যদি না এজেন্টের বিজ্ঞাপন কোথাও দেখা যায়? বিদেশের বিদেশী এজেন্টরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। অন্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশের সঙ্গে নিজেদের বিজ্ঞাপনও তাঁরা সসম্মানে প্রচার করেন। আমরা জানি, বহু বাঙালী ব্যবসায়ী সময়াভাবে এবং এজেন্টদের পরিচয়ের অভাবে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ইচ্ছা সত্ত্বেও নীরবতা পালন করে চলেছেন। আমাদের বিজ্ঞাপনের এজেন্টগণ বিষয়টি সম্পর্কে এখনও অবহিত হোন—এই অনুরোধ। বিজ্ঞাপনের ব্যবসা করতে নেমে বিজ্ঞাপনের মূল্য যে তাঁরা বোঝেন না, সে ধারণা আমরা নিশ্চয়ই পোষণ করবো না।

ইনষ্টলমেণ্টে জিনিষ কেনা

পাশের বাড়ীর গৃহিণী এসে আপনার গৃহিণীর কাছে গল্প করে গেছেন, জানিয়ে গেছেন তাঁদের হালফেশানের আনকোরা নতুন কেনা সেলাই কলটির কথা, আরও জানিয়ে গেছেন হিজ মাষ্টার্স ভয়েস বা ঐ জাতীয় কোন রেডিও ঘরে আসার কথা। জানিয়ে গেছেন আরও যেন কি কি। আপনি সারা দিন অফিস ঠেঙ্গিয়ে, সন্ধ্যায় শিয়ালদার বাজার থেকে সস্তায় কিছু তরিতরকারী মাছ কিনে, এক হাতে ছেলের জন্য রবিনসন বার্লির ছোট একটি টিন, অপর হাতে কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাতে কেনা মেয়ের জামার ছিট নিয়ে এই বেজায় গরমে ঘর্মাক্ত কলেবরে বাড়ীতে এসে দু' দণ্ড দম নিতে না নিতেই এক এক করে আপনার কর্ণকুহরে প্রবেশ করল সেই সব সংবাদগুলি। চা-জলখাবার তেতো লাগতে লাগলো মুখে। কিন্তু আসল ব্যাপারটির খবর আপনিও হয়তো জানেন না, জানেন না হয়তো আপনার গৃহিণীও। কি হলে আপনারই সমান টাকা মাসকাবারে কামিয়ে সকলের ওপরে টেক্কা দিয়ে এই আকালের বাজারেও নতুন সেলাইকল, রেডিও কেনা চলে তার ভেতরকার কারসাজীটি তো আপনার জানা নেই! আসলে খবর নিয়ে দেখুন, সেগুলি বেশীর ভাগই মাসিক কিস্তীতে কেনা। চুক্তি আছে, মাসে মাসে কিছু নগদ দক্ষিণা এবং ক্রয়কালীন কিছু আগাম দিলেই ফ্যান কোম্পানী আপনার বাড়ীতে এসে টাঙিয়ে দিয়ে যাবে পাখা, রেডিও কোম্পানী বসিয়ে দিয়ে যাবে রেডিও, সেলাইকল কোম্পানী মাল দিতে পিছপাও হবে না। বাংলা দেশে এ জিনিষটির বহুল প্রচার হোক, পৃথিবীর আর আর সব দেশের মত কেবল মাত্র সখের জিনিষের মধ্যেই যেন ঐ বন্দোবস্তটি সীমাবদ্ধ না থাকে। পোষাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য নানা আবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রীও যেন এর আওতায় আসে এবং সুদের হার কম হয়, এই আমাদের বক্তব্য।

লেখক ও লেখা

যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।···যাহা অসত্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য্য। সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনীধারণ মহাপাপ।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি—

অবশেষে ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি হওয়া সত্যই সম্ভব হইয়াছে। ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঃ মেণ্ডেস্ ফ্রাঁস এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, ২০শে জুলাইয়ের (১৯৫৪) মধ্যে ইন্দোচীনে শান্তি স্থাপন করিতে না পারিলে তিনি পদত্যাগ করিবেন। কার্য্যতঃ ২০শে জুলাই তারিখেই ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হইয়াছে, এ কথা বলিলে ভুল বলা হয় না। ২০শে জুলাই তারিখের মধ্যরাত্রের পূর্ব্বেই যুদ্ধবিরতির সর্ত্তাদি সম্পর্কে একমত হওয়া সম্ভব হয়। চূড়ান্ত মতৈক্য হইতে মঃ মেণ্ডেস ফ্রাঁসের প্রতিশ্রুত সময়ের পরেও ১০ মিনিট লাগিয়াছিল। ভিয়েটনাম এবং লাওসের যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় গ্রীণউইচ সময়ের ২টা ৫০ মিনিটের সময়। জেনেভা সহরের উপর তখন ভোর নামিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাম্বোডিয়ার যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে শেষ মুহূর্ত্তে একটা টেকনিক্যাল বাধা উপস্থিত হইয়াছিল। ফলে কাম্বোডিয়ার যুদ্ধবিরতি চুক্তি দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে স্বাক্ষরিত হয়। ভিয়েটনাম ও লাওসের যুদ্ধবিরতি চুক্তিপত্রে ২০শে জুলাইয়ের তারিখ দেওয়া হইয়াছে। ভিয়েটনাম চুক্তি সম্পর্কে একটা কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ভিয়েটনামের প্রতিনিধি উহাতে স্বাক্ষর করেন নাই। ভিয়েটনামের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ট্রান ভান ডু এই চুক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভিয়েটনামী জনগণের পবিত্র অধিকার অথবা রাজনৈতিক ঐক্য এবং জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা ভিয়েটনামের থাকিবে। তাঁহার এই উক্তি বাস্তবক্ষেত্রে কি রূপ গ্রহণ করিবে, যুদ্ধবিরতির উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে, এই প্রশ্ন একেবারে উপেক্ষার বিষয় বলিয়া মনে করা যায় না।

ভিয়েটনামের যে যুদ্ধবিরতি সীমারেখা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাতে ভিয়েটনাম প্রায় সমান দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে। যুদ্ধবিরতি সীমারেখা স্থির হইয়াছে সং বেন হাই নদী বরাবর। উহা সপ্তদশ অক্ষরেখার উজানে ভিয়েটনাম হইতে লাওসে যাওয়ার ৯নং সড়কের ২০ কিলোমিটার অর্থাৎ ১২½ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই যুদ্ধবিরতি রেখার উত্তরের অঞ্চল ভিয়েটমীনদের দখলে পড়িল, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। দুইটি বড় সহর হানয় ও হাইফং সহ সমগ্র লোহিত নদীর বদ্বীপ এই অঞ্চলে পড়িয়াছে। এই যুদ্ধবিরতি সীমারেখাকে অবশ্য রাজনৈতিক সীমা বলিয়া গণ্য করা হইবে না। দুই বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এক বৎসর পর ভিয়েটমীন এবং ভিয়েটনাম উভয় পক্ষ মিলিয়া নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিবার জন্য আলোচনা করিবে। যুদ্ধবিরতি পরিদর্শনের জন্য ভারত, পোল্যাণ্ড এবং কানাডাকে লইয়া একটি আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধবিরতি কমিশন গঠিত হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক কমিশন যদি কোন বিষয়ে একমত না হইতে পারেন, তাহা হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের রিপোর্ট সহ বিষয়টি নয়টি জাতি লইয়া গঠিত ইন্দোচীন সম্মেলনের নিকট পেশ করিতে হইবে।

যুদ্ধবিরতি হওয়ায় সাত বৎসরব্যাপী ইন্দোচীন যুদ্ধের অবসান হইল। এখানে এই যুদ্ধের কারণ এবং বিবরণ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার স্থান আমরা পাইব না। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে হাইফংয়ে ফ্রান্স ও ভিয়েটমীনদের মধ্যে যে ক্ষুদ্র সংঘর্ষ সুরু হয় তাহাই প্রথমে পরিণত হয় গেরিলা-যুদ্ধে। তিন বৎসরব্যাপী গেরিলা-যুদ্ধ চলিবার পর ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে যুদ্ধের রূপের পরিবর্ত্তন হয়, গেরিলা-যুদ্ধ পরিণত হয় প্রকৃত সংগ্রামে। কিন্তু ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরের সংঘর্ষের কারণটি বুঝিতে হইলে আরও কিছু দিন পূর্ব্বের ঘটনা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম শেষ হওয়ার প্রাক্কালে ১৯৪৫ সালের ৮ই আগষ্ট ভিয়েটমীনরা হানয় দখল করে এবং ইহার পর সমগ্র টংকিং অঞ্চল দখল করিয়া নিজেদের গবর্ণমেণ্ট গঠন করে এবং হো-চিন-মীন ভিয়েটনামের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। অতঃপর আনামের সম্রাট বাওদাইকে বিতাড়িত করিয়া ভিয়েটমীনরা আনাম তো দখল করেই, কোচিন-চীনও তাহাদের দখলে আসে। এই ভাবে ২রা সেপ্টেম্বর (১৯৪৫) সমগ্র ভিয়েটনামে ভিয়েটমীনদের প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্স গোড়া হইতেই এই প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পছন্দ করে নাই। জাপ সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করার অজুহাতে জেনারেল গ্রেসীর পরিচালনায় কয়েক ডিভিশন বৃটিশ সৈন্য ইন্দোচীনে অবতরণ করে এবং ভিয়েটনাম সৈন্যের সহিত কয়েকটি সংঘর্ষের পর তাহারা কতক অঞ্চল দখল করিতে সমর্থ হয়। অতঃপর ফ্রান্স হইতে জেঃ লা ক্লার্ক ইন্দোচীনে উপস্থিত হন এবং ক্যাথলিক পাদ্রী ড আর্গালিউ ফরাসী নৌ-বাহিনীর এডমিরাল হইয়া বসেন। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয়তাবাদীদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম দমনের জন্য বৃটিশ সৈন্যবাহিনীকে ইন্দোচীন হইতে সরাইয়া লওয়ায় ফ্রান্সের পক্ষে ভিয়েটমীন সৈন্যসহিত লড়াই করা সম্ভব ছিল না। কাজেই মঃ বিদোর

প্রথম কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার আমলে ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে ভিয়েটনাম প্রজাতন্ত্রের সহিত একটা মিটমাট করিবার চেষ্টা করা হয় এবং ১৯৪৬ সালের মার্চ্চ মাসে হানয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স-ইন্দোচীন ফেডারেশনের মধ্যে ভিয়েটনাম প্রজাতন্ত্রের স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার ফ্রান্স স্বীকার করিয়া লয় এবং ডাঃ হো-চিন-মীনও ইন্দোচীনে ফরাসী সৈন্যকে অবস্থান করিতে দিতে রাজী হন। অতঃপর এই চুক্তি-সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনার জন্য ডাঃ হো ফ্রান্সে যান। এই আলোচনা-বৈঠকে ডাঃ হো ইন্দোচীনের পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনের ও অন্য দেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি অধিকার দাবী করিলে ফ্রান্স তাহা অগ্রাহ্য করে। অবশেষে আগষ্ট মাসে (১৯৪৬) স্থিতাবস্থা বজায় রাখিয়া একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়া ডাঃ হো ইন্দোচীনে ফিরিয়া আসেন।

১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি যুদ্ধ বাধিবার কারণটি ডাঃ হোর ফ্রান্স যাত্রার পরেই সৃষ্টি হইয়াছিল। কোচিন-চায়নায় গণভোট গ্রহণে ফ্রান্স প্রথমে রাজী হইয়াছিল। কিন্তু ডাঃ হো আলাপ-আলোচনার জন্য প্যারী যাত্রা করিবার পরেই দ্য আর্গালিউ কোচিন-চীনে এক তাঁবেদার গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া বসেন। এই গবর্ণমেণ্ট গঠন করায় মার্চ্চের চুক্তি ভঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া ডাঃ হো অভিযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। অধিকন্তু ফরাসী কর্তৃপক্ষ এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করেন যে, তাঁহাদের অনুমতি-পত্র ব্যতীত ভিয়েটনামে কোন পণ্য প্রেরণ করা চলিবে না। হাইফংয়ে তাঁহারা একটি শুল্ক-অফিসও স্থাপন করেন। ইহাই সব নয়। হাইফংয়ে এবং কিয়েনএনে অবস্থিত ভিয়েটনাম সৈন্যের উপর বোমাও বর্ষণ করা হয়। অবশেষে ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি ফরাসী সৈন্য হানয়ে অবস্থিত ভিয়েটনাম মন্ত্রিসভার অফিস আক্রমণ করে। ইহা-ই হইল ইন্দোচীন-সংগ্রামের সুরু।

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্রান্স ভিয়েটমীন সৈন্যদিগকে হানয় অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয় এবং অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আরও উত্তরে বিতাড়িত করে। কিন্তু ভিয়েটমীন সৈন্যরা ফরাসী সৈন্যের সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় নাই। তা সত্ত্বেও ফ্রান্স বড় বড় কয়েকটি সহর ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও ভিয়েটমীন প্রজাতন্ত্রের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। ভিয়েটনামের অধিবাসীরা ফ্রান্সের বিরোধী। তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স ১৯৪৭ সালের জুলাই হইতে একটি তাঁবেদার ভিয়েটনাম গবর্ণমেণ্ট গঠন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকে। অবশেষে আনামের প্রাক্তন সম্রাট বাওদাইয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু বাওদাই গবর্ণমেণ্ট দ্বারা ফ্রান্সের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। তাঁহারা সমগ্র ভিয়েটনাম বাওদাইয়ের অধীনে আনিতে তো পারেন-ই নাই, শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র ইন্দোচীনই ফ্রান্সের হাতছাড়া হইবার উপক্রম

হয়। এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে উভয় পক্ষের বিপুল জনক্ষয় হইয়াছে। ফরাসী গবর্ণমেণ্টের হিসাব হইতে দেখা যায়, ফরাসী ইউনিয়ন বাহিনীর ৯২ হাজার সৈন্য নিহত হইয়াছে। তন্মধ্যে ফরাসী সৈন্যের সংখ্যা ১৯ হাজার। ইন্দোচীন-সৈন্য নিহত হইয়াছে প্রায় ৪৩ হাজার এবং ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সৈন্য এবং বিদেশী সৈন্য নিহত হইয়াছে ৩০ হাজার। ভিয়েটমীনদের পক্ষে নিহতের সংখ্যা আরও বেশী বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই সাত বৎসরের যুদ্ধে ফ্রান্সের ব্যয় হইয়াছে ২৮৫ কোটি ৩৩ লক্ষ ষ্টার্লিং। তন্মধ্যে ফ্রান্স যোগাইয়াছে ১৬৬ কোটি ১৮ লক্ষ ষ্টার্লিং। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে আসিয়াছে ১০৪৯ হাজার মিলিয়ন ফ্রাঁ। অবশিষ্ট খরচ বহন করিয়াছে ভিয়েটনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়া।

জেনেভা সম্মেলনে ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠন সম্পর্কে কোন মীমাংসা সম্ভব না হইলেও ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি হওয়া এই সম্মেলনের যে একটা বৃহৎ সাফল্য, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। দুই বৎসর পরে ঐক্যবদ্ধ ভিয়েটনাম গঠন সম্ভব হইবে কিনা সে-সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়। কিন্তু ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি হওয়ায় এক দিকে যেমন বিপুল লোকক্ষয় নিরোধ হইয়াছে তেমনি যুদ্ধ সম্প্রসারিত হওয়ার আশঙ্কাও নিবারিত হইয়াছে। যে-ভাবে ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি হইয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তাহা পছন্দ হয় নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য এই আশ্বাস দিয়াছে যে, বলপূর্ব্বক তাহারা এই যুদ্ধবিরতিকে বিপর্য্যস্ত করিবে না, কিম্বা উহা বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য হুমকীও দিবে না। মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ২১শে জুলাই (১৯৫৪) তাঁহার সাপ্তাহিক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, যুদ্ধবিরতি চুক্তির মধ্যে এমন কতকগুলি বিষয় আছে যে-গুলি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পছন্দ করে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই অপছন্দ হইতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভরসা করা কঠিন। ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া রক্ষা-ব্যবস্থা গঠনের তোড়জোড় পূর্ণ উদ্যমেই চলিতেছে।

যুদ্ধবিরতির পরে—

ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতির পর সুদূর প্রাচ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পাইবে বলিয়া যে-আশা করা গিয়াছিল তাহা পূর্ণ হয় নাই। যুদ্ধবিরতির অব্যবহিত পরেই একটি ঘটনা ঘটে ২৩শে জুলাই (১৯৫৪)। ঐদিন প্রাতে একটি বৃটিশ যাত্রীবাহী বিমানকে দুইখানি চীনা বিমান চিয়াং কাইশেকের বিমান বলিয়া ভ্রম করিয়া গুলী করিয়া ভূপাতিত করে। চীন গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ক্ষতিপূরণ দিতেও রাজী হন। বৃটেন অপেক্ষা মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রই এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করিয়া বেশ একটা ঘোরাল অবস্থা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে। এমন কি, একখানি মার্কিণ বিমান দুইখানি চীনা বিমানকে গুলী করিয়া ধ্বংস করে! অতঃপর ইহা লইয়া গুরুতর আর কিছু ঘটে নাই বটে, কিন্তু নানা ভাবে অবস্থাকে বিপজ্জনক করিয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টায় অগ্রগামী হইয়াছেন দক্ষিণ-কোরিয়ার প্রেসিডেণ্ট সিং ম্যান রী। গত ২৯শে জুলাই (১৯৫৪) মার্কিণ কংগ্রেসের উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন যে, চীনকে মুক্ত করিবার জন্য চীনের মূল ভূখণ্ড আক্রমণ করিতে ২০ লক্ষ সৈন্যের এশীয় বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র, বিমানবহর ও নৌবহর দিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য করা উচিত। ডাঃ রী এই উক্তির মধ্যে তাঁহার নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, না, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বেনামীতে এই উক্তি করিয়াছেন তাহা ভাবিবার কথা বটে! তিনি কোরিয়া যুদ্ধ পুনরায় আরম্ভ করারও পক্ষপাতী। জেনেভা সম্মেলনে কোরিয়া-সংক্রান্ত আলোচনা ব্যর্থ হওয়া তিনি ভয়ানক খুসী হইয়াছেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সোজাসুজি কোরিয়ায় পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পথে অনেক বাধা আছে। একক ইন্দোচীনের যুদ্ধেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অবতীর্ণ হইতে পারে নাই। জেনেভা সম্মেলন চলিতে থাকার সময়ই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে প্রজাতন্ত্রী চীনকে আসন দেওয়ার কথা উঠিয়াছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উহার তীব্র বিরোধিতা করিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে প্রজাতন্ত্রী চীনকে আসন দেওয়ার বিরোধিতা করা আর উহাকে আক্রমণের জন্য চিয়াং কাইশেককে সাহায্য করা একই ধরণের ব্যাপার বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। গত ২রা আগষ্ট (১৯৫৪) প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধান সেনাপতি জেঃ চু তে এক বেতার-বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ফরমোসা কর্তৃক চীনের উপকূলভাগ এবং দ্বীপগুলি আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, লোকদিগকে হত্যা করা হইতেছে, জেলেদের উপর লুঠ তরাজ চলিতেছে এবং প্যারাসুটের সাহায্যে গুপ্তচরদিগকে মূল ভূখণ্ডে অবতরণ করান হইতেছে। তিনি আরও অভিযোগ করিয়াছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বিমান ও যুদ্ধজাহাজ দিয়া চিয়াং কাইশেককে সাহায্য করিতেছে এবং মার্কিণ সামরিক মিশন চিয়াংয়ের সৈন্যদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তিনি এই অভিযোগও করিয়াছেন, মার্কিণ যুদ্ধজাহাজ ও বিমান চীনের আকাশে এবং সাগরে হানা দিতেছে। এই সকল অভিযোগ সমস্তই মিথ্যা ইহা মনে করিবার কোন কারণ আছে কি? অনেকে মনে করেন, ফরমোসা আক্রমণের জন্য চীন অত্যন্ত গোপনতার সহিত হাইনান দ্বীপে আয়োজন করিতেছে। চীনের প্রধান সেনাপতি বেতার-বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, চীনের জনগণ ফরমোসাকে মুক্ত করিবেই, অন্য কোন রাষ্ট্রকে উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু মার্কিণ সপ্তম নৌবহর দ্বারা ফরমোসা সুরক্ষিত রহিয়াছে, ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক।

ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি হওয়ায় পৃথিবী শান্তির পথে সত্যই এক পদ অগ্রসর হইয়াছে ইহা স্বীকার করা কঠিন। জেনেভা সম্মেলন চলিতে থাকা কালের প্রায় সমসময়ে নয়াদিল্লীতে নেহরু ও চৌ-এন-লাইয়ের মধ্যে এবং ওয়াশিংটনে আইসেনহাওয়ার ও চার্চ্চিলের মধ্যে যে আলোচনা হয়, এই উভয় আলোচনার লক্ষ্যই শান্তি। নেহরু-লাই ঘোষণায় কম্যুনিষ্ট ও অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলির পরস্পর পাশাপাশি অন্য দেশের সার্ব্বভৌম মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া এবং অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিয়া শান্তিতে বাস করিবার কথা আছে। কিন্তু আইসেনহাওয়ার চার্চ্চিল-ঘোষণায় একপ কোন কথা নাই। তাঁহাদের ঘোষণায় পরাধীন দেশগুলি মুক্ত করিবার যে কথা আছে তাহা বৃটিশ বা ফরাসী উপনিবেশগুলির

জীবনে এমন চমৎকার রান্না আগে কখনও করিনি …কিন্তু কি ক'রে হোলো তা বুঝলাম না!

সবকিছুই অন্যদিনের মতো ছিল। স্বামীর ফিরতে দেরী, ছেলেরা হাত ধুতে গিয়ে মারামারি, ইতিমধ্যে ছোট বাচ্চাটা আবার উঠে পড়লো। যাই হোক শেষ অবধি সবাই খেতে ব'সলো—খাবার পরিবেশন করলাম রোজকার মতই! হঠাৎ লক্ষ্য ক'রে দেখি কারো মুখে কথাটি নেই, সবাই খেতে ব্যস্ত—হাপুশ হুপুশ শব্দে সবাই খেয়ে যাচ্ছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল না—একি স্বপ্ন না সত্যি। কি এমন অসাধারণ কাজ করেছি যাতে এই পরিবর্ত্তন হোলো?

যে স্বামী, ছেলেমেয়েরা রান্না ভাল হয়নি ব'লে রোজ খুঁৎখুঁৎ করে, হঠাৎ তাদের আজ একি ব্যাপার? খাওয়া হ'য়ে গেলে ভাবতে বসলাম। বাজার নতুন কিছু কিনেছি ব'লে ত মনে প'ড়ছে না…তরিতরকারী, মাছ,…হ্যা হ্যা মনে প'ড়েছে, মনে প'ড়েছে একটা জিনিস শুধু নতুন কিনেছি বটে!

দোকানদারের পরামর্শে আজই সকালে বায়ুরোধক শীল-করা একটিন ডালডা বনস্পতি কিনে তাতেই রান্না করেছি। দোকানদার বলেছিল বটে যে ভাজায়, রান্না করায়, মিষ্টি তৈরীর কাজে, এক কথায় সবরকম রান্নার পক্ষেই ডালডা বনস্পতি আদর্শ। আরও বলেছিল ডালডা সবরকম খাবারের স্বাদগন্ধ ফুটিয়ে তোলে।

এতদিনে স্বামী আর ছেলেমেয়েদের ডালডা বনস্পতিতে আমার রাঁধা খাবার খাইয়ে যে খুসী করতে পেরেছি তা ভেবে আনন্দ হ'লো। ডালডা বনস্পতি সবরকম রান্নার পক্ষেই উৎকৃষ্ট আর এতে

খাবারের স্বাভাবিক স্বাদ-গন্ধ ফুটে ওঠে! রান্নার জন্য খুচরো স্নেহপদার্থ কিনে বিপদ ডেকে আনবেন না। মনে রাখবেন খুচরো ও খোলা অবস্থায় দামী জিনিষেও ভেজাল থাকতে পারে ও তাতে মশামাছি, ধুলোবালি প'ড়তে পারে। আর সেইরকম স্নেহপদার্থে তৈরী রান্না খেয়ে আপনার অসুখ বিসুখ ক'রতে পারে। ডালডা বনস্পতি সর্ব্বদা বায়ুরোধক, শীল-করা টিনে তাজা ও খাঁটি থাকে। ডালডা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল আর এতে খরচও কম! ফের যখন বাজার করতে বেরোবেন ডালডার কথা ভুলবেন না।

১০, ৫, ২, ১ ও ½ পাউণ্ড টিনে পাবেন।

ডালডায় এখন ভিটামিন এ ও ডি দেওয়া হয়।

বিনামূল্যে উপদেশের জন্য আজই লিখুন:

দি ডালডা
এ্যাডভাইসারি সার্ভিস
পোঃ বক্স নং ৩৫৩, বোম্বাই ১

ডালডা বনস্পতি

রাঁধতে ভালো - খরচ কম

গাছ মার্কা টিন
দেখে নেবেন

HVM. 218-X52 BG

স্বাধীনতা নয়, তাহা কম্যুনিষ্ট দেশগুলিকে মুক্ত করিবার হুমকী। আইসেনহাওয়ার-চার্চিল ঘোষণার সহিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া রক্ষা-ব্যবস্থা গঠনের সম্বন্ধ যে অবিচ্ছেদ্য, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

জেনেভা সম্মেলনের প্রাক্কালেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া রক্ষা-ব্যবস্থা গঠনের প্রস্তাব করে। বৃটেন জেনেভা সম্মেলনের ফলাফল না দেখিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া রক্ষা-ব্যবস্থা গঠনে রাজী হয় নাই বটে, কিন্তু উহার মূলনীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। জেনেভা সম্মেলন চলার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া রক্ষা-ব্যবস্থা গঠনের প্রস্তুতি। গত জুন মাসে ওয়াশিংটনে স্যার উইনষ্টন চার্চিল ও প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের মধ্যে যে-আলোচনা হয় তাহাতে জেনেভা সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিতই হউক আর ব্যর্থই হউক দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া রক্ষা-ব্যবস্থা গঠনের জন্য প্রস্তুতি চালাইয়া যাওয়া সম্পর্কে তাঁহারা উভয়েই একমত হইয়াছিলেন। জেনেভা সম্মেলনে ইন্দোচীন-আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার এক সপ্তাহ পার হইতে না হইতেই দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া রক্ষা-ব্যবস্থা গঠনের নূতন স্তর সুরু করা হইয়াছে।

গত ৩১শে জুলাই (১৯৫৪) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া রক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে বাগুইয়োতে এক সম্মেলনে যোগদানের জন্য বৃটেন কলম্বো শক্তিবর্গকে অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ এবং ইন্দোনেশিয়াকে আমন্ত্রণ-পত্র প্রদান করেন। সিংহলের প্রধান মন্ত্রী স্যার জন কোটেলেওয়ালা প্রস্তাব করেন যে, ঐরূপ সম্মেলনে যোগদানের পূর্ব্বে উক্ত রক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্য কলম্বো শক্তিবর্গের এক সম্মেলন হওয়া আবশ্যক। যতটুকু জানা যাইতেছে তাহাতে প্রকাশ, ভারত পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী-গোষ্ঠী প্রবর্ত্তিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এশিয়া রক্ষা-ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনায় যোগ দিতে অসামর্থ্য জানাইয়াছেন। ইন্দোনেশিয়াও ঐ সম্মেলনে যোগদান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। সিংহলও নাকি ঐ আলোচনায় যোগ দিতে অনিচ্ছুক। ব্রহ্মদেশও নাকি রাজী নয়। পাকিস্তান এই আলোচনায় যোগদান করিতে রাজী আছে বলিয়া প্রকাশ। দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এশিয়া রক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্য সিংহলের প্রধান মন্ত্রী কলম্বো শক্তিগুলির সম্মেলনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহরুজী উহাকে অ-সময়োচিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইন্দোনেশিয়া এই বৈঠকে যোগদান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। ব্রহ্মদেশ জানাইয়াছে যে, তাহার কোন আপত্তি নাই। পাকিস্তান যোগদানে সম্মতি জানাইয়াছে।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া চুক্তি-সংস্থা সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মতের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই চুক্তি-সংস্থায় সামরিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরেই জোর দেওয়া হইবে। মিঃ ডালেস-ও এই রকম কথাই বলিয়াছেন। মার্কিণ সিনেটে যে-ভাবে বৈদেশিক সাহায্য-পরিকল্পনাকে ছাঁটকাট করিয়াছে তাহাতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া চুক্তি-সংস্থা সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মতের পরিবর্ত্তন হওয়া সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড এশিয়ার দেশ হইলেও উহারা পাশ্চাত্য শক্তির মধ্যেই গণ্য। থাইল্যাণ্ড ও ফিলিপাইন আমেরিকার তাঁবেদার মাত্র। পাকিস্তানের সহিত আমেরিকার সামরিক চুক্তি হওয়ায় পাকিস্তানেরও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সুতরাং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া চুক্তি-সংস্থা গঠনের যে আয়োজন চলিতেছে তাহা এশিয়াবাসীর ভাগ্য নির্দ্ধারণের ব্যাপারে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা মাত্র। ইহাতে এশিয়ায় শান্তির পরিবর্ত্তে যুদ্ধের আশঙ্কাই তীব্র হইয়া উঠিবে।

সুয়েজখাল ও ইরাণের তৈল—

অবশেষে সুয়েজ খাল ও ইরাণের তৈল সম্পর্কেও মীমাংসা হওয়া সম্ভব হইয়াছে। গত ২৭শে জুলাই মিশর এবং বৃটেনের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে এবং ৫ই আগষ্ট (১৯৫৪) ইরাণ গবর্ণমেণ্ট এবং আটটি আন্তর্জ্জাতিক তৈল কোম্পানী লইয়া গঠিত সংস্থার (consortium) মধ্যে ইরাণের তৈল সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। মিশরে এবং ইরাণে সামরিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই চুক্তি দুইটি সম্পাদিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে কি না, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চাপ এই চুক্তি সম্পাদনে কতটুকু সাহায্য করিয়াছে তাহা আমাদের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। সুয়েজ খাল সংক্রান্ত চুক্তি ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসেই সম্পাদিত হইতে পারিত। কিন্তু বৃটেন দাবী করিয়াছিল যে, শান্তির সময়ে ঘাঁটি পরিদর্শনের জন্য ৩ হাজার বৃটিশ টেকনিশিয়ান থাকিবে এবং তাহারা বৃটিশ সৈন্যের উর্দ্দী পরিধান করিবে। ইহার জন্য বৃটেন জেদ না ধরিলে অনেক পূর্ব্বেই সুয়েজ খাল সংক্রান্ত চুক্তি হওয়া সম্ভব হইত। ইরাণের তৈলশিল্প সম্পর্কে জাতীয়তাবাদীদের যে-দাবী ছিল বর্ত্তমান চুক্তি দ্বারা তাহা পূরণ হয় নাই, ইরাণের তৈলশিল্পের উপর বৈদেশিক প্রভুত্ব রহিয়াই গেল।

মিশর এবং বৃটেনের মধ্যে সুয়েজ খাল সম্পর্কে মীমাংসা হইয়া যে নূতন চুক্তি হইয়াছে তাহা সাত বৎসর স্থায়ী হইবে। সুয়েজ খাল অঞ্চলে বৃটেনের ৭৩ হাজার সৈন্য রহিয়াছে। বৃটেন ২০ মাসে এই সৈন্য অপসারণ করিবে। সুয়েজ খাল ঘাঁটি তদারকের ভার থাকিবে অসামরিক বৃটিশ ঠিকাদারী ফার্ম্মের উপর। আরব রাষ্ট্রগুলি কিম্বা তুরস্ক আক্রান্ত হইলে বৃটিশ আবার সুয়েজ খাল অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ করিতে পারিবে। এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরেই মার্কিণ সাহায্য সম্পর্কে মিশর ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। মিশর মধ্যপ্রাচীতে বিশেষ করিয়া আরব রাষ্ট্রগুলির উপর নেতৃত্ব করিতে চায়। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে মার্কিণ সাহায্য ব্যতীত এই নেতৃত্বলাভ মিশরের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার সুয়েজ খাল সম্পর্কে বৃটেনের সঙ্গে মীমাংসা না হইলে মার্কিণ সামরিক সাহায্য পাওয়াও সম্ভব নয়। এদিকে মার্কিণ সামরিক সাহায্য পাইয়া পাকিস্তান মুসলিম-জগতে তাহার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইয়াছে। সুয়েজ খাল সম্পর্কে মীমাংসা হওয়ায় মার্কিণ সামরিক সাহায্য পাওয়া সম্পর্কে মিশরের আশা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। সেই সঙ্গে সমগ্র মধ্যপ্রাচীতে মার্কিণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে।

মোসাদ্দেক গবর্ণমেণ্ট ১৯৫১ সালে ইরাণের তৈলশিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেন এবং এংলো-ইরাণীয়ান কোম্পানীর তৈলশোধন কারখানা বন্ধ হয়। বর্ত্তমানে তৈলশিল্প সম্পর্কে মীমাংসা হইয়া যে-চুক্তি হইয়াছে তাহাতে ইরাণের তৈলশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত থাকা নীতিগত দিক

হইতে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ ইরাণের তৈলশিল্প পরিচালনা ও উৎপন্ন তৈল বাজারে চালান দেওয়ার সমগ্র কর্তৃত্ব থাকিবে অ-ইরাণীয় কোম্পানীর হাতে। দক্ষিণ ইরাণের তৈলশিল্পের কর্তৃত্ব-ভার আটটি কোম্পানী লইয়া গঠিত কনসরটিয়াম কর্তৃক গৃহীত হইবে। ইহাদিগকে লইয়া দুইটি কোম্পানী গঠিত হইবে। তাহারাই ইরাণ গবর্ণমেণ্ট এবং ন্যাশন্যাল ইরাণীয়ান অয়েল কোম্পানীর পক্ষে তৈলশিল্প পরিচালন করিবে। ডাঃ মোসাদ্দেকের আমলে এংলো-ইরাণীয়ান কোম্পানীকে দেয় ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন মীমাংসার পথে বড় বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। ডাঃ মোসাদ্দেক ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী ছিলেন। কিন্তু উক্ত কোম্পানী ভবিষ্য লাভ হইতে বঞ্চিত হওয়ার দরুণও ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়াছিল। ডাঃ মোসাদ্দেক তাহা দিতে রাজী হন নাই। বর্ত্তমানে যে মীমাংসা হইয়াছে তাহাতেও উক্ত কোম্পানী ঐরূপ কোন ক্ষতিপূরণ পাইবে না। তাহারা মোট ক্ষতিপূরণ পাইবে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। দশ বৎসরে দশটি সমান কিস্তীতে ঐ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। ইরাণের তৈলশিল্প সম্পর্কে মীমাংসা হইল বটে, কিন্তু উহার উপর বিদেশী প্রভুত্ব রহিয়াই গেল। ইরাণে জাহেদী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই এইরূপ চুক্তি সম্ভব হইয়াছে।

টিউনিশিয়া ও মরক্কো—

ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মেণ্ডেস ফ্রাঁস ইন্দোচীন যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনের পরেই উত্তর-আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশ টিউনিশিয়ার জন্য শাসন-সংস্কার ঘোষণা করেন। এই শাসন-সংস্কারের ঘোষণা করিবার জন্য তিনি বিমানযোগে টিউনিশিয়ায় গিয়াছিলেন। গত তিন বৎসর ধরিয়া ফ্রান্স টিউনিশিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য যে-চেষ্টা করিয়াছে তাহার একটিও টিউনিশিয়ার জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল নিও-দস্তুর পার্টির পছন্দ হয় নাই। গত মার্চ্চ মাসে শাসন-সংস্কারের শেষ দফা প্রস্তাব দেওয়ার পর হইতে টিউনিশিয়ায় গুরুতর হাঙ্গামা চলিয়া আসিতেছে। মঃ মেণ্ডেস ফ্রাঁস যে স্বায়ত্বশাসন ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে টিউনিশিয়ার জনগণ সার্ব্বভৌম কর্তৃত্ব লাভ করিবে। টিউনিশিয়ায় যে-সকল ফরাসী আছে নিজেদের এসেম্বলীতে তাহাদের প্রতিনিধি থাকিবে। এই এসেম্বলী ফরাসী রেসিডেণ্ট জেনারেলের নিকট দায়ী থাকিবে, কিন্তু টিউনিশিয়ার শাসন পরিচালনের সহিত উহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। ইহা হইতে টিউনিশিয়াস্থিত ফরাসীদের রাজনৈতিক মর্য্যাদার স্বরূপটি বুঝা যাইতেছে না। তাহারা কি টিউনিশিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিয়া সার্ব্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করিবে? তাহা হইলে ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা ভাবিবার কথা বটে।

ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী টিউনিশিয়ার জন্য যে স্বায়ত্ত-শাসন ঘোষণা করিয়াছেন তাহা নানা দিক দিয়াই খুব অস্পষ্ট এবং মহম্মদ বরগুইব প্রভৃতি নিও-দস্তুর নেতাদিগকে মুক্তি দিবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। অধিকন্তু জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাসবাদীদিগকে দৃঢ় হস্তে দমন করিবার হুমকী দেওয়া হইয়াছে। টিউনিশের যে ১০ জন

মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য মঃ তাহের বেন আম্মারকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। এই মনোনীত প্রধান মন্ত্রী নিজে একজন নরমপন্থী। নিজকে সহ যে দশ জন মন্ত্রীর নাম তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে নিওদস্তুর পার্টির সদস্য আছেন চারি জন। এই মন্ত্রিসভা স্বায়ত্ত-শাসনের খুঁটিনাটি ব্যাপার লইয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা চালাইবেন। সুতরাং টিউনিশিয়ার এই স্বায়ত্ত-শাসনের প্রকৃত স্বরূপটি যে কি, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। সন্ত্রাসবাদের অজুহাতে জাতীয়তাবাদীদিগকে যদি দমন করার ব্যবস্থা হয় তবে রাজনৈতিক দিক দিয়া টিউনিশিয়া সমস্যার সমাধান ব্যাহত হইবে। টিউনিশিয়াকে স্বায়ত্ত-শাসন দিতে ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রীর যদি প্রকৃত অভিপ্রায়ই থাকিবে, তাহা হইলে নিওদস্তুর পার্টির হাতে তিনি ক্ষমতা দিলেন না কেন? এই প্রশ্নের গুরুত্ব উপেক্ষা করা যায় না।

ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী তবু যা হোক টিউনিশিয়াকে স্বায়ত্ত-শাসন দিবার একটা প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু মরক্কো সম্বন্ধে তাহাও করা হয় নাই। কেন করা হয় নাই—তাহা দুর্বোধ্য বলিয়াই মনে হয়। সম্প্রতি মরক্কোর রাবাতের নিকটবর্ত্তী—পোর্টলিওয়াওটে গুরুতর হাঙ্গামা হইয়া গেল। তাহা যে স্বাধীনতা দাবীরই বিক্ষুব্ধ আত্মপ্রকাশ, এ কথা ফরাসী সরকারের উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এই হাঙ্গামার বিবরণ দিবার এখানে স্থানাভাব। নির্ব্বাসিত সুলতানের প্রত্যাবর্ত্তনের দাবী করিয়া ইস্তিকলাল পার্টি সমগ্র দেশে সাত দিনব্যাপী যে ধর্ম্মঘট আহ্বান করেন তাহাকে উপলক্ষ করিয়া এই হাঙ্গামার উদ্ভব হয়। গত বৎসর ফরাসী গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত কুটকৌশল অবলম্বন করিয়া মরক্কোর সুলতানকে গদীচ্যুত করিয়া নির্ব্বাসিত করেন। তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ ফরাসী গবর্ণমেণ্ট পছন্দ করিতেন না। তিনি অনেক সময় ফরাসী সরকারের হুকুম পালন করিতে অস্বীকার করিবার দুঃসাহস প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্ব্বশক্তিমান ফরাসী গবর্ণমেণ্টও খুব সহজে তাঁহাকে অপসারণ করিতে পারেন নাই। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমে গৃহযুদ্ধ বাধাইবার উস্কানী দেন। পরে এই গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা দূর করিবার অছিলায় তাঁহাকে গদীচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করা হয়। কিন্তু ইহাতে মরক্কোর কোন সমস্যারই সমাধান হয় নাই। নির্বাসিত সুলতানের প্রতি জনগণের আনুগত্য অক্ষুন্নই রহিয়াছে। মরক্কোর আসল সমস্যাটা বিদেশী শাসন হইতে মুক্তির সমস্যা।

ডাচ-ইন্দোনেশীয় ইউনিয়নের অবসান—

হল্যাণ্ডের সহিত ইন্দোনেশিয়ার সংযোগ-সূত্র ডাচ্-ইন্দোনেশীয় ইউনিয়নের অবশেষে অবসান হইয়াছে। ইন্দোনেশীয় গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অনুযায়ী গত ২৯শে জুন (১৯৫৪) হেগে এ সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়। প্রায় ছয় সপ্তাহব্যাপী আলোচনার পর গত ১০ই আগষ্ট চুক্তি সম্পাদিত হয়। হেগে অনুষ্ঠিত গোলবৈঠকে সম্পাদিত যে চুক্তি অনুযায়ী ইন্দোনেশিয়া ১৯৪৯ সালে স্বাধীনতা লাভ করে, তাহা দ্বারাই ডাচ্-ইন্দোনেশীয় ইউনিয়ন গঠিত হয়। আলোচ্য চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় এই ইউনিয়নের অবসান হইল এবং ইউনিয়ন ষ্টেটিউট এবং তৎসংক্রান্ত তিনটি চুক্তি বাতিল হইয়া গেল। ঔপনিবেশিক সম্পর্কের শেষ সূত্র ছিন্ন হওয়ায় হল্যাণ্ডের সহিত ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্ক আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে দুইটি সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের সম্পর্ক যে-ভাবে সাধারণতঃ নির্দ্ধারিত হয়, সেই ভাবেই নির্দ্ধারিত হইবে। এই চুক্তির সম্পূর্ণ বিবরণ অবশ্য প্রকাশিত হয় নাই। তবে যেটুকু প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, ইন্দোনেশিয়ায় হল্যাণ্ডের স্বার্থ ন্যায়সঙ্গত ভাবে রক্ষা করা হইবে।

ডাচ্-ইন্দোনেশীয় ইউনিয়নের অবসান হওয়ায় ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা যে পূর্ণাঙ্গ হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য ইহাতেই ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল সমস্যার অবসান হইল তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাছাড়া পশ্চিম নিউগিনি সমস্যার কোন সমাধান এই চুক্তি দ্বারা হয় নাই। এই আলোচনা-বৈঠকে ডাচ গবর্ণমেণ্ট পশ্চিম নিউগিনি সম্পর্কে কোন আলোচনা করিতেই রাজী হন নাই। হল্যাণ্ড পশ্চিম নিউগিনির উপর অধিকার ছাড়িতে রাজী নহে।

শাশ্বতী

সুশীলকুমার গুপ্ত

এত যুদ্ধ-মারী-বন্যা হ'য়ে যায়, তবুও তোমাকে
এখনো ভুলিনি; তাই আকাশের গভীর নীলিমা
দু' চোখে ছড়ায় স্বপ্ন; জীবনের ক্ষুব্ধ যন্ত্রণাকে
এখনো ভোলাতে পারে নাগরিক চাঁদের মহিমা
দরিদ্র গলির পরে; সহসা উন্মনা হ'য়ে যাই
খাঁচায় পাখীর ডাকে কেঁপে-ওঠা সোনালী প্রহরে;
আকাশে তারার চোখে হারানো দৃষ্টিকে খুঁজে পাই;
এখনো কবিতা শুনি রাত্রে ঝিঁঝি-শিশিরের স্বরে।

তোমাকে ভোলার পণে সহরের লোহা-কাঠ-শানে
হোক যত আয়োজন, তোমার প্রেমকে দূরে ঠেলে।
পরিখা-প্রাচীর গ'ড়ে হানাহানি ভাগাভাগি হোক;
তবুও তোমার ডাক, প্রেমময় সঙ্গীত-আলোকে
সব ব্যর্থ বাধা মুছে বুকে বুকে প্রেম দেয় জ্বেলে;
ভোলার বিফল চেষ্টা তোমাকেই কাছে টেনে আনে।

কেশ প্রসঙ্গে তাঁরা ক্যালকেমিকোর মধুর সুগন্ধি কেশতৈল **ক্যাষ্টরল** এর কথা আলোচনা করেন। নারী-সৌন্দর্য্যের যে দুর্নিবার আকর্ষণ, তার অনেকখানি পুষ্পমাল্যের মত জড়িয়ে থাকে তাঁদের চাঁচর চিকুরে।

ক্যাষ্টরল ব্যবহারে কেশশ্রী অপরূপ উৎকর্ষ লাভ করে; কারণ ইহা বিশুদ্ধ ও পরিস্রুত ক্যাষ্টর অয়েল হইতে প্রস্তুত। ইহার সুবাস চিত্তকে প্রসন্ন করে।

৫ ও ১০ আউন্স শিশিতে পাওয়া যায়।
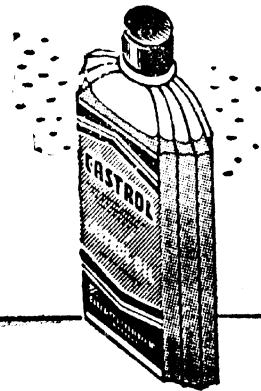
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

বেতার-কেন্দ্র অর্থে স্কুল-কলেজ নয়

কলকাতা বেতার-কেন্দ্র শুনতে শুনতে কোন দিন আপনার মনে হয়নি, আপনি কোন স্কুলের কিংবা কলেজের বেঞ্চিতে বসে লেকচার শুনছেন ? আপনি যদি পুরুষ হন, তা হ'লে নিশ্চয়ই নিজেকে তখন মনে করবেন একজন সুবাধ্য ছাত্র। আর যদি মহিলা হন, নিজেকে মনে হবে ছাত্রী। আমাদের অন্ততঃ তাইতো মনে হয়। গত কয়েক মাস ধ'রে কলকাতা কেন্দ্র থেকে যে ধরনের সব ভাষণ আর কথিকা পাঠ ক'রে শোনানো হচ্ছে, সেগুলি স্কুল-কলেজের ছাপানো ম্যাগাজিনেই শোভা পায় না কি ? রেডিওর কথিকা বা ভাষণ আর ছাত্রপাঠ্য রচনা যে এক বস্তু নয়, তা সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু কলকাতা বেতার-কেন্দ্র এ কথাটি স্বীকার করতে চান না। আর তাই চান না বলেই দিনের পর দিন ধ'রে অল্পখ্যাত অধ্যাপক, উটকো সাহিত্যিক আর মাথামোটা সম্পাদকদের ডাকিয়ে কলেজী রচনা পাঠের ব্যবস্থা হচ্ছে বেতার-কেন্দ্রে। বেতারের সকল শ্রোতাই এমন কিছু ছাত্র-ছাত্রী নয়, তবুও সমগ্র দেশবাসীর প্রতি কেন যে এই অবিচার কে জানে ! মাথামুণ্ডহীন সাহিত্যিক বিশ্লেষণ মানেই অধ্যাপনা নয়, কাগজে দু'কলম লেখা ছাপা হ'লেই যে কেউ সাহিত্যিক হয় না, তেমনি কোন কাগজের সম্পাদক অর্থেই সে সবজান্তা নয়। সুতরাং উত্তমশীল অধ্যাপক, খবরের কাগজের সাহিত্যিক আর পত্র-পত্রিকার বিদ্যাবুদ্ধিহীন সম্পাদকদের ডেকে ডেকে গাধার ডাক শুনিয়ে কি ফল পান বেতার-কেন্দ্র ?

এতে সুবিধা এই, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র দেখে ভাষণের বিষয় ঠিক করা যায়, কলেজের ম্যাগাজিন থেকে ভাষণের বিষয় চুরি করা যায়। কিন্তু বাঙলা দেশে এই মূর্খামি আর কত দিন প্রশ্রয় পাবে ? বাঙলা ও বাঙালীকে কি সত্যি এতই নির্বোধ মনে করেন বেতার-কেন্দ্র ? তৎভব আর তৎসমের পার্থক্য শিখেছি আমরা বিদ্যালয়ে। বেতার-কেন্দ্র থেকে সম্প্রতি আবার সেই শিক্ষা পাওয়া গেল।

স্বাক্ষরিত পুস্তক সমালোচনা

মাসে মাসে পত্র-পত্রিকাদিতে দেখা যায়, কোনো বিশেষ ধরণের গ্রন্থের স্বাক্ষরিত সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে, এতদ্দ্বারা বইটি যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা প্রমাণ করার একটা প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা আছে। সাধারণতঃ যে সব সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রে নামহীন সমালোচনা প্রকাশিত হয়ে থাকে সেখানে সহসা সম্পাদক-নামাঙ্কিত সমালোচনা দেখা গেলে পাঠক চমকিত হয়। সংবাদপত্র সম্পাদকরা যেন সকল বিষয়েই এক্সপার্ট বা বিশেষজ্ঞ, তাই সরিষার তৈল থেকে সংসাহিত্য পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই তাঁদের অভিমত দেওয়ার অধিকার আছে। এতদ্দ্বারা সাহিত্য-পাঠকের পক্ষে গ্রন্থ নির্বাচন করার অসুবিধা হয় সন্দেহ নেই। কয়েকটি বিখ্যাত মাসিকপত্রে নামসহিযুক্ত সমালোচনা প্রকাশের রীতি আছে,—সে বন্দোবস্ত ভালোই, কারণ সেখানে সম্পাদক বিভিন্ন সমালোচকগণের কাছে গ্রন্থগুলি পাঠিয়ে অভিমত সংগ্রহ করেন এবং সমালোচকও স্বাক্ষরিত সমালোচনার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য। ইংরাজী সাহিত্যের সমালোচক জেমস এ্যাগেট লিখিত সমালোচনা পড়ার জন্য পাঠকরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন, এডমণ্ড গস্‌, ডেস্‌মণ্ড ম্যাক্‌কার্থীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনাও উল্লেখযোগ্য। দি নিউ ষ্টেটসম্যান এ্যাণ্ড নেশন পত্রিকার সাহিত্য-সম্পাদক ডি. এস. প্রিটচেটও স্বাক্ষরিত সমালোচনা প্রকাশ করতেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সমালোচনা কি বেনামা প্রকাশিত হবে ? অনেক পত্রিকায় যথা টাইমস লিটারারী সাপ্লিমেন্ট-এ বেনামা সমালোচনা প্রকাশিত হয়ে থাকে,—"পাঞ্চ" পত্রিকায় থাকে সমালোচকের নামের আদ্যক্ষর। মার্কিণ পত্রিকা 'টাইমে' সমালোচনার সঙ্গে থাকে গ্রন্থকারের জীবনের ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি। সমালোচনাও যে সাহিত্য-কর্ম হ'তে পারে তার প্রমাণ ডেসমণ্ড ম্যাককার্থী,—সম্প্রতি নিউ ষ্টেটসম্যান এ্যাণ্ড নেশন পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থের স্বাক্ষরিত সমালোচনার এক সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং যদি বিশেষজ্ঞ দিয়ে বিশেষ ধরণের গ্রন্থের স্বাক্ষরিত সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহলে সব দিক দিয়ে ভালোই হয়।

এক সঙ্গে পাঁচ-সাতখানি বই ধরে সমালোচনা করাও অন্যায়, কারণ, তদ্দ্বারা কারো প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়। পরস্পর পিঠ চুলকানির ভঙ্গীতে কোনো সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখকদের যে সুদীর্ঘ সমালোচনা মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয় তার নাম প্রশস্তি, সমালোচনা নয়। অনেকের ধারণা, সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রিকাদিতে সমালোচনা প্রকাশিত হলে সেই গ্রন্থের প্রচারে সুবিধা হয়। কিছু হয় সত্য, তবে বিশেষ প্রচার হয় 'হুইস্‌পারিং ক্যাম্‌পেন' বা মুখে মুখে প্রচারিত প্রশংসায়। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে এই পদ্ধতিটি বিশেষ চালু হয়েছে।

বইএর মলাট আর লেখকের ললাট

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য-গ্রন্থের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, বইএর মলাট সম্পর্কে আমাদের প্রকাশকগণ অনেক সচেতন হয়েছেন, অর্থাৎ চকোলেটের বা সাবানের বাক্স যেমন চিত্তাকর্ষক করে ক্রেতাদের মন ভোলানোর

চেষ্টা করা হয়, তেমনই বইএর মলাট সুশ্রী করার দিকে এদিনের প্রকাশক মহলের আগ্রহ বেশী। কেউ কেউ তিন বা ততোধিক রঙের মলাট ছাপাচ্ছেন, সোনা-রূপার অলংকরণও দেখা যাচ্ছে। প্রধানত: আশু বন্দ্যোপাধ্যায়, খালেদ চৌধুরী, মণীন্দ্র মিত্র, পূর্ণেন্দু পত্রী, অজিত গুপ্ত, রঘুনাথ, সমীর সরকার প্রভৃতি মলাট-শিল্পীরাই এই সব প্রচ্ছদ-চিত্র এঁকে থাকেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্নদা মুন্সী, মাখন দত্তগুপ্ত, সত্যজিৎ রায় এবং সূর্য্য রায়ও এঁকে থাকেন। শেষোক্ত শিল্পীরা কমার্সিয়াল আর্টের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর, তাই তাঁদের আঁকা মলাট কম দেখা যায়। কিন্তু মলাটের ঐ ছবিটুকুই ক্রেতার চরম লাভ। যুদ্ধের সময় কাপড়ের অভাব হওয়াতে জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে প্রকাশকরা কাগজের মলাট ব্যবহার করতে সুরু করেন, তার পর যুদ্ধ থেমেছে, কাপড়ের রেশন উঠে গেছে, সম্ভবত মলাটে ব্যবহারের উপযোগী কাপড়ও হয়ত দুর্লভ নয়, তবু সাত-আট টাকা দামের গল্প-উপন্যাসের বইএরও সেই কাগজের মলাট। ফলে একখানি বই পড়ে শেষ করার সঙ্গেই তার মলাটের "পুট" ফাটতে সুরু হয়, তার পর আর তার সেই চকোলেট-মার্কা বাহার থাকে না। পাঠাগার-কর্তৃপক্ষের সমূহ বিপদ, একখানি বই চু-চার জন গ্রাহকের হাত ফিরলেই তাকে আর চেনা যায় না। একটি সাধারণ গল্প বা উপন্যাসের গ্রন্থের দাম তিন থেকে সাত-আট টাকা পর্য্যন্ত,—এত খরচ করেই যদি ছাপা ছবি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যায়, একটু লাভের মাত্রা কমিয়ে মলাটে কাপড় দেওয়ার প্রথাটা কি আবার চালু করা যায় না? হাতের কাছে রয়েছে সর্বজনপরিচিত সাড়ে ছ' টাকা দামের 'চন্দ্রিকা' (৬৭০ পৃষ্ঠা), কাপড়ের মলাট। প্রশ্ন এই, যদি এই গ্রন্থটি এই দামে এই রকম মলাটে দেওয়া যায় তাহ'লে অন্য বইও দেওয়া সম্ভব নয় কেন? লেখকের ললাটে আর বইএর মলাটে বই কাটে সত্য, কিন্তু সদ্‌গ্রন্থের বহুল প্রচারের জন্য শুধু চাকচিক্যময় মলাট দিলেই চলবে না, একটু মজবুত মলাট চাই, দাম কিন্তু আর একটু কমালেই ভালো হয়। লেখকের ললাটের সঙ্গে প্রকাশকের ললাটও ত' একই সূত্রে জড়িত।

বইয়ের বিজ্ঞাপন

বইয়ের বিজ্ঞাপনের 'আঙ্গিক' অবশ্য কিছু বদলেছে, ইদানীং অনেক রকমের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। কিন্তু বইয়ের বিজ্ঞাপন এবং জমি বিক্রয় বা কর্মখালির বিজ্ঞাপন যে এক নয়, এ কথা অনেক প্রকাশকই খেয়াল রাখেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিরক্তিভরে একেবারে শেষ মুহূর্তে প্রকাশকরা বিজ্ঞাপনের 'কপি' পাঠান। এই সব 'কপি' কোনো বিশেষজ্ঞের রচনা নয়, স্বয়ং প্রকাশক বা তাঁর কর্মচারী এটি পেনসিল বা কালিতে লিখে প্রেসে পাঠিয়ে দেন। এক পাতা ঠাস বুনোনের প্রেস টাইপের বিজ্ঞাপন, যতগুলি গ্রন্থ তাঁরা প্রকাশ করেছেন সবগুলি না দিলে মন ভরে না, ফলে ক্রেতাকে খুঁজে বার করতে হবে কোন্‌টি উপন্যাস, কোন্‌টি প্রবন্ধ, কোন্‌টি গল্প, কোন্‌টি সদ্য-প্রকাশিত, কোন্‌টি চতুর্থ সংস্করণ, কারণ সবই ত' এক সঙ্গে একই রকম টাইপে পাশাপাশি সাজানো।—প্রকাশক তাঁর সম্পূর্ণ ক্যাটালগটাই ত' আপনার সামনে মেলে ধরেছেন, যদি আপনার চোখে না পড়ে সে দোষ কি তাঁর? পাঠকের ক্লান্ত দৃষ্টি পরিচিত সেই

একই টাইপের বিজ্ঞাপনে পড়ে বই কি, কিন্তু বিরক্ত হয়ে সে নতুন কিছুর সন্ধানে পাতা ওলটায়। কার মাথাব্যথা আছে পূর্ণপৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনের নূতন-পুরাতন গ্রন্থের ক্যাটালগ পড়তে। এই ধরণের বিজ্ঞাপন যে অযথা অর্থব্যয়, এ কথা কে তাঁদের বোঝাবে? অথচ ঐ পৃষ্ঠাটিকে কত সুন্দর করে, সুনির্বাচিত কয়েকটি কম কথায় অল্প জায়গায় কতগুলি বইএর সংবাদ জানানো যায়। পাঠকের আগ্রহ তাতে স্বভাবতঃই বাড়ে। দুঃখের বিষয় "বই বিক্রী হয় না" এই নাকিসুরের কান্না আজো কানে আসে।— অথচ চোখের সামনে দেখি, যাঁরা সার্থক বিজ্ঞাপনের কৌশল জানেন তাঁদের বই কাটেও বেশী। এই প্রসঙ্গে আমরা অতীতে মন্তব্য করেছি, প্রয়োজন বোধে পুনরায় এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিজ্ঞাপনের ধারা পাল্টান—বই বেশী বিক্রী হবেই। বাংলা বইয়ের ক্রেতার অভাব নেই, কেবল বই বিক্রী করতে জানা লোকের অভাব।

নূতন প্রকাশক

প্রতিদিনই নূতন প্রকাশকের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত হয়ত এসপ্লানেডের হকার্স কর্ণারের কাছাকাছি 'বুক কর্ণার' তৈরী করার প্রয়োজন হবে। নূতন প্রকাশক কিন্তু পুরাতন লেখকের দিকেই চোখ রাখেন, কারণ তাঁরা ইতিমধ্যেই খ্যাতি লাভ করেছেন, তাদের বই ছাপলে দায়িত্ব কম, লেখকের নামে বই কাটবে, লাভ হবে, গাড়ি-বাড়ি হওয়াও বিচিত্র নয়। ফলে পরিচিত যে সব লেখক আছেন তাঁদের কাছে এঁরা গলবস্ত্র হয়ে 'নতুন বই'এর দাবী জানান, যাঁরা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী অর্থাৎ অর্থ বলে বলীয়ান্, তাঁরা দু'-চার জনকে 'দাদন' দিয়ে রাখছেন, মোটর কিনে দিচ্ছেন ভবিষ্যতের আশায়। ফলে লেখকরা, (অবশ্য মুষ্টিমেয় কয়েক জন) ইদানীং ভালোই আছেন, এবং দাদনের কিস্তি মেটানোর জন্য নেহাৎ তাগিদের খাতিরে যা প্রাণ চায় তাই লিখে দিয়ে দায়মুক্ত হচ্ছেন, ফলে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে না।—এখনও এ দেশে সাহিত্য-কর্ম একমাত্র কর্ম (wholetime job) হিসাবে লেখকরা গ্রহণ করেননি। দু'-এক জন ভাগ্যবান সাহিত্যিক ভিন্ন অনেক কৃতী সাহিত্যিককে অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা এবং কেরাণিগিরি করতে হয়। সুতরাং এই অবস্থায় মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনা স্বভাবতই কমে আসে। নূতন লেখকদের মধ্যে যাঁদের প্রতিশ্রুতি আছে তাঁদের নিয়েই নূতন প্রকাশকের পাড়ি দেওয়া উচিত। নূতন আবিষ্কারে আনন্দ আছে কৃতিত্ব আছে, গৌরব আছে। চিরাচরিত প্রথায় শুধু উপন্যাস না ছেপে গল্প, রম্যকাহিনী, সরস প্রবন্ধ এবং বিবিধ শিক্ষণীয় গ্রন্থও প্রকাশ করে প্রচার করা সম্ভব এবং তাতেও নিশ্চয়ই লাভ হতে পারে। এদিনের পাঠকের রুচির পরিবর্তন ঘটছে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অনেক নূতন প্রকাশক মূল গ্রন্থ দুর্লভ হওয়ায় কেবলমাত্র অনুবাদ-গ্রন্থই প্রকাশ করছেন। অনুবাদে স্বদেশীয় সাহিত্য সমৃদ্ধ হয় নেই, কিন্তু তার পিছনে সুচিন্তিত পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে,—যা খুসী বিদেশী বই, যাকে তাকে দিয়ে অনুবাদ করানোয় অনেক বিপদ আছে। নূতন প্রকাশকদের সাদর অভিনন্দন জানিয়ে সবিনয়ে নিবেদন করি, তাঁরা সত্যই নূতন কিছু করুন, গতানুগতিকতার মোহ কাটিয়ে উঠুন। একবার পথ দেখালে অনুকরণের লোকের অভাব হবে না।

পূজা বার্ষিকী

রথযাত্রার সময় থেকেই সকলে কোমর বেঁধে শারদীয়া সাময়িক পত্রিকার বাৎসরিক সংখ্যা প্রকাশের আয়োজনে মেতেছেন। যে সব পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ হয়, তাঁরা যথারীতি মহালয়ার পূর্বেই তাঁদের শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ করবেন, তারপর অষ্টমীর দিন পর্যন্ত হরেক রকম পত্রিকা (যা বছরে একবার মাত্র দেখা যায়) প্রকাশ হবে। আমাদের কাছে অনেকে প্রশ্ন করেন এইবার কেমন হবে? প্রশ্নটা অনেকটা 'এই সপ্তাহ কেমন যাবে' ধরণের। আমরাও তাই মোটামুটি একটা আভাস দিলাম—অধিকাংশ পত্রিকার মলাটে তেলের বিজ্ঞাপনের ছবি দেখা যাবে, ভিতরে শ্রীশ্রীদুর্গার আর্ট-সম্মত প্রতিকৃতি বা প্রাচীন চিত্র, তারপর আগমনীর পর অপ্রকাশিত রচনা, চিঠিপত্র,—গল্প, কবিতা, উপন্যাস, সেই ফাঁকে বিজ্ঞাপনদাতা, প্রচার-সচিব, ইনকমট্যাক্সওলা, প্রেসম্যান প্রভৃতির আত্মীয়-স্বজনের অপরিণত হাতের রচনা —আর বাকী পৃষ্ঠাগুলি বিজ্ঞাপনে পরিপূর্ণ থাকবে। শেষ পৃষ্ঠায় পুনরায় কেশতৈল বা বিস্কুটের বিজ্ঞাপন। মোটামুটি এই আমাদের পূর্বাভাষ। ব্যতিক্রম হ'লে আমাদের সংবাদ পাঠাবেন।

কারিগরী শিক্ষার জন্য সচিত্র বই

মধ্যবিত্ত সমাজে বেকারের সংখ্যা দিন দিন যে ভাবে বাড়ছে শেষ পর্যন্ত কি যে এর পরিণতি, সেই চিন্তা আজ সকলের মনে। দেশের যাঁরা নায়ক তাঁরা নির্বাচনের সময় অবশ্য এই সব হতভাগ্য বেকারদের কথা উল্লেখ করে অনেক কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেন, তারপর সব চুপচাপ। ইদানীং ছেলেরা কারিগরী বৃত্তির দিকে অধিক আগ্রহশীল হয়েছে, ফলে কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে কলা বিভাগ অপেক্ষা ছাত্র-ছাত্রীর আবেদন বেশী পাওয়া যায়। অঙ্কে কাঁচা থাকলে এবং তৃতীয় বিভাগে পাশ করলে কোনো ছাত্রই বিজ্ঞান ক্লাসে স্থান পায় না। এই রকম ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় যদি কারিগরী শিক্ষার সচিত্র বই পাওয়া যায়, তাহলে কিছু সংখ্যক দরিদ্র যুবক স্বল্প পুঁজিতে বাড়ীতে বসে কিছু কাজ শিখতে পারে। বিশ্ববিখ্যাত পেলম্যান ইনষ্টিটুটের ধরণে বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তিকা প্রকাশ করলে তার অসংখ্য প্রচার হওয়া সম্ভব। আমরা বেতার-বিজ্ঞান, বিদ্যুৎ-শিল্প সম্পর্কে কয়েকটি বাংলা বই দেখেছি—কিন্তু এই ধরণের বই আরো হওয়া উচিত। বিশেষজ্ঞগণ যদি সহজ ভাষায় অল্প দামে কারিগরী শিক্ষার বই প্রকাশ করেন তাহলে পাঠক, লেখক এবং প্রকাশক সকলেই উপকৃত হবেন।

শৈলজানন্দের গ্রন্থাবলী

কল্লোল যুগের অন্যতম নায়ক, নীচের তলার সমাজ-জীবনের ছবি বাংলা সাহিত্যে যিনি একরূপ সর্বপ্রথম প্রকাশ করেছিলেন, সেই শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বহু মূল্যবান উপন্যাসের গ্রন্থাবলী এত দিনে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের উদ্যোগে প্রকাশিত হ'ল। উত্তরকালে শৈলজানন্দ সাহিত্য-ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে সিনেমায়

পরিচালক হিসাবে যোগদান করেন,—তাঁর চিত্রগুলির সাফল্য আজ সর্বজনজ্ঞাত। এই গ্রন্থাবলীর একটি খণ্ডে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ও অপর খণ্ডে সিনেমার উপন্যাস একত্রে সংকলিত হবে।

এই সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে শৈলজানন্দের নতুন উপন্যাস সুরু হ'ল।

সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বই

পথের দাবী

'পথের দাবী' নতুন বই নয়, লেখকও শরৎচন্দ্র। সুতরাং বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত এই উপন্যাসের নতুন পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। ১৩২৯ থেকে ১৩৩৩ পর্যন্ত 'পথের দাবী' 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়,—তারপর ১৩৩৩এর ভাদ্র মাসে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশী সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করেন। গোপনে (অবশ্য চড়া দামে) এই উপন্যাসের প্রচুর প্রচার হয়েছে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কয়েকটি সংস্করণ হওয়া সত্ত্বেও তেমন সহজে বইটি কোনো রহস্যজনক কারণে পাওয়া যেত না। এত দিনে একটা প্রামাণিক নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল সাহিত্য-পাঠকের কাছে, এ অতি আনন্দ-সংবাদ। এই উপন্যাসটির প্রতি শরৎচন্দ্রের অতি মমতা ছিল এবং এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তীব্র মতবিরোধ হয়। উপন্যাস হিসাবে হয়ত ঘটনা এবং কাহিনী স্থানে স্থানে শিথিল মনে হতে পারে তবু 'পথের দাবী' একটি সার্থক উপন্যাস। বিপ্লবীর মনে যে-গ্রন্থ পরাধীনতার জ্বালা এনে দিয়েছে, সে-গ্রন্থ দেশপ্রেমিক নরনারীর কাছে পরম পবিত্র বস্তু। সব্যসাচীর কাল্পনিক চরিত্র উত্তরকালে নেতাজীর মধ্যে আমরা বিচিত্র রূপে রূপায়িত হতে দেখেছি, তাই "পথের দাবী" জাতীয় সদ্‌গ্রন্থাবলীর অন্যতম। এই নূতন সংস্করণটির প্রকাশক এম, সি, সরকার এ্যাণ্ড সনস্ লিমিটেড; দাম ছয় টাকা মাত্র।

যখন পুলিস ছিলাম

ছায়াচিত্র এবং রঙ্গমঞ্চের খ্যাতনামা অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য সম্প্রতি সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করেছেন, এবং সেই কার্যটি যে অনধিকার প্রবেশের পর্যায়ে পড়েনি রসিকজন মাত্রেই তা স্বীকার করবেন। আমাদের দেশের যার যে রকম রুচি ও প্রতিভা, তদনুযায়ী কাজ মেলে না, তাই সাহিত্যিক হ'ন মুদীর দোকানের কেরাণী আর অভিনেতার পেশা হয় পুলিশের দারোগাগিরি করা। একদা অদৃষ্টের পরিহাসে গোয়েন্দা পুলিশের 'ইয়াচার' হিসাবে ভট্টাচার্য মহাশয় কাজ করতেন এবং সেই সূত্রে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। ইংরেজ-রমণীর ঘনিষ্ঠ সংসর্গ ও মগ-তরুণীর প্রেমলীলাও উপরি পাওনা হিসাবে সেই অভিশপ্ত জীবনে বিধাতার প্রসন্ন আশীর্বাদের মতো বর্ষিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানকে সুদূর টেকনাফ দ্বীপে নির্বাসনে কাটাতে হয়েছে,—দুর্গম সমুদ্রপথ, ভয়াবহ বন্যজন্তুর কাছাকাছি বিপজ্জনক পরিভ্রমণ প্রভৃতি রোমাঞ্চকর কাহিনী উপন্যাসের মতই চিত্তচমকপ্রদ এবং বিস্ময়কর। শুধু বোধ করি দীর্ঘ দিন রঙ্গজগতের সঙ্গে লেখক জড়িত থাকায় শেষের দিকটা অতি-নাটকীয় হয়ে উঠেছে। ধীরাজ বাবুর এই চমৎকার রহস্যকাহিনী 'যখন পুলিস ছিলাম' প্রকাশ করেছেন নিউ এজ পাব্লিসার্স, দাম সাড়ে তিন টাকা।

পুরশ্চরণ-রত্নাকর

শতাব্দী কাল আগে মহাত্মা হরকুমার ঠাকুর মহাশয় পুরশ্চরণ-বোধিনী নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। সেই গ্রন্থটি এই বিষয়ে পথিকৃৎ হ'লেও বর্তমানে সেই গ্রন্থ সংগ্রহ করা কঠিন। পুরশ্চরণ বিষয়ে নানা জ্ঞাতব্য তথ্য নানা শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করে শ্রীপরমানন্দ তীর্থনাথ মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য মহাশয় এই মূল্যবান গ্রন্থটি জগন্মোহন তর্কালঙ্কার এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয়ের পদ্ধতি অবলম্বনে সংকলন করেছেন। এই গ্রন্থে তন্ত্রের প্রমাণ-নিরপেক্ষ কোনো তথ্য বাদ দেওয়া হয়নি। পুরশ্চরণহীন সাধকের নিত্যকর্ম বা পূজা, যাগ-যোগ, শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি সিদ্ধ হয় না, এমন কি, যথাসর্বস্ব ব্যয় করেও পুরশ্চরণ করা কর্তব্য। এই মহৎ গ্রন্থটি অশেষ শ্রম সহকারে সংকলন করে সাধকপ্রবর মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য একটি পবিত্র কর্তব্য পালন করলেন। অশেষ যত্নসহকারে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন মহারাণী শ্রীমতী সুরীতি ঠাকুর ও তৃপ্তা হালদার, ১২, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ টাকা।

বেদান্ত-কেশরী

মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ পরিচালিত "The Vedanta Kesori" পত্রিকায় Holy Mother birth centenary number (জুলাই, ১৯৫৪) আমাদের হস্তগত হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশটির ওপর সুন্দর সুরচিত প্রবন্ধ এই সংখ্যাটির বৈশিষ্ট্য, লেখকদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্বামীজিরা ছাড়া ওলফাম কোস্, জাঁ হারবার্ট, ভিক্ষু আনন্দ ইশারোধ, এলিজাবেথ ডেভিডসন, হার্থা মার্ভেন, জোন রেইন জেম্স, গোয়েনডলিন টমাস, মেরিয়ান কোড (মুক্তি, সাল্টবোস সেলো), আলমা সাঙ্কলনড, তাফিজ সৈদ, সুবালক্ষ্মী, রুক্মিণী দেবী, চিং থুং, সুরেন্দ্র সেন প্রভৃতির সুলিখিত রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নারী-কল্যাণ সম্পর্কিত বহুবিধ চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ এই সংখ্যাটিতে স্থান-লাভ করেছে। ঠাকুর ও শ্রীমার কয়েকটি সুন্দর আর্ট-প্লেটও এই সংখ্যাটিতে আছে। এমন সুমুদ্রিত বৃহৎ গ্রন্থটির দাম মাত্র দু' টাকা। সম্পাদনা করেছেন স্বামী কৈলাসানন্দ এবং স্বামী বুধানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মাদ্রাজ (৪) থেকে প্রকাশ করেছেন স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ।

প্রচ্ছদপট

[এই সংখ্যার প্রচ্ছদে শিল্পী ও ভাস্কর শ্রীসুনীল পাল নির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবক্ষ মূর্ত্তির প্রতিলিপি প্রকাশিত হইল]

আগামী সংখ্যায়

স্যার টমাস ম্যালোরী
নাইটস্ অফ দি রাউণ্ড টেবিল

স্বাধীনতা-দিবস

"স্বাধীনতার সপ্তম বৎসরে ভারতে বেকার-সমস্যা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। অথচ এই বৎসরেই আরম্ভ হইয়াছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসর। এই পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। পার্লামেন্টে ক্রমবর্দ্ধমান বেকার-সমস্যা সম্পর্কে বে-সরকারী প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার পর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর্ম্মসংস্থানের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। কিন্তু যে ভাবে বেকার-সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বেকার-সমস্যার অতি নগণ্য অংশেরও সমাধান হইবে না। অথচ এদিকে নিত্য-নূতন বেকার সৃষ্টি হইতেছে। মিশ্র অর্থনীতি যে বন্ধ্যা, বেসরকারী শিল্পে প্রয়োজনীয় মূলধন নিয়োগ না হওয়া, উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি না হওয়া এবং মূল্য বৃদ্ধি অব্যাহত থাকা হইতেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। এখন চলিতেছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গঠনের আয়োজন। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের এখনও কিছুই হয় নাই। অথচ পাসপোর্ট প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরেও উদ্বাস্তুর আগমন অব্যাহত রহিয়াছে। কংগ্রেসী শাসকবর্গ ভারতের বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত হওয়াকে রাজনৈতিক স্বাধীনতায় পরিবর্ত্তন করার পরিবর্ত্তে ব্যক্তিস্বাধীনতা লোপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের ব্যবস্থা করা দূরে থাকুক, তাহাদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থাও তাঁহারা করিতে পারেন নাই। তাই শাসকশ্রেণী ছাড়া স্বাধীনতা দিবসে আনন্দ করিবার মত উৎসাহ কাহারও নাই। স্বাধীনতা দিবসের আগমনে জনগণের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে না। শাসকবর্গ জনগণ হইতে বহু ঊর্দ্ধে অবস্থান করেন। জনগণের অবস্থার সহিত তাঁহাদের কোন পরিচয় নাই।"

—দৈনিক বসুমতী।

ইসলামী শিক্ষা

"পূর্ববঙ্গের গবর্ণর মীর্জ্জা ইস্কান্দার সাহেব পূর্ববঙ্গের জনমতকে ঠাণ্ডা করিয়াছেন—যুক্তফ্রন্টের সমর্থক জনমণ্ডলী স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। পূর্ববঙ্গের নিরঙ্কুশ শান্তি সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। এই মহাশান্তিপূর্ণ পরিবেশেই যে গঠনমূলক কাজের অনুকূল তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই, এবার পূর্ববঙ্গের শিক্ষা সংস্কারে ইস্কান্দার সরকার মন দিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের ইসলামীকরণ সর্বাগ্রে সাধন করিতে পারিলে, তবেই না হইবে আদর্শ শিক্ষা সংস্কার? পূর্ব্ববঙ্গের কলেজগুলির প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণ যাহাতে বর্ত্তমান পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী পুস্তক ক্রয় করিয়া না ফেলে তজ্জন্য কলেজ-কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দান করা হইয়াছে। প্রকাশ, ইতোমধ্যে সরকারী নির্দেশে নূতন পাঠ্যতালিকা রচিত হইতেছে। নূতন পাঠ্যতালিকায় ভারতীয় গ্রন্থকারদের রচনাবলী বাদ দিবার নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। জানি না, গ্রন্থকার মুসলমান হইলেই যথেষ্ট বিবেচিত হইবে কি না। রচনাবলীর ভাষা এবং ভাবও তো ইসলামসম্মত হওয়া চাই। নূরুল আমীনের মন্ত্রিত্বকালে পাঠ্যপুস্তকের ইসলামসম্মত ভাষা সেই ভাবের হইয়াছে। যুক্তফ্রন্টের স্বল্পকালস্থায়ী মন্ত্রিত্বের আমলে শিক্ষামন্ত্রী লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল যে সকল গ্রন্থ ও রচনা পাঠ্যতালিকা হইতে তুলিয়া দিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন—ইস্কান্দারী সরকার সেই সর্বনাশা নির্দেশ বাতিল করিয়া দিয়াছেন; এবারে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তিত হইবে। সেই শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে পূর্ববঙ্গের শিক্ষার মান কিরূপ উচ্চস্তরে উন্নীত হয়, তাহাই দেখিবার।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

বন্যাপ্রসঙ্গ

"প্রকৃতপক্ষে বিহার, উত্তরবঙ্গ ও আসামের বন্যা নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে (বোধ হয় আসামের সমস্যা ইহার মধ্যে সর্বাধিক, কেন না, সেখানে বন্যা বার্ষিক বিপর্যয়ে পরিণত হইয়াছে)। এই তিন অঞ্চলের নদী, উৎপত্তি-স্থল ও অববাহিকার বিস্তৃত জল-জরীপ এবং বন্যা প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে এখনই কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির অবহিত হওয়া দরকার। অন্ততঃ এবারের প্লাবনের পর যে-কোনো দায়িত্ববোধসম্পন্ন সরকার এই শিক্ষাই লাভ করিবেন। এখানেও উল্লেখ করা যায় যে, বিহারে কোশী নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পনা প্রস্তুতের কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে; আসামে ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি ও অববাহিকা অঞ্চল ভূমিকম্পের পর ব্যাপক ভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া ভারত সরকার রিপোর্ট দিয়াছেন। কেবল উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে কারণ কিম্বা প্রতিকার কোনো বিষয়েই এখনও পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য কোনো চিত্র পাওয়া যায় নাই। কি কারণে আমরা জানি না, পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী সম্প্রতি তাঁহার বিবৃতিতে 'চূড়ান্ত দুর্গতদের' সংখ্যাটুকু উল্লেখ করিয়াছেন এবং সংজ্ঞা ও পরিমাপহীন ঐ 'চূড়ান্ত' কথাটুকুর ফাঁকে তিন-চার লক্ষ দুর্গত এবং প্রায় তিন শত বর্গ-মাইল বন্যাহত এলাকা তাঁহার হিসাবের বাহিরে থাকিয়া গিয়াছে। ঠিক ঐ ভাবে স্থায়ী সমাধানের ব্যাপারেও

করিয়া কাজ চালাইতে হইলে সে এক দুরূহ ব্যাপার! লোকে যে ছাপাইয়া লইবে কিম্বা কোন প্রেস যে ছাপাইয়া উহা বিক্রয় করিবে সে সম্বন্ধেও সরকারী কর্তৃপক্ষ মহলের কোন সুস্পষ্ট অভিমত জানা যাইতেছে না। এ অবস্থায় আমরা মহকুমা শাসক ও জেলাশাসক মহাশয়কে অবিলম্বে ইহার একটা বিহিত-ব্যবস্থা করিতে ও সকলকে জানাইয়া দিতে অনুরোধ করি। —প্রদীপ (তমলুক)।

দায়িত্বহীন গো-পালক

"আসানসোলে উদ্বাস্তু, মশা, ফেরিওয়ালা প্রভৃতির মত আর একটি সমস্যা বেশ মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে—তাহা গরুর উৎপাত। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেও লিখিয়াছি এবং সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের সহিত আলোচনাও করিয়াছি যে, আসানসোল সহরের সন্নিহিত সর্ব্বসাধারণ গো-চারণ মাঠ না থাকায় উত্তরোত্তর এই গরুর উৎপাত বৃদ্ধি হইতেছে। দায়িত্বহীন গো-পালকগণ গরুর দুধ দোহন করিয়া তাহাকে পথে চরিয়া বেড়াইতে ছাড়িয়া দেন এবং কোন ব্যক্তি বা যান দ্বারা ঐ গরু আহত হইলে দলবদ্ধ ভাবে রুখিয়া দাঁড়ান। পথ, বাজার প্রভৃতির মধ্যে এই সমস্ত গরু দৌড়াদৌড়ি ও উৎপাত করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করে। প্রত্যহ পথ ও বাজারে চলমান ব্যক্তিদের এ সম্বন্ধে তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। গরুগুলিরও তাহাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আস্থা কম নাই। অল্প-স্বল্প ঠেলা, অথবা রিক্সা, মোটর, বাসের গর্জ্জনেও তাহারা পথ হইতে সরিয়া যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে না। বেশ কয়েক ঘা লাঠি মারার পর নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও পথ হইতে একটু সরিয়া যায় মাত্র। বাজারে গরুর উৎপাত সম্বন্ধে বলা নিষ্প্রয়োজন, ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। এই সমস্ত গরুর মালিকগণ তাঁহাদের দায়িত্ব পালন তো করেনই না পরন্তু অন্য নির্ব্বিরোধী নাগরিকগণেরও অসুবিধার সৃষ্টি করেন। আমরা মনে করি এ সমস্ত দায়িত্বহীন গো-পালকগণের উপযুক্ত শাস্তিবিধানের প্রয়োজন আছে। কলিকাতার এইরূপ গরুগুলি ও খাটালগুলির জন্য চলমান আদালতের (Mobile Court) ব্যবস্থা হইয়াছে। আসানসোলে কি এইরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে না?"

—আসানসোল হিতৈষী।

এক দিকে অনাবৃষ্টি, অন্য দিকে বন্যা

"এক দিকে অনাবৃষ্টি অন্য দিকে বন্যা আমাদের দেশে একরূপ বার্ষিক ব্যাপার বলিলেই চলে। কিন্তু এবার বন্যার প্রকোপ ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। উত্তরবঙ্গে কুচবিহার জেলার প্রায় কোন অঞ্চলই বন্যার প্রকোপ হইতে রক্ষা পায় নাই এবং তিন লক্ষ অধিবাসী গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। জলপাইগুড়ি জেলার প্রায় দুই শত বর্গ-মাইল জলপ্লাবিত হইয়া ৫০ হাজার লোক সম্পূর্ণরূপে গৃহহারা হইয়াছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে প্রায় এক লক্ষ লোক। আসামের গোয়ালপাড়া, নওগাঁ, তেজপুর মহকুমায় বহু মাইল প্লাবিত হইয়াছে ও গবাদি পশু বন্যার ফলে বিপন্ন হইয়াছে। উত্তরবঙ্গে, বিহারে ও আসামে লক্ষ লক্ষ নর-নারী বন্যার প্লাবনে আজ বিপন্ন। গভর্ণমেণ্ট এবং দেশবাসীর সাহায্যের উপরেই তাহাদের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। এক দিকে এই অবস্থা আর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অনাবৃষ্টির জন্য চাষ-আবাদ প্রায় বন্ধ। সুতরাং এই অনাবৃষ্টি জনিত দুর্ভিক্ষের জন্যও সরকারকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।"

—বীরভূম বার্ত্তা।

শোক-সংবাদ

"আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টার, ভারতীয় সংসদের সদস্য এবং ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদারের জীবন বিচিত্র ঘটনা ও কর্মে পূর্ণ। ১৮৮৮ সালে মধ্যযুগের বঙ্গ সংস্কৃতির পাদপীঠ কৃষ্ণনগরে এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এইখানেই তাঁহার বাল্যশিক্ষা হইয়াছিল। কৃষ্ণনগর অদূরে বলিয়া কলিকাতার বিপ্লবী চিন্তাধারা সহজেই সেখানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা মাতৃভূমি উদ্ধারের জন্য যুবকগণের মনে স্বাদেশিকতার যে নবমন্ত্র জাগিয়াছিল, বালক সুরেশচন্দ্র তাহাতে দীক্ষিত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। বালেশ্বর বিপ্লবখ্যাত যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে তিনি দেশসেবায় ব্রতী হইলেন। বাঙ্গলার বিভিন্ন দলের বিপ্লবিগণ যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৯১০ সালে গোয়েন্দা পুলিশ, পুলিশ সুপার সামসুল হুদাকে হত্যার অভিযোগে যতীন মুখার্জি ও অন্যান্যদের সহিত শ্রীমজুমদারকেও গ্রেপ্তার করে। জেলে থাকার সময় যতীন মুখার্জি ও তাঁহাকে হাওড়া রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মামলায়ও জড়িত করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯১১ সালে তাঁহারা সকলেই মুক্তি পান। তরুণ বয়স হইতেই শ্রীমজুমদারের মুদ্রণ-শিল্পের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। কারামুক্তির পর ১৯১২ সালে তিনি হারাসমাস এণ্ড জোন্স কোম্পানীর অধুনালুপ্ত

কী-বোর্ডের পরিকল্পনা করিয়া দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহার পরিকল্পনা ও কী-বোর্ড স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ১৯২২ সালে দোল-পূর্ণিমার দিন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হইল। ১৯৩২ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রচারসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ তিনি আনন্দ প্রেসকে ১নং বর্মণ ষ্ট্রীটের বৃহৎ ভবনে স্থানান্তরিত করেন। বর্তমানে এখানে আনন্দবাজার পত্রিকা, অর্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও দেশ প্রকাশিত হইতেছে। বর্দ্ধিত চাহিদা মিটাইবার জন্য এখানে দুইটি ডুপ্লে টিবুলার রোটারী মেশিন স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে শ্রীমজুমদার ইংরেজী ভাষায় হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯১৮-১৯ সালে দর কমানো প্রতিযোগিতা নিবারণের উদ্দেশ্যে কলিকাতার মুদ্রাকরদিগকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তিনি অগ্রণী হইয়াছিলেন। শ্রীমজুমদার মুদ্রণ ও সংবাদপত্র ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়াও দেশের জাতীয় আন্দোলনের সব পর্যায়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৪৫ সালে তিনি রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হন। এই কমিটি পরে রবীন্দ্র-ভারতীতে পরিবর্তিত হয়। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি উহার সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি কংগ্রেস প্রার্থিরূপে গণ-পরিষদে নির্বাচিত হইয়া সংসদের কার্যে মনোনিবেশ করেন। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত গ্রহণের জন্য তিনি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশবাসী তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত চিরদিন স্মরণ করিবে। ১৯৫২ সালে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের দ্বারা যখন রাজ্য আইনসভা ও ভারতীয় সংসদ গঠিত হইল, তখন তিনি কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে রাজ্য-পরিষদের সদস্যনির্বাচিত হন। শ্রীমজুমদার অকৃতদার। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৬ বৎসর হইয়াছিল।"

ক্যাম্ব্রিয়ান প্রেসে যোগদান করেন। কিন্তু এই প্রেসের সীমিত পরিধির মধ্যে তাঁহার প্রতিভা বেশী দিন আবদ্ধ থাকিতে পারিল না। ১৯১৪ সালে তিনি কলিকাতার একটি ক্ষুদ্র গৃহে প্রেস খুলিয়া বসিলেন, উহাই বর্তমানে বিখ্যাত শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে পরিণত হইয়াছে। সামান্য মূলধনে প্রতিষ্ঠিত এই ক্ষুদ্র প্রেসে তাঁহার কল্পনা ও প্রতিভা স্বচ্ছন্দে বিকাশ লাভ করিতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে এইখানেই তিনি বাঙ্গলা লাইনো টাইপ উদ্ভাবনের কল্পনা করেন। দীর্ঘ ছয় বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি বাঙ্গলা লাইনো টাইপ কী-বোর্ড উদ্ভাবন করেন। বাঙ্গলা ভাষার ৬ শত অক্ষরকে কমাইয়া মাত্র ১২৪টি করা হইল। ১৯৩৭ সালে বাঙ্গলা লাইনো টাইপ মেশিনে আনন্দবাজার পত্রিকা মুদ্রিত হইতে লাগিল। মুদ্রণ-শিল্পে ইহা একটি বিস্ময়কর বৈপ্লবিক উদ্ভাবন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। লাইনো টাইপ মেশিনে বাঙ্গলা কী-বোর্ড প্রস্তুতের পর তিনি উন্নত ধরণের বাঙ্গলা টাইপ-রাইটিং মেশিন পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। শ্রীমজুমদার আধুনিক ষ্ট্যাণ্ডার্ড রেমিংটন বাঙ্গলা টাইপ-রাইটিং-এর

* * * *

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রাক্তন মেজর-জেনারেল এ, সি, চ্যাটার্জী গত ১৭ই আগষ্ট মঙ্গলবার রাত্রি ১২টার সময় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মেজর-জেনারেল চ্যাটার্জী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ব্রহ্মদেশে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অধীনে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেন এবং আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হন। আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্তৃক মণিপুর অঞ্চল বৃটিশ শাসনের কবল হইতে মুক্ত হইলে তিনি পরশাসনমুক্ত ভারতীয় অঞ্চলের গভর্ণর নিযুক্ত হন। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের অধিকর্তা পদে বৃত হন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
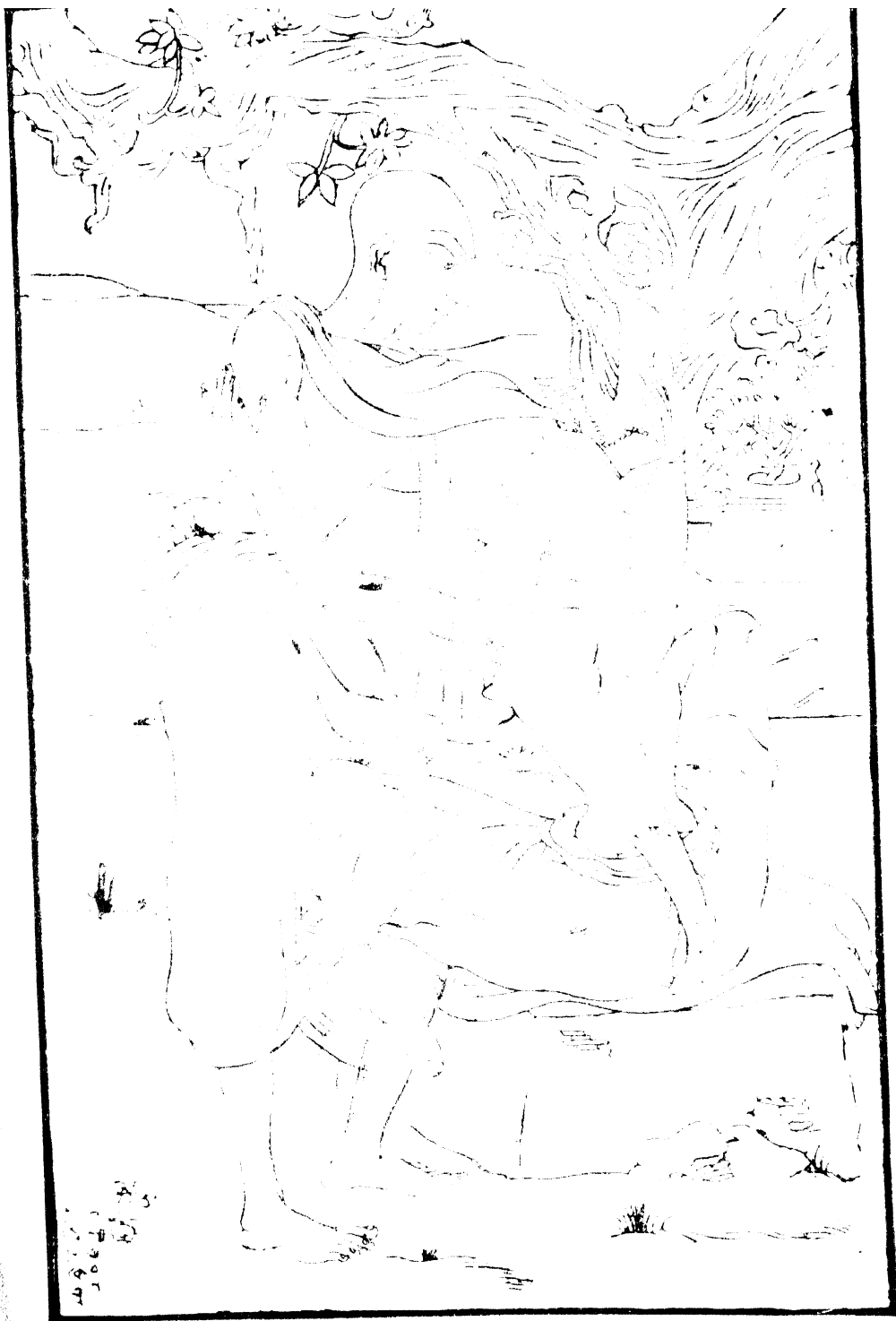
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মাসিক বসুমতী

শ্রীচৈতন্য ও হরিদাস

—মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় অঙ্কিত। শান্তিনিকেতন

প্রথম খণ্ড]　　সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত　　[পঞ্চম সংখ্যা
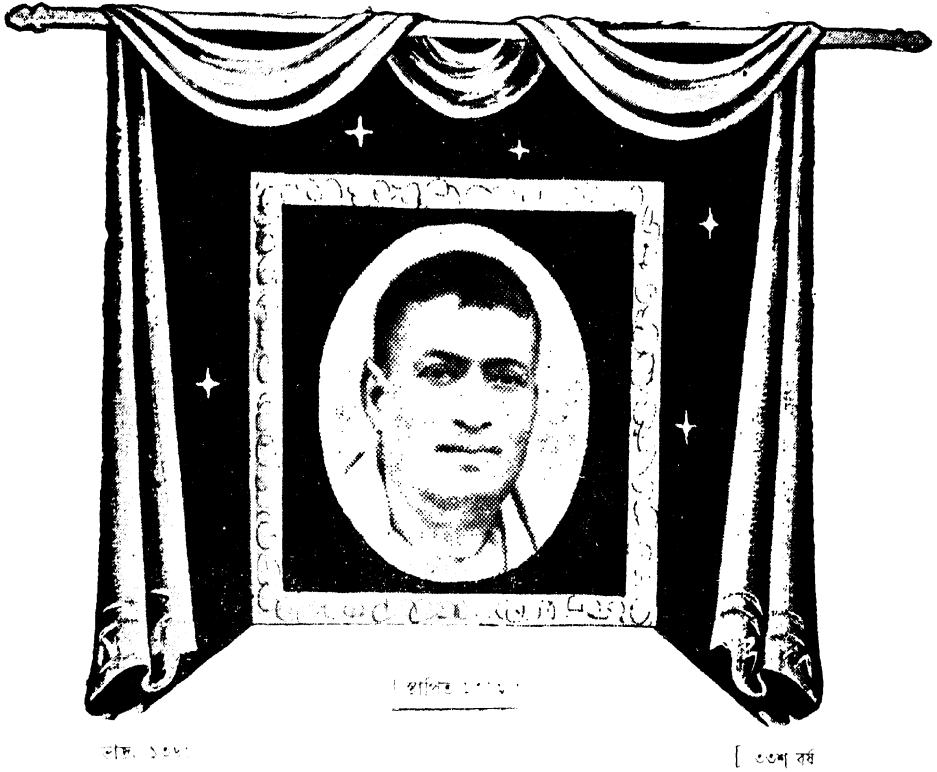
ভাদ্র, ১৩[illegible]　　[৩৩শ বর্ষ

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। "যেমন গানের অনুলোম বিলোম,—সা ঋা গা মা পা ধা নি সা—করিয়া সুর তুলিয়া আবার সা নি ধা পা মা গা ঋা সা—করিয়া সুর নামান। সমাধিতে অদ্বৈত-বোধটা অনুভব করিয়া আবার নীচে নামিয়া 'আমি'-বোধটা লইয়া থাকা।"

"যেমন বেলটা হাতে লইয়া বিচার করা যে, খোলা, বিচি, শাঁস—ইহার কোন্‌টা বেল। প্রথম খোলাটাকে অসার বলিয়া ফেলিয়া দিলাম; বিচিগুলোকেও ঐরূপ করিলাম; আর শাঁসটুকু আলাদা করিয়া বলিলাম, এইটিই বেলের সার—এইটিই আদৎ বেল। তার পর আবার বিচার আসিল যে, যাহারই শাঁস তাহারই খোলা ও বিচি—খোলা, বিচি ও শাঁস সব একত্র করিয়াই বেলটা; সেই রকম নিত্য ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া তার পর বিচার,—যে নিত্য, সেই লীলায় জগৎ!"

"যেমন থোড়খানার খোলা ছাড়াতে ছাড়াতে মাঝটায় পৌছুলুম আর সেইটাকেই সার ভাবলুম। তার পর বিচার এল—খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল—দুই জড়িয়েই থোড়টা।"

"যেমন প্যাজটা—খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে আর কিছুই থাকে না, সেই রকম 'কোন্‌টা আমি' বিচার ক'রে দেখ্‌তে গিয়ে শরীরটা নয়, মনটা নয়, বুদ্ধিটা নয়, ক'রে ছাড়াতে ছাড়াতে গিয়ে দেখা যায় 'আমি' বলে একটা আলাদা কিছুই নাই,—সবই 'তিনি' 'তিনি' 'তিনি' (ঈশ্বর)";—"যেমন গঙ্গার খানিকটা জল বেড়া দিয়ে ঘিরে বলা—এটা আমার গঙ্গা!"

দাবা খেলা, বাঙলা দেশে

শ্রীবিশ্বমোহন সেন

বাংলা দেশের হাট-বাজার, গাছতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, বড়লোকের বৈঠকখানা এবং আড্ডাধারীর আড্ডায় প্রায়ই দাবা খেলা-রত লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে শতকরা একশোটি লোকই কেবল সময় বধ করিবার জন্যই খেলেন, খেলা সম্বন্ধে কোন উন্নতি বা ইহা সম্বন্ধে কিছু জানিবার চেষ্টা করেন না। অথচ এই দাবা খেলার পশ্চাতে যে কি সুদূরপ্রসারী ইতিহাস, কি বৃহৎ পরিস্থিতি ও কত বিচিত্র সংবাদ রহিয়াছে, তাহা একবার দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। বর্তমান প্রবন্ধে তাহারই সামান্য একটুখানি আভাস দিবার চেষ্টা করিব। আশা এই যে, উৎসাহী পাঠক আগ্রহ দেখাইলে বিশদ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ আলোচনার সূচনা করা যাইবে।

দাবা খেলার জন্মস্থান যে কোথায়, তাহা নির্ণয় করাই সুকঠিন। ইহার সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে কিন্তু পণ্ডিতেরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। এবং সেই জন্যই তাঁহারা সেই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেনও না। আমার নিজের ধারণা, ইহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ, কিন্তু তাহা ধারণা মাত্র, তাহার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। দাবা খেলাই সম্ভবতঃ একমাত্র খেলা, যাহা মানুষ তাহার প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষের নিকট হইতে পাইয়াছে এবং রাখিয়া আসিয়াছে। কাল ক্রমে ইহার নিয়মাবলীতে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে বটে কিন্তু কাঠামো বদলায় নাই। যাহাই হৌক—কোন্ সুপ্রাচীন কালে কোন্ মহান্ ব্যক্তি এই খেলা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ ভাবেই ধূমাচ্ছন্ন। এরূপ ধূমাচ্ছন্ন যে ইহার জন্ম-বৃত্তান্ত লইয়া বাগ্-বিতণ্ডাই ইহার সম্বন্ধে আলোচনার একটি প্রধান বিষয়। এবং দুঃখের কথা এই যে, সেই আলোচনা ইহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ হইতে বিদেশেই বেশী হইয়া থাকে।

ভারতীয় ভাষাতে আমি নিজে দাবা সম্বন্ধে মাত্র দুইখানি বইয়ের অস্তিত্ব জানি। একখানি বাংলায় ও একখানি তেলেগুতে। অথচ ইংরাজীতে ইহা লইয়া হাজার হাজার পুস্তক আছে এবং ইংরাজীতে দাবা-সাহিত্য সাহিত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ। ইংরাজীতে ইহাকে Chess বলে এবং ইহার সংশ্লিষ্ট সাহিত্যকে Chess-literature বলিয়া থাকে। কোন ইংরাজী দাবা-পুস্তকের ভূমিকাতে আমি পড়িয়াছিলাম যে শুধু ইংরাজী ভাষা পঞ্চাশ হাজারের ঊর্দ্ধে দাবা-পুস্তক আছে, ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। Oxford University Press-এর প্রকাশিত Chess নামে একখানি বই আছে, মূল্য ৫০৲ টাকা। দাবা সম্বন্ধে এত বড় এবং এত বিস্তারিত আলোচনা-পূর্ণ পুস্তক আর নাই।

এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, যুদ্ধপ্রিয় লঙ্কেশ্বর রাবণকে গৃহে আবদ্ধ রাখিবার জন্য তাঁহার মহিষী মন্দোদরী এই বৈঠকী যুদ্ধক্রীড়া উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। হিন্দু, গ্রীক, রোমান, ব্যাবিলনীয়ান, সাইথিয়ান, মিশরী, ইহুদী, আরবী, ফারসী ও চীনাদিগের মধ্যে এই খেলার জন্মস্থান লইয়া মতানৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। Oxford University Press-এর পুস্তকে মিশরের Pyramid-এ প্রাপ্ত হস্তি-দন্ত-নির্ম্মিত কারুকার্য্য-মণ্ডিত দাবার ঘুঁটির ছবি আছে।

সংস্কৃত চতুরঙ্গ হইতে এই খেলা পারস্য দেশে গিয়া "চৎরং" এবং পারস্য হইতে আরবে গিয়া "সতরঞ্চ" নামে পরিচিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় চতুরঙ্গ শব্দের অর্থ সৈন্য-বিভাগের চারিটি অঙ্গ— হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি। দাক্ষিণাত্যে বাংলা দেশের নৌকাকে রথ বলিয়া থাকে। হস্তী, অশ্ব ও পদাতি ঠিক একই আছে। উত্তর-ভারতে নৌকাকে হাতী ও হাতীকে উষ্ট্র বলে। বোধ করি রাজপুতানায়ও ঐরূপ উষ্ট্রও যুদ্ধের অঙ্গ ছিল বলিয়া একমাত্র বাংলা দেশেই উহাকে নৌকা বলা হয়। কারণ বুঝিতে দেরী হয় না। বাংলা দেশ নদীমাতৃক এবং বহু নৌ-যুদ্ধ সেখানে হইয়াছে। প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় ইত্যাদি বার-ভূঁইয়ার নৌ-বল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। সিরাজদ্দৌলা, মিরজুমলা, মিরজাফর, মির-কাসিমের নৌ-বলও কিছু কম প্রসিদ্ধ নহে। কাজেই বাংলা তাহার অভ্যাস মত রথের নাম বদলাইয়া নৌকা করিয়া দিয়াছে। ইংরাজীতে উহাকে Rook অথবা Castle বলে। সেই জন্য উহার আকৃতিও ইংরাজী ঘুঁটিতে দুর্গের ন্যায়। তবে বর্তমানে তাহাকে Castle না বলিয়া Rook নামেই অভিহিত করা হইতেছে। Rook শব্দ ফারসী "রোখ" অর্থাৎ যোদ্ধা হইতে আসিয়াছে। ইউরোপের প্রথম দাবা খেলার যুগে উহাকে Rooke বলিত। পরে তাহারা নিজেদের সুবিধা মত উহাকে Castle করিয়া সহজ করিয়া লইয়াছে। কিন্তু Castle জোটে না তাই আবার ফিরিয়া Rook বলিতেছে। দাবা খেলা ভারতবর্ষ হইতে পারস্য, পারস্য হইতে আরব, আরব হইতে ইউরোপে যায়। এ সম্বন্ধে পরিষ্কার ঐতিহাসিক সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপে আগে এই খেলাকে "স্কাকৃহী" বলিত। তাহা হইতে Echecks, Echecks হইতে Checks ও Checks হইতে Chess হইয়াছে। সেই জন্য ইংরাজীতে কিস্তি দেওয়াকে Check এবং দাবার ঘরের নক্সা বা পরিকল্পনাকে (Design) Checkered বা Check বলে। চীনা ভাষায় দাবা খেলা "চকৃখী" নামে পরিচিত। "চকখী" ও "স্কাকৃহী"র ধ্বনিগত মিল লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ইউরোপে দাবা খেলা বহুল প্রচারিত এবং সেখানকার নর-নারী প্রায় সকলেই ইহার সহিত পরিচিত। সেখানকার বড় বড় দাবা-খেলোয়াড়রা বাজী জিতিয়া পণস্বরূপ বহু অর্থ পাইয়া থাকেন। প্রায় প্রত্যেক ছোট-বড় সহরেই বহু দাবার আড্ডা (বিশেষ ভাবে Restaurant ও Cafe জাতীয় খানাঘরে) আছে, সেখানে যে-কেহ বাজী রাখিয়া দাবা খেলিতে পারে। বহু লোক দাবা খেলিয়াই বহু অর্থ উপায় করেন এবং নিজেদের জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন। ইহারা পেশাদার দাবা-খেলোয়াড়।

বর্তমান যুগে রাশিয়া পৃথিবীর মধ্যে দাবা খেলায় শীর্ষস্থানীয় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। সেখানকার কি স্ত্রী কি পুরুষ, প্রায়

১০ জনের ভিতরে ৯ জনই দাবা খেলা জানে। স্কুল হইতে ছেলে-মেয়েদিগকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়। গত কয়েক বৎসর International Championship রাশিয়াই একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে। রাশিয়াতে পেশাদারী দাবা খেলোয়াড়ের সম্মান শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, অভিনেতা ইত্যাদি ব্যক্তিদিগের সমকক্ষ।

বিদেশের বর্তমান কালের নামজাদা দাবা-খেলোয়াড়দের মধ্যে A-A-Alakhim (Russia, Expatriated France, demised 1948) সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। ইঁহার গভীর চিন্তাযুক্ত চক্রনার চাল এত চমৎকার যে, ইঁহাকে দাবা খেলার "যাদুকর" নামে অভিহিত করা হইত। তাহার পর (Capablanca J. R. (Cuba, Demised 1942), Salo Flohr (Polland), Max Euwo (Polland) Samuel Reshevsky (Russia), Expatriated American), Ruben Fine (America), M-M-Rotvinik (Russia), Daul Keres (Russia), Vidman (Germany), Eliskases (Germany) ইত্যাদি লোকেরা নামজাদা আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়। বাংলা দেশেও ৺গোস্বামী (পুঁটে গোঁসাই), ৺দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ৺কালীচরণ বসাক, ৺শশিভূষণ ঘোষ, ৺হরিধন দত্ত, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত আগা মহম্মদ মুসা প্রভৃতির নাম গত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী দাবা-প্রীতিপূর্ণ লোক মাত্রেই জানিয়া থাকেন। কিষণলাল, এম, জি, মহাপেল; এন, আর, যোশী; এস, ভি, বোভাস; ভি, কে, কাদিলকার: মির সুলতান খাঁ প্রভৃতি উত্তর-ভারতীয় খেলোয়াড়-গণের নামও উল্লেখযোগ্য। সুলতান খাঁ বিলাতে গিয়াও এক সময় দাবা খেলিয়া বেশ সুনাম করিয়াছিলেন। যাঁহাদিগের নাম এখানে করা হইল ইঁহারা বিদেশী যে কোন খেলোয়াড় হইতেই কোন অংশে নূ্যন নহেন। দুঃখের বিষয় যে তাঁহাদের প্রতিযোগিতার বা সৌখীন কোন খেলাই কখনো লিপিবদ্ধ হয় নাই এবং তাঁহাদের জীবন-বৃত্তান্ত এমন কি নামও আর কিছু দিন বাদে লোকে জানিবে না। দাবা খেলার আলোচনা বৃদ্ধি পাইয়া এ সম্বন্ধে লোক সচেতন হইলে ইহার জন্মস্থানবাসীরাও এ খেলায় যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য দেখাইতে পারেন এবং এক কালে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারেন বলিয়াই মনে হয়।

দুগ্‌গা মায়ের প্রতি

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

শিবালয়ের দুগ্‌গা মা!
এমন করে হঠাৎ তোমার আসা মোটেই উচিত না।
তোমার পূজোয় কোথায় পাব ঢোলক, বাঁশি, বাদ্যি গো?
'লারে-লাপ্পা', মাইক শুধু—এই আমাদের সাধ্যি গো!
ছিন্ন পাঁজির নোটিশ দিয়ে সদলবলে মর্ত্ত্যেতে,
আসছ তুমি বাপের বাড়ী হায় গো বিনা সর্ত্তেতে।
লজ্জাহীনা, আনছ আবার ভৃঙ্গী এবং নন্দীটায়,
ভাবছ বুঝি বুঝতে নারি আমরা তোমার ফন্দীটায়?
কলিযুগের কন্‌ট্রোলেতে ভাত ও কাপড় জুটছে না,
জলাভাবে শিবোদ্যানে ধুতরা ফুলও ফুটছে না।
বাবার নেই কাণাকড়ি গর্ব্ব তবু যায়নিকো,
অসুরবধের ভাগে তো তাই লজ্জা তোমার পায়নিকো।
মায়ে-ঝিয়ে বাপের বাড়ীর অন্ন খাবে খুব সুখে,
নন্দী তো হায় লাইন দেবে গাঁজার শপের সম্মুখে।

আমরা মা গো তোমার চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমান;
বুঝতে পারি মায়ের প্রতি তোমার প্রেমের মিথ্যে ভাণ।
পোকায়-ধরা চাল কাঁচকলায় এবার তোমায় পূজবো গো,
সর্ব্বজনীন পূজোর টাকা নিজের ট্যাঁকে গুঁজবো গো!
দু'হাতি এক গামছা দেবো আর দেবো এক শুকনো ডাব,
মঞ্চে তোমার শোভা পাবে পরের বাড়ীর ফুলের টাব।
তোমার মাথার টিনের চূড়ে জ্বলব আলো বৈদ্যুতিক,
যাহার ছটা আধুনিকার সাজ মুখে পড়বে ঠিক।
বলব কী হায় লাজের কথা মা তুমি আজ উর্ব্বশী,
বাঁকা-চোরা চাউনি হেনে মঞ্চোপরি রও বসি।
তোমাকে আজ আনাই মোরা মর্ত্ত্যধামে অর্ডার দিয়ে,
কৃষ্ণনগর, কুমারটুলী বিনা ভাড়ায় ট্রেণে নিয়ে।
একটা কথা বলি চুপে ক্ষমা ক'রো দুগ্‌গা মা গো,
সৌম্য তব দৃষ্টি মোদের কাড়তে তো হায় পারলে না গো!

পাশের দিকের কন্যাভরা অঙ্গনেতে মোদের দিঠি,
আধুনিকার কাছে পাঠাই চোরা চোখের ফাজিল চিঠি।
পুজোর ভিড়ে ভদ্রমেয়ের পায়ে ফোটাই পটকা মা গো,
দেখে-শুনে মনে বুঝি জাগছে তোমার খট্‌কা মা গো!
যা বলিনু সত্যি সবই এবং সহজ জলের মতো,
মর্ত্ত্যধামে কেলেঙ্কারীর কথা যে আর বলব কতো?
তাই বলি মা ভুল করেছ, পালাও গো এই মর্ত্ত্য হ'তে,
কিংবা এসো, ভাসাও গা এই কলিযুগের জনস্রোতে।

পতিতা অম্বপালী

শ্রীহরিশচন্দ্র বসু

বৈশালী—

বৈশালী আছে,—নেই তার কিছুই। কাল হরণ করেছে তার যথাসর্ব্বস্ব—লুপ্ত করেছে তার সৌন্দর্য্য, চূর্ণ করেছে তার বিশাল গর্ব্ব। কিন্তু নিঃস্ব হ'য়েও রয়েছে সে বেঁচে—তার অমর স্মৃতি বুকে নিয়ে। শুধু একবার নয়, এই বুদ্ধ-চরণ-পরশ-ধন্যা বৈশালী বারত্রয় পবিত্র হয়েছিল বুদ্ধ-চরণ-স্পর্শে। এই সেই ভক্ত-হৃদয়-তীর্থ বৈশালী—যার কোলে স্থান পেয়েছিল প্রাতঃস্মরণীয়া বুদ্ধ-চরণাশ্রিতা অম্বপালী। এই পবিত্র ভূমির একটি আম্রকুঞ্জে এক শুভ মুহূর্ত্তে ফুটে উঠ্‌ল একটি ফুল—যে ফুলের শোভায় ও সৌরভে বৈশালী নগর হ'ল চঞ্চল। এ ফুলেরই স্বত্বাধিকার নিয়ে দেখা দিল এক বিরাট দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। যে ফুল ফোটে ভগবৎ-চরণে অঞ্জলি হ'য়ে ঝরে পড়বে বলে, তাকে কেন্দ্র করে কোন অনর্থের উদয় হ'তে পারে কি?—না, পারে না। তাই রাজায় রাজায় হ'ল মীমাংসা—এ ফুল নিজস্ব সৌন্দর্য্য নিয়ে থাক্‌বে বেঁচে—একান্ত স্বাধীন ভাবে, নিজে তাপদগ্ধ হ'য়ে অনন্ত চক্ষুকে করবে সে তৃপ্ত। তাই সে করেছিল—নিজের রূপ দিয়ে, গন্ধ দিয়ে। সবার তরে নিজেকে দিয়েছিল সে বিলিয়ে। শুধু দুটি বস্তু অতি যত্নে সে নিজস্ব করে ধরে রেখেছিল। সে দুটি বস্তু তার প্রাণ ও মন, যা একদিন বুদ্ধ-চরণে অঞ্জলি দিয়ে হয়েছিল ধন্যা, পেয়েছিল অফুরন্ত আনন্দ, অপার তৃপ্তি!

এই ফুলটিরই নাম অম্বপালী—একটি মনুষ্যকন্যা। পিতা কে, মাতা কে, তা কেউ-ই জানে না। বৈশালী-নগরস্থ একটি আম্রকুঞ্জের মালী এক উষার আলোয় দেখল এই শিশু কন্যাটিকে; আম্রকুঞ্জ আলো করে পল্লব-শয্যায় আছে শুয়ে, মালী কন্যাটিকে অসীম স্নেহে কোলে তুলে নিল। আম্রকুঞ্জকন্যা মালিনীর স্তনদুগ্ধে বাড়তে লাগল। আম্রকুঞ্জে পালিত হয়েছিল বলে নাম হ'ল তার অম্বপালী। যেদিন রঙীন বসন্তের হাওয়া লাগল তার দেহে, যৌবনের তরঙ্গ দিল দেখা, প্রতি অঙ্গে এল চঞ্চলতা, অজস্র চোখে লাগল ধাঁধা—এল বিস্ময়,—চম্‌কে উঠল সারা দেশ, "এ কী রূপ?—কী এ সৌন্দর্য্য!" বৈশালী ও তৎসংলগ্ন রাজ্যসমূহের শত শত রাজকুমার সর্ব্বস্ব বিনিময়েও অম্বপালীর পাণিগ্রহণ করতে এগিয়ে এল। ফলে দেখা দিল একটা কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বাভাস। যুব-সম্প্রদায়ে এল উন্মাদনা, হ'ল তারা ক্ষিপ্ত, প্রাচীনেরা হ'ল শঙ্কিত—চঞ্চল।

উপায়?—

পরিশেষে সকলেরই মিলিত চেষ্টায় হ'ল কলহের অবসান—এল একটা মীমাংসা। অম্বপালী হ'ল নগরবধূ, উপাধি পেল স্ত্রীরত্ন—দেবভোগ্যা অম্বপালী হ'ল সর্ব্বজনভোগ্যা।

নিরুপায়। রাজশক্তি উপহার দিল তাকে গণিকাবৃত্তি, তাই তাকে নিতে হ'ল নতশিরে। কারণ, অম্বপালী এক ক্ষুদ্র মালীর পালিতা কন্যা বই তো নয়! শুধু সে চেয়ে নিল পাঁচটি সর্ত্ত।

প্রথম:—অম্বপালী পেল এক প্রাসাদোপম অট্টালিকা।

দ্বিতীয়:—এক ব্যক্তির উপস্থিতিতে অপর ব্যক্তির প্রবেশাধিকার থাকবে না তার গৃহে।

তৃতীয়:—প্রতি ব্যক্তি অম্বপালীকে পাঁচ শত কার্ষাপণ (তৎকালীন মুদ্রা) দেবে।

চতুর্থ:—গৃহবিচয় কালে (গৃহতল্লাসী) তার গৃহবিচয় হবে সপ্তম দিবস।

পঞ্চম:—রিক্ত হস্তে যদি কেউ তার গৃহে প্রবেশ করে, তাহ'লে তার মনোরঞ্জন করতে অম্বপালী বাধ্য থাকবে না।

অম্বপালী শুধু সৌন্দর্য্যের সম্রাজ্ঞীই ছিল না, নৃত্য-গানেও ছিল সে অদ্বিতীয়া। অল্প দিনের মধ্যেই তার যশের বার্ত্তা ছড়িয়ে পড়ল দেশে দেশে। পঙ্কজ-গন্ধে-মত্ত অলিকুল যেমন ছুটে আসে মধু আহরণে, তেমনি দেশ-দেশান্তর হ'তে লোক ছুটে আসতে লাগল অম্বপালী-দর্শনে।—অম্বপালী হ'ল বিশাল সম্পদের অধিকারিণী। সেই সুযোগে বৈশালী নগরীর সর্ব্বমুখী প্রসারতা চলল বেড়ে।

তৎকালীন মগধেশ্বর রাজা বিম্বিসার ছিলেন বৈশালীর শত্রু। তিনি দূতের মুখে অম্বপালীর রূপ-গুণের বার্ত্তা শুনে, অম্বপালী-সঙ্গ-লোভ সম্বরণ করতে না পেরে একদিন ছদ্মবেশে প্রবেশ করলেন বৈশালী নগরে। অম্বপালী-ভবনে পঞ্চম দিবসাবধি অবস্থানের পর পঞ্চ সর্ত্তের বলে তিনি নির্বিঘ্নে নিজ দেশে ফিরে যেতে পেরেছিলেন। অম্বপালী-নন্দন বিমলকুন্দন মহারাজ বিম্বিসারের পুত্র বলে পরিচিত।

লোকচক্ষে অম্বপালী-ভবন ছিল 'আনন্দমুখর শান্তি-নিকেতন', একটা বিরাট আকর্ষণ। কিন্তু অম্বপালীর চোখে?···একটা বিরাট জ্বালাময়ী অগ্নিকুণ্ড। যাতে নিয়ত হচ্ছিল সে দগ্ধ। তার একমাত্র সান্ত্বনা—তার হৃদয়কুঞ্জের চিরসুন্দর ভগবান একদিন আস্‌বেন—তাকে কৃপা করবেন। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে, আহারে-বিহারে শুধু ছিল তার একটি প্রার্থনা, "হে দেবতা! সে দিনের আর কত বাকী? আমার সম্পদ আমি তুলে' রেখেছি তোমারই তরে। রাজার সম্পদ, নগরের সম্পদ, এই দেহ দিয়েছি নগরের সেবায়। তুমি এস—গ্রহণ কর—কৃপা কর!"

প্রেমের ঠাকুর—ভক্তের ভগবান ভক্তের ডাক শুনেছেন। ভগবান বুদ্ধ চলেছেন আজ কুশীনগরাভিমুখে, সঙ্গে চলেছে তাঁর শিষ্যমণ্ডলী—ভিক্ষুসঙ্ঘ। পশ্চাতে ছুটে চলেছে জনসমুদ্র গগন-ভেদী ধ্বনি তুলে—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।"

কুশীনগরের পথে কোটিগ্রাম নামক একটি গণ্ডগ্রামে বিশ্রাম-লাভের আশায় ভগবান বুদ্ধ সশিষ্য দু'-এক দিন করেন অবস্থান। এই শুভ বার্ত্তা ছড়িয়ে পড়ল বৈশালীর বুকে। "—ভগবান বুদ্ধ এসেছেন—ভগবান বুদ্ধ এসেছেন।" অম্বপালী শ্রবণ মাত্র ছুটে চলেছে কোটিগ্রামাভিমুখে, এত দিন দেহ দান করে করে যে জ্বালা সঞ্চয় করেছিল, তার হবে আজ সমাপ্তি। আজও সে করবে দান—কিন্তু এ দানে হবে সে তৃপ্ত, করবে তার জ্বালাময়ী জ্বালার

শান্তি। চলেছে সে পর্ব্বত-কোলের ক্ষিপ্রা নদীকন্যার মতো—হৃদয়ে তার বুদ্ধের ধ্যান-স্তিমিত রূপ—মুখে তার—"কৃপা কর প্রভু—কৃপা কর! শান্তি দাও—শান্তি দাও!"

ভগবান অন্তর্য্যামী। তিনি শুনেছেন অম্বপালীর কাতর আহ্বান—দেখতে পেয়েছেন নয়নধারায় ধরিত্রী ধৌত করতে করতে অম্বপালী আসছে ছুটে। তখন তিনি নিজ শিষ্য ও ভিক্ষু-সঙ্ঘকে সম্বোধন করে বললেন—"বৈশালীর আম্রকুঞ্জ-পালিতা অম্বপালী আসছে। সাবধান! তার অপূর্ব্ব রূপচ্ছটায় যেন তোমাদের চিত্ত-চাঞ্চল্যের উদয় না হয়।"

"দয়া করো প্রভু!" বলে অম্বপালী বুদ্ধ-চরণে পতিত হ'ল। জ্বালার হ'ল শান্তি—লাভ করল অপূর্ব্ব আনন্দ।

ভগবান অম্বপালীর অন্তরের সন্ধান জানেন, তাই তার অন্তরের নিমন্ত্রণ করলেন গ্রহণ। বললেন—"দেবি! গৃহে যাও, কল্য আমি তোমার গৃহে গমন করে তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করবো।" অম্বপালীর হৃদয়ে আশার আলো উঠল জ্বলে—আনন্দ-সজল নয়নে ফিরে গেল গৃহে। এত দিন যে গৃহ ছিল তার কাছে বিরাট জ্বালাময়ী অগ্নিকুণ্ড, আজ তার চোখে সে গৃহ দেবালয়রূপে মূর্ত হ'য়ে উঠল। অম্বপালী আজ দেবালয়ে—দেবতার অপেক্ষায়। আজ সে দেবী।

বৈশালীর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ছুটে এলেন বুদ্ধের সকাশে। চরণ-ধূলি-দানে তাদের গৃহ পবিত্র করতে জানালেন নিমন্ত্রণ। ভগবান উত্তরে জানালেন, "এ যাত্রা আমার অম্বপালীর আহ্বানে—তাই করেছি তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ, তদুপরি আমার সময় সংক্ষেপ—কুশীনগর আমায় ডাকছে—বরণডালা সাজিয়ে অপেক্ষা করছে আমায় বরণ করতে।" এ যাত্রাই ছিল ভগবানের শেষ যাত্রা, তাই তিনি কুশী-নগরের আভাস দিলেন। আবার বললেন—"অম্বপালী যদি তার নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে নেয়, তোমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্ভব হ'তে পারে।"

আশার একটু ক্ষীণ আলো। অধীর আগ্রহে ছুটে চলল তারা অম্বপালী-ভবন লক্ষ্য করে। কতো অনুনয়-বিনয়, কাতর ও কঠোর আবেদন, অবশেষে লক্ষ লক্ষ টাকার লোভ, কিছুতেই অম্বপালীর মন টলল না। অম্বপালী সকলকে জানিয়ে দিল—সারা বিশ্বের বিনিময়েও অম্বপালীর পক্ষে তা অসম্ভব। ক্ষুব্ধ চিত্তে সকলেই ফিরে গেল।

পরদিবস স-শিষ্য ভগবান বুদ্ধদেব অম্বপালীর গৃহে পদার্পণ করলেন। আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হ'ল অম্বপালীর জয়গান। দেবতারা করলেন পুষ্পবর্ষণ। অম্বপালী বুদ্ধ-চরণে অঞ্জলি হ'য়ে পড়ল লুটিয়ে—অশ্রু-সজল নয়নে গাইল—"হে সুন্দর! হে প্রেমময়! তোমার শীতল চরণ পরশে আজ আমার জ্বালার হ'ল অবসান।" অম্বপালীর হ'ল কৃপালাভ। ভিক্ষুণীর সাজে হ'ল সে সজ্জিত। একমাত্র পুত্র বিমলকুন্দনের কাতর ক্রন্দন, বিশাল সম্পদের মায়া কোনটাই তাকে ধরে রাখতে পারল না। কী সুন্দর! বৈশালীর নগরবধূ আজ চলেছে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর বেশে পথে পথে। দেশে দেশে বুদ্ধের বাণী বিলিয়ে।—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি—সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি'।

অম্বপালীর উল্লেখ বহু পালিগ্রন্থেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। তন্মধ্যে 'বিনয়বস্তু' (Gilgit Text), 'চিওয়ার বস্তু', 'থেরিগাথায়' অম্বপালীর ইতিহাস বিশদ্ ভাবে দৃষ্ট হয়। শ্রীরাজেশ্বরনারায়ণ সিংহ বিরচিত অপূর্ব্ব হিন্দি কাব্যগ্রন্থ "অম্বপালী" ও বাংলা ভাষায় লিখিত কতিপয় নিবন্ধ ব্যতীত, আর কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষায়ই অনুরূপ গ্রন্থ সম্ভবতঃ নাই।

পতিতাকে যে ভগবান কৃপা করেন, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই অম্বপালীর জীবনী। অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়, মেরি ম্যাকডেলিনের জীবনেও। মেরি ম্যাকডোলিন (Marry Macdelin) ছিল রাজা হ্যারল্ডের (King Harold) সভার রাজ-গণিকা, যাকে ভগবান যীশু খৃষ্ট দিয়েছিলেন কোল।

প্রথম

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

যেটুকু পরশ দিয়েছিলে তুমি তোমার কাজের ফাঁকে
তারি সুর আজো আমার জীবনে কতো ছায়া-ছবি আঁকে
নীল নির্জন ক্ষণে,
একটি গানের আরোহীর মত বার বার আসে মনে।

তার পর কতো প্রেমের পরশ আমার কপোল ঘিরে
ঝরা শ্রাবণের কান্নার মত প্রতিদিন গেছে ফিরে
মুছে গেছে তারা ইতিহাস হ'তে নিবে গেছে তার আলো
তুমি শুধু সেই অন্ধকারেতে একটি প্রদীপ জ্বালো

আর কোনো কিছু নাই,
তোমার আমার জীবনের মাঝে সুদূর শূন্যতাই।

এখনো কখনো ঘুম ভেঙে দেখি ঘরের জানালা পাশে
কৃষ্ণচূড়ার শাড়ীর প্রান্ত দিগন্ত থেকে আসে
ধূ ধূ করা মাঠ বিবর্ণ-বন হলুদে বালুর চর
এখানে আকাশ থেমে গেছে যেন কিছু নেই এর পর।
শুধু এ ধ্যানের স্তব্ধ শিয়রে একটু জ্যোতির আলো
কি জানি কি ভেবে সেদিন আমায় এমনি বেসেছ ভালো।

প্রথম প্রেমের যেটুকু পরশ সেদিন দিয়েছ দান
বুঝিনি কখন সারাটা জীবনে তাই হয়ে গেছে গান।

জুয়ায় আপনি হারবেনই

সুনীলকুমার ধর

'খবর'-এর ঘোড়া যে একেবারে জেতে না বা জেতেনি এমন নয়। তবে অধিকাংশ সময়ই এটাকে আপনারা 'কাক-তালীয়' ঘটনা বলে ধরে নিতে পারেন। আগেই আমি বলিছি যে, একমাত্র ঘোড়ার ট্রেণারই বড় জোর বলতে পারেন, অমুক রেসে তাঁর অমুক ঘোড়া 'try' করা হবে এবং সত্যই যদি ঐ 'try'-করা ঘোড়া যে দলে দৌড়বে সে দলে সেদিন তার সঙ্গে পাল্লা দেবার মত আর কেউ না থাকে—তা হলে এই try-করা ঘোড়া শেষ পর্যন্ত জিততেও পারে। অনেক সময় এই ধরণের 'খবরই' রেসুড়েদের মনে 'খবরের' প্রতি নেশা জাগায়। কিন্তু এমনি প্রত্যেক 'খবরই' যদি সত্য হ'ত তা হলে প্রত্যেক রেসের প্রত্যেকটি ঘোড়াই জিততো!

এ কথাও যদি ধরে নেওয়া যায় যে, যারা বহুদিন থেকে কোন এক বিশেষ জুয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে ফলাফল লক্ষ্য ক'রে আসছে তাদের পক্ষে (রেসের ট্রেণার ছাড়া) ঐ জুয়ায় কোন্ অবস্থায় কি ফল হওয়া সম্ভব সে সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছান স্বাভাবিক, তা হলে নিঃসন্দেহে বলা যেত যে, তাদের পক্ষে বড়লোক হওয়া সম্ভব না হলেও—জুয়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত নিশ্চিত লাভবান হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু দেখা গেছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ন'বার অকৃতকার্য্য হয়ে একবার কৃতকার্য্য হয়েছে এই শ্রেণীর লোকেরা। এই জন্যই দেখা গেছে যে, যখনই কোন জুয়াড়ী পর পর দু-চার দিন কোন এক বিশেষ জুয়ায় জিতেছে তখনই সে তার এক 'বিশেষ পদ্ধতি' (system) সম্বন্ধে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে: কিন্তু এমনই তার দুরদৃষ্ট যে, শেষ পর্য্যন্ত তাকে ঐ পদ্ধতি অনুসরণ করেই পথে গিয়ে ব'সতে হয়েছে! এ কথাও হয়ত আপনারা কেউ কেউ শুনে থাকবেন যে, জুয়ায় সর্বস্বান্ত হয়েও জুয়াড়ী বলছে: আর দু-চার দিন যদি কোন রকমে চালাতে পারতাম তা হলে এত দিনে ভাগ্যদেবী এসে আমার ঘরে বাঁধা পড়তেন। আমার এই বক্তব্যের উদাহরণ একটু পরেই দিচ্ছি।

জুয়াকে যদি আমরা game of chance বলেই ধরে নিই তা হলেও দু' রকমের chance-এর কথা আমাদের সব সময় বিচার করে দেখতে হবে। প্রথম হচ্ছে, যে লোকটি জুয়া খেলতে এসেছে তার তখনকার নিজস্ব জিতবার chance এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ঐ বিশেষ খেলাটির স্বাভাবিক গতির chance. যেমন ধরুন, কোন একটা রেসে যখন ১১টি ঘোড়া দৌড়ায় তখন প্রচলিত নিয়ম ও আইন অনুযায়ী হ্যাণ্ডিক্যাপ (গুণানুসারে প্রত্যেকটি ঘোড়া যে ওজন বহন করে) দিয়ে তাদের প্রত্যেকেরই জিতবার সম্ভাবনাকে সমান করে দেওয়া হয়। প্রথম ঘোড়াটিকে (গুণানুসারে একেবারে এক নম্বর) যদি ৯ ষ্টোন ৪ পাউণ্ড ওজন দেওয়া হয় তা হলে অবস্থা বিচার করে সর্বশেষ ঘোড়াটিকে (অর্থাৎ গুণের দিক থেকে সর্বনিকৃষ্ট) দেওয়া হয় ৭ ষ্টোন ২ পাউণ্ড। অর্থাৎ আঙ্কিক হিসাবে এই ওজনের তারতম্য করে প্রথম ঘোড়াটির (যার জিতবার সম্ভাবনা সব চেয়ে বেশী) সঙ্গে দ্বিতীয় ঘোড়াটিকে এবং এমনি করে সব ঘোড়াকে একই পর্য্যায়ে নিয়ে আসা হয়। এ কথা আমি আগেই ব'লেছি যে, ঘোড়া জিতবার মূলে অনেকগুলি বিশেষ প্রত্যক্ষ কারণ আছে—যেমন, বংশ, স্বাস্থ্য, ট্রেনিং এবং জকি। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও অনেক সময় দেখা যায় যে, ওজনের তারতম্য ঘটিয়েই যে সমস্ত কম-chance-ওয়ালা ঘোড়াকে সমান chance দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্য থেকেই একটা ঘোড়া জিতে সব 'up-set' করে দিল। এখন কথা হল আঙ্কিক হিসাব মত যদি হ্যাণ্ডিক্যাপেই বিশ্বাস করতে হয় তা হলে ত প্রত্যেক হ্যাণ্ডিক্যাপ রেসের প্রত্যেক ঘোড়ারই একসঙ্গে একই সময়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছান উচিত কিন্তু তা হয় না এবং যে কারণে হয় না, ঠিক সেই কারণে unfancied ঘোড়া (অর্থাৎ সাধারণের হিসাবে যে ঘোড়া জিতবার জন্য 'তৈরী' হয়নি) যখন জেতে তখনই তাকে বলা হয় up-set করেছে। অথচ আঙ্কিক হিসাবে কোন রেসেই কোন ঘোড়ারই up-set করার কথা নয়। বা up-set বলে কোন শব্দ ব্যবহার করাও উচিত নয়। সুতরাং যেখানে অনেক হিসাব, অনেক ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও up-set হওয়া সম্ভব এবং প্রায়ই হয়ে থাকে সেখানে আপনার সমস্ত হিসাবও যে শেষ পর্য্যন্ত up-set হয়ে যাবে এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে? এই রকম ক্ষেত্রে যদি জুয়াড়ীর ব্যক্তিগত জিতবার chance-এর সঙ্গে এই up-set-এর chance-এর যোগাযোগ ঘটে তবেই ঐ রেসুড়ের পক্ষে জেতা সম্ভব।

পাকা পেশাদার জুয়াড়ীদের মতে জুয়ায় অবশ্যপালনীয় কয়েকটি নিয়ম আছে। প্রথমত, জুয়া খেলাকে ঠিক ব্যবসায়ের পর্য্যায়ে নিয়ে গিয়ে তাকে ঠিক ব্যবসায়ীর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে হবে। কোন উত্তেজনা থাকবে না, কোন আতিশয্য থাকবে না। বিশেষ করে উত্তেজনা যদি থাকে তা হলে বুঝতে হবে উত্তেজিত ব্যক্তির বিচার-শক্তি (বিশেষ করে তাস বা ক্যাসে খেলার সময়) একেবারে পঙ্গু এবং তার জিতবার chance-ও সুদূরপরাহত। আবার যেখানে আতিশয্য সেখানেও ঐ এক অবস্থা। তা ছাড়া আর একটা যে কথা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে তা হল, যখন হার হতে আরম্ভ হবে (তাস বা ক্যাসে) তখনই জুয়া খেলা বন্ধ করতে হবে। এ রকম লক্ষ লক্ষ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আছে যে, যখন হার হতে আরম্ভ হয় তখনও 'কেন আমি জিতবো না' এই মনোভাব নিয়ে খেলা চালিয়ে জুয়াড়ীর হারের পরিমাণ অনেক গুণ বেড়ে গেছে। ভাগ্যদেবী জুয়াড়ীদের উপর এমনি পরিহাস-পরায়ণা যে, জিতবার সময় আনন্দে আত্মহারা হয়ে খেলতে থাকলে শেষ পর্য্যন্ত তাকে চোখের জলে ভাসিয়ে ছাড়েন, আবার যে হারতে হারতেও কিছুতেই খেলার জিদ ছাড়ে না তাকে মারতে মারতে পথে টেনে আনেন। এই দুয়েরই মূলে কিন্তু বিপরীতধর্মী একটি করুণ উপলব্ধি আছে। যখন কেউ কোন জুয়ায় পর পর জিততে থাকে তখন সে মনে করে যে, তার 'সুসময়' অনন্ত (যে-chance-এর উপর নির্ভরই হ'চ্ছে তার জুয়া খেলা, তার কথাও তার মনে থাকে না!) আবার যখন হারে তখন মনে করে, তার 'দুঃসময়ের' শেষ

ন হবে না? এই হল জুয়ার সর্বনেশে নেশা এবং চরমতম অভিশাপ!

Chance সম্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প আছে। গল্পটি বলেছেন, হাইনমেৎস্। ১৮১৩ সালে অগডেন নামে এক ভদ্রলোক কোন এক Casino-য় (জুয়ার আড্ডা) গিয়ে ঘুঁটি (dice) ছোড়ার বাজি ধরেন। তিনি বলেন যে, পর পর দশ বার একজোড়া ঘুঁটি (সাধারণতঃ একজোড়া ঘুঁটি নিয়েই ঘুঁটি খেলা বা 'dice throw' করা হয়) ছুড়লে পর পর দশ বার '৭' পড়বে না। বাজি ধরলেন এক হাজার গিনিতে এক গিনি। অর্থাৎ তিনি যদি জেতেন তা হলে পাবেন এক গিনি আর হারলে হারবেন এক হাজার গিনি। জোড়া ঘুঁটি ছোড়া আরম্ভ হল এবং এমনি আশ্চর্য্য ব্যাপার যে পর পর ন'বারই '৭' পড়লো! এই সময় মিঃ অগডেন চঞ্চল হয়ে উঠে বললেন, যাক গে যা হবার হয়েছে. আর ঘুঁটি ছুড়তে হবে না। মোট বাজির টাকা (১০০০ গিনি) থেকে আমাকে ৫৭০ গিনি ফেরৎ দিন। অর্থাৎ এই সময় তিনি ৫৩০ গিনি হেরে যেতে বাজি হয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ তাঁর এ প্রস্তাবে রাজি হলেন না। তিনি মনে করলেন, ন'বার '৭' যখন পড়েছে তখন আর একবারই বা না পড়বে কেন! তার পর দশ বারের বার ঘুঁটি ছোড়া হল কিন্তু সেবার পড়লো '৯' এবং শেষ পর্য্যন্ত মিঃ অগডেন এক গিনি জিতেছিলেন।

এই ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে, এই রকম ঘটনা ঐ ঘটনার দিনের আগে কখনও ঘটেনি এর পরে আজ পর্য্যন্ত কোন রকম জুয়াচুরি না করে আর ঘটেনি। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে এ কথা বেশ বুঝা যায় যে, দশ বার না হোক পর পর ন'বার '৭' পড়ার chance-ও chance-এর পক্ষে ঘটানো সম্ভব নয় কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যখন দেখা গেল যে, তাও সম্ভব তা সত্ত্বেও এখনও কি আমরা জোর করে বলতে পারবো (যদিও দশ বারের বার '৯' পড়েছিল) দশবারের বারও '৭' পড়া সম্ভব ছিল? তা যদি বলতে না পারি (যেমন মিঃ অগডেনের প্রতিপক্ষ মনে করেছিলেন) তা হলে chance-এর উপর নির্ভর করে জুয়া খেলবো কি করে? মিঃ অগডেন এবং তাঁর প্রতিপক্ষের মনোভাব বিশ্লেষণ করলেই আমরা আসল কথাটা বুঝতে পারবো।

ন' বার পর পর '৭' পড়ার পরও যদি মিঃ অগডেন এ কথা বিশ্বাস করতে পারতেন যে, 'power of chance was limited' এবং পরের বার '৭' পড়বে না—তা হলে তিনি কখনই ৫৩০ গিনি হেরে যেতে চাইতেন না। অথচ যখন তিনি প্রথমে বাজি ধরেন তখন তাঁর মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে, পর পর দশ বার '৭' পড়তে পারে না, কারণ 'power of chance was limited' এবং এর জন্যই তিনি মাত্র এক গিনির জন্য এক হাজার গিনি বাজি ধরেছিলেন। অপর দিকে তাঁর প্রতিপক্ষ ন' বার পর পর '৭' পড়ায় chance-এর উপর এতখানি আস্থাবান হয়ে পড়েছিলেন, ('power of chance unlimited') যে, তিনি ৫৩০ গিনি নিয়ে সন্তুষ্ট হতে চাইলেন না। তাঁর স্থির ধারণা হয়েছিল যে, পর পর ন' বার যখন '৭' পড়েছে—তখন দশ বারের বারও '৭' পড়বেই।

অথচ সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে ওঁরা দু'জনেই মনে মনে জানতেন যে, যত বার ঘুঁটি ছোড়া হবে তত বারই '৭' পড়তে পারে না—তবুও তাঁরা কেউ-ই এ কথা স্থিরভাবে ভাবতে পারছিলেন না, কখন '৭' পড়া বন্ধ হবে। তাঁরা দু'জনেই বোধ হয় মনে মনে এই হিসাব করছিলেন যে, যখন সাত বারের পর আট বার '৭' পড়লো এবং আট বারের পর ন' বারও '৭' পড়লো—তখন ন' বারের পর দশ বারও '৭' পড়বে। এক জন এই সম্ভাবনায় ভয় পেলেন, অপর জন উত্তেজিত হয়ে হাতে-আসা একটা মোটা টাকা না নিয়ে উপরন্তু এক গিনি লোকসান দিলেন! ঘটনা চক্রের আবর্ত্তে পড়ে ওঁরা দু'জনেই একই সময়ে অসম্ভবকে সম্ভব বলে বিশ্বাস করেছিলেন!

এই ঘটনাটি আরো একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে, প্রথমেই আপনাদের অনেকের মনে যে ধারণা হয়েছিল—এক গিনির জন্য এক হাজার গিনি বাজি ধরা মিঃ অগডেনের পক্ষে খুব বেশী হঠকারিতা হয়েছিল, আঙ্কিক হিসাবে আপনাদের এ ধারণা কিন্তু সত্য নয়। একজোড়া ঘুঁটি ছুড়লে '৩৬' রকমের সংখ্যা আসতে পারে এবং এর মধ্যে ছয়টি সংখ্যা আসতে পারে যার মোট সংখ্যা '৭' হবে। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, ঘুঁটি ছুড়লে—একবার '৭' আসার সম্ভাবনা হচ্ছে ছ' বারে—একবার এবং পর পর দশ বার '৭' আসার সম্ভাবনা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ৬,৪৬৬,১৭৬০ ভাগের এক ভাগ এবং ঠিক হিসাবমত বাজি রাখতে হলে মিঃ অগডেনের বাজি রাখা উচিত ছিল এক হাজার গিনির বদলে ৬০,৪৬৬,১৭৬ গিনি। কিন্তু যখন পর পর ন' বার '৭' পড়েছে তখন দশ বার '৭' পড়ার সম্ভাবনা এসে দাঁড়িয়েছিল ছ ভাগের এক ভাগ এবং এই জন্যই মিঃ অগডেনের প্রতিপক্ষ ৫৩০ গিনি নিয়ে সন্তুষ্ট হতে চাননি। তিনি মনে করেছিলেন, ১০,০৭৭,৫৯৫১২ যদি সম্ভব হতে পেরে থাকে, তা হলে ছ' ভাগের এক ভাগই বা সম্ভব হবে না কেন? সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম chance-ও কতখানি chance-এর উপর নির্ভর করে।

আরো বিশদ ভাবে ব্যাপারটা বুঝাবার জন্য আর একটা গল্প বলছি আপনাদের। গল্পটি হল এক নাম-করা ইংরেজ জুয়াড়ীকে কেন্দ্র করে। এই ভদ্রলোককে …ন্টিনেন্টের প্রায় জুয়ার আড্ডায় দেখা যেত এবং নিজের বহু অভিজ্ঞতা এবং chance-combination-এর সম্ভাবনাকে ভিত্তি করে তিনি নিজস্ব একটা system তৈরী করেছিলেন। সিষ্টেমের মূল সূত্রটি হল এই : যে ঘটনা এই মাত্র ঘটে গেল বা পর পর একাধিক বার ঘটে গেল, সেই ঘটনাটির শীঘ্র ঘটবার সম্ভাবনা কম এবং যা ঘটেনি তারই ঘটবার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে বেশী। ভদ্রলোক Monte Carlo-তে গিয়ে প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে র‍্যুলে'র টেবিলে নীরবে বসে থেকে যে যে সংখ্যাগুলি এল সেগুলি খাতায় লিখে নিলেন। তার পর যে সংখ্যাগুলি এই দু' ঘণ্টার মধ্যে একাধিক বার এসেছে সেগুলি বাদ দিয়ে যে সংখ্যা একেবারে আসেনি বা দৈবাৎ এক-আধ বার এসেছে সেই সংখ্যার উপর তিনি বাজি ধরতে আরম্ভ করলেন। 'The most elementary of the theories of probability' অনুযায়ী এই সিষ্টেমে বাস্তবতঃ কোন ত্রুটি ছিল না। কারণ এই পদ্ধতি অনুসারে যে সংখ্যাগুলি আগে একাধিক বার এসেছে সেগুলির চেয়ে সংখ্যাগুলি এখনও এক বারও আসেনি, তাদের আসার সম্ভাবনা বেশী সম্ভব। আপনারাও অনেকে যাঁরা জুয়া খেলেন হয়ত এই চমৎকার 'আঙ্কিক' (!) হিসাব দেখে মনে

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, ঐ ভদ্রলোক ঐ দিন এক ঘণ্টার মধ্যে এই 'সিষ্টেম' অনুযায়ী খেলে ৭০০ পাউণ্ড জিতেছেন। ভদ্রলোকের উত্তেজনা ও আনন্দ আর ধরে না! এত দিনে তিনি ক্যলে'য় জিতবার সত্যিকারের 'philosopher's stone' আবিষ্কার করেছেন মনে করে তার পরদিনই সকালে জেতা টাকার বেশির ভাগই এক ব্যাঙ্কের মারফতে লণ্ডনে পাঠিয়ে দিলেন। সেই রাত্রে ভদ্রলোক আবার নিজের সিষ্টেমের 'পরশ পাথর' নিয়ে বেশ হৃষ্ট এবং উত্তেজিত চিত্তে Monte Carlo-তে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সে রাত্রে হারলেন ৫০ পাউণ্ড। তার পর দিন হারলেন, তার পরের দিনও হারলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে টেলিগ্রাম করে লণ্ডন থেকে টাকা আনিয়ে নিতে হয় এবং ৭ দিনের মধ্যে (কেবল ফিরে যাবার খরচ ছাড়া) সব হেরে তিনি লণ্ডনে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। এত দিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তৈরী এই 'নিশ্চিত সিষ্টেমের' ভঙ্গুরতা দেখে ভদ্রলোক ঘেন্নায় জুয়া খেলাই ছেড়ে দিলেন এবং তার পর যত দিন জীবিত ছিলেন আর কখনও জুয়া খেলেন নি—উপরন্তু তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন যাতে কেউ জুয়া না খেলে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, 'চান্সের' উপর নির্ভর করলে সম্ভাব্য ঘটনা সম্ভবপর সময়ে যেমন ঘটতে পারে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও কি মনে হয় না যে, এই সম্ভবপর সময় কত দিনে এবং কখন আসবে সে সম্বন্ধেও কোন নিশ্চয়তা নেই?

আর একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দিই। কোন রকম কায়দা-কানুন না করে যদি একটা টাকাকে আমরা একশো বার শূন্যে ছুঁড়ি (toss) এবং কত বার 'হেড' আর কতবার 'টেল' পড়লো তার হিসাব রাখাও হয় তা হলে তাদের মধ্যে পার্থক্য খুব কম থাকবে এ কথা কি আমরা জোর করে বলতে পারি? অথচ প্রত্যক্ষতঃ দেখা গেছে একশো'র মধ্যে ৭০ বার 'হেড' ৩০ বার 'টেল' পড়েছে। কিন্তু অঙ্কিক হিসাবে হেড এবং টেল (যে হেতু টাকার মাত্র দুটো দিক আছে) সমান সমান হওয়া উচিত ছিল না কি? 'হেড' পড়ার সম্ভাবনা যখন 'টেল' পড়ার সম্ভাবনার সঙ্গে সমান তখন এই পার্থক্য থেকেই বুঝা যায় যে, সমান সমান 'চান্স'ও সব সময় আপনার 'চান্স' যে আসবেই তাও নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়। আপনি জিততেও পারেন হারতেও পারেন। যেখানে আপনি জিতবেনই এ কথা বলতে পারেন না সেখানে আপনি হারতে পারেন —এই সম্ভাবনার মধ্যে যাবেন কেন? এর পরও কোন জুয়াড়ী যদি বলেন, chance আমাকেই বঞ্চিত করবে এ কথাই বা বিশ্বাস করবো কেন, তাঁকে বলবো, ঐ chance-এর নেশাই শেষ পর্য্যন্ত আপনার মাথা খাবে। আপনি এখনও যখন বলছেন, আপনাকেই chance বঞ্চিত করবেই এ কথা যেমন ঠিক নয় তেমনি যে মনোভাব বা চিন্তাধারা থেকে আপনার এই কথা মনে হল, সেই ধারার অপর দিকটার কথাটা সঙ্গে সঙ্গে এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন?

আচ্ছা, আপনার মনোভাবটাই বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। যদি কোন একটা ঘটনা পূর্ব্বে কোন এক বিশেষ পরিস্থিতিতে এক হাজার বারও ঘটে থাকে (জুয়ায়) পরের হাজার বার তার বিপরীতটাই ঘটবে বা ঘটবে না তার যেমন নিশ্চয়তা নেই তেমনি আগেকার হাজার বার ঘটা ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না তারও তেমন কোন স্থিরতা নেই। দুটোর যে কোন একটা ঘটতে পারে—না'ও ঘটতে পারে। একটা ঘটনা ঘটবার পরমুহূর্ত্তে তার পুনরাবৃত্তি হবে বা হবে না এ কথা বার বার ঘটবার পরও আজও কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারেনি। যখন ঘটেছে তখন ঘটেছে, যখন ঘটেনি তখন ঘটেনি। কেন ঘটেছে, কেন ঘটেনি এর কারণ নির্ণয় করা আজও সম্ভব হয়নি কারও পক্ষে। কোন এক সংঘটিত ঘটনা (জুয়ায়) কখনই কোন দিক দিয়ে পরবর্ত্তী ঘটনাকে প্রভাবিত করে না। প্রথম রেসে জিতবার পর দ্বিতীয় রেসেও আপনি জিতবেন না এর যেমন কোন অনিশ্চয়তা নেই তেমনি আপনি হারবেনই এ কথা রেস শেষ হবার আগেও জোর করে বলা সম্ভব নয়। অথচ কার্য্যক্ষেত্রে আমরা দেখি প্রথম, দ্বিতীয় এমন কি তৃতীয় রেসে জিতেও কিংবা দিনের পর দিন জিতে হেরে, জিতে হেরে—শেষ পর্য্যন্ত শতকরা অন্ততঃ ৯৯ জন রেসের 'দৌলতে' পথে গিয়ে বসে! তবে এ কথা ঠিক যে আপনার জিতবার chance আর রেসের ঘোড়ার জিতবার chance— এই দুটোর মধ্যে যদি কোন উপায়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন, তা হলে একদিন আপনার প্রাসাদের চূড়া আকাশের বুক চিরে স্বর্গে গিয়ে পৌঁছবে!

সব চেয়ে দুঃখের কথা হল, যাঁরা জুয়া খেলেন, যাঁরা রেসে যান তাঁরা প্রত্যেকেই মনে মনে খুব ভাল ভাবেই এ সব কথা জানেন, খেলেন কিন্তু যেহেতু তাঁরা কিছুতেই অতি অল্প আয়াসে ধনী হবার স্বপ্নের নেশা কাটাতে পারেন না বা যাঁরা কঠোর পরিশ্রম করে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে বিমুখ বা যাঁদের জুয়ার নেশা ব্যাধিতে পর্য্যবসিত হয়েছে—তাঁদের একেবারে নিঃসম্বল হয়ে পথে না আসা পর্য্যন্ত কোন রকমেই কিছু বোঝানো যাবে না। অথচ চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব নেই এই বিষয়ে। তবুও আজ পর্য্যন্ত জুয়াড়ীদের কিছুতেই বোঝানো সম্ভব হল না যে, বিশেষ অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিকে যা ঘটেনি তার ঐ না-ঘটার সম্ভাবনার উপর ঐ অবস্থা এবং পরিবেশে যা ঘটেছে তার কোন প্রভাব বিস্তার কোন মতেই সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে আমরা যদি 'টস্' করার কথায় ফিরে যাই তা হলে আমি আশা করি যে, অসংখ্য পাঠকের মধ্যে অন্ততঃ এক জনও জুয়ায় 'ধন মন' নষ্ট করবার অসারতা এত দিনে বুঝতে পারবেন।

যেমন কোন লোক যদি একটা টাকা 'টস্' করে পর পর ন'বার 'হেড' ফেলে, তা হলেও আমাদের সাধারণ বুদ্ধি আমাদের বলবে যে, দশ বারের বার 'টস্' করবার আগে তার 'হেড' 'টেল' ফেলবার সম্ভাবনা ঠিক তাই আছে যা সর্ব্বপ্রথম 'টস্' করবার সময়ে ছিল। টস্ করবার সুরুতে তার পক্ষে এ কথা জোর করে বলা কোন রকমেই সম্ভব ছিল না যে, দশবারের মধ্যে দশ বারই সে 'হেড' ফেলবে, কিন্তু যেহেতু সে ন'বার 'হেড' ফেলেছে, সেই হেতু সেই দশ বারের বারও 'হেড' ফেলবে—এ কথা যদি ঘটনা-পরম্পরায় (পর পর ন'বার 'হেড' ফেলা) বাস্তব সত্য হয়েও ওঠে—তার পক্ষে কিছুতেই স্থির ভাবে বলা সম্ভব নয় (দশ বারের বার 'হেড' না পড়া পর্য্যন্ত)। সুতরাং যে ঘটনা আপনার নিজের হাতের মধ্যে তার উপরও যখন আপনার কোন 'হাত' নেই, তখন যে জুয়া অনেক ঘটনা-সাপেক্ষ সেখানে আপনার ভাগ্যে যে দুর্ভোগ ঘটবেই তাতে আর সন্দেহ কি? বিশ্বাস না হয় আপনি নিজে একটা টাকা নিয়ে টস্ করে দেখবেন (অবশ্য কোন রকম চালাকি করবেন না যেন!)।

খেয়াল খাতা

শ্রীনিমাইচন্দ্র খাঁ সংগৃহীত

পার্থিব যে কোন সম্পদের ধ্বংস আছে; কিন্তু শুদ্ধ ভালবাসাই পৃথিবীতে পরম সম্পদ, ইহার ধ্বংস নাই। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন।

—শ্রীযামিনী রায়।

হস্তলিপিতে লিপিটিই থাকে
থাকে না হস্তস্পর্শ।
অন্তর থেকে অন্তরে এসো
করো অনন্তদর্শ॥

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

কমিউনিজমই আমাদের পথ ও আমাদের উদ্দেশ্য।

—সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জ্যোতির্লেখায় রাতের আকাশে ও লেখা কার?
খুঁজে খুঁজে ফিরে কোথায় পাব যে লেখন তার।
পায়ের তলায় ঘাসের বনে সে পেলাম লেখা—
ঘাসের ফুলের পাঁপড়িতে ফুটে সে রঙ রেখা!

—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

তোমার জীবনবৃন্তে ফুটি উঠুক
যশের কমল,
সমস্ত জীবন হোক নির্মাল্যের সম,
পবিত্র নির্মল।

—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

জীর্ণ পাতারা ঝরে যায় বারে বারে
তবু মর্মর সঞ্চিত থাক গভীর প্রাণের তারে।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র।

সূর্য উঠিবে আশ্বাসে জেগে আছি
আলোয় ভরিবে প্রাচী
অনর্থ হবে পরম অর্থবান
সংশয় দ্বিধা হয়ে যাবে অবসান
যাহা মিছে তাহা মিলাবে কুহেলি সম
হে সূর্য নমো নম।

—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরের স্বাক্ষর নিজের খাতায়
কুড়িয়ে কি লাভ?

—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

ভুলো না, এই তপোভুমি ভারতের
তোমরা অমর সন্তান, এই মায়ের
যোগ্য হও।

—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

ওঁ শঙ্কর
দিনবন্ধু দিননাথ দয়াসিন্ধু
মধুসূদন নারায়ণ।

—আলাউদ্দিন খাঁ।

অটোগ্রাফের খাতা দেখে
শঙ্কা জাগে মনের মাঝে।
লিখব যাহা হয়ত তাহা
হয়ে যাবে নেহাৎ বাজে॥

—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ফাঁসির দড়ি হ'ল গলার হার—
সেই ছেলেদের জানাই নমস্কার

—মনোজ বসু।

আশীর্ব্বাণী
লভি' অক্ষয় আয়ু
মুঠায় আঁকড়ি' ধর' এ ধরণী
আকাশে বাড়াও বাহু।
ধাও উদ্দাম গতি,
বিদ্যুৎ সম ধাও আনন্দে
আকাশ জলধি মথি,'
লোহার নিগড় ছিঁড়ে'
ঝাণ্ডা তুলিয়া আগাইয়া যাও,
লক্ষ লোকের ভিড়ে।
এস গো দুঃসাহসী
ললাট হইতে উঠাইয়া ফেল
দুর্ভাবনার মসী।
উত্তাল গিরি-চূড়া
ভীম বিক্রমে দৃঢ় পদাঘাতে
স-দর্পে কর' গুঁড়া।

—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

রেখো দুঃখ সুখ সনে
আপনারে ঠিক,
হয়ো পুণ্য ভারতের
যোগ্য নাগরিক।

—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

চাষা আর চষা মাটি
দুইয়ে মিলে দেশ খাঁটি।

—শ্রীকালিদাস রায়

[রোজেনবার্গ-দম্পতির হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় দুঃখের কাহিনী। বৈদ্যুতিক কেদারায় মৃত্যু বরণের পূর্ব্বে রোজেনবার্গ স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে যে-সকল ঘরোয়া পত্রালাপ চলে, সেগুলি বর্তমানে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সংখ্যার পত্রাবলীর অনুবাদক সাম্যবাদী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ক্যালকাটা বুক-ক্লাব প্রকাশিত "রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ" গ্রন্থ থেকে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পত্র আমরা অনুবাদক ও প্রকাশকের অনুমতি সহ পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দিই।]

রোজেনবার্গ-দম্পতির পত্রাবলী

প্রিয়তমা,

আজকের ঘটনাগুলো সংক্ষেপে আগে ব'লে নিই। আজ সকাল থেকেই খুব অস্থির, উন্মনা হয়ে পড়েছিলাম। এত উদ্বেগ হচ্ছিল বলার নয়। তোমাদের গলার স্বর যেই সেল ব্লকের দিকে ভেসে এল, অমনি আমার সেই অসহ্য ভাব দূরে চলে গেল। রবার্টএর গলাফাটানো চীৎকারও আমার কাছে গানের কলির মত মনে হ'ল।

দুপুরের খাওয়া শেষ ক'রে গেলাম কাউন্সেল ঘরে। বাচ্চারা ছিল দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে। আমি যখন ওদের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম, ওরা কেমন যেন জড়োসড়ো হয়ে গেল—যেন অনেক দূরের মানুষ। প্রথমটা আমার একটু ধন্ধ লেগে গিয়েছিল। গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছিল না, দুটো চোখ ভ'রে উঠেছিল জলে। আর মাইকেল কেবলি বলছিল, "বাপি, তোমার গলা যে চেনাই যায় না।"

মিনিট দুই পরে নিজেকে সামলে নিলাম। তারপর কিছুক্ষণ চুমো খাওয়া আর বুকে জড়ানোর পালা। রবী আমার কোলে এসে ব'সল। আমার দিকে সরু ক্ষীণ মুখ তুলে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থেকে বললে, "বাড়ীতে যাও না কেন, বাপি?" আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম। "কেন তুমি রবিবারে রবিবারে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে শেণ্টারে যাওনি?" আবার আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম। কিন্তু ও এত ছোট যে, মাথায় কিছুই ঢুকল না। ঘরময় ছুটোছুটি ক'রে চেয়ারগুলোর সঙ্গে খেলা করতে লাগল।

ছেলেদের আমি থলি-ভর্তি শক্ত চিনির মিঠাই দিলাম আর ট্রেণ, বাস আর মোটর গাড়ীর আঁকা ছবি দেখালাম। মাইকেল বেশীর ভাগ সময় ব'সে ব'সে পেন্সিল দিয়ে ট্রাকের ছবি আঁকল।—বউটিকে একটু লাজুক-লাজুক মনে হ'ল, কথা ব'লল কম। আমার দিকে মুখ তুলে তাকায়নি ব'ললেই হয়। তুমি যা বলেছিলে সেই মত আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার সঙ্গে কী আলোচনা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ডেভ, তোমার মা এবং রুথ সম্পর্কে দু'-চারটে কথা ব'লল।

যখন তোমার পরিবার সম্পর্কে আমি সব খুলে বললাম একমাত্র তখনই আমাদের আলাপ জমে উঠল। মাইকেল হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসল, "তোমাদের বিচারে কোন নিরপেক্ষ উপদেষ্টা ছিল কি?" জিজ্ঞেস করল, "মিষ্টার ব্লক ছাড়া তোমাদের পক্ষে আর কে সাক্ষী ছিল?" আসল কথা, ওরা দু'জনেই খুব ভয় পাচ্ছে।

মাইকেলের কথা থেকে একটা জিনিষ বেরিয়ে এল। তা হ'চ্ছে এই যে, আমার বদলে মাইকেল এখানে থাকলেই ভাল হ'ত। অবশ্য ইচ্ছে থাকলেও প্রথম দেখা-সাক্ষাতে এর চেয়ে বেশী বিষয়ে কথা হওয়া সম্ভব ছিল না। কিছুক্ষণ গান করা গেল। তার পর খেলার ইস্কুল নিয়ে গল্প—তাতে ওদের মন অনেকটা হাল্কা হ'ল।

তুমি আগে যে ভাবে কথাবার্তা ব'লে রেখেছিলে, তাতে আমার খুব সুবিধেই হয়েছিল। ছেলেদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় ব্যাপারটা এত ভাল ভাবে উৎরে যাবে ভাবতেও পারিনি। জানো, ওরা বায়না ধরেছিল সেপাইরা ওদের দেহতল্লাসী করুক। ছেলেরা বলল তোমাকে নাকি আরও ছোট দেখাচ্ছে। আমি ওদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম আমার গোঁফজোড়াটি নেই। ছোটটি জিজ্ঞেস করল, "গেল কোথায়?"

ওদের কথাবার্তা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম কাঠের ব্লক রেলের লাইন, মূর্তি গড়বার মাটি, রকমারি জিনিষ তৈরির বাক্স এবং আর যা সব খেলনা ছিল কোনটা নিয়েই ওরা খেলে না। এমন হতে পারে যে খেলনাগুলো হারিয়ে গেছে, কিম্বা খেলনাগুলো ওরা পায় না।

ব্যাপারগুলো আমাদের খুঁটিয়ে দেখা দরকার। প্রিয়তমা, ছেলেদের কাছে থাকা আমাদের একান্ত দরকার। আশা করি, বেশী দিন ওদের ছেড়ে থাকতে হবে না আমাদের। মাইকেল বলেছিল আমরা যাবো ব'লে আমাদের জন্যে নাকি ঘর গোছানো হচ্ছে, ওর ঠাকুমা নাকি ভেতরের ঘরে উঠে যাচ্ছেন। অর্থাৎ, ও ধরেই নিয়েছে আমরা ফিরে যাচ্ছি। ওদের ছেড়ে চলে আসবার সময় মনে হ'ল আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন ছিঁড়ে ফেলেছি। ভালবাসা জেনো। জুলি

২২শে জুলাই, ১৯৫২

প্রিয়তমা জুলি আমার,

বই থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পড়ার সময় থেকে কিছুটা সময় তোমাকে না দিয়ে পারলাম না। একটা দারুণ খবর আছে। আজ বিকেলে তোমার চিঠির সঙ্গে আরও একটা চিঠি পেয়েছি। লিখেছে মাইকেল আর রবী। গত সপ্তাহে তুমি ওদের যে চিঠি

দিয়েছিলে, বোঝাই যাচ্ছে এটা তার জবাব। বুধবার যখন দেখা হবে তখন নিশ্চয় তোমাকে প'ড়ে শোনাবো। কিন্তু যতক্ষণ তোমাকে প'ড়ে না শোনাচ্ছি আমার শান্তি নেই।

তুমি হয়ত জানতে পারো না, প্রত্যেক বুধবারে তোমাকে দেখার জন্যে কী অধীর আগ্রহে আমি অপেক্ষা ক'রে থাকি। তুমি আমাকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে যে স্নেহসিক্ত কথাগুলো বলো, তা শুনে আমি সান্ত্বনা পাই।

এই প্রচণ্ড গরমে আমার সমস্ত উৎসাহ চলে গেছে। খেলতে ইচ্ছে করে না, লিখতে ইচ্ছে করে না—যাতে সামান্যতম হাত-পা নড়াবার দরকার হয়, এমন কিছুই করতে ভাল লাগে না।

প্রিয়তম, আর আমার ধৈর্য মানছে না; আমি তোমাকে একান্ত ভাবে চাই। আমার করবার মধ্যে আছে শুধু—পোড়া কাগজে পোড়া পেন্সিল দিয়ে হিজিবিজি লিখে যাওয়া। আগের চেয়েও তুমি আজ অনেক বেশী আমার হৃদয় ছেয়ে আছো। তোমার একা নিঃসঙ্গ এথেল

৩রা আগষ্ট, ১৯৫২

প্রিয়তমা,

আরও একটা দিন, আরও একটা সপ্তাহ, আরও একটা মাস। আমাদের ছাড়াই সময় বয়ে চলেছে। আমরা প'ড়ে আছি একটানা অন্তহীন নিঃসঙ্গতার মধ্যে। যা কিছু আমাদের প্রিয়, সমস্ত কিছু থেকেই আমরা বঞ্চিত হয়েছি। শুধু কাড়তে পারেনি একটি মাত্র জিনিস—আমাদের আত্মমর্যাদা। জীবনের মূল আদর্শগুলো বার বার জোর গলায় ঘোষণা করা, প্রেরণা নিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার জন্যে অতীতের সমস্ত অভিজ্ঞতা স্মৃতিপটে জাগিয়ে তোলা—এ ছাড়া আর কি ভাবেই বা মানুষ মনের জোর রাখতে পারে?

সময়কে পরাভূত করার জন্যে সারাক্ষণ বই পড়া, লেখা আর বাধা-বিপত্তির ভাবনাগুলো মন থেকে মুছে ফেলা। কিন্তু তাই ব'লে কখনই প্রতিদিনের বাস্তব ঘটনাগুলো যেন চোখের আড়াল না যায়—

প্রিয়তমা, সেই চেষ্টাই তো আমরা ক'রে চলেছি। হয়ত আমাদের জীবনে অনেক কিছু করবার আছে ব'লেই, হয়ত জীবনকে আমরা একান্ত ভাবে ভালবাসি ব'লেই—এই বিচ্ছেদ আমাদের কাছে এত দুঃসহ। কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে মজা এইখানে যে, আমরা এত-সব জানি ব'লেই আমাদের মনের একটুও জোর বসে না।

ছেলেদের নিয়ে গরমের ছুটিগুলো সেই যে আমরা একসঙ্গে কাটাতাম মনে আছে? গ্রামাঞ্চলে কিম্বা সমুদ্রের ধারে সবাই আমরা এক জায়গায়—ভাবতে পারো? যখন দেখি, দেশের মানুষ আমাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে, আমাদের ছেলেদের মঙ্গলের জন্যে সমস্ত রকম ভাবে চেষ্টা করছে—আমাদের এই নিদারুণ বেদনা ও দুর্ভাবনা কমে যায়। কিন্তু নিজেকে বড় বঞ্চিত ব'লে মনে হয়। দুটো বছর—আমাদের ছেলেদের পক্ষে বিশেষ জরুরী দুটো বছর আমাদের কাছ থেকে ওরা যেন ছিনিয়ে নিয়েছে। শীগ্‌গির শীগ্‌গির ছেলেদের কাছে ফিরে যাই—এইটুকুই আমার একমাত্র কামনা। শয়তানের দল! দুজন নিরপরাধ স্ত্রী-পুরুষ আর তাদের নিরপরাধ সন্তান-সন্ততির গলায় পা দিয়ে হাড়মাস শুষে নিয়েছো। যা নেবার তার চেয়েও বেশী নিয়েছো, এবার ছেড়ে দাও।

আমরা আশা করছি যদি আমরা এই মিথ্যে মামলার মুখোস খুলে দিতে পারি তাহ'লে এত দিন ধ'রে যে বেদনা আমাদের বুক বিদীর্ণ করেছে তা সার্থক হবে। অন্তত অন্য কোন নিরপরাধ মানুষকে আমাদের মত এত অনায়াসে যন্ত্রণা দেওয়া যাবে না। ভালবাসা নিও।

জুলি

১৯শে জানুয়ারী, ১৯৫৩

প্রিয় ম্যানি,

এর আগে যে চিঠি দিয়েছিলাম, তার পর জল অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। রোজেনবার্গ-দম্পতি অকম্পিত কণ্ঠে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল—দেশের মানুষ আইনের ছদ্মবেশে হত্যার ব্যাপারটা কিছুতেই মুখ বুঁজে মেনে নেবে না। আমাদের সে ভবিষ্যদ্বাণী যে নির্ভুল ছিল তা সহস্র বার প্রমাণ হয়ে গেছে।

এখানে সেখানে একেকটা তারিখ হঠাৎ হঠাৎ দেখা দেয়। আমার ব্যক্তিগত দিনপঞ্জিতে লেখা আছে দেখছি: বুধবার ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫২—ওপরওয়ালাদের যথারীতি নির্দেশ দিয়ে এক ভদ্রলোক জেলার সাহেবকে সঙ্গে ক'রে আমার কাছে এলেন—আমার স্বাস্থ্য কেমন আছে না আছে, আমি কী চাই না চাই, জানতে। অবশ্য একটা জিনিস চাইলেও পাবো না—জল্লাদের (হ্যাঁ, ভদ্রলোক 'জল্লাদ'ই বলেছিলেন) হাত বন্ধ করতে। ১২ই জানুয়ারী থেকে যে সপ্তাহের শুরু, সেই সপ্তাহে মৃত্যুর বোতাম টেপবার জন্যে সে সেজেগুজে তৈরি হয়ে আছে। আর তার পর রবিবার, ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৫২—আমি আমার সেলে শান্ত মনে ব'সে গানের পর গান 'শুনছিলাম'। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে ওসিনিং ষ্টেশনে* দাঁড়িয়ে হাজারখানেক মানুষ সেই গান গাইছিল (যদিও আমি সে গান নিজের কানে শুনতে পাইনি) আমার মধ্যে এমন এক প্রশান্তি আর ভরসা, এমন এক আত্মিক যোগ অনুভব করলাম—যা হাজার বঞ্চনায়, হাজার নিঃসঙ্গতায়, হাজার বিপদেও ভাঙবে না।

জানুয়ারীর ১৪ই তারিখ এসে চলে গেল। যেমন ক'রে তার ঠিক আগেই কয়েকটা অশান্ত দিন এসে ফিরে গিয়েছিল। দিনগুলোর কথা মনে আছে। আমাদের দুয়োরে সদলবলে টহল দিয়ে ফিরেছেন হেন অফিসার তেন অফিসার আর পোঁ-ধরা কলমচী'র দল সেই সময় সমানে আমাদের গায়ে কাদা ছিটিয়ে চলেছে।

এ ছাড়া আরও অসংখ্য স্মৃতি আছে যা কোন দিনপঞ্জিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আবেগময় কত যে স্মৃতি! উর্ধ্বশ্বাসে একটার পর একটা সেই আবেগ উল্কার বেগে ছুটে গিয়েছিল। আজ পেছনের দিকে তাকিয়ে যখন দেখি—নিবে-যাওয়া নক্ষত্রের মত তাদের মনে হয়। অবিকল মৃত নক্ষত্রের মতই তারা আজ পাণ্ডুর, তারা বিবর্ণ, তারা বিস্মৃত। আবার, দ্রুত-ধাবমান এই বর্তমানের কাঁধের ওপর দিয়ে

* সিং-সিং জেলখানাটা হ'ল নিউইয়র্ক প্রদেশের ওসিনিং অঞ্চলে। আমেরিকার যে হাজার হাজার মানুষ চেয়েছিল রোজেনবার্গ দম্পতি বাঁচুক—তাদেরই প্রতিনিধি হয়ে হাজারখানেক লোকের বন্ধ মিছিল এসেছিল রোজেনবার্গদের অভিনন্দন জানাতে ...ই হবে যৌবনের প্রতিনিধিদলকে জেলখানার ধারে ঘেঁষতে দেয় ...ভালবাসি। আমরা জয়ী রেলষ্টেশনে জমায়েত হয়ে ঘণ্টার ...

রোজেনবার্গদের প্রতি দৃঢ় ...

তোমার প্রেমে-পড়া সেই যুবক—জুলি

পেছনে যখন এক নজর তাকাই, আমার স্পষ্ট মনে পড়ে—তখন আমার মনে হ'ত প্রত্যেকটি দিন যেন নিজেকে টেনে দীর্ঘ ক'রে আমার সামনে মেলে ধরেছে স্বর্ণময় অনন্ত সম্ভাবনা। এমনি এক দিনে আমার স্বামীকে লিখেছিলাম: "সংগ্রাম গজ্‌রাচ্ছে, আমি শান্ত।" আর চানুকা পরব উপলক্ষে ছেলেদের রবিবারের 'টাইমস্' কাগজ থেকে কেটে পাঠিয়েছিলাম একটা চমৎকার হাস্কাগোছের ছোট কবিতা।

সে সব, সে সবই অতীত। আর ক'দিনের মধ্যেই আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। সেই অপেক্ষায় আমরা এখানে বসে আছি। সময়ের শক্ত ফাঁস যতই ছোট হয়ে আসছে, ততই দম নেবার জন্যে আমরা প্রাণপণে লড়ছি। দিন ঘনিয়ে আসছে। তার ছায়া ক্রমেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। আসন্ন দিনের গর্ভে কী আছে আমরা জানি না। এই ক্ষিপ্তপ্রায় যুগের বিশাল পটভূমিকায় তাকে বিবর্ণ, কদাকার দেখাচ্ছে। আর আসলে তো সিদ্ধান্তটা কিছুই নয়—কয়েকটি সরল প্রস্তাবের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ্যাঁ কিম্বা না।

প্রথমত, মামলার দোষ-গুণ যাই থাক—আজ দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ মনে করছে: রোজেনবার্গদের প্রার্থনা অনুযায়ী আইনগত সুযোগ-সুবিধে দিতে অস্বীকার ক'রে আদালতগুলো প্রমাণ ক'রে দিয়েছে যে, প্রায় দু'বছর ধ'রে রোজেনবার্গরা যে সন্দেহ ব'লে এসেছে—আমরা হ'লাম ঠাণ্ডা যুদ্ধের রাজনৈতিক শিকার—সে কথা এক বর্ণ মিথ্যে নয়। দুনিয়ার এই কোটি কোটি মানুষদের দলে আছেন এ যুগের কয়েক জন শ্রেষ্ঠ মনীষী। তাই তো দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ প্রতিবাদের ঝড় তুলে আমাদের প্রাণদণ্ড রদ করতে চেয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এই ব্যাপক প্রতিবাদ—আর সত্যি বলতে কি, প্রতিবাদ যে রয়েছে—এ থেকেই আমাদের মামলার রাজনৈতিক চরিত্র পরিষ্কার ফুটে ওঠে—তার চাপে প'ড়ে কোন কোন মহল মরীয়া হয়ে চেষ্টা করছে—হয় আমাদের নিন্দাকারী বিরুদ্ধপক্ষকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় ক'রে তুলে আমাদের সমর্থনকারীদের গুরুত্ব যথাসম্ভব ছোট ক'রে দেখাতে, না হয়ত সমস্ত ব্যাপারটাই "কমিউনিষ্টদের ষড়যন্ত্র" ব'লে উড়িয়ে দিতে।

তৃতীয়ত, যখন দুনিয়া কখনও রাগে ফেটে পড়েছে, কখনও বজ্রকণ্ঠে হেঁকে উঠেছে, কখনও চোখ রাঙিয়ে শাসাচ্ছে, আবার কখনও সকাতরে প্রার্থনা জানাচ্ছে—তখন আমাদের সামনে আমরা পৃথিবীর সব চেয়ে শক্তিশালী জাতির সম্পূর্ণ অন্য মূর্তি দেখছি; তার হাত-পা বাঁধা, সে অসহায়। ভুল হ'লে নিজেকে শুধ্‌রে নেবার মুরোদ নেই তার। কেন না সব সময়েই পুরনো ভুল শুধরে নেওয়া যত না সহজ, তার চেয়ে ঢের বেশী সহজ নতুন নতুন ভুল ক'রে বসা।

চতুর্থত, এটাকে দু'-কথায় আর সহজ ক'রে এমন কি শুনে হাসি পাবার মত ক'রে এই গুরুতর প্রশ্ন আমি রাখতে চাই: "যুক্তরাষ্ট্রের মুখরক্ষার জন্যে দুটি তরুণ টাটকা জীবন বলি দেওয়া কি কাজের কথা হ'ল—বিশেষ ক'রে যাদের অপরাধ সম্পর্কে সারা দুনিয়ার মানুষ বলছে: সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে?"

সিদ্ধান্তটা এমন কিছুই নয়। রোজেনবার্গদের প্রতি করুণা দেখাতে যদি "মুখ ছোট হয়ে যায়" তাহ'লে বুঝতে হবে দেশের বিচার জিনিষটা যাঁতাকলের চেয়েও নৃশংস ব্যাপার—যাকে একটা দিকে একবার চালিয়ে দিলে বোতলের নিষ্ক্রান্ত ভয়ঙ্কর দৈত্যের মত ক্রমেই বড় হ'তে হ'তে হাতের বাইরে চলে যাবে আর দেশময় তখন শুরু হবে তার উন্মত্ত তাণ্ডব নৃত্য।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আর সেই আবছায়ার মধ্যে ব'সে আমরা দিন গুনছি আর আশা করছি। আমরা বিশ্বাস হারাই না; আজও সূর্যের আলো জেগে আছে আমাদের জন্মের এই মাটিতে—এই "স্বাধীনতার মিষ্টি দেশে"—এই আমেরিকায়। এথেল

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

প্রিয়তমা এথেল,

সাধারণত: সপ্তাহের শেষে বাড়ী থেকে একবার কেউ না কেউ আসে। এবার না আসায় সপ্তাহের শেষ দিকটা বড় দীর্ঘ ব'লে মনে হ'ল। গত শুক্রবার তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে ফেরবার পর থেকে তোমার কথাই ভাবছি।

তুমি কী দুঃসহ ব্যথা পাও, আমি জানি। বিশেষ ক'রে আজ আমরা ব'সে ব'সে মৃত্যুর দিন গুনছি; তাই আশাভঙ্গের দারুণ বেদনা নিজেকে বাড়িয়ে সহস্রগুণ ক'রে আমাদের সামনে দাঁড়ায়। নিজেকে তুমি সেদিন ধ'রে রাখতে পারোনি। তোমার চোখে নেমে এসেছিল দর-দর ধারে অশ্রু; কান্না চাপতে পারোনি। সেদিনকার সেই চোখের জল, সেই কান্না যেমন ছিল তোমার বেদনার বাইরের—তেমনি জেনে রেখো, তোমারই মত এক দারুণ যন্ত্রণার দরুণই সে সময় আমার বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল। এখানে যে অসহ্য যাতনা সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ঘোরে তাকে শান্ত করব, তার হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবো—আমার সে সাধ্য নেই। কিন্তু আমরা শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পেরেছি এই দারুণ যাতনা সত্ত্বেও; আর আমরা যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে পরস্পরকে বাঁধতে পেরেছি তা তো এই দারুণ যাতনারই জন্যে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকেরা তাঁদের লেখায় প্রেমের বর্ণনা দিয়েছেন, তাঁরা ব্যাখ্যা ক'রে দেখিয়েছেন স্বামি-স্ত্রীর পরস্পরকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার ক'রে নেওয়ার মধ্যে কী সৌন্দর্য, কী মহত্ত্ব আছে। কিন্তু এমন কি মৃত্যুর দ্বারদেশে এসেও তোমার আমার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে ব্যথায় কাতর যে চূড়ান্ত সুখ, তার কাছে তাঁদের সমস্ত বর্ণনা-ব্যাখ্যা ম্লান হয়ে যায়।

আমি বিশ্বাস করি, মানুষের সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষাকে আমরা রূপ দিতে পেরেছি, তার কারণ আমরা আমাদের সন্তানদের মহত্তম কল্যাণের জন্যে, সমগ্র মানবজাতির মহত্তম কল্যাণের জন্যে আমাদের ব্যক্তিগত ভালবাসার মহৎ শক্তিকে কাজে লাগিয়েছি।

তোমার একনিষ্ঠ স্বামী—জুলি

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

প্রিয় ম্যানি,

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে একটা বিশ্রী ব্যাপার শুরু হয়েছে। আর সেটা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমি মেয়েমানুষ এবং মা ব'লে নাকি আমার প্রতি মানবোচিত দয়া দেখানো হবে; আমার মৃত্যুদণ্ডটা মাপ হয়ে যাবে, কিন্তু আমার স্বামীকে বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়ে মারা হবে—এই রকম একটা কথা কানে কানে আলগোছে ছড়ানো হচ্ছে। তারপর আরও একটু অগ্রসর হয়ে আশা প্রকাশ ক'রে ফিস্‌ফিসিয়ে বলা হচ্ছে—আর এ যদি হয়, তাহলে আমার

"গুপ্তচরবৃত্তির গোপন তথ্যগুলো" আমার সঙ্গে সঙ্গে মাঠে মারা যেতে পারবে না ; পরে আমি কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হবো—এমন একটা সম্ভাবনা সেক্ষেত্রে থেকে যাবে। কথাটাকে শেষ পর্যন্ত এইখানে এনে দাঁড় করানো হচ্ছে : আমার স্বামী বাঁচবে কি মরবে তার দায়িত্ব আমারই ওপর বর্তাচ্ছে : যদি আমি তাকে নিজে ইচ্ছে ক'রে "ভাঙিয়ে আনতে" রাজী না হই, তাহলে স্বামীর রক্তে আমার হাত লাল হবে।

হুঁ, তাহলে এখন ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমার স্বামীর জীবনের দাম দিয়ে আমাকে আমার নিজের জীবনটা কিনে নিতে হবে। স্ত্রীজাতির প্রতি দরদে উথলে-ওঠা বীরপুরুষের দল আমার দিকে যে দড়িটা ছুঁড়ে দিয়েছে, সেটা চেপে ধ'রে একটি বারও পেছনে না তাকিয়ে আমি ডাঙায় উঠি আর চুলো মরুক গে যাক আমার স্বামীটা, এই তো? শয়তান কোথাকার! রাগে আমার মাথায় খুন চাপে। বীভৎসতায়, ঘৃণায়, গায়ের মধ্যে যেন পাক দিয়ে ওঠে। এই সব রক্ষাকর্তারা আসলে আমার জন্যে এমন একটা কবর গাঁথতে চাইছে যার মধ্যে আমি যেন বেঁচে না থেকেও ধুকপুক ক'রে বাঁচি, ম'রে না গিয়েও ছটফট করে মরি। সারাটা দিনমান আমার আশা বলতে কিছু থাকবে না, সারাটা রাত আমি শান্তি পাবো না। বার বার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠবে সেই প্রিয় মুখ, আমার কেবলি মনে হবে আমি যেন সেই প্রিয় কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। বার বার আমি হায় হায় ক'রে বলে উঠবো শেষ বিদায়ের বুক-ভাঙা যন্ত্রণায় মুচড়ে-ওঠা বাণী। আর অনিবার্য হত্যার আঘাতে আমি টলে টলে পড়ব, চোখে অন্ধকার দেখব।

আর আমাদের ছেলেদেরই বা কী দশা হবে? পিতৃতুল্য বাপকে যমের দুয়োরে পাঠানো, পুত্রস্নেহাতুরা মাকে চিরস্থায়ী শূন্যতার হাতে সঁপে দেওয়া—একে কোন্ ধরণের অনুকম্পা বলে? অমন কৃপার পাত্র হয়ে মাথা হেঁট ক'রে বেঁচে থাকবার চেয়ে আমি হাজার বার চাই আমার স্বামীকে মৃত্যুর মধ্যে জড়িয়ে ধরতে।

রাজনৈতিক কুটনীদের কাছে নিজেকে বারবনিতার মত বিক্রী ক'রে—না, আমি আমার বিবাহবাসরে অগ্নি-সাক্ষী-করা শপথ ভাঙব না ; দু'জনে যে আনন্দ, যে অখণ্ডতা আমরা ভাগ ক'রে নিয়েছি, তার সম্মান আমি ধূলোয় লুটিয়ে দেবো না। আমার স্বামী নির্দোষ, যেমন নির্দোষ আমি নিজে। দুনিয়ার কারো ক্ষমতা নেই জীবনে কিম্বা মরণে আমাদের আলাদা করে। এথেল।

১৫শে মার্চ্চ, ১৯৫৩

প্রিয়তমা আমার,

কোন এক যুবকের ভাল-লাগা ভালবাসায় পরিণত হতে দুটো দিন—এখনও দুটো দিন বাকি। যার যখন পালা সে যেন ঠিক তখনই আসছে। সূর্য-ওঠা ফুটফুটে দিনগুলোর হাত ধ'রে মধু মাস ঐ আসে। ধমনীতে রক্ত চঞ্চল হবে, ফুর্তিতে নেচে উঠবে হৃদয় আর যৌবনের নেশা-ধরানো আবেগ নতুন নতুন জয়ের পথে ঠেলে দেবে। কেন না আসলে তো সমস্ত অগ্রগতির মধ্যে থাকে তারুণ্যেরই তাড়না। আমাদের মামলার আসল চেহারা সারা দুনিয়ার মানুষ চিনে ফেলেছে। আর পৃথিবীতে যারা সব চেয়ে ক্ষমতাবান, সেই সাধারণ মানুষ আমাদের পেছনে ; তারা দেখিয়ে দিচ্ছে তারা সজাগ, তারা জানে শান্তির জন্যে স্বাধীনতার জন্যে কেমন ক'রে লড়তে হয়। বিচার নিয়ে এই ছেলেখেলা শুধু যে সাধারণ মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে তাই নয়, প্রগতিশীল মতের জন্যে আমাদের মামলার দু'জন নিরীহ মানুষকে নিষ্ঠুর মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আমাদের সরকারের পর্দা ফাঁই ক'রে দিয়েছে। জনসাধারণ পুরো অর্থ টের পেতে শুরু করেছে। এই সব দেখে মনে আমি বেজায় বল পাচ্ছি ; আর তার সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে আমার গভীর ভালবাসা—কিন্তু প্রকাশ করতে পথ না পেয়ে সে কেঁদে মরছে। আমরা যে ন্যায়ধর্মের পতাকা শক্ত হাতে উঁচু ক'রে রাখতে পেরেছি, আমরা যে ভালো কাজে নিজেদের লাগাতে পেরেছি, তার জন্যে সত্যিই আমরা সুখী। তবু যত দিন না আমরা আমাদের সন্তানদের কাছে নিজের সংসারে ফিরে যাই—আমাদের এ দেহে শান্তি নেই।

আমি ভাবছিলাম, প্রিয়তমা—আজ তিন বছর হ'তে চলল আমরা ছেলেদের ছেড়ে। যখন একসঙ্গে থাকতাম প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমাদের কাছে কী মূল্যবানই না ছিল! ওরা যখন নতুন কিছু শিখত, আমাদের কী আনন্দ। হয়ত ছেলেদের মধ্যে কেউ একটা নতুন ছবি এঁকেছে, কাঠের টুকরো দিয়ে বানিয়েছে খেলাঘর, কেউ হয়ত এমন কিছু করেছে যার বিশেষ তাৎপর্য আছে ; বেড়ে ওঠার লক্ষণ, সঙ্গীতে কিম্বা শিল্পে ক্ষমতার নিদর্শন আর আনন্দ, উদ্বেগ আর ব্যথায় জড়ানো সাত-পাঁচ সমস্যা। এই ছিল আমাদের আটপৌরে সুখের সংসার। তাহ'লে রবীর বয়েস হতে চলল ছয়, মাইকের তো দশ চলছে। ওরা এবং আমরা আমাদের জন্মগত অধিকার হারিয়েছি। আমরা যে স্থির বিশ্বাসে লিখে যাই, আমরা যে শক্ত হয়ে থাকি তার কারণ, বেদনার গভীর ক্ষতচিহ্নে আমাদের শরীরে দেগে দেওয়া হয়েছে দুরপনেয় সত্য। যখন আমি দেখি মাইকেলের অতল নীল চোখে ঝিলিক দিয়ে ওঠে আমাদের প্রতি ওর অকুণ্ঠ সমর্থন, যখন রবীর মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সহানুভূতির স্মিত হাসি তখন বুঝি কিসের জোরে এই নিদারুণ জ্বালা আমরা সহ্য ক'রে চলেছি। আমার মনে হয় আসলে আমার ভেতরটা তুলতুলে নরম ; নইলে যখন ছেলেদের কথা ভাবি তোমার কথা ভাবি মনটা কেন কোমল হয়ে পড়ে? কাউকে আমি জানতে দিই না ; কিন্তু আমার হৃদয়টা চীৎকার ক'রে কাঁদে।

জানো, আমি আজ-কাল এক ধার থেকে পড়ছি। বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে, পদার্থের রীতি-নীতি সম্পর্কে, অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে, রাজনীতি আর বিজ্ঞান সম্পর্কে যত বই আছে পড়ছি। মানুষ প্রকৃতিকে নাড়াচাড়া ক'রে বহু আকাঙ্ক্ষিত এই সুন্দর পৃথিবী গ'ড়ে তুলতে পারে এ কথা আমি যত জানি ততই বুঝতে পারি সে আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার জন্যে কাজ করা কত জরুরী। ছেলেদের যদি সত্য ভালবাসতে চাই তো তার এই একটি পথই আছে। স্বৈরাচারী শাসনে এ ওর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যখন আমরা দুজন দুপাশে আড়াআড়ি হয়ে বসি আমার চোখের তারা, আমার কণ্ঠস্বর, আমার প্রত্যেকটি ভঙ্গিমা তোমাকে জানিয়ে দেয় তোমার প্রতি আমার মন-প্রাণ-ঢেলে-দেওয়া একাগ্র নিষ্ঠা, গভীর শ্রদ্ধা আর সেই সঙ্গে কথা দেয় আমি চিরদিন তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকব। দিন তাহ'লে আসছে। বসন্তের এক ঝলক ফুরফুরে হাওয়া। বন্ধ পাপড়িগুলো খুলে যাবে আর তাই সারা বছরটাই হবে যৌবনের ঋতুরঙ্গ। দিন আসছে। তোমাকে ভালবাসি। আমরা জয়ী হবো।

তোমার প্রেমে-পড়া সেই যুবক—জুলি

আমার "বাঘ" শিকার

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

আমাদের অমৃতবাজার গ্রামের ১৫।১৬ মাইল দূরে একবার বাঘের উপদ্রবের কথা শোনা গেল। আজকে বাছুরটা, কালকে ছাগলটা, পরশু একটা কুকুর হারাইতে লাগিল। যেখানে এই অত্যাচার হইতেছিল সেই গ্রামের লোকেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। সেই গ্রামের যিনি জমিদার তিনি বিখ্যাত শিকারী ছিলেন। কিন্তু সেই সময় তিনি অসুস্থ থাকায় বাঘটার কিছুই করিতে পারেন নাই।

সে সময়টা ছিল বর্ষার পরেই, পূজোর কিছু আগে। বৃষ্টির পর গ্রামের চতুর্দ্দিক্ জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে সেই জন্য বাঘটা যে কোথায় লুকাইয়া থাকিত কেহই দেখিতে পাইত না। গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটি বিরাট বাঁওড়। আমাদের যশোহর জেলায় জলা-ভূমিকে বাঁওড় বলিয়া থাকে। এই সব বাঁওড় বর্ষাকালে নদীর সহিত যুক্ত হইয়া যায়, পরে জল শুকাইয়া গেলে নদীর সহিত সংযোগ ছিন্ন হয়।

বাঁওড়ে বহু জলজ উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে, সেই জন্য ইহার কোথাও বা গভীর জঙ্গল কোথাও বা পরিষ্কার জল। এই জল কোন স্থানে হাঁটু-জল ও স্থানে স্থানে অত্যন্ত গভীর। গ্রামের দিকটি ছাড়া এই বাঁওড়ের তিন পাশ গভীর জঙ্গলে আবৃত। গ্রামের দিকটাও পরিষ্কার ছিল না, সেদিকেও অল্প-স্বল্প জঙ্গল ছিল। এই জঙ্গলের গাছপালা অধিকাংশ বেত-কাঁটা বাঁশ, সেই জন্যে ইহা মানুষের দুর্ভেদ্য ছিল। ইহার ভিতর জন্তু-জানোয়ার কি আছে তাহা গ্রামবাসীর কেবল কল্পনার বিষয় ছিল।

সেই গ্রামে আমার এক আত্মীয় ছিলেন। একদিন সকালে আমি সেখানে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছি। দেখি যে, তাঁহার বৈঠকখানায় কিসের এক জটলা হইতেছে। আমি শুনিলাম যে, ৩।৪ দিন আগে সন্ধ্যাবেলায় এক জনের একটি পোষা কুকুরকে বাঘে লইয়াছে। কুকুরটি বাঁওড়ের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিল, কিন্তু আর ফিরিয়া আসে নাই। যাঁহার এই সখের কুকুর খোওয়া গিয়াছে তিনি অতিশয় রুষ্ট হইয়া বলিতেছিলেন, "এ রকম হ'লে ত গ্রামে টেঁকা যায় না! মানলুম জমিদার বাবুর অসুখ হয়েছে, কিন্তু তাই ব'লে কি গ্রামে এমন লোক কেউ নেই যে বাঘটা মারতে পারে? এর আগেও ত বাঘের উপদ্রব হয়েছে, কিন্তু কিছু দিন পরেই বাঘটা হয় মারা পড়েছে কি অন্যত্র চলে গেছে। এবার নাগাড়ে অত্যাচার চল্‌ছে। মানুষ আর কত দিন সহ্য করতে পারে?"

আমাকে দেখে আমার আত্মীয় বল্লেন, "এই যে বাবাজী, তুমি এসেছ। আমাদের এই বাঘটা মেরে দাও না?"

আমি বাঘ মারিব শুনিয়া আমার হাসি পাইল, আমি যে কি রকম শিকারী তাহা না বলাই ভাল। আমি ঘুঘুটা-আসটা মারিয়া থাকি, কখনও বা খরগোস বা সজারু। তখনও ইহার বড় জন্তু আমি শিকার করি নাই, যদিও পরে আমি ২।৪টা হরিণ মারিয়াছি। বাঘ তো আর নিরীহ জন্তু নয় যে আমি ফসকাইয়া গেলাম আর সে বাড়ী চলিয়া গেল? আমি বলিলাম, "আমায় ক্ষমা করবেন, বাঘ মারা আমার কর্ম্ম নয়।" কিন্তু গ্রামের লোকেরা ছাড়ে না, তাঁহাদের অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ যাঁহার কুকুর হারাইয়াছিল তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সমবেত ভাবে আমাকে বিশেষ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, যাহাতে আমি তাঁহাদের বিপদ হইতে রক্ষা করি। তাঁহারা বলিলেন, "আপনি ভাবছেন কেন? টিপ নিয়ে কথা। যে পায়রার গায়ে গুলী লাগাতে পারে সে কি আর বাঘের গায়ে গুলী লাগাতে পারে না? যদিও একথা সত্য যে, বাঘ আক্রমণ করিতে পারে কিন্তু তাহারও বন্দোবস্ত করা যায়। আপনাকে একটা বড় গাছে উঠাইয়া দিব, আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকিবেন।"

মানুষের মনে বাহাদুরী লইবার একটা সতত আকাঙ্ক্ষা থাকে। ভাবিলাম, দেখি না চেষ্টা করিয়া যদি ফাঁকতালে বাঘশিকারী হওয়া যায় ত মন্দ কি! তা ছাড়া তাঁহারা এরূপ ভাবে ধরাধরি করিতেছিলেন যে, তাঁহাদের অনুরোধ এড়ান দুষ্কর। অগত্যা রাজী হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে কি করিতে হইবে? তাঁহারা বলিলেন যে, অত্যাচারটা বাঁওড়ের দিকে হইয়া থাকে এবং বাঘটা নিশ্চয় ঐখানে লুকাইয়া আছে। স্থির হইল যে আমি বাঁওড়ের ধারে কোন গাছে উঠিয়া বন্দুক লইয়া বসিয়া থাকিব এবং গ্রামের লোকেরা হৈ-চৈ করিয়া বাঘটিকে তাড়াইয়া বাহির করিবে। আমার আত্মীয় বলিলেন, তাঁহার অনেক মুসলমান ঢালী প্রজা আছে। তাহারা খুব সাহসী এবং আবশ্যক হইলে তাহারা কাঁটা-খোঁচা না মানিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না।

যদিও আমার বুক গুর-গুর করিতেছিল, তথাপি রাজী হইয়া গেলাম। কিন্তু আমার আত্মীয় আমাকে যে বন্দুক দিলেন তাহা দেখিয়া আমার চক্ষু স্থির! বন্দুকটি গাদা বন্দুক, যাহা একবারের বেশী দু'বার ফায়ার করা যায় না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের অঞ্চলে বড় বাঘ আসে না। চলিত কথায় যাহাকে গোবাঘা বলে, অর্থাৎ চিতা জাতীয় বলে—এই রকম ছোট বাঘই দেখা যায়। ইহারা ছাগল, ভেড়া, কুকুর লইয়া যায়, কখনও মানুষ মারিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। তবে আঘাত পাইলে যে মানুষকে আক্রমণ করিবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে?

ইহার পরও আমার আশ্চর্য্য হইবার কারণ ছিল। অনেক খুঁজিয়াও বন্দুকের কোন গুলী পাওয়া গেল না। আমি ভাবিলাম যাক বাঁচা গেল, আমাকে আর বাঘ মারিতে হইবে না। কিন্তু গ্রামের "ইঞ্জিনিয়াররা" হার মানিবার পাত্র নহেন, তাঁহারা মাছ ধরিবার জালের একটি লোহার কাঠি লইয়া আসিলেন এবং হাতুড়ি দিয়া পিটিয়া-পাটিয়া কাঠিটিকে খানিকটা গোল মত করিলেন। তার পর সেই "গুলী" বন্দুকের নলের মধ্যে পুরিয়া বারুদ দিয়া বেশ করিয়া গাদা হইল। এই "একাঘ্নি" লইয়া আমি গ্রামের লোকসহ শিকারে যাত্রা করিলাম।

বাঁওড়ের নিকট গিয়া দেখি যে, পাতলা জঙ্গলের ভিতর, ঠিক গভীর জঙ্গলের ধারে, একটি সুন্দর কাঁটাল গাছ রহিয়াছে। একটি মইয়ের সাহায্যে গাছে উঠিলাম ও দুটি মোটা ডালের সংযোগ-স্থলে

উপবেশন করিলাম। এই উচ্চ স্থানে বসিয়া মনে কতকটা সাহস হইল। ভাবিলাম যে, বাঘটা এখন সহজে আর আমার কিছু করিতে পারিবে না। আমি ভাল ভাবে বসিয়া জঙ্গলের মধ্যে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। আর গ্রামের কতকগুলি সাহসী যুবক বাঁওড়ের দিক হইতে হৈ-চৈ করিয়া বন ঠেঙ্গাইতে সুরু করিল। এই কাঁটাল গাছের নিকটেই সেই সখের কুকুরটি নিরুদ্দেশ হইয়াছিল। সেই জন্য আমাদের আশা ছিল যে, এইখানেই বাঘ বাহির হইবে।

যাঁহারা শিকারী তাঁহারা জানেন যে, গভীর জঙ্গলের মধ্যেও জন্তু-জানোয়ারদের চলাফেরা করিবার পথ থাকে। এই সব পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া গিয়াছে, কিন্তু এমন মসৃণ যে জানোয়াররা এই পথে চলিলে বিন্দুমাত্র শব্দ হয় না। বিপথে গেলে জানোয়ারের পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। সেই জন্য অনেক সময় এইরূপ হয় যে জানোয়ার তাড়া খাইয়া অল্পক্ষণ ছুটপাট করিয়া যাইয়া পরে নিঃশব্দে চলিয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, কিছু রাস্তা বিপথে চলিয়া নিজেদের বাঁধা রাস্তায় পড়ে, তখন আর তাহাদের গমনে কিছুমাত্র শব্দ হয় না।

জঙ্গলের ভিতরটা অন্ধকার মত ছিল বলিয়া আমি প্রথমটা বেশী কিছু দেখিতে পাই নাই। পরে চক্ষু অভ্যস্ত হইলে বনের ভিতরটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। আমি দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, আমার ঠিক সামনে ২০।২৫ হাত দূরে একটা শুঁড়ি-পথ দেখা যাইতেছে। এই পথের দু'ধারে কাঁটার জঙ্গল কিন্তু পথটি খোলা ও পরিষ্কার। শুধু তাহাই নহে। চলা-ফেরা করিলে রাস্তা যেমন পিটানো বলিয়া বোধ হয়—এই শুঁড়ি-পথটিও অনেকটা সেইরূপ তেলা-তেলা ছিল। আমি নিশ্চিত বুঝিলাম যে, বাঘকে এই পথ দিয়াই আসিতে হইবে। আমি যেখানে বসিয়াছিলাম সেইখান হইতে আড়াআড়ি ভাবে বিস্তৃত শুঁড়ি-পথটির মাত্র এক হাতের মত পরিসর-স্থান দেখা যাইতেছিল। বাকি পথটা জঙ্গলে ঢাকা। বাঘকে সেই পথ দিয়া যাইতে হইলে আমার চোখে অন্ততঃ একবার পড়িতেই হইবে। আমি বন্দুকের ঘোড়া তুলিয়া সেই শুঁড়ি-পথে যে এক হাত পরিমাণ রাস্তা দেখা যাইতেছিল সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিলাম, যাহাতে বাঘটা সেই ফাঁকা জায়গাটুকু পার হইতে গেলে তাহাকে গুলী করিতে পারি।

ওদিকে গ্রামের লোকদের হৈ-হৈ শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে। এইরূপে ২০।২৫ মিনিট কাটিয়া গিয়াছে। হঠাৎ দেখিলাম যে, সেই ফাঁকা শুঁড়ি-পথে কি যেন একটা নড়িতেছে। মেটে-মেটে রং ও তার ওপর সাদা সাদা ডোরা কাটা। আমি ভাবিলাম—এ কি রকম বাঘ! কিন্তু তখন আর বেশী চিন্তা করিবার সময় ছিল না। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আমাকে এখনই গুলী করিতে হইবে ও লক্ষ্যভেদ করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমার দ্বিতীয় বার গুলী করিবার উপায় নাই।

আমার যত দূর সাধ্য লক্ষ্য স্থির করিয়া বন্দুকের আওয়াজ করিলাম। বন্দুকের গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করিলাম যে, জন্তুটির যেখানে গুলী লাগিল সেখানটা প্রথমটা সাদা ও পরে রক্তাক্ত হইয়া গেল। গুলী খাইয়া জন্তুটি তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল এবং আঘাত-স্থান শীঘ্রই জঙ্গলের আড়ালে পড়িল। কিন্তু এ কি, তাহার দেহও শেষ হয় না! জন্তুটি কত লম্বা? আমি এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় বাঁওড়ের অপর দিক হইতে ভীষণ কোলাহল শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ১০।১২ জন লোক আমার গাছের কাছে দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, "আপনি শীঘ্র মই দিয়া নামিয়া আসুন। ইহা বাঘ নহে, প্রকাণ্ড অজগর!" আমি তাড়াতাড়ি গাছ হইতে নামিয়া তাহাদের সহিত ছুটিলাম।

সাপটা জঙ্গলের যে ধার হইতে বাহির হইয়াছে তাহার এক দিকে ফাঁকা মাঠ আর অপর দিকে মেথরজাতীয় অতি দরিদ্রের কয়েকটি কুটির ছিল। এই কুটিরগুলির প্রায় ১০০ হাত দূরে আবার পাতলা জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে। সেই পাতলা জঙ্গলে প্রথমেই একটা ডোবা মত ছিল, এইখানে গ্রামের ময়লা ফেলা হইত এবং এই ডোবার মধ্যে অল্প জল, বুনো কচু ও আশ্‌সেওড়ার ঘন জঙ্গল ছিল।

আমরা দৌড়িয়া আসিয়া দেখি যে, সেই বিরাট সাপটা গভীর জঙ্গল হইতে বাহির হইয়াছে ও আস্তে আস্তে গরীব লোকদের কুঁড়েঘরের দিকে যাইতেছে। ততক্ষণে শত শত লোক জমিয়া গিয়াছে কিন্তু সাপের ভ্রূক্ষেপ নাই। সাপটি ২০।২৫ হাত লম্বা ও সেই পরিমাণে মোটা। তাহাকে আটকায় কাহার সাধ্য? আমারও এমন ক্ষমতা নাই যে পুনরায় গুলী করি। আমরা নিরাপদে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া এই অদ্ভুত দৃশ্য উপভোগ করিতেছি। এই জাতীয় সাপ বেশী জোরে চলিতে পারে না ইহাই ছিল আমাদের ভরসা।

এমন সময় এক হৃদয়-বিদারক ঘটনা ঘটিল—যাহা মনে করিলে আজও আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এবং অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হয় এই জন্য যে, আমি সাপটিকে গুলীর খোঁচা মারিয়া ক্রুদ্ধ করিয়া না দিলে হয়তো এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিত না। সত্য কথা বলিতে কি, আমার বন্দুকের গুলী অত বড় সাপটির কিছুই ক্ষতি করিতে পারে নাই। কেবল তাহাকে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল মাত্র।

সামনের দিকের একটি কুঁড়েঘরের একটি খোলা দাওয়ায় মেথরদের একটি ১৫।১৬ বৎসরের ছেলে ঘুমাইতেছিল। তাহার জ্বর হইয়াছিল বলিয়া এত চীৎকারেও তাহার ঘুম ভাঙ্গে নাই। সাপটা চলিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ ঘুরিয়া ঐ কুটিরের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল এবং ঐ ঘুমন্ত ছেলেটির উরুত কামড়াইয়া ধরিল। তাহার পর যেমন ব্যাঙ মুখে করিয়া লইয়া যায় সেইরূপ ছেলেটিকে মুখে করিয়া শূন্যে উঠাইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। ছেলেটা যন্ত্রণায় একবার চীৎকার করিয়া এবং সাপের বিকট চেহারা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া গেল।

আমরা স্তম্ভিত ও হতজ্ঞান হইয়া দেখিতেছিলাম। এরূপ যে হইতে পারে, তা আমরা একবারও ভাবি নাই। তাছাড়া এই ঘটনাটা যেন বিদ্যুতের মত ঘটিয়া গেল। আমাদের চমক ভাঙ্গিলে আমরা বুঝিলাম যে, এখনই সাপটাকে আটকাইতে হইবে। নহিলে ছেলেটির নিস্তার নাই। তখন যে যাহা পাইল তাহা লইয়া ছুটিয়া সাপের সম্মুখে দৌড়াইয়া গেল ও তাহার গতিরোধের চেষ্টা করিতে লাগিল। গ্রামের লোকেরা মরিয়া হইয়া সাপটাকে বাধা দিতে লাগিল, যাহাতে সে কোন রকমে সেই ময়লাপূর্ণ ডোবাটার দিকে না যাইতে পারে। সকলেই বুঝিয়াছিল যে সেখানেই কোন

গর্ত্তের মধ্যে সাপটার বাসা। সেখানে একবার ঢুকিতে পারিলে তাহাকে ধরা অসম্ভব এবং ছেলেটিকেও বাঁচানো যাইবে না। সেই জন্য তাহারা লাঠি-সোঁটা লইয়া সাপটার সামনে যাইয়া তাহাকে আটকাইতে লাগিল। সাপটার মুখে ছেলেটি থাকাতে তাহার আর কামড়াইবার যো ছিল না, আর সেই জন্য নির্ভয়ে গ্রামের লোকেরা সাপটির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিল।

তাহারা বাধা দিতেছে আর অজগরটি এদিক-ওদিক করিয়া তাহাদের পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতেছে। যখনই কোন ফাঁক পাইতেছে তখনই ২।৪ হাত অগ্রসর হইতেছে। এইরূপে গ্রামের লোকদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও সাপটি তাহার বাসার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

গ্রামের লোকেরা যখন স্থির বুঝিল যে, আর বেশীক্ষণ সাপটিকে বাধা দেওয়া যাইবে না তখন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল যে এখনই একবার জমিদার বাবুকে খবর দেওয়া হোক। তাঁহার কাছে ভাল ভাল বন্দুক ও রাইফেল আছে। যদিও তিনি অসুস্থ, তাহা হইলেও একটি লোকের প্রাণ যাইতেছে শুনিলে তিনি না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না। আমার আত্মীয় বলিলেন, ইহা খুব ভাল কথা এবং দুই জন লোককে জমিদার বাবুকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

আমার আত্মীয় গ্রামের লোকেদের ডাকিয়া বলিলেন, "এস ভাই, আমরা প্রাণপণে সাপটাকে বাধা দিই। অন্ততঃ যতক্ষণ না জমিদার বাবু আসেন ততক্ষণ আমরা সাপটাকে কিছুতেই ডোবার নিকট যাইতে দিব না।" এ বিষয়ে সকলে একমত হইয়া তাহাদের যথাকর্ত্তব্য করিতে লাগিল। সাপটি খুব লম্বা ও মোটা। তাহার দেহটা লম্বা হইয়া আছে, আর তাহার মুখ ছেলেটিকে কামড়াইয়া শূন্যে উঠাইয়া আছে। তাহার বিরাট দেহ গুটাইয়া আস্তে আস্তে চলিতেছে। আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া দাঁড়াইয়া আছি!

এই সময়ে কয় জন লোকের সহিত প্রৌঢ় জমিদার বাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার এক কর্ম্মচারীও আসিয়াছেন, যিনি জমিদার বাবুর শিকারের নিত্যসঙ্গী।

জমিদার বাবু আসিয়াই সমস্ত ব্যাপারটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কয়েকটা লোককে তাঁহার বাড়ী হইতে ও গ্রামের অন্য লোকের বাড়ী হইতে যে কয়খানি বলিদানের খাঁড়া পাওয়া যায়, তাহা লইয়া আসিতে বলিলেন। তাহারা ছুটিয়া চলিয়া গেল। জমিদার বাবু আমার আত্মীয় ও গ্রামের অন্যান্য মাতব্বরদের তাঁহার মতলব বুঝাইয়া বলিলেন। তিনি বলিলেন যে, সাপটাকে গুলী করিয়া মারা কিছুমাত্র শক্ত নয়। সাপটা এখন যে অবস্থায় পড়িয়াছে, তাহাতে তাহার গায়ে রাইফেল ঠেকাইয়া গুলী করিলেও তাহার বাধা দিবার ক্ষমতা নেই। গুলী করিলে সাপটা নিশ্চিত মরিবে বটে, কিন্তু মানুষটিকে বাঁচাইতে পারা যাইবে না। সাপ গুলী খাইলে মরিবার আগে মানুষটিকে ল্যাজের দ্বারা জড়াইয়া পিষিয়া মারিবে। অতএব এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে সে তাহা না করিতে পারে।

এমন সময় আট-দশখানি খাঁড়া আসিয়া পৌঁছিল। এই খাঁড়াগুলি যেমন ভারী তেমনি ধারালো। তিনি সেই খাঁড়াগুলি কতকগুলি বলিষ্ঠ যুবকদের হাতে একখানি করিয়া দিয়া সাপটার দেহের স্থানে স্থানে দাঁড় করাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, তিনি ইসারা করিলেই তাহারা নিজ নিজ স্থানে সাপটার দেহে পুনঃপুনঃ আঘাত করিতে থাকিবে যতক্ষণ না সাপটার দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। জমিদার বাবু বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার ইসারা অর্থাৎ সিগন্যাল হইতেছে বন্দুকের আওয়াজ।

সকলে তাহাদের যথাকর্ত্তব্য বুঝিয়া, নিজ নিজ স্থানে খাঁড়া হস্তে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলে, জমিদার বাবু সাপটার অতি নিকটে গিয়া বড় রাইফেল দিয়া তাহার ঘাড়ে গুলী করিলেন। গুলী লাগিল সাপের মুখের মাত্র ৩ হাত তফাতে এবং সেই জায়গাটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সাপের দেহের দশ জায়গায় উপর্য্যুপরি খাঁড়ার কোপ পড়িয়া সাপটা দশ টুকরা হইয়া গেল। এইরূপে সেই বিরাট রাক্ষসের প্রাণান্ত ঘটিল।

এইবার মানুষটাকে বাঁচাইবার পালা। সাপের মুখেতে বাঁশ পুরিয়া দিয়া অনেক কষ্টে সেই ছেলেটাকে বাহির করা হইল। বহু শুশ্রূষার পর তাহার জ্ঞান হইল। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাহাকে যশোরে প্রেরণ করা হইল। সেখানে ৩ মাস চিকিৎসার পর লোকটা ভাল হইয়াছিল বটে, কিন্তু যে উরুতে সাপে কামড় বসাইয়াছিল সেই পাখানি ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া সরু হইয়া গিয়াছিল।

এ কথা অবশ্য বলিতে হইবে না যে, এই সাপটা মারিবার পর গ্রামের লোকেদের ছাগল, ভেড়া, কুকুর আর 'বাঘে' লইয়া যায় নাই।

মুসলমান পণ্ডিত আল কেরাটীর গুণাবলী

মুসলমান ধর্ম্মের প্রথম উন্নতি সময়ে বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত আল কেরাটী হিন্দুদের নিকট থেকে দশ গুণোত্তর অঙ্কস্থাপন প্রণালী, আদি-গণিত, বীজগণিত এবং বীণা বাজানো শিক্ষা করেন এবং মুসলমান রাজ্যসমূহে প্রচার করেন। আল কেরাটী আদি-গণিতের নাম হিন্দ্‌সা ময়বানা, বীজগণিতের নাম হিন্দ্‌সা আল যাবরা এবং বীণার নাম সেতার রেখেছিলেন। আল কেরাটীর প্রচারের জন্য এই সকল বিষয়গুলি য়ুরোপে পরে প্রচারিত হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইংরাজীতে বীজগণিতের নামান্তর কি আল যাবরা থেকেই আলজেব্রা হয়নি?

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো সতেরো

ঢ্যামনা সাপে ধরলে মরে না কিন্তু জাত-সাপে কামড়ালে এক ডাক, দু ডাক, তার পরেই মরণ। বললেন গিরিশ ঘোষকে।

তোর যা খুশি তাই কর। আমি যখন তোর ভার নিয়েছি তোর জন্মমরণের মরণ হয়ে গিয়েছে।

আমি দেখেছি মা-কালীর পা থেকে এক কৃষ্ণবর্ণ শিশুর উদ্ভব হল, হাতে সুধাভাণ্ড ও পানপাত্র। দেখেছি পান করতে করতে দিব্যানন্দে বিভোর সেই শিশু। সেই শিশুই এই গিরিশ। ভৈরবের অংশে জন্ম তাই মদ্যপানে অনুরাগ।

কি দয়া! আমার এই অপরাধকে অপরাধ বলেই ধরলেন না। গিরিশ ভাবছে তদ্গত হয়ে। যে অপরাধে বাপ পর্যন্ত ত্যাজ্যপুত্র করে তাও তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎ।

মঙ্গলমূলমূদ্রা শ্রীসুন্দরীর পূজারী আমি। তাঁর এক হাতে ভোগ আর এক হাতে মোক্ষ। তেমনি আবার বামে বামা দক্ষিণে মদপাত্র, মুখে জপসাধন মস্তকে শ্রীনাথ। আর হৃদয়ে? আনন্দ হৃদয়াম্বুজে।

ঠাকুরের অসুখ। বসে আছেন বিছানার উপর। মেঝের উপর মাদুর পাতা। ভক্তেরা রাত জাগে পালা করে। ঠাকুরের প্রায় ঘুম নেই। পাহারাদার ভক্তেরাও বিনিদ্র।

লাটু আর মাষ্টারের সঙ্গে গিরিশও চলে এল উপরে। মাদুরের উপর বসল। ঘরের কোণের আলোটি গেল আড়াল হয়ে।

ওগো আলোটি কাছে আনো। আমি গিরিশকে একটু দেখি।

মাষ্টার আলোটি কাছে এনে ধরল।

'ভালো আছ?' গিরিশকে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

ভালো আছি কি না জানি না, কিন্তু তোমার এই দয়াভরা প্রশ্নটিতেই ভালো হয়ে গেলাম সর্বাঙ্গে। তোমার করুণা সর্বসাধিনী।

'ওরে এঁকে তামাক খাওয়া। পান এনে দে।' লাটুর প্রতি হুকুমজারি করলেন।

লাটু পান-তামাক নিয়ে এল।

তাতে কি তৃপ্তি আছে?

কিছুক্ষণ পরে আবার উঠলেন চঞ্চল হয়ে, 'ওরে কিছু জলখাবার এনে দে।'

'পান-টান দিয়েছি।' লাটু বললে, 'দোকান থেকে আনতে গেছে জলখাবার।'

কে এক ভক্ত ক'গাছা ফুলের মালা নিয়ে এসেছে। গলায় পরলেন সেগুলো একে-একে। পরলেন, না, আর কাউকে পরালেন? আর কাউকে পরালুম। হৃদয়মধ্যে যে হরি আছেন তাঁকে পরালুম।

দু'গাছি মালা তুলে নিলেন গলা থেকে। গিরিশকে বললেন, 'এগিয়ে এস।' গিরিশ এগিয়ে আসতেই তার গলায় উপহার দিলেন।

'ওরে জলখাবার কি এল?' আবার উঠলেন অস্থির হয়ে।

অসুখ, ঘুম নেই, এত যন্ত্রণার মধ্যেও এত মমতা! এত করুণা! মানুষ ভগবান নয়তো কে ভগবান!

সেই দিন তাই কথা হচ্ছিল বলরাম-মন্দিরে। ঠাকুর বললেন গিরিশকে, 'তুমি একবার নরেনের সঙ্গে বিচার করে দেখ, সে কি বলে।'

'দেখেছি। সে মানতে চায় না। বলে ঈশ্বর অনন্ত। যে অনন্ত তার আবার অংশ কি! তার অংশ হয় না।'

'হয়।' বললেন ঠাকুর, 'ঈশ্বর ইচ্ছে করলে তাঁ[র] সারবস্তু পাঠাতে পারেন মানুষের মধ্য দিয়ে। শু[ধু] পারেন না পাঠান। এ তোমাদের উপমা দিয়ে [কি] বোঝাব? গরুর মধ্যে গরুর শিংটা যদি ছোঁও, [তা] গরুকেও ছোঁয়া হল। পা বা লেজ ছুঁলেও তাই

কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর সারবস্তু হচ্ছে দুধ। বাঁট দিয়ে সেই দুধ আসে। অবতার হচ্ছে গাভীর বাঁট।' থামলেন ঠাকুর। আবার বললেন, 'তেমনি প্রেমভক্তি শেখাবার জন্যে মানুষের দেহ ধারণ করে মাঝে মাঝে আসেন ঈশ্বর।'

পরশরতন শুনেছ এবার শোনো মানুষরতন। অবতারই হচ্ছে সেই মানুষরতন।

'নরেন বলে', গিরিশ বললে, 'ঈশ্বরের ধারণা কে করতে পারে? তিনি অন্তহীন।'

'হোন। তাঁকে ধারণা করা কি দরকার? তাঁকে একবার দেখতে পারলেই হল। তাঁর অবতারকে দেখা মানেই তাঁকে দেখা। যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে আসে, সে বলে গঙ্গা দর্শনস্পর্শন করে এলুম। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত হাত দিতে ছুঁতে হয় না। তোমার পা-টা যদি ছুঁই তোমাকেই ছোঁয়া হল। তাই নয়? আগুন সব জায়গায় আছে তবে কাঠে বেশি।'

'তাই যেখানে আগুন পাবো সেখানে আগুন পোয়াবো।' গিরিশ বললে তৃপ্ত মুখে।

'তেমনি ঈশ্বর যদি খোঁজো, মানুষে খুঁজবে—'

রূপে-রূপে রূপ মিশায়ে আপনি নিরাকার।

'মানুষেই তেমনি তাঁর বেশি প্রকাশ, বিশেষ প্রকাশ। যে মানুষে দেখবে প্রেমভক্তি উথলে পড়ছে, ঈশ্বরের জন্যে যে পাগল, তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা, সেই মানুষে নিশ্চয় জেনো তিনি অবতীর্ণ। যিনি তারণ করেন তিনিই অবতার।'

'কিন্তু নরেন্দ্র বলে তিনি অবাঙ্‌মনসগোচর—'

'মনের গোচর নয় বটে কিন্তু শুদ্ধ মনের গোচর। বুদ্ধির গোচর নয় বটে শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর।' বললেন ঠাকুর, 'ঋষিমুনিরা কি তাঁকে দেখেননি? তাঁরা চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎকার করেছিলেন।'

'কিন্তু যাই বলুন, নরেন আমার কাছে তর্কে হেরে গেছে।'

হেরে গেছে? ঠাকুর চমকে উঠলেন। অবতার-তত্ত্ব মানে না, নরেনের হেরে যাওয়াই তো উচিত একশো বার তবু তাঁর নরেন হারবে এ যেন সহ্যের বাইরে।

বললেন, 'না, হারেনি। আমায় এসে বললে গিরিশ ঘোষের মানুষকে অবতার বলে এত বিশ্বাস, তার আমি কি বলব! অমন বিশ্বাসের উপর কিছু বলতে নেই। তাই ছেড়ে দিল তর্ক।'

নরেন মানে না, তবু নরেনকে ভালোবাসেন। নরেন তর্কে হেরে যাবে এ অসহনীয় লাগে। আর, এ কেমনধারা তর্ক? যে তর্কে স্বয়ং ঠাকুরকে বাতিল করে দিচ্ছে। আমি নস্যাৎ হই তো হব তবু নরেন জিতুক। আমাকে হারিয়ে ওর যে জিত সে তো আমারও জিত।

একদিন ও ঠিক বুঝবে। এমন অগাধ যার হৃদয় সে বুঝবে না? বুঝবে আমার অবতারতত্ত্বের মানে কি।

মানে হচ্ছে এই, সকলেই তাঁর অবতার, সকলেই তাঁর প্রতিচ্ছায়া। 'জীবে জীবে চেয়ে দেখ সবই যে তার অবতার। তুই নতুন লীলা কি দেখাবি তার নিত্যলীলা চমৎকার।' আমি নিয়ে এসেছি এই মহতী প্রতিশ্রুতি এই বৃহতী সম্ভাবনা। মানুষকে প্রমাণিত হতে হবে প্রকাশিত হয়ে। প্রকাশিত হবে সে কখন? যখন সে তার অন্তরের অমৃতময় অমিততেজ পুরুষকে উদ্‌ঘাটিত করতে পারবে, উন্মোচিত করতে পারবে। সেখানেই সে অবতার, ঈশ্বর সমান।

ঠিক বুঝবে একদিন নরেন। জীবকে শুধু জীবজ্ঞানে সেবা করবে না, জীবকে শিবজ্ঞানে পূজা করবে। সে পূজা ভালোবাসা! সে পূজা দুঃখমোচন, কলঙ্কমোচন। অপমানের অবহেলার উচ্ছেদ। সত্তাসীমার সম্প্রসার।

রাষ্ট্র হবে নতুন জীবনবেদ, নবতর সাম্যবাদ। শুধু পঙ্‌ক্তি সমান নয় পাত্র সমান। শুধু ভোগের বস্তু সমান নয়, ভোগ করার ক্ষমতাও সমান। শুধু— পরিবেশনে সমান নয় আস্বাদনেও সমান।

'ওরে এল জলখাবার?' আবার চঞ্চল হলেন ঠাকুর।

মাষ্টার পাখা করছিলেন, বললেন, 'আনতে গেছে। এই এল বলে।'

কে না কে গিরিশ তাকে খাওয়াবার জন্যে ঠাকুরের এত ব্যাকুলতা—গিরিশ যেন এ করুণার পারাপার দেখছে না! বাঁধা-বরাদ্দ অনেক পেয়েছে সে, এ যে উপরি-পাওনা। উপরি-পাওনার শেষ নেই।

এসেছে খাবার। ফাগুর দোকানের গরম কচুরি, লুচি আর মিষ্টি। সেই বরানগরে ফাগুর দোকান।

ঠাকুর আগে প্রসাদ করে দিলেন। তার পর খাবারের থালা ধরে দিলেন গিরিশের হাতে। বললেন, 'বেশ কচুরি। খাও।'

ভুখা কি ছু হাতে খায় ? তবু গিরিশের ইচ্ছে হল ঠাকুরকে খুশি করার জন্যে খায় সে গোগ্রাসে।

খাবার দিয়েছি, এবার জল দিতে হয়। ঐ তো আমার কুঁজো, ওখান থেকে গড়িয়ে দিলেই হবে।

উঠে পড়লেন ঠাকুর। রুগ্ন, দুর্বল, পা টলছে, তবু এগিয়ে চললেন কুঁজোর দিকে। রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে রইল ভক্তেরা। গিরিশও স্তম্ভিত। বাধা দেবার কথা ওঠে না, সবাই দিব্যানন্দে বিনিশ্চল।

ঠিক জল গড়ালেন কুঁজো থেকে। বোশেখ মাস, গ্লাশ থেকে খানিকটা জল হাতে নিয়ে অনুভব করলেন যথেষ্ট ঠাণ্ডা কিনা। যতটা ভেবেছিলেন ততটা নয়। কিন্তু কি আর করা যায়! এর চেয়ে ঠাণ্ডা আর পাবেন কোথায়! অগত্যা তাই দিলেন এগিয়ে।

খাদ্য খেয়ে পেট ভরে, রসনার তৃপ্তি হয়। জল খেয়ে গলা ভেজে, বুক জুড়োয়। কিন্তু এ যে খাচ্ছে গিরিশ এ কি খাদ্যপানীয় ? কোন্ ক্ষুধা কোন্ তৃষ্ণার নিবারণ হচ্ছে কে জানে ?

খেতে-খেতে বললে গিরিশ, 'দেবেন বাবু সংসার ত্যাগ করবেন।'

ঠাকুর যেন খুশি হলেন না। কথা বলতে কষ্ট হয়, তাই আঙুল দিয়ে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করে ইসারায় জিগগেস করলেন, 'তার পরিবার-পরিজনের খাওয়া-দাওয়া হবে কি করে ? চলবে কি করে সংসার ?'

'তা জানি না।'

এ সেই দেবেন মজুমদার। বলে দিয়েছিলেন ঠাকুর, তোমার বাড়ি যাব একদিন। এই ধরো সামনের রবিবার। দেখো, তোমার আয় কম, বেশি লোকজন ডেকো না। আর, বাড়িও তোমার সেই কোথায়। গাড়িভাড়াও দুর্মূল্য।

দেবেন্দ্র হাসল। বললে, 'হলই বা আয় কম, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—'

কথা শুনে ঠাকুরের কি হাসি! যে করেই হোক আমার ঘি খাওয়া চাই। অন্যে ঠকুক আমি ঠকতে পারব না। খবর যখন পেয়েছি চেয়ে-চিন্তে চুরি করে আদায়-আস্বাদ করতেই হবে।

নিমু গোস্বামীর লেনে দেবেনের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। বাড়ি পৌঁছেই বললেন, 'আমার জন্যে খাবার কিছু কোরো না, অতি সামান্য, শরীর তত ভালো নয়।'

কুলপি-বরফ তৈরি করেছে দেবেন। তাই খেয়ে ঠাকুরের মহানন্দ। গান ধরেছেন ভাবোল্লাসে :

এসেছেন এক ভাবের ফকির—
ও সে হিন্দুর ঠাকুর, মুসলমানের পীর ॥

সকলের সকল। একলার একলা। কারুর ভাব আমি নষ্ট করিনে। যে নষ্ট-ভ্রষ্ট তারও না। শুধু একটু বেঁকিয়ে দিই। শুধু যে পাপী তাকে বলি মায়ের সন্তান বলে নিজেকে ভাবতে। যেথা খুশি সেথা যাও যাহা খুশি তাহা করো, শুধু মাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, মাকে সঙ্গে নিয়ে করো। যে মুহূর্তে মা তোমার সঙ্গে সে মুহূর্তে তুমি শুদ্ধ তোমার কর্ম শুদ্ধ তোমার চিন্তা শুদ্ধ। মা তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে যা মঙ্গলের ক্ষেত্র, এমন কাজে প্রেরিত করবে যা সৌন্দর্যের কর্ম। পৃথিবীতে সর্বত্র মা-তে ওতপ্রোত হও। ভূ-তে থেকে মা-তে নিমজ্জন, তারই নাম ভূমা।

'রাম বাবু আপনার কথা লিখেছেন বইয়ে।' কে একজন বললে ঠাকুরকে।

'সে আবার কি!'

'পরমহংসের ভক্তি—এই নিয়ে।'

'তবে আর কি।' ঠাকুর বললেন সহাস্যে, 'এবার রামের খুব নাম হবে।'

গিরিশ টিপ্পনি কাটল। 'সে বলে সে আপনার চেলা।'

'আমার চেলাটেলা কেউ নেই।' ঠাকুর বললেন বিগলিত হয়ে, 'আমি রামের দাসানুদাস।'

আমি অণুর অণু, রেণুর রেণু। আমি তৃণের তৃণ, ধূলির ধূলি। 'আমি' খুঁজতে-খুঁজতে 'তুমি' এসে পড়ে। তুমি তুমি তুমি।

'খুব কুলপি খেয়েছি।' গাড়িতে উঠে বলছেন মাষ্টারকে : 'তুমি নিয়ে যেও আরো গোটা চার-পাঁচ—' বালকের মত আনন্দ করছেন।

ঠাকুরকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরল দেবেন। দেখল উঠোনে তক্তপোষের উপর কে একটা লোক ঘুমিয়ে আছে। কাছে গিয়ে ঠাহর করে দেখল পাড়ারই বাসিন্দে। ওঠো, ওঠো, ডাকল তাকে দেবেন। লোকটি উঠে বসে চোখ মুছতে মুছতে বললে, 'পরমহংসদেব কি এসেছেন ?' সবাই হেসে উঠল। এসেছেন কি মশাই, এসে চলে গেছেন।

সর্বস্বান্তের মত তাকিয়ে রইল লোকটি। সেই কখন থেকে বসে আছে ঠাকুর দর্শনের আশায়। তখনো আসেননি, বসে থেকে থেকে তাই একটু শুয়ে

পড়েছিল, চৈত্র মাস, হাওয়া দিয়েছিল ঝির-ঝির করে। এখন জেগে উঠে দেখে চলে গেছে সেই রাজকুমার।

মোহনিদ্রায় অস্ত গিয়েছে সে স্বর্ণলগ্ন। এখন কাঁদতে বসল অন্ধকারে! আমি ঘুমিয়ে পড়ি কিন্তু তোমার চোখে তো ঘুম নেই! তুমি আমাকে জাগালে না কেন? এবার তবে জাগাও, স্নিগ্ধ আলোকে না হোক, রুদ্র আলোকে। আনন্দে না হোক, হাহাকারে। আঁধার রাতের রাজা হয়েই তবে দেখা দাও। আমার ছিন্ন শয়ন ধূলায় টেনে তোমার জন্যে আঙিনা সাজাবো।

ঠাকুরের কেবল নরেন-নরেন। তাই নিয়ে অভিমান হয়েছে দেবেনের। সেবার ষ্টার থিয়েটারে বৃষকেতু নাটক দেখবার শেষে জমায়েত হয়েছে সকলে। নরেন, গিরিশ, আরো অনেকে। কিন্তু দেবেন আসেনি।

'দেবেন আসেনি কেন?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'অভিমান করে আসেনি।' বললে গিরিশ। 'বলে, আমাদের ভিতর তো ক্ষীরের পোর নেই, কলায়ের পোর। আমরা এসে কি করব?'

জলখাবার দিয়েছে ঠাকুরকে, তাই থেকে আবার নরেনকে দিচ্ছেন।

যতীন দেব কাছে ছিল, ঠাট্টা করে উঠল। 'আমরা শালারা সব ভেসে এসেছি। শুধু নরেন খাও, নরেন খাও। আর কেউ জানে না খেতে।'

যতীনের থুতনি ধরে আদর করলেন ঠাকুর। বললেন, 'সেখানে, দক্ষিণেশ্বরে যাস। সেখানে গিয়ে খাস।'

অবস্থা প্রায় অচল দেবেনের। জমিদারি সেরেস্তায় দিনে যা কাজ করে তাতে কুলোয় না, তাই মিনার্ভা থিয়েটারে ক্যাশিয়ারির চাকরি নিলে। শুধু ক্যাশিয়ারি নয়, থিয়েটারের এটা-ওটা ফরমাস খাটো। সময়ে-অসময়ে নটীদের ডেকে আনো তাদের বাড়ি থেকে। ক্রমে-ক্রমে, কাজলের ঘরে কাজ করতে গিয়ে পায়ে দাগ লেগে গেল। অনুতাপে পুড়তে লাগল দেবেন।

নাগমশাই হুঙ্কার দিয়ে উঠল: 'ভয় কি, গুরু আছেন সঙ্গে, ধুয়ে দেবেন।'

সেই কথাই বলছে দেবেন কৃতাঞ্জলি হয়ে। 'জীবনে হীন কাজ করলে ভগবানের পথ থেকে সে জন্মের মত বিচ্যুত হবে এমন কোন বিধি নেই। কত জঘন্য কাজ যে করেছি তবু করুণাময় ঠাকুর আমাকে ত্যাগ করেননি।'

তাই তো বললেন বিবেকানন্দ, একটানা উন্নতি প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়। প্রত্যুত প্রতি পদস্খলনের পরে যে পুনরভ্যুত্থান তাই প্রকৃত মহত্ত্ব।

পুরোনো কথায় ফিরে এল গিরিশ। ঠাকুরকে লক্ষ্য করে বললে, 'আচ্ছা মশাই, কোনটা ঠিক? কষ্টে সংসার ছাড়া, না, সংসারের কষ্টে তাকে ডাকা?'

'যারা কষ্টের জন্যে সংসার ছাড়ে তারা হীন থাকের লোক। আমি তো সংসার ছাড়বার দলে নই। আমি লোকেদের বলি এ-ও কর ও-ও কর। সংসারও কর, ঈশ্বরকেও ডাক। সব ত্যাগ করতে বলি না। কেমন খাচ্ছ কচুরি?'

'ফাগুর দোকানের কচুরি। চমৎকার!' খেতে খেতে একমুখ হাসল গিরিশ।

'হ্যাঁ, লুচি থাক, কচুরিই খাও। কচুরি রজোগুণের। কচুরিই খাও।'

খেতে-খেতে গিরিশ বললে, 'আচ্ছা মশাই, মনটা এই বেশ উঁচু আছে, আবার নিচু হয় কেন?'

'সংসারে থাকতে গেলেই ওরকম হয়। কখনো উঁচু, কখনো নিচু। কখনো ঈশ্বরচিন্তা হরিনাম করে, কখনো বা কামিনীকাঞ্চনে মন দিয়ে ফেলে। যেমন সাধারণ মাছি, কখনো সন্দেশে বসছে কখনো বা পচা ঘায়ে। কিন্তু মৌমাছি করে কি! মৌমাছি কেবল ফুলে বসে। ফুল ছাড়া আর কিছু তার খাবার নেই।'

দক্ষিণের ছোট ছাদটিতে হাত ধুতে গেল গিরিশ।

মনে পড়ল কত দিন বারাঙ্গনারা কাছে বসে খাইয়েছে। আজ ঠাকুর খাওয়ালেন।

'ওগো অনেকগুলি কচুরি খেয়েছে গিরিশ।' ব্যস্ত হয়ে মাষ্টারকে বললেন, 'বলে দাও বাড়িতে আজ আর কিছু না খায়।'

শুধু সুখ দেখেন না কল্যাণ দেখেন। দয়াসারসিন্ধু। কারুণ্যকল্পদ্রুম। শুধু খাওয়ান না, হজমের খবর নেন।

হাত-মুখ ধুয়ে পান চিবুতে-চিবুতে গিরিশ আবার বসল ঠাকুরের কাছটিতে।

'ঐ যে বলেছি পাঁকাল মাছের মত থাকো—'

'রাখুন মশায়, অতশত বুঝি না। মনে করলে সব্বাইকে আপনি ভালো করে দিতে পারেন—কেন করবেন না?' গিরিশ রোক করে উঠল। 'মলয়ের হাওয়া বইলে সব কাঠ চন্দন হয়।'

'কে বললে হয় ? সার না থাকলে হয় না চন্দন।'

'অত-শত বুঝি না মশাই—' আবার তম্বি করে উঠল গিরিশ।

'আইনেই ও রকম আছে।'

'আপনার সব বে-আইনি।'

'তবে হ্যাঁ, তেমন ভক্তি যদি হয় আইন নাকচ হয়ে যায়। ভক্তি-নদী ওথলালে ডাঙায় এক-বাঁশ জল।' বললেন ঠাকুর, 'ভক্তি যদি উন্মাদ হয়, বেদবিধি মানে না। দূর্বা তোলে তো বাছে না। যা হাতে আসে তাই নেয়। তুলসী ছেঁড়ে না পড়-পড় করে ডাল ভাঙে।'

আল-বাঁধ, দরজা-চৌকাঠ উড়ে যায়। গণ্ডি-চৌহদ্দির চিহ্ন থাকে না।

সেই মধুরভাবিনী পাগলির কথা উঠল। ঠাকুরকে মধুরভাবে ভজনা করে। একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে কাঁদছে অঝোরে। কি হল, কাঁদছিস কেন ? জিগগেস করলেন ঠাকুর। পাগলি বললে, মাথা ব্যথা করছে—

'সে পাগলি ধন্য।' গিরিশ হুঙ্কার দিয়ে উঠল : 'যে ভাবেই হোক আপনাকে অষ্টপ্রহর সে চিন্তা করছে। আর, মশায়, আমি ? আপনাকে চিন্তা করে আমি কি ছিলাম কি হয়েছি—'

কী ছিলাম ? অহঙ্কারী ছিলাম। দক্ষযজ্ঞে দক্ষের অভিনয় দেখে ঠাকুরই বলেছিলেন, দেখেছ, শালা যেন অংখারে মট-মট করছে। গয়াতে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে উঠতে গিয়েছি, পা পিছলে মরি আর কি। প্রাণভয়ে বলে ফেললাম, ভগবান রক্ষা করো। পরক্ষণেই বলে উঠলাম, থু থু ! যদি কখনো প্রেমে ডাকতে পারি ভগবানকে, তবেই ডাকবো, ভয়ে নয়। তাই তো প্রেমের ঠাকুর নেমে এলে। ডাকবার আগে নিজেই ডেকে নিলে।

অলস ছিলাম। এখন সে আলস্য সমর্পণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরূপ প্রেমনির্ভর।

পাপী ছিলাম। এখন কৃষ্ণ লোহা কাস্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। যা ছিল সুরা তাই হয়েছে সুধা।

তুচ্ছকে আদর করিনি কোনো দিন। এখন অমানীমানদ হয়েছি। চারদিকে দেখতে পাচ্ছি এক মহারসের প্রকাশ। যা ছিল দণ্ডপলের, তাই এখন অখণ্ড কালের। দেখিনি এত দিন। আজ দেখতে পাচ্ছি। এই দেখতে পাওয়াটাই মুক্তি। সৃষ্টির মুক্তি নয়, দৃষ্টির মুক্তি। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

[ক্রমশঃ।

মেঘমল্লার

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

ছোট এক শহরের নদী-তীরে ছোট এক বাড়ী।—
ছেলেটি অফিসে খাটে। বউটি ঘরের নানা কাজে
ঘুরে-ফেরে ইতস্ততঃ। কখনো সেলাই করে—কখনো
আবার—একটি গল্পের বই হাতে নিয়ে বসে।

সারা দিন বৃষ্টিপাত গুরু-গুরু মেঘের মল্লার
ছেলেটি এস্রাজ নিয়ে এক মনে তুলেছে ঝংকার !
সুরের সত্তায় লীন ! মেয়েটি হঠাৎ আল্‌গোছে
কি ভেবে বইটি ফেলে, এক মনে চেয়ে র'লো শুধু !
তার পর চুল খুলে, সেই চুল বেঁধে নিয়ে পুনঃ
ত্রস্তে বুকের 'পরে টেনে দিলো বিস্রস্ত বসন !!

শীতের কলকাতায় সঙ্গীতের আসর জমে ওঠে এখানে-ওখানে। মিউজিক কনফারেন্সগুলির কর্তৃপক্ষগণ সজাগ হচ্ছেন এখন থেকেই। তানসেন সঙ্গীত-সম্মেলনের কর্মকর্তাগণ ইতোমধ্যেই কাঁসর বাজিয়ে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন। ৪ ঠা নভেম্বর থেকে ৮ই নভেম্বর অবধি কলকাতার আসর তাঁরাই সরগরম করে রাখবেন। ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী (করাচী), ছোটে গোলাম আলী (লাহোর) মীসার হোসেন, রবিশঙ্কর, নির্ম্মলা দেবী, আলী আকবর, শান্তাপ্রসাদ, রোশনকুমারী ইত্যাদিকে তাঁরা ভাড়া করে ফেলেছেন এখুনিই। এদিকে অল ইণ্ডিয়া সদারং মিউজিক কনফারেন্স ১৭ই থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর অবধি সম্মেলন বসাচ্ছেন এলিট সিনেমায়। এঁদের ওখানেও ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী, আলী আকবর, হীরাবাঈ বরোদেকার, তারাপদ চক্রবর্তী, দবির খাঁ, চিন্ময় লাহিড়ী, শান্তাপ্রসাদ, কেরামতোল্লা খাঁ, রাধিকামোহন মৈত্র, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ইত্যাদি অংশ গ্রহণ করছেন। আশুতোষ কলেজ-হলে ঝঙ্কারের ৫ম বার্ষিক অধিবেশন বেশ ঘটা করেই। ওস্তাদ কেরামতোল্লা খাঁ, শ্রীজিতেন সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, সুখেন্দু গোস্বামী ইত্যাদি অনেকেই এতে অংশ গ্রহণ করেছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে শ্রীসিদ্ধার্থ রায় (সেতার), শ্রীপ্রীতি সেন, (খেয়াল), শ্রীশঙ্করনাথ ঘোষ (তবলা), শ্রীমতী রমা পাল (খেয়াল), শ্রীনিমাইচাঁদ ধর (স্বরোদ) ইত্যাদি অংশ গ্রহণ করেন। পাখোয়াজী দানীবাবুকে এখনো দেশ ভোলেনি। চুঁচুড়ার দেশবন্ধু স্কুলে তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে এক সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শোভা দেবী ও পৃথ্বীশ মুখোপাধ্যায় সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ৯ই সেপ্টেম্বর রক্সি সিনেমাগৃহে গভর্ণরের উপস্থিতিতে এক জলসা হবার কথা রয়েছে। এতে অংশ গ্রহণ করবেন এ কানন, বিজন ঘোষদস্তিদার, রামনাথ মিশির, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, অনুরাধা গুহ ইত্যাদি। অনেথলাল, শান্তাপ্রসাদ, শ্যাম গাঙ্গুলী, এবং অনুরাধা গুহ চললেন মিড্‌ল ইষ্টে সফর করতে সঙ্গীত-নাটক আকাডেমীর পক্ষ থেকে। তাঁরা কাবুল, তেহারাণ, দামাস্কাস ও কায়রোতে সিটিং দেবেন। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা যারা সুকণ্ঠ তাদের বিনামূল্যে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে অখিল ভারতীয় সঙ্গীত কলাবিদ সমিতি এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে ৮২ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে সমিতির সম্পাদকের সঙ্গে সংযোগ করতে হবে। অক্টোবর ২৩শে থেকে ২৭শে অল ইণ্ডিয়া রেডিও 'রেডিও-সঙ্গীত সম্মেলন' নামে এক গানের জলসা বসাচ্ছেন। বড় বড় অনেককেই এতে দেখা যাবে। ভারতের প্রথম টেলিভিসন আসছে বোম্বাইতে। ১৯৫৬ সাল নাগাদ তার দর্শন পাওয়া যাবে। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বিভিন্ন কেন্দ্রে কর্মচারীদের মধ্যে বিয়ে হওয়াটা আর চলবে না বলে যে খবর পাওয়া গিয়েছিল এখন জানা যাচ্ছে যে সেটা ঠিক নয়। আসলে বিয়ে হতে পারবে, তবে স্বামি-স্ত্রীকে একই কেন্দ্রে চাকুরীতে রাখার দায়িত্ব নিতে সরকার রাজী নন। সিনেমার গান রেডিওতে যে আর বাজছে না এত দিনে জানা গেল যে তার জন্য দায়ী সিনেমার গানের মালিকেরাই। সত্যি কথা বলতে রেডিও কর্তাদের এ বিষয়ে কোন বাধা-নিষেধ নেই, বলেছেন সম্প্রতি ডাঃ কেশকার। এ মাসে এই অবধি।

বৈজু বাওরার একটি গানের স্বরলিপি

স্বরলিপি—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাহার—তেওরা

[বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত 'সঙ্গীত-মঞ্জরী' হইতে উদ্ধৃত]

আজু বহত সুগন্ধ পবন সুমন্দ মধুর বসন্তমে
হর মকুর পর যুথ মধুপ মদহর নিরত কর রব কুঞ্জমে।
কহি কোয়েলিয়া কুহু করহি আমুবাকে ডার রঙ্গমে
কহি বেলি চামেলি গুলাব গেঁদা চম্প রঙ্গ বিরঙ্গমে।
ইত যোবন মদমাতী যুবতী জলি রহি বিন কান্তমে
পুকার ঘন হা নাথ নাথ বিহত ভই প্রাণান্তমে।
শুনি শ্রবণ রব রঙ্গনাথ কহত বচাবে নাথ কুসঙ্গমে
এহি রঙ্গ ঢঙ্গ অনঙ্গ মনসোঁ উত্তারী রাখ সুসঙ্গমে।

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
ধনা র্সা না | র্সা র্সা | র্রা র্সা | ণা -ধা ধা | ণা দণা | পা মা |
আ০ ০ জু ব হু ত সু গ ০ ন্ধ প ব ন সু

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
মমা পা পা | মা পা | মজ্ঞা মজ্ঞা | মা -ধা পা | ধা -া | ধা না |
ম০ ০ ন্দ ম ধু র০ ব০ স ০ স্ত মে ০ হু ব

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
না র্সা র্সা | র্সা র্সা | র্রা র্সা | না র্সা র্সা | ণা ণা | ধা ধা |
ম কু র প র যু থ ম ধু প ম দ হু র

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
ধা ধা ণা | পা পা | মা মা | পা র্সা না | না -র্সা | ণা ধা ॥
নি র ত ক র র ব কু ০ ঞ্জ মে ০ ০ ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
না না না | না না | না -র্সা | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা | র্সা না | র্সা র্রা র্সা |
ক হি কো য়ে লি য়া ০ কু হু ক র হি আ ম্র বা ০ কে

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
র্র র্জ্ঞা | র্রসা -না | র্সর্সা র্রা র্সা | ণা ধা | ধা না | র্সা র্মা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা |
ভা ০ র০ ০ র০ ০ ঞ্জ মে ০ ক হি বে ০ লি চা মে

৪ ১´ ২ ৩ ১ ২ ৩
র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্সর্জ্ঞা র্মা র্রা | র্রা -া | র্সা -া | নর্সা র্রা র্সা | ণা -ধা | ধা ণা |
লি শু লা০ ০ ব গেঁ ০ দা ০ চ০ ০ ম্প ব ০ জ বি

১´ ২ ৩
পা র্সা না | না -র্সা | ণা ধা ॥
র ০ ঞ্জ মে ০ ০ ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
সা সা মা | মা মা | মা মা | মা -া মা | মা মা | মা মা |
ই ত যো ব ন য দ মা ০ তী যু ব তী জ

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
মমা পা মা | পা -া | মজ্ঞা মজ্ঞা | মা -ধা পা | ধা -া | -া না | না -র্সা র্সা |
লি০ ০ র হী ০ বি০ ন০ কা ০ স্ত মে ০ ০ পু কা ০ র

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
র্সা র্সা | র্সা -া | ণা ধা ধা | ণা -ণা | পা পা | মজ্ঞা -া জ্ঞা |
ঘ ন হা ০ না ০ থ না ০ থ বি হ০ ০ ত

২ ৩ ১´ ২
জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞমা পা | জ্ঞমা -া রা | সা -া ॥
ত য়ি প্রা০ ০ ণা০ ০ স্ত মে ০

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
না না | না র্সা র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা | না -র্সা না | র্সা র্সা | র্সা র্সা |
শু নি শ্র ব ণ র ব র ঙ্গ না ০ থ ক হ ত ব

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
র্সর্সা র্রা র্সা | র্রা -র্জ্ঞা | র্রা র্সা | নর্সা র্রা র্সা | ণা -ধা | ধা না |
চা০ ০ বে না ০ থ কু স০ ০ ঙ্গ মে ০ এ হি

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
র্সা র্মা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা -া | র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্মর্জ্ঞা -র্মা র্রা | র্রা র্রা | র্সা র্সা |
র ০ ঙ্গ ঢ ০ ঙ্গ অ ন০ ০ ঙ্গ ম দ সৌঁ উ

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
নর্সা র্রা র্সা | ণা -ধা | ধা ণা | পা র্সা না | না -র্সা | ণা ধা ॥
ভা ০ রী রা ০ থ সু স ০ ঙ্গ মে ০ ০ ০

জোগিয়া

প্রাপ্ত—শ্রীযামিনী গঙ্গোপাধ্যায় স্বরলিপি—শ্রীমমতা মৈত্র

গাহিবার সময় প্রাতঃকাল, ঠাট—ভৈরব (ঋ, দা)

আরোহণ—সা ঋ মা পা দা র্সা

অবরোহণ—র্সা না দা পা দা মা ঋ সা।

আরোহণে গান্ধার ও নিষাদ বর্জ্জিত

অবরোহণে গান্ধার বর্জ্জিত।

জাতি—ওড়ব—ষাড়ব।

বাদী—মধ্যম, সমবাদী—ষড়্জ।

জোগিয়ার আরোহণে গান্ধার এবং নিষাদ দু'টিই বর্জ্জিতস্বর হ'লেও, অবরোহণে (ষাড়ব প্রকারে) কখনও শুধু গান্ধার, এবং (ওড়ব প্রকারে) কখনও গান্ধার এবং নিষাদ দুই-ই বর্জ্জিত হয়।

গুণকেলির বিস্তারের সঙ্গে জোগিয়ার বিস্তারের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়।

এটি উত্তরাঙ্গের রাগ। পঞ্চম থেকে তার সপ্তকের ষড়্জ পর্য্যন্ত আলাপ ও বিস্তারের প্রশস্ত ক্ষেত্র।

জোগিয়ার অবরোহণে নিষাদের, এবং কখনও কখনও অল্প পরিমাণে গান্ধারেরও ব্যবহার দেখা যায়। তা'তেও রাগের কোন হানি হয় না।

স্বরবিস্তার

সা, ঋমা, পদা মপা দঋ র্সা, নর্সা নদা পা, দনা দপা, দমা মা ঋগা ঋসা।

সঋ মপা দা, পা, মপা দর্সা, দঋ, র্সা, ঋ'র্মা ঋ'র্গা ঋ'র্সা, নর্সা নদা পদা নদা পা, মপা দপা দমা, ঋগা ঋসা।

জোগিয়া—ত্রিতাল

পিয়া মিলনকী আশ, সখিরী
দিন দিন বঢ়ত মোর সাগারো যোবনওয়া।
যব সে মোর পিয়া গমন কিয়ু
তরপত হুয় সাগারো দিনরতিয়া॥

আস্থায়ী

+ ৩ ০ ১
|| | |-া মা মা মা | পা দা পদা ঋর্া |
০ পি য়া মি ল ন কী০ ০

+ ৩ ০ ১
| সা -া র্সদা নর্সা | নর্সা ঋর্সা নদা -া | মা দদা দা -া | -া পসা পদনা দা |
আ ০ শ স খি০ ০০ রী ০ ০ দিন দিন ০ ০ বঢ় ত০০ মো

+ ৩ ০ ১
| পা মপা মপদা -া | মপা ঋপা ঋ সা | | ||
র সাগা রো০০ ০ যো০ ব০ ন ওয়া

অন্তরা

+ ৩ ০ ১
|| | |-া মমা পা দা | পদা র্সা র্সা নর্সা |
০ যব সে মো র০ ০ পি য়া

+ ৩ ০ ১
| -া র্সঋ র্সঋ র্মা | র্গঋ র্গা ঋ র্সা | -া দদা দা দা | পদা পদনা দা পা |
০ গম ন০ ০ ০ ০ কি য়ু ০ তর প ত হুয় ০০০ ০ ০

+ ৩ ০ ১
| মপা মপদা -া পম | গঋ পা ঋ সা | | || ||
সাগা রো০০ ০ দিন র ০ তি য়া

তান—

(১) ১ সঋ মপ দর্সা ঋ'র্ম | + ঋ'র্গা ঋ'র্সা নদা পমা | ৩ দপা মপা ঋপা ঋসা

(২) ১ মপা দর্সা ঋ'র্মা ঋ'র্গা | + ঋ'র্সা নদা পমা পমা | ৩ দপা মপা ঋপা ঋসা

(৩) ০ সঋ মপা দপা মপা | ১ দর্সা ঋ'র্মা ঋ'র্গা ঋ'র্সা |
+ নদা পমা দনা দপা | ৩ দমা পমা ঋপা ঋসা

বিবেক-ব্যথা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

রাত্রি দুইটা ধ্বনিল যে গীর্জ্জায়,
গোটা লণ্ডন নিমগ্ন নিদ্রায়।
ভাবিয়া যদিও নাহিক কোনোই লাভই,
তবু ভারতের—ভারতের কথা ভাবি।
মরে যাই ক্ষোভে, ঘৃণা, দুঃখ, লজ্জায়।

দেখিনি ভারত, শুনেছি মহিমা তার—
ইংরাজ—কবি জাতির অহঙ্কার।
অবিচার মোরা করেছি তাহার প্রতি,
বুকে বিবেকের বিষ্ণন পাই নিতি,
ক্ষমা মাগি তার হেথায় বারম্বার।

করিয়াছি মোরা সে দেশের দুর্গতি—
স্থিতি ও প্রবেশ অকীর্ত্তিকর অতি।
ভারতবাসীর চরিত্র অনুপম,—
বলিতে গেলে তো তারাই নরোত্তম,
সব দিক দিয়া তাদের করেছি ক্ষতি।

নন্দকুমার মহারাজে দেহি ফাঁসি
হীন বিচারের প্রহসন শুনে হাসি।
স্যার নাকি ছিল আলার সে 'ইম্পে'?
এ যে মান দেওয়া অশ্বের ডিম্বে!
কলঙ্কে তার কলুষিত দেশবাসী।

ক্ষীণ অজুহাতে, দীন অজুহাতে অতি,—
শ্বেত ঘাতকেরা লভিত অব্যাহতি।
কথায় কথায় গরিবের প্লীহা ফাটা,
স্মরিলেও সারা অঙ্গেতে দেয় কাঁটা,
কে দেখেছে হেন দুর্নীতি, দুর্ম্মতি?

বিনয়-বধির, টলিনি নয়ন-জলে,
মনুষ্যত্ব দলেছি চরণতলে।
লুটেছি, টুটেছি, নিতি নব ছল খুঁজি,—
কপটতা আর কুটিলতা ছিল পুঁজি।
মানুষকে পশু করিয়াছি পশু বলে।

ভারতবাসীরা উদার মহৎ ধীর,—
কাপুরুষ নয়, দেহে-মনে তারা বীর।
দার্শনিকের জাতি তারা ঠিক বটে,
পরাধীনতায় ঘটেছিল যাহা ঘটে,
গৌরব তারা সমগ্র অবনীর।

অভ্রংলিহ আদর্শ তাহাদের,
পুত্র তাহারা সত্য অমৃতের।
তা'রা হিমালয়, আমরা "ডোভার ক্লিফ"
মোরা লণ্টন, তাহারা পঞ্চদীপ
"অক্ষয়-বটে" "ও কে" যে প্রভেদ ঢের।

সংযমহীন, ধর্ম্ম-পরাঙ্মুখ,
মোরা সব পেয়ে কতটুকু পাই সুখ?
তাহারা রয়েছে যে হোমানলের আঁচে
দেবতা এবং স্বর্গ তাদের কাছে।
ভোগে বীতরাগ, ত্যাগে সদা উন্মুখ।

দীর্ঘ দিনের পীড়নে উৎপীড়িত
সংযত জাতি সতত থাকিত ভীত।
যারা করেছিল সমস্ত বর্জ্জন,
শোনালো তাদিকে কামানের গর্জ্জন?
সে বীরত্বের চিনা নাই কিঞ্চিৎও।

সভ্যতার যে বর্ণের ও পরিচয়—
ছিল না মোদের—আজ মোর মনে হয়।
যাহারা কেবল শ্বেতবর্ণের জোরে,
রূঢ় গর্ব্বিত পদক্ষেপেতে ঘোরে,
শোচনীয় হয় তাহাদের পরাজয়।

রেল টেলিগ্রাফ দিয়েছি ষ্টীমার,
ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন, রেডিও বাকি কি আর?
ভগবান সাথে যাহাদের সংযোগ,
এ সব তাদের বিফল কর্ম্মভোগ,
কেন নলকূপ?—যেথা সুধা-পারাবার।

রাজকীয় সব লাটের নামের সারি,
মহা মহাবীর বৃহৎ উপাধিধারী,
জ্যোতিষ্ক সম থাকিত যাহারা ফুটি,
আজিকে তাহারা 'পাজাঙ্গীর' ফিনকুটি,
গভীর তিমিরে ডুবিতেছে তাড়াতাড়ি।

ত্যজিয়া ভারত—সরায়ে ঘৃণ্য ভার,
প্রায়শ্চিত্ত কিছুটা করেছি তার।
নিয়েছি অনেক দিয়াও এসেছি কিছু,
তবু অনুতাপে মাথা হয়ে আসে নীচু,
সে অপরাধ কি মার্জ্জনা করিবার?

ভারত ত্যজিয়া, করছি ভারত ভোগ,
দূর থেকে দেখি সেই আনন্দ-লোক।
দেব-দেউলির মালিক হওয়ার চেয়ে,
ধন্য হয়েছি দেবের প্রসাদ পেয়ে,
ভারতই পারিবে দিতে যে দিব্য চোখ।

আজ তারে ভেট পাঠাইছে বৃটানিয়া।
বন্দনা করে তারে গুয়া-পান দিয়া।
মৈত্রীর রাখী ছিন্ন হবার নয়,
এইবার হলো ঘনিষ্ঠ পরিচয়,
লয়ে বিশুদ্ধ ভক্তিনম্র হিয়া।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ডি. এচ. লরেন্স

মোরেল হাসপাতালে থাকলেও তাদের খুব দুরবস্থায় পড়তে হয়নি। সপ্তাহে চোদ্দ শিলিং পাওয়া যেত খনি থেকে, মজুরদের সমিতি থেকে রোগের সাহায্য বাবদ পাওয়া যেত দশ শিলিং, আর পাঁচ শিলিং আসত রুগ্ন মজুরদের সাহায্য-ভাণ্ডার থেকে। তাছাড়া মোরেলের সহকর্মীরা প্রতি সপ্তাহেই মিসেস মোরেলকে পাঁচ-সাত শিলিং দিয়ে সাহায্য করত। কাজেই সংসারের খরচ চালাতে খুব অসুবিধেয় পড়তে হয়নি তাঁকে। এদিকে হাসপাতালে মোরেলও ভাল হয়ে উঠেছে—এ-বাড়ির লোকের সুখ আর শান্তিতে কোন ফাঁক রইল না। শনিবার আর বুধবার এই দু'দিন মিসেস মোরেল স্বামীকে দেখতে যেতেন এবং ফিরে আসার সময় শহর থেকে টুকিটাকি জিনিস কিনে নিয়ে আসতেন। কোন দিন পলের জন্যে রঙের বাক্স, কিম্বা ছবি আঁকবার মোটা কাগজ, কোন দিন অ্যানির জন্যে ছবিওয়ালা পোষ্টকার্ড, ডাকে দেবার আগে তাই নিয়ে বাড়ির সবাই মাতামাতি করত; কোন দিন বা আর্থারের জন্যে একটা ছোট করাত কিম্বা একটা সুন্দর, নরম কাঠের টুকরো। দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াবার গল্প করতে করতে মা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। কয়েক দিনের মধ্যে ছবির দোকানের লোকেরা তাঁকে চিনে ফেলল—পল-এর সম্বন্ধেও অনেক কথা তাদের জানা হয়ে গেল। বইয়ের দোকানের মেয়েটি তাঁকে দেখলেই আগ্রহের সঙ্গে কথা বলত। শহর থেকে ফিরে কত গল্প, কত খবরই যে তিনি শোনাতেন। শুতে যাবার আগে পর্য্যন্ত তিন জনে বসে গল্প করতেন—গল্প শুনতেন, বলতেন, কখনো বা তর্ক হ'ত নিজেদের মধ্যে। তখন পল উনুনের আগুনটাকে খুঁচিয়ে বড়ো ক'রে তুলত। খুশি হয়ে পল বলত মায়ের কাছে, 'এবার বাড়িতে পুরুষ মানুষ বলতে ত' আমিই।' এ ক'দিনেই তারা বুঝতে পেরেছিল বাড়ির জীবন কতদূর শান্তিময় হতে পারে। কয়েক দিন পরেই মোরেল ফিরে আসবে, এ কথা ভাবতে তাদের খুব ভাল লাগছিল না, যদিও নিজেদের এতটা হৃদয়হীন বলে স্বীকার করতে তারা রাজী হ'ত না নিশ্চয়ই।

পল-এর বয়স এখন চোদ্দ—সে কাজ-কর্ম্ম খুঁজছিল। দেখতে ছোটখাট, ভারী সুকোমল চেহারা, চুলের রঙ ঘন পাটল, চোখ ঈষৎ নীল। ছেলেবেলার ফোলা-ফোলা মুখ ভেঙে এখনই তার মুখ উইলিয়মের মত হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। কাটখোট্টা চেহারা, বেশ রুক্ষই বলা চলে। কিন্তু মুখের ভাবে অফুরন্ত চাঞ্চল্য, যেন পৃথিবীর সব-কিছু সে চোখ চেয়ে দেখছে, যেন প্রাণের অপরিমেয় উষ্ণতার স্পর্শ লেগেছে তার মুখশ্রীতে। মায়ের মত তারও মুখে লেগে থাকত চাপা হাসি—দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করত। কিন্তু যদি কখনো প্রাণের উদ্দাম গতিতে বাধা পেত, তখন তার মুখ কেমন যেন বিশ্রী বিবর্ণ হয়ে উঠত। যদি ওকে কেউ না বুঝত কিম্বা ওর যথার্থ মূল্য দিতে রাজী না হত, তাহলে ওর ক্ষোভের সীমা থাকত না। সাধারণতঃ এই ধরণের ছেলেরাই নির্ব্বোধ কিম্বা অপদার্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু একটু স্নেহ, একটু প্রাণের স্পর্শ পেলে এদের জীবন বিকশিত হয়ে ওঠে, তখন সকলের শ্রদ্ধা ওরা পায়।

প্রথম পরিচয়ে ও কোন কিছুকেই সহজ ভাবে গ্রহণ করতে জানে না—তার আঘাতে ওর মন বেদনায় ভরে ওঠে। সাত বছর বয়সে যখন প্রথমে স্কুলে সে ভর্ত্তি হ'ল, তখন সেই স্কুলে যেতে তার ভীষণ ভয় করত, যন্ত্রণা বোধ করত মনে মনে। কিন্তু ক্রমশঃ স্কুল তার ভাল লেগে গেল। এবার কাজের জগতে প্রথম প্রবেশের বেলায়ও তার মন তেমনি স্পর্শকাতর, তেমনি বেদনাগ্রস্ত হয়ে উঠল। এ বয়সে সে যা সুন্দর ছবি আঁকত তা সত্যিই সুন্দর! তাছাড়া ফরাসী আর জার্ম্মান ভাষা আর অঙ্ক সে মিঃ হীটনের কাছে কিছু কিছু শিখেছিল। কিন্তু চাকরির বাজারে এ সবের কোন দাম ছিল না। কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের কাজে সে ছিল নিতান্ত অপটু—মা ভাবতেন ওর গায়ে একটুও জোর নেই। জিনিসপত্র তৈরি করার কাজও তার ভাল লাগত না—তার চেয়ে দৌড়ে বেড়ান, কিম্বা গ্রামের মধ্যে এক পাক ঘুরে আসা অথবা বই পড়া, ছবি আঁকা, এ সবই তার ভাল লাগত।

একদিন মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ধরণের কাজ তুমি চাও?'

—'যে কোন ধরণের।'

—'এ কি একটা উত্তর হ'ল?' মিসেস মোরেল বললেন। কিন্তু সত্যি বলতে গেলে এ ছাড়া আর কোন জবাব তার দেবার ছিল না। সংসারে তার আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিধি খুব বেশী নয়। বাড়ির কাছাকাছি কোথাও বিনা হাঙ্গামায় সপ্তাহে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ শিলিং রোজগার করা, তার পর বাবা মারা গেলে একটা ছোট বাড়িতে মাকে নিয়ে থাকা আর ছবি এঁকে কিম্বা নিজের খুশিমত বেরিয়ে মনের সুখে জীবনটাকে কাটিয়ে দেওয়া। জীবনের পরিকল্পনা বলতে সে এইটুকুই বুঝত। কিন্তু নিজেকে নিয়ে নিজে সে সন্তুষ্ট ছিল, নিজের সঙ্গে তুলনা ক'রে অন্য লোককে সে দেখত আর তাদের স্থান নির্দ্ধারণ করতেও তার দেরি হ'ত না—নিজের বিচারশক্তির উপর তার আস্থা ছিল গভীর। মাঝে মাঝে সে ভাবত হয়ত বা সত্যিকারের গুণী শিল্পী সে হতে পারবে। কিন্তু এ নিয়ে মাথা-ঘামাবার অভ্যাস তার ছিল না।

মা বললেন, 'কাগজগুলোতে বিজ্ঞাপন খুঁজে দেখলে ত' পারো!'

পল মায়ের মুখের দিকে চোখ তুলে চাইল। এমন নিদারুণ

দীনতা আর সুতীব্র উদ্বেগের মধ্যে দিয়েই তাকে যেতে হবে! কিন্তু মুখে সে কোন কথা উচ্চারণ করল না। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তার সমস্ত সত্তা জুড়ে শুধু এই ভাবনাটাই প্রবল হয়ে উঠল,—আজ বেরিয়ে গিয়ে কাজের জন্যে বিজ্ঞাপন দেখতে হবে।

এই ভাবনাটাই তার সমস্ত সকালবেলার আনন্দকে আচ্ছন্ন করে মাথা তুলে দাঁড়াল—তার প্রাণের ধারাও যেন শুকিয়ে গেল এই ভাবনার ছোঁয়াচ লেগে। কে যেন তার অন্তরকে চেপে ধরেছে শক্ত মুঠোতে।

অবশেষে দশটার সময় বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে পড়ল। সবাই পলকে জানত একটু অদ্ভুত ধরণের শান্ত ছেলে বলে। ছোট শহরটির প্রসারিত রাস্তার উপর রোদ পড়েছে, যেতে যেতে পলের মনে হতে লাগল সব লোক যেন তার দিকে চেয়ে বলাবলি করছে, 'ওই ত' ছেলেটা যাচ্ছে সমবায় সমিতির পড়ার ঘরে গিয়ে খবরের কাগজ ঘাঁটতে—দেখতে কোথাও কোন চাকরি পাওয়া যায় কি না। ওর ত' কাজ-কর্ম নেই, মায়ের উপর বসে খাচ্ছে।' সমবায় সমিতির পোশাকের দোকানের পেছনে পাথর-বাঁধান সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে পল্ পড়বার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল। সাধারণতঃ একটি-দু'টি লোকই ওখানে বসে থাকে—হয় বুড়ো নিষ্কর্মা লোক, নয়ত' কর্ম কোন খনির মজুর। ঘরে ঢুকতে তার কেমন সঙ্কোচ হচ্ছিল, সবাই যখন ওর দিকে চোখ তুলে চাইল, তখন লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল সে। টেবিলে বসে সে খবরগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার ভাণ করল। মনে মনে সে জানত, ওরা ভাববে, তেরো বছরের একটা ছেলে পড়ার ঘরে বসে করে কী? কাজেই মনে অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল তার।

জানালা দিয়ে করুণ চোখে বাইরের দিকে চাইল সে একবার। এখন থেকেই সে যেন কল-কারখানার বন্দী, এই শিল্প-ব্যবস্থার নাগপাশ থেকে আর যেন তার মুক্তি নেই। বাইরের লাল দেয়ালের উপর দিয়ে মুখ তুলে আছে বড়ো বড়ো সূর্য্যমুখী, দেয়ালের নীচে দিয়ে মেয়েরা দুপুরবেলার রান্নার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে যাচ্ছে, ফুলগুলো যেন হাসিমুখে চেয়ে আছে তাদেরই দিকে। সমস্ত উপত্যকা জুড়ে শস্যের রাশ, রোদের তেজে ঝকমকে হয়ে উঠেছে। মাঠের মাঝখানে দুটো কয়লার খনি থেকে উঠছে ক্ষীণ ধোঁয়ার কুণ্ডলী। দূরে পাহাড়ের উপর গভীর বন, তার অন্ধকার যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে। পল্ যেন এখুনিই দমে গেল তার আসন্ন বন্দিদশার কথা ভেবে। গৃহের অবাধ মুক্তি আর বেশী দিন নয়!

শেষ পর্য্যন্ত ঘরের লোকগুলো সব চলে গিয়ে ঘরটা যখন খালি হয়ে গেল, তখন পল্ তাড়াতাড়ি এক টুকরো কাগজের উপর একটা বিজ্ঞাপন টুকে নিলে। তারপর আর একটাও টুকে নিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে সে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

মিসেস মোরেল একবার বিজ্ঞাপনগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন। দেখে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি চেষ্টা করে দেখতে পার।'

উইলিয়মের হাতের লেখা একখানা দরখাস্ত বাড়িতে ছিল—চমৎকার কায়দাদুরস্ত করে লেখা। পল দাদার সেই দরখাস্তখানা দেখে দেখে একটু অদল-বদল করে লিখে ফেললে। তার হাতের লেখা ছিল জঘন্য। উইলিয়ম নিজে তার সব কাজ খুব ভাল করে করত। পলের হাতের লেখা দেখে তার বিরক্তির সীমা থাকত না।

লণ্ডনে গিয়ে উইলিয়ম খুব কাজের লোক হয়ে উঠেছিল। বেষ্ট-উড্-এ থাকতে সে যে সব লোকের সঙ্গে মেলামেশা করত, এখানে এসে দেখল—তার চেয়ে অনেক উঁচু দরের লোকের সঙ্গে সে মিশতে পারে। তাদের অফিসের কয়েকটি কেরাণী আইন পড়ছিল এবং শিক্ষানবীশ হিসাবে অফিসে কাজ করছিল। উইলিয়াম নিজে খুবই আমুদে, সে যেখানেই যেত সেখানেই তার বন্ধু জুটতে দেরি হ'ত না। কিছুদিনের মধ্যেই সে বড় বড় লোকের বাড়ি যেতে আরম্ভ করল। অনেক সময় তাদের বাড়িতে গিয়ে সে থাকত। বেষ্টউডে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারই খুব বড়লোক। কিন্তু এদের কাছে সে অতি নগণ্য। বেষ্টউডে সব চেয়ে সম্মানিত লোক ছিলেন গির্জ্জার পাদরী, কিন্তু তার সঙ্গেও এরা খুব কমই মিশত। এমনি সব লোকের সঙ্গে মিশে উইলিয়ম নিজেকেও খুব অসাধারণ লোক বলে মনে করতে শিখল। এত সহজে সে ভদ্রলোকের স্তরে উঠে গেল যে সে-কথা ভাবতেও তার অবাক লাগত।

তার উন্নতি দেখে মা খুশি হয়েছিলেন, আর মায়ের আনন্দ দেখে সে নিজেও গর্ববোধ করত। লণ্ডনের যে পাড়ায় সে থাকত সেখানকার বাড়িটা ছিল বাসের অযোগ্য। কিন্তু এখন তার চিঠি-পত্রে ফুটে উঠতে লাগল একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা। নতুন জীবনের স্রোতে ভেসে চলতে গিয়ে সে যেন নিজেকে আর স্থির রাখতে পারছিল না। মা তার জন্যে চিন্তিত হয়ে উঠলেন। ছেলে ক্রমশঃ নিজের উপর বশ হারিয়ে ফেলছে, এ কথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। সে নাচত, থিয়েটারে যেত, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বেড়াতে যেত, নৌকোয় চড়ে অনেক দূর ঘুরে আসত, তারপর গভীর রাত্রি অবধি তার ঠাণ্ডা শোবার ঘরটায় বসে ল্যাটিন মুখস্থ করত। এই সব খবরই মিসেস মোরেল পেয়েছিলেন। তিনি জানতেন, ছেলে চায় অফিসের কাজে তাড়াতাড়ি উন্নতি করতে আর আইনের ধারাগুলো যত দূর সম্ভব শিখে নিতে। এখন আর সে বাড়ীতে মায়ের কাছে টাকা পাঠাতে পারত না। তার সামান্য আয়ের সবটুকু নিজের জন্যেই খরচ করতে হ'ত। মা-ও পারতপক্ষে কোন দিন তার কাছে কিছু চাইতেন না। যদিও বা চাইতেন, খুব দুরবস্থায় প'ড়ে, যখন তার কাছ থেকে সামান্য দশ শিলিং পেলেও সংসারের অনেকটা ভার লাঘব হয়। উইলিয়মের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি স্বপ্ন দেখতেন—দেখতেন, তিনিও তার পাশেই রয়েছেন। ছেলের জন্যে যদিও তার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না, যদিও তাঁর মন অস্বস্তিতে ভারী হয়ে থাকত, তবুও এক মুহূর্ত্তের জন্যও এ কথা তিনি কারু কাছে স্বীকার করতেন না।

আজ-কাল উইলিয়ম একটি মেয়ের কথা প্রায়ই লিখত। একটি নাচের জলসায় আলাপ হয়েছিল ওদের দু'জনে। মেয়েটি সুন্দরী, চুল ঘন কাল, বয়স অল্প, এবং খুবই বড় বংশের মেয়ে। অনেক ছেলেরাই তাকে পাবার জন্যে তার পিছনে ছুটছিল। মা তার উত্তরে লিখেছিলেন, 'আমার মনে হয়, অন্য লোক যদি ওর পেছনে না ছুটত তবে তুমিও হয়ত আর ছুটতে না। দলের মধ্যে পড়ে তোমার বিপদের ভয় থাকে না, আর বুদ্ধিশুদ্ধিও লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু তোমার সাবধান হওয়া উচিত। যখন দেখবে তুমি একাই তাকে লাভ করেছ, তখন তোমার কেমন লাগবে সে কথা কখনও ভেবে দেখেছ কি?'

কথাগুলো পড়ে উইলিয়মের রাগ হ'ত। সে আগের মতই মেয়েটির পেছনে ছুটোছুটি করতে লাগল। মেয়েটিকে নিয়ে সে নদীতে বেড়াতে গিয়েছিল। মায়ের কাছে সে লিখল, 'যদি তুমি ওকে দেখ, তা'হলে আমার মনের ভাব বুঝতে পারবে। ওকে দেখতে লম্বা, ঠিক যেন রাণীর মত, গায়ের রঙ পরিষ্কার যেন স্বচ্ছ ফলের মত উজ্জ্বল; চুল ঘন কাল, আর চোখ দুটিতে ঔজ্জ্বল্য আর চপলতা। রাত্রিবেলায় জলের বুকে আলো পড়ে যেমন দেখায় ঠিক তেমনি। ওকে দেখার আগে তুমি যত খুশি ঠাট্টা ক'রে নাও আমাকে, আর ও যা পোশাক পরে সেই হ'ল লণ্ডনের সেরা পোশাক। লণ্ডনের রাস্তায় তোমার ছেলে যখন ওকে নিয়ে বেড়াতে যায়, তখন সগৌরবে মাথা তুলেই সে যেতে পারে।'

মিসেস মোরেল অবাক হয়ে ভাবতেন, তার ছেলে কি শুধু সুন্দর চেহারা আর ভাল পোশাক দেখেই একটা মেয়েকে নিয়ে লণ্ডনের রাস্তা দিয়ে বেড়ায়, না সেই মেয়েটি সত্যিই তার মনের মানুষ? তবু নিজের মনে সন্দেহ নিয়েও মা ছেলেকে জানালেন অভিনন্দন। কিন্তু বাড়িতে দাঁড়িয়ে কাপড় কাচতে কাচতে ছেলের জন্যে তাঁর দুশ্চিন্তার সীমা থাকত না। একটি জবরদস্ত মেয়ে তাঁর ছেলের ঘাড়ে চেপে বসেছে, তার খরচ চালানো ছেলের সামান্য আয়ে সম্ভব নয়, হয়ত শহরের বাইরে একটা ছোট্ট ভাঙা বাড়িতে সারাটা জীবন কোন মতে তাকে কাটিয়ে দিতে হবে। আবার নিজের মনেই তিনি ভাবতেন, আমার মত বোকা আর নেই। বিপদ আসবার আগেই ভেবে সারা হচ্ছি। তবু তাঁর মনের দুশ্চিন্তা পুরোপুরি ঘুচত না। উইলিয়ম পাছে নিজেকে নষ্ট করে ফেলে, পাছে সে নিজেই নিজের উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করে, এই ভাবনায় সর্ব্বদা তিনি বিব্রত হয়ে থাকতেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই পলের কাছে চাকরির ডাক এলো। নটিংহাম শহরের ২১ নং স্পেনীয়েল রো'তে টমাস্ জর্ডনের ডাক্তারী যন্ত্রপাতি তৈরি করবার দোকান। সেইখান থেকে ডাক এল পলের। মিসেস মোরেলের আনন্দের সীমা রইল না। বললেন, 'দেখেছ, তুমি কেবল চারটে চিঠি ছেড়েছ, তার মধ্যে তিন নম্বরটারই জবাব এসে গেছে। আমি ত' বরাবরই বলি তোমার কপাল খুব ভাল।' কথাগুলো বলতে বলতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

মিষ্টার জর্ডনের দোকান থেকে যে চিঠিখানা এসেছিল, তার উপর আঁকা ছিল একটা কাঠের পা, আর তাতে টানা মোজা পরানো। ছবিটা দেখে পলের মনে ভারী ভয় হতে লাগল। বাইরের জগতের সঙ্গে আগের কোন পরিচয়ই তার নেই। আজ তার মনে হতে লাগল কী অদ্ভুত এই জগৎ, এখানে সব জিনিসেরই বাঁধা দাম। ব্যক্তিত্বের কোন মূল্য এখানে নেই। এই দোকান-দারীর রাজ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না, বার বার তার এই ভয় হতে লাগল। কাঠের পা নিয়ে কোন ব্যবসা চলতে পারে এ কথা ভাবতেও কেমন অদ্ভুত লাগে।

মঙ্গলবার সকাল বেলা মা ও ছেলে এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে। আগষ্ট মাস, চার দিকে রোদ খাঁ-খাঁ করছে। যেতে যেতে পলের মনে হতে লাগল যেন তার হৃদয় মুক্তির জন্য আকুলি-বিকুলি করছে। এই যে অপরিচিত লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়ান—হয় তারা নেবে তাকে নয় ত' ফিরিয়ে দেবে—এর মত অসহ্য যন্ত্রণা আর নেই। এর চেয়ে দেহের যন্ত্রণা সহ্য করা সহজ। তবুও পথে পথে মায়ের সঙ্গে গল্প করেই যে চলতে লাগল। নিজের যন্ত্রণার কথা মায়ের কাছে সে ঘুণাক্ষরেও স্বীকার করল না। আর তিনিও খুব বেশী অনুমান করতে পারেননি। মায়ের মন আজ খুব হাল্কা। অনর্গল তিনি কথা বলে যাচ্ছেন; যেন কোন তরুণী কথা বলছে তার তরুণ প্রেমিকের সঙ্গে। বেষ্টউডের টিকিট-ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মা তাঁর টাকার থলে থেকে টিকিটের টাকা খুলে বার করে দিলেন। পল মুগ্ধ চোখে তার দিকে চেয়ে রইল। মায়ের ছেঁড়া থলে থেকে পুরোন দস্তানা-পরা হাত দিয়ে এই টাকা তুলে নেওয়ার মধ্যে কী যেন এক অপরূপ মাধুর্য্য আছে! মায়ের প্রতি স্নেহে, ভালবাসায় তার হৃদয় মথিত হয়ে উঠল।

মায়ের উত্তেজনার আজ সীমা নেই। খুবই উল্লসিত দেখাচ্ছে তাঁকে। গাড়ির অন্য যাত্রীদের সামনে মা কথা বলতে সুরু করবেন, এই ভেবে পলের মনে মোটেই স্বস্তি ছিল না।

হঠাৎ মা বললেন, 'দেখ ঐ গরুটার দিকে চেয়ে, ও কেমন ঘুরপাক খাচ্ছে, মনে হয় যেন সার্কাস করছে।'

পল্ আস্তে আস্তে বললে, 'বোধ হয় ওর গায়ে পোকাগুলো ডিম পেড়েছে।'

—'কী পেড়েছে?' মা মহা উৎসাহে প্রশ্ন করলেন, এ নিয়ে ছেলের সঙ্গে কথা বলতে আজ তাঁর একটুও লজ্জা হচ্ছিল না।

খানিকক্ষণ তারা দু'জনেই চুপ করে কী যেন ভাবতে লাগলেন। মা যে তার মুখোমুখী বসে আছেন এ কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও পলের মন থেকে যায়নি। হঠাৎ দু'জনার চোখাচোখি হয়ে গেল আর মা ছেলের দিকে চেয়ে একটু মৃদু হাসলেন। এমন অন্তরঙ্গতার হাসি তাঁর মুখে পল এর আগে আর দেখেনি। তাঁর হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা তাঁর হাসিটুকুকে মধুর আর উজ্জ্বল করে তুলেছিল। তারপর দু'জনেই মুখ ফিরিয়ে আবার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন।

গাড়িখানা আস্তে আস্তে চলে এসে যোল মাইল দূরের শহরে লাগল। মা আর ছেলে দু'জনে ষ্টেশনের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে হাঁটতে লাগলেন। দুটি প্রেমিক-প্রেমিকা রাস্তা দিয়ে এক সঙ্গে চলতে যে উত্তেজনা অনুভব করে, আজ তাদের মনেও সেই উত্তেজনা। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে নদীর জলের উপর রেলিংয়ে ভর ক'রে তাঁরা দেখলেন, নীচের জলে নৌকোগুলো ভাস্‌ছে। পল্ বললে, 'এ যেন দেখতে ঠিক ভেনিস শহরের মত। আশ-পাশে কারখানার উঁচু-উঁচু দেওয়াল। মাঝখানে এইটুকু জলের উপর রোদ এসে পড়েছে। মা হেসে বললেন, 'তাই বটে।'

দোকানে দোকানে ঘুরে তাঁরা অনেক কিছু জিনিস দেখে বেড়ালেন। কোন দোকানে গিয়ে মা হয়ত বললেন, 'ঐ যে ব্লাউজটা দেখছ ওটা এ্যানীর গায়ে ঠিক মানাবে, তাই নয় কী? আর দামও খুব সস্তা।' পল্ বললে, 'আর খুব চমৎকার ছুঁচের কাজও রয়েছে।' মা বললেন, 'সত্যি।'

অনেক সময় ছিল তাদের হাতে, কাজেই তাড়াতাড়ি করবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই অপরিচিত শহরে ঘুরে বেড়াতে তাদের খুবই ভাল লাগছিল। তবু পলের মনে এক-রাশ আশঙ্কা

এসে জট পাকিয়ে তুলেছিল। টমাস্ জর্ডনের সঙ্গে দেখা করার কথা ভেবে সে আর কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিল না।

সেন্ট পিটার্স গির্জ্জার ঘড়িতে তখন প্রায় এগারোটা বেজেছে। একটা গলি দিয়ে তাঁরা এসে পড়লেন কেল্লায় যাবার রাস্তায়। রাস্তাটা অন্ধকার আর বহুদিনের পুরোন। দু'পাশে নীচু-নীচু অন্ধকার দোকান ; বাড়ির দরজাগুলো-সবুজ রঙের, তাতে পেতলের 'নকার।' হলুদ রঙের সিঁড়িগুলো রাস্তার কিনারা অবধি নেমে এসেছে। এর পর আর একটা পুরোন দোকান, তার ছোট জানালাটা যেন কোন ধূর্ত লোকের আধ-খোলা চোখের মত। টমাস্ জর্ডনের দোকান খুঁজতে খুঁজতে আস্তে আস্তে দু'জনে এগিয়ে চললেন,—যেন কোন নির্জ্জন জায়গায় তাঁরা নতুন কোন জিনিসের সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন। দু'জনেরই মনে ঔৎসুক্যের অবধি নেই। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড বড় আলোকবিহীন ফটকের উপর তাঁরা দেখলেন অনেকগুলো দোকানের নাম লেখা রয়েছে। তার মধ্যে টমাস্ জর্ডনের দোকানও আছে। দেখে মিসেস মোরেল বললেন, 'ঐ ত' দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ঠিক কোন জায়গাটায় কি ক'রে বুঝব?' দু'জনে চেয়ে দেখতে লাগলেন সেদিকে। এক দিকে একটা বাক্স তৈরি করবার কারখানা—অন্য দিকে একটা হোটেল।

পল বললে, 'এই রাস্তা দিয়ে ভিতরে যেতে হবে।'

দু'জনে সেই ড্রাগনের মুখের মত প্রকাণ্ড ফটকটার ভিতরে ঢুকে পড়লেন। ভিতরে এসে দেখলেন একটা প্রশস্ত আঙিনা, তার চারি দিকে বড়ো বড়ো দালান। খড়, প্যাকিং-কাগজ, বাক্স চারিদিকে সব ছড়ানো। একটা বেতের বাক্সর মধ্যে থেকে খড়গুলো বেরিয়ে আঙিনার উপর ছড়িয়ে পড়েছে, তার উপর সূর্য্যের কিরণ পড়ে দেখাচ্ছে যেন ঠিক সোনার মত। কিন্তু অন্য সব জায়গায় ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। চার পাশে কয়েকটি দরজা আর দুটি সিঁড়ি। ঠিক সামনেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে একটা অপরিচ্ছন্ন কাচের দরজার উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা সেই ভয়ঙ্কর নাম—'টমাস্ জর্ডন এণ্ড সন্স—ডাক্তারীর যন্ত্রপাতি।' মিসেস মোরেল আগে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন, পেছনে পল। সেই অন্ধকার দরজা দিয়ে অপরিচ্ছন্ন ঘরের মধ্যে পল্ গিয়ে যখন মায়ের পিছু-পিছু ঢুকল, তখন তার মনের অবস্থা এত শোচনীয় যে, বোধ হয় ফাঁসির মঞ্চে উঠবার সময় রাজা প্রথম চার্লস-এর মনও এত খারাপ হয়নি!

দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে মা অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর সামনে একটা প্রকাণ্ড মালগুদাম, কাগজে মোড়া প্যাকেটগুলো ইতস্তত: ছড়ানো। অফিসের কেরাণীরা জামার আস্তিন গুটিয়ে এদিক-ওদিকে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অস্পষ্ট আলোতে হলদে কাগজের পুলিন্দাগুলোকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। কাউণ্টারগুলো ঘন বাদামী রঙের কাঠ দিয়ে তৈরি। গোলমাল নেই, ঠিক যেন শান্ত বাড়ির মত। মিসেস মোরেল দু'পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। পল্ তাঁর পেছনে। মায়ের মাথায় রবিবারে পরবার টুপি আর একটা কালো মুখাবরণ। ছেলের গায়ে নরফোকের স্যুট আর ছোট ছেলেরা যেমন পরে তেমনি সাদা চওড়া কলার।

একটি কেরানী মুখ তুলে তাঁদের দিকে দেখল। লোকটি লম্বা আর রোগা, মুখখানা নেহাৎ শীর্ণ। তার চাউনির মধ্যে সজীবতার আভাস পাওয়া যায়। লোকটি আবার চাইল ঘরের অন্য দিকে, সেদিকে ছিল একটা কাচের কুটরী। তারপর সে এদিকে এগিয়ে এল। কোন কথা না বলে মিসেস মোরেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল—জিজ্ঞাসার ভদ্র ভঙ্গীতে।

—'মি: জর্ডনের সঙ্গে দেখা হবে কি?' মিসেস মোরেল জিজ্ঞেস করলেন।

—'হ্যাঁ, আমি ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছি।'

যুবকটি কাচের কুটরীর কাছে গেল। পাকা গোঁফ আর লাল মুখওয়ালা একটি বুড়ো লোককে দেখা গেল এদিক থেকে। তাকে দেখে পোমেরেনিয়ার কুকুরের কথা মনে পড়ল পল্-এর। লোকটি এদিকে এগিয়ে এল। তার পা দু'টি ছোট, দেহ মেদবহুল, গায়ে আলপাকার হাতকাটা জামা। দুলতে দুলতে এধারে এসে কতকটা জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে, যেন এক কান খাড়া করে সে দাঁড়াল। বলল, 'নমস্কার।' মিসেস মোরেল তার খদ্দের কি না না বুঝতে পেরে লোকটা সন্দেহে ইতস্তত: করছিল।

—'নমস্কার।' মিসেস মোরেল বললেন, 'আমার ছেলেকে নিয়ে এসেছি। পল্ মোরেল। ওকে আপনি আজ সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন।'

মি: জর্ডন একটু আত্মম্ভরিতার সুরে সংক্ষেপে বললেন, 'হ্যাঁ, আসুন এদিকে।' নিজের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে তিনি কসুর করলেন না।

[ক্রমশ:।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য্য

ভারতের সোনা

"Ile have the flye to India for gold,
Ransacke the Ocean for orient pearl,
And search all corners of the
new-found world
For pleasant fruits and princely delicates."
—Marlowe, Doctor Faustus.

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী

[ভারতের বিশিষ্ট সঙ্গীত-সাধক]

সুরবিশেষজ্ঞ ও স্বনামধন্য শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীর জীবন উল্লেখযোগ্য। প্রতিদিনের নানা কর্মব্যস্ততার ভিতরেও একটা চরম লক্ষ্য তাঁর ঠিক আছে সুর ও সঙ্গীত-সাধনা। বীরেন্দ্রকিশোরের জীবনের অন্য ক্ষেত্রেও গৌরবের ছাপ রয়েছে, থাকলেও কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় এখানেই—যেখানে তিনি একজন নৈতিক সুরশিল্পী ও সঙ্গীত-সাধক। শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর ১৩১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন ময়মনসিংহ গৌরীপুরের রাজ-পরিবারে। পিতা স্বনামধন্য ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী জমিদার হয়েও দেশ ও জাতির জন্য একান্ত দরদী ছিলেন। তৎকালীন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের তিনি ছিলেন একজন কর্ণধার। সুতরাং অতি শৈশবেই শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়ার সুযোগ পান। তাঁর জ্ঞানোন্মেষ যখন হয়ে উঠে, সে সময়ই বাঙ্গালায় স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ বয়ে যায়। এ আন্দোলনের প্রভাব তাঁর উপরে এসে পড়তে থাকে। তাঁদের কলিকাতাস্থ তখনকার বাসভবন জাতীয়তার একটি কেন্দ্র ছিল। শ্রীরায়-চৌধুরীর নিজের কথায় ঐ সময় ৫৩ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে আমরা বাস ক'রতুম। তদানীন্তন স্বদেশী যুগের নেতা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, মনীষী বিপিন পাল, ডন সোসাইটির সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী-প্রমুখ সকলেই আমাদের বাড়ী আসতেন এবং তাঁদের সান্নিধ্য লাভ করবার আমার প্রচুর সুযোগ ঘটে।

এই পরিবেশে বর্দ্ধিত হ'য়ে শ্রীবীরেন্দ্রকিশোরের ছাত্রজীবনের সূত্রপাত হ'লো। তাঁর প্রথম বিদ্যালয়ে শিক্ষা আরম্ভ হয় দেওঘরে। কিছু কাল সেখানে পড়া-শুনোর পর তিনি চলে আসেন কলকাতায় এবং মিত্র ইনষ্টিটিউশন থেকে ১৯২০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন মর্য্যাদার সঙ্গে। তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে একে একে আই, এ ও বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন এবং প্রতিবারই বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সংস্কৃত ভাষাতেও প্রথম থেকেই তাঁর অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রকাশ পায়।

শ্রীরায়-চৌধুরী যখন বি, এ পড়ছেন সে সময়ই পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন টাঙ্গাইলের বিশিষ্ট পণ্ডিত শরৎচন্দ্র সাংখ্যতীর্থের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে। ইন্দিরা দেবী উত্তর কালে এক জন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। শ্রী রায়-চৌধুরীর জীবনে শিল্প, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সাধনার প্রধান উৎস ছিলেন তাঁর সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী। তাঁরা উভয়েই শিল্প ও সংস্কৃতির পূজারী হিসেবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হ'বার সুযোগ পান এবং তাঁদের শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ লাভ করেন।

বাঙ্গালা তথা ভারতের সঙ্গীত-জগতে শ্রী বীরেন্দ্রকিশোর আজ একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার ক'রে আছেন। তাঁর জীবনের এ চরম সাফল্য বা সিদ্ধি এক দিনে হয়। এ'র পিছনে রয়েছে তাঁর বহু বর্ষব্যাপী কঠোর ও একনিষ্ঠ সাধনা। ছোটবেলা থেকেই তাঁর সঙ্গীতগত প্রাণ বটে কিন্তু তাঁর সত্যিকারের সুর-সাধনা আরম্ভ হয় একটু বেশী বয়সে ছাত্রজীবন অতিক্রান্ত হওয়ার পর।

১৯৩০ থেকে '৩৭ সাল পর্য্যন্ত অধিকাংশ সময়েই তিনি পাহাড় অঞ্চলে কাটিয়েছেন। পাহাড়ে অবস্থান কালেই সঙ্গীতচর্চ্চার দিকে তিনি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়। স্বনামধন্য সুরসাধক রাধিকামোহন মৈত্র, ওস্তাদ আমির খাঁ সারেঙ্গী, এস্রাজী শীতল মুখার্জ্জী, বিখ্যাত সেতারী এনাএত খাঁ—এঁদের থেকে তিনি সুর ও সঙ্গীত বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তানসেন-বংশীয় মহম্মদ আলী খাঁ সাহেবের নিকট তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন ধ্রুপদ সঙ্গীত ও সুরশৃঙ্গার যন্ত্র। পরবর্ত্তী সময়ে ওস্তাদ আলা-উদ্দীন খাঁ, ওস্তাদ হাফিজমানী, ওস্তাদ কেরামত-উল্লা, ওস্তাদ সেহাদী হোসেন খাঁ প্রমুখ ভারতবিখ্যাত সুর ও সঙ্গীত-বিশারদদের কাছ থেকে তিনি সঙ্গীত সাধনার অকুণ্ঠ সাহায্য লাভ করেন। শ্রী রায়-চৌধুরীর সঙ্গীত সাধনা অব্যাহত ভাবে চলেছে আজও পর্য্যন্ত। কলকাতার যতগুলো নামকরা সঙ্গীত-সম্মেলন ও সংস্থা রয়েছে, তিনি সব ক'টির সঙ্গেই কোন না কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট। সঙ্গীত সাধনার ক্ষেত্রে তাঁর উৎসাহ, উপদেশ ও সক্রিয় সহযোগিতা থেকে কেউ বঞ্চিত হয়নি কোন দিন, এখনও নয়। সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকার সম্পাদকরূপে তিনি সঙ্গীত বিষয়ে বহু মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। "হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান" ও "রাগ সঙ্গীত" নামে তাঁর রচিত গ্রন্থ দু'খানি সঙ্গীত-জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও শ্রী রায়-চৌধুরীর এক কালে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। সে সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়। ১৯৩৭ সালে তিনি পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় আইন সভায় সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তখন তিনি প্রকাশ্য ভাবে কোন দলভুক্ত ছিলেন না। পরবর্ত্তী সময়ে তিনি দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের (নেতাজী) সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৪১ সালে সুভাষ বাবুর দলের মনোনয়ন নিয়েই তিনি নির্ব্বাচনে জয়ী হ'য়ে এম, এল, সি হন। ১৯৫০ সালে পত্নী ইন্দিরা দেবীর অকাল বিয়োগের পর থেকেই শ্রীবীরেন্দ্রকিশোরের জীবনের পট পরিবর্ত্তন হয়। রাজনৈতিক

কার্য্যকলাপ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের দিকে একান্ত ভাবে মনোযোগী হন। সাহিত্য, দর্শন, স্বর ও সঙ্গীত—এ সকলই হচ্ছে তখন থেকে তাঁর জীবনের প্রধান অবলম্বন ও সাধনার বস্তু। বর্ত্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গীত ও নাটক-একাডেমির একজন সদস্য। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর অডিশন কমিটিরও অন্যতম সদস্য তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিক ফ্যাকাল্টির তিনি একজন সদস্য। হিন্দুস্থান ইনসিওর কোম্পানীর তিনি অন্যতম ডিরেক্টর। এ ছাড়া আরও কয়েকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট রয়েছেন ঘনিষ্ঠ ভাবে। অপর দিকে সাহিত্যব্রতী হিসেবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি সারগর্ভ প্রবন্ধাদি লিখে আসছেন এবং সুনাম অর্জ্জন করেছেন। শ্রী রায়-চৌধুরীর জীবন এখনও প্রচুর সম্ভাবনাময়। বাঙ্গালা ও ভারতের সঙ্গীত-জগত তাঁর কাছ থেকে ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু পাবার প্রত্যাশা রাখে। তিনি মাসিক বসুমতীর এক জন নিয়মিত পাঠক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী।

সত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্ব-বোর্ডের সদস্য]

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে এমন ধারণা করবার যথেষ্ট কারণ ছিল—যাঁরা সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন, বিশেষ করে যাঁরা খেতাবধারী কিম্বা ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোক, তাঁদের দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ ব'লতে কিছু নেই। কিন্তু কোন নিয়মই যেমন সর্ব্বাবস্থায় ধরা-বাঁধা পথে চলে না, ক্ষেত্র-বিশেষে যেমন এরও ব্যতিক্রম ঘটে, তেমনই তৎকালীন আই, সি, এস-সমাজ তথা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারিমণ্ডলী আরও হয়তো মুষ্টিমেয় কয়েক জনের সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড ব্যতিক্রম হ'লেন বাংলা দেশরই অন্যতম সুসন্তান শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, আই, সি, এস। দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধের কোন কালেই তাঁর অভাব ঘটেনি—ইংরেজ সরকারের কড়া দৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে যখনই তিনি সুযোগ পেয়েছেন, আত্মনিয়োগ করেছেন দেশ ও জাতির সক্রিয় সেবায় একান্ত নিরলস ভাবে। আই, সি, এস হতে গিয়েও তিনি বিদেশী শাসক-গোষ্ঠীর কাছে দাসখত লিখে দিলেন না—এ জন্যই তিনি দেশবাসীর একান্ত প্রিয় ও বরণীয়।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন সংগঠনের প্রথম পর্য্যায়ে প্রেরণার প্রধান উৎস ছিলেন তাঁর পরমারাধ্যতমা জননী। ১৮৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে হুগলীতে তাঁর জন্ম হয়। কিন্তু জন্মের এক বছরের মধ্যেই তিনি পিতৃহারা হন। তাঁর পিতা শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন প্রথিতযশা সরকারী উকিল। পিতার কাছ থেকে অনেক সম্পদই তিনি পেতে পারতেন কিন্তু ভাগ্য-বিড়ম্বনায় জীবন আরম্ভের মুহূর্ত্তেই যখন তিনি সে থেকে বঞ্চিত হলেন তখন তাঁর সম্মুখে একমাত্র আশার আলো জ্বালাবার জন্যে রইলেন তাঁর মা। অসহায় অবস্থায় মায়ের কাছ থেকেই পেলেন তিনি অফুরন্ত স্নেহ ও ভালবাসার সম্পদ, আর পেলেন এগিয়ে যাবার দুর্দ্দমনীয় প্রেরণা। পুণ্যময়ী জননীর শিক্ষা ও আদর্শ যে কতখানি প্রভাব বিস্তার ক'রতে পারে, তার প্রমাণ মিলতে লাগলো শ্রীসত্যেন্দ্রমোহনের ছাত্রজীবন থেকেই। ১৯১৫ সালে অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে হুগলী ব্রাঞ্চ ইস্কুল থেকে তিনি উত্তীর্ণ হ'লেন প্রবেশিকা পরীক্ষায়। তার পর ভর্ত্তি হলেন এসে সরাসরি প্রেসিডেন্সী কলেজে। কলেজ-জীবনে সকল ব্যাপারেই তাঁর ছিল নেতৃত্বের ভূমিকা। এ সময় একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে তিনি জড়িত হ'য়ে পড়েন। এ ঘটনায় ভারত-বিরোধী মন্তব্যের জন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (তৎকালে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র) ওটেন সাহেবকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করেছিলেন এবং এ ক'রতে গিয়ে তিনি কলেজ থেকে পর্য্যন্ত বিতাড়িত হয়েছিলেন। দণ্ডের হাত থেকে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ও সে সময় রেহাই পাননি। ব্লাক-বুকে তাঁর নাম উঠলো এবং পাঁচ টাকা হ'লো জরিমানা। জাতীয়তার অবমাননা যাঁরা ক'রেছেন তাঁদের কাছ থেকে এ দণ্ড মকুব চেয়ে নিতে তিনি অস্বীকার করলেন।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বি, এ পড়ছেন প্রেসিডেন্সী কলেজে সে সময় একটা বিরাট কাজের আহ্বান এলো তাঁর কাছে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তৎকালে দেশের নেতৃত্ব করছেন। যুব-বাঙ্গালকে লক্ষ্য করে তিনি আহ্বান জানালেন তারা যেন তখনকার মহাযুদ্ধে যোগদান করে। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রনেতা হিসেবে তিনি তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এলেন এবং যোগদান ক'রলেন "ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনফ্যান্ট্রি"তে। বয়সে সর্ব্বকনিষ্ঠ হলেও নিজের যোগ্যতা বলে সৈন্যবিভাগে তিনি উচ্চ স্থান লাভ করেন।

ওটেন সাহেবের ঘটনাটি উপলক্ষ্য করে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীসত্যেন্দ্রমোহনের অন্তরঙ্গতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। দুই জনে চললেন পাশাপাশি। একই বছরে পাশ করলেন বি, এ দর্শনশাস্ত্রে অনার্স সহকারে। তার পর থেকে বলতে গেলে সুভাষচন্দ্রই হয়ে চললেন তাঁর প্রেরণার মুখ্য বস্তু হিসেবে। সুভাষচন্দ্র বিলেতে গিয়ে আই, সি এস হ'লেন, তাঁকেও তখন আই, সি, এস না হলে নয়। ১৯২০ সালেই তিনি উচ্চশিক্ষার্থে বিলাত গমন করেন এবং যাবার সঙ্গে শ্রীসুভাষচন্দ্র ও তাঁর সহপাঠী বন্ধু শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁকে ভর্ত্তি ক'রে দিলেন কেমব্রিজে। বিলেতে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একই কক্ষে তাঁর থাকার সুযোগ হয়েছিল।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২২ সালে কেমব্রিজ থেকে "ট্রিপস" ডিগ্রী অর্জ্জন করেন এবং ঐ বৎসরই আই, সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন সম্যক্ কৃতিত্বের সঙ্গে। প্রথমে অবিশ্যি শ্রীঅরবিন্দের মতই তিনিও অনভ্যাস হেতু অশ্বারোহণে অকৃতকার্য্য হন, কিন্তু নিষ্ঠার সঙ্গে কিছুদিন অশ্ব চালনা শিক্ষার পরই পরীক্ষা দিতে এ বিষয়ে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৩ সালে তিনি ফিরে এলেন স্বদেশে এবং সরকারী উচ্চপদ গ্রহণ করে কর্ম্মে নিযুক্ত হলেন হুগলীতে মায়ের কাছাকাছি। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলার শাসন বিভাগীয় বহু দায়িত্বশীল পদে তিনি কার্য্য ক'রে আসছেন অসাধারণ নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে। বর্ত্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্ব-বোর্ডের মাননীয় সদস্য।

অবিভক্ত বাঙালার রাজস্ব বিভাগীয় সেক্রেটারী এবং অসামরিক প্রোটেকশন বিভাগের ডিরেক্টর হিসাবে শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন কর্ম্মনিষ্ঠা

সংগঠন শক্তির যে ছাপ রেখেছেন, তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর এ-পদে বহাল থাকা কালীনই বাঙ্গালার উপর দিয়ে পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যায়। এর টাল সামলাবার প্রথম ধাক্কা এসে পড়ে তাঁর উপরেই। অবিশ্যি সরবরাহ দপ্তরের দায়িত্ব তাঁর হাতে ছিল না। তবুও দুর্গত নরনারী ও শিশুর সেবায় সেদিনের তাঁর অকুণ্ঠ শ্রম ও প্রয়াস বাঙ্গালী ভুলতে পারবে না। তৎকালীন সরকারকেও তাঁকে মর্য্যাদা দিতে হলো এ-কাজের। ১৯৪৫ সালে তিনি সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত হ'লেন।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনধারার আর একটা উল্লেখযোগ্য দিক সাহিত্যের প্রতি তাঁর অসাধারণ অনুরাগ। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি প্রেরণা পান তাঁর পূজনীয়া বৌদিদি শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর কাছ থেকে। তাঁরই মুখের কথা, অবসর গ্রহণের পর তিনি সাহিত্য-চর্চ্চা নিয়েই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত ক'রবেন। কর্ম্মজীবনের ন্যায় তাঁর সাহিত্যিক জীবনও যে গৌরব ও সাফল্যের বাণী বহন ক'রবে, এ অনায়াসেই আশা করা চলে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তাঁর স্ত্রী শ্রীসুষমা দেবী এবং অন্যতমা কন্যা শীলা চট্টোপাধ্যায় মাসিক বসুমতীর লেখিকা। তাঁর পরিবারবর্গ মাসিক বসুমতীর একনিষ্ঠ পাঠক এবং তিনি নিজেও।

গণেশ ঘোষ

(অগ্নিযুগের বীর বিপ্লবী)

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের অন্যতম নায়ক এবং বর্ত্তমানে কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা শ্রীগণেশ ঘোষ থাকেন কড়েয়া রোডের এক মেসে। দীর্ঘ ঋজু বলিষ্ঠ চেহারা। যখন বললেন বয়স তার পঞ্চান্ন ধরো-ধরো তখন সত্যিই আশ্চর্য্য লেগেছিল। তাঁকে দেখলে চল্লিশের বেশী বলে মনেই হয় না। অবিবাহিত গণেশ ঘোষ অগ্নিযুগের বাঙলার তেজস্বী যুবশক্তির জীবন্ত প্রতীক। জন্ম তাঁর যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমায়। বাবা ছিলেন চট্টগ্রামের ষ্টেশন-মাষ্টার। সেই সূত্রে কৈশোরে সেখানে যান লেখাপড়া শিখতে। স্কুলেই যুগান্তর দলের সন্ত্রাসবাদী 'দাদা'দের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। দীক্ষাগুরু মাষ্টারদা সূর্য সেন। স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি এলেন যাদবপুর টেকনিকাল কলেজে পড়তে কিন্তু তাতে মন বসল না। গোপনে গোপনে দলের কাজ করতে লাগলেন। ১৯২২ সালে সর্বপ্রথম কারাবরণ করেন চাটগাঁ ট্রেণ লুণ্ঠনের মামলায়। মাণিকতলা বোমার মামলায়ও (১৯২৩) তাঁকে আসামী করা হয়। ১৯২৮—২৯ সালে তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। চুয়ান্ন বছরের জীবনে মোট ২৩ বছর জেল-খাটা গণেশ ঘোষের সব চেয়ে বড় কীর্তি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল। সে-যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন মাষ্টারদা। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল রাত সওয়া দশটায় অতর্কিত আক্রমণে চট্টগ্রাম দখল করে স্বাধীন গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করাই তাঁদের সঙ্কল্প ছিল। গণেশ বাবুদের উপর ভার পড়েছিল পুলিশের অস্ত্রাগার দখল করে সেখানকার পাঁচশ' রাইফেল এবং গুলী-বারুদ লুণ্ঠন করার। সে-কাজ তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করলেও অভিজ্ঞতার অভাবে শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রামকে স্বাধীন করতে পারেননি। বিচারে গণেশ বাবুর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। সাত বছর আন্দামানে নারকেল দড়ি পাকাবার পর চুয়াল্লিশ দিন অনশন করে আন্দামান থেকে ১৯৩৭ সালে আসেন প্রেসিডেন্সী জেলে। মুক্তিলাভ করেন ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার সময়। জেলখানায় কম্যুনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। ফলে ১৯৫০ সালে কংগ্রেসী আমলে আবার দু'বছর কারাবাস হয়। জেলখানায় থাকা অবস্থায় ১৯৫১ সালে তিনি ১১ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর জামানত বাজেয়াপ্ত করে এবং কংগ্রেসী প্রার্থীর ডবল ভোট পেয়ে বেলগাছিয়া কেন্দ্র থেকে বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ভাবপ্রবণ এবং লাজুক প্রকৃতির গণেশ বাবু ইংরাজী, হিন্দী এবং বাঙলা ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে পারেন। তাঁর সঙ্গে প্রায় ঘণ্টা তিনেক আলাপ করলাম। তিনি মাষ্টারদাকে সে যুগের শ্রেষ্ঠতম নেতা বলে মনে করেন। তাঁর সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যায়, তাঁর মনটা অত্যন্ত সংবেদনশীল। বললেন "চট্টগ্রামের কথা মনে হলে একটি অশ্রুসজল নারীর মুখ ভেসে ওঠে আমার চোখের সামনে। তিনি হলেন মাষ্টারদার পত্নী পুষ্পকুন্তলা সেন। সে-যুগে সন্ত্রাসবাদীদের কাছে নারীর মুখ দর্শন নীতি-বিগর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হত। তাই মাষ্টারদা স্ত্রীর মুখ দর্শন করতেন না। কুন্তলা বউদি কত দিন কান্নাকাটি করে আমাদের কাছে বলেছেন, 'ভাই, তোমাদের মাষ্টার-দাকে একবার একটু আমার কাছে আসতে বোলো। শুধু চোখের দেখা দেখব।' আমরা মুখে বলতাম 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।' আর মাষ্টারদার কাছে গিয়ে বলতাম, 'খবর্দার মাষ্টারদা বউদির আহ্বানে সাড়া দেবেন না।' আজ মনে হয় একটি নারী-হৃদয়ের শুভ্র কামনাকে কি নির্মম ভাবেই না আমরা পদদলিত করেছি! সেই আঘাতে কুন্তলা বউদি যৌবনের প্রারম্ভেই মারা গিয়েছিলেন। ভাবলে মনে হয় শহীদ শুধু মাষ্টারদা একা নন, কুন্তলা বউদিও। আজও অন্যমনস্ক মুহূর্তে ভদ্রমহিলার মুখটা আমার বিবেককে অপরাধী করে।" বর্তমানে গণেশ বাবু রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনে পেশ করবার জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে স্মারকলিপি প্রণয়নে ব্যস্ত আছেন। তাঁর একমাত্র বোন বেঁচে নেই এবং একমাত্র ভাই শ্রীহট্টের (পাকিস্তান) চা-বাগানে ডাক্তারী করেন।

ডাঃ মণীন্দ্রনাথ সরকার

(কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ)

মানুষ, বিশেষ করে যাঁরা প্রতিষ্ঠাবান ও খ্যাতিসম্পন্ন, খোঁজ করলে হয়তো দেখা যাবে তাঁদের এক একটি জীবন গড়ে উঠেছে এক সময়ের একটা বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এ-ও দেখা যাবে যে-কোন মহত্তর প্রেরণা বা স্পষ্ট ইঙ্গিতই তাঁদের জীবন সংগঠনের মূল উৎস। বাঙ্গালা তথা ভারতের বিখ্যাত ধাত্রী-বিদ্যাবিশারদ ও স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ এম, এন, সরকারের

মহিষাসুর, চামুণ্ডেশ্বরী পাহাড়, মহীশূর
—পরমেশ গুপ্ত

নারীমূর্তি, কোনারক
—মদন বসু

[মাসিক বসুমতীর আলোকচিত্র-শিল্পীদের প্রতি]

মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় নিয়মিত আলোকচিত্র প্রকাশের পরিকল্পনা যথার্থই সার্থক হয়েছে। কেন না, কত অসংখ্য আলোকচিত্রীর কত অজস্র ছায়াচিত্রই না এ যাবৎ মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছে—যেগুলি দেখে দেখে পরিতৃপ্ত হয়েছেন আমাদের লক্ষ লক্ষ পাঠক-পাঠিকা। বেশ কয়েক বছর যাবৎ বছরের পর বছর, মাসের পর মাস প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত আলোকচিত্র সমূহের মধ্যে আমরা দেখেছি, আমাদের দেশ ও দেশবাসীকে। মাসিক বসুমতীর আলোকচিত্র দেখলেই ধরা যায়, বোঝা যায় বাঙলা ও বাঙালীর দৃষ্টিকোণ। তাই বলে মাসিক বসুমতী শুধু বাঙলা ও বাঙালীকে দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। বাঙলার বাইরের সমগ্র ভারতবর্ষের নানান বাসিন্দা ও বাসভূমির ছবিও আমরা সাগ্রহে ছেপেছি। সঙ্গে সঙ্গে জন্তু-জানোয়ার, পশু-পক্ষী, আলো, আকাশ আর অন্ধকারের প্রাকৃতিক দৃশ্য।

সুখের বিষয়, আমরা বহু সত্যিকার এ্যামেচার ফটোগ্রাফারদের ছবি মাসের পর মাস ধ'রে পেয়ে থাকি এবং এখনও পাই এবং ভবিষ্যতেও পাবো। প্রতিযোগিতার বাঁধা গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল মাসিক বসুমতী। প্রতিযোগিতা, রেষারেষির দ্বন্দ্বমূলক প্রচেষ্টায় বিরত হয়ে নির্বিবাদে প্রত্যেকের প্রত্যেক বিষয়ের প্রকাশযোগ্য ছবিই এখন থেকে ছাপা হবে। আমাদের সুদক্ষ ও হিতৈষী আলোকচিত্র-শিল্পীদের অনুরোধ, তাঁরা এখন থেকে যেমন ছবি তোলার উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেবেন, তেমনই দৃষ্টিপাত করবেন ছবির বিষয়ের (subject) প্রতি। বিষয় যত বিচিত্র হয়, ততই বৈচিত্র্য দেখানোর পক্ষপাতী মাসিক বসুমতী।

পেঁচার বাসা-ত্যাগ
—নিশাচর

রাতের কারখানা —কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

পেচক-শাবক, বাসায়
—নিশাচর

—রণজিৎ রায়-চৌধুরী

পদ্মিনী ?
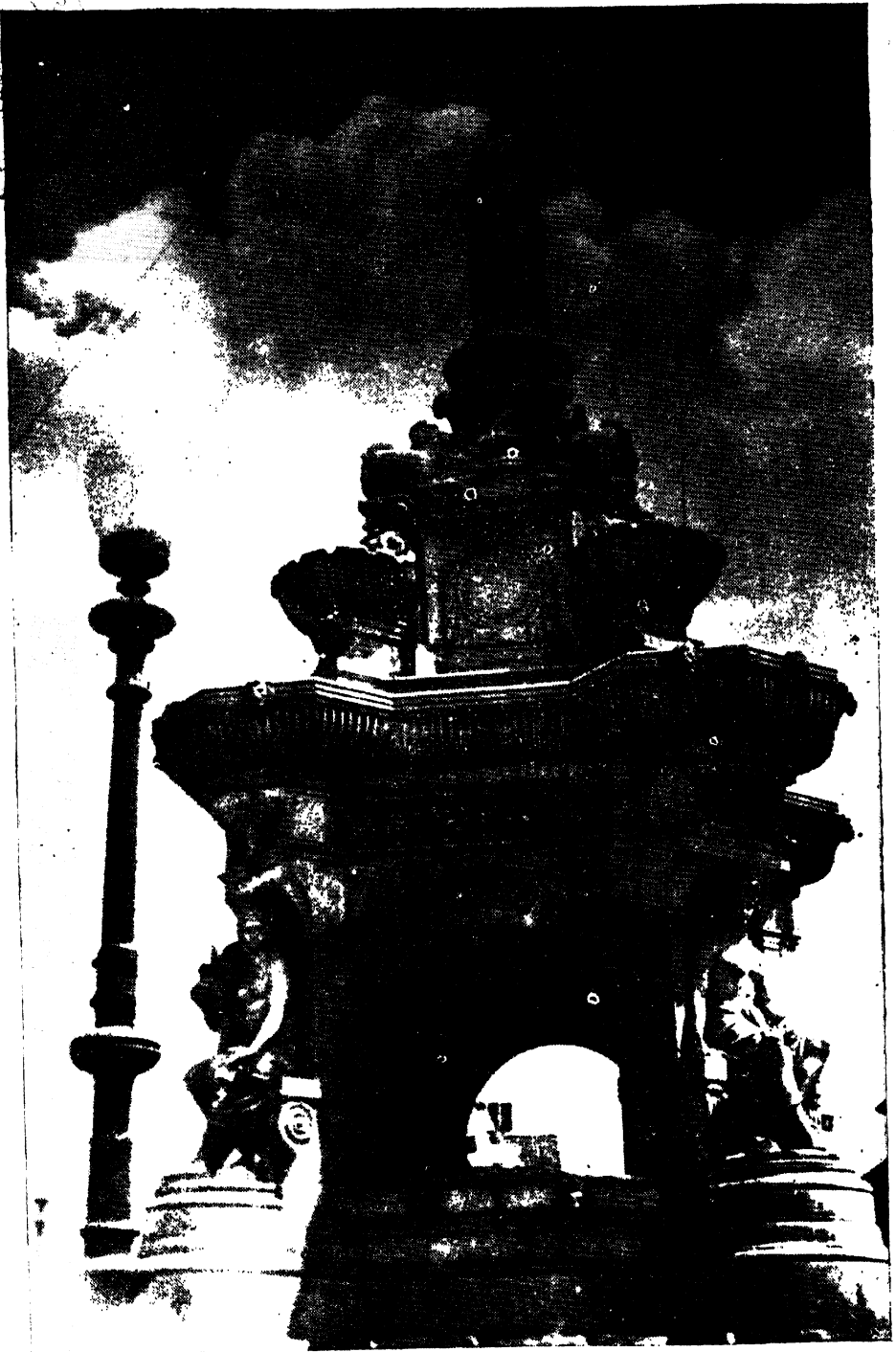
ফ্লোরা ফাউণ্টেন (বম্বে) —বিশু চক্রবর্ত্তী
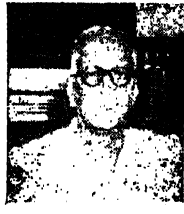
মণীন্দ্রনাথ সরকার　　সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়　　গণেশ ঘোষ　　বীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী

মণীন্দ্রনাথ সরকার) সাফল্যময় জীবনের গতিধারার সূত্রপাত যেখানে, অনুসন্ধান করতে যেয়ে সেখানেও একটা বিশেষ ঘটনার যোগাযোগ লক্ষ্য করি। এ ঘটনাটি না ঘটলে স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁকে হয়তো আমরা একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরূপে পেতুম না, পেতুম অপর কোন বিশেষ ক্ষেত্রে একজন প্রতিষ্ঠাবান মানুষ হিসেবে।

ঘটনাটি—ডাঃ সরকারেরই কথা—"আমি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ পড়ি। সে সময় আমার এক শিক্ষকপত্নীর সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যু ঘটে। আমার মা এ মহিলাটিকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসতেন। সন্তান হবার সময় এক শোচনীয় পরিস্থিতিতে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় মায়ের প্রাণে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। আমাকে লক্ষ্য করে তখনই তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন, আমাকে চিকিৎসক হ'তে হ'বে, বিশেষ করে ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হ'তে হবে। মায়ের এ বক্তব্য আদেশ হিসেবে আমি শিরোধার্য্য করলুম। এ থেকেই ডাক্তার হওয়ার জন্য আমার সঙ্কল্প স্থির হ'য়ে গেল এবং পাল্টে গেল সঙ্গে সঙ্গে আমার চিন্তাধারার মোড়।"

আজকের দিনের ভারত-বিখ্যাত স্ত্রীব্যাধি চিকিৎসক ডাঃ মণীন্দ্রনাথ সরকার জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৭ সালে মুঙ্গের জেলার জামালপুরে। তাঁর প্রথম পড়াশুনো আরম্ভ হয় জামালপুরেরই একটি পাঠশালায়। সেখান থেকে খড়গ্‌পুরের বিদ্যালয়ে এসে উচ্চ প্রাইমারী ও মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তি পান। ১৯১৩ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন খড়্‌গপুর রেলওয়ে স্কুল থেকে এবং বর্দ্ধমান বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি লাভ করেন। বাঁকুড়া মিশনারী কলেজে থেকে বৃত্তিসহ আই, এ পাস করার পর তিনি ভর্ত্তি হ'লেন এসে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। এখানে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু (নেতাজী), শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (বিচারপতি) ও স্বনামধন্য শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁর সহপাঠী ছিলেন এবং এঁদের সঙ্গে সে সময় তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। এ কলেজ থেকেই তিনি অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স সহ বি, এ পাস করেন। এবং প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সকলের প্রশংসার্হ হন।

এখানেই পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডাঃ সরকারের জীবন-ধারার প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন সূচিত হ'লো। তিনি জেনারেল লাইনের পড়াশুনো ছেড়ে মায়ের নির্দ্দেশানুযায়ী কৃতবিদ্য চিকিৎসক হওয়ার জন্য ভর্ত্তি হ'লেন গিয়ে ক'লকাতা মেডিকেল কলেজে ১৯১৭ সালে। অপূর্ব্ব প্রতিভা প্রকাশ পেল এখানে তিনি যখন পড়ছেন। প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেন। এ ভাবে ১৯২৩ সালে তিনি এম, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। মায়ের নির্দ্দেশিত ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত বিষয়ের পরীক্ষায় অসম কৃতিত্বের পরিচয় দেন তিনি। চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ করে স্ত্রীব্যাধি সম্পর্কে উচ্চ জ্ঞান লাভের ব্যাকুলতায় ১৯২৯ সালের প্রথম দিকে তিনি বিলেত যান এবং ঐ বৎসরই এডেনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এফ, আর, সি, এস হন। এর পরও তিনি কয়েক বার ইউরোপ যান এবং বিভিন্ন বড় বড় হাসপাতালগুলোর কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করে বহুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

ডাঃ সরকারের চরিত্রের একটা উল্লেখযোগ্য দিক—পিতামাতার উপর বরাবরই তাঁর অবিচল ও অপরিসীম ভক্তি। তাঁদের নির্দ্দেশ অনুসরণ করে চলাটাই তাঁর নিকট একটা মস্ত বড় জিনিষ ছিল। এম, বি পাস করার পর আই, এম, এস হওয়ার প্রশ্ন যখন এলো তখন তাঁর পরমারাধ্য পিতৃদেব স্বর্গত চন্দ্রকুমার সরকার এতে সম্মতি দিলেন না। পিতার মনোগত ভাব লক্ষ্য করে আই, এম, এস কমিশন পাওয়া সত্ত্বেও সে সুযোগ গ্রহণে তিনি বিরত থাকলেন। তাঁর চরিত্রে অপর বৈশিষ্ট্য ছোটবেলা থেকেই তিনি সকলের ভালবাসা দাবী করে এসেছেন। তাঁরই কথায় তিনি পেয়েছেনও ভালবাসা প্রচুর যা জীবনের অমূল্য সম্পদ বলে তাঁর কাছে বিবেচিত। একটি ছোট্ট ঘটনা তিনি বলছেন—"আমি যখন বাঁকুড়া কলেজে পড়ি তখন আমার একবার হাম হয়। বাঁকুড়া কলেজের রেভারেণ্ড মিচেল ও তাঁর পত্নী আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। অসুখ হ'য়েছে শুনেই তাঁরা আমায় তাঁদের গৃহে নিয়ে যান এবং স্নেহ ও যত্ন দিয়ে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তোলেন। তাঁদের স্নেহের কথা এবং আরও পাঁচ জনের নিঃস্বার্থ ভালবাসা আমি আজও ভুলতে পারি না। স্বীকার করবো বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদের ন্যায় এ-ও আমার জীবনের পরম সম্পদ ও চলার শ্রেষ্ঠ পাথেয়।"

ডাঃ সরকারের কর্ম্মজীবন সুরু হয় ১৯২৩ সালে ক'লকাতা মেডিকেল কলেজে, এ কলেজের প্রসূতি-সদনে (ইডেন হাসপাতাল) তিনি বিভিন্ন পদে কৃতিত্বের সঙ্গে কার্য্য করেন। ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি উক্ত কলেজে প্রধান অধ্যাপকও ছিলেন বহু বৎসর। বর্ত্তমানে তিনি এ কলেজ ও হাসপাতালের যথাক্রমে অধ্যক্ষ ও সুপারিন্টেনডেণ্ট। তিনি বাঙ্গালা ও ভারতের বহু চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের তিনি একজন সদস্য। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি একজন পরীক্ষক।

দেশ ও জাতির সেবায় বিশেষতঃ নারীজাতির মঙ্গলব্রতে তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত। তিনি মাসিক বসুমতীর অন্যতম বিশিষ্ট পাঠক।

উদয়ভানু

বিলাসবাসিনীর বিস্তৃত আঁখিযুগলে স্নেহাপ্লুত দৃষ্টি। কনিষ্ঠ পুত্র কাশীশঙ্করকে কাছে পেয়েছেন, পরম আনন্দে বুক যেন তাঁর ভ'রে যায়। শয্যায় শায়িত ছিলেন রাজমাতা, ধীরে ধীরে উঠে বসেছেন; অনেক প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশার চাঁদ যেন হাতে পেয়েছেন, এমনই হাসি-খুশী ভাব। আপন শিশুসন্তানকে জননী যে স্নেহার্দ্র চক্ষে দেখেন, বিলাসবাসিনীর চোখেও সেই দৃষ্টি ফুটেছে। মায়ের চোখে হয়তো ছেলের বয়স ধরা পড়ে না। কাশীশঙ্করের পৃষ্ঠে হাত রাখলেন রাজমাতা। ডান হাতে আঁচলের সাহায্যে মুছিয়ে দিলেন ঘর্ম্মাক্ত পুত্রের অনিন্দ্য মুখবিম্ব। বিলাসবাসিনীর পদদ্বয় দুই হাতে ধ'রে আছেন ছোটকুমার—একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে। পুত্রের চিবুক স্পর্শ করলেন মা। সেই হাত নিজের ওষ্ঠে ঠেকিয়ে চুমু খেলেন। দর-দর ঘামছেন কাশী-শঙ্কর—অসহ্য গ্রীষ্মের উত্তাপে। পুত্রের প্রশস্ত ললাট আবার মুছিয়ে দিতে দিতে রাজমাতা বললেন,—কোথায় ছিলে তুমি? এত শ্রান্ত-ক্লান্তই বা কেন? কার সঙ্গে যুদ্ধ করে এলে?

মাতৃবাক্য শুনে স্মিতহাসি হাসলেন কাশীশঙ্কর। তখনও তিনি ভাবছিলেন, ইংরাজ কোম্পানীর কুঠীতে যাওয়ার কথা ভাঙবেন কি ভাঙবেন না। কে জানে, স্নেহময়ী রাজমাতা হয়তো শুনে আপত্তি জানাবেন, ঘোর অসম্মতি প্রকাশ করবেন। ছেলের কাজে হয়তো দুঃখ পাবেন। যেমন করেই হোক, হয়তো বাধা প্রদান করবেন কাশীশঙ্করের কাজে। বিলাসবাসিনীর কাছে চলবে না কোন ওজর-আপত্তি, মিথ্যা অজুহাত। বিলাসবাসিনীর কথা অকাট্য, অনড়, অটল।

চিন্তার রেখা, ঘোর চিন্তারেখা ফুটলো ছোটকুমারের প্রশস্ত ললাটে।

ধনুকের মত দুই ভ্রূ আরও যেন বক্র হয়ে ওঠে। বেশ কয়েক মুহূর্ত্ত গভীর চিন্তায় নিবিষ্ট থাকেন কাশীশঙ্কর। মাতৃদেবীর সমুখে তিনি কোন মতেই মিথ্যা বলতে পারবেন না। অদ্যাবধি কখনও বলেননি! কিন্তু কী-ই বা বলা যায়! সত্যকে গোপন করে মিথ্যাভাষণেই বা কী লাভ আছে? বেশ কিয়ৎক্ষণ চিন্তাবিষ্ট থেকে ও সাহসে বুক বেঁধে কাশীশঙ্কর বললেন,—ইংরেজ কোম্পানীর কুঠীতে গিয়েছিলাম।

—কেন? সেখানে কেন? পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে ঐ ম্লেচ্ছদের কাছে কেন? সবিস্ময়ে শুধোলেন রাজমাতা। নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইলেন উত্তরের প্রত্যাশায়।

জননীর পদধূলি দুই হাতে মাথায় মাখলেন কাশীশঙ্কর। সহাস্যে বললেন,—মা গো, তুমি যেন অসম্মত হও না। আমাকে বাধা দান ক'র না। আমি—

কথার মাঝেই কথা ধরলেন রাজমাতা। দীপ্তকণ্ঠে বললেন,—কি এমন দুষ্কার্য্যে রত হয়েছো যে বাধা দেবো?

—আমি, আমি মা ব্যবসা করতে চাই। সওদাগরীতে প্রচুর অর্থ লাভ করা যায়। ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চাই। মহাজনের কারবার। সেই কারণেই আমি গিয়েছিলাম ইংরেজদের কুঠীতে।

অনেক ভয়ে ভয়ে কথাগুলি শেষ করলেন ছোটকুমার।

চকিতের মধ্যে বিলাসবাসিনীর অপূর্ব্ব মুখশ্রী বিলুপ্ত হয়ে যায় বুঝি! স্তব্ধ ও ধীরকণ্ঠে তিনি বললেন,—রাজার ছেলে ব্যবসা করতে যাবে কোন্ দুঃখে? তোমার অভাব কি? এ কথা তো আমার কানে পৌঁছয়নি?

যেন শিশুসুলভ কণ্ঠে কথা বলেন কাশীশঙ্কর। বলেন,—মা, আমি রাজার ছেলে ঠিক কথা, অভাব যে আমার নেই তা-ও ঠিক। তবে—

—তবে?

রাজমাতার একটি মাত্র কথায় বিপুল আগ্রহ। উদ্‌গ্রীবতা।

কুঞ্চিত ভ্রূ। বিব্রত মুখকান্তি। কী যেন ভাবতে

ভাবতে বললেন রাজকুমার,—রাধানগরের প্রকৃত রাজা আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর। তাঁর স্ত্রীপুত্র-পরিবার আছেন, ভরণপোষণের বহু লোক আছে। আমিও যদি তাঁর আয়ের অঙ্কে ভাগ বসাই, আয়ের অংশ দিনের পর দিন হস্তগত ক'রে যাই, অন্যায় হবে না?

মাথায় যেন বজ্রপাত হয় রাজমাতার—চোখে যেন আঁধার দেখেন—শরীর যেন তাঁর থর-থর কাঁপতে থাকে প্রবল উত্তেজনায়। একটি সুদীর্ঘ শ্বাস ফেললেন অত্যন্ত ধীরে ধীরে। বললেন,—রাজা কালীশঙ্কর কি কোন দিন তোমাকে মন্দ কথা বলেছে? সে কি চায় না যে, তোমরা একই পরিবারে বসবাস কর? আমার এমন একান্নবর্ত্তী সংসার ভেঙে ছারখার হয়ে যাবে!

জিভ কাটলেন কাশীশঙ্কর, অবাক-বিস্ময়ে। আফসোসের সঙ্গে বললেন,—কদাপি নয়, কোন দিন নয়। আমার অগ্রজ তেমন ধাতুর মানুষই নন। তিনি প্রকৃতই দেবতা! কেবলমাত্র এই কারণেই তো আমি তাঁর স্কন্ধে থাকতে নারাজ। আমি তাঁকে অব্যাহতি দিতে চাই। সর্ব্বোপরি, একটা নির্দ্দিষ্ট আয়ে আমার চলে না। কোন মতে দিন গুজরাণ করি।

বিলাসবাসিনীর উগ্র কণ্ঠ দুঃখভারাক্রান্ত। তিনি বললেন,—একেই আমার মেয়ের জ্বালায় দিবা-রাত আমি জ্বলছি। তোমার আবার এ কি মতি-গতি? তার চেয়ে আমাকে তোমরা দু' ভাইয়ে রাধানগরে পাঠিয়ে দাও। রাধাশ্যামের সেবা করবো আমি। তারপর তোমরা যা মন চায় কর'। আমি বাধা দিতে আসবো না। আমাকে পাঠিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে ভেন্ন হও, সদাগরী করতে চাও, আমি দেখতে আসবো না।

মৃদু মৃদু হাসির সঙ্গে কাশীশঙ্কর বললেন,—মা, তুমি এখনই রুষ্ট হও কেন? ব্যবসা ছাড়া গতি কি? অদূর ভবিষ্যতে রাজা আর রাজত্ব কি থাকবে তুমি মনে কর?

—আমি জ্যোতিস জানি না যে ভবিষ্যতের কথা বলবো। আমাকে আর কিছু জানিও না। আমাকে রাধানগরে পাঠিয়ে দিয়ে যা খুশী কর তোমরা।

বিলাসবাসিনীর কণ্ঠ যেন বাষ্পরুদ্ধ। কি কথা শুনছেন তিনি! এক অশ্রুতপূর্ব্ব কথা! মন যেন তাঁর আঁকুপাকু করতে থাকে।

—রাধানগরে যাবে কি মা? সেখানে কি মানুষ থাকতে পারে? সে যে এক পাণ্ডববর্জিত স্থান!

—আমার রাধাশ্যাম সেখানে আছেন, আর আমি থাকতে পারবো না? কাশীশঙ্কর, তুমি আমাকে কিছু শুনিও না! আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও, সুখে থাকো।

—মা, আমার প্রতি কি তুমি বিরূপ হয়েছো?

আকুল আগ্রহের সঙ্গে বললেন কাশীশঙ্কর। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। পায়ের 'পরে পা দিয়ে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসলেন।

রাজমাতার কুঠরীর দোরগোড়ায় যেন কার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ! গ্রীষ্মদিনের নিস্তব্ধ দুপুরের নীরবতায় মনে হয় বুঝি সর্পের ফোঁসফোঁসানি!

—বিরূপ আমি কারু প্রতি হইনি। তবে জন্মাবধি যাকে বুক বেঁধে মানুষ করেছি সে যদি আমার শেষ বয়সে।

কথা বলতে বলতে বিলাসবাসিনীর আঁখিপ্রান্ত চিক-চিক করে। অধর-ওষ্ঠ কাঁপতে থাকে ক্ষোভের আতিশয্যে। কুঠরীর আড়কাঠে দৃষ্টি তুলে বসে থাকেন তিনি নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে। স্থাণুর মত।

কাশীশঙ্কর চিন্তাগ্রস্ত হন বড় বেশী। দু'হাতে মাথার ভর রেখে বসে থাকেন নিশ্চুপ। বিলাসবাসিনীর কুঠরীর আলো-অন্ধকারে কাশীশঙ্করের দুই হাতের অঙ্গুরীয়গুলি রঙ বিকীরণ করে। জ্বল-জ্বল করে হীরা-মুক্তা-মাণিক্য। ধীরে ধীরে মুখ তোলেন ছোটকুমার। গাত্রোত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বলেন,—আমার এই কাজে তুমি কি মনে ব্যথা পাবে? তবে তো আমি নিরুপায়! কিংকর্ত্তব্য এখন আমার?

নিজেকে যেন নিজেই প্রশ্ন করলেন কাশীশঙ্কর। শেষ কথাগুলি যেন জিজ্ঞাসা করলেন নিজেকেই।

কম্পমান কণ্ঠে রাজমাতা বললেন,—হাঁ অথবা না, আমি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবো না। তোমরা ভাইয়ে ভাইয়ে ভেন্ন হবে, তা আমি দেখতে পারবো না! কথা বলতে বলতে ক্ষণেক থেমে আবার বললেন,—এখন যাও, বেলা অনেক হয়েছে। স্নানাহার শেষ কর'গে যাও।

দোরগোড়ায় আবার কার ফোঁসফোঁসানি!

রাজগৃহের দুই বাস্তুসর্প কি এসেছে এ দিক্‌পানে? তাদেরও কি আছে কোন বক্তব্য? রাজমাতার কাছে কোন নালিশ জানাতে আসেনি তো শাঁখ-শাঁখিনী?

—রাজমাতা, আমাকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিন। আমার কিছু কথা বলবার আছে, নিবেদন করবো। অনুমতি দিন।

দরজার বাইরে অদৃশ্যে থেকে কে এক নারী কথা বলে, মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে।

—কে তুমি?

হঠাৎ কথা শুনে, এক আকুল নারীকণ্ঠ শুনেই চমকে উঠেছিলেন বিলাসবাসিনী। নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন,—কে গা তুমি?

—আমি, রাজমাতা! যদি আদেশ করেন তো ঘরে সিঁদোই।

—তুমি কে তাই শুনি?

বিলাসবাসিনীর বিরক্তিপূর্ণ কথায় ক্রোধের আভাস!

—আমি শিবানী।

নামটি শুনেই মুখখানি বিকৃত করলেন রাজমাতা। কেমন যেন বিব্রত বোধ করলেন। বললেন,—এখন তুমি যাও, পরে এসো। আমার ছেলে এখন ঘরে আছে। এখন বিদেয় হও।

কুঠরীর দ্বারে এক শুভ্র নারীমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়।

আলুলায়িত রুক্ষ কেশের বোঝা তার পৃষ্ঠে। পরিধানে কোরা লালপাড় সুতিবস্ত্র। দণ্ডায়মানা ঐ নারীর অধরোষ্ঠে ক্ষীণ হাস্যরেখা। রাজমাতার মুখে বিদায় হয়ে যাওয়ার নির্দ্দেশ শুনে শাড়ীর আঁচলে চোখের প্রান্ত মুছলো ঐ দীর্ঘ এবং সুকেশা রমণী। তার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা, তবুও চোখ দুটি যেন অশ্রুসজল। কয়েক মুহূর্ত্ত চুপচাপ থেকে ঐ শুভ্রকায়া নারী কথা বলে সুমিষ্ট সুরে। বললে,—রাজমাতা, তুমি যে বলেছিলে আমার বিয়ে দিয়ে দেবে, কবে হবে সেই বিয়ে? কার সঙ্গে দেবে?

—বিদেয় হ', বিদেয় হ' এখনই! ও মা, লাজলজ্জার বালাই নেই! আচ্ছা আটকপালে মেয়ে তো তুমি! বিয়ে কি হাতের মোয়া না কি?

বিলাসবাসিনী কথা বলেন রুক্ষকণ্ঠে। বিকৃত মুখভঙ্গী তাঁর। সহানুভূতিহীন কথা।

—সীঁথিতে আমি সিঁদুর পরবো না বলতে চাও? ফুলশয্যে হবে না আমার? কনে-বৌ সাজবো না? অত্যন্ত ব্যথাতুর সুর শিবানীর কথায়। নালিশের মতই সকাতর আবেদন জানাচ্ছে যেন আদালতে।

শিবানীর কথাগুলি শুনে কাশীশঙ্করের মনে যেন দয়ার উদ্রেক হয়। দু' হাতে মাথা রেখে চিন্তাগ্রস্তের মত ব'সে থাকেন নীরবে। আনতদৃষ্টিতে।

বিলাসবাসিনী বললেন ক্ষুব্ধ ও রুষ্টকণ্ঠে,—শুনছো তো কাশীশঙ্কর? মেয়ের কি নির্লজ্জ কথা! কি বেহায়াপণা! পাগল আর সাধে বলে!

ছোটকুমার বললেন,—আমি আর কি বলতে পারি মা?

—এ জীবনে অনেক ন্যাকামি আমি দেখেছি কাশীশঙ্কর! এমনটি কখনও দেখিনি। কস্মিনকালেও নয়। দূর কর, দূর কর, ওকে এখান থেকে দূর ক'রে দাও এই মুহূর্ত্তে।

রাজমাতা বললেন উদ্ধত সুরে। বিরক্তির চরমে পৌঁছেছেন তিনি যেন!

—বিদেয় আমি একেরে হব'। আমাকে রাধানগরে পাঠিয়ে দাও। সেখানে যেমন ছিলুম তেমনি থাকবো। রাধাশ্যামের মন্দিরে থাকবো সেবাদাসী হয়ে। আমি জানি, বিয়ে আমার হবে না। সমাজ বাধা দেবে।

কথাগুলি বলতে বলতে হাঁপিয়ে ওঠে বুঝি শিবানী। দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, কথায় কথায় কুঠরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো নির্ভয়ে। নিঃসঙ্কোচে। বিনা দ্বিধায়।

এ সকল কথা আশা করেননি বিলাসবাসিনী। ক্রোধের আতিশয্যে নির্ব্বাক্ হয়ে যান তিনি। শিবানীর প্রতি এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন।

কাশীশঙ্কর অনন্যোপায় হয়ে বললেন,—আমি এখন যাই—স্নানাহার করি, যাই।

—হ্যাঁ, তাই যাও। তুমি, তুমি এখানে আছো শুনেই আবাগীর বেটি এসেছে, তা কি তুমি বোঝ না কাশীশঙ্কর? আমি সব বুঝি।

বিলাসবাসিনীর রুষ্ট কথায় অস্থিরতা প্রকাশ পায়। অসহ্য মনে হয় তাঁর। তিতিবিরক্ত হয়ে পড়েন।

শিবানী কথা বলে দুঃখকাতর সুরে। যেন কাঁদছে! বললে,—আমি পাগল, আমার মাথার ঠিক নেই। বয়েস কালে বিয়ে না হ'লে কার আর মাথার ঠিক থাকে? কথা বলতে বলতে থেমে আবার বললে,—রাজমাতা, তুমিই আমাকে বলেছিলে যে তোমার ছোট রাজকুমারের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে, আমাকে ঘরের বৌ করবে। কথা রাখলে না তুমি? আমি এখন তোমার চক্ষুশূল হয়েছি, তা কি বুঝি না?

লজ্জায় অধীর হয়ে ওঠেন কাশীশঙ্কর। কানে আঙুল দেন। বলেন,—মা, আমি তবে যাই।

—যাচ্ছি নয়, আসছি বলতে হয়। বললেন বিলাসবাসিনী, সস্নেহে। বললেন,—ওকে এখন এখান থেকে যেতে বলে দাও কাশীশঙ্কর!

মা, তোমার যা বক্তব্য তুমিই বল।

কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন কাশীশঙ্কর। শিবানীকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেন কুঠরী থেকে। সলজ্জায়। দ্রুতপদে।

—মরছি আমি শতেক জ্বালায়! এ আবার কি কাটাঘায়ে নুণের ছিটে! রাজমাতা স্বগত করলেন। আপন মনেই বললেন কথাগুলি। বললেন,—বিয়ের আশা তুমি ত্যাগ কর শিবানী! পাগলকে কে বিয়ে করবে? তুমি এখন যাও, আমি এখন বিশ্রাম করবো।

—আমার যা হয় একটা বিলি-ব্যবস্থা করে দিলেই আমি চলে যাই। শিবানী বললে দুঃখ-কাতর কণ্ঠে। চোখের জল মুছতে মুছতে।

যতই হোক বিলাসবাসিনী নারী। শিবানীর আবেদন-নিবেদনে মন যে তাঁর ঈষৎ সিক্ত হয়। বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা পালনের পর নিম্নস্বরে বললেন,—জানিস্ শিবানী, যে যার কপাল নিয়ে আসে এই পিথিবীতে। তোর কপাল পুড়েছে, আমি কি করতে পারি বল্? আমার কি আর সাধ হয় না তোর বিয়ে দিয়ে দিই? তোর মতন রূপসী মেয়ের বিয়ে আমি দিতে পারিনি, এ দুঃখু রাখবার জায়গা আমার নেই। তোর মাথাটা যদি ঠিক থাকতো শিবানী!

সজল চোখে শিবানী বললে,—মাথা আমার ঠিকই আছে রাজমাতা! তোমার পায়ে ধরি। তুমি আজ আছো, চিরকাল তুমি থাকবে না। তখন? কে দেখবে আমাকে?

—ভগবান দেখবেন! যিনি পাঠিয়েছেন পিথিবীতে, তিনিই দেখবেন।

এলো চুলের খোঁপা দু' হাতে জড়াতে জড়াতে বিষণ্ণসুরে শিবানী বলে,—তাই ব'লে আমি সীঁথিতে সিঁদুর পরবো না? শ্বশুরঘর করবো না?

নিশ্চুপ থাকেন বিলাসবাসিনী।

কুঠরীর আড়কাঠে চোখ তুলে চুপচাপ ব'সে থাকতে থাকতে বললেন,—লোকে যে শুনলে হাসবে শিবানী! লাজলজ্জার বালাই নেই তোর? মান-অপমানের?

কেমন যেন শূন্যদৃষ্টি ফুটলো শিবানীর চোখে। বিকৃতমস্তিষ্কের মতই পলকহীন চোখে চেয়ে রইলো কতক্ষণ। এমন শূন্যদৃষ্টিতে কি দেখছে শিবানী! দেখছে না হয়তো কিছুই, লক্ষ্যহীন চোখে তাকিয়ে আছে শুধু।

—খাওয়া-দাওয়া করেছিস্ শিবানী?

হেসে ফেললো শিবানী। কাতর হাসি। মুখে হাসি মাখিয়ে বললে,—না, খাইনি। সকাল থেকে এখনও কিছু মুখে দিইনি। খেতে আর মন চায় না! একেবারে চিতায় শুয়ে খাবো।

—বালাই, ষাট! এমন কথা কি বলতে আছে? বেশ তো আছিস তুই, মাঝে-মিশেলে এমন মাথা খারাপ করিস যে কেন বুঝি না!

কথা বলতে বলতে শুয়ে পড়লেন রাজমাতা বিলাসবাসিনী। নিজের শয্যায় এলিয়ে পড়লেন।

শিবানী বললে চাপা কণ্ঠে,—আমি চলে যাবো রাজবাড়ী থেকে। তুমি রাজমাতা, আমাকে শুধু বলে দাও, কে আমার মা? আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দাও।

—ছিঃ শিবানী, ও সব কথা মুখে আনতে নেই। তোমার মাও নেই, বাবাও নেই, তাঁরা স্বর্গে গেছেন তোর জন্মের পরেই। আমাকে দিয়ে গেছেন তোকে, গ'ড়ে-পিটে মানুষ করতে। রাজমাতা কথা বলেন ফিস-ফিস। চুপি চুপি। পাছে কেউ শুনতে পায় সেই ভয়ে ধীর কণ্ঠে বললেন।

মিটি-মিটি হাসলো শিবানী। অর্থহীন হাসি। ফ্যাল-ফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললে,—তুমি যে বলেছিলে, ছোট কুমারের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে, তার কি করলে? আমাকে মিথ্যে কথা—

—ত্যাখ, শিবানী, আমাকে আর জ্বালাসনে! ঈষৎ ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন বিলাসবাসিনী। বললেন,—আকাশের চাঁদ চাইলেই কি পাওয়া যায়? আমা. কাশী সে-ছেলে নয় যে গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে করতে যাবে!

—তবে তুমি আমাকে রাধানগরে পাঠিয়ে দাও, তোমার দুই পায়ে আমি গড় করছি। সেখানে আমি বেশ থাকবো। তোমাদের রাধাশ্যামের মন্দিরের সেবাদাসী হয়ে থাকবো। ছোটরাজাকে দেখলে যে আমার বুকে কষ্ট হয়, জ্বালা ধরে। কথায় কথায় শিবানীর বুকের জ্বালা যেন তার মুখাবয়বে প্রতিফলিত হয়!

বিলাসবাসিনী বলেন,—আমার কাশীর জন্যে তোর যদি এতই কষ্ট, তা তার পানে দৃষ্টি দিস কেন? এখন যা খাওয়া-দাওয়া কর্‌গে যা।

—খেতে আমার মন চায় না। ক্ষুধা ম'রে গেছে, মুখে কিছু রোচে না!

—তবে মর্‌গে যা। আমি আর পারি না। বাতের যন্ত্রণায় পিঠ-কোমর টন-টন করছে। রাজমাতা কথা শেষ করে দেখলেন কথা শোনার মানুষ চলে গেছে। কুঠরীতে তিনি এখন একা। উদাস-চোখে বসে থাকেন তিনি। চিন্তা-জ্বরে কাহিল তাঁর চাউনি!

কুঠরীর বাইরের দরদালানে ছিলেন বড়রাণী। রাজাবাহাদুরের প্রধানা মহিষী উমারাণী। পলকহীন চোখে দেখছিলেন আকাশ আর দূরের দৃশ্য—যেখানে শুধু ঘন সবুজের বন্যা। দ্বিপ্রহরের শুভ্র আকাশ। দূরে, শুধু গাছ আর গাছ—মাটির বক্ষ ভেদি মহাশূন্যে মাথা তুলেছে। কত রকমের, কত ধরণের ছোট-বড় গাছ। খেজুর, তেঁতুল, পলাশ, বাবলা, পালতেমাদার, শিমুল, পিপুল, শিশু, তাল, নারকেল আর বাঁশঝাড়। উমারাণীর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল প্রকৃতির খেয়ালে, কিন্তু মন তাঁর প্রকৃতির পিছু-পিছু ধাওয়া করেনি! সজাগ কানে শুনছিলেন শিবানীর কথাবার্ত্তা। কি বলতে চায় সে রাজমাতাকে!

—বড়রাণী!

—কে?

ডাক শুনে চমকে ওঠেন যেন উমারাণী! প্রকৃতি থেকে চোখ ফিরিয়ে যেন প্রকৃতিস্থা হন নিজে। মিহি ও মিষ্টি সুরে বলেন,—ডাকছো শিবানী? বল, কি বলবে?

—বলবার কিছু নেই। তোমাকে দেখছি, তুমি কত রূপবতী। হাসতে হাসতে বললে শিবানী।

উমারাণীও হাসলেন। শব্দহীন, মৃদুমন্দ, মুক্তা-ঝরানো হাসি! ডালিমরাঙা ঠোঁটের ফাঁক থেকে চোখে পড়ে মুক্তোর মত দাঁতের সারি! মৃগনয়না উমারাণীর চোখে কি অন্তরস্পর্শী দৃষ্টি!

—তোর কত কষ্ট শিবানী! সহানুভূতির সুরে বলেন রাজরাণী।—তোর দুঃখের কথা যেন কানে শোনা যায় না! তা তুই আমাকে দেখছিস, তুইও বা কম কি?

হাসলো শিবানী। দুঃখের হাসি হাসলো উদাস চোখে! বললে,—আমি আবার সুন্দর, তার আবার রূপ! শুনলে তো বড়রাণী, বাইরে থেকে রাজমায়ের কথা তুমি শুনলে তো?

—হ্যাঁ, শুনেছি বৈ কি। সব শুনেছি। কথা বলতে বলতে ক্ষণিকের জন্য থামলেন উমারাণী। বৈশাখের এলো-মেলো হাওয়ায় উড়ন্ত আঁচল টেনে ত্রস্তে বুকের বসন ঠিকঠাক করলেন। বললেন,—কিন্তু, আমি কি করতে পারি বল?

—তুমি আর কি করবে বড়রাণী! তুমি আর কি করতে পারো? কাঁপা-কাঁপা গলায় শিবানী ব'লে যায়।—ভগবানও হয়তো কিছু করতে পারবেন না। আমি চ'লে যাব রাজবাড়ী থেকে, এখানে আর থাকবো না।

অসীম আগ্রহের সঙ্গে উমারাণী শুধোলেন,—কোথায়

যাবি শিবানী? কে তোকে ঠাঁই দেবে? এত চঞ্চল হচ্ছিস কেন?

—রাধাশ্যাম ঠাঁই দেবে, আর কে দেবে! যিনি সর্ব্বহারার তানকর্ত্তা সেই বিষ্ণু দেবেন। পরম বিজ্ঞের মত বললে শিবানী। বলতে বলতে ছল-ছল ছুই চক্ষু নিমীলিত করলো, অদৃষ্ট কোন্ দেবতাকে স্মরণ করলো কিনা কে জানে! বললে,—চলে যাবো তোমাদের রাধানগরে, রাধাশ্যামের বিগ্রহের সেবাদাসীর কাজ ক'রবো। বেশ থাকবো আমি।

রাধানগরে আছে রাধাশ্যামের বিগ্রহ। নিরেট স্বর্ণমূর্ত্তি। যুগলমূর্ত্তি।

উমারাণীর চোখ ছুটিও সিক্ত হয়। লালপদ্মে শিশির-বিন্দুর মত ছু' ফোঁটা জল ছু' চোখে টলমল করে। বলেন,—না রে শিবানী, তুই যাস্‌নে। আমি জানি সেবাদাসীদের কত কষ্ট, মানুষ হয়েও তারা মানুষের মত থাকতে পায় না। বড্ড কড়াকড়ি!

—তা হোক বড়রাণী। কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠ শিবানীর। বলে, কষ্টভোগ না করলে তো বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে ঠাঁই মিলবে না। সুখভোগ যে আমার পোড়াকপালে নেই।

—তাই ব'লে তুই সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবি?

ঈষৎ বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন রাজমহিষী। কথা শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। গভীর দীর্ঘশ্বাস।

—হ্যাঁ। উপায় কি আর বল' বড়রাণী! কথা বলতে বলতে ক্ষণেক থেকে আবার বলে,—অন্যায় নয়? তুমিই বল' না। শিশুকাল থেকে শুনে আসছি যে, ছোট রাজকুমারের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, আমি রাজবাড়ীর বৌ হব। কোথা থেকে কি হয়ে গেল! কিন্তু আমি যে তাঁকে ছাড়া আর কাকেও জানি না, চিনি না। তাঁকেই যে আমি আমার—

কথা বলতে বলতে কা'কে দেখলো শিবানী। কথা থামালো সহসা। কা'কে দেখলো সে! লজ্জা ও সঙ্কোচের আধিক্যে পলকের মধ্যে শিবানীর মুখাকৃতি আরও স্তব্ধ ও ম্লান হয়ে যায়। দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকে।

উমারাণী সলজ্জায় ঈষৎ গুণ্ঠন টানলেন। বড়রাণীর পশ্চাদ্ভাগ থেকে অনিমেষ চক্ষুতে দৃষ্টিপাত করে শিবানী—যেন এক অভাবনীয়ের দর্শন পেয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকে।

—বধূরাণী, তুমি কি কিছু অবগত আছো?

কাশীশঙ্করের ব্যগ্র কণ্ঠ। আবার কোথা থেকে ফিরে আসেন ছোটকুমার। সশব্দ পদক্ষেপে। ব্যগ্রব্যাকুল দৃষ্টি কাশীশঙ্করের সুদীর্ঘ চক্ষে। অধিক চাঞ্চল্যে কিঞ্চিৎ অস্থিরচিত্ত। উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত।

রাজমহিষীর শুষ্ক কণ্ঠনালী। মুখে কথা ফোটে না সহসা। দেবরের প্রশ্নে যেন বিস্ময়ের ঘোর নামে রাণীর মনে। নিজেকে সম্বরণ করেন অতি কষ্টে। অস্পষ্ট কণ্ঠে উমারাণী বললেন,—কি অবগত আছি আমি?

কাশীশঙ্কর ততক্ষণে কাছাকাছি পৌঁছেছেন। উদ্বেগ ও উত্তেজনায় চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় তাঁর চলনে-বলনে। বলিষ্ঠ আকৃতি তাঁর, পেশীবহুল শরীর। ক্রোধ না আবেগে দেহ বুঝি তাঁর স্ফীত হতে থাকে ক্রমেই। ক্রুদ্ধ স্বরে তিনি বললেন,—জগমোহন লেঠেলটাকে সপ্তগ্রামে কে পাঠালে?

—আমি তো জানি না ছোটরাজা! আমাকে আপনার এ প্রশ্ন কেন? উমারাণী বললেন অবিচলিতের মত।

—তবে কি মাতৃদেবীর আদেশে জগমোহন গেছে?

ফিরতি প্রশ্ন করেন কাশীশঙ্কর। ক্রোধ না আবেগের আতিশয্যে কাঁপতে থাকেন যেন। আকাশে দ্বিপ্রাহরিক উজ্জ্বল দিনমণি। প্রখর তাপে মাঠ-ঘাট দগ্ধ হয়ে যায় দিকে দিকে! গ্রীষ্মের আধিক্যে কাশীশঙ্করের ঘর্ম্মাক্ত মুখমণ্ডল। কপালে স্বেদবিন্দু। শ্বেতচন্দনের ন্যায় শুভ্রকান্তি ক্ষোভ না ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করেছে যেন!

সাবগুণ্ঠনে নম্রমুখী হন রাজরাণী। ধীরে ধীরে বললেন,—রাজমাতা কখন কা'কে কি আদেশ করেন, আমাকে ব্যক্ত করেন না। আমি কিছুই জানি না।

উদাত্ত কণ্ঠে কাশীশঙ্কর বললে,—মান-মর্য্যাদা লজ্জা-সম্ভ্রম কিছুই থাকে না যে দেখি! জগমোহনের সাধ্য কি যে কৃষ্ণরামের গৃহে প্রবেশের অনুমতি পায়? বিন্ধ্যবাসিনীর খবরাখবর সে কোথা থেকে সংগ্রহ করবে তাও জানি না। বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কি মাতৃদেবীর বুদ্ধিভ্রংশ হ'তে চলেছে?

—ছোটরাজা, আমি কিছুই জানি না।

উমারাণীর টুকরো টুকরো কথা। যেন সঙ্গীতের ঝঙ্কার।

রাজমাতা বিলাসবাসিনীর কুঠরীর দিকে অগ্রসর হলেন কাশীশঙ্কর। সশব্দ পদক্ষেপে। কোথা থেকে শুনেছেন কাশীশঙ্কর! কে যেন তাঁর কানে তুলে দিয়েছে কথাটি। লাঠিয়াল জগমোহন রাজপ্রাসাদের বিনা অনুমতিতে, কেবল মাত্র রাজ-অন্দরের মেয়েলী আদেশে সপ্তগ্রাম যাত্রা করেছে বিন্ধ্যবাসিনীর প্রকৃত সমাচার সংগ্রহার্থে। জমিদার কৃষ্ণরাম যে প্রকৃতির মানুষ, তাতে ভয় ও আশঙ্কা হয়—বিনা বিচার ও বিবেচনায় হয়তো বিন্ধ্যবাসিনীর অত্যাচারের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। বিতাড়িত কুকুরের মত কি না কে জানে, ফিরতে হবে হয়তো ঐ জগমোহনকে।

রাজমাতার কুঠরীর দ্বারে কাশীশঙ্কর বিলীয়মান! গম্ভীরকণ্ঠে কি যেন বলতে বলতে চলেছেন। দীর্ঘ পদক্ষেপে! কাশীশঙ্কর বলছেন,—জগমোহন আসুক, তাকে আমি গারদে চালান করবো! ব্যাটা বেল্লিক বদমায়েস বেয়াদবকে বন্দী করবো আমি!

কাছাকাছি কোথায় যেন গুরু-গুরু মেঘগর্জ্জন হয়, এমনই ক্রোধগম্ভীর কাশীশঙ্করের কণ্ঠস্বর! কথার শেষে তিনি কটিদেশের ঝুলন্ত অস্ত্র স্পর্শ করলেন বজ্রমুষ্টিতে।

চরম চরিতার্থতা
শরতের নির্মল
বৈরাগী
শেফালির স্নিগ্ধ
সোনার পাখায়
দিগন্তে শরতের
মহিমা।
মধুর এই যে
মুহূর্ত, হৃদয়ের
পানেই এর
চরিতার্থতা।
রম্য রুচির
বিলাস, রূপসাধন
চরম চরিতার্থতা—
"লক্ষ্মীবিলাসে"।
লক্ষ্মীবিলাস তৈল

পাষাণীর মত অচঞ্চল যেন শিবানী। পলকহীন দৃষ্টি! বিমুগ্ধা শিবানীকে উদ্দেশ করে রাজমহিষী সহাস্যে বললেন,—দর্শন পেয়ে চক্ষু সার্থক হয়েছে তো?

—কি যে বল' বড়রাণী! আমার কি অধিকার? তার চেয়ে চল, এ স্থান ত্যাগ করাই ভাল। কাতরস্বরে কথা বলে শিবানী। কেমন সিক্তকণ্ঠে। বললে,—খুনোখুনি না হয়, আমার তো সেই ভয় হয়! জগমোহন ভালয় ভালয় ফিরে আসে তবেই মঙ্গল!

কথা বলতে বলতে দু'জনে চললেন সন্ত্রস্তের মত। রাজমহিষীর মুখের হাসি মিলায় না। তিনি বলেন,—শিবানী, দেখলি তো মনের সুখে? দেখে খুশী হয়েছিস তো?

—কি যে বল তুমি! বললে শিবানী। উদাস সুরে বললে,—চোখ দুটিকে উপড়ানো যায় না, তাই তো দেখতে হয়!

আবার হাসলেন বড়রাণী! শব্দহীন হাসি হাসলেন! হাসতে হাসতে বললেন,—চোখ উপড়ালে কি হবে? মানস-চক্ষু আছে না?

ক্ষীণ হাস্যরেখা শিবানীর মুখের কোথায়! হাসি চাপতে প্রয়াসী হয় সে! বলে,—বড়রাজার আহার হয়েছে? খুব তো নিশ্চিন্তায় আমাকে দংশানো হচ্ছে!

হঠাৎ যেন মনে পড়লো! মুখের হাসি মিলিয়ে গেল উমারাণীর! চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে আকাশ দেখলেন। বৈশাখের খটখটে রূপালী আকাশ! শুভ্র মেঘের পাল তুলে সপ্তডিঙা চলেছে যেন আকাশে! উত্তপ্ত রৌদ্রকিরণে দিগঞ্চল ধিকি-ধিকি কাঁপছে বুঝি।

স্তিমিতকণ্ঠে উমারাণী বললেন,—রাজাবাহাদুর আজ এখনও অন্দরে আসেন না কেন কে জানে?

পরস্পর পরস্পরের প্রতি সন্দিহান চোখে দেখেন! রাজমহিষীর কথায় যেন দুশ্চিন্তার আভাষ পাওয়া যায়! নিম্নস্বরে বললে শিবনী,—হয়তো রঙ্গলীলায় মত্ত এখন তিনি!

বিষের জ্বালা ধরে যেন রাজরাণীর বক্ষ-মাঝে। শিবানীর অনুমান সত্য হ'লেও হতে পারে, তবুও রাজমহিষীকে যেন উন্মনা দেখায়। কালবৈশাখীর কালো-মেঘ নামে যেন তাঁর মুখাবয়বে। দালানের পর দালান পেরিয়ে নিজের মহলের দিকে এগিয়ে চলেন উমারাণী।

—জগমোহনকে আমি বন্দী করবো!

কথাটি ঠিক কাণে পৌঁছেছে। ভাবনার আলোড়নেও থেকে থেকে কাশীশঙ্করের সক্রোধ উক্তি বাজে যেন কাণে কাণে। বন্দী করার পণ শুনে চমকে শিউরে ওঠেন রাজমহিষী। স্মৃতিপটে দেখতে পান, রাজগৃহের গারদখানা। লোহার গরাদের তমসাচ্ছন্ন খাঁচা একেকটি, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। কেবল মাত্র আগ্রহ ও কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে কত দিন উমারাণী দেখেছেন গারদঘর—উপরতলার জাফরির ঝিলিমিলির অন্তরালে থেকে দেখেছেন স্বচক্ষে। দেখতে দেখতে অন্তরাত্মা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। উমারাণী নিজে দেখেছেন, কয়েদী ঘানি টানছে চক্রাকারে পাক দিতে দিতে ঘানির বিশ্রী কর্কশ ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ কাণে শুনেছেন। স্বকর্ণে। দেখেছেন সরষের তেলের ঘানিতে বলদের কাজ করছে কয়েদী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে এক নাগাড়ে সরষে পিষছে। তৈল নিষ্কাশন করছে তিলে তিলে। কিংবা গম ভাঙছে পাথরের জাঁতায়।

ওদিকে রাজমাতার কুঠরীতে কি বাক্‌যুদ্ধ চলেছে! কে জানে! দালানের পর দালান পেরিয়ে চলেছিলেন বড়রাণী। বিষণ্ণ সুরে তিনি বললেন,—শিবানী, রাজমহলে যেতে হচ্ছে ভাই আমাকে। রাজাবাহাদুরের আহারের সময় উত্তীর্ণ হ'তে চলেছে।

শিবানী হাসলো মৃদু মৃদু। কষ্টের ক্ষীণ শুষ্কহাসি। বললে,—বৌরাণী, আমাকে তুমি বিষ জোগাড় ক'রে দাও। খেয়ে আমি সকল জ্বালা জুড়াই।

—বিষ?

—হ্যাঁ বিষ! যা খেলে মানুষের ঘুম আর ভাঙে না।

ধমকে উঠলেন উমারাণী। বললেন,—ছিঃ শিবানী, অমন কথা মুখে আনে না। আত্মহত্যা যে পাপ!

আবার হাসলো শিবানী। রুখু চুলের চূর্ণকুন্তল কপাল থেকে সরিয়ে দিতে দিতে শুষ্কহাসি হাসলো। বললে,—বৌরাণী, তোমাদের জগমোহনকে কে কোথায় পাঠালে? ছোট রাজকুমারের রাগ কেন এত?

ফিস-ফিস কথা বলেন রাজমহিষী। ইদিক-সিদিক দেখে ফিস-ফিস বললেন,—মা তাকে পাঠিয়েছেন সাতগাঁয়ে, ননদিনী বিন্ধ্যবাসিনীর ভাল-মন্দ জানতে পাঠিয়েছেন।

চোখ বড় করলো শিবানী। শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো কতক্ষণ। চিন্তার সূত্র যেন ছিঁড়ে যায়, খেই হারিয়ে ফেলে মনের গতির—শিবানী পাষাণমূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে। নিষ্পলক চোখে দেখে, গমনোদ্যতা রাজমহিষীকে।

এক দালানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে শিবানীকে একা ফেলে রেখে কেমন যেন আনমনার মত উমারাণী চললেন রাজমহলের পথে। তাঁর হাতের অলঙ্কার, চুড়, কঙ্কণ না বলয়ের কিঙ্কিণী শোনা যায়। চরণচাঁদের রিণিঝিনি ভাসে দালানের বাতাসে।

ওদিকে রাজমাতার কুঠরীতে কি মাতা-পুত্রে বাক্‌বিতণ্ডা চলেছে! কথা-কাটাকাটি! দেবর কাশীশঙ্করের চণ্ডমূর্ত্তি দেখে কেমন যেন ভয় ভয় করেছে বড়রাণীর। কি উগ্র মূর্ত্তি! ক্রোধেরই বা কি অভিব্যক্তি! রাজাবাহাদুরই বা কোথায় এখন! দরবার কি তবে এখনও শেষ হয়নি আজ?

দরবার শেষ হয়ে গেছে কোন্ কালে। দরবারে যদি রাজা না থাকেন, কে চালাবে দরবার? গদীতে যদি রাজা

[৮৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ভারতের সাধনা—ভক্তির ধারা

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ভারতীয় জ্ঞানের উন্নমান নির্ণয় করিতে হইলে বেদ, উপনিষদ্ এবং ভারতীয় দর্শনের আলোচনা করিতে হয়। ভারতের কর্মকাণ্ড ইহার যাগযজ্ঞের বিধিতে বর্ণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শনের যে লোকহিতবাদ তাহাও ভারতবর্ষে অজ্ঞাত ছিল না।

এতাবদমসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০ স্কন্ধে, ২২শ অধ্যায়।

আমি এই প্রবন্ধে শুধু ভক্তির কথাই বলিব। ভক্তি অর্থে ভজন। এই ভক্তি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে গীতায় এবং অন্যান্য শাস্ত্রে, তাহারই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। সেই পরমানন্দময়, পরমরসসার, এক অপূর্ব রহস্যময় ভক্তিবাদে আমরা যে প্রেরণা লাভ করি তাহা অন্য কোথাও সুলভ নহে। এই ভক্তিবাদের জন্যই ভারতে ত্রি-চতুর্থাংশ হিন্দু এই ভক্তিবাদী। তাঁহারা যাহাই উপাসনা করুন না, তাঁহাদের উপাসনার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় এই ভক্তিবাদে।

ইহাকে পরম রহস্যময় বলিয়াছি এই জন্য যে, ইহা যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না। অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া ভগবান বলিতেছেন, হে অর্জুন, বেদাধ্যয়নের দ্বারা এ রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। দানের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা আমার এ স্বরূপ দেখা যায় না। আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, সেই কেবল আমাকে এবংবিধরূপে দেখিতে পায়।১ আরও বলিতেছেন, অনন্যা ভক্তির দ্বারা আমাকে জানা যায় এবং আমাতে প্রবেশ করা যায়।২ তাহার পর আবার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন, আমি যেরূপ এবং যাহা তাহা একাগ্র ভক্তির প্রভাবে স্বরূপতঃ অবগত হওয়া যায়।৩

তিনি স্পষ্ট ভাষায় গীতায় বলিতেছেন, 'ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া'—আমি একমাত্র ভক্তির দ্বারাই লভ্য।

জ্ঞানের সম্বন্ধে গীতায় ভগবান বলিতেছেন, জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র কিছুই নাই।৪ জ্ঞানরূপ অনল সমস্ত কর্মবন্ধন অনায়াসে ভস্মসাৎ করিয়া দেয়, যেমন আগুনে ইন্ধন দিলে অচিরে ভস্মীভূত হয়।৫ শুধু তাহাই নহে, জ্ঞানলাভ করিলে অচিরে পরমশান্তি লাভ হয়।৬ যদি তুমি সকল পাপী হইতেও অধিক পাপী হও, তথাপি জ্ঞানরূপ নৌকার দ্বারা অনায়াসে পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।৭ কিন্তু এখানেও বলিতেছেন, জিজ্ঞাসুদের মধ্যে সেই জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ যে সর্বদা আমাতেই নিষ্ঠাবান এবং একমাত্র আমাতেই ভক্তিমান্। কারণ, আমি সেই জ্ঞানীর অতিমাত্র প্রিয়। দেহাদি অভিমানের অভাবে চিত্তবিক্ষেপের অভাবে জ্ঞানী আমাতে নিত্যযুক্ত হইতে পারেন।৮

গীতায় কর্মযোগের ব্যাখ্যায় ভগবান্ বলিতেছেন, কেহ কর্ম না করিয়া ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না। কারণ, প্রকৃতি তোমাকে অবশ করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকে।৯ তোমার ইচ্ছা না থাকিলেও তোমাকে কোনও কোন কর্ম করিতে বাধ্য হইতে হইবে। কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই ভাল। কারণ, তোমার দেহযাত্রা কর্ম পরিত্যাগ করিলে অসম্ভব হইয়া পড়িবে। এখানে স্মরণ করিতে পারা যায়, সেদিন পণ্ডিত জহরলালজী আজমীরে বলিয়াছেন, 'আরাম হারাম হ্যায়।' যদি কেহ কর্ম না করে তাহা হইলে তাহার পক্ষে জীবনই দুর্বিষহ হইয়া পড়ে। কর্মযোগের আসল কথা শুধু যে কর্ম করিতে হইবে তাহাই নহে, অনাসক্ত হইয়া কর্মাচরণ করিতে হইবে। গীতা বলিতেছেন, যাঁহারা সর্বকর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া অনন্য ভক্তিযোগ সহকারে আমার ধ্যান করিতে করিতে উপাসনা করে, হে পার্থ, আমাতে আবেশিত-চিত্ত সেই সাধকগণকে আমি অবিলম্বে মৃত্যুময় সংসার-সাগর হইতে সম্যক্‌রূপে উদ্ধার করিয়া থাকি।১০ শুধু যে তিনি মৃত্যুময় সংসার হইতে উদ্ধার করেন তাহাই নহে, বস্তুতঃ তিনি আমাদের সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করেন। এ সম্বন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন :

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

আমি কর্তা, এইরূপ যাঁহার ভাবনা নাই, যাঁহার বুদ্ধি কোনও কর্মে আসক্ত হয় না, তিনি এই জগতে সমস্ত প্রাণিগণকে

১। ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥ —গীতা ১১ অঃ।

২। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ —গীতা ১১ অঃ।

৩। ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥
—গীতা ১৮ অঃ।

৪। ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
—গীতা ৪ অঃ।

৫। যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ —গীতা ৪ অঃ।

৬। জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥
—গীতা ৪ অঃ।

৭। অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ —গীতা ৪ অঃ।

৮। তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ —গীতা ৭ অঃ।

৯। ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
—গীতা ৩ অঃ।

১০। যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥
—গীতা ১২ অঃ।

হত্যা করিলেও হনন করেন না ও তাহার ফলেও আবদ্ধ হন না। এই শ্লোকের ভাবার্থ লইয়া Aldous Huxly তাঁহার গ্রন্থ "চিরকালের দর্শন" (Perennial Philosophy) লিখিয়াছেন, যুদ্ধে কোনও সেনাপতি যখন প্রবৃত্ত হন, তখন সেই দলের কাহারও সহিত তাঁহার শত্রুতা নাই এবং তিনি যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধেও উদাসীন। এই ভাবে যুদ্ধ করিলে কোনও পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করে না।

ইহাই হইল কর্মযোগের আসল কথা। অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিতে হইবে এবং ভগবানে একান্ত নির্ভর করিতে হইবে। তিনি গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব, হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও।১১ তবে একটা কথা মনে রাখিও যে, সেই যোগীই শ্রেষ্ঠ যিনি সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধাবান হইয়া আমার ভজনা করেন।১২ এই যে কর্মযোগের কথা বলিতে গিয়াও যে ভগবান তাঁহার ভক্তগণের স্থান সকলের উচ্চে স্থাপন করিলেন ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। কেহ কেহ গীতাকে প্রধানতঃ কর্মযোগের ব্যাখ্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ গীতায় জ্ঞানযোগের প্রাধান্য আছে বলিয়াছেন। কিন্তু, আমার বোধ হয় সমগ্র গ্রন্থখানির মাঝে ভক্তিযোগের কথা এত পরিষ্কার ভাবে বলা রহিয়াছে যে ইহাকে ভক্তিযোগের গ্রন্থই বলা যায়।

ভক্তি অনুরাগ মাত্র। কিন্তু সেই অনুরাগের কথাই এত উচ্চ চারিত্রিক সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে যে, ইহাতে ভারতীয় সাধনার এক উচ্চ ধারাই সূচিত হয়। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন, কোন ভক্ত তাঁহার প্রিয়। কিন্তু তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, তাঁহার কেহ প্রিয় নাই, বৈরীও নাই।১৩ অথচ কোনও কোনও ভক্ত কেমন করিয়া তাঁহার প্রিয় হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় ইহাই, ভক্তি দ্বারাই তিনি শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভ করেন। অর্থাৎ, ভগবানকে অনুগ্রহ করিতে হয় না, ভক্ত ভক্তির জোরেই কৃতকৃতার্থ হন। সর্বভূতেই যিনি অদ্বেষদৃষ্টি, সর্বজনে যিনি মৈত্রীভাবসম্পন্ন ও হীনজনে কৃপালু এবং যিনি পুত্রাদিতে মমতাশূন্য, নিরহঙ্কার ও ক্ষমাবান্ এবং নিজে মনোবুদ্ধি আমাতে সমর্পণ করিয়াছেন তিনিই আমার প্রিয়। শত্রুতে ও মিত্রে যাঁহার তুল্যভাব, মান ও অপমান এতদুভয়ই যাঁহার সমান, সুখদুঃখে যিনি সমবুদ্ধি, নিন্দা ও স্তুতি এতদুভয়ই যাঁহার সমান সেই ভক্তই আমার প্রিয়।১৪।

ভক্তকে ভগবান প্রিয় বলিলেন। তাহাকে অনুগ্রহভাজন বা দয়ার পাত্র এসব কিছুই বলিলেন না, বলিলেন প্রিয়, অর্থাৎ প্রেমের পাত্র—প্রণয়ভাজন। সমানে সমানে প্রেম হয়। উভয় পক্ষে না হইলে এক পক্ষের প্রেম বলা যায় না। শুধু তাহাই নহে, তিনি বলিয়াছেন, পত্র-পুষ্প ফল যে আমাকে ভক্তিতে উপহার দেয়, আমি তাহার সেই ভক্তির অর্ঘ্য সযত্নে গ্রহণ করিয়া থাকি।১৫ ইহা হইতে ভগবানের সঙ্গে এমন একটা প্রেম-সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিল এবং এমন একটি বিরাট প্রেম-সঙ্গীত রচিত হইল যাহার তুলনা পাওয়া যায় না। 'নারদপঞ্চরাত্রম্' বলিতেছেন, অন্য কিছুতে মমতা না হইয়া শ্রীকৃষ্ণে যদি প্রেমসঙ্গত মমতা হয়, তাহা হইলেই তাহাকে ভক্তি বলা যায়। নারদ এবং শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্রে এই প্রকার ব্যাখ্যাই দেওয়া হইয়াছে। ভক্তি অর্থে যে প্রেম, তাহার মূল গীতার ঐ আটটি শ্লোক।১৬

রূপ গোস্বামী লিখিলেন, বাঞ্ছিতের প্রতি যে সহজ অনুরাগ হয় তাহাকেই ভক্তি বলে।১৭ ভগবানের প্রতি এরূপ অনুরাগ জন্মিলেই জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি কিছুরই প্রয়োজন হয় না। এরূপ অনুরাগ যার জন্মে, তাহার সুকৃতির অন্ত নাই। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ইঁহাদের সম্বন্ধেই বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণকে কিনিতে হইলে তার একমাত্র মূল্য হইতেছে লালসা বা লৌল্য।১৮

'সমুৎকণ্ঠায় হয় সদা লালসা প্রধান।
নামগানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণনাম॥'

এই রূপ ভাবে যাঁহারা কৃষ্ণনামে মজেন, তাঁহাদের পাপকর্ম্মে কখনও রুচি হয় না।

বিধিধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥

এই সম্বন্ধে একটি পদ মনে পড়িতেছে,

কি দিব, কি দিব বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন আমার তুমি॥

প্রিয়জনকে কিছু উপহার দিবার জন্য ইচ্ছা করে। বিশেষতঃ তোমার মত এমন সর্বস্ব দিয়া কেনা প্রিয়তমকে। কিন্তু আমার বলিতে কিছু ত নাই। একমাত্র তুমি আমার সর্বস্ব।

তুমি যে আমারি বন্ধু, আমি যে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিব কি যাবে আমার॥

১১। তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥

১২। যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

১৩। সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
—গীতা ৯ অঃ।

১৪ অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো নরঃ॥
—গীতা ১২ অঃ।

১৫। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ —গীতা ৯ অঃ।

১৬। অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
—হরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত নারদপঞ্চরাত্রম্।

১৭। ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ॥
শ্রীরূপ: হরিভক্তিরসামৃত।

১৮। 'তত্র লৌল্যম্ হি মূল্যমেকলং।'

অষ্ট্রেলিয়ার রঘু ডাকাত

[সত্য ঘটনা]

এলবার্ট কান
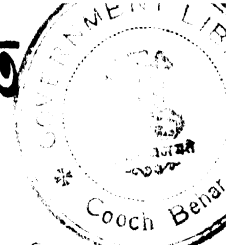
১৮৭৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী। দিনটা ছিল সোমবার। অষ্ট্রেলিয়ার জিবালডিয়ারী সহরে "ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস" এর পাছদুয়ারে দাঁড়িয়ে ব্যাঙ্কের এক কেরাণী দাড়ি-গোঁফ লাগানো এক যুবকের কাছে উষ্মা প্রকাশ করে বলছিল যে পাছদুয়ার দিয়ে ব্যাঙ্কে ঢোকার কোন অধিকার তার নেই। ব্যাঙ্কে কোন কাজ থাকলে তার সামনের দরজা দিয়েই ঢোকা উচিত।

আগন্তুক জো বার্ণ কেরাণীর দিকে রিভলভার উঁচিয়ে বলল চোপ রও, আমরা কেলীর দলের লোক।

এই ভীতিপ্রদ ঘোষণায় কেরাণীটি এত দূর আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিল যে সে তৎক্ষণাৎ কাঁপতে আরম্ভ করে এবং বাকী জীবনটা সেই কাঁপুনি নিয়েই কাটায়। ইতিমধ্যে নেড কেলী সদর দরজা দিয়ে ব্যাঙ্কে ঢুকে ২৩০০ পাউণ্ড নিয়ে হাওয়া হয়ে যায়।

নেড কেলী অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত 'রঘু ডাকাত'। ডন ব্র্যাডম্যানের মতই তার নাম ছেলে-বুড়োর মুখে মুখে। এখনও অষ্ট্রেলিয়ার লোক সাহসের তুলনা দিতে গেলে বলে, হ্যাঁ নেড কেলীর মত সাহস বটে লোকটার।

নেড কেলীর জন্ম ১৮৫৪ সালে। তার বাবা জন কেলী ছিলেন একজন আইরিশ দেশপ্রেমিক। সেখানে কৃষি-সংক্রান্ত কি এক আইন অমান্যের অভিযোগে তাঁর অষ্ট্রেলিয়ায় দ্বীপান্তর হয়। নেড কেলী তার আটটি সন্তানের মধ্যে সর্ব জ্যেষ্ঠ। কেলীরা আগে বাস করত ভিক্টোরিয়ার ওয়াল্লান ওয়াল্লানে। জন কেলীর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা ছেলেপুলেদের নিয়ে গ্রেটায় চলে আসেন। গ্রেটা ছিল বেনালা থানার অধীন। কর্তৃপক্ষ আইরিশ দেশভক্তদের মোটেই ভাল চোখে দেখতেন না। ফলে একেবারে স্থুরু থেকেই পুলিস তাদের পেছনে লাগল। ১৮৭০ সালে নেডের বয়স যখন মাত্র ১৫ বছর তখনই একবার তাকে অপরের ঘোড়ার জিন এবং লাগাম চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু প্রমাণের অভাবে কোন শাস্তি দেওয়া যায়নি। ১৬ বছর বয়সে এক ফেরিওয়ালাকে প্রহার করার অভিযোগে তার ৬ মাস জেল হয়। ফেরিওয়ালাই আগে মারামারি লাগিয়েছিল কিন্তু শেষে সে-ই মার খেয়ে পালায়। জেল থেকে বেরোতে না বেরোতে আবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবারের অপরাধ ঘোড়া চুরি। নেড বলল ঘোড়াটাকে সে কুড়িয়ে পেয়েছে কিন্তু তার যুক্তি বিচারকরা গ্রহণ করলেন না। সে পেল তিন বছরের কারাদণ্ড। মামলার শুনানীতে কিন্তু প্রকাশ পেয়েছিল যে ঘোড়াটাকে তার মালিকের কাছ থেকে গ্যাঁড়া মেরে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছিল রাইট নামে অপর এক ব্যক্তি। তার সাজা হয় মাত্র ১৮ মাসের কারাদণ্ড অথচ ছাড়া ঘোড়া নিজের বাড়ীতে বেঁধে রাখার অভিযোগে নেড পেল ৩ বছরের দণ্ড। তার উপর এই অবিচারের একমাত্র হেতু ছিল এই যে, সে একজন আইরিশ বিপ্লবীর সন্তান। সত্যিকার অপরাধ করে সে প্রথম শাস্তি পায় ১৮৭৭ সালে ২২ বছর বয়সে। মদ্যপান করে বেনালার ফুট-পাথের উপর দিয়ে ঘোড়া ছোটাবার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। হাজত ভেঙ্গে সে পলায়ন করে কিন্তু এক সার্জেণ্ট এবং তিন জন কনষ্টেবল প্রবল ধস্তাধস্তি হাতাহাতির পর তাকে আবার গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। কনষ্টেবলদের মধ্যে লোনিগ্যান নামে এক-জন তার উপর এমন নিষ্ঠুর উৎপীড়ন করেছিল যে নেড চিৎকার করে বলে ওঠে: "যদি কখনও কাউকে গুলী করে মারি তাহলে লোনিগ্যানই হবে আমার প্রথম শিকার।" হাজত ভাঙ্গবার অপরাধে নেডের ৩ পাউণ্ড ১ শিলিং জরিমানা হয়েছিল। হয়ত আরও কঠিন শাস্তি হত কিন্তু "জাষ্টিস অফ পিস" খেতাবওয়ালা এক ভদ্রলোক তাকে পুলিসের নির্মম উৎপীড়নের হাত থেকে বাঁচিয়ে আদালতে তার পক্ষে সাক্ষী দিয়ে তার অপরাধ অনেক লঘু করে দেন।

এই ঘটনার পর নেড কেলীর সঙ্গে পুলিসের শত্রুতা চরমে উঠল। এক ঘোড়া চুরির মামলায় কনেষ্টবল ফিজপ্যাট্রিক একবার কেলীদের বাড়ীতে গিয়ে হাজির। নেডের ছোট ভাই ড্যানকে জেরা করাই তার উদ্দেশ্য। সেখানে কি এক বেফাঁস কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে ১৭ বৎসর বয়স্ক ড্যান মারল তার মাথায় এক ডাণ্ডা। পড়ে গিয়ে ফিজপ্যাট্রিক যখন তার রিভলভার হাতড়াচ্ছে, ঠিক সেই সময় দরজা দিয়ে ঢুকল নেড কেলী এবং দুই ভাই মিলে কেড়ে নিল তার অস্ত্রশস্ত্র। ধ্বস্তাধস্তিতে ফিজপ্যাট্রিকের কব্জি কেটে গেল।

সেই রাত্রে ফিজপ্যাট্রিক বেনালা থানায় ফিরে এই মারামারির একটা অতিরঞ্জিত কাহিনী বর্ণনা করে সকলকে উত্তেজিত করল। সে বলল, নেড কেলীর রিভলভারের গুলীতে তার কব্জি কেটেছে, মিসেস কেলী বেলচার বাড়ি মেরেছেন তার মাথায় এবং মিসেস কেলীর জামাই স্কিলিয়নও রিভলভার নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির ছিল। তৎক্ষণাৎ উপরোক্ত লোকগুলোর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়ে গেল।

নেড শুনল যে তার এবং তার ভাইয়ের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে। মাকেও যে এর সঙ্গে জড়ানো হয়েছে তা সে জানত না। তারা দুই ভাই তখন পালিয়ে গেল ওয়াম্বাট এলাকায়। মাছ না পেয়ে ছিপে কামড় দেওয়ার মত মিসেস কেলী, উইলিয়মসন এবং স্কিলিয়নকে গ্রেপ্তার করে বিচার করা হল। বিচারে মিসেস কেলী পেলেন তিন বছর ও অপর দু'জন ছ' বছরের কঠোর কারাদণ্ড! মামলায় একমাত্র সাক্ষী ফিজপ্যাট্রিক এবং তারই কথার উপর বিশ্বাস করে বিচারক ব্যারী বৃটিশ বিচারের ন্যায়পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মিসেস কেলীকে বললেন: "আপনার ছেলেকে পেলে পনেরো বছর ঠুকে দিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় একটা উদাহরণ রেখে যেতাম।"

মায়ের প্রতি এই অন্যায় এবং অবিচারে নেড কেলী ক্রোধে ফেটে পড়তে লাগল। এবার পুলিসের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। সে শুনল যে তার সন্ধানে পুলিস ওয়াম্বাট এলাকায় তল্লাসী

করতে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সে স্থির করে ফেলল তার কর্তব্য। তাদের হাতে তখন একটা রাইফেল আর একটা 'সট গান' ছাড়া আর কিছু ছিল না। তাই নিয়েই আকস্মিক ভাবে হানা দিল পুলিস-ক্যাম্পে। কনেষ্টবল লোনিগ্যান তাদের দেখে একটা কাঠের গুঁড়ির পেছনে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করছিল কিন্তু নেড কেলী সট গান চালিয়ে প্রথমেই তাকে খতম করে তার আগেকার দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ গ্রহণ করল এবং পুলিস ক্যাম্পের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। পথে অপর দুই কনেষ্টবলের সঙ্গে হল তাদের সংঘর্ষ। তাতে কনেষ্টবল দু'জনই প্রাণ হারালো। শুধু ম্যাকিণ্টায়ার নামক একজন কনেষ্টবল কোন রকমে প্রাণ নিয়ে ফিরে গেল থানায়। এই সংঘর্ষের অতিরঞ্জিত বিবরণ ছড়িয়ে পড়ল সারা অষ্ট্রেলিয়ায়। ভিক্টোরিয়ান গভর্ণমেণ্ট এক আইন পাশ করে হুকুম দিলেন যে নেড কেলী এবং এবং তার দলের লোকদের যে কেউ গুলী করে মারতে পারে। তাতে কোন অপরাধ হবে না।

উপরোক্ত ঘটনার পর বেনালা থানার শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। মেলবোর্ণ থেকে দলে দলে পুলিস এসে সেখানে জমায়েত হতে থাকে। নেড কেলীও নূতন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সঙ্গীদের নিয়ে উত্তর ওয়াঙ্গারাট্টা এবং ওয়ারবাইয়ের ঝোপে জঙ্গলে পুলিসের চোখে ধূলো দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা পুলিসকে ভয় পায় না, ভয় পায় পুলিস-নিয়োজিত আদিম অধিবাসীদের। এই আদিম অধিবাসীরা ঝোপ-জঙ্গল থেকে লোক খুঁজে বার করতে ওস্তাদ।

১৮৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কেলীরা আবার আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করল। এক শিকারী দলের গাড়ী চুরি করে বেলা ৩টার সময় হানা দিল ন্যাশানাল ব্যাঙ্কে এবং ফিরে এল দুই হাজার পাউণ্ড লুঠ করে। নেডের দলের ষ্টিভ হার্ট যখন পেছনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকে সেই সময় স্কুলের সহপাঠিনী ম্যাগী শ'র সঙ্গে তার দেখা হয়। ম্যাগী সেখানে চাকরী করছিল। ষ্টিভকে দেখে সে বলে "কি খবর হে ষ্টিভ?" ষ্টিভ বলে "চোপরও।" লুণ্ঠনের পর নেড কেলী ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও কর্মচারীদের ফেইথফুল ক্রিক ষ্টেসনে নিয়ে গিয়ে চা খাইয়ে দেয়। তার পর ঘোড় দৌড় দেখাবার নাম করে ঘোড়ায় চেপে উধাও হয়ে যায়।

এদিকে যখন এই কাণ্ড ঘটছে ওদিকে পুলিশরা তখন নেড কেলীকে ধরতে না পারার জন্য পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করছে। ১৮৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তারা একটা মস্ত সুযোগ পেল। শোনা গেল সদলবলে কেলী মুরে নদী পেরিয়ে জিরিলডিয়ারীর দিকে আসছে। কেলীরা কিন্তু ততক্ষণ সহরে পৌঁছে গেছে। সহরের থানায় দুই পুলিশ সারাদিনে এক মাতাল ধরে ভীষণ ক্লান্ত। নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল বিছানায়। কেলীরা তাদের সেই থানার একটা ঘরেই তালা মেরে রাখল। পরদিন দুই নতুন কনষ্টেবলকে দেখা গেল জিরালডিয়ারীর রাজপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে অতি বিনীত ভাবে। লোকজনের সঙ্গে গল্প-গুজব করছে, মদ-সিগারেট খাচ্ছে—ভদ্র-সুশীল দুটি পুলিশ। এরা দু'জন অবশ্য নেড কেলী এবং জো বার্ণ। পরের দিনই তারা আত্মপ্রকাশ করল স্বরূপে। সহরের সমস্ত লোককে দুই হোটেলে আটকে ব্যাঙ্ক লুঠ করে হাওয়া হয়ে গেল। এক ব্যাঙ্ক লুঠ করা ছাড়া সহরের আর কারও কোন ক্ষতি তারা করেনি। বরং ষ্টিভ হার্ট স্থানীয় এক নাগরিকের কাছ থেকে একটা ঘড়ি নিয়েছিল বলে নেড কেলীর কাছে গাঁট্টা খেলো।

লুণ্ঠিত টাকা-কড়ি নিয়ে তারা বেনালায় ফিরে এসে ভাগ করে দিল দরিদ্রদের মধ্যে। কারণ এই গরীব লোকেরা আগে তাদের অনেক সাহায্য করেছে। কিন্তু বেচারীরা টাকা নিয়ে পড়ল বিপদে। এক মাসের মধ্যে পুলিশ তাদের কুড়ি জনকে জেলে পোরে।

নেড কেলী প্রস্তুত হতে লাগল পরের অভিযানের জন্য। নিজের জন্য সে এমন একটা লোহার জামা তৈরী করল, যাতে বন্দুকের গুলী তার দেহে প্রবেশ না করতে পারে। এই জামার ওজন হল ৯৫ পাউণ্ড অর্থাৎ এক মণেরও বেশী এবং দশ গজ দূর থেকে নিক্ষিপ্ত গুলী প্রতিরোধ করতে পারে।

এদিকে পুলিস ঘোষণা করল যে, নেড কেলীকে যে ধরতে পারবে সে ৮ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার পাবে। সে যুগের হিসাবে এই টাকা প্রায় ধনীর সম্পদ। কিন্তু এত সত্ত্বেও কেলীদের কেশাগ্রও স্পর্শ করা গেল না। বরং তারাই ছদ্মবেশে রেস এবং মদের আসর এবং সামাজিক উৎসব-আনন্দে অংশ গ্রহণ করতে লাগল। একবার ভায়োলেট সহরে এক বিখ্যাত সামাজিক মিলনোৎসবে নেড কেলী ছদ্মবেশে এসে নেচে গেল এক মেলবোর্ণের পুলিশের সঙ্গে। পুলিসটা জানতেও পারেনি যে যার সঙ্গে হাত-ধরাধরি করে নাচছে তাকে ধরতে পারলে সে ৮ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার আর চাকরীতে প্রোমোশন পাবে।

কিন্তু পুলিস তাদের পাকড়াও করবার জন্য যে বিপুল আয়োজন করছিল তাতে কেলীর দলের কেউ কেউ ভীত না হয়ে পারেনি। তারা প্রস্তাব করল, কুইন্সল্যাণ্ডে পালিয়ে গিয়ে নতুন করে জীবন সুরু করবে। কেলী রাজি হল না। সে বলল, "আমার মা যত দিন জেলে আছেন তত দিন শান্তি নেই।" তখন তারা ঠিক করল মিসেস কেলীর মুক্তির জন্য তারা পুলিস অফিসার ধরে জামিন হিসাবে আটকে রাখবে।

সেরিট নামে একটি লোক ছিল কেলীদের দলের জো বার্ণের বাল্যবন্ধু। লোকটা পুলিসের গোয়েন্দা হলেও কেলীদের বন্ধু ছিল। আস্তে আস্তে লোভ ঢুকল তার মনে। সে ভাবল, ওদের ধরিয়ে দিয়ে রাতারাতি বড়লোক হবে। এ সুযোগ সে ছাড়বে কেন? কেলীরা আগেই তাকে সন্দেহ করেছিল। তাই জিরালডিয়ারী অভিযানের সময় মিথ্যা করে সেরিটকে বলেছিল যে, তারা গৌলবার্ণ সহরে যাচ্ছে। পরে তারা জানতে পারে যে, তাদের ধরবার জন্য নির্দিষ্ট দিনে গৌলবার্ণ সহরে পুলিসের বিরাট সমাবেশ হয়েছিল। এর পর আবার সেরিট একদিন জো বার্ণের মাকে অশ্লীল ভাষায় খিস্তি করে। কাজেই তার আয়ু আর ক'দিন? নেড ভাবল, সেরিটকে যদি হঠাৎ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে একটা নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাবে। একজন পাকাপোক্ত গোয়েন্দার মৃত্যু ঘটলে পুলিস একেবারে মরিয়া হয়ে উঠবে। তার পরই স্পেশাল ট্রেণে করে বেনালা থেকে পুলিস আসবে বিচওয়ার্থে। সেই দলে নিশ্চয়ই দু'জন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থাকবে। সুতরাং সেই স্পেশাল ট্রেণ যদি আটক করা যায় তাহলে মায়ের মুক্তির জামিন হিসাবে সেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দু'জনকে আটকানো যাবে।

১৮৮০ সালের ২৬শে জুন জো বার্ণ আর ড্যান কেলী সেরিটের

গৃহাভিমুখে যাত্রা করল। সন্ধ্যার সময় তার বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে এক জার্মান ফেরিওয়ালার সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ। তার নাম এ্যান্টন উইক্স। উইক্সকে হাতকড়া লাগিয়ে তারা নিজেদের সঙ্গে নিল। জো বার্ণের বাড়ী পৌঁছে উইক্সকে বলল দরজায় টোকা দিতে। সেরিটও সন্দেহ করেছিল কেলীরা যে কোন দিন তার বাড়ীতে হানা দিতে পারে। তাই বাড়ীতে চার জন পুলিস এনে রেখেছিল। তারা তখন সেখানেই ছিল। দরজার কড়া নাড়া শুনে সেরিট বলল, "কে হে?" উইক্স বলল, "আমি গো আমি। পথ হারিয়েছি।" পরিচিত গলার স্বর শুনে সেরিট দরজা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে জো বার্ণ চালালো গুলী। সেরিট তৎক্ষণাৎ পড়েই মরে গেল। একটা কথাও তার মুখ দিয়ে উচ্চারণ হল না। জো এবং ড্যান এ্যান্টন উইক্সকে মুক্তি দিয়ে পলায়ন করল আর পুলিস চারজন ঘরে বসে কাঁপতে লাগল।

এর পর পরিকল্পনার দ্বিতীয় ভাগ—পুলিসের স্পেশ্যাল ট্রেণ আটক করতে হবে। নেড কেলী এবং ষ্টিভ হার্ট এক রেল শ্রমিকদের ক্যাম্পে গিয়ে তাদের দিয়ে গ্লেনরাউয়ান ষ্টেশনের এক মাইল দূরে খানিকটা রেল-লাইন উপড়ে ফেলল আর তার দলের লোকেরা গিয়ে দখল করল গ্লেনরাউয়ান সহরটা। সেখানকার সমস্ত পুরুষ লোককে নিয়ে আটক করা হল মিসেস জোনের গ্লেনরাউয়ান হোটেলে। মদ চলতে লাগল পিপে পিপে। আর সারা দিন হৈ-হুল্লোড়। ফলটা হল এই যে মদের নেশায় কেলীরাও বে-সামাল হয়ে পড়ল। পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার ব্যাপারে ঢিলেমি দেখা দিল তাদের মধ্যে।

এদিকে সেরিটের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হেয়ারের নেতৃত্বে ৫০ জন পুলিস এক স্পেশাল ট্রেণে করে চলেছে ঘটনাস্থলে। রাত এগারোটায় ট্রেন এসে থামলো লাইন-ওপড়ানো যায়গায়। হতচকিত পুলিস শুনলো যে কেলীরা সদলবলে গ্লেনরাউয়ান হোটেলে বসে আছে। প্রায় একই সঙ্গে কেলীরাও সংবাদ পেল যে তাদের প্রত্যাশিত পুলিস ট্রেণ যথাস্থানে এসে হাজির হয়েছে! তারা তৈরী হয়ে নিল। নেড কেলী ঘোড়ায় চেপে গেল ট্রেনের দখল নিতে। প্রচণ্ড গুলীবর্ষণের মধ্যে যেই সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমেছে অমনি তার পায়ে এবং হাতে এসে লাগল গুলী। সেও পাল্টা গুলী চালিয়ে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হেয়ারের কব্জি উড়িয়ে দিল। কিন্তু প্রচুর রক্তপাতের ফলে নিজে সে ক্রমশ নিস্তেজ দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাড়াতাড়ি পাশে একটা ঝোপের মধ্যে গিয়ে রক্তাক্ত কলেবরে এলিয়ে পড়ল।

পুলিস তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘেরাও করল হোটেলটা। তার পর সেখানে সারা রাত ধরে চলল খণ্ডযুদ্ধ। ভোর পাঁচটার সময় জো বার্ণ মারাত্মক আঘাত খেয়ে মারা গেল। কিন্তু ভোরের কুয়াশা ভেদ করে এক নতুন মূর্তির আবির্ভাবে পুলিশ দল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। নেড কেলী ঝোপ থেকে বেরিয়ে অটুট পুলিস অবরোধের দিকে এগিয়ে আসছে শেষ লড়াই লড়বে বলে। কয়েক জন পুলিস তার উপর গুলী চালালো কিন্তু সে গুলী তার ফিরে এল ইস্পাতের জামায় লেগে। একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো নেড কিন্তু একটা গুলী গিয়ে লাগল তার ডান হাতে। তা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে সে এগুতে লাগল। ডান হাত অকেজো হওয়ায় বাঁ হাতে গুলী চালাচ্ছে কিন্তু বড় দুর্বল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভীষণ ভাবে জখম আধ-মরা নেড কেলীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

হোটেলের যুদ্ধ তখনও থামেনি। বাইরে ৫০ জন সশস্ত্র পুলিস আর ভিতরে শুধু ড্যান কেলী আর ষ্টিভ হার্ট। দুপুরের পর ভিতরের লোক ক্লান্ত হয়ে পড়ছে বোঝা গেল এবং বেলা ৩টার সময় পুলিস হোটেলটায় আগুন জ্বালিয়ে দিল। ড্যান কেলী এবং ষ্টিভ হার্ট তাতেই মারা যায়।

নেড কেলী কিন্তু মুমূর্ষু অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল। স্থানীয় কোন জুরী তার বিরুদ্ধে রায় দেবে না ভেবে কর্তৃপক্ষ তার মামলা স্থানান্তর করালেন মেলবোর্ণে। ১৮৮০ সালের ২৮শে অক্টোবর বিচারপতি স্যার রেডমণ্ড ব্যারী তাকে ফাঁসীর আদেশ দেন। স্মরণ থাকতে পারে এই ব্যারীই নেডের মাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। বিচারপতির রায় শুনে আসামীর কাঠগড়া থেকেই নেড তাকে বলেছিল: "ঠিক হায়, সেখানে তোমায় হাতে পাবো।" নেডের ফাঁসীর ১২ দিন বাদে বিচারপতি ব্যারী অপ্রত্যাশিত ভাবে ফুসফুসের অসুখে মারা যান।

অষ্ট্রেলিয়ার বয় ডাকাতের দোষ-গুণের বিচার করতে চাই না তবে এ কথা ঠিক লোকটার সাহসও ছিল হৃদয়ও ছিল। কেলীর দলের ১ জন ছিল ১০ জন সৈন্যের সমান। তা ছাড়া পেশাদার দস্যুও তাকে ঠিক বলা যায় না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা তার পিতার দেশপ্রেম সহ্য করতে পারেনি বলে যে ভাবে তাদের পরিবারের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে তাতেই সে মরিয়া হয়ে হানাহানির পথ নিতে বাধ্য হয়—অনেকটা আমাদের দেশের অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মত। নেড কেলীকে স্থানীয় অধিবাসীরা অত্যন্ত ভালবাসত। শেষ মুহূর্তে ফাঁসীর হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য ৩২ হাজার লোকের স্বাক্ষরযুক্ত এক দরখাস্ত পাঠানো হয়েছিল সরকারের কাছে কিন্তু তাতে কর্ণপাত করা হয়নি। গলায় ফাঁস লটকাবার পূর্ব মুহূর্তে নেড বলেছিল "এই তো জীবন!" তার পর চিরদিনের মত তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়।

অনুবাদক—সুনীল ঘোষ

"কত সৌভাগ্যে এই জন্ম, খুব করে ভগবানকে ডেকে যাও। খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়? সংসারে কাজ-কর্মের মধ্যেও একটি সময় করে নিতে হয়। জপ-ধ্যান করতে করতে দেখবে ঠাকুর কথা কবেন, মনে যে বাসনাটি হবে তক্ষুণি পূর্ণ করে দেবেন—কি শান্তি প্রাণে আসবে!"

—শ্রীশ্রীমা

আমি তাকে বন্দী করবো, তুমি যেন বাধা দিও না। নচেৎ এই তরবারির সাহায্যে তাকে আমিই দ্বিখণ্ডিত করবো।

কথা বলতে বলতে ক্রুদ্ধ কাশীশঙ্কর কটিদেশের ঝুলানো অস্ত্র স্পর্শ করলেন!

কনিষ্ঠ সহোদরের পৃষ্ঠে হাত রাখলেন রাজাবাহাদুর! কোন ক্রমে উঠে দণ্ডায়মান হন তিনি। পদদ্বয় কাঁপতে থাকে হয়তো। বললেন, সস্নেহে বললেন,—উত্তেজিত হও কেন? জগমোহনকে আমিই শাস্তি দেবো! মাতৃদেবীই বা কেন যে এত উতলা হন! কেষ্টরাম যে কোন প্রকৃতির মানুষ তা কি তিনি অবগত নন? জগমোহনকে কেষ্টরাম কখনও আমল দেয়? সামান্য একটা লেঠেলকে! তার গৃহে প্রবেশের অনুমতি পাবে কোথায় জগমোহন? কেষ্টরাম নিশ্চয়ই অপমান করবে, বিতাড়িত করবে জগমোহনকে!

স্তব্ধ-গম্ভীর কণ্ঠে কাশীশঙ্কর বলেন,—এই কারণে সহোদরা বিন্ধ্যবাসিনীকেও হয়তো কত অত্যাচার সহ্য করতে হবে কে জানে!

—যথার্থ ই বলেছো। বিন্ধ্যবাসিনীও বাদ যাবে না!

কথা বলতে বলতে রাজাবাহাদুর বালাখানা ত্যাগ করতে উদ্যোগী হন! কথায় যেন তাঁর নিশ্চয়তার সুর। আক্ষেপের আবেগ। বালাখানার দ্বারে এগিয়ে ক্ষণেক দাঁড়ালেন। বললেন,—তুমি অধৈর্য্য হও কেন? যাও স্নানাহার কর, বেলা আর নাই। আমিও যাই।

অগত্যা কাশীশঙ্করকে শান্ত হ'তে হয়। জ্যেষ্ঠ সহোদরের অনুগামী হন তিনি। সমগ্র মুখে তাঁর ক্রোধ এবং দুশ্চিন্তার কালো ছায়া নামে। বুকের পরে দুই হাতের আলিঙ্গন। আনতদৃষ্টি। চলতে চলতে তিনি বললেন,—আমি কেবল বিন্ধ্যবাসিনীর জন্য ব্যস্ত হই। না জানি কত কষ্টেই না সে দিনযাপন করে!

গড় মান্দারণের আকাশের মধ্যস্থলে সূর্য্যের গতি যেন চিরদিনের মত থেমে গেছে। যেদিকে দৃষ্টি যায় শুধু জনহীন, সীমাহীন প্রান্তর। কোথাও কোথাও গাছ-গাছড়ার বনজঙ্গল। তিন্তিড়ী ও মাধবীলতার ঘন আবেষ্টনে হেথায় সেথায় কুঞ্জবনের সৃষ্টি হয়েছে। কুঞ্জের অভ্যন্তরে লতাবৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় জড়িয়ে আছে অসংখ্য বিষধর ভুজঙ্গ। বনজঙ্গলে দিবালোকে লুকিয়ে আছে চিতাবাঘের দল। বর্ত্তমানে মান্দারণ একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু পূর্ব্বে এই স্থানে নাকি এক সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল। মান্দারণে পুরাকালে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল; যেজন্য গ্রামের নাম গড়-মান্দারণ।

মান্দারণের মধ্য দিয়ে স্রোতস্বিনী আমোদর নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে, কুলু কুলু রবে। নদীর গতি কোথাও সরল, কোথাও বা বক্র। নদী যেখানে বক্রাকারে প্রবহমান, সেখানে খণ্ড খণ্ড ত্রিকোণ ভূমি তীরদেশে বিরাজ করে। এমনই এক ত্রিকোণ ভূমিতে জমিদার কৃষ্ণরামের এক পরিত্যক্ত অট্টালিকা আছে। কালের গ্রাসে জীর্ণ ও ভগ্নপ্রায় অট্টালিকার আমূলশিরঃ প্রস্তরে নির্ম্মিত। অট্টালিকার নিম্নভাগ আমোদরের জলে সদাক্ষণ ধৌত হয়। সম্মুখভাগে সিংহদ্বার। সেখানে বন্দুকধারী পাহারাদার—জমিদার কৃষ্ণরামের নির্দ্দিষ্ট ও বিশ্বস্ত এক পাঠান মুসলমান—মর্ম্মরমূর্ত্তির মত সর্ব্বদাই দণ্ডায়মান আছে। সিংহদ্বারের ফাটল দেখা যায়। বট আর অশ্বত্থের চারা ফাটলের স্থানে স্থানে। আপাতদৃষ্টিতে অট্টালিকা মনুষ্যহীন মনে হয়। কিন্তু—

কিন্তু অট্টালিকার যে ভাগে গৃহমূল বিধৌত ক'রে আমোদর নদী কুলু কুলু রবে বহে চলে, সেই অংশের এক কক্ষ-বাতায়নে বসে বিন্ধ্যবাসিনী জলাবর্ত্ত নিরীক্ষণ করেন প্রহরের পর প্রহর। মধ্যহ্নকাল অতীত হ'তে চলে তবুও খেয়াল নেই বিন্ধ্যবাসিনীর। আমোদর-স্পর্শ শীতল নৈদাঘ বাতাসে বিন্ধ্যবাসিনীর অলককুন্তল ও পট্টবস্ত্রাঞ্চল কাঁপতে থাকে। প্রথম দর্শনে মনে হয়, বুঝি এক সন্ন্যাসিনী, কঠোরব্রত উদ্‌যাপনের জন্য একাকিনী হয়ে আছেন। বিন্ধ্যবাসিনীর মুখাবয়বে বালিকাভাব। আয়ত দুই চোখে শুধুই সরলতা। দেহের পশ্চাদ্ভাগে অন্ধকারময় কেশরাশি নিতম্ব স্পর্শ করেছে। বিন্ধ্যবাসিনী কখনও দৃষ্টি প্রসারিত করেন, দেখেন আমোদরের জলাবর্ত্ত। জলের ঘূর্ণী। কখনও বা শুভ্র পট্টবস্ত্রের ঘন লাল-পাড় অঞ্চল হাতের আঙুলে জড়াতে থাকেন। নির্ব্বাসিতা রাজকন্যার নিরাভরণ গাত্র। নিয়মরক্ষার জন্য দুই হাতে শঙ্খবলয়। সীমন্তে অস্পষ্ট সিঁদুররেখা। সধবা নারীর দুই লক্ষণ মাত্র বজায় রেখেছেন রাজকুমারী।

অট্টালিকায় আরও এক নারী আছে। সে পরিচারিকা, জনৈক ব্রাহ্মণ-কন্যা। তার নাম যশোদা। নির্দ্দোষ জমিদার-পত্নীর নির্ব্বাসনের দুঃখে সেও বিগলিতচিত্ত। মনে তার সুখ নেই।

মান্দারণের মধ্যগগনে সূর্য্যের অবস্থান লক্ষ্য করে পরিচারিকা। বিন্ধ্যবাসিনী এখনও অভুক্ত ও অনাহারী। সেই প্রাতঃকালে নদীশোভা নিরীক্ষণে বসেছেন, এখনও সেই এক ভাবেই ব'সে আছেন। নির্নিমেষ চক্ষে দেখছেন তো দেখছেনই—জনহীন, সীমাহীন সবুজ প্রান্তর আর স্রোতস্বিনী, বেগবতী আমোদর নদী।

পরিচারিকা যশোদা পিছন থেকে কথা বলে সহসা। বলে,—বৌ, গতকাল একাদশী গেছে, আজ দ্বাদশী। গত কাল তুমি মুখে কিছু তুললে না। এয়োস্ত্রী হয়ে একাদশী পালন করলে! আজও কি অভুক্ত থাকতে চাও?

বিন্ধ্যবাসিনীর গোলাপী ওষ্ঠাধরে স্মিত-হাসির রেখা ফুটলো। ক্লান্ত-হাসি। বিন্ধ্যবাসিনী বললেন,—এ বেলায় আর জ্বালাসনে আমাকে যশোদা। সন্ধ্যা উৎরে যাক, তারপর।

গড়-মান্দারণে সন্ধ্যা নামতে তখনও অনেক দেরী। সূর্য্য এখন সবে মধ্যাকাশে পৌছেছেন। [ক্রমশঃ

কলিকাতায় গো-রক্ষা আন্দোলন

"কলিকাতায় এই অদ্ভুত আন্দোলন সম্পর্কে সাধারণ লোকের মনে কতকগুলি প্রশ্ন না জাগিয়া পারে না। ভারতবর্ষের অন্য সমস্ত অঞ্চল ছাড়িয়া হঠাৎ কলিকাতায় এই আন্দোলন সুরু হইল কেন? গো-সম্পদ রক্ষার জন্য ভারতের অন্যান্য স্থানে গভর্ণমেণ্ট যে ধরণের আইন করিয়াছেন, কলিকাতাতেও মোটামুটি সেই ধরণের আইনই আছে। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র কলিকাতাকে বাছিয়া লইবার কারণ কি? গো-রক্ষা আন্দোলন যাঁহারা সুরু করিয়াছেন—সাধারণ ভাবে পশুহত্যা নিবারণ যে তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়—তাহা খুবই স্পষ্ট। কারণ অন্য কোন পশুহত্যার বিরুদ্ধে তাঁহারা কোন আপত্তি তুলেন নাই। দেশের গো-সম্পদ রক্ষা বা তাহার উন্নতি সাধনের সঙ্গে এই ধরণের আন্দোলনের কোন যোগাযোগ আছে বলিয়াও মনে হয় না। কারণ, পাশ্চাত্যের দেশগুলি গো-হত্যা নিবারণের নামে আইন পাশ না করিয়াও গো-সম্পদের যেরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছে—আমাদের দেশে তাহার কথা কল্পনা করাও যায় না। বস্তুতঃ পক্ষে গো-রক্ষা আন্দোলনকারীরা একটা ধর্ম্মগত প্রশ্নকে রাজনীতির মধ্যে টানিয়া আনিতে যতটা ব্যস্ত, গো-সম্পদের উন্নতির জন্য ততটা যেন ব্যস্ত নহেন। ভারতবর্ষের মত বহু জাতি ও সম্প্রদায়ের দেশে জাতিতে জাতিতে এবং সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি ছাড়া এই ধরণের আন্দোলনে অন্য কোন সুফল ফলিবার আশা দেখা যায় না। বাঙ্গালা দেশে তথা ভারতবর্ষে আজ নানাবিধ সমস্যা আছে। সব চেয়ে বড় সমস্যা সাধারণ মানুষের বাঁচিবার সমস্যা। কিন্তু যাঁহারা গো-রক্ষার জন্য আজ এত বেশি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, মানুষকে রক্ষার জন্য তাঁহাদের কখনো মাথা ঘামাইতে দেখা যায় নাই। বড়বাজারের ব্যবসায়ী-শ্রেণীর একাংশ আজ উৎসাহের আধিক্যে পথে ঝাণ্ডা লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু অভুক্ত মানুষের খাদ্যের জন্য আন্দোলনে, বেকারদের কর্ম্ম-সংস্থানের আন্দোলনে ইঁহাদের একবারও দেখা যায় না কেন? ভেজালের ফলে আজ সমগ্র জাত তিলে তিলে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু গো-রক্ষার জন্য যাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে—ভেজালের বিরুদ্ধে তাঁহাদের উচ্চবাচ্য করিতে কেহ কখনো শুনিয়াছে কি?"

—দৈনিক বসুমতী।

ডাঃ রায় কি অবুঝ?

"মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের দৃষ্টি একটি বিষয়ে আমরা আকৃষ্ট করিতেছি। উদ্বাস্তুদের দুঃখ, দুর্ভোগ, কষ্ট ইত্যাদির এমনিতেই অভাব নাই, তাহার পরেও রাজনৈতিক দলসমূহ আরও দুঃখ ও কষ্ট উদ্বাস্তুদের গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করিয়া থাকেন, দেখা যাইতেছে! উদ্বাস্তু সমস্যাকে ইঁহারা দলীয় স্বার্থের ব্যাপারেই খাটাইতেছেন, এই দৃষ্টিভঙ্গী ডাঃ রায় যেন গ্রহণ না করেন। আজও ডাক দিলে দূর অঞ্চল হইতে কাচ্চাবাচ্চা লইয়া মেয়েছেলেরা দাবী জানাইতে দলে দলে দুঃখ ও বিপদ বরণ করে, ইহা হইতে কি কিছুই প্রমাণিত হয় না? ইহা হইতে কি প্রমাণিত হয়, তাহা ডাঃ রায় বুঝেন না বা জানেন না, ইহা আমরা মনে করি না। প্রকাণ্ড একটা গলদ নিশ্চয় কোথাও রহিয়াছে, যাহার জন্য উদ্বাস্তু-সমস্যার সমাধানে বিলম্ব ঘটিতেছে। শুধু এই কথাটাই ডাঃ রায়কে আমরা জানাইয়া রাখিতে পারি যে, আমাদের উদ্বাস্তু মা-বোনেরা আজও এমন ভাবে অসহায় ভিক্ষুকের মত পথে মিছিল করিয়া বাহির হইবেন, এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখিতে আমরা আর মোটেই ইচ্ছুক নহি। কংগ্রেসদল এবং দেশবাসীও ডাঃ রায়কে শক্তিমান পুরুষ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, এই ভয়াবহ অভিশাপ হইতে আমাদিগকে মুক্তি দিয়া তাঁহার বহুকথিত শক্তির একটা বাস্তব প্রমাণ তিনি প্রতিষ্ঠা করুন।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

বিপথগামী তরুণ

"দুঃখের বিষয়, এই মূলগত সংস্কারের চিন্তা আজিও আমাদের মনে উদিত হয় নাই—বিষবৃক্ষ বজায় রাখিয়া আমরা শুধু তাহার ডাল ছাঁটাইয়েরই আয়োজন করিতেছি, তাই ভেজাল নিবারণ বলুন, গুণ্ডা দমন বলুন, পতিতাবৃত্তি ও ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধ বলুন, কোনটাই সদিচ্ছার স্তর অতিক্রমে বাস্তবে লক্ষ্য করার মতো সাফল্যলাভ করে অল্পই। অনড় সমাজ-ব্যবস্থার বিপত্তিই আমাদিগকে যেখানে আছি, ঠিক সেখানেই দাঁড় করাইয়া রাখে। কাজেই পুলিশ অধিনেতাদ্বয়ের সদুপদেশ যুক্তিপূর্ণ হইলেও, তাহা কাজে খাটাইবার সুযোগ কোথায়? আর অর্থনৈতিক কারণটা সকল ক্ষেত্রে মুখ্য না হইলেও, অনেক ক্ষেত্রে যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, ইহাও ব্যাঙ্কে, জহরতের দোকানে, কারখানার ক্যাসঘরে, ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে বার বার যে সমস্ত সশস্ত্র ডাকাতি হইয়াছে, নিত্য যে সমস্ত খুন, জখম জালিয়াতি ও জুয়াচুরি অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার খতিয়ান লইলেই বোঝা যাইবে। এই পর্য্যায়ের অপরাধীরা বালক বা কিশোর নয়, যুবক এবং বৃত্তিহীন বেকার দশা, অবিবাহ এবং আনুষঙ্গিক আক্রোশ এবং অসন্তোষই যে তাহাদিগকে সমাজধ্বংসী আচরণে প্রবৃত্ত করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাদের সংশোধনের

জন্যও গ্রেপ্তার বা পিটুনি নয়, বাধ্যতামূলক শ্রমশিবিরে নিয়োগই প্রকৃত পন্থা, কিন্তু তাহারই বা ব্যবস্থা কোথায় ?"

—যুগান্তর।

অনাদায়কারীর রেহাই

"লোকসভায় এক প্রশ্নের জবাবে সহকারী অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, ১৯৫৪ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত আয়কর এবং সুপার ট্যাক্স বাবদ প্রাপ্য টাকার মধ্যে ১৬৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা আদায় করা যায় নাই। টাকা কি ভাবে আদায় করা হইবে এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিয়াছেন যে, যাঁহারা একসঙ্গে সমস্ত টাকা দিতে পারিবেন না, তাঁহাদের নিকট হইতে উপযুক্ত সিকিউরিটি দাবি করা হইবে এবং কিস্তিবন্দী উপায়ে প্রাপ্য আদায়ের ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু কেন? আয়কর বা সুপার ট্যাক্স যাঁহারা দিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে বিপুল সংখ্যাধিক অংশই তো মুনাফা এবং অতিরিক্ত মুনাফা লুটিয়া থাকেন নির্দ্ধারিত ট্যাক্সের অন্ততঃ কয়েক গুণ টাকা। তাঁহাদের নিকট ট্যাক্স বাকি পড়িবে কেন, আর পড়িলেও তাঁহাদের প্রতি এমন সদয় ব্যবহারের হেতুটা কি? সাধারণ কৃষক যখন রাজস্ব দিতে পারেন না বা ছোট দোকানী যখন সেলস্ ট্যাক্স জোগাইতে অক্ষম হন, তখন তো পেয়াদা-পুলিশ এবং কোর্ট-আদালতের হয়রাণির অন্ত থাকে না —অথচ আয়কর ও সুপার ট্যাক্স অনাদায়কারীর প্রতি রীতিমত জামাই আদরের এই ব্যবস্থাটি হয় কেন, জানিতে পারি কি?"

—স্বাধীনতা।

গ্রেপ্তার

"২৪ পরগণা ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের সম্পাদক ইয়াকুব পৈলান দুই একদিন পূর্ব্বে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। জানা গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত মোট প্রায় ৩০ জন কৃষক-কর্মী ও নেতা গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তন্মধ্যে ৮ জন ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের এবং প্রায় ২২ জন জয়নগর থানা আঞ্চলিক কৃষক সমিতির কর্মী এবং নেতা। এখনও অনেকের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা রহিয়াছে। ১০৭ ধারা প্রভৃতি আইন অনুযায়ী জয়নগর থানার মোট ১১৯ জন কৃষক-নেতা ও কর্মীর নামে পরোয়ানা জারী করা হয় এইরূপ প্রকাশ। এই পরোয়ানার আসামীগণকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য গত কয়েক দিন পূর্ব্বে জয়নগর থানায় বিপুল সংখক পুলিশ আমদানী হয়। অভিযুক্ত কৃষক-কর্মী ও নেতাগণকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য জয়নগর থানার বিভিন্ন ইউনিয়নে পুলিশক্যাম্প বসিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।"

—বন্ধু (২৪ পরগণা)।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা কমিশন

"কমিশন যে সহযোগিতা চাহিয়াছেন, বিদ্যালয়ের প্রত্যেক হিতৈষীর উচিত স্কুলের অসৎ-দৃষ্টান্তসম্পন্ন প্রত্যেক শিক্ষকের দোষ দেখিয়ে দেওয়া। কারণ, ভবিষ্যতের আশা-ভরসা ছাত্রগণের অনুকরণীয় চরিত্রবান শিক্ষক যত বেশী হইবে ততই মঙ্গল। শিক্ষকগণ খাইতে পান না বলিয়া অপাপবিদ্ধ ছাত্রগণের মস্তক চর্ব্বণকারী যাহাতে না হইতে পারেন তাহাও দেখিতে হইবে। আমরা পুকুর চুরি, ছাত্রের সহায়তায় অপকর্ম্ম, সরস্বতীর পবিত্র মন্দিরে দুষ্ট সরস্বতীর আবির্ভাব প্রভৃতির কাগজাত প্রমাণ যাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি তাহা রেজিষ্টারী ডাকে কমিশনের নিকট পাঠাইব। স্কুল ইন্‌স্পেক্টর যাঁহার অন্যায় জিদের দরুণ বে-আইনী ভাবে শিক্ষককে তাড়ান হইয়াছিল। শিক্ষককে তাঁহার ক্ষতিপূরণ দেড় হাজারের উপর আক্কেলসেলামী স্কুলকে দিতে হইয়াছে, তাহা কমিশনের গোচরে আনা স্কুল কমিটির কর্ত্তব্য। দেবচরিত্র শিক্ষক একেবারে নাই, একথা বলা যায় না। তাঁহাদের উল্লেখ করিয়া কমিশনকে তাঁহাদের সম্বন্ধে সুবিবেচনা করার অনুরোধও যেন করা হয়।"

—জঙ্গিপুর সংবাদ।

প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে

"দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার পবিত্র গুরুভার আজ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। বহু শক্তি আজ আবার ভারতকে পরাধীন করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। সে সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে আমাদের স্বাধীনতাকে যক্ষের ধনের মতন রক্ষা করতে হবে। আর সেই সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করতে হবে ভারতের বুকে এখনও যে সমস্ত বিদেশী অঞ্চল রয়েছে, সেগুলির মুক্তিসাধন করতে হবে। প্রতিজ্ঞা করতে হবে স্বাধীন ভারতের স্বাধীনতার মাধুর্য্য সম্পূর্ণভাবে ভোগ করার পথে যে ধনতান্ত্রিক শোষণ চালু রয়েছে, তার অবসান ঘটিয়ে নূতন সমাজবাদী স্বাধীন ভারত গড়ে তুলতে হবে। আজ স্বাধীনতা উৎসবের আনন্দের দিন। আজ স্বাধীনতা রক্ষা করা ও শোষণহীন নূতন সমাজ গঠন করার ব্রত গ্রহণ করার দিন। দেশী, বিদেশী শোষকদের অবসান ঘটিয়ে পুর্ণ ও পুঁজিবাদের উচ্ছেদ করে নূতন সুন্দর সমাজ-জীবন গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। স্বাধীন ভারতের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে এক কণ্ঠে উচ্চারণ করি বন্দে মাতরম্।"

—নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)।

বাঁধের বিপত্তি

"পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও জনসাধারণের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া রেল কর্তৃপক্ষ সহস্র সহস্র লোকের কি সাংঘাতিক দুর্গতি ডাকিয়া আনিল! দিল্লীর লোকসভায় কংগ্রেস সদস্য শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ এই সাংঘাতিক অবস্থা অবগত হইয়াই বোধ হয় রেল-সচিবকে গত জুন মাসে ময়নাগুড়িতে অনুষ্ঠিত বন্যায় রেল কর্ত্তৃপক্ষের দায়িত্ব সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের লোকসভার সদস্য হিসাবে রেলের এই প্রকার অব্যবস্থার জন্য তাঁহার পক্ষেও বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক। এই প্রশ্নগুলির যে উত্তর তিনি পাইয়াছেন তাহা আমাদের অবগতির জন্য তিনি আমাদের জানাইয়াছেন। রেল-সচিবের পক্ষে শ্রীসাহ নাওয়াজ খাঁন উপেন বাবুর প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রচার অধিকর্ত্তার পক্ষ হইতে এই উত্তরগুলি পাঠ করিয়া তাহাদের নিজ "প্রতিবাদের" সংস্কার ও সংশোধন করা উচিত অথবা রেল-সচিবের পক্ষ হইতে যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ জানান উচিত। রেল-সচিব অতি স্পষ্ট ভাবেই শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণকে জানাইয়াছেন যে, এ সম্পর্কে রেল কর্তৃপক্ষ তাহার পুরাপুরি দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রচার অধিকর্ত্তাকে আমরা শ্রীউপেন বাবুর উত্তর সমূহ আনাইয়া তাহা পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। রেল কর্তৃপক্ষ তাহার উত্তর দিয়াছেন। সমস্ত দায়িত্ব তাঁহারা রাজ্য সহকারের স্কন্ধে চাপাইয়াছেন।

ইহাতে জনসাধারণ কি বুঝিবে ? তাহারা কি ইহাকে সুব্যবস্থা বলিয়াই মানিয়া লইবে ? প্রচার অধিকর্ত্তার পক্ষের প্রতিবাদ এই সকল প্রশ্নের সম্মুখে যে কত অসার তাহার বিস্তৃত আলোচনা আমরা এখন করিতে চাই না। আমরা শুধু বলিতে চাই—কি মারাত্মক অবস্থার মধ্যে মানুষকে বাস করিতে হইতেছে। আশা করি, পশ্চিমবঙ্গ প্রচার অধিকর্ত্তা লোকসভায় রেল-সচিবের পক্ষ হইতে যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে তৎসম্পর্কে জনসাধারণকে আর একবার অবহিত করিয়া প্রকৃত অবস্থা জানাইবেন।" —ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

প্রাইভেট টেষ্ট পরীক্ষা

"১৯৫৫ সালের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় মেদিনীপুর জেলার যাঁহারা প্রাইভেট ছাত্রীরূপে পরীক্ষা দিতে চান, ছাত্র হইলে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে এবং ছাত্রী হইলে মেদিনীপুর গার্লস ও ঝাড়গ্রাম রাণী বিনোদমঞ্জরী গার্লস হাই স্কুলে তাঁহাদের টেষ্ট পরীক্ষা দিবার বিজ্ঞপ্তি 'বিভিন্ন বোর্ড সংবাদে' প্রকাশিত হইল। গত বৎসর সেকেণ্ডারী বোর্ডের হাতে ইহার ভার ছিল এবং প্রাইভেট ছাত্রছাত্রীগণকে যে কোন অনুমোদিত বিদ্যালয়ে টেষ্ট পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে ডি, পি, আই মহাশয়ের হাতে ইহার ভার থাকায় প্রতি জেলায় কয়েকটি অভিজাত বিদ্যালয়ে প্রাইভেট ছাত্রছাত্রীদিগকে টেষ্ট পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। গত বৎসরের ব্যবস্থায় প্রত্যেক জেলায় মফঃস্বলের ছাত্র-ছাত্রীদের যে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। মেদিনীপুরের পল্লীগ্রামের বিশেষতঃ ঘাটাল, কাঁথি সাব-ডিভিজানের ও তমলুক মহকুমায় নন্দীগ্রাম সুতাহাটা ও ময়না থানার ছাত্র বা ছাত্রীদিগকে যে শ্রমসাধ্য পথ ধরিয়া এবং মেদিনীপুর সহরে থাকিয়া পরীক্ষা দিতে হইলে ইহা যে কিরূপ ব্যয়সাপেক্ষ ও অসুবিধাজনক তাহা জেলাবাসী ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। ছাত্রী হইলে তাঁহার অভিভাবকে ত নিশ্চয়ই সঙ্গে যাইতে হইবে। এই উভয়ের খরচা চিন্তা করিয়া স্ত্রীশিক্ষায় পশ্চাদপদ এই জেলার অভিভাবকগণকে আর অগ্রসর হইতে হইবে না। তাই ছাত্রছাত্রীগণের ও তাঁহাদের অভিভাবকগণের মধ্যে সুখ-সুবিধার ও খরচের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গত বৎসরের ন্যায় সর্বত্র ছাত্রছাত্রীগণকে মফঃস্বলের অনুমোদিত বিদ্যালয়ে টেষ্ট পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পুনর্বিবেচনা করিয়া ডি, পি, আই মহাশয় অবশ্যই দিবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।"

—প্রলাপ (তমলুক)

সরকারী খেতাব চাই না

"গঠনমূলক কাজে যাঁরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের উৎসাহিত করার জন্য নেহরু সরকারের ইচ্ছায় রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ যাঁদের উপাধি বিতরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে ওয়ার্ধা আশ্রমের শ্রীমতী আশাদেবী আর্য্যনায়কম্ উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছেন। উপাধি প্রত্যাখ্যানের কারণস্বরূপ তিনি বলেছেন, সরকারী উপাধি গ্রহণ করা গঠনমূলক কাজের মূল দার্শনিক তত্ত্বের বিরোধী। আশা দেবী শুধু সাহসের পরিচয় দেননি, তিনি সরকারের উপাধি বিতরণের
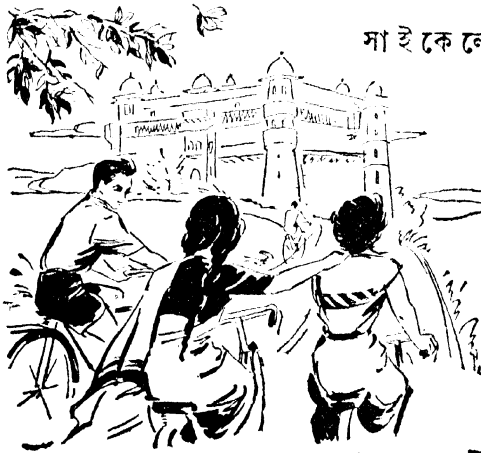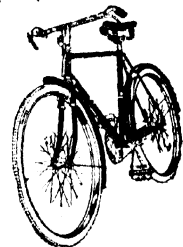
নীতির এক তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। বিদেশী সরকার কয়েকটি বাছাই করা তল্পীবাহককে খেতাব দিয়ে একটি খয়ের খাঁ দলের সৃষ্টি করেছিল। দেশী সরকার সেই খেতাবগুলিকে বাতিল করে দিয়ে ও কোন বিদেশী সরকারের খেতাব গ্রহণ নিষিদ্ধ করে ভাল কাজই করেছিল। কিন্তু কালক্রমে এই সরকারও উপাধি বিতরণের পুরানো প্রথা চালু করতে সুরু করেছে। উপাধি বিতরণ শুধু অনর্থক নয়, ক্ষতিকরও বটে। যাঁরা কৃতিত্বপূর্ণ কাজ করবেন জনপ্রিয়তাই তাঁদের সম্মান হবে। সরকারী খেতাবে তাঁদের প্রয়োজন কি? শ্রীমতী আশা দেবী দেশের লোকের সামনে একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।"

—গণবাণী (কলিকাতা)।

নেহেরু ও প্রগতি !

"সর্ব্বদিকে প্রগতি হইতেছে বলিয়া শ্রীনেহেরু একমুখে অজস্র আওয়াজ তুলিয়া তারিফ পাইয়াছেন কংগ্রেসী পার্ষদদের সভায়। প্রগতি হইতেছে বই কি? ভারতীয় কমিশন ইন্দোচীনের শালিসীতে গিয়াছে, নেহেরু-ভগ্নী শ্রীবিজয়লক্ষ্মী ইয়োরোপ পরিভ্রমণ শেষ করিয়া আসিয়া এখন এশিয়ার সর্ব্বত্র ভারতের বিজয়বার্তা প্রচার করিতেছেন। এদিকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতে কত কি যাদু হইয়াছে, খাদ্যশস্য বাড়িয়াছে, রাস্তা বাড়িয়াছে। বস্ত্রাদি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা লক্ষ্য পূর্ণ করিয়া এখন ফ্যাক্টরীতে ফ্যাক্টরীতে জমিয়া উঠিতেছে। কিন্তু যে যাদু বলে উৎপন্ন বাড়িতেছে সেই যাদু বলেই আবার বেকারও বাড়িতেছে, কাঁচা মাল পাকা হইয়া জমিয়া জমিয়া পচিয়া উঠিতেছে কিন্তু কিনিবার লোক পাওয়া যাইতেছে না। উৎপন্নের জমা পাহাড় ভুখা বেকারীক্লিষ্ট জনতা বসিয়া বসিয়া দেখিবে আর প্রগতির জীবন্ত নিদর্শনে গদগদ হইয়া বার বার নেহেরুজীর জয়ধ্বনি করিবে। এবং শ্রীনেহেরু সাম্প্রতিক আন্তর্জাতীয় গগনের ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে বিচরণ করিতে করিতে মাঝে মাঝে বলিয়া উঠিবেন—প্রগতি হইতেছে, একেবারে সর্ব্বত্র প্রগতি হইতেছে। প্রগতি হইতেছে বই কি! বেকারীর প্রগতি হইতেছে, ভূখার প্রগতি হইতেছে, আর্থিক অনটনের প্রগতি হইতেছে, মায় পদক পদবী বিতরণে পর্য্যন্ত প্রগতি হইতেছে! সাধে কি শ্রীনেহেরু গ্লিমস অফ দি ওয়ার্ল্ড হিষ্টরী লিখিয়াছেন?"

—জনমত (কলিকাতা)।

ধলভূমের সমস্যা

"আজ-কাল এই প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয়লাভ করিয়া যদি বিহার তথা ধলভূমের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় তাহা হইলে স্বতঃই মনে হয়, আমরা কত পশ্চাতে পড়িয়া আছি। ইংরাজ শাসনের অবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু শাসকগণের সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের অবসান ঘটে নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রকার প্রশাসনিক নির্দ্দেশের কোন প্রকার মূল্য এখানকার সরকারী কর্ম্মচারিগণ আদৌ দেন বলে মনে হয় না। সরকারী কর্ত্তব্যের নামে হীন প্রাদেশিকতার বীজ ছড়ান হইতেছে। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় পুরুলিয়ার অহিংস সত্যাগ্রহ দমনে, অশোভন ভাবে হিন্দীভাষা প্রচারের আগ্রহে, হিন্দী শিক্ষা বাবদে অযথা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দে, চাকুরীক্ষেত্রে অহিন্দীভাষীদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণে এবং ধলভূমকে হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চল বলিয়া অপপ্রচার করায়। ধলভূমকে হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চল বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও আবার নূতন করিয়া হিন্দী প্রচলন করিবার প্রয়াস কেন? বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করিবার এই কালোপাহাড়ী মনোবৃত্তি কেন? যে কোন নিরপেক্ষ বিচারক তলিয়ে দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে একটা বিরাট ও স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা এখানে চলিতেছে।"

—নবজাগরণ (জামসেদপুর)।

সরকারের গ্রহণ করা উচিত

"খাগড়া দৈহাট্টা হইতে একটি পাকা রাস্তা ঝাউখোলা কাশীমবাজার হইয়া চুনাখালির মোড় পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং সেখানে বহরমপুর লালগোলা ন্যাশনাল হাইওয়ের সহিত মিলিয়াছে। উক্ত রাস্তার অবস্থা বর্ত্তমানে চরম শোচনীয়। বহুস্থানে পুরাতন রাস্তার শোলিং-এর ইটও উঠিয়া গিয়াছে। গোগাড়ীর দাপটে পথের সর্ব্বত্র খাল-খন্দ গভীরতর হইয়াছে। বৃষ্টি হইলে যে রাস্তাটি সম্পূর্ণ চলাচল অযোগ্য হইয়া থাকে, তাহা উক্ত রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যাঁহাদের তাঁহাদের ভীষণ বর্ষার সময় না পাঠাইলে ঠিক বুঝাইতে পারা যাইবে না। রাস্তাটির তিন ভাগ বহরমপুর পৌর এলাকাভুক্ত এবং বাকী এক ভাগ সম্ভবতঃ জেলা বোর্ডের। ভাগের মা গঙ্গা পান না বলিয়া যে প্রবাদ আছে সম্ভবতঃ তাহা এই রাস্তা সম্বন্ধেও খাটে। আমরাও এই রাস্তাটির প্রতি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শুনিয়াছি জাতীয় সড়ক হইতে মুর্শিদাবাদ পৌরসভার নিকট পর্য্যন্ত রাস্তাটির জন্য রাজ্য সরকার ৭৫০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। আমাদের ধারণায় খাগড়া-চুনাখালি রাস্তাটি লালবাগের উক্ত রাস্তা অপেক্ষাও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সহরের জনসাধারণের অধিক প্রয়োজনীয় এবং গ্রাম্য এলাকার ব্যবসায়ের পক্ষে একান্ত দরকারী। অবিলম্বে উক্ত রাস্তাটিও সরকারের গ্রহণ করা উচিত।"

—মুর্শিদাবাদ সমাচার।

পাট চাষের ভবিষ্যৎ

"গত ২৯শে ও ৩০শে আগষ্ট তমলুক মহকুমা কৃষক সমিতির উদ্যোগে মদনমোহনচক গ্রামে তমলুক পাটচাষীদের এক সম্মেলন হয়। তমলুক মহকুমার পাটচাষ কেন্দ্রগুলি হইতে প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। কমরেড্ ভূপাল পাণ্ডা উহাতে সভাপতিত্ব করেন। অতঃপর ৩০শে দোবান্দী হাটে এক জনসভার মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। প্রাদেশিক কৃষক সভার সদস্য শ্রীবগলাপ্রসন্ন গুহ এই সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পাটের সর্ব্বনিম্ন দর ৩৫ টাকা বাঁধিয়া দেওয়ার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান এবং এতদুপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে সরকারী পাটক্রয়কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে উক্ত দরের সমতারক্ষা, ফাটকা বন্ধকরণ, পাটচাষিগণ পাট ধরিয়া রাখিয়া সুবিধামত দরে যাহাতে বিক্রয় করিতে পারে তজ্জন্য মণ-প্রতি ন্যায্য হারে সরকারী ঋণদান ও নূতন করিয়া পাট তদন্ত কমিটি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখান। অতঃপর চটকলে যে শ্রমিক

ছাঁটাই করিয়া উৎপাদন খরচা হ্রাসকরণের নীতি বর্ত্তমানে গ্রহণ করা হইয়াছে তিনি তাহার নিন্দা করিয়া শ্রমিক মৈত্রী দ্বারা তাহা প্রতিরোধ করিতে এবং চটকলের সমস্ত বৃটিশ পুঁজি বাজেয়াপ্ত করিয়া জাতীয়করণের দাবী তুলেন। বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের সদস্য সাদইমানী বেগ ও কমরেড ভূপাল পাণ্ডাও এই দাবীগুলিকে সমর্থন জানাইয়া সভায় বক্তৃতা করেন এবং সকলকে এই আন্দোলনে সাহায্য বা অংশ গ্রহণ করিতে আহ্বান জানান। এখন পাট তমলুকের একটি অর্থকরী কৃষি। ধান উঠার পূর্বে অনেক কৃষক এই পাটের দ্বারাই তাহাদের আর্থিক অভাব দূর করে। পাটচাষ তমলুকে যেমন ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে তেমনিই তমলুকের আর্থিক জীবনও ইহার সহিত সম্পৃক্ত হইয়া গিয়াছে। বিশেষ ভারত বিভাগের পর হইতে পূর্ব্ব-বাংলা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় এই দিক দিয়া আর্থিক নির্ভরশীলতা তমলুকের আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু গত ২।৩ বৎসর যাবৎ এই পাটের দর লইয়া সর্বত্র যেরূপ ফাটকাবাজী চলিয়াছে এবং অবাঙ্গালী মধ্যবর্ত্তী মহাজন ও এজেন্টরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে চাষীদের যেরূপ প্রবঞ্চনা আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে কৃষকদের খরচই পোষায় না বরং সঙ্কটেরই সৃষ্টি হইয়াছে। এমন কি লোকসভা ও ব্যবস্থা পরিষদে এই আতঙ্ক প্রকাশ পাইলেও সরকার কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের ভরসা দিতে পারেন নাই।"

—প্রদীপ (তমলুক)

হেড-পোষ্টাফিসে জানলা নেই ?

"আসানসোলের হেড-পোষ্টাফিসে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য জানালা মাত্র একটি কিন্তু সেখানে রেজিষ্ট্রেশন, ভি, পি, প্রভৃতি কাজ করিবার জন্য একজন মাত্র কেরাণী থাকেন। ফলে লম্বা লাইন হয় ও সকলের পক্ষে অল্প সময়ে ও সহজে কাজ করা সম্ভব হয় না। ইহা ছাড়া আসানসোল ক্রমবর্দ্ধমান সহর। এখানে তিনটি স্থানীয় পত্রিকা চলিতেছে—সুতরাং যদি একই দিনে শ'খানেক ভি, পি, অথবা ঐ প্রকারের কাজ আসে তো সাধারণের কাজ হওয়া সম্ভবপর নয়। অতএব আমরা স্থানীয় এবং পশ্চিমবঙ্গমণ্ডলের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল মহোদয়ের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সম্প্রতি হেড-পোষ্টাফিসটিকে বাড়াইবার একটি পরিকল্পনা চলিতেছে। সেই সময় ভি, পি, রেজিষ্ট্রেশন প্রভৃতির জন্য দুইটি জানালা ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।" —আসানসোল হিতৈষী।

পতাকা মুড়িয়া পড়িবে

"ছেলেমেয়েদের একদিকে যেরূপ শরীরের বল কমিয়া যাইতেছে, আর এক দিকে শুভ্র আত্মার সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া রূপালী পর্দ্দায় যৌন আবেদনমূলক চিত্র যে কিরূপ স্থান দখল করিয়াছে—সদৃষ্টান্তে সেদিনের প্রকাশিত সংবাদে দেখুন, মাত্র নয় বৎসরের সিনেমাপ্রিয় বালক তাহার বৌদিদির চারি হাজার টাকার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া

দিয়াছে। ইহা বড় ঘটনা বলিয়া প্রকাশিত। অপ্রকাশিত রেশনের কমতি দ্রব্য খরিদ হইতে বাজারের বাঁচানো পয়সা, ঘরের পুরাতন কাগজ, শিশি বোতল একই পথে গিয়াছে। জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনে প্রেক্ষাগৃহে আইন করিয়া ধূমপান বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি অপ্রাপ্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের সম্মুখে তাহাদের কচি মনের পতন সাথী যৌন আবেদনমূলক চিত্র প্রদর্শন বন্ধ করা হয় নাই। আমরা কাহারও স্বার্থের উপর কটাক্ষ করিতেছি না, জাতির ভবিষ্যতের উপর লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি অনেক নগ্ন চিত্রের প্রভাবে কু-অভ্যাস ও কু-চিন্তা সংক্রামক ব্যাধির মত সুকুমার বালক-বালিকার মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের পোষাক, ফ্যাসান, রুচি লক্ষ্য করিয়া উহার একাংশ অনুমান করা যাইবে। মধ্যবিত্ত সংসারের অভিভাবকবৃন্দ যেখানে অর্থের সন্ধানে সূর্য্যোদয় হইতে গভীর রাত্রাবধি অন্যত্র থাকিতেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের কঠোর শ্রমের শেষে বালক-বালিকাদের তত্ত্বাবধান বিরক্তিকর বলিয়া অবহেলিত হইতেছে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে জাতির কর্ণধারগণের দরবারে আমাদের আবেদন পাঠাইতেছি, ভবিষ্যৎ জাতির স্বরূপ পতাকাবাহী এই কিশোর শোভাযাত্রা হইতে উপলব্ধি করুন, নচেৎ তাঁহাদের অর্পিত পতাকার গতি জাতীয় অবনতির শেষ পৈঠায় মাথা মুড়িয়া পড়িবে।"

—বারাসাত বার্ত্তা।

গ্রন্থাগার সমস্যা

"গত ১৯শে আগষ্ট গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। কি ভাবে গ্রন্থাগারগুলির সংরক্ষণ, উন্নতিসাধন ও শিক্ষার বাহন হিসাবে জনসাধারণের কল্যাণ সাধন হয় তাহারই তাৎপর্য্য অনুধাবন করাই গ্রন্থাগার দিবস পালনের আসল উদ্দেশ্য। গত দুই বৎসর এই সকল অঞ্চলে কিছু উৎসাহ, উদ্দীপনা দেখা গিয়াছিল কিন্তু এই বৎসর কোথাও গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। যাহাই হউক, সমালোচনা দ্বারা গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে প্রাণ-সঞ্চার করা সম্ভব নয়। গ্রন্থাগারের আর্থিক উন্নতি, গ্রন্থাগারিকের নিয়মিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগারের সম্বন্ধে আগ্রহের সৃষ্টি করা গণতান্ত্রিক সরকারের অন্যতম কর্তব্য বলিয়া মনে হয়। রাজ্যসরকার একটি কার্য্যকরী সংস্থা গঠন করিয়া গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা করিলে সমীচীন হইবে। কলিকাতা কর্পোরেশন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতেছেন এবং যাহারা গ্রন্থাগারের সুযোগ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক সেই মহল্লার অধিবাসীদের উপর কর ধার্য্য করিয়া আর্থিক সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করা যায় কিনা এই বিষয়ে বিল উত্থাপন করিবার জন্য আলাপ-আলোচনাও চলিতেছে। জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যাল এলাকায় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের বিশেষ কোন দায়িত্ব আছে কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত নয় কি?"

—ভারতী (রঘুনাথগঞ্জ)।

বর্দ্ধমানের বিদ্যুৎ

"বর্দ্ধমান বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের কয়েক জন পরিচালক বর্দ্ধমানে আসিয়া সহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি বিধান কি ভাবে করা যাইতে পারে সে বিষয়ে সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন। বাণী পত্রিকার প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহারা অনেক আশা-ভরসা দিলেন। নূতন সংযোগ দেওয়া বন্ধ করিবেন। নূতন ডিজেল ইঞ্জিন ক্রয় করা হইয়াছে, শীঘ্রই তাহা হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন আরম্ভ হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আলাপ-আলোচনায় আশান্বিত হইয়া সন্ধ্যায় (বৃহস্পতিবার) সংবাদ লিখিতে বসিলাম শ্রীকাঁদিবার পূর্ব্বেই বাতি নিবিয়া গেল; মন-মেজাজ বিগড়াইয়া গেল। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল ডাঃ মৈত্রের চেম্বারে বিদ্যুৎ কোম্পানীর পরিচালকবর্গ যাহা বলিয়াছিলেন তাহাকে গালভরা প্রতিশ্রুতি ভাবিয়াছিলাম। আসলে তাহারা যে রসিকতা করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারি নাই। সুইচ বন্ধ করিয়া অন্ধকার গলি কোনক্রমে অতিক্রম করিয়া বড় রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। রাস্তায় প্রচুর আলো। মহরমের মিছিল বাহির হইয়াছে।"

—বর্দ্ধমান বাণী।

সংকটের মুখে তাঁতশিল্প

"শান্তিপুর প্রধানতঃ তাঁতশিল্পের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই তাঁতশিল্প এক নিদারুণ সংকটের মুখে পড়িয়াছে। প্রায় ৭।৮ হাজার তাঁতশিল্পী ও তাঁহাদের উপর নির্ভরশীল প্রায় ৩৫ হাজার নরনারী অর্দ্ধাহারে দিন যাপন করছেন। তাহা ছাড়া শান্তিপুরের দোকানদার, শিক্ষক, ডাক্তার ও শান্তিপুরের অর্থনৈতিক উপর নির্ভরশীল আরও ৮।১০ হাজার মানুষের জীবন আজ বিপন্ন হইতে বসিয়াছে। শারদীয়া পূজার সময় ছাড়া শান্তিপুরী কাপড়ের চাহিদা বাজারে কমিয়া যায়। তাই একমাত্র পূজার সময় ছাড়া অন্য সময়ে মহাজনরা যে দরে কাপড় খরিদ করেন, সেই দরে তাঁত-মালিকদের কাপড় বিক্রয় করা ছাড়া অন্য কোন রাস্তা থাকে না। ফলে শান্তিপুরী কাপড় বিক্রয় করিয়া যে লাভ হয় তাহা মহাজনরা ছাড়া তাঁত শ্রমিকরা পায় না। এমন কি জীবনধারণের উপযোগী মজুরীও থাকে না। তাঁত শ্রমিকদের মাসিক আয় ২৫৲ টাকার উর্দ্ধে যায় না। নিম্নের হিসাবটি লক্ষ্য করিলে পরিষ্কার হইবে—সাধারণ ৮০ নং কাউণ্টের সূতার এক জোড়া শাড়ীর কাঁচা মালের দাম :—

৫ মোড়া টানা ও পোড়েন	১।৶০	হিসাবে	৮৶০
৭ ফেটী ঘাস	।০	"	১৷০
৭ ফেটি বুন্নো	।০	"	১৸০
১ ফোরা জরি			৸৶
টানা হাটা, পাকান, পেটা, পারি ইত্যাদি বাবদ			২৷০
ক্ষয় ক্ষতি ও ঘর ভাড়া বাবদ			৷০

মোট—১৪৸৶০

উপরোক্ত কাউণ্টের এক জোড়া শাড়ী প্রস্তুত করিতে সাড়ে ৫ দিন সময় লাগে। কিন্তু বর্ত্তমানে শান্তিপুরের বাজার দর ১৯৲ টাকা তাহা হইলে কাঁচা মালের দাম বাদে ৪৶০ আনার মধ্যে তাঁত মালিকদের লাভ ও তাঁত শ্রমিকদের মজুরী রহিয়াছে। এত অল্প আয়ে একটি সাধারণ মানুষের পরিবারের জীবন নির্ব্বাহ হতে পারে না! তাই শান্তিপুরের তাঁতশিল্পকে বাঁচান এখনি দরকার।"

—বর্দ্ধমানের ডাক।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

(স্থাপিত ১৩২১)
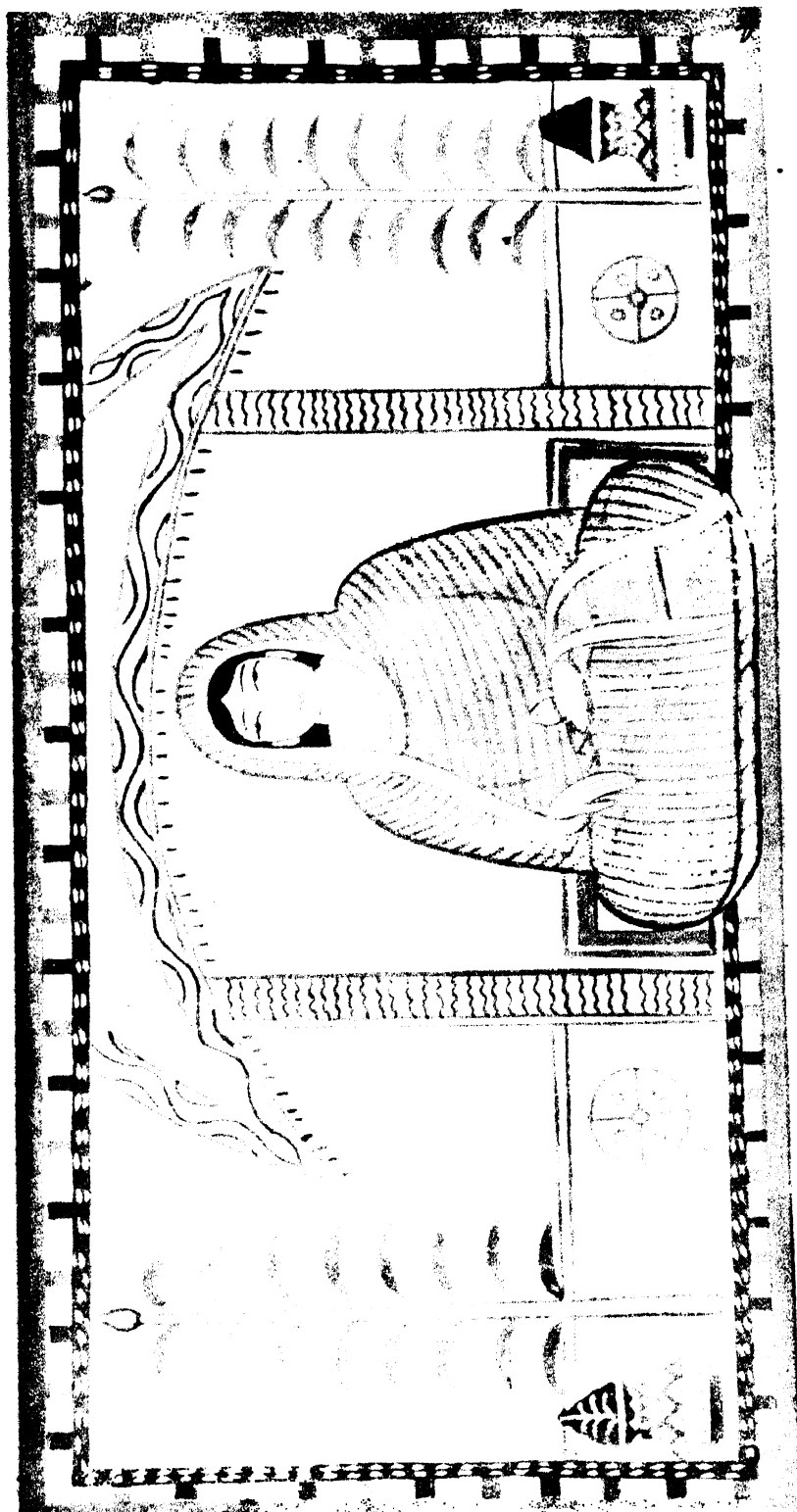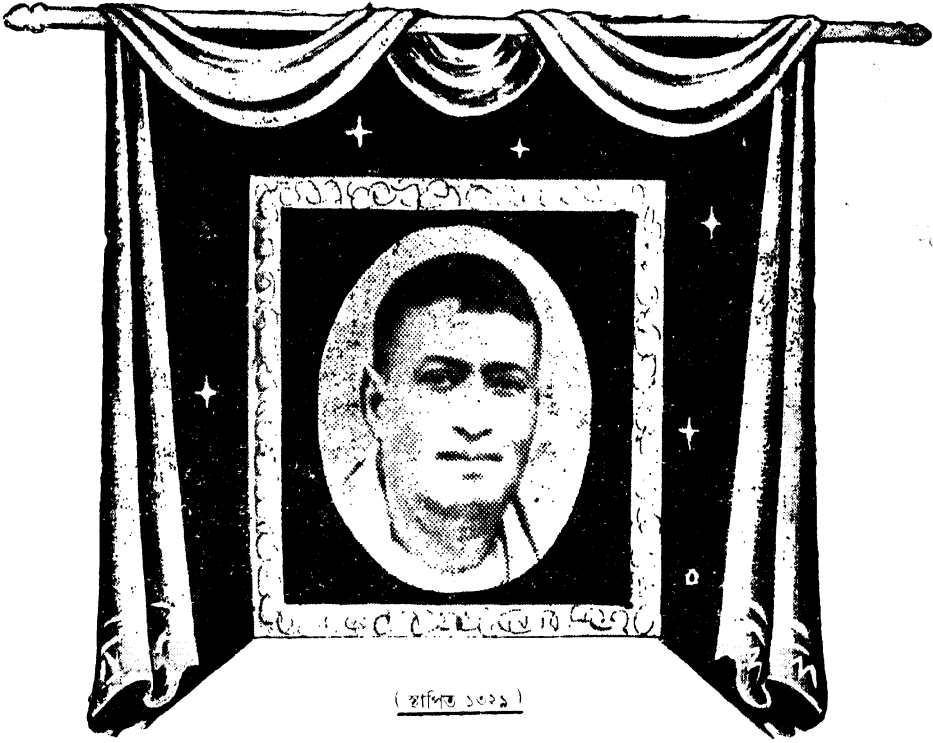
আশ্বিন, ১৩৬১ [৩৩শ বর্ষ

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। "ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে, নিষ্কাম হয়ে পূজা জপ, তপ, অনেক কর্তে কর্তে ক্রমে ভগবানের প্রতি অনুরাগ হয়। এই অনুরাগ বা রাগভক্তি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ ঈশ্বরলাভ হবে না। তাঁর উপর ভালোবাসা চাই। সংসারবুদ্ধি একেবারে চলে যাবে, আর তাঁর উপর ষোলো আনা মন হবে, তবে তাঁকে পাবে। যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালোবাসা জন্মায় ততক্ষণ ভক্তি, কাঁচা-ভক্তি। তাঁর উপর ভালোবাসা এলে তখন সেই ভক্তির নাম পাকাভক্তি। ভক্তির দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়, কিন্তু পাকাভক্তি, প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি চাই। সেই ভক্তি এলেই তাঁর উপর ভালোবাসা আসে। যেমন ছেলের মার উপর ভালোবাসা, মার ছেলের উপর ভালোবাসা, স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালোবাসা। এ ভালোবাসা, এ রাগভক্তি এলে স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-কুটুম্বের উপর সে মায়ার টান থাকে না—দয়া থাকে। আমার জিনিষ আমার জিনিস বলে সেই সকল জিনিষকে ভালোবাসার নাম মায়া। সবাইকে ভালোবাসার নাম দয়া। এ ভালোবাসা এলে, সংসার বিদেশ বোধ হয়। বিষয়-বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে দর্শন হয় না। দেশলায়ের কাঠি যদি ভিজে থাকে, হাজারো ঘষো কোনো রকমেই জ্বলবে না—কেবল একরাশ কাঠি লোকসান হয়। বিষয়াসক্ত মন—ভিজে দেশলাই।"

হিরণ্ময়ী দেবী

(সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী)

শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়

বেশী দিনের কথা নয়, বোধ করি তিন চার মাস পূর্ব্বে আমার এক প্রতিবেশী বাল্য বন্ধু সকালে এসে আমাকে বললেন মণি, আমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ী সামতাবেড়ে, কাল ভাই সেথা নে গিয়েছিলাম—শুনলাম ৺শরৎ চাটুয্যে মশায়ের বাড়ী তাদের বাড়ীর খুবই সন্নিকটে—ফলে লোভ সামলাতে পারলাম না তাঁর বাড়ীতে যাবার। তোমার এ বাড়ীতে কতদিন তাঁকে দেখেছি, ইত্যাদি। তার পর বন্ধু বললেন—'শরৎবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আমার মেয়ে দেখা করিয়ে দিলে, তিনি আমার বাড়ী বেহালায় শুনে বার বার তোমাদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন; তোমার স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরা প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে সব জানবার তাঁর কি আগ্রহ দেখলাম ভাই! তাই তোমার কাছে এসে বলে গেলাম, একবার পার তো যেও তাঁর কাছে। খুব খুসী হবেন' বন্ধুবরের কথাগুলি শুনে মন আমার আনন্দে ও দুঃখে ভরে গেল, কতদিনের কত পুরাণো স্মৃতি মনের মাঝে এসে সব উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগলো। দাদার কাছে কতবার সেখানে গিয়েছি—বৌদির হাতের রান্না, খেতের ধানের মোটা চালের মিষ্টি ভাত, সামনের পুকুরের সদ্য ধরা রুই মাছের ঝোল, ভাজা কত খেয়েছি। কত স্নেহ, কত মিষ্টি ব্যবহারই না তাঁর কাছে কতবার কতরকমে পেয়েছি—সেই সব কথাই মনে পড়তে লাগলো। মনে পড়লো, এবং কেন জানিনা, একটা কথা আমার মনে একান্ত করে চেপে বসে রয়েছে ও আমার বহুসময় মনে পড়ে। কতদিনের কথা, তবুও যেন কত না আমার মনে রয়েছে। হঠাৎ একদিন দাদার একখানা চিঠি পেলাম—লিখেছেন 'মণি, বড় বৌয়ের খুব অসুখ, এ যাত্রায় বাঁচবেন কিনা জানি না—পারতো একবার এসো'। চিঠি পড়ে মন বড় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো, তখনই ছুটে গেলাম। দেউলটিতে নেমে সামতাবেড়ে যখন পৌছালাম, তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হতে চলেছে। যাঁরা সামতাবেড়ে গিয়েছেন তাঁরাই জানেন যে, দেউলটি থেকে সামতাবেড়ে যেতে রাস্তা দুর্গম না হলেও মাঠের উপর দিয়ে ২।৩ মাইল পদব্রজে যাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম—কিন্তু শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা যেখানে ঝুটা নয়—সেখানে কষ্টকে আনন্দ বলেই গ্রহণ করতে হয় এবং কষ্টও যেন মনে থাকে না। দেখলাম দাদার বাড়ীর একদিকের একতলার নীচের একটি লম্বা খোলা দালানে একখানি ইজিচেয়ারে দাদা শুয়ে আছেন—বাঁদিকের লম্বা হাতলে বাঁ পায়ের উপর ডান পাটি দিয়ে। পাশেই গড়গড়াতে তামাক সাজা, হাতে নল, কিন্তু টানছেন না। বোধ হোলো চোখ বুজেই আছেন। নির্জ্জন সন্ধ্যা, ও তার চেয়েও নির্জ্জন পরিবেশ—ঠিক পাশেই রূপনারায়ণ নদী বয়ে যাচ্ছে, রূপালি চাঁদের আলো তার উপর পড়েছে। বোধ করি সময়টা ফাল্গুনের শেষাশেষি—চারিদিক গাছপালায় ঘেরা, পাশ দিয়ে একটি সরু রাস্তা নদীর ধার দিয়ে চলে গেছে, অদূরে রাস্তার পাশেই দাদার মধ্যম ভ্রাতা প্রভাসচন্দ্রের (বেদানন্দ স্বামী) সমাধি, ইনি খুব কম বয়সেই রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছিলেন। একটি হ্যারিকেন আলো খানিকটা দূরে টিম্ টিম্ করে জ্বলছে। আস্তে আস্তে গিয়ে দাদার পায়ের ধূলা নিতেই তাঁর সম্বিত ফিরে এলো—বুঝলাম এবার যে সত্যিই তিনি চোখ বুজিয়ে কোন ভাবনার রাজ্যে গিয়েছিলেন। পাশেই একটি ছোটো বেতের মোড়া ছিল, বসলাম। বললেন, 'মণি তুমি আজই যে আসবে তা আমি আশা করি নি—তবে আমার চিঠি পেয়ে যে তুমি নিশ্চয়ই আসবে, এটা আমি সুনিশ্চিত করেই জানতাম। চলো উপরে, খুব করুণ ভাবেই বললেন, বড় বৌয়ের খুব বাড়াবাড়ি অসুখ মণি, ডবল নিউমোনিয়া—বোধ করি এবার আর তাঁকে ধরে রাখতে পারলাম না। বুকে পিটে সর্দ্দি বসে গেছে, জ্বরও খুব বেশী—অচৈতন্য অবস্থাতেই রয়েছেন। এখানকার ডাক্তার দেখছেন। দেখলাম দাদার দু'চোখ জলে ভরে গিয়েছে, কথাগুলিও বেশ ভারী ভারী। আবার বললেন, সব সময়েই প্রার্থনা জানাই উনি আমার আগে যেন যান, কারণ আমি আগে চলে গেলে বড় বৌ এক দিনও বাঁচতে পারবেন না, এ আমি খুব ভাল করেই জানি। তাঁর কথাগুলি শুনে আমারও চোখে জল এলো। দরদী শরৎচন্দ্র, একথা শুধু তোমারই মনের কথা, তুমিই শুধু ভালবাসার এ রূপ দিতে পার। দুজনে উপরের ঘরে এসে দেখলাম বড় তক্তপোষের উপর বিছানায় বৌ'দি শুয়ে আছেন, অর্দ্ধ-অচৈতন্য অবস্থা। পাশে বসে একটি তরুণী মাথায় হাওয়া করছেন। ঘরে একটি মাত্র হ্যারিকেন আলো। দাদা নিস্তব্ধ বৌদি'র মাথার কাছটিতে এসে দাঁড়ালেন আমাকে পাশে নিয়ে। মাথা নীচু করে একবার বললেন—বড়বৌ মণি এসেছে। কোনো জবাব পাওয়া গেল না। কপালে হাত দিয়ে বললেন—এখনও বেশ জ্বর ভোগ কচ্ছে। বললেন মেয়েটিকে—দুর্গা কতক্ষণ আগে জ্বর দেখেছ, ওষুধ ক'বার খাওয়ানো হোলো ইত্যাদি। নীরবে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, একটিও কথা বলবার শক্তি যেন আমার লোপ পেয়েছিল। পরে দাদার সঙ্গেই নীচে নেমে এলাম। কতদিন হয়ে গেলো তবুও আজও সে দৃশ্য আমার চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে ভাসছে, যেন সে দিনের কথা!

আর একদিনের কথা কেন জানি না আমার মন থেকে কিছুতেই যেন নড়তে চায় না এবং যখনই মনে হয়, মন আমার দুঃখে ভরে যায়। দুর্দ্দিনের সেই দারুণ দিনটিতে যেদিন দাদাকে দাহ করে শ্মশান থেকে ফিরে এলাম অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়ীতে—বেলা তখন বোধ করি পড়ে এসেছে, উপরে গেলাম, কান্নার শতধা রোলে সমস্ত বাড়ীখানি নিরানন্দ পুরীতে পর্য্যবসিত হয়েছে—আমার স্ত্রী বৌ'দিকে বুকে নিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ও দুবোনে চোখের

জলে সারা হচ্ছেন। আমাকে দেখেই বৌ'দি ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে সে কী বুকফাটা কান্না, বললেন—মণি আমাকে একাটি রেখে দিয়ে তোমার দাদা কেমন করে চলে গেলেন বলো, আরো কতই না তাঁর সেই শীতের অপরাহ্ণে পাষাণভাঙ্গা বিলাপ। মনে ভাসলো সেই পূর্ব্বের স্মৃতি, যেদিন সেই সামতাবেড়ের বাড়ীর নির্জ্জন সন্ধ্যায় বাড়াবাড়ি অসুখে বৌদিদি শয্যাগত, আমাকে পাশে নিয়ে দাদা দাঁড়িয়ে। মনে পড়লো সেই দরদী শরৎচন্দ্রের মুখের কথা "বরঞ্চ উনি আমার আগে যান, কারণ আমি চলে গেলে বড় বৌ একদিনও বাঁচবেন না।' তাই ভাবি অনেক সময় যে এ সংসারে মানুষ সবই সহ্য করতে পারে এবং কি যে সহ্য করতে পারে না, তা এতদিনের আমার এত বিচিত্র অভিজ্ঞতাতে আজও জানতে পারলাম না।

আমার প্রতিবেশী বন্ধুবরের কথা শোনবার পর কেন জানি না মনটা বৌদিদির কাছে যাবার জন্য আমাকে পাগল করে তুললো। কতদিন তাকে দেখিনি, দাদা আজ নেই—তিনি আমাকে আজও স্মরণ করেছেন, এই সব চিন্তা আমাকে যেন বিক্ষিপ্ত করে তুললো। বালীগঞ্জের বাড়ীতে গিয়ে জানলাম বৌদি দেশে গৃহ-দেবতার পূজার্চ্চনা নিয়েই আছেন, এখন কলকাতায় আসবেন না। দেখেছিলাম বটে সেখানে সেই এক ধারে ছোট্ট ঘরখানিতে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি। ভারী সুন্দর মূর্ত্তি দুটি। দাদাও নিত্য সেখানে বসে পূজা করছেন তাও নিজের চোখেই দেখে এসেছি। বর্ষাকাল, সেই তিন মাইল রাস্তা ভেঙ্গে মাঠ পেরিয়ে যাওয়া অতি কষ্টসাধ্য, কাজেই বৌদিদির কলকাতা আসা পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করেই রইলাম। এখানে এলেই তাঁর কাছে গিয়ে দুটি পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে বসবো তাঁর একান্ত কাছটিতে, সামনাসামনি বসে দুজনে গল্প করবো—সে শুধু দাদার গল্প, আর কোনো গল্প নয়। মানুষের মনই অন্তর্য্যামী, এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই। কেন জানি না হঠাৎ একদিন মনে হোলো একবার বালীগঞ্জের বাড়ীতে টেলিফোন করে জিজ্ঞাসা করি বৌদিদির কথা। প্রকাশের মেয়ে মুকুল টেলিফোন ধরেছিলো—আমার গলা শুনে খুবই আনন্দিত হল, বললে বড় মা এখানে এখন আছেন, শুনে কত আনন্দ যে পেলাম তা জানাতে পারি না। পরদিনই যাবো বৌদিকে জানাতে বলেছিলাম। পরদিনই অর্থাৎ ৪ঠা সেপ্টেম্বর শনিবার বিকেল ৫টার সময় গেলাম দাদার বাড়ী ২৪ নং অশ্বিনীদত্ত রোড, শরৎ-স্মৃতি-মন্দিরে। সারাদিন আকাশে মেঘের ঘনঘটা, তারি মাঝে বৃষ্টির খেলা চলছিলো, বিকেলের দিকটা আকাশ অনেক পরিষ্কার হয়ে এলো। চাকরকে দিয়ে খবর দিলাম, মুকুল নেমে এলো—বাড়ীতে ঢুকেই দাদার সেই বড় ঘরখানিতে গিয়ে দেখলাম, সাজ-সরঞ্জাম প্রায় সেই সবই আছে, খানকয়েক দামী সোফা কেবল আরো স্থান পেয়েছে। দাদার সেই ইজিচেয়ারখানি, সেই ফরাস বিছানা, সবই রয়েছে। মনটা কেমন যেন বিমনা হয়ে গেল, মনে হোলো দাদা উপরেই আছেন, এলেন বলে। কতদিন দাদা থাকতে এঘরে এসেছি, কত গল্প করেছি, কত হাসি, কত রকমের কত গল্পই না পাশটিতে বসে শুনেছি এই ঘরখানিতে। মুকুল আমাকে বসতে বলে বৌদিদিকে খবর দিতে গেলো। পরক্ষণেই বৌদিদি এলেন। কতদিন পরে দেখলাম, তাঁর পায়ের ধূলা কী শ্রদ্ধার সঙ্গেই না মাথায় নিলাম। বৌদিদি একখানি সোফায় বসলেন—আমি ঠিক সামনেটিতে বসলাম। দেখলাম বেশ প্রাচীন হয়ে গেছেন। তার বয়স তো প্রায় সত্তর বছর হোলো, খুবই দুর্ব্বল হয়ে গেছেন। tumour এ বহুদিন কষ্ট পাচ্ছেন। দাদা জীবিত থাকতেই নাকি এ অসুখ হয়েছিলো—কিন্তু কোনো দিন দাদার মুখে শুনি নি বা বাহ্যতঃ কিছু লক্ষ্যও করিনি। আজই প্রথম শুনলাম, কিন্তু হার্ট খুব দুর্ব্বল বলে ডাক্তার অস্ত্রোপচার করতে সাহস করেননি। রোগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে—এখন তো আর অপারেশনের কথা ওঠেই না। পা দুখানি বড়ই দুর্ব্বল হয়ে গেছে বললেন, লক্ষ্যও করলাম চলতে ফিরতে বেশ কষ্ট হয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার সকল কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। ক্রমে কথার পর কথা চলতে লাগলো—বললাম বৌদি পূজার সময় এখানে থাকবেন তো, তা হ'লে সেই কটা দিন আমার গৃহে আপনাকে নিয়ে গিয়ে আমরা সবাই আপনার একান্ত কাছটিতে থাকতে পারি। চোখ দুটি ছলছল করে বৌদি আমায় বললেন, 'না ভাই, ও সময়টা আমি দেশেই যাবো। বললেন, মহানবমীর দিন প্রকাশ আমাদের ছেড়ে চলে গেছে ওসময়টা আমি কিছুতেই এখানে থাকতে পারি না। পূজা শেষ হলে আবার আসবো। সঙ্গে সঙ্গেই আরো করুণ সুরে বললেন 'মণি, তিন জনের কি এক জনেরও থাকতে নেই ?' দেয়ালের দিকে দাদার বড় ছবিখানির দিকে চেয়ে বললেন 'তোমার দাদা কেমন করে আমাকে ছেড়ে রয়েছেন বলতে পারো ভাই, আমাকে যে বড় ভালোবাসতেন।' বৌদিকে বললাম, সেই বহুদিন পূর্ব্বের দাদার সেই ক'টি কথা—বৌদিদির ডবল নিউমোনিয়ার সময় যা বলেছিলেন। দুর্গার সে কী সেবা বৌদিদিকে, তা নিজের চোখে দেখেছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম 'বৌদি সেই মেয়েটি যিনি আপনাকে অসুখের সময় সেবা করে' সারিয়ে তুলেছিলেন, তিনি কোথায় ? বললেন, তার নাম দুর্গা, বেচারা কম বয়সে বিধবা হয়ে আমাদের কাছেই ছিলো, শেষে উনিই এক দিন জানাশুনা একটি ভালো ছেলের সঙ্গে তার বিবাহ দেন। সে এখন সুখেই ঘর সংসার করছে। এখন তারা লক্ষ্ণৌএ থাকে। মনে পড়লো আর এক দিনের কথা, আজ কত দিন হয়ে গেলো। আমি বরাবরের মতন হাওড়ায় দাদাকে আনতে গিয়েছি গাড়ী নিয়ে—তখন তিনি আমার বেহালার বাড়ীতে প্রায়ই এসে দীর্ঘদিন থাকতেন—বালীগঞ্জের বাড়ী তখনও হয় নি। শুধু জমিটা Improvment Trust থেকে Instalment System এ কেনা ছিল। পরে আমি ও স্বর্গীয় হরেন্দ্রলাল ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় ঐ বাড়ী নির্ম্মাণ হয়। ট্রেণ থেকে নেমে দাদাকে নিয়ে প্লাটফরম দিয়ে আসছি, বেলা প্রায় ২টা—দেখি হঠাৎ ভীড়ের মাঝে একটি সুদর্শন যুবক দাদার পায়ের ধূলা মাথায় নিলেন, দাদাও দেখলাম এক গাল হেসে তার কাঁধে হাত দিয়ে একটু সরে গেলেন, আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। দুজনে অনেক কথাবার্ত্তা হোলো। পরে ছেলেটি ট্রেণের দিকে চলে গেলেন। ফিরে আসতে দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দাদা কিছু যদি মনে না করেন তো জিজ্ঞাসা করি, ছেলেটি কে ?' দাদার অপূর্ব্ব হাসি দেখবার যাদের সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরাই শুধু জানেন যে, সে হাসির মাঝে কত মধু মেশানো থাকতো, বললেন, ওহে মণি, ছেলেটি লক্ষ্ণৌতে ভালো কাজ করে। তুমি তো আমার বাড়ীতে দুর্গাকে দেখেছ, তারই

সঙ্গে ঐ ছেলেটির বিয়ের সব ঠিক করে দিয়েছি। দুর্গা লক্ষ্ণৌ গেছে কিন্তু কেমন করে হোক্ সেখানে একটু কাণা-ঘুষা হচ্ছে মেয়েটিকে নিয়ে, বিধবা বিবাহ সেখানকার পুরুতরা দেবেন না। তাই ছেলেটি কলকাতায় এসেছিলো বিয়ের মন্তর পড়াবার জন্যে পুরুত ঠাকুর ঠিক করতে। মোটা দক্ষিণা কবুল করে কালীঘাটে একজনকে জোগাড়ও হয়েছে, ছেলেটির সঙ্গে তিনিও লক্ষ্ণৌ আজই যাচ্ছেন, তিনিই বিয়ে দেবেন। দু'জনে হাসতে হাসতে গাড়ীতে উঠলাম। সেই দুর্গা! পরমেশ্বর তাঁদের মঙ্গল করুণ। আজ দিদির মুখে তাঁদের সত্যিই মঙ্গল শুনে বড়ই আনন্দ পেলাম।

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম বৌ'দি দাদা আপনাকে চিঠি পত্তর লিখতেন, মুখখানি একটু ঘুরিয়ে বললেন, "তোমার দাদা তো তাই আমাকে ছেড়ে বড় একটা বেশী দিন থাকতেন না, তা ছাড়া আমি মুখ্যু মানুষ লেখাপড়া তো জানি না, শুধু নামটাই লিখতে পারি—না, চিঠি কখনও লেখেন নি।" মুকুল রহস্য করে বললে, কেন বড় মা, সেই যে তোমাকে চিঠি দিয়েছিলেন আমরা শুনেছি। বৌ'দি শুধু একটু হাসলেন অর্থাৎ মেয়ে রহস্য করছে মাত্র। বৌ'দিকে বললাম শুনেছি অনেক পুরানো কাগজপত্তর দাদার আপনার কাছে আছে, দু'একখানা যদি দেন তো লোকসমাজে সেগুলা প্রকাশ করি। তিনি জবাব দেবার আগেই মুকুল ও অমু (প্রকাশের ছেলে মেয়ে) বললেন যে, যা-কিছু ঐ ধরণের কাগজ পত্তর ছিল তা সবই বৌ'দি' অপ্রয়োজনীয় মনে করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। বৌ'দিদি বললেন, তা ছাড়া অনেক সব তাঁর অবর্ত্তমানে চুরিও হয়ে গেছে। সেই প্রসঙ্গে বললেন যে, একবার কলকাতা থেকে জনকয়েক বয়স্কা মেয়ে এসেছিলো আমাদের গ্রামের বাড়ীতে ও আমার সঙ্গে আলাপ করতে। বেশ আজকালকার শিক্ষিতা মেয়ে বলেই মনে হোলো কথায় বার্ত্তায় ও বেশভূষায়। উপরের ঘরেই তাঁদের বসালাম। তাঁদের চলে যাবার পরে লক্ষ্য করলাম তোমার বাবার (স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ রায়) সঙ্গে ওঁর একসঙ্গে যে ছবিখানি ছিল—সেটি আর সেখানে নেই, আরো বললেন বেশ রাগ করেই যে, তাঁদের দেখতে পেলে খুব বকতাম। বেশ বুঝলাম ছবিখানি খোয়া যাওয়াতে বৌদিদি খুবই দুঃখিত হয়েছেন। মুকুল আমাকে বললে যে দাদার অনেক জামা পর্য্যন্ত লোকজনকে তিনি দিয়েছেন। দাদা চীনাকোট পরতেন একথা যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁরাই জানেন। সামান্য পরিচিত কেহ এসে বললেন দাদার গায়ের মাপের জামা একবার দরকার দরজিকে ঐ রকম জামা করতে দেবেন তিনি। তখনই তা দিলেন কিন্তু ফেরৎ আর পেলেন না। এমনি কত রকমে কত জিনিষ খোয়া গিয়েছে শুনলাম। বৌ'দি' বললেন মণি মৃত্যুঞ্জয়কে চিনতে তো? জানতাম বটে এই লোকটি দাদার কাছে অনেক সময় থাকতেন। বললেন দেশের বাড়ীতে আমি তখন একাটি থাকি, হঠাৎ একদিন মৃত্যুঞ্জয় এসে আমার পা দু'টা জড়িয়ে ধরে কী কান্না, পা কিছুতেই ছাড়বে না। আমি ভাই পা ধরে কান্না কিছুতেই সহ্য করতে পারি না, বললে যে, অমু (অমল") তাকে কি এক ব্যাপারে জেলে দেবে; তিনি একছত্র লিখে দিলেই আর তার জেল হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা বললে সে ও শেষ পর্য্যন্ত একখানা সাদা কাগজে আমার সই করিয়ে নিয়ে গেল যেন অমুকে আমি জানাচ্ছি যে, মৃত্যুঞ্জয়কে জেলে দিও না। আহা, সত্যিই তো বেচারা জেলে যাবে আমি লিখে দিলে যদি সে রক্ষা পায় তো কেন দোবো না। আমার কাছে তখন জনাকয়েক ছোট জাতের মেয়ে বসেছিলো, তারা সবই দেখছিলো ও শুনছিলো। মৃত্যুঞ্জয় চলে যাবার পর তারা সকলেই আমাকে বিরক্ত হয়ে বললে—বড় মা আপনি সাদা কাগজে সই দিলেন কেন? ওঁর যদি কোনো বদ মতলব থাকে? অনেক পরে অবশ্য বুঝলাম যে, কাজটা হয়তো ভালো হয়নি আমার।" অমু কাছেই আমাদের বসেছিলো, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে মৃত্যুঞ্জয় সেই সাদা সই করা কাগজে খান কয়েক দাদার অপ্রকাশিত গ্রন্থের স্বত্ব বাজারে কয়েক দিনের মধ্যেই পাঁচ শত টাকায় বিক্রী করেছিলো। এখন বুঝলাম যে, সেই অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলির পাণ্ডুলিপি ইতিপূর্ব্বেই চলে গেছে। বৌদি' শুধু চুপ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে নিজের এই নির্ব্বুদ্ধিতার কথাগুলি অমুর মুখ থেকে শুনলেন। সংসারে সবাই এ রকম ভুল করেন না জানি, কিন্তু তিনি তো আর সকলের মতন হৃদয় রাখেন না। মৃত্যুঞ্জয়ের পায়ে জড়িয়ে কান্না, ও তার জেল হবে এই দুটি মাত্র অস্ত্র এই মহিয়সী সরল হৃদয়া নারীর হৃদয়ে গভীর ভাবেই চেপে বসেছিলো। কোন্‌টা উচিত, কোন্‌টা নয়—এ বিচার করবার মতন হৃদয়বৃত্তি এই অবস্থায় তাঁর নেই ও ছিল না।

কেন জানি না, এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে একটি অসঙ্গত প্রশ্ন বৌদিকে জিজ্ঞাসা করলাম। আচ্ছা বৌদি, আপনার বিয়ে কোথায় হয়েছিলো, রেঙ্গুনে না এখানে? এই প্রসঙ্গে পাঠকদের জানাতে চাই যে, আমি নিজে বহু দিন পূর্ব্বে একবার দাদাকে ঐ একই প্রশ্ন করে ছিলাম, তাতে তিনি বলেছিলেন যে, মেদিনীপুরে যখন তিনি ছিলেন তখন এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের এক অসুন্দরী অরক্ষণীয়া কন্যাকে বিবাহ করে তিনি ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হতে মুক্ত করেছিলেন। এর বেশী কিছু আমিও জিজ্ঞাসা করিনি, তিনিও বলেননি। আজকাল নানা কাগজে শরৎচন্দ্রপ্রসঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মন্তব্য পড়ি, তাই এইটুকু লেখবার লোভ সামলাতে পারলাম না, এখন পাঠক-সমাজ নিজেরাই এর সত্যাসত্য নির্ণয় করে নেবেন। বৌদি বললেন যে, তিনি মেদিনীপুরের মেয়ে ও দাদা তাঁকে সেখানেই বিবাহ করেছিলেন, তার পর আমাকে নিয়ে তিনি রেঙ্গুনে যান। বললেন, আমার বাবা বড় গরীব ছিলেন, তোমার দাদা বিয়ের পর রেঙ্গুন থেকে নিয়মিত প্রতি মাসে বাবাকে মণি-অর্ডার করে সাহায্য পাঠাতেন। আমি লেখাপড়া জানি না, বাবার হাতের সই-করা টাকা পাওয়ার রসিদ যখন ফিরে যেতো রেঙ্গুনে, তখনই জানতাম যে, বাবা আমার ভালো আছেন—এমন অনেক দিন হয়েছিলো। তার পর একদিন টাকার রসিদ না এসে টাকা সমেত মণি-অর্ডার তোমার দাদার নামে ফিরে এলো। সেইদিনই জানলাম বাবা আমার আর ইহজগতে নেই। সেদিন বেশ মনে পড়ে আজও, কী কান্নাই না কেঁদেছিলাম আমি। ১৪ বছরের মেয়ে বিয়ে করে তোমার দাদা এনেছিলেন—এই দীর্ঘ দিন আর বাবাকে দেখিনি; শুধু আশা করে বসে থাকতাম বাবার হাতের সই-করা রসিদখানির জন্য। সইটাই তাঁর বার বার দেখতাম—হ্যাঁ বাবারই সই, তিনি ভালই আছেন, কত আনন্দই না পেতাম। তার পর তাও একদিন শেষ হয়ে গেল। কত দিনের

কথা, কিন্তু স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম বৌদির চোখের কোণে জল আজও টল্ টল্ করছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। বৌদিদিও দেখলাম, বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন—অসুস্থ শরীর, প্রাচীন হয়েছেন—দেহ খুবই দুর্ব্বল। হার্টের অসুখ, কাজেই আর বেশীক্ষণ থাকা ভালো নয়—ওঠার উপক্রম করে শেষ কথা জিজ্ঞাসা করলাম—বৌদি, দাদার তো অনেক ছবি আমার কাছে আছে। আপনার ছবি যদি থাকে তো একখানা দিন আমায়, কোথাও তো আপনার ছবি দেখিনি। বৌদিদি একটু হাসলেন, বললেন, মণি, আমার কোনো ছবি নেই। তোমার দাদা একবার রেঙ্গুনে একখানা ছবি তোলাবার সব ঠিক করেছিলেন—সব ঠিক। ছবিওয়ালাও এসেছেন ছবি তুলতে, তোমার দাদা চেয়ারে বসে, আমি তাঁর ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে। এমন সময় হঠাৎ আমার পেটে ব্যথা ধরলো, বোধ হয় অম্বলের ব্যথা—আর ছবি তোলা হোলো না ভাই। সেই অবধি আর কোনো ছবি তোলবার চেষ্টা হয়নি। উঠে পড়লাম। বৌদিদির দুটি পায়ের ধুলা নিয়ে মাথায় দিলাম। এই সুদীর্ঘ জীবনে অনেক সময় প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় অনেকবার পায়ের ধূলা অনেকেরই নিতে হয়েছে, কিন্তু বিশ্বাস করবেন, এমন গভীর শ্রদ্ধাভরে পায়ের ধুলো মাথায় কারো কোনোদিন নেবার ইচ্ছা হয়নি। বৌদি' বললেন 'আবার এসো মণি'। নিশ্চয়ই আসবো দিদি বলে গাড়ীতে এলাম—অমু ও মুকুল দুজনাই আমাকে গাড়ী পর্য্যন্ত এসে সেদিনের মত বিদায় দিল।

* * *

গাড়ীতে বসে আসতে আসতে এই কথাটাই শুধু বার বার মনে হোলো যে, তোমার সঙ্গে ক'টা কথাই বা কইলাম কিন্তু কত কথাই না জানলাম। মনে হোলো—তুমিই সেই রসস্রষ্টা শরৎচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী, তোমাকেই কল্পনা করে শরৎচন্দ্রের অগণিত পাঠক ও ভক্তবৃন্দ কতরূপেই না তোমাকে আজও মনশ্চক্ষে এখনও শ্রদ্ধাভরে দেখছেন তাঁরা। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস শরৎচন্দ্র তোমার মাঝেই রাজলক্ষ্মী, অন্নদা দিদি, অভয়া ও বিন্দুর রূপ দেখেছেন। হবেও বা! মানুষের বাইরের রূপটা তো সব নয়—অন্তরের রূপই তার সর্ব্বস্ব! হে মহিমময়ী নারী, তোমাকে শতকোটি প্রণাম।

বেদনার বার্ত্তা

…'পল্লী-সমাজ' ব'লে আমার একখানা ছোট বই আছে। তার বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল ব'লে আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগও করেছিলেন যে, এত বড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে বিধবা কেউ আর থাকবে না। মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না, প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই ইহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর একটা দিকও ত আছে। ইহার প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি মন্দ হয়, হিন্দু-সমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই। রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালে, কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দু-সমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হ'ল এই যে, এত বড় দু'টি মহাপ্রাণ নর-নারী এ জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হ'য়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্ত্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি, ত তার বেশী আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়। রমার ব্যর্থ জীবনের মত এ রচনা বর্ত্তমানে ব্যর্থ হ'তে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দ্দোষীর এত বড় শাস্তিভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হবে না, এ কথা আমি নিশ্চয় জানি। এ বিশ্বাস না থাকলে সাহিত্য-সেবীর কলম সেইখানেই সেদিন বন্ধ হ'য়ে যেত।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কৈলাস মানস-সরোবর যাত্রা

শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী

মানুষ তীর্থে যায় নানা প্রকার উদ্দেশ্য লইয়া। কেহ যায় পুণ্য সঞ্চয় জন্য, কেহ পাপক্ষালন জন্য, কেহ সাধু-সঙ্গ পাইবার জন্য, কেহ বা কেবল দেশভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য।

আমি যে কি উদ্দেশ্য লইয়া এই দুর্গম তীর্থে আমার ৬৯ বৎসর বয়সে জীর্ণ ও অপটু দেহে যাওয়া স্থির করিয়া ফেলিলাম, তাহা নিজেই ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। প্রতি বৎসর ৺শারদীয়া পূজার অবকাশে কয়েক জন উকিল-বন্ধুর সহিত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করা একটা নেশায় দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। বন্ধুরা ক্রমশঃ সরিয়া গেলেও নিজেকে এই প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে পারি নাই। ১৯৩৩ সালে আমাদের দলের কয়েক জনের সহিত ৺কৈলাস ধাম মানস-সরোবর যাওয়া স্থির করিয়া আবশ্যকীয় জিনিষপত্রও সংগ্রহ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার এক ভ্রাতার সাংঘাতিক পীড়া ও পরে মৃত্যুর দরুণ আমার যাওয়া হয় নাই। মনে একটু ক্ষোভ থাকিয়া যায়। ইহার অনেক দিন পরে স্বর্গীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৺কৈলাস মানস-সরোবর ভ্রমণ করিয়া আলোক-চিত্র লইয়া আসেন। সেই চিত্র আমি দেখি, সেও বহু বৎসর হইয়া গেল। পরে শ্রীযুক্ত বৃদ্ধদেব বসুর অলৌকিক উপায়ে স্বাস্থ্য পুনর্লাভের কথাগুলি এবং তাঁহার আনীত বদরী কেদার ও মানস সরোবর আলোকচিত্র দেখি। এই চিত্র নানা বর্ণে রঞ্জিত থাকায় অতিশয় মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল। ঐ সকল চিত্র দেখিয়া স্বচক্ষে ঐ সকল স্থানের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। সেও অনেক দিন হইয়া গেল। ৺বদরী-কেদারে আমার সহযাত্রী শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত বৎসর কৈলাস মানস-সরোবর দেখিয়া ফিরিয়া আসেন। তাঁহার নিকট বিবরণ শুনিয়া যাওয়ার সঙ্কল্প করি ও সঙ্গী অন্বেষণ করিতে থাকি। ইতিমধ্যে সংবাদ পাই শোভাবাজার রাজবাটীর ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দেব এক সাধুর সহিত কৈলাস গত বৎসরই গিয়াছিলেন। এই সাধু শ্রীমৎ প্রণবানন্দজী ৩০।৩২ বার কৈলাস গিয়াছেন ও ২ বৎসর শীতকালেও তিব্বতে বাস করিয়াছেন এবং ৺কৈলাস মানস-সরোবর সম্বন্ধে বহু আবশ্যকীয় তথ্য ও বিবরণ সম্বলিত একখানি প্রামাণ্য ইংরাজী গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আরও শুনিতে পাই যে, তিনি শীঘ্র কলিকাতায় আসিবেন। স্বামিজী কলিকাতায় আসিলে শোভাবাজার রাজবাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তথায় আমার অন্য সহযাত্রী হাওড়া মিউনিসিপালিটীর কমিশনার ডাক্তার নিতাইচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত পরিচয় হয়। পরে স্বামিজীর সহিত বহুবাজারে এবং আমার বাটীতেও সাক্ষাৎ হয়, এবং স্বামিজীর প্রণীত Kailash and Manas-sarowar নামক পুস্তকখানি ক্রয় করিয়া উহা হইতে আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ করি। স্বামিজী আমাদের সহিত যাইতে স্বীকৃত হন। এমন একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি সঙ্গে থাকিলে যাত্রার কোনও বিপদ বা বিঘ্ন হইবে না মনে করিয়া আশ্বস্ত হই। সমস্ত বিশ্লেষণ করিয়া মনে হয় দেশ-ভ্রমণই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তবে সাধুসঙ্গ পাইবার প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা যে ছিল না, একথা বলিতে পারি না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি "With Mystics and Magicians in Tibbet" by Mrs. Alexandra Neil গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া তিব্বতী সাধুদের অলৌকিক শক্তির বিষয় অবগত হই। মনে হইয়াছিল তিব্বতে গেলে ঐরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন সাধু দেখিতে পাইলেও পাইতে পারি।

কার্য্যতঃ কিন্তু স্বামী প্রণবানন্দজীর সাহায্য লাভ বা তিব্বতী সাধু দর্শন ভাগ্যে ঘটে নাই। আমরা আলমোড়ায় ৫ই জুন তারিখে পৌঁছি। তথায় আরও ২।৩ দল বাঙ্গালী যাত্রী কেহ পূর্ব্বে, কেহ আমাদের পরে, পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে ১০ই জুন কৈলাস অভিমুখে রওনা হইয়া যান। স্বামিজীর সহিত যাইব বলিয়া আমরা অপেক্ষা করিতেছিলাম কিন্তু স্বামিজী বাধ্য বাধ্যবাধকতায় ... তারিখের পূর্ব্বে যাইতে পারিবেন না জানাইয়া দেওয়ায় আমরা নিজেরাই আলমোড়া হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের যাহা বাকী ছিল তাহা কিনিয়া লই এবং ঘোড়া ঠিক করিয়া ১১ই জুন ৺কৈলাসের দিকে স্বামিজীর জন্য অপেক্ষা না করিয়াই যাত্রা করি। যাত্রাপথে স্বামিজীর সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই। তিব্বতে প্রবেশ করিয়া আমরা দুই স্থানে মাত্র গোম্ফায় অবস্থান করি। অন্যত্র আমরা তাঁবুতে ছিলাম। প্রথম মানস-সরোবরের উপর অবস্থিত গোসল গোম্ফাতে থাকি। এখানে কার্য্যকারক ব্যতীত সাধক বা যোগী কোন লামা ছিলেন না। শেষ তীর্থ-পুরী গোম্ফায় ছিলাম। তথায় কয়েক জন শিক্ষার্থী ও এক জন পরিচারক ব্যতীত কোন সাধককে দেখি নাই। ইহা সত্ত্বেও কিন্তু মনে হয় ৺কৈলাস মানস-সরোবর যাত্রা ব্যর্থ হয় নাই। অহমিকা চিরদিনই আমাদের নিজ অর্থ সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিতে প্ররোচিত করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা যে সকল সময় ফলপ্রসূ হয় না, ভগবৎ কৃপার ও অনুগ্রহের প্রয়োজন হয়, এই যাত্রায় তাহা বিশেষ ভাবে বুঝিয়াছি এবং নিজের অক্ষমতা ও অপটুতা উপলব্ধি করিয়া বিপৎকালে ভগবানের উপর নির্ভর করিতে শিখিয়াছি। ফিরিয়া আসিবার সময় গার্ব্বিয়াং পৌঁছিয়া সংবাদ পাই যে, কুখ্যাত নিরপানির পথ, স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং ডাক ও যাত্রী চলাচল ব্যাহত হইয়াছে। পথ মেরামত হইবে মনে করিয়া, আমরা ৭ দিন গার্ব্বিয়াংএ অবস্থান করি ও পথ সম্বন্ধে সংবাদ লইতে থাকি। জানিতে পারি যে, পথ ৭ দিনেও মেরামত হয় নাই। যে স্থানে রাস্তা ভাঙ্গিয়াছে তথায় দড়ির সাহায্যে লোক উপরে উঠিতেছে এবং ভারী বোঝা ২।৩ ভাগ করিয়া উঠাইতেছে। পাহাড়ী যাত্রীরা যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে ও ডাক-হরকরা প্রায় ।০ অর্দ্ধ মণ ওজনের Postal Bag লইয়া আসিতেছে ইহা দেখি। অন্য লোকে যাইতেছে সুতরাং আমরাও কোন ক্রমে

যাইতে পারিব, এইরূপ মনে করিয়া বাহির হইয়া পড়ি। আমাদের দ্বিতীয় দিনে ঐ স্থানে পৌঁছিবার কথা ; কিন্তু অসুস্থতা ও বৃষ্টির জন্য পৌঁছিতে আরও দুই দিন বিলম্ব হয়। অর্থাৎ রাস্তা ভাঙ্গিবার চতুর্দ্দশ দিনে আমরা তথায় উপস্থিত হই। ফিরিবার পথে ভাঙ্গা রাস্তার যে অংশ প্রথমে পড়ে, তাহার কোন প্রকার মেরামত হয় নাই দেখিলাম। বস্তুতঃ সেখানে কোনও রাস্তা নাই। যেখানে ধ্বস নামিয়াছে, তাহার অপর প্রান্তে খাড়া পাহাড়। আমাদের মত সমতলবাসী কোন ক্রমে সেখানে উঠিতে পারে না। আমাদের পাহাড়ী কুলিরা পর্ব্বতচারী পশুর ন্যায় পাহাড়ের খাঁজে ও গাত্রে পা রাখিয়া ও হাত দিয়া পাহাড় ধরিয়া কোন ক্রমে উপরে উঠিয়া গেল এবং সেখান হইতে আন্দাজ ১৫ ফুট লম্বা পশমের (বোঝা বহিবার) দড়ি ফেলিয়া দিল, তাহা কিন্তু নিম্নে পৌঁছিলনা। তখন নীচের একজন কুলি উপরে আর একটি দড়ি ছুড়িয়া দিতে লাগিল এবং ৩।৪ বার ছুড়িবার পর উপরের লোক উহা ধরিয়া ফেলিয়া নিজ দড়িতে বাঁধিয়া নামাইয়া দিল। ঐ দড়ি আমাদের বক্ষে বন্ধন করতঃ টানিয়া উঠাইল। আমরাও হস্ত ও পদ সাহায্যে পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া কোনরূপে উপরে উঠিলাম। উপরে উঠিয়া দেখি সেখানেও পথ নাই। পাহাড়ের ধার দিয়া ৪।৫ ইঞ্চি মাত্র প্রশস্ত পথ চলিয়া প্রায় ২ ফারলঙ বা ¼ মাইল গেলে সাবেক রাস্তায় পড়িলাম। এই ৪।৫ ইঞ্চি পাহাড়ের কিনারায় পথের প্রায় ২০০০ ফুট অব্যবহিত নিম্নে খরস্রোতা কালী নদী প্রবাহিতা, এবং অসাবধানতা বশতঃ কোনরূপে পদস্খলন হইলে সলিল-সমাধি অনিবার্য্য। এই সময়ে নিজের অক্ষমতা স্মরণ করিয়া ইষ্ট দেবতাকে ডাকিয়াছিলাম ও তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিয়াছিলাম। বিপজ্জনক পথ অতিক্রম করিবার পর উপলব্ধি করিয়াছি যে, "আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী, চতুর্ব্বিধ লোক আমাকে ভজনা করে" শ্রীমদ্ভগবদ্‌-গীতার এই ভগবদ্‌-বাক্য একান্ত সত্য। পূর্ব্বে আর পাঁচটি বিষয়চিন্তার মধ্যে একবার ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিলে মনে করিতাম যে ভগবানকে ডাকিলাম ; সে ডাকা যে কিছুই নয়, "ডাকার মত যদি পারতাম ডাকতে তাহলে কি লুকিয়ে থাকতে পারতে" এই কথা যে যথার্থ—ইহা নিরাপদে ঐ বিপদসঙ্কুল পথ উত্তীর্ণ হওয়ার পর বুঝিয়াছি। আর বুঝিয়াছি যে, ভগবৎকৃপা ব্যতীত আমার পক্ষে ঐরূপ ভাবে উপরে উঠা, এবং অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ পাহাড়ের কিনারার উপর দিয়া আসা কিছুতেই সম্ভব হইত না।

আর এক লাভ হইয়াছে—আমরা শিক্ষালাভ করিয়া মার্জ্জিত-রুচি ও সভ্য হইয়াছি। আমাদের ব্যবহার অশিক্ষিতদের অপেক্ষা অনেক ভাল—এই ধারণাও দূরীভূত হইয়াছে। কুমায়ুনের পার্ব্বত্য অধিবাসীদের যে সততা ও সহৃদয়তা দেখিয়াছি, তাহা আমাদের অনুকরণীয়। ইহারা এত দরিদ্র যে একমুষ্টি শক্তুর জন্য ভিক্ষা করে। কিন্তু পরের পয়সা পথে পড়িয়া থাকিলেও লইবে না। একদিন আমাদের ঘরের ভিতর একটি এক-আনি পাওয়া গেল, সেখানে একটি কুলি বসিয়াছিল ; ঐ আনিটি তাহার মনে করিয়া দিতে গেলে, সে নিজের পকেট দেখিয়া বলিল যে, আমার পয়সা ত ঠিক আছে, ইহা আমার নহে। ফিরিবার সময় এক জন কুলিকে তাহার প্রাপ্য অপেক্ষা ২৲ টাকা বেশী হিসাবের ভুলে দেওয়া হয়, পুনরায় সে ব্যক্তি আসিলে ঐ কথা বলায় সে উহা স্বীকার করিয়া টাকা ফেরৎ দিয়া গেল।

কৈলাস-যাত্রীদের এই অঞ্চলের অধিবাসীরা অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। ৺কৈলাস হইতে ফিরিবার পথে যখন মেলার শ্রীযুক্ত প্রতাপ সিং মান সিং ভ্রাতৃদ্বয়ের দোকানে পৌঁছি, শ্রীযুক্ত প্রতাপ সিং প্রত্যেক যাত্রীকে ঘোলের সরবৎ পান করিতে দিলেন ও তাহার জন্য কোনও দাম লইলেন না। আমার লাঠি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে শুনিয়া তিনি আমাকে নিজের ব্যবহার্য্য লাঠিটি দিলেন, কোনও আপত্তি শুনিলেন না।

আমাদের যাইবার এবং আসিবার পথে বহু স্থানে আমাদিগকে দোকানের দাওয়ায় বা উপরের ঘরে রাত্রে আশ্রয় লইতে হইয়াছে। তজ্জন্য অধিকাংশ সময়ে ভাড়া দিতে হয় নাই। যাইবার পথে দুই স্থানে এবং ফিরিবার পথে দুইস্থানে স্কুল-মাষ্টারের অনুমতি লইয়া স্কুল-গৃহের বারান্দায়ও রাত্রি যাপন করি। যাইবার সময় স্কুলের ছুটি ছিল। আসিবার পথে স্কুল বসিবার পূর্ব্বে আমাদের চলিয়া আসিতে হইত। আমার অসুস্থতা দেখিয়া বুদির মাষ্টার মহাশয় স্কুল চলিতে থাকা-কালেই বারান্দার একধারে আমাদিগকে থাকিতে দিয়াছিলেন।

ফিরিবার পথে আমার সঙ্গীদের অনেক পূর্ব্বে আমি আশকোট পৌঁছি। সঙ্গীরা পদব্রজে উচ্চ চড়াই ভাঙ্গিয়া পৌঁছিতে দেরী হয়। এক দোকানদার আমাকে সাদরে তাহার দোকানে বসিতে অনুমতি দেন। আমরা কৈলাস হইতে আসিতেছি শুনিয়া সাগ্রহে আমাদের নিকট পথের গল্প শুনেন। চলিয়া আসিবার সময় তিনি ২টা নাসপাতি, উপস্থিত অন্য একজন ভদ্রলোক ২টা আম্রফল এবং ঐ গ্রামবাসী, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বর্ম্মা প্রত্যাগত এক সিপাহী, তাহার বাগান হইতে পাড়িয়া আনিয়া ৪টি কাঁচা আম উপহার দেন ; একজন আম্রবিক্রেতার নিকট হইতে আমরা কয়েকটি আম কিনি। তাহার নিকট বিক্রয়ার্থ আড়ুফল ছিল ; সে আমাদিগকে ১২টি আড়ু খাইতে দেয়।

এই যাত্রার আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। আমাদের দেশে শ্রমিক পিতার পুত্রেরাও যদি ইংরাজী লেখা পড়া শেখে, তাহারা কোন দৈহিক পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে চাহে না। ঐরূপ কাজ ছোট কাজ, ভদ্র লোকের করণীয় নহে, এই ধারণা আমাদের শিক্ষিত সমাজে বদ্ধমূল, এবং তথাকথিত অশিক্ষিতদের মধ্যেও এই ধারণা প্রসার লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। শুনিয়াছি আমেরিকায় শিক্ষার্থীরা স্কুল-কলেজের অবসর সময়ে শ্রমসাধ্য কার্য্যে ব্রতী হইয়া অর্থোপার্জ্জনকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন না অনেকেই ক্ষেত্রে কৃষি-শ্রমিকের কাজ বা হোটেলের পরিচারকের কাজ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশেও ছেলেরা যে এইরূপ সংদৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে, ইহা দেখিলাম এই যাত্রা-পথে ধারচুলা পৌঁছিয়া গার্ব্বিয়াং যাইবার জন্য আমাদের মাল বাহী কুলী সংগ্রহ করিতে হয়। ৭জন কুলির মধ্যে ৭ জন এক ব্রাহ্ম পরিবারের। তাহাদের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ ১৫ বৎসর বয়স্ক বালক সে উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর ছাত্র, স্কুলের অবকাশ সময়ে দুঃস্থ সংসারের জন্য পরিশ্রম করিয়া কিছু অর্থোপার্জ্জন করিতে

আসিয়াছে। এ কাজ তাহার পক্ষে নূতন, ইহা বুঝিলাম দ্বিতীয় দিনে। প্রথম হইতেই তাহার ভ্রাতারা তাহার বোঝাটি লঘু করিয়া দিয়াছিল কিন্তু দ্বিতীয় দিনে অতি উচ্চ পাহাড়ে চড়াই উঠিতে কিছুদূর গিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, তাহার ভ্রাতারা তাহার বোঝা হইতে আরও কিছু নিজেরা লইয়া ভার লাঘব করিয়া দেয়, শেষ পর্য্যন্ত সে হাস্যমুখেই বোঝা লইয়া গিয়াছিল। তাহার প্রফুল্ল আনন আমার মনশ্চক্ষে এখনও ভাসিতেছে। কবে আমাদের দেশের ছাত্রগণ এই অশিক্ষিত সমাজের বালকের আদর্শ গ্রহণ করিয়া দৈহিক শ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন ছোটকাজ, এই মনোবৃত্তি ত্যাগ করিবে, এবং নিজেদের সংসারের ও বাংলাদেশের কল্যাণের জন্য শ্রমসাধ্য কাজে আত্মনিয়োগ করিতে শিখিবে ?

আমরা কিছু লেখাপড়া' শিখিয়া নিজেদের তথাকথিত অশিক্ষিত লোকদের অপেক্ষা যে উচ্চস্তরের এবং উন্নত মনে করি, এই যাত্রার ফলে সেই ভ্রান্তি সম্পূর্ণরূপে না হউক আংশিক ভাবে নিরসন হইয়াছে। ইহাও কম লাভ নহে। আমার মনে হয়, মনের সঙ্কীর্ণতাই পাপ। মন যাহাতে প্রসার লাভ করে তাহাই পুণ্য। এই দিক দিয়া বিচার করিলে এই যাত্রায় আমাদের পুণ্য লাভ হইয়াছে। পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি বলে বা পূর্ব্ব কর্ম্ম ফলে মানুষের দেব-দর্শন হয় শুনিয়াছি। যাত্রার প্রাক্কালে ৺কৈলাস বা মানস সরোবরে দেব-দর্শন হইতে পারে, এরূপ সম্ভাবনা মনের কোণে স্থান পায় নাই ; সুতরাং সে দিক দিয়া যাত্রা ব্যর্থ হয় নাই।

৺জগন্ময়ী মাতা এবং শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর যে বিশ্বরূপ ধরিয়া সর্ব্বদাই আমাদের সমক্ষে প্রকাশমান, এই সত্যের ধারণা আমরা সহরবাসী করিতে পারি না। জনমানবহীন মরুকান্তারে, উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-শৃঙ্গে, ভৈরব গর্জ্জনকারী জল-প্রপাতে, অমিত বিক্রমা খরস্রোতা নদীপ্রবাহে, চিরতুষারাবৃত হিমালয়ে শ্বাপদ সঙ্কুল গহন বনে, সুদূরপ্রসারী জলরাশিতে, এবং তিব্বতের গাঢ়নীল বর্ণ আকাশে বিরাটের বিশ্বরূপের কিছু অভাস পাওয়া যায় মাত্র। এই সকলই আমাদের যাত্রা পথে আমরা পাইয়াছি, এবং স্থান-মাহাত্ম্য বশতঃই হউক বা অন্য কারণে হউক, তৎকালে সাময়িক ভাবে বিষয় চিন্তা, স্বজন এবং স্বগৃহের চিন্তা পরিহার করিতে পারিয়াছি। অর্জ্জুনকে ভগবান দিব্য দৃষ্টি দিলে তবে তিনি বিশ্বরূপ দেখিতে সমর্থ হন, সে দিব্য দৃষ্টি অনেক পুণ্য ফলে লাভ হয়, তাহা আমাদের হইবার নহে ও হয় নাই। তবে মনে হয় প্রবেশিকা হিসাবে কিছুক্ষণের জন্যও মন যে সংসার-চিন্তা হইতে সরিয়া আসিয়াছিল, তাহার সার্থকতা কম নহে।

জীব বা জড় যাহাতেই হউক, সৌন্দর্য্য মাত্রই চিরসুন্দরের অভিব্যক্তি ; মনকে আকর্ষণ করিয়া সংসার-চিন্তা হইতে সরাইয়া লইবার ক্ষমতা তাহার আছে। ৺কৈলাস যাত্রার পথে ঘাসে ও কাঁটা গাছে নানাবর্ণের ফুলের বিচিত্র শোভা, ৺কৈলাস পর্ব্বতের ললাটে তুষার-ধবল ও কৃষ্ণবর্ণের ত্রিপুণ্ডক-রেখা ও নিম্নভাগে তুষারমধ্যে সমান্তরাল কৃষ্ণবর্ণ রেখাগুলি, (যাহা রাবণ রাজার ৺কৈলাসকে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টার নিদর্শন বলিয়া খ্যাত) মানস সরোবরের এবং রাক্ষসতালের পরিবর্ত্তনশীল বর্ণ-বৈচিত্র্য এবং রঙের খেলা নবাগতের চিত্তহরণ করে। ৺কৈলাস পর্ব্বত এবং মানস-সরোবর ও রাক্ষসতাল প্রথম দর্শনে মন যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইয়াছিল এবং পার্থিব চিন্তা ভুলিয়া এক স্বপ্নরাজ্যে চলিয়া গিয়াছিলাম। দেবতাকে দেখি নাই, তাঁহার রূপের কথা বলিতে পারি না, যদি তিনি অরূপ না হন, মনে হয় তাঁহার রূপের ছায়া এই স্থানের নৈসর্গিক বর্ণ-বৈচিত্র্যে দেখিয়াছি।

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, ৺কৈলাসে মন্দির আছে কিনা ও হরগৌরীর বিগ্রহ আছে কিনা ? বৌদ্ধ গোম্ফা ব্যতীত অন্য কোনও মন্দির তথায় নাই এবং হরগৌরীর কোন বিগ্রহ নাই, তবে বিশ্বেশ্বর ভূপৃষ্ঠে স্থাণুরূপে এই পর্ব্বতাকারে অবস্থান করিতেছেন, এইরূপ কল্পনা করা আদৌ কষ্টসাধ্য নহে।

মানস-সরোবরে পদ্ম আছে কিনা, হংস আছে কিনা, উহাতে স্নান করা যায় কিনা, একথাও অনেকে জিজ্ঞাসা করেন। মানস-সরোবরের একাংশে পঙ্ক দেখিয়াছি কিন্তু পঙ্কজ কোনস্থানে দেখি নাই। স্বচ্ছ অংশে হরিদ্বর্ণের শৈবালও দেখিয়াছি, কোন প্রকার জলজ পুষ্প দেখি নাই। স্বর্ণবর্ণ পক্ষযুক্ত হংস এবং অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের হংস দেখিয়াছি, ইহারা সকলেই বেশ উড়িতে পারে। মানস-সরোবরে স্নান আমি দুই দিন করিয়াছি, জল ঠাণ্ডা বটে কিন্তু তুষার-শীতল নহে। স্নান করা যায়, তাহাতে হাত পায় খিল ধরে না। অবশ্য বেশী দূর জলে যাই নাই। ৺কৈলাস পরিক্রমা কালে তৃতীয় দিনে আমরা আকাশে এক বিচিত্র রামধনুর প্রকাশ দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হই। পূর্ব্ব দিকে সূর্য্য কিছু দূর উঠিয়াছেন, এমন সময় সূর্য্য হইতে অল্প দূরে এক রামধনু-গোলক আবির্ভূত হইল, দেখিতে সপ্তবর্ণে রঞ্জিত একটি গোল বলের মত। ঐ গোলক হইতে রশ্মি-ছটা ৺কৈলাস পর্ব্বতের দিকে প্রসারিত। আমরা এবং আরও যে সকল যাত্রী উপস্থিত ছিলেন, কেহ কখনও এইরূপ রামধনু দেখি নাই। উহা শ্রীশ্রী৺কৈলাস-বিভূতি বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম।

আধুনিক জনপদবাসীর পক্ষে স্বাভাবিক পরিবেশে অরণ্যচারী পশুর অবস্থান ও বিচরণ দেখা একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। ৺কৈলাস যাত্রার পথে স্বাভাবিক পরিবেশে মৃগযূথ ও বন্য অশ্ব, শশক ও ইন্দুর দেখিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছিল। কৈলাস পরিক্রমা কালে যখন আমরা নিয়ান্দ্রি গোম্ফার তলদেশে তাঁবু ফেলিয়াছিলাম, নদীর অপর পারে বহু মৃগ পর্ব্বতের সানুদেশে বিচরণ করিতেছে দেখিতে পাই। প্রথমতঃ তাহারা আমাদের দেখে নাই, দেখিতে পাইবা মাত্র ছুটিয়া উপরে উঠিয়া গেল। তীর্থ-পুরী যাইবার পথে এক স্থানে কতকগুলি বন্য অশ্ব দেখি, তাহারা আমাদের দেখিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া দাঁড়াইল, পরে আমরা নিকটবর্ত্তী হইয়া এক জন শব্দ করিলে, তাহারা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দৌড়াইয়া চলিয়া গেল। যাত্রা সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কথা বলিলাম। বারান্তরে যাত্রার দিন-পঞ্জী ও আবশ্যকীয় তথ্যসমূহ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো আঠারো

কিন্তু হাজরা একেবারে শুকনো কাঠ। অথচ দালালি জ্ঞান টনটনে।

ঠাকুরের দেশের লোক, বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। হঠাৎ কি খেয়াল হয়েছে, চলে এসেছে সংসার ছেড়ে। আমি ছাড়ব বললেই তো সে ছাড়ে না! তাই ঠাকুরের ঘরের পূবের বারান্দায় বসে মালা ফেরায় বটে কিন্তু মন পড়ে থাকে বাড়িঘরে। হাজার টাকা দেনা, শোধ হবে কি করে? বাড়িতে সামান্য যে জমি, তা দিয়ে স্ত্রী-পুত্রের পেট চলতে পারে কিন্তু নগদ টাকা জুটবে কোথায়? তাই মালা জপে আর মিটির-মিটির করে তাকায় যদি মিলে যায় কোনো শিষ্যচেলা। যদি ভক্তিভরে মুক্ত করে ঋণভার।

এক নম্বরের তার্কিক। ঠাকুর যত বলেন তর্জন-গর্জনে হবেনা, হাজরা তত তেড়ে ফুঁড়ে ওঠে। বলে, 'আমাকে বলছ কি, তুমিও তো ধনীর ছেলে দেখে সুন্দর ছেলে দেখে ভাব করো, ভালোবাসো।'

নরেনের কথা বলছে বুঝি! নরেন আবার হাজরার 'ফেরেণ্ড'। ওরে নরেনের নুন দিয়ে ভাত খাবার পয়সা জোটেনা। ওকে দেখলে জগৎ ভুল হয়ে যায়।

সবাইকে কেবল পাটোয়ারি বুদ্ধির মন্ত্র দেবে। সাধন করো তো সকাম সাধন। সব মেহনতের মজুরি আছে, তার সব চেয়ে যে কষ্টের কাজ—এই সব জপ তপ আসন-শাসন—এর বেলায় ফক্কিকার! চলবেনা এ ফাঁকিবাজি। রোদে পুড়তে-পুড়তে যেতে পারবনা ফাঁকায়-ফাঁকায়।

সুখ ধনে নয়, মনে। সে কথা কে শোনে!

কেবল অহঙ্কার! এত জপ করলাম! ঠায় বসে এত ডাকলাম রুদ্ধনিশ্বাসে। আমার হবেনা তো হবে কার!

হবার মধ্যে, বেরিয়ে যেতে হল দক্ষিণেশ্বর থেকে। কথায়ই আছে, বড় বাড়লে ঝড়ে ভাঙে। কিন্তু বেরিয়ে যাবে কোথায়? আবার এদিকেই উসখুস।

'হাজরা এখন মানছে।' বললে নরেন। 'তার অহঙ্কার হয়েছিল—'

'ও কথা বিশ্বাস করো না। দক্ষিণেশ্বরে ফের আসবার জন্যে বলছে অমনি।'

'কি করে বুঝলেন?'

'সে আমি বেশ বুঝেছি।' হাসলেন ঠাকুর। ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নরেনের মতে হাজরা খুব ভালো লোক।'

'একশো বার।' নরেন জোর দিয়ে বললে।

'কেন? এই যে এত সব শুনলি। দেখলি—'

'তা হোক গে। দোষ কি একেবারে নেই? আছে, তবে অল্প। গুণই বেশি।'

ঠাকুরকে সায় দিতে হল। 'হ্যাঁ, নিষ্ঠা আছে বটে।'

তবে আর কি। যদি একটা কিছু থাকে, টেনে নাও। যদি অভিমুখী হয়, সাধ্য কি তুমি মুখ ফেরাও। আর কিছু না থাক নিয়তস্থিতি তো আছে। স্থিতি থেকেই প্রীতি আসবে একদিন।

আর কি করা! নরেন যখন বলেছে, হাত বাড়িয়ে টেনে নিতে হল হাজরাকে।

'হাজরা একটি কম নয়।' প্রাণকৃষ্ণকে বলছেন ঠাকুর। 'যদি এখানে বড় দরগা হয় তবে হাজরা ছোট দরগা।'

কিন্তু দোষের মধ্যে, পরনিন্দায় পঞ্চমুখ। আর বড্ড আচারী। তা ছাড়া একটু পেটুক।

নবতের কাছে দেখা। বললেন তাকে ঠাকুর, 'শোনো। বেশি নেয়োনা। আর শুচিবাই ছেড়ে দাও। আচার যতটুকু করবার ততটুকু করবে। বেশি বাড়াবাড়ি ভালো নয়।'

'আর?'

'কারু নিন্দা করো না, পোকাটিরও না।' অগাধ স্নেহস্বরে বললেন ঠাকুর, 'যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে তেমনি এও বলবে, যেন কারু নিন্দা না করি।'

নিন্দা করে আনন্দ, নিন্দা না করে আনন্দ। কোন্ আনন্দ বেশি? কোন আনন্দ অম্লান?

'কিন্তু প্রার্থনা করলে তিনি কি শুনবেন?'

'নির্ঘাৎ শুনবেন। যদি ডাকটি ঠিক হয়, আন্তরিক হয়। ও দেশে একজনের স্ত্রীর খুব অসুখ হয়েছিল। কে বললে, সারবে না। তাই শুনে লোকটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। অজ্ঞান হয় আর কি! এমন কে হচ্ছে ঈশ্বরের জন্যে?'

কি আশ্চর্য, হাজরা হঠাৎ ঠাকুরের পায়ের ধুলো নিল।

'এ আবার কি!' অত্যন্ত কুণ্ঠিত হলেন ঠাকুর।

'যাঁর ছায়ায় আছি তাঁর পায়ের ধুলো নেব না?'

না, না, তুমি নেবে কেন? আমি নেব। তুমি শুধু ঈশ্বরকে তুষ্ট কর। শাখা-প্রশাখায় জল দিতে হয় না, মূলে জল দিলেই বৃক্ষ তুষ্ট হয়। তেমনি মূলে জল দাও।

দ্রৌপদীর হাঁড়ির শাক খেয়ে কৃষ্ণ যেই বললেন তৃপ্ত হয়েছি তখন আর সকলেও তৃপ্ত হল। ঢেউ-ঢেউ উঠল চারদিকে। তার আগে নয়।

সুতরাং তাঁকে খুশি করো। তাঁর আনন্দেই আর-সকলে আনন্দিত। তাঁর সমর্থনেই আর-সকলের সমর্থন।

'তাই সংসারে যেতে জ্ঞানীর ভয় কি?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'মশাই, জ্ঞান হলে তো?' মহিমাচরণ টিপ্পনী কাটল।

ঠাকুর পরিহাস করে বললেন, 'হাজরার সবই হয়েছে, তবে একটু সংসারে মন আছে, এই যা। তা কি আর করা, ছেলেরা রয়েছে, জমি-টমি রয়েছে, ধার রয়েছে—উপায় কি!'

'তাহলে আর জ্ঞান হল কোথায়?' মহিমাচরণ আবার ফোড়ন দিল।

'না গো, তুমি জানো না।' সস্মিতমুখে ঠাকুর বললেন, 'সব্বাই হাজরার নাম করে। বলে রাসমণির ঠাকুরবাড়িতে হাজরা বলে যে আছে, সেই হচ্ছে একটা লোক। লোকের মত লোক।'

হাজরা মুখ খুলল। বললে, 'তা কেন? আপনি হচ্ছেন নিরুপম, আপনার উপমা নেই, তাই কেউ বুঝতে পারে না আপনাকে।'

'তবেই বুঝতে পারছ নিরুপমকে দিয়ে কোনো কাজ হয় না।'

'সে কি মশাই?' মহিমাচরণ গর্জে উঠল: 'হাজরা কি জানে? আপনি যেমনি বলবেন তেমনি শুনবে ও।'

'তা কেন? ওকে জিগগেস করে দেখ না! ও আমায় স্পষ্ট বলে দিয়েছে, তোমার সঙ্গে আমার লেনাদেনা নেই।'

'তাই নাকি? ভারি তার্কিক তো!'

'শুধু তাই নয়, আমায় আবার শিক্ষা দেয় মাঝে মাঝে।'

সবাই হেসে উঠল। চুপ করে হাজরা বসে আছে এক কোণে। 'কেন দেব না? আমার কি কিছুই বক্তব্য নেই? থাকতে পারে না? বেশ তো, এস, তর্ক করি।'

কিন্তু তর্ক ঠাকুরের পোষায় না। তর্ক করতে গিয়ে গালাগাল দিয়ে বসলেন হাজরাকে। তার পর শুতে গেলেন মশারির মধ্যে। শুয়ে কি শান্তি আছে? তর্কের ঝোঁকে কি কটু কথা বলেছেন, হয়তো মনে ব্যথা পেয়েছে হাজরা, সেই ভেবে অস্বস্তি। তার পর আবার চলে এসেছেন মশারির বাইরে। বাইরে এসে হঠাৎ প্রণাম করে বসলেন হাজরাকে।

তোমাকে না মানি কিন্তু তোমার নিষ্ঠাকে প্রণাম। প্রণাম তোমার বাক্‌শক্তিকে। গালাগালিতেও যে তুমি অবিচলিত থাকো, প্রণাম তোমার সেই আঘাত-বিজয়ী প্রতিজ্ঞাকে।

'শুয়েছি, আবার কি বলেছি মনে করে বেরিয়ে এসে হাজরাকে প্রণাম করে যাই—তবে হয়।'

কিন্তু এততেও হাজরার হল না। ছাড়তে পারল না দালালি। বৈধীভক্তির দেশাচার। কামনা কণ্টকিত ফলাকাঙ্ক্ষা।

মায়ের কাছে বসেও মালা জপ করবে। এ ? হীনবুদ্ধি! যে এখানে আসবে তারই চৈতন্য হবে একবারে চৈতন্যে হবে। তার আবার কিসের মালাজপ তার শুধু রাগভক্তি। তার শুধু রঞ্জন-অঞ্জন।

গোলোকধাম খেলা হচ্ছে। মাষ্টার, কিশোরী লাটু আর হাজরা। চারজন খেলোয়াড়।

হঠাৎ ঠাকুর এসে দাঁড়ালেন এক পাশে। কী ব্যাপার? কত দূর?

মাষ্টা আর কিশোরীর ঘুঁটি উঠে গেল।

'ধন্য তোমরা দু ভাই।' উল্লাস করে উঠলেন ঠাকুর। শুধু তাই? নমস্কার করলেন দু ভাইকে। 'কেন করবনা? ওরা জয়ী হয়েছে। ওদের জয়ের মধ্যে যে ঈশ্বরের করুণা।

কাকে না নমস্কার করেছেন।

পঞ্চবটীতে এক সাধু এসেছে। যেন মূর্তিমান দুর্বাসা। যাকে তাকে গাল দেয়, শাপ দেয়, মারতে আসে। যখন-তখন, কারণে-অকারণে। ক্রোধে একেবারে নগ্ন-অগ্নি।

'হিঁয়া আগ মিলেগা?' হুঙ্কার দিয়ে উঠল সাধু।

হাত জোড় করে সাধুকে ঠাকুর নমস্কার করলেন। একবার নয় বহুবার। যতক্ষণ সাধু ছিল ততক্ষণই রইলেন করজোড়ে। নীরব বিনতিতে।

আগুন নিয়ে প্রসন্নমনে চলে গেল সাধু। কাউকে শাপমন্যি করলেনা। তেড়ে এলনা পায়ের খড়ম নিয়ে।

সাধু চলে গেলে ভবনাথ বললে হাসতে-হাসতে: 'আপনার সাধুর উপর কী ভক্তি!'

'ওরে তমোমুখ নারায়ণ। যাদের তমোগুণ তাদের এই রকম করে প্রসন্ন করতে হয়।' বললেন ঠাকুর, 'আর এ তো সাধু।'

খেলা দেখছেন ঠাকুর। ওরে, হাজরার কী হল আবার!

কী হল!

চেয়ে ছাখ, হাজরার ঘুঁটি আবার নরকে পড়েছে। সকলে হেসে উঠল হো-হো করে।

লাটুর কী অবস্থা! সাত-চিৎ ঢেলেছে লাটু। এক চালে মুক্তি। এক লাফে উল্লঙ্ঘন। সংসারঘর থেকে একেবারে ব্রহ্মলোক। ধেই-ধেই করে নাচতে লাগল লাটু।

'এর একটা মানে আছে।' বললেন ঠাকুর, 'অহঙ্কারের উত্থান নেই, আর ঠিক লোকের সর্বত্র জয়। হাজরার বড় অহঙ্কার, হয়েছিল তাই তার পতন আর লেটো হচ্ছে ঠিক লোক, তাই তার ঊর্ধ্বগতি। ঈশ্বরের এমনও আছে যে ঠিক লোকের কখনো কোথাও তিনি অপমান করেন না। সর্বত্র জিতিয়ে দেন।'

তবে কি হাজরা ঠিক লোক নয়?

নইলে তাকে রাখা গেল না কেন?

এমনিতে থাকত নিজের খেয়ালে কিছু এসে যেত না। উলটে ঠাকুরের বিরুদ্ধতা করতে লাগল। ঠাকুর তখন ভবতারিণীকে বললেন, 'মা, হাজরা যদি মেকি হয়, ওকে সরিয়ে দে এখান থেকে।'

কদিন পরে সরে গেল হাজরা। কিন্তু নরেন তাকে ছেড়ে দেবে না সহজে। বললে, 'কিন্তু, এক কথা। বলো, মৃত্যুকালে ওর ইষ্ট দর্শন হবে।'

ঠাকুর চোখ তুলে তাকালেন নরেনের দিকে।

বন্ধুর জন্যে আবার অনুনয় করল নরেন। 'ও চলে যাচ্ছে যাক, কিন্তু এটুকু অভয় ওকে দিতে হবে। নইলে কি নিয়ে থাকবে ও? ও তাপে-লজ্জায় বিমর্ষ। ও কিছু বলতে পারছে না, আমি ওর হয়ে বলছি। বলো ইষ্টদর্শন হবে ওর মৃত্যুকালে। আর কিছু না থাক, নিষ্ঠা ছিল ওর, ও আর কিছু না পাক তোমারও প্রণাম পেয়েছে। বলো, সত্যি নয়? আর, তোমার প্রণাম যে পেয়েছে—বলো, হবে?'

ঠাকুর বললেন, 'হবে।'

প্রতাপ হাজরাকে আর পায় কে। অনুরক্ত করে না পাক, বিরক্ত করে আদায় করে নিয়েছে। এই তার অসীম প্রতাপ।

হৃদয়ের মত সেও ছেড়ে গেল দক্ষিণেশ্বর। কিন্তু তার তো তবু হবে শেষ সময়। হৃদয়ের কি হবে না? তার পক্ষে নরেনের মত মুরুব্বি নেই বলেই কি এই দীন দশা? এত বলবান সেবা, এত সহিষ্ণু সান্নিধ্য, এত অকাতর শুশ্রূষা—এ কি ব্যর্থ হবে?

কিছুই কি ব্যর্থ হয়?

একশো উনিশ

'মশাই, আপনার সঙ্গে কে দেখা করতে এসেছেন।' কে একজন লোক বললে এসে ঠাকুরকে।

'আমার সঙ্গে?' ঠাকুরতো অবাক।

হ্যাঁ, আপনারই নাম করলে।'

'কোথায় সে লোক?'

'যদু মল্লিকের বাগানে এসেছেন। দাঁড়িয়ে আছেন ফটকের সামনে।'

এখানে নিয়ে এস, এ কথা বললেন না ঠাকুর। এতদূর যখন এসেছে তখন ফটক ডিঙিয়ে ভিতরে চলে আসতে দোষ কি, তাও বললেন না। যখন ফটকের

সামনে এসেই নেমে পড়েছে তখন নিশ্চয়ই ভিতরে ঢুকতে কোনো বাধা আছে। নইলে এটুকু পথ আর আসবে না কেন? যাই দেখি গে কে এল। হয়তো হৃদে এসেছে। ও বলেই ঢুকছে না এখানে।

পা চালিয়ে পূবমুখো চলে গেলেন ঠাকুর। যা ভেবেছিলেন। হৃদয়ই দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে করজোড়ে। রামসমীপে মহাবীরের মত।

ঠাকুরকে দেখেই পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়ল। কাঁদতে লাগল অঝোরে। পরিত্যক্ত শিশুর মত।

ঠাকুর বললেন, 'ওঠ্। কাঁদিস নি। কান্নার কী হয়েছে!' বলছেন আর নিজে কাঁদছেন। যেন কান্নার কিছুই নেই এমনিভাবে নিজের চোখ মুছছেন গোপনে।

যে যন্ত্রণা দিয়েছে, তারও জন্যে করুণা। যে বিরক্ত করেছে, তারও জন্যে অনুরাগ!

শুধু ভক্তের ডাকেই সাড়া দেন না, যে পরিত্যক্ত তারও ডাকে সাড়া দেন। ছুটে আসেন নিষেধের গণ্ডি পেরিয়ে। ধূলোর থেকে তুলে নেন হাত বাড়িয়ে।

'কিরে, এখন যে এলি?'

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।'

তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব তার কি সময়-অসময় আছে? হৃদয় কাঁদছে তো কাঁদছেই। বললে, 'আমার দুঃখ আর কার কাছে বলব?'

আমার আর কে আছে? শত ফটক বন্ধ হয়ে গেলেও তুমি আছ আমার ফটিকজল। মেয়াদহীন কয়েদখানার বাইরে মুক্ত প্রান্তরের ডাক। তোমাকে কে আটকাবে? আর সবাই ঠেলুক তুমি ঠেলতে পারবে না।

'তোর আবার কিসের দুঃখ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'তোমার সঙ্গছাড়া হয়ে আছি। সে দুঃখের কি আর শেষ আছে?'

'বা, তখন যে বল্লে গেলি,' ঠাকুর মনে করিয়ে দিলেন, 'তোমার ভাব নিয়ে তুমি থাকো, আমাকে থাকতে দাও আমার নিজের ভাবে।'

কান্নার একটা প্রবল ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিল হৃদয়কে। বললে, 'হ্যাঁ, তখন তো তা বলেছিলাম, কিন্তু আমি তার কি জানি। আমি তার কি বুঝি!'

'তাতে কি হয়েছে। এমনিতর দুঃখকষ্ট আছেই সংসারে।' ঠাকুর সান্ত্বনা দিলেন: 'সংসার করতে গেলেই আছে এমন সুখদুঃখ, এমন ওঠা-নামা। তাতে কি! এমনিতে কেমন আছিস? ধান-টান কেমন হয়েছে এবার?'

'মন্দ নয়।' একটা নিশ্বাস ছাড়ল হৃদয়।

'আজ এখন তবে আয়। আজ রোববার, অনেক লোকজন এসেছে, তারা বসে আছে সকলে।'

আমিও কি সকলের মধ্যে একলা নই? আমিও কি বসে সেই এক পাশে?

'শোন, আরেকদিন আসিস। তখন বসে কথা কইব তোর সঙ্গে।'

সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করল হৃদয়। চোখ মুছতে-মুছতে চলে গেল সমুখ দিয়ে।

দুর্দান্ত সেবাও যেমন করেছে, তেমনি যন্ত্রণাও দিয়েছে অফুরন্ত। ছেলেকে যেমন মানুষ করে তেমনি করে নেড়েছে চেড়েছে ঘষেছে-মেজেছে ঠাকুরকে। রাত-দিন বেহুঁস হয়ে থাকতেন, নিষ্পলক চোখে পাহারা দিয়েছে। আজ সবাই তোমরা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছ, হৃদয় থাকলে পায়ে হাত দেয় কার সাধ্যি? অসুখে দুখানা হাড় হয়ে গেছি, কিছু খেতে পারিনা, আমাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে খাচ্ছে হৃদয়, যদি খেতে আমার রুচি আসে। বলছে, এই দেখনা আমি কেমন খাই। তুমি শুধু তোমার মনের গুণে খেতে পাচ্ছনা। কাটিয়ে ফেল মনের গুণ। কত করেছে আমার জন্যে। গঙ্গায় নেমে তুলে এনেছে এই ডুবন্ত দেহকে। ফুলুই শ্যামবাজারে কীর্তনের সময় ভিড়ে আমার সর্দি-গর্মি হয়, সেই ভয়ে খোলা মাঠে টেনে নিয়ে গেছে। বেলঘরে নিয়ে গেছে কেশবের কাছে। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে লাটসাহেবের বাড়ি দেখিয়েছে।

তেমনি যন্ত্রণা দিতেও কসুর করেনি। ভেবেছিল ওর 'আণ্ডারে' আছি, যা করাবে তাই করব। বললে, মার কাছে ক্ষমতা চাও, ব্যামোর ওষুধ চাও। নইলে আবার মা কি। ওর পরামর্শ শুনতে গিয়ে ঘা খেলুম। শম্ভু মল্লিকের কাছে টাকা চায়, যদি পারে হাতিয়ে নেয় লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারীর সেই থলেটা। দশ হাজারের থলে। কেবল বিত্তবেসাত জমি-গরুর দিকে লালসা। সিদ্ধাই-সিদ্ধাই করে আস্ফালন। জ্বালিয়ে মেরেছে। এমন জুলুমি, পোস্তার উপর থেকে

জোয়ারের জলে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলুম।

তারই জন্যে, সেই হৃদয়ের জন্যেই, কাঁদছেন ঠাকুর। যে কাঁদায়, কি আশ্চর্য, তারই জন্যে আবার কাঁদেন। যে বিতাড়িত, তারই জন্যে আবার ছুটে আসেন ব্যগ্র হয়ে। যে অযোগ্য, অকর্মণ্য, তারও জন্যে রেখে দেন আশ্বাসের আতপত্র।

এঁটে ধরে থাক, কিছুতেই ছাড়িসনে, সাধ্য কি তোকে ফেলে রাখে জলের পাশে। পালিয়ে সে কোথায় যাবে, তুই যে তার পা নিয়ে বসে আছিস। ঐ ছাখ সে হেসে উঠেছে অন্ধকারে, নিবিড় বনের অন্তরালে ঐ ছাখ জেগে উঠেছে শুকতারা।

সামান্য যাত্রাদলের ছোকরা, তার সঙ্গেও ঈশ্বরকথা।

দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরে যাত্রা হচ্ছে। পালা বিদ্যাসুন্দর। শেষরাত্রি থেকে সুরু হয়েছে, সকালেও শেষ হয়নি। মন্দিরে মাকে দেখতে এসে ঠাকুর একটু শুনেছেন কান পেতে। যাত্রাশেষে ঠাকুরের ঘরে এসেছে অভিনেতারা।

যে ছোকরা বিদ্যা সেজেছিল তার অভিনয়ে ঠাকুর খুব খুশি। বললেন, 'বেশ করেছ তুমি। শোনো, যদি কেউ গাইতে বাজাতে নাচতে পটু হয়, যে কোনো একটা বিদ্যাতে যদি তার দক্ষতা থাকে, তাহলে চেষ্টা করলে সহজেই সে ঈশ্বর লাভ করতে পারে।'

আমিও তো ভালো য়্যাকটিং করতে পারি। চমকে উঠল ছোকরা। আমার পক্ষেও সম্ভব ঈশ্বর লাভ?

তা ছাড়া আবার কি। কত অভ্যাস করেই না তবে গাইতে-বাজাতে শিখেছ। কত লাফঝাঁপ করেই না রপ্ত করেছ নাচ। সেই অভ্যাসযোগেই লাভ হবে ঈশ্বর।

'আজ্ঞে, কাম আর কামনায় তফাৎ কি?' জিগগেস করল ছোকরা।

তুচ্ছ লোকের আবার তত্ত্বজিজ্ঞাসা, এই বলে উড়িয়ে দিলেন না ঠাকুর। বললেন, 'কাম যেন গাছের মূল আর কামনা তার ডালপালা। যদি কামনা করতেই হয়, ঈশ্বরে ভক্তি-কামনা করো। যদি মত্ততা করতেই হয় আমি ঈশ্বরের সন্তান এইভাবে মত্ত হও।' তাকালেন ছোকরার দিকে। শুধোলেন, 'তোমার বিয়ে হয়েছে?'

ছোকরা ঘাড় কাত করল।

'ছেলেপুলে?'

'আজ্ঞে একটি কন্যা গত। আরেকটি হয়েছে।'

'এর মধ্যে হ'লো-গেলো? এই তোমার কম বয়স! বলে, 'সাঁজসকালে ভাতার মলো, কাঁদব কত রাত!'

সবাই হেসে উঠল।

'সংসারে সুখ তো দেখলে!' ঠাকুর আবার তাকালেন ছোকরার দিকে। 'যেমন আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া।'

'কিন্তু সংসার ছাড়ব কি করে?'

'না, না, ছাড়বে কেন? সংসার করবে কিন্তু মন রাখবে ঈশ্বরের দিকে। সেই যে ছুতোরের মেয়ে চাল এলে দেয় অথচ সর্বক্ষণ হুঁস রাখে ঢেঁকির মুষল যেন হাতে না পড়ে—তেমনি। ছেলেকে মাই দিচ্ছে, খদ্দেরের সঙ্গে কথা কইছে, এক ফাঁকে এক হাতে খোলায় ভেজে নিচ্ছে ভিজে ধান—'

'মনে রাখব আপনার কথাগুলো।'

'মাঝে মাঝে এখানে এসো। রবিবার কিংবা অন্য ছুটীতে—'

'আজ্ঞে আমাদের তিন মাস রবিবার। শ্রাবণ, ভাদ্র আর পৌষ। বর্ষা আর ধান কাটবার সময়। আপনার কাছে আসব সে আমাদের ভাগ্য।'

'হ্যা, সবাই মিল হয়ে থাকবে। মিল থাকলেই দেখতে-শুনতে ভালো। চারজন গান গাইছে, কিন্তু প্রত্যেকে যদি ভিন্ন সুর ধরে যাত্রা ভেঙে যায়।'

সবাই মিলে এক সুর ধরো। এক তরীতে ভাসো। একাকার হয়ে যাও।

যাত্রা থেকেই যাত্রা করো।

বললেন ঠাকুর, 'তোমাদের মধ্যে যারা কেবল মেয়ে সাজে তাদের মেয়েলি ভাব হয়ে যায়। তাই না? তেমনি যারা রাতদিন ঈশ্বরচিন্তা করে তাদের মধ্যে ঈশ্বরসত্তার রঙ ধরে। মন ধোপাঘরের কাপড়, তাকে যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে।'

আমি কেন বিদ্যাসুন্দর শুনলাম? এর মানে কি? দেখলাম, তাল মান গান নিখুঁত। তারপর মা দেখিয়ে দিলেন, নারায়ণই যাত্রাওয়ালাদের রূপ ধরে যাত্রা করছেন।

এই ঠাকুরের অবতারবাদ। সকলেই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব। ঈশ্বরের প্রতিধ্বনি।

এই ঠাকুরের আত্মদর্শন। সমস্ত মন ঈশ্বরকে না দিলে ঈশ্বরের দর্শন হয় না। তেমনি সমস্ত জনে তাঁকে না দেখলেও হয় না দর্শন। মনে-জনে দেখাই ঠিক দেখা। [ক্রমশঃ।

খেয়াল খাতা

প্রমীলা মিত্র সংগৃহীত

মাঠে আছে কাঁচা ধান, কাঁচা হাঁড়ি কুমোরের বাড়ি,
কাঁচা চুলো ভিজে কাঠ, পাত পাড়িয়োনা তাড়াতাড়ি।

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সময়ের সদ্ব্যবহার করিবে।

—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

পরিচয়ের জানাজানি, নাই বা কিসে ?
লিপির মাঝে প্রাণটি গেল প্রাণে মিশে—
বোনটি যদি শ্রদ্ধা পাঠায় দিদিকে তার,
দিদি তারে স্নেহ দিয়ে শুধবে সে ধার।
চিরদিনের নিয়ম এ যে চিরন্তনী—
প্রেমের ফাঁদে বেঁধে ফেলা হৃদয়-মনই,
হবে না তো "তৃপ্ত হলেই সঙ্গোপনে",
তৃপ্তি কিছু পাঠিও আবার চিঠির সনে।

—শ্রীঅনুরূপা দেবী।

কহে চণ্ডীদাস
সুখ-দুঃখ দুটি ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করিবে আশ
দুঃখ যাবে তার ঠাঁই॥

—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

কালির লেখার দাম দেবে কাল একশো বছর পরে,
সংগ্রাহিকা কুড়োন লেখা এই আশাটি ধরে।
সোনার সাথে গাঁথেন পেতল, তালের সাথে তিল,
হাসছে নাকি অলক্ষ্যে কাল দেখে এ গরমিল ?

—শ্রীনিরুপমা দেবী।

"গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ।"

—শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু।

দিনের আলো নিবে এল
তবু মনের আলো চোখে জাগে,—
নাইক হেথায় দিবারাতি
সদাই জ্বলছে ভাতি অনুরাগে।

—শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

"আবার মোরা মানুষ হব মন্দিরে ঐ বাজছে শাঁখ,
আয় ছুটে ভাই ভগ্নি মিলি শুনিস্ নাকি মায়ের ডাক।"

—শ্রীনীলরতন সরকার।

The lights we see are few, but
The invisible lights are many.
We stand in the midst of a
Luminous Ocean, perfectly blind.

—J. C. Bose

"যা লোকদ্বয়সাধনা তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী।"

—শ্রীপশুপতিনাথ শাস্ত্রী।

একদিন হিমালয়ের পাদদেশে দাঁড়াইয়া, এক চোখ বুজিয়া, অপর চোখের সামনে আমি একটি পয়সাকে ধরিয়াছিলাম, তাহাতে হিমালয় পর্ব্বত সম্পূর্ণ ভাবে আড়াল হইয়া গিয়াছিল। সেই সময় আমার মনে হইয়াছিল—আমাদের তুচ্ছ ক্ষুদ্র স্বার্থ, বাসনা, হৃদয়ের অতি কাছে ধরিয়া থাকি বলিয়া, ঈশ্বরের বিরাট মঙ্গলময় মূর্ত্তি আড়াল হইয়া যায়।

—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বলে গেছেন নবীন কবি প্রবীণ বয়সে।
তাঁর সেই মহাকাব্য রৈবতকের শেষে॥
দাঁড়ায়ে অপার কাল জলধির তীরে।
সম্মুখে অপার সিন্ধু পরিপূর্ণ নীরে॥
আমিও তেমনি বসি সেই সিন্ধু-তীরে।
ভয়ে ভয়ে ত্রাসে ত্রাসে অতি ধীরে ধীরে।
চলিয়াছি আমি কোন্ অজানার পথে—
—কোন্ অচেনার রথে।

—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

কার না জানি শুভ্র বদনের
একটি শুধু তিলের লাগি।
ইরাণ দেশের পাগল কবির
আঁখির কোণে ছিলাম জাগি।
অধর ছুঁয়ে পড়ছে সুধা
পরশমণির পেয়ালা বয়ে—
জীবনটা মোর কাটছে কি সেই
রূপের নেশায় বিভোর হয়ে।

—শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

'আজি হ'তে শত বর্ষ পরে' কি রবিবাবুর নিজের কবিতা ? আ[illegible] এমিল ভেরেবাঁর কবিতা পড়লুম।

'Celui qui me lira....' 'যে আমার লেখা পড়বে·····
'Celui qui me lira dans les siecles, un soir
Troublant mes vcrs sons leurs sommeil on
sons lem...

'একদিন সন্ধ্যাবেলা শতাব্দীর পর, যে আমার কবিতা পড়বে' ইত্যাদি।

তবু বলবো, ভেরেবাঁর চেয়ে রবিবাবুর কবিতাটি ভাল।

—মুজতবা আলী

নন্দলাল বসু

(শিল্পসাধক)

গত ৩রা ডিসেম্বর আচার্য নন্দলাল বসুর বয়স সত্তর বছর পূর্ণ হল। এই সূত্রে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্যদানের আয়োজন করেছেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা। এ কাজে তাঁদের অধিকার সর্বাগ্রে. এ কথা স্বীকার করে নিয়েও বলব, শ্রদ্ধানিবেদনে অধিকারের সীমারেখা সত্যি করে কোথাও টানা চলে না। তাঁর চরণতলে বসে যারা দীর্ঘকাল শিক্ষালাভের দুর্লভ সুযোগ পেয়েছে, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁকে কাছ থেকে দেখবার-জানবার ভাগ্য যাদের হয়েছে, তাদের প্রীতির অর্ঘ্যে সেদিন যুক্ত হবে দেশের অসংখ্য কলারসিকদের স্বতঃউৎসারিত সশ্রদ্ধ প্রণতি। আর এই দুয়ে মিলেই পূর্ণ হবে তাঁর জন্মোৎসব।

কথায় বলে, তোমার বয়েস তুমি বছরের আঙুলে গুণো না; গোণো বন্ধু-সংখ্যা দিয়ে। কিন্তু তাঁর মত নির্জন মানুষ, সারা জীবনই যাঁর কথা জনতার পারে ঢাকা ছিল, তাঁর বয়সের হিসেব করব কী ভাবে? তাঁর শিল্পসাধনার গভীরতা আর শিল্পজীবনের ব্যাপ্তি দিয়ে। জাপানী চিত্রকর ওকাকুরা একবার এদেশে এসেছেন। তরুণ আর্টস্কুলের ছাত্র নন্দলাল ইত্যাদি গেলেন তাঁর কাছে উপদেশ চাইতে। তিনি সবার বয়স জানতে চাইলেন। জন্মপত্রিকা দেখে বললেন, 'ও বয়সের কথা হচ্ছে না। কে কতদিন ধরে ছবি আঁকছ তাই বল।' হয়তো একথা শুধু তাঁর মত শিল্পীর পক্ষে প্রযোজ্য তা নয়; সুকুমার কলার চর্চা করেন যাঁরা, তাঁদের সবার পক্ষেও বটে।

বাং ১২৯০, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ইং ১৮৮৩ খৃঃ ৩রা ডিসেম্বর তারিখে মুঙ্গের-খড়গপুরে নন্দলালের জন্ম হয়। বাল্যকাল থেকেই তাঁর শিল্পানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় এবং অনুকূল পারিবারিক প্রতিবেশে তা ক্রমে ক্রমে বেড়েই যায়। বাবা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু ছিলেন দ্বারভাঙ্গা রাজের নামকরা স্থপতি। মা ক্ষেত্রমণি দেবী সুন্দর সুন্দর খয়েরের পুতুল, মিষ্টান্নের ছাঁচ, সূক্ষ্ম কাজ করা কাঁথা ইত্যাদি বানাতেন। আর তাঁর মন ছিল ঈশ্বরপ্রীতিতে সুস্নিগ্ধ। পরবর্তী জীবনে আমরা নন্দলালের জীবনে যে একাগ্র ভগবদ্ভক্তির পরিচয় পাই, তার গোড়াপত্তন এইখানে।

কোলকাতার সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিবিনিময় ঘটল ষোলো বছর বয়সে। নন্দলালের ছাত্রজীবন খুব চমকপ্রদ কিছু নয়। কুড়ি বছরে পাশ করলেন এনট্রান্স। কিন্তু দুবার চেষ্টা করেও এফ, এ পাশ করতে পারলেন না। তখন অভিভাবকরা চাইলেন ডাক্তারী পড়াতে। প্রবেশপত্র মিললো না বলে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের বাণিজ্য বিভাগে। কিন্তু লক্ষ্মীর সাধনায় মন তাঁর বসলো না। এর মধ্যে মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে এসে উপস্থিত হলেন অবনীন্দ্রনাথের দরবারে সত্যেন বটব্যাল মশায়কে সঙ্গী করে। এসেই বুঝলেন যথাস্থানে পৌঁছেছেন। সেই যে এক ঘর লোকের মাঝে ছোট ছেলে কেবল মায়ের আঁচল খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। একটা ধরে আর ছাড়ে। অবশেষে যখন ঠিক জায়গায় এসে হাজির হয়, তার মনের সব ভয়, সংশয় দূর হয়ে যায়। এ যেন ঠিক তাই।

কিন্তু ভর্তি হওয়া অত সহজ হয়নি। অবনীন্দ্রনাথ প্রথমেই বললেন 'কি রে! আর কোথাও কিছু হল না, তাই এখানে এসে জুটেছিস?' এনট্রান্স সার্টিফিকেট না দেখে আমলই দিলেন না। অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব তাঁর আগের আঁকা ছবি 'মহাশ্বেতা' দেখে খুসী হয়ে উঠলেন। আর্ট স্কুলে তিনি ছাত্রের অধিকার পেলেন নানা রকম পরীক্ষার পর। প্রথম ডিজাইন-শিক্ষক ঈশ্বরীপ্রসাদের ক্লাশে, পরে অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে টেনে নিলেন নিজের ক্লাশের গণ্ডী পেরিয়ে তাঁর অফুরন্ত স্নেহের সীমানায়। এর মধ্যে একুশ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন। তিনি ছবিলেখা শিখতে যাচ্ছেন শুনে সন্ত্রস্ত শ্বশুরকুলকে সান্ত্বনা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বললেন- 'ওর সব ভার আমি নিলাম। সে সময় নব্য চিত্রকলায় পুরাণ, সাহিত্য, ইতিহাস থেকে প্রেরণা এসেছিল। ছবি আঁকলেন 'বাণাহত হাঁস কোলে সিদ্ধার্থ', 'দশরথের মৃত্যু', 'কালী', 'সত্য-ভামা-শ্রীকৃষ্ণ', 'কর্ণ', 'জগাই মাধাই', 'শিবের তাণ্ডব', 'সতী', 'শিব-সতী', 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' ইত্যাদি। হ্যাভেল সাহেবের সংগৃহীত মোগল ছবিরও নকল করেন।

আর্টস্কুলে ছিলেন পাঁচ বছর। এর মধ্যে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতের

নন্দলাল বসু

সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন নন্দলালের সুযোগ্য শিষ্য শিল্পী মণীন্দ্র গুপ্ত। নন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাতের কিছু পরেই নিবেদিতা বললেন তাঁকে মেজের ওপর বুদ্ধের মত আসন করে বসতে। তারপর বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে বললেন—'আশ্চর্য! সব ভারতীয়ই আসলে দেখতে ঠিক বুদ্ধদেবের মত।' নানা উপদেশও দিলেন তিনি তরুণ চিত্রকরকে। রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা আগ্রহের সূত্রপাত এ থেকেই সম্ভবতঃ হয়। এই সময়ই শিল্পসমজদার মহেন্দ্র দত্তর সঙ্গেও তাঁর আর্টের গভীর মর্ম নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়।

স্কুল থেকে বেরিয়ে গুরুর আহ্বানে জোড়াসাঁকোয় এলেন কাজ করতে। তিন বছর ষাট টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হল তাঁকে। এই সময় তিনি নিবেদিতার "ইণ্ডিয়ান মিথস অব হিন্দুজ এণ্ড বুদ্ধিষ্টস" বইখানির ছবিগুলি আঁকেন। ঠাকুর-শিল্প সংগ্রহের তালিকা প্রণয়নে সাহায্য করেন কুমারস্বামীকে। ওকাকুরার সঙ্গে আলাপের কথা আগেই বলেছি। বিচিত্রাভবনে এসে থাকেন অপর জাপানী শিল্পী আরাইসান। তাঁর কাছে জাপানী চিত্ররীতি, কালিতুলির কাজ শেখেন নন্দলাল।

তাঁর শিল্পজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল অজন্তাগুহাচিত্রের নকল করাতে। আনুঃ ১৯১০ সালে লেডী হ্যারিংহামের এ দেশে আগমন। গুরুর নির্দেশে এ কাজের ভার নিলেন নন্দলাল, অসিত হালদার। এ কাজ শেষ করে যখন ফিরে এলেন, দেখা গেল ধারাবাহী ভারত-চিত্রকলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় সম্পূর্ণ হয়েছে। এরপর ১৯২১ সালে গিয়েছিলেন বাগগুহার ভিত্তিচিত্রের নকল নিতে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে তিনি প্রাচীন শিল্পকীর্তির সঙ্গে পরিচিত হন। এছাড়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাথে তিনি দেখেন চীন-জাপান-ইন্দোনেশিয়া। পরে যান ব্রহ্মদেশ আর সিংহলে। গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের সংযোগ যখন নিবিড়তর করতে চাইলেন গান্ধীজী, তখন ডাক দিলেন নন্দলালকে। লক্ষ্ণৌ, ফৈজপুর এবং হরিপুরা কংগ্রেসে গিয়ে ছবি এঁকে দিলেন তিনি।

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করলেন বিচিত্রাসভা আর সেখানে ডেকে আনলেন নন্দলাল বসু আর অসিত হালদারকে। মুকুল দে আর সুরেন করকে। বিচিত্রাসভা উঠে গেলে প্রতিমা দেবীর শিল্প শিক্ষার ভার নিলেন। এই সময় জগদীশচন্দ্রের আহ্বানে তাঁর ওখানে এঁকে দেন মহাভারতের ছবি।

তাঁর শিল্প আর শিক্ষক জীবনের প্রাণকেন্দ্র শান্তিনিকেতনে এলেন ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে। সেদিন 'অচলায়তন' নাটকের অভিনয় ছিল। প্রিয় শিল্পীকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন গুরুদেব। সেই অনুষ্ঠানের শেষে হঠাৎ এক বিচিত্র অনুভূতি হল নন্দলালের। মনে হল তাঁর জড় দেহ হঠাৎ যেন স্বচ্ছ হয়ে গেছে। অবাধে তার মধ্য দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে আলো আর হাওয়ার তরঙ্গ। এই অপরূপ অনুভূতি সারা জীবনই তাঁকে আবিষ্ট করে রেখেছে। তাই আশ্রম-জীবনের সঙ্গে তাঁর সংযোগ সত্যি করে কখনই বিচ্ছিন্ন হয়নি। তা কি হবার?

সংক্ষেপে এই তাঁর জীবন-কথা। কিন্তু এতো কিছুই বলা হল না। কতকগুলো ঘটনার মধ্যে তো যথার্থ প্রতিভা বেঁচে থাকেন না। যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তিনি শান্তিনিকেতনে রয়েছেন, তার যথার্থ পরিচয় দিতে পারে তাঁর ছাত্ররা। তাঁদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন শিল্পাচার্য্যের পূর্ণতর জীবন-কথা লেখেন। তাঁর শিল্পকলা তো আপনার প্রাণ-প্রাচুর্যে অমর হয়ে থাকবে। সনাতন ভারত-শিল্পের ঐতিহ্যগুহা নিঃসৃত সে শিল্পধারা যুগ পেরিয়ে, সীমিত পরিবেশ পেরিয়ে বয়ে চলবে হৃদয়কে অভিষিক্ত করে, দৃষ্টিকে উন্মীলিত করে। আগামী কালেও তাঁর শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা চলবে। কিন্তু আজ কাছ থেকে তাঁকে যারা দেখলেন, এই মহা সৌভাগ্য নিয়ে তাঁরা থাকবেন কোথায়?

ডাঃ পি, কে, সেন

(ভারতের প্রখ্যাত যক্ষ্মা-চিকিৎসক)

সাধারণ মানুষের পক্ষে হয় তো যেটা অসম্ভব, একজন প্রতিভাশীল অনন্যসাধারণ মানুষের পক্ষে মোটেই সেরূপ নয়। এঁরা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারেন—যে দিকেই এঁদের জীবন-রথ চলুক না কেন, সেখানেই ফুটে উঠবে একটা অসাধারণত্ব। বাঙ্গালা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যক্ষ্মা-চিকিৎসক ডাঃ প্রফুল্লকুমার সেনের নাম এ প্রসঙ্গে অনায়াসেই উল্লেখ করা যেতে পারে।

ডাঃ পি, কে, সেন

ডাঃ সেন যে একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, বিশেষ করে যক্ষ্মা-চিকিৎসক হ'তে গেলেন এর মূলে রয়েছে একটি কেন, একাধিক কারণ। অবশ্য মূল কারণ হ'লো তাঁর পুণ্যপ্রতিম বাপ মায়ের প্রতি তাঁর অসীম অনুরাগ ও ভক্তি। তাঁদের একান্ত আগ্রহেই তিনি ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন ও সুরু হয় চিকিৎসক হওয়ার জন্য তাঁর দুর্বার সাধনা।

ডাঃ প্রফুল্লকুমার যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞ হ'বার জন্য কেন ব্যস্ত হলেন সে একটি ঘটনা। তাঁর নিজেরই কথায়—ডাক্তারী লাইনে যখন আমি এলুম, তখন সঙ্কল্প নিয়েছিলুম আর্ত্ত মানুষের উপকারে যাতে আসতে পারি, এমন ভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে হ'বে। যক্ষ্মা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করবো প্রথমেই অবশ্য স্থির ছিল না। কিন্তু এমনি হ'লো যাতে পরবর্ত্তী সময়ে এ দিকেই আমার ঝোঁক গেল বেশী। আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এ মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাঁকে বাঁচাবার জন্য কোন ব্যবস্থা হ'লো না দেখে আমার মন সেদিন কেঁদে উঠেছিল। মনে মনে ঠিক করে নিলুম যদি ডাক্তার হ'তে পারি তবে যক্ষ্মা চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ হ'বার জন্যে সচেষ্ট হ'বো।

১৯০৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যশোহর জেলার দিঘলকান্দি গ্রামে মাতুলালয়ে ডাঃ সেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রায় বাহাদুর নলিনীকান্ত সেন ছিলেন ফরিদপুরের প্রসিদ্ধ সরকারী

নর্ত্তকী

—অজিতকুমার ঘোষ
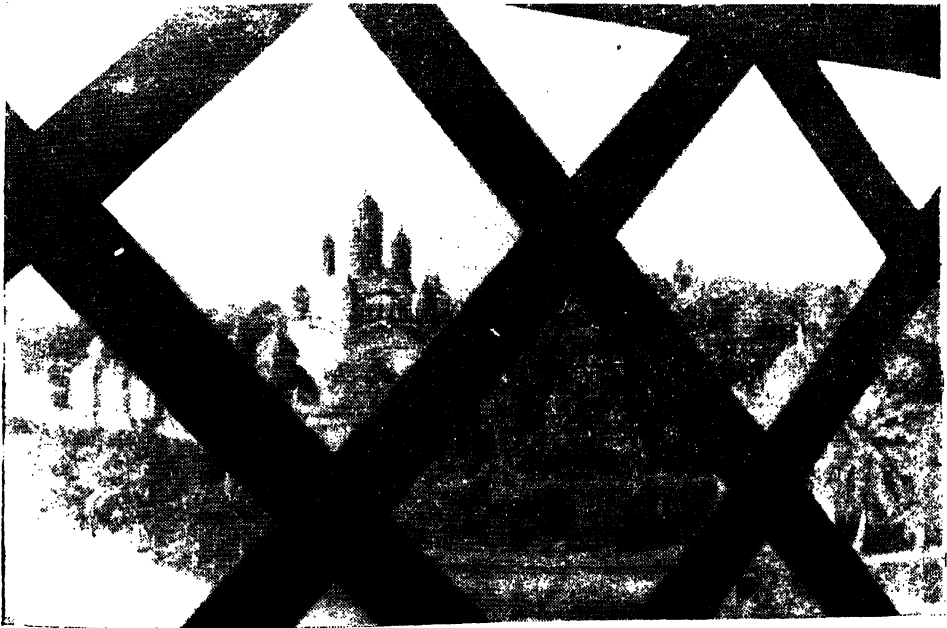
দক্ষিণেশ্বর (বালী ব্রিজ থেকে)

—মুকুল সরকার

—সুকুমার মিত্র

ওরা কাজ করে

—কুমারেশ নন্দী

—গৌতম ভট্টাচার্য্য

বৈদ্যনাথধাম ষ্টেশন —রবীন ঘোষ

প্রতীক্ষা
—অজ্ঞাতনামা
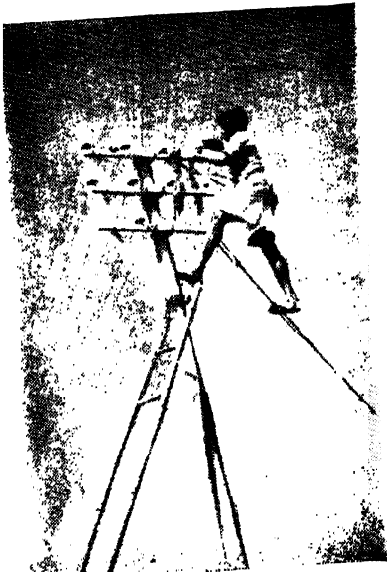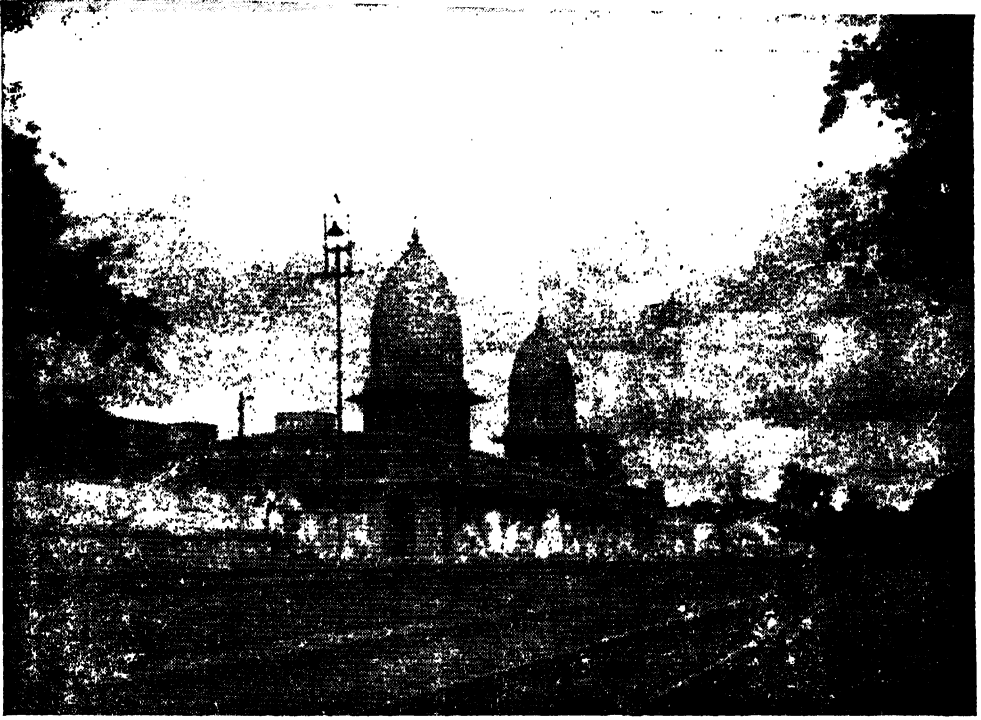
—পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

দুর্গামূর্ত্তি (বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দিরগাত্রে)

উকিল। ফরিদপুর জিলা স্কুল থেকেই ডাঃ সেন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কৃতিত্বের সঙ্গে ১৯২১ সালে। কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সসম্মানে আই, এস্ সি পাশ করার পর ১৯২৩ সালে ভর্ত্তি হলেন তিনি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে। পর পর তিন বছর সেখানে পড়াশুনো চললো, পরবর্ত্তী তিন বছর তিনি অধ্যয়ন করলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজে। ১৯২৯ সালে তিনি এ কলেজ থেকেই এম, বি ডিগ্রী লাভ করলেন এবং কৃতিত্বের মর্য্যাদা-স্বরূপ পেলেন বৃত্তি।

এ ভাবে ডাঃ প্রফুল্লকুমারের জীবন সাধনায় একটির পর একটি সাফল্য ঘটে চললো। জ্ঞানপিপাসা এখানেই তাঁর মিটলো না। একটি বৃত্তি নিয়ে ১৯৩২ সালে তিনি চলে গেলেন সুদূর জার্ম্মাণীতে। তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে একনিষ্ঠ ভাবে চিকিৎসা শাস্ত্রে গবেষণা করে চললেন। এক বৎসর কাল মধ্যেই তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, ডি ডিগ্রীতে হ'লেন ভূষিত তার পর জার্ম্মাণী ও সুইজারল্যাণ্ডের বড় বড় স্বাস্থ্যাবাসগুলি তিনি পরিদর্শন করতে থাকেন এবং নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে চলেন নিয়ম ও শৃঙ্খলার সঙ্গে। ১৯৩৪ সালের শেষ ভাগে তিনি একই উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড গমন করেন এবং নিজের অসাধারণ চেষ্টায় ও প্রতিভা বলে তিনি ওয়েলস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের টি, ডি, ডি ডিপ্লোমা লাভ করেন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে। এর পর তিনি 'নিউমনোকোনিওসিস' ও 'টিউবারকিউলিসিস' বিষয়ে একনিষ্ঠ গবেষণা আরম্ভ করেন। প্রতিভার মর্য্যাদা পেতে বিলম্ব হ'লো না। ১৯৩৫ সালেই তিনি পি, এইচ ডি ডিগ্রীতে ভূষিত হ'লেন। ওয়েলস্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এর পূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী যক্ষ্মারোগ বিষয়ে গবেষণা করে এইরূপ সম্মান লাভ করতে সমর্থ হননি।

১৯৩৬ সালে ডাঃ সেন স্বদেশে ফিরে এলেন স্বদেশবাসীর সেবা করবেন বলে। অল্প দিন মধ্যেই তিনি যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে (বর্ত্তমান কুমুদশঙ্কর রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল) ভিজিটিং ফিজিসিয়ান হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত এ ভাবেই চ'ললো। তার পরেই তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ-হাসপাতালে এসে যক্ষ্মা চিকিৎসা বিভাগে যোগদান করলেন। বর্ত্তমানে তিনি এ বিভাগের প্রধান চিকিৎসক ও পরিচালক। ১৯৫২ সাল থেকে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজের যক্ষ্মা রোগ সংক্রান্ত বিষয়ের অধ্যাপকের দায়িত্বশীল পদও অলঙ্কৃত করে আছেন। যক্ষ্মা সম্পর্কে বহু তথ্য সমম্বিত মৌলিক ও শিক্ষণীয় প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন এবং এখনও করছেন। ইণ্ডিয়ান জর্ণাল অফ টিউবারকিউলিসিসের তিনি যুগ্ম-সম্পাদক। তিনি আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতের বিভিন্ন যক্ষ্মা প্রতিষ্ঠানের সহিত নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট। বঙ্গীয় যক্ষ্মা সমিতির মেডিকেল সাব-কমিটির তিনি চেয়ারম্যান।

ডাঃ সেন চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রবীণ হ'লেও মনে-প্রাণে ও কর্ম্মশক্তির দিক থেকে এখনও তরুণ। এরই ভেতর দেশ ও জাতি তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছে, তার তুলনা হয় না। ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে আরও প্রচুর পাওয়ার প্রত্যাশা দেশবাসী রাখছে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(বাঙ্গালার প্রবীণ সাহিত্য-সেবী)

"আমার জীবনে দুইটি জিনিসের প্রভাব অত্যন্ত বেশী, সে নেশা বললেও চলে, এক সাহিত্য, দুই সঙ্গীত। বার বৎসর ওকালতী করে এবং ওকালতীর দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে একদিন সে ওকালতী ত্যাগ ক'রলুম এবং উপস্থিত হ'লুম এসে 'বিচিত্রা'র বন্দরে—এ নেশা নয় তো কি? কোন দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি এ ধরণের দুঃসাহসের কাজ নিশ্চয়ই ক'রতেন না। ওকালতীতে আমার পসার ভালই ছিল। ছাড়বার কথা হলে বন্ধু-বান্ধবরা বলে উঠলো—যার হয় না সে ছাড়ুক তুমি কেন ছাড়বে? উত্তরে বলেছিলুম—নেশায় ছাড়ালো। মাতালকে যদি জিজ্ঞেস কর মদ কেন খাও—সে বলবে নেশায় খাই।"

এ সহজ সরল কথাগুলো আর কারো নয়—স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দরদী মন থেকে এ বেরিয়ে আসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মুহূর্ত্তে। বিচিত্রার সম্পাদক সত্যিই বিচিত্র তাঁর জীবন পদ্ধতি ও চিন্তাধারা। দীর্ঘ বার বৎসর কাল তিনি ওকালতী ক'রলেন, প্রচুর অর্থ, সম্মান ও প্রতিপত্তিও তাঁর হ'য়েছিল এ থেকেই। কিন্তু এর আকর্ষণ তাঁর কাছে বড় হ'য়ে থাকলো না। সাহিত্য-সাধনার জন্য তাঁর মানুষ মন উঠ্লো যেদিন, সেদিন ওকালতী পেশা ছাড়তে তিনি এতটুকু দ্বিধা করলেন না। এ সাহসিকতার কাজ তো বটেই—অনন্যসাধারণও।

শ্রীউপেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৮১ সালের ১২ই অক্টোবর ভাগলপুরে। তাঁর পিতা মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন একজন সরকারী কর্ম্মচারী। উপেন্দ্রনাথের শৈশব শিক্ষা আরম্ভ হয় প্রধানতঃ পূর্ণিয়ার প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে। পূর্ণিয়ার বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়নের পর তিনি কলকাতার সাউথ সুবার্ব্বণ স্কুলে এসে ভর্ত্তি হন। এখানেই পড়াশুনো চললেও এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন ভাগলপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুল থেকে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। তার পর ক্রমে সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ (কলকাতা) থেকে আই, এ, প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি, এ ও রিপন কলেজ থেকে বি, এল পরীক্ষায় সাফল্য লাভ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

করেন। তার পরেই সুরু হয় তাঁর কর্মজীবন ভাগলপুরে ওকালতী।

কর্ম্ম-জীবনে আমরা তাঁকে প্রথম অবস্থায় ওকালতী করতে দেখলেও ভাবজগতে তিনি বরাবরই সাহিত্যের পূজারী। ১২ বৎসর বয়সেই তাঁর রচিত "সন্ধ্যা" নামক কবিতা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়। তাঁর সাহিত্যিক জীবন সম্পর্কে তিনি নিজেই বলছেন—'সন্ধ্যা'র পর অনেক দিনের সাহিত্য সাধনা শুধু মাটীর নীচেকার ব্যাপার, তাতে মূল হয়তো জন্মেছিল কিন্তু উপরে অঙ্কুর হয়তো দেখা দেয়নি। যতদূর মনে পড়ে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধাদি তৎকালীন মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশিত হওয়ার পর 'সপ্তক' নামা প্রথম গল্প পুস্তক মুদ্রিত হয় সম্ভবত: ১৯১২ সালে। তার পর দ্বিতীয় পুস্তক 'শশীনাথ' উপন্যাস ১৯১৫ কি ১৬ সালে। 'শশীনাথ' শেষ হয়ে তিন বৎসর বাক্স-বন্দী হয়ে পড়েছিল। শরৎচন্দ্রকে (কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) দেখালুম। শরৎচন্দ্র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন এবং স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে উহা শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে দিলেন প্রকাশ করবার জন্যে। পুস্তকাকারে শশীনাথ প্রকাশ হলে আমি আশাতীত খ্যাতিলাভ করলাম। প্রবাসীতে উচ্চ প্রশংসিত 'শশীনাথ' পাঠ ক'রে রামানন্দ বাবু (স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) তাঁর কাগজে (প্রবাসী) আমার 'রাজপথ' উপন্যাস সাগ্রহে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

বিচিত্রার সম্পাদনা শ্রীউপেন্দ্রনাথের লেখক জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ১৯২৫ সালের আষাঢ় মাসে এ বিখ্যাত মাসিক পত্রটি আত্মপ্রকাশ করেছিল। এ পত্রিকাটিতেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এত কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও গল্প প্রকাশিত হয়েছে দেখে সাধারণ লোক সেদিন মনে করতো 'বিচিত্রা' ঠাকুর বাড়ীর কাগজ। এই বিচিত্রাতেই শরৎচন্দ্রের কিছু প্রবন্ধ ছাড়াও দুটি বৃহৎ উপন্যাস বিপ্রদাস ও শ্রীকান্ত (চতুর্থ পর্ব্ব) প্রকাশিত হয় ধারাবাহিক ভাবে। "আমার ও রাধারাণী দেবীর বিশেষ অনুরোধে শরৎচন্দ্র কথ্যভাষায় একটি উপন্যাস লিখতে সম্মত হন। বিচিত্রার পাতায় সে উপন্যাসের কয়েকটি অপূর্ব্ব অধ্যায় প্রকাশিত হওয়ার পরই কালরোগ শরৎচন্দ্রের দেহ অধিকার করে এবং এর পর শরৎচন্দ্রের আর কোন সাহিত্য প্রচেষ্টা সম্ভব হয়নি।"

বাঙ্গালার তিন জন মনীষী ব্যক্তির সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের নিবিড় সাহচর্য্য ঘটবার সুযোগ হয়েছিল। এঁরা হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও শরৎচন্দ্র। ভাগলপুর আদালতে বিখ্যাত লছমীপুর মামলা প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জনের সহকারী রূপে তিনি কাজ করেন এবং এ থেকেই উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গতার সূত্রপাত হয়। উপেন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্য নয়, সঙ্গীতেরও একনিষ্ঠ সাধক ও সুর-রসিক। সঙ্গীত ও সাহিত্যের মধ্য দিয়াই পরবর্ত্তী সময়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা জন্মে।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের যে নিবিড় সম্পর্ক তা কতগুলো বাস্তব কারণেই। শরৎচন্দ্র ও উপেন্দ্রনাথ একই পরিবেশে মানুষ—একের প্রভাব অপরের উপর সেজন্যেই এতখানি স্বাভাবিক রূপে পড়েছে। এ সম্পর্কের উল্লেখ করে উপেন্দ্রনাথ বললেন, "আমাদের ভাগলপুরের বাড়ী ছিল বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার। আমার জ্যাঠামশাই কেদারনাথ ছিলেন বাড়ীর কর্ত্তা। তাঁরই দৌহিত্র হচ্ছেন স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র, শরৎ আমার চেয়ে ৫ বছরের বড় ছিলেন। আমি সম্পর্কে মামা হ'লেও আমরা উভয়ে ছিলুম বন্ধু-ভাবাপন্ন। জন্ম দেবানন্দপুরে হলেও শরৎচন্দ্রের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের অধিকাংশ সময় কাটে ভাগলপুরের বাঙ্গালীটোলার গাঙ্গুলী বাড়ীতেই।

উপেন্দ্রনাথ আজও পর্য্যন্ত সাহিত্য সাধনায় নিরলস ভাবে নিযুক্ত রয়েছেন। তাঁর লেখনী প্রসূত বহু অনবদ্য রচনা এযাবৎ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'য়েছে। তন্মধ্যে 'কাশীনাথ' ও 'রাজপথ' ছাড়াও 'অমলতরু,' 'অমলা,' 'অভিজ্ঞান,' 'আসাবরী,' 'বিদূষীভার্য্যা,' 'অন্তরাগ,' 'ছদ্মবেশী,' 'স্মৃতি-কথা,' 'সোনালী রঙ,' 'যৌতুক,' 'দিকশূল,' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসেবে বাঙ্গালার সাহিত্য জগতে তিনি একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলেছেন প্রথম থেকেই। গত দুই বছর ধরে তিনি 'গল্পভারতী'র (মাসিকপত্র) সম্পাদনায় ব্যস্ত রয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে এখনই জাতি যা পেয়েছে এবং তাঁর লেখনীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যতখানি সমৃদ্ধ হয়েছে, তার তুলনা হয় না।

ডাঃ মেঘনাদ সাহা

(ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক)

একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলেই নয়, বিশিষ্ট স্বদেশপ্রেমিক আদর্শ শিক্ষাব্রতী ও মানব দরদী হিসেবেও তিনি সর্বজন-বরেণ্য। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে আরম্ভ ক'রে ভারতের প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে সঙ্গে আজও পর্য্যন্ত অবহেলিত জাতির সেবায় অকুণ্ঠ ভাবে নিযুক্ত র'য়েছেন।

ডা: সাহা আজ থেকে ঠিক ৬১ বছর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন ঢাকা থেকে ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী একটি গণ্ডগ্রাম সেওড়াতলীতে, তাঁদের ছিল সামান্য আয়ের একটি মধ্যবিত্ত পরিবার। একটি ছোট্ট মুদি দোকানের অনিশ্চিত আয়ের উপর নির্ভর করতো সমগ্র পরিবারটির জীবনযাত্রা। তাঁর মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী ও পিতা জগন্নাথ সাহা উভয়েই কঠোর পরিশ্রমী ও উদ্যমশীল ছিলেন। ছেলে-মেয়েদের কেমন করে মানুষ করা যায় এজন্য তাঁদের প্রাণে ছিল একটা প্রচণ্ড ব্যাকুলতা। ডা: সাহাকেও প্রথম অবস্থায় উক্ত মুদি দোকান দেখাশুনোর দায়িত্ব নিতে হয়। কিন্তু এ'তে তিনি খাপ খেয়ে উঠলেন না। ইত্যবসরে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষকগণ তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও পড়বার আগ্রহ লক্ষ্য ক'রলেন এবং তাঁর পিতাকে যেয়ে অনুরোধ জানালেন তিনি যেন পুত্রের উচ্চশিক্ষায় আপত্তি না জানান। কিন্তু পিতার তখন আর্থিক সঙ্গতি ছিল না বলে ডা: সাহাকে শিক্ষালাভের তাগিদে নির্ভর করতে হ'য়েছিল অপরের সাহায্যের উপর। গ্রামে বা গ্রামের আশে-পাশে কোন উচ্চ বিদ্যালয় না থাকায় সেওড়াতলী থেকে সাত মাইল দূরে শিমুলিয়ায় গিয়ে সেখানকার মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে তাঁকে ভর্ত্তি হ'তে হয়। এ বিদ্যালয় থেকেই তিনি

মধ্য ইংরেজী পরীক্ষায় ঢাকা জিলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং যথারীতি বৃত্তিও পান। ছাত্র হিসেবে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় এখান থেকেই হ'লো সুরু।

১৯০৫ সালে ডাঃ সাহা চলে এলেন ঢাকায় এবং ভর্ত্তি হলেন সেখানকার কলেজিয়েট স্কুলে। ১৯০৫ সাল ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী বৎসর। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এ সময় সারা বাঙ্গালায় যে বিক্ষোভ ও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে, তা থেকে তখনকার ছাত্র সমাজ দূরে থাকতে পারেনি। এরই ভেতর বাঙ্গালার তদানীন্তন লেঃ গভর্ণর স্যার বোম ফিল্ড ফুলার গেলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শন করতে। স্কুলের উর্দ্ধতন শ্রেণীর ছাত্রগণ যাদের মধ্যে ডাঃ মেঘনাদও ছিলেন, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো এবং স্কুল বর্জ্জন অভিযান চালালো। শাস্তি স্বরূপ সরকার বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের স্কুল থেকে ব্যাপক বহিষ্কারের আদেশ দিলেন। কিশোর মেঘনাদও রেহাই পেলেন না। তাঁর আরও ক্ষতি হলো—তিনি তাঁর বৃত্তি ও বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। ১৯০৯ সালে তিনি এনট্রান্স পরীক্ষায় পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্রদের মধ্যে সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

এর পরেই প্রশ্ন উঠলো ডাঃ সাহা কোন লাইনে নিজের জীবন সংগঠন করবেন। পরবর্ত্তী কালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের পথকেই বেছে নিলেন মুহূর্ত্তে। তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে আই-এস-সিতে ভর্ত্তি হলেন। আই-এস-সি ফাইনেল পরীক্ষায় অঙ্ক ও রসায়ন শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে সকলের শ্রদ্ধার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার পর ১৯১১ সালে ঢাকা থেকে তিনি চলে এলেন কলকাতায় এবং পড়তে সুরু করলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এস-সি অঙ্ক শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনো যখন শেষ হ'লো তখন উপস্থিত হ'লো নতুন সমস্যা ডাঃ সাহার সম্মুখে—এখন কি করবেন? একবার তিনি স্থির করলেন, ভারতীয় ফিন্যান্স পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করবেন। কিন্তু ছাত্র হিসেবে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করে আসা সত্ত্বেও তাঁকে পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া হলো না—কারণ তৎকালীন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী (বাঘা যতীন) পুলিন দাস প্রমুখদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। রাজনৈতিক সংস্রবের দরুণই সরকারী চাকরীও তাঁর ভাগ্যে তখন জুটলো না। নানা দিক ভেবে তিনি এ সিদ্ধান্তে এলেন ফলিত অঙ্কশাস্ত্র ও পদার্থ বিদ্যায় গবেষণা চালিয়ে যাবেন এবং বিজ্ঞানী হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রবেন।

বিজ্ঞান-শাস্ত্রে মৌলিক প্রবন্ধের জন্য তিনি ১৯১৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস-সি উপাধিতে ভূষিত হন। পর বৎসরই অপর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। এ বৃত্তি এবং গুরুপ্রসন্ন ঘোষ ফেলোশিপ নিয়ে তিনি চলে যান বিলেতে ১৯১৯ সালে বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভের দুরন্ত তাগিদে।

ডাঃ মেঘনাদ সাহা

বিজ্ঞানী হিসেবে ডাঃ সাহার নাম তখন থেকেই চার দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বিলাতে ও জার্মাণীতে আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে তিনি গবেষণা করে চললেন অবিরাম এবং বিজ্ঞান সম্পর্কিত বহু নতুন তথ্য আবিষ্কার করে বিজ্ঞান জগতে অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। দেশ বিদেশে নানা বিজ্ঞান পত্রে তাঁহার সুচিন্তিত গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয় এ সময়ে।

ডাঃ সাহা ইউরোপ থেকে ফিরে এলেন স্বদেশে এবং ১৯২১ সালে ক'লকাতা বিজ্ঞান কলেজে পদার্থ-শাস্ত্রের খয়রা অধ্যাপক পদে যোগদান করলেন। তার পর তিনি কয়েক বৎসরের জন্য এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক পদ অলঙ্কৃত করেন, এ পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালীন তাঁর অপূর্ব্ব গবেষণার জন্য তাঁকে এফ, আর, এস উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৩৮ সালে এলাহাবাদ থেকে প্রভূত সম্মানের অধিকারী হয়ে অধ্যাপক সাহা কলকাতায় ফিরে আসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের পদার্থশাস্ত্রের পালিত অধ্যাপকের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালের পর দীর্ঘ ১৫ বৎসর কাল ডাঃ সাহার জীবন অত্যন্ত কর্ম্মদীপ্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে আজ যে "নিউক্লিয়ার ফিজিক্স" গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে এ তাঁরই অপূর্ব্ব প্রতিভার ও প্রচেষ্টার অনিবার্য্য ফল।

(মাসিক বসুমতীর পক্ষ থেকে বিশেষ প্রতিনিধি কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

'চার জন' সম্পর্কে

ভাদ্র মাসের "মাসিক বসুমতী"তে আমার সম্বন্ধে যে 'পরিচিতি' প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কিছু ভুল হইয়া গিয়াছে এবং দুই একটি অত্যাবশ্যক বিষয় উল্লিখিত হয় নাই। প্রথমতঃ, বাংলার তরুণ প্রতিভাশালী যন্ত্রশিল্পী শ্রীমান রাধিকামোহন মৈত্র আমার শিক্ষক নয়, সতীর্থ। তাঁর পূর্ব্বগুরু আমীর খাঁ স্বরোদী ও বর্ত্তমান গুরু মহম্মদ দবীর খাঁ বীণ্‌কার, এঁরাই আমার শিক্ষক। দ্বিতীয়তঃ, আমার স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণী ইন্দিরা দেবী ও আমি চিত্রশিল্প ও সঙ্গীতের প্রেরণা পাইয়াছি, শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক প্রভাব হইতে, তিনি আমাদের উভয়েরই অধ্যাত্ম-গুরু ছিলেন। তাঁর আশীর্ব্বাদ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও চিত্রশিল্প-গুরু অবনীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ সমভাবেই আমার সহধর্ম্মিণীর জীবনে কার্য্যকরী হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার সম্বন্ধ হইল আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক—প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক নহে। এখনও শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম ও সাংস্কৃতিক আদর্শ প্রচার আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য—সঙ্গীতেও মূল প্রেরণা তাঁহার আদর্শ হইতেই পাইয়াছি।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

* * * *

ভাদ্র সংখ্যায় 'চার জনে' শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলে অনবধানতাবশতঃ সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্রিত হয়েছে, এই জন্য আমরা দুঃখিত।

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের বাণী

স্বামী সিদ্ধানন্দ

কারুর জন্য মোহ বা আসক্তি রাখবে না। কিন্তু ভগবানের উপর অনুরাগ আসক্তি হওয়া চাই। ভগবানকে ধরলে সবই সত্য আর তাঁকে বাদ দিলে সবই মায়া—মিথ্যা।

জ্ঞানী কাকে বলে? যে কতকগুলি বই ও শাস্ত্র পড়েছে আর কয়েকটা পাশ দিয়েছে তাকেই জ্ঞানী বলে? না। যিনি ভগবানের রাস্তা জানেন ও বলতে পারেন তিনিই জ্ঞানী। তাঁকে না জানলে কি কিছু হয়? গৌতম তাঁকেই জেনে ত বুদ্ধ (জ্ঞানী) হয়েছিলেন। ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) ছিলেন জ্ঞানী। লেখা-পড়া না শিখেও তিনি কত বড় জ্ঞানী দেখছ ত?

জীবন্মুক্ত হবার পরে জ্ঞানীরা কেবল লোক-কল্যাণের জন্য জগতে থাকেন। নৈলে তাঁদের আর কোন বাসনা নেই। তাঁদের সমস্ত কিছুই লাভ হ'য়েছে। তাঁদের আর প্রাপ্য অপ্রাপ্য কিছুই নেই। জগত তাঁদের কাছে অলীক স্বপ্নের মত। তাঁরা মায়ার পারে গিয়ে মায়াতীত হ'য়েছেন।

শান্তি মানুষ পেতে পারে যদি সে ভোগকে ছাড়তে পারে। এই ভোগ হ'তেই যত দুঃখ-কষ্ট রোগ-শোক। যা দুঃখের মূল তাকে আঁকড়ে থাকলে মানুষ কোথেকে শান্তি পাবে? স্বয়ং ভগবান এসেও ভোগীকে শান্তি দিতে পারে না—মানুষ ত দূরের কথা।

কারুর কাছে উপকার পেলে, তাঁকে কখনও ভুলে যেও না। উপকারের ঋণ কখনও শোধ হয় না। তা যত সামান্যই হোক্ না কেন। ঋণ শোধ করতে পার আর না পার চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে। সব সময় খাঁটি থাকবে।

সব সময় নিজেরই দোষ দেখবে। ভুলেও পরের নিন্দা ও চর্চ্চা করবে না। পরনিন্দা মহাপাপ। ওতে মন ছোট হ'য়ে যায়, পরের নিন্দা-চর্চ্চা না ক'রে নিজের চর্চ্চা করবে। পর-নিন্দা পর-চর্চ্চা আত্মাকে কলুষিত করে। সব সময় মানুষের গুণটিই দেখবে। দোষ দেখার স্বভাব হ'লে শুধু দোষই চোখে পড়ে, কারণ দোষে-গুণে মানুষ। ঈশ্বরই নির্দ্দোষ ও গুণময়।

অসুখ বিসুখ, আপদ বিপদ হ'লে ঈশ্বরে নির্ভর ক'রে ক জন থাকতে পারে? সেজন্য ঠাকুরকে স্মরণ করে তার যথাসাধ্য প্রতিকারের চেষ্টা করবে। চেষ্টাও তো তিনিই দিয়েছেন। তাঁকে ভেবে করলে নির্ভরতা আসে।

মতের মিল হোক্ আর নেই হোক্ তার জন্য মাথা ঘামাতে নেই বা কারুর সঙ্গে সে নিয়ে অযথা তর্ক করতে নেই। তাতে ধর্ম্মভাবের হানি হয়। যে যা ইচ্ছে করুক না তাতে তোমাকে কে বাধা দিতে আসছে?

ঠিক্ ঠিক্ সতী নেই যে নিজের মন জগৎস্বামীর পায়ে সঁপে দিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর ও ছেলেদের মনও তাঁকে দিতে পেরেছে। মানুষের মন অসতীর মত হ'য়ে রয়েছে। সতীর যেমন পতিভক্তি ভগবানেও তেমনি ভক্তি। কুন্তীকে সতী বলবে না ত কি বলবে? তিনি নিজের মন তো ভগবানে দিয়ে ছিলেনই, বাকী সব ছেলের মনও ভগবানে দিয়েছিলেন। তারই কল্যাণে ছেলেরা বেঁচে গেল এবং নিজেও বেঁচে গেলেন।

সংসারে মাতা পিতার মত গুরু আর কেউ নেই। সদ্‌গুরু ইষ্টের পরই তাঁদের স্থান। তাঁদের বাদ দিয়ে ধর্ম্ম ষোল আনা পূর্ণ হয় না। শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব, আমাদের ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) এ সব অবতার পুরুষদের জীবন দেখলেই বুঝতে পারবে। তাঁদের (মাতা-পিতা) জন্য এঁরা কি-না করেছেন? মার অনুমতি না নিয়ে সন্ন্যাস পর্য্যন্ত নেননি ঠিক্ ঠিক্ ধর্ম্মলাভ করতে হ'লে এঁদের জীবন মানতে হবে।

ভগবানের কাছে কিছু চাইতে নেই। কারণ তিনি সবই জানেন। তিনি কোথা দিয়ে কি রকম ক'রে যে ভক্তের অভীষ্ট পূরণ করেন তা ভাবতে গেলে অবাক্ হ'তে হয়। ঠিক্ ঠিক্ ভক্তের জীবনে এরূপ অলৌকিক ঘটনা কতই ঘটে থাকে। কিন্তু ঠিক্ ঠিক্ ভক্ত হওয়া বড়ই কঠিন। যারা নামে ভক্ত তারা ভোজনে খুব মজবুত—ভজনে নয়। তাই তারা আত্মার উন্নতি করতে পারে না। হৈ হৈ করে বৃথা জীবন কাটিয়ে দেয়! যারা ঠিক্ ঠিক্ ভক্ত হ'তে চায় তারা হৈ-হৈ মোটেই ভালবাসে না। তারা নির্জ্জনে ভগবানকে ডাকে। ঠাকুর মাঝে মাঝে গাইতেন—"মন যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে—মাকে তুমি দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেহ নাহি দেখে।"

মানুষ আবার কি চণ্ডাল ব্রাহ্মণ হয়ে জন্ম নেয় নাকি? এ সব কর্ম্মগত সংস্কার। গীতাতে শ্রীভগবান বলেছেন—"গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" কর্ম্মের দ্বারা গুণ আবার গুণের দ্বারা বিভাগ। কর্ম্মই সব—শুভ কর্ম্মের দ্বারা সুসংস্কার হয়। মহাপ্রভু বলেছেন—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।"

কামনা-বাসনা থেকেই জীবের অভাব বোধ। না হলে জীবের কোনও অভাব নেই। ভগবানে অনুরাগ হলে বাসনা ক্ষয় হয়। তখন অভাব ঘুচে গিয়ে স্বভাব জাগতে থাকে।

কেবল নাম করে চলে যাও—কেন না, কোন শরীরে তাঁর দয়া হবেই—তিনি উদ্ধার করবেনই। এ যে তাঁরই দায়। তাইতো ঠাকুর দুঃখ ক'রে গাইতেন—'এ যে পড়েছি দায়। সে দায় কব আর কায়। যার দায় সেই বুঝে, অন্যে আর কি বুঝবে?'

শ্রীভগবানের দয়াতে যাঁরা জন্মান, সর্ব্বজীবে অসীম দয়া নিয়ে তাঁরা নেমে আসেন। তাঁরা (মহাপুরুষেরা) দয়ার মূর্ত্তিস্বরূপ জানবে। সংসারের মায়া-বদ্ধ জীবকে হুঁস করিয়ে দিবার জন্য তাঁরা দেহ ধারণ করে এসে উপদেশ দেন। যারা তাঁদের হুকুম মানে তারা বেঁচে যায়। কিন্তু যারা সব জেনে-শুনেও বিগড়ে থাকে, ডুবে ডুবে জল খায়, তারা কপট। তারা যেচে লোকের সর্ব্বনাশ করে। তাদের জীবনটা বৃথা হ'য়ে যায়। যখন অনেক জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ ভোগ করে, তখন হে ভগবান, আমায় বাঁচাও। তোমার দয়া বিনা আর

বাঁচি না ব'লে প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে উঠবে তখন মনুষ্য-জীবন ধারণ সার্থক হবে।

যে তাঁর (ঠাকুরের) হুকুম পালন করবে সংসারের শতেক তুফান-তরঙ্গে আপদ বিপদে তিনি তাকে রক্ষা করবেন। তাঁরই সব খাচ্ছে, তাঁরই পরছে অথচ তাঁর হুকুম মানে না। এসব বেইমানী বৈ কী? তাঁকে না মানলে কি ধর্ম্ম হয়? যে পৃথিবীর জন্মদাতা ও বাপমাকে মানে না সে 'চোর'। তার দ্বারা কি কখনও ধর্ম্মলাভ হয়, না দেশের কল্যাণ সাধিত হয়?

মানুষের কাছে ফাঁকি দিয়ে চলা সোজা কিন্তু ভগবানের কাছে ফাঁকি চলে না। লোকের কাছে যত ভালই সাজো না কেন, তোমার কি গলদ, তোমার চেয়েও তিনি ভাল জানেন। সেজন্য ঈশ্বরের কাছে অকপট ভাবে প্রাণ খুলে প্রার্থনা করতে হয়;—হে প্রভু, আমার সব দোষ তুমি দূর করে দাও। যতই এগোও না কেন একটু না একটু দোষ থাকবেই। ভগবানকে না পাওয়া পর্য্যন্ত কখনও নির্দ্দোষ হওয়া যায় না।

হিংসাই বিষ। একটু মাছ মাংস খেলে আর কি হবে? ওটা ত লোকাচার। আসল হিংসা হচ্ছে পরশ্রীকাতরতা। অপরের ভালটা সহ্য হয় না—অন্যের ভাল বা উন্নতি দেখে চোখ ফেটে যায়। যদি হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ছাড়তে পার, তবে ভগবানকে বুঝতে পারবে।

আজ-কাল সকলেই Leaber (নেতা) হ'তে চায়। দেশের সেবা করতে কোমর বাঁধে। আরে যাদের দয়াতে এই পৃথিবী দেখলে সেই বাপমার সেবাই প্রাণ দিয়ে ভালবেসে করতে পারলে না। সে আবার দেশের সেবা কি করবে? হেলে ধরতে পারলে না কেউটে ধরতে যায়। ব্যাপার বোঝ। যার ব্রহ্মচর্য্য নেই, সেই পরম বস্তু ভগবান যার লাভ হয়নি সে আবার হাঘাড়া 'লিডার' সেজে দেশের ও দশের কল্যাণ করবে! আরে নিজের বাপমার অসুখ হ'লে সেবা করতে পারে না, সে আবার দেশের সেবা করবে কি? যে নিজেরই কল্যাণের পথ চেনে না, সে আবার কি দেশের কল্যাণ করতে পারে? এরকম লিডার হুজুকে পড়ে প্রথমে লোকের বাহবা পেলেও শেষে লোক হাসবে বৈ তো নয়, যখন লোক তার সাচ্চা (আসল) রূপ বুঝতে পারবে। তাই স্বামীজী বলতেন—ওরে লিডার জন্মায়, টেনে টুনে কি লিডার করা যায়?

স্বার্থ-মান যশের কাঙ্গাল—এ রকম কাঙ্গালের দ্বারা কি কখনও বড় কাজ হতে পারে? দেশের জন্য ভেবে ভেবে পাগলপারা হ'লে তবে ভগবানের দয়া লাভ হবে। এখন তাঁর ইঙ্গিতে কাজ করতে না নামলে ঠিক্ ঠিক্ কল্যাণ করতে পারবে। শুধু শুধু চেঁচামিচি লেক্‌চার করা বৃথা, তাতে কি কল্যাণ হয় রে? আরে হিংসা ছাড়তে না পারলে দেশের উপর ভালবাসা হবে কেমন ক'রে?

ভগবান পবিত্র হৃদয় দেখে তবে তাঁর কাজ করবার শক্তি দেন। তাঁর হুকুম পেয়ে যে কাজ ক'রে ধন্য হয়, এবং তাঁর কাজই ঠিক্ ঠিক্ কাজ হয়। স্বামীজীর জীবন তার সাক্ষী। তিনি কত তপস্যা ক'রেছেন! তবে তাঁর হুকুম পেয়ে কোমর বেঁধে কাজে লেগেছিলেন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে কত কাজ করে গেলেন তা তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। কার দ্বারা কি করাতে হবে তা ভগবানই বুঝেন। তাঁর জগতে তিনিই ভাল বুঝেন তুমি আমি কি বুঝতে পারি? যে বিষয় বুঝি না তা নিয়ে হৈ চৈ করার কি দরকার? চুপ ক'রে থাকাই ভাল। যে ঠিক্ ঠিক্ কর্ম্মী যে ভগবানের দয়ায় তাঁর কাজ করতে হুকুম পাবে। তার দ্বারা তিনিই কাজ করিয়ে নেন। যেমন স্বামীজীর দ্বারা তিনি করিয়ে নিলেন তবে তাঁকে ছাড়লেন। যে এই ব্যাপার বুঝে সে আর হৈ চৈ করে না—সে জীবন্মুক্ত হ'য়ে গেছে। এই জীবন্মুক্ত পুরুষেরাই তাঁর কাজ ঠিক ঠিক করতে পারেন।

অমাবস্যার রাতে কোলের মানুষ যেমন চেনা যায় না তেমনি মোহ অন্ধকারে জীব এরূপ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে যে সে নিজেকে চিনতে পারে না। মোহকূপ হ'তে তুলে জীবকে তার আসল রূপ চিনিয়ে দিবার জন্য ভগবান অবতার হয়ে আসেন। এ দায় তাঁরই। তাইতো ঠাকুর মাঝে মাঝে গাইতেন—'এ যে ঠেকেছি যে দায়, কব কায়।' জীবোদ্ধারের জন্য ভগবান আবার কখনও কখনও শক্তিশালী মহাপুরুষ ও আচার্য্যগণকে পাঠান। যদি বল ভগবান ইচ্ছা করলেই তো জীবকে সংসারবন্ধন হ'তে মুক্ত করে দিতে পারেন, তবে আবার দেহ ধারণ করেন কেন? এসব কেনর উত্তর জীব কি দিবে?

তিনি ইচ্ছাময়, লীলাময় ও মঙ্গলময়—তাঁর ব্যাপার কে বলতে পারে? তিনি দুনিয়ার মালিক, তাঁর খুশীমত কাজ করেন। জীব কি তাঁর তত্ত্ব সব জানতে পারে? তিনি খুশী হয়ে যতটুকু জানিয়ে দেন ততটুকুই ভাল; তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। মায়ার অধীন জীব আবার তাঁর কাজের হেতু খুঁজতে যায়। ও-সব পাগলামী ভাল নয়। তাঁর শরণাপন্ন হও, তাঁর দয়া-ভিখারী হও। তাঁর দয়া পাবে এবং এ মায়া থেকে ত্রাণ পেয়ে যাবে।*

* শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীমৎ স্বামী সিদ্ধানন্দ মহারাজ সংগৃহীত তথ্যাবলী অবলম্বনে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও লিখিত।

ভবানী মুখোপাধ্যায়
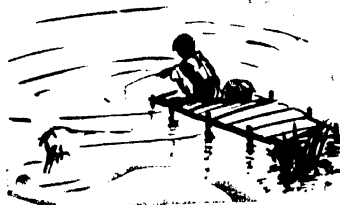
কৃষ্ণার মার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব, ছোটবেলায় একত্রে খেলা করেছি, একই পাঠশালায় পড়েছি, তারপর বড় হয়েও কিছু না কিছু যোগসূত্র রয়ে গেছে। এখন আমরা উভয়েই চল্লিশের সীমানা পার হয়েছি, আমাকে অবশ্য বয়সের উপযোগী মনে হয়, কিন্তু কৃষ্ণার মা বিভাবতীকে বয়সের অনুপাতে অনেক ছোট মনে হয়। মেয়েদের যদিও অতি অল্প বয়সেই বার্ধক্য আসে তবু বিভার শরীরে এখনও জরা স্পর্শ করেনি। এখনও আমার সঙ্গে ওর প্রীতির সম্পর্ক বজায় আছে, সাধারণত: তা থাকে না, মেয়েদের সঙ্গে ত' নয়ই, ছোটবেলার অনেক পুরুষ বন্ধুও বুড়ো বয়সে হারিয়ে যায়। দুটো কারণে অবশ্য এই মৈত্রী ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, প্রথমত: আমি যখন উদীয়মান লেখক হিসাবে রীতিমত কসরৎ করছি তখনই মঞ্চ ও পর্দার সে খ্যাতনামা অভিনেত্রী, আর কিছুকাল সে আমার বন্ধু সিনেমা-জগতের হারাধন চক্রবর্তীর স্ত্রী হয়ে সংসারী হওয়ার চেষ্টা করেছিল, সেই সময়—যাক্ সে সব কথা, এখানে না বলাই ভালো; এ কাহিনীর বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার যোগও নেই।

এই কাহিনী আমার আত্মকাহিনী নয়, বিভাবতীর জীবন-কথাও নয়, এই কাহিনী বিভাবতীর একমাত্র সন্তান কৃষ্ণার কাহিনী।

বিভাবতীর চিরদিন মনে মনে ধারণা যে তার অসংখ্য প্রেমলীলার ফলেই সে অভিনেত্রী হিসাবে সাফল্য লাভ করেছে। তার আরো বিশ্বাস ছিল সুখী হতে হলে স্ত্রীলোককে বার বার প্রেমে পড়তে হবে, এবং প্রেমের সাগরে ডুবে থাকতে হবে। কৃষ্ণার জন্মের পর বিভাবতী স্থির করে যে তাকে 'মুক্ত, স্বচ্ছন্দ এবং স্বাধীন' ভাবে গড়ে তুলতে হবে। কৃষ্ণার জীবনের প্রথম কয়েক বছর এই ভারটা রইলো এক নার্সের ওপর, তারপর তাকে কার্সিয়ং না কোথায় এক ফিরিঙ্গীদের স্কুলে ভর্তি করে এল বিভাবতী। ছুটিতে যখন কলকাতায় আসৃত তখন যাঁরা পড়াতেন তাদের ওপর কড়া নজর রাখতো বিভাবতী, নীতিবাদের চাপে মেয়েটা না শুকিয়ে যায়, এই তার ভয়।

ছোট্ট মেয়ে কৃষ্ণা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দু'টি টলটলে ডাগর চোখ আর তার ওপর পাতলা জোড়া ভুরু, টিকোলো নাক, আর ঘন কৃষ্ণবর্ণ চুল, আকারেও বাঙালী মেয়ের অনুপাতে একটু লম্বা, সব জড়িয়ে একটা বিদেশী ছাপ কোথায় যেন পাওয়া যায়। বিভাবতী বলত—আমি আমার মেয়ের সঙ্গে বন্ধু ভাবে মিশবো। ওকে ওর খুসী মত চল্‌তে বল্‌বো, কোনো কিছুতেই বাধা দে না। ওকে আমি মনের মত করে গড়ে তুলবো।

আমার মনে হয়, হয়ত বিভাবতীর মনে মনে এক উদ্বেগ ছিল, কিছুতেই যেন কৃষ্ণার ওপর একটা ঈর্ষা ভাব না জাগে। ওর খ্যাতির আকাশ যেন মেঘে না ঢা পড়ে। এই সেদিনও যখন বয়স হয়েছে, তখনও দু-একটা ভূমিক ও কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছে। মাঝে মাঝে আয়নায় নি চোখ আর মুখ চুপ করে দেখত বিভাবতী, বার্ধক্যের পদধ্বনি ত ক্রমেই শঙ্কিত করে তুলছে। এই রকম এক সময় হঠাৎ এক আমাকে বলে বসলো,—"ইচ্ছে হয় একদিন ঘুম ভেঙে উঠে দে দেখতে হয় আমাকে তা নিজের চোখেই দেখি।"—তারপর একটু থেমে বললে—"কৃষ্ণাটা তেমন সুন্দরী হবে না, তবে দেখতে হবে চমৎকার।"

কৃষ্ণা মেয়েটা বয়সের অনুপাতে একটু বেশী গম্ভীর, ওর তাকালেই ও চুপ করে মুখের দিকে চেয়ে থাকবে। মাঝে মাঝে ওকে বেড়াতে নিয়ে যেতাম,—কখনো সখনো হয়ত বলে বসতো—'আপনি বুড়ো হয়েছেন, কিছু জানেন না—' তখন একটু বেয়াড়া শোনাতো। ওর বয়সের হিসাবে কত কি যে জানে,—ওদের বয়সে আমরা কথাই বল্‌তে পারতাম না।

চোদ্দ বছর বয়সে মেয়েটা কেমন অদ্ভুত বদ্‌মেজাজী হয়ে উঠল, মাথার চুল উস্‌কো-খুস্‌কো, জিভের কি ধার! কি যে বলে বসবে ঠিক নেই! এ সব ব্যাপারে ওর মার হয়ত সমর্থন ছিল, জানি না বিভাবতীর কি প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল। মাঝে মাঝে অতি বিশ্রী মনে হ'ত।

সেবার স্কুলে ফিরে যাওয়ার সময় কৃষ্ণা হঠাৎ আমার পায়ের ধুলো নিয়ে কেঁদে ফেল্‌ল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, চলে গেল। আমি নিঃসন্তান, সেই প্রথম বুঝলাম সন্তানহীনতার জ্বালা। ও চলে যাওয়ার পর আমিও কাঁদলাম,—মনকে বোঝালাম, থাকলেই বা কি করতাম তাদের নিয়ে!"

কৃষ্ণার যে রকম আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে গেল, কোনো মেয়েকে এত তাড়াতাড়ি এমন বদ্‌লাতে কখনো দেখিনি। সেই বছরেই প্রায় চার ইঞ্চি মাথায় বাড়লো, ছোট্ট মেয়েটি স্কার্ট ছেড়ে শাড়ী ধরলো, শরীরটাও যেন শীর্ণ হ'ল। মাথায় খোঁপা বাঁধতে শিখেছে, তাতে শাদা ফুল দিয়ে সাজায়—কত হরেক রকম শাড়ী আর ব্লাউজের আবদার। নিজের কথাই তার কাছে বড়ো, আর সকলের কথার সে প্রতিবাদ করবেই, তবে সেটা করবে হাসিমুখে। পাছে তার ব্যবহার রূঢ় হয়ে পড়ে, তাই সর্বদা সতর্ক থাকে। গলার স্বরটাও পালটে গেল। বিশেষ লক্ষ্য রাখে যাতে কোনো অপ্রীতিকর কথা না মুখ দিয়ে বেরোয়, আমাদের চাইতেও সতর্ক।

ঠিক কুড়িতেই বি, এ পাশ করে ইতিহাস নিয়ে পোষ্ট-গ্রাজুয়েটে ঢুক্‌লো কৃষ্ণা। আমার বউবাজারের হজুরীমল লেনের ছোট্ট বাসায় বেশী সময় কাটাতে সে ভালো বাসতো। বয়সের সঙ্গে কৃষ্ণার রূপও দেখবার মতো হলো,—মাঝে মাঝে মনে হ'ত ওর মাকে সে ছাড়িয়ে চলে গেছে। মেয়েটি চটপট সব কথা বুঝে নেয়, বুদ্ধিও বেশ প্রখর। ওর মার অন্যান্য বন্ধুরা ভাবতেন মেয়েটি দাম্ভিক ও মুখরা, কিন্তু তা নয়। ওর তীক্ষ্ণ ভঙ্গীর ফলে ওকে বোঝা কঠিন। শুধু আমার কাছে এসে ও মাঝে মাঝে কাঁদতো, আর কেউ বোধ করি ওর চোখের জল দেখেনি।

এদিকে বিভাবতী হিসেব করে বসে আছে মেয়েটি প্রেমে পড়ুক, যেন ছিপ হাতে করে মাছ ধরার আশায় বসে আছে বিভাবতী। তাহ'লে মেয়ের মা হিসাবে ওর কর্তব্য পালন করে বিভাবতী। বলত "মেয়েটার কারো সঙ্গে আলাপই হল না এখনো, বরাত দেখো।'

আমিই প্রথম হালদারের কথা শুনি,—প্রথমে শুধু হালদার, তারপর রণজিত হালদার,—অবশেষে শুধু রণজিত। ছেলেটিও ওরই বয়সী প্রায়, অর্থাৎ কুড়ি একুশ বছরই বয়স, যেন দুটি সমবয়সী ছেলে-মেয়ে একত্রে মানুষ হচ্ছে।

এর পরের সপ্তাহে রণজিতকে মার কাছে নিয়ে গেল কৃষ্ণা পরিচয় করিয়ে দেবে, ছেলেটি পড়াশোনায় ভালো, কিন্তু ফলটা ভালো হ'ল না। প্রথম দর্শনে রণজিতের বিভাবতীকে তেমন ভালো লাগলো না, এবং বিভাবতীকে সন্তুষ্ট করার তার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ মনে হল। আমিও সেদিন ওদের বাসায় ছিলাম, রণজিত চলে যাওয়ার পর বিভাবতী তার ধীর মৃদু কণ্ঠস্বরকে ব্যঙ্গ করতে লাগলো। ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণা তখন তাকে সিঁড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে গেছে, নইলে হয়ত একটা কাণ্ড হয়ে যেত। আমি তার আগের দিন বলেছিলাম,—'কৃষ্ণা, তোমার মার কাছে যাওয়ার আগে ওর জামাটা পালটানো দরকার।'

এই কথায় চটে ওঠে কৃষ্ণা বলেছিল—"ও গরীব হয়ে জন্মেছে সেটা ত' আর ওর অপরাধ নয়।"

রণজিতের মা একটু স্বার্থপর ধরণের, স্বামী ছিলেন এক নামকরা সওদাগরী অফিসের বড়বাবু, সেই হিসাবে কিছু 'উইডো পেনসন' পেয়ে থাকেন, বারবার তিনি রণজিতকে বলেন, 'এমন উড়োন-চণ্ডী মার্কা ছেলে না থাকলে তিনি পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকতেন। ফলে রণজিতের অর্থকষ্ট প্রবল, দু' একটি ট্যুইশনি করে কলকাতার বাসা খরচ চালাতে হয়, শুনেছি প্রতিদিন বেলগাছিয়া থেকে হেঁটে য়ুনিভার্সিটি আসে—আর কৃষ্ণা সর্বদাই তার সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট। আমারই ঘরে বসে ওরা কি সব বই কিনতে হবে তার আলোচনা করছিল, টাকার কথায় কৃষ্ণা কিছু দিতে চায়, ফলে ঠোঁট কামড়ে রণজিত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, এ বিষয়ে ছেলেটি অতিরিক্ত অভিমানী। আমার দিকে একবার বাঁকা চোখে তাকিয়ে কৃষ্ণা অমনি পিছনে ছুটলো। আমি শুনতে পেলাম বারান্দায় ওরা কথা বলছে, হঠাৎ কৃষ্ণা বেশ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কি যে হ'ল কে জানে, তারপর উভয়ে ফিরে এল, কৃষ্ণার মুখে বিজয়িনীর দীপ্ত ভঙ্গী।

ছেলেটির ভঙ্গীটা বড় মনোরম, যদি বোঝে কেউ তাকে অপছন্দ করছে, কিংবা সে অবাঞ্ছিত, তখনই সে সেখান থেকে সরে পড়বে। শৈশব থেকেই অবহেলিত হওয়ার ফলে এতটুকু করুণা বা সৌজন্যের স্পর্শ কোথাও পেলে তার মনে মূল্য সম্পর্কে সংশয় জাগে। কৃষ্ণাকে সে উপাসনা করতে শুরু করেছে, যেহেতু উভয়ে প্রেমে পড়েছে, আবার সন্দেহের দোলায় দুলছে, পেয়ে হারাণোর ভয়। অনেক দূর অবধি পাড়ি দিতে তাই তার বড় আশংকা। কিন্তু কৃষ্ণাকে সে ভালোবাসে, একাগ্রচিত্তে ভালোবাসে। মার স্বার্থবুদ্ধির ফলে জীবনে সে এতটুকু স্নেহ স্পর্শ পায়নি, তাই কৃষ্ণার ভালোবাসায় সে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করেছে। সাধারণতঃ স্বার্থপর জননীদের সন্তানরা কিঞ্চিৎ উদার ও মহৎ স্বভাবের হয়ে থাকে।

রণজিতের এক দূর-সম্পর্কের কাকার ছোট্ট একটি ওষুধের কারখানা ছিল, সেখানে ম্যালেরিয়ার টনিক, কেশ-তৈল, আর দাঁতের মাজন তৈরী হ'ত। বৃদ্ধ রণজিতকে স্নেহ করতেন, রণজিত উপযুক্ত হলে তাকে তাঁর কারবারে নিয়ে নেবেন, এমন আশ্বাসও দিয়েছিলেন। সহসা সব গোলমাল হয়ে গেল, বৃদ্ধ ভদ্রলোক করোনারি থ্রমবোসিসের প্রথম আঘাতে কাবু হলেন, সেরে উঠলেন বটে, তবে আর তাঁর বেশী ভরসা নেই। তাই রণজিতকে পড়া ছেড়ে সোজাসুজি ব্যবসা দেখার জন্য ডেকে পাঠালেন।

রণজিত আর কৃষ্ণা আমার বাসায় দৌড়ে এল এই সংবাদ নিয়ে।

ওরা দুটিতে অদ্ভুত প্রাণী, এখন পর্যন্ত ওদের মুখে একটা আদরের সম্ভাষণ শুনিনি। উভয়ে উভয়কে 'বোকা', 'ইডিয়ট', 'মুখ্যু' এমন কি 'গাধা' পর্যন্ত বলত—অনেক সময়ে ওরা একত্রে না এসে আলাদা আসতো, তার পর দ্বিতীয় প্রাণী কিছু পরে এসে বলত—'বোকাটা গেল কোথায়?' যেন দুটি ভাই বোন, উপমাটা খারাপ শোনায় নইলে বলতাম যেন দুটি সুন্দর পপির মত দেখায় ওদের। দিনরাত হাসছে, ঝগড়া করছে, তর্ক করছে, অভিমান হচ্ছে আবার ভাবও হচ্ছে। আমার এই বাসাটাই ওদের মিলন-ক্ষেত্র, আমাকে ওরা নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করেছে।

এই দিন কিন্তু এতই উত্তেজিত হয়েছে দুজনে যে, শান্ত কণ্ঠে

কথা বলতে পারছে না.—এ ওকে বাধা দিচ্ছে, তর্ক করছে, রীতিমত কলহ, শেষটায় কৃষ্ণা ধাক্কা দিয়ে অসতর্ক রণজিতকে সোফার ওপর ঠেলে ফেলে দিল। তার পর সজোরে তার পাশেই বসে পড়লো, রণজিত বেচারী হাঁফাচ্ছে।

"জানেন মেশোমশাই, আপনি আগে আমার কথাটা শুনুন, আমি একে বলছি, এখনই কাকার সঙ্গে দেখা করে কাজটা হাতে নিতে—'

"তাহ'লে তোমাদের বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়—তাই না?"

কৃষ্ণা লজ্জিত ভঙ্গীতে হাস্‌লো। রণজিত একটু দম নিয়ে বলল—"কি করে বিয়ে হবে বলুন, প্রথমটা মাসে একশ থেকে দেড়শ টাকার বেশী এলাওয়েন্স পাওয়া যাবে না। ঐ টাকায় কি বিয়ে করা যায়, গাধাটা বুঝতে পারছে না।'

"বুঝতে খুব পারছি, তুমিই একটি সিলি এ্যাস্।"

"এ সব এক্‌সপেরিমেণ্ট চলে না, বুঝলে—"

"চালাতেই হ'বে, নইলে বিয়ে হবে কি করে?

"আমি তোমায় বিয়ে করবো না—"

শেষটায় একটা মীমাংসায় না পৌছতে পেরে এক রকম জোর করে ওদের বার করে দিলাম, আমার সামনে একটা মীমাংসা করতে হয়ত বাধছে।

সিঁড়ি বেয়ে নামার সময়ও ওদের উচ্চকণ্ঠ আমার কানে পৌছালো, বুঝলাম সমস্যার সমাধান হ'চ্ছে না।

পর দিন কৃষ্ণা একাই গম্ভীর মুখে আমার কাছে এল। রণজিত রাজী হয়েছে, ওর কাকার কাজেই যাবে। বিয়েটাও এখনই হবে, যদি ওর টাকাতেই কৃষ্ণা চালাতে পারে, এবং বিভাবতীর কাছে হাত পাততে না হয়।

"জানেন, মেশোমশাই, কাল এখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে আমরা আউটরাম ঘাট গেছি আবার সেখান থেকে বাড়ী ফিরেছি। তার পর ও শেষটায় রাজী হ'ল।"

অর্থাৎ বউবাজার থেকে আউটরাম ঘাট, সেখান থেকে আবার গোখেল রোড। সাধে কবি বলেছেন 'যৌবনে দাও রাজটীকা'।

'তার পর আমিও কাঁদি ওরও চোখে জল, মানে দুজনে একটু টায়ার্ড হয়ে গিছলাম কিনা। পরে দুজনেই হেসে ফেললাম। আমিই জিতলাম, কেমন আপনাকে বলিনি। আচ্ছা, মেশোমশাই, আপনার বাসাটায় যদি প্রথম দিকটায় থাকি, আপনার লেখাপড়ার অসুবিধা হবে?"

"অসুবিধা আর কি, ছেলে পুলে থাকলেই যা হাঙ্গাম, তা তোমরা দুজনেও ছেলে বইত নয়। কিন্তু কৃষ্ণা তোমার মা মত দিয়েছেন এই বিয়েতে?"

কৃষ্ণা আমার মুখের পানে ভাবহীন ভঙ্গীতে তাকিয়ে রইল, তার চোখ দুটো যেন সহসা পাথরে রূপান্তরিত হয়েছে। কি গম্ভীর মুখ!

"আজ সকালে বলেছিলাম।"

"কি বললেন?"

"হেসে উঠল, বলল ঐ ষ্টুপিডটাকে বিয়ে করবি কি বল? দু-চার দিন এক সঙ্গে মেলামেশা করতে পারিস, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু বিয়ে, রামোচন্দর। খাওয়াবে কি?"

"তার পর?"

"বললাম, আমার তা ইচ্ছা নয়, আমি ওকে বিয়ে করবোই, এই বলে ঘর থেকে চলে এলাম। মেশোমশাই, মার ও ভাবে কথা বলা ঠিক হয়নি। জানেন, আমার ভয় হয় রণজুকে না অমন কিছু বলে বসে, সে ক্ষেপে লাল হয়ে উঠবে, দেখবেন আপনি—! এখানে এলে আমাদের সব কিছুই যোগাড় করে নিতে হবে না মেশোমশাই?"

আমি স্পষ্টই বললাম আমি এতে খুশীই হব। কৃষ্ণা এ কথায় বিস্মিত হল না বা তেমন স্বস্তির ভাব দেখালো না. সে নিঃশব্দে চলে গেল। তখনো পর্যন্ত বুঝিনি রণজিতকে হারাণোর ভয় তার সব চেয়ে বেশী। এমনই রণজিতের আত্মাভিমান যে কোনো একটা কথার সূত্র ধরে সে ঠিক করে নেবে। ও বোধ হয় তেমন 'সিরিয়স' নয়। যা বুঝলাম, শ্রান্তিতে অবসন্ন হয়ে না পড়া পর্যন্ত রণজিত এই বিবাহে সম্মত হয়নি। আহা, কৃষ্ণার কতই বা বয়স, দুজনেই এখনও তেইশ-চব্বিশের কোঠায়। কৃষ্ণা ভয়ে ভয়ে আছে, পাছে বিভাবতী রণজিতকে কোনো কটু কথা বলে বসে, আর রণজিত বেঁকে বসে, তাহ'লেই আবার নতুন করে সব করতে হবে ওকে। কাগজ-কলম রেখে দিয়ে ছুটলাম গোখেল রোডে বিভাবতীর বাড়ি।

বিভাবতী খুবই চটেছে কৃষ্ণার উপর। অর্থাৎ সে হতাশ হয়ে পড়েছে, কৃষ্ণা তাকে বসিয়ে দিয়েছে। রণজিত সম্পর্কে একবার বল্‌লো 'সেই ওধুধের দোকানের ছোঁড়াটা'। কি করে ওর সঙ্গে মেলামেশা করে আমি ভাবি, কি পেয়েছে ওর মধ্যে কে জানে? ঐ ত চেহারা! তা না হয় একত্রে পড়া-শোনা করে, মিশুক, কিন্তু তাই বলে বিয়ে! জানো মেয়েটা ওকে 'রোকারাম' বলে ডাকে,—যাকে নিজেই বোকা বলে জানিস তাকেই বিয়ে! কি হয়েছে জানো, যাকে প্রথম দেখেছে তাকেই ভালোবেশে বসে আছে। ওরকম কত আস্‌বে কত যাবে। কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে, এখনই বিয়ে? মাসখানেকের মধ্যেই হাঁফিয়ে উঠবে দেখো।"

প্রথমটা প্রাণভরে মনের কথা বল্‌তে দিলাম বিভাবতীকে, তারপর একটু ঠাণ্ডা করে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলাম-রণজিতকে যে কিছু না বলে!

বাড়ি ফিরে এসে দেখি তুমুল কাণ্ড, কৃষ্ণা আর রণজিত দুজনে আমার রান্নাঘরে ঢুকে হৈ-চৈ বাধিয়েছে। নিজেরাই সব ঠিক-ঠাক করছে, সাজাচ্ছে, এমন সময় বুঝি রণজিতের হাত থেকে একটা প্লেট পড়ে ভেঙে গেছে। তাই এত হল্লা! কৃষ্ণা ওর চুল ধরে টান্‌ছে, বল্‌ছে—"মেসোমশায়ের চায়ের সেটটা ভাঙলে, কি বলবেন উনি বলোত, তুমি একটা গাধা।" রণজিতও চটেছে এবং বোধ করি কৃষ্ণার চুল ধরবার উপক্রম করছে, এমন সময় আমি গিয়ে পড়েছি। আমি চিনেমাটির প্লেটটা হাতে তুলে নিয়ে দু'জনকেই একটু বকলাম, ফলে ওরা যেন স্কুলের ছাত্রের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবতে লাগলাম, এই কি প্রেম? ঘর থেকে বেরোবার সময় শুন্‌লাম "তোমার লেগেছে না কি কৃষ্ণা?" দেখলাম কৃষ্ণা মাথা নাড়লো, আর রণজিতের মুখে হাসি ফুটে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি আমার ঘরে চলে এলাম। নিজের কথা মনে হল, চল্লিশ কবে পার হয়ে এখন আমি প্রৌঢ়, ওদের মনের কথা আমি কতটুকু বুঝি! জীবন-যুদ্ধে পরাজিত সৈনিক নূতন যুগের রণ-কৌশলের সঙ্গে পরিচয় কৈ

কৃষ্ণাও য়ুনিভার্সিটির ক্লাস করা বন্ধ করলো। সিক্সথ ইয়ারের মাঝামাঝি কাল। সমস্ত সময়টা কাটায় কৃষ্ণা বেলেঘাটা অঞ্চলে ছোটখাটো বাড়ির খোঁজে। ঐ অঞ্চলেই ওদের কারখানা।

রাতে খাওয়ার সময় ওদের কত কথা ; সারা দিনের হিসাব নিকাশ, জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটির অন্তহীন আলোচনা। অবশেষে কৃষ্ণার একটা বাড়ি পছন্দ হয়ে গেল, মাসে ত্রিশ টাকা ভাড়া,—দুখানি ঘর, একটি রান্না-ভাঁড়ার, আলাদা বাথরুম, এক রকম লটারির টাকা পাওয়ার মতো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেকার ঘটনা, তাই সেলামিটা আর দিতে হয়নি। কারখানা থেকে টিফিনের সময় বেরিয়ে পড়ে রণজিতও একবার ফ্লাটটা দেখে এসেছে।

সেই সন্ধ্যায় কি কি আসবাব-পত্র লাগবে, সংসারের নানান টুকিটাকি জিনিসের ফর্দ, মায় কখানি তোয়ালে কিনতে হবে, তার হিসাব পর্যন্ত হয়ে গেল।

অতি কষ্টে রণজিতকে বোঝালাম কৃষ্ণা যদি তার মার কাছ থেকে মাসে শ'খানেক টাকা নেয়, তাতে এমন কিছু সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে না, বরং সেই টাকায় কিছু আসবাবপত্র কেনাও চলবে। বিবাহের যৌতুক হিসাবে আমিও শ পাঁচেক টাকা দেব বললাম।

কৃষ্ণা নানা রকম মাপ জোক করে দোকানে দোকানে ঘুরে পর্দার কাপড় কিনে আনল, পর্দা টাঙাবার রিঙ, আরো কত কি!

এক সময় ওকে নিরালায় পেয়ে বললাম—"আচ্ছা কৃষ্ণা, রান্না করে, ঘর সংসারের কাজ করে তোমার মত কনভেন্টে পড়া মেয়ের ক্লান্তি আসবে না? সারা দিন ত' রণজিত বাড়ি থাকবে না, সে সময়টা কি ভাবে কাটবে? তার চেয়ে এম. এ টা পাশ করে ফেলো। একটা ভালো দেখে চাকর রাখো, সেই রান্না-বান্নার কাজটা চালিয়ে নেবে।"

"ওর কষ্টের উপার্জন এই ভাবে নষ্ট করবো? না মেসোমশাই, তা আমি পারবো না, আমি সাধারণ মেয়ে, আমার তেমন কোনো উচ্চাভিলাষ নেই। আমি ঘর সংসারের কাজ করেই খুসীতে থাকবো।"

কথাটা সেদিন তেমন বিশ্বাস করিনি। একটা বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা আধুনিক মেয়ে যে এইতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে, তা কোনো দিন ভাবিনি। এই জীবনের সঙ্গে ওর ঠাকুমার জীবনের আকৃতিগত পার্থক্য কোথায়!

রণজিৎ বড়ই একগুঁয়ে, ওদের আধেক কলহের মূল সেইখানে। আমার মনে হ'ত রণজিতকে ক্ষেপিয়ে তুলে তার পর শান্ত করতে বিভাবতীর ভালোই লাগত। এর মধ্যে একটা মাতৃসুলভ মনস্তত্ত্ব লুকানো আছে। জীবনের প্রথম প্রেম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা সর্ব শেষ প্রেমের চাইতেও অনেক অস্বস্তিকর।

একবার যদি কোনো রকমে মনের গভীরে বাসা বাঁধে, তাহলে তাকে ভোলা বড়ই কঠিন, পৃথিবীতে এত বড়, এত প্রেরণাময় অনুভূতি আর কিছু নেই।

বিভাবতীর রাগের আর সীমা রইলো না যেদিন ওদের এই নতুন বাসা সে স্বচক্ষে দেখলো। ছোট ছোট দু'খানি ঘর, (বিভাবতীর মতে পায়রার খোপ), রাস্তার দিকে অবশ্য মুখ আছে, এক ফালি বারান্দাও আছে। নীচের তলায় থাকে চট্টগ্রামের এক দাশ শর্মারা। কর্তা বুঝি শিয়ালদার রেলে কাজ করে, গিন্নীর বিশাল চেহারা, যেমন লম্বা তেমনই চওড়া। কে বলবে বাংলার মাটিতে এই স্বাস্থ্য বিকশিত হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণার সঙ্গে এর মধ্যেই ভারী ভাব। ওকে বুঝি কি ভাবে ইলিশ মাছের পাতুরি রাঁধতে হয় তাই শেখাতে আসছিলেন, আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ালেন। বিভাবতী ত' তাঁকে রীতিমত অপমানই করলো, অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে একটাও কথা বললো না।

চটেছিল বিভাবতী, তাই রণজিত সম্পর্কে যা মুখে এলো বলে গেল। সব চুপ করে শুনে গেল কৃষ্ণা। সে সব সহ্য করতে পারে কিন্তু রণজিতের অপমান তার সয় না, এ বিষয়ে সে দক্ষকন্যা সতীরই সমতুল্য। ওর কণ্ঠস্বর ও দীপ্ত ভঙ্গী দেখে আমি সেদিন বুঝেছিলাম যে, আর যাই হোক, যেখানে রণজিত আর কৃষ্ণার জগত সেখানে আর কারো প্রবেশাধিকার নেই। আর কারো কথা সে কানে তুলবে না। এর সঙ্গে এই হল যে, বিভাবতীর টাকা আর কিছুতেই সে ছোঁবে না।

বিভাবতীর রাগও কমলো না। মেয়েটা যে সুখী হয়েছে, শান্তিতে আছে এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না বিভাবতী। এই বিবাহটা যেন তার মনে ব্যক্তিগত অপমানের মত বিঁধছে।

বিভাবতী ছাড়া আর কেউ হ'লে বিয়েটির এইখানেই নিষ্পত্তি হ'ত। বড় জোর কেউ কারো মুখ দেখতো না, নয় ক্ষমা করতো, অজ্ঞানের অপরাধ ভুলে যেত। বিভাবতীর মনে কিন্তু এই সব 'রোমান্টিক' মেয়েলিপনার স্থান নেই, তাই বিবাহ সম্পর্কে সেও নানারকম কথা ভাবতে লাগল। ভাবল এই কষ্ট, এই অর্থাভাব নিয়েই রণজিতের সঙ্গে লড়াই বাধবে, তখন একেবারে মুঠোর ভেতর আসবে কৃষ্ণা। টাকা চাইবে, উপদেশ চাইবে, বলবে—'মা, কি ভুলই করেছি।' আর প্রসন্নচিত্তে বিভাবতী বলবে "ঠিক হায়, কৃষ্ণা, শক্ত হও। জীবন আর যৌন জীবন এক নয়, একই অভিজ্ঞতার দু'টি বিভিন্ন দিক—জীবনের জয়পতাকা উড়িয়ে দাও তাতে লেখ, 'ভোগেই চরম সুখ!' মানবদেহ পেয়েছ, ভোগ করে নাও, জীবনের সকল আনন্দ অঞ্জলি ভরে আকণ্ঠ পান করে নাও।"

কৃষ্ণাকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করে আনতে হবে। দু চারজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। থিয়েটারে প্রথম রজনী বা সিনেমায় ট্রেড শোতে ডাকতে হবে।

নিমন্ত্রণ করতেই কৃষ্ণা বলে উঠল—"ওকেও নিয়ে যাবে ত'?"

"আর যে টিকিট নেই,—একঘণ্টাও ছেড়ে থাকতে পারবি না? না, তোকে বুঝি কোথাও যেতে দেয় না?"

কৃষ্ণা হাসে, নিমন্ত্রণ রাখেনা। হয়ত প্রথম রজনীর অভিনয় দেখে আনন্দ পাওয়া যেত, থিয়েটার আর সিনেমায় কার অরুচি। কিন্তু রণজিত-হীন সন্ধ্যা অর্থহীন। বিভাবতী কিন্তু এই সহজ কথাটা সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। তা নয় কৃষ্ণা প্রলোভন জয় করার চেষ্টা করছে। ওদের বাড়িতেও দু চারজন বন্ধু-বান্ধব আসে, কৃষ্ণা তাদের সব দেখায়, দুটি ঘর, রান্নাঘর, মায় চায়ের বাসন পর্যন্ত। অনেক দিন অনেক রাত পর্যন্ত তারা থাকে, রণজিতের খাবার উনানে বসানো থাকে। কখনো দু চারজন অপরিচিতকে নিয়ে বিভাবতী এসে হাজির হয়, কিছুতেই উঠতে চায় না,—রণজিত কাজ থেকে

ফিরে এসে অপরিচিতের হাটে ম্লান মুখে বসে থাকে, অনেক পরে তারা যখন উঠে যায়, তখন পবিত্র হিন্দু হোটেল থেকে খাবার কিনে এনে খেতে হয়। সেদিন রান্না করার সময় হয়নি।

এর পর দিনই ওদের দুজনকেই নিমন্ত্রণ করলো বিভাবতী। কথা প্রসঙ্গে বললো—"এ ভাবে কৃষ্ণাকে দিন রাত হাঁড়ি-হেঁসেল নিয়ে আটকে রাখা ঠিক নয়—স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে। বিয়ে ত' অনেকদিন হয়ে গেল এখন মাঝে সাজে একটু বৈচিত্র্য না হলে জীবন বিস্বাদ হয়ে উঠবে"—ইত্যাদি।

এই সর্বপ্রথম রণজিত জানতে পারলো কৃষ্ণা বহু নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেছে। মনে আনন্দ হল তার, তাই বললে—না কৃষ্ণাকে ত' আমি আটকে রাখিনি, যাবে বৈকি সে সর্বত্র, প্রয়োজন মত যাওয়াই ত' উচিত।"

"বিভাবতী তখনই বলল—'তাহ'লে ওকে একটু বুঝিয়ে বোলো।"

কৃষ্ণা ঘরে ঢুকেই বুঝলো রণজিতকে মা কিছু বলেছে। কি করে যে শেষ পর্যন্ত সব মিটমাট হল তা আমার জানা নেই, রণজিত যদি কলহ সুরু করে থাকে, তাহলে বিছানায় শোয়ার পর তার মীমাংসা হয়েছে, ঐ বিরাট খাটটি ওদের পরম-মিত্র। ক্লান্ত দেহ একটুতেই ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, সকল কলহের অবসান ঘটে।

বিভাবতী মাঝে মাঝে আমার বাসায় এসে শুনিয়ে যেত কৃষ্ণা এখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে, "দিনরাত ঐ এঁদোঘরে, একটা সঙ্গী নেই, কথা বলতে আছে শুধু চাটগার দাশশর্মা-গিন্নী। তা অর্দ্ধেক কথাই বোঝা যায় না, কথা কইবে কি!

আমি জানতে চাই—"তোমাকে কৃষ্ণা এইসব বলছিল নাকি?"

আমার দিকে চকিতে একবার তাকালো বিভাবতী, তারপর বলল—"ঠিক এই সব কথা বলেনি, নিজের মুখে কি আর কেউ নিজের মূর্খামির কথা স্বীকার করে, তবে ওর মুখ চোখের ভাব দেখে তাই মনে হয়।"

কৃষ্ণার ওখানে যখন তখন দু'চার জনকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হ'ত বিভাবতী, আর সেই সঙ্গে কিছু জিনিষপত্রও দিত, আর কৃষ্ণাও তা অম্লান বদনে গ্রহণ করতো। এইসব বন্ধু-বান্ধবরা নিয়তই পরিবর্তিত হতেন, কিন্তু লেগে রইলেন তরুণ সিনেমা-ডাইরেকটার নিখিল সরকার। তার তোলা 'রক্তের দাগ,' 'ভুলের ফসল' ইত্যাদি বই তেমন জমেনি। তবে ছোকরার পয়সা আছে, সে খবর বিভাবতীর অজানা নেই।

সংক্ষেপে নিখিল সরকার লোকটা সদালাপী, রসিক এবং আনন্দময়। অবশ্য এ কালে এইসব এমন একটা কিছু বিশেষ সদগুণ নয়। কৃষ্ণার সঙ্গেও আর সকলের চাইতে এই লোকটির ঘনিষ্টতা হয়েছিল বেশী। লোকটি এক কালে স্কুলের মাষ্টার ছিল দিল্লী না সিমলায়, তার পর ছবি এঁকেছে, ষ্টুডিয়োতে ঢুকেছিল শিল্প-নির্দেশক হয়ে, এখন হয়েছে ডাইরেক্টর। রীতিমত রোমাণ্টিক টাইপ। মিহি সুরে নানা রকম কৃত্রিম ভঙ্গীতে কথা বলতে পারে, নারীচিত্ত জয় করবার উপযোগী সৎ ও অসৎ গুণ দুই-ই তার আছে। কৃষ্ণাকে একটা জাপানীজ পুড্‌ল কুকুর উপহার দিয়েছে, সময়ে অসময়ে মার্সিডিজ্ বেন্‌জ হাঁকিয়ে আসছে। কখনো ডায়মণ্ডহারবার কখনো দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণাকে।

বিভাবতীর কাছে এ সব জলখাবার, ওদের এই অন্তরঙ্গতার সংবাদ শুধু যে আমি তা নয় চেনা-অচেনা যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই শোনাচ্ছে, রণজিত কয়েক বার নিখিল সরকারের নাম শুনেছে, দেখেছে তাকে মাত্র একবার। আমার বিশ্বাস বিভাবতী তাকে বিশদ বিবরণ না দেওয়া পর্যন্ত সে এ-বিষয়ে কোনো গুরুত্ব দেয়নি কখনো। আর পাঁচ জনের মতই ভেবেছে।

বিভাবতীর ব্যবহারটা এমনই কুৎসিত হয়ে উঠেছিল এই সময় যে সব কথা ঠিকমত লেখাও সম্ভব নয়। এমনই তার ভাব ভঙ্গী, যেন এই রোমাণ্টিক নাটকের সে একটা মূল চরিত্র। তাই যা কিছু সে করে সবটাই নাটকীয়। কৃষ্ণার বিবাহটা সে মেনে নিতে পারেনি, তাই তার ধারণা এই বিবাহ ভেঙে যেতে বাধ্য, যেমনই আকস্মিক গতিতে বিয়ে হয়েছে, ভাঙবেও সেই ভাবেই।

বিভাবতীর পরিকল্পনা যদি সব ঠিক মত চলে, তাহ'লে এই বিবাহ ভাঙবে কৃষ্ণার মন যদি রণজিতের ওপর থেকে সরে অন্যের ওপর পড়ে, তাই তার এই বিশ্বাস হয়েছে যে বিবাহে ইতিমধ্যেই ভাঙন ধরেছে।

অনেকদিন রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে বিভাবতীর মাথায় নাটকীয় সিচুয়েশন খেলে ভালো,—কত কাল্পনিক কথোপকথন সে ঠিক করে রেখেছে, বিশেষতঃ রণজিত সম্পর্কে।

রণজিত যখন এলো তখন আমি বিভাবতীর বাসায় বসে চা খাচ্ছি। রণজিত এসেছিল কৃষ্ণার খোঁজে, সেদিন বুঝি ছটা'র বদলে ওদের তিনটেয় কারখানা বন্ধ হয়েছে, বাড়ি ফিরতে দাশশর্মা-গিন্নী খবর দিয়েছেন কৃষ্ণা ওখানেই এসেছে।

রণজিত তখনই বেরবার উপক্রম করছিল, কিন্তু বিভাবতী শাশুড়ির কর্তব্য হিসাবে এক কাপ চা না খাইয়ে ওকে ছাড়বে না। আমি বড়ই ক্লান্ত ছিলাম সেদিন, তিন ঘণ্টা ধরে এক সাহিত্য সভার সভাপতিত্ব করে একেবারে হাঁফিয়ে উঠেছি। আমার কানে বিভাবতীর নাটকীয় উক্তি আর চোখে ভাসছে রণজিতের রক্তহীন শাদা মুখ—

"আপনি ঠিক জানেন, ও নিখিল সরকারের সঙ্গে গেছে?"

"হয়ত গেছে, আমি ত' শুনেছি প্রায়ই যায়!"

কথাটা একেবারে মিথ্যা।—

"কোথায় যায়?"

"তুমি বাসে গিয়ে ধরতে পারবে না, হয় ডায়মণ্ডহারবার নয় দক্ষিণেশ্বর।" বিভাবতীর মুখে কুটিল হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

হঠাৎ আমার মনে হ'ল বিভাবতীর কথায় রণজিত উত্তেজিত হয়ে উঠছে, তাই আমি বললাম—"তবে গেল পাঁচদিনের মধ্যে চারদিন বিকালে সে আমার কাছেই ছিল।"

বিভাবতী চটে উঠে আমাকে বলল—"শঙ্করদা, শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না—" রণজিত উঠে দাঁড়ালো।

"জানো রণজিৎ, দিনরাত ঐটুকু মেয়ে কি রান্না ঘরের কালিঝুলি মেখে বসে থাকতে পারে? এটাও তোমার ভাবা উচিত।"

রণজিত মৃদু গলায় বলল—"আমি ত' তাকে বেঁধে রাখিনি!"

"তাহ'লে ওকে কিছু বলো না, তোমরা ছেলেমানুষ, অল্পতেই খারাপটা ভেবে নাও।"

"কিসের খারাপ?"

"কৃষ্ণাকে তুমি হয়ত এত বাঁধনে ধরে রাখতে পারবে না।"

এইবার রণজিত উত্তেজিত গলায় বলল—"যা বলতে চান স্পষ্টকরে বলুন, ইঙ্গিত ইসারা ত' অনেক করলেন"—

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—"দেখো রণজিত, কৃষ্ণা হয়ত বাড়িতে বসে তোমারই জন্য রান্না করছে, তুমি বৃথা এখানে দাঁড়িয়ে এই সব শুনে মন খারাপ করছ।"

অত্যন্ত গম্ভীর মুখে রণজিত বেরিয়ে চলে গেল। আমার মনে হল বিভাবতীকে দুকথা শুনিয়ে দিই, কিন্তু এমনই আমার দুর্বলতা যে, কাউকে মুখের ওপর অপ্রিয় কথা বলতে পারি না। তাই চুপ করে গেলাম, যাই হোক আমিই বা কে! তা ছাড়া আমার কথায় কোনোদিন গুরুত্ব দেয়নি বিভাবতী।

এদিকে রাত আটটার পর বাসায় ফিরে এসে দেখি দাশ-শর্মাদের একটা ক্লাস টেনে পড়া ছেলের হাত দিয়ে এক জরুরী চিঠি পাঠিয়েছে কৃষ্ণা!

"রণজিত এখনও বাড়ি ফেরেনি। দুপুরে একবার এসেছিল, তখন আমি বাড়ি ছিলাম না, তারপর আর খবর নেই। সেই চারটে থেকে ওর চা জলখাবার নিয়ে বসে আছি, দেখা নেই। মেশোমশাই, বোধহয় একটা কিছু এ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে, আপনি একটু পুলিসে খোঁজ করুন।"

আবার ছুটলাম বেলেঘাটা। বেচারী যখন দরজা খুলে দিল, তখন সত্যি আমার চোখে জল এল। হয়ত ভেবেছিল রণজিত ফিরেছে। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে উঠেছে, চুল বাঁধেনি, কাপড় ছাড়েনি, মূর্তিমতী আনন্দ-প্রতিমা বিষাদ-প্রতিমায় রূপান্তরিত। সারা বিকাল থেকে কেবল ঘর আর বার হয়েছে, একবার জানলা একবার বারান্দায় দাঁড়িয়েছে। ওর মনোভঙ্গী বুঝলাম: পথের পদধ্বনি কি ভাবে এ সময় বুকে বাজে আমি জানি।

রণজিত হতভাগার ওপর ভারী রাগ হল; মনে হল বিভাবতীর কৌশলের ফলে এই মূল্য বার বার দিতে হবে কৃষ্ণাকে। এদিকে আবার রণজিতের যা মেজাজ, ওদের বিয়েটা শেষ পর্যন্ত সত্যি না ভাঙে।

আমাকে এমন চুপচাপ দেখে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরলো কৃষ্ণা, বললো—"বলুন না মেশোমশাই, আপনি নিশ্চয়ই কিছু জানেন। বলুন, এখনই বলুন।"

সব কথা বলা উচিত হবে কিনা ভাবছিলাম, শুধু বললাম "এইটুকু জানি, আজ সন্ধ্যায় রণজিত গোখেল রোডে তোমার খোঁজে গিছল।" তারপর একটু থেমে বললাম—"তোমার মা হয়ত তাকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন।"

কঠোর হয়ে উঠল কৃষ্ণার ভঙ্গী, সে বলল—"আপনাকে সব খুলে বলতেই হবে, মা কি কি বলেছে বলুন। মা নিশ্চয়ই আজে-বাজে কথা বলেছে আবার।"

আমি বললাম, "সব কথা মনে নেই কৃষ্ণা, আমি বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—তবে বোধ হয় বলল তুমি হয়ত নিখিলের সঙ্গে ডায়মণ্ডহারবার-টারবার গেছ। রণজিৎ প্রশ্ন করছিল 'নিখিলের সঙ্গে কৃষ্ণা গেছে আপনি ঠিক জানেন', সেই সময়টা আমি উঠে পড়লুম।"

"বলুন, বলুন—"

"তার পর ও চলে গেল।"

"ঠিক কি কথা হয়েছিল জানেন না? আমি ঠিক কথাটা শুনলে হয়ত একটা ব্যবস্থা করতে পারি!"

"যা মনে ছিল সবই ত' বললাম।"

কথাটা বোধ করি কৃষ্ণা বিশ্বাস করেনি, আমার মুখের পানে অদ্ভুত ভঙ্গীতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিজের মুখে হাত চাপা দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি ধীরে ধীরে বললাম: "তোমার মা এখনও রণজিতকে ঠিক বুঝতে পারেননি, মনে হয় এই কথাটা রণজিতকে তোমার বুঝিয়ে বলা উচিত। মাকে আর কি বলবে তুমি?"

"মা? মাকে আমি পাঁচ বছর বয়স থেকেই জেনেছি মেশোমশাই। আমি কড়া কথা বলতে চাই না মেশোমশাই, উনি আমার মা, কিন্তু আমি অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু ওঁকে বিশ্বাস করার মত নির্বুদ্ধিতা আর নেই। আমাকে টাকা দেন, সাড়ি দেন, আমার মা?"

কৃষ্ণার কণ্ঠস্বর উত্তেজিতও নয়, তেমন শান্তও নয়, কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণ। হঠাৎ ওর মার কথা মনে পড়ল, কত ছোট থেকে তাকে জানি, মাত্র এক বছরের এদিক-ওদিক। আজ কৃষ্ণার মধ্যে অতীতের সেই বিভাবতীকে যেন দেখতে পেলাম। কি কঠোর তার ভঙ্গী,—মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে, নয়নে বিদ্যুৎ-বহ্নি। কৃষ্ণা আবার পথের ওপর পদধ্বনি শুনছে, ভাবছে আমি তাকে লক্ষ্য করছি না, আমিও জানলার ধারে উঠে গিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ দরজায় সামান্য শব্দ হ'তেই লাফিয়ে দরজা খুলতে গেল কৃষ্ণা। কিন্তু দৌড়ে নীচে না গিয়ে দরজার গোড়ায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বুঝলাম, কৃষ্ণার রাগ এখনও কমেনি।

আমার কিন্তু রণজিতকে দেখে সব রাগ মন থেকে চলে গেছে। বেচারীকে ভারী ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বেচারী হয়ত কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে, কৃষ্ণাকে হারাবার আতঙ্কে সে প্রায় মৃতকল্প। তারুণ্যের বড় দোষ এই যে, সব কিছুই অতিরঞ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী, আর আছে আন্তরিকতা,—তার ফলেই ওরা এত কষ্ট পায়।

অনেকক্ষণ দুজনেই নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

তার পর হঠাৎ কৃষ্ণা বলল: "কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

"পথে পথে ঘুরছিলাম।" আমাকে দেখে রণজিত হয়ত লজ্জিত হয়েছে।

কৃষ্ণা বলল: "আমি আকাশ-পাতাল ভাবছি সেই থেকে।"

"আমারই দোষ।"

"যদি একটা এ্যাক্সিডেণ্ট হ'ত। কি মনে হয় বলো ত?"

"সেকথা ভাবিনি,—আমারই অন্যায়।"

"আমার কথাটাও তোমার ভাবা উচিত।"

"ভাবছিলাম, সারা সন্ধ্যা ধরেই ত' ভাবছিলাম।"

"আমি শর্মা-গিন্নীর মত গরম জলে তোমার ভাতটা রেখে দিয়েছি, এতক্ষণে বোধ হয় অখাদ্য হয়ে গেল।"

"যাক্ গে, আজ আর কিছু খেতে ইচ্ছা নেই।" তার পর বসে রণজিত আবার বলে—"সত্যি, আমি অতি মূর্খ, তোমার দিকে চাই না, এই বাড়ি, না আছে গাড়ি, না আছে টাকা!"

"কে চেয়েছে গাড়ি, বাড়ি! আমি আর কখনো নিখিলকে এখানে আসতে দেব না।"

"না, না,—তা কোরো না, আমি একটা স্বার্থপর গাধা হ'তে চাই না।"

"কে বলেছে তুমি গাধা!"

আমি বললাম—"আবার সেই গাধা প্রসঙ্গ,—এবার তা'হলে আমাকে ছুটি দাও মা,—তোমাদের দাম্পত্য-কলহ মিটুক।"

হঠাৎ রণজিতের পায়ের দিকে তাকিয়ে রোষভরে কৃষ্ণা বলল: "তুমি যে আবার ভালো জুতোটা পরেছ, ব্যাপার কি?"

"তোমার জন্যে। গোখেল রোডে গেলাম, তাই ভালো জুতোটাই পরতে হ'ল।"

"তোমার দেখছি ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স হচ্ছে, ছিঃ ছিঃ মাথাটার কাছে বেয়াড়া দাগ করে এনেছ। জানো আর এক জোড়া ভালো জুতো তোমার নেই, কোথায় যেতে-আসতে দরকার হবে বলে তুলে রেখেছিলাম।"

"বোধ হয় শেয়ালদার কাছে বাস থেকে নামতে গিয়ে হয়েছে। ছিঃ, ছিঃ।"

"তোমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, এইটেই তোমার ভালো জুতো, আর এত অযত্ন।"

"গেলবারে যখন ব্রাউনটা পরে গোখেল রোডে গিছলাম, তুমি রাগ করেছিলে, বলেছিলে সবাই হাসবে।"

"আমি অতশত জানি না, খালি পায়ে থাকলেও তোমার দাম কমবে না।

যাকৃগে, যা হয় করে আমি ঠিক করে নেব'খন।'

এতক্ষণ উঠতে পারছিলাম না, জুতো প্রসঙ্গ বেশ জমে উঠতে আমি বললাম: "কৃষ্ণা মা, আমি এবার যাই, এগারোটা বেজে গেছে, এতক্ষণ শুয়ে পড়া উচিত ছিল।"

"মেসোমশাই, আপনি সত্যি 'গ্রেট'—ও আপনি না এলে—"

'গ্রেট', 'আপনি না এলে'। —আমি বেচারী এই মধ্যরাত্রে এখন কি করে বাড়ি ফিরি, সে কথা ওরা ভাবলো না। অর্ধেক পথ হেঁটে এসে রাসমণি বাজারের কাছে একটা খালি ট্যাক্সি কপালে জুটে গেল।

দু'দিন পরে বিভাবতী আমাকে আবার বেলেঘাটায় টেনে নিয়ে গেল। রণজিত একা ছিল ওপরের ঘরে, কৃষ্ণা বুঝি দাশশর্মা-গিন্নীর কাছে কি একটা নতুন রান্না শিখতে গেছে। বিভাবতী বোধকরি তার পার্ট মুখস্থ করেই এসেছিল, বলল:

"দেখতে এলাম কৃষ্ণার কাণ্ড কারখানা কতদূর গড়ালো?"

"কিসের কাণ্ড কারখানা?"

ঠিক সেই সময় কৃষ্ণাও ঘরে এল, আমি ভ্রুকুঞ্চিত করে কৃষ্ণাকে সতর্ক করার চেষ্টা করলাম। একবার রণজিত একবার মার দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকালো কৃষ্ণা। রণজিতের ক্রুদ্ধচোখের চাইতে বিভাবতীর কুটিল দৃষ্টি তার কাছে গভীর অর্থব্যঞ্জক মনে হ'ল।

"মা বুঝি কিছু বলেছে মেসোমশাই!"

"আমি কি জানি মা, মনে করেছিলাম রণজিত বুঝি সব জানে।"

কি ভাবলো কি জানি কৃষ্ণা, সে হঠাৎ বলে উঠলো—'কি আরম্ভ

রণজিত বলল: "কিছু বলতে হবে না কৃষ্ণা, আমি সত্যি 'ফুল' নই।" ঘরময় একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া, কিসের যে কাণ্ড আর কারখানা কে জানে! হয়ত সেই নিখিল ঘটিত ব্যাপার। রণজিত এর পর আর দাঁড়ালো না এক মুহূর্ত, তাড়াতাড়ি চলে গেল। শনিবার কাকার বাসায় গিয়ে ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা করতে হয়, তিনি সেই 'স্ট্রোকে'র পর আর বেরোন না।

রণজিত চলে যাওয়ার পর কয়েক মিনিট কৃষ্ণা শোবার ঘরে বসে রইল, এদিকে বিভাবতী বোধকরি তার পরবর্তী পরিকল্পনা মনে মনে চিন্তা করছে।

কৃষ্ণা আত্মস্থ হয়েছে, সে বেশ ঠাণ্ডা গলায় বলল: "তুমি ইচ্ছে করেই এ সব করেছ মা। তোমার নিজের ধারণা মতই [illegible] করেছ কিন্তু সবাইকে নিজের মতো ভেবো না। রণজিতকে [illegible] আমি খুসী হয়েছি। শান্তিতে আছি, তুমি আর আমার সুখের [illegible] আগুন লাগাবার চেষ্টা কোরোনা। ওর কাকা শীগ্‌গীরই একটা ছোট বাড়ি ওকে দিয়ে দিচ্ছেন, শ্রাবণের শেষাশেষি আমরা সেখানে উঠে যাবো। আমাদের নতুন বাড়িতে তুমি না এলেই আমার শান্তি হবে মা।"

বিভাবতী আহত হয়েছে, কৃষ্ণার গভীর কালো চোখে আগুন জ্বলছে, শান্তগলায় বিভাবতী বলল: "তাহ'লে, তোমার [illegible] আসতে আমাকে মানা করছ!"

"উপস্থিত তাই। জানেন মেসোমশাই রণজিত একবার যদি আমাকে সন্দেহ করতে সুরু করে তাহলেই সর্বনাশ হবে।"

আমি বিভাবতীর মুখের দিকে তাকালাম। তার মুখে কথা নেই, কথা খুঁজছে, পাচ্ছেনা মনে হ'ল। শুখনো মুখে উঠে পড়ল বিভাবতী। দেরাজের গায়ে লম্বা আয়নায় নিজের মুখের [illegible] ভালো করে তাকালো একবার।

সারাটি পথ একটিও কথা বলেনি বিভাবতী, কিন্তু আমার [illegible] পৌঁছে কোচে বসেই তার কথার স্রোত বইতে সুরু হ'ল—"[illegible] শঙ্করদা, সেবার গরমের ছুটিতে কৃষ্ণা বড় দুষ্টুমি করেছিল, [illegible] বলেছিলাম ছুটি ফুরানোর আগেই তুই কন্‌ভেন্টে ফিরে যা। কি [illegible] মেয়ের, পাঁচমিনিটেই সুটকেশ হাতে তৈরী একেবারে, অনেক বুঝিয়ে তবে ঠাণ্ডা করি।"

আবার বলে বিভাবতী: "এখন অবশ্য বোকামি করেছে তবে ছেলেমানুষ, ওর কথা অতটা সিরিয়সলি নেওয়া ঠিক হবে না। আবার এক নেমতন্ন করে আনবো, ভাব দেখাব যেন কিছুই হয় নি।"

"যদি না আসতে চায়।"

"অপেক্ষা করব, ওর চৈতন্য-উদয়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকব। জানো শঙ্করদা, মেয়ে হলেও কৃষ্ণা আর আমি দু'জনেই বন্ধু, বন্ধুর মতই দেখেছি ওকে, আমাকে সব কথা ও বলে আমিও কিছু রেখে-ঢেকে বলি না। আমি ওকে সৎ আর নির্ভীক করে গড়েছি।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বিভাবতী, আমি নিঃশব্দে চুরুট টানতে লাগলাম। ভর ছিল বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের বিদ্যুৎলতা এইবার হয়ত কাঁদছে, এই চোখে

জল তার সীতা ষোড়শী, প্রফুল্ল, ইত্যাদি নারীচরিত্রের ছকবাঁধা কান্না নয়, আসল চোখের জল।

এই সময় নিচে রাস্তায় কি একটা ঠাকুরের বিসর্জন উপলক্ষ্যে ব্যাগ পাইপ বাজিয়ে শোভা যাত্রা চলেছে। বাজনায় ত্রুটি আছে, তবু এই সব উত্তেজনাময় পরিবেশ আমার ভালো লাগে। শোনবার জন্য জানলায় দাঁড়ালাম। রাজপথের খারাপ সঙ্গীতও মানুষের কানে মধুর হয়ে বাজে।

বক্ বক্ করছে তখনও বিভাবতী, এখন সে অন্য জগতের মানুষ, তার সব কথা কানে নিইনি।—দেখলাম হাতব্যাগ খুলে আরসী বার করে মুখটা ভালো করে দেখছে বিভাবতী।

বললাম—"কি দেখছ? পুরানো নিভাং আছে কি না দেখছ?"

"তুমি আবার ওকে নিয়ে বসলে, ঐ কি বস্তি, ও হল তুষারকণা, কিন্তু আমার অনেক কাজ শঙ্করদা, ঐ বোকা মেয়েটার কথায় আর মন খারাপ করবো না। এখনও আমার বয়স আছে। আচ্ছা আমার কত বয়স হয়েছে শঙ্কর দা? তোমার চেয়ে ত' আমি অনেক ছোট!"

দশ বছর কমিয়ে বললাম—"কত আর, এই বত্রিশ তেত্রিশ। দেখায় অনেক কম।"

"তবে কি জানো শঙ্কর দা, এখন আমি ক্লান্ত, যখন আনন্দে থাকি তখন মনে হয় বয়স অনেক কম, দুঃখ হ'লেই মনে হয় বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। জানো শঙ্কর দা স্টেজ ছেড়ে দেব। মজুমদার মশাই নতুন পার্ট দিতে চান, নেব না মনে করছি,—স্ক্রীনেও ছুটি নেব। এইবার একটা 'আত্মস্মৃতি' লিখব মনে করছি। ভয় নেই, তোমার অন্ন খাবো না, তোমার নামও মেনশন করবো না, তুষারেরও নয়,—নির্বোধ মেয়ে, দেখবে ঠিক বছর খানেক পরে এসে মাফ চাইবে, মাফ করবো, যতই হোক্ আমারই ত' মেয়ে।"

উঠে পাশের ঘরে গেল বিভাবতী, বোধকরি চুল বা মেক-আপ ঠিক করতে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গীতে করুণ গলায় বহু নাটকের নায়িকা বিভাবতী বলল:

"বোধকরি তুমি ছাড়া আমার আপনজন আর কেউ রইলো না, শঙ্কর দা!"

কালীঘাট

শ্রীমতী মনীষা দেবী

অনেক তীর্থেরই মত
যাত্রী-সমাগত,
ভীড়ে আর ঘামে আর পকেট-মারেতে
গঙ্গার ধারেতে
ফুলে ও কাদায়
কালীঘাট গড়াগড়ি যায়!

হরেক বর্ণ রঙেরা সাজানো দোকান
রয়েছে ছড়ানো সব খান!
সাড়ে ছ' আনার মাল
এত জঞ্জাল
পথ চলা দায়;
ধূসরিত ভিখারী বন্যায়
তারও পরে ধাওয়া করে পিছে!

অনেক গেরুয়া-সাজ, রক্তবাস, আরও কত কি যে
আপন ফিকিরে ঘোরে: কত যে দালাল
শিকার-সন্ধানী চায় বিকাইতে অবৈধ যে মাল।
বস্তীর কলহ আর চিলে ও শকুনে
টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি ঘরে ঘরে তুন ও চৌতনে।

বাস্তীর আগুনে-পোড়া নেড়া তালগাছ
নিত্যকার সাক্ষী তার। কিন্তু তার এক পায়ে নাচ
বন্ধ হয় নাকো তবু
একবারও কভু।
খাপ্‌রার ছাদ দেওয়া দোকানের সারের ওপারে
কোমল শ্যামল রঙে কোঁকড়ানো পাতায় বাহারে

পাশাপাশি দুই আমগাছে
সন্যবদ্ধ মাথা তুলে আছে।
গভীর প্রশান্ত চোখ মেলে,
যা দেখে সবারে যেন মায়াস্পর্শে স্নিগ্ধ করে ফেলে।

উৎসাহী যাত্রীর দল দেবীনামে তোলে সিংহনাদ
দেউড়ীতে শিকলের টন্‌টনে পৌঁছায় সংবাদ;
পূজা ও বলির গন্ধে মন্থর বাতাসে
মাঝে মাঝে মিশে যায় শ্মশানের উদাস নিঃশ্বাসে।
সেই সঙ্গে কোন্ উঠে উঠে চলে আসে কালীঘাট
নীচে ফেলে দিয়ে তার সামান্যের বিষম ঝঞ্ঝাট।

উঠে চলে আসে যেথা মন্দিরের গম্বুজের 'পরে
সন্ধ্যাতারা জ্বলে,
গোধূলির আলো যেথা মিলাইয়া যায় গঙ্গাপারে
চেতলার তীরে ঐ তরুসারে সবুজের ঝাড়ে;
মহাশ্মশানে
স্মৃতিসৌধ মহাপুরুষের
শূন্যে মাথা তোলে, সেথা প্রথম রাত্রের
অন্ধকার আকাশকে রক্তাভ দেখায় চিতালোকে
সেই ঊর্দ্ধলোকে
উঠে আসে ধীর পায়ে ছেড়ে তার শূন্যতার হাট
চেনা না অচেনা যেন এক কালীঘাট।

ঘণ্টি দিয়ে ছেড়ে দেয় ট্রাম,
ক্ষণিক বিরাম
এসব ছবিতে ভরে যায়,
ট্রপেজ-দর্পণ নয়, কালীঘাট উত্তীর্ণ হাজরায়!

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ডি. এচ. লরেন্স

মিঃ জর্ডনকে অনুসরণ করে যে ঘরটিতে গিয়ে তাঁরা ঢুকলেন, সেটা একটা ছোট, অপরিষ্কার ঘর,—কালো চামড়া দিয়ে তার আসবাবপত্রগুলো মোড়া, তাতে অনেক লোকের হাত লেগে লেগে রঙ চটে গেছে। টেবিলের উপর এক জোড়া ভেড়ার চামড়ার বেল্ট, দেখতে নতুন আর চকচকে। নতুন চামড়ার গন্ধ পলের শুঁকতে ভালো লাগল। জিনিসগুলো কেন ওখানে রাখা হয়েছে, কী জন্যেই বা রাখা হয়েছে, পল তা বুঝতে পারল না। বুঝবার ক্ষমতাও তার ছিল না। চারিদিকে চেয়ে সে এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে সে শুধু দেখেই যাচ্ছিল, কোন জিনিসের মর্ম উপলব্ধি করবার ক্ষমতা তার ছিল না।

একটা চেয়ারের দিকে আঙুল নির্দেশ করে মিঃ জর্ডন বসতে বললেন মিসেস মোরেলকে। তাঁর গলায় বিরক্তির সুর। মিসেস মোরেল দ্বিধাগ্রস্তের মত চেয়ারের একটা ধার ঘেঁষে বসে পড়লেন। তখন সেই বেঁটে বুড়ো লোকটি হাতড়াতে হাতড়াতে একটা কাগজ খুঁজে বের করলেন। ক'রে, ফট্ ক'রে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, 'তুমিই লিখেছ এই চিঠিটা?'

চিঠিখানা পল-এর সামনে মেলে ধরতেই পল চিনতে পারল এ তার নিজের হাতের লেখা। বললে, 'হ্যাঁ।'

বলতে গিয়ে তার মনে হ'ল, প্রথমতঃ সে মিথ্যা কথা বলছে, কেন না চিঠির ভাষাটা তার নয়, উইলিয়মের; দ্বিতীয়তঃ চিঠিটাকে এই মোটা লালমুখো লোকটার হাতে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে, বাড়ীর রান্না-ঘরের টেবিলে থাকবার সময় যেমনটি ছিল, ঠিক তেমনটি যেন আর নেই। চিঠিটা এক সময়ে তার নিজস্ব ছিল, আজ যেন ভুল পথে গিয়ে হারিয়ে গেছে। লোকটা চিঠিখানা হাতে নিয়ে যেমন অবজ্ঞাভরে ধরে রেখেছিল, তা'তে পল-এর আরও রাগ হতে লাগল।

বুড়ো লোকটি মুখ খিঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় লিখতে শিখেছ হে?'

পল মরমে ম'রে গিয়ে একবার শুধু চাইল তাঁর দিকে, মুখ দিয়ে কথা বেরুল না।

মিসেস মোরেল ছেলের হয়ে বললেন, 'সত্যি, ওর হাতের লেখা ভারী বিশ্রী।' ব'লে মুখের ওড়নাটা খুলে ফেললেন। মায়ের এই নম্রভাব পল-এর ভালো লাগছিল না; কেন সে এই অভদ্র বেঁটে লোকটার সঙ্গে নিজের মান বজায় রেখে কথা বলতে পারে না। কিন্তু ভালো লাগছিল তার মায়ের অনাবৃত মুখের মাধুর্যটুকুকে—এতক্ষণ ওড়নার আড়ালে যা ঢাকা পড়েছিল।

বুড়ো লোকটি তবু আবার চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'বলেছ ফরাসী ভাষা জানো সত্যি নাকি হে?'

—'হ্যাঁ, সত্যি।' পল বললে।

—'কোন স্কুলে পড়তে তুমি?'

—'বোর্ড-স্কুলে।'

—'সেইখানেই বুঝি শিখতে ফরাসী ভাষা?'

—'না, আমি, মানে—' বলতে গিয়ে চোখ-মুখ লাল ক'রে পল থামল। মিসেস মোরেল আধ-অনুনয়ের সুরে, তবু একটু যেন দূরত্ব বজায় রেখে বললেন,

'ওর ধর্মপিতার কাছে ও শিখছে।'

মিঃ জর্ডন এক মুহূর্ত কি বলবেন ভেবে পেলেন না। তারপর হঠাৎ গরম হয়ে উঠে পকেট থেকে টান দিয়ে আর এক তাড়া কাগজ বের করলেন। তাঁর হাতযোড়া, যেন সব সময় কাজের জন্যে তৈরী হয়ে আছে। কাগজটার ভাঁজ ভেঙে তিনি দিলেন পল-এর হাতে। ভাঁজ ভাঙবার সময় কাগজটা কড়-কড় শব্দ করে উঠল।

বললেন 'পড়ো শুনি।'

ফরাসী ভাষায় লেখা একখানা চিঠি, বিদেশী লোকের টানা হাতের ছোট ছোট ক'রে লেখা। পল-এর সাধ্য হ'ল না, এর পাঠ উদ্ধার করে। কাগজটার দিকে অর্থহীন দৃষ্টি রেখে সে দাঁড়িয়ে রইল।

গোড়ার কথাটা শুধু সে পড়ল, 'মহাশয়—', তারপর পল বিভ্রান্ত হয়ে মিঃ জর্ডনের দিকে চাইল। বললে, 'এই—এমন—'

সে বলতে চাইছিল হাতের লেখার কথা, কিন্তু সময় মতো কথাটা মুখ দিয়ে বার করবে, এমন বুদ্ধি তখন তার ঘটে ছিল না। ভারী বোকা বনে গেল সে; মিঃ জর্ডনের উপর যারপর নাই রাগ হতে লাগল। আবার নিরুপায় হয়ে কাগজটার দিকে নজর দিল সে। পড়ল: 'মহাশয়, অনুগ্রহ করে আমার জন্যে—বুঝতে পারছি না—আমার জন্যে দু'জোড়া ছাই রঙের সুতোর মোজা—পড়তে পারছি না—আঁ্যা, আঙুল-ছাড়া—তারপর কী হবে—বুঝতে পারছি না। কিন্তু 'হাতের লেখা' এই দুটি কথা কিছুতেই তার মুখ দিয়ে বেরুল না। তার অবস্থা দেখে, মিঃ জর্ডন কাগজটা ছিনিয়ে নিলেন তার হাত থেকে, নিয়ে পড়লেন: 'অনুগ্রহ ক'রে ফেরত ডাকে দু'জোড়া পায়ের আঙুল ছাড়া ছাইরঙের সুতির মোজা পাঠাবেন।'

পল লজ্জা পেয়ে বললে, 'ফরাসী ভাষায় ও কথাটার মানে হাতের আঙুলও হয় আবার পায়ের আঙুল হয়। আর সাধারণতঃ ওর মানে হাতের আঙুল।'

বেঁটে মানুষটি চোখ তুলে একবার তাকে দেখলেন। ছেলেটা বলে কী! তিনি বরাবরই জানেন ও-কথাটার মানে পায়ের আঙুল,

এইটুকুই তাঁর কাজের পক্ষে জানা দরকার। ওর মানে যে আবার হাতের আঙুলও হতে পারে, এ-নিয়ে মাথা ঘামাবার তাঁর দরকার নেই। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মোজার আবার হাতের আঙুল কি।'

পল তবু তার জেদ ছাড়ল না। বললে, 'হ্যাঁ, ওর মানে হাতের আঙুলই।'

এই লোকটা তাকে অপদার্থ প্রমাণ করতে চেয়েছে, লোকটার উপর রাগে পল ফেটে পড়তে লাগল। এই রোগা বোকার মত ছেলেটির এমন অগ্নিশর্ম্মা মূর্ত্তি দেখবার জন্যে মিঃ জর্ডন প্রস্তুত ছিলেন না। একবার তিনি তাকালেন ওর দিকে, একবার ওর মায়ের দিকে। মিসেস মোরেল চুপচাপ বসেছিলেন। যারা গরীব, অন্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া যাদের গতি নেই, তাদের অদ্ভুত অসহায় দৃষ্টি তাঁর চোখে। মিঃ জর্ডন জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও কবে থেকে ও আসতে পারবে?'

—'আপনি যেদিন থেকে বলবেন।' মিসেস মোরেল বললেন।

—'ওর স্কুলের পড়া শেষ হয়ে গেছে—ও কি তা'হলে বেষ্টউডেই থাকছে?'

—'হ্যাঁ, তবে পৌনে আটটার মধ্যেই ষ্টেশনে এসে পৌঁছতে পারবে।'

মিষ্টার জর্ডন সংক্ষেপে 'হুঁ' বলে কথাটাতে সায় দিলেন। ফলে তার অফিসের ছোট কেরাণীর পদে পলের বহাল হ'ল—মাইনে সপ্তাহে আট শিলিং।

এরপর পল আর একটিও কথা বলেনি। মায়ের পিছনে পিছনে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। নীচে নেমে এসে মা তাঁর স্নেহ আর আনন্দে উজ্জ্বল নীল চোখ দুটি মেলে ছেলের দিকে চাইলেন। বললেন, 'কাজটা তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।' পল বললে, 'যাই বলো মা, ও কথাটার মানে হাতের আঙুল! ওঃ কী বিশ্রী হাতের লেখা! সেই জন্যেই ত' আমার গোলমাল হয়ে গেল। ও লেখা পড়ে কার সাধ্য!' মা বললেন, 'সে জন্যে ভেব না, লোকটা আসলে ভালো, আর ওর সঙ্গে তোমার দেখাই বা হবে কতক্ষণ? ঐ যে অল্প বয়সের ছেলেটি আমাদের প্রথম ডেকে নিয়ে গেল, ওকে তোমার নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে?'

পল বললে, 'কিন্তু মা মিঃ জর্ডন ত' একেবারে বাজে লোক। এই সব কারখানার মালিক সে কি ক'রে হ'ল?' মা বললেন, 'মনে হচ্ছে, সাধারণ মজুর থেকে ও এত বড় হয়েছে। আর তোমাকেও বলি, লোকের এত খুঁটিনাটি বিচার করা এবার থেকে ছেড়ে দিতে হবে। ওরা যাই করুক না কেন তোমার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার না করলেই হ'ল। তুমি ভাবছ ওরা তোমাকে দেখাবার জন্যে সব কিছু করছে, কিন্তু বাস্তবিক ওটা তাদের অভ্যাস।

আকাশে প্রখর রোদ। বাজারের উপর নীল আকাশে রোদের আলো ঝক্‌ঝক্‌ করছে। রাস্তার পাথরগুলো রোদ প'ড়ে ঝিকমিক করে উঠছে। রাস্তার দু'ধারে দোকান—তাদের ভেতরটা অন্ধকার, আবার সে অন্ধকারের মধ্যে নানা বিচিত্র রঙের বাহার। বাজারের এক পাশে ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ি গড়গড় করে চলেছে। সেখানে এক সারি ফলের দোকান। ফলগুলো খোলা পড়ে রয়েছে রোদে,—আপেল, কমলা, কুল, কলা চারিদিকে শুধু ফলের গন্ধ। আস্তে আস্তে পলের মন থেকে রাগ আর লজ্জার ভাব কেটে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'দুপুর বেলা কোথায় খেতে যাব মা?'

বাইরে খেতে গেলেই অযথা খরচ। পল তার জীবনে মাত্র একবার কি দু'বার দোকানে ঢুকেছে খাওয়ার জন্যে; আর তা'ও হয়ত এক কাপ চা কিম্বা একটা বিস্কুট খেতে। বেষ্টউডের অধিকাংশ লোক চা আর রুটি-মাখন খাওয়াকে যথেষ্ট মনে করত, তার উপর টিন-বন্ধ মাংস পেলে ত' কথাই নেই! সত্যিকারের রান্নাকরা খাবার ছিল দুর্লভ, তার খরচ পোষাতে অনেকেই পারত না। পলের মনে হতে লাগল খাবার কথা বলে সে যেন গুরুতর অপরাধ করেছে।

খুঁজতে খুঁজতে একটা ছোট দোকান পাওয়া গেল। বাইরে থেকে দোকানটাকে সস্তা বলেই মনে হয়। কিন্তু ভিতরে গিয়ে যখন খাবারের দামগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন, তখন মিসেস মোরেলের মন খারাপ হয়ে গেল। জিনিসপত্র এত দুর্মূল্য এ তাঁর ধারণা ছিল না। সব চেয়ে যা সস্তা—আলু আর মাংসের 'বড়া' তাই তিনি চাইলেন।

পল বললে, 'আমাদের এখানে আসা উচিৎ হয়নি। মা বললেন, 'যাক্ গে, আর কোন দিন ত' আসছি না!' পল মিষ্টি খেতে খুব ভালবাসত। মা তার জন্যে একটা আঙুরের মোরব্বা কিনে দিতে চাইলেন। পল বললে, 'না মা আমার দরকার নেই।' মা তার কথা শুনলেন না, বললেন, 'দাঁড়াও না। এইটুকু তুমি খেতে পারবে।' ব'লে তিনি দোকানের পরিচারিকাকে ডাকবার জন্যে চারিদিকে চাইতে লাগলেন। কিন্তু পরিচারিকা তখন খুব ব্যস্ত। মিসেস মোরেল চাইলেন না তাকে বিরক্ত করতে। অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন তার সময় হয়। সে কিন্তু ভুলেও আর এদিকে এলো না; যেখানে পুরুষ মানুষেরা সব ব'সে খাচ্ছিল, সেইখানে সে ঘোরাঘুরি আর মস্করা করতে লাগল।

মিসেস মোরেল ছেলেকে বললেন, 'দেখছিস মেয়েটা কি বেহায়া? ঐ যে লোকটা আমাদের অনেক পরে এসেছে তার জন্যে ও পুডিং নিয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের বেলা দেরি করছে।' পল বললে, 'যাক না মা।'

মিসেস মোরেলের রাগ ধরে গিয়েছিল। তিনি গরীব, বেশী দামের খাবার চাইতে পারেননি, কাজেই নিজের দাবী জানাবার জন্যে জোর করে এগিয়ে যাবার সাহস তিনি পেলেন না। অনেকক্ষণ তাঁরা বসে রইলেন। তখন পল বললে, 'আর কেন মা, চল যাই।' এবার মিসেস মোরেল উঠে দাঁড়ালেন। পরিচারিকাটি এধার দিয়েই যাচ্ছিল। মিসেস মোরেল স্পষ্ট ক'রে তাকে শুনিয়ে বললেন, 'একটা আঙুরের মোরব্বা এনে দিতে হবে।' মেয়েটি চোখ বড় বড় করে তাঁর দিকে চাইল। তার চোখের চাউনিতে নিদারুণ অবজ্ঞা। বললে, 'আচ্ছা, এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।' মিসেস মোরেল বললেন, 'অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আছি আমরা।'

এক মিনিটের মধ্যেই মেয়েটি মোরব্বা নিয়ে ফিরে এলো। মিসেস মোরেল গম্ভীর ভাবে তার কাছে খাবারের বিল চাইলেন। পলের ইচ্ছে করছিল লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে। মায়ের এই অদ্ভুত রুক্ষতা দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে জানত পৃথিবীর সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে করেই তার মা নিজের সামান্য অধিকার

সম্বন্ধেও এত বেশী সচেতন হয়ে উঠেছে। মিসেস মোরেলও ছেলের মত লজ্জা অনুভব করছিলেন; বাইরে বেরিয়ে এসে দু'জনেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন! মা বললেন, 'এই শেষ—আর কোন দিন আমি এখানে ঢুকছি না।' তার পর একটু থেমে বললেন, 'চল, বুট্সের দোকানটা একটু দেখে যাই, আরও দু'-এক জায়গায় ঘুরে ফিরে তার পর যাব।'

বুট্সের ছবির দোকানে ঢুকে দু'জনে ছবি দেখে দেখে ঘুরতে লাগলেন।

ছবিগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা হলো দু'জনের মধ্যে। একটা কালো তুলি কিনবার সখ পলের অনেকদিন থেকে ছিল। আজ একটা ছোট কালো তুলি দেখে মা তাকে কিনে দিতে চাইলেন। কিন্তু নিজের জন্যে খরচ বাড়াতে পল রাজী হ'ল না। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সে অনেক পোষাকের দোকানে ঘুরল। ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে পল-এর বিরক্তি এসে গেল। তবু মায়ের মন রাখবার জন্যে সে সব কিছুতেই আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল।

এক জায়গায় গিয়ে মা বললেন, 'দেখেছ কি সুন্দর কালো আঙুর, দেখেই জিবে জল আসে। কতদিন থেকে ভাবছি কিনব, কিন্তু আর হয়ে ওঠে না। দেখি, কোনদিন পারি কিনা। তারপর ফুলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে ফুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বললেন, 'আর কি সুন্দর! দোকানের ভেতরটা ভারী অন্ধকার। পল দেখল একটি সুন্দর কালো পোষাক পরা যুবতী অবাক হয়ে তাদের দিকে চেয়ে আছে। মাকে টেনে নিয়ে দূরে সরে যেতে চাইল সে; বললে, 'ওরা সবাই চেয়ে আছে তোমার দিকে। 'কি হয়েছে তা'তে?' মা বিরক্ত হয়ে বললেন। কিছুতেই তিনি সরে গেলেন না। তার-পর অন্য একটা ফুল দেখতে পেয়ে—নিজে থেকেই দরজা থেকে সরে এলেন জানালার সামনে। পল তখন চেষ্টা করছিল কি করে সেই কালো পোষাক পরা মেয়েটির চোখ এড়ানো যায়। মা ডাকলেন, 'পল একবার এদিকে এসে দেখ।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও পলকে ফিরে আসতে হ'ল।

মা তাঁর আঙুল দিয়ে এক ঝাড় ফুল দেখালেন। বললেন, 'একবার এই ফুলগুলোর দিকে চেয়ে দেখ।'

পল একটা অস্ফুট শব্দ করে তার আগ্রহ প্রকাশ করলে। বললে, 'মনে হচ্ছে যেন পাপড়িগুলো ঝরে পড়বে। কিন্তু তা নয়, ওরা সত্যি সত্যি ঝরে পড়ে না।' মা বললেন, 'আর কেমন কতগুলো ফুল এক সঙ্গে, কী সুন্দর।' পল বললে, 'ওগুলো কি কিনবে?' মা বললেন, 'আমিও তাই ভাবছি। অবশ্য আমরা নিশ্চিত নই।'

—'আমাদের ঘরে নিয়ে গেলে এই ফুলগুলো একদিনেই ঝরে যাবে।' মা বললেন, 'হাঁ, যা সাঙ্ঘাতিক ঠাণ্ডা—ঐ গর্তটুকুর ভিতর ত' আর রোদ যায় না। ওখানে ফুলগাছ বাঁচতে পারে না। আর তাছাড়া রান্নাঘরের ধোঁয়াতে ওরা দম বন্ধ হয়ে মারা যায়।'

কয়েকটা টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনে তারা ষ্টেশনের দিকে রওয়ানা হলেন। খালের ওপর থেকে চেয়ে দেখলেন দু'ধারে অন্ধকার বাড়িগুলো মাঝখানে অনেক দূরে ঘাসে ঢাকা গৈরিক মাটির পাহাড়ের উপর পুরনো কেল্লা—বিকেলের হালকা রোদ পড়ে তাকে আশ্চর্য্য সুন্দর লাগছে। পল বললে, 'জায়গাটা বেশ ভাল, দুপুরবেলা খাবার ছুটির সময় বেরিয়ে প'ড়ে আমি সব কিছু ঘুরে-ফিরে দেখব। মনে হচ্ছে জায়গাটা আমার খুব ভাল লাগবে। মা তার কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ভাল লাগবে বইকি।'

আজকের বিকেলটা মায়ের সঙ্গে কাটল পরম আনন্দে। আজকের সন্ধ্যাটিও কেমন শান্ত আর কোমল। যখন দু'জনে বাড়ি ফিরে এলেন, তখন পরিশ্রান্ত হলেও দু'জনেরই মন খুশিতে টলমল করছে।

পরদিন সকাল বেলা পল তার সীজন-টিকিট কেনবার ফরমটা নিয়ে ষ্টেশনে গেল। ফিরে এসে দেখল মা এইমাত্র উঠে ঘরের মেঝে ধোয়াচ্ছেন। পল পা তুলে বসল সোফাটার উপর, বললে, 'শনিবারের মধ্যে এসে যাবে, ষ্টেশনের লোকেরা বললে।' মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত দাম নেবে?'—'প্রায় এক পাউণ্ড এগারো শিলিং।' মা কোন কথা না বলে তাঁর কাজ করে যেতে লাগলেন। পল আবার জিজ্ঞেস করল, 'অনেক দাম মনে হচ্ছে?' মা বললেন, 'না, আমি এই রকমই ভেবেছিলুম।' পল বললে, 'আর আমি ত' সপ্তাহে আট শিলিং করেই পাব। মা এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। তার পর ঘর ধুতে ধুতে এক সময়ে বললেন, 'উইলিয়ম যখন লণ্ডনে যায় আমাকে কথা দিয়েছিল মাসে এক পাউণ্ড ক'রে পাঠাবে। পাঠিয়েছেন দশ শিলিং করে দু'বার; আর এখন ত' ওর হাতে এক ফার্দিংও নেই। আমি ওর কাছে চাইই বা কি করব? অবশ্য আমার নিজের দরকার নেই। তবে তুমিই হয়ত ভাববে ও তোমাকে এই টিকিটটা কিনে দিয়ে সাহায্য করতে পারত। আমি কিন্তু এত বেশী আশা করি না।' পল বললে, 'কেন মা সে ত' অনেক টাকা রোজগার করে?'

—'হ্যাঁ, বছরে এক শ' ত্রিশ পর্য্যন্ত। কিন্তু ওরা সব সমান, মুখে অনেক কথা বলে কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা।' পল বললে, 'সে ত' নিজের জন্যই সপ্তাহে পঞ্চাশ শিলিংয়ের বেশী খরচ করে।'

মা বললেন, 'আর আমাকে এই সংসার চালাতে হয় ত্রিশ শিলিংয়েরও কমে। তাছাড়া ছুটো-একটা বাড়িতে খরচও করতে হয় বইকি। কিন্তু একবার বাড়ি ছেড়ে গেলে ওরা আর বাড়ির কথা কিম্বা মাকে একটু সাহায্য করবার কথা ভেবেও দেখে না। ঐ যে সাজ-পোষাক পরা ধনীর দুলালী তার জন্যে টাকা খরচ করতে ত' আপত্তি দেখি না।'

পল বললে, 'ও যদি সত্যিই বড়লোকের মেয়ে হয়ে থাকে, তা'হলে ত' ওর নিজেরই অনেক টাকা থাকার কথা।'

—'থাকার ত' কথা, কিন্তু নেই। আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তা' না হলে উইলিয়ম কি এমনি ওকে সোনার বালা কিনে দেয়?—কই, আমার জীবনে কেউ ত' আমাকে সোনার বালা দিয়ে দেখেনি?'

উইলিয়াম তার প্রেমের ব্যাপারে বেশ সাফল্যলাভ করেছিল। মেয়েটির নাম লুইসা, কিন্তু সে ডাকত 'জিপ্‌সী' বলে। মেয়েটির কাছে একখানা ফটো সে চেয়েছিল মায়ের কাছে পাঠাবার জন্যে। যথা সময়ে ফটো এলো—একটি সুন্দরী মেয়ে, চুল কালো, পাশ ফেরানো প্রোফাইল ফটো, মুখে সামান্য একটু হাসি, আর বুক পর্য্যন্ত খোলা। ফটো ঐ পর্য্যন্ত, কাজেই তার নীচে কাপড় আছে কিনা বুঝবার উপায় নেই। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য্য

প্রমথ চৌধুরীর অপ্রকাশিত পত্র বিজয়কৃষ্ণকে লেখা

১নং ব্রাইট ষ্ট্রীট, বালিগঞ্জ।
১৯।৬।১৮

কল্যাণীয়েষু,—

এইমাত্র 'ভারতী' পেলুম এবং পাওয়া মাত্র "আর্ট ও কবিত্ব" পড়লুম এবং পড়ামাত্র তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি। তুমি যে এ তর্ক তুলেছ তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর্টের চর্চ্চা করার অর্থ যে মনের শক্তি ও সংযমের চর্চ্চা করা—এ ধারণা আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের "মোছলমে" নেই। কবিত্ব যে ভক্তিমার্গের জিনিষ আর আর্ট শক্তিমার্গের—তোমার এ কথা ঠিক। তার পর এ কথাও ঠিক যে, চিত্তচাঞ্চল্য হতে মুক্তিলাভ না করলে মানুষে আর্ট রচনা করতে পারে না—অপরপক্ষে হৃদয়াবেগই হচ্ছে কবিত্বের মূল উপাদান। তবে আমাদের এইটুকু মনে রাখা উচিত যে,—যে লেখার ভিতর আর্ট নেই, তা কাব্য নয়। যার হৃদয়াবেগ নেই, সে কবি হতে পারে না, কিন্তু সেই সঙ্গে যার নির্লিপ্ত হবার শক্তি নেই সেও কবি হতে পারে না। এক কথায় lyrical ও hysterical পর্য্যায়শব্দ নয়। সুতরাং কবির রচনায় আর্ট ও কবিত্ব দুই একসঙ্গেই থাকে—অথচ এ দুয়ের মূলে আছে, মনের পৃথক পৃথক ধর্ম্ম। যার critical faculty হৃদয়াবেগের সমতুল্য নয়—সে কবির লেখা কখনও অমর হয় না, এবং critic অর্থ সাক্ষী—ভোক্তাও নয়, কর্ত্তাও নয়। যে একাধারে ভোক্তা, কর্ত্তা ও দর্শক সেই কবিই যথার্থ আর্টিষ্ট।

জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সবুজপত্রে' বীরবলের পত্রখানি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ো—তাতে যা আছে তা শুধু আইডিয়ার খেলা নয়। সে পত্রে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ঐ আর্ট ও কবিত্বের কথাই বলা হয়েছে। সে পত্র অন্তের কাছে হেঁয়ালি হতে পারে, কিন্তু তোমাদের কাছে তা স্পষ্ট কথা। সে চিঠিখানি পড়ে কি মনে হয় আমাকে লিখো। আমি কবুল জবাব করছি—ওসব লেখা পাঠকদের জন্য লেখা নয়, লেখকদের জন্য লেখা। ও-চিঠির মধ্যে যে এলোমেলো ভাব আছে, সে সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত—অর্থাৎ ও-ক্ষেত্রে মনের আবেগে ভাবের পারম্পর্য্য ভেঙ্গে দেয়নি; আমি ইচ্ছে করেই তা উল্টেপাল্টে সাজিয়েছি। ভাবকে এ রকম করে ভাসিয়ে নেবার ভিতর যে চাতুরী আছে—আশা করি, লেখকদের চোখে তা ধরা পড়বে।

তোমার প্রবন্ধের অনেক কথাই আমার খুব ভাল লেগেছে—তার ভিতর নমুনা-হিসেবে দুটি তুলে দিচ্ছি।

১। কবিকে যে সৃষ্টিমুক্তির দিকে টানে পাঠককে সেই একই সৃষ্টি মোহের দিকে ঠেলে।

২। সভ্যতা বলতে যা বোঝায় তা "সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি" ছাড়া আর কিছুই নয়।

তোমার ও-বাক্যটির যাথার্থ্য যদি সকলে হৃদয়ঙ্গম করত, তাহলে সমাজের মনের ময়লা কাটতে উদ্যত হবামাত্র সমাজ আমাদের গায়ে ধূলা নিক্ষেপ করত না।

তোমার লেখা যে আমার ভাল লেগেছে তার প্রমাণ এই টাট্‌কা চিঠি। ইতি—

স্বাঃ শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ,
পোঃ গরিফা, ২৪ পরগণা।

১নং ব্রাইট ষ্ট্রীট, বালিগঞ্জ।
২রা জুলাই ১৯১৮

কল্যাণীয়েষু,—

আমার শেষ চিঠির উত্তর পেতে কেন যে এত দেরি হচ্ছে তা ঠিক বুঝতে পারছিলুম না। মানুষকে মোটামুটি দু' ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক যারা চিঠি লেখে—আর যারা লেখে না।—আমার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে অনেক আছেন, যাঁরা উপরোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু তুমি হচ্ছ একজন প্রথম শ্রেণীর লোক; সুতরাং তোমার পত্র অনাগত থাকলে সেটা একটা ভাবনার বিষয় হয়ে ওঠে। আজকে বুকপোষ্টে প্রেরিত তোমার পত্র প্রাপ্ত হয়ে বিলম্বের কারণ বুঝতে বাকী রইল না। ঐখানেই পরিচয় যে নামে পত্র হলেও এবার যা আমার হস্তগত হয়েছে তা হচ্ছে একটি মানানসই প্রবন্ধ। তুমি যখন পত্রছলে প্রবন্ধ লিখেছ, তখন আমার স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে, আমিও শ্রীমান্ চিরকিশোরের উদ্দেশ্যে পত্রছলে প্রবন্ধ লিখি। এবং সেই ছলটা বজায় রাখবার জন্য সে প্রবন্ধ লজিকের ছাঁচে ঢালাই করিনে, কিন্তু তা হলেও সমগ্র প্রবন্ধটির মধ্যে একটি যোগসূত্র থেকেই যায়। আমার মনের বস্তু আপনা হতেই গুছিয়ে ওঠে—সুতরাং এ ধরণের লেখার ভিতর ইংরাজিতে যাকে বলে—Studied negligence তারই পরিচয় পাবে।

বলা বাহুল্য, চিরকিশোরের পত্রে আধ-মজা করে লেখা। দ্বিতীয় পত্রখানিতে একটা Paradox-এর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি, সুতরাং ও-লেখার বিচার করতে হলে তার যুক্তির চাতুরির দিকেই নজর রাখতে হবে। ভাবের খেলায় আমার হাত সাফাই কিনা তাই হচ্ছে বিচার্য্য।

যদি বলো,—ভাব নিয়ে এ রকম খেলা করবার প্রয়োজন কি? তার প্রথম উত্তর—সময়ে সময়ে এই খেলা খেলবার প্রবৃত্তি আমার মনে অদম্য হয়ে ওঠে, তখন ভাব নিয়ে এই রকম লোফালুফি করতে

আমি আনন্দ পাই এবং সেই আনন্দ হচ্ছে নিছক অহেতুক আনন্দ। ও পত্রখানি যে কতটা ঝোঁকের মাথায় লেখা তার প্রমাণ ওটি এক টানে লেখা। প্রকাশ করবার আগে ওটিকে অবশ্য একটু মেজে-ঘসে নিয়েছি। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, এ রকম লেখার সার্থকতাই এই যে এতে মানুষকে ভাবতে শেখায় parad-ox মানুষের মনে ঘা দিয়ে তাকে জাগিয়ে তোলে। সাহিত্যের কাজই হচ্ছে মানুষের মনকে চাঙ্গা করে তোলা। ঐ চিঠিখানি পড়ে অনেকের মনে যে চমক্ লেগেছে তার প্রমাণ নিত্যই পাচ্ছি। লোকে বলছে very clever, শুধু অতুল বাবু বলছেন খালি clever নয় true-ও বটে। তিনি ও লেখার ভিতরে কি true দেখেছেন আমি জানি নে ; কিন্তু এ কথা বোধ হয় ভরসা করে বলা যায় যে ও পত্রে অনেক ছোটখাটো সত্য কথা এখানে ওখানে ছড়ানো রয়েছে।

আজকে আর্ট ও কবিত্বের যোগাযোগের আলোচনা আর করব না। এখন আমার মাথার ঠিক নেই। আমার একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা সপরিবারে কিছু কাল থেকে আমার সঙ্গে বাস করছিলেন, আজ তিনি অন্য বাড়ীতে উঠে যাচ্ছেন। একটা পুরো ঘরকন্না একদম স্থানান্তরিত করা ব্যাপারখানা যে কি তা বুঝতেই পারো। রেলওয়ের Wagon এর মত তিনখানি বড় Van এসেছে আর জন কুড়ি কুলি আমার ঘরের ভিতর ছুটোছুটি করছে চেঁচামিচি করছে। এই হট্টগোলের ভিতর তোমাকে চিঠি লিখছি, সুতরাং এই চিঠিতে কোন বড় কথা তুললে তা নিশ্চয়ই ঘুলিয়ে যাবে। এই গোলযোগের ভিতর এতখানি যে লিখতে পেয়েছি এতেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি—যদিচ কি যে লিখছি সে বিষয়ে মনে কোনরূপ স্পষ্ট ধারণা নেই। অতএব বেদব্যাস এইখানেই বিশ্রাম করলেম। ইতি—

স্বা: শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ
গরিফা—পো:, ২৪ পরগণা।

১নং ব্রাইট ষ্ট্রীট—বালিগঞ্জ
১২।৭।১৮

কল্যাণীয়েযু—

তোমার চিঠির বড় করে জবাব পরে দেব—আজ শুধু এই কথাটা বলে রাখি যে আজকাল Reform Scheme-এর চর্চ্চায় ব্যস্ত আছি। সাহিত্যচর্চ্চা এ হপ্তার জন্য শিকেয় তোলা রইল।

আসছে কাল জনকতক অসাহিত্যিক লোকের সঙ্গে এই Scheme নিয়ে আলোচনা করব—সুতরাং কাল তোমার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কোনও ফল নেই। এ শনিবারের পরের শনিবারে এসো—পেট ভরে আর্ট ও poetry উপভোগ করা যাবে।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ স্বা:—শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী
গরিফা—পো:, ২৪ পরগণা।

১নং ব্রাইট ষ্ট্রীট—বালিগঞ্জ
১২।৭।১৮

কল্যাণীয়েযু—

Reform Scheme-এর হাড়িকাঠে যে পালা দিয়েছি তার আর সন্দেহ নেই—তবে একবার যখন দিয়েছি তখন সহজে উদ্ধার পাচ্ছিনে। পলিটিক্সের মহাদোষ এই যে ওতে মানুষকে একেবারে পেয়ে বসে, এবং অপর কাজের বার করে দেয়। একে জ্বর তায় আবার পলিটিক্সের হাঙ্গাম—এই দুই নিয়ে এ কদিন কতটা বিব্রত আছি যে একখানা চিঠি লেখবারও অবসর পাইনে।

আমার ইংরাজি লেখাটা তোমার ভাল লেগেছে শুনে খুসি হলুম। দেখা হলে এ বিষয়ে মুখে আলোচনা করা যাবে। পরশু বিকেলে আমাকে বাড়ী পাবে। আজ বেজায় গরম—মাথার ভিতর বুদ্ধি ঘুমিয়ে পড়েছে—হাতের কলমও ভাল করে চলছে না—অতএব এইখানেই ইতি দিই।

স্বা:—শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

পু:—এইমাত্র খবর পেলাম যে শনিবার বিকেলে হয়ত আমাকে পাঁচ জনের reform scheme নিয়ে বসতে হতে পারে। এ বিপদ এড়ানো কঠিন, কেন না—বন্ধু-বান্ধবেরা আমার এখানে এসেই জোটেন। সুতরাং তুমি যদি শনিবার না এসে রবিবারে আসতে পারো ত ভাল হয়।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ
গরিফা—পো:, ২৪ পরগণা।

মোরাবাদি, রাঁচি
২৪।১০।১৮

কল্যাণীয়েযু,—

কাল সকাল বেলাই ভাবছিলুম যে বহু দিন তোমার কোন খোঁজ খবর পাইনি কেন? বিকেলে তোমার চিঠি পেলুম। এই যুদ্ধ জ্বরের জ্বালাটা বড়ই গায়ে লাগে। পাপ করলে অপরে আর তার শাস্তি ভোগ করছি আমরা। যুদ্ধ করছে গোরায় আর শয্যাশায়ী হচ্ছে কালা আদ্মি, একেই বলে প্রকৃতির ন্যায়বিচার। সে যাই হোক, তুমি যে মাস দেড়েক ভুগে এখন আবার খাড়া হয়েছ এ খবর পেয়ে সুখী হলুম।

তুমি যে সাহিত্যের হাওয়া বদলের কথা বলেছ সে বদল যদি সত্যি ঘটে থাকে, তাহলে তার প্রভাব নবীন লেখকদের মধ্যেই দেখা যাবে। মনোজগতে একই আবহাওয়ার ভিতর মানুষ যে চিরদিন বাস করবে এ ব্যবস্থা ভগবানের নয়। বঙ্গসরস্বতী যদি মোড় ফিরে থাকেন তাহলে সে জাগতিক নিয়মেই হয়েছে, সুতরাং তা আহ্লাদেরই কথা। এর ভিতর আমার কিছু হাত আছে কি না সে বিচার পাঠক-সমাজ করবেন। আমার নিজের মুখে এ বিষয়ে কোন কথা শোভা পায় না। এ মাসের 'প্রতিভা'য় বীরবলের হালখাতার একটি সমালোচনা বেরিয়েছে। সমালোচক লিখেছে যে—"পাঠকগণের উপর বীরবলের এই বিষয়ে একটা অসাধারণ প্রভাব রহিয়াছে।" সে বিষয়টি হচ্ছে এই—বীরবলের কথা "সকলেই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে বাধ্য হন।" এ বড় কম প্রশংসা নয়, এ প্রশংসার আমি যদি যথার্থ অধিকারী হই তাহলে তার প্রধান কারণ এই যে—আমি লেখায় Sincere—আমি কলমের মুখ দিয়ে নিজের মত নিজের মনের কথা বলি—আর পাঁচ জনের মতের সঙ্গে তার মিল হবে না জানলেও, আমি মৌনব্রত অবলম্বন করি নে। আমার বিশ্বাস, মানুষ মাত্রেরই অনুভূতি ও চিন্তার ভিতর কিছু না কিছু বিশেষত্ব আছে—এবং যে লেখার ভিতর সেই বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না—তা দর্শন হতে পারে—বিজ্ঞান হতে পারে,—কিন্তু সাহিত্য নয়। এই বিশ্বাসের

বলেই আমি আমার মতামতের ভিতর দিয়ে নিজেকেই প্রকাশ করতে চাই। এবং যে লেখায় তা করতে কৃতকার্য্য হই—তা সাহিত্য হয়—তবে তা কোন্ শ্রেণীর সাহিত্য সে বিচার অপরে করবেন। "স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহ" গীতার এই বচনটি সাহিত্যিকদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। রবি বাবু মহাশয়ের চিঠি দেখলে আমি বলতে পারি যে, তিনি তোমার চিঠির যথাযোগ্য উত্তর দিয়েছেন—কিম্বা ভদ্রতা করে সেরে দিয়েছেন। তবে একথা ঠিক যে কিছুদিন থেকে তাঁর শরীরও ভাল নেই, অথচ তিনি ছেলে পড়ানোর কাজে বিশেষ ব্যস্ত থাকেন।

Sex Problem সম্বন্ধে তোমার প্রবন্ধ পড়ে আমার যা মনে হয়, তা তোমাকে জানাব। ও-তর্কটা এখন মুলতুবি থাক। তবে এ কথা বলতে পারি যে আমিও মানুষের মুক্তির একান্ত পক্ষপাতী এবং আমি যাকে মুক্তি বলে বুঝি—অপরে তা উচ্ছৃঙ্খলতা মনে করলেও, আমি আমার মুক্তির বারতা প্রচার করতে কুণ্ঠিত হব না।

পলিটিক্সের যে তর্কটা তুমি তুলেছ ঐটেই হচ্ছে ওর একমাত্র তর্ক। কেউ ঝোঁকেন জাতীয় স্বার্থের দিকে—আবার কেউ ঝোঁকেন মানব-ধর্ম্মের দিকে। এই কারণেই পলিটিক্সের রাজ্যে পরস্পরবিরোধী দু'টি দলের সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয়ে মানুষে মোক্ষশাস্ত্র গড়তে পারে কিন্তু Politics গড়তে পারবে না, কেন না Politics-এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে জাতীয় স্বার্থসাধন। সংস্কৃত ভাষায় ত ও শাস্ত্রের নাম অর্থশাস্ত্র। তবে ধর্ম্মকে ত্যাগ করা জাতীয় স্বার্থসাধনের শ্রেষ্ঠ উপায় কি না সেইটেই হচ্ছে বিবেচ্য। এ বিষয়ে আমি একটি প্রবন্ধ লিখব মনে করছি—অতএব এ-পত্রে ও বিষয়ের আলোচনা করব না।

তুমি আমার লেখায় বিশেষ করে কি গুণ দেখতে পাও তা স্পষ্ট করে বলোনি, সুতরাং সে বিষয়ে রবি বাবুর কি মত তা বলতে পারি নে। যদিও আমার লেখা সম্বন্ধে রবি বাবুর মতামত মোটামুটি জানি বলেই আমার বিশ্বাস।

তুমি তোমার ঐ তিন পাতা চিঠিতে যে সব সমস্যার অবতারণা করেছ আমি অন্তত তিনটি প্রবন্ধের কম তার সমাধান করতে পারি নে। আর্ট সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত ভাবে একটি প্রবন্ধ লেখবার আমার ইচ্ছে আছে। সে ইচ্ছে যে করে কার্য্যে পরিণত করতে পারব—সে জানি নে। তবে গত সংখ্যার সবুজপত্রে বীরবলের চিঠিতে তার সূত্রপাত দেখতে পাবে। ও পত্রখানি কি রকম লাগল আমাকে জানিয়ো।

আজ তবে বিজয়ার আশীর্ব্বাদ দিয়ে এইখানেই বিদায় হই। এখানে কিছু করবার নেই বলে কিছু করবারও সময় নেই—শুধু আছে দিবারাত্র আলসেমি করবার। ইতি—

স্বাঃ শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ,
গরিফা, পোঃ ২৪ পরগণা।

১নং ব্রাইট ষ্ট্রীট, বালিগঞ্জ।
২১।১।১৯

কল্যাণীয়েষু—

বহুকাল তোমাকে চিঠি লিখিনি, তার একমাত্র কারণ, বহুকাল কাউকেই চিঠি লিখিনি এবং তার একমাত্র কারণ, এবার রাঁচি থেকে ফিরে এসে অবধি কাজের মধ্যে করছি শুধু এক সামাজিক ভদ্রতা। সকাল-সন্ধ্যে লোকের সঙ্গে দেখা করা আর ভদ্রতা করা ছাড়া আমার অপর কোনও কাজ নেই। আমার আত্মীয়-সমাজ বিরাট এবং এই বিরাট সমাজের বেশির ভাগ লোকের অবসরের অভাব নেই। কাজেই এঁদের অনুগ্রহে আমার কিছু করবার অবসর প্রায়ই থাকে না।

সে যাই হোক—তোমার চিঠির আজ জবাব দিতে বসেছি, কেন না অনেক দিন পরে আজ সকালটা ফাঁক পেয়েছি। তুমি "রামশ্যাম" সম্বন্ধে তোমার মতটা যদি আর একটু স্পষ্ট করে লিখতে, তাহলে আমি আর একটু বেশি খুসি হতুম। আমি আন্দাজ করছি যে, রামশ্যামের জীবনবৃত্তান্ত পড়ে তুমিও চমৎকৃত হয়েছ, কেন না আরও বহু লোক যে চমৎকৃত হয়েছেন তার প্রমাণ পাচ্ছি। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় থেকে আমাদের দেশের ছোটবড় অনেক সাহিত্যিকের মুখে ও চিঠিতে এ গল্পের অসম্ভব সুখ্যাতি শুনছি। এমন কি আমার লেখার যাঁরা মোটেই পক্ষপাতী নন, তাঁরাও এর গুণগান করছেন। আমার বিশ্বাস, এ আমার লেখার গুণে নয়, "রামশ্যামের" চরিত্রের গুণে,—এ ক্ষেত্রে বিষয়ের গৌরবে আমার কথা গৌরবান্বিত হয়েছে। তবে এমন কথাও শুনতে পাচ্ছি যে, "রামশ্যাম" তাঁদের জীবন-চরিত পড়ে তাদৃশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠেননি। সম্ভবতঃ এ গুজবটা সত্য—কেন না আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে রামও এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন না, শ্যামও কিছু করেন না।

এখানে আজ দুদিন ধরে বেজায় বাদলা হয়েছে। জলো হাওয়ায় হাত-পা কালিয়ে আসছে, এই ক'ছত্র চিঠি লিখতে গিয়ে—আঙ্গুলের ডগা অসাড় হয়ে এসেছে, সুতরাং এইখানেই শেষ করতে হল। এর পরেও যদি কলম চালাই, তাহলে তার মুখ দিয়ে বেরুবে শুধু—'কাগের ছা' আর 'বগের ছা'। ইতি—

স্বাঃ শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, পোঃ গরিফা
২৪ পরগণা।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণকে লেখা অপ্রকাশিত পত্রাবলী

92, Upper Circular Rd.
College of Science,
Calcutta, 5. 9. 27.

My dear Vidyabhusan Mahasaya,

আমি তো নিখিল ভারতীয় কায়স্থ সভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছি। আমাকে এখন বাংলার কায়স্থদের সম্বন্ধে কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে। এ বিষয়ে আপনিই যোগ্যতম ব্যক্তি। নইলে আমি নাচার।

Your Sincerely
P. C. Roy

College of Science
Calcutta,
11. 6. 24.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আরও কিছু খবর দরকার হইয়াছে। Tributory States-এ লোকসংখ্যা কত? আর উড়িষ্যায় British Territory-তেই বা

লোক কত? বাংলায় কত উড়িয়া অধিবাসী আছে? অর্থাৎ যাহারা এখানে আসিয়া কুলী, মজুরী, বামুন ও বেহারা ইত্যাদির কাজ করে?

বিনীত
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত-সমিতি
৪০নং বিডন ষ্ট্রীট
২২শে আগষ্ট

মাননীয় অমূল্যচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়,

১৯২৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে Forwardএ ৺দুর্গাপূজা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ ইংরাজীতে লিখিয়াছিলেন তাহা অতি সুন্দর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছিল। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঐরূপ প্রবন্ধ বাঙ্গালা ভাষায় আমাদের বিশ্ববাণীর পূজাসংখ্যার জন্য যদি লিখিয়া দেন তাহা হইলে আমরা আপনার নিকট চিরবাধিত থাকিব। উহাতে বেদ হইতে যে সকল Quotation দিয়াছেন তাহার সংস্কৃত মূল ও অনুবাদ দিলে ভাল হইবে। আশা করি আমার এই অনুরোধ বিফল হইবে না। আর একটি অনুরোধ জানাইতেছি—আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমায় Woman's Place in Hindu Religion এ প্রকাশিত ইংরাজী অনুবাদের সংস্কৃত শ্লোকগুলি কোন্ স্মৃতিশাস্ত্রে আছে তাহা বলিয়া দিলে আমি অত্যন্ত বাধিত হইব। আশা করি আপনি শারীরিক কুশলে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভাশীর্ব্বাদ জানিবেন। ইতি—

আপনার শুভানুধ্যায়ী অভেদানন্দ

পুনশ্চ:—

আপনার যজ্ঞ সম্বন্ধে প্রবন্ধটি যাহার প্রথম ভাগ বিশ্ববাণীতে বাহির হইয়াছিল তাহার অবশিষ্ট অংশটি এই পত্রবাহকের হস্তে দিবেন—যদি Block করা আবশ্যক মনে করেন তাহলে ছবিগুলিও দিবেন ইতি—অঃ

শিবরতন মিত্রকে লেখা অপ্রকাশিত পত্রাবলী

শ্রীশ্রীদুর্গা

শ্রদ্ধাস্পদেষ

কিছু দিন হইল পত্র দিয়াছি, উত্তর না আসায় চিন্তিত আছি। বিশ্বকোষ যাহাতে প্রতি মাসে চার খণ্ড প্রকাশিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সুতরাং পূর্ব্বেই প্রেসকপি প্রস্তুত রাখিতে হইবে। আপনার তালিকা হইতে নিম্নলিখিত শব্দগুলি পাঠাইলাম। অভিরাম দাস, অভিরাম দ্বিজ, অমরচন্দ্র দত্ত, অমরনাথ রায়চৌধুরী, অমর মাণিক্য, অমর সিংহ, অমর সিংহদ্বিজ, অমলা দেবী, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ, অমূল্যচরণ বসু, অমৃতলাল গুপ্ত, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতনাথ মুখোপাধ্যায়।

সম্ভবত: উক্ত জীবনীগুলি আপনার লেখা আছে। আশা করি, অতি সত্বর পাঠাইয়া দিবেন। দিতে দেরী হইলে বাদ পড়িয়া যাইবে। অন্ততঃ অত অংশ অবিলম্বে পাঠাইবার চেষ্টা করিবেন। বিলম্বে পাঠাইলে কাজে লাগিবে না। লিখিতে বিলম্ব থাকিলে পত্র পাঠ জানাইয়া সুখী করিবেন।

নিয়ত কুশলপ্রার্থী।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

দি বিশ্বকোষ অফিস ৮, বিশ্বকোষ লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা

৩।৩।৩৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আজ ৪ দিন হইল হরেকৃষ্ণ বাবু সিউড়ি গিয়াছেন, তাঁহার হাতে আপনার এক পত্র দিয়াছি তাহা পাইয়া থাকিবেন। তিনি সিউড়ি গিয়া তাঁহার পত্র লিখিবার কথা, এ পর্যন্ত কোন সংবাদ না দেওয়ায় আপনাকে পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। আপনি আমার পত্র পাইয়াছেন কি না জানিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইব। ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগীরের জীবনী লেখেন নাই। যদি সম্ভব লিখিয়া পাঠাইতে পারেন তবে ভাল হয়। পত্রোত্তরে আপনাদের কুশল সংবাদ দিয়া সুখী করিবেন।

ভবদীয়
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

মেহেরপুর পোঃ
ডিষ্ট্রীক্ট নদীয়া ৩ এপ্রিল ১৯১৫

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইলাম। আমার ফটো আপনাকে পাঠাইতে পারিলাম না, কারণ আমার ন্যায় মাতৃভাষার অকিঞ্চন সেবকের ফটো আপনার গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়া সাধারণের নিকট আমার হাস্যাস্পদ হইবার আগ্রহ নাই। যদি কাহাকেও কিছু দান করি, তবে তাহা নিঃস্বার্থ ভাবেই করি, যে জন্য প্রতিদানে কিছু পাইবারও আগ্রহ নাই।

আপনার পুস্তকালয়ে অনেক উৎকৃষ্ট ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক আছে, তাহাদের পার্শ্বে আমার অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস ও গল্পের পুস্তক স্থান পাইবার যোগ্য নহে, তাহা আমি জানি, তবে আমার পত্র পাইয়া আপনি নিতান্ত শিষ্টাচারের অনুরোধেই আমার কোন কোন পুস্তক ভবিষ্যতে গ্রহণ করিবেন, একরূপ আশা দিয়াছেন, আপনার যাহাতে কষ্ট হয়, একরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আমি কখনই অনুরোধ করিব না। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আপনি আমার কোনও পুস্তক ক্রয় করুন, একরূপ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আমি পূর্ব্বপত্রে আপনার নিকট হইতে পুস্তক ফেরত আনিবার কথা লিখি নাই। মাতৃভাষার সেবকগণের মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজা অধিক নাই। নিবেদন ইতি

বিনীত
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

দি রহস্য-লহরী অফিস
পোঃ মেহেরপুর, ডিষ্ট্রীক্ট নদীয়া
২৬ মার্চ ১৯১৫

সবিনয় নিবেদন,

আমি কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় গিয়াছিলাম, বাড়ী ফিরিয়া আপনার পত্র পাইলাম, উত্তর লিখিতে বিলম্ব হইল, ক্রটি মার্জ্জনা করিবেন। আপনার সহিত আমার চাক্ষুষ আলাপ না থাকিলেও আপনার ন্যায় বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদের পরিচয় আমার অজ্ঞাত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ আপনি পূর্ব্বে মাতৃভাষার সেবাব্রতে আমার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মৎপ্রণীত কোনও পুস্তক ফেরৎ দেওয়ায় আমি তাহার পর হইতে আপনাকে পাঠাই নাই। সম্ভবত আপনার

বিখ্যাত পুস্তকালয়ে ঐ শ্রেণীর পুস্তক রাখিবার যোগ্য নয় বলিয়াই উহা ফেরৎ দিয়াছিলেন, সুতরাং আমার বিলাপের কোন কারণ নাই।

মৎপ্রণীত নবান্ন প্রবন্ধটি পল্লীচিত্রের তৃতীয় সংস্করণে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। একই প্রবন্ধ বিভিন্ন পুস্তকে প্রকাশিত হওয়া সঙ্গত কিনা বুঝিতেছি না, তবে উহা গ্রহণ করিলে যদি আপনার কোনও উপকার হয় তাহা হইলে আপনি উহা অসঙ্কোচে ব্যবহার করিতে পারেন, তবে প্রবন্ধটি যে আমার রচিত আপনার পুস্তকে এ কথা আপনার স্বীকার করা নানা কারণে প্রার্থনীয় হইবে। পল্লীচিত্রে ও পল্লীবৈচিত্র্যে যে সকল প্রবন্ধ বাদ পড়িয়াছে, এবার সেগুলি একত্র সম্বদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিতেছি। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরিশ বাবুও আমাকে পত্র লিখিয়া আমার দুইটি চিত্র স্বীয় পুস্তকের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সেজন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার পর্য্যন্ত আবশ্যক মনে করেন নাই, বোধ হয় তিনি মনে করিয়াছেন আমার প্রবন্ধ দুটি গ্রহণ করিয়াই তিনি আমাকে যথেষ্ট গৌরবান্বিত করিয়াছেন, এ অবস্থায় দান গ্রহণ স্বীকার করা বাহুল্য মাত্র। নিবেদন ইতি

বিনীত

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

ঠিকানা:

মেহেরপুর, জেলা নদীয়া

২৯এ মাঘ ১৩১০

বিপুল সম্মানভাজনেষু,

সবিনয় নিবেদন,

মৎপ্রণীত জাল মোহান্ত ও পিশাচ পুরোহিত প্রভৃতি উপন্যাস পাঠে সাহিত্যরসলিপ্সু বঙ্গীয় পাঠক সমাজ যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করিলেও অনেক উচ্চশিক্ষিত সাহিত্যরসজ্ঞ পাঠক ও সমালোচক আমাদের জানাইয়াছিলেন, যে সকল উপন্যাস কেবল আমোদ প্রচারের উদ্দেশ্যেই বিরচিত হয়, যাহাতে কোন মহৎ চরিত্র বা উচ্চ মনোবৃত্তির বিকাশ নাই, কোনও নিরঞ্জন সত্য, ধর্মনীতি, স্বদেশপ্রীতি বা আত্মত্যাগের গৌরব যাহাতে বিচিত্র বর্ণরাগে উদ্ভাসিত হয় নাই, সেরূপ উপন্যাস কখনও স্থায়ী সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারে না। বঙ্গসাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে সেরূপ উপন্যাসই তাঁহারা আমার নিকট প্রত্যাশা করেন। অদ্ভুত ঘটনার ইন্দ্রজালে বা বিষয়-বৈচিত্র্যে পাঠক সমাজকে আমোদিত করিতে পারেন বঙ্গ-সাহিত্যে এরূপ লেখকের অভাব নাই। আমার লেখনী সবার উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হয়, ইহাই তাঁহাদের ঐকান্তিক কামনা।

চিন্তাশীল ও সুশিক্ষিত স্বদেশীয় পাঠক মহোদয় উদ্দিষ্ট এই অনুজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আমি পাশ্চাত্য আদর্শে সাহিত্যাচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণে কয়দপহারী শিখ নামক একখানি নূতন উপন্যাস বহু পরিশ্রমে রচনা করিয়াছি! সম্প্রতি তাহা প্রকাশিত হওয়ায় আপনার পূর্ণানুগ্রহ কামনা করিয়া আপনার কর-কমলে প্রেরণ করিলাম। পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের পৌত্র এই উপন্যাসের নায়ক। ইহাতে আমি শিক্ষিত সমাজের রুচিকর অনেক মনোজ্ঞ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি। পুস্তকখানি আপনার মনোরঞ্জনে সমর্থ হইলেই আমার লেখনী ধন্য হইবে।

পুস্তকখানি মৎপ্রণীত আধুনিক উপন্যাস হওয়ায় আকারে অনেক বৃহৎ ও পঞ্চাশ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ হইলেও ইহার মূল্য আপনার জন্য মাশুলসহ দেড় টাকা নির্দ্দিষ্ট করিলাম। পুস্তকখানি ছাপান কাগজ বাঁধাই হিসাবেও আশানুরূপ সুলভ হইয়াছে কি না আপনি তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। আশা করি নির্দ্দিষ্ট মূল্যে পুস্তকখানি গ্রহণ করিলে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। নিবেদন ইতি। শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

৯।২, বিশ্বম্ভর মল্লিক লেন, হাটখোলা, কলিকাতা।

৩রা কার্ত্তিক ১৩১০।

মান্যবরেষু,

সবিনয় নিবেদন, নন্দনকাননের নূতন ও পুরাতন সকল গ্রাহককেই আমার প্রণীত অজয়সিংহের কুঠী, পট, হামিদা ও বাসন্তী এই চারিখানি উপন্যাস একত্র অত্যন্ত সুলভে দুই টাকা মূল্যে প্রদান করা হইতেছে, কেবল ডাকমাশুল চারি আনা অতিরিক্ত লাগে। পুস্তকগুলির ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট উপহারের পুস্তকের মত নহে, পত্রসংখ্যা একত্র প্রায় নয় শত পৃষ্ঠা। এগুলি বাজারের অসার বাজে উপন্যাস নহে, কোন ইংরাজী উপন্যাসের অনুবাদও নহে, সুতরাং ইহা যে কিরূপ সুলভ মূল্যে প্রদত্ত হইতেছে, তাহা সহজেই বুঝিবেন। নিম্নে পুস্তকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি।

১। অজয়সিংহের কুঠী এই সুবৃহৎ উপন্যাসখানি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই স্বীকার করিয়াছেন, এরূপ কৌতূহলোদ্দীপক, সুখপাঠ্য, ভক্তিসূচক উৎকৃষ্ট উপন্যাস বহুদিন বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। ইহা বঙ্গভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসসমূহের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য। একজন সুরসিক সমালোচক লিখিয়াছেন, এ পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া যাইতে হয়। এই জলকষ্ট ও অন্নকষ্টের দেশে ইহা বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয়। পুস্তকখানি সকলেরই পাঠ করা উচিত, তাহাতে অর্থের অপব্যয় নাই।

২। পট—ইহাতে ছয়টি অতি মনোরম আমোদপ্রদ উপভোগ্য গোয়েন্দার উপন্যাস আছে। উপন্যাসগুলি যে বাঙ্গালায় সম্পূর্ণ নূতন ধরণের তাহা প্রদীপ প্রভৃতি পত্রিকা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে যে ছয়টি সম্পূর্ণ উপন্যাস আছে তাহাদের নাম যথাক্রমে (ক) শক্তিভক্ত (খ) উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে (গ) বৃথারহস্য (ঘ) চক্ষুদান (ঙ) জাল ডিটেকটিভ (চ) পত্র লেখার বিড়ম্বনা।

৩। হামিদা আসলী যুদ্ধাবলম্বনে লিখিত রোমান্স বা রসন্যাস। এখানি খাঁটি বাঙ্গালা রসন্যাস, যুদ্ধকাহিনীতে পূর্ণ। অথচ ইহা স্বদেশপ্রীতি ও স্বজন-বাৎসল্যের, প্রেম ও কর্ত্তব্যে পরিপূর্ণ মহাসমরের একটি অতি সুন্দর চিত্র। সুপ্রসিদ্ধ ডেলি নিউজ ইহার অজস্র প্রশংসা করিয়াছিলেন।

৪। বাসন্তী—ইহাতে যে কয়েকটি অনতিবৃহৎ উপন্যাস আছে তাহার প্রত্যেকটি সুমধুর প্রীতিকর ও প্রাণস্পর্শী বলিয়া বহু সংবাদপত্রে প্রশংসিত হইয়াছে। পুস্তকগুলির জন্য আমাকেই পত্র লিখিতে হইবে, কারণ বাজারে প্রত্যেক উপন্যাস পূর্ণমূল্যে বিক্রয়ের নিয়ম আছে। গ্রন্থাবলী কেবল আমাদের কাছে সুলভে পাইবেন। আপনার অনুমতি পাইলে পুস্তকগুলি ডাকযোগে পাঠাইতে পারি। নিবেদন ইতি—

বিনীত

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, কোনো সভ্য জাতির বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা কিম্বা অন্য কোনো বোধ্য ভাষাতে যদি ধর্মচর্চা না থাকে তবে সে সম্প্রদায় ক্রিয়া-কর্ম ও পাল-পার্বণ নিয়েই মত্ত থাকে। এই তত্ত্বটি ভারতবাসীর ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। কারণ, তাঁরা স্বভাবত: এবং ঐতিহ্য বশত: ধর্মানুরাগী। তার কোনো বোধ্য ভাষাতে সত্যধর্মের মূল স্বরূপ সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ না থাকলে সে তখন সব-কিছু হারাবার ভয়ে ধর্মের বহিরাচরণ অর্থাৎ তার খোলস ক্রিয়াকর্মকেই আঁকড়ে ধরে থাকে।[১]

কলকাতা অর্বাচীন শহর। যে সব হিন্দু এ শহরের গোড়াপত্তন কালে ইংরেজের সাহায্য করে বিত্তশালী হন তাঁদের ভিতর সংস্কৃত ভাষার কোন চর্চা ছিল না। বাঙলা গদ্য তখনো জন্মলাভ করেনি। কাজেই মাতৃভাষার মাধ্যমে যে তাঁরা সত্যধর্মের সন্ধান পাবেন তারও কোনো উপায় ছিল না। ওদিকে আবার বাঙালী ধর্মপ্রাণ। তাই সে তখন কলকাতা শহরে পাল-পার্বণে যা সমারোহ করলো তা দেখে অধিকতর বিত্তশালী শাসক ইংরেজ-সম্প্রদায় পর্যন্ত স্তম্ভিত হন। এর শেষ রেশ হুতোমে পাওয়া যায়।

জাতির উত্থান-পতনেও এ অবস্থা বার বার ঘটে থাকে। এবং সমগ্র ভাবে বিচার করতে গেলে তাতে করে জাতির বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। গরীব-দুঃখীর তথা সমগ্র সমাজের জন্য এর একটা অর্থ নৈতিক মূল্য তো আছে বটেই, তদুপরি এক যুগের অত্যধিক পাল-পার্বণের মোহকে পরবর্তী যুগের ঐকান্তিক ধ্যান-ধারণা অনেকখানি ক্ষতি-পূরণ করে দেয়।

কিন্তু বিপদ ঘটে, যখন ঐ ক্রিয়াকর্মের যুগে হঠাৎ এক বিদেশী ধর্ম এসে উপস্থিত হয়, তার চিন্তাধারা তার সত্যপথ সন্ধানের আন্দোলন-আলোড়ন নিয়ে। এবং এই ধর্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্যান্য রাজনৈতিক এবং সামাজিক (কঁৎ, মিল ইত্যাদি) প্রশ্নের যুক্তি-তর্কমূলক আলোচনা-গবেষণা বিজড়িত থাকে তবে ক্রিয়াকর্মাসক্ত সমাজের পক্ষে তখন সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়। বাঙালী-সমাজের অগ্রণিগণ ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে অনেকখানি ইংরিজি শিখে ফেলেছেন এবং খৃষ্টধর্মের মূলতত্ত্ব, তার মহান্ আদর্শবাদ, এই ধর্মে অনুপ্রাণিত মহাজনগণের সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা তাদের মনকে বার বার বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে—তাঁদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, আমাদের ধর্মে আছে কি, আছে তো শুধু দেখতে পাই অন্ত:সারশূন্য পূজাপার্বণ, আর ওদের ধর্মে দেখি, স্বয়ং ভগবান পিতারূপে মানুষের হৃদয়দ্বারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে পেলে এই অর্থহীন জীবন আপন চরম মূল্য লাভ করে, দুঃখ-দৈন্য আশা-আকাঙ্ক্ষা এক পরম পরিসমাপ্তিতে অনন্ত জীবন লাভ করে।

হিন্দুশাস্ত্রের অতি সামান্য অংশও যাঁরা অধ্যয়ন করেছেন তাঁরাই জানেন, এ সব কিছু নূতন তত্ত্ব নয়। বস্তুত: জীবন-সমস্যা ও ধর্মে তার সমাধান এই অবলম্বন করেই আমাদের সর্বশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। এক দিকে দৈনন্দিন জীবনের অন্তহীন প্রলোভন, অন্য দিকে সত্যনিষ্ঠার প্রতি ধর্মের কঠোর কঠিন আদেশ—এ দুয়ের মাঝখানে মানুষ কি প্রকারে সার্থক গৃহী হতে পারে, সেই পন্থাই তো আমাদের শাস্ত্রকারগণ যুগে যুগে দেখিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু এ সব তত্ত্ব যাঁরা জানতেন তাঁরা থাকতেন গ্রামে, তাঁরা পড়তেন পড়াতেন টোল-চতুষ্পাঠীতে এবং তাঁরা ইংরেজের সংস্পর্শে আসেননি বলে ওঁদের ধর্ম যে নাগরিক হিন্দুকে নানা প্রশ্নে বিচলিত করে তুলেছে সে সংবাদও তাঁদের কানে এসে পৌঁছয়নি।

---

(১) বর্তমান লেখকের মনে সন্দেহ আছে, শাক্যমুনির আবির্ভাবের ঠিক পূর্বেই এই পরিস্থিতি হয়েছিল। বৈদিক ভাষা তখন প্রায় অবোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলেই ক্রিয়াকর্ম—যাগযজ্ঞ—পশুহত্যা—তখন সত্যধর্মের স্থান অধিকার করে বসেছিল। বুদ্ধদেব তখন এরই বিরুদ্ধে সত্যধর্ম প্রচার করেন ও সর্বজনবোধ্য লোকায়ত প্রাকৃত (পরে পালি নামে পরিচিত) ভাষার শরণ নেন।

আর সব চেয়ে আশ্চর্য্য, এই সব 'টোলো' 'বিটেল বামুনরা' যে শুধু পাদ্রী সাহেবদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে আপন ধর্মের মর্য্যাদা-মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারতো তা নয়, তারা যে কান্ট-হেগেলের চেলাদের সঙ্গে বিশুদ্ধ দর্শনের ক্ষেত্রেও সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ছিল—এ তত্ত্বটিও নাগরিক হিন্দুদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল। 'ঘরের কাছে নিইনে খবর, খুঁজতে গেলেম দিল্লী শহর' লালন ফকীরের অর্থহীন গীত নয়।২ এঁরা সত্যই জানতেন না, আমাদের টোলে শুধু স্মার্ত নন, নৈয়ায়িকও ছিলেন, এবং স্মার্তরাও যে শুধু তৈলবট নিয়ে বিধান দিতেন তাই নয়, তাঁরা সে-বিধানের সামাজিক মূল্যও যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারতেন।

কলকাতার চিন্তাশীল গুণী জন তখন এই পরিস্থিতি দেখে বিচলিত হয়েছিলেন।

সৌভাগ্য ক্রমে এই সময় রাজা রামমোহন রায়ের উদয় হয়। তাঁর ব্রাহ্ম-আন্দোলন যে বাঙালী জাতির কি পরিমাণ উপকার করেছে, এই ব্রাহ্মসমাজের কীর্ত্তিমান পুরুষসিংহ রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যকে যে কি পরিমাণ ঐশ্বর্য্যশালী ও বহুমুখী করে গিয়েছেন, তার সম্পূর্ণ হিসাব-নিকাশ এখনো শেষ হয়নি। বাঙালী সাধক, বাঙালী লেখক, বাঙালী পাঠক সকলেই সে কথা স্বীকার করেছেন। স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন,

এদানির ব্রাহ্মধর্ম্ম যার ছড়াছড়ি।
তাহারেও বার বার নমস্কার করি ॥

পরমহংসদেবের মর্ম্মর মূর্তি —পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী গৃহীত আলোকচিত্র

'ছড়াছড়ি' শব্দে তখনকার দিনে প্রচলিত একটু ক্ষুদ্র তাচ্ছিল্য লুকানো রয়েছে। পরমহংসদেব সেটিকেও 'নমস্কার' করেছেন।

রাজা রামমোহন খৃষ্টধর্মে মহাপণ্ডিত ছিলেন, মুসলমান ধর্মের 'জবরদস্ত মৌলবী' ছিলেন এবং সব চেয়ে বড় কথা, সে যুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে যে বস্তু সম্পূর্ণ অবান্তর এমন কি অন্তরায়, সেই হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁর সাধারণ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় ব্যুৎপত্তি এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল।

রাজা জানতেন, সে যুগের হিন্দুকে তর্ক-বিতর্ক করতে হবে খৃষ্টধর্মের সঙ্গে। অর্থাৎ খৃষ্টান মিশনারীর সামনে 'ক' অক্ষরে 'কৃষ্ণনাম' স্মরণে 'এক ঘটি' ও চোখের জল ফেললেই অপর ধর্মের মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না—খুব বেশী হলে, ভদ্র মিশনারী হয়ত তাকে ভক্ত বলে স্বীকার করবে মাত্র। তাই তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, কলকাতার হিন্দুর ক্রিয়াকর্মের পিছনে রয়েছে হিন্দুর ষড়দর্শন, বুদ্ধ এবং মহাবীরের বিশ্বপ্রেম এবং সর্ব্ব পশ্চাতে রয়েছে অহরহ জাজ্বল্যমান বেদ-বেদান্তের অখণ্ড দিব্যদৃষ্টি।

(২) শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের গাওয়া গান এরই কাছাকাছি:
আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অনিল গুপ্ত সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ২১৩ পৃঃ।

(৩) শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় কথার আড়।

দেশের আপামর জনসাধারণের ভিতর হিন্দুধর্মের নব-উন্মাদনা জানতে হলে রাজা রামমোহন হিন্দুধর্মের কোন্ কোন্ সম্পদ গ্রহণ এবং প্রচার করতেন সে কথা বলা শক্ত; কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে যুগের কলিকাতাবাসী সুসভ্য অথচ আপন শাস্ত্রে অজ্ঞ হিন্দুর সামনে তিনি সর্বশাস্ত্র মন্থন করে উপনিষদগুলিই তুলে ধরে প্রকৃত ঋষির গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। উপনিষদ থেকেই শঙ্কর-দর্শনের সূত্রপাত এবং শঙ্করের অদ্বৈতবাদ অতিশয় অক্লেশে, পরম অবহেলায় খৃষ্টানের ট্রিনিটিকে সম্মুখ সংগ্রামে আহ্বান করতে পারে। উপনিষদের গুণকীর্তন এ ক্ষুদ্র এবং অক্ষম রচনার উদ্দেশ্য নহে,—অনুসন্ধিৎসু পাঠক তুর্কীপণ্ডিত অল-বীরুনী, মোগল সূফী দারাশীকুহ (ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)[৪] এবং জর্মন দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের রচনাতে তার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাবেন।

এবং ধর্মের যে সব বাহ্যানুষ্ঠান সত্যধর্ম থেকে অতি দূরে চলে গিয়ে অধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে রাজা সংগ্রাম আরম্ভ করলেন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে। এবং সে সংগ্রামের জন্য তিনি অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চয় করলেন হিন্দুস্মৃতি থেকেই। এ স্থলে রাজা বিশ্বজনীন যুক্তিতর্ক ব্যবহার না করে প্রধানতঃ ব্যবহার করলেন হিন্দুশাস্ত্রসম্মত ন্যায় এবং উদাহরণ। রাজা প্রমাণ করলেন যে, তিনি দর্শনে যে রকম বিদগ্ধ, ক্রিয়াকর্মের ভূমিতেও অনুরূপ স্মার্ত মল্লবীর।

শাস্ত্রালোচনায় ঈষৎ অবাস্তর হলেও এ-স্থলে বাঙলা সাহিত্যানুরাগীর দৃষ্টি তার অতি প্রিয় একটি বস্তুর দিকে আকর্ষণ করি। রাজাকে তাঁর আন্দোলন চালাতে হয়েছিল কলকাতার বাঙালীদের ভিতর। এঁরা সংস্কৃত জানেন না। তাই তাঁকে বাধ্য হয়ে লিখতে হয়েছিল বাঙলা ভাষাতে। পদ্য এ সব যুক্তি-তর্কের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বাহন। তাই তাঁকে বাঙলা গদ্য নির্মাণ করে তার-ই মাধ্যমে আপন বক্তব্য প্রকাশ করতে হয়েছিল। রাজার পূর্বে যে বাঙলা গদ্য লেখা হয়নি এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু হিন্দুধর্মের এই তুমুল আন্দোলন-আকর্ষণ-মন্থনের ফলে যে অমৃত বেরুল তারই নাম বাঙলা গদ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে এ-জাতীয় ঘটনা বহু বার ঘটেছে; তথাগতের কৃপায় পালি, মহাবীরের কৃপায় অর্ধ-মাগধী, মুহম্মদের কৃপায় আরবী গদ্য, লুথারের কৃপায় জর্মন গদ্যের সৃষ্টি। পূর্বেই নিবেদন করেছি, গণবোধ্য মাতৃভাষাতে শাস্ত্রালোচনা না থাকলে ক্রিয়াকর্মের আত্যন্তিক প্রসার পায়; তার বিরুদ্ধে নবধর্ম পত্তন কিম্বা সনাতন ধর্মের সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়।[৫] এবং সে আন্দোলনকে বাধ্য হয়েই গণ-ভাষার আশ্রয় নিতে হয়।

রাজার প্রচলিত সংস্কার উপনিষদে আপনার দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করার ফলে কতকগুলি জিনিস সে অস্বীকার করল। তার প্রথম, সাকার উপাসনা। দ্বিতীয় বৈষ্ণবধর্মের তদানীন্তন প্রচলিত রূপ; এবং ক্রমে ক্রমে গণধর্মের (folk religion) প্রতি ব্রাহ্মদের অবজ্ঞা স্পষ্টতর হতে লাগল।[৬] প্রমাণস্বরূপ বলতে পারি, তখনকার দিনে কেন আজও যদি কেউ ব্রাহ্মমন্দিরের বক্তৃতা দিনের পর দিন শোনে তবু সে উপনিষদের পরবর্তী যুগের ধর্ম সাধনার অল্প ইঙ্গিতই শুনতে পাবে। তার মনে হয়, উপনিষদ-আশ্রিত ধর্ম-দর্শনের শেষ হয়ে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত হিন্দুরা আর কোনো প্রকারের উন্নতি করতে পারেননি। এমন কি, গীতার উল্লেখও আমি অল্পই শুনেছি। রামায়ণ, মহাভারত পুরাণের কথা প্রায় কখনোই শুনিনি। বৃন্দাবনের রসরাজ—রসমতীর অভূতপূর্ব অলৌকিক প্রেমের কাহিনী থেকে কোনো ব্রাহ্ম কখনো কোনো দৃষ্টান্ত আহরণ করেননি।

ধর্ম জানেন, আমি ব্রাহ্মদের নিকট অকৃতজ্ঞ নই। পাছে তাঁরা ভুল বোঝেন তাই বাধ্য হয়ে ব্যক্তিগত কথা তুললুম এবং করজোড়ে নিবেদন করছি, আমি মুসলমান, আমার কাছে হিন্দু যা, ব্রাহ্মও তা, আমি হিন্দু-ব্রাহ্ম উভয় পন্থার (আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস পন্থা ভিন্ন নয়) সাধু-সন্তদের বার বার নমস্কার করি।

ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ যতই অধ্যয়ন করি ততই দেখতে পাই, ব্রাহ্মরা যেন ক্রমে ক্রমেই জনগণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। জনগণকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করে এক বিরাট গণ-আন্দোলন আরম্ভ করার প্রচেষ্টা যেন তাঁদের ভিতর ছিল না। এ যুগেও তার উদাহরণ পাইনি। ১১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত আমি বহু ব্রাহ্ম-পরিবারের আতিথ্য লাভ করেছি, ফলে গভীর হৃদ্যতা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ব্রাহ্ম-পরিবারে হিন্দু চাকর-বাকরকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা দেখিনি। মুসলমান-খৃষ্টানরা সর্বদাই করে থাকেন বলেই এটা আমার কাছে একটু আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছিল। আমার মনে হয়, ব্রহ্মমন্ত্র সর্বজনীন কিন্তু এ-কথাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ব্রহ্মজ্ঞানীরা যে কোনো কারণেই হোক সর্বজনকে আহ্বান জানাতে পারেননি। মুসলমানের নমাজে মুটে-মজুর চাকর-বাকরের সংখ্যাই বেশী, হিন্দুর সংকীর্তনে ভাবোল্লাসে নৃত্য করে 'নিম্নশ্রেণীর' প্রচুর হিন্দু, আর মন্দিরে আরতির সময় শিক্ষিত হিন্দুকে তো আজ-কাল দেখতেই পাওয়া যায় না। অথচ পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম-সম্মেলনে ব্রাহ্ম চাকর নফর দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

তার জন্য আমি ব্রহ্মবাদীদের আদৌ ত্রুটি ধরছি না। এঁরা

---

(৪) দারা তাঁর অতুলনীয় ধর্মগ্রন্থ আরম্ভ করেছেন এই বলে: "হে প্রভু, তুমি তোমার সুন্দর মুখ কুফর (অবিদ্যা) কিম্বা ইমান (বিদ্যা) দু' পাশের কোনো অলকগুচ্ছ (জুলফ্) দিয়ে ঢেকে রাখোনি।" এই শ্লোক ঈশোপনিষদের 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যং বিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥'-রই অনুবাদ।

(৫) বস্তুতঃ, সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম পৃথিবীতে কোনো মহাপুরুষ কখনোই আরম্ভ করেননি। বুদ্ধদেব বলতেন, তাঁর পূর্বে বহু বুদ্ধ জন্ম নিয়েছেন, মহাবীর জৈনদের সর্বশেষ তীর্থঙ্কর বা জিন। খৃষ্ট বলেন, তিনি বিধির বিধান ভাঙতে আসেননি—তিনি এসেছেন তাকে পূর্ণ রূপ দান করতে। মুহম্মদ বলতেন, তাঁর পূর্বে বহু সহস্র পয়গম্বর আবির্ভূত হয়েছেন। বস্তুতঃ, এঁদের কেউ বলেননি, আমি প্রথম; প্রায় সকলেই বরঞ্চ বলেছেন, আমি-ই শেষ।

(৬) একটা অবিশ্বাস্য গল্পে শুনেছি, কোনো ব্রাহ্মভক্ত নাকি কদম্বতরুকে 'অশ্লীল বৃক্ষ' নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু এর থেকে অন্ততঃ এইটুকু বোঝা হয়, হিন্দুরা ব্রাহ্মদের 'গোঁড়ামি' সম্বন্ধে তখনকার দিনে কি ধারণা পোষণ করতেন।

অক্ষম ছিলেন, এ-কথা আমি কখনো স্বীকার করবো না। আমার মনে হয়, এঁরা প্রধানত সমাজের নেতৃস্থানীয়দের নিয়েই আপন আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন এবং তাদের মাধ্যমে যে আমাদের মত বহু হিন্দু-মুসলমান প্রচুর উপকৃত হয়েছিলেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, হিন্দুদের গণরূপ তখন একেবারেই অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল। তার জন্য ব্রাহ্মদের দোষ দিলে অত্যন্ত অন্যায় হবে; দোষ হিন্দুদের। তাঁদের নেতৃস্থানীয়েরা তখন হয় দীক্ষা নিয়েছেন, কিম্বা ব্রাহ্মদের প্রতি সহানুভূতিশীল, আপন গরীব জাত-ভাই কি ধর্মকর্ম করছে এবং তার কল্যাণে সত্যধর্মের সন্ধান পাচ্ছে কি না এ-বিষয়ে তাঁরা তখন উদাসীন। যেন গণধর্ম ধর্মই নয়, যেন ধর্মে একমাত্র শিক্ষিত জনেরই শাস্ত্রাধিকার!

অতিশয় মারাত্মক পরিস্থিতি। দেশের দশের তা হলে সর্বনাশ হয়; শিক্ষিত জনকেও শেষ পর্য্যন্ত তার তিক্ত ফল আস্বাদন করতে হয়।৭

*   *   *   *

ঠিক এই সময়ে করুণাময়ের কৃপায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব।

পরমহংসদেবকে সমগ্র এবং সম্পূর্ণ ভাবে ধারণা করা আমাদের মত অতি সাধারণ প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব। কারণ, আমরা সব-কিছুই গ্রহণ করি আমাদের বুদ্ধি দিয়ে—যুক্তিতর্কের ছাঁচে ফেলে। অথচ কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সাধু-সন্তদের ধারণা করতে গেলে আমরা পাই বরফের সেই অতি অল্প অংশটুকুর খবর, যেটি জলের উপর ভাসছে। অর্থাৎ বেশীর ভাগ বস্তুটি যে অতীন্দ্রিয় তৃতীয় চক্ষু দিয়ে দেখতে হয় সেটি আমাদের নেই। তৎসত্ত্বেও যারা তার বিচার করে তাদের নিয়ে মৃদু হাস্য করে বাউল গেয়েছেন—

ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরী
নিকষে ঘষয়ে কমল, আ মরি আ মরি।

যার যেমন মাপকাঠি! স্যাকরার ক্রাইটেরিয়ন তার নিকষ পাথর। সে তাই দিয়ে পদ্মফুলের গুণ বিচার করতে যায়! কিন্তু এর চেয়েও মারাত্মক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং পরমহংসদেব—একাধিক বার। নুনের পুতুল সমুদ্রে নেমেছিল তার গভীরতা মাপবে বলে। তিন পা যেতে না যেতেই সে গলে গিয়ে জলের সঙ্গে মিশে গেল! (৮)

তাই নিয়ে কিন্তু কিছুমাত্র শোক করার প্রয়োজন নেই! স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবই বলেছেন, তোমার এক ঘটি জলের দরকার। পুকুরে কত জল তা জেনে তোমার কি হবে? (৯)

তাই মা ভৈঃ। যারা বলে আমাদের মত পাপী-তাপীর অধিকার নেই পরমহংসদেব মত মহাপুরুষের জীবন নিয়ে আলোচনা করার—তারা ভুল বলে। অধিকার আমাদেরই—এক মহাপুরুষ অন্য মহাপুরুষের জীবনী লিখতে যাবেন কেন? সে অধিকার গ্রহণ করতে গিয়ে ভুল-ত্রুটি হলে মহাত্মাদের কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। হীনপ্রাণকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

পরমহংসদেবের কাছে আসার পূর্বেই চোখে পড়বে, লোকটি কী সরল! এগিয়ে এসে বোঝা যায়, এঁর বাহির-ভিতর দুই-ই সরল। এঁর শরীরটি যেমন পরিষ্কার, এঁর মনটিও তেমনি পরিষ্কার। মেদিনীপুর অঞ্চলে যাকে বলে 'নিখিরকিচ'—চাঁচা-ছোলা। যেন এই মাত্র তৈরী হয়েছে কাঁসার ঘটিটি—কোনো জায়গায় টোল পড়েনি।

এঁর মত সরল ভাষায় কেউ কখনো কথা বলেনি। এঁর ভাষার সঙ্গে সব চেয়ে বেশী সাদৃশ্য খৃষ্টের ভাষা ও বাক্যভঙ্গীর। আমাদের দেশের এক আলঙ্কারিক বলেছেন, 'উপমা কালিদাসস্য'। এর অর্থ শুধু এই নয় যে, কালিদাস উত্তম উপমা প্রয়োগ করতে পারতেন, এর অর্থ উপমা মাত্রেই কালিদাসের, অর্থাৎ উপমার রাজ্যে কালিদাস একচ্ছত্রাধিপতি। আমার মনে হয়, উপমা-বৈচিত্র্যে পরমহংস কালিদাসকেও হার মানিয়েছেন। কালিদাস ব্যবহার করেছেন শুধু সুন্দর মধুর তুলনা—যেগুলো কাব্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। রামকৃষ্ণের সেখানে কোনো বাছ-বিচার ছিল না। ইংরিজিতে একটা প্রবাদ আছে, 'তার জাঁতায় যা-ই ফেলো না কেন, ময়দা হয়ে বেরিয়ে আসে।' পরমহংসের বেলাও ঠিক তাই। কিছু একটা দেখলেই হ'ল! সময় মত ঠিক সেটি উপমার আকার নিয়ে বেরিয়ে আসবে। এমন কি, যে সব কথা আমরা সমাজে বলতে কিন্তু-কিন্তু করি, পরমহংস সর্ব্বজন-সমক্ষে অক্লেশে সেগুলো বলে যেতেন। ভগবানকে পেতে হলে কি ধরণের 'বেগে'র প্রয়োজন যে সম্বন্ধে তাঁর তুলনাটির উল্লেখ এখানে না-ই বা করলুম।

ঠিক এইখানেই আমরা একটি মূল সূত্র পাব। তিনি জনগণের ধর্ম (ফোক্ রিলিজিয়ন), আচার-ব্যবহার, ভাষা—সব জিনিসকেই তার চরম মূল্য দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন বলেই জনগণের ভাষা, বাচনভঙ্গী সানন্দে ব্যবহার করে যেতেন। জনগণের অন্যায়-অধর্ম তিনি স্বীকার করতেন না, কিন্তু যেখানে শুদ্ধমাত্র রুচির প্রশ্ন সেখানে তিনি 'ধোপদুরস্ত' 'ফিটফাট' হবার কোনো প্রয়োজন বোধ করতেন না। ভাষাতে সেদিনকার ছুঁৎবাই' রোগ আমরা পেয়েছিলুম ভিক্টোরীয় পুরিটানিজম থেকে—তখন কে জানতো পঞ্চাশ বছর যেতে না যেতেই জয়েস্ এসে আমাদের ছুঁৎবাইয়ের 'ভণ্ডামি' লণ্ডভণ্ড করে দেবেন। ১০

(৭) রাজনীতির ক্ষেত্রে এই শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধানের জন্য আমরা যে কি কর্মফল ভোগ করেছি, সে তথ্যের উত্থাপন এ-স্থলে অবান্তর।

(৮) আমাদের ব্যক্তিগত প্রার্থনা, তাই যেন হয়। বাউল গেয়েছেন, 'যে জন ডুবলো, সখী, তার কি আছে আর বাকি গো?' ঠাকুরও প্রায়ই গাইতেন 'ডোব, ডোব, ডোব!'

(৯) এক চীনা সাধক এরই কাছাকাছি এসে বলেছেন, 'মাই কাপ, ইজ স্মল; বাট্ আই ড্রিঙ্ক অফ নার!

১০। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ-দ্বন্দ্বের সমাধান না করতে পেরে দু'রকম ভাষাই ব্যবহার করতেন। 'সীতার বনবাসের' ভাষা সকলেই চেনেন, কিন্তু যেখানে তিনি রামা-শ্যামাকে বিধবা বিবাহের শত্রুদের বিপক্ষে ক্ষেপাতে চেয়েছেন সেখানে 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য' এই বেনামীতে, 'ফাজিল-চালাক, দিলদরিয়া তুখোড় ইয়ার, তার একটি বেদড়া মন্ত্রী আছে—এটি তারই ত্যাঁদড়ামি, লোকটা লক্ষ্মীছাড়া বক্কেশ্বর আনাড়ির

পরমহংসদেব গণধর্ম স্বীকার করে তার চরম মূল্য দিলেন। সাকার উপাসনা গণধর্মের প্রধান লক্ষণ। বাঙালী সেই সাকারের পূজা করে প্রধানতঃ কালীরূপে। কালীমূর্তি দেখলে অ-হিন্দু রীতিমত ভয় পায়। পরমহংসদেব সেই কালীকে স্বীকার করলেন।

অথচ 'দূরের কথা' বিচার করলে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলে, পরমহংসদেব আসলে বেদান্তবাদী। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এ-তিন মার্গ তিনি অবস্থাভেদে একে-ওকে বরণ করতে বলেছেন, কিন্তু সব-কিছু বলার পর তিনি সর্বদাই বলেছেন, 'কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্ম ব্যতীত সব-কিছু মিথ্যা বলে অনুভব করতে পারো নি ততক্ষণ পর্যন্ত সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারবে না।' 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা, যিনি বলেছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।

'কি রকম জানো, যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে। শেষে বিচারের পর সমাধি হয়। তখন 'আমি' 'তুমি', 'জগৎ' এ সবের খবর থাকে না।'

অথচ গণধর্মে নেমে এসে বলছেন, 'যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই? যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলছে দুলছে, শক্তি বা কালীর উপমা। কালী 'সাকার আকার নিরাকারা'। তোমাদের যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস, কালীকে সেই রূপ চিন্তা করবে।১১ আর একটি কথা—তোমার নিরাকার বলে যদি বিশ্বাস, দৃঢ় করে তাই বিশ্বাস করো কিন্তু মতুয়ার (dogmatism) বুদ্ধি করো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে বলো না যে, তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না। ব'লো, আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, আর কত কি হতে পারেন তিনি জানেন। আমি জানি না, বুঝতে পারি না।'১২

জনগণপূজ্য শক্তির সাকার-সাধনা ('পৌত্তলিকতা' শব্দটা সর্বথা বর্জনীয়—এটাতে তাচ্ছীল্য এবং ব্যঙ্গের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে) স্বীকার করে পরমহংসদেব তৎকালীন ধর্মজগতের ভারসাম্য আনয়ন করলেন বটে কিন্তু প্রশ্ন, জড়সাধনার অন্ধকার দিকটা কি তিনি লক্ষ্য করলেন না?

এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব এবং মহত্ত্ব; এই সাকার-সাধনার পশ্চাতে যে জ্ঞেয় অজ্ঞেয় ব্রহ্মের বিরাট মূর্তি অহরহ বিরাজমান পরমহংসদেব বার বার সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই ভারসাম্যই ব্রহ্মজ্ঞানী কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ এবং তাঁদের শিষ্যদের আকর্ষণ করতে পেরেছিল। তিনি যদি মতুয়া কালীপূজক হতেন তবে তিনি পরমহংস হতেন না।

বস্তুতঃ, একটি চরম সত্য আমাদের বার বার স্বীকার করা উচিত। যেখানেই যে মানুষ যে কোনো পন্থায় ভগবানের সন্ধান করেছে তাকেই সন্ধান জানাতে হয়। এমন কি ক্ষুদ্র শিশু যখন সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে তাঁর সাহায্য কামনা করে (হায়, কলকাতার সরস্বতীপূজার বহু আড়ম্বর দেখে অনেক সময় মনে হয়, এরাই বুঝি এ যুগে দেবীর একমাত্র সাধক) তাকেও মানতে হয়,—গাছের পাতা, জলের কৌটা যখন মানুষ মাথায় ঠেকায় তারও বিলক্ষণ মূল্য আছে। গীতাতে এ সত্যটি অতি সরল ভাষায় বলা হয়েছে।

কিন্তু সাকার-নিরাকার নিয়ে আজ আর তর্ক করে লাভ কি? বাঙালা দেশে আজ আর ক'জন লোক নিরাকার পূজা করেন তার খবর বলা শক্ত—কারণ সে পূজা হয় গুহকোণে, নির্জনে। অথচ কলকাতার বারোয়ারী সাকার পূজার যা আড়ম্বর তা দেখে বাঙালীর কত গুণী-জ্ঞানী যে বিক্ষুব্ধ হন তার প্রকাশ খবরের কাগজে প্রতি বৎসর দেখি। এইমাত্র নিবেদন করেছি, এরও মূল্য আছে—তাই আমার এক জ্ঞানী বন্ধু বড় দুঃখে বলেছিলেন, 'কিন্তু কী ভয়ঙ্কর ট্রেন করে এ স্কুলে সে সত্যটি স্বীকার করি!'

সাকার-নিরাকারের আধ্যাত্মিক মূল্য যা আছে তা আছে, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব সমাধানের সামাজিক মূল্য কি?

চূড়ামণি বেঅকুফের শিরোমণি' ইত্যাদি 'গ্রাম্য' বাক্য পরমানন্দে ব্যবহার করেছেন। তিনি যে সব আদিরসাত্মক গল্প ছাপায় (!) প্রকাশ করেছেন সেগুলো সমাজে বললে এখনও সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

(১১) শক্তিকে নানা দেশের কবি এবং সাধকগণ নানারূপ কল্পনা করেছেন। কাব্যে বিবেকানন্দের কবিতাই শ্রেষ্ঠতম।

"মৃত্যুরূপা মাতা

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণা-বায়ু-বেগ!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে।
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরি চূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র—মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর!—দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,—
নাচে তা'রা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালী! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে;
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালী তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,—মাতৃরূপা তা'রি কাছে আসে।"

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ)

ইংরিজিতে এর প্রথম ছত্র "The Stars are blotted out"

আশ্চর্য্য বোধ হয় রবীন্দ্রনাথও অতি বাল্যবয়সে (১৪?) কালী সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখেছিলেন।

(১২) ডগ্‌মাটিজম্ না করে মনকে খোলা এবং জানা-অজানার মাঝখানেই যে সত্য পন্থা এর উৎকৃষ্ট প্রকাশ কেনোপনিষদে:—

"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥"

'আমি এইরূপ মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি; অর্থাৎ 'জানি না' ইহাও মনে করি না, এবং 'জানি' ইহাও মনে করি না। 'জানি না যে তাহাও নহে এবং জানি যে তাহাও নহে'—আমাদের মধ্যে যিনি এই বচনটির মর্ম জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন।'—গম্ভীরানন্দ

চতুর্থ পাদটীকা পুনরায় দ্রষ্টব্য।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম সকলেই বাঙালী সমাজে সমান অংশীদার। এঁদের ধর্মাচরণ যা-ই হোক না কেন, সমাজে তাঁরা মেলা-মেশা করেছেন অবাধে। একবার ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে এই সহজ মেলা-মেশা না থাকলে খৃষ্টান মাইকেল, মুসলমান মুশরফ হুসেন, নজরুল ইসলাম এবং জসীমউদ্দীন বাঙলা কাব্যে খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন না। সমঝদার এবং রসিক জনের গুণগ্রাহিতা ও উৎসাহ লাভ না করে কম কবিই এ-সংসারে সার্থক কাব্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এবং এঁদের সকলেরই উৎসাহী পাঠক এবং গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন প্রধান হিন্দুরাই।১৩

আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যে কোনো মতবৈষম্যের ফলে যদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় একই সমাজের ভিতর অন্তরঙ্গভাব বর্জন করেন তবে সেই অখণ্ড, সমগ্র সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি—'মহতী বিনষ্টি' হয়। এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে সে যুগে কয় জন গুণী সচেতন ছিলেন? মুসলমান সাকার মানে না, কিন্তু তাই বলে তো সে যুগে বাঙালী সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ক্ষুণ্ণ হয়নি? তবে কেন ঐ কারণেই, ব্রাহ্মে-হিন্দুতে সামাজিক অন্তরঙ্গ গতিবিধি বন্ধ হবে?

পরমহংসদেব এই বিরোধ নির্মূল করতে চেয়েছিলেন বলেই সাকার-নিরাকারের অর্থহীন, অপ্রিয় আলোচনা বর্জন করেননি। তাই বার বার দেখি তিনি আপন হিন্দু ভক্তবৃন্দ নিয়েই সন্তুষ্ট নন। বার বার দেখি, তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, বিজয় কোথায়, শিবনাথ যে বলেছিল আসবে, বলছেন কেশব আমার বড় প্রিয়। অথচ তিনি তো ব্রাহ্ম ভক্তদের 'কালী-কাল্টে কনভার্ট' করার জন্য কিছুমাত্র ব্যগ্র নন। তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছিলেন, এদের বিরোধ যেন লোপ পায়।১৪

আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, এই দ্বন্দ্ব অপসারণের অদ্বিতীয় কৃতিত্ব পরমহংসদেবের।

সামাজিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে এতখানি সচেতন পুরুষ যে তার অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে অচেতন থাকবেন এ কখনই হতে পারে না। পক্ষান্তরে, আবার অন্য সত্যও সর্বজনবিদিত—(কামিনী-কাঞ্চনে) পরমহংসের তীব্র বৈরাগ্য। তার থেকেই ধরে নিতে পারি, অর্থসমস্যা আপন সত্তায় (perse) তাঁর সামনে উপস্থিত হয়নি। যারা মুখ্যতঃ অর্থ কামনা করে, রামকৃষ্ণদেব তো তাদের উপদেষ্টা নন। যাঁরা মুখ্যতঃ ধর্মজিজ্ঞাসু অথচ অর্থসমস্যায় কাতর, তিনি তাঁদের সে দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সমূহ সচেতন ছিলেন। কাজেই পরোক্ষ ভাবে তিনি সমাজের অর্থনৈতিক প্রশ্নেরও সমাধান দিয়েছেন। যে যতখানি কাজে লাগাতে পেরেছে সে ততখানি উপকার পেয়েছে।

রামকৃষ্ণদেব বহু বার বলেছেন, 'কলিকালে মানবের অন্নগতপ্রাণ!' এর অর্থ আর কিছুই নয়—এর সরল অর্থ, ইংরেজের শোষণনীতির শোচনীয় পরিণাম বাঙালীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে! অন্নাভাবে সে তখন এমনই কাতর যে অন্য কোনো চিন্তার স্থান আর তার মস্তকে নাই! তবু যাঁরা ধর্মে অনুরক্ত তাঁরা বার বার পরমহংসদেবকে প্রশ্ন করেছেন, 'উপায় কি?'

পূর্বেই বলেছি তিনি ছিলেন বেদান্তবাদী। তা হলে তাঁর কাছ থেকে উত্তর প্রত্যাশা করতে পারি যে জগৎ মায়া-মিথ্যা অনুমিত হলেই অর্থের প্রয়োজন আপনার থেকেই ঘুচে যাবে। কিন্তু তিনি বলেছেন, পাখীর মত দাসীর মত সংসারের কাজ করে যাবে, কিন্তু মন পড়ে রইবে ভগবানের পায়ের তলায়! অর্থাৎ কলিযুগে সমাজের সে স্বচ্ছলতা নেই যে, তোমাকে অন্ন জোটাবে আর তুমি নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞানমার্গে আপন মুক্তির সন্ধান পাবে। কলির মানুষের কর্ম থেকে মুক্তি নেই।

ওদিকে যে সব ব্রাহ্ম ভক্তের অর্থাভাব ছিল না, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানের তপস্বী তাঁদের বার বার বলেছেন, ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে ডাকো। কলিযুগে ভক্তি ভিন্ন গতি নেই।

আর সকলকেই এ-কথা বলেছেন, এই জন্যেই যারা সাধনার সবশেষ স্তরে পৌঁছতে চায়—রাখাল, নরেন্দ্রর মত যারা জন্মাবধি জীবন্মুক্ত তাদের ক'জন বাদ দিলে আর ক'টি প্রাণী সে স্তরে পৌঁছতে পারবে সে বিষয়ে তাঁর মনে গভীর সন্দেহ ছিল—তাদের হতে হবে নিরঙ্কুশ জ্ঞানমার্গের সাধক। শুদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, ব্রহ্ম ভিন্ন নিত্যবস্তু কিছুই নেই।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সমগ্র ভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমার নেই। এ-কথা স্বীকার করেও যদি দম্ভভরে কিছু বলি, তবে বলবো, যে সাধক গীতোক্ত কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয় করতে পেরেছেন তিনি সমগ্র পুরুষ, পরম পুরুষ। কোনো মহাপুরুষকে যদি দম্ভভরে যাচাই করতে চাই, তবে এই তিনটির সমন্বয়েই সন্ধান করবো। তার কারণ গীতাতে এই তিন পন্থা উল্লিখিত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত অন্য কোনো চতুর্থ পন্থা আবিষ্কৃত হয়নি। এ তিন পন্থার সমন্বয়কারী শ্রীকৃষ্ণের সহচর। তাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ।

* * * *

যে পাঠক ধৈর্য্য সহকারে আমার প্রগল্‌ভতা এতক্ষণ ধরে শুনলেন তিনি কৌতূহল বশতঃ স্বতঃই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন, 'এ তো হল মানুষের সংসর্গে আগত সমাজে সমুজ্জ্বল রামকৃষ্ণদেব। কিন্তু যেখানে তিনি একা—তাঁর সাধনার লোকে তিনি কতখানি উঠতে পেরেছিলেন? সোজা বাঙলায়, তিনি কি ভগবানকে সাক্ষাৎ দেখতে পেয়েছিলেন?'

এর উত্তরে বলবো, 'মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, এই প্রশ্নের উত্তর দেবার অধিকার আমাদের কারোরই নেই। এ প্রশ্নের উত্তর জ্ঞান-বুদ্ধির অগম্য! রামকৃষ্ণের সমকক্ষ জনই এর উত্তর দিতে পারেন।'

রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছনর পরও

---

(১৩) পূর্ববর্তী যুগে পরাগল, ছুটি খাঁর মত মুসলমান গুণগ্রাহী ছিলেন বলেই হিন্দুরা মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন; পরবর্তী যুগে হিন্দু সমঝদার ছিলেন বলেই সৈয়দ মরতুজা প্রমুখ বহুতর মুসলমান বৈষ্ণব-পদাবলী রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবিগণ সম্বন্ধে অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

(১৪) এ বিষয়ে পরমহংসদেব কতখানি 'নাছোড়বান্দা' ছিলেন তার সব চেয়ে ভালো উদাহরণ অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাবেন, অনিল গুপ্ত সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ ভাগে। পাঠক তখন 'নাছোড়বান্দার' [illegible] নিঃসন্দেহ হবেন।

ইচ্ছার স্রোত

(অপ্রকাশিত)

শিবনাথ শাস্ত্রী

তোমার ইচ্ছার স্রোত, জগতে যেতেছে বয়ে,
সে স্রোতে যে, গা ভাসায়, সেই যায় পার হয়ে।
ওই স্রোত নর-নারী, রেখেছে সবারে ঘিরে,
রাখে নাশে, পালে ত্রাসে, ডোবায় সুস্নিগ্ধ নীরে ;
ওই স্রোত দিবা-রাতি, জড়-জীব নাহি জানে,
স্তুতি, নিন্দা, কাম, ক্রোধ, রাজা-প্রজা নাহি মানে ;
জড়-রাজ্যে ওই প্রেম, দুর্জ্জয় শকতি ধরে,
লীলা, হেলা, খেলা করে, কোটি যুগ-যুগান্তরে ;
তুঙ্গ-শৃঙ্গ-গিরি গড়ে, ভাঙ্গে তারে ভূকম্পনে,
সাগরে নগর গড়ে, ভাঙ্গে তারে পরক্ষণে ;
ওই স্রোত নরে দেখে, ক্রীড়ার পুতুলি প্রায়,
পুণ্যে রাখে, পাপে নাশে, মুখ পানে নাহি চায় ;
নরের চাতুরী যত, মাকড়সার জাল সম,
ছিঁড়িয়া ভাসায়ে লয়, নাহি মানে শত শ্রম ;
নিম পুতে, আম খেতে, যে জন প্রয়াসী হয়,
ওই প্রেম, তার মুখে, লবণাম্বু পুরে লয়,
কাজে পাপী, মুখে সাধু, যে জন হইতে চায়,
স্রোত তার, আশা দুর্গ, ভাসায়ে লইয়া যায় ;
সবলতা, দুর্ব্বলতা, উঠা আর পড়া হয়,
কি ভাবে, দিয়েছ ফাঁকি, লোকে তারে চিনে লয় ;

সে ভাবে সৌরভে পুরি, আশে-পাশে আছে যারা,
রাখ রাখ বলে নাকে, কাপড় দিতেছে তারা ;
ওই নদী যথা কাষ্ঠ, আনিয়া চড়াতে ফেলে,
সদর্পে বহিয়া যায়, সেই কাষ্ঠে অবহেলে ;
তেমনিও ইচ্ছাস্রোত, সে জনে দুর্ব্বল করি,
জীবন-বালুকা পার্শ্বে, ফেলে যায় পরিহরি ;
তাই বলি হ'তে চাহ, নাহি চাহ দেখাবারে,
অদৃশ্য মাপের কাঠি, মাপিতেছে যে তোমারে ;
নিজ হাতে পাঁচ হাত, ভেবে কেন ভুলে রও,
সে কঠিন মাপে তুমি, দু' হাতের অধিক নও।
যখন সে ভাবে আমি, সিংহ সম বল ধরি,
তখন পাপের স্মৃতি, দেয় তারে কাবু করি ;
আছে সব, কিছু নাই বল বুদ্ধি অন্তর্দ্ধান,
মুখ কুকুরের মত সাহসেতে হীন-প্রাণ ;
পদে পদে এই শিক্ষা, এ জীবনটা আর কার,
রাখে থাকি দিলে পাই, পাপের নাহি নিস্তার ;
তুমি গো ঘিরিয়া আছ, তুমি গো জাগিয়া রও,
পাপেতে ফেরাও মুখ, পুণ্যে কোলে তুলে লও ;
জানি না বুঝি না সব চিনি না নিকট দূর,
ঐ স্রোতে গা ভাসাই, লও মোরে ব্রহ্মপুর।

(কটক, ১৯০৭ ১৪ই নভেম্বর)

কোনো কোনো মানুষ লোক-হিতার্থে এ সংসারে ফিরে আসেন। যেমন নারদ শুকদেবাদি।' এ কথা ভুললে চলবে না।

স্পষ্টত দেখতে পাচ্ছি, এ-কথাটি স্বামী বিবেকানন্দের মনে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল। লোক-হিতার্থে তিনি যে বিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন নির্মাণ করে যান এ রকম সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান প্রভু তথাগতের পর এ যাবৎ কেউ নির্মাণ করেননি।

* * * *

এইবারে শেষ প্রশ্ন দিয়ে প্রথম প্রশ্নে ফিরে যাই।

পরমহংসদেব গীতার তিন মার্গের সমন্বয় করেছিলেন। প্রকৃত হিন্দু সেই চেষ্টাই করবে। কিন্তু তিনি যে ধুতিখানাকে লুঙ্গীর মত পরে আল্লা আল্লাও করছিলেন এবং আপন ঘরে টাঙানো খৃষ্টের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতেন সে-কথাও তো জানি। এ সবের প্রতি তাঁর অনুরাগ এল কোথা থেকে? বিশেষত: যখন একাধিক বার বলা হয়েছে, অ-হিন্দু মার্গে চলবার সময় পরমহংসদেব কায়মনবাক্যে সেই মার্গকেই বিশ্বাস করতেন।

অনেকের বিশ্বাস চতুর্বেদে, বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস অর্থাৎ পলিথেইজমের বর্ণনা আছে। কিন্তু ম্যাক্সমূলার দেখিয়েছেন ঋগ্বেদের ঋষি যখন ইন্দ্রস্তুতি গাহেন তখন তিনি বলেন, 'হে ইন্দ্র, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই বরুণ, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব।'

আবার যখন বরুণমন্ত্র শুনি, তখন সেটিতেও তাই,—'হে বরুণ, তুমি বরুণ, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব।' অর্থাৎ ঋষি যখন যে দেবতাকে স্মরণ করেছেন তখন তিনিই তাঁর কাছে পরমেশ্বররূপে দেখা দিয়েছেন। এ সাধনা বহু ঈশ্বরবাদের নয়। এর সন্ধান অন্য দেশে পাওয়া যায় না বলে ম্যাক্সমূলার এর নূতন নাম করেছিলেন 'হেনোথেয়িজম'।

পরমহংসদেব বেদোক্ত এই পথই বরণ করেছিলেন অর্থাৎ সনাতন আর্যধর্মের প্রাচীনতম শ্রুতিসম্মত পন্থা বরণ করেছিলেন। তিনি যখন বেদান্তবাদী তখন বেদান্তই সব কিছু, আবার যখন আল্লা আল্লা করেছেন তখন আল্লাই পরমাত্মা।

এই করেই তিনি সর্বধর্মের রসাস্বাদন করে সর্বধর্ম-সমন্বয় করতে পেরেছিলেন।

কোনো বিশেষ শাস্ত্রকে সর্বশেষ, অভ্রান্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্র বলে স্বীকার করে তিনি অন্য সব-কিছুর অবহেলা করেননি।

অনেকের বিশ্বাস, হিন্দু আপন ধর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট, অন্য ধর্মের সন্ধান সে করে না।

বহু শতাব্দীর বিজয়-অভিযান ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে এ যুগের হিন্দু সম্বন্ধে এ কথা হয়ত খাটে। তাই পরমহংসদেব আপন জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, সনাতন আর্যধর্ম এ পন্থা কখনো গ্রাহ্য করেনি।

সত্য সর্বত্র বিরাজমান, ঋগ্বেদের এই বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণে তারই প্রতিধ্বনি। সর্বত্র এর অনুসন্ধানে সচেতন থাকলে বাঙালী পরমহংসের অনুকরণ করে ধন্য হবে। বাকিটুকু দয়াময়ের হাতে।

আমি সুরেশচন্দ্রকে যেমন জানি

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের সুহৃদ ও বহু দিন পর্য্যন্ত একই ভাবের ভাবুক পরাণদা'র—যিনি লোকসমাজে সুরেশচন্দ্র মজুমদার নামেই সমধিক পরিচিত—বিষয়ে আমি যেমন ভাবে জানি সেই কথা লিখিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করিতেছি। তাঁর সঙ্গে একান্ত ঘরোয়া ভাবে যে পরিচয় তাহা এমনই আপন বন্ধুগোষ্ঠীগত যাহার সম্পর্কে সাধারণ পাঠক-সমাজের তেমন কৌতূহল নাই। কিন্তু সেই গুলিই আমাদের স্মৃতিকোঠার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইয়া আছে। সেই গুলিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া স্মৃতিতর্পণ আমার নিকট বহুলাংশে নিরর্থক হইলেও পাঠক-সমাজ সুরেশ বাবুর সম্পর্কে যাহা জানিতে আগ্রহান্বিত তাহাই অল্প কথায় বলিবার প্রয়াস পাইব।

সুরেশ বাবুর বাল্য ও কৈশোর সম্পর্কে আমাদের কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই, তবে তাঁর ও তাঁর সে যুগের সহচরদিগের নিকট হইতে যাহা জানিয়াছি সে যুগ সম্বন্ধে তাহাই আমার অবলম্বন। তাঁর পিতার কর্ম্মস্থল কৃষ্ণনগরেই তাঁর এই যুগ অতিবাহিত হয়। তিনি ছিলেন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, তাঁহার পিতা নদীয়া জেলা-বোর্ডের পূর্ত্ত বিভাগে একজন কর্ম্মচারী ছিলেন এবং এই সূত্রেই জেলা-বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার দ্বারকানাথ সরকারের পরিবারের সঙ্গে মজুমদার-পরিবারের অন্তরঙ্গতা জন্মে। কৈশোরে পরাণদা' বলিষ্ঠ-দেহী কর্ম্মঠ যুবক ছিলেন এবং ফুটবল খেলোয়াড়রূপে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। এই ফুটবল খেলার মাঠেই তাঁহার দৈহিক ক্ষিপ্রতা ও বলিষ্ঠ খেলোয়াড়ি মনোভাব বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনিই এই তরুণটিকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। যতীন্দ্রনাথের অস্ত্রভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিতে সুরেশচন্দ্র পিতার মুরুব্বি ও বন্ধু দ্বারকানাথের জামাতা পূর্ণচন্দ্র মৌলিকের একটি রিভলবার চুরি করিয়া যতীন্দ্রনাথকে প্রদান করেন। বিচার ও শাসন-বিভাগের পদস্থ কর্ম্মচারী পূর্ণ বাবুর অবসর যাপন কালে কৃষ্ণনগরে এইরূপে আগ্নেয়াস্ত্র হারাইয়া যাওয়াতে পুলিশ হইতে জোর তদন্ত চলে কিন্তু তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পরে হাইকোর্টে গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্ম্মচারী শামশুল আলামকে বীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত-গুপ্ত নামক যতীন্দ্রনাথের এক বিপ্লবী শিষ্য হত্যা করিয়া ধৃত হয়। হত্যাকারীর নিকট যে আগ্নেয়াস্ত্রটি পাওয়া যায়, তাহা পূর্ণ বাবুর বলিয়া সনাক্ত হয়। এই সময়ে ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে নাত্ড়া গ্রামে এক রাজনৈতিক ডাকাইতি সম্পর্কে ললিত চক্রবর্ত্তী নামক একজন যুবক ধৃত হইয়া পুলিশের নিকট যে স্বীকারোক্তি করে, তাহাতে যতীন্দ্রনাথের পরিচালনায় একটি বিরাট বিপ্লব আয়োজনের কথা প্রকাশ পায়, ও পুলিশ এ সম্পর্কে হাওড়া ষড়যন্ত্রের মামলা নামে খ্যাত একটি রাজনৈতিক মামলা দায়ের করে; এই মামলার প্রধান আসামী ছিলেন যতীন্দ্রনাথ এবং সুরেশচন্দ্র ছিলেন আসামীদের মধ্যে অন্যতম। কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর মামলা চলার পর প্রমাণাভাবে মামলা ফাঁসিয়া যায়। এক মহা বিপদ হইতে সুরেশচন্দ্র মুক্তিলাভ করিলেন বটে কিন্তু বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে বৃহত্তর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। তিনি বিচারাধীন কয়েদী থাকা কালেই তাঁহার পিতা লোকান্তরিত হন। পিতা জীবনে যাহা কিছু সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন তাহা কলিকাতায় বাটী নির্ম্মাণের জন্য এক নিকট-আত্মীয়ের নিকট গচ্ছিত রাখিতেন, তিনি সেই ধন সংরক্ষণের বিষয় সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন; কাজে-কাজেই বিধবা মাতা ও দুই ভগিনী সহ সুরেশচন্দ্র অকূল-পাথারে ভাসিলেন। এ বিপদের সময় সম্পূর্ণ অনাত্মীয় হইলেও পরমাত্মীয়ের ন্যায় দ্বারিক বাবু নিজ গৃহে সুরেশচন্দ্রের পরিবারকে আশ্রয় দিলেন ও সুরেশচন্দ্রকে ভাগ্যান্বেষণ করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ করিয়া দিবার মানসে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিশোরীলাল সরকারের নিকট কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

সহায়-সম্পদহীন, মাত্র এন্ট্রান্স পরীক্ষোত্তীর্ণ এক তরুণের পক্ষে কলিকাতা নগরীতে অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু ভাগ্যক্রমে এখানে সুরেশচন্দ্রের যে আশ্রয় মিলিল, তাহার ফলে তাঁহার সৌভাগ্যোদয়ের প্রথম সোপান রচিত হইয়া গেল।

কিশোরীলালের কন্যা সরলাবালা সদ্য-বিধবা হইয়া একমাত্র কন্যা নির্ঝরিণীকে লইয়া ভ্রাতা ডাক্তার সরসীলাল সরকারের কলিকাতাস্থ বাটীতে তখন অবস্থান করিতেন; ভ্রাতা সরসী বাবু সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকায় বাহিরেই থাকিতেন। কিশোরী বাবু সরলাবালার আশ্রয়েই সুরেশচন্দ্রের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সে যুগে সরকারের সন্দেহ ভাজন কোনও ব্যক্তির পক্ষে আত্মীয়-স্বজনের গৃহেও স্থান পাওয়া কঠিন ছিল, সে ক্ষেত্রে পিতার অনুরোধে সুরেশচন্দ্রকে আশ্রয়দান ও মাতৃবৎ স্নেহে তাঁহাকে গ্রহণ করা কম সাহসের পরিচায়ক নহে। সুরেশচন্দ্রও আজীবন এই স্নেহের ঋণকে স্বীকার পাইয়া যথাসাধ্য প্রতিদানের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। দুইটি অজানা লোকের মধ্যে এই ভাবে যে নিগূঢ় আত্মীয়তা-বোধ জাগিয়া উঠে, চিরদিনই তাহা অম্লান ছিল।

কিন্তু আশ্রয়লাভেই সকল সমস্যার সমাধান হয় না। অর্থোপার্জ্জনের উপায় আবিষ্কার করা তো অতি দুরূহ ব্যাপার! কিশোরীলালের চেষ্টায় তাঁহার শ্যালকপুত্র মৃণালকান্তি ঘোষ সুরেশচন্দ্রের মুরুব্বি হইয়া উঠিলেন এবং মৃণাল বাবুই সুরেশচন্দ্রকে জীবনের উপায়স্বরূপ যে পথের নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন সেই পথে চলাতেই উত্তরকালে সুরেশচন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন। মৃণাল বাবু সুরেশচন্দ্রকে মুদ্রণ-শিল্পকেই বৃত্তিরূপে গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন এবং এজন্য হাতে-কলমে কাজ শিখিয়া লইতে তাঁহারই সুপারিশ ক্রমে অমৃতবাজার পত্রিকার মুদ্রণকার্য্যে অন্যতম প্রধান মাল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এরাসমাস জোন্স অ্যাণ্ড কোম্পানীর

(Erasmus Jonse & Co) ছাপাখানায় শিক্ষানবিশ কম্পোজিটার হইয়া প্রবেশ করেন। মেধাবী এই যুবকের কর্ম্ম-দক্ষতা, তৎপরতা ও নিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া জোন্স কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ সুরেশকে একে একে মুদ্রণশিল্প সংক্রান্ত সকল কর্ম্মেই শিক্ষা দিয়া নিপুণ মুদ্রণশিল্পী করিয়া তুলিলেন। এই চাকুরির ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং তাহার আয়ে কোনও দিন স্বচ্ছল অবস্থায় সংসার পরিচালন সুবিধার হইবে না বুঝিয়া মৃণাল বাবু সুরেশচন্দ্রকে নিজস্ব একটি ছাপাখানা স্থাপনের মতলব দিলেন এবং পুরাতন ছাপার প্রেস কিনিয়া ছোটখাটো একটি ছাপাখানা করিবার জন্য কিছু টাকা দিলেন, এই সর্ত্তে যে, তিনি লভ্যাংশের অর্দ্ধেক অংশীদার হইবেন। এই ভাবে আপার সারকুলার রোডে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস স্থাপিত ও সুরেশচন্দ্রের ব্যবসায় জীবনের আরম্ভ হয়। শ্যামবাজার অঞ্চলে ছাপাখানার কাজ তখন প্রচুর ছিল না, সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের আরম্ভের সময় উহা ব্যবসায় হিসাবে তেমন সুবিধার হয় নাই।

মাখনলাল সেন এই সময়ে কলেজ স্কোয়ারে (বর্ত্তমানে বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট) একটি গৃহ ভাড়া লইয়া তাঁহার কয়েকটি বিপ্লবী অনুচরকে লইয়া একটি মেস গড়িয়া বাস করিতেছিলেন। এ বাটীর নীচের তলা তাঁহাদের কোনও প্রয়োজনে লাগিত না। পুস্তক-প্রকাশক বহুল এই অঞ্চলে তাহাদের একান্ত সান্নিধ্যে এই বাড়ীর এক তলায় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস উঠাইয়া আনিলে ছাপাখানার কাজ পাওয়ার সুবিধা হইবে, এই কথা মাখন বাবু সুরেশ বাবুকে বলিলে উহার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুরেশচন্দ্র কলেজ স্কোয়ারে ছাপাখানা তুলিয়া আনিলেন। ইহার পর হইতেই সুরেশ বাবুর ভাগ্যোদয়ের সূত্রপাত হয়। তিনি মুদ্রণশিল্পে হাতে-কলমে কাজ শিখিয়া যে দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি যে মুদ্রণ-পারিপাট্য দেখাইতে সমর্থ হন, তাহার ফলে পুস্তক প্রকাশকদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে কাজ দিতে লাগিলেন। এরূপে কিছু দিন চলার পর প্রখর ব্যবসায়ী-বুদ্ধি সুরেশচন্দ্রকে এক অভিনব পথে যাত্রা করিতে উদ্বোধিত করে, তাহা হইল এই যে, দেশীয় ছাপাখানায় লাইনো টাইপ যন্ত্র প্রবর্ত্তন। এত দিন পর্য্যন্ত কলিকাতায় প্রধানতঃ ইউরোপীয়গণ পরিচালিত মুদ্রণালয়েই লাইনো যন্ত্র ব্যবহৃত হইত, সুরেশচন্দ্র এই যন্ত্র বসাইবার পর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত পুস্তকগুলির শ্রী-সৌন্দর্য্য এত বাড়িয়া গেল যে, ঐ মুদ্রণালয় কলিকাতার শ্রেষ্ঠ মুদ্রাযন্ত্রগুলির সমপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া পরিচিত হইল এবং সুরেশচন্দ্র যে একজন মাষ্টার প্রিণ্টার অর্থাৎ অতি দক্ষ মুদ্রণশিল্পী, তাহা স্বীকৃত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ মুদ্রণালয় যখন এইরূপ উন্নতির পথে তখন ইহার ঘুমন্ত অংশীদার মৃণাল বাবু অংশীদারিত্ব ত্যাগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, সুরেশচন্দ্রকে আবার এক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। এত দিন পর্য্যন্ত এই ব্যবসায়ে যাহা আয় হইয়াছে, তাহা হইতে সামান্য কিছু নিজ সংসারের জন্য লইয়া তিনি প্রেসেরই প্রসার সাধন করিয়া আসিয়াছেন, কাজে কাজেই হাতে নগদ কিছু ছিল না—থাকিবার কথাও নহে। কিন্তু প্রেসের সম্পত্তি এই সময়ে বাহাত্তর হাজার টাকা নিরূপিত হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধাংশ ছত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া যাইবে কোথা হইতে?

এই দুঃসময়ে সুরেশচন্দ্রের অন্যতম সুহৃদ ও বহু বিপদ মুহূর্ত্তে বহু বারের সহায়ক গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (গণেন ব্রহ্মচারী নামে প্রখ্যাত) চল্লিশ সহস্র মুদ্রা অতি সহজশোধ্য উপায়ে ঋণ দান করেন এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানে তৎকালে পরিচালিত রামকৃষ্ণ সংঘের পুস্তকাবলী বিশেষতঃ বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী এই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রণের জন্য দিয়া ঋণ শোধ করিতে সাহায্য করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের ন্যায় খ্যাতিসম্পন্ন সুবৃহৎ ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধনই যদি সুরেশচন্দ্রের জীবনের একমাত্র কৃতিত্ব হইত, তাহা হইলেও ব্যবসায়-জগতে একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন বাঙ্গালী হিসাবে সুরেশচন্দ্র স্মরণীয় হইয়া থাকিতেন, কিন্তু এইখানেই সুরেশচন্দ্রের প্রতিভা নিঃশেষিত হয় নাই। মুদ্রণ-শিল্প-জগতে তাঁহার মৌলিক আবিষ্কার তাঁহাকে একজন উচ্চশ্রেণীর উদ্ভাবক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম পরিচালকরূপে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রচারাধিক্য বজায় রাখিতে, ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার সহিত সমান তালে চলিতে ও উহার বৃদ্ধি সাধন করিতে হইলে রোটারী যন্ত্র ছাড়া উপায় নাই এবং রোটারী যন্ত্র বসাইবার পরই এক নূতন সমস্যা উহার পরিচালনের অন্তরায় হইয়া উঠিল। দেখা গেল যে, লাইনো টাইপের নিত্য-নূতন অক্ষর ব্যতীত পুরাতন প্রথার অক্ষরের দ্বারা রোটারীর কাজ চালাইতে হইলে চাপে যে পরিমাণ টাইপ ভাঙ্গে তাহাতে যে ব্যয় হয় তাহা সহ্য করিয়া পত্রিকা পরিচালন প্রায় অসম্ভব। কিন্তু বাঙ্গালা হরফ নির্মিত করিবার লাইনো যন্ত্র তখন পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই—বাঙ্গালা অক্ষরের সংখ্যাধিক্যই উহার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়; এতগুলি অক্ষরের স্থান সঙ্কুলান কিবোর্ডের পক্ষে সম্ভব নহে। সুরেশচন্দ্র অক্ষরের সংখ্যা কমাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন ও শ্রীযুক্ত বাবু রাজশেখর বসুর সহায়তায় অল্পদিনেই প্রচলিত অক্ষর ছাঁদের কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া এবং কতকগুলি অক্ষরের অর্দ্ধাংশের সাহায্যে যুক্তাক্ষর সৃষ্টির নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া তিনি অক্ষরের সংখ্যা এমন কম করিতে সমর্থ হইলেন যে, কিবোর্ডে উহার স্থান সঙ্কুলান সম্ভব হইল। কিন্তু অক্ষর স্থাপন করিতে হইলে ভাষার প্রতি অক্ষরের ব্যবহারের অনুপাত জানা প্রয়োজন; বাঙ্গালা অক্ষরের এই অনুপাত (word frequency) জানা ছিল না। সুরেশচন্দ্র আনন্দবাজার পত্রিকার ফাইল লইয়া বহু পরিশ্রম করিয়া সংবাদপত্রের পক্ষে উপযোগী এই আনুপাতিক হার বাহির করিয়া কিবোর্ড দ্রুত লাইন প্রস্তুতের উপযোগী করিয়া তুলিতে সমর্থ হইলেন। লাইনো টাইপ প্রস্তুতকারী কোম্পানী সুরেশচন্দ্রের এই নব উদ্ভাবনকে গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা অক্ষর-মুদ্রণের উপযোগী লাইনো যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ফলে যেমন দ্রুত কম্পোজ করা সম্ভব হইল, তেমনই অল্প পরিসরে অধিক অক্ষর-সমাবেশ সম্ভব হওয়াতে সংবাদপত্রের পূর্ব্ব পরিসরেই অধিক সংবাদ দেওয়া সম্ভব হইল এবং টাইপ ক্ষয় হইতেও রেহাই পাওয়া গেল। আজ-কাল বাঙ্গালা ভাষায় পরিচালিত অনেকগুলি দৈনিকই লাইনো যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে। সুরেশচন্দ্রের আবিষ্কারেই উহা সম্ভবপর হইয়াছে। সুরেশচন্দ্রের উদ্ভাবিত এই পদ্ধতির সামান্য রদবদল করিয়া সুরেশচন্দ্র তাহাকে টাইপ রাইটারের উপযোগী করিয়াছেন এবং রেমিংটন কোম্পানী সেই পদ্ধতিতে

টাইপ রাইটার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নততর ও দ্রুত-মুদ্রণক্ষম বাঙ্গালা টাইপ রাইটার নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

এই উদ্ভাবনী প্রতিভার জন্য সুরেশচন্দ্রের নাম মুদ্রণজগতে অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা ও উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য দুইটি পত্রিকা "দেশ" ও "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" সুরেশচন্দ্র অগ্রণী না হইলে ঐগুলির সৃষ্টি সম্ভব হইত না, একথা সত্য কিন্তু উহার বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সুরেশচন্দ্রের অবদান অপেক্ষা প্রথম যুগের কর্ম্মীদের মধ্যে মাখনলাল সেন, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, অমলাচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি কর্ম্মীদের শ্রম, বুদ্ধি ও ত্যাগের ফলেই যে উহা সম্ভব হইয়াছে, একথা স্বীকার না করিলে সত্যের অপলাপ হয়। ঘটনাচক্রে যখন ইঁহাদের সঙ্গে আনন্দবাজার সংস্থার সম্পর্ক ছিন্ন হয় তখন দক্ষহস্তে পরিচালন ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সক্ষম হইয়া সুরেশচন্দ্র সাংবাদিক-জগতে নিজস্ব প্রতিষ্ঠা সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ব্যবসায়ী, উদ্ভাবক ও দক্ষ পরিচালক হিসাবে সুরেশচন্দ্রের পরিচয় দেশবাসী শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ রাখিবে কিন্তু মানুষ সুরেশচন্দ্রের স্মৃতি আমাদের নিকট আরও উজ্জ্বল। জীবনযাত্রার পথে তিনি যাঁহাদের নিকট বিন্দুমাত্র সাহায্য পাইয়াছিলেন, বিত্তশালী ও প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াও তাঁহাদের তিনি ভোলেন নাই।

যখন তিনি বিত্তশালী হন নাই, তখনও রাজনীতি ক্ষেত্রে যে সমস্ত সহকর্মী দুঃস্থ হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদের জন্য সাধ্যমত এবং সময়-বিশেষে সাধ্যাতীত সাহায্য করিয়াছেন। অনেক রাজনৈতিক কর্ম্মীর কর্ম্মসংস্থান করিয়া দিয়া তাঁহাদের জীবনযাত্রার উপায় করিয়া দিয়াছেন। অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের তিনি ছিলেন দরদী বন্ধু।

মানুষ মাত্রেই অপূর্ণ। সুরেশচন্দ্রের যে কোনও দোষ-ত্রুটি ছিল না, তাহা নহে। উহার আলোচনার সময় ও ক্ষেত্র ইহা নহে। তবে এ কথা একান্ত সত্য যে, তাঁহার দোষ ত্রুটি অপেক্ষা গুণ ছিল অনেক বেশী। আমাদের সঙ্গে তাঁহার গুরুতর মতবিরোধ ঘটিয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা মনান্তরে পর্য্যবসিত হইতে দেন নাই। একত্রে কর্ম্ম পরিচালনে রত থাকা আমাদের কাহারও কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই; কিন্তু তাহার জন্য হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন হয় নাই; পূর্ব্বের ন্যায় সপ্রেম ব্যবহার তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি। তাঁহার উদার ও বিশাল হৃদয়ের উহা অন্যতম পরিচয়। কর্ম্মযোগী সুরেশচন্দ্রের মহাপ্রয়াণও সাধনোচিত হইয়াছে। তাঁহার কর্ম্মজীবন যাঁহার কৃপায় সম্ভব হয়, সেই ভক্তিভূষণ মৃণালকান্তি ঘোষের সহধর্ম্মিণী কৃষ্ণবালা ঘোষের শ্রাদ্ধবাসরে শেষ শ্রদ্ধার তর্পণ প্রদান করিতে, বহু জনের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া যাওয়াই তাঁহার মৃত্যুরও নৈমিত্তিক কারণ হইল। জন্ম ও মৃত্যু যখন মানুষের আয়ত্তাধীন নহে, তখন কৃতজ্ঞ চিত্তের এই শেষ পরিচয় সুরেশচন্দ্রের চারিত্রিক বিশেষত্বের সহিত মিলাইয়াই ভাগ্যবিধাতার ইচ্ছায় ঘটিয়াছে। এই বিদায়ের ক্ষণে তাঁহার গুণাবলীকে স্মরণ করিয়া এইখানেই আমার শ্রদ্ধার তর্পণ শেষ করি।

ডার্মষ্টাডে কবির জন্মোৎসব

শ্রীবিমলেন্দু কয়াল

১৯২১ সালের ৩০শে এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ জেনেভায় উপস্থিত হন। ৩রা মে এক সম্মিলনীতে কবি বক্তৃতা করেন। এখান থেকে তিনি বেলে (Basle) যাত্রা করেন। এই স্থানে উপস্থিত হবার পূর্বে কবি লুজানে উপস্থিত হন। তখন তাঁর বয়স ৬১ বৎসর। সুতরাং এই স্থানেই তাঁর জন্মোৎসব সম্পন্ন করা হয়। দেশ-দেশান্তরের কবি, সাহিত্যিক ও মনীষিবৃন্দ এবং পুস্তক প্রকাশকগণ এই উপলক্ষে তাঁকে অভিনন্দিত করে পত্র লেখেন। জার্মাণীর ইম্পিরিয়াল রিপাবলিকের নিকট থেকেও এক পত্র আসে। তাঁরা শুধু শুভ অভিনন্দন দ্বারা ভারতের মহাকবির প্রতি তাঁদের কর্তব্য সমাপন করেন নাই। গেটের যুগ থেকে আরম্ভ করে জর্মাণ দর্শন, সাহিত্য কাব্য ইতিহাস ও বিজ্ঞানের বহু মূল্যবান গ্রন্থের একটি সংগ্রহমালা তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে উপঢৌকন দিবার প্রস্তাবও করেন। কবি ১০ই মে বেল থেকে এই পত্রের প্রত্যুত্তরে জানিয়েছিলেন, জর্মাণীরা ভারতের একজন কবিকে যে ভাবে অভিনন্দন করার বাসনা প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁরা যে ভারতের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, এই কথা প্রমাণিত হয়। তাকে ভারত ও পাশ্চাত্যের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনের ইংগিত বলে মনে হয়। এতে জর্মাণ জাতির আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এতদনুসারে জর্মাণ সরকারের প্রকাশ্য আমন্ত্রণে কবিগুরু ২০শে মে জর্মাণীর হামবুর্গ শহরে উপনীত হন। প্রিন্স অটো বিসমার্ক এখানে এসে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সেখান থেকে তিনি ডেনমার্ক ভ্রমণ শেষ করে আবার ২রা জুন জর্মাণীতে প্রত্যাবর্তন করেন। পরদিন বার্লিনে ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে গুরুদেব বলেছিলেন—"হে জর্মাণীর তরুণ-তরুণীগণ, আমি জানি তোমরা আমায় ভালবাস, তোমরা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমার দেশের তরুণ-তরুণীরাও আমায় অধিক ভালবাসে। আমি যে দেশে, যেখানে, যে সময়ে যুবকদের সঙ্গে মিলিত হই, সর্বদাই তাদের প্রীতির চক্ষে দেখি। আমি জানি, তরুণরাই সকল পুনর্গঠনের প্রধান সহায়।" সেখান থেকে মিউনিক এবং মিউনিক হতে কবি ডার্মষ্টাড-এ উপনীত হন। গ্রাণ্ড ডিউক হেস কবিকে তাঁর নিজস্ব মোটরে করে এখানে এনেছিলেন। এই স্থানে কবিগুরু এক সপ্তাহ অবস্থান করেন এবং বিপুল আড়ম্বরের সহিত এখানে তাঁর জন্মোৎসব ও কবি-সপ্তাহ পালন করা হয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনে ইহা এক যুগান্তকারী ঘটনা, ইহার পর পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়। বিভিন্ন সূত্র হতে সংগৃহীত সেই কাহিনী এখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা গেল।

ডার্মষ্টাডে রবীন্দ্রনাথ কাউণ্ট কাইজারলিঙের স্কুল অব উইসডমে (জ্ঞান-নিকেতনে) অতিথিরূপে ছিলেন। এই উপলক্ষে হাজার হাজার দর্শনপ্রার্থী জর্মাণীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে এখানে সমবেত হন। প্রতিদিন সকাল ৯টায় এবং বিকাল ৪ ঘটিকায় প্রশ্নোত্তর, পরের

উদ্যানে প্রকাণ্ড সভার অধিবেশন বসিত। কাউণ্ট কাইজারলিঙ কবিগুরুর পার্শ্বে উপবেশন করে কবির উত্তর-প্রত্যুত্তর জর্মাণ ভাষায় রূপান্তরিত করে দিতেন, দৈনন্দিন আলোচনার বিষয় বুলেটিন আকারে প্রত্যহ প্রকাশিত হত এবং সমস্ত জর্মাণীতে তাহা প্রচারিত করবার আয়োজন চলত। ১২ই জুন রবিবার এক বিশাল বনভোজনের আয়োজন হয়েছিল। ইহাতে প্রায় ৪ হাজার বিশিষ্ট দর্শকের সমারোহ হয়। হেসের গ্রাণ্ড ডিউক ও কাউণ্ট কাইজারলিঙের সমভিব্যাহারে রবীন্দ্রনাথ নিকটবর্তী এক শৈলশিখরে সমারোহ সহকারে উপনীত হয়েছিলেন, সেখানে নৃত্য-গীতাদির দ্বারা তাঁকে অভিনন্দন করা হয়। সমগ্র জর্মাণ জাতির পক্ষ হতে কবিকে এই ভাবে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

কাউণ্ট কাইজারলিঙের Der Weg Zur Vollendung নামক পত্রিকায় এক অলৌকিক সমাদরে কবিকে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা হয়। তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল—

"ওঁ! জ্ঞানের দেবতা গণেশের চরণে আমাদের পবিত্র প্রণস্তি···সূর্য্যাস্তের দেশে (জর্মাণী) ধর্মনগর নামে (ডার্মষ্টাড) এক শহর আছে। এখানে রবীন্দ্রনাথের সখা এক ক্ষত্রিয় বাস করেন। তিনি এক বিদ্যাভবন স্থাপন করেছেন। তিনি অর্থাৎ কবি তাঁর কাছেই এসেছেন।···প্রাচ্য থেকে যে ব্যক্তি এখানে শুভাগমন করেছেন, তিনি সেই অসীম অনন্তের জীবন্ত প্রতিমূর্তি···সহৃদয় ডিউক (হেস) তাঁকে তাঁর প্রাসাদে অতিথিরূপে রেখেছেন। প্রাচ্যের এই জ্যোতিমান্ সূর্য্যরশ্মি যাতে সকলে অবলোকন করতে পারেন, সেই জন্য প্রাসাদের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।"

অনেকে মনে করেন, ডার্মষ্টাডে কবিকে এই ভাবে সম্মানিত করার পশ্চাতে কাইজারলিঙ তথা জর্মাণীর একটা নিগূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। ইহার পশ্চাতে রাজনৈতিক বা অন্য কোনও প্রকারের উদ্দেশ্য থাকুক বা না থাকুক, এই ঘটনায় ভারতের মহাকবির প্রতি জর্মাণীর অসামান্য শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। ইংলণ্ডে ইতিপূর্বে কবির প্রতি যে ভাবে সমাদর করা হয়েছিল তার অপেক্ষা এই অভিনন্দনে আরও অন্তরঙ্গতা ও শ্রদ্ধার নিবিড়তা বিকসিত হয়ে উঠেছে।

ডার্মষ্টাডে যখন কবি-সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয় তখন সুবিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী ডাঃ মেঘনাদ সাহা বার্লিনে উপস্থিত ছিলেন। কবিকে জর্মাণ ভাষায় যে অভিনন্দন পত্র এই উপলক্ষে প্রদান করা হয় তিনি তাহার বিবরণ মডার্ণ রিভিউ পত্রের ১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত করেছেন। তাঁর মর্মকথার ভাবান্তর 'বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক গ্রন্থ হতে এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

ইউরোপের সুদূর প্রবাসে তাঁর ষাট বৎসর জন্মোৎসব সম্পাদন সময় উপস্থিত হওয়াতে তাঁর জর্মাণ বন্ধু ও অনুরাগিগণ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার এক উত্তম সুযোগ পেয়েছেন।

পৃথিবীর দুইটি মহাদেশ এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ করার আন্তরিক চেষ্টার জন্য জর্মাণরা রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সাম্যভাব, কবিতার সুমধুর সুর, ভাবের গভীরতা গাঙ্গেয় প্রদেশ ও ইউরোপের নর-নারীরা যেমন প্রবল অনুরাগের সঙ্গে শ্রবণ করছে, তা আর কোনও জীবিত কবির ভাগ্যে ঘটেনি। তাঁর বক্তৃতার গভীর ভাব ও ভগবৎ-তত্ত্বকথা জর্মাণরা হৃদয়ঙ্গম করেছেন। তাঁরা বিশ্ববাসীর সঙ্গে একযোগে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

জর্মাণ জাতির এমন দুর্দিনে, যখন মানব সভ্যতার বিষম পরীক্ষার সময় উপস্থিত, তখনও রবীন্দ্র-পূজারীর সংখ্যা এখানে নিতান্ত অল্প নয়। তাঁরা তাঁদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নীরবে ও অনাড়ম্বরে প্রদর্শন করার জন্য আগ্রহান্বিত।

রবীন্দ্রনাথ জর্মাণীতে এসে জর্মাণবাসীদের সঙ্গে পরিচিত হবেন, এই সংবাদ জেনে নিম্নলিখিত জর্মাণ সুধীগণ একটি রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা সমিতি গঠন করেছেন। জর্মাণীর বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও প্রকাশকগণের সহযোগে জর্মাণ পুস্তকের একটি সংগ্রহ করে এই সমিতি সক্ষম হয়েছেন। এই সংগ্রহমালা রবীন্দ্রনাথের প্রতি জর্মাণ জাতির ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রতীকরূপে কবির স্বদেশের শান্তিনিকেতন আশ্রমের গ্রন্থাগারে উপঢৌকন দিতে সুধীমণ্ডলী মনস্থ করেছেন।

এই সামান্য উপহার জর্মাণবাসীর ওই শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি শ্রদ্ধারই নিদর্শন। এই সংগ্রহ ভারতের সাংস্কৃতিক বিদ্যা ও পুস্তকেরই আদরের চিহ্ন, বিশ্বের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে জর্মাণীর অবদানের নিদর্শন এই পুস্তকাবলী।

এই উপহারের অন্তর্গত পুস্তকগুলির গ্রন্থকর্তাদের নামের তালিকা এই সঙ্গে দেওয়া হল। যে ভারত বিশ্বজ্ঞানের উৎপত্তির মহাক্ষেত্র সেই দেশবাসীর সহিত জর্মাণীদের ভালবাসা, সংযোগ ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন এই পুস্তকগুলি জর্মাণ সাংস্কৃতিক জগৎ থেকে বহন করে ভারতে নিয়ে যাচ্ছে···

কাউণ্ট বার্ণষ্টর্ফ—ষ্টার্ণবার্গ | গার্ডট্ হপ্‌টম্যান—বার্লিন
ডাঃ এডলফ্ হারনাক্—বার্লিন | কাউণ্ট হাউম্যান—ষ্টাটগার্ট
ডাঃ রুডল্ফ্ অয়কেন্—যেনা | হারম্যান হেস—মণ্টাগনোল
ডাঃ হারমান্ যাকোবী—বান | কাউণ্ট কাইজারলিঙ—ডার্মষ্টাড
ফ্রঃ হেলেন সেয়ার ফ্রাঙ্ক—হামবুর্গ | কার্ট ওল্ফ—মিউনিক
ডাঃ রিচার্ড উইল হেলম্— | ডাঃ মায়ার বেনফাই

ষ্টাটগার্ট—৩রা মে, ১৯২১ সাল।

আমরা পূর্বেই বলেছি, জর্মাণীর এই অভূতপূর্ব শ্রদ্ধা নিবেদন, এই বিরাট কবি-সম্বর্দ্ধনা ইউরোপের অন্যান্য জাতির চক্ষে বিসদৃশ অথবা নিগূঢ় অর্থপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। তখন বিশ্বের প্রথম মহাযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। জর্মাণীর তখন পতনাবস্থা, সুতরাং অন্যান্য দেশের পক্ষে তার ভুল বোঝা অসঙ্গত ছিল না। কিন্তু প্রাচ্যের মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসংশয় ছিলেন; তাঁদের ধারণা অমূলক বা ভ্রান্ত ছিল না। বাঙলার কবির প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ ছিল; কেন না রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা মনে করতেন শুধু একজন দার্শনিক পণ্ডিত বলে নয়, কিন্তু এক সত্যদ্রষ্টা ভারতের ঋষিকল্প পুরুষ বলে। এই উক্তির সমর্থনে ডক্টর ফ্রেডারিক ভুসেল যে কথা বলেছিলেন আমরা এখানে তা উদ্ধৃত করে আমাদের বক্তব্য পরিসমাপ্ত করছি। ডক্টর ভুসেলের এই প্রবন্ধ Westermanns Monatshefte পত্রিকার আগষ্ট সংখ্যায় (১৯২১) প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

গত শ্রাবণ মাসের মাসিক বসুমতীতে ২৪শ ও ২৫শ সংখ্যা বিজলীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। "জীবন কাহিনীর কয়েকটি পাতা"র অনবদ্য কাহিনী এবার আরম্ভ হচ্ছে ১৩২৮ সাল, ৩০শে বৈশাখ (১৩ই মে, ১৯২১) প্রকাশিত বিজলীর ২৬শ সংখ্যার পরিচয় ও বিবরণ থেকে। এ সংখ্যার কাল-বৈশাখীর বাণী হচ্ছে—"যেখানে শান্তি মানে দাসত্ব সেখানে মনুষ্যত্বের প্রথম চিহ্ন হচ্ছে অশান্তি। মানুষকে চিরদিন দুঃখের ভিতর দিয়ে আনন্দের অধিকারী হতে হয়, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অমরত্ব লাভ করতে হয়। মানুষ আজ দাস হয়ে আর বেঁচে থাকতে চায় না; তাই এই জগৎজোড়া বিপ্লবের সূচনা। মানুষের অন্তরের দেবতা আজ জেগে উঠে বলছেন, 'আমি মুক্ত, আমি মুক্ত।'—

এই কাল-বৈশাখীর পর আরম্ভ হয়েছে খবর; তার প্রথমটি চিত্তাকর্ষক—"স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নাকি তাঁর কাগজ 'শ্রদ্ধায়' কাবুলের আমীরের ভারতবর্ষে গোয়েন্দা রাখার কি লিখেছেন। সে সম্বন্ধে মৌলানা মহম্মদ আলি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছেন—'কথাটা কি সত্যি, যে, আপনি লিখেছেন যে আমীরের একজন গোয়েন্দা পণ্ডিত মালবের সঙ্গে দেখা করে; মালব্য তাঁকে গান্ধীজীর কাছে পরিচয় দেন। আর গান্ধীজী তাঁকে মহম্মদ আলি ও শৌকত আলির কাছে পাঠিয়ে দেন? আমি নাকি আমীরকে লিখেছি যে হিন্দু-মুসলমান সব একজোট হয়েছে; কিন্তু পণ্টন এখনও আমাদের দলে আসে নি? সেই গোয়েন্দা নাকি ধরা পড়ে আমার চিঠিখানি সরকারের হাতে দিয়েছে?' * * * সরকার বাহাদুরের টনক নড়েছে। পার্লামেন্টে মণ্টেগু বলেছেন যে মাদ্রাজের বক্তৃতার সময় মহম্মদ আলি যে বলেছেন—আফগানিস্থানের আমীর ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে, সে বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করবেন। আমরা বলি—খুঁচিয়ে ঘা নাই বা করলে। তখন সিনফিন দলের সঙ্গে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সন্ধির কথাবার্তা চলছে। ডি ভ্যালেরার সঙ্গে সার জেমস্ ক্রেগের দেখা হয়ে কি কি সর্তে সন্ধি হতে পারে তার আলোচনা হয়েছিল। দেখা যাক, কত দূর কি হয়।"

ভারতের শৃঙ্খলমুক্তির তেইশ চব্বিশ বৎসর আগে ক্ষুদ্র আয়র্লণ্ড পায়ের শিকল যে কেটে ফেললো, সে কেবল শৌর্য্যের ও বিপ্লবের পথে সে বৃটেনকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল বলেই। ভারতের মুক্তির বিলম্ব ঘটে গেল গান্ধীজীর অহিংসা শক্তির নিরুপদ্রব পন্থার অভিশাপে। শেষে পরাধীনতা ঘোচাবার জন্য প্রয়োজন হ'লো কলির কল্কী হিটলারের দুর্দ্ধর্ষ দুর্ব্বার আঘাত—একটা বিশ্ব-লণ্ডভণ্ডকারী মহাসমরের। অতএব অহিংসা পরম ধর্ম্ম নয়, কিন্তু মারণাস্ত্রের ঠেলায়ই ভারতের আড়াই শত বৎসরের বৃটিশ পরাধীনতার সোনার শিকল খসে গেল। "বিজলী" একথা বুঝতো বলেই সে তার সাত বৎসরের জীবনে গান্ধীজীর তামস সাত্ত্বিকতার পলিটিক্সকে বাংলার মাটিতে গোড়া গাঁথতে দেয় নাই। বাঙ্গের বুকের বিদ্যুল্লতা বিজলী জানতো যে, শিশু গোপাল কৃষ্ণও পুতনার স্তন এক নিঃশ্বাসে পান করে তার জীবনীশক্তি শুষে নিয়েছিল, শিশুর কোমল পায়ের নৃত্যের শক্তি কালিয় নাগকে দলন করেছিল।

তার পর এ সংখ্যার সম্পাদকীয়ের শিরোনামায়ই তার পরিচয়—"মরণের চেয়ে বড় সত্যি নাই"। এই নাতিদীর্ঘ লেখাটি সর্ব্বকালের প্রয়োজ্য এক পরম সত্য ঘোষণা করছে, সেই জন্য লেখাটি আমরা উদ্ধৃত না করে পারলাম না।

"মরণের চেয়ে পরম এত বড় সত্যি আর কিছু নাই। সৃষ্টির নিয়ম এই—যে যত বড় মরণ মরতে পারবে সে তত বড় জীবন পাবে। আমরা যে পরম ধনের প্রকাশ সে অখণ্ড বস্তু তো কখনও যায় না, শুধু মরণের মানস-সরোবরে ডুব দিয়ে নতুন তনু নতুন শক্তি ও আনন্দ নিয়ে ফিরে আসে। ছোট্ট প্রকাশটুকুকে আমরা চিনি বলে সেই বউ ছেলে নাতি-পুতির মত ছোট্ট ছোট্ট প্রকাশগুলি আমাদের কাছে এত মারাত্মক রকম আপন জিনিস হয়ে দাঁড়ায়, সেই নামরূপধারাই রূপ নিয়ে আনন্দে আমাদের বেঁধে ফেলে, আমরা তার লোভে পড়ে গিয়ে তাকে হারাবার ভয়ে আকুল হই। যদি কখনও কোন উপায়ে, শুভলগ্নে কোন অপূর্ব্ব দৃষ্টি পেয়ে একবার সত্যটাকে দেখতে পাওয়া যায় তা'হলে কোন ছোট জিনিসই আর আমাদের বাঁধতে পারে না। যদি সাদা চোখে দেখতে পাওয়া যায়, যে, এক অনন্ত অসীম জগৎবুকে ধরা সদা অনন্ত অবয়ে রূপ নিচ্ছে, নিতুই নতুন হবার আনন্দে ক্রমাগতই ভেঙে পড়ছে, তা'হলে ছোট ছোট জীবন-মরণ আমাদের সমভাবে আনন্দ দিতে পাবে—আর বাঁধে না!

কিন্তু এই দেহ-মন হয়ে আমরা নিজের বড়ত্ব—রূপ হারিয়ে বসে আছি; স্বর্গ আর মর্ত্তের মাঝের সোণার সিঁড়ি ভেঙে গেছে; মালার সূতো ছিঁড়ে গিয়ে দানাগুলো ছড়িয়ে গেছে। এখন ছোটকে ভুলে বড় হতে হবে, ছোটর মরণেই বড়র প্রকাশ, একবার চূড়ান্ত-মরণ-সন্ধানে মরতে পারলেই চূড়ান্ত-জীবন! কিন্তু ছোটর মায়া কাটানো বড় দায়, ছোট যে এখন নিতান্তই ধ্রুব, হারানো অখণ্ডস্বরূপ আমার যে এখন অধ্রুব। * * * কিন্তু পরের জন্য মরতে পার বলেই তো তুমি দেশোদ্ধারী, পরের

জন্য অস্থি দিয়েছিল বলেই তো দধীচির এত নাম! পরের হিতে টাকাকড়ি বিলিয়ে দিয়ে মেয়েদের দুঃখে কেঁদে কেঁদেই তো বিদ্যা-সাগর অমর! এরই নাম অনন্তশায়ী অখণ্ডের ডাক! এই ডাক শুনে এই বাঁশীর মনমজানো সর্বনাশা বংশীধ্বনি প্রাণের কোণে পেয়ে মানুষ ছোটর মায়া কাটায়, মরতে মরতে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর জীবন পায়; তখন আর তার "নাল্পে সুখমস্তি।" অল্প আর তখন তাকে সুখ দিতে পারে না, দেহ-মন স্বার্থ-অভিসন্ধি সব ভেসে যায়, অন্তরটা হয়ে যায় দরাজ মাঠ। * * কিন্তু যার কথা বলছি সে মরণ-সাধক তিল তিল করে পরের তরে বিশ্বের জন্য অখণ্ডের লাগি নিঃস্বার্থের নিষ্কামের মরণ মরতে পারে এমন করে মরণ যার চরণের সাধা সহজ-গতি, তার জীবনের শেষ নাই। সেই মহামরণের —আপনভোলা রুদ্র পূজকের শ্মশানে তখন নিত্যানন্দ বিরাজ করে শূন্য তার জীবনের অনন্ত জ্যোতির বিথারে ভরে যায়, জগচ্ছক্তি কালী তার বুকের পদ্মে সৃষ্টি রচা চরণ দেয়, তখনই তো নবযুগের শ্মশানবিহারীর শক্তির বোধন সফল হয়। তোমরা সেই মরণজয়ী শিব হবে না?"

এ সংখ্যার দ্বিতীয় সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শিরোনামা হচ্ছে, "সত্যি সত্যি কি চাও?" সংক্ষেপে তার আসল মর্ম্মকথা হচ্ছে—"স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন শুধু চালাকী দিয়ে কোন বড় কাজ হয় না।" এই কথাটি আমাদের সভা-সমিতিগুলির সামনে টাঙিয়ে দেবার সময় এসেছে। আমরা সবাই মনে মনে ঠিক করে বসে আছি যে কোন রকমে তাল-গোল পাকিয়ে চুপ করে বসে থাকলে বা মাঝে মাঝে একটু আধটু হল্লাগুল্লা করলেই কাজটা যথাসময়ে আপনা আপনিই হয়ে যাবে। আর আমরা তখন গোঁফে তা' দিতে দিতে স্ফূর্ত্তি করে মজা লুটবো।

তা' হবে না। * * * যারা কুড়ে, গেঁতো, হতভাগা, তাদের দুঃখ ঘোচাবার জন্যে ভগবানের দয়ার সমুদ্রে কখনও বান ডাকবে না। জগতে যারা কিছু করতে পেরেছে তারা চিৎ হয়ে পড়ে পড়ে লেজ নাড়তে নাড়তে তা পারেনি। তাদের বুকের রক্ত জল করতে হয়েছে; প্রাণের শত বাঁধন ছিঁড়ে রক্তাক্ত মনটিকে হাসিমুখে ইষ্ট দেবতার পায়ে ধরে দিতে হয়েছে। * * *

মুক্তির সিংহদ্বার বীরদের জন্যই খোলা থাকে, যারা হট্টগোলের মাঝখানে পড়ে শুধু গণ্ডায় আণ্ডা মিশিয়ে যায়, তাদের জন্য নয়। * * * তোমরা ইংরেজি সাহিত্য ইতিহাস পড়, ইংরেজের চরিত্র কি তা' বোঝনি? ইংরেজ তার শত্রুকে শ্রদ্ধা করতে পারে কিন্তু তার গোলামকে ঘৃণার চক্ষে দেখে থাকে। * * * মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, "Swaraj has to be experienced by each one for himself. One drowning man will never save another, slaves our-selves, it will be mere pretension to think of freeing others."—"স্বরাজ কি, তা প্রত্যেকটি মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে। একজন জলমগ্ন মানুষ অপরকে বাঁচাবে কি করে? নিজেরা আমরা গোলাম, পরকে মুক্ত করার চেষ্টা ছলনামাত্র"। গান্ধীজীর এই কথাগুলি আগুনের অক্ষরে বুকের মাঝে লিখে রেখো।

এবারকার উপেনের লেখা উনপঞ্চাশী রঙ্গরসের ভাষায় লেখা—গোপালদার অবতারত্ব লাভ—"এই দু' মাসের মধ্যেই গোপালদার চেহারা ফিরে গেছে। দিব্যি সুঠাম নধর চেহারা; পরনে গেরুয়া—অথচ পরিপাটি লম্বা কোঁচা ঝুলছে। গায়ে গেরুয়া রঙের পাতলা আলখাল্লা আর মাথায় বাবরী। একেবারে সত্ত্বের মূর্ত্তরূপ! গলার রুদ্রাক্ষ মালাগাছটিতে একটা চকচকে মহত্ত্ব ফুটে বেরুচ্ছে। আর সব চেয়ে দেখবার জিনিষ দাদার সেই ত্যাগের নধর নেয়াপাতি বর্তুল ভুঁড়িটি।" এই সুরে মেকি গুরুজির মাহাত্ম্য বর্ণনা দুই কলম জুড়ে চলেছে। এ সংখ্যায় "দুনিয়াদারী" লেখাটি তৃতীয় দফায় পৌঁছেছে। ভাগবত-শক্তি জীবনে লাভ করে প্রাণটাকে বিরাট বিশ্বব্যাপী করে তোলার কথা প্রাণধনের মুখে চলছে—"কিন্তু মনে রাখিস, বেঁচে থাকতে হবে। পোকা মাকড়ের মত ছোট্ট একটুখানি বুকের ভিতর আরো ছোট্ট, আরও সহজে নষ্ট হওয়া প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা কি সম্ভব? * * * আমরা ভারতবর্ষের লোকেরা প্রাণকে এক সময় খুব বড় করেই পেয়েছিলুম কিন্তু তাল সামলাতে পারলুম না বলেই তার অবমাননা করলুম, তার স্ফূর্ত্তিকে বাধা দিয়ে, তার গতিকে জড়তার বোঝা চাপিয়ে আড়ষ্ট করে রেখে। তাই ও-পদার্থটি আমাদের ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। তাকে (প্রাণকে) হারিয়ে তবে না আমরা বুঝলুম কি ছিল তার শক্তি! শত রকম দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে সে-ই না আমাদের হাজার হাজার বছর ঠিক চালিয়ে নিয়েছিল—আর তার অভাবেই না আমরা গলিত শবের মত দুনিয়ায় দুর্ভর হয়ে পড়েছিলুম।

"এই যে প্রাণ—একেই জাগ্রত করতে হবে। আজ বুকের ভিতর কেবল তার স্পন্দনটুকুই অনুভব করছি, সে যখন সমস্ত দেহ মন কাঁপিয়ে তুলবে নব নব ভাবের আবেগে, চিরনূতন কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষায়, তখনই হবে প্রাণের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।"

"দুনিয়াদারী"র পর এ সংখ্যার শেষের দিকে আছে "কালাপানির কয়েদীর কথা"—কালাপানির সমস্যা নিয়ে আলোচনা—রাজবন্দীদের দুঃখ-বেদনার কথা। একটু উদ্ধৃত করলেই এর মর্ম্মকথা বোঝা যাবে—"ঢাক পিটিয়ে যখন রিফর্ম বিলের গাজন গাওয়া চলছিল তখন শোনা গিয়েছিল যে সাদা আর কালো নাকি সরকারের চোখে একাকার হয়ে যাবে। ভেবেছিলুম হবেও বা! সত্য যুগ বুঝি ফিরে এলো। তার পর—হরি, হরি, হরি! যা হবার নয় তাও কি হয়? পোড়া মাটি কি মিশ খায়? এক জন চুণোগলির ট্যাঁস যদি আমাদের পিলে ফাটিয়ে কালাপানিতে কয়েদী হয়ে যান—ত তাঁর জন্যে চা, পাঁউরুটি, মাংসের ব্যবস্থা হবে; অধিকন্তু পিণ্ডী পাকাবার জন্যে তাঁকে সরকার বাহাদুরের তরফ থেকে এক জন রাঁধুনী দেওয়া হবে। বল কি, রাজার জাত—একটু খাতির চাই নে? যুক্তিস্বরূপ বলা হয় যে কচুর ঘণ্ট তাঁদের পেটে সইবে না আর যে সব ভদ্রলোকের ছেলে রাজনীতির ফ্যাসাদে পড়ে কালা-পানিতে গেছে তারা বোধ হয় বাড়ীতে কচুর ঘণ্টই খেতো! দয়ানিধি রে!"

ষ্টেট সেক্রেটারী হুকুম দিয়েছেন যে কালাপানির কয়েদীর আড্ডা উঠিয়ে দিতে হবে; কিন্তু বিড়ালের ভাগ্যে শিকে যদিও বা ছিঁড়লো তবু পড়ে না যে!

আমাদের বন্ধু পণ্ডিত হৃষীকেশ একবার শিবরাত্রির উপোস করে সারা রাত ক্ষিদের চোটে ছটফট করেছিলেন। ভোরবেলা কখন কাক ডাকবে, আর তিনি মুখে-হাতে জল দিয়ে পেটে কিঞ্চিৎ

দেবেন, সেই আশায় এক একবার ঘড়িটা টং টং করে বাজে, আর তিনি জিজ্ঞাসা করেন—"কাক কি ডাকলো রে ?" শেষে যখন রাত তিনটে বাজে তখন তিনি প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে একেবারে নিরাশ হয়ে বললেন—কাকও ডাকবে, ভোরও হবে, কিন্তু হৃষীকেশের প্রাণটা থাকতে থাকতে আর হবে না !"

"কালাপানির বন্ধুদের কথা ভেবে আমাদের ঐ কথাই মনে হচ্ছে। দেশের দুর্দ্দিনও কাটবে, কালাপানিও উঠবে, কিন্তু ছেলেগুলোর প্রাণ থাকতে থাকতে তা বুঝি হবে না !"

বিজলীর প্রতি সংখ্যা শেষ হয় "কাজের কথা"র দু' দফা লেখা দিয়ে। এই লেখাগুলি আজ দেশ গঠনের দিনে একত্রে ছেপে প্রকাশ করা উচিত, কাজের ও গঠনের মূল সূত্রগুলি এই সব লেখায় আছে। এ সংখ্যার "কাজের কথা"র সবটুকু উদ্ধৃত করি।

মূল সূত্র।

কাজের কথার মূল সূত্র হচ্ছে—আগে কাজ তার পর কথা। ভাত ছড়ালে যেমন কাকের অভাব হয় না, প্রসাদ ছড়ালে যেমন ভক্তের অভাব হয় না, বচন ছড়ালে তেমনি শোনবার বা হাততালি দেবার লোকের অভাব হয় না। কিন্তু কাক শুধু কা কা করেই বাসায় ফিরে যায়, ভক্ত কেবল প্রসাদের দিকে টাঁক করে বসে থাকে আর সভাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই হাততালির ঝড় থেমে যায়।

কাজের লোক সেই যে নিজেকে চেনে আর তার কাজকে চেনে, সহধর্ম্মীকে সহকর্ম্মীকে দেখলেই ধরতে পারে। মুখটি বুঁজে সে আপন মনে গড়ে যায়। হ্যাঁ, না,—কোন কথা নিয়ে বেশি তর্ক করে না, জবরদস্তি করে লোকের ঘাড়ে নিজের মতামতের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাদের পিষে ফেলতে চায় না ; নিজের মোড়লীর মায়াতেও বদ্ধ নয়। নব বসন্ত এলে যেমন গাছ কচি কচি পাতায় আর ফুলে শোভা ধরে উঠে, তেমনি কর্ম্মীর আশে-পাশে নতুন মানুষ গজিয়ে ওঠে, নব-জীবনের সাড়া পড়ে যায়,—কেন না, কর্ম্মীর ভিতর খেলেছে ভগবানের সৃষ্টির আনন্দ !

কুছ পরোয়া নেহি !

জর্জ ষ্টিফেন্সন যখন লোহার রেলের উপর গাড়ী চালাবার প্রস্তাব করেছিলেন—তখন বিলেতের দেশশুদ্ধ বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার তাঁকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। আরে পাগল ! তাও কখনও হয় ? রেলের উপর গাড়ী কি করে চলবে ? কেতাব বার করে, অঙ্ক কষে, এনার্জি মোশন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে পণ্ডিতেরা প্রমাণ করে দিলেন যে ষ্টিফেন্সনের গাড়ী চলবে—না !!

ষ্টিফেন্সন সে কথা শুনলেন, কিন্তু মুখটি বুঁজে রেল পাততে লেগে গেলেন। শেষে রেল হ'লো, গাড়ী হলো, আর একদিন সুপ্রভাতে পণ্ডিতদের আইন-কানুন উল্টে দিয়ে রেলের উপর ষ্টিফেন্সনের গাড়ীও চললো। তিনি তখন শুধু বললেন—"এই দেখো, আমার গাড়ী চলছে !" পণ্ডিতরাও নাছোড়বান্দা। তাঁরা বললেন, "হ্যাঁ, চলছে বটে ; কিন্তু শাস্ত্রমতে না চলাই উচিত ছিল।"

আমাদের দেশেও এমন ঢের লোক পাবে, যারা শেষ পর্য্যন্ত তোমার কাণের কাছে বলতে থাকবে—"হবে না, হবে না।"

কুছ পরোয়া নেহি ! করে তাদের দেখিয়ে দাও যে "হয়, হয়, হয় !"

তার পর আরম্ভ হচ্ছে অগ্নিকন্যা 'বিজলীর' ১৮২৮ সালে ৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবারে প্রকাশিত ২৭ সংখ্যা। এবারকার "কাল-বৈশাখী"তে আছে—

"ক্যালডিয়া, ব্যাবিলন, মিশর, পেরু—কোথায় গেল তাদের প্রাচীন সভ্যতা ? আজ অনুসন্ধিৎসু প্রত্নতত্ত্ববিদ ভূ-গর্ভ খুঁজে তাদের জীর্ণ কঙ্কাল আর সংসারযাত্রার উপকরণ বাহির করে বলছে—'এঁরাও একদিন আমাদের মত ছুটে ছুটে বেড়াতো, লাঠালাঠি করতো, অহঙ্কারে মাথা উঁচু করে সগর্ব্বে পদক্ষেপে পৃথিবীর বুক কাঁপিয়ে তুলতো।" কোথা গেল তারা ? কেন গেল ? কাল-বৈশাখীর আগে তৃণখণ্ডের মত কেন তারা ছিন্নভিন্ন হলো ?

আজ আকাশের কোণে ঘনঘটায় আবার কাল-বৈশাখী দেখা দিচ্ছে। আজ যাদের অহঙ্কারে পৃথিবী কাঁপছে তারা এ আসন্ন মৃত্যুকে ঠেকাবে কি দিয়ে ? অমৃতের সন্ধান যদি তারা না পায়, তা' হলে ভবিষ্যৎ যুগে আবার কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ভূ-গর্ভ খুঁড়ে তাদের কামানের টুকরো বাহির করে বলবে—"এরই নাম ছিল ইউরোপ !"

"কাল-বৈশাখী"র পর যে (কাল-বৈশাখী সূচক) যে সংবাদ থাকে তাতে এ সংখ্যায় বিলেতে অলডারসট্ প্রভৃতি দু'-তিন জায়গায় সৈন্যরা ধর্ম্মঘটের মজুরদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার খবর আছে। সেটা ধামা চাপা দেবার প্রয়াসে কর্ত্তারা সাফাই গেয়ে বলেন যে, তারা মদ খেয়ে একটু ফূর্ত্তি করেছিল মাত্র। এ দেশে কালা ফৌজ যদি ঐ রকম ফূর্ত্তি করতো তা' হলে বোধ হয় এতক্ষণ কোর্ট মার্শাল হয়ে যেতো। তার পরের খবর হচ্ছে—সিমলার এক সভায় মহাত্মা গান্ধী সিমলায় আসবার কারণ প্রকাশ করেন। পণ্ডিত মালব্য তাঁকে বড় লাটের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ডেকে পাঠান। দেখা হবার সময় বড় লাট তাঁর কথা বেশ মন দিয়ে শোনেন, আর গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে সেই মত কাজ করবার পক্ষে যা' বাধা তা' গুছিয়ে বলেন। ফল যে বিশেষ কিছু হবে তা' বলে মনে হয় না। লালা লজপত রায় বলেন, যে মূল কথা নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে আমাদের বিরোধ (অর্থাৎ স্বরাজের কথা) সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যদি কেউ রফা করে ফেলতে চান, তা' হলে লোকে তাঁর কথা গ্রাহ্য করবে না।

১৯২১ সালের মে মাসের এই খবরে বোঝা যাচ্ছে, ভারতের সঙ্গে একটা সম্মানজনক মিটমাট লেবার গর্ণমেণ্টের আগেও বহু দিন ধরে বৃটেন কামনা করে এসেছিলেন, দ্বিতীয় মহাসমরের হিটলারী ঠেলায় মাথাভারী অর্দ্ধ পৃথিবীব্যাপী এম্পায়ারের মাজা না ভেঙে পড়া অবধি আপোশ-রফার সর্ত্ত ছিল কড়া। যুদ্ধের পরের উদার শ্রমজীবী সরকার নাকের বদলে নরুণ দিয়ে ভারতকে সাম্প্রদায়িক করাতে কেটে দীর্ণ বিষাক্ত মুক্তি দান করেন। ক্ষুদ্র আয়র্লণ্ডের বেলায়ও কূটনীতির ও ভেদনীতির এই করাত কাজে লেগেছিল, যার ক্ষত আয়র্লণ্ড আজও নিরাময় করতে পারে নাই।

এ সংখ্যার দুইটি সম্পাদকীয়ের শিরোনামা হচ্ছে প্রথম "উত্তেজনা ও ইমোশান" এবং দ্বিতীয় "মফস্বলের চিঠি"। এই দীর্ঘ দু' কলম প্রথম লেখাটির তাৎপর্য্য সামান্য উদ্ধৃতিতেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে, যথা—"হয়তো আমরা অসারই হয়ে উঠেছি,

তার প্রতিবাদ করে আমরা আর অবিনয়ের নির্লজ্জতা প্রকাশ করবো না—কিন্তু এই কথাটা, এই সত্য কথাটা অতি স্পষ্ট করে কোন রকম হেঁয়ালী না রেখে আজ দেশের দশ জনের সামনে বলা চাই-ই চাই যে এনার্কিজম্ চালানো থেকে সুরু করে সাম্রাজ্য গঠন পর্য্যন্ত কোন কাজই উত্তেজনা বা ইমোশান দিয়ে সহজ বা সফল হয়ে ওঠে না, উঠবে না—অতীতেও ওঠেনি। তার জন্যে চাই ঠাণ্ডা মাথা, তার চাইতেও ঠাণ্ডা হৃদয়—চাই অসীম ধৈর্য্য-তার চাইতেও বেশি স্থৈর্য্য। * * * উত্তেজনা সত্যের সত্যকার বেশ নয়, সেটা হচ্ছে সত্যের ছদ্মবেশ। * * * উত্তেজনার এই গলদকে যদি আমরা জাতীয় জীবনে ধৈর্য্যে-স্থৈর্য্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় পরিবর্ত্তন করতে না পারি, তবে আমরা যদি বাদশাহীও পাই তা' হলে সেটা হবে আবু হোসেনের মত এক দিনের বাদশাহী। হাউই যেমন আপনাকে ধ্বংস করতে করতেই শক্তি সংগ্রহ করে আকাশে ওঠে এবং পরিণামে অবশিষ্ট থাকে কেবল অর্দ্ধদগ্ধ এক খণ্ড বাঁশের চোঙ, তেমনি উত্তেজনারও যে শক্তি সে আপনাকে ক্ষয় করে করেই চলবে।"

'ইতি কস্যচিৎ বৃদ্ধ' বলে সহি-করা মফঃস্বলের চিঠি রাইচরণ আর তার শাশুড়ীতে ঝগড়া নিয়ে এক মুখরোচক আলাপ। চাষীর পিছনে সহুরে দেশোদ্ধারী বাবুরা লেগে চাষের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বই পড়িয়ে চাষীকে আইডিয়াল চাষী তৈরী করার দুশ্চেষ্টা নিয়ে লেখাটি উপেনের উপভোগ্য সৃষ্টি। তারই ঠিক পরে উপেনের লেখা ঊনপঞ্চাশী, পণ্ডিত হৃষীকেশের সঙ্কীর্ত্তনে নাচতে নাচতে বৈকুণ্ঠলাভে আপত্তির কৈফিয়ৎ। পণ্ডিতজী বললেন, "বাঃ! প্রথমেই তো বৈকুণ্ঠে ঢুকতে না ঢুকতে চতুর্ভুজ হয়ে যেতে হবে। দু'টো হাতের খাটুনীই খেটে উঠতে পারিনে, তা' আবার চারটে হাত! আর ভগবান যে সিংহাসনে বসে আছেন, তার চার দিকে পার্ষদেরা ধূপ-ধুনো-গুগ্গুলের ধোঁয়া দিয়ে রেখেছেন তা' চোখে লাগলেই তো অন্ধকার! তার উপর রাত নেই, দিন নেই, শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁশর আরতি লেগেই আছে। বড় বড় ভুঁড়েল ভক্তরা চারিদিকে চামর দোলাচ্ছে, আর ঐ নারদ বাবাজীবন কেবল সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে আউড়ে ঘুরছেন। দৈত্য-কুলের প্রহ্লাদ থেকে আরম্ভ করে হনুমান দাস বাবাজী পর্য্যন্ত যত সব ভক্তরা মরে বৈকুণ্ঠে গেছেন, সবাই হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্তব-স্তুতি করছেন, নয়তো লম্বা হয়ে পড়ে পড়ে নাক রগড়াচ্ছেন। বাপ! আর আমার বৈকুণ্ঠে পার্ষদ হয়ে কাজ নেই।"

"তাই তো পণ্ডিতজী, বৈকুণ্ঠের এমন হুবহু নক্সা পেলে কোথায়!"

পণ্ডিতজী হেসে বললেন, "দাদা! তোমরা থিয়সফিকেল সোসাইটির লোক, আর এই খবরটা রাখ না? একবার লেডবিটারের বইগুলো হাতড়ে দেখ দেখি, ভূতলোক, প্রেতলোক থেকে আরম্ভ করে গোলক, ঢোলক এমন কি নোলক পর্য্যন্ত সব রাজ্যের খবর এখানে পাবে। ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা কোন লোকে কোন খোঁটায় বাঁধা আছে, ঐরাবত কি রকম চিন্ময় খোল-বিচালি খায়, তার ফটো পর্য্যন্ত দেখতে পাবে। বাগবাজারের আড্ডার বাইরে অত খবর আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, কর্ম্মমার্গ এসব তো অনেক দিনের জিনিস, কিন্তু ধূমমার্গ এঁদের একেবারে নিজস্ব আবিষ্কার। দেড় ছটাক বৌদ্ধধর্ম্ম, আধ ছটাক বেদান্ত, এক ছটাক বুজরুকি আর এক ছটাক গঞ্জিকা বেশ করে এক সঙ্গে সিদ্ধ করে এঁরা ভবরোগের পাঁচন যা' বানিয়েছেন তা' তারিফ করবার জিনিস বটে!"

এবারকার দুনিয়াদারী মানুষের আনন্দরসসিক্ত মন প্রাণে আর মুক্তিলোভাতুর তাপস মনের মধ্যে দ্বন্দ্বের এক অপূর্ব্ব চিত্র। এ লেখাও উপেনের পাকা হাতের লেখা।

—তিন দিনের আফিস ছুটি। বাড়ী যেতে হবে যে? ট্রামে করে গিয়ে ট্রেন ধরলুম। * * * গাড়ীর গতির সঙ্গে সঙ্গে আরোহীদেরও একটা inertia এসে পড়ে কথাটা জানতুম; কিন্তু গাড়ী যেমন চলে, মনও তেমনি ছোটে এটা জানা ছিল না। * * * নিজের মনের খবর নিতে গিয়ে দেখি সেও চম্পট দিয়েছে। দেখলুম এরই মধ্যে তার মিলন হয়ে গেছে আমার খোকার সঙ্গে আর খোকার মায়ের সঙ্গে। সেখানে গিয়ে এরই মধ্যে সে গড়ে তুলেছে একটা স্বপ্নের রাজ্য,—সেখানে দুঃখ নেই, ব্যথা নেই,—আছে শুধু আনন্দ আর ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না এমন একটা বুক-ভরা আরাম।

আমার বুভুক্ষু অন্তরের সবখানি কামনা দিয়ে বসে বসে তাদের কথাই ভাবছি। পেছনে বসে দু'টি ভদ্রলোক ভক্তিতত্ত্ব-কূজ ঝটিকা আলোড়নে ব্যস্ত ছিলেন। এক জন বললেন, "সংসার আঁকড়ে পড়ে থাকলে চলবে না, কঠোর সংযমে মনকে পবিত্র করতে হবে, তবেই ভাগবত শক্তি জাগ্রত হবে।"

* * * খুব বড় রকম একটা ধাক্কা খেয়ে মনটা ফিরে এসে স্বস্থানে আশ্রয় নিলে। * * * তার পরে নিজেকে খুব জোর করে বোঝালুম—সত্যি, সত্যি, ওঁরা যা বলছেন, প্রাণধন যা বলেছে তাই সত্যি, নির্ভেজ সত্যি, অমোঘ সত্যি। আমিই দুর্ব্বল, দুর্ব্বল আমার মন।

গ্লানিতে বুকটা ভরে গেল। অন্তরের এ দৈন্য দূর করতেই হবে। আমি প্রতিপন্ন করবোই যে, আমি সকল মোহমুক্ত এই ভেবে সমস্তটা পথ হঠ-যোগীর আসনে কাঠের মত শক্ত হয়ে বসে রইলুম।

বাড়ীতে গিয়ে যখন পৌছালুম তখন মনু আমার স্ত্রী তুলসী-তলায় সাঁঝের বাতিটি রেখে সবে মাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে। পায়ের শব্দ শুনে সে আমার দিকে চাইলো। চোখ দু'টি তার ঐ ঘীয়ের প্রদীপটির মতই শান্তোজ্জ্বল, দমকা হাওয়ার মত কি যেন একটা কিছু আমার বুকের ভিতরটা ওলট-পালট করে দিল। সামলে নিয়ে মনকে বললাম, "ওরে শান্ত হ', শক্ত হ, একেবারে পাথর হয়ে থাক।"

ঘরে ঢুকে দেখি খোকনমণি বেরাল ছানাটাকে ছেড়ে কচি কচি হাত দু'খানি মেলে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার বুকে। সমস্ত শরীর দিয়ে একটা পুলক-স্পন্দন ছুটে গেল—ভাবলুম, সত্যি—এই-ই, পরম সত্যি।

তার পর এমনি দ্বন্দ্বের মধ্যে কঠোর হয়ে তিন দিন ছুটি কাটিয়ে মনুর ও খোকনের কাছে অশ্রুসজল বিদায় নিয়ে কলিকাতা যাত্রা।

* * * ট্রেনের জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালুম, অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলাম না। চোখ বুঁজলুম। অন্তরও আমার আঁধারে ভরা, কিন্তু তারই মাঝে যেন দেখতে পেলাম ঘীয়ের প্রদীপের মতই মনুর শান্তোজ্জ্বল সজল আঁখি দু'টি। মনে মনে বললুম—ওই-ই সত্যি—ওই-ই সত্যি—মিথ্যা নয়, মোহ নয়, ধ্রুবতারার মতই আমার হৃদয়াকাশে চির সত্য ওই-ই।"

মানুষের আকাশচারী মন মাটির পোকা, দুই রাজ্য নিয়ে তার

সুখ-দুঃখ মুক্তি-বন্ধনের লীলা। মানুষ—ভ্রান্ত মানুষ কেবল তার স্থির খাতায় বিধাতার সৃষ্টির কপিবুক শুধরে corect করছে আর বিধাতা সত্যের মাটি দিয়ে আনন্দের বৈকুণ্ঠ রচনা করছেন সহস্র হস্তে। মাটি ও আকাশের মাঝে সুর কেটে গেছে, ভেদের তাই ব্যথা এত টনটনে হয়ে পূর্ণ সত্যের থেকে ভ্রষ্ট মানুষকে বিভ্রান্ত করে।

এ সংখ্যায় আছে আমার স্বাক্ষরিত পণ্ডিচারীর পত্র। তখন উপেন বিজলী অফিসে বিজলী চালায়, আর আমি পণ্ডিচারীতে। পত্রটি এইরূপ—"ভায়া, আজ সকালে অরবিন্দের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, এজাতি অনেক খেটেছে, অনেক দুঃখ-বেদনায় পরিশ্রান্ত হয়েছে, মানুষকে শান্তি ও আনন্দ দিতে হবে। মানুষ ভেতরে ভগবানের ডাক ও তাঁর শক্তির স্পর্শ পায়, তা' বুঝতে না পেরে ছটফট করে বেড়ায়, খানিকটা যা' তা' এলোমেলো কাজ করে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বসে পড়ে। তাঁর শক্তি ও আনন্দ ধারণ করতে শিখতে হবে; কারণ ভিতরের কর্ম্ম—অন্তরের প্রকাশই প্রকাশ, বাহিরটা এই জগত চরাচর ও কর্ম্মযন্ত্র তারই জ্যোতিচ্ছটার একটুখানি রেশমাত্র। কর্ম্ম থাকবে, জগৎ থাকবে, কিছুই যাবে না, শুধু রূপান্তর হয়ে transformed হয়ে থাকবে। মানুষের পিছনে অগাধ অটল শান্তি ও অন্তরে অফুরন্ত আনন্দ বিরাজ করলে আর অতি বড় কর্ম্মও তাকে শ্রান্ত করতে পারে না, সব কাজ সুখের অনায়াস খেলায় পরিণত হয়। * * * তার অভাবের কর্ম্ম নয়, আনন্দের কর্ম্ম, জ্ঞানে বিধৃত শক্তির শান্ত মধুর কর্ম্ম।"

এই সুরে সমস্ত চিঠিটি লেখা। তারপর সংখ্যাটির শেষের দিকে আছে—"রামধনের স্বর্গযাত্রা"—এও একটি ব্যঙ্গরসাত্মক লেখা। তারপর সেই দু'দফা "কাজের কথা"।

তখন ভারতের রাজনীতিতে মহম্মদ আলি সৌকত আলিকে নিয়ে চলেছে গরম পলিটিক্সের আসর। লর্ড রিডিং তখন ভারতের বড় লাটের মসনদে; মহাত্মাজীর মারফৎ একটা রাজনৈতিক মীমাংসা করে ফেলার তিনি পক্ষপাতী। বিজলীর পাঁচমিশেলী আর খড়কুটোর স্তম্ভ এই সব খবরে ভরা থাকতো। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাগজের রিপোর্টার মহম্মদ আলির সঙ্গে আমীরী কচকচি সম্বন্ধে দেখা করেন। তাতে মহম্মদ আলি নাকি বলেছেন, "খালিফা যদি জেহাদ প্রচার করেন, তা'হলে আমি যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য। তবে অর্থ দিয়ে সাহায্য করবো কি হাতিয়ার ধরবো তা' আমার ইচ্ছাধীন। কিন্তু ভারতকে স্বাধীন করতে আমীরকে কখনো ডাকবো না, তার জন্য বিশ কোটি হিন্দু যদি না পারে দশ কোটি মুসলমান সে কাজে প্রাণপাত করবে"।

পরের প্যারায় দেখা যাচ্ছে—খবরের কাগজের মহলে খুব ধুমধাম করে গবেষণা চলছে যে সত্যি সত্যি যদি আফগান এসে পড়ে তা' হলে কি হবে? বিজলী সে সম্পর্কে টিপ্পনী করে বলছে—"আফগান জুজুর নাম শুনে এত ভয় পাবার তো কোন কারণ দেখিনে। যে মারাঠা উঠে আওরঙ্গজেবের সিংহাসন কাঁপিয়ে তুলেছিল তাদের বংশধরেরা কি একেবারে মরে গেছে? যে রাজপুতেরা ত্রিশ বছর ধরে যুদ্ধ করে মোগলের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছিল তাদের রক্ত কি জল হয়ে গেছে? যে শিখের প্রভাবে আফগান ভয়ে ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল, সে শিখেরা কি গুরু গোবিন্দের নাম ভুলে গেছে! সর্দ্দার হরি সিং এর নামে কাঁপতো কারা? এই আফগানেরই পূর্ব্ব পুরুষেরা নয় কি? আফগানের কি চারটে হাত-পা ঠ্যাং? এত গবেষণা কিসের?"

এ সংখ্যার খড়কুটো কলম খবর দিচ্ছে—এবার ডাক্তার সান ইয়াৎসেন চীন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট হয়ে বসেছেন গত ৮ই মে তারিখে। তার আগে ১৩ই এপ্রিল মহাত্মা গান্ধীর সহিত বড় লাটের অনেকক্ষণ কথা হয়, সে সাক্ষাতে কেউ উপস্থিত ছিলেন না। গান্ধীজী দেশে গোলমালের কারণ ভাল করে বুঝিয়ে দেন। রাউলাট এক্ট, প্রেস এক্ট, উপনিবেশগুলিতে ভারতবাসীর উপর দুর্ব্যবহার সব কথাই ওঠে। মহাত্মা গান্ধীর নাকি ধারণা হয়েছে লর্ড রিডিং দেশকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগবেন।

মাদ্রাজে বক্তৃতায় মহম্মদ আলি নাকি বলেছিলেন যে, ইংরাজেরা এদেশে চোরের মত ঢুকেছিল, সুতরাং চোরের মত তাদের মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এই নিয়ে পার্লামেণ্টে বিলেতে প্রশ্ন উঠেছে।

তার পর "কাজের কথা" উদ্ধৃত করি—

কাজের কথা

নিজেকে ভরে তোলো

মেয়েদের একটা কথা আছে জান তো—'ঘোরে টেকো পোড়ে না।' অনেক সময় দেখা যায় লোকে ছুটাছুটি করে, লাফালাফি করে, চেঁচামেচি করে; বাইরে থেকে মনে হয় কি একটা রৈ-রৈ কাণ্ড চলছে। কিন্তু চাঞ্চল্য থাকলেই সব সময় গতি থাকে তা' নয়; লাফালাফি আর কাজ এক জিনিষ নয়। কাজের সিদ্ধির জন্য চাই একটা পরিস্ফুট উদ্দেশ্য আর সংযত শক্তি। কি চাই তাই যেখানে বুদ্ধির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, সেখানে অনেকটা শক্তি বাজে খরচ হয়ে যাবেই যাবে। যেখানে পাওয়ার চেয়ে ধাওয়ার নেশা বেশি সেখানে অর্দ্ধেক পথ ছুটে গিয়ে চিৎ হয়ে পড়তে হবেই হবে। আলোও চাই, উত্তাপও চাই; কিন্তু আলোর চেয়ে যেন উত্তাপটা না বেশি হয়ে পড়ে; তা' হলে কর্ম্মে শুধু হাতের কণ্ডুয়ন নিবৃত্তি মাত্র হয়ে দাঁড়াবে।

নিজেকে ভরে তোল; কাজ আপনি গড়ে উঠবে।

কাজের কথা

লজ্জার কথা

কংগ্রেসের একজন কর্ম্মী সেদিন আমাদের বলছিলেন—"দাদা, চাঁদা আদায় করতে গিয়ে আমরা গালাগালি খেয়ে মরছি। ফণ্ডের নাম শুনলেই লোকে নাক সিঁটকে বলে ১৯০৫ থেকে আজ পর্য্যন্ত দেশে এতগুলো যে ফণ্ড হলো, সে টাকাগুলো গেল কোথা বলতে পার? কথাটার কোন উত্তর দিতে পারিনে বলে লজ্জায় আমরা মরে যাই।

লজ্জার কথাই বটে! টাকাগুলো আমাদের দেশে এমনি চটচটে হয়ে দাঁড়িয়েছে যে হাতে এলেই হাতের সঙ্গে জড়িয়ে যায়; হাত থেকে ছাড়ানো দায়, বিশেষতঃ পুরানো নেতাদের হাত থেকে। তাই চাই টাকা সংগ্রহের আগে নতুন মানুষ যারা অর্থের দাস নয়, অর্থ যাদের দাস, যারা নিজেদের সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে দেশকে সেবা করবার অধিকার পেয়েছে। সেই আত্মভোলা কর্ম্মীদের হাতেই

দেশের কাজ গড়ে উঠবে; তারাই নিজেদের প্রাণ দিয়ে দেশের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে।

তার পর ১৩২৮ সাল: ১৩ই জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত বিজলীর ২৮ সংখ্যার কথা এলো—

কাল-বৈশাখী।

মানুষের অন্তরের দেবতা আজ জেগে উঠে বলছেন, "আমি মুক্ত, আমি মুক্ত।" অন্তরশায়ী সেই দেবতার জাগায় দেশে-বিদেশে মানুষ টলমল; কে কি করবে, কেমন করে হৃদয়ের সার্থক শক্তিটাকে বাক্ত করে এই আকাশ চিরে দেবে তা' বুঝে উঠতে পারছে না। জগত ভরে শক্তির দেবতা জাগছে, জ্ঞানের দেবতা জাগেনি; তাই বিশ্বভরে এত তাজা রক্ত এত কাঁচা মাথার অপচয় চলছে। শুধু শক্তিতে মানুষ মাতে, জ্ঞানে স্থির হয় আর প্রেমে ও আনন্দেই তাহা সহজ গতি পায়। শুধু শক্তি হলো বামমার্গের কালী, যে শুধু ভাঙতে জানে, গড়তে চায় না; ভূতের সঙ্গে নাচে, সে মায়ের অসিতে দিক সকল মধুময় করে আনন্দ ঝরে না। জ্ঞানের শিব ভারতে জাগবে তবে জগতে জীবনের ছন্দ ফিরবে। এখন অন্ধ দুনিয়া মাতাল হয়ে শুধু প্রলয় রচনা করছে।

এ সংখ্যার সম্পাদকীয়ের শিরোনামা হচ্ছে—"নব যুগের জীবন-সঙ্কেত"। তার মর্ম্মকথা হচ্ছে—"এত দিন আমরা জগৎকে —এই সুখ-দুঃখ গাছপালা জড়জীব সব বস্তুকে ভাগবত সাধনার বাধা বলে দেখে এসেছি। সাধক উপরে সেই জ্ঞানের ভূমিতে উঠে দেখেছেন বটে, যে, এ সবও ব্রহ্ম, তাঁরই তনু, তাঁরই বিভূতি। কিন্তু সাধন দিতে গিয়ে তারাই মোটা দুনিয়ায় নেমে এসে সংসারকে তিরস্কার করেছেন। বড় জোর বলেছেন, সংসারে থেকেও সাধনা হবে না কেন, হয় বই কি; বরঞ্চ কেল্লায় বসে লড়াই করাই সুবিধা। পাঁকাল মাছের মত পাঁকে থাকবে অথচ গায়ে পাঁক লাগবে না।" এই সব কথায় সংসারকে পাঁক বলে তিরস্কার করা হয়, বড় জোর মোটের উপর মন্দ নয় বলে মেনে নেওয়া হয়।

এত দিন তাই ধর্ম্ম ছিল মটকায়, ধর্ম্ম ছিল দুনিয়া ছেড়ে উপরে উঠে গিয়ে ওপর থেকে নীচেটাকে কৃপার চোখে দেখায়। এই জীব-তরানো ধর্ম্মে বাছা বাছা মানুষ উর্দ্ধগামী সাধকের কৃপায় ও শক্তিতে ভরে যেতো, জীবজগৎ কিন্তু পড়ে থাকতো সেই পাঁকেই। বেদান্তের "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" সবই ব্রহ্মময়—এই ছিল সাধনার জিনিস আর মটকা থেকে অনুভূতি করার দৃষ্টি। সব বড় বড় শক্তি সাধকের এই উপরের দিকে চলায় এই Stargazing সংস্কারে এতদিন জগতে ব্রহ্মপ্লাবন আসেনি * * * মানব সাধারণ শাস্ত্র জ্ঞানেই আটকে আছে, সমস্ত মানব-জাতি এ পরা জ্ঞানে সহজ প্রতিষ্ঠা পায়নি।

* * * *

এই রকম ভাবের এত দিন দরকার ছিল, কারণ ওপরটার প্রতিষ্ঠা মানুষের বুদ্ধিতে আগে করা চাই। শান্ত আধারের সান্ত মানুষের আগে বোঝা চাই যে সান্তকে ছেড়ে অনন্ত বলে একটা কিছু আছে। * * * এবার তাই উপরে উঠে সে পূর্ণ শিবত্ব নিয়ে বুদ্ধি মন প্রাণ দেহ রূপ সিঁড়ি দিয়ে তোমাদের জগতে নামতে হবে: নামতে নামতে যেমন যেমন সে পরশমণির পদক্ষেপ হবে তেমনি তেমনি সিঁড়ির ধাপগুলি সব স্বর্ণময় হয়ে যাবে। * * * আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সহজ জ্ঞানে স্বতঃস্ফূর্ত্তযোগে তিন লোক-জোড়া আপন স্বরূপ দেখতে পাবেন।"

তার পর এ সংখ্যার "পণ্ডিচারীর পত্র" বড় উপাদেয় বস্তু। সে পত্র থেকে শ্রীঅরবিন্দের কথা প্রায় সবটাই বাংলা দেশকে আবার দেওয়া প্রয়োজন। চিঠিটির মূল কথা এই—কাল দুপুর বেলার বৈঠকে পণ্ডিত হৃষীকেশ ধান ভানতে শিবের গীত আরম্ভ করলো।

পণ্ডিত। আমাদের বিজলী অফিসে অনেক ছেলেরা কোমর বেঁধে লড়াই করতে আসে। তারা বলে, "কি মশাই, আপনারা সব খাটো দেশবুদ্ধি নিয়ে প্রভিন্সিয়ালিজ্‌ম্ প্রচার করছেন? ভারত বলতে আমরা একটা বিরাট সর্ব্বদেশব্যাপী ভারতীয় জাতীয়তা পাই, আর বাঙালী বলতে সেটা হারিয়ে ছোট হয়ে যাই।" আপনি বলুন বাঙালীর জীবনধারা ও সভ্যতার সত্যটা ঠিক, না, ভারতীয় জাতীয়তার বড় culture ও সত্যটা ঠিক!

অর। দু'টোর মধ্যে বিরোধ বা গোল কোন্‌খানটায়? তোমরা ঝগড়া কর কি নিয়ে?

প। আমরা বাঙালী, না, ভারতবাসী?

অর। তোমরা দুই-ই। আমার মাঝে বাঙালীর জীবনের সত্য আছে, ভারতের জীবনের সত্য আছে, আবার জগতের culture এর সত্য আছে। আমি এক বিষয়ে বাঙালী, ভারতবাসী ও জগদবাসী মানুষ। কোনটাকে নষ্ট করে কোনটাই হয় না, একটা ওর ভাল করে ফুটলে আর গুলো সঙ্গেই থাকে। যখন দু'জনে একটা সত্যের দু'টো দিক আলাদা-আলাদা ধরে তর্ক করে তখন দু'জনেই আরও বিষম মিথ্যার গোলকধাঁধায় পথ হারায়।

প। এক সঙ্গে সবগুলির সামঞ্জস্য বলছেন?

অর। বলছি একেরই বহু ভেদ। * * * দু'টো গাছ ঠিক এক রকম হয় না, অথচ তারা একও বটে। এই তো সৃষ্টির ছন্দ (rythm), বহুকে নষ্ট করে এককে গড়া যায় না। * * * Dead level of uniformity—বুদ্ধির (intellect) স্বভাবই তাই, প্যাটার্ণ বা নক্সা কেটে সব সেই প্যাটার্ণে গড়তে চায়।

প। তা সত্যি, প্যাটার্ণ সুন্দর হতে পারে কিন্তু তাতে সত্য নেই।

অর। ঐ শোনো! ঐ তো রোগ। প্যাটার্ণে সত্য নেই কেন? সুন্দরে চিরদিনই সত্য আছে আর সত্যও সদাই চিরসুন্দর। প্যাটার্ণে দোষ নেই, শুধু প্যাটার্ণ বহু হোক, সচল সহজ চিরপরিবর্ত্তনশীল স্বতস্ফূর্ত্ত filexble হোক। consistency is the bugbear of small minds * * * ভারতের শিখ, মরাটা, বাঙালী মাদ্রাজী আদি জাতিগুলি আপন আপন জীবন সত্য সফল করুক সব বিভিন্ন ভাষাগুলি জীবন্ত ও নব-সৃষ্টির শক্তিতে শক্তিধর (Creative) হোক, তা' হলেই হিন্দি ভাষা আপনি আপন জীবন বেগে ফুটতে ফুটতে সমস্ত ভারতের ভাষা হবে। তোমরা যদি ভারতের জীবন-বৈচিত্র্য নষ্ট করতে হিন্দিকে সবার ঘাড়ে চাপিয়ে দাও তা' হলে হিন্দি ভাষা কখনও Creative হবে না হিন্দি ভাষাকে বধ করার অত সহজ পথ আর নাই। The more Bengal is truly herself, the mo

abundantly she builds up true Indian Nationalism—বাংলা যতই আপন জীবন বৈচিত্র্য ও জীবন-সত্য পূর্ণ ও সার্থক করবে, বাংলা যতই অজস্র ধারে বাংলার দান দেবে, ততই সে প্রকৃত ভারতীয় জাতীয়তা গড়ে তুলবে।

প। তা হ'লে কি করা যাবে?

অর। সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি নিয়ে বাঙালী হও না, বাঙালীর জীবন-বিকাশে যা' ভুল-ভ্রান্তি আছে তা' ভারতের ও জগতের সত্য ও culture থেকে সংশোধন করে নাও, কিন্তু তা' করতে গিয়ে বাঙালীর জীবন-ভিত্তি নড়ে না যায়। এ সব জাতিগত জীবন-বৈচিত্র্য একাই সত্যের বহুমুখী দিক (aspects); সে এক এ-সত্যও নয়, ও সত্যও নয় সকলগুলির সমবায়ও নয়, অথচ সবারই মূল সত্য। সে অনির্বচনীয়কে ভাষায় ব্যক্ত করতে গেলেই খণ্ড খণ্ড করে ফেলা হয় মাত্র। ইতি—

তোমাদের সঙ্গের সাথী
বারীন।

এ সংখ্যায় ৪এ চাউলপটি লেন ভবানীপুর থেকে কবি প্রফুল্লময়ী একটি বৈশ্যকুলের অনাথা বিধবা ও ৩টি সন্তানের জন্য দান চেয়ে আবেদন করেছেন, বিজলীর ভিক্ষার ঝুলিতে। আজ-কাল উদ্বাস্তুর যুগে এ রকম অনাথা পথে-ঘাটে পড়ে পড়ে ধুঁকছে মুমূর্ষু সন্তান নিয়ে। প্রতি কাগজে এদের জন্য ভিক্ষার ঝুলির সৃষ্টি হোক। অনেকগুলি অসহায়ের একে একে গতি তা' হলে হয়ে যাবে।

জহর ব্রতের গান

শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী

জ্বাল, জ্বাল্ তোরা ওগো সহচরী, প্রচণ্ড তেজে আগুন জ্বাল্;
গৈরিক বেশে সেজেছে সেনারা, হাতে তুলে নে'ছে কৃপাণ ঢাল।
শত্রু-সেনার হাতের পরশ-লাঞ্ছিত-তনু মোরা না ধ'রি—
অগ্নি-শিখার নৃত্যের তালে অগ্নিকুণ্ডে নৃত্য ক'রি।
পায়ের নূপুর-নিক্কণ শুনো একটু বেতালা বোল না বলে—
আঁখি পরে আঁখি তুলিয়া দেখিও বেদনায় তাহা ভরে না জলে।
সীঁথির সিঁদুর সূর্য্যের মত জ্বল জ্বল্ করে মধ্যাকাশে,
তা'রি খরতেজে শত্রুসেনারা পুড়িয়া মরিবে ভাগ্যনাশে।
রাজপুত-নারী রাজপুত-অরি অংক-শায়িনী স্বপনে নয়,
যা' আসে আসুক, যা' ঘটে ঘটুক, রাজপুতানী সে জানে না ভয়।
মরণ-বেদনা কালিমা তাহার আননে মোদের আঁকিতে নারে,
কত যে সহজে প্রাণ দেওয়া যায় রাজপুত-নারী দেখাতে পারে।
নও-জোয়ানেরা যুদ্ধক্ষেত্রে খেলিতে চ'লিলে রক্তে হোরি—
অগ্নি-সখারে আলিংগনেতে বাঁধিয়া আমরা নৃত্য করি।
কত 'বাদলের' শোণিত ঝ'রেছে বাদলের ধারে এ মরুভূমে,
কত 'গোরা' শেষ-শয়ন ল'ভেছে এই মেবারের পাহাড় চুমে।
এলো আলাদীন রূপের তৃষায় পদ্মিনী নারী লইতে লুঠি—
হায়! মরীচিকা-ছলনায় ভুলি ভরে অঞ্জলি বালুর মুঠি!
রাণা প্রতাপের বীর্য্য-প্রতাপে শাহী-তখ্‌তের শান্তি নাই;
হলদিঘাটের পরাজয়-গাথা জয়-গৌরবে গাহি গো তাই।
সূর্য্যবংশ-সম্ভূত রাণা সূর্য্যের তেজে যুঝিল একা—
প্রাণরক্ষায় মান বিকাবার চিন্তা সে মনে দেয়নি দেখা।
তাঁরি মত মান রাখিবারে, প্রাণ এই মরণের মহোৎসবে—
সঁপিবারে মোরা—পুর-ললনারা—মিলেছি শংখ-উলুর রবে।
বাজাও বাদ্য, সাজাও কুণ্ড,—আগুনের শিখা উঠুক জ্ব'লি,—
বাহুপাশে তারে বাঁধিয়া নাচিব, শেষে তারি কোলে
পড়িব ঢলি।

অন্নপূর্ণা গোস্বামী

মফঃস্বল সহরের বেল-হাসপাতাল যেন তটস্থ হয়ে উঠেছে। যত উদ্বেগ আর শঙ্কা, তত সতর্কতা। পাণ থেকে চুণটুকু যেন না খসে,—অনুষ্ঠানের ত্রুটি-বিচ্যুতি না ঘটে যায়।

হাসপাতালের অফিসার-ওয়ার্ডে য়্যাকাউন্টস্ বিভাগের বড় সাহেবের স্ত্রী ভর্তি হয়েছেন।

ডিষ্ট্রিক্ট মেডিক্যাল অফিসার দিনে বার দুই তাঁকে পরীক্ষা করছেন। ইন্‌ডোর য়্যাসিস্‌ট্যান্ট সার্জন রোগিণীর তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ম্যাট্রন চঞ্চল, নার্সেরা তটস্থ;—ওয়ার্ড-য়্যাটেণ্ডেণ্ট, আয়া জমাদার ছুটোছুটি করতে করতে হিম্‌-সিম্‌ খেয়ে যাচ্ছে।

কে জানে, কোথায় পাণ থেকে চুণটুকু খস্‌বে,—রিপোর্ট আর চার্জসীট; জবাব আর কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণান্ত হতে হবে আর কী—হস্‌পিট্যাল ষ্টাফের উদ্বেগ আর আশঙ্কার অন্ত নেই যেন। উদ্বেগ আর শঙ্কার অন্ত নেই য়্যাকাউন্টস্‌ অফিসারের। ভিজিটিং আওয়ারে আসছেন, ঘন ঘন টেলিফোনে খবরাখবর করছেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর স্ত্রীর প্রথম সন্তান হবে।

উৎকণ্ঠা বৈ কি! ফুল শুকিয়ে চুপসে গিয়েছে, ফল ধরা কী আর সহজ কথা? ডিষ্ট্রিক্ট মেডিক্যাল অফিসার পেসেণ্টকে ভর্তি করে নিয়ে বোস সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—"একটিও ইস্যু কী আর আগে জন্মায়নি?"

"বিয়ে তো করবই না ভেবেছিলুম"—বিষণ্ণ হাসি হাসতে লাগলেন বোস সাহেব। "এই তো সেদিন রাঁচী স্বাস্থ্য পরিবর্তনে গিয়েছিলুম" —বিষণ্ণ হাসি এবার প্রফুল্ল হয়ে এল বোস সাহেবের পুরু ঠোঁটের রেখায়,—চশমার কাচ ঝিকিয়ে উঠলো সুখের শিহরণে।

মেডিক্যাল অফিসার বললেন—"মিসেস বোস শিবের তপস্যা ভেঙ্গে দিলেন আর কী?"

তিনি বলেন, "আমিই তাঁর তপস্যা ভেঙ্গেছি"—বোস সাহেবের কণ্ঠ উচ্ছল হয়ে উঠেছে—"ইস্কুলে পড়াতে পড়াতে নাকি তাঁর মগজের রস-কষ একেবারে শুকিয়ে গেছলো"।

"পঁয়ত্রিশ বছরে প্রথম সন্তান"—মেডিক্যাল অফিসার মিঃ বোসকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন—"নরম্যাল ডেলিভারি হয়তো হবে না—হয়তো ফরসেপ, হয়তো অপারেশন, তবে প্রসূতিকে রক্ষা করতে তাঁরা পারবেন।" এইমাত্র মেডিক্যাল অফিসার পেসেণ্টের বেড্‌ রাউণ্ড দিয়ে এলেন। পেলভিসিটারে পেলভিসের মেজারমেণ্ট নিলেন,—আনুষঙ্গিক পরীক্ষাগুলিও সেরে ফেলেছেন।

ইন্‌ডোর য়্যাসিস্‌ট্যান্ট সার্জন প্রত্যহের চার্ট নিয়ে নিজের অফিস-রুমে ফিরে এসেছেন।

রেজিষ্টার-খাতার দিকে য়্যাসিস্‌ট্যান্ট সার্জন ডাক্তার সবিতৃ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন, "মিসেস বসু"। না প্রান্তিকাকে চিনতে ডাক্তার সবিতৃর একটুও ভুল হয়নি।

হোক না বিশ বছরের ব্যবধান,—কত স্মৃতি ফিকে হয়ে আসে, কত স্মৃতি নিঃশেষে মুছে যায়। আবার কত স্মৃতি স্মরণের পৃষ্ঠায় অগ্নি-অক্ষর বিকীর্ণ করে। চমকপ্রদ কাহিনী বীভৎস আর বিচিত্র কাহিনী স্মৃতিপটে স্মরণের স্বাক্ষর রাখে।

সেদিনও প্রান্তিকা মেডিক্যাল কলেজ-হসপিট্যালে ফিমেল ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিল। পনেরো বছরের কিশোরী মেয়ে, আজকের মত ভারীক্কে হয়ে ওঠেনি, গালের চামড়ায় টান ধরেনি, চোখের কোলে এত কালী জমা হয়নি, ঠিক ফুলের পাপড়ির মত পাতলা ফিন্‌ফিনে চেহারা, কাজলটানা চোখে স্বপ্নের অঞ্জন মাখানো, কালো ভোমরা চুলগুলি পিঠে ছড়িয়ে থাকতো।

ফিমেল ওয়ার্ডে সেদিন কী কান্নাই না কাঁদতো প্রান্তিকা, ওর ফর্সা ধবধবে গালে চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তো। নতুন মেডিক্যাল ষ্টুডেণ্ট, পল্লীগ্রাম থেকে এসেছি—কী বা বুঝি? মিডোয়াইফেরী প্রফেসরকে অ্যাসিষ্ট করতে ফিমেল ওয়ার্ডে যেতুম, কুমারী প্রান্তিকা কাঁদতো, ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতুম।

প্রফেসর বাগচী ওকে খুব স্নেহ করতেন। চোখের জল নিজের রুমালে মুছিয়ে দিয়ে বলতেন "ছিঃ, কান্না কেন? মানুষ ভুল করে

তুমিও অজ্ঞাতে ভুল করে ফেলেছ। এ কথা কেউ কোনও দিন জানবে না—কুমারী মেয়ে এখানে সে কথা আর জানছে কে? না কিশোরী কালের এ হঠাৎ পা-পিছলে যাওয়া কেউ কোনও দিন জানতে পারবে না।" ডাক্তার সবিতৃ রেজিষ্টার খাতা সরিয়ে রাখতে রাখতে মৃদু হাসলেন—পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে প্রান্তিকার প্রথম সন্তান হবে; হয়তো ফরসেপ ডেলিভারী হয়তো অপারেশন, মেডিক্যাল অফিসারের নির্দেশ মত যন্ত্রপাতিগুলি গোছগাছ করতে ডাক্তার সবিতৃ তৎপর হয়ে উঠলেন।

"স্যর, একবার ভেতরে আসতে পারি?"

ডাক্তার সবিতৃ অস্ত্রোপচার আলমারীর সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন, না প্রান্তিকা তাঁকে চিনতে পারেনি, চিনবেই বা কেমন করে? সেদিনের তরুণ ছাত্র আজ বিজ্ঞ ডাক্তার, চল্লিশ পার হয়েছে, ঘন কালো কোঁকড়ানো চুলে সাদা পাক ধরেছে—

আবার বাইরে থেকে ম্যাট্রন বললে—"স্যর একবার ভেতরে আসতে পারি—"

"আসুন সিষ্টার" ডাক্তার সবিতৃর চিন্তার তার কেটে গেল, টেবলের সম্মুখে চেয়ারে উপবেশন করে জিজ্ঞাসু চোখে ম্যাট্রনের দিকে তাকালেন।

"স্যর, নার্সদের ডিউটিটা একটু চেঞ্জ করতে হবে"। ম্যাট্রনের চোখের তারায় উদ্বেগ আর শঙ্কা ঘনীভূত হয়ে উঠেছে "মিস্ লিলিয়ান মিসেস বোসের ঘরে গেলে আর আসতে চান না, মিসেস বোস ওর সঙ্গে গল্প করেন, আর এদিকে কাজ সব সামলানো যায় না—"

সবিতৃ উত্তর দেবার আগেই টেবলে টেলিফোন বেজে উঠলো, সবিতৃ রিসিভার কানে তুলে নিলেন, মিঃ বসু স্ত্রীর খবরাখবর করছেন। ম্যাট্রন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

* * * *

ম্যাট্রনের যাকে নিয়ে উদ্বেগ আর শঙ্কার অন্ত ছিল না—তাকেই প্রান্তিকা জড়িয়ে ধরলেন সস্নেহ অনুরাগে।

কুড়ি বছরের মেয়ে লিলিয়ান নার্স,—নার্স-সুলভ লাবণ্য মাখানো চেহারা, নার্স-সুলভ সুমিষ্ট ব্যবহার।

"নার্সিংটা নিছক জীবিকা নয়, রোগীর জীবন"; এ কথাটা বুঝেছে একমাত্র মিস লিলিয়ান" প্রান্তিকা সেদিন ভিজিটিং আওয়ারে স্বামীর কাছে লিলিয়ানের প্রশংসা করছিলেন।

মিঃ বোস্ বললেন—"ক্রিশ্চান মেয়েরা সেবাধর্মটাকে সর্বজনীন করে নিতে পেরেছেন, আমাদের মেয়েদের এখনও সংস্কার কাটেনি,—জড়তা কাটেনি—"

এর পর মিঃ বোসের অনুরোধে ডিষ্ট্রীক্ট মেডিক্যাল অফিসার লিলিয়ানকে অফিসার ওয়ার্ডে স্পেশ্যাল ডিউটি দিয়ে দিয়েছিলেন।

লিলিয়ানের পাতলা ঠোঁটে মিষ্টি হাসিটুকু সুন্দর দেখাচ্ছে। প্রান্তিকার রুক্ষ চুলের গোছায় চিরুণী টানতে টানতে লিলিয়ান বলছিল—"হ্যাঁ, অরফ্যানেজেই আমি মানুষ হয়েছি—লেখাপড়া শিখেছি, তার পর তারাই আমাকে ক্যাম্পবেল হস্‌পিট্যাল থেকে ট্রেণিং দিয়ে চাকরীতে ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

নিরুত্তর প্রান্তিকা, আর কী বা তিনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন? শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে ওর কালো ভ্রমর চুলের দিকে দেখছেন।

ভিজিটিং আওয়ার। মিঃ বসু হাসিমুখে ঘরে ঢুকলেন।

জিজ্ঞেস করলেন স্ত্রীকে—"কেমন লাগছে সুইট-হার্ট?" মিঃ বোস অফিসার মানুষ,—ইংরেজী আদব-কায়দাতেই চলেন।

প্রান্তিকা হাসলো। মৃদু গলায় বললো—"ব্যথা যেন আসছে মনে হচ্ছে—"

"ব্যথা—" হয়তো আনন্দে হয়তো উদ্বেগে চীৎকার করে উঠলেন মিঃ বসু—"লেবার পেন—"

এর পর রেল-হাসপাতাল যেন তটস্থ হয়ে উঠলো।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে য়্যাকাউন্টস্ অফিসারের স্ত্রীর প্রথম সন্তান হবে।

যত শঙ্কা—তত উদ্বেগ,—সতর্কতার অন্ত নেই যেন।

মেডিক্যাল অফিসার প্রান্তিকার গর্ভস্থ সন্তানের পজিসন নিচ্ছেন, হার্টের-প্যালপিটেশন শুনছেন—য়্যাসিসট্যাণ্ট সার্জ্জেন সবিতৃ অন্যান্য চার্ট গ্রহণ করছেন।

[illegible] করছে—"নরম্যাল ডেলিভারী কী আর হবে?"

"ফুল তো শুকিয়ে চুপসে গিয়েছে—ফল বের করা কঠিন।"

নার্সেরা চঞ্চল—হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছে,—ওয়ার্ড-য়্যাটেণ্ডেণ্ট, জমাদার ও আয়া তটস্থ হয়ে রয়েছে।

উদ্বেগ আর শঙ্কার অন্ত নেই যেন—যদি পাণ থেকে চূণটুকু খসে—চাকরী নিয়ে টান পড়বে।

উদ্বেগ আর শঙ্কার অন্ত নেই মিঃ বোসের,—পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে স্ত্রীর প্রথম সন্তান হবে। মুকুলিত পুষ্পের ফল দান করবার সময় যে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। কে জানে, কী যে অঘটন ঘটবে!

ভিজিটিং রুমে ঘন ঘন চুরুট টানতে লাগলেন মিঃ বোস, লেবার রুম থেকে আর্ত চীৎকার তাঁর উৎকর্ণ শ্রুতিমূলে ধাক্কা দিতে লাগলো।

* * * *

মফঃস্বলের রেল-হাসপাতাল আবার নিঝুম নিস্তব্ধ।

অফিসার-ওয়ার্ডে তালা ঝুলছে।

ফরসেপ ডেলিভারী নয়, অপারেশন নয়, একেবারে নরম্যাল ডেলিভারী।

প্রান্তিকার একটি ছেলে জন্মেছে।

লিলিয়ান নব জাতককে ছাড়তে আর চায় না—না কাঁদতেই ওকে তুলছে, ওর কাপড় বদলাচ্ছে—চুমু খাচ্ছে, পাউডার ঘষছে।

প্রান্তিকা ওকে জিজ্ঞেস করলেন—"কী রে লিলি, তুই যাবি আমার সঙ্গে? খোকাকে রাখবি?"

ইদানীং প্রান্তিকা ওকে তুই বলতে সুরু করেছেন।

লিলিয়ান সম্মতি জানালো।

"বাঃ রে, তোর যে সরকারী চাকরি—" প্রান্তিকা রক্তশূন্য ফোলা-ফোলা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

"আমি তো আর যন্ত্র নই"—অভিমান-রুদ্ধ গলায় লিলিয়ান বললো, "সকলের আত্মীয়-স্বজন আছে—আমার কেউ কেই—"

মিঃ বসু সব শুনে বললেন—"বেশ তো, মিস লিলিয়ান চলুক আমাদের সঙ্গে—খোকার তো একজন নার্স দরকার—"

ডেলিভারীর দিন সাতেকের মধ্যে প্রান্তিকা হস্‌পিট্যাল ছাড়লেন,—দিন সাতেকের মধ্যে লিলিয়ানের রেজিগ্‌নেশন চিঠিও মঞ্জুর হয়ে এল। খুশীর আর অন্ত নেই মিঃ বোসের—নিঃসন্তানটেই

পুত্র-সন্তান তিনি লাভ করেছেন। দুর্ভাবনার তাঁর অন্ত ছিল না। উঃ, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে প্রথম সন্তান! ফুলের তো ফলদানের শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল।

উঃ, হসপিট্যাল ষ্টাফ খুব খেটেছে তাঁর স্ত্রীর জন্যে,—হস্‌পিট্যাল ষ্টাফের প্রতি কৃতজ্ঞতার আর অন্ত নেই মিঃ বসুর, মেডিক্যাল অফিসারের ঋণ পরিশোধ করবার নয়।

মিঃ বসু মেডিক্যাল অফিসারকে একটি পার্কার কলম উপহার দিয়ে গেলেন। সাবোর্ডিনেট ষ্টাফকে টি-পার্টি দেবার জন্যে এক শ' টাকা দিলেন।

মিনিয়ালস্‌ ষ্টাফদের গোটা কুড়ি টাকা বখশিস দিয়ে গেলেন। প্রাপ্তিকা একখানা ক্ষুদ্র চিঠি অ্যাসিসট্যাণ্ট সার্জনকে দিয়ে গিয়েছেন। এতক্ষণ ডাক্তার সবিতৃর চেম্বারেই ম্যাট্রন নার্সদের গল্পগুজব চলছিল।

কিছুক্ষণ আগে প্রাপ্তিকা হস্‌পিটাল ত্যাগ করে গিয়েছে।

ম্যাট্রন বললো—"লিলিয়ানের ভাগ্য ফিরে গেল, কালে গভর্নেস হয়ে যাবে—"

একজন নার্স প্রতিবাদ জানালো—"সরকারী চাকরিটা ছাড়া উচিত হয়নি"—আর একজন নার্স বললো—"আহা মানুষ তো আর যন্ত্র নয়, যদি মায়া মমতা, ভালোবাসা পায় মন্দ কী"—

ডাক্তার সবিতৃ নিরুত্তর। একমাত্র তিনি জানেন নিছক নার্সের আকর্ষণেই প্রাপ্তিকা লিলিয়ানকে নিয়ে যায়নি—আরও গভীরতর আকর্ষণ রয়েছে, সঙ্গোপন আকর্ষণ রয়েছে।

ডাক্তারের সঙ্গে টি-পার্টি সম্বন্ধে আলোচনা করে ম্যাট্রন ও নার্স কয়েক জন অফিসরুম থেকে চলে গিয়েছে।

সবিতৃ এবার প্রাপ্তিকার চিঠিখানা বের করলেন।

"ডাক্তারবাবু—বিচিত্র মানুষ আপনি! বিশ বছর আগেও আপনাকে দেখেছিলুম, এমনই নীরব,—বিশ বছর পরেও আপনি ঠিক তেমনি নীরব।

আপনার সুন্দর চোখ দুটির নীরব ভাষা বলে দেয়—আপনি সব উপলব্ধি করেন, অনুভব করেন—কিন্তু কথা আপনি বলেন না।

আপনার মহত্ত্ব আপনার উদারতা স্মরণ করবার মত।

আপনি সেদিন ছিলেন ষ্টুডেণ্ট—আজ বিজ্ঞ চিকিৎসক!

এ হাসপাতালের একমাত্র আপনি বুঝতে পারলেন—লিলিয়ানকে আমি কেন নিয়ে গেলুম।

বিচিত্র আপনি!

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি

প্রাপ্তিকা বসু।"

ডাক্তার সবিতৃ চিঠিখানা ভাঁজ করতে করতে মৃদু হাসলেন—প্রাপ্তিকা তাঁকে ঠিকই চিনতে পেরেছেন—ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে কতকটা আপন-মনেই ডাক্তার বললেন—"বিচিত্র ঠিক নই আমি,—বাইওলজিক্যাল ফ্যাক্টের দিক থেকে জীবনকে বিচার করি, তাই বিচিত্র কিছুই মনে হয় না। মনে হয় এ তো স্বাভাবিক। বিচিত্র নয়—সহজ, স্বচ্ছন্দ, সাবলীল।"

পলাতক

আনন্দ বাগচী

অন্ধকারে যত বার ফিরে আসো ঠিক লাগে হাওয়া
ছদ্ম চোখে-মুখে, যত ডুব দাও মেঘে মেঘে ছাওয়া
রাত্রির তলায় তুমি, সময় তোমার নাম জানে
নিজেকে হারাতে তুমি পারো না পারো না কোনখানে।
যতই ফেরাও পিঠ রৌদ্র-জ্যোৎস্না আঁকা পৃথিবীর
চটুল চোখের দিকে, এই নর-নারীর শিবির
যতই বর্জন করো পলাতক, তোমার স্পর্দ্ধাকে
বিস্ময় করে না ক্ষমা, পাকে পাকে ক্লান্তি ঘিরে থাকে।
দিগ্বলয় দগ্ধ হয়, ইতিহাস ধূসর অক্ষরে
কথা কয়, মুখোমুখী কালের আয়নায় ছবি পড়ে
আবার রাত্রির পুরু ছাই এসে ছবি মুছে দেয়
তুমিও যেখানে থাক আমিও সেখানে; কে যে নেয়
অমূল্য মুহূর্তগুলি আমাদের বিস্ময়ের লোকে,
রোদ্দুরের বঁড়শী বেঁধে পলাতক তোমার দু' চোখে॥

যশ পাল

পেশোয়ার থেকে গোপনে চরস আমদানী তখন এমনি ভয়ানক হয়ে ওঠে যে, অপরাধীকে খুঁজে বের করার জন্য পুলিসের নাকালের অন্ত ছিল না। দিনে-রাতে বিশ্রাম যেমন ছিল না তেমনি হতে পারছিল না নিশ্চিন্ত। নেশার জিনিসের গোপন ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তারের মধ্যে বুদ্ধির যে মৌলিকতা রয়েছে তা অন্য কোন বিভাগে আছে কি না সন্দেহ! কি ভাবে কোন্ জিনিসের মধ্যে যে লুকিয়ে রাখে তা কে বলতে পারে?

লাহোরের মেন ষ্টেশনের ধারে পায়চারী করতে করতে পেশোয়ার এক্সপ্রেসের যাত্রীদের ব্যস্ততা লক্ষ্য করছিলাম। এমন সময় আপাদ-মস্তক সাদা চাদরে ঢেকে এক বুড়ী কিছুটা দ্বিধা-জড়িত পদক্ষেপে আমার সামনে দিয়ে পার হয়ে গেল। তখনি তাকে একটু সন্দেহ না করে পারলাম না। দীর্ঘ দিন পুলিসের কাজে এটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে যে সন্দেহ করবার কোন প্রত্যক্ষ কারণ না থাকলেও প্রতি ক্ষেত্রে সন্দেহ করা উচিত। কত বার বোরখা-পরা ভদ্রমহিলাদের মাল-পত্রের সাথে পাওয়া গেছে বিস্তর চরস। কোন ঝানু ব্যবসায়ী হয়ত ঐ বুড়ীকে দিয়ে দু'-চার সের চরস গোপনে বের করে আনবার মতলবে সে নেই, তাই বা কে বলতে পারে?

'এই বুড়ী, এদিকে আয় দেখি!'—গম্ভীর গলায় আমি ডাকলাম তাকে। এক হাতে নিজের ছোট্ট পুঁটলী, অপর হাতে শরীর-ঢাকা চাদরটা সামলাতে সামলাতে বুড়ী পিছন ফিরে আমার দিকে একবার তাকালো শুধু; তার পর যেমনি হাঁটছিল তেমনি হাঁটতে লাগল—যেন আমার ডাক সে শুনতেই পায়নি।

সন্দেহ ক্রমে জমে উঠল। এবার একটু ভয় দেখিয়ে ডাকলাম—'এদিকে শোন্ শীগগির!'

তবু তার হাঁটার গতির কোনই পরিবর্তন হোল না। আমার ডাক যেন বোঝেওনি আর শোনেওনি। এবারও সে আমার দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে হেঁটে চলল। শেষে সঙ্গের সেপাইকে দিয়ে তাকে ধরে আনালাম।

তার ছোট্ট পুঁটলীর ওপর রুলের বাড়ি মেরে বলি—'কি আছে এতে?'

হাত-পা আর চোখ-মুখ নেড়ে আবোল-তাবোল কি যে বলে গেল তার একটি বর্ণও হৃদয়ঙ্গম হোল না। তার চালাকি বুঝতে পেরে পুশ্‌তো ভাষায় আবার জিজ্ঞেস করি, ব্যাকুল ভাবে বিড়-বিড় করে যা বলল এবারও তার কিছুই বুঝতে পারলাম না।

ধৈর্য্যের বাঁধ বুঝি বা ভেঙ্গে পড়ে। একবার মনে হোল বুড়ী হয়ত পাগলের অভিনয় করছে, না হয় পুশ্‌তো বা পাঞ্জাবী কোন ভাষাই বোঝে না, তাই অন্য কোন ভাষায় কথা বলছে। সঙ্গে সেপাইটি তাকে জোর করে বোঝাবার আশায় বেশ চীৎকার করে বলল—'এতে কি আছে শীগ্‌গির বল!'

তবুও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

মনে মনে আমি ভেবে চলি, বুড়ী যদি নেশাই [illegible] পেশোয়ার এক্সপ্রেসে চড়ে এত রাতে একলা এখানে এলো কি করে? আর কি দরকারই বা আছে এই লাহোরে? [illegible] খাতিরে বুড়ীকে কাশ্মীরী বলে না হয় ধরা গেল কিন্তু এই পোঁটলীতে যে চরস নেই তা কেউ জোর গলায় বলতে পারে? কিংবা অন্য কোন গুপ্ত রহস্য?

আবার এও তো হতে পারে, মেয়ে-বেচা ব্যবসায়ী কাশ্মীর দালাল কেউ? ঐ ছোট্ট পুঁটলীটা যে ভাবে আঁকড়ে ধরে আছে তাতে বেশ সন্দেহ জাগে মনে।

সঙ্গের সেপাইটি কাশ্মীরী ভাষার অজ্ঞতা প্রকাশ করে বলল—'কিথে গাস্সা?' (যাচ্ছো কোথায়?)

বুড়ী এবারও নিরুত্তর রইল।

সেপাইটির ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গার উপক্রম হোল। আমার দিকে ফিরে বেশ একটু উত্তেজিত স্বরে বলল—'বাবু, এ নিশ্চয়ই শয়তানী করছে, অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

একটু ভেবে নিয়ে আদেশ দিলাম—'একটা টাঙ্গায় চাপিয়ে একে বড় কনষ্টেবলের কাছে নিয়ে যাও।'

কনেষ্টবল পীর হোসেন জাতিতে কাশ্মীরী। সৈয়দ সম্প্রদায়ে জন্মাবার ফলে আধ্যাত্মিক প্রভাব তার জীবনে প্রচুর। তাকে ডেকে এই বুড়ীর সাথে কথা চালাবার নির্দেশ দিলাম।

পীর হোসেন তার দিকে এগিয়ে এসে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন কথা বলল। সংগে সংগে দেখলাম, বুড়ীর চোখে-মুখে ভয়ের লেশমাত্র চিহ্ন নেই। পীর হোসেনের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বুড়ী তার ময়লা চাদরের এক প্রান্ত দিয়ে চোখের কোণ দুটো মুছতে মুছতে হড়-বড় করে কি যেন বলে গেল।

পীর হোসেন আমাকে জানালো, স্ত্রীলোকটি তার স্বামীর খবর জানতে চাচ্ছে। তাকে খুঁজে বের করবার জন্যেই পেশোয়ার এক্সপ্রেসে সে এখানে এসেছে। অনেক বছর আগে নিজের ভাগ্যকে ফেরাবার আশায় সে এখানে এসেছিল কিন্তু আর ফিরে যায়নি। কত চিঠি লিখেছে, কত খবর পাঠিয়েছে কিন্তু সবই বৃথা পণ্ডশ্রম হয়েছে। তাই সে নিজে এসেছে তাকে নিয়ে যেতে, আর নিয়ে যাবেই।

পীর হোসেনের কথাগুলো মন দিয়ে শুনে আমি বললাম—'স্বামীর খোঁজ পরে করা যাবে, এখন ওর পুঁটলীটা খোল দেখি।'

পীর হোসেন দুর্বোধ্য ভাষায় আমার আদেশ তাকে জানিয়ে দিল। তার কথায় বেশ সংকুচিত হয়ে বুড়ী পুঁটলী খুলে ফেলল। দেখলাম তাতে রয়েছে, একটা ছেঁড়া আর ময়লা চাদরের কোণে বাঁধা অনেক দিনের বাসি ভুট্টার রুটির গুঁড়ো; কাশ্মীরী কায়দার পুরানো এক ওয়েষ্ট কোট—জায়গায় জায়গায় যে-সব বিশ্রী ফুল আর লতাপাতা আঁকা আছে তা যেন কাশ্মীরী সূচীশিল্পকে ব্যঙ্গ করছে। তাতে আবার গোল গোল কাচের টুকরোও বসানো। নিতান্ত অনিচ্ছায় ওয়েষ্ট কোটের ভাঁজ খুলতেই দেখলাম কাপড়ের মধ্যে লুকানো আছে একটা ছোরা। অনেক ভরসা দেবার পর ছোরাটি বের করল কিন্তু প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেও ছোরা রাখার আসল উদ্দেশ্য জানা গেল না।

নিজের গাঁয়ের বাইরে যে কোন দিন পা দিল না, সে একা কি করে লাহোরে এলো? যদিও জানিয়েছে স্বামীকে খুঁজে বের করতে এসেছে কিন্তু ঠিকানাও জানে না, আবার তাকেও চেনে না কেউ! তার ওপর সঙ্গে রয়েছে পুরুষের ওয়েষ্ট কোট আর একটা ছোরা...?

ব্যাপারটা যে জটিল আর ঘোরালো, সে সম্বন্ধে আমার আর কোন সন্দেহ রইল না। তাই পীর হোসেনকে বললাম—'এ স্ত্রীলোক নেহাত বোকা নয়। আবার যদি কোন ভয়াবহ মামলার ফেরারী হয় তাতেও আশ্চর্য হবার নেই!—একে গ্রেপ্তার করাই উচিত।'

স্ত্রীলোকটিকে পুলিসের হেপাজতে দিয়ে আমি অন্যান্য কাগজপত্রে মন দিলাম। মাঝে মাঝে ফাইল থেকে মুখ তুলে দেখি, ওরা কি করছে। পীর হোসেন ধৈর্য্যের সঙ্গে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে চলেছে আর বুড়ী অঝোর ঝোরে কাঁদছে। এখন আমার বাধা দেওয়া উচিত হবে না ভেবে চুপ করে রইলাম। অনেকক্ষণ সান্ত্বনা দেবার পর বুড়ী শান্ত হয়ে চোখের জল মুছে বলতে সুরু করল তার কাহিনী—

শ্রীনগর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে বৈরীনাগের কাছাকাছি এই বুড়ীর বাড়ী। সেখান থেকে প্রায় আড়াই শ' মাইল পায়ে হেঁটে জম্মুতে আসে। তারপর নানা জায়গায় খুঁজে, নানা ষ্টেশন ঘুরে এখানে এসে পৌঁছেছে, স্বামীর ঠিকানা জানে না, তবে জানে শুধু যে, সে এখানেই আছে।

'ঠিকানা জানিস্ না, তবে স্বামীকে খুঁজে বের করবি কি করে?'—আমি ধমকে উঠি—'হয় ও ওর স্বামীর ঠিকানা জানে, না হয় অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে।'

তার পর নিজের সহানুভূতি প্রকাশ করে এবং দেড় ঘণ্টা প্রশ্নবাণে জর্জরিত হবার পর স্ত্রীলোকটি যা বলেছিল পীর হোসেনের মারফৎ শুনলাম—

'তিরিশ বছর আগে গাঁয়ের অন্যান্য যোয়ান মরদদের সাথে আমার স্বামী ফজ্জু, ভাগ্য ফেরাবার আশায় এখানে এসেছিল। তখন আমাদের যা ছিল দান-ধ্যান করেও অনেক বাঁচতো। আট-দশটা মহিষ, দশ-বারো বিঘা জমি, নানা রকম ফলের গাছের সারি—পরিশ্রম করে খাটলে এর থেকে অনেক টাকা পাওয়া যায়। তার মা-ও তাকে কত বোঝালো। আমার বয়স তখন কুড়ি। আমাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে বলল—'খুবাণি গাছে ফুল ফোটার আগেই সে ফিরে আসবে। লাহোরের রাস্তায় নাকি চাঁদির টাকা ছড়ানো আছে; সবাই কুড়োতে যাচ্ছে আর সে-ই বা যাবে না কেন?'

'আমি কাঁদতে লাগলাম। তাতে কোন ফল হোল না। সে চলে এলো লাহোরে। শাশুড়ী রাগ করে বলতেন—'কাজে যখন লাগল না তখন ও ছেলে না জন্মালেই সুখী হতাম।'

'বছর ঘুরে এলো। ক্রমে ক্রমে পার হোল আরো কয়েকটা বছর। বরফ গলতে সুরু হয়, ভিন দেশ থেকে ফিরে আসে লোকেরা কিন্তু আমার স্বামীর আর আসার আশা নেই। এমনি ভাবে কেটে গেল আরো দুটো বছর। পাশের বাড়ীর হাবলার স্বামী রহমন লাহোর থেকে ফিরে ফজ্জার একটা চিঠি দিল আমাকে। তাতে লেখা—পুলিশ অনর্থক আমাকে আটকে রেখেছে। কিছু টাকা পেলে ছেড়ে দেবে।

'শাশুড়ী আর আমি দিন-রাত কাঁদতে থাকি। শেষে দুটো মোষ বিক্রী করে চল্লিশ টাকা পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু মন স্থির হোল না। শাশুড়ীকে লুকিয়ে ডাকঘরের পিওনকে দিয়ে তাকে চিঠি দিলাম—পত্রপাঠ যেন চলে আসে। শাশুড়ীর ভীষণ শক্ত ব্যামো। দিন-রাত কাঁদেন আর আমায় কেবল বকেন। তাঁর ধারণা আমি নাকি তাকে তাড়িয়েছি। আমার ভীষণ ভয় করছে, সে যেন শীগ্‌গির চলে আসে। তাছাড়া ক্ষেত-খামার দেখা একলার পক্ষে সম্ভব নয়।

'রসিদ আর চিঠির জবাব এসেছিল?'—পীর হোসেনের কথায় হঠাৎ বাধা দিয়ে উঠলাম আমি।

'টাকার রসিদ এসেছিল ঠিকই কিন্তু চিঠির কোন জবাব আসেনি।'

আমাকে বিশ্বাস করাবার জন্য ওয়েষ্ট কোটের পকেট থেকে তিনটে রসিদ বের করে দেখালো।

'বছরের পর বছর কেটে যায় কিন্তু ফজ্জা আর ফেরে না। যারা বেশী রোজগারের আশায় অমৃতসর থেকে লাহোরে যেতো তাদের কাছে মাঝে মাঝে ফজ্জার খবর পেতাম। কখনও শুনি, তাকে নাকি পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে, কখনও বা চাকরী হবার কথা, আবার কখনও দোকান করে বড়লোক হবার কথা। শাশুড়ী আর বেশী কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মরে গেলেন। আমি একেবারে অসহায় হয়ে পড়লাম। ফারুর বিয়ে আমার অনেক পরে হয়েছিল; হাবলার নাতি হয়ে গেল।

'এমনি করে ন' বছর কাটার পর লাহোর থেকে একজন ফলওয়ালা নিয়ে এলো। চিঠিতে জানিয়েছে তার নাকি ভীষণ অসুখ; হাতে একটা পাই পর্যন্ত নেই। ভীষণ কষ্টে আছে...কিন্তু টাকা পেলেই চলে আসবে।

'আবার একটা মোষ বিক্রী করলাম। পাগ্‌লুকে দুটো আখরোটের গাছ জলের দরে বিক্রী করে চল্লিশ টাকা পাঠালাম। সেই সাথে এবারও ডাক-পিওনকে দিয়ে চিঠি লিখি—'তোমার মা মারা গেছেন। আমি এখন একলা পড়ে গেছি। তার ওপর গাঁশুদ্ধ লোক এখন

একঘরে করেছে—যার স্বামী নিরুদ্দেশ তার আবার জায়গা কোথায়? কেউ ফসল কেটে নিয়ে যায়, কেউ বা গাছের ফল। কেবল ভয় হয় আমি বোধ হয় অকেজো হয়ে পড়ব। টাকার আর দরকার নেই—শীগ্‌গির বাড়ী ফের।

'এবার কিন্তু চিঠির উত্তর এলো। ফজ্জা লিখেছে—কিচ্ছু ভাবনা কোর না। আমি শীগ্‌গির বাড়ী গিয়ে তোমাকে এখানে নিয়ে আসব। লাহোরের মত জায়গা হয় না। তাই এখানকার ব্যবসা কিছুতেই ছাড়া চলবে না—কি বল?'

'আমি আবার লেখালাম—ওখানে ব্যবসার দরকার নেই, বাড়ীতে থাকলেই হবে। ক্ষেতের আর জন্তুর ক্ষতি হয়েছে বিস্তর;—শুধু তুমি চলে এসো।

'কিন্তু না এলো চিঠির উত্তর, না এলো ফজ্জা নিজে। এদিকে বার কয়েক অসুখে আমাকে একেবারে অকেজো করে ফেলল। ঘরে আর কেউ থাকতে চায় না, কেবল মামচু জল দিয়ে যেতো আর মোষ দেখতো। এমনি ভাবে কাটলো দু'টি বছর। একদিন মামচু বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসে বলল—যত দিন শক্তি ছিল কাজ করেছিস এখন তো বুড়ী হতে চলেছিস্; আর পাঁচ-ছ' বছরের মধ্যে শুধু হাড় ছাড়া আর কিছু থাকবে না। তার চেয়ে আমাকে বিয়ে কর। আমার দুই ছেলে আছে, তারাই আমাদের খাওয়াবে। আর যদি তোর ছেলেপুলে হয় সে তো ভালো কথা। কিন্তু···

'আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম—ফজ্জা আমার স্বামী, ও ঠিক আসবেই। আবার আমরা ঘর করব।

'তিন বছর পর ফজ্জা চিঠি লিখে জানালো কোন মহাজনের দেনা শোধ দিতে না পারার জন্য জেল হয়েছে। তিরিশ টাকা পাঠাবার কথা লিখতে ভোলেনি। জমি বন্ধক রেখে টাকা পাঠিয়ে এবার লিখলুম—'তোমার ঘর-বাড়ী জমি-জমা সব যেতে বসেছে, এমনি ভাবে ভিন দেশে কাটালে চলবে কি করে? অন্য সবার জোয়ান ছেলে ঘরে বসেই টাকার পাহাড় করে চলেছে আর তুমি ভিন দেশে ঘুরে ঘুরেই কাটালে?'

'কেউ এলো না!—এমন কি চিঠির জবাবও। পরে শুনলাম ও নাকি আবার একটা বিয়ে করেছে। তখনি লিখলাম দু'জনকে আসার জন্য। আমার কোন আপত্তি নেই বরং দাসীগিরি করে তাদের সেবা করব। দু'বেলা দু'টুকরো রুটি ছাড়া আর কিছু চাইবার নেই।

'কেউ এলো না। এদিকে আমি ক্রমেই অথর্ব হয়ে পড়ছি, ক্ষেত-খামার দেখা বা রান্না করা হয়ে ওঠে না। আর করবই বা কার জন্য? আমার বেঁচে থাকারই বা মূল্য কোথায়? যার জন্য দীর্ঘ তিরিশ বছর তিল তিল করে সমস্ত যন্ত্রণা সয়ে এসেছি আজ তাকে খুঁজে বের করে নিয়ে যাব। আমার ছেলে-মেয়ে নেই, তাতে ক্ষতি কি? শেষ ক'দিন এক সাথে থাকব। যে আগে যাবে পরের জন তার কবরে মাটি দেবে।'

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল বুড়ী। আমি আর এবার তাকে ধমক দিতে পারলাম না। তার ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস কখন যে আমার মনকে ছেয়ে ফেলেছে তা টের পাইনি। তাই ফাইলের স্তূপ থেকে মুখটা তুলে জানলা দিয়ে বাইরে প্রসারিত করে দিলাম আমার চোখের দৃষ্টি।

কয়েক মুহূর্ত পরে সেই নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম—'ছোরা কার?'

'আমার'—চাদরের খুঁটে চোখের জল মুছে বুড়ী উত্তর দিল।

'ওটা দিয়ে কি করবে?'

বুড়ী নিরুত্তর রইল এবার।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর পীর হোসেন বেশ সহানুভূতির সুরে কথাটা বুঝিয়ে দিতেই সে উত্তেজিত হয়ে জবাব দিল—'তার সাথে দেখা হলে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করব যার জন্য দীর্ঘ দিন এত অবিচার সহ্য করে এলাম সে কেন এমনি ভাবে আমার জীবনকে ব্যর্থ করে দিল? কি তার অধিকার? তারি জন্য আজ আমি পথে এসে দাঁড়িয়েছি; আজো যদি সে প্রত্যাখ্যান করে তবে এই ছোরাই তার সব শেষ এনে দেবে।'

বুড়ীর কথা শুনে ভয়ে শিউরে উঠলাম আমি। কিন্তু রাগ করলাম না আর ঘৃণাও এলো না মনে। পুলিসের ডেরায় বসে যে এমনি ভাবে স্পষ্ট ভাষায় মানুষ খুন করার বাসনা জানায় তাকে শাস্তিই বা দিই কি? শুধু ছোরাটা কেড়ে রাখবার ইংগিত করলাম পীর হোসেনকে।

*   *   *   *

সারা লাহোর তোলপাড় করে সুরু হোল ফজ্জাকে খোঁজা। শহরের দশ নম্বর দাগী বদমাইসদের খাতায় দেখলাম ফজ্জা অনেক রূপে আবির্ভূত। ফজ্জা, ফৈজু কখনও বা ফজ্জলা কিন্তু এর মধ্যে বুড়ীর ফজ্জা কে? ব্যাপারটি পরিষ্কার করে জানবার জন্য ফজ্জার চেহারার বর্ণনা দিতে বললাম বুড়ীকে।

সে উত্তরে জানালো, 'ফজ্জা দেখতে সুন্দর আর সুপুরুষ; মুখে দাড়ি-গোঁফ আছে; বেশ লম্বা আর মোটাসোটা; নাকের ওপর একটা ক্ষতচিহ্ন আছে।'

হাজিরা খাতায় পাওয়া গেল, ডান নাকের ওপর ক্ষতচিহ্ন-ওয়ালা লোকটি হীরামণ্ডীর ফজ্জা। খোঁজ নিয়ে জানলাম, সে জামিনের টাকা দিতে না পারার জন্য ১০৫ দফায় লাহোর সেন্ট্রাল জেলে দণ্ডভোগ করে চলেছে। কিন্তু সেকথা বুড়ীকে বলা চলে না। শাহ সাহেবের সাথে দেখা করে তাঁর একটা সুপারিশ নিয়ে মিঞা ইয়াকুব হোসেনের কাছ থেকে ফজ্জার মুচলেকা দিয়ে দিলাম। তার পর ফজ্জাকে আড়ালে ডেকে এনে ভয় দেখিয়ে বললাম—'বুড়ীর সাথে ফিরে গিয়ে সুখে-শান্তিতে ঘর কর্।'

বুড়ীর সামনে ফজ্জাকে দাঁড় করিয়ে দিলাম, কিন্তু কেউ-ই কাউকে চিনতে পারলো না!

বুড়ী হয়ত ভাবছিল সেই তেইশ-চাব্বিশ বছরের তরুণ জোয়ান ফজ্জাকে। পীর হোসেন দুর্বোধ্য ভাষায় দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিল। তার পরেও বজ্রাহতের মত নিস্পন্দ ভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল বুড়ী। কোন কথাই কারো মুখ দিয়ে বের হোল না। বুড়ী কেবল দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে ফজ্জার মুখের দিকে তাকালো।

ফজ্জার চুলগুলো দুধের মত সাদা ধবধবে হয়ে গেছে; চোখে-মুখে নেমেছে বার্ধক্যের স্পষ্ট বলি-রেখা। চোখের সেই

নিষ্প্রভ দৃষ্টি আর দন্তহীন মুখ দেখে বুড়ী কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না এই তার ফজ্জা—যার জন্য সে জীবনভোর তপস্যা করে এসেছে।

কোন কথা না বলে কেবল এক বুক-চেরা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে এক পাশে সরে দাঁড়াল বুড়ী। তার পর উদ্গত অশ্রু ঢাকবার জন্য চাদরের প্রান্ত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল।

সবাই আমরা নির্বাক্ হয়ে গেছি। সান্ত্বনার একটি বাণীও তাদের শোনাতে পারলাম না। কেবল সন্ধ্যার কিছু পরে পীর হোসেন অনেকক্ষণ ধরে বুড়ীকে বোঝালো ফজ্জাকে নিয়ে সে যেন ফিরে যায়।

বুড়ী চীৎকার করে জবাব দিল—'ঐ চোর লম্পট বদমাইসের মুখ আমি কিছুতেই দেখব না।'

ওয়েষ্ট কোটটা ফেলে রেখে নিজের চাদরটা বুড়ী তুলে নিল। তার পর সোজা হাঁটতে লাগল ষ্টেশনের দিকে।

আমারও কিছু করবার ছিল না। স্থাণুর মত চুপচাপ বসে রইলাম। কেবল মনে হতে লাগল, তিরিশ বছর ধরে ভালোবাসার যে সাধনা বুড়ী করে চলেছিল এই কি তার পরিণতি?

অনুবাদক—শ্রীতন্ময় বাগচী।

এই প্রভাতের প্রেক্ষাপটেতে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

এসো উৎসবে ঝড়ের বেদনা তুমি
অবসর ক্ষণে নাহি মোর কোন কাজ :
অশ্রু-হাসির অভ্র-আবীর গুলি'
আঁখি-অধরের খেলা করি এসো আজ।
কৃষ্ণছায়ায় স্বপনে যে ছিল নিশা
বকুল-সুরভি এসেছিলে তারে দিতে ?
আজিকার নব শস্যবীজের তৃষা
মিটিবে কি তব ফসলের সঙ্গীতে ?

সাগরের ডাকে উঠেছিল ঝড় করে
ঝাপসা আলোয় দেখেছিনু নিরালায় :
কাজলা মেঘের মিছিলে তারকা নভে
প্রাণহীন হয়ে ছিল যে ঝঞ্ঝা-বায়।
দিবসের চিতা ভস্মেরে ধুয়ে দিয়ে
মল্লার সুরে ঝরেছে কি বারিধারা ?
বীজ বুননের গানখানি মাঠে নিয়ে
কি যেন কোথায় হ'য়ে গেছে পথহারা।

কাব্যকলার ফুলঝরানোর রাতে
রঙের খেলায় শিল্প গিয়েছে মরে,
অতীত লোকের পথে পথে কারা কাঁদে
অনাগতদের জনম সূচনা তরে !
এই প্রভাতের প্রেক্ষাপটেতে ভাবি
নূতন করিয়া কি গান শোনাবে মোরে ?
আকাশের কোন্ কেন্দ্রে আলোর ঝাঁপি
তুমি শিরে তুলি নৃত্য করেছ ভোরে !

মোর জনমের তিথি-ডোরে বেঁধে রাখী
তুমি এলে আর ফুলে-ভরা ধরাতল :
সে জন আমারে দিয়েছে কি আজ ফাঁকি
জীবনের ঘটে যে জন ভরেছে জল !
শেফালীর সাজি করে লয়ে এলে তুমি
বর্ষামুখর রাত্রির অবসানে।

কেঁদে কত বার কেতকী পড়েছে ঘুমি
বিজলী নাচনে অজানা পথের পানে।
তোমার কথাটি কয়েছিনু আমি তারে,
প্রেমের পত্র উৎসব-রসে ভরি,
সঙ্গীত হয়ে আসিবে আমার দ্বারে—
সে ছিল নীরব : বিহ্বল বিভাবরী।
তুমি কি করেছ প্রণয়ের আরাধন
প্রতি হৃদয়ের পরিচয় অনুরাগে !
তার সাথে তব ছিল কি গো আলাপন,
প্রতি মানবের ভিতরে যে জন জাগে ?

পলাতকা

সন্তোষকুমার দে

স্বামীনাথনকে দেখে আমার সবিতার কথা মনে পড়লো। গ্রেট ঈষ্টার্ণে বসে গল্প করতে করতে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম। মদে তখন মগজে খুশির আমেজ এসেছে,—স্বামীনাথন বললে,—সবিতার কথা আমায় শুধিয়ো না। আমি আর তার খবর রাখি নে।

ভেবেছিলাম স্বামীনাথনকেই সবিতা এবার স্বামী করেছে। তা তবে নয়। সবিতাও ওর চিরকৌমার্যে ফাটল ধরাতে পারলে না!

আমার পরিহাসে স্বামীনাথন হেসে বললে,—সে কি ভালোবাসে, না ভালোবাসায় ধরা দেয়? আমার সঙ্গে নিখরচায় ষ্টেট্স-এ যেতে চেয়েছিল, সেটাই ছিল তার উদ্দেশ্য। ও দেশে পৌঁছেই নতুন বন্ধু জুটিয়ে নিয়ে সরে পড়ল।

'আলট্রা মডার্ণ'—বললাম আমি।

স্বামীনাথন বাধা দিয়ে বললে—তারো বেশি, বরং ওকে 'অ্যাটম-এজ' কি 'হাইড্রোজেন-এজ'-এর মেয়ে বললেই ভালো হয়। বিলাস যাদের জীবনের চরম অভিলাষ। তারা জানে, মুহূর্তে জীবন ফুংকারে উড়ে যেতে পারে, নিশ্চিহ্ন হয়ে বাষ্পে পরিণত হয়ে যেতে পারে গোটা দেহটা। এ যুগে প্রেম, ভালোবাসা, সতীত্ব এ-সব নেহাৎ মামুলী সেকেলেপণা ছাড়া আর কিছু নয়।

স্বামীনাথন আরও কি কি বলেছিল সবিতার মার্কিণ মুলুকে জীবন বিষয়ে,—আমি আর তাতে কান দিলাম না। গ্রেট ঈষ্টার্ণের উজ্জ্বল-আলোকিত অত্যুগ্র গন্ধামোদিত পানকক্ষ পরিত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে এসেও আমার কানে কথাটা বাজতে লাগল—সবিতা ফেরেনি, সবিতা নিউইয়র্কেই থেকে গেছে।

সবিতা রহমান। শহরের সেরা সুন্দরী। স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে, শিক্ষায়, শালীনতায়, আলাপে, ব্যবহারে সবার চোখে পড়ে। আমার দীর্ঘশ্বাস তাই সকলের অলক্ষ্যেই বাতাসে মিশিয়ে দিয়ে ব্যবসায়ে মন দিয়েছিলাম। আমদানি আর রপ্তানির কারবার করি, ওরই মধ্যে মাথা গুঁজে স্বস্তির শ্বাস ফেলি। সবিতা নিশ্চয় এতো দিনে কলেজের স্মৃতি ভুলে গেছে। আমার দুরাশা তাকে প্রেম দিয়ে জয় করতে চেয়েছিল,—কিন্তু সে তুচ্ছ মোহ ত্যাগ করে বরণ করলে আমারই বন্ধু আব্বাস রহমানকে। রহমান ছিল তার ধনী পিতার একমাত্র পুত্র, তায় শিল্পী। আমারই মাধ্যমে আলাপ হয়েছিল, শেষে একদিন আমাকেই সবিতা ওদের বিবাহের নিমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র দিলে। কতো কথা, কতো স্মৃতি, কতো দীর্ঘশ্বাস!

সবিতা কিন্তু ভোলেনি। কয়েক বৎসর পরে দেখা। একই শহরে বাস করি, কিন্তু যে সমাজে ওরা চলাফেরা করে আমি সযত্নে তা পরিহার করে চলি বলে দীর্ঘকাল আর সাক্ষাৎ হয়নি। রবিবার বিকেলটা আমি ইদানীং লেকে যাই, জলের পাশে শুয়ে শুয়ে হাওয়া খাই, সিগ্রেট পোড়াই—তার পর রাত হলে বাড়ি ফিরে আসি। নিঃসঙ্গ জীবনে এর বেশি আনন্দময় সন্ধ্যা কোন ক্লাব, সিনেমা হোটেলে আমি পাইনি।

সেদিন রাত করেই ফিরছিলাম। পথে সবিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ। একা, হাতের শিকলে পোষা একটি প্রাণী, অল্প অন্ধকারে কুকুরের জাতিটা আন্দাজ করতে পারিনি। মোলায়েম সৌরভ ছড়িয়ে সে আমাকে ছাড়িয়ে চলে গেল, কিন্তু একটু দূরে যেয়েই ফিরে এলো। এসে মুখোমুখি হলে উভয়েই নিঃসন্দেহে চিনলাম।

এতো দিনের আলাপ, এই লেক্ এলেকাতেও কতো দিন দুই জনে পদচারণা করে বেড়িয়েছি। অসংকোচে সে বললে,—এখনও তুমি লেকে বেড়াতে এসে থাকো দেখছি!

উত্তর দিতে হল,—অথচ কী-ই বা উত্তর দেবার ছিল। মামুলি কথা। তবু এতো দিন পরে ওকে দেখে ভালোই লাগল। সবিতা যে এখনও আমাকে ভোলেনি এতে যেন একটু আনন্দ ছিল। অথচ সত্যিই কি মানুষ ভোলে, না কেবল ভোলার ভাণ করে?

বেশে-বাসে উগ্র আধুনিকা। খোঁপাটিতে পর্যন্ত রজনীগন্ধার পাপড়ির মালা জড়ানো। যখন হাঁটতে হাঁটতে রাজপথে এলাম, পথিক জনেরা বার বার ওকে দেখতে লাগল। সেই সবিতা, এখন যেন আরো উগ্র, আরো উচ্ছল। বললে,—খুব ব্যস্ত না থাকো তো চলো না একটু এ দিকটা ঘুরে যাই।

গেলাম। একটা ফুলের দোকানে উঠে ও থামল। দোকানী সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো। এটা-ওটা দেখে একগুচ্ছ গোলাপও বেছে নিলে। আমি দামটা দিতে গেলে ও বাধা দিয়ে বললে—এটা আমাদের জানা-শোনা দোকান, রহমানের অ্যাকাউন্টে ফুল যায়, নগদ দাম দিতে হবে না।

এতক্ষণের সৌহার্দ্যে যেন এই একটি কথায় ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠল। রহমান মাঝে এসে দাঁড়ালো। সবিতা যে রহমানের বিবাহিতা পত্নী, এই বোধটা যেন আমি তীব্র ভাবে অনুভব করলাম। এতক্ষণে দোকানের মোলায়েম ফ্লুরোসেণ্ট আলোতে সবিতার চোখ-মুখ-বুক একসঙ্গে আমার নজরে পড়ল। চোখে পড়ল ওর হাতে-ধরা প্রাণীটি—সোনালি শিকলে বাঁধা একটি বানর!

পোষা বানর নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন এমন কোন ভদ্রমহিলা ইতিপূর্বে নজরে পড়েনি। কোনো বেদেনীর বানর পোষা অভ্যাস থাকলেও তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়, শুনিনি। মনে মনে প্রশ্নটা তোলপাড় করছি, এমন সময় একটা অঘটন ঘটল। ফুলের তোড়ায় মন দিতে গিয়ে সবিতার হাতের শিকলটা কখন ফসকে গেল। বানরটি অমনি এক লাফে দোকানের শো-কেসের উপরে চড়ে বসল। সবিতা প্রায় চীৎকার করে ধমক দিলে। আমি ছুটে শিকলটা ধরে ফেললাম, ধরে নিয়ে এলাম সবিতার কাছে। এবার আর সন্দেহ রইল না যে শিকলটা কেবল সোনালি নয়, সোনার। এ কি উৎকট পরিহাস—সোনার শিকলে বাঁধা বানর!

আমার অবাক ভাবটা সবিতার নজর এড়ায়নি। পথে বেরিয়ে এসে বললে,—'উপমাটা ভালো লাগল তো?'

বললাম—'কিসের উপমা?'

'কেন, এই সোনার শিকলে বাঁধা বানরের? এটি তোমার বন্ধু রহমানের প্রতীক। আমি জীবটির প্রতি আসক্ত নই, কিন্তু এই সোনার শিকলটি হ্যামিল্টনের বাড়িতে খাঁটি সোনায় তৈরী, এতে ফাঁকি নেই।'

'অর্থাৎ?'—প্রশ্নটা নিজের অজ্ঞাতেই করে ফেলেছিলাম।

'অর্থাৎ তোমার বন্ধু পালিয়েছেন। জানো না বোধ হয়? তা জানবেই বা কেমন করে! আমাদের বিয়ে হয়ে অবধি তো তুমি অভিমান ভরে এ দিকটাই আর মাড়াওনি। আমরা যে

সব হোটেল-ক্লাব-ক্যাবারেতে যাই তাও তুমি সযত্নে পরিহার করেছ। সবই আমি লক্ষ্য করেছি বন্ধু, কিছুই আমার নজর এড়ায়নি। তুমি আমায় ভালোবাসতে, হয়তো এখনও ভালোবাসাটা ভুলতে পারোনি—তারই একটা অহেতুক দুর্বলতা বুকে নিয়ে হয়তো এখনো একা লেকের, অন্ধকার আকাশের তলায় লুকিয়ে থাকো। কিন্তু তোমার বন্ধু আমায় বিয়েই করেছিলেন, ভালোবাসেন নি। তাই তিনি স্বচ্ছন্দে বিলেত চলে গেলেন। শুনেছি, ইংলণ্ডে তাঁর শিল্প-প্রতিভার খুব সমাদর হয়েছে, সেখানেই তিনি স্থায়িভাবে থাকবেন।'

'তালাক্? কী অপরাধে? এমন সুন্দরী স্ত্রী, যাঁকে রহমান ভালোবেসে বিয়ে করেছিল, ভালোবাসায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল, তাকেই ফেলে শেষ পর্যন্ত পালালো? আমি তো জানি, আমার কাছে রহমান কোনো কথা লুকোয়নি? সবিতা তার সুমুখে প্রদীপ্ত সূর্য্যের মতো উদয় হয়েছিল, মুহূর্তে রহমানকে সে জয় করে নিয়েছিল। রহমান নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছিল। তার পক্ষে সবিতাকে অদেয় কিছুই ছিল না। কিন্তু তবু কেন সে পালালো? সবিতাকে নিরাশ্রয় রেখে কাপুরুষের মতো সে পালিয়ে গেল!'

সবিতা আমার চিন্তামগ্ন অবস্থা দেখে খিল-খিল করে হেসে ফেললে, বললে—'বড় ভাবনায় পড়লে নাকি? না হে, তোমার বন্ধু অবিবেচক নন, তাঁর বাড়ি, গাড়ি মায় ব্যাঙ্কে টাকাকড়ি সবই আমার জন্য রেখে গেছেন। এক রকম খালি হাতেই চলে গেছেন তিনি। সঙ্গে গেছে কেবল ক্যামেরাগুলি আর তার অফিসের সেক্রেটারি ক্যামেলিয়া।'

রহস্য ঘন হয়ে উঠল। ক্যামেলিয়াকে আমিও জানি। আগে এসেছিল রহমানের ষ্টুডিওতে মডেল হয়ে, পরে ওখানে চাকরি নেয়। টেলিফোন অ্যাটেণ্ড করত, সেট্ সাজাতো, মডেল ডেকে আনত, চিঠি টাইপ করত—এক কথায় সে রহমানের ব্যবসায়ে আন্তরিক সদিচ্ছা নিয়ে অতি সুনিপুণ ভাবে সহায়তা করত। আমরাই তাকে রহমানের সেক্রেটারি বলতুম। রহমান যখন সাবিতাকে বিয়ে করলে, তখনও ক্যামেলিয়া ছিল। রহমানের বিয়েতে সে সবিতাকে কি একটা দামী জিনিষ উপহারও দিয়েছিল।

অনেকটা ছবি স্পষ্ট হয়ে এলো সবিতার সঙ্গে রহমানের বাড়িতে এসে। সাজানো-গোছানো আধুনিক বাড়ি। বয়-বাবুর্চি-খানসামা, ড্রইং-রুম ডাইনিং রুম, গ্যারাজ-গাড়ি, কোন কিছুরই অভাব নেই। তবু রহমান পালালো কেন?

ওদের বসবার ঘরে ফায়ার প্লেসের উপরে কতকগুলি সামুদ্রিক শঙ্খ সাজানো ছিল। আমি একবার জন্মদিনে রহমানকে সেগুলি উপহার দিয়েছিলাম। সেগুলি যথাস্থানে নেই দেখে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। সবিতা বললে,—'ও জঞ্জাল আমি ফেলে দিয়েছিলাম, তোমার বন্ধুটির তাতে কি রাগ! আরে কি জ্বালা,—সারা বাড়িতে মাটির পুতুল, কাচের পুতুল, কড়ি, শামুক, কাঠের খেলনা! কেন, এটা কি প্রদর্শনী না প্রত্নতত্ত্বশালা? ওই নিয়েও খুব মনকষাকষি হয়েছিল। অবস্থা চরমে উঠল—একটা কড়ে পুতুল নিয়ে। পুতুলটা একটা উলঙ্গ মেয়ের। কাচের টেবিলের উপর এক খণ্ড পাথর বসিয়ে নকল পাহাড় আর হ্রদ তৈরী করে তার পাশে পুতুলটি আর একটি ছোট কাগজের খোলা ছাতা রেখে ছবি তুলে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল রহমান, যে ছবি দেখে মনে হবে, কোন পাহাড়ের কোলে হ্রদ হতে স্নান করে কোন মেয়ে উলঙ্গ হয়ে হ্রদের কূলে বসে আছে। ছবিটা নাকি বিদেশে যেয়ে আন্তর্জাতিক পুরস্কার পায়। আমার কিন্তু বড্ড রাগ হয়েছিল। ছবি তুলতে হয়, জীবন্ত মেয়ের ছবি নাও—যারা সৌন্দর্য্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব; তা নয়, পুতুল দিয়ে সাজিয়ে নকল হ্রদে পদ্ম ফোটানো। রাগ করে আমি পুতুলটা ভেঙ্গে ফেলেছিলাম।

ছবিটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। ঘরে একটি নারী সব কিছুতে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, সখের জিনিষ আছড়ে ভেঙ্গে ফেলে। নিজে সুন্দরী, কিন্তু সৌন্দর্য্যের উপাসনাকে উপহাস করে। আর ষ্টুডিওতে একটি নারী সতত যত্নশীল, পার্শ্বচারিণী। সহকর্মিণী, তাই বুঝি সহজেই সে সহধর্মিণী। ক্যামেলিয়ার কর্মরত মৌন মূর্তিটি মনে পড়ল। সেই শান্ত সৌম্যশ্রী কি নিতান্ত অচেতনার বস্তু ছিল?

বলে চলল সবিতা—'আসলে তোমার বন্ধুটি ছিল খাঁটি পিউরিটান। বাইরে আধুনিকতার বড়াই ছিল। দক্ষিণ-কলকাতায় বাড়ি, ষ্টুডিবেকার গাড়ি, ইউরোপীয়ান কোম্পানির ফোটোগ্রাফিক ষ্টুডিও, সাহেব-সুবো খরিদ্দার, আর তাদের পাকড়াবার জন্য ঐ চামেলিয়া না ম্যাগ্নোলিয়া ঐ পরগাছা ট্যাস্ মেয়েটা!

'কিন্তু ভিতরে ভিতরে একেবারে সেকেলে মোল্লার পো। নাইট ক্লাব একেবারে অপছন্দ, মেয়েরা ড্রিঙ্ক করবে কি আর কোনো পুরুষের সঙ্গে নাচবে তা-ও একদম বরদাস্ত করতে পারত না। তা হলে তার এমন মেয়ে বিয়ে করা উচিত ছিল যাকে হারেমে পুরে রাখা যায়।

'নিজে একটু-আধটু যা লিকার খেত, শেষ পর্যান্ত তাও ছেড়ে দিলে। সারা দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে রাতে খাবার টেবিলে ঝিমুত, বয়-বেয়ারারা হাসাহাসি করত। আর নিত্যি রাতে ঘরে খেয়ে রাত এগারোটা না বাজতেই ঘুম! কি নিষ্ঠা যেন ছ'শো টাকার পেতি অপিসর। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যেত। সমাজে ওকে নিয়ে চলা-ফেরা করাও দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল, শেষ পর্য্যন্ত তাই একা-একা আমাকেই পার্টি-ক্লাব রিসেপসন সব দিক রক্ষা করতে হচ্ছিল। এ সব সম্পর্ক না রাখলে বা চলে কি করে? নইলে তো পাহাড়ে-জঙ্গলে কি গ্রাম অঞ্চলে যেয়ে থাকলেই হত। সভ্য সমাজে আর থাকা কেন?'

সবিতার সমস্যাটা ক্রমে আমার কাছে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে আসছিল। সে আরাম চায়, আনন্দ চায়, সমাজের সেরা সুন্দরী মেয়ে সে, সর্ববিষয়ে সে পুরোধা হয়ে থাকতে চায়। সত্যিই তো, সভ্যজগতে কে রাত এগারোটায় ঘুমায়? হোটেল, নাইট ক্লাব এসব তবে রয়েছে কেন?

'সফিষ্টিকেশন' এমন জিনিষ যা আষ্টে-পৃষ্ঠে মানুষকে বাঁধে, কিছুতেই সহজ হতে দেয় না। মন আর মুখ এক হলেই বোকা বলতে হয়।

কিন্তু রহমান শুধু দক্ষ ফোটোগ্রাফার নয়, সে জাত-শিল্পী। তার ধাতে এ অত্যাচার সইবে কেন? স্ত্রীর ব্যবহারে সে তাই ক্রমে দূরে সরে গিয়েছে, শেষে সব-কিছু পরিত্যাগ করে চলে গেছে। মনে হয়,

ক্যামেলিয়াকেও সে সঙ্গে নেয়নি, ক্যামেলিয়া নিজেই তার সঙ্গে গেছে। আর পথের সঙ্গী যদি জীবনসঙ্গিনী হয় তাতে দোষ দেব কিসে ?

কিন্তু সবিতাই বা কি করবে ? যে পথ সে বেছে নিয়েছে সেটা শুধু ছুটে চলার, তাতে বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, বুঝি তাই কিছুতেই তৃপ্তিও নেই। বহমানের প্রতীক হিসাবে সোনার শিকলে বাঁধা বানর কাছে রেখে সে কা'কে উপহাস করছে তা সে নিজেই জানে না।

স্বামীনাথন আমার বন্ধু, আমার আমদানী রপ্তানি ব্যবসায়ে তার সঙ্গে অনেক সময় লেন-দেন হয়, আমি বেচি,—ও কেনে, ও বেচে,—আমি কিনি। ও মাঝে মাঝে ইংলণ্ড-আমেরিকায় যায়, আমি তার সুযোগটা নিই, বিদেশের বাজারে আমার কিছু মালও গছিয়ে দিয়ে আসে।

জানি না, কি সূত্রে সবিতার সঙ্গে স্বামীনাথনের আলাপ হয়েছিল। আমি করিয়ে দিইনি এই আমার সান্ত্বনা। স্বামীনাথন অবিবাহিত, ক্লাব-পার্টি নিয়েই জীবন কাটায়। হয়ত সেখানেই সবিতার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। স্বামীনাথন বসন্ত—প্রণয়। সবিতাকে সে বিয়ে করবে করবে শুনেছিলাম। ইতিমধ্যে ওকে যেতে হল আমেরিকায়—সবিতা এমন সুযোগ ছাড়লে না। সে-ও গেল, কিন্তু ফিরে এলো না। সবিতার চরম লক্ষ্য আধুনিক সভ্যতার বারাণসী নিউ-ইয়র্ক। তার স্বপ্নের শেষ, তার আকাঙ্ক্ষার শেষ পরিণতি ! কিন্তু সে কি সেখানেও তৃপ্তি পাবে ?

আকন্দ ফুল

শ্রীলীলাময় দে

আকন্দ, তোর ফুলের বুকে মিষ্টি মধুর গন্ধ কোথায়
আপনি ফুটে আপনি শুকাস্ তোর পানে কেউ ফিরেও না চায়
বাতাস পাগল করে না তোরে
কবির খাতায় ছন্দ-ডোরে
রূপের বিকাশ ফুলের পাখা নেইকো লেখা
তাই বুঝি তোর জীবন মিছে
মালা রচায় রইলি পিছে
ফুল-সায়রে তোর সমাদর যায় না দেখা।

নিত্য যে তুই আপন খেলায় আপনা ভুলে মত্ত থাকিস্
তোর বেদনায় মৌন মাটি যে খবরের খোঁজ কি রাখিস্ ?
আপন ঘরের একটি টেরে
মায়ের আদর লভিস্ যে রে
তাই তো রে তোর নিতি সোহাগ সবাই মনে
শিউলি, গোলাপ, জুঁই, চামেলি
বিলিয়ে সুবাস অশ্রু ফেলি
ক্ষণিক জীবন, ধরার ধূলায় ঝরছে ক্ষণে।

তোর সমাদর লোক-সমাজে নেই বলে তাই আছিস্ ভালো
হাজার লোকের হাতছানিতে নিবতো ধরায় জীবন-আলো।
তিন ভুবনের স্রষ্টা যিনি
তোর সমাদর করেন তিনি
কণ্ঠে যাহার জ্বলছে সদা বিষের জ্বালা
জগত-মানব বুঝবে কি যে
তোর জীবনের মূল্য কি যে
মহেশ্বরের গলায় দোলে তোর যে মালা।

জ্বালানি কাঠের রোলা

মোপাসাঁ

ছোট একটা সুন্দর ড্রয়িং-রুম। দরজায়-জানলায় ভারি-ভারি পর্দা টাঙ্গানো। মৃদু ফুলের আর ধূপের গন্ধে ঘরটি মনোরম। বেশ শীত পড়েছে। চিম্‌নীতে গন্‌গন্‌ করছে আগুন। ঘরের কোণে পুরনো লেসের ঢাকনি-দেওয়া একটা ল্যাম্পের মৃদু নরম সবুজাভ আলো পড়েছে আলাপরত দুটি মানুষকে ঘিরে।

মহিলাটি বৃদ্ধা—এই বাড়ীর মালিক। চুল সব সাদা হ'য়ে গেছে কিন্তু চর্ম্ম তাঁর লোল হয়নি, রেখাও পড়েনি। চির-জীবন যিনি সুগন্ধি-জলে স্নান ক'রে এসেছেন, তারই প্রভাবে যেন তাঁর সমস্ত অঙ্গ স্নিগ্ধ, সুরভিত, প্রসন্ন। ভদ্রলোকটি তাঁর পুরাতন বন্ধু এবং অবিবাহিত। জীবনের যাত্রাপথে তিনি চিরদিনের বন্ধু—সে বন্ধুত্ব খুবই নিবিড়। কিন্তু আর কিছু না।

চিমনীর আগুনের দিকে চেয়ে মিনিট খানেক তাঁরা চুপ করে বসেছিলেন। বিশেষ যে কিছু ভাবছিলেন তা-ও নয়। এক এক সময় চুপ ক'রে পাশাপাশি বসেই আমাদের প্রিয়জনের মনের স্পর্শ আরও গভীর ক'রে অনুভব করি।

হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড কাঠ—অসমস্ত শিকড়সমেত একটা গাছের গুঁড়ি ছিটকে পড়ল। পড়ল, মেজের উপর কতকগুলো জ্বালানি কাঠ ছিল, তারই উপর। চারি দিকে আগুন ছিটিয়ে পড়ল! মহিলাটি একটা চীৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠলেন। যেন ছুটে পালিয়ে যাবেন। কিন্তু ভদ্রলোক এক লাথিতে কাঠখানা ফিরিয়ে চিম্‌নীর ভিতর ছুড়ে দিয়ে বুটজুতো দিয়ে আগুনের ফুলকিগুলো মেরে দিলেন।

বিপদ যখন কেটে গেল তখন পোড়া গন্ধে ঘরটা ভরে উঠল। মহিলাটির সামনে বসে মৃদু হেসে তিনি বললেন, এই বেখাপ্পা ঘটনাটাতে হঠাৎ মনে করিয়ে দিলে—কেন এত দিন বিয়ে করিনি।

অবাক চোখে ভদ্রমহিলা ওঁর মুখের দিকে উৎসুক হ'য়ে চাইলেন। বয়েস যাদের পার হ'য়ে গেছে, সব কথা নিঃশেষে শোনবার কৌতূহল নিয়ে, তারা যেমন ক'রে চায়, তেমনি সন্দেহভরা তীক্ষ্ণ কৌতূহল নিয়ে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তার পর বললেন, সে কি রকম?

তিনি বললেন, সে এক দীর্ঘ কাহিনী, শুনলে মন খারাপ হয়ে যাবে।

* * *

আমার সব চেয়ে প্রাণের বন্ধু জুলিয়েঁর সঙ্গে আমার কেমন ক'রে হঠাৎ ছাড়াছাড়ি হ'ল, ভেবে আমার পুরানো বন্ধুরা বেশ অবাক্ হ'তেন। এমন অবিচ্ছেদ্য, এমন সুনিবিড় বন্ধুত্ব যে কেমন ক'রে একেবারে যেন কেউ কাউকে চিনিই না, এমন অবস্থায় এসে দাঁড়াল তা তাঁরা বুঝতেই পারতেন না।

এক সময় জুলিয়েঁ আর আমি একসঙ্গে থাকতুম। আমরা দুই বন্ধু এমন অচ্ছেদ্য ভাবে আসক্ত ছিলুম যে, কোনো কিছুতেই সে বন্ধুত্ব ভেঙ্গে যেতে পারে, এ কেউ কল্পনা করতে পারত না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা জুলিয়েঁ এসে বললে যে, তার বিয়ের ঠিক হয়ে গিয়েছে। কথাটা আমার মনে এমন একটা ধাক্কা দিলে যে আমার মনে হ'ল যেন সে আমার কি একটা মূল্যবান সম্পত্তিই চুরি করেছে, কি দারুণ একটা বিশ্বাসঘাতকতাই করেছে। পুরুষ বন্ধুদের একজনের যখন বিয়ে হয়ে যায় তখন তাদের সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। দু'টি পুরুষ বন্ধুর মধ্যে যে খোলামেলা, বলিষ্ঠ ভালবাসা—যে ভালবাসা মনের এবং প্রাণের—দুটি বন্ধুর যে ভালবাসায় পরস্পরের মধ্যে একটা একান্ত বিশ্বাস এবং নির্ভর বিরাজ করে, স্ত্রীলোকের সর্বগ্রাসী, নজরবন্দী, সন্দেহবাদী দেহজ প্রেম তা বরদাস্ত করতে পারে না।

স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রেম যতই তীব্র হোক এবং যত নিবিড় ভাবেই তারা যুক্ত হোক, মনে-প্রাণে চিরকালই তারা অপরিচিত থেকে যায়। ভিতরে ভিতরে তারা শত্রু হয়ে ওঠে—তাদের পরস্পরের জাতই আলাদা। তাদের একজন প্রভু অপর জন দাস, একজন বিজেতা অপর জন পরাহত—এ হতেই হবে—কখনও কোনো কালেই সমান সমান হবে না। মুঠোর মধ্যে মুঠো নিয়ে চাপ দিতে কামজ আবেগে তাদের হাত কাঁপতে থাকে, তাদের সেই মুঠো করে হাত ধরার মধ্যে পুরুষের অকপট মুক্তপ্রাণের আবেগ, সেই দীর্ঘ স্থায়ী বলিষ্ঠ স্পর্শ, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে খোলা প্রাণে নিজেকে ছেড়ে দেওয়ার স্বরূপটি প্রকাশ পায় না। তাই প্রাচীন দার্শনিকেরা বৃদ্ধ বয়সের সান্ত্বনাস্বরূপ খুঁজতেন নির্ভরযোগ্য বন্ধু; আর যে আদান-প্রদান কেবল পুরুষের মধ্যেই সম্ভব, সেই মননশীল চিন্তার বিনিময়ে পরস্পরের সাহচর্যে জীবনটা কাটিয়ে যেতেন। তাঁরা বিবাহ করে পুত্রোৎপাদন করতেন না, কোমরের জোর হ'লে যে পুত্র বাপকে পথে বসিয়ে সরে পড়ে।

যাই হোক, বন্ধু জুলিয়ে বিয়ে করলেন। স্ত্রীটি সুন্দরী, মোটা-সোটা, হাসিখুশী, কোঁকড়া চুলে লোভনীয় ছোটখাট মানুষ। প্রথম প্রথম ওদের বাড়ী বড় যেতাম না; ওদের প্রেমের বাধা হতে সঙ্কোচ হত। যাই হোক, ওরা আমাকে খুব টানত; প্রায়ই নেমন্তন্ন করত; আমাকে খুব পছন্দ করে বলে মনে হ'ত। ফলে তাদের ঐ জীবনের মোহ আমাকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করলে—বাধা দিলাম না। প্রায়ই রাত্রে ওদের বাড়ী থেকে খেয়ে ফিরে ভাবতুম, ওর মত আমিও বিয়ে করে ফেলি, এই নির্জীব বাড়ী আর ভাল লাগে না। ওরা কখনো ছাড়াছাড়ি হোতো না; দুজনে মসগুল হয়ে থাকত।

একদিন রাত্রে জুলিয়ে আমাকে খেতে বললে। আমিও গেলুম।

জুলিয়ে বললে ভাই, খাওয়ার পরেই একটা কাজে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। নাগাদ এগারোটায় ফিরব। তার চেয়ে দেরী হবে না। তুমি ততক্ষণ বার্থার কাছে এসে একটু গল্পগাছা কোরো, কেমন?

মেয়েটি হাসল।

—আমিই বলেছিলাম আপনাকে ডেকে আনতে।

খুশী হয়ে আমি হাতটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলুম, বললুম, বরাবরই ত আপনার স্নেহ পেয়ে আসছি। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলুম যে আমার হাতটা সাগ্রহে, বেশ একটুক্ষণ ওর মুঠোটা ধরে রইলো। কিন্তু তখন তা ধর্তব্যের মধ্যে আনিনি। সবাই খেতে বসলাম। আটটার সময় জুলিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ও বেরিয়ে যেতেই আমরা দুজনে কেমন একটা অদ্ভুত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। যদিও আজকাল ওদের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু এ রকম একলা দুজনে আর কোন দিন আমরা থাকিনি। এ রকম অবস্থায় যেমন লোকে করে থাকে, আজে-বাজে নানা কথা বলে সময়টা কাটাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু কোনও কথায় যোগ না দিয়ে, কি করবে ভেবে না পেয়ে, সে চুপ করে চোখ নিচু করে ব'সে রইল—যেন কি একটা কঠিন সমস্যায় পড়ে গেছে। শেষে আর এ-ও-তা বলার মত কিছু না পেয়ে আমিও চুপ করলুম। এক এক সময় বলবার মত কিছু খুঁজে পাওয়া যে কি শক্ত হয়!

তা ছাড়া, ঘরের আবহাওয়ায়, বলতে গেলে আমার একেবারে হাড়ে হাড়ে এমন একটা কিছু অনুভব করতে লাগলুম—যা আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না, কিন্তু যাতে ক'রে এমন একটা রহস্যময় অনুভূতি মনের মধ্যে হতে লাগল যে, ভালই হোক, আর মন্দই হোক, যার সঙ্গে আমি রয়েছি তার মনে আমার সম্বন্ধে একটা কিছু গোপন অভিসন্ধি আছে।

এই অস্বস্তিকর নীরবতা চলল খানিকক্ষণ। তারপর বার্থা আমাকে বললে, চিমনীর আগুনটা নিবে আসছে, ওতে একখানা কাঠ দিয়ে দিন না—একটু!

অতএব উঠে গিয়ে কাঠ-রাখা সিন্দুকের ডালা খুলে সব চেয়ে বড় একখানা কাঠের রোলা বার করে নিয়ে চিমনীতে অন্য আধপোড়া কাঠগুলোর ওপর দাঁড় করিয়ে দিলুম। তারপর আবার সব চুপ-চাপ।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাঠের কুঁদোটা দাউ-দাউ করে ধরে উঠলো। আগুনের আঁচে আমাদের মুখ যেন ঝলসে যেতে লাগল। তখন মেয়েটি চোখ তুলে আমার দিকে চাইল। চোখে তাহার অদ্ভুত একটা দৃষ্টি আমার উপর। বললে, বড় আঁচ লাগছে। চলুন ঐখানে সোফায় গিয়ে বসি।

কাজেই দুজনে সোফায় গিয়ে বসলুম। হঠাৎ সে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, একটি মেয়ে এসে যদি আপনাকে বলে যে, 'আমি তোমায় ভালবাসি', ত কি করেন?

হকচকিয়ে গিয়ে উত্তর কিছু না পেয়ে আমি বললুম, এরকম কথা কল্পনায়ও আনতে পারিনে—হয়ত মেয়েটি কেমন তার উপর নির্ভর করবে অনেকখানি।

এই কথায় মেয়েটি হেসে উঠল। স্নায়ুবিকার পীড়িত, কঠিন, কম্পমান হাস্য; কাচের গায়ে ধাক্কা মেরে পাৎলা কাচ ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে মনে হয় সে কৃত্রিম হাসি। তারপর বললে, 'পুরুষ মানুষের হিম্মৎও নেই চোখাবুদ্ধিও নেই।' তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, 'মিঃ পল, আপনি কি প্রেমে পড়েছেন কখনো?' স্বীকার করতেই হো'ল, 'পড়েছি বৈ কি।' সব পরিষ্কার করে খুলে বলতে বললে সে। অগত্যা, বানিয়ে-শানিয়ে কতকগুলো গল্প বললুম। কখনো সহানুভূতি, কখনো ঘৃণা প্রকাশ করে করে আমার গল্প সে মনোযোগ দিয়ে শুনলে। তারপর হঠাৎ বললে, কিছু না, কিছুই বোঝেন না আপনি ও বিষয়ে। আমার মনে হয় যে, খাটি প্রেম তাই-ই, যাতে মানুষের স্নায়ু-বিকার ঘটায়, মানুষকে অব্যবস্থিত চিত্ত করে, মাথা খারাপ করে দেয়, কি ভাবে কথাটা প্রকাশ করি। সেটা হবে ভীষণ, দুর্দান্ত, প্রায় বলতে গেলে অপরাধের মত এবং অপবিত্র—এক ধরণের অ-সতীত্ব যাকে বলা যায়। অর্থাৎ সে প্রেমে নীতির বাঁধন, ভ্রাতৃত্বের গণ্ডী, শুচিতার বাধা সব ভেঙ্গে না ফেলে যেন তার নিস্তার নেই। শান্ত, সহজ, সমাজসঙ্গত নিরাপদ প্রেম কি খাটি প্রেম?

কি যে ওকে উত্তর দেব তা ভেবে উঠতে পারলাম না। শুধু একটা দার্শনিক চিন্তা মনে এলো—হায় রে স্ত্রী-বুদ্ধি! নিজের স্বরূপটি তুমি আজ দেখালে বটে!

কথা বলতে বলতে তার মুখে একটি শান্ত স্বর্গীয় ভাব ফুটে উঠল। তার পর আমার কাঁধে মাথা রেখে, সোফার কুশনের উপর ভর দিয়ে সে সটান শুয়ে পড়ল; তার গাউনটা অল্প উঠে পড়ায় তার সিল্কের মোজা আগুনের ঝলক লেগে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দু'-এক মিনিট পরে সে আবার শুরু করলে,—

'আপনাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি মনে হচ্ছে; না?' 'মোটেই না' বলে, আমি প্রতিবাদ করলাম। সে আমার বুকের উপরে একেবারে ঢলে পড়ল; আমার দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করে বললে, 'যদি বলি যে আমি তোমায় ভালবেসেছি—তবে কি কর?'

উত্তর যে কি দেব তা ভেবে পাবার আগেই সে দুই হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে খাঁ করে আমার মাথাটা টেনে নামিয়ে নিয়ে আমার ঠোঁটের উপর তার ঠোঁট দুটো রাখল।

বন্ধু! সত্যি বলছি আপনাকে; যে আমার একটুও স্বস্তি লাগছিল না—ভাল লাগছিল না। কী!? জুলিয়েকে ঠকাবো? এই নির্বোধ, বিকৃত-মস্তিষ্ক, ধূর্ত স্ত্রীলোক একটা ভীষণ কামুক—তাতে সন্দেহ নাই, এর স্বামী ইতিমধ্যেই এর ক্ষুধা মেটাবার

পক্ষে যথেষ্ট নয়—সেই স্ত্রীলোকের উপপতি হতে হবে? জুলিয়ানকে দিনের পর দিন ঠকাতে থাকবো, বিশ্বাসঘাতকতা করব, আর কামের আকর্ষণে এই স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করব? না, সে আমার পোষাবে না। কিন্তু এখন কি করি? জুলিয়ানের নকল করা নিছক গর্দভের কাজও বটে, কঠিনও বটে, কেন না এ স্ত্রীলোক নিজের বিশ্বাসঘাতকতায় অন্যকে পাগল করে তুলছে, নিজের স্পর্দ্ধায় সে উত্তেজিত, বেপথু এবং কামার্ত্ত। যে জীবনে কখনো নারীর উষ্ণ চুম্বন লাভ করেনি, একমাত্র সেই আমার উপর ঢেলা মারতে পারে।

যা হোক, আর এক মিনিট—যা বলছি, বুঝতে পারছেন তো? আর মিনিট খানেক—তাহলেই আমি—না, তাহলেই ও—হঠাৎ একটা দারুণ শব্দে আমরা দুজনেই চমকে লাফিয়ে উঠলাম। সেই বড় কাঠের রোলাটা ঘরের মধ্যে উলটে পড়েছে—সঙ্গে সঙ্গে লোহার সিক আর চিমনীর ঢাকাও ছিটকে পড়েছে। আর কারপেটে আগুন ধরে গেছে, পাগলের মত আমি লাফিয়ে উঠ্‌লাম। তার পর যখন সেই রোলাটাকে আবার চিমনীর মধ্যে রাখছি এমন সময় দরজা দড়াম করে খুলে জুলিয়েঁ ঘরে এসে ঢুকলো।

দেখলুম বেশ খুসী-খুসী ভাবখানা। বললে, হয়ে গেল, ম ভেবেছিলাম তার দু' ঘণ্টা আগেই কাজটা হয়ে গেল।

ভেবে দেখুন বন্ধু, ঐ কাঠের রোলাটা না হলে একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়তুম আর পরিণাম যে কি হত তা ত বুঝতেই পারছেন?

ঐ রকম একটা ব্যাপারে জীবনে আর কখনো ধরা না পড়তে হয় তার জন্য আমি বার বার সাবধান হয়ে চলেছি। কিছু দিনের মধ্যেই দেখি, আমার উপর জুলিয়েঁর তেমন আর টান নেই। তার স্ত্রী নিশ্চয়ই আমাদের বন্ধুত্ব যাতে নষ্ট হয় তার চেষ্টা করছে। তার পর ধীরে ধীরে সে আমাকে এড়িয়ে চলতে লাগলো, আর এখন আমাদের একেবারেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

বিয়ে যে কেন করলুম না, তার কারণটা হ'ল ঐ। আমার বিবেচনায় আপনার অন্ততঃ এতে অবাক হওয়া উচিত নয়।

অনুবাদক—শ্রীজীবন-য় রায়

দুটো দিনের ডায়েরী

প্রভাকর মাঝি

আকাশটা এত নীল, আহা এই নীলের মোড়কে
হীরের চুমকি-দেওয়া তারাগুলো জ্বল-জ্বল করে।
বহু দিনকার চেনা সাম্‌নের গাব গাছটায়
একটা ফিঙের ডাকে থেকে থেকে এত মধু ঝরে।
ঘাসে ঘাসে চিক্-চিক্ করিতেছে চিকণ শিশির,
গুঁড়ো গুঁড়ো রোদ ঝরে মুঠো-মুঠো ফাগের মতন।
মন চায় উড়ে যেতে খুসিয়াল বকেদের সনে—
জীবনের বালিয়াড়ি পার হতে জাগছে স্বপন।
পৃথিবীটা এত ভাল, এত মধু হিমেল হাওয়ায়,
আজকে এসেছে কাছে পাটনার মালবিকা রায়।

আকাশ কোথায় নীল? চিমনির কালো কালো ধোঁয়া
তারার লাবণ্যটুকু মুছে যেন দিল চিরতরে।
ভুতুড়ে গাবের গাছে বিচ্ছিরি স্বরে একটানা
ফিঙেটা তো ডেকে ডেকে কান দুটো ঝালাপালা করে।
হলদে বিবর্ণ ঘাসে সবুজের চিহ্ন জেগে নেই,
একটুকু রঙ নেই, এক ফোঁটা রস নেই আর।
ঝাপ্‌সা দু'চোখ দিয়ে দেখছি গভীর হতাশায়
পৃথিবীটা জুড়ে শুধু লড়াই চলছে জীবিকার।
হঠাৎ নিজেকে যেন মনে হোল বড়ো অসহায়,
আজকে গিয়েছে চলে পাটনার মালবিকা রায়।

বাঘের কবলে—আসামের জঙ্গলে

(সত্য ঘটনা)

সোফোন দাস্তি

ট্রেন থেকে যে ষ্টেশনে নামলাম, তার নামটা মনে পড়ছে না। এক সন্ধ্যায় আমার সামনে এসে নিজের ভাষায় কি যেন বলল। আমি উর্দু অথবা ভারতের অন্য কোন ভাষা জানি না। তবু বুঝলাম সে বলছে যে, সে স্লুইনকোর্থের ড্রাইভার। আমাকে ষ্টেশন থেকে স্লুইনকোর্থের চায়ের বাগিচায় নিয়ে যাবার জন্য ষ্টেশনে এসেছে। গম্ভীর ভাবে গিয়ে বসলাম তার মোটরের পেছনের বেঞ্চিতে। ষ্টেশন-মাষ্টার এবং তাঁর সহকর্মীরা অতি বিনয়ের সঙ্গে সেলাম করে আমায় বিদায় দিলেন। গাড়ী ছুটল।

কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলাম। হঠাৎ দেখি, আমাদের মোটর গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলেছে। চারি দিকে বড় বড় বৃক্ষ আর ঝোপ-ঝাড়। আমি নাইজেরিয়ার জঙ্গল দেখেছি এবং যুদ্ধের সময় বর্মার জঙ্গলে জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। জঙ্গলের নাম শুনেই যাঁরা আঁতকে ওঠেন আমি তাদের দলে নই। আমি জঙ্গল ভালবাসি। পশ্চিমী মরুভূমির মত ধূধূ প্রান্তর দেখলেই বরং আমার ঢের বেশী ভয় লাগে। ঝোপ ঝাড় জঙ্গল বৃক্ষের সমারোহ এবং সেখানকার বিচিত্র অধিবাসীরা আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। সত্যি কথা বলতে কি, বন-জঙ্গল সম্বন্ধে অনেক আতঙ্কজনক গাঁজাখুরী গালগল্প চালু আছে। সেগুলো সবই মিথ্যা। সুতরাং আমাদের গাড়ী যখনই হিমালয়ের পাদদেশস্থ পার্বত্য অঞ্চলের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে লাগল তখনই আমি একটা পরিচিত পরিবেশ দেখে উৎসাহিত হয়ে উঠতে লাগলাম। দূরে, বহু দূরে আমাদের সামনে যে পর্বতমালা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তার ওপারেই নাকি 'নিষিদ্ধ' রাজ্য ভুটান। সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় রেডিয়েটরের শোভাবর্দ্ধনকারী উলঙ্গ নারী-মূর্তিটিকে কেমন যেন বেমানান লাগছিল।

হঠাৎ বুথিভঙ্গ এবং আনবোড়ের স্মৃতি ভেঙ্গে গেল। মনে হল গাড়ীর গতি কমে আসছে। সামনে তাকিয়ে দেখি, এক বিরাট হাতী ডান দিকের জঙ্গল থেকে মুখ বার করে আছে। তারপর সে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। আমাদের দিকে যেন ভ্রূক্ষেপই নেই। ডাইনে-বাঁয়ে এলোমেলো ভাবে শুঁড় চালনা করছে। তার দাঁত মাত্র একটি। শুনলাম ড্রাইভার অস্ফুটে বলছে "শা বাহাদুর"। তার কণ্ঠে দস্তুর মত আতঙ্ক। গাড়ীখানাকে সে হাতীর থেকে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে দাঁড় করিয়ে দিল। আমি বললাম "যাও"। আমি জানি অধিকাংশ বন্য জন্তুই মানুষের কণ্ঠস্বর পছন্দ করে না এবং দৃঢ় বিশ্বাসে আশা করছিলাম যে বিশাল জন্তুটি আমাদের গাড়ীখানিকে আওয়াজ করতে করতে তার দিকে যেতে দেখলে সে পথ ছেড়ে দেবে। কিন্তু ড্রাইভার শা বাহাদুরের কাছ থেকে দূরে সরে থাকাই বেশী পছন্দ করল এবং মনে হল সে শা বাহাদুরকে চেনে। তখন আমার জানা ছিল না যে এক দাঁতওয়ালা হাতী অপার্থিব রহস্যময় জীব বলে বিবেচিত হয়। তারপর যখন শা বাহাদুর রাস্তা ত্যাগ করার পরিবর্ত্তে 'গজেন্দ্র গমনে' আমাদের মোটরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল তখন দস্তুর মত আতঙ্ক ধরে গেল। সে যেন পরীক্ষা করে দেখতে আসছে কে তার গৃহে অনধিকার প্রবেশ করেছে! তার কুলোর মত দুটি বিশাল কান নড়ছিল দ্রুত তালে। আমাদের থেকে এক দুই গজ দূরে এসে সে থেমে পড়ল এবং ক্ষুদে ক্ষুদে দুই চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। মনে হল সে কি করবে না করবে তা স্থির করতে পারছে না এবং একটু যেন বিমর্ষও। চারিদিকে তাকিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে আরও একটু এগিয়ে এসে সে তার শুঁড় বাড়িয়ে দিল। গাড়ীর আতঙ্কগ্রস্ত দুই আরোহী এবার বুঝতে পারল যে পুরুষ হস্তীটির আগ্রহের উৎস হল রেডিয়েটারের শোভাবর্দ্ধনকারী চকচকে, ক্রোমিয়াম প্লেটে মোড়া উলঙ্গ নারী-মূর্তিটি। মূর্তির প্রসারিত বাহু দুটি যেন সানুনয় আমন্ত্রণ এবং তার দেহে যে সামান্য একটুকরো কাপড় ছিল তাও যেন বাতাসে উড়ে যাচ্ছে পেছনের দিকে। বলা বাহুল্য, তখন বাতাসের নাম-গন্ধও ছিল না। কি কাণ্ড! শা বাহাদুর অতি সযত্নে এবং আদর সোহাগের ভঙ্গিতে নারী-মূর্তিটিকে তার শুঁড়ে জড়িয়ে ফেলল। সেই কামাতুরা দীপ্তিময়ী নারীমূর্তির প্রতি আকৃষ্ট শা বাহাদুর তাকে তার শুঁড়ে জড়িয়ে সলজ্জ আকর্ষণ করতে গিয়ে টের পেল যে বেশ গরম হয়ে আছে। গাড়ীখানা অনেক পুরোনো। ভিতরে জল ফুটছিল টগবগ করে আর বাইরে কামাতুরা নারীমূর্তির দেহের তাপ তার সঙ্গে তাল রেখেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শা বাহাদুর কৌতুক বশতঃ তার শরীরের সব চেয়ে স্পর্শকাতর অঙ্গ দিয়ে তাকে বেষ্টন করে বেদনাহত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে ছলনাময়ী নারীকে ত্যাগ করে দ্রুত পায়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রেয়সীর প্রথম আঘাতেই এভাবে পলায়ন করা শা বাহাদুরের পক্ষে নিশ্চয়ই উপযুক্ত কাজ হয়নি। যাই হোক, তার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার অস্ফুটে কি যেন উচ্চারণ করে গিয়ার লাগিয়ে বাকী কুড়ি মাইল অতি দ্রুতগতিতে চালাতে লাগল, যেন শা বাহাদুরের শুঁড় তাকে তাড়া করেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা প্রধান সড়ক ছেড়ে চা-বাগানের মধ্যে ঢুকলাম। চারিদিকে কোমর পর্যন্ত উঁচু সবুজ চায়ের গাছ। দূর থেকে বিলিয়ার্ড টেবলের মত দেখায়। একটা ছোট বাড়ী পেরিয়ে একটা বড় বাড়ীর সামনে আমাদের গাড়ী থামল। পাথরে তৈরী সুন্দর বাংলো। বহু বর্ণে বিচিত্র লতাপাতা দিয়ে ঘেরা বিরাট লন পেরিয়ে বারান্দার সিঁড়িতে উঠতেই গৃহস্বামী অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে তাঁর বাঁ হাত বাড়িয়ে দিলেন। দেখলাম তাঁর ডান হাতখানা কাঁধ থেকেই বিচ্ছিন্ন।

গল্প করতে করতে ঘরের চারি দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম দেওয়ালে বন্য জন্তুর সুন্দর সুন্দর ছবি টাঙানো রয়েছে। আমি তাঁকে শা বাহাদুরের কাহিনী খুলে বললাম। স্লুইনাকোর্থ বললেন "হ্যাঁ, শা বাহাদুরকে এখানে সকলেই চেনে। আশ্চর্যের কথা এই যে হাতীটা এক দাঁতওয়ালা হলেও কারও বিশেষ ক্ষতি করে না। কিন্তু এর আগে কখনও সে মোটর গাড়ী তল্লাস করছে বলে শুনিনি।"

স্লুইনাকোর্থ বারান্দার কোণায় দরজা খুলে আমায় শোবার ঘর

দেখালেন। তার গালিচা, পর্দা, আসবাবপত্র দেখে লণ্ডনের ফ্ল্যাট বলে মনে হয়। এটা যে জঙ্গলের বাঙলো তা ভুলেই যেতে হয়। এখানে এই ভুটান-সীমান্তে আমি যে বাথরুম পেলাম তা অনেক বড় সহরে পাবো কি-না সন্দেহ আছে। ঝিক্‌ঝিকে টালি-পাতা মেঝে, গরম এবং ঠাণ্ডা জলের চকচকে কল। বেড়ার কাছে বেড়াতে বেড়াতে সুন্দর সুন্দর ফুল এবং বড় বড় প্রজাপতি দেখে মুগ্ধ হলাম।

খাবার টেবলে গৃহস্বামী বললেন, "যায়গাটা আপনার বিশেষ খারাপ লাগবে না। এখন এখানে কিছুই করবার নেই। বর্ষা এখনও শেষ হয়নি, কাজেই শিকার সম্ভব নয়। বড় জোর দুই একটা হরিণ মারা যেতে পারে। আমি আপনার জন্য বন বিভাগ থেকে একটা হাতী ধার করেছি। না, শা বাহাদুর নয়। পরশু পর্যন্ত হাতীটা এসে পড়বে। তার পিঠে চেপে দুই একবার জঙ্গলে ঘুরে আসতে পারেন।"

শুনে যে কি আনন্দ পেলাম, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সন্ধ্যাটা কাটল শিকারের গল্পে। গৃহস্বামী শিকারে বেশ ওস্তাদ বলে বোঝা গেল। হাতীর চরিত্র সম্বন্ধেও তাঁর অগাধ জ্ঞান। আমি শুধু এই ভেবে বিস্মিত হচ্ছিলাম যে সুইনফোর্থের হাত তো মাত্র একটা, এত বড় বড় শিকার এক হাতে উনি করলেন কি করে? ভদ্রলোক বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়। তাই ভেবেছিলাম উনি বোধ হয় প্রথম মহাযুদ্ধে নিজের হাত হারিয়েছেন।

হাতীর পিঠে জঙ্গল পরিভ্রমণ আনন্দদায়ক এবং শিক্ষণীয়ও বটে। সুইনফোর্থ আমাকে হাওদায় চড়ার কৌশল শিখিয়ে দিলেন। আমাদের হাতীর নাম দেবীপ্রিয়া। তার পিঠে চড়ে জঙ্গলে যেতে যেতে সুইনফোর্থের সঙ্গে আমার গল্প জমে উঠল। সুইনফোর্থ বললেন, হাতীদের নাকি রৌদ্রে বেশী খাটানো হয় না। মাদী হাতী পুরুষ হাতীর চেয়ে বেশী বিশ্বস্ত। পুরুষ হাতীরা যতই ভাল হোক না কেন, এক সময় না এক সময় ক্ষেপে উঠবেই। তখন তাদের বেঁধে রাখতে হয়। দুই দাঁতওয়ালা হাতী খুব খাটতে পারে। এক দাঁতওয়ালা হাতীরা সাধারণতঃ বদমেজাজী হয় তবে তাদের পবিত্র জীব বলে মনে করা হয়। মহারাজারা এক দাঁতওয়ালা অথবা কম বেশী পায়ের আঙুলওয়ালা হাতীর জন্য অনেক বেশী টাকা মূল্য দিয়ে থাকেন। কি ভাবে খেদায় হাতী ধরা হয় এবং মাহুত কত ধৈর্য্য ধরে হাতীকে পোষ মানায় সে কাহিনীও শোনা গেল।

আমাদের সঙ্গে রাইফেল ছিল। সুইনফোর্থ বললেন, "একটা কার্তুজ মাটিতে ফেলে দিন।"

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁর দিকে তাকালাম।

"ফেলেই দেখুন না। যেন অন্যমনস্ক অবস্থায় পড়ে গেছে।"

আমি একটা কার্তুজ ফেলে দিলাম। সুইনফোর্থ মাহুতকে কি যেন বললেন। সঙ্গে সঙ্গে দেবীপ্রিয়া থেমে গিয়ে দুই এক পা পেছু হটল। মাহুত মাটিতে কার্তুজটা দেখে হাতীর কাঁধে পায়ের আঙুল দিয়ে একটা চাপ দিল আর হাতীটা তার শুঁড়ে করে কার্তুজটা মাটি থেকে তুলে মাথার উপর দিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে দিল।

আমি বললাম, "কার্তুজটা চকচকে দেখতে বলে হাতীর পক্ষে তোলা সম্ভব হয়েছে, অন্য কিছু তুলতে পারবে না বোধ হয়।" সুইনফোর্থ কিছুক্ষণ নীরব থেকে হঠাৎ আমায় বললেন, "সামনে ঐ যে একটা ছোট গাছের ডাল তিন টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে আছে, ওর কোন্ টুকরোটা আপনার চাই?"

আমি বললাম, "মাঝের টা।"

সঙ্গে সঙ্গে মাহুত হাতীর কাঁধে আবার পায়ের আঙুল দিয়ে একটা বিশেষ রকমের চাপ দিল। আর তৎক্ষণাৎ হাতী তার শুঁড়ে করে মাঝের টুকরোটা মাটি থেকে কুড়িয়ে তুলে দিল আমার হাতে। হাতীর ভাবটা এই, যেন বলতে চায় "দেখ গো দেখ, আমি কেমন লক্ষ্মী মেয়ে।"

আমি "লক্ষ্মী মেয়ের" পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করলাম কিন্তু বেচারী বোধ হয় টেরও পায়নি যে তার চামড়ায় আমি স্পর্শ করেছি।

আমরা রাস্তা ছেড়ে তৃণের বনে ঢুকলাম। আধ ইঞ্চি চওড়া এবং হাতীর পা সমান উঁচু ঘাসের ঘন বন। মাঝে মাঝে দুই একটা গাছের ডাল আমাদের পথ রোধ করছিল কিন্তু দেবীপ্রিয়া বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে সে বাধা দূর করল। আমরা যেমন দেশলাই কাঠি ভাঙ্গি, ঠিক তেমন ভাবে ডাল ভাঙতে ভাঙতে এগোতে লাগল সে।

সত্যি, আমি দেবীপ্রিয়ার প্রেমে পড়ে গেলাম। রোজ তার পিঠে চেপে বেড়াতে বেরুনো অভ্যাস হয়ে গেল। মাঝে মাঝে দুই-একটা হরিণ শিয়াল নজরে পড়লেও তেমন বিপজ্জনক জন্তু কখনও দেখিনি। এমন কি শা বাহাদুরকেও নয়।

একদিন সুইনফোর্থ বললেন যে, আমি তাঁর রাইফেল নিয়ে একটা হরিণ শিকার করতে পারি। তিনি নিজে আমার সঙ্গে আসতে পারবেন না তবে গুরিয়া নাথ নামে একজন সরকারী কর্মচারীকে আমার সঙ্গে দেবেন। লোকটা নাকি পাকা শিকারী।

গুরিয়া নাথ একটা পুরোনো ভারী রাইফেল নিয়ে আমার সঙ্গে দেবীপ্রিয়ার পিঠে চাপল এবং আমরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। সেটা নাকি রিজার্ভ ফরেষ্ট। হঠাৎ গুরিয়া নাথ মাহুতকে দাঁড়াতে বলে একটা বড় গাছের ডালে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, প্রায় ২৫ গজ দূরে গাছের ডালে একটি বনমোরগ নিশ্চল হয়ে বসে আছে। গুরিয়া নাথ কালবিলম্ব না করে তার দিকে বন্দুক চালালো। কয়েকটি পালক ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে আর পাখীটাও ঝুপ করে পড়ে গেল মাটিতে। এ সময়ে রিজার্ভ ফরেষ্টে বনমোরগ শিকার করা আইন অনুসারে নিষিদ্ধ কিন্তু গুরিয়া নাথ ভ্রূক্ষেপও করল না বরং আমি একটু আপত্তি করায় যেন চটে উঠল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা একটা তৃণময় অঞ্চলে প্রবেশ করলাম। হঠাৎ হাতীটা দাঁড়িয়ে পড়ল এবং মাহুত আঙুল দিয়ে কি যেন দেখালো বাঁ দিকে। তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম একটা ব্রাউন রঙের হরিণ। মাথায় চমৎকার দুটি শিঙ্।

গুরিয়া নাথ বলল: এতক্ষণে পেয়েছি বাছাধনকে।

আমি সুইনফোর্থের রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিলাম। যদি রাইফেল বিশ্বাসঘাতকতা না করে তাহলে শিকার কিছুতেই ফস্কাবে না।

কিন্তু কি জানি কেন, হরিণটাকে মারতে মন চাইছিল না।

গুলী চালাবার সময় হাতীটা হঠাৎ নড়ে ওঠায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হলাম আর হরিণটাও পালিয়ে গেল বনের মধ্যে।

শিকার প্রচেষ্টা এ ভাবে ব্যর্থ হলেও চা-বাগানের দিনগুলো বিচিত্র অভিজ্ঞতায় কেটে গেল। বিদায় নেবার আগের দিন সুইনফোর্থের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প হল খাবার-টেবলে। সুইনফোর্থ আমায় প্রশ্ন করলেন, "আমার ডান হাতটা গেল কিসে জানেন? জানেন না। তাহলে শুনুন।"

"আমাদের পাশের চা-বাগানের লোকেরা শিকারের আইন-কানুন মোটেই মানতে চায় না। ওদের একজন একদিন বন-মোরগ শিকারের উদ্দেশ্যে এক গাছে চড়েছে। শিকারের কায়দাটা ভারী অদ্ভুত। যে গাছে বন-মোরগ বাসা বাঁধে, বিকেলে সেই গাছে চড়ে বসে থাকতে হয় আর সন্ধ্যায় পাখীগুলো যখন নীড়ে ফেরে তখন তাদের শিকার করতে হয়। লোকটা গাছে চড়ে হঠাৎ নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে একটা বাঘ। দেখেই তো তার হৃৎকম্প। তাড়াতাড়ি তার উপর রাইফেল চালিয়ে দিল। বাঘের গায়ে লাগল না, লাগল থাবায়। বাঘটা আর্তনাদ করে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। দু-তিন ঘণ্টা বাদে লোকটা গাছ থেকে নেমে তার বন্ধুদের কাছে গিয়ে গল্পটা খুলে বলল। তৎক্ষণাৎ তারা আমায় টেলিফোন করে জানালো যে, তাদের বাগান একটা বাঘের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছে। আমিও কোপসে নগরে একটা হাতীর জন্য টেলিফোন করলাম। তারা আমাকে দুটো হাতী পাঠালো—দেবীপ্রিয়া এবং রূপারাণী। রূপারাণীর পিঠে চড়ে আমি আগে চারটে বাঘ শিকার করেছি। হাতী দুটো সন্ধ্যার সময় রুকারপুর থেকে এসে পৌঁছালো। পরদিন রূপারাণীর পিঠে চড়ে আমি বাঘ শিকারে বেরুলাম। পেছনে চলল দেবীপ্রিয়া। আমার শিকারী খবর এনে দিয়েছিল। কাজেই কোন্ দিকে যে আমাদের যেতে হবে তা আমাদের অজানা ছিল না। শিকারী আমার হাতীতেই ছিল। চা-বাগান ছাড়িয়ে মাইল খানেক ভিতরে ঢুকতেই সে বলল, আমরা বাঘের আবাস ভূমিতে পৌঁছে গেছি। কি করব না করব আলোচনা করছি এমন সময় বিরাট এক মাদী বাঘ জঙ্গল ভেঙ্গে সোজা আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। রূপারাণী লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে পেছন ফিরেই দে ছুট। দেবীপ্রিয়াও ছুটতে সুরু করল। ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই যে, আমাদের সামনে ভিজে রাস্তা বেয়ে ছুটছে দেবীপ্রিয়া আর বাঘিনী চলেছে রূপারাণীর পাশে পাশে। আমি বাঘিনীর দিকে রাইফেল বাগিয়ে তাক্ করার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। হঠাৎ রূপারাণী পেছন ফিরে রুখে দাঁড়ালো।

"দুর্ভাগ্য বশতঃ সেবার ভারী বৃষ্টি হয়েছিল! সারা পথ অসম্ভব কাদা। রূপারাণী বাঘিনীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য ডান দিকে ফিরতেই পা পিছলে পড়ে গেল। মাহুত নতুন হলেও বুদ্ধিমান লোক ছিল। চক্ষের নিমেষে সে গিয়ে উঠল এক গাছে। শিকারীও কোন দিকে না তাকিয়ে একটা গাছে বাদুড়ের মত ঝুলে পড়ল। আমি গিয়ে দাঁড়ালাম বাঘিনীর সামনে একটা উঁচু জায়গায়। সঙ্গে সঙ্গে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর। তার থাবাটা আমার হাতের উপর এত জোরে এসে চেপে বসল যে, আজও আমি তার যন্ত্রণা ভুলতে পারিনি। তার পর একটা মোচড় দিয়ে একটা হেঁচকা টান মারতেই হাতের হাড়টা আলগা হয়ে গেল। এইবার সে আমার বাহুমূলে থাবা বসালো। জানি না কেমন করে কি হয়ে গেল। আমি যখন মাটিতে নামি তখন আমার হাতে রাইফেল ছিল। আমি বাঁ হাতে সে রাইফেলটা দিয়ে বাঘিনীকে তাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। সত্যি কথা বলতে কি, তখন আমি ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত। বাঘিনী আমার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ডান হাত ছেড়ে দিয়ে রাইফেলটা কামড়ে ধরবার চেষ্টা করল, কারণ ওটা তার অস্বস্তি বাড়াচ্ছিল। আর ধরবি তো ধর রাইফেলের ঘোড়াটার উপরই সে দিল কামড়। হয়ত আপনি বিশ্বাস করবেন না কিন্তু পরে আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাবো। তার পরের ঘটনা বিশেষ কিছু মনে নেই শুধু মনে আছে রাইফেলের আওয়াজ হয়েছিল এবং বাঘিনী এক পা দু পা করে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"ইতিমধ্যে দেবীপ্রিয়ার মাহুত দেবীপ্রিয়াকে বশে এনে আবার ফিরে এসেছে। রূপারাণীর মাহুত এবং শিকারীকে গাছ থেকে নামিয়ে আমাকে তার পিঠে তুলে বাসায় ফিরিয়ে আনল। তার পর এক বছর হাসপাতালে ছিলাম কিন্তু হাতটাকে বাঁচানো গেল না।"

"বাঘিনীর কি হল?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"কয়েক দিন বাদে এক পুলিশ-সুপার এসে তাকে মেরে গেলেন। দেখা গেল বেচারীর থাবায় গ্যাংগ্রিন হয়েছে আর একটা দাঁত ভাঙ্গা।"

"দাঁত ভাঙল কি করে?"

"আপনাকে একটা জিনিস দেখাবো বলেছিলাম, এইবার দেখাচ্ছি।" সুইনফোর্থ ঘর থেকে একটা রাইফেল নিয়ে এল। ঘোড়ার কাছে যে কাঠের টুকরো থাকে সেইটার উপর আঙুল দিয়ে দেখালো, "বাঘটা যখন আমার হাত ছেড়ে রাইফেলে কামড় দেয় তখন তার দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল, এই দেখুন তার টুকরোটা।"

দেখলাম সত্যিই একটা দাঁতের টুকরো কাঠে আটকে আছে। শুনলাম এই ঘটনার পর দেবীপ্রিয়ার মাহুতকে নাকি "বৃটিশ এম্পায়ার মেডেল" পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

অনুবাদক—সুনীল ঘোষ।

প্রেমেন্দ্র বিশ্বাস

"ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।"

ঘুমন্ত সিংহের মুখে স্বয়ং আসে না ছুটে
হরিণের মতো কোনো খোদা আহার,
সুদৃঢ় সংকল্প ও একাগ্র চেষ্টায় উঠে
করিয়া লইতে হয় বাহ্যোদ্ধার।

শ্রীতরুণ রায়

ঘুম থেকে উঠে বিজয়ভূষণ আড়মোড়া ভাঙে। আজকের সকালটা তার খুব ভাল লাগছে। শরতের মিষ্টি রোদ, ঝিরঝিরে হাওয়া। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সবুজ গাছটার উপর সোনালী আলো এসে পড়েছে। বিজয়ভূষণ সেই দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। আজকের দিনটি, অন্য দিনের চেয়ে অনেকখানি পৃথক। প্রায় ছ'মাস বাদে আজ দেখা হবে আশালতার সংগে।

আশালতা ও তার স্বামী নরেন্দ্রনাথ পাটনা থেকে কোলকাতা এসেছে মাত্র তিন দিনের জন্যে। কাল নরেন্দ্রনাথ বিজয়ভূষণের অফিসে এসেছিল দেখা করতে। হাতে হাত মিলিয়ে, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে, আপনার উপকার আমি ভুলব না। আপনি আমায় কোম্পানীর বেতনভোগী অরগানাইজার করে দিয়েছেন, সেজন্যে অশেষ ধন্যবাদ!

বিজয়ভূষণ ব্যস্ত হয়ে উত্তর দিয়েছিল, একথা কেন বলছেন, ইন্সিওরেন্স কোম্পানী সব সময় যোগ্য লোকই খোঁজে, আপনি যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন তাই না—

—না, না, এ আপনার অনেক মেহেরবানী।

—সে কথা থাক, পাটনায় কেমন কাজ হচ্ছে বলুন?

—খুব ভাল। আপনি চলে আসার পর এ ছ'মাসের মধ্যে কোম্পানী অনেকটা দাঁড়িয়ে গেছে। ম্যানেজার খুব সুদক্ষ।

—কাগজপত্রে তাই দেখছি বটে! আপনার নিজের কি রকম চলছে বলুন—

নরেন্দ্রনাথ সহাস্যে বলে, অফিসের কাজ তো করছি, তাছাড়া আশালতার নামে একটা এজেন্সি রেখেছি। তাতেও মন্দ রোজগার হচ্ছে না। ইন্সিওরেন্স ছাড়াও বাবুজীর মোটর গ্যারেজ বেশ চালু আছে।

কথা শুনে বিজয়ভূষণ সত্যিই খুশী হয়। বলে, বড় আনন্দ পেলাম। আপনার ছেলের কি খবর বলুন?

—প্রেমল, ঠিক সেই রকমই দুষ্টু। একটা ইংরাজী স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি। কিন্তু ও আপনার অভাব খুব অনুভব করে।

—তাই নাকি?

—বাঃ, আঙ্কল বলতে ও তো পাগল। আপনি থাকতে সব সময় জালাতন করত না; কিন্তু কি আশ্চর্য্য কলকাতায় ফিরে এসে আপনি ভাল করে চিঠিপত্র দিলেন না।

বিজয়ভূষণ অপ্রস্তুত হয়ে বলে, কাজের চাপে বুঝেছেন না? সময়ই পাই না—

—সে আমি বুঝতে পারি, আশা বোঝে না। বলে, উনি বিদেশে ছিলেন তাই আমাদের সংগে এত মেলামেশা করেছেন, দেশে ফিরে গিয়ে কি আর বিদেশীদের কথা মনে থাকে?

বিজয়ভূষণ বাধা দিয়ে বলে, মোটেই তা নয়। আপনাদের কথা কত সময় ভাবি—

—সে ঝগড়া আপনি আশার সংগে করবেন, আপনার সংগে দেখা করার জন্যেই সে এত দূর ছুটে এসেছে।

—বেশ তো, কালকে একসংগে লাঞ্চ করা যাক। একটার সময় 'কোয়ালিটি'তে আশাকে নিয়ে আসুন।

—কোন্ জায়গায় বলুন তো?

—পার্ক ষ্ট্রীটে।

ধন্যবাদ জানিয়ে নরেন্দ্রনাথ বিদায় নেয়।

আজই একটার সময় আশালতার সংগে দেখা হবার কথা, বিজয়ভূষণ বিছানায় বসে বসে সেই কথাই ভাবছে। চাকর এসে সেখানেই চা দিয়ে যায়।

তার মনে পড়ছে পাটনায় এই পাঞ্জাবী পরিবারটির সংগে প্রথম আলাপের কথা। বিজয়ভূষণ তখন পাটনায় ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে এসেছে, নতুন শাখা খোলার সব রকম ব্যবস্থা করার জন্যে। ফ্রেজার রোডে দু'খানা কামরা নিয়ে তার অফিস, সংগে মাত্র দু'জন কর্মচারী। পাটনায় তখন থাকার জায়গা পাওয়া এক রকম অসম্ভব। সৌভাগ্য বশতঃ দানাপুরে ওর পিসতুতো ভাই রেলের কাজ করত। বেশ ভাল কোয়ার্টার্স, সেইখানে গিয়ে বিজয়ভূষণ ওঠে। দানাপুর থেকে

ট্রেণে করে পাটনায় আসতে মিনিট পনেরর বেশী লাগত না, তাই যাতায়াতে বিশেষ অসুবিধে ছিল না।

একদিন কাজ সেরে বিজয়ভূষণ বাড়ী ফিরছে, ট্রেণে এতটুকু জায়গা নেই। কোন রকমে সেকেণ্ড ক্লাশ কামরার এক কোণে দাঁড়িয়েছে। মোটা মানুষ, এমনিতেই ঘেমে ওঠে। তার উপর দমবন্ধ-করা ভীড়। মনে মনে ভাবে, মিনিট পনের কোন রকমে কেটে যাবে। এমন সময় পিছন থেকে পিঠে হাত দিয়ে কে ডাকে, ফিরে দেখে এক পাঞ্জাবী-দম্পতি। ভদ্রলোকটি বলে, এখানে বসুন।

তারা সরে গিয়ে জায়গা করে দেয়। বিজয়ভূষণ বাধা দিয়ে বলে, না, না। কষ্ট করবেন না।

—এতে কষ্টের কি আছে?

অগত্যা বিজয়ভূষণকে বসতে হয়।

—ক'দ্দুর যাচ্ছেন?

—দানাপুর।

—আমরাও তো দানাপুর যাচ্ছি।

—কোথায়?

—মিলিটারীদের জন্যে যে 'প্রভিসন্' ষ্টোর আছে, তারই কণ্ট্রাকটার আমাদের আত্মীয়।

—মিষ্টার সন্ধি?

ভদ্রলোক বিস্ময় প্রকাশ করেন, চেনেন দেখছি? আমাদেরও পদবী সন্ধি কি না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আলাপ জমে ওঠে। ভদ্রলোকটি মিশুকে প্রকৃতির, বিজয়ভূষণের কাজ-কর্মের কথাও উনি জেনে নেন। বলেন, খুব ভাল হ'ল, আমরা পাটনায় থাকি, নিশ্চয় দেখা হবে। এই কার্ডে আমাদের ঠিকানা আছে।

ভদ্রলোক ব্যাগ থেকে একটি কার্ড বের করে দেন।

দানাপুরে ট্রেণ থামলে বিজয়ভূষণ পাঞ্জাবী-দম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বাড়ী চলে আসে। সে মনে মনে একথা স্বীকার না করে, পারে না, শ্রীমতী সন্ধি সত্যিই রূপসী। এ ধরণের নিখুঁত চেহারা ছবির পর্দা ছাড়া বড় একটা বাইরে দেখা যায় না।

এ ঘটনার দিন পনের বাদে বিজয়ভূষণ 'কদমকুয়া'য় গিয়েছিল এক পার্টির সংগে দেখা করতে। দেখা হ'ল না, অফিসে ফিরে আসছিল। মনে পড়ে গেল তার ট্রেণে আলাপিত সন্ধি-পরিবার এই জায়গারই ঠিকানা দিয়েছিল। পকেট থেকে কার্ড বার করে ঠিকানা মিলিয়ে, ওদের বাড়ী খুঁজে পেতে দেরী হয় না। বড় বড় হরফে সাইনবোর্ড লেখা রয়েছে, 'সন্ধি অটোমবাইলস'। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক মোটর গাড়ীর বনেট খুলে তদারক করছিলেন। বিজয়ভূষণ কাছে গিয়ে ইংরাজীতে জিজ্ঞেস করে, মিঃ সন্ধি বাড়ী আছেন?

ভদ্রলোক না তাকিয়ে উত্তর দেন, আমিই মিঃ সন্ধি, কি চাই বলুন?

—আর কোন মিঃ সন্ধি থাকেন কি? দানাপুর ট্রেণে আলাপ হয়েছিল?

ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকান, তাহলে বোধ হয় আমার ছেলেকে খুঁজছেন। বলেই চীৎকার করে ডাকেন, নরেন্দ্র—, পাঞ্জাবী ভাষায় আরও কিছু বলেন।

ওপর থেকে সাড়া দিয়ে নরেন্দ্রনাথ নেমে আসে। বিজয়ভূষণকে দেখে সে খুব খুসী হয়, করমর্দন করে সাগ্রহে বাবার সংগে আলাপ করিয়ে দেয়, আমার বাবা, ইনি আমার বন্ধু।

প্রৌঢ় মিঃ সন্ধি হেসে বললেন, নরেন্দ্র, এঁকে ওপরে নিয়ে যাও, আমি এখনই আসছি।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে বসবার ঘরে বিজয়ভূষণকে বসিয়ে নরেন্দ্র ভিতরে চলে যায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে ঢোকে, এঁকে দেখেছেন, কিন্তু সেদিন আপনার সংগে আলাপ হয়নি। আমার স্ত্রী আশালতা।

বিজয়ভূষণ নমস্কার করে নিজের পদবী বলে, চ্যাটার্জ্জী।

আশালতা প্রথম কথা বলে, আপনাকে বাঙালী বলে মনেই হয় না।

—কেন?

—আমি তো ভেবেছিলাম ইউ-পির লোক। হিন্দী তো খুব ভাল বলেন?

বিজয়ভূষণ অমায়িক হাসে, ছোটবেলা থেকে বাইরে মানুষ হয়েছি, বাবার সংগে মজঃফরপুরে থাকতাম।

—তাই বলুন, বাঙালীদের হিন্দী উচ্চারণ মোটেই ভাল নয়।

—সেটা বাঙালীর দোষ নয়, ভাষাটার দোষ। আমরা এটাকে বলি দরোয়ানী ভাষা—

নরেন্দ্রনাথ উদার গলায় বলে, এ-বিষয়ে আমরাও একমত। পাঞ্জাবী আর উর্দ্দু এ দুটো ভাষাই আমরা পছন্দ করি। অবশ্য শুনেছি বাংলা খুবই ভাল ভাষা, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা কিছুই বুঝতে পারি না। তবে কয়েকটা রবীন্দ্র বাবুর লেখা দু'-একটা ইংরাজীতে পড়েছি।

কথা উঠল পাটনা সহর সম্বন্ধে। আশালতা জিজ্ঞেস করে, মিঃ চ্যাটার্জ্জী, এ সহর কেমন লাগছে?

—অভিযোগ করার কিছু নেই। তবে কলকাতায় থেকে বুঝেছেন না—

—সে তো বটেই। তবে আপনারা তো দেশে ফিরে যাবেন,

আজ না হয় কাল। কিন্তু আমাদের কি বলুন তো, দেশই রইল না—

আশালতার গলার স্বর গম্ভীর হয়ে আসে। নরেন্দ্র সহজ করে বুঝিয়ে দেয়, আমরা উদ্বাস্তু কি না—

—কোথায় বাড়ী আপনাদের?

—লাহোর। সেখানে বাবার মোটরের বিরাট ব্যবসা ছিল, বাড়ী ছিল।

নরেন্দ্রনাথ লাহোরের গল্প করে, সেখানকার সুখের দিনের কথা। তারপর দেশ ভাগ হ'ল, আত্মীয়-স্বজনকে হারিয়ে কি ভাবে সব-কিছু ফেলে রেখে পালিয়ে আসতে হয়। এ ধরণের দুঃখের ইতিহাস বিজয়ভূষণ অনেকের মুখেই আগে শুনেছে, তবে এদের মধ্যে যে ভাবটা তার ভাল লেগেছিল তা হ'ল দুঃখের মধ্যেও বাঁচবার কি অদম্য ইচ্ছা! নিজেদের পায়ে ভালো ভাবে দাঁড়াবার কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!

—পাটনায় এলাম আমার দূরসম্পর্কের কাকার জন্যে। উনিই দানাপুরে থাকেন। এখানে বাবা ছোট করে গ্যারেজের কাজ সুরু করেছেন, আমিও ঐতেই সাহায্য করি। যত দিন না অন্য কিছু পাই—

কথাবার্ত্তার ফাঁকে কোন সময় উঠে গিয়ে আশালতা চা, পাকোড়া নিয়ে আসে।

—এ কি, এত কে খাবে?

আশালতা বলে, বেশী কিছু তো দিইনি। প্রথম দিন এলেন, চা খেয়ে যাবেন না?

গল্প করতে করতে তিন জনেই, চাপর্বে যোগ দেয়। হাসি-ঠাট্টা আলাপের মধ্যে কখন যে খাবারের থালা খালি হয়ে যায়, কেউ খেয়াল করে না।

আশালতা হেসে বলে, দেখলেন তো, কি রকম হিসেব করে খাবার দিয়েছি? এতটুকু ফেলা যায়নি—

বিজয়ভূষণ কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, প্রশংসা আমার পাওনা। কারণ, আমি হলাম চিরকেলে পেটুক, তাই খাবারের অপচয় করতে দিইনি।

চলে আসার সময় সন্ধি-দম্পতি বার বার করে বলে দেয়, আবার আসবেন নিশ্চয়। আমাদের বন্ধু-বান্ধব এখানে বেশী নেই, আপনার সংগে আলাপ হয়ে বড় আনন্দ পেলাম।

অফিসে ফেরার মুখে বিজয়ভূষণ এই পরিবারটির কথা সারা ক্ষণ ভেবেছে। তার মনে হয়েছে আশালতা শুধু সুন্দরীই নয়, সুগৃহিণীও বটে!

চাকর এসে দাড়ি কামানোর গরম জল দিয়ে যায়। অগত্যা বিজয়ভূষণকে বিছানা ছেড়ে উঠতেই হয়। চেয়ারে বসে সামনে আয়না রেখে মুখে সাবান লাগায়। দাড়ি কামাতে সুরু করে মনে পড়ল প্রেমলের কথা। প্রেমল নরেন্দ্রনাথের বছর ছয়েকের ফুট্‌ফুটে ছেলে, দাড়ি কামাবার তার ভীষণ সখ। সেই সূত্রেই বিজয়ভূষণের সংগে তার আলাপ।

সে দিন বোধ হয় শনিবার, অফিসের পর বিজয়ভূষণ নরেন্দ্রনাথের বাড়ী গিয়েছিল। প্রায় শনিবারই এ সময় তাসের আড্ডা বসে। বামী খেলতে খেলতে নরেন্দ্রনাথের বাবা মিঃ সন্ধি বললেন, তাস খেলতাম আমরা যৌবনে, কত টাকা বাজী ধরা হত। সে এক নেশার মত ছিল।

নরেন্দ্রনাথ সায় দিয়ে বলে, সে আমার মনে আছে। আমরা তখন ছোট, তাস খেলার ঘরে ঢোকার নিয়ম ছিল না। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতাম।

—শ'য়ে শ'য়ে টাকা একদিনে খেলা হত।

আশালতা মাঝখান থেকে বলে, কি জানি, বাজী রেখে কেন লোকে তাস খেলে! এমনি খেলাতেই তো যথেষ্ট আনন্দ।

কথা হয়তো এই ভাবেই চলতো কিন্তু প্রেমল এসে থামিয়ে দেয়। সে মাকে কিছুতেই খেলতে দেবে না। তার সংগে পাশের ঘরে গল্প করতে হবে।

নরেন্দ্রনাথ বললে, সানি, একটু অপেক্ষা কর আমরা খেলে নিই। মিঃ সন্ধি অনেক বার বললেন, আশালতা আদর করে পরে অনেক রকম গল্প বলার প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু কিছুতেই কাজ হ'ল না। প্রেমল কান্না জুড়ে দিল। তখন বিজয়ভূষণ শেষ চেষ্টা করে, প্রেমলের কাছে গিয়ে কানে কানে বলে, তুমি যদি এখন আমাদের খেলতে দাও, তাহলে পরে তোমার দাড়ি কামিয়ে দেব।

আশ্চর্য্য! সংগে সংগে প্রেমলের কান্না থেমে গেল। চোখের জল মুছে জিজ্ঞেস করে, সত্যি তো? তাহলে আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি।

প্রেমল হাসিমুখে পাশের ঘরে চলে যায়। সকলে বিজয়ভূষণকে জিজ্ঞেস করে, কি বললেন ওকে?

—সে বলব না। ও আমাদের গোপন কথা।

খেলা শেষ হয়ে গেলে অবশ্য বিজয়ভূষণকে প্রেমলের গালে দাড়ি কামানোর সাবান লাগিয়ে ব্লেডবিহীন সেফটি-রেজারটা বুলিয়ে দিতে হয়েছিল। সেই থেকে প্রেমল সব সময় তার পেছু পেছু ঘুরত, বাড়ীতে এলে 'আঙ্কল্' বলে গলা জড়িয়ে ধরত।

এই শিশুটিকে বিজয়ভূষণ সহজেই ভালবেসে ফেলে। তার জন্যে লজেন্স চকলেট নিয়ে আসা, ইংরাজী গল্পের বই কিনে আনা, ছোটদের সিনেমা দেখতে নিয়ে যাওয়া, এ ছিল তার অন্যতম কাজ। কত দিন শুধু প্রেমলের জন্যেই তাকে এ বাড়ীতে আসতে হয়েছে, যে সময় আর কেউ হয়ত ছিল না!

আশালতা সকৃতজ্ঞ চিত্তে কত দিন বলেছে, প্রেমল আপনাকে খুব ভালবাসে, বাড়ীর লোক ছাড়া ও আর কাউকে এত কাছে টেনে নেয়নি।

বিজয়ভূষণ বলেছিল, শিশুদের আমি খুব ভালবাসি।

প্রেমলের সংগে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর বিজয়ভূষণ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল, আশালতার মত কর্ত্তব্যপরায়ণা, স্নেহময়ী জননী আজকের দিনে সহজে চোখে পড়ে না।

বেশ বেলা হয়ে গেছে, বিজয়ভূষণ ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে। দাড়ি কামান শেষ করে স্নান করতে চলে যায়। ঝাঁজরি থেকে ঠাণ্ডা জল পড়ছে সমস্ত শরীরে, কি স্নিগ্ধ, কি শীতল! পাঞ্জাবী পরিবারের সকলের কথাই মনে পড়ছে, ক' মাসের মধ্যে কতখানি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল বিজয়ভূষণ। সদা হাস্যময়, প্রৌঢ় মিঃ সন্ধি, নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। অবসর বিনোদনের জন্য যেটুকু গল্প করেন তা প্রাণখোলা হাসিতে ভরা। আগে লাহোরে কি রকম ছিলেন,

সে নিয়ে দুঃখ করা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। বিজয়ভূষণের মনে পড়ে তিনি একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন, Act act in this living present, heart within and God overhead.

এ কথা যে তিনি শুধু মুখেই বলতেন তা নয়, বিশ্বাস করতেন সর্ব্বান্তঃকরণে।

কিন্তু পুত্র নরেন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষ। আগেকার দিনের কথা বলে সে দুঃখ করে। এখন কি করবে না করবে ভেবে পায় না। মিঃ সন্ধির সংগে গ্যারেজের কাজ করলেও সেদিকে সবটুকু মন দিতে পারে না। অন্য কিছু করার আশায় উন্মুখ হয়ে থাকে।

এই উদ্বাস্তু-পরিবারটিকে সুসংবদ্ধ করে রেখেছিল আশালতা। সে মিঃ সন্ধির সংগে দৈনন্দিন কাজের কথা আলোচনা করত, ভুলেও ফেলে-আসা দিনের কথা উল্লেখ করত না। মিঃ সন্ধি গর্ব করে বলতেন, আশালতা ঠিক আমায় বুঝতে পেরেছে, আমার আদর্শে সে অনুপ্রাণিত।

অথচ বিজয়ভূষণ লক্ষ্য করেছে, স্বামী নরেন্দ্রনাথের সংগে সে কত সময় দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা আলোচনা করে। স্বামীর সব-কিছু ভাবনার অংশ নেয়, পরামর্শ করে সংসার চালায়। সংগে সংগে প্রেমলের জন্যেও তার দুর্ভাবনার অন্ত নেই। স্পষ্ট বোঝা যায়, আশালতা এই পরিবারটির প্রাণকেন্দ্র।

বিজয়ভূষণ স্নান সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে, তাড়াতাড়ি স্যুট পরে নিয়ে ব্রেকফাষ্ট টেবিলে গিয়ে বসে। চাকর আগে থেকেই খাবার সাজিয়ে রেখেছিল। একটা মুসুম্বি তুলে নিয়ে লেবুর মত খোসা ছাড়াতে সুরু করে। মনে পড়ে আশালতা তাকে এই ভাবে না কেটে মুসুম্বি খেতে শিখিয়েছিল।

তারা গিয়েছিল পিকনিকে, 'কাইলয়ার' ষ্টেশনে নেমে গঙ্গার সঙ্গম দেখতে এক্কায় চড়ে। সারাদিন হৈ-চৈ। পথে যেতে যেতে প্রৌঢ় সন্ধি বললেন, কিছু মনে করবেন না মিঃ চ্যাটার্জ্জী, ইন্সিওরেন্সের এজেন্টদের উপর অনেক রকম মজার গল্প আছে।

বিজয়ভূষণ উত্তর দেয়, আমিও অনেক রকম জানি। তবে আপনারটা কি শুনি?

—কোন ভদ্রলোকের কাছে 'লাইফ ইন্সিওর' করবার জন্যে দুজন এজেন্ট গেছে। এক জন আমেরিকান কোম্পানীর আর এক জন বিলিতী কোম্পানীর। ভদ্রলোক তো মহা বিপদে পড়লেন, কা'কে দিয়ে ইন্সিওর করাবেন। শেষ পর্য্যন্ত বললেন, "যার কোম্পানী তাড়াতাড়ি পেমেণ্ট দেয় সেইখানেই তিনি ইন্সিওর করাবেন।" তখন ইংরাজ ব্রোকারটি বললেন, "তাহলে তো আমার কোম্পানীতেই করাতে হয়, কারণ আপনি মারা যাবার সংগে সংগে ডাক্তার ডেথ্ সার্টিফিকেট দেবার আগেই আপনার ওয়ারিশকে আমরা টাকা দিয়ে দেবো।" এ কথা শুনে আমেরিকান ব্রোকার হো-হো করে হেসে উঠল, "এ তো কিছুই নয়। আমাদের কোম্পানী আরও তাড়াতাড়ি পেমেণ্ট করে। মনে করুন, আপনি ঠিক করলেন আত্মহত্যা করবেন, বিশ তলা 'স্কাই স্ক্রেপারে'র উপর থেকে মারলেন লাফ। যখন আপনি দোতলা পর্য্যন্ত নেমেছেন জানলা থেকে আমরা চেক্ বার করে আপনার হাতে দিয়ে দেবো।"

কথা শুনে সকলেই হাসলো, বিজয়ভূষণ হাসলো সব চেয়ে বেশী। বললে, ওদেশে তবু তো ভাল, ইন্সিওরেন্স করার দাম লোকে বোঝে। কিন্তু এদেশে যে সব উল্টো। আমি তো দেখছি এই পাটনা সহরে কাউকে ইন্সিওর করতে বলার চেয়ে কুইনাইন খাওয়ানো সোজা।

—এখানে আপনার কাজ ভাল হচ্ছে না?

—চলছে এক রকম। সবাই সুবিধে চায়। এই তো ক'দিন আগে এক পার্টি এসেছিল, তার গাড়ী বুঝি এক্সিডেণ্টে ভেঙ্গে গেছে। দুই হাজার টাকার ক্লেম দিয়েছে। পুলিশে ঠিক মত রিপোর্ট করেনি, কোন বড় গ্যারেজের এস্টিমেট নেয়নি, এ ব্যবস্থায় আমরা কি করতে পারি বলুন?

মিঃ সন্ধি বললেন, গাড়ীর কাজ না জানলে সত্যি মুস্কিল হয়। আপনি এক কাজ করতে পারেন, গাড়ীর কোন ক্লেম এলে আমাকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন, ন্যায্য পাওনা কি না বলে দেবো।

—অনেক মেহেরবানী আপনার, এতে সত্যিই কাজের সুবিধে হবে।

আশালতা বাধা দিয়ে বলে, আপনারা কাজের কথা একটু থামাবেন, এর চাইতে বেড়াতে না বেরুলেই হ'ত।

বিজয়ভূষণ তাড়াতাড়ি বলে, সত্যি আমাদের অন্যায় হয়েছে। এ রকম খরখরে রোদ, কাঠো মাঠ, অসমতল রাস্তা, এক্কার ঝাঁকুনি, এ রকম ভাল জিনিষ উপভোগ না করা—

নরেন্দ্রনাথ হেসে ফেলে, আপনি দেখছি আশাকে বড্ড রাগিয়ে দেন।

আশালতা ইতিমধ্যে ব্যাগ থেকে মুসুম্বি বার করে সকলের হাতে দেয়। বিজয়ভূষণ জিজ্ঞেস করে, কাটব কি দিয়ে?

—কাটতে হবে না, ছাড়ান।

এর আগে বিজয়ভূষণ এ ভাবে ছাড়িয়ে মুসুম্বি কখনও খায়নি। ধন্যবাদ জানিয়ে বলে, আপনার কাছে একটা নতুন জিনিষ শিখলাম।

বিজয়ভূষণের প্রাতরাশ তখনও শেষ হয়নি। খুব আস্তে আস্তে কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে। আশালতা কফি খেতে খুব ভালবাসত। শুধু নিজে খেতে নয়, অপরকে খাওয়াতেও। কত দিন বিজয়ভূষণকে আশালতার কাছে খেয়ে আসতে হয়েছে। প্রেমল আসত অফিসে, চাকরের সংগে। সেইখান থেকেই ছুটির পর ধরে নিয়ে যেত মার কাছে। বিজয়ভূষণ হেসে বলত, আপনার ছেলে আর আমায় অফিস করতে দেবে না দেখছি—

আশালতা হাসে, আপনার সংগে গল্প না করলে যে ওর মন ভরে না।

প্রেমল বাধা দিয়ে বলে, 'আঙ্কল' কি শুধু আমার সংগে গল্প করে? দাদু, বাবা, তুমি, সবাই তো গল্প কর।

বিজয়ভূষণ প্রেমলের পিঠে হাত রাখে, আমার একটা সুবিধে হয়েছে, দোকানে গিয়ে কফি খেতে হয় না।

আশালতা বলে, কফির জন্যে তো আসেন না, প্রেমল নিয়ে ধরে না আনলে—

—আপনি কেন ও-কথা ভাবেন, এখানে আপনারা ছাড়া আমার তো কোন বন্ধু নেই?

—কেন, এখানে তো অনেক বাঙালী আছেন?

—বাঙালী হলেই কি বন্ধু হয়?

একটু পরে আশালতা বলে, আমাকে বাংলা ভাষা শেখালেন না তো ?

—বাংলা দেশে চলুন, ক'দিনে শিখে যাবেন।

—কবে যাওয়া হবে কে জানে ? আমি বাংলা গান শুনেছি, আপনি গাইতে জানেন ?

—শোনাবার মত নয়, বাথরুমে গেয়ে থাকি।

বেশীর ভাগ বিকেলের দিকে আশালতার সংগে একলা বসেই বিজয়ভূষণের গল্প করতে হত। বেশ খানিক বাদে নরেন্দ্রনাথ ও মিঃ সন্ধি এসে যোগ দিতেন। নরেন্দ্রনাথ কত দিন বলেছে, মিঃ চ্যাটার্জ্জী,—আপনাকে পেয়ে আমার ছেলে এবং স্ত্রী দুজনেই খুব খুশী আছে ও বেচারীরা সংগীর অভাবে এখানে শুকিয়ে যাচ্ছিল !

আশালতা সে কথায় সায় দিয়ে বলত, মিঃ চ্যাটার্জ্জীকে আমার খুব আপনার লোক মনে হয়, নিজের আত্মীয়ের মত।

যে দিন সিনেমা দেখে ফিরতে রাত হ'ত সেদিন আর বিজয়ভূষণের দানাপুরে ফেরা হত না। খেয়ে দেয়ে ওদের ওখানেই শুয়ে পড়ত। খাওয়ার পর কফি হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ গল্প চলত। বিজয়ভূষণ অকপটে স্বীকার করেছে এভাবে কোন বিদেশী পরিবারের সংগে সে আগে কখনও মিলে যেতে পারেনি।

আশালতা নিজের হাতে বিছানা তৈরী করতো। নরেন্দ্রনাথের পাঞ্জাবী, পাজামা বিজয়ভূষণের জন্যে ঘরে রেখে যেতো। বালিশে ওডিকোলনের গন্ধ ছড়িয়ে দিত।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে হঠাৎ একদিন বিজয়ভূষণের মনে হয়েছিল আশালতা তাকে ভালবাসে। এ ধারণাটাকে সে মন থেকে তখনই মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। তা না হলে কেন আশালতা বিজয়ভূষণের সংগে দেখা করবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে বসে থাকে ? কেন কথায় কথায় তার উপর অভিমান হয় ? কেন বিজয়ভূষণ তার কথা শুনলে ব্যথা পায় ? সে রাত্রে বিজয়ভূষণের ঘুম হ'ল না। বার বার উঠে সে পায়চারী করেছে।

জল খাবার জন্যে একবার সে ঘর থেকে বার হয়েছিল, দেখে, আশালতা চুপ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। তখন অনেক রাত, বিজয়ভূষণের সাহস হয়নি কাছে যাবার। জল না খেয়েই লঘু পায়ে সে ঘরে ফিরে আসে। কিন্তু বুঝতে পেরেছিল, আশালতা তারই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। লজ্জায় সে-ও বেরিয়ে বোধ হয় আসতে পারেনি। বিজয়ভূষণের মত নিশ্চয় আশালতারও ঘুম আসছে না, তা না হলে এত রাত্রে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে কেন ?

এর পর থেকে বিজয়ভূষণ সব-কিছুর মধ্যে লক্ষ্য করেছে, আশালতা তার প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট। দু'জনে একসংগে বেরুতে এখন বিজয়ভূষণের ভয় হ'ত, পাছে লোকে কিছু বলে। আশালতা কিন্তু এ সব গ্রাহ্য করত না। কত দিন সাইকেল-রিক্সা করে পাশাপাশি বসে বাজার করতে গেছে। হয়তো বলেছে, আপনাকে বড্ড জ্বালাতন করি, না ?

—কে বললে ?

—আমি বুঝতে পারি। কিন্তু আপত্তি করলেও শুনব না, আপনার সংগে কথা বলে যে কি আনন্দ পাই—

খেলার ছলে বিজয়ভূষণের হাত নিজের কোলের উপর টেনে নেয়, কি নরম হাত আপনার ? বিজয়ভূষণের শিহরণ জাগে, নরম গলায় বলে, মনটা কিন্তু শক্ত।

—মোটেই না, আপনি তো মেয়েদের মত।

—ভুল করছেন।

—দেখা যাবে।

বিজয়ভূষণের মনে পড়ছে, নৌকায় করে একদিন দুজনে বেড়াতে গিয়েছিলো। সংগে প্রেমল গিয়েছিল বটে কিন্তু আশালতার এতখানি সান্নিধ্য এর আগে বিজয়ভূষণ পায়নি। গোলাপী রংএর শালোয়ার কামিজে কি সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে, চোখে-মুখে উছ্‌লে-পড়া হাসি। ফেরার মুখে বলেছিল, এত আনন্দ অনেক দিন পাইনি।

বিজয়ভূষণ সায় দেয়, আমিও।

—আপনার আর কি, ক'দিন বাদেই কলকাতায় ফিরে যাবেন। তখন—বলতে গিয়ে আশালতার চোখে জল এসে পড়ে। বিজয়ভূষণ তার কাঁধের উপর আলতো করে হাত রাখে, কেঁদো না আশা, দেখা তো হবেই।

—কে বলতে পারে ?

বিজয়ভূষণের বুক কেঁপে ওঠে, সে বুঝতে পারে আশা কি চাইছে। এই সুন্দর মুহূর্ত্তটি চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য—কিন্তু এ অন্যায়, আশালতা বিবাহিতা, তার বন্ধুর স্ত্রী। বিজয়ভূষণ সরে বসে। সেদিন সে বুঝতে পেরেছিল তার ধারণা সত্য, আশালতার প্রেমতৃষ্ণা নরেন্দ্রনাথ মেটাতে পারেনি।

প্রাতরাশ শেষ করে বিজয়ভূষণ অফিস যাবার জন্যে গাড়ীতে গিয়ে বসে। গাড়ী চলেছে, ফাঁকা রাস্তা দিয়ে। হাতে ঘড়ি নেই, কে জানে দেরী হয়ে গেল কি না !

ঘড়ির কথা মনে হতেই ট্রেণে করে দানাপুর আসার ছবি ভেসে ওঠে। আশালতা বিজয়ভূষণকে অফিসে নিখুঁত ইংরাজীতে চার লাইন চিঠি লিখেছিল, সে যেন নিশ্চয় করে বিকেলে দেখা করে। অফিসে বিজয়ভূষণ ভাল করে কাজে মন দিতে পারে না, বার বার মনে হয়, কেন আশালতা হঠাৎ ডেকে পাঠিয়েছে। হয়তো কোন দরকারী কথা আছে, হয়ত কোন গোপন কথা, হয়তো—

ভাবতেই মুখ শুকিয়ে যায়, নরেন্দ্রনাথ কিছু সন্দেহ করেনি তো ? আশ্চর্য্য নয়, যে রকম আশালতা আজ-কাল প্রগল্‌ভা হয়ে উঠেছে। সকলের সামনেই বিজয়ভূষণের গায়ে হাত দেয়, কে বলতে পারে, অন্যেরা সন্দেহ করেছে কিনা ? বিজয়ভূষণ মনে মনে ভীত হয়ে পড়ে।

কিন্তু বিকেলবেলা আশালতার কাছে পৌছলে সেই দুর্ভাবনা কেটে যায়। আশালতা এগিয়ে এসে বলে, আপনাকে আর একটু কষ্ট দেবো মিঃ চ্যাটার্জী, আমাকে আর প্রেমলকে দানাপুরে রেখে আসতে হবে।

বিজয়ভূষণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, এ আর কি, দানাপুরে তো রোজই ফিরছি, আজ সংগে আপনাদের নিয়ে যাব এই তো ?

—আমার স্বামীরই নিয়ে যাবার কথা ছিল। একটু আগে ফোন করেছেন, উনি যেতে পারবেন না, আপনার সংগে চলে যেতে, কাল সকালে গিয়ে উনি নিয়ে আসবেন।

তখনই রিক্সা চেপে তারা বেরিয়ে পড়ে।

বিজয়ভূষণ ইচ্ছে করেই ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট কেটেছিল। কারণ, সেকেণ্ড ক্লাশে অনেক সময় বসবার জায়গা পাওয়া যায় না। সেদিন গাড়ীতে বেশী ভীড় ছিল না, ওরা তিন জনে উঠে বসে। প্রেমল জিজ্ঞেস করে, আঙ্কল্, দানাপুর পৌঁছতে কত সময় লাগবে?

—মিনিট পনেরো।

—ট্রেণে চড়ে অনেক দূর যেতে ইচ্ছে করে।

—চল আমার সংগে কোলকাতা।

—তুমি কবে কোলকাতা যাবে?

—খুব শীগ্‌গির।

প্রেমল আশালতাকে জিজ্ঞেস করে, মামী, আমি আঙ্কলের সংগে কলকাতা যাব?

আশালতা হাসে, একলা গিয়ে থাকতে পারবে?

—খুব পারব।

—তাহলে যেও।

ট্রেণ ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু কয়েক মিনিট বাদেই ফুলওয়াড়ী সাইডিংএ গাড়ী থামিয়ে দেয়। লাইন ক্লীয়ার পায়নি। অন্য দিক থেকে মেল গাড়ী আসছে। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে আসে, ট্রেণের আলো জ্বলে ওঠে। গাড়ীতে দু'জন আরোহী ছিল, তারা ঐখানেই নেমে পড়ে, বলে, তাড়াতাড়ি আছে। রেলেরই তারা কর্মচারী। প্রেমল অনেকক্ষণ ছুটোছুটি করে হাঁপিয়ে পড়ে বিজয়ভূষণের কোলে মাথা রেখে বেঞ্চিতে গা এলিয়ে দেয়। বিজয়ভূষণ নিজের মনেই বলে, এ রকম তো কখনও হয়নি, প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রেখেছে!

আশালতা নিজে থেকেই উত্তর দেয়, আমার কিন্তু খারাপ লাগছে না।

বিজয়ভূষণ চমকে ওঠে, আশালতা কি বলে বসবে ভাবতেই তার ভয় করে। বলে, পৌঁছতে আপনার দেরী হয়ে যাবে তো?

—একলা থাকলে ভয় ছিল, আপনার সংগে যখন আছি—

—আজ ততো গরম নেই। এক একদিন ট্রেণে যা গরম হয়, এই তো ক'দিন আগে এই ট্রেণেই—

আশালতার দিকে তাকিয়ে বিজয়ভূষণ থেমে যায়, সে একদৃষ্টে তারই দিকে চেয়ে আছে। বিজয়ভূষণের শরীরের মধ্যে সেই শিহরণ, মনের মধ্যে সেই ভয়। আশালতা বলে, আপনি তো শীগগির চলে যাবেন?

—যেতে হবে। বলতে গিয়ে বিজয়ভূষণের গলা কেঁপে ওঠে।

—পাঞ্জাবে শিখেদের মধ্যে একটা প্রথা আছে। যখন একজন অপরকে বন্ধু বলে স্বীকারক রে, সে তার মাথার পাগড়ী বন্ধুর মাথায় পরিয়ে দেয় এবং বন্ধুর পাগড়ীটি নিজের মাথায় পরে। এটি প্রাচীন প্রথা। আমি অনেক দিন থেকেই আপনাকে বলব ভাবছি, ঠিক সুযোগ পাইনি।

—কি বলুন?

—আমরাও বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে আসুন কোন জিনিষ বদল করি।

—কি?

—হাতের ঘড়ি। কথার সংগে সংগে আশালতা নিজের ঘড়ি খুলে বিজয়ভূষণের হাতে দেয়। বলে, আপনারটা আমায় দিন। বিজয়ভূষণের হাত থেকে ঘড়ি নিয়ে সজল দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে বলে, আপনি হয়তো ভাবছেন এ কি ছেলেমানুষি, কিন্তু এরও অনেক দাম আছে, অন্ততঃ আমার কাছে।

একটু পরেই গাড়ী চলতে সুরু করে।

বিজয়ভূষণের মনে পড়ছে এর পর সে খুব কম আশালতাদের বাড়ী গেছে। তার প্রতি যে আশালতার দুর্ব্বলতা তাকে সে অযথা প্রশ্রয় দেয়নি। পাছে এই বিদেশী পরিবারটির সংগে তার বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তবে কোলকাতায় ফিরে আসার আগে নরেন্দ্রনাথকে সে কোম্পানীর এজেন্ট করে দিয়েছিল। বলে এসেছিল, মন দিয়ে কিছুদিন কাজ করুন, শীগগির আমি আপনাকে কোম্পানীর বেতনভোগী অরগানাইজার করিয়ে দেবো।

নরেন্দ্রনাথ সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলেছিল, উদ্বাস্তুদের বন্ধু বড় একটা কেউ হয় না, ভগবানের আশীর্ব্বাদে আপনার মধ্যে পেয়েছি অকৃত্রিম বন্ধুত্ব। পাটনা থেকে কোলকাতা চলে আসার দিন দেখা করতে ষ্টেশনে এসেছিল সন্ধি-পরিবারের সকলেই। প্রেমল একতোড়া ফুল বিজয়ভূষণের হাতে তুলে দেয়, সকলের চোখে জল। ক'দিনের মধুর আলাপের কথা সকলের মনে পড়ছে। ঠিক ট্রেণ ছাড়ার সময় আশালতা বলেছিল, ঘড়িটায় রোজ দম দেবেন।

ট্রেণে সারা রাত বিজয়ভূষণ আশালতার কথা ভেবেছে।

আজ সেই আশালতার সঙ্গে প্রায় ছ' মাস বাদে দেখা হবে। ইতিমধ্যে চিঠিপত্রের বিশেষ আদান-প্রদান হয়নি, প্রেমল দু'-তিনটে পোষ্টকার্ড পাঠিয়েছিল, তাকেই দু'-এক কলম যা লিখেছিল বিজয়ভূষণ। এত দিন বাদে আশালতা কি ভাবে আলাপ করবে? আগের সে দুর্ব্বলতা তার মধ্যে আছে কি না ভাবতে ভাবতেই বিজয়ভূষণ অফিসে এসে পৌঁছয়।

অফিস থেকে কাজে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল। সেখান থেকে সোজা এসে পৌঁছল কোয়ালিটিতে, একটা বেজে পাঁচ মিনিটের সময়। বিজয়ভূষণ আশা করেনি যে, এর মধ্যেই নরেন্দ্রনাথরা এসে পড়বে বলে, কিন্তু আশ্চর্য্য, রেস্তর্াঁয় ঢুকেই দেখে, এক কোণের চেয়ারে আশালতা বসে আছে। দূর থেকে দেখেই চিনতে পেরেছিল বিজয়ভূষণ, সেই নিখুঁত মুখ, ফর্সা রং, মেমসাহেবী কায়দায় চুল বাঁধা। পরনে গোলাপী রংএর শালোয়ার কামিজ। বিজয়ভূষণকে দেখেই আশালতার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হাত তুলে নমস্কার করে বলে, আপনি পাঁচ মিনিট দেরী—

—বিশেষ লজ্জিত। চেয়ারে বসতে বসতে বিজয়ভূষণ বলে, নরেন্দ্র কই?

—উনি আসতে পারলেন না, শরীরটা ভাল নেই। ওঁর হয়ে মাপ চেয়ে নিতে বললেন। সকাল থেকে খুব মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে। ভেবেছিলেন একটার মধ্যে ঠিক হয়ে যাবেন, কিন্তু না হওয়ায় আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

—অসুবিধে থাকলে আমায় জানিয়ে দিলেই পারতেন।

—তিন বার টেলিফোন করেছিলাম।

—তাই ত বটে, আমি অফিসে ছিলাম না।

—আশালতার পছন্দমত খাবার অর্ডার দেওয়া হয়।

—তার পর, কি খবর বলুন?

—পাটনায় আর নতুন কি খবর, সবই এক রকম আছে।

—শুনলাম মিঃ সিন্ধির গ্যারেজ ভাল চলছে ?

—হ্যাঁ।

—প্রেমল আমার উপর খুব রাগ করেছে বোধ হয় ?

—ও বলেছে আপনার সংগে দেখা হলে কথা বলবে না। আমাকেও বারণ করে দিয়েছে কথা বলতে।

—তাই নাকি ? বিজয়ভূষণ হেসে ওঠে, ওর জন্যে একটা বড় মেকানো সেট আপনাদের সংগে পাঠাব। তাতে যদি রাগ পড়ে, একটু থেমে নিজে থেকেই বলে, পাটনায় দিনগুলো বড় সুন্দর কেটেছিল।

—আশালতা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে, সত্যি বলছেন ?

—কত সময় ভাবি। সেই নৌকা চড়ে বেড়াতে যাওয়া, তাস খেলা, কত রকম প্রোগ্রাম—

—যে'দিন রাত্রে আমাদের বাড়ী থাকতেন, কি হৈ-হৈ না হত ! বিশেষ করে প্রেমল আপনাকে এক মিনিট ছাড়ত না।

বয় খাবার দিয়ে যায়। খেতে খেতে বিজয়ভূষণ বলে, পাটনায় থাকতে খুব ট্রেণে চড়া হত, এখানে সুবিধে নেই। কথা শুনেই আশালতা মুখ তুলে তাকায়, বিজয়ভূষণের চোখে চোখ রেখে বলে, মনে আছে সেই ঘড়ি বদলের কথা ?

এ কণ্ঠস্বরের সংগে বিজয়ভূষণ পরিচিত। চোখ নামিয়ে বলে, সে তো ভোলবার নয়।

—আপনি নিশ্চয় আমার ঘড়িটায় রোজ দম দেন না, আমি কিন্তু দেখুন সব সময় আপনার ঘড়ি আমার সংগে রাখি।

আশালতা ব্যাগ থেকে ঘড়ি বার করে দেখায়। বিজয়ভূষণ মনে মনে শঙ্কিত হয়, এ ঘড়ি নিশ্চয় অন্যদের চোখে পড়েছে ! কে জানে আশালতা কি বলেছে তাদের কাছে ! হয়ত নরেন্দ্রনাথও দেখেছে, ভাবতেই বিজয়ভূষণ বিমর্ষ হয়ে পড়ে। তার বন্ধুত্বের দাম সে দিতে পারেনি।

আশালতার কথায় তার চমক ভাঙ্গে। কি ভাবছেন ?

বিজয়ভূষণ নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, সে দিনগুলোর কথা।

—আর পাটনায় আসবেন না ?

—আবার হয়ত একদিন।

খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিল। আশালতা বিজয়ভূষণের হাতে আলতো করে হাত রেখে বলে, আমাদের ভুলবেন না, মাঝে মাঝে আসবেন পাটনায়।

বিজয়ভূষণ অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নেয়। সংযত কণ্ঠে বলে, ভুলব না কোন দিন, আমার উপর বিশ্বাস রাখুন।

বিদায় নিয়ে আশালতা হোটেলে ফিরে যায়। বিজয়ভূষণ যায় অফিসে। সারা দিনই সে মনে মনে কষ্ট পায় কেন ? সে আশালতাকে খুলে বলতে পারল না যে, সে তার কথা বুঝেছে। কেন সে বলতে পারল না, সে তাকে ভালবাসে ? ক'লকাতায় ফিরে এসে আত্মীয়-স্বজনের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও এত দিন কেন সে বিয়ে করেনি ? এ কথাগুলো বলবার আর কি সে সুযোগ পাবে ?

পরদিন নরেন্দ্রনাথ অফিসে এল বিজয়ভূষণের কাছে বিদায় নিতে, বিশেষ দুঃখিত, লাঞ্চে যোগ দিতে পারেনি কাল।

—আশালতার কাছে শুনলাম, আপনার শরীর ভাল ছিল না।

—হ্যাঁ বড় খারাপ লাগছিল। আশা আপনার সংগে দেখা করে খুব খুশী, ও সব সময় আপনার কথা বলে।

বিজয়ভূষণের মুখ শুকিয়ে যায়, শুধু ম্লান হাসে। নরেন্দ্রনাথ বলে যায়, আশার কাছে আপনি যে কতখানি সে এক আমি ছাড়া কেউ জানে না। আশা বলেছে কিনা জানি না, ওর একমাত্র ভাই লাহোরে দাঙ্গায় মারা যায়, আশ্চর্য্য মিল আপনার সংগে তার চেহারার।

বিজয়ভূষণ কৌতূহল প্রকাশ করে, আমি তো কিছু জানি না !

—আশা খুব চাপা মেয়ে, ওই ওর স্বভাব। প্রথম দিন ট্রেণে আপনাকে দেখেই আমরা চমকে উঠেছিলাম, ওর মৃত ভাইএর সংগে কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ! সেই দিন থেকেই আপনার সংগে আমাদের আলাপ করার ইচ্ছা। সত্যি, আপনাকে পেয়ে আশা নিজের দাদার অভাব যেন অনেকখানি ভুলে গেছে।

—আশ্চর্য্য !

—আপনি যে হাত-ঘড়িটা ওকে দিয়েছেন কত যত্ন করে আশা হাতে রাখে।

নরেন্দ্র চুপ করে। একটু পরে বিজয়ভূষণের করমর্দন করে বলে, আপনি আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। এখন চলি।

বিজয়ভূষণ ভদ্রতা করে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আশার কথাও ভুলে যায়, সারা মুখের ওপর তার কে যেন কালী মাখিয়ে দিয়েছে !

শ্রীমতী লিজেল্ রেমঁ

নয়, সেদিক হতে মুখ ফিরিয়েছি। আমরা ভারতের সন্তান, "প্রত্যেকের তরে প্রত্যেকে আমরা"... (১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবরের চিঠি)। নিবেদিতা এর পরে ফি বছর এই তিথিটি পালন করতেন। বন্ধুরা তাঁর

একচত্বারিংশ অধ্যায়

বারাণসী-কংগ্রেস

নিবেদিতা তখনও দার্জিলিঙে।

১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ আইন চালু হল। শহরে বাজারে সব যেন থমকে থেমে গেল। সর্বত্র একটা গভীর বিষাদের কালো ছায়া! কাগজে কাগজে খবর বেরুল, যখন তখন দোকান-পসারে ঝাঁপ পড়ল, হল 'দুয়ার রুদ্ধ ভবনে-ভবনে।' প্রাণের চিহ্ন আর কোথাও যেন চোখে পড়ে না। সেদিন রান্না করে কেউ কিছু মুখে তোলেনি—অনেকে একেবারে উপবাসী রইল।

সবই বৃথা হল? ভারত-সচিবের কাছে এত আবেদন, বড় লাটের কাছে স্মারকলিপি আর শেষ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণকে ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল করতে গোখলের প্রতি বেদন পাঠানো, কিছুতেই কিছু না। ষাট হাজার স্বাক্ষর-যুক্ত একখানা আবেদন-পত্র 'হাউস্ অব কমন্সে' পাঠানো হয় একটা কিছু করবার অনুরোধ জানিয়ে, হার্বার্ট রবার্ট এ-নিয়ে পার্লামেণ্টে বিতর্কও তুলেছিলেন। কিন্তু কোনও ফলই ফলল না শেষ পর্যন্ত।

দার্জিলিঙ্ টাউন হলের আশে-পাশে আস্তে আস্তে লোকের ভিড় জমে। সবার মুখেই একটা বেদনার ছাপ। সংক্ষেপে অথচ প্রাণস্পর্শী ভাষায় প্রতিবাদ জানান হল। সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন দু'জন—দেশবন্ধু আর নিবেদিতা। বক্ষে করাঘাত করে নিবেদিতা বলে উঠলেন, 'ধিক আমার জন্মভূমিকে! বাংলার বুকে এই যে ভেদের প্রাচীর তুলে, দশকে অপমান করেছে। ভারতবাসীর আত্মত্যাগ আর শৌর্যের ফলে যত দিন ইংরেজ নিজ হাতে আবার তা তুলে না নেয়, আমাদের সম্মান করতে বাধ্য না হয়, আমরা চালিয়ে যাবই এ-সংগ্রাম!'

সভা-ভঙ্গের আগে সমবেত জনতা একবার একযোগে তাদের ডান হাতখানি তুলে ধরল। মণিবন্ধে তাদের রাখি বাঁধা...নাড়ীর বাঁধনের চেয়েও বড় বাঁধন এই মিলন-রাখি। সেদিন জনতার এ-ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছিল এক নীরব তর্জন। ব্যথাহত মাতৃভূমিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকে সেদিন বদ্ধপরিকর, তাকে রক্ষা করতেই হবে! মিসেস বুলকে জগদীশ বোস লেখেন, 'মা গো, আইন করে ওরা আমাদের ভিন্ন করতে চায়, কিন্তু আজ সবাই আমরা "রাখিবদ্ধ ভাই"—"ভাই ভাই একঠাঁই" হয়ে সকল বিপদ নির্ভয়ে বরণ করব আমরা। এই আমাদের যথার্থ মিলন। আজ থেকে সত্য সত্যই নতুন করে আমাদের জাতীয় জীবন শুরু হল। বিদেশীর ভরসা আর

বাড়িতে একত্র হত, তিনি ফল আর পাঁচমিশালী স্যালাড খাওয়াতেন সবাইকে।

এর পরে কটা দিন যেন নিরানন্দ, হতোদ্যম বিষাদে কাটল। তারপর হঠাৎ সারা দেশে স্বাধীনতা লাভের একটা দুর্জয় সংকল্প জেগে উঠল। কলকাতার লোক ছুটল আনন্দমোহন বোসের বাড়িতে। ত্রিশ বৎসর ধরে তিনি হিন্দুদের এক হতে বলেছেন—কেউ তাঁর কথা শোনেনি। আনন্দমোহন তখন মরণাপন্ন। দূরদর্শী বৃদ্ধকে জনতা সেদিন ধরে নিয়ে গেল তাঁরই বাড়ির সামনে এক খণ্ড পড়ো জমিতে। ওইখানে বাংলার আদি 'জাতিসদন' গড়ে উঠবে, আনন্দমোহন তাঁর আশীর্বাদ দিয়ে সমর্থন করুন এ প্রচেষ্টাকে। দশ জন নেতা সমস্বরে বললেন, 'স্বরাজ চাই' অমনি সমবেত কণ্ঠে জনতা বজ্রনির্ঘোষে গর্জে উঠল, 'আমরা স্বরাজ চাই।'

সেই উত্তাল পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ গাইলেন—

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান!
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন বাঙালীর ঘরে যত ভাই-বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান!

জনতা সে-গান ফিরে ফিরে গাইল। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করা তখন বে-আইনী হয়ে গেছে, শোভাযাত্রা কি সভা করাও চলবে না। সান্ধ্য আইন জারি হয়েছে। রাজনৈতিক আন্দোলনে ভাগ নিয়েছে জানতে পারলেই স্কুল-কলেজ থেকে তাড়ান হচ্ছে ছেলেদের, খেতে হচ্ছে পুলিশের লাঠি। রাগে গরজাতে লাগল দেশের লোক।

নিবেদিতা স্থির থাকতে পারলেন না। সন্তানের ব্যথা মায়ের বুকে বাজল, তখনই তিনি কলকাতায় চলে এলেন। ঠিক সেই সময় গোখলেও ফিরেছেন লণ্ডন থেকে। নিবেদিতা গিয়ে দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। এ নিয়ে কোনও গোলযোগ হল না। পুলিশ বোধ হয় ওঁর কথা ভুলে গিয়েছিল। ছ' মাস পাহাড়ে থাকায় ওঁর সম্বন্ধে যত গুজব সবই চাপা পড়েছে। কিন্তু নিবেদিতা যা তা-ই আছেন। উনি ফিরে এসেছেন শুনে সন্ধ্যায় যে-সব বন্ধু ছুটে এলেন দেখা করতে, নিবেদিতা তাদের বললেন, 'বুক বাঁধ। নিষ্ঠা আর আনুগত্য চাই। সব চেয়ে বড় কথা, 'তৈরি' থাকতে হবে।'

কয়েক সপ্তাহ পরে গোখলের সভাপতিত্বে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হওয়ার কথা। ওদিকে তাঁর যা অপকর্ম করবার ছিল করে লর্ড কার্জন বিদায় নিচ্ছেন। তিনি চলে যেতেই শাসন-কার্যে তাঁর যারা সহায়ক তাদের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা দেখা দিল দেশে। সাত বৎসর প্রভুত্ব চালিয়ে দেশের যে-ক্ষতি করে গেলেন

লর্ড কার্জন, যে-আঘাত দিলেন লোকের মনে, তার সঙ্গে তুলনা করা চলে একমাত্র আউরঙ্গজেবের শাসন কালের।

গোখলে ইংল্যাণ্ডে গেছেন, এ-খবর নিবেদিতা যে জানতেন না তা নয়। কিন্তু অপ্রত্যাশিত দ্রুত গতিতে সব ঘটনা ঘটে গেল। গোখলের অনুপস্থিতিতে দলের অবস্থা খারাপ হয়ে ওঠে। নরমপন্থীরা ভাবলেন তাঁর বিলাত যাত্রাটা উচিতই হয়েছে, চরমপন্থীরা বিশ্বাসঘাতক বলে তাঁকে দূষতে লাগলেন। নিবেদিতা কিন্তু বিশ্বস্ত বন্ধুর মত গোখলেরই পক্ষ নিলেন। ২০শে সেপ্টেম্বর গোখলেকে লিখেছিলেন, '···এখানে একটা গুজব রটছে। কর্তৃপক্ষ বলছেন তুমি নাকি বঙ্গবিচ্ছেদের স্বপক্ষেই মত দিয়েছ। আমরা অবশ্য জানি এ কথা সত্য নয়—কিন্তু এ-গুজবে লোকের মন এত বিগড়ে গেছে যে তোমার স্বাক্ষরিত একটা সুস্পষ্ট প্রতিবাদ বেরুলে খুব কাজ হত। কাউন্সিলের কোনও ইউরোপীয়ান সদস্য কি তোমার মতামত চেয়েছিল? তখন কি তুমি এমন কিছু বলেছ যার ভুল অর্থ করা হয়েছে? যদি বলেও থাক, তবুও দেশবাসীর স্বার্থ যেখানে জড়িত সেখানে তাদের মতটাই যে চূড়ান্ত—একথা লেখবার পথ তোমার খোলাই আছে···'

এদিকে পুরুত-গোঁসাইদের মাঝে এমন কি মেয়ে মহলেও বিলাতী বর্জনের ধূম পড়ে গেছে। দেশের লোক যে-পরিমাণ ত্যাগস্বীকার করছে তা একেবারে অসাধারণ! প্রবল স্বাজাত্যবোধের উদ্দীপনায় অখ্যাত সাধারণ লোকেও যে ছোটখাট মহত্বের পরিচয় দিচ্ছে, আমার মতে এর একটা বিশেষ মূল্য আছে। এ হতেই দেশের লুপ্ত সামর্থ্যের একটা নিরিখ পাওয়া যায়। রুশবাসীর এমনি তেজেই নেপোলিয়ানের মস্কো-অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। এতেই আমেরিকা স্বাধীন হয়েছিল। ইতিহাসে আরও নজির আছে। ও হতেই পর-পর সব-কিছু এসে যাবে। কয়েক মাস আগে ঠিক এই জিনিসটাই আমাদের ছিল না। আজ চার দিকে এর চিহ্ন দেখছি। এইটি হল আসত আশার কথা, আর সব সে তুলনায় নেহাৎ তুচ্ছ। খরিদদার কোনও বিলাতী মাল চাইলে সাধারণ একটা মুদীও তাকে তিরস্কার করছে এমনও দেখা যাচ্ছে! পুরানো দিনের যে-সব কথা ওদের কানেও ঢোকেনি ভেবেছিলাম আজ সে সব কথা হাওয়ায় ফিরছে—দেখছি হারায়নি কিছুই, সব জমা আছে মনের গোপনে···

বিদ্রোহের ঝাঁঝে লোকের অলস ঔদাসীন্য যেন উবে গেল। বড় বড় শহরে ধর্মঘট হতে লাগল। মিলের শ্রমিক, আফিসের কেরাণী, চা-বাগানের কুলী সবাই একজোট হয়, তাদের দাবিকে গুরুত্ব দেবার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গড়বার আলোচনা চলে ভাসা-ভাসা ভাবে। গোখলে আর জাতীয় মহাসভার কাছ থেকে একটা নিষ্পত্তির আশা করে সবাই।

কংগ্রেস বসবার কিছু দিন আগে নিবেদিতা কাগজে কাগজে লিখলেন, 'কংগ্রেসের আসল কাজ কি?' সদস্যদের নতুন ভাবে নতুন চিন্তায় অভ্যস্ত করাই তার আসল কাজ, যার ফলে 'ন্যাশনালিটি'র ভিত্তি পাকা হবে। দেশবাসীকে সংঘবদ্ধ ও কর্মতৎপর করে তুলতে হবে আর হিমালয় হতে কন্যাকুমারিকা, ও-দিকে মণিপুর হতে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিরাট দেশের অগণ্য অধিবাসীদের মনে আত্মীয়তার বোধকে উজ্জ্বল করাই মহাসভার কর্তব্য।

কংগ্রেস অধিবেশনের তিন দিন আগে নিবেদিতা কাশীতে এলেন। ব্রহ্মচারী গণেন মহারাজ ওঁর তরুণ সহকারী। পাণ্ডে হাবেলীর যে পুরনো বাড়িখানা নিবেদিতার জন্য নির্দিষ্ট ছিল, ব্রহ্মচারী আগে এসে সেখানা বসবাসের উপযোগী করে রেখেছিলেন।

গোখলে যেদিন বারাণসীতে পৌছলেন, লোকের উৎসাহ-উত্তেজনা চরমে উঠল! লণ্ডন থেকে আসতে পথশ্রমে তিনি ক্লান্ত কি না সে খোঁজ সে নেয়—গোখলে তাদের আপন জন, এই যথেষ্ট! মহাসভার একপ্রাণতা যেন গোখলের মাঝে রূপ ধরেছে। দেশ তাঁকে চায়! তাঁর বিপক্ষবাদীরাও প্রতীক্ষায় আছে তাঁর, তাদেরও গভীর আস্থা গোখলের 'পরে।

মহা সমারোহের মধ্যে গোখলে পুণ্যধাম কাশীতে এসে ঢুকলেন। ঢোল-করতাল বাজিয়ে জনতা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। ষ্টেশন থেকে একটু দূরে জমকালো একখানা জুড়ি দাঁড়িয়ে আছে ওঁকে নিয়ে যাবার জন্য। ও-দেশের নিয়ম, একটি মেয়ে পুরবাসীর হয়ে নেতাকে স্বাগত জানাবে। সবাই একবাক্যে নিবেদিতাকে এ কাজের ভার দিল। গোখলে নামতেই এগিয়ে এসে নিবেদিতা তাঁর সামনে ধরলেন এক পাত্র দুধ—বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ! তার পর গলায় পরিয়ে দিলেন সোনালী জরির থোপনা-গাঁথা ফুল-কর্পূরের মালা।

বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শোভাযাত্রা মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে শহরের দিকে। নিবেদিতা চলেন গোখলের বন্ধুদের সঙ্গে। হঠাৎ জনতা চঞ্চল হয়ে উঠল, অধীর উত্তেজনায় ঘিরে ধরল গোখলের গাড়ি—গোখলেকে দেখতে চায়, ছুঁতে চায় তারা। একখানা খোলা গাড়িতে গোখলেকে চড়ান হল, তার পর ঘোড়া খুলে দিয়ে সবাই মিলে তাকে টেনে নিয়ে চলল।

এমনি প্রবল উত্তেজনার মধ্যে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশন-গৃহেও যেন উৎসবের উচ্ছ্বাস···রঙিন কাগজের ঝুলন-মালা আর নিশান উড়ছে চার দিকে। আশ-পাশের অলি-গলিতে লোকের কী হৈ-চৈ, যেন মেলা বসেছে। যাওয়া-আসার পথে দোকানীরা দোকান খুলেছে, বইয়ের দোকানই বেশি। গাছের তলায় বসেছে অস্থায়ী ভিয়ান—বিক্রী হচ্ছে কচৌড়ী পকৌড়া, ডালমুট।

এই পরিবেশে মহাসভার সভাপতিত্ব করতে হলে চাই অসামান্য শক্তি। গোখলে তৈরী ছিলেন। বড় লাটের দুর্বিনীত বাক্যবাণে হিন্দুরা এত উত্তেজিত ছিল যে, নরম আর গরমপন্থীরা বিবাদ ভুলে এবার হাত মিলিয়েছে। এ সুযোগ ফস্‌কাতে দেওয়া চলবে না! বিলাতী বর্জনকে নীতি হিসাবে স্বীকার করে নিতে হবে, সবার মনের এই ইচ্ছা। তখনও স্বদেশী করা বে-আইনী। রবীন্দ্রনাথ উঠে 'বন্দে মাতরম্' গাইবার পর গোখলে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন, জনতার দাবিকে ন্যায্য বলে ঘোষণা করলেন।

ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এমনি করে অহিংস-সংগ্রাম ঘোষিত হল। জাতীয় মহাসভা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ছেড়ে অর্থনীতিক আক্রমণ শুরু করল। সম্মেলনগুলোতে উত্তেজনার ঝড় বইতে থাকে—কাজ করাই দায়। যারা তখনও ধীর-স্থির হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছিলেন, তিলক সেই অবশিষ্ট নরমপন্থীদের উপর চড়াও হয়ে তাদের বিপক্ষ দলে ঢোকালেন। অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন নেপথ্যে, কিন্তু তার প্রভাবও কিছু
না।

বরোদার মহারাজা মহাসভা সম্মেলনের অন্যতম অতিথি। ১৯০৪-এর আগষ্ট থেকে রমেশ দত্ত গাইকোয়াড়ের নিজস্ব পরামর্শদাতা হয়েছিলেন। গাইকোয়াড় তাঁকে শুধন, 'এসব ব্যাপারে নিবেদিতার হাত কতটুকু? নিবেদিতাকে দেখাই যায় না বলতে গেলে।' কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর তিল-ভাণ্ডেশ্বরের বাসাটি হয়ে ওঠে নেতাদের বৈঠকখানা। একটা সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য নিবেদিতার কাছে যাওয়াই চাই সবার। তা ছাড়া ওখানে ওঁদের মন্তব্যগুলো খবরের কাগজওয়ালাদের কানে ওঠবার ভয় নাই। বিভিন্ন দল আর বিরোধী সংখ্যালঘুরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মতভেদ নিয়ে আলোচনা চালায় ওখানে। খুশি মত ওরা যায়-আসে। বন্ধুজনেরা করেন দ্বাররক্ষীর কাজ।

নিচের তলার ঘরগুলোতে অফিসের কাজ হয়। কয়েক জন অন্তরঙ্গ বন্ধু নিয়ে নিবেদিতা ওখানে কাজ করেন। অধিবেশনের অনেক ভাষণই প্রথম তাঁর হাতে এসে পড়ে, তিনি চমৎকার ইংরেজীতে ওগুলো মার্জিত করে ছেড়ে দেন। অনেক সময় স্বয়ং বক্তাদের সাহায্যে ওদের আবার ঢেলে সাজা হয়। আগে ভাগেই সরকারী সমালোচনার জবাবস্বরূপ প্রচুর পরিসংখ্যান ঠেসে দেওয়া হয় ওদের মধ্যে। সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলোও নিবেদিতা তেমনি সযত্নে সংশোধন করে দেন। কি ধরণের কাজ যে নিবেদিতা করেছিলেন, গোখলের উদ্বোধন ভাষণটায় চোখ বোলালেই তা বোঝা যায়।

দিনের বেশির ভাগ যায় মহাসভার অধিবেশনে। তার পর নিবেদিতার ওখানে বৈঠক চলে অনেক রাত্রি অবধি। আগন্তুকদের বসানো হয় যে ঘরে, সে-ঘরের মেঝেয় পাতলা একটা মাদুরের পরে সাদা চাদর পাতা। ঘরের এক কোণে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে নিবেদিতা স্বাগত জানান অভ্যাগতদের। ওঁকে ঘিরে অর্ধচন্দ্রাকারে মণ্ডলী করে বসেন সবাই। 'আসছে কালের কার্যসূচী কি?' এই প্রশ্ন করে আলোচনার মুখ বন্ধ করেন নিবেদিতা। যেদিন গোখলে আসেন, বাড়ির বাইরে রাস্তায় সেদিন ভিড় জমে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। উনি বেরিয়ে এলে ওঁর গাড়ির পিছনে ধীরে-ধীরে লোক চলতে থাকে।

নিবেদিতার এই সান্ধ্য-আসরেই একদিন গাইকোয়াড় এবং আরও সব নামজাদা লোক একত্র হলেন। সে-আসরে এক দল দেশসেবক তৈরি করবার কথা তুললেন গোখলে। এ তাঁর অনেক দিনের কল্পনা। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সর্ব শ্রেণীর ভারতীয়দের নিয়ে একটা সমিতি গড়া হবে। একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা দেশসেবার ব্রত নেবে—অনেকটা জাপানী সামুরাইদের মত। এটা কোনও নতুন ধর্ম-সম্প্রদায় নয়; দেশের সর্বত্র যে-'ন্যাশনালিজমে'র ঢেউ উঠেছে, তাকে বাগ মানিয়ে তার বিপুল শক্তি সংহত করে কাজে লাগাতে হবে। গোখলের কাছে একমাত্র ধর্ম হল 'দেশসেবা'। সেদিনকার সভাতেই বিখ্যাত 'ভারত সেবক-সংঘ' রূপ ধরল। নিবেদিতার বন্ধুরা হলেন তার আদি সভ্য।

মহাসভার অধিবেশন যত দিন চলল, নিবেদিতা তত দিন ষ্টেটস্‌ম্যানের কলকাতা সংস্করণের নিজস্ব সংবাদদাতা হয়ে রইলেন। প্রতি সন্ধ্যায় নিজের মন্তব্য জুড়ে র‍্যাটক্লিফের কাছে মহাসভার বিবরণী পাঠিয়ে দিতেন। অন্যান্য সংবাদপত্রের সঙ্গেও যোগ ছিল। ষ্টেটস্‌ম্যানের প্রবন্ধগুলোতে নিবেদিতা আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করেও একটু আপোসের সুরে কথা কইতেন—ফলে ইংরেজ আর হিন্দুর মধ্যে মতভেদের ঝাঁঝটা কমে আসত। অন্যান্য দৈনিকগুলোতে অত সাবধান হতেন না, ভারতের দাবিটাই জোরের সঙ্গে সমর্থন করতেন।

কংগ্রেসের কাজ শেষ হতেই নিবেদিতা কাশীর বাসা ছেড়ে দিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের দু'জন সাধু কাশীতে একটি ছত্র খুলেছিলেন। যাওয়ার আগে গঙ্গার ঘাটে-ঘাটে একটা দিন কাটালেন তাঁদের সঙ্গে। শহর থেকে বহুদূরে একটা নির্জন জায়গায় সাধুরা কুঁড়ে বেঁধে বাস করেন। তিন জন হাঁটতে হাঁটতে চললেন সেইখানে। দেবতার সঙ্গে প্রাণের কথা কইবার উপযুক্ত জায়গা বটে! যে-মন্দিরে শিশু বিবেকানন্দকে তাঁর মা বিশ্বেশ্বরের পায়ে সঁপে দিয়েছিলেন, সেখানেও একটি দিন কাটাবার ইচ্ছা হয় নিবেদিতার···গিয়ে দেবতার কাছে বর চান, যেন ভারতের সেবা করে যেতে পারেন আমরণ,—ওই হবে তাঁর গুরুসেবা।

বারাণসী কংগ্রেসের পরে নিবেদিতা সর্বজন-পরিচিতা হয়ে উঠলেন, কিছু দিন ধরে একটা গভীর প্রেরণা জোগাতে লাগলেন দেশবাসীর মনে। কিন্তু ১৯০৬-এর ডিসেম্বরে কলকাতা কংগ্রেসে হঠাৎ যেন কি হয়ে গেল! গোখলে আর তিলকে মতভেদ দেখা দিল। একটা ভাঙন অবশ্যম্ভাবী। দীর্ঘ দিন ধরে চলল তার জের।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জটিল সমস্যা আর সঙ্কট কাল দেখা দিল!

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

সশস্ত্র বিপ্লব

ওদিকে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বিলিতী বর্জনের ধুয়া যখন সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে নিবেদিতা তখন বলেছিলেন, 'কেবল কথা আর কথা! কথা আর নয়, এবার কাজ চাই।' অরবিন্দ ঘোষ দেশব্যাপী যে বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করলেন নিবেদিতা তাঁর সকল শক্তি নিয়ে তাতে যোগ দিলেন। দার্জিলিঙ্‌ থেকে ফিরে এসেছেন অন্ততঃ বছর খানেক খাটবার মত স্বাস্থ্য আর সামর্থ্য নিয়ে।

বঙ্গভঙ্গের পর দেশে যখন তুমুল আলোড়ন শুরু হয়েছে অরবিন্দ ঘোষ ঠিক তখনই রাজধানীতে বসবাস করতে এলেন। কলকাতা তখন ভারতবর্ষের রাজধানী। সদ্য-প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল কলেজে'র অধ্যক্ষ পদ নিলেন অরবিন্দ। কিন্তু অধ্যক্ষতার গণ্ডি ছাড়িয়ে তাঁর প্রভাব দেখতে-দেখতে বহু দূর ছড়িয়ে পড়ল। জাতীয় আন্দোলনকে অধ্যাত্ম সাধনার মর্যাদা দেওয়ার জন্যই যেন তিনি এসেছিলেন। দেশহিতৈষণাকে ইষ্টনিষ্ঠার গুরুত্ব দিলেন তিনি। অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন অসাধারণ দৃঢ়চেতা, অমোঘ তাঁর বীর্য। যা কিছু তাঁর জন্ম আর কর্ম দ্বারা অর্জিত, যা কিছু তাঁর নিজস্ব সবই ছিল ঈশ্বর অর্পিত—আর যে ঈশ্বর তাঁর দেশ। ভারতবর্ষ তো একটা ভৌগোলিক ভূখণ্ড মাত্র নয়, অরবিন্দের কাছে তিনি সাক্ষাৎ জগন্মাতা। বাইরে থেকে দেখতে মানুষটি শান্ত-শিষ্ট নিরীহ গোছের। মুখে কথা নাই—কিন্তু মানুষকে গ্রাস করতেন অজগরের মত। যারা তাঁর হাতে পড়ত, দেশের সঙ্গে তাদের অদ্ভুত একটা রহস্য-গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠত।

ঘটনাচক্র দ্রুত আবর্তিত হচ্ছিল। তিলকের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র
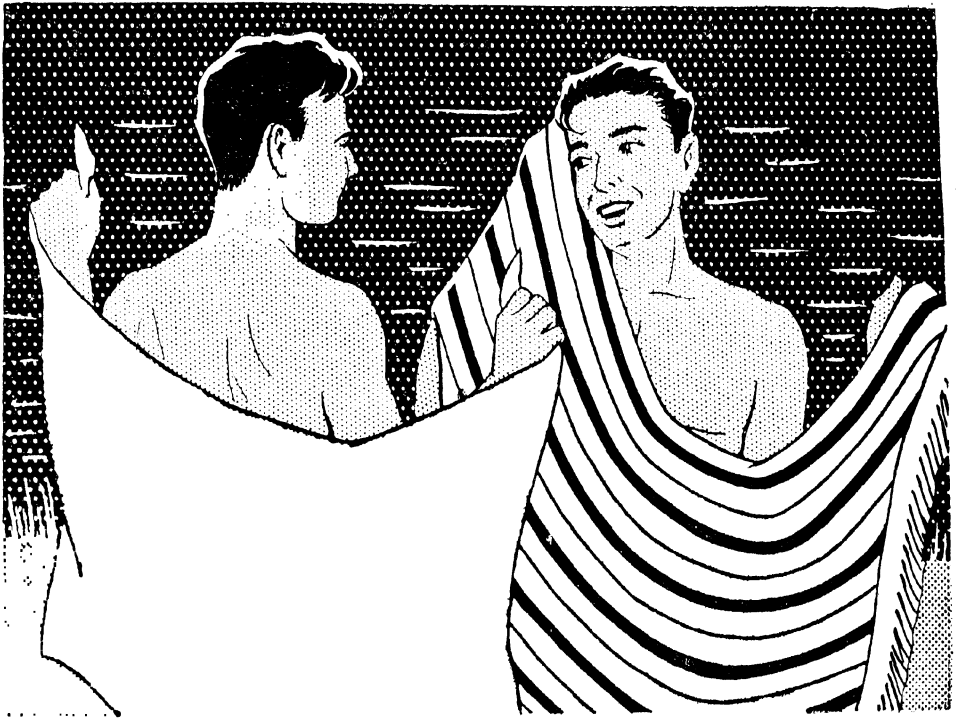
বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, বাংলার দলের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ সহজেই ঘটানো চলত। ভারতের জাপান-সমর্থক আন্দোলন, রুশ-বিপ্লবের ফলে উদ্বাস্তুদের ইউরোপময় ছড়িয়ে পড়া আর ভারতের বাইরে এখানে-ওখানে দেশভক্ত হিন্দুদের জোট—সব মিলে আন্দোলনে ইন্ধন যোগাতে লাগল। এমন কি, বিপ্লবীরা ইংল্যাণ্ডেও দলের লোক জুটিয়েছিল। সেখানে অক্সফোর্ডে কেম্‌ব্রিজ আর এডিনবরার হিন্দুছাত্ররা জন কয়েক প্রভাবশালী সাংবাদিক আর পার্লামেন্টের সদস্যকে হাত করেছিল। আইরিশ বিপ্লবের ইতিহাস হতেই চরমপন্থী হিন্দুরা 'ন্যাশনালিষ্ট' শব্দটি গ্রহণ করে, কেন না ওতেই তাদের দাবির স্বরূপ ঠিক ঠিক প্রকাশ পেত।

অরবিন্দ ছিলেন আন্দোলনের কাণ্ডারী। তিনি যে জাতীয়তার পাঠ দিতেন, আসলে তা' আধ্যাত্মিকতা। ক্রমে জাতির আচার্য হয়ে উঠলেন অরবিন্দ। যারা বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দেবে তারা যেন উপলব্ধি করে যে দেবতার হাতে তারা যন্ত্র মাত্র—এই ছিল তার আদর্শ। ঈশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করে দেশসেবাকে গ্রহণ করতে হবে জীবনধর্ম হিসাবে। এ-ব্রত হবে আত্মনিবেদন আর আনুগত্যের সাধনা।

অরবিন্দ চাইতেন প্রত্যেকটি ছেলে নেতৃত্বের সামর্থ্য অর্জন করবে। হবে পূর্ণ মানব, স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের বুকে এক-একটি মানুষ হবে অন্তরে-বাইরে স্বরাট···অথচ কেউ কারও মর্যাদা লঙ্ঘন করবে না। এ তাঁর স্বপ্ন, সহজ বুদ্ধিতে বিচার করতে গেলে এ-স্বপ্ন সফল হওয়ারও কোনও আশা ছিল না। যে কোনও নতুন মতবাদের বিরুদ্ধে যেমন অসংখ্য প্রতিকূলতা দেখা দেয়, অরবিন্দের এই ভারতধর্মের বিরুদ্ধে তেমনি রুখে দাঁড়াল সরকারী কর্তৃপক্ষ আর তার সশস্ত্র প্রতিরোধ শক্তি। কিন্তু ভগবন্নির্ভরতার অটল ভিত্তিতে অরবিন্দের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত। দৈববাণীর মত তাঁর কথা, দিন-দিন লোকের কাছে সে-কথার দাম বাড়ে: 'যত দিন জনসেবার মন্ত্রে তাঁকে আহ্বান করা না হবে ততদিন শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে অবতীর্ণ হবেন না। জগতের অসুরশক্তি তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যুযুৎসু হয়ে উঠলেই দেবতার অবতার অবশ্যম্ভাবী—সেই দিন দেবশক্তি স্বীয় বীর্য অনুভব করে।' এ কর্মযোগ বিনা দ্বিধায় দুঃখ বরণের ব্রত। এ ব্রত গ্রহণ করতে হলে বিশ্বাস থাকা চাই যে, মাত্র বীর্য নিয়ে লড়াই করে যারা, তাদের শক্তির যোগান ভগবানই দেন! অকুণ্ঠ আত্মবিসর্জনই শক্তির উৎস। বর্তমানের আত্মদান হতেই ভাবী যুগের তরুণরা পাবে অগ্রাভিযানের প্রেরণা। ব্যষ্টি আর সমষ্টি এক এবং অবিচ্ছেদ্য।

বারাণসী থেকে ফেরবার পথে নিবেদিতা সোজা কলকাতা না এসে ঘুরপথে অনেকটা বেড়িয়ে এলেন। সাঁচী আর চিতোরে থাকবার সময় দেখা করলেন জন কয়েক ধনী জমিদারের সঙ্গে। স্বদেশীর জন্য ওঁদের নাম চাঁদার খাতায় উঠল। দেশ ভ্রমণের সময় নিবেদিতার কাজের বিরাম ছিল না। পথ-চলতি অবস্থায় যে সব ছোটখাট আদরা ফুটে উঠত কলমের মুখে, নিবেদিতা প্রবন্ধকারে সেগুলো হয় 'নিউ ইণ্ডিয়া' নয় বারীন ঘোষের পত্রিকায় পাঠাতেন। অল্প দিন হল ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামীজির ভাই) আর বারীন ঘোষ মিলে যুগান্তর নামে একখানা পত্রিকা বার করেছেন। ১৯০৬ সনের মার্চে যুগান্তর পূর্ণাঙ্গ হয়ে দেখা দেয়। এর আগে এমনি একটি পত্রিকা বার করবার চেষ্টা আরও হয়েছে, সাময়িক ভাবে কিছু কাজও হয়েছে—যুগান্তর সেই সব অপূর্ণ চেষ্টারই সুষ্ঠু পরিণতি। বার হওয়া মাত্র কাগজখানা বিপ্লবী দলের মুখপত্র হয়ে উঠল। অধ্যাত্মমুক্তিই চরম লক্ষ্য—যুগান্তরের প্রতিপাদ্য হল এই। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা তারই একটা প্রত্যঙ্গ মাত্র। নিবেদিতা বললেন, 'আমার গুরুর কাছ থেকে এ ভাবটা পেয়েছ তোমরা। খুব ভাল কথা। এবার তোমার কাগজে খুশিমত এর ব্যাখ্যা কর—লোকে অল্প দিনের মধ্যেই এ ভাব নিয়ে নেবে!' যুগান্তরের এক সংখ্যা এক টাকাতেও বিক্রি হয়েছে। ১৯০৭ সনের প্রথমেই ওর প্রচার দৈনিক পঞ্চাশ হাজারে উঠল।

এ সময়ে অরবিন্দের 'বন্দে মাতরম্' কাগজও বেরুত। বিপিন পাল ওটা প্রথম চালাতে শুরু করেন। এই সব পত্রিকা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে একযোগে সরকারের বিরোধিতা করত। মান্দ্রাজের তিরুমলাচার্য নিবেদিতাকে 'বাল ভারত'? পত্রিকার সম্পাদিকা হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। লিখলেন, 'আমাদের দেশে যে মতবাদ লোকমান্য,—আমার কাগজখানায় তাকেই রূপ দিতে চাই। ওর সম্পূর্ণ ভার আপনি নিন, ওটাকে আরও সুন্দর এবং জনপ্রিয় করে তুলুন—এই আমার ইচ্ছা।' নিজের একখানা কাগজ হবে এটা খুশির কথা হলেও নিবেদিতা প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করলেন।* নইলে বড় বেশী ঝুঁকি নেওয়া হত। নিবেদিতাকে আড়ালে থাকতে হবে। সরকার-বিরোধী কোন পত্রিকা-সম্পাদক' হাঙ্গামায় পড়লে তৎক্ষণাৎ নিবেদিতাকে তাঁর স্থান পূরণ করতে হবে যে! জনসাধারণের মতামত গড়ে তোলবার জন্য বিদ্রোহের পো ধরে রাখতেই হবে—বিরাম দিলে চলবে না। এ-সাধনা সার্থক হল। ফলে ১৯০৭ সনে 'সিডিশাস মিটিং অ্যাক্ট' পাশ হয়ে বহু ধর-পাকড়ও হল। বোঝা গেল; আঘাত হানাটা বৃথা যায়নি।

নিবেদিতার আশে-পাশে তরুণ জাতীয়তাবাদীরা জড়ো হত। ১৯০৬ সন ভোর ওঁর সবটুকু সঞ্চিত শক্তি উজান ব্যয় করলেন তাদের আয়র্ল্যাণ্ডের কথা খোলাখুলি শোনাতে! ব্রতচারীর এই নতুন আদর্শকে ওরা কি ভাবে গ্রহণ করবে, হিন্দু সংস্কারের সঙ্গে কি করে তাকে খাপ খাওয়াবে সে ওদের ভাবনা। নিবেদিতার কাজ কেবল দু' হাতে নিজের যা-কিছু আছে বিলিয়ে দেওয়া। ফল কি হল সে-সম্বন্ধে রায় দেবে ইতিহাস। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের এ-অধ্যায়টা 'রিফর্মেশন' কি ফরাসী বিপ্লবের মতই অদ্ভুত! কত নগণ্য ব্যাপারও আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় স্মরণীয় হয়ে উঠেছে তখন।

আয়র্ল্যাণ্ডের সশস্ত্র সংগ্রামটা কি ধরণের ছিল নিবেদিতা তা ভাল করেই জানতেন। লণ্ডনের কর্মীদের মধ্যে তিনিও কাজ

---

* পত্রিকাটার ভার নিবেদিতা নিয়েছিলেন ঠিকই। 'বাল ভারত' ক্রমে ম্যাট্‌সিনীর 'ইয়ং ইটালী' হয়ে উঠেছিলেন। বিখ্যাত তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী নিবেদিতার খাতিরে ওতে কবিতা দিতেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে নিবেদিতাকে আচার্য বলে বরণ করেছিলেন উনি।

করেছেন, থেকেছেন বিপ্লবীদের সঙ্গে। বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী পরিণামকে ভারতবর্ষ কি ভাবে গ্রহণ করছে, নিবেদিতা একবার তার একটা উদাহরণ স্বচক্ষে দেখেছেন। চার বছর আগের কথা, পুণার ঘটনা। রাজদ্রোহী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে চাপেকরদের ফাঁসী হয়েছিল। নিবেদিতা তাঁদের মাকে শ্রদ্ধা-নিবেদন করতে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন, বৃদ্ধা পূজা করছেন। পূজা ছেড়ে উঠলেন বিদেশিনীকে সম্ভাষণ করতে। কিন্তু কি দেখতে এসেছেন নিবেদিতা? দু' ছেলের ফাঁসি হয়েছে তো কী হয়েছে!···মনে মনে একটা ধাক্কা খেলেন। দেশমাতৃকার পায়ে হাসিমুখে সন্তানদের বলি দিয়েছেন যে মা, তাঁর সামনে দেশপ্রেম আর বীরকীর্তির কথা তোলা কী বিড়ম্বনা! নত হয়ে নিবেদিতা বৃদ্ধার পায়ে হাত দিলেন। যে শিক্ষা পেলেন তাঁর কাছে, তার বীর্য অন্যদের মাঝেও সঞ্চারিত করতে পারবেন, এই এক লাভ।

তখনকার সমস্যার মুখোমুখি হতে হলে এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন, যার মধ্যে আদর্শের স্বপ্ন আর বাস্তবের রূঢ়তার সমন্বয় ঘটেছে। এ নিয়ে নিবেদিতাকে প্রায় তাঁর সব ক'জন বন্ধুর সঙ্গেই লড়তে হয়েছিল। তাঁদের নিজেদের মধ্যেই মতের একতা নাই, দৃষ্টিভঙ্গি এক-একজনের এক এক রকম। স্বাধীনতা-সংগ্রামে সর্বপ্রথম যিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ এবার সরে দাঁড়ালেন। বললেন, 'ভারতবর্ষ ভুল পথে চলেছে। বড় বেশী বিদেশী ধারার অনুকরণ করছে দেশ।' তাঁর মত নিবেদিতাও কি সহিংস আন্দোলনকে অপছন্দ করতেন না? গুরু তাঁকে যে-জীবনের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন তার বিপরীত জীবনযাত্রাকে যে সত্যই হেয় মনে হত তাঁর। কিন্তু 'নিয়তি: কেন বাধ্যতে'। নিবেদিতা যে নিপুণ ধানুকীর হাতের তীর—তার বেশি কিছু নন তো! রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন ধ্যানের ভারতকে, গেয়েছেন আনন্দ আর মৈত্রীর গান—সশস্ত্র বিপ্লবের তাণ্ডবে তাঁর স্বপ্ন ভেঙে যাবে। তাই তিনি অস্বীকার করলেন এ বিপ্লবকে। কেউ তাঁকে বলল কাপুরুষ, বলল আত্মসর্বস্ব অভিজাত। আসলে যে-কাজ তাঁর নয় সে-কাজ করবার প্রেরণা তো রবীন্দ্রনাথ পেতে পারেন না। ওদিকে নিবেদিতার প্রতীচ্যসুলভ যুযুৎসাকে কেউ নিন্দা করল, কেউ বা করল ঈর্ষা। অথচ দেশের ক্লৈব্য ঘোচানোর জন্য হিংসা আর বিপ্লবকে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করাই যে কর্তব্য এখন—নিবেদিতা এই শুধু বুঝতেন। অনেকেই তাকে শুধত, 'ইংরেজের কাছে মান পাওয়ার জন্য কি করব আমরা বলুন তো?' নিবেদিতা সরাসরি বলতেন, 'এ ক্ষেত্রে ওরা যেমন লড়ত তোমরাও তেমনি লড় আর ফলাফল নির্বিকারে সহ্য করবার জন্য তৈরি থাক। তোমরা সত্যি মান চাও কিনা এই তার একমাত্র পরখ, তবে পরখটা কঠিন বটে।' এর পরে যদি কেউ জানতে চাইত, 'পরিণামে কি ঘটতে পারে?' উনি জবাব দিতেন, 'তা আমি জানি না! এ আত্মত্যাগের জন্য পুরস্কার আশা করাও যেমন উচিত নয়, তেমনি বিপদের সম্ভাবনা কতখানি আগে-ভাগে তা-ও খতাবার অধিকার আমাদের নাই। ও-সব ভাবনা আমাদের নয়। নির্ভীক হতে হবে এইটে হল আসল কথা। বুকের রক্তে যেন কাপুরুষতার অপবাদ ধুয়ে-মুছে যায়। কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি এস!'

যারা রুখে দাঁড়াতে জানে না, ইংরেজ অন্তরে অন্তরে তাদের ঘৃণা করে—এ কথা নিবেদিতা ভাল করেই জানতেন। তাই তিনিই রুখে দাঁড়ালেন। জাতীয়তাবাদী নেতাদের বললেন, 'কাজে লেগে যাও না, কিসের প্রতীক্ষায় বসে আছ বল তো? ভূযমন যেমন অগুণতি, লড়বার কায়দাও তো তেমনি রকমারি আছে। আয়র্ল্যাণ্ডে একটা কথা আছে, "বোমা না ফাটালে ইংরেজ এক কণিকাও কিছু দেবে না!" ইতিহাসের সাক্ষ্যে কথাটার সত্যতা প্রমাণ হয়ে গেছে। এক পা এগুতে হলেই ধস্তাধস্তি করতে হয়েছে, যে-কোনও অধিকার সরকারের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে হয়েছে, দিতে হয়েছে প্রাণবলি। নিজের বীর সন্তানদের জন্য আয়র্ল্যাণ্ডের গর্বের শেষ নাই। কিন্তু তোমাদের ছেলেরা কই? তাদের মধ্যে কি ক্ষত্রিয় নাই?'

নিবেদিতা প্রগলভতা বরদাস্ত করতেন না তা বলে। যারা এসে বলত, 'আমরা ভারতের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত···' নিবেদিতা তাদের মুখের উপর বলে বসতেন, 'অস্ত্র ধরতে জান? গুলী ছুঁড়তে? জান না? তবে যাও, শিখে এস গিয়ে।' যাদের মতি স্থির নয় নিবেদিতা অনায়াসে তাদের মনটা যেন আক্রমণ করে লজ্জা দিতেন—দিতেন ফিরিয়ে। বলতেন, 'স্বয়ংবরে কৃষ্ণাকে পাওয়ার জন্য অর্জুনকে লক্ষ্যবেধ করতে হয়েছিল শুধু জলে ছায়া দেখে—তাঁর হাত কাঁপেনি, নজর টলেনি! স্বপ্রতিষ্ঠ হবে যে, সে কাপুরুষতার অপবাদ মুছে আজ আঘাত হানুক শত্রুকে, রক্ত ঢালুক—মান আদায়ের প্রথম পাঠ এই।' এ সব কথায় বন্ধুরা চমকে উঠতেন সন্দেহ কি! আবার বলতেন, 'অহিংসার আর্যপথে "ধর্মবিজয়" করলেই তা আদর্শ সংগ্রাম হত বটে,

কিন্তু আমরা কি তার যোগ্য? না। বিদেশীর অধীনতা স্বীকার করে পুরুষানুক্রমে নরকবাস করে আসছি আমরা। প্রথমে এ নরক থেকে মুক্তি চাই। আদর্শ হিসাবে অহিংসা খুব বড় জিনিস হতে পারে, কিন্তু অব্যর্থ আঘাত হানবার সামর্থ্য রেখেও স্বেচ্ছায় তা হানছি না—এ বীর্য যতক্ষণ অর্জন করতে না পারছি—ততক্ষণ অহিংসা একটা কথার কথা। দুর্বলের অহিংসা তো একটা পাপ। আর ভয়ে যে হাত তোলে না সে তো কাপুরুষ। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিলেন বলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, 'ভণ্ড।' ভর্ৎসনা করে বলেননি কি যে 'ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ! মুখে তোমার প্রজ্ঞাবাদ কিন্তু কাজে তুমি ক্লীব!'

নিরীহ জনসাধারণ বিমূঢ় হয়ে কি-করি কি-করি ভাবে, আবার একটুকুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে নিবেদিতা সেদিন হিংসার এই আদর্শকে উঁচু করে ধরলেন। অস্বাস্থ্যকর একটা অক্ষমতা দেখা দিয়েছিল লোকের মনে—অনেক সময় পরস্পরের সৌহার্দ ক্ষুণ্ণ হত তাতে, সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ত সংসারে বিষ। ১৯০৬ সনে গোখলেকে হত্যা করবার চেষ্টা হয়। শুনে নিবেদিতা বজ্রাহত হয়ে গেলেন। সবার কাছে গিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি করেছিলে এ কাজ? তুমি? এ কী ব্যাপার! এমন করে আমাদের ছত্রভঙ্গ হওয়ার সময় তো এ নয়।' বিরোধী পক্ষে যোগ দিলেও গোখলেকে নিবেদিতা বন্ধুই ভাবতেন। প্রকাশ্যে যখনই তাঁর সমালোচনা করতেন ব্যক্তিগত ভাবে নিবেদিতা অপরাধীর মত চিঠি লিখতেন তাঁকে।...পরিষদ ছাড়বার চেষ্টা তোমার সফল হবে না এই আশাই করি। ঐ তোমার উপযুক্ত ক্ষেত্র, ওখানে তোমার থাকা নিতান্ত দরকার। প্যারিসের দারুণ সঙ্কটে লামার্তিন যা করেছিলেন তুমিও হয়তো একদিন ভারতের জন্য তা-ই করবে। আমার সব সময় মনে হয় এই তোমার নিয়তি। আর পরিষদে থাক কি না-ই থাক এ তোমার কপালের লিখন। তোমার নিয়তি তোমার পিছু-পিছু ফিরছে, কাজেই তুমি তার অনুসরণ থেকে ক্ষান্ত হও...'* নিবেদিতা প্রায়ই ঠাট্টা করে বলতেন, 'দেশে স্বরাজ এলে গোখলে হবেন আমাদের অর্থসচিব।'

নির্ভীক তরুণ ন্যাশনালিষ্টদেরও হীনম্মন্যতা মধ্যে মধ্যে মর্মান্তিক হতাশার কারণ হয়ে উঠত। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত একদিন নিবেদিকাকে এসে বললেন, 'লোকে কেবল কালী কালী বলে চেঁচাচ্ছে কেন? শুনতে পান না? ওরা এখনও মোহাবিষ্ট না হয়ে কিছু করতে শেখেনি। কিন্তু এ তো কুসংস্কার! এ আমরা কোথায় চলেছি? দেখছেন না আমরা উপবাসী বুভুক্ষু? মনে হয় ছুটে পালাই, কিন্তু যাবই বা কোথায়? কোথায় সেই সত্যিকার ভারত? যার জন্য এ-সংগ্রাম, কোথায় সে? দেখিয়ে দিন, চিনিয়ে দিন আমাদের।' নিবেদিতা চিনিয়ে দিলেন, নিবেদিতা—স্বাধীনতাকামী আর পাঁচটা দেশের সংগ্রামকাহিনীর মাধ্যমে। যে-সব জাতীয় বিপ্লবে আধুনিক ইউরোপের অভ্যুত্থান, তাদের তীব্র সংবেগ যেন নিবেদিতার প্রাণস্পন্দে মূর্ত হয়ে উঠল। ১৮৪৮এর আন্দোলন সম্পর্কিত এক গাদা বই-এর অর্ডার গেল—ছেলেদের হাতে-হাতে সেগুলো ফিরবে এখন। ওদের সঙ্গে ম্যাটসিনি আর কাভুর পড়েন নিবেদিতা, স্বামীজির ভাষণ আর প্রিন্স ক্রপট্‌কিনের সদ্যঃপ্রকাশিত বই নিয়ে আলোচনা করেন।

বলতেন, 'কি করে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে তার উপায় খুঁজে বার কর। বসে থেকো না। দু'পুরুষ ধরে কেবল স্বপ্নের ঘোরে দিন কেটেছে। লোকে তোমাদের শ্রদ্ধা করবে এ আশা কর কি করে? চাই সত্যনিষ্ঠা কর্তব্যজ্ঞান আর সর্বভূতে ভালবাসা; তার জন্য চাই অনিঃশেষ ও অবিচল আত্মত্যাগের বীর্য। সে-ত্যাগে ক্লান্তি নাই, বিরাম নাই, কোনও শর্ত নাই—আছে শুধু ব্রতচারীর নিষ্ঠা আর নিরন্তর উৎসর্গের আকুতি! সাধনায় সিদ্ধি পেতে হলে তাঁর যন্ত্ররূপে অকুণ্ঠ বিশ্বাসের স্রোতে গা ঢেলে দেওয়া চাই। উপস্থিত কাজের বাইরে অন্য-কিছুর ভাবনা রাখতে নাই—আমার গুরু যেমন আমায় বলতেন, 'পরিকল্পনা নয়, কোনও ছককাটা নয়...' (১৯১১ সনের ২৩শে জুন অরবিন্দ ঘোষকে লেখা চিঠি)।

ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত সংঘগুলিকে কি কৌশলে এক সূত্রে বাঁধা যায়, আয়র্ল্যাণ্ডের উদাহরণ দিয়ে নিবেদিতা ওদের তা বুঝিয়ে দেন। ওদেশে প্রত্যেকে মনে করত সংঘের মর্যাদা নির্ভর করছে যেন তারই পরে। অনন্যসাধারণ কর্তব্যবোধ নিয়ে প্রত্যেকটি হুকুম নিখুঁত ভাবে সবাই প্রতিপালন করত, সংঘের উদ্দেশ্য ভুলে যেত না কেউ-ই। বাংলার গ্রামে-গ্রামে এমনি সহযোগিতার সৃষ্টি করতে হলে চাই অঢেল টাকা। নিজের উপার্জন ছাড়া নিবেদিতা নানা জায়গা থেকে কিছু যোগাড়ও করেছিলেন। কয়েকটি মেয়ে তাঁকে গায়ের গয়না পর্যন্ত দিয়েছিল। দরকার মত খরচ-পত্রের ভার ছিল বারীন ঘোষের 'পরে।

সে বার গ্রীষ্মকালে নানা দুর্দৈবের মধ্যে আবার পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ আর বন্যা দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হল, অশ্বিনীকুমার দত্তের চেষ্টায় অনেকগুলো সাহায্য-সমিতি গড়ে ওঠে। নিবেদিতাকে তিনিই বরিশালে নিয়ে যান। গৈরিকবসনা নিবেদিতা ভাষণ দিয়ে ওখানে প্রচুর টাকা তুলেছিলেন। সে টাকায় পাঁচ হাজার লোককে তিন দিন অন্তর পেট পুরে খেতে দেওয়া হত। দেশের অবস্থা তখন খুবই খারাপ। বরিশাল থেকে নিবেদিতা সে-দুর্দিনের ভয়াবহ বিবরণ নিয়ে এলেন—মানুষ একেবারে সর্বস্বান্ত, কলাপাতা পরছে, খাচ্ছে আগাছা, আর ভাঙা কুঁড়ের সামনে পড়ে মরছে। মেয়েরা আর্তনাদ করছে 'মা গো ভাত দে!' বাজারে সওদার জিনিস বলতে এক নৌকা শশা আর লঙ্কার চারা! বন্যার স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে একখানা বজরায় চেপে নিবেদিতা চার দিন ধরে খালে-খালে ঘুরলেন। জল ক্রমেই বাড়ছে,—সেই সঙ্গে বাড়ে জিনিসের দাম, চাল আর পাওয়া যাচ্ছে না। রূপকথায় যেমন, তেমনি বন্যার তাড়ায় বাঘে-গরুতে একত্র হয়, ছাগলের খুরের নিচে কুণ্ডলী পাকায় গোখরো সাপ—আতঙ্কে হিংসা ভুলে গেছে সবাই।

ফিরে এসে কলকাতার লোককে এ-বিষয়ে অবহিত করবার চেষ্টা করেন নিবেদিতা। তিনি আর পুষ্পদেবী নামে তাঁর সঙ্গিনী আরেকটি মহিলা ভাষণ দিলেন টাউনহলে, কিন্তু কেউ গা করল না। কাগজে-কাগজেও লিখলেন নিবেদিতা। এদিকে

* ১৯০৭ সনের ২৮শে মার্চ লেখা চিঠি।

অসীম ক্লান্তি! হঠাৎ জ্বরে ধরল নিবেদিতাকে, সবাই ভাবল ম্যালেরিয়া, বলল বিশ্রাম নিতে। শহর থেকে আট মাইল দূরে দমদমে চলে গেলেন—একটা আমবাগানে আনন্দ বোসের একখানি আরামকুঠি ছিল, নিবেদিতা সেখানে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু গাছের ডালে-ডালে হাওয়ার হাহাকার—কার একটানা মরণ কাতরানি যেন তাড়া করছে নিবেদিতাকে। অবিরাম সে আর্তস্বর কানে বাজে—ঐ উড়িয়ার পিলেপটকা ছেলেগুলো পেট চাপড়াচ্ছে, গোপালের মা আর স্বামী স্বরূপানন্দের কথা ভেসে আসছে কানে। মাত্র চৌত্রিশ বৎসরে হঠাৎ স্বামী স্বরূপানন্দের কাল হয়েছে। তাঁর জীবন-সূর্যও যে অস্তাচলে ঢলে পড়ছে, এ কি তারই অস্ফুট পূর্বাভাস? নিবেদিতা গুটিয়ে আসেন নিজের মাঝে। মাকে শুধ'ন, 'মা গো, কি ইচ্ছা তোমার? আর কত দিন যুঝব এমন করে?'

নব্বই বছরের বৃদ্ধা গোপালের মার মৃত্যুতে নিবেদিতা অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। সে-মরণ কিন্তু পুণ্যপ্রয়াণ। চাঁদ তখন মাঝ-আকাশে মাথার 'পরে, গোপালের মাকে অঞ্জলি করা হল তাঁরই ইচ্ছামত। গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগতেই একটু চাঙ্গা হয়ে ঠাকুরের নাম করতে থাকেন বৃদ্ধা। তার পর একটি গোটা দিন ঢেউয়ের ছলছলানির সঙ্গে তাল রেখে চলল তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দ। পাশে একটি সাধু মন্ত্র আওড়াচ্ছেন, 'ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম!' বৃদ্ধাও মনে মনে তাই আউড়ে চলেছেন।

কী শান্তির মরণ!

নিবেদিতাও যেন সেই শান্তির ডাক শুনতে পেয়েছেন, তবুও তিনি বীরাঙ্গনার প্রহরণ আঁকড়ে আছেন। একটা অধীর আবেগে ক'টা দিন কাটে—রহস্যানুভূতির উন্মাদনায় অদ্ভুত ক'টা দিন! তার পর হঠাৎ নিবেদিতা এলিয়ে পড়লেন। 'কাজের পালা সাঙ্গ এবার—ভারতের জন্য শেষ বাণীটি রেখে যাব চরমপত্রের আকারে··· একদিন বিকালে বসে বসে ভাবছিলাম "ভারতবর্ষকে আমার শেষ কথাটি বলতে হলে স্বামীজির সমগ্র আদর্শকে রূপ দিতে হবে একটি বাণীতে—চেষ্টা করে দেখব লিখতে পারি কি না।" সম্ভবতঃ ওই হবে আমার চরমপত্র।' ১৯০৬ সনের ১৩ই ডিসেম্বরের চিঠি)।

'অরিন্দম হিন্দুধর্ম' (Aggressive Hinduism) সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যত ভাষণ দিয়েছেন, তিন দিনের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় নিবেদিতা তার সার সঙ্কলন করেন। কাজটা করতে গিয়ে পুরনো দিনগুলো যেন ফিরে এল—কানে ভেসে এল জনতার সহর্ষ-উচ্ছ্বাস আর প্রশস্তি। সবাই যেন তাঁরই মুখপানে চেয়ে আছে। আবার সব ঝাপসা হয়ে যায়। কলম সরিয়ে রাখেন নিবেদিতা। কিন্তু এখনও উইলটা লেখা হয়নি যে! খুব বেশী সময় লাগল না লিখতে। মিসেস বুলের দানপত্রে একটা মোটা অঙ্কের উল্লেখ আছে,—কথা ছিল নিবেদিতা তার সদ্ব্যয়ের ব্যবস্থা করবেন। যদি নিবেদিতা মিসেস বুলের আগে মারা যান তাহলে সে টাকাটার কি হবে, এই নিয়ে তাঁকে একটা চিঠি লিখলেন। চিঠিতে ছিল 'আমার ইচ্ছা, শিল্প-প্রতিযোগিতার জন্য দেশবাসীকে বছরে হাজার পাউণ্ড দেওয়া হ'ক। ক্রিষ্টিনকে দিয়ে গেলাম স্বামীজির বইয়ের আয়ে আমার যে-অংশ আছে আর আমার বইয়ের যা আয় সেইটা, সেই সঙ্গে আরও তিন হাজার পাউণ্ড। আর এদেশের বিজ্ঞানচর্চার জন্য খোকার হাতে দিয়ে যাব তিন হাজার পাউণ্ড···' (১৬ই জুলাই ১৯০৮-এর চিঠি)। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবার। তারপর সারা রাত ধরে চলে আত্মবিজয়ের ধ্যানগম্ভীর তপস্যা।

নিবেদিতার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আর কর্মক্ষমতা যেন মিলিয়ে গেছে। অবশ দেহ-মন নিয়ে কত দিন কেটে গেল। প্রায়ই এখন নির্জনে কাঁদেন নিবেদিতা। জীবন যেন নির্মল হতে নির্মলতর হয়ে চুঁইয়ে পড়ছে তিলে তিলে। কিন্তু আলো কই, আলো!···বাড়িটার চার-পাশে বাতাস যেন কেঁদে মরছে আজ! শান্তিঃ! শান্তিঃ! আঁধার রাত। তবু ডাক শুনতে পাচ্ছি। মায়ের ডাক। আমি যাব, আমি যাব! বলি দেব নিজেকে!···

(১৯০৮-এর ১২ই জানুয়ারির চিঠি)

ধীরে ধীরে আবার জীবনীশক্তি ফিরে আসে···কিন্তু এ যেন আরেকটা মানুষ। নতুন নিবেদিতাকে তাঁর বন্ধুরা আর কোন-দিনই পুরোপুরি চিনতে পারবেন না। ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যকে রাজদণ্ডের মত ব্যবহার করেছেন একদিন, আজ তিনি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, শুধু মায়ের দাসী। মা বলেছেন, 'একদিন সবার পুরোভাগে তোমায় স্থান দিয়েছিলাম—সে আমারই ইচ্ছা···আজ আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়েছে, তোমার শেষ···'

রণরঙ্গিণী তাঁর প্রহরণ নামিয়ে রেখেছেন এবার।

'···নৈষ্কর্ম্যের সাধনা করছি এবার, এর চাইতে বড় আর কিছু নাই। ভেবে দেখলাম, সংসারের কুরুক্ষেত্রে যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে কেউ,—নীরন্ধ্র আঁধারে সে বন্দী হয়, আলোর আভাস কোথাও মেলে না তার। মহাজীবনের ছন্দে এই আয়াস নাই, আছে উপচে পড়া। কণ্টকিত হয়ে ভাবি, আমিও কত বার হৃদয়ের বাতায়ন রুধেছি যে! ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!' (১৯০৭ সন ২রা জুনের চিঠি)।

হাতের খড়্গ আজ খসে পড়েছে রণোন্মাদিনীর।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী

কদলী

শ্রীরাইমোহন সামন্ত

A. A, Milne লিখেছেন "Of the fruits of the year I give my vote to the orange." তিনি কমলা লেবুর স্বপক্ষে সাফাই গেয়েছেন বিস্তর কিন্তু তবুও তাঁর সিদ্ধান্ত সমর্থন করতে আমি পারলাম না। আমার বিবেচনায় অন্তত আমাদের দেশের সেরা ফল কমলা নয়,—কদলী ওরফে কলা। কেন তাই বলি।

যাঁরা জিহ্বার দাস, রসনার স্বাদ যাঁদের বুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেছে, তাঁরা হয়ত আমকেই ভোট দিতে চাইবেন। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, আমের অসংখ্য জাতি; বর্ত্তমান যুগে এই উৎকট জাতি-বৈষম্য বরদাস্ত করা শক্ত। আবার জাতিতে জাতিতে গুণকর্মের বিভিন্নতা এতই বিস্তীর্ণ যে আমকে একটা ফল বলতে ইচ্ছা হয় না। আম জাতি নয়,—মহাজাতি। তা ছাড়া আমের অপরাধ অনেক: এই যেমন আম আলগোছে খাওয়া শক্ত। ওকে সাবধানে খেতে হয়,—পরিধানের সঙ্গে ওর সম্প্রীতি কম,—সামান্য সুযোগেই ও পরিচ্ছদ লাঞ্ছিত করতে ওস্তাদ। আম শুকনা খাবার নয়—আহারান্তে জল খুঁজতে হয়—ভদ্র হবার জন্য। এই সব নানান্ কারণেই না বেচারা ইংরাজ তার দুই শত বৎসরব্যাপী রাজত্ব কালেও এই সুরসাল রসালের পুজারী হতে পারে নাই! আমের বিপক্ষে একটা বড় যুক্তি যে, এটা একটা বিশেষ কালের ফল—চিরকালের নয়, গোটা বছরের নয়। আমের triumvirate বোম্বাই, ল্যাংড়া, ফজলি এরা তিনে মিলেও বৎসরের কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করে; গোটা আম্রজাতির সমবেত চেষ্টাও বার মাস আসর জমিয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া সব আমই কিছু আম নয়, অনেক আমই আমের ভেঙানি মাত্র, আম নামের অযোগ্য। অপর পক্ষে কলা চিরকালের, সারা বছরের, ঠাণ্ডা গুদামের কল্যাণে নয়, নিজস্ব শক্তিতেই। কেবল এই একমাত্র গুণেই কলা আর সব ফলকে কলা দেখাতে পারে! কিন্তু কলার এই একমাত্র গুণ নয়, কলার গুণের ওর নাই। অন্যান্য নামকরা কয়েকটা ফলের সঙ্গে তুলনা করলেই কলার অগণিত গুণের কিছুটা পরিস্ফুট হবে।

আমের পর আসে জাম। বিকৃত যকৃৎ মেরামত করতে যদি কেউ জাম খেতে চান খান, আমি আপত্তি করব না, কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে জামুনের সার্থকতা আমার কাছে মালুম নয়। ঠাকুর-ঘরে ঢুকে কলা খেয়েও কলা খাইনি বললে বেকসুর খালাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে—প্রমাণ অভাবে, কিন্তু জাম খেয়ে কেটে পড়বার যো নাই, হাঁ করলেই আর "না" বলবার পথ থাকে না। আমি মানুষ খুন করি না, কারণ murder will be out; আমি জাম খাই না, কারণ সগোত্রীয়!

ডাব ফল নয়, জল—সুতরাং বর্ত্তমান প্রতিযোগিতায় তার প্রবেশাধিকার নাই। তার কঠিন রূপ নারিকেলের বহিরাবরণ এতই কঠিন যে, শুধু হাতে তাকে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, হাতিয়ারের আবশ্যক। দুর্ভেদ্যতায় গডরেজের লৌহসিন্দুককে মনে করিয়ে দেয় ও। তাই নারিকেল বাড়ীর খাদ্য—গাড়ীর নয়। অথচ সাম্প্রতিক সভ্যতায় মানুষ বাড়ীতে থাকে কয় দিন, কয় ঘণ্টা?

কাঁটাল পাইকারী ফল, খুচরা ব্যবহারে বাধা সুস্পষ্ট। তার উপর ভাঙবার জন্য পরের মাথা পাওয়া গেলেও, হাতে আঠা লেপ্টে থাকবেই। তত্ত্বজ্ঞানী বলবেন হাতে তেল মাখ,—কিন্তু তেল মাখ বললেই তেল মাখা যায় না,—আসক্তি ত্যাগ কর, বললেই আসক্তি ত্যাগ করতে পারে কই বদ্ধ জীবে?

তাল নিভৃতে খাবার,—সমাজের, বিশেষ ভদ্র সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে নয়। বহু দুর্বলতা আমরা সমাজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবার সযত্ন প্রয়াস পাই। যে কোন মাননীয় নেতারই নেতৃত্ব নস্যাৎ হবে যদি একবার তাঁর ভক্তবৃন্দ তাঁকে তাল খেতে দেখেন!

গুপ্ত কবির প্রশংসাপত্র সত্ত্বেও সহস্রচক্ষু আনারসকে অনায়াসেই বাতিল করতে হয়। কারণ, প্রথমতঃ তাকে বানানর জন্য যে শ্রম ও নিপুণতার প্রয়োজন তা সহজলভ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ, সে স্বপ্রতিষ্ঠ নয়—অর্থাৎ শিল্পী লাগে তাকে মেক্ আপ দেবার জন্য,—নুণ চিনির প্রয়োজন হয় তার তার তুলবার জন্য।

মেওয়ার কথা আর তুললাম না। ওরা আমীরি ফল, নেহাৎই পোষাকী, তাই খদ্দেরের খোঁজে ওরা বের হয় না—খদ্দেরকে চুঁড়তে হয় ওদের জন্য। অত দেমাক বাজারে চলে, না জনতা বরদাস্ত করে?

মিলনে কমলাকে সোনার ফল বলেছেন। কমলার রঙের সঙ্গে পাকা সোনার সামান্য সাদৃশ্য থাকলেও গিনি সোনার সঙ্গে ওর রঙের কোন মিল নাই বললেই চলে। গিনি সোনার সঙ্গে রঙ মেলাতে পারে যদি কোন ফল তবে তা সুপক্ব কদলী। আমার মতে কলা শুধু কাঞ্চন নয়—কষিত কাঞ্চন।

কলার গুণ সম্বন্ধে পাঠকগণ এখনও যদি বিগত-সন্দেহ না হয়ে থাকেন তবে আমার ওকালতিকেই দোষ দেব—ওর নিজের কোন গুণাল্পতা স্বীকার করব না। ওর সব গুণ লিখতে গেলে প্রবন্ধ আকারে রামায়ণ হয়ে দাঁড়াবে। আমি তার কয়েকটা বড় গুণের ইঙ্গিত মাত্র করে বিদায় নেব। প্রথমতঃ কলা suits all purse, সব রকম অর্থ নৈতিক অবস্থার উপযোগী কলা মিলবে। টাকা থাকে দু' টাকা তিন টাকা ডজন কলা খান,—মর্ত্তমান, কানাই বাঁশী, সিঙ্গাপুরী। আর যদি কমলার কৃপা অজস্র ধারায় না পেয়েই থাকেন তবে ছ আনা ডজন কাঁটালি, চাঁপাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। ছোট বড় মাঝারি ভেদে ওদের দু' আনা দশ পয়সা ডজনও পেতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ কলার ভেজাল নাই; কমলা মনে করে গোঁড়া লেবু কিনতে পারেন, বোম্বাইএর দাম দিয়ে টক চোঁচআলা বুনো আম ঘরে এনে ঘরণীর গঞ্জনা শুনতে পারেন, কিন্তু কলা কিনতে গিয়ে এ দুর্গতির দুর্ভাবনা নাই। কলার জহুরি হতে দীর্ঘ-মেয়াদী নবিশীর আবশ্যকতা নাই। তৃতীয়তঃ, সমস্ত সংক্রামক রোগকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কলা আপনি না ধুয়ে খেতে পারেন। জামার আবরণে কলা আপনাকে যাবতীয় রোগের বীজাণু থেকে বাঁচিয়ে রাখে। জামা খুলেই মুখে ফেলে দেন; কোন ভয় নাই। এই জামার কথা বলতে গিয়ে একটা কথা মনে না এসেই পারে না। এর জামা আলগা পরা, খুলতে কোন কষ্ট নাই। আমের কথা ভাবুন, জামা গায়ে এমন ল্যাপটান যে, ছুরি-বঁটির দরকার করে জামা খুলতে, ছাল ছাড়াতে। অবশ্য এ বিষয়ে কমলাও কলার সমধর্মী। কিন্তু কলার চতুর্থ গুণ যা এখন বলব তা কমলার নাই। জামা খুলা হলেই

দার্জ্জিলিং

—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

বকধার্ম্মিক
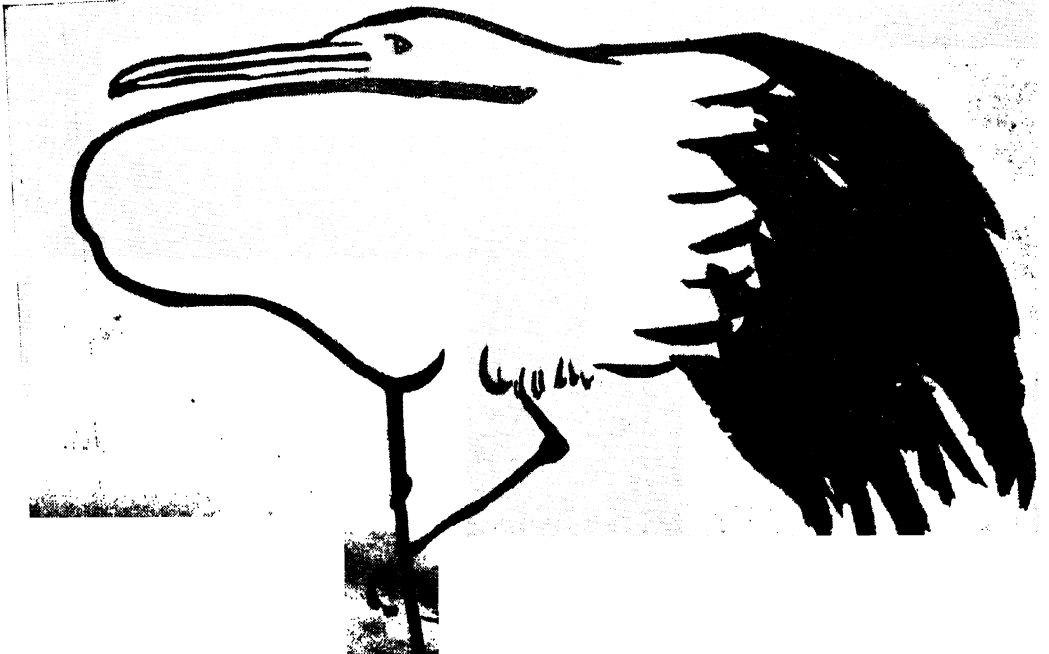
আর নির্ভাবনা ; কলা মুখে পুরে আর ভাবতে হয় না বাতিল অংশ কোথায় ফেলবেন। অপর পক্ষে কমলার সবটা খাওয়া যায় না, তার বিচি আছে ; ছিবড়ে আছে। আর কলা, you can eat it whole। কলার খোসায় অর্থাৎ তার জামার কোন সার্থকতা নাই তা যেন কেউ না ভাবেন। শত্রুকে জব্দ করবার ব্রহ্মাস্ত্র এমন পাবেন কোথায়? রাজধানীর ফুটপাথে বা রেল-ষ্টেশনের প্লাটফরমে তাক-মাফিক এক খণ্ড কলার খোসা কি অভাবনীয় ফল উৎপাদন করে তা অনেকেই দেখেছেন। মিত্রপক্ষ বা নিরপেক্ষ কেউ যদি কুপোকাৎ হন তা হলেও হরজ নাই, প্রাণভরে একটু হেসে নিতে পারবেন। হাস্যরসের মত এমন উপভোগ্য রস আর কি আছে? কলার খোসা সেই হাস্যরসের এটম বম। এটা কলার পঞ্চতম গুণ। ষষ্ঠ গুণের উল্লেখ পূর্বেই করেছি। কলা চিরকালের। যারা আসে যায়, তাদের সঙ্গে দু'দণ্ডের আলাপ করা যায়,—যে স্থায়ী তাকেই ডাকা যায় বন্ধু। নচিকেতা যমকে বলেছিলেন যা অস্থায়ী, পণ্ডিত ব্যক্তি তাতে আসক্ত হন না, "কঃ তেষু রমতে বুধ?" চিরদিনের ফল এই কলায় আসক্ত হলেও তাকে জ্ঞানী বলতে আটকাবে না। কলায় অনেকের আপত্তি হতে পারে বানরের সঙ্গে এর অবাঞ্ছনীয় association এর জন্য। কিন্তু বানরের প্রিয় এই ফলটি কেন ঠাকুরের প্রিয় নয় শুনি? কোন্ নৈবেদ্য পূর্ণাঙ্গ হয় কলা ছাড়া?

আমি ডাক্তার নই, খাদ্যপ্রাণ পরীক্ষায় কলা কত নম্বর পাবে বলতে পারব না ; তবে পুষ্টির পরীক্ষায় লেটার পাবে বলে আমার স্থির বিশ্বাস। An apple a day keeps the doctor away এই ইংরাজি প্রবচনের অনুরূপ কলার প্রশস্তি জ্ঞাপক একটা প্রবচন প্রচলন করবার সময় এসেছে। আমি প্রস্তাব করব, 'দিনে দুটা কলা খেলে সত্তর বছর অবহেলে।' "সত্তর" বললাম বাইবেলকে অনুসরণ করে ; সংস্কৃত "শতং সমা"র মর্যাদা রেখে "একশ"ও বলতে পারতাম, তবে আজকের এই ঘোরতর জীবন-যুদ্ধের মধ্যে "একশ" একটু অতিরঞ্জন শোনাবে।

দুটি সনেট

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১

ধনী নহি আমি, ধনী নহে মোর কোন
বংশধর। রাশি রাশি রজতের ভার
স্তূপীকৃত কনকের নাই কোষাগার
আমার প্রাসাদ নহে পাথরে বাঁধানো।
সুদূর পারস্য হতে, তুরস্কের দেশে
ধনীরা যেমন আনে কার্পেট কুশন
কিছু নাই মোর গৃহে, বসার আসন।
আমার গৃহের দ্বারে ভৃত্য নাই বসে
আহ্বানে উৎকর্ণ হয়ে। দূরদেশজাত
দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ, যাহা সদা শোভমান
ধনীর প্রাসাদে তাহা হেথা আকাঙ্খিত
তবু মোর নহে অন্ধ অদৃষ্টের দান
নয়ন দেখেনি তারে। তবুও গর্বিত
নামেতে তাদের মোর ভরে আছে কান।

২

তাই মোর দুঃখ নাই—নীলিম আকাশ
নিষ্প্রভ তারার করে আজিকে উজ্জ্বল
শ্যামলিম বসুধার পুষ্পের অঞ্চল
গিরি-শিখরের কত উন্নত প্রকাশ—
শ্যামল গুণ্ঠন—মনোরম প্রান্তর
রোদে ঝলমল, আহা সকলই আমার
আমার নয়ন আর শ্রবণ অন্তর
এ আনন্দ-রসে মুগ্ধ, দুঃখ কিসে আর?
রণোন্মাদ ঝঞ্ঝা জাগে ভীম গরজনে
মলয় সমীর বহে উল্লাসেতে ভরে
রজতত্তটিনী বহে কুল-কুল স্বনে
ঘনায়িত অন্ধকারে অশেষ সাগরে
সকল শোকের মাঝে সান্ত্বনায় আনে
অতীন্দ্রিয় মনোরম—এ আমার তরে।

অনুবাদক—শিশিরকুমার দাস।

প্রবাসীর পত্র

মন্মথনাথ রায়

ডেনিস সমাজের কয়েকটা দিক

ছোট একটি দেশ এই ডেনমার্ক, এ-দেশের আয়তন হল ন্যূনাধিক সতের হাজার বর্গ-মাইল। লোকসংখ্যা বিয়াল্লিশ লক্ষ, তবুও বাইরের বিশ্বের কাছে তুলে ধরবার মত বিশিষ্টতা রয়েছে এর কিছু, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্য দেশ থেকে তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা তথ্য সংগ্রহ করতে আসে এদেশে, এখানকার সমাজ-ব্যবস্থা, শিক্ষা-ব্যবস্থা, সমবায় সমিতি আর সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থা বিদেশীর মনে সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের উদ্রেক করে, এ সকল ব্যবস্থার পাশাপাশি এমন ব্যবস্থাও রয়েছে যা প্রবাসীর মনকে নাড়া দেয়, অনেকে হয়ত সে ব্যবস্থার সঙ্গে এ দেশের উন্নতির যোগসূত্র খুঁজে পায় না।

পরিবারের পরিধি এদেশে খুব ক্ষুদ্র। পরিসংখ্যান অনুসারে এক একটি পরিবারের লোকসংখ্যা গড়ে সাড়ে তিন। এমন অনেক পরিবার রয়েছে যার লোকসংখ্যা একাধিক নয়, আমাদের দেশে এ কিন্তু বিরল, এখানে যেমন অবিবাহিত মহিলা রয়েছে অনেক, তেমন অবিবাহিত পুরুষও রয়েছে অনেক। এদের পরিবারে সাধারণতঃ রয়েছে স্বামী, স্ত্রী আর বড় জোর দুটি সন্তান, পনের ষোল বছর বয়েস উত্তীর্ণ হলে পুত্রকন্যা হয়ে যায় স্বাধীন। তাদের গতিবিধি চালচলন নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার থাকে না পিতা-মাতার, দৈনন্দিন জীবনে তারা কি করবে, কোন্ পথে তারা অগ্রসর হবে, কার সাহচর্য তারা গ্রহণ করবে, তা তারা নিজেরাই নির্ধারণ করবে। পিতা-মাতা যদি সন্তানের নির্ধারিত পথে তাদের চলতে সহায়তা করতে পারে ত ভাল, না হয় বিরোধ অপরিহার্য। বিয়ের পর পুত্র আর পিতা-মাতার সঙ্গে একবাড়ীতে বাস করে না, এ দেশে এটা একেবারে স্থির নিয়ম, অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার, পিতাপুত্রের নিজ নিজ মতামত রয়েছে, সুবিধা অসুবিধা রয়েছে। একে অপরের নির্দেশ সহ্য করবে কেন? তাই বিবাহান্তে পুত্র পিতার কাছ থেকে সরে যায়, যত দিন প্রত্যক্ষ বিরোধ দেখা না দেয় তত দিন পিতাপুত্রে সম্ভাব, আলাপ-আলোচনা চলে। আর যদি কোন কারণে মতদ্বৈধ হল তাহলে সব বন্ধ হয়ে যায়, পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের অধিকার—অবশ্য পিতার জীবদ্দশায় নয়, নিজের পরিণয় আর পিতার মৃত্যুর মধ্যবর্তী কাল পুত্রকে প্রায় ক্ষেত্রেই নির্ভর করতে হয় নিজ উপার্জনের উপর, পিতা-মাতাও পুত্রের কাছ থেকে সাধারণতঃ সাহায্য পায় না। মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—বার্ধক্যে অসহায় পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ কে করে? দেশের সরকার সে ব্যবস্থা করে রেখেছে। তাদের ভরণ-পোষণের ভার সরকারের, ১৯৪৯ সালে সরকার দু'লক্ষ চৌত্রিশ হাজার বৃদ্ধ অসহায় নর-নারীর ভরণ-পোষণ ব্যবস্থা করেছিল, আজকাল সংখ্যা আরও একটু বেশি হবে।

উপরের এ আলোচনা থেকে বুঝা যায়, এদেশে যৌথ পরিবার বলে কিছু নেই। ফলে পারিবারিক আকর্ষণটা তেমন জোরালো নয়, যৌথ পরিবার আমাদের সমাজের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ, অসুবিধা এর রয়েছে সত্য, কিন্তু সুবিধাও এর রয়েছে অনেক, আমাদের পরিবারের আয়তন এত ছোট হলে স্নেহ-মমতা প্রভৃতি মনের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলো একেবারে শুকিয়ে যেত।

সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ে সহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বালক বালিকা একসঙ্গে লেখাপড়া করছে। একসঙ্গে তারা বেড়ে উঠছে। পরস্পরকে তারা ঘনিষ্ঠ ভাবে জেনে নিবার সুযোগ পাচ্ছে। যৌবনেও চলেছে সহশিক্ষা আর সহযাত্রা, অবাধ মেলামেশা। এতেও আপত্তি নেই কারও—না পিতা-মাতার না পাড়াপড়শীর, পিতামাতার চোখের সামনে যুবক-যুবতী গল্প করছে, হাতাহাতি করছে, হাস্য-পরিহাসে আকাশ-বাতাস না হোক পরিবেশটা চঞ্চল করে তুলছে। তাতে বিরক্তি বোধ নেই কারও এতটুকু। ছুটির দিনে যুবক-যুবতী চলেছে একসঙ্গে আনন্দ করতে। মোটর-সাইকেলে চলেছে যুবক। পাশে বসে আছে বান্ধবী, কারও মনে কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ নেই, নিবিড়তর সান্নিধ্যেও বুঝি বা কোন বাধা নেই। এভাবে এদের প্রণয় হয়, তার পর হয় পরিণয়, ফল কিন্তু সকল ক্ষেত্রে শুভ হয় না। সহরাঞ্চলে শতকরা ত্রিশটি ক্ষেত্রে আর গ্রামাঞ্চলে শতকরা আঠারটি ক্ষেত্রে হয় বিবাহ-বিচ্ছেদ। অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে যে ভুল হয়েছিল তাতেও আর সন্দেহ থাকে না। এটা যে একটা মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এ কথা আজ এদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করে, কিন্তু আপাততঃ এতে কারও কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। সমাজে কারও অমর্য্যাদার আশঙ্কা নেই এতে এতটুকু।

আর একটি সমস্যা এদের দাঁড়িয়েছে। এদেশে অপরিণয়োদ্ভূত (born out of wedlock) শিশুর সংখ্যা মোট শিশুর সংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ। অপরিণীতার সন্তানের লালন-পালন করে হয় পিতা, না হয় মাতা আর না হয় রাষ্ট্র। সন্তানের তেমন অমর্য্যাদার কিছু নেই। সে অপর শিশুর সঙ্গে সমান মর্য্যাদায় বেড়ে উঠে। জননীর কিংবা জননীর পিতামাতারও সমাজে তাতে তেমন কোন অমর্য্যাদা হয় না। বিশেষতঃ, পরে যদি শিশুর পিতা-মাতা পরিণয়াবদ্ধ হয়। এক ভদ্রলোককে কথা প্রসঙ্গে জিগ্যেস করেছিলাম, এদেশে মেয়েদের সাধারণতঃ বিয়ে হয় কত বয়সে? তিনি বললেন—সাধারণতঃ মেয়েদের বিয়ে হয় কুড়ি বছর বয়সের পর। সে কথা বলেই তিনি বললেন, তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু আঠার বছর বয়সে, মেয়েটি তখন সন্তানসম্ভবা। আমরা একথা জানতাম না। ভদ্রলোক বললেন বিনা দ্বিধায়, স্পষ্ট বুঝা গেল, এতে তাঁর অমর্য্যাদার কিছু নেই বলেই এরা মনে করে।

মহিলাদের সাজ-পোষাকের দিক দিয়ে এদের অগ্রগতি হয়েছে অনেক দূর, এদেশের সমুদ্রস্নান আর রৌদ্রস্নানের পোষাক আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করে। স্কার্ট হয়ে চলেছে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর, আর উর্ধ দেহের আবরণ হয়ে চলেছে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতা এমন পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, তার ফলে তার অস্তিত্বই হয়ে পড়েছে সন্দেহজনক। কিন্তু এ পোষাক-চাঞ্চল্য এমন কি কৌতূহলেরও সৃষ্টি করে না। এ অতি সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনা। যা চলে আসছে তাতে সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নূতনত্বও নেই, চাঞ্চল্যও নেই।

জীবন চলেছে অনির্দিষ্ট গতিতে। কোথায় যে তার শেষ হবে তা যেন কারও জানা নেই! স্রোতে ভেসে চলেছে। যেখানে গিয়ে বাধা পায় সেখানেই দাঁড়িয়ে যাবে, না হয় আরও এগিয়ে যাবে। খাবার টেবিলে পরিচয় হল এক যুবকের সঙ্গে। যৌবন তার দেহ আর মনের কূল ছাপিয়ে উপছে পড়ছে। মুহূর্তে সে গোটা বিশ্বকে বন্ধু করে নিতে পারে। আমি ত কোন্ ছার! একদিনের পরিচয়েই বন্ধুত্ব জমে গেল। যুবক তার সঙ্গিনীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। আমায় রোজ তার টেবিলে বসে খেতে অনুরোধ

করলে। যুবকের কথায় আনন্দ। যুবতীর মুখে মৃদু হাসি। বুঝে নিলাম—মৃদু হাসির কাছে পরাভব মেনেছে যুবক। এক টেবিলে বসে খাই। গল্প যুবকই করে, আমরা দু'জনে শুনে যাই। মন্দ লাগে না। কথায় মসগুল হয়ে গেলে খাদ্যাখাদ্যের কথা মনে থাকে না। খেয়ে চলি বিনা বাধায়।

সেদিন সান্ধ্যভোজের পর আমায় ডেকে যুবক বললে, আজ আমাদের সঙ্গে তোমায় বেড়াতে যেতে হবে, আমি সঙ্কোচ বোধ করছি বুঝতে পেরে যুবতী বললে চলুন না একটু বেড়িয়ে আসি। আর আপত্তি করা অশোভন হবে ভেবে বেরিয়ে পড়লাম। যুবক তার দেশের কথা, বাড়ীর কথা বললে। তারপর বললে—জান বন্ধু, আমরা দুজনায় এনগেজড্। এখান থেকে ফিরে গেলেই আমাদের বিয়ে হবে। কাজেই এখন আমাদের মেলা-মেশায় আপত্তি থাকতে পারে না একটুকু। আমি ইভাকে পেয়ে কত যে সুখী হব! ইভাও বার বার আমাকে বলেছে সে-ও কত দিন ধরে আমার অপেক্ষা করছে। She is an angle of a girl মেয়ে নয়, স্বর্গের দেবী। যুবতীর মুখে সলজ্জ হাসি খেলে গেল।

কিছুদিন আর আমাদের দেখা হয়নি, আমি চলে গিয়েছি সুদূর পল্লীতে, পক্ষান্তে ফিরে এসে দেখি, যুবক আর যুবতী চলে গেছে। মনে ভাবলাম, এত দিনে ওদের স্বপ্ন সফল হয়ে গেছে। ওদের বিয়ে হয়ে গেছে। এখন ছোট্ট একটি নীড় বেঁধে ওরা বাস করছে যেন কপোত-কপোতী।

আমাদের ফিরবার সময় হয়েছে, একদিন সহরের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছি, হঠাৎ সেই যুবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ। আমি চীৎকার করে বলে উঠলাম—হ্যালো মিঃ ষ্টীল, যুবক আমার দিকে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলে। করমর্দন করে বললাম, তুমি ত নিশ্চয়ই ভাল আছ, তোমার গৃহিণী কেমন আছেন? ধীরে ধীরে আমার হাত থেকে সে তার হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে বন্ধু, তুমি যাকে গৃহিণী বলে বলছ সে হয়ত ভাল আছে। তবে সে আমার গৃহিণী নয়, হবার কোন সম্ভাবনাও নেই। সে এখন অপরের গৃহ আলোকিত করছে। মিঃ ষ্টীল লৌহের মত শক্তই আছে। কিন্তু সেই উপচে-পড়া আনন্দ আর তার মুখে নেই। আমি বললাম, সে কি? তুমি বললে সব ঠিক হয়ে আছে। হোটেল থেকে গেলেই তোমাদের বিয়ে হবে? উত্তরে ষ্টীল বললে—আমি যা ভেবেছিলাম তোমাকে তাই বলেছি। ইভা তার হাসিতে যা বুঝাতে চেয়েছিল মানে কিন্তু তা ছিল না তার। আসলে ইভা আগেই অপরকে কথা দিয়েছিল। আর সেখানে কেবল নীরব হাসি দিয়ে নয়, মন দিয়ে। হোটেল থেকে গিয়েই সে তাকে বিয়ে করেছে। জিজ্ঞেস করলাম—কে সেই সৌভাগ্যবান? ষ্টীল বললে—সে আমার ছোট ভাই। মেয়েটি আসলে কিন্তু Devil of a Woman একেবারে শয়তানী! বিদায় নিয়ে এলাম, সারা রাস্তায় কেবল মনে হল—যে আজ স্বর্গের দেবী, কালই সে হয়ে গেল শয়তানী! আসল কথা হল এরা নিজেকেই নিজেরা জানে না। অপরকে জানবে কি করে? স্রোতে যারা দেহ এলিয়ে দেয় তাদের এমন আঘাত পেতেই হয়।

এদেশে মহিলারাও কোন কোন ক্ষেত্রে নির্ঝঞ্ঝাটে একা বাস করেন। কেহ বা আপন গৃহে কেহ বা একেবারে হোটেলে। কারও আয় হয় চাকরী থেকে কারও আয় হয় পূর্বসঞ্চিত অর্থের সুদ থেকে। আমাদের হোটেলে এ ধরণের মহিলা আছেন কয়েক জন, এরা নিঃসঙ্কোচে আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করেন, গল্প-ঠাট্টা করেন। এক দিন আমরা দু' বন্ধুতে এক মহিলার সঙ্গে আলাপ করছিলাম, তিনি তার মা-বাবার কথা বললেন, বন্ধুর কথা বললেন। আমার বন্ধুটি সুযোগ বুঝে বললেন—কই আপনার স্বামীর কথা ত কিছু বললেন না? তিনি অত্যন্ত সহজ ভাবে জবাব দিলেন—স্বামী বলতে এখন ত কিছু নেই? যখন ছিলেন তখন তাঁকে স্বামী বলে মানতে পারিনি বলেই ত ছেড়ে চলে এলাম। বিয়ের আগে ভেবেছিলাম—তাকে আমার চাই-ই। বিয়ের ক'দিন পরই দেখি, তাঁর সঙ্গ নিতান্ত অসহনীয়। তাই বিবাহ-বিচ্ছেদ হল। তার পর আর সে ঝামেলায় যাইনি। অতি সহজে এদের বিয়ে হয়। আর তেমনি সহজে তা ভেঙ্গে যায়। জীবনের তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয় এটা। এরা কি সুখী? পালবিহীন নৌকার মত ছুটে চলেছে। এখানে-সেখানে ধাক্কা খাচ্ছে। একটু থেমে আবার চলেছে। নোঙর করতে আর পারবে না। ডাক্তাররা বলেন, এদেশে বেশি সংখ্যক রোগী হচ্ছে মানসিক ব্যাধির, এর সঙ্গে তাদের এই জীবনযাত্রার কি কোন যোগ নেই?

চীন দেখে এলাম

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু

খাওয়াটা সান-ইয়াৎ-সেন পার্কে। পার্ক মানে শুধু মাত্র মাঠ বিবেচনা করবেন না। নিষিদ্ধ-শহরের ভিতরে এক এলাহী জায়গা। তিয়েন-আন-মেন পেরিয়েই ঠিক সামনে। হাজার বছর আগে মন্দির ছিল এখানে। প্রাচীন সাইপ্রেস গাছ অজস্র। আর আছে ফুল—ফুলে ফুলে রঙের বাহার। আছে বেণুকুঞ্জ ছোট-বড় টিলার উপরে। খাল আর পুকুর—খালের উপর পাথরের পুল, কাঠের পুল। চিড়িয়াখানা মতন একদিকে—বানর, ময়ূর আর নানা রকমের পাখী সেখানে। প্রশস্ত হল-ওয়ালা পুরানো ঘরবাড়ি—বহু বিচিত্র ছবি তার দেয়ালে। জায়গাটা নতুন রকমে সাজিয়ে-গুছিয়ে ১৯৩৮ অব্দে জাতির জনকের নাম জুড়ে দেওয়া হয়। বিকালবেলা দেখতে পাবেন, হাজার মানুষ এই মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চিড়িয়াখানা-মিউজিয়াম দেখছে, খেলাধূলা করছে।

পৌঁছবো আমরা হলগুলোর ভিতর—মেয়র মশায় যেখানে টেবিল সাজিয়ে ভোজের আয়োজন করে রেখেছেন। পৌঁছনো কিন্তু বড় সহজ ব্যাপার নয়। এর চেয়ে সেই যে মহাপ্রাচীরে উঠেছিলাম—সে অভিযান অনেক হাল্কা ছিল। যত কলেজের ছেলে-মেয়ে ভিড় করেছে। কান-ফাটানো হাততালি। আর সেই দরবার—সেকহ্যাণ্ড, অন্ততপক্ষে হাতের ছোঁয়া একটুখানি। রক্ষা এই, অতি বড় নিয়মনিষ্ঠায় এদের পেয়ে বসেছে। পথের দু'ধারে অফুরন্ত সংখ্যায় গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়েছে—কিন্তু সেই যে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে, লোভ যত প্রচণ্ডই হোক, পা সেখান থেকে এক ইঞ্চি সরিয়ে আনবে না। অথচ খড়ি দিয়ে লাইন দেগে দেয়নি কেউ; এইও—হাঁক দিয়ে সপাং-সপাং বেতের আওয়াজও ছাড়ছে না কোন মাষ্টার। শাসনের মানুষ কোন দিকে কাউকে দেখতে পাইনে। রেল-ষ্টেশনেও ঠিক এই ব্যাপার দেখেছি। দলে দলে ষ্টেশনে যেত সমাদর করে নিয়ে আসতে, অথবা বিদায় দিতে। কিন্তু গাড়ির গায়ে গিয়ে কেউ দাঁড়াবে না, হাতখানেক দূরে সারবন্দি হয়ে সব থাকবে। মাথায় হাতুড়ি পিটিলেও সেই জায়গা ছেড়ে নড়বে না কেউ।

খাওয়া আর কি—হুল্লোড়! ভদ্রলোকে মুখ এবং হস্ত দিয়ে ভোজ খায়—এরা ভোজ খাচ্ছে সর্বাঙ্গ দিয়ে। ডায়েরিতে, দেখছি, ভোজের সম্বন্ধে লেখা রয়েছে—'উঃ, বিষম পচা মাছ আজকের টেবিলে!' এই নাকি ভারি উপাদেয় এক তরকারি! পরম তৃপ্তিতে সকলে পচা গজাল মাছ সাবাড় করছে। কিন্তু খাওয়া কতটুকুই বা—নাচ-গানেই প্রবল। নটরাজের প্রলয় নাচন কোথায় লাগে! আমার তাগত নেই এ হেন বীরোচিত আহারের—প্রায় নিরম্বু উপোস সে রাত্রে।

খাওয়ার পরেও আছে—সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আজকের এ জিনিষ ফাঁকি দেওয়াও চলবে না। মিঃ লান-ফাঙ সেই যে কথা দিয়েছিলেন—তিনি আজ নামছেন 'কুইফির সান্ত্বনা' নাটকে। তা ছাড়া আছে নাম-করা ক্লাসিকাল নাচ-গান। দেশবিদেশ থেকে অতিথিরা এসেছেন—তাঁরাও নিজেদের লোক-সঙ্গীত ও জাতীয় সঙ্গীত গাইবেন।

মে ল্যাং-ফ্যাং সেই যে কথা দিয়েছিলেন—মনে আছে? আজকে সেই দিন। আমাদের খাতিরে আজ তিনি ষ্টেজে নামবেন। ভোজের পর অতএব চললাম অপেরায়। ক্লান্তিতে চোখ ভেঙে আসছে, তা হোক—হেন শুভযোগ ছাড়তে পারিনে কিছুতে। নব নাট্যশালার জনক তিনি—চীনে এসে তাঁর অভিনয় না দেখলে ছি-ছি করবেন যে আপনারা!

আরও মজা। যুবতী নায়িকা সাজবেন তিনি। পঁয়ষট্টি বছরের বুড়োমানুষ—বিশ-বাইশের সুন্দরী হয়ে দাঁড়াবেন ষ্টেজের উপর। বুঝুন। অপেরা শুধু নয়, ম্যাজিকও দেখে নিচ্ছেন এক পালার ভিতরে।

নাচ-গানের সন্ধ্যা (An Evening of songs and dances)—খাসা নাম দিয়েছে অনুষ্ঠানের। সন্ধ্যা অবশ্য নয়—সে পার হয়ে গেছে ঘণ্টা চারেক আগে। বাজনা, নাচ-গান আর আলোর বাহার চলল একের পর এক। রকমারি লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, বাচ্চাদের নাচ গান, শত শত বৎসর ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে মুক্তি সংগ্রাম চলেছে তারই নানা আলেখ্য। ভাল হচ্ছে, খুব তারিপ পাচ্ছে শ্রোতাদের কাছ থেকে। আমি অধীর ভাবে প্রোগ্রাম ওলটাচ্ছি, মূল-পালা আসবে কখন? কুই-ফির সান্ত্বনা।

আজকের বাঁধা পালা নয়—পুরো শতাব্দী ধরে এই ক্ল্যাসিক্যাল নাটক দর্শকদের মাতিয়ে আসছে। চীনা প্রবাদের এক নাম-করা রূপসী হলেন কুই-ফি। ঐতিহাসিক চরিত্র বটে—আমাদের যেমন পদ্মিনী কি নুরজাহান। সম্রাট তাং মিং-হুয়াঙের উপপত্নী। সেকালের দর্শক মুগ্ধ হয়ে দেখত রূপমতীর প্রমোদ-লাস্য—দেখে স্ফূর্তি করে ঘরে ফিরত। এখনকার দর্শক সেই একই পালা দেখতে দেখতে চোখের জল মোছে। অথচ পালার কথাবার্তা প্রায় কিছুই রদবদল হয়নি। আরও তাজ্জব, কুই-ফির পার্ট চল্লিশ বছর ধরে একই মানুষ করে আসছেন—মে ল্যাং-ফ্যাং। অভিনয়ের ধারা পালটেছে, মানুষেরও রুচি বদলে গেছে।

তা যেন হল, কিন্তু আজ যে ভিন্ন লোক। প্রথম সারিতে আমরা বসেছি, কুই-ফি ষ্টেজে এলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাই। না, এ মেয়ে কক্ষনো সে নয়। একসঙ্গে গল্প-গুজব করেছি, খেয়েছি

পাশা-পাশি বসে—ঠকাপ্পেন শেষ পর্যন্ত? দোভাষীকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করি, কি ব্যাপার—অসুখ-বিসুখ করল নাকি?

দোভাষী অবাক করে দেয়, ঐ তো মে। হাঁ, তিনিই—

ষোল আনা বিশ্বাস হল না, সংশয় রয়ে গেল। বিলকুল এমন ভোল বদলানো যায় মেক-আপের গুণে? আসবার দিন সে ল্যাং ফ্যাং তাঁর লেখা একটা বই দিলেন আমায়। চীনা ভাষা—আমি তার কি বুঝব? শেষ দিকে অনেকগুলো ছবি—বিভিন্ন রূপসজ্জায় মে। মেয়ে-পুরুষ, রাজা-ফকির, বুড়া-যুবা (হামাগুড়ি-দেওয়া শিশু কেবল নয়) নানান চেহারার ফোটো। এঁরা যে সবাই একটি মানুষ, ছবি দেখে কে বলবে? তার মধ্যে কুই-ফিরও ছবি পেলাম বটে!

সেকালে পুরুষেরা মেয়ের পার্ট করত। এই হল অপেরার ঐতিহ্য। (সেই রীতি অনুযায়ী মে এখনো মেয়ে সাজেন) আমাদের যাত্রার মতো। সেকালে আসরে অভিনয়ের মেয়ে পাওয়া যেতো না বলেই হয়তো! চীন-ভারত দুই পুরানো জাতেরই এই এক গতিক। এখন দিন পাল্টেছে। কত চাই মেয়ে? গাদা গাদা মেয়ে নাচ-গান-অভিনয় করে বেড়াচ্ছে। কুই-ফি রূপী মে ল্যাং-ফ্যাঙের ডাইনে-বাঁয়ে পাঁচ-পাচ গণ্ডা সখী—তারা সকলেই নির্ভেজাল মেয়ে।

জ্যোৎস্না-প্রমত্ত রাত—মনে মনে বড় সাধ, এই রাতে কুসুমমণ্ডপে কুই-ফি রাজার সঙ্গে আনন্দোৎসব করবে, ভোজ খাবে।—চলল সে মণ্ডপে। সাদা মার্বেলের সেতু চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করছে, যুয়েন-ইয়াং পাখী সাঁতার দিচ্ছে জলে। রঙিন মাছ দেখছে কুই-ফি সেতুর উপর দাঁড়িয়ে, উড়ন্ত বুনো হাঁস দেখছে। হায়, রাজা এলো না, সে আর এক রাণীর অন্দরে। অবসাদে কুই-ফি ভেঙে পড়ছে। সুরার মধ্যে সে সান্ত্বনা খোঁজে। নাচছে—পানোন্মত্ত অবস্থায় টলে পড়ে বুঝি বা! খোজা চাকরকে পাঠাল, কিন্তু সে-ও সাহস করল না রাজার কাছে হাজির হতে। হতাশ কুই-ফি আবার ফিরে চলল।

রাত আড়াইটে। বেদনা-বিহ্বল মনে আমরাও হোটেলে ফিরছি। নারী ছিল খেলার সামগ্রী বড় লোকের কাছে। দুর্ভাগিনী কুই-ফি! রূপ হল অভিশাপ, বিলাস-কক্ষ বন্দিশালা।

লিফট থেকে ঘর অবধি গিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ব—তা-ও আর পেরে উঠিনে। এমন ক্লান্তি লাগছে। সকাল-সকাল উঠতে হবে, আমাদের বারো জন কাল চলে যাচ্ছেন। ভারতের নানা অঞ্চলে ঘর, কিন্তু এখানে এসে এক পরিবারের হয়ে গেছি। আবার কবে দেখা হয় না হয়—ঘরবাড়ি ছেড়ে দূর প্রবাসে যেতে হলে মানুষ যেমন করে, তেমনি তাঁদের ভাবগতিক!

এরোড্রোম অবধি চললাম ওঁদের সঙ্গে—আরও যেটুকু সঙ্গ পাওয়া যায়। আর এক বাসে ফুলের তোড়া নিয়ে পায়োনিয়র ছেলে-মেয়েরা চলল, তোড়া হাতে নিয়ে বিদায় দেবে। শেষ রাত থেকে দুর্যোগ চলেছে—ঝোড়ো হাওয়া, ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি নামছে। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি এরোড্রোমের এঘরে-ওঘরে। সময় পার হয়ে গেল, তবু প্লেনে উঠবার ডাক পড়ে না। কি ব্যাপার? দেখা যাক আর কিছুক্ষণ—খাওয়া-দাওয়া করুন না বসে বসে কিম্বা বইটই পড়ুন।

ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে যতগুলি গিয়েছিলাম সবাই আমরা ফিরে এলাম। প্লেন উড়বে না—সাংহাই থেকে খবর হয়েছে, আরও খারাপ সেখানকার আবহাওয়া। ফুলের তোড়া যেমন-কে-তেমন পায়োনিয়রদের হাতে, একটাও খরচ হয়নি। কেমন, চলে যাচ্ছিলেন যে বড় অভাগাদের বিভূঁয়ে ফেলে?

ফিরে তো এলাম। নেমে দাঁড়াতেই আবার বলে, উঠুন—। ব্যাক্‌টিরিওলজিকাল মিউজিয়ামে যৎকিঞ্চিৎ নমুনা দেখে আসুন মানুষ কত ক্ষমতা ধরে। বাঘ-ভালুক বন্যা-মহামারী নিতান্ত নস্যি। সেই যে মহাপ্রাচীর দেখে ফিরবার সময় ঝর্ণার জল খেতে দিল না, দুর্গম পাহাড়ের কোনখানে হয়তো বা বীজাণু-বোমা ফেলে গেছে। সেই থেকে দেখবার ভাবি লোভ—কি এমন বস্তু যার নামে গাঁয়ের চাষাভুষো অবধি সন্ত্রস্ত! উত্তর-কোরিয়া এবং চীনের সীমানার মধ্যে যে সব বোমা ফেলেছে, তারই খোলা ও টুকরোটাকরা সাজিয়ে রেখেছে।

খান আষ্টেক ঘর নিয়ে মিউজিয়াম। দোভাষীরা ঘুরছে বুঝিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু মুখের বাক্য নিষ্প্রয়োজন—প্রতিটি বস্তুর পরিচয় লেখা রয়েছে। বোমা মারতে এসে কতকগুলো প্লেন ঘায়েল হয়েছে, বোমাবাজ সৈন্যও ধরা পড়েছে কিছু কিছু। সৈন্যদের ছবি যার নিজ হাতে তারা জবানবন্দী লিখে দিয়েছে, তার ফোটো টাঙিয়ে রেখেচে দেয়ালে দেয়ালে। কাচের ডেস্কে তালাবদ্ধ মূল-দলিল। টেপ-রেকর্ডে অনেকের মুখের কথাও ধরে রেখেছে, সেই সব বাজিয়ে শোনাল। মার্কিন সৈন্য সবিস্তারে বলছে, কেমন করে মারণ-যজ্ঞে তাদের নামানো হল। অনুশোচনায় ভেঙে পড়ছে, এ তো লড়াই নয়—নিরীহ নিরপরাধ মানুষ নির্বিচারে হত্যা করা। সেই হত্যার কাহিনীও নামধামসহ লিখে রেখেছে অনেক—
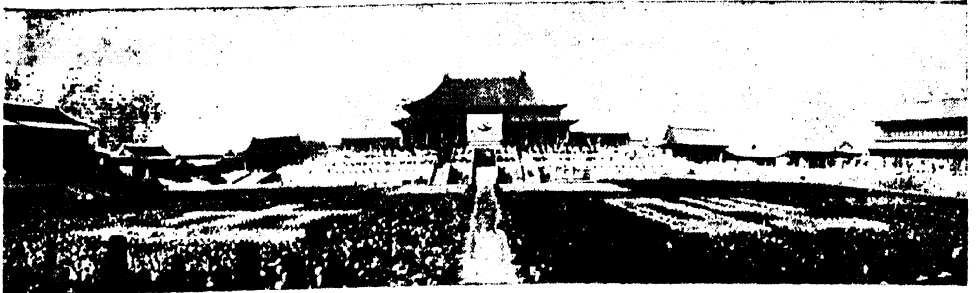
প্রাসাদ-চত্বরে সভা—জনতার মাথার সাদা টুপিতে 'হো-পিন' অর্থাৎ শান্তি লেখা হয়েছে

সংক্রামক রোগের বীজ ছড়িয়ে গেছে, গ্রামকে-গ্রাম উৎসন্ন হয়েছে একেবারে।

রাত্রে আজ বলনাচের আয়োজন। বাজনা বাজছে, ডিনারের পর সাজগোজ করে নেমে যাচ্ছে সকলে। জাতীয় উৎসবের দিন আমি নেচেছি, দেখেছে যারা তাদের কাউকে জানিনে। আজ ওঁরা নাচবেন, আমি দেখব।

বেড়ে জমেছে। বর্ণচোরা এতগুলি নৃত্যবিশারদ আমাদের মধ্যে, কে ভাবতে পেরেছে? পলিতকেশ একজন—বিষম কাঠখোট্টা মানুষ, সামনে যেতে বুক দুরুদুরু করে—দেখি, কচিকাঁচা এক মেয়ের হাত ধরে নাচের ঠমকে গলে গলে পড়ছেন। হলময় এই চলেছে। মগ্ন হয়ে দেখছি—হায় রে, শনির দৃষ্টি পড়ে গেছে অধমের দিকেও। বসে আছেন যে বড়! সকলকে নামতে হবে, বসে বসে দেখবার এবং দেখে দেখে হাসবার একজন কাউকেও থাকতে দেওয়া হবে না।

কাপুরুষ ব্যক্তি আমি, প্রস্তাব মাত্রেই কপালে ঘাম দেখা দিল। আশৈশব আমার সঙ্গীতাভ্যাস ভাল লোকের আসরে নয়—হাটের ফিরতি পথে বাঁশতলার অন্ধকারে ভূতের ভয়ে যখন গা কাঁপত। নাচতে পারি, সে তো জানেন সর্বজনা, দশ বছুরে নৃত্যগুরুর তালিম-দুষ্ট রাজপথের উপরে। সাজানো আসরে জ্ঞানীগুণীর মধ্যে ঝিকমিকে ঐ বড় বড় মেয়ের সঙ্গে একেবারে পা উঠবে না।

কোন গতিকে হাত এড়িয়ে থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রেমচন্দের ছেলে অমৃত রায় অদূরে। তাঁর উপরেও হামলা হচ্ছে। কিন্তু নড়াতে পারল না, বেকুব হয়ে ফিরে গেল। ভরসা পেয়ে এবার অমৃত রায়ের টেবিলে গিয়ে বসি। দুটি মেয়ে একটু পরে এসে সামনের চেয়ার দুটোয় বসল। বসে থাকে। চেয়ার খালি রয়েছে যখন—কেউ তাকাচ্ছে না তোমাদের দিকে। ও হরি, একটি আবার ওর মধ্যে ইংরেজি-জানা—হয় তো বা দোভাষীর কাজ করে। বলল, এক পাক নেচে আসুন না আমার এই বান্ধবীর সঙ্গে। অমৃত রায় হাঁ হাঁ করে ওঠেন—তাঁর হিল্লেয় এসে বসেছি, অথচ দরিয়ায় ঠেলে দিলেন তিনি। হাঁ, হাঁ—একটুও নাচেন নি ইনি—

যে-ই না বলা, তড়াক করে উঠে দাঁড়াল অন্য মেয়েটা। হাসছে মৃদু মৃদু, হাত বাড়িয়ে দিল। সে হাত ধরলাম না আমি। ইংরেজি-নবিশটাকে বললাম, পায়ে ব্যথা আমার—সিঁড়ি থেকে পিছলে পা মচকে গিয়েছে, বুঝিয়ে দাও ওকে—

মেয়েটি ম্লান দৃষ্টি তুলে তাকাল। সে ছবি এখনো মনে ভাসে। বোধ করি অপমান করা হল তাকে, আমার পক্ষে সামাজিক অপরাধ। বসে পড়ল চেয়ারে সে আবার, আসরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে নাচ দেখতে লাগল। টিপি-টিপি আমি উঠে পড়লাম—বিপদের ত্রি-সীমানায় আর থাকছি নে।

সিঁড়িতে ডক্টর কিচলুর সঙ্গে দেখা। নামছেন তিনি এতক্ষণে। হেসে বললেন, উঠে চললে এর মধ্যে?

পালিয়ে যাচ্ছি—

আর যে ক'টা দিন পিকিনে আছি, বাঁধা-ধরা কিছু নেই—এখানে-ওখানে দেখে-শুনে বেড়ানো। একদিন গ্রামে নিয়ে চলুন না ও মশায়! শহরে দেশের খাঁটি চেহারা পাওয়া যায় না, ঘুরে-ফিরে একটু গ্রামযাত্রা দেখে আসি।

সেই বন্দোবস্তই হয়েছে। কাল। পনের-বিশ জন করে এক এক গ্রামে নিয়ে যাবে। সকাল বেলা বেরিয়ে সমস্তটা দিন টহল দিয়ে সন্ধ্যাবেলা বাসায় ফেরা।

তিন বছরে নতুন চীন অসাধ্য সাধন করেছে। সব চেয়ে তাজ্জব ভূমি-সংস্কার! চীনে পা দেওয়ার প্রথমক্ষণ থেকে প্রত্যক্ষ করছি শ্যামায়িত সারা দেশ। ফলাফল আরও ভাল করে বুঝব কাল গ্রামের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে। ইতিমধ্যে ব্যাপারটা মোটামুটি জেনে নেওয়া যাক! এক বড় মাতব্বরকে পাকড়ানো গেছে, বিস্তর হদিশ দেবেন তিনি। চলুন পীস-হোটেলে।

নিচের তলায় এক বড় ঘরে ঘিরে বসেছি ভদ্রলোককে।

আমাদের দেশের, ধরুন, আড়াই গুণ জায়গা। চিরকালের নিয়ম ভেঙে এত বড় দেশের ভূমি বণ্টন কি করে তিনটে বছরের মধ্যে করে ফেললেন বলুন তো? কোন্ মন্ত্রে?

তিন বছরে নয়, ওটা ভুল ধারণা। বরঞ্চ বছর ত্রিশেকও বলতে পারেন। উনিশ শ' একুশ থেকেই এই নিয়ে ভাবনা-চিন্তা হচ্ছে।

জমির ক্ষুধা চাষী মানুষের চিরকালের। নিজের ক্ষেতখামার হবে, আপন জমি চাষ করবে, এই তার সর্বোত্তম সাধ। এর জন্যে বিস্তর লড়াই করে এসেছে—দু' হাজার বছর আগেও তার খবর মেলে।

উনিশ শ' উনপঞ্চাশের অক্টোবর থেকে গোটা চীন জুড়ে নতুন ব্যবস্থার চলন হল। কিন্তু আগেও কোন না কোন অংশ মুক্তি-বাহিনীর দখলে ছিল। ঘাঁটি বানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এমনি ভূমি-সংস্কারের ব্যবস্থা—যাবতীয় পরিকল্পনার সকলের পয়লা নম্বরে হল এটা। হাতে-কলমে করতে গিয়ে অসুবিধা দেখা দিয়েছে অনেক রকম, বিস্তর কাটকুট করতে হয়েছে। গোড়ায় দাবি ছিল,—জমির খাজনা কমানো হোক, সুদ-খরচাও অত দিতে পারব না। উনিশ শ' ছেচল্লিশে একেবারে মোক্ষম কথা—জোড়াতালিতে হবে না, জমিদারের জমি খাস করে চাষীদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দিতে হবে। জাপানীরা উৎখাত হল ঐ সময়ে। অনেক জমিদার জাপানীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, তাদের জমি কেড়েকুড়ে চাষীদের দেওয়া হল। বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়ে ক্ষেপে উঠেছে, ঘাসপাতা আর মুখে তুলছে না। মাও সে-তুং ঠিক বুঝেছিলেন, চীনের শাসনভার পাবে সেই দল, চাষীকে যারা জমি দিতে পারবে। তাই আজ দেখুন, নতুন সরকারের একটু কিছু ঘটলে কোটি কোটি চাষী মুঠোয় করে প্রাণ নিয়ে আসবে দুম করে ছুঁড়ে দেবার জন্য। পুরানো বনেদি জাত ওরা—নতুন দলের সম্পর্কে বিস্তর ভয়-সন্দেহ ছিল। কিন্তু ঐ একটা কাজ করেই রাতারাতি তাবৎ চাষীর হৃদয় জয় করে ফেলল। চাষী, শ্রমিক আর ছাত্র পুরোপুরি দলে ভিড়েছে—ধুরন্ধরেরা জোট পাকিয়ে বোমায় পথ সাফাই করে বেয়নেটে ঘিরে চিয়াংকে গদিতে এনে বসালেও চীনের মাটিতে তিলার্ধ তিনি তিষ্ঠাতে পারবেন না, নিঃসংশয়ে আমরা এটা বুঝে এসেছি।

জমির মালিক জমিদার—জমি চষে অন্য লোক। অথবা টাকা খেয়ে জমি বন্দোবস্ত করে দিয়েছে অন্যকে, নিয়মিত খাজনা পায়।

চীনের জনসংখ্যার শতকরা পাঁচ ভাগ—অথচ জমি দখল করেছিল অর্ধেকেরও বেশি।

চাষীরা চার রকম। জমিদারের নিচেই ধনী চাষী। আমাদের দেশের জোতদার তালুকদার আর কি! মধ্যবিত্ত চাষী—নিজ হাতে চাষবাস করে কায়ক্লেশে অশন-বসন জোটায়। গরিব চাষী সংখ্যায় সব চেয়ে বেশি। দিন-রাত ক্ষেতে খেটেও খেতে পায় না, মজুর-বৃত্তি করতে হয়। ফসলের প্রায় অর্ধেক দিতে হয় খাজনা বাবদে। অসময়ে ফসল ধার করতে হয়, সুদ তার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে। কোন দিন শোধ হবার আশা নেই। আর হল পুরোপুরি মজুর—পরের জমি চাষ করে, নিজের বলতে এক কাঠাও নেই পৃথিবীর উপর।

কৃষক-সমিতি গ্রামে গ্রামে। তার মধ্য দিয়ে চাষীরা বল-ভরসা পাচ্ছে জমিদারের অত্যাচারের কথা মুখে বলবার। সে কথা দু-একটা শুনতে চান নাকি আপনারা? বেশি শোনালে তো কানে আঙুল দেবেন। শুধু মাত্র টাকা-পয়সার শোষণ নয়—বিস্তর বীর পুরুষ আছেন যাঁরা খুনই করেছেন দশ-বিশটা। মাকড় মারলে ধোকড় হয় তো গরিব মারলে হানি কিসের? শুধু বাইরের মানুষই মারেননি, ঘরেও দু-পাঁচটা পত্নী ও উপপত্নী মেরে পুর্বাহ্নে হাত রঙ করে নিয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত হামেশাই মেলে। আর এ গৌরব পুরুষ মানুষেরই নয় শুধু। মেয়ে জমিদারণীও চাপে পড়ে এবম্বিধ আত্ম-কীর্তি ফাঁস করেছেন। এক প্রবীণ সৌম্যদর্শন জমিদার জানালেন, প্রজাপাটকের মধ্যে বিয়েথাওয়া হলে নববধূর প্রথম রাত্রিবাস তাঁর সঙ্গে। বরাবর তিনি এই অধিকার উপভোগ করে এসেছেন।

ভূমি-সংস্কার—চিরকালের এক পাকা রীতি চুরমার করে দেওয়া সোজা কাজ নয়। জমিদারের অজস্র অর্থ ও প্রতিপত্তি—সহজে ছেড়ে দেবে না তারা। চাষীরাও কিল খেয়ে কিল চুরি করবে যতক্ষণ না সুনিশ্চিত বুঝছে, দেশের শাসনশক্তি পুরোপুরি তাদের দিকে। সমিতির মধ্যে চোরাগোপ্তা জমিদারের লোক ঢুকে যাচ্ছে, পরিকল্পনা নিয়ে খুব সতর্ক ভাবে এগুতে হবে অতএব।

এক একটা অঞ্চল নিয়ে পড়ো, তার মধ্যে বিশেষ করে একটা গ্রাম বেছে নাও। শহর থেকে পাকাপোক্ত কর্মীরা এসে গেছে, গ্রামকর্মীরা আছে, আছে সমিতির প্রতিনিধিরা। সরকারী নীতি তারা লোককে বোঝাচ্ছে। আর বুঝে দেখ, জমিদার প্রজাসাধারণের জমাজমি ছলে বলে আহরণ করেই এমন ফেঁপে উঠেছে। মীটিং হচ্ছে, জমিদারের ছল-চাতুরী পাপ-অন্যায় যেখানে সর্বসমক্ষে মোকাবিলা হবে সেখানে। গণ-আদালতে বিচার হবে বড় বড় অপরাধে অপরাধী যারা। 'হোয়াইট হেয়ারড গার্ল' ছবির শেষটা দেখেছেন তো? সেই ব্যাপার আর কি!

দুটো শ্রেণী এমনি ভাবে আলাদা করা হল, যাদের স্বার্থ একেবারে উল্টো। এর উপরে আপিল চলবে। সকল পদ্ধতি পার হয়ে এলে সর্বশেষে পাকা সরকারী মঞ্জুরি। তার পরেও ব্যতিক্রম আছে কিছু কিছু। ধরুন, বুড়ো অশক্ত হয়ে পড়েছে একটা লোক কিম্বা বাপ-মা হারিয়েছে এক শিশু। অথবা মুক্তিবাহিনীতে থেকে লড়াই করেছে কেউ। জমিদার শ্রেণীর হলেও এদের সম্পর্কে বিবেচনা হবে, আক্রোশ বশে কিছু করা হবে না।

তার পরে জমিদারি বাজেয়াপ্ত—চাষীর মধ্যে জমির বিলিব্যবস্থা। জমিদারি উৎখাত হল, কিন্তু জমিদার সমাজের মানুষ—নিয়ম মাফিক তারাও জমি পাবে। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ চাষীর চেয়ে কিছু বেশিই। আর ভাল লোক হলে তাকে প্লট বেছে নিতে দেওয়া হবে আগেকার দখলি সম্পত্তির ভিতর থেকে। তবে বাপু নিজে কায়ক্লেশে করতে হবে। স্বহস্তে না পেরে ওঠো, মজুর লাগাও। কিন্তু অন্যকে বিলি করে দিয়ে খাটে বসে পা দোলাবে আর উপস্বত্ব খাবে—সে সত্যযুগ চিরকালের জন্য খতম হয়ে গেছে।

চাষীর সব চেয়ে বড় সাধ, নিজের ভুঁই ক্ষেত হবে, সেখানে ফসল ফলাবে। সাধ পুরেছে এত দিনে। গ্রামে গ্রামে উন্মত্ত উৎসব। পুরানো দলিলপত্র গাদা গাদা বয়ে এনে আগুনে দিচ্ছে। দলিল পুড়ল, আর চাষীর চিরকালের মনোবেদনা।

রবিশঙ্কর মহারাজ বেজায় মেতেছেন। মানুষের ভাল দেখলেই খুশি। কোন্ জাত, কোথায় ঘর—এই সব অবান্তর প্রশ্নে কদাচ মাথা ঘামান না। একদিন বড় উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, মহাত্মাজী যা-সমস্ত চেয়েছিলেন—সে আমি এখানেই দেখতে পাচ্ছি।

আমি বললাম, এই আমাদের চিরদিনের রীতি মহারাজ। গেঁয়ো যোগীদের কলকে দিইনে, ভিন্দেশে গিয়ে তাঁদের আসর জমাতে হয়। প্রভু বুদ্ধের নাম আমার দেশে ক'জায়গায় বা শুনে থাকেন? এখানে তাঁর নামে কত মঠ-মন্দির, এই কম্যুনিষ্ট আমলেও হলদে আলখেল্লা-পরা শ্রমণরা বুদ্ধের নামগানে আকাশ-ভুবন বিমন্দ্রিত করছেন। মহাত্মাজীরও হয়তো তাই—দেশের চেয়ে বিদেশ-বিভুঁয়ে বেশি খাতির হবে।

আজ দুপুরে মহারাজের দলে ভিড়ে পড়লাম। ছোট দল ওঁদের—উমাশঙ্কর যোশী, যশোবন্ত প্রাণশঙ্কর শুকলা আর মহারাজ—বড় দলের মধ্যেও দেখেছি, এই তিন জন স্বতন্ত্র সদাই। হৈ-চৈ নেই, শান্ত পায়ে ঘুরে ঘুরে দেখেন এটা-ওটা। আজ ওঁরা পিকিনের এক ইস্কুল দেখতে যাচ্ছেন। চলুন, আমিও যাবো।

আট নম্বর মিডল ইস্কুল। ঝকঝকে বাড়ি, অনেকখানি জায়গা নিয়ে। হোপিন ওয়ানশোয়ে, শান্তি দীর্ঘজীবী হোক—হাঁকডাক করে পরম আদরে ভিতরে নিয়ে গেল। ধবধবে পোষাক

পরা ছেলেরা ঠাণ্ডা হয়ে লেখাপড়া করছে। আমাদের গেঁয়ো পাঠশালায় সেকালে ইনস্পেক্টর এলে এই রকম হত। আগের দিন সমঝে দেওয়া হত অবিশ্যি—ধোপানো কাপড় পরে আসবি, টুঁ শব্দ হয়েছে কি পিটিয়ে পিঠের ছাল তুলে নেবো ইনস্পেক্টর চলে যাবার পর। বারোমেসে অনিয়মের মধ্যে একটা দিনের ঐ শৃঙ্খলার উৎপাত। কিন্তু আমরা তো আগে-ভাগে জানান দিয়ে আসিনি—এত ছিমছাম হবার সময় পেলো কখন ?

সকলের নিচের ক্লাসে ঢুকলাম প্রেসিডেণ্ট মশায়ের সঙ্গে। ভারত কোথায় জানো, এঁরা সেই ভারতের লোক। তামাম ক্লাস ড্যাবড্যাব করে চেয়ে দেখছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী কে বলো দিকি ? তা'-ও বলতে পারে দু-পাঁচ জন। নেহরু। নানান শ্রেণীর মধ্যে জিজ্ঞাসা করে দেখেছি, নেহরুর নাম জানা অনেকেরই। আর জানে রবীন্দ্রনাথকে—কলেজ-পাড়ার মধ্যেই অবশ্য বেশি।

উপর-নিচে এক পাক বেড়িয়ে এসে হলের ভিতর লম্বা টেবিলের দুধারে জমিয়ে বসা গেল। আমরা চার জন, মাষ্টার মশায় বা আর প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। চা-সেবন এবং তৎসহ মোলাকাত চলছে। যেমন যেমন শুনলাম, টুকে নিয়েছি। এর থেকে শিক্ষার হাল-চাল বুঝে নিন গে আপনারা।

জুনিয়ার সিনিয়ার দুটো বিভাগ। তিন বছর লাগে এক এক বিভাগের পড়া শেষ করতে। সাতাশটা ক্লাশ—ছেলেও সাতাশ শ'র কাছাকাছি। কর্মীরা হলেন পঁচানব্বুই—ওর মধ্যে মাষ্টার চুয়াম্ন জন। কেরাণি ইত্যাদি তবে হিসাব করে নিন।

প্রেসিডেণ্ট আর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হলেন আমাদের যেমন হেড মাষ্টার ও এ্যাসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার। পড়াতে হয়, আবার দেখাশুনাও করতে হয় সকল রকম। আমাদেরই মতন।

আবাসিক ইস্কুল—ছেলেদের বোর্ডিং-এ থাকতে হবে। তিন বারের খাওয়া—এক মাসের মোটমাট খাইখরচা ৭৫,০০০ ইয়ুয়ান। ঘর ভাড়া ছয় মাসের একসঙ্গে দিতে হয়—১০,০০০ ইয়ুয়ান (৪৮০০ ইয়ুয়ানে এক টাকা, এই মতে হিসাব কষে নিন)। মাইনে-পত্রের ঝামেলা নেই, পাঠ্যবইও মুফতে পাওয়া যায়। এ দায় সরকার ঘাড় পেতে নিয়েছেন। শিক্ষালাভ করতে চায়—সে বাবদে আবার গাঁটের পয়সা খরচ করবে, এ কেমন কথা ! গরিব বলে দরখাস্ত ছাড়লে খাইখরচাও মকুব হয়ে যায়, সরকার সেটা দিয়ে দেন স্কলারশিপ হিসাবে।

ইস্কুল আটটা-পাঁচটায়—মাঝে দু-ঘণ্টা, বারোটা থেকে দুটো, নাওয়া-খাওয়ার ফাঁক। তিন ঘণ্টা পড়াতে হয় মাষ্টার মশায়দের। বাকিটা অবসর। তা-ও ঠিক নয়—নিয়মিত গবেষণা ও শলা পরামর্শ হয় শিক্ষা-ব্যবস্থার যাতে উন্নতি করা যেতে পারে।

ইস্কুলটা চালু করেন কুয়োমিণ্টাং-কর্তারা। তখন ন'টা ক্লাস, সাড়ে চার শ' ছেলে। এই যে বিশাল বাড়ি দেখছেন, ১৯৫০-এর শেষাশেষি এটা তৈরি—নতুন চীনের জন্মের ঠিক এক বছর পরে। সরকার থেকে তখন ৩৫৪২ মিলিয়ন ধার দিয়েছিল আমাদের। এ বছরও তিনটে নতুন ক্লাস বেড়েছে। খেলার মাঠের ঐ দেয়ালটাও এ বছরের।

শিক্ষার কায়দাকানুনও বদলে গেছে নতুন কালে। শুধু পাণ্ডিত্য নয়—ছেলেরা যাতে স্বদেশপ্রাণ হয়, সেই শিক্ষা আমাদের। স্বদেশ-প্রেমের অঙ্গে বিশ্বপ্রাণতা শেখানো হয়—মানুষে মানুষে তফাৎ নেই, শিখছে এরা শিশু বয়স থেকে। লড়াইয়ের উপর বিষম ঘৃণা—বড় হয়ে এরা পৃথিবীর শান্তি কোন রকমে বিঘ্নিত হতে দেবে না। মাও-তুচিকে বড় ভালবাসে ছেলেরা, আপন জন মনে করে।

কেমিষ্ট্রির যন্ত্রপাতি ৩৫৪২ দফা, বায়োলজির ৯৩৭ দফা—বেশির ভাগই হালের আমদানি। এগারোটা মাইক্রোস্কোপ নতুন কেনা হয়েছে। এক্সপেরিমেণ্টের উত্তম ব্যবস্থা—ঘুরে দেখেই মালুম পাবেন। লাইব্রেরির বই আঠাশ হাজারের উপর।

শিক্ষক মশায়দের উপর সরকারের খুব নেকনজর। মাইনে গড়পড়তা ন' লক্ষ ইয়ুয়ান। সব চেয়ে বেশি যিনি পান তিনি দশ লক্ষ। সব চেয়ে কম ছ' লক্ষ ৫৫০ ক্যাটিশ চাল বা ময়দা মেলে ন-লক্ষ ইয়ুয়ানে। আগেকার দিনে মাষ্টারেরা পেতেন ২২০ ক্যাটিসের মতন। জীবনমান অতএব শতকরা পঞ্চাশ ষাটের মতন বেড়েছে। বিষম খুশি সেজন্যে তাঁরা, প্রাণ ঢেলে পড়াচ্ছেন। ছাত্র-শিক্ষকে ভারি ভাব। ছেলেদের পড়াশুনোর চাড় অত্যন্ত বেড়ে গেছে। আগেকার দিনে ইস্কুলের চার দেয়ালের মধ্যে যাবতীয় পড়াশুনো, ছেলেদের নিয়ে দেশময় দেদার ঘোরাঘুরি এখন।

ল্যাবরেটারিতে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে সত্যি আমরা তাজ্জব। এই তো এক ইস্কুল—দশ-বারো-চোদ্দ বয়সের ছেলেরা। সেই বালখিল্যমণ্ডলীর গবেষণার বাহার দেখুন একবার! ভারিক্কি চাল—এটা ঢালছে, ওটা মাপছে। তাকিয়ে হেসে পড়ছে আমাদের দিকে, আবার তখনই ঘাড় ফিরিয়ে নিজের কাজে লাগছে। তিলেক অপব্যয়ের সময় নেই। লম্বা টেবিলের দুই প্রান্তে দুটো করে মাইক্রোস্কোপ। চোঙায় একবার করে চোখ দিচ্ছে, আর কাগজে আঁকছে যা আসছে চোখের নজরে···

তার পরে ছুটির ঘণ্টা বাজল। ওদের সঙ্গে আমরাও ছুটে এলাম খেলার মাঠে। নানান দল করে খেলছে, খেলাই বা কত রকমের! নাচ হচ্ছে, গান হচ্ছে—নাচে-গানে মিলিয়ে আধেক তাণ্ডব গোছের খেলা। দেবশিশুর মতো একটা ছেলে তার নিজের হাতে-আঁকা ছবি দিল আমাকে। আর বুকের ব্যাজ খুলে আমার জামায় পরিয়ে দিল। ছেলেটার নাম নিয়ে এসেছি—চাও-উই-সিয়ান (Chao-Wei-Hsian)। আর কি জানি তার, শুধু এই নামটুকুই। চেয়ে দেখি, আর তিন জনকেও অমনি ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছে। ইস্কুলের ব্যাজ—ছাত্ররাই শুধু পরতে পারে। কি করব বলুন—আপনাদের কাছে এত গণ্যমান্য হয়েও বিদেশ-বিভুঁয়ে এক মিডল ইস্কুলের পড়ুয়া হয়ে যেতে হল। [ক্রমশঃ।

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে পূর্ব্ব-পাকিস্থান, অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য দৃশ্যের আলোকচিত্র প্রকাশ করা হল। আলোকচিত্রী আমানুল হক।

নাচ-গান-বাজনা

ভারতবর্ষের লোক-নৃত্য

অজয়কুমার গুপ্ত

বিশাল এই ভারতভূমির পর্বতে, কান্তারে, শ্যামল বনানীর অন্তরালে, পল্লীর ছায়ায় যে অনাবিল বিচিত্র জীবনস্রোত বহিতেছে এবং তাহা হইতে সঞ্জাত সমাজ-জীবনের আনন্দ-হিল্লোল, তার মূর্ত্ত প্রতীক—অনেক রকমের লোক-নৃত্য প্রচলিত, তাহার কতটুকু আমরা সহরবাসী খবর রাখি?

গত বৎসর এবং এই বৎসর, রাজধানী দিল্লীর প্রজাতন্ত্র দিবসে উৎসবের বিশেষ অঙ্গস্বরূপ National Stadium-এ ১৬টি প্রদেশের রঙ্গীন লোক-নৃত্যের অনুষ্ঠান ভারতের বিচিত্র ও বিপুল সম্পদের ইঙ্গিত দিয়ে গেলো। দর্শক-জনসাধারণ, দেশ-বিদেশের রাজদূতগণ, দেশের মন্ত্রী ও নেতারা এই নৃত্যের আস্বাদনে মন্ত্রমুগ্ধ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বোধ হয় এই প্রথম গত বৎসর হইতে বিভিন্ন রাজ্যের লোক-নৃত্যের সম্মিলিত অনুষ্ঠান হইতেছে। এই সম্মেলনের ভিতর দিয়া "পল্লী ভারতের" দূর-দূরান্তরের সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র প্রবল বেগে নগরবাসী ও বিদেশীর সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। এইরূপ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা খুব সম্ভব শ্রীজহরলাল নেহেরু। এই বৎসরের লোক-নৃত্য অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে আশীর্বাণীতে তিনি জানাইয়াছেন যে, প্রতি বৎসর প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লীতে সম্মিলিত লোক-নৃত্য অনুষ্ঠান করা স্থির হইয়াছে এবং লোক-নৃত্য-শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে। তিনি আশা করেন লোক-নৃত্যের প্রসার হইবে। "...it was decided to continue it year after year, and to start institutes for training in such dancing. Some beginnings have already been made and I hope that this folk-dancing will grow and flourish.)"। টিকিট-বিক্রয়-লব্ধ টাকা প্রধান মন্ত্রীর সাহায্য-ভাণ্ডারে দেওয়া হইয়াছে।

এই বৎসরই সর্বপ্রথম লোক-নৃত্যে সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য প্রধান মন্ত্রী নেহেরুজী চাম্বা হইতে আগত এক দল নর্তক-নর্তকীদের "সঙ্গীত-নাটক-একাডেমী-ট্রফি" প্রদান করেন। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান মন্ত্রী মন্তব্য করেন যে, দেশের প্রকৃত উন্নতির জন্য সাধারণ লোকের জীবনে সংস্কৃতিমূলক কার্য্যকলাপের একান্ত প্রয়োজন। তাঁহার মতে যাহারা সর্বদাই চিন্তান্বিত ও

বোম্বের (গোয়া) নর্তকী

গম্ভীর, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা সঙ্গীত ও নৃত্য করে, তাহারা তাহাদের কর্তব্য সুষ্ঠু ভাবে পালন করে।

দেশের বিভিন্ন অংশে যে লোক-নৃত্য ও উপজাতীয় নৃত্য প্রচলিত আছে, তাহাকে উৎসাহ দান ও রাজধানীর অধিবাসী ও বিদেশীদের ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সম্পদ দেখানোই প্রজাতন্ত্র দিবসের এই নৃত্য-উৎসবের আয়োজন করার মূল উদ্দেশ্য।

ইহা ছাড়া দলে দলে বিভিন্ন রাজ্যের নর্তক-নর্তকীরা, সংখ্যায় প্রায় এক হাজার হইবে, সাময়িক কাল তালকাঠোরা গার্ডেনে

বোম্বের (গোয়া) মাছুয়া নৃত্য

আসাম-মণিপুরের কেলী-গোপাল নৃত্য

পাশাপাশি শিবিরে বসবাস করে, নাচের মহড়া দিয়া যে অনুষ্ঠানে অবতীর্ণ হয়, তাহাতে তাহারা নিজেদের পরস্পরের মধ্যে ভাবের ও নৃত্য-কৌশলের আদান-প্রদান করিবার সুযোগ পায়। ইহাতে প্রত্যেক লোক-নৃত্যই ভবিষ্যতে উন্নততর হইবে আশা করা যায়। গত বৎসরের প্রজাতন্ত্র দিবসে আসাম, বিহার, বোম্বে, হিমাচল প্রদেশ, হায়দরাবাদ, মধ্যপ্রদেশ, মণিপুর, উড়িষ্যা, পেপস্‌-পাঞ্জাব, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের লোক-নৃত্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া উপরিউক্ত

পাঞ্জাবের ভাঙ্গরা নৃত্য

অন্যান্য সকল প্রদেশের নতুন নতুন লোক-নৃত্য মঞ্চস্থ হয়। আজমীর রাজ্যের লোক-নৃত্য অনুষ্ঠানে এই বার প্রথম যোগ দেয়।

National Stadiumএর ময়দানের কেন্দ্রস্থলে, উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে, Flood lightএর মধ্যে প্রদেশের পর প্রদেশ নর্ত্তক-নর্ত্তকীরা যখন নানান বেশবাসে, বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র সহকারে অজানা ভাষায় গান ও ছন্দে নেচে নেচে অন্ধকারে মিলাইয়া গেলো, তখন চারি দিকের গ্যালারীর দর্শকমণ্ডলীর মনেও জীবনের ছন্দ না জাগাইয়া পারে নাই। এমন আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের মধ্যেও একটি অভাব বরাবর থাকিয়া যায়—প্রাকৃতিক পরিবেশ। যেমন "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে," সেই মত এই সব বিভিন্ন লোক-নৃত্যগুলি নিজ নিজ প্রাকৃতিক পরিবেশে না জানি আরও কত জীবন্ত সুন্দর! এই সব নাচগুলি নিজ নিজ পরিবেশে Technicolour documentary ছবি তুলিয়া রাখা উচিত। সেই চলচ্চিত্র নৃত্য-শিল্পীদের এক অমূল্য সম্পদ হইবে। আর দেশে-বিদেশের রসিক জনের কাছে সমাদৃত হইবে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

লোক-নৃত্যের উৎসই হইল তাহার সামাজিক জীবন এবং প্রাকৃতিক আবেষ্টনী। তাই লোক-নৃত্যের মাধ্যমে সেই সমাজের হৃদয়-বৃত্তি, চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের পরিচয় পাওয়া যায়। পশ্চিম-বাংলার পেলব আবহাওয়া হইতে আগত সাঁওতাল-সাঁওতালীর গুলারিয়া বা ভাগওয়া নাচ ও গানের মধ্যে স্বচ্ছন্দ, সরল ও মৃদু ভাবটিই প্রকাশিত হয়। কিন্তু আসামের খামা-নাগা নৃত্যের সাজ-সজ্জা ও উল্লাসের চীৎকার সীমান্তের পার্ব্বত্য জাতির যোদ্ধা প্রকৃতির পরিচয় দেয়। এই নৃত্যের শিরস্ত্রাণে এক-একটি পালক একটি শত্রুর ছিন্ন মুণ্ডের নিদর্শন। গত বৎসর হায়দরাবাদ হইতে আগত সিদ্দি নর্ত্তকরা, তাহাদের আফ্রিকার পূর্ব্বপুরুষের আকৃতি-প্রকৃতি, নাচ ও গানের রীতি বহন করিতেছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মোগল বাদশা সিদ্দিদের আফ্রিকা হইতে হায়দরাবাদে আনিয়াছিলেন। মোগল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেলে, নিজাম তাহার আফ্রিকান দেহরক্ষী হিসাবে ইহাদের রাখেন। আর এই বৎসর হায়দরাবাদের নর্ত্তকীদের দলটি—পোষাকে রঙের প্লাবন, মাথায় কলসী লইয়া লাম্বাড়ি-নৃত্যে—পল্লীবালাদের কূয়া হইতে জল লইয়া ফিরিবার দৃশ্যই প্রস্ফুটিত করে। আবার সৌরাষ্ট্রের দণ্ডীরাস নৃত্যে বা সমুদ্রতীরের জেলেদের পধার নৃত্যে সাগরের ঢেউয়ের মতই দামাল অঙ্গচালনা দৃষ্ট হয়। এই বৎসরে বোম্বের দফারি মালহারি নৃত্যে বা "নারিকেল দিবস নৃত্যে" (Coconut Day Dance) সমুদ্রতীরের জীবনের ছবিই প্রকট। বিষ্ণুভক্ত মণিপুরের "কেলী-গোপাল (কৃষ্ণলীলা) নৃত্যে তাই দেখি সেই মধুর ভাবসম্পদ্। শৌর্য্য-বীর্য্যের দেশ পাঞ্জাবের ভাঙরা নাচেও তাই বলিষ্ঠতার নিদর্শন প্রতিফলিত হইতেছে। তেমনি হিমাচল প্রদেশের গদ্দি নাচ, চাম্বা নাচ যাহা এই বৎসরের শ্রেষ্ঠ নাচ বলিয়া পুরস্কৃত হইয়াছে, রাজস্থানের গোমার, গৌরি বা দানণ্ডী নাচ, বিহারের হো-মাগে, কারোয়া, লুরি-সৌরে নাচ, উড়িষ্যার কোয়া বা কিরাত-অর্জ্জুন নাচ প্রভৃতিতে নিজ নিজ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মিলে।

মাইক মায়ীকি জয়!

আজকের দিনে সর্বজনীন পূজামণ্ডপ থেকে গৃহস্থজনের গৃহে গৃহে মিষ্টান্ন পরিবেশন সম্ভব হয় না, তাই তুধের বদলে ঘোলের ব্যবস্থা হিসাবে সঙ্গীত পরিবেশিত হয় জনসাধারণের আনন্দ বিধানার্থে। প্রতিমা, আলোকসজ্জা, প্যাণ্ডেল, গেট, প্রদর্শনী ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে আজকের পুজোয় মাইকও তাই একটি অপরিহার্য বস্তু। আমরা চীৎকার করে গান শোনাতে ভুলে গেছি। আজকের গায়কেরা ক্ষীণকণ্ঠ লালিমা পাল (পুং) মার্কা প্রায়ই। অতএব আনো মাইক। বাজাও গ্রামোফোন। লাগাও স্পীকার। গান দাও, 'ত্রিনয়নী দুর্গা'। একটা জিনিস এবার আমরা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, 'আয়েগা,' 'রাজা কি আয়েগি বরাত' কি 'বাবুজী ধীরে চলনা'র চেয়ে মাইকওয়ালাদের বেশী নজর গেছে 'ত্রিনয়নী দুর্গা'র দিকে। 'এই যমুনার তীরে'ও বাদ যায়নি। মাইকের সম্বন্ধে কড়াকড়ি যথাযথ ভাবে অধিকাংশ স্থানেই প্রতিপালিত হয়নি অথচ সে কারণে শাসকবর্গের কাছ থেকে কোন হস্তক্ষেপের কথাও আমরা জানতে পারিনি। 'ত্রিনয়নী দুর্গা' গান বাজানো হলেও অধিকাংশ প্রতিমাতেই কিন্তু তৃতীয় নেত্রটি নেই-ই। আমাদের নিবেদন মাইকবাজিয়েদের প্রতি, তাঁদের তৃতীয় নেত্র অর্থাৎ জ্ঞান-নেত্র খুলবে কবে? নাগরিকতা বোধ জাগ্রত হবেই বা কখন?

আধুনিক সঙ্গীত কোন্ অর্থে আধুনিক?

আধুনিক সঙ্গীত কা'কে বলে আর কা'কে বলে না, সে সম্পর্কে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম আছে কি? না সে নিয়ম মেনে চলেন কেউ? আধুনিক সঙ্গীত মানে সাধারণ শ্রোতাদের প্রায়ই ধারণা, কয়েক জন বিশেষ বিশেষ গাইয়ে এবং লালিমা পাল (পুং) মার্কা গলায় ইনিয়ে বিনিয়ে, 'যদি না মিটাতে পারি ভালবাসিবার সাধ, নিও না গো অপরাধ' কিংবা 'ছিল কি না ছিল চাঁদ দেখি নাই গগনে, আহা: দেখা হল কোন লগনে' মার্কা গান। কিন্তু এই আধুনিক সঙ্গীত কোন্ অর্থে আধুনিক? ভাবে? ভাষায়? সুরের মনোহারিত্বে? না শুধু প্রেম নিবেদনের ভঙ্গিমায় বা বিরহ জানানোর অছিলায়? সাত বছর আগে মরে-যাওয়া কোনও প্রিয়ার প্রতি বিরহ-বোধক সঙ্গীত না শ্বশুরঘর করে ফিরে আসার কালে বাপের বাড়ীর জন্য আনন্দোচ্ছ্বাস? কী এ? সত্বর এই আধুনিক সঙ্গীত কথাটির সংজ্ঞা নির্ধারিত হোক! নচেৎ রেমো, শেমো সকলেই আজ যে আধুনিক সঙ্গীত গাইয়েদের পর্যায়ে উঠে পড়েছেন তাঁদেরই রামরাজত্ব চলতে থাকবে।

রবিবারের অনুরোধের আসর রেডিওতে

'অনুরোধের আসরে আপনাদেরই পছন্দ মত গানের রেকর্ড বাজিয়ে শোনান হচ্ছে।' এ ঘোষণাটি শনিবার আর রবিবার একটা বেজে চল্লিশ মিনিট থেকে দুটো বেজে ত্রিশ মিনিট অবধি আপনি বেশ কয়েক বারই শোনেন, তাই না? খুব ভাল কথা। কিন্তু এই অনুরোধ কে করেন? তাঁদের নাম-ধাম জানতে পারেন আপনি? পারেন না। পারবেনই বা কি করে? নাম তো বলা হয় না। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছেন কি কখনো, যাঁরা এই সব অনুরোধ করেন তাঁরা সব সময় সৎ উদ্দেশ্যেই অনুরোধ না করতেও পারেন? কোন গায়কই হয়ত নিজের রেকর্ড বেশী বিক্রি করার আশায় চেনা-শোনা, আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছেন, কখন বা বেনামীতে বাজে ঠিকানা দেখিয়ে রাশি রাশি চিঠি পাঠিয়েছেন এমনও হওয়া বিচিত্র নয়। বক্তৃতা যেদিন হওয়ার কথা ছিল সেদিন কোনও কারণে হয়নি অথচ রেডিও-ষ্টেশন সেই বক্তার না করা বক্তৃতাটির সুখ্যাতি করে চিঠি এসেছে, এমন ঘটনাও আমরা শুনেছি। অনুরোধের আসরে শচীন গুপ্ত, শচীন দেববর্মণ, জগন্ময় মিত্র, বেচু দত্ত প্রভৃতি কয়েক জনের গান যত বেশী বাজানো হয় তত বেশী তো আর কারোর বেলায় বাজে না? মন্তব্য না করেই বলছি, অল ইণ্ডিয়া রেডিও কলকাতা ষ্টেশন এদিকে একটু নজর দেবেন কি?

কলকাতায় আসন্ন সঙ্গীত-সম্মেলন

শীতের হাওয়া এখনও বইতে শুরু করেনি কিন্তু সঙ্গীত-সম্মেলনের মহড়া ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। প্রাথমিক কাজ-কর্ম অর্থাৎ সম্মেলনের স্থান নির্বাচন, আর্টিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ, তারিখ নির্ণয় ইত্যাদি আরম্ভ হয়েছে। সদারঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলন হয়ে গেল মোটামুটি ঘটা করেই। তানসেন সঙ্গীত-সম্মেলন তারিখ ও স্থান এবং সম্ভাব্য শিল্পীদের নামের তালিকা ঘোষণা করেছেন। অতি উত্তম। শীতের বাজারে গানের আসর জমানোতে কলকাতার সঙ্গীত-রসিক-সমাজ

গত কয়েক বছর ধরে অফুরন্ত আনন্দ পেয়েছে বাইরের বহু গুণিজনের স্পর্শে। ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের প্রতি সাধারণ মানুষ প্রসন্ন হয়েছে একটু। এবারের সম্মেলনগুলির কর্তৃপক্ষ যেন গত বারের ভুল-ত্রুটির পুনরাবৃত্তি না করেন। গত বারে যেমন বহু গায়ক বা বাদক ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নিয়েছেন অথচ এ্যাডজাষ্টমেণ্টের অভাবে অনেক ভাল গায়কেরই রাত্রের শেষ দিকে অল্পে কাজ সারতে হয়েছে; এবারে তেমনটি যেন না হয়। বাংলা দেশের গায়কদের উপর যেন কোন অবিচার না করা হয় এবং জনসাধারণের সুবিধার্থে প্রবেশ-দক্ষিণা কিছু অল্প করেন।

যন্ত্রসঙ্গীতের রেকর্ড, শুধু গানের রেকর্ড নয়

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস, কলম্বিয়া, সেনোলা ইত্যাদি দেশী বিদেশী অনেকগুলি গ্রামোফোন রেকর্ড তৈয়ারীর কারখানা এদেশে রয়েছে এবং বহু দিন ধরে এদের মধ্যে অনেকেই সুনামের সঙ্গে কাজ করেও যাচ্ছেন। কিন্তু এত দিন অবধি এঁদের নজর ছিল শুধু মাত্র কণ্ঠ-সঙ্গীতের রেকর্ডিং করার দিকেই। সম্প্রতি এঁরা কেউ কেউ শুধু কণ্ঠসঙ্গীতই নয় যন্ত্রসঙ্গীতের রেকর্ড করানোর ব্যাপারেও মনোনিবেশ করেছেন। অবশ্য খুব দোষ এঁদেরও নেই। এত দিন জনসাধারণের মধ্যেও যন্ত্রসঙ্গীতের চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম ছিল। ফলে এঁরা কমার্শিয়াল পয়েণ্ট অব্ ভিউ থেকে এত দিন যন্ত্রসঙ্গীতের কোনও রেকর্ড করাননি। এখন ওস্তাদ আলি আকবরের স্বরোদ কি রবিশঙ্করের সেতার বাজনার রেকর্ড আপনি বাজারে অনায়াসে পেতে পারেন। আমাদের আশা আছে, যন্ত্রসঙ্গীতের রেকর্ড করানোর ব্যাপারে গ্রামোফোন কোম্পানীগুলি আরও অধিক অগ্রসর হবেন এবং ঢোল, বীণা, তবলা, খোল, পাখোয়াজ, গীটার, জলতরঙ্গ ইত্যাদি বাজিয়েদের রেকর্ডও বাজারে শীঘ্রই দেখা যাবে।

রেডিও-মাস, বাঙলা দেশে

অক্টোবরের শুরু থেকে সারা অবধি অল ইণ্ডিয়া রেডিওর রেডিও-মাস। অর্থাৎ রেডিওকে অধিকতর ভাবে জনপ্রিয় করে তোলবার জন্যে এ ব্যবস্থা। খুব ভাল কথা সন্দেহ নেই। অক্টোবর মাসে রেডিও কিনলে এ বছরের লাইসেন্স-ফি দেবেন রেডিওডিলার। এরিয়ালের দাম লাগবে না। সবই তো হল। সহরের লোকেরা রেডিওর গুণপণা সম্বন্ধে কম ওয়াকিবহাল নন। কিন্তু যেখানে একখানি মাত্র ঘরে এক ডজন লোককে গুঁতাগুঁতি করে শুয়ে রাত কাটাতে হয়, সারাদিন টো টো করে পার্কে, রাস্তায় গরমের জন্য ঘুরে বেড়াতে হয়, সিনেমা দেখে সময় কাটাতে হয়, সে-দেশে রেডিও তো একটা বিলাস মাত্র। শিক্ষা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, আহার-বাসস্থানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, রোজগার ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত না হলে রেডিও-মাসই করুন আর রেডিও-বৎসরই করুন, কোন ফল হবে না। রেডিও-মাসে অনেক বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রেখেছেন কর্তৃপক্ষ, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বাঁকুড়া, বীরভূম, নদীয়া, মেদিনীপুর, হুগলী ইত্যাদি জেলার অন্তর্বর্তী গ্রামসমূহে ভ্যান নিয়ে নিয়ে প্রচারের কতখানি বন্দোবস্ত হয়েছে? সস্তায় বা ইনষ্টলমেণ্টে রেডিও দেবেন কি? স্কুল, লাইব্রেরী, হাসপাতাল ইত্যাদিতে বিনামূল্যে ক'টি সেট দেবেন এ মাসে বেতার কর্তৃপক্ষ? এ না হলে সকলই বিফল হল।

H. M. V., Columbia Strike মিটিয়ে নিন

পূজোর বাজার বিশেষ করে বাংলা দেশে কেনা-বেচার একটা মরশুম। পল্লীগ্রাম এবং সহরতলী অঞ্চলে রেডিওর আধিপত্য অপেক্ষাকৃত কম। তাই গ্রামোফোনের কদর সেখানে বেশী। সহরেরও এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা গ্রামোফোন বাজাতে ভালবাসেন। এইচ-এম-ভি কি কলম্বিয়া কোম্পানীর রেকর্ড পূজোর বাজারে সবলেই দু-একখানি করে কিনে নিয়ে সহরের কাজ-কর্ম মিটিয়ে মফঃস্বলের গৃহে যান। এবারে ষ্ট্রাইক থাকায় বাজারে এরা কোন নতুন রেকর্ড দিতে পারছেন না। ফলে ক্ষতি হচ্ছে সব চেয়ে বেশী ছোট ছোট দোকানদারদের। এই মরশুমে রেকর্ডের কেনা বেচা প্রায় কিছুই হল না তাঁদের। সামনে কালীপূজো আছে। সুরু হয়ে গেছে রেডিও-মাসও। এটিও রেকর্ড কেনা-বেচার একটি বিশেষ শুভ মুহূর্ত। এ সময়ে আমাদের বক্তব্য (এইচ-এম-ভি ও কলম্বিয়ার কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের কাছে) ষ্ট্রাইক মিটিয়ে নিন। ব্যবসা খারাপ হলে উভয়কেই তার জন্য ভুগতে হবে। সময়ে সাবধান হন। আমাদের দুঃখু এই যে, রেডিও-মাস এবং শারদীয়া পূজায় কিছু বিক্রী পেলেন না কোম্পানী।

আপনি কি জানেন ?

১। পালি ভাষা বাঙলা ভাষার সহোদরা। কোন্ বাঙলা শব্দ থেকে পালি শব্দের উৎপত্তি ?

২। বৌদ্ধ মঠের নাম সংঘারাম কেন ?

৩। "চিকিৎসাই আমাদের জাতীয় বিদ্যা; যেমন গায়ত্রী-হীন ব্রাহ্মণ, যুদ্ধবিমুখ ক্ষত্রিয়, আয়ুর্বেদবিহীন বৈদ্যও তদ্রূপ জঘন্য।" কে বলেছিলেন ?

[উত্তর ১০১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

১০০৫

৫

পল বিজ্ঞ কণ্ঠে বললে, 'কলম্বো থেকে আদন বন্দর ২০৮২ মাইল রাস্তা। জাহাজে ছ' দিন লাগে। মাঝখানে দ্বীপ-টীপ নেই, অন্ততঃ আমার ম্যাপে নেই। তবে আদনের ঠিক আগেই সোকোত্রা দ্বীপ। সেটা হয়ত দেখতে পাবো।'

আমি বললুম, 'যদি রাত্রিবেলা ঐ জায়গা দিয়ে যাই তবে দেখবে কি করে? আর দিনের বেলা হলেও অতখানি পাশ দিয়ে বোধ হয় জাহাজ যাবে না। তার কারণ, বড় বড় দ্বীপের আশ-পাশে বিস্তর ছোট ছোট দ্বীপও জলের তলায় মাথা ডুবিয়ে শুয়ে থাকে। এর কোনটার সঙ্গে জাহাজ যদি ধাক্কা খায় তবে আর আমরা সামনের দিকে এগবো না— এগিয়ে যাবো তলার দিকে।'

এদিকে কথা বলে যাচ্ছি, ওদিকে আমার বার বার মনে হতে লাগলো, সোকোত্রা নামটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। হঠাৎ আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমার বাবার মাসী, মেসোমশাই তাঁদের দুই ছেলেকে নিয়ে গত শতকের শেষের দিকে মক্কায় হজ করতে গিয়েছিলেন এবং আমার খুব ছেলেবেলায় তাঁর কাছ থেকে সে ভ্রমণের অনেক গল্প আমি শুনেছিলুম। আমার এই দাদীটি ছিলেন গল্প বলার ভারী ওস্তাদ। রাত্রির রান্না না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি আমাদের গল্প বলে বলে দিব্য জাগিয়ে রাখতে পারতেন এবং যেই চাচীরা খবর দিতেন, রান্না তৈরী, অমনি তিনি বেশ কায়দা করে গল্পটা শেষ করে দিতে পারতেন। আমরা টেরই পেতুম না, দাদী তার গল্প আচমকা শেষ করে দিয়ে আমাদের সামনে একটা ল্যাজ-কাটা হনুমান রেখে চলে গেলেন। আমাদের মনে হত গল্পটা যেন একটা আস্ত ডানা-কাটা পরী।

সেই দাদীর মুখে শুনেছিলুম, সোকোত্রার কাছে এসে নাকি যাত্রীদের মুখ শুকিয়ে যেত। জলের স্রোতের তোড়ে আর পাগলা হাওয়ার থাবড়ায় জাহাজ নাকি হুড়মুড়িয়ে গিয়ে পড়তো কোনো একটা ডুবন্ত দ্বীপের ঘাড়ে আর হয়ে যেত হাজারো টুকরোয় খান্ খান্। কেউ বা জাহাজের তক্তা, কেউ বা ডুবন্ত দ্বীপের শ্যাওলা-মাখানো [illegible] প্রাণপণ চিৎকার করত 'বাঁচাও, বাঁচাও,' কিন্তু কে বাঁচায় কাকে, কোথায় আলো, কোথায় তীর! ক্রমে ক্রমে তাদের হাতের মুঠি শিথিল হয়ে আসতো, একে একে জলের তলে লীন হয়ে যেত।

দাদী যে ভাবে বর্ণনা দিয়ে যেতেন, তাতে আমি সব-কিছু ভুলে দুশ্চিন্তায় আকুল হয়ে উঠতুম, দাদী বাঁচলেন না, দাদীও ডুবে গেলেন। মনেই থাকত না, জলজ্যান্ত দাদী আমাকে কোলে বসিয়ে গল্প বলছেন। শেষটায় বলতেন, 'আমাদের জাহাজের কিছু হয়নি, এ সব ঘটেছিল অন্য জাহাজে। সে জাহাজ করে গিয়েছিলেন তোর বন্ধু ময়না মিয়ার ঠাকুদা। জানিস তো, তিনি আর ফেরেননি। খুদা তালা তাকে বেহেস্তে নিয়ে গিয়েছেন। মক্কার হজের পথে কেউ যদি মারা যায় তবে তার আর পাপ-পুণ্যের বিচার হয় না, সে সোজা স্বর্গে চলে যায়।'

দাদী এ রকম গল্প বলে যেতেন অনেকক্ষণ ধরে আর একই গল্প বলতে পারতেন বহু বার। প্রতি বারেই মনে হত চেনা গল্প অচেনারূপে দেখছি। কিম্বা বলতে পারো, দাদী বাড়ীর রাঙা বৌদিকে কখনো দেখছি রাস-মণ্ডল শাড়ীতে, কখনো বুলবুল চশমে। (হায়, এ সব সুন্দর সুন্দর শাড়ী আজ গেল কোথায়!)

দাদীর গল্পের কথা আজ যখন ভাবি তখন মনে হয় দাদী তার বর্ণনাতে আরব্য উপন্যাসের সাহায্য বেশ কিছু নিতেন। আরব্য উপন্যাসের রকম-বেরকমের গল্পের মধ্যে সমুদ্র-যাত্রা, জাহাজডুবী, অচেনা দেশ, অজানা দ্বীপ সম্বন্ধে গল্প বিস্তর। সিন্দবাদ নাবিকের গল্প পড়ে মনে হয়, জলের পীর বদর সাহেব যেন আইন বানিয়ে দিয়েছিলেন, যে জাহাজ ডুববে সেটাতেই যেন সিন্দবাদ থাকে। বেচারী সিন্দবাদ!

আরব্য উপন্যাসে যে এত সমুদ্র-যাত্রার গল্প, তার প্রধান কারণ,আরবরা এক কালে সমুদ্রের রাজা ছিল—আজ যে রকম মার্কিন-ইংরেজের জাহাজ পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে দেখা যায়। তার কারণ বুঝতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না। আরব দেশের তিন দিকে সমুদ্র, তাই আরবরা সমুদ্রকে ডরায় না, আমরা যে রকম পদ্মা মেঘনাকে ডরাইনে, যদিও পশ্চিমারা গোয়ালন্দের পদ্মা দেখে হনুমানজীর নাম স্মরণ করতে থাকে। আরবদের পূর্বে ছিল রোমানরা দরিয়ার বাদশা—আরবরা তাদের যুদ্ধে হারিয়ে ক্রমে ক্রমে তাদেরই মত অবাধে অনায়াসে সমুদ্রে যাতায়াত আরম্ভ করল। ম্যাপে দেখতে পাবে, মক্কা সমুদ্র থেকে বেশী দূরে নয়। আরবরা তখন লাল দরিয়া পেরিয়ে মৌসুমী হাওয়ায় ভর করে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা জুড়লো।

এ সব কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ আবার সোকোত্রার কথা মনে পড়ে গেল। দাদীমার সোকোত্রা স্মরণ করিয়ে দিল গ্রীকদের দেওয়া সোকোত্রার নাম 'দিয়োসকরিজম্' সঙ্গে সঙ্গে হুশ হুশ করে মনে পড়ে গেল যে পণ্ডিতেরা বলেন

সৈয়দ মুজতবা আলি

এই 'দিয়োসকরিজম্' নাম এসেছে সংস্কৃত 'দ্বীপ সুখাধার' থেকে। আরবরা যখন এই দ্বীপে প্রথম নামলো তখন ভারতীয় বোম্বেটেদের সঙ্গে এদের লাগলো ঝগড়া। সে ঝগড়া কত দিন ধরে চলেছিল বলা শক্ত, কারণ আমাদের সমাজ-পতিরা তখন সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে কড়া কড়া আইন জারী করতে আরম্ভ করেছেন। আমার মনে হয়, এদেশ থেকে কোনো সাহায্য না পাওয়াতে এরা ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে যায়, কিম্বা ঐ দেশের লোকের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক হয়ে যায়—যে রকম শ্যাম, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে বহু-শতাব্দীর আদান-প্রদানের পর এক দিন আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। খুব সম্ভব ঐ সমুদ্র-যাত্রা নিষেধ করারই ফলে। ভারতীয়েরা কিন্তু সোকোত্রায় তাদের একটি চিহ্ন রেখে গিয়েছে; সোকোত্রার গাই-গোরু জাতে সিন্ধী দেশের। আশ্চর্য, সভ্যতার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কিন্তু তার পোষা গোরু ঘোড়া শতাব্দীর পর শতাব্দী বেঁচে থেকে তার প্রভুর কথা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মোগল-পাঠানের রাজত্ব ভারতবর্ষ থেকে কবে লোপ পেয়ে গিয়েছে কিন্তু তাদের আনা গোলাপ ফুল আমাদের বাগানে আরো কত শত বৎসর রাজত্ব করবে কে জানে!

আমি চোখ বন্ধ করে আত্মচিন্তায় মগ্ন হলেই পল পার্সি আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে অন্য কিছু একটায় লেগে যেত। আমি তাদের সন্ধানে বেরিয়ে দেখি, তারা লাউঞ্জে বসে চিঠি লিখছে। আমাকে দেখে পার্সি শুধালে, 'জাহাজে যে ফরাসী ডাক-টিকিট পাওয়া যায় তাই দিয়ে এ চিঠি চীন দেশে যাবে তো?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়। এমন কি জিবুটি বন্দরের ডাক-ঘরেও যদি ছাড়ো তবু যাবে। কারণ জিবুটি বন্দর ফরাসীদের। কিন্তু যদি পোর্টসঈদ বন্দরে ছাড়ো তবে সে টিকিট মিশর দেশে বাতিল বলে চিঠিখানা যাবে বেয়ারিং পোস্টে।'

'কিন্তু যদি পোর্টসঈদে পৌঁছে জাহাজের লেটার-বক্সে ছাড়ি?'

'তা হলে ঠিক।'

আমি বললুম, 'হুঁ। তবে বন্দরে নেমে মিশরী ডাক-টিকিট লাগানোই ভালো।'

'কেন, স্যর?'

আমি বললুম, 'বৎস, আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, চীন দেশে তোমার একটি ছোট বোন রয়েছে। সে নিশ্চয়ই ডাক-টিকিট জমায়। তুমি যদি বন্দরে বন্দরে ফরাসী টিকিট সাঁটো তাতে তার কি লাভ? মিশরী টিকিট পেলে সে খুশী হবে না? তাও আবার দাদার চিঠিতে!'

পার্সি আবার ভ্যাচর ভ্যাচর আরম্ভ করলে—'চুল কাটা সমস্যার সমাধান যখন আমি করে দিয়েছিলুম ঠিক সেই রকম—আমার সঙ্গে দেখা না হলে—'

আমি বললুম, 'ব্যস, ব্যস। আর শোনো, স্ট্যাম্প লাগাবার সময়, এক পয়সা, দু' পয়সা, এক আনা, দু' পয়সা করে করে চোদ্দ পয়সার টিকিট লাগাবে—ঢুম করে শুদ্ধ একটা চোদ্দ পয়সার টিকিট লাগিয়ো না। বোন তা হলে এক ধাক্কাতেই অনেকগুলো টিকিট পেয়ে যাবে।'

ততক্ষণে পল এসে আমার সঙ্গ নিয়েছে। আস্তে আস্তে শুধালো, 'সোকোত্রা দ্বীপের কথা উঠাতে আপনি কি ভাবছিলেন?'

আমি বললুম, 'অনেক কিছু।' এবং তার খানিকটে তাকে শুনিয়ে দিলুম।

পল দেখতে পার্সির মত সমস্তক্ষণ এটা-ওটা নিয়ে মেতে থাকে না। মাঝে মাঝে জাহাজের এক কোণে বসে বই-টই পড়ে। তাই খানিকক্ষণ চুপ করে আমার কথাগুলো হজম করে নিয়ে বললে, 'বিষয়টা সত্যি ভারি ইনটেরেসটিঙ্। সমুদ্রে সব প্রথম কে আধিপত্য বিস্তার করলে, তার পর কে, তারাই বা সেটা হারালো কেন, আজ যে মার্কিণ আর ইংরেজ আধিপত্য করছে সেটাই বা আর কত দিন থাকবে? এবং তার পর আধিপত্য পাবে কে?'

আমি একটু ভেবে বললুম, 'বোধ হয়, আফ্রিকার নিগ্রোরা। ফিনিশিয়ান, গ্রীক, রোমান, ভারতীয়, চীনা, আরব, পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ ইত্যাদি যাবতীয় ইয়োরোপীয় সবাই তো পালা করে রাজত্ব করলে—একমাত্র ওরাই বাদ গেছে! এখন বোধ হয় ওদের পালা। আর ম্যাপে দেখছ তো, কি বিরাট মহাদেশ, ওতে কোটি কোটি লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান স্ত্রী-পুরুষ কিলবিল করছে।'

পল বললে, 'কিন্তু ওদের বুদ্ধিশুদ্ধি?'

আমি বললুম, 'সে তো দুই পুরুষের কথা। লেগে গেলে এক শ' বছরের ভিতর একটা জাত অন্য সব কটা জাতকে হারিয়ে দিতে পারে। বরঞ্চ পুরনো সভ্য জাত যারা আধ-মরা হয়ে গিয়েছে, তাদের নূতন করে বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত করে রাজার আসনে বসানো কঠিন। এক বার ছাঁচে ঢালাই করে যে মাল তৈরী করা হয়েছে তাকে ফের পিটে-ঠুকে নূতন আকার দেওয়া কঠিন—সেই তো হচ্ছে আজকের দিনের চীনা, ভারতীয় এবং আরো মেলা প্রাচীন জাতের নূতন সমস্যা।'

পল জিজ্ঞেস করলে, 'ভারতীয়েরাও এক কালে সমুদ্রে রাজত্ব করেছে নাকি?'

আমি বললুম, 'সে-কথা আজ প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছে। কিন্তু সেজন্য তাদের দোষ দেওয়া অনুচিত। কারণ, ভারতীয়েরা নিজেই সে ইতিহাসের সন্ধান রাখে না। অথচ আমার যতদূর জানা, তাতে তারা লাল দরিয়া থেকে চীনা সমুদ্র পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে, শ্যাম, ইন্দোচীন ইন্দোনেশিয়াতে রাজত্বও করেছে। তার পর একদিন আমাদের সমাজপতিরা সমুদ্রযাত্রা বারণ করে দিলেন। খুব সম্ভব আমাদের সাম্রাজ্য বিস্তার তাঁরা পছন্দ করেননি। তাই হয়ত তাঁরা বলতে চেয়েছিলেন যে দেশ জয় করেছো তারই আর পাঁচ জনের সঙ্গে মিলে মিশে

এক হয়ে যাও, আপন দেশে ফিরে আসার কোনো প্রয়োজন নেই।'

পল বললে, 'আমার জীবনের এই ষোল বৎসর কাটলো চীনে কিন্তু ভারতের সঙ্গে চীনের কখনো কোনো যোগ হয়েছিল বলে শুনিনি। শুধু শুনেছি বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে এসেছিল। কিন্তু সে তো কটমটে ব্যাপার!'

আমি বললুম, 'অতিশয়। ও পাড়া মাড়িয়ো না। কিন্তু চীন ভারতের মধ্যে এক বার একটি ভারি চমৎকার মজাদার দোস্তী হয়েছিল। শুনবে?'

পল বললে, 'তা আর বলতে। কিন্তু পার্সিটা গেল কোথায়? কুকুর-ছানার মত ও যেন সমস্ত ক্ষণ নিজের ল্যাজ খুঁজে বেড়ায়। ওরে, ও পার্সি।'

জিরাফ-কাহিনী

দিল্লীতে যখন পাঠান-মোগল রাজত্ব করতো তখন সামান্যতম সুযোগ পেলেই বাঙলা দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার চেষ্টা করতো। বাঙলার প্রধান সুবিধে এই যে, সেখানে নদী-নালা বিল-হাওর বিস্তর এবং পাঠান-মোগলের আপন পিতৃভূমি কিম্বা দিল্লীতে ও-সব জিনিস নেই বলেই তারা যখনই বিদ্রোহ দমন করতে এসে বাঙলার জল দেখত তখনই তাদের মুখ যেত শুকিয়ে।

এই রকম একটা সুযোগ পেয়ে বাঙলার এক শাসন-কর্তা স্বাধীন হয়ে রাজা হয়ে যান। রাজাটি একটু খামখেয়ালি ছিলেন। তা না হলে কোথায় ইরাণ আর কোথায় বাঙলা দেশ! তিনি সেখানে দূত পাঠালেন বিস্তর দামী দামী সওগাত সঙ্গে দিয়ে ইরাণের সব চেয়ে সেরা কবি হাফিজকে বাঙলা দেশে নিমন্ত্রণ করার জন্য! চিঠিতে লিখলেন 'হে কবি, তোমার সুমধুর অথচ উদাত্ত কণ্ঠে তামাম ইরাণ দেশ ভরে গিয়েছে। ইরাণ ক্ষুদ্র দেশ, তোমার কণ্ঠস্ফূর্তির জন্য সেখানে আর স্থান নেই। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, এখানে এস, তোমার কণ্ঠস্বর এখানে প্রচুর জায়গা পাবে।' তার সরল অর্থ, ইরাণে আর ক'টা লোক তোমার সত্যকার কদর করতে পারবে? এ-দেশের লোকসংখ্যা প্রচুর। এইখানে চলে এস।

হাফিজের তখন বয়স হয়েছে। তাঁর বুড়ো হাড় ক'খানা তখন আর দীর্ঘ ভ্রমণ আর দীর্ঘতর প্রবাসের জন্য দেশ ছাড়তে নারাজ। তাই কবি একটি সুন্দর কবিতা লিখে না আসতে পারার জন্য বিস্তর দুঃখ প্রকাশ করলেন।

বাঙলা দেশের সরকারি দলিল-দস্তাবেজে এ ঘটনার কোনো উল্লেখ নাই। এর ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে ইরাণের খাতা পত্র থেকে।[১]

তার পর রাজার দৃষ্টি গেল সেই সুদূর চীন দেশের দিকে। কিন্তু চীন-সম্রাটকে তো আর বাঙলা দেশে নিমন্ত্রণ করা যায় না? কাজেই রাজদূতকে বহু উত্তম উত্তম উপঢৌকন দিয়ে চীনের সম্রাটকে বাঙলার রাজার আনন্দ-অভিবাদন জানালেন।

চীন-সম্রাট সুদূর বাঙলা দেশের রাজার সৌজন্য ভদ্রতার পরিচয় পেয়ে পরম আপ্যায়িত হলেন। চীন বিত্তশালী দেশ। প্রতিদানে পাঠালেন আরো বেশী মূল্যবান উপঢৌকন।

বাঙলার রাজা তখন ভাবলেন, চীনের সম্রাটকে আমি কি দিতে পারি যা তাঁর নেই। রাজদূতকে মনের কথা খুলে তার উপদেশ চাইলেন। রাজদূতটি ছিলেন অতিশয় বিচক্ষণ লোক। তিনি যখন চীনে ছিলেন তখন চীন দেশের আচার-ব্যবহার বিশ্বাস-অবিশ্বাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করেছিলেন। বললেন, 'চীনের বহু লোকের বিশ্বাস, গাছের চেয়ে উঁচু মাথাওলা যে এক পয়মন্ত প্রাণী আছে সে যদি কখনো চীন দেশে আসে তবে সে দেশের শস্য তার-ই মাথার মত উঁচু হবে।'

রাজা শুধালে, 'কি সে প্রাণী?'

রাজদূত বললেন, 'জিরাফ। আফ্রিকাতে পাওয়া যায়।'

রাজা বললেন, 'আনাও আফ্রিকা থেকে।'

যেন চাট্টিখানি কথা! কোথায় বাঙলা দেশ, আর কোথায় আফ্রিকা! আজ যে এই বিরাট বিরাট কলের জাহাজ দুনিয়ার সর্বত্র আনাগোণা করে তার-ই একটাতে জিরাফ পোরা কি সহজ! তখনকার দিনের পালের জাহাজে আফ্রিকা থেকে বাঙলা দেশ, সেখান থেকে আবার চীন—ক'মাস, কিম্বা ক'বছর লাগবে কে জানে? তত দিন তার জন্য ঐ অকূল দরিয়ায় ঘাস-পাতা পাবে কোথায়—দেখতে পাচ্ছো এই কলের জাহাজেই আমাদের শাক-সব্‌জী স্যালাড, খেতে দেয় অল্প—তার অন্যান্য তদারকি কি সহজ?

তখনকার দিনে আরব কারবারিরা আফ্রিকা, সোকোত্রা, সিংহল হয়ে বাঙলা দেশে ব্যবসা করতে যেত। রাজা হুকুম দিলেন, 'জিরাফ নিয়ে এস।'

জিরাফ এল। কি খেয়ে এল, কত দিনে এল, কিছুই বলতে পারবো না। রাজা জিরাফ দেখে ভারী খুশী। হুকুম দিলেন, 'চীন-সম্রাটকে ভেট দিয়ে এস।'

সেই চীন! জাহাজে করে! কত দিন লাগলো কে জানে!

চীন-সম্রাট সংবাদ পেয়ে যে কতখানি খুশী হয়েছিলেন তার খানিকটে কল্পনা করা যায়। তিনি হুকুম দিলেন, প্রাণীটার জন্য খুব উঁচু করে আস্তাবল বানাও।

বলা তো যায় না, তার মুণ্ডুটা মেঘে ঠেকবে, না চাঁদে ঠোক্কর লাগাবে!

দীর্ঘ ভ্রমণের পর জিরাফ যখন জিরিয়ে-জুরিয়ে তৈরী তখন শুভদিন শুভক্ষণ দেখে, চীন-সম্রাট পাত্র অমাত্য সভাসদ সহ

---

(১) এক কালে বাঙলা দেশে প্রচুর হাফিজ পড়া হত। এখনও কেউ কেউ 'নেত্র নাই বাহা হেরি বিধুর বদন, কর্ণ নাই, চাই শুনি ভ্রমর গুঞ্জন' 'সত্তাব শতক'এর বাঙলা অনুবাদে পড়ে। হাফিজের সব চেয়ে উত্তম বাঙলা অনুবাদ করেছেন, ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

শোভাযাত্রা করে জিরাফ দর্শনে বেরুলেন। সঙ্গে নিলেন, বিশেষ করে, রাজচিত্রকর এবং সভাকবি।

সম্রাট জিরাফ থেকে গভীর আনন্দ লাভ করলেন। সভাসদ ধন্য ধন্য করলেন। আপামর জনসাধারণ গভীর সন্তোষ লাভ করলো,—তাদের গুরুজন বলেছিলেন যে এ রকম অদ্ভুত প্রাণী পৃথিবীতে আছে, এবং সে এক দিন চীন দেশে আসবে, সেটা কিছু অন্যায় বলেননি। যারা সন্দেহ করতো তাদের মুণ্ডুগুলো এখন টেনেটেনে ঐ জিরাফের মুণ্ডুটার মত উঁচু করে দেওয়া উচিত।

সম্রাট চিত্রকরকে আদেশ দিলেন, 'এই শুভলগ্ন, শুভদিবস চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য তুমি এই জিরাফের একটি উত্তম চিত্র অঙ্কন করো।'

ছবি আঁকা হল।

সম্রাট কবিকে আদেশ করলেন, 'তুমি এই শুভ অনুষ্ঠানের বর্ণনা ছন্দে বেঁধে ছবিতে লিখে রাখো।'

তাই করা হল।

গল্প শেষ করে বললুম, 'সে ছবির প্রিন্ট আমি কাগজে দেখেছি।'

পল শুধালে, 'স্যর, আপনি কি চীনা ভাষা পড়তে পারেন?'

আমি বললুম, 'আদপেই না। আমার এক বন্ধু চীনা শিখেছে সে-ভাষাতে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ার জন্য। জানো তো, আমাদের বহু শাস্ত্র এ দেশে বৌদ্ধধর্ম লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু চীনা অনুবাদে এখন বেঁচে আছে। আমার বন্ধু বৌদ্ধ শাস্ত্র খুঁজতে খুঁজতে এই অদ্ভুত কাহিনীর সাক্ষাৎ পায়। তারই বাঙলা অনুবাদ করে, ছবিশুদ্ধ সেটা বাঙলা কাগজে ছাপায়। তা না হলে বাঙলা দেশের লোক কখনো এ কাহিনী জানতে পারতো না, কারণ বাঙলা দেশে এ-সম্বন্ধে কোনো ইতিহাস বা দলিল-পত্র নেই।'

পার্সি বললে, 'কিন্তু স্যর, এটা তো ইতিহাসের মত শোনালো না! এ যে গল্পকে ছাড়িয়ে যায়।'

আমি বললুম, 'কেন বৎস, তোমার মাতৃভাষাতেই তো রয়েছে, 'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান্ ফিক্‌শন্'—'সত্য ঘটনা গল্পের চেয়েও চমকপ্রদ'।

এবং আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস যে, ঘটনার বর্ণনা মানুষকে গল্পের চেয়েও বেশী সজাগ করে না তুলতে পারে, সে ঘটনার কোনো ঐতিহাসিক মূল্য নেই। কিম্বা বলবো, যে লোক ঘটনাটার বর্ণনা দিয়েছে সে সত্যকার ঐতিহাসিক নয়। আমার দেশে এ রকম কাঠখোট্টা ঐতিহাসিকই বেশী!' [ক্রমশঃ।

দস্যু অঙ্গুলিমালা

শ্রীসুলতা কর

রাজা প্রসেনজিৎ কোশল যখন শ্রাবস্তী নগরে রাজত্ব করছিলেন, সেই সময় অঙ্গুলিমালা নামে এক দুর্দ্দান্ত দস্যুর অত্যাচারে প্রজাদের জীবন ও ধনসম্পত্তি বিপন্ন হয়ে উঠেছিল! এই নিষ্ঠুর দস্যু নির্ম্মম ভাবে নরহত্যা ও লুণ্ঠন করে চলছিল। তার নির্ম্মম হত্যালীলায় গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ছিল, শহরের পর শহর শ্মশানে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল। অসংখ্য নরহত্যা করে সে তাদের প্রত্যেকের আঙ্গুল কেটে নিত, সেই আঙ্গুলের মালা তৈরী করে নিজের গলায় পরে সগর্ব্বে ঘুরে বেড়াত। এজন্য তার নাম হয়েছিল দস্যু অঙ্গুলিমালা। বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সবাই তার নাম শুনলে ভয়ে কেঁপে উঠত।

এই সময় বুদ্ধদেব শ্রাবস্তী নগরে জেতবনে ভিক্ষু অনাথপিণ্ডদের উদ্যান-ভবনে এসে বাস করছিলেন, আর জনগণকে ধর্ম্মের উপদেশ শোনাচ্ছিলেন। এক সন্ধ্যায় বুদ্ধদেব গৈরিক বসন পরে, ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে শ্রাবস্তী নগরের রাজপথে বার হলেন। কিছুক্ষণ চলবার পর তিনি রাজপথ পরিত্যাগ করে কিছু দূরে এক বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। জটিল লতাগুল্মাচ্ছন্ন বনের মাঝখানে সরু পায়ে-চলা পথ। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

বুদ্ধদেব একা সেই পথ ধরে চললেন। বনের মধ্যে কয়েক জন গোয়ালা কুঁড়ে ঘর বেঁধে থাকত। বুদ্ধদেব তাদের ঘরের পাশ দিয়ে চললেন। দূর থেকে তাঁকে দেখে গোয়ালারা ছুটতে ছুটতে তাঁর সামনে এসে বলল—"হে সন্ন্যাসী, এই পথ ধরে সন্ধ্যায় একা যাবেন না। এই বনে অঙ্গুলিমালা নামে এক দুর্দ্দান্ত দস্যু বাস করে। মাঝে মাঝে সশস্ত্র পঞ্চাশ ব্যক্তি বা একশ ব্যক্তি একত্র হয়ে এই পথ ধরে গেছে কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও ফেরেনি। দস্যু একা তাদের সবাইকে হত্যা করেছে। যদিও আপনি সন্ন্যাসী, আপনার কাছে কোন অর্থ নাই। তবু দস্যু অঙ্গুলিমালা আপনাকে দেখতে পেলেই হত্যা করবে। সাধু-সন্ন্যাসীকে সে ভক্তি করে না। অকারণে নরহত্যা করেও সে আনন্দ পায়।"

বুদ্ধদেব গোয়ালাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন—"বৎস, তোমরা আমার প্রাণহানির আশঙ্কা করো না। দস্যু আমার কোন অনিষ্ট করবে না।" এই বলে তিনি গোয়ালাদের কুঁড়েঘর পার হয়ে সেই পথ ধরে চলতে লাগলেন। আরও কিছুক্ষণ চলবার পর বুদ্ধদেব কয়েক জন মেষপালকের কুঁড়েঘরের সামনে এলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে মেষপালকেরা ছুটে এসে চীৎকার করে বলতে লাগল—"সন্ন্যাসী, থামুন, থামুন। আর এগিয়ে যাবেন না। দুর্দ্দান্ত দস্যু অঙ্গুলিমালা আপনাকে দেখলেই হত্যা করবে।" বুদ্ধদেব বললেন—"তোমরা বৃথা ভয় করছ, দস্যু অঙ্গুলিমালা আমার কোন অনিষ্ট করবে না।"

এই বলে বুদ্ধদেব গভীর বনের মধ্যে ঢুকে যেতে লাগলেন। বনের প্রান্তসীমায় কয়েকটি কৃষকের কুঁড়েঘর। দূর থেকে বুদ্ধদেবকে দেখে কৃষকেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে চীৎকার করে বলতে লাগল—"প্রভু, থামুন, থামুন। আর এক পা'ও এগিয়ে যাবেন না। আপনি দুর্দ্দান্ত দস্যু অঙ্গুলিমালার বাসস্থানের কাছে এসে পড়েছেন। আপনাকে দেখতে পেলেই সেই অধার্ম্মিক নিষ্ঠুর দস্যু নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিবে।"

বুদ্ধদেব কৃষকদের অভয় দিয়ে এগিয়ে চললেন।—তার পর জনমানবহীন গভীর বনে প্রবেশ করে দেখলেন, মৃত নরনারীর আঙ্গুলের মালা গলায় পরে, কানে প্রকাণ্ড কুণ্ডল ঝুলিয়ে হাতে শাণিত খড়গ নিয়ে, মানুষের রক্তে রাঙ্গা বস্ত্র পরে সাক্ষাৎ কালান্তক যমের মত দস্যু অঙ্গুলিমালা বৃক্ষকাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখছে। তার মুখের ভাবে নিষ্ঠুর পৈশাচিকতা ফুটে উঠেছে।

বুদ্ধদেব প্রশান্ত বদনে নির্ভীক ভাবে দস্যুর সামনে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

দস্যু অঙ্গুলিমালা বুদ্ধদেবকে তার সামনে এগিয়ে আসতে দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! রাতের ঘোর অন্ধকারে নির্জ্জন বনের মধ্যে একা এক সন্ন্যাসী গেরুয়া বসন পরে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছেন?

দস্যু ভাবতে লাগল—এই পথে সশস্ত্র পঞ্চাশ ব্যক্তি কিংবা সশস্ত্র একশ ব্যক্তি ভিন্ন আর কেউ-ই কোন দিন আসতে সাহস পায়নি। আর তারা সবাই একা আমার অস্ত্রাঘাতে নিহত হয়েছে। শ্রাবস্তী নগরে ও আশ-পাশের সকল সহরে এ-কথা রটে গেছে। নিশ্চয়ই এই সন্ন্যাসীও সে খবর জানেন। না জানলেও এই পথের ধারে যে সব গোয়ালারা, মেষপালকেরা, কৃষকেরা থাকে তারা নিশ্চয়ই সন্ন্যাসীকে সাবধান করে দিয়েছে। কিন্তু তবুও কেমন করে ইনি আমার বাসস্থানের সামনে এলেন? ভাবতে ভাবতে সে বুদ্ধদেবের দিকে তাকাল। অন্ধকারে তাঁর মুখ দেখতে পেল না বটে কিন্তু দেখল তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে আসছেন।

তাই দেখে দস্যুর মনে হঠাৎ প্রচণ্ড ক্রোধ জেগে উঠল। সে ভাবল—যদি বা এই সন্ন্যাসী না জেনে আমার মত ভীষণ দস্যুর বাসস্থানে এসে পড়ে থাকেন তাহলেও এখন আমার মত দুর্দ্দান্ত দস্যুকে দেখে, আমার শাণিত উদ্যত খড়্গ দেখে এই সন্ন্যাসীর ভয় পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে ইনি এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন আমাকে গ্রাহ্য করেন না। যেন আমি তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছি। এখনই এই সন্ন্যাসীকে হত্যা করে আমাকে তাচ্ছিল্য করার উপযুক্ত প্রতিদান দেব। এই ভেবে অঙ্গুলিমালা শাণিত খড়্গ দোলাতে দোলাতে বুদ্ধদেবের দিকে ছুটে আসতে লাগল।

কিন্তু হঠাৎ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটল। দস্যু প্রাণপণে ছুটে আসতে লাগল কিন্তু কিছুতেই বুদ্ধদেবের সামনে আসতে পারল না। সে চেয়ে দেখল, সন্ন্যাসী তার দিকে এগিয়ে আসছেন আগের মত শান্ত পাদক্ষেপে। কিন্তু তবু দু'জনের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান রয়েছে ঠিক আগের মতই।

অঙ্গুলিমালা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল—এ কি ব্যাপার! এ কি ইন্দ্রজাল? সন্ন্যাসী কি যাদুমন্ত্রে আমাকে অক্ষম করে দিচ্ছেন। কত বার তেজস্বী ঘোড়া পাগল হয়ে ছুটেছে, আমি দৌড়ে গিয়ে সেই ঘোড়া ধরেছি, আমার শরাঘাতে প্রাণভয়ে ভীত হরিণ বনের সরু পথ ধরে ছুটেছে, কত বার সেই উল্কার মত বেগে ধাবমান হরিণকে আমি ধরেছি। আজ এই সন্ন্যাসী ধীর নিশ্চিন্ত গতিতে চলেছেন আর আমি উদ্ধশ্বাসে ছুটছি তবুও এঁকে ধরতে পারছি না? এ কি করে সম্ভব হল?

ভাবতে ভাবতে অঙ্গুলিমালা আর না ছুটে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ল, চীৎকার করে বলল—"সন্ন্যাসী, স্থির হয়ে দাঁড়াও, সন্ন্যাসী, স্থির হয়ে দাঁড়াও।"

বুদ্ধদেব ঠিক আগের মতই ধীর ভাবে এগিয়ে আসতে আসতে শান্ত কণ্ঠে বললেন—"আমি স্থির হয়েই আছি অঙ্গুলিমালা, এবার তুমিও আমার মত স্থির হও।"

বুদ্ধদেবের কথা শুনে দস্যু বিস্মিত হয়ে বলল—"সন্ন্যাসী, এ কি অনুচিত কথা বলছেন! আপনি এগিয়ে আসছেন আর আমি ত এখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। অথচ আপনি বলছেন—অঙ্গুলিমালা, তুমি আমার মত স্থির হও?"

বুদ্ধদেব বললেন—"আমি সত্য কথাই বলছি। আমার মন শান্ত। কামনা, বাসনা আমাকে বিক্ষিপ্ত করে না। সর্ব্বজীবের উপর আমার প্রেম ও করুণা আছে। সেজন্য যতই দ্রুত আমি চলি না কেন, তবুও আমি স্থির হয়ে আছি। আর অঙ্গুলিমালা, তোমার মন বাসনা, কামনায় বিক্ষুব্ধ। ধন, মান, ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষায় তুমি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছ। কোন জীবের উপর তোমার দয়া নাই, প্রেম নাই। সেজন্য যতই স্থির হয়ে দাঁড়াও, তবু তুমি ছুটে চলেছ। উদ্ধশ্বাসে ছুটেও তুমি যে আমার কাছে আসতে পারছিলে না তার কারণ এই! আমি ঐন্দ্রজালিক নই। বাসনামুক্ত সন্ন্যাসী মাত্র। হে অঙ্গুলিমালা, এবার তুমিও আমার মত শান্ত হও, বাসনামুক্ত হও।"

বুদ্ধদেবের এই বাণী দস্যুর কঠোর অন্তঃকরণকে গলিয়ে দিল। সে ভাবল—জীবনে এমন সত্য বাণী আমি শুনিনি। সারা জীবন হিংসা আর নির্মমতার সাধনা করে চলেছি। এত দিন ধরে নরহত্যা করে যে ধনরত্নের স্তূপ জমা করলাম তার পরিবর্ত্তে মনে কি কোন দিন শান্তি পেয়েছি? আজ সন্ন্যাসী যে কথা শোনালেন এ আমার অন্তরের কথা। আমি যতই স্থির হয়ে দাঁড়াই না কেন, আমার মত জগতে আর কে অশান্তির তাড়নায় ছুটে চলেছে?

দস্যু অঙ্গুলিমালার চোখ দিয়ে দর-দর ধারে জল পড়তে লাগল। হাতের শাণিত খড়্গ খসে পড়ে গেল। তার পৈশাচিক মুখের ভাব ব্যথায় বেদনায় করুণ মর্ম্মস্পর্শী হয়ে উঠল।

বুদ্ধদেব ততক্ষণে তার আরও কাছে এসে পড়েছেন। দস্যু এবার তাঁর মুখ দেখতে পেল। তাঁর মুখের সে কি অপূর্ব্ব প্রশান্তি, কি করুণাভরা দৃষ্টি! যেন দৃষ্টির সেই করুণার নির্ঝরে জগতের সমস্ত পাপ, তাপ, গ্লানি ধুয়ে যাবে। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে যেন পলকেই অঙ্গুলিমালার জন্মান্তর ঘটে গেল। মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করে অঙ্গুলিমালা বলল—"প্রভু, আপনি কে বলুন?"

বুদ্ধদেব বললেন—"বৎস, আমি তথাগত।"

দস্যু বলল—"কোন্ জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে নরপিশাচ আমি তথাগতের দর্শন পেলাম? আপনার অমৃত বাণী শুনলাম? এমন সত্য বাণী আমাকে কেউ কখনও শোনায়নি। আপনার বাণী আমার অন্তরে প্রবেশ করে আমার সমস্ত সত্তা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। দস্যু অঙ্গুলিমালা আজ মরে গেল, আপনার একান্ত অনুগত শিষ্য জন্ম নিল। বলুন কি করলে মনের শান্তি পাব, কি করলে দুষ্কৃতি মোচন হবে?"

বুদ্ধদেব বললেন—"অঙ্গুলিমালা, হিংসা আর নিষ্ঠুরতা ত্যাগ কর। সর্ব্বজীবের উপর করুণা ও প্রেমের সাধনা কর। মন বাসনামুক্ত কর, তাহলে তুমি পরম শান্তির অধিকারী হবে।"

অঙ্গুলিমালা বলল—"প্রভু, আমার মত দস্যু কি সঙ্ঘে প্রবেশ করে আপনার ধর্ম্মে দীক্ষা নিতে পারে?"

বুদ্ধদেব বললেন—"পারে বৈ কি বৎস! অনুশোচনায় তোমার সব পাপ ধুয়ে গেছে। এখনি তোমাকে আমি ভিক্ষুর ধর্ম্মে দীক্ষিত

করছি। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে চল।" এই বলে সেইখানে দাঁড়িয়েই বুদ্ধদেব অঙ্গুলিমালাকে ভিক্ষু-ধর্ম্মে দীক্ষিত করলেন।

দস্যু অঙ্গুলিমালা গেরুয়া বসন পরে, মস্তক মুণ্ডিত করে ভিক্ষা-পাত্র হাতে নিয়ে সেই রাতেই বুদ্ধদেবের সঙ্গে তাঁর শ্রাবস্তী নগরের সঙ্ঘে চলে এল।

নগরবাসীরা এ-সব ঘটনা জানতে পারল না। তারা একদিন রাজা প্রসেনজিৎ কোশলকে গিয়ে বলল—"মহারাজ, দস্যু অঙ্গুলিমালার অত্যাচারে আমাদের আপনার রাজ্যে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আপনি তাকে দমন করে আমাদের রক্ষা করুন।"

প্রজাদের কথা শুনে রাজা প্রসেনজিৎ কোশল সৈন্য-সামন্ত, অশ্ব-রথ সাজিয়ে দস্যুকে দমন করবার জন্য যাত্রা করলেন। যাত্রার পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করবার জন্য একা পায়ে হেঁটে অনাথপিণ্ডদের উদ্যান-ভবনে প্রবেশ করলেন। বুদ্ধদেবের সামনে এসে ভক্তিভরে প্রণাম করে এক পাশে বসলেন।

বুদ্ধদেব আশীর্ব্বাদ করে বললেন—"মহারাজ, আপনাকে চিন্তিত দেখছি কেন? রাজা বিম্বিসার কি আপনার রাজ্য আক্রমণ করেছেন? কিংবা বৈশালীর লিচ্ছবি রাজারা ষড়যন্ত্র করেছেন?"

রাজা বললেন—"দেব, এ-সব কিছুই হয়নি। আমার রাজ্যে অঙ্গুলিমালা নামে এক ভীষণ দস্যু এমন অত্যাচার করছে যে, গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর জনশূন্য হয়ে পড়ছে। আমি বহু চেষ্টা করেও তাকে দমন করতে পারিনি। আজ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করছি, সেজন্যই মন চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে রয়েছে।"

বুদ্ধদেব বললেন—"মহারাজ, যদি সেই ভয়ানক দস্যু গেরুয়া বসন পরে, মস্তক মুণ্ডিত করে এই সঙ্ঘে প্রবেশ করে, ভিক্ষুর জীবন গ্রহণ করে, তাহলে আপনি তার প্রতি কি রকম ব্যবহার করবেন?"

রাজা বললেন—"প্রভু, এ কি কখনও সম্ভব? আপনি জানেন না কিন্তু সারা জীবন সে শুধু নরহত্যা আর লুণ্ঠন করে কাটিয়েছে। কিন্তু তাহলেও আপনি যা বলছেন তা' যদি সম্ভব হয় তবে আমি সেই দস্যুকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করব। তাকে ভিক্ষুর প্রাপ্য সম্মান দেব।"

রাজার কাছ হতে অল্প দূরে ভিক্ষু অঙ্গুলিমালা বসেছিলেন, আঙুল দিয়ে তাঁকে দেখিয়ে বুদ্ধদেব বললেন—"মহারাজ, দেখুন, ওই ভিক্ষুই দস্যু অঙ্গুলিমালা।"

রাজা বিস্মিত হয়ে মুখ তুলে চেয়ে দেখলেন এক বিরাট বপু পুরুষ গেরুয়া বসন পরে মুণ্ডিত মস্তকে বসে মালা জপ করছেন।

এই কি সেই ভয়ানক দস্যু! ভয়ে রাজার শরীর থর্-থর্ করে কেঁপে উঠল, শরীরের রোম দাঁড়িয়ে উঠল।

বুদ্ধদেব বললেন—"মহারাজ, ভয় পাবেন না। ভিক্ষু অঙ্গুলি-মালার কাছ থেকে আজ জগতের কোন প্রাণীর কোন ভয় নাই। সর্ব্বজীবের উপর করুণা ও প্রেমের ব্রত তিনি গ্রহণ করেছেন।"

বুদ্ধদেবের কথা শুনে রাজার ভয় দূর হল। তিনি দস্যুর মুখের দিকে ভাল করে তাকালেন। সত্যই ত। ভিক্ষুর মুখের ভাবে কি প্রশান্ত উদারতা! কে বলবে এ সেই নরপিশাচ দস্যু?

ভিক্ষু অঙ্গুলিমালাকে প্রণাম করে রাজা বললেন—"হে ভিক্ষু, আপনি পূর্ব্বে যা-ই করুন না কেন, সে সব আমি ভুলে যাব। আপনাকে ভিক্ষুর যোগ্য সম্মান দেব। আপনি অনুগ্রহ করে আমার দেওয়া এই বস্ত্র কয়টি গ্রহণ করুন।"

রাজার ইঙ্গিতে পার্শ্বচরেরা কয়েকটি মূল্যবান গেরুয়া বসন ভিক্ষু অঙ্গুলিমালার সামনে রাখল। ভিক্ষু বললেন—"মহারাজ, আমি আপনার উদারতায় কৃতার্থ হলাম। কিন্তু আমি সব রকম বিলাস ত্যাগ করেছি। সেজন্য এই মূল্যবান বস্ত্র গ্রহণ করতে পারব না। মাত্র একটি চীর বসন ও দিনান্তে এক মুষ্টি খাদ্যই আমার জীবন ধারণের পক্ষে যথেষ্ট। আপনি যাকে দেখছেন এ বিলাসী দস্যু অঙ্গুলিমালা নয়, প্রভু বুদ্ধের কৃপায় নির্ব্বাণমন্ত্রে দীক্ষিত ভিক্ষু অঙ্গুলিমালা।" অঙ্গুলিমালার কথা শুনে বিস্ময়ে রাজা প্রসেনজিৎ কোশল স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে বুদ্ধদেবকে বললেন—"এ আশ্চর্য্য ব্যাপার কেমন করে সম্ভব হল? সহস্র সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কত বার যুদ্ধ করে এই দুর্দান্ত দস্যুকে আমি পরাজিত করতে পারিনি। আর আপনি! বিনা অস্ত্রে বিনা যুদ্ধে তাকে কি করে এমন ভাবে পরাজিত করলেন?"

বুদ্ধদেব বললেন—"মহারাজ, ধর্ম্মের মন্ত্রে, নির্ব্বাণের মন্ত্রে জগতের সব অপরাজিতই পরাজিত হয়।"

রাজা প্রসেনজিৎ কোশল বুদ্ধদেবকে প্রণাম করে, ভিক্ষু অঙ্গুলিমালাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন।

এর পর অঙ্গুলিমালা দীর্ঘকাল ধরে তপস্যা করে, মৈত্রী করুণা প্রেমের ব্রত পালন করে এমন পুণ্যজীবন যাপন করতে লাগলেন যে, বুদ্ধদেব তাঁকে সঙ্ঘের শ্রেষ্ঠ ভিক্ষুর পদ দিলেন।

ভিক্ষুরা বিস্মিত হয়ে বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করল—"প্রভু, সারাজীবন শত শত নরহত্যা করে, নিষ্ঠুরতা আর পাশবিকতার চর্চ্চা করে যে কাটাল আপনি তাকে কেমন করে সঙ্ঘের শ্রেষ্ঠ ভিক্ষুর পদ দিলেন?"

বুদ্ধদেব বললেন—"হে ভিক্ষুরা, সারাজীবন যে যত পাপ কাজ করুক না কেন, যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে নির্ব্বাণ মন্ত্রে দীক্ষা নেয়, মৈত্রী-করুণার ব্রত গ্রহণ করে, তবে তার পূর্ব্বজন্মের সব পাপ ক্ষয় হয়ে যায়। একজন্যই দস্যু অঙ্গুলিমালা আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভিক্ষু অঙ্গুলিমালা হয়েছে।"

সেইক্স ও হেলকিওন

ইন্দিরা দেবী

(গ্রীসের রূপকথা)

ছোট্ট দেশ গ্রীস, আর তাতে অগুণতি রাজ্য। এক একটা রাজ্য কতোটুকুই আর বড়? তবু রাজ্য তো? আর রাজ্য হলেই রাজা থাকা চাই। এমনি এক রাজ্যের রাজা সেইক্স। ছোট রাজ্যের রাজা হলেও সেইক্স রীতিমত রাজা। পাত্র-মিত্র, লোক-লস্কর, সৈন্য-সামন্ত সবই রয়েছে! সেইক্স লোকও খুব ভালো—প্রজাদের সুখ-দুঃখের প্রতি সদা-সর্ব্বদা নজর রাখতেন। প্রজারাও তাঁর ওপর ভারী খুসী। বেশ সুখে আর নির্ভাবনায় দিন কেটে যাচ্ছিল, সেইক্স-এর রাণী হেলকিওন রূপে-গুণে অসাধারণ ছিলেন। রাজা-রাণী দু'জন দু'জনকে এতো ভালো বাসতেন যে, বেশীক্ষণ কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না। সব বিষয়েই তাঁরা দু'জনে দু'জনের পরামর্শ নিতেন, তাদের মতের অমিল হতো না।

সুখেই দিন যাচ্ছিল। কিন্তু চিরকাল ত কারুর সুখে যায় না? একদিন তাদের জীবনে নেমে এলো দুর্য্যোগের ছায়া। প্রতিবেশী এক রাজ্যের রাজা সেইক্স-এর রাজ্য আক্রমণ করার তোড়জোড় করছিলেন। গ্রীস দেশে এক রাজ্যের সঙ্গে অপর রাজ্যের ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকতো। এই আক্রমণের সম্ভাবনায় সেইক্স রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

গ্রীস দেশের লোকেরা ছিল খুব ধর্ম্মভীরু। কোন জরুরী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে তারা দেবতাদের মতামত জানতে চাইতো। কোন প্রার্থী মন্দিরে হত্যা দিলে পুরোহিতরা তাকে দেবতাদের মতামত জানিয়ে দিতেন। অ্যাপোলো দেবতার মন্দিরেই বেশীর ভাগ লোক যেতো। সেইক্স অ্যাপোলোর মন্দিরেই যেতে চাইলেন। অনেকখানি পথ—সমুদ্রপথে যেতে হবে। সেইক্স-এর সঙ্কল্পের কথা শুনে রাণী ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ক'দিন তাকে ছেড়ে থাকতে হবে কে জানে? পথে কখন কি বিপদ ঘটবে কে বলতে পারে? যদি জাহাজডুবি হয়? যদি জলদস্যুদের হাতে ধরা পড়েন? যদি প্রাণ যায়? রাণী আর ভাবতে পারছেন না, রাজাকে নিবৃত্ত করার জন্য কত চেষ্টাই করলেন। কিন্তু সেইক্স-এর মতের পরিবর্ত্তন হলো না। রাণীকে অভয় দিয়ে রাজা অনেক কথা বললেন। তখন রাণী জানালেন, যেতেই যদি হয় তবে তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। সেইক্স তাতে খুশীই হতেন; কিন্তু বলা ত যায় না, যদি কোন বিপদই ঘটে তখন? অনেক করে বুঝিয়ে শেষ পর্য্যন্ত সেইক্স রাণীকে নিরস্ত করলেন। শেষে একদিন সেইক্সকে নিয়ে জাহাজ সমুদ্রপথে পাড়ি দিলো। রাণী নিজে জাহাজঘাটিতে এসে চোখের জল ফেলতে ফেলতে রাজাকে বিদায়-সম্বর্দ্ধনা জানালেন। রাজা কথা দিলেন যতো তড়াতাড়ি সম্ভব মন্দির দর্শন করে তার কাছে ফিরে আসবেন। চোখের জল মুছতে মুছতে রাণী প্রাসাদে ফিরে এলেন। সেইক্সের জাহাজ আস্তে আস্তে সমুদ্রের বুকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

পরদিন থেকে রাণী জুনো দেবীর মন্দিরে গিয়ে রাজা নিরাপদে ফিরে আসুন এই প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। অন্তরের সবখানি ব্যাকুলতা দিয়ে প্রার্থনা করলেন রাণী। দিন গেল, সপ্তাহ গেল, রাজা ফিরে এলেন না। মাসও অতিক্রান্ত হতে চললো, তবু রাজার কোন খবর নেই। অমঙ্গলের আশঙ্কায় রাণী অস্থির হয়ে উঠলেন। দিন-রাত মন্দিরে পড়ে থেকে তিনি দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন।

এদিকে রাজা যে জাহাজে করে যাচ্ছিলেন প্রথমে তাকে কোন বিপদে পড়তে হয়নি। নীল আকাশের নীচে নীল সমুদ্রের ওপর দিয়ে শাদা পালতোলা জাহাজ—গন্তব্য স্থানের দিকে নির্ঝঞ্ঝাটে চলছিল। কিন্তু চার দিন ক্রমাগত চলার পর পাঁচ দিনের দিন বিপদ ঘটলো। সকাল থেকেই কালো কালো মেঘে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেল। তার পর আরম্ভ হলো বাতাসের দাপাদাপি—ঝড়ের সে কী প্রলয়ঙ্কর রূপ! ঢেউগুলো ফুলে ফুলে উঠলো—হাল ধরে রাখা অসম্ভব—পাল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। তার পর এক ঝাপটায় কাৎ হয়ে জাহাজ ডুবে গেলো সমুদ্রের জলে। যাত্রীরা কেউ-ই উদ্ধার পেলো না। সমুদ্রের তলায় তাদের কবর রচিত হলো। সেইক্সও বাদ গেলেন না।

এদিকে রাণীর কাতর প্রার্থনা শুনে জুনোর মন গলে গেলো। কিন্তু কী করবেন তিনি? মরা মানুষকে বাঁচাবেন কি করে? অনেক ভেবে-চিন্তে জুনো স্থির করলেন ঘুমের দেবতা সোম্‌নাসের শরণ নিতে হবে।

আল্‌প্‌স পাহাড়ের এক গুহায় থাকতেন সোম্‌নাস। সেখানে দিনের বেলায়ও সূর্য্যের আলো ঢুকতো না। গভীর অন্ধকার। তাতে সারা ক্ষণই সোম্‌নাস ঘুমিয়ে কাটাতেন। জুনো তার কাছে দূত পাঠালেন। অনেক কষ্টে সোম্‌নাস-এর ঘুম ভাঙিয়ে দূত তাকে জুনোর আদেশ জানালো, জুনোর কথামত সোম্‌নাস হেলাকওনে-এর প্রাসাদে স্বপ্নের দূতদের পাঠিয়ে দিলেন। সমস্ত দিন উপোস আর প্রার্থনার পর হেলাকওনে ক্লান্ত হয়ে তার প্রাসাদে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এমন সময় তিনি স্বপ্ন দেখলেন যেন সেইক্স আস্তে আস্তে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু কী চেহারা? তার জামা-কাপড় সব ভিজে গিয়েছে। মাথার চুল থেকে টুপটাপ করে জল ঝরে পড়ছে। গায়ে লেগে আছে সমুদ্রের শৈবাল। সেইক্স যেন তাকে বলছেন "আমি বেঁচে নেই—জাহাজডুবিতে আমার মৃত্যু হয়েছে—কিন্তু তুমি দুঃখ করো না—ভগবানের বিধান সবই ত মেনে নিতে হবে?"

দুঃস্বপ্ন দেখে হেলাকওনে জেগে উঠলেন। অমঙ্গলের আশঙ্কা দৃঢ়তর হলো তার মনে। অস্থিরতায় ছটফট করতে লাগলেন কখন রাত শেষ হবে তার প্রতীক্ষায়। তারপর ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই হেলাকওনে ছুটে গেলেন সমুদ্রের ধারে যেখানে তার স্বামীকে বিদায় জানিয়েছিলেন তিনি। কান্নায় তাঁর বুক ভেঙে পড়ছিল। সমুদ্রের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়েছিলেন হেলাকওনে। এমন সময় ঢেউ-এর বুকে ভাসতে ভাসতে তার মৃত স্বামীর দেহ এসে ঠেকলো তিনি যেখানটায় দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে। স্বপ্ন তাহলে সত্যি? হেলাকওনে শোকে-দুঃখে অস্থির হয়ে পড়লেন। কী হবে এ জীবন রেখে। তিনি সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিলেন—মৃত্যুর পরপারে যদি স্বামীর সঙ্গে মিলন হয় এই ভেবে। স্বর্গের দেবতারা অবাক-বিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখছিলেন। জুনোর মনে ভারী দয়া হলো। তিনি মন্ত্রবলে দুটি মৃতদেহকে দুটি বড় বড় শাদা পাখীতে রূপান্তরিত করে দিলেন।

তারপর হাজার হাজার বছর কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও দূর সমুদ্রের বুকে নাবিকরা দেখতে পায় একজোড়া শাদা পাখী পাশাপাশি ভেসে বেড়াচ্ছে—আর সে সময় সমুদ্রের জল স্থির, নিস্পন্দ হয়ে যায়। শান্ত, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের বুকে ভেসে-বেড়ানো পাখী দুটিকে দেখে তাদের মনে পড়ে সেইক্স আর হেলাকওনের কথা।

উত্তর

১। পাটলিপুত্র শব্দের পাটলির অপভ্রংশ পালি।

২। সংঘারাম কথাটি সংস্কৃত সংগ্রহম্‌ শব্দের অপভ্রংশ। বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিগণ একত্রে সংঘারামে বাস করতেন।

৩। রাজা লক্ষ্মণসেন।
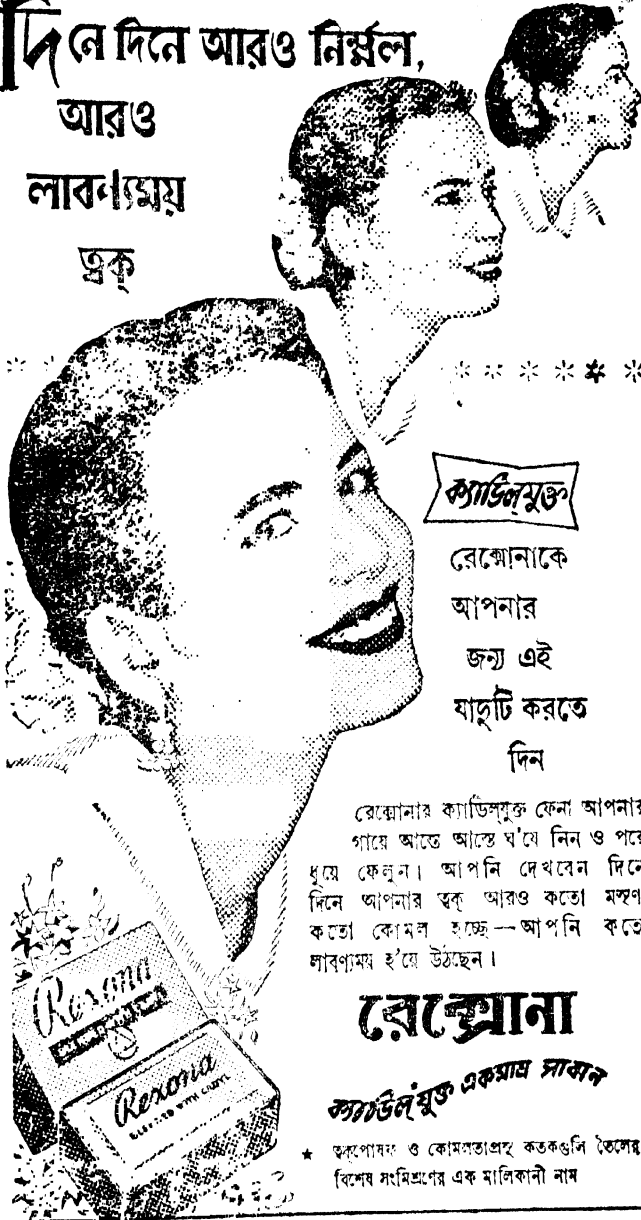
দিনে দিনে আরও নির্ম্মল,
আরও
লাবণ্যময়
ত্বক্
ক্যাডিলযুক্ত
রেক্সোনাকে
আপনার
জন্য এই
যাদুটি করতে
দিন
রেক্সোনার ক্যাডিলযুক্ত ফেনা আপনার গায়ে আস্তে আস্তে ঘ'ষে নিন ও পরে ধুয়ে ফেলুন। আপনি দেখবেন দিনে দিনে আপনার ত্বক্ আরও কতো মসৃণ, কতো কোমল হচ্ছে—আপনি কতো লাবণ্যময় হ'য়ে উঠছেন।
রেক্সোনা
ক্যাডিলযুক্ত একমাত্র সাবান
★ ত্বক্‌পোষক ও কোমলতাপ্রদ কতকগুলি তৈলের বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম
Rexona
RP. 123-50 BG
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত

সা হি ত্য

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

সুরঙ্গিণী সর্বাধিকারী—মহিলা লেখিকা। স্বামী—প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী। গ্রন্থ—তারাচরিত (ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা, ১৮৭৫, জানুয়ারি।

সুরবালা দত্ত—মহিলা সাহিত্যিক। যুগ্ম-সম্পাদক—মাতৃমন্দির (১৩৩০-৩৪)।

সুরুচিবালা রায়—মহিলা সাহিত্যিক। জন্ম—১৩০৩ বঙ্গ ১১ই কার্তিক শিলং এ। পিতা—রায়-সাহেব রমণচন্দ্র বিশ্বাস (শ্রীহট্ট ইচাকুটানিবাসী)। স্বামী—গৌরসুন্দর রায় (অ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট)। ইনি কল্লোলযুগের একজন প্রধানা লেখিকা। ব্রহ্মদেশে অবস্থান (১৯২৫-৪২)। রেঙ্গুন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভানেত্রী (১৯৩১)। গ্রন্থ—মর্মস্মৃতি (গ), আহুতি (উপ), ঝরাপাতা (উ), মীরা (উপ)।

সুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—ঘরের কথা (ত্রৈমাসিক, ১৩৩৪-৩৬)।

সুরেন্দ্রচন্দ্র সাহা—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—উৎসাহ (১৩০৫-৬)।

সুরেন্দ্রনাথ কুমার—ভাষাবিদ্ শিক্ষানুরাগী। জন্ম—চন্দননগর। বাল্যে পাঠ্যাবস্থায় ফরাসী ও লাটিন ভাষা শিক্ষা। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত, পালি, পার্সী, আরবী, গ্রীক, জর্মান, স্প্যানিস, ইতালীয়ান, ডাচ, রাশিয়ান প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। কর্ম—প্রধান পুস্তক-তালিকা প্রণেতা, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী (১৯০৪), গ্রন্থাধ্যক্ষ, এশিয়াটিক সোসাইটী অফ বেঙ্গল (১৯০৭-১৩), সুপারিনটেনডেণ্ট, ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী (১৯১৩-৪৮)। দীর্ঘ ৩৫ বৎসর ইনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, কাব্য, গণিত, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা করেন, বহু পাঠককে নানা বিষয়ে সাহায্য করেন এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক রচনা প্রকাশ করেন। গ্রন্থ—দেবদত্ত (বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে অনূদিত), Sen Dynesty.

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—বৈরাগ্য-যোগ, স্মৃতির আলো।

সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—সেবক (১৩২১-১৩২৫)।

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী—চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। জন্ম—নদীয়ার ভাজনঘাটে। চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। গ্রন্থ—স্নেহময়ী।

সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৭১ খৃঃ ঢাকা জেলার মাইজমারা গ্রামে। শিক্ষা—এম-এ কুচবিহার কলেজ, ১৯০২, স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)। কর্ম—সরকারী সেক্রেটারিয়েট বিভাগে। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অন্যতম সম্পাদক। অবসর গ্রহণ (১৯৩১)। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। গ্রন্থ—শিবশক্তি-মিলন, সতীগীতিকা।

সুরেন্দ্রনাথ দত্ত—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—সরণী (১৩২৫-২৬)।

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—কবি, দার্শনিক ও শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮৮৭ খৃঃ বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে। মৃত্যু—১৯৫২ খৃঃ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ সহরে। শিক্ষা—এম-এ, পিএইচ-ডি। আবাল্য মেধাবী ছাত্র, অল্প বয়সেই সুপণ্ডিতরূপে খ্যাতিমান। ইংরেজি, ফরাসী, জর্মান, ইতালীয়, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় পণ্ডিত। কর্ম—(কিং জর্জ) অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, কলম্ব ; অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ, অধ্যাপক, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতের প্রতিনিধি, ইউরোপ ও আমেরিকায় আন্তর্জাতিক দর্শন কংগ্রেসে, রাশিয়ায় (১৯২৫), আমেরিকা (১৯২৬), ইউরোপ আন্তর্জাতিক ধর্ম সম্মেলনে (১৯৩৬)। সভাপতি (দর্শন), বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন (মাজু, ১৩৩৪)। গ্রন্থ—দার্শনিকী, তত্ত্বকথা, ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, সৌন্দর্যতত্ত্ব, বাংলায় দুইখানি গ্রন্থ, প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা, রবিদীপিকা, নিবেদন (কাব্য), ক্ষণলেখা (ঐ), বিজয়িনী (ঐ), চারণী (ঐ), চারণ (ঐ), অধ্যাপক (উপ), আয়ুর্বেদ, সাহিত্য-পরিচয়, কাব্য-পরিচয়, Yoga Philosophy in relation to other System of Indian Thought (কলি বিশ্ব), Yoga Philosphy & Religion (লণ্ডন), Hindu Mysticism (লণ্ডন), Indian Idealism (কেম্ব্রিজ), Philosophical Essays (কলি), Implication of Realism in Vedanta, Logic of the Vedanta, The Concept of Nirvana, The Dogmas of Indian Philosophy, Croce and Buddhism, The Religion of Mind & Body in the Yoga, The Philosophy of the Vijnapati-Matrata-Siddhi, Contemporary Indian Philosophy, Hermitage of India : Indian Philosophy (অক্সফোর্ড), Yoga Philosophy (লক্ষ্ণৌ), A Study of Patanjali (কলি), Rabindranath : the Poet and Philosopher, A History of Indian Philosophy (কেম্ব্রিজ)।

সুরেন্দ্রনাথ বড়াল—দার্শনিক ও সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস-জীবনের নাম—পরমহংস স্বামী শ্রীআনন্দ আচার্য। জন্ম—১৮৮১ খৃঃ হুগলী সহরের প্রাচীন বড়াল বংশে। মৃত্যু—১৯৪৫ খৃঃ নরওয়ে অষ্টার্ডল পর্বতের গুহায়। পিতা—গোবর্ধন বড়াল (হুগলী)। শিক্ষা—এফ-এ (হুগলী কলেজ), বি-এ (ডাফ কলেজ, ১৯০৮), এম-এ (নন-কলিজিয়েট)। কর্ম—অধ্যাপক, বর্ধমান রাজ কলেজ। বাল্যকাল হইতেই হিন্দু দর্শনের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ। এই সময় বহু সাধুসঙ্গ ও স্বামী শিবনারায়ণ মহারাজের নিকট দীক্ষালাভ। গুরুদেবের প্রেরণায় লণ্ডন যাত্রা (১৯১২), ইণ্টারন্যাশন্যাল সাইকিক্যাল সোসাইটীর সভ্য ও তথায় হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে বহু বক্তৃতাদান ও খ্যাতিলাভ। নরওয়ের অসলো নগরীতে গমন (১৯১৫) এবং অসলো ও ষ্টকহলম বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের অবৈতনিক অধ্যাপক।

হিন্দুধর্ম প্রচার ও বহু শিষ্যলাভ। অতঃপর নরওয়ের অষ্টার্ডল পর্বতে 'গৌরীশঙ্কর মঠ' স্থাপনা এবং ধ্যান-ধারণা ও লোক-শিক্ষায় নিযুক্ত। ইনি ২৭ বৎসর যাবৎ প্রবাসী ছিলেন ও তত্রস্থ স্থানে দেহরক্ষা করেন। ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন এবং উহা লণ্ডন, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি স্থানে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ—(ইংরেজি ভাষায়) The Samhita, Vikram-Urbasi, Brahmadarsanam, Gaurisankar Guha, Snow birds, Kalkaram, Tatwajnanam, Usarika, Sakhi, Satrusakha, Karlima Rani, Valmiki Ramayan, Yoga of Conquest, Girirani, Arctic Swallows, Wild Swans, Sara & other poems. এতদ্ব্যতীত নরওয়েজিয়ান ও সুইডিস ভাষায় ইঁহার বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রসিদ্ধ বাগ্মী, দেশসেবক, রাজনীতিজ্ঞ ও শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮৪৮ খৃঃ ১০ই নভেম্বর ভবানীপুরে। মৃত্যু—১৯২৫ খৃঃ ৬ই অগষ্ট। পৈতৃক নিবাস—মনিরামপুর, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা। পিতা—ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষা—ডোভেটন কলেজ, প্রবেশিকা (১৮৬৩), এফ-এ (১৮৬৫), বি-এ (১৮৬৮), আই-সি-এস (১৮৬৯)। কর্ম—অ্যাডিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীহট্ট, অধ্যাপক, মেট্রোপলিট্যান কলেজ (১৮৭৬), সিটি কলেজ, ফ্রি চার্চ ইনসটিটিউট (১৮৮১), রিপন কলেজ (১৮৮৫), কয়েকটি নবপ্রবর্তিত আইনের বিরোধিতা, লর্ড লিটনের সংবাদপত্র দমনের বিরোধিতা, প্রতিষ্ঠাতা—Indian Association (১৮৭৬, ২৬ জুলাই), রিপন কলেজ (১৮৮২)। সম্পাদক, Indian Association, সভ্য, মিউনিসিপ্যাল সভা (১৮৭৬), আইন-সভার সভ্য, মিউনিসিপ্যাল আইনের বিরোধিতা (১৮৯৭), জাতীয় মহাসমিতি স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা, সভাপতি, জাতীয় মহাসভা, পুণা (১৮৯৫), আমেদাবাদ (১৯০২)। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের হোতা, বরিশালে ধৃত (১৯০৬) ও পরে মুক্তি। প্রেস-কনফারেন্সে যোগদানের জন্য লণ্ডনে গমন (১৯০৯), নির্ভীক ভাবে জনমত প্রচার। অতঃপর মডারেট দলে যোগদান (১৯১৮) এবং কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ। বাংলা সরকারের স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ (১৯২০)। গ্রন্থ—The Nation in making, সম্পাদক—বেঙ্গলী (১৮৭৮)।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—নাট্যকার। নাট্য-গ্রন্থ—মোগল-পাঠান, হিন্দু বীর, কুরুক্ষেত্র, শ্রীকৃষ্ণ, কলির সমুদ্র-মন্থন।

সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক—গ্রন্থকার। কর্ম—স্যানিটারি ইন্সপেক্টর। গ্রন্থ—যুগবার্তা।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—কবি। জন্ম—১২৪৪ বঙ্গ ২৫এ ফাল্গুন যশোহর জেলায় জগন্নাথপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ-বংশে। মৃত্যু—১২৮৫ বঙ্গ ৩রা বৈশাখ। পিতা—প্রসন্ননাথ মজুমদার। শিক্ষা—বাল্যকালে ফার্সী ভাষা, ফ্রি চার্চ ইনষ্টিটিউসন, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, হেয়ার সাহেবের স্কুল। এই সময়ে 'ষড়্‌ঋতু বর্ণন' কবিতা রচনা। কর্ম—ঠাকুরবাড়ী এষ্টেটে। ইঁহার বহু কবিতা ও প্রবন্ধ বিক্ষিপ্ত ভাবে আছে। গ্রন্থ—ষড়্‌ঋতু বর্ণন (১৮৫৬), সবিতা সুদর্শন (কা, ১৮৭০), বর্ষবর্তন (কা, ১৮৭২), রাজস্থানের ইতিবৃত্ত (১৮৭২), বিশ্বরহস্য (১৮৭৭), মহিলা, ১ম (কা, ১৮৮০), ২য় (১৮৮৩), হামির (না, ১৮৮১)।

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র—শিক্ষাব্রতী, কবি ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৮৭ বঙ্গ (?)। মৃত্যু—১৯৪৫ খৃঃ ১লা জুন লক্ষ্ণৌ। কর্ম—ভারতীয় এডুকেশন সার্ভিসে, অধ্যাপক (পদার্থ বিদ্যা), প্রেসিডেন্সী কলেজ, অধ্যক্ষ, ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ, রাজশাহী কলেজ। কাব্যগ্রন্থ—ব্রাউনিং পত্রাবলী, জোনাকী, পর্ণজা।

সুরেন্দ্রনাথ রায়—গ্রন্থকার। ইনি বহু স্ত্রীশিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ—সাবিত্রী-সত্যবান, নারীলিপি, কুললক্ষ্মী, শৈব্যা, পদ্মিনী, শর্মিষ্ঠা, বিধির মিলন, মাতৃমঙ্গল, গ্রন্থিবন্ধন, ইন্দুপ্রভা, পরিণয়, সতীধর্ম, নারীর স্বর্গ।

সুরেন্দ্রনাথ রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—স্মৃতিমন্দির, সমর্পণ।

সুরেন্দ্রনাথ সেন—পুরাতত্ত্ববিদ্‌ ও শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮৯০ খৃঃ ২৯এ জুলাই বরিশাল জেলার মাহিলাড়া গ্রামে। পিতা—মথুরানাথ সেন। শিক্ষা—বাল্যে টাঙ্গাইল, সন্তোষ স্কুল, এণ্ট্রান্স (বাটাজোড় হাই ইংলিশ স্কুল, ১৯০৬), এফ-এ (ব্রজমোহন কলেজ, ১৯০৮); এই সময়ে ব্রজমোহন স্কুলে শিক্ষকতা, তৎপরে নদীয়া শিকারপুরে, কিছুদিন প্রিভারসীপ অধ্যয়ন। পুনরায় পাঠারম্ভ—বি-এ (১৯১৩), এম-এ (১৯১৫), পি-আর-এস (১৯১৭), পি-এইচ-ডি (১৯২২), ডি-লিট। গবেষণা—লিসবন, ইভোরা, প্যারী, লণ্ডন, অক্সফোর্ড। কর্ম—বলধার জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর গার্জেন টিউটার, অধ্যাপক, জব্বলপুর গভর্ণমেণ্ট কলেজ (১৯১৬), লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৭-১৯৩১), আশুতোষ অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩১-১৯৩৯), দিল্লীতে ন্যাশন্যাল আর্কাইবসে (ইম্পিরিয়েল রেকর্ড ডিপার্টমেণ্ট (১৯৪০—১৯৪৯), অধ্যাপক, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৯-৫০), দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর (১৯৫০), ভাইস-চ্যান্সেলার, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫০-১৯৫৩); সহ সম্পাদক, ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্স (১৯২২), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে কেম্ব্রিজে যোগদান (১৯২৬), ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের শাখা-সভাপতি (১৯৩৩, ১৯৪০), মূল সভাপতি (১৯৪৪), ভারত গভর্ণমেণ্ট ডিরেক্টার (১৯৪৪)। গ্রন্থ—অশোক, হিন্দুগৌরবের শেষ অধ্যায়, প্রাচীন বাংলা পত্র-সঙ্কলন, পেশোয়া-দিগের রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতি, পাগীর কথা, ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ (সম্পাদিত), Civa Chatrapati, Administrative System of the Mahrattas, Military System of of the Mahrattas, Foreign Biographies of Shivaji, Studies In Indian History, Early Career of Kanhoji Angria and other Papers, Off the Main Track, Indian Travels of Thevenot and Carery, Sanskrit Documents in the National Archives of India, Calender of Persian Correrspondence, Vol. VII & IX. সম্পাদক—Indian Archives, The Indian Records Series.

সুরেন্দ্রনাথ সেন—সাময়িকপত্রসেবী। জন্ম—চন্দননগর (হুগলী)। সম্পাদক—মাতৃভূমি।

সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৭১ বঙ্গ বীরভূম জেলায় ভাণ্ডীরবন গ্রামে। মৃত্যু—১৩৪৯ বঙ্গ। পিতা—জগন্নাথ ঘোষাল। শিক্ষা—বি-এল (১৮৪৯)। কর্ম—শিক্ষকতা, ডুমকা জেলা স্কুল, ভাগলপুর জেলা স্কুল, আইন-ব্যবসায়, ভাগলপুর ও ডুম্‌কায় (১৮৯৪-১৯৩২), সরকারী উকীল (১৯২৭-১৯৩১)। বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যানুরাগী, অসহযোগ-আন্দোলনের সময় অভিযুক্ত কংগ্রেস কর্মিগণকে বহু সাহায্য দান। 'ভক্তিবিনোদ' উপাধি (বঙ্গসাহিত্য সারস্বত মহামণ্ডল কর্তৃক, ১৯২৪ খৃঃ) লাভ। গ্রন্থ—গোলাপ-কুমারী (নাটক), সুরেন্দ্র-পদাবলী (কাব্য)।

সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়—কবি। কাব্য-গ্রন্থ—তন্বী, মঞ্জরী।

সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী—গ্রন্থকার। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলায় কালীপুর গ্রামে। গ্রন্থ—তীর্থের পথে।

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—দার্শনিক পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। জন্ম—নদীয়া জেলায় চুয়াডাঙ্গা মহকুমার অনন্তপুরে। ইঁহারা সিদ্ধতান্ত্রিক পণ্ডিত বংশ। ইনি বহু উপন্যাস, দার্শনিক গ্রন্থ ও কবিতা রচনা করেন। বিভিন্ন সাময়িকপত্রের লেখক। গ্রন্থ—উপন্যাস—মিলন মন্দির, পথের আলো, বিনিময় (না), অভিসার, যোগবাণী, ছিন্নমস্তা, সোনার কণ্ঠি, সতীলক্ষ্মী, স্বপ্ন-সুন্দরী, লুকোচুরি, কনক প্রতিমা, ভবানীর মঠ, লোহার বাঁধন, ভৈরবী, হেমচন্দ্র, লাল পল্টন, স্বর্ণকুটীর, ভবানী পাঠক, সেনাপতির গুপ্ত রহস্য, বর-বিনিময়, বৈরাগীর হাট, প্রেম-উন্মাদিনী, প্রতিদান, অগ্নিসাক্ষী, সতীর পতি-পূজা, সোনার পারিজাত, সোনার কঙ্কন, বোধন-বাড়ী, ফুলওয়ালা, বাসরে মিলন, ঊষা, বিশ্ববীণা (কবিতা, ১৩৩৩), যোগ ও ধর্ম—যোগতত্ত্ব-বারিধি, প্রেততর্পণ, দেবতা ও আরাধনা, জন্মান্তর-রহস্য, যোগ ও সাধন রহস্য, ব্রহ্মচর্য-শিক্ষা, রসতত্ত্ব ও শক্তিসাধনা, পুরোহিত-দর্পণ, প্রেততত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, দীক্ষা ও সাধনা, গৃহস্থের যোগ-শিক্ষা। সম্পাদক—সমালোচক (মাসিক, ১২৯৭ কাশীপুর, চুয়াডাঙ্গা), আখ্যান (সাপ্তাহিক), নবনন্দিনী (১২৯২-৯৩), নদীয়াবাসী (১৩০২-৩)।

সুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ (ভট্টাচার্য)—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৯১ খৃঃ ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাহেশ্বরদী গ্রামে। পিতা—প্রভাতচন্দ্র ভট্টাচার্য। শিক্ষা—এম-এ, সংস্কৃতে 'পঞ্চতীর্থ' 'বেদান্তশাস্ত্রী' প্রভৃতি উপাধিলাভ। কর্ম—সংস্কৃতাধ্যাপক, বর্ধমান রাজকলেজ, শিক্ষক, সরকারী স্কুল পূর্ববঙ্গে, নারীশিক্ষা-মন্দিরের কলেজ বিভাগের অধ্যাপক (১৯৪৯), টোলবিভাগে মহামহাধ্যাপক। ছাত্রাবস্থায় কৃতিত্ব অনুসারে ১১টি স্বর্ণ ও রৌপ্যপদকের অধিকারী। ভারতবর্ষের বহু তীর্থস্থান পর্যটনকারী। শিক্ষা, সাহিত্য ও ধর্মানুরাগী। পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের সহযোগী সম্পাদক। বহু গ্রন্থ রচনা। গ্রন্থ—বেদশতক, আদর্শ হিন্দু বিবাহ, ব্রাহ্মণ ও হিন্দু গৃহস্থের শ্রীকৃষ্ণ সাধন, ভক্তের ভগবান (শিশুনাট্য), বঙ্গগৌরব হোসেন শাহ (না), আত্মদান (গীতিনাট্য), দক্ষিণা (ঐ), বিশ্ববীণা (কবিতা), ছাত্রজীবনে শক্তিসঞ্চার, বরযাত্রী বা কন্যাদায়, গোধন, সমাজ, ব্রাহ্মণ, তীর্থরাজ, প্রাচীন যুগে সমরবিজ্ঞান।

সুরেশচন্দ্র ঘোষ—গ্রন্থকার। জন্ম—বর্ধমান জেলায় তেরকোনা গ্রামে। পিতা—জগবন্ধু ঘোষ। প্রসিদ্ধ বাগ্মী রাসবিহারী ঘোষের কনিষ্ঠ সহোদর। গ্রন্থ—দাদার কথা (রাসবিহারী ঘোষের জীবনী), নিরঞ্জন।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—সাহিত্যিক। গ্রন্থ—নূতন রূপকথা, ঐন্দ্রজালিক, উড়োচিঠি, সবুজ কথা, ইরানীর উপকথা, ইন্দ্রধনু। সম্পাদক—অলকা (১৪২৮-১৯) উত্তরা (কাশী, মাসিক পত্র)।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। শিক্ষা—বি-এল। গ্রন্থ—লজ্জাদেবী, দেবনাথ, বাসবী, পরিতাপ, শ্রমিকের ছেলে।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—জন্ম—চন্দননগর। গ্রন্থ—সবুজ কথা (১৯২০)।

সুরেশচন্দ্র দত্ত—ভক্ত। জন্ম—১৮৫০ খ্রীঃ কলিকাতা হাটখোলা দত্তবংশে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। গ্রন্থ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তসাধক, সহচর নারদসূত্র, কাজের লোক।

সুরেশচন্দ্র নন্দী—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৯৭ বঙ্গ ১৪ই ভাদ্র বালিগঞ্জে (মাতুলালয়)। পিতা—অধরচন্দ্র নন্দী। মাতা—ভবতারিণী দেবী। পৈতৃক নিবাস—কলিকাতা। কর্ম—সরকারী ডাকবিভাগের পদস্থ কর্মচারী। অবসর গ্রহণ (১৯৪৫) করিয়া স্থায়িভাবে বরাহনগরে বাস। বাল্যকাল হইতে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী। বহু সাময়িক পত্রের লেখক। গ্রন্থ—কবি শেখ সাদী (জীবনী, ১৩৩০), ওমর খৈয়াম (জীবনী, ১৩৩৬)। সহ-সম্পাদক—যমুনা (মাসিক), অর্ঘ্য।

সুরেশচন্দ্র পাল—চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৫৭ খৃঃ কলিকাতা সিমুলিয়ায়। মৃত্যু—১৯৩১ খৃঃ। শিক্ষা—বিলাতে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ স্কুল (১৮৭৮-১৮৯১)। কর্ম—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। তদানীন্তন কালে বিখ্যাত সন্তরণবিদ্ ও ক্রীড়ানুরাগী। গ্রন্থ—Advanced English Primer.

সুরেশচন্দ্র পালিত—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—অর্ঘ্য (১৩২২-২৭)।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি বহুদিন জাপানে ছিলেন। গ্রন্থ—চিত্রবহুল জাপান, বনস্পতির অভিশাপ, পোর্ট আর্থারের ক্ষুধা (১৩০৯)।

সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—পণ্ডিত। জন্ম—শ্রীহট্ট জেলার ইলাজপুর গ্রামে। কর্ম—শিক্ষকতা, নবীগঞ্জ জে. কে. হাইস্কুল, শ্রীহট্ট। গ্রন্থ—হিন্দুধর্ম-সংহিতা, কাজের লোক (দৃশ্যকাব্য), বীরব্রত (শিশুনাট্য), পথের সন্ধান (ঐ), নতুন বাংলা ব্যাকরণ (পাঠ্যগ্রন্থ)।

সুরেশচন্দ্র মজুমদার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পূজার অর্ঘ্য, মাতৃতীর্থ।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—সমালোচক ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৭০ খৃঃ ৩০এ মার্চ কলকাতা। মৃত্যু—১৯২১ খৃঃ ১লা জানুয়ারি। পিতা—গোপালচন্দ্র ঘোষাল সমাজপতি মাতা—হেমলতা দেবী (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা)। পূর্ব নিবাস—নদীয়া জেলার আঁশমালী গ্রামে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা, ১৪।১৫ বৎসর হইতেই বাংলা রচনার হস্তক্ষেপ। গ্রন্থ—কল্কিপুরাণ (অনুবাদ, ১২৯৩),

সাজি (গল্প, ১৩০৭), রণভেরী (১৯১০—কোনান ডয়েল কৃত To Drumএর অনুবাদ), ইউরোপের মহাসমর (ইতিহাস, ১৯১৫), ছিন্নহস্ত (উপ, ১৩২২), কবিতাপাঠ (পাঠ্যপুস্তক)। সম্পাদিত গ্রন্থ—আগমনী (পূজাবার্ষিকী), বঙ্কিম-প্রসঙ্গ (সংকলিত, মৃত্যুর পরে প্রকাশিত, ১৯২১)। সম্পাদক—সাহিত্যকল্পদ্রুম (মাঘ, ১২৯৬), সাহিত্য (মাসিক, ১২৯৬-১৩২৭), বসুমতী (দৈনিক), সন্ধ্যা, নায়ক, বাঙ্গালী।

সুরেশচন্দ্র সাহা—সাময়িকপত্রসেবী। জন্ম—রাজসাহী জেলার বোয়ালিয়া গ্রামে। সম্পাদক—উৎসাহ (মাসিক, ১৩০৪, বৈশাখ)।

সুললিত সরকার—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—যুবক (১৩৩৭-৩৮)।

সুলেখা দেবী—গ্রন্থকর্ত্রী। নিবাস—চন্দননগর। গ্রন্থ—প্রশ্নমালা, আকস্মিক বিপদ-আপদ, Outlines of grammer.

সুশীলকুমার গুপ্ত—কবি ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৩০৪। শিক্ষা—বি, কে, ইউনিয়ন ইনসটিটিউসন খুলনা, দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী, এম-এ, এম-এস্‌সি (প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ডবলু-বি-সি-এস। কর্ম—কর্মাধ্যক্ষ, গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ও কমার্সিয়াল মিউজিয়ম। বহু সাময়িক পত্রে, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা রচনা। কাব্যগ্রন্থ—রৌদ্র-জ্যোৎস্না (১৩৫৪)।

সুশীলকুমার দে—শিক্ষাব্রতী ও কবি। জন্ম—১৮৯০ খৃঃ ২৯এ জানুয়ারি কলিকাতা। পিতা—ডাক্তার সতীশচন্দ্র দে। শিক্ষা—প্রবেশিকা (রাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল, কটক, ১৯০৫, বৃত্তিলাভ), এফ-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৯০৭, বৃত্তিলাভ), বি-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৯০৯, ৩য় স্থান বৃত্তিলাভ), এম-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ২য় স্থান), বি-এল (কলি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯১২, বৃত্তিলাভ); গ্রিফিথ পুরস্কার (১৯১৫), প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি (১৯১৭), লণ্ডনে অধ্যয়ন (১৯১৯-২১), ডি-লিট্ (১৯২১) লণ্ডনে অধ্যাপক টমাস ও ডক্টর বারনেটের নিকট এবং বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হেরমান জাকোবির নিকট ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা (১৯২০-২২)। অধ্যাপক (ইংরেজি), প্রেসিডেন্সী কলেজ (১৯১২), লেকচারার, (ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৩-২৩), ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইংরেজি রীডার (১৯২৩-৪), সংস্কৃত বিভাগের প্রধান রীডার (১৯২৫-৩৭), প্রধান অধ্যাপক (১৯৩৭-১৯৪৭); কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক (১৯৫১)। 'বিদ্যারত্ন' উপাধি (ঢাকা সারস্বত সমাজ, ১৯৪৩)। সরোজিনী সুবর্ণ পদক (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৮), 'বিদ্যাসিন্ধু' উপাধি (নবদ্বীপ বিবুধজননী সভা, ১৯৫০) লাভ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ (১৯১৮-১৯) সহ-সভাপতি (১৯৪৮), সভাপতি (১৯৫০), মূল সভাপতি, অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্স (বোম্বাই, ১৯৪৮-৪৯), বিভাগীয় সভাপতি (ঐ, মহীশূর, ১৯৩৫, কাশী, ১৯৪৩), অনারারী ফেলো, রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী অফ গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্ল্যাণ্ড (১৯৫৪); ভাণ্ডারকর রিসার্চ সোসাইটী কর্তৃক মহাভারত সম্পাদনে সাহায্যের জন্য আমন্ত্রিত (১৯৩৪), অন্নমালাই ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে বক্তৃতা দান (১৯৩৫, ১৯৪৩), পুণার ডেকান কলেজ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক সংস্কৃত অভিধান সংকলনে আমন্ত্রিত (১৯৪৯)। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দান (১৯৫১), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি' বক্তৃতা (১৯৫০)। ইনি বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ও ভারতের বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, আগ্রা, পঞ্জাব, নাগপুর, বিশ্বভারতী, গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের পরীক্ষক। কাব্য, বৈষ্ণব-সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যে সমপারদর্শী। বহু সাময়িক পত্রে গবেষণামূলক প্রবন্ধের রচয়িতা। গ্রন্থ—দীপালি (কাব্য, ১৩৩৫), প্রাক্তনী (ঐ, ১৩৪১), লীলায়িতা (ঐ, ১৩৪১), অঞ্জলি (ঐ, ১৩৪৮), ক্ষণদীপিকা (ঐ, ১৩৫৫), বাংলা প্রবাদ (১৩৫২), দীনবন্ধু মিত্র (১৩৫৮), নানা নিবন্ধ (১৩৬০), সায়ন্তনী (কাব্যগ্রন্থ, ১৩৬১), Bengali Literature in the Nineteenth Century, (1800—1825 (১৯১৯), Studies in the History of Sanskrit Poetics ১ম (লণ্ডন, ১৯২৩), ২য় (১৯২৫), Treatment of Love in Sanskrit Laterature (কলি, ১৯২৯), Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal from Sanskrit to Bengali Sources (কলি, ১৯৪২), History of Sanskrit Leterature (কলি, ১৯৪৭), সম্পাদিত গ্রন্থ—The Vakrokti-jivita (কলি), The Kicaka-Vadha of Nitivarman (ঢাকা বিশ্ব, ১৯২৯), The Padyavali (ঢাকা বিশ্ব, ১৯৩৪), The Krisna Karnamrita of Lilasuka Bilvamangala (ঢাকা বিশ্ব, ১৯৩৮), The Udyoga-Parvan of the Mahabharata (পুণা, ১৯৪০), The Jnana-Dipika of Devabodha (বোম্বাই, ১৯৪৪)।

সুশীলকুমার শীল—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—যৌবনের ডাক, গৃহস্থালী, রূপের নেশা, ব্যথার শেষ, মিলন রাত্রি।

সুশীলকুমার সেন—আয়ুর্বেদবিদ ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৯০২ খৃঃ ১৭ই অক্টোবর কলিকাতা। পিতা—মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন। শিক্ষা—প্রবেশিকা (হিন্দু স্কুল, ১৯২১), বি-এস্‌সি (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৯২৫), এম-এস্‌সি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৭)। এতদ্ব্যতীত কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন। আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন (বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ নিকেতন), শারীরতত্ত্ব অধ্যয়ন (মেডিকেল কলেজ)। 'প্রাণাচার্য,' 'কবিরত্ন,' 'ভিষগাচার্য' উপাধিলাভ। ডিরেক্টর, কল্পতরু আয়ুর্বেদিক ওয়ার্ক, ন্যাশান্যাল ইনস্যুরেন্স কোং, হিমালয় অ্যাস্যুরেন্স কোং। সভাপতি, মেদিনীপুর কোলাঘাট আয়ুর্বেদিক মহাসম্মেলন (১৯৪৯)। নিখিল ভারত সংস্কৃত পরিষদ (১৯৫০), অবৈতনিক অধ্যক্ষ ও পরিদর্শক, বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতাল, প্রধান চিকিৎসক ও পরিদর্শক, শ্রীবিশুদ্ধানন্দ মাড়োয়ারী আয়ুর্বেদ হাসপাতাল (১৯৪৮)। নিখিল ভারত আয়ুর্বেদিক কনভেনসনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ইত্যাদি। গ্রন্থ—দেবী (কাব্য), মহুয়া (কাব্য), আয়ুর্বেদিক দ্রব্যগুণ-সংহিতা, মহৌষধ-মঞ্জুষা, সংক্ষিপ্ত গাৰ্হস্থ্য চিকিৎসা।

[ক্রমশঃ।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গন

"নেপাল তোমায় দেখে এলাম"

সুনীলিমা ঘোষ

যৌতুকপ্রাপ্তা সালঙ্কারা নববধূর মত বিজ্ঞান অনেক যৌতুক দিয়েছে আধুনিক সভ্যতাকে, যার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তর্কের কারণ রয়েছে প্রচুর, সৌন্দর্য্য বিচারে মতভেদের, তবু বিজ্ঞান 'আবেগ কেড়ে নিয়ে বেগ বৃদ্ধি করেছে' এটা যেমন সত্যি, সঙ্গে সঙ্গে এটাও সত্যি সাধারণ লোকের সামনে সৌন্দর্য্যের খনি খানিকটা খুলে দিয়েছে সে। কিছু দিন আগেও উড়োজাহাজের শব্দ শুনলে ছুটে না আসতো এমন ভারতবাসী খুব কমই ছিল। আর এখন বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি ও যন্ত্রে বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত আমরাও এই বহু-দর্শিত বহু-আকাঙ্ক্ষিত উড়োজাহাজে চেপে যেমন উপভোগ করছি এর বেগ, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ ভরে পৃথিবীর সৌন্দর্য্য-সুধা পান করছি—যে সৌন্দর্য্যকে দেওয়ালে বা বইয়ে দেখেই সন্তুষ্ট ছিলাম, ভাবিনি কখনও এর কণামাত্রের সঙ্গে হবে চাক্ষুস পরিচয়।

যাক্‌গে, আসল কথায় আসা যাক্‌ যাচ্ছি নেপাল—যার সম্বন্ধে জানতাম আমরা অল্প—যেখানকার রাজা সম্বন্ধে প্রবাদ আপন ক্ষমতা বহির্ভূত কোন দেশে তিনি পদার্পণ করেন না, যিনি নেপালবাসীর কাছে নারায়ণ হয়েও ব্রহ্মা রাণার কঠিন নাগপাশে আবদ্ধ ছিলেন এত কাল। কিন্তু কালের অমোঘ গতিতে ভারতের ভাগ্যের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নেপালের ভাগ্যেরও পরিবর্ত্তন হয়েছে অনেক। রাজা কাটিয়েছেন রাণার প্রতাপ, ছেড়েছেন তাঁর ঠুনকো আত্মাভিমান—যে দেশে তাঁর অধিকার নেই, সে দেশে তিনি পদার্পণ করবেন না। চলেছি সেখানে যেখানে পৃথিবী সম্পূর্ণ ভাবে মানবের পদানত হয়ে নেই, এখানে-সেখানে উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তার উন্নত শির। আর অবজ্ঞাভরে তাকিয়ে আছে তার পদানত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মনুষ্যকুলের দিকে। এ চলার আরেকটা থ্রিল—এই জুনের মাঝামাঝি প্রায় সারা ভারতের লোক যখন সূর্য্যদেবের প্রচণ্ড তেজে প্রায় সিদ্ধ হচ্ছে, তখন ৪৬৭২ ফিট উঁচুতে বসে নভেম্বরের আবহাওয়াকে উপভোগ করাবার মধ্যে থ্রিল আছে বই কি? সাথে সাথে এ কথাটাও বার বার মনে করিয়ে দেয় মানুষ করেছে অনেক, যা একদিন কল্পনারও ছিল বাইরে, তবু প্রকৃতির ওপর হাত তার কত পরিমিত—সে পারে একটা ঘর বড় জোর পুরো একটা বাড়ী air cond tion করতে, কিন্তু পারে কি সারা ভারতকে নেপালের আবহাওয়া দিতে নিদেন পক্ষে কোলকাতা সহরকে? কৃত্রিম বৃষ্টি ঝরিয়ে পারে কৃষির সাহায্য করতে কিন্তু সে কতটুকু যায়গা? পারে মানুষকে সাচ্ছন্দ্য দিতে, কিন্তু প্রাণ?

আসছি নেপাল—পাশপোর্ট লাগে কিন্তু তা পাকিস্থানের মত পবিত্র স্থানের প্রবেশ অধিকার লাভের জন্য নয় বলেই হয়তো সেটা যোগাড় করা কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু অনুমতি পাওয়া যেমন কষ্টকর নয়, প্রবেশের পথ কষ্টসাধ্য। নেপালের অন্য কোন দেশের সাথে ট্রেণ-সংযোগ নেই—দুটো মাত্র route একটা land route অন্যটা air route প্রথমটায় যেতে হয় মানুষের ঘাড়ে চেপে, দ্বিতীয়টায় বায়ু চেপে। প্রথমটায় বাজে মানুষ হয়ে মানুষকে অমানুষিক ব্যথা দেবার দুঃখ যা সহ্য করা কঠিন আর পদদ্বয়ের আশ্রয় নেওয়া, সমতলবাসিনী হিলতোলা পাদুকা-পরিহিতা আয়াসী তরুণীর পক্ষে কল্পনা করাও ধৃষ্টতা। তাই ব্যোমযানের আশ্রয়ই নেওয়া হলো। বিহারকে পরিহার করে নেপালে প্রবেশ পথ নেই। তার রাজধানীর পথেই রওনা হচ্ছি রাজবাহিনী চেপে—রাজবাহিনী বলেই তার টিকিট জোগাড় করাও রাজসিক ব্যাপার।

রওনা হবার দিন 29th may 1953—যখন এখানকার লোক অসহ্য হয়ে উঠেছে প্রকৃতির ক্ষিপ্ত বৃষের মত তপ্ত নিঃশ্বাসে—বহু কষ্টে আসা গেল এরোড্রমে—নিস্তব্ধ আবহাওয়ায় সাদা ইউনিফর্ম পরিহিত কর্ম্মচারীরা লঘু পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রকৃতিও তার রুক্ষতা হারিয়ে মিষ্টি স্পর্শ বুলোচ্ছে—তৃপ্ত হয়েছে সে রসের মাধ্যমে মানবের সাদর আহ্বানে। সব চাইতে আশ্চর্য্য যারা ষ্টেশনে ওরে বৌদি কোথায় গেলি? 'এই হতচ্ছাড়া চাকরটা গেল কোথায়? বলে হন্তদন্ত হয়ে হুঙ্কার ছাড়েন, 'কোলি, কোলি' চীৎকার করে ভুঁড়ি নিয়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম হন, পানের পিক্‌ ফেলে রঞ্জিত করেন চার ধার তাঁরাও চুপচাপ বসে আছেন। বৌদি, বুলু, হাবুও এ শান্ত পরিস্থিতিতে হকচকিয়ে শান্ত হয়ে এক কোণে বসে পায়ের বদলে চোখ দুটোকে এধার থেকে ওধার ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে ক্রমাগত। ঢুকতেই প্রশ্ন হলো 'are you Mrs. Ghosh?' 'Oh yes.' "you are too late, I am going to cancell your ticket." মাথায় বজ্রাঘাত হলো, কিন্তু কেন? শুনলাম, প্লেন ছাড়বার পনের মিনিট আগে উপস্থিতির নিয়ম যাত্রীদের—সে নিয়ম আমি লঙ্ঘন করেছি মাত্র দশ মিনিট আগে পৌঁছে। যে কারণেই হোক্‌ আমিও অনুমতি পেলাম যাবার। মালপত্রও বেশী ছিল—যাত্রীরা যখন আরোহণ করছে আমার ওজন সার্চ্চ ইত্যাদি সারা হলো, উঠতে পেলাম আমিও কিন্তু মাল সঙ্গে নিয়ে। কারণ লাগেজ ভ্যান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

খাকি ইউনিফর্ম পরিহিত সারথি এসে এক মিনিট attention হয়ে দাঁড়ালেন ইঞ্জিনঘরের সামনে, তার পর কানে তুলো গুঁজে ঢুকে বন্ধ করলেন ঘর। কিছুক্ষণের ভেতরই সামনের পাখা ঘুরতে আরম্ভ করলো, বন্‌ বন্‌, সঙ্গে সঙ্গে মনেও চিন্তার জট পাকাতে সুরু করলো—গত কিছুদিনের যাত্রীদের মত আমার কপালেও স্বর্গপ্রাপ্তি যোগ আছে কি না কে জানে? তখন হয়তো বিধ্বস্ত কলের রাশির ভেতর থেকে দেহ সনাক্ত করাও হয়ে উঠবে না—তাল পাকানো

মাংসপিণ্ডটা বঙ্গ, কলিঙ্গ না উৎকলবাসিনীর সেটা বোঝাই হয়ে উঠবে গবেষণার বিষয়। পরদিন সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় দুর্ভাগাদের তালিকায় আমার নামও হয়তো বেরুবে, শুধু আত্মীয়-পরিজন প্রতিদিন প্রতিটি মধুর স্মৃতি মনে করে তুষের মত জ্বলতে থাকবেন। আর আমি হয়ত সেই ক্ষণে অমরাবতীতে ইন্দ্রের পদসেবা করতে করতে উপভোগ করছি উর্বশী-নৃত্য! ঝাকি লাগতেই চিন্তার সূত্র ছিন্ন হলো—দাদা এসেছিলেন তুলে দিতে, সঙ্গে আমার ছোট ছেলে।

বিমানটি এবার চলতে সুরু করলো দ্রুত গতিতে, গতি দ্রুততর হতেই মর্ত্ত্য ছেড়ে আকাশে উঠলাম—আস্তে আস্তে বাড়ী-ঘর, মাঠ-ঘাট নদী-নালা ক্ষীণ হতে ক্ষীণায়মান হতে লাগলো—মুগ্ধ হতে মুগ্ধতর হলো দৃষ্টি, সার্থক হলো দর্শনেন্দ্রিয়। বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হলো দর্শনীয় বস্তু। মরি মরি, দৃষ্টির আরেকটা দিক খুলে গেল! মনে হলো শরৎচন্দ্রের সুরে সুর মিলিয়ে বলি, কোন মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে নৈকট্যেই সৌন্দর্য্য, দূরত্বে নাই! এই যে স্বর্গ মর্ত্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টি আমাদের দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া যাইতেছে মরি মরি ইহার কি রূপ! আমরা অপরূপ কিছু দেখলেই নিকটতর করি দর্শনীয় বস্তু দৃষ্টিকে তৃপ্ত করতে কিন্তু mycroscope দিয়ে সামনের হাতীকে দেখবার মত দৃষ্টিকে আমরা দিই ফাঁকি, করি প্রবঞ্চনা। নিকটে দৃষ্টি হয় সীমাবদ্ধ ও অতি প্রাকট্যের দোষে দোষণীয়। যতই উচ্চতর হতে লাগলো বিমান দৃষ্টি হতে লাগলো পরিব্যাপ্ত—একটি ঘর, একটি ফুলওয়ারী, একটি রাস্তা, একটু নদী, কয়েকটা গাছ, খানিকটা মাঠ ছিল তার সৌন্দর্য্য নিয়ে ও অতি বাস্তবের স্পর্শ নিয়ে। এবার মানচিত্রের একটু অংশ খুলে গেল চোখের সামনে। মনে হলো এ যেন ছোট্ট একটি আদর্শ গ্রাম ও সহরের আইডিয়াল মডেল। কোন শিল্পী চোখের সামনে তুলে ধরেছে, যা আছে তা নয়—যা হওয়া উচিত ছিল ঠিক তেমনি। একটি বাড়ী হলো একটি সহর, অনেকগুলো ঘর তার আশে-পাশের গ্রাম। একটি ফুলওয়ারীর পরিবর্ত্তন হলো এখানে ওখানে অনেক সবুজের সমারোহে, একটি রাস্তা হলো অনেকগুলো আঁকা-বাঁকা লাল সাঁথিতে রূপান্তরিত, নদীর একটু অংশ তার অনেকগুলো বাঁক নিয়ে দেখা দিল, তার বুকে দোলা দিয়ে চলেছে মরালের ঝাঁকের মত ছোট্ট ছোট্ট নৌকো বা ষ্টীমার, পাশে দেশলাইয়ের তৈরী রেলগাড়ীর মত ট্রেণ চলেছে—এ যেমনি আকর্ষণীয় তেমনি মোহনীয়। এ যেন সাধারণ মেয়ের artist এর তুলি-ছোঁয়ানো অসাধারণ ছবি।

খানিকটা চলার পরই আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন অনুভূত হলো। পাহাড়ীয়া রাস্তা বলেই হয়ত প্লেন উঁচু-নীচু হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে

হতে লাগলো কোন অদৃশ্য মানব যেন চেয়ারটাকে আস্তে ঠেলে নীচে নামিয়ে পরমুহূর্ত্তেই উঠিয়ে নিচ্ছে ওপরে, যার ঠেলা সামলানো পাকযন্ত্রের পক্ষে কষ্টকর। মনোযোগ ভঙ্গ হলো—পাকযন্ত্র যাকে রাখতে অস্বীকার করছিলো তাকে চা দিয়ে নীচে নামাবার সাহায্যকারিণীরূপে air hostess এর আবির্ভাবে। বইও আছে মনকে তন্ময় করবার জন্য। চা নিয়ে আবার দৃষ্টি প্রসারিত হলো ছোট্ট কাচের জানালা দিয়ে নীচে; দেখলাম—

'অসীম নীরব নয় ঐ গিরি হিমালয়
উথলি উঠিছে যেন অনন্ত বারিধি
ব্যেপে দিক্ দিগন্তর'—

বিমান ভূমি স্পর্শ করলো, তারপর স্থির হলো। দাদা বৌদি এসেছেন—দুজনেই খুসিতে উপচে পড়ছেন—বিদেশে আত্মীয় ভগবানের মতই পরম আকাঙ্ক্ষিত। ইণ্ডিয়ান এ্যামব্যাসিতে থাকেন ওরা—এরোড্রোম থেকে বেশ খানিকটা দূর প্রায় ৬ মাইল। ডাকমোটরে যেতে হবে। আশে-পাশে ছোট-বড় অনেক পাহাড় তারা যেন মৌন হয়ে শুনছে বিশ্বজনের সুখ-দুঃখের গান * * *

"মেঘ উত্তরী, তুষার কিরীট,
ছত্র আকাশ, ধরা পাদপীঠ;
তুমি লভিয়াছ মৃত্যু ভুবনে চির-অমরতা বর!
তপস্বী তব আশ্রয়ে পেয়েছে কাম্যফল;
মোদের দিয়াছ নব আনন্দ—
মহামহিমার বিশাল ছন্দ
তোমারে হেরিয়া পরাণ ভরিয়া উছলিছে অবিরল।"
নম নম হিমাচল।'

বাজারে এসে গাড়ী থামলো,—সাধারণ লোকই বেশী, এদেশেও নেপালী দেখছি সোলআনাই বেশী, কিছু বাবুর্চি ও দ্বাররক্ষীও আছে। ওরা বেঁটে ও একটু মোটা মোটা, চোখ ছোট, নাক চেপ্টা, আমাদের ভেতর যেন একটু বেমানান। কিন্তু কই এখানে তো তেমন লাগছে না, এখানেই ওরাই যেন মানানসই আমরা বেমানান। সঞ্জীব চাটুয্যের 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' পরীক্ষার জন্য পড়া ছিল বইয়ে, অন্তর দিয়ে প্রথম উপলব্ধি করলাম নেপালে। আসল কথা, আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি আর ভগ্নাংশ কোনখানেই সুমানান নয়।

যেতে যেতে 'গায়ে আমার পুলক লাগে চোখে ঘনায় ঘোর'। পথের দুধারে ফুলের সমারোহ। সাদা, লাল, নীল, গোলাপী হলুদ, অজস্র। উর্ব্বশীর মত প্রকৃতির রূপ, চুলের রাশি তার সারা আকাশ ছড়িয়ে এক দিকে সর্ব্ব অঙ্গে তার ঝরণার চাঞ্চল্য অন্য দিকে গাম্ভীর্য্যে সে অটলনীয়া, সারা অঙ্গে তার ফুলের সজ্জা, লজ্জারুণ আননে তার হাল্কা সাদা মেঘের অবগুণ্ঠন, পবনদেবের অত্যাচারে সে অবগুণ্ঠন মুহূর্ত্তের তরে খসে গেলেই লজ্জায় আরক্তিম হচ্ছে তার আনন সূর্য্যদেবের সাক্ষাতে।

এ্যামব্যাসিতে মোটর এসে থামলো—চার দিক থেকে বহু উৎসুক চোখ নিরীক্ষণ করতে লাগলো, আনন্দ-মিশ্রিত ঈর্ষায় ভরে উঠলো কারো বক্ষ অন্যের বাঞ্ছিত এ আত্মীয় লাভে।

ইণ্ডিয়ান এ্যামব্যাসির বাড়ীগুলো খুব বড় না হলেও সিচুয়েসন চমৎকার! আমাদের বাড়ী এ্যামব্যাসির ভেতরই কিন্তু অন্য কোয়াটার্স থেকে একটু আলাদা এক ধাপ নীচে। ওখানে মাত্র দু'জনের কোয়াটার্স ও পাশে wireless office, ঢুকতেই Indian Embassyর ঠিক উল্টো দিকে British Embassy, Indian Embassyতে ভারতীয় নিজস্ব একটি ডাকঘরও আছে।

ভারতীয় দূতাবাসে ছয় ঘর বাঙালী ও বাইরে কাটমণ্ডুতে বেশ কয়েক ঘর বাঙালী আছেন। এর ভেতর দু'-এক জন কলেজের প্রফেসরও আছেন। শুনলাম, এক ঘর বাঙালী নেপালের nationality নিয়েই আছেন। স্বদেশে যাই করুক বিদেশে এসে বাঙালী সর্ব্বপ্রথম বাঙালীর খোঁজ নেয় এ অতি বড় সত্য। বাঙালীর মত স্বজনপ্রিয় জাতি বোধ হয় আর নেই—'কত রূপ স্নেহ করি স্বদেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া' বাঙালীর লেখা বাঙালীরই অন্তরের কথা। তার এ স্বজনপ্রিয়তা ও স্বাতন্ত্র্যের জন্যই এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত, ভাগ্যতাড়িত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত হয়েও বাঙালী আজও বাঙালীই আছে।

দু'দিন ঘরে বসেই কাটলো। সবই নতুন। লোক-জন, কথাবার্ত্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ, এমন কি আবহাওয়া পর্য্যন্ত। নিস্তব্ধ আবহাওয়ায় প্রকৃতি যেন মুখে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করছে, 'চুপ, কথা বলো না, শুধু দেখ, অনুভব করো। শান্তি ভোগ করো, শান্তি ভঙ্গ করো না।'

কিন্তু প্রকৃতির এ সাবধান-বাণী অগ্রাহ্য করে হিমালয়বিজয়ী বীর তেনসিং হিলারী প্রকৃতিকে পরাজয় করে মানবের বিজয়-ধ্বজা ওড়ালো। উল্লাসে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো মানব তার এ বিজয়ে। সৌভাগ্য ক্রমে আমিও তার ভাগ পেলাম খানিকটা। বেতার বিভাগে কাজ করেন দাদা,—রাণীর coronationএ প্রথম এ বিজয়বার্ত্তা দিয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করা হলো। তারপর নেপালরাজ, তৃতীয় ব্যক্তি জনতার ভেতর প্রথম জানলাম আমরা।

নিতান্ত সাধারণ, নগণ্য তেনসিং-পরিবার যাদের কাছে আমরাই ছিলাম পরম দর্শনীয় বস্তু। এক রাত্রির আলাদীনের করস্পর্শে তাঁরাই হয়ে উঠলেন জনতা-সম্বর্দ্ধিত, রিপোর্টার পরিবেষ্টিত, পৃথিবী-বরেণ্য, প্রকৃতি-বিজয়ী, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, সাহসী বীর তেনসিং। এ্যামব্যাসি ক্লাবে তেনসিং-পত্নী তদীয়া দুই কন্যাসহ সম্বর্দ্ধিতা হলেন। দুদিন আগেও যে সব মহামান্যা উচ্চপদধারিণী স্বামীর গরবে গরবিণীরা তাদের দেখলে নাসিকা কুঞ্চিত করতেন তাঁরাই পরম আগ্রহভরে নানা ভঙ্গিতে তাঁদের সঙ্গে ফটো তুলিয়ে ধন্যা হলেন। বীরভোগ্যা পৃথিবী। অজ্ঞাত, অখ্যাত, এক দার্জ্জিলিংবাসী দরিদ্র শের্পা আজ নেপালরাজ, কাল রাষ্ট্রপতি, পরশু নেহেরু; তার পর দিন ইংলণ্ডেশ্বরী কর্ত্তৃক অভিনন্দিত ও সাদরে গৃহীত হতে লাগলেন।

কোন দিন কোন নেপালবাসী যাঁর খোঁজ নেয়নি ভুলক্রমেও, কোথায় কোন্ বনের আড়ালে লুকিয়েছিল ভুঁই-চাপা—ভুঁই ফেটে তার বিজয়-গর্ব্বিত মুখ বেরুতেই সাড়া পড়ে গেল সারা নেপালে, নেপাল দক্ষিণ-বাহু তেনসিং, তুমি ভারতবাসী না নেপালী? নেপাল বলবর্দ্ধক তেনসিং তুমি কার পতাকা আগে হিমালয়ের উন্নতশিরে এঁটে দিয়ে এলে? সে কি ভারতের না নেপালের? নেপাল-সমুদ্র তোমার কোন্ Nationality?

রোজ দলে দলে ছাত্র গিয়ে তাকে বোঝাতে লাগলো, বীর

তেনসিং, তুমি আমাদের ভাই, আমাদের গর্ব্ব, এশিয়ার গর্ব্ব, পৃথিবীর গর্ব্ব, তোমার গর্ব্বে নগণ্য আমরা, আমরাও গর্ব্বিত, তেনসিং-পত্নীর তখনও এসব খেতাবের মর্ম্মোদ্ঘাটন করা সম্ভব হয় নি—তাঁর স্বপ্ন খেতাব নয়, ভাঙ্গা কুঁড়ের পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ঝকঝকে ছোট্ট একখানি বাড়ী, মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা, সচ্ছল ভাবে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা।

তখন কি তাঁর ধারণা ছিল, দুদিন পর তাঁর ভাগ্যের রাজোচিত পরিবর্ত্তনের খবর। তারিখটা ঠিক মনে নেই। তেনসিং, হিলারী, হাণ্ট কাটমণ্ডু উপত্যকায় নেমে এসেছেন—তাঁদের প্রথম অভিনন্দন জানানো হবে নেপালরাজ-প্রাসাদে—আমাদের বাড়ী খুব দূরে নয়, কাজেই দলবদ্ধ ভাবে রওনা দিলাম প্রাসাদোদ্দেশে, আমরা এসে পৌঁছুতেই টগবগিয়ে রাঙা ঘোড়ার 'পরে সাদা পোষাকে মেয়েরা, তারপর ব্যাণ্ড পার্টি, তারপর ছেলের দল, এর পরের জীপে মিঃ হাণ্ট ও আরো কেউ, পরের জীপে জোড়হস্ত, বিজয়গর্ব্বে গর্ব্বিত, স্মিতহাস্য মুখে তেনসিং, তারপর হিলারী, সর্ব্বশেষে আবার ছেলেদের দল গিয়ে ঢুকলো প্রাসাদে।

প্রকৃতি বিজয়ের উত্তেজনা কমলে রওনা হলাম এখানকার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ শঙ্করাচার্য্য-স্থাপিত পশুপতিনাথ দর্শনে। এখানে যান-বাহনের বড় বেশী অসুবিধে, এক মোটর, না হয় হাঁটা। মন্দির প্রায় ৩ মাইল দূর, কাজেই গাড়ী ছাড়া উপায় নেই। ডাণ্ডির কিছু কিছু চল আছে সহরে। কিন্তু সহরবাসী সহরে তাতে বড় চাপে না, পথে রাস্তার পাশে ছোট ছোট বহু মূর্ত্তি চোখে পড়লো, একমাত্র গণেশ মূর্ত্তিরই বাঙলা দেশের মূর্ত্তির সাথে সাদৃশ্য আছে। তাছাড়া অন্য কোন মূর্ত্তিই সম্পূর্ণ বাঙালা দেশের মত নয়। কিছুটা দূর দূরই পাহাড়ের ফাটল থেকে পাথরের মকর বা সিংহ-মুখ থেকে জল বেরুচ্ছে—কোন কোন যায়গায় শুধু কয়েকটি পাথর বসিয়ে জলের ধারা বার করা হয়েছে। এর চার ধারেও রয়েছে ছোট ছোট পাথরের মূর্ত্তি, কয়েকটা মন্দির পড়লো—নেপালে যত মন্দিরই দেখেছি সবগুলো প্যাগোডা আকারের। চার দিকে দেখতে দেখতে একেবারে মন্দিরের সামনে এসে পড়লাম। এখানকার পশুপতিনাথ অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা, কি দেখবো—রামকৃষ্ণের সাধনা বা রামপ্রসাদের ভক্তি কিছুই আমাদের নেই; তাই বার বার 'মন বলে তুমি আছ ভগবান, চোখ বলে তুমি নাই।'

মন্দিরদ্বারে এসে জুতো খুলে ঢুকলাম মন্দির-প্রাঙ্গণে। দৃষ্টি বাধা পেল সামনে একটু উঁচু পিলারের ওপর পিতলের বৃষ মূর্ত্তিতে। মহাদেব-বাহন পরম ভক্তিভরে গলা উঁচিয়ে মন্দিরের সামনে বসে আছে! বিরাটত্বে এটা দুটো বৃষ অপেক্ষা বড় বই ছোট হবে না। শোনা যায়, পশুপতিনাথ দর্শনের আগে এ বৃষ দেখা ভাল নয়—কিন্তু মন্দিরদ্বার দিয়ে ঢুকলে চোখকে যতই শাসন করো না কেন, না দেখে উপায় থাকে না। মন্দির বন্ধ—দুপুরে বন্ধ থাকে। কাজেই ঘুরে ঘুরে কারুকার্য্য দেখতে লাগলাম। প্যাগোডা আকারের বিরাট মন্দির, ওপরটা সম্পূর্ণ পেতল দিয়ে মোড়ানো। মন্দিরের চার দিক বেষ্টন করে পেতলের স্তম্ভের ওপর চার থাকে প্রায় সহস্র প্রদীপ বসানো। শুনলাম, বিশেষ বিশেষ দিনে সেগুলো জ্বালানো হয়। মন্দিরের চারমুখের প্রতি দ্বারে দুটো করে পরী প্রদীপ হস্তে। পাশে দুটো সিংহ। মন্দিরগায়ে বহু সূক্ষ্ম কারুকার্য্য। তার ভেতর বহু ড্রাগন ও মৎস্যকুমারী-জাতীয় মূর্ত্তিও রয়েছে, মনে হয় এগুলো রূপোর তৈরী। এ্যামব্যাসি বা লিগেসনের লোকদের খুব খাতির নেপালে, তাই কয় মিনিট আগেই দরজা খুলে গেল। শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি, কিন্তু লিঙ্গগাত্রে চারদিকে চারটে মুখ বসানো। পশুপতিনাথ জাগ্রত কিনা জানি না—কিন্তু চার দিকের গম্ভীর নিস্তব্ধ আবহাওয়ায় ভক্তির সঞ্চার হয় হৃদয়ে সহজেই। মন্দিরের তিন দিক ঘিরিয়ে ঘিরিয়ে ধর্ম্মশালা, তাতে বিশেষ বিশেষ দিনে ধর্ম্মার্থীদের ভীড় থাকে, সেদিনও ছিল খুব অল্প—২।১ জন সাধু ধুনি জ্বালিয়ে আপন কর্ম্মে ব্যস্ত—নীচে পেছনে বাগমতী নদী নিস্তব্ধে তার প্রাণের অর্ঘ্য জানাচ্ছে পশুপতি-নাথের চরণে। মহাদেব অতি দীন-দরিদ্র—অন্নপূর্ণার করুণা ছাড়া তাঁর দিন চলে না, তবু তিনি দেবশ্রেষ্ঠ, তাই মানুষ তাঁকে রাজসিক ভাবেই রাজার উপাচারে সাজিয়েছে—ওপরে অতি সূক্ষ্ম জালের কাজ করা রূপোর চাঁদোয়া, বহুমূল্য স্বর্ণ-আচ্ছাদন, বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার—তাঁর ভোগ-সেবা রাজারই মত।

খালি হাতে দেব, গুরু ও রাজ-সন্দর্শনে যেতে নেই—কিছু ফুল ও মিষ্টি সঙ্গে নিয়েছিলাম—চারদিকের মুখে সে মিষ্টি একটু ঘিরিয়ে রেখে দিল, ফুলের মালা তাঁর গলায় পরানো হলো। একটি ফুলের মালা, খানিকটা চন্দন ও প্রসাদ পেলাম। এ চন্দন অতি পবিত্র ও তীর্থার্থীদের কাছে এর অত্যন্ত চাহিদা।

প্রতি পূর্ণিমায় বিশেষ করে শিবরাত্রির দিন পশুপতিনাথের ভোগ দেখবার মত। কিন্তু আমরা তো পুণ্যপ্রত্যাশী নয়, নতুনত্ব পিয়াসী আমাদের মন। তাই শিবরাত্রির পশুপতিকে দেখবার বাসনা নিয়ে হয়তো আর কোন দিন যাওয়া হবে না। ফিরবার আগের দিন শনিবারে পূর্ণিমা পড়লো। রওনা হবো শেষ রাতে, অসম্ভব বৃষ্টি ও দুর্য্যোগ, তবু রওনা হলাম বিকেল চারটের সময় হেঁটেই, কারণ গাড়ী পাওয়া গেল না। আমাদের পক্ষে তিন মাইল রাস্তা হেঁটে যাওয়া সাহসেরই পরিচয়, বিশেষ এ দুর্য্যোগে; কিন্তু কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না, কেষ্টর জন্য এ সাহসটুকু করলাম।

মন্দিরে পৌঁছলাম পরিশ্রান্ত পথক্লান্ত ভিজে কাক হয়ে—বর্ষাতি ও ছাতাকে উপেক্ষা করে মহাদেব তাঁর আশীষ বর্ষণ করছেন সর্ব্ব অঙ্গে। আবার হেঁটে যেতে হবে মনে করতেও ভয় হচ্ছিল। দর্শনের আগ্রহ ও উৎসাহ অনেক কমে গেছে। কিন্তু ভেতরে এসে সর্ব্ব ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে—মন্দির-প্রাঙ্গণ লোকে ভরে গেছে, এক দিকের প্রাঙ্গণ আলাদা করে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে। পাণ্ডারা কয়েক জন মাথা মুড়িয়ে নূতন ধুতি পরে, মুখ, নাক একটা কাপড়ে বেঁধে ঝুড়ি ঝুড়ি ভাত এনে ফেলছে। ৪।৫ জন সেটা টিপে টিপে চৌকো করে রাখছে—এমনি ভাবে ৯মণ ঘি দিয়ে আধ-সেদ্ধ ভাত রাখা শেষ হলে চার দিকে ৮৪ রকমের ব্যঞ্জন সাজিয়ে দেওয়া হলো। পুরোহিত এলেন, পূজো সুরু হলো। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, নিস্তব্ধ প্রাঙ্গণে সোনার প্রভা ছড়িয়ে পূর্ণিমার চাঁদ তার প্রেম-ভক্তি নিয়ে দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে নীল চাঁদোয়ায় সহস্র তারা উঠলো, ঝিকমিকিয়ে হেসে হেসে উঠলো চাঁদের প্রেমে মন্দিরের চূড়ো, চাঁদের স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে। জ্বলে উঠলো মন্দির বেষ্টন করে সহস্র ঘিয়ের প্রদীপ ও মশাল।

ধূপ ধুনো ও কুসুমের সুরভিত হৃদয়-নিঙড়ানো প্রেম শুধু দেবাদিদেবকেই মুগ্ধ করলো না, মোহিত করলো তাঁর ভক্তদেরও। এদিক-ওদিক ১১ জন সাধু খঞ্জনি বাজাচ্ছে, মাঝে মাঝে তাঁদের ধ্যানগম্ভীর স্বর ভেসে উঠছে ওম্, ওম্, ওম্। মন্ত্রপাঠরত পুরোহিতের উদাত্ত কণ্ঠের সঙ্গে সহস্র উদ্বেলিত হৃদয়ের প্রেম ও ভক্তি লুটিয়ে পড়লো মহাদেবের চরণে। এ দৃশ্য যে দেখেছে, যে অনুভব করেছে, সেই বুঝবে এর মোহনীয়তা—এ উপলব্ধি করা যায় সমস্ত হৃদয় দিয়ে, বোঝানো যায় না কলমে। বাগমতী ও চাঁদের প্রেম বুকে নিয়ে আনন্দে কুলকুল করে জানাচ্ছে তার প্রণতি, দিচ্ছে স্নিগ্ধ হাওয়া, কেউ কেউ তার স্পর্শে স্নিগ্ধ করছে দেহকে। পাশে পুণ্যার্থীর সাথে রয়েছে বহু মুমূর্ষ। একজন মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীলোককে ১০।১২ জন লোক একটা খাটিয়ায় বয়ে নিয়ে এলো—পাশে এক বৃদ্ধ গীতা পাঠ করতে করতে আসছেন—মহাদেবের চরণে অর্ঘ্যরূপে দিতে এসেছে তাদের নির্গতপ্রায় প্রাণ। সামনেই নদীর ওপর বাঁধানো চত্বর—এই শ্মশান—মাঝে মাঝে তাতে জ্বলে ওঠে বৈকুণ্ঠলোভী মানবের দেহাবশেষ।

বাগমতীর সেতু পেরিয়ে চললাম গুহ্যেশ্বরী দর্শনে। শতাধিক সিঁড়ির চড়াই-উৎরাই পার হয়ে তবে মন্দির। সিঁড়ির দুদিকে বহু ছোট ছোট শিব-মন্দির। পুণ্যার্থীর স্মরণ-চিহ্ন। এদিকে ওদিকে বহু পাথরে খোদাইমূর্ত্তিও রয়েছে—যার ভাস্কর্যের চাতুর্য্য মুগ্ধ করে মনকে। গুহ্যেশ্বরী মন্দিরের চূড়োও পেতলের তৈরী, ঝকঝক করছে সোনার মত। চূড়োয় ড্রাগন জাতীয় কোন মূর্ত্তি রয়েছে। এরও চারদিকে ধর্ম্মশালা ও মন্দির প্রাঙ্গণে পাথরের বড় বড় সিংহ ও কাছিমের মূর্ত্তি রয়েছে। এবারের পূজোপচার হচ্ছে ফল, মিষ্টি, সিঁদূর, ধূপকাটি ও সলতে—বিশেষ ভাবে তৈরী যা বিনা তৈলাক্ত পদার্থেই জ্বালানো যায়।

মন্দিরে ঢুকলাম, কোন দেবীমূর্ত্তি নাই। মাঝখানে খানিকটা যায়গা সোনার রেলিং দিয়ে আলাদা করা, চার কোণে চার প্রদীপ হাতে চার কিন্নরী-পাশে বেশ বড় ভারী এক সোনার কাছিম—ও ঠিক মাঝখানে খুব ভারী সোনার রাজদণ্ডের আকারের দণ্ড—তার ভেতরে রাখা আছে পবিত্র চরণামৃত—এ জল বাগমতীর সাথে যুক্ত—বাগমতীরই জল। দেবীমূর্ত্তির বদলে স্বর্ণ-কাছিম দর্শনে আশ্চর্য্যই হলাম কিন্তু যাকে যাই জিজ্ঞেস করো না কেন, হেসে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলবে 'ভায়া মাস্‌্, ভায়া মাস্' অর্থাৎ ভাষা বুঝি না। যাক্, অনেক কষ্টে যা উদ্ধার করা গেল, তা হচ্ছে এই—সতীর একটা অঙ্গ বাগমতীর জলে পড়া মাত্র কোন কাছিম খেয়ে ফেলে—সেটাকে তুলে নিয়ে এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়, তারই প্রতীক এই স্বর্ণ-কাছিম। কিন্তু মনে হয়, প্রবাদ জনপ্রিয় হলেও আসলে ভিত্তিহীন, অবতারের অন্যতম এক রূপ কাছিমের প্রতীক, এই স্বর্ণ-কাছিম।

এখানে একটা জিনিষ দেখে ভারী আশ্চর্য্য লেগেছে—মন্দিরে কুকুর ও মানুষের সমান প্রবেশাধিকার দেখে। আরো আশ্চর্য্য, আমাদের দেশের গোঁড়া হিন্দুরা যে জীবের নামোচ্চারণে পর্য্যন্ত জিহ্বাকে অশুদ্ধ মনে করে, সে অশুদ্ধতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য দেবনাম জুড়ে নামকরণ করেছেন 'রামপাখী'—সেই হিন্দুদেরই মন্দিরে উৎসর্গ করা হয় এই রামপাখী অথবা এর ডিম কেটে। শুনেছি, শাস্ত্রে বন্যকুক্কুট আস্বাদনেও দোষ নেই হিন্দুদেরও, কিন্তু আশ্চর্য্য এই দেশাচার! [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

বিধবা

শ্রীমালতী গুহ রায়

ভারতবর্ষে আবহমান কাল থেকে নারী-পূজার বিধি রয়েছে। কুমারী পূজা, সধবা-পূজা ইত্যাদি পূজার প্রচলন থেকে বোঝা যায় যে, নারী ভারতে সর্ব্ব অবস্থায়ই পূজিতা হয়। ভারত-সমাজের এটি একটি নিজস্ব বিশেষত্ব। অন্য কোন দেশে এ রকম নারী-পূজার প্রচলন আছে বলে আমরা জানি না।

কোন দেশ বা সমাজের নিজস্ব বিশেষত্ব, মনুষ্যত্বেরই একটি বিশেষ সম্পদ। ভারতের এই নারী-পূজার মধ্যে শুধু যে ধূপ-দীপ বা সিঁদূর-চন্দন ইত্যাদি পূজার সামগ্রীই এর বৈশিষ্ট্য, তা নয়। ভারতীয়া নারীকে যে ভারত একমাত্র ভোগেরই বস্তু মনে করে না, নারী যে তাদের চোখে দেবীমূর্ত্তিরই প্রতীক এবং শ্রদ্ধারই পাত্রী—এইটুকুই তার বিভিন্ন রূপে এ নারী-পূজার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এই যে নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, এইটুকুই ভারতের নিজস্ব সম্পদ বা শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। এ অলঙ্কার ভারতেরই যেমন শোভা পায়, অন্য দেশের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে জবরদস্তি করে তা ঢুকাতে গেলে হয়তো তত শোভা না-ও হতে পারে।

কিন্তু ভারতের এই নারী-পূজা, এই মাতৃ-পূজার মধ্যে যে একটা বিষম বৈষম্য রয়ে গেছে, এটাই বড় মর্ম্মান্তিক! এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার। ভারতের কুমারী বা সধবা হিসেবে নারী যদি শ্রদ্ধার পাত্রী হন, এমন কি পূজোপকরণ দিয়ে পূজা করেও যদি সে শ্রদ্ধা প্রকাশের রূপ পায়, তবে সমাজের বিধবা নারী সে পূজায় বঞ্চিতা কেন? তারই জন্য সমাজের পুঞ্জীভূত দুঃখ-কষ্ট অবহেলা অনাদর কেন?

বিধবা কথাটির অর্থ কি? একটি কুমারী মেয়ে সে একটি পুরুষকে অবলম্বন করে তার নিজ পিতৃগৃহ ও পরিজন থেকে নূতন সংসারে আসে, তিনিই তার স্বামী। তাঁর সংসারই তাঁর নিজের সংসার এবং সেই তাঁকে অবলম্বন করে তাঁর এ আসা ও থাকার যে সামাজিক অনুমোদন ও ধর্ম্মসংস্কার, তাই হচ্ছে বিবাহ।

এই বিবাহ-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কুমারী বা অনূঢ়া কন্যা সধবা হ'ন। এবং প্রকৃতির নিয়মে ক্রমে স্বামি-সহবাসে সন্তানবতী হলে হন মা। এই মাতৃপদবাচ্য হতে তাঁকে বয়সে, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে-গুণে বৃদ্ধি পেতে হয় না। প্রকৃতিই তাঁকে বিবাহিত জীবনে মাতৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিতা করেন। শারীরিক কোন অসুস্থতা থাকলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। মা হয়ে অবশ্য তাঁর ধৈর্য্য, স্নেহ, প্রীতি, মমতা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি ধীরে ধীরে তাঁর সন্তানকে উপলক্ষ করে ফুটে উঠতে থাকে বেশী। তাঁর মাতৃত্বের কোন সুনির্দ্দিষ্ট বয়সও থাকে না। পনেরো থেকে সুরু করে ত্রিশ-চল্লিশ এমন কি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও তাঁদের মা হতে দেখা যায়।

মা হলেই তিনি আমাদের চোখে স্বর্গাদপি গরীয়সী হয়ে ওঠেন। কেন না, মাতৃত্বেই নারীর পূর্ণ বিকাশ। বিবাহিতা নারী মাত্রেরই জীবন থেকে বিধির বিধানে যদি তার স্বামীর অভাব হয়, তবেই তিনি হন বিধবা। এর জন্যও তাঁর কোন বয়স বা কোন দোষের অপেক্ষা করে না। এমন কি, বিবাহ-রাত্রিতে স্বামীর সঙ্গে ভাল করে পরিচয় হবার আগেও তিনি স্বামিহীনা হতে পারেন,

আবার সংসারের গৌরবময়ী প্রতিষ্ঠাত্রী ও সন্তান-জননী 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' হয়েও সে দুর্ভাগ্য তাঁর আসতে পারে। দোষে, গুণে, ক্ষমায়, স্নেহে, প্রেমে, করুণায়, বাৎসল্যে ও সংসার-পরিচালন ক্ষমতায় তিনি যেমন ছিলেন তেমনি রইলেন ; তাঁর সাজান বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন, ব্যাঙ্কের টাকা, আলমারীর গহনা এমন কি আলনায় কোঁচান শাড়ীটি পর্য্যন্ত যেমন তেমনই রয়ে গেল, একমাত্র তাঁর জীবনপথ থেকে তাঁর স্বামীই শুধু বিদায় নিয়ে কোন অজানা পথে পাড়ি দিলেন ; আর ফলে তিনি হলেন বিধবা।

যে সমাজ এত দিন ধরে তাঁকে পূজা করলো, শ্রদ্ধা জানালো, সে সমাজও তাঁকে কেমন আলগা করে দিল। 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা:'। ভারতের এই অন্তর্নিহিত বাণী যাকে ধর্ম্মেরই অঙ্গ বলে গণ্য করা হয়, এই স্বামিহীনা নারীর বেলায়ই তার অন্যথা কেন যে হ'ল, এ কিন্তু কিছুতেই বোঝা যায় না। পতির অভাব ঘটলেও নারী তো সেই নারীই রয়ে গেল, রাতারাতি অন্য কিছু বা ডাকিনী যোগিনী তো বনে গেল না ?

ভারতীয়া নারীর জীবনে পতিই পরমদেবতা, পতিই তাঁর একমাত্র গতি। পতিই নারীর মূল্যনির্দ্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি। কাজেই হিন্দুনারীর কাছে স্বামীই তাঁর যথাসর্ব্বস্ব। স্বামীর তুষ্টির জন্য তিনি কী না করতে পারেন ? সেই স্বামীই যখন তাঁর জীবন থেকে বিদায় নেন, বিশ্বদুনিয়া তাঁর চোখে অন্ধকার হয়ে যায়। সংসার তাঁর কাছে মরুভূমি হয়ে দাঁড়ায়, বাঁচা-মরা দুই-ই যেন তাঁর কাছে সমান মনে হয়। সেই সময়টাতেই তাঁকে সমাজের কতগুলি নিষ্ঠুর অনুশাসন দিয়ে নাগপাশের মত বেঁধে ফেলে। প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁকে তাঁর স্বামিহীনতার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার কোন প্রয়োজন আছে বলে তো মনে হয় না। ভগবানের দেওয়া শাস্তির ভারে তিনি যখন নুয়ে পড়ে তুষের আগুনের মত ধিকি-ধিকি করে জ্বলেন, সেই সময়টাই সমাজের দণ্ড তাঁকে মরার উপর খাঁড়ার ঘা দেয়। প্রাণাপেক্ষা প্রিয় স্বামীর বিয়োগ-ব্যথায় তিনি তো তখন পাষাণের মতই হয়ে যান, তাঁর আর তখন কোন সুখ-দুঃখ জ্ঞানও থাকে না। অন্তরের যে নিদারুণ যন্ত্রণায় তিনি দগ্ধ হন, বাইরের কোন যন্ত্রণা কোন কষ্টেই তাঁর তখন অধিক কষ্ট বোধ হবার কথা নয়, তা ঠিকই। কিন্তু তবু অন্তরই যখন তাঁর এরকম নিস্পৃহ নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে, বাইরে থেকে তখন সমাজব্যবস্থা দিয়ে বাধ্য করে নির্লিপ্ততা আনবার জন্য প্রচলিত কঠোর নিষ্ঠুর ব্যবস্থা কেন ?

স্বামীর কল্যাণে যে নারী নিত্য সযত্নে নিজ সীমন্তে সিঁদুর রেখা টেনে দিয়েছেন, তিনি তো আর তাঁর স্বামীকে সর্ব্বকল্যাণ অকল্যাণের ঊর্দ্ধপথে বিদায় দিয়ে আর কোন নূতন রেখা টানতে বসবেন না ? তবে কেন নিষ্ঠুরভাবে সেই চিহ্নটুকুকে ঘষে-মেজে তৎক্ষণাৎই উঠিয়ে ফেলার জন্য এত সমারোহ ? যে স্বামীর মনোরঞ্জনে সর্ব্ব-প্রযত্নে তিনি নিজেকে সজ্জিতা করে আনন্দ পেতেন, স্বামীর অভাবে আর তো তাঁর দেহসজ্জায় বা প্রসাধনে কোন অনুরক্তি আসবে না ? তবে কেন তক্ষুণিই তাঁর পাড়ওয়ালা শাড়ীটিকে নিষ্ঠুর ভাবে খুলে নিয়ে সাদা থান পরিয়ে সম্পূর্ণ নিরাভরণা দীনা-হীনা বেশ করে দেবার জন্য সমাজ-ব্যবস্থা এতই বদ্ধপরিকর ? অন্তর থেকে যাঁর

আনন্দই জন্মের মত ঘুচে গেল, তাঁর হাতে দুগাছা চুড়ি, পরনে একটা পাড়ওয়ালা শাড়ী রইল কি না রইল তাতে তাঁর তো কিছুই এসে-যায় না। শুধু মাত্র জীবনমৃতা সদ্যোবিধবার প্রতি এক অসীম নিষ্ঠুরতারই যেন পরিচয় দেয়। সদ্য পিতৃহীন সন্তানেরা যে জননীকে অবলম্বন করে শোক লাঘব করবার চেষ্টা করবে, তাদের অন্তরে পিতৃশোকের সাথে মায়ের এই নিরাভরণা সর্বহারা রূপ যেন অসহ্য যাতনারই সৃষ্টি করে।

সমাজ-বিধান-কর্তাদের তরফ থেকে শোনা যায় যে, বিধবা নারীর শুচিতা রক্ষা করার জন্যই নাকি এ ব্যবস্থা। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ যুক্তির কোন তাৎপর্য্য নেই। শুভ্র বেশ অবশ্য শুচিতারই পরিচায়ক কিন্তু সেই শুভ্র বসনের এক কোণে একটু পাড়ের অস্তিত্ব থাকলে তার শুভ্রশুচিতা কিছুমাত্র কমে বলে মনে হয় না। তবে শুভ্রবেশ বৈধব্যের পরিচায়ক, একথা বলা যেতে পারে। কিন্তু সদ্যোবিধবা-নারী যখন ক্রমে একটু সুস্থির হন তখন তিনি এ বেশ গ্রহণ করতে পারেন স্বামীর পারলৌকিক কাজ অন্ত হলে। তত দিনে ছেলে-মেয়েরাও একটু সামলে উঠতে পারে।

জোর-জবরদস্তি করে কোন ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে অন্তরের শুচিতা রক্ষা করা যায় না। স্বেচ্ছায় যে ত্যাগ বৈরাগ্য আসে সেটাই আসল ত্যাগ-বৈরাগ্য। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ব্যবস্থা কতকটা সাহায্য করে বটে।

সন্তান ও স্বামী দুই-ই নারীর জীবনে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। উপযুক্ত পুত্রের বিয়োগ-ব্যথায় শোকার্তা জননী শোকের বেগ প্রশমিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সমাজে পাঁচ জনের সঙ্গে মিলে যান, সহজ স্বাভাবিক জীবন যাপন সুরু করে দেন। কিন্তু পুত্রবধূর জন্যই ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। তাঁরই প্রাণাধিক পুত্রের বিয়োগ-চিহ্ন তাঁর সর্বাঙ্গের কোন অঙ্গেই থাকবে না, বধূ তা বহন করবে আজীবন। শুধু যে সে তার স্বামীর বিয়োগ চিহ্নই বহন করবে তা নয়, তার দেহের কাঠামোটাতে শুধু জীবন-বহ্নিটুকু জ্বালিয়ে রাখতে যেটুকু প্রয়োজন তা ছাড়া সে তার জীবন থেকে সবই বিয়োগ করে দেবে। এই আমাদের সমাজবিধি। স্বামিহীনা নারীর কৃচ্ছ্রতাবরণ যতই অধিক হবে পাতিব্রত্যের সার্টিফিকেট সে ততই বেশী পাবে। আর স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে যদি এক চিতায় সে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে, তবে তার অমর কীর্তিই থেকে যাবে ভারতের বুকে। তার চিতাভস্ম নিয়ে পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে পুজোও করবে সমাজ। কিন্তু সে বেঁচে থাকলে, তাকে নয়।

সন্তানবিধুরা মায়ের সঙ্গে পুত্রের সম্পর্ক রক্ত-মাংসের ও নাড়ীর। সন্তান বিয়োগে তাঁর যেমন অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়, স্বামী বিয়োগে স্ত্রীরও তো তেমনি। অবশ্য স্বামিস্ত্রীতে যদি প্রকৃত ভালবাসা বা প্রেম না গড়ে থাকে তবে তো স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রেই বা জবরদস্তি করে এ শোকচিহ্ন আমরণ তার উপরে চাপান হাস্যাস্পদ নয় কি?

সংসারাসক্ত সংসারীকে গেরুয়া চাপিয়ে দিলেই কি তাঁকে সন্ন্যাসী বলা সাজে? না শান্তির সন্ধানে মন্ত্র-তন্ত্র পূজা-পাঠ নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আপন অন্তরে আমূল পরিবর্তন বোধ করেন? তেমনি বাহ্য কতকগুলি বিধি-ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে সদ্যোবিধবার পক্ষেও ও-রকম কোন ত্যাগ-বৈরাগ্য আনা সম্ভব নয়। অন্তর থেকে যার ত্যাগ-বৈরাগ্য আসবে তার জন্য কোন বাধ্য-বাধকতার দরকার করে না। জবরদস্তি করে যা করা যায় তার একটা বিষময় ফল আছেই। এক্ষেত্রেও চিরকাল তা হয়ে আসছে এবং আসবেও। অষ্টমবর্ষীয়া মেয়েকে বিয়ে দিয়ে গৌরীদান করলে পিতৃ-পিতামহ অক্ষয় স্বর্গবাস করতেন। এ-ও ভারতেরই প্রচলিত এক অমোঘ বিধি ছিল; কিন্তু যুক্তি বিচারে আজ সে স্বর্গদ্বার বন্ধ হওয়ায় মেয়েরা কটা দিন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, একটু লেখাপড়া শিখে জ্ঞানী গুণী হবার সুযোগ পায়। আর কুড়ি বৎসরে ৫।৬টি সন্তানজননী হয়ে অকাল-বার্দ্ধক্যে নুয়েও পড়ে না। অবশ্য এই থেকে আমি বলতে চাই না যে—মেয়েদের ২৫।৩০ বৎসর বা তদধিক বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে না দিয়ে শুধু জ্ঞানগুণের চর্চ্চায়ই নিযুক্ত রাখা হোক। বিধবার শুচিতা আর অষ্টম বর্ষে গৌরীদান কোনটাই যে যুক্তিপ্রমাণে টেকে না—তাই আমার বক্তব্য বিষয়। জবরদস্তি করে কোন কিছুই সমাজে চিরদিন চালান যায় না—চালান উচিতও নয়।

এতক্ষণ বলেছি স্বামিহীনা নারীর ব্যক্তিগত সাজ-পোষাকের কথা। শিশুকাল থেকে ঠাকুমা পিসীমা বা নিকট-আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব বা সমাজের বিধবা নারীর শুভ্রবেশ দেখে একটি মেয়ে হয়তো বৈধব্যের চিহ্ন হিসাবে তার শুভ্রবেশ সহজেই বরণ করে নিতে দ্বিধা করে না, যেমন নাকি সে স্বামী গ্রহণ কালে সঁথির সিঁদুর ও হাতের লোহা স্বেচ্ছায় বরণ করে নেয় এয়োস্ত্রীর লক্ষণ বলে। কিন্তু আরো একটি করুণ দিক রয়ে গেছে। বিধবারা স্বামিহীনা হবার সাথে সাথে সে সর্ব উৎসবে মঙ্গল কাজে অপয়া হতভাগিনী বলে বর্জ্জিতা হয়। বিবাহিত পুরুষের একমাত্র আত্মীয়া তাঁর স্ত্রীই নন, তাঁর মা ভগিনী ইত্যাদি থাকেন, আত্মীয় তো কতই থাকেন কিন্তু কোন কারণে তাঁর মৃত্যু হলে দুর্ভাগ্যের জন্য অপরাধী হবেন সমাজের কাছে একমাত্র তাঁর স্ত্রীই, এ কেমনতর বিধি? স্বামীর সঙ্গে যখন তাঁর ভাগ্য জড়িত ছিল তখন তো স্বামীর সর্ব সুখ-সৌভাগ্যের অংশ এক তিনিই ভোগ করতে ব্যস্ত ছিলেন না? পরিবারের প্রতিটি প্রাণীকে সে সুখ-সৌভাগ্য বিতরণ করে তার অবশিষ্টাংশটুকই তো তিনি ভোগ করে এসেছেন? সকলকে বঞ্চিত করে স্বামীর সব কিছু একলা ভোগ করতে চাইলে তো সমাজ তাকে ঘৃণার চোখেই দেখতো। স্বার্থপর হীনমনারূপে পরিচিত হতেন তিনি? আর স্বামিবিয়োগে সেই মানুষটির অভাবের যন্ত্রণাই তাঁর কাছে সব নয়, সমাজের অবহেলা অনাদরটুকু তার জন্যই পুঞ্জীভূত হয়ে উঠবে, তাই তার নামকরণ হবে বিধবা।

বিধবা নারী কোন বিবাহ-অনুষ্ঠানে থাকতে পাবেন না, এতে নাকি নবদম্পতির অকল্যাণ হবে। অথচ সেই বিবাহ-উৎসবের গুরু পরিশ্রমের কাজগুলি কিন্তু আড়াল থেকে তিনিই করে দেবেন। তাঁকে ব্রহ্মচারিণীর মত থাকতে হবে। তিনি মাছ, মাংস, পিয়াজ, রসুন ইত্যাদি উত্তেজক খাদ্য বলে কিছুই খাবেন না। আলাদা হবিষ্যিঘরে নিত্যমাজা বাসনে নিরামিষ রান্না করে তাঁকে খেতে হবে। অথচ মাছের রান্নাঘরে গিয়ে তাঁকেই কিন্তু মাছ কুটতে, রান্না করতে, পেঁয়াজ রসুন বাটতে হবে। শাস্ত্রকাররা বলেছেন 'ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনম্' কিন্তু বিধবাদের জন্য এ শাস্ত্রবচন নয়।

লতা মঙ্গেশকর —বিশু চক্রবর্তী

তীরন্দাজ
—নীলমণি রায়

—পরিমল গোস্বামী

সোনালী স্বপন

—সুচিত্রা বিশ্বাস

শ্যামলেন্দু চক্রবর্ত্ত

মুখ ও মুখোস

পল্লী বাঙলা —অর্দ্ধেন্দুকুমার ভৌমিক

—শুভেন্দুকুমার সিংহ

—শ্রীমতী কণা চট্টোপাধ্যায়

প্রতিবিম্ব

—অরুণকুমার বসু

শিমলাশৈল

পথে প্রবাসে

—অশোককুমার মিশ্র

নর্ম্মদাবক্ষে

তা থাকলে হয়তো এ শাস্ত্রবাণীর দোহাই দিয়েও বিধবাদের এ নিষ্ঠুরতা ও পরিশ্রম থেকে বাঁচানো যেতো।

যিনি কাল পর্য্যন্তও মাছ না হ'লে এক গ্রাস ভাত মুখে তুলতে পারতেন না, আজ তাঁকে দিয়েই সমাজের মাছ কাটাতে, বাটনা বাটাতে, রান্না করাতে আপত্তি নেই। শুধু তিনি তাঁরই অতিপ্রিয় এ-সব মাছ, মাংস, পেঁয়াজ রশুন নিজ হাতে রান্না করে পাঁচ পাতে পরিবেশন করে স্নানান্তে শুদ্ধ শুচি হয়ে তাঁর নিজ হবিষ্যিঘরে আতপ চাল মটর ডালে তৃপ্ত থাকলেই হ'ল? ব্যবস্থাটা চিন্তা করলেই বোঝা যায় কতটা হৃদয়হীনতার পরিচয়।

সংযম পালনই যদি বিধবাদের আহারের কঠোরতার উদ্দেশ্য বা কারণ হয়, তবে তাঁকে তাঁর এ সব অতিপ্রিয় ভোগসামগ্রীর থেকে একটু আড়ালে রাখাই ভাল নয় কি? নিত্য প্রলোভনের সুমুখে ফেলে এরকম নিষ্ঠুর পরীক্ষার কি উদ্দেশ্য? নিন্দা ও বিদ্রূপের ভয়ে হয়তো অনেকে সমাজের এ নিষ্ঠুর বিধান অসহায় ভাবেই মেনে চলেন, কেন না বিধবা মাত্রই অন্তর দিয়ে এ ব্যবস্থা যে অনুমোদন করেন তা নয়। আর এ অগ্নিপরীক্ষায়ও যে তাঁরা শতকরা শতজনই উত্তীর্ণা হ'ন, তাও বোধ করি নয়। যাঁদের অন্তরের সুপ্ত বাসনা সাময়িক সমাজ ও সংসারের শাসন-ব্যবস্থায়, ভয়ে লজ্জায় সুপ্ত থাকে, তা—একদিন না একদিন প্রকাশ পায়ই সমাজের অন্তরের অন্দর মহলে ব্যভিচাররূপে।

যে পুরুষ-সম্প্রদায় সমাজের শাসনসংস্কার বা রক্ষণব্যবস্থার জন্য নানা বিধি-ব্যবস্থা তৈরী করেন, তাঁদেরই অনেকে কিন্তু আবার নানা রকম প্রলোভনের ফাঁদ পেতে অসহায়া বিধবা নারীকে জড়িয়েও ফেলেন। পুরুষ মুক্ত জীব। তারা চট করেই আপন দুষ্কৃতি বা পাপের বোঝা ঝেড়ে-মুছে মুক্ত হয়ে পড়েন; নারী কিন্তু বিবিধ বিধানে বদ্ধ। সে চোরাবালিতে ক্রমশঃ তলিয়েই যায়; উদ্ধারের পথ পায় না। বহু প্রাচীন কাল থেকে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এমন সর্ব্বহারা বিধবাদের কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের জন্য সারাটি জীবন দুর্ব্বহ বোঝা হয়ে কেটেছে ও কাটছে। পরম পবিত্র তীর্থধাম কাশী বৃন্দাবন জগন্নাথক্ষেত্রে এরকম হৃতসর্ব্বস্ব অসহায়া নারীর অভাব নেই। তাদের খাদ্যসংযম, নিরাভরণ দেহ, শুভ্রশুচিবেশ কিংবা কেশহীন মুণ্ডিত-মস্তকও তাঁদের সে পতন থেকে রক্ষা করতে পারেনি, পারে না, পারবেও না।

কুমারী-পূজা বা সধবাপূজা না করে আমাদের এই সর্ব্বহারা বিধবা পূজারই যদি প্রচলন থাকতো, তাঁদের দেবীর আসনে বসিয়ে সমাজ ও সংসার যদি তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতো, এরকম অশ্রদ্ধা অবহেলা বা ঘৃণা দিয়ে আবর্জ্জনার মত সরিয়ে না দিত, তবেই হয়তো তাঁরা দেবী হয়ে গড়ে উঠতেন। স্বামিহীনতা তো তাঁদের ব্যক্তিগত কোন অপরাধও নয়, কলঙ্কও নয়, বিধাতারই এক অমোঘ বিধান মাত্র। তবে কেন বিধবা নারী অপরাধীর মত মুখ লুকিয়ে বেড়াবে?

স্বামীর চোখেও তো স্ত্রীই প্রিয়তমা। স্ত্রীর প্রেম ও সেবায় তিনি নাকি যে রকম তৃপ্ত হন এমন আর কারুর সেবা-যত্নে নন, এমন কি জননীরও নয়। কাজে কাজেই যে স্ত্রী অন্তিম কাল পর্য্যন্ত তাঁর সেবা করতে পেলো, তাঁরই তুষ্টি-বিধানে আত্মনিয়োগ করলো, তাঁকে তাঁর অন্তরভরা প্রেম ও দরদে ভরিয়ে পূর্ণ করে চিরবিদায় দিলেন, তাঁকে সৌভাগ্যবতী না বলে ভাগ্যহীনা বলা হবে কেন? স্বামীকে অনিশ্চিতের মুখে ফেলে রেখে সধবা অবস্থায় মৃত্যুকেই সর্ব্বসৌভাগ্য বলে ঘোষণাই বা করা হয় কেন?

আমাদের হিন্দুসমাজের নারী যে স্বামী বর্ত্তমানে নিজ মৃত্যুর জন্য নিত্য কামনা জানান তার পেছনে তো তাঁর কোন ত্যাগ বা গৌরবের কিছু আছে বলে মনে হয় না? স্বামীর তুষ্টির জন্য যে স্ত্রী হেন কৃচ্ছ্রতা নেই না বরণ করতে পারেন, তিনিই স্বামীকে অনিশ্চিতের মধ্যে রেখে মৃত্যুবরণের জন্য কখনই অধীর হতে পারেন না, যদি না এর পেছনে তাঁর দুর্ব্বহ ঘৃণ্য জীবন যাপনের ইতিহাস জড়িয়ে থাকতো। স্বামীর সেবাই যদি তাঁর ধর্ম হয়, পতিই যদি তাঁর দেবতা হন, তবে ধরার বাস্তব দেবতা ছেড়ে কল্পিত দেবতার উদ্দেশ্যে স্বর্গে যেতে তিনি কোন মতেই ব্যস্ত হতেন না। কাজেই যে স্ত্রী তাঁর স্বামী-দেবতাকে প্রাণভরা দরদ ও সেবা দিয়ে পরিচর্য্যা করে পরিতৃপ্ত ভাবেই বিদায় দিয়েছেন নিজের কৃচ্ছ্রতা দৈন্য বরণ করে, তিনি আর যাই হোন—ভাগ্যহীনা অপয়া হতে কখনোই পারেন না। অবহেলার থেকে শ্রদ্ধাই তাঁর প্রাপ্য।

কিন্তু হিন্দুবিধবা জানেন, যে গোটা সমাজ-ব্যবস্থাই পুরুষদের হাতে তাঁদের খামখেয়ালে আপন রুচিমত তৈরী। তাঁদেরই প্রয়োজনে এর সৃষ্টি, তাঁদেরই অপ্রয়োজনে এর বিলোপ। পুরুষ তার প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুর সাথে সাথে পুনর্বিবাহ করে আর একটি প্রিয়তমা বরণ করে নিয়ে আসবে, কাজেই তাঁর সেবার জন্য নূতন প্রিয়তমাই যথেষ্ট। কিন্তু তাঁর নিজের প্রিয়তমের অভাবে শুধু যে তাঁরই নিজ জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে তাই নয়, সমাজের শত নিষ্ঠুর অনুশাসনরূপ কঠোর দণ্ড তাঁকে প্রতি মুহূর্ত্তে নিষ্পেষণ করবে। তিনি সর্ব্বহারা হয়ে রিক্তা হয়েও নিষ্কৃতি পাবেন না। তাঁকে অবহেলা অযত্ন ও ঘৃণা সহ্য করে পশুর মতই বাঁচতে হবে। তাঁর ক্ষতবিক্ষত শোকার্ত্ত হৃদয় কারুর সহানুভূতি তো পাবেই না, বরং কঠোর সমালোচকের দৃষ্টিতে তাঁর প্রতিটি পাদক্ষেপ নিষ্ঠুর ভাবে চুল চিরে বিচার হবে আর তাঁর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাঁকে সকলেই প্রতারণা ও বঞ্চনা করবে।

তাই মনে হয়, নারীর যে রূপটিতে নারী পূজিতা হবার সর্ব্বাধিক উপযুক্তা, দেবীরূপে শ্রদ্ধা পেয়ে দেবী হয়েই গড়ে উঠতে সমর্থা, ঠিক সেই রূপটিতেই ভারত তাঁকে অবহেলা ও ঘৃণা দিয়ে কত দূরে নিয়ে ফেলেছে। শুচিশুদ্ধ বেশবাসে তাঁকে সাজিয়ে, পবিত্র সাত্ত্বিক আহারে তাঁকে রেখে তাঁর ত্যাগ-বৈরাগ্যের এ জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তিকেই যদি শ্রদ্ধা বা পূজো করতে সমাজ না পারবে, তবে শুদ্ধ শুচিতার দোহাই দিয়ে তার প্রতি এ নিষ্ঠুরতার প্রহসন কেন?

ভারতীয়া নারী নেহাৎ ভারতীয় ত্যাগ-বৈরাগ্যের মাল-মশলা নিয়ে তার আধ্যাত্মিক সম্পদের মধ্যে লালিতা পালিতা বলেই হয়তো তাঁর এ বৈধব্যজনিত অত্যাচার অবিচার ও ঘৃণা অবহেলা তাঁকে পশুত্বে নামিয়ে দেয়নি। দেবীত্বে পৌঁছে না দিলেও অন্যান্য দেশের তুলনায় আদর্শ-মানবীতেই রেখেছে। কিন্তু ত্যাগ-বৈরাগ্য ও ভারতীয় আধ্যাত্মিক নিজস্ব সম্পদ আজ-কাল যে ভাবে অবহেলিত হয়ে চলছে, তাতে ভবিষ্যৎ পরিণাম কি হবে বলা যায় না

অধিক চুরি করুন

সত্যেন্দ্রনাথ বাগচি

বৌদ্ধ যুগে চুরি করলে, চোরকে ভীষণ শাস্তি দেওয়া হ'তো। রাষ্ট্রীয় বিধান অনুসারে চোরের হাত, পা, কাণ প্রভৃতি অঙ্গের কোন একটি স্থান কেটে ফেলে দেওয়া হতো। থানায় 'বি, এল'-এর তালিকায় চোরের নাম নোট করবার কোন ঝামেলা ছিল না। খাতায় চোরের নাম চিহ্নিত না ক'রে চোরের অঙ্গেই চুরির নিশানা চিহ্ন ক'রে ছেড়ে দেওয়া হ'তো। চুরির যে ভীষণ শাস্তি দেওয়া হ'তো, তাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সেই সময়কার রাষ্ট্র-নীতিতে চৌর্য্যবৃত্তি ছিল অতি ভীষণ ঘৃণার বস্তু এবং রাষ্ট্রনায়কগণ—রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি সকলেই চুরি করা মহাপাপ বলেই গণ্য করতেন। সেই সব যুগে চুরিও হ'তো কম—হয়তো হতোই না। যে সব অতি সাহসী চোর নেহাৎ বিপদে পড়ে কিংবা অন্য কোন অতি প্রয়োজনীয় কারণে চুরি করতে বের হ'তো—তারা অতি সাবধানে কার্য্য সমাধা করতো। নইলে, যে শাস্তি তাদের ললাটে লেখা হ'তো সে সম্বন্ধে তারা প্রস্তুত হ'য়েই বের হ'তো। তবু এত কড়া আইন কানুন থাকা সত্ত্বেও সে যুগের দু'-একটি চুরির নজির পাওয়া যায়।

চুরিটা মানুষের একটি মজ্জাগত অভ্যাস—কিংবা এমন কোন কারণ এর পেছনে আছে, যার তাগিদ, যারা চুরি ক'রে তারা এড়াতে পারে না। কেহ অভাবের তাড়নায় চুরি করলে তার উদ্দেশ্যটা বুঝতে কষ্ট হয় না, বরং সে চুরি না ক'রে যদি ডাকাতি করতো তবে আমরা অধিক খুশী হতাম—এই মনোভাব পোষণ করে থাকি। গত দুর্ভিক্ষে ভিক্ষার চাইতে চুরি উত্তম এবং চুরির চাইতে ডাকাতি উত্তমতর, এটা আমাদের অনেকের মুখেই শোনা যেত।

কিন্তু যারা উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে চুরি করে, তাদের মনোভাব বা মতলব বোঝা দায়। তাদের মনোবিজ্ঞান বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা আমার নেই। সব আছে, বাড়ী, গাড়ী, বাড়ীতে প্রচুর অন্ন আছে—এক কথায় সবই আছে, তবু যদি সেই বাড়ী-গাড়ীর মালিক চুরিতে অভ্যস্ত থাকেন তবে আমরা তো বিস্মিত হইই—আর যারা চিরদিনের বনেদী চোর বা অভিজাত চোর তারাও কম বিস্মিত হয় না।

এই সব তথা-কথিত বড়লোকেরা কেন চুরি করেন?—অবশ্য এঁরা কি আর সিঁদ কাঠি হাতে গভীর রাত্রে ভয়ে ভয়ে চুরি করেন?—এঁরা স্পষ্ট দিবালোকে, হাজার হাজার লোকের সামনে বুক ফুলিয়ে চুরি করেন। চুরি ক'রে আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন—দশ জনের একজন হ'ন।

আর আমরা চুরি করতে পারিনে ব'লে তাঁরা আমাদের ঘৃণার চক্ষে দেখে থাকেন, আমরা সমাজ পরিত্যক্ত অর্থাৎ সোসাইটির বাইরে, লোক-চক্ষুর অন্তরালে আবর্জ্জনার ন্যায় অবাঞ্ছিত রূপে দিন কাটিয়ে দিই।

আমাদের অফিসের একজন অফিসার কেরাণী চুরি করেছিলেন—ম্যানেজারের সহি জাল ক'রে। তিনি ছিলেন কাঁচা চোর, তিনি জানতেন না যে, ঐ ভাবের চুরির ফ্যাসান বহুদিন আগে উঠে গেছে। আজ কাল এমন ভাবে চুরি করতে হবে, যাতে "কাক পক্ষীও" টের না পায়—নইলে চুরির মাহাত্ম্য কোথায়? জাল করলে ধরা পড়বার ভয় থাকে, জালে পরিশ্রমও আছে। আধুনিক চুরির আর্টে এ সব পুরোনো হ'য়ে গেছে—এক কথায় বলা যায় উঠেই গেছে। আধুনিক চুরির আর্টে এই কথাই বলে যে, এমন ভাবে চুরি করতে হবে, যাতে বিশ্ববাসী জেনেও নীরব রবে অথচ আপনার ব্রেণের প্রশংসায় পঞ্চমুখী মুখর হ'য়ে উঠবে।

এমন ভাবে চুরি করতে হবে যাতে আপনাকে বিন্দুমাত্র পরিশ্রম না করতে হয়, চৌর্য্য মাল আপনার বাড়ীতে আপনিই এসে হাজির হয়—আপনি শুধু একটুখানি নির্লিপ্ত দৃষ্টি বুলিয়ে জিনিষটাকে আপনার গৃহে যথাস্থানে রক্ষা করবেন। ব্ল্যাক মার্কেটের প্রথায় চুরির ধরণও পুরোনো হ'তে চললো।

অবশ্য চুরি বহু প্রকারের আছে। স্থান কাল পাত্র ভেদে আমরা সকলেই কিছু না কিছু চুরি প্রতিনিয়ত ক'রে যাচ্ছি। সে সব চুরিতে তত মারাত্মক কিছু হয় না—অর্থাৎ বড়লোক বা গণ্যমান্য হওয়া যায় না। ছোট বেলা থেকেই বাজার করতে গিয়ে দু'চার পয়সা চুরি করা অনেকেরই অভ্যাস ছিল বা আছে। তাতে ব্রেণের বিশেষ দরকার হয় না—ওটা সহজাত বুদ্ধির উপরেই চলে।

স্কুল-কলেজ-জীবনে পিতার পাঠানো মেস-খরচের টাকাকে হাত খরচের টাকায় রূপান্তরিত করা, সময় চুরি অর্থাৎ ক্লাস পালানো ও সেই অমূল্য সময়ে সিনেমা, খেলা প্রভৃতি দর্শন ক'রে চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করা, এবং পেন্সিল, কলম, খাতা, বই, নোট বই প্রভৃতি মামুলী ও খুচরো চুরি তো আছেই। চুরি ক'রে ধূমপানের মত মধুর ধূমপান জীবনে পাওয়া কঠিন, এবং প্রেমপত্র লেখার মত, প্রথম জীবনে কবিতা লেখার মত চুরি ক'রে কে না ধূমপান করেছেন?—

কিন্তু এই সব চুরিতে বড়লোক হওয়া যায় না, সমাজ-চিহ্নিত গণ্যমান্য হওয়াও যায় না। তবু চুরি করি, এবং করবোও। তাই বলছিলাম, ছোট বেলা থেকেই আমরা চুরির মায়া ত্যাগ ক'রে উঠতে পারিনে। আর এই জন্যই শাস্ত্র এবং পুরাণে চুরির উপর এতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ চুরিকে ঠেকাতে গিয়ে বহুবিধ আইন, কানুন, বাধা, নিষেধ, ধর্ম্মভয় প্রভৃতির বাঁধ দেওয়া হয়েছে। তবু চুরি হয় এবং চিরদিন হবেই। কোন অস্ত্র নেই যা দিয়ে চুরিকে ঠেকানো যেতে পারে।

আদম এবং ইভ চুরি করেই নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিলেন। কাজটা ভালই করেছিলেন, সেই থেকেই চুরি, প্রেম, প্রজাসৃষ্টি প্রভৃতি বহুবিধ কর্ম্মের সূত্রপাত করে গেছেন।

গোয়েন্দা বিভাগের এবং স্পাইয়ের কাজ হচ্ছে, চুরি ক'রে চোরকে ধরা। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা—বলা যায়। প্রত্যেক দেশে গোয়েন্দা আছে, স্পাই আছে—সুতরাং প্রত্যেক দেশই চুরির পক্ষপাতী, এ বিষয়ে কেহ দ্বিমত হ'তে পারবেন না।

অতএব অনায়াসে প্রমাণ করা যায় যে, সমাজ-জীবন এবং রাষ্ট্র-জীবন উভয় জীবনেই চুরি অপরিহার্য্য। আমরা যতখানি সভ্য হচ্ছি, যতখানি বৈজ্ঞানিক হচ্ছি, যতখানি শিক্ষিত হচ্ছি, যতখানি ভদ্র হচ্ছি—ঠিক তত খানিই চোরও হচ্ছি। জীবনে কেহ কোন দিন কোন কিছু চুরি করেন নাই, এমন কথা স্ফীতবক্ষে জোর গলায় বলতে পারবেন না। জীবনে প্রত্যেকেই কোন কিছু কোন দিন চুরি করেছেন, এবং এখনও ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, সোজাসুজি বা একটু বক্রভাবে চুরি করেই যাচ্ছেন। যুগ পালটাচ্ছে—চুরির ধরণও পাল্টাচ্ছে, চুরির অভিনবত্বও বাড়ছে। চুরিও দিন দিন বেড়ে চলছে।

সংবাদপত্রের সব চেয়ে বড় ও মজার খবর হচ্ছে চুরির। গরু চুরি, নারী চুরি, গাড়ী চুরি, গহনা চুরি, টাকা চুরি এবং সর্ব্বোপরি

পাকীস্তান কর্তৃক "সীমান্তের যা পাওয়া যায় তাই চুরি" সংবাদপত্রের সর্ব্বত্র পাবেন।

অতএব, বৌদ্ধ যুগে যাহা ছিল অত্যন্ত পাপের ও ঘৃণার কাজ, এই যুগে তাই হচ্ছে মহাপুণ্যের ও আনন্দের কাজ। এ যুগে চুরিই হচ্ছে জীবনযাত্রার একটা অঙ্গ বিশেষ। যে চুরি করতে পারে না, সে জীবন-যুদ্ধে জয়ী হ'তে পারে না।

সুতরাং এ যুগে অন্ততঃ আমাদের দেশে শ্রেফ্ চুরির জন্যই একজন মন্ত্রীর প্রয়োজন। এঁদের কাজ হবে, দেশে নিপুণ, ভদ্র ও বুদ্ধিমান চোর সৃষ্টি করা। দেশে দেশে চৌর্য্য-সমিতি গঠন করা। চোরদের মধ্যে প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। শ্রেষ্ঠ চোরদের পুরস্কার দেওয়া—অর্থে এবং উপাধিতে। শ্রেষ্ঠতম চোরকে মন্ত্রীর আসন দেওয়া। চুরি আইন সঙ্গত এবং তার জন্য যথাযথ 'লাইসেন্স' এর ব্যবস্থা করা।

চুরি করেই আমরা বিশ্বে শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করতে সক্ষম হব—অন্ততঃ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির টাকায় মুষ্টিমেয় দু' একজন যে কতবড় পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন, এবং পাচ্ছেন, তাহা আমাদের দেশের অতি নির্ব্বোধও প্রমাণ ক'রে দিতে পারবে।—

চুরির ফল হাতে হাতে—এর জন্য গীতার শ্লোক আউড়াতে হয় না—"কাজ করে যাও, ফলটি ভগবানের হাতে—।" যদিও এ যুগে এখনও চুরি বে-আইনি, তবু আমাদের দেশের অতি মহাপুরুষ চোরগণ কখনও পুলিশের কবলে পড়েন না। খুব সম্ভব, পুলিশও গীতার শ্লোক বাতিল ক'রে, চুরি-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছে। পুলিশই শ্রেষ্ঠ চোর—তাই তাকে অনায়াসে বাটপাড় বলা যেতে পারে। চুরির উপরেও এঁরা বিনা পরিশ্রমে চুরি ক'রে থাকেন।

সুতরাং নির্ভয়ে চুরি করে যাও, ফল হাতে হাতে। বাল্যকাল থেকে আমরা যে ধরণের চুরিতে অভ্যস্ত, সেই ধরণটাকে বুদ্ধি ও সাহসের দ্বারা অধিক উজ্জ্বল করতে হবে—বাল্যকালই হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণের প্রকৃষ্ট সময়, সেই সময়টা বৃথা স্কুল-কলেজের দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে আধুনিক জীবনযাত্রার সব চাইতে বড় পন্থা চুরি সম্বন্ধে হাতে-কলমে জ্ঞান লাভ করতে হবে। তবেই ভবিষ্যৎ জীবনে সর্ব্বজনগণ্য মহাপুরুষ হ'তে পারবেন। উত্তম রূপে চুরি করা না শিখলে এ যুগে এক পাও এগুতে পারবেন না, জীবন-যুদ্ধে পদে পদে পরাজিত হ'য়ে শেষে হতাশ জীবন যাপন করতে হবে। কথায় বলে, "চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা—।" বিদ্যাটি বৃহৎ সন্দেহ নেই, কিন্তু এ যুগে ধরা পড়বার কোনও আশঙ্কা নেই। চুরির বিস্তর রাস্তা খোলা আছে—যে কোন একটি বেছে নিয়ে চটপট এগিয়ে চলুন, আপনি নিজে ধন্য হবেন, দেশ ধন্য হবে, আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে।

এক একটি দেশ একই সাথে চৌর্য্য-তপস্যায় আত্মনিয়োগ ক'রে—চৌর্য্য-তপস্যার গভীর ধ্যানে আসন গ্রহণ ক'রে মহাপুণ্যবান, মহা শক্তিশালী, বিত্তশালী দেশের সুসন্তান হোক—এই শুভ কামনা জানাই।

উদাহরণ দ্বারা এ বিষয়ে বহু কিছু লেখার আছে—যাঁরা লিখতে চান, যাঁরা দেশকে বিত্তশালী করতে চান, যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় হ'তে চান, তাঁরা আমার উপরের লেখা থেকেই বহু মসলা সংগ্রহ করতে পারবেন। চুরি করুন এবং দেশকে চোর তৈরী করুন।

' জর্জ-মাইকেল

'উনিশ'

বিবেক-দংশনে জর্জরিত হয়ে সারা দিনটা ঘুরে বেড়ালো মোদরুল্লো। তার আসন্ন দুটি সন্তানকে সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত কর'র জন্য বৃথাই চেষ্টা করলো। কিন্তু শুধু তার কথাই বার বার মনে এলো—যার জন্ম হবে, আনন্দময় পরিবেশে সুখ, সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যে যে-প্রাণীর আবির্ভাব ঘটবে, তারই ত' দিব্য-জীবন। সন্তান অপেক্ষা প্রসূতির কথাটাই বেশী করে চিন্তা করে মোদরু। পৃথিবীর সব যাদুঘরে তার গৌরবমণ্ডিত মূর্তি যেন ইতিমধ্যেই শোভা পাচ্ছে, দেহভারে শরীরে জেগেছে স্বর্গীয় দ্যুতি। বিভিন্ন মতের শিল্পীরা বিভিন্ন ধারায় তার ছবি আঁকছে। এখন রেখা বা আঙ্গিক নিয়ে কে আর বিরোধ বাধাবে? দেবতা সৃষ্টি করে স্বয়ং মোদরু আজ দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সুন্দর প্রাসাদে ওরই কোলে চড়ে দেবতা শ্বেতমর্মরের সিঁড়ি অতিক্রম করবে,—চারপাশের দেওয়াল উজ্জ্বল সিল্কে মোড়া।

প্রিন্‌সেসের প্রাসাদের সামনে এল রুদ্ধ দরজার ঘণ্টা বাজানোর সময়। মোদরুর মনে হ'ল তার বুকটা বুঝি তীব্র বেদনায় কাঁপছে। আঃ! সে কি এই প্রথম এ বাড়ীতে এল!

"রাজকুমারী বাড়ী নেই, দুচার দিনের ভেতর ফিরবেন না।" কথা কটি অতি মৃদু গলায় পরিচারক বলল। যেন কেউ শুনে ফেল্‌বে এই তার আশংকা।

তাকে গলাটিপে মেরে ফেল্‌তে পারতো মোদরুল্লো। ভয়ে ভয়ে সরে যায় বিস্মিত পরিচারক। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামার সময় রুদ্ধ দুয়ারের দিকে বার বার সতৃষ্ণ নয়নে তাকায় মোদরু।

কেন?—ঠিক এই সময়টিতে মোদরুকে কিছু না জানিয়ে এমন হঠাৎ চলে গেল রাজকুমারী! একি তার সেই চিঠির প্রতিক্রিয়া! দু তিন দিন! কেন? কখন? কোথায়? কিসের দাবীতে এমন করে চলে গেল?···অন্য কোনও প্রেমিকের আবেদনে সাড়া দেওয়ার মতো মেয়ে ত' সে নয়। তারপর সেই দিব্য-শিশুটির কি হবে? ' সারা-পৃথিবীর আশা ও আনন্দের বাণীবাহক মোদরুল্লোকে এই ক্ষীণাঙ্গী এই সুক্ষ্মদেহী দেবকন্যা কি খেলার সামগ্রী পেয়েছেন? মোদরুল্লোকে কি তিনি প্রহসনের চরিত্র বিশেষ ঠাউরেছেন? রাজকুমারীর মনে কি সম্মুখে প্রসারিত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই?

বাড়ী ফেরার পর হারিকট-রুজ প্রশ্ন করে—"কি হয়েছে তোমার মোদরু? ব্যাপার কি?"

ওর মুখের পানে তাকায় মোদরু। ওর মুখটাও রক্তহীন, গালে কিঞ্চিৎ পেলব নীলারুণাভ বর্ণ লেগে আছে তাই, নইলে অতি কুৎসিৎ দেখাতো। হারিকটের জন্য মনে করুণা জাগে মোদরুর। ধীরে ধীরে তার কপালে একটি চুম্বনরেখা আঁকে, কিন্তু দুর্দশাজর্জর সর্বহারার ভ্রূণ যে-দেহ ধারণ করে আছে, সেদিকে তাকানোর সাহস নেই তার মনে। কারণ, এখন আর সে বিশ্বাস করে না যে, অ না গ ত বি ধা তা এই দেহ থেকেই আবির্ভূত হবে।

বৃথাই চিন্তা করে মোদরুল্লো:

"কিন্তু সেই অনাগত বিধাতা কেন শুধু ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির মধ্যেই জন্মাবে? সে ত' আসল নয়, প্রতিলিপি মাত্র! বরং বর্তমান কালের সর্বপ্রধান শক্তি হল জনসাধারণ, সেই জনতার সৌন্দর্যে ভূষিত হয়েই অনাগত পুরুষের নবজন্ম হবে না কেন? আজ সারা পৃথিবীতে বরং ক্ষয়িষ্ণু আভিজাত্য অভিশপ্ত।"

হঠাৎ সেই সাংবাদিকের উক্তিটা মনে পড়ে মোদরুল্লোর। তখনই সে মাথা নত করে।

"বেতন পাওয়ার পূর্ব-দিনের বৈরাগ্য।"

পরদিন রাতে উঠে-পড়ে রাজকুমারীর বাড়ীর দিকে সে হাওয়ার গতিতে ছুটে চলে। সেই বিরাট প্রাসাদের এক কোণে মৃদু আলোকরশ্মি দেখা যাচ্ছে।

দৌড়ে দোরের কাছে গিয়ে সজোরে ঘণ্টাটা বাজালো মোদরু, সাধারণ অতিথির জন্য দোরের একপাশে যে ঘণ্টাটি আছে তারই একপাশে গোপনে রাখা আছে এই বিশেষ ঘণ্টাটি। আর একবার ঘণ্টাটি বাজালো মোদরু।

সহসা দরজা খুলে গেল। সেক্‌সপীয়রীয় নায়িকার মত বিবর্ণ পাণ্ডুর রাজকুমারী স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছেন। শীর্ণ, শ্রান্ত তাঁর আকৃতি। হাতে একটি টর্চলাইট, গায়ে একটি পাতলা আলখাল্লা, —তাঁর সূক্ষ্ম সেমিজটা চাপা আছে মাত্র। তার ভিতর থেকে জ্যোতির্ময়ী দেহ বেশ দেখা যায়।

ক্লান্ত অথচ মধুর গলায় রাজকুমারী বললেন—"তুমি!"

আকৃতির এই অনৈসর্গিকত্ব, এই সারল্য কণ্ঠস্বরের এই মৃদুতা সবই ওর ভালো লাগে। আঙরাখাভ্যান্তরস্থ তুষার শুভ্র পাদযুগল চুম্বনে আগ্রহ জাগে মোদরুর।

"তাড়াতাড়ি চলে এসো! আমার যে শীত করছে।"

দরজাটা বন্ধ করে নিজের কোটটি ওর গায়ে জড়িয়ে দেয়, মোদরু। তার পর অসীম প্রীতিভরে ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়। তাড়াতাড়ি পা দুটি ঢাকা দেয় রাজকুমারী, তার পর নরম গোলাপী তাকিয়াগুলি গুছিয়ে তার স্বচ্ছ দেহভার এলিয়ে দিয়ে ওর মুখের দিকে বিষাদভরা বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

ছোট্ট আলোটি তখনও জ্বলছিল, সে আলোটি নেভায়নি রাজকুমারী। মন্দিরের প্রদীপের মত সেটি জ্বলছে। এই মন্দির—মেঝেতে চমৎকার ফার-পোতা রয়েছে, দেয়ালগাত্রে সিল্কের পর্দা,—আর সোনালি ফ্রেমে বাঁধা বংশের আদিম পুরুষের প্রতিকৃতি,—পটভূমি সোনালি, সবুজ আর লাল ম্লান হয়ে এসেছে—এ যেন অমৃতলোকের সূতিকাগার, বিশ্বজনীন সৌন্দর্যের রত্নশালা। কারুকার্যখচিত চমৎকার ইতালীয় দেয়ালগিরি, গাঢ় সবুজ মণি-খচিত লেশ, আর ঐ উজ্জ্বল বিছানা, আর রাজকুমারী, দেহভারে রূপান্তরিত,—

সৌন্দর্য, সঙ্গতি ও শান্তির অপরূপ আনন্দময়ী মূর্ত্তি! মোদক্ক লক্ষ্য করল বিছানার পাশে ওর চিঠিখানি পড়ে আছে, সবে খোলা হয়েছে চিঠিটা।

ওর মুখের উদ্বেগ ও আশংকা-ভরা দৃষ্টি লক্ষ্য করেও রাজকুমারীর মুখের করুণাভরা মৃদু হাসি মুছে যাচ্ছে না। মোদক্কর অতি পরিচিত এক ভঙ্গীতে ভঙ্গুর আঙুল দিয়ে মাথায় একগুচ্ছ চুল সরিয়ে রাজকুমারী বল্লেন:

"আমাকে এবার তুমি প্রায় মেরে ফেলেছিলে···!"

কিছুই বুঝলো না মোদক্ক—কয়েক মিনিট ধরে কোনো অর্থই বোধগম্য হ'ল না।

অস্ত্রোপচার এবং আনুসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে থাকেন রাজকুমারী, নিজেদের শারীরিক ক্লেশ সম্পর্কে মেয়েরা সাধারণতঃ বিচারবুদ্ধিহীন হয়ে যেমন বিরক্তিকর ফিরিস্তি দিয়ে থাকে, এ-ও তাই। ঘৃণায় উত্তপ্ত হয়ে উঠে মোদক্কলো। রাজকুমারীর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর সে চীৎকার করে উঠে—

"ব্যভিচারিণী!" সারা বাড়ীটা সেই আওয়াজে যেন কেঁপে উঠে।

দরিদ্র মুদির দোকানের মেয়েটি ওদিকে তার গর্ভভার অসীম ক্লেশে বহন করছে, আর এই ঐশ্বর্যময়ী, স্বাধীন ললনা, বিলাস এবং প্রাচুর্য্যের মধ্যে যার জীবন কাটে, যে এক দিব্য-পুরুষের জননী হিসাবে অমরত্ব লাভ করতে পারতো, সে কিনা সাধারণ রমণীর মতো এই কুৎসিৎ কাণ্ডটা করে বসল। এক পিশাচ ডাক্তারের সহযোগিতায় ম্যাডোনা স্বয়ং ভগবান খৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করলো।

"ব্যভিচারিণী!"

প্রথমটা কথাটি উচ্চারিত হওয়া মাত্র প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিলেন রাজকুমারী। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝলেন যে, এ কোনো সাধারণ মানুষের উক্তি নয়, একটা ক্ষণিক আনন্দের সহচরী হিসাবে তাকে এই কল্পনা-বিলাসী নির্ভীক মানুষটি গ্রহণ করেনি, গ্রহণ করেছিল এক মহৎ পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে। ওর অঙ্গাবরণ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যখন ওর নগ্ন পা দুখানি সজোরে ধরেছে মোদক্ক তখন ওর সহসা তার সেই দুর্জ্ঞেয় উক্তি মনে পড়ল:

"আমি তোমাকে অভিষিক্ত করলাম, তোমাকে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করলাম।"

তীব্র বেগে রাজকুমারীকে তুলে ধরেছে মোদক্ক। তার শরীরের মাংসল অংশ চেপে ধরে কোথায় তাকে টেনে নিয়ে চলেছে কে জানে!

"তুমি আমাকে একটা সাধারণ লম্পট মনে করেছিলে? মনে করেছিলে তোমার সিল্কের বিছানা, রূপার কাপ, সুগন্ধি শরীরের বিনিময়ে আমি আমার জীবনের বহুমূল্য রজনী তোমার সঙ্গে কাটিয়েছি? আমি কি তোমার মধ্যে সেই অনাগত বিধাতার আধারের সন্ধান পাইনি? কিন্তু সেই আধার যদি অপবিত্র হয়ে থাকে,

তাহ'লে আর কি প্রয়োজন তার ? কি প্রয়োজন সেই সৌন্দর্য্যের যা স্বর্গীয় হলেও ব্যভিচারমুক্ত নয় ? কুলটার স্থান নর্দামায় !"

মাথার ওপর একবার রাজকুমারীর সেই লঘু দেহটা ঘুরিয়ে নিল মোদরুল্লো,—রাজকুমারীর কণ্ঠে এতটুকু শব্দ নেই। ঘর থেকে বার করে, বারন্দায় ফেল্‌ল সে রাজকুমারীকে তার পর পা দিয়ে তাকে ঠেলে দিয়ে মর্মর সিঁড়ি বেয়ে নীচে টেনে নিয়ে এল, তার পর সদর দরজা খোলার যে-কৌশল সে শিখেছিল সে কৌশল প্রয়োগ করে দরজা খুলে ফেল্‌ল—এই দরজা দিয়েই ইন্দ্রজালভরা কত প্রভাতে সে আশাভরা হৃদয়ে বেরিয়ে এসেছে, আজ সেই কথা মনে পড়ায় রাগে সর্বশরীর জ্বলে উঠ্‌ল…

হু হু শব্দে শীতল হাওয়া ঘরের ভিতর আস্‌ছে, সেই রাত্রে নির্জন পথে সে রাজকুমারীকে টেনে নিয়ে এল, পরণে তার সেই পাতলা সেমিজটুকু, সারা অঙ্গে আর কিছু নেই, গা দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে। রক্তের সুদীর্ঘ আঁচড়।

"আমার সৌন্দর্য্য ! এ সৌন্দর্য্য মানুষকে ধ্বংস করে ! একে রাস্তায় ফেলে চুরমার করো,—যে পুষ্পপাত্র দেবতার সেবায় উৎসর্গীকৃত, তা কলঙ্কিত হলে তাকে ভেঙে ফেলাই উচিত। কুলটার স্থান নর্দামায়, নর্দামায় !"

মাথার চুল ধরে টেনে আস্তাকুঁড়ে এনে ফেল্‌ল তাকে মোদরু, তার পাশে নর্দামা খুঁজে অবশেষে সেইখানে রাজকুমারীর দেহটা ফেলে দিল। সেইখানে কর্দমাক্ত জলে অচেতন রাজকুমারীর দেহ পড়ে রইল। তাকে ফেলে দৌড়ালো মোদরু।

কোথায় ঘড়িতে পাঁচটা বাজ্‌লো। সরু একটা গলিতে একটা মদের দোকান সবে ঝাঁপ খুল্‌ছে,—তখনও টেবলের ওপর চেয়ার রাখা রয়েছে। ভেতরে ঢুকে মোদরু এক পাঁট মদ আর গ্লাস চাইল। প্রথম গ্লাস মদ ঢেলে এক নিঃশ্বাসে সেটুকু পান কর্‌লো, তার পর আবার গ্লাস ভর্তি করলো, বোতলটা হাত থেকে নামিয়ে টেবলে রাখেনি, বোতলটা আঁকড়ে ধরে আছে। এই ভাবে গ্লাসের পর গ্লাস শেষ করলো,—দম ফেলার জন্যও থাম্‌ছে না,—তারপর দ্বিতীয় বোতল, তৃতীয় বোতল।

মুখ থেকে মদের বিশ্রী গন্ধ না মুছেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌ল মোদরু। ষ্টুডিয়োতে ফেরার পথে আরো দু' গ্লাস কারখানা-শ্রমিকের ব্রাণ্ডি পান করলো। টল্‌তে টল্‌তে ওপরে উঠে,—বিছানার ওপর মূর্চ্ছাহতের মত পড়ে রইল মোদরু।

কিন্তু হারিকট রুজ যখন বাজার করে ফিরল, তখন যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠ্‌ল মোদরু, হারিকটের হাত জিনিষপত্রে ভর্তি, সে ফলের ঝুড়িটা মাটিতে রাখ্‌লো।

"কেরোসিন আছে ?" মোদরু প্রশ্ন করে।

ঠোঁটের হাসি মুছে গেল হারিকটের।

"আছে পাঁচ ছ' বোতল।"

"নিয়ে এসো এইখানে।"

বিছানার পাশে কেরোসিনের পাত্রটা রেখে, মোদরু উঠে দাঁড়িয়ে তার সমস্ত সিল্‌ক সার্ট নিয়ে এল, এই সার্ট অতি যত্নে সে নিজের হাতে ইস্ত্রী করে, হারিকট স্বহস্তে কাচে। এখন টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলে সেই সিল্কের সার্ট।

"কি হচ্ছে এ সব ? কি করছ ?"

সেলফ্‌ থেকে কাঁচের বাসন পত্র নামিয়ে টুকরো টুকরো ক… ভাঙলো মোদরু।

বাধা দিতে সাহস হয় না হারিকটের। সে শুধু মাথা না… সে বুঝছে যে তাদের এই সামান্য ঐশ্বর্য্য ধ্বংস করার নিশ্চয়ই কো… উপযুক্ত হেতু বর্ত্তমান।

যখন সব কাপড় ছেঁড়া হ'ল, দুখানি ছাড়া সব কাঁচের বাস… ধ্বংস হল, তখন সাইড বোর্ড ভেঙে টুকরো করল, চেয়ার গু… ভাঙলো। ছোট দেয়ালগিরিটাও টুক্‌রো টুক্‌রো কর্‌লো।

"আমি যা করছি তুমিও তাই করো।" মোদরু হুকুম দেয়।

সেই সব টুক্‌রো জিনিষ হাতে যতটা ধরে তুলে নেয় মোদরু, তারপর কেরোসিনের পাত্রটা দড়ি শুদ্ধ দাঁতে চেপে ধরে বাইরে… উঠানে নিয়ে জড়ো করে। চারবার এই রকম করবার পর সেই সব ধ্বংস স্তূপের ওপর কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল।

তখন আশ-পাশের সবাই দৌড়ে এসে ওকে গালাগাল সুরু করে—রাজমিস্ত্রীর দল হৈচৈ করে, বাড়ীর প্রহরী এসে প্রাণপণে চীৎকার করতে থাকে।

অবশেষে সকলকে উদ্দেশ করে শূন্যে হাত তুলে মোদরুল্লো বলে : "তোমরা কি মনে করো শুধু এই সবই জ্বলছে—একটা বিরাট জগৎ এইমাত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। আহা ! যদি সেই খুনে স্ত্রীলোকটাকে তার অর্থ, সম্পদ, বাড়ী, গাড়ী সমেত এইভাবে জ্বালিয়ে দিতে পারতাম ! কেন পারলাম না ? শুধু দারিদ্র্যের মধ্যেই আছে সততা, আছে ঔজ্জ্বল্য। সেই মানুষের ঐশ্বর্য্য বাড়ে তার দৃষ্টিশক্তি তখনই স্থূল হয়ে যায়। হারিকট তুমি জানোনা কে এই সবের মূল্য দিয়েছে। ভাবছো আফতালিয়েন দিয়েছে ? ভাবছো আমি প্রতিভাধর তাই আফতালিয়েন আমার প্রতিভার মূল্য দিয়েছে ? নরক ! নরক ! একটা বেশ্যা এই সবের দাম দিয়েছে, আর আফতালিয়েন সেই টাকা আমার হাতে তুলে দিয়েছে। আমিও ফুলে উঠেছি, ভেবেছি এতদিনে বুঝি আমার প্রতিভা স্বীকৃত হল !—এই সব সেই স্ত্রীলোকটার জিনিষ…এসো আমাকে সাহায্য করো।"

দুজনে হাঁটু মুড়ে বসে বহ্ন্যুৎসবে মত্ত হ'ল। ফুঁ দিয়ে আগুনের তেজ বৃদ্ধি করতে থাকে, দু'একটা টুক্‌রো উড়ে মুখেও এসে পড়ে।

হারিকট-রুজ একবার থেমে বিস্মিত দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে ওঠে…

"ওঁর কথাই ঠিক ! উনি ঠিকই বলেছেন।"

তারপর প্রহরীকে বলে :

"আমি সব ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে দেব। এই নাও আগাম ভাড়া। আমরা সব কাগজের নোট পুড়িয়ে ফেল্‌বো। প্রতি পাই পয়সাটা পর্যন্ত।"

ইতিমধ্যে পুলিশ ডাকা হয়েছিল। পুলিশ এসে যখন প্রশ্ন করলো মোদরুকে এই সবের অর্থ কি ?

মোদরু বললে :—"খেলা,—খুসী, খেয়াল ! বুঝলে মিঞা ! —এখন যাই এক পাত্র টেনে আসি।"

কুড়ি

সারাদিন সারা রাত ধরে প্রাণভরে মদ্যপান করলো মোদরু, এই ভাবেই চললো আরো অনেকদিন। হারিকট-রুজ ওকে ত্যাগ

না করে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে, যেন অন্ধ উন্মাদকে পরিচালনা করছে উক্ত কুকুর।

ক'দিনেই সব টাকা ফুরিয়ে গেল। মোদক এখন লা-রোতন্দে গিয়ে ভিক্ষা করে মদ্যপান করে, একটা দলের ভেতর ভিড়ে চেয়ার টেনে বসে পড়ে, তারপর হুকুম দেয়। যাদের আগে ঘৃণা করতো, উপেক্ষা করতো, এ তাদেরই দল, তারা এখন মোদককে দলে টানতে পেরে গর্ববোধ করে।

একটু গোলাপী ধরণের নেশা হলেই আর যারা তার মদের দাম দিচ্ছে তাদের সঙ্গে বসবে না, উঠে দাঁড়াবে, তারপর নেশা জমে উঠলেই ঘুরতে আরম্ভ করবে, তখন যার তার এমন কি অপরিচিতের এঁটো গ্লাসটাও টেনে নিয়ে চুমুক দেবে। কি যে খাচ্ছে সে জ্ঞান নেই, মদ্য হ'লেই হ'ল। বীয়ার ওর তালুদেশে একটা শীতল স্পর্শ এনে দেয়, আর দুধ খেলেই বমি করে ফেলে।

হারিকট-রুজ যদি ওকে ২বরৌসকীর বাড়ী টেনে নিয়ে গিয়ে খাবারের থালার সামনে বসিয়ে দিত, তাহলে বোধ করি ও কিছুই খেত না। হারিকটকে যা খুসী করবার অধিকার দিয়েছিল মোদক, কোনো প্রশ্ন করতো না, কি এসে যায় এসব ব্যাপারে?

হুঁসিয়ার পোল ২বরৌসকী আফতালিয়েনের হাত থেকে কয়েকটা ক্যানভাস বাঁচিয়ে রেখেছিল। ইদানীং সে আর কিনছিল না কিছু। তবু প্রিনসেসের কৃপায় মোদক্লোর ছবির চাহিদা তখনও বাজারে চালু রয়েছে। এই অবস্থার প্রাথমিক সুবিধা না পেলেও ২বরৌসকী কিছু সুবিধা গ্রহণ করলো। লাভও হল। কিন্তু আফতালিয়েন এবং ২বরৌসকী উভয়েই শিল্পীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছে,—কারণ অতি দ্রুতগতিতে সে যে অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, এ সংবাদ কারো অজানা ছিল না। উভয়ে ভাবলো আর বেশী দিন ওর ক্যান্‌ভাস ধরে রাখা ঠিক হবে না,—কারণ ক'দিন পরেই প্রিনসেসের সামাজিক বন্ধুবান্ধবেরা আবার নতুন আর্টিষ্ট ধরবে, তখন মোদক্লোর ছবির দাম ছেঁড়া নেকড়ার সমান হবে, স্যুটিনের ছবি বা ক্রেমেগের স্থূল ধরণের ছবির মত দামও পাওয়া যাবে না।

মোদক অতি নীচ হয়ে পড়েছে, দুষ্মান তার প্রকৃতি। ডাক্তারের মত সহিষ্ণুতায় ২বরৌসকী তাকে শান্ত করে। কিন্তু তার স্ত্রী আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তিনি মোদকের এই সব মাতলামিতে ভয় পান, তাই ২বরো তাকে রু ক্যামপান প্রিমেয়ারে ছোট্ট পানশালা 'Cantina'য় নিয়ে গেল, বৃদ্ধা ইতালীয়ান রমণী রোসালি এই পানশালার কর্ত্রী, কানে তার দুটি বড়ো বড়ো ইয়ারিং।

শিল্পী বুগারোর মডেল ছিল একদা এই রোসালি। ভার্জিন আর সেণ্ট সিসিলিয়ার অসংখ্য ছবির জন্য রোসালিকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম দিকে এই সব 'পোজে'র জন্য গর্ববোধ করতো রোসালি—এখন বিরক্ত হয়। পৃথিবীর সব মুাজিয়মে তার মুখ তার নগ্নদেহ সোনার ফ্রেমে মহা সমারোহে টাঙানো আছে আর এখানে দিনরাত রান্নাঘরে উনানের পাশে বসে দারিদ্র্যের মধ্যে তার দিন কাটছে। একটা কাপড় কোমরে জড়িয়ে চেঁচাচ্ছে "Porco Dio!"—কিংবা মিষ্টি খাবারের মাছি তাড়াচ্ছে—"Porco Madona! Brutto Dio!"

যাই হোক, ২বরৌসকী যখন মোদককে নিয়ে তার দোকানে এল তখন তার মেজাজটা ভালো ছিল। নতুন খদ্দেরের খাতিরে কালো দাঁত বার করে রোসালি তার বিখ্যাত গালাগাল উচ্চারণ করলো। এটা শুনতে সবাই ভালোবাসে।

স্থির হল মোদক তার এই দুর্গন্ধওলা, সিঁড়ি নোঙরা রেস্তোরাঁর দেওয়ালে ছবি আঁকবে,—এই হোটেলের পৃষ্ঠপোষক ছিন্নকন্থা পরিহিত সাধারণ জনতা, তারা কেউ মজুর, কেউ শ্রমিক, কেউ ডাক্তার, কেউ বা কিউবিষ্ট—যে পাত্রে তারা খায়, সমগ্র ভোজন কালে তা পরিবর্তন করা হয় না, আর খাবার হল সাধারণতঃ স্প্যাগেটি, আর একটু ফল, এবং সিয়ান্টি মদ্য।

"দু'মুঠো অন্নের জন্য ছবি আঁকবো, এই ত' জীবন। দুর্ঘটনার পর এই সর্বপ্রথম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে মোদক—"আমিও মেহনতী মানুষ, তার বেশী আর কি, খাটো আর খাও! দিন মজুরের দাম নেব, তার বেশী আর আশা নেই আমার! বুঝলে হারিকট,—বেশী প্রেরণা মানে আর্টের বিরুদ্ধে চক্রান্ত! যে-শ্রমিক The smile of Rheims-এর ভাস্কর, অর্থের বাইরে তার দৃষ্টি ছিল, নইলে তার ঐ মূর্তি শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঁচতো না। রোসালি—আমাকে মদ দাও, আমি এখনই ছবি আঁকা সুরু করছি।"
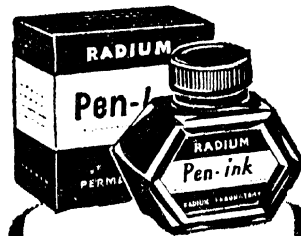
[ক্রমশঃ।

অনুবাদ :—ভবানী মুখোপাধ্যায়

কেনা কাটা কেনা কাটা

পূজোর বাজারে আমরা কি শিখলাম

বিগত পাঁচদিন ধরে অফুরন্ত ভাবে আনন্দে ভেসেছে বাংলাদেশ। আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে। পূজামণ্ডপে নতুন জামা-কাপড় পরে শিশুরা কলরব মুখর, পথে পথে অগণিত নরনারীর উৎসব-মিছিল, কিন্তু আজ সব শেষ। শূন্য-গৃহ আজি নিরানন্দময়। ঠাকুর চলে গেছেন। নিরঞ্জন শেষ। ঢাকি বাজাচ্ছে বিসর্জ্জনের বাজনা। রাত-প্রদীপ জ্বলছে মণ্ডপে মণ্ডপে একান্ত অসহায় অবহেলিত ভাবে। পূজো শেষ হল কিন্তু কি শিক্ষা পেলাম আমরা এবার? এ বৎসরের দোকানদারগণ পূজোর বাজারে কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে রাখলেন? আগামী বৎসরে এ বৎসরের অভিজ্ঞতাগুলিকে কাজে লাগাবেন নিশ্চয়ই তাঁরা। পূজোর প্রায় মাসখানেক আগেই কলকাতার রাস্তাঘাট সত্যিই বাজারের আকার ধারণ করেছিল। বিশেষ করে শেষের কয়েকটি দিন তো কলেজ-স্কোয়ার, হাতীবাগান, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বড়বাজারের হ্যারিসন রোড, কটন ষ্ট্রীট অঞ্চল, চৌরঙ্গীর ষ্টল, নিউমার্কেট, জগুবাবুর বাজার, রাসবিহারী এভিনিউ, গড়িয়াহাট, লেক মার্কেট প্রভৃতি অঞ্চল সত্যিই পূজোর বাজার-রূপ ধারণ করেছিল। এমন কি কোথাও কোথাও ক্রেতারা 'কিউ'এ দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু দোকান সমূহের যথাযথ বিন্যাসের অভাব, দামের অসামঞ্জস্য ইত্যাদি ক্রেতাদের বিশেষ অসুবিধার কারণ ঘটিয়েছে। পোষাকের দোকান-গুলি, মিষ্টান্নের দোকানসমূহ, প্রসাধন-ব্যবসায়ীর, মণিকার ও পাদুকা-প্রতিষ্ঠানেরা সকলেই পূজোর বাজারে কিছু কিছু বিজ্ঞাপনও দিয়েছেন দেখলাম। পূজোর বাজারে বিজ্ঞাপনের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু বিজ্ঞাপন (যা কেবলমাত্র টাইপের বাহারেই শেষ) যথেষ্ট ভাবে ক্রেতাগণকে আকর্ষণ করে না। একমাত্র ব্যতিক্রম দেখেছি বেঙ্গল ষ্টোর্সের। **Are you dress conscious? visit Bengal Stores.** এইটুকু মাত্র তাদের বিজ্ঞাপন। খুবই এফেক্টিভ। আগামী বৎসর সমূহে দোকানদারগণ এ বিষয়ে নজর দিন।

কলকাতার নিউ মার্কেটের যথাযথ arrangement

নয়াদিল্লীর গোলমার্কেট সত্যিই গোল। যাঁরা তা দেখেছেন তাঁরাই জানেন। কলকাতার নিউ-মার্কেট কিন্তু মোটেই নিউ নয় আজ। বাড়ীর পঞ্চাশ বছরের প্রায় বৃদ্ধের নাম তাঁর আশী বছর বয়সের বৃদ্ধা মায়ের কাছে যেমন 'খোকা', ঠিক তেমনি এই নিউ-মার্কেট। কলকাতার সবচেয়ে বড় বাজার। দেশ-বিদেশের সহস্র সহস্র লোক প্রতিদিন আসছেন এখানে। অথচ এই মার্কেটটির কোন শ্রী নেই, কোন ছাঁদ নেই। দোকানগুলি দ্রব্যগুণে এক সারিতে পরপর সাজানো তো নেইই—এমন কি ছোটদোকান এবং বড়দোকান, ফলের দোকান এবং মিষ্টান্নের দোকান পাশাপাশি থাকায় দেখতেও চোখে অতি বিশ্রী লাগে। বিশেষ করে বিদেশীদের চোখে এটি খুবই খারাপ লাগবার কথা। কারণ পৃথিবীর কোনও দেশেরই প্রধান প্রধান মার্কেটগুলি এমন ধারা নয়। জনসাধারণের সুবিধার্থে বাজারের মধ্যে কোথাও টাঙানো নেই কোন ছাপানো ম্যাপ। হায়, হায় একটি গাইডও আপনি খুঁজে পাবেন না। ডাইরেক্টরী নেই। দোকান-দারগণের নামের তালিকা ছাপা নেই কোথাও। কর্ত্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ তাঁরা মার্কেটটির সংস্কারে সচেষ্ট হন। কেন না এই বাজারটির সংস্কারের বহু পরিকল্পনা পঃ বঃ সরকার বা ক্যাল কর্পোরেশন অচিরাৎ গ্রহণ করতে পারেন।

এভারেডী ষ্টোর্সের প্রস্তুত 'রত্না' কলম উপহার গ্রহণার্থে স্কুলের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীর সমাবেশ

পূজোর বিজ্ঞাপন

পুজোর বিজ্ঞাপন অর্থে আমরা কেবলমাত্র বাংলা দেশের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন সমূহের কথাই বলছি না। অবশ্য সে বিষয়েও বলবার যথেষ্ট রয়েছে। পুজোর বাজারে দোকানের বিক্রি বাড়াবার উদ্দেশ্যে আগেকার দিনে অনেক দোকানদারগণ জিনিষপত্র ফাউ দেওয়ার কথা ঘোষণা করতেন। বলতেন প্রাইজ দেওয়া হবে এত টাকার জিনিস কিনলে। বোনাস, কমিশন ইত্যাদির বন্দোবস্ত ত' ছিলই। তা ছাড়া বহু জিনিষে পুজা কনসেশনও দেবার ব্যবস্থা ছিল। প্রাইজ ছাড়াও নানাপ্রকার লটারী, র‍্যাফেল ইত্যাদি হত। ক্রেতাগণের ক্যাসমেমোগুলির ডুপ্লিকেট থাকত দোকানেই। সেইগুলি নিয়েই হোত লটারী, র‍্যাফেল এবং তাতে পুরস্কারও থাকত লোভনীয় রকমের। এখন আবার সেই সমস্ত ব্যবস্থাগুলির কিছু কিছু ফিরিয়ে আনলে কেমন হয়? পুজোর বাজারে কেবলমাত্র 'সস্তায় জিনিস কিনুন এখানেই' কি 'পূজা কনসেশন সেল' ইত্যাদি বড় বড় ফেষ্টুন লালশালুর ওপর সাদা কাপড় কেটে লাগিয়ে বসে থাকলেই চলবে? নতুন নতুন জিনিষ ভাবতে হবে। কি করে পূজোবাজারকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, সে সম্বন্ধে নতুন এ্যাঙ্গেলে চিন্তা করতে হবে আগামী বর্ষের জন্য। কমলালয় ষ্টোর্স প্রভৃতি দোকানসমূহ মাঝে মাঝে লটারীর বন্দোবস্ত অবশ্য করেন, কিন্তু এটির বহুল প্রচার হওয়া আবশ্যক।

বাঙলার মেয়েদের পোষাকের ফ্যাশানের বালাই নেই

বাঙালী মেয়ে। প্রথম দর্শনে একনজর তাঁকে দেখে নিয়েই আপনি নিঃসন্দেহচিত্তে বলতে পারবেন কি মেয়েটি বাঙালীই? বেশ ছিমছাম। আঠারো উনিশ বয়স। ড্রেস করে শাড়ী পরা। পায়ে হিল-তোলা জুতো কি জরির কাজ-করা চটি। বাঙ্গালোর, সিফন, মাইশোর বা বড় জোর শান্তিপুর, ধনেখালি, মুর্শিদাবাদ কি টাঙ্গাইল কদাচিৎ নকল বেনারসী। হ্যাঁ, হ্যাঁ কম দামী জর্জেটও আছে। কিন্তু এইটাই কি পোষাক নয় একটি মারাঠী, গুজরাটী কি সিন্ধী মেয়েরও? রাজকুমারী অমৃতকাউরের সঙ্গে মন্ত্রী রেণুকা রায়কে তফাৎ করে নিতে পারবেন কি বর্দ্ধমান জেলার অজ পাড়াগাঁয়ের কোন ভদ্রলোক? আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, বাঙালী মেয়েদের পোষাকের ফ্যাশানের কোন বালাই নেই। অথচ প্রাচীনকালে বাঙালী মেয়েদের পোষাক-সজ্জা বিশেষ ভাবে বিখ্যাত ছিল সারা ভারতে। কাপড় কেনায়, পরার ঢংয়ে, মাথায় কবরী বিন্যাসে, পায়ের আলতা পরায় সর্বত্রই একটা বিশেষত্ব ছিল বাঙালী মেয়ের। কোথায় হারিয়ে গেল আজ সেই বিশেষত্ব? তা কি আবার ফিরিয়ে আনা যায় না নতুনকালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে? মাথা থেকে পা অবধি ভিনদেশী গন্ধ কতদিন বরদাস্ত করব আর আমরা?

অলঙ্কারের দোকানের সাজসজ্জার উন্নতি

গত কয়েক মাসের মধ্যে বেশ কয়েক বার নানাভাবে আমরা গহনাপত্রের দোকানগুলিকে তাঁদের খোল নলচে পাল্টাবার কথা বলেছি। বলেছি যে আজকের দিনে আর সেই আগেকার মত ঘরের পিছনের দেওয়াল জুড়ে সিন্দুকের সার দিয়ে সামনে গদী

কেজারের প্রস্তুত ওয়াচষ্ট্র্যাপ বিভিন্ন সাইজের
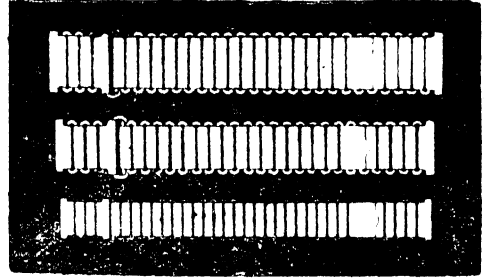
পেতে একটি ব্যালান্স রেখে, বাইরে লোহার রেলিঙের পার্টিশন তুলে, শ্রীগণেশের মাথায় বেশ করে সিঁদুর পরিয়ে কুলুঙ্গীতে তাঁকে যত্ন সহকারে রেখে ধূপধুনো দিলেই চলবে না, আজ নতুন কালে কেনাবেচা বজায় রাখতে হলে কাচের শো-কেস গড়াতে হবে, সোফা রাখতে হবে, নীয়ন আলো দিতে হবে, বিজ্ঞাপন দিতে হবে নিয়মিত, সাইনবোর্ডের শ্রী-ছাঁদ পালটাতে হবে। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে দোকানদারগণ আমাদের সে আবেদনে কর্ণপাত করেছেন। সহর ও সহরতলীর বহু দোকান তাঁদের পুরোনো হালচাল পালটেছেন। বিশেষ করে বৌবাজার অঞ্চল, ধর্মতলা, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, দক্ষিণ কলিকাতার আশুতোষ মুখার্জী রোড, গড়িয়াহাট প্রভৃতি স্থানেই এ উন্নতি দেখা গেছে। গ্রামাঞ্চলেও এ উন্নতির ব্যাপকতা গিয়ে হাজির হোক—এই আমাদের ইচ্ছা।

কি কলম ব্যবহার করবেন?

কি কলম আপনি কিনবেন? ধর্মতলা ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে কোন ফেরীওয়ালা হাকছে, সাড়ে ছ' আনায় বাবু বড়িয়া কলম। একদম ফাষ্ট (!) ক্লাস। একটি কলম তুলে আপনি হাতে নিলেন। সত্যিই তো ভারী সুন্দর দেখতে। লেখাও তো মন্দ হয় না। দামও বেশ কম। ক' মাস যাবে? দু'মাসও তো যাবে। সাড়ে ছ' আনার কলম দু'মাস গেলেই যথেষ্ট। কিন্তু আপনার কথাই যদি সত্যি হয়,
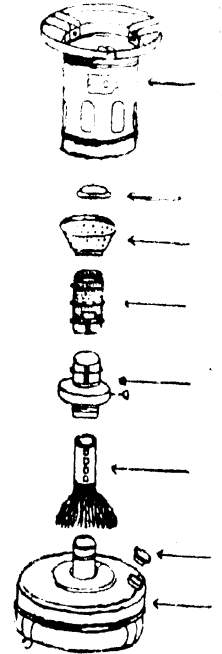
চিমনী, বার্ণার, ফ্লেমগার্ড ইত্যাদি একটি ষ্টোভের অংশ, সমূহ। কেজার লিমিটেডের পণ্য। দাম সব জড়িয়ে ১৩৷৹

অর্থাৎ সাড়ে ছ'আনার কলম যদি দু'মাসই যায় সত্যি সত্যি তাহলে কলম কেনার পিছনে বছরে আপনাকে কত ব্যয় করতে হচ্ছে? প্রায় আড়াই টাকা। কিন্তু পাঁচ ছ টাকা দামের মধ্যে বাজারে এমন সব কলমও রয়েছে যার মেয়াদ কমপক্ষে সাত আট বছর তো বটেই। কখন কখন এ কলমগুলি যত্ন করে রাখলে দশ বার বছরও যায়। পার্কার, সেফার্স, এভারসার্ফ, ব্ল্যাকবার্ড ইত্যাদি কলমগুলি দামে বেশী। কিন্তু পাইলট, রাজা, ভেনাস ইত্যাদি কম দামের কলমও রয়েছে যা অনেক দিন অবধি টেঁকসই হয় এবং কাজেও খুব ভাল। দিশী কলম রয়েছে ঝর্ণা, বন্ধু ইত্যাদি। এরাও কোন অংশে কম যায় না। দেশী মাল বলে অবহেলিত করবেন না এদের। প্ল্যাটিনাম কিংবা ইরিডিয়ম পয়েন্টেড নিব, সেলফ ফিলার, ভ্যাকুমেটিক ইত্যাদির বন্দোবস্ত এদেশের কলমেও আছে। তাও দেখতে সুশ্রী। কলম কেনার আগে দেশী কলমগুলিও যেন আপনার নজরে পড়ে, এই বক্তব্য।

বাজার-দর কে বা কারা ওঠায় নামায়?

পুজোর ঠিক সপ্তাহ খানেক আগে থাকতেই বাজার থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল আটা, ময়দা, গম এবং গমজাত দ্রব্যাদি। অসাধু ব্যবসায়িগণ এই সুযোগ গ্রহণ করলেন পুরোভাবেই। সামনে পুজো, বাজারে গম চাই। দোকানদারগণ খাবার তৈরী করবেন, গৃহস্থগণের বাড়ীতেও হবে ভালমন্দ খাবার-দাবার বছরকার দিন ক'টিতে। সুতরাং দাম বাড়লেও লোক কিনবেই এই ভেবে যাঁর হাতে যা মাল ছিল সকলেই গুদামজাত করলেন। ফলে দাম বেড়ে ৩০৲ টাকা মণ অবধি উঠল। পুজোর বাজারে জিনিষের দাম চিরকালই একটু বাড়তো। কিন্তু এখন যেন এই দাম বাড়া বা কমার কোনও [illegible] নেই। কে বাড়ায় এই দাম? ম্যানুফ্যাকচারার্স, এজেন্ট, ইম্পোর্টার্স, কাষ্টমস, রেলওয়ে ফ্রেটস, লোকাল ডিলারের কমিশন সব কিছুই এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী কি? অনাবৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তি তো আছেই। এরপরও যদি অসাধু ব্যবসায়িগণ ফাটকা করে কি জিনিষ গুদামে আটকে রেখে অধিক মুনাফা আদায় করবার চেষ্টা করেন তো ব্যবসার ক্রমিক ক্ষতিই হবে তাঁদের। হাঁসের সোনার ডিম পাড়ার পুরোনো গল্পটি আবার তাঁদের শোনাবার প্রয়োজন হবে কি?

টাকা জমাবেন কোথায়?

কেনাকাটা বিভাগের উৎপত্তি, বক্তব্য এবং বিস্তার দেখে আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণ হয়ত ধরে নিয়েছেন কেবলমাত্র জিনিষপত্র ধরে-বেঁধে কেনানোটাই যেন আমাদের উদ্দেশ্য। কিনুন, কিনুন, কিনুন—এই আমাদের কেবলমাত্র বক্তব্য। অর্থাৎ পয়সা খরচ করিয়ে দেওয়ার দিকেই লক্ষ্য। আসলে ব্যাপারটি কিন্তু তা নয়। জিনিষপত্র কিনতে গিয়ে যাতে আপনি পয়সা জলে ফেলে দিয়ে না আসেন, তারই জন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা। শুধু খরচা নয়, টাকা জমাবার ব্যাপারেও কিছু কথা আছে আমাদের। কথা হল টাকা জমাবেন কোথায়? গত কয়েক বছরে বাংলা দেশে কয়েকটি বেশ নামকরা ব্যাঙ্ক নিয়ে গোটা পঞ্চাশেক ব্যাঙ্ক লালবাতি জ্বেলেছে। এ সব দেখেশুনে ঘরের মেঝেতে আমাদের আদিম যুগের গর্ত্ত করে টাকা জমাবার সেই পুরনো পদ্ধতিটির কথা আপনার মনে হলেও হতে পারে। কিন্তু দেশী ব্যবসার মধ্যে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ইত্যাদি এখন বেশ ভালভাবেই কাজ করছেন। আপনারা হয়ত জানেন যে, আজকাল আগের মত চটপট আর ব্যাঙ্ক ফেল করানো সম্ভব নয়, কারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে গচ্ছিত সিকিউরিটি। এ ছাড়া নানা প্রকার ইনসিওরেন্স বম্বে মিউচুয়্যাল, ন্যাশনাল, হিন্দুস্থান, মেট্রোপলিটান ইত্যাদিও রয়েছে। সেখানেও আপনি নির্ভয়ে টাকা জমাতে পারেন। টাকা জমাতে পারেন নানা প্রকার সার্টিফিকেট, লোন প্রভৃতি কোম্পানীর কাগজ কিনেও। যাই করুন, যক্ষের মত টাকা ঘরে আটকে না রেখে তাকে খাটাতে দিন।

আপনার গৃহে একটি ষ্টোভের প্রয়োজন

বেলা তিনটে বাজল। চা খাবার ইচ্ছা হয়েছে আপনার। ঝি আসে নি। উনুন ধরানো হয়নি তখনও। কি করবেন? গৃহিণীকে ডাকবেন? মোটেই না। একটি ষ্টোভ এমনি সময়ে আপনাকে কতখানি সার্ভিস দেবে ভেবে দেখুন। পিকনিক করতে যান, বিদেশে বেড়াতে চলুন, সময়ে অসময়ে বন্ধু একটি ষ্টোভ। বিদেশী ষ্টোভ ছাড়াও দেশী প্রতিষ্ঠানের জিনিষ পরীক্ষা করে দেখুন না একবার। সঙ্গে প্রকাশিত চিত্রসমূহ ও মূল্য কেজার লিমিটেডের। স্বল্প দিনের প্রতিষ্ঠান হলেও এদের জিনিষ ভালই।

দম্ভ

দম্ভের ন্যায় ধর্ম্মজীবনের শত্রু আর নাই। এই কারণেই ভক্তি-পথাবলম্বিগণ দীনতাকে ভক্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ করিয়াছেন। তোমার সমক্ষে যদি একটি দশহস্ত উচ্চ মৃত্তিকার স্তূপ থাকে, তাহাতে যেমন হিমালয়কেও তোমার দৃষ্টি হইতে আবৃত করিয়া রাখিতে পারে, তেমনি একটু দম্ভ তোমার দৃষ্টি হইতে অপরের পর্ব্বত-প্রমাণ সাধুতাকেও প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে। তুমি উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে, যে দিকে যাইতে চাও সেই দিকেই একটা স্তূপ তোমার দৃষ্টিকে রোধ করে, সেটা তোমার নিজের মস্তক, তবে আর তুমি সাধুজনের সাধুতা বা কি দেখিবে এবং ঈশ্বরের মহত্ত্বই বা কি বুঝিবে! ধর্ম্মজীবন লাভের পক্ষে প্রথম প্রয়োজন আত্মপরীক্ষা দ্বারা সর্ব্ববিধ দম্ভ হইতে আপনাকে রক্ষা করা। —শিবনাথ শাস্ত্রী।

(উপন্যাস)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

৩

খুব বেশিদিনের কথা নয়। সীতারাম তখন ইউনিয়ম বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট হয়ে অবধি সে ভাবছিল ামের লোকের কিছু উপকার করবে।

সুলতানপুরের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে পার হয়ে গেছে হিঙুল দী। গ্রামটাকে দু'ভাগে ভাগ করে' দিয়েছে। কিন্তু এই 'ভাগে ভাগ করে' দেওয়ার কথা লোকজনের মনে থাকে না। ালের মত ছোট শুক্‌নো নদী—পায়ে হেঁটেই বারোমাস পার হয়ে ায়। ভাবনা-চিন্তার কোনও প্রয়োজনও হয় না।

প্রয়োজন হয় শুধু বর্ষাকালে। তাও মাত্র কয়েকটা দিন। পশ্চিমে যে-বৎসর বেশি বৃষ্টি হয়, ছোটনাগপুরের পাহাড় বেয়ে বর্ষার জলের ঢল্ নামে—সেই বছর এই হিঙুল ভরে' যায় গেরুয়া রঙের গৈরিক জলধারায়। লোকজনের পারাপার যায় বন্ধ হয়ে। সুলতানপুরের এপারের সঙ্গে ও-পারের কোনও সম্বন্ধ থাকে না।

এইখানে একটা পুল তৈরি করে' দিতে পারলে কিছু উপকার করা হয় সত্যি।

গ্রামের লোক কেউ কিছুই করবে না। একটি পয়সাও দেবে না। আগেকার দিনের কথা মনে আছে। বর্ষাকাল। হিঙুল ভরে গেছে ঘোলাটে জলে। সীতারাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে—কোন্ অদৃশ্য বিধাতা যেন তাদের এই সুলতানপুরের বুকের ওপর ধারালো ছুরি চালিয়ে গ্রামটিকে দু'ভাগ করে' দিয়েছে। হিঙুলের ওই লোহিতাভ জলস্রোত বুঝি-বা তারই রক্তের ধারা!

এইখানে একটি পুল তৈরি করে' দেবার কথা সে যে শুধু একা ভাবে তা' নয়। গ্রামের মুরুব্বি-মাতব্বরেরাও ভাবেন।

প্রতিকারের আশায় মজলিস বসে। আলাপ চলে, আলোচনা চলে, চাঁদার খাতা তৈরি হয়, অনেকগুলা নাম পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় নামের পাশে-পাশে একটা করে' সহি। টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি।

প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়, কিন্তু টাকা পাওয়া যায় না। টাকার তাগিদ দিতে দিতেই বর্ষা শেষ হয়।

কালো মেঘ কেটে গিয়ে ক্ষান্তবর্ষণ আকাশ আবার নীল নির্মল হয়ে ওঠে। হিঙুলের জল কোন্‌দিক দিয়ে কোথায় চলে যায় কেউ টেরই পায় না। শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রে হিঙুলের ভিজা বালি আবার ঝিক্‌মিক্ করতে থাকে। নদীর এপারে ওপারে আবার চলাচল সুরু হয়।

নদীর পুল তৈরি করবার কথা কারও আর মনে থাকে না। মনে থাকে শুধু সীতারাম মুখুজ্যের। তার প্রমাণ সে শেষ পর্য্যন্ত দিলে।

বারম্বার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে যাওয়া আসা করে, এর-ওর হাতে পায়ে ধরে' পুল তৈরি করবার যাবতীয় মালমসলা—লোহা, সিমেণ্ট, ইঁট—জেলা-বোর্ড থেকে সব-কিছুই বের করে' ফেললে। বাকি টাকা দেবে ইউনিয়ন্ বোর্ড। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেখাশোনা করবে।

এই পুল তৈরি করবার সময় প্রায় প্রত্যহই হিঙুলের উত্তর-দিকের পা'ড়ে একটি গাছের ছায়ায় গিয়ে বসতো সীতারাম। একদিন অমনি গিয়ে বসেছে; ঘড়িতে তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। রাস্তার ধারে মুখুজ্যে-পুকুরটা পরিষ্কার দেখা যায় সেখান থেকে।

হঠাৎ সেইদিকে নজর পড়তেই সীতারাম দেখলে, ঘাটের শান্-বাঁধানো চত্বরের ওপর এসে দাঁড়ালো তার মেয়ে মালা—কাঁকে পেতলের কলসি। কলসিটা নামিয়ে রেখে মালা ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলো। সীতারাম সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

পুকুরটা তাদের নিজের। বাড়ীর মেয়েদের ব্যবহারের জন্য সীতারামের বাবা ওটা খুঁড়িয়েছিলেন। কলকাতা থেকে ভাল ভাল কলমের চারা আনিয়ে পুঁতেছিলেন পুকুরের পা'ড়ে। মনের মত করে' ঘাট বাঁধিয়েছিলেন। ঘাটের দু'পাশে ছিল ফুলের বাগান। দেখাশোনা করবার জন্যে দু'জন মালি ছিল। এখন সে-সব কিছুই নেই। ফুলের বাগান এখন আগাছার জঙ্গলে ভরে গেছে। ফলের গাছগুলো বড় হয়েছে। ফলও ধরে প্রচুর। কিন্তু কতক খায় মানুষে, কতক খায় বাঁদরে। শেষ পর্য্যন্ত গাছের পাতা ছাড়া কিছুই আর থাকে না।

লোক জনের মজুরি চুকিয়ে দিয়ে সীতারাম উঠে দাঁড়ালো। বাড়ী যাবে। সঙ্কটাভৈরবীর মন্দির আর এণ্ডারসন সাহেবের কুঠির হড-গিয়ারের মাঝের আকাশটা রাঙা হয়ে উঠেছে। একটা তাল গাছের আড়ালে সূর্য্য বুঝি অস্ত গেল।

কিন্তু এ কি? সীতারাম মুখুজ্যে-পুকুরের দিকে তাকিয়ে দেখলে, মালা তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে! কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। ছেলেটির হাতে একটি বন্দুক।

সীতারাম ভাল করে' দেখলে। চিনতে দেরি হ'লো না। দেবুর ছেলে রঞ্জন।

সীতারামের সেইদিন প্রথম মনে হ'লো, রঞ্জনের সঙ্গে মালার বিয়ে দিলে মন্দ হয় না।

কথাটা সীতারাম কাউকে বললে না। এমন কি তার স্ত্রীকে পর্য্যন্ত না।

দেবুর বাড়ী হিজুলের এ-পারে, সীতারামের বাড়ী ও-পারে।

তবে কি তাদের বৈবাহিক সূত্রে বাঁধবার উদ্দেশ্যেই অদৃশ্য বিধাতা তাকে দিয়ে এই মিলনের সেতুটি তৈরি করালেন?

হ'তেও পারে-বা!

পুলটা তখনও শেষ হয়নি। সীতারামকে রোজই যেতে হয় হিজুলের তীরে।

সেদিনও বৈকালে সে বাড়ী ফেরবার পথে দেখলে মুখুজ্যে-পুকুরের ঘাটে মালার কাছে দাঁড়িয়ে রঞ্জন! ব্যাপারটা সেদিন আর সীতারাম উপেক্ষা করতে পারলে না! কোনও প্রয়োজন ছিল না, তবু সে সেইদিকে এগিয়ে গেল। মালা আর রঞ্জন ছিল পেছন ফিরে' দাঁড়িয়ে। মালার হাতে ছিল রঞ্জনের বন্দুক। মালা কিসের ওপর যেন তাগ্ করেছিল। রঞ্জন বোধ হয় তাকে শিখিয়ে দিচ্ছিল কেমন করে' বন্দুক ছুঁড়তে হয়।

সীতারাম ডাকলে: মালা!

বাবার ডাক শুনে মালা পেছন ফিরে' তাকিয়েই অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বন্দুকটা কিন্তু তখনও তার হাতে।

সীতারাম বললে: বন্দুক নিয়ে ছেলেখেলা করে না। ছিঃ!

রঞ্জন এগিয়ে এলো সীতারামের দিকে। হাসতে হাসতে বললে: ওটা 'এয়ার গান্' জ্যেঠামশাই, 'ফায়ার্ আর্ম্‌স' নয়।

বলেই সে তার পায়ের কাছে গড় হয়ে একটি প্রণাম করে' উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ভাল আছেন?

সীতারাম বললে, হ্যাঁ বাবা। তুমি বুঝি ছুটিতে এসেছো কলকাতা থেকে?

রঞ্জন বললে, হ্যাঁ।

তোমার বাবা কোথায়?

কুঠিতে।

সীতারাম তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে। চমৎকার ছেলে!

কিন্তু একটা না বললে ভাল দেখায় না। কি জন্যে এখানে এলো সীতারাম? তাদের লজ্জা দেবার জন্যে? এক জন নবোদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরী যোড়শী, আর একজন স্বাস্থ্য-সুন্দর প্রিয়দর্শন যুবক।

রঞ্জনের দিক থেকে চোখটা ফিরিয়ে নিলে সীতারাম। ঘাটের পাশে প্রকাণ্ড চাঁপা গাছটার দিকে তাকিয়ে বললে, চাঁপাফুল ফোটেনি?

মালা বলে উঠলো: চাঁপাফুল এখন ফোটে নাকি? তুমি তাও জানো না বাবা?

মালা যেন কথা কইতে পেয়ে বেঁচে গেল।

সীতারামও এমন ভান করলে যেন সে চাঁপা ফুল ফুটেছে কিনা দেখবার জন্যই এখানে এসেছিল। এ সময় ফোটে না জানলে সে আসতো না।

কাজেই আর তার এখানে দাঁড়িয়ে থাকবার কোনও প্রয়োজন নেই। সীতারাম চলে গেল।

কিন্তু তার চুপ করে থাকা বোধ হয় আর চলে না। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা। আগে তারই যাওয়া উচিত দেবুর কাছে। কিন্তু বংশমর্য্যাদায় তারা অনেক ছোট। উপযাচক হয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মত গলবস্ত্র হয়ে দেবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে আত্মসম্মানে কোথায় যেন লাগে! সীতারাম মুখুজ্যে ইতস্তত করতে লাগলো। দেখতে দেখতে পুলের কাজ শেষ হ'য়ে গেল।

গ্রামের সবাই পুল দেখতে এলো। এলো না শুধু দেবু চাটুজ্যে।

সীতারাম ভেবেছিল এইখানেই বলবে তার ছেলের সঙ্গে মালার বিয়ের কথাটা। কিন্তু সে সুযোগ যখন হ'লো না, তখন এক দিন যেতেই হয়।

সুলতানপুরের তখন জমজমাট অবস্থা।

দেবু এক জন মস্ত লোক।

সীতারাম মনে-মনে ভাবে, মালার কপাল ভাল। যেটা হবার হয় সেটা এমনি করেই হয়। মেয়েটা বেছে বেছে ভাবও করেছে ঠিক রঞ্জনের সঙ্গে।

সীতারাম তার বাইরের ঘরে বসে বসে বোধ করি দেবুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথাই ভাবছিল। কাঞ্চন কাছে এসে দাঁড়ালো। চায়ের কাপটি হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললে: মেয়েটার বিয়ের জন্যে একটু উঠেপড়ে লাগো। আর যে তাকাতে পারছি না মালার দিকে।

সীতারাম বললে: লাগছি। কোথায় সে?

কে? মালা?

হ্যাঁ।

পুকুরে গেল।

সীতারামের চোখের সুমুখে ভেসে উঠলো রঞ্জনের সঙ্গে তার সেই বন্দুক ছোঁড়ার দৃশ্যটা। নীরবে সে চা খেতে লাগলো।

কাঞ্চন বললে: কোথায় যেন বলেছিলে ঠিক করেছো!

সীতারাম অন্যমনস্ক হয়ে বলে ফেললে: বন্দুক দেখেছো?

বলেই কথাটা পালটে নিলে।—ছাখো, কি বলতে কি বলে ফেললাম। রঞ্জনকে দেখেছো? দেবু চাটুজ্যের ছেলে—রঞ্জন।

কাঞ্চন বললে: দেখেছি। মালাই সেদিন দেখালে। আমাদের মুখুজ্যেপুকুরে চাঁপাগাছে ফুল ফুটেছে কিনা দেখতে এসেছিল।

সীতারাম ম্লান একটু হাসলে। হেসে তার স্ত্রীর মুখের পানে তাকিয়ে রইলো।

তাকাচ্ছো যে অমন করে'?

এমনিই।

শুনছি নাকি দেবু চাটুজ্যে খুব বড়লোক হ'য়ে গেছে। ও কি দেবে? নিশ্চয় দেবে।

তাহ'লে আর দেরি কোরো না। যাও তাড়াতাড়ি। গিয়ে পাকাপাকি করে' এসো।

যাবার প্রয়োজন হ'লো না।

সীতারাম মুখুজ্যের বাড়ীর ফটকের সুমুখে সেদিন একখানা গাড়ী এসে দাঁড়ালো। ঝকঝকে নতুন মোটর-গাড়ী। মোটর থেকে নামলো দেবু চাটুজ্যে নিজে।

এসেই ডাকলে: কোথায়, মুখুজ্যে কোথায়?

মুখুজ্যে ছুটে বেরিয়ে এলো ঘরের ভেতর থেকে।—আরে আরে, দেবু যে! কি সৌভাগ্য! এসো, এসো! গাড়ী কি নতুন কিনলে নাকি?

দেবু বললে: ছিঃ,লে তুমি পুল বাঁধিয়ে দিলে, পুলের ওপর দিয়ে মোটর-গাড়ীই যদি না চললো তো পুল কিসের জন্যে?

সীতারাম বললে: ঠিক বলেছ। কিন্তু আমি অপেক্ষা করছিলাম দেবু চাটুজ্যের মোটরের জন্যে। আজ আমার সে সাধ মিটে গেল।—এসো, ভেতরে এসো।

এই বলে' দেবুকে এক রকম সে টানতে টানতে বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বললে: বোসো।

দেবু বসলো। বসেই বললে, কথাটা কিন্তু তাড়াতাড়ি সেরে নেবো। শুনেছো বোধ হয় এণ্ডারসান-সাহেব তাঁর যা কিছু সব আমাকে দিয়ে গেছেন।

শুনেছি। তুমি ভাগ্যবান। তোমার বাবা রাখাল চাটুজ্যে বড় ভাল মানুষ ছিলেন।

তাঁর আশীর্বাদ! বলেই দেবু তার হাত দুটি জোড় করে' কপালে ঠেকিয়ে তার স্বর্গত পিতার উদ্দেশে একটি প্রণাম করলে।

সীতারাম বললে: চাটুজ্যে বেঁচে থাকলে আজ তার কত আনন্দই না হ'তো!

দেবু বললে: মনে হ'লে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে নিজের হাতে রান্না করে' খাইয়ে আমাকে ইস্কুলে পাঠিয়েছেন, ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে' করে'—

আর সে বলতে পারলে না। চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে' এলো। পকেট থেকে রুমাল বের করে' চোখ মুছে, গলাটা পরিষ্কার করে' নিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাড়ীর ভেতর থেকে এক হাতে চা আর এক হাতে নিমকির একটা ডিস্ নিয়ে চাকর ঘরে ঢুকলো।

দেবু বলে উঠলো: না না এ-সব কি, এ-সব কেন?

কেন তা দেবু না বুঝলেও সীতারাম বুঝেছে। বললে, কিছু না, তুমি খাও।

সীতারাম ভাবলে, খাওয়া হোক, তার পর কথাটা পাড়বে।

দেবু কিন্তু খেতে খেতে অন্য কথা পেড়ে বসলো। বললে, সাহেব আমাকে দিয়ে গেছেন চালু কলিয়ারী একটি, আর তিনটি এখনও তৈরি হচ্ছে। কাজেই এখন শুধু খরচ আর খরচ! এই খরচ সামলাবার জন্যে এখন আমি ধার দেনা করে' চলেছি। এখন অবশ্য আমাকে ধার দেবার লোকের অভাব নেই। জামজুড়ির মাড়োয়ারী-মহাজনরা টাকা দেবার জন্যে বসে আছে। বলছে কত টাকা চাই বল, আমরা দিচ্ছি। কিন্তু সাহেব যাবার আগে আমাকে হাতে ধরে' একটি কথা শুধু বলে গেছেন, টাকার অভাবে কলিয়ারী যদি বন্ধ হয়ে যায় তাও ভালো, তবু মাড়োয়ারীর কাছে কখনও একটি পয়সা ধার নেবে না। তাই আমি আজ তোমার কাছে এসেছি দশ হাজার টাকা ধার নেবার জন্যে।

কথাটা সীতারামের বুকে এসে ধক্ করে' বাজলো।

ভুল শোনেনি তো? সীতারাম তাকিয়ে রইলো তার মুখের পানে একদৃষ্টিতে।

দেবু আবার বললে: দশ হাজার টাকা আমাকে তুমি ধার দাও। মাস দুই পরে এক হাজার টাকা সুদ সমেত আমি তোমাকে এগারো হাজার টাকা নিজে এসে দিয়ে যাব।

সীতারাম মুখুজ্যে কি যে বলবে বুঝতে পারছিল না। দেবু চাটুজ্যে আজ তার কাছে এসে হাত পেতেছে! মনে হ'লো এ তার সৌভাগ্য। আজ যদি সে সারা সুলতানপুরের সমস্ত লোককে ডেকে তাদের চোখের সুমুখে দশ হাজার টাকা তাকে দিতে পারতো!

কিন্তু হা ভগবান! অদৃষ্টের এ কী নিষ্ঠুর পরিহাস!

সীতারাম বললে: তোমার কি মনে হয় দেবু, আজ তোমাকে দেবার মত আমার দশ হাজার টাকা আছে?

দেবু বললে, নেই?

'না' বলতে সীতারামের কষ্ট হচ্ছিল, তবু তাকে বলতে হ'লো: না ভাই, নেই।

বললে: মেয়ের বিয়ের জন্যে মাত্র ছ' হাজার টাকা আমি রেখেছি অতি কষ্টে। আর কিছু সোনা—

কথাটা দেবু তাকে শেষ করতে দিলে না। বললে: আমার ছেলে রঞ্জনের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেবে?

যে-কথা বলবার জন্যে সীতারাম এতক্ষণ উন্মুখ হয়ে ছিল, দেবু নিজেই সেকথা বলে বসলো।

সীতারাম বললে, কেন দেবো না? তোমার মত যদি থাকে, নিশ্চয়ই দেবো।

দেবু বললে, বাস্, এই কথা রইলো! তোমার মেয়ের জন্যে ভেবো না। তোমার মেয়ে আমার বৌ হবে—এই আমি কথা দিয়ে গেলাম। দাও সেই ছ' হাজার টাকা। ধার করেই নিয়ে যাচ্ছি। সুদসমেত এ টাকা আমি ফিরিয়েও দেবো! ছেলের বিয়েও দেবো, তোমার মেয়ের সঙ্গে।

সীতারাম নিশ্চিন্ত হ'লো। বললে: বোসো। টাকা আমি এনে দিচ্ছি।

এই বলে' সে বাড়ীর ভেতর চলে গেল!

ওদিকে দেখে, কাঞ্চন দাঁড়িয়ে আছে দোরের পাশেই। কান পেতে সবই সে শুনেছে। তবু একবার জিজ্ঞাসা করলে, শুনলে তো?

কাঞ্চন বললে, শুনলাম।

সিন্দুকের চাবিটা দেবে এসো। আমাকে বলতেও হলো না। দেবু নিজেই বললে।

চাবিটা সীতারামের হাতে দিয়ে কাঞ্চন বললে, তবে যে শুনি এত টাকা করেছে, মস্ত বড়লোক হয়েছে, আর আজ কিনা দশ হাজার টাকার জন্যে তোমার কাছে ছুটে এলো!

সীতারাম বললে: ও রকম হয়। কলিয়ারী তিনটে চালু হ'তে দাও, তখন দেখবে।—তাছাড়া আমি টাকা রেখেছি মেয়ের বিয়ের জন্যে। সেই বিয়ের কথাটাই যখন পাকাপাকি হয়ে গেল, তখন আর আমার টাকাটা ওর হাতে তুলে দিতে আপত্তি কি!

এই বলে বাণ্ডিল বাঁধা নোটের তাড়াটা বের করে নিয়ে বললে: সিন্দুক বন্ধ কর।

টাকা নিয়ে সীতারাম বাইরের ঘরে এসেই দেখে দেবু একটা সাদা কাগজের ওপর টিকিট বসিয়ে ছ' হাজার টাকার একটা হ্যাণ্ডনোট লিখে রেখেছে।

সীতারাম বললে: হ্যাণ্ডনোট কি হবে? ছেলের বিয়ে তুমি কখন দেবে শুধু সেই কথাটি বলে যাও।

দেবু বললে: এতদিন যখন চুপ করে' আছ মুখুজ্যে, তখন আর কিছুদিন তুমি এমনি চুপ করে' থাকো। আমার ওই একমাত্র ছেলে—তোমারও ওই একমাত্র মেয়ে, বিয়েটা বেশ ভাল করেই দেবো।

সীতারাম বললে: ভাল মন্দ কিছু জানি না ভাই, মেয়ে আমার বড় হয়ে গেছে, আমার আর সবুর সইছে না।

দেবু বললে: বুঝতে পেরেছি। আর ছ'টি মাস আমাকে সময় দাও। তার আগেই আমি অবশ্য সব সামলে নেবো। তবু আমি দু'এক মাস হাতে রাখলাম।

সীতারাম কি আর বলবে? চুপ করে' তাকে থাকতেই হবে। ছ'টা মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

সীতারাম হাতজোড় করে' ভগবানের উদ্দেশে একটি প্রণাম করে' বললে : ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আজ তুমি আমাকে অনেকখানি নিশ্চিন্ত করে' দিয়ে গেলে ;

নোটের তাড়াটি পকেটে রেখে দেবু উঠে দাঁড়ালো।—আজ তাহ'লে আসি মুখুজ্যে। তুমিও আজ আমাকে অনেকখানি নিশ্চিন্ত করলে।

দেবু চলে যাচ্ছিল। সীতারাম বললে : নোটগুলো গুণে দেখলে না ?

দেবু একটু হেসে বললে : বেয়াই এখনও হওনি, এরই মধ্যে ঠকাবে নাকি ? তুমি কম দেবে না—আমি জানি।

এই বলে' দ্রুতগতিতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে সে তার গাড়ীতে চড়ে বসলো। গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে আবার বললে : চলি মুখুজ্যে। আরও চার হাজার এক্ষুণি জোগাড় করতে হবে।

দেবু আরও চার হাজার সংগ্রহ করেছিল কিনা সীতারাম মুখুজ্যে সে-সংবাদ অবশ্য রাখেনি। তবে যে-সীতারামকে বাড়ী থেকে বড় একটা বেরুতে দেখা যেতো না, আজকাল দেখা যাচ্ছে সে বেরুচ্ছে।

মুখুজ্যে-পুকুরে যাচ্ছে, খবর নিচ্ছে—চাঁপা গাছে ফুল ফুটেছে কি-না। বাবা রুদ্রেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করছে, সঙ্কটা-ভৈরবীর কাছে গিয়ে মাথা খুঁড়ছে : ছ'টা মাস তাড়াতাড়ি পার করে' দে মা, আমি নিশ্চিন্ত হই !

সীতারাম দেবুর বাড়ীতেও যায়। দেখা না পেয়ে ফিরে' আসে। দেবু যে কোথায় কখন থাকে, কেউ তা' বলতে পারে না। আহার নেই, নিদ্রা নেই, চরকির মত দিবারাত্রি ঘুরে বেড়ায়।

সীতারাম বলে : একেই বলে কর্মযোগী। এই রকম না হ'লে কখনও এত বড় হয় !

পুরনো পৈতৃক ভিটে ছেড়ে দিয়ে দেবু এখন তার নতুন বাড়ীতে উঠে এসেছে। সুলতানপুরের একটেরে তার সে নতুন বাড়ীখানি দু'দণ্ড তাকিয়ে দেখবার মত। এণ্ডারসন-সাহেব নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ীখানি তৈরি করিয়েছেন। সাহেবী ধরণে তৈরি বাঙ্গালীর বাড়ী। দিনের বেলা পায়ে হেঁটে সে বাড়ীর সুমুখে গিয়ে দাঁড়াতে সীতারামের লজ্জা করে। তাই সেদিন সে ভেবেছিল, সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপিচুপি গিয়ে দেবুর সঙ্গে দেখা করে' আসবে। কিন্তু বাড়ীর কাছাকাছি যেতেই বিজলী বাতির আলোয় চোখে তার ধাঁধাঁ লেগে গেল। যাবে কি যাবে না ভাবছে, এমন সময় একজন লোক এসে জিজ্ঞাসা করলে : কাকে চাই ?

সীতারাম বললে : দেবু—

লোকটা বোধ হয় নেপালী। বললে : দেবু-এবু কোই নেহি আছে ইহা।

আর-কিছু জিজ্ঞাসা করতে সীতারামের ভয় করছিল। তবু বললে : বাবুর ছেলে আছে ? রঞ্জন ?

লোকটা বলে উঠলো : লঠন-উঠন কোই নেই বাবু, কাহে দিক্ করতা। হাটো হিঁয়াসে। সাহেবকা মোটর অভি আ যায়ে গা। চলো।

সীতারাম সেই যে চলে এসেছে, আর যায়নি। যেতে ভরসা হয় না। বড় লোক একদিন তারাও ছিল। তাদেরও বাড়ীর দরজায় দরোয়ান থাকতো। কিন্তু এ রকম আদব-কায়দা ছিল না তাদের। ছিল না বলেই বোধ হয় এত তাড়াতাড়ি তাদের সব কিছু চলে গেল। এইটেই বোধ হয় ভাল।

তবে গরীব আত্মীয়-স্বজনদের দেখা করবার বোধহয় অন্য কোনো-রকম রীতি আছে। সেইটে কি রকম জানবার জন্যে সীতারাম ভাবছিল দেবুকে একখানা চিঠি লিখবে।

সুলতানপুরে বাস করে সুলতানপুরেই চিঠি লেখা !

তা ছাড়া আর কোনও পথ যখন নেই !

সীতারাম তার স্ত্রীকে কাছে ডেকে বললে : মালাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা কর তো, রঞ্জন এখানে আছে কিনা !

কাঞ্চন বললে : মালা জানবে কেমন করে ?

সীতারাম বললে : তুমি শুধোই না একবার জিজ্ঞাসা করে !

কাঞ্চন হাসতে হাসতে এসে খবর দিলে : না, সে এখানে নেই। কলকাতায় আছে।

প্রায় ছ' মাস হ'তে চললো—দেবু সেই যে টাকা নিয়ে গেছে, তার পর সীতারামের সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

দেবুকে চিঠি লিখবে লিখবে ভাবছে, এমন সময় হঠাৎ এক দিন সকালে সুলতানপুরেরই একটি ছেলে সীতারামের সঙ্গে দেখা করলে। ছেলেটির নাম সুধীর। প্রিয়দর্শন সুন্দর চেহারা। বয়স বাইশ-তেইশের বেশি নয়।

সীতারামের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে সুধীর।

সীতারাম প্রথমে তাকে চিনতে পারেনি।

সুধীর নিজের পরিচয় নিজেই দিলে। বললে : আমি সুধীর। দক্ষিণপাড়ার প্রমথ ভট্টাচাজের ছেলে।

সীতারাম বললে : এসো, এসো, বোসো। তার পর বল কি খবর।

সুধীর বললে : আমি এসেছি দেবু চাটুজ্যের বাড়ী থেকে। আমি ওঁর কাছেই চাকরি করি।

সীতারাম বললে : দেবুকে আমি একখানা চিঠি লিখবো ভাবছিলাম।

সুধীর বললে : চিঠি আর লিখতে হবে না। তিনিই আমাকে পাঠালেন।

কি জন্যে পাঠিয়েছে শোনবার জন্যে সীতারাম উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলো !

[ক্রমশঃ

খ্রীষ্ট-স্তব

কে আর তারিতে পারে, লর্ড জিজছ ক্রাইষ্ট বিনা গো।
পাতক সাগর ঘোর, লর্ড জিজছ ক্রাইষ্ট বিনা গো।
সেই মহাশয় ঈশ্বর-তনয় পাপীর ত্রাণের হেতু।
তাঁরে যেই জন করয়ে ভজন পার হবে ভবসেতু।

এই পৃথিবীতে নাহি কোন জন নিষ্পাপি ও কলেবর।
জগতের ত্রাণকর্ত্তা সেই জন জিজছও নাম তাঁহার।
অতএব মন কর রে ভজন তাহাকে জানিয়া সার।
তাঁহার বিহনে পাতকী তারণে কোন জন নাহি আর।

—রামরাম বসু লিখিত। 'বিশু খৃষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত' হইতে।

L. 240-X52 BG
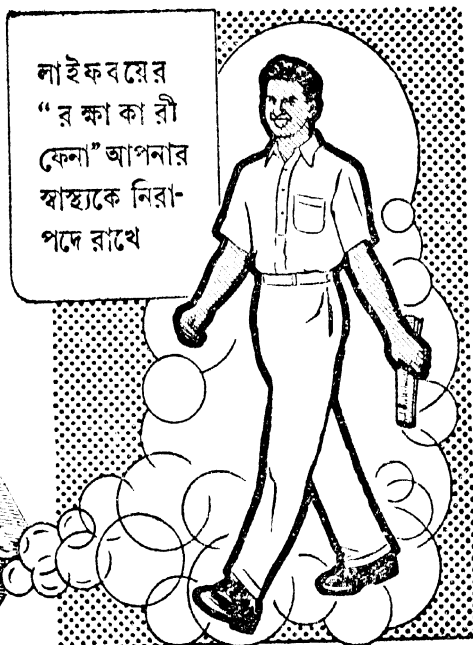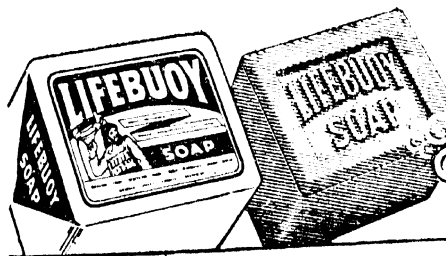
ভারতে প্রস্তুত

[উপন্যাস] শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৫

পিকনিকের দলটি রীতিমত একটা উৎকণ্ঠা ও আতঙ্ক নিয়েই পাড়ায় ফিরেছিল। বাড়ীতে এসেই শুনল—কথাটা জানাজানি হয়ে গেছে, তাছাড়া দুপুর থেকে ললিতেরও কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে প্রত্যেককেই অভিভাবকদের সামনে নানা রকম জেরার সম্মুখীন হতে হয়। মোটামুটি খবরটা শুনে এবং এ-দল থেকে দুই খিদমৎগার হেবো ও মেধোকে নিয়ে গ্রাম্য মাতব্বরগণ লণ্ঠন ও মশাল জ্বেলে জাঙ্গালে সন্ধানের জন্য রওনা হলেও দলের ছেলে মেয়েগুলি একেবারে যেন ভেঙে পড়ার মত হয়ে ওঁদের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করতে থাকে। বাচ্চাগুলি খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেও বসন্ত, রতন, রাধা, শান্তি প্রমুখ চাঁইয়েরা চণ্ডীমণ্ডপে এসে জমায়েত হয়; এদের পেয়ে সেখানকার ভাঙা মজলিস আবার জমকে ওঠে। পাড়ার সবাই ত আর অনুসন্ধানের জন্য দলে যোগ দেয় নাই—চড়িভাতির দলের চাঁইগুলিকে চণ্ডীমণ্ডপে হাজির দেখে তাদের মজলিসী মন দুলে ওঠে।

রাত তখন বেশীও হয়নি, গ্রামাঞ্চল নিশুতি হতে অনেকটা বাকি, এমনি সময় সন্ধানী দল কৃতকার্য হয়ে বহু কণ্ঠের কলরবে পল্লীপথ মুখরিত করে চণ্ডীমণ্ডপে ফিরে এলেন। পল্লীর দুটি বলিষ্ঠ যুবকের স্কন্ধে ললিত ও দেবী বিহসিত মুখে বসে আছে—তখনো পর্যন্ত তাদের গলায় ঝুলছে রজনীগন্ধার মালা। মজলিস ভঙ্গ করে মজলিসীরা দাওয়ার উপর এগিয়ে এসেছিল। সন্ধানকারীরা বারংবার নূতন করে ঘোষণা করছিলেন—জাঙ্গালে তাঁদের যেতে হয়নি, হর-গৌরীর মন্দির থেকেই জ্যান্ত হর-গৌরীকে যে অবস্থায় পেয়েছেন, সেই অবস্থায় তুলে এনেছেন।

কথাটা শুনে এবং স্বচক্ষে তাঁদের কথিত হর-গৌরীকে দেখে চণ্ডীমণ্ডপের মজলিসীরাও সহর্ষে হর-গৌরীর নামে জয়ধ্বনি দিল বটে, কিন্তু বসন্ত রাধা প্রমুখ চাঁইগুলির মুখ সব এক সঙ্গে যেন কালো হয়ে গেল। এরা অবাক হয়ে তখন ভাবছিল, তাদের এতগুলো চোখে ধূলো দিয়ে ললিত কি করে জাঙ্গালে গিয়েছিল, আর দেবীর সঙ্গেই বা মিশে মন্দিরে পালিয়ে এসেছিল? হায়—হায়, তারা ওদের চালে মাত হয়ে গেল—ললতেই ভিতে সব ভেস্তে দিলে!

সেই রাতে পশুপতি ও বগলাকে পরিবেষ্টন করে চণ্ডীমণ্ডপের প্রশস্ত আঙিনায় পল্লীর বিভিন্ন বয়সের প্রৌঢ় ও যুবকগণ আর একবার স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, এ ঘটনা হর-গৌরীর ইচ্ছাতেই হয়েছে; দেব-দম্পতির দোহাইতেই হয়েছে এর সৃষ্টি, এ যেন গোড়া থেকেই গড়ে দিয়েছেন ওঁরা; খবরদার—যেন না পরে ভাঙে, ছাড়াছাড়ি না হয়।

বগলাপদ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পশুপতির দিকে তাকাতেই পশুপতি প্রসন্নমুখে বলে ওঠেন—পাগল? আমার স্ত্রী এখন থেকেই সম্বন্ধটাকে পাকিয়ে ফেলেছেন; বগলা ভায়া কি বল?

বগলা বললেন—আমি হচ্ছি মেয়ের বাপ, সে দিক দিয়ে প্রার্থী বইত নই; তবে বলি, আমার স্ত্রীও মনে মনে গেরো দিয়ে রেখেছেন। তার পর, এ যেন দৈবী কাণ্ডের মত তাক লাগিয়ে দিচ্ছে—ভাঙতে কখনো পারে না।

অন্যতম প্রবীণ প্রতিবাসী সত্য ঘোষাল সন্ধানী দলের সঙ্গে না গেলেও উৎকণ্ঠিত ভাবেই প্রতীক্ষা করছিলেন। এই সময় তিনিও চণ্ডীমণ্ডপের দিকে আসছিলেন, বগলার কথাগুলি দূর থেকেই তাঁর কর্ণগোচর হয়েছিল, কাছে এসে তিনিও বললেন—পারে নাই ত! এ কি বড় সাধারণ কথা— আমি ত শুনে অবাক! তাই বলি—এই ছটো খোকা খুকুকে উপলক্ষ করে এই গ্রামেই তোমরা হরগৌরীর লীলা দেখবে।

কথাগুলি সকলেরই মনঃপূত হওয়ায় সমস্বরে একটা উল্লাসধ্বনি উঠল। এমন কি, অনর্থক অসময়ে পরিশ্রমের এই ক্লান্তির জন্য কেউই যে বিরক্ত হননি, তাঁদের হর্ষভাব থেকেই উপলব্ধি করা গেল। সত্যই, এই শিশু দুটির অবাধ মেলা-মেশা, সদ্ভাব ও খেলাধূলার ভিতর দিয়ে দম্পতি-সুলভ কথাবার্তাগুলি শুনে এঁরাও সকলে এমনই কৌতুক বোধ করতেন যে, এদের দু' পক্ষের পিতামাতার মত এঁরাও ভবিষ্যতে এদের মধ্যে মিলন-গ্রন্থী রচনার কল্পনা না করে পারেন না বরং এতেই তৃপ্তি পান।

সকালে উঠেই বালক-বালিকার দল দেখল যে, আবার সব পাল্টে গেছে; দেবী ললিতের সঙ্গে ভাব করে দ্বিগুণ উৎসাহে খেলাঘরের কাজে লেগে পড়েছে। রাধা যেন ভেঙে পড়েছে, বসন্ত ও রতন তাকে নানা ভাবে আশ্বাস দিতে থাকে—ভাবিস কেন, এক পৌষে কি শীত পালায়—এর শোধ আমরা তুলবই।

রাধা চোখ মুখ ঘুরিয়ে বলে—বাবা, ওকি সোজা ছেলে! ভিজে বেড়ালের মতন চুপ করে থাকে, যেন কিছু জানে না। একেই ত বলে, মিটমিটে ডান ছেলে খাবার রাক্ষস!

ওদিকে রাণী অসুস্থ দেহে ভেবেই অস্থির হয়ে উঠেছিল। তার দিদি দেবীর সঙ্গে ললিতদা'র আড়ি হয়েছে শুনে সে মনে মনে খুবই অস্বস্তি বোধ করেছে কদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে। কিন্তু দেবী নিজে তার কাছে সব কথা ভাঙেনি বলে, সেও অভিমানে গুম হয়ে থাকে। নিজের মনেই ঠিক করে নেয়—আগে সেরে উঠি, তার

পর করে এরা বিচিত। দিদি কি জানে না, ললিতদা'র সঙ্গে তার আড়ি হতে পারে না।

এই সব ভাবতে ভাবতেই সেদিন কিন্তু ঘাম দিয়ে রাণীর জ্বর ছেড়ে যায়। তার পর সন্ধ্যার দিকে চড়িভাতির দলের আর সকলে যখন ফিরে এসে দেবীর নিরুদ্দেশের খবর দেয়, তখন রাণীর রোক দেখে কে? কান্নায় ভেঙে না পড়ে সে তখনি কোমরে কাপড় জড়িয়ে দলের চাঁই বসন্ত আর রাধাকে যা নয় তাই বলে একেবারে কুরুক্ষেত্র করে দেয়। তর্জন করে বলে—তোরা না জাঁক করে তাকে নিয়ে গিয়েছিলি ললিতদা'র সঙ্গে তার আড়ি করে দিয়ে? এখন কোন মুখে এসে বলছিস—'তাকে খুঁজে পাইনি, কোথায় গেছে তা'ও জানিনে?' কিন্তু আমি বলছি, ললিতদা যদি ও দলে থাকত, যেখানেই দিদি থাকুক—খুঁজে বার করে আনত।'

মা ছুটে এসে মেয়েকে সামলান, জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলেন—আজই সবে জ্বর ছেড়েছে, আর তুই এমনি করে চেঁচাচ্ছিস? কোথায় যাবে সে—যখন হরগৌরীর সেবাধরা, ওঁরাই তাকে খুঁজে দেবেন।

এমনি সময় খবর এল যে, ললিতকেও পাওয়া যাচ্ছে না; দুপুর বেলার খাওয়া-দাওয়ার পর কোথায় যে চলে বেরিয়েছে—কেউ তা জানে না।···রাণী অমনি চেঁচিয়ে ওঠে—তাহলে আর ভাবনা নেই, ললিতদা যখন বাড়ী নেই—নিশ্চয়ই জঙ্গলে গেছে, দিদিকে না নিয়ে সে ফিরবে না।

এই ঘটনার পর থেকে ললিত ও দেবীকে নিয়ে যেন গ্রামের মধ্যে আর এক রকমের পরিস্থিতির উদ্ভব হলো, আর সেই সঙ্গে এদের খেলাধূলির আসর জেঁকে উঠল। এদিকে রাণী সেরে উঠে পথ্য পেয়ে সেদিন দেবীদের দোতলায় এসে বলল: ওদিনের লুকোচুরি খেলা আর পিক্‌নিকের শোধ নিতে হবে দিদি—বড় জঙ্গলে গিয়ে এমন জাঁকিয়ে চড়ুইভাতি করব, সবার তাক লেগে যাবে।

দেবী বলল: বেশ ত, তোর অসুখ ছিল বলে সেদিনের খেলায় কি কেলেঙ্কারী—তুই থাকলে কি অমন গুলজার হোত?

ললিত ফুল-চন্দন দিয়ে দেবীকে সাজাচ্ছিল, কথা সে কমই বলে; কিন্তু দেবীর কথার উত্তরে খপ করে বলে বসল: ঈশ্বর যা করেন ভালোর জন্যেই; ওদের কাজটা খারাপ হলেও, আমাদের কিন্তু ভালোই হয়েছিল।

মুচকি হেসে রাণী বলল: সে কথা একশো বার—হরগৌরীর মন্দিরে সেদিন হর-গৌরী সাজা হয়েছিল—সে কি মন্দ? আমি কিন্তু সেদিন যেই শুনি, তোমাকেও দুপুরের পর থেকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, তখনি ভেবেছিলুম—তুমি দিদির সন্ধানে ছুটেছিলে, আর—তাই ত সত্যি হলো। তা বলে কিন্তু, ওদের ওপর টেক্কা দিয়ে বড় জঙ্গলে গিয়ে খুব জাঁকিয়ে চড়িভাতি আমরা করবই।

কিন্তু বিরোধী দলের উপর টেক্কা দিয়ে খুব জাঁকিয়ে চড়িভাতি করবার পরিবর্তে কয়েকদিনের মধ্যেই ললিতের সঙ্গ ছাড়া হয়ে, গ্রামের সঙ্গে সম্বন্ধ কাটিয়ে রাণীদের কলকাতায় রওনা হবার কথাটা পাকা হয়ে গেল। বগলাপদ মধ্যে কলকাতায় গিয়েছিলেন; সেখান থেকে ফিরে এসে ভাগ্যোদয়ের যে আখ্যানটি শুভানুধ্যায়ী মহলকে জানিয়ে দিলেন, শুনে প্রত্যেকেই প্রফুল্ল হয়ে তাঁর শুভাদৃষ্টের তারিফ করতে লাগলেন। কলকাতার যে শিল্পপতির প্রতিষ্ঠানে তিনি মফঃস্বলের দ্রব্যজাত সরবরাহ করতেন, তিনি সরকার কর্তৃক কতকগুলি বিশেষ পণ্য সরবরাহের একচেটিয়া সরবরাহকার মনোনীত হওয়ায় সেই সকল পণ্য সম্পর্কে বগলাপদ অভিজ্ঞ বলিয়া, অংশীদার-রূপে তাঁকে সেই সরবরাহ-প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করেছেন—সে-সম্বন্ধে লেখা পড়া পাকা হয়ে গেছে। সাত দিনের মধ্যে এখানকার পাট তুলে তাঁকে সপরিবার কলকাতায় রওনা হতে হবে।

চণ্ডীমণ্ডপে বসে বগলাপদ বন্ধু পশুপতিকে বলছিলেন: গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় যেতে সত্যিই প্রাণটা যেন কেঁদে উঠছে; কিন্তু না গিয়েও উপায় নেই, পটিনারসিপ ডীড্ পর্যন্ত রেজেষ্ট্রি হয়ে গেছে, তার পর, এমন একটা চান্স—

পশুপতি গম্ভীর মুখে বললেন: বটেই ত, অত বড় ব্যবসাদার তোমাকে বখরাদার করে নিয়েছেন—এ কি সাধারণ কথা হে? তবে সবাইকে ছেড়ে ছুড়ে যেতে মনে কষ্ট হবে বৈ কি, তা' সে কষ্ট সামলে নিতে হবে—এর পর গা-সওয়া হয়ে যাবে। এখন কথা হচ্ছে, মন থেকে সব মুছে না-গেলেই হলো।

মুখখানার একটা বিশেষ ভঙ্গি করে বগলা বললেন: মুছে যাবে। এই গাম, এই চণ্ডীমণ্ডপ, তোমার সঙ্গে বসে গুড়ুক টানতে টানতে গল্প-গুজব, হর-গৌরীদের ঘর গেরস্থালী—সর্বক্ষণই চোখের ওপর ভাসছে—এসব কি ভোলবার, না মন থেকে মুছে যাবার মত ব্যাপার? বরং আমি বলতে পারি ভায়া, ছেলে বড় হলে যেন ওদের এখানকার সেই সব কথা ভুলে যেয়ো না; তাহলে আমার স্ত্রী একবারে ভেঙে পড়বেন কিন্তু।

পশুপতি মুখখানাকে কিঞ্চিৎ দৃঢ় করেই বলে উঠলেন: আমরা পাড়াগাঁয়ের মানুষ, এখানে মানুষ হয়েছি, এখানে বাস করছি, আর—এখানেই থাকব। কাজেই, আমাদের মনমতিও ঠিক থাকবে—কিছুতেই নড়চড় হবে না জেনো।

পুকুরঘাটে দুই সই অনুপমা ও সুলোচনার মধ্যেও এমন আকস্মিকভাবে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে বসবাস-সম্পর্কে আলোচনা চলে।

অনুপমা বলেন: আমি খালি খালি ভাবছি সই, ছোঁড়াটার কথা—কি করে ও মনটাকে ধরে রাখবে জানিনে। রাতে ঘুমন্ত চেঁচিয়ে ওঠে—তাতে কেবলি দেবীর কথা; তাকে ডাকছে, কত কি বলছে। ঘুমিয়েও নিস্তার নেই সই! সেই সাথী ওর সঙ্গছাড়া হয়ে কলকাতায় চলেছে—শুনে অবধি ছেলের মুখখানা একবারে শুকিয়ে গেছে!

সুলোচনাও মেয়ের কথা তুলে বলেন: আর বোল না সই, দেবীকে নিয়েও আমি এমনি ভাবনায় পড়েছি। কলকাতা থেকে চিঠি এসেছে, কর্তা পড়ে শোনাচ্ছিলেন সবাইকে। আমাদের জন্যে একখানা বাড়ী সাজিয়ে রেখেছে, বিজলীর আলো, পাখা, কলের জল, রেডিও, ঝি-চাকর, রাঁধুনী—সব বরাদ্দ করে রেখেছেন ওখানকার ব্যবসার মালিক। শুনে রাণীর কি আহ্লাদ! কিন্তু দেবীর পানে তাকিয়ে যদি দেখতে সই—চমকে উঠতে। তার মুখে একটিও কথা নেই, চোখ দুটো ছলছল করছে মুখখানা একবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আড়ালে আমাকে একলা পেয়ে আমার

কোলে মুখখানা গুঁজে বলে—আমি কলকাতায় যাব না মা, আমাকে তোমরা জেঠামণির বাড়ীতে রেখে যাও, আমি এখানে থাকব। এমন কাকুতি করে বললে যে, আমার চোখ দুটোও ঝাপসা হয়ে এলো!

অনুপমা এর পর একটু শক্ত হয়ে বলেন: ছেলে-বয়সের মনের ধর্মই এ রকম সই—সহজে বাগ মানে না; কিন্তু মানাতেই হবে। আবার এর পর দেখবে, সহরে গিয়ে পাঁচ রকম নতুন নতুন দেখে ভুলে যাবে—হয়ত পরে এখানকার কথা মনেই থাকবে না।

শিউরে উঠে সুলোচনা বলেন: অমন কথা বোল না সই, এখানকার কথা মনে থাকবে না, একথা ভাবতেও পারি না; মনে নেই—হরগৌরী-মন্দিরের কথা!

সুলোচনা বলেন: মনে অবিশ্যি আছে সই, সে কি ভুলবার? তবে সহরের ধারা-ধর্ম নাকি আলাদা, আগের কথা সব ভুলিয়ে দেয়; তাই ভয় হয়—

তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দেবার উদ্দেশ্যে সুলোচনা বলে ওঠেন: হরগৌরী আমাদের মনগুলো ভরসায় ভরিয়ে রাখুন সই, এই কামনাই করি। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমরা যেন মুখের কথা মনে রাখি।

খেলাঘরে খেলা আর জমে না, নতুন একটা চড়িভাতির কথাও চাপা পড়ে গেছে। ললিত ও দেবী দুটিতে মুখোমুখী বসে ভবিষ্যৎ নিয়ে কত কথাই বলাবলি করে।

দেবী বলে: রাধার মনোস্কামনাই পূর্ণ হলো; আমার এই সাজানো ঘর-গেরস্থালী সেই দখল করে বসবে। আর তুমি—

দেবীর স্বর আবেগে বন্ধ হয়ে আসে। ললিত সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে: দূর! তা কখখনো হবে না। তুই চলে গেলে আমি আবার এই ঘরে বসে খেলব? রাধি এখানে এসে···তুই আমাকে কি ভেবেছিস্?

কথার সঙ্গে ললিতের চোখ দুটো বাষ্পে ভরে ওঠে, একটু পরেই সেই বাষ্প থেকে অশ্রুধারা নামে। দেবী বিহ্বল ভাবে বলে: কেঁদোনা ললিত দা, আমি কি জানিনা তুমি আমাকে কত ভালবাস। আমিও ঠিক করতে পারছি না—সহরে গিয়ে, তোমায় ছেড়ে কি করে থাকব! মাকে অত করে বললুম—আমাকে এখানে রেখে যাও মা, নিয়ে যেওনা, আমি কলকাতায় গিয়ে থাকতে পারবনা! কিন্তু—

বলতে বলতে দেবীর দুটি আয়ত চোখেও জলের ধারা নেমে আসে। ললিত কাছে এগিয়ে গিয়ে কোঁচার খুঁটে তার চোখের জল মুছে দিয়ে সান্ত্বনা দেয়: কাঁদিস্‌নি ভাই, তোর কান্না যে আমি সইতে পারি না।

আপনাকে সামলে নিয়ে দেবী বলে: মা বলছিলেন, সবাই কি বরাবর এক জায়গায় থাকে? ছাড়াছাড়ি হয়—আবার আসেও। আমরা যাচ্ছি কাজের জন্যে, আবার আসব এখানে। ঘরবাড়ী ত আর তুলে নিয়ে যাচ্ছি নে? কলকাতায় গিয়ে চিঠি লিখবি, আর তোর ললিত দাকেও বলবি—চিঠি লিখতে। লিখবে তুমি চিঠি—বল?

গাঢ়স্বরে ললিত উত্তর দেয়: লিখব। কাকা বাবু বাবাকে ওঁর ঠিকানা লিখে দিয়েছেন, পাঁজিতে লিখে নিয়েছেন, আমি লিখব: আর তুমি?

ম্লান মুখে দেবী বলে: তুমি ত জানো ললিতদা, আমি চিঠি লিখতে জানি না। তবে কি করে লিখব বল?

ললিত বলে: কেন, মাকে দিয়ে লিখিয়ে নেবে। তারপর ওখানে গিয়ে কত পড়াশোনা করবে, লিখতে আর বাধবে না। কলকাতা সহরে দেখবার কত কি আছে; ট্রাম গাড়ী, হাওয়া গাড়ী, চিড়িয়াখানা, আরো কত কি! ঐ সব দেখে হয়ত এখানকার কথা ভুলেই যাবে। তখন হয়ত—

দেবী ঝংকার দিয়ে বলে ওঠে: অমন কথা বলবে না বলছি—ভালো হবে না। এখানকার কথা আমি ভুলে যাব! তোমার কথা আমার···জানো, ক'রাত আমি ঘুমুতে পারিনি! আর তুমি—

চোখে আঁচল চাপা দেয় দেবী। ললিতও অপ্রস্তুত হয়ে তারই আঁচলের কাপড়ে চোখ দুটি মুছিয়ে দিতে দিতে বলতে থাকে: আমি ভুল করে ওকথা বলেছি দেবী ভাই, তুই কিছু মনে করিসনি, জানি রে জানি, তুই আমাকে ভুলতে পারবি নি।

দেবীর অভিমান এ কথায় চূর্ণ হয়ে যায়, ছল ছল চোখে প্রিয় সাথীর ম্লান মুখখানির পানে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সে। ললিতের বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ দুটিও চক্ চক্ করে ওঠে।

এদিকে দেখতে দেখতে রথযাত্রার উৎসব এসে পড়েছে। ললিত নিজের হাতে একখানা রথ তৈরী করতে লেগে গেছে প্রচণ্ড উৎসাহে। এই রথ খেলাঘরে পূজো করে, তারপর দেবীর সঙ্গে একত্র টেনে সে সকলের ওপর টেক্কা দেবে, এই কল্পনা তাকে আরো উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে। দেবীকেও বলেছে সে—কলকাতায় যাবার আগে আমি তোকে এমন একটি জিনিস নিজের হাতে তৈরী করে দেব, দেখেই তুই খুব খুশি হবি, আর সেটা মনে করে রাখবি।

দেবী কথাগুলি শোনে, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোন কথা আর বা'র হয় না; সে মনে মনে ভাবে—ললিতদাকে সে কি দেবে তাহলে! তারও ত কিছু দেওয়া চাই। কিন্তু কি দেবে? তার ত দেবার মত কিছুই নেই!

কথা ছিল, রথযাত্রার পর ত্রয়োদশীর দিন বগলাপদ সপরিবার কলকাতা রওনা হবেন—পশুপতিই দিন স্থির করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ক'দিন আগেই সন্ধ্যার পর বগলাপদ কলকাতা থেকে তার পেলেন—রথযাত্রার দিন সকালেই তিনি যেন সপরিবার রওনা হয়ে পড়েন। শিয়ালদহ ষ্টেশনে লোকজন ও যান বাহন সব মোতায়েম থাকবে।

অগত্যা বগলাপদকে সেই ভাবেই প্রস্তুত হতে হয়। বন্ধু পশুপতিকে তারবার্তা জানিয়ে তাঁরও সম্মতি নিয়ে তিনি সস্ত্রীক মালপত্র গুছাতে থাকেন। দেবীর শরীরটা সেদিন ভালো ছিল না, বিকেলের দিকে একবার ললিতের সঙ্গে দেখা করে এসেই দুটি মুড়ি-মুড়কি ও একটু দুধ খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। তারের কথা সে জানতে পারেনি।

ললিত এখন রথ নিয়ে ভারি ব্যস্ত। বাড়ীতেই তার রথ

নির্মাণের কাজটি সংগোপনে চলেছে—আর কোন দিকে তার লক্ষ্য রাখবার অবসর নেই।

সকালে উঠে সাজানো রথখানি নিয়ে তাদের খেলাঘরে আসতেই রাধা ছুটে এসে বলল: বা রে, ললিত দা! দিব্যি রথ বানিয়েছ ত? কিন্তু যার জন্যে এনেছ, সে ত কলকাতায় চললো। ভালোই ত হলো, এখন এসো—এই রথ নিয়ে আমরা খেলি।

ললিতের মনে হলো, তার মাথায় বুঝি আকাশ ভেঙে পড়েছে; দেবীরা কলকাতায় চলল! সে কি, তাদের যেতে ত এখনও তিন দিন দেরী। চোখ দুটো পাকিয়ে সে রাধার পানে চেয়ে বলল: সকালেই মিছে কথা বলিসনে রাধা—

রাধা বলল: মিছে কথা নয়—সত্যি। কেন, তুমি কি শোন নি—কাল রাতে তার এসেছে কলকাতা থেকে। তাই ওরা আজই চলেছে। ঐ দ্যাখ—

ললিত বিস্ফারিত চোখে দেখল—তার বগলা কাকা, সইমা, দেবী ও রাণীকে নিয়ে তাদের বাড়ীর দিকেই আসছেন। তাঁদের বেশভূষা দেখেই সে বুঝল যে, রাধা মিছে কথা বলেনি। কিন্তু সত্য হলেও এ কি দারুণ অবস্থা! তার এত যত্নে গড়া রথ, এত আশা উল্লাস সব ব্যর্থ হয়ে গেল!

কাছে এসেই বগলাপদ বললেন: এই যে ললিত, তোমাকেই আমরা খুঁজছিলাম। আমরা আজই চলেছি বাবা! তোমার বাবা মা'র সঙ্গে দেখা করে আসি।

সুলোচনা দেবী ললিতের চিবুকটি ধরে চুমো খেয়ে বললেন: বেঁচে থাকো বাবা—

রাণী এগিয়ে এসে বলল: রথ তৈরী করেছ ললিতদা, বা—বেশ হয়েছে; তবে দুঃখ এই—দিদির আর রথ টানা হলো না।

ললিত নির্বাক, তার নিষ্পলক দৃষ্টি ম্লানমুখী দেবীর দিকেই নিবদ্ধ। এই সময় সুলোচনা দেবী পিছনে ফিরে মেয়েদের উদ্দেশে বললেন: তোরাও আয়—জেঠামণি, সইমাকে গড় করে যা।

রাণী তাড়াতাড়ি মাকে অনুকরণ করল। দেবী পথের ধারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল; মায়ের আহ্বানে দু'পা এগুতেই ললিতের সঙ্গে চোখোচোখী হয়ে গেল।

ললিতের দুই চোখের কোণ বেয়ে তখন অশ্রুর ধারা ছুটেছে। সেই অবস্থায় আর্তকণ্ঠে বলল: কাল সারা রাত জেগে তোমাকে দেব বলে তৈরী করেছি দেবী ভাই। তখন কি জেনেছিলুম—তোমরা আজই চলে যাবে?

দেবীও অশ্রুভরা চোখে জবাব দিল: আমিও জানতুম না, সন্ধ্যের আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সকালে উঠে সব শুনলুম। তুমি আমার জন্যে কষ্ট করে এত বড় রথ বানিয়েছ ললিতদা! এ রথ দেখে আমার যেতে ইচ্ছে করছে না—কিছুতেই না। কিন্তু আমাকে ত থাকতে দেবে না—

কথার সঙ্গে আবার অশ্রুধারা চোখের কোণে নেমে এল। ললিত কোঁচার খুঁট দিয়ে দেবীর অশ্রু মুছিয়ে দিতে দিতে বলল: তোমার জন্যে তৈরী করেছি, তুমি এটা নিয়ে যাও দেবী ভাই!

দেবীও কাপড়ের ভিতর থেকে ছোট একখানি ফটো বার করে বলল: কেবলই ভাবতুম ললিতদা, আমি তোমাকে কি দেব! আর কিছু না পেয়ে আমার এই ছবিখানা দিয়ে যাচ্ছি। সেবার সদরে আমাদের দুই বোনকে নিয়ে গিয়ে বাবা তুলিয়েছিলেন। খারাপ হয়ে গেছে বলে কলকাতায় ভাল করে তুলতে দিয়েছেন। কলকাতায় গিয়ে পাঠিয়ে দেব। এখন এইটিই রাখ ভাই!

ছবিখানি হাতে নিয়ে ললিত বলল: আমার জিনিসের চেয়েও অনেক ভাল জিনিস তুমি আমাকে দিলে দেবী ভাই। তোমার এই ছবিই হবে আমার সাথী।

মায়ের ডাকে দেবী চমকিত হয়ে উঠল। ললিতের বাবা ও মায়ের সঙ্গে বগলাবাবু, সুলোচনা ও রাণী পুনরায় এই পথেই ফিরে এলেন। সুলোচনা বললেন: সইমাকে প্রণাম করতে এলিনি দেবী—এখনো কথা ফুরোয় নি?

অনুপমা দেবী একটু এগিয়ে এসে বললেন: তাতে হয়েছে কি সই—আমরাই ত এসেছি, এইখানেও সেটা না হয় হবে।

দেবী তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে সই মা ও জেঠামণিকে প্রণাম করল। অনুপমা দেবী দেবীকে কোলে টেনে বললেন: সইমাকে যেন ভুলে যেয়ো না মা?

ম্লান মুখখানি তুলে সইমার পানে নীরবে তাকাল দেবী। তার পর বগলার কাছে গিয়ে আবদারের সুরে বলল: বাবা, আমি এই রথখানা নিয়ে যাব—ললিতদা আমার জন্যে······

কন্যার কথায় বাধা দিয়ে বগলাপদ বললেন: দূর ক্ষেপী, এ কি সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া চলে—কত ওঠা নামা, ধকল সইবে কেন, ভেঙে যাবে; তার চেয়ে কলকাতায় গিয়ে রঙ করা টিনের রথ কিনে দেব'খন।

দেবীর মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল—সেই অবস্থাতেই ললিতদা'র বিষণ্ণ মুখের নীরব ভাষাও বুঝি তার পড়া হয়ে গেল।

বগলাপদ বললেন: চল, আর দেরী করা চলবে না।

অদূরে রাস্তার উপর ছই দেওয়া যাত্রীবাহী গো-যান দাঁড়িয়েছিল। মালপত্র তার মধ্যে তোলা হয়ে গেছে—পল্লী-প্রতিবাসীদের অনেকেই সেখানে সমবেত হয়েছেন। তাঁদের প্রতি যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানিয়ে পথ করে নিয়ে একে একে এঁরা গাড়ীতে উঠলেন। সবার পিছনে দেবী, তার ছল ছল চোখদুটিও তখন পিছনে পড়েছে—পরিত্যক্ত রথখানির পাশে মর্মর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে, যেখান থেকে ললিতও তার পানে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

এই অবস্থায় পশুপতি গম্ভীর কণ্ঠে বিদায়বাণী শুনিয়ে দিলেন: দুর্গা, দুর্গা—শিবাস্তে পন্থানঃ।

[ক্রমশঃ।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করার ব্যবস্থা—

ইউরোপীয় ডিফেন্স কমিউনিটির চিতাভস্ম হইতে অতি দ্রুত নূতন পশ্চিম ইউরোপীয় দেশরক্ষা-ব্যবস্থা জন্মলাভ করিয়াছে। লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পশ্চিমী নবরাষ্ট্র সম্মেলনে গত ৩রা অক্টোবর (১৯৫৪) পশ্চিম ইউরোপের রক্ষা ব্যবস্থার জন্য স্বাক্ষরিত হইয়াছে পশ্চিম জার্ম্মাণীকে পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত করার চুক্তি। ৩০শে আগষ্ট (১৯৫৪) ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদে ইউরোপীয় ডিফেন্স কমিউনিটি-চুক্তি অগ্রাহ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গেই উহার স্থান গ্রহণের জন্য নূতন রক্ষা ব্যবস্থা গঠনে যাহাতে বিলম্ব না হয়, তজ্জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ তৎপর হইয়া উঠেন। মিঃ ডালেস প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, অতঃপর উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি-সংস্থা এ-সম্পর্কে বিবেচনা করিবে। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ক্ষুদ্র একটি সম্মেলন বিশেষ করিয়া প্রাক্তন ইউরোপীয় ডিফেন্স কমিউনিটিভুক্ত দেশগুলির সম্মেলন আহ্বান করাই সঙ্গত মনে করেন। তদনুযায়ী মিঃ ইডেন একদিকে কূটনৈতিক সূত্রে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে এ সম্পর্কে যেমন আলোচনা করেন, তেমনি বিমানযোগে পাঁচ দিনে পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া প্রাক্তন ইউরোপীয় ডিফেন্স কমিউনিটির অন্তর্গত ছটি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে আলোচনা করেন। উহারই ফলে ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৪) নয়টি রাষ্ট্রের সম্মেলন আহ্বান করার প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাব উত্তর আটলাণ্টিক কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্যদের সভায় উপস্থিত করা হইলে, তাঁহারা উহা অনুমোদন করেন। নবরাষ্ট্র সম্মেলন আহ্বানের ইহাই ইতিকথা। বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, পশ্চিম-জার্ম্মাণী, ইটালী, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড এবং লুক্সেমবুর্গ—এই নয় রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিবগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সমমর্য্যাদা সম্পন্ন রাষ্ট্র হিসাবে পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে কি উপায়ে পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা ব্যবস্থায় গ্রহণ করিতে পারা যায়, তাহাই ছিল এই নবরাষ্ট্র সম্মেলনের উদ্দেশ্য। এই সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমী বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয় এবং পশ্চিম-জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলার ডাঃ এডেনারের মধ্যে দ্রুত পশ্চিম জার্ম্মাণীর দখলী অবস্থা অবসানের জন্য চলিতেছিল পৃথক ভাবে আর একটি আলোচনা।

লণ্ডনে নবরাষ্ট্র সম্মেলন আরম্ভ হয় ২৮শে সেপ্টেম্বর এবং উহা শেষ হয় ৩রা অক্টোবর (১৯৫৪)। এই সম্মেলন যে অবিমিশ্র সাফল্যের সহিত শেষ হইয়াছে সে-কথা বলাই বাহুল্য। ৩রা অক্টোবর গ্রীণউইচ সময়ের ২টা ৫৫ মিনিটের সময় বৃটেন, মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, কানাডা, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, লুক্সেমবুর্গ ইটালী ও জার্ম্মাণীকে পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত করার মূল চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে। সেই সঙ্গে পশ্চিম-জার্ম্মাণীর দখলকার অবস্থার বিলোপ সাধনের ঘোষণানামায় স্বাক্ষর করেন বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিবত্রয়। এই নবরাষ্ট্র চুক্তি সকলের দাবীই পূরণ করিতে পারিয়াছে, ইহা সত্যই অভূতপূর্ব ব্যাপার। এই চুক্তির ফলে পশ্চিম-জার্ম্মাণী সার্ব্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে পুনরায় অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হইয়া নূতন ইউরোপীয় দেশরক্ষা-সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবে। সুতরাং পশ্চিম-জার্ম্মাণীর আত্মাভিমান অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ইউরোপীয় রক্ষা ব্যবস্থায় পশ্চিম-জার্ম্মাণী গৃহীত হওয়ায় অনমনীয় দাবী পূরণ হওয়ায় মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রও আর agonising reprisal লওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছে না। এই প্রসঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা বড় উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইল এই যে, অস্ত্রসজ্জিত পশ্চিম-জার্ম্মাণী সম্পর্কে ফ্রান্সের ভয়ও নিরাকৃত হইয়াছে। ইউরোপীয় ডিফেন্স কমিউনিটি এবং ব্রাসেল্‌স চুক্তি জার্ম্মাণ জঙ্গীবাদের পুনরভ্যুত্থান সম্পর্কে ফ্রান্সের যে-ভয় দূর করিতে পারে নাই, আলোচ্য নূতন চুক্তিতে স্বাধীন সার্ব্বভৌম পশ্চিম-জার্ম্মাণীর জাতীয় সৈন্যবাহিনী থাকার এবং ব্রাসেল্‌স চুক্তিতে পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে গ্রহণের ব্যবস্থা সত্ত্বেও ফ্রান্সের সেই ভয় দূর হইল কিরূপে, তাহা সত্যই ভাবিবার কথা বটে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ব্রাসেল্‌স চুক্তিতে ইটালীকেও গ্রহণ করা হইবে।

জার্ম্মাণ আক্রমণ আশঙ্কার বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালে বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড এবং লুক্সেমবুর্গের মধ্যে ৫০ বৎসরের জন্য ব্রাসেল্‌সে যে-চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাহাই ব্রাসেল্‌স-চুক্তি নামে খ্যাত। ঐ চুক্তির ৪নং ধারায় স্বাক্ষরকারীরা এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, ইউরোপে তাহাদের কেহ আক্রান্ত হইলে অন্যান্য সকলে তাহাদের শক্তি অনুযায়ী তাহাকে সামরিক ও অন্যান্য সাহায্য প্রদান করিবে। গোড়ায় ব্রুসেলস চুক্তি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সামরিক ব্যবস্থা ছিল। উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর এই সামরিক ব্যবস্থা উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তিসংস্থার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। যে ব্রাসেল্‌স চুক্তি জার্ম্মাণ আক্রমণ আশঙ্কার বিরুদ্ধে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাতেই পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে গ্রহণ করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ইহার নূতন নাম রাখা হইবে 'পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়ন।' এই নূতন ব্যবস্থায় জার্ম্মাণ জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের আশঙ্কা কিরূপে দূর হইল? ইউরোপীয় ডিফেন্স কমিউনিটি গঠনের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহাতে উহার অন্তর্ভুক্ত ফ্রান্স, পশ্চিম-জার্ম্মাণী বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড এবং লুক্সেমবুর্গ এই ছয়টি দেশ তাহাদের সমস্ত স্থলবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং উপকূলবাহিনী ইউরোপ রক্ষার জন্য ৫০ বৎসরের জন্য একত্রীভূত করিতে রাজী হইয়াছিল। উহার সমর্থকগণ মনে করেন, এই ব্যবস্থায় এক দিকে সৈন্যবাহিনী প্রদান করিলে পশ্চিম-জার্ম্মাণী ইউরোপীয় রক্ষা ব্যবস্থায় যেমন তাহার ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিবে, তেমনি পুনরস্ত্রসজ্জিত পশ্চিম-জার্ম্মাণীতে জঙ্গীবাদের পুনরুত্থান নিরোধ করাও সম্ভব হইবে। তথাপি ফরাসী জাতীয় পরিষদ ইউরোপীয় ডিফেন্স কমিউনিটিকে অগ্রাহ্য করিল কেন? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বটে যে, পশ্চিম-জার্ম্মাণীতে জঙ্গীবাদ নিরোধের পক্ষ ইউরোপীয় ডিফেন্স কমিউনিটি শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা ছিল। কারণ এই ব্যবস্থায় পশ্চিম-জার্ম্মাণীর জাতীয় সৈন্যবাহিনী বলিয়া কিছু থাকিত না। কিন্তু নবরাষ্ট্র সম্মেলনে যে-নূতন চুক্তি হইয়াছে তাহাতে সার্ব্বভৌম স্বাধীন জার্ম্মাণীর জাতীয় সৈন্যবাহিনী থাকিবে। ইউরোপীয় ডিফেন্স কমিউনিটি গঠিত হইলে পশ্চিম-জার্ম্মাণীর জাতীয় সৈন্যবাহিনী থাকিত না বটে, কিন্তু কালক্রমে ফ্রান্সের জাতীয় বাহিনী বিলুপ্ত হওয়ারও আশঙ্কা ছিল। উহা ব্যতীত আর একটা আশঙ্কা ছিল যাহা জার্ম্মাণ জঙ্গীবাদ অপেক্ষাও ভয়াবহরূপ গ্রহণ করিতে পারিত। ছয়টি দেশের স্থলসৈন্য, বিমানবাহিনী ও উপকূলবাহিনী একত্রীভূত হইয়া যে-বাহিনী গঠিত হইত তাহা অতিজাতীয় বাহিনীতে পরিণত হইত। উহার উপর কোন গবর্ণমেণ্টেরই কোন ক্ষমতা থাকিত না। কিন্তু উক্ত ছয়টি দেশের মধ্যে কোন একটি বিশেষ শক্তিশালী দেশের, বিশেষতঃ পশ্চিম-জার্ম্মাণীর, এই অতি-জাতীয় বাহিনীর উপর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নহে। এইরূপ অবস্থা ঘটিলে উহার পরিণাম যে জার্ম্মাণ জঙ্গীবাদ অপেক্ষাও ভয়াবহ হইত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই আশঙ্কার জন্যই যে, ফরাসী জাতীয় পরিষদ ইউরোপীয় ডিফেন্স কমিউনিটি চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। লণ্ডনের নবরাষ্ট্র সম্মেলনে যে-নূতন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল, তাহা এই নয় রাষ্ট্রের পার্লামেণ্টের এবং উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তিভুক্ত দেশগুলির পার্লামেণ্টের অনুমোদন-সাপেক্ষ। পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে সার্ব্বভৌম ক্ষমতা দান এবং তাহাকে পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত করার জন্য লণ্ডনে অনুষ্ঠিত নবরাষ্ট্র সম্মেলনে যে-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, সে সম্পর্কে গত ১২ই অক্টোবর (১৯৫৪) ফরাসী জাতীয় পরিষদ ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মেঁদে ফ্রাঁসের প্রতি পূর্ণ আস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ইউরোপীয় রক্ষা ব্যবস্থার একটি বৃহৎ বাধা যে দূর হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জার্ম্মাণ জঙ্গীবাদ সম্পর্কে ফ্রান্সের আশঙ্কা দূর হইল কিরূপে?

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মিঃ ইডেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, চারি ডিভিসন বৃটিশ সৈন্য এবং কিছু বৃটিশ বিমানবহর ইউরোপে রাখা হইবে এবং ব্রুসেলস্ চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে বৃটেন ঐ সৈন্যবাহিনী ইউরোপ হইতে সরাইয়া আনিবে না। ব্রুসালস্ চুক্তির মেয়াদ ৫০ বৎসর। সুতরাং ব্রুসালস্ চুক্তির অধিকাংশ রাষ্ট্র যদি চায় তবে আগামী অর্দ্ধ শতাব্দী কাল বৃটিশ সৈন্য ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে থাকিবে। মিঃ ডালেস-ও আশ্বাস দিয়াছেন যে, ইউরোপীয় ঐক্যের শক্তি বৃদ্ধির জন্য মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সাহায্য করিতে থাকার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং বর্ত্তমানে ইউরোপে যে-পরিমাণ মার্কিণ সৈন্য আছে তাহা অনির্দ্দিষ্ট কাল ইউরোপে থাকিবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি মার্কিণ-গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পশ্চিম-জার্ম্মাণীর নূতন সৈন্যবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা লণ্ডন-চুক্তিতেই নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নূতন পশ্চিম-জার্ম্মাণ বাহিনীতে ৫ লক্ষ সৈন্য থাকিবে, বিমান থাকিবে ১৩৫০টি এবং একটি ক্ষুদ্র নৌবহরও থাকিবে। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ সম্পর্কে পশ্চিম-জার্ম্মাণীর উপর কতগুলি বিধি-নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। কোন পরমাণু, জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্র এবং আরও কতকগুলি বিশেষ অস্ত্রশস্ত্র পশ্চিম-জার্ম্মাণী নির্ম্মাণ করিবে না বলিয়া ডাঃ এডেনার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তাছাড়া পশ্চিম-জার্ম্মাণীর পুনরস্ত্রসজ্জা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্রুসালস্ চুক্তির অধীনে একটি এজেন্সী গঠিত হইবে। এই এজেন্সী ব্রুসালস চুক্তির অন্তর্গত দেশগুলির অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে এবং কোন্ দেশের কি পরিমাণ সশস্ত্র বাহিনী থাকিবে তাহার উচ্চ সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে। এই সকল কারণেই যে পশ্চিম-জার্ম্মাণীতে জঙ্গীবাদের পুনরুত্থান সম্পর্কে ফ্রান্সের আশঙ্কা দূর হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা যে মিথ্যা নিরাপত্তা বোধ নয়, সে-সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যায় না। এই নূতন চুক্তিতে রাশিয়া বিক্ষুব্ধ হইবে, ফলে ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীকে রাশিয়া অস্ত্রসজ্জিত করিবে, ইহা-ই ভবিষ্যতের আসল সমস্যা নয়। কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য লণ্ডন-চুক্তিতে পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহার ফলে হিটলারের ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিবে কি না, ইহাই আসল সমস্যা।

পশ্চিম-জার্ম্মাণী হইবে স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র। সে ব্রুসালস্ চুক্তি ও উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তিরও সদস্য হইবে। তাহার সৈন্য বাহিনী থাকিবে। অস্ত্রশস্ত্রও সে নির্ম্মাণ করিতে পারিবে। অবশ্য অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ ও আমদানী সম্পর্কে পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু ভার্সাই সন্ধি অনুযায়ী অনুরূপ পরিদর্শনের ও নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও জার্ম্মাণী বিরাট সামরিক শক্তি গড়িয়া তুলিয়াছিল। বস্তুতঃ কোন সার্ব্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র যদি ইচ্ছানুরূপ সামরিক শক্তি অর্জ্জন করিতে চায় তবে কোনরূপ চুক্তি দ্বারা তাহার ইচ্ছাকে ব্যহত করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বলশেভিক রাশিয়াকে ধ্বংস করিবার জন্য পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ, বিশেষ করিয়া বৃটেন হিটলাররূপ বিধ্বংসী অস্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছিল! সেই অস্ত্রের প্রথম আঘাত বলশেভিক রাশিয়ার উপর পড়ে নাই এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গকে বলশেভিক রাশিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে হইয়াছিল হিটলারকে পরাজিত করিবার জন্য। লণ্ডন চুক্তি দ্বারা সেই ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবৃত্তির সূচনা করা হইয়াছে, এরূপ আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নয়। পশ্চিম-জার্ম্মাণী ইউরোপীয় রক্ষা ব্যবস্থার সদস্য হইয়াছে বলিয়াই জার্ম্মাণীতে জঙ্গীবাদের পুনরুত্থানের পথ রুদ্ধ

হইয়াছে, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। কমুনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তথা পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা ব্যবস্থার জন্য যে অস্ত্র গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইল তাহার প্রথম আঘাত যে পশ্চিম ইউরোপের উপরেই পড়িবে না, সে-কথা নিশ্চয় করিয়া কেহই বলিতে পারে না। ডাঃ এডেনারের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও অস্ত্রবলে ঐক্যবদ্ধ জার্মাণী গঠনের প্রচেষ্টা সমগ্র ইউরোপে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিতে পারে। উহার পরিণাম অনুমান করা কঠিন নয়।

ত্রিয়স্ত্র সম্পর্কে মীমাংসা—

অবশেষে ত্রিয়েস্ত সম্পর্কে একটা মীমাংসা হইয়াছে। লণ্ডনে যখন পররাষ্ট্র সম্মেলন চলিতেছিল, সেই সময় যুগোশ্লোভিয়া, ইটালী, ও মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধির মধ্যে ত্রিয়েস্ত সম্পর্কে চূড়ান্ত আলোচনা হইয়া ৫ই অক্টোবর (১৯৫৪) চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অবশ্য যুগোশ্লাভিয়া এবং ইটালীর পার্লামেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ। এই আলোচনায় যে-ভাবে ত্রিয়েস্ত সমস্যার মীমাংসা করা হইল, কার্য্যতঃ তাহা ১৯৫৩ সালের ৮ই অক্টোবর বৃটেন ও মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র ত্রিয়েস্তের 'ক' অঞ্চল ইটালীকে দিবার যে ঘোষণা করিয়াছিল, উহারই অনুরূপ। উক্ত ঘোষণায় তাঁহারা জানাইয়া ছিলেন যে, ত্রিয়েস্তের 'ক' অঞ্চল হইতে তাঁহারা তাঁহাদের সৈন্য সরাইয়া লইবেন এবং ঐ অঞ্চল ইটালীর হাতে অর্পণ করিবেন। গত ৫ই অক্টোবর (১৯৫৪) ত্রিয়েস্ত সমস্যার সমাধান করিয়া লণ্ডনে যে-চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল তাহাতে ত্রিয়স্তের 'ক' অঞ্চল পাইল ইটালী এবং 'খ' অঞ্চল পাইল যুগোশ্লাভিয়া। এই চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হইতে তিন সপ্তাহের মধ্যে ইঙ্গ-মার্কিণ এবং যুগোশ্লাভ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ ত্রিয়স্তকে যুগোশ্লাভিয়া ও ইটালীর মধ্যে বিভক্ত করিয়া দিয়া নূতন সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। উভয় অঞ্চলের মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমান সীমা যে-রূপ আছে প্রায় তাহাই বহাল থাকিবে ; তবে এক খণ্ড ভূমি ও একটি গ্রাম যুগোশ্লাভিয়ার অংশে পড়িবে। ত্রিয়স্ত সহর ও বন্দরটি 'ক' অঞ্চলে অবস্থিত। সুতরাং উহাও ইটালীই পাইবে। ১৯৪৭ সালের ইটালী-শান্তি-চুক্তির বিধান অনুযায়ী ইটালী ত্রিয়স্তকে স্বাধীন বন্দর রূপে ব্যবহৃত হইবার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবে, এইরূপ বুঝা পড়া হইয়াছে। বৃটিশ ও মার্কিণ-গবর্ণমেণ্টের ১৯৫৩ সালের ৮ই অক্টোবরের ঘোষণা অনুসারেই যে এই মীমাংসা হইল ; তাহার জন্য এক বৎসর বিলম্ব হইল কেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক।

১৯৫৩ সালের ৮ই অক্টোবরের উক্ত ঘোষণার পর মার্শাল টিটো হুমকী দিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইটালীর সৈন্য যদি ত্রিয়স্তের 'ক' অঞ্চলে প্রবেশ করে তাহা হইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। ঐ সময় ইটালী যেমন ত্রিয়স্তের 'ক' অঞ্চলের নিকটে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিল, তেমনি 'খ' অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিল যুগোশ্লাভিয়া। অতঃপর ত্রিয়েস্ত সমস্যা সমাধানের বৃটেন ও আমেরিকা এক গোল-টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করে এবং এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, ত্রিয়স্তের 'ক' অঞ্চল ইটালীকে দেওয়া হইবে, এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে শুধু গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা হইবে। মার্শাল টিটো তখন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'ক' অঞ্চল ইটালীকে দেওয়া হইবে, এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে গোলটেবিল বৈঠক হওয়ার কোন সার্থকতা নাই। কারণ, উক্ত প্রস্তাবকেই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। মার্শাল টিটো তাঁহার সমস্ত বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ সত্ত্বেও অবশেষে ঐ সিদ্ধান্তই মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন।

ত্রিয়স্তে ইটালীয় লোকের সংখ্যা বেশী করিতে ফ্যাসিষ্ট ইটালী চেষ্টা কম করে নাই। ত্রিয়স্ত সহর ও বন্দরে ইটালীয়ের সংখ্যা বেশী হইলেও ত্রিয়স্তের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরা সকলেই শ্লোভানী। ত্রিয়স্ত সম্পর্কে ইটালী ও যুগোশ্লাভিয়ার দাবী সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করিবার জন্য ইটালীর সহিত শান্তি-চুক্তিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অছিগিরির অধীনে ত্রিয়স্তকে একটি স্বাধীন অঞ্চল গঠনের সর্ত্ত আছে। কিন্তু রাশিয়ার সহিত পশ্চিমী শক্তি-বর্গের ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে ১৯৪৮ সালের ২০শে মার্চ্চ বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র ত্রিয়স্তই ইটালীকে দিবার প্রস্তাব করে। ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ঐ সময় যুগোশ্লাভিয়া ছিল সোভিয়েট রাশিয়ার দলে। টিটো-কমিনফর্ম বিরোধের ফলে যুগোশ্লাভিয়া রাশিয়ার দল ছাড়িয়া ইঙ্গ-মার্কিণ দলে যোগ দান করার পর অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটায় পশ্চিমী শক্তিবর্গ আলাপ-আলোচনা দ্বারা ত্রিয়স্ত-সমস্যা সমাধানের জন্য ইটালী ও যুগোশ্লাভিয়া উভয় দেশকেই উপদেশ দেয়। কিন্তু উহাতে মীমাংসার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক, বিরোধের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পায়। অবশেষে গত ৮ই অক্টোবর (১৯৫৩) বৃটেন এবং মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র ত্রিয়স্তের 'ক' অঞ্চলটি ইটালীকে দিবার প্রস্তাব করে। সম্প্রতি লণ্ডনের আলোচনায় ত্রিয়স্ত সম্পর্কে যে-মীমাংসা হইল তাহাতে উক্ত প্রস্তাবকেই কার্য্যকরী রূপ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। মীমাংসা হইল বটে, কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ার বিক্ষুব্ধ মনোভাব দূর হইয়াছে, একথা বলা চলে না। এই মীমাংসার মধ্যেই বিরোধের বীজ উপ্ত রহিয়া গেল। ভাবী বিরোধের পরিণতি গুরুতর না হইতে পারে, কিন্তু মনকষাকষি চলিতেই থাকিবে।

নিরস্ত্রীকরণের নূতন রুশ প্রস্তাব—

আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর গতি যে-ভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশনও বিশ্ববাসীর সাগ্রহ দৃষ্টি তেমন আকর্ষণ করিতে অসমর্থ। তথাপি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৪) রুশ প্রতিনিধি মঃ ভিসিনস্কী যে-নূতন নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার গুরুত্ব উপেক্ষার বিষয় নহে। নিরস্ত্রীকরণ অর্থাৎ পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমা নিষিদ্ধকরণ এবং প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র হ্রাসকরণ কোনদিনই সম্ভব হইবে কিনা তাহাতে সন্দেহ থাকিলেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অস্তিত্ব তৎসম্পর্কে আলোচনার যে প্রশস্ত পথ, তাহা অনস্বীকার্য্য। নূতন সোভিয়েট পরিকল্পনায় পরমাণু-বোমা, হাইড্রোজেন বোমা এবং ব্যাপক ধ্বংসের অন্যান্য অস্ত্র বিনা সর্ত্তে নিষিদ্ধ করিবার, প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করিবার এবং উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলি কার্য্যকরী করিবার জন্য আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। রাশিয়া

এই পরিকল্পনায় দুইটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠনের প্রস্তাব করিয়াছে। প্রথম কমিশনটি হইবে অস্থায়ী। তাহা গঠিত হইবে নিরাপত্তা পরিষদের অধীনে এবং উহার কাজ হইবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্ত্র হ্রাস করা সংক্রান্ত বিবরণ সংগ্রহ করা। দ্বিতীয় কমিশনটি হইবে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। উহার নিয়ন্ত্রণ করিবার এবং নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি কার্যকরী হওয়া সম্পর্কে পরিদর্শন করিবার ক্ষমতা থাকিবে। গত ১৩ই মে (১৯৫৪) হইতে ২২শে জুন পর্যন্ত লণ্ডনে নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের সাব-কমিটির অধিবেশনে অচল অবস্থার উদ্ভব হওয়ার পর রাশিয়া এই নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে। সাব্-কমিটির উক্ত অধিবেশনে গত ১১ই জুন (১৯৫৪) নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে বৃটেন এবং ফ্রান্স যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, এই প্রস্তাব তাহারই ভিত্তিতে রচিত।

রাশিয়ার নূতন পরিকল্পনায় নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহিত রাশিয়ার মতভেদ অনেকটা হ্রাস সূচিত হইতেছে বটে, কিন্তু এখনও যে-টুকু ব্যবধান রহিয়াছে তাহাও দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া মনে হইলে আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না। লণ্ডনের মে-জুনের বৈঠকে বৃটেন এবং ফ্রান্স যে-প্রস্তাব করে তাহা তিনটি পর্য্যায়ে বিভক্ত। অর্থাৎ পর পর তিন দফায় নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করার প্রস্তাব উক্ত ইঙ্গ-ফরাসী পরিকল্পনায় করা হইয়াছে। প্রথম পর্য্যায়ে নিয়ন্ত্রণ-সংস্থা গঠন করিয়া উহাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। যে-পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করা সম্পর্কে মতৈক্য হইবে তাহার অর্দ্ধেক হ্রাস করা এবং পরমাণু-অস্ত্র নির্ম্মাণ নিষিদ্ধকরণ হইবে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কাজ। তৃতীয় পর্য্যায়ে অবশিষ্ট প্রচলিত অস্ত্র হ্রাস এবং পরমাণু-অস্ত্র সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হইবে। এই তিনটি পর্য্যয়ের প্রত্যেকটি কার্য্যে পরিণত করিতে কি পরিমাণ সময় দেওয়া হইবে তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবে আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ-সংস্থা। এই পরিকল্পনা আবার দুইটি সর্ত্ত সাপেক্ষ। প্রথমতঃ কি কি অস্ত্র নিষিদ্ধ করা হইবে এবং প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র কি পরিমাণে হ্রাস করা হইবে সে-সম্পর্কে একমত হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা কি কি কাজ করিবে এবং তাহার ক্ষমতা কি হইবে সে-সম্পর্কেও এক হওয়া প্রয়োজন। রাশিয়া এই প্রস্তাব আলোচনা করিতেও রাজী হইতে পারে নাই। রাশিয়া প্রস্তাব করে যে, সর্ব্বপ্রথম কোনরূপ পরিদর্শনের ব্যবস্থা না করিয়া পরমাণু-অস্ত্র নিষিদ্ধ করিতে হইবে। তার পর বিদেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রের যে সকল সামরিক ঘাঁটি আছে সেগুলি সমস্তই বিলোপ করিতে হইবে এবং সশস্ত্র বাহিনীর এবং সামরিক ব্যয়বরাদ্দের এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করিতে হইবে। এই অবস্থার মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের সাব্‌কমিটির লণ্ডন বৈঠক শেষ হয়।

রাশিয়ার নূতন পরিকল্পনায় পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করণের আগে প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করণকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় কার্য্যক্রম হইবে এইরূপ:—যে-পরিমাণ প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র, সশস্ত্র বাহিনী ও সামরিক বাজেট হ্রাস করা সম্পর্কে মতৈক্য হইবে রাষ্ট্রসমূহকে ছয়মাস বা একবৎসরের মধ্যে তাহার অর্দ্ধেক হ্রাস করিতে হইবে এবং এই হ্রাস করার কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হইয়াছে কিনা তাহা পরিদর্শনের জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠন করা হইবে। উহা হইবে অস্থায়ী আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন। উক্ত অর্দ্ধেক হ্রাস করার কাজ শেষ হইলে অবশিষ্ট অর্দ্ধেক হ্রাস, ও পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং এই স্তরে গঠন করা হইবে স্থায়ী আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন।

নিরস্ত্রীকরণের জন্য আলোচনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা পোষণ করিবার মত এ পর্য্যন্ত কিছুই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে ঘরোয়া ভাবে আলোচনা চালাইবার জন্য রাজনৈতিক কমিটিতে গত ১৩ই অক্টোবর (১৯৫৪) কানাডা এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। গত গ্রীষ্মে লণ্ডনে ঐরূপ আলোচনা হইয়াছিল। আবার ঐরূপ আলোচনার ফল কি হইবে, সে-সম্বন্ধে অনুমান করা বোধ হয় খুব কঠিন নয়। প্রথম পরমাণু-বোমা বর্ষিত হয় ১৯৪৫ সালে হিরোশিমায়। উহার পর প্রায় দশ বৎসর অতীত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত পরমাণু বোমা নিষিদ্ধ করা তো সম্ভব হয়-ই নাই, অধিকন্তু উহা অপেক্ষাও ব্যাপক ধ্বংস-শক্তি-সম্পন্ন হাইড্রোজেন-বোমা নির্ম্মিত হইতেছে। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বারমুডা সম্মেলন শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট মিঃ আইসেনহাওয়ার সরাসরি নিউইয়র্ক যাইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এক বক্তৃতায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে একটি আন্তর্জ্জাতিক শক্তি এজেন্সী গঠনের প্রস্তাব করেন। বিভিন্ন দেশের মজুত ইউরেনিয়াম এবং অন্যান্য বিস্ফোরণযোগ্য আণবিক উপাদান হইতে কতক অংশ এই এজেন্সীর হাতে অর্পণ করা, এই প্রস্তাবের মূল কথা। ঐসকল দ্রব্য ঐ এজেন্সী মানবজাতির কল্যাণের জন্য নিয়োগ করিবে। পরমাণু শক্তির উপাদানগুলির কতক অংশ আমানত রাখিবার জন্য এই ব্যাঙ্ক গঠনের প্রস্তাব যে বারুদ পরিকল্পনার উপর জনকল্যাণের একটা চাকচিক্যময় আবরণ, তাহা আমরা যথাসময়ে (মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ, ১৩৬০) উল্লেখ করিয়াছি। প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের প্রস্তাব সম্পর্কে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই আলোচনা সম্পর্কে উল্লেখ করিবার স্থান এখানে আমরা পাইব না। তবে রাশিয়া এ সম্পর্কে আরও আলোচনা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এদিকে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণে সুপার হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ার করিয়া মজুত করিবার যে-সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যেমন উপেক্ষার বিষয় নয়, তেমনি মার্কিণ পরমাণু শক্তি কমিশন হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংস শক্তি সম্বন্ধে যে-দাবী করিয়াছে, তাহাও অত্যন্ত ভয়াবহ।

সম্প্রতি মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র এমন এক ধরণের হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ারীর পদ্ধতি বাহির করিয়াছে, যাহার বিস্ফোরণ-শক্তি হইবে ৪৫ মেগাটন অথবা ৪৫ মিলিয়ন টন। কয়েক মাস পূর্ব্বেও বিশেষজ্ঞগণ নাকি এই বোমা তৈয়ার করিতে সমর্থ হন নাই। হিরোশিমায় যে পরমাণু-বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহার বিস্ফোরণ-শক্তি ছিল মাত্র ২০ হাজার টন। গত ৫ই মার্চ্চ (১৯৫৪) বিকিনিতে যে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হইয়াছে তাহার বিস্ফোরণ শক্তি ১০ মিলিয়ন টন। উহার ধ্বংস শক্তি সম্পর্কে যে-হিসাব করা হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, উহার বিস্ফোরণের

ফলে ৫০ বর্গ মাইল স্থান সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, দুই শত বর্গ মাইল স্থান গুরুতর রূপে বিধ্বস্ত হইবে এবং সামান্য রকম বিধ্বস্ত হইবে ৬ শত বর্গ মাইল স্থান এবং অগ্নিতে ভস্মীভূত হইবে ৬ শত বর্গ মাইল স্থান। বিকিনিতে যে-হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হইয়াছে, উহার ধ্বংস শক্তির ইহা-ই হিসাব। উহার বিস্ফোরণ শক্তি যে মাত্র ১০ মিলিয়ন টন তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। নূতন হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ শক্তি হইবে ৪৫ মেগাটন বা ৪৫ মিলিয়ন টন টি-এন-টি। উহার ধ্বংস শক্তি যে কিরূপ ভয়াবহ হইবে তাহা কল্পনাতীত বলিয়াই মনে হয়। বিজ্ঞানীরা উহার ধ্বংস শক্তির পরিমাণ এখনও নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। এই হাইড্রোজেন বোমাই হাইড্রোজেন বোমার চরম উৎকর্ষতার পরিচয় দিতেছে কি না তাহাই বা কে বলিবে। গত মার্চ্চ মাসে (১৯৫৪) হাইড্রোজেন বোমার যে-বিস্ফোরণ ঘটানো হইয়াছে তাহার ছবিও প্রকাশ করা হইয়াছে। রাশিয়া ও চীনকে ভীতি প্রদর্শন করাই এই সকল বিবরণ প্রকাশের একমাত্র কারণ কি না, তাহাই বা কে বলিবে। হাইড্রোজেন বোমা নির্ম্মাণে রাশিয়া পিছনে পড়িয়া আছে কি না এবং থাকিবে কি না,তাহাও বলা কঠিন।

বৃটিশ শ্রমিক দলের বার্ষিক সম্মেলন—

স্কারবোরোতে বৃটিশ শ্রমিক দলের বার্ষিক সম্মেলন গত ২রা অক্টোবর (১৯৫৪) শেষ হইয়াছে। এই সম্মেলনে বামপন্থী বৃটিশ শ্রমিক নেতা মিঃ বিভানের পরাজয়ই একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। এই পরাজয়ের মধ্যে জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিতকরণ এবং এশিয়া সম্পর্কে বৃটিশ শ্রমিক দলের যে নীতি সূচিত হইয়াছে, তাহাই বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। বৃটেনের আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দল জয়লাভ করিবে, না, শ্রমিক জয়লাভ করিবে, সে-সম্বন্ধে অনুমান করা সম্ভব নহে। কিন্তু শ্রমিকদল জয়লাভ করিলে শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের এশিয়া ও পশ্চিম জার্ম্মানী সংক্রান্ত নীতি যে রক্ষণশীলদলের পন্থাই অনুসরণ করিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। বৃটিশ শ্রমিক দলের এই বার্ষিক সম্মেলনে দক্ষিণপন্থী শাখার নেতৃত্ব দলের উপর সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবারের বৃটিশ শ্রমিকদলের বার্ষিক সম্মেলন সম্পর্কে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, মিঃ এটলীর নেতৃত্বে বৃটিশ শ্রমিক প্রতিনিধিগণ চীন সফর করিয়া ফিরিয়া আসার পর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সম্মেলনে মিঃ এটলী কম্যুনিষ্ট চীন এবং এশিয়া সম্পর্কে অনেক ভাল ভাল কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সম্মেলনে গৃহীত নীতি এই সকল ভাল ভাল কথার সম্পূর্ণ বিরোধী।

গত আগষ্ট মাসের (১৯৫৪) মাঝামাঝি মিঃ এটলীর নেতৃত্বে বৃটিশ শ্রমিকদলের এক প্রতিনিধিদল চীন পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন। শ্রমিকগণের বার্ষিক সম্মেলনের প্রথমদিনে (২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৪) বৈদেশিক ব্যাপার সম্পর্কে বিতর্ক উপস্থিত করিয়া মিঃ
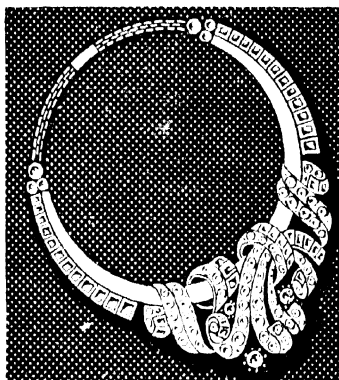
এটলী চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। চীনের কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেণ্টকে তিনি পীড়নকারী (oppressive) বলিয়া অভিহিত করিলেও, তিনি ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, এই গভর্ণমেণ্ট সরকারী বিভাগ হইতে দুর্নীতি দূর করিতে পারিয়াছে এবং চীনার এই সর্ব্বপ্রথম সৎ গভর্ণমেণ্ট পাইয়াছে। কম্যুনিষ্ট-চীন দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া দখল করিতে চায় কি না, এই প্রশ্ন সম্বন্ধে মি: এটলী বলিয়াছেন, "চীন গভর্ণমেণ্টকে ৬০ কোটি লোকের দায়িত্ব বহন করিতে হইতেছে। তাঁহারা তাঁহাদের বোঝা আরও বৃদ্ধি করিতে চাইবেন না বলিয়াই আমার ধারণা।" ফরমোসা সম্পর্কে চীনের তিক্ত মনোভাবের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, দলবলসহ চিয়াং কাইশেককে কোনও স্থানে শান্তিতে বাস করিবার জন্য অপসারিত করা উচিত। সিয়াটো চুক্তি সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া তিনি অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের ভয়ের কথা উল্লেখ করিলেও, ইহাও বলিয়াছেন "But what we must avoid is trying to form something in which you set Europeans against Asia." অর্থাৎ 'এশিয়ার বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দিগকে ব্যবহার করা আমাদের বর্জ্জন করিতে হইবে।' তিনি আরও বলেন যে, যে-কোন দেশরক্ষা ব্যবস্থা গঠন করা যাউক না কেন উহার সহিত এশিয়ার দেশগুলির কার্য্যকরী সহযোগিতা না হইলেও শুভেচ্ছা থাকা উচিত। তিনি আরও বলেন, 'চীনসহ সকলকে লইয়া একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠুক; ইহাই আমি দেখিতে চাই।'

কম্যুনিষ্ট চীন সম্পর্কে মি: এটলীর সমস্ত রকম শুভেচ্ছা সত্ত্বেও সিয়াটো চুক্তি তাঁহার সমর্থন লাভ করিয়াছে এবং সিয়াটো চুক্তির বিরোধিতা করিয়া যে-দুইটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে পুনরায় অস্ত্র সজ্জিত করা সমর্থন করিয়াও শ্রমিকদলের বার্ষিক সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। মি: বিভান বৃটিশ শ্রমিকদলের জাতীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির কোষাধ্যক্ষের পদে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই। বৃটিশ শ্রমিক দলের বার্ষিক সম্মেলনে দক্ষিণ পন্থীদের জয় এবং বাম-পন্থীদের পরাজয় হওয়ায় বৃটিশারগণ যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অনেকে মি: বিভানের পরাজয়েও একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা উহাকে 'পরাজয়ের মধ্যে জয়' বলিয়া আশঙ্কা করেন।

লণ্ডনে ডক ও বাস ধর্ম্মঘট—

সেপ্টেম্বর মাসের (১৯৫৪) শেষভাগে লণ্ডন ডকে ক্ষুদ্র আকারে যে ধর্ম্মঘটের সুরু হইয়াছে ক্রমে তাহার বিস্তৃতি বাড়িতে থাকে। ধর্ম্মঘট বাসকর্ম্মীদের মধ্যেও বিস্তৃতি লাভ করে। ১৭ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ মালখালাসকারী নৌকাগুলির মাঝিরা এবং নাবিকরাও ধর্ম্মঘট করিয়াছে এবং বৃটেনের অন্যান্য বন্দরে, এমন কি ইউরোপের মূল ভূখণ্ডেও উহা বিস্তৃতি লাভ করার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। এই ধর্ম্মঘটের বিস্তৃতি ইংলণ্ডের ১৯২৬ সালের শ্রমিক ধর্ম্মঘটের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে পাঁচ জন ইলেক্‌ট্রিশিয়ানকে বরখাস্ত করায় ৮ হাজার জাহাজ মেরামতকারী শ্রমিক ধর্ম্মঘট করে। তাহাদের অভিযোগ এই যে, 'সর্ব্বশেষ যাহাকে নিযুক্ত করা হইবে, সর্ব্বপ্রথম তাহাকে বরখাস্ত করা হইবে', এই চুক্তি উক্ত পাঁচ জন ইলেক্‌ট্রিশিয়ানকে বরখাস্ত করায় লঙ্ঘন করা হইয়াছে। এই ধর্ম্মঘটের ক্রমবিস্তৃতির বিবরণ এখানে উল্লেখ করার স্থানাভাব। প্রথমে উহার প্রতি বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে বলিয়াও মনে হয় না। ১৩ই অক্টোবর বাসকর্ম্মীদের মধ্যেও ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়।

১৭ই অক্টোবরের (১৯৫৪) সংবাদে প্রকাশ, সাড়ে চারি হাজার মাঝি এবং নাবিক ধর্ম্মঘট করায় লণ্ডন ডকে ধর্ম্মঘটীদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৭ হাজার। লণ্ডনে প্রতিদিন ৭ হাজার ৬ শত বাস ও ট্রলি বাস চলাচল করিয়া থাকে। তন্মধ্যে ৪ হাজার ১৭১টি বাস-ই ড্রাইভার ও কনডাকটার ধর্ম্মঘটের ফলে অচল হইয়া পড়িয়াছে। ডক ও বাস ধর্ম্মঘট সম্পর্কে যে-সংবাদ এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে পরিবেশন করা হইয়াছে তাহাতে এই গুরুতর ধর্ম্মঘটের কারণগুলি প্রকাশ করা হয় নাই, ইহাও লক্ষ্য করার বিষয়। ধর্ম্মঘটের নেতা ডিক ব্যারেট বলিয়াছেন, মালিকরা দাবী না মানিলে শ্রমিকরা কাজে ফিরিয়া যাইবে না; গত ১৩ই অক্টোবর ইউনিয়ন-নেতারা ডক শ্রমিকদের কাজে যোগদান করাইতে ব্যর্থ হইয়াছেন। পরিবহন ও সাধা[illegible] শ্রমিক ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী মি: এ ডিকিন গত [illegible] অক্টোবর এই ধর্ম্মঘটের জন্য কম্যুনিষ্টদিগকে দায়ী করিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তি বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথম শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের আমলে শ্রমিক ধর্ম্মঘটগুলির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

বিশ্বযুদ্ধের পরবর্ত্তী প্রথম শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের আমলে শ্রমি[illegible] ধর্ম্মঘট বড় কম হয় নাই; লণ্ডন ডকে একাধিকবার শ্রমিক ধর্ম্মঘট হইয়াছে। ল্যাঙ্কাশায়ারের ৫২ হাজার খনি-শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। লণ্ডন-স্কটল্যাণ্ড রেলওয়ের কর্ম্মীরা রবিবাসরীয় ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। এই সকল ধর্ম্মঘটের বিবরণ এখানে উল্লেখ করিবার স্থানাভাব। এই সকল ধর্ম্মঘটের জন্যও কম্যুনিষ্টদিগকেই দায়ী করা হইয়াছিল। ঐ সময় গোঁড়ারক্ষণশীল পত্রিকা 'টাইমস' মন্তব্য করিয়াছিলেন (২৩শে জুলাই ১৯৪৯), "গত চারি বৎসরের ইতিহাস ইহা প্রমাণ করিতেছে যে, সব কিছুরই জন্য আন্তর্জ্জাতিক উপদ্রবকারীদিগকে দায়ী করার অর্থ বালিতে নিজের মুখ লুকাইবার চেষ্টা মাত্র।"

দুর্গোৎসব

"দুর্গোৎসব বাঙ্গালা দেশের পরব, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এর নাম-গন্ধও নাই; বোধ হয়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল হ'তেই বাঙ্গালায় দুর্গোৎসবের প্রাদুর্ভাব বাড়ে। পূর্ব্বে রাজ-রাজড়া ও বনেদী বড়মানুষদের বাড়ীতেই কেবল দুর্গোৎসব হতো, কিন্তু আজকাল পুঁটেতেলীকেও প্রতিমা আনতে দেখা যায়; পূর্ব্বেকার দুর্গোৎসব ও এখনকার দুর্গোৎসবে অনেক ভিন্ন।"

—কালীপ্রসন্ন সিংহ।

“যেমন সাদা—তেমন বিশুদ্ধ—লাক্স টয়লেট সাবান—কি সরের মতো সুগন্ধি ফেনা এর।”

বনানী চৌধুরী বলেন।
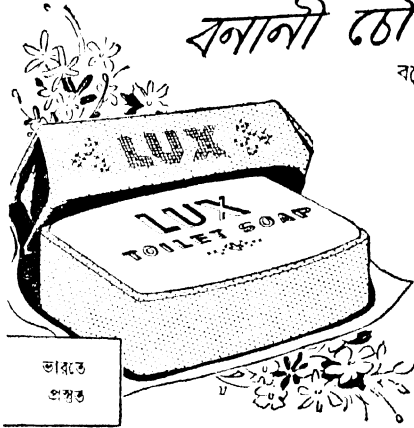
লাক্স টয়লেট সাবান এত সাদা হবার কারণ কি ? কারণ ইহা তৈরী ক'রতে কেবল সবচেয়ে বিশুদ্ধ তেল ব্যবহার করা হয়। “এক লাক্স টয়লেট সাবানেই আমার সৌন্দর্য্য প্রসাধন সম্পূর্ণ হয়” বনানী চৌধুরী বলেন। “এর সরের মতো সক্রিয় ফেনা লোমকূপের ভেতর পর্য্যন্ত গিয়ে পরিষ্কার ক'রে আমার ত্বককে রেশমের মতো কোমল, ও নির্ম্মল করে দে'য়। রোজ লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করে আপনার মুখশ্রী সুন্দর রাখুন। এর সুগন্ধও আপনার খুব ভালো লাগবে।”

সুখবর !

নতুন

বড় সাইজ

সারা শরীরের সৌন্দর্য্যের জন্য এখন পাওয়া যাচ্ছে আজই কিনে দেখুন।

“...সেইজন্যই ত আমি আরও পরিষ্কার ও ঝরঝরে মুখশ্রীর জন্য লাক্স টয়লেট সাবানের ওপর নির্ভর করি!”

★ চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান ★

LTS. 427-X52 BG

কলকাতায় এ্যামেচারদের অভিনীত নাটক

পুরনো আমলের কথা বলছি : ওল্ড ক্লাব, আনন্দ-পরিষদ, ভবানীপুর নাট্য-সমাজ ইত্যাদি সেকালের সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়দের অভিনীত বহু নাটকের প্রশংসা শুনেছি আমরা সেকালের গুণীজনের মুখে মুখে। আজও কলকাতায় সখের নাট্য সম্প্রদায়ের অভাব নেই। প্রাইভেট ক্লাব, সদাগরী কি সরকারী অফিসের কেরাণী বাবুদের হঠাৎ খেয়াল হলে রিহার্সাল বসানো ক্লাব, পুজো-আচ্চায় বারোয়ারী তলায় পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের আসর গরম করা নাটুকে-ক্লাব সব এখনো আছে। কিন্তু তাঁদের প্রোডাক্ট কি? 'সাজাহান', 'সিরাজদ্দৌলা', 'নন্দকুমার' থেকে বড়জোর 'বিশ বছর আগে' কি 'কালিন্দী'। দৌড় এর বেশী নয়। অথচ পয়সা খরচ এরা কম করেন না। ষ্টার রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নেন, নামী দোকানদারের কাছ থেকে ড্রেস ভাড়া করে আনেন, একদিনের জন্য বাদশা সাজেন ও অবশেষে লুচি-মাংসের সদ্ব্যবহার করে গৃহে ফেরেন। কিন্তু পুরনোকালের ওল্ড ক্লাব, আনন্দ-পরিষদ, ভবানীপুর নাট্য-সমাজ বহু ভাল ভাল অভিনেতার জন্ম দিয়েছেন। বাংলাদেশের ষ্টেজ গড়ার ইতিহাসে তাঁদের দান আছে। আজকের সৌখীনরাই বা তা পারবেন না কেন! মফঃস্বলের ছোট ছোট সহরে এমন কি গ্রামেও রয়েছে এমনি বহু দল। তাদের মধ্যেও হয়ত রয়েছে দু' একজন শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী কি দুর্গাদাস। যথেষ্ট সাহায্য, সুযোগ ও কালচারের অভাবে প্রতিভা হয়ত চিরতরে সেখানে হয়ে যাবে নিঃশেষিত। গৃহ-কর্ত্তার তর্জ্জনী পল্লীগ্রামের কোন কিশোর শিশিরকুমারের অস্তিত্ব চিরতরে করবে লুপ্ত। সঙ্গীত-নাটক আকাদেমী কি করছেন?

সৌখীনদের নাটকে মহিলা মহিলা নয়, পুরুষ

পাড়ার রকে বসে দুই ইয়ার বন্ধু রাম আর শ্যাম রোজই আসর আদি-রসাত্মক আলোচনা থেকে সুরু করে সিনেমা ষ্টার, মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল, রাজা-উজীর কিই না চলছে তাদের। কিন্তু সখের থিয়েটারের ষ্টেজে যখন দুজনের দেখা হল তখন একজন বিশুপাগল অপর জন নন্দিনী (আমরা রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের কথা বলছি)। একজন সেজেছেন কবি। গান তার কণ্ঠে নয় শুধু, অন্তরেও। বলা যেতে পারে বিশুপাগলই একটা গান। আর একজন প্রকৃতি-কন্যা। ধানী রঙের কাপড় পরনে, কাঁচা-পাকা ধানের শীষের মত গায়ের রঙ। মুক্তির একটা হাওয়া সর্বাঙ্গে। খুসীতে ডগমগ। প্রাণরসে উচ্ছল। পাঠক-পাঠিকাগণ বিচার করুন রাম আর শ্যাম বিশুপাগল আর নন্দিনীর এই পার্ট করতে পারবে? না রাম আর শ্যামকে চেনবার পর আপনাদেরই আর ভাল লাগবে তা দেখতে? অবশ্য রাম আর রমা হলেই যে ভাল লাগবে তা বলছি না। তবু গোঁফ-কামানো শ্যামকে নন্দিনীর ভূমিকায় দেখার হাত থেকে তো আপনি পরিত্রাণ পাবেন। উদার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে এই প্রথাটি বাতিল হওয়া প্রয়োজন। না'হলে দাসী, বালা, মতি আর ননী, রাণীরাই চিরকাল বাংলার রঙ্গমঞ্চে রাজত্ব করে যাবেন।

মিনার্ভায় কি প্রদীপ জ্বলবে আবার?

'শ্যামলী'র দুইশত রজনীর পর কি চৈতন্য হল হঠাৎ মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষের? আমরা শুনতে পাচ্ছি যে মিনার্ভা থিয়েটার গৃহটির সংস্কার করা হচ্ছে। এটি যদি সত্যি হয় তো খুবই আশার কথা। রঙ্গমঞ্চই জাতির প্রাণ। 'শ্যামলী'র মঞ্চসাফল্য, রঙমহলের সংস্কার বাংলার মঞ্চে নতুন ইতিহাস রচনার আভাষ দিচ্ছে কি? মিনার্ভাও এগিয়ে আসুন। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করবার চেষ্টা করুন। তাতে সকলেরই ধন্যবাদাই হবেন তাঁরা।

দূরভাষিণীর পর উল্কা

ফ্লপ করেছে দূরভাষিণী। তাইকি বদল হল নাটকের? বদলটি শুভ সংবাদ। কিন্তু দূরভাষিণীর পর উল্কাই কি খুব উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে! এ কোটারী-মনোবৃত্তি কেন? আমরা শুনেছি শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্তও রঙমহলের কর্ত্তৃপক্ষদের নিজস্ব গোষ্ঠীভুক্ত। একটু বাইরের দিকেও তাঁরা নজর দিন। ব্যবসা করতে নেমে পুরোপুরি ব্যবসাদার হওয়াই ভাল। যে নাটক পয়সা দেবে তা যাঁরই হোক তাই তাঁরা নিন। আমাদের নিবেদন, রঙমহলের কর্ত্তৃপক্ষ নাটক-নির্ব্বাচনে সময় দিন, উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিন।

বকুল—পুরনো আইডিয়া। নিউ থিয়েটার্সের কাছ থেকে এ জিনিষ আশা করিনি

বাংলাদেশের দুর্ভাগ্যই বলবো এবছর পূজোয় 'বকুল' ছাড়া নতুন ছবি নেই

জমিদারের মেয়ে। বাপ মা নেই। ছেলে-মেয়ে দু চোখে দেখতে পারে না। যা খুশী তাই করে বেড়ায়। কখন [illegible] মাইল স্পীডে মোটর হাঁকাচ্ছে। কখন বাড়ীতে চুপচাপ [illegible] সারাদিন কাটিয়ে দিলে। অর্থাৎ খামখেয়ালী নম্বর ওয়ান। পুরোনো কলেজ-বন্ধুকে রাস্তা থেকে ডেকে একদিন তুলল গাড়ীতে

সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি
পুষ্পগন্ধে সুরভিত
ক্যাস্টর অয়েল
বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

সৎসাহিত্যের পুরস্কার

রবীন্দ্র পুরস্কার, জগত্তারিণী পদক, লীলাপদক, দিল্লীর নরসিংহ দাস পুরস্কার—মোটামুটি এই কয়টি পুরস্কার বাংলা দেশের সাহিত্যকারদের অদৃষ্টে সাধারণতঃ লাভ হয়। বাংলা সাহিত্য ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম স্বীকৃত হলেও দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত লেখকদের পুরস্কৃত করার জন্য কোনও সাধারণ তহবিল গঠিত হয়নি। বাংলা দেশের ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে বিরাট রসগ্রাহী সমাজ কিঞ্চিৎ সচেষ্ট হলেই একটি বিরাট তহবিল সৃষ্টি করতে পারেন। সম্প্রতি বাংলা দেশের কয়েকজন সাহিত্যকারদের বাংলার জনপ্রিয় রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় চা পানে আপ্যায়িত করেছেন, সংবাদপত্রে মুদ্রিত সংবাদে জানা গেল। তাঁরা ভুরিভোজনের সময় কি বিষয় আলোচনা করেছেন, সে কথা আমাদের জানা নেই,—কিন্তু যদি তাঁরা বাংলার অন্যতম দানবীর ও বর্তমান রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারের কাছে এই সাধারণ তহবিলের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন, তাহ'লে একটা ব্যবস্থা হ'লেও হতে পারে। রাজ্যপালের আপ্রাণ চেষ্টায় দার্জিলিং-এর ষ্টেপ্ এসাইড্ আজ জাতীয় সম্পত্তি। ব্যক্তি ও দল নির্বিশেষে বাংলার সাহিত্যিকবৃন্দের কি এই বিষয়ে কিছু একটা করা অসম্ভব?

কবরের সাহিত্য

সম্প্রতি মার্কিণ মুলুক থেকে কয়েকটি ভ্রাম্যমান ছাত্র এদেশে জ্ঞানচর্চায় এসেছেন। তাঁদের অন্যতম ডোনাল্ড স্মীথ বোম্বের সাংবাদিকদের কাছে সখেদে বলেছেন—"ভারতীয় পুস্তক সংগ্রহের বুভুক্ষায় তিনি বহু ভারতীয় রেল ষ্টেশনের গ্রন্থ-বিপণিতে ঘুরেছেন কিন্তু দেখেছেন সেখানে কেবল মার্কিণী-যৌন-রোমান্স এবং চটুল রহস্য-কাহিনীর সুলভ সংস্করণ। তাঁর মতে সাধারণ মার্কিণ দেশবাসীর রুচির প্রতিফলন এর মধ্যে নেই, এই সাহিত্য কবরের সাহিত্য।"

আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, বিদেশীর চোখে এদেশী সাহিত্য না তুলে ধরে, ধরছি বিদেশী অশ্লীল সাহিত্যের পসরা। এই প্রচারের পিছনে কি সরকারী সমর্থন আছে? সরকারের এই বিষয়ে অবিলম্বে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।—

চার্লস ল্যাম্বের বাড়ী

চার্লস ল্যাম্বের বাড়ী 'ল্যাম্বস্ কটেজ'-এডমনটন সম্প্রতি বিক্রয়ার্থে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। এই বাড়ীতেই প্রবন্ধকার চার্লস ল্যাম্ব আর তাঁর বোন মেরী জীবনের শেষদিনগুলি যাপন করেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে লণ্ডন রোডে হঠাৎ পড়ে যাওয়ার পর তাঁর মৃত্যু ঘটে।

বাড়ীটির অবস্থা অতি চমৎকার, এবং প্রাচীন স্মৃতিসৌধ হিসাবে সংরক্ষিত হওয়ার কথা ছিল। এই বাড়ীতেই মেরী ল্যাম্ব দীর্ঘকাল মানসিক রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। বাড়ীটি ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দের এবং একজন শিল্পী তখন এইখানে বাস করতেন। সমগ্র বাড়ীটার দাম—সাড়ে চার হাজার পাউণ্ড।

গ্রীমের রূপকথা

আলসাস্ লোরেনের সিসটারসিয়ান মনাষ্টারীর কর্তৃপক্ষ 'গ্রীমস্ ফেয়ারী টেলসে'র পাণ্ডুলিপির মালিক, গত বছর এই পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনীর জন্য লণ্ডনে পাঠানো হয়েছিল। সম্প্রতি সেই পাণ্ডুলিপি ৭৫,০০০ ডলারে বিক্রয় করা হয়েছে। সম্প্রতি ডাঃ মার্টিন বোডমার এই মূল্যে পাণ্ডুলিপি কিনেছেন। এই সুইস ভদ্রলোক পৃথিবীর বহু মূল্যবান পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে রেখেছেন। এই পাণ্ডুলিপির পত্রাঙ্ক ১১৩ এবং সম্ভবতঃ ১৮০৬ থেকে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে জেকব এবং উইলহেলম গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় রচনা করেছিলেন। পাণ্ডুলিপিতে মোট ৪৭টি গল্প আছে এবং কয়েকটি গল্পের স্কেচ আছে। কয়েকটি গল্প প্রচলিত গল্পগুলির মতই—তবে অনেকগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে। আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের অনেক পাণ্ডুলিপি নাকি মুদির দোকানের ঠোঙা হিসাবে বিক্রী হয়েছে, এই সংবাদ সম্প্রতি একজন প্রবীণ সাহিত্যিকের কাছে জানা গেল।

জোলার নতুন বই

জোলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "Earth" ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছে,—১৮৯১ খৃষ্টাব্দ থেকে এই গ্রন্থ ইংরাজী সাহিত্য পাঠকের কাছে সুলভ ছিল না। জোলার অধিকাংশই বাংলায় অনূদিত হয়েছে। বিখ্যাত গ্রন্থ 'নানা'র বাংলা সংস্করণ বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির মাত্র পাঁচ সিকা দামে প্রকাশ করেছেন।

পৃথিবীর পাঠাগার

প্যারিসের ন্যাশানাল লাইব্রেরী, পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা ৩৭০০০০০। ন্যাশানাল লাইব্রেরীর ন্যায় অধিকসংখ্যক পুস্তক পৃথিবীর অন্য কোন পাঠাগারে নাই। ইহার পর বিলাতের বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীর স্থান, এই লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ২৩০০০০০। আমেরিকার ওয়াশিংটন সহরের কংগ্রেস-লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সমান। নীচে পৃথিবীর কয়েকটি বিখ্যাত পাঠাগারের পুস্তকসংখ্যা দেখানো হচ্ছে।

লেনিন গ্রাড সাধারণ পাঠাগার	২০৪৪০০০,
প্রাসিয়ান ষ্টেট্ পাঠাগার	১৭৭০০০০,
মিউনিক সাধারণ পাঠাগার	১৪০০০০০,
ষ্ট্রাসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগার	১২০০০০০,
ম্যাড্রিড ন্যাশানাল পাঠাগার	১১২৫০০০,
ভিয়েনা ষ্টেট পাঠাগার	১০০০০০০,
ভিয়েনা ইউনিভার্সিটি পাঠাগার	১০০০০০০,

য়ুরোপের বড় লাইব্রেরীগুলির সংখ্যা ৬০১টি, সমস্ত লাইব্রেরীগুলির মোট পুস্তকসংখ্যা ১১ কোটি ১০ লক্ষ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৩১৪টি বড় পাঠাগার আছে, সমস্তগুলির মোট পুস্তকসংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লক্ষ। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় ২২টি, এশিয়ায় ২৩টি, অষ্ট্রেলিয়ায় ৭টি ও আফ্রিকায় ৩টি বড় লাইব্রেরী আছে।

য়ুরোপের মধ্যে একমাত্র জার্ম্মাণীতে ১৬০টি বড় লাইব্রেরী আছে। ঐ লাইব্রেরীগুলির মোট পুস্তকসংখ্যা দুই কোটি। ইংলণ্ডে ১০১টি বড় লাইব্রেরী আছে, তাহাদের পুস্তকসংখ্যা এক কোটি ৭০ লক্ষ। ইটালীর ৮৫টি বড় লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা এক কোটি ৩০ লক্ষ।

য়ুরোপের সমস্ত লাইব্রেরীগুলির মধ্যে প্যারিসের ন্যাশানাল লাইব্রেরী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে উহা স্থাপিত হয়। ভিয়েনার লাইব্রেরী ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। য়ুরোপের অনেক পুরাতন ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীর কথা শুনতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কোন কোনটি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর মধ্যে স্পেনের স্যালমানকা লাইব্রেরী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; ১২৫৪ খৃষ্টাব্দে উহা স্থাপিত হয়। ষ্ট্রাসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়-লাইব্রেরী অপেক্ষা বড়। রোমের প্রাচীন ভ্যাটিকান লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা মাত্র ৫ লক্ষ, কিন্তু প্রাচীনত্বের দিক হইতে এই লাইব্রেরীর স্থান সকলের উচ্চে।

সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বই

জালিয়াৎ ক্লাইব

১৩১৪ সালে বাঙালী সাহিত্যিক সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় 'জালিয়াৎ ক্লাইব' নামক এই দুঃসাহসিক গ্রন্থ রচনা করেন। ক্লাইব নিজেই বলেছিলেন—'সময় উপস্থিত হ'লে আমি শত বারও জাল করতে প্রস্তুত আছি' তাই সুপণ্ডিত লেখক এই গ্রন্থটির নামকরণ করেছিলেন 'জালিয়াৎ ক্লাইব'। সম-সাময়িক ইতিহাস অবলম্বনে রচিত এই গ্রন্থে ইংরাজেরা কি ভাবে কলিকাতা হস্তগত করেন তার মনোজ্ঞ বিবরণ আছে। এই দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান গ্রন্থটি সম্প্রতি বসুমতী সাহিত্য-মন্দির পুনর্মুদ্রণ করেছেন। ত্রিবর্ণ প্রচ্ছদ-শোভিত এই গ্রন্থটির দাম দুই টাকা মাত্র।

ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা

এক শতকের মধ্যে রচিত, বাংলা কবিতার মধ্যে যে-সকল ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা, উল্লেখ বা ইঙ্গিত আছে, বাংলার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের ওপর সেগুলি কি প্রভাব বিস্তার করেছে "ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা" গ্রন্থে তারই অপূর্ব গবেষণা করেছেন শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গ্রন্থে অনেক নূতন কথা আছে, অনেক পুরানো কথাও আছে। গ্রন্থটি মধ্যযুগীয় বাংলার সাহিত্যের ও ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের এক উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। গ্রন্থটির প্রকাশক—শ্রীশান্তিকুমার মিত্র, মূল্য সাড়ে চার টাকা মাত্র।

মুক্ত পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ

গল্প রচনার আঙ্গিকে স্বামীজীর জীবনী রচনার প্রয়াস করেছেন শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ। স্বামীজী-চরিত্রের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুকে যথাসম্ভব মর্যাদায় রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন লেখক। সহজবোধ্য ও সরল করে জীবন-কথা বলার এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। গ্রন্থটিতে কয়েকটি সুমুদ্রিত ছবিও আছে। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন প্রাচ্যভারতী, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞান-ভারতী

ইংরাজীর মাধ্যমেই আমরা বহুবিধ বিষয়ে মূলতঃ শিক্ষালাভ করে থাকি,—ইদানীং কিন্তু মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ এবং পরিভাষা সংকলন করে এই অভিধানটি সম্পাদনা করেছেন। এই শ্রমসাধ্য কার্য বিশেষ অধ্যবসায় এবং নিষ্ঠার পরিচায়ক। পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা, জীব-বিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা, প্রাণী-বিদ্যা, স্বাস্থ্য-বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ান্তর্গত শব্দ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য অর্থ ও বিশেষ পারিভাষিক শব্দ আছে। গ্রন্থটির ভূমিকা সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখেছেন। শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা ভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক বহু জ্ঞাতব্য তথ্য পরিশিষ্ট হিসাবে প্রদত্ত হয়েছে। এই আলোচনার মধ্যে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের তালিকা, তাদের সাংকেতিক চিহ্ন, বিভিন্ন তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও গতি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস শুধু ছাত্র-ছাত্রী নয় সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের কাছেও তিনি বিশেষ ধন্যবাদভাজন। দৈনন্দিন প্রয়োজনের বস্তু এই গ্রন্থটির প্রকাশক—এম, সি, সরকার এ্যাণ্ড সন্স, লিঃ, কলিকাতা, দাম চার টাকা বারো আনা মাত্র।

অবিস্মরণীয় মুহূর্ত

বাস্তব জীবনের বিচিত্র পরিবেশে যে অপূর্ব রোমাঞ্চের ছাপ আছে, একজন মানুষের মধ্য দিয়ে যেদিন এক মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ মানুষের মূকবাসনা সার্থক হয়ে ওঠে, সেদিন সভ্যতার রথ একদিনে এক শতাব্দীর পথ পেরিয়ে যায়। তেমনই কয়েকটি দিব্য-মুহূর্তের মালা গেঁথেছেন বাংলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় অনুবাদকার, কল্লোল-যুগের অন্যতম নায়ক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের মনোরম ভাষায় রচিত বর্তমান পৃথিবীর বিচিত্র সাধনার কাহিনী "অবিস্মরণীয় মুহূর্ত" বাংলা সাহিত্যে এক সম্পূর্ণ নূতন ধরণের গ্রন্থ। এই সুমুদ্রিত গ্রন্থটির প্রকাশক—মেসার্স ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিসিং কোম্পানী। মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

সিদ্ধার্থ

জার্মাণ নোবেল লরিয়েট হারমান হেসের বিখ্যাত উপন্যাস 'সিদ্ধার্থে'র বঙ্গানুবাদ করেছেন 'শীলভদ্র'। ভগবান বুদ্ধের সমকালীন তরুণ ব্রাহ্মণ যুবক সিদ্ধার্থ নির্বাণের আশায় সংসার ত্যাগ করে কঠোর সাধনা সুরু করেন এবং বুদ্ধের বাণী তাঁকে মুক্তিপথের সন্ধান দিতে পারে না। তাই আবার তিনি জন-সমাজে ফিরে এলেন ভোগের সাধনায়। বিলাসিনী কমলার সাহচর্যে বুঝলেন ভোগেও তৃপ্তি নেই—আবার তিনি পথে এসে দাঁড়ালেন। এবার খেয়াতরীর মাঝি বাসুদেব আর নদী তরঙ্গ তাঁর সকল প্রশ্নের সমাধান করে। দুঃখ জয়ের ইঙ্গিত ও নব-জীবনের রহস্য তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। হারমান হেসের এই ছোট উপন্যাসটি অনুবাদের জন্য নির্বাচন করে অনুবাদক 'শীলভদ্র' সুরুচি ও সাহিত্য বোধের পরিচয় দিয়েছেন, তবে তাঁর অনুবাদ মাঝে মাঝে অস্পষ্ট এবং জটিল হয়েছে।

ডুবানো ময়ূরপঙ্খী কি জলের তলেও চলে?

"পাকিস্তানের দূষিত ব্রণ তবে কি আপন বিষে আপনি ফাটিবে এবং এই আধা-শরিয়তী আধা-গণতন্ত্রী সরকারের শেষটা পতন ঘটাইবে? কিছুই এ জগতে ও ক্রুর স্বার্থগন্ধী কুচক্রের দুনিয়ায় অসম্ভব নহে। ভারতের যদি সুদিন আসিয়া থাকে, তাহা হইলে বিরোধী শক্তিগুলি স্বতঃই পথের কাঁটা হইয়া প্রগতির বিঘ্ন ঘটাইতে পারিবে না। বিধাতাপুরুষ আমাদের ন্যায় হাসেন কি-না জানি না, তাঁহার হাতের অসহায় ক্রীড়াপুত্তলিগুলির অঙ্গভঙ্গীতে রঙ্গরস উপভোগ করেন কি-না জানি না। তথাপি আমরা মানুষ, সকলই মানুষের চোখের রঙে ও রসে দেখিয়া থাকি। পাকিস্তানের মার্কিণ-প্রীতির বিড়ম্বনা দেখিয়া বিধাতার পরিহাস বলিয়াই উহাকে মনে হয় না কি? বৃদ্ধ স্থবির হক সাহেবের উলটানো ময়ূরপঙ্খী নাও ডুবিয়াও কি তবে জলের তলে সাবমেরিণের গতিতে চলিতেছে? কিছুই বিচিত্র নয়। জীয়ন্ত মানুষকে হাল্কা মাটির তলায় সাত তাড়াতাড়ি কবর দিলে মড়া সুযোগ ও সুবিধামত ঠেলিয়া উঠিতে পারে; শিয়ালেও মাটি আঁচড়াইয়া দানোয় পাওয়া মড়াকে উদ্ধার করিতে পারে। শ্মশানে-মশানে শিয়াল শকুনী গৃধিনী ভূতপ্রেত দানা-দৈত্যের তো অভাব নাই। শ্মশান যে শিবের বুকে নৃত্যপরা কালী করালবদনার আস্তানা! অঘটন-ঘটনপটিয়সী মেয়ে সে। হক সাহেব জ্বরের তাড়সের পারার ন্যায় হঠাৎ নামিতে উঠিতে পারেন; কিন্তু ধুরন্ধর কূটবুদ্ধি সুরাবর্দ্দী সাহেব তো কোলাপ্সের নাড়ী রাখেন না। তিনি এই নয়-দশ বৎসরে যুক্ত বঙ্গে ও পাক্-বঙ্গে অনেক খেল খেলিয়াছেন। বৃটেন ও মার্কিণে প্রভাবিত অঞ্চল লইয়া, দুনিয়ার বাজার লইয়া, আন্তর্জ্জাতিক প্রাধান্য লইয়া চোরাগোপ্তা টক্কর চলিতেছে। সে বড় মজার লড়াই। মুখে হাসি, আস্তিনের ভাঁজে বুদ্ধির তীক্ষ্ণফলা ছুরি লইয়া সে গভীর জলের খেলা। শ্রীনেহরু এতখানি আদর্শবাদী ও আকাশে ন্যস্তদৃষ্টি না হইলে এই খরস্রোতের ঘূর্ণিপাকে অনেক সুবিধাই করিয়া লইতে পারতেন। তাঁহার রাগ আছে, বেগ আছে, দুঃসাহস আছে, কিন্তু চক্ষে যে আদর্শের ঠুলি বাঁধা। তথাপি ভারতের অদৃষ্টের গ্রহগুলি আজ তুঙ্গী, যতক্ষণ তৃতীয় কুরুক্ষেত্র না বাধে! ঐ সর্ব্বনাশটি ঘটিলেই সকলের সকল আদর্শের নামাবলী ঝড়ে উড়িয়া যাইবে। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।"

—দৈনিক বসুমতী

নূতন আবিষ্কার?

"পূর্ব-ভারতে আমরা যখন উৎসব-মত্ততায় ব্যস্ত ছিলাম তখন আমাদের ক্লান্তিহীন প্রধান মন্ত্রী কোচিন হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত তিন দিনের সমুদ্রপথে এবং তার পর দেশের অভ্যন্তরেও বিলাসপুরী বোম্বাইর বস্তী অঞ্চলে ভারত-সত্তার আবিষ্কারে তীর্থ পরিক্রমা করিতেছিলেন। "দীর্ঘকাল পূর্বে তিনি ভারত আত্মার সন্ধানে" বাহির হইয়াছেন, কিন্তু এবারের সমুদ্র-যাত্রা এবং বোম্বাইর সহরতলী পর্য্যটন নাকি এই আবিষ্কারের যাত্রায় নূতন একটি "আনন্দদায়ক, মর্মস্পর্শী এবং স্মরণীয় অধ্যায়" যোজনা করিয়াছে এবং ভারত সন্ধানী নেহরুজী ভারতের পশ্চিম তীর হইতে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, "ভারতের অগ্রগতির পথে কোনো বাধা বরদাস্ত করা হইবে না।" সংবিধান পবিত্র বলিয়া যে সব আইনবাগীশ ইহার পরিবর্ত্তনে বাধা দেন, শ্রীযুক্ত নেহরু তাঁহাদের সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, "যাহা ভারতবর্ষের প্রগতির পরিপন্থী, তাহা সাফ করিয়া দেওয়া হইবে।" সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত তালিকার কতকগুলি ধারা, বিশেষতঃ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা-মূলক সম্পত্তির অধিকার বিষয়ক ধারাগুলি "আমাদের শৃঙ্খলিত করিয়াছে। আমরা আইনবাগীশদের কবলে পড়িয়াছি।" নৌবাহিনীর সামরিক আদব-কায়দায় ভারতের যে বলদৃপ্ত ভবিষ্যৎ তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার পরই দেশের মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাইর অপরিচ্ছন্ন বস্তী তাঁহার দিবাস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে এবং মুসাফির নেহরু তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করিয়াছেন—"আমাদের দেশের লজ্জা, আমাদের জাতির অপমান। ইহাদের পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে এবং এই অপরিচ্ছন্ন জীবনের জন্য যাঁহারা দায়ী, সেই সব জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া দূরের কথা, তাঁহাদের কারাগারে নিক্ষেপ করিতে হইবে।" স্বয়ং ভারতের প্রধান-মন্ত্রীর মুখ হইতে অকস্মাৎ এই ঘোষণা ছাপার অক্ষরে পাঠ করিয়া আমরা সত্যই চমকিয়া উঠিয়াছি। কারণ এই ধরণের মন্তব্য আমরা সাধারণতঃ তাঁহাদের মুখেই শুনিয়াছি—যাঁহারা ঘোরতর রূপে কংগ্রেসের বিরোধী এবং একান্ত রূপে লাল মতবাদে দীক্ষিত! কিন্তু কংগ্রেসেরই সভাপতি এবং ভারতবর্ষেরই প্রধান মন্ত্রী যখন প্রকাশ্য ঘোষণায় বলেন যে, বস্তীগুলিকে পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে এবং বস্তীর মালিকদের জেলে পুরিতে হইবে এবং ক্ষতিপূরণের কোনো প্রশ্নই নাই—তখন এই বিপ্লবাত্মক বাণী শুনিয়া জনসাধারণ বিহ্বল চিত্তে প্রশ্ন করিবেন, ইনি কি আমাদের সেই পুরানো দিনের নেহরু, যিনি বৃটিশ সাম্রাজ্য-

মাধুর্যমণ্ডিত সৌন্দর্য—

বাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরিয়া জনগণের মুক্তির জন্য লড়াই করিয়াছিলেন কিংবা ইনি দিল্লীর গদিতে আসীন সেই মহামান্য প্রধান মন্ত্রী, যিনি সংবিধানের মারফৎ সমস্ত কায়েমী স্বার্থকে পবিত্র বলিয়া বিধান রচনা করিয়াছিলেন ?"

—যুগান্তর

নেহরুজীর বৈরাগ্য

"পণ্ডিত নেহরু প্রদেশ-কংগ্রেস-সভাপতিদের নিকট লিখিত তাঁহার পত্রে দুইটি সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন, এক, তিনি কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করিবেন ; দুই, সাময়িককালের জন্য হইলেও প্রধানমন্ত্রিত্ব ত্যাগের ইচ্ছা তাঁহার হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরুর প্রথম সিদ্ধান্তটি সমর্থন না করিবার সঙ্গত কোন হেতু নাই। বিশেষ প্রয়োজনেই তিনি কংগ্রেস-সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই প্রয়োজন পূর্ণভাবে না হইলেও বহুলাংশে সিদ্ধ হইয়াছে। সিদ্ধ না হইলেও প্রধানমন্ত্রিত্ব এবং কংগ্রেস সভাপতিত্ব একই ব্যক্তিতে কেন্দ্রস্থ ও সংহত থাকা আজ জাতীয় জীবনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে। কংগ্রেসের হাতে দেশের গবর্ণমেণ্ট, এই অবস্থায় কংগ্রেস এবং গবর্ণমেণ্ট উভয়ের নেতৃত্ব একই হস্তে থাকা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের পক্ষে ক্ষতিকর ; কারণ, কংগ্রেস্ সে ক্ষেত্রে 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েস'-এ পরিণত হইতে বাধ্য। আর দেশে কোন শক্তিশালী বিরোধী পক্ষ নাই, ইহা মনে রাখিলে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার গবর্ণমেণ্টকে গঠনমূলক সমালোচনা ও অন্যান্য উপায়ে জনমত দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার দায়িত্ব কংগ্রেসের কার্যত: থাকা চাই ; প্রধান মন্ত্রী প্রতিষ্ঠানের প্রধান যতদিন থাকিবেন, ততদিন বাস্তবে এই সুযোগ কংগ্রেসের পক্ষে পাওয়া দু:সাধ্য। কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট এবং গণতন্ত্র, এক কথায় ভারতের জাতীয় জীবনের বলিষ্ঠ অগ্রগতি ও পরিণতির জন্য প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর কংগ্রেস সভাপতি থাকা এখন আর যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন নহে। কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করার যে সিদ্ধান্ত পণ্ডিত নেহরু করিয়াছেন, তাহা সময়োচিত ও সমর্থনযোগ্য বলিয়াই সকলে মনে করিবেন।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

ইহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির কর

"লোকসভায় পাবলিক একাউণ্টস কমিটি নবম রিপোর্টে ভারত সরকারের দেশরক্ষা দপ্তরের অর্থপ্রাপ্তি, অর্থব্যয়ের পদ্ধতি এবং জমাখরচ সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়া পরপর অনেক টাকার কতকগুলি কনট্রাক্টের ব্যাপারে এবং কেনাকাটা ইত্যাদির সুবিদিত নিয়মপদ্ধতির ব্যাপারে দেশরক্ষা-দপ্তরের একেবারে অতি সাধারণ সতর্কতা অবলম্বনেও শৈথিল্য দেখিয়া গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সঙ্গেই তাঁহারা পূর্ত্ত, গৃহনির্ম্মাণ ও সরবরাহ দপ্তর এবং মাননির্দ্ধারণ ও ষ্টোর্স দপ্তরের কর্ত্তব্যে অবহেলারও তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ১১৪১ সাল হইতে ১১৫১ সাল অবধি উক্ত দপ্তরগুলি যে সকল কেলেঙ্কারী করিয়াছে তাহারও মাত্র অল্প কয়েকটিই এই রিপোর্টে প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষত: ১১৫২ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই দপ্তরগুলিতেই এ পর্য্যন্ত আরও যত কেলেঙ্কারী ঘটিয়াছে, তাহা এই রিপোর্টের আসে নাই। দেশরক্ষা দপ্তরের মতই ভারত সরকারের অপরাপর দপ্তরেও এই ধরণের নানা কেলেঙ্কারী ঘটিয়াছে এবং অহরহই ঘটিতেছে—একথা এদেশের প্রায় সকলেরই জানা। বিগত যে মাসে ভারত সরকারের ১১৫২ সালের হিসাব-পত্রাদি সম্পর্কে যে অডিট রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেশরক্ষা দপ্তরের এই সকল কেলেঙ্কারীর বাহিরেও আরও ডজনে ডজনে কেলেঙ্কারীর ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা ছাড়াও হীরাকুঁদ, দামোদরভ্যালী ইত্যাদি নদী-উপত্যকা পরিকল্পনায়, সিন্ধ্রি সার কারখানার এবং এমনি আরও অনেক কাজে কারবারে কোটি কোটি টাকা অপব্যয় ও কারচুপির কথা কে না শুনিয়াছেন ? অন্যান্য কেলেঙ্কারীর কথা বাদই দেওয়া যাক, ক্ষয় ও অপচয়ের পরিপূর্ণ বিবরণের কথাও তুলিয়া রাখুন—উপরোক্ত অডিট রিপোর্টে প্রকৃতপক্ষে যে অসম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও দেখা যায় যে, একমাত্র ১১৫২ সালের খরচপত্রের মধ্যে ভারত সরকার কমপক্ষে সাড়ে তের কোটি টাকা অপচয় এবং অপব্যয় করিয়াছেন। অথচ জনসাধারণের শিক্ষা বা চিকিৎসার জন্য বেশি খরচ করিতে বলুন অথবা কর্ম্মক্ষম বেকারদিগকে কাজ জুটাইয়া দিতে অথবা ভাতা দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে টাকা খরচের দাবী করুন—এই শাসকদের মুখে অহরহ টাকা নাই রব ছাড়া আর কোন কিছুই শুনিতে পাইবেন না।"

—স্বাধীনতা।

কোথায় চিন্তামণি ?

"অদ্য বাজার অনুসন্ধানে জানা গেল যে, বাজারে চিনি নাই বলিলেই চলে এবং কোন মূল্যেই হয়ত অতঃপর কয়দিন চিনি পাওয়া যাইবে না। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতাস্থ রিজিওন্যাল ডিরেক্টার অব ফুড, কলিকাতা হইতে ষ্টীমারে বিদেশী চিনি ও ময়দা ইত্যাদি বুকিং বন্ধ করিয়া দেন। ফলে আসামের জন্য যাবতীয় চিনি ও আটা ময়দা আমদানী বন্ধ হয়। কারণ লিঙ্ক লাইন বন্ধ থাকায় বিহার ও উত্তর প্রদেশের মিল হইতে সোজা গাড়ীতে চিনি ইত্যাদি আনাইবার ব্যবস্থাও বন্ধ। ফলে গত এক সপ্তাহ যাবৎ সমস্ত আসামে চিনি ও গমজাত দ্রব্যের নিদারুণ অভাব অনুভূত হইতেছে। প্রকাশ, কলিকাতাতে দেশী চিনির মূল্য মণপ্রতি ৭।৮৲ বাড়িয়া গিয়াছে এবং এই বর্দ্ধিত মূল্যেও দেশী চিনি পাওয়া যাইতেছে না। লিঙ্ক লাইন বন্ধ থাকায় মিলওয়ালারা পালিজা ঘাট দিয়া ষ্টীমারে মাল বুক্ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে—যদিও এই ভাবে রেলে-ষ্টীমারে মাল বুক বন্ধ করার কোন সঙ্গত কারণ মিলওয়ালাদের থাকিতে পারে না। বিদেশী চিনি বুকিং বন্ধ, দেশী চিনিও মিলওয়ালারা all-rail ছাড়া বুক করিবেন না—ফলে আসামবাসী ও আসামের উপর নির্ভরশীল ত্রিপুরাবাসী কিছুদিন চিনি না পাওয়ারই আশঙ্কা দাঁড়াইয়াছে।"

—যুগশক্তি (আসাম)

দায়ী কে ?

"কেন বন্যা হ'ল"—এ প্রশ্ন অবান্তর ! কিন্তু প্রশ্ন হ'ল : এ সম্বন্ধে সরকার কতটুকু করতে পারতো বা পূর্বাহ্নে তার কি করণীয় ছিল। কিছু মাত্র সচেষ্ট হ'লেই বর্তমান যুগে দুর্য্যোগের প্রতিক্রিয়া [illegible]

থেকে রেহাই পাওয়া আজ আর অবাস্তব অসম্ভব নয়। আমাদের জিজ্ঞাসা—বন্যার ধ্বংসলীলা প্রতিকারের ব্যবস্থা হিসাবে পূর্বাহ্নে সরকার পক্ষ থেকে কতখানি প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। গত ৫০ সন থেকেই তিস্তার গতি ভিন্নপথ ধরে ক্রমাগত দক্ষিণ-পূর্ব দিকের ঢালু জমির মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যাবার ঝোঁক নিয়েছে। তা' ছাড়া স্থানীয় জনসাধারণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তিস্তার বুকের উপর ৪ থেকে ৫ ফুট বালুর চড়া পড়ায় স্থায়ী সংকটের কথা বার বার ঘোষণা করে আসছেন এবং কর্তৃপক্ষের দৃষ্টির গোচরে এক বর্ষার পূর্বেই আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবী এঁরা জানিয়েছেন। সরকারী কোন এক প্রতিবাদলিপিতেও উক্ত কথার সত্যতা আমরা লক্ষ্য করতে পাই। আবার অনেকেই নব প্রতিষ্ঠিত লিংক লাইনের গতিপথের গোলযোগের দরুণই বর্তমানে একপ বন্যা প্রতি বৎসর সংঘটিত হচ্ছে—অন্যতম কারণ হিসাবেও এরা অবিহিত করেছেন। বর্ষার প্রারম্ভেই যে একপ দুর্বিপাক ঘটতে পারে সেরূপ ধারণা কোন ক্রমেই অমূলক নয় এবং হ'লও তাই। এ বিষয়ে বাস্তব, সিদ্ধান্তের পরিবর্তে উপস্থিত মহাসংকটের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বর্ষার ঠিক প্রারম্ভে কর্তৃপক্ষ দারজিলিং-এর শৈলশিখরে আর মহাকরণের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আরাম কেদারায় মৌজ করে বসে 'বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করে নিজেদের কর্তব্য খালাস করলেন। আজ তাঁদের ত্রুটির ফলে যে সর্বনাশ সংঘটিত হ'ল তার দায়িত্ব সরকারকেই পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে হবে।" —জনমত।

ইহাকে প্রাদেশিকতা বলা চলে না

"বাঙ্গালা দেশে সব প্রদেশের লোক আছে। সব প্রদেশে বাঙ্গালীও আছে। কিন্তু তার মধ্যে একটা কথা এই যে, অন্য প্রদেশের বাঙ্গালী সেখানে যাহা উপার্জ্জন করেন তাহা সেখানেই খরচ করেন। বাঙ্গলায় ভিন্ন প্রদেশীয়েরা যাহা উপার্জ্জন করেন তার অধিকাংশই নিজ নিজ প্রদেশে প্রেরিত হয় এবং এখানে যে টাকা থাকে তাহা অবাঙ্গালী ব্যাঙ্কে থাকে, অবাঙ্গালী ব্যবসাতেই খাটে। একমাত্র চটকল এলাকার পোষ্টাফিসগুলি হইতে কত টাকা বাঙ্গলার বাহিরে যায় তার কিছু নমুনা দেওয়া গেল—

১৯৪৪	...	২,৮৩,০২,৬৩১ টাকা
১৯৪৫	...	৩,২৯,৩৭,৫৬৭
১৯৪৬	...	২,৭৪,৫২,৬৩১
১৯৪৭	...	২,১১,১১,৬০১

ইহার পরবর্তী অঙ্ক সংগ্রহ করা যায় নাই। পোষ্টাফিসে দাঁড়াইলে আজকাল দেখা যায় ইনসিওরেন্সের কাউণ্টারে লম্বা লাইন, চার পাঁচ ছয় শত টাকা করিয়া গয়লা, আলুওয়ালা প্রভৃতি দেশে পাঠাইতেছে। ইহারও কোন হিসাব পাওয়া যাইতেছে না, তবে বেশ কয়েক কোটি টাকা এদিক দিয়াও বাহিরে যাইতেছে ইহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী কর্মবিমুখ এই অপবাদ আছে। কিন্তু ষ্টেট বাস ড্রাইভার, হকার, কলকারখানা প্রভৃতিতে আজকাল দেখা যায় অতি শ্রমসাধ্য কাজও বাঙ্গালী করিতে চাহিতেছে এবং করিতেছে। কাজে মন নাই, দায়িত্ববোধ কম, কেবলই দল পাকানো এবং ইউনিয়ন গড়া ইত্যাদি অপবাদও বাঙ্গালীর খুব আছে, অনেকে সুযোগ পাইলে বাঙ্গালী নিতে চান না ইহাও ঠিক, কিন্তু সে সব দোষ অবস্থা একটু ভাল হইলেই দূর হইবে। এখন যার প্রয়োজন দেড় শত টাকা, সে উপার্জ্জন করিতে পারে ষাট বা সত্তর টাকা, বিরক্তি ও হতাশা তাহার মনোবৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশে বাধা দেয়।

আমরা মনে করি, অর্থোপার্জ্জন ক্ষেত্রে বাঙ্গালা সরকার বাঙ্গালীকে সাহায্য করিলে তাহাকে প্রাদেশিকতা বলা উচিত নয়। অন্য যে কোন প্রদেশে গিয়া কাজ পাওয়ার সুযোগ যদি বাঙ্গালীর থাকিত, তবে আমরা বলিতাম এখানেও সবাই বিনা বাধায় আসুক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতেছে না। বাঙ্গলায় অবাঙ্গালী সুযোগ পায়, বাঙ্গালী ঘরেও পায় না, বাহিরেও না। এই অবস্থা চলিতে পারে না, এবং ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টাকে প্রাদেশিকতা বলা অন্যায়।" —যুগবাণী

পুরনো চাল !

"নেহরু-সেনানায়ক চুক্তি, নেহরু-কোটলেওয়ালা চুক্তি এবং সর্বশেষ ভারত-সিংহল চুক্তি—কোনটিতেই সিংহল-প্রবাসী ৭ লক্ষ ভারতীয়ের ন্যায়সঙ্গত মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। আমরা যেরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলাম, সেইরূপই হইয়াছে। নয়াদিল্লী হইতে যে তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আসল সমস্যা সমাধানের বিশেষ কোন ইঙ্গিত নাই। অধিকাংশ বিষয়ই সিংহল সরকারের বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয়েরা প্রধানতঃ শ্রমিক হিসাবে সিংহলে গিয়াছে। সিংহল সরকার তাহাদের নাগরিকত্ব স্বীকার করিলে তাহারা শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে। সুতরাং গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার একটানা চেষ্টা হইতেছে। সাম্প্রতিক চুক্তিতেও চাবিকাঠি সিংহল

সরকারের হাতেই রহিয়া গিয়াছে। ৭ লক্ষ লোকের সকলের নাম তালিকাভুক্ত করিবে না। যদি ৫ লক্ষ ভারতীয় সিংহলের নাগরিক হইতে চায়, তাহাদের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করিতে কোন ক্রমেই দুই বৎসর লাগিবার কথা নয়। সিংহল সরকার দীর্ঘ মেয়াদ লইয়াছেন নূতন সুযোগ সৃষ্টির আশায়। চুক্তির জন্য সিংহলের গরজটাও কম ছিল না। ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেতাকে লইয়া বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল চাপ দেওয়া। সেই উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হইয়াছে। সিংহলে খাস সিংহলীর পরিমাণ মোট অধিবাসীর শতকরা ৫৭ ভাগ, ভারতীয়দের সংখ্যা শতকরা ৯ জন। সুতরাং ভারতীয়গণের সমস্যা লইয়া সিংহলীরা চিন্তিত। দিল্লী চুক্তির ফলে তাহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে। চুক্তি করিয়া তাহা রক্ষা করার মনোবৃত্তি সিংহল সরকার অদ্যাবধি দেখান নাই। ভারতীয় হাই কমিশনার কেশবনের কাকুতি-মিনতি হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত সরকারের অনুরোধ-উপরোধ, সব কিছুই আমরা এ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইতে দেখিয়াছি। কাজেই নূতন চুক্তিতে পাকাপাকি ভাবে কার্যপদ্ধতি নির্ধারিত না হওয়ায় আমরা নিশ্চিন্ততার কোন কারণ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না।" —লোকসেবক।

কল্যাণীর কল্যাণে

"কিছুদিন পূর্ব্বে বীরভূম করগেটেড্ টিন এসেছে। সরবরাহ বিভাগের মারফৎ বিভিন্ন দোকান হতে বিভিন্ন অঞ্চলের চাহিদা মেটাবার জন্য। টিনের বাণ্ডিল খুলে দেখা যাচ্ছে তাতে বড় বড় ফুটো এবং কাটা ভাঙ্গা ব্যবহারী করগেট। ব্যাপার কি? দোকানী বলে এগুলি কল্যাণী কংগ্রেসের ব্যবহৃত টিন। মোটা মোটা বল্টু আঁটা রয়েছে, প্রায় আধ ইঞ্চি ফুটো রয়েছে কোন কোনটিতে ৬।৮টি দাম কিন্তু নূতন বাণ্ডিলের সমান। কল্যাণী কংগ্রেসের ধুমধামের ঠেলা যে এতদিনে বীরভূমের গ্রামবাসীকে বহন করিতে হবে তা ছিল তাদের ধারণার অতীত। দল নিরপেক্ষতার চমৎকার নমুনা!" —বীরভূম বাণী।

দৃষ্টি এদিকে পড়ুক

"তেঁতুলতলা বাজারের পূর্ব্বদিকে একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটি আসিয়া বিজয়চাঁদ রোডে মিলিত হইয়াছে। এই রাস্তা দিয়া বহু লোকজন চলাচল করে। রিক্সা গোগাড়ী মোটর প্রভৃতিও চলাচল করে। রাস্তাটির প্রতি মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের যে মনোযোগটুকু আবশ্যক দুঃখের বিষয় তাহা দেওয়া হয় না। রাস্তায় জঞ্জাল স্তূপীকৃত হইয়া থাকে। অব্যবস্থা তো আছেই। উপরন্তু রাস্তায় বাজার বসে, মাল-বোঝাই গোগাড়ী ও রিক্সা রাস্তায় বহুক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ইহার ফলে প্রত্যহ যাতায়াতকারী লোকজনকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। পুলিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে পড়িলে আমরা সুখী হইব।" —বর্দ্ধমান বাণী।

ভোটমাতার মহিমা অপার!

"মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম এলেকার লোকসভার নির্ব্বাচন আরম্ভ হইতেছে। ভোটদাতাগণকে ভোট দিতে হইবে। আমরা বিগত নির্বাচনে দেখিয়াছি, কোন কোন ভোটদাতা পোলিং বুথের দিশেহারা হইয়াছেন, ব্যালট ব্যাক্সে ভোটপত্র না দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছেন, যে বাক্সে ভোট দিবে মনস্থ করিয়াছিলেন ভোট দেওয়ার সময় অন্যটিতে দিয়াছেন। কেহ বা সব দলের মন রক্ষার জন্য ব্যালটপেপার ছিঁড়িয়া প্রতি দলের বাক্সে এক একটি টুকরা দিয়াছেন, আবার কেহ বা ফুল দুর্ব্বা দিয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া বলিয়াছেন, হে ভোট মাতা, তোমার মহিমা অপার! এগুলি হইয়াছে রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাবে। আবার সত্যই অপার, কারণ এই ভোটে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি কোটি কোটি লোকের পরিচালক হইয়া থাকেন। জনগণের অনভিজ্ঞতার সুযোগে ভাল লোক যেমন গিয়াছেন আবার কিছু ধাপ্পাবাজ নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া ভোট আদায় করিয়াছে, ইহাতে দেশবাসীই প্রতারিত হইয়াছেন। গণতান্ত্রিক দেশের ভোটারের দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য অসীম। তাঁহারা যে শক্তি সমর্পণ করিবেন তাহা দ্বারা দেশের যেমন কল্যাণ হয় আবার ভুলক্রমে দুষ্ট প্রকৃতির কে কে হাতে সেই শক্তি দিলে তাহা দ্বারা দেশ ধ্বংসের পথে নামিয়া যায়।" —সমাজ (মেদিনীপুর)।

বাঙ্গালী কোথায় যাইবে?

"ধলভূম পরগণা যে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল, একথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এখানকার বাঙ্গালী সমাজকে বাদ দিলেও আদিবাসী বলিয়া যাহাদের গণ্য করা হয় (সাঁওতাল, খাড়িয়া প্রভৃতি) তাহারা সকলেই কথিত বাংলা ভাষায় অধিকার রাখে। এখানে অল্পবিস্তর যাহা সাঁওতাল সাহিত্য মুদ্রিত হয় তাহারও অক্ষর বাংলা। বৃহত্তর বাংলারই ইহা একটি অংশবিশেষ, তাহা ভাষাগত ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বোঝা যায়। সম্প্রতি বিহার সরকার আদিবাসী উন্নয়নের অজুহাতে এই সমস্ত আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার নামে যে হিন্দী প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন তাহা হইতে প্রমাণ হয় যে, ধলভূম পরগণা কোনক্রমেই হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চল নয়। হিন্দী ভাষা যে এখানকার আদিবাসীদের বোধগম্য নহে, তাহারও একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ সরকার ঘাটশীলা অঞ্চলে যে খাড়িয়া বস্তি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করিতেছেন তাহার জন্য একজন খা[illegible] অফিসারকে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার মা[illegible] অধিবাসীদের কাছে খাড়িয়া ভাষায় বিবৃত করাই তাহার [illegible] এই খাড়িয়াগণ অনায়াসেই বাংলা বুঝিতে পারে, কিন্তু সরক[illegible] অত্যুগ্র হিন্দী প্রীতির ফলে এই ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।"

নবজাগরণ (জামসেদপুর)

হিমঘর পাইলাম

"কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে ও জেলা কেন্দ্রীয় বিপণন সমিতির উদ্যোগে বর্ধমান জেলার মেমারী অঞ্চলে একটি হিমঘর ও দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের উদ্যোগে অপর একটি হিমঘর স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে জানিয়া সুখী হইয়াছি। এইরূপ হিমঘরের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বর্ধমান জেলার মেমারী, জামালপুর, কালনা ও কাটোয়া মহকুমায় প্রচুর পরিমাণে সব্জী উৎপন্ন হয়। সংরক্ষণের অভাবে কৃষকগণকে অল্প মূল্যে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়। জেলাবাসীর সহযোগিতায় অবিলম্বে পরিকল্পনা রূপায়িত হইবে বলিয়া আমরা ভরসা করি।"

—বর্দ্ধমান!

যন্ত্রের যন্ত্রণা

"পুরুলিয়া সহরে বর্তমানে ইলেকট্রিক লাইটের যে বিপর্যয় চলিয়াছে, তাহা অমার্জনীয়। এই বর্ষায় অন্ধকার রাত্রিতে বিজলী বাতির খুঁটিগুলি আলোহীন অবস্থায় দাঁড়াইয়া পথচারীর দুর্ভোগ দেখিয়া যেন সহরবাসীকে ব্যঙ্গ করিয়া চলিয়াছে। বিজলী বাতির ব্যাপার কি আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যদি আলো জ্বলেও তাহাতেও রাস্তা আলো হয় না, এত নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ। লোকে ত কষ্ট পাইতেছে তাহার উপর আলো না জ্বলিলেও যদি মিউনিসিপ্যালিটিকে পুরা চার্জ দিতে হয় তবে আর কোন কথা নাই। এই অব্যবস্থার জন্য কে দায়ী তাহা জনসাধারণ জানিতে চাহে। ইহার প্রতিকার অবিলম্বে স্থায়িভাবে করা প্রয়োজন। আশা করি, মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অবিলম্বে অবহিত হইবেন এবং এই অবাঞ্ছিত বিপর্যয়ের কারণ সম্বন্ধে সহরবাসীকে অবহিত করিবেন।"

—মুক্তি (পুরুলিয়া)।

এক্ষুণি কিছু করুন

"মহকুমার অবস্থার কথা বার বার আমরা জানাইবার চেষ্টা করিয়াছি। অধিকাংশ জায়গায় আবাদ নাই। যে সামান্য জমিতে আবাদ হইয়াছে তার ধানের অবস্থাও শোচনীয়। জলাশ্রয়ের নীচে কোথাও কোথাও জমিতে আবাদ হইয়াছে এবং চাষের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল কিন্তু মোট জমির পরিমাণের তুলনায় তাহা নগণ্য। গত কয়েক দিনের মধ্যে বিনপুর ও ঝাড়গ্রাম থানার বহু অঞ্চলে আমরা আমাদের প্রতিনিধিকে পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহার নিকট যে বর্ণনা পাইতেছি তাহা ভয়াবহ। ঝাড়গ্রাম থানার ঝাড়গ্রাম হইতে লোধাশুলী মানিকপাড়া খালশিউলী চাড়দা রাউতারাপুর পর্য্যন্ত এ দিকে দুধকুণ্ডি ইউনিয়নে আবাদ মোটেই হয় নাই বলা চলে। যে সামান্য আবাদ হইয়াছে তাহাতেও ব্যাপক পোকা লাগিয়াছে। বিনপুর থানার দহিজুড়ী, আধারিয়া নপুর হাড়দা কাকো প্রভৃতি ইউনিয়ানের জমির বৃহৎ অংশ নাবাদী হইয়া পড়িয়া আছে। সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা হাড়দা নিয়ানের। হাড়দার নিকট হইতে যে বিরাট মাঠ রহিয়াছে। তা সম্পূর্ণ ভাবে অনাবাদী পড়িয়া আছে। কোথাও একটি চারাও পোতা হয় নাই। ছোট বড় সকলের মুখে হতাশা ও অবসাদের ভাব। কাজ-কর্ম্ম নাই। খাবার নাই। ধান নাই। টাকা পয়সা নাই। গরু-বাছুর কাঁসা-পিতলের বাসন পর্য্যন্ত যে বন্ধক পড়িয়াছে না হয় বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। একে অনাবাদী তাহার উপর সেটেলমেন্টের আবির্ভাব, সামান্য যা কিছু সম্বল ছিল তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে সেটেলমেণ্টএর বন্যা থেকে নিজেদের জমি জায়গা রক্ষার জন্য। আমীনের পিছনে ঘোরা ক্যাম্পে হাজির হওয়া ইহাই হইতেছে অনেকের প্রধান কাজ। সংসারের ...র অভিযোগের কথা ভাবিবার সময়ও অনেকের নাই। ...র মধ্যেই বহু বাড়ীতে ২।১ দিন অন্তর সামান্য কিছু ...র জুটিতেছে। শীঘ্রই তাহাও আর জোটান যাইবে না এই ক... সকলে বলিতেছে। অবিলম্বে খয়রাতী সাহায্য টেষ্ট রিলিফ ...য় ধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনাবাদী জমিতে তিসি ... চাষের ব্যবস্থার জন্য সরকারকে আগাইয়া আসিতে হইবে। বীজ ও চাষের খরচের জন্য অর্থ দিতে হইবে, মহকুমার প্রকৃত অবস্থাকে গোপন রাখিয়া রিপোর্ট প্রস্তুত হইতে পারে কিন্তু তাহাতে অসংখ্য লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, কেহই বাঁচাইতে পারিবে না। এ বৎসর লোক নিঃশব্দে আর মরিবে না। মরিবার আগে বাঁচিবার চেষ্টা করিয়া সমস্ত দেশে এক অরাজকতার সৃষ্টি করিবে। তাই এখন হইতে ব্যবস্থার প্রয়োজন।"

—নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)

শোক-সংবাদ

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

বাঙ্গলার প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার গত ১৬ই অক্টোবর শনিবার অপরাহ্নে নীলরতন সরকার হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রায় এক মাস কাল যাবৎ যকৃতের পীড়ায় অসুস্থ হইয়া তিনি হাসপাতালে ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। বাংলার খ্যাতনামা এবং নির্ভীকতম সাংবাদিকদের অন্যতম শ্রীযুক্ত মজুমদার ১৮৯৩ সালে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার খারিনদা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যকাল ও কৈশোর কুচবিহারে অতিবাহিত হইয়াছে। এখানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুচবিহারের রাজবাটীতে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কৈশোর জীবন হইতেই স্বাধীনচেতা সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯০৭ সালে রাজনৈতিক কারণে তিনি বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হন এবং তাহার পর হইতে এই নির্ভীক মানুষটির জীবন-সংগ্রাম সুরু হয়। যৌবনে একান্ত নিঃস্ব অবস্থায় কলিকাতায় আসিয়া রামকৃষ্ণ-মিশনের গণেন মহারাজ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি মনীষীদের সংস্পর্শ লাভ করেন এবং শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজীদের অনুপ্রেরণায় তিনি বিবেকানন্দ চরিত রচনা করেন। তাহার পর সত্যেন্দ্রনাথ দেশ... চিত্তরঞ্জনের সংস্পর্শে আসিয়া সেদিনের বিখ্যাত পত্রিকা '...' নিয়মিত ভাবে লিখিতে থাকেন। এই পত্রিকাতেই ...র পদে প্রসন্ন রায়চৌধুরীর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাকে সা... সম্পাদনায় বরণ করিয়া লন। স্বর্গতঃ প্রফুল্লকুমার
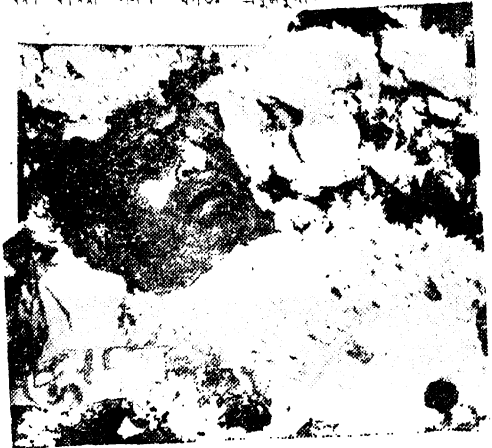
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া আনন্দবাজার অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবার কিছুকাল পরে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ইহার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাহার পর ১৯২২ সাল হইতে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত তিনি দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক পদে নিযুক্ত ছিলেন। সাংবাদিক হিসাবে তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি, নির্ভীক মতবাদ প্রচারের জন্য শীঘ্রই সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁহাকে তিনবার কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। শুধু সাংবাদিক হিসাবে নয়, দেশের স্বাধীনতা অর্জনে কংগ্রেসের সংগ্রামের সহিত সত্যেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। সুবক্তা হিসাবেও তাঁহার বিশেষ সুনাম ছিল। প্রথম জীবনে তিনি অভিনয় কলাতেও দক্ষতার পরিচয় দেন। ১৯৪০ সালের পর সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ক্রমান্বয়ে গ্লোব সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, স্বরাজ ও সত্যযুগ সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং কিছুকাল যুগান্তর ও বসুমতীর সহিতও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রগতিশীল সাপ্তাহিক অরণি পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের অন্যতম সভাপতিরূপে তিনি সাংবাদিকদের উন্নতি বিধানে বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ১৯৫১ সালের আগষ্ট মাসে ভারত হইতে রাশিয়ায় প্রেরিত এক সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। জওহরলালের আত্মচরিতের অনুবাদ, আমার দেখা রাশিয়া, ষ্ট্যালিনের জীবনী প্রভৃতি মূল্যবান পুস্তক তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রথম যৌবনে তিনি স্বৈরিণী নামে একখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। রসরচনার জন্যও সত্যেন্দ্রনাথ সুবিখ্যাত ছিলেন। 'নন্দীভৃঙ্গী' ছদ্মনামে তাঁহার বহু রসরচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পাঠকবর্গের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের শেষ গ্রন্থ 'আমার দেখা রাশিয়া' মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাঙ্গালার সংবাদ-পত্র জগৎ একজন প্রতিভাবান বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাংবাদিক হারাইল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।"

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাত্রি ৮॥ ঘটিকায় কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মেদিনীপুর জেলার হিজলীতে ৬৭ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিছুদিন হইতে তিনি দুরারোগ্য হাঁপানী রোগে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার দুই পুত্র, স্ত্রী ও পুত্রবধূ ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ বঙ্গাব্দ ১২৯৪ সনের আষাঢ় মাসে বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার আদিনিবাস শান্তিপুরের নিকট হরিপুর গ্রামে। পিতার নাম দ্বারকানাথ সেনগুপ্ত। যতীন্দ্রনাথ এফ, এ, পাশ করিয়া শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে প্রবেশ করেন ও তথা হইতে ১৯১১ সালে বি, ই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কর্মজীবনের অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত হয় বহরমপুরে। কৃষ্ণনগরে থাকা কালীন তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা' আত্মপ্রকাশ করে। বাল্যে ও কৈশোরে কাশীরাম দাসের মহাভারত ও পাঠ্যপুস্তকের কবিতা ছাড়া অন্য কিছু পা[ঠ] করিবার সুযোগ পান নাই, পরে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে প্রবেশে[র] পর তাঁহার রবীন্দ্র-কাব্যের সহিত পরিচ[য়] ঘটে। আধুনিক কবিগণের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী তাঁহার কবিতার ভাষা ও ভাবের বলিষ্ঠত[া] এবং তীব্র অনুভূতির আত্মস্থতা অতিশয় লক্ষ্যণীয়।' তাঁহার বিখ্যাত কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে 'মরীচিকা,' 'মরুশিখা,' 'মরুমায়া' ও 'সায়ম' উল্লেখযোগ্য। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' অবলম্বনে তিনিও একখানি 'কুমারসম্ভব' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার কাব্য সঞ্চয়ন 'অনুপূর্বা'ও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তিনি 'মাসিক বসুমতীর' একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁর অনূদিত 'ম্যাকবেথ' সম্প্রতি 'মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।
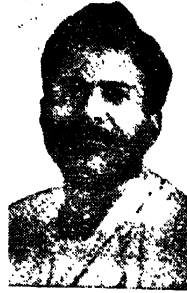
মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী

"হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজের প্রাক্তন যুগ্ম-সম্পাদক মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী ৭৯ বৎসর বয়সে তাঁহার বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। পরলোকগত মুনীন্দ্রপ্রসাদ স্বর্গত স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর অন্যতম ভ্রাতা। মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র হইতেছেন অধ্যাপক শ্রীমৃণাল সর্বাধিকারী ও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীমৃগেনচন্দ্র সর্বাধিকারী। কবি মুনীন্দ্রপ্রসাদের ব্যক্তিত্ব চরিত্রগত আদর্শ ও উদারতার জন্য বন্ধু ও পরিচিতবর্গ সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার কাব্য ও সাহিত্য গ্রন্থের মধ্যে 'মানসকুঞ্জ', 'মানস-সরো[জ]', 'হৃদয়লহরী', 'নবীনের সংসার', 'নবতারা', 'শুভেন্দু কলঙ্ক', 'Pulsation', 'Rambling Thoughts' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ 'Pulsation' য়ুরোপ ও অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য দেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। ব্যক্তিগত জীবনে অনেক সাধক ও মহাপুরুষের সহিত তাঁ[হার] ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি বসুমতীর একজন নিয়মিত লেখ[ক] ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা গভীর দুঃখ বোধ করিতেছি।"

হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"সোনারপুরের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান শান্তি সংসদের সভাপতি সু-অভিনেতা হিসাবে খ্যাত শ্রীহরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কালোদা) মাত্র কয়েক দিনের অসুখে হঠাৎ গত ২৩শে আশ্বিন তারি[খে] পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৭ [বৎসর] হইয়াছিল। তিনি বরযাত্রী, বাঁশের কেল্লা, ভোর হয়ে রিক্সাওয়ালা প্রভৃতি ৭ খানি ছবিতে অভিনয় করিয়া[ছেন] বর্তমানে ২ খানি ছবিতে অভিনয় করিতেছিলেন। তি[নি] ... ও ২টি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।"

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্তৃক মু[দ্রিত]